সূচীপত্র

সূচীপত্র

৭৩ বর্ষ : ১২শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২০শে ভাদ্র, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 5th September, 1968

বে-সরকারী বাসে ভাড়া বৃদ্ধি

শারদোৎসব আসছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়তে শুরু করেছে। এমনিতেই কোনো জিনিসের দাম স্বাভাবিক নয়, তারপর দাম আরো বৃদ্ধি পেলে সাধারণ মানুষের দুর্দশা কীরকম হয়—তা বলাই বাহুল্য। অথচ বেতনভোগী, কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষক প্রমুখ সাধারণ বেতনভুক শ্রেণীগুলির মাইনে বৃদ্ধি পায় না। এই অবস্থায় সরকারের উচিত ছিল—যথার্থ দ্রব্যমূল্য স্থিরীকৃত রাখা। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার অথবা রাজ্য সরকার এমন কোনো উদ্যম গ্রহণ করেন নি—যাতে অনুমান করা যেতে পারে যে, সাধারণ রোজগারসম্পন্ন মানুষগুলির প্রতি সরকার সহানুভূতিশীল ও সদয়।

দ্রব্যমূল্য যে সময় ঊর্ধ্বগতির দিকে এবং সাধারণ মানুষের আয়ের পথ সীমিত, সে সময় আর একদিকে তাদের ব্যয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদনে বে-সরকারী বাসের কিছু মালিক। চব্বিশ পরগনা ও কলকাতার উপকণ্ঠের কয়েকটি অঞ্চলের বে-সরকারী বাসে যাত্রীদের ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

পক্ষকাল পূর্বে এই পত্রিকার 'বঙ্গদর্শনে' আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল যে, কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্পোরেশন তাদের বাসে চড়ার জন্য যেহেতু ভাড়া বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, সেহেতু বে-সরকারী বাসের মালিকদেরও যাত্রীদের ভাড়া বৃদ্ধির জন্যে উসকে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের আশঙ্কা মিথ্যা নয়, বে-সরকারী বাসের যাত্রীদের ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণে তা প্রমাণিত হোল।

আমাদের প্রশ্ন : এইভাবে ভাড়া বৃদ্ধির জন্যে কার বা কাদের মস্তিষ্ক ক্রিয়া করেছে? একেই তো অ-সাধারণ ব্যয়ের চাপে জনসাধারণের শ্বাসরোধ হবার উপক্রম, এরপর কোন উর্বর মস্তিষ্ক থেকে জনসাধারণের ব্যয়ভার বৃদ্ধির ব্যবস্থা বের হয়েছে। জানি না, রাষ্ট্রপতির শাসনের নামে, এভাবে জনসাধারণকে হাতে নয়, ভাতে মারার অধিকার কে দিল?

আমরা আগেই বলেছি—স্টেট বাসের ভাড়া বৃদ্ধির প্রশ্ন অবাস্তব। তেমনি আমরা মনে করি, বে-সরকারী বাসে ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক ও অন্যায়।

এমন একদিন ছিল যখন যাত্রীদের সুবিধা করার নামে ভাড়া বাড়িয়ে দেওয়া হতো। পরে দেখা যেত, সুবিধার নামে যে আশ্বাস দেওয়া হয়, তা ধাপ্পা ছাড়া আর কিছুই নয়। বারবার লোক ঠকানো যায় না, বা বারবার ঠকে লোকে শেখে—তাই মামুলি সেই পথ-এ এখন ভাড়া বাড়ানোর কথা বলা হয় না। দ্বিতীয়ত এক পয়সা ভাড়া বৃদ্ধির প্রশ্নে কয়েক বছর আগে যে অঘটন ঘটেছিল—তা এখনো সবাই স্মরণ করতে পারেন।

অধুনা তাই, নিজেদের খুব চালাক ভেবে কেউ ঢাক-ঢোল পিটিয়ে ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব করে—আর কেউ বা রাতারাতি ভাড়া বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে। স্টেট বাস কর্তৃপক্ষের এখন যা অবস্থা—তাতে জনসাধারণের মতিগতি বোঝার জন্যে আগেভাগে জানিয়ে ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে; আর বে-সরকারী বাস-মালিকদের একটি শ্রেণীর বুকের পাটা বর্ধিত রুটে খুব শক্ত হওয়ায় তারা রাতারাতি অর্থাৎ দু'-একদিনের নোটিশে ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কিন্তু বে-সরকারী বাসে ভাড়া বৃদ্ধি হবে কেন? (১) ভাড়া বৃদ্ধির জন্যেই বা কার অনুমতি পাওয়া গেছে? (২) পেট্রোলের দাম কি বেড়েছে? (৩) বে-সরকারী বাসেও কি মাথাভারী প্রশাসনের কুকীর্তি স্থাপিত হয়েছে? (৪) বে-সরকারী বাসে বিক্রিত টিকিটের হিসেব কি ঠিকভাবে রাখা হয়? (৫) বে-সরকারী অধিকাংশ বাসের রুট বাড়ানো হয়েছে, তবু কি আয় বাড়ে নি? (৬) সরকার যদি ভাড়া বৃদ্ধির অনুমোদন দিয়ে থাকে—তাহলে কোন্ কোন্ জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে ভাড়া বৃদ্ধি সংক্রান্ত কথা সরকার বৈঠকে বসে বলেছে? এবং জনপ্রতিনিধিরাও কি ভাড়া বাড়াবার অনুমতি দিয়েছে? (৭) যে কোন বাসযাত্রীর ধারণা রুট বর্ধিত হবার পর বে-সরকারী বাসগুলির আয় বহুলাংশে বেড়েছে, আর বে-সরকারী মালিকদের কেউ কেউ যদি মনে করেন আয় বাড়ে নি—তাহলে স্টেট বাসগুলিকেও বর্ধিত রুটে চলার ব্যবস্থা ধীরে ধীরে করা হলে ক্ষতি কি?

আশা করি, এইসব প্রশ্ন স্থির মস্তিষ্কে রাজ্যপাল বিবেচনা করবেন। তবে আমাদের ধারণা ভাড়া বাড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই। অধিকন্তু আমাদের শেষ প্রশ্ন : বে-সরকারী বাসের কিছু মালিক যদি মনে করেন—এখন তাদের ক্ষতি হচ্ছে, তাহলে সরকার এখনই তাদের লাইসেন্স নাকচ করে বর্তমান হারে যাঁরা বাস চালাতে পারবেন তাঁদেরই আহ্বান করা উচিত।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় যখন কোন 'ডার্ক হর্স' বাজী মাৎ করে তখন 'ফেভারিট' ঘোড়ার সমর্থকেরা বেকুব বনে যায় বটে, কিন্তু সেই বিজয়ী অজ্ঞাত-কুলশীল ঘোড়ার পৃষ্ঠপোষকরা মোটা ডিভিডেন্ড লাভ করেন। মেরিল্যাণ্ডের গভর্নর স্পাইরো থিয়োডোর এগ্নিউ রাজনীতির ক্ষেত্রে তেমনি একজন ডার্ক হর্স বা প্রায় অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি, ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পদের নির্বাচনে যদি তিনি জয়লাভ করতে পারেন তবে রিচার্ড নিকসন তাঁর উমেদার হিসেবে অবশ্যই চড়া ডিভিডেণ্ড দাবি করতে পারবেন। কারণ ফ্লোরিডার মিয়ামী বীচ-এ অনুষ্ঠিত রিপাবলিকান দলের প্রতিনিধি সম্মেলনে আমেরিকার আসন্ন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনে রিচার্ড নিকসন দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মনোনয়ন লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই নিকসন ঘোষণা করলেন যে, তাঁর সহযোদ্ধা হবেন মেরিল্যাণ্ড রাজ্যের ৪৯ বছর বয়স্ক গভর্নর এগ্নিউ। এর আগে এগ্নিউ-এর নাম কোন বিদেশী তো বটেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও খুব বেশি লোক শোনে নি।

রাজনীতিতে এগ্নিউর হাতেখড়ি মাত্র সেদিনের ঘটনা। মাত্র দু' বছর আগে '৬৬ সনে তিনি গভর্নর পদে নির্বাচন-প্রার্থী হন তখনই জনসাধারণের মধ্যে তাঁর খানিকটা পরিচিতি হয়। গত বছর যখন মেরিল্যাণ্ডের গভর্নর হিসেবে শপথ নেন তখন সে পরিচয়ের পরিধি সামান্য বাড়ে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। সেনেট-প্রতিনিধি সভার সদস্য হলে বহির্জগতে যে প্রচারলাভের সুযোগ ঘটে, গভর্নর এগ্নিউর ক্ষেত্রে তা ঘটার অবকাশ ছিল না। গভর্নর নির্বাচিত হবার আগে তিনি ছিলেন বাল্টিমোর কাউণ্টির প্রধান কর্ম-কর্তা মাত্র। কাজেই রাজনীতিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে কেমন করে?

কারণ আরো রয়েছে। এগ্নিউ জন্ম-সূত্রে আমেরিকান নন, গ্রীক। তাঁর বাবা ১৮৯৭ সনে আমেরিকায় স্থায়িভাবে বসবাস করার উদ্দেশ্যে গ্রীস ছেড়ে চলে আসেন এবং বাল্টিমোর শহরে একটা

স্পাইরো এগ্নিউ

রেস্তোরাঁ করে রোজগারের উপায় করেন। এঁদের পদবী ছিল এ্যানাগনস্টোপোলাস, তাকেই সংক্ষেপে করা হয়েছে এগ্নিউ বলে।

এগ্নিউর জন্ম অবশ্য আমেরিকার বাল্টিমোর শহরেই ১৯১৮ সনে। এখান-কারই সরকারী স্কুলে তিনি শিক্ষালাভ করেন এবং জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর রসায়ন বিজ্ঞান পড়েছেন। অতঃপর তিনি আইন অধ্যয়ন করেন বটে কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে যাওয়ায় তখনকার মত তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে হল।

যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে তিনি অফিসার পদ লাভ করেন এবং বাল্‌জ, ফ্রান্স ও জার্মানীর যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করার এবং মূল্যবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগ লাভ করেন। যুদ্ধের শেষে সেনাবিভাগ থেকে ছাড়া পেয়ে এগ্নিউ আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যান এবং '৪৭ সনে আইনের স্নাতক হন। কিন্তু আইন ব্যবসা সুরু করার আগেই তাঁকে আবার কোরিয়ার যুদ্ধে যেতে হয় পদস্থ সামরিক কর্মচারী হিসেবে। ফিরে এসে '৫২ সালে এগ্নিউ প্রথমে একটা আইন ব্যবসায়ী সংস্থায় যোগ দিলেন এবং পরে নিজেই একটা আইন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান খুলে বসলেন এবং পুরোদমে ওকালতি সুরু করলেন। ব্যবসায় বেশ কিছু অর্থ সঞ্চয় করার পর '৬২ সনে এগ্নিউ কাউণ্টির প্রধান কর্মকর্তার ভার নিলেন এবং নিজেকে ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের মত উপযুক্ত করে তুলতে লাগলেন।

এলেনর ইসাবেল জুডিফন্ডের সঙ্গে এগ্নিউর বিয়ে হয় ১৯৪২ সনে। তাঁদের ৪টি সন্তান।

এগ্নিউর কৃতিত্ব এখানে যে, তিনিই প্রথম গ্রীক যিনি আমেরিকার একটা অঙ্গরাজ্যের গভর্নরের পদ লাভ করেছেন। যদি প্রেসিডেণ্ট পদে রিচার্ড নিকসন জয়লাভ করতে পারেন তবে নিকসনের গৌরব অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু রেকর্ড সৃষ্টি করবেন এগ্নিউই। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অতবড় সম্মানীয় পদ ইতিপূর্বে কোন গ্রীক বংশোদ্ভূতের ভাগ্যে জোটে নি ভবিষ্যতেও কখনো জুটবে কি না সন্দেহ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, রিপাবলিকান দল কি ডেমোক্রাটিক দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবেন?

চেকোশ্লোভাকিয়ার সংকট

নির্মল বসু

চেকোশ্লোভাকিয়ায় পঞ্চ কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের সৈন্য প্রবেশের চেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা হ'ল, এই বহিঃসৈন্যের সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ হওয়া সত্ত্বেও তারা চেকোশ্লোভাকিয়ার জনগণকে বাগে আনতে পারে নি। চেক নেতারা কোনরূপ সামরিক প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেন নি, অহেতুক রক্তপাত এড়ানোর জন্য তাঁরা জনগণকেও নীরবে প্রতিবাদ জানাবার পরামর্শ দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও সারা দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে দখলদার সৈন্যের সঙ্গে অসহযোগিতা করেছে, হাজারে হাজারে নরনারী সোভিয়েট ট্যাঙ্কের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, এবং দেশের স্বাধীনতা রক্ষার সঙ্কল্প নিয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে তারা অগ্রসর হয়েছে। ডুবসেক নেতৃত্বের সমর্থনে সমগ্র দেশ ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছে এবং সোভিয়েটের পক্ষে কোন তাঁবেদার সরকার গঠন করা সম্ভব হয় নি।

চেকোশ্লোভাকিয়ার জনগণের এই শক্তির উৎস কোথায়?

জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৮ সালে যখন নতুন রাষ্ট্ররূপে চেকোশ্লোভাকিয়ার জন্ম হয়, তখন থেকেই এই দেশ গণতন্ত্রের পথ অনুসরণ করে আসছে। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে যখন একের পর এক গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে, তখন মাসারিক ও বেনেসের নেতৃত্বে এই দেশে গণতন্ত্র দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চেকোশ্লোভাকিয়া পশ্চিমী গণতন্ত্রের দেশ ও সোভিয়েট য়ুনিয়ন, দু-এরই প্রশংসা ও সমর্থন লাভ করেছে। স্ট্যালিন ও অন্যান্য সোভিয়েট নেতাদের সঙ্গে চেক নেতাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পূর্ব য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে যখন কমিউনিস্ট অভ্যুত্থান হয়, তখনও চেকোশ্লোভাকিয়া এর থেকে বাদ ছিল। অনেক পরে, সর্বশেষে, ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারীতে গটওয়াল্ডের নেতৃত্বে চেকোশ্লোভাকিয়াতে কমিউনিস্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, বেনেস সরে যেতে বাধ্য হন। কিন্তু তখনও দেখা গেছে, চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট শাসন অন্যান্য দেশের তুলনায় কিছুটা পরিমাণে গণতন্ত্রের নীতি অনুসরণের চেষ্টা করেছে। পরবর্তীকালে অবশ্য গটওয়াল্ডও কঠোর নিয়ন্ত্রণের পথ গ্রহণ করেন, গটওয়াল্ডের পর নভোটনির আমলে তা আরও কঠোর রূপ ধারণ করে। স্ট্যালিনবাদের পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৫৩ সালে স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর, এবং বিশেষ করে ১৯৫৬ সালে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি সম্মেলনে ক্রুশ্চভ কর্তৃক স্ট্যালিন আমলের নানা কুকীর্তি ফাঁসের পর, পূর্ব য়ুরোপের নানা দেশে স্ট্যালিনপন্থী নেতৃত্ব ও স্ট্যালিন-পন্থার শাসন-পরিচালনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ সুরু হয়। যুগোস্লাভিয়া অবশ্য অনেক আগেই স্ট্যালিন ও সোভিয়েট নেতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে। চেকোশ্লোভাকিয়ায় বিক্ষোভ থাকলেও তা খুব একটা আত্মপ্রকাশ করে নি। গত বৎসর ৩১শে অক্টোবর প্রাগে বিশ্ব-বিদ্যালয় ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলের মধ্যে প্রথম নভোটনি-শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ পায়। ছাত্ররা অর্থনৈতিক সংস্কার ও বুদ্ধিজীবীর স্বাধীনতা দাবি করে। বিক্ষোভ যে কেবল ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, জনগণের সর্বস্তরে, এমন কি পার্টি ও সরকারের নেতাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, তা বোঝা যায় ৫ই জানুয়ারী, ১৯৬৮ তারিখে চেকোশ্লোভাকিয়া কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে। এই বৈঠকে চেকোশ্লোভাকিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি অ্যানটনিন নভোটনিকে দলের প্রথম সম্পাদকের পদ থেকে অপসারিত করে তাঁর জায়গায় আলেকজান্ডার ডুবসেককে নির্বাচিত করা হয়। এই বৈঠকেই এতদিনের শাসনের বিচ্যুতি বিশ্লেষণ করে গণতন্ত্রীকরণের নীতি অনুসরণের সংকল্প ঘোষণা করা হয়।

ডুবসেকের নেতৃত্বে চেকোশ্লোভাকিয়ায় যে গণতন্ত্রীকরণের কাজ সুরু হয়, তার মূল কথা কি? ৫ই এপ্রিল চেক কমিউনিস্ট পার্টি যে 'কর্মসূচী' (Action Programme) গ্রহণ করে, তাতে বলা হয়, এতদিন যে নীতি অনুসরণ করা হয়েছে তা সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে। কেন্দ্রীকরণের নামে আমলাতন্ত্র শক্তিবৃদ্ধি করেছে। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা হয়েছে, এবং সঙ্কীর্ণতা এমন কি জাতি-বিদ্বেষের পথ গ্রহণ করা হয়েছে। ক্ষমতার অপব্যবহার ও মুষ্টিমেয় ব্যক্তির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এর ফলে, জনগণের মধ্যে উদ্যোগ নষ্ট হয়েছে, এবং অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও চেকোশ্লোভাকিয়ার মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে।

এই অবস্থার পরিবর্তনের জন্য 'কর্মসূচীতে' সমাজতন্ত্রের পাশাপাশি গণতন্ত্রের সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে, পরবর্তী কয়েক মাসে গণতন্ত্রীকরণের যেটুকু কাজ হয়েছে তা হ'ল: সংবাদপত্রের পূর্ণ [illegible] স্বীকার, এবং নভোটনির [illegible] ও বিতাড়িত [illegible]। চেক নেতারা আর যে চেষ্টা [illegible] ছিল, তা হল, পশ্চিমী [illegible] সঙ্গে আরও বেশি [illegible] সম্পর্ক স্থাপন, এবং [illegible] জার্মানীর সঙ্গে কূটনৈতিক [illegible] প্রতিষ্ঠা। লুডউইক [illegible] প্রথমে ৭০ জন বুদ্ধিজীবী [illegible] এবং পরে ৩০ হাজার নব-নারীর স্বাক্ষরিত [illegible]-বিখ্যাত 'দুই হাজার শব্দের [illegible]' (Two Thousand Words) দাবির বহর অনেক: সংস্কার ও [illegible] প্রকাশ্য সমালোচনার অধিকার চাই, ধর্মঘট ও বিক্ষোভ পরিচালনার অধিকার চাই, স্বাধীন নির্বাচন চাই, আইনসভায় বিরোধী দলের অস্তিত্ব চাই। ডুবসেক ও অন্যান্য কমিউনিস্ট নেতারা এই দলিলকে অগ্রাহ্য করেছেন, এবং অদূরদর্শী রাজনৈতিক বুদ্ধিপ্রসূত বলে একে অভিহিত করেছেন। তবে গণতন্ত্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্বত্র অবশ্য সোভিয়েট কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে এবং দাবি উঠেছে: সোভিয়েটপন্থীদের হটাও।

চেক নেতারা নিজের দেশের অবস্থার উপযোগী সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে চান। এ ব্যাপারে তাঁরা অপরের খবরদারী মানতে রাজী নন। ডুবসেকের ভাষায় "চেকোশ্লোভাকিয়ার জন্য যে সমাজতন্ত্র উপযোগী তা গড়ে তোলার জন্য আমরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চাই।" (জুলাই মাসে টেলিভিশন ভাষণ)। এটা আজ নতুন কিছু নয়। যুগোস্লাভিয়া, এবং পরে চীন, আলবানিয়া, রুমানিয়া সবাই এই পথে চলেছে। চেকোশ্লোভাকিয়াই বা পারবে না কেন? গণতন্ত্রীকরণের যে কর্মসূচী চেক কমিউনিস্ট পার্টি গ্রহণ করেছে, তা সমাজতন্ত্র থেকে সরে আসা কোন কর্মসূচী নয়। তাছাড়া, সোভিয়েট য়ুনিয়ন ও অন্যান্য কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত থেকেই, ওয়ারশ গোষ্ঠীর সদস্যরূপেই, চেকোশ্লোভাকিয়া থাকতে চায়—এ কথা বারে বারে ঘোষণা করা হয়েছে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার এই নতুন পরিস্থিতিতে সোভিয়েট য়ুনিয়ন ও ওয়ারশ চুক্তিগোষ্ঠীর অন্যান্যরা এত বিচলিত কেন? প্রথম কথা, মুখে যাই বলুন, সোভিয়েটের পছন্দ নয় এমন কোন সমাজতন্ত্রের কর্মসূচী কোন দেশ অনুসরণ করুক, এটা সোভিয়েট য়ুনিয়নের নেতারা চান না। যুগোশ্লাভিয়া ও (চীন ও আলবানিয়ার কথা যদি বাদও দিই) রুমানিয়ার সঙ্গে সোভিয়েট য়ুনিয়নের মতভেদ ও মনোমালিন্যের এই প্রধান কারণ। দ্বিতীয়ত, গণতন্ত্রীকরণকে তাঁদের বড় ভয়। পার্টি নেতৃত্বের সামগ্রিক কর্তৃত্বের যে অনুশাসন তাঁরা সর্বত্র গড়ে তুলেছেন, তার বিপরীত কোন ব্যাপার কোন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে হলে তার ছোঁয়াচ তাঁদের দেশেও এসে পড়বে। চেকোশ্লোভাকিয়ার গণতন্ত্রীকরণের ধাক্কা প্রথম এসে পড়বে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বা পূর্ব জার্মানীতে, তারপর পোল্যাণ্ডে, এবং তারপর সোভিয়েট য়ুনিয়ন সহ সব কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে। তৃতীয়ত, গণতন্ত্রীকরণের নাম করে দেশের অভ্যন্তরে সমাজতন্ত্রবিরোধী ও প্রতিবিপ্লবীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। ইতিমধ্যেই 'দুই হাজার শব্দের' আড়ালে এই শক্তি উঁকি মারছে। বিদেশী শক্তির সাহায্যে প্রতিবিপ্লবীরা যদি কোন রকমে চেকোশ্লোভাকিয়ায় সমাজতন্ত্রের অবসান ঘটাতে পারে, তাহলে কেবল চেকোশ্লোভাকিয়াতেই সমাজতন্ত্রের ক্ষতি হবে না, অন্য দেশেও, বিশেষ করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে সমাজতন্ত্রের বড় রকম ক্ষতি হবে। সোভিয়েটের বক্তব্য, পশ্চিম জার্মানী সীমান্ত অতিক্রম করে বহু অনুচর অনুপ্রবেশ করেছে, তারা দেশের অভ্যন্তরে প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে যোগসাজসে নাশকতামূলক কাজের জন্য তৈরি হচ্ছে। চতুর্থত, সোভিয়েট য়ুনিয়ন তথা কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর নিরাপত্তার প্রশ্ন। য়ুরোপে এখনও উত্তেজনা রয়েছে। দুই শিবিরের সৈন্য এখনও মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—এক দিকে ন্যাটো চক্র, আর একদিকে ওয়ারশ চুক্তি। এই পরিপ্রেক্ষিতে চেকোশ্লোভাকিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার উত্তরে পূর্ব জার্মানী ও পোল্যাণ্ড, পূর্বে সোভিয়েট য়ুনিয়ন, দক্ষিণে হাঙ্গেরী ও পশ্চিমে অস্ট্রিয়া ও পশ্চিম জার্মানী। গণতন্ত্রীকরণের সুযোগ নিয়ে যদি অস্ট্রিয়া ও পশ্চিম জার্মানী সীমান্ত পার হয়ে 'ন্যাটো' গোষ্ঠীর অনুচর প্রবেশ করে এবং শেষ পর্যন্ত চেকোশ্লোভাকিয়ায় তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তিন দিকে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির বিপদ। এই অবস্থায় পূর্ব জার্মানীর রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষা করা পর্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। 'প্রাভদা' এই কথাই বারে বারে বলেছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ তাঁদের নিজেদের নিরাপত্তার জন্যই দরকার। বহু পূর্বে বিসমার্কও ঠিক এই কথাই বলেছিলেন, 'বোহেমিয়া যার দখলে থাকবে, সারা য়ুরোপের ওপর সে কর্তৃত্ব করবে।' বোহেমিয়া এখন চেকোশ্লোভাকিয়ার অঙ্গীভূত।

সোভিয়েট নেতারা চেক নেতাদের সঙ্গে আপোষের জন্য চেষ্টা করেছেন। জানুয়ারী থেকে আগস্ট, বারে বারে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। ২৯শে জানুয়ারী ডুবসেক মস্কো গিয়েছেন, সোভিয়েট নেতাদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, তাঁরা সমাজতন্ত্রের পথ থেকে বিচ্যুত হন নি। সোভিয়েট য়ুনিয়ন তথা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগোষ্ঠীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে, এমন কোন কাজ তাঁরা করবেন না। ২৩শে মার্চ ড্রেসডেনে চেকোশ্লোভাকিয়া সহ ওয়ারশ গোষ্ঠীর সকল রাষ্ট্রের নেতাদের বৈঠক হয়। ১৭ই মে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সি কোসিগিন প্রাগ আসেন। ১৪ই জুলাই ওয়ারশতে সোভিয়েট য়ুনিয়ন, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া ও পূর্ব জার্মানীর নেতাদের বৈঠক হয়—আমন্ত্রণ সত্ত্বেও চেকোশ্লোভাকিয়া এই বৈঠকে যোগ দেয় নি। ওয়ারশ বৈঠক থেকে পাঁচ কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের নেতারা চেকোশ্লোভাকিয়ার উদ্দেশে এক কড়া চিঠি দেন। তাঁরা বলেন: "এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, যার ফলে চেকোশ্লোভাকিয়ায় সমাজতন্ত্র বিপন্ন হয়েছে, এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বার্থও ক্ষুন্ন হতে বসেছে। সুতরাং তাঁরা এ ব্যাপারে চুপ করে বসে থাকবেন না। চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপার কেবল তার একার ব্যাপার নয়। ইতিমধ্যে ওয়ারশ গোষ্ঠীর ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ সুরু হয়ে গেছে। চেক সীমান্ত বরাবর সোভিয়েট য়ুনিয়ন ইদানীংকালের বৃহত্তম সামরিক মহড়ার অনুষ্ঠান করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২৯শে জুলাই চেক-সোভিয়েট সীমান্তে ক্ষুদ্র চেক শহর সিয়েনা নাদ তিসুতে সোভিয়েট ও চেক নেতাদের মধ্যে বৈঠক হয়। সোভিয়েট য়ুনিয়নের পক্ষে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভ, প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সি কোসিগিন, সুপ্রীম সোভিয়েটের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি নিকোলাই পডগরনি, তাত্ত্বিক নেতা মিখাইল সুসলভ সবাই ছিলেন। চেক প্রতিনিধি দলে ডুবসেক ছাড়াও ছিলেন, রাষ্ট্রপতি লুডউইক সবোডা, প্রধানমন্ত্রী অলড্রিচ চার্নিক, ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীর সভাপতি জোসেফ স্মরকোভস্কি প্রমুখ বিশিষ্ট নেতারা। শেষ পর্যন্ত সিয়েনাতে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা মীমাংসা হয়। ৩রা আগস্ট শ্লোভাকিয়ার রাজধানী ব্রাতিস্লাভায় ওয়ারশ গোষ্ঠীর অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে এই মীমাংসাসূত্র অনুমোদিত হয়। সোভিয়েট ও চেক নেতারা ছাড়া পোল্যাণ্ডের ভ্ল্যাডিস্ল গোমুলকা, হঙ্গেরীর য়ানোস কাদার, বুলগারিয়ার টোডর ঝিবকভ ও পূর্ব জার্মানীর ওয়ালটার উলব্রিখট ব্রাতিস্লাভা বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। সিয়েনা ও ব্রাতিস্লাভায় স্থির হয়েছে, সোভিয়েট পক্ষ চেকোশ্লোভাকিয়ার গণতন্ত্রীকরণের অধিকার স্বীকার করে নেবেন, ডুবসেক নেতৃত্বকেও তাঁরা গ্রহণ করবেন, তবে তার বিনিময়ে চেকোশ্লোভাকিয়াকে কতকগুলো ব্যবস্থা করতে হবে। প্রথম, সংবাদপত্রের ওপর (এবং রেডিও ও টেলিভিশনের ওপর) কঠোরতর নিয়ন্ত্রণ চালু করতে হবে। দ্বিতীয়, পশ্চিম জার্মানী ও অস্ট্রিয়া সীমান্তে কড়া পাহারা বসাতে হবে। আর, তৃতীয়, ওয়ারশ চুক্তি-গোষ্ঠীর সঙ্গে সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করতে হবে।

ব্রাতিস্লাভার পর সবাই হাসিমুখে নিজের নিজের দেশে ফিরেছেন। উলব্রিখট বোধ হয় পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারেন নি। তাই ১২ই আগস্ট আবার তিনি কারল ভিভ্যারি এসেছেন ডুবসেক ও অন্যান্য নেতার সঙ্গে কথা বলার জন্য। তারপর তিনিও হাসিমুখে পুষ্পার্ঘ্য হস্তে দেশে ফিরে গিয়েছেন।

এই অবস্থায়, হঠাৎ, ২০শে আগস্ট রাত্রির গোপন অন্ধকারে সোভিয়েট য়ুনিয়ন ও ওয়ারশ গোষ্ঠীভুক্ত অপর চারটি রাষ্ট্রের সৈন্যের চেকোশ্লোভাকিয়া প্রবেশ আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও কূটনীতির পর্যবেক্ষকদের রীতিমত বিস্মিত করেছে। অবশ্য ক'দিন ধরেই 'প্রাভদায়' চেক নেতাদের কিছু কিছু সমালোচনা বের হচ্ছিল। কিন্তু এর ওপর বিশেষ কেউ গুরুত্ব আরোপ করেন নি। 'ব্রাতিস্লাভা স্পিরিটে' সবাই আশ্বস্ত বোধ করছিলেন।

সোভিয়েট পক্ষের সৈন্যরা সমগ্র দেশের ওপর তাদের দখল স্থাপন করেছে। পার্টি দপ্তর, ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী ভবন সব কিছু অবরোধ করেছে। ডুবসেক থেকে সুরু করে প্রধান নেতাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে অজ্ঞাতস্থানে নিয়ে গেছে। চেক জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সর্বত্র দখলদার সৈন্যদের প্রতিরোধ করেছে—সর্বপ্রকারে তারা এদের সঙ্গে অসহযোগিতা করেছে। চেক জনতার বিক্ষোভ এতটা স্বতঃস্ফূর্ত তীব্র ও কার্যকরী হয়েছে যে, চেক নেতারাও এতে বিস্মিত ও অভিভূত

হয়েছেন। ওয়ারশ গোষ্ঠীর নেতারা বোধ হয় এই অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সৈন্যবাহিনীর সমর্থনের জোরে একটা তাঁবেদার সরকার স্থাপনের চেষ্টাও তাঁদের সফল হল না। চেক জনগণ অত্যন্ত ঐক্যবদ্ধভাবে ডুবচেকের পেছনে দাঁড়িয়েছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁরা চেক নেতাদের সঙ্গে আপোষের চেষ্টা করেন। সবোভা এবং পরে ডুবচেক, চার্নিক, স্মরকোভস্কি, হুসাক সবাইকে মস্কো নিয়ে যাওয়া হয়। চেক নেতাদের সঙ্গে সোভিয়েট নেতাদের আলোচনার সময় ওয়ারশ গোষ্ঠীর অন্যান্য রাষ্ট্রের নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। ২৬শে আগস্ট মস্কো থেকে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়, সম্মানজনক মীমাংসায় পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। সোভিয়েট পক্ষ ডুবচেক নেতৃত্বকে আবার স্বীকার করে নিচ্ছেন। চেক নেতারাও গণতন্ত্রীকরণের গতিকে মন্থর করতে, সংবাদপত্রের ওপর আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সম্মত হয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা, চেক নেতারা স্বীকার করেছেন, আপাতত বেশ কিছু সোভিয়েট সৈন্য (এবং অন্যান্য ওয়ারশ গোষ্ঠীভুক্ত রাষ্ট্রের সৈন্য) চেকোস্লোভাকিয়ায় থাকবে। পশ্চিম জার্মানী সীমান্ত তারা পাহারা দেবে। অন্যান্য জায়গাতেও থাকবে। তবে, দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তারা হস্তক্ষেপ করবে না। ধীরে ধীরে সৈন্য অপসারণের ব্যবস্থা করা হবে।

মস্কো চুক্তির সংবাদে চেক জনগণের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। ডুবচেক নেতৃত্ব বজায় থাকায় এবং গণতন্ত্রীকরণের দাবি স্বীকৃত হওয়ায় তারা খুশি। কিন্তু সোভিয়েট সৈন্য চেক-ভূমিতে থাকবে কেন? জোর করে, বন্দুক উঁচিয়ে ধরে, মস্কোতে যে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে তা তারা মানবে না। তবে, চেক নেতারা বাস্তবদৃষ্টির বিবেচনায় আপাতত এই চুক্তি মানার পক্ষে।

এখন প্রশ্ন হল: সোভিয়েট ইউনিয়ন এ ভাবে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ চালাল কেন? সোভিয়েটের বক্তব্য ২০শে আগস্ট রাত্রেই 'তাস' প্রকাশ করেছে, পরদিন 'প্রাভদায়' তা ছাপা হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য: চেকোশ্লোভাকিয়ায় সমাজতন্ত্রবিরোধী ও প্রতিবিপ্লবীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে—তাদের দমন করার জন্যই এই অভিযান। যুদ্ধবাদ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এই অভিযান। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির যৌথ নিরাপত্তার স্বার্থে আত্মরক্ষার জন্যই এই অভিযান। আর, তাঁদের বক্তব্য চেকোশ্লোভাকিয়ার পার্টি ও সরকারের আমন্ত্রণেই তাঁদের সৈন্যরা সেখানে গেছে। সমাজতন্ত্রের শক্তি নিরাপদ হলেই তারা নিজেদের দেশে ফিরে যাবে।

চেক নেতারা সবাই অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছেন, তাঁরা কেউ সোভিয়েট য়ুনিয়ন কিংবা অপর কোন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রকে সৈন্য পাঠাতে বলেন নি। রাষ্ট্রপতি সবোডা, দলের সম্পাদক ডুবসেক, প্রধান-মন্ত্রী চার্নিক আইনসভার সভাপতি স্মরকোভস্কি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জিরি হাজাক কেউ ডাকেন নি। তবে কে ডাকল? সোভিয়েট পক্ষ এ পর্যন্ত কারও নাম প্রকাশও করেন নি। সুতরাং, সোভিয়েট য়ুনিয়ন ও অপর চারটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের কয়েক লক্ষ সৈন্য সম্পূর্ণ নিজেদের দায়িত্বে বিনা আহ্বানে চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করেছে। চেক নেতারা এই কাজকে হস্তক্ষেপ ও আক্রমণ বলে অভিহিত করেছেন। মস্কো চুক্তির পরেও ৩০শে আগস্ট প্রাগ বেতার থেকে ভাষণ দেবার সময় স্মরকোভস্কি এই কাজকে 'বিশ্বাস-ঘাতকতা' (treachery) আখ্যা দিয়েছেন।

সোভিয়েটের এই কাজে বিশ্বের সর্বত্র বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমীগোষ্ঠী স্বাভাবিকভাবেই এই কাজের নিন্দা করেছে—তারা উল্লসিত। অধিকাংশ জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এর নিন্দা করেছে। বিভিন্ন দেশে সাধারণ মানুষ—যাদের অনেকেই সোভিয়েটের অনুরাগী—ধিক্কার দিয়েছে এই কাজের বিরুদ্ধে। রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল উ থান্ট কঠোর ভাষায় এই আক্রমণের নিন্দা করেছেন। নিরাপত্তা পরিষদে এই কাজের নিন্দাসূচক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দুই আক্রমণকারী রাষ্ট্র সোভিয়েট য়ুনিয়ন ও বুলগারিয়া ছাড়া আর কারও ভোট পড়ে নি। যুগোশ্লাভিয়ার টিটো ও রুমানিয়ার সোসেস্কু তীব্র ভাষায় সোভিয়েট কার্যের নিন্দা ও চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। যুগোশ্লাভিয়া ও রুমানিয়া অবশ্য প্রথম থেকেই চেকোশ্লোভাকিয়ার পক্ষে—গণতন্ত্রীকরণের নীতিকেও তাঁরা সমর্থন করেছেন। আলবানিয়া নিন্দা করেছে। কঠোরতম ভাষা ব্যবহার করেছে চীন। চৌ এন-লাই সোভিয়েট আক্রমণকে হিটলারের কাজের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, খাস সোভিয়েট শিবিরে তীব্র নিন্দা ধ্বনিত হয়েছে। ফ্রান্স, ইতালী ও বৃটেনের মত প্রভাবশালী কমিউনিস্ট পার্টি এই কাজের নিন্দা করেছে। ৮৮টি দেশের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মাত্র ১০টি পার্টি সোভিয়েট আচরণকে সমর্থন করেছে। ওয়ারশ গোষ্ঠীর বাইরে কিউবা, এবং কিছুটা পরিমাণে উত্তর ভিয়েতনাম ও উত্তর কোরিয়া ছাড়া কোন রাষ্ট্র সোভিয়েটের সমর্থনে এগিয়ে আসে নি। দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের পর কখনও সোভিয়েট য়ুনিয়ন এ রকম কোণঠাসা ও একঘরে হয় নি। বিশ্ব জনমত এই ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় যদি সত্যি সত্যি সমাজতন্ত্র-বিরোধী ও প্রতিবিপ্লবী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে থাকে, বা পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত হয়ে থাকে (যার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না) ডুবসেকরাই তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। এ চেষ্টা তাঁরা করছেনও। সিয়ের্না ও ব্রাতিশ্লাভার সমাজতন্ত্রবিরোধী শক্তি প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত চেকোশ্লোভা-কিয়া মেনে নিয়েছে। ডুবসেক নেতৃত্ব এ কাজে ব্যর্থ হয়েছেন, তার প্রমাণ কোথায়? আর যদি তাঁরা ব্যর্থ হনও, তাহলেও কি বাইরের কোন শক্তি (ভ্রাতৃপ্রতিম হলেও) বিনা আমন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করতে পারে? ওয়ারশ চুক্তির উল্লেখ করে যৌথ নিরাপত্তার কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু ওয়ারশ চুক্তির (Pact of Friend-ship, Co operation and Mutual Assistance) ৮ম ধারায় পরিষ্কার বলা হয়েছে: চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্র কেউ নিজেদের

সবিনয় নিবেদন

অনিবার্য কারণ বশত এ সপ্তাহে মনোজ বসুর ধারাবাহিক উপন্যাস "পথ কে রুখবে" প্রকাশ করা গেল না। আগামী সংখ্যায় এটি যথারীতি প্রকাশিত হবে। —সম্পাদিকা

কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্ত-ক্ষেপ করবে না। ("will not inter-fere in the internal affairs of each other")। রাষ্ট্রসংঘ সনদের ২ ধারার ৪ উপধারাতেও স্পষ্ট বলা হয়েছে: কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপারে বলপ্রয়োগ করবে না। যদি কোন রাষ্ট্র অপরের দ্বারা আক্রান্ত হয়, অথবা আক্রমণের আশঙ্কা থাকে এবং সে নিজে অপরের সাহায্য চায়, তবেই যৌথ নিরাপত্তা বা 'collective security' র কথা ওঠে। এখানে চেকোশ্লোভাকিয়া কারও দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সোভিয়েট পক্ষের কারও সাহায্য চায় নি। এখানে যৌথ নিরাপত্তার কথা ওঠে কি করে?

১৯৫৫ সালের ওয়ারশ চুক্তি, অথবা পরবর্তী কালের অন্য কোন চুক্তিতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এমন কোন সিদ্ধান্ত হয় নি যে, এক দেশের সমাজতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ কোন পরি-বর্তনের ব্যাপারে অন্য দেশের হস্তক্ষেপের অধিকার আছে। সমাজতান্ত্রিক বা সর্ব-হারা আন্তর্জাতিকতার যুক্তিও এ হতে পারে না। কোন দেশের স্বাধীনভাবে নিজের মত করে সমাজতন্ত্রের পথে চলার অধিকার নেই? টিটো-স্ট্যালিন বিরোধের সময় যুগোশ্লাভিয়াকে সমাজ-তন্ত্রবিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। আর আজ খাস মস্কোও স্বীকার কতে বাধ্য হযেছে, যুগোশ্লাভিয়া মূলত সমাজতন্ত্রী, এবং শান্তি ও প্রগতির দিকেই তার অবস্থান।

সোভিয়েট য়ুনিয়নের যুক্তি ও কাজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিপজ্জনক নজীর সৃষ্টি করতে পারে। আজ যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলে, কিউবার অবস্থান মার্কিন গোলার্ধে তাদের পছন্দমত গণতন্ত্রের পক্ষে বিপদস্বরূপ, সুতরাং তাকে আক্রমণ করতে হবে, তা হলে? ভারত কি বলতে পারে, পাকিস্তানে গণতন্ত্রের মৃত্যু হবার ফলে ভারতে গণতন্ত্র বিপন্ন হয়েছে, সুতরাং ভারতে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য পাকিস্তান আক্রমণ ও সেখানে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করে দেবার অধিকার তার আছে? আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন যুক্তি সম্পূর্ণ অচল। রাষ্ট্রসংঘের নীতি, কিংবা সোভিয়েটের অনুসৃত 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের' ধারণা, অথবা আরও বেশি বিপ্লবীদের আন্তর্জাতিকতা, কোনটার সঙ্গেই এই যুক্তি খাপ খায় না।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েট আক্রমণের ফলে কেবল কমিউনিস্ট জগৎ নয়, আন্ত-র্জাতিক রাজনীতিতেও গুরুতর পরি-বর্তন দেখা দিতে বাধ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট য়ুনিয়নের মধ্যে সম্প্রতি যে আপোষের চেষ্টা সুরু হয়েছিল, তা বাধা-প্রাপ্ত হবে। ভিয়েতনামের যুদ্ধ থামানোর জন্য যে চেষ্টা সুরু হয়েছিল, তাতেও বাধার সৃষ্টি হবে। ভিয়েতনামের যুদ্ধ-বাজরা উল্লসিত হবে। য়ুরোপের রাজ-নীতিতেও নতুন করে ক্ষমতার পুন-র্বিন্যাসের সম্ভাবনা রয়েছে—ফ্রান্স হয়তো আবার 'ন্যাটো'তে ফিরে আসার কথা ভাববে। সর্বোপরি, এর ফলে আন্ত-র্জাতিক শান্তি ও সমাজতন্ত্রের আন্দো-লনের বিশেষ ক্ষতি হল।

সহজ করে কথা বলা যে কত কঠিন, তা আজ লিখতে বসে প্রতি অক্ষরে বুঝতে পারছি। কোন এক আদিম যুগে মানুষ যখন কথা বলতে শেখে নি সেদিন শুধু একটি অর্থবহ শব্দকে প্রকাশ করতেই তার কত বেদনা পেতে হয়েছিল। অনভ্যস্ত জিভ অনভ্যস্ত কণ্ঠনালীর সংগে সংগতি সাধনের কি প্রাণপণ প্রয়াসের পর তবে একটি অর্থবহ শব্দের জন্ম হয়েছিল!

কিন্তু আজ? আজ আমাদের ভাষায় শব্দের অন্ত নেই। একই শব্দের কত অর্থ, একই অর্থের কত শব্দ। কিন্তু তবু সহজ কথাটা বলতে গিয়ে সহজ শব্দের সন্ধানে হারিয়ে যেতে হচ্ছে।

আমার মনে হয় এখানটাতেই সভ্যতার সবচেয়ে বড় বিড়ম্বনা- সভ্যতার স্ববিরোধিতার শুরু এইখানেই। যা সহজসাধ্য নয় তাকে সহজ করার প্রবণতা আর যা সহজ তাকে কঠিন করে তোলা এর মধ্যেই সম্ভবত নিহিত রয়েছে সভ্যতার সংকট।

ছোটবেলার পাঠ্য বইতে পড়েছি দয়া, স্নেহ, মমতা, সাহস, পরোপকারিতা এগুলি মানুষের মনুষ্যত্বের কুলতিলক। এরই সংগে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল থেকে শুরু করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর মহম্মদ মহসীন পর্যন্ত মনীষীদের দয়া স্নেহ ও পরোপকারিতার গল্প মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। প্রয়াগের মেলায় হর্ষবর্ধনের দান, প্রভুপুত্রের স্বার্থে ধাত্রী পান্নার আপন সন্তান বিসর্জনের কাহিনী ছোটবেলা থেকেই মনের মধ্যে দানশীলতা ও নিঃস্বার্থতার উদাহরণ লিখে রেখে গিয়েছিল।

কিন্তু বড় হয়ে জীবনের পথ হাঁটতে গিয়ে দেখলাম মানুষের মনের মানচিত্রটা তামাম পালটে গেছে। ছোটবেলার পরিচিত মানব-চরিত্রের সীমারেখার সংগে আজকের মানব-চরিত্রের সীমান্তরেখা মিলছে কই? মনে হচ্ছে ইতিমধ্যে যেন একটা ভয়াবহ আগ্রাসন ঘটে গেছে মানুষের মনের প্রত্যন্তে।

* * *

পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে পথ চলতে দাঁড়িয়ে গেলাম—ট্রাফিকের লাল আলোয় গাড়ির স্রোত নিশ্চল হয়ে গেছে। অপেক্ষমাণ একটি গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল একটি স্কাউট ছেলে—হাতে লেবেল আঁটা টিনের বাক্স। গাড়ির ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে দানশীলা অবরোহিণী ছেলেটির বাক্সে একমুঠো খুচরো পয়সা ঢেলে দিলেন। পর মুহূর্তে সবুজ আলোর সংকেত পেয়ে গাড়ি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। মনে পড়ল প্রয়াগ মেলায় হর্ষবর্ধন যা দিয়েছিলেন সেও ছিল দান এবং আজকের পার্ক স্ট্রীটে এই মহিলা হাত বাড়িয়ে বন্যার চাঁদার বাক্সে যা দিলেন সেও দান; তবু দুটোর মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। দানশীলতাটা যেন আজ আর মানব-চরিত্রের গুণ বিশেষ নয়। ও যেন অভ্যাস—নেহাৎ দায়সারা একটা অভ্যাসের 'হ্যাংগওভার' মাত্র। মনে পড়ল মাত্র কয়েক বছর আগেও এই পার্ক স্ট্রীটের মোড়েই দেখেছি সেবা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন—'ইনভেস্ট ইন কাইন্ডনেস।" যা একদা মানুষের অপরিহার্য কর্তব্য বলে পাঠ্য বইতে জেনেছিলাম—বড় হয়ে সেটা দেখলাম পরিণত হয়েছে পুঁজি লগ্নির বাজারে। এই জন্যই বলেছিলাম যা অনায়াসলভ্য নয়, যাকে অর্জন করতে হলে হৃদয়ের অনেকখানি ছেড়ে দিতে হয়, সেই অপরিহার্য মানবগুণগুলি সভ্যতার পাল্লায় পড়ে কী হাসাকর রূপ পরিগ্রহ করেছে! আশ্চর্য! এ যদি সংকট না হয় তাহলে সংকট কাকে বলে?

তবু, এর চেয়েও বড় একটা সংকটের কথা লিখব বলেই আজ শুরু করেছিলাম। কিন্তু সহজ কথাটাকে সহজ করে বলতে পারছি কই?

আজই সকালের ডাকে আমার কাছে একটা কাগজ এসেছে। কাগজ না বলে আবেদন বলাই বোধ হয় ঠিক হবে। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক নিরক্ষরতা দিবস উদযাপন সমিতির পক্ষ থেকে নিরক্ষরতা অভিযানের আবেদন এবং তার কর্মসূচী।

আজ থেকে তিন বছর আগে ইউনেস্কোর ডাকে তেহরানে বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের শিক্ষামন্ত্রীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল দেশে দেশে নিরক্ষরতার সমস্যা এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের আয়োজন। পর বছর থেকে ইউনেস্কোর সভায় ঠিক হয় প্রতি বছর ৮ই সেপ্টেম্বর

দেখবেন খবরের কাগজে আমার দানটা [illegible] ছাপা হবে।

তারিখটিতে বিশ্বের সর্বত্র নিরক্ষরতা দিবস পালন করা হবে। অনুরূপ প্রত্যেকটি দেশের কাছে ইউনেস্কো আবেদন জানিয়েছিল ঐ দিনটিকে কেন্দ্র করে নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযানের সূচনা করার। তারই প্রস্তুতিপর্ব চলেছে বাংলা-দেশে এ বছরও।

আবেদনপত্রে আন্তর্জাতিক নিরক্ষরতা সপ্তাহের কর্মসূচীর যে দীর্ঘ বিবরণ রয়েছে তার মধ্যে একটি অংশ আমাকে বিশেষ করে আকৃষ্ট করল। সমগ্র বাংলা দেশকে সাক্ষর করে তোলার প্রথম পদক্ষেপ রূপে এ বছর আন্তর্জাতিক নিরক্ষরতা সপ্তাহে একটি গ্রামকে বেছে নেওয়া হয়েছে যে গ্রাম থেকে সর্বপ্রথম নিরক্ষরতাকে নির্মূল করা হবে। সেই গ্রাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মভূমি বীরসিংহ।

* * *

নিবারণ মুনসীর প্রার্থনারও কোন দাম নেই, হয়তো তাঁর শুভকামনাও মূল্য-হীন। কিন্তু যদি সামান্য মাত্র মূল্যও আমার প্রার্থনার থাকে তাহলে আশীর্বাদ করি এই তরুণ উদ্যোক্তাদের প্রচেষ্টা সফল হোক। প্রার্থনা করি এই [illegible] দীর্ঘজীবী হোন।

সভ্যতায়, শিল্পে, কৃষিতে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে ভারতবর্ষ পৃথিবীর অনেক দেশেরই পেছনে পড়ে আছে আমাদের সেই সুপ্রসবিনী মাতৃভূমি কিন্তু একটি ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশকে হারিয়ে দিতে পেরেছে নিরক্ষরতায়। পৃথিবীতে মোট নিরক্ষরের সংখ্যা ১০০ কোটি। তার মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান ভারত-বর্ষের। এখানে ৩৬ কোটি মানুষ নিরক্ষর। শতাব্দীর প্রতি দশকে ভারতের এই নিরক্ষরদের সংখ্যা আশ্চর্য এক দ্রুত গতিতে বেড়ে চলেছে।

[illegible] বছরের স্বাধীনতার মধ্যে আমার দেশের অনেক নদীর বুকে বাঁধ বেঁধেছে, অনেক পাহাড় কেটে পথ তৈরি হয়েছে, অনেক জঙ্গল সাফ হয়ে [illegible] বিরাট বিরাট শিল্প প্রকল্পের চিমনি মাথা তুলেছে। দামোদরের খাল, ময়ূরাক্ষীর খাল, রূপনারায়ণের খাল সহস্র বাহু ছড়িয়ে

মহাকাশ-অভিযানের যুগে আন্দোলন

দিয়েছে মাঠে মাঠে। কিন্তু কি হবে এ সবে যদি মানুষগুলো আলোর নেশায় মেতে উঠতে না পারে। বংশানুক্রমিক নিরক্ষরতার অন্ধকার যে ৩৬ কোটি মানুষের মগজে জমাট বেঁধে আছে তাদেরই উপরে তো দেশের উৎপাদনের ভার? নিরক্ষর মানুষ কি করে কাজে লাগাবে আধুনিক উৎপাদনযন্ত্রকে, উৎপাদন পদ্ধতিকে? তা হয় না। এ গোঁজামিল চলবে না, চলে না।

একুশ বছর বয়স হল আমাদের স্বাধীনতার। তবু এই বয়সেই সে স্বাধীনতা যেন স্থবির বুড়ি হয়ে গেছে। স্বাধীনতা যন্ত্র নয়, স্বাধীনতা নদী নয়, পাহাড় নয়, মাঠ নয়, স্বাধীনতা শুধু রাজনৈতিক শাসনক্ষমতা নয়। স্বাধীনতার একমাত্র শরিক মানুষ। স্বাধীনতার প্রথম কথা মানুষ এবং শেষ কথাও তাই।

ছত্রিশ কোটি মানুষকে বোবা করে দেশ এগোতে পারে না, পারবে না। এ অভিশাপ নয়। নির্মম, অমানুষিক সত্য।

পৃথিবীর ইতিহাসের দিকেই তাকিয়ে দেখুন। এমন একটাও দেশ নেই, যে দেশ বড় হয়েছে কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিক্ষিত মানুষের দৌলতে। আজও আমরা কথায় কথায় ভিয়েতনামের উদাহরণ দিই। কিন্তু সেই ভিয়েতনামেরও লড়াইটা শুধু সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নয়। "সাম্রাজ্যবাদ আর নিরক্ষরতা এই দুই প্রধান শত্রু আমাদের"—স্বয়ং হো চি-মিনের ঘোষণা। হো চি-মিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মরণপণ লড়াই চালাতে চালাতেও নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে লড়াইটাকে ভোলেন নি। অথচ আমরা স্বাধীনতার এই একুশ বছরের মধ্যেই বেমালুম ভুলে গেছি দেশজোড়া এই নিরক্ষরতার সমস্যাটাকে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যে দেশে গড়ছে না তা নয়, শিক্ষার প্রসার শ্লথগতিতে হলেও হচ্ছে। কিন্তু নিরক্ষরতার এই জমান ঋণ এক পয়সাও শোধ হচ্ছে না, উল্টে প্রতি বছরেই তার বোঝা বাড়ছে চক্রবৃদ্ধি হারে। এই ভয়াবহ নিরেট অন্ধকারে বসে এর পরেও আমরা যখন নিশ্চিন্তে স্বাধীন, সুখী ভবিষ্যতের কথা বলি তখন মাঝে মাঝে মনে হয় দেশটা যেন সত্যিই শিব-ঠাকুরের দেশ হয়ে উঠেছে।

বর্ণ দর্শন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবারকার সমাবর্তন উৎসবে জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এমন কতকগুলি স্পষ্ট কথা বলেছেন যা গভীর গুরুত্বের সঙ্গে ভেবে দেখা দরকার। তাঁর মত আজীবন শিক্ষাব্রতীর সারাজীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ বিচারবোধের পরিপ্রেক্ষিতে এই ভাষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একে মামুলী দীক্ষান্তিক ভাষণ বলে মনে করলে ভুল হবে। এই সমাবর্তন ভাষণে তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, আজ দেশে যে ছাত্র-অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তার জন্য ছাত্রসমাজ দায়ী নয়, দায়ী শিক্ষাজগতে নৈরাজ্য। একাদশ শ্রেণী প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় এবং ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রী কোর্স কোন কাজের নয়। পুরাতন নিয়মটিই যে অনেক ভাল ছিল অভিজ্ঞতার নিরিখে এটা প্রমাণিত হয়েছে বলে শ্রীচট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন। কেন না তাতে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার মধ্যে একটা সুন্দর হার্মনি ছিল এবং অর্ধশতাধিক বছর ধরে যা কার্যকরী ছিল তাকে রাতারাতি বদলে ফেলার সার্থকতা কি আছে এই প্রশ্ন সমাবর্তন বক্তৃতায় শ্রীচট্টোপাধ্যায় রেখেছেন। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমরা এ বিষয়েও একমত যে, বর্তমানের প্রচলিত পদ্ধতি এমন কিছু নিদর্শন দেখাতে পারে নি যা থেকে প্রমাণিত হবে যে পুরাতন পদ্ধতির চেয়ে এটি ভাল। একাদশ শ্রেণী ও ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রী কোর্স প্রচলিত করে সরকারী টাকার শ্রাদ্ধ করা ভিন্ন আর কিছুই করা হয় নি, ছেলেমেয়েদের ঘাড়ে পর্বত প্রমাণ বই-এর বোঝা চেপেছে, কিন্তু ছাত্রদের শিক্ষার মানের কোনই উন্নতি হয় নি। আগেকার আমলে ছাত্ররা যেটুকু শিখত সেটুকু ভাল করে শেখার সুযোগ পেত তাতে কারো যে কোন অসুবিধা হচ্ছিল এরও প্রমাণ নেই। এ কারণে আজীবন শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় পুরাতন পদ্ধতিতে ফিরে যাবার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি স্কুল পর্যায়ে দশ বছর পূর্বের মত দু বছরের ইণ্টারমিডিয়েট এবং দু বছরের ডিগ্রী কোর্সের পুনঃপ্রবর্তনের সুপারিশ করেছেন। এ ছাড়া তিনি আরও একটি সুপারিশ করেছেন যা রীতিমত অভিনন্দন যোগ্য। তিনি খোলাখুলি জানিয়েছেন যে, শিক্ষার মাধ্যম হবে আগেকার মত মাতৃভাষা ও ইংরাজী। ত্রিভাষা সূত্রের নাম করে হিন্দী চাপানোর তিনি নিন্দা করেছেন। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, হিন্দী চাপানোর নীতির ফলেই জাতীয় ক্ষেত্রে আজ অনৈক্য ও বিক্ষোভ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। অবিবেচনাপ্রসূত সরকারী শিক্ষানীতির দরুণ আজ দেশে চরম অনৈক্য সৃষ্টি হয়েছে।

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় এও বলেছেন যে শিক্ষানীতি বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই কেন না এতাবৎকাল শিক্ষার নামে হিন্দী ভাষার রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষানীতি আর কিছুই করতে পারে নি। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শিক্ষাব্যবস্থাকে একছাঁচে ঢেলে সাজাবার যে কোন চেষ্টাই অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। শ্রীচট্টোপাধ্যায় সাফ জানিয়েছেন যে প্রাথমিক স্তরে কেবল মাতৃভাষা, মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষা এবং ইংরাজী ও একটি ক্লাসিক্যাল ভাষা শেখানোর পূর্বতন রীতিটিকেই আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। দুঃখের বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর চেয়ে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীই আজ প্রবল। শিক্ষা-সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের এই অপচেষ্টা যতদিন না বন্ধ হবে ততদিন শিক্ষাক্ষেত্রের এই নৈরাজ্য দূর হবে না। যাঁরা শিক্ষার নামে রাজনীতির খেলায় নেমেছেন তাঁরা বিশেষ কয়েকটি শ্রেণীর কাছ থেকে মদত পাচ্ছেন। সামান্য অনুগ্রহ ও সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় প্রশাসকবর্গ দলীয় নেতাদের অভিসন্ধিমূলক ব্যবস্থাগুলিকে উৎসাহভরে কার্যকরী করে যাচ্ছেন। শিক্ষাজগতে যাঁরা ভাগ্যবিধাতা হয়ে বসে আছেন তাঁরা কেউই শিক্ষাব্রতী নন। আমাদের দেশের এইটাই সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি। এখানে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যাঁরা করেন তাঁরা কেউই অর্থনীতিবিদ নন শিক্ষাক্ষেত্রের চূড়ায় যাঁরা বসে থাকেন তাঁরা কেউ শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত নন। মাঠে রাজনৈতিক বক্তৃতাবাজি করতে পারলেই, আর নেপথ্যে গাঁটছড়া বাঁধা ও খোলার অভিনয়ে পারদর্শী হতে পারলেই এ দেশে পার্লামেন্টেরিয়ান হওয়া যায় এবং তাহলে সকল বিষয়েতেই স্পেসালিস্ট হবার বা মতামত দেবার অধিকার জন্মে যায়। ইনকামট্যাক্স বা কমার্শিয়াল ট্যাক্স ঠিক দেবার নিয়মটি যিনি [illegible] পারেন তাঁর পক্ষে অর্থমন্ত্রী হতে কোন বাধা নেই। কাজেই এই জাতীয় [illegible] যারা শুধু দলবাজি নিয়ে [illegible] পাঠশালায় পাঠ নেয় নি, তারা যখন শিক্ষা ব্যবস্থার মাথায় চেপে বসে তখন শিক্ষা যে কি রকম হবে তা [illegible] না। অপর দিকে যাঁরা আজীবন শিক্ষাব্রতী, যাঁরা এই জন্য প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাঁদের কোন কথা থাকে না [illegible]। আশংকা হয় আচার্য সুনীতিকুমারের মত মানুষেরও সারা জীবনের অভিজ্ঞতা [illegible] পরামর্শ সরকারী আমলা এবং [illegible] কারবারীদের ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে [illegible]। তথাপি আমরা মনে করি যে [illegible] অনুসৃত হোক বা না হোক, এই জাতীয় মূল্যবান অভিমতগুলির সম্বন্ধে প্রচার হওয়া দরকার যাতে জনসাধারণ শিক্ষার্থী সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে অবগত হতে পারেন। একমাত্র জাগ্রত ও যুক্তিশীল জনমতই পেশাদার রাজনীতির কারবারী ও তস্য তল্পিবাহক আমলাদের কর্তৃত্বের [illegible] করে দিতে পারে। তাছাড়া স্বভাবতই [illegible] লাগে এ প্রশ্নগুলি সত্যই কোন দিন জোর গলায় তোলা হয় নি যে পূর্বতন শিক্ষা পদ্ধতির দোষ বা অসম্পূর্ণতা কোথায় ছিল? তাকে বদলানোই বা প্রয়োজন হল কেন? নতুন পদ্ধতি কি এমন প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে? পুরাতন পদ্ধতির চেয়ে সেটা শ্রেষ্ঠ বলেই বা বিবেচিত হবে কেন? বিক্ষিপ্ত ভাবেও এই প্রশ্নগুলি উঠেছে, এবং তা উঠেছে এমন ব্যক্তির কাছ থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে যাঁর অভিজ্ঞতা অর্ধশতাব্দী কালের চেয়েও বেশি। আমরা আশা করব যে এই বিষয়টি নিয়ে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ চিন্তা করবেন। কেন না, যা মনে হয়, অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের সুপারিশগুলি বর্তমানের শিক্ষাজগতের সমস্যার অনেকখানি সমাধান করতে পারে।

কর্তৃপক্ষের দাবিপত্র হিসাবে ব্যবহার করা হবে?

শিক্ষার গুঁতা কারসাজী

পাশাপাশি আরও একটি চিত্র দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি কলেজ বন্ধ হয়ে আছে, বরং বলা যায় কর্তৃপক্ষ কলেজগুলিতে লক-আউট ঘোষণা করেছেন। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বেলুড় কলেজ থেকেই এই লক-আউটের সূত্রপাত দেখা গেছে, এখন তা ক্রমশ অন্যান্য কলেজেও ব্যাপ্ত হচ্ছে। কারখানার মালিকেরা যেমন শ্রমিকদের দাবিদাওয়ার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করার জন্য, অনেকক্ষেত্রে শ্রম আইন লঙ্ঘন করেও, কারখানাগুলি লক-আউট করে দিচ্ছে (সম্প্রতি যা অত্যন্ত ব্যাপক আকার ধারণ করেছে) ঠিক সেই একই পদ্ধতি কলেজ কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেছে। মালিক-শ্রমিক সম্পর্কটা, কর্তৃপক্ষ ও অধ্যাপক, অথবা কর্তৃপক্ষ ও ছাত্রদের ওপর বর্তেছে। স্কুল ও কলেজ উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায় ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডি নামক একটি সংস্থাই কার্যত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ঘাড়ে চেপে থাকে। এইগুলি গঠিত হয় সাধারণত এমন লোক নিয়ে যারা শিক্ষা দীক্ষার বড় একটা ধার ধারে না। সাধারণত ধনী বা প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি, মহাজন, সিনেমা হলের মালিক পেশাদার রাজনীতিক এরাই এগুলির শোভাবর্ধন করে। কোন কোন ক্ষেত্রে, অর্থাৎ রামকৃষ্ণ মিশন বা অপরাপর সঙ্ঘ পরিচালিত বিদ্যায়তনগুলির পরিচালক সমিতিতে বাইরের লোকের স্থান আবার খুবই অল্প। এমন কি বিদ্যায়তনের শিক্ষক বা অধ্যাপকও এই পরিচালক সমিতিতে বহুক্ষেত্রে স্থান পান না। বেলুড় কলেজের অধ্যাপকেরা দাবি করেছিলেন যে, অন্তত তাঁদের নির্বাচিত একজন অধ্যাপককেও পরিচালক সমিতিতে স্থান দেওয়া হোক, এবং এইটুকু দাবিও মোহান্ত মহারাজরা মানেন নি। এখানকার রীতি নাকি হচ্ছে মোহান্ত মহারাজেরা একজন অধ্যাপককে মনোনীত করে নেবেন। এই অ-গণতান্ত্রিকতার প্রতিবাদে অধ্যাপকেরা এক ঘণ্টার জন্য প্রতীক ধর্মঘট পালন করেছিলেন, এবং তারই পরিণতি অতঃপর এই লক-আউট। অপরাপর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা অনুরূপ। আগেই বলেছি সেগুলির কার্যকরী সমিতি গঠিত হয় ক্ষমতালোভী একদল স্থানীয় মানুষকে নিয়ে যাদের শিক্ষা দীক্ষার প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, কর্তৃত্ব করার জন্যই তারা মত্ত হস্তীর মত সরস্বতীর কমলবনে প্রবেশ করে। শিক্ষক বা অধ্যাপক সম্প্রদায় হচ্ছেন যেন এদের জমিদারীর প্রজা, এবং ব্যবহারটাও সেইরকমই করে থাকে। কলেজের অধ্যক্ষকে বা স্কুলের হেড মাস্টারকে এদের সঙ্গেই হাত মেলাতে হয়, কেন না এখানে কোন স্বাধীনচেতা মানুষ থাকলে তাঁকে বরদাস্ত করা হবে না এটাই অলিখিত নিয়ম। শিক্ষকদের যখন বেতন দেওয়া হয়, আজকাল সরকার তা বহুলাংশে বহন করেন, এরা মনে করে যেন নিজেদের ঘর থেকে দিচ্ছে। তা ছাড়া নিয়োগ বা পদচ্যুতির ব্যাপারেও এদের ক্ষমতা যথেষ্ট থাকায় তার অপব্যবহার ছাড়া সদ্ব্যবহার হয় না। কোন স্কুলে বা কলেজে কাজ পেতে গেলে শিক্ষাগত যোগ্যতাটাই যথেষ্ট নয়, যোগ্যতমকে ডিঙিয়ে অযোগ্যরাও তা পেতে পারে যদি এই ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডির লোক হাতে থাকে। শিক্ষাজগতে এই শাসকগোষ্ঠীরাই আজ শিক্ষাক্ষেত্রের অবনতির জন্য বহুলাংশে দায়ী। অন্তরের শিক্ষক বা অধ্যাপকের পক্ষে শিক্ষা দানের চেয়ে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার দায়িত্বই বেশি। কার্যত তাঁকে এমন অশিক্ষিত ব্যক্তিদের কর্তৃত্বে থাকতে হয়, যা কোন শিক্ষাব্রতীর নিকট মোটেই কাম্য নয় এবং পরিচালক সমিতির বিরাগভাজন কোন শিক্ষক বা অধ্যাপককে রক্ষা করতে বিদ্যায়তনের যিনি প্রধান তিনি এগিয়ে আসেন না। এই অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের হাত থেকে শিক্ষাজগৎকে রক্ষা করতে হলে

বর্তমানের প্রচলিত ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের বিরুদ্ধে বেশ কিছুকাল ধরে নানারকম অভিযোগ বিভিন্ন মহল থেকে শোনা যাচ্ছিল। সম্প্রতি প্রমাণিত হয়েছে যে উপাচার্য ১৯৬৫ ও ১৯৬৬ সালে একটি বিশেষ কোম্পানীকে বিনা টেন্ডারে এবং নিয়মবহির্ভূতভাবে কয়েক লক্ষ টাকার কন্ট্রাক্ট দিয়েছিলেন, শুধু তাই নয়, এ বিষয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য-নির্বাহক পরিষদের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি। এই বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ও অধ্যাপকদের মধ্যে চাঞ্চল্য জেগেছিল এবং তাঁরা তদন্তের জন্য আন্দোলনও করেছিলেন, যার ফলে বেশ কিছুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্ম শিকেয় উঠে গিয়েছিল। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে অডিট রিপোর্টের বিরূপ মন্তব্যগুলি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্য জানা গেলে পরে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য অর্থাৎ রাজ্যপাল ধর্মবীরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে এবং তাঁকে এই বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলা হবে।

মজা হচ্ছে এই যে কোন বৃহৎ ব্যক্তি বেকায়দায় পড়লে এদেশে তাঁকে বাঁচানোর লোকের দৃষ্টি হয় না। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এই প্রসঙ্গে এমন একটি কথা বলেছেন যা রীতিমত আশংকাজনক। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম এই যে মহৎ পদাধিকারী ব্যক্তিরা অন্তত এমন আচরণ করবেন যাতে সততার একটা "শো" থাকে এবং সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি উপাচার্য মশাইকে কিছুটা 'মৃদু তিরস্কার' করেছেন এই মাত্র। অথচ তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ, কেন না এটা স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে তিনি তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন। এদিকে সংবাদে প্রকাশ যে, রাজ্যপাল বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করতে অনিচ্ছুক। শেষ পর্যন্ত কি সবটাই ধামাচাপা পড়বে? এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। উপাচার্যের মত পদসমূহ পেশাদার প্রশাসকদের হাতে না দিয়ে তা শিক্ষাবিদদের হাতেই দেওয়া উচিত। দীর্ঘকাল পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক উপাচার্য হবার ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মধারার কিছুটা উন্নতির চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য আবার এদিকে পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি বেশ জটিল। এখন ঘটনাচক্র কোনদিকে যায় সেটা দেখার জন্য অপেক্ষা করাই সঙ্গত।

ফায়ারম্যান ধর্মঘট

পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ বিভাগে স্টাম ইঞ্জিনের ফায়ারম্যানদের কর্মবিরতির ফলে ওই বিভাগের পাঁচটি সেকশনের ৫২টি যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল তো বন্ধ হয়েই আছে এবং সেই সঙ্গে এক বিরাট অঞ্চলের খাদ্য পরিবহন, শিল্পোদ্যোগ এবং কাঁচা মাল সরবরাহ ব্যবস্থাও অচল হয়ে পড়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার অধিকাংশ এলাকা কার্যত পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। প্রমোশন ও অপরাপর দাবি দাওয়ার ভিত্তিতে প্রায় ছয় শত ফায়ারম্যান ২১শে আগস্ট থেকে কর্মবিরতি শুরু করেছেন। ফলে রাণাঘাট-লালগোলা, রাণাঘাট-বানপুর, রাণাঘাট-বনগাঁ, বারাসত-হাসনাবাদ এবং শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ ঘাট সেকশনের রেল চলাচল বন্ধ হয়ে রয়েছে। প্রত্যহ বিশ হাজার যাত্রীর যাতায়াত বন্ধ হয়ে আছে। রেল কর্তৃপক্ষের সাড়ে দশ হাজার টাকার বেশি দৈনিক ক্ষতি হচ্ছে এবং বহু পরিমাণ কাঁচামাল, খাদ্য ইত্যাদির আনা নেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই যে, ফায়ারম্যানদের এই আকস্মিক কর্মবিরতির মূলে অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়াটা খুব বড় ব্যাপার নয়। তাঁরা মূলত কয়েকটি পদাধিকার দাবি করেছেন, এবং কাজের সময় কিছুটা কমাতে চাইছেন। এবং এটা সত্য যে আট ঘণ্টা কাজ এ-যুগে অচল, অথচ তাঁদের [illegible] করতে হয়। এটাকে আট ঘণ্টায় নামিয়ে আনাই সঙ্গত। (২১।৮।৬৮)

গ্রাম-গ্রামান্তরে

ভোট রাখুন, ৬৫ লক্ষ দুর্গতকে আগে বাঁচান

এখন গাঁয়ের মানুষের ঐ ৬৫ লক্ষ লোকের জন্য ভাবনা—ওদের কি হবে? ওরা কি লঙ্গরখানায়, শিবিরে, তাঁবুতে বা রিলিফ সেন্টারে এইভাবেই দিন কাটাবে, না ঘরে ফিরবে? ঘর অবশ্য থাকলে ওরা নিজেরাই এতদিনে ফিরে যেতো, কারুর সাহায্যের বা কৃপার ওরা প্রত্যাশী নয়। কিন্তু ভাগ্য এবার ওদের সত্যই বিরূপ, বোধহয় সব দিক দিয়েই। ভিনমাটি, ক্ষেতের ফসল, এমন কি শেষ সম্বলও তারা হারিয়েছে নিজেদের দোষে নয়—একশ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের চূড়ান্ত গাফিলতির ফলে। গাফিলতি যে কত পর্বতপ্রমাণ তার দৃষ্টান্ত বন্যার এক মাস দেড় মাস পরেও মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগনার গ্রামে গ্রামে এসে একবার দেখে যান। এখনও প্রায় মানুষ-প্রমাণ জল। যে কোন গ্রামে গিয়ে যে কোন লোককে জিজ্ঞেস করুন কেন এমন হল? তার একটি উত্তরই আসবে- বাঁধ ভেঙেছে তাই। কেন বাঁধ ভাঙলো? এর উত্তরও হাজার হাজার গ্রামবাসী একই সঙ্গে বলবেন—ওদের বার বার বলা সত্ত্বেও ওরা বাঁধ মেরামত করে নি—তাই এ বিপর্যয়। বাঁধের এই অবস্থা সৃষ্টির বিরাম নেই তার ওপর জলবাবুদের জল ছাড়ার খেলা--এই ত্র্যহস্পর্শে পশ্চিমবাংলার ৬৫ লক্ষ লোক আজ ছন্নছাড়া। নেতাদের বক্তৃতার সময় জনগণের আদালতের ফুল-ঝুরি ঝরে; কিন্তু কোথায় সে জনগণের আদালত? ৬৫ লক্ষ লোকের জীবনে যারা শোচনীয় বিপর্যয় এনে দিয়েছে দেশে কি এমন একজনও নেতা নেই তাদের টেনে এনে জনগণের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারেন? ছিন্নমূল লক্ষ লক্ষ মানুষের পক্ষ থেকে আমি দাবি করবো—এদের বিচার হোক, কৈফিয়ৎ তলব করা হোক সারা বছরে এঁরা বাঁধ পরীক্ষা করেন নি কেন? কেন জনগণের অনুরোধ তাঁরা শোনেন নি? কেন বাঁধ মেরামত বা মজবুত করেন নি? কেন স্লুইসগুলো নেড়েচেড়ে দেখা হয় নি? ভাঙা স্লুইস পাল্টে নতুন স্লুইস কেন দেওয়া হয় নি? প্রতি বছরই যে গ্রাম বন্যায় ভাসে এ বছর গরমকালে কিছু নদীগুলো সংস্কার করে সে সব গ্রাম রক্ষার চেষ্টা করা হয় নি কেন? কেন খেয়ালখুশি মাফিক জলাধার থেকে জল ছাড়া হল? জনগণের আদালত বসালে এসব কোন প্রশ্নেরই ওঁরা জবাব দিতে পারবেন না। ও দের একমাত্র শাস্তি—লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চিরতরে বন্ধ করা। এমন শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত যাতে ওঁরা জীবনে আর কোনদিন এঁদের নাম উচ্চারণ না করে।

কিন্তু কে দেবে ওঁদের শাস্তি? কে ধরবে হাল? রাজ্যপাল? তাহলেই হয়েছে! বন্যার কবলে পড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন দিশেহারা, তখন রাজ্যপালের একবার দু'দশ দন্ড না আর্তমানুষগুলির পাশে গিয়ে একবার দাঁড়ানো দরকার। সেই সময় গেলে তিনি স্বচক্ষে দেখে আসতে পারতেন তাঁর আমলাদের কীর্তি। বন্যার একমাস পর বন্যার্তদের উদ্ধারের কাজ যখন প্রায় শেষ, রিলিফ সেন্টারে যখন হাজার হাজার মানুষকে সরকারী ও বেসরকারী ব্যবস্থায় রিলিফ দেওয়া হচ্ছে, সেই সময় আমলারা ঘটা করে রাজ্যপালকে নিয়ে এলেন। উদ্দেশ্য—কেন বন্যা হল তার কারণ অনুসন্ধানে নয়, —রিলিফ সেন্টারে খাদ্য আর্ত-মানুষের তাঁরা কত না সেবা করছেন তাই দেখিয়ে বাহবা পাবার জন্যে! ধুরন্ধর আমলারা রাজ্যপালকেও বুঝে নিয়েছেন।

শুধু ভিজে মাটিতে কার্পেট পেতে, রাজ্যপালকে গদিমোড়া চেয়ারে বসিয়ে সভা করে ফুলের মালা পরালে হয়তো চলবে না—জলও দেখাতে হবে। তাই নৌকো করে রাজ্যপালকে নিয়ে যাওয়া হল এক রিলিফ সেন্টার থেকে আর এক রিলিফ সেন্টারে! জলের ওপর দিয়ে যেতে যেতে পাছে রাজ্যপালের মুখ ফসকে কোন কথা বেরিয়ে পড়ে, তাই অনবরত [illegible] একবার এ কানে আর একবার

[illegible]

ও কানে জপ করা হল—'স্যার, এতো বৃষ্টি মেদিনীপুরে গত এক শ' বছরে বোধহয় হয় নি, সে কি বৃষ্টি, সে কি বৃষ্টি!'—একটা বাঁধ কেন চারটে বাঁধ করলেও এ জল আটকানো যেতো না!' রাজ্যপালেরও গলায় বোধহয় কথা গেল আটকে, তিনি আর জিজ্ঞেস করতেই পারলেন না বাঁধগুলো ঠিক আছে কি না, আগে থাকতে দেখা হয়েছিল তো? এই একটি প্রশ্নে আমলারা হয়তো জলে ছিটকে পড়তো; কিন্তু তাদের গায়ে জলের ছিটেও লাগলো না। রিলিফ সেণ্টার ঘুরিয়ে, রাজ্যপালকে দিয়ে রিলিফ বিতরণ করিয়ে, বন্যার্তদের সভায় বক্তৃতা করিয়ে তাঁরা রাজ্যপালকে ফিরিয়ে দিলেন এই বুঝিয়ে আরও রিলিফের ব্যবস্থা না করতে পারলে সমস্যা, বন্যার্তদের বাঁচানো মুস্কিল হয়ে পড়বে।

জনগণের আদালতে দোষীর বিচার তাহলে আর কে করবে? দেশের নেতারা? দেখতে পাচ্ছেন না। তাঁদের আচরণ? শুনতে পাচ্ছেন না ওঁদের বুলি? মানুষ মরে মরুক লক্ষ লক্ষ মানুষ ভিখারী হয়ে থাক তাতে নেই দোষ। ফসল জমি-জমা চুলোয় যাক—এমন কি সমগ্র দেশ যদি জাহান্নমে যায়, তাও যাক—গদি ওদের চাই, আর তার জন্যে চাই এখুনি নির্বাচন। ৬৫ লক্ষ লোকের সর্বনাশ হয়েছে তো তাঁদের কি? তাঁদের তো আর সর্বনাশ হয় নি? অতএব নির্বাচন চাই। গদিতে একবার বসলে ওঁরা মানুষের সব দুঃখ নাকি ঘোচাবেন। আশ্চর্য দেশ এ, আর ততোধিক আশ্চর্য এদেশের নেতাদের রাজনীতি! এদের কাছে দেশ মানুষ কিছুই নয়—রাজনীতিই বড়; আর তার চেয়ে বড় গদি।

সত্যি যদি তাঁরা দেশকে ও জনগণকে ভালবাসতেন, তাহলে দেশের এই চরম দুর্দিনে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত নেতারা এক হয়ে ৬৫ লক্ষ আর্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতেন, নাওয়া-খাওয়া ভুলে তাদের সেবা করতেন, যাদের ঘরবাড়ি গিয়েছে, নতুন করে তাদের ঘরবাড়ি বানিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতেন, প্রতিটি মানুষ ঘরে না ফিরে-যাওয়া পর্যন্ত তাঁরা নিশ্চিন্ত হতে পারতেন না। এসব নেতারা কি দেশে নেই? নিশ্চয়ই কিছু এখনও আছেন। রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে তাঁরা আজ দিশেহারা! তা না হলে বন্যার্ত মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখে সরকারের উপর দোষারোপ করে, কলকাতায় বসে বিবৃতির পর বিবৃতি দিয়ে তাঁরা কখনও এমনভাবে তাঁদের কর্তব্য শেষ করতে পারতেন না!

বন্যায় সর্বহারাদের নামে, আর্ত মানবতার নামে আমি আবার আবেদন করছি দলমত নির্বিশেষে দেশের সকলের কাছে—রাজনীতির দাবা-খেলা বন্ধ করুন, ভোট এখন রাখুন। ছুটে আসুন সকলে যে যা পারেন সাহায্য নিয়ে,—দুর্গত মানুষগুলিকে বাঁচান। এখনও বর্ষা শেষ হয় নি দেখতে পাচ্ছেন না একটা বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে আর একটা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কিভাবে হাজার হাজার পরিবার ভাঙাচোরা বাঁধের উপর আশ্রয় নিয়েছে? যদি আর একটা জলের তোড় আসে বাঁধটি রক্ষা পাবে না, জলের তোড়ে ওরাও যে কোথায় ভেসে যাবে তার সন্ধানই বোধহয় আর পাওয়া যাবে না। ওদের সরিয়ে নিয়ে কোন নিরাপদ জায়গায় রাখার ব্যবস্থা করুন। শুধু গ্রামবাসীদের উপর সব দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে আপনারা শহরের মানুষ দয়া করে নিশ্চিন্ত হয়ে এই সময় বসে থাকবেন না। মনে রাখবেন গ্রামই বাংলার প্রাণ, গ্রাম বাঁচলে শহরও বাঁচবে। গত দু' মাস ধরে কত 'ধকল ওদের ওপর দিয়ে গেছে, তবুও এখনো ওদের মনোবল এতটুকু ভাঙে নি। চাষীরা এখনও আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। ইচ্ছেটা—ধরণটা একটু কমুক, জলটা একবার ক্ষেত থেকে নামুক, তারপর কোমর বেঁধে ছেলে-মেয়ে-বুড়ো সব ছুটবে ক্ষেতের দিকে। [illegible] হাজার চেষ্টা করলেও আপনারা ওদের রিলিফ সেণ্টারে ধরে রাখতে পারবেন না। ওরা ভিখারী নয়, জাত-চাষী। ভিখারী হলে ওরা একদিন শহরবাসীদের কাছে ছুটে যেত, আপনাদের বিরক্ত করে মারত। কিন্তু দেখবেন, গাঁ ছেড়ে কেউ যায় নি—চাষের খোঁজে ওরা ছাড়তে পারবে নি, আর পারবেও না—কারণ এখনও ভাদ্র পার হয়ে যায় নি। এখনও যদি বীজ পায় খুব দেরিতে বসালেও চলবে আর বি ডি ও বাবুরা বীজতলা দেখেন বলেছেন, যদি দেন, আর একটু জল কমলে ঐ জলেই বড় বীজতলা বসিয়ে ভাল ফসলই ফলাতে পারবে। চাষীদের এ আশা ও উৎসাহ নষ্ট করবেন না। আকাশের মতিগতি দেখে মনে হচ্ছে ভাটা পড়েছে এখনই শরৎকালের মতো এখানে-ওখানে বৃষ্টি হচ্ছে। ক'দিন আগে তো খুব ঝড়ও হয়ে গেল। এরকম দু-একটি ঝড় আর কয়েক পশলা বৃষ্টি হলেই মনে হয় এবারের বর্ষা শেষ হবে। কিন্তু বর্ষা শেষ হবার আগে সকলে মিলে শেষ চেষ্টা [illegible] বিপন্ন পরিবারগুলিকে [illegible] বাঁচিয়ে রাখতে হবে [illegible] যার [illegible] অনেকেই দিবারাত্র চেষ্টা করছেন [illegible] আপনারাও সকলে হাত [illegible] আর একদিন [illegible] নামা না সরামাত্রই চাষীরা যাতে দেশী বীজ বা বীজতলা পায় তার জন্য আপনারা সকলে মিলে ব্যবস্থা করুন। সরকারের উপর নির্ভর করে আর হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবেন না। এই শেষ সময় প্লাবিত এলাকায় ফসল যতটুকু সম্ভব হয় তার জন্য উদ্যম চাষীর হাতে দ্রুত দেশী ধানের চারা পৌঁছে দেওয়া দরকার। সরকারী খামারে হয়তো অত চারা পাওয়া যাবে না, তবে এখন অনেক জায়গায় কিনতে পাওয়া যাচ্ছে। সেগুলি কিনে এনে দুর্গত চাষীদের হাতে তুলে দিন বা দেবার জন্য প্রস্তুত থাকুন। এই সপ্তাহের মধ্যেই এ কাজটি সকলে মিলে শেষ করুন তাহলে আগামী বছর দেখবেন ক্ষতি যা হয়েছে তা অনেকটা পুষিয়ে গেছে। এ সপ্তাহে চারের ও রিলিফের দিকেই আমি বেশি করে জোর দিলাম কারণ এ দুটি এ সপ্তাহের অপরিহার্য কাজ। পুনর্বাসন না হয় দু' সপ্তাহ পরে করলেও চলবে কিন্তু এ দুটি কাজের একটিতেও যদি কোন ত্রুটি হয় তাহলে এ বছরের মতো ফসলও যাবে, মানুষও অনেক মরবে। বন্যার্তদের বাঁচান, চাষীদের বাঁচান—ফসল যাতে ফলে তার ব্যবস্থা করুন—এই আবেদন লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সকলের কাছে রাখছি।

মেহতার পদত্যাগে দক্ষিণী উল্লাস

চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রশ্নে শ্রীঅশোক মেহতার পদত্যাগে তাঁকে যাঁরা বাহবা দিলেন তাঁদের সেই বাহবাদানের পেছনে যে নীতিনিষ্ঠার ছিটেফোঁটাও নেই শ্রীমেহতা তা স্বয়ং উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তাঁকে যখন আহ্বান জানানো হল তাঁর পদত্যাগের ওপর আরো কিছু উত্তেজনা-মূলক বাণীবর্ষণ করতে, শ্রীমেহতা সে প্রস্তাব সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন। যা হবার হয়ে গেছে। কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সভার আওয়াজও বড় সুবিধের নয়। সেখানে শ্রীমতী কৃপালনী সহ কতিপয়ের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জোরদার হয়ে উঠেছিল, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী 'ফরগেট এন্ড ফরগিভ' শ্লোগান তুলে সে ঝড় থামিয়ে দিয়েছেন। অন্যদিকে নিরাপত্তা পরিষদ চুপ। সোভিয়েট রাশিয়ায় চেক নেতারা সম্মিলিত হয়েছিলেন। আপোষ সম্পর্কে রোজদিন উল্টোপাল্টা খবর ছুটছে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। এও শোনা যাচ্ছে যে, শ্লোভাকদের একাংশ বিক্ষুব্ধ। তাঁরা পঞ্চরাষ্ট্রের প্রবেশটা স্বাধীনতা-হরণের সামিল বলে জ্ঞান করছেন। আবার শুনছি আপোষ প্রায় হল বলে। সৈন্যাপসরণও কয়েক ক্ষেত্রে শুরু হয়েছে।

কিন্তু সব সংবাদের ওপর চেক প্রেসিডেন্ট স্বোবোদা এবং তথাকার কম্যুনিস্ট পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারী ডুবসেকের প্রাগ-প্রত্যাবর্তনের পর বিবৃতিই প্রমাণ করছে, আম-দুধ মিশতে শুরু করেছে। ঘনঘটা পরিষ্কৃত হওয়ার মুখে। এবং পঞ্চরাষ্ট্রীয় সৈন্যদল চেকভূমি পরিত্যাগের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

শ্লোভাককেন্দ্রিক উত্তেজনায় চতুর্দিক কম্পমান হয়ে উঠেছে সত্য। সেখানে ডিভিসনের পর ডিভিসন সৈন্য গেছে। তবু অনেক দেশে শুধুমাত্র পুলিশ নামলেও যে রক্তপাত ঘটে, তেমন কিছুও ঘটে নি। উত্তেজনা অতঃপর অন্তত চেকভূমিতে প্রশমিত হয়ে আসারই সম্ভাবনা। তবু নজরীর, প্রেসিডেন্ট স্বোবোদা ইতস্তত তরুণ প্রাণ নাশের ঘটনায় কত বেদনা প্রকাশ করেছেন।

ভবিষ্যতের ভাবনা

এতো উত্তেজনার মধ্যে কংগ্রেসের একটি মহল কিন্তু ভবিষ্যতের ভাবনাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারেন নি। তাঁরাই প্রধানমন্ত্রীর পাশের জন। তাই যখন শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রশ্নে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের কার্যকরী কমিটিতে বাক-বিতণ্ডা এবং দাবি উঠছে, তখনও প্রধানমন্ত্রীর সুচিন্তিত বক্তব্যে সকলে শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার প্রস্তাবই গ্রহণ করেছেন।

শৃঙ্খলার প্রশ্ন

এই সভায় আর একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেছে যে সরকারী প্রস্তাবের বিরোধিতা শ্রীমতী কৃপালনী হঠাৎ উত্তেজনার বশেই করে ফেলেন নি। তাঁর পেছনে ছিল বহু নেতৃস্থানীয় এম পি'র সমর্থন। এমন কি বিতর্কে প্রকাশ, স্বয়ং উপ প্রধানমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী শ্রীদেশাই ও ছিলেন শ্রীমতী কৃপালনীর প্রস্তাবের একজন সমর্থক। তবে তিনি যখন দেখলেন প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করছেন তখন তিনিও তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।

শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ এগিয়ে এসেছিলেন দেশাই-কৃপালনীকে বিড়ম্বনার হাত থেকে উদ্ধার করতে। কিন্তু বিভূতি মিশ্রও তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছেন: দেশাই-কৃপালনী উভয়েই উপস্থিত, সুতরাং অভিযোগ খণ্ডন করতে হলে তাঁরাই করবেন। তারকেশ্বরীকে তখন তাঁর ক্লোক গুটিয়ে অনাহূত ওকালতিতে ইস্তফা দিয়ে বসে পড়তে হয়। জবাব দেন উপ-প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। স্বীকার করেন, শ্রীমতী কৃপালনীর প্রস্তাবে তাঁর সমর্থন ছিল।

শ্রীমিশ্রের ন্যায় আরও কয়েকজন প্রবীণ সদস্য বলেন যে, শ্রীমতী কৃপালনীর মতো প্রবীণ সদস্যা যদি শৃঙ্খলাভঙ্গ করেন এবং ব্যাপারটা সয়ে যাওয়া হয় তাহলে একটি খুব খারাপ নজীরই তরুণদের সামনে তুলে ধরা হবে। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী কেঁচো খুঁড়ে আর কিছু যার কথাও এখন বন্দী নন। নমোনম্মো করে এ যাত্রার গোলমালটা তিনি চাপা দিয়ে দিলেন। [illegible] জানা গেল সর্বত্র [illegible] আছে।

ভারতবিরোধী প্রচারে পশ্চিমী বন্ধুরা

সংসদ সদস্য [illegible] প্রমুখ একটি [illegible] ইউনাইটেড প্রেস সার্ভিস ও ওরিয়েণ্ট প্রেস নামে দুটি ভারতীয় সংবাদ সংস্থা পাকিস্তান জামাত এবং [illegible] প্রবোচনায় ভারত-বিরোধী প্রচার কার্য [illegible]। স্বরাষ্ট্র [illegible] মন্ত্রী শ্রী [illegible] আশ্বাস দিয়েছেন এ বিষয়ে তদন্ত করা হবে বলে।

[illegible] লোকসভায় বৈদেশিক দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীসুরেন্দ্র পাল সিং জানান যে, লণ্ডনের সাপ্তাহিক পত্রিকা 'অবজার্ভার' নাগাভূমি সম্পর্কে মিথ্যা সংবাদের ভিত্তিতে ভারতবিরোধী প্রচারের মহান দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। ভারতীয় হাই কমিশন অসত্যভাবে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ পাঠিয়ে প্রতিবাদটিও ঐ পত্রে মুদ্রিত করাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

পশ্চিমী সম্পাদের মধ্যে এমন ভারত-বিদ্বেষী মনোভাবসম্পন্ন কিছু মহানুভব ব্যক্তির যে অসদ্ভাব নেই তা আমরা জানি। এঁরা ভারত-বিদ্বেষের প্রচণ্ড তাগিদে পড়ে [illegible] ধর্মীয় আলখাল্লা চাপিয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘাঁটি বেঁধেও বসে থাকেন। এঁদের অপকীর্তির সংবাদ মাঝেমধ্যে ফাঁস হয়ে গেছে। কিন্তু দেশের দরিদ্র অশিক্ষিত যে জনসাধারণের মধ্যে এঁরা প্রচার নামেন তাঁরা সহজেই সাদা চামড়ার ঔজ্জ্বল্য এবং দীর্ঘদিনের পরাধীন মনোভাবের হীনমন্যতার দরুণ এঁদের শিকারও হন। অসহায় সাধারণ মানুষ যখন বৈদেশিক প্রচারের শিকার হন তখন দোষটা আমাদের ঘাড়েই চাপে। কেন না আমরা তাঁদের এমন অনালোকিত দুরবস্থার মধ্যে রেখেছি যে তাঁদের ওপর প্রভাব বিস্তার করা অন্যের পক্ষে অনেক সহজ হয়ে পড়েছে। এর জন্য আমরা সমবেত-ভাবে এবং আমাদের সরকারও অনেক ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়তার জন্য দায়ী।

কিন্তু যে শিক্ষিত বিত্তবান সমাজ

বিদেশীর কাছে দালালি করে অর্থের লোভে এবং জেনে বুঝে দেশ ও জাতির সঙ্গে গুপ্ত বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত হয়, তাদের পাপের শাস্তি তাদেরই গ্রহণ করতে হবে পুরো দায়িত্বের সঙ্গে। এক্ষেত্রে অনমনীয় এবং ক্ষমাহীন দৃঢ়তা গ্রহণের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। বিদেশী চক্রান্তের সঙ্গে অনেক দেশী গণ্যমান্য ব্যক্তির সম্পর্কও প্রকাশ হয়ে থাকে। কিন্তু যে চরম শাস্তির বিধান তাদের ওপর চাপালে দেশের ওপর তা একটি স্থায়ী রেখাপাত করতে পারে, দুঃখের বিষয় এখানে তা করাই হয় না। বরং এ জাতীয় সংবাদকে গোপন করা হয়। চক্রান্তকারীর সামাজিক মর্যাদা অটুট রেখে।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের প্রতি নমনীয় আচরণও দেশের প্রতি পরোক্ষ বিশ্বাসঘাতকতা।

এ হেন আচরণের সংবাদমাত্র শুধু তদন্তই নয়, প্রকাশ্য বিচার ও প্রকাশ্য শাস্তির ব্যবস্থাই বাঞ্ছনীয়।

আসাম পুনর্গঠন সমস্যা একই ভিত্তিতে

এতদিনের এত আলোচনা বানচাল হতে বসল। আসাম পুনর্গঠনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না আসাম আইনসভা কিম্বা রাজ্য কংগ্রেস অথবা রাজ্য কংগ্রেস পরিষদীয় দল। এক বাক্যে তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের দু-দুটি প্রস্তাবই অগ্রাহ্য করেছেন। ফলে আসামের পর্বতীয়া সমস্যা ভাসমান হয়ে রইল একই তিমির স্রোতে।

কেন্দ্রের ডাকে রাজ্যপাল শ্রী বি কে নেহরু গেছেন দিল্লী। কিন্তু রাজ্যের যেমন অনমনীয় মনোভাব তাতে নতুন কিছু হয়ে ওঠার আশা প্রায় তিরোহিত। আসাম বিধানসভার উভয়পক্ষীয় সদস্যগণই নতুনভাবে কোনোরকম পুনর্গঠনেই গররাজি। মুখ্যমন্ত্রী চালিহা বলছেন, রাজ্য সরকার আসাম পুনর্গঠনে অশোক মেহতা কমিটির সুপারিশ অনুসারে পুনর্গঠনে রাজী। অন্যথা রাজ্যে অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। কিন্তু আসাম পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে শ্রীমেহতার সুপারিশ আর এক পক্ষ, পার্বত্য উপজাতিগণ, মেনে নেন নি। এ নিয়ে একাধিক বৈঠক হয়ে গেছে। শ্রীযুত চালিহা নিজেও দিল্লী গেছলেন এবং আপোষের বিষয়ে খানিকটা নরমরাজি মনোভাবও প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু রাজ্য কংগ্রেসের মোটা অংশই চালিহার এই মীমাংসামূলক মনোভাব আদৌ বরদাস্ত করতে পারেন নি।

অশোক মেহতা কমিটির সুপারিশ হল নামান্তরে পটাশকর কমিটিরই সুপারিশ। যার লক্ষ্য পর্বতীয়াদের কেবলমাত্র আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া। পর্বতীয়াগণের দাবি পৃথক রাজ্যের। যদি নাগাভূমি হতে পারে, পার্বত্য আসাম হবে না কেন? তাঁদের প্রশ্ন।

এই প্রশ্নের ফলেই অশোক মেহতা কমিটির সৃষ্টি। কিন্তু সে কমিটির সুপারিশ, পর্বতীয়াদের আকাঙ্ক্ষাপূরণে অক্ষম। ফলত সুপারিশ প্রকাশের পর তাঁদের মধ্যে বিক্ষোভ এতদূর তীব্রতা লাভ করে যে তাঁরা একযোগে নির্বাচন পর্যন্ত বয়কট করেছিলেন সংঘবদ্ধ শক্তি নিয়ে। বাধ্য হয়ে সমস্যার পুনর্বিচার করতে হয়েছিল কেন্দ্রকে এবং কেন্দ্রীয় নেতারা সমস্যার একটি ক্ষীণ সমাধানও খুঁজে নিয়েছিলেন।

কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে স্থির হয় যে, একটি স্বতন্ত্র পাহাড়ী রাজ্য গঠন করা যেতে পারে গারো খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে। আসামের মধ্যে থেকেই কতকগুলি ব্যাপারে এই পাহাড়ী রাজ্যের স্বতন্ত্র ক্ষমতা থাকবে। আঞ্চলিক শৃঙ্খলারক্ষার ভারও থাকবে নবগঠিত রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত। অবশ্য এই সিদ্ধান্তেও কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সর্বসম্মত ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। এজন্যই প্রধানমন্ত্রীকে পত্রযোগে দু-একজন সদস্য জানিয়েছিলেন, পার্লামেন্টারী কমিটির সঙ্গে পরামর্শ না করে সরকার যেন কোন সিদ্ধান্ত না গ্রহণ করেন।

কেন্দ্রের তো এই অবস্থা। ওদিকে রাজ্য কংগ্রেসে ও আইনসভায় ঘোর বিরোধিতা, এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার কতৃত্বই অসহায়। যদিও শোনা গেছে, উপ-প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী প্রমুখ কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পুনর্গঠন সংক্রান্ত খসড়াটি অনুমোদন করেছিলেন। কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা আশ্বাস দিয়েছিলেন, আসাম কংগ্রেসকে তাঁরা রাজী করাবেন বলে। কিন্তু কিছুতেই কোন সুফল ফলল না। অবস্থায় এখন অধিকতর জটই পাকিয়ে উঠল। পার্বত্য নেতৃসম্মেলন উগ্রপন্থী নন তাই রক্ষে, না হলে দেশব্যাপী যে ইতস্তত অরাজকতা চলছে তাতে অসন্তুষ্ট পর্বতীয়াদের গিয়ে নতুন অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি হতে পারত। বার বার আঘাত পেয়ে এঁদের ধৈর্যের বাঁধও শিথিল হয়ে আসছে। এবং না-ভোক তেমন কিছু, কিন্তু পর্বতীয়াদের নিয়ে যদি বিদ্রোহী নাগাদের মতো ভুগতে হয়, তবে পূর্ব সীমান্তকে কেন্দ্র করে নতুন সঙ্কট দেখা দেবে, যা শুধু আসামকেই নয়, বিব্রত করবে সমগ্র ভারতকেই।

প্রধানমন্ত্রী তাই পর্বতীয়া সমস্যাকে একটি আঞ্চলিক সমস্যারূপে না দেখে ব্যাপক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির বিচার করতে আহবান জানিয়েছেন।

ভারতদর্শনের প্রস্তাব বহুকাল যাবৎ কিস্তিতে কিস্তিতে ঠিক ঐ বক্তব্যই তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে; আজ যা প্রধানমন্ত্রী বলছেন। তিনি বলেছেন, আসামের পর্বতীয়া-সমস্যাকে সীমান্ত সমস্যারূপেই বিচার করা হোক।

অর্থাৎ সমগ্র দেশের প্রতিরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকেই এই সমস্যার সমাধান খুঁজে নিতে হবে। এবং যদি তাই হয়, তাহলে এত বড় একটি বিষয়কে শুধুমাত্র রাজ্য বিধানসভা ও রাজ্য কংগ্রেসের মতামতের ওপর ছেড়ে দিয়ে কেন্দ্রের পক্ষের অসহায়ের মতো ফলাফল লক্ষ্য করা সম্ভব নয়।

লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করার আগে সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃসম্মেলনের সদস্য শ্রীসোয়েল উদ্বিগ্নভাবে পর্বতীয়া সমস্যা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের সর্বশেষ সংবাদ চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সরকার তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য সমান ব্যগ্রতা বোধ করছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি অভাবনীয় জটিলতা ধারণ করায় নতুন চিন্তার অবসর দেখা দিয়েছে। সরকার অবশ্য আগামী ১২ই সেপ্টেম্বরের মধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেন।

বিধানসভায় বিক্ষোভ

ওদিকে আসাম বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী চালিহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশিত হচ্ছে। আনা হয়েছে অনাস্থা প্রস্তাব।

চালিহার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ইতিপূর্বে মৌনভাব অবলম্বন করে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তে মৌন সম্মতিই দান করেছেন। বর্তমানে রাজ্যের গরম অবস্থা লক্ষ্য করে ভোল পাল্টাচ্ছেন মাত্র।

আসাম থেকে নির্বাচিত সংসদের কংগ্রেস সদস্যগণও অবশেষে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস এবং পরিষদীয় দলের সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছেন। উল্লেখনীয় এই যে, যে বৈঠকে উক্ত অনুমোদন দান করা হয় সেখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দীন আলি আহমেদও উপস্থিত ছিলেন।

সমগ্র আসাম পুনর্গঠন প্রশ্নে এক-কাট্টা হয়ে রুখে দাঁড়াল। অতঃপর বিষয়টি আরও শক্ত কব্জায় গিয়ে পড়ছে। আগামী ১২ সেপ্টেম্বর, সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তার ফলাফল কী হয় সমগ্র পূর্বাঞ্চল তার জন্য উৎকণ্ঠিত অপেক্ষায় থাকবে।

প্রধানমন্ত্রীর আবেদন এক রকম নিষ্ফল হয়েছে বলা যায়। এবং তার অর্থই হল পূর্বাকাশে নতুন ঘনঘটার আয়োজন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :

উপ-রাষ্ট্রপতি হুবার্ট হোরেশিও হামফ্রে আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন।

কদিন ধরে চিকাগো শহরে ডেমোক্রাটিক পার্টির জাতীয় সম্মেলন চলছে। ২৯শে আগস্ট প্রার্থী মনোনয়নের ভোট নেওয়া হয়। বিপুল ভোটাধিক্যে হামফ্রে জয়লাভ করেছেন। হামফ্রে পেয়েছেন ১৭৬১টি ভোট, প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে ইউজিন ম্যাকার্থি পেয়েছেন ৬০১ ভোট, জর্জ ম্যাকগভরন ১৭৬ আর নিগ্রো প্রার্থী চ্যানিং ফিলিপস ৬৭টি ভোট।

উপ-রাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনয়ন পেয়েছেন মেন থেকে নির্বাচিত সেনেট সদস্য এডমন্ড মাসকি।

হামফ্রের মনোনয়ন লাভের অর্থ হল, ডেমোক্রাটিক পার্টি জনসন শাসনের নীতির প্রতি পুনরায় তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করল। জনসনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে, ডেমোক্রাটিক পার্টিতেও তার ঢেউ এসে লেগেছে। বিশেষ করে ভিয়েতনাম যুদ্ধের ব্যাপারে এই বিক্ষোভ তীব্র আকার ধারণ করেছে। উত্তর ভিয়েতনামে নিঃশর্তে বোমাবর্ষণ বন্ধ করে কমিউনিস্টদের সংগে একটা মিটমাট করে ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসানের দাবি উঠছে। ইউজিন ম্যাকার্থি এই দাবি নিয়েই রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন। তাঁর পক্ষে বেশ সমর্থনও পাওয়া গিয়েছিল। তবু তিনি সুবিধা করে উঠতে পারলেন না। কদিন আগেই তিনি পরাজয় স্বীকার করেছেন। তবে রবার্ট কেনেডিকে যদি আততায়ীর হাতে প্রাণ হারাতে না হত, তবে কি হত বলা শক্ত। কেনেডির মনোনয়ন লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর ছিল।

ভিয়েতনামের ব্যাপারে ডেমোক্রাটিক সম্মেলন থেকে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে মার্কিন সৈন্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত না করা পর্যন্ত এবং উত্তর ভিয়েতনামের কাছ থেকে উপযুক্ত সাড়া না পাওয়া পর্যন্ত মার্কিন বোমাবর্ষণ বন্ধ করা চলবে না। ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সৈন্য অপসারণের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিনিধিদের একাংশের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। সম্মেলন চলাকালে প্রতিদিন বাইরে যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ ও মিছিল হয়েছে। এই বিক্ষোভ দমনের জন্য পুলিশকে টিয়ারগ্যাস ছুঁড়তে হয়েছে, লাঠি চালাতে হয়েছে, এবং প্রায় হাজার লোককে গ্রেপ্তার করতে হয়েছে।

হামফ্রে মনোনয়ন পেলেন বটে, তবে দ্বিধাবিভক্ত ডেমোক্রাটিক পার্টিকে এক করে কিভাবে তিনি নির্বাচনী অভিযান পরিচালনা করবেন, তা চিন্তার বিষয়।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ডেমোক্রাটিক পার্টির মনোনয়ন লাভের পর হুবার্ট হামফ্রের (বাঁদিকে) আনন্দোল্লাস।

হামফ্রেকে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসনের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। ইউজিন ম্যাকার্থি হয়তো এমনিতেই হারতেন তবু চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েট সামরিক হস্তক্ষেপ তার জয়ের সম্ভাবনাকে পুরোপুরি নষ্ট করেছে। ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রতিনিধিরা যুদ্ধবিরোধী মনোভাবকে একেবারেই পাত্তা দেন নি, তাঁরা কমিউনিস্টদের ব্যাপারে কঠোর হতে চেয়েছেন। তাই হামফ্রে এত বেশি ভোট পেয়েছেন। হামফ্রে কমিউনিস্টদের সম্পর্কে, ভিয়েতনামের ব্যাপারে কঠোর নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী। কিন্তু এই প্রশ্নে হামফ্রের চেয়েও নিকসনের সুবিধা আরও বেশি। তিনি কমিউনিস্ট-বিরোধী বলে বিখ্যাত। ডেমোক্রাটিক পার্টির চেয়ে রিপাবলিকান পার্টি বেশি কমিউনিস্ট বিরোধী। ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরীতে যখন সোভিয়েট সৈন্য অভিযান করে, ইমরে নজেকে হত্যা করে যানোস কাদারকে ক্ষমতায় বসায়, তখনও মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হচ্ছিল। সে নির্বাচনে ডেমোক্রাট প্রার্থী আদলাই স্টিভেনসন রিপাবলিকান প্রার্থী ডুইট আইসেনহাওয়ারের কাছে পরাজিত হন। এবার কি হবে?

চেকোশ্লোভাকিয়া :

চেকোশ্লোভাকিয়া ও সোভিয়েট যুনিয়নের নেতাদের মধ্যে মস্কোতে চারদিন ব্যাপী আলোচনার পর উভয়পক্ষের মধ্যে একটা মীমাংসা হয়েছে। ২৭শে আগস্ট মস্কো থেকে যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশ করে বলা হয়েছে, চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে ওয়ারশজোটের সৈন্য অপসারণের শর্তের ব্যাপারে উভয় দেশের নেতাদের মধ্যে ঐকমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আলোচনার পর চেকোশ্লোভাকিয়ার নেতৃবৃন্দ লুডভিক স্বোবোদা আলেকজান্ডার ডুবচেক, যোশেফ স্মরকোভস্কি, অলড্রিচ চারনিক গুস্তাভ হুসাক, সবাই প্রাগে ফিরে এসেছেন।

সোভিয়েট য়ুনিয়ন ও ওয়ারশ চুক্তি-ভুক্ত অপর চারটি রাষ্ট্র পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, বুলগারিয়া ও পূর্ব জার্মানীর সৈন্যদের চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণের পর দখলদার সৈন্যদের পক্ষ থেকে চেকোস্লোভাকিয়ায় তাদের পছন্দমত একটা সরকার গঠনের চেষ্টা হয়। কিন্তু এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সবোডা ডুবসেকদের বাদ দিয়ে কোন সরকার গঠন করতে অসম্মত হন। এমন কি যে ভাসিল বিলাক নভোটনির একান্ত অনুগামী ও সোভিয়েটপন্থী বলে পরিচিত, তিনিও তাঁবেদার সরকার গঠন করতে সাহস পান নি। চেক জনগণ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে দখলদার সৈন্যদের সঙ্গে অসহযোগিতা করেছে। সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে ডুবসেকের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছে। এই অবস্থায় বাধ্য হয়ে দখলদার সৈন্যবাহিনীর প্রধান জেনারেল আইভান প্যাভ্লভস্কি চেক রাষ্ট্রপতি লুডউইক সবোডার সঙ্গে আলোচনা সুরু করেন। এই আলোচনার জের টেনেই সবোডা অন্যান্য নেতাদের নিয়ে মস্কো যান। চেক কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক ও গণতন্ত্রীকরণের প্রধান নায়ক আলেকজাণ্ডার ডুবসেক, প্রধানমন্ত্রী অলড্রিচ চারনিক, জাতীয় পরিষদের সভাপতি যোশেফ স্মরকোভস্কি ও আরও বিশিষ্ট নেতাদের দখলদার সৈন্যরা গ্রেপ্তার করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে গিয়েছিল। সবোডার চাপে এঁদের সবাইকে মস্কোতে আলোচনার জন্য উপস্থিত করা হয়।

প্রধানত আলোচনা চেকোস্লোভাকিয়া ও সোভিয়েট য়ুনিয়নের নেতাদের মধ্যে হয়েছে। সোভিয়েট পক্ষে কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভ, প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সি কোসিগিন, সুপ্রীম সোভিয়েটের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি নিকোলাই পডগর্নি, বিশিষ্ট তত্ত্ববিদ্ মিখাইল সুসলভ প্রমুখ ছিলেন। তবে আলোচনার শেষ পর্যায়ে ওয়ারশগোষ্ঠীর অন্য চার রাষ্ট্রের নেতারাও যোগ দেন।

যুক্ত ইস্তাহারে মীমাংসার শর্তগুলি প্রকাশ করা হয় নি কেবল উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, "পরস্পরের প্রতি মর্যাদা, সাম্য আঞ্চলিক অখণ্ডত্ব, স্বাধীনতা ও সমাজতান্ত্রিক সংহতির ওপর ভিত্তি করে সহযোগিতা"র পথে তাঁরা একত্র চলবেন বলে সংকল্পবদ্ধ। বিভিন্ন মহল থেকে অবশ্য মস্কো চুক্তির শর্ত মোটামুটি জানা গেছে। সোভিয়েট নেতারা চেকোস্লোভাকিয়ার ডুবসেক নেতৃত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা মেনে নিয়েছেন। সরকার ও পার্টিকে আবার স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে দেওয়া হবে। 'অ্যাকশন প্রোগ্রামের' ভিত্তিতে যে গণতন্ত্রীকরণের কাজ সুরু হয়েছে, তাও অব্যাহত থাকবে। তবে, চেক নেতারা সংবাদপত্রের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ চালু করবেন বলে কথা দিয়েছেন। সোভিয়েট য়ুনিয়ন ও অন্যান্য কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা সংবাদপত্র বা অন্য কোথাও করতে দেওয়া হবে না। সিয়ের্না ও ব্রাতিস্লাভায় যে চুক্তি হয়েছিল, মস্কোতে আবার সে কথাই বলা হল। তবে, আপাতত ওয়ারশ-চুক্তির কিছু সৈন্য চেকোস্লোভাকিয়ায় থাকবে। বিশেষ করে পশ্চিম জার্মানীর সীমান্তে এরা পাহারা দেবে। আভ্যন্তরীণ কোন ব্যাপারে এরা হস্তক্ষেপ করবে না। পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে সৈন্য অপসারণ করা হবে।

চেক জনগণের মধ্যে মস্কো চুক্তির মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে। ডুবসেক ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ নিরাপদে দেশে ফিরেছেন, (মাঝে সংবাদ রটেছিল, ডুবসেককে মেরে ফেলা হয়েছে), এবং সোভিয়েট নেতারা ডুবসেক নেতৃত্ব ও গণতন্ত্রীকরণের দাবি মেনে নিয়েছেন (বা; মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন), এতে চেক জনতা উল্লসিত। কিন্তু তাদের প্রশ্ন: স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র চেকোস্লোভাকিয়ার মাটিতে দখলদার সৈন্য থাকবে কেন? বিক্ষুব্ধ চেকরা এই কারণে মস্কো চুক্তির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছে। অনেকের মতে, এই ঘটনা ১৯৩৮ সালে মিউনিক চুক্তির মত আপোষ, লজ্জা ও বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন। চেক নেতারা স্বাধীনভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন নি। বলা [illegible], জোর করে তাঁদের দিয়ে এই চুক্তি মানিয়ে নেওয়া হয়েছে। জাতীয় পরিষদও এই চুক্তি অনুমোদন করে নি। [illegible] ঘোষণার দাবি করেছেন।

চেক নেতারা যে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মস্কো আলোচনা করতে পারেন নি, এতে কোন সন্দেহ নেই। [illegible] রাষ্ট্রীয় সম্মানই প্রদর্শন করা হয় নি। কেন চেক ভূমিতে ছ' লক্ষ দখলদার সৈন্য অবস্থান করছে—[illegible] নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের লড়াই চলছে [illegible], ডুবসেক, চার্নিকদের আটক [illegible] মস্কোতে ধরে আনা হয়েছে [illegible] স্থিতিতে সৈন্য অপসারণের দাবি [illegible] চেক নেতাদের উপায় কি?

মস্কো আলোচনায় চেক প্রতিনিধি দলের অন্যতম স্মরকোভস্কি ৩০শে আগস্ট প্রাগ বেতার থেকে ভাষণ দেবার সময় স্বীকার করেছেন, এটা একটা আপোষ। তবে তিনি জনগণের কাছে আবেদন করেছেন, নেতৃবৃন্দের ওপর আস্থা রেখে এই চুক্তি মেনে নিতে। তাঁরা দেশপ্রেমিকের মতই এই চুক্তি করেছেন। আরও যাতে রক্তপাত না হয়, তার জন্যই কিছুটা সরে এসেও তাঁরা আপোষ করতে বাধ্য হয়েছেন। সবোডা, ডুবসেক সবাই বলেছেন তাঁরা আত্মসমর্পণ করেন নি, গণতন্ত্রীকরণের কাজও অব্যাহত থাকবে।

তবে, সোভিয়েট নেতাদের খুশি করার জন্য চেক নেতাদের কিছু করতেই হবে। ইতিমধ্যেই সংবাদপত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর করা হয়েছে। জাতীয় সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'সেটেকা'র প্রধান

মিরোস্লাভ সুলেককে পদচ্যুত করা হয়েছে। পার্টি প্রেসিডিয়ামের প্রচার বিভাগের প্রধান ফের্ডিনান্দ সিক্কারকেও সরানো হয়েছে। চারনিককে মন্ত্রিসভার ঘড়রকমের রদবদল করতে হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, গণতন্ত্রীকরণের অন্যতম কয়েকজন নেতা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিরোস্লাভ গালুস্কা, শিক্ষামন্ত্রী ভ্লাদিমির কাদেলাক, পররাষ্ট্র-মন্ত্রী জিরি হাজেক, সহকারী প্রধানমন্ত্রী ওটা সিক প্রমুখ নতুন মন্ত্রিসভায় স্থান পাবেন না। এঁদের জায়গায় সোভিয়েট সমর্থকদের নিতে হবে। পার্টি প্রেসিডিয়ামেও পরিবর্তন করতে হবে।

চেক জনসাধারণ এই অবস্থা কতটা মেনে নেবে, তা বলা শক্ত। এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দিতে বাধ্য। ইতিমধ্যেই স্লোভাকিয়া কমিউনিস্ট পার্টিতে বিক্ষোভ সুরু হয়েছে। সোভিয়েট সমর্থক বলে পরিচিত ভাসিল বিলাককে দলের প্রথম সম্পাদকের পদ থেকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় ডুবচেকের ঘনিষ্ঠ অনুগামী গুস্তাভ হুসাককে প্রথম সম্পাদক করা হয়েছে। অপর দিকে, ওয়ারশজোটের সৈন্যরাও বসে [illegible] চেক নেতারা কিভাবে মস্কো চুক্তি পালন করেন তা দেখার জন্য। প্রাভদায় [illegible] জানানো হচ্ছে, প্রতি-বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা [illegible]। এই দুই দিক সামলে ডুবচেক [illegible] কাজ করেন, দেখা যাক।

[illegible] আবার চেক সংকটের পটভূমিকায় রুমানিয়া নিয়ে উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। রুমানিয়ার সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্পর্ক অনেক দিন থেকেই খারাপ। চেকোস্লোভাকিয়ার গণতন্ত্রী-করণের আন্দোলনে প্রথম থেকে সমর্থন জানিয়ে আসছে রুমানিয়া। রুমানিয়ার রাষ্ট্রপতি ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক নিকোলাই চাউসেস্কু নিজে প্রাগে এসে চেক নেতাদের প্রতি তাঁদের পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে গেছেন। চেকো-স্লোভাকিয়ায় সোভিয়েট সৈন্য প্রবেশের পর তীব্র ভাষায় এই কাজের নিন্দা করেছেন চাউসেস্কু। বুখারেস্টে নাগরিকদের এক বিরাট জনসভাও অনুষ্ঠিত হয়েছে সোভিয়েট আক্রমণের বিরুদ্ধে। নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে বিপন্ন বোধ করে রুমানিয়া স্বদেশে সৈনা সমাবেশের নির্দেশও দিয়েছে। চাউসেস্কু ও যুগো-স্লাভিয়ার টিটোর মধ্যে এক দফা আলোচনা হয়েছে পরিস্থিতি নিয়ে। চেকোস্লোভা-কিয়ার সহকারী প্রধানমন্ত্রী ওটা সিক বুখারেস্টে গিয়ে রুমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী [illegible] ও বেলগ্রেডে গিয়ে যুগো-স্লাভিয়ার প্রধানমন্ত্রী মিকা স্পিলিয়াকের [illegible]। রুমানিয়ার এই

সব ব্যাপার দেখে সোভিয়েট ইউনিয়ন রীতিমত ক্রুদ্ধ। 'প্রাভদা'য় রুমানিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। এই সব দেখে শুনে অনেকেই আশংকা প্রকাশ করেছেন চেকোস্লোভা-কিয়ার পর এবার রুমানিয়ার পালা। এমন কি মার্কিন রাষ্ট্রপতি লিনডন জনসনও সম্ভাব্য রুমানিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নকে সাবধান করে দিয়েছে। তবে মনে হচ্ছে, এই আশংকা অমূলক। রুমানিয়ার বিরুদ্ধে কোন আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনার উদ্দেশ্য সোভিয়েট ইউনিয়নের নেই। রুমানিয়াও সুর নরম করেছে। সংবাদপত্রে সোভিয়েটের সমালোচনা কমেছে। বরং সোভিয়েট বন্ধুত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বিবৃতি ও প্রবন্ধ প্রকাশ করা হচ্ছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা:

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যের শাসন দ্রুত ভাঙছে। শ্বেতকায়দের মধ্যেই এই শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে।

কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যাপকের পদচ্যুতির বিরুদ্ধে

আগামী সপ্তাহ থেকে
সাপ্তাহিক বসুমতীতে
নিয়মিতভাবে পুনরায়
প্রকাশিত হবে
শিবাজীর
"রণাঙ্গন ওদেশে এবং এদেশে"

বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্বেতাঙ্গ ছাত্ররা ন'দিন ধরে অবস্থান ধর্মঘট করেছে।

কেপটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক নৃতত্ত্বের অধ্যাপক পদে ৩১ বৎসর বয়স্ক আফ্রিকীয় পণ্ডিত আর্চি মাফেজীকে নিয়োগ করা হয়। যে ক'জন ব্যক্তি এই পদের জন্য প্রার্থী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে মাফেজীর যোগ্যতা সবচেয়ে বেশি। আর, বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুসারে কোন কৃষ্ণাঙ্গকে কর্মে নিয়োগ করায় কোন বাধাও নেই। বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিলের সব সদস্য শ্বেতাঙ্গ। তাঁরা সর্বসম্মতি-ক্রমে মাফেজীকে অধ্যাপক পদে নিয়োগ করেন।

কিন্তু ভোরস্টার সরকারের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঔদ্ধত্য সহ্য করা সম্ভব হল না। শিক্ষামন্ত্রী জান দ্য ক্লার্ক হুকুম পাঠালেন, এ কাজ দক্ষিণ আফ্রিকার ঐতিহ্য বিরোধী—সুতরাং অবিলম্বে মাফেজীকে পদচ্যুত করো। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তারা ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁরা সরকারের এই নির্দেশকে অন্যায় বলে মনে করেন। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় স্বাতন্ত্র্যের ওপর এটা সরকারের অন্যায় হস্তক্ষেপ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়কে মাথা নত করতে হল। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থসাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। মাফেজীর চাকরী গেল।

শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে এর বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ সুরু হল। বিশিষ্ট অধ্যাপক ডবলিউ এম পোপ প্রতিবাদে চাকরীতে ইস্তফা দিলেন। কেপটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পালা করে এক সঙ্গে তিনশ'জন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের সম্মুখে অবস্থান ধর্মঘট করল। তাদের দাবি: মাফেজীকে পুনর্নিয়োগ করতে হবে। কেপটাউন ছাত্রদের সমর্থনে জোহানেসবার্গ ও অন্যান্য শহরেও ছাত্ররা মিছিল বের করেছে। বর্ণবৈষম্যবাদী মুষ্টিমেয় ছাত্রের পালটা বিক্ষোভে তারা বিচলিত হয় নি। সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রের সমর্থন তারা পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি পুন-র্বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় ন'দিন পরে ছাত্ররা অবস্থান ধর্মঘট প্রত্যাহার করেছে।

মাফেজী তাঁর চাকরী ফিরে পাবেন কি না সেটা বড় কথা নয়, শ্বেতাঙ্গ ছাত্র ও শিক্ষকরা আজ বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে নেমেছে, দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনীতিতে এর গুরুত্ব কম নয়।

গো-বধ-এর প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য গলায় দড়ি বেঁধে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা গ্রহণের দৃশ্যটা আজকাল আর দেখা যায় না। শহরে গৃহস্থরা গরু পোষার পাট তুলে দিয়েছে বহুকাল আগে, আর গ্রামেও ঠিক পূর্বের মত গোপালনের সুযোগ নেই ; যা হোক যে দৃশ্যটার কথা বলছিলাম, সেটা হ'ল এই যে, গলায় দড়ি জড়িয়ে এক ব্যক্তি আপনার দ্বারে এসে দাঁড়াবে, কথা বলবে না, শুধু গো গো করবে। এই দৃশ্য দেখে আপনাকে বুঝতে হবে যে, এই ব্যক্তির বাড়িতে একটি গরু মারা গেছে এবং গরুটা যে কারণেই মারা যাক, মরার সময় গরুর গলার দড়ি ছিল। কোন গরুর মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে গরুর গলার দড়ি খুলে দিতে হয়। এই ক্ষেত্রে গরুর গলায় দড়ি থাকা অবস্থায় গরুটার মৃত্যু হয়েছে। তাই সেই গরুর মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্তের জন্য উক্ত ব্যক্তি ভিক্ষা সংগ্রহে বেরিয়েছে। কিন্তু যে কারণে এই দৃশ্যের কথা বলছি সেটা কিন্তু গরুর মৃত্যুর কারণে নয় ; বর্তমানে আপনি যদি উত্তরবাংলার কোচবিহারের দিনহাটা থেকে শুরু করে মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম অথবা দার্জিলিঙের কালিম্পং থেকে ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ পর্যন্ত যে কোন কেন্দ্রে যান, তবে দেখবেন একদল ব্যক্তি ঠিক গরুর মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্তের মত গলায় দড়ি বেঁধে গো গো করে বেড়াচ্ছেন। এই গো গো শব্দকারীদের সঙ্গে বর্তমান ভ্রাম্যমাণ ব্যক্তিদের তফাৎ হল এই—এঁরা হাতে একটি তালিকা নিয়ে এক-একটা এলাকায় যাচ্ছেন, হাটে-গঞ্জে-বাজারে গিয়ে বসছেন আর খোঁজ করছেন—আচ্ছা দাদা, বলুন তো অমুক ব্যক্তি কোন্ গ্রামে থাকেন, আচ্ছা, অমুক ব্যক্তির কি রকম পয়সা আছে, অথবা অমুক ব্যক্তি নির্বাচনপ্রার্থী হলে কি রকম ভোট পাবেন। হাটে-গঞ্জে প্রাথমিক খোঁজ নিয়ে খোঁজারুর দল গ্রামে গিয়ে ধরছেন এক-একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে, যে ব্যক্তি হয়ত অতীতে কোন নির্বাচনে কোন দলের হয়ে নির্বাচনপ্রার্থী হয়েছিলেন, কিন্তু এখন আর রাজনীতি করেন না অথবা যে ব্যক্তি হয়ত গত নির্বাচনে নির্দলীয় প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে কিছু ভোট পেয়েছিলেন। খোঁজারুর দল তাঁকে গিয়ে ধরছেন—স্যার, আপনি আমাদের দলের প্রার্থী হয়ে নির্বাচনপ্রার্থী হোন, টাকা-পয়সা, গাড়ির জন্য ভাবনা নেই, আমরা দেব। কোন ব্যক্তি কোন এক বিশেষ দলের মনোনয়ন চেয়ে বিফল হয়েছেন, এমন ব্যক্তির খোঁজ নিয়ে খোঁজারুর দল তাঁর কাছে যাচ্ছেন, বলছেন—স্যার, আপনি আমার দলের মনোনয়নে দাঁড়ান। কেউ রাজী হচ্ছেন, কেউ রাজী হচ্ছেন না, তবে খোঁজারুর দলের এই প্রার্থী শিকারের দৃশ্য রাজ্যের সর্বত্র চলছে।

কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলা যাক। আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচনে রাজ্যের সব দলেরই যোগ্য প্রার্থীর বড়ই অভাব। কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট এই দুই দলের বিরাট রাজ্যব্যাপী সংগঠন থাকায় এই দুই দলের সমস্যার একটু ইতরবিশেষ আছে, তবে তাঁরাও সমস্যামুক্ত নন। কিন্তু যে সব দল যাঁরা একশত-দুইশত প্রার্থীর মসনবদার হতে চেয়েছিলেন, তাঁরা অনেকেই এখন হালে পানি পাচ্ছেন না। কংগ্রেসের প্রার্থীর অভাব নেই, বরং কংগ্রেস দলের অনেককে প্রার্থী হবার সুযোগ না দেওয়াতেই বিপত্তি দেখা দেয়, যদিও এবার কংগ্রেসকেও প্রার্থী বাছাই করতে গিয়ে যোগ্য প্রার্থীর অভাব অনুভব করতে হয়েছে, যুক্তফ্রন্টের বহু মহীরুহের সামনে কংগ্রেস প্রার্থী দিতে গিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে নিতান্তই এক-একটি আগাছাকে দাঁড় করিয়েছে। এ ছাড়া কংগ্রেস পড়েছে এক ভগবানের মারে। একজন প্রার্থী এই শেষ সময়ে হার্ট এ্যাটাকে অসুস্থ হয়ে পড়লেন আর নাম প্রত্যাহার করে নিলেন। একজন প্রার্থী পারিবারিক দুর্ঘটনার দরুণ নাম প্রত্যাহার করে নিলেন। আর একজন জাঁদরেল প্রার্থী অকস্মাৎ মারা গেলেন। তবে কংগ্রেসের একটা সুবিধা যা হোক তাড়াতাড়ি সে শূন্য স্থান পূর্ণ করতে পারছে। কিন্তু অন্য দল—যাদের এক-জন প্রার্থী বিগড়ে গেলে বা প্রার্থী হতে অস্বীকার করলে সেই দলকে চোখে সর্ষের ফুল দেখতে হচ্ছে। যুক্তফ্রন্টের কোন কোন দল যে এখনও সব আসনে প্রার্থী ঘোষণা করতে পারে নি, তার অন্যতম কারণ হল এটা। কয়েকটি কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী সংগ্রহে হিমসিম খেয়ে যখন কোন প্রার্থী পাচ্ছে—সেখানেও বহু সময় বহু বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। যুক্তফ্রন্ট বাঁকুড়া জেলায় একটি কেন্দ্রে প্রার্থী ঠিক করল, কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, সেই প্রার্থী তত দরকষাকষি শুরু করল। প্রথমে বলল—আমার নির্বাচনের খরচ পড়বে এত হাজার টাকা, দিতে হবে কিন্তু। সেই দল ঢোক গিলে বলল, দেখা যাবে, কাজ শুরু কর। কিছুদিন পরে প্রার্থী এসে বলল, কাজ শুরু করতে বললেন, কিন্তু তার এত খরচা চাই। আমার যাতায়াত করতে হবে, ঘোরাফেরা করতে হবে, তার জন্য তো খরচা চাই। যুক্তফ্রন্টের সেই দল সব শুনে বোবা হয়ে গেল, বলে কি? নির্বাচনের প্রচার শুরু করবে, প্রার্থী নিজে ঘোরাফেরা করবে, তার জন্য পান-বিড়ির খরচা চাই। সেই দল বলল—বাবা, তোমার প্রার্থী হয়ে কাজ নেই, তুমি অন্য পথ দেখ। অন্য পথ দেখবার কিছু নেই, পরে জানা গেল সেই প্রার্থী ইতিমধ্যে অন্য ঐ গো গো দলের একজনের শিকার হয়ে বেশ কিছু অগ্রিম নিয়ে বসেছে। যুক্তফ্রন্টের অপর এক-দলের একজনকে অনেককাল একটি কেন্দ্রের জন্য প্রার্থী মনোনীত করা হয়েছে। এই প্রার্থী ভদ্রলোক গত নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন সেটা কোন অসম্ভব ঘটনা নয়। কিন্তু কেউ কোনদিন শুনেছেন—কোন ব্যক্তি নির্বাচনে বিয়োগান্তভাবে পরাজিত হবার পর সোজা নিজেকে মন্ত্রী করবার জন্য প্রস্তাব করতে পারে। এই ভদ্রলোক কিন্তু সেই ব্যক্তি, যিনি নির্বাচনে পরাজিত হলেও রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনকালে সোজা

ধ্যাজার হয়েছিলেন শ্রীজ্যোতি বসু ও শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের কাছে—তাঁদের হাতে ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে নিজের মনের বাসনা প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীজ্যোতি বসু ও শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় উক্ত ব্যক্তির আভাস-ইঙ্গিতের প্রস্তাব শুনে থ হয়ে গেলেন। বলে কি, বিজয়ী ব্যক্তিরা কেউ মন্ত্রিত্বের জন্য উমেদারী করছে না, এই ব্যক্তি পরাজিত হয়েও বলছে—আমার সম্প্রদায়ের কোন যোগ্য ব্যক্তি নেই মন্ত্রী হবার মত। অতএব । এই ব্যক্তি এইবারও মনোনয়ন পেয়েছেন, কিন্তু যে দলের প্রার্থী সেই দলের শুধু ভয়, তার এই প্রার্থী জয়ী না হয়ে যায়। ভাবুন অবস্থাটা, দলের ভাবনা, কিভাবে তার প্রার্থী জয়ী হয় তাই নিয়ে, আর দলের নেতার ভাবনা, এই প্রার্থী জয়ী হলে কি হবে তা নিয়ে। এই সামান্য ঘটনাটি উল্লেখ করে এই কথাটাই বলতে চাই, যোগ্য প্রার্থীর অভাবের কারণেই এই জাতীয় মনোভাবের প্রার্থীকে মনোনয়ন দিতে হয় আর এই প্রার্থীরা জয়ী হয়ে দলকে ডুবিয়ে, কখনও দলত্যাগ করে, কখন দেশী বিলাতী খেয়ে আত্মবিক্রয় করে

কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট দুই বড় শরিক—২৮০টি কেন্দ্র ও তার প্রার্থী নিয়ে তাঁদের কারবার, তাঁদের এই বৃহৎ যজ্ঞে সামান্য ত্রুটি হতে পারে, কিন্তু কেলোর কীর্তি করছেন অন্য বারো ভুঁইয়ারা। এই ভুঁইয়ারা কেউ ঘোষণা করেছিলেন—২৮০টি কেন্দ্রে প্রার্থী দেবেন, কেউ ঘোষণা করেছিলেন—১৫০টি কেন্দ্রে প্রার্থী দেবেন, কারও ঘোষণা ছিল—প্রার্থীসংখ্যা ১০০ হবে। এই ঘোষণাগুলি ছিল, লোকদল, আই এন ডি এফ, জাতীয় দল, মুসলিম লীগ, জনসঙ্ঘ, ক্রান্তি দল, কৃষক সমাজ প্রভৃতি দলের। কিন্তু নির্বাচন নভেম্বরে হলে মাঝে মাত্র দু মাস বাকি, আর এই দু' মাসের একমাস যাবে পূজা সহ অন্যান্য পর্বে, অর্থাৎ মূলে সময় মাত্র একমাস, অথচ প্রকৃতপক্ষে জনসঙ্ঘ ও মুসলিম লীগ ছাড়া অন্য কেউ তার প্রার্থীতালিকার কোন নমুনাই প্রকাশ করতে পারেন নি। এর মধ্যে পি-এস-পি অবশ্য রহস্য উপন্যাসের একটি পর্ব বাজারে ছেড়েছেন অর্থাৎ কতকগুলি কেন্দ্রের নাম বাজারে ছেড়ে দিয়েছেন। সেই কেন্দ্রের প্রার্থী কারা, বা আরও কত কেন্দ্রে তাঁরা প্রার্থী দেবেন সেই কথা ঘোষণা করা সম্ভব হয় নি। এই দলগুলির মধ্যে কত রকমের খেলা চলছে তার কোন হিসাব নেই, একজন প্রার্থীরও সন্ধান পেলে হয়ত তিন দল দিয়ে তাঁর কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন।

[illegible] আছে [illegible] বাড়ির [illegible] এবং হবু প্রার্থীর বাড়িতে [illegible] সদের [illegible] করছেন—সন্ধ্যাবেলার জাতীয় দলের নেতা গাড়ি নিয়ে সেখানে হাজির। হবু প্রার্থী তখন কাকে কোথায় রাখেন সেই বিপত্তিতে অস্থির। বহরমপুরে একজন প্রার্থী সম্প্রতি এই-রকম বিপত্তিতে পড়েছিলেন। ফরাক্কায় জনৈক প্রাক্তন বিধানসভা সদস্য লোকদলের প্রার্থী হবার চেষ্টা করছেন—আর তাঁর এক ভাই, যিনি পেশায় শিক্ষক, তিনি জাতীয় দলের প্রার্থী হচ্ছেন। তাঁর আর এক ভাই মুসলিম লীগের শ্রীসেকেন্দার আলি মোল্লার সঙ্গে কথা বলছেন। প্রার্থী ইলোপ-এর কথা শোনা যায়, কিন্তু দল ইলোপ করা যায় এমন কথা সহজে শোনা যায় না। শ্রীআশুতোষ ঘোষের আই এন ডি এফ কম করে এমনি ছোট তিন-চারটি দলকে ইতিমধ্যে ইলোপ করে দিয়েছেন বলা যায়। সেকেন্দার আলি মোল্লার মুসলিম লীগ দপ্তরের বাড়িটি সম্প্রতি প্রবল বর্ষণে ভেঙে পড়ে। শ্রীমোল্লা দপ্তর বাড়ি ভেঙে পড়ায় উদ্বাস্তু হন। নতুন দপ্তরে যখন গিয়ে পৌঁছান, তখন দেখেন শুধু দপ্তর নয়, তাঁর দলের একটা বড় অংশকে আই এন ডি এফ গ্রাস করে নিয়েছে। শ্রীযোগেন মণ্ডলের রিপাবলিকান পার্টিকে এই নির্বাচনে হয়ত দেখা যাবে—তাঁরাও শ্রীআশুতোষ ঘোষের দলের হয়ে কাজ করছেন। শ্রীযোগেন মণ্ডল গত নির্বাচনে শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তের আশীর্বাদ পেয়ে বারাসত লোকসভা কেন্দ্রে লড়াই করেছিলেন, এবার শ্রীমণ্ডল শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্তকে ছেড়ে শ্রীআশুতোষ ঘোষের উপর ভর করেছেন। অর্থাৎ কংগ্রেস এবং যুক্তফ্রন্ট ছাড়া অন্য দলগুলির প্রার্থীতালিকা কবে প্রকাশিত হবে ঠিক নেই—আব হলেও দেখা যাবে, একজন প্রার্থীর নাম হয়ত তিন দলে রয়েছে আর সেই প্রার্থী কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলছেন—না, না, মশাই অমুক দলের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি অমুক দলের অকৃত্রিম সেবক ও প্রার্থী। কিন্তু নির্বাচনের আগে হলো এই অবস্থা, নির্বাচনেব পর এই সব রাজনীতিবিদরা জয়যুক্ত হলে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে সেটা এখন থেকেই বোঝা যাচ্ছে। আর কোনক্রমে যদি কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট উভয় দলের কেউ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করে, অর্থাৎ যদি অন্য কোন দলের সহায়তায় মন্ত্রিসভা গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন যে খেলা হবে সেই খেলা গতবারের চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয় হবে সন্দেহ নেই।

প্রিয় বান্ধবী,

আপনাকে এই নামে সম্বোধন করায়— মার্জনা করবেন। কিন্তু উপায় কি— আপনার নাম আমার অজ্ঞাত, ঠিকানাও। এবার নিশ্চয় অনুমান করতে পারছেন কোথা থেকে আপনার খোঁজ পেয়েছি। তা ছাড়া, সম্বোধনটিকে ইংরেজি শিষ্টতা বলে ধরে নিলে আপত্তির কোনও কারণ নেই। এবং যদি এই চিঠির জবাব দেন (যা আমি সর্বান্তঃকরণে আশা করছি) তবে আপনাকেও এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

উপরন্তু এখনও আপনি আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, যদিও আপনার কথা আমি কিছুটা জানি। তা না হলে অবশ্য এ চিঠি লিখতাম না। আমি জানি আপনি বি-এ পাশ করেছেন, এবং নিজে উপার্জন করেন। এও জানি আপনি বেড়াতে এবং বই পড়তে ভালবাসেন—বিশেষ করে জীবনী এবং কবিতা। এই সবই আপনার সঙ্গে আমার মিলে যাচ্ছে, তবে আমি এম-এ—অর্থবিদ্যায়। নিজের সম্বন্ধে অবশ্য আরও কিছু বলতে পারি, কিন্তু হয়তো তাতে আপনার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, সুতরাং প্রথম চিঠি সংক্ষেপ করাই ভাল।

যেভাবে এই আলাপের সূচনা তার থেকে ধরে নিচ্ছি আপনি সেকেলে বাঙালী মেয়ে নন—এবং হয়তো আমারই মত কিছুটা নিঃসঙ্গ। তবু এখন সাক্ষাৎ পরিচয়ের অনুরোধ আমি করব না; তাই তো প্রাথমিক সর্ত, কি বলেন? সুতরাং আপাতত এক অশরীরী সংখ্যা রইল আমার সাক্ষী।”

চিঠিটি এসেছে দুই খামের আবরণে। বাইরেরটি বড়, বাদামী রং এবং তার উপর রমার নাম ঠিকানা টাইপ করা; ভিতরের সাদা খামটির উপর কালিতে লেখা একটি নম্বর, তার নিচে মিতালির সমিতির ঠিকানা। হাতব্যাগ খুলে ছোট এক খুপরি থেকে রমা ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ বার করল, তার সঙ্গে মেলাল নম্বর। তারপর চিঠি ছোট খামটির মধ্যে ভরে তা ব্যাগের মধ্যে রাখল এবং ছুটল আপিসের বাস ধরতে।

অন্যদিন আপিসে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বাসের ভিড়ে রমার মন বিগড়ে যায়, আজ সারা পথটা সে অন্যমনস্ক হয়ে রইল, তারপর কাজের মধ্যেও এক ভাবালুতা ঘিরে থাকল তাকে। চিঠির জবাব দেবে কি? দিলে কি লিখবে?

কাহিনীর সূত্রপাত আসলে প্রায় দু মাস আগে। এক সাপ্তাহিক পত্রিকায় ক্ষুদ্র এক বিজ্ঞাপন রমার চোখে পড়েছিল, মিতালি সমিতি নামক এক প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে। বিজ্ঞাপনের ভাষা চমকপ্রদ: “বন্ধু সকলেরই আছে, কিন্তু তাদের ক’জনের সঙ্গ বা স্মৃতি জীবনের নানা আঘাতের মধ্যে মনকে শান্ত করে, তৃপ্ত করে? ক’জনের থেকে সংবেদন আশা করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসি? দুঃখের দিনে একলা বসে যখন ভাবি তখন কি আমাদের অনেকেরই মনে হয় না যে সান্ত্বনার দরদী বন্ধু একজনও নেই যার সঙ্গে আমাদের মন এক সুরে বাঁধা? কিন্তু এমন লোক সত্যিই আছে যে আমাকে বুঝতে পারবে, যাকে আমি বুঝতে পারব। আমাদের আশেপাশেই আছে—কিন্তু অল্পসংখ্যক পরিচয়ের মধ্যে তাদের পাওয়া যায় না, সব ভাল জিনিসের মত তাদেরও খুঁজে বার করতে হয়। এই কাজে আমরা সাহায্য করতে চাই।”

সভ্য হতে হলে সামান্য কিছু মাশুল সহ নাম, ঠিকানা, বয়স এবং নিজের সম্বন্ধে আর কিছু তথ্য লিখে পাঠাতে হবে, এর মধ্যে জীবিকা, অবসর বিনোদনের কাজ, রুচি ইত্যাদি বিষয়ে বলা যেতে পারে, কিন্তু কে কতটা জানাবে তা সম্পূর্ণ তার নিজের ইচ্ছাধীন। প্রতি মাসেই এইসব খবর সভ্যদের পাঠানো হবে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হল সমিতির পক্ষ থেকে কারও নাম ঠিকানা অন্যকে জানানো হবে না— প্রত্যেকের পরিচয় শুধু মাত্র একটি নম্বর। সভ্যরা নিজের ইচ্ছামত সময় বুঝে নাম ঠিকানা প্রকাশ করবেন এবং সাক্ষাৎ আলাপ করবেন। কিন্তু যদি প্রাথমিক পত্র বিনিময়ে আশানুরূপ সুরটি না বাজে তবে যে কেউ পরীক্ষা সমাপ্ত করতে পারে শুধু চিঠির জবাব না দিয়ে; অপর ব্যক্তি উৎসুক হলেও তখন তাকে আর বিরক্ত করতে পারবে না।

বিজ্ঞাপনটি পড়ে রমার মনে প্রথমেই যে ভাবের উদ্রেক হয়েছিল তা মৃদু

বিস্ময়। সমাজের নিশ্চয় দ্রুত প্রগতি হচ্ছে, কিছু কাল আগেও দেশী কাগজে এমন জিনিস আশা করা যেত না। অবশ্য প্রগতি মানে পাশ্চাত্যের অনুকরণ মাত্র। কিন্তু পাত্রী নির্বাচনে গিয়ে সে থেমে গেল, সমিতি সংক্রান্ত মন দিয়ে পড়ল আবার। না, এদের কার্য পদ্ধতির মধ্যে মৌলিকতা আছে—এরা ফটো চায় নি, এরা নাম ঠিকানা জানাতে নারাজ; চিঠি লিখতে হবে সমিতিকে, তারা যথাস্থানে পৌঁছে দেবে। এই ব্যবস্থা আমাদের সমাজে মেয়েদের পক্ষ অন্তত খুবই বাঞ্ছনীয়, নয়তো পাড়ার ছেলেদের উৎপাতে তিষ্ঠানো দায় হবে; চিঠির জবাব না দিলে, কিম্বা হয়তো প্রথম তারা এসে বাড়ি চড়াও করবে। তাহলে মেয়ে সভ্য পাওয়া যাবে না, সমিতিও টিকবে না। সমস্তই হবে পরিকল্পনা যার মাথায় খেলেছে তার বুদ্ধি আছে।

পরদিন অনেকটা খেলার ছলে রমা চিঠি লিখল সমিতিকে, নিজের সম্বন্ধে অল্পকথায় জানাল কিছু, যার ইঙ্গিত আমরা এই গল্পের প্রথমে উদ্ধৃত পত্রে পেয়েছি। কয়েক দিনের মধ্যে তার নিজের নম্বর উল্লেখ করে রসিদ এবং তার সঙ্গে একফালি টাইপ করা কাগজে অনেকেক সভ্যের পরিচয় এল। সেই বিবরণ পড়ে একটু মজাই লাগল তার, মনে হল অনেকেরই যেন চেষ্টা নিজের [illegible] বলতে! রমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা হল না কাউকে চিঠি লিখতে।

ক্রমে অনেকদিন পর্যন্ত কোনও চিঠি না পেয়ে সমিতির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল, যদিও প্রথম দিকে হয়তো আগের চেয়ে একটু ঘনঘনই ডাকের খোঁজ করেছে সে। তারপর প্রায় দেড় মাস বাদে এল পর পর দুই চিঠি। নম্বর মিলিয়ে সভ্য তালিকায় দেখল একজন কলেজের ছাত্র, আর এক ব্যক্তি ব্যবসায়ী, বয়স পঁয়তাল্লিশ। প্রথম জন কাব্যের তাড়নায় অনেক কথা লিখে শেষে নিজের ঠিকানা দিয়েছে ও রমারটা জানতে চেয়েছে, এবং কাছাকাছি কোনও পার্কে তার সঙ্গে মিলিত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। দ্বিতীয় ব্যক্তির পত্র অনেক সংক্ষিপ্ত, তিনি ঠিকানা জানান নি, জানতেও চান নি, পার্ক স্ট্রীটের এক বিখ্যাত রেস্তোরাঁয় চা অথবা ডিনারের নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন; নিজের সুবিধা মত (ডায়ারি দেখে নিশ্চয়) কয়েকটি তারিখের উল্লেখ করতেও তিনি ভোলেন নি। নানারকম শোনা গল্পের থেকে রমার তৎক্ষণাৎ সন্দেহ হল ভদ্রলোকের উদ্দেশ্য খুব মহৎ নাও হতে পারে; দুরভিসন্ধি না থাকলেও সম্ভবত এই বয়সে প্রকাশ্যে বিয়ের পথে পা বাড়াতে লজ্জিত হয়ে সমিতিকে ছদ্মবেশী প্রজাপতির দপ্তর বলে ধরেছেন। তা ভাবা অবশ্য আশ্চর্য নয়। যাই হোক, সে একটি চিঠিরও জবাব দেয় নি।

কিন্তু এই তৃতীয় পত্রের সুর অন্যরকম। মনে হয় ভদ্রলোক আত্মপ্রকাশ করতে অতিমাত্রায় ব্যগ্র নন, তাঁর এই প্রচেষ্টা যেন পরীক্ষামূলক (শব্দটি রমা তার অফিসের কাজে প্রায়ই ব্যবহার করে থাকে, সুতরাং চট করে মনে এল)। ভাষা এবং বক্তব্যও মার্জিত। উনি কি লেখক? কিন্তু সে কথা তো লেখেন নি, তালিকায় তাঁর বিবরণেও কিছু নেই। সমিতিতে নিজের নাম পাঠাবার সময়ে রমার নিজেকে মোটেই অসাধারণ মনে হয় নি, কিন্তু উনি যে তাকে ঐ দলে ফেললেন তা তার মন্দ লাগল না। তারপর ঐ শেষের দিকে নিঃসঙ্গতার ইঙ্গিত. কি করে উনি তার সম্বন্ধে এটা ধরে নিলেন? কিন্তু কথাটা কি একেবারেই মিথ্যা, শুধু কি কৌতূহলের বশেই সে সমিতিকে নিজের নাম পাঠিয়েছে?...

আপাতত যেখানে সে বসে আছে সেখানে সঙ্গীর অভাব নেই, বরং চাপটা অতিরিক্ত। মাঝারি মাপের ঘর জুড়ে গায়ে গায়ে ঠেকানো টেবিল, কোনওটির দু পাশে কোনওটির এক পাশে লোক বসে আছে। অধিকাংশই পুরুষ, তাকে নিয়ে মাত্র তিনটি মেয়ে। টেবিলে স্তূপীকৃত অগোছালো ফাইল ও কাগজপত্র তার ফাঁকে একটুখানি উপত্যকার সৃষ্টি করে যে যার কলম চালাচ্ছে; অবশ্য এখনও সকলে এসে পৌঁছায় নি, যারা এসেছে তাদের কেউ কেউ প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত। ঘরের অবশিষ্ট অংশের প্রায় সবটা অধিকার করে আছে কাঠের তাক, তাতে গাদা করে ঠাসা মোটা ফাইল থেকে উপচে পড়ছে ধূলিধূসর পুরনো কাগজ। জানলা দিয়ে পাশের বাড়ির রং চটা দেয়াল ছাড়া কিছু দেখা যায় না। দরজার বাইরে চওড়া বারান্দায় সর্বদা নানা কাজে অসংখ্য লোকের আনাগোনা। আজ দু বছর হয়ে গেল, কিন্তু ঘরে বাইরে এই কলরব ও ভিড় এখনও রমার সম্পূর্ণ গা-সহা হয়ে যায় নি। এক বিশাল গৃহের তিনতলার কয়েকটি ঘর জুড়ে এই সরকারী প্রচারের অফিস।

অভ্যাস অনুযায়ী রমা কাজে মন দিয়েছে, কিন্তু আজ মনটা ঠিক অন্যদিনের মত ধূসরবর্ণ নয়, চিঠির সুর ইঙ্গিত তাৎপর্য চেতনার তলে নানারকম জাল বুনে চলেছে। তাহা সম্বন্ধে দু একবার সন্দেহ জাগায় খুব ইচ্ছা হল আবার পড়ে দেখে, কিন্তু সংকোচের বাধা পেরিয়ে তা সম্ভব হল না। বিশেষত পাশের টেবিলে বসে আছে পুষ্প, তার চোখ কিছু এড়ায় না। থাক, বাড়ি গিয়েই পড়বে, জবাব দেবার এমন তাড়া কি! জবাব যে দিতেই হবে এমন কোনও কথা নেই। ভেবে দেখতে হবে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে। তাছাড়া, তাড়াতাড়ি জবাব দিলে উনি হয়তো ভেবে বসবেন সে আত্মদান করতে পা বাড়িয়ে আছে। পুরুষমানুষ তো .

বেয়ারা এসে জানাল কর্তা ডাকছেন। অর্থাৎ সুহাস রায়, বারান্দা দিয়ে আরও কয়েকটি ঘর পেরিয়ে তার ক্ষুদ্র কামরা। খবর পেয়ে রমার মনে একটুখানি ছায়া পড়ল; লোকটি মাত্র কয়েক মাস হল এসেছে, প্রথম দিকে বেশ চলছিল, কিন্তু ক্রমে রমার সঙ্গে তার সম্পর্কটা কেমন বিগড়ে গেল।

সুহাস রায়ের বয়স ত্রিশের অল্প নিচে, পরিচ্ছন্ন চেহারা, গায়ে বুশ শার্ট। রমা সামনের চেয়ারটায় বসলে সে বললে, "আপনার এই রাইট-আপটা একেবারেই ঠিক হয় নি, মিনিস্টার খুব বিরক্ত হয়েছেন পড়ে।"

ঘাড় বাড়িয়ে সামনের কাগজটার দিকে তাকাল রমা। এক মন্ত্রীর সংক্ষিপ্ত জীবনী কোনও এক পত্রিকায় ছাপা হবে, তার উপর ভার পড়েছিল জিনিসটা গুছিয়ে লিখে দেবার, তার জন্য তিনি নিজেই সুহাসের হাত দিয়ে কিছু তথ্য সরবরাহ করেছিলেন।

রমা বললে, "কিন্তু আপনি তো দেখে দিয়েছিলেন।"

"না, সময়ের অভাবে তা সম্ভব হয় নি—সেটাই মস্ত ভুল হয়েছে।" তারপর টাইপ করা কাগজটার উপর লাল দাগের গায়ে নিজের পেনসিল ঠেকিয়ে সুহাস বললে, "আপনি এসব লিখতে গিয়েছেন কেন আমি তো বুঝি না। ছাত্রজীবনের কথা এত ফলাও করে লিখবার কি দরকার ছিল? আপনাকে বলে দিয়েছি প্রথম জীবনের দিকটা শুধু টাচ্ করে কর্মজীবনের কথা লিখবেন।"

রমা বললে, "সেসব তো আছে: উনি ক'বার জেলে গিয়েছেন, সেখানে ক'দিন ক'ঘন্টা থেকেছেন, কত গজ সুতো কেটেছেন, কবে কি আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন "

"উনি বলছেন ওটা আরও এক কলমের মত বাড়াতে হবে—সব ম্যাটার তো আপনাকে দেওয়া হয়েছে।"

"ম্যাটার কিছু বাদ পড়ে নি, আপনি মিলিয়ে দেখতে পারেন।"

"তবু ওটাকে কি আরও ফোর্সফুল করা যায় না—তাহলে আর কলমের গুণ কি? উনি কি বললেন জানেন, বললেন আপনার

ভাষার ইন্সপিরেশন নেই। আর উনি যে গ্র্যাজুয়েট নন সে কথাটা এভাবে লিখবার কি দরকার ছিল; একদিকে বিদ্যার্জনের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ, অন্যদিকে দেশমাতার অসহ্য অপমান—এই দ্বন্দ্বের ফলে যে উনি পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তা আপনি লেখেন নি।"

"উনি যে থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলেন তার পিছনেও কি এই দ্বন্দ্ব? যদিও কথাটা আমি লিখি নি, আপনার পছন্দ হবে না জেনে।"

উক্তিটা প্রায় অতর্কিতে রমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। সুহাস রায় কয়েক মুহূর্ত থমকে রইল, তারপর বললে, "দেখুন মিস ব্যানার্জি, দয়া করে মনে রাখবেন এটা আমার পছন্দ অপছন্দের কথা নয়। ওসব মূল্যবান তথ্য আপনারা কোথা থেকে পান আমি জানি না, খবরটা সত্যি কিনা তাও জানি না। কিন্তু আপনাকে যেমন যেমন নির্দেশ দেওয়া হয় কাজটা সেই রকমই হওয়া দরকার। মিনিস্টারকে ফেস করি আমি, আপনি নন। নিয়ে যান এটা, নতুন করে লিখে আনুন, দেখবেন এবার যেন ঠিক হয়। কালকের মধ্যে চাই, সম্পাদক তাগাদা দিচ্ছে।"

নিজের জায়গায় ফিরে এসে রমা গুম্ হয়ে বসে রইল। কেন যে লোকটা তার সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করে...কি ক্ষতি করেছে সে তার? সে যা করে তাই ভুল। "ভাষার ইন্সপিরেশন নেই", ইন্সপিরেশনের উপযুক্ত বিষয় দিয়েছেন বটে। একেবারে আত্মবিক্রয় করে বসে আছেন, প্রভুরা যা বলেন তাই ঠিক।...

পাশের টেবিলে পুষ্প আড়চোখে তার দিকে তাকাল। আজ সকাল থেকে সে এক মোটা বাংলা উপন্যাস (৩৮তম সংস্করণ।) পড়ছে, বইখানার দাম পঁচিশ টাকা—অবশ্য সে এনেছে লাইব্রেরি থেকে। বহু প্রসিদ্ধ লোকের গোপন কীর্তিকলাপ বর্ণিত হয়েছে গ্রন্থে, যদিও কারও নাম করা হয় নি, কিন্তু বর্ণনা এত স্পষ্ট যে তার দরকার করে না। পড়তে আরম্ভ করে বিবেকের পীড়ন সত্ত্বেও সে থামতে পারে নি, কিন্তু এবার রমার অবস্থা দেখে কৌতূহল আরও অদম্য হল।

জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছে রে?"

রমা সংক্ষেপে বললে, "মন্ত্রীর জীবনী লিখতে হুকুম হয়েছিল, পছন্দ হয় নি।"

"কেন?"

"কর্মজীবনের কথা লিখতে হবে, শিক্ষার কথা বলা চলবে না।"

ওপাশ থেকে রজেন সরকার টিপ্পনী কাটল, "মিস ব্যানার্জী, জানেন না বুঝি বাংলা দেশে এক অলিখিত আইন আছে যে শিক্ষামন্ত্রীকে অশিক্ষিত হতে হবে?"

রমা মুখে বললে, উনি শিক্ষামন্ত্রী নন।"

এদের মধ্যে শুরু হল কথকথা আলোচনা, কেউ মন্তব্য করলে মন্ত্রীদের নিয়ে, কেউ সুহাস রায়কে নিয়ে। রমা কোনও কথা বললে না, এ ধরণের আলোচনায় যে অভ্যস্ত, কিন্তু তার মনে হয় এরা উপরের দিকে আছে এই সব টীকা-টিপ্পনী অনেকটা তাদের প্রতি ঈর্ষাজাত, উপরের আসনে বসিয়ে দিলে এরাই যে আদর্শ মানবের নিদর্শন হবেন এক এক জন তা মনে হয় না। কিন্তু সহকর্মীদের সঙ্গে রমার সম্পর্ক ভাল; প্রথমে দু একজন একটু বেশি ভাব জমাতে চেষ্টা করেছিল (ঘরের অন্য মেয়েদের তুলনায় তাকে দেখতে অনেক ভাল), কিন্তু সাড়া না পেয়ে তারা তা মেনে নিয়েছে, শত্রুতা করে নি।

তখন প্রায় দুপুরের ছুটির সময় হয়ে এসেছে, রমা ঠিক করল বিকালে কাজটায় হাত দেবে। সুহাস রায় যা চায় তার চেয়েও বেশি লিখবে। এমন সময়ে হঠাৎ সকালের চিঠির কথা মনে পড়ে শুষ্ক তিক্ত চিত্ত প্রসন্নতার রসে স্নিগ্ধ হল। ভিতর থেকে কে যেন তার হয়ে সিদ্ধান্ত করে দিল—চিঠির জবাব সে দেবে।

তবু তিনদিন সে দেরি করল, যাতে গরজটা বেশি প্রত্যক্ষ না হয়। রবিবার দুপুর বেলা নিরিবিলিতে নিজের বিছানায় জানলার কাছে বসে সে লিখতে আরম্ভ করল।

"অজানা বন্ধু,

আপনি ছোট্ট কিন্তু সুন্দর চিঠি লিখেছেন, ধন্যবাদ। নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় জবাব দিতে একটু দেরি হয়ে গেল, মাপ করবেন। না, কথাটা খুব সত্যি নয়, সন্ধ্যাবেলা হয়তো সময় পেতাম, কিন্তু অফিসে সারাদিন কাজের পর মনটা ভার হয়ে থাকে—আমার কাজের চরিত্রটাই ঐ রকম।

আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি, আপনি কি লেখক? চিঠি পড়ে তাই মনে হয়, যদিও আপনার চিঠি বা সমিতির থেকে এ সম্বন্ধে কিছু জানি না। প্রশ্নটা যদি বেশি ব্যক্তিগত মনে হয় তো জবাব দেবেন না।

না লিখলেও সাহিত্যে আপনার অনুরাগ আছে এটা প্রকাশ্য খবর। আপনার প্রিয় লেখক কারা কারা, কি ধরণের বই আপনার আছে এ সম্বন্ধে দু কথা লিখলে সুখী হব। আমার নিজের রুচি পুরোনো প্রতিষ্ঠিত ক্লাসিকসের দিকে—নবীনদের পড়ে যে রকম আনন্দ পাই না, অনেককে বুঝতেও পারি না, বিশেষ করে কবিদের। তবে এলিয়টের কবিতা সবটা না বুঝলেও বারে বারে পড়তে ভাল লাগে।

তাছাড়া পড়বার খুব সময়ও পাই না, সারাদিন চাকরি করি, ঘরের কাজেও সাহায্য করি যতটা পারি। আমাদের ছোট্ট সংসার—মা, বাবা আর আমরা দুই বোন। বাবা চাকরি করেন, বোন এখনও পড়ে। আমার যে উপার্জন না করলে চলে না তা নয়, খানিকটা শখের ও মনের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কাজটা নিয়েছিলাম, কিন্তু এখন এক এক সময়ে মনে হয় ছেড়ে দিই।"

এইখানে রমার ইচ্ছা হল নিজের অফিস সম্বন্ধে, বিশেষ করে সুহাস রায় সম্বন্ধে দু কথা লেখে, কিন্তু একেবারে প্রথম চিঠিতে তা বেশি ব্যক্তিগত হয়ে যাবে মনে করে বিরত হল। শুধু লিখল: "নিজের সম্বন্ধে বেশি বকবক করে হয়তো আপনার বিরক্তির উদ্রেক করছি। সুতরাং শুভেচ্ছা জানিয়ে আজ এইখানেই শেষ করি। ইতি ৪০।"

বারোদিন পরে সে চিঠি পেল।

"প্রিয় বন্ধু,

চিঠির যে জবাব দিয়েছেন তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। সমিতি ঘুরে আপনার চিঠি আসতে প্রায় এক সপ্তাহ লাগল, যদিও আমরা নিশ্চয় একই সহরে, হয়তো বা একই পাড়ায় থাকি। তবু এই ভাল, কি বলেন? চোখের দেখা দিয়ে মানুষ চেনা যায় না, বরং এক এক সময়ে তা মায়ার সৃষ্টি করে, প্রকৃত পরিচয়ের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। স্থূল শারীরিক আত্মপ্রকাশটা তো সম্পূর্ণ আমাদের হাতে, তা যে কোনও মুহূর্তে সম্ভব।

আপনি ঠিকই ধরেছেন। অল্পবয়স থেকেই লিখবার নেশা আমার আছে। ছাত্র বয়সে কলেজের পত্রিকায় লিখেছি, তখন ভাবতাম সাহিত্য চর্চায়—অর্থাৎ লেখা আর পড়ায়—জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারলে মন্দ হয় না। পরে অবশ্য রূঢ় বাস্তবের দিকে তাকিয়ে জীবিকার জন্য অন্য পথ বেছে নিয়েছি। তবু আশা ছিল দৈনন্দিন লক্ষ্মীর পূজা শেষ করে অবসরকালে সরস্বতীর আরাধনা একেবারে অসম্ভব হবে না। পত্র-পত্রিকায় গল্প প্রবন্ধ বেরিয়েছে, যদিও আমার প্রসিদ্ধি এমন নয় যে তা আপনার চোখে পড়ে থাকবে। অনেকদিন থেকে ইচ্ছা ছিল একটা উপন্যাস লিখব, আগে যে চাকরিতে ছিলাম তাতে তা বেশ খানিকটা এগিয়েছিল। বর্তমান কাজে ঢুকে ক্রমে ক্রমে একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কেন তা হয়েছে সেই আলোচনায় কোনও লাভ নেই, আপনার সঙ্গে আলাপ কালে বরং ও সব আমি ভুলে থাকতে চাই। তবে এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে জীবিকার কাজে আপনি যে সুখী নন সেইখানেও আমাদের মিল আছে। অবশ্য এই দলে আছে আরও অসংখ্য লোক।

আর তাই যদি বলেন বলেই বা সুখী ক'জন? এ যুগে সুখ যেন ক্রমেই মানুষের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে দেখে বলতে আমি আরাম, এমন কি আনন্দও ভোগ করি (কিন্তু)। সেই কারণে অনেক দার্শনিক, যেমন স্টইকরা, সুখকে ধর্ম বা কর্তব্য মনে করেন, যেমন

মন আজ খুশীতে ভরা

শরীর যদি ভাল থাকে তাহলে ভ্রমণের জন্য মানুষ আনন্দে মেতে ওঠে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করবার জন্য।

আপনিও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য সাধনার অব্যর্থ মহৌষধ প্রতিদিন আহারের পর দুইবার করে দু'চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) খাবেন। এতে ক্লান্তি দূর করে, খিদে ও হজমশক্তি বাড়ে, সর্দি কাশি থেকে রেহাই পাবেন।

সাধনা ঔষধালয় ঢাকা

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ এম-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন), এম.সি.এস. (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য।

৩৬, সাধনা ঔষধালয় রোড
সাধনা নগর, কলিকাতা ৪৮.

বড় আদর্শ। পক্ষান্তরে আমার মনে হয় যারা সুখকে প্রথম স্থান দিয়েছেন (অ্যারিস্টটল, স্পিনোজো, বেনথাম, মিল) তাদের দল ভাবী। আপনি কোন দলে?

এই প্রসঙ্গে আপনার আর এক জিজ্ঞাসার জবাব দিই। আমি সব রকমই পড়ি, অবশ্য বিজ্ঞান বিশেষ কিছু বুঝি না। প্রিয় লেখকদের নাম জানতে চেয়েছেন, আমি বলব ঔপন্যাসিকদের মধ্যে দস্তয়েভস্কি সেরা, তাঁর মত জন্মায় নি। শেক্সপিয়ারের রস অবশ্য কখনও ফুরায় না। ফরাসী প্রবন্ধকার মঁতেন এবং কবি বোদলেআর আমার ভাল লাগে, যদিও ইতি একটু একঘেয়ে, এর চার লাইনের স্তবকগুলিও সব এক ছন্দে বাঁধা।

আমাদের বড় পরিবার, অনেক লোক। এই ব্যস্ততার মধ্যে নিরিবিলিতে বসে পড়া লেখা বা ভাবা এক এক সময়ে কঠিন হয়ে পড়ে, মনে হয় কোথাও একটি দুটি ঘর ভাড়া করে একা থাকতে পারলে মন্দ হত না।

আমার পরিচয় এতখানি দিলাম যাতে আর "অজানা বন্ধু" বলে সম্বোধন না করতে পারেন। প্রীতি নমস্কারান্তে—৩৫।"

চিঠিখানি সে আর একবার আরও ধীরে পড়ল, তারপর একের পর এক ভাবনা ভিড় করে এল মনে, কল্পনা যেন রূপ নিতে থাকল বাস্তবে। শালীন ও মার্জিত এর চিন্তা ও ভাষা, যেমন পরিচ্ছন্ন হাতের লেখা--স্বভাবও বোধহয় তাই। পড়াশুনা অনেক আছে, কিন্তু তা নিয়ে দাম্ভিকতা নেই। নিরিবিলিতে সাহিত্য চর্চার জন্য মন উৎসুক, এবং তারই মত দিনের গ্লানিকর কাজের ভারে পীড়িত আত্মা। কি কাজ করেন কে জানে—স্পষ্টই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গিয়েছেন অপ্রীতিকর বলে। অর্থনীতির এম-এ, হয়তো কোনও কলেজে পড়ান, কিংবা কোনও ধনীর প্রাইভেট সেক্রেটারি, মনিবের অন্যায় হুকুম ও খামখেয়ালের সঙ্গে সুর মেলাতে পারছেন না, ঠিক সে নিজে যেমন ভুগছে। আহা, সুহাস রায়ের বদলে ঐ লোকটির সঙ্গে যদি তার কাজ করতে হত—তার নিজের সমস্যা তো মিটতই, রমার মনে হয় উনিও শান্তি পেতেন।...বিবাহিত নন বলেই মনে হয়—ঐ যে লিখেছেন ছোট্ট বাসায় একা থাকবার কথা। এও মনে হয় তার চিঠি উনি পেতে চান, তাকে চিঠি লিখেও উনি আনন্দ পান (আনন্দ না সুখ? আচ্ছা এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কি?)। কিন্তু—হঠাৎ তার মনে হল—আর কাউকে যে উনি ঠিক এই রকমই চিঠি লিখছেন না তা কে জানে, সমিতির তালিকায় তো আরও কয়েকটি মেয়ে আছে।...লোকটিকে কিন্তু তেমন মনে হয় না, মাত্র দুটো চিঠিতেই যেন তার স্বভাবটা ধরা পড়েছে।

তখন থেকে আট দশ দিন পর পর তাদের পত্র বিনিময় চলল। রমা অবশ্য পরের চিঠি "প্রিয় বন্ধু" বলেই শুরু করেছে, তারপর প্রতি চিঠিতেই বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ হয়েছে, যদিও ব্যক্তিগত কথা প্রায় থাকতই না। সেটা অনেকটা হয়েছে ৩৫ নম্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী। এক চিঠিতে সে পরিষ্কার লিখেছে "চার পাশের জগৎটার ঘাত-প্রতিঘাত কাটিয়ে উঠতে পারলেই মানুষের প্রকৃত আত্মপ্রকাশ সম্ভব, কারণ নানা দায়ে প্রতিদিন আমরা এমন কাজ করি যা আমাদের বিবেকই মানে না। বংশ, ধর্ম, জীবিকা এসব কারও সত্য পরিচয় নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিও চরিত্র গঠন করে না। দৈনন্দিন সংসারের ঊর্ধ্বে আপন আপন মনের গহনে আমরা যা ভাবি যা চাই আসলে আমরা তাই। এরই কিছু কিছু চিঠিতে প্রকাশ করতে চেষ্টা করি। কিন্তু অনেকেই এত ব্যস্ত যে হয়তো সারা জীবনেই সুযোগ পায় না এই আসল আমিকে চিনতে—যারা পায় তারাই ভাগ্যবান।" চাক্ষুষ পরিচয়ের ইচ্ছা কখনও সে ইঙ্গিতেও প্রকাশ করত না, নামের বদলে ঐ বিদঘুটে নিষ্প্রাণ নম্বর দিয়েই যে যার চিঠি শেষ করত।

যাই হক, এই সব ছোট বিষয় নিয়ে রমা বেশি ভাবে না, তার দিনগুলি এখন অনেক প্রফুল্ল। নানা কাজের মধ্যে এই বন্ধুত্বের রস সিঞ্চিত করে মন, ভাবে পরের চিঠিতে কি লিখবে। ক্রমে পরিষ্কার বোঝা গিয়েছে যে ভদ্রলোক অবিবাহিত এবং তিনি আর কারও সঙ্গে এই ধরণের পত্রালাপ করছেন না। হয়তো রমা কোনও চিঠিতে অত্যধিক কৌতুহল প্রকাশ করেছিল, অথবা তিনি নিজেই ভেবেছেন এই কৌতুহল স্বাভাবিক। রমা নিজে আরও কয়েকটা চিঠি পেয়েছে সমিতির থেকে, একটারও জবাব দেয় নি।

এদিকে আপিসের ধারা গতানুগতিক খাতে বয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে সে ভাবে সুহাস রায়ের সঙ্গে তারই এত খটমাট কেন, আর সবাই তো তাকে নিয়ে এত ভাবে না। নিজেদের মধ্যে তারা তার সম্বন্ধে যাই বলুক, মোটামুটি তাকে খুশি করে চলে, অথচ অবজ্ঞা করে কিছুটা।

এই সেদিন হুকুম হল এক নতুন হাসপাতালের উদ্বোধন করতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী যাবেন, শেষ মুহূর্তে তাঁর জন্য এক বক্তৃতা লিখে দিতে হবে। নির্দেশ পাওয়া গেল দুঃস্থ পীড়িতদের জন্য তাঁর প্রাণ যে চিরকাল কেঁদেছে এবং মন্ত্রিত্ব পাওয়ার পর তিনি যে "বৈপ্লবিক" কর্মপন্থা অবলম্বন করেছেন তা ফলাও করে লিখতে হবে, উপরন্তু লেখার কাজে সাহায্য করতে চেয়ে তিনি কতগুলি শব্দের উল্লেখ করেছেন যা বক্তৃতায় ব্যবহার করতে হবে, যথা যারপর নাই, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, পরীক্ষা নিরীক্ষা, ঐতিহ্য। রমা যখন বলল বিষয়টার সঙ্গে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সম্পর্ক খুঁজে বার করা কঠিন, সুহাস রায় রীতিমত বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করলে, "আপনি সব কিছু নিয়ে তর্ক করেন।"

এর দিন কয়েক পরে সকালে আপিসে এসে সে দেখে ঘরের মাঝখানে চেয়ার টেনে এনে প্রতিভা দাস বসেছে পিছনে চুল ছড়িয়ে দিয়ে, উপরে পুরোদমে ঘুরছে পাখা। তখনও এক রণজিৎবাবু ছাড়া আর কেউ আসে নি, সে তার কোণে বসে যথারীতি মাথা নিচু করে কলম চালাচ্ছে। একটুখানি আশ্চর্য হয়ে রমা জিজ্ঞাসা করল, "কি ব্যাপার?"

প্রতিভা বললে, "মাথা ঘষেছি, তাড়াতাড়িতে চুল শুকোতে পারি নি।"

"কিন্তু সওয়া দশটা বাজে যে, কেউ যদি এসে পড়ে।"

"কেউ" মানে অবশ্য কর্তৃপক্ষের কেউ। কিন্তু প্রতিভা পরম অবজ্ঞায় জবাব দিল, "তা বলে আমি ভিজে চুলে কাজ করব নাকি—চুল পড়ে গেলে বিয়ে হবে না।"

আরও অবাক হয়ে রমা তার মুখের দিকে তাকাল, কিন্তু তা গম্ভীর, পরিহাসের লেশ মাত্র নেই সেখানে। রণজিৎবাবু কথাটা শুনে থাকলেও তার কোনও চিহ্ন দেখা গেল না, সম্ভবত প্রতিভা তাকে পুরুষের মধ্যেই গণ্য করে না। তা ছাড়া, উপরওয়ালার শাসনের প্রতি এই সম্পূর্ণ অবহেলা...এরাই সুখে আছে, ভাবল রমা। বিয়ের ভাবনা সবচেয়ে আগে, তার তুলনায় আর সব তুচ্ছ, এরা চাকরি করতে আসে রেল স্টেশনের ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করার মত (কিন্তু তার নিজের উদ্দেশ্যই বা কি, একটুখানি সংশয় উঁকি দিল রমার মনে, সে কি এসেছে কাজের অনুরাগে?)। তবে প্রতিভার কি এখনও বিয়ের আশা আছে? রং কাদার মত, দেহ স্থূল, বয়স অন্তত আটাশ—যদিও আপিসে বলে তেইশ। শাড়ি ও প্রসাধনের নানা বাহার সত্ত্বেও সহকর্মীরা তার দিকে তাকিয়েও দেখে না, বরং রসিকতা করে নাম দিয়েছে পুতুলা দাস। রমার তো মনে হয় চুল না শুকিয়ে নিয়মিত একবেলা উপোস দিলে বরং বিয়ের আশা বাড়ে।

এই সব ভাবতে ভাবতে সে নিজের কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে, যদিও তৎক্ষণে অর্ধেক উৎপাত হয়ে গিলছে। দিল্লী থেকে এসেছে একগাদা ইংরেজী রিপোর্ট, সংবাদ ইত্যাদি, এখানে পৌঁছে তার জায়গায় জায়গায় লাল পেনসিলের দাগ পড়েছে, সেগুলি বাংলায় অনুবাদ করতে হবে। সবে মনোযোগটা বসেছে এমন সময় ডাক পড়ল কর্তার ঘরে।

"দেখুন মিস ব্যানার্জী, শিল্প বিভাগের বাজেট আগামীকাল অ্যাসেম্বলিতে পেশ করা হবে, তার জন্য একটা খসড়া তৈরি করে দিন। এ পর্যন্ত কি কি টেকনিক্যাল স্কুল কলেজ কারখানা ইত্যাদি হয়েছে তার বিবরণ দিয়ে আগামী বছরের পরিকল্পনা প্রকাশ করতে হবে। এই কাগজপত্রে সব পাবেন।"

রমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল—সময় কই? খসড়া বানিয়ে টাইপ করাতে হবে, তা না হলে আবার উনি দেখবেন না। "কিন্তু আমার যে আজ অনেক কাজ, সারা দিনেও শেষ হবে কিনা সন্দেহ। আর কাউকে দিলে হয় না?" বলল সে।

সুহাস রায় বলল, "আকে বলব সে এমনই জবাব দেবে—কাজ কাজ। আপনিই করে দিন। কি [illegible]তে হবে ঠিক বুঝেছেন তো?"

রমা গম্ভীর হয়ে কি ভাবল, তার চোখের সামনে ফুটে উঠল পাখার তলায় প্রতিভার অলস [illegible]জড়িত মূর্তি। হঠাৎ সে বলল, "ওসা [illegible] বিবিল দুর্বিল দি। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সবিস্তারে বলতে হবে, কিন্তু যে-সব প্রতিষ্ঠান

রক্ষা করা হয় নি, যে সব প্রতিষ্ঠান লাভ দেখাতে পারে নি তাদের কথা থাকবে না কেন?"

সুহাস রায়ের ফরসা মুখ লাল হয়ে উঠল, তীক্ষ্ণ সুরে বললে, "মিস ব্যানার্জী, আপনার যদি এখানকার কাজ ভাল না লাগে তবে ছেড়ে দিতে পারেন, কিন্তু যদি থাকতে চান তবে নিয়ম মেনে চলতে হবে। নিয়ম যদি খারাপও হয় তা বদলানোর ক্ষমতা আমার হাতে নেই।"

নিজের জায়গায় ফিরে এল রমা। জানলার বাইরে শেওলা-ধরা দেয়ালটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ ছলছল হয়ে এল তার। সারাদিন প্রায় কারও সংগে কথাই বললে না, বাড়ি ফিরে সন্ধ্যার পর বসল বন্ধুকে চিঠি লিখতে। এখন আর তারা চিঠির জবাব পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে না, সপ্তাহে দু তিন বার লেখে। মনের ভার হালকা করতে সেদিন আপিসের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে দু কথা না লিখে পারল না, কিন্তু ইংগিতে মাত্র কারণ সে জানে বন্ধুর কাছে এ সব আলোচনা অপ্রীতিকর। "আজ দিনটা বড় বিশ্রী কেটেছে," লিখল সে, "খালি ভেবেছি আমি কি পাপ করেছি যে এমন লোকের অধীনে আমাকে কাজ করতে হয়। এমনও তো হতে পারত যে তুমি বা তোমার মত লোকের সংগেই আমার কাজ।"

এ চিঠির জবাবে বন্ধুও এ সম্বন্ধে দু কথা লিখল: "আমার সত্যিই অবাক লাগে যে, এমন সুন্দর স্বভাব সত্ত্বেও আপিসের কর্তার কাছে তোমায় লাঞ্ছনা সইতে হয়। তবে আমার সম্বন্ধে যা লিখেছ তাতে দুঃখের মধ্যেও হাসি পেল—আমার মত লোকের প্রতিও জগৎ প্রায়ই অবিচার করে, অশিষ্ট দুর্বিনীত কর্মচারী আজ কাল সর্বত্র মেলে, মাত্র একজনই জীবন দুর্বিষহ করে দিতে পারে।

"আমার যা কর্মক্ষেত্র তাকে বলা যায় সাংস্কৃতিক—অন্তত তাই ভেবে আগের কাজ ছেড়ে এখানে এসেছি। এখানে কর্মীরা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত, অথচ এখন মনে হয় আগের জায়গায় থেকে গেলেই ভাল হত। কিন্তু শুনলে অবাক হবে (অন্তত আমি নিজে হয়েছি) যে এরই মধ্যে সেদিন এক কবিতা লিখে বসেছি—আমার প্রথম কবিতা। তোমাকেই উৎসর্গ করেছি, কারণ আমাদের পরিচয় না ঘটলে এই সৃষ্টি কোনও দিনই সম্ভব হত না। উপন্যাসটাও আবার আরম্ভ করতে পারব মনে হচ্ছে।"

সনেটটি ভিন্ন কাগজে লিখে ভরে দিয়েছে চিঠিতে। রমা পড়ল বারে বারে। কাব্যলক্ষ্মীর করুণা ভোরের প্রথম আলোর মত নতুন চেতনা ও অভিজ্ঞতা জাগিয়েছে কবির মনে, তার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনই রচনার উদ্দেশ্য। "কায়াহীন কল্পনা [illegible]" যেন এই লক্ষ্মী। রমা নিজেও কবির কাছে কায়াহীন এবং অনেকাংশে কল্পনা, কথাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবতে ভাল লাগল তার।

আবার কৌতূহল ঘুর ঘুর করতে থাকল আগের কথাগুলিকে ঘিরে। "সাংস্কৃতিক" প্রতিষ্ঠানটি কি হতে পারে? বিশ্ববিদ্যালয়, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, রেডিও, সংবাদপত্র ইত্যাদি ভাবল সে, কিন্তু দৃঢ় নির্দেশ কিছু পেল না। মনে মনে বলল, বন্ধু, তুমি বড় বেশি আড়াল করে রেখেছ নিজেকে। পরস্পরের বাস্তব জীবন সম্বন্ধে কিছু জানলে হয়তো সংবেদন আরও গভীর হত, সান্ত্বনার প্রলেপ আরও স্নিগ্ধ হত। অনেক দিন হয়ে গেল এখনও আমরা অপরের কাছে দুটি নম্বর মাত্র, তুমি ৩৫ আমি ৪৩। হাওয়ার গায়ে কল্পনার ছায়া হয়েই কি আমাদের দিন কাটবে? তুমি হয়তো বলবে আমাদের সত্য পরিচয় আমরা পেয়েছি, তাতে কোনও ফাঁক নেই। কিন্তু নাম ঠিকানা জানলেও কি পরিচয়ে বাধা হত। আর...তার

বন্যা : ১৩৭৫

দিনেশ দাস

আকাশে কিসের শব্দ,
হাওয়ায় কী যেন হাহাকার ঃ
নিচে খল্‌খল জলের নির্মম অট্টহাসি।
অথই জলের তলে ডোবে, পচে, গলে
ঈশ্বরের বন্যায় মেদিনীপুর অঞ্চল,
আর মানুষের তৈরি বন্যায় হাওড়া-হুগলী জেলা।

ভাদ্রের হলুদ রোদের পাপড়িগুলি
ছড়িয়ে পড়ে আদিগন্ত জলের ওপর,
প্রখর উত্তাপে জল কাঁপছে,
বাসিমড়ার মত পচে ঢোল হ'য়ে উঠছে গ্রামগুলি ঃ
উঁচু নারকেল-তালগাছের মাথায়
ওৎ পেতে ব'সে আছে শকুনি-হাড়গিলের দল।

অফিসাররা কখনও কখনও
নিরাপদ সরকারী নৌকোয় জল-বিহার করেন ঃ
নৌকোর আশেপাশে সাঁতরে আসে
দূর-দূরান্তর থেকে ক্ষুধার্ত মানুষের দল
একমুঠো চিড়ে-মুড়ির প্রত্যাশায়।

কখনও কখনও কোনো দেশপ্রেমিক
নৌকো থেকে ছাতু-গুড়ের পিণ্ড
তুলে দেয় মুমূর্ষুদের মুখে।
কোথাও লঙরখানায়
ভিড়ের চাপে পিষে যায় রুগ্ন, বুভুক্ষু শিশুরা—
আহা! গুঁড়িয়ে যায় আমার দেশের ছোট ছোট চুনী-পান্না-মুক্তা!

দূরে দূরে প্রাচীন অশ্বত্থ-বটগুলি
হতাশ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে,
তাদের শীর্ণ ডালগুলি অসহায়ভাবে বাতাসে দুলছে।
এদিকে জলের অন্ধকারে যেন
কারা সলা-পরামর্শ করে।
মুমূর্ষু ধানগাছগুলি এখনো কাঁদছে ঃ
তাদের কান্নাই যেন আজ
ধানের রঙের মত শরতের সোনালী রোদে
ছড়িয়ে পড়ে—আছড়ে পড়ে॥

তোমার কি একটুও দেখতে ইচ্ছা করে না আমাকে?...

এই ভাবনার সুর ক্রমে তার চিঠিতে প্রকাশ পেল। জবাবে বন্ধু লিখল, "তোমার কথাই ঠিক, আমাদের চেনা জানা এত দিনে নিঃসন্দেহে হয়ে গিয়েছে, সুতরাং মুখোমুখি হতে ভয় কি?" তাদের পত্রালাপ সুরু হয়েছিল গ্রীষ্মের আরম্ভে, আর তখন ডিসেম্বর মাস।

সে প্রস্তাব করলে রবিবার সন্ধ্যায় চৌরঙ্গী পাড়ায় এক রেস্তরাঁয় দুজনে উপস্থিত হবে। (পুরুষরা রেস্তরাঁ ছাড়া কোনও মিলনকেন্দ্র ভাবতে পারে না, রমা বললে মনে মনে।) কিন্তু বেশি লোকজন ও আলোর সম্ভাবনাটা তার ভাল লাগল না, তার পছন্দ নিরিবিলি কোনও আধ-অন্ধকার জায়গা; প্রথম সাক্ষাতের স্পষ্টতা সে যথাসম্ভব মৃদু করতে চায়। শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হলঃ স্থান গঙ্গার ধারে এক বিশেষ বেঞ্চি যা দুজনেই চেনে, কাল সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা।

অজানা উদ্বেগ, আগ্রহ, ঔৎসুক্য মিলিয়ে কাটল বাকি কটা দিন। ট্রাম থেকে নেমে একটু ধীরেই হাঁটল সে যাতে নির্দিষ্ট সময়ের দু চার মিনিট পরে পৌঁছায়—ঐ রকম জায়গায় কোনও মেয়ে একলা বসে আছে দেখলে লোকে নানা কথা ভাববে। কিন্তু দূর থেকে দেখল খালি বেঞ্চির পাশে দাঁড়িয়ে আছে পাঞ্জাবী ও চাদর পরিহিত এক ব্যক্তি পথের দিকে চেয়ে। নদীর কাছে শীতের কুয়াশা বেশ ঘন হয়ে জমেছে, দেহের শিহরণ অনুভব করতে করতে এইটুকু পর্দার জন্য কৃতজ্ঞ হল রমা।

দু পা এগিয়ে এসে অপেক্ষাকারী হাত তুলে নমস্কার জানাল। তারপর—

"এ কি আপনি?!"

"ও মা আপনি!?"

রমার সামনে সুহাস।

এ গল্পের এইখানেই শেষ। কতক্ষণ তারা চোখের সাক্ষ্য বিশ্বাস না করে নির্বোধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, কতক্ষণে দুজনে পরস্পর নিকট প্রার্থনা জানাক, তা সহজেই অনুমেয়। তারপর কি হল সে সম্বন্ধে আমাদের কল্পনা যা স্বভাব ভেদে নানা অনুমান সম্ভব।

কেউ বলবে অবস্থাটা স্পষ্ট হবার সঙ্গে সংগে রমা লজ্জায় ধিক্কারে পিছন ফিরে দ্রুত পা চালাল, অন্ধকারে গা ঢাকা দিতে পেরে নিশ্বাস নিয়ে বাঁচল, পরদিন প্রথম ডাকেই পাঠাল পদত্যাগপত্র। অথবা ছুটি নিল অসুস্থতার দোহাই দিয়ে। অথবা পলায়নের মুহূর্তে তার কানে কানে কে যেন বুঝিয়ে দিল আবেগের ঝোঁকে কাজ করলে পরে চাকরি করা কঠিন হবে, সুতরাং সে থেকে গেল। অথবা থেকে গেল অন্য কারণেঃ অবস্থার কৌতুক উপলব্ধি করে হঠাৎ তার দারুণ হাসি পেল, হাসির ছোঁয়াচ লাগল সুহাসেরও, সামলাতে না পেরে দুজনে বসে পড়ল বেঞ্চিতে। সুতরাং বিয়োগান্ত মিলনান্ত দুই পরিণতিই সম্ভব।

যদি এমন হয় যে, রমা অবিলম্বে পদ ত্যাগ করে নি তবে ভাবা যায় যে, প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে ঘটনাচক্র তাদের কাছে পরিষ্কার হল, আকস্মিক আবিষ্কারের লজ্জা ও গ্লানি কেটে গেল, বন্ধুত্ব গাঢ়তর হল। এই কাহিনী যদি চলচ্চিত্রে ওঠে তবে নাটকের এই শেষ দৃশ্য হয়তো ঐ বেঞ্চিতে বসেই অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু এই সবই নিজ নিজ ধাত অনুযায়ী আমাদের কল্পনা। যেই ক্ষণে সেদিন নদীর ধারে তারা পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে গল্পের শেষ হয়েছে তখনই, একটি জিজ্ঞাসা রেখে—রমা ও সুহাসের কোন্ জায়াটা সত্য, আমাদের [illegible]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী-প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে আমি দীর্ঘ সময় সুভাষ-চন্দ্রের কথা কার্যত বিস্মৃত হয়েছি। এখনো আমাকে আরো কিছু সময়ের জন্য সুভাষ-প্রসঙ্গ স্থগিত রাখতে হবে। বাংলাদেশে গান্ধীজীর জীবনদর্শন কখনই দৃঢ়মূল হয় নি। মনে হয়, সে ব্যাপারে কিছু তথ্য দেওয়ার প্রয়োজন আছে। এখানে আমি সেই শ্রেষ্ঠ বাঙালী সাহিত্যিকের বক্তব্যকে গ্রহণ করছি, যিনি বাঙালীর সাধারণ গুণদোষের অধিকারী ছিলেন বলে সকলের দ্বারা স্বীকৃত। রবীন্দ্র-যুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালী ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধিকন্তু বাংলাদেশের সমসাময়িক রাজনীতির সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে যুক্ত ছিলেন। দেশবন্ধুর ভক্ত ও সুভাষচন্দ্রের অনুরাগী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় চরকা, খদ্দর, হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি বিষয়ে নানা কথা লিখে গেছেন নানাভাবে। একটি বেনামী রচনায় তিনি বাঙালীর খদ্দর-সাধনার খদ্দর একেবারে কেড়ে নিয়েছেন। সেই আকর্ষণীয় রচনার কিছু অংশ উপস্থিত করা যায়।

"শরৎবাবুর রংপুর অভিভাষণের উত্তরে চরকা লইয়া কথাকাটাকাটি হইয়া গেল বিস্তর, আজও তার শেষ হয় নাই। প্রথমে চরকাভক্তের দল প্রচার দিলেন, তিনি মহাত্মাজীর টিকিতে চরকা বাঁধিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এতবড় একটা অমর্যাদা-কর উক্তি অভিভাষণে ছিল না, কিন্তু তা বলিলে কি হয়,—ছিলই। না হইলে আর ভক্তের বেদনা প্রকাশের সুযোগ মিলিবে কি করিয়া? .....

"শরৎবাবুর অপরাধ হইল কিসে? তিনি বলিয়াছিলেন, বাংলা-দেশের লোকে চরকা গ্রহণ করে নাই। সুতরাং গ্রহণ না করার জন্য অপরাধ যদি থাকে, সে এদেশের লোকের। খামোকা তাঁহার উপর রাগ করিয়া লাভ কি? এ বিষয়ে আমার যৎ-কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে। স্বচক্ষে দেখিয়াছি তো এই বছর আষ্টেক চরকা লইয়া লোকের সঙ্গে কি ধস্তাধস্তিই না হইল! কিন্তু প্রথম হইতেই মানুষে সেই যে ঘাড় বাঁকাইয়া রহিল, স্বরাজের লোভ, মহাত্মার দোহাই, বন্দেমাতরমের দিব্যি, কোন কিছু দিয়াই সে বাঁকা ঘাড় আর সোজা করা গেল না। বক্তৃতার জোরে যাহাকে দলে আনা গেল, সে বিপদ ঘটাইল আরও বেশী। নব উৎসাহে কাজে মন দিয়া দিন দশ-পনের পরেই জোট পাকানো এক মুঠা সুতা আনিয়া হাজির করিল! আষ্টেপৃষ্ঠে তাহাতে নামধাম সমেত লেবেল আঁটা অর্থাৎ গোলমালে খোয়া না যায়। কহিল, দিন তো মশাই একটা প্রমাণ সাড়ী বুনে।

কর্মীরা কহিত—এতে কি কখনো সাড়ী হয়! হয় না? আচ্ছা সাড়ীতে কাজ নেই, ধুতিই বুনে দিন, কিন্তু দেখবেন, বহর ছোট করে ফেলবেন না যেন।

কর্মীরা এতে ধুতিও হবে না।

হবে না কি রকম? আচ্ছা জোড়া দশ হাত না হোক, ন' হাত সাড়ে ন' হাত তো হবে? বেশ তাতেই চলবে। আচ্ছা চললুম—এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতে উদ্যত।

কর্মীরা প্রাণের দায়ে তখন চীৎকার করিয়া হাত মুখ নাড়িয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিত যে, এ ঢাকাই মসলিন নয়,—খদ্দর। এক মুঠো সুতার কাজ নয় মশাই, অন্তত এক থান্না সুতার দরকার।

কিন্তু এ ত' গেল বাহিরের লোকের কথা। কিন্তু তাই বলিয়া কর্মীদের উৎসাহ উদ্যম অথবা খদ্দর-নিষ্ঠার লেশমাত্র অভাব ছিল, তাহা বলিতে পারিব না। প্রথম যুগে মোটা খদ্দরের ভারের উপরেই প্রধানত Patriotism নির্ভর করিত।

সুভাষচন্দ্রের কথা মনে পড়ে।

তিনি পরিয়া আসতেন দিশী সামিয়ানা তৈরীর কাপড় মাঝখানে সেলাই করিয়া। সমবেত প্রশংসার মৃদুগুঞ্জনে সভা মুখরিত হইয়া উঠিত এবং সেই পরিধেয় বস্ত্রের কর্কশতা, দৃঢ়তা, স্থায়িত্ব ও ওজনের গুরুত্ব কল্পনা করিয়া কিরণশঙ্কর প্রমুখ ভক্তবৃন্দের দুই চক্ষু ভাবা-বেশে অশ্রুসজল হইয়া উঠিত।

কিন্তু সামিয়ানার কাপড়ে কুলাইল না। আসিল নবন কৃষ্ণের যুগ। সেদিন আসল ও নকল কর্মী এক আঁচড়ে চিনা গেল। যথা—আনন্দবরণ—দীর্ঘ শুভ্র দেহের লবন-টুক মাত্র ঢাকিয়া যখন কাঠের জুতা পায়ে খটাখট শব্দে সভায় প্রবেশ করিতেন, তখন শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে উপস্থিত সকলেই চোখ বুজিয়া অধোবদনে থাকিত। এবং তিনি সুখাসীন না হওয়া পর্যন্ত কেহ চোখ তুলিয়া চাহিতে সাহস করিত না। সে কি দিন! "My only answer is Charka", অধোমুখে বসিয়া সকলেই মহাবাক্য মনে মনে জপ করিয়া ভাবিত, ইংরাজের আর রক্ষা নেই, ল্যাঙ্কাশায়ারে লালবাতি জ্বালিয়া ব্যাটারা মরিল বলিয়া।......

সেদিন ফরেন ক্লথ মানেই ছিল মিল ক্লথ। তা সে যেখানেই তৈরী হউক না কেন? সেদিন অপবিত্র মিল ক্লথ পরিব না প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি কোনো স্বদেশভক্ত দিগম্বর মূর্তিতেও কংগ্রেসে প্রবেশ করিত, ৩১শে ডিসেম্বরের মুখ চাহিয়া কাহারও সাধ্য ছিল না কথাটি বলে।. ..

ব্যক্তিগত ভক্তি অন্ধ হইয়া গেলে কোথাও তাহার আর সীমা থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাংলার খদ্দরের একজন বড় আড়তদারের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আশ্রম তৈরী হইতে আরম্ভ করিয়া ছাগদুগ্ধ পান করা পর্যন্ত তিনি সমস্তই গ্রহণ করিয়াছেন—তেমনি টিকি, তেমনি কাপড় পরা, তেমনি গায়ে চাদর দেওয়া, তেমনি হাঁটু মুড়িয়া বসা, তেমনি মাটির দিকে চাহিয়া মৃদু-মধুর বাক্যালাপ—সমস্ত। কিন্তু ইহাতেও পূজার উপচার সম্পূর্ণ হয় নাই, ষোলকলায় হৃদয় ভরে নাই, উপেন্দ্রনাথ বলেন, এবারে না কি তিনি সম্মুখের দাঁতগুলি তুলিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বাস্তবিক এ অনুরাগ অতুলনীয়, মনে হয় যেন বৈজ্ঞানিক প্রফুল্ল ঘোষকেও ইনি হার মানাইয়াছেন।"

এর পর চরকার পক্ষে অর্থনৈতিক যুক্তির উল্লেখ করেছেন শরৎচন্দ্র। বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের মতে প্রত্যহ অবসর সময়ে চরকা কাটলে মাসে আট আনা, দশ আনা, বারো আনা আয় বাড়ে। গরীব দেশে সেই ঢের। শরৎচন্দ্রের প্রশ্ন, "কিন্তু দৈনিক এই এক পয়সা দেড় পয়সা আয়বৃদ্ধিতে চাষারা খাইয়া পরিয়া পরিতুষ্ট হইয়া কি করিয়া যে ইংরেজ তাড়াইয়া স্বরাজ আনিবে তাহা বুঝা কঠিন।"

তারপর—

"অনিলবরণ বলেন, কোথায় চরকা, কোথায় তুলো, কোথায় ধুনুরী, এত হাঙ্গামা না করিয়া অবসর মত দু' মুঠো ঘাস ছিঁড়িলেও মাসিক দশ আনা বার আনা অর্থাৎ দিন এক পয়সা দেড় পয়সা রোজগার হয়। তিনি আরও বলেন, ইহাতে অন্য উপকারও আছে। এ, আই, সি, সির একটা মিটিং ডাকিয়া franchise করিয়া দিলে লিডারদের তখন ঘাস ছিঁড়িতে পাড়াগাঁয়ে আসিতে হইবে। কারণ শহরে ঘাস মিলে না। অতএব এদেশে [illegible] পল্লীসংগঠনের কাজটাও দ্রুত আগাইয়া যাইবে। [illegible] লোক চাপা দিয়া মারার দুষ্কর্মটা কিছু কম হওয়ারই সম্ভাবনা।'

এবং তারপর—

'নিখিল ভারত কার্টুনে সকল খবর দিতেছেন, বিশ লাখ টাকার চরকা কিনিয়া বাইশ লাখ টাকার খাদি প্রস্তুত হইয়াছে। উৎসব লাগিয়া গেল, সবাই কহিল—আর চিন্তা নাই, বিদেশী কাপড় দূর হইল বলিয়া। কলকাতার বড় কংগ্রেস অধিবেশনে; সুভাষচন্দ্র বলিলেন, খবরদার, কলের তৈরী দেশী এক-খানি সুতাও যেন এক্জিবিশনে না ঢোকে। এ ঢুকলে উনি আর ঢুকিবেন না।

নলিনীরঞ্জন বিষয়ী মানুষ, কত ধানে কত চাল হয়, খবর রাখা তাঁর পেশা, কপালে চোখ তুলিয়া বলিলেন, সে কি কথা! বিলেতী কাপড় বয়কট করার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তোমার ঐ বাইশ লাখ দিয়া সাত-আট কোটির ধাক্কা সামলাইবে কেন?

সেইন-গোপ্তা সাহেব বীরদর্পে বলিলেন, আমরা ঐ খদ্দর এক্শ টুকরা করিয়া লেংটি করিয়া পরিব। নলিনীরঞ্জন কহিলেন, সে জানি, কিন্তু এক্শ টুকরা কেন, উহার একখানি করিয়া ভাগ করিয়া দিলেও যে ভাগে কুলাইবে না।

সুভাষ বলিলেন, বস্ত্র বয়কট পরে হইবে, আপাতত মহাত্মাজীর বয়কট সহিবে না।

কিরণশঙ্কর বলিলেন, ঠিক ঠিক।

মহাত্মা আসিলেন, লোকমুখে খবর লইয়া দেশে ফিরিয়া সার্টিফিকেট পাঠাইয়া দিলেন, ফিলিস সবকাস' [illegible] জমে নাই।

নেতারা টুঁ-শব্দটি করিলেন না, পাছে রাগ করিয়া তিনি স্বরাজের চাবি-কাঠিটি আটকাইয়া রাখেন। বাংলাদেশের যেখানে যত আশ্রম ছিল তাহার তপস্বীরা বগল বাজাইয়া নাচিতে লাগিল,—কেমন? কর এক্জিবিশন!'

[বেণু—আশ্বিন—১৩৩৬]

শরৎচন্দ্র চরকা আন্দোলন সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালীর মনোভাবকে অনেকাংশে প্রকাশ করেছেন। অসহযোগের নেতা দেশবন্ধুর ব্যক্তিগত ধারণার একটি রূপও তিনি উপস্থিত করেছেন। বরিশালের পথে স্টিমারে যাবার সময়ে এক রাত্রে ডেকের উপর বসে দেশবন্ধু শরৎচন্দ্রের কাছে নিজের মনের কতকগুলি দিক খুলে ধরেছিলেন। তারই একটি অংশ—

"[illegible] হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি চরকা বিশ্বাস করেন?

বলিলাম, আপনি যে বিশ্বাসের ইঙ্গিত করছেন, সে বিশ্বাস করি নে।

কেন করেন না?

বোধ হয় অনেকদিন অনেক চরকা কেটেছি বলেই।

দেশবন্ধু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, এই ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি লোকের পাঁচ কোটি লোকও যদি সুতো কাটে ত' ষাট কোটি টাকার সুতো হতে পারে।

বলিলাম, পারে। দশ লক্ষ লোক মিলে একটা বাড়ি তৈরীতে হাত লাগালে দেড় সেকেন্ডে হতে পারে। হয়, আপনি বিশ্বাস করেন?

দেশবন্ধু বলিলেন, এ দুটো এক বস্তু নয়। কিন্তু আপনার কথা আমি বুঝেছি,—সেই দশ মণ তেল পোড়ার গল্প। কিন্তু তবুও আমি, বিশ্বাস করি। আমার ভারি ইচ্ছে হয় যে, চরকা কাটা শিখি, কিন্তু কোন রকম হাতের কাজেই আমার কোন পটুতা নেই।

বলিলাম, ভগবান আপনাকে রক্ষা করেছেন।"

[স্মৃতিকথা]

চরকা প্রসঙ্গ এই পর্যন্ত। চরকার ব্যাপারটাকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ, পূর্বেই বলেছি চরকা গান্ধীবাদের 'অশোকচক্র'। রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী-সুভাষচন্দ্র পরিচ্ছেদ ইতিমধ্যে যথেষ্ট দীর্ঘ হয়েছে; আমরা এ পর্যন্ত গান্ধীজী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের রূপ দেখবার চেষ্টা করেছি। গান্ধীজী সম্বন্ধে সুভাষ-চন্দ্রের ধারণার একটা আভাসও দেওয়া হয়েছে; কিন্তু সেটাকে আভাসমাত্র রাখা চলবে না। ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত গান্ধীজী সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের মনোভাব ঠিক কি ধরনের, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বিচারের প্রয়োজন হবে। 'অন্ধ গান্ধী-ভক্তির' জন্য রবীন্দ্রনাথ ও রোমা রোলাঁর প্রতি সুভাষচন্দ্র কটাক্ষ করেছেন, তার পত্রে পূর্বেই তা দেখেছি। সে ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যেতে পারে, সুভাষচন্দ্রের 'অন্ধ গান্ধীভক্তি' ছিল না। তা যে ছিল না ১৯২৮ সালে যুব-সম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর ভাষণের আলোচনায় দেখা গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা পত্রে তিনি বলেছেন—আমি এক যুক্তিবাদীর দৃষ্টি দিয়ে ভারতীয় জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস লিখেছি।

যুক্তিবাদী সুভাষচন্দ্র গান্ধীবাদ সম্বন্ধে কি বলেছেন?

সুভাষচন্দ্রের চোখে গান্ধীজী ও গান্ধীবাদ

গান্ধীজীর প্রশংসায় সুভাষচন্দ্র কতদূর অগ্রসর হতে প্রস্তুত ছিলেন, পূর্ব পরিচ্ছেদে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। গান্ধীমহিমার আরো বহু বিবরণ সুভাষচন্দ্রের রচনা ও ভাষণ থেকে পাওয়া যাবে। আবার ছাবর উল্টোপিঠও তিনি খুলে ধরবেন। তাঁর দৃষ্টি, নির্মোহ যুক্তিবাদীর দৃষ্টি। তিনি স্বভাবে আবেগহীন ছিলেন না, কিন্তু গান্ধীজী সে আবেগের তরঙ্গ-সিংহাসন পান নি। গান্ধীজীকে সুভাষচন্দ্র প্রথম থেকে কিভাবে বিচার করেছেন,[১] তার চমৎকার বর্ণনা সুভাষচন্দ্র নিজেই করেছেন। ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল গ্রন্থে গান্ধী সুভাষের প্রথম সাক্ষাৎকারের বিবরণ এই প্রকার:

> আমি ১৯২০ সালে ইংলণ্ডে আই সি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, কিন্তু দেখলাম আমার পক্ষে আমার দেশ ও বৃটিশ সরকার, এই দুই প্রভুকে এক সঙ্গে পূজা করা সম্ভব নয়, তাই ১৯২১ সালের মে মাসে পদত্যাগ করে ভারতে ফিরলাম যাতে দেশে পূর্ণোদ্যমে যে সংগ্রাম চলেছে তাতে অংশ গ্রহণ করতে পারি। ১৬ই জুলাই বোম্বাইয়ে পৌঁছলাম, গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি পেলাম সেই দিনই। সাক্ষাৎ প্রার্থনার উদ্দেশ্য ছিল, যে সংগ্রামে আমি যোগ দিতে যাচ্ছি তার নেতার কাছ থেকে সংগ্রামের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করে নেওয়া। পৃথিবীর অন্যান্য অংশের বিপ্লবী নেতারা যে সকল রীতি ও কৌশল ব্যবহার করেছেন সে সকল সম্বন্ধে গত কয়েক বৎসরে আমি কিছু জানবার চেষ্টা করেছি, এখন তারই আলোকে আমি মহাত্মার মন ও উদ্দেশ্য বুঝতে চাইলাম।
>
> সেই অপরাহ্ণের দৃশ্য আমার স্পষ্ট মনে আছে। মণিভবনে (বোম্বাইয়ে মহাত্মার সাধারণ বাসস্থান) উপস্থিত হলে আমাকে ভারতীয় গালিচায় ঢাকা একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। ঘরে ঢুকে আমি আমার বিদেশী পোষাকের জন্য কিছুটা অস্বস্তিতে পড়লাম এবং লজ্জা না চেয়ে পারলাম না। মহাত্মা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সহৃদয় হাসি দিয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন, ও অল্পক্ষণের মধ্যেই অবস্থাটা সহজ করে দিলেন; কথাবার্তা তখনি শুরু হয়ে গেল। আমি খুঁটিনাটি বিষয়গুলি সম্বন্ধে বুঝে নিতে চাইলাম,—কিভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়ে তিনি শাসকদের হাত থেকে অবশেষে শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার পরিকল্পনা করেছেন—তার বিষয়ে জানতে চাইলাম। সেই উদ্দেশ্যে আমি প্রশ্নের পর প্রশ্ন বর্ষণ করতে লাগলাম আর মহাত্মা তাঁর স্বভাবগত ধৈর্যের সঙ্গে উত্তর দিতে লাগলেন। তিনটি বিষয় সম্বন্ধে ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল। প্রথমত, কংগ্রেস পরিচালিত বিভিন্ন আন্দোলনমূলক কার্যাবলী কিভাবে এগিয়ে গিয়ে চরম পর্যায়ের কর বন্ধ আন্দোলনে পৌঁছবে? দ্বিতীয়ত, নিছক কর বন্ধ বা আইনঅমান্য আন্দোলন কিভাবে সরকারকে রণক্ষেত্র থেকে সরিয়ে আমাদের স্বাধীনতা দেওয়াবে? তৃতীয়ত, মহাত্মা কিভাবে এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজের প্রতিশ্রুতি দেন, যা তিনি নাগপুর কংগ্রেসের পর থেকে দিয়ে আসছেন? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমি সন্তুষ্ট হলাম। এক কোটি সদস্য ও এক কোটি টাকার যে আবেদন তিনি জানিয়েছিলেন, তাতে সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া গিয়াছে, এর পর তিনি পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশ, বিদেশী বস্ত্র বয়কট ও খাদি প্রচারকে গ্রহণ করলেন। পরবর্তী কয়েক মাসে তাঁর প্রচেষ্টা খাদি প্রচারে সংহত থাকবে। তিনি মনে করেন, সরকার যে মুহূর্তে উপলব্ধি করবে যে, কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক কাজ সফলতালাভ করেছে, তখন সে কংগ্রেসকে আঘাত করতে এগিয়ে আসবে। আর সরকার যখন তা

১ গান্ধীজীর অহিংসা সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের কিশোরকালের ঔদাসীন্যের বর্ণনা দিলীপকুমারের সাক্ষ্য থেকে পাওয়া গিয়েছে, এবং পূর্বে আমরা তা উদ্ধৃত করেছি।
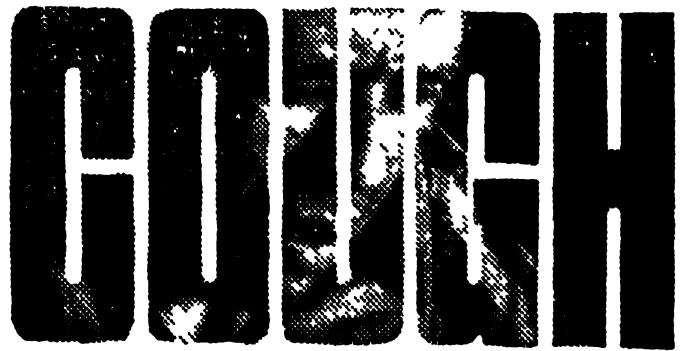
করতে শুরু করবে, তখনি সরকারের নির্দেশ অমান্য করে কারাবরণ আরম্ভ করা যাবে। অবিলম্বে কারাগারগুলি ভরে যাবে এবং তখন আসবে শেষ পর্যায়—কর-বন্ধ আন্দোলন।

অপর দুটি প্রশ্ন সম্বন্ধে মহাত্মার উত্তর বিশ্বাসযোগ্য হয় নি। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি কি আশা করেন যে, বয়কট আন্দোলন ল্যাঙ্কাশায়ারের এমন দুর্গতি ঘটাবে যে, তারা ভারতের সঙ্গে আপোষ করবার জন্য পার্লামেণ্ট ও ক্যাবিনেটের উপর চাপ দিতে বাধ্য হবে? উত্তরে মহাত্মা আমার কাছে মাত্র এইটেই স্পষ্ট করে তুললেন যে, না, শুধু একেই কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য করার পথ বলে তিনি মনে করেন না। তাঁর মনোবাসনা ঠিক কি, তা বুঝতে পারলাম না; হয় তিনি পূর্ব থেকে তাঁর সমস্ত গোপন পরিকল্পনা উদ্ঘাটন করতে চান না, নয় তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা নেই।

[পিছনের দিকে তাকিয়ে আজ আমার মনে হচ্ছে, মহাত্মা সম্ভবতঃ ভারতের জাতীয় দাবী মেনে নেওয়ার ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের 'হৃদয়ের পরিবর্তন' আশা করেছিলেন।] সব জড়িয়ে দ্বিতীয় প্রশ্নে তাঁর উত্তর নৈরাশ্যজনক। তৃতীয় প্রশ্নেও তার থেকে ভাল কিছু নয়। এক বছরের মধ্যে স্বরাজলাভ, তাঁর কাছে নিছক বিশ্বাসের বস্তু, আমার কাছে কিন্তু সেটা নিতান্ত অবাস্তব ব্যাপার, এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি আরো অনেক বেশী সময়ের জন্য কাজ করতে প্রস্তুত ছিলাম। যাই হোক এই এক ঘণ্টার আলাপে যা শিখতে পেরেছি তার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া ছাড়া আমার অন্য পথ ছিল না। কিন্তু সে সময়ে আমি যতই নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে, নিশ্চয় আমার পক্ষে বোধবুদ্ধির অভাব ঘটেছিল, তবু আমার বুদ্ধি ও যুক্তি আমাকে বারবার দেখিয়ে দিল যে, মহাত্মার পরিকল্পনার মধ্যে সুস্পষ্টতার শোচনীয় অভাব আছে এবং তিনি স্বয়ং পরিষ্কারভাবে জানেন না—কোন্ কোন্ অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে আমরা আমাদের চিরপোষিত স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছব।"২

যুক্তি ও বুদ্ধিশালী সুভাষচন্দ্র মহাত্মার কাছ থেকে 'হতাশ ও মুহ্যমান' হয়ে ফিরেছিলেন। তিনটি প্রশ্নের মধ্যে মাত্র একটির সন্তোষজনক উত্তর তিনি পেয়েছিলেন—পরবর্তীকালেও মহাত্মার মত ও পথ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের সন্তোষের গড় ঐ তিনে-এক—এই হিসেবেই থেকে যাবে। মহাত্মা অত্যাচারীর হৃদয়ের স্বেচ্ছা-পরিবর্তনে বিশ্বাস করতেন, নেতাজী তাদের অনিচ্ছার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক হৃদয়ের পরিবর্তনে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সুতরাং মহাত্মার কীর্তি বিচারের সময়ে সুভাষচন্দ্র আধ্যাত্মিক আবেগ সর্বথা বর্জন করবেন। সুভাষচন্দ্রের কাছে মহাত্মার শ্রেষ্ঠ গৌরব জাতীয় সংগ্রামের নায়করূপে। যেখানে তিনি সফল সেখানে সুভাষচন্দ্রের প্রণাম, যেখানে বুদ্ধিভ্রান্তিতে ব্যর্থ, সেখানে সমালোচনা।

ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল গ্রন্থে ১৯২০-১৯৩৪ পর্যন্ত কালে মহাত্মার কার্যাবলীকে সুভাষচন্দ্র খুঁটিয়ে বিচার করেছেন। কাজের সুবিধার জন্য আমি ঐ ১৪ বছরকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে নেব। সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য বলবার সময়ে গান্ধীজীর বিশেষ বিশেষ সিদ্ধান্ত ও প্রয়াস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের আলোচনার চেষ্টাও করা হবে।

প্রথম পর্ব

প্রথম অংশ ১৯২২ সালের ১০ই মার্চ পর্যন্ত। ঐদিন গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

আমরা আগে বহুবার বলেছি, এই পর্বেই গান্ধীজীর দানের মহিমা সুভাষচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। তখনকার বিপ্লবী গান্ধীর ছবি সুভাষচন্দ্র তাঁর বইয়ে দিয়েছেন।

ইংরেজ সরকারের বিশ্বাসঘাতকতায় 'অনুগত সহযোগী' গান্ধীকেও বিদ্রোহী হতে হল। 'জালিয়ানওয়ালাবাগের ধাক্কা লেগে সহযোগিতার জাহাজডুবি হয়ে গেল।' 'বৃটিশ সিংহ ভারতবাসীর মুখের উপর রক্তাক্ত থাবা নাড়তে লাগল।'

"১৯১৯ সালের গোড়া বছর ধরে বিদ্যুৎ এবং বজ্রে চমকিত ছিল ভারতের রাজনৈতিক আকাশ। বছরের শেষের দিকে মনে হয়েছিল আকাশ বুঝি মেঘমুক্ত হয়ে যাচ্ছে—শান্তি ও স্বস্তির লক্ষণ যেন দেখা গেল অমৃতসর কংগ্রেসে। কিন্তু সে আশা পূরণ হল না। আবার মেঘ জমতে শুরু হল ১৯২০ সালের শেষের দিকে, আকাশ ঘন কালো ও আতঙ্কজনক। নূতন বৎসরের আগমনের সঙ্গে ঘূর্ণী ও ঝড় আছড়ে পড়ল। সেই ঘূর্ণীর উপর বসে ঝড়কে নিয়ন্ত্রিত করবেন কে? সেই বিধি-নির্দিষ্ট পুরুষের নাম—মহাত্মা গান্ধী।"

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে উত্তাল হয়ে উঠল অসহযোগী ও খেলাফতী ভারতবর্ষ। চিত্তরঞ্জন, মোতিলাল, লাজপত, মহম্মদ আলী, সওকত আলী—ভারতের শ্রেষ্ঠ কয়েকটি পুরুষ গান্ধীজীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। ভারতবর্ষ নামক কারাগার থেকে দলে দলে লোক জেল নামক মুক্তির আগারে প্রবেশ করতে লাগল। পান-নিরোধ, অস্পৃশ্যতা-বর্জন, বিদেশী বস্ত্রের বয়কট ও বহ্ন্যুৎসব, খাদি প্রচার, উপাধি ত্যাগ, স্কুল-কলেজ, আইনসভা ও আদালত বয়কট, কর-বন্ধ—এক বৎসরের মধ্যে দুশো বছরের কলঙ্কিত ইতিহাসকে মিথ্যে করে ফেলবার জন্য ভারতবর্ষ বিপুল প্রতিজ্ঞায় থরথর কাঁপতে থাকল।

আন্দোলনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সুভাষচন্দ্র দেখলেন গান্ধী ভারতবর্ষকে কী দিয়েছেন!

সুভাষচন্দ্রের বিচারে সে দানগুলি হোল—

এক, সর্বভারতীয় জনজাগরণ। কোনো আন্দোলন এইভাবে সর্বশ্রেণীর মানুষকে স্পর্শ করে নি। ভারত তার অবিসম্বাদিত নায়ককে পেল।

দুই, ভারতের প্রত্যন্তভাগ পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রসারণ—সংগঠন জাতীয় কংগ্রেসের প্রসার এবং তাকে যথার্থ পার্টি-রূপে গঠনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

গান্ধীজীর পক্ষে সর্বভারতীয় গণ-জাগরণ আনা সম্ভবপর হোল কি করে, কিভাবে তিনি ভারতের নেতৃত্বকে অসংশয়ে গ্রহণ করতে পেরেছেন তার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন সুভাষচন্দ্র। তাঁর মতে ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল, গান্ধী তার মধ্যে এসে পদার্পণ করেছিলেন। মহারাষ্ট্রের সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের [illegible] তিলকের মৃত্যু হয়েছে তখন। তিনিই ছিলেন গান্ধীজীর সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী। সশস্ত্র অভ্যুত্থানেরও মৃত্যু হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধকালের সেই বিপ্লবপ্রয়াস আর সম্ভব নয় যুদ্ধোত্তরকালে যুদ্ধবিজয়ী ইংরেজের কামানের মুখে। পথ কোথায়? গান্ধী এলেন, দেহে-মনে দীর্ঘ ধীর প্রস্তুতির পরে, সত্যাগ্রহের অভিনব অথচ ভারতীয় মনের কাছে উপাদেয় পদ্ধতি নিয়ে। ভারতীয়রা তাঁকে অবিলম্বে হৃদয়ে আসন দিল, কারণ,—সর্বোচ্চ কারণ—

> "তিনি তাঁর মস্তকের চতুর্দিকে ঋষিত্বের এক জ্যোতির্বলয় আরোপিত করতে সমর্থ হয়েছেন, যার মূল্য ভারতবর্ষে অপরিসীম; এ-দেশের জনতার কাছে লাট-বেলাট, কি কোটিপতির চেয়েও ঋষির আসন বড়।"

ছোটদের আজীবন খুশিপায়ে চলতে হবে—এই কথা মনে রেখে জুতো কিনবেন

ছোটরা বড়ো হবে পায়ের নিখুঁত গঠন বজায় রেখে—এই যদি আপনার কামনা—তা হলে এখন থেকেই তাদের জুতো কেনা বিষয়ে সাবধান হোন। অন্যথা, ছোট্ট পায়ে বড়ো রকমের ক্ষতির সম্ভাবনা। ছোটদের বাটার জুতো বাড়ন্ত পায়ের কথা মনে রেখেই তৈরি, নকশায় আর নির্মাণে আরামে হাঁটার নিশ্চিন্ত নির্ভরতা। সামনে আঙুল মেলার বাড়তি জায়গা, খাপ খাওয়ানো গোড়ালির গড়ন, আর এমন জুতোর তলি যা অবাধে পা সঞ্চালনের সহায়ক। তাই সুঠাম গঠনে তাদের পা বাড়ে, যার ফল আজীবন খুশিপায়ে চলা। টুকটুকে রঙ, বাহারে নকশা, আর আরামে পয়লা নম্বর—এমন জুতোই এখন সব বাটার দোকানে। আজই নিয়ে আসুন আপনার বাচ্চাদের। এদের খুশিপায়েই শুরু হোক শরতের শোভাযাত্রা।

৬·৯৫

৮·৫০

৮·৫০

Bata

৮·৯৫

৮·২৫-৯·৯৫
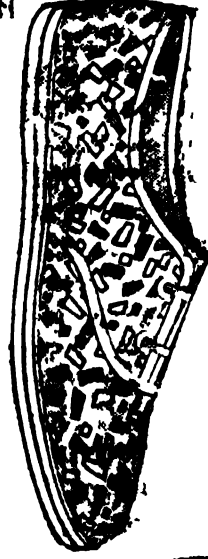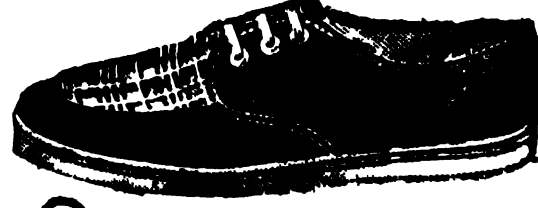
কিংবা টলস্টয়ের ভাবধারাকে বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভব এবং হিংসার আশ্রয় গ্রহণ না করেও স্বাধীনতা-সংগ্রাম করা যায়।

গান্ধীজী এই যে জনজাগরণ আনলেন, একে স্থায়ী ও প্রণালীবদ্ধ করবার জন্য প্রয়োজন সংগঠনের। কংগ্রেসের সংগঠনের দ্বারা গান্ধীজী সেই মহাপ্রয়োজন সাধন করলেন।

১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসের নাগপুর কংগ্রেসে গান্ধীজী তাঁর রচিত কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র পাস করিয়ে নিলেন। 'ভারতীয় স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাসে নাগপুর কংগ্রেস মূল্যবান অধ্যায়স্বরূপ' এবং এই নাগপুর কংগ্রেস মিঃ গান্ধীর ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্র।' নাগপুর কংগ্রেসের পরে মহাত্মা কিভাবে কংগ্রেসকে গঠিত করে যথার্থ পার্টিতে দাঁড় করিয়েছেন, পার্টি ও সংগঠনের একান্ত অনুরাগী সুভাষচন্দ্র তার রূপ উপস্থিত করেছেন—

> ১৯২১ সাল নিঃসন্দেহে দেশকে দিয়েছে একটি বিশেষ সংগঠিত পার্টি প্রতিষ্ঠান। তার আগে পর্যন্ত কংগ্রেস ছিল মূলতঃ বচনমূলক নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। মহাত্মা কংগ্রেসকে কেবল নূতন গঠনতন্ত্র এবং দেশব্যাপ্ত প্রতিষ্ঠাই দিলেন না, উপরন্তু যা প্রয়োজনীয় তাই করলেন—কংগ্রেসকে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান করে তুললেন—ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা দেশের সর্বত্র গৃহীত হল ও বিশেষ গুরুত্ব লাভ করল। একই ধরনের ধ্বনি ওঠানো হতে লাগল সর্বত্র এবং ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একই নীতি ও আদর্শ প্রচারিত হতে লাগল। ইংরেজি ভাষার গুরুত্বই কমে গেল, কংগ্রেস হিন্দীকে (বা হিন্দুস্থানীকে) রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকার করে নিল। খদ্দর স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকল কংগ্রেসসেবীর সরকারী' পোষাক হয়ে গেল। এক কথায় আধুনিক রাজনৈতিক পার্টির সর্বপ্রকার লক্ষণ দেখা গেল ভারতে। এই সকল বস্তুর কৃতিত্ব স্বভাবতই আন্দোলনের নেতা মহাত্মা গান্ধীর প্রাপ্য।"

মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসকে রাজনৈতিক অর্থে পার্টিরূপে গঠন করেছেন—পার্টি-প্রেমিক সুভাষচন্দ্রের পক্ষে এই মহাগুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটিকে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। গান্ধীজী বহু দোষত্রুটি করেছেন, গান্ধীজীর (এবং সুভাষচন্দ্রের) দৃষ্টিতে সেগুলি 'হিমালয়-প্রমাণ ভ্রান্তি', কিন্তু একটি বিরাট কৃতিত্ব তাঁর সকল দিয়েছে—ভারতবর্ষে সুসংগঠিত পার্টির জন্মদাতা তিনি।

চরকার প্রশ্নটিকে সুভাষচন্দ্র এই পার্টি-সংগঠনের দিক থেকে দেখেছেন বলে তার বিরুদ্ধে কঠোর হতে পারেন নি, যা হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র। সুতোর ফাঁদে যে স্বরাজ-বিহঙ্গ ধরা পড়তে পারে না, বছরখানেক ধরে চরকা চালালেই যে ইংরেজ ত্রাহি ত্রাহি করে উঠবে না, তা বুঝবার বুদ্ধি নিশ্চয় সুভাষচন্দ্রের ছিল। তবু তিনি খদ্দর সম্বন্ধে নিষ্ঠাবান ছিলেন কেন? সুভাষচন্দ্র নিষ্ঠাবান ছিলেন সুভাষচন্দ্রেরই অর্থে, গান্ধীজীর অর্থে নয়। যে-কোন ফ্রণ্টে ইংরেজকে আক্রমণ করার তিনি বিশ্বাসী। খাদির দ্বারা বিদেশী অর্থনীতিকে কিছু পরিমাণে আঘাত তো করা যায়—এবং নিজের কাপড় নিজে বুনছি, এই আত্মনির্ভরতা থেকে একদিকে বিদেশী বস্ত্র বয়কট, অন্যদিকে সংগ্রামী মনের যে সংগঠন সম্ভবপর, সুভাষচন্দ্র তাকে কোনমতে মূল্যহীন ভাবতে পারেন না। চরকার রহস্যময় আধ্যাত্মিকতা নয়, ব্যবহারিক কার্যকারিতা ও চরিত্রগঠনের দিকটিই তিনি স্বীকার করেছেন। সকলের বড় কথা, এই চরকা 'কংগ্রেস পার্টিকে' একটি সরকারী পোষাক দিয়েছে। পোষাকের যে একটি মর্যাদা সম্ভব, তার দ্বারা যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি হতে পারে, খাদি আন্দোলন ছাড়া কিভাবে তা সম্ভব করা যেত। তাই চরকা বিরোধিতার ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের মতবর্তী হতে পারেন নি, তিনি এই প্রয়োজনীয় কুসংস্কারটিকে সংহতির দিক থেকে মূল্যবান মনে করেছিলেন।

চরকার প্রশ্নেই যদি সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মতবর্তী না হন অসহযোগের প্রশ্নে যে হবেন না, তা বলাই বাহুল্য। বয়কট বা অসহযোগ রবীন্দ্রনাথের মতে পশ্চিমের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাবে, যে-বিচ্ছেদ মানুষের সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে। আগেই দেখেছি, কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত কী তীব্র ছিল, এবং স্কুল কলেজ বর্জনকে একেবারেই সমর্থন করতে পারেন নি। অপর দিকে অসহযোগ ছাড়া বিদেশী শাসককে বিতাড়ন কিভাবে সম্ভব সুভাষচন্দ্র নিশ্চয় ভেবে পান নি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞানকর্মের সমন্বয়ে বিশ্বাসী, বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অগ্রণী সমর্থক সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর অসহযোগকে মনে-প্রাণে বরণ করেছিলেন, অপরপক্ষে অসহযোগী গান্ধীজীর সঙ্গে তার বিরোধের কারণ, গান্ধীজীর অসহযোগের ঝড়ের ভিতরে বহু সময় সহ-

সমর্থন করেন নি, তার পরিচয় তাঁর ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল গ্রন্থের মধ্যেই আছে। অসহযোগী গান্ধীকে কোন্ কোন্ বিরোধী দলের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি (১) ভারতীয় উদারনৈতিক দল, (২) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, (৩) বিপ্লবীদল প্রভৃতির কথা বলেছেন। এদের সকলেরই বিরোধিতার নিজস্ব কারণ আছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মত সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন—

> "ভারতীয় উদারনৈতিকদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মনোবৃত্তি ও দৃষ্টিভঙ্গীর ঘনিষ্ঠ ঐক্য ছিল, যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কংগ্রেসের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জনের নীতিতে বিশেষভাবে ঘা খেয়েছেন। অসহযোগের ক্রমস্ফীতির তরঙ্গে যদিও তাঁদের প্রভাব সাময়িকভাবে মন্দীভূত হয়েছিল, তবু তাঁরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে লাগলেন। তাঁদের এই চেষ্টায় তাঁরা ভারতের সুবিখ্যাত কবি ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত লোকেরও সমর্থন পেলেন। কবি জুলাইয়ের মাঝামাঝি ইউরোপ থেকে বোম্বাইয়ে পৌঁছলেন। আমিও একই জাহাজে তাঁর সঙ্গে ফিরেছিলুম। জাহাজে প্রত্যাবর্তনের সময়ে তাঁর সঙ্গে কংগ্রেসের নতুন অসহযোগনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করার সুযোগ আমার হয়েছিল। তিনি কোনমতে ব্যাপারটার বিরোধী ছিলেন না। তবে তিনি গঠনমূলক কাজের উপর বেশী জোর দেবার পক্ষপাতী ছিলেন, যাতে করে জনসাধারণের সম্পূর্ণ সহযোগিতা ও সমর্থনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের মধ্যে আর একটি রাষ্ট্র গড়ে। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত আইরিশ সিনফিন আন্দোলনের গঠনমূলক দিকটির সঙ্গে একরূপ, এবং আমার এ বিষয়ক ধারণার সঙ্গে তার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। কিন্তু ভারতে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী এক দলের দ্বারা বেষ্টিত হলেন, যারা ঐ আন্দোলনের ত্রুটির দিকটাই তাঁর কাছে তুলে ধরতে লাগল—আধুনিক বিজ্ঞান ও আধুনিক ঔষধাদির সম্বন্ধে মহাত্মার ব্যক্তিগত অভিমত সম্বন্ধেও তাঁকে অবহিত করান হতে লাগল, যার সঙ্গে কংগ্রেসের রাজনৈতিক পরিকল্পনা ও কার্যাবলীর কোনই সম্পর্ক নেই। অসহযোগ আন্দোলন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, সংস্কৃতি

কলকাতায় তিনি শিক্ষার মিলন নামে এক জোরালো ভাষণ দিলেন। ঐ বক্তৃতায় ভারতকে অবশিষ্ট পৃথিবীর সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের বর্জন করার প্রচেষ্টাকে সমূহ ধিক্কার দিলেন। কংগ্রেস মহল এই আক্রমণকে সর্বাংশে সহ্য করতে পারে না, অথচ কবির পর্যায়ের এমন কোনো সাহিত্যিক নেই যিনি ঐ আঘাতের প্রত্যুত্তর দিতে পারেন। যাই হোক, বাংলার প্রধান ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শিক্ষার বিরোধ নামে এক ভাষণে উত্তর দেবার চেষ্টা করলেন। তাঁর মূল বক্তব্য, যদিও সংস্কৃতির সর্বজনীন ভিত্তি আছে, কিন্তু তবু প্রতি দেশেরই একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, যা তার জাতীয় প্রতিভার সৃষ্টি। ভারতকে নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেই চেষ্টায় যদি বৃটিশ প্রভাবে গড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্জন করতে হয়—তাতে দোষের কিছু নেই। কবির কোনো আক্রমণ মহাত্মার কাছে নিরতিশয় অবাঞ্ছিত, বিশেষত যখন দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে মহাত্মার প্রত্যাবর্তনের পর থেকে দুজনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। তাই কবিকে শান্ত করবার জন্য মহাত্মা বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছিলেন। কালক্রমে কবির প্রতিবাদ একেবারে নির্বিষ হয়ে পড়ল এবং তিনি মহাত্মার পরবর্তী আন্দোলনগুলির একজন সমর্থক হয়ে উঠলেন।"

মূল্যবান বিশ্লেষণ। সুভাষচন্দ্র অসহযোগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ক্রমিক মত পরিবর্তনের কথা বলেছেন। এই পরিবর্তনের কয়েকটি পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ অসহযোগের সম্পূর্ণ বিরোধী নন, যদিও গঠনমূলক কর্মের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করার পক্ষপাতী। দ্বিতীয় পর্যায়ে কবি নানা প্রভাবে অসহযোগের বিশেষ বিরোধী এবং গান্ধীজীর কঠোর সমালোচক, তৃতীয় পর্যায়ে গান্ধীজীর ব্যক্তিগত প্রয়াসে তাঁর প্রতিরোধ মন্দীভূত এবং অতঃপর মহাত্মার গোঁড়া সমর্থক। এই শেষ অবস্থাটি পুণা প্যাক্ট ইত্যাদিকে মনে রেখে সুভাষচন্দ্র নিশ্চয় লিখেছেন।

অসহযোগ ও গান্ধী-আন্দোলন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মতপর্যায় নিয়ে সুভাষচন্দ্রের বিশ্লেষণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা যায়। প্রথম কথা, আমরা আগে যা দেখেছি, অসহযোগ আন্দোলনে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপ থাকতেই বিশেষ সন্দিগ্ধ, তাঁর পত্রাবলীতে তার প্রমাণ আছে। তবে এই সন্দেহ হয়ত সুস্পষ্ট বিরোধিতায় পৌঁছায় নি এবং তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপ দিতে অগ্রসর ত্যাগী তরুণ সুভাষচন্দ্রের নিকটে নেতিবাচক দিকটিকে বড় করে তুলতে পারেন নি। দ্বিতীয়ত, গান্ধীজীর চেষ্টায় হয়ত রবীন্দ্রনাথের 'প্রতিরোধ নিস্তেজ' হয়েছিল এবং তিনি গান্ধীর পরবর্তী আন্দোলনগুলির গোঁড়া সমর্থকও হয়ত হয়েছিলেন, তথাপি মনে রাখা ভাল যে, কবি কোনোদিন চরকা ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর মত বদলান নি। উপরি-উদ্ধৃত অংশ থেকে সুভাষচন্দ্রের মনের স্পষ্ট ছবি পাচ্ছি। প্রথম অংশে, যেখানে রবীন্দ্রনাথের মতের সঙ্গে আইরিশ সিন-ফিন আন্দোলনের গঠনমূলক দিকের মিল ঘটেছে, সেখানে তিনি বিশেষ খুশি; দ্বিতীয় অংশে, যেখানে রবীন্দ্রনাথ জাতীয় অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী সেখানে সংগ্রামীরূপে অসন্তুষ্ট; তৃতীয় অংশে, রবীন্দ্রনাথ যেখানে আবার গান্ধীজীর 'অন্ধ অনুরাগী' সেখানেও তাঁর মন অপ্রসন্ন কারণ তিনি চাইতেন না রবীন্দ্রনাথ সর্ববিষয়ে গান্ধীজীকে গ্রহণ করুন; গান্ধীজীর অবৈজ্ঞানিকতা ও সংগ্রাম-বিরোধী মনোভাবের ক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের নিষ্ক্রিয়তা বা গান্ধী-সমর্থক দেখতে মোটেই রাজী ছিলেন না।

স্কুল ও অন্যান্য বয়কটের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবকে সমর্থন করা সুভাষচন্দ্রের পক্ষে কোনোভাবে সম্ভব ছিল না। স্কুল-কলেজ বয়কটের বিরোধিতার বিরুদ্ধে তাঁর সরল প্রশ্নের চেহারাটি সুন্দর। সুভাষচন্দ্র বললেন, বিদ্যায়তন বর্জন না করলে কংগ্রেস ছেলে পেত কোথায়, যারা কংগ্রেসের আন্দোলনকে সফল করতে সবচেয়ে সাহায্য করেছিল? তাছাড়া কংগ্রেস বিদ্যালয়-ত্যাগীদের জন্য জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছিল, একথা তিনি জানিয়েছেন।

গান্ধীজীর কাণ্ডের আরো একটি দিক সম্পর্কে সুভাষচন্দ্র দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—ভারতের নারী-জাগরণে তার দান। সেটা যেন অতিপ্রাকৃত সৃষ্টি—সুভাষচন্দ্র সম্ভ্রমের সঙ্গে জানিয়েছেন।*

এই পর্যন্ত। গান্ধীমহিমার ইতি-বাচক দিক সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র প্রচুর বলেছেন। কিন্তু বিপরীত দিক? সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন এ ব্যাপারে—

> "মহাত্মা অপূর্বভাবে আন্দোলন আরম্ভ করেন; তিনি ত্রুটিহীন নৈপুণ্যের সঙ্গে সেটাকে গড়ে তোলেন; সাফল্য থেকে সাফল্যে অগ্রসর হয়ে তিনি আন্দোলনের শিখরে পৌঁছে যান;—কিন্তু তার পরেই তাঁর স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়ে, তিনি দ্বিধার ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে যান।"

[ক্রমশঃ]

* ১৯৩০-এর আইনঅমান্য আন্দোলনের কালে গান্ধীজীর আবেদন নারীদের মধ্যে যে মুক্তির ও শান্তির ডাক উপস্থিত করেছিল এবং তারা তাতে যেভাবে সাড়া দিয়েছিল, তা দেখে বিদেশী পর্যবেক্ষক মিঃ এইচ এন ব্রেলসফোর্ড এবং মিঃ জর্জ স্লোকম্ব বলেছিলেন, অসহযোগ যদি ভারতের এই নারীজাগরণ ছাড়া আর কিছু নাও করে থাকে, তবু শুধু এর দ্বারাই তার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়েছে।—২৫৭

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আমার মেজমামিমা (পি, আর, দাসের পত্নী) এবং সেজ মাসিমা মেসোমশায়ের সংে। একবার দার্জিলিং-এ গিয়ে চার নম্বর ম্যালভিলা' বাড়িতে ছিলাম। আমাদের বাড়ির একটু ওপরে ছিল তিন নম্বরের বাড়ি, সেখানে আমার ছোট পিসিমারা এসেছিলেন। আর তারও ওপরে ছিল দু' নম্বর বাড়ি, সেই বাড়ির ওপর দিয়ে রাস্তা চলে গিয়েছে 'ম্যাল্'-এ যাবার, সেই রাস্তার ওপরেই হচ্ছে 'স্টেপাসাইড্' বাড়ি। এই বাড়িতে এসে তখন রয়েছেন ভাওয়ালের মধ্যম কুমার সস্ত্রীক। আমরা যখন বেড়াতে যেতাম আসতাম প্রায়ই দেখতে পেতাম ওপরের বারান্দায় ভাওয়ালের কুমারকে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে রাস্তার দিকে একটু ঝুঁকে। ফর্সা রং, চেহারা ভালো, চুল চোখ ছিল কটামতন। হঠাৎ একদিন শুনলাম কুমার মারা গেছেন। আমার ছোট পিসেমশায় ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্যকে একবার তারা ডাকতে এসেছিল, তিনি গিয়ে দেখে এসেছিলেন। মনে আছে সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা মৃতদেহ নিচে নামিয়ে এনে বাড়ির সামনে খোলা জায়গায় রাখা হয়েছিল। রাস্তা দিয়ে যেতে আসতে বেশ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। এই ভাওয়ালের মধ্যম কুমারের মৃত্যুর ব্যাপার নিয়ে যে এত বড় মামলা হবে এত কান্ড হবে তা তখন কেই বা জেনেছিল। আমরা দার্জিলিং-এ থাকতেই সেবার পি, এন্ বোসের ছেলে-মেয়েরা— রাজা বোস মধু বোস উমা বোস (জ্ঞানাঙ্কুর দে'র পত্নী ও মঞ্জু দে'র জননী) চিনিমা বোস (অমূল্য বোসের পত্নী ও দিলীপ বসুর জননী) মিলে ধ্রুব চরিত্র অভিনয় করেন। আমাকে ধ্রুবের সাথীর ছোট্ট একটা ভূমিকা দিয়েছিলেন। এত কথা বলার উদ্দেশ্য ধ্রুব চরিত্র রিহার্সাল দিতে গিয়ে তার সবটাই আমার শেখা হয়ে যায়। কলকাতায় ফিরে গিয়ে ঝোঁক হল মা মামাবাবু ওদের 'ধ্রুব চরিত্র' অভিনয় করে দেখাতে হবে। মামাবাবু বরাবরই এইসব জিনিসে খুব উৎসাহ দিতেন। দোতলার বারান্দার একটুখানি জায়গা চারিদিকে সাধারণ কাপড় দিয়ে পর্দা টাঙিয়ে ঘিরে নিয়ে আমি একাই সকলের ভূমিকা অভিনয় করে 'ধ্রুব চরিত্র' মামাবাবুদের দেখালাম। মা, মামাবাবু, মামিমা, মাসিমা, পিসিমা (ইনি আমাদের মামিও হতেন) আত্মীয়-স্বজন যাঁরা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন ডেকে এনে অভিনয় দেখাতে সামনে বসিয়ে দেওয়া গেল। এই অভিনয় করে আমি পুরস্কার পাই। মামাবাবু কিনে দিয়েছিলেন ভালো একটি অর্গান, মামিমা গড়িয়ে দিয়েছিলেন আটগাছা সোনার চুড়ি আর পিসিমা দিয়েছিলেন গলার সোনার হার।

আমাদের আরেকটা অভিনয়ের মজার গল্প বলি। তখন বেশ বড় হয়েছি, 'লরেটো কনভেন্ট্'-এ ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ছি। কলকাতা রসা রোডের বাড়িতে রয়েছি। স্থির হল আমাদের বন্ধুরা ও দাদাদের বন্ধুরা আলাদা করে দুটি অভিনয় করে মামাবাবুকে দেখানো হবে। যাদেরটা ভালো হবে তাদের মামাবাবু পুরস্কার দেবেন। দু' দলের মধ্যে বেশ একটা প্রতিযোগিতার ভাব। দাদারা বেছে নিলেন রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' আর আমরা 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'। আমাদের সুবিধা ছিল 'লক্ষ্মীর পরীক্ষাতে' সবই মেয়ে, ছেলের পার্ট নেই। দাদা নিজে কোনও ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। বোধ হয় সামনে পরীক্ষা কি ওইরকম কিছু ছিল। 'মালিনী'তে সুধীরঞ্জন দাস 'সুপ্রিয়'র ভূমিকায় নেমেছিলেন। মামাতো ভাই ভোম্বলেরও ছোটমতন একটা কি অংশ ছিল। আমাদের 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা'তে আমার বন্ধু বুবু (শশীভূষণ মজুমদারের দ্বিতীয়া কন্যা সুধীরঞ্জনের পত্নী) হয়েছিলেন 'ক্ষীরো', মোনা হয়েছিল রাণী কল্যাণী, স্যার নীলরতন সরকারের কনিষ্ঠা কন্যা টুনী (অশোক চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী) হয়েছিল 'লক্ষ্মী' আর আমি 'মালতী'। দাদা রোজ এসে আমাদের রিহার্সাল দেখে যেতেন। তারপর দেখলাম প্রায়ই বলতে সুরু করেছেন, 'আমার বন্ধুরা যা অভিনয় করছে! তোরা তাদের কাছে কিছুই না।' ক্রমাগত এই রকম শুনতে শুনতে আমরা কিরকম দমে গেলাম। ভাবনাও হল সত্যই যদি না পারি। কি লজ্জা, তার থেকে কেলেঙ্কারী করে দরকার নেই। মামাবাবুকে বলেকয়ে পুরস্কার দেওয়াটা না হয় বন্ধ করে দেওয়া যাক্। মামাবাবু শুধু মত প্রকাশ করবেন কাদেরটা বেশি ভালো হয়েছে, তা হলেই হবে। শেষ পর্যন্ত মামাবাবুকে দিয়ে বললামও তাই। যাই হোক, দেখা গেল বেশভূষা সবই আমাদের অপরিবর্তিত। সকলেই যে যার বাড়ি থেকে সুন্দর সুন্দর গয়নাপত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ সব আনছে। কাজেই সবই যেমন চাইছি সেই রকমই পাচ্ছি। আমাদের যা লাগবে না সেই সব দাদাদের দিয়ে দিচ্ছি। তাঁরা আবার ভাড়া করা সাজ-পোষাকও এনেছিলেন। মামার বাড়ির নিচে মস্ত খাবার ঘরে মঞ্চ ইত্যাদি করা হল। ঠিক হল আগে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' হবে, পরে 'মালিনী'। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা সব এলে সন্ধে হল আমাদের অভিনয়। [illegible]

রূপসজ্জা সব এত সুন্দর হয়েছিল, যেমন দেখাচ্ছিল রাণী কল্যাণীকে, তেমন দেখাচ্ছিল লক্ষ্মীকে এবং রাণীবেশে ক্ষীরোকে। অভিনয় প্রত্যেকে এতই ভালো করল যে মামাবাবুরা সকলেই মহা খুশি 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' দেখে। আমরা নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম আমাদের এত ভালো হয়েছে দেখে। তবু দম আটকে বসে রইলাম দাদার বন্ধুদেরটা কেমন হয় তাই দেখবার জন্যে। সুরু হল দাদাদের 'মালিনী'। পর্দা ওঠার সঙ্গেই প্রথমে প্রবেশ করলেন যে সন্ন্যাসী 'ত্যাগ কর বৎসে ত্যাগ কর সুখ আশা, দূর কর বিষয়পিপাসা, ছিন্ন কর সংসার বন্ধন'— বলতে বলতে সেই অগ্রসর হয়ে আসছেন, তাঁর গৈরিক বসনের নিচ থেকে ঝলমলিয়ে উঠল জরীর পোষাক, তাই দেখে প্রথমে খুব হাসাহাসি হল। মামাতোভাই ডোম্বলের জন্য এমন মাপের পোষাক ভাড়া করে আনা হয়েছিল যে সে পোষাক তার আঁট হওয়ায় সে সামনে ফিরে অভিনয় করতে না পেরে পিছন ফিরে কোনরকমে দু' কথা বলে সরে পড়ল।— হাসাহাসি আরো চরমে উঠল। যাই-হোক 'সুগ্রীব' এবং 'লক্ষ্মণ' এদের দুজনের অভিনয় সত্যই খুব ভাল হয়েছিল। কিন্তু হলে হবে কি সবসুদ্ধ জিনিসটা একেবারে দাঁড়ায় নি। আমাদের জয় জয়কার। মামাবাবু বললেন, 'তোরা এত বোকা কেন রে? পুরস্কার ছেড়ে দিতে গেলি কি জন্যে? না হয় তোরা নাই পেতিস?' কি আর বলব, এত মন খারাপ হয়ে গেল! দাদাই ত' ওইরকম করে বলে বলে আমাদের মন সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। পরে দাদাকে দেখতে পেয়েই ধরলাম এবং যেই বলেছি 'এই বুঝি তোমার বন্ধুদের ভালো অভিনয় করা দাদা!' অম্লানবদনে দাদা বললেন, 'তোদের ধাপ্পা দিতেই ত' ওই সব বলতাম, যাতে তোরা ঘাবড়ে গিয়ে নিজেরাই মামাবাবুকে বলে পুরস্কারের ব্যাপারটা অন্তত বন্ধ করিস।' শুনে অবাক! খুব রাগ হয়েছিল দাদার ওপর।

আমরা ভাই-বোনেরা সকলেই গাইতে পারতাম। বিশেষ করে আমার সেজদির (নলিনা ঘোষ) গলা ছিল ঠিক পাখির মত। এত মিষ্টি, কণ্ঠে যেন মধু ঝরত। তানও সুন্দর পরিষ্কার ছিল। তবে গান গাওয়াতে হলে সেজদিকে বেশ খানিকক্ষণ ধরে সাধতে হত। রবীন্দ্রনাথের এই গানগুলি বেছে বেছে সেজদিকে গাইতে অনুরোধ করা হত।

'তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়'
'বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে'
'কেন যামিনী না যেতে জাগালে না
বেলা হল মরি লাজে'
[illegible] যারে যারে ফিরালে'

গানগুলি যেন তার কণ্ঠের জন্যেই তৈরি। দাদা হাসির গানই বেশি গাইতেন। কথাবার্তা সবেতেই দাদার এমন একটা ধরণ আছে যে কিছুতেই হাসি চেপে রাখা যায় না। না হাসিয়ে দাদা কথাই বলতে পারেন না। রসিকতা ঠাট্টা হাসি তামাসা তাঁর কথায় কথায়, আর তারও বেশ একটি নিজস্ব ঢং, একটি ভঙ্গি আছে। কিছু বলতে আরম্ভ হলে আগেই হাসি পেয়ে যায়, পরে ত' কথাই নেই। দাদাকে এ সমস্ত ছাড়া ভাবাই যায় না। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের—

'প্রথম যখন বিয়ে হল
ভাবলাম বাহা বাহা রে
কি রকম যে হয়ে গেলাম
বলব তাহা কাহা রে।'
'তোমারি তুলনা চাঁদ অকস্মার ধাড়ি
যেমনি অঙ্গের কালো বরণ
তেমনি কালো মুখে কালো দাড়ি!'

এবং রজনী সেনের—

'যদি কুমড়োর মত চালে ধরে রত
পানতুয়া শত শত'

এই সব গান দাদা খুব জমিয়ে গাইতেন। 'যদি কুমড়োর মত' গানটিতে এক জায়গায় কোথায় যেন আখর আছে,

নেমে যে যেতাম,
গামছা পরে নেমে যে যেতাম'—

এমন ভাব আর ভঙ্গি করে গাইতেন যে হেসে সব প্রায় গাড়িয়ে পড়ত। মামাতোভাই ডোম্বল গলা ছেড়ে গা ছেড়ে দিয়ে সুরে-বেসুরে গেয়ে চলত দ্বিজেন্দ্রলালের—

'সারা সকালটি বসে বসে
এই সাধের মালাটি গেঁথেছি'।—

গলার সুর যেন টলতে টলতে চলত, কোথায় কখন টলে পড়ে তার ঠিক নেই। বিশেষ করে 'মালাটি গেঁথেছি'র জায়গায় সুরটি কড়ি মধ্যম ছুঁয়ে পঞ্চমে না লেগে পঞ্চম ছাড়িয়ে চলে গিয়ে এমন জায়গায় দাঁড়াত যে সেটা সুরের পর্যায়েই আর থাকত না। হেসে মরে যাবার মত অবস্থা হত। শুনেছি মামাবাবু গাইতে গেলেই মা আর মাসিমা নাকি তাঁকে থামিয়ে দিতেন। প্রায়ই তাঁকে বলতে শুনেছি 'দিদি আর অমলার' জন্যে আমার গান হল না। আমি গাইতে গেলেই ওরা আমায় কেবল থামিয়ে দিত।'—

মোনার মুখে মামাবাবু চণ্ডীদাসের—

"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী
অবনি বহিয়া যায়
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে
মদন মুরছা পায়।"

এই গানটি শুনতে খুব ভাল বাসতেন। প্রায়ই তাঁকে এ গানটি গাইতে বলতেন। এই সময় থেকেই বোধ করি মামাবাবুর জীবনে বৈষ্ণব পদাবলী প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করে। এ সময়ে মনে আছে রসা রোডের বাড়িতে খুব কীর্তন হত। বহু কীর্তনীয়ার কীর্তন সেই সময় শুনেছি। পান্নাময়ীর কীর্তন খুব ভালো লাগত। তারপরে দাদাবাবু মারা যাবার পরে নবদ্বীপের বিখ্যাত কীর্তনীয়া গণেশ দাসের কীর্তন দিয়েছিলেন মামাবাবু পনেরো দিন ধরে। অদ্ভুত পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল গণেশের সেই প্রাণ মাতানো গানে। এই সময় বুঝতে পারি গণেশ দাসের কীর্তন কত উচ্চাঙ্গের। কী কণ্ঠ আর কী ভক্তির সঙ্গেই গাইতেন, অমন আর শুনি নি। কীর্তনের প্রায় সব পালাই সে সময়ে তাঁর মুখে আমাদের শুনবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সত্যিই কত বড় সৌভাগ্য যে সেই কথাই ভাবি। তার মধ্যে 'দান', 'চিত্রপটে মিলন', 'নৌকাবিহার', 'কুঞ্জ ভঙ্গ', 'গোষ্ঠবিহার' ইত্যাদি পালাগুলি শুনে আমরা একেবারে মুগ্ধ। তাঁর মুখেই এই পালাগুলি নতুন শুনি। তার আগে 'মাথুর', 'মান' এই সবই শুনেছি একাধিক বার। তখন আমরা প্রায় কীর্তনে পাগল, মেতে আছি এমন যে একবার শুনে মনে হচ্ছে আবার কখন গিয়ে শুনব,—সে এক অবস্থা। অপূর্ব সে জিনিস। কীর্তন যে কোথায় উঠতে পারে তা হয়ত বুঝতে পারতাম না গণেশের কীর্তন না শুনলে। তাছাড়া কীর্তনের সুরসম্পদ সম্বন্ধেও এই ধারণা হত না। আখর দেবার ক্ষমতাও তাঁর অসাধারণ। এমন আখরও আর শুনলাম না। সে জিনিস না শুনলে বোঝা যায় না, বোঝান যায় না। পরে আরো কত জনের কত কীর্তন ত' শুনেছি, এমন মনও ভরে নি এমন রসও আর পাই নি। সুর, লয়, ভাব, রস, সবেরই অতলে এমন তলিয়ে যাবার অভিজ্ঞতা আমার আর কারো কীর্তন শুনে হয় নি। মামাবাবুর শ্রাদ্ধবাসরে ডোম্বল (চিররঞ্জন) পালা কীর্তনের ব্যবস্থা করেছিল। তিন জায়গায় তিনটি বড় বড় সামিয়ানার তলে এক মাস ধরে চলেছিল কীর্তন গান। সে সময়েও গণেশ দাস এসেছিলেন। আমরা তাঁর কীর্তনের আসরে গিয়েই বসতাম। মামাবাবুর মৃত্যুর পরে মোনা (অপর্ণা দেবী) নিজেকে কীর্তন গানে উৎসর্গ করে পালা কীর্তনে পারদর্শী হয়ে ওঠে। বহু বহুৎ সভায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে পদাবলী কীর্তন গেয়ে সে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রাখত শুনেছি। আমি তখন

পণ্ডিচেরীতে চলে এসেছি, তাই তার কীর্তন আমার শোনা হয় নি। ভদ্রসমাজে মহিলাদের মধ্যে মোনার আগে এ-হেন কাজে আর কেউ অগ্রসর হয় নি। তাকে এ পথের পথপ্রদর্শক বলা যায়। কীর্তন জগতে অপর্ণা দেবী সুপরিচিতা এবং সুপ্রতিষ্ঠিতা।

আমাদের ছোট বোনটি—লীনা, অরও ভারি মধুর গানের গলা ছিল। এই বোনটি আমাদের বেশ একটু অসাধারণ রকমের ছিল। কিন্তু শিখতে গেলে কারো সাহায্য ছাড়া 'নিজে নিজে শিখব' এই দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল। সবে তার তখন সাড়ে তিন কি চার বছর বয়েস। আমাদের বড় বোনের একটা টেবিল হারমোনিয়ম ছিল চেয়ারে বসে বাজাতে গেলে সেই হারমোনিয়মের 'প্যাডেল'-এ তার পা পৌঁছত না। তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক পা দিয়ে বেলো করে গুনগুন করে গেয়ে সেই সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে হারমোনিয়মে তুলত, ভুল হলে নিজেই উঁহু বলে মাথাটি নেড়ে শুধরে নিয়ে আবার ঠিক করে বাজাতে চেষ্টা করত। পুরুলিয়াতে, বছর ছয়েক বয়স তখন। মাসিমার একটি পিয়ানো ছিল সেই পিয়ানোও এমনি করেই বাজাতে শিখেছিল। কখনো ভুল হচ্ছে দেখলে আমরা কেউ যদি দেখিয়ে দিতে যেতাম, দিত না, বলত 'সব সব আমি নিজে নিজে করব।' বেহালাও বাজাত। মাসিমা ছোট একটি বেহালা কিনে দিয়েছিলেন কী যে খুশি একটি নিজস্ব জিনিস পেয়ে। মাথাটি কাত করে ঘাড়ের উপর বেহালা চেপে ধরে ঘন ঘন ছড় টেনে ওইটুকু মেয়ের বাজানোর দৃশ্য আজো ভুলতে পারি নি। আমাদের বাড়িতে প্রথম যখন ক্রুশের লেস বোনা সুরু হয় আমরা সকলেই তাই নিয়ে মেতে আছি। মা নিজে বুনছেন, শেখাচ্ছেনও দিচ্ছেন আমরা শিখছি। আমাদের ছোট বোনটির ঝোঁক হল সে কারো কাছে শিখবে না নিজে নিজে করবে। মনে আছে তার দৃঢ় সংকল্পের কথা। সারা দিন না খেয়ে-দেয়ে একটা উঁচু খাটের নিচে বসে বসে সে নিবিষ্টচিত্তে ক্রুশের 'চেন স্টিচ' যেটা না জানলে ক্রুশে বোনা যায় না, মাথা খাটিয়ে বার করবার চেষ্টা করছে। মা কতবার গিয়ে বলেন 'আয়, আমি দেখিয়ে দি'—কতবারই মাথা নেড়ে আপত্তি জানায়। শেষ পর্যন্ত অনেক পরিশ্রমের পর সে সত্যই নিজে নিজে বার করে তবে ছাড়ল। অদ্ভুত ক্ষমতা ও অধ্যবসায় ছিল তার। ছবি কি চমৎকার আঁকত। সম্বল ছিল শুধু একটি পেনসিল। ঐ পেনসিল দিয়ে দুটি [illegible] বাচ্চার [illegible]

বাচ্চা দুটির মুখ আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে আছে। আমার ছোট সেতারটি নিয়ে নিজের মনে বাজাত। আমাকে ওস্তাদ যেরকম করে বাজাতে শেখাতেন, তাই দেখে দেখে নিজে চেষ্টা করে সেতারেও বেশ সুর তুলতে শিখেছিল। সুরেন ওস্তাদের কাছে গান শিখতে আরম্ভ করার পরে, যে গানটি সে শিখতে আরম্ভ করত তার শেখা শেষ হবার আগেই আমি গানটি শিখে ফেলতাম বলে সেটা তার একেবারেই পছন্দ ছিল না। কারো একবার শেখা হয়ে গেছে যে গান সে গান শিখতে তার মোটেই ভালো লাগত না। সে চাইত আমরা জানি না এমন কোন গান শিখে আমাদের আগে সর্বপ্রথম সে-ই সে গানটি গাইবে। কিন্তু বেচারির ভাগ্যে তা হত না। আমিই তার সে ইচ্ছের বাদ সাধতাম। সুরেন ওস্তাদকে গিয়ে বলত, ওস্তাদবাবু, ওরা কেউ জানে না এই রকম নতুন গান আমি শিখতে চাই। ওস্তাদবাবুও বেছে বেছে তাকে সেইরকম গানই একটা শেখাতে সুরু করতেন, কিন্তু হলে হবে কি? সে যখন শিখত আমি গিয়ে শুনতাম এবং তার শেখার আগেই শিখে নিয়ে গেয়ে গানটি পুরোনো করে দিতাম। সে এত দুঃখ পেত। নতুন গান আর নতুন থাকত না। এই বোনটি মাত্র বার বছর বয়েসে সব খেলা শেষ করে চলে যায়। অকালে কুসুম ঝরে গেল। দুরারোগ্য টাইফয়েড জ্বরে তার মৃত্যু হয়। বিকারের ঘোরে তাকে গাইতে শুনতাম—

'জীবনে যত পূজা হল না সারা—
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।'

আর—

'এ সংসারের হাটে—
আমার যতই দিবস কাটে—
আমার যতই দুহাত ভরে ওঠে ধনে,
তবু জেনো আমি পাইনি কেন
সে কথা রয় মনে।
যেন ভুল না যাই
বেদনা পাই শয়নে স্বপনে।'—

তার জীবনে মা-ই ছিলেন সব। তার মৃত্যুতে মাকে দেখেছিলাম কী শান্ত স্থির মূর্তি। চোখে জল নেই। দুটি হাত জোড় করে বসে আছেন চোখ দুটি বুজে। শ্মশানে নিয়ে যাবার আগে বোনটিকে লাল বেনারসী পরিয়ে ফুলে-চন্দনে দিয়ে সুন্দর করে যখন সাজিয়ে দেওয়া হল, নিয়ে যাবার ঠিক আগে আস্তে আস্তে মা তার শিরশ্চুম্বন করে শান্ত সুরে বললেন—'নিয়ে যাও।' পরে উঠে গিয়ে বসলেন অন্য ঘরে। আমার একটি বোন খুবই কাতর হয়ে কান্নাকাটি [illegible] তার পিঠে হাত দিয়ে সান্ত্বনার সুরে বললেন, "কেঁদো না, কাঁদতে নেই। বরং ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ হও যে এমন সুন্দর জিনিস এতদিন তিনি আমাদের কাছে রেখেছিলেন।" শোকে-দুঃখে মাকে আমরা কাঁদতে দেখি নি। ভগবানে ছিল তাঁর অটল বিশ্বাস। দুঃখ-শোক সবই তিনি গ্রহণ করতেন ভগবানের করুণা, তাঁর আশীর্বাদরূপে। পণ্ডিচেরীতে এসে শ্রীমাকে যখন মায়ের ছবি দেখাই তখন শ্রীমা তাঁর বিষয় খুবই ভালো বলেছিলেন।

আদালতে যোগদান করার কয়েক বছরের মধ্যেই মামাবাবু পিতার ঋণের ভার নিজের স্কন্ধে তুলে নিলেন আদালতে দেউলিয়া নাম লিখিয়ে। এর ফলে তাঁকে আদালতে প্র্যাকটিস করা নিয়ে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়। প্রাণপণ চেষ্টায় বাধার সেই জগদ্দল পাথর ঠেলে মামাবাবু নিজের পসার জমিয়ে তুললেন। বোমা ষড়যন্ত্রের মামলার পর তাঁর খুব নাম হল। সেইখান থেকে তাঁর যশের শুরু। তারপর উঠলেন তার শিখরে 'ডুমরাওন কেস' নামক মামলায় জয়ী হয়ে কেশোপ্রসাদ সিংকে ডুমরাওনের গদিতে বসিয়ে। তখন কলকাতার আদালতের প্রথম শ্রেণীর ব্যবহারজীবীদের মধ্যে একজন হয়ে দাঁড়ালেন এবং ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী আইনজীবী বলে গণ্য হলেন ও প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। এই ডুমরাওন কেস [illegible] আরা যান তখন বাড়িসুদ্ধ সকলেই তাঁর সঙ্গে আরা যায়। [illegible] দাদাবাবু, মাসিমা, মামাতো [illegible] এবং মাসিমারাও কেউ কেউ [illegible] ছিলেন। মা এবং আমরাও সেই সঙ্গে ছিলাম। আরাতে যে বাড়িতে আমরা ছিলাম তার নাম ছিল 'Nanda Babu's Bungalow'—স্টেশনের ঠিক পিছন দিকে ছিল বাড়িটি। কিছু দিন [illegible] আমাদের নিয়ে মা [illegible] আমাদের এক পিসিমার (সম্পর্কে [illegible] মাতামহী) কাছে, সেখানে [illegible] দিন থেকে পিসিমা ও [illegible] (সত্যজিৎ এর জননী) নিয়ে আমাদের পিতামহের জমিদারীর কাছারী কাওরাইদ এলেন। এই প্রথম আমরা গ্রামে এলাম। ঠাকুর্দা তখন বেঁচে নেই। ঢাকা ও ময়মনসিং-এর মাঝে অবস্থিত কাওরাইদ। কাওরাইদের এলাকা যেখানে শেষ সেখান থেকে ভাওয়ালের এলাকা সুরু। এইখানে এসে ঠাকুর্দার শিল্পিমনের কত পরিচয় কত নিদর্শন যে পেলাম। কত বড় শিল্পী তিনি ছিলেন তা বুঝতে বিলম্ব হল না তাঁর নানা কারুকার্য দেখে। মোমবাতির [illegible] দিয়ে কি অপূর্ব [illegible]

একটি নৌকো করেছিলেন শুধু সামান্য সরুণ দিয়ে খোদাই করে, সত্যি দেখবার মতন, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না যে মোমবাতি দিয়ে এমন জিনিস হতে পারে। তা ছাড়া খড়ির উপর খোদাই করা কত মূর্তি, কত ছোট ছোট অদ্ভুত সুন্দর সুন্দর জিনিস সব যে দেখতে পেলাম, সবের মধ্যে ঠাকুর্দার স্পর্শ যেন লেগে আছে। খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম দেখে। ঠাকুর্দার কাছারী-বাড়িটি ছিল কাঠের বাড়ি। আমরা সেই বাড়িতে ছিলাম। এই জায়গাটি তাঁর বড় প্রিয় ছিল। ঠাকুর্দার সমযকার তাঁর ভক্তবৃন্দের মধ্যে কেউ কেউ দেখলাম তখনো বেঁচে আছেন। তাঁদের কাছে রোজ সন্ধ্যাবেলা বসে ঠাকুর্দার কত কথা শুনতাম মুগ্ধচিত্তে। যত শুনতাম তত আরো শুনতে ইচ্ছে করত। সত্যিকারের একজন সাধু মহাত্মা ব্যক্তি ছিলেন, মনটা কেবলই তাঁর পাযে লুটিযে পড়ত। জমিদারীর কাজে ঠাকুর্দাকে প্রায়ই কাওরাইদ এসে থাকতে হত। এই কাছারী বাড়িতেই থাকতেন। বাড়িটির চারদিক খোলা। নানা রকম ছোট-বড় গাছ-পালায ভরা. ভারি সুন্দর প্রাকৃতিক শোভা! সামনে দিযে বযে গেছে ছোট নদী। লম্বা লম্বা একেকটি তালগাছে যে কতগুলি ববে বাবুই পাখীর বাসা ঝুলেছে দেখা যেত। বাবুই পাখীর কি অদ্ভুত বাসা সব যে দেখলাম। এরকম পাখীর বাসা আগে কখনো দেখি নি। সারাদিন পাখীর ডাকই নত রকমের শোনা যাচ্ছে। চারদিকে প্রকৃতির এত রকমের ছড়াছড়ি যে মন যেন তারই সুরে সুর মেলাতে চাইত। গাছপালা সবই যেন আপনজন। মনে হত কি একটা সম্বন্ধ আছে এদের সঙ্গে। গাছের যে সব ডালে হাত পৌঁছয সেই সব ডালে, পাতাগুলির গাযে গাযে হাত বুলিযে কেবল দেখতাম. কেন জানি না খুব ভাল লাগত। পাশাপাশি গাছের আশেপাশে ঘুরে বেড়াতাম বুলবুলি পাখীর বাসার খোঁজে। গাছের ডালে বসে দোয়েল বুলবুলির শিস. ভরা দুপুরে কোকিলের ডেকেই যাওয়া, যখন তখন এসে কোথাও কোন গাছে বসে 'বৌ কথা কও' পাখীর সুর করে বার বার বলা. তারপর পাপিযার সেই মধুর ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া সুর. —সব এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি করত. মনে যেন কিসের ছোঁযা লাগত। কাছারীবাড়ির অদূরে আশে-পাশে সব নায়েব গোমস্তাদের খড়ের চালের কুটির। বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের কত বর্ণনা পড়েছি, শুনেছি কত কথা কত ভালো লাগল এখানে এসে সব দেখে' সবাই মিলে নদীতে স্নান করতে যেতাম' সাঁতরে এপার-ওপার করতাম, তবে বেশ ভয়ে ভয়ে, কেন না নদীতে কুমীর আছে, কিম্বা কখনো কখনো আসে এই রকমই শুনেছিলাম। নদীটি ছোট হলে কি হবে খুব স্রোতস্বিনী। মনে আছে একদিন কলাগাছের গুঁড়ি নিয়ে ভাসতে ভাসতে এমন টানের মুখে গিযে পড়েছিলাম যে ফিরে আসতে পারব কি না রীতিমত ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছিল। নৌকোর করেও আমরা বেড়াতে যেতাম বহুদূরে যে সব জমিদারী অঞ্চল আছে সেই সব দেখতে। কাছারী-বাড়ির একদিকে ছিল ছোট একটি উপাসনা মন্দির, ঠাকুর্দাই করিয়েছিলেন। তারই পাশের জমিতে পরিবারের যাঁরা গত হয়েছেন তাঁদের সারি সারি শ্বেত পাথরের সমাধি রয়েছে। প্রতিটি সমাধির ওপর মার্বেল পাথরের ফলকে তাঁর জন্ম মৃত্যু এবং কোনও গানের দু'-চারটি করে লাইন লিখিত। ঠাকুর্দা, ঠানদি ও আমাদের বাবা—এঁদের সমাধি দেখলাম। বাবার সমাধির গাযে লেখা রযেছে রবীন্দ্রনাথের গানের এই লাইনগুলি—

—'সুখ সুখ করে দ্বারে দ্বারে মোরে
কত দিকে কত খোঁজালে
তুমি যে আমার এত আপনার
এবার সে কথা বোঝালে
করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে
কোথা নিয়ে যায় কাহারে
আমি সহসা দেখিনু, নয়ন মেলিয়ে
এনেছ তোমারি দুয়ারে —

মায়ের কাছে শুনেছি বাবার এ গানটি নাকি ভারি প্রিয় ছিল। ঠাকুর্দা পোষ্যপুত্র ছিলেন। পরে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ঢাকা অঞ্চলে তিনি 'ভক্ত কালী-নারায়ণ গুপ্ত' নামে সুপরিচিত। ঠাকুর্দা ছিলেন অতি সাধাসিধে ধরণের সহজ সরল নিরহংকার মানুষ। ভগবদ্ভাবে সর্বদাই ভরপুর হয়ে থাকতেন। সংসারে সকলের সঙ্গে, সকলের মাঝে থাকলেও প্রায়ই তাঁকে শ্মশানে ধ্যানস্থ অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যেত। 'ভক্তসংগীত ও ভাবকথা' নামক তাঁর উপদেশের সাধন-সঙ্গীত ও সাধনার কথার একটি বই আছে। গ্রাম্য ভাষা ও গ্রাম্য সুরে রচিত গানগুলি। পড়লে কিম্বা গানগুলি শুনলে বোঝা যায় তিনি কোন্ রসে বিভোর হয়ে ছিলেন। কোন রসের আস্বাদ পেয়েছিলেন আমি কয়েকটি করে লাইন তুলে দিচ্ছি।

"মরি! দেখলে সে রূপ আর কি
ভোলা যায়
ভুলি ভুলি ভুলতে নারি
শয়নে স্বপনে জাগায়।
নয়নজলে নয়ন অন্ধ প্রায়,
দেখি দেখি আর দেখি না
জলে ভরে যায়
সে যে লুকোচুরি খেলা করে,
দেখা দিয়ে আবার লুকায়।"

"এ গো দরদী, আমার মন কেন
উদাসী হতে চায়,
(তুমি) ডাকো গো নাহি,
হাঁকো গো নাহি, আপনে আপনে
চলে যায়।
এ গো এ উদাস নয়, সে উদাসের প্রায়
যে উদাসে সংসার ছেড়ে বনেতে
চলে যায়,
এ যে সংসার ধর্ম, ধর্ম, তার
সংসার দুইয়ে এক করে মেলায়।"

"পরশে রস রসেতে বশ,
বশ বিনা সকলি নীরস
এই রসে হয় সকল সরস
এমন মধুর চায় রে।'—
'নাই এর চের নাই কিছু নাই
আছের ঘরে সব আছে রে
থাকলেই সে হাস্যবদন, না থাকলে কে
হাসতে পারে"

'তুমি সুন্দর অতি সুন্দর
তুমি সুন্দরের খনি
পরশে তোমার হই হে সুন্দর
পরশ [illegible]'—

'এ নাম যোগীজনার [illegible]
ধন
[illegible]
[illegible]
ও তার আনন্দ [illegible]
[illegible]'—

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] রে।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] রে।
—[illegible]
[illegible]
গার্ড তার আপনি ভগবান.
[illegible] যান
হাঁকা [illegible]
[illegible] টান
লাই লাল কি সাদা [illegible]
দিশায় দিশায় [illegible]"

[ক্রমশঃ]

[দিনের পর দিন যাঁরা উদ্বাস্তু-ত্রাণের ব্যর্থ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বাংলার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে বুভুক্ষু মানুষদের উদ্দেশ্যে যাঁরা পরিহাস করে বলেছেন—'না খেয়ে কেউ মরছে না'—এ কাহিনী তাঁদের হাতে পৌঁছে দিলাম। আর দিলাম পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার আমার হতভাগ্য বাঙালী ভাই-বোনদের হাতে—লেখক]

ওকে পাকিস্তানে ফিরে যেতে হবে! আর মাত্র কয়েকটি ঘণ্টা ভারতের মাটিতে ওর থাকা চলবে! ওর জীবনে নিয়তির এ এক কঠোর নির্দেশ। অথচ কি অপ-রাধ ও করেছিলো—ভেবে পায় না! শুধু জানে গোটা জীবনটা এক তীব্র ছিঃ-ছিঃ-তে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, তা থেকে মুক্তি নেই। অথচ এ ও চায় নি—আরো পাঁচটা সাধারণ মানুষের মতো স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সহজ অনাড়ম্বর ঘর বাঁধবার স্বপ্ন ওরও ছিল। কিন্তু নিয়তির কি অলংঘ্য নির্দেশ! একটিবারও ও বলতে পারছে না—'দেখ, তোমাকেও আমি ভালবেসেছিলাম,—তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচতে পারবো না। আমাকে তুমি আপন বক্ষে বন্দী করে রাখো' আজ শুধু বাঁচার প্রশ্ন নয়—বাঁচার প্রশ্ন ছাপিয়ে বাঁচাবার প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। ওর নির্জন আস্তানায় আজ কত লোকের ভিড়। জিনিসপত্রগুলি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। সম্পত্তির মধ্যে কয়েকটি কাঁচের গ্লাস, হাতা-খুন্তী-হাঁড়ি-কড়াই, খান তিনেক কাঁসার থালা, একটা ছাতি, একটা টর্চ লাইট আর একটা বিছানার চাদর। স্থাবর সম্পত্তি বলতেও এই—অস্থাবর হলেও এই। এই বিক্রয়লব্ধ টাকাই হবে ওর পথ অতিক্রমের পাথেয়।

বৌ-এর চোখে জল। কোলের সদ্যাগত ছেলেটি কিছুক্ষণ আগে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত মুখের উপর স্বর্গীয় সারল্যের ছায়া। তবু ওদের হাত ধরে আজ ওকে সীমান্ত অতিক্রম করতে হবে। ওই নিষ্পাপ শিশু ঘুণাক্ষরেও জানবে না, যে মাটিতে ও জন্মগ্রহণ করেছে—মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরে তার সকল আকর্ষণ ছিন্ন করে চলে যেতে হবে—এতটুকু ভালবাসার অধিকার আর থাকবে না। অথচ এ ওর জন্মভূমি। 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' তবু জ্ঞান হবার আগেই আজ সেই 'স্বর্গ' হতে বিদায় নিতে হবে—একদিন জানবে জন্মভূমির মাটিতে ওর স্থান হয় নি। এ যেন এক মর্মান্তিক tradition হয়ে গেল। একদিন ওদেরও সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল। আর আজ নিজের ভালবাসার রক্তে গড়া শিশু-সন্তানকে নিয়ে এক বিস্মৃত অতীতের প্রতি যাত্রা হবে শুরু। ওদের প্রত্যাশিত সন্তান। যখন ওর আসবার কথা—তখন আসে নি। আজ জীবনসূর্য যখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে তখনই হলো ওর আবির্ভাব সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। ভালবাসার অতি-বিলম্বে প্রাপ্ত ফসল—যেন নিয়তির এক রূঢ় পরিহাস। তবু ভাগ্যকে ও কখনো দোষারোপ করে নি। দুঃসময়ের এই সন্তানকে হাসিমুখেই বরণ করে নিয়েছিলো। আরো বেশি করে ভালোবেসেছিলো ভবীকে। নীহার ওকে যা দিতে পারে নি—ভবী আজ তাই দিয়েছে—। তবু নীহারকে ও ভুলতে পারে নি কোনদিন। মাঝে মাঝে যখন সেই স্বল্পভাষী বধূটির কথা ওর মনে পড়তো—তখনই দেখেছি ও কেমন অন্যমনা হয়ে গেছে। আমাকে জিজ্ঞেস করেছে—"দাদা, মরণের পরে মানুষ তার আপনজনের সংগে দেখা করতে পারে?" আমি বয়সে ওর থেকে অনেক ছোট, তবু আমাকে 'দাদা' বলেই ও ডাকে। আমিও ওর নামের শেষে একটি সংক্ষিপ্ত 'দা' যোগ করে ওকে ডাকতাম। নীহারের কথা বলতে বলতে ও অতীতদিনের সেই পরিত্যক্ত অন্ধকারে চলে গেছে। ওর মনে পড়ে ১৯৪৭ সালের কথা—কখন একটি দেশকে কেটে দু'খণ্ড করে মানুষ স্বাধীনতার অমৃত-পান করতে চেয়েছে।

সেদিন আজকের পূর্ব পাকিস্তানে এক আনন্দের জোয়ার এসেছিল। কিন্তু ওরা প্রাণ খুলে হাসতে পারে নি। যেটুকু হেসেছে—সে কেবল লোক-দেখানো হাসি। 'আমি জীবিত থাকতে দেশ বিভাগ হবে না—আমার মৃতদেহের উপর যা খুশি করো'—গান্ধীজীর সেই বিখ্যাত উক্তিকে ব্যর্থ করে দিয়ে—জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্ব সৃষ্টি করলো পাকিস্তান। বাংলাদেশকে কেটে দু'ভাগ করে যে ভাগ পাকি-স্তানের দিকে ঠেলে দেওয়া হলো—ওরা পড়লো সেই ভাগে।—স্বভাবতই ওরা উল্লসিত হতে পারে নি। তবু ভারতীয় নেতারা বারবার পূর্ব-পাকিস্তানী হিন্দুদের অভয় দিতে থাকেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল বললেন—"সীমান্তের অপর পারের ভ্রাতৃগণ! কখনো আপনারা মনে করিবেন না যে আপনারা অবহেলিত ও বিস্মৃত হইতে যাইতেছেন। আপনাদের মঙ্গল আমাদের জাগ্রত দৃষ্টির বিষয়ীভূত। আমরা পরম ঔৎসুক্যের সহিত আপনাদের ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য করিব। আমার আশা ও বিশ্বাস অনতিবিলম্বে আমরা উভয় দেশের লোক একই সাধারণ প্রতি আনুগত্য লইয়া মিলিত হইব।"

ঐ একই দিনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের সম্পর্কে ঘোষণা করলেন—"তাঁহারা আমাদেরই লোক এবং যাহাই ঘটুক না কেন চিরদিন আমাদেরই থাকিবেন এবং আমরাও তাঁহাদের সুখে-দুঃখে সমান অংশীদার রহিব।"

এর মাস কয়েকদিন আগে গান্ধীজী ঘোষণা করেছেন, "অপর পারের উদ্বাস্তুগণকে ভারতীয় নাগরিকরূপে আশ্রয় ব্যবস্থা করিতে হইবে। ... আমি সংসদের এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছি যে ভারত সরকার পাকিস্তানে পরিত্যক্ত পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুগণের গৃহ ও ভূসম্পত্তির উপযুক্ত মূল্য প্রদান করিবেন।"

এ সব কথা সীমান্তের ওপারে মানুষের মুখে মুখে ফেরে আর ওরা মনে কিছুটা স্বস্তি পায়। ১৯৪৬ সালের বঙ্গবন্যার চিত্র তখনো মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয় নি। ভীত, সন্ত্রস্ত আর দূরদর্শী মানুষের দল তাই একে একে জন্মভূমির বাহু-বন্ধন ছিন্ন করে—সাতপুরুষের মাটির আকর্ষণকে নির্মমভাবে গলা টিপে হত্যা করে এপারে এসে আশ্রয় নিতে থাকে।

১৯৪৮-৪৯ সাল। আজ এতকাল পরে সব কথা ওর আলো করে মনে পড়ে না। অনেক আগে নীহার ... করেছে। ... এক পরে থাকতেও চিহ্ন নেই। মাতৃ সংগীত ওকে

লড়াই করে লাভ করতে হয়েছিল। ওর মায়ের মৃত্যুর পর পিতা কেশব দাস দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন। দ্বিতীয়-পক্ষের এই সন্তানদেরই জমিজমার মালিকানা হস্তান্তর করার যে চক্রান্ত হয়েছিল ওর ঠাকুর্দা সে চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। সৎ-ভাইদের হাতে ওকে নিগৃহীত হতে হয়েছিল। আজ পিতাও নেই—পিতামহও নেই। অভিশপ্ত সম্পত্তি বিক্রি করে নীহারকণার হাত ধরে ও সীমান্তের এপারে এসে উঠতে চায়। বিদায়কালে কেউ একফোঁটা চোখের জল ফেলে নি ওদের জন্য। নীহার কেঁদে ফেলেছিল—কিন্তু ও নিজের হাতে সে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলেছে—"কেঁদো না, এখানে আমাদেব কে আছে বলো তো? তাছাড়া চারিদিকের মানুষেরা যেভাবে চলে

যাচ্ছে—তাতে আমরাই বা কতদিন থাকতে পারবো? বরং ওখানে গিয়ে আমরা আমাদের ছোট সংসার সাজিয়ে তুলবো।" যারা ওকে গ্রাম ছেড়ে যেতে মানা করে-ছিলো সবচেয়ে বেশি করে তারা ওর আত্মীয় নয়- ওর সংগে তাদের রক্তের সম্পর্ক ছিল না তারা ওর জ্ঞাতিও নয়। তারা ওর গ্রামবাসী—ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ। আজ দীর্ঘ বিশ বছর পরে সেই মোকাম মোল্লা-বুদো মোল্লার কথা বারবার মনে পড়ছে—"তোকে যেতে দিতে চাই নি—তবু তুই আজ যাচ্ছিস। আল্লার দরবারে দোয়া মাঙছি, আল্লাপাক্ তোর মঙ্গল করুন। তাছাড়া আমরাও ত' আর চিরকাল বেঁচে থাকবো না। তোর সম্পত্তি কিনেছি বটে—কিন্তু তার ন্যায্য মূল্য হয়ত দিতে পারি নি। তবু একটা কথা তোকে বলে দিই—খোদা না করুন, যদি কখনো বিপদে পড়িস আর ফিরে আসতে মন চায়—চলে আসিস—তোর বাস করবার জায়গার অভাব হবে না।" আজ সে বৃদ্ধরা হয়তো আর ইহজগতে নেই। তবু আজ তাদের কথা মনে পড়ছে বার বার-একান্ত আত্মীয়ের মতো। দীর্ঘকাল তাদের সংগে যোগাযোগও ছিল না। প্রথম প্রথম ৫।৬ বছর চিঠিপত্র আদান-প্রদান চলছিলো। তারপর ধীরে ধীরে তাও বন্ধ হয়ে গেছে। এক একবার ওদের আন্তরিকতার টানে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় নি তা নয়। কিন্তু তখনই হয়তো শুনেছে পূর্ববাংলা সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় উত্তপ্ত। আর তখনই ওর সে ইচ্ছা কর্পূরের মতো শূন্যে মিলিয়ে গেছে। সকলেই ত' আর মোকাম মোল্লা, বুদো মোল্লার মতো নয়। সংসারে এদের সংখ্যা যে বড় কম!

জমি বিক্রির টাকা ওর সীমান্তের এপারে আসে নি। আনবার জন্য কোন চোরাই কিংবা আন্তর্জাতিক পদ্ধতি অবলম্বন করে নি ওরা। নিজেদের পোঁটলা-পুঁটলীর মধ্যেই যখের ধনের মতো আগলে নিয়ে আসতে চেয়েছিলো। কিন্তু বেনাপোলের land customs-এর এক মহিলা অফিসারের হাতে নীহারকণা ধরা পড়ে গেল প্রথমে। এই সূত্রে থেকে ওর স্বামীকেও সন্দেহ করে check করা হলো। হাজার মিনতি জানিয়ে এক শ' টাকাও ওদের হাত থেকে ওরা ফেরৎ পেলো না। আন্ত-র্জাতিক আইনে ফেরৎ দেবার নিয়ম নেই! বাংলার মানুষ বাঙালীর হাতে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিলো!

উত্তর চব্বিশ পরগনার একটি মহ-কুমা শহরে ওদের গ্রামের চৈতন্য অধিকারীর সংগে দেখা! তারই দোকানে একটি কাজ ওর জুটে গেল। একটি ছোট্ট ঘর ভাড়া নিয়ে ওরা ওদের ছোট্ট বাসা গুছিয়ে তুললো। কিন্তু এ সুখ বেশি-দিন ওর ভাগ্যে টিকলো না। ১৯৫২ সালের এক রাত্রে মাত্র একদিনের কলেরায় নীহারের মৃত্যু হলো। বছর দুই ধরে সরকারী সাহায্যের জন্য রিফিউজি কার্ড বের করে চেষ্টা করেছে যে যেমন বলেছে তেমনি পদ্ধতিতে। কিন্তু কোন ফল হয় নি। সে সময় অনেকেরই বেলঘরিয়া এবং অন্যান্য স্থানে বসতি মিলেছে। কিন্তু ওর কোন হিল্লে হয় নি। সে কি ওর অজ্ঞতার জন্য—না ওপরওয়ালাদের গাফিলতির জন্য তা ও জানে না। নীহারকণার মৃত্যুর পর সব কিছুই ওর কাছে অর্থহীন হয়ে গেল। এতবড়ো পৃথিবীতে ওর যেন আর কিছুই রইলো না।

কিন্তু মানুষের জীবনের গতি কি বিচিত্র! বছরখানেক পরে উত্তর চব্বিশ পরগনারই আর একটি বাজারে ভবীর সংগে ওর দেখা! এই ভবী—যে আজ কোলের শিশুপুত্রকে শুইয়ে রেখে চোখের জল ফেলছে। সেদিনও চোখের জল ফেলেছিল। সেদিন ভবীকে এখানে দেখে ও বিস্মিত হয়েছিল—মনে পড়ে-ছিল দেশের গ্রামের কথা। তখন কতই বা ভবীর বয়স! এগারো কি বারো বছর। ফ্রক-পরা এই কালো মেয়েটিকে ওর বড় ভালো লাগতো। 'মাঝে মাঝে রসিকতা করে বলতো—'দেখ্ ভবী, আমি তোকে বিয়ে করবো।' মেয়েটি লজ্জায় পালিয়ে যেতো। তারপর সেদিনের কথা ওর আজো মনে পড়ে। ও দোকানে কাজ করছিলো—। হঠাৎ পাশের বাড়ি থেকে একটি শিশু-কণ্ঠের চিৎকার শুনে ছুটে যায়। গিয়ে যা দেখলো তাতে ওর সর্বশরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। ছুটতে গিয়ে ভবী একটি আগুন-বোঝাই উনুনের মধ্যে পড়ে গেছে। পাঁজাকোলা করে ও নিয়ে আসে ওকে। তারপর ডাক্তার—হাসপাতাল। দুই পায়ের আঙুলগুলি ভবীর চিরকালের জন্য বাতিল হয়ে যায়। তারপর একদিন ভবীর বিয়েও হলো তার মা-বাবার ইচ্ছেমত। ও বিয়ে করলো নীহারকণাকে। সেই ভবী সেদিন চব্বিশ পরগনার সেই বাজারে ওর সামনে চোখের জলের মধ্যে পরবর্তী ইতিহাস বলেছিলো। স্বামী তাকে পরিত্যাগ করেছে।

দুটি অসহায় মানুষ সেদিন পর-স্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছিলো। আবার ও ঘর সাজালো। সেই ঘর আজ আবার ভেঙে যাচ্ছে। কিন্তু কেন?

১৯৬৫-৬৬ সালের আহার্য ও নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি ওদের জীবনধারণকে এক কঠিন সংকটের মুখে নিয়ে এলো। ভবী ঘরে বসে কাগজের ঠোঙা এবং বিড়ি তৈরী করে স্বামীকে সাহায্য করতে লাগলো। তবু বুঝি আর শেষ রক্ষা হয় না। দেশব্যাপী তখন চতুর্থ সাধারণ নির্বা-চনের তোড়জোড় চলছে। আরো পাঁচটি সর্বহারা মানুষের মতো ওরাও স্বপ্ন দেখে হয়তো শাসকদলের পরাজয় ঘটবে—দেশের সংকটের অবসান হবে। মানুষের জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হবার সংগে সংগে তাই যখন খাদ্যবস্তু বিশেষ করে চালের দাম আকাশ থেকে মাটিতে নেমে এলো তখন ওরা উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে ক'দিন? কার যেন অদৃশ্য অঙ্গুলি নির্দেশে ওদের উৎফুল্লতা সুদে আসলে ফিরিয়ে দেবার সময় এসে দাঁড়ালো। ১৯৬৭ সালের এপ্রিল নাগাদ চাল-ডাল এবং নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যের দাম আকাশ ফুঁড়ে ওপরে উঠতে লাগলো। অভাবের বেদনা দুটিমাত্র প্রাণীর সংসারেও কত দুঃসহ হতে পারে সেটা বোঝা গেলো একদিন যখন [illegible] পাওয়া গেলো না। একদিন দুদিন কেটে গেলো—ও ফেরে না। [illegible] ওঠে ভবী। নিজেই একদিন [illegible] পড়ে খুঁজে আনবার জন্য [illegible] অবস্থায়। [illegible]

কয়েকদিন পরে ও ফিরে [illegible]। কিন্তু জীবন সম্পর্কে এক [illegible] দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। খাদ্যা[illegible] অর্থনৈতিক সংকট একটি [illegible] নাগরিককে কিভাবে অধঃপতিত ও নীতিজ্ঞানশূন্য করে তুলতে [illegible] ও তার একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। চালের কারবা চোরাই চালানের ব্যবসায়ে ও নেমে পড়লো। নেমে পড়তে বাধ্য হলো। যে দোকানে ও কাজ করতো চিঁড়ে মুড়ি-চিনির দুষ্প্রাপ্যতার জন্য সে দোকান প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। কাজেই মালিকের আর কর্মচারী রাখবার প্রয়োজন কোথায়? তাই তো ওকে জীবনদেবতার অভিশাপেই এই চোরাকারবারীর জীবন বেছে নিতে হলো। অথচ এ ও চায় নি। সন্তানসম্ভবা ভবীকে ও যেদিন হাস-পাতালে নিয়ে গেছে সেদিন দুটি টাকাও ওর হাতে ছিল না। আমারই সামনে ভবী সেদিন এসে দাঁড়িয়েছিল তারপর বহুদিন সময়ে-অসময়ে ওদেরকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে হয়েছে। আর বিদায় নেবার আগে ওই ঘটি-বাটি বিক্রি করা টাকা দিয়ে অতর্কিতে এসে সব দেনা মিটিয়ে দিয়ে গেল। একটা কথাও আমি বলতে পারি নি। শুধু অবাক-বিস্ময়ে ভেবেছি এরাও মানুষ—এঁরাও বেঁচে

[illegible] এদের জীবনে প্রেম আছে—এরাও [illegible]—জনগণ [illegible] রক্ত দিয়েও সে জনজনকে গঠন করে তুলতে চায়। আলোকে আলো—পাপকে পাপ বলে এরাও জানে—তবু কখনো পাপ-পুণ্য, সাদা-কালো, ন্যায়-অন্যায়ের ব্যবধান এদের চোখের উপর ঘুচে যায়। তখন মানুষ ওদের ঘৃণা করে—ওরা করে সমাজকে আর সমাজের ভাগ্যবিধাতা-দেরকে।

প্রথম প্রথম র‍্যাকের কারবার বেশ সুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু কথায় বলে 'চোরের দশদিন, গেরস্তর একদিন।' বিশেষ করে তখন রাজ্যের নতুন সরকার নতুন খাদ্য-নীতির চোরাবালিতে পথ হাতড়ে ফিরছে। পুলিশ এবং এন ভি এফ বাহিনীর হাতে বার বার ছিনতাই-এর ফলে ওর ধার-করা সামান্য পুঁজির কার-বার শেষ পর্যন্ত নষ্ট হয়ে গেল। বাজারে তখন চালের দাম প্রতি কিলো সাড়ে চার টাকা। এ অবস্থায় অর্ধাহার অনাহারই হলো ওদের নিত্যদিনের পাথেয়। বৌ-এর চোখে জল পড়ে। বোনের ছেলেটি অপুষ্টিজনিত রোগে ভোগে। তবু ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দুইবেলা ডাক্তারের কাছে ছুটতে হয়। ও শুধু নিঃসীম আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজের জীবনের যোগ-বিয়োগের অংক মেলায়। কাস্তে নিয়ে ক্ষেতে মাঠে ওকে দেখেছি—দেখেছি ভাগচাষীর সংগে ক্ষেতখামারের কাজ করতে। কিন্তু সে নিতান্তই সাময়িক। ও কাজ চাইলেও—কাজ যেন ওকে চায় না! কত-দিন আমাকে বলেছে, দাদা, একটা ছোট-খাটো কাজ যে-করেই হোক জোগাড় করে দিন, নাহলে ছেলে-বউ নিয়ে মরতে হবে।' কিন্তু আমি পারি নি। পারি নি এই স্বাধীন দেশে দুটো খেয়ে পরে বেঁচে থাকবার পথ দেখিয়ে দিতে। একদিন রাত্রে হঠাৎ আমার ঘরে এসে উপস্থিত – 'দাদা, শুনেছেন?' আমি মুখ তুলতেই বললো, 'তবে যে খবরের কাগজে লেখে না খেয়ে কেউ মরছে না—কাউকে মরতে দেওয়া হবে না?' তাহলে?' আমি তখনও ওর কথা ঠিক বুঝতে পারি নি। জিজ্ঞেস করলাম—'কি ব্যাপার—কি হয়েছে?'

'জানেন না, ডাক্তারবাবু মরে গেছেন?'

'কোন্ ডাক্তারবাবু?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'ডাঃ বিশ্বাস। ছোট ছেলেটিকেও সাথে নিয়ে গেছেন। মেয়ে দুটিকে কেমন-[illegible] বাঁচানো গেছে।'

ওর কথা শুনে আমি শুধু বিস্মিতই হই নি—মর্মাহত হয়েছিলাম এই ভেবে [illegible] যারা অতঃপর বেঁচে রইলো তাদের কি হবে? ডাঃ [illegible] আমি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাড়নায় এতকালের practice-এর কেন্দ্র ছেড়ে ঘরবাড়ি বিক্রি করে কয়েকমাইল অভ্যন্তরে গ্রামের মধ্যে আত্মগোপন করে-ছিলেন ছেলেমেয়ে নিয়ে। সেদিন যখন অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পেলাম তখন স্বভাবতই এ ব্যাপারে একটু তথ্য সংগ্রহ করতে ইচ্ছে হলো। তাই যোগাযোগ করেছিলাম স্থানীয় ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসের কর্মী সঞ্জয় চক্রবর্তীর সংগে তিনি ডাক্তারবাবুর খুব কাছের লোক ছিলেন। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে বলা হয়েছে খাদ্যে বিষক্রিয়ার ফলেই ওদের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু বিষ এলো কোত্থেকে? অনেকের ধারণা—জীবন-যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভের জন্য ডাক্তার নিজেই এ বিষ মিশ্রিত করেছিলেন খাদ্যে। মুক্তি হয়ত তিনি পেয়েছেন—ছোট ছেলে-টিকেও দিয়েছেন কিন্তু বিধবা স্ত্রী আর অরক্ষণীয়া মেয়ে দুটির জীবন-যন্ত্রণা দ্বিগুণ হয়ে রইলো। শ্রীচক্রবর্তীর রিপোর্টে দেখেছি : "...ডাক্তার হলেও নিজেই ছিলেন গ্যাস্ট্রিক আলসারের রোগী। অন্যের চিকিৎসা করতেন কিন্তু পয়সার অভাবে নিজের সুচিকিৎসা কোনকালেই হতো না। গ্রাম্য হোমিওপ্যাথ—লবণ আনতে পান্তা ফুরোয়। বিষয়-সম্পত্তি বলতে শুধু একফোঁটা ভদ্রাসন। ৩।৪টি ছেলেমেয়ে নিয়ে বেশ বড় সংসার। চালের দাম হু-হু করে বেড়ে চলাতে ভদ্রলোক বেসামাল। অবশেষে সরকারী খয়রাতী সাহায্য নিয়েও বাঁচার আশা না দেখে ভদ্রাসনটি বেচে দিলেন। বাঁচার জন্যে নতুন জায়গা নির্বাচন করে মাইল কয়েক দূরে গ্রামে বাসা বাঁধলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য পিছু ছাড়লো না। অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে জীবনদেবতা যখন পরিত্রাহি ডাকছে তখন একদিন .... ' একমাত্র শ্রীমতী বিশ্বাস বাদে পরিবারের সবাই নীত হলেন মহকুমা হাসপাতালে। অবিবাহিতা মেয়ে দুটি পরদিন জীবন্মৃত অবস্থায় ছাড়া পেলে চলে এলো অকূল সাগরে ভাসতে—ফিরলেন না শুধু ডাক্তার আর তার হতভাগা ছেলেটি।"

এ তো শুধু একটিমাত্র ঘটনা দুচোখ খুলে রাখলে গ্রামবাংলায় এমন ঘটনা অনেক দেখা যায়। তাই 'কাগজে যে বলে না খেয়ে কেউ মরছে না তবে?'—ওর এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারি নি। শুধু বলেছিলাম—'ওদের সব কথা সত্যি নয়।' কেন না গ্রামে গ্রামে জীবন্মৃত মানবাত্মার করুণ ক্রন্দন আমি শুনেছি। যারা অনা-হারে অর্ধাহারে অখাদ্যের উপর জীবন-ধারণ করে আছে—তারাও মরছে—মরবে। সে মৃত্যু অনাহারের মৃত্যু—অপুষ্টিজনিত ব্যাধির হাতে মৃত্যু। কোন আবরণেই এ মৃত্যুর প্রকৃতরূপকে ঢেকে রাখা যায় না। [illegible] এ-কথা যারা [illegible] [illegible] নিজেদের বিবেকবুদ্ধির সংগেই মিথ্যাচার করে। প্রভুত্ব আর আধিপত্য বিস্তারের রাজনীতি যারা করে এই মিথ্যাচারই তাদের হাতিয়ার। সেই আদর্শ আর দলবদলের রাজনীতিকদের কাছে জনতার স্বার্থ উপেক্ষিতই থাকে। তাদের রাজনীতি মেহনতী মানুষের জীবনবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তাই রাজ্যের নবগঠিত জনপ্রিয় সরকারের পতন ঘটেছে। বিশ বছরের মনোপলি বিজনেসের অবসানের সংগে সংগে সেই বিজনেসম্যানদের দিনের শান্তি—রাত্রির নিদ্রা টুটে গেছিলো। এবং রাজ্যের রাজনীতি অতঃপর একটি নাটকীয় কাহিনীর প্রাপ্ত হয়ে উঠলো। শুধু ফ্রন্ট সরকারেরই পতন হলো না—পি ডি এফ, কংগ্রেস-পি ডি এফ কোয়ালি-শন—'একে একে নিভিল দেউটি।' সামরিক অভ্যুত্থানের সময় যাঁরা পাকিস্তানে ছিলেন তাদের মনে করিয়ে দেবে পাকিস্তানের তৎকালীন শাসনব্যবস্থা এবং ক্ষমতালাভের কথা। এখন সব্যসাচী ধর্মবীর শৃংখলা স্থাপন এবং জঞ্জাল অপসারণ—দুইহাতে দুই মহা-দায়িত্বভারে ন্যুব্জ এবং ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন। 'এত্ত জঞ্জাল' তা ত শপথ গ্রহণের আগে কেউ বলে নি!

কিন্তু যে অকথিত কাহিনী বলতে বসেছিলাম তা শেষ করি। ডাঃ নগেন বিশ্বাস মুক্তিলাভ করলেন মর্ত থেকে বিদায় নিয়ে। কিন্তু ওদের সে শক্তি ও সাহস নেই। বাঁচবার চেয়ে আজ বাঁচাবার প্রশ্নটিই বড় হয়ে উঠেছে। তাই অসময়ের ঐ শিশুকে বুকে করে ফিরে যেতে হলো সেই বিশ বছর আগে পরিত্যক্ত পূর্ব-বাংলার এক অখ্যাত গ্রামে। সেই মোকাম মোল্লা, বুদো মোল্লা হয়ত আজ নেই—কিন্তু তাঁদের সন্তানসন্ততিত আছে। তারা কি বুঝবে না—মাটির প্রেমকে অস্বীকার করতে চাইলেই করা যায় না? রক্তের সম্পর্ক তাদের সংগে হয়ত নেই—কিন্তু মাটির সম্পর্ক যে রক্তের সম্পর্ক থেকেও গভীর হতে পারে এ-কথা ত মিথ্যে নয়! তবু আজও তার [illegible] অহংকার চোখের জল [illegible] সেখানে গিয়েই দাঁড়াবে—বলে—"ভাই, [illegible] এসেছি।'

[illegible]—একটি তীব্র [illegible] ব্যঙ্গ করে গেলো ওরা স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাদের। ব্যঙ্গ করলো দণ্ডকারণ্য প্রকল্পকে—যা এক লক্ষ উদ্বাস্তু পরিবারের বসতিস্থাপনের প্রতি-শ্রুতি নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলো। ব্যঙ্গ করলো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলন-উচ্চকণ্ঠ ভগীরথ-গোষ্ঠীকে। ব্যঙ্গ করলো সেই বিখ্যাত উক্তিকে—"স্বাধীন ভারতে নবাগতদের [illegible] প্রাসাদ ও দরিদ্র শ্রমিকের জীর্ণ কুটির—এই দুই [illegible] [illegible] একদিনও [illegible] পারবে না।"

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ভারতবন্ধু গেরাসিম লেবেডেভ

মস্কো : হোটেল মিনস—গর্কী স্ট্রীট—পয়লা মার্চ, উরা বেজমেনেভ আমাকে এসে জানালেন যে, সেদিন সকাল দশটা নাগাদ আমাকে নভোস্তি প্রেস এজেন্সির অফিসে যেতে হবে ওঁদের এশিয়ান সেকশনের অফিসারদের সঙ্গে আলাপ করতে—ওঁরাই আবার আমাকে লাঞ্চ খাওয়াবেন। এই নভোস্তি প্রেসের আমন্ত্রণেই আমি রাশিয়া পরিক্রমায় এসেছিলাম।

ওঁদের তরফ থেকে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন মিস্টার কুজনেটসভ, ইনি রাশিয়ান কাণ্ট্রিজ ডিপার্টমেণ্টের ডেপুটি চীফ—আর ছিলেন মিস্টার মাখোটিন এবং মিস্টার গেভোর্ভকিয়ান—দুজনেই প্রেস এজেন্সির ভারতীয় বিভাগের অফিসার—তবে শুনলাম মিস্টার মাখোটিন বোধহয় অন্য বিভাগে বদলী হয়েছেন। মাখোটিন কলকাতায় বেশ কয়েক বছর উড স্ট্রীটে কালচারেল সেকশনের প্রধান হিসাবে কাজ করে গেছেন। তবে তখন আমার তাঁর সঙ্গে আলাপ ছিল না।

বসুমতী সাপ্তাহিক এবং দৈনিক কাগজ এঁরা বেশ প্রীতির চোখেই দেখেন। রাশিয়া সম্বন্ধে আমাদের ঐ কাগজে যে সব লেখা হয় তার অনুবাদ ওঁরা পান ওঁদের কলকাতা অফিস থেকে। এঁদের কাছে শুনলাম যে, বসুমতীর রাজনীতি দৃষ্টিভঙ্গি এঁরা বিশেষভাবে পছন্দ করেন এই জন্য যে আমাদের কাগজের মতামত এবং বিশ্লেষণ হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষ এবং পক্ষপাতশূন্য এবং বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বসুমতী কখনও সত্যের অপলাপ সাধন করবার চেষ্টা করে না।

রাশিয়া সম্বন্ধে কোনো কিছু লেখবার ব্যাপারে এঁদের কোনো রকমের সাহায্য দরকার হলে আমাকে জানাতে অনুরোধ করলেন মিস্টার মাখোটিন। আমি বললাম—আপাতত একটি বিষয়ে আমি সাহায্য চাই। সেটি হচ্ছে—ভারতবর্ষ থেকে ফেরবার পর গেরাসিম লেবেডেভ রাশিয়াতে কিভাবে বাকী জীবন কাটিয়েছেন তার বিস্তৃত বিবরণ। কারণ লেবেডেভের ভারতে অবস্থানকালীন জীবনী সম্বন্ধে বহু বাস্তব এবং অবাস্তব কাহিনী এবং নাটক নভেল প্রকাশিত হয়েছে বটে; কিন্তু তাঁর পরবর্তী জীবন সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি না।

নভোস্তির লোকেরা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে আমার আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ে মালমশলা সংগ্রহ করে তাঁরা পরে আমাকে পাঠিয়ে দেবেন।

এর পর আমাকে লাঞ্চ খাবার জন্য একটি চাইনিজ রেস্তোরাঁতে নিয়ে গেলেন। অবশ্য রেস্তোরাঁতে কোনো চাইনিজ দেখলাম না—খাবার তৈরি, খাবার দেওয়া সবই রাশিয়ানরাই করছেন—রাশিয়ার সঙ্গে মনোমালিন্যের সূত্রপাতেই চাইনিজরা মস্কো ত্যাগ করে চলে গেছে। মাখোটিন কলকাতায় প্রায় সব চাইনিজ রেস্তোরাঁর সঙ্গে অল্প-বিস্তর পরিচিত ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কলকাতার চাইনিজ রেস্তোরাঁর তুলনায় এটি কেমন লাগছে? উত্তরে বললাম—এরকম গবজ্জার্স চাইনিজ রেস্তোরাঁ কলকাতায় নেই।

তিনি হেসে বললেন—কিন্তু কলকাতার মত ভাল চাইনিজ ফুড এরা তৈরি করতে পারে না। খাবার সময়ে বুঝলাম তাঁর কথাটা কতো সত্যি। এর কারণও আছে—রাশিয়ার চাইনিজ রেস্তোরাঁতে এখন আর চাইনিজ কুক নেই—আমাদের দেশে এখনও তাই আছে।

যাই হোক গল্পগুজবে এবং হাসিঠাট্টায় সেদিনটা নভোস্তির লোকেদের সঙ্গে বেশ ভালই কেটেছিল। সেদিন রাত্রের প্লেনেই (ওঁদের মতে পরদিন সকালে) আমি দিল্লী রওনা হই।

দিন দুয়েক আগে নভোস্তি প্রেস প্রেরিত লেবেডেভের রাশিয়া প্রত্যাবর্তনের পরের দিনগুলোর কাহিনী আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। "দি লাস্ট ফিউ ইয়ার্স অভ গেরাসিম লেবেডেভ" এই শীর্ষকে কাহিনীটি ইংরাজিতে লিখে পাঠিয়েছেন তিনি ম্যাগ্রাম। কাহিনীর অনুবাদ করে এখানে তুলে দিচ্ছি :

সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং ভারতবর্ষে গেরাসিম লেবেডেভ নামটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাশালী এবং বহুগুণসম্পন্ন—একাধারে সংগীতজ্ঞ, শিল্পী এবং বৈজ্ঞানিক। জীবনের বারো বছর তিনি ভারতে কাটান—লেবেডেভ ভারতবর্ষকে দ্বিতীয় মাতৃভূমি জ্ঞান করতেন। কলকাতায় তিনিই প্রথম নতুন ধরণের বাংলা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। রাশিয়াতে ফিরে আসবার পর ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ভারতীয় ভাষাগুলিকে জনপ্রিয় করবার জন্য তিনি আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেন। যে সময়টা অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই বিখ্যাত গবেষক ভারতে কাটিয়েছিলেন—সেই সময়ের পূর্ণ বিবরণী এবং লেবেডেভের কার্যধারার বিশদ ইতিহাস সোভিয়েট এবং ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসগুলিতে ভালভাবেই বর্ণিত আছে। কিন্তু রাশিয়াতে প্রত্যাবর্তনের পর লেবেডেভের জীবনের বাকি ইতিহাস যথাযথভাবে পাওয়া যায় না—যা আছে তা ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবেই রয়েছে।

১৭৯৭ সালের নভেম্বর মাসে লেবেডেভ ভারত ত্যাগ করেন—আর কখনও ওদেশে ফিরে যান নি। তিনি ছিলেন বৃটিশ জাহাজ লর্ড টাবলোর যাত্রী—এ জাহাজের ক্যাপ্টেনের নাম ছিল ডব্লিউ টমসন। ১৭৯৮ সালে জাহাজটি এসে গ্রেট বৃটেনের সমুদ্রকূলে লাগে।

এর কিছুদিন পর—কারণ ঐ সময় একদেশ থেকে অন্য দেশে খবর পৌঁছতে বেশ কিছুটা সময় লাগতো—রাশিয়াতে সংবাদ এলো যে একজন রাশিয়ান লণ্ডন শহরে এসে বসবাস করছে।

সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে যে, ১৭৯৯ সালের 'MOSKOVOSKYE VEDOMOSTI-র (মস্কো গেজেট) একটি সংখ্যায় একটি ছোট্ট খবর প্রকাশিত হয়েছিল এইভাবে—"A Russian musician, just back from India, is going to publish a collection of Hindusthani and Bengali arias in London. (আরিয়া শব্দটির অর্থ হচ্ছে a lengthy and developed vocal piece.) As he is considered to be well versed in both these languages and music, he is expected to be the first to popularize Oriental music, which is still little known in this country."

উপরোক্ত সংবাদে বর্ণিত রাশিয়ান সংগীতজ্ঞ ভদ্রলোকটির নিশ্চয়ই গেরাসিম লেবেডেভ। [illegible]

গেরাসিম লেবেডেভ এসব [illegible] ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন কি না। তবে ১৮০১ সালে তাঁর 'গ্র্যামার অভ ক্যালকাটা ডায়লেক্ট অভ স্পোকন হিন্দুস্থানী'—লণ্ডনে প্রকাশিত হয়েছিল।

ঐ বছরেই লেবেডেভ লণ্ডনে ফিরে আসেন। সঙ্গে করে এনেছিলেন ভারতীয় নানা ভাষা এবং ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ে নিজের গবেষণার বহু পাণ্ডুলিপি। সে সব পাণ্ডুলিপির সব কয়েকটি অবশ্য রক্ষিত হয় নি—তা সত্ত্বেও তিনি যে যে বিষয়ে গবেষণামূলক কাজ করছিলেন তার স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় সে সময়ের অন্যান্য লোকের তাঁর সম্পর্কে সমালোচনামূলক রচনা থেকে এবং লেবেডেভের নানা চিঠিপত্রাদি থেকে।

V. MAGRAM লিখেছেন: **Among his works are a Manual of Bengalese writing, dictionaries and grammar of the Bengali and Hindusthani languages, conversation books, notes on customs and way of life of the inhabitants of East India, a manuscript on the rudiments of Indian Mathematics.”**

গেরাসিম সঙ্গে করে এনেছিলেন অনেক ভারতীয় পাণ্ডুলিপি। এইগুলোই বোধহয় রাশিয়ার ভারতীয় প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহশালার প্রথম সংগৃহীত পুঁথি। সংস্কৃত অভিধান অমরকোষ, সংস্কৃতে রচিত হিতোপদেশের গল্প এবং আরও অন্যান্য গ্রন্থ এই সংগ্রহের ভিতরে ছিল। রাশিয়াতে ফেরবার পরও গেরাসিম তাঁর গবেষণার কাজ চালাতে চেয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল রাশিয়ান জনসাধারণের কাছে ভারতবর্ষ এবং ভারতীয় সভ্যতার পরিচিতি দেওয়া এবং ভারতের বিভিন্ন ভাষাকে জানবার জন্য রাশিয়ানদের আগ্রহান্বিত ও কৌতূহলী করে তোলা। সহজেই বোঝা যায় কি ধরণের শক্ত কাজে তিনি হাত দিয়েছিলেন—কারণ সেই সময় গ্রেট ব্রিটেনের মত রাশিয়ার ভারতের সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। যেটুকু ব্যবসার সম্পর্ক ছিল তাও করা হোত বৃটিশ বণিকদের সাহায্যে এবং বৃটিশ জাহাজের মাধ্যমে। তখন রাশিয়াতে এমন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল না যেখানে ওরিয়েণ্টাল ল্যাঙ্গুয়েজেস শেখা যায়। এ বিষয়ে লেবেডেভই হলেন অগ্রণী—এই কঠিন কাজ আরম্ভ করতে গিয়ে তিনি এতটুকু ভয় পান নি। রাশিয়াতে ফেরবার সঙ্গে সঙ্গেই লেবেডেভ তাঁর পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার জন্য উঠেপড়ে লাগলেন। তিনি প্রথমেই একটি প্রিণ্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠা [illegible] ভারতীয় টাইপ তৈরি করে ভারতীয় ভাষায় বই ছাপা হোত। শুধু রাশিয়াতে কেন, ইওরোপেও এইটিই প্রথম মুদ্রাযন্ত্র যেটি থেকে ভারতীয় ভাষায় প্রিণ্ট করা হোত। ১৮০৫ সালে এই ছাপাখানা থেকে লেবেডেভের একটি বই বেরোল—On the Indians religious beliefs, customs and traditions. এতে বাংলা হরফে ভারতীয় কোটেশন উদ্ধৃত হয়েছিল। একশো ষাট বছরেরও আগে লেবেডেভের ঐ বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং সে সময়ে বর্ণিত অনেক তথ্য এবং খবরাখবর আজকের দিনে বেখাপ্পা মনে হতে পারে। তবুও ভারতবর্ষের লোকেদের জীবনের প্রত্যক্ষদর্শীর (এবং প্রথম রাশিয়ান পর্যবেক্ষক) বিবরণী হিসাবে এটি একটি অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ।

রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তনের পর গেরাসিম লেবেডেভ ফরিন মিনিস্ট্রিতে অনুবাদকের কাজে নিযুক্ত হন। এ কাজে অর্থাগম ভালই হোত, তবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে সময়ের অভাব হতে লাগল। বোধহয় এই কারণেই তাঁর অনেক লেখা প্রকাশিত হতে পারে নি—যদিও অনেক রচনা তিনি ছাপার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লেবেডেভ একটি তুলনামূলক অভিধান—বাংলা, হিন্দুস্থানী, রাশিয়ান এবং ইংরাজী ভাষার আপেক্ষিক সম্পর্ক বিষয়ক, রচনায় রত ছিলেন।

শেষ পর্যন্ত লেবেডেভ মনে মনে আশা পোষণ করতেন যে তাঁর লেখা বইগুলো ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হবে। জীবনে এই ছিল তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—এ কথা জানা যায় তাঁর চিঠিপত্র এবং নানা লোকের কাছে আবেদন সম্বলিত লেখা থেকে। কিন্তু সে আশা তাঁর চরিতার্থ হয় নি। গুরুতর পীড়ায় ১৮১৭ সালের ১৫ই জুলাই গেরাসিম লেবেডেভ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। The gravestone bears an epitaph—a short poem praising his services on being the first of Russians sons to describe the Indians' life and customs, to familiarize Russians with the Indian languages. That tombstone is still on his grave to this day.

আজ সোভিয়েট রাশিয়াতে ইণ্ডলজি বিষয়ে প্রচুর গবেষণার কাজ হচ্ছে এ কথা সর্বজনবিদিত—কিন্তু এক সময়ে যখন রুশ দেশে ভারতবর্ষ এবং ভারতীয়দের সম্পর্কে কোন ধারণা বা জ্ঞান ছিল না, তখন গেরাসিম লেবেডেভই ভারতীয় ঐতিহ্য এবং ভারতীয় জীবনাদর্শকে অন্তর থেকে গ্রহণ করে, দেশে ফিরে প্রথম ইণ্ডলজির ক্ষেত্রে কাজ শুরু করেন। বীজরূপে একদিন তিনি যা বপন করেছিলেন, আজ তাই মহীরুহের আকার নিয়েছে।

ক্রমশঃ

আকাশবাণী পরিক্রমা

মেঘদূত

২০শে আগস্ট রাত ৯-৩০ মিঃ (বেতার জগৎ-এ উল্লিখিত হয়েছে ১০-৩০ মিঃ!) লোকগীতিব অনুষ্ঠানে শ্রীবন্ধুদেব রায় ও সহশিল্পিবৃন্দ বাঙলাদেশের আঞ্চলিক উৎসবগীতি পরিবেশন করলেন। চৈত্রসংক্রান্তি, ভাসানগান, ভাদু, নবান্ন, মাঘমণ্ডলব্রত, গাজন—ঋতু-উৎসবগুলিকে লোকগীতিতে তুলে ধরলেন শ্রোতাদের কাছে। ব্রত পার্বণের গানগুলি অনাস্বাদিত মোহজাল সৃষ্টি করে মনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। গানগুলিতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য কতটুকু বজায় ছিল অ আমার পক্ষে বলা শক্ত। কারণ দুই বাঙলার আঞ্চলিক লোকগীতিব সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ পরিচয় নেই। তবে গানে কয়েকটি জেলার উপভাষা যে বেশ বঞ্চিত হয়েছিল সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহ।

লোকগীতির একটি নিজস্ব জাত আছে বৈশিষ্ট্য আছে। এ গানের আপনার একটি বক্তব্য ও উদ্দেশ্য থাকে; বৈশিষ্ট্যটি ঠিকমতো প্রকাশ না পেলে লোকগীতিব সুরে কাটা পড়ে। লোকগীতি মুখে মুখে চলার গান এবং গানেব ভাষায় পবিবর্তনও স্বীকৃত। ধর্মসংগীতকে লোকপর্যায় আনা চলে না ধর্মীয় গানের প্রায় সবই কেতাবী হয়ে গেছে। গার্হস্থ্য জীবন, উৎসব প্রেম, বিবাহ প্রভৃতি হলো লোক-গীতির পুঁজিপাটা। বিবাহাদি ব্যাপারে ধর্মীয় আচার থাকা সত্ত্বেও এটি লোক-গীতির আওতায় এসেছে। বিবাহের গানে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য থাকায় এবং কালে কালে পবিবর্তন ঘটায় লোকগীতিব শ্রেণী-ভুক্ত হয়েছে।

আকাশবাণীব লোকগীতিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়: বিশুদ্ধ এবং অবিশুদ্ধ। অবিশুদ্ধ গানে লোকগীতির বৈশিষ্ট্য থাকে না। তাব বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আধুনিক সুর তৎসহ কিছু ঝাঁকানি, আঞ্চলিক শব্দ ও তাব বিকৃত উচ্চারণ যা, যে কোন বুদ্ধিমান লোকের কাছে ধরা পড়তে দেরি হয় না। আকাশবাণী পরি-বেশিত লোকগীতি ঝিমচ্ছে তার আফিং ছাড়াতে শহুরে কায়দায় মদ ধরিয়ে কোন লাভ হবে না।

দেশী সংগীত বাঙালি সংস্কৃতির নিজস্ব সম্পদ। এ সব গান ওস্তাদী বর্জিত, কথার প্রাধান্য ভাবকে ফুটিয়ে তোলে। [illegible] কথায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'প্রথম চালটা সর্বাঙ্গসুন্দর নয়, তার অনেক ভঙ্গি হাস্যকর এবং কুশ্রী। কিন্তু সব চেয়ে আশার কথা—সে চলতে শুরু করেছে, সে বাঁধন মানছে না।' এখানেই দেশী গানের কৃতিত্ব।

*

২৫শে আগস্ট শ্রীবনানী ঘোষের কণ্ঠে সুরে কথা বলা রবীন্দ্রসংগীত শোনা গেল। একজন নামী শিল্পীর সংগীতের মান এত নেমে যাওয়ায় বেদনাবোধ হলো। প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা যখন দায়ঠেলা মেজাজে গেয়ে যান তখন তাঁরা বেমালুম ভুলে যান, শ্রোতাদের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি দেখানোর প্রয়োজন রয়েছে। গান গাওয়া শেষ কথা নয় গেয়ে পুলক সৃষ্টি করা হবে শিল্পীর লক্ষ্য। শিল্পীর দুটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চাইলে বোঁ বোঁ শব্দে মাথার উপর লাঠি ঘুরিয়ে দেবেন। এঁদের হয়তো ধারণা 'আমরা ভুল গাইতে পারি না। আমাদের একটি গানও রসশূন্য হতে পারে না। তোমার কান তৈরি নয়। দয়া করে কান দুটি উপড়ে ফেল।' শিল্পী এমনি খাড়া মনোভাব নিয়ে চললে বিপদ ঘটে সমালোচকের। তাকে অপ্রিয় হতে হয়। তবে মেঘদূতের একটা সুবিধে আছে—সংগীতশাস্ত্রে সে গুণীও নয় জ্ঞানীও নয় এমন কি একটা গানের স্কুলের মালিক পর্যন্ত নয়। অই ভয়-ডরের কোন বালাই নেই। মনের কথা বলে ফেলতে একটুকু বাধে না। বাধে না বলেই এই পরিক্রমায় আরও একজন শিল্পীর সংগীত পরিবেশন সম্পর্কে দু-একটি কথা বলতে চাই। ইনি হলেন সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীচিন্ময় চট্টোপাধ্যায়। ২৮শে জুলাই এঁর পরিবেশিত গানগুলি মেটে সিঁদুরের মতো ম্লান বোধ হয়েছিল। বেতারে গাইবার পূর্বে অনুশীলনের অভাব শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের গানে প্রকট হয়ে ওঠে। তিনি গাইলেন, 'আমার যে দিন ভেসে গেছে চোখের জলে।' এই গানে উচ্চারণের ব্যাপারে সময়ের মাত্রাজ্ঞানের অভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল। থেকে থেকে এত ভাবালুতা প্রকাশ পাচ্ছিল যা বিরক্তিকর বলা যায়। নাটকীয় ভঙ্গির পরিবর্তে সংযম দেখানো কৃতিত্বের মাপকাঠি এবং তাতেই শিল্পীর গৌরব বাড়বে। শ্রীচট্টো-পাধ্যায় এবং তাঁর মতো আরও অনেকে সন্দেশে চিনি মিশিয়ে শ্রোতাদের খাওয়াতে চান। [illegible] প্যানপ্যানানি মতো না [illegible] বিরুদ্ধ। শ্রোতারা গান শোনার আশায় বসে থাকেন অথচ শিল্পী যদি শ্রোতাদের আশায় জল ঢেলে দেন তবে শিল্পীর লোকপ্রিয়তা মেটে সিঁদুরের মতোই কি নিষ্প্রভ হয়ে যাবে না!

বর্তমানের গায়ক-গায়িকাদের মধ্যে যথার্থ শিল্পীর সংখ্যা কমে আসছে। সত্যিকার শিল্পীদের অনেককে সংগীত চর্চার চেয়ে দলীয় পলিটিক্সে বেশি সময় দিতে হচ্ছে। বেতারের জনকয় নবীন শিল্পী সম্পর্কে আমরা আশান্বিত। তবে নামের কাঙালি হলে, গাছে ওঠার আগেই এক কাঁদি চাই মনে করে যদি পলিটিক্সে নেমে পড়েন তবে পড়ে যেতে কষ্ট পেতে হবে না। সদ্ভাব সঙ্গে সাধনা চললে নবীনদের কেউ কেউ প্রবীণদের ছাঁটাই করবেন শীগগির। সাধনালব্ধ গান শুনিয়ে এঁরা আনন্দ দিতে পেরেছেন। বোঝাতে চেষ্টা করছেন সংগীত বাহিরের নয় অন্তরের ধ্যানের প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সংগীতে তো আমরা তেমন করিয়া বাহিরের দিক দিয়া দেখিতে চাই না। প্রেমিক ঠিক কি রকম করিয়া অনুভব করিতেছে তাহা তো আমার জানিবার বিষয় নহে। সেই অনুভূতির অন্তরে অন্তরে যে সংগীতটি বাজিতেছে তাহাই আমরা গানে জানিতে চাই।' গানে জানাবেন কে? শিল্পে যিনি সংযম আয়ত্ত করেছেন।

শিল্পীরা (প্রভাবশালী যাঁরা) ভুল গাইলে আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষের করণীয় কিছু নেই। তবে যে সব শিল্পী আধুনিক গেয়ে থাকেন, গলা স্টাইল সবই আধুনিক মার্কা তাঁদের রবীন্দ্রসংগীতের প্রোগ্রাম দেওয়া তো বন্ধ করতে পারেন। সেটুকু ক্ষমতা আশা করি সংগীত বিভাগের কর্তৃ-পক্ষের হাতে আছে।

*

২৪শে আগস্ট রবীন্দ্রসংগীতের আসরে শ্রীকৃষ্ণা গুহঠাকুরতার গান রীতির দিক দিয়ে বলার কিছু থাকলেও গলাটি বড়ো মিষ্টি। এবং ২৯শে আগস্ট শ্রীমেখলা পালের গান রীতিমতো ভালো। যাঁদের সম্ভাবনা রয়েছে এঁরা তাঁদের অন্যতম।

*

২৮শে আগস্ট শ্রীঅনুপকুমার ঘোষের কণ্ঠে অতুলপ্রসাদের গান প্রশংসনীয়। অতুলপ্রসাদী সুরে [illegible] এই শিল্পীর [illegible] শ্রী[illegible] [illegible]

রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস

আন্দোলনের পরে

শহরের যে কয়টি সিনেমার সামনে সংরক্ষণ সমিতির পোস্টার ঝুলেছিল সেগুলি উঠে গেছে। শো-কেসে পুরনো ছবির স্টিল আর দেওয়ালে পোস্টার লাগানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এভাবে পুরনো ছবি দিয়ে হাউসগুলিতে বাতি জ্বালানো হচ্ছে। প্রায় পাঁচ মাস যে সব সিনেমার লোক ছবি দেখতে পায় নি, এমন কি মুখ ফিরিয়ে দেখেও নি এখন আস্তে আস্তে টিকেট ঘরের সামনে দাঁড়াচ্ছে। কোন কোন হাউসে 'হাউস ফুল' ঝোলানো দেখা যাচ্ছে। তা পুরনো হলেও বাংলা ছবি ত'! বাংলা ছবি দেখার একটা আলাদা নেশা আছে। বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে। হিন্দী ছবিতে কড়া রস আছে বটে কিন্তু মনে দাগ কাটে না, যতক্ষণ দেখে ততক্ষণ ভাল, হাউস থেকে বেরিয়ে এলে সব ফুৎকার। আজকাল কলেজের মেয়েরাও ম্যাটিনীতে হিন্দী ছবি দেখে, তা অনেকটা এ্যাডভেঞ্চার করার মত লুকিয়ে-চুরিয়ে, বাড়ির লোককে না জানিয়ে। কেউ কেউ অতি আধুনিকা বন্ধু জুটিয়ে দেখে, আর যে স্টাইল ফিল্মি পোষাক, চুলের বাহার, অনুকরণ করা যায় কি না ভাবে। দিবাস্বপ্ন দেখে। সে যা হোক, বাংলা ছবি না দেখলে কিন্তু এদেরও মন ভরে না। বাংলা-দেশের স্নিগ্ধ শান্তভাবের মত বাংলা ছবির মেজাজ, একারণেই বাংলা ছবি সাধারণ বাঙালীর ভাল লাগে। তাই আজ যখন সিনেমার সামনে লাল ফেস্টুন উঠে গেছে, আলো জ্বলছে, আগামী ছবির স্টিল সাঁটা হয়েছে, তাই দেখে পাড়ার সবাই একটু হাসিখুশি হয়েছে বৈ কি!

প্রায় পাঁচ মাস পরে হাউসগুলি খুলেছে, কিন্তু মুক্তি তালিকায় বাংলা ছবির নাম কোথায়? 'আদ্যাশক্তি মহামায়া'-র অনেকটা যেন গোপনে আবির্ভাব হলো। সস্কোচের সঙ্গে। তার পরে 'বাঘিনী', একটিমাত্র ছবি। আর কোন ছবির নাম বিজ্ঞাপিত হচ্ছে না, হয়ত শারদীয় মরশুমের জন্য সব ছবি অপেক্ষা করছে। পাঁচ মাস পরে একটিমাত্র বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করছে কেন? ভারতী, রূপবাণী, উত্তরা-উজ্জ্বলা, ইন্দিরা, অরুণা, পূরবী, শ্রী, পূর্ণ, সিনেমাগুলিতে কি হচ্ছে? এই হাউসগুলিতেও বাংলা ছবিই দেখান হতো, এগুলি ছিল বাংলা ছবির রিলিজ চেন। সংরক্ষণ সমিতির আন্দোলনের পরে দেখা যাচ্ছে—পূর্ণতে একটা সেক্স-ক্রাইম ছবি, আর অন্যান্য হাউস-গুলিতে হিন্দী ছবি মুক্তিলাভ করছে। বাংলা হাউসগুলি হিন্দী ছবির হাউসে রূপান্তরিত হচ্ছে। উত্তরা, উজ্জ্বলা, রূপবাণী, ভারতী, অরুণা, মৃণালিনী, ইন্দিরা, পূরবী, শ্রী, পূর্ণ সব বাংলা হাউসগুলিতে হিন্দী ছবির জবরদখল অথবা সুযোগ গ্রহণ করেছে। সুতরাং প্রশ্ন আসে, সংরক্ষণ সমিতির আন্দোলনের কি ফল হল। সংরক্ষণ সমিতি যে বাঙালীর জয় হয়েছে বলে বিজ্ঞাপন দিল সেই বিজ্ঞাপন কি মিথ্যা, ভাঁওতা? স্বাভাবিকভাবে জয়লাভের পরে আটটি রিলিজ চেনে আটটি বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করা উচিত ছিল। সংরক্ষণ সমিতির উদ্যোগেই ক্রমানুক্রমিক করে নতুন ছবিগুলি মুক্তিলাভ করলে বাঙালী ছবির দর্শকরা জয়লাভের আনন্দ অনুভব করতে পারতেন। বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পকে তা' নৈতিক প্রেরণা জোগাত। কিন্তু তা না হয়ে জয় হয়েছে বলে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে সংরক্ষণ সমিতি সরে পড়ল; আর বাংলা ছবির রিলিজ চেনগুলিতে দেখা যাচ্ছে হিন্দী ছবির রোশনাই দপ দপ করে জ্বলছে। সংরক্ষণ সমিতির পরিচালকরা এর কৈফিয়ৎ বা জয়লাভের তাৎপর্য কি তা অন্তত সাংবাদিকদের কাছে ব্যাখ্যা করে দেশবাসীকে জানাতে সাহায্য করবেন? তা যদি না করেন তবে কেন তাঁরা পিকেটিং করলেন?

রাষ্ট্রপতিশাসিত রাজ্য সরকার যে নির্দেশ জারী করেছেন দশ সপ্তাহ বাংলা ছবি দেখান বাধ্যতামূলক—তারও তাৎপর্য কি? যেসব সিনেমা একমাত্র বাংলা ছবি দেখাত সে সব সিনেমা হিন্দী ছবির রিলিজ চেনে পরিণত হয়েছে। তা' হলে দশ সপ্তাহ বাংলা ছবি দেখাবে কারা? —নূতন।

রাগিণীর বিরহ মিলন

গত ১১ই আগস্ট রবীন্দ্র সদনে রাগিণীর প্রযোজনায় এক অভিনব ও আকর্ষণীয় সঙ্গীত-নৃত্য অনুষ্ঠান হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বাছাইকরা বর্ষা-সঙ্গীতের মালা আর তাকে নৃত্যের ছন্দে ও তালে রূপে-রসে মনোজ্ঞ করে উপস্থিত করেছে শিল্পিগণ। কবি-মানসে বর্ষার যে বিরহ মিলনের স্নিগ্ধ সম্ভাব রসসঞ্জাত প্রভাব তাকে সঙ্গীতমালায় মূর্ত করে তোলা যথেষ্ট কৃতিত্বের কাজ। এই নৃত্যনাট্য পরিকল্পনা প্রখ্যাত শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাসের। পরিকল্পনায় তিনি যে বিদগ্ধমনের পরিচয় দিয়েছেন—তা শ্রোতারা অনুভব করেছেন। সম্পূর্ণরূপে ভাবে নাটকীয়তার অভাব থাকলেও তাঁর সুললিত কণ্ঠের গান শ্রোতারা প্রাণভরে গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতে দেবব্রত বিশ্বাস আজো স্বকীয় মহিমায় ভাস্বর। তাঁর দরদী ও দরাজ গলা সংস্কার সঙ্গীতরসিকদের এক আকর্ষণীয় জিনিস।

নৃত্য পরিকল্পনায় ছিলেন সুপরিচিত নৃত্যশিল্পী ও পরিচালক অমিত চট্টোপাধ্যায়। তাঁর নৃত্য পরিকল্পনায় স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি, পরিণত শিল্পদৃষ্টি এবং রবীন্দ্রসংগীত ও নৃত্যকলার ধারণা সার্থক প্রতিফলিত। প্রকৃত সত্যের নৃত্য পরিকল্পনায় 'পাগলা হাওয়া', 'মোর ভাবনা যে কি হায়', 'মন হারা যেন', 'আকাশ ভরা সূর্য তারা' এবং 'শ্যামল মিলনদিন' গানগুলিতে নৃত্য পরিকল্পনায় তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছেন। নৃত্যাংশে তিনি নিজেও সাবলীলতায় প্রশংসনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। গায়ত্রী চট্টো-পাধ্যায় নৃত্যজগতে এক পরিচিত নাম। এদিনের অনুষ্ঠানে তাঁর [illegible]

একলা পথে', 'চিনিলে না আমারে' নৃত্য যথেষ্ট আনন্দ দান করেছে। তিনি সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন 'মনে হলো যেন পেরিয়ে এলেম' গানের সাথে নৃত্যে।

সঙ্গীতে দেবব্রত বিশ্বাসের সহযোগী ছিলেন পদ্মিনী দাশগুপ্ত। কুমারী পদ্মিনীকে অনেকে ইতিপূর্বে নৃত্যশিল্পীরূপে দেখেছি। কিন্তু সংগীতেও যে এই তরুণী শিল্পী সমান দক্ষ সেদিন তা অনুভব করা গেল।

নৃত্যে সহশিল্পীরূপে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছেন : সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুন্ধতী চাকলাদার শিবানী দাশগুপ্ত পূর্ণিমা চৌধুরী, পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায়, সুস্মিতা সেনগুপ্ত জয়শ্রী রায় শিখা দাস, ইন্দ্রাণী দাশগুপ্ত স্মৃতিকণা সরকার।

নৃত্যশিল্পীদের পোষাক পরিকল্পনায় সুকৃতি চক্রবর্তী শিল্পিমনের পরিচয় দিয়েছেন। সংগঠনায় ছিলেন বাবুল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুরগীতির প্রতিষ্ঠা দিবস

গত ১৫ই আগস্ট সুরগীত বালিকা সঙ্গীতালয়ের ২২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত দপ্তর অধিকর্তা শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র নিয়োগী মহাশয়, নতুন খবরের সম্পাদক শ্রীধীরেন্দ্র মল্লিক (অনুষ্ঠান সভাপতি), সঙ্গীতাচার্য শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল (প্রধান অতিথি) এবং প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সভাপতি শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁ মহাশয় সংগীতের প্রসারণা ও উপযোগিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা সংগীত, যন্ত্রসংগীত এবং নৃত্য পরিবেশন করেন। শ্রীসুবল সাহা "কাবুলিওয়ালা" কাহিনীটি মূকাভিনয় করে প্রশংসা অর্জন করেন। প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদনলাল দে মহাশয় সকলের সহযোগিতা কামনা করে ভাষণ দেন।

সুরবিতানে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী

গত জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ৮৩ মনসাতলা লেন (খিদিরপুর) অবস্থিত সংগীতায়ন ও সাংস্কৃতিক সংস্থা "সুরবিতান এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানে 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী' পালন করে। প্রতিষ্ঠানাধ্যক্ষ শিল্পী শ্রীরবীন্দ্র বসু সংস্কৃত সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন এবং এক আকর্ষণীয় ডিমি স্বাস্থ্যের সংগীতাঙ্গর প্রযোজনা ও পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিপ্রা মিত্র, মীরা রহমান, মালা চ্যাটার্জী, শীলা চক্রবর্তী, অরুন্ধতী মুখার্জী, কুতুবুদ্দীন আহমদ এবং সোনালী চক্রবর্তী।

বেলঘরিয়ায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ২৪শে আগস্ট বেলঘরিয়ার যাদবপুর কমার্শিয়াল কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কলেজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সন্ধ্যায় বহু দর্শক উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস ঘোষ (এস ডি পি ও) এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রী[illegible]নাথ ভট্টাচার্য। উদ্বোধন সংগীতের পর কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমূল্যরঞ্জন ঘোষ এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী অলোক বাগচী, সুদাম বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় ভট্টাচার্য, অশোক চট্টোপাধ্যায়, কুমকুম চক্রবর্তী, দেবব্রত বোস এবং মীনা মুখার্জী। আবৃত্তি করেন অমিয় মুখোপাধ্যায় এবং হাস্য কৌতুক পরিবেশন করেন অনু দত্ত।

মধ্য ইন্টালী সাংস্কৃতিক সম্মেলন

মধ্য ইন্টালী সাংস্কৃতিক সম্মেলন আগামী অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে

[illegible]

'ঝুক গয়া আসমান' ছবিতে সায়রা বানু ও রাজেন্দ্রকুমার

জয়দিনব্যাপী তৃতীয় বার্ষিক সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করেছে। সম্মেলন ওই এলাকার শ্রীনারায়ণ দেবের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হবে। মোটামুটি ছোট আসর। কিন্তু শিল্পী নির্বাচনে এই সংস্থার যে পূর্ব সুনাম ছিল, তা পরম্পরায় বজায় রাখা হচ্ছে। এবারের শিল্পীদলে আছেন সারা ভারতের প্রখ্যাত শিল্পীরা। প্রতিবারের ন্যায় এবারও কয়েকজন নতুন প্রতিভাকে সুযোগ দাওয়া হবে গুণাগুণ বিচারে। যোগাযোগের ঠিকানা : ১৭এ ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলিকাতা—১৪।

কেউ দাবী নয়

মেখলীগঞ্জ মহকুমার অন্যতম প্রখ্যাত প্রাচীন নাট্যসংস্থা-নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল ক্লাব গোষ্ঠী গত ২৩শে আগস্ট দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেউ দাবী নয়' নাটকটি এন্. এন. এম্. ক্লাব মঞ্চে মঞ্চস্থ করলেন। নাটকটি সামগ্রিকভাবে সাফল্যলাভ না করলেও কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পীর অভিনয় বৈশিষ্ট্যে মোটামুটি রসোত্তীর্ণ হয়েছে।

নাটকের মূল চরিত্র 'বিজন' রূপায়ণে পীযূষ সিংহ নায়িকা 'সুধা' চরিত্রে গৌরী চক্রবর্তী মাণিক ও রমেন চরিত্রে রবি ঘোষ ও শিশির চৌধুরী এবং অন্যান্য চরিত্রে গায়ত্রী সরস্বতী অসীমা দত্ত, দেবব্রত দত্ত, দ্বিজেন চক্রবর্তী অভিনয় করেছেন। মঞ্চসজ্জার কাজ মোটামুটি ভাল।

মীরকাশিম

গত ২৬শে আগস্ট রবীন্দ্র সরোবর মঞ্চে চেতলা নবারুণ সঙ্ঘের চতুর্থ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীমন্মথ রায়ের "মীর-কাশিম" নাটকটি সঙ্ঘের সভ্য ও সভ্যাদের দ্বারা সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। নাটকটি পরিচালনা করেন সঙ্ঘের সভাপতি পাঁচুগোপাল ঘোষ। মীরকাশিমের ভূমিকায় শ্যামল ঘোষ, মীরজাফরের ভূমিকায় অমল ঘোষ এবং ফতেমার ভূমিকায় কাজল চক্রবর্তী অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। পার্শ্বচরিত্রে পরিমল দাস ও কৃষ্ণা ঘোষ দর্শকদের প্রশংসা লাভ করেছেন। সংগীত পরিচালনা করেন সমীরকুমার ঘোষ। নাটকটি অভিনয়ের আগে দেবী চৌধুরী বসু আধুনিক নৃত্য পরিবেশন করেন। উৎসবে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন সাহিত্যিক শ্রীশচীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিশ্ব যুব উৎসবে ভারতীয় মূকাভিনয়ের সমাদর

সোফিয়ায় নবম বিশ্ব যুব উৎসবে এই প্রথম ভারতীয় মূকাভিনয় পরিবেশিত হয়। মূকাভিনয় পরিবেশন করেন মূকাভিনয়ের কৃতী শিল্পী যোগেশ দত্ত। তাঁর মূকাভিনয় বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে ও ভারতীয় মূকাভিনয় সকলের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিশ্ব যুব উৎসবের এক অনুষ্ঠানে শ্রীদত্তকে ভারতীয় মূকাভিনয় সম্বন্ধে কিছু বলতে বলা হয়। শ্রীদত্ত বলেন, "ভারতীয় মূকাভিনয় অতি পুরাতন ও প্রাচীন। তার প্রমাণ ভরত মুনির নাট্যশাস্ত্র ও কথাকলি এবং ভরত-

সোফিয়ায় অনুষ্ঠিত নবম বিশ্ব যুব উৎসবের মৈত্রী-প্রতীকের সামনে জনৈকা ফরাসী শিল্পীর সঙ্গে যোগেশ দত্ত।

নাট্যম নৃত্য। আমরা সেই পুরাতন শিল্পের পুনরুজ্জীবন করেছি।' বিশ্ব যুব উৎসবের শেষে শ্রীদত্ত বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, রাশিয়া, তাসখন্দ, সমরখন্দ ও আরও কয়েকটি জায়গায় বিশেষ আমন্ত্রণে মূকাভিনয় পরিবেশন করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

'দাবী' নাটকের সার্ধপঞ্চশততম অভিনয়

আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর '৬৮ শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় স্টার থিয়েটারে অভিনীত "দাবী" নাটকের সার্ধ-পঞ্চশততম অভিনয়ের পুরস্কার বিতরণী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রবীণ সাহিত্যরথী ডক্টর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি ও প্রখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) মহাশয় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন এবং পুরস্কার বিতরণ করবেন নটসূর্য শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়।

সংগীত পরিষদের উদ্বোধন

শিখি সংগীত পরিষদের উদ্যোগে আহূত এক সংগীত আসরে সংগীতাচার্য শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী শুদ্ধকল্যাণ রাগে খেয়াল গেয়ে শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেন। পূর্বে সংগীত পরিষদের সংগীত শিক্ষায়তনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি জানান যে, উত্তর শহরতলীর এই অঞ্চলে তিনি সর্বপ্রথম এখানেই গান গাইতে এলেন। সাহিত্য শিল্প ও সংগীতের ত্রিবিধ মিলনকেন্দ্র সংগীত পরিষদ। সেজন্য তিনি আশা পোষণ করেন যে, এই পরিষদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে এবং বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জগতে এর অবদান একদিন স্বীকৃত হবে। শ্রীযুক্ত [illegible] কর শ্রীতারাপদ চক্রবর্তীকে স্বাগত জানান এবং শ্রীঅরুণ ভটাচার্য পরিষদের আদর্শ ও কর্মসূচী সংক্ষিপ্তভাবে জানান। পরিষদের একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়: সভাপতি: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, প্রধান উপদেষ্টা: শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ: অরুণ ভট্টাচার্য ও সম্পাদিকা: শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর কণ্ঠে সহযোগিতা করেন শ্রীমানস চক্রবর্তী

এস, এল, কিমরের 'অভিমানী' ছবিতে [illegible] রায় ও মালবী নন্দী

সোভিয়েট ছবি 'দেয়ার ইজ নো কোর্ট ইন কয়ার'-এর একটি দৃশ্য

ও তবলায় সহযোগিতা করেন শ্রীবলরাম মুখোপাধ্যায়।

হিচকক সম্মানিত

বিশ্ব চলচ্চিত্রে সুখ্যাত, সেরা রহস্যচিত্র নির্মাতা আলফ্রেড হিচকককে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি দিয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়।

যাদুকর এ· সি· সরকার

আই· বি· এম ক্লাবের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে সম্প্রতি যাদুকর এ· সি· সরকার তাঁর বহু প্রসংশিত যাদুর খেলা প্রদর্শন করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন।

বাংলা ছবির বিশেষ প্রদর্শনী

ক্যালকাটা সিনে ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে গত ১৯শে থেকে ২৫শে আগস্ট পর্যন্ত কয়েকটি বাংলা ছবি দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছিল একাডেমি অফ ফাইন আর্টস ভবনে। এই বিশেষ প্রদর্শনীর জন্য যে ছবিগুলি বাছাই করা হয়েছিল—প্রতিটি ছবিই আপন বৈশিষ্ট্যে দর্শনীয়, এবং সিনে ইনস্টিটিউট বাছাই করার ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য বিবেচনা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ছবিগুলি ছিলঃ পঞ্চতপা (অসিত সেন), অন্তরীক্ষ (রাজেন তরফদার), বাইশে শ্রাবণ (মৃণাল সেন), বেনারসী (অরূপ গুহঠাকুরতা), কালামাটি (তপন সিংহ), কাঞ্চনজঙ্ঘা (সত্যজিৎ রায়) ছবিগুলি ১৬" মিঃ পর্দায় দেখানো হয়েছে। যদি দর্শকদের কিছু অতৃপ্তি থাকে তবে তা একারণে।

ডাচ চলচ্চিত্র উৎসব

কলকাতার ফিল্ম সোসাইটি ও ক্লাবগুলির উদ্যোগে ডাচ চলচ্চিত্র সেসন আরম্ভ হচ্ছে। ডাচ ছবির সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই বললেই চলে। ইতিপূর্বে ডাচ প্রামাণিকচিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল এবং তা দেখে নেদারল্যাণ্ডের চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে আমরা কিছুটা ধারণা করতে পেরেছিলাম। এবার দেখান হবে পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্র। ভারতে এই প্রথম ডাচ কাহিনীচিত্র দেখান হবে। যে ছবিগুলি দেখান হবে তার মধ্যে রয়েছেঃ অন্স অব এ রেন, প্যারানোইয়া, এ মর্নিং অব সিক্স উইকস্। এই সঙ্গে থাকবে পাঁচটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি। ডাচ দূতাবাসের সাংস্কৃতিক সেক্রেটারী যিনি সিনেমার উৎসব উদ্বোধন করবেন। ছবিগুলি দেখান হবে একাডেমি অফ ফাইন আর্টস, ছায়া ও প্রাচী সিনেমায়।

আজ বসন্ত

রূপকল্প ফিল্মসের প্রথম ছবি 'আজ বসন্ত'-র চিত্রগ্রহণের কাজ নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিওতে চলেছে। এই ছবির কাহিনী লিখেছেন প্রশান্ত দেব। ছবির বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করছেন উত্তমকুমার, তন্দ্রা, কমল মিত্র, অসিতবরণ, মলিনা দেবী, তরুণকুমার, সীমতা বিশ্বাস।

"গান্ধীবাদ কি অচল" প্রসঙ্গে
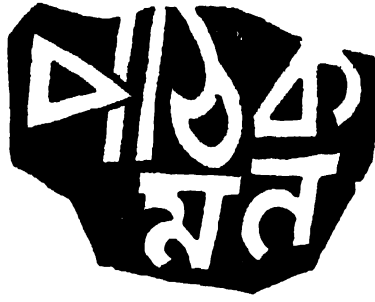
৩০শে শ্রাবণ, ১৩৭৫ সনের সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত অধ্যাপক দিলীপ ঘোষরায়ের 'গান্ধীবাদ কি সচল?' নামক প্রবন্ধ বিষয়ে মতামত আহ্বান করেছেন দেখে সুখী হলাম।

বহুকাল পর্যন্ত গান্ধীবাদ আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোকের মনে কুয়াশার সৃষ্টি করেছে। তাঁরা রাজনীতি এবং দেশ-সেবার ক্ষেত্রে অভিনব মতবাদের স্রষ্টা মোহনলাল করমচাঁদ গান্ধী নামক অনন্য-সাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী দেশহিতব্রতীকে শুধুমাত্র 'মহাত্মা' বলে প্রণাম জানিয়েই ক্ষান্ত হন নি. তাঁকে সকল প্রকার মানবিক ভুল দোষ ত্রুটির ঊর্ধ্বে তুলে. দেবতার আসনে বসিয়ে পুজো করতেও দ্বিধা করেন নি। অধ্যাপক ঘোষরায় নিরাসক্ত দৃষ্টিতে উক্ত প্রবন্ধে গান্ধী-ব্যক্তিত্বের স্বরূপ কী, ব্যবহারিক রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধী-বাদের স্থান কোথায়, প্রভৃতি জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন দেখে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্বের অসম্পূর্ণতা এবং রাজনৈতিক মতবাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা সম্পর্কে তাঁর এই যুক্তিপূর্ণ নির্ভীক আলোচনা পড়ে মোহাচ্ছন্ন গান্ধীবাদীরা হয়ত ক্ষুব্ধ হবেন। তথাপি গান্ধী শতবার্ষিকীর উদ্যোগপর্বে এক শ্রেণীর লোকের চোখে এই অবতার-রূপ মহাপুরুষের ব্যক্তিত্বের আসল রূপ এবং মতবাদের ভ্রান্তির দিকটি উদ্ঘাটিত করে অধ্যাপক ঘোষরায় জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন করেছেন বলেই মনে করি। সত্য যুগে যুগে মুগ্ধ ভক্তের চোখে কুয়াশাচ্ছন্ন হয়েছে—এ তথ্য ইতিহাসসম্মত। আবার অনুসন্ধিৎসু মানুষের তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদের আঘাতে সে কুয়াশা অপসৃত হয়েছে, দেখা দিয়েছে সত্যের জ্যোতির্ময় মূর্তি—এটাও ইতিহাসেরই কথা। অধ্যাপক ঘোষরায়ের তথ্যনির্ভর যুক্তিবাদী সত্যসন্ধানের আলোকে মোহমুগ্ধ গান্ধীবাদীদের দৃষ্টি-গ্রাহ্য মিথ্যার কুয়াশা যদি বিদীর্ণ হয়—সেটা হবে সব চাইতে আনন্দের।

প্রথমে শ্রীঘোষরায় গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের সীমাবদ্ধতার কথা বলতে গিয়ে তাঁর রাজ-নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা এবং অনুদারতার কথা উল্লেখ করেছেন। রাজ-নৈতিক স্বাধীনতা লাভের অস্ত্র হিসেবে অহিংস আন্দোলনের প্রতি প্রত্যয়ের দৃঢ়তা গান্ধী-চরিত্রকে অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সহিংস বিপ্লবীদের প্রতি তাঁর অসহিষ্ণু অসংযত উক্তি এবং আচরণ তাঁকে 'মহাত্মা' নামের অযোগ্য করে তুলেছিল। অ্যানি বেসান্ত, অরবিন্দ ঘোষ, সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র প্রমুখ এ জাতীয় স্বদেশ-প্রেমিকেরা ছাড়াও

বিদেশীয় রাজনীতিবিদ লয়েড জর্জ এমন কি চার্চিল পর্যন্ত যখন ভারতীয় বিপ্লবী-দের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন তখন গান্ধীজীর পক্ষে তাঁদের 'ভ্রান্ত', 'দেশের শত্রু' বলে উল্লেখ করা তাঁর সংকীর্ণ দৃষ্টি ও অনুদার হৃদয়ের পরিচায়ক বলে ব্যাখ্যা করলে ভুলের সম্ভাবনা কোথায়? ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধীজীর বিশিষ্ট অব-দানের উৎস সন্ধানে শ্রীঘোষরায় যখন মন্তব্য করেন,—'প্রকৃতপক্ষে একদিকে বিপ্লবীদের অদম্য চেতনা অপর দিকে তিলক, দেশবন্ধু, সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিন পাল প্রমুখের চেষ্টায় তৈরি কংগ্রেসের বুনিয়াদ হাতে না পেলে গান্ধীর এতটুকু অবদানও সম্ভব হতো না।'—তখন এ যুক্তির সারবত্তা গান্ধীর কোন অন্ধ ভক্তের পক্ষেও অগ্রাহ্য করা বোধ হয় সম্ভব নয়! ভারতের রাজ-নৈতিক রঙ্গমঞ্চে গান্ধী-আবির্ভাবের প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব থেকেই ভারতীয় যুব-মানসকে স্বদেশপ্রেমের বহ্নিবন্যায় উদ্দীপ্ত করেছিলেন এই সশস্ত্র বিপ্লবীরাই—এ তথ্যও ইতিহাসসম্মত।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে শুরু করে পর-বর্তীকালে ভারতবর্ষে গান্ধীজীর রাজনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার উল্লেখ করে শ্রীঘোষরায় এটা সার্থকভাবে প্রমাণ করেছেন যে একটা আপোষপন্থী নমনীয় মনোভাব তাঁর সকল আন্দোলনের ব্যর্থতার মূলে। দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনে তাঁর অবলম্বিত নীতির ফলে সে দেশে আজও কোণঠাসা নীতি (Apartheid) অবাধে চলছে বলে শ্রীঘোষরায় যে মন্তব্য করেছেন তাও ভিত্তিহীন নয়। সাম্রাজ্যবাদীর সহিংস-যুদ্ধে দেশবাসীকে সহযোগিতার আহ্বান গান্ধীর অহিংস-নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। শ্রীঘোষরায় আরো দেখিয়ে-ছেন, ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন যখন বেশ শক্তি সঞ্চয় করে উঠেছে গান্ধীজী তখনও বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সাড়াদায়ক সহযোগিতার নীতি 'responsive Co-operation) বর্জন করতে পারেন নি। ১৯২১ ও ১৯২২ সালে গান্ধীজী কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ১৯২২ সালে তাঁরই নেতৃত্বে ভারতবর্ষের দিকে দিকে যখন বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল তখন চৌরিচৌরায় অনুষ্ঠিত হিংসাত্মক ঘটনার প্রতিবাদে গান্ধী বারদোলিতে সার্থক পরিণামমুখী আন্দোলন বন্ধ করে দেন। এতে তাঁর বিশিষ্ট অনুগামী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, লালা লাজপত রায় এমন কি জওহরলাল নেহরু পর্যন্ত গান্ধীর কাজের তীব্র সমা-লোচনা করেন। মনীষী রমা রলাঁর মত গান্ধী-অনুরক্ত ব্যক্তিও আন্দোলনের উষ্ণতার সময় গান্ধীর এ পশ্চাদপসরণকে সমর্থন করতে পারেন নি। ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার গান্ধীর এরূপ সিদ্ধান্তকে প্রচণ্ড ভ্রমাত্মক কার্য বলে বর্ণনা করেছেন। আন্দোলনকে তীব্রতর করে তোলার পরিবর্তে তিনি অস্পৃশ্যতা বর্জন. নিষ্ঠার সঙ্গে বস্ত্রবয়ন এবং সংযমের সাহায্যে স্বরাজ সাধনার পরি-কল্পনাকে কার্যকরী করে তুলতে আহ্বান জানালেন। দেশবাসীকে। স্বাধীনতা-সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এ ধরণের পরিকল্পনাকে অবাস্তব বলে বর্ণনা করতে বহু মনীষী দ্বিধা করেন নি। ১৯২৭ সনে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব পাশ হবার সময় তিনি মাদ্রাজে উপস্থিত থেকেও উক্ত অধিবেশনে যোগ দেন নি। পূর্ণ স্বাধীনতাকে কার্যকর রূপ দেওয়া তৎকালীন কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই ছিল তাঁর স্থির বিশ্বাস। এ নরমপন্থী মনোভাবের দরুণ কংগ্রেসের ভেতর যখন বামপন্থী শক্তি জাগ্রত হয়ে উঠল সে শক্তির প্রতি তাঁর অসহিষ্ণুতার অন্ত রইল না। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ বাম-পন্থী নেতাদের তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে স্থান দিলেন না। বামপন্থী নেতাদের প্রতি গান্ধী-পরিচালিত কংগ্রেসের এই বৈষম্য-মূলক আচরণের ফলে—বন্ধন-অসহিষ্ণু বামপন্থী শক্তি ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করে ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের যে প্রবল প্রতিস্পর্ধী হয়ে দাঁড়িয়েছে—এ সত্য অস্বীকার করা যাবে কী?

গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনের সব চাইতে বড় ভ্রান্তি বোধ হয় ১৯৩৭ সনে মুসলিম লীগের সর্বাধিনায়ক মহম্মদ জিন্নার সঙ্গে আচরণে। সে বৎসর গান্ধী-পরিচালিত কংগ্রেস জিন্না সাহেবের হিন্দু-মুসলমান কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করে। গান্ধী কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত সর্বান্তঃকরণে মেনে নেন এবং এ বিষয়ে মুসলিম লীগের সঙ্গে কোন প্রকার আলাপ-আলোচনায় আসতে অস্বীকার করেন। মুসলিম লীগের রাজ-নৈতিক ভবিষ্যৎ এ-ভাবে অনিশ্চিত হয়ে উঠলে লীগ সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজনৈতিক কর্মপন্থা গ্রহণ করবার নীতি গ্রহণ করল। লীগের এই স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র আদর্শের রাজনৈতিক কর্মধারার পরিণতিতে যে পাকিস্তান সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে এ তথ্য

ইতিহাসসম্মত। মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর পরিচালিত কংগ্রেসের অদূরদর্শী নীতির ফলে মিঃ জিন্না ও তাঁর অনুবর্তীরা যে পাকিস্তান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন ডক্টর শশধর সিংহ তাঁর Ind.an Independence in Perspective নামক সুচিন্তিত গ্রন্থে। অধ্যাপক ঘোষরায়ের প্রবন্ধের কোন জায়গায় এই গ্রন্থখানির উল্লেখ দেখা গেল না। পড়া না থাকলে তাঁকে এই বইখানি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। আলোচ্য বিষয়ে অনেক নতুন আলোক পাবেন।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের জন্য সভাপতি নির্বাচনের দ্বন্দ্বে সুভাষ বসুর জয়লাভ গান্ধীকে তাঁর সমস্ত ছদ্মবেশের আবরণ-মুক্ত করেছিল তাঁর সে সময়কার অসহিষ্ণু উক্তিই তার প্রমাণ (Sitaramiva's defeat is my own defeat). অতঃপর সুভাষ বসুকে ভারতের রাজনীতি থেকে অপসারিত করা যে গান্ধীর অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল—এ সত্য কারো অজানা নয়। সুভাষ বসুর গৌরবময় রাজনৈতিক জীবনের দিক থেকে অবশ্য গান্ধীর এ বিরোধিতা খুবই সুফল প্রসব করেছিল। কর্মক্ষেত্রকে ভারতবর্ষের বাইরে বেছে নিয়ে সশস্ত্র সংঘর্ষের সাহায্যে শ্রীযুক্ত বসু যদি বিশ্বযুদ্ধে বিপর্যস্ত বৃটিশ শক্তিকে আঘাত না করতেন, ভারতের স্বাধীনতা আরো কত বিলম্বিত হত কে জানে? এ ছাড়া গান্ধীর পক্ষপাতদুষ্ট অন্তর সুভাষ বসুকে ভারতের জনজীবনের অন্যতম নেতা বলে স্বীকৃতি দিতে যত কার্পণ্যই করুক না কেন, ভারতের জনসাধারণ এই অসামান্য আত্মত্যাগী কর্মবীরকে 'নেতাজী' বলে সম্বোধন করে হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে দ্বিধা করে নি। গান্ধী-প্রভাবিত কংগ্রেস-বিতাড়িত সুভাষ বসু আসমুদ্র হিমাচল-ব্যাপী এখনও 'নেতাজী' নামে শ্রদ্ধা পাচ্ছেন। এতে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক মতের প্রতি যেমন আস্থা প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নির্ণয়ে গান্ধীর ধারণা যে ভ্রান্ত ও একদেশদর্শী তাও প্রমাণিত হয়েছে।

শক্তিশালী গণ-আন্দোলন সৃষ্টি গান্ধীজীর রাজনৈতিক জীবনের সব চাইতে বড় সার্থকতার প্রমাণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু এ. আর. দেশাই-এর মত কোন কোন গান্ধী-সমালোচক এ ধরণের আন্দোলনকে যখন গান্ধীর আপোষপন্থী চুক্তি ও সন্ধির সহায়ক চাপ সৃষ্টির নামান্তর বলে মনে করেন তখন তার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। দেশবন্ধুর মত গান্ধী-অনুরক্ত নেতাও সার্থক আন্দোলনের [illegible] গান্ধীজীর [illegible] দিশাহারা নেতৃত্বের অক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছেন। গান্ধীর পরম অনুরক্ত জওহরলাল নেহরুও তাঁর গুরুর রাজনৈতিক মতের লক্ষ্যহীনতা এবং রহস্যময়তার কথা বারে বারে ঘোষণা করতেও দ্বিধা করেন নি।

ভারতের অগণিত দরিদ্র জনসাধারণের দারিদ্র্যমুক্তির প্রশ্নে উচ্চকণ্ঠ হলেও গান্ধীজী তাঁর সমস্ত রাজনৈতিক জীবনে যে শিল্পপতি এবং ধনতান্ত্রিক গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা করে চলেছেন তার প্রমাণের অভাব নেই। তাঁর মহামানবতার মাহাত্ম্য-রক্ষার জন্যও যে তিনি ধনিকশ্রেণীর ওপর নির্ভরশীল ছিলেন—লুই ফিসারের এ মন্তব্যও ভিত্তিহীন মনে হয় না। গান্ধী-প্রবর্তিত অভিনব রাজনীতির একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের সংমিশ্রণ। বিহার ভূমিকম্পের পটভূমিকায় গান্ধীজীর ধর্মবোধের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক ঘোষরায় প্রমাণ করেছেন মহাত্মাজীর ধর্ম কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয় নি। রবীন্দ্রনাথের মত কবি, রোমা রলাঁর মত মানবতাবাদীও গান্ধীর এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মবোধের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

অন্যায়, অসত্য এবং অধর্মের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর আপোষহীন সংগ্রামের কথা বহুঘোষিত। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে তাঁরই একান্ত অনুরক্ত জওহরলাল নেহরু, প্যাটেল প্রমুখ যখন ভারত বিভাগ প্রস্তাব মেনে নিয়ে চূড়ান্ত ক্ষমতালোভের পরিচয় দিলেন তখন তাঁদের কাছে গান্ধীর নির্বীর্য আত্মসমর্পণ একটি বিরাট বিস্ময়ের বিষয় বলে মনে হয় না কী? একদল প্রচণ্ড গান্ধীভক্ত আমাদের কাছে একদিন ভারত বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীর রাজনৈতিক জীবনের ভূমিকা সম্পর্কে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ দিচ্ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, গান্ধীজী যদি ভারত বিভাগকে পাপ বলে মনে করতেন তাহলে তাঁর অনুবর্তীদের পাপকার্যের প্রতিবাদে আমরণ অনশন করলেন না কেন? যদি এ অনশনে তাঁর মৃত্যুও ঘটত তাহলে সে মৃত্যু কী আততায়ীর হাতে গুলী খেয়ে মৃত্যুর চাইতে কম গৌরবজনক হত? গান্ধীজীর একনিষ্ঠ ভক্তটি আমার এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর দিতে পারেন নি।

গান্ধীজীর অহিংসা অসহযোগ আন্দোলনের সাহায্যেই ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে—এ একদেশদর্শী মতও আধুনিক ঐতিহাসিক সমীক্ষায় ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগণ্য ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে মহম্মদ আলী জিন্নার সহিংস প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, নেতাজী সুভাষ বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনীর ভারত আক্রমণ, ১৯৪৬ সনের নৌ-বিদ্রোহ, বিমান বাহিনীর ধর্মঘট, বিহারের পুলিশ ধর্মঘট, এমন কি পরোক্ষভাবে নাৎসী জার্মানীর এবং জাপানের বৃটিশ সাম্রাজ্যবিরোধী যুদ্ধ ভারতের স্বাধীনতা অর্জনকে ত্বরান্বিত করেছে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও গান্ধীজীর দৃষ্টি যে মধ্যযুগীয় এটাও সার্থকভাবে প্রমাণ করেছেন বিস্তৃত আলোচনার সাহায্যে অধ্যাপক ঘোষরায়। গান্ধীভক্ত জওহরলাল নেহরু গান্ধীর অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সমালোচনা করেই শুধু ক্ষান্ত হন নি, ভারতবর্ষে যন্ত্রযুগের প্রবর্তন করে ভারতীয় জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে তিনি যে অক্লান্ত প্রয়াসের পরিচয় দিয়েছেন তা কারো অবিদিত নেই। ভারতের অগণিত দরিদ্র অশিক্ষিত এবং অন্যান্যদের 'হরিজন'-রূপে দেখা মানবতার অপমানেরই নামান্তর—অধ্যাপক ঘোষরায়ের এ মন্তব্যও যুক্তিহীন নয়।

পরিশেষে বক্তব্য, গান্ধীবাদের পরিণতি সম্পর্কে অধ্যাপক ঘোষরায়ের এই তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ গান্ধীজীর নাম-ভাঙিয়ে খাওয়া ভূয়ো গান্ধীবাদের চোখ ফোটাতে যদি কিছুটা সাহায্য করে তবেই এ প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য সার্থক হবে।

—শ্রীব্রজেন্দ্রলাল নাথ
বি ১৫/৫৮ লেক প্লেস
কল্যাণী, নদীয়া

॥

ভারতবাসী অবতারবাদে বিশ্বাসী। বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ আমাদের নিকট অবতাররূপে পূজিত। ধর্মপ্রাণ ভারতবর্ষে এঁদের আবির্ভাব হয়েছে—যখন ধর্মের মধ্যে এসেছে গ্লানি, দ্বন্দ্ব, অসত্য। তাই ঘরে ঘরে আজ দেখি এইসব অবতারদের পূজার আয়োজন। এঁদের ধর্মমত, উপদেশ, আদর্শ হিন্দুর প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষেত্রে জড়িয়ে রয়েছে। এঁদের বিচরণক্ষেত্র ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ এক ধর্মের সহিত অপর ধর্মের মিলন, প্রাত্যহিক জীবনের সহস্র গ্লানি, হিংসা দুঃখ-দ্বন্দ্বের হাত থেকে যুগজীবনের সহিত সমান তালে উত্তরণের পথে এঁদের অবদান চিরস্মরণীয়।

ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষার্ধে গান্ধীজীর আবির্ভাব। একদিকে ধর্মের ভণ্ডামি, অশিক্ষা ও কুসংস্কারকে সমাজ থেকে সমূলে বিতাড়নের জন্য রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ ন্যায়, শিক্ষা ও মানবধর্ম প্রচারের মাধ্যমে ভারতভূমিকে [illegible] [illegible] রত, অন্যদিকে

গান্ধীজীর আবির্ভাব রাজনীতির মধ্যে ধর্মের ধ্বজা বহন করে, তিনি সত্য ও অহিংসার বাণী নিয়ে, অগ্নিযুগের সমস্ত বিপ্লবী আন্দোলনকে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে, তিলক, দেশবন্ধু, সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিন পালের কংগ্রেসের পাকা ভিতে পা দিয়ে রাজনীতির ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। তিনি শান্তির বারি সিঞ্চন করে শত লক্ষ বিপ্লবী প্রাণের হোমাগ্নিকে নির্বাপিত করে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণের পথকে আরও কয়েক শতাব্দী প্রশস্ত করে দিলেন।

গান্ধীজীর একমাত্র মন্ত্র অহিংসা। তাইতো তিনি সহিংস বিপ্লবীদের আগুন নিবিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর হলেন। আর সহিংস শত্রুপক্ষকে তোষণের জন্য সর্বপ্রকার সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করলেন। প্রথম মহাযুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে সাহায্যের জন্য দেশবাসীকে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানালেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের শতাব্দীর নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডে নীরব রইলেন। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসকের মর্যাদা রক্ষার ভাবনায় তাঁর সমস্ত অহিংস আন্দোলন পরিচালিত হল। যখনই কোন সহিংস আন্দোলনের বিন্দুমাত্র আভাস পেয়েছেন তখনই তিনি আন্দোলনের কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নিয়েছেন, দেশবাসীকে ভয় দেখিয়েছেন—তিনি কংগ্রেস ছেড়ে দেবেন, তিনি আমরণ অনশন করবেন।

গান্ধীজীর রাজনীতিতে দূরদৃষ্টির অভাব ছিল। যার ফলস্বরূপ আমরা পেয়েছি খণ্ডিত ভারতবর্ষ। হিন্দু-মুসলমান মিলনের আন্দোলন ছিল দুর্বল। তাই তাঁর খিলাফৎ আন্দোলনের নেতৃত্ব হয়েছে ব্যর্থ। গান্ধীজীর অর্থনীতি চরকাসর্বস্ব। গ্রামীণ কুটীরশিল্পকে বাঁচিয়ে তোলার পক্ষে এই যুক্তি কেবলই মোহ সৃষ্টি করে। আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে এর অবদান কতটুকু হতে পারে তা সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারায় ধরা পড়তে পারে না। বৃহৎ শিল্পপতি ও জমিদারগোষ্ঠী ছিল তাঁর ব্যক্তিজীবন ও রাজনৈতিক জীবনে শক্তির উৎস। শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের বলেন—শিল্পপতি ও জমিদাররা তাদের অছিস্বরূপ কাজ করবেন। তিনি পাশ্চাত্যের সমাজতন্ত্রবাদ বা কমিউনিজমে বিশ্বাসী নন।

তাহলে গান্ধীজী আমাদের কি দিয়েছেন? তথাকথিত স্বাধীনতা? এ সম্পর্কে ডক্টর মজুমদারের বক্তব্যই অতি স্পষ্ট: "There is no evidence that Satyagraha or Self-Suffering of Gandhi's followers had anything to do with it. interpretation of Satyagraha it could not have any effect on the British decision to grant independence to India."

ভারতবর্ষে ক্রমবর্ধমান পুঁজিপতিশ্রেণী, সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ বাহিনীর ভারত আক্রমণ, আজাদ হিন্দ বন্দীমুক্তি আন্দোলন, ১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহ, বিমানবাহিনীর ধর্মঘট, বিহারের পুলিশ ধর্মঘট প্রভৃতির গুরুত্ব ইংরেজদের ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য।

তাহলে গান্ধীজী আমাদের কি দিয়েছেন? তাঁর অহিংসা, তাঁর সত্য, তাঁর ধর্ম, তাঁর হরিজন সেবা? পুঁজিপতির লাভের অঙ্ক যখন ফুলে ফেঁপে উপচে উঠবে তখন তার সামান্য উচ্ছিষ্ট শ্রমিকদের প্রতি ছুঁড়ে দেবেন, জমিদারগোষ্ঠী তার বিলাসব্যসনের সামান্য ছিটেফোঁটা দরিদ্র ও 'হরিজনদের' দান করবেন। এই ছিল গান্ধী-সমাজতন্ত্রের ভাষ্য। তাঁর অহিংসা, সত্য, ধর্মের মূল লক্ষ্য জনসাধারণের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনকে উন্নত করা। Plain living and high thinking. কারণ তিনি ভাবতেন শ্রমিকশ্রেণীর এবং সমস্ত মানুষের দুঃখদুর্দশার মূলীভূত কারণ—তাদের নৈতিক চরিত্রের দুর্বলতা। কিন্তু তিনি জনসাধারণের জীবনযাত্রার ব্যবস্থা সাদাসিধা একটা নির্দিষ্ট হারের ঊর্ধ্বে উঠুক এটা পছন্দ করেন না, কেন না বেশি প্রাচুর্য বিলাসিতা এবং পাপবুদ্ধির সহায়ক। গান্ধীজীর শ্রমিক-মালিক, জমিদার-প্রজার সম্পর্কে চিন্তা সত্যই মানবজাতির প্রতি অবমাননাকর, পৃথিবীর মাটি, জল, বাতাস কোন বিশেষ শ্রেণীর ভোগের জন্য নয়। সকল মানুষই সমান অংশীদার। শ্রমিকের শ্রম জাতীয় সম্পদ। শ্রমিক জাতীয় আয়ের একজন সমান অংশীদার, কিন্তু গান্ধীজী আমাদের শেখালেন—জমিদার ও শিল্পপতির সেবা ও দানের উপর নির্ভরশীল হতে। তাহলে ক্ষেতের সোনালী ফসল, কারখানার শিল্পজাত দ্রব্য, বিজ্ঞানের দান —এ সমস্ত কি শুধুই বিত্তবানদের জন্য।

'আমার জীবনই আমার বাণী'। মহাকালের দিগন্তে এই বাণী কি ধনী-নির্ধনের প্রাণের একতারায় কোন সুর ধ্বনিত করে তুলতে পারবে?

গান্ধীজী চেয়েছিলেন, 'রামরাজত্ব' প্রতিষ্ঠা করতে। ভারতবর্ষ বিশ বৎসর স্বাধীন হয়েছে। 'রামরাজত্ব' সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা তার নমুনা দেখতে পাচ্ছি—জমিদার-শিল্পপতির কব্জায় জাতি সংকার, দারিদ্র্য, দুঃখ ও বেকার সমস্যায় জর্জরিত সমাজ, লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু জীবনের [illegible] বৎসরের মধ্যে দেশের সমস্ত নিরক্ষরতা দূর করতে সক্ষম হয়েছিল। ভারতবর্ষে এখন শতকরা আশিজন নিরক্ষর। রামরাজত্বই তিনি প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন।

গান্ধীজী কি কোন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন? তাঁর অহিংসনীতি, তাঁর ধর্ম যুগোপযোগী নয়। অথচ তিনি জনপ্রিয়তার ঊর্ধ্বে উঠেছিলেন। তিনি যখন ইহলোক ত্যাগ করেন তখন জগদ্বাসী আলোহারা হলেন। নেহরুর কণ্ঠে শুনতে পাই—

"The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere....The best prayer we can offer him and his memory is to dedicate ourselves to truth and to the cause for which this great countryman of ours lived and for which he died." নেহরু গান্ধীজীর অলৌকিক ক্ষমতার নিকট বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন, একথা আমরা তাঁর জীবনচরিত থেকে পাই।

ভারতবর্ষে ধর্মজগতে এসেছে বহু বিপ্লব। সেই বিপ্লব আলোড়ন সৃষ্টি করেছে সমাজের ক্ষেত্রে, মানুষের মনের সংস্কারে। রাজনীতিতেও তার প্রভাব এসে পড়েছে। এই সব ধর্মবিপ্লবের হোতারা আমাদের কাছে অবতার হয়ে রয়েছেন। গান্ধীজী তাঁর গোঁড়া ধর্মমত নিয়ে এলেন রাজনীতির মধ্যে। অদৃষ্টবাদী ভারতবাসী চিরকাল ধর্মকে মাথার উপরে রেখেছেন। ধর্মের নামে তাঁরা সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন। তাই গান্ধীজীর সত্য, অহিংসা, ধর্মের স্বাধীনতা আন্দোলন যে মোহ বিস্তার করেছিল তার প্রভাব ভারতবাসীর মনে দাগ কেটেছিল। অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসাধারণ তাঁকে অবতাররূপে গ্রহণ করেছিল। তাঁর আন্দোলনের আহ্বান সারাদেশের স্নায়ুতন্ত্রকে নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু অন্তঃসারশূন্য গোঁড়া ধর্মসর্বস্ব আন্দোলন দেশবাসীকে শুধুই পঙ্গু করে রেখে গেল। এই জড়ত্ব ঘোচাতে জানি না আমাদের কত শতাব্দী অপেক্ষা করতে হবে।

ইংরেজশাসক ক্ষমতা হস্তান্তর করে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গিয়েছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষকে তার স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব দান করে গিয়েছে। দুই শত বৎসরের পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল তা আমরা দেখতে পাই নি। যে বিপ্লব সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মন থেকে যুগ যুগ সঞ্চিত ক্লেদ গ্লানিকে দূর করতে পারে, যে বিপ্লব ভাবীকালের জনগণের মঙ্গলের [illegible]

তুলে ধরতে পারে, সেই বিপ্লব আমাদের চাই। জানি না কোন ভবিষ্যতের তরুণদল সেই সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য যুগান্তকারী বিপ্লবের গান রচনা করবে, জানি না সেই বিপ্লবীরা গান্ধীজীর অহিংস বিপ্লবকে কোন আস্তাকুঁড়ে ফেলবে কিন্তু এখনই আমরা দেখতে পাই তাঁর একান্ত শিষ্যরা যারা গান্ধীশিষ্য বলে সর্বভাবতময় ঢক্কানিনাদ করে ঘুরে বেড়ান সেই অহিংসাকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

—সুধীরঞ্জন বেরা
ঘাটাল, মেদিনীপুর

*

"গান্ধীবাদ কি সচল ?" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অধ্যাপক দিলীপ ঘোষরায় গান্ধীজীর রাজনীতি বিষয়ক দুটি ভ্রান্ত দিক [illegible] কেন [illegible] করেন নি তা [illegible] যা সাম্য- [illegible] বর্জিতহীন [illegible] এই [illegible] (End) এই [illegible] Young India তে লিখেছিলেন, "There is however one great thing in common between us. Both claim to have the good of the country and humanity as our only goal. Though we may for the moment seem to be going in opposite direction, I expect we shall meet some day.' গান্ধী [illegible] এই আশা করে [illegible] বিষয়ক গান্ধীজীর চিন্তাধারা। তিনি বলেছিলেন যে কোন বিদেশী শত্রুরাজ্য যদি ভারতকে আক্রমণ করে তবে আমাদের যুদ্ধ করা উচিত হবে না জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে শত্রুসৈন্যের সম্মুখে বুক পেতে দিতে। আমাদের গুলী করে মারতে মারতে শত্রুসৈন্যের মনে আকস্মিক পরিবর্তন দেখা দেবে: এবং আমাদের মনোবলের কাছে শত্রুর পরাজয় সুনিশ্চিত। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা এইরকম উদ্ভট বিচারধারা গ্রহণ করতে পারি না। কিন্তু শ্রীযুক্ত দিলীপ ঘোষরায় ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে গান্ধীজীর স্বীকার করতে চান নি। কিন্তু ঐ একই সংখ্যায় "রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র" প্রবন্ধের লেখক মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন, "১৯২০ সালে যদি তিনি তাঁর সংগ্রামের নতুন অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে না আসতেন তাহলে ভারত হয়ত আজও শক্তিহীন থেকে যেত—এ কথায় একটুও বাহুল্য নেই। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর দান অতুলনীয়—অনন্যসাধারণ। কোন একক মানুষ অনুরূপ অবস্থায় এর থেকে বেশি অর্জন করতে পারেন নি।"

বর্তমানে গান্ধীবাদ আমাদের কাছে ভ্রান্ত মনে হয় কেন ? আমার মনে হয় এর জন্য দায়ী স্বয়ং তথাকথিত গান্ধীবাদীরা। মনে রাখতে হবে গান্ধীজীর মতবাদের চেয়ে তিনি নিজেই ছিলেন মহৎ। তাঁর মূল সিদ্ধান্ত ছিল "Plain living and high thinking" বর্তমানের তথাকথিত গান্ধীবাদীদের দিকে তাকিয়ে দেখুন তো।

সাম্যবাদী বিচারধারার সফল সঞ্চালনের জন্য সমগ্র [illegible] জনতা চেষ্টিত: অর গান্ধীবাদকে মুছে ফেলবার জন্য স্বয়ং গান্ধীবাদীরাই উঠে পড়ে লেগেছেন। [illegible] গান্ধীবাদী না গান্ধীজীবী ? বস্তুত [illegible] গান্ধীবাদে [illegible] গান্ধীবাদী বলে [illegible] প্রমাণিত হন তাঁরা [illegible] গান্ধীবাদী। তাই গান্ধীবাদের [illegible] জন্য দায়ী [illegible] তথা [illegible] গান্ধীবাদী। বিশ [illegible] কেন আশা-আকাঙ্ক্ষা [illegible] পারে নি—পূরণ করে চলেছেন [illegible] নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থ।

কিন্তু [illegible] বিষয়ক চিন্তাধারা [illegible] 'অধ্যাত্মিকতা' বলে যে [illegible] না করা কি [illegible] গান্ধীজীর মূল সিদ্ধান্ত 'অধ্যাত্মবাদ ও সত্যের সন্ধান'। রাজনীতি ছিল তাঁর গৌণ বিষয়। তাঁর প্রকৃত বিচারধারার সফল সঞ্চালনের জন্য যে ভূমির প্রয়োজন সেই ভূমি তৈরি করাই ছিল তাঁর আসল লক্ষ্য। তাই [illegible] তিনি কখনও 'Mass' হিসাবে দেখেন নি। প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে [illegible] সংশোধনের পথ দেখিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। Louis Fischer তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যা বুঝেছিলেন তা এইভাবে ব্যক্ত করেছিলেন "In the midst of his historic 1946 negotiations with British Cabinet Ministers on India's impending independence, I watched Gandhi try to patch up a marital disput between two untouchables. This was his idea of democracy. He took the misdeeds and himself; he had not done enough to improve them. He regarded the good in a person as all of that person, and did not look for the bad. The person tried to be worthy of Gandhi's faith; the person grew. Gandhi endeavoured to degrade, debase, humiliate, and hurt none, to elevate all That is democracy too.' গান্ধীজী চেয়েছিলেন ব্যক্তির 'self purification' ও 'self realisation' গান্ধীজীর রাজনীতি বিষয়ক চিন্তাধারার [illegible] প্রমাণের আগে প্রমাণ করতে হবে রাজনীতিতে শৃঙ্খলাবদ্ধতা [illegible] 'আত্ম-শুদ্ধি ও আত্মজ্ঞান এর প্রয়োজনীয়তা কিছুমাত্র না। [illegible] গান্ধীজীর রাজনীতি বিষয়ক চিন্তাধারার শুধু [illegible] বা সমালোচনা করে থাকি কিন্তু তিনি তাঁর বিচারধারার সফল [illegible] যেভাবে ভূমি তৈরি [illegible] বলে গেছেন [illegible] তাকা[illegible] না। এর নেই [illegible] গান্ধীবাদের [illegible] —আর এর নেই গান্ধীবাদের [illegible] ব্যর্থতা।

—শ্যামাপদ দে
দেওঘর কলেজ, দেওঘর

*

আপনার সম্পাদিত সাপ্তাহিক বসুমতীর ১৫ই আগস্টের সংখ্যায় শ্রীদিলীপ ঘোষরায়ের গান্ধীবাদ কি সচল ? রচনাটি পড়লাম। এই রচনাটি বিতর্কমূলক বলে আমি মনে করি না, কেন না এই প্রবন্ধটি এত বেশি বলিষ্ঠভাবে একটি ঐতিহাসিক সত্যকে তুলে ধরেছে যে হাজার চেষ্টা করেও এর বিরুদ্ধে কোন যুক্তি খাড়া করা সম্ভব নয়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অসংখ্য শহীদের রক্তস্নানের পিছনে যে চক্রান্ত কাজ করছিল সেটা তো পুঁজিপতি জমিদারের নেতৃত্ব। এবং এই নেতৃত্বই তো গান্ধীবাদের মধ্য দিয়ে সহস্র বছরের পরাধীন অশিক্ষিত ভারতবাসীকে বিভ্রান্ত করতে পেরেছিল। তারই বিষময় ফল ভারতবর্ষ ভোগ করছে। যাই হোক এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধে একটি কথাই বলার আছে তা হচ্ছে দিলীপবাবু দেখিয়েছেন গান্ধীজীর অলৌকিক ক্ষমতা। আসলে এই 'ক্ষমতা" প্রচারের মধ্য দিয়ে জনগণের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়েছিল।

এই প্রবন্ধটির কেবলমাত্র উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই করবো না সাথে সাথে লেখক ও সম্পাদিকা দুজনকে এই প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ জানাবো।

—[illegible] মিত্র
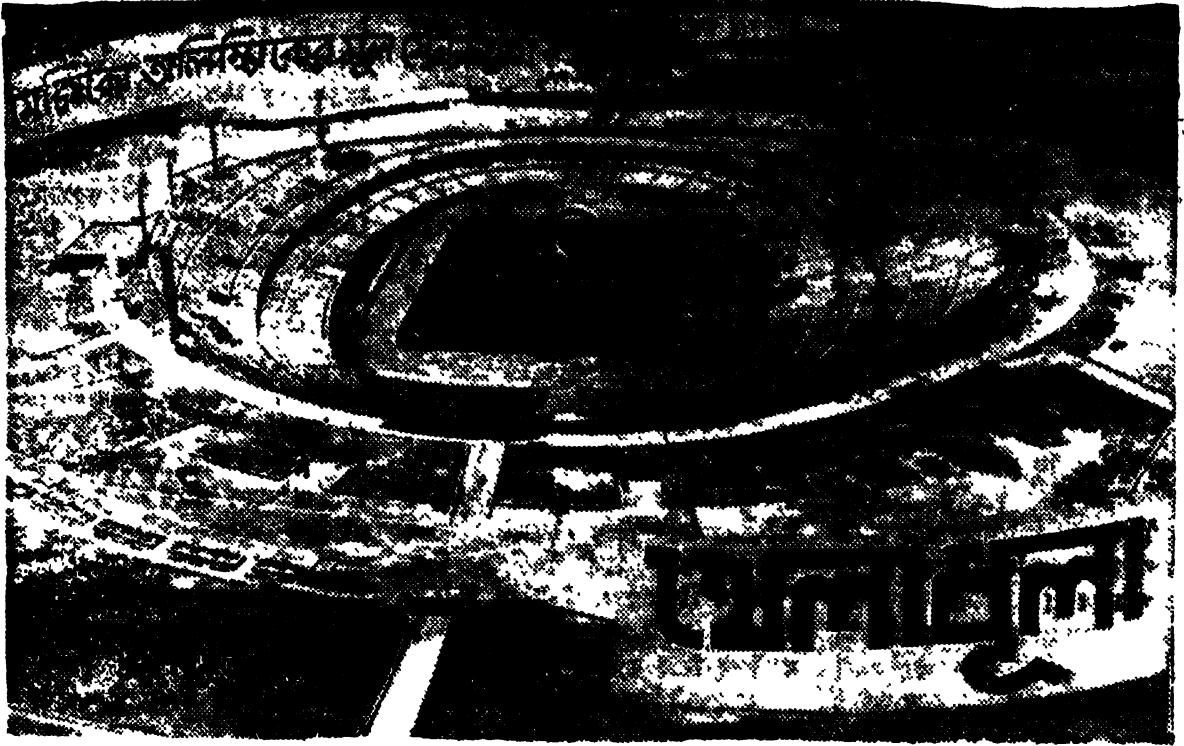
অনাচার

আচার আর অনাচার কথা দুটির মধ্যে সম্পর্ক বোধহয় বড়ই মধুর। যেমন আলো আর অন্ধকার—অর্থাৎ আলো আছে বলেই যেমন অন্ধকারকে বোঝা যায় কিম্বা অন্ধকার আছে বলেই যেমন আলোর অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় তেমনি আচারের প্রশ্ন আছে বলেই বোধহয় অনাচার আমাদের কাছে অতো বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। তাই অনাচার সম্বন্ধে আমরা উঠি হুঁশিয়ার হয়ে। চাই—সেই অনাচারের প্রতিবিধান করে সুবিচারের সুব্যবস্থায় আবার সব কিছু সহনীয় হয়ে উঠুক। তাই আজ সময় এসেছে ক্রীড়াজগতের সমস্ত অনাচারকে নির্মূল করার, সময় এসেছে সমস্ত অন্যায়, অবিচার আর অনাচার চর্চার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার। জানি খুবই কঠিন এ কাজ, হয়তো বা অসম্ভবও। তবু চেষ্টা করতে দোষ কি? কারণ সেই চেষ্টার ফসলই হয়তো একদিন ফলে-ফুলে ভরে উঠে ক্রীড়াজগৎকে ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেবে।

প্রথমেই ধরা যাক আই এফ এ আর কলকাতার ফুটবলের কথা। গত সংখ্যায় আমরা আই এফ এ-র আব্দার সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলাম। আই এফ এ-র আব্দারের বহর দেখে তামরা তো থ। কিন্তু অমন আব্দার করতে যে যোগ্যতা থাকার দরকার তার কতটুকু আছে ইণ্ডিয়ান ফুটবল এ্যাসোসিয়েশন এর? কর্মদক্ষতার চেয়ে মুখের জোরে বাজীমাৎ করার প্রচেষ্টা আজ আই এফ এ কর্তৃপক্ষকে বেশিভাবে পেয়ে বসেছে। ফলে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। বাংলা দেশের ফুটবল খেলার কিম্বা খেলানো থেকে আরম্ভ করে সব কিছুর ভার আই এফ এ-র ওপর। ফুটবল খেলার উন্নতি থেকে আরম্ভ করে খেলার পরিচালন দায়িত্ব কতোটা সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন আমাদের মহান-মাননীয় আই এফ এ কর্তৃপক্ষ?, তার প্রমাণ ....?

বেশি দূরে যাবার দরকার নেই। কলকাতার ফুটবলের দিকে তাকালেই দেখতে পাওয়া যাবে সমস্যায় কণ্টকিত চরম অব্যবস্থায় অবস্থিত একটি ফুটবল সংস্থাকে। কলকাতা তথা বাংলা দেশে ফুটবল খেলার পরিচালনভার যাদের ওপর তাঁরা নিজেরাই আজ নিজেদের ঘর সামলাতে ব্যস্ত। কিন্তু দুর্বল কর্তৃপক্ষ তাকিয়ে থাকেন বড় বড় ক্লাবগুলোর দিকে। নিজেদের মৌলিকতা তাঁরা যেন হারিয়ে ফেলেছেন। স্বাধীন কর্মক্ষমতাও নেই। নেই পরিচালকের সেই সহজ সংযত এবং সিদ্ধান্তে অটল কড়া মনোভাব। অথচ কিছু করার দরকার তা সে ভালো হোক, মন্দ হোক—যাই হোক না কেন সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা যখন আছে তখন নিতেই হবে—তার জন্যে পরে যদি অনেক কাঠ-খড় পোড়ে, তাতেও পিছুপা হবার দরকার নেই। এ বছরের সিঙ্গল লীগ খেলার সিদ্ধান্তও আই এফ এ-র অমনি একটি অমূলক আচরণের সাম্প্রতিক উদাহরণ।

যাক সে কথা—ধরা যাক মারডেকা ফুটবলের কথা। ভারতীয় দল গঠনের পর সদম্ভে ঘোষণা করা হলো যে ভারতীয় দলের আক্রমণভাগে খেলোয়াড়দের গোল করার দুর্বলতা ছাড়া দলটি খুবই শক্তিশালী। বিশেষ করে রক্ষণভাগটি দুর্ভেদ্য। তাই অনেকেই আশা করেছিলেন যে বেশি গোল করতে না পারলেও গোল হয়তো ভারতীয় দল বিশেষ একটা খাবে না। কিন্তু আসল জায়গায় হলো কি? থাইল্যাণ্ডের মতো দুর্বল দলও ভারতের দুর্ভেদ্য রক্ষণভাগকে বিধ্বস্ত করে গোল করলো। ভারতও উঠতে পারলো না ফাইন্যাল রাউণ্ডে। এর পরেও কি বলতে হবে যে ফুটবল খেলার মান উন্নত হচ্ছে? হয়তো অনেকের মনে প্রশ্ন জাগবে যে ভারতীয় দল প্রসংগটিও আই এফ এ-র আওতায়—আই এফ এ-কে কেন দোষ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ভারতীয় দল বলতে বাংলার খেলোয়াড়দেরই বোঝায়। ফলে বাংলার খেলোয়াড়রা ভালো খেললে ভারতীয় দলও ভালো খেলতো সুতরাং...। শান্তিপ্রিয়

অ্যাসেজ লড়াই

এ বছরের অ্যাসেজ লড়াই শেষ হয়ে গেলো। মরশুমে ১—১ খেলায় অমীমাংসিত থাকলেও অ্যাসেজ থেকে গেলো অস্ট্রেলিয়ার হাতে পূর্ব জয়লাভের সূত্রে।

তবে ইংলণ্ডের অধিনায়ক কলিন কাউড্রের সান্ত্বনা যে শেষ টেস্টে ইংলণ্ড হারাতে পেরেছে অস্ট্রেলিয়াকে। পঞ্চম ও শেষ টেস্টে ইংলণ্ড ২২৬ রানে হারিয়ে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়াকে। আমরা এর আগে অনেকবার লিখেছি যে এবারের ইংলণ্ড দল অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। তারপর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে রাবার জিতে আসায় ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের মনোবল গিয়েছিলো অনেক বেড়ে।

তবু প্রথম টেস্টে ইংলণ্ডকে হারতে হয়েছিলো। অবশ্য তার জন্যে বিশেষভাবে দায়ী প্রথম টেস্ট খেলার সময়কার অস্বাভাবিক আবহাওয়া। ইংলণ্ডকে চতুর্থ টেস্টে হতে হয়েছিলো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হয়ে।

॥ বিল লরি ॥
অ্যাসেজ বজায় রেখে দেশে ফিরছেন। শেষ টেস্টে পরাজিত হলেও নিজে করেছেন শতরান।

কিন্তু তারপর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ টেস্টে ইংলণ্ড আপ্রাণ চেষ্টা করেছে জেতার জন্যে। কিন্তু ইংলণ্ড দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্টে সে সুযোগ হারিয়েছে ঐ একই কারণে অর্থাৎ অস্বাভাবিক আবহাওয়ার জন্যে।

শেষ পর্যন্ত চতুর্থ টেস্টও শেষ হলো অমীমাংসিতভাবে। আর সেই সংগে অ্যাসেজের ভাগ্যও চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়ে গেলো। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বিল

॥ বেসিল ডি অলিভেরা ॥
ইংলণ্ডের বর্ণবৈষম্য নীতির শিকার অলিভেরা সুযোগ পেলেন না দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে এম সি সি দলের প্রতিনিধিত্ব করার।

লরীও হলেন নিশ্চিন্ত। অ্যাসেজ হারাবার ভয় আর থাকলো না। কিন্তু তারপর!

তারপর লরীর ইচ্ছে ছিলো টেনেটুনে শেষ টেস্টটাকেও অমীমাংসার পথে নিয়ে যাবার। তাহলে টেস্ট ম্যাচে পরাজয়ের হাত এড়িয়ে সিরিজ জেতার সম্মান অর্জন করতে পারবে অস্ট্রেলিয়া।

কিন্তু ইংলণ্ডের অধিনায়ক কলিন কাউড্রেও চেয়েছিলেন শেষ টেস্টে জয়লাভ করতে। তাহলে আর যাই হোক পরাজিত অধিনায়ক হিসেবে তিনি পরিচিত হবেন না। কারণ অ্যাসেজ জেতার প্রশ্ন তখন আর না থাকলেও, মরশুম হারার সংশয় যে তখনো ছিলো।

তাই প্রথম থেকেই ইংলণ্ড ছিলো সতর্ক। প্রথমে ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়ে ইংলণ্ড করলো ৪৯৪ রান। এর মধ্যে এডরিচ করলেন ১৬৪ আর অলিভেরা করলেন ১৫৮ রান। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ১০৫ রান করায় তারা সামলে গেলো। বাঁচলো ফলো অনের হাত থেকেও। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হলো ৩২৪ রানের মাথায়।

দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ড বিশেষ সুবিধে করতে পারলো না। অবশ্য সে বিপর্যয় একদিক দিয়ে শাপে বর হয়েছে ইংলণ্ডের কাছে। মাত্র ১৮১ রানে হয়ে গেলো ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস।

অস্ট্রেলিয়া যখন তাদের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করলো তখন তারা ৩৫১ রানে পিছিয়ে। কিন্তু জয়লাভের প্রশ্ন তখন তাদের কাছে অবান্তর হয়ে গেছে। পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য অস্ট্রেলিয়াকে তখন আপ্রাণ [illegible] চালাতে হলো।

এডরিচ সেরা

এ বছরের ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট মরশুমে ইংলণ্ডের এডরিচ সেরা ব্যাটসম্যানের সম্মান লাভ করেছেন। পুরস্কার হিসেবে তিনি পেয়েছেন ২৫০ স্টার্লিং। পাঁচটি টেস্টে এডরিচ করেছেন মোট ৫৫৪ রান। গড়ে ইনিংস প্রতি ৬১·৫ রান।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব চেষ্টাই বিফলে [illegible] দিনে

॥ এডরিচ ॥
শেষ টেস্টেও করেছেন শতাধিক রান

বৃষ্টি আসায় ইংলণ্ড যেমন হারাতে বসেছিলো জয়লাভের সুযোগ, তেমনি অস্ট্রেলিয়া পড়লো আরো বিপাকে।

আণ্ডারউডের মারাত্মক বোলিং-এর বিরুদ্ধে মোটে মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারলেন না অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরা। মাত্র ১২৫ রানে শেষ হয়ে গেলো অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস। আণ্ডারউড ৩১·৩ ওভার বোলিং করে ১৯টি মেডেন ওভার পেয়ে ৫১ রানের বিনিময়ে ৭টি উইকেট পেলেন।

ফলে এ্যাসেজ লড়াই এর শেষ টেস্টে অস্ট্রেলিয়া পরাজিত হওয়ায় এ মরশুম থেকে গেলো অমীমাংসিত।

এ বছরের আই· এফ· এ শীল্ডের খেলা কলকাতা ময়দানে সপ্তাহ দুয়েকের পুরনো হলেও আসল খেলা আরম্ভ হচ্ছে এই সপ্তাহ থেকে। কলকাতা ময়দানের তিন প্রধান এই সপ্তাহেই মাঠে নামছে।

আর এদের আগমনের সংগে সংগেই ময়দানী ফুটবলের চেহারাটাই যাবে পাল্টে। ফুটবলানন্দে মুখর হয়ে উঠবে কলকাতা ময়দান। সেই সংগে জমে উঠবে আই· এফ· এ শীল্ডের খেলাগুলো।

গত বছরের শীল্ড ফাইন্যাল খেলা আই· এফ· এ কর্তৃপক্ষের কর্মদক্ষতার ফলে পরিত্যক্ত হয়েছে। ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বী দুটি দলের মধ্যে মোহনবাগানের চেয়ে ক্ষতির বহরটা ইস্টবেঙ্গলের বেশি। কারণ গত বছরের শীল্ড ফাইন্যাল খেলা পরিত্যক্ত হওয়ায় তারা হারালো ত্রিমুকুট বিজয়ের সম্মান।

তাই এ বছরের শীল্ডের শেষ গতি কি হবে তাই নিয়ে এখনই বিশেষ কারো মাথাব্যথা না থাকলেও একটু-আধটু চিন্তার কারণ তো আছেই।

এ বছরের আই· এফ· এ শীল্ডের শেষ পর্যায়ের খেলাগুলো পরিচালনা করার জন্যে বাংলার বাইরে থেকে কয়েকজন রেফারী আনা হচ্ছে। আর তার জন্যে খরচও হবে বেশ কয়েক হাজার টাকা।

কিন্তু একটা কথা আজ বার বার মনে হচ্ছে। জানি নে আমার এ মনোভাব সম্পূর্ণভাবে সংকীর্ণতার পরিচায়ক কি না! যদি তাই হয় তাহলেও ব্যাপারটার গুরুত্ব কোন অংশেই কমবে না।

সত্যিই কি আই· এফ· এ শীল্ডের বড় খেলাগুলো পরিচালনা করার জন্যে বাইরে থেকে রেফারী আনার কোন প্রয়োজন আছে? আমার এ প্রশ্ন শুধু মাত্র সি· আর· এ, আই· এফ. এ-র কাছেই নয়—পাঠক-পাঠিকাদের কাছেও।

তা ছাড়া এ বছর বড় বড় খেলাগুলোয় রেফারীর পোস্টিং নিয়েও আই· এফ· এ-র কর্মকর্তাদের নাক গলাতে দেখা গেছে। আর তাই নিয়ে উঠেছে প্রতিবাদের ঝড়।

তাই আজ সব দিক বিচার করে মনে জেগেছে নানা প্রশ্ন। শেষ পর্যন্ত আই· এফ· এ-র এই জুবিলী বছরে কি যে হবে কে জানে! শীল্ডের পরে বসবে সুপার লীগের আসর। কিন্তু এ এখন আর আজকের কথা নয় ভবিষ্যতের বিষয়...।

কুয়ালালামপুরের মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দল খেলছে জাপানের বিরুদ্ধে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে জাপানের গোলরক্ষক কে ফুনামোতোকে ভারতীয় খেলোয়াড়দের একটি আক্রমণ প্রতিহত করতে। এই খেলায় ভারত এক গোলে

[illegible]
দু'সংখ্যায় আমরা ফুটবল খেলার ১১ নম্বর নিয়ম অফসাইড সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এই সংখ্যাতেও অফসাইড নিয়মের বাকী অংশ বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে ছবির সাহায্যে।
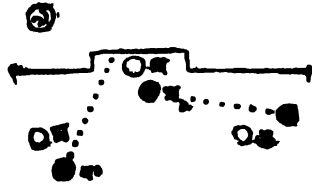
৯ নম্বর ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে ক একটা বল গোলে মারলো। ক বলটা মারার সংগে সংগে খ তার জায়গা থেকে ছুটে খ১ জায়গায় চলে এলো। যাতে সে প্রতিপক্ষ দলের গোলরক্ষক গ-কে বলটা ঠিক মত ধরতে না দিতে অর্থাৎ অসুবিধেয় ফেলতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে খ-এর অফসাইড হবে। কারণ সেই একই। খ ছিলো বলের আগে আর ক যখন বলটা গোলে মারলো তখন খ-এর সামনেও ছিলো না প্রতিপক্ষ দলের দু'জন খেলোয়াড়।
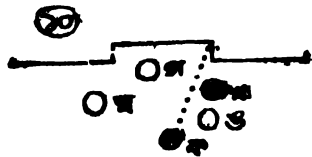
১০ নম্বর ছবির বেলাতেও খ-র অফসাইড হবে। কারণ ক যখন বলটা গোলে শট করেছে তখন খ ছুটে এসে

ঙ-কে সামলাতে গেলো। কিন্তু আইনত খ তা করতে পারে না। কারণ ক যখন বলটা মারছে তখন খ-তো বলের সামনে ছিলোই, এমন কি খ-এর সামনে প্রতিপক্ষ দলের গোল লাইনের মধ্যে দু'জন প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ও ছিলো না।

১১ নম্বর ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে ক কর্নার কিক করায় বল এলো খ-এর কাছে। খ-ও সংগে সংগে বলটা গোলে মারলো আর সেই বলটা ওদের নিজেদের দলের খেলোয়াড় চ-এর পায় লেগে গোলে চুকলো। কিন্তু এক্ষেত্রে চ-এর অফসাইডের জন্যে রেফারী গোলটা বাতিল করে দেবেন। কারণ কর্নার কিক থেকে বল পেয়ে খ যখন বলটা গোলে মারলো তখন চ ছিলো বলের সামনে, তা ছাড়া গোল-লাইন ও চ-এর মধ্যে ছিলো না দু'জন প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়। অতএব এক্ষেত্রে চ এর অফসাইড হবে।
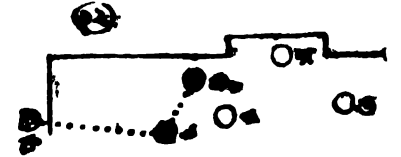
১২ নম্বর ছবির ক্ষেত্রেও অফসাইড হবে একই নিয়মে। ক থ্রো করে বলটা খ-কে দিয়ে দৌড়ে চলে গেলো ক১ স্থানে। খ তখন বলটা ক-কে ক১ স্থানে পাস করলো। কিন্তু ক তখন অফ-সাইডে। কারণ খ যখন বলটা ক-কে ক১ স্থানে ঠেলে দিচ্ছে ক তখনই চলে গেছে বলের সামনে। আর ক-এর সামনেও তখন নেই প্রতিপক্ষ দলের দু'জন খেলোয়াড়, সুতরাং......।

আশা করি অফসাইড নিয়ে এই সচিত্র আলোচনায় খেলার আইন সংক্রান্ত বিষয়ে উৎসাহী আর খেলোয়াড় পাঠকদের কিছুটা সুবিধে হচ্ছে এই বিষয়ে বিবাদ মিটোবার জন্যে। এই আলোচনা আপনাদের কেমন লাগছে জানালে বাধিত হবো।

মেক্সিকোর পথে এখন চলেছে অলিম্পিক মশাল। গ্রীস থেকে জাহাজযোগে প্রজ্বলিত মশাল ইতালী হয়ে এখন এগিয়ে চলেছে। মশালটি বার্সিলোনা থেকে সালভাদরে পৌঁছবে আর সেখান থেকে মশালটি যাবে মেক্সিকো শহরে।

* * *

মালয়েশিয়া এবার কুয়ালালামপুরের মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। এই প্রতিযোগিতায় রানার্স আপ হয়েছে বর্মা। আর ভারতের ভাগ্যে জুটেছে ষষ্ঠ স্থানটি।
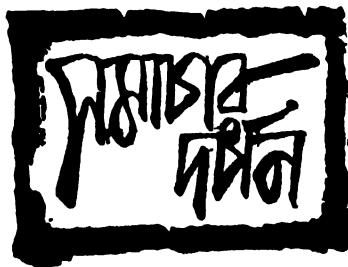
ব্যাংককে বসবে ১৯৬৯ সালের এশীয় [illegible] প্রতিযোগিতার আসর। এপ্রিল মাসের শেষ ভাগে অনুষ্ঠিত হবে এই প্রতিযোগিতা। ঠিক হয়েছে যে ১৯৭০ সালে হংকং-এ আর ১৯৭১ সালে জাপানে বসবে এশীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর।

* * *

পাক-ভারত ক্রিকেট দলের উভয় দেশ ভ্রমণের প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হলো। পরিত্যক্ত হয়েছে পাকিস্তানের গোঁয়ের জন্যে। তারা কিছুতেই ভারতের প্রস্তাব মেনে নিয়ে দু'দেশের মধ্যে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা চালাতে দেবে না।

হৃষীকেশচন্দ্র দে (রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা—৫)।

প্রশ্ন : ভারতীয় ফুটবল দল কোন্ বছর মারডেকা লাভ করেছিলো?

উত্তর : সে সৌভাগ্য কি ভারতীয় দলের এখনো হয়েছে?

মণীন্দ্র ভৌমিক (বাণীবন, হাওড়া)

উত্তর : আপনি ঠিকই ধরেছেন—ওটা ছাপার গোলমাল হয়েছিলো। অবশ্য ব্লকটা এদিক-ওদিক হবার জন্যে আশা করি বিশেষ কোন অসুবিধে হয় নি কারো। ভুল ধরার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।

হীরেন্দ্রমোহন তন্ত্র (সুভাষ পল্লী, শিলিগুড়ি)

প্রশ্ন : ইংলণ্ডের পিটার রিচার্ডসন ও হাটন আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ওয়ালকট ও উইকসের ব্যাটিং এ্যাভারেজ জানতে চাই।

উত্তর :

নাম	টেস্ট	ইনিংস	অপঃ	রান	সর্বোচ্চ	শতরান	এ্যাভাঃ
রিচার্ডসন	৩৪	৫৬	১	২০৬১	১২৬	৫	৩৭·৭৪
হাটন	৭৯	১৩৮	১৫	৬৯৭১	৩৬৪	১৯	৫৬·৬৭
ওয়ালকট	৪৪	৭৪	৭	৩৭৯৮	২২০	১৫	৫৬·৬৮
উইকস	৪৮	৮১ ...	৫	৪৪৫৫	২০৭	১৫	৫৮·৬১

মেণ্টু চক্রবর্তী (কালীবাড়ি রোড, হাফলং আসাম)

প্রশ্ন : আই এফ এ শীল্ডে প্রদীপ ব্যানার্জী, চুনী গোস্বামী ও বলরামের কে বেশি গোল করেছেন এবং কতোগুলো?

উত্তর : আমার জানা নেই। ওঁরা নিজেরাও জানেন কি না সন্দেহ। তবে আপনাদের কারো জানা থাকলে জানাবেন।

স্বপন চণ্ডী, গণেশ ও শিবেন (ছোটবাজার রাণাঘাট নদীয়া)

প্রশ্ন : বর্তমানে পৃথিবীর সেরা স্পিন বোলার ও অলরাউণ্ডার আপনার মতে কে?

উত্তর : ল্যান্স গিবস ও গাঃ সোবার্স!

অলকেশ গুহকর্মকার (তেজগঞ্জ, বর্ধমান)

প্রশ্ন : টেস্ট ম্যাচের হিসেবে বোরদে ও জয়সীমার মধ্যে কার রান সংখ্যা বেশি?

উত্তর : এখনো বোরদের।
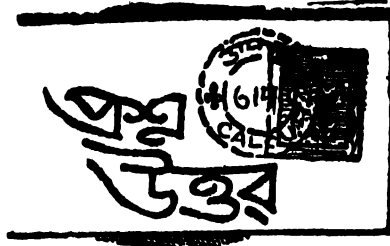
এ. এ. মোল্লা (এস্টেট অফিস, দুর্গাপুর স্টীল প্লান্ট, দুর্গাপুর—৫)

উত্তর : আপনার উত্তর আর নতুন করে দিলাম না। ক্লাব পরিচিতি বিভাগে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান আর মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিষয়ে লেখার সময় বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে। আশা করি আপনি দেখে নেবেন। যদি না পান জানাবেন, তাহলে আবার জানাবো।

পরিতোষ নাগ (প্রসন্ননগর, বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

উত্তর : ক্রিকেট খেলার সময় আবার ক্রিকেট খেলার আইন-কানুন নিয়ে আলোচনা করবো। ইঞ্জিনিয়ার সম্বন্ধে আমরা তো আগেই লিখেছি। যাই হোক খেলোয়াড়দের কে কেমন খেলেন এ বিষয়ে স্পষ্টাস্পষ্টি উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না, কারণ কোন খেলোয়াড় আজ ভাল খেলেন, আবার হয়তো কাল খারাপ। তাই ...। যাই হোক সাপ্তাহিক বসুমতীর খেলাধুলো বিভাগটা আপনার ভালো লাগে জেনে আমরা উৎসাহিত বোধ করছি।

দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় (ইন্দিরা দেবী রোড, বেহালা

উত্তর : আপনার এই প্রশ্নটার উত্তর [illegible] ফুটবলের এই [illegible] না দেওয়াই ভালো।

রণজিৎ চন্দ (বিজয়পুর, ২৪ পরগনা) ও **অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায়** (চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব, চন্দননগর, হুগলী)

উত্তর : আপনাদের চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। প্রমাদবশত বাঙালী টেস্ট ক্রিকেটার তালিকায় সুব্রত গুহ ও মণ্টু ব্যানার্জীর নাম বাদ পড়েছিলো। গত সংখ্যাতেই এ বিষয়ে লেখা হয়েছে। আশা করি আপনারাও দেখে থাকবেন। সাপ্তাহিক বসুমতীর খেলাধুলো বিভাগ সম্বন্ধে আপনাদের মতামত জানতে পারলে খুশি হবো।

অনিমেষ শিকদার (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, বিজ্ঞান বিভাগ, ১ম বর্ষ, নৈহাটী, ২৪ পরগনা)

উত্তর : আপনার চিঠি থেকে কিছু অংশ তুলে দিলাম পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্যে।

."যদি '৬৭ সালের শীল্ড ফাইন্যালে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানকে যুগ্ম বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হোত তা হলে ইস্টবেঙ্গলই হতো একমাত্র টীম যে ত্রিমুকুট অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করতো। পরিশেষে একটা কথা বলে আই· এফ এ-র দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে তারা যেন স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করার পর তাঁদের সিদ্ধান্তে পৌঁছান ..!"

সমরেশ রায় (কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা-৪)

প্রশ্ন : খেলোয়াড়রা কি খেতে ভালোবাসেন?

উত্তর : গালাগালি!

কল্যাণ কর্মকার (আসানসোল)

প্রশ্ন : ভালো খেলোয়াড় হতে গেলে কি করতে হবে?

উত্তর : প্রথমে নিজের পায়ে তারপর কোচদের পায়ে তেল মালিশ করতে হবে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

৭৩ বর্ষ : ১০শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২৭শে ভাদ্র, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 12th September, 19…

বিকল্প পরিবহন ব্যবস্থা

কলকাতায় ও তার উপকণ্ঠে বে-সরকারী বাসের ভাড়া বৃদ্ধিতে প্রতিবাদ ক্রমশ মুখর হয়ে উঠছে। সরকার পুলিশ দিয়ে প্রতিবাদকারীদের শায়েস্তা করা ছাড়া সমস্যা সমাধানের জন্য এক পা-ও অগ্রসর হয় নি। জনির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সুস্পষ্ট শাসন যখন থাকে না—তখন জনগণের প্রতি সরকারের দায়িত্বও হয়তো থাকে না—সেই বিবেচনায় কি বর্তমান সরকার অন্যায় ভাবে ভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে নিজের মুখে কুলুপ এঁটে দিয়েছে?

সরকারী বা বে সরকারী বাসের কর্তৃপক্ষের কোনো রকম দরদ যাত্রীদের প্রতি নেই। কম সংখ্যক বাসে বা কম খরচে তারা সাধারণ মানুষের মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে পেলেই খুশি। অবাক হতে হয় তখনই, যখন দেখা যায় সরকার বিবেক বুদ্ধি ও সহানুভূতি নিয়ে সাধারণ মানুষের দিকে এগিয়ে আসে না। কলকাতার উপকণ্ঠ থেকে কলকাতায় এবং খোদ কলকাতার বুকে পরিচালিত বাসগুলিতে ক্রমাগত যাত্রীদের সংখ্যা বাড়ছে। ভাড়া বৃদ্ধিতে বাসের মালিকদের আয় হয় যতো বেশি, ততো বেশি দুর্গতি বাড়ে যাত্রীদের। বর্তমানে এই দুর্গতি চরমে উঠেছে। সুতরাং ভাড়া বৃদ্ধির কোনো প্রয়োজন নেই। এখন সর্বাপেক্ষা যা বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে—তা হচ্ছে পরিবহন সমস্যা সমাধানকল্পে নতুন পথে অগ্রসর হওয়া।

নতুন পথ কি? সেই পথ হচ্ছে, বাসগুলির ওপর আত্যন্তিক নির্ভরতা দূর করার জন্যে এই মুহূর্তে চক্রবেড় রেলপথ স্থাপন করা।

চক্রবেড় রেলপথ স্থাপন করার পরিকল্পনা নতুন নয়। কলকাতায় চক্রবেড় রেলপথ নির্মাণের জন্য বের হয়েছিল ১৯৪৭ সালে জিনওয়ালা-রিপোর্ট, ১৯৫৩ সালে রায়-রিপোর্ট ও ১৯৫৬ সালে সারঙ্গপানি রিপোর্ট। প্রত্যেকটি রিপোর্টেই ছিল অখণ্ডনীয় যুক্তি। তাছাড়া ছিল—তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আপ্রাণ চেষ্টা। বলা যেতে পারে, একমাত্র তাঁরই প্রচেষ্টাতেই ট্রাম বাস ছাড়া বিকল্প পরিবহন ব্যবস্থা কার্যকর করার কথা পরিকল্পনা করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু কলকাতাবাসীদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, কলকাতার একশ্রেণীর ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি (এঁরা সৌভাগ্যবান, কারণ ট্রামে বাসে এঁদের চড়তে হয় না) খুব একটা ইচ্ছুক ছিলেন না—ট্রাম বাস ছাড়া চক্রবেড় রেলপথ নির্মাণের ব্যবস্থা করার। তাই চক্রবেড় রেলপথের পরিকল্পনা বানচাল করার জন্য এলো ভূগর্ভস্থ রেলপথ, শূন্যে ঝোলানো রেলপথের পরিকল্পনা। অর্থাৎ পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা।

কিন্তু দেশে এখনো স্থিরমস্তিষ্কসম্পন্ন কিছু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি আছেন যাঁরা সাহসের সঙ্গে সোজা কথা বলেন। জনসাধারণ কর্তৃক কলকাতায় পরিবহন সমস্যার সমাধানের দাবিটাকে ত আর একেবারে অগ্রাহ্য করাও যায় না। তাই গঠিত হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি। এই কমিটি জোরালো যুক্তি দিয়ে কলকাতায় চক্রবেড় রেলপথ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা যে অপরিহার্য সেই অভিমত দিয়েছেন। রাজ্য সরকারও বিশেষজ্ঞদের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে একই অনুরোধ করেছেন।

অতএব দু' পক্ষের একই বিষয়ে সায় যখন রয়েছে, তখন আর কালবিলম্ব কেন? অবশ্য দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিদের মুখে দু-একটা কথা শুনে মনে হচ্ছে, [illegible] কিছুদিন সহ্য করতে হবে। কারণ,—চতুর্থ পরিকল্পনা। চতুর্থ পরিকল্পনার কাজকর্ম কবে থেকে শুরু হবে সে কথা আমরা আর শুনতে চাই না। আমরা চাই, কাজ আজই আরম্ভ করা হোক। চক্রবেড় রেলপথ নির্মাণের জন্য ব্যয় যাই হোক না কেন—সব চাইতে বড় কথা কলকাতার বুকে ও তার চারপাশে যে সব রেলপথ রয়েছে অভিজ্ঞদের অভিমতে [illegible] কাজ বহুদূর এগিয়ে আছে।

দেশে অর্থাভাব। তবু বিকল্প পরিবহন পরিকল্পনার নানান অপচেষ্টায় অর্থ ব্যয় কম হয় নি। আশা করি, সেই অপচেষ্টার প্রায়শ্চিত্ত করে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার তাদের সুবুদ্ধির পরিচয় দেবে। প্রসঙ্গত, সরকারী বা বেসরকারী বাসের কর্তৃপক্ষের মাথায় হাত দিয়ে বসার কোনো কারণ নেই। যথাযথ ব্যবস্থার দ্বারা বাড়তি বাসগুলিকে অনায়াসে পল্লীবাংলার মুখ দেখানো যেতে পারে। কিন্তু মুনাফালোভীরা কি সেপথে অগ্রসর হবেন? তাঁরা অগ্রসর না হলে জনসাধারণ নিরুপায়; চক্রবেড় রেলপথের প্রয়োজনীয়তা তবু অপরিহার্য।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

ইংরেজীর 'ডুয়েল ফাইট' কথাটাকে বাংলায় সম্মুখ সমর, অর্থাৎ সম্মুখ সমরে সমবেত দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বললে হয়তো খুব ভুল হবে না। তবু মধ্যপ্রদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা বলতে গিয়ে ডুয়েল ফাইট না বলে বোধহয় বলা উচিত ডি পি মিশ্র আর এস সি শুক্লা আজ অবতীর্ণ হয়েছেন সম্মুখ সমরে। দুজনেরই ধনুর্ভঙ্গ পণ—পিছিয়ে আসবো না।

তাই আজ মধ্যপ্রদেশকে কেন্দ্র করে সারা ভারতের কংগ্রেসী মহলে চলেছে আশা-নিরাশার দোলা। সংশয়ের কালো মেঘে মধ্যপ্রদেশের রাজনৈতিক আকাশ আজ সমাচ্ছন্ন। কিন্তু ঐ কালো-অন্ধকারের মধ্যেও আশার আলো দেখাবার ক্ষমতা রাখেন মাত্র একজনই। একমাত্র তিনিই হয়তো পারেন মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেসকে অনিবার্য ঐ সংঘর্ষের হাত থেকে বাঁচাতে।

রাজাজীর নাম আজ তাই সকলের মুখে মুখে। বিশেষ করে কেন্দ্র আর রাজ্যের কংগ্রেসী মহলে রাজা নরেশচন্দ্র সিং আজ অভাবনীয় আধিপত্যের আসনে আসীন। কিন্তু রাজনীতির অভিজ্ঞ নায়ক রাজা সিং মধ্যপ্রদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। তাই তিনি চাইছেন শ্যাম রাখতে আবার কুলও রাখতে। তিনি ডি পি মিশ্রর পরম ঘনিষ্ঠ হলেও চাইছেন না এই মুহূর্তে শুক্লাকে চটাতে।

কারণ রাজ্য ও রাজনীতিতে ডি পি মিশ্রর এই সাম্প্রতিক চালটি সময় থাকতেই ধরে ফেলেছেন রাজা নরেশচন্দ্র সিং। রাজাজী ঠিকই বুঝেছেন যে মিশ্রসাহেব তাঁকে দিয়েই সরাতে চাইছেন তাঁর পথের কাঁটা। মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে বর্তমান নেতা এস সি শুক্লাকে হটাতে ডি পি মিশ্র বদ্ধপরিকর। তাই বলতে এতো-টুকুও ইতস্তত করেন নি যে রাজা যদি নেতা হিসাবে নির্বাচিত হতে না চান তাহলে তিনি নিজেই শুক্লাকে হটাবার জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে অবতীর্ণ হবেন।

হয়তো শেষ পর্যন্ত তাই হতে হবে। কারণ রাজ্য ও রাজনীতিতে অভিজ্ঞ রাজা কাঁচা লোক নন। তিনি বেশ ভালোভাবেই

রাজা নরেশচন্দ্র সিং

জানেন যে মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেসে তাঁর মূল্য কতোখানি। কংগ্রেস যদি রাজ্যের আদিবাসী মহলকে হাতে রাখতে চায় তাহলে তাঁকে ছাড়া একপাও এগুবার ক্ষমতা নেই তাঁদের। তাই ডি পি মিশ্রর প্রস্তাবে তিনিও সাফ বলে দিয়েছেন যে উভয় পক্ষের সম্পূর্ণ সম্মতিতে তাঁকে যদি নেতা হিসেবে মনোনীত করা হয়, তাহলে তিনি আসেন—নয়তো নেই।

রাজ্য ও রাজনীতির সাম্প্রতিক পরি-স্থিতির বিচারে এক কথাই বলেছেন রাজা নরেশচন্দ্র সিং। আর বলবেন নাই বা কেন? রাজনীতি তো তাঁর কাছে কিছু আর নতুন নয়। মিশ্র মন্ত্রিসভা পতনের আগে পর্যন্ত তিনি পনেরো বছরেরও বেশি ছিলেন রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী। আর যে কাজে অভাবনীয় সাফল্যের পরিচয় দিয়ে তিনি আজ লাভ করেছেন আদিবাসী মহলের অদ্বিতীয় নেতার পদ।

হবেন নাই বা কেন। ছোটবেলা থেকেই যে তিনি আরম্ভ করেছিলেন আদিবাসী মহলে ঘোরাঘুরি। তবু রাজার ছেলে রাজাই। ১৯০৮ সালে সারনগড়ের রাজার ঘরে জন্ম নরেশচন্দ্র সিং-এর। তারপর বয়েস বাড়তে না বাড়তেই পড়াশোনা আরম্ভ হলো রায়পুরের রাজকুমার স্কুলে। কিন্তু পড়ার সময়ই আদিবাসীদের কল্যাণের জন্যে তিনি আরম্ভ করেছিলেন প্রচেষ্টা।

সমস্ত আদিবাসী অঞ্চল ঘুরে ঘুরে তিনি তাদের জানলেন, চিনলেন তাদের, পরিচিত হলেন তাদের কলা, সংস্কৃতি আর কৃষ্টির সংগে। নাচলেন, গান গাইলেন ওদের সংগে। সম্পূর্ণভাবে মিশে গেলেন ওদের সংগে। তবেই না আজকের রাজা নরেশচন্দ্র সিং আদিবাসী মহলে এতো প্রিয়।

তবু একটা কিন্তু থেকে গেছে রাজার নির্বাচনের ব্যাপারে। রাজাজী রাজন্য-ভাতা বিলোপের সরকারী সিদ্ধান্তের সমর্থক কিনা এখনো জানা যায় নি। অবশ্য ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতার কাছে এ সমস্যা কোন অন্তরায়ই নয়।

তাই আজ রাজা নরেশচন্দ্র সিং-কে ঘিরেই মধ্যপ্রদেশের রাজ্য ও রাজনীতিতে দেখা দিয়েছে আশা-নিরাশার দোলা। কিন্তু শুক্লা বলেছেন যে তিনি কিছুতেই পিছিয়ে আসবেন না; রাজা সিং-এর সিদ্ধান্ত, সর্বসম্মতিতে নির্বাচিত না হলে তিনি মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেসের নেতা হতে রাজী নন; আর ডি পি মিশ্র বলেছেন যে, রাজা যদি না চান তাহলে তিনিই লড়বেন শুক্লার বিরুদ্ধে। তাই মনে হচ্ছে যে শেষ মুহূর্তে মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেসী [illegible]......॥

বেশ কিছুকাল ধরে পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃতি অস্বাভাবিক আচরণ করে চলেছে। মাসদুয়েক আগে নিয়মিত বর্ষণ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সমগ্র ভাদ্রমাসে একফোঁটা বৃষ্টি হয় নি, কৃষকের পক্ষে এটা মোটেই সুলক্ষণ নয়। বিগত বর্ষার সমস্ত জলটাই মাটি টেনে নিয়েছে, প্রখর সূর্যতাপে ধানগাছের গোড়ায় ফাটল ধরেছে। এহেন অবস্থায় যদি আগামী দু'-চার দিনের মধ্যে বৃষ্টি না হয়, তাহলে ধানগাছগুলি জ্বলে যাবে। এতটা আশঙ্কার কোন কারণ ঘটত না, যদি গত বর্ষার দানকে ঠিকমত ধরে রাখার উপযোগী জলাধার থাকত, যদি দেশের মধ্যে বড় বড় খাল থাকত, যদি মজে-যাওয়া-নদীগুলি সংস্কৃত হত। কিন্তু নির্বোধ সরকার, ততোধিক নির্বোধ পরিকল্পনা কমিশন এবং সর্বাধিক অযোগ্য ও হৃদয়হীন প্রশাসনযন্ত্র সোনার দেশকে শ্মশানে পরিণত করেছে গত বিশ বছর ধরে। কাজেই আপাতত সেই প্রকৃতির করুণার ওপর নির্ভর করা ভিন্ন উপায় নেই। যদি দু'-চার দিনের মধ্যে কিছুটা বৃষ্টিও হয় তাহলে মঙ্গল।

রাজ্যপালের প্রশাসন

যুক্তফ্রন্টের আমলে একটা "গেল গেল" রব জোরদার হয়েছিল সর্বত্র। তখন কথায় কথায় আইন ও শৃংখলা বিপন্ন হয়ে পড়েছে বলা হত। কথায় কথায় বলা হত, পুলিশের মনোবল ভেঙে যাচ্ছে, শ্রমবিরোধ লেগেই চলছে আর [illegible] [illegible] দিন দেশের শিল্প-বাণিজ্যের সর্বনাশ করছেন। কিন্তু পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, রাজ্যপালের প্রশাসনে অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হয় নি, উল্টে প্রতিটি ক্ষেত্রে অবস্থার আরও অধোগতি হয়েছে। শ্রমবিরোধ কমা দূরে থাকুক, তা আরও বর্ধিত হয়েছে, ছাঁটাই, লে-অফ, লক-আউটের পরিমাণ কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্টের আমলের তুলনায় অনেক বেড়েছে। আর আইন ও শৃংখলার যে নিদর্শন আমরা পাচ্ছি, তাতে আইনের শাসনের কিছুমাত্র অবশেষ আছে বলে মনে হয় না। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, গুণ্ডামি, ধর্ষণ, লুঠতরাজ ও হত্যার মাত্রা পূর্বের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। পার্ক স্ট্রীটের দুঃসাহসিক ডাকাতির আজও কিনারা হল না।

মনে রাখতে হবে, রাজ্যপাল এখন শুধু নিয়মতান্ত্রিক প্রধানই নন, কার্যত পশ্চিমবঙ্গের শাসনযন্ত্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা তাঁর হাতে ন্যস্ত। অন্তত এটুকু আশা করা গেছল যে, রাষ্ট্রপতি-শাসনে সরকারী প্রশাসনযন্ত্রের কিছুটা উন্নতি হবে, কেন না কোন রাজনৈতিক দল বা নেতার চাপ প্রশাসনযন্ত্রকে সহ্য করতে হবে না এবং বাইরের হস্তক্ষেপ মুক্ত হয়ে প্রশাসকগণ তাঁদের যোগ্যতা চূড়ান্তভাবে প্রদর্শন করবেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসীর সকল আশার মতই এই আশাটুকুও হতাশায় পরিণত হয়েছে। বন্যাত্রাণের ব্যাপারে রাজ্যপালের প্রশাসন যে চূড়ান্ত রকম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে সে কাহিনী আমরা পূর্বে বহুবার উল্লেখ করেছি। সরকারী অফিসারদের মধ্যে খামখেয়ালী, কর্তব্যে অবহেলা, সরকারী নির্দেশকে অস্বীকার করার প্রবণতা যে কি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে, সাম্প্রতিক কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকেই তা বোঝা যাবে। একজন অফিসারের জায়গায় অপর একজন অফিসার যাচ্ছেন পুলিশের দপ্তর নিয়ে, পৃথিবীর ইতিহাসে বোধ হয় এরকম ব্যাপার দ্বিতীয় ঘটে নি, যা ঘটেছে ধর্মবীরের প্রশাসনে। ওয়াকফ কমিশনারের পদটিকে কেন্দ্র করে এই ব্যাপার। ঐ পদে যিনি আসীন ছিলেন তাঁকে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে এবং তাঁর জায়গায় যিনি গেলেন, পূর্বতন অফিসার তাঁকে চার্জ বুঝিয়ে দেবার পরিবর্তে সোজা রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত পুলিশ বাহিনী সঙ্গে নিয়ে অফিসের তালা ভেঙে ভদ্রলোককে কাজে যোগদান করতে হল। প্রশাসনযন্ত্রের কতদূর অধঃপতন হলে এটা সম্ভব, তা পাঠকদের বিচার করতে অনুরোধ করি। টিটাগড় থানার কথাই ধরুন না। একটি [illegible] নাম এলাকায় একই পদে দুজন দারোগা লাঠালাঠি করছেন, থানার কাজকর্ম বন্ধ এবং পরিণামে সমগ্র অঞ্চল জুড়েই সমাজবিরোধীদের স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্যপালের প্রশাসন দক্ষতার এই নজির বাস্তবিকই অভূতপূর্ব। এতেও নাকি 'ল এন্ড অর্ডার' ভাঙে না।

অবশ্য কোন কোন বিশেষ কর্মচারীর সঙ্গে রাজ্যপালের ঘনিষ্ঠতা অনেকের কাছেই দৃষ্টিকটু লাগছে। একটি সংবাদে প্রকাশ যে, রাজ্যপাল জনৈক ডি-আই-জির গৃহে গানের আসরে

টিশ ডেজনে (ডিনার) যোগদান করেছেন। ঐ বিশেষ কর্মচারীটির প্রতি তাঁর অনুগ্রহে অনেকেই ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, বিশেষ করে পুলিশের ওপর মহলে এই ব্যাপারটিকে উপলক্ষ করে রীতিমত চাঞ্চল্য দেখা গেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। মুখ্য প্রশাসক হিসাবে রাজ্যপাল সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে থাকবেন, এটাই আশা করা যায়।

রাজ্যপালের শাসন নিয়ে একটি অতিকথার সৃষ্টি করা হয়েছে, এমন কি কোন কোন পত্র-পত্রিকায় চিঠিপত্রের আকারে নির্বাচনবিরোধী মতামতও ফলাও করে ছাপানো হচ্ছে। কিন্তু আইন ও শৃংখলার প্রকৃত অবস্থা কি, তা সযত্নে গোপন করা হয়েছে। সমাজবিরোধী-দের দৌরাত্ম্য থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুই অবাধে চলেছে, অথচ তা নিয়ে কোন সোরগোল তোলা হচ্ছে না। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা যে, গত বছরের তুলনায় অধিকতর শোচনীয় হয়েছে এই স্থূল অবস্থাটা জনসাধারণ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছেন। রাজ্যপাল নিজের কোনই ইমেজ সৃষ্টি করতে পারেন নি, আইন ও শৃংখলার অবনতি, প্রশাসনযন্ত্রের অকর্মণ্যতা কোন কিছুই চেপে রাখা যাচ্ছে না, যদিও সে চেষ্টার ত্রুটি নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচন মারফৎ বৈধ সরকার গঠিত হোক, এই দাবিই আজ সর্বস্তর থেকেই জেগে উঠছে।

দুর্গাপুর প্রসংগ

দুর্গাপুর থেকে সংবাদ এসেছে যে, সেখানকার ইস্পাত কারখানার রোলিং মিলের একদল শ্রমিক গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর থেকে হঠাৎ বে-আইনীভাবে কর্মবিরতি করে কারখানার উৎপাদন তো বন্ধ করেইছে, উপরন্তু নাশকতামূলক কর্মের দ্বারা ঐ কারখানার গুরুতর ক্ষতিসাধন করেছে এবং এই ক্ষতির পরিমাণ এক কোটি টাকারও বেশি। এই বিষয়কে উপলক্ষ করে ছত্রিশ জন শ্রমিককে সাসপেন্ড করা হয়েছে। ব্লাস্ট ফার্নেসের চার হাজারেরও বেশি শ্রমিককে নাকি লে-অফ করা হয়েছে এবং গণ্ডগোলের আশঙ্কায় ঐ অঞ্চলে ব্যাপক পুলিশী ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুর্গাপুরের অবস্থা এখন অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং এই বঙ্গদর্শন লেখার সময় পর্যন্ত তা উত্তরোত্তর বর্ধিত হচ্ছে। কর্তৃপক্ষের বিবৃতি অনুযায়ী দুর্গাপুরে যাদের বিরুদ্ধে নাশকতার অভিযোগ উঠেছে তারা কিন্তু কোন বামপন্থী ট্রেড ইউ-নিয়নের লোক নয়, খোদ কংগ্রেসের দ্বারা পুষ্টপোষিত আই-এন-টি-ইউ-সি'র অন্তর্ভুক্ত হিন্দুস্থান স্টীল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সদস্য।

নাশকতামূলক কার্যকলাপ কোন যুক্তিতেই সমর্থন করা যায় না। কংগ্রেস নেতারা বামপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রায় নাশকতামূলক ক্রিয়াকলাপের অভিযোগ করে থাকেন, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটি উল্টো। যদিও শ্রমিকেরা কারখানার ক্ষতি করেছে এরকম কোন দৃষ্টান্ত আমরা এ পর্যন্ত পাই নি, এইটাই বোধহয় প্রথম।

কিন্তু দুর্গাপুর সম্পর্কে যতগুলি রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি কর্তৃপক্ষেরই প্রদত্ত রিপোর্ট, আসল ব্যাপারটা কি, শ্রমিকেরা কেন এই নাশকতামূলক কাজ করল, এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট সংবাদ এ পর্যন্ত পরিবেশিত হয় নি। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় একটা অশান্তি দীর্ঘকাল ধরে চলছিল এবং গত কয়েক মাসে সকল কাজকর্ম প্রায় অচল হয়ে ছিল, এ বক্তব্যটি কিন্তু প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। একটা কিছু নিশ্চয়ই গূঢ় ব্যাপার ইতিমধ্যে ওখানে ঘটেছে, যার ফলে শ্রমিকদের মনোভাব ক্ষিপ্ততার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, এবং সেটা গেছে বলেই এই অস্বাভাবিক কাণ্ডটা ঘটেছে। সেই গূঢ় কারণটা যে কি, সেটা বুঝে উঠতে এখনও পারা যায় নি বা কেউ বোঝাতেও এগিয়ে আসেন নি। সংবাদপত্রের ঢাক ঢাক গুড় গুড় অস্পষ্ট সংবাদ ছাড়া হাতে আর কিছু নেই।

বিশ্বাস আমরা কোন তরফেরই করি না, কেন না কেউই সত্য কথা বলে না। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় যে নাশকতা-মূলক কর্ম ঘটেছে তাতে সন্দেহের যেমন কোন অবকাশ নেই, কিন্তু সেই সংগে এই বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই যে, কর্তৃপক্ষ ধোয়া তুলসীপাতা নয়। আসলে আমরা জানতে চাইছি দুর্গা-পুরের ইস্পাত কারখানার শ্রমিকদের এই-রকম একটা অস্বাভাবিক কাণ্ডের পিছন-কার প্রোভোকেশনটা কে দিয়েছে, কারা দিয়েছে এবং এই বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব কতটুকু?

এদেশে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগসমূহের ব্যর্থতার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে কর্তৃ-পক্ষ ও শ্রমিকদের মধ্যে অহি-নকুল বা খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। ঠিক এই বিষয়টি আমরা পূর্বে আলোচনা করেছিলাম। এই সম্পর্কটা নিশ্চয় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ-সমূহে থাকা উচিত নয়। বেতনভুক কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও বহুক্ষেত্রেই দেখা যায় কর্তৃপক্ষের মনোভাব বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মালিকের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এবং এই মনোভাবটি সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা তথা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগসমূহের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

আগেই বলেছি, দুর্গাপুরের সাম্প্রতিক অস্বাভাবিক ঘটনাসমূহের মূল নেপথ্য কারণ আমাদের জানা নেই। এ বিষয়ে সংবাদপত্রগুলিও সংবাদে অথবা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে কোন আলোকপাত করা হয় নি। একটি দৈনিকের দশ লাইনের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই বিষয়ের চূড়ান্ত বক্তব্য হল যে, কোন প্রতিষ্ঠানে একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। বর্তমান ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তের সার্থকতা কি সেটা বুঝে ওঠা দুষ্কর। অপর একটি দৈনিকে এই নাশকতামূলক কর্ম যে বামপন্থী ইউ-নিয়ন করে নি কংগ্রেসী ইউনিয়ন করেছে, তার ওপর জোর দিয়ে একটি দীর্ঘ উপদেশাত্মক নিবন্ধ লেখা হয়েছে। নাশকতামূলক কর্ম যে প্রতিষ্ঠানই করুক না কেন, তা নিন্দিত ও ঘৃণিত হবে। আমরা এক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে বাদ দিয়ে ঘটনাটাকে পেয়েছি এবং যত-ক্ষণ না পর্যন্ত আসল নেপথ্য কাহিনীটা জানা যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সব মন্তব্যই নিরর্থক।

বে-সরকারী বাস ও জনসাধারণ

বে-সরকারী বাসগুলিতে ভাড়া বাড়া-বার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং এই সিদ্ধান্তের ফলে জনসাধারণের মধ্যে রীতিমত ক্ষোভ ও উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে। এই ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের কোন যৌক্তিকতা নেই। আসলে রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্তৃপক্ষ লোকসানের ধাক্কা এড়ানোর জন্য ভাড়া বাড়াবার যে ইংগিত দিয়েছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে বে-সরকারী বাস-মালিকদের এই সিদ্ধান্ত। এদের বক্তব্য স্টেট বাসের যখন ভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে, তখন তাদেরই বা ভাড়া বাড়াতে অসুবিধা কোথায়? স্টেট বাসের ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের কথা যখন ঘোষণা করা হয়েছিল তখন তার প্রতিবাদে আমরা বঙ্গদর্শনে যা লিখেছিলাম তা এখানে তুলে দিচ্ছি। "এই সিদ্ধান্তের দ্বারা স্টেট বাসের লোকসান তো এড়ানো যাবেই না, উপরন্তু বে-সরকারী বাস-মালিকরা ভাড়া বাড়িয়ে আরও একদফা বাড়তি মুনাফা পকেটে তুলতে উৎসাহ পাবে। এইরকম উদ্ভট সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে সরকার নিজেই মুনাফাবাজির প্রশ্রয় দিচ্ছেন।" বলাই বাহুল্য, ঐ ঘোষণাটির সুযোগ নিতে প্রাইভেট বাসের মালিকরা কিছুমাত্র দেরি করে নি।

জনসাধারণ ন্যায়সঙ্গতভাবেই প্রতিবাদের রাস্তা নিয়েছেন। তার পরিণতিতে উত্তর কলকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনের আকারে বিস্তার লাভ করছে। যুক্তফ্রন্ট এই বিষয় প্রতিবাদসূচক বিবৃতি দিয়েছে, কংগ্রেসও এই বিষয় নিয়ে আন্দোলনের পথে নেমেছে। মূলত বারাকপুর থেকে উত্তর কলকাতা এবং এদিকে হাওড়া, এই অঞ্চলগুলিতেই যাত্রীবিক্ষোভ চূড়ান্ত আকারে রূপপরিগ্রহ করতে চলেছে। এই আন্দোলনকে অবশ্যই সমর্থন করা উচিত, কেন না প্রাইভেট বাসের মালিকদের এই পকেটমারসুলভ আচরণ কোন যুক্তি দিয়েই সমর্থন করা যায় না।

তাদের যে বাস চালাতে গিয়ে লোকসান হচ্ছে এর পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। অতি মুনাফার এই প্রবণতাকে যেমন করেই হোক শায়েস্তা করা দরকার।

দমদম ও বারাকপুর অঞ্চলে ছাত্রদের সঙ্গে বাসওয়ালাদের কয়েকটি সংঘর্ষ হয়ে গেছে। বারাকপুরে তদুপরি পুলিশ বাসওয়ালাদের ভাড়াটে গুন্ডার ভূমিকা নিয়ে ছাত্রদের পিটেছে। ছাত্ররা কোন অন্যায় কথা বলেন নি। কন্ডাক্টরদের দুর্ব্যবহারের তাঁরা প্রতিবাদ করেছেন, দু'-একটি নির্ধারিত স্টপেজে বাস নিয়মিত ভাবে থামাবার দাবি জানিয়েছেন, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কনসেশন দাবি করেছেন, যে রীতিটি পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র আছে এবং আইনত বাস কর্তৃপক্ষও তা দিতে বাধ্য, এক্ষেত্রে তারা বে-আইনী করে তা দেয় না বলেই ছাত্র বিক্ষোভ।

ছাত্ররা ভাড়া দেয় না বলে বাস মালিকেরা যে অভিযোগ এনেছে, তা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এটা বিহার বা উত্তরপ্রদেশ নয়। পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রসমাজের সামাজিক চেতনা আজও পর্যন্ত ভারতের যে কোন স্থানের চেয়ে বেশি। ছাত্রেরা আর যাই করুক, বাস ভাড়া ফাঁকি দেয় না এবং বাস-মালিক প্রতিষ্ঠানের এই জঘন্য মিথ্যাভাষণের জবাব যদি ছাত্রেরা উগ্রভাবে দেন তাহলে তাতে নিন্দার তো কোন কারণ নেই-ই, উপরন্তু তা অভিনন্দনযোগ্য হবে।

এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছে ধর্মবীরের পুলিশ ছাত্রদের পিটিয়ে। বাস্তবিকই যেদিকেই তাকান না কেন, পুলিশের এই আদি চরিত্রের কোনই পরিবর্তন নেই। শ্রমিকরা ধর্মঘট করলে তাদের ঠ্যাঙানোর জন্য পুলিশ, মালিক লক-আউট ঘোষণা করলে তাদের রক্ষার জন্য পুলিশ, সিনেমা হলওয়ালারা প্রয়োজন কর্মীদের বদলে নতুন লোক দিয়ে বে-আইনীভাবে হল চালানোর চেষ্টা করলে তাদের সাহায্যকারী পুলিশ, অর্থাৎ অপকর্মের হেন ক্ষেত্র নেই যেখানে অপকর্মকারীদের ভাড়াটে গুন্ডার ভূমিকা পুলিশ নেয় নি। এক্ষেত্রেও পুলিশ তাদের ট্র্যাডিশন বজায় রেখেছে। লোহার ডান্ডাধারী ড্রাইভার, কন্ডাক্টর, ক্লিনার ও মালিকদের ভাড়াটে গুন্ডাদের আক্রমণের হাত থেকে ছাত্রদের রক্ষা করার বদলে তাদেরই বেধড়ক প্রহার করে পুলিশ তার প্রভুদের সেবা করেছে।

যাত্রীদের আন্দোলনের তীব্রতা কিন্তু নিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আজকের বঙ্গদর্শন লেখার সময় পর্যন্ত যাত্রীদের উত্তেজনা এবং বাসওয়ালাদের ঔদ্ধত্য বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি। এই বিষয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিও মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। ভাড়া বাড়ানোর কোন যথাযোগ্য নোটিশ না দিয়ে এবং এই বিষয়ে সরকারের কোন লিখিত সম্মতি না নিয়ে বাসওয়ালারা যে বে-আইনী কাজ করেছে তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই সরকার গ্রহণ করেন নি, উল্টে বাসওয়ালাদের সমর্থনে পুলিশ পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে আমরা রাজ্যপালের দ্রুত হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করি, আগুন বেশি জ্বলে ওঠার আগেই তা নিভিয়ে দেওয়া ভাল।

সংক্ষিপ্ত সমাচার

গত ২৯শে অগাস্ট তারিখে স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ডিরেক্টর ডাঃ জে বি চ্যাটার্জী ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ হেমাটোলজির দ্বাদশতম অধিবেশনে যোগদানের জন্য নিউ ইয়র্ক অভিমুখে যাত্রা করেছেন। তিনি 'এরিথ্রোসাইট মেটাবোলিজম্' সংক্রান্ত সেমিনারে সভাপতিত্ব করবেন। এ ছাড়া তিনি 'প্রোবলেমস অফ কুলিস অ্যানিমিয়া' এই বিষয়েও তিন দিনব্যাপী সম্মেলনে ভাষণ দেবেন। অধ্যাপক চ্যাটার্জী ও তাঁর সহকর্মীদের 'রেড সেল মেটাবোলিজম এবং হেরিডিটারি অ্যানোমালিজ অফ হেমোগ্লোবিন সিন্থেসিস'-এর ওপর গবেষণা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে, এই কথাও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য।

*

নীলরতন সরকার হাসপাতালের অবৈতনিক উপদেষ্টা এবং অধ্যাপক ও প্রখ্যাত শল্য-চিকিৎসক ডাঃ এ কে সাহা সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরীর ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যায় ডি-এস-সি ডিগ্রি লাভ করেছেন। শরীর ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যায় ডাঃ সাহাই প্রথম এই সম্মান অর্জন করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৯ সালের অক্টোবর মাসে মেক্সিকোতে আন্তর্জাতিক শল্য-চিকিৎসকদের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে তাতে ভাষণ দেবার জন্য ডাঃ সাহা আমন্ত্রিত হয়েছেন।

গ্রাম-গ্রামান্তরে

আমলাদের গভীর-অগভীরের খেলা

সরকারী ইঞ্জিনীয়ারদের অশেষ কেরামতির ফলে এবার গ্রাম-বাংলায় যে ভয়াবহ বন্যা ও ধ্বংসলীলা হয়ে গেল তার খবর বারে বারে আপনাদের দিয়েছি, এবার সেই সব 'ইঞ্জিনীয়ারদের' আরও কিছু কর্মতৎপরতার খবর আপনাদের শুনিয়ে রাখি। অবশ্য আপনারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি খবর রাখেন, কিন্তু গ্রামের মানুষের সঙ্গে যে সব পরিকল্পনা জড়িত এবং যার ভাল-মন্দর ওপর লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ জনতার কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ভর করে সে সব পরিকল্পনার কাজ নিয়ে বারে বারে আলোচনা না করলে সংশ্লিষ্ট কর্তাদের বোধহয় চোখ ফোটানো যাবে না।

চাষবাসের উন্নতির কত কথাই না ওঁরা বলে বেড়ান; লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ওঁরা এমনভাবে প্রচার করে থাকেন যেন চাষবাসের যেটুকু উন্নতি দেশে হয়েছে সবটুকুই ওঁদের কৃতিত্ব! অবশ্য কয়েক রকম বিদেশী ধানের চাষ করিয়ে ওঁরা ভাল ফলনই পেয়েছেন—কিন্তু এই বিদেশী বীজের চাষ করতে গিয়ে যে হুজুক, ঝামেলা-ঝক্কি ও ঝুঁকি চাষী-দের নিতে হয় তা ক'জনের পক্ষে সম্ভব? যাঁদের অর্থ আছে তাঁরা ঝুঁকি নিয়েছেন; যাঁরা সাফল্য লাভ করেছেন সরকার তাঁদের নামধাম ছবি কাগজে কাগজে প্রচার করে বিদেশী ফসলের গুণগান করতে এক মুহূর্ত দেরি করেন নি। কিন্তু যাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন তাঁদের কথা সরকারী কর্ম-কর্তারা কিন্তু বেমালুম চেপে গেছেন। গাঁয়ে গাঁয়ে খোঁজ করে জানলুম এঁদের সংখ্যা কৃতী চাষীদের চেয়ে কতগুণ বেশি। বন্যা যদি না হত তাহলে খুব সহজেই আপনারা জানতে পারতেন ক'দানা ঐ সব বিদেশী ধানের বীজ চাষীরা এ বছর নিয়ে গেছে। বন্যা হয়েছে যেন কৃষি-বাবুদের মওকা, তাঁরা জানেন চাষবাসের আর সময় নেই, চাষীরা এই শেষ সময়ে বীজ নিয়ে যেতে বাধ্য হবে। হয়েছেও তাই। তাই এবারে আর তাইচুন-তাইনানের কাহিনী জানানো গেল না।

কিন্তু খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির সেই 'ক্র্যাশ পরিকল্পনা' খবর কি কিছু আর শুনতে পাচ্ছেন? লক্ষ লক্ষ টাকার এই পরিকল্পনা বোধহয় এবার বানের জলে ভেসে গেছে, তা না হলে গাঁয়ের মানুষ জানুক আর না জানুক খবরের কাগজে নিশ্চয়ই এতদিন ঢক্কানিনাদ সুরু হয়ে যেতো। আপদ চুকেছে, ক্র্যাশবাবুরাও বেঁচেছেন; বন্যায় পরিকল্পনা ক্র্যাশ হয়েছে, তাদের ক্র্যাশ করে কে? খোঁজ নিয়ে জানুন এই সব সরকারী কৃষিবিদ-দের বোধহয় এতদিনে প্রমোশন হয়ে গিয়েছে।

এই পরিকল্পনার দুটি অংশ গভীর আর অগভীর নলকূপের কাহিনীর খবর কিছু কিছু আপনারা শুনে রাখুন—তা হলেই বুঝবেন কি সাংঘাতিক চাষ-বাসের আর গাঁয়ের উন্নতি ওঁরা করছেন।

আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন বাংলার প্রায় হাজার দেড়েক গভীর নলকূপ বসানো আছে, এই দেড় হাজার নলকূপের মধ্যে প্রায় অর্ধেক আজ প্রায় দু বছর হল অকেজো হয়ে পড়ে আছে। শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন প্রয়োজনীয় পাইপ লাইনই এখনও বসানো হয় নি, জল দেওয়া তো দূরের কথা। ফল কি হল? ক্র্যাশ পরিকল্পনা অনুযায়ী যে ৭০ হাজার একর জমিতে সেচ হয়ে বছরে তিন-তিনটি ফসল হওয়ার কথা সেখানে একটিও হল না। কেন হল না তার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে হয় তো কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে। তবু গভীর নলকূপের অন্তরালের কাহিনী যা আমাদের কানে আসছে তা একটু-আধটু আপনাদের শুনিয়ে রাখি।

কংগ্রেস সরকারের আমলে সিদ্ধান্ত হল—চাষের ক্ষেতে গভীর নলকূপের জল সরবরাহের জন্যে পাইপ লাইন বসানো হবে। এর জন্যে প্রয়োজন হবে বিদেশ থেকে 'ডিচিং মেশিন' প্রভৃতি যন্ত্রপাতি আমদানী করা। ৯৫ লক্ষ টাকার প্রয়ো-জনীয় বৈদেশিক মুদ্রার জন্যে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের শরণাপন্ন হলেন। বছর দুয়েক আগে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের জন্য ঐ বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুরও করে দিলেন। কিন্তু শুনলে আশ্চর্য হতে হয় যে, বৈদেশিক মুদ্রার জন্যে কেন্দ্রের কাছে বার বা[illegible] হয়, বৈদেশিক মুদ্রা না [illegible] পরি-কল্পনার পর পরিকল্পনা [illegible] হয় সেই বৈদেশিক মুদ্রা হাতে [illegible] সত্ত্বেও তার সদ্ব্যবহার হল না। কৃষি[illegible] এই কলঙ্কময় অধ্যায়ের জন্য কে [illegible] দায়ী সেটা কিন্তু আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। শুনেছি ঐ সাড়ে সাতশ গভীর নল-কূপের জল চাষের ক্ষেতে সরবরাহের জন্য পাইপ লাইন বসাবার পরিকল্পনা যুক্ত-ফ্রন্ট সরকারের আমলেই নাকি পরিত্যক্ত হয়েছে। সত্যি মিথ্যে জানি না, চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি গভীর নলকূপ বসেছে, জলও অনেক নলকূপ থেকে বেরুচ্ছে, তবে বেশির ভাগ নলকূপ অকেজো হয়ে পড়ে আছে। ওগুলোও বন্ধ করে দিলেই হয়। কোটি কোটি টাকার শ্রাদ্ধ যখন হয়েছে ভাল করেই হোক, দোষ গুণ আর কে বিচার করছে? কংগ্রেস সরকার এলে বলবেন যুক্তফ্রন্ট সরকারের দোষ, যুক্তফ্রন্ট এলে বলবেন কংগ্রেস সরকারের দোষ আর যখন আমলাদের সরকার থাকবে তখন দোষ চাপাবে কংগ্রেস—ফ্রন্ট উভয় সরকারের ঘাড়েই। কাজে কাউকে আর বলার কিছু নেই, দেশটা তো লুটের সম্পত্তিতে বহুদিন আগেই পরিণত হয়েছে।

এবারে আসুন ক্র্যাশ পরিকল্পনার আর একটি অংশ অগভীর নলকূপ দেখতে। কোন কাগজে বোধহয় এর খবর বেরোয় নি, কিন্তু সরকারী প্রচারপত্রে এর

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের খবর বেরিয়ে গেছে। ১৮ই মে'র 'ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর মলাটের ছবিখানা একবার দেখুন। রাজ্যপাল ঘটা করে ফুলের মালা পরিয়ে দিচ্ছেন অগভীর নলকূপের গলে, কোট প্যান্ট আর নেকটাই পরা সাহেবরা আনন্দে গদ্‌ গদ্‌—কি কৃষি বিপ্লব-ই না দেশে ঘটালেন তাঁরা! গোটাকুড়ি 'সাহেব' হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু যাদের জন্যে এ পরিকল্পনা তাদের একজনকেও কি ঐ ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন? খোঁজ নিয়ে জানুন হয় তো তাদের অনুষ্ঠান স্থলেই আসতে দেওয়া হয় নি। গোবরডাঙার যে ভদ্রলোকের মাধ্যমে এই অগভীর নলকূপ বসানো হল একটু খোঁজ করলেই জানতে পারবেন সেই ভদ্রলোকের ব্যাঙ্ক থেকে পাঁচ হাজার টাকা ধার নেওয়ার কোন প্রয়োজনই বোধহয় ছিল না, যেহেতু ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে অগভীর নলকূপ বসাবার পরিকল্পনা হয়েছে, অতএব একজনকে দিয়ে এ কাজ না করালে ও'রা যে আর রাজ্যপালের কাছে মুখ দেখাতে পারবেন না, প্রমোশনও হয়তো আটকে যাবে। তাই এ কু-কাজটি ঘটা করে সুসম্পন্ন হল।

তিন ইঞ্চি ব্যাসের ৪০ হাজার অগভীর নলকূপ বসাতে খরচ পড়বে ২০ কোটি টাকা, দু' বছরের মধ্যে এ পরিকল্পনার কাজ শেষ হবে বলেও ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু টাকা দেবে কে? সরকার? উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যে রকম স্তুতার ফোয়ারা ছুটলো তাতে সত্যি মনে হয়েছিল অনেক অপকর্মের পর সরকারী আমলারা এবার সত্যিই বুঝি দেশের চাষীদের কার্যত উপকার করবেন। কিন্তু সে গুড়ে বালি! উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজ্যপালকে ধোঁকা দিয়েই আমলারা স্বমূর্তি ধরলেন নিজেদের হাত সংকুচিত করে নিয়ে সমস্ত খরচের বোঝা চাপালেন চাষীদের ঘাড়ে। সরকার একটি পয়সাও দিচ্ছেন না: ব্যবস্থা হয়েছে ব্যাঙ্ক চাষীদের ঐ পাঁচ হাজার টাকা ধার দেবে, তাও যে যা শর্তে জানি না বাংলা দেশের ক'জন চাষী সেই টাকা নেবার জন্যে এগিয়ে আসবেন। অথচ পরিকল্পনার ফানুস যখন প্রথম বাজলো অর্থাৎ মার্চ মাসে ঘোষণা করা হয়েছিল শতকরা ৪৫ ভাগ সাবসিডি দেওয়া হবে; এপ্রিলে সেই সাবসিডি কমিয়ে ৩৩ ভাগ করা হল; তার ১৩ই মে গোবরডাঙার রাজ্যপালকে দিয়ে উদ্বোধন অনুষ্ঠান করিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংসে ফিরে এসেই আমলারা গোমড়া মুখে জানিয়ে দিলেন—ও সব সাবসিডি-টাবসিডি কিছুই দেওয়া হবে না, চাষীদের যদি জলের প্রয়োজন থাকে নিজেরাই টাকা ধার করে নলকূপ বসাক। ব্যাস, সাবসিডি প্রকল্পের সমাধি হল।

অগভীর নলকূপ ভাল হোক, মন্দ হোক চাষীরা অতশত বোঝে না; জল পেলেই হল। নেশাও ধরলো একবার পরীক্ষা করে দেখাই যাক না। যাদের টাকা আছে তারা অবশ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু করে দিয়েছেন; এরা ঠিক চাষী নন, জায়গা জমি আছে চাষীদের দিয়ে চাষ করিয়ে নেন। আর এরা আছে বলেই তো সরকার আছে; যত উদ্ভট পরিকল্পনাই হোক না কেন এরাই সবচেয়ে আগে এগিয়ে আসবে সে পরিকল্পনার গুণগান করতে। পরিকল্পনা কার্যকরী হলেই সরকারের প্রচারদপ্তরের ফটোগ্রাফার একেবারে তাদের কাছে গিয়ে হাজির হবে, ফটো তোলা হবে, তাঁর বাণী লিপিবদ্ধ করা হবে,—তারপর কাগজে কাগজে প্রচার করা হবে পরিকল্পনার মহিমা কীর্তন। এদের কথা আমি বলছি না। আমি বলছি দেশের যারা সত্যিকারের চাষী তাদের কথা। আগেই বলেছি ভালমন্দ অতশত ওরা বোঝে না, ওরা শুধু চায় সেচের জল। খবর পেয়েছে অগভীর নলকূপ করলে জল পাওয়া যাবে, তাই টাকার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে; কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা বড় কম কথা নয়। সরকার যে ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা করেছেন শুনছি সেই ব্যাঙ্ক এমন সব শর্ত করেছেন যে, চাষীদের ঋণ পাওয়া সুদূরপরাহত। শর্তগুলি হল, (১) যে জায়গায় নলকূপ বসানো হবে সেখানে ঋণ গ্রহণকারী চাষীর একনাগাড়ে নিজস্ব ১৫ বিঘা জমি কমপক্ষে থাকা চাই, (২) নলকূপ বসানোর সাড়ে ১২ শতাংশ খরচের ভার ঋণ গ্রহণকারীকে খরচ করতে হবে, (৩) ১৫০ ফুটের বেশি গভীর করার প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত সমস্ত ব্যয়ভার চাষীকেই বহন করতে হবে, (৪) চাষীকে ঋণের বিনিময়ে ব্যাঙ্কের কাছে জমি বন্ধক রাখতে হবে এবং এ জন্য জমিগুলির স্বত্ব-স্বামিত্ব প্রমাণের জন্য সমুদয় সার্চিং ইত্যাদি ফি চাষীকেই বহন করতে হবে, (৫) বন্ধকী দলিল সম্পাদনের জন্য সমুদয় স্ট্যাম্প ডিউটি চাষীকেই বহন করতে হবে। এ ছাড়া আরও একটি শর্ত ছিল, শুনছি সেটি নাকি তুলে নেওয়ার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে: সেটি হল নলকূপ বসানোর আগে চাষীরা কোন ঋণই পাবে না, কাজ শেষ করে বিল জমা দেওয়ার পর উপরোক্ত নিয়ম অনুসারে চাষীর নিজের খরচের অংশ বাদ দিয়ে বাকিটা ঋণ হিসেবে দেওয়া হবে।

এখন বুঝুন চাষীরা কোন স্বর্গলোকে আছে! বাংলা দেশের চাষীদের অবস্থা তো আপনারা জানেন, বলুন তো ক'জন প্রকৃত চাষীর পক্ষে সম্ভব হবে এ সব শর্ত অনুযায়ী টাকা ধার নেওয়ার? যাদের সঙ্গতি আছে এরকম দু'-দশজনকে দিয়ে নলকূপ বসিয়ে ওরা সমগ্র দেশকে কিভাবে ধাপ্পা মেরে চলেছে দেখুন। যদি বুঝতাম সরকার নিজের তহবিল থেকেই বি-ডি-ও'র মাধ্যমে ঐ টাকা সহজ কিস্তিতে চাষীদের দিচ্ছেন তাহলেও কিছুটা আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যেতো। যদি ধার নিয়েই ঐ নলকূপ বসাতে হয় তাহলে ব্যাঙ্ক কেন, যে কোন মহাজনের কাছ থেকে ধার নিয়ে চাষীরা তো তা করতে পারে। এ পরিকল্পনার দায়-দায়িত্ব খরচের যখন সমুদয় বোঝা চাষী বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ওপর, সরকারের কৃতিত্ব কোনখানটায় যার জন্যে ও'রা এত ঢাক-ঢোল পেটাচ্ছেন—সেটা আমাদের বুঝিয়ে দিতে পারেন কি?

গালভরা ইংরাজী শব্দের ২৬ বড় পরিকল্পনা নিয়ে ও'রা যখনই যে গ্রামে গিয়েছেন গ্রামবাসীরা তা দেখে বিশ হাত দূরে সরে গিয়েছে: কতকগুলি পেটোয়া লোককে দিয়ে ও'রা কাজ হাসিল করার চেষ্টা করেছেন। বিদ্‌কুটে পরিকল্পনায় কোটি কোটি টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে প্রতি বছরই আমরা দেখছি, অথচ সারা বাংলা দেশে এমন একজনও কেউ নেই যে এ সব অপচয় বন্ধ করতে এগিয়ে আসেন। গত বিশ বছর ধরে কোটি কোটি টাকার শ্রাদ্ধ ও'রা করেছেন, অথচ এ সব টাকা যদি আজ থাকতো অনায়াসে বহু খাল-বিল, নদী-নালা সংস্কার হয়ে যেতো, লিফট ইরিগেশন করে নদী বা বড় বড় বিল থেকে জল এনেও চাষ আবাদ করা যেতো—দেশে এতদিনে খাদ্যে স্বাবলম্বী হবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তা হ'ল না বা হতে দেন নি ও'রা। জানি না এতবড় সাংঘাতিক বন্যার পরেও ও'দের শিক্ষা হয়েছে কি না; আমার বিশ্বাস হয় নি; কারণ শিক্ষা দেবার লোক কৈ? উপযুক্ত শিক্ষা ও শাস্তি ও'দের যদি দেওয়া হতো তাহলে রাইটার্স বিল্ডিংসের চেহারাই পাল্টে যেতো। সে-রকম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ আজ যদি বাংলাদেশে থাকতেন আর এক মুহূর্ত কালবিলম্ব না করে তিনি দেশের নদী-নালা, খাল-বিল-পুকুর সংস্কারের হুকুম দিতেন; তাতে শুধু সাংঘাতিক বন্যারই প্রতিরোধ হতো না, সারা বছর চাষবাসের চাষীদের কাছে সুবর্ণ সুযোগ আসতো। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রকল্পে মোহাচ্ছন্ন, নেকটাই পরা কৃষি-পণ্ডিতরা বহাল তবিয়তে থাকতে দেশের সে সুদিন সহজে আসবে বলে মনে হয় না।

—[illegible] চট্টোপাধ্যায়

জাতীয় স্বার্থ

কম্যুনিস্ট হোক চাই অ-কম্যুনিস্ট হোক, ইদানীং প্রত্যেকটি রাষ্ট্রকেই তার জাতীয় স্বার্থের দিকে তাকিয়ে আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণ করতে দেখা যাচ্ছে। অধুনা বলছি এই কারণে যে, সম্প্রতি জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নটি সব আদর্শের বালাই ঝেড়ে ফেলেছে। পশ্চিমী শক্তিবর্গ কম্যুনিজম-বিরোধী যে কোন প্রশ্নে একজোট বাধলেও স্ব স্ব জাতীয় স্বার্থকে সবার ওপরে ধরে রেখেছেন; একই ভাবে এশিয়া ভূখণ্ডে চীনকে দেখা যাচ্ছে গোঁড়া জাতীয়তার ধারক-বাহক-রূপে। কম্যুনিজমের প্রশ্ন নয়, নয় সমাজতন্ত্র বিস্তারের স্বপ্ন, চীন এশিয়ায় তার আধিপত্য বিস্তারের দিকেই সমধিক আগ্রহী। এই আধিপত্য বিস্তার যদি সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র না-ও হয় তবে তা নেতৃত্ববাদী নিশ্চয়ই। রাশিয়ার সঙ্গে তার বিবাদের এটাও যে অন্যতম কারণ প্রভাবমুক্ত দৃষ্টিতে বিচার করলে তা ধরা পড়বে এবং অনেকের কাছে ব্যাপারটি ইতিমধ্যে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

পাকিস্তানের মতো একটি গোঁড়া ধর্মভিত্তিক কার্যত সাধারণের স্বাধীনতা অবদমনকারী একনায়কতন্ত্রী জঙ্গী শাসনের সঙ্গে চীনের দহরম মহরমও তার জাতীয় স্বার্থের মুখ চেয়ে প্রসার লাভ করছে। জাতীয় স্বার্থের দিকে তাকিয়েই সম্প্রতি রাশিয়াকেও পাকিস্তানের প্রতি উদার হতে হয়েছে এবং পাকিস্তানকে নিয়ে একটি প্রচ্ছন্ন টাগ অব-ওয়ার দুই সমাজতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে শুরু হয়েছে বলে সন্দেহের অবকাশও দেখা দিয়েছে রুশ-পাক অস্ত্র চুক্তির পরে। শ্লোভাকদের ব্যাপারে দুনিয়ার দক্ষিণী-শক্তির সঙ্গে চীনের কণ্ঠস্বর একই গ্রামে রাশিয়ার নিন্দাবাদে মুখর হলেও বোঝা যাচ্ছে, দক্ষিণীশক্তির সঙ্গে চীন কণ্ঠসঙ্গীতে সংগত করতে অনায়াসেই তৎপর হতে পারে যদি তদ্দ্বারা রাশিয়াকে কোণঠাসা করা যায়। রাশিয়া যে ভারতের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব অটুট রেখেই অগ্রসর হতে চায়, তাও তার নিঃস্বার্থ প্রেম বলে গণনা করলে ভুলই করা হবে। আন্তর্জাতিক মিত্রতা জিনিসটাই কূটনৈতিক। কোনক্ষেত্রেই তাকে নির্জলা সাদা চোখে দেখার বাড়াবাড়ি না করাই ভালো। শত্রুতা-মিত্রতা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির জাতীয় স্বার্থের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সম্পর্কের তারতম্য অত্যন্ত হতাশ বা অত্যুৎসাহী, কোনটাই হওয়া উচিত নয়। সবটাই জাতীয় স্বার্থের কষ্টি-পাথরে বিচার্য।

দুঃখের বিষয় আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপারে আমরা এই সমুদয় কূটনৈতিক কারণগুলিকে বিচার না করে ভাই ভাই গলাগলিতে বাঁধনহারা ঢলাঢলি করে বসি, তেমনিই উৎকট রাগ-বিরাগ প্রকাশ করে শিশুসুলভ অন্ধ উন্মাদনার স্রোতে গা ভাসাই।

ভারতে জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা গোষ্ঠীস্বার্থ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের দরদী বন্ধু নির্বাচনে ব্যস্ত। এজন্য ভারতের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর বিশেষ বিশেষ ক্ষোভ থেকে গেছে। কেন না ভারতের ঘোষিত নীতি জোটনিরপেক্ষ। জোটনিরপেক্ষ নেহরু নীতির সমালোচকরা নেহরুর আমলেও অসন্তুষ্ট ছিলেন, আজও আছেন। তবে নেহরুজীকে একেবারে শেষ জীবনে কিছুটা পশ্চিমঘেঁষা করবার স্বপ্ন কেউ কেউ দেখে থাকলেও নেহরুর আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তার জন্য তাঁকে অন্তত তাঁর আপন দল থেকে কেউ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চ্যালেঞ্জ করার মতো সাহস পান নি, আর নেহরুকন্যাকে যেমনভাবে তাঁরা কোণঠাসা করার প্রয়াস পাচ্ছেন। শ্লোভাক প্রশ্নে শ্রীমতী গান্ধী একটি প্রবল ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হয়েছিলেন। পাক-রুশ অস্ত্র চুক্তির ব্যাপারেও তাঁকে জোটবদ্ধ আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হয়েছিল সাম্প্রতিক কসরৎ বারেই। তবে এবারকার আক্রমণ বড় প্রত্যক্ষ এবং অনেকটা সোজা। এমন 'জোটনিরপেক্ষতা-বিরোধী' শিবিরের প্রচারকার্যও খুব অনুকূল আবহাওয়ার সুযোগ ভোগ করেছে।

ভারতের স্বার্থ অক্ষুণ্ণই আছে

ভারত-রুশ বাণিজ্যচুক্তিগুলির ফলে ভারতের স্বার্থ অক্ষুণ্ণই আছে বলে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেন উপ-প্রধান তথা অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহের একটি প্রশ্নের উত্তরে। প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সভায় যেখানে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন অনুপস্থিত।

উপ-প্রধানমন্ত্রী একটি অপপ্রচারের প্রতিবাদ করে বলেন: পশ্চিমী দেশগুলির অপেক্ষা সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য ভারতবর্ষ লাভবানই হয়েছে। একথা সত্য নয় যে, আমদানী বাণিজ্যে ভারতকে অধিক মূল্য দিতে হয় এবং রাশিয়াকে ভারতীয় সামগ্রী স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করতে হয়। বরং ঠিক উল্টো। পশ্চিমী দেশগুলির সাহায্যের শর্ত অপেক্ষা সোভিয়েট শর্তাবলী ভারতের স্বার্থের অনুকূল।

শ্রীদেশাই সুস্পষ্টভাবে শ্রীমতী সিংহের বক্তব্যের প্রতিবাদ করলেন: বহু মূল শিল্পে ভারতের সোভিয়েট সহায়তা গ্রহণ করতে হয়েছিল যখন অন্য কোথাও থেকেও এই সহায়তা পাওয়া যায় নি।

ভালোকেই একথা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেন যে আমরা প্রথমত মূলত পশ্চিমী সাহায্যের উপরেই একান্ত নির্ভরশীল ছিলাম। কিন্তু ভারতের আপন স্বার্থেই ক্রমে ভারতকে রাশিয়া এবং পূর্ব-ইউরোপীয় দেশগুলির দিকে ঝুঁকতে হয়েছিল এবং তদ্দ্বারা নিঃসন্দেহ ভারতের আর্থিক এবং জাতীয় উন্নয়নের পক্ষে লাভবানই হয়েছে।

শ্রীদেশাই-এর এহেন ব্যাখ্যার পর উপপ্রধানমন্ত্রীদের কণ্ঠ কিছুটা সংযত হবে বলে আশা করা যায়। কেন না শ্রীদেশাই-এর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতি অনুরাগের দিন কোনোকালেও স্বীকৃত না সুতরাং তাঁর ব্যাখ্যাকে অপব্যাখ্যার সুযোগও নেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চতুর্থ পরিকল্পনা-কালেও নতুন ভারত সোভিয়েট উদ্যোগ এবং পুরনো উদ্যোগের কার্যে

সোভিয়েট সাহায্যের সম্ভাবনাও প্রচুর বলে সরকারী মুখপাত্রগণ [illegible] থাকেন।

বাস্তব অবস্থায় [illegible] ভারতের স্বার্থ প্রত্যক্ষত সংরক্ষিত [illegible] সেক্ষেত্রে ভারতকে অনুকূল সাহায্য গ্রহণ থেকে বিরত করার চেষ্টা অভিসন্ধিমূলক। আমরা নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করার এমত মনোভাব ত্যাগ না করলে ভবিষ্যৎ ভারতের কাছে সন্তোষজনক উত্তর রেখে যেতে পারব না। যাঁরা ক্ষুদ্র স্বার্থ-চেতনায় জাতীয় লাভালাভকে নগণ্য গণনা করেন, তাঁদের বিভ্রান্তিমূলক প্রচার থেকে আমরা যতদূরে সরে থাকতে পারি, দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল।

শিক্ষক দিবস

আমরা আদর্শবাদী জাতি। চিন্তায় এবং কথায় আদর্শের বালাই ইদানীং যদিও লাখে একজনও রাখেন না, কিন্তু সকলেই আমরা যথাসম্ভব আদর্শের নামাবলীটি চাপিয়ে রাখতে চাই, ভালও বাসি। বড় কথা এবং বড় বড় ব্যাপারে তাই আমাদের তীব্র আকর্ষণ। ফলত সব কিছুতেই ঢক্কানিনাদ আমাদের বড্ড বেশি পছন্দ। আমরা চালাকির দ্বারাই মহৎ কার্যের পুণ্যার্জনপ্রয়াসী।

লাখো লাখো হাড্ডিসার বুভুক্ষু উলঙ্গ অশিক্ষিত শিশুর জন্মভূমি ভারতবর্ষের সংবাদপত্রে কতিপয় সুসজ্জিত সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রেণীর শিশুদের ছবি ছেপে আমরা চাচা নেহরুর জন্মদিবসকে শিশুদিবসরূপে পালন করি। অসীম দুর্দশাগ্রস্ত শ্রমজীবীসমাজ যখন ব্যয়ভারে ঋণভারে এবং অন্ধকারে মনুষ্যেতর জীবনযাপন করছে তখন কোন শ্রমিকরমণী অথবা শ্রমিককে সাজিয়ে গুজিয়ে প্রধানমন্ত্রীদের পাশে দাঁড় করিয়ে নতুন তৈরি বাঁধ ইত্যাদির উদ্বোধন করিয়ে থাকি (এ ও সংবাদপত্রে ছবি ছেপেই)। অনুরূপভাবে আমাদের প্রাক্তন শিক্ষাবিদ প্রেসিডেন্ট ডঃ রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিবস উপলক্ষে আমরা শিক্ষক দিবসেরও আয়োজন করেছি। স্বভাবতই এদিন শিক্ষকদের পুরস্কৃত করা হয়। কিন্তু সেই সব ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতীরাই দুনিয়ায় পুরস্কৃত হয়ে থাকেন পুরস্কার-দাতার নেক নজর যাঁরা লাভ করতে পারেন। পুরস্কার বিতরণের চেহারাটা দুনিয়া জুড়ে একই রকম। নোবেল পুরস্কার, পুলিটজার কিম্বা লেনিন কিম্বা নেহরু কিম্বা অন্যতর যে কোনো পুরস্কারই হোক—তাকে সমালোচকরা বহু ক্ষেত্রেই পেটোয়া-তোষিণী পুরস্কার-রূপেই বিচার করতে বাধ্য হন। পুরস্কার আর খেতাবপ্রাপ্তি আজ তাই তার [illegible] এবং প্রাপকের সুবিধা-সুযোগ প্রাপ্তির গুরুত্বের দ্বারাই বিচার্য, বস্তুত প্রাপকের গুণ তদ্দ্বারা কতদূর নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণিত হয় তাতে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। এমন কারণে সম্প্রতিকালে দুই-একজন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ খেতাব ও পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করে জগৎজুড়ে আলোড়নেরও সৃষ্টি করেছেন। অবশ্য এ প্রসঙ্গ প্রসংগতই এসে পড়েছে। এর দ্বারা একথা নিশ্চয়ই বলতে চাইছি না যে, ভারত সরকার যে নিরানব্বইজন শিক্ষককে বিশাল ভারত-বর্ষের বিভিন্ন স্থান এবং সুদূর গণ্ড-গ্রাম থেকেও বাছাই করে এনে পুরস্কৃত করেছেন তাঁরা পুরস্কারের যথার্থ প্রাপক নন। কেন না বিশাল ভারতে ঐ বিশিষ্ট নিরানব্বই-এর পরিচয় লাখে নিরানব্বই জনেরও জানার কথা নয়। যাঁরা জেনেছেন ও পুরস্কার দিয়েছেন, সুতরাং তাঁরাই এ ব্যাপারে একমাত্র হদিস রাখতে পারেন। তাই যা না জানি তা নিয়ে বাক্যব্যয় না করাই বিধেয়। প্রাপকের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি তবে শিক্ষককে বছর বছর পুরস্কার দানের দ্বারা শিক্ষাজগতে কোনো সুরাহা হয় বলে বিশ্বাস করি না। যেমন বিশ্বাস করি না পুরস্কার দ্বারা মহৎ শিল্প-সাহিত্যের যথার্থ বিচার হয়। যেমন জেনে গেছি, ব্লকভুক্তরাই বিভিন্ন ব্লকের রাজনৈতিক পুরস্কার লাভ করে সেই বিশেষ ব্লকের স্বার্থ ও আদর্শ রক্ষা করে। এমন একটা দিন হয়ত সত্যিই আসবে যখন পরীক্ষার্থী ভিন্ন আর কেউ কোনো পুরস্কার লাভ করলে তিনি পুরস্কার-দাতার গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিরূপে বিশেষভাবে চিহ্নিত হবেন। সাধারণের শ্রদ্ধায় তদ্দ্বারা কোন ইতর বিশেষ ঘটবে না। আবহমান কাল থেকে তাই হয়ে আসছে। রাজা যার প্রতি প্রসন্ন হতেন, সেসবও পুরস্কারের মুক্তাহার তাঁর গলায়ই শোভা পেতো। যাক গে। পুরস্কার নিয়ে এই বাকবিতণ্ডার পরিশ্রম আপাতত তোলা থাক। পুরস্কারের দ্বারা কস্মিনকালেও সত্যিকার গুণীর আদর কদর হয়েছে কি না সন্দেহ। গুণী ব্যক্তি সূর্যের মতো স্বপ্রকাশ এবং পুরস্কার নিরপেক্ষ। পরন্তু গুণীকে তাই পুরস্কৃত করা যায় না। দিতে হলে দিতে হয় শ্রদ্ধার্ঘ্য। এবং জগৎটা যখন টাকার গন্ধে মশগুল তখন সেই শ্রদ্ধার্ঘ্যটি আর্থিক মূল্যের মাপে কম-বেশি করে বড় গুণী ছোট গুণীর তারতম্য বোঝাতে পারে। কিন্তু পুরস্কারে ভয় আছে। যিনি সূর্যপ্রতিম, তাঁর প্রভা আপনি বিচ্ছুরিত হবে। সকলে যখন তাঁকে মাথায় তুলে নেবেন, সকলের সঙ্গে দেশের সরকারেরও তখন তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের সুযোগ আসবে। 'বন খুঁজে টিয়ে' বার করে পুরস্কার দেওয়ার প্রয়োজন কি। একজন এ্যালাওয়েন্স, ইনক্রিমেন্ট ইত্যাদিও তো দেওয়া যেতে পারে। উৎসাহ দানের পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। পেটোয়া সৃষ্টির সেটাই প্রচলিত প্রথা।

যখন ৯৯ জন শিক্ষক জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হচ্ছেন তখন রাজধানী দিল্লীর শিক্ষকসম্প্রদায় পালন করছেন 'কালা দিবস'; গান্ধী সমাধিতে সংকল্প জানিয়ে একশ পাঁচজন অনশন ধর্মঘট করছেন। এই অবস্থাই শিক্ষকদিবসের ফাঁপা ঢাকটি বাজিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

বেতনহার, চাকুরীর শর্তাদি বিষয়ে শিক্ষকদের দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতেই এই বিক্ষোভ। প্রকাশ, স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনও শিক্ষকদের দাবি-দাওয়ার যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন।

একটা যুগ ছিল যখন শিক্ষক ছিলেন আপন বিদ্যাশ্রমের আপনি পরিচালক। ছিলেন গুরু। ছাত্ররা এই গুরুগৃহেই বাস করতেন। গুরুর সংসারের সঙ্গে নিজেরাও ওতপ্রোতভাবে মিশে যেতেন। বেতন গ্রহণের বালাই ছিল না। কিন্তু সে বিদ্যাশ্রমও নেই, ছাত্র শিক্ষকের সেই সম্পর্কও নেই এবং মুষ্টিমেয় সংখ্যক বিদ্যার্থী ও উৎসর্গীকৃতপ্রাণ শিক্ষাগুরুও নেই। এখন তা সম্ভবও নয়। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে বিদ্যাশ্রম অবশ্যম্ভাবী রূপে বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত হয়েছে, তবে সামাজিক কাঠামো বিশেষে কোথাও কোথাও বিদ্যালয় হয়েছে বিদ্যা ব্যবসার কেন্দ্র।

আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এক-একটি বিশিষ্ট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। বিশ্ব-বিদ্যালয় ও শিক্ষা পর্ষৎগুলি বিভিন্ন ফী ও পাঠ্যপুস্তকাদি বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রচুর মুনাফা উত্তোলন করছে। মহাবিদ্যালয়ে অনেক্ষেত্রে 'বোনাস' পর্যন্ত চালু হয়েছে। কোন কোন স্কুলেও নাকি 'বোনাস' দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা পর্ষৎগুলি উৎপাদনশীল লাভজনক প্রতিষ্ঠানের মতো যে হারে উপার্জন করে যাচ্ছেন তাতে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মিগণ ফ্যাক্টরী আইনের সুবিধা-সুযোগ এবং বোনাস দাবি করলে বলার কিছু নেই। বিদ্যালয়গুলিও বিরাট বিরাট ব্যবসাকেন্দ্র। এখানকার শিক্ষকরা অবশ্যই বোনাস দাবি করতে পারেন। বহু প্রতিষ্ঠানকে অবশ্য সরকারী সাহায্যের ওপর নির্ভর করেই চলতে হয়। তবে এদেশে লাভের কড়ি সর্বদাই পিঁপড়ের খেয়ে যায় বলে যথার্থ লাভের অঙ্ক আর টের পাওয়া যায় না। কিন্তু বিদ্যা ভেজালের যে একটি প্রকাণ্ড

[illegible] ঠাকুর চাই।

এজন্য আজকের শিক্ষক সম্প্রদায়কে আর সদ্ভাষিতাবলীর বন্যায় ভাসিয়ে মানুষ বানানোর হঠকারিতা চলে না। সাধারণের মতো তাঁরাও শ্রমজীবী মানুষ। কায়িক শ্রম না করে তাঁরা মস্তিষ্কের শ্রম করছেন; জিহ্বার শ্রম করছেন। ছাত্ররা তাঁদের কাছে রোল-কলের খাতায় সংখ্যা-মাত্র এবং বিদ্যালয় তাঁদের বিদ্যাবিক্রয়ের বাজার। কথাগুলি শুনতে কটু হলেও, বাস্তব অবস্থার সত্যাসত্য আদর্শবাদের গ্যাসে ধুঁয়োট করার অর্থ হয় না।

শিক্ষকদের আন্দোলনে তাই আজ শ্রমিক-কর্মচারীরাও সহানুভূতিশীল শরিকের মতো পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। সরকারের উচ্চপদস্থ বেতনভুক শিক্ষক-গণকে যখন গেজেটেড অফিসর বলা যায়; শিক্ষকতাকে যখন এডুকেশন সার্ভিসের বিশেষ কোটায় ফেলা যায় তখন মাস্টার মশায়দের নিয়ে বড় বড় আদর্শের বুলি কপচানোর আর সুযোগ কোথায়।

আজকের বাজারে দরদাম যেভাবে অবাধে বাড়ছে তাতে প্রতিদিনই যে বেতন-বৃদ্ধির দাবিতে রাজপথ মুখরিত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। শ্রমিক-কর্মচারীরা এই দাবি নিয়ে রোজ পথে নামছেন, শিক্ষকরা কি পেট মেরে আদর্শের বায়ু সেবন করবেন? পথে বসে পড়তে হচ্ছে তাঁদেরও।

দেশের অর্থনীতিকে আমরা যেভাবে নিয়ে চলেছি, সে তুলনায় বেতনবৃদ্ধির দাবিতে মিটিং মিছিল যে খুবই কম, স্থিরভাবে বিবেচনা করলে তা সহজেই উপলব্ধি করা সম্ভব।

শিক্ষক দিবসে শিক্ষক বিক্ষোভ তাই কোন বিস্ময়ের সৃষ্টি করে না, ব্যাপারটা এমনই স্বাভাবিক, এমনই অবশ্যম্ভাবী। আর সেই সঙ্গে কতিপয় শিক্ষকের জাতীয় পুরস্কার গ্রহণও বিস্ময়ের বালাই রাখে না। যস্মিন দেশে যদাচার।

পুরস্কার যাঁরা গ্রহণ করলেন তাঁরা অভিনন্দনযোগ্য; রুটির লড়াই-এ নেমে যাঁরা অনশন করলেন তাঁরাও অভিনন্দন-যোগ্য; শিক্ষক দিবসে যাঁরা মানুষের উদ্দেশ্য এবং আদর্শের ওপর বক্তৃতা করলেন তাঁরা সংবাদে উল্লেখ্য; এবং যাঁরা সমাজজীবনে নানা বৈপরীত্যের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে বহাল তবিয়তে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে আছেন তাঁরা সমীচের পাত্র! এবং সর্বমোট ফলাফল, একটি বিরাট শূন্য।

আসাম :

মেঘালয়ে মেঘ

গত সংখ্যায় আশঙ্কা প্রকাশ করে-ছিলাম, আসাম পুনর্গঠন সংক্রান্ত ব্যাপারটি নতুন জটিলতার সৃষ্টি করবে। গত সংখ্যার লেখা যখন প্রেসে তখনই সংবাদ বের হল, এ-পি-এচ-এল-সি অর্থাৎ সর্বদলীয় পার্বত্য নেতৃ সম্মেলন তাঁদের স্বতন্ত্র পার্বত্য রাজ্য গঠনের দাবি

শ্রী বি, পি, চালিহা

নস্যাৎ হয়ে যেতে দেখে আগামী ১২ই সেপ্টেম্বরের আগে বা অব্যবহিত পরবর্তী সময় থেকে অহিংস প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। মন্দের ভালো এই যে প্রস্তাবিত সংগ্রামের ঘোষিত চেহারা হবে অহিংস। কিন্তু কাজে ও কথায় যে সমতা বস্তুতই রক্ষিত হবে এমন গ্যারান্টি কোন আন্দোলনেই রাখা যায় না। আন্দোলনের মেজাজ অহিংস থাকলেও নানাদিকের প্ররোচনায় তা মুহূর্তে মধ্যে সহিংস রূপ গ্রহণ করতে পারে। এমন তো হামেসাই হয়। ছাই চাপা আগুন যে কেবলমাত্র ধুঁইয়েই থাকবে, জ্বলবে না, জ্বালাবে না এমন কথা কে বলবেন। খাসি, গারো, জয়ন্তি-য়ার আকাশে যে মেঘ জমা হতে সুরু হল, তাদের আন্দোলন সুরু হলে সে মেঘ কেমন প্লাবনের সৃষ্টি করবে তা কি 'মেঘালয়ে'র (স্বতন্ত্র পার্বত্য রাজ্যের প্রস্তাবিত নাম ছিল মেঘালয়) দাবিদাররাই বলতে পারেন।

অসমীয়াগণের পক্ষে রাজ্যের সুচ্যগ্র মেদিনীর স্বাতন্ত্রীকরণে ঘোরতর আপত্তি অবশ্যই সেন্টিমেন্টের দিক থেকে স্বাভাবিক। কিন্তু পর্বতীয়াগণের অভাব-অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁদের দাবিও অন্যদিকে অস্বীকার করার পথ নেই। কেন্দ্রীয় সরকার তাই যতটা সয়, একটা মধ্যপন্থী রফার চেষ্টায় ছিলেন। তা সে চেষ্টাও ক্রমে নস্যাৎ হতে বসল।

এখনও চেষ্টার ইতি হয় নি। ১০ই সেপ্টেম্বর আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালিহাকে নিয়ে দিল্লী বৈঠক বসছে। এই বৈঠকের ফলাফলের ওপর আসামের ঘনায়মান সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতি নির্ভরশীল। এই মুহূর্তে এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য সেকা-রণেই অনভিপ্রেত। বিশেষ বর্তমান সংখ্যা যখন পাঠকের হাতে তখন হয় সংকট তার মূর্তি পরিগ্রহ করেছে, নচেৎ একটি হেস্তনেস্ত হয়ে গেছে।

আমরা সুখবরের পথ চেয়েই বসে থাকলাম। তবে পূর্ব অভিজ্ঞতা মনে বিশেষ ভরসার অবসর রাখে নি। পর্বতীয়া সমস্যাকে কেন্দ্র করে এ পর্যন্ত জল অনেক ঘোলা করা হয়েছে। সংকটের আসল রূপ প্রত্যক্ষ না করে সরকার বস্তুতই কি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। প্রকৃত স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এমন নজীর অল্প। সংকট ভয়াবহ রূপ না ধরলে এখানে সরকারী সিদ্ধান্ত তার শেষ কর্তব্যের হদিস পায় না।

তবু 'লেট আস হোপ ফর দা বেটার'।

(৭।৯।৬৮)

যেভাবেই হোক আমাদের সোভিয়েট য়ুনিয়নের আস্থা অর্জন করতে হবে : ডুবসেক

চেকোশ্লোভাকিয়া :

চেকোশ্লোভাকিয়া কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে মস্কো চুক্তি পালনের জন্য চেষ্টা করছেন। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় বক্তৃতা প্রসংগে পার্টির প্রথম সম্পাদক আলেকজান্ডার ডুবসেক বলেছেন, "যেভাবেই হোক আমাদের সোভিয়েট য়ুনিয়নের আস্থা অর্জন করতে হবে। মস্কো চুক্তি আমরা মানব না বলে যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর করতে হবে।"

জনসাধারণের মধ্যে মস্কো চুক্তির বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ রয়েছে, নেতৃবৃন্দ তা দূর করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করছেন; এ ব্যাপারে ডুবসেককে বিশেষভাবে সাহায্য করছেন লুডউইক সবোভ্রে, জোশেফ স্মরকোভস্কি, গুস্তাভ হুসাক প্রমুখ বিশিষ্ট নেতা।

সোভিয়েট আস্থা অর্জনের জন্য পার্টি ও সরকারে ব্যাপক পরিবর্তন করা হচ্ছে। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে নতুন প্রেসিডিয়াম গঠন করা হয়েছে। আগে প্রেসিডিয়ামের সদস্য সংখ্যা ছিল ১১, এখন তা বাড়িয়ে ২১ করা হয়েছে। সোভিয়েট সমর্থকদের আরও বেশি সংখ্যায় গ্রহণ করার জন্যই এই সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি। তাছাড়া অনেক পুরোনো সদস্যকে এবার প্রেসিডিয়াম থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

সরকারে যে সব পরিবর্তন করা হয়েছে, তাতে দেখা যায়, গণতন্ত্রীকরণের বিশিষ্ট কয়েকজন নেতা বাদ পড়েছেন। সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও নতুন অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যের প্রধান নায়ক ওটা সিককে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। ওটা সিক বর্তমানে বেলগ্রেডে। তিনি এর পর আদৌ দেশে ফিরবেন কি না সন্দেহ। পররাষ্ট্রমন্ত্রী জিরি হাজেককে বাদ দিয়ে তাঁর জায়গায় তাঁরই সহকারী ভাসলে প্লেসকটকে পররাষ্ট্র দপ্তরের ভার দেয়া হয়েছে। হাজেকও এখন দেশের বাইরে—সুইজারল্যান্ডে। 'প্রাভদা'য় ওটা সিক ও জিরি হাজেককে প্রতিবিপ্লবীদের অন্যতম প্রধান নায়ক বলে আক্রমণ করা হয়েছিল। এ ছাড়াও আর যাঁরা বাদ পড়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জোশেফ প্যাভেল (তাঁর জায়গায় জান পেলনার নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন), পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপাত্র 'রুডে প্রাভো'র প্রধান সম্পাদক অলড্রিচ সুভেস্তকা (তাঁর জায়গায় সম্পাদক হয়েছেন জিরি সেটেবা)।

এত করেও চেক নেতারা সোভিয়েট নেতাদের সন্তুষ্ট করতে পারছেন কি না বলা শক্ত। কারণ, 'প্রাভদা' সমানে বলে যাচ্ছে, প্রতিবিপ্লবীরা এখনও চেকোশ্লোভাকিয়ায় যথেষ্ট শক্তিশালী রয়েছে। 'প্রাগ' থেকে 'প্রাভদা'র প্রতিনিধি লিখছেন, মস্কো চুক্তি অনুযায়ী চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য যা করার কথা, তা এখনও 'সন্তোষজনকভাবে' করা হচ্ছে না।

এদিকে চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনার পর 'ন্যাটো' চক্রের সাজ সাজ রব বেড়ে গিয়েছে। পশ্চিম জার্মানী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কাছে পশ্চিম জার্মানীতে তাদের সৈন্যসংখ্যা আরও বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাগ্রহে এ প্রস্তাবে রাজী হয়েছে। ওয়াশিংটন থেকে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে পশ্চিম জার্মানীতে মার্কিন সৈন্য বাড়ানো হবে।

ব্রাসেলসে 'ন্যাটো'র প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা কমিটির বৈঠক বসেছিল। ফ্রান্স ছাড়া 'ন্যাটো' গোষ্ঠীর ১৫টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে প্রকাশিত ইস্তাহারে বলা হয়েছে : পূর্ব য়ুরোপের ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ অবহিত আছেন। এর জন্য প্রয়োজন মত ব্যবস্থা তাঁরা গ্রহণ করবেন। সোভিয়েট য়ুনিয়ন তথা ওয়ারশ চুক্তি গোষ্ঠীর প্রতি এ অনেকটা সতর্কবাণী বা চ্যালেঞ্জের মত।

ওয়ারশ গোষ্ঠী কর্তৃক চেকোশ্লোভাকিয়ায় সামরিক হস্তক্ষেপ, এবং পশ্চিমী গোষ্ঠীর আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য পশ্চিম জার্মানী (ও অস্ট্রিয়া) সীমান্তে সোভিয়েট য়ুনিয়ন ও অন্যান্য কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ 'ন্যাটো' গোষ্ঠীও পশ্চিম জার্মানীতে সৈন্য বাড়ায়। ফলে দু' পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়।

আবার, সোভিয়েট য়ুনিয়ন নতুন করে যুগোশ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার-অভিযান সুরু করেছে। সোভিয়েট প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপত্র 'রেড স্টার' পত্রিকায় যুগোশ্লাভিয়াকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে। দীর্ঘকাল বিরোধের পর প্রায় ছ' বৎসর পূর্বে উভয় দেশের মধ্যে মৈত্রী সম্পর্কে পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর এই প্রথম সোভিয়েট য়ুনিয়ন যুগোশ্লাভিয়াকে এ রকম কঠোর ভাষায় গাল দিল।

'রেড স্টার' বলেছে, চীনা বিভেদপন্থী (splitters) ও যুগোশ্লাভ শোধনবাদীরা (revisionists) চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রতিবিপ্লবীদের সাহায্য করছে। 'রেড স্টার' আরও অভিযোগ করেছে, চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী ও ব্রিটেন প্রভৃতি যে চক্রান্তে লিপ্ত, চীন ও যুগোশ্লাভিয়া তাদেরই সাহায্য করছে।

লক্ষণীয়, 'রেড স্টারের' সমালোচনায় এবার রুমানিয়ার নাম নেই। 'বামপন্থী' চীন ও 'দক্ষিণপন্থী' যুগোশ্লাভিয়া এই দু'টি দেশ এবার আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র :

ইজরায়েল নতুন করে আবার আরব জগতের বিরুদ্ধে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, এই সংবাদে আরবরা চিন্তিত।

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] উল্লেখযোগ্য [illegible] আরবরাষ্ট্রের প্রতিনিধি-দের এক বৈঠক বসেছিল, ইজরায়েলী আক্রমণের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে আলোচনার জন্য। দশটি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তিনটি দেশের রাষ্ট্রদূত-পর্যায়ের প্রতিনিধি এই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। জর্ডানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মোনেম রিফাই এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

'গত বৎসর জুন মাসে ইজরায়েলের কাছে যুদ্ধে হেরে যাবার পর থেকে আরব জোটের অবস্থা খুব সুবিধার নয়। পরাজয়ের গ্লানি এখনও তারা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। ইজরায়েলের কাছ থেকে অধিকৃত আরব অঞ্চল ফিরে পাওয়া সম্ভব হয় নি। আরব রাষ্ট্রগুলির সৈন্যদের নিয়ে যে সম্মিলিত আরব বাহিনী গড়ে উঠে-ছিল, তাও ধীরে ধীরে লোপ পেয়েছে।

আরবদের নিজেদের মধ্যে বিরোধও ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইয়েমেনে গৃহ-যুদ্ধের অবসান হয় নি। প্রজাতন্ত্রী ইয়েমেন সরকারের পেছনে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সক্রিয় সমর্থন রয়েছে। আবার বিদ্রোহী রাজতন্ত্রীদের সাহায্য করছে সৌদি আরব ও অন্য কয়েকটি রাষ্ট্র। লেবানন ও সিরিয়ার মধ্যে বিরোধ রয়েছে। আবার, সিরিয়ার বামপন্থী বাথ পার্টি আর ইরাকের দক্ষিণপন্থী বাথ পার্টির মধ্যে সম্পর্ক খুব খারাপ—উভয় দলই নিজ নিজ দেশে শাসন ক্ষমতায় রয়েছে। তিউনিসিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত আরব প্রজা-তন্ত্রের বিরোধ রয়েছে। তিউনিসিয়ার প্রতিনিধি এবারও কায়রো বৈঠক থেকে রাগ করে চলে গেছেন।

এইভাবে বহু বিভক্ত আরব শক্তির পক্ষে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে কিভাবে দাঁড়ানো সম্ভব হবে? আরব লীগ আপ্রাণ চেষ্টা করছে, সব আরব রাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য। কায়রো বৈঠক সেই উদ্দেশ্যেই ডাকা।

শেষ পর্যন্ত আলোচনার পর আরব নেতারা কয়েকটি ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছতে পেরেছেন। প্রথম, উপস্থিত সকলে একবাক্যে ঘোষণা করেছেন, ইজরায়েলী আক্রমণের বিরুদ্ধে জর্ডানকে তাঁরা সর্বপ্রকারে সাহায্য করবেন। (সম্প্রতি, বেশ কয়েক বার ইজরায়েলী বিমান থেকে জর্ডানে বেসামরিক এলাকায় বোমাবর্ষণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিরা-পত্তা পরিষদ এই আক্রমণের নিন্দাও করেছে। তা সত্ত্বেও ইজরায়েল হুমকী দিয়েছে, তারা আবার আক্রমণ করবে।) দ্বিতীয়, প্যালেস্টাইন কম্যান্ডোর বীর যোদ্ধারা ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম পরিচালনা করছে, তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। তৃতীয়, কায়রো বৈঠকে ঠিক করা হয়েছে ইজরায়েলীরা কিভাবে জেরুজালেমে মুসলমান ও খৃস্টানদের পবিত্র ধর্মস্থানগুলি নষ্ট করছে ইচ্ছাকৃত ভাবে অপবিত্র করছে, তা সমগ্র বিশ্বে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হবে। সুয়েজ খাল এলাকায় ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘর্ষের ব্যাপারে ও আরব নেতারা আলোচনা করেন। এ ছাড়া, আবদুল খালিক হাসুনাকে আরও এক বছরের জন্য আরব লীগের সেক্রেটারী-জেনারেল পদে পুন-র্নিয়োগ করা হয়। হাসুনা ১৯৫২ সাল থেকে এই সংস্থার সেক্রেটারী-জেনারেল পদে রয়েছেন।

অন্তর্বিরোধে ক্ষতবিক্ষত হলেও আরব জাতিগুলির পক্ষে ইজরায়েলী আক্রমণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়ানো সম্ভব হবে বলেই অধিকাংশের ধারণা। নাসেরের বিরুদ্ধে কোন কোন আরব মহলে কিছুটা বিরূপ মনোভাব দেখা গেলেও, এখনও নাসেরই আরব জগতের সবচেয়ে প্রভাব-শালী ও জনপ্রিয় নেতা, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কায়রো বৈঠকে এই কথাই আর একবার প্রমাণিত হল।

কঙ্গো প্রজাতন্ত্র :

কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে (ব্রাজাভিল) এত দ্রুত সামরিক অভ্যুত্থান ও শাসক পরি-বর্তন হচ্ছে যে মাঝে মাঝে ঘটনার সঙ্গে তাল রেখে চলা শক্ত হয়ে পড়ছে। মাত্র অল্প কদিন আগে খবর এল, এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি আলফন্‌স্ মাসাম্বা-দেবাতকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার খবর এল, এই অভ্যুত্থানের উদ্যোক্তা সৈন্য-বাহিনী বিশ ঘণ্টা পরে আবার এই মাসাম্বা-দেবাতকেই রাষ্ট্রপতি পদে ফিরিয়ে এনেছে।

গত ৩০শে আগস্ট রাত্রে আর এক বার সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে বলে সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। এবার মাসাম্বা-দেবাতকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় আলফ্রেড রাওলকে রাষ্ট্রপতি পদে বসানো হয়েছে। ঘোষণা করা হয়েছে, রাওল নিজে রাষ্ট্রপতি ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। রাওল যে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন তাতে প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পায়গনেট ছাড়া পুরোনো মন্ত্রিসভার (মাসাম্বা-দেবাতের) আর সবাই আছেন।

মাসাম্বা-দেবাতকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রয়াস এবার বিনা রক্তপাতে সম্ভব হয় নি। ব্রাজাভিলের পথে উভয়পক্ষের মধ্যে জোর সংঘর্ষ হয়েছে। অনেক ব্যক্তি এই সংঘর্ষে মারা গেছে। দক্ষিণাঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে মাসাম্বা-দেবাতের প্রভাব বেশি। সেখানে এখনও অভ্যুত্থানবাদীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের জোর লড়াই চলছে।

এবারের অভ্যুত্থানের নায়করা দক্ষিণপন্থী না বামপন্থী ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ না পাওয়া পর্যন্ত এখনই সে সম্পর্কে নিশ্চিত বলা মুশকিল। তবে এতদিন কঙ্গো (ব্রাজাভিল) সরকার বামপন্থী না বামপন্থী. ঘটনার বিস্তৃত কয়েকমাস হল মাসাম্বা-দেবাত তার থেকে কিছুটা সরে আসার চেষ্টা করছিলেন বলে তাঁর নিজের দল ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। গতবারের অভ্যুত্থানের চেহারা ছিল নিশ্চিতভাবে বামপন্থী।

গুয়াতেমালা :

গুয়াতেমালার মার্কিন রাষ্ট্রদূত জন গর্ডন মেন আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন। কেবল মধ্য বা দক্ষিণ আমেরিকাতেই নয়, ইতিপূর্বে বিশ্বের আর কোথাও এভাবে কোন মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিহত হন নি। এই ঘটনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো বটেই, গুয়াতেমালা তথা সমগ্র লাতিন আমেরিকা অঞ্চলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জন গর্ডন মেন একটি সরকারী ভোজসভায় যোগ দেবার পর তাঁর গাড়িতে করে গুয়াতেমালার শহরতলীতে তাঁর বাড়িতে ফিরছিলেন। গাড়িতে তিনি ও তাঁর মোটরচালক ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। হঠাৎ বিপরীত দিক থেকে দুটি গাড়ি এসে তাঁর গাড়িটিকে আটক করে। গাড়ি থেকে কয়েকজন লোক নেমে আসে। তারা জোর করে মেনকে গাড়ি থেকে রাস্তায় বের করে আনে, এবং সাব-মেশিন গানের গুলিতে তাঁকে হত্যা করে পথের মাঝখানে ফেলে চলে যায়।

মেন মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগের অভিজ্ঞ কর্মচারী। লাতিন আমেরিকার কূটনীতিতে তাঁর পারদর্শিতা দীর্ঘদিনের। কদিনের মধ্যেই গুয়াতেমালা ছেড়ে রাষ্ট্রসংঘের অপর একটি পদে তাঁর যোগ দেবার কথা ছিল।

এখন কথা হল : কেন এই হত্যা? সাধারণ হত্যাকাণ্ড এটা নয়। হত্যাকারীদের মেনের ওপর ব্যক্তিগত কোন রাগ আছে বলেও মনে হয় না। রাজনীতির দিক থেকেও মেন এমন কিছু বিখ্যাত ব্যক্তি অথবা মার্কিন সরকারী নীতির একজন প্রধান কর্ণধারও নন।

এ নেহাৎই গুয়াতেমালার এক শ্রেণীর জনসাধারণের তীব্র মার্কিনবিরোধী মনোভাবের প্রকাশ। সমগ্র লাতিন আমেরিকা জুড়েই আজ মার্কিন কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছে। গুয়াতেমালাও তার থেকে বাদ নেই। মার্কিন বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ক্যাস্ট্রোপন্থী এফ-এ-আরের (রেবেল আর্মড্ ফোরসেস) লোকেরাই এই হত্যাকাণ্ড করেছে।

কেবল মার্কিনবিরোধী মনোভাবই নয়, সেই সঙ্গে ক্যাস্ট্রো-গুয়েভারার অনুগামীদের গোপন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, এই আজ লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের অবস্থা।

এই ঘটনার পর রাষ্ট্রপতি জুলিও সিজার মেনদেজ মন্টেনিগ্রো সারা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন। ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর নিয়ন্ত্রণ কঠোরতর করা হয়েছে। যে কোন লোককে প্রয়োজনে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১৯৬৬ সালে জনবিদ্রোহে সামরিক একনায়কত্বের অবসান ঘটিয়ে মেনদেজের নেতৃত্বে মোটামুটি একটি গণতান্ত্রিক শাসন গুয়াতেমালায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে মেনদেজ সরকার প্রতি ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করেছে। এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর নীতি গ্রহণের জন্য মেনদেজ সরকারের ওপর চাপ দেবে।

তিন ভূমিকায়—

অন্তর্বর্তী নির্বাচনের মুখে দার্জিলিং জেলার স্বায়ত্তশাসনের দাবি মুখর হয়ে উঠেছে। শুধু মুখর বললে সবটা বলা হয় না, কারণ এক বিভেদ ও বিচ্ছেদকামী শক্তি সূক্ষ্ম আবরণে নিজেকে আড়াল করে উঁকিঝুঁকি মারছে। দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসে সম্প্রতি একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এবং সেই প্রস্তাব আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর রাজ্য কংগ্রেসের সভায় আলোচিত হবে। সেটি এমন এক স্পর্শকাতর প্রস্তাব যে, সে প্রস্তাব গৃহীত হলে পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য এলাকার স্বার্থ সম্পর্কে চরম উদ্বেগ দেখা দেবে, আবার গৃহীত না হলে শান্ত শৈলশিখর দার্জিলিং ঝড়ের কেন্দ্রে পরিণত হবে। দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের প্রস্তাবের মূল কথা হল—দার্জিলিং জেলা স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাবের মাধ্যমে রাজ্যের মধ্যে মার্লদা "হিল এরিয়াজ কমিটি অফ দি স্টেট এসেমব্লী" চেয়েছেন। আলাদা আইনসভা চাওয়ার অর্থ হল ভবিষ্যতে আলাদা রাজ্য চাইবার পদক্ষেপ। দার্জিলিং জেলার পার্বত্য এলাকার কংগ্রেস নেতারা অবশ্য এক্ষুণি আলাদা রাজ্য চাইবার কথাটা মুখ ফুটে বলছেন না, কিন্তু তাঁদের প্রস্তাবকে যদি যথাযথ রূপ দেওয়া যায়, তবে দার্জিলিং একদা পশ্চিমবাংলা থেকে আলাদা হয়ে যাবেই। পার্বত্য এলাকার কংগ্রেস নেতাদের জিদ এবং এই প্রস্তাব গ্রহণের পটভূমিকা বিশ্লেষণ করলে এই সত্য ধরা পড়বেই।

দার্জিলিং জেলার সমতল এলাকার কংগ্রেস নেতারা কোনক্রমেই দার্জিলিং পার্বত্য এলাকার কংগ্রেস নেতাদের এই পরিকল্পনার সংগে নিজেদের যুক্ত করতে রাজী নন। সমতল এলাকার কংগ্রেস নেতারা প্রথমে সর্বপ্রকারে এই প্রস্তাব গ্রহণের বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু যখন দেখলেন পার্বত্য এলাকার কংগ্রেস নেতাদের কোনক্রমে বাগে আনা যাবে না, তখন তাঁরা এই প্রস্তাবের সংগে এক সংশোধনী এনে বললেন ঠিক আছে দার্জিলিংকে যদি স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়, তবে সমতলবাসীরা নিজেদের দার্জিলিং থেকে আলাদা করে নেবে। সমতলবাসীরা কোনক্রমে নিজেদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পরিকল্পনার সংগে যুক্ত রাখবে না। তাই ঠিক হল দার্জিলিংকে যদি স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়, তবে শিলিগুড়ি সহ সমতল এলাকা দার্জিলিং থেকে আলাদা হয়ে যাবে—নিজেরা স্বতন্ত্র জেলা হিসাবে নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করবে।

দার্জিলিং জেলায় এই যে নতুন ঝড় উঠেছে এ কিন্তু কোন হঠাৎ-ঘটা ঘটনা নয়। এই ঘটনার পিছনে রয়েছে এক দীর্ঘ দিনের ইতিহাস। সেই সুদূর অতীতে ১৮৩৫ সালে দার্জিলিং পাহাড়ের শাসনভার ইংরেজ গ্রহণ করে সামরিক প্রয়োজনে ও ইংরেজ কর্মচারীদের স্বাস্থ্য-নিবাস তৈরি করতে। পরে ১৯১৬ সালে দার্জিলিং জেলা হিসাবে রূপ পায়। তারপর অনেক দিন পর ১৯৫৩-৫৪ সালের দার্জিলিং জেলার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি ওঠে। এই দাবির জনক হল কমুনিস্ট পার্টি। কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হিসাবে শ্রীরতনলাল ব্রাহ্মণ প্রথম যখন নির্বাচিত হন, তখন তাঁর নির্বাচনী ধ্বনি ছিল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন। পরে জাতীয়তাবাদকে ভিত্তি করে গোর্খা লীগ গঠিত হয়—তাদেরও প্রধান দাবি ছিল দার্জিলিং-এর জন্য স্বায়ত্তশাসন। ১৯৫৫ সালে এই দাবি এত উগ্র রূপ গ্রহণ করে যে কংগ্রেসকেও এই দাবি সমর্থন করতে হয়। ১৯৫৪ সালে গোর্খা লীগ, কম্যুনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেস যুক্তভাবে এক স্মারকলিপি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করে। এই সময়ের আন্দোলনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মন্ত্রী কালীপদ মুখার্জীর নেতৃত্বে এক অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেন। এই সময় বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ ও পাহাড় এলাকাকে বেশ কিছু সুবিধা দেওয়া হয় এবং পরবর্তীকালে তার জের চলে। কিন্তু যাদের জন্য এই সব ব্যবস্থা তারা কিন্তু খুশি হয় না। রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হলে সেই সরকার আরো একটু এগিয়ে গিয়ে দার্জিলিং ও নেপালীভাষীদের জন্য কিছু কাজ করেন নেপালী ভাষাকে স্বীকৃতি দেন। ১৯৬৮ সালে গোর্খা লীগ আবার এই দাবি তোলে এবং যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচীতে এই দাবির ভাবধারা সংযুক্ত করা হয়। গোর্খা লীগের পর কংগ্রেস আরো এক ধাপ এগিয়ে দাবি তোলেন দার্জিলিং-এর স্বায়ত্তশাসন চাই। কংগ্রেসের প্রাক্তন উপমন্ত্রী শ্রী এন বি গুরুং হুমকি দেন কংগ্রেস এই প্রস্তাব সমর্থন না করলে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করবেন। সম্প্রতি কালিম্পং কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে যে বিলম্ব ঘটল তার পিছনেও রয়েছে এই প্রস্তাব। যতক্ষণ জেলা কংগ্রেস রাজী না হয়েছে ততক্ষণ কালিম্পং-এ প্রার্থী পাওয়া যায় নি।

গত মার্চ মাসে জেলা কংগ্রেসের সভায় শ্রী এন বি গুরুং প্রথম জেলা ভাগের প্রস্তাব তোলেন। পরে ১৮ই আগস্ট শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত জেলা কংগ্রেসের সভায় শ্রীঅরুণ মৈত্র, শ্রীপঞ্চানন তালুকদার, শ্রীসনৎ ঘোষ এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। অর্থাৎ এইদিন থেকে জেলা কংগ্রেসের পার্বত্য ও সমতল এলাকার নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। ২৫শে আগস্ট কালিম্পং-এ জেলা কংগ্রেসের সভায় দার্জিলিং জেলা ভাগের প্রস্তাব সর্বসম্মতিভাবে গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে জেলা সদর কার্শিয়াং ও কালিম্পং স্বায়ত্তশাসন জেলা এবং শিলিগুড়ি ও তার সংলগ্ন এলাকা নিয়েও আর একটি পৃথক জেলা গঠিত হবে। পাঁচ ঘণ্টা আলোচনার পর এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। দার্জিলিং জেলার স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রস্তাব গৃহীত হলে শিলিগুড়ি এলাকার কংগ্রেস নেতাগণ স্বতন্ত্র প্রস্তাব পেশ করেন। এই প্রস্তাব শিলিগুড়িকে দার্জিলিং জেলা থেকে আলাদা করার প্রস্তাব সংশোধনী হিসাবে মূল প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন শ্রী টি মানিশয়ন। সমর্থন করেন শ্রীকালীপদ ধর। এই প্রস্তাব পাশ হবার পরদিনই যুক্তফ্রন্ট নেতা শ্রীদেওপ্রকাশ রাই বলেন যে দার্জিলিং পার্বত্য এলাকা থেকে শিলিগুড়ি মহকুমাকে বাদ দিয়ে আর একটি স্বতন্ত্র জেলা গঠনের কংগ্রেসী প্রস্তাব বেদনাদায়ক ও বিপজ্জনক। এই প্রস্তাবের ফলে সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবেই। কংগ্রেস এই প্রস্তাবের দ্বারা প্রমাণ করতে চায় যে, শিলিগুড়ি আর দার্জিলিং-এর মানুষ একসংগে বসবাস করতে পারে না।

গোর্খা লীগ নেতা শ্রীদেওপ্রকাশ রাই

আশংকা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তিনি এই কথা বললেন না যে, না দার্জিলিং-এর জন্য কোন আলাদা ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই, দার্জিলিং সারা পশ্চিমবঙ্গের সংগে এক থেকে তার ভাগ্য পশ্চিমবঙ্গের সংগে অভিন্ন রাখবে। এই ক্ষেত্রে শ্রী এন বি গুরুং ও শ্রী টি ম্যানিবেনের সংগে শ্রীদেও-প্রকাশ রাই-এর তফাৎ হল শ্রীদেওপ্রকাশ রাই যে প্রস্তাব শুধুমাত্র আভাসে-ইঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন, কংগ্রেস নেতারা সেটা প্রকাশ্যে বলে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে দুই পক্ষই নেপালী ও লেপচা জনসাধারণকে বিচ্ছিন্নকামী মনোভাবে প্রলুব্ধ করে ভোট চায়। শ্রীদেওপ্রকাশের বিপদ হয়েছে এই যে কংগ্রেস তাঁর চেয়ে এককাঠি এগিয়ে গেছে। শ্রীদেওপ্রকাশ রাইয়ের সংগে শ্রীগুরুং-এর দলের তফাৎ হল—শ্রীরাই দার্জিলিং-এ স্বায়ত্তশাসন চান, কিন্তু শিলিগুড়িকে বাদ দিয়ে নয়, শিলিগুড়িকে সংগে নিয়ে। আর শ্রীগুরুং ও শ্রীম্যানি-বেন দার্জিলিং-এর স্বায়ত্তশাসন চান—তার জন্য দরকার হলে শিলিগুড়িকে দার্জিলিং থেকে ছাঁটাই করতে রাজী। কিন্তু রাজ্য কংগ্রেস পড়েছেন এক দোটানায়। তাঁরা শিলিগুড়ি সহ সমতল এলাকাকে খুশি রাখবেন, না দার্জিলিং-এর পার্বত্য এলাকাকে খুশি রাখবেন। আর একটি কথা হল—ঠিক এমন একটা সময় বুঝে দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস এই প্রস্তাব নিয়ে হল্লা তুললো, যখন শুধু নির্বাচন শিয়রে নয়, আসামে এই প্রশ্ন নিয়ে ঝড় চলছে। আসামের পার্বত্য এলাকার মানুষকে নিয়ে আসাম কংগ্রেস এবং কেন্দ্রীয় সরকার যখন হিমসিম খাচ্ছেন, তখন পশ্চিমবঙ্গেও একই ঝড় উঠল। সবচেয়ে শেষে যে প্রশ্ন মনে আসে, সেই প্রশ্ন হল—পার্বত্য এলাকার মানুষ কেন এই স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধিকার দাবি করছে। পার্বত্য এলাকার মানুষের বক্তব্য হল যে, তারা সমতল এলাকার সংগে অগ্রগতির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে। তাই প্রশাসনিক কিছু সুবিধা পেয়ে নিজেদের সমতলের সমকক্ষ করে নিতে চায়। আপাতদৃষ্টিতে কথাটা সত্যি মুখরোচক। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, এই কথাটা দার্জিলিং জেলার ক্ষেত্রে একেবারে ভুয়া। অন্য পার্বত্য এলাকার কথা এই ক্ষেত্রে তুলে লাভ নেই, দার্জিলিং পার্বত্য এলাকার মানুষের কিন্তু কোনদিক দিয়েই কোন বক্তব্য থাকতে পারে না। দার্জিলিং রাজ্যের সমতল এলাকা থেকে অগ্রগতির ক্ষেত্রে পিছিয়ে তো নেই, বরং বহু ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে। দার্জিলিং-এর স্থানীয় ভাষাকে রাজ্যে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, পার্বত্য এলাকার সংস্কৃতি প্রসারে শিলিগুড়িতে [illegible] [illegible] [illegible] হয়েছে। দার্জিলিং-এ নেপালী [illegible] শিক্ষার [illegible] [illegible] অনুপাতে আছে। রাজ্যের জনসংখ্যার অনুপাতে যে-কোন স্থানের তুলনায় দার্জিলিং জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কম নয়, বরং বেশি। বর্গমাইল হিসাবে মোটর চলার রাস্তা রাজ্যের যে-কোন এলাকা থেকে দার্জিলিং জেলায় বেশি। চাকুরীর ক্ষেত্রেও দার্জিলিং-এর মানুষ অন্য এলাকা অপেক্ষা অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধে পায়। অর্থাৎ রাজ্যের লোকসংখ্যা হিসাবে বেকারের সংখ্যা দার্জিলিং জেলাতে কম। সর্বোপরি রাজ্য সরকারের কাছ থেকে জেলা হিসাবে রাজকোষ থেকে সবচেয়ে বেশি অর্থ পায় দার্জিলিং জেলা। দার্জিলিং জেলা রাজস্ব ভাণ্ডারে যদি জমা দেয় এক টাকা, তবে রাজ্য সরকার দার্জিলিং-এর জন্য ব্যয় করেন ১১ টাকা। অর্থাৎ দার্জিলিং থেকে রাজ্য অর্থভাণ্ডারে যে টাকা রাজস্ব হিসাবে আসে, রাজ্য সরকার তার ১১ গুণ বেশি দার্জিলিং-এর জন্য খরচ করে। তবু কেন এই বিক্ষোভ? এর একমাত্র জবাব—যে যত পায়, তার দাবি তত বেশি হয়। কাশ্মীরের জন্য ভারত সরকারের খরচ সবচেয়ে বেশি, কাশ্মীরে চালের দাম সবচেয়ে সস্তা, তবু কাশ্মীরে কত বিক্ষোভ—স্বাধীনতা চাই, স্বতন্ত্র হতে চাই। এই স্বতন্ত্রকামীরা কেন যুক্তি-তর্কে আসতে চায় না এবং অন্তত ভাবা-বেগে বিচ্ছিন্নতাকামীরা চলে দার্জিলিং-এ এই বিচ্ছিন্নকামিতা রোগ সৃষ্টি হয়েছে—এই রোগের নিরাময় সহজ নয়। সোজা জিজ্ঞাসা করেছিলাম দার্জিলিং-এর একজন কংগ্রেস নেতাকে—আপনাদের মধ্যে কিজো কে হবে, বেস্তাফেড গাইকেল স্কট আছেন তো, আর শ্রীবাক্সাপাপালাচারী বা শ্রীজয়-প্রকাশ নারায়ণ সব আপনাদের দাবি সমর্থন করে বিবৃতি দিচ্ছেন? কংগ্রেস নেতা শুধু করজোড়ে বললেন—পাগলকে নৌকায় চাপিয়ে আর নৌকা ডোবাবার কথা মনে করিয়ে দেবেন না। দার্জিলিং জেলার কথা একটু ভাল করে আপনারা ভাববার চেষ্টা করুন। শুধু চীন-পাকি-স্তান নয়, আরো কয়েকটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রও দার্জিলিং সম্পর্কে খুবই লোভা-তুর। একদল পাগল কিছুদিন আগে এই দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়িতে মুক্তাঞ্চল সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিল, আবার বছর না ঘুরতেই আর একদল স্বায়ত্ত-শাসনের নামে আলাদা রাজ্য গড়বার স্বপ্ন দেখছে। ব্যাপারটা কিন্তু যত ছোট ও সহজ মনে করছেন, তত ছোট নয়। দার্জিলিং জেলায় [illegible] [illegible] [illegible] দেখা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আলোচ্য পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র ও সকল বুদ্ধিশীল মানুষের সমালোচনা যেখানে প্রেরণাবাদী গান্ধীর বিরুদ্ধে সংবদ্ধ হয়েছে, সে প্রসঙ্গটির [illegible] উল্লেখ করা যায়। এক বৎসরের [illegible] গান্ধী [illegible] ঘোষণা করেছিলেন। [illegible] এক বছর [illegible] দিন যারা বেঁচে আছে এবং [illegible] অনেকদিন বাঁচতে চায়, সকলেই ভাবল একটা বছর সময়ের দিক থেকে এমন কি সুতরাং একটু গা ঘামিয়ে দেখা যা[illegible] না কিছু চরকা কেটে এক বছর পড়াশোনা ও আদালত বন্ধ করে, টাক্স দেওয়া কোন রকমে বছরখানেক ঝুলিয়ে রেখে যদি স্বরাজটা পেয়ে যাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন [illegible] আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এ হল সন্ন্যাসীর তামাকে [illegible] সোনা করে দেওয়া।

সুভাষচন্দ্র কি বলেন? গান্ধীজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে যিনি [illegible] [illegible] পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রশ্ন [illegible]ছিলেন, তাঁর মনোভাব এ ব্যাপারে [illegible] না হওয়াই [illegible]।

"৩১শে ডিসেম্বর [illegible] আগে বা পরে চাঞ্চল্য [illegible] কিছু ঘটল না। প্রতিশ্রুত স্বরাজ এল না। [illegible] মাস আগে প্রাক্তন বিপ্লবীদের এক সম্মেলনে মহাত্মা বলেছিলেন - তিনি এই বৎসরের শেষে স্বরাজপ্রাপ্তি সম্বন্ধে এতই সুনিশ্চিত যে ৩১শে ডিসেম্বরের পরে স্বরাজ বিনা তিনি বেঁচে আছেন ভাবতেই পারেন না। তিনি আরো বলেছিলেন প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব এবং [illegible] স্বায়ত্তশাসন তিনি চাইলেই পেয়ে যান কিন্তু তাঁর ইচ্ছা খাঁটি ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস এবং তা পেলেই তিনি তাঁর আশ্রমের উপরে ইউনিয়ন জ্যাক ওঠাতে রাজী। ১৯২১ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের উপর যখন যবনিকাপাত হল—আমার মনশ্চক্ষু থেকে এই সব কথা স্বপ্নবৎ উড়ে গেল।"

"ভারতের জনগণ ১৯২১ সালে ১ বৎসরের মধ্যে স্বরাজ পাওয়া সম্বন্ধে কী গভীর বিশ্বাস পোষণ করেছিল, তা এই দূরবর্তী (১৯৩৪) সময়ে ঠিকভাবে অনুভব করা সম্ভব নয়। চরম সন্দিগ্ধ বুদ্ধিজীবী পর্যন্ত সেই আশাবাদে ধরা দিয়েছিল। ১৯২১ সালে প্রকাশ্য জনসভায় একজন প্রতিষ্ঠাবান বাঙালী অ্যাডভোকেটের বক্তৃতার কথা আমার মনে আছে বক্তৃতার মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ গাম্ভীর্য ও আন্তরিকতার সঙ্গে বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিলেন—'আমরা এই বৎসর শেষ হওয়ার আগে নিশ্চয় স্বরাজ পেয়ে যাচ্ছি। যদি আপনারা প্রশ্ন করেন, কিভাবে তা পেয়ে যাচ্ছি তার উত্তর আমি দিতে পারব না। কিন্তু আমরা যে স্বরাজ পাচ্ছি তাতে ভুল নেই।' ১৯২১ সালের অপর একটি ঘটনা: কলকাতার একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী রাজনীতিকের সঙ্গে মহাত্মার দ্বারা প্রভাবিত কোনো বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। তিনি ঘোষণা করলেন, 'কংগ্রেসের সব কর্তব্য বৎসরের মধ্যে শেষ করে ফেলা উচিত, পরের বছরের জন্য কোনো কিছুই রাখা ঠিক হবে না।' সাধারণ বুদ্ধির কাছেও এটা অসম্ভব কথা কিন্তু মহাত্মাকে সমর্থন করে সেই বন্ধু বললেন 'আমরা ৩১শে ডিসেম্বরের পরে তাকাচ্ছি না বলে নিশ্চিতভাবে স্থির করেছি।' এ সকলই এখন পাগলামি বলে মনে হবে।"

"এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজের প্রতিশ্রুতি কেবল বুদ্ধিহীনতার নয়, ছেলেমানুষির পরিচয়। যে কোনো যুক্তিশীল লোকের কাছে তার নির্বুদ্ধিতা ধরা পড়েছিল। মহাত্মার শিষ্যরা অবশ্য পরে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে বলেন—দেশ শর্ত পালন করে নি বলেই এক বছরে স্বরাজ পাওয়া যায় নি। মূল প্রতিশ্রুতিটি যেমন [illegible], ব্যাখ্যাটিও অনুরূপ অসন্তোষজনক, কারণ [illegible] কোনো [illegible] অমুক শর্ত পালন করলে [illegible] এক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উচিত, [illegible] কি [illegible] এবং তার [illegible] কোন [illegible] পারে।"

এক [illegible] স্বরাজের [illegible] [illegible] ও খেলাফতকে [illegible] [illegible] যায়। [illegible] হিন্দু-মুসলিম মিলনের অতিশয় বিরোধী। তাঁর শিল্পসমৃদ্ধ রচনায় প্রকাশিত মনোভাব শরৎচন্দ্রের [illegible] লেখায় সমর্থিত। এখানে [illegible] লেখার কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি:

'বছর কয়েক পূর্বে [illegible] অহিংস অসহযোগের [illegible] একটা কথা [illegible] মিলিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে হিন্দু মুসলিম মিলন চাই ই। চাই শুধু জিনিসটা ভাল বলিয়া নয়, চাই ই এইজন্য যে, এ না হইলে স্বরাজ বলো, স্বাধীনতা বলো,

তাহার কল্পনা করাও পাগলামি। কেন পাগলামি একথা যদি কেহ তখন জিজ্ঞাসা করিত, নেতৃবৃন্দ কি জবাব দিতেন তাঁহারাই জানেন, কিন্তু লেখায় বক্তৃতায় চীৎকারের বিস্তারে কথাটা এমনই বিপুলায়তন ও স্বতঃসিদ্ধ হইয়া গেল যে, এক পাগল ছাড়া আর এত বড় পাগলামি করিবার দুঃসাহস কাহারও রহিল না।

তার পরে এই মিলন-ছায়াবাজির রোশনাই জোগাইতেই হিন্দুর প্রাণান্ত হইল। সময় এবং শক্তি কত যে বিফলে গেল তাহার ত' হিসাবও নাই। ইহারই ফলে মহাত্মাজীর আন্দোলন, ইহারই ফলে দেশবন্ধুর প্যাক্ট। অথচ এত বড় দুটা ভুয়া জিনিসও ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কম আছে। প্যাক্টের তবু বা কতক অর্থ বোঝা যায়: কারণ কল্যাণের হউক, অকল্যাণের হউক, সময় মত একটা ছাড়-বফা করিয়া কাউন্সিল-ঘরে বাংলা সরকারকে পরাজিত করিবার একটা উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু খিলাফৎ-আন্দোলন হিন্দুর পক্ষে শুধু অর্থ-হীন নয়, অসত্য। কোনো মিথ্যাকেই অবলম্বন করিয়া জয়ী হওয়া যায় না। এবং যে-মিথ্যার জগদ্দল পাথর গলায় বাঁধিয়া এত বড় অসহযোগ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত রসাতলে গেল, সে এই খিলাফৎ। স্বরাজ চাই, বিদেশীর শাসনপাশ হইতে মুক্তি চাই, ভারতবাসীর এই দাবির বিরুদ্ধে ইংরাজ হয়ত একটা যুক্তি খাড়া করিতে পারে, কিন্তু বিশ্বের দরবারে তা টিকে না। পাই বা না পাই এই জন্মগত অধিকারের জন্য লড়াই করায় পুণ্য আছে, প্রাণপাত হইলে অন্তে স্বর্গবাস হয়। এই সত্যকে অস্বীকার করিতে পারে জগতে এমন কেহ নাই। কিন্তু খিলাফৎ চাই—এ কোন্ কথা? যে-দেশের সহিত ভারতের সংস্রব নাই যে-দেশের মানুষে কি খায়, কি পরে, কি-রকম তাদের চেহারা, কিছুই জানি না, সেই দেশ পূর্বে তুর্কীর শাসনাধীন ছিল, এখন যদিচ, তুর্কী লড়াইয়ে হারিয়াছে, তথাপি সুলতানকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হউক, কারণ, পরাধীন মুসলমান সমাজ আবদার ধরিয়াছে। এ কোন্ সঙ্গত প্রার্থনা? অতএব ইহাও একটা প্যাক্ট। ঘরের ব্যাপার। যেহেতু আমরা স্বরাজ চাই, এবং তোমরা চাও খিলাফৎ—অতএব এসো, একত্র হইয়া আমরা খিলাফতের জন্য মাথা খুঁড়ি এবং তোমরা স্বরাজের জন্য তাল ঠুকিয়া অভিনয় শুরু কর কিন্তু এদিকে বৃটিশ গভর্ন-মেণ্ট কর্ণপাত করিল না এবং ওদিকে [illegible] জন্য [illegible] সেই খলিফাকেই তুর্কীরা দেশ হইতে বাহির করিয়া দিল। সুতরাং এইরূপে খিলাফৎ-আন্দোলন যখন নিতান্তই অসার ও অর্থহীন হইয়া পড়িল, তখন নিজের শূন্যগর্ভতায় সে শুধু নিজেই মরিল না, ভারতের স্বরাজ আন্দোলনেরও প্রাণবধ করিয়া গেল। বস্তুতঃ এমন ঘুষ দিয়া, প্রলোভন দেখাইয়া, পিঠ চাপড়াইয়া কি স্বদেশের মুক্তিসংগ্রামে লোক ভর্তি করা যায়, না করিলেই বিজয়লাভ হয়? হয় না, এবং কোনদিন হইবে বলিয়াও মনে করি না।

"এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি খাটিয়াছিলেন মহাত্মাজী নিজে। এতখানি আশাও বোধ করি কেহ করে নাই, এত বড় প্রতারিতও বোধ করি কেহ হয় নাই। সেকালে বড় বড় মুসলিম পাণ্ডাদের কেহ-বা হইয়াছিলেন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত, কেহ-বা বাম হস্ত, কেহ-বা চক্ষু কর্ণ, কেহ-বা আর কিছু—হায়রে! এত বড় তামাশার ব্যাপার কি আর কোথাও অনুষ্ঠিত হইয়াছে! পরিশেষে হিন্দু-মুসলমান মিলনের শেষ চেষ্টা করিলেন তিনি দিল্লীতে—দীর্ঘ একুশ দিন উপবাস করিয়া। ধর্মপ্রাণ সরলচিত্ত সাধু মানুষ তিনি, বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, এতখানি যন্ত্রণা দেখিয়াও কি তাহাদের দয়া হইবে না! সে-যাত্রা কোনমতে প্রাণটা তাঁহার টিকিয়া গেল। ভ্রাতার অধিক, সর্বাপেক্ষা প্রিয় মিঃ মহম্মদ আলিই বিচলিত হইলেন সবচেয়ে বেশি। তাঁহার চোখের উপরেই সমস্ত ঘটিয়াছিল—অশ্রুপাত করিয়া কহিলেন আহা! বড় ভাল লোক এই মহাত্মাজীটি! ইঁহার সত্যকার উপকার কিছু করাই চাই। অতএব আগে যাই মক্কায়, গিয়া পীরের সিন্নি দিই, পরে ফিরিয়া আসিয়া কলমা পড়াইয়া কাফের-ধর্ম ত্যাগ করাইয়া তবে ছাড়িব।

"শুনিয়া মহাত্মা কহিলেন, পৃথিবী দ্বিধা হও।"

কঠিন সমালোচনা। যেমন সরল তেমনি মর্মান্তিক। খিলাফৎ মরল সেই সঙ্গে ভারতের স্বরাজ-আন্দোলনের প্রাণবধ করে গেল। কোথায় তুর্কীর সুলতান, তাঁর রাজ্য গিয়েছে আর কোথায় ভারতবর্ষ—সেখানকার মুসলমানেরা ধর্মরাজার জন্য কাঁদছে! ভারতীয় মুসলমানদের বহির্মুখী এই আকর্ষণকে পাখার বাতাস দিয়ে বাড়িয়ে যে ভারতের সর্বনাশ করা ছাড়া আর [illegible] হয় নি, তাতে সন্দেহ কোথায়? [illegible] রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক [illegible] বিষয়ে [illegible] রাজনৈতিক [illegible] ব্যাপারে রাজী হলেন কি করে?

সুভাষচন্দ্র কিন্তু ধর্মমন্দিরের রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। তিনি প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্যাক্টে বিশ্বাস করতেন, অথচ সেই প্যাক্ট যাতে পরবর্তীকালে ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর না হয়, সে বিষয়ে সাবধান হতে চাইতেন। তাই খিলাফৎকে সমর্থন জানিয়ে যদি ভারতীয় মুসলমানদের আন্দোলনে টেনে আনা যায় (যখন তারা আরব-পারস্য-তুরস্কের রাম রাজ্যের প্রয়োজন ছাড়া মাতবে না), তাহলে তাতে তিনি গররাজি নন, কিন্তু তাঁর বক্তব্য, এটা বাইরের চুক্তি, আসল উদ্দেশ্য ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে মুসলমানদের আকর্ষণ করা; তাঁর মতে সেটা সম্ভব হোত যদি মুসলমানদের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের অধীনে থেকে খিলাফৎ আন্দোলন করতে দেওয়া হোত। সুভাষচন্দ্র বলেছেন—

"কয়েক বৎসর পরে আলী ভাইয়েরা যদিও মহাত্মার সঙ্গ ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু আলী ভাইদের সঙ্গে মহাত্মার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের বিরুদ্ধে কিছু বলা যায়। আমার মতে, আসল ভুল, অন্যান্য সকল জাতীয় প্রশ্নের সঙ্গে খিলাফত ব্যাপারটা মিশিয়ে ফেলার মধ্যে ছিল না, তা ছিল জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কহীন সারা দেশব্যাপ্ত স্বতন্ত্র খিলাফত কমিটি গড়তে দেওয়ার মধ্যে। তার ফল হল এই, পরবর্তীকালে নব্য তুরস্কের নেতা গাজী মুস্তাফা কামাল পাশা যখন সুলতানকে খলিফা পদ ত্যাগে বাধ্য করে খলিফা পদটি একেবারে তুলে দিলেন, তখন খিলাফত প্রশ্ন তার সমস্ত মূল্য হারিয়ে ফেলল এবং খিলাফত সংগঠনের অধিকাংশ সদস্য বৃটিশ-ঘেঁষা প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক মুসলমান প্রতিষ্ঠান-সমূহের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ল। যদি কোনো পৃথক খিলাফত কমিটি গঠিত হতে দেওয়া না হত, যদি সকল খিলাফতী মুসলমানকে জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিতে জোর করা হত, তাহলে হয়ত তারা খিলাফত আন্দোলন মরে যাবার পরেও কংগ্রেসে থেকে যেত।"

শুভ কামনা!—সুভাষচন্দ্রের মন্তব্য সম্বন্ধে এইটুকুই মন্তব্য করা চলে। সুভাষচন্দ্র যা বলেছেন, তা করা হলে হয়ত সত্যই ভাল হত, কিন্তু ভাল নাও হতে পারত। খিলাফৎ কমিটিকে পৃথকভাবে
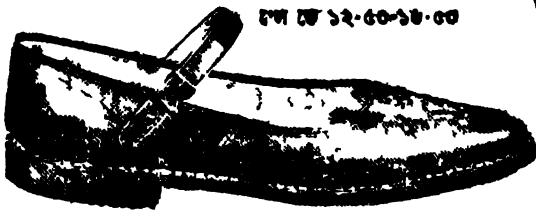
গড়ে উঠতে না দিলে তারা কংগ্রেসে যোগদান করত তার নিশ্চয়তা কোথায়? দ্বিতীয়ত, যদি সাময়িক আবেগে যোগদান করতও, খিলাফত মরে যাবার পরেও তারা মুখ হয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে জুড়ে থাকত কি? তখন যদি তারা দলে দলে কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ত, প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস সহসা দুর্বল হয়ে পড়ত না কি?

সুভাষচন্দ্রের যুক্তি আমরা বুঝতে পারি; একবার কোনো প্রতিষ্ঠানকে বরণ করলে তার থেকে বেরিয়ে আসার নানা মানসিক বাধা থাকে; গাঁ-ভাসানো বন্যার জল সরে গেলেও দীঘিতে পুকুরে কিছু জল থেকে যায়ই; সে সব সত্যি হলেও এবং হিন্দু-মুসলমানকে কিছু সময়ের জন্য যথার্থভাবে মিলিত করতে পারার গৌরব একমাত্র সুভাষচন্দ্রের পাওনা হলেও বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা শর্তাধীনে খিলাফতকে গ্রহণ করার চেয়ে শর্তহীনভাবে এ কাজকে নিন্দার পক্ষপাতী।

এই পর্যায়ের সর্ব শেষ বিষয়রূপে আন্দোলন চলাকালে গান্ধীজীর শোচনীয় রাজনৈতিক বুদ্ধিভ্রান্তি বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যকে উপস্থিত করব।

অসহযোগ আন্দোলন, খিলাফতের সহযোগে এবং চিত্তরঞ্জন, মোতিলাল ও লাজপৎ রায়ের বিপুল চেষ্টায় প্রবলাকার ধারণ করলেও১ ১৯২১ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত কোনো দেশব্যাপ্ত সংঘর্ষের পরিচয় পাওয়া গেল না। এতে যখন কংগ্রেস মহল হতাশ ও বিমর্ষ বোধ করছে তখন উদ্ধারের পথ দেখালো সরকার। সরকার জানালো, প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতদর্শনে আসছেন, ১৭ই নভেম্বর তিনি বোম্বাইয়ে পদার্পণ করবেন। কংগ্রেস দেখল এই সুযোগ—যুবরাজের আগমন বয়কট করে দেশে আন্দোলনকে জোরদার করা যাবে। ১৭ই নভেম্বর হরতাল ঘোষিত হল; বোম্বাইয়ে সেই হরতাল উপলক্ষে রাজভক্ত পার্শীদের সঙ্গে কংগ্রেসীদের সংঘর্ষ হলেও উত্তর ভারতের অন্যত্র বিশেষত কলকাতায় (সুভাষচন্দ্রের সংগঠনের গুণে) বিশেষ সাফল্যলাভ করল। কলকাতার হরতাল-সাফল্যে ইংরেজ মহলে কাঁপন উঠল—শহর বুঝি কংগ্রেসের হাতে চলে গিয়েছে। সুতরাং সরকার কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদলকে বে-আইনী ঘোষণা করে দিল।

দেশবন্ধুর বুদ্ধিতে, সংগঠনে ও প্রেরণায় বাংলায় অসহযোগ এর পরে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। গোড়ায় সাফল্য ঘটবে কি না সন্দেহ হচ্ছিল, দেশবন্ধু তাঁর স্ত্রীকে পাঠালেন গ্রেপ্তার হতে। শ্রীমতী বাসন্তী দেবী গ্রেপ্তার হয়েছেন—বাঙালীর রক্তে আগুন ধরিয়ে দিল এই সংবাদ, এবং আন্দোলনের জোয়ারে অসামরিক শাসনতন্ত্র প্রচণ্ড ধাক্কা খেল।

এরই মধ্যে ১৯২১ সালের ২৪শে ডিসেম্বর প্রিন্স অব ওয়েলসের কলকাতা আসার কথা। সরকার নিতান্ত সংকটে পড়ল। যুবরাজের উপস্থিতিতে দমননীতির কঠোর প্রয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না; ওদিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ইংরেজের দুর্বিপাক চলছে। আয়ারল্যাণ্ডে সিনফিন আন্দোলন বহুলাংশে সফল হয়েছে; গাজী মুস্তাফা কামাল পাশার সঙ্গে তুরস্কের এবং পারস্যের সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার চুক্তি হয়েছে; মিশরে জগলুল পাশার নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলন জোরদার হয়েছে বিশেষভাবে; এইভাবে সমস্ত মুসলিম দুনিয়া গ্রেট বৃটেনের বিরুদ্ধে সন্নবদ্ধ এবং তার উৎসাহজনক প্রভাব পড়েছে ভারতীয় মুসলমানদের উপরে।

ভারতের ভাইসরয় লর্ড রীডিং এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষে উদ্‌গ্রীব হলেন। মদনমোহন মালব্য গেলেন দেশবন্ধুর কাছে কারাগারে লর্ড রীডিং-এর দূত হয়ে। সরকারের বক্তব্য হল—যদি কংগ্রেস এখুনি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়, যাতে যুবরাজের সম্বর্ধনায় ব্যাঘাত না ঘটে, তাহলে সরকার কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক দলের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেবেন, অসহযোগীদের মুক্তি দেবেন এখুনি, পরে সরকার কংগ্রেসের সঙ্গে ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনার জন্য রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স ডাকবেন।

দেশবন্ধু আপোষ প্রস্তাবে রাজী হলেন।

সুভাষচন্দ্র প্রমুখ তরুণেরা বললেন, কদাপি না।

দেশবন্ধু বোঝালেন, ভাইসরয়ের প্রস্তাব ঈশ্বরপ্রেরিত। মহাত্মা এক বছরে স্বরাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে গণ্ডগোলে পড়িয়েছেন, বছর শেষ হতে পনেরো দিনও বাকি নেই, সেখানে মুখরক্ষা করতে হলে জনসাধারণকে একটা কিছু দিতে হবে। এই সেই মহাসুযোগ। পরে যদি রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স না হয়, কিংবা ব্যর্থ হয়, সেক্ষেত্রে ইংরেজের বিশ্বাসঘাতকতার পটভূমিকায় নতুন করে সংগ্রাম আরম্ভের পথ সহজেই খোলা থাকবে।

যুক্তি অকাট্য। সুভাষচন্দ্র প্রমুখ রক্তগরম ছোকরারাও সেকথা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, বিশেষত মহাত্মার প্রতিশ্রুতি যখন জনসাধারণের সামনে কংগ্রেসকে লজ্জাজনক অবস্থায় নিক্ষেপ করেছে।

কিন্তু মহাত্মা বললেন—না! আলী-ভাইদের মুক্তি চাই, কবে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স হবে তার তারিখ চাই। সরকার বলল, আলী ভাইয়েরা অসহযোগের সূত্রে গ্রেপ্তার হন নি, তাঁদের মুক্তির বিবেচনা অন্য সময় করা যাবে, এবং এখুনি রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের তারিখ দেওয়া সম্ভব নয়।

দেশবন্ধুর টেলিগ্রামের অনুনয়গুলো কারাগার থেকে ছুটে গিয়ে মহাত্মার পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়তে লাগল। মহাত্মা অনমনীয় রইলেন, ক্রমে কিছু নমনীয় হলেন, অবশেষে যখন প্রায় রাজী হলেন—অপেক্ষায় ক্লান্ত রীডিং তখন দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। দেশবন্ধু?—

"দেশবন্ধু ক্রোধে ও হতাশায় আত্মহারা। বললেন, জীবনের মত একটা সুযোগ নষ্ট হয়ে গেল।"

হবেই, শুধু একজনের উপর অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপালে এমন ঘটবেই। সকলেই বুঝল মহাত্মা একটি বিরাট রাজনৈতিক ভ্রান্তি দেখালেন। সম্ভবত মহাত্মাও তা বুঝলেন। তাই বিভ্রান্ত জনতার মধ্যে উন্মাদনা ফিরিয়ে আনার জন্য ১৯২২ সালের গোড়ার দিকে বরদৌলিতে করবন্ধ আন্দোলনের সংকল্প ঘোষণা করলেন। বরদৌলি একেবারে গান্ধীরাজ্য; সকলে বিপুল আশা নিয়ে সেইদিকে তাকিয়ে রইল—সারা দেশময় আবেগ আবার ফেনিয়ে উঠল। মহাত্মার চরমপত্র সমস্ত দেশকে উত্তেজনার শিহরণের মধ্যে যেন নিক্ষেপ করল। সকলে নিশ্বাস বন্ধ করে একটির পর একটি প্রহর গণতে লাগল।' এমন সময়—

'সহসা বিনামেঘে বজ্রপাত! জনগণ স্তম্ভিত নির্বাক। ঘটনা—চৌরিচৌরা।"

গান্ধীজীর হিমালয়প্রমাণ ভ্রান্তির এভারেস্টের নাম চৌরিচৌরা।

"৪ঠা ফেব্রুয়ারী যুক্তপ্রদেশের চৌরিচৌরা নামক জায়গায় গ্রামবাসীরা উত্তপ্ত হয়ে রাগের মাথায় একটা পুলিশ ফাঁড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং কয়েকজন পুলিশকে মেরে ফেলে। মহাত্মার কাছে সংবাদ পৌঁছলে তিনি ঘটনার গতি দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং তখনই বরদৌলিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং ডাকলেন। তাঁর তাগিদে ওয়ার্কিং কমিটি অনির্দিষ্টকালের জন্য অসহযোগ আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করে নিল; সবল

---

১ সুভাষচন্দ্রের মতে দেশবন্ধু, মোতিলাল ও লাজপৎ রায়ের সাহায্য ভিন্ন গান্ধীর পক্ষে অনুরূপ পরিমাণে সাফল্যলাভ করা সম্ভব হোত কিনা সন্দেহ।—১০।

কংগ্রেসসেবীকে [illegible] মূলক কাজ গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হল।"

গান্ধীজীর সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া ?

"ডিক্টেটারের নির্দেশ সে সময়ে পালন করা হয়েছিল বটে, কিন্তু কংগ্রেস-শিবিরে রীতিমত বিদ্রোহ দেখা দিল। কেউ বুঝতে পারল না, মহাত্মা চৌরিচৌরার বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে দেশব্যাপী আন্দোলনকে গলা টিপে মারার কাজে ব্যবহার করলেন, কেন ? সাধারণের ক্ষোভবৃদ্ধির আরো কারণ এই যে, মহাত্মা বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শের পরিশ্রমটুকুও করলেন না—বিশেষত সাধারণভাবে সমস্ত দেশে যখন আইন অমান্য আন্দোলনের উপযোগী পরিবেশ বিশেষভাবে সৃষ্টি হয়েছে। সর্বসাধারণের উৎসাহ যখন টগবগ করে ফুটে ওঠার মুখে তখনি তার ওপর ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেওয়া জাতীয় সর্বনাশ ছাড়া আর কিছু নয়।"

এই মনোভাব মোতিলাল নেহরুর, এই মনোভাব লালা লাজপত রায়ের, যিনি নাকি জেল থেকে ৭০ পৃষ্ঠার এক প্রতিবাদপত্র গান্ধীজীকে পাঠিয়েছিলেন চরম হতাশায়। এবং দেশবন্ধু—

"আমি সেই সময়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে ছিলাম, দেখলাম মহাত্মার ক্রমাগত [illegible]পনা, রাগে দুঃখে তাঁকে [illegible] করে ফেলেছে। ডিসেম্বরের উৎ[illegible] ভুলকে যখন তিনি সবে ভুলতে [illegible] করেছেন, তখনি এল বরদৌলির [illegible] অপসরণ— মর্মান্তিক আঘাতের মু[illegible]"

চৌরিচৌরা একদিকে মহাত্মার ভুলের হিমালয় [illegible]পরদিকে তাঁর মাহাত্ম্যের মানমন্দির। মহাত্মার অনুরাগীরা দ্বিতীয় কথাটি বলেছেন শ্রদ্ধাভরে এবং আমরা তাঁদের অনুভূতিকে শ্রদ্ধা করি। চৌরিচৌরার পরে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় সমস্ত দেশ যখন বিভ্রান্ত, কংগ্রেসের কর্মীমহলে বিতর্কের ঝড় উঠেছে, ঠিক সেই মনস্তাত্ত্বিক উদ্‌ভ্রান্তির ক্ষণে লর্ড রীডিং আঘাত হানলেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করতে রীডিং ভীত ছিলেন, পাছে দেশে রক্তের ঝড় বয়ে যায়। মহাত্মা স্বয়ং যখন সে ঝড়ের শ্বাসরোধ করলেন তখন তাঁকে গ্রেপ্তার করতে আর বাধা রইল না। ইয়ং ইণ্ডিয়ায় লিখিত কয়েকটি 'প্রেরণাপূর্ণ রচনার' জন্য ১৯২২ সালে ১৪ই মার্চ তাঁকে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

চৌরিচৌরার পরে গান্ধীজী যে বিবৃতি দিলেন, সেই বিবৃতি মানবমহত্ত্বের ইতিহাসে একটি মূল্যবান দলিল, সন্দেহ নেই। চৌরিচৌরা ঘটনার মধ্যে তিনি [illegible] দেখেছিলেন। [illegible] একবাটি দুধে এক ফোঁটা আর্সেনিক দিলে তা পানের অযোগ্য হয়ে ওঠে, তেমনি বরদৌলির শান্তিময়তায় যদি চৌরিচৌরার একবিন্দু মৃত্যু-হলাহলও মেশে, তবে তা গ্রহণের অযোগ্য হয়ে উঠবে।' হিংসার হলাহলকে পান করে নীলকণ্ঠ হবার ইচ্ছা গান্ধীজীর ছিল না।

'ভগবানের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদের ভাবায় স্পন্দিত ওষ্ঠ' গান্ধীজীর অপূর্ব স্বীকারোক্তির সম্পূর্ণ মহিমাকে আমরা শ্রদ্ধা জানাবো নিশ্চয়, মেনে নেব, এই ঘটনায় গান্ধীজীর মহাত্মা-স্বরূপ সর্বাধিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, কিন্তু অবশ্যই প্রশ্ন করব—গান্ধীজীকে 'মহাত্মা' করে তোলবার জন্য কি চিত্তরঞ্জন, মোতিলাল, লাজপত রায় তাঁদের বৃত্তি ত্যাগ করে অপরিসীম যন্ত্রণাবরণ করেছেন, ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক কি গান্ধীজীর ব্যক্তিমহিমা বৃদ্ধির জন্যই সংগ্রাম করেছে বা প্রাণ দিয়েছে ?

অতঃপর গান্ধীজীর মামলা হল। সেই ঐতিহাসিক মামলার সমরূপ ব্যাপার দেখা গিয়াছিল পন্টিয়াস পাইলেটের কাছে খৃস্টের বিচারের সময়ে, একথা দেশবন্ধু তাঁর অবশিষ্ট আবেগ সংগ্রহ করে বলবেন গয়া কংগ্রেসে সভাপতির ভাষণে। গান্ধীজী ইংরেজ বিচারপতিকে সম্বোধন করে বললেন, যদি আপনার মনে হয় যে, বে-আইনের দ্বারা অন্যায় বিচার, তা পাপ, তাহলে আপনি পদত্যাগ করুন, অপরপক্ষে আপনি যদি মনে করেন, এই আইনের দ্বারা এদেশের মঙ্গল হচ্ছে, তাহলে আমাকে কঠোরতম শাস্তি দিন।

ইংরেজ বিচারপতি মিঃ ব্রুমফিল্ড মহাত্মার সঙ্গে সৌজন্যের প্রতিযোগিতা করেছিলেন। তিনি সবিনয়ে সশ্রদ্ধচিত্তে ছয় বছরের কারাদণ্ড দিলেন তাঁকে।

চৌরিচৌরা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কী ছিল ? দেখা গেল তাঁর আশঙ্কাই সত্য। রাজনীতিতে অহিংসার যে পাইকারী ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁর আপত্তি ছিল, এবং আপত্তির মূলে ব্যাপারটার অবাস্তবতা সম্বন্ধে ইঙ্গিত ছিল—চৌরিচৌরার ঘটনা দেখিয়ে দিল—কবিই ঠিকভাবে চিন্তা করতে পেরেছে এক্ষেত্রে। চৌরিচৌরার ঘটনা যেদিন ঘটল, ঠিক তার আগের দিন গুজরাটের সাহিত্যিক লালা-দলপতরামকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। বরদৌলিতে গান্ধীজীর দ্বিতীয় সত্যাগ্রহ-সিদ্ধান্তের কথা মনে রেখেই ঐ চিঠি লেখা হয়েছিল। ঐ চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ অহিংসার নৈতিক [illegible] করেও রাজনৈতিক প্রয়োজনে অহিংসার ব্যবহারের যৌক্তিকতার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। মহাপুরুষেরা অধ্যাত্ম উন্নয়নের জন্য অহিংসার ব্যবহার করেছেন ব্যক্তিজীবনে। সেই অহিংসাকে সময় বেঁধে, প্রোগ্রাম করে কার্যকরী করা সম্ভব কি ? হয়ত কিছু সময়ের জন্য সম্ভব, বাইরের চাপে ও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের তাগিদে মানুষ হয়ত কিছু সময়ের জন্য নিজেদের স্বভাবকে দমিয়ে রাখতে পারে, কিন্তু ব্যাপারটা যদি স্বতঃস্ফূর্ত না হয়, তাহলে সেটা অন্ধশক্তির সামিল হয়ে পড়ে।*

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, চৌরিচৌরা একটি চমৎকার ঘটনা, যা গান্ধীজীর মাহাত্ম্য, রবীন্দ্রনাথের দূরদর্শিতা এবং চিত্তরঞ্জনের রিঅ্যাকশনের (এবং সুভাষচন্দ্রের এবং অধিকাংশ রাজনৈতিক কর্মীর) উৎস।

[ক্রমশঃ]

* স—র-জী, ৩য়—৭৭—৭৮।

স্বাধীন ভারতে বেকার ইঞ্জিনীয়ার

চল্লিশ হাজার বেকার ইঞ্জিনীয়ার নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় বয়ে চলেছে। এখন কোন ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সভা হলেই প্রথম কথা ওঠে ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে এত বেকারী কেন, এই বেকার ইঞ্জিনীয়ারদের নিয়ে সরকার কি ভাবছেন, সরকার কেন এদের জন্য আগেভাগে ভাবেন নি ইত্যাদি। চল্লিশ হাজার বেকার ইঞ্জিনীয়ারের চিত্র নিশ্চয়ই মর্মস্পর্শী। এবং এই বেকার জড়ত্বের আশু অবসানে দাবি ইঞ্জিনীয়ার অ-ইঞ্জিনীয়ার সবাই করছেন।

ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে একটি দল আছেন যাঁদের কথা আলোচনায় আসে না। যাঁদের সংখ্যা বেকার ইঞ্জিনীয়ারদের থেকে অনেক বেশি, যাঁদের ব্যথা বেকার ইঞ্জিনীয়ারদের মত না হলেও, কাছাকাছি। এঁরা হলেন বেকার ঠিক নন নিরাকার ইঞ্জিনীয়ারেরা। নিরাকার এই অর্থে বলছি যে, এঁরা পুরোপুরি বেকার না হলেও কোন চাকরীতে বা ব্যবসায়ে এখনও হালে পানি পান নি। নিতান্তই অস্থায়িভাবে যাঁদের চাকরীতে নিযোগ করা হয়েছে।

ইঞ্জিনীয়ারদের অবস্থা স্বাধীনতার আগে বেশ খারাপই ছিল। তখনকার দিনে একটি সরকারী এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ারের চাকরী পাওয়া আর হাতে স্বর্গ পাওয়া একই কথা ছিল। স্বাধীনতার পর বিশেষ করে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ হাতে নেবার পর থেকেই ইঞ্জিনীয়ারদের বাজার ভাল হ'ল, ইঞ্জিনীয়ারেরা পটাপট চাকরী পেতে সুরু করলেন, বিয়ের বাজারে ইঞ্জিনীয়ার পাত্রের দাম বাড়লো। সবাই তখন ইঞ্জিনীয়ার পাত্র খোঁজেন।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সবচেয়ে উপকৃত হলেন আধাবয়সী ইঞ্জিনীয়ারেরা। সরকারী বেসরকারী সব প্রতিষ্ঠান থেকেই সাদা চামড়ার লোকেরা দেশে চলে যেতে সুরু করল। চাকরীর উঁচু পদগুলি যা এতকাল বিলিতী সাহেবদের একচেটিয়া ছিল সেগুলি দেশী সাহেবরা পেতে লাগলেন। যেসব ইঞ্জিনীয়াররা জীবনে প্রমোশন পাবেন না ধারণা করে বসেছিলেন ধুমদাম করে প্রমোশন পেয়ে গেলেন, ক্ষেত্র বিশেষে ডবল প্রমোশন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে সারা দেশব্যাপী ইঞ্জিনীয়ারিং কাজকর্ম সুরু হয়ে গেল। ডি ভি সি'র মতো বিরাট কয়েকটি পরিকল্পনায় হাত দেওয়া হ'ল। এই সময়ে যে সব ছাত্র ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে বেরুলেন তাঁরা চাকরীর বাজারে এসে দেখলেন সোনা ফলেছে। কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা নেবেন বুঝতে পারছেন না। গজিয়ে উঠলো হাজারে হাজারে ইঞ্জিনীয়ারিং কন্ট্রাক্টরী কারবার, কল-কারখানা। সরকারী সংস্থার তুলনায় বেসরকারী সংস্থায় মাইনে দিচ্ছিলো অনেক বেশি। সরকারী চাকরীতে তখন লোক হয় না। এমন শুনেছি—হয়তো পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে স্টেট গভর্নমেন্টে চাকরীর জন্য দরখাস্ত চাওয়া হয়েছে। বিশটা পোস্টের জন্য হয়তো মোট দরখাস্ত পড়েছে পনেরোটি। তাও আবার যারা ইন্টারভিউ দিয়ে সিলেকটেড হলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই চাকরীতে যোগ দিলেন না। ফলে মফস্বলের বহু চাকরী মাসের পর মাস খালি পড়ে রইলো। এই সময়ে কন্ট্রাক্টরী করেও দু' পয়সা হচ্ছিল। তাই অনেক তরুণ ইঞ্জিনীয়ার একটি ফাইন্যান্সিয়ার যোগাড় করেই ঝাঁপিয়ে পড়ল বিজনেস করে লাক ট্রাই করতে। অনেকের ভাগ্যে মণিকাঞ্চন লাভ যোগ ঘটল প্রচুর।

এর পর এলো দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। দ্বিতীয় পরিকল্পনা মানেই ভারতে শিল্প-বিপ্লবের সুরু। আর শিল্প মানেই ইঞ্জিনীয়ারদের পোয়াবারো। হিন্দুস্থান স্টিল, হেভি ইঞ্জিনীয়ারিং থারমল পাওয়ার স্টেশনের মত বড় বড় শিল্প গড়ে উঠছে তখন। বিয়ের বাজারে ইঞ্জিনীয়ার পাত্রদের দর আরও বাড়ল। বহু অল্প বয়সী ইঞ্জিনীয়াররা তখন কি সরকারী, আধা সরকারী, কি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে সর্বত্র উঁচু পদে উঠে গেছেন। সরকারও তখন বিপুল বিক্রমে দেশে ইঞ্জিনীয়ার তৈরি করে চলেছেন, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে সীট বেড়ে চলল।

কিন্তু হঠাৎ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষাশেষি অর্থাৎ ১৯৬১ সাল থেকে কেমন যেন উল্টো হাওয়া বইতে সুরু করল। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বহর প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা থেকে বড়ো হলেও—সবাই যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। সবার মনে হতে লাগলো তৃতীয় পরিকল্পনা আরও বড় ও ব্যাপক হওয়া উচিত ছিল। তা না হলে যে হারে দেশে ইঞ্জিনীয়ার তৈরি হচ্ছে, তাতে তাদের সবাইকে চাকরী দেওয়া যাবে না হয়তো। তৃতীয় পরিকল্পনার সুরুতে এসব ব্যাপার খুব বেশি অনুভব না করা গেলেও কয়েক বছর যেতে না যেতেই রোগ মালুম হ'ল। নতুন চাকরী নেই, ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যা বছরে বছরে বেড়ে যাচ্ছে। নতুন পদ সৃষ্টির কথা হলে সবখানেই একই উত্তর—যা লোক আছে এই নিয়েই চালিয়ে যান। নতুন কাজ আসছে না—এক্সপ্যানশন বন্ধ—এখন নতুন লোক নিলে ছাঁটাই করতে হবে। সবখানেই লোক নেওয়া কমে গেল। নতুন ইঞ্জিনীয়ারদের অবস্থা শোচনীয় হতে লাগল। মাত্র পাঁচ-দশ বছর আগে যেসব ফার্ম কলেজে কলেজে লোক পাঠিয়ে নতুন ইঞ্জিনীয়ার যোগাড় কোরত, এখন সেইসব ফার্মের দরজা ইঞ্জিনীয়ারদের জন্য একেবারে বন্ধ—নো ভেকেন্সি। ঠিক যেন সরষের তেলের সমস্যা—একমাস আগেও যে তেল তিন টাকায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছিল হঠাৎ একমাসের মধ্যে দাম পাঁচ টাকায় উঠলো আর মালও বাজার থেকে উধাও হল। সবাই অবাক হয়ে ভাবলেন এ কি করে সম্ভব—সবার মুখে একই প্রশ্ন, গেল বছর যে কোম্পানী বিশজন ইঞ্জিনীয়ার নিয়েছে এবার কম করে দশজনও তো নিতে পারে। গোলমালটা কোথায়? কল-কারখানার মালিকেরা প্রশ্ন করেন কাজ কোথায়—কাজ পেলে ইঞ্জিনীয়ারদের চাকরী দিতে আমাদের আপত্তি কি? সবার মুখেই কেবল প্রশ্ন আর প্রশ্ন। কাকে লক্ষ্য করে এই প্রশ্ন কেউ জানেন না। উত্তর দেবারও লোক নেই। যাঁরা ইকনমিক্স একটু একটু জানেন বা বোঝেন তাঁরা অবাক হন। কোন দেশের ইকনমিক কণ্ডিশন তো এমন ভাবে চলে না। প্রত্যেক দেশেই সব ধরণের ব্যবসায়ে ও কাজকর্মে এক সময় জোয়ার আসে আবার সেই জোয়ার পূর্ণ অবস্থায় পৌঁছাবার পর ভাটা সুরু হয়। [illegible] ঠিক যে জোয়ারের বানের চেয়ে [illegible] অনেক বেশি অনুভূত হয়। কিন্তু আমাদের দেশে একি? এতো ঠিক জোয়ার নয়—আমাদের সমৃদ্ধি পাহাড় ভাঙা প্রবাহ। আমাদের অর্থনৈতিক খাতে বর্ষার ধারা নেমেছিল এক সময়ে, সেই ধারা দুকূল ভাসিয়ে ছিলও হয়তো কোথাও কোথাও কিন্তু সেই স্রোতে জোয়ারের জীবন ছিল না কোনদিন—ভাটা আসবার প্রশ্নও তাই আসে না। আমাদের জীবনে এখন যে অর্থনৈতিক ভাটা চলেছে এটা ঠিক জোয়ারের পর ভাটা নয়। এটা প্রবল বর্ষণের পর নদীতে যেমন হঠাৎ জল সরে গিয়ে চড়াগুলো জেগে ওঠে ঠিক তেমনি। তা না হলে গত পনেরো বিশ বছর ধরে আমাদের জীবন খাতে যে অবিরাম ধারার সমৃদ্ধির প্রবাহ বয়ে চলেছে দেখেছি আজ হঠাৎ স্তব্ধ

কেন—অর্থনীতিবিদেরা কেন হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন জাতীয় জীবনের এই ভীষণ পরাজয়কে মেনে নিয়ে? ইঞ্জিনীয়াররা হাতিয়ার ছাড়া কিছু নন। সেই হাতিয়ার যাঁরা এতদিন চালিয়েছেন, আজ তাঁরা মুখ লুকোচ্ছেন কেন? দেশের সমৃদ্ধির জয়তিলকটি কপালে আঁকবার জন্যে যাঁদের মাথাগুলিকে আমরা সব সময়েই উঁচু থাকতে দেখেছি, আজ তাঁদের মসীলিপ্ত মুখটি নিয়ে কেবল লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন? এটা আর কারও বুঝতে বাকী নেই যে, আমাদের অর্থনৈতিক জীবনের মূল মন্ত্রটিতে কোথাও ভুল ছিল। আমাদের পুরুতমশাইরা জোর করে দোষ চাপিয়ে দিচ্ছেন ইঞ্জিনীয়ারদের ওপর এই বলে যে, তাঁদের যজমান ইঞ্জিনীয়াররা মন্ত্রটির উচ্চারণে ভুল করেছেন

তাই এই বিপত্তি। দেশের লোক হাসছেন বিজ্ঞ লোকের অজ্ঞতা দেখে।

ধান ভানতে ভানতে 'খেনোর' উদ্ধার করে ফেললাম খানিকটা। বর্তমানে তরুণ ইঞ্জিনীয়ার যাঁরা চাকরী একটা জুটিয়ে কোনমতে বেকারত্বের অপবাদ ঘুচিয়েছেন, তাঁদের চিত্রটি একটু আপনাদের সামনে তুলে ধরা যাক। গত তিন-চার বছরে ইঞ্জিনীয়ারদের পক্ষে একটা চাকরী পাওয়াই যথেষ্ট। ভিক্ষার চাল, কাঁড়া কি আকাঁড়া বাছ-বিচার করার প্রশ্নই আসে নি। কলেজ থেকে গড্ডালিকা প্রবাহের মত তাঁদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয় রাস্তায়। প্রত্যেক ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ট্রেনিং ডিপার্টমেন্ট আছে। তাঁদের অবস্থাও শোচনীয়। পাশ করা ছাত্ররা বিক্ষোভ করে —ট্রেনিং জুটিয়ে দাও। কলেজ কর্তৃপক্ষও ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে সরকারী বেসরকারী সব প্রতিষ্ঠানের দ্বারে দ্বারে ঘোরেন এক গাদা অপগণ্ড ছেলেপুলের জনকের অপমান মাথায় নিয়ে। ভিক্ষার ঝুলি ভরে না। কেউ দেয় একমুঠি, কেউ বা দেয় অর্থহীন আশ্বাস। সবার অবস্থাই যে সমান। সরকারী আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে যেখানে নিজের স্টাফকে মাইনে দিতেই নাভিশ্বাস উঠছে সেখানে নতুন লোককে ঘরে ঠাঁই দেবার প্রশ্ন আসে কি করে? প্রাইভেট কোম্পানীতেও একই অবস্থা— কাজের অর্ডার নেই, ছাঁটাই করতে পারলেই ভালো—এই অবস্থায় নতুন লোক নেওয়া? গতিক অত্যন্ত খারাপ বুঝে ভারত সরকার কিছু সংখ্যক স্কলারশিপ বা স্টাইপেণ্ড নতুন পাশ করা ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে দিতে সুরু করলেন। কিন্তু তার সংখ্যাও নিতান্ত কম। কিছু ছেলের একটা কিছু জুটলো এই যা। বাকী ছেলেগুলো বাড়িতে বসে ঘুমোয়, অভিভাবকের বকুনি খায়, বিকেল হলেই পার্কে, বন্ধুর বাড়িতে, ক্লাবে আড্ডা মারে। যাঁরা কোনক্রমে স্টাইপেণ্ড পেয়ে বা অন্যভাবে কোথাও একটা চাকরী জোটালো—তাদের অবস্থাও ভাল নয়—সামান্য টাকা পায়—কোনমতে চলে। নিতান্ত অস্থায়ী বলে কোনখানেই ভাল দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হয় না তাদেরকে। তাই যত দিন যায়—বয়সই বাড়ে, কাজের অভিজ্ঞতা বাড়ে না—মাইনে তো বাড়েই। শিক্ষানবিশীকাল পার হবার পর আসে আবার দুর্যোগপূর্ণ সময়। কতদিন আর শিক্ষানবিশী থাকা যায়? অনেকে তিন-চার বছর পর্যন্তও কোন প্রতিষ্ঠানে বা ডিপার্টমেন্টে শিক্ষানবিশী হিসেবে কাজ করেও সেই ডিপার্টমেন্ট বা অন্য কোথাও চাকরী জোটাতে পারছেন না।

ভারতে আজ চাকরী-বাকরীর এই [illegible] যে দেশের ভাল ভাল তরুণ ইঞ্জিনীয়ারেরা বিদেশে চলে গেছেন ও সেখানে বছরের পর বছর চাকরী করে যাচ্ছেন। এটা দেশের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। ঠিক হল হয় আইনের ভয় দেখিয়ে বা ভালো চাকরীর লোভ দেখিয়ে বাইরের ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে। দেশে এদের জন্য একটা 'পুল' তৈরি হল। অনেক ইঞ্জিনীয়ার দেশে চলে এলেন এবং এই পুলে যোগ দিলেন। মাইনে দেওয়া হল যৎসামান্যই—তাঁদের বলা হল তোমাদের তো ভাল কোয়ালিফিকেশন আছে এখানে থাক আর ভাল চাকরীর খোঁজ খবর করো—পেয়ে গেলেই আমাদের খারাপ চাকরীটা ছেড়ে দিও। প্রথম প্রথম পি এইচ ডি, এ এম আই (মেক্) ই, এ এম আই (স্ট্রাক্ট)-ই ইত্যাদি দামী কোয়ালিফিকেশন-ওয়ালা ছেলেরা দু-চার ছমাসের মধ্যে মোটামুটি ভালো চাকরী জুটিয়ে নিচ্ছিলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে অবস্থা গেল পাল্টে। যাঁরা দেড় হাজার টাকা মাইনে আশা করেন তাঁদের কপালে পাঁচশো টাকা মাইনের চাকরীও জুটলো না। তাই এঁদের মধ্যে যাঁদের আত্মার বাঁধন দেশে খুব একটা নেই, আবার চেষ্টা করতে লাগলেন বিদেশে পাড়ি দিতে। আর অন্যেরা ফ্রাসট্রেটেড হয়ে এখানে পড়ে রইলেন। এঁদের মধ্যে অনেকে যাঁরা কংক্রিট টেকনোলজিতে উচ্চশিক্ষা নিয়ে এসেছেন তাঁদেরকে বাধ্য হয়ে ঢুকতে হল টিউব-ওয়েল কোম্পানীতে। ফলে তাঁদের কষ্টার্জিত জ্ঞান পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেল। বিদেশে যে সব ইঞ্জিনীয়ার বেশ কিছুদিন ভালো চাকরী-বাকরী না পেয়ে লাইনই পাল্টে ফেললেন একেবারে—নাইজেরিয়া ফেরৎ এক ভদ্রলোক তো থিয়েটার নিয়ে মেতেছেন, কেউ ট্রাকের ব্যবসা করছেন কেউ বা পলিটিক্সে ভিড়ে গেছেন অন্য কোন পথ না পেয়ে। কি বিচিত্র এই দেশ।

প্রাইভেট কোম্পানীতে যাঁরা ঢুকেছেন বৎসরান্তে মাইনে বাড়ছে না, বোনাসের টাকাও গেছে কমে আর ছাঁটাই-এর উদ্যত খড়্গ তো মাথার ওপর সব সময়েই ঝুলছে। একটা শ্রমিক ছাঁটাই হলে বিক্ষোভ হয়, হরতাল চলে তাঁদের সমবেদনায়। কিন্তু একজন ইঞ্জিনীয়ারের চাকরী গেলে সে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে—কেউ সমবেদনা জানায় না তাকে। যাঁরা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে ঢুকেছিলেন (আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান বলতে হিন্দুস্থান স্টীল, দুর্গাপুর প্রজেক্টস, হেভী ইঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশন, ডি ভি সি এন্ড্রুজকেই বোঝাচ্ছি) তাঁদের অবস্থা হয়েছে সবচেয়ে সঙ্গীন। প্রথমে চাকরীতে ঢুকে পাঁচ-সাত বছর আগে বছরে যাঁরা দুটো পর্যন্ত প্রমোশন পেয়েছেন আজ তাঁরা ডিমোশনের ভয়ে কাতর। বিনা দ্বিধায় অনেককে ডিমোশন, ছাঁটাই করে দেওয়া হচ্ছে। অনেকে ভয় পেয়ে অপমানিত হবার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে ফ্রাইং প্যান থেকে ফায়ারে গিয়ে পড়লেন; অর্থাৎ এতদিনের চাকরী ছেড়ে খারাপ চাকরী বুঝেও নতুন চাকরীতে জয়েন করে গেলেন। ফলে ফ্রাসট্রেশন তো কমলই না বাড়লো বরং।

গত কয়েক বছরে অনেক সরকারী ও আধা-সরকারী সংস্থা গজিয়েছে ও অকালে মারা গেছে। অনেক ভরসা ও আশা নিয়ে এসব সংস্থায় তরুণ ইঞ্জিনীয়ারেরা ঢুকেছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকের চাকরী চলে গেল হঠাৎ ডিপার্টমেন্ট উঠে যাবার সংগে-সংগেই—আবার অনেকে দিন দিন গুটিয়ে আসা ডিপার্টমেন্টে চুপচাপ বসে রইলেন ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে। তাঁদের অবস্থা কিন্তু এখনও ভাল হয় নি। কবে হবে ভগবান জানেন।

যাঁরা সরকারী বিভাগে আছেন, তাঁদের অবস্থাও মোটেই ভাল নয়। কোন কোন ডিপার্টমেন্টে ইঞ্জিনীয়ারদের ডিমোশনও হচ্ছে। সব ডিপার্টমেন্টের অবস্থা অবশ্য অমন খারাপ নয়। রেলওয়ে সার্ভিসে প্রমোশন প্রায় বন্ধ হতে গেলে। স্টেট গভর্নমেন্টের সেচ বিভাগে গত পনেরো-বিশ বছর চাকরী করেও একটি প্রমোশনও পান নি এমন ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যা অনেক। পি ডবলিউ ডির ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যেও ফ্রাসট্রেশন এসেছে। চাকরী থেকেও অনেকে বেকার। কারণ তাঁদের হাতে তেমন কোন কাজ নেই।

ভারতে ইঞ্জিনীয়ারদের মত অসহায় আর ফ্রাসটেটেড বোধহয় আর কেউ নয়। বহু বছর আগে যখন নিতান্ত সাধারণ mediovre ছেলেরা ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে যেতেন তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাও থাকতো কম। কিন্তু গত বেশ কয়েক বছর ধরে ভালো ভালো ছেলেরা আই এ এস পরীক্ষা না দিয়েও ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ছেন। আজ ভাগ্যচক্রে এইসব ভিক্ষার্থী ইঞ্জিনীয়ারদের প্রশাসকদের অধীনে তাঁদের মরজি মাফিক চলতে হচ্ছে। সরকারী চাকরীতে ইঞ্জিনীয়ারদের ফ্রাসট্রেশনের এটাও একটা কারণ।

ইঞ্জিনীয়ারদের দুঃখের কাহিনী আর শুনিয়ে কাজ নেই। চাই একটা সন্তোষজনক সমাধান। আমরা দেখে শিখতে পারি নি—ঠেকে শিখতে হয়েছে সব কিছু। দেশের প্রশাসক ও চিন্তাশীল গোষ্ঠীর কাছে নিবেদন—তাঁরা যেন গত বিশ বছরের অভিজ্ঞতাটা ভুলে না যান, ইঞ্জিনীয়ারদের দাবিয়ে রেখে কোন লাভ নেই, ইঞ্জিনীয়ারদের সহযোগিতায় ও সহমর্মিতাতেই দেশের সমৃদ্ধি।

—[illegible] দে বিই, এম্ই

—[illegible] বিই, এম্ই

বিহঙ্গের কোনো গান (গানের সংকলন)—অমিয় চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থালোক, ১৫৯/১বি রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯। মূল্য : এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

এখানি সহজ সুন্দর সাবলীল গানের সংকলন "বিহঙ্গের কোনো গান" পাঠকদেরও আনন্দ দান করবে। প্রায় সমস্ত গানই বিষাদের সুরে সমাচ্ছন্ন। দেশাত্মবোধক গান 'হে শতাব্দ্র প্রাণ বহ্নি জ্বলো' ও 'আলোর পথে চলতে হবে ডাক এসেছে' ভাল লাগবে। দুটি বৈষ্ণব গীতি 'বাধা তো মানে না মানা', এবং 'ও বাঙা ফুলরাখী কে পরালে/শ্যামরায়'। কোন কোন গানে রবীন্দ্রপ্রভাব স্পষ্ট। 'বেদনার রঙে রঙে আলোর ঠিকানা তুমি লিখেছ', 'এই পৃথিবীর কত খেলা আমি দেখেছি', 'স্বপ্ন রঙিন তারার মিছিল/রূপকথা রাত পেরিয়েছে' প্রভৃতি গান কবিতা হিসেবে পড়তে এবং আবৃত্তি করতেও ভাল লাগে। গীতিকার হিসেবে আমরা অমিয় চট্টোপাধ্যায়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। ছাপা, বাঁধানো ও প্রচ্ছদ সুন্দর।

কবিতা : সম্পাদক—বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : [illegible] পরিষদের পক্ষে সুনীলকুমার দাস [illegible] কলেজ [illegible] কলকাতা ৯ থেকে প্রকাশিত। মূল্য : এক টাকা।

[illegible] প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যার [illegible] প্রবন্ধ বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সত্যপ্রিয় ঘোষের 'বাংলা সাহিত্যে গোর্কির প্রভাব' সুলিখিত ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ। গোর্কির সঙ্গে একদা বাঙালী সাহিত্যিকদের যোগ ছিল না। ১৯০৫ খৃস্টাব্দে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিত দৈনিক বেঙ্গলী পত্রিকায় তিনি প্রথম সম্বর্ধনা অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন। তখন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগ। গোর্কি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে এক মহান যোদ্ধা বলে সেদিনের বাঙালী পাঠকসম্প্রদায় তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে বরণ করে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে নজরুল এবং অন্যান্য কিছু বাঙালী সাহিত্যিকদের ওপর গোর্কির প্রভাব সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে আলোকপাত করেছেন সত্যপ্রিয়বাবু। তবে রবীন্দ্রনাথ এবং চিত্তরঞ্জনের 'ইংরেজের প্রতি আনুগত্য' সম্পর্কে তিনি যে সব তথ্য পরিবেশন করেছেন সেগুলি একেবারেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হল না। মনে হয় কিছুটা রবীন্দ্র-অসহিষ্ণুতার জন্যই তিনি বলেছেন যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় রাজনৈতিক বুদ্ধিতে রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা অগ্রসর ছিলেন। এদেশের চিন্তাশীল পাঠকসম্প্রদায়, যাঁরা রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলীর সঙ্গে পরিচিত, তাঁদের কাছে 'এ ঐতিহাসিক [illegible]

হবে। আরেকটি কথা। ছোট-বড় যে কোন মানুষেরই কোন একটি উক্তি out of context অর্থাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে তুলে ধরে তার থেকে এমন অনেক কিছুই প্রমাণ করা যায়, যা তাঁর জীবনদর্শনের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। লেখক সেভাবেই দ্বিজেন্দ্রলাল এবং সত্যেন দত্তর প্রতি অবিচার করেছেন। এঁরা দুজন যদি ইংরাজ জাতের সত্যিকার বড় কতকগুলি গুণের প্রশংসা করে থাকেন তার থেকেই তাঁদের দেশপ্রেমের অভাব ছিল এমন কথা মেনে নেওয়া যায় না। অপরপক্ষে আজ থেকে অর্ধশতাব্দীরও বেশি আগে কেবলমাত্র ইংরাজ-বিদ্বেষের দ্বারা অথবা ইংরাজ বিতাড়ন করেই ভারতবর্ষের সব সমস্যা সমাধান করা যাবে কি না এ বিষয়ে কারুর মনে প্রশ্ন জেগে উঠলে দেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার দূরদৃষ্টির প্রশংসা না করে পারা যায় না। গোর্কির সম্পর্কে অরবিন্দ পোদ্দার এবং সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের প্রবন্ধ দুটিও উল্লেখযোগ্য।

আজকের যুগে মার্কিন জনজীবনের হতাশা ও লক্ষ্যহীনতা দেবব্রত ঘোষের লেখা ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি প্রবন্ধের বক্তব্য হল কেনেডি কিং ম্যালকম প্রমুখের হত্যাকাণ্ড বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। মার্কিন সমাজদেহে যে অসুস্থতা দেখা দিয়েছে, তারই অনিবার্য বহিঃপ্রকাশ এই কুৎসিত ঘটনাবলী। লেখক বলেছেন যে, মূল কারণ দূরীভূত না হলে এবং সেখানকার সমাজের কাঠামো পরিবর্তিত না হলে এসবের অবসান ঘটবে না। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রো আন্দোলন আজ একটা পরিণত রূপ খুঁজে পেয়েছে। এই ঐতিহাসিক আন্দোলনে উইলিয়াম এডোয়ার্ড বার্গহার্ট দুবোয়ার ভূমিকা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন পবিত্র পাল। নিগ্রো স্বাধিকার আন্দোলন, আফ্রিকার মুক্তি, মানবাধিকার, শান্তি আন্দোলনের সঙ্গে দুবোয়া সারা জীবন কেমন করে যুক্ত ছিলেন সে ইতিহাস সত্যিই চিত্তাকর্ষক। উনিশ শ' সতেরো সালের অক্টোবর মহাবিপ্লবের পর থেকে আজ অবধি সোভিয়েট সমাজক্রান্তির মূল্যায়ন এবং সোভিয়েট দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে মার্ক্স-এঙ্গেলস-লেনিনের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভেতরে কত সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে সে সম্পর্কে ত্রিদিব চৌধুরী তাঁর 'সোভিয়েট সমাজ-ক্রান্তির অর্ধ-শতাব্দী' প্রবন্ধে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। অন্যান্য রচনাগুলিও সুলিখিত।

চিত্রবীক্ষণ (চলচ্চিত্র মাসিক পত্রিকা : সিনে সেন্ট্রাল কলকাতার মুখপত্র) : সম্পাদক—শ্রীজয়সুন্দর গুপ্ত : প্রকাশক—অশোক চট্টোপাধ্যায়, ২, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩। মূল্য : ৭৫ পয়সা।

চলচ্চিত্রকে যারা সত্যি-সত্যিই ভালবাসেন তাঁরা জানেন যে আজকের দিনে সার্থক ছবি কেবলমাত্র দর্শককে আনন্দ দেবার জন্যই তোলা হয় না। এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। ব্যবসা[illegible] ভিত্তিতে প্রদর্শিত দেশী বিদেশী ছবি দেখে যে সব দর্শক তৃপ্ত হন না [illegible] প্রচেষ্টায় আমাদের দেশে একাধিক সিনে ক্লাব গড়ে উঠেছে। এই সব সংস্থার পৃথিবীর নানা দেশের ছবি দর্শকদের দেখানো হয় এবং সেইভাবে চলচ্চিত্র শিল্পে বিভিন্ন নতুন ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে সুরু করে উচ্চমানের কলাকুশলতার পরিচয়ও আমরা পেয়ে থাকি। নানান পৃথক ধরণের কাহিনীকে কেন্দ্র করে এই সব ছবিগুলি তোলা হয় এবং বক্তব্যের গুরুত্বই এগুলির প্রধান আকর্ষণ। বর্তমান যুগের সার্থক চিত্রের মাধ্যমে আধুনিককালের জীবনযাত্রা পরিষ্কার প্রতিফলনের চেষ্টা করা হয়েছে বলেই সেগুলি দর্শকদের কাছে এত প্রিয়। তাদের ভয়-ভাবনা, আশা ও আকাঙ্ক্ষার আসল রূপটিকে ফুটিয়ে তোলবার প্রচেষ্টায় যে পরিচালক যতটা সাফল্য লাভ করেন তাঁর চিত্র আমাদের মনকে ততটাই নাড়া দিয়ে যায়।

চিত্রবীক্ষণের যে কটি সংখ্যা আমরা পেয়েছি তার প্রতিটিতেই বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ রয়েছে। বর্তমান বছরের মে মাসের সংখ্যাটিতে 'রেনোয়ার সঙ্গ সাক্ষাৎকার', চেক চলচ্চিত্রের নব পর্যায় নামে দুটি প্রবন্ধ এবং 'ইভান দি টেরিবল'-এর সিনারিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জুন মাসে প্রকাশিত সংখ্যাটিতে হাঙ্গেরীর চিত্রে নুভেল ভাগ' এবং বাংলা চলচ্চিত্রে সংকট তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ।

জয় জিতে যায়। ও জীত লোহি হো অকতা। জীত লোহি। বাপুজি নে কহা' —তাই বলছিলাম, ও বড়োই বন্য-বন্য হোক গাইড দুবিবেদের নয় এবার।

পরিচ্ছন্ন ও আরামদায়ক রেস্টুরেন্ট টাওয়ার ভিউতে বসে কলকাতার কফি-হাউসের আমেজ নিতে নিতে চুচড়োর 'চৌরংগী' অঞ্চল ঘড়ির মোড়ের টাওয়ার ক্লকের নিশ্চল কাঁটা দুটির দিকে তাকিয়ে ছিলাম। বেলা সেকটা বাজে। ২ নং ও ৪ নং বাস দুটি টার্মিনাসে এসে থামলো। বাস থেকে নেমে মবিল, ডিজেল আর কেরোসিন ছড়ানো থকথকে, কালো কালো কাদার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একদল 'বাঘিনী' আগে আগে, পেছনে আরেক দল 'বাঘ' কোথায় যেন চলেছে সবিস্ময়ে দেখলাম। পাশের টেবিলে সজোরে করে একটা শব্দ হল। কে একজন টেবিলে আনন্দের চোটে ঘুসি মেরেছে।

'বাঘিনী দেখেছিস?'

'দেখি নি? অই ত' যাচ্ছে সব।'

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। কাঁধে আলুথালু আঁচল, শ্যাম্পু করা চুলের নিচে শুকনো কপালে চাঁদ-মার্কা এতখানি খয়েরি টিপ আঁটা সমরেশ বসুর 'বিবর', 'স্বীকারোক্তি', 'প্রজাপতি'র নায়িকারা বই থেকে বেরিয়ে পড়ে রাস্তা-ঘাট, অলিগলি ছেয়ে ফেলেছে। 'বাঘেরা'-ও পেছিয়ে নেই। তাদের দিকে তাকালে, তাদের চোখা চোখা 'ডায়লগ' শুনলে মনে হবে অ.মার চারপাশে শুধু 'বিবর', 'স্বীকারোক্তি', 'প্রজাতির পৃথিবী'। হায় সমরেশ বসু, তোমাদের বোতল থেকে ছিপি খুলে যে দৈত্য বেরিয়েছে একদিন ইতিহাসের নির্মম বিচারে সেই দৈত্যই তোমাদের হিসেব নেবে। আমরা শুধু তোমাদের পতনে একটু 'হায় হায়' করতে পারি।

রণাংগন এখন স্তব্ধ তবু কোন্ ছুতোয় যে কতোবড়ো ঘটনা ঘটে যাবে হাত গুণে তা' আগে থেকে কেউ বলতে পারে না।

হয়তো সকাল দশটায় কোন চোখা শিস বা সুতীক্ষ্ণ টিটকিরি কোন স্কুল বা কলেজগামিনীকে লক্ষ্য করে ছোড়া হয়েছে, সেই সকালের এই অতি তুচ্ছ নর্দমা বা আস্তাকুঁড়ের দুর্গন্ধযুক্ত ঘটনা রাত আটটায় একটা ভীষণ প্রলয়ংকর রূপ নিতে পারে।

দলেরই সাপোর্টারের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বাড়ছে। ইথারে ইথারে সংবাদের তরঙ্গ চলে গেল দূর-দূরান্তে। কোথা থেকে জুটে গেল নানা জায়গার লোক। কারুর হাতে বোমা। কারুর হাতে এ্যাসিড বাল্ব। হঠাৎ ইলেকট্রিক তার কারা ছিঁড়ে দিলো। টিটকিরি আর চোখা শিসের গল্প চলে গেল আড়ালে। কোথা থেকে পিকিং আর ওয়াশিংটনের ঝাঁঝালো বুকনিতে বাতাস হয়ে উঠলো মাতাল।

হ্যাঁ। যে কোন শহরের এটাই এখন-কার বৈশিষ্ট্য। যে কোন ঘটনাই ঘটুক, যতো আয়তনে সামান্য হোক, সে ঘটনা উত্তপ্ত রাজনৈতিক কথাবার্তায় এসে দাঁড়াবেই। একদল হবেই 'আমেরিকার দালাল'। আরেক দল 'চীনের দালাল'। এ না হয়ে যায় না।

আমাদের ছোটোবেলায় আমরা দেয়ালের দিকে তাকাতাম সিনেমার খবরের জন্যে। এখন যে কোন শহরের যে কোন দেয়াল দেখে দেশের রাজনীতি কোন খাতে বয়ে যাচ্ছে তা' বলে দেওয়া যাবে। খবরের কাগজ পড়তে হবে না। এমন কি পার্টির মুখপত্র পড়তে হবে না। পার্টি সাহিত্যও পড়তে হবে না।

ঠিক নিশুদ্ধ চুল গজাবার মত রোমহর্ষক সব লেখা কাগজের খাঁচার ভেতর থেকে সর্বদা হালুম হুলুম করছে, বুর্জোয়া দেখলে আর রক্ষে নেই, নির্ঘাৎ খেয়ে ফেলবে, তবে কি না কাগজের খাঁচার মধ্যে অক্ষরের শেকলে বাঁধা, তা' না হলে —আমি বিখ্যাত মহসীন কলেজের নাম শুনে দেখতে গিয়েছিলাম বিকেলে : ফিরে। কলেজ ততক্ষণে তালা বন্ধ হয়ে গেছে।

কিন্তু আমার মনক্ষুণ্ণ হবার কোন কারণ ঘটলো না।

বিরাট দুটি স্তম্ভ জুড়ে যে সব পোস্টার পড়েছে আমি সযত্নে সেগুলো টুকে নিলাম আমার ডায়েরীতে।

'নকশালবাড়ীর লাল আগুনে দিক থেকে দিকে ছড়িয়ে দিন',

'শিক্ষা সংকোচন রুখতে গেলে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করতে হবে', চেক ভূমিখণ্ড থেকে জংগী রুশ সাম্রাজ্যবাদ পা ওঠাও', 'কমরেড ডুবচেক, গৈরিক সেলাম', 'চেয়ারম্যান মাও-এর নির্দেশিত পথে গ্রামগুলিকে দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করো' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এর মধ্যে যেটি আমার ভালো লাগলো মানে কিঞ্চিৎ অভিনবত্বের সন্ধান পেলাম সেটা হচ্ছে ঐ, 'কমরেড ডুবচেক, গৈরিক সেলাম।'

এতদিন 'লাল সেলাম' বলে একটা কথা জানতাম। এখন শুনলাম 'গৈরিক সেলাম'। এই প্রথমই শুনলাম। আমি যে-সব শহর পরিক্রমা করেছি সেখানে জনসংঘ বা স্বতন্ত্র বা পি এস পি'র কোন ক্যান্ডিডেটের তেমন দাপট নেই বটে, কিন্তু অশুভ, প্ররোচনাময় সেই ফ্যাসিস্ট হিটলারের প্রেতচ্ছায়া ঐ 'গৈরিক সেলাম'-এর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত।

এমন ক্যান্ডিডেট কোথাও কোথাও কেউ কেউ আছেন, যাঁদের অবস্থা ভালো নয়, যাঁরা কংগ্রেসী নন, কম্যুনিস্ট নন, ফরোয়ার্ড ব্লক বা বাংলা কংগ্রেসের কেউ নন, শুধু এইটুকু যোগ্যতা যে কিছু লোক জোগাড় করতে পারেন, তাঁরা ইলেকশনে নিশ্চিত পরাজয় জেনেও কেন যে দাঁড়াচ্ছেন, বিশেষ, খুব কম করেও যেখানে চার-পাঁচ হাজার টাকা খরচ, বোঝা যায় না।

কিন্তু বুঝতে চাইলে বোঝা কিছু শক্ত নয়। এই সব ক্যান্ডিডেটদের সামনে নয় পেছনে একটু তাকাতে হবে কষ্ট করে। কারা আছে এদের পেছনে? কংগ্রেসই এদের দাঁড় করাচ্ছে। কংগ্রেসেরও সামনের দিকে তাকালে চলবে না। কংগ্রেসের পেছনের দিকে তাকাতে হবে। কংগ্রেসের পেছনে আছে মিল মালিক। গ্রামের বড় বড় জোতদার। আরো আরো পেছনে চলে গেলে অবশ্য কলম্বাসের মত আমেরিকা আবিষ্কার করা যায়। সি আই এ-র ফেলিকদম্বমূলে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশের যে যামিনীজাগর রতি-বিলাস শুরু হয়ে গেছে অনেকদিন এ তত্ত্ব ত' আমাদের কানাগলির ট্যাঁরা বলাইও জানে।

পরিচিত শহর ও মাঝে মাঝে আমার কাছে অপরিচিত হয়ে যাচ্ছে আজকাল এই আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনী আবহাওয়ায়।

যেদিকেই চোখ ফেরাই চোখ আটকে যাবেই বোল্ড টাইপের আলকাতরায়, 'এই নির্বাচন বয়কট করুন।' বাটার সুবিখ্যাত মোজেইক করা দেয়ালে কে বা কারা আলকাতরায় অমর অক্ষরে লিখে রেখে গেছে, 'মার্কিনী গোমস্তা কংগ্রেস টাকার এপিঠ, কংগ্রেসীদের গোমস্তা যুক্তফ্রন্ট টাকার অপরপিঠ। যুক্তফ্রন্ট নিপাত যাক্। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।'

বেড়াতে বেড়াতে হুগলী কোর্টে গেছি। কোর্টের বাইরে ত' আছেই গণ্ডা চারেক, কোর্টের ভেতরেও কোথাও আর বাকী নেই। সিঁড়ির গায়ে, কাঠের হাত-বাক্সের সামনে, ছেঁড়া, তেলচিটে মাদুরে মক্কেল বিছিয়ে বুকের বোতাম খুলে দিয়ে যেখানে বসে ভাঙা পাখায় হাওয়া খাচ্ছে আর মশা তাড়াচ্ছে মুহুরীরা, তাদের মাথার ওপরকার দেয়ালে লেখা সেই বিখ্যাত আলকাতরাতেই, 'এই নির্বাচন বয়কট করুন।' 'বুর্জোয়া প্রহসনে ভুলবেন না।' 'গ্রামকে দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করে শহরকে ঘেরাও করার মাও-পন্থা অবিলম্বে গ্রহণ করুন।'

আমার দাঁত শক্ত কিন্তু যেখানে 'উত্তমরূপে দাঁত বাধানো হয়' টিনের বিজ্ঞাপন ঝুলছে তার তলায় দৈবাৎ দাঁড়িয়ে গেছি, দেখি তার তলাতে অবশ্যই আলকাতরায়, 'নকশালবাড়ি লাল সেলাম।' পোস্ট অফিসে চিঠি ফেলতে গেছি যে লাল বাক্সটিতে তার গায়ে কাগজ সাঁটা 'নকশালবাড়ি লাল সেলাম।' 'এখানে প্রস্রাব করিও না'—সিনেমা হলের যেখানে এই নোটিশ টাঙানো সেখানেও, 'নকশালবাড়ি জিন্দাবাদ।' অলিতে গলিতে 'কানু সান্যাল জিন্দাবাদ', 'জংগল সাঁওতাল জিন্দাবাদ।' এসব কোথা থেকে আসছে ও অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমি যতোটা দেখেছি তাতে মনে হয় এ ধরণের বিপ্লব চায়ের দোকানে তৈরি করছেন আঠারো থেকে পঁচিশ বছরের যুবকেরা, এবং এই অসাধারণ বিপ্লবকে দেয়ালে আটকে রেখে রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'উত্তেজনার আগুন পোহাচ্ছেন।'

হে নকশালপন্থী কাল্পনিক বন্দুকধারী, অসমসাহসী, মুহূর্তে মুহূর্তে মাওয়ের 'কোটেশন' উচ্চারণকারী নির্ভেজাল বিপ্লবী যুবকবৃন্দ, যদি ঠিক করে থাকেন এই নির্বাচনে কংগ্রেসকে জিতিয়ে দেবার সুমহান দায়িত্ব আপনারা কাঁধে তুলে নিয়েছেন, তাহলে সে কাজ করে যান, দেয়ালে বিপ্লবের কানুন আঁটুন আর [illegible] থাকুন, নিশ্চিতভাবে একথা বলে রেখে চাই, আজ কিংবা কাল জনগণ থেকে আপনারা বিচ্ছিন্ন হবেন-ই, ইতিমধ্যেই বিচ্ছিন্ন হয়েছেন, দেশের মুক্তি আপনাদের মত দু'-চারজন মানুষের মোহমুক্তিতেই আসে না, মুক্তি সেদিনই আসে যেদিন দেশের সমগ্র অন্তরাত্মা জেগে উঠবে। 'কোটেশন' পড়ে শর্টকাটে মাওকে জানতে গিয়েই ফ্যাসাদে পড়েছেন মাওয়ের সিলেকটেড ওয়ার্কস যত্নসহকারে পড়লেই বুঝতে পারবেন বুকনি আর বিপ্লব এক জিনিস নয়। হো চি মিন, মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, মানবেন্দ্রনাথ রায়, লেনিন ইত্যাদি পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে যে মাওয়েরও গৌরবজনক স্থান আপনাদের যত্রতত্র মাও মাও চীৎকার সেই কথাটাই ভুলিয়ে দিতে বসেছে।

রণাঙ্গন এখন স্তব্ধ। কিন্তু শহরের আনাচে-কানাচে বারুদের ঘ্রাণ ঠিকই পাওয়া যাচ্ছে। কান পেতে শুনলেই শুনতে পাওয়া যাবে 'চালের দাম সাড়ে চার টাকা থেকে নেমে ১ টাকা ৪০-এ এসে নামলো, তবু শালা বিকেলে বাড়িতে গিয়ে সেই তিনখানা চামড়ার মত রুটিই বরাদ্দ, একটুও বাড়লো না, রাতে রুটির বদলে ভাত জুটলো না একদিনও, তবে শালা কংগ্রেস যে এখানে মিটিং করে বলে গেল আমরা চালের দর নামিয়েছি তাহলে সেটা কেমন ফক্কিকার বুঝে নাও একবার। দর নেমে গেছে অনেক কিন্তু আমরা কিনতে পারছি না কেন এর কে জবাব দেবে?

পাশ থেকে একজন বলল, 'জবাব দেবে আগামী নির্বাচন।'

হ্যাঁ। আগামী নির্বাচনই জবাব দেবে। তবে সে জবাব এবার আর ছুতোরের ঠুকঠাক নয়। কামারের এক ঘা। যুক্তফ্রন্টের এক হাতুড়ির ঘায়ে দলাদলিতে শতজীর্ণ কংগ্রেসের 'এক্তেকাল' ঘনিয়ে আসবে। ঐ শুনতে পাচ্ছি, কেন্দ্রীয় পাঠাগারে বসে শুনতে পাচ্ছি কলকল্লোল। ওরা বেরিয়েছে। ঐ ছাত্ররা। সংবাদপত্রের কর্মচারীদের সমর্থনে। স্কুল-কলেজ স্তব্ধ। থম থম করছে শহর।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখছি পি-ডি-এফ সরকারের বিরুদ্ধে যেসব ছেলেরা লড়েছিলো, সর্বাঙ্গে বীরের ক্ষতচিহ্ন নিয়ে সেই সব ছেলেরা আবার পথে বেরিয়েছে ছাত্র-ধর্মঘটে সামিল হবার জন্যে। আবার শুনতে পাচ্ছি, 'নিপাত যাক, নিপাত যাক', 'ধ্বংস হোক', অকুণ্ঠ সংগ্রামের সেই অগ্নি-ঝরা বাণী। দুঃখ এই, দেশব্যাপী নির্বাচনের এই ভয়ানক শক্ত লড়ায়ে নকশালপন্থী যুবকেরা থাকবে না, যেমন তারা ছিল না পি-ডি-এফ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার [illegible] [illegible]।...

[illegible]

নাটক

ইংরাজী নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে একটি চিরস্থায়ী সংঘাত বা বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজী নাটক কখন কাব্যাশ্রয়ী কখন গদ্যাশ্রয়ী হয়। সেক্সপীয়রের সময় নাটক এতই কাব্যাশ্রয়ী ছিল যে, কোন কোন সমালোচক—ইঁহাদের মধ্যে L. C. Knights প্রধান—নাটকের ... প্রাধান্য দিয়াছেন। The drama is subsumed in the Poetry. ভার্জিনিয়া উলফ তাঁহার Notes on an Elizabethe Play-তেও ঐ কথাই বলিয়াছেন। ... Congrave হইতে Sheridan-এর ইংরাজী নাটক সম্পূর্ণভাবে গদ্য-নির্ভর। লক্ষণীয় যে এই শতাব্দী ট্র্যাজেডির পক্ষে অবক্ষয়ের যুগ। ট্র্যাজেডি বোধ হয় আংশিকভাবে কাব্য-নির্ভর, যদিও সেক্সপীয়র তাঁর ট্র্যাজেডির চরম মুহূর্তে সব সময়ই গদ্য ব্যবহার করেন। ষাট বৎসর পূর্বে Sir Walter Raleigh এটি লক্ষ্য করেন।

বিংশ শতাব্দীতেও নাট্যজগতে কাব্য ও গদ্যের পালা-বদল চলছে। শতাব্দীর প্রথমাংশটা ছিল গদ্যের যুগ। শ, গলসওয়ার্দি ও গ্র্যান-ভিল-বার্কার নাট্যজগতে যে যুগান্তর আনিয়াছিলেন তাহার মূল সূত্রই ছিল দর্শককে সমস্যা-সচেতন করা। বলা বাহুল্য এ বিষয়ে গদ্য অনেক বেশি উপযোগী।

এই শতাব্দীতে কাব্যাশ্রয়ী নাটকের উদ্যোক্তা ইয়েটস ও টি এস এলিয়ট। টি এস এলিয়টের Murder in the Cathedrel কেবল কাব্যাশ্রয়ী নয়, কতকটা গ্রীক আদর্শে রচিত। এ বিষয়ে Samson Agonistes-এর সহিত ইহার সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। এলিয়টের পরে উল্লেখযোগ্য নাম Christopher Fry (ক্রিস্টোফার ফ্রাই)। চতুর্থ দশকে মনে হইয়াছিল যে ফ্রাই বোধ হয় কাব্য-নাট্যের স্বর্ণযুগ ফিরাইয়া আনিলেন। কিন্তু যে আশা ফলপ্রসূ হয় নাই। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, এলিয়টের মতে কাব্য-নাট্যের একটি স্বকীয় রূপ আছে। তিনি ইহাকে The Third Form আখ্যা দিয়াছিলেন। বর্তমানে আবার গদ্য-নাটক চলিতেছে।

এই শতাব্দীতে প্রতীকাশ্রয়ী নাটক যথেষ্টই হইয়াছে, তবে স্বাভাবিক কারণেই মঞ্চে সাফল্য তাহাদের মেলে নাই। অবশ্য Samuel Beckett ব্যতিক্রম। তাঁর Waiting for Godot জনমানসে অভূতপূর্ব প্রতিষ্ঠা পাইয়াছে। ইবসেনের অনেক নাটক প্রতীকাশ্রয়ী কিন্তু ইবসেনের প্রধান সমর্থক বার্নার্ড শ ইবসেনের প্রভাব ভিন্নপথে চালিত করিয়াছিলেন। অন্যান্য প্রতীকাশ্রয়ী নাটকের মধ্যে Eugene O' Neill-এর Long day's Journey into the Night আর All God's Chillen got wings উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত নাটকের নায়িকা একজন drug-addict. তাহাকে মঞ্চে দেখা যায়, নিজের বিবাহ-বাসরের পোষাকটি (যাহা সে হঠাৎ ট্রাঙ্কের মধ্যে পাইয়াছে) লইয়া স্মৃতি-রোমন্থন করিত। তাহার পর সেটি যায় তাহার স্বামীর হাতে। এই একখানি পোষাক হারানো দিনের সুখ-শান্তির প্রতীক হইয়া উঠে। এই সকল নাটকে বা Tennessee Williams এর The Glass Menagerie-তে প্রতীক কখনও নাটকের বিষয়বস্তুকে অতিক্রম করে না।

যে সকল কারণে পঞ্চম দশকে ইংলণ্ডে Angry young Men-দের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহাই নাটকেও প্রতিফলিত হইয়াছিল। Angry Young Men কথাটি বহুল প্রচলিত হইলেও সাহিত্যক্ষেত্রে প্রকৃত Angry Young Men একজনই John Osborne. John Braine বা Kingsley Amis সত্যকারের Angry নন। আর Angus Wilson তো প্রতিবাদই জানাইয়াছেন।

যাহা হউক, এ দশকে নাট্যকারেরাও মনে করিলেন Angry-দের মতই—"There are no good brave causes left." অর্থাৎ চমক-লাগান বা উত্তেজনা-জ্ঞাপক বিষয়ের একান্ত অভাব। এই অভাববোধ তাঁহাদের ... লইয়া যায় সমাজের অবজ্ঞাত, অবহেলিতদের প্রতি এবং এই বোধ হইতেই Elmer Rice-এর The Adding Machine এবং Arthur Miller-এর The Death of a Salesman-এর জন্ম। Elmer Rice যখন কলিকাতায় আসেন তাহার সঙ্গে এই লেখকের আলাপ হইয়াছিল। তিনি এ যুগের সকল নাট্যকারদের অন্যতম। একই সঙ্গে একাধিক নাটক West End ও Broadway-তে অভিনীত হইতেছে, এ সৌভাগ্য Elmer Rice ছাড়া আর কাহারও ঘটে নাই। Arthur Miller-কে সাধারণ লোকে জানে Marilyn Monroe-র অন্যতম স্বামী বলিয়া। বস্তুত তিনি একজন যুগান্তকারী লেখক ও Death of a Salesmen-এর

পলাতকা

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

একদা তুমি তো ছিলে সুখে-স্বপ্নে নির্জন বৈভবে
পরিচিত গন্ধ তার নিশ্বাসে প্রশ্বাসে,
উদাসী চৈত্রের হাওয়া
পাতা ঝরে যায়
বিষন্ন গোধূলিক্ষণ মায়াবী সন্ধ্যায়,
রোমন্থন সে-পৃথিবীরে পুরনো বিশ্বাসে।

একদা তোমার প্রেম দুটি চোখ আশ্বাসের ছবি
তাই নিয়ে পথচলা
গান গাওয়া
শূন্যতাকে পূর্ণ করা, ছিলো ছিলো সবই,
আকাশ, নক্ষত্র আর ঝাউছায়া মন
পরিচিত গন্ধ তার অশরীরী স্মৃতি।

পলাতকা আজ তুমি নির্জনতা এখন বিদায়,
মশালের রক্ত বং চীৎকারে চীৎকারে—
ভাবনায় ক্ষুধা ভয়
নেই সে-হৃদয়
একদা তোমার স্থিতি, সব স্মৃতি
সমুদ্রের ঢেউ-এ মুছে যায় ॥

কেন ?

অশোক ভট্টাচার্য

আমাদের সুচেতনা কাজ করে অথচ কম্পাসে
দিক ভুল হয় আর মাঝেমধ্যে চোরা পাহাড়ের
সঙ্গে ধাক্কা লেগে যায় ঃ কেউ যেন ভাঙনী পাড়ের
শোনে নি কখনো নাম এ রকম মুখ করে ফিরে চলে আসে।

প্রেরণা প্রার্থনা নয় ; তবুও তা কুয়াশায় উন্মেষের মত
এক আলো জেলে রাখে বাতিঘরে—কোনো দুর্বিপাকে
ভাঙাচোরা মাস্তুলের স্মৃতি যেন অযথার্থ—জড়াতেই থাকে
সরীসৃপ স্বভাবের মুক্তি নিতে মানুষেরা সমুদ্রে সম্মত।

কেন না বন্দর থেকে অগণন নির্মোকের ভার
যাত্রাকে ব্যাহত করে ; আন্দোলিত পালের বদলে
এখনো প্রত্যাশারক্ত হৃদয়কে বেঁধে দিতে বলে—
খোলস বা মুখোসের প্রলেপে বা আস্তরণে তৃপ্তি নেই যার।

সে মানুষ আমি তুমি ঃ আমাদের সুচেতনা কাজ করে তবে
সমস্ত জাহাজ কেন নিষ্প্রাণ ছবির মত নিশ্চলতা হবে?

নায়ক Willy Leman, বিংশ শতাব্দীতে সাধারণ মানুষের অসহায়তার প্রতীক

Absurd Drama-র অভ্যুত্থান ষষ্ঠ দশকে। Absurd Drama-র জন্ম প্যারিসে, লণ্ডনে নয়। প্রধান Absurd Dramatist-রা প্রায় সকলেই ইউরোপীয় অর্থাৎ কেহই ইংরাজ নহেন---Ionesco ও Genet ইঁহাদের মধ্যে সুপরিচিত। তবে Beckett-এর Waiting for Godot বহুলাংশে Absurd Drama-র সমগোত্রীয়। Waiting For Godot-র এ দেশে সুদক্ষ অনুবাদ ও নিপুণ অভিনয় হইয়াছে,---উভয় ক্ষেত্রেই কৃতিত্ব শ্রীঅশোক সেনের। যে দুইজন ভবঘুরে Vladimir ও Estragon প্রতীক্ষা করে, তাহা কিসের প্রতীক্ষা ? তাহারা নিজেরাও তা জানে না এবং এখানেই Absurd Drama-র সঙ্গে সাদৃশ্য। অপর পক্ষে প্রতীক্ষা মানব-জাতির অস্তিত্বের সঙ্গে সংযুক্ত। এখানে Beckett কি সার্ত্রে্র (Sartre) কাছে ঋণী ? অথবা Absurd Drama-র জনক Antonie Artand-র কাছে ? Bamber Gascoigne বলিয়াছেন---The play is aboye all about mankind's attempts to fiddle its way th;ough life. The play is not about Godot, but about waiting. It is about life on earth, not hereafter.

Absurd Drama ব্যতীত ইংলণ্ডের নাট্যজগতে আর একটি আধুনিক প্রচেষ্টা Kitchen Sink Drama. ইহার প্রধান উদ্যোক্তা Arnold Wesker, Kitchen বা রন্ধনশালা তাঁহার নাটকগুলির মধ্যে কতকটা প্রতীকের মত। তাঁহার তিনটি বিখ্যাত নাটকের---*Chicken Soup with Barley ; Roots* এবং *I'am talking about Jerusalem*---বিষয়বস্তু সমাজতন্ত্রবাদ। নায়ক Ronnie Kahn-এর অভিজ্ঞতা এই যে বাস্তব ও আদর্শে সামঞ্জস্য রাখা কঠিন। গলসওয়াদির Forsyte Saga-র কথা স্মরণ করায়।

আর দুইজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকার Brendan Behan এবং Harold Pinter, Behan-এর অকাল মৃত্যু অতীব শোচনীয়। তাহার Quare Fellow নাটকে একজন প্রাণদণ্ডে অভিযুক্ত আসামীর মানসিক দ্বন্দ্ব দেখি। রুশ সাহিত্যে এটি দুর্লভ বিষয় নয় কিন্তু ইংরাজী সাহিত্যে ইহা বিরল। Pinter-এর The Birth day Party-তে Ionesco এবং Beckett-এর প্রভাব সুস্পষ্ট কিন্তু তাঁহার The Caretaker বহুলাংশেই মৌলিক।

একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার---Sean O' Casey সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম না। স্বল্পপরিসরের অসুবিধা তো আছেই তাহা ছাড়া O' Casey সম্বন্ধে আলোচনা ব্যক্তিগত হইতে বাধ্য। ইয়েটসসের বিরোধিতার জন্য তাঁহাকে Abbey Theatre ছাড়িতে হয় এবং এ গ্লানি তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার রাজনৈতিক মতবাদের জন্য তিনি জীবদ্দশায় কতকটা একাকী ছিলেন। তাঁহার সমসাময়িকদের মধ্যে তিনি যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বিশেষত্ত সামাজিকতার নিরিখে তাহা অনস্বীকার্য।

ভোরে সকালে অতৃপ্ত নিদ্রার বিরক্তি মেখে নিয়ে উঠে পড়ল রঞ্জনা। প্রথম রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল নেড়ি কুকুরটা। চালাঘরের মাচার নিচে কুঁকিয়ে কুঁকিয়ে কাতরাচ্ছিল। রাত্রির নিস্তব্ধতায় শব্দটা বীভৎস মনে হচ্ছিল। শব্দটা কোথা থেকে আসছে, কিসের শব্দ কান পেতে ঠাওর করেও রঞ্জনার ভয় ভয় করছিল। ওপাশের তক্তপোষে সুপ্রভা পীযূষের বড় ছেলে সুবুকে সঙ্গে নিয়ে শুয়েছিলেন। ঘরের মধ্যে তিনটে মানুষ, কাতরানোর শব্দটাও নেড়ির তাতেও সন্দেহ নেই, তবু ভয়ে রঞ্জনার ঘুম আসছিল না। সুপ্রভাকে কুণ্ঠায় ডাকতেও পারে নি। তবু একসময় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। শেষরাত্রে নেড়ির ছানাটার তারস্বরে চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেছে। কি বিশ্রী চিৎকার, যেন সুর করে কাঁদছে। যতবার তন্দ্রা এসেছে ছানাটার চিৎকারে চোখ খুলে গেছে।

সকালে উঠে উঠানে গোবরছড়া দেওয়া সুপ্রভার অভ্যাস। রঞ্জনা বারান্দায় এসে মাকে উদ্দেশ করে বলল,—কি জ্বালা হয়েছে বল দিকি নি। নেড়ি আর ছানাটা সমস্ত রাত ঘুমোতে দেয় নি। দুটোকেই আজ মেরে তাড়াব।

সুপ্রভা অর্ধ-নির্লিপ্তকণ্ঠে বললেন,—লক্ষ্মীছাড়াটা আর কোথাও জায়গা পেল নি?

—কুকুর হেন জীব তাড়িয়ে দিলে যায় না আর এখানে সোহাগ করবার লোকের অভাব নেই।

রঞ্জনার লক্ষ্য যে, সে সামনে নেই। তবু ঠেস দিয়ে মাকেই কথাগুলো শোনাল। নবনীতা সামনে থাকলে বলতে সে সাহস পেত না। অথচ তার বাবা যত-দিন বেঁচে ছিলেন যে কোন ছল ছুতোয় বৌদিকে ঝেড়ে পাঁচ কথা শুনিয়ে দিত। এখন সংসারের চাবিকাঠি দাদার হাতে। কর্তৃত্ব বৌদির। নবনীতার প্রতি রঞ্জনার বাঁকা মনোভাব। পীযূষের কাছে অতিরিক্ত আস্কারা পেয়ে নবনীতা সবার মাথা ডিঙিয়ে মোড়লি করছে উঠতে বসতে মাকে এই অভিযোগ শোনায়। স্বামীর ওপর পুরোমাত্রায় আব্দার খাটাবে নিজের ভবিষ্যৎ কল্পনায় এই অভিপ্রায় থাকা সত্ত্বেও। রঞ্জনার বিশ্বাস পীযূষ নবনীতার কাছে খুব জব্দ হয়ে আছে। তাকে ঘাটাতে সাহস পাবে না। তা না হলে শরীরে দগদগে ঘা নিয়ে নেড়ি কুকুরটা একদিন যখন বারান্দায় শুয়েছিল, নাক সিঁটকে লাঠিগাছা হাতে নিয়ে পীযূষ ওটাকে মেরে তাড়াতেই ঘর থেকে বেরিয়েছিল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে নবনীতা ঝংকার দিয়ে উঠেছিল,—তোমার কি কাণ্ডজ্ঞান নেই, পোয়াতি জীবের গায়ে

জাতি তুলে একটা অমঙ্গল ঘটাতে চাও।

সবাই নবনীতার পানে তাকিয়েছিল। নবনীতার শরীরেও আসন্ন মাতৃত্বের লক্ষণ। সে রোগা হয়েছে, চোখের কোলে কালি পড়েছে। পীযূষ শঙ্কিত হয়েছিল এবং রঞ্জনার মুখে বিতৃষ্ণা ফুটে উঠেছিল। পীযূষ হেই হেই করে কুকুরটাকে তাড়িয়েছিল। নেড়িটা চালাঘরের মাচার নিচে গিয়ে ঢুকেছিল আর সেই থেকে মৌরসী মেজাজে ওখানেই বাস করছে। নবনীতা মাঝে মাঝে ওটাকে হাঁড়ি থেকে দুটো ভাত দেয় ওটাও রঞ্জনার চোখ এড়ায় নি। ওতেও মনে মনে রঞ্জনা ক্ষুব্ধ। নবনীতাকে গতর খাটিয়ে রোজগার করতে হয় না। করলে, এই আক্রার দিনে কিসে কি আসে সে বুঝতো।

পীযূষের বড় ছেলে সুবু, ছেলে বলতে ঐ একটাই—তার পরে মেয়ে; তার পরের ছেলেটা মাত্র তিন মাস বেঁচে ছিল সেও আজ আড়াই বছর আগেকার কথা,—সুবু একদিন মাচার কাছে দাঁড়িয়ে আনন্দে নেচে নেচে বলছিল, তিনটে বাচ্চা। এমন অসভ্য ছেলেটা, খেঁকো কুকুরটার গায়ের দুর্গন্ধে কার সাধ্য চালাঘরের কাছে যায়, অথচ সুবু নির্বিবাদে একটা বাচ্চাকে টেনে বের করবার জন্য লেজে হাত দিচ্ছিল আর নেড়ি খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠতেই হাত গুটিয়ে আনছিল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঐ দেখে মহারাণী ফিক্ ফিক্ করে হাসছিলেন, ছেলেকে মুখের কথাটিও বলেন নি। হপ্তা দুই আগে পরে দুটি বাচ্চা খতম হয়েছে। দুটির শেষটি গেছে আর বাঁচবে না। একটা ভাঙা ঝুড়িতে করে বাচ্চাটাকে রাস্তায় ফেলে দিতে গিয়েছিল পীযূষ। উঠানে দাঁড়িয়ে নবনীতা শাশুড়ীকে উদ্দেশ করে বলেছিল, বাঁচবে কি, মায়ের বুকে এক ফোঁটা দুধ আছে? পোড়া অদৃষ্ট তবু ভগবান দেব।

সুপ্রভা মমতার কণ্ঠে বলেছিলেন—জন্ম নিয়েছে কর্মফলে। মুক্তি পেয়ে গেল।

ঘরে বসে মেয়েদের ইস্কুলের খাতা দেখছিল রঞ্জনা। নবনীতা যেন মহত্ত্ব জাহির করতেই নেড়ির প্রতি করুণা প্রকাশ করল। রঞ্জনার ঠোঁটের কোণে শ্লেষের হাসি ফুটে উঠেছিল।

গতকাল বিকেলে নবনীতা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। রঞ্জনা তাই নেড়ির সম্বন্ধে নিজের সিদ্ধান্ত নিঃশঙ্ক কণ্ঠে ঘোষণা করতে পারল। মন্তব্যটা শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গে নেড়ির ছানাটা কেঁও-কেঁও শব্দে আবার চেঁচিয়ে উঠল। রঞ্জনা এমন ভাব দেখাল, যেন তার মাথার রক্ত চাড়া দিয়ে উঠেছে। উঠান থেকে একটা শুকনো ডাল কুড়িয়ে চালাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। নেড়ি আর ছানাটাকে মেরে বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে তাড়িয়ে দিয়ে আসবে। চালাঘরটার কাছে উৎকট গন্ধ। মাছি উড়ছে। নেড়িটা হয়ত বন-ভাগাড় থেকে কোন জন্তুর পচা হাড় টেনে এনেছে। ঘেন্নায় নাকে আঁচল চাপা দিয়ে গুঁড়িমেরে মাচার নিচে তাকাল রঞ্জনা। কিনারা ঘেঁষে নেড়িটা সটান শুয়ে আছে, পেট ঢোলকের মত ফুলে উঠেছে, মাছি ভন্ ভন্ করছে, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে নেড়ি বেঁচে নেই। রাত্রে মৃত্যু যন্ত্রণায় তাহলে কাতরাচ্ছিল ভাবল রঞ্জনা। ছানাটা মায়ের শুষ্ক স্তন মুখে নিয়ে টানছে। হয়ত কিছুই পাচ্ছে না। ক্ষোভে বেপরোয়া হয়ে উঠছে। ককিয়ে ককিয়ে লম্বা সুরে চিৎকার করে নেড়ির লাসটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। নেড়ির পা কামড়াচ্ছে, লেজের ডগা মুখে নিয়ে টেনে নেড়িকে জাগাতে চেষ্টা করছে। নেড়ি আর জাগবে না, অবোধ জীবটা কি করে জানবে? অসহনীয় জীবন থেকে, অক্ষম মাতৃত্ব থেকে নেড়ি মুক্তি পেয়ে গেছে।

সকালবেলার স্নিগ্ধ আলোয় অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে রইল রঞ্জনা। অনুভব করল। ঝি কুয়োতলায় বাসন নামাচ্ছে। উঠানের আরেক ধারে সুপ্রভা উনুন সাজাচ্ছেন। সুবু উঠে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে খেতে দিতে আবদার করছে। রঞ্জনা আস্তে আস্তে মা'র পিছনে এসে দাড়াল।

—নেড়ি মরে গেছে।—উদাসীন কণ্ঠে বলল।

—কাল সমস্ত দিন ওটাকে দেখি নি।

—পেট ফুলে ঢাক হয়েছে। কি দুর্গন্ধ।

—দেখ দিকি নি আরেক জ্বালা। কে ওটাকে ফেলবে?

সুপ্রভা পীযূষের ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। রঞ্জনা বললে, বাচ্চাটা মাই চুষে কিছুই পাচ্ছে না। কি বাঁদাটাই না বাঁদছ—

—আজ-কালের মধ্যে ওটাও মরবে।

—সে কি করে জান?—বেঁচে যেতেও পারে।

—মা ছাড়া কি শিশু বাঁচে। শিশুরা বড় হলে অবশ্য এ কথা মনে রাখে না।

সুপ্রভার কণ্ঠ শুষ্ক। অথচ রঞ্জনা সমবেদনা আশা করেছিল। এই অভিযোগ কোথা থেকে এল, ভাবতে গিয়ে রঞ্জনা দস্তুরমত ক্ষুব্ধ হল। সকালবেলার চায়ের জন্য রান্নাঘরের মিট্-সেফে বাসি দুধ থাকে। মাকে বলে খানিকটা নেবার জন্য সে এসেছিল। বলতে রুচি হল না। রান্নাঘরে ঢুকে নিজের অধিকার প্রয়োগ করে খানিকটা দুধ একটা ভাঙা কাপে ঢেলে নিয়ে নাকে আঁচল চাপা দিয়ে চালাঘরে ফিরে এল। ছানাটা গোঙরাচ্ছে। নিষ্ফল ক্রোধে নেড়ির পিঠে নখে আঁচড় কাটছে। কাপটা মাচার কাছে নামিয়ে চু-চু করে বাচ্চাটাকে ডাকল। রঞ্জনার দিকে আসবার ওটার কোন আগ্রহই দেখা গেল না। যেন একটু ভয় পেয়ে নেড়ির লাসটার ওপাশে গিয়ে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করবার জন্য যেমন দাঁড়ায় তেমনি ভঙ্গিতে ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

—ন্যাকামো! না খেলে আমার বয়েই গেছে। —বাচ্চাটাকে উদ্দেশ করে বলল রঞ্জনা। যাকে বললো, সে তখনও ঘেউ ঘেউ করছে। ঔদ্ধত্যকে পরাভূত করবার বৃত্তি হয়ত মানুষের সহজাত। ছেলেমানুষী জেদে শুচি-অশুচির প্রশ্ন সে ভুলে গেল। বাচ্চাটাকে ঘাড়ে ধরে তুলে এনে ভাঙা পেয়ালায় ওর মুখ ঠেসে ধরল। বাচ্চাটা দু'-একবার নিজেকে ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করে চুক্ চুক্ চেটে তুলতে লাগলো।

রাস্তা থেকে একটা মেথর ডেকে আনল পীযূষ। নেড়িকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, বাচ্চাটা চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখল। কোন শব্দ নেই। পীযূষ মেথরকে বললে,—ছানাটাকেও নিয়ে যা খানিকটা দূরে রাস্তায় কোথাও ছেড়ে দিস।

—কেন ওটার কি হয়েছে? রঞ্জনা বলল।

আরেকদিন ওটা মরে পড়ে থাকবে।

দেখাই যাক না। রাস্তায় ফেলে রাখলে দুষ্টু ছেলেরা ফুটবলের মত লাথি দিয়েই ওটাকে মেরে ফেলবে।

নবনীতার খোঁজ নিতে হাসপাতালে করে পীযূষ বেরিয়ে গেল।

বেশ কৌতূহলের বিষয়বস্তু হয়ে উঠছে ছানাটা। উঠানময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঘেউ ঘেউ করছে, গাছের শুকনো পাতার ওপর লাফিয়ে পড়ে খেলা করছে। ঘর থেকে বেরিয়ে বারে বারে ওটাকে দেখছে রঞ্জনা। মাটিতে কটা মুড়ি রেখে তু-তু করে ডাকল। ওটা এল না, কিংবা সাড়াও দিল না। ইস্কুলে যাবার আগে বাটিতে সামান্য একটু দুধে কটা ভাত ভিজিয়ে ভাঙা কাপটায় ঢেলে দিয়ে এল। বাচ্চাটা মাচার নিচে পালিয়ে গেছল। রঞ্জনা ঘুরে দাঁড়াতেই ছুটে এসে চেটে খেতে লাগল। আড় চোখে দেখে শান্ত খুশিতে হেসে রঞ্জনা চলে এল।

রোদ্দুর যখন গাছের ডগায় উঠে গেছে রঞ্জনা ইস্কুল থেকে ফিরে এল। ভিতরের বারান্দায় বসে সুপ্রভা নাতি-নাতনীকে গল্প বলে ভোলাতে চেষ্টা
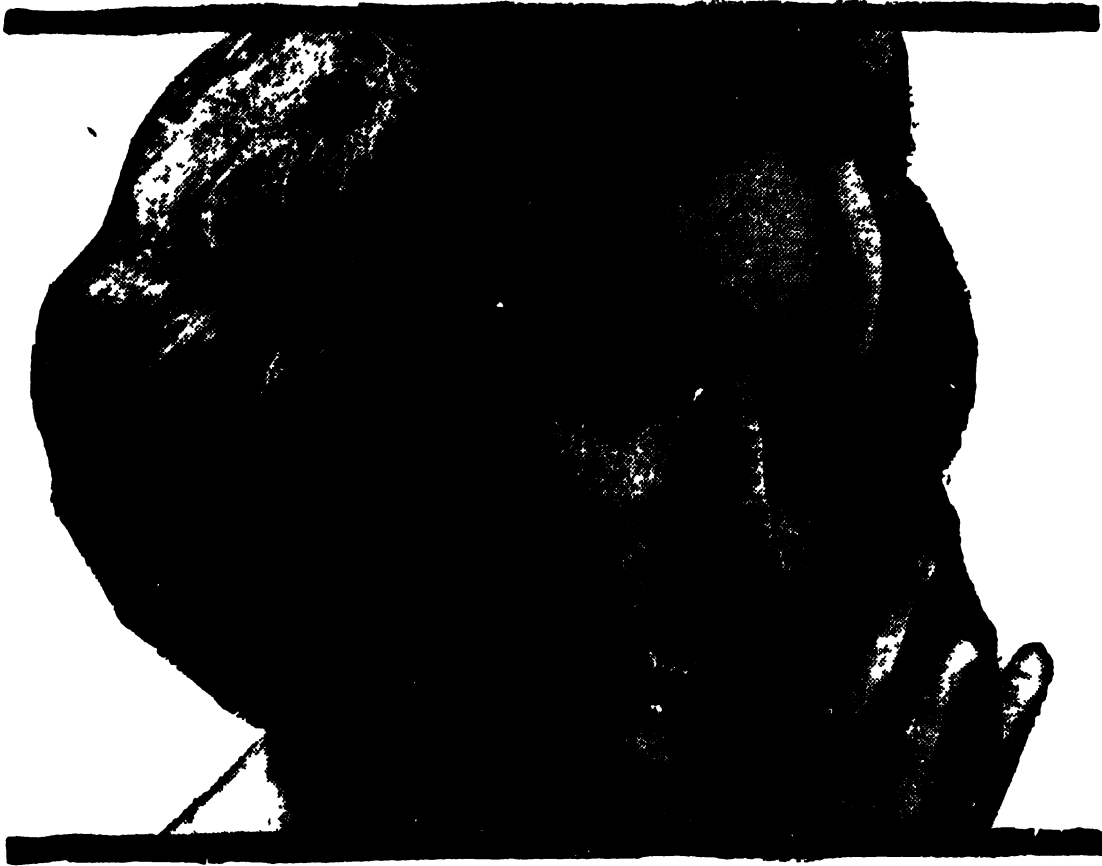
ঐ সুন্দর কেশ বিন্যাস অতি দীর্ঘকাল সুন্দর থাকবে না – – –

শেলাক ব্যতীত

চুল আটকাবার প্রসাধন সামগ্রীতে, এরোসলযুক্ত ও এরোসলহীন কেশ সিঞ্চনে উভয়তই শেলাকই প্রাথমিক আঠা।

শেলাকসমূহ ফ্লেক্সোগ্রাফিক কালি, পেষাই কল, পিল, কনফেকশনারী, জলীয় বাষ্প সেট করা কালি, প্রসাধন, বৈদ্যুতিক ইন-স্যুলেটর, কোল্ড টপ এনামেল ইত্যাদিতে বিভিন্ন প্রান্তিক ব্যবহার সামগ্রী পছন্দমত প্রস্তুত হয় পৃথিবীর বৃহত্তম শেলাক প্রস্তুতকারক, এঞ্জেলো ব্রাদার্স কর্তৃক। উহারা নিখুঁতভাবে স্পেসিফিকেশন অনু-যায়ী প্রস্তুত হয়। সমুদয় এঞ্জেলো গ্রেডই আই-এস-আই স্ট্যান্ডার্ড ও এতদ্ব্যতীত কঠোরতর এঞ্জেলো স্পেসিফিকেশন মত। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এঞ্জেলো ব্রাদার্স গুণের সমতা রক্ষা করেন।

এঞ্জেলো ব্রাদার্স লিমিটেড, কাশীপুর, কলিকাতা-২

করছেন। রঞ্জনা ভেতরে আসতেই বললেন,- খোকার মেয়ে হয়েছে।

কথাগুলো সুপ্রভা এমনভাবে বললেন, তাঁর মুখে আনন্দের লেশমাত্র নেই, বরং তাঁকে একটু গম্ভীরতর দেখালো।

—ভালই,—রঞ্জনা বলল। তার মুখে কৌতুকের বাঁকা হাসিও ফুটল। মেয়ে হয়েছে তাতে যেন জব্দ হয়েছে নবনীতা এবং রঞ্জনা মনে মনে আরাম পাচ্ছে। রঞ্জনার বদ্ধমূল ধারণা নবনীতা অন্য বাড়ির মেয়ে বলেই রঞ্জনার বিয়ের জন্য একটু উদ্বেগ নেই। সে তাড়া দেয় না বলেই পাঁচ্যুষেরও এমন ধরি-না-ছুঁই ভাব। বৌদির দুটি মেয়ে হল। দিনের পর দিন তাকে ভেবে মরতে হবে। এখন যেটুকু তার সদিচ্ছার অভাব, সেই শাস্তিটুকু পেতে হবে। ঘরে ফিরে ইস্কুলের কাপড় জামা ছেড়ে বারান্দায় এসে বসল। কুকুরছানাটা আর তাকে ভয় করছে না। তার পায়ের কাছে এসে মাটিতে গড়াগড়ি খেয়ে খেলা করছে। রোদ গাছের তলা থেকে ওপরে উঠে যাচ্ছে। চারিদিকের গাছপালা এবং ঘরবাড়ির ওপর ছায়াচ্ছন্নতা। জামগাছের ডালে একটা পাখি ডাকছে। চেনা সুর। পাখিটাকেও সে দেখতে পেল। একটা হলুদ পাখি।

সন্ধ্যার উদাস পরিবেশে হলুদ পাখিটার মিষ্টি কূজন রঞ্জনাকে অন্যমনস্ক করে তুলল। হলুদ পাখিরা নাকি অভীষ্ট অতিথির খবর নিয়ে আসে। রঞ্জনার হৃদয়ে একজন অতিথির জন্য আসন পাতাই রয়েছে। সে ঋতুর অতিথি নয়, যে আসবে আর চলে যাবে। হলুদ পাখিরা বসন্তে আসে। শীতের কুয়াশা শেষ হলে আকাশ যখন মেঘকে বুকে ডাকে, কৃষ্ণচূড়ার ডালে কুঁড়ির সংবাদ আসে, জামগাছে নতুন পাতা গজায়, সেই গতিশীলতার স্রোতে পাখা মেলে এরা আসে। আবার শীতের বাতাস বইলে চলে যায়। রঞ্জনার মনের শূন্যতা একজন অতিথিকে দিনের পর দিন ডাকছে। তার মন যেন হঠাৎ উধাও হয়ে যেতে লাগলো।

রাত্রে ঘুমের মধ্যে সেই পাখিটার ডাক রঞ্জনা আবার শুনতে পাচ্ছিল। সেটা আদৌ কোনও ডালে বসেছে কি না, তার পারিপার্শ্বিকতা, ডালপালা-মেঘ-আকাশ কিছুই দেখবার প্রয়োজন রইল না। নীলাভ অন্ধকারের মধ্যে জ্যোৎস্নার মত স্নিগ্ধ অপরিসর একটি আলোকবৃত্ত। স্বচ্ছ নয়, সেই পাখিটা ডাকছে সেখানে অশরীরী আরও কিছু রয়েছে যা সে দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু অনুভব করেছিল। শব্দটা পাখির কূজন হলেও তার রঞ্জনার গভীরতর এবং তাৎপর্যপূর্ণ আবেদন। স্বপ্ন এমনই খামখেয়ালি ব্যাপার তাতে যা থাকে সম্পূর্ণ দেখা যাবেই এমন নয়, আর যা না থাকে তারও আভাস ভেসে বেড়াতে পারে। ঘুমের মধ্যে সেই পাখিটাকে মনে হচ্ছিল পাখি নয়। যেন সেটা মানুষ হতে পারত। কারণ, অন্তরঙ্গ মানুষের সংস্পর্শে যে উত্তেজনা ও সুখের আবেশ দেহে সঞ্চারিত হয় তেমনই কোন সংবেদন স্বপ্নকে আনন্দে আপ্লুত করেছিল।

সেই মুহূর্তে সুপ্রভা রঞ্জনাকে ডাকলেন। ঘুমের মধ্যে সে নাকি বিড়বিড় করতে শুরু করেছিল। অতএব নিরেই রঞ্জনার ঘুম ভাঙল। সকালবেলা বারান্দার এককোণে জামগাছটার ছায়া পড়ে। অন্যমনস্কতায় চুপ করে সে এসে বারান্দায় বসল। মাঝ রাতে কুকুরছানাটা যখন মাতায় নিতে কেঁউ কেঁউ করছিল, তার সন্দেহ হয়েছিল চালাঘরের কাছাকাছিতে হয়ত শেয়াল ঘোরাফেরা করছে। ছানাটা তাই ভয় পেয়েছে। মাতার নিতে ছানাটা এখন চেঁচাচ্ছে। ওটার প্রতি সে করুণার্দ্র বলেই রঞ্জনার মনে হল, ঐ ক্ষুদ্র জীবটা দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে শূন্যতার বিরুদ্ধে নালিশ জানাচ্ছে। ওর কেউ নেই। কেউ না থাকার প্রশ্ন এইভাবে তার চিন্তায় উদিত হল, তার নিজের অনেক কেউ রয়েছে, কেবল একজন মাত্র নেই। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সেই একজন ভিন্ন ভিন্ন লোক। হয়ত সেই প্রয়োজন বাস্তব কার্যকারণ থেকে উদ্ভূত হয়, কিন্তু বেঁচে থাকার ঐটাই অন্যতম শর্ত। তার জীবনে সেই একজনের অভাব সে রূঢ় আত্মনিপীড়নে অনুভব করে। ঘুমের মধ্যে সেই অতৃপ্ত উত্তেজনার মধ্যে ভোগ করে সে আরাম পাচ্ছিল। সেই পাখিটা যদিও মানুষ ছিল না, কিন্তু ওটাকেই কেন্দ্র করে মাধুর্য-সচেতনতা তাকে রোমাঞ্চিত করেছিল। জেগে উঠে সেই অনুভব হারিয়ে ফেলেছে। যা হারিয়েছে অলস মনে তাই সে হাতড়ে বেড়াতে লাগল।

সুপ্রভা রান্নাঘর থেকে হাঁক দিয়ে বললেন,—আচ্ছা তাহলে দেরি করে দিই। ইস্কুলে গিয়ে আজ কাজ নেই।

—শনিবার, দুটো ক্লাশ নিলেই ছুটি। কামাই করব কোন দুঃখে?—রঞ্জনা বলল।

কেবল শনিবার বলেই নয়, অনবরত খবর পাঠাচ্ছে অঞ্জলি। সে নাকি খুব অসুস্থ হয়েছে। তার দিক থেকে অস্বাভাবিক কিছু নয়। হাসপাতাল থেকে অঞ্জলি বাড়ি ফিরেছে। মাস ঘুরে গেলেও রঞ্জনা খোঁজ নিতে যায় নি। কেন যায় নি, কিংবা সংকোচ বোধ করছে সেই কথাটাই কেবল তাকে বলতে পারবে না।

অঞ্জলির অবস্থা খারাপ শুনে বন্ধু-মহলে রঞ্জনাই সবার আগে হাসপাতালে ছুটে গেছল। একনাগাড়ে তিন-চার দিন ইস্কুল থেকে ফিরবার পথে রোজ হাসপাতালে অঞ্জলিকে দেখে এসেছে। প্রতিবার অঞ্জলিকে দেখে মনে হতো মেয়ে হয়ে জন্মাবার এইটাই বোধ হয় চরম দুর্ভোগ। লোকে হয়ত বলবে অসাবধান। বিয়ের তিন সাড়ে তিন বছরের মধ্যে দুবার হাসপাতালে যেতে হলে লোকে হয়ত তাই বলে। দু বছর আগে হোক পরে হোক, এই অবস্থা তো একদিন আসবেই, এবং সে ক্ষেত্রেও মেয়েরা কি নিরুপায় অসহায় নয়। অঞ্জলির প্রথমবারে হয়েছিল একটি মরা ছেলে। শরীর সম্পূর্ণ সারবার আগেই এবার হয়েছে একটি মেয়ে। হাসপাতালে অঞ্জলির পাশে কাদার ঢেলার মত নরম শরীর, মুখটা মোমের পুতুলের মত মেয়েটাকে দেখে রঞ্জনার কেন জানি ঘৃণা হতো। যেন একটা শত্রু। মায়ের স্বাস্থ্য শেষ করে, মাকে যমের দুয়ার দেখিয়ে এসেছে।

শেষ যেদিন হাসপাতালে অঞ্জলিকে দেখতে গিয়েছিল, দর্শনার্থীদের দেখবার সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ঐটুকু সময় সে অঞ্জলির কাছে বসেছিল। রীতেন এবং রঞ্জনা এক সঙ্গেই হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছিল। উত্তরবঙ্গের এই ছোট্ট শহরে মিউনিসিপ্যালটির রাস্তায় এখনও টিম টিম করে কেরোসিনের আলো জ্বলে। হাসপাতালের দিকটায় বাড়িঘর কম। নিজের হাতে রেঁধে খাওয়া, তিনবার করে হাসপাতালে ছোটা তার আগেও একটি বছর স্বাস্থ্যহীন স্ত্রীকে নিয়ে দুর্ভোগ, ডাক্তারের বিল মেটাবার ঝক্কি—আর দুঃখের কাহিনী ফেঁদেছিল রীতেন। কেমন যেন হাঁপিয়ে বলছিল রীতেন। অতটা রঞ্জনার বিশ্বাস হচ্ছিল না। সে জানে সংসারের খাটুনি এবং রীতিমত চিকিৎসার অভাবেই অঞ্জলির স্বাস্থ্য এতটা ভেঙেছে। এই স্বাস্থ্য নিয়েই ইস্কুলের মাস্টারি তাকে চালিয়ে যেতে হয়েছে। তবু দুঃসময়ে মানুষকে সমবেদনা জানাতেই হয়। যত কম কথায় সম্ভব সেই কর্তব্য পালন করেছিল রঞ্জনা।

কিছুটা হেঁটে এসে তারা ফাঁকায় পড়েছিল। এদিকটায় বাড়ি-ঘর মোটেই নেই। রীতেনের চলার গতি শ্লথ। হঠাৎ থেমে রঞ্জনার দিকে তাকাল। দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সে। আলো-ছায়ায় তার মুখখানা রঞ্জনা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু তার চাহনির খরতায় ভয় পেয়ে রঞ্জনা বলেছিল,—অন্ধকার হয়ে গেছে, একটু জোরে চলুন।

—কেন তোমার কি ভয় করছে?—কৌতুকের রেশ ছিল রীতেনের কণ্ঠে।

—সেজন্য নয়, মা ভাববে।

—ভাববে কেন? তুমি তো আর কচি খুকি নও।

রঞ্জনা একথায় একটু লজ্জাই পেয়েছিল, জবাব দেয় নি।

রীতেন আবার চলতে শুরু করেছিল। কয়েক কদম নীরবে এসে বলেছিল,—আমি তো ভাবছি তুমি আমাদের বাড়ি হয়ে যাবে।

—আরেক দিন যাব। অঞ্জলি ফিরে আসুক।

—তাতে কি লাভ।

লাভ-লোকসানের প্রশ্ন তলিয়ে ভাববার চেষ্টা না করেই রঞ্জনা জবাব দিয়েছিল,- পরে একদিন যাব।

—আজ বাড়িতে কেউ নেই। আধঘণ্টা দেরি হলে এমন কি হবে?

রীতেনের ইঙ্গিত এবার স্পষ্ট অনুমান করতে পেরেছিল রঞ্জনা। তীক্ষ্মকণ্ঠে জবাব দিয়েছিল—না।

দোষ কি। এমন কত হচ্ছে—

রীতেনের কণ্ঠে নিবিষ্ট আবেশ ঐকান্তিক শুনিয়েছিল, কিন্তু রঞ্জনার স্নায়ুর শিহরণ উঠে মন বড় হয়ে উঠেছিল। তেমনি সে ভয় পেয়েছিল। জবাব দিতে পারে নি।

কয়েক সেকেণ্ড থেমে রীতেন বলেছিল, বিয়ে আর বন্ধুত্বে অনেক তফাৎ রঞ্জনা। বন্ধুত্বের আনন্দ বিয়েতে পাওয়া যায় না। বিয়ে করে আমি ঠকে গেছি।

রঞ্জনা তীব্রকণ্ঠে বলে উঠেছিল,—চুপ করে বাড়ি চলে যান। রাস্তার মাঝখানে চেঁচিয়ে লোক জড় করলে কি সম্মান বাড়বে?

পিছনে অনতিদূরে আরও কয়েকজন লোক আসছিল। হয়ত ভয় পেয়েই সটান জোরে হাঁটতে শুরু করেছিল রীতেন। রঞ্জনা তাকে এড়াবার জন্যই ধীরে ধীরে হাঁটছিল।

সেই থেকে অঞ্জলিকে আর দেখতে যায় নি। কেন এতদিনের মধ্যে একদিন তাকে দেখতেও গেল না, অঞ্জলি নিশ্চয় জানতে চাইবে। কিন্তু সত্য কথা তাকে কোনদিন সে বলতে পারবে না। দাম্পত্য জীবনের পুঁজি যে ঠুনকো বিশ্বাস তা নষ্ট করে দিলে ক্ষতি ছাড়া অঞ্জলির উপকার কিছুই হবে না। তাছাড়া সত্যের বিপরীতধর্ম তার প্রতিক্রিয়া। সেটারও শক্তি কম নয়। কে অপরাধী তার সাক্ষী প্রমাণ কি আছে। কিন্তু তাই বলে অঞ্জলির সঙ্গে বন্ধুত্ব কি সে ছিন্ন করবে। স্কুল এবং কলেজ-জীবনে যাদের কাছে মনের কথা বলে আনন্দ পেতো তাদের সবাই কে কোথায় চলে গেছে। বৎসরান্তেও দেখা হয় না। তারা অসম্ভব বদলে গেছে। কেমন যেন তাকে উপেক্ষা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। একমাত্র অঞ্জলিই কাছে আছে। ইস্কুলে একসঙ্গে মাস্টারি করছে। প্রীতির সম্পর্ক বজায় রেখেছে। প্রশ্নটা তার মনে এইভাবে উপস্থিত হয়েছে, রীতেনের অপরাধ। শাস্তিটা সে এবং অঞ্জলি দুজনে ভাগ করে কেন পাবে। শনিবারে শেষ ঘণ্টায় তার ক্লাশ নেই। মনে মনে স্থির করেছে সে যাবে এবং কম কথায় কর্তব্য সেরে রীতেন কোর্ট থেকে ফিরবার আগেই চলে আসবে।

বাড়ি থাকলে আজকেও হয়ত যাওয়া হবে না, কারণ মার অনুমতি নিয়ে যেতে হবে। তিনি হয়ত বলবেন, আরেক দিন যাস। ইস্কুলে গেলে সে বালাই নেই। ফিরতে দেরি হবার কৈফিয়ৎ টিচারদের মিটিং হল কিংবা যা হোক একটা দিলেই চলবে। অঞ্জলির সঙ্গে সে বেশি মেলামেশা করে তার মা এক সময় তাও পছন্দ করতেন না। অঞ্জলি প্রেম করে রীতেনকে বিয়ে করেছে। লোকের কাছে নাক সিঁটকে বলতেন—কি বদ মেয়ে রে বাপ মুখ দেখে মনে হয় ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না। পেটে পেটে এত বিদ্যা।—হালে অবশ্য এক-আধবার তার প্রশংসাও করেন।
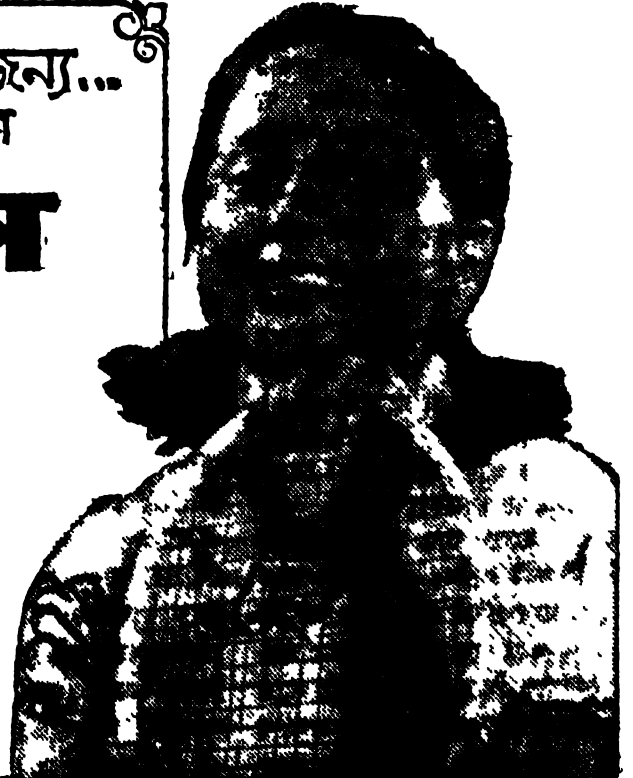
বলেন, বুদ্ধিমতী মেয়ে। বাপ-মা'র কাঁধে বোঝা হয়ে চাপে নি। রঞ্জনা বুঝতে পারে এই প্রশংসা তার প্রতি কটাক্ষ। অর্থাৎ ঐ পথে সেও যদি দায় থেকে মুক্তি দেয়।

বাসি কাপড় ছেড়ে রান্না করতে গেল সে। কাজ করতে করতে এক সময় তার ইচ্ছে হয়েছিল মাকে শুনিয়ে দেয়, বুদ্ধিমতী মেয়ের ঐ ভাগ্য। যারা প্রেম করে বিয়ের সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে অস্থির সেটা তাদের সংযমের অভাব। অপরিণত বুদ্ধিতে নিজের মনকেও সব সময় তারা দেখতে পায় না। অপরকে চেনা আরও শক্ত। ওতে মা-বাবার সমস্যা মিটলেও আর কতকগুলি অশান্তি পোহাতে হয়।

শনিবার প্রথম ও তৃতীয় পিরিয়ডে রঞ্জনার ক্লাশ। দ্বিতীয় পিরিয়ডে কমন রুমে মেয়েদের খাতা দেখতে বসে এক ফাঁকে স্বপ্নের সেই হলুদ পাখিটা এবং সেই আবেগ জেগে উঠেছিল। তার বুদ্ধি-গত বিশ্বাস বলে উঠেছিল, হলুদ পাখিরা স্বপ্নের মধ্যেও মানুষ হতে পারতো না। আর হলুদ পাখি না হয়ে সেটা যদি মানুষ হতো, স্বপ্নের ছায়া মানুষ রক্ত-মাংসে সম্পূর্ণ বাস্তব মানুষের প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না। ঘুমের মধ্যে তার দেহে যে আবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল দেহপ্রান্তে তাই ক্ষুধা উন্মেষিত করে—অসহনীয় শূন্যতায় যে কোনদিকে তাকে ঠেলে পাঠাতে উদ্বেলিত। সেই মানসিকতা কেবল নিজেকে নিয়ে সম্পূর্ণ নয়; একজন সঙ্গী খুঁজছিল এবং রঞ্জিতেনের কথা তার মনে পড়ল। হাসপাতালের রাস্তায় রঞ্জিতেনের অশোভন ইঙ্গিত সেদিন যা আত্মমর্যাদা আহত করেছিল, সেইটাই সম্ভাবনাময় প্রতীয়মান হল। রঞ্জিতেনকে এড়িয়ে অঞ্জলিকে দেখে আসবার অভিপ্রায় সে বাতিল করে দিলে। ভাবল স্কুল ছুটি পর্যন্ত কমনরুমে বসে মেয়েদের খাতা দেখে কাটাবে। দেরি করে গেলেই রঞ্জিতেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। হাসপাতালের রাস্তায় যেখানে ছেদ পড়েছে সেই ভাঙা জুড়তে হবে।

তৃতীয় পিরিয়ডে ক্লাশে পড়াতে পড়াতে রঞ্জনা ভীষণ রেগে গেল। ফোর্থ বেঞ্চের তিনবার ফেলকরা মেয়েটা, এক কুড়ি বয়স হয়েছে তার, মুখ নিচু করে একটা টিপ্পনী কাটল। রঞ্জনার মনে হল যেন তার প্রতিই এই কথাগুলো সে প্রয়োগ করেছে। সে বুঝতে পারছিল, পড়া বোঝাতে গিয়ে সামান্য একটা সূত্রে নারী-পুরুষের সম্পর্কের দিক সম্বন্ধে বলতে শুরু করে, কেমন যেন তার একটু আতিশয্য এসে যাচ্ছিল। সে অশোভন কিছু বলেছে তাও নয়। কোথা থেকে ক্ষোভের তাত লেগেছিল তার মনে। সে বলছিল, সমাজ চিরকাল মেয়েদের ওপর উৎপীড়ন করেছে। ঐশ্বর্য, চিন্তার ব্যাপ্তি আরও অনেক কিছু স্বাধীনভাবে উপভোগ করবার অধিকার তাদের দেয় নি, এবং সমাজ বলতেই পুরুষ। সেই ধুমসি মেয়েটা হাই বেঞ্চের নিচে মুখ লুকিয়ে ফোড়ন কেটে উঠল,—আহা-হা, মেয়েরা কত ধোওয়া তুলসীপাতা।

রঞ্জনার রাগ হল তার বক্তব্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করায়, শাণিত দৃষ্টিতে হুকুম করল,—কে কথা বলেছ, উঠে দাঁড়াও।

কেউ উঠল না। সেই ধুমসি মেয়েটাকে নির্দেশ করে রঞ্জনা বলল,—উঠে দাঁড়াও।

—আমি তো কিছুই করি নি দিদিমণি,—দাঁড়িয়ে উঠে গোবেচারির মত বললে মেয়েটি।

—তুমিই বলেছ,—জোর দিয়ে বলল রঞ্জনা। পাশের মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল,—কি বলেছে বন্দনা?

সেই মেয়েটি কাচুমাচু খেয়ে বললে,—কে কথা বলেছে আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।

রঞ্জনা আর যাচাই করল না। বেঞ্চির সব ক'টা মেয়েকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আরও সতর্ক সংযমে অধীত বিষয়ে ফিরে এল সে। ঘন্টা পড়বার আর বেশি দেরি ছিল না। ক্লাশ থেকে যখন অফিস ঘরে এল, সেই মেয়েটির কথার প্রতিধ্বনি তখনও তার মনে শেষ হয় নি। ফেল-নবীশ মেয়েটা যেন ব্যক্তিগতভাবে তাকে ঐ কথাগুলো প্রয়োগ করেছে। সেই ক্ষোভ তাকে আত্মজিজ্ঞাসার মোড়ে এনে দাঁড় করালো। রঞ্জিতেনকে কেন্দ্র করে অসংগত অভিপ্রায় বিবেকের টিপ্পনী থেকে অব্যাহত পেল না।

শেষ ঘন্টায় যখন তার ক্লাশ ছিল না অঞ্জলিদের বাড়ির উদ্দেশ্যে সে বের হয়ে যেতে পারত। কিন্তু গেল না। রঞ্জিতেন কোর্ট থেকে ফিরবে এই আশায় কমনরুমে সে বসে আছে তাও নয়। কেমন যেন মানসিক আচ্ছন্নতার মধ্যে সে পড়ে গেছে। কি করবে সমস্তই এলোমেলো। তার জীবনের শূন্য যেদিকটা অন্ধকারের মত সেই স্তব্ধতা থেকে যেদিকে সে এগুতে চেয়েছিল, প্রকৃতির হাতে মার খাবার আশঙ্কা তাতে ছিলই, এখন সেখানে গ্লানি চুঁইয়ে আসছে। ভবিষ্যতের দিকে তাকাবার এই মুহূর্তে তার কোন সম্বল নেই, অস্থির ভাবনা তাই অতীতের মধ্যে প্রবেশ করছে। অতীতের ঘটনাবলী স্মৃতি থেকে টেনে বের করে পূর্ণতা অপূর্ণতার হিসাব কষতে লাগলো রঞ্জনা। সেই সূত্রে সুধাময়ের কথা তার মনে পড়ল। কলেজের রাস্তার চৌমাথায় একটা বইয়ের দোকানে বসে বেকার সুধাময় সময় কাটাতো। রঞ্জনার সহপাঠিনীদের অনেকের কাছেই সে চেনা। কোন মেয়েকে একা যেতে দেখলে পিছু পিছু ধাওয়া করাই ছিল তার স্বভাব। একাধিকবার রঞ্জনাকেও সে অনু-সরণ করেছে। বাঁকা করে সিগারেট ধরিয়ে আড় চোখে হেসে কিংবা পিছন থেকে সাইকেলে এসে এক রাশ ধোঁয়া মুখের ওপর ছেড়ে বোঁ করে পালিয়ে গেছে। প্রত্যেকটি মেয়ে ওকে ঘৃণা করতো। ওর নাম মুখে আনতে নাক সিঁটকাতো। তাদের সুরে সুর মিলিয়ে রঞ্জনাও তাই করেছে। অথচ তার গোপন মনের কোণে সুধাময়কে কেন্দ্র করে আকুলতা সে অনুভব করত। কোন এক সময় থেকে সুধাময়কে আর রাস্তায় দেখা যেতো না। অঞ্জলি বলেছিল, আমলাপাড়ার কোন মেয়েকে নাকি চিঠি লিখেছিল, কিন্তু ধোলাই খেয়েছে। সেখান থেকেই সুধা-ময়ের জীবনের মোড় ঘুরেছে। এখন সে দুর্গাপুরে কাজ করে। বিয়ে করেছে। সমাজে সজ্জন, ভদ্রলোক। সুধাময়কে দিয়ে তার কোন প্রয়োজন নেই। তার যৌবন-কল্পনা থেকে অনেককাল আগেই সে হারিয়ে গেছে। তার কথা আকস্মিক-ভাবে জেগে উঠলো এবং রঞ্জনা অনুভব করল, সুধাময়কে ঘিরে সেদিনকার যৌবন-আকুলতা, হলুদ পাখিটার অনু-প্রেরণা এবং রঞ্জিতেনের আকর্ষণ, এই তিনের অন্তর্নিহিত লক্ষ্য এক। অথচ এর মধ্যে এমন কিছু অভাব থেকে যাচ্ছে, যার জন্য আর পাঁচজনের চোখে হেয় হতে হবে এবং নিজের বিচারবুদ্ধিও নিজেকে অপরাধী করছে।

ছুটির ঘন্টা বাজবার আগেই রঞ্জনা রাস্তায় চলে এল। মাথার ওপর দুপুরের রোদ্দুর। মন উদ্যমহীন। যেন সে খুব ক্লান্ত। হেঁটে চলতে শরীরটা বোঝার মত ঠেকছে। একখানা খালি রিক্‌শা পেয়ে উঠে বসল। কোথায় যাবে বলতে গিয়ে অঞ্জলির বাড়ি যাবার প্রসঙ্গ নির্দ্বিধায় বাতিল করে নিজের বাড়ির ঠিকানা বলল।

গেটে এসে নামতেই কুকুরছানাটা ছুটে এসে তার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। এই ছোট্ট কৃতজ্ঞতায় তার চিন্তার আবদ্ধ স্রোত ভালবাসার আরেক পথ দিয়ে নির্গত হয়ে স্নিগ্ধ খুশিতে মন

ঝলমল করে উঠল। নেড়ির ছানাটাকে আদর করতে ইচ্ছে হল তার। নুয়ে বাচ্চাটার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

সোজা হয়ে দাঁড়াতেই নজর পড়ল আমগাছটার সেই ডালটায় যেখানে বসে হলদে পাখিটা সেদিন ডাকছিল। নতুন পাতার সবুজের উচ্ছ্বাস। পাখিটা নেই। হলদে পাখিরা ঋতুর অতিথি। ওরা আসে, চলে যায়। ওরা নাকি নতুন অতিথিকে আহ্বান জানায়। নন্দরাণীর হৃদয়ের দ্বার একজন অতিথির জন্য খোলাই রয়েছে। আলো না জ্বাললে সেই অতিথিকে কোথায় সে আহ্বান জানাবে!

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ঠাকুর্দা যেমন প্রজাবৎসল ছিলেন তারাও তেমনি তাঁকে ঠিক দেবতার মত পূজো করত। এত ভক্তি বিশ্বাস ছিল যে, ঠাকুর্দার নামে তারা বীজ রোপণ করত। শুনেছিলাম বালক বয়সে সঙ্গীদের সঙ্গে খেলতে খেলতে একবার একটি আমবাগানে আম পাড়তে গিয়ে দেখেন নানা গাছে নানারকম আম ফলে আছে। দেখে নাকি সঙ্গীদের বলেন—'দেখ্ ঈশ্বর বেটার কি স্মরণশক্তি রে। গেল বছর যে গাছে যে নমুনার আম ঝুলাইয়াছিলেন এ বছরও ঠিক ওই গাছে ওই নমুনার আম ঝুলাইয়াছেন?' ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার জন্য তাঁকে বহুপ্রকার উৎপীড়নের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। ব্রহ্মধর্ম ছিল তাঁর প্রাণ এবং ব্রহ্মনাম ছিল তাঁর সাধনার মন্ত্র। একদিকে যেমন এই ধর্মপ্রচারকল্পে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত তিনি গ্রামে গ্রামে দলবল নিয়ে নগর সংকীর্তন করে বেড়াতেন, দূর-দূরান্তরে চলে যেতেন পায়ে হেঁটে। অন্যদিকে আবার সকলের সঙ্গে একসঙ্গে বসে ঠাট্টা-তামাসা রঙ্গ-রসিকতা সবই খুব করতেন। একবার একটি নিমন্ত্রণসভায় ঠাকুর্দাও ছিলেন। বেগুনভাজা পাতে দিতে তিনি নাকি বলে উঠেন, 'বাইগুন-গুলার তো দেখি বড় বীচি।'—শুনে এক ভদ্রলোক তাঁকে সংশোধন করে বলেন—'রায়মশায়ের (ঠাকুর্দাকে সকলে 'রায়মশায়' বলত কেন না ওঁদের জমিদারী উপাধি ছিল 'রায়') আর বাঙাল কথা গেল না। বেগুন বললে যত মিষ্টি শোনায় বাইগুন বললে কি তা হয়?' ঠাকুর্দা হেসে উত্তর দিলেন—'মিষ্টি শোনানই যদি উদ্দেশ্য তবে বেগুন কেন প্রাণনাথ বললে ত' আরো মিষ্টি শোনায়।'—ঠাকুর্দা যতদিন বেঁচে ছিলেন প্রতি বছরই আমাকে নিয়ে একবার তাঁর কাছে ঢাকায় যেতেন। তাঁকে খুব ভালো মনে নেই। যখন তিনি মারা যান আমি তখন খুব ছোট। শুনেছি আমাদের বাবার যখন অকালে মৃত্যু হয় তখন ঠাকুর্দা তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্রের মৃতদেহের সামনে অবিচলিত শান্তচিত্তে দাঁড়িয়ে করজোড়ে বলেছিলেন—'হে ভগবান, তুমি যে দয়া করিয়া আমার স্নেহের ধনকে রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিলে এজন্য কৃতজ্ঞতাভরে তোমাকে প্রণাম করিতেছি।' বন্ধু-বান্ধব যাঁরা ভাবিত হয়েছিলেন এতবড় পুত্রশোক তিনি কেমন করে সহ্য করবেন ইত্যাদি, তাঁরা তাঁর ওই ভাব দেখে বুঝেছিলেন সত্যই তিনি ভগবানের পথে কতটা অগ্রসর হয়েছেন। পিসিমাদের কাছে আরেকটা গল্প শুনেছিলাম। এতই ভালো লেগেছিল! এই গল্পটির মধ্যে তাঁর কি সুন্দর নম্র অমায়িক দিকটি ফুটে উঠেছে। ঠাকুর্দা নাকি একবার কৃষ্ণনগরে যাচ্ছিলেন আমাদের জ্যাঠামশায়ের কাছে। ট্রেনের কামরায় বন্ধুসহ একটি ভদ্রলোক বসেছিলেন তাঁরাও কৃষ্ণনগর যাচ্ছিলেন। ভৃত্যের সঙ্গে আমাদের ঠাকুর্দাকে কথা বলতে শুনে বুঝতে পারলেন যে ঠাকুর্দা বাঙাল, তখন ভদ্রলোকটি তাঁর বন্ধুকে বললেন যে একটি বাঙাল পাওয়া গেছে, সমস্ত পথ বেশ আমোদে কাটানো যাবে। ভদ্রলোকটি ঠাকুর্দাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কোথায় যাবেন? ঠাকুর্দা—কৃষ্ণনগর যাইতেছি—। প্রশ্ন—কেন কৃষ্ণনগর যাচ্ছেন? উত্তর—আমার পোলার কাছে যাইতেছি। প্রশ্ন—আপনার পোলা কি করেন? উত্তর—কালেক্টরিতে কাজ করেন। প্রশ্ন—নাম কি? উত্তর—কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত। প্রশ্ন—মশায় আমরা ত' কালেক্টরের কাছারীতে ঐ নামে কাউকে জানি না। উত্তর—না, মানবে তারে কে, জি গুপ্ত কয়। তখন ভদ্রলোকটি ঠাকুর্দার সামান্য কয়টি কথায় তাঁর পরিচয় পেয়ে অনুতপ্ত হয়ে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এবং স্টেশনে যখন কালেক্টর সাহেবের গাড়ি ও চাপরাশী আসে তখন ঠাকুর্দাকে গিয়ে সানুনয় অনুরোধ করেন যে, আমার বাড়ি পদধূলি না দিয়ে আপনি কিছুতেই যেতে পারবেন না। ঠাকুর্দার স্বভাবই এমনি শিশুর মত সরল ছিল। তাঁর বিষয় কিছু লিখব ভেবে লিখি নি লিখতে লিখতে আপনি কেমন ওই দিকে চলে গেল লেখার ধারা। ঠাকুর্দার বিষয় শুধু একটু ছুঁয়ে যেতে পারলাম, কেন না দু'-চার কথায় তাঁর মত ঋষিতুল্য জীবনের কিছুই বলা হয় না, বলা যায়ও না। তাঁর জীবন ছিল একটি জীবনের মত জীবন। তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি ছিলেন সাধক, ভগবতপ্রেমিক। তাঁর ধর্ম ছিল ভগবানের ধ্যান কর্ম ছিল ভগবানের নাম, রূপ ছিল ভগবানে ভক্তি। আমাদের বংশ পরিচয়—

পিতামহ, ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত। দেশ ঢাকা, গ্রাম ভাটপাড়া।

পিতামহী, অন্নদাসুন্দরী দেবী।

জ্যাঠামশায়, স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত (স্যার কে, জি, গুপ্ত) আই, সি, এস্।

পিতৃদেব, ডাক্তার প্যারীমোহন গুপ্ত সিভিল সার্জন।

বড়কাকা, গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট।

ছোটকাকা, বিনয়চন্দ্র গুপ্ত, শিল্পী।

বড় পিসিমা, হেমন্তশশী, ডাক্তার রামপ্রসাদ সেনের পত্নী (অতুলপ্রসাদ সেনের জননী)।

মেজ পিসিমা, চপলা, প্রফেসর শশিভূষণ দত্তের পত্নী।

সেজ পিসিমা, সৌদামিনী, জগৎমোহন

দাসের প্রথমা পত্নী (চারুচন্দ্র দাস ব্যারিস্টারের জননী)।

ধন পিসিমা সরলা, জগৎমোহন দাসের দ্বিতীয়া পত্নী (সত্যজিৎ রায়ের মাতামহী)

সোনা পিসিমা, বিমলা সত্যরঞ্জন দাসের (ব্যারিস্টার ও Empire of India Life Assurance Co. প্রতিষ্ঠাতা)-র পত্নী।

ছোট পিসিমা, সুবালা, বিখ্যাত ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের পত্নী—(ডাক্তার অজয়কৃষ্ণ আচার্য, গাইনকলজিস্ট, ও বিজয়কৃষ্ণ আচার্য আই, সি, এস এঁদের জননী)

বহুদিন বাদে ১৯২০ সালের নভেম্বরে আরেকবার এই কাওরাইদে আসি। দাদা বিলাত থেকে ফিরে এলে দাদার বিয়ে মা এইখান থেকেই দেন। সেবার যা আনন্দ করেছিলাম। তাতাবাবা (সুকুমার রায) সব অনেকে গিয়েছিলেন, হাসিযে হাসিযে মারতেন সবাইকে। ফিরে এলে মামাবাবু মামিমা নিজের পুত্রবধূকে যেমন দিয়েছিলেন আমাদের দাদার বৌকেও সেরকম হীরের নেকলেশ ব্রেসলেট দিযে আশীর্বাদ করলেন।

১৯১৩ সালের ১৪ই মে, মামাবাবু পিতৃঋণ শোধ করে স্বনামধন্য হলেন। মা তখন আমাদের দুই বোন ও দাদাকে নিয়ে ল্যান্সডাউন রোডের একটি বাড়িতে ছিলেন। ঋণমুক্ত হয়ে মামাবাবু মামিমাকে সঙ্গে নিয়ে মায়ের কাছে এলেন। তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে। এসে মাকে প্রণাম করলেন। ভাই-বোনের সেদিনের এই মিলনে ফুটে উঠেছিল যে জিনিস যে চিত্র, তা সেদিন যেমন ছিল আজও তেমনি রইল সকল কথার অতীত হয়ে। দিদিমা দাদাবাবু বেঁচে থাকতেই মামাবাবু পিতৃঋণ পরিশোধ করেন।

সনাতন হিন্দুধর্মেই ছিল মামাবাবুর প্রকৃত আস্থা। তাঁর পিতা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করাতে তাঁকে ব্রাহ্মসমাজে থাকতে হলেও আসলে মনে প্রাণে তিনি ছিলেন একটি সত্যকারের হিন্দু। হিন্দুধর্মের যেটি প্রাণ সেইটি তিনি বুঝেছিলেন, উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তার ডালপালাকে আশ্রয় না করে একেবারে মূলকেই আশ্রয় করেছিলেন। প্রকাশ্যে যখন নিজেকে হিন্দু বলতে আরম্ভ করেন তখন ব্রাহ্মসমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ কেউ একজন তাঁকে এসে বলেন, 'তুমি তাহলে তোমার পিতার ধর্ম রাখলে না।' উত্তরে মামাবাবু বলেন, 'পিতার ধর্ম রাখাই যদি পুত্রের ধর্ম হয় তবে আমার পিতা কখনো তাঁর পিতার ধর্ম পরিত্যাগ করতেন না।' মামাবাবুর বড় মেয়ে মোনার বিয়ে যখন হিন্দুমতে দেবেন স্থির করেন, তখন চারিদিক কালো করে তার নিন্দা অপবাদের তুমুল ঝড় ওঠে। বিপক্ষদলেরা সব দলবেঁধে লেগে গেলেন বিরোধিতা করতে। হিন্দুসমাজের গোঁড়া মতাবলম্বী যাঁরা তাঁরা এই অসবর্ণ বিবাহ নিয়ে যত পারলেন বিষ ছড়াতে ছাড়লেন না। আর ব্রাহ্মসমাজের সমাজপতিরা উঠে দাঁড়ালেন ন্যায়, অন্যায়, উচিত, অনুচিত, বিচারে তাঁদের রায় দিতে। সেসব একটা ব্যাপার। কি তিক্ততারই যে সৃষ্টি হয়েছিল। মামাবাবু ভয়ে পিছু হটবার পাত্র নন। যা করতে চাইতেন তা নির্ভয়েই করতেন। তাই এতসব বাধা-বিঘ্নের সম্মুখে ঘোর বিরোধিতার উঁচিয়ে থাকা খাঁড়ার নিচে মহাসমারোহে মেয়ের বিয়ে দিলেন শালগ্রামশিলার সামনে হিন্দুশাস্ত্র মতে। মোনার বিয়েতে কি বাড়িই সাজানো হয়েছিল। ও বাড়ির কারো বিয়েতেই আর অমন হয় নি। বরফের উঁচু উঁচু পাহাড়—কি সুন্দর লাগছিল। খরচের আদি অন্ত ছিল না। হিসেবের কথা মনে হবার মতন কথাই যেন নয়। খরচের স্রোতে গা ভাসিয়ে আমরা ভেসে চলেছিলাম আনন্দের হিল্লোল তুলে।

কোনও রকম গোঁড়ামি দেখেছি মামাবাবু একেবারেই পছন্দ করতেন না। আমাদের দেশের জাতিভেদ প্রথার উনি দারুণ বিপক্ষে ছিলেন। বিশেষ করে নিম্নশ্রেণীর নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতিকে সমাজে যা করে একঘরে কোণঠাসা করে
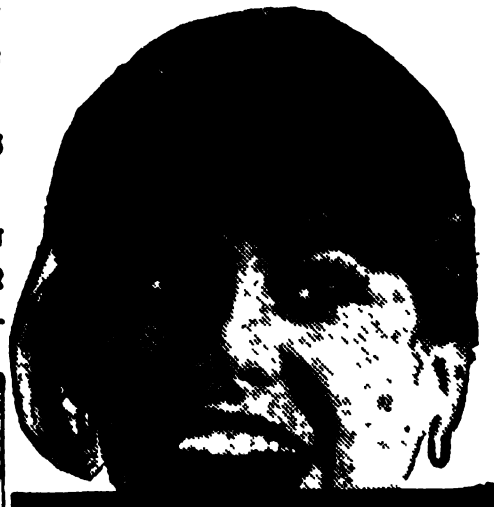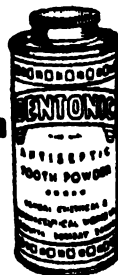
স্নাথা হয়েছে তা তাঁর বুকে কাঁটার মতন বিঁধত। মানুষের প্রতি মানুষের এই মনোভাব, এই অবিচার কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। মন তাঁর বিদ্রোহ করে বসত, প্রতিকারের জন্যে ব্যাকুল হত, উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠত। জাতিগত অধিকারে তাদের মধ্যে কেউ উচ্চ কেউ নিচ, কেউ নমস্য কেউ অস্পৃশ্য—শ্রেণী-বিভাগের এই পার্থক্যকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। বলতেন—মনুষ্যত্বের এতবড় অপমান ভাবা যায় না। তাই, ঠিক করে থেকে কোথা থেকে, কেন, কি কারণে এই জাতিভেদের উদ্ভব, সূচনা, তাই খুঁজে বার করার জন্যে তাঁর পরিশ্রম ও চেষ্টার শেষ ছিল না। এই সব পতিত অস্পৃশ্য পদানত জাতিদের কি করে উদ্ধার করা যায় তোলা যায়, এ যেন তাঁর একটা ব্রতর মত ছিল। তাদের জন্যে তাঁর প্রাণ কত যে কাঁদত, কতই কাতর হত সে আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। তাছাড়া গ্রামের গরীব চাষীসম্প্রদায় যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে আমাদের অন্ন যোগায় তাদের নিজেদের যে দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোটে না, অঙ্গের বস্ত্র জোটে না এ জন্যও তাঁর দুঃখের সীমা ছিল না। কিভাবে কেমন করে এদের অভাব মোচন করা যায় মনুষ্যসমাজে এরা মানুষের মত মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে পারে এই সমস্যার সমাধান নিয়ে তাঁকে ভেবে আকুল হতে দেখেছি। এই সম্বন্ধে যখন কারো সঙ্গে আলোচনা করতেন দেখতাম অশ্রু-সজল হয়ে উঠত গভীর চোখ দুটি। মনে হত যারা শুনছে তাদেরও চোখ জলে ভরে আসত। তাই ভাবি এমন করে দুঃখীর দুঃখ কজনের বা বুকে বাজে কজন পারে পরের দুঃখ এতখানি অনুভব করতে। বলতেন 'আমি যদি মরি, তবে চণ্ডালের ঘরে জন্মগ্রহণ করব, ছোট জাতকে তুলব বড় করব।' আজ মনে পড়ছে তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে গাওয়া রাম-কমলের গানের এই লাইনটি—

শতকোটির বিনিময়ে মিলবে কি
সে প্রাণ—

কোনও জিনিস কিনবার সময় আমরা দর-দস্তুর করছি দেখলে ভারি অপছন্দের সুরে বলতেন, 'গরীবের দু'-চার আনা পয়সা মেরে তোদের কি এত লাভ!' —এই ছিল তাঁর মনোভাব। এইভাবে ছোটখাটো জিনিসে ধরা পড়ত এইসব শ্রেণীর লোকেদের প্রতি কতখানি অনু-কম্পা কতখানি দরদেভরা সহানুভূতি থাকত তাঁর অন্তরটি জুড়ে। প্রকাশ হয়ে পড়ত তাদের সম্বন্ধে তাঁর মনের অনেক কথা, মনের গহনে কোথায় রয়েছে কোন্ ক্ষত, কোন্ ব্যথা। 'দরিদ্র নারায়ণ', দরিদ্রসেবা 'নারায়ণ সেবা'—এই আমরা শুনতাম তাঁর মুখে। দিদিমা দাদাবাবুর শ্রাদ্ধে মামাবাবু দরিদ্রসেবার আয়োজন করেছিলেন। কাঙালী ভোজন হয়েছিল। এতবড় কাঙালী ভোজনের ব্যাপার আগে আর দেখি নি। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ছিল খাবার আয়োজন। দিদিমার শ্রাদ্ধ হয়েছিল পুরুলিয়ার বাড়িতে, দাদাবাবুর কলকাতায় রসা রোডের বাড়িতে। মনে হচ্ছে চোখে দেখছি যেন সেই দৃশ্য—সেই দলে দলে ভিখারীদের ক্রমাগত যাওয়া আসা। যে যত পারছে খাচ্ছে এবং বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। দাদাবাবুর শ্রাদ্ধে প্রত্যেককে ল্যাংড়া আম দেওয়া হয়েছিল আমরা পরিবেশন করেছিলাম যে যত চাইছে তত দিয়েছি। মামাবাবু নিজে ঘুরে ঘুরে ভোজনরত কাঙালীদের দেখে বেড়াচ্ছিলেন। দরিদ্রসেবার মহানন্দে তাঁর মুখ সেদিন উদ্ভাসিত দেখেছিলাম। আজ ভাবি বাল্যকাল থেকে কাছে ছিলাম বলে কত ছোটখাটো দৈনন্দিন ব্যাপারের মধ্য দিয়ে তাঁর কত দিক এবং কতদিক থেকে তাঁকে দেখবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। চিনেছিলাম কতটুকু তা জানি না। শুধু আজও তাঁর কথা ভাবতে আজো মন ভরে ওঠে, অন্তরে জমা হয় কি এক অনুভূতি যেন। যখন থেকে তাঁকে দেখছি সেই যখন ছোট্টটি ছিলাম, তখন থেকেই তাঁর হাসিতে দৃষ্টিতে মনে হত কি যেন আছে কি যেন পেতাম কি যেন দেখতাম। তাঁদের সংসারে যখন এলাম—তখন তিনি চলেছেন অজানের কঠিন অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে, তখনই প্রথম দেখি তাঁর মুখে সেই হাসি চোখে সেই চাহনি—অফুরন্ত সে অনুভূতি আজো স্পষ্ট রয়েছে তার স্মৃতি। তারপর যখন উঠলেন ধন মান ও যশের উচ্চ শিখরে, তখনো দেখেছি সেই হাসিই সেই চাহনিই। আবার যখন সর্বত্যাগী হয়ে ভিক্ষার ঝুলি হাতে ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে দেশে গ্রামে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তখনো দেখেছি একই হাসি, একই দৃষ্টি। কোনও অবস্থায় তার ব্যতিক্রম দেখি নি। কি সে জিনিস বুঝি নি, মন সেদিক দিয়ে যায়ও নি, শুধু এইটুকুমাত্র বুঝতে পেরেছিলাম যে তা এমন কিছু যা জীবনে ভোলা যায় না, যার স্পর্শ লেগে থাকে, ছেয়ে থাকে অন্তর। যেদিন সেই হাসি, সেই দৃষ্টি চিরতরে নিভে গেল সেদিন মনে হয়েছিল অন্ধকার পৃথিবী, মনে হয়েছিল পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল—দাঁড়াবার কিছু পাচ্ছি না—এরপরে বেঁচে থাকবার অসুবিধা রইল না ওই হাসি ওই দৃষ্টির মধ্যে কি ছিল, কোন্ জিনিস আমাকে ঘিরে থাকত ঘিরে রাখত।

ভাঙার দিকে যেমন গড়ার দিকেও তেমন নিজের অক্লান্ত কর্মক্ষমতাকে মামাবাবু ঢেলে দিয়েছিলেন। দেশের মঙ্গল, তার উন্নতি করতে হলে আগে চাই পল্লী-জীবনের আমূল সংস্কার, চাই অর্ধমৃতপ্রাণ গ্রাম জীবনটিকে পুনরুজ্জীবিত করে প্রাণধর্মী করে তোলা। তিনি বলতেন দেশের প্রাণ এরাই, এরা জাগলে দেশ জাগবে। দেখতাম পদানত জাতির মুমূর্ষু প্রাণকে সচেতন করে মামাবাবু তাঁর প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও প্রাণশক্তির দ্বারা মানুষের মত বাঁচতে পারার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতেন। চোখে জ্বলে উঠত জ্যোতি কণ্ঠে ধ্বনিত হত ডাকার মত জাগ্রত পারার প্রাণঢালা সেই সুর আহ্বান করে যখন বলতেন ওঠো তোমরা তোমাদের পায়েই ত' রয়েছে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াবার শক্তি, তোমরা আপনাকে জাগাও—

—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্
নিবোধত'—

বিবেকানন্দের মত তাঁর কণ্ঠেও বারবার এই বাণী উত্থিত হচ্ছে সাধা-রণের মাঝে উপাসনের অন্তর শক্তি জাগরিত করে সঞ্চারিত করে। আশ্চর্য ছিল তাঁর বলবার ক্ষমতা আর অসাধারণ ছিল তার আকর্ষণী শক্তি।

মামাবাবু শুধু কর্মীই ছিলেন না। কবি এবং সাহিত্যিক দুই-ই ছিলেন। কাব্যসাহিত্যে প্রগাঢ় অনুরাগের যথেষ্ট পরিচয় তিনি দিয়েছেন। তাঁর মুখে শুনেছি শৈশব থেকেই তিনি কবিতা লিখতেন এবং অতি অল্প বয়সেই সাহিত্যচর্চা সুরু করেন। এ দুটি জিনিস তাঁর বড় প্রিয় ছিল। তবে বড় সাধের এই সাহিত্য-সাধনা তাঁর ইচ্ছামত তিনি করতে পারেন নি। কেন না তা' করতে হলে যে অবকাশের দরকার তা তাঁর জীবনে কতটুকুই বা মিলেছিল! তবু সাহিত্যসেবা তিনি কোনওদিনই একেবারে ছাড়েন নি। [ক্রমশঃ]

[illegible] দেখতে [illegible]
পড়ছিল কলকাতার কথা, সেই-যে সেই হাবাগোবা লোকটি! শহরে এসেছে অনেক আশাভরসা নিয়ে। হাতীবাগানে হাতী দেখবে, বউবাজারে সের দরে বউ কিনবে, টালিগঞ্জে দেখবে টালির স্তূপ আর বালিগঞ্জে কেবলই বালি কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে সরষেফুল দেখতে হোল! আমার অবস্থাটাও হয়েছিল অনেকটা তারই মত। দু পাশে ছোট-বড় কয়েকটা দোকানঘর আর মাঝখানে একচিলতে পায়েচলা পথ, শেষপ্রান্তে কিছু লোক দাঁড়িয়ে জটলা করছে, এটাই নাকি আমতা বন্দর! বন্যার জল চারদিকে থৈ থৈ করছে, কিন্তু জাহাজ তো দূরের কথা, একটা বড় নৌকাও নেই কোথাও, কেবল দুটা পানসি ঘোলাটে ঢেউ-এর মাথায় নাচছে। এপার-ওপার হচ্ছে মানুষগুলো। বন্দরের ডাকে নয়, বন্যার তাড়ায়!

এমন হাঁড়ির হাল আমতা বন্দরের কিন্তু আগে ছিল না। তখন জাহাজ না ভিড়ুক বড় বড় বজরা আর নৌকা এসে নোঙর ফেলত। অবিভক্ত বাংলার এ কোণ ও কোণ থেকে আসত অসংখ্য লোক, ব্যবসা করতে, চাকরি খুঁজতে, ঠকতে ঠকাতে। তাদের সোরগোলে গম গম করত বন্দর-এলাকা। মাত্র আশী নব্বুই বছর আগের কথা বলছি। এখনও আমতার এ গ্রাম, ও গ্রাম ঘুরলে দু একজন বুড়ো-মানুষের সন্ধান পাওয়া যাবে, যাঁরা বন্দরের সেকাল একাল, দু কালের খবরই রাখেন।১

এ বন্দর আসলে অনেক পুরনো। কবে এর পত্তন হোল তা মনে পড়ছে না। তবে এটা ঠিক যে এখানে যখন পুরোদমে ব্যবসা বাণিজ্য চলছিল তখন বাংলাদেশে ইংরেজরা সাবধানে চলাফেরা করছে, নবাবের ভয় আর দেশওয়ালী ভাই-দের তাড়ায় তারা ব্যতিব্যস্ত, প্রাণটুকু বাঁচিয়ে দুটো পয়সা রোজগার করতে পারলেই যথেষ্ট, কলকাতা তখন কোথায়!

আমতার মেলাইচণ্ডীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন হাটখোলার দত্তরা। আমতা বন্দরে ছিল তাদের বড় বড় নুনের গোলা। ১৬৭৯ খৃস্টাব্দের কথা বলছি। কলকাতার জন্ম তখনও হয় নি। এরও পরে, আরও প্রায় আড়াইশ' বছর ধরে আমতা বন্দর টিকেছিল। যদিও তার গুরুত্ব ক্রমশই কমে আসছিল।২

১ সুরেশচন্দ্র ঘোষাল—দক্ষিণপাড়া, আমতা।

২। "রেলওয়ে বিস্তারের পূর্বে আমতা হাওড়া জেলার বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। পূর্বে দামোদর নদ দিয়া নৌকাযোগে রাণীগঞ্জ হইতে কয়লা ও মেদিনীপুর হইতে লবণ আমদানি হইত। তৎকালে আমতায় বহু লবণ ও কয়লার গোলা ছিল। আমতা হইতে কয়লা ও লবণ বোঝাই নৌকা সকল দামোদর নদ বাহিয়া ভাগীরথী গঙ্গায় পড়িত এবং ভাগীরথী তীরস্থ নানাস্থানে উক্ত দ্রব্য সরবরাহ করিত। এখনও আমতার দামোদর তীরস্থ কিয়দংশ বন্দর নামে খ্যাত।" "হুগলী ও হাওড়া জেলার ইতিহাস", ১ম খণ্ড বিধুভূষণ ভট্টাচার্য।

কলকাতার হঠাৎবাবু আর হাওড়ার কলকারখানার চাহিদা মিটিয়েছে আমতা বন্দর বহুদিন।

মেদিনীপুর আর হাওড়ার দক্ষিণাংশ থেকে নুন আসত আমতায়, আমতার বিখ্যাত গোলাদার ছিলেন হাটখোলার মদনমোহন দত্ত। ঘাটাল থেকে আসত মটকী ঘি আর দই। পাট, পান ধান আসত প্রচুর পরিমাণে। আসত মাদুর, হাতে বোনা চটের থলে তাঁতের শাড়ি ইত্যাদি। তারপর এসব আবার চলে যেত কলকাতায়, হুগলীতে, মুর্শিদাবাদে এমন কি সুদূর পূর্ববঙ্গের ঢাকায়। আমতার মাদুর, পোনার ডিম আর পান্তুয়ার ভীষণ চাহিদা ছিল সেদিন।

শিল্পনগরী হাওড়াকে গড়ে তোলার পেছনেও আছে আমতা বন্দরের অবদান। হাওড়ার চিনির কল, চটকল, ডক, ইত্যাদির পত্তন হয়েছিল বেলগাড়ি চালু হবার অনেক আগেই। তখন পাট ও কয়লা আসত জলপথে, প্রথমে রাণীগঞ্জ থেকে আমতায়, তারপর আমতা থেকে শালকিয়ায়। আমতার দশ মাইল দক্ষিণে মহিশরেখাতেও এ সময় গড়ে উঠেছিল একটা ছোটখাটো গঞ্জ।৩

অন্য আর কিছুই দেখার উপায় নেই। [illegible] বন্দর।

[illegible] সম্বন্ধে [illegible] কথা [illegible] মনে পড়ল। নদীর গতিপথের পরিবর্তন হয়েছে [illegible] হারাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে [illegible] অর্থনৈতিক অবস্থাও পরিবর্তন ঘটছে। দামোদর যতদিন নাব্য ছিল ততদিন আমতা বন্দর শ্রীহীন হয় নি। তারপর ধীরে ধীরে দামোদরের জল কমতে শুরু করল এবং সেই সঙ্গে আমতার গুরুত্বও। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে দেখা গেল আমতা বন্দর আকাশের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছে অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে। বর্ষায় জল পেলে দামোদর নাব্য হবে, সুবিধে হবে বড় নৌকা চলাচলের এবং তখন কয়লা আসবে রাণীগঞ্জ থেকে চালান যাবে হাওড়ায়,

৩। During the rains large quantities of coal come by it from the Raniganj mines in boats of twenty to us burden and transhipped and forwarded via the Uluberia Canal and Hugli River, to Calcutta. A Statistical Account of Bengal, Vol—3. W. W. Hunter. 1875

দামোদরের বন্যা

কলকাতায়।[৪] আরও কয়েক বছর কেটে গেল এভাবে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আমতার কাছে দামোদর অসম্ভব রকমের শীর্ণ হয়ে পড়ল,—গরমের দিনে মাত্র ১০/১২ ফিট চওড়া এবং গভীরতায় এক ফুট। বন্দর আমতার সমৃদ্ধি তখন বাস্তবকে হারিয়ে খোশগল্পের জগতে আশ্রয় নিয়েছে।[৫]

কিন্তু বন্দর আমতা কোনও ব্যতিক্রম নয় বাংলার একদা বিখ্যাত, সমৃদ্ধ, বহু জনপদ এবং বন্দর এমইভাবে লক্ষ্মীকে হারিয়েছে। গৌড় আজ ঘন জঙ্গল আর ভাঙাচুড়ো ইমারত নিয়ে নিস্তব্ধ। তাম্ভা আজ আমাদের স্মৃতিপটে কদাচিৎ উঁকি দেয় আর ত্রিবেণী কেবলই নগণ্য স্নানের ঘাট। এমইভাবে শ্রীহীন হয়েছে শ্রীপুর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, সোনারগাঁ, সপ্তগ্রাম, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। গংগা পদ্মা গতিপথ পরিবর্তন করেছে। ভাগীরথী, সরস্বতীর গতি বন্ধ হয়েছে, সাথে সাথে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে।

কলকাতার ভবিষ্যৎও একই কারণে নৈরাশ্যজনক। নদীপথে লক্ষ্মী এসেছেন বাঙালীর ঘরে আবার ফিরে গেছেন নদী-পথেই। আমতায় এসে বুঝতে পারলুম কথাটা কত বড় সত্য।[৬]

আমতা বন্দর হারিয়ে একেবারেই মৃতপ্রায়, একথা অবশ্য বলব না, তবে এটা সবাই নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে, দামোদর যদি আজও নাব্য থাকত, বন্দরের কর্মচাঞ্চল্য যদি থেমে না যেত তা হলে আমতার অবস্থা আজ ফুলে ফেঁপে উঠত। তবুও ঘুরেফিরে খবরাখবর নিয়ে ধারণা হোল যে, আমতার পুনর্গঠন এখনও সম্ভব এবং যেহেতু হাওড়া জেলার অর্থ-নৈতিক অবস্থার উন্নতি অনেকটা নির্ভর করে [illegible] আমতার শ্রীবৃদ্ধির ওপর [illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible]।

বন্দর আমতার [illegible] [illegible] [illegible] খুবই ক্ষীণ। তা হলেও আরও অনেক রাস্তা আছে [illegible] উন্নতি [illegible]। আমতার আয়তন ৩৮৫ বর্গ কিলোমিটার বা ১৪৯ বর্গমাইল। টাউনের পশ্চাদ-ভূমিতে রয়েছে প্রকৃতির অকৃপণ হাতের অপরিমেয় দান। ধান, পান, পাট আর আলু আমতার মাটিতে ফলে চমৎকার। কিন্তু এক্ষেত্রে দুটি বড় বাধা আছে—সেচ ব্যবস্থার ত্রুটি এবং বন্যা। বাগনান এবং শ্যামপুর নিয়ে আলোচনা করার সময় বার বার এই দুটি অসুবিধের কথা বলেছি। পুনরাবৃত্তি হচ্ছে বুঝতে পারছি, কিন্তু এড়িয়ে যাওয়ার কোনও উপায় নেই। হাওড়া জেলার সর্বত্রই সেচ-ব্যবস্থার ত্রুটি লেগে আছে, আর আছে বন্যার ভয়। আমতার পুনর্গঠন সম্ভব হবে না, এ দুটি সমস্যার সমাধান না হলে।

এবারের বন্যার কথাই বলি। কেঁদুয়ার মাঠ যার আয়তন ১০ হাজার একর, তা এখনও জলের তলায়। আমতা কেন, গোটা হাওড়া জেলার কয়েক মাসের খোরাক যোগাতে পারে এই কেঁদুয়ার মাঠ। কিন্তু জল নিকাশের ব্যবস্থার অভাবে ধানের চারা পচে যায় ফি বছর, এবার তো আর কথাই নেই! এবার কি হোল তা টের পাওয়া যাবে আসছে বছর! হাওড়ার লোকের কপালে যা আছে তা অভিজ্ঞ চাষীরা ইতিমধ্যেই টের পেয়েছে। কৃষিজাত পণ্যের ওপর যখন আমতার অর্থনৈতিক অবস্থা নির্ভর করছে, তখন পুনর্গঠনের কর্মসূচীতে কেঁদুয়ার মাঠের সংস্কারসাধনের দাবি সর্বাগ্রে। একেই কেঁদুয়ার মাঠ নিচু এবং অল্প বৃষ্টিতেই জল দাঁড়িয়ে যায়, তার ওপর যদি অন্যান্য অঞ্চল থেকেও জল ছাড়া হয় তা হলে চাষীদের অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়! যে খালটি মাঠে আছে তা অত্যন্ত অগভীর। এমন কিছু করতে হবে যার ফলে কেঁদুয়ার মাঠের অতিরিক্ত জল বেরিয়ে যেতে পারে। শুনেছি, একটা সরকারী পরিকল্পনা আছে কেঁদুয়ার মাঠ নিয়ে। কবে তা' কাজে লাগানো হবে কে জানে?

"কেঁদোর মাঠের চাষ।
ভাবনা বার মাস॥"

তা সে যাদের ভাবনা তারা ভাবুক না বসে বস্ত্র দুঃখি, রাইটার্স বিল্ডিংস-এর সাহেবদের কি আসে যায়!

কেঁদুয়ার মাঠের পাশে [illegible] হবে [illegible] [illegible] কথা, ভাবতে হবে [illegible]।

৪। তিন নম্বর নোটেরই অনুরূপ।

৫। "Above this point the river narrows rapidly, and at Amta shrinks in the hot weather to a width of only 10 to 12 feet and a depth of a foot or so." Bengal District—Gazetteers : Howrah, L. S. S. O' Malley, 1909.

৬। The constant Fluctuations of the river beds and river banks can not fail to affect the population; and indeed the mightier' the rivers and the greater their changes of course, the more profound the effect on humanity." The Changing Face of Bengal : A study in riverine economy, Dr. Radhakamal Mukherjee.

[illegible] জলে [illegible]। [illegible], সেখানে এখন এক [illegible]। [illegible] মাঠে দেখলুম [illegible] ছেলেরা। [illegible] আর পথ সব একাকার। দামোদরের নিম্নাংশ মজে আসছিল অনেক আগে থেকেই, ডি-ভি-সি'কে সেদিক থেকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু এমন কিছু ভাবা নিশ্চয় উচিত ছিল যাতে বর্ষায় ডি-ভি-সি অতিরিক্ত জল ছাড়লে হুগলী, হাওড়া বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। দামোদরের নিম্নাংশের খাত গভীর করে কাটিয়ে না দিলে বন্যা হবেই। আমতা থানার পুনর্গঠনের প্রথম ধাপে তাই দামোদরের খাত কাটাতে হবে।

এর পর দেখতে হবে আমতা থানার নিজস্ব প্রাকৃতিক সম্পদকে নিয়ে কোনও কুটিরশিল্প গড়ে তোলা যায় কি না। তাল ও খেজুরগাছ আমতা অঞ্চলে যথেষ্টই আছে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে গড়ে তোলা যায় গুড়শিল্প, ভাল গুড়ের বেশ চাহিদা আছে বাজারে। সরকার ও চাষী উভয়কেই এ বিষয়ে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। নারকেলের শুকনো খোসা নিয়ে চমৎকার অর্থকরী ব্যবসা চালু করা যেতে পারে নিম্নবঙ্গের সর্বত্র। পাপোশ, খসখস, চিক, দড়ি ইত্যাদি তৈরি হতে পারে শুকনো খোসা থেকে। আমতায় এমনি একটা ব্যবসা যদি গড়ে ওঠে তবে তার গুরুত্বও অনেক বেড়ে যাবে। জুতো তৈরি আমতার এক পুরনো কুটিরশিল্প, কিন্তু আজ তা পড়ে মার খাচ্ছে,— কলকাতার বিভিন্ন নামজাদা প্রতিষ্ঠানের সাথে পাল্লা দিতে পারে নি। মনে হয় কলকাতার লোক বা কলকাতায় যাঁরা নিয়মিত যাতায়াত করেন তাঁদের রুচির সঙ্গে আমতার জুতো শিল্পীরা বিশেষ পরিচিত নন। তাই তাদের তৈরি জুতোর চাহিদা কমে এসেছে। আরও দুটি অসুবিধা অবশ্য আছে। একটি মূলধনের অপরটি বিদ্যুতের। মহাজনের খপ্পরে পড়ে গ্রাম বাংলার অধিকাংশ কুটিরশিল্পেরই নাভিশ্বাস উঠেছে। আমতার ক্ষেত্রেও এটা নির্মম সত্য। বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থার কোনও সুবন্দোবস্ত আমতায় নেই। তাই জুতোই হোক, গুড়েই হোক, কি চিনির কল হোক আমতার শিল্পোন্নতির আশু সম্ভাবনা নেই। লোহার গজাল ও নানা ধরণের পেরেক তৈরির কিছু ছোট কারখানা গড়ে উঠেছে আমতায়, মাল চালান যাচ্ছে হাওড়ায়। আরও মন্দ হচ্ছে না। কিন্তু বিদ্যুতের সরবরাহ না থাকলে এই শিল্পের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হবে না। আরও একটি অপেক্ষাকৃত [illegible] কুটিরশিল্পকে নতুন করে গড়ে তোলা যেতে পারে। মাদুরের কথা বলছি। আমতার মাদুর এককালে পূর্ববাংলাও চালান যেত, এখনও খিলা, বসন্তপুর ইত্যাদির মাদুর বেশ মসৃণ এবং টেকসই।

আমতার বাজার

আমতার বিভিন্ন গ্রামে পান আর আলু ফলে প্রচুর। আলু মজুত রাখার জন্য চাই কয়েকটি ঠাণ্ডাঘর। পানের জন্যও চাই অনুরূপ ব্যবস্থা। এছাড়া চাই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি। এ দুটির অভাবে আমতার অর্থকরী কৃষিপণ্য আজ কলকাতার ব্যবসায়ীদের মুঠোয় চলে এসেছে। পান আর আলু নষ্ট হওয়ার ভয়ে চাষীরা ছেড়ে দিচ্ছে কলকাতার পাইকারদের কাছে। ঠাণ্ডাঘর এবং ব্রডগেজ রেলওয়ে হলে আমতার চাষীদের হাতেই ব্যবসাটা থাকবে এবং আমতা থেকেই তারা সরাসরি বাইরে মাল চালান দিতে পারবে।

শিল্প আর কৃষির উন্নতি হলে আমতার আর্থিক অবস্থার অনেক উন্নতি হবে। আরও কয়েকটি সমস্যা আছে যা একই সঙ্গে ভাবতে হবে। আমতা অঞ্চলে চিকিৎসার কোনও সুবন্দোবস্ত নেই, সরকারী সেবাপ্রতিষ্ঠানগুলি অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও কর্তব্য পালনে সমান উদাসীন, ভাল ডাক্তারের সংখ্যাও নগণ্য। রোগের চিকিৎসাই যদি না হয় তবে মানুষ থাকে কোন সাহসে।

আমতায় কলেজ বলতে মাত্র একটি। রামসদয় মহাবিদ্যালয়। কিন্তু কলেজটিতে অনার্স নিয়ে পড়াশুনোর সুযোগ খুবই সীমিত। কেন না আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। কলেজটির উন্নতি হলে হাওড়া জেলার ছাত্রসমাজের নজর এসে পড়বে আমতার ওপর। বলা বাহুল্য আমতার গুরুত্ব বাড়বে।

কৃষি, কৃষিনির্ভর শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং যোগাযোগ, মোটের ওপর এ কটি বিষয়ের উন্নতি হলেই আমতার চেহারা বদলে যাবে। পশ্চিম বাংলার অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য।*

* আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত।

পথ কে রুখবে?

মনোজ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ আঠারো ॥

অমলেশের কাগজ পড়া শুনছিল ফুলরা এক মনে। বড় দুর্লভ জিনিস। পশ্চিমবঙ্গের এসব কাগজ পাকিস্তানে ঢোকে না—খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কায়ক্লেশে বর্ডার অবধি এসেছে। ব্যস, আর নয়। দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা হয়তো ভাবেন, বঙ্গের নামে এ-পারের মন আনচান করে উঠবে। পূর্ববঙ্গের মানুষ নন আর এঁরা—পূর্ব-পাকিস্তানবাসী। আইন মতে দেশভুঁইয়ের নাম পূর্ব-পাকিস্তান। মেঘনা, পদ্মা, আড়িয়াল-খাঁ বুড়িগঙ্গার জলে বঙ্গের বড় হিস্যার বিসর্জন হয়েছে। ছোট হিস্যারও সমগতি হতে যাচ্ছিল—পূর্ব-বাংলা গেছে, পশ্চিম-বাংলাই বা কেন আর? দাও ওটুকু বিহারের সঙ্গে মিশিয়ে—বিহার-বঙ্গ মার্জার হয়ে যাক। দেশ-ভাগ যাঁদের কীর্তি এ আয়োজনও তাঁদের। ঝপাট চুকিয়ে-বুকিয়ে দিচ্ছিলেন—বঙ্গ নাম থাকত না ভূগোলের পাতায়। উঁহু, ভুল বললাম—থাকত বঙ্গোপসাগর, জাত ধরে বাঙালির ডুবে মরবার জন্য। আগামী দিনের রমেশমজুমদার প্রত্নগুপ্তরা গবেষণা করতেন, বাংলা বলে ছিল এক দেশ—বেপরোয়া দুর্ধর্ষ দেশপ্রেমী কথাকার মানুষ। পুরানো কালে বিস্তর ছিল, আর উত্তরকালেও ছিল বাঘা-যতীন, সূর্য সেন, সুভাষ বসু—কত কত কত এমনি। নিষ্ঠুর ভবিতব্য খলখল করে হাসছে: দুষমনকে শাস্তি দেবার বনেদি পদ্ধতি—নাক কাটো কান কাটো হাত কাটো পা কাটো, সর্বশেষে মুণ্ডপাত। বঙ্গদেশ নিয়ে হুবহু সেই খেলা সুদীর্ঘকাল থেকে। টুকরো কেটে কেটে ছুঁড়ে দেওয়া হল পূবে-পশ্চিমে। পুরোপুরি দুই খণ্ড শেষটা—বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা এবং পূর্ববঙ্গ-আসাম। কিন্তু সেদিনের বাঙালি 'যথা আজ্ঞা' বলে মেনে নেয় নি। মারে খণ্ডনকর্তাদের। তাতে মারে—বিলাতি জিনিস বয়কট, স্বদেশী-ব্রত গ্রহণ। হাতেও মারে—পবিত্র রামধনে-গীতি সহ বোমা-পিস্তল। আর সংস্কৃতির মানুষ লেখক-গায়করাও নেমে পড়েছে—কলমে বেরুচ্ছে ভলকে ভলকে অগ্নিশিখা, কণ্ঠে গাইছে অগ্নি-ক্ষরা গান। আর বেয়াড়া রবিঠাকুরের দল কলম ছাড়াও রাখিবন্ধন নিয়ে পড়লেন—এ-মানুষ ও-মানুষের হাতে হলদে রাখি পরিয়ে সংকল্প নিচ্ছে: জবরদস্তি করে ওরা মাটি ভাগ করেছে, মানুষ আমরা আলাদা নই আলাদা নই আলাদা নই। রুখেছিল সেবারের দেশ-খণ্ডন—বৃটিশ-ইজ্জত পায়ে দলে সেটেলড ফ্যাক্ট আনসেটেলড করে দিল। বঙ্গ-ভঙ্গ বাতিল শেষ পর্যন্ত।

এবারে বেশি সতর্কতা, অনেক বেশি তোড়জোড়। দেশ-খণ্ডনের পিছনে দুনিয়ার বড় বড় মাথা। এক-ভাবত নেই—দুটো সম্পূর্ণ পৃথক দেশ। সেই দুই দেশে—রেডিও শুনুন, প্রতিদিনের সংবাদপত্র পড়ুন—ধুন্দুমার যেন লেগেই আছে। বিভেদের মিথ্যা-চিত্রের রং উঠে গিয়ে সত্য পাছে প্রকট হয়: একই তো আমরা আসলে—চিরকাল এক ছিলাম, এখনো তাই। লাঠালাঠি কেন তবে, পেটে না খেয়ে অস্ত্র কিনে কিনে কি জন্য তবে বর্ডারে জড়ো করি? ভিক্ষাপাত্র হাতে দুনিয়ার তাবৎ জাতের কাছে 'আজ্ঞে' 'আজ্ঞে' করে বেড়ানো সেই মুহূর্তেই তো শেষ হয়ে যাবে। হতে দেবে নাকি তাই।

পৃথক হল পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ। ধীরে রজনী, ধীরে। পরবর্তী অধ্যায়ে পূর্ববঙ্গ নেই, বাংলা-টাংলা নয় আর—পূর্ব-পাকিস্তান। ভারতের দিকটায় একটু তবু ফ্যাকড়া থেকে যায়—পশ্চিমবঙ্গ। তাই বা কদ্দিন আর, বঙ্গ নাম নিঃশেষে মুছে দাও—ভারতীয় কর্তারাই উঠে-পড়ে লাগলেন। এবং রবিঠাকুর ইতিমধ্যে দেহরক্ষা করেছেন—পরম বশম্বদ সাহিত্যিকদল কর্তাদের অভিপ্রায় বুঝে বিবৃতি ছাড়লেন: ঢোকাও বিহারে—বঙ্গের গঙ্গাপ্রাপ্তি হোক।

তবু হল না—মুখচুন্ড-সুখচুন্ড যে জনতাকে আমল দেন না, রুখে উঠে তারাই ঠেকিয়ে দিল। বঙ্গ নাম অঙ্গে রেখে টিকে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু বঙ্গভাষা নামে আরও এক বস্তু আছে, শনির দৃষ্টি এবারে তার দিকে। ভাষার মুণ্ডপাত করতে হবে পূর্ব-বাংলার সঙ্গে এখনো যা যোগাযোগের সেতু।

যাকগে। ধান ভানতে শিবের গীত বিস্তর হয়ে গেল, গল্প আসি। কাগজে ওপারের খবর পড়া হচ্ছে, তন্ময় হয়ে শুনছে ফুলরা। জ্ঞান হওয়া ইস্তক সে দেশ চোখে দেখে নি, গল্প শুনেছে বিস্তর। আজকে জীবনের এই প্রথম। গভীর রাত্রে চাঁদ ডুবে গিয়ে জীবজগৎ যখন ঘুমে অচেতন, অভিনব পন্থায় সেই নতুন দেশে পাড়ি জমানো।

ঘরের বাইরে একটা মেয়ে এসে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। ফুলরাকে দেখতে পেয়ে চিলে যেমন করে ছোঁ মারে, এসে পড়ল তার উপরে। জড়িয়ে ধরল।

চেঁচিয়ে উঠত ফুলরা আর একটু হলে। মেয়েটা কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় ধমক দেয়: পুরুষদের মধ্যে কেন? আলাদা ঘর আছে না আমাদের? চলে এসো।

সংলগ্ন—অনুরোধ রাখে কি না রাখে, সে অপেক্ষা নেই—ফুলরার হাত ধরে হেঁচকা-টান। হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলল।

বলে ড্যাবড্যাব করে তাকাও কেন! চিনতে পারছ না? আমি ফুলি গো আমিও তোমায় দেখি নি। এ ঘাটে বুঝি পারাপার হও না—কোন ঘাট তোমাদের?

ফুলরা সহজ হয়েছে এতক্ষণে। বলে কোন ঘাটই নয়।

পাসপোর্ট-ভিসা করে নিয়ম-দস্তুর যাও বুঝি? যা ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট—তা-ও তো বন্ধ আছে আজকাল। বলি, দেশের মাঝখান দিয়ে বেমক্কা বর্ডার-লাইন টেনেছে—এটাই বা কেমন নিয়ম শুনি? অনিয়ম তবে আর কাকে বলব?

ফজলুল বলল, যাই নে তো সেই জন্মে। এই আমার প্রথম যাওয়া ও-পারে।

মনে করে নাকি?

ঘাড় নেড়ে দিল ফজলুরার। বলে, অনেকেই তাই বলে—যাবই না আর ও-দেশে। রাগে বলে শোকে-দুঃখে বলে। চোখের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়ার মতন। চিরকাল ধরে যাওয়া আসা—বরাবর ঠিক অই চলবে। কলমের টান দিয়ে আর সকল সম্পর্ক মুছে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে আলাদা হয়ে গেলাম। হয় তাই কখনো?

কবা দোচালা ঘরের একটা অংশে কাঠের বেড়ায় ঘেরা। হেরিকেন জ্বলছে ভিতরে। এ ঘরের একটু বিশেষ ব্যবস্থা। মেঝেয় মাদুর পাতা যথারীতি—তা ছাড়া দুটো তক্তাপোশ, তার উপরে সতরঞ্চি।

[illegible] ছেলেপুলে নিয়ে সব আসে। বাচ্চা ঘুম পাড়িয়ে তক্তাপোশে শুইয়ে দেয়। এক-একদিন এমন [illegible] আড়াআড়ি শুইয়েও দুই তক্তাপোশে কুলায় না। আজ দেখ একেবারে ফাঁকা। একা [illegible] বসেছিলাম কথার দোসর পাই নে। আমার মামা-মামি ওপার থেকে, খবর দিয়েছিল। মনের আহ্লাদে [illegible] কিন্তু ভরসা করতে পারে না। আমি সেই জন্যে এসেছি। অথচ তাদের পাত্তা নেই। ঘাবড়ে গেছে খুব সম্ভব, আসবে না।

দুজনে তক্তাপোশে বসল। ফজলি বলে, লড়াই থেকে মিলিটারি বসিয়েছে, তারপর এই রকম। পুলিশ-কাস্টমস দেশ-ভাগের পর থেকেই আছে, তাদের সঙ্গে পাকা বন্দোবস্ত, ডাল ভাতের মতন হয়ে গেছে তারা। মিলিটারি নতুন আমদানী তাদের নিয়ে ভয় ভাঙে নি এখনো। ও বেটারা ঘুমোয় না তো, ঘুমোতেই জানে না বোধহয়—দিন-রাত্তির মাঠে মাঠে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। দিনকতক এমন হয়েছিল, কোন [illegible] মানুষ নেই—ফাঁকা ধু-ধু সব। আস্তে আস্তে আবার এখন জমে উঠছে। না [illegible] যাবে কোথা—গরজ বড় বালাই। [illegible] গরজে বেরুতে হয়। তবে মেয়ে-লোকে বেরুতে ভরসা পায় না, এক-পা এগোয় [illegible] দু-পা পিছিয়ে পড়ে। মেয়েদের বড় কষ্ট।

ফজলুরা প্রশ্ন করে: মিলিটারি [illegible] বন্তে আসে না কেন?

আসে নি ঠিক এখনো। পুলিশের মারফতে একটু-আধটু ঠারেঠোরে কথা হতে পারে। তার বেশি নয়।

মুখ বিমর্ষ করে ফজলি বলতে লাগল মুশকিল হয়েছে পাড়াগাঁ জায়গায় বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার মতন লোক খুঁজে পাওয়া যায় না। দেশী ফৌজ নয়, [illegible]

বেটারা। কথা বলে, ঠিক যেন ঠেঙার বাড়ি মারছে—[illegible] ওঠে। কী বলছে [illegible] জানে না [illegible] নি। খোদার [illegible]।

[illegible] তা হলেও [illegible] নিশ্চয় ভুল নেই। বন্দোবস্তে না এসে যাবে কোথা? সদা সদা এসেছে পরের মুলুকে—জল-কাদা ভেঙে গুঁতো-ঘুষ্ট খেয়ে নরম হয়ে উঠুক, আলবত তখন বন্দোবস্তে ঢুকে পড়বে।

বলো হরি, হরিবোল—

মড়া চলেছেন শ্মশান-বন্ধুদের কাঁধে চেপে। গঙ্গায় যাবেন। এই হরিধ্বনি আগেও তো শুনেছিলাম। মড়ার দল দ্রুত-পায়ে মাঠে নেমে অপথ-কুপথ ভেঙে ছুটতে লাগল। পথ সংক্ষেপ করে সীমান্ত পার হয়ে নড়াহাটি গঙ্গায় পৌঁছনো [illegible] উদ্দেশ্য। মড়ার পচন ধরে যাচ্ছে। অমলেশের আর এক সন্দেহ—শ্মশান-বন্ধুদের মধ্যে চেনালোক বেরুবে—[illegible] পড়তে চায় না বলেই ওরা ভিন্ন পথ নিল।

[illegible]-ডহর মাঠ-জঙ্গল ভেঙে মল্লিক-হাটের পাশ কাটিয়ে এবারে তারা প্রশস্ত রাজপথে উঠল। আইনসঙ্গত পথ—পাশ-পোর্ট ভিসার জোরে বুক ফুলিয়ে যে পথে মানুষ চলাচল করে। চেকপোস্টের সামনে গিয়ে মড়া নামাল। ছেলেরা দু-তিন জন অফিসে ঢুকে গেল, অন্যেরা গাছ-তলায় কাঁধের গামছা নেড়ে বাতাস খাচ্ছে।

বুড়োমানুষ মড়া—বাঁশের চালির উপর ফুলের গাদার মধ্যে শুয়ে রীতিমত জাঁকজমকে যাচ্ছেন। মুখের খানিকটা বেরিয়ে পড়েছে, গায়ে-গতরে দিব্যি ছিলেন। ভাগ্যধর মানুষ—ছেলেমেয়ে নাতিপুতি জোতজমি বাগ-বাগিচা দালান-পুকুর উত্তরপুরুষে যত-কিছু প্রত্যাশা করে, সবই তিনি রেখে যাচ্ছেন। ছেলেরাও তেমনি—পারলৌকিক কর্মের কোন অঙ্গে খুঁত থাকতে দেবে না।

অফিসের ভিতর ঢুকে অফিসারকে বড় ছেলে বলল, হেঁজিপেঁজি নন—নামকরা লোক আমার বাবা, দীনদয়াল চাটুজ্যে। নাম শুনে থাকতে পারেন। মরেছেনও খুব ভাল—সজ্ঞানে গঙ্গানারায়ণ-ব্রহ্ম বলতে বলতে। আমাদের যা করণীয় সমস্ত করেছি। শেষ এখন হুজুরের হাতে। আপনি দয়া না করলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গতি হবে না।

[illegible] প্রবীণ, মানুষটি বড় [illegible]। [illegible] চাকরি করছেন—তখন [illegible] পাকিস্তান ছিল না একই দেশ বলে [illegible] পারেন। [illegible] তাই [illegible] দেশ [illegible] গেলেও মনে প্রাণে সম্পূর্ণ [illegible] পারেন না। [illegible] তিনি [illegible] আমি মুসলমান আপনারা [illegible]। যে সে হিন্দু নন, বর্ণের সেরা ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের গতি আমায় দিতে হবে—কি বলতে চান, ঠিক বুঝতে পারছি নে।
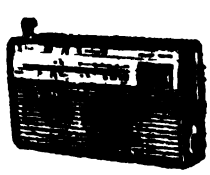
ছেলে কাতর হয়ে করজোড়ে বলে, দুনিয়ার মধ্যে কেউ যদি পারেন সে আপনি। বর্ডারের কর্তা হয়ে তামাটের লোকের দায়ঝক্কি সামলাচ্ছেন, আপনি পারবেন না তো কি পিণ্ডির সিংহাসন থেকে নেমে এসে আয়ুব খাঁ পারতে যাবেন? আমরা শুধু আপনাকে চিনি হুজুর, কাজকর্ম তাতেই দিব্যি চলে যাচ্ছে। বেশি চিনতে গেলেই যত বখেড়া এসে জোটে।

ইত্যাদি আমড়াগাছি অন্তে আসল প্রস্তাবে আসে এইবার। বৃদ্ধ দীনদয়াল মৃত্যুশয্যায় কাকুতি-মিনতি করে গেছেন [illegible] গঙ্গায় যান [illegible]। শেষ ইচ্ছা। [illegible] ইচ্ছা নয় হুজুর, অন্তিমের শাস্ত্র বলছে, [illegible] গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটিয়ে দিতে পারলে পরলোকের পথের কোন ঝামেলা রইল না, যমদূত ছুঁতে পারবে না—চড়াং করে বৈকুণ্ঠে উঠে বসলেন। কিন্তু পাকিস্তানে গঙ্গা কোথা? একবার ওপারে গিয়ে মড়িটা গঙ্গায় দিয়েই হাত ধুয়ে ফেরত চলে আসব একদিনের বেশি লাগবে না। বলেন তো উপযুক্ত জামিনের বন্দোবস্ত করে যেতেও পারি।

অফিসার হাত ঘুরিয়ে অসহায়ভাবে বললেন, উপায় নেই। সাংঘাতিক কড়া-কড়ি। আইন মোতাবেক পাশপোর্ট দেখিয়েই লোকে আজকাল পার পাচ্ছে না—

সে তো জ্যান্ত লোকের বেলা, মড়ার আবার পাশপোর্ট কি হুজুর? মড়ার নামে দরখাস্ত দিলে তো ছুঁড়ে ফেলে দেবেন।

এ কথার জবাব হয় না। অফিসার হকচকিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, মড়া তো পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন না, আপনারাই বয়ে নিচ্ছেন। আপনাদের পাশপোর্ট কই?

তাই বা কেমন করে হবে? বাবা তো আগেভাগে জানান দিয়ে রাখেন নি, যে মরছি অমুক তারিখে। মড়া গঙ্গায় দিতে যাবে—পাশপোর্ট-ভিসা বানিয়ে রেখে দাও। আগেভাগে নোটিশ পেলে ওঁর জন্যেও তো পাশপোর্ট করা যেত। তখন জ্যান্ত ছিলেন, খুব একটা অসুবিধে হত না।

এর বিপক্ষেও বলবার কিছু নেই। অফিসার সাহেব ভ্রূ-কুঞ্চিত করে ভাবতে লাগলেন।

সেই বড় ছেলে আবার বলে, বাইরের লোকে যা-ই বলুক, খাসা আছি আমরা হুজুর। ওপারের হিন্দুস্থানের চেয়ে অনেক ভাল। ওখানে হাংগামা নিত্যিদিন. এটা নেই সেটা নেই—লেগেই আছে। চাল শুনতে পাচ্ছি আড়াই টাকা সের—আমাদের নিদেনপক্ষে পাঁচ সের মিলবে ঐ টাকায়। থুতু ফেলতেও ওদিকে যেতাম না—কি করব পিতৃবাক্য। পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম, শাস্ত্রে লিখেছে।

আর একজন জুড়ে দিল : ভয়ও আছে হুজুর। গঙ্গা না পেলে মুক্তি হবে না—আমাদের শাস্ত্রে বলে গেছেন। ইহলোকের মানুষ কেয়ার করি নে. কিন্তু ছেলেপুলে নিয়ে ঘরসংসার—পরলোকের ওঁদের বড্ড ডরাই। ধরুন, রাত-বিরেতে ঘরের বেড়ায় দমাদ্দম ঢিল ছুঁড়তে লাগলেন। কিম্বা হাট করে ফিরছি—খেজুরগাছের মতন লম্বা হয়ে পথ আটকে নাকি-সুরে বলছেন গঙ্গায় দিলি কই—ঘাড় মটকাবো। সঙ্গে সঙ্গেই তো জ্ঞান হারিয়ে পথের উপর পড়ব, অক্কা পেয়ে যাব। বোঝানোর সময় হবে না যে যে পাশপোর্টের অভাবে হুজুরের কাছে ছাড় মেলে নি, বর্ডার অবধি গিয়ে ফিরতে হয়েছিল।

মড়া রেখেছে অফিসের সামনে—দাঁত মেলে নিমীলিত চোখে রয়েছে. ঘাড় তুলতেই অফিসারের নজরে পড়ল। আর সেই মড়ার কানের কাছে লোকটা তারস্বরে বলে যাচ্ছে, গঙ্গাপাপিণ্ডি ছুড়ে দিচ্ছেন ইনি—এই তমিজুদ্দিন সাহেব। ভয়ে হোক অথবা করুণার বশে হোক অফিসার রাজি হয়ে বললেন, এমন করে বলছেন আপনারা, পরলোকের দোহাই পাড়ছেন—চুপিসারে চলে যান তবে মাঠ পার হয়ে। শব্দ-সাড়া করবেন না রাস্তাপথেও এগোবেন না আর। মিলিটারি মোতায়েন আছে, তারা নিজেরাই এক-একটা আস্ত জিন, বাঙালি ভূত কাছ ঘেঁসতে পারবে না। টের পেলে আটক করে আবারই কাছে ফের নিয়ে আসবে। তখন আর ছাড়বার উপায় থাকবে না আমার।

এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব কি হতে পারে। ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে শ্মশান-বন্ধুরা মড়া তুলল। কাঁধে তোলবার সময় বলতে হয় 'বলো হরি, হরিবোল'। ফিসফিস করে বলল সেটা। বাইরের কারো কানে গেল না—শুনল কেবল শ্মশান-বন্ধুরাই, এবং মড়ার যদি কানে আওয়াজ ধারণের ক্ষমতা থাকে, তবে তিনি।

মাঠ ভেঙে ছুটেছে। পার হয়ে উঠল এক পত্রঘন আমবাগানের ভিতরে। মানুষ-জন আড়াল করে দিব্যি যাওয়া যাবে, সীমানা সম্পূর্ণ পার হয়ে গিয়ে তখন আত্মপ্রকাশ করবে, হরিধ্বনিতে আকাশ ফাটাবে।

হবার জো আছে তাই। ক্ষিতিনাথের আচমকা যেন পাতাল ফুঁড়ে আবির্ভাব। পবিত্রাণ নেই—ভূত যেমন, কাস্টমসের মানুষও অবিকল তেমনি। বুঝি অন্তর্যামী তারা, আকাশ হয়ে নিঃশব্দে সর্বত্র চলাচল।

ক্ষিতিনাথ বললেন মড়া দিব্যি পার হয়ে এসেছেন—দিল ছেড়ে? শুনে ভাগ্য-বান মড়া—আপাদমস্তক গঙ্গা পেয়ে যাচ্ছেন। খাটে না শুইয়ে চালির উপরে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নিয়ে এলেন যে?

মাঠঘাট ভেঙে আসতে হল, বিশ্রী বেয়াড়া উঁচুনিচু রাস্তা। শুইয়ে আনতে গেলে হয়তো বা গড়িয়ে ভূঁয়ে পড়ে গেলেন—

তা বটে, তা বটে—ভালই করেছেন। এক দেশ থেকে ভিন্ন দেশে চালান হয়ে এলেন, সামাল করে আনতে হবে বই কি। এবারে তো এসে গেছেন, বাঁধন-কষণের আর কি দরকার? মরা মানুষের প্রাণ নেই বটে—তবু দেখতে বড় উৎকট লাগছে।

শ্মশান-বন্ধুরা আপত্তি তুলে বলে, কদিনের বাসি মড়া, আলগা করে দিলে দুর্গন্ধ উঠবে। খোলাখুলি একেবারে শ্মশানঘাটে নামিয়ে করব।

চালির প্রান্ত এঁটে ধরে ক্ষিতিনাথ আদেশের সুরে বললেন, নামিয়ে ফেলুন, এগোবেন না।

আর টুপ টুপ করে এ-গাছ থেকে ও-গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ছে সিপাহিরা। নিমেষের মানুষ পলকের মধ্যে ঘিরে ফেলল। ক্ষিতিনাথ বললেন, দড়িদড়া খুলুন। মড়াকে এতক্ষণ বড় কষ্ট দিয়েছেন, আর দেবেন না।

[ক্রমশ]
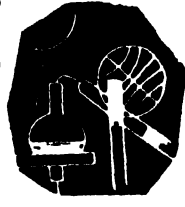
সাগর-সমীক্ষা

বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন একবার বিনয় করে বলেছিলেন, আমি সমুদ্দুরের তীরে নুড়ি কুড়োচ্ছি। অর্থাৎ, জ্ঞানটা খুবই সামান্য আমার। যা' কিছু আমি অর্জন করেছি, তা জ্ঞান-সমুদ্দুরের তীরে নুড়ি-কুড়োনোর মতো।

আজকালকার বিজ্ঞানীরা কিন্তু নিউটনের মতো বিনয়ী নন। তাই হামেশাই অন্য কথা বলেন ওঁরা। হামেশাই ওঁদের বলতে শোনা যায়, নুড়ি কুড়োতে কুড়োতে সমুদ্দুরে নেমে এসেছি আমরা, এবং নেমে খবর যা পেয়েছি, তা খুবই আশাপ্রদ। আমরা খবর পেয়েছি যে সমুদ্দুরকে কাজে লাগাতে পারলে পৃথিবীর খাদ্য-সমস্যার সমাধান অচিরেই হবে।

আজকের বিজ্ঞানীদের এই সব আশ্বাসবাণী শুনে খুবই খুশি হই আমরা। আমরা বলি, চমৎকার' খাদ্য-সমস্যার সমাধান যদি হয় তো খুব ভালো কথা। কিন্তু সমাধান হবে কি?

সোভিয়েত অ্যাকাডেমিসিয়ান ভি বগোরভ বলেছেন,—হ্যাঁ, হবে। কেন না আমি মনে করি, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমুদ্দুরের ফসলকে দ্বিগুণ করা যাবে।

—দ্বিগুণ' বগোরভ-এর কথা শুনে আমার এক বিজ্ঞানী বন্ধু বিদ্রূপ করেছিলেন। বলেছিলেন, মিথ্যু আর কাকে বলে!

বন্ধুটি এই বাক্যবাণ সোভিয়েত অ্যাকাডেমিসিয়ানকে কতখানি বিদ্ধ করল, জানি না; কিন্তু আমাকে যে করল, তা হলপ করে বলতে পারি। কেন না, বগোরভ-এর যুগান্তকারী চিন্তাধারার সঙ্গে সবেমাত্র আত্মীয়তা গড়ে উঠেছিল আমার! আমি সবেমাত্র জানতে পেরেছিলুম যে সমুদ্দুরের কাছ থেকে পাওয়া ফসলের পরিমাণ গত ৭০ বছরের মধ্যে ১৫ গুণ বেড়ে গেছে।

হ্যাঁ, সত্যি বেড়েছে ১৫ গুণ। জলজ খাদ্য যা আমরা পাই, তার সামগ্রিক উৎপাদন ১৫ গুণ বেড়েছে। অবিশ্যি এই সামগ্রিক উৎপাদন বলতে নদী-নালা, খাল-বিল, হ্রদ-উপহ্রদ সব কিছুর অবদানকেই বোঝাচ্ছে।

কিন্তু নদী-নালা বা খাল-বিলের অবদান তো সীমাবদ্ধ। উৎপাদনকে ১৫ গুণ বাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা ওদের কোথায়! অ্যাকাডেমিসিয়ান বগোরভ বলছেন, সে ক্ষমতা আছে সমুদ্দুরের এবং সমুদ্দুরের দৌলতেই আজ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে।

আগে মাছ ধরা হ'ত সমুদ্রোপকূলে; বা উপকূলের কাছাকাছি সব জায়গায়। কিন্তু আজ একদিকে সস্তা প্রোটিন-খাদ্যের বিপুল চাহিদা এবং অপরদিকে মাছ-ধরার উন্নত পদ্ধতি অবস্থার পরিবর্তনে সাহায্য করেছে অনেকখানি। আজকাল গভীর-সমুদ্রে মাছ-ধরা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। তাই আজকের দিনের মানুষ সমুদ্রের কাছ থেকে বছরে ৫২০ লক্ষ টন ফসল গ্রহণ করেও বলছে, আরও চাই।

অবিশ্যি ফসল বলতে এখানে সমুদ্রজ সব রকম প্রাণীকেই বোঝাচ্ছে। বোঝাচ্ছে এমন কি সমুদ্র-শৈবালকেও। তবে শৈবাল মানুষ যা পায়, মাছের তুলনায় তা সামান্য। বগোরভ-এর হিসেব অনুযায়ী সমুদ্রজ ফসলের শতকরা ৮৮ ভাগই হল মাছ

এই মাছ-ধরার ক্ষেত্রে নতুন নতুন সব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে এখন। এখন ডিজেল-চালিত সমুদ্র-জাহাজ 'কোল্ড্-স্টোরেজ'-সহ দূর-সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছে। এ-ছাড়া শব্দবিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতির ফলে গভীর-সমুদ্রেও মাছ-ধরা সম্ভবপর হচ্ছে। কিন্তু তবু এ-কথা ভুলে গেলে চলবে না যে সমুদ্র-ফসলকে ঘরে-তোলার পদ্ধতিতে বৈপ্লবিক কোনো পরিবর্তন আজও অবধি হয় নি। আজও সমুদ্র থেকে খাদ্য-আহরণের প্রচেষ্টা মানুষের অন্য সব বড়ো বড়ো প্রচেষ্টার তুলনায় খুবই অকিঞ্চিৎকর। কেন না আজ অবধি জাপান ফ্রান্স প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কয়েকটি মাত্র দেশ সমুদ্র-ফসল সম্পর্কে আগ্রহী। সমুদ্রে কাঁকড়া, চিংড়ি-মাছ শৈবাল ও শামুকের চাষ করছে কয়েকটি মাত্র দেশ। কিন্তু আজও চাষ-আবাদ নামক বস্তুটা সমুদ্রের ব্যাপারে একেবারেই উপেক্ষিত। আজ সমুদ্র থেকে ফসল-সংগ্রহ-করা বলতে আমরা বুঝি, শিকার করা। অথচ শিকার করে ডাঙায় কতটুকু আর সংগ্রহ করি আমরা। ডাঙায় আমাদের খাদ্য-সংগ্রহের বেশির ভাগই আসে চাষ-আবাদ থেকে। তাই খাদ্য-বিশেষজ্ঞদের কারও কারও ধারণা, চাষ-আবাদের ক্ষেত্রে জলের সঙ্গে ডাঙার এই আশমান-জমিন ফারাক রাখা আর চলবে না; বরং জলে চাষ-করার কাজটাও চালিয়ে যেতে হবে ডাঙার সঙ্গে তাল দিয়ে। অবিশ্যি তাল দেওয়া মানে এই নয় যে, 'রিজার্ভ ফরেস্ট'-এর এখানে-সেখানে যেমন সমুদ্রেরও যত্রতত্র তেমনি লটকে দিতে হবে 'হান্টিং ইজ প্রহিবেবিটেড' বা 'শিকার খেলনা মানা হায়'। বরং এর মানে হল এই যে, শিকার যেন কোথাও বেহিসাবী ধরণের না হয়; যেন খাদ্যসংগ্রহের নেশার ঘোরে কোথাও খুনী না হয়ে উঠি আমরা।

'খুনী' কথাটার ওপর জোর দিচ্ছেন বিজ্ঞানীরা। বলছেন, খুনের নেশায় আমাদের পেয়ে বসলে হাঁসের পেট চিরে ডিম বের করিয়ের মতো অবস্থা হবে আমাদের। অর্থাৎ, ক্ষতিটা আমাদেরই হবে অপূরণীয়।

আতঙ্কের কথা, এই ধরণের ক্ষতি-সাধনে এরই মধ্যে তৎপর হয়েছে মানুষ। অর্থাৎ, ডিম-পাড়ার জন্যে হাঁসকে লালন-পালন না করে মানুষ তার পেট কাটতে উদ্যত হয়েছে। এই পেট-কাটা-মার্কা মানববুদ্ধির একটি বিশিষ্ট উদাহরণ নরওয়ের সমুদ্রোপকূল থেকে সংগ্রহ করেছেন বিজ্ঞানীরা।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, নরওয়ের সমুদ্রোপকূলে অপরিণত হেরিং-মাছদের নির্বিচারে ধরা হয়। ফলে, অপেক্ষাকৃত ভারী এবং মূল্যবান পরিণত হেরিংদের সংখ্যা উত্তর নরওয়েতে ক্রমেই কমে যাচ্ছে। প্রাচ্যদেশে স্যালমন মাছের সংখ্যাও হয়তো এরই মধ্যে কমতো। হয়তো বা জাপানী জেলেদের পেট-কাটা-মার্কা বুদ্ধির গুণে প্রায় নির্বংশ হয়ে যেত স্যালমন মাছ।

কিন্তু তা' যে হয় নি, নদীর মধ্যে সমুদ্র-বরাবর কয়েক কিলোমিটার জুড়ে জাল পেতে রেখে জাপানী জেলেরা যে স্যালমন-ধরার পূর্ণ সুযোগ পায় নি, সেজন্যে সোভিয়েত রাশিয়া এবং জাপান,—উভয় সরকারেরই মিলিত উদ্যোগ দায়ী।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সমুদ্রে মাছ-ধরার ক্ষেত্রে এই ধরণের মিলিত-উদ্যোগ এবং আইন কানুন গড়ে তুলতে হবে। তা ছাড়া বিভিন্ন দেশের স্বার্থের কথা চিন্তা করে লক্ষ্য রাখতে হবে সমুদ্রজ বহু বিচিত্র শ্রেণীর মাছের ওপর। কোথায় কোন্ শ্রেণীর মাছ নির্বংশ হতে চলেছে, আবার কোথায় কোন্ শ্রেণী বংশবৃদ্ধি করছে অতি দ্রুত গতিতে, তা জেনে যদি মাছ-ধরার ব্যবস্থা হয় তো লাভবান আমরাই হবো।

সুখের কথা, আমাদের লাভের অংককে বাড়াবার জন্যে তৎপর হয়েছেন আজকের বিজ্ঞানীরা। ওঁরা বলছেন, শুধু মাছ কেন সমুদ্রজ অন্য সব ফসলকেও বাড়াবার চেষ্টা করতে হবে। সমুদ্রোপকূলের কাছাকাছি অগভীর অংশগুলোকে কাজে লাগাতে হবে আমাদের। ওখানে জলের তলায় চাষবাসে মনোযোগ দিতে হবে।

কিন্তু জলের তলায় চাষবাস?

বিশেষজ্ঞ বলছেন হ্যাঁ, ঠিক তাই। জলের তলাতেও চাষবাস করতে হবে এইবার। পৃথিবীর খাদ্যসমস্যার সমাধান করতে হলে এ ছাড়া আর অন্য কোনো পথ নেই।

কিন্তু প্রশ্ন দাঁড়ায় জলের তলায় কী চাষ করবো আমরা?

বগোরভ বলছেন কেন! অনেক কিছু। সমুদ্রের তলার শামুকজাতীয় প্রাণী আর নানা ধরণের মাছের ছানার ঝাঁক সমুদ্র শৈবাল ইত্যাদি চাষের অজস্র উপকরণ তো আমাদের হাতের কাছেই আছে।

বিপক্ষ দল আপত্তি জুড়েন এইখানে। বলেন,—উপকরণ আছে, কিন্তু উপায় কই? চাষ করবার মতো এত জায়গা কোথায় পাবো আমরা?

বগোরভ বলেন,—কেন! সমুদ্রেই পাবো। ভাগ্যগুণে সমুদ্রের অগভীর অংশগুলোর আয়তন তো আর কম নয়! বরং সমগ্র ইউরোপ মহাদেশের চেয়ে বেশীই হবে ওরা।

কিন্তু মজার কথা হল এই যে, সমুদ্রোপকূলের অগভীর অংশগুলোকে এখনও অবধি পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারি নি আমরা। অগভীর অংশগুলোতে বসবাস করে যে সব অপ্রয়োজনীয় জীব, তাদেরও আমরা হটিয়ে দিতে পারি নি। অথচ আমাদের বিশেষ কোনো কাজে লাগে না ওরা। চুনযুক্ত স্পনজ প্রবাল-কীট, জেলি মাছ বা তারা মাছ জাতীয় যে সব জীব ওখানে থাকে তাদের দিয়ে আমাদের উপকার প্রায় কিছুই হয় না।

এদিকে উপকার হয় না বটে, কিন্তু অপকার হয়। কেন না সমুদ্রোপকূলবর্তী ওই সব জীবগুলো যে সব খাদ্য গ্রহণ করে, আমাদের খাদ্য মাছেরও সেগুলো গ্রহণ না করলে চলে না। আর শুধু কি তাই। কত যে মাছের ছানার ঝাঁককে এবং এমন কি পরিণত মাছকে খেয়ে ফেলে ওরা তার সীমাসংখ্যা নেই। অতএব সমুদ্রের উপকূলবর্তী অগভীর অংশ থেকে ওদের যদি বিতাড়িত করা যেত এবং যদি ওই সব জায়গায় চাষ করা যেত আমাদের প্রয়োজনীয় সব মাছের, তবে কত যে লাভবান হতুম আমরা, আমাদের পৃথিবীর খাদ্যসমস্যার যে কতটা সমাধান হত তা' বুঝিয়ে বলতে গেলে ছোটখাটো একখানি মৎস্যপুরাণ রচিত হতে পারে।

কিন্তু কে বলাবেন বুঝিয়ে?—বগোরভ দুঃখ করে বলছেন কে বুঝিয়ে বলবেন? পৃথিবীর অনেকেই যে 'বুঝবো না' বলে কানে হাত দিয়ে বসে আছেন। অনেকে ধরেই নিয়েছেন যে, সমুদ্রে চাষ করে খাদ্য-সমস্যার সমাধান করার ভাবনা আজগুবি ছাড়া কিছু নয়। অথচ সত্যি কি তাই? আজকের বিজ্ঞানীরা প্রশ্ন তুলেছেন, সত্যি কি পৃথিবীর খাদ্যসমস্যার সমাধানে সমুদ্র বিশিষ্ট কোনো ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না?

সমুদ্রকে নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এরই মধ্যে যে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, তাদের দিকে তাকালে এই সব প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়া যায়। জানা যায় যে, ক্ষুধার্ত পৃথিবীতে খাদ্যসমস্যার সমাধানে সমুদ্রের অবদান অনস্বীকার্য। সমুদ্রে মাছের উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়াস সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছে এরই মধ্যে। তা' ছাড়া মাছকে খেদিয়ে এক সাগর থেকে অন্য এক সাগরে নিয়ে যাওয়ার কাজেও এরই মধ্যে বহু দেশ দক্ষতা দেখিয়েছে। রাশিয়া প্রমাণ করেছে যে, মাছের খাদ্য এবং পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে বংশবৃদ্ধি ওরা বেশ দ্রুত গতিতেই করে। এই শ্রেণীর কাজের বিশিষ্ট নজির হল কাস্পিয়ান সাগর। এল এ জেনকেভিচ-এর নেতৃত্বে ওই সাগরের মাছের উপযোগী খাদ্যকে বাড়াবার ব্যবস্থা হল একবার এবং একবার আজব সাগর থেকে বহু মাছ ও সমুদ্রজ প্রাণীকে ওখানে খেদিয়ে আনা হল। এই খেদিয়ে আনার এবং এই বাড়তি-খাদ্য-সরবরাহের পরিণতি শেষ পর্যন্ত ভালোই হয়েছিল। কারণ, আজকাল হামেশাই শুনতে পাই আমরা যে কাস্পিয়ান সাগরের সম্পদ অনবরতই বাড়তির দিকে। তার শুধু কাস্পিয়ান সাগর কেন আজ অনেক সাগরেরই সম্পদ-বাড়াবার স্বপ্ন দেখছেন বিজ্ঞানীরা এবং দেখছেন বলেই সাগর-স্রোত নিয়ে নিত্য নূতন পরীক্ষা করছেন ওঁরা। ওঁদের পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ থেকে সম্প্রতি জানতে পেরেছি আমরা যে পৃথিবীতে এখন ১৮ লক্ষ কোটি টন মাছ আছে কিন্তু তাদের মধ্যে মানুষের কাজে লাগায় বছরে মাত্র কয়েক কোটি টন।

প্রশ্ন উঠছে সমুদ্র সম্পদকে কি আরও বেশি পরিমাণে কাজে লাগান যায় না? বিজ্ঞানীরা বলছেন—হ্যাঁ, যায়। ইচ্ছে করলে সমুদ্র-সম্পদকে অনেকখানি বাড়ানও যায়। বিভিন্ন উপসাগরকে উর্বর করা যায় ইচ্ছে করলেই। নাইট্রেট এবং ফসফেট সরবরাহ করে ওদের মধ্যে মাছের বংশবৃদ্ধির অনুকূলে পরিবেশ গড়ে তোলা যায়।

সাম্প্রতিককালে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এমন কি এর চেয়েও কঠিন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উদ্যোগী হয়েছেন। কড্ শ্রেণীর অন্তর্গত টারপুগ মাছ, যাদের সাধারণত প্রশান্ত মহাসাগরেই দেখা যায়, তাদের নিয়ে ওঁরা চাষ সুরু করেছেন আটলান্টিক মহাসাগরে।

কিন্তু এ সবই হল সমুদ্রের জৈব-সম্পদের কথা। আর অজৈব সম্পদ? সমুদ্রে যে কী বিপুল পরিমাণ রাসায়নিক ও খনিজ-সম্পদ আছে, সে হিসেব কি আজও অবধি নেওয়া হয়েছে?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন,—না, হয় নি নেয়া।

এবং হয় নি বলেই আমরা বলছি, আজকের বিজ্ঞানীরাও নিউটনের মতো বিনয়ী হতে পারেন। স্যার আইজ্যাক-এর মতোই বলতে পারেন ওঁরা, আমরা সমুদ্দুরের তীরে নুড়ি কুড়োচ্ছি; আসল রত্নভাণ্ডার পরিচয় আমরা এখনও পাই নি।
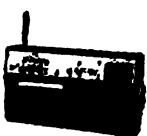
[ব্রেশ্‌ট সম্বন্ধে লিখতে লিখতে বার্লিনার আসেম্বলের আমন্ত্রণে ফেব্রুয়ারী মাসে আমাকে হঠাৎ চলে যেতে হল বার্লিনে ১৯৬৮ সালের ব্রেশট্-ডায়লগে অংশ গ্রহণ করতে। এক মাসের মত লেখা আমি দিয়ে গিয়েছিলাম—কিন্তু পূর্ব জার্মানী, লণ্ডন, রাশিয়া প্রভৃতি সফর করতে আমার কেটে গেল দু' মাস। দেশে ফেরবার পর লিখতে শুরু করলাম 'পূর্ব জার্মানী ও সোভিয়েট দেশ পরিক্রমা'। এই সব কারণেই 'রঙ্গমঞ্চ—ওদেশে এবং এদেশে' লেখাটি এতদিন বন্ধ রাখতে হয়েছিল এই জন্য প্রথমেই এই প্রবন্ধের পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এই শীর্ষকে ব্রেশট সম্বন্ধে আমার শেষ লেখা প্রকাশিত হয়েছিল এই বছরের সাতই মার্চের সাপ্তাহিকে। তার পর থেকেই আবার আরম্ভ করছি।]

দ্বিতীয় অধ্যায়

বার্লিন (১৯২৪—১৯৩৩)

Into the cities came I in the time of disorder..

Brecht, An die Nachgeborenen.

বার্লিন চিরকালই ব্রেশটকে আকর্ষণ করেছে—এই জগতের আধুনিক বিরাট শহরকে অন্তর থেকে ঘৃণা করতেই তিনি ভালবাসতেন। বিরাট পাথর, কন্‌ক্রিট এবং এস্‌ক্যালটের স্তূপ—এখানকার মানুষ যেন জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছে। বিংশ শতাব্দীর পৃথিবী অতি ভয়াবহ এবং সর্বনাশকর জায়গা — সর্বত্র কামোন্মত্ততা, কলুষতা এবং লোভ—এ পৃথিবীর আসল রূপায়ণ দেখা যায় বড় বড় শহরে—বার্লিন এমনই একটি শহর। অবজ্ঞাভরে ব্রেশট বার্লিনের উপনাম দিয়েছিলেন মেহগনী। সুতরাং তাঁর বিখ্যাত ওপেরা 'রাইজ এণ্ড ফল অভ দি টাউন অভ মেহগনী' বার্লিনেরই উত্থান-পতনের কাহিনী। এই ওপেরাটি এবার বার্লিনে দেখেছিলাম। ব্রেশটের এই ওপেরার বার্লিন হচ্ছে মিডল টেয়েন্টিজ এবং আরলি আরটিজের বার্লিন—অর্থাৎ যখন এই বিরাট শহরটি ঠাসা হয়েছিল চিত্রশালা, বাদ্যঘর এবং অসংখ্য গণিকালয়ের দ্বারা। (পূর্ব বার্লিনে গণিকাবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত হয়েছে।) ঐ সময়ের মেহগনী বা বার্লিনে অর্থ থাকলেই সব কিছু পাওয়া যেত এবং অর্থের অভাবটাই ছিল সব থেকে বড় অপরাধ।

যুবক ব্রেশট এই বার্লিন শহরেই তাঁর অপরিসীম উচ্চাশার অগ্রগতির পথ খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন—এইভাবেই তিনি যশ, প্রভাব ও প্রতিপত্তি অর্জন করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। বার্নার্ড রাইসের মতে—

Brecht at that time believed that he would have to create for himself a network of followers and believers that would cover the whole of Ger-

বের্টোল্ট ব্রেশট—১৯৪৫ সালে

many, people who would work for a new art of the theatre from key positions—in theatres, publishing houses, and newspapers. He saw himself as the chieftain of this band.

ব্রেশট মনেপ্রাণে উপলব্ধি করেছিলেন যে, পচনশীল জার্মান থিয়েটারকে নতুন-ভাবে গড়তে হলে দেশের কেন্দ্রভূমি থেকেই তা করতে হবে—আর জার্মান থিয়েটারের কেন্দ্রভূমি বলতে বার্লিনকেই বোঝায় এ বিষয়েও তাঁর মনে কোন সন্দেহ ছিল না।

১৯২৪ সালের শেষদিকে ব্রেশট বার্লিনে চলে এলেন। এই বছরের অক্টোবর মাসে তাঁর নাটক 'ইম ডিকইসট' ডয়েটসে থিয়েটারে মঞ্চস্থ হবার ব্যবস্থা হয়েছিল। তার পরেই ডিসেম্বর মাসে প্রাসিয়ান থিয়েটারে ব্রেশটের 'এডওয়ার্ড দি সেকেণ্ড' অভিনীত হয়। মারলোর নাটকের উপর ভিত্তি করেই ব্রেশটের নাটকটি রচিত হয়েছিল।

এই সময় ব্রেশট আবার ডয়েটসে থিয়েটারের ড্রামাটর্জ বা লিটারারি ডিরেক্টরের পদ গ্রহণ করেন।

থিয়েটার বিষয়ক নানা ধরণের কার্য-কলাপে ব্রেশট এখন থেকে প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে আত্মনিয়োগ করলেন। বার্লিনের নাট্যজগৎ এবং সাহিত্যিকগোষ্ঠীর সঙ্গে তর্কবিতর্কে যোগ দিতেন, সবাই মিলে নাট্য উন্নয়নের পরিকল্পনা করতেন—এ সব বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেই বেশির ভাগ সময় কেটে যেত।

এই সময়ের বার্লিনের [illegible] সমধিক প্রভাব ছিল তিনজন বিখ্যাত প্রডিউসারের (১) রাইনহার্ট—প্রডাকসন ব্যাপারে এঁর একটা নিজস্ব কালারফুল স্টাইল ছিল—রিয়ালিজম এবং রোমাণ্টি-সিজমের মিশ্রণের ভেতর দিয়েই ইনি নাটকের বক্তব্যকে রূপায়িত করবার চেষ্টা করতেন। এই সময়টায় রাইনহার্ট চাইছিলেন মঞ্চের উপর সম্পূর্ণ নতুন ধরণের জগতের চেহারা দেখাতে—যেমন ধরুন সার্কাসের দৃশ্য বা প্রকাণ্ড একটি সমগ্র হলঘরের অবতারণা করা অথবা একটা সমগ্র শহরকে মঞ্চমায়ার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করা। সলজবুর্গ ফেস্টিভ্যালে ম্যাক্স রাইনহার্ট তাঁর 'এভরিম্যানে' তাঁর মনের এই ধরণের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করে-ছিলেন।

(২) লিওপোল্ড জেসনার—ইনি স্টাট্স থিয়েটারের (প্রাশিয়ান স্টেট থিয়েটার) সঙ্গে যুক্ত ছিলেন—অভিব্যক্তি-বাদের প্রয়োগে ইনি ক্ল্যাসিক্সের মঞ্চ-রূপায়ণ করতেন। এঁর সমস্ত প্রডাকসনই হোত অত্যন্ত স্টাইলাইজড ধরণের।

(৩) আর ছিলেন উগ্র বামপন্থী এরউইন পিসকেটর। ইনি এ্যাজিটপ্রপ্ থিয়েটারে নাটক প্রডিউস করতেন।

পিসকেটর মনে করতেন রঙ্গমঞ্চের সব থেকে বড় কাজ হল জনগণের সংগঠন করা। তিনি চাইছিলেন সমসাময়িক রাজনীতি প্রচার করবার জন্য একটি উদ্দেশ্যমূলক থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করতে।

এই [illegible] থিয়েটারে [illegible] গ্রাফস, তথ্যমূলক ক্যাপশনস, ল্যানটার্ন স্লাইডস (ফোটোগ্রাফস এবং ডকুমেন্টস সংক্রান্ত), নিউজরিলস এবং ডকুমেন্টারী ফিল্ম ব্যবহার করতেন—যাতে নাটকের দর্শকদের কাছে স্পষ্ট হয়ে পটভূমিকা দর্শকদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর শিক্ষামূলক কোনো কিছুর প্রচার করবার জন্য কোরাসের সাহায্য নেওয়া হোত—তারা তাদের বক্তব্য হয়—সংলাপ, না হয় সঙ্গীতের সাহায্যে দর্শক-দের কাছে নিবেদন করতো। এই কোরাস কখনও মঞ্চের উপর থাকতো, আবার সময় সময় প্রেক্ষাগৃহের ভেতর থেকেই অভিনয় করতো। এর ফলে দর্শকরাও যেন নাটকের এ্যাকসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়তো।

Piscator's aim was a theatre that would be political, technological—and epic.

এপিক শব্দের দ্বারা তিনি বোঝাতে চাইতেন যে তাঁর নাটক চিরাচরিত ওয়েল মেইড প্লের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের—a kind of illustrated lecture or newspaper report on a political or social theme, loosely constructed in the shape of a serious revue: a sequence of musical numbers, sketches, film, declamation, sometimes linked by one or several narrators.

প্রথম যে এপিক নাটক পিসকেটর মঞ্চস্থ করেছিলেন তার নাম হচ্ছে 'ফানেন' —এর ইংরাজী প্রতিশব্দ হচ্ছে ফ্ল্যাগস—লেখক আলফনস পাকেট। এ নাটকের বিষয়বস্তু ছিল ১৮৮৬ সালের শিকাগো এনার্কিস্টদের বিচার বা ট্রায়াল। নাটকের অভিনয়ের প্রস্তাবনার সময় স্টেজের পেছনে টাঙানো পর্দার উপর এই ইতি-হাসের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ছবি প্রজেক্ট করা হয়েছিল। প্রত্যেক দৃশ্যের পর মঞ্চের দুদিকে স্থাপিত বোর্ডের উপর লিখিত ভাষ্য দেওয়া হচ্ছিল। পিসকেটর দাবি করেছিলেন যে, 'ফানেনই' হচ্ছে প্রথম মার্কসিস্ট নাটক এবং এটি তিনিই প্রথম মঞ্চস্থ করতে সাহসী হয়েছিলেন।

[ক্রমশ]

"মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে
লুকায় অশনি"
সাধনার
মহাভৃঙ্গরাজ তেল
মেঘের মত ঘন কুন্তল কেশদাম নারীদের আভিজাত্যের নিদর্শন। তাই কবি বলেছেন— "চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা" সেইজন্য সৌন্দর্য বিলাসিনী মাত্রেই ব্যবহার করেন সাধনার মহাভৃঙ্গরাজ তেল বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদ মতে প্রস্তুত স্নিগ্ধ ও শীতল। কেশ উৎপাদনে ও সংরক্ষণে এর জুড়ি নেই।
সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা
৩৬. সাধনা ঔষধালয় রোড. সাধনা নগর. কলিকাতা · ৪৮
অধ্যক্ষ যোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম.এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ.সি.এস (লণ্ডন), এম.সি.এস (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

সন্ধ্যা রায়
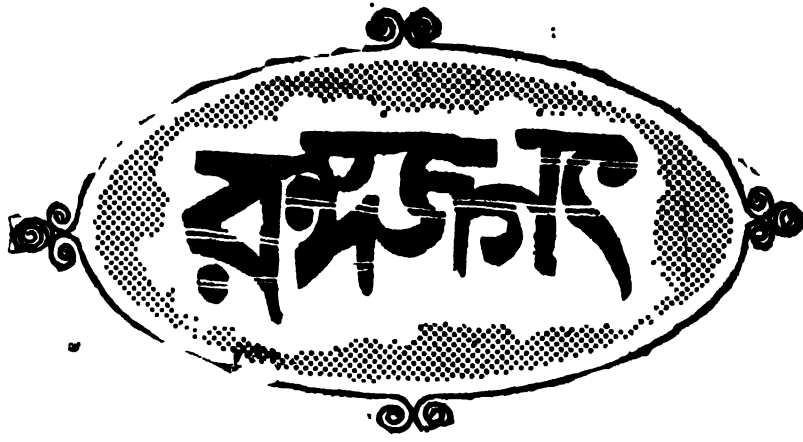
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের ওয়েলফেয়ার বোর্ডের উদ্যোগে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া অফিসের হলঘরে এক নাটকের প্রতিযোগিতা হয়েছে। এই প্রতিযোগিতা বিভিন্ন দিক থেকে বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসের কর্মচারীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছেন। আটদিনব্যাপী প্রতিযোগিতায় সাতাশটি একাঙ্ক নাটক অভিনীত হয়েছে। সরকারী কর্মচারীরা সারাদিনের পরিশ্রমের পর অবসর বিনোদনের উদ্দেশ্যে নাটক করেন। কিন্তু তা-সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে যে অভিনয়-প্রতিভা, নাটক পরিচালনের দক্ষতা এবং নাটক রচনার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেছে তা বিস্ময়ের। যাঁরা নিয়মিত নাটক অভিনয় করে থাকেন, আংশিক পেশা হিসাবে অভিনয়কে গ্রহণ করেছেন তাঁদের সঙ্গে তুলনায় এঁরা দক্ষতার দিক থেকে মোটেই কম নন।

সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি। সাধারণভাবে অনেকে অফিস ক্লাবগুলি সম্পর্কে তাচ্ছিল্যের সুরে বলে থাকেন—তাঁরা নাকি নাটকের ব্যাপারে পুরাতনপন্থী। কিন্তু যাঁরা এই সাতাশটি নাটক দেখেছেন তাঁরা এই উক্তিকে ভুল মনে করবেন। এই সাতাশটি নাটকের মধ্যে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি, সমস্যা ও চিন্তাধারা প্রতিফলিত হয়েছে। সেখানে সাম্প্রদায়িক সমস্যার বিরুদ্ধে উদ্বেগ দেখেছি 'আদাব' নাটকে; কয়লাখনি শ্রমিকের দুর্ভাগ্য ও শোষণের তীব্রতায় তাদের শোচনীয় অবস্থা গ্রামাঞ্চলের কৃষক—যারা সারা দেশকে অন্ন যোগাচ্ছে, অথচ তাদের ঘরে ঘরে চালের অভাব; শহরে শ্রমিকশ্রেণীর বিক্ষোভ, ধর্মঘট, এবং ধর্মঘটকে বানচাল করার চক্রান্ত, অভাব ও দৈন্যের জ্বালা থেকে পরিত্রাণের জন্য যারা জীবন থেকে পলায়ন করতে চায়—তাদের অভিজ্ঞতার সংগ্রামের বাণী এই নাটকগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। যুদ্ধের ভয়াবহ দিন শেষ হলেও আজো যে সমাজের স্তরে স্তরে যুদ্ধ চলছে তারই কথা এসেছে একটি নাটকে। আর এসেছে বিপ্লবকে সংগঠন করার ব্যাপারে বিপ্লবীদের ভূমিকা বিষয়ে আদর্শগত সংঘর্ষের কথা। এই সঙ্গে পরিবেশন করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'কালের যাত্রা'।

আজ বিশ্বব্যাপী যে দুটি মানবতাবোধ মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে তারই স্পষ্ট প্রকাশ এই নাটকগুলিতে হয়েছে। একদিকে উদার মানবিকতা। যে মানবিকতা সমাজের শোষিত মানুষের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়ে তোলে। আবার এই উদার মানবিকতার মুখোস পরে যারা ভেজালের ব্যবসা করে—সেই নীতিহীনদের মুখোস খুলে ধরার নাটকও অভিনীত হয়েছে। আর একদিকে এসেছে বিপ্লবী মানবিকতার বাণী। যে মানবিকতা শেখায় যারা শোষণ করে তাদের ঘৃণা করতে। শোষণের মূলোচ্ছেদ করার জন্য কঠোর ও নির্মম হতে।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা উচ্চশিক্ষিত এবং সমাজের প্রগতিশীল অংশ। তাঁরা প্রগতিশীল চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন নাটকগুলিতে। নাটকের প্রতিযোগিতা হলেও—বাস্তবিকপক্ষে এই প্রতিযোগিতা হয়ে উঠেছিল নাটকের উৎসব। এই উৎসবে আশার বাণী, বলিষ্ঠ সমাজচেতনা এবং অবসর মুহূর্তকে সুন্দর জীবন গঠনের স্বপ্ন ও সংগ্রামে রূপান্তরিত করার বাসনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁদের এই উৎসব সার্থক; এবং

ঝুক্ গয়া আসমান

আর, ডি, বনশাল বাংলা ছবি প্রযোজনা করে প্রযোজক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। নবীন ও প্রবীণ পরিচালকদের এবং সত্যজিৎ রায়কে দিয়েও তিনি ছবি করেছিলেন। আর, ডি, বি প্রযোজিত ও সত্যজিৎ রায় পরিচালিত ছবি দেশে-বিদেশে প্রশংসা ও সম্মান লাভ করেছে এবং প্রযোজক হিসাবে শ্রীবনশাল প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। সম্প্রতি তিনি সারা ভারতে ব্যবসার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দী ছবি প্রযোজনা করেছেন। আর, ডি বি'র প্রথম হিন্দী ছবি 'ঝুক গয়া আসমান কলকাতায় মুক্তিলাভ করেছে। ছবিটি রঙীন, দামী চিত্রতারকা ও বহু অর্থব্যয়ে ছবিটি নির্মিত হয়েছে।

ছবির নায়ক সঞ্জয় দার্জিলিং-এ একজন ট্যুরিস্ট গাইড। একটি গাড়ি, আর বন্ধু মাত্র তার সম্বল। হোস্টেলের ছাত্রী প্রিয়ার সঙ্গে তার পরিচয়ে প্রেম। প্রিয়াকে গাড়িতে তুলে দিতে এসে এ্যাক্সিডেণ্টে সে মারা যায়। কিন্তু স্বর্গে গেলে জানা যায় তার পরমায়ু শেষ হয় নি, যমদূত ভুল করে তাকে নিয়ে এসেছে। ভুল সংশোধনের জন্য তাকে এমন একজনের দেহে ঢুকিয়ে দেওয়া হল যে অবিকল দেখতে তারই মত। লোকটি বিরাট শিল্পপতি। সঞ্জয় তার দেহে নবজন্ম লাভের পর শিল্পপতির কাজকর্মে পরিবর্তন দেখা যায়: অফিসের

ডাচ ছবি 'ডান্স অব হেরন'-এর একটি দৃশ্য।

প্রকৃতির লোকটি ভাল লোকের আস্থা ধারণ করে সৎ হয়ে যায়। অনেক ঘটনার পর প্রেমিকার সঙ্গেও তার মিলন হয়। ছোট ভাই ঈর্ষাকাতর। সে সজ্জনকে বিষ খাইয়ে মারতে চায়। অবশেষে তার চক্রান্ত ধরা পড়ে, আর দুজনার মধ্যে দারুণ লড়াইয়ের পর ছোট ভাই কাবু হয়ে দোষ কবুল করে।

ছবিটি ক্রাইম, সেক্স, রোমান্স, কমিক, ফ্যানটাসি ও ভাবপ্রবণতার নাচ, গান, রূপক প্রভৃতি মিশ্রিত রসের ছবি। এ ধরণের বিদেশী ছবি আজকাল লোকে লাইনে দাঁড়িয়ে দেখে। সুতরাং এই ছবিটিও সেদিক থেকে আকর্ষণীয় হবে।

অভিনয়ে রয়েছে রাজেন্দ্রকুমার, সায়রাবানু, দুর্গা খোটে, রাজিন্দর নাথ, প্রেম চোপরা, প্রবীণ চৌধুরী, ডেভিড, মধুমতী, সুলোচনা প্রমুখ। ছবির পরিচালক —লেখ টান্ডন।

দুটি ডাচ ছবি

গত ১লা সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতায় ডাচ চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধন হয়েছে। উদ্বোধন করেছেন নেদারল্যান্ড দূতাবাসের প্রথম সেক্রেটারী মিঃ জে, জি, জঙ। সকালে রক্সি সিনেমায় সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা সোসাইটি সিনেমায় সিনেক্লাব-ক্যালকাটা এবং ছায়া সিনেমায় নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়েছে। প্রথম দিন তিনটি অনুষ্ঠানে "এ মর্নিং অব সিক্স উইকস্" ছবিটি দেখান হয়েছে।

দ্বিতীয় ছবি "দি ডান্স অব দি হেরন"। ফনস্ রাডেমেকার পরিচালিত এই ছবি ডাচ ছবির জগৎকে ইউরোপের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। অভিনয়ের শিল্পীর দিক থেকে যেমন এলিনের ভূমিকায় গানেল লিন্ডব্লমকে নির্বাচন করেছে, কাহিনীর আবেদনও ব্যাপক। হুগো ক্লজ লিখিত চিত্রনাট্য এই ছবির অবলম্বন। এক বিবাহিত দম্পতিকে কেন্দ্র করে কাহিনীর নাটকীয় রস ও দ্বন্দ্ব গড়ে উঠেছে। এলিনে আর এডওয়ার্ড একদিন হয়ত ভালবেসেই বিয়ে করেছিল। [illegible] পরে হঠাৎ তাদের [illegible] দেখা দেয়। ছবির শুরু এং ন [illegible]। সমুদ্র তীরবর্তী এক গ্রামে বিশ্রাম [illegible] করতে গিয়েছে। [illegible] এডওয়ার্ডের মনে সন্দেহ [illegible]। এলিনের [illegible] এডওয়ার্ড সমান [illegible]। এডওয়ার্ডের [illegible] ইন্ধন যোগাচ্ছে। [illegible] এলিনের [illegible] প্রকাশ করে। [illegible] জন্য [illegible] রইল। কোন ব্যাপারেই [illegible] না। কোন ব্যাপারে উৎসাহ দেখায় না। [illegible] এলিনে আরো [illegible] সমুদ্রতীরে এক ব্যক্তির সংগে দেখা হয়, তাকে সে বাড়ি নিয়ে আসে তার সংগে এমন ব্যবহার করে স্বামী যাতে [illegible] হয়ে তার প্রতি উপেক্ষার ব্যবহার না করে। কিন্তু এতেও কাজ হয় না। এবার এডওয়ার্ড এমন ভাব দেখায় যেন সে আত্মহননের

ডাচ ছবি "এ মর্নিং অব সিক্স উইকস"-এর একটি দৃশ্য

দিকে চলেছে। অ্যালনে হঠাৎ যেন সামলে যায়। এডওয়ার্ডকে নিয়ে সে সমুদ্রে যায়, এডওয়ার্ডের মনেও পরিবর্তন দেখা যায়।

দাম্পত্য জীবনের ব্যক্তিগত চিন্তা ও ব্যবহারের মুহূর্তগুলিকে কেন্দ্র করে এই ছবি পরিচালনা ও সম্পাদনা গুণে দেখতে ভালই লাগে। নাচে, গানে এবং কাহিনীর নাটকীয়তায় ছবিটি উপভোগ্য। যদিও গতি কিছুটা ধীর কিন্তু নেদারল্যাণ্ডের জীবনের সংগে তা সঙ্গতিপূর্ণ।

আর একটি ছবি "প্যারানইয়া"। প্যারানইয়া মানসিক রোগ। ছবির নায়ক এণ্টনক্রিভার যুদ্ধের স্মৃতিতে রোগগ্রস্ত। সে মনে করে পুলিশ তাকে খোঁজ করতো জার্মান এস. এস বাহিনীর লোক হিসাবে। এই চিন্তায় সে নিজেকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখে। বাড়িওয়ালা তাকে তাড়াতে চায়। এতে বাড়িওয়ালার ওপর তার রাগ। আনা তাকে ভালবাসে। কিন্তু সে ভালবাসার প্রতিদান কিছুই নেই। একদিন আনার বাবা এজন্য আনাকে সাবধান করে দেয়। সেদিনই আনা এণ্টনের ঘরে যায় তাকে রান্না করে খাওয়াতে। এণ্টন এমন যৌন আবেগ প্রকাশ করে যাতে আনা তাকে তার দেহ সঁপে দেয়। কিন্তু যৌনাবেগের চরম মুহূর্তে এণ্টন তাকে বিবস্ত্রা অবস্থায় ভিন্ন ঘরে আটক করে রাখে। ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়িওয়ালা উপস্থিত হলে এণ্টন তাকে গুলী করে, আনার ঘরের দিকে গুলী ছোড়ে এবং নিজে নিচে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে।

ছবিটির বক্তব্য স্পষ্ট নয়। যুদ্ধের স্মৃতি তাকে পীড়ন করছে, কিন্তু তার থেকে কি বলতে চায় সে। আনা একবার তার বাবাকে বলল—যুদ্ধের কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। কিন্তু সভ্যতার এত বড় কলঙ্কময় অধ্যায়কে মানুষ ভুলবে কেন? এই কথাকে বলবার জন্য পরিচালনা অত্যন্ত ধীর গতিতে কাহিনীকে এমন যন্ত্রণাদায়ক করে এগিয়েছেন যে দর্শকরা পীড়িত হয়ে ওঠে। সময় সময় তিনি বিবস্ত্রা নারীদেহ দেখিয়ে (যার প্রয়োজন ছিল না) দর্শকদের রস দেবার চেষ্টা করেছেন। শেষ পর্যন্ত এণ্টন ও আনার দোলাচলের যে দৃশ্য—তা নিছক পর্নোগ্রাফির পর্যায়ে পড়ে।

পরিচ্ছন্ন বক্তব্যহীন ছবিতে এ দৃশ্যের তেমন শিল্পমূল্য নেই। শেষ পর্যন্ত মনে হয় পরিচালক নিজেই বুঝি মানসিক রোগে ভুগছেন। ছবিটির পরিচালক এড্রিয়ান ডিটভূর্স্ট।

এই পূর্ণাঙ্গ ছবিগুলির সংগে কয়েকটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি দেখান হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে—'আ-তামারা', দি ফ্লাওয়ার্স, পিয়ানো পোর্ট্রেট ইত্যাদি।

ন্যাভো প্রোডাকসনের 'গড় নাসমপুর' ছবির একটি দৃশ্যে দেব মুখার্জী সুব্রতা চ্যাটার্জী।

একা নয়

গন্ধর্ব নাট্যসংস্থা দীর্ঘদিন পরে একটি নাটক মঞ্চস্থ করেছে। নাটকটি বিষয়-বস্তুর গুণে দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়েছে। ম্যাক্সিম গর্কির গল্প নাটকের অবলম্বন। স্বাধীনতার অর্থ কি? ব্যক্তির স্বাধীনতা না সমাজের স্বাধীনতা—এই প্রশ্নগুলি জেগেছে এক প্রাণবন্ত যুবকের মনে। গ্রামবন্ধু দুটি গল্পে তার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে। প্রথম গল্পটি এক চঞ্চল অস্থির যুবক বিটলুর। সে সমাজ মানে না, মানে না কোন বন্ধন। তার কাছে স্বাধীনতার অর্থ যখন মন যা চায় তাই করা। মনের চালনায় সে যা খুশি করে, মনকে সমাজের দশজনের সংগে একই সূত্রে বাঁধে না। বিটলুর স্বাধীনতা তাই গিয়ে পৌঁছলো ব্যক্তিসর্বস্বতায়, আত্মকেন্দ্রিকতায়। এই আত্মকেন্দ্রিকতার জন্য যাকে তার ভাল লেগেছিল তাকেও গ্রহণ করতে পারল না। তার সব বাধার বাসনাকে সে গলা টিপে হত্যা করল—জীবনকে পিছুটান থেকে মুক্ত করতে। কিন্তু এমন একটা সময় এল যখন সে নিজেকে নিঃসঙ্গ, সম্পূর্ণ একা মনে করল। যাকে সে স্বাধীনতা মনে করেছে সেই স্বাধীনতা তার কাছে হয়ে উঠলো বিচ্ছিন্নতা। বিটলু নিজে সেদিন সবার কাছে শাস্তি চাইল, শাস্তির জন্য সে আকুতি জানাল; শাস্তিই তাকে দেবে শান্তি।

দ্বিতীয় গল্প শোনাল সুনন্দর। অত্যাচার ও শোষণ অসহ্য হওয়ায় গ্রামের মোড়ল গ্রাম ছেড়ে চলে আসছিল—নতুন জীবনের সন্ধানে। এমন একটা দেশে তারা যেতে চায় যেখানে শোষণ নেই, নির্যাতন নেই, সকলের জন্য স্বাধীনতা আছে। মাঝপথে এসে মোড়ল অনুভব করল গ্রামে আরো অনেককে তারা রেখে এসেছে। সুখ যদি অর্জন করতে হয় সকলকে নিয়ে করতে হবে। সে গ্রামে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তার ছেলে সুনন্দকে করল মোড়ল। পথের মাঝে হঠাৎ উপস্থিত হল সংশয়। সহযাত্রীদের মনে দেখা দিল অবিশ্বাস, সন্দেহ। সুনন্দ তার মুখোমুখি দাঁড়াল, সে পাশ কাটাবার বা অন্যদের ছেড়ে যাবার কথাও ভাবল না। সহযাত্রীদের চেতনার স্তর মেনে নিয়ে এই সংশয় সে নিজের

ছায়ারূপার 'প্রথম বসন্ত' ছবিতে বিকাশ রায়, মাধবী মুখার্জী ও পাহাড়ী সান্যাল

ব্যর্থতা বলেই স্বীকার করল। জীবন দিয়ে সে জীবনদীপ জ্বালিয়ে গেল—সকলের জন্য স্বাধীনতার অভিযানকে অগ্রসর করতে।

রাত্রিতে বসে গ্রামবৃদ্ধ এই দুটি গল্পে স্বাধীনতার অর্থ শোনাল। 'একা নয়' নাটকটি রূপকথার মেজাজে উপস্থাপিত হয়েছে। উপস্থাপনা রীতি বিশেষ প্রশংসনীয়। রূপকথার মেজাজ এবং বক্তব্যের বলিষ্ঠতার জন্য নাটকটি দর্শকদের ভাল লাগবে। তবে এই নাটকে মঞ্চসজ্জা ও আলোর কাজের দিকে আরো নজর রাখলে ভাল হতো। আগাগোড়া নাটকটি রাত্রির আবছা অন্ধকারে উপস্থিত করার কারণ নেই। সুনন্দর গল্পাংশে সাদা আলোয় কাহিনী উপস্থিত করা যেতে পারত। বিটলু এবং সুনন্দ—দুই দৃশ্যের দৃশ্যসজ্জা ভিন্নরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অভিনয়ের দিক থেকে সকলে মোটামুটি চরিত্রগুলিকে যথার্থভাবে উপস্থিত করেছেন। তবে সুনন্দর অভিনয় আরো উন্নত হবার সুযোগ আছে। বিশেষ করে তাঁর উচ্চারণে আরো স্পষ্ট, আরো দৃঢ়তাব্যঞ্জক হতে হবে।

পরিচালনার ব্যাপারে রূপকথার মেজাজটি আরো স্পষ্টতর করার চেষ্টা করলে আরো উপভোগ্য হবে মনে হয়। গ্রামবাসীদের মুভমেন্ট কোরিওগ্রাফিক হলে এই অংশ আরো ছন্দোময় এবং উপভোগ্য হবে। সংলাপ আরো কাব্যধর্মী করার অবকাশ আছে।

'একা নয়' নাটক মঞ্চরূপায়ণের জন্য আমরা 'গন্ধর্ব'কে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই নাটকটি বর্তমান কালোপযোগী। নাটকটি ব্যাপক অভিনীত হওয়া দরকার।

নাট্যরসের দিক থেকেও দর্শকরা এখানে নতুনত্ব উপভোগ করবেন। তাই নাটকটিকে আরো সুসম্পূর্ণ করার দিকে গান্ধর্ব মনোযোগী হলে আমরা আনন্দিত হবো।

বুলগেরীয় ও চেকোশ্লাভাক চলচ্চিত্র সেসন

সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটার উদ্যোগে আগামী ১১ই থেকে ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রাচী সিনেমায় বুলগেরীয় ছবি দেখান হবে। এই সেসনে দেখান হবেঃ এ সাইড ট্রাক, এ রেস্টলেস হোম, নাইট উইদ-আউট আর্মার, দি পীচ থিপ।
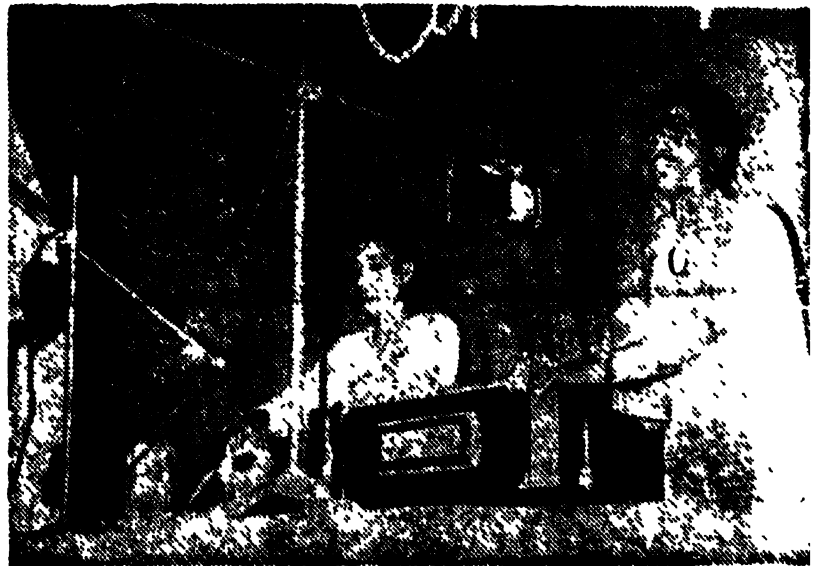
আগামী ১৪ই থেকে ১৯শে সেপ্টেম্বর চেকোশ্লোভাক ছবির সেসন শুরু হবে। এতে দেখান হবে ; ক্যারেজ টু ভিয়েনা, দি এন্ড অব এজেন্ট ডবলিউ সি ফোর সান ইন দি নেট, রোমান্স ফর বিউগিল সেটালেন এযারশিপ।

বোখারোর সংগীত অনুষ্ঠান

সম্প্রতি বোখারোতে দু দিনব্যাপী একটি মনোরম সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল। অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সনৎ সিংহ, দিলীপ চক্রবর্তী, মীরা বিশ্বাস, বুবাই বিশ্বাস, কমলেশ বোস ও সুশীল চক্রবর্তী।

ভারতীয় সংগীত মহাবিদ্যালয়

আগামী ১৪ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম মঞ্চে ভারতী সংগীত মহাবিদ্যালয়ের অষ্টাদশ সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। উদ্বোধন করবেন শ্রীঅজিতকুমার দত্ত, প্রাক্তন এ্যাডভোকেট জেনারেল। সভাপতিত্ব করবেন শ্রীদেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। পারিতোষিক বিতরণ করবেনঃ শ্রীমতী কুন্ডু। উক্ত উৎসবে সংগীতানুষ্ঠানের পর মহাবিদ্যালয়ের কুশলী ছাত্রীগণ "সীতাহরণ" নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করবে।

বোখারোয় অনুষ্ঠিত সঙ্গীত অনুষ্ঠানে তরুণ শিল্পী দিলীপ চক্রবর্তী সঙ্গীত পরিবেশন করছেন।

'মানুষ ও মনুষ্যত্বের জন্য' প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত এই নিবন্ধের জন্য প্রথমেই কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই; কারণ বর্তমানে বাংলাদেশে সাহিত্যে যে ধরণের বিকাশ পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাতে একমাত্র বীরেন্দ্রবাবুই মূল কেন্দ্র অনুসন্ধানের দিকে তামাম পাঠকসমাজকে নির্দেশ দিয়েছেন। এইভাবে অন্য কোন মানুষ সাহিত্যের শ্লীল ও অশ্লীল দৃষ্টিকোণের বিচার করেছেন বলে আমার জানা নেই।

সুতরাং সত্যিসত্যিই "মানুষ ও মনুষ্যত্বের জন্য" সাহিত্যের মাধ্যমে কতখানি চিন্তা করাতে পারে, তা বিচার করার সময় এসেছে। এবং এইখানেই বীরেনবাবুর কথামত উদ্ধৃতি সহকারে আমার এই প্রবন্ধের সূত্রপাত করাই ভাল :

কিন্তু মশাইরা! যদি আপনারা এ কথাই মনে করে থাকেন যে অশ্লীল সাহিত্য আজ আমাদের পথে বসাচ্ছে, তাহলে এতদিন ধরে যে শ্লীল সাহিত্য বাংলাদেশে লেখা হয়ে এসেছে, তার জন্য আপনারা কতটুকু কী করেছেন?"

এহেন মশাইদের আক্রমণে আমার ব্যক্তিগত কিছু বক্তব্য আছে। আমি মনে করি, সাহিত্যিক হচ্ছে প্রকৃত মানুষ আর বাকী যারা রাম-শ্যাম যদু-মধুর আসনে বসে থাকে, তারা মানুষের পর্যায়ে একাসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে না। কারণ—সাহিত্যিকদের দৃষ্টিতে সুন্দরের রূপ দেখেই সাধারণ সমাজ সুন্দরকে চিনতে বা জানতে শেখে। সবাই যদি সাহিত্যের শ্লীল বা অশ্লীল বুঝে ফেলবে, তাহলে শ্লীল/অশ্লীল নিয়ে তত্ত্ব ও তথ্যে এত কালনেমির লঙ্কা ভাগ হচ্ছেই বা কেন? সুতরাং সাহিত্য যেমন সবাই সমান পর্যায়ে নিতে পারে না, তেমন সবাই সাহিত্য সুন্দরকে সমান পর্যায়ে দিতে পারে না।

এই সুন্দরকে অনুভব করে সুষ্ঠুভাবে পরিবেশন করা সাহিত্যিকদের কাজ, সুতরাং প্রথমে যাঁরা সাহিত্যের আসরে সাহিত্যিকের নামাবলী গায়ে বাজারে এসেছেন, তাঁদের কাছেই বীরেনবাবুর প্রশ্নটা করা উচিত ছিল; এবং আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে, তিনি যাঁদের সৎসাহিত্যিক নামে অভিহিত করেছেন, তাঁরা এবং তিনি এ বিষয়ে কতখানি অগ্রসর হয়েছেন? সে বিষয়ে সাধারণ পাঠকসমাজের ভেতরে ও বীরেনবাবুর "মশাই"-এর একজন হয়ে নিশ্চয়ই প্রশ্ন রাখতে পারি।

দ্বিতীয়ত তাঁর নিবন্ধে তিনি লিটল ম্যাগাজিনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ

বাদ জানাই। এইসঙ্গে অনেকগুলি কথা থেকে যায়—লিটল ম্যাগাজিন নিশ্চয় লক্ষ্য করা উচিত এবং সেই সঙ্গে যে সকল সাহিত্যিক "মানুষ ও মনুষ্যত্বের জন্য" নীরব চিৎকার করছেন, তাঁদেরও একটু সচেষ্ট হওয়ার প্রয়োজন আছে। কারণ বীরেনবাবুর উল্লিখিত নামের অনেকেই লিটল ম্যাগাজিনে বিনা অর্থপাতে রচনা দিতে উৎসাহী হন না বলেই মনে করি। সুতরাং লিটল ম্যাগাজিন কর্তারা শেষ পর্যন্ত তাঁদের মোসাহেবী ছাড়া অন্য উপায় দেখেন না বলেই বিশ্বাস।

আর তাছাড়া, লিটল ম্যাগাজিন সংরক্ষণের কথা আজ পর্যন্ত কেমন সহৃদয় সাহিত্যিক ভেবেছেন বলে আমার জানা নেই। এদেশে বহু পত্রিকার জন্মের কিছু পরেই যে স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে তার সঠিক হিসেব রাখা কোনওদিন সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। অথচ "মানুষ ও মনুষ্যত্বের জন্য" মশাইদের লিটল ম্যাগাজিনগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের অনুরোধের পূর্বে লিটল ম্যাগাজিন সংরক্ষণশালা গঠনের জন্য আন্দোলন করা উচিত, এবং আমার মতে এই আন্দোলনের নেতারা হবেন সেই সকল সাহিত্যিকরা যাঁরা সত্যিসত্যিই "মানুষ ও মনুষ্যত্বের জন্য" নিম্নলিখিত কার্যগুলির প্রতি নিজেরা আত্মনিয়োগ করবেন :

(ক) অর্থের জন্য অশ্লীল পত্রিকাতে রচনা স্বনামে বা বেনামে লিখবেন না।

(খ) কোন সময়েই বাজারী পত্রিকাগুলি (যারা সাহিত্যের নামে ভণ্ডামী করে) সমর্থন করবেন না বা অর্থের বিনিময়ে নিজেদের প্রয়োজনেও কিনবেন না।

(গ) পল্লীতে পল্লীতে লিটল ম্যাগাজিনগুলির সমর্থনে সংরক্ষণশালা গঠন করতে সক্রিয় সহযোগিতা করতে হবে।

(ঘ) পল্লীতে পল্লীতে অন্তত মাসে একদিন সাহিত্যবাসরের আয়োজন করে সমাজদর্শন, রাজনৈতিক আলোচনা, কবিতা পাঠ প্রভৃতিতে সক্রিয় সহযোগিতা করতে হবে।

(ঙ) "মশাইদের" সঙ্গে সমাজসচেতন [illegible] যোগাযোগে সক্রিয় সহায়তা করতে হবে।

(চ) পল্লীতে পল্লীতে অশ্লীল সাহিত্য বর্জন, অশ্লীল ছবির প্রদর্শনী বর্জন প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাপক গণসভার আয়োজনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে।

আমার মতে "মানুষ ও মনুষ্যত্বের জন্য' শুধু মশাইদের অভিযুক্ত করলে অভিযোগটা একপক্ষীয় হয়ে যায়। সুতরাং লেখকেরা যদি এ বিষয়ে প্রথমেই অগ্রণী না হন, তাহলে পাঠকসমাজ নিরুপায়। যেমন বীরেনবাবু অভিযোগ করে বলেছেন—"অথবা সমরেশকে গাল দেবার আগে, তাঁর 'প্রজাপতি' বা 'গঙ্গা' রচনার জন্য যা প্রাপ্য ছিল, আপনাদের একজনকেও দেখি নি সেই প্রাপ্যটুকু দিতে।" কথাটা বীরেনবাবু ঠিকই বলেছেন, কিন্তু তবুও প্রশ্ন থেকে যায় না কি? বীরেনবাবুর মতে (?) সমরেশবাবু তাঁর প্রাপ্য না পেয়ে কি ইদানীংকালের হৈ-চৈ" সাহিত্য করতে সুরু করেছেন? এক্ষেত্রে বীরেনবাবুর 'আপনারা" থেকে লেখকের দায়িত্বই বেশি, আর সব থেকে দায়ী হচ্ছে তাদের যাঁরা সংবাদপত্রের আড়ালে আত্মগোপন করে তথাকথিত দেশপ্রেমিকের নামাবলী গায়ে বহু অর্থ উপার্জন করে শহরে ও গ্রামে প্রণামী পেয়ে থাকেন। [illegible] সন্তোষ বসুর [illegible] প্রতিধ্বনি [illegible] মেলাতে [illegible]ছেন, ঝগড়া করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্য, যে সাহিত্য নিয়ে ঝগড়ার উল্লেখ করেছেন তিনি, সে সাহিত্য নিয়ে আদৌ কোনো ঝগড়া হয়েছে বলে আমার জানা নেই। যদি তা থাকত, তাহলে নিবাদী বা বাদী, কারুর না কারুর অমন দশা [illegible] যেতো, কিন্তু তা হয় নি—যাঁরা শ্লীল/অশ্লীল নিয়ে এত লেখালেখি করছেন (আয় আমি পর্যন্ত) এবং যাঁরা দিনেরাতে গাঁটের কড়ি দিয়ে কিনে ঘুমের ব্যাঘাত নিয়ে বেঁচে আছেন—এই উভয় দলই বর্তমানে দুর্দান্তভাবে বহাল তবিয়তে আছে বলেই দেখতে পাচ্ছি।

চতুর্থত, বীরেনবাবুর একটি উপমা সত্যিই যথার্থ। তিনি এই প্রসঙ্গে "রোগীর শিয়রে নার্সে"র সেবার সঙ্গে সাহিত্যিকদের সাহিত্য সেবার তুলনা করেছেন। তবুও একটা কথা থেকে যায়। কথাটা হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের, তিনি প্রায়ই বলতেন। "সত্য কথা বলা ভাল বলে সবাই উপদেশ দেন, কিন্তু কেমন করে সত্য কথা বলতে হয়, একথা কেউ বলেন না।" কথাটা যদি আমরা একটু ভাবি, তাহলে হয়ত "মানুষ ও মনুষ্যত্বের জন্য" কিছু করা সম্ভব হবে। নচেৎ ইদানীং শ্লীল/অশ্লীল নিয়ে বাজারে

যে ধরণের সাহিত্যসংখ্যা বেরোচ্ছে, তেমনি হয়ত কোনদিন "মানুষ ও মনুষ্যত্বের জন্য" একটি বিশেষ সংখ্যা বেরোবে। যখন আমরা বেঁচে থেকে তারই ভেতর নিজের নাম খুঁজতে খুঁজতে কফিহাউসের কোনো এক জায়গায় চেয়ার টেবিল দখল করে নিজের হাসি হাসতে থাকব।

—প্রদ্যোতকুমার ঘোষ
১১৪/এ, বিধান সরণী
কলকাতা—৪

"গান্ধীবাদ কি সচল?" প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক বসুমতীর ১১শ সংখ্যায় "গান্ধীবাদ কি সচল?" প্রবন্ধের উপর বহু আলোচনা পড়ে খুশি হলাম। গান্ধী-রাজনীতির মূল্যায়নে বর্তমানে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সত্যই উৎসাহের বিষয় এবং বর্তমানে এর প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করবেন না। দীপক মজুমদার, কামাখ্যাপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও মুন্সী আবদুল আজিজের বক্তব্য ভালো লাগল। গান্ধীজীর উপরে বিশেষ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্ববিপ্লবী দার্শনিক মানবেন্দ্রনাথ রায় বহুপূর্বে অনেকবার তাঁর বিভিন্ন লেখায় করেছেন। পাঠক-পাঠিকাদের মানবেন্দ্রনাথ রায়ের 'প্রবলেম অফ ফ্রিডম' বইটি পড়তে অনুরোধ করছি। বিশেষ করে 'Psycho-analysis of Gandhism' অধ্যায়টি। বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হতে ক্ষুরধার ন্যায় তীক্ষ্ম, সরস এই রচনাশৈলী ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিশ্লেষণের ইতিহাসে এক অপূর্ব সম্পদ। মানবেন্দ্রনাথের পূর্বে কোন রাজনৈতিক নেতা গান্ধীবাদের উপরে ঐ রকম মনন-শীল লেখা আর লেখেন নি এবং সাহসীও হন নি। এও তাৎপর্যময় বটে।

গান্ধীবাদ ও ফ্যাসিজম সম্বন্ধে রায় বলেছেন, -গান্ধীবাদ হল নেগেটিভ নেগেশন অব ফ্রিডম ও ফিয়ার ফ্রম ফ্রিডম। আর ফ্যাসিজিম হল- পজিটিভ নেগেশন অব ফ্রিডম ও ফ্লাইট ফ্রম ফ্রিডম। আমরা কিছু তাঁর লেখা হতে উদ্ধৃত করছি। পাঠক পাঠিকারা ভারতের বর্তমান অবস্থার সংগে তুলনা করে মনের খোরাক পাবেন আশা করি। "Faith is fear of life Ghandhi preaches faith —blind, unadulterated faith amounting to unconditional submission. Those who are afraid of life, are anxious to run away from it, naturally cannot have the will to live. that is, will to be free. Because, there is no freedom

the time of Savonarolla, there were few who thought like him. Ghandhi had the advantage of practically a whole nation thinking like himself, because it has inherited an authoritarian psychology from its cultural traditions, which have not yet been repudiated by the spirit of Renaissance. That is the secret of Ghandhi's success. (P. 35|36—Problem of Freedom).

গান্ধীবাদের মূল্যায়নে রায়ের লেখা বর্তমান যুব-মানসে এক আলোড়ন সৃষ্টি করবে—এ আশা করা অসঙ্গত হবে না। আর তাছাড়া নানাদিক দিয়ে বিশ্লেষণ করাও খুব দরকার এবং পুরাতন লেখার সঙ্গে পরিচয় থাকাও উচিত হবে।

আপনার সাপ্তাহিক এ বিষয়ে আরো অগ্রণী হোক এ আশা করব।

—শ্রীঋষি দাশগুপ্ত
খাটুরা, ২৪ পরগনা

*

অধ্যাপক দিলীপ ঘোষরায়ের "গান্ধী-বাদ কি সচল" (সংখ্যা ১৫ই অগাস্ট) লেখাটি নিঃসন্দেহে যুগোপযোগী হয়েছে, কারণ আজকের ভারতে গান্ধীবাদ থেকে কিছু নেবার আছে কি না সেটা বিশেষ-ভাবে চিন্তা করে দেখবার সময় এসেছে।

গান্ধীমানসের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন যে তাঁর চিন্তার এবং কর্ম-ধারায় এমন অনেক কিছু ছিল যুক্তির মাধ্যমে যার মূল্যায়ন করা প্রায় অসম্ভব। তথাপি আমরা দেখি তিনি পর্যায়ক্রমে যে-ভাবে সমগ্র দেশকে প্রথমে অসহযোগ পরে লবণ সত্যাগ্রহ এবং সর্বশেষে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করেছেন আর কোন নেতার পক্ষে ঐ সময়ের মধ্যে ঐরূপ ব্যাপক আন্দোলনকে রূপদান ও পরিচালিত করা সম্ভব হয় নি। আমি লেখককে বসুমতীর ঐ সংখ্যায় শংকরীপ্রসাদ বসুর "রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র" প্রবন্ধ সুভাষ-চন্দ্রের লেখা/বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃতিগুলি পড়ে দেখতে অনুরোধ করছি। মতবাদের পার্থক্য সত্ত্বেও মহাত্মাকে তিনি জাতির জনক বলে স্বীকার করতে দ্বিধা করেন নি। গান্ধীজীর এই প্রায় অলৌকিক ক্ষমতার উৎস সন্ধানে যিনি সফল হবেন তিনিই হবেন আগামী দিনের মহান নেতা।

লেখক বিবেকানন্দের ভাবধারার উপর শ্রদ্ধাশীল। "বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদ ভাববাদী দর্শনের দ্বারা যতই প্রভাবিত হোক না তাঁর প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও দূরদৃষ্টির অপরিসীম গুরুত্ব অনস্বীকার্য" এর দ্বারা লেখক কি বলতে চেয়েছেন

ছেন, সমাজতন্ত্রের ভূমিকাস্বরূপ প্রথমে আধ্যাত্মিকতার প্লাবন আনা দরকার যাতে মানুষের শুভবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয় লেখক কি সেই ইঙ্গিত করেছেন?

দু-এক জায়গায় লেখকের মন্তব্যে মহাত্মা সম্পর্কে যেন পরিহাসের সুর বেজে উঠেছে, সেটা না থাকলে প্রবন্ধটির মূল্য আরও বর্ধিত হত।

—শ্রীসুবিমল মিত্র
গিরিডি, বিহার

* * *

"উত্তরবঙ্গের ছেলে ভুলানো ছড়া" প্রসঙ্গে

৭৩ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় সাপ্তাহিক বসুমতীতে শ্রীমথুরেশ চক্রবর্তীর 'উত্তর-বঙ্গের ছেলে ভুলানো ছড়া" প্রকাশের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। শ্রীচক্রবর্তী উক্ত প্রবন্ধে কিছু ছড়ার উল্লেখ করেছেন এবং রাজবংশীদের কিছু সামাজিক ও পারি-বারিক কথা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু উক্ত ক্ষুদ্র প্রবন্ধে রাজবংশীদের সম্বন্ধে জানার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

আমিও এই পত্রে রাজবংশীদের বিস্তারিত আলোচনা করব না। তবে কয়েকটি মূল বিষয়ের ওপর আলোকপাত করার চেষ্টা করব মাত্র।

রাজবংশীদের নিজস্ব সভ্যতা, সমাজ, সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য আছে। স্বর্গীয় রায়বাহাদুর পঞ্চানন বর্মণ মহাশয় বিভিন্ন গ্রন্থ পর্যালোচনা করে পণ্ডিতদের কাছে প্রমাণ করেছেন যে, রাজবংশী জাতি আদি ক্ষত্রিয় জাতিরই বংশধর। পরশুরাম ক্ষত্রিয় নিধনে দৃঢ়সংকল্প হলে এরা উত্তরবঙ্গে (এবং পূর্ববঙ্গের রংপুর জেলায়) আত্মগোপন করে থাকে এবং সভ্যতা, বৈশিষ্ট্য, কৃষ্টি ইত্যাদি গোপন করে। পরবর্তীকালে বংশধরদের কাছে এটা (সভ্যতা ইত্যাদি) অজানিতই থেকে যায়। পঞ্চাননবাবু তা সকলের গোচরে আনেন।

এদের ভাষা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এটি বাংলা ভাষার একটি আঞ্চলিক রূপ। সাধু বাংলা শব্দের অগ্র-পশ্চাৎ-মধ্যে বর্ণলোপ বা পরিবর্তন করে এদের কথ্যভাষা গঠিত হয়েছে। লেখ্যভাষা হিসাবে এরা বিশুদ্ধ বাংলা ভাষাই ব্যবহার করে।

রাজবংশীরা সরল ও ধর্মভীরু। এরা নির্ঝঞ্ঝাট ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতে ভালবাসে।

এই পত্রে রাজবংশীদের সম্বন্ধে দু-একটি মূল তথ্য পরিবেশন করা হল। শ্রীচক্রবর্তী যদি রাজবংশীদের সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, তাহলে নিশ্চয় তিনি প্রকৃত তথ্য পরি-বেশনের জন্য অনেক রাজবংশীর সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করবেন।

—[illegible] রায়

কারচুপি
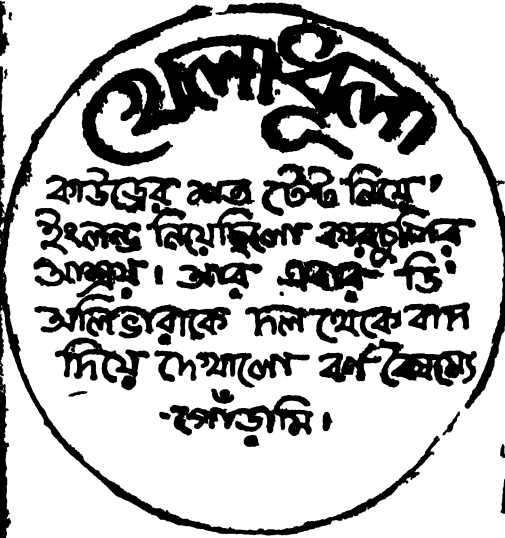
ইংলণ্ডকে নিয়ে এখন বিশ্ব ক্রিকেটের আসরে উঠেছে প্রতিবাদের ঝড়। সে-ঝড়ের ঝাপটা ইংলণ্ডের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের গায়ে কতোটা লাগবে কিম্বা আদৌ লাগবে কি না জানি না। তবে তাদের সাম্প্রতিক কার্যকলাপ ইংলণ্ডের গোঁড়া সমর্থকদের মনেও লাগিয়েছে সন্দেহের দোলা। শুধু তাই নয়—বিশ্ব ক্রিকেটের রঙ্গমঞ্চে ইংলণ্ড আজ নিজেকে বড় ছোট করে ফেলেছে। হঠাৎ বড় বিশ্রীভাবে প্রকটিত হয়ে উঠেছে ইংলণ্ডের অন্ধ আত্মকেন্দ্রিকতার পরিচয়। আর ঐ আত্মকেন্দ্রিকতা থেকেই এসেছে কারচুপি করার প্রয়াস। কিন্তু ব্যাপারটা এতোই গুরুতর যে শুধুমাত্র কারচুপি বলে ওকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ এর সংগে জড়িয়ে আছে অনেকগুলি প্রশ্ন, জড়িয়ে আছে কারচুপির মাধ্যমে নতুন রেকর্ড প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। আর অন্ধ বর্ণ-বৈষম্যকে প্রশ্রয় দেবার প্রচেষ্টা।

বিশ্ব ক্রিকেটের দরবারে এই দুটি বিষয়ই জঘন্য অপরাধ। কিন্তু ক্রিকেট খেলার আইনকানুন থেকে আরম্ভ করে ক্রিকেট খেলার পরিচালনভার যাদের ওপর তারাই যদি এই ধরণের অকল্পনীয় অপরাধে অপরাধী হন তাহলে তার বিচার করবে কে? হয়তো আজ শুধুমাত্র সেই কারণেই সমস্ত বিশ্ব জুড়ে উঠেছে প্রতিবাদের ঝড়। কেউই আজ ইংলণ্ডের ঐ অন্যায় আচরণকে মেনে নিতে রাজী নন। কেউ সহ্য করতে চাইছেন না ইংলণ্ডের এই জঘন্য ধরণের কারচুপি করে নিজেদের ঢোল নিজেরাই পেটাবার প্রচেষ্টা আর বর্ণ-গোঁড়ামিকে, সকলের চোখে ধুলো দিয়ে, ফাঁকতালে চালিয়ে দিয়ে বাজীমাৎ করার অসহনীয় প্রয়াসকে। ইংলণ্ডই আজ তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে সমালোচনার বিষয়। ইংলণ্ডকে নিয়েই আজ তাই পত্র পত্রিকায় বয়ে চলেছে প্রতিবাদের ঝড়।

এ ঝড়ের সূত্রপাত হয়েছিল বেশ কিছুদিন আগেই। কিন্তু ব্যাপারটা এতো পরিকল্পিত উপায়ে সংঘটিত হয়েছিলো যে এতটুকুও টের পাওয়া যায় নি। প্রথমেই ধরা যাক ইংলণ্ডের অধিনায়ক কলিন কাউড্রের বিশ্ব রেকর্ডের কথা। ইংলণ্ডের প্রচারের জোরে কাউড্রে কিছুদিন আগে লাভ করেছেন শততম টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করার সম্মান। শুধু তাই নয় সেই সংগে আরো একটি খেতাব জুটেছে তাঁর। হ্যামণ্ডের বহু পুরনো ক্যাচ ধরার রেকর্ড ভেঙে দিয়ে কাউড্রে না কি স্থাপন করেছেন ক্যাচ ধরার নতুন বিশ্ব রেকর্ড। কথাটা মিথ্যে নয়। কাউড্রে সত্যিই একশর ওপর টেস্ট খেলেছেন আর ক্যাচও ধরেছেন রেকর্ড সংখ্যক। কিন্তু সব থেকে বড় দুঃখের বিষয় হলো যে, এই সংখ্যার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলাগুলোকেও ধরা হয়েছে। কিন্তু বর্ণবৈষম্যমূলক নীতির জন্যে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট জগৎ থেকে নির্বাসিত। সরকারী টেস্ট ম্যাচের স্বীকৃতি তাদের বিরুদ্ধে খেলাগুলোকে দেওয়া হয় না। আর সরকারী টেস্ট ম্যাচ ছাড়া রেকর্ডের প্রশ্নও ওঠে না। অথচ ইংলণ্ড নির্বিকারে কাউড্রের রেকর্ডকে কেন্দ্র করে দিয়ে গেলো অতো বড় ভাঁওতা।

গায়ে নামাবলী দিয়ে মুখে হরিনাম জপলে কি হবে—ইংলণ্ডও যে বর্ণবৈষম্যনীতির গোঁড়া সমর্থক তার প্রমাণ এবার পাওয়া গেলো তাদের ব্যাটসম্যান ডি অলিভিয়েরার ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে। এম. সি. সি'র দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ডি অলিভিয়েরা দল থেকে বাদ পড়েছেন যে কারণের দোহাই-ই দিন না ইংলণ্ডের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ আজ আর এ কথা বুঝতে কারো বাকী নেই যে ডি অলিভিয়েরা জন্মসূত্রে প্রাপ্ত রংই কাল হয়ে দাঁড়ালো। তা না হলে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ টেস্টে যে খেলোয়াড় ১৫৮ রান করতে পারেন—তাঁকে এম· সি· সি দল থেকে বাদ দেওয়া হলো কোন্ অজুহাতে? আজ তাই ডি অলিভিয়েরা বিষয়টি নিয়ে খোদ ইংলণ্ডের ক্রিকেটগোষ্ঠীমহলে উঠেছে প্রতিবাদের ঝড়। সে যাই হোক—কিন্তু আসল প্রশ্ন হল যে ইংলণ্ডের এই ধরণের কারচুপি করার অপপ্রচেষ্টা আর কতোকাল চলবে? আর কতোকাল সহ্য করতে হবে এই ধরণের [illegible]......? —[illegible]
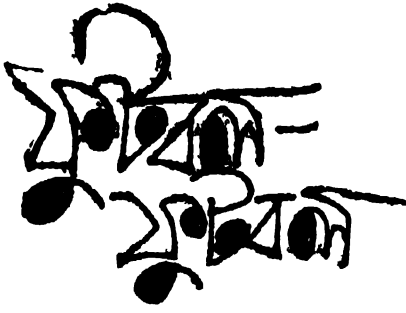
কলকাতা ময়দানে আই· এফ· এ শীল্ডের খেলাগুলো এখন জমে উঠেছে। প্রথম আর দ্বিতীয় রাউণ্ডের খেলাগুলো শেষ হয়ে গেছে। এখন চলেছে আই· এফ· এ শীল্ডের শেষ ধাপের খেলা। কলকাতা ময়দানের তিন প্রধান—মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল আর মহামেডান স্পোর্টিং ইতিমধ্যেই নেমেছে মাঠে।

কিন্তু আই· এফ· এ শীল্ডের খেলা থেকে বিদায় নিতে হয়েছে এবারের সুপার লীগ ফুটবল প্রতিযোগিতার চতুর্থ দল এরিয়ান্সকে। এরিয়ান্স দু' গোলে হেরে গেছে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের কাছে। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সকে তৃতীয় রাউণ্ডে খেলতে হবে উয়াড়ীর বিরুদ্ধে।

তবে বাইরের দলগুলো যতো বেশি আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে কলকাতা ময়দানে, তার চেয়ে অনেক বেশি পারে কলকাতার প্রধান দলগুলো। তাই আই· এফ এ শীল্ডের শেষ পর্বে কলকাতা ময়দান এখন আনন্দে মুখর।

মোহনবাগান খেলছে, ইস্টবেঙ্গল খেলছে—খেলছে মহামেডান স্পোর্টিং। আই এফ এ শীল্ডের খেলাগুলোকে কেন্দ্র করে ময়দানী ফুটবলের আসর এখন জম-জমাট। মাঠে মাঠে আজ যেন বসে গেছে আনন্দের হাট।

আই· এফ· এ শীল্ডের কথা থাক। এখন আসি মারডেকা ফুটবলের কথায়। এই পুরনো প্রসঙ্গের জের টানার কারণ হলো নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি শ্রী এম দত্তরায়ের কয়েকটি মন্তব্য।

মারডেকা ফুটবলে ভারতের ষষ্ঠ স্থান লাভ করার প্রসংগে শ্রী দত্তরায় বলেছেন যে ন'দিনে ভারতকে খেলতে হয়েছে পাঁচটি খেলা। এ বড় শ্রমসাধ্য বিষয়। তা ছাড়া ফ্লাড লাইটে খেলতে অনভ্যস্ত ভারতীয় খেলোয়াড়রা রাত্তিরে খেলতে যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে পড়েছিলেন!

আহা কি সুন্দর যুক্তি। শ্রী দত্তরায়ের প্রশংসা না করে যে আর উপায় নেই। কিন্তু শ্রী দত্তরায় কি ভুলে গেলেন যে, এইভাবে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা কোনমতেই সম্ভব নয়।

কারণ—প্রথমেই ধরা যাক ঐ ন'দিনে পাঁচটি খেলার বিষয়টি। একমাত্র ভারতকেই কি অংশ গ্রহণ করতে হয়েছে ন'দিনে পাঁচটি খেলায়? যদি তাই হতো তাহলে বলার কিছুই ছিলো না। কিন্তু তা তো নয়। এ অসুবিধার সম্মুখীন যে হতে হয়েছে সমস্ত দলগুলোকেই!

তার ওপর এ তো আর কিছু নতুন নয়। প্রত্যেক বছরই এই ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় ভারতকে। কিন্তু তার জন্যে কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না? কোন শিক্ষা আর বিশ্রাম দিয়ে খেলোয়াড়দের ন'দিনে পাঁচটি খেলায় অংশ গ্রহণ করার মতো ক্ষমতা অর্জন করিয়ে নেওয়া হয় না? এ প্রশ্নের উত্তর কি দত্তরায় মহাশয় দেবেন?

শ্রী দত্তরায় আবার তুলেছেন সেই ফ্লাড লাইটের প্রসংগটি। আবার বলেছেন যে ফ্লাড লাইটে ভারতীয় খেলোয়াড়রা খেলতে অনভ্যস্ত—তাই তাঁরা রাত্তিরের খেলায় বিশেষ সুবিধে করতে পারেন নি। কিন্তু এর জন্যে দায়ী কারা? রাত্তিরে ফ্লাড লাইটে খেলার ব্যবস্থা করার জন্যে বলে বলে আমরা হয়রান হয়ে গেছি। খেলোয়াড়রাও জানিয়েছেন তাঁদের অসুবিধার কথা। কিন্তু কোন ব্যবস্থাই করার প্রয়োজন বোধ করেন নি ভারতের মাননীয় ফুটবল কর্তৃপক্ষ।

কিন্তু বলার ব্যাপারে কোন আগল নেই তাঁদের। ভারত হারলেই তাঁদের দায়িত্ব এড়াতে গিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাঁরা ঐ একই কথার পুনরাবৃত্তি করে চলেন বছরের পর বছর। অথচ সে সকল আসানের ক্ষমতা তাঁদের হাতে থাকলেও কাজের বেলায় তাঁরা কিছুই করেন না!

সোবার্সের সেই বলটি

সোবার্সের সেই বলটিকে সাজিয়ে রাখা হবে নটিংহামশায়ার ক্লাবের সংগ্রহশালায়। গত ৩১শে আগস্ট সোবার্স গ্লামারগানের বিরুদ্ধে খেলার সময় পর পর ছটা বলে ছ'বার ওভার বাউণ্ডারী মেরেছিলেন। হতভাগ্য বোলারটি ছিলেন গ্লামারগানের দলের ম্যালকম ন্যাস। হতভাগ্য হলে কি হবে, বিশ্ব রেকর্ডের পাতায় সোবার্সের সংগে তাঁর নামটাও যে যুক্ত থাকলো। আর যাই হোক ন্যাসের কাছে এটি কোন অংশে কম লাভ নয়।

পর পর পাঁচবার ওভার বাউণ্ডারী মারার পর সোবার্স যখন ওভারের শেষ

বলটাও দর্শকদের মাথার ওপর দিয়ে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে দিলেন, তখন অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও বলটা আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। সকলেই ভেবেছিলেন যে বলটা হারিয়ে গেছে।

আসলে কিন্তু বলটা হারিয়ে যায় নি। ঠিক ঐ সময় সতেরো বছরের স্কুলের ছেলে রিচার্ড লুইস বলটা কুড়িয়ে পেলো রাস্তায়। গত ২রা সেপ্টেম্বর লুইস সেই কুড়িয়ে-পাওয়া ক্রিকেটের ঐতিহাসিক বলটা তুলে দিলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপনকারী খেলোয়াড় গারফিল্ড সোবার্সের হাতে।

আর সোবার্সের হাত ঘুরে বলটা এখন এসেছে নটিংহামশায়ার ক্লাবের সংগ্রহশালায়। বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টিকারী বলটা সাজানো থাকবে সেইখানেই...!

অলিম্পিক আসছে

কিছুদিন আগে আমেরিকার নিগ্রোরা মেক্সিকো অলিম্পিক বয়কট করার জন্যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য হয়েছেন। আর এই বয়কটের নেতা মিঃ হ্যারি এডওয়ার্ডস গত ৩১শে আগস্ট রাত্তিরে এই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেবার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন এক সাংবাদিক সম্মেলনে।

এই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেবার একমাত্র কারণ হলো সমর্থনের অভাব।

খোদ আমেরিকার নিগ্রোদের অনেকেই এই আন্দোলন সমর্থন করেন নি।

আমেরিকার যে ছাব্বিশ জন নিগ্রো প্রতিযোগীর মেক্সিকো অলিম্পিকে যোগ দেবার সম্ভাবনা আছে তাঁদের অর্ধেকও এই বয়কট আন্দোলনে সাড়া দেন নি। শুধু তাই নয়—তাঁদের অনেকে এই
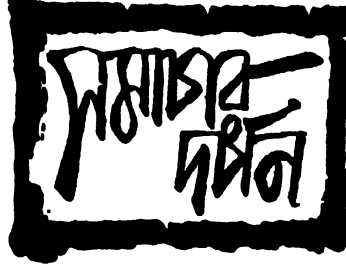
॥ ইন্দার সিং ॥

এশিয়ান অল স্টার দলে প্রতিনিধিত্ব করছেন ভারতের এই তরুণ খেলোয়াড়টি।

অভিমতও জানিয়েছেন যে বয়কট আন্দোলনে অংশ গ্রহণকারী নিগ্রো প্রতিযোগীদের স্থানে বিকল্প প্রতিযোগীর ব্যবস্থাও তাঁরা করবেন।

ফলে নিগ্রোদের অলিম্পিক বয়কট আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। কিন্তু এই বয়কট আন্দোলন যে এমনভাবে প্রত্যাহার করে নিতে হবে—এ কথা আন্দোলন শুরু করার আগে বা আন্দোলনের সময় কেউ কল্পনাও করতে পারেন নি।

ওদিকে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার সময় প্রায় এসে গেলো। মাঝে আর মাত্র কয়েকটা সপ্তাহ। তারপরই মেক্সিকোর আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠবে অলিম্পিকানন্দে। তাই আজ সমস্ত বিশ্ব জুড়েই পড়ে গেছে সাজ-সাজ রব।

ভারতীয় প্রতিযোগীরাও অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদানের আনন্দে ইতিমধ্যেই মেতে উঠেছেন। ভারতীয় হকি দলের ওপরই সকলের দৃষ্টি সবচেয়ে বেশি। তারা এখন মেক্সিকো যাবার আগে গেছেন বিদেশ ভ্রমণে। দেখা যাক হকি খেলায় অলিম্পিক স্বর্ণপদক ভারতীয় দল এবারও লাভ করতে পারে কি না.....!

কুয়ালালামপুরের মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবার পর ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা দমদম বিমান বন্দরে হলেন বেইজ্জতের একশেষ। ফুটবল খেলোয়াড় বলে কাস্টমসের লোকরা তাঁদের ছেড়ে কথা কন নি। বামালসুদ্ধ ধরেছেন তাঁদের টেপ রেকর্ডার থেকে আরম্ভ করে তাঁদের সংগে অনেক জিনিস। আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধেই ওঁরা জিনিসগুলো এনেছিলেন।

সব থেকে বেশি জিনিস এনেছে সি প্রসাদ। মোট সাতজন খেলোয়াড়কে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ধরেছেন। ডিউটি তো দিতে হয়েছেই সেই সংগে ফাইনও দিতে হয়েছে তাঁদের। কে কতো ডিউটি আর ফাইন দিয়েছেন তার হিসেব দেওয়া হলো নিচে—

ভারতীয় অলিম্পিক হকি দল এখন মেক্সিকোর পথে বিদেশ ভ্রমণ করছে। ভারতীয় দল কাম্পালায় প্রথম খেলায় উগান্ডা হকি এ্যাসোসিয়েশনকে ৯—১ গোলে হারিয়ে দিয়েছে। ভারতের পক্ষে গোলগুলি করেছেন হরবিন্দার সিং ৩টি, ইন্দার সিং ২টি, তারসেম ৩টি আর

॥ নঈম ॥
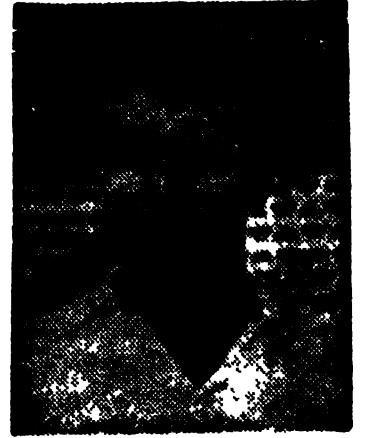
মারডেকা প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত সাফল্যের জন্যে পেয়েছেন এশিয়ান অল স্টার দলে খেলার সুযোগ।

পিটার ১টি। ভারতীয় দল উগান্ডা থেকে কেনিয়া হয়ে রোমে যাবে।

সি প্রসাদ	—ডিউটি ২৭০০ টাকা	—ফাইন ২৫০০ টাকা
প্যাপানা	—ডিউটি ৩৯০ টাকা	—ফাইন ২০০ টাকা
নঈম	—ডিউটি ৫০০ টাকা	—ফাইন ২৫০ টাকা
কান্নান	—ডিউটি ৮৭৫ টাকা	—ফাইন ৬০০ টাকা
সাদাতুল্লা	—ডিউটি ৩৬০ টাকা	—ফাইন ১৫০ টাকা
অশোক চ্যাটার্জী	—ডিউটি ২৫০ টাকা	—ফাইন ১৫০ টাকা
মুস্তাফা	—ডিউটি ৪৬৩ টাকা	—ফাইন ২০০ টাকা
ইন্দার সিং	ডিউটি ৯৫০ টাকা	—ফাইন ৭৫০ টাকা

॥ সি প্রসাদ ॥

এশিয়ান অল স্টার দলের পক্ষে খেলার জন্যে মনোনীত হয়েছেন

ইংলন্ডেও এখন ফুটবল খেলা নিয়ে আরম্ভ হয়েছে মেঠো হাংগামা। আর এই হাংগামা বন্ধ করার জন্যে এখন লন্ডনের ম্যাজিস্ট্রেটরা খুব কড়া ব্যবস্থার কথা ভাবছেন। আর রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বলেছেন যে, খেলার গোলমালের জন্যে যদি রেলের ক্ষতি হয় তাহলে সে ক্ষতি পূরণ করতে হবে ক্লাবগুলোকে। এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে কিছুদিন আগে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড সেফিল্ডে ওয়েডনেসডের কাছে হেরে যাবার পর ম্যাঞ্চেস্টারের সমর্থকরা যে ট্রেনে উঠেছিলো তার সাতটা কামরা বিধ্বস্ত হয়। আর লীডস-এ লিভারপুল হেরে গেলে লিভারপুলের সমর্থকরা রেগে গিয়ে একটি ট্রেনের কয়েকটি কামরা নষ্ট করে দেয়...!

পাঠকের কলম থেকে

দিন দিন আমাদের দেশে ফুটবলের মান নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে কেন ? কেন আমরা দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে পরাজয়কে কণ্ঠহার-রূপে গ্রহণ করছি ? এই খেলাধূলার জন্যে জনসাধারণের পকেট থেকে তো প্রচুর পয়সা যাচ্ছে এবং সরকারী বাজেটেও টাকার অঙ্ক বছর বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৬৭-৬৮ সালে যেখানে বরাদ্দ ছিল ২৭·৬৫ লক্ষ টাকা, ১৯৬৮-৬৯ সালে সেখানে টাকার অঙ্ক বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭·১৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু ব্যয় অনুযায়ী ফললাভ কতটা হয়েছে এর একমাত্র জবাব, আদৌ হয় নি। "উ... সংবাদের টাকায় এমন ছিনিমিনি খেলা একমাত্র ভারতবর্ষের মাটিতেই সম্ভব। এবং এ খেলায় ভারতবর্ষ নিঃসন্দেহে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান।' কিন্তু কেন আমাদের দশা এমন হলো ? আর কারণই বা কি ? এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে কর্মকর্তারা নানারকম আবোল-তাবোল বকেন। খেলোয়াড়দের দৈহিক সক্ষমতা বজায় রাখার জন্যে কোন সময় খেলা কমাচ্ছেন, আবার খেলার সময় বাড়াবার জন্যে ওকালতিও করছেন। সময় না বাড়ালে আমরা নাকি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় হটে আসব। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, সুস্থ পরিবেশ ও খেলোয়াড়ের জীবনের ঝুঁকি, ইত্যাদির ব্যবস্থা—যেটা সর্বাগ্রে প্রয়োজন, তার কোন ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া ব্যয়ের নামে মোটা টাকা নানাজনের পকেটস্থ হচ্ছে। আমরা সবাই ক্রীড়ানুরাগীরা বৃথা মাথা কুটে মরছি—দেশের মান গেল ! ইজ্জত গেল !!

আমাদের দেশে ফুটবল খেলোয়াড়গণ অপেশাদার, অথচ ক্লাব কর্তৃপক্ষের নিকট হতে গোপন চুক্তির ভিত্তিতে হাজার হাজার টাকা নিচ্ছেন। তবুও তাঁরা অপেশাদার। কিন্তু যদি আমাদের দেশে ফুটবলে পেশাদারী প্রথা চালু করা হয়, তাহলে ফুটবলের মান উন্নত হওয়ার ষোল আনা সম্ভাবনা আছে। পৃথিবীর বহু দেশেই আজ পেশাদারী ফুটবল চালু হয়ে গেছে এবং হচ্ছে। আমাদের দেশের ফুটবল খেলোয়াড়গণ সাধারণত সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসেন। তাঁদের ওপর সংসারের দায়-দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। সুতরাং খেলাধূলার বাইরের সময়ে তাঁদের বিভিন্ন কর্মস্থলে কাজ করে সংসার প্রতিপালন করতে হয়। কিন্তু ঐ খেলোয়াড় কোন কারণে আহত হয়ে পড়লে, তাঁর সংসারে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করা ছাড়া তাঁর

॥ অলিম্পিক আসছে ॥

জার্মানীর এঞ্জেলিকা হিলবার্ট মেক্সিকো অলিম্পিকে ডাইভিং বিভাগে স্বর্ণপদকের প্রতিদ্বন্দ্বী। ছবিতে তাঁকে দেখা যাচ্ছে অনুশীলনের এক মনোরম ভঙ্গিতে।

কোন উপায় থাকে না। কিন্তু পেশাদারী প্রথা প্রবর্তন করলে এরকম হবার সম্ভাবনা থাকে না, অথচ খেলার মানও উন্নত হবে। কারণ খেলোয়াড় যখন জানবেন যে, এই খেলাধূলাই তাঁর জীবন ও জীবিকার মাধ্যম, তখন তিনি মন-প্রাণ দিয়ে খেলবেন এবং তার উন্নতির জন্যে চেষ্টা করবেন। ফলে খেলাধূলোর যথেষ্ট উন্নতি হবে।

কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা ! আমাদের দেশের ক্রীড়া-কর্ণধারগণ জনসাধারণের পয়সায় পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত 'ট্যুর' দিচ্ছেন নানা কাজের অজুহাতে। কিন্তু প্রকৃত খেলার এবং খেলোয়াড়ের উন্নতির জন্যে এক কপর্দক ব্যয় করতে তাঁরা নারাজ। আমরা এর সমাধানের জন্যে যতই চিৎকার শব্দ করি না কেন তাঁদের কিন্তু ঘুম ভাঙে না। "ঘুম ভাঙলেই বা কি করবে ? ওঁরা যে জেগে ঘুমোন। সুতরাং ..! সুতরাং আর কিছুই নয়—আমাদের কর্মকর্তাদের তৎপরতার গুণে শুধু বাংলা দেশেই নয়, তাবৎ ভারতবর্ষে ফুটবল খেলার মান দিন দিন গড়গড়িয়ে নেমে চলেছে নিচের দিকে !" (সাপ্তাহিক বসুমতী, ২৭শে জুন, ১৯৬৮)।

'ফুটবলের তীর্থ' এই কলকাতায় ফুটবল খেলা একটা বিরাট লাভজনক ব্যবসায়ে দাঁড়িয়েছে। এতে লাভবান হচ্ছেন ক্লাব কর্তাগণ এবং নামী-দামী কিছু সংখ্যক খেলোয়াড়। পূর্বেই বলেছি, অপেশাদারী সংজ্ঞানুযায়ী যদিও খেলোয়াড়গণ খেলাধূলাভাবে কিছু গ্রহণ করতে পারেন না তবুও—

'Only few clubs today pay a few top-notch players reasonably handsome "fees" but under the counter.' (Berry Sarbadhikary, Hindusthan Standard).

আর খেলোয়াড়গণও আজকাল নামের কাঙাল নন। তারা তাঁদের জীবিকার জন্যে চান অর্থ। কেবল নিজেদের জন্যে নয়—তাঁদের পরিবারের প্রত্যেকের মুখে স্বচ্ছন্দের হাসি ফুটে উঠুক এটা তারা সব সময়েই চান। এ প্রসঙ্গে একটি ক্রীড়া-পাক্ষিকের সম্পাদকীয় অংশ সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

'So-called name and fame cannot satisfy a player in these days when he requires a lot of money to keep pace with the growing needs of time." (Players' Magazine).

সুতরাং এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে প্রকৃত খেলার মান উন্নত করার জন্যে ফুটবলে পেশাদারী প্রথা প্রবর্তন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ এই প্রথা প্রবর্তনে আজ অগ্রণী। এইসব অন্যান্য দেশের দিকে তাকাবার পর যখন আমরা আমাদের দেশের দিকে চোখ ফেরাই, তখন দেখি আমাদের ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারে আবৃত। কিন্তু সময় এখনও আছে, পূর্বদিগন্তে সূর্য মেঘের আড়ালে যদিও সাময়িক ঢাকা পড়েছে, তা আবার কিছুক্ষণ পরে উজ্জ্বল হয়ে পৃথিবী আলোকিত করবে। কর্মকর্তাদের এখনও সজাগ হবার সময় আছে।

—কাজী জহর আলী

সুকুমার সরকার (ডায়মণ্ডহারবার রোড, বেহালা)

প্রশ্ন : আপনার মতে কলকাতার সবচেয়ে খারাপ খেলোয়াড় কে?

উত্তর : হয় আপনি, না হয় আমি...!

রমেনকুমার ঘোষ (বারাকপুর, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : গত সংখ্যায়, খেলোয়াড়রা কি খেতে ভালোবাসেন, এই প্রশ্নের উত্তরে আপনি লিখেছেন—গালাগালি। কিন্তু আমার মনে হয় খেলোয়াড়রা আরো কিছু ভালোবাসেন। বলুন তো কি?

উত্তর : হাততালি .....!

প্রাণশংকর সাহা (বেনিয়াটোলা স্ট্রীট, কলকাতা—৫)

প্রশ্ন : আপনি আমার একটি প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন কেন? পশ্চিম জার্মানীর ফুটবল কোচ ডেটমার ক্রামার কি ভারতে এসেছেন? ইস্টবেঙ্গল নাকি বর্মা থেকে একজন স্টপার আনাচ্ছে?

উত্তর : একাধিক প্রশ্ন থাকলে না এড়িয়ে গিয়ে উপায় নেই। আপনাদের দিস্তে দিস্তে চিঠি পেরিয়ে আসতে হচ্ছে যে।

ডেটমার ক্রামার এখনো আসেন নি।

বর্মা থেকে ইস্টবেঙ্গলের স্টপার আসছে কি না আমি জানি না।

অলোকরঞ্জন দাশ (ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ)

প্রশ্ন : ফুটবল রেফারিং পরীক্ষা কোথায় কিভাবে দেওয়া যায়? এ বিষয় বিস্তারিতভাবে জানতে চাই?

উত্তর : আপনি সম্পাদক সি আর এ C/o. ময়দান টেণ্ট, কলকাতা—এই ঠিকানায় চিঠি দিয়ে সব কিছু জেনে নিতে পারেন।

আর বইটির ব্যাপারে যে কোন বই-এর দোকানে চিঠি লিখুন—তাহলেই পাবেন। ইংরেজী ও বাংলা দু'ভাষাতেই ফুটবলের আইন-কানুনের ওপর বই আছে।

বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায় (কুলটি)

প্রশ্ন : ফুটবল সমীক্ষা আবার চালু করুন না। বলাই দে'র ফটোসহ জীবনী চাই।

উত্তর : ফুটবল সমীক্ষা সামনের বছরের

ফুটবল মরশুমে আবার আরম্ভ করা হবে।
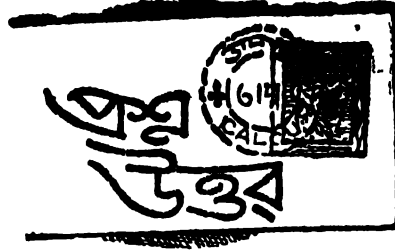
বলাই দে'র ফটোসহ জীবনী গত বছর সাপ্তাহিক বসুমতীর পাতায় ছাপা হয়েছে।

শিবেন, স্বপন, গণেশ ও মানা (রাণাঘাট ছোলাবাজার, নদীয়া)

উত্তর : চুনী গোস্বামী, প্রদীপ ব্যানার্জী আর বলরামকে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলা হয়।

কাজলকুমার পান (দিগপার, বাঁকুড়া)

প্রশ্ন : আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা কোন সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে?

কোন দল সবচেয়ে বেশিবার আই এফ এ শীল্ড লাভ করেছে?

ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কোন কোন সালে আই এফ এ শীল্ড, রোভার্স ও ডুরাণ্ড কাপ জিতেছে?

উত্তর : ১৮৯৩ সাল থেকে আই এফ এ শীল্ডের খেলা চলে আসছে।

ক্যালকাটা ৯ বার আই এফ এ শীল্ড জিতেছে ও ইস্টবেঙ্গলও সবচেয়ে বেশি মোট ৯ বার আই এফ এ শীল্ড পেয়েছে।

ইস্টবেঙ্গল আই এফ এ শীল্ড জিতেছে—

১৯৪৩ সালে, ১৯৪৫ সালে, ১৯৪৯, ১৯৫০, ১৯৫১ সালে, ১৯৫৮ সালে, ১৯৬১ যুগ্ম (মোহনবাগান) ১৯৬৫ ও ১৯৬৬ সালে।

ইস্টবেঙ্গল রোভার্স কাপ জিতেছে—১৯৪৯ ও ১৯৬৭ সালে।

ইস্টবেঙ্গল ডুরাণ্ড কাপ পেয়েছে—১৯৫১-৫২, ১৯৫৬, ১৯৬০ সালে যুগ্ম (মোহনবাগান) ও ১৯৬৭ সালে।

এক সঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন করলে কিন্তু উত্তর পেতে এবার থেকে অনেক দেরি হবে।

প্রদীপকুমার বসু (পঞ্চাননতলা রোড, বেহালা, কলকাতা-৩৪)

প্রশ্ন : কলকাতা ময়দানে ফুটবল লীগ কোন সাল থেকে আরম্ভ হয়? মোহনবাগান দল কোন বছরে হকি ও ফুটবলে ট্রিমুকুট লাভ করেছে?

উত্তর : ১৮৯৮ সাল থেকে কলকাতা ময়দানে ফুটবল লীগ খেলা আরম্ভ হয়।

কোন বছরেই নয়...!

অশোককুমার বিশ্বাস (বিশ্বাস টেলার, বুধামুতমপল্লী, আসানসোল)

প্রশ্ন : ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলের ফুলটিম-এর নামগুলো জানালো বাধিত হবো।

উত্তর : আমার কাছে নেই। খুব দরকার থাকলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে চিঠি লিখে জেনে নিতে পারেন।

পথিকরঞ্জন রায় (সত্যেন রায় রোড, কলকাতা-৩৪)

প্রশ্ন : পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘদেহী ফুটবল খেলোয়াড় কে?

উত্তর : তা তো জানি না।

অপরাজিতভাবে লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে কলকাতা ময়দানের ক'য়েকটি দল। কিন্তু তারা কি কোন খেলায় একটাও গোল খায় নি? অপরাজিতভাবে এবং একটাও গোল না খেয়ে কোন দল চ্যাম্পিয়ান হয়েছে কিনা যদি কারো জানা থাকে তাহলে জানাবেন।

বুদ্ধিমান বন্দ্যোপাধ্যায় (বাগবাজার)

প্রশ্ন : পাতৌদির বিয়ে কবে?

ফুটবল আর ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে কার কার বিয়ে হয় নি জানাবেন কি?

উত্তর : শুনছি এই নভেম্বরেই শর্মিলার সঙ্গে পাতৌদির বিয়ে হবে।

সত্যিই আপনি বুদ্ধিমান। নির্ঘাত প্রজাপতির অফিস খোলার তালে আছেন।

দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় (মহারাণী ইন্দিরা দেবী রোড, কলকাতা-৬০)

প্রশ্ন : ভারতের ফুটবল খেলোয়াড় ইন্দার সিং ও হকি খেলোয়াড় ইন্দার সিং কি একই ব্যক্তি?

উত্তর : না।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

এ. সরকার এণ্ড সন্স

সূচীপত্র

৭৩ বর্ষ : ১৪শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২রা আশ্বিন, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 19th September, 1968

দুর্গাপুরের ঘটনার তদন্ত হোক

যুদ্ধের সময় বিজিতপক্ষ পশ্চাৎ অপসারণের সময় একটা নিয়ম পালন করে থাকে। নিয়মটা হচ্ছে এই যে, নিজের সীমানা ছেড়ে বিজিতপক্ষ যখন পালিয়ে যায়, তখন সে নিজের ছেড়ে-যাওয়া দেশকেও নির্মমভাবে ধ্বংস করে যায়। এই ধরণের নীতি যুদ্ধের সময় চলতে পারে, এবং বিদেশী শত্রুর হাতে পড়া অপেক্ষা বহ্নির গ্রাসে দেশ যাওয়া ঢের ভালো—নীতিও হয়তো দোষের নয়।

এই রকম নীতি স্বদেশের মধ্যে বিবদমান পরস্পর বিপরীতধর্মী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রশ্রয় না পাক—এটাই সকলের কাম্য। তবে বর্তমানে দেশে রাজনৈতিক ওলটপালটে দলগুলি প্রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ়। শ্রমিক জগতেও অশান্তি ক্রমাগত মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। একদিকে বেকারিত্ব, ছাটাই, লক আউট আর একদিকে মুদ্রামূল্যহ্রাস জনিত ভুল নীতি ও বিগত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির ত্রুটির কারণে কী মালিকপক্ষ, কী শ্রমিকপক্ষ—দু' দিকেই পারস্পরিক অসদ্ভাব বিদ্যমান। এই অবস্থায় সর্বাপেক্ষা দায়িত্ব বর্তেছে ট্রেড ইউনিয়নগুলির উপর। কিন্তু দুর্গাপুরস্থ হিন্দুস্থান স্টীলের চেয়ারম্যান শ্রী কে টি চন্ডী সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিশদ তথ্যসহ যে সব কথা প্রকাশ করেছেন—তাতে এই ভেবে আতঙ্কিত হতে হয় যে, কী ধরণের ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা শ্রমিক আন্দোলন চালাচ্ছেন। এবং তথাকথিত দায়িত্বশীল এই ধরণের নেতাদের উপর শ্রমিক আন্দোলন চালাবার ভার থাকলে যুদ্ধে পরাজিত পক্ষের মনোভাব অবলম্বনে তারাও যে একদিন গোটা দেশটাকে ধ্বংস করে দেবে না তা কে বলতে পারে!

এখন পার্লামেন্টে কংগ্রেস দলেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ঐ দলের কথামতই চলে। আই-এন-টি-ইউ-সি দীর্ঘকাল ধরে শ্রমিক আন্দোলনে সুনাম অর্জন করেছে। তবু এই শ্রমিক প্রতিষ্ঠানটি শ্রমিকদের হিত করার নামে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প প্রতিষ্ঠানে যে সর্বনাশ ডেকে আনছে দিন কয়েক আগে শ্রীচন্ডীর সুস্পষ্ট ঘোষণা থেকেই অনুমান করা যায়। এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত শ্রমিক সদস্যরা নেতাদের নির্দেশে কারখানায় যা করেছে, তা যদি সত্য হয় তাকে নাশকতামূলক কাজ ছাড়া আর কিছুই বলা হয়তো যায় না এবং এই ধরণের অহিতকর কাজে দেশের বর্তমান দুঃসময়ে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় আশি লক্ষ টাকার মতো হল তা পূরণ করবে কে?

শ্রমিকগণ কর্তৃক নাশকতামূলক কাজ করা কিভাবে সম্ভব হোল শ্রীচন্ডী তার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে বলেছেন যে, শীতলীকরণ বিভাগের শ্রমিকরা শুধুমাত্র কর্মবিরতি করলে কারখানার কোনোরকম ক্ষতি সাধিত হোত না। কিন্তু আই এন টি ইউ সি-র দুই নেতার নির্দেশক্রমে রাত্রি দশটার শিফটে যোগ দিয়েই হঠাৎ তারা কাজ বন্ধ করে এবং পাম্পগুলি বন্ধ করে দিয়ে কারখানার সমূহ ক্ষতি করে দেয়। শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে দিলে অকুস্থলে দশ মিনিটের মধ্যে অফিসাররা এসে পাম্প পুনরায় চালু করতে চাইলে তাঁদের বাধা দেওয়া হয়। তাঁরা শ্রমিকদের কাছে জ্ঞাত হন যে, ইউনিয়নের সেক্রেটারির নির্দেশ ব্যতীত কাউকে পাম্প চালু করতে দেওয়া হবে না। এই নিদারুণ অবস্থায় কারখানার ডিরেক্টরের সামনে কারখানার পার্শোনাল অফিসার ইউনিয়নের দুইজন কর্মকর্তার সঙ্গে তন্মুহূর্তে যোগাযোগ করে সম্পূর্ণ বিফল হন। বলা বাহুল্য কারখানার কর্তৃপক্ষকে উক্ত দুই নেতার গৃহ থেকে জানানো হয় যে, একজন 'বাথরুমে' আর একজন 'ডিনারে'র জন্য তৈরি। দেশের সম্পদ ধ্বংস করার জন্যে অন্যায়ভাবে পরিচালিত করে নেতৃবৃন্দ গৃহে সুখে-স্বাচ্ছন্দে বিরাজমান স্বাধীন ভারতে এ রকম ঘটনা চিন্তা করা যায় না।

আমরা জানি না, কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের বিবৃতি কতদূর সত্য। তবে তিনি নাশকতামূলক কাজের জন্য যাদের স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, তারা ঐ বিবৃতির প্রতিবাদ করে নি। বরং পরবর্তী ঘটনা যা ঘটেছে তা আরো উদ্বেগজনক। গত ৯ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, দ্রুত দমকলবাহিনী এসে না পৌঁছলে দুর্গাপুর প্ল্যান্টও রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়ে যেত। আই এন টি ইউ সি'র নেতৃবৃন্দ এ ঘটনার প্রতিবাদ করে নি, উল্টে তারা ব্রিগেডিয়ার ওয়াধেরার অপসারণের জন্য শ্লোগান তুলেছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের জিজ্ঞাস্য, সরকার কি দেশ গঠনের সময় ট্রেড ইউনিয়ন দিয়ে নাশকতামূলক কাজের পোষণ করবে? এতদিন প্রচারিত হয়ে এসেছে যে, সরকারের বিরোধী দলই যতো নষ্টের গোড়া। এই শ্লোগানে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও মাঝে মাঝে কোনো কোনো দলকে বেআইনী ঘোষণা করার কথাও শুনিয়েছেন।

দলে থেকেও যাঁরা দলের ঊর্ধে প্রকৃত সেই সব দেশহিতৈষীদের কাছে আমাদের অনুরোধ, তাঁরা উপরি-উক্ত নাশকতামূলক কাজের বিচার-বিভাগীয় তদন্তের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। সূত্রতেই সাবধানতা গ্রহণ করলে সারা দেশটাকে এখনো ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

সম্পাদকীয়

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, জন্ম নয় কর্মই মানুষের আসল পরিচয়। কর্মের দ্বারাই মানুষ লাভ করে মানবিক অধিকার, লাভ করে মনুষ্যত্ব। কিন্তু যুগ পাল্টে গেছে। গীতার যুগে যা ছিলো একান্ত স্বাভাবিক, আজ শুধুমাত্র তা অস্বাভাবিকই নয় সম্পূর্ণ অচলও বটে। আজ বোধহয় কর্মের চেয়ে জন্মাধিকারের মূল্যটাই বেশি। শুধু বেশিই নয়—আজকের এই পারমাণবিক যুগেও যে সমস্যাটি সমস্যা-বিক্ষুব্ধ সমাজকে ধিক্কারে চীৎকারে মুখর করে তুলেছে তা হলো বর্ণবৈষম্য নীতির কাছে আত্মসমর্পণের ঘৃণ্য প্রচেষ্টা।

আজ যে মানুষটিকে ঘিরে সমস্ত পৃথিবীতে উঠেছে প্রতিবাদের ঝড়, সাদা-কালোর ভেদাভেদ নীতির নিকৃষ্টতম পরিচয় পেয়ে যখন সমস্ত বিশ্ববাসী স্তব্ধ তখনো কিন্তু সেই লোকটি নির্বিকার, সম্পূর্ণ নিরাসক্ত।

তাই ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় বেসিল ডলিভিয়েরা শুধু জানিয়েছেন তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখের কথা। বলেছেন, ভেবেছিলেন এম সি সি দলের সদস্য হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গিয়ে খেলবেন নিজের দেশের সেই সব মাঠে—যেখানে তাঁরা সহজে পারতেন না প্রবেশ করতে। ডলিভিয়েরার আরো ইচ্ছে ছিলো যে, অশ্বেতকায়দের তরফ থেকে শ্বেতকায়-দের কাছে তিনি প্রমাণ করে দেখিয়ে দেবেন যে অশ্বেতকায়রাও সুযোগ পেলে ভালোই খেলতে পারে।

খেলোয়াড় হিসেবে ডলিভিয়েরার যোগ্যতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মাত্র দু'-এক সপ্তাহ আগে ইংলণ্ড যখন পড়ে-ছিলো আত্মসম্মান বজায় রাখার ঠেকায়, দেশের মাটিতে সিরিজ হারার ভয়ে যখন ইংলণ্ড সন্ত্রস্ত—তখনই আবার দল থেকে [illegible] ডলিভিয়েরাকে ডেকে নিতে হয়েছিলো। আর ডলি-ভিয়েরাও নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ টেস্টে করলেন ১৫৮ রান। শেষ টেস্টে ইংলণ্ডের জেতার পেছনে তাই ছিলো ডলিভিয়েরার অবিস্মরণীয় অবদান।

তবু ডলিভিয়েরাকে বাদ পড়তে হলো —দক্ষিণ আফ্রিকা সফরকারী এম সি সি দলে জায়গা হলো না তাঁর। কারণ ডলি-ভিয়েরা মিশ্র রক্ত—বর্ণসংকর। দক্ষিণ

ডলিভিয়েরা

আফ্রিকার কেপটাউনে জন্ম ডলিভিয়েরার। আর জন্মসূত্রে প্রাপ্ত তাঁর গায়ের রংই কাল হয়ে দাঁড়ালো। শ্বেতকায়দের মতো হলেও ঠিক যেন সাহেবদের মতো গায়ের রং নয় ডলিভিয়েরার। টকটকে রং-এর একটু যেন অভাবে আজ।

তাই দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর বর্ণবৈষম্য নীতির বলি হলো ডলিভিয়েরা বহুর বলেক [illegible] ইংলণ্ডের ক্রিকেটকে কলঙ্কমুক্ত করার জন্যে। ডলিভিয়েরার যে স্বপ্ন শেষ পর্যন্ত সত্যিই হলো। ডলিভিয়েরা আজ শুধু ইংলণ্ডেরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানই নন—খ্যাতি তাঁর বিশ্বজোড়া। তবু মিথ্যের দোহাই দিয়ে ডলিভিয়েরাকে দল থেকে বাদ দিলেন এম সি সি কর্তৃপক্ষ।

এখানেই শেষ হলো না। দেখতে দেখতে সমস্যার আবর্তে ক্রিকেট রঙ্গমঞ্চের জল হয়ে উঠেছে আরো বেশি ঘোলা। খেলোয়াড় হিসেবে দল থেকে বাদ যাওয়ার ইংলণ্ডের একটি সংবাদপত্র ডলিভিয়েরাকে ক্রিকেট সমীক্ষক হিসেবে এম সি সি দলের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠাবার সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে ফেললেন।

কিন্তু সেখানেও বাধা। এবার মুখ খুললেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী জন ভরস্টার। তিনি অভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, ক্রিকেট সমীক্ষক হিসেবেও ডলিভিয়েরার দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে বাধা দেওয়া হবে। আর এই আভাষ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের সংবাদপত্র মহলে অসন্তোষের আগুন উঠেছে দানা বেঁধে। সান, মিরর আর ডেইলি মেল একসঙ্গে এম সি সির দক্ষিণ আফ্রিকা সফর বাতিল করার প্রস্তাব তুলেছে।

এইখানেই শেষ নয়। এবার এসেছে বোমা রাখার হুমকী। এক অজ্ঞাত পরিচয় পত্রলেখক এইভাবে হুমকী দিয়েছে যে, শুধুমাত্র শ্বেতকায় প্রতিনিধিদের নিয়ে যে বিমান দক্ষিণ আফ্রিকা যাবে—সেই বিমানে রাখা হবে একটা তাজা বোমা। এই খবরটি অবশ্য স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডেও পৌঁছেছে.

তাই আজ ডলিভিয়েরা ও বর্ণবৈষম্য নীতিকে কেন্দ্র করে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ইংলণ্ডে, এই অভাবনীয় সংকটের হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব একমাত্র এম সি সি দলের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর বাতিল করলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি হবে কে জানে। তবে আজ যাই হোক এ কথা আজ আর কারো বুঝতে বাকী নেই যে অন্তরে অন্তরে, ইংলণ্ডের একশ্রেণীর উন্নাসিক লোকও দক্ষিণ আফ্রিকার এই বর্ণবৈষম্য নীতির শুধুমাত্র সমর্থকই নন [illegible] নন।

"তবে পরাণে ভালবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে।"

কথাটা হয়তো একটু জ্যাঠামি জ্যাঠামি মনে হইতে পারে তবুও যদি, রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও উপরোক্ত বক্তব্যের সহিত আমি কোনমতেই সায় দিতে পারি না।

ভালবাসা রূপকে থোড়াই কেয়ার করে। অর্থাৎ সর্বদা, সর্বক্ষেত্রেই ভালবাসা রূপনির্ভর নহে। যদি তাহাই হইত তবে দুনিয়াতে কুরূপ আর কুরূপারা কেহই উৎরাইতে পারিত না। বস্তুত দেখা যায় ভালবাসার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহারাই কিন্তু হৃদয় জয় করিয়া ঘরে ফিরিতেছে। পৃথিবীতে কুরূপ ও কুরূপাদের সংখ্যাই বেশি, কারণ রূপের বণ্টন ব্যাপারে বিধাতা সমাজতান্ত্রিক বণ্টন ব্যবস্থার ধার ধারেন না। এ ব্যাপারে বিধাতার পক্ষপাতিত্ব একটু বেশি বলিয়াই মনে হয়।

রূপ ব্যক্তিনিরপেক্ষ কোন পরম বস্তু নহে। অর্থাৎ রূপের কোন সর্বজনীন ফরমূলা নাই। মেঘবরণ চুল, দুধে-আলতা রং, পটলচেরা-চোখ, তিল ফুল অথবা বাঁশীর মত নাক অথবা শিখরদশনা, বিম্বাধরা ইত্যাদি রূপের প্রাচীন অথবা রূপকথাজাত স্পেসিফিকেশনগুলির কোন সর্বজনীন মূল্য নাই। শুধু প্রাচীন কেন এ-কালেও মিয়ামি বিচের বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতার নির্ধারিত আন্তর্জাতিক ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকসেরও মূল্য হ্রাস।

"অহো! কি হেরিলাম, হেরিয়াই মজিলাম। সখি আমাকে ধর" বনমধ্যে নায়ককে প্রথম দর্শনেই সে-কালের নায়িকারা প্রায়শই প্রিয়সখীদের হস্তোপরি এইভাবে মূর্ছা যাইতেন। সেই প্রথমদৃষ্টে মনোমুগ্ধকারী নায়ককে কল্পনা [illegible]

রোমশ বক্ষ, ঠোঁটের উপর এরলফ্লিনের মত একটি সূক্ষ্ম গোঁফের রেখা। এ রকম নায়ককে প্রথম দর্শনে আজকার যে কোন নায়িকা একবাক্যে বাতিল করিয়া দিবে। শুধু সেদিন অথবা এ-দিনের প্রশ্ন নহে মানুষে মানুষে রূপবোধ ভিন্নতর। সৌন্দর্য অথবা রূপ নিতান্তই আপেক্ষিক বস্তু মাত্র। তাই চিরন্তন নায়ক অথবা চিরন্তন নায়িকা বলিয়া কিছু নাই। রূপেরও কোন সংজ্ঞা নাই। যাহাকে ভাল লাগে সেই রূপবান, সেই রূপসী। ভালবাসা রূপের জন্য অপেক্ষা করে না বরং রূপকেই ভালবাসার দুয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়।

* * *

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালে আন্তর্জাতিক বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতা দিনে দিনে যেরূপ জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেছে তাহাতে মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে এই প্রতিযোগিতা অলিম্পিক প্রতিযোগিতার জাত মারিবে। শোনা যায় এই বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতাগুলি নিছকই সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতা নহে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহার সহিত বিশ্ব রাজনীতি এবং বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ জড়িত থাকে। রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক স্বার্থে দেশ বিশেষকে খুশি রাখা এবং নির্বাচিত সুন্দরীর সাহায্যে সূক্ষ্মভাবে রাজনৈতিক প্রচার চালান ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ লক্ষণ [illegible] বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতার হালে [illegible] পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। নির্বাচিত সুন্দরীকে যুদ্ধরত দেশের সৈনিকদের মনোরঞ্জনের জন্য নিয়োগ করা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এবং নিরপেক্ষ দেশের ক্ষেত্রে একটি সংকট [illegible] পরিকল্পিত সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই। দুরভিসন্ধি ছাড়া ইহার পিছনে কোন সৎ উদ্দেশ্য নাই। বিগত বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত জনৈকা ভারতীয় তরুণী ভারতের পক্ষে এইরূপ এক সংকট সৃষ্টি করিয়াছিল।

এ বছর মিয়ামি বিচে নির্বাচিত ব্রেজিলিয়ান সুন্দরী তাঁহার সুসংবাদ সংবাদ শুনিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে প্রায় কাৎলা মাছের মতই হাঁ করিয়াছিলেন। বিস্ময় বিস্ফারিত সেই হাঁ-করা সুন্দরীর ছবি পৃথিবীর সর্বত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। বিশ্বসুন্দরী খেতাব এবং তৎসহ বিপুল অর্থপ্রাপ্তি, বিশ্বভ্রমণ এবং মাতামাতির এহেন অপ্রত্যাশিত সুযোগে খুব কম সুন্দরীই মাথা ঠিক রাখিতে পারেন। সকলেই আনন্দে ডগমগ হন। কেহ হাঁ করেন, কেহ করেন না—এইটুকুই তফাৎ।

কিন্তু কোন নিরিখে মিয়ামি বিচের হাটে প্রতি বছর সুন্দরী নির্বাচিত হন? সংক্ষেপে বলিতে গেলে দৈর্ঘ্য পরিমাপের যে আন্তর্জাতিক গজ ফিতাটি আছে তাহারই কয়েকটি চিহ্ন এই প্রতিযোগিতায় সৌন্দর্যের চূড়ান্ত নির্ধারক। ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিচারকদের নির্ধারিত ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকসের

বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক

বঙ্গভূষণ খাসনবীশ
আগে ছিলেন চারশ' বিশ।
এখন তিনি দেশ সেবক ;
হিজ হাইনেস সম্পাদক ॥

প্রকাশক

মহামহিম পাল
বইকে বলেন 'মাল'।
চুক্তি করেন, এক হাজার,
বই ছাপেন পাঁচ হাজার ॥

অধ্যাপক

এম, এ, ডি, ফিল লেনগুপ্ত
লিখেছেন একটা অর্থ-পুস্তক ;
দাম করেছেন পনেরো টাকা
মাথায় নিয়েছেন মস্ত কাঁকা।
টাকা কুড়াচ্ছেন কাঁড়ি কাঁড়ি
রাসেল স্ট্রীট-এ তুলবেন বাড়ি ॥

বিশ্বাস

জয়ন্তী সেন

প্রদীপ্ত বিশ্বাসে অন্ত ভুলে থাকা যায়।
দু'চোখ যখন রাখি
প্রত্যয়ের স্থির নীলিমায়—
সাজাই নিশ্চিন্ত ক্ষেত উপার্জিত আলোর বাতাসে
অথবা উদ্‌বৃত্ত সারে ফুল ফোটে নিরাসক্ত ঘাসে।
ঋতুর উচ্ছ্বাসে ভরে জীবনের প্রতিশ্রুত ফাঁক।
বিশ্বাস আমার হাতে ছাঁচে ঢালা নিরাকার মাটি
তাকে নিয়ে কত পরিপাটি
মনের বসতি গড়ি—এ কোণে সাজানো সুখা পাত্র
স্মরণীয় সাফল্য সৃষ্টি হৃদয়ের প্রেরণাবশত
ও কোণে আবিষ্ট ছায়ানটে
উৎসব-রচিত একনিষ্ঠ মন বাজে অবিরত।

বিশ্বাস আমার চোখে নিরাময় সূর্য হতে জানে
রৌদ্রঢালা মনের বাগানে
যখনই আশ্রিত ইচ্ছা হাত তুলে খেলার প্রথায়
প্রকাশ্য ভাষাকে তার অনুভবে ফিরে পেতে চায়।

অগ্নিপরীক্ষায় যিনি উত্তীর্ণ হইবেন তিনি যত বোকা-বোকাই দেখিতে হোন না কেন তিনিই বিশ্বসুন্দরী।

বিচার শেষ হইবামাত্র শুরু হয় প্রচার। আধুনিক বিশ্বে মনোপলি করায়ত্ত এই প্রচার-যন্ত্রটি ঠিক সেই ব্রাহ্মণ ও তিন চোরের গল্পের সেই চোরদিগের মতন। গল্পটি কাহারো অজানা নহে। সরলমতি ব্রাহ্মণ তাঁহার স্কন্ধোপরি একটি পাঁঠা লইয়া যাইতেছিলেন। পাঁঠাটিকে হাতাইবার উদ্দেশ্যে পথিমধ্যে তিনটি চোর বেচারি ব্রাহ্মণকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করাইয়া ছাড়িল যে তাঁহার স্কন্ধোপরি উক্ত জীবটি পাঁঠা নহে একটি কুকুর মাত্র। চোরদিগের পুনঃ পুনঃ একই কথা প্রচারে শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণও পাঁঠাকে কুকুর বলিয়া স্থির নিশ্চিত হইল এবং পাঁঠাটিকে পথিমধ্যে ত্যাগ করিয়া স্নানান্তে ঘরে ফিরিল।

আধুনিক মনোপলির প্রচার-যন্ত্রেও জলজ্যান্ত পাঁঠাকে এমনি করিয়াই কুকুরে রূপান্তরিত করে। নির্বোধ ব্রাহ্মণের মত আমরাও সেই প্রচার [illegible] [illegible] নাই। [illegible] রুচি, পোশাক, পরিচ্ছদে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নিতান্ত ব্যক্তিগত আঙিনাটিতে, আমাদের নিতান্তই ব্যক্তিগত রূপবোধে, এমন কি আমাদের বিবেকটিকে পর্যন্ত এই একঘেয়ে প্রচার এমন মোহগ্রস্ত করিয়া ফেলে যে, আমরা নিজেকেই নিজে চিনিতে পারি না। নিজের উপর নিজেই আর বিশ্বাস রাখিতে পারি না। প্রাগৈতিহাসিক যুগে দাঁতাল ম্যামথের সামনে দাঁড়াইয়াও মানুষ সম্ভবত নিজেকে এত অসহায়, এত অক্ষম বোধ করে নাই।

* * *

প্রচার আমাদের এমনই মোহগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছে যে, এই সুন্দরী প্রতিযোগিতা আর নিয়াদি দিকে সীমাবদ্ধ নাই। আমাদের এই অনুন্নত মাতৃভূমিতেও এই প্রতিযোগিতা একপ্রকার ছিঁড়িকে পর্যবসিত হইয়াছে। আপাতত ভারত সুন্দরী, বোম্বাই সুন্দরী, কলকাতা সুন্দরী ইত্যাদি প্রতিযোগিতা মনে হয় অচিরে ভবিষ্যতে মহল্লা সুন্দরী, ব্লক সুন্দরী, পঞ্চায়েৎ সুন্দরী প্রতিযোগিতায় গিয়া পৌঁছাইবে। দাঁতের মাজন, সাবান, সিগারেট ও দাড়ি কামাইবার ব্লেডের ম্যানুফ্যাকচারেরাই এখনও পর্যন্ত এই সব প্রতিযোগিতার পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু পৃষ্ঠপোষকতা কি এইখানেই সীমাবদ্ধ থাকিবে? অদূর ভবিষ্যতে গড়ের মাঠের কোন ফুচকাওয়ালার পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ের মাঠ-সুন্দরী প্রতিযোগিতার সংবাদ পাইলে আমি অন্তত বিস্মিত হইব না।

* * *

দেহ ও মন, রূপ এবং বুদ্ধি ইহাদের মধ্যে পারস্পরিক যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটুকু মানুষ এতকাল যত্নে পালন করিয়া আসিয়াছে—আজ কেন সে তাহা ভাঙিতে ভুলিতে বসিয়াছে। বহিরঙ্গকে সাজাইবার জন্য মানুষ যে পরিমাণ সময় ভাবনা ও শ্রম ব্যয় করে তাহার শতাংশও যদি সে তাহার মন ও বিবেকবুদ্ধিকে ঘষামাজার কাজে লাগাইত, মনে হয় মানুষকে তাহা হইলে অনেক বেশি সুন্দর দেখাইত।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী প্রচারের বোধ হয় শুভ উদ্বোধন হল গত সপ্তাহে বেলেঘাটার শ্রীবিশ্বনাথ চৌধুরীর হত্যাকান্ড দিয়ে। এটাই বোধহয় অহিংস ভারত রাষ্ট্রের আগামী দিনের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পূর্বাভাষ। বিশ্বনাথ চৌধুরী ছিলেন যুক্তফ্রন্টের সমর্থক ও কর্মী। তিনি যখন পোস্টার লাগাচ্ছিলেন, তখন একটি রাজনৈতিক দলের কিছু লোক তাঁকে হত্যা করে। সংবাদে প্রকাশ, একজন আততায়ীকে স্থানীয় কংগ্রেসী কাউন্সিলার শ্রীশংকুলাল বিশ্বাসের বাড়ি থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ব্যাপারটিকে নিছক গুন্ডাবাজী বা সমাজবিরোধীদের কাজ বললে লঘু করে দেখা হয়।

রাজ্যপালের পুলিশ

এখন আমরা পুলিশবাহিনীকে রাজ্যপালের ঘরের লোক বলেই উল্লেখ করব, কেন না এখন তো রাজ্যপালই দেশের আইন ও শৃংখলার আইনসম্মত রক্ষক। সেই হিসাবে পুলিশের সৎকর্ম বা অপকর্মের দায়িত্ব তাঁর ঘাড়েই চাপবে।

যুক্তফ্রন্টের অপঘাত মৃত্যুর পর পুলিশকে বেশিদিন অনাথ থাকতে হয় নি, বর্তমানেক পার হতে না হতেই বহুদিনের উপোষী আত্মাকে পুলিশ লাঠিবাজি আর গুলীবাজির দ্বারা চাঙ্গা করে নিয়েছে। পি ডি এফ আমলে পুলিশ ও সরকার তো সমার্থবাচক হয়ে গিয়েছিল। আর রাজ্যপালের আমলে তো কথাই নেই।

সম্প্রতি পুলিশী তান্ডবের একটা বীভৎস পরিচয় আমরা পেয়েছি আলিপুরে, যেখানে পুলিশের হাতে খোদ এ-ডি-এম-এরই মাথা ভেঙেছে। আলিপুর কালেক্টোরেটের সম্মুখে একজন দোকানদারকে তার কর্মচারীকে প্রহার করতে দেখে কয়েকজন সরকারী কর্মচারী এই বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। পুলিশ তখন কোথা থেকে এসে উপস্থিত জনতার ওপর লাঠি চার্জ শুরু করে। এঁরা বেহালা থানার পুলিশ। চব্বিশ পরগনার জেলা শাসক পুলিশকে নিরস্ত করার জন্য কলকাতা পুলিশকে খবর দেন এবং অতিরিক্ত জেলা শাসক স্বয়ং ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশকে সংযত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর এই আবেদনে সাড়া দেওয়া দূরে থাক, উল্টে পুলিশ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকেই রীতিমত লাঠিপেটা করে। স্বাধীন দেশের পুলিশের এই কীর্তি সত্যই বিস্ময়কর, বোধ হয় ওদের প্রত্যেককে একটি করে পদ্মশ্রী দেওয়া উচিত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ব্যাপারটি নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে যে চাঞ্চল্য আশা করা গিয়েছিল, তেমন কিছু হয় নি। মনে হয় সত্যই পুলিশীরাজ কায়েম হয়েছে

মধ্যবর্তী নির্বাচনের আরম্ভ

খেলাটা জমেছে মন্দ নয়। আশ্চর্য, আমাদের দেশে এমন একটা মানুষ নেই যে, সত্য কথাটা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। নির্বাচনের তারিখ নিয়ে রাজনৈতিক পথী-মহারথীরা ক্রমাগত নানাপ্রকার মতামত প্রকাশ করে যাচ্ছেন এবং নির্বাচনী কমিশনারকে অযথা দোষারোপ করছেন। কিন্তু প্রত্যেকেই কথা বলছেন নিজের দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, নিজেদের সুবিধাজনক সময়টার কথাই তাঁরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছেন।

নির্বাচনকার্য যত শীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন হওয়া দরকার, তার কারণ এই যে নির্বাচনোত্তর বৈধ সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের জন্য কোন মৌলিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভবপর হচ্ছে না রাজ্যপালের কেয়ারটেকার সরকার শুধুমাত্র দপ্তরগুলি চালাতে পারেন. কিন্তু বৃহত্তর কর্মের ক্ষেত্রে তাঁর ক্ষমতা স্বাভাবিক নিয়মেই সীমাবদ্ধ। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে কেয়ারটেকার সরকার চলাকালীন কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে পশ্চিমবঙ্গের জন্য যে বাজেট মঞ্জুর করা হয় তা শুধু অফিসগুলিকে

... পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গে আর্-নি। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় সমস্যাসংকুল এই রাজ্যটি ইতিমধ্যেই এক বছর পিছিয়ে পড়েছে। রাজ্যপাল শুধুমাত্র শাসন কাঠামোটা বজায় রেখেছেন, এ ছাড়া তাঁর পক্ষে আর কী-ই বা করা সম্ভব ? কেন না তাঁরও হাত-পা কেন্দ্রের কাছে বাঁধা, বন্যা-ত্রাণের জন্য যৎসামান্য ব্যয় মঞ্জুর করাতেও তাঁকে কেন্দ্রের দুয়ারে ধর্না দিতে হয়। দল বিশেষের স্বার্থের চেয়ে পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক স্বার্থ অনেক বড় এবং সেই দিক থেকে বিচার করে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন-সিদ্ধ বৈধ সরকারের প্রয়োজন খুবই জরুরী। কাজেই যত শীঘ্র হয় নির্বাচনের ব্যবস্থা করা উচিত।

দুর্গাপুর প্রসঙ্গ

আগে তাবা গিয়েছিল দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় অন্তর্ঘাতী ক্রিয়াকলাপের পিছনে হয়ত কোন নিগূঢ় কারণ আছে এবং বিগত সংখ্যার বঙ্গদর্শনে এই স্যাবোটাজের নিন্দা করেও একথা বলা হয়েছিল যে, এত বড় একটা কান্ড নিশ্চয় অকারণে ঘটে নি। কিন্তু গত এক সপ্তাহ ধরে দুর্গাপুর সংক্রান্ত যতগুলি ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে কতকগুলি ... কেন্দ্রীয় সরকারই আই এন টি ইউ সি নেতৃবর্গের বিপক্ষে যাচ্ছে। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার প্রধান ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী শ্রীচন্তী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, এই স্যাবোটাজ ঘটার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ইউনিয়ন নেতাদের সঙ্গে যোগা-যোগ করার চেষ্টা করা হয়েছিল, এবং তাঁরা ইচ্ছে করেই টেলিফোনে কথাবার্তা বলতে গররাজি হয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে এই অন্তর্ঘাতমূলক ক্রিয়াকলাপের পিছনে তাঁদের উস্কানী ছিল। এই দুজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতার একজন ছিলেন স্নানাগারে অপর একজন ডিনার টেবিলে, এবং কর্তৃপক্ষের আকুল আহবান সত্ত্বেও তাতে কর্ণপাত করার প্রয়োজন বোধ করেন নি।

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, আই এন টি ইউ সি সরকারী দলের সঙ্গে জড়িত বলেই কি এই প্রতিষ্ঠানের প্রধিকরা অন্তর্ঘাতী কাজে লিপ্ত থাকলে তা মোটেই দোষের নয় ! অথচ দুর্গাপুরের ঘটনার ব্যাপারে কোন বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন যদি যুক্ত থাকত, তাহলে এতদিনে নিশ্চয়ই ডি আই রুলে হাজার পাঁচ-সাত লোককে খাঁচায় পুরে ফেলা হত এবং জগৎকে ... পিছনে বৈদেশিক শক্তির হাত আছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রধানমন্ত্রী

বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চল এবং আরও কিছু দরকারী প্রয়োজনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন। কিন্তু এবার এই প্রসঙ্গে দুটি জিনিস চোখে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রীর আগমন জনগণের মধ্যে কোন সাড়া জাগাতে পারে নি, তাঁকে দেখার জন্য কৌতূহলী জনতা পথের দু' পাশে ভিড় করে দাঁড়ায় নি। যদিও তিনি দমদম বিমানঘাঁটি থেকে কংগ্রেস ভবন পর্যন্ত রাজপথ দিয়েই গিয়েছিলেন। জনগণের এই ঔদাসীন্যের কারণটা বুঝে ওঠা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। এ পর্যন্ত কলকাতায় নেহরু এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রী অভাবনীয় অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন। ভারতের তৃতীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষেত্রে জনগণের ঔদাসীন্যের কারণ এই যে বর্তমান

আগামী সংখ্যায়

গ্রাম-গ্রামান্তরে

কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব জনসাধারণের কোন প্রত্যাশাই পূর্ণ করতে পারে নি, সুদূর ভবিষ্যতে পারবে এমন কোনই ভরসা নেই। দমদম বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য কিছু সরকারী আমলা ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে সেখানে কোন বড় কংগ্রেস নেতাকে দেখা যায় নি। এমন কি কংগ্রেস ভবনে কংগ্রেস কর্মীদের সভায় প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ কোন অভ্যর্থনা জানানো হয় নি। এটি মোটেই সুদৃশ্য নয়, দলের সঙ্গে যদি প্রধানমন্ত্রীর বনিবনা না থাকে তাহলে তাঁর যে কোন প্রচেষ্টাই বাধার সম্মুখীন হবে এবং ফলে তাঁর কিছু করার শক্তিও লোপ পাবে। আর জনসাধারণের চোখে দু' তরফই মর্যাদা হারাবেন ঠিক যা ঘটেছে বর্তমানে।

পশ্চিমবাংলার প্রতি অবিচার

প্রতিরক্ষার সাজসরঞ্জাম নির্মাণকারী কলকারখানাসমূহের সদরদপ্তর অন্যত্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই অপচেষ্টা দীর্ঘকাল ধরেই হচ্ছিল। তবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গত বিধানচন্দ্র রায়ের চেষ্টায় তা সম্ভব হয় নি। এখন রাষ্ট্রপতি শাসনের সুযোগে তা কানপুরে সরাবার ব্যবস্থা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এই দপ্তর

৫০ পয়সা লাভ!
স্টক থাকা পর্যন্ত
৬০ পয়সা দামের
সুন্দর প্লাস্টিকের গেলাস
এখন মাত্র ১০ পয়সায়
এই টিনের
ভেতরে পাবেন।
Cadbury's
Bournvita
ideal food drink
ngth and vigour
OFFER!
Tumbler
450g
net
Bournvita
FOR STRENGTH AND VIGOUR
এই লেবেল দেখে
নিতে ভুলবেন না
শক্তি, উৎসাহ ও
স্বাদের জন্য—
বোর্নভিটা।

উঠলেন কেন সে কথা বলা শক্ত। তবে এই প্রশ্নে পূর্বে যে তদন্ত কমিটি বসানো হয়েছিল তাঁরা স্থানান্তরের বিরোধিতাই করেছিলেন। সেই কমিটি বলেছিলেন, কলকাতার সুবিন্যস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্য হতে এই দপ্তরটিকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাবার কোন অর্থই হয় না। কিন্তু তদন্ত কমিটির এই সুপারিশকে অগ্রাহ্য করেই কেন্দ্রীয় সরকার দপ্তরটিকে স্থানান্তরের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে কেন্দ্রীয় কর্তাদের আঞ্চলিক মনোবৃত্তি। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি সুপ্রসন্ন ব্যক্তি কেন্দ্রীয় সরকারে খুব কমই আছেন। নানা দিক থেকেই পশ্চিমবঙ্গকে খর্ব করার চেষ্টা হচ্ছে। কথাটা শুনতে খারাপ লাগে, বাংলাদেশ ও বাঙালী সম্বন্ধে ভারতের অপরাপর অংশের মানুষদের একটা ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স আছে, এবং এই কমপ্লেক্সের দরুনই বাঙালী-বিদ্বেষ সকল স্থানে সৃষ্ট হয়েছে এবং নেতাদের মধ্যে তা পুরোপুরি বিদ্যমান। অতএব যেমন করেই হোক বাঙালী ও বাংলার ক্ষতি কর এটাই কেন্দ্রীয় কর্তাদের মনোভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এই দুষ্কার্যটি করার জন্য বিশেষভাবে রাষ্ট্রপতির শাসনকালকেই বেছে নেওয়া হয়েছে কেন না এখন হৈ চৈ কম হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও নিশ্চয়ই এই বিষয়ে কিছু বক্তব্য আছে এবং নির্বাচিত সরকার ভিন্ন তা কিভাবে প্রকাশ পাবে?

ঘরের শত্রু বিভীষণ

রাজ্য সরকারের কৃষিদপ্তর 'লিফট ইরিগেশন স্কীমের' জন্য ৩২০০ পাম্প পাম্পের অর্ডার ... প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই বারো কোটি টাকারও বেশি অর্ডারের এক সামান্য ভগ্নাংশও পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারীং কারখানাগুলির কপালে জুটবে না। এই রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারীং কারখানাগুলি অর্ডারের অভাবে প্রায় উচ্ছন্নে যেতে বসেছে, অথচ এখানে অর্ডার না দিয়ে কৃষিবিভাগের কর্তাব্যক্তিরা বোম্বাই এবং অন্যত্র অর্ডার দিতে চলেছেন। এই বিষয়ে রাজ্যপাল শ্রীধবনমবীরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনিও বিস্ময় প্রকাশ করে মন্তব্য করেন: কোটি কোটি টাকার এ কাজ এ রাজ্যে করালে এখানকার কিছু লোক খেয়ে বাঁচত। কতিপয় ব্যক্তির স্বার্থে দেশের স্বার্থ বিসর্জন দেবার রীতি তো এখানে দীর্ঘকালই প্রচলিত, বিশেষ করে বারো কোটি টাকার অর্ডার পাওয়ায় কৃতজ্ঞতার হয়ত বোম্বাই-এর প্রতিষ্ঠানগুলি কৃষিদপ্তরের কর্তাদের কলকাতায় বাড়ি হাঁকাবার সংস্থান করে দেবে এবং সেইরকম কোন আশ্বাস পিছনে না থাকলে কৃষিদপ্তরের কর্তারা এরকম জাতিদ্রোহিতা করতে যাবেন কেন?

অধ্যাপকদের মৌন মিছিল

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির পরিচালনায় রাজ্যের প্রায় দুই সহস্রাধিক অধ্যাপক বুধবার ১১ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে রাজভবনের সামনে মৌন শোভাযাত্রার মাধ্যমে অবিলম্বে সমহারে বর্ধিত বেতনক্রম চালু করার দাবি জানান। অধ্যাপকদলের পক্ষ থেকে রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে যে স্মারকলিপি পেশ করা হয় তাতে বলা হয় যে বৃহস্পতিবার রাজ্যের অধ্যাপকসমাজ কর্মবিরতি পালন করবেন এবং তাঁদের দাবি মানা না হলে তাঁরা দীর্ঘস্থায়ী কর্মবিরতি ও পরীক্ষা বর্জনের পথ অবলম্বন করবেন। এই একই দাবি নিয়ে অধ্যাপকেরা বছরের পর বছর আন্দোলনের হুমকি দিচ্ছেন, কিন্তু সরকার এই বিষয়ে নীরব। অধ্যাপকদের দাবি-দাওয়াগুলির মধ্যে অযৌক্তিকতা কিছুই নেই, কাজেই যথাশীঘ্র সম্ভব তা মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা উচিত। পরীক্ষা বর্জন ও দীর্ঘস্থায়ী কর্মবিরতির পথে যাতে অধ্যাপকেরা পা না বাড়াতে বাধ্য হন সরকারের কর্তব্য সেই দিক দেখা।

নজরুল ভবন

সংবাদে প্রকাশ, একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রধানমন্ত্রী কলকাতায় থাকাকালীন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের একটি বাড়ি নির্মাণের জন্য কথাবার্তা বলেন এবং প্রধানমন্ত্রী নাকি জানিয়েছেন যে, তিনি এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে অবহিত করবেন। যে আশু প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং সরকারের এ বিষয়ে অবশ্যই কিছু করণীয় আছে, এই দাবি দীর্ঘকাল ধরেই আমরা তুলে এসেছি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, প্রায় বিস্মৃত কবিকে পুনরায় জনজীবনে ফিরিয়ে আনার পিছনে নবপর্যায়ের সাপ্তাহিক বসুমতীরই অবদান কম নয়। কবিকে ... রাখা, কবির ... প্রকাশ, কবির ... এবং ... নজরুল সংগ্রহশালা নির্মাণ প্রভৃতির দাবি আমরা দীর্ঘকাল ধরেই করে আসছি এবং সত্যই যদি নজরুল ভবন গড়ে ওঠে, তাহলে আনন্দের চেয়ে সুখী আর কেউ হবে না। কিন্তু এ বিষয়ে যোজনার সঙ্গে কয়েকটি কথা আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যা অপ্রিয় হলেও সত্য। যেহেতু কবি নজরুল একটি স্পর্শকাতর নাম, এবং যেহেতু তিনি আজ সম্পূর্ণ অসুস্থ, সেইহেতু তাঁকে ভাঙিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা কোন কোন মহলে চলছে, আর তা চলছে সাফল্যের সঙ্গেই। এই বছরেই দেখা গেছে হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা একটি সংস্থা কবিকে সাহায্যের নাম করে নানাবিধ অনুষ্ঠান মারফৎ প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে। আমরা চাই নজরুল ভবন হোক, সেখানে কবি আজীবন বাস করুন, তাঁকে সেবার জন্য নার্স রাখা হোক, এবং তাঁর দেহান্তের পর ওই ভবন নজরুল সংগ্রহশালা ও গবেষণাকেন্দ্রে পরিণত হোক। কিন্তু এই সঙ্গে আমরা এও দাবি করছি যে, ওই বাড়ির মালিকানা যেন সরকার নিজের হাতে রাখেন। কবি স্বাভাবিক ও সুস্থ থাকলে এ কথা উঠত না; কিন্তু যেহেতু কবির নিজস্ব মতামতের কোন সুযোগই নেই, সেইহেতু দায়িত্ব সরকারেরই। নজরুল ভবন ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। গৃহনির্মাণ কার্য যেন সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে হয়, কেন না গৃহনির্মাণের নাম করে কোন ব্যক্তিকে যদি টাকা দেওয়া হয়, হোক তিনি কবির বন্ধু বা পরিজন বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তাহলে তার অপব্যবহারের সম্ভাবনাই বেশি, হয়ত তা ধোঁয়াতেও উড়ে যেতে পারে। কোন ট্রাস্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকেও এই কারণে অর্থ মঞ্জুর করা উচিত নয়, এমন কি সেইরকম কোন প্রতিষ্ঠানে কবির এককালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা নিকট আত্মীয়রা থাকলেও। একমাত্র বিশুদ্ধ সরকারী উদ্যোগে ও প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে নজরুল ভবন, সংগ্রহশালা ও গবেষণাকেন্দ্র গড়ে উঠুক, যেখানে বোর্ড অফ ট্রাস্টি হবেন শুধু একমাত্র সরকারই, নতুবা বাংলাদেশের মানুষ এ বিষয়ে আশ্বস্ত হবে না।

মেঘালয়

অতঃপর যদি পর্বতীয়াগণ মেনে নেন তাহলে খাসি জয়ন্তিয়া আর গারো পাহাড় নিয়ে রাজ্যের মধ্যে রাজ্য গঠনের একটি অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে আসাম অন্তঃরাজ্যে। তিন পাহাড়ী অঞ্চল হবে আসাম অন্তঃরাজ্যের মধ্যে একটি উপরাজ্য যার সব রকম স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারই থাকবে, শুধু থাকবে না আইন ও শৃংখলা রক্ষার ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার। এই আইন-শৃংখলার প্রশ্নেই মিজো পাহাড় জেলাকে প্রস্তাবিত উপ-রাজ্যে যোগদানের সুযোগ দেওয়া হয় নি। কিন্তু সুযোগ আছে মিকির ও উত্তর কাছাড় পার্বত্য রাজ্যের। ইচ্ছে করলে এতদঞ্চলের পর্বতীয়াগণ দুই-তৃতীয়াংশ মেজরিটির ভোটে উপরাজ্যে যোগ দিতে পারবেন। কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত বিনা বিতর্কেই ওয়ার্কিং কমিটির সমর্থন লাভ করে এবং আসাম থেকে নির্বাচিত ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ এবং আসামের মুখ্যমন্ত্রী বি পি চালিহাও সিদ্ধান্তটি মেনে নেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়ে দেন, এই উপরাজ্য গঠন আসামের বিশেষ অবস্থার জন্যই করা হয়েছে। ভবিষ্যতে অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে এই উপরাজ্যটিকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করা হবে না। এ-সম্পর্কে শীঘ্রই আইন প্রণয়ন করা হবে। সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে বিল উত্থাপিত হবে।

কিন্তু এক্ষেত্রে সহজ কোন সমাধান নেই। যেহেতু উপরাজ্যের অস্তিত্ব পূর্বে কল্পনা করা হয় নি সুতরাং সংবিধানেও এজন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। রাজ্য গঠন করতে হলে সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। মুখ্য-মন্ত্রীসহ রাজ্যের মধ্যে উপরাজ্যে একটি বিধানসভাও থাকবে যার কোনও ইতি-পূর্ব নজির নেই।

পার্বত্য নেতৃমহলে প্রতিক্রিয়া

কিন্তু কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে পার্বত্য নেতৃমহল খুব খুশি হতে পারেন নি। বরং তাঁরা গভীরভাবে হতাশ। পার্বত্য নেতৃ-সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক স্ট্যানলী নিকলস রায় কেন্দ্রীয় প্রস্তাবের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, প্রস্তাবটি গ্রহণযোগ্য নয়। অন্য দু-একজন পার্বত্য নেতার ধারণাও অনুরূপ। তবে পর্বতীবাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম গত বারো তারিখ থেকে তিন দিনের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত সঙ্গে-সঙ্গেই গৃহীত হয়েছিল।

আসাম উপত্যকা থেকে যে বিরোধিতার হুংকার শোনা গেছল, কেন্দ্রের বর্তমান প্রস্তাবে তা কিন্তু গলে জল হয়ে গেছে, সবাই হৃষ্টচিত্তে এখন প্রস্তাবটি মেনে নিতেই আগ্রহী, পর্বতীয়াগণ ছাড়া। কিন্তু এই মুহূর্তেই পর্বতীয়া রাজ্যকে সম্পূর্ণভাবে আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন করার দাবিটি গ্রহণ করলে তার যে প্রতিক্রিয়া আসামে এবং অন্যান্য অঞ্চলেও দেখা দিতে পারত—কেন্দ্রের বর্তমান প্রস্তাবে তাই এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। পর্বতীয়াগণের এ-বিষয়টিও কি বর্তমান মুহূর্তে সহানুভূতির সঙ্গেই বিবেচনা করে দেখা উচিত নয়? তাঁরা তাঁদের বহুদিনের দাবিকে প্রাথমিক সাফল্যের স্তরে উন্নীত করতে পেরেছেন। পর্বতীয়াগণ অবহেলিত, তাঁদের এই ক্ষোভ কেন্দ্রীয় প্রস্তাবে বহুলভাবে মেটারই সম্ভাবনা। এক রাজ্যপাল একটি হাইকোর্ট এবং আইন-শৃংখলার প্রশ্ন ছাড়া তাঁদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার মোটামুটি স্বীকৃত। এমতাবস্থায় তাঁদের পক্ষেও দাবির ও জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে চিন্তাধারা প্রবাহিত করাই বাঞ্ছনীয়।

ভাঙনের দায়িত্ব

যে মেহতা কমিটির সুপারিশ সর্বৈব-ভাবে গ্রহণে আপত্তি ছিল তাঁদের, বর্তমানে সেই সুপারিশেরও সম্ভাব্য রদ-বদল করা হয়েছে। সূচনার পক্ষে এই জয় বর্তমানে মেনে নিলে পর্বতীয়াগণের পক্ষে ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কিন্তু তাঁদের লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে কয়েক পা অগ্রসর হওয়ারই বরং সুযোগ আছে। তাছাড়া এই ছাড়টুকুতে সমতলবাসীদের প্রতিক্রিয়া এখন আন্তরিক সৌহার্দ্য-পূর্ণ। এমন একটি পরিস্থিতিকে কাজে না লাগিয়ে যদি পর্বতীয়াগণের তরফে পুরোপুরি তাঁদের দাবি মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে একই জল ঘোলাতে থাকে তবে অবস্থার যে অবনতি আশংকা করা যায় তাতে বর্তমানের মধুর পরিবেশটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। জনসংঘের মতো কতি-পয় তো এই ছাড়েই গেল গেল, ভাঙল ভাঙল রব তুলেছেন। বলছেন, এইভাবে ভাঙন সুরু হল।

বস্তুতই যদি ভাঙন সুরু হয় তবে তাও একরকম অবশ্যম্ভাবী। দেশ আজ ক্ষুদ্র স্বার্থচেতনার দ্বারা পরিচালিত। সংকীর্ণ প্রাদেশিকতাও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে গ্রাস করছে। তাঁরা এমন কি যে রাজ্য তাঁদের নেকনজরের বাইরে, তার তৈরি শহর নগর অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে দেওয়ার চক্রান্তেও তাঁরা ইতস্তত করেন না। ঠিক এই জন্যই পূর্ব ও পশ্চিম

পাকিস্তানে আজ অগণতান্ত্রিক চরম আকার ধারণ করছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রের অবহেলা আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি এবং কলকাতাকে নানাভাবে পঙ্গু করে দেওয়ার একটা অভিপ্রায় অনেকদিন থেকেই প্রকট হয়ে উঠতে দেখছি। সুতরাং মনে মনে তাদের কান্না কেন্দ্রের দৃষ্টি করলেন পশ্চিমবঙ্গবাসী তা ভালই বোঝেন। তাই অবহেলিত সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের সহানুভূতি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই উৎসারিত হয়। পার্বতীয়াগণের ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে পার্বতীয়া ক্ষোভকে গণনা করে এসেছে। পত্র-পত্রিকায় তাঁদের অভাবগুলি পেয়ে এসেছে সমুচিত প্রচারের সুযোগ। আজও তাঁদের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের সহানুভূতি সমান সক্রিয়। তবে যেহেতু পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য যা জাতীয় স্বার্থের জন্য নিজে চিরকালই উদারভাবে আত্মত্যাগ করে এসেছে এবং আসে, তাই পার্বতীয়াদের অনুত্তেজিতভাবে প্রথম জয়টুকু বরণ করে নেওয়ার সাধু প্রস্তাবই সেখান থেকে স্বভাবতই উত্থাপিত হবে। এই ভাঙনের দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গে অন্তত পার্বতীবাদের ভাঙন-প্রীতি বলে কখনই গণ্য হবে না।

প্রস্তাবিত ক্ষমতা হস্তান্তর

যেসব অঞ্চল নিয়ে রাজ্যটি গঠিত হবে সে সব অঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা আর পুলিশের (গ্রাম্য ও নগর পুলিশ বাদে) দায়িত্ব থাকবে আসাম রাজ্যের হাতে, নতুন রাজ্যের হাতে নয়।

জংগল আসাম রাজ্য ও স্বশাসিত রাজ্যের জন্য সাধারণ থাকবে রাজ্যপাল, হাইকোর্ট, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, নির্বাচন পর্ষৎ আর রাজধানী শিলং। কেন্দ্রীয় কৃত্যকের (সার্ভিসের) ও উচ্চতর রাজ্য কৃত্যকের একাংশও সাধারণ থাকবে।

আসামের বিধানসভা ও সরকারের হাতে ঐ অঞ্চলের আন্তঃরাজ্য রাজপথ, সেচ, বন্যানিয়ন্ত্রণ, জল নিষ্কাশন, জল সরবরাহ, জলবিদ্যুৎ প্রভৃতি প্রকল্প এবং রেল চলাচল ও প্রধান প্রধান শিল্প থাকবে।

ঐ সব ছাড়া রাজ্য তালিকার আর সবই নতুন রাজ্যের হাতে থাকবে। সেগুলো হল—কৃষি, মৎস্য চাষ, বন, শিক্ষা (বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাসহ), রাজ্য যোগাযোগ চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও সমবায়, ভূমি, খনি ও খনিজ উন্নয়ন, আবগারি ও কুটির শিল্প এবং বিচার ও কারা। উপজাতীয় স্বার্থ ও রীতিনীতি সংক্রান্ত বিষয়, যেমন বিবাহ

[illegible], [illegible] বিচার-সভার হাতে থাকবে। তাছাড়া এই বিধান-সভা এই রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়ের জন্য কর ধার্য করতে পারবেন।

[illegible]

প্রস্তাবিত পার্বত্য রাজ্যের বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় সাত লক্ষ আশী হাজার। মিকির আর উত্তর কাছাড় পাহাড়ী জেলার লোকসংখ্যা ২ লক্ষ ৭৯ হাজার।

আসামের পাহাড়ী জেলাগুলো নিয়ে স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের দাবি রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন ১৯৫৪-৫৫ সালে অগ্রাহ্য করেন। ১৯৬০-এর নভেম্বরে স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি আবার তোলেন পার্বত্য নেতৃ সম্মেলন। গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে ১৯৬১-র ফেব্রুয়ারীতে স্বশাসনের কথা বলা হয়। কিন্তু সেবোক্ত প্রস্তাব পার্বত্য নেতৃ সম্মেলন অগ্রাহ্য করেন।

গত ১৯৬৬-তে পাটাশকর কমিশন পূর্ণ স্বশাসন পরিকল্পনার প্রস্তাব দেন। পার্বত্য নেতৃ সম্মেলন ১৯৬৬-র ২১শে মে এই প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করেন।

তারপরই, ১৯৬৭-র ১৩ই জানুয়ারী সরকারী ঘোষণায় ফেডারেল পরিকল্পনার প্রস্তাব দেওয়া হয়। পার্বত্য নেতৃ সম্মেলন এই প্রস্তাবটি অভিনন্দিত করেন। কিন্তু অন্য সব পক্ষ বিরোধিতা করেন।

কেন্দ্রীয় সরকার অতঃপর শ্রীঅশোক মেহতার নেতৃত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করেন। সেই কমিটির রিপোর্টে পাহাড়ী অঞ্চলের জেলা পরিষদগুলিকে অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গ্রহণ করবার সুযোগ দিতে বলা হয়।

ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন পার্বত্য নেতৃ সম্মেলন।

তারপরই সরকার বর্তমান পরিকল্পনা উদ্ভাবন করেন।

রাজস্থানে কিসের বলি

ইতিপূর্বে ভারতীয় নামক একটি সুসভ্য জাতির জন্মভূমি ভারতবর্ষে প্রকাশ্য দিবালোকে হরিজন বালককে বেওয়ারিশ ইঁদুরের মতো পিটিয়ে হত্যা করার সংবাদ আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তারপর শুনেছেন, গ্রাম ছেড়ে হরিজনরা পালাচ্ছেন এবং তাঁদের বসতভিটা সেই ফেলে আসা গ্রামে পট [illegible] পুড়ছে। শুনেছেন এ-সমস্তই ভারতবর্ষ নামক একটি ভৌগোলিক সীমানায় সীমিত স্থানে ঘটেছে, যেখানে একটি সুসভ্য সরকার কেন্দ্রে এবং তদনুরূপভাবে 'সুসভ্য' সরকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে। যেখানে 'সুসভ্য' পুলিশবাহিনীর হাতে ঢাল-লাঠি-রাইফেল-কাঁদানে গ্যাস ও অন্যান্য মারাত্মক মারণাস্ত্র থাকে। যেখানে আইন ও শৃঙ্খলাহানির প্রশ্নে একদল লোক একসময় দূরে চাৎকার করে সরকার [illegible] অংশ গ্রহণও করেছিলেন। অথচ আজ আবার তাঁদেরই হুকুমে-হাজির সুসভ্য পুলিশবাহিনী বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন থাকাকালে ও বিভিন্ন মিছিলের মোকাবেলায় মহড়া নেওয়ার অভ্যাসে সুস্পষ্ট প্রকাশমান নির্মম হত্যালীলার ছবি অন্যতম। যে দেশে বিদেশী প্রতিনিধিদের নিয়ে কার্নিভালের ওপর [illegible] মিটিং-সিটিংও হয় এবং যে দেশ সুযোগ পেলেই বিদেশী বন্ধুদের ন্যায়নীতি শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং যে দেশের মন্ত্রী ভিন দেশের [illegible] নীতির প্রশ্নে পদত্যাগ করেন,

[illegible] সেই দেশে বারো বছরের ছেলেকে বলি দেওয়া হয় কণ্ট্রাক্টরের পুষ্করিণী খনন উদ্বোধন যজ্ঞে। পিটিয়ে হত্যা করা হয় চোর বদনামাঙ্কিত হরিজন বালককে। দুর্বলের ঘরে আগুন দেওয়া হয় বর্ণ-হিন্দুর বেগারী শ্রমিক হতে অস্বীকার করলে। এই সুসভ্য দেশটিতে এখনও বাকি আছে শুধু শিশুর কচি মাংসে কালিয়া কাবাব রোস্ট বানানো এবং তার মেনু প্রকাশ্য হোটেলে খরিদ্দারের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সাজিয়ে রাখা। তবে বুদ্ধ-চৈতন্য-বিবেকানন্দের ভারতে পশ্চাদগতি যে হারে শুরু হয়েছে, তাতে এখানে যে কোনদিন শিশুর 'চপ' তৈরি হচ্ছে শুনলে আমরা কেউ বিস্মিত হব না। বস্তুতই এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাওয়াই ভার।

সম্প্রতি রাজস্থানে যে স্পেসিমেন পাওয়া গেল তা নামান্তরে শিশুভক্ষণই ঘটে। অন্তত একের ভোগের জন্য অন্যের কিশোর বালক বলিদান শিশুভক্ষণ ছাড়া আর কী।

সংবাদটি রাজস্থানের বিধানসভায় প্রচুত হওয়ামাত্র বিস্ময়ে শীৎকার ধ্বনি উত্থিত হয়েছিল সভাকক্ষে। কিন্তু বিষয়টি আলোচনার জন্য অতিরিক্ত সময় মঞ্জুর করতে রাজী হন নি তথাকার স্পীকার মহোদয়।

স্বতন্ত্র সদস্য রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে আহ্বান জানান। কিন্তু ফালতু দেশীয় ব্যাপারে পদত্যাগ করে ফায়দা কি? তাঁরা [illegible] সাড়া দিতে পারেন নি। স্পীকার মহোদয় অতিরিক্ত প্রশ্ন উত্থাপন কড়াভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। জনৈক সদস্যের প্রস্তাব ছিল, নিহত বালকটির আত্মার প্রতি সভাগৃহ শ্রদ্ধা নিবেদন করুক এবং তার পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করুন সরকার। ধীর বিবেচক স্পীকার মহোদয় বলেছেন, ব্যাপারটা তাঁকে ভেবে দেখতে হবে। অর্থাৎ বড়ই কড়া আইন।

আইন নেই শুধু দেশে। নাগরিক অধিকার সংবিধানে প্রদত্ত মায়া মাত্র। কারও প্রাণ রক্ষার সম্পত্তি রক্ষার ক্ষমতা নেই সরকার ও প্রশাসনের।

সভাগৃহ যখন আবেগে কাঁপছে ও রাগে ফুঁসছে, তখন স্পীকার সহ সরকার পক্ষের ধৈর্য দেখবার মতো। এমন না হলে অরাজক রাজত্বও দিব্যি দিনের পর দিন ফাইলবন্দী হয়ে টিকে থাকে!

সদস্যদের প্রশ্নের উত্তরে সরকারী তরফ জানিয়েছেন, বালকটির কঙ্কাল পুলিশ উদ্ধার করে গত ৪ঠা জুলাই। বালকটি নিখোঁজ হয়েছিল ২১শে মে। জানা গেছে, জনৈক কণ্ট্রাক্টর উদয়পুর জেলার কোদাই তহশীলের মাদারা গ্রামে একটি পুষ্করিণী খনন ব্যাপারের উদ্বোধন কালে মজুর শ্রেণীর একটি বার বছরের কিশোরকে নৈবেদ্যের বলিরূপে অর্পণ করে। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বা প্রতি-বেদনে জানা যায়, বালকটির গলার অর্ধেকটা ছুরি দিয়ে কাটা হয়। এতো বড় একটা কসাই-কসরৎ দেখবার জন্য [illegible] উপস্থিত ছিলেন কি না, জনৈকের এই প্রশ্নের জবাবে সরকার জানান, খবরটা তাঁদের অজ্ঞাত।

বস্তুত বিচিত্র এই দেশই যে দুনিয়ার ন্যায়নীতির হালচালের পরীক্ষক এবং গায়ে না-মানুক আপনি মোড়ল পাশমার্ক প্রদাতা, তা যথার্থই এদেশের পক্ষে মানানসই হয়েছে।

শুনেছি, যাঁরা অনেকদূর এগিয়েছেন তাঁরা নাকি আবার বন্য সমাজে ফেরৎ যেতে চান; কিন্তু যে ভারত কোনোভাবেই 'যাকে বলে এগোনো' তার কল্পনাও এ পর্যন্ত ফাঁদতে পারে নি, তার বন্য বর্বরতা এখনই মধ্যযুগের মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

কতিপয় ভারতীয়ের গায়ে বনমানুষের লোম, দাঁতে দাঁতালের ধার, চোখে শ্বাপদের ক্ষুধার্ত দৃষ্টি এবং শরীরে মাংসাশী জন্তুর দুর্গন্ধ; এই ভয়ংকর দুঠেঙে জন্তু দেশে এতোগুলি চিড়িয়াখানা এবং জেলখানা থাকা সত্ত্বেও কেমন করে লোকালয়ে বসবাস করছে সেটাই আশ্চর্য! এই মানুষ-খেকো দুঠেঙে জন্তুগুলির ব্যবস্থা করতে না পারলে এদেশের ব্যর্থ সরকার ও শান্তিরক্ষকদের নরখাদক পোষণের অভিযোগে একদিন বিশ্ব-আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। জাতিকে তোয়াক্কা না করলে কী হবে, আন্তর্জাতিক জগতে নীতিবাগীশ ভারত সেদিন কী জবাব দেবে?

(১৪।৯।৬৮)

ইজরায়েলকে নতুন করে আক্রমণ করার ব্যাপারে উস্কানি জুগিয়েছেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী নিকসন (ডানদিকে)।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র :

আবার ইজরায়েল আরবভূমির ওপর আক্রমণ করেছে। ৮ই সেপ্টেম্বর রাতে হঠাৎ ইজরায়েলী কামান থেকে সুয়েজ শহরের ওপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করা হয়। পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রও গোলা ছোঁড়ে। সুয়েজ খালের পাশে চার ঘণ্টা ধরে দু' পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। বহু ব্যক্তি হতাহত হয়।

গত বছর জুন মাসে যুদ্ধবিরতির পর এই নিয়ে ইজরায়েল অষ্টমবার সুয়েজ অঞ্চলের ওপর আক্রমণ করল। ৪ঠা সেপ্টেম্বর প্যালেস্টাইনের আরব গেরিলারা তেলআভিভের রাজধানী তেল আভিভে বড় রকমের একটা বিস্ফোরণ ঘটায়। তারই প্রতিশোধ নেবার জন্য ইজরায়েলী সৈন্য সুয়েজের ওপর হামলা করেছে।

ইজরায়েলকে নতুন করে আক্রমণ করার ব্যাপারে উস্কানি জুগিয়েছেন রিচার্ড নিকসন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী নিকসন বলেছেন "মধ্যপ্রাচ্যের ভারসাম্য ইজরায়েলের দিকে নিয়ে আসতে হবে।" যে-সব আরব রাষ্ট্র 'আক্রমণাত্মক' নীতি গ্রহণ করবে তাদের সব সাহায্য বন্ধ করে দেয়া হবে, আর যারা 'উদার' নীতি গ্রহণ করবে, তাদের সাহায্য বৃদ্ধি করা হবে। নিকসন হয়তো আপাতত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদী ভোটের দিকে তাকিয়েই এই কথা বলেছেন। কিন্তু এর ফলে ইজরায়েলের যুদ্ধোন্মাদনা বৃদ্ধি পেয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তিস্থাপনে রাষ্ট্রসংঘের প্রচেষ্টা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ৯ই সেপ্টেম্বর এক প্রস্তাবে ইজরায়েল ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, উভয়ের কাছেই সুয়েজ খাল এলাকায় যুদ্ধবিরতি মেনে চলার জন্য আহ্বান জানিয়েছে। রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল উ থান্ট এই অঞ্চলে অবস্থানরত রাষ্ট্রসংঘ পর্যবেক্ষকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত যে রিপোর্ট নিরাপত্তা পরিষদে পেশ করেন তাতেও দেখা যায়, ইজরায়েলই প্রথম আক্রমণ শুরু করে।

ইজরায়েলের আক্রমণের আর একটি উদ্দেশ্য বোধ হয়, রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধি গানার য্যারিং যাতে শান্তি প্রচেষ্টা ত্যাগ করে ব্যর্থ হয়ে এই এলাকা থেকে চলে যান, তার জন্য নতুন উত্তেজনা সৃষ্টি করা।

সোয়াজিল্যাণ্ড :

বৃটিশ শাসন থেকে মুক্তিলাভ করে সোয়াজিল্যাণ্ড স্বাধীনতা অর্জন করল। এই সঙ্গে, আফ্রিকায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্নটিও লোপ পেল। বৃটেনের আইন ও ধারণা অনুসারে অবশ্য দক্ষিণ রোডেশিয়া এখনও বৃটিশ কর্তৃত্বাধীন। কিন্তু বিদ্রোহী আয়ান স্মিথ বৃটিশ সরকারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে একতরফাভাবে রোডেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে, এবং বর্তমানে একটি প্রজাতন্ত্রী সংবিধান রচনার কাজে ব্যস্ত রয়েছে; বৃটেন কিছুই করতে পারছে না। তাই, প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত এই ক্ষুদ্র দেশটি ছিল বৃটেনের 'প্রোটেক্টরেট'। সাতচল্লিশ বছর ধরে এখানে রাজা দ্বিতীয় সোভুজার 'রাজত্ব' চলছে।

গত ৭ই সেপ্টেম্বর সোয়াজিল্যাণ্ডের রাজধানী মবাবানে শহরে ন্যাশনাল স্পোর্টস স্টেডিয়ামে ষাট হাজার মানুষের উপস্থিতিতে এক আনন্দানুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে সোয়াজিল্যাণ্ডের স্বাধীনতা উৎসব পালিত হয়। বৃটেনের কমনওয়েলথ দপ্তরের মন্ত্রী জর্জ টমসন রাণী এলিজাবেথের প্রতিনিধিরূপে রাজা সোভুজার হাতে স্বাধীনতাদানের সিদ্ধান্ত-পত্র অর্পণ করেন।

এই অনুষ্ঠানে চার হাজার বীর যোদ্ধা এক সঙ্গে সমবনৃত্যে অংশ গ্রহণ করে। আর একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। ৬৯ বৎসর বয়স্ক রাজা সোভুজার ১১২ জন স্ত্রী মিছিল করে এসে স্বাধীনতা-অনুষ্ঠানে যোগ দেন। সবাই মোটরগাড়ি করে অনুষ্ঠানে আসেন, সবাই-এর এক পোষাক—নীল ও কমলা রং-এর কাপড়, মাথায় নীল রিবন বাঁধা, নগ্নপদ। রাজার দেহরক্ষী রাণীদের সবাইকে নিয়ে সামনে এক জায়গায় বসিয়ে দেন। রাজা সোভুজার হারেমে তাঁর ১৭০ জনের মত স্ত্রী আছেন। এখন সমস্যা দেখা দিয়েছে, এঁদের মধ্যে তিনি কাকে পাটরাণীর আসনে বসাবেন।

সোয়াজিল্যাণ্ডের লোকসংখ্যা তিন লক্ষ নব্বুই হাজার। এদের মধ্যে দশ হাজারের মত শ্বেতাঙ্গ। সোয়াজিল্যাণ্ডের লোকেরা সবাই প্রায় একই উপজাতির অন্তর্ভুক্ত—এই দিক দিয়ে তাদের মধ্যে উপজাতীয় কলহের আশংকা কম। তবে সোয়াজিরা অত্যন্ত দরিদ্র ও অশিক্ষিত। অথচ, সোয়াজিল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও প্রচুর। রপ্তানী বাণিজ্য থেকে সোয়াজিল্যাণ্ড বছরে ৬ কোটি পাউণ্ডের মত উপার্জন করে। চিনি, কাষ্ঠমণ্ড, অ্যাসবেসটস, আকরিক লোহা প্রভৃতি তার প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। সুদূর জাপানের সঙ্গেও তার বাণিজ্য-সম্পর্ক রয়েছে। সোয়াজিল্যাণ্ডের মাটিতে সোনা, কয়লা ও অ্যাসবেসটস প্রচুর পরিমাণে রয়েছে।

বৃটেন এতদিন কেবল এই দেশ শোষণই করেছে। এখানকার লোকেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি, বা তাদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য বিশেষ কিছু করে নি। যা কিছু ধনসম্পদ, তার প্রায় সবটাই শ্বেতাঙ্গদের হাতে। আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত অথচ সোয়াজি রীতি-নীতির প্রতি আস্থাবান রাজা এখন কি করেন দেখা যাক।

সোয়াজিল্যাণ্ডের মুশকিল হবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে। তার চার দিকের তিন দিক ঘিরে রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সোয়াজিল্যাণ্ডের অধিকাংশ ব্যবসা-বাণিজ্য দক্ষিণ আফ্রিকার লোকের হাতে। বিদেশের সঙ্গে সোয়াজিল্যাণ্ডের বাণিজ্য দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের কর্মচারীরা দেখাশুনো করেন। জোহানেসবার্গের বিমানবন্দর হল সোয়াজিল্যাণ্ডের বিমানবন্দর। এই অবস্থায় কৃষ্ণাংগ-অধ্যুষিত রাজ্য হয়েও সোয়াজিল্যাণ্ডকে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গেই চলতে হবে। বর্ণবৈষম্যের প্রশ্নে তার যত ক্ষোভই থাক

সোয়াজিল্যাণ্ডকে ইতিমধ্যেই রাষ্ট্র-সংঘের ১৩২তম সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কমনওয়েলথের ২৮তম সদস্য হ'ল সোয়াজিল্যাণ্ড।

রুমানিয়া :

যাঁরা ভেবেছিলেন, চেকোস্লোভাকিয়ার পর এবার রুমানিয়ার ওপর ওয়ারশ গোষ্ঠীর সামরিক হস্তক্ষেপ হবে, তাঁরা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছেন। সোভিয়েট য়ুনিয়ন বা অপর কোন ওয়ারশ গোষ্ঠী-ভুক্ত রাষ্ট্র রুমানিয়া অভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করে নি।

তবু রুমানিয়া সোভিয়েট সম্পর্কে যথেষ্ট উত্তেজনা এখনও রয়েছে। সোভিয়েট সংবাদপত্রগুলিতে রুমানিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করা হচ্ছে। বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইকেল স্টুয়ার্টের বুখারেস্ট সফর উপলক্ষে সোভিয়েট য়ুনিয়নের সরকারী মুখপত্র 'ইজভেস্তিয়া'য় ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে রুমানিয়া ও বৃটেন, উভয়েরই তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। 'ইজভেস্তিয়ার' বক্তব্য, বৃটেন পূর্ব য়ুরোপের রাজনীতিতে অনধিকার প্রবেশ করছে। রুমানিয়াকে অন্যান্য কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উসকে দিয়ে বৃটেন ঠাণ্ডা লড়াইকে জিইয়ে রাখতে চায়। এই সূত্রে 'ইজভেস্তিয়া' ন্যাটো গোষ্ঠী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ করে মার্কিন প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী ক্লার্ক ক্লিফোর্ডেরও সমালোচনা করেন।

রুমানিয়া এখন সোভিয়েট সমালোচনার সুর নরম করলেও একেবারে চুপ করে যায় নি। রুমানিয়ার রাষ্ট্রপতি ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক নিকোলাই সোসেস্কু বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইকেল স্টুয়ার্টকে সাদর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছেন এবং উভয় দেশের সমস্বার্থের বিষয় ও পূর্ব য়ুরোপের সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে আলোচনা করেছেন। সোভিয়েট-রুমানিয়া সম্পর্কের বিষয়ও নিশ্চয়ই তাঁদের আলোচনায় উঠেছিল।

১০ই সেপ্টেম্বর সকালে সোসেস্কু স্টুয়ার্টের সঙ্গে কথা বলেছেন। আর, সেদিনই বিকালে বুখারেস্টে এক বিরাট জনসভায়, জনতার বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে সোসেস্কু বললেন 'জাতির সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করলে তবেই সমাজতন্ত্রের জয় হবে।' সোসেস্কু তাঁর বক্তৃতায় কোথাও চেকোস্লোভাকিয়ার ঘটনার উল্লেখ করেন নি। তবু এই বক্তৃতার উপলক্ষ চেকোস্লোভাকিয়ায় ওয়ারশ গোষ্ঠীর সামরিক হস্তক্ষেপ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সোসেস্কু সোজাসুজি নাম না করেও সোভিয়েট নেতাদের উদ্দেশে ব্যঙ্গোক্তি করেন : "কেউ কেউ মনে করেন 'আমিই মার্কসবাদী'। কিন্তু তা হতে পারে না। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কারও একার নয়।" এই বক্তৃতাতেই সোসেস্কু কমিউনিস্ট-সংহতির বিষয়েও আলোচনা করেন।

চেকোস্লোভাকিয়ায় গণতন্ত্রীকরণের কাজ শুরু হবার প্রথম থেকে রুমানিয়া চেকোস্লোভাকিয়াকে সমর্থন করে আসছে। চেকোস্লোভাকিয়ার ওপর ওয়ারশ গোষ্ঠীর সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রথমেই প্রতিবাদ জানিয়েছে রুমানিয়া। রুমানিয়ার সঙ্গে সোভিয়েট য়ুনিয়ন তথা ওয়ারশ গোষ্ঠীর বিরোধ অনেক দিনের। সোসেস্কুর আগে যিনি রুমানিয়ার রাষ্ট্রপতি ও পার্টিপ্রধান ছিলেন সেই ঘর্গে ঘর্গিউ-দেজের আমল থেকেই শুরু হয়েছে বিরোধ, প্রায় ১৯৬০ সাল থেকে।

ওয়ারশ গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সংস্থা 'কমেকনের' নীতির বিরুদ্ধে রুমানিয়ার বিক্ষোভ। রুমানিয়ার বক্তব্য, 'কমেকনের' নীতি এমনভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে, যাতে রুমানিয়া চিরকাল শিল্পে অনগ্রসর একটি কৃষিপ্রধান দেশ রূপে থাকতে বাধ্য হয়। রুমানিয়া অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশকে খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল সরবরাহ করবে, আর অন্য দেশ থেকে শিল্পজাত দ্রব্য কিনবে। এই ব্যবস্থা চলবে না। ঝর্গিউ দেজ এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং রুমানিয়ার শিল্পায়নের ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। কেবল অর্থনীতি নয় রাজনীতি, শিক্ষা সংস্কৃতি প্রতি ব্যাপারেই তিনি সোভিয়েট কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে যান। তিনি স্বাধীন রাজনীতি অনুসরণের চেষ্টা করেন। স্কুলে এতদিন রুশ ভাষাকে বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় ভাষা রূপে পড়ানো হত। ঝর্গিউ-দেজ তা বন্ধ করে দেন। ১৯৬৫ সালে ঝর্গিউ-দেজের মৃত্যুর পর সেসেস্কু তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাঁর অনুসৃত নীতিই পুরোপুরি অনুসরণ করেন।

চীন-সোভিয়েট দ্বন্দ্বে রুমানিয়া নিরপেক্ষ বরং কিছুটা চীনের দিক ঘেঁষে রয়েছে। আবার, পশ্চিমীদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেছে রুমানিয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী এমন কি ইজরায়েলের সহযোগিতায় রুমানিয়ার অনেকগুলি শিল্প গড়ে উঠেছে। আরব-ইজরায়েল সংঘর্ষের সময় রুমানিয়া আরবদের সমর্থন করতে অস্বীকার করে। অন্যান্য কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের মত ইজরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদও করে নি রুমানিয়া।

সুতরাং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্পর্কের নতুন পটভূমিকায় রুমানিয়া-সোভিয়েট বিরোধ আবার কোন দিকে মোড় নেবে, বলা শক্ত।

চেকোস্লোভাকিয়া ঃ

চেক নেতারা সোভিয়েট নেতাদের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করতে চেয়েছেন। সে আলোচনা হয়েছেও।

২৩শে থেকে ২৬শে আগস্ট মস্কোতে যে আলোচনা হয়, এবং সোভিয়েট য়ুনিয়ন ও চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যে যে চুক্তি হয়, সেই অনুযায়ী চেক নেতারা চেকোস্লোভাকিয়া 'স্বাভাবিক অবস্থা' ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করেন। প্রতি-বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, সংবাদ-পত্র ও রেডিও-টেলিভিশনের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ এবং সাম্রাজ্যবাদীদের অনুপ্রবেশ, নাশকতামূলক কাজ ও আক্রমণের আশঙ্কার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য চেক নেতারা প্রতিশ্রুতি দেন। সেই মত কাজ সুরুও হয়। কিন্তু সোভিয়েট য়ুনিয়ন কাজের গতিতে খুশি নয়। সোভিয়েট পত্রপত্রিকায় প্রায় প্রতিদিনই বলা হয়, 'স্বাভাবিক অবস্থা' ফিরিয়ে আনার জন্য চেক নেতারা যেভাবে কাজ করছেন তা মোটেই সন্তোষ-জনক নয়। এখনও প্রতিবিপ্লবীরা যথেষ্ট শক্তিশালী রয়েছে এবং তারা তাদের কাজ করে চলেছে। চেক নেতারা বলেছিলেন, দখলদার সৈন্যদের সরিয়ে নিলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সুবিধা হবে। কিন্তু সোভিয়েট য়ুনিয়ন এই বক্তব্য গ্রহণ করে নি। ৮ই সেপ্টেম্বর সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সরকারী মুখপত্র 'প্রাভদা'য় অ্যালেক্সি লুকোভেট্সের লেখা যে দীর্ঘ আন্তর্জাতিক ভাষ্য বের হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, "মিত্রশক্তির সৈন্যদল যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসা সম্ভব নয়" চেক নেতাদের এই ধারণার সঙ্গে সোভিয়েট য়ুনিয়ন একমত নয়। 'প্রাভদা'য় পরিষ্কার বলা হয়েছে ঃ "এ বিষয়ে যেন কোন সন্দেহ না থাকে যে মিত্রশক্তির সৈন্যবাহিনী তাদের মহৎ আন্তর্জাতিক কর্তব্য পালনের জন্য অবশ্যই শেষ পর্যন্ত থাকবে।"

মস্কো চুক্তি পালনের ব্যাপারে সোভিয়েট নেতাদের মধ্যে যে অবিশ্বাসের ভাব দেখা দিয়েছে এবং সৈন্যাপসারণের প্রশ্নে কি করা হবে, এই বিষয়ে চেক নেতারা সোভিয়েট নেতাদের সঙ্গে খোলা-খুলি কথাবার্তা বলতে চেয়েছেন। তা ছাড়া সামরিক হস্তক্ষেপের পর চেকো-স্লোভাকিয়ায় যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, সে-সম্পর্কেও কথা বলা প্রয়োজন। মস্কো চুক্তি অনুসারে সোভিয়েট য়ুনিয়ন ক্ষতিপূরণ দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

চেক কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নতুন প্রেসিডিয়াম সোভিয়েট য়ুনিয়নের সঙ্গে আলোচনার এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ইতিমধ্যে সোভিয়েট য়ুনিয়নের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভ্যাসিলি কুজ্‌নেৎসভ প্রাগে এসে চেক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। কুজ্‌নেৎসভ ব্রাতিস্লাভা গিয়ে গুস্তাভ হুসাকের সঙ্গেও কথা বলেন।

এর পরেই ১০ই সেপ্টেম্বর, চেক প্রধানমন্ত্রী ওল্‌দ্রিচ চার্নিক মস্কো যান। চার্নিকের সঙ্গে সহকারী প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্টিসেক হামুজ ও বৈদেশিক বাণিজ্য-মন্ত্রী ভ্যাস্লে ভালেস্ ছিলেন। চার্নিক সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সি কোসি-গিনের সঙ্গে আলোচনা করেন। কোসিগিন ছাড়াও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সহকারী প্রধানমন্ত্রী নিকোলাই বাইবাকভ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকো ও আরও কয়েকজন মন্ত্রী।

আলোচনা শেষে প্রকাশিত যুক্ত ইস্তাহারে ঘোষণা করা হয়েছে, উভয় দেশের মধ্যে এক অর্থনৈতিক চুক্তি হয়েছে।

অর্থনৈতিক ব্যাপারে আলোচনা ছাড়াও মস্কো চুক্তি কার্যকর করার প্রশ্নে চেক নেতারা তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন। মনে হয়, চেক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে সোভিয়েট নেতারা খুশি হয়েছেন, আশ্বস্ত হয়েছেন। কেন না তার পরেই খবর প্রকাশিত হয়েছে, প্রাগ ও অন্যান্য কয়েকটি শহর থেকে সোভিয়েট য়ুনিয়ন ও অন্যান্য ওয়ারশ গোষ্ঠীর সৈন্য অপসারণের কাজ সুরু হয়েছে। অবশ্য, পূর্ব জার্মানীর সৈন্য আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ২০শে আগস্ট যখন ওয়ারশ গোষ্ঠীর বিভিন্ন দেশের সৈন্য চেকো-স্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করে তখন তার মধ্যে পূর্ব জার্মানীর সৈন্যও ছিল। কিন্তু ১৯৪৫ সালের পট্‌সডাম চুক্তি অনুসারে অপর কোন রাষ্ট্রে জার্মান সৈন্যের প্রবেশ বেআইনী। সোভিয়েট য়ুনিয়ন পট্‌সডাম চুক্তির অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। সুতরাং, সোভিয়েট য়ুনিয়ন পরে যখন দেখেছে, জার্মান সৈন্য দিয়ে চেকোস্লোভাকিয়া প্রবেশ করা ঠিক হয় নি, তখনই জার্মান সৈন্য সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

এখন অন্যান্য সৈন্য সরানোর কাজও সুরু হয়েছে। (১৯।৯।৬৮)

"বাছা আমার
গিরগিটির ছা
কখন কোন
রঙ বদলায়
এই লাল, ঐ
নাচায় উঠে
রামধনুর গায়
সোনা আমার
পারলে কিন্তু
মানুষও তায়।"

বারে বারে এই রঙ বদলানো গিরগিটির ছার কথা মনে পড়ছিল। এই কবিতাটি সব চেয়ে বেশি মনে পড়লো যখন হিন্দুস্থান স্টীলের চেয়ারম্যান শ্রী কে টি চণ্ডীকে কম্যুনিস্ট বানিয়ে পরোক্ষে দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানার রোলিং মিলের কোটি টাকা ক্ষতি ও প্রায় সাত হাজার মানুষকে বেকার করার দায় শ্রীচণ্ডীর উপর চাপানোর চেষ্টা দেখা গেল।

আমি সম্প্রতি দুর্গাপুরে জাতীয় সম্পত্তি দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার রোলিং মিলের সাবোতাজের কথা বলছি। শ্রীচণ্ডীর কুলজী ঠিকুজী জানা নেই, তিনি ছাত্রজীবনে অথবা অন্য কোন গোপন জীবনে কম্যুনিস্ট ছিলেন বা আছেন সেই সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই। কিন্তু যাঁরা আজ শ্রীচণ্ডীকে কম্যুনিস্ট বানাচ্ছেন এবং তাঁর জন্যই যদি দুর্গাপুরে এত বড় সর্বনাশ হয়ে থাকে, তবে তার জন্য দায়িত্ব নিশ্চয়ই তাঁদের, যাঁরা কম্যুনিস্ট জেনেও শ্রীচণ্ডীকে দুর্গাপুর স্টীলের সর্বময় কর্তা করেছেন। যাঁরা শ্রীচণ্ডীকে সর্বময় কর্তৃত্ব দিলেন, তাঁরাই আবার শ্রীচণ্ডীকে কম্যুনিস্ট আখ্যা দিচ্ছেন—এর চেয়ে হাস্যকর কথা সম্প্রতি কেউ শুনেছেন বলে মনে হয় না। কিন্তু মূল কথা সেটা নয়, মূল কথা হল—ও গিরগিটির ছা, যারা দরকারে মত নাচায় উঠে রামধনুর গায় আবার সময় মত মানুষের ঘাড় মটকায়।

গত ৪ঠা দুর্গাপুর রোলিং মিলের কর্মচারীরা রাত্রি দশটায় কাজ সুরু করে হঠাৎ কাজ বন্ধ করে বসে পড়েন। কর্মচারীরা চুল্লী পাঁচজাকিয়ন্তের বিভাগটি বন্ধ করেছেন। শুধু বন্ধ করে দেওয়া নয়, অন্য কাউকে চালু করতে দেওয়া হয় নি। কর্ম বিরত শ্রমিকরা জানিয়েছে যে, তাদের এই কাজ ইউনিয়নের নেতৃত্বের নির্দেশ মত করা হচ্ছে, তারা নিজেরা প্লান্ট চালু করবে না—অন্যদেরও চালু করতে দেবে না। কারখানার কর্তৃপক্ষ তখন ইউনিয়ন নেতাদের খোঁজাখুঁজি করে এবং টেলিফোন করেন। কিন্তু টেলিফোনে জবাব আসে—ইউনিয়ন নেতাদের একজন বাথরুমে, অপর জন ডিনারে ব্যস্ত। ব্যস যা হবার হল, দেশের মানুষের মনের রক্ত জল করা পয়সায় গড়ে ওঠা দুর্গাপুরের জাতীয় সম্পত্তির প্রায় কোটি টাকা ক্ষতি হল। দুর্গাপুর স্টীলের কর্তৃপক্ষ এই ঘটনার পর চার হাজার শ্রমিককে লে-অফ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ একদিকে কোটি টাকার জাতীয় সম্পত্তি হানি —অপর দিকে চার হাজার মানুষ অর্থাৎ তাদের কুড়ি হাজার পরিবারের লোকের মুখের গ্রাস বন্ধ হয়। দুর্গাপুর স্টীলের চেয়ারম্যান শ্রীচণ্ডী এই ঘটনার পর কলকাতার সাংবাদিকদের কাছে সব কিছুর জন্য শ্রীআনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরণজিৎ ঘটককে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের শেষ বুঝি একটি দুর্ভাগ্য হয় না। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় যে ক্ষতি হয়েছে, সেই ক্ষতি হয়ত পূরণ হবে, হয়ত লে-অফ হওয়া মানুষগুলি আবার কাজ পাবে, কিন্তু তার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য সৃষ্টি করলেন শিক্ষা শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার সর্বকালের হকদার আই এন টি ইউ সি ও তার অভিভাবক কংগ্রেস। কথায় বলে যা চেয়ে আমের কাল, কিন্তু কথা রবে চিরকাল। কংগ্রেস সেই চিরকালের কথা রচনা করলেন, কথা রচনা করলেন দুর্গাপুরে।

"কি করে এই দুর্গতি থেকে আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি। সেই পথে মানুষকে সাহায্য না করে ট্রাম পোড়াও, বাস পোড়াও, রেল পোড়াও, সব পুড়িয়ে শেষ কর—এ কোন্ নীতি, এ আন্দোলন না বামপন্থী রাজনীতির খেলা"।

"গণতন্ত্র রূপায়ণ হলে কম্যুনিস্টদের কোন আশা-ভরসা নেই দেখে হিংসাত্মক কর্মের মাধ্যমে জনগণকে ধ্বংসাত্মক কর্মে লিপ্ত করাতে চায়। জনগণকে সরাসরি সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষে আনার চক্রান্ত হল এই বামপন্থী হিংসামূলক ধ্বংসাত্মক কর্মসূচীর আন্দোলন"।

জাতীয় সম্পত্তি, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও প্রাণ ধ্বংসকারী এই আন্দোলন গণতন্ত্র দমন করে একনায়কতন্ত্র স্থাপনে অগ্রণী কম্যুনিস্ট জনগণের অভিসম্পাতে ধ্বংস হোক।"

কংগ্রেস জনগণের "গণতন্ত্রে হিংসাত্মক বা ধ্বংসাত্মক কাজের অবকাশ কোথায়? এখানে তো জনসাধারণ ইচ্ছে করলেই ভোট দিয়ে শাসক দলকে পাল্টাতে পারেন, যদি তাদের মতে শাসক দল অন্যায় কাজ করেন। গণতন্ত্রে হিংসার পথ যারা গ্রহণ করেন, তাঁরা মূলত গণতন্ত্রকেই অস্বীকার করেন। আজ গণতন্ত্রের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য জোর রাখার প্রশ্ন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে, জনসাধারণকে সেটাই খেয়াল রাখতে হবে।"

[—আমাদের কথা। শ্রীঅতুল্য ঘোষের বক্তৃতার অংশ]

কংগ্রেস ও শ্রীঅতুল্য ঘোষের বক্তব্যগুলি তুলে ধরা হ'ল এই কারণে যে, সন্ত্রাস, ধর্মঘট, সাবতাজ প্রভৃতি কাজগুলি এতদিন বামপন্থীরা করে বলেই প্রচার

সরকারী মুখপাত্র শ্রীচণ্ডীকে ডান কম্যুনিস্ট পার্টি বানিয়ে তাঁর ওপর সব অপরাধের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হলো। কংগ্রেসের সরকারী মুখপত্র লিখেছে—"একদা ডান কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য বর্তমান চেয়ারম্যান শ্রীচণ্ডী।" ডান ও বাম কম্যুনিস্ট পার্টি সৃষ্টি হয়েছে ১৯৬৪ সালের পর, তাই শ্রীচণ্ডীকে যখন ডান কম্যুনিস্ট বলা হচ্ছে, তখন বুঝতে হবে শ্রীচণ্ডী ১৯৬৪ সালের পরও কম্যুনিস্ট ছিলেন। ১৯৬৪ সালের পর যে লোক কম্যুনিস্ট ছিলেন, সেই লোককে দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানায় চেয়ারম্যান করলেন কারা? আর একজন কম্যুনিস্টকে চেয়ারম্যান করে বলা হচ্ছে—"শ্রীচণ্ডী তলায় তলায় কম্যুনিস্ট শ্রমিকদের সঙ্গে গোপন চক্রান্ত জাল বিস্তার করেছিলেন"। বুঝুন অবস্থা—কম্যুনিস্টকে চেয়ারম্যান করা হল আবার তলায় তলায় চক্রান্ত জাল বিস্তারেরও সুযোগ দেওয়া হল—সেই কথা আবার বলছেন কে—যাঁরা শ্রীচণ্ডীকে নিয়োগ করেছেন। আরো মজার কথা লিখেছেন কংগ্রেসের মুখপত্র "আসলে প্ল্যান্টের ক্ষতি বেশি হয় নি"। এতদিন তো জানতাম হরতাল-ধর্মঘট, ট্রাম-বাস পোড়ানো প্রভৃতি ঘটনায় তিলকে নিয়ে তুলকালাম করা হয় অথচ আজ পরম বৈষ্ণবের মত বলা হচ্ছে ক্ষতি বেশি কিছু হয় নি। কংগ্রেস মুখপত্র যখন বলছে বেশি ক্ষতি হয় নি, তখন কম্যুনিস্ট মুখপত্র বলছে, "অতুল্য ঘোষ পরিচালিত আনন্দগোপাল-লাবণ্য ঘটক নির্দেশিত আই এন টি ইউ সির কর্মীদের এই ধ্বংসাত্মক কাজের ফলে দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানার উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। কুলিং সিস্টেম মেশিন বন্ধ করে দেওয়ার ফলে অন্যান্য

মেশিনে যে চিড় ধরেছে, তা সারাই করতে নূতন পাইপ বসাতে প্রায় এক কোটি টাকা খরচ হবে, এবং উৎপাদনের ক্ষতির হিসাব ধরলে ক্ষতি হবে কয়েক কোটি টাকা।"

দুর্গাপুর নিয়ে রাতারাতি দেখা যাচ্ছে 'দেশ হিতৈষী' জনসেবক হয়ে গেল আর 'জন সেবক' দেশ হিতৈষী হয়ে উঠল। এই সম্পর্কে দেশ হিতৈষী কিন্তু নূতন কিছু কথা বলেছেন, যেটা উল্লেখ করা দরকার। দেশ হিতৈষী বলছেন, **"এই রকম ধ্বংসাত্মক কাজ হতে পারে এই আশংকা করে হিন্দুস্থান স্টীল এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন থেকে কর্তৃপক্ষকে পূর্বাহ্নেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। তৎসত্ত্বেও কেন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। ৩রা সেপ্টেম্বর রাত্রিতে কংগ্রেস পরিচালিত আই এন টি ইউ সি ইউনিয়ন, তাও আবার হিন্দুস্থান স্টীল কর্তৃপক্ষের স্বীকৃত ইউনিয়ন যা করলো সেই রকম ঘটনা গত ফেব্রুয়ারী মাসেও আরও একবার চেষ্টা হয়েছিল এবং বর্তমান ধ্বংসাত্মক কাজের সাথে যারা জড়িত রয়েছে, ফেব্রুয়ারী মাসেও তারা ছিল। কর্তৃপক্ষ এই ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে কয়েকজনকে ধরে এবং ষড়যন্ত্রকারীরা তখন মুচলেখা দিয়ে নাকি নিষ্কৃতি পায়।"**

দুর্গাপুরের গণ্ডগোল কিন্তু শুধু দুই দল শ্রমিকের মধ্যে বা দুইটি ইউনিয়নের মধ্যে মনে করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই—সমগ্র ঘটনার সঙ্গে এমন অনেকগুলি প্রশ্ন উঠে এসেছে যার জবাব সহজে পাবার নয়।
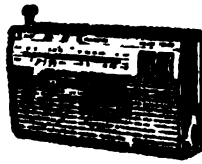
প্রথমে ধরা যাক ইস্পাত কারখানার কর্তা ব্যক্তিদের কথা। দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানার ঘটনা এত ঘটা করে শ্রীচেয়ারম্যান শ্রীচণ্ডী বললেন এবং অভিযোগ করলেন, আই এন টি ইউ সির বিরুদ্ধে অত্যধিক কঠোর ও সরলভাবে। এই ভাবে কোন সরকারী অফিসার কখনও প্রকাশ্যে এই জাতীয় অভিযোগ কোন কংগ্রেস পরিচালিত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অতীতে এনেছেন বলে মনে পড়ে না। শ্রীচণ্ডী এই কাজ করলেন সব জেনেই যে, তিনি শ্রীআনন্দগোপাল মুখার্জীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনছেন, পরোক্ষে সেই অভিযোগ শ্রীঅতুল্য ঘোষের বিরুদ্ধেই আনছেন। কারণ দুর্গাপুরের ইউনিয়ন বা শ্রীআনন্দগোপাল মুখার্জীর বিরুদ্ধে কিছু বলা শ্রীঅতুল্য ঘোষের বিরুদ্ধেই বলা। শ্রীচণ্ডী এই কাজ করেছেন সম্পূর্ণ নিজের বিবেচনায় এই কথা ভাববার যথেষ্ট কারণ আছে বলে মনে হয় না—শ্রীচণ্ডীর পিছনে আরো উচ্চক্ষমতার কেউ আছেন নিশ্চয়ই। আর ঠিক এই কারণে কি শ্রীআনন্দগোপাল মুখার্জী, শ্রীলাবণ্য ঘটক, ৮ই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতা আসছেন, একদিন থাকছেন ভালভাবে জেনেই কলকাতায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে পিছনে ফেলে দিল্লীতে ছুটে গেলেন ভারতের উপ-প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরবার করতে। শ্রীআনন্দগোপাল মুখার্জী কি কারণে কলকাতা অপেক্ষা দিল্লীকে নিকটে, প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা উপ-প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরবার করা সুবিধাজনক মনে করলেন। তাই সতত প্রশ্ন ওঠে যায়—কিসের জোরে শ্রীচণ্ডী পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে উৎসাহ পান—সেই কারণেই কি শ্রীআনন্দগোপাল মুখার্জী কলকাতায় প্রধানমন্ত্রীকে পিছনে ফেলে দিল্লীতে উপ-প্রধানমন্ত্রীর কাছে ছুটে যান।

আর এক ঘটনা লক্ষ্য করার। চেয়ারম্যান শ্রীচণ্ডী যখন সব ক্ষতির জন্য আই এন টি ইউ সি পরিচালিত শ্রমিকদের দায়ী করছেন, তখন ইস্পাত মন্ত্রণালয় সেক্রেটারী কিন্তু দোষটা কিছু পুলিশের ওপর চাপাতে চাইছেন। শ্রীচণ্ডী যখন বলছেন, "রাজ্য সরকার সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন এবং সময়মত পুলিশী সাহায্য না পেলে অবস্থার ভয়াবহ পরিণতি ঘটতে পারতো", তখন দিল্লীর অফিসার শ্রীলাল বলছেন, "পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার জন্যই দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার ক্ষতির অঙ্ক বেড়েছে।" যা হোক, দুর্গাপুরের ক্ষতি যা হবার হয়েছে, সেই ক্ষতির সুযোগে কয়েক হাজার শ্রমিককে লে-অফও করা হয়েছে অর্থাৎ মরতে মরণ রাশীওয়ালার। দেশের মানুষের পয়সায় তৈরি জাতীয় সম্পত্তির ক্ষতি হল, দেশের মানুষ বেকার হল—তাই নিয়ে সুরু রাজনীতির খেলা।

পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী তথা পশ্চিমবঙ্গের আশা-আকাঙ্ক্ষা, গৌরবের একমাত্র স্থান দুর্গাপুর, বাঙালীর একমাত্র ভরসা ও ভবিষ্যৎ দুর্গাপুর আজ এক সর্বভারতীয় রাজনীতির ঘুটিতে পরিণত হচ্ছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গিরগিটির ছার মত রং বদলিয়ে দলের কাজ হাসিল করছেন—দুর্গাপুরের ঘটনার সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য সম্ভবত এইখানে।

মরেল

হেক্সাগোনাল ওয়্যারড

হ্যারো রীডেড

শীট গ্লাস

মরক্কো পিনহেড

জর্জিয়ান ওয়্যারড

রাফকাস্ট

হ্যামার্ড

পরিবার পরিকল্পনা কেন ?

ডঃ অমিয়কুমার হাটি

আধুনিক যুগে আণবিক অস্ত্র এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি এই দুটিই মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক। প্রথমটি হঠাৎ সমূলে ধ্বংস করতে পারে জগৎকে। দ্বিতীয়টি তিলে তিলে অপুষ্টি অসুখ অবক্ষয় ও অবলুপ্তির পথে নিয়ে যাবে মানবসভ্যতাকে।

জনসংখ্যা বিস্ফোরণ (Population explosion) এখন আন্তর্জাতিক সমস্যা। সমাজকর্মী, অর্থনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছেন। দরিদ্র, অনুন্নত ও অর্ধ-উন্নত দেশগুলিতে অর্থাৎ এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি সুখ ও সমৃদ্ধির অন্তরায় সৃষ্টি করছে, সার্বিক উন্নয়নের পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ভারতের মোট জনসংখ্যা এখন ৫০ কোটির উপর। এখানে প্রতিদিন ৫৫ হাজার শিশু জন্মগ্রহণ করছে (অর্থাৎ প্রতি দেড় সেকেন্ড একটি করে শিশু ভূমিষ্ঠ হচ্ছে)। প্রত্যেক বছর ভারতের মোট জনসংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ১৩ মিলিয়ন (১৩০ লক্ষ) বা তারও বেশি লোক, যা অস্ট্রেলিয়া বা নেদারল্যান্ডের মোট জনসংখ্যার চেয়ে বেশি। খাদ্যোৎপাদন এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। ১৯৫০ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে খাদ্যোৎপাদন যেখানে বেড়েছে শতকরা তিন ভাগ, সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে বছরে শতকরা ২·৫ ভাগ। একই কারণে মোট জাতীয় আয় বাড়লেও, মাথাপিছু আয় বেড়েছে খুবই কম—১৫ বছরে শতকরা ১·৮ ভাগ মাত্র।

১৯৫১ সালে বেকার সংখ্যা ছিল ৩ মিলিয়ন। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে মোট ৩১ মিলিয়ন লোকের অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও ১৯৬৬ সালে বেকার সংখ্যা দাঁড়ালো এক কোটিতে। এইভাবে ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৬৪-৬৬ সালে শতকরা ৩০০ ভাগের মত সুযোগ-সুবিধা বাড়লেও তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে ৬ থেকে ১১ বছরের যেসব ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ে না, তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬ কোটি। কাজেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে সব পরিকল্পনাই হয়ত গোড়া কেটে আগায় জল ঢালার মত হবে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আছে বলেই আমরা পরিকল্পিত জনসংখ্যা চাচ্ছি। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, সুখ ও সমৃদ্ধ-জীবন প্রত্যেক মানুষের, প্রত্যেক পরিবারের, প্রত্যেক জাতির কাম্য।

সরকার চান, বর্তমান জন্মহার হাজার-করা ৪১ থেকে ১৯৭১ সালে ৩০-এ এবং ১৯৭৫ সালে ২৫-এ নামিয়ে আনা। এই ব্যবস্থা সম্ভব হলে এ হবে সামাজিক স্থাপত্যবিদ্যার (Social engineering) শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।

স্বাধীনতার আগেও পরিবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে চিন্তা করা হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের নেতৃস্থানীয়া Margaret Sanger ঐ সময়ে মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন, যাতে ভারতবর্ষেও ঐ আন্দোলন আরম্ভ হয়, সে জন্যে তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা চান। মহাত্মা গান্ধী কিন্তু জোর দিয়েছিলেন, মানুষের সংযমের উপর। তার উত্তরে Margaret Sanger বলেছিলেন, "But Mahatmaji, if a young married couple exercise restraint for 364 days out of 365 in the year, there is still the prospect of a child every year."

এখন যুগ বদলেছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সবকিছু বিচার-বিবেচনা করছি আমরা। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী যোজনাতে পরিবার পরিকল্পনাকে প্রকৃতই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় যেখানে পরিবার পরিকল্পনা বাবদ খরচ হয়েছিল ১·৪৫ মিলিয়ন টাকা, সেখানে চতুর্থ যোজনায় বরাদ্দ হয়েছে ২২৯ কোটি টাকা।

আধুনিকীকরণের অঙ্গ হিসাবে বা সামাজিক পরিবর্তনের ফলেই উন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ভারতবর্ষে কিন্তু সামাজিক পরিবর্তন আনতে চায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে। এর জন্যে নতুন করে বিপুল কর্মোদ্যোগ শুরু হয়েছে। প্রতিটি জনসাধারণ যাতে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে অবহিত হতে পারে, তার জন্যে ব্যাপক প্রচার অভিযান চলছে—সুদূর পল্লীতেও পরিবার পরিকল্পনার প্রতীক চিহ্ন লাল ত্রিভুজ পরিচিত হয়ে উঠেছে আজ। এই সঙ্গে সরকার চেষ্টা করছেন তথাকথিত cafeteria approach-এর বদলে পরিকল্পনাকে পরিকল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বাস্তবে রূপ দেবার।

কাজেই পরিচালন ব্যবস্থা ও সংগঠনকে শক্তিশালী করা হচ্ছে, প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছাড়াও শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে প্রচুরসংখ্যক পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। গ্রহণযোগ্য বৈজ্ঞানিক সমস্ত রকম সহায়ক ব্যবস্থা জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য করা হচ্ছে। পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পে জেলি (Jelly), ফোম ট্যাবলেট (Foam tablet), কনডম (Condom), ডায়াফ্রাম (Diaphragm), লুপ (Loop), ভ্যাসেকটমী (Vasectomy), স্যালপিং-

সালপিংজেকটমী (Salpingectomy) বা জন্ম-নিরোধক খাবার পিল (Oral contraceptives) যেখানে যা প্রয়োগ করা বিধেয়, পরিবেশ ও প্রয়োজন বুঝে সেখানে তাই ব্যবহার করতে হবে। কোন্ উপায় অবলম্বন করে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা হবে, সেটা জরুরী নয়—জরুরী হচ্ছে কত তাড়াতাড়ি এবং কিভাবে জন্মহার কমানো যায়। ভারতবর্ষে ৪ মিলিয়নেরও উপর পুরুষের ভ্যাসেকটমী অপারেশন করা হয়েছে, যার ফলে ১০ থেকে ১২ মিলিয়ন শিশুর জন্ম বন্ধ করা গেছে।

মা এবং নবজাত সন্তানের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং পরিবারের সুখ-সমৃদ্ধি পরিকল্পিত পরিবারের মাধ্যমেই

দোলনার ছুটি

খোকার বয়স তিন বছর ; ওর দোলনাটি অবশ্য ওর চাইতে একদিনের ছোট। ওদের জীবন প্রায় একসঙ্গেই শুরু হয়েছিলো। খোকা যখন আস্তে আস্তে বড় হতে শুরু করলো তখন দোলনায় শুয়ে ঘুমানোটা ওর আর পছন্দ হচ্ছিলো না। ও নিজেকে অনেক বড় বলে মনে করতে লাগলো, কাজেই দোলনায় শোয়া ছেড়ে দিলো। দোলনাও ছুটি পেলো। তবে খোকা তার এই পুরানো সঙ্গীকে অন্য রকমভাবে ব্যবহার করার উপায় বের ক'রে ফেললো। দোলনাটা ওর ছবির বই, ব্যাট, পুতুল ইত্যাদি রাখার জায়গা হয়ে গেলো। মা বললেন "দেখো খোকার কত জিনিস, ও কত খুশী।" বাবা বেশ গর্বের সঙ্গে হেসে বললেন "দোলনাটাকে [illegible] ছুটি দিয়ে অনেক বুদ্ধিমানের মতো কাজ করিনি কি?" হাঁ, ওরা সত্যিই বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমান বাবা মা পরিকল্পনা করেই পরিবার গঠন করেন। পরিবার পরিকল্পনার অর্থ শুধু কম ছেলে মেয়ে হওয়াই নয়, বাবা মা যখন সত্যিই আর একটি সন্তানের জন্য তৈরী হন তখনই শুধু সন্তান লাভ করাটাও পরিবার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। সন্তান জন্ম এখন আর দৈবের ওপর নির্ভরশীল নয়। পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতিতে আপনি ইচ্ছানুযায়ী সন্তান লাভ করতে পারেন। বিনামূল্যে পরামর্শাদির জন্য আপনার বাড়ীর নিকটবর্তী পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

সম্ভব। প্রতি বছরই সন্তানবতী হলে মায়ের স্বাস্থ্য ভেঙে যায়, রোগাক্রমণের [illegible] অকাল বার্ধক্য আসে। নবাগত [illegible] পায় না, তার খাওয়া-পরার [illegible] পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা [illegible] সম্বন্ধে সজাগ থাকা [illegible] এই জন্যেই একটি সন্তান [illegible] বছর সন্তান ধারণ না [illegible] পরিবারে সন্তানের [illegible] খুব [illegible] সুচিকিৎসা ও [illegible] এই বিজ্ঞান-[illegible] গর্ভনিরোধক [illegible] উপরে বলা হয়েছে, তাদের [illegible] সাহায্য নিলে সাময়িক-ভাবে অথবা চিরতরে গর্ভনিরোধ সম্ভব। এর জন্যে সরকার বিনামূল্যে সব রকম সাহায্য করেন পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র-গুলির মাধ্যমে।

যে [illegible] সন্তান উৎপাদন সম্ভব, সেই বয়ঃসীমার ১ কোটি দম্পতি রয়েছেন আমাদের দেশে যাঁদের উপর আজ পরি-বার পরিকল্পনার সংগ্রামী দায়িত্বভার [illegible]। পরিবার পরিকল্পনা কিন্তু শুধু-মাত্র [illegible] নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যেসব দম্পতির সন্তান হচ্ছে না, তাঁরাও এইসব কেন্দ্রে এলে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত চিকিৎসা করা হয়, যাতে তাঁরা সন্তান লাভ করতে পারেন।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ মানেই স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতি। কারণ জনসংখ্যা অত্যধিক হলে অস্বাভাবিক ভিড় বাড়বে শহরে, স্থানাভাব দেখা দেবে উন্মুক্ত জায়গা আর থাকবে না, জল ও বাতাস পর্যন্ত দূষিত হবে, মড়ক দেখা দেবে।

এত বিরাট পরিকল্পনা, বিপুল অর্থ-ব্যয় ও পরিশ্রম—কিন্তু এ পর্যন্ত সাফল্য অর্জিত হয়েছে কতটুকু? [illegible]তে এগুলো তো চলবে না! পরিকল্পনার ভিত্তিই তাহলে নষ্ট হয়ে যাবে। এই সংগ্রামে জনসাধারণকেও সামিল হতে হবে।

পরিকল্পনার ত্রুটি-বিচ্যুতি খুঁজে বের করার ও তার প্রতিকারের দায়িত্ব মুখ্যত সরকারের। সরকারকে এ বিষয়ে সজাগ ও সতর্ক থাকতেই হবে।

সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্যে সর্বাত্মক কর্মোদ্যোগ দরকার। সর্বপ্রথম কথা হচ্ছে প্রচার। ভারতবর্ষের ৫০০,০০০ গ্রামে পরিবার পরিকল্পনার বার্তা পৌঁছে দিতে হবে, যেখানে শতকরা ৮০ ভাগ লোকের বাস এবং যাদের অধিকাংশই নিরক্ষর এবং এ সম্বন্ধে অজ্ঞ। দরিদ্র ও নিরক্ষরদের ক্ষেত্রেই পরিবার পরিকল্পনা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে এ জিনিস নতুন নয়।

প্রচারের এই কাজ কত দুরূহ তা সহজেই অনুমান করা যায়। কর্মীসংখ্যা স্বল্প যথেষ্ট ডাক্তার নেই নার্স নেই। এ-অভাব দূর করতে সময় লাগবে হয়ত। প্যারামেডিক্যাল পার্সোন্যাল যোগাড় করা যেতে পারে। সমাজসেবিকারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। প্রতিটি প্রসূতিসদন, মাতৃ ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র-গুলিতে যাঁরা সদ্য জননী হতে যাচ্ছেন বা হয়েছেন, তাঁদের পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করলে ঐ শিক্ষা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়বে। পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের কর্মীদের তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন হতে হবে। জনসাধারণের মনে কোন ভ্রান্ত ধারণা থাকলে তা' যথাসময়ে দূর করতে হবে। যেমন, লুপ লাগানো সম্বন্ধে কিছুকাল আগে বিরূপ গুঞ্জন উঠেছিল। উপযুক্ত ডাক্তারী ব্যবস্থায় লুপ ব্যবহার [illegible] এই গরীব দেশে পরিবার পরিকল্পনার কাজ অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

পরিসংখ্যান নিয়েও জনসাধারণের কিছু অভিযোগ আছে- অসাধু কর্মীদের কার-সাজিতে ভ্যাসেকটমী অপারেশন না করেই অনেক সময় নাকি লেখা হয়—এই অপা-রেশনের ব্যাপারে একশ্রেণীর দালালের কীর্তিকলাপ কিছুদিন আগে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

পরিবার পরিকল্পনা [illegible] সম্প্রদায়ের মধ্যে না [illegible] অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর [illegible] সীমাবদ্ধ না থাকে সব সম্প্র[illegible] শ্রেণী যেন এর সুফলের [illegible] হতে পারে, তার [illegible] দরকার। তা' নাহলে [illegible] ব্যর্থ হবে। কারণ [illegible] ভারতের জাতীয় সমস্যা [illegible] গত, সম্প্রদায়গত বা [illegible] নয়।

গর্ভপাত ব্যবস্থা বৈধীকরণ করা হবে কি না এই প্রসঙ্গে যথেষ্ট বিতর্ক উঠেছে। বিয়ের বয়স বাড়িয়ে দেবার কথাও ভাবা হচ্ছে। এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক

প্রশ্নগুলো, দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা ভালভাবে ভেবে দেখা দরকার। প্রয়োজন-বোধে সমাজকর্মী, চিকিৎসক ও জন-নায়কদের মতামত যাচাই করতে হবে।

বিদেশের বহু রাষ্ট্র পরিবার পরিকল্পনায় আমাদের দেশকে সাহায্য করছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডঃ চন্দ্রশেখর বলছেন যে, অর্থ এখন বাধা নয়—বাধা হচ্ছে গর্ভ-নিরোধক বস্তু বা ওষুধের অপ্রতুলতা, কর্মীর স্বল্পতা, শুধু গণসংযোগ ও প্রচারের অভাব। তবে জনসাধারণের সদিচ্ছা সক্রিয় সহযোগিতা ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টার উপরেই পরিবার পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভরশীল। আর, এই সংগ্রামে সাফল্যলাভ করতেই হবে। কারণ এর সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্ন জড়িত। সমাজ এবং জাতির সুখ-সমৃদ্ধি স্বাধীনতার জন্যেই পরিবার পরিকল্পনা। বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে মানুষের কাছে এ একটা মস্ত চ্যালেঞ্জ। সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা থাকলে মানুষের জয়লাভ অনিবার্য।
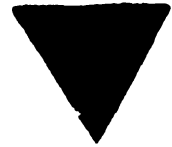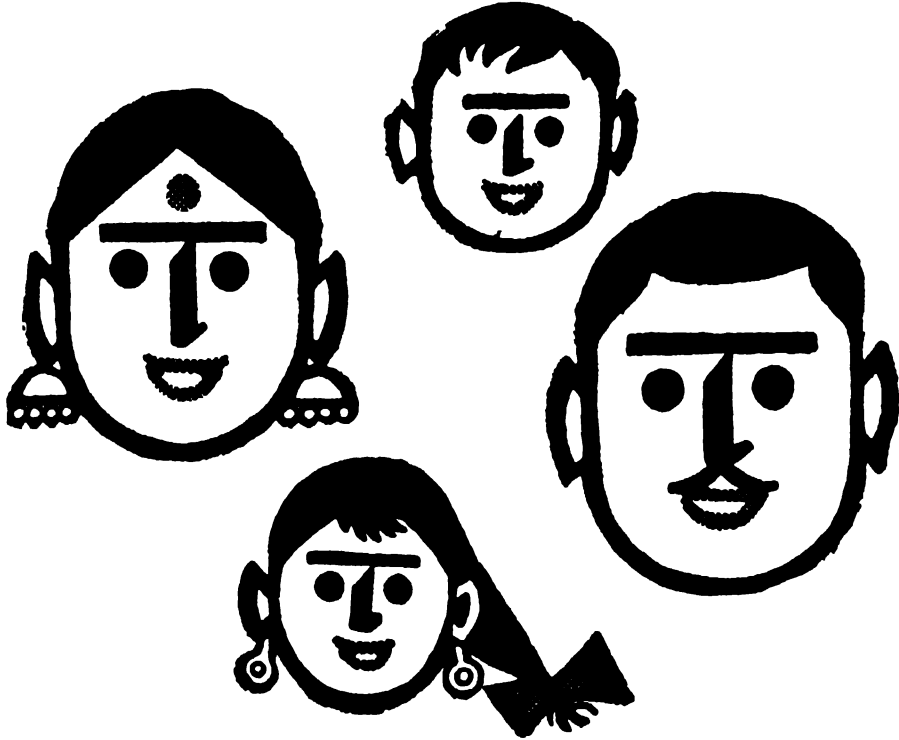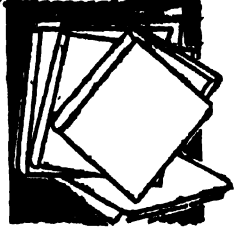
নিবেদিতা লোকমাতা (প্রথম খণ্ড) ১৯৬৮—শংকরীপ্রসাদ বসু। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৯। দাম: ত্রিশ টাকা।

তথ্য ও তত্ত্বের আলোকে শংকরীপ্রসাদ বসুর "নিবেদিতা লোকমাতা" একটি কালজয়ী অম্লান সৃষ্টি। বিবেকানন্দের মানসকন্যা, জননী সারদা দেবীর বিদেশিনী খুকী, দেবী, প্রাণের সরস্বতী, জগদীশচন্দ্রের Lady of the Lamp, রবীন্দ্রনাথের লোকমাতা, ভারতপ্রাণা ভগিনী নিবেদিতার অলোকসামান্য পরম পবিত্র অমৃত জীবনের সঙ্গে যাঁরা সম্যক পরিচিত হতে চান, তাঁদের কাছে অক্লান্তকর্মী গবেষকের এই সুপরিকল্পিত ও সুবৃহৎ গ্রন্থটি অপরিহার্য ও অমূল্য বিবেচিত হবে। নিবেদিতা জীবনের এ এক অভিনব মহাভারত। সবুজ দ্বীপ Emerald isle (আয়ারল্যাণ্ড)-এর মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে মার্গারেট ই নোবল কিভাবে সমগ্রকালের ভারতবর্ষের সেবিকাবান্ধবীমাতা হয়ে উঠলেন, অভিনব আঙ্গিকে তার জীবন্ত চিত্র অংকন করেছেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল অথচ সত্যনিষ্ঠ গবেষক। তথ্যাদি সংগ্রহের জন্যে প্রভূত পরিশ্রম করতে হয়েছে তাঁকে, বাংলা তথা ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর অপরিসীম শ্রদ্ধাই তাঁকে পথ দেখিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে, বহু সাহায্য ও সহানুভূতি পেয়েছেন বহু প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির কাছ থেকে। [illegible] অনির্বাণ নামে স্বামীজী তাঁর কাছে রক্ষিত নিবেদিতার বিপুল পরিমাণ চিঠি গবেষকের হাতে তুলে দিয়ে যে বিশ্বাসভার ন্যস্ত করেছিলেন, সে বিশ্বাসের মর্যাদা তিনি রেখেছেন। উপনিষদ বলেছেন, "শ্রদ্ধয়া দেয়ম্"। শ্রদ্ধাপ্রসূত এ উপহার বাঙালীর মানসজীবনকে আলোকিত করবে, আরও বহু গবেষককে ভবিষ্যতে প্রেরণা দেবে, পথ দেখাবে।

৮০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ প্রথম খণ্ডটি চার পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্ব 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নিবেদিতা' (২৭০ পৃঃ)। দ্বিতীয় পর্ব মৃত্যুরূপা কালী (৩৯০ পৃঃ পর্যন্ত)। তৃতীয় পর্ব পূর্বজীবন (৫৪১ পৃঃ পর্যন্ত) এবং চতুর্থ পর্ব ভগিনী [illegible]

ভারত-ভারতী ভগিনী নিবেদিতার কর্মময় জীবনসমুদ্রের যতই গভীরে প্রবেশ করি, ততই মণিমুক্তার অমৃত দীপ্তির সন্ধান পাই, এই দীর্ঘ গ্রন্থটি পড়তে এতটুকু ক্লান্তি আসে না, সর্বক্ষণ তীর্থযাত্রার অপার্থিব আনন্দে আপ্লুত হই। ঐতিহাসিক নিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাহিত্যিকের স্বাদু অন্তর। একটি বৃহৎ, মহৎ জীবনকে জানতে গিয়ে আমরাও উদ্দীপ্ত ও উজ্জীবিত হয়ে উঠি।

প্রথম পর্বে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ছাড়াও শ্রীমা সারদাদেবী, গোপালমা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি রামকৃষ্ণ মণ্ডলীর সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্ক সম্বন্ধে তথ্য সন্নিবিষ্ট রয়েছে। নিবেদিতার ভারতে প্রথম পদার্পণ, ব্রহ্মচারিণীর দীক্ষা, অমরনাথের 'অমির তীর্থযাত্রা, স্বামীজীর মহাপ্রয়াণ আশংকায় নিবেদিতার অস্বস্তি, ২০শে জুন থেকে ৩১শে জুলাই ১৮৯৯ এই দেড় মাসে স্বামীজীর সঙ্গে নিবেদিতার সমুদ্রযাত্রার বিবরণ (এই সময়টিকে নিবেদিতা তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় বলেছেন), স্বামীজীর মৃত্যুর আট দিন আগে খাওয়ার পর তাঁর নিজের হাতে নিবেদিতার হাত ধুইয়ে দেবার মমতামাখা বিবরণ, স্বামীজীর মৃতদেহে ব্যজনরত নিবেদিতার সেই অপরূপ মহীয়সী মূর্তি, সারদা মার সঙ্গে তাঁর স্নিগ্ধ মধুর সম্পর্ক ইত্যাদি অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে।

স্বামীজী সম্বন্ধে স্বল্পালোচিত বহু তথ্যের যুগোপযোগী পরিবেশন গ্রন্থটির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বিবেকানন্দ বলছেন, (রামকৃষ্ণের পর আমি বিদ্যাসাগরের অনুবর্তী (পৃঃ ১০৫) ,নিবেদিতাকে বলেছিলেন, "আহা যদি তোমার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎ হত!" (পৃঃ ৬)। চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব আন্দোলনের সমাজ সংগঠন ভূমিকার বিশেষ প্রশংসা করেন স্বামীজী (পৃঃ ৪৯)। অভেদবুদ্ধি এই মহামানব ছিলেন সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে'। মুসলমানদের সম্বন্ধে তাঁর উক্তি—"কি জানো আমি মুসলমানদের ভালবাসি" (পৃঃ ১৬৭)। আবার মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষ সেবার কাজে অনাথাশ্রম স্থাপন সম্পর্কে—"মুসলমান বালককেও লইতে করিবে না। তাহাদের খাওয়া-দাওয়া আলগ করিয়া দিলেই হইল, এবং যাহাতে তাহারা নীতিপরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী ও পরহিতরত হয়, এই প্রকার শিক্ষা দিবে। ইহারই নাম ধর্ম (পৃঃ ১৪)। নিগ্রোদের সম্বন্ধে মানবিকতার অপূর্ব আলেখ্য অঙ্কিত হয়েছে ১৩৩ পৃষ্ঠায়।

মার্গারেট নোবল নিবেদিতা হয়ে কালীকে কিভাবে বরণ করেছিলেন, তারই বিবরণ রয়েছে দ্বিতীয় পর্ব 'মৃত্যুরূপা কালী'তে। নিবেদিতার প্রথম কালী বক্তৃতা (পৃঃ ৩১৩) পাঠ করলে ইতিহাস সমাজদর্শন ও ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর অসাধারণ মনীষার পরিচয় পাই।

তৃতীয় পর্বে ভগিনী নিবেদিতার পূর্ব জীবন আলোচিত হয়েছে মুখ্যত শ্রীমতী লিজেল রেমঁ সংগৃহীত তথ্যাদির ভিত্তিতে। তাঁর বাল্যজীবনের মহানুভবতা (গাঁয়ের অসুস্থ লোকদের কাছে ৬ বছর বয়সে চেঁচিয়ে বাইবেল পড়তেন পৃঃ ৪১১) প্রথম থেকেই বিপুল ধর্মানুভূতি ও প্রগাঢ় জাতীয়তাবোধ, ঐ সময়ে সাংবাদিক ও লেখিকারূপে তাঁর স্বীকৃতি এবং সর্বোপরি স্বামীজীর সংস্পর্শ তাঁর পরিবর্তন, 'নিবেদিতা'য় রূপায়ণ বিধৃত রয়েছে।

বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবন কর্ম ও চিন্তা সম্বন্ধে সুধী গবেষক নানা বিচিত্র বর্ণের আলোকসম্পাত করেছেন চতুর্থ পর্বে। [illegible] বসুর সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত না হওয়ার জন্যে যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, আমরা তার যাথার্থ্য উপলব্ধি করি। সুখের বিষয় তিনি এদিকে দৃষ্টি সজাগ রেখেই তথ্যাদি পরিবেশন করেছেন। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে আচার্য বসুর প্রথম পরিচয় তাঁর বিজ্ঞান সাধনায় এই বিদুষী মহিলার অসাধারণ অবদান উদ্ঘাটিত হয়েছে এই পর্বে। নিবেদিতার ধারণা ছিল সন্ন্যাস ও বিজ্ঞানের সহাবস্থানের উপর ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল (পৃঃ ৫৮১)। এই পর্বে বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র; আবার জগদীশচন্দ্র প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বিষয়ে আলোচনা আছে, কিভাবে দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্নধর্মী প্রতিভা পরস্পরের আকর্ষণ অনুভব করেছেন, কিভাবে বিশ্বজগতে বন্দিত হয়েছেন, তার রোমাঞ্চকর বিবরণ আছে। স্বামীজী ও জগদীশচন্দ্রের সাক্ষাৎকার, নিবেদিতা কর্তৃক জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানকর্মে আশা ভরসা প্রেরণা ও সর্ববিধ সাহায্য যথাযথ আলোচিত। নিবেদিতা তিরোধানই জগদীশচন্দ্রের প্রায় মৃত্যুর কারণ। জগদীশচন্দ্র অপূর্ব একটি শোকবাক্যের মধ্যে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, "সে তো শরীরিণী নয়—সে তো মনোময়ী।" স্মরণ থাকতে পারে, ভারতে

আলোকে, জীবনাবসান জগদীশচন্দ্রের আবাসে।

প্রচুর ছবিতে গ্রন্থটি সুসমৃদ্ধ। তার কয়েকটি গবেষক অত্যন্ত শ্রম সহকারে আহরণ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ-দর্শী, স্বামীজীর সহপাঠী বন্ধু ও শিষ্য প্রিয়নাথ সিংহ অঙ্কিত রঙীন চিত্রটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও মহত্ত্ব সমন্বিত, একটি আশ্চর্য আবিষ্কার (এই চিত্রে দেখা যাচ্ছে নরেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতানুভূতি দান করছেন) কালীর সঙ্গে স্বামীজীর ব্যক্তিগত সম্পর্কসূচক অধ্যাপক-মুজেরের গোপন দলিলটি, মিসেস ওলি বুলকে লেখা বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে জগদীশচন্দ্রের পত্রের প্রতিলিপি (জগদীশ-চন্দ্রের রাজনীতির প্রতি ছিল অনীহা এবং নিবেদিতাকে তিনিও রাজনীতি থেকে বাইরে নিয়ে আসবার চেষ্টা করেছেন) প্রভৃতি বহু ফটোগ্রাফ গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

ভাষা সরল, অনবদ্য প্রসাদগুণবিশিষ্ট, প্রাণের আবেগে সিঞ্চিত। অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন শঙ্করী-প্রসাদ বসু। টীকা এবং ভাষ্য সহযোগে নিবেদিতার জীবনবেদ ব্যাখ্যাত হয়েছে। মুদ্রণসৌকর্য অনন্যসাধারণ—আনন্দ পাবলিশার্স এর জন্যে অভিনন্দনযোগ্য। পূর্ণেন্দু পত্রী অঙ্কিত প্রচ্ছদপটটি মনোরম।

সমালোচকের পক্ষে বলা শোভন কি না জানি না, কিন্তু এমন একটি গ্রন্থ সমা-লোচনার অধিকার পাওয়াও গর্ব ও গৌরবের।

আমরা সাগ্রহে এই গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় রইলাম।

ভারত কন্যা কেরালা—সুদীন চট্টো-পাধ্যায়। জ্ঞানতীর্থ, ১নং বিধান সরণী, কলকাতা-১২, মূল্যঃ ৬·০০

ভারতের অঙ্গরাজ্য কেরালা সম্পর্কে উৎসাহী পাঠক-পাঠিকাদের নিঃসন্দেহে সন্তুষ্ট করতে পারবে সুদীন চট্টো-পাধ্যায়ের 'ভারত কন্যা কেরালা' গ্রন্থটি। কেরালার সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে রাজনীতির খুঁটিনাটি দিক-গুলো নিপুণ হাতে চিত্রিত করেছেন লেখক তাঁর সাবলীল ভাষার মাধ্যমে।

বইটির আগাগোড়া বর্ণনার অনাবিল ছন্দে বর্ণিত। ইংরেজীতে যাকে বলে অনেকটা সেই রিপোর্টিং টাইপে লেখা। তবে লেখক যদি তাঁর বর্ণনায় আর একটু সরস হতেন তাহলে বইটি হতো সোনায় সোহাগা। কারণ অমূল্য এই বইটির কিছু কিছু অংশ সাধারণ পাঠক-পাঠিকাদের কাছে কিছুটা একঘেয়ে লাগতে পারে।

তাতে অবশ্য বইটির মূল্য এতোটুকুও কমবে না। কারণ আমাদের দেশে এই ধরণের প্রকাশনের প্রয়োজন আজ খুবই বেশি। আজ সব থেকে বেশি দরকার হলো একে অপরকে চেনার। অর্থাৎ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য এবং রাজ্য-বাসীদের সঙ্গে পরিচিত হবার প্রয়োজন সব থেকে বেশি। সেদিক দিয়ে বিচার করলে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে লেখা 'ভারত কন্যা কেরালা' অন্তত ভারতের একটি রাজ্যের সঙ্গে আমাদের ভালো-ভাবে পরিচিত করে দিতে সক্ষম হবে। সেই জন্যে লেখক ও প্রকাশককে ধন্যবাদ জানাই আর কামনা করি বইটির বহুল প্রচার।

সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট বইটির আকর্ষণ অনেক বাড়িয়েছে। ছাপা আর বাঁধাই ভালোই।

বিংশ শতাব্দীর মার্কিন সাহিত্য

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

ইতিহাস, ভূগোল, জাতিপরিচয় : ১৯০০—৫০

সমাজ ও জনসাধারণের চরিত্রের দিক থেকে বিচার করতে গেলে আজও মনে হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেন দুটো দেশ। আঠারো শতক থেকেই দেশের উত্তরাংশে যেমন বস্ত্রশিল্পের প্রাধান্য, দাক্ষিণাত্য প্রদেশে তেমনি সুতো, তামাক ও ধানের চাষ—ফলে উত্তরাংশে নারী ও শিশু শ্রমিকদের পাশাপাশিই কাজ করতে থাকেন অন্য দেশ থেকে আগত শ্রমিক, আর দাক্ষিণাত্যে আমদানি হয় আফ্রিকা থেকে জোর করে ধরে আনা কালো মানুষ, ক্রীতদাস। এক অংশে খবরদারি করেন শিল্পপতিরা, অন্য অংশে বাগিচা মালিকেরা। দেশের দুই অংশের মধ্যে এই বিরোধের অবশ্যম্ভাবী ফল ঘটেছিল, ১৮৬১ সালের গৃহযুদ্ধ। গৃহযুদ্ধে উত্তরখণ্ডের জয় হয়েছিল, নিগ্রো ক্রীতদাসেরা মুক্তি পেয়েছিলেন। প্রথমে মনে হয়েছিল, বুঝি জাতীয় ঐক্য ও মানবমুক্তির আদর্শেরই জয় হল। কিন্তু ক্রমে বোঝা যায়, আসলে বণিক, শিল্পপতি ও মহাজনেরা জমিদারদের পরাভূত করলেন মাত্র। ফলে শিল্পক্ষেত্রে দ্রুত বিকাশের পালা এল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় শিল্প কমিশন ১৯০২ সালেই ঘোষণা করেন "১৮৬৫-র পর যে পরিবর্তন ও অগ্রগতি ঘটেছে, অনেকক্ষেত্রেই তার বিস্তৃতি পৃথিবীর সমগ্র অতীতের কীর্তিকে ছাপিয়ে গেছে।" ১৮৬৫ সালের গৃহযুদ্ধান্তের অনেক আগেই যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পপ্রসারের সূচনা হয়েছিল। গৃহযুদ্ধের সামরিক প্রয়োজনেই পরিবহন ব্যবস্থার যে উন্নতি সাধিত হয়েছিল, কৃষির উৎপাদনে যে বৃদ্ধি ঘটেছিল, গৃহযুদ্ধের পরেও তা চলতে থাকল। এমনিতেই প্রাকৃতিক সম্পদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুফলা। পৃথিবীতে যত খনিজ কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে, তার প্রায় অর্ধেকই রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯২৯ সালে পৃথিবীর মোট লৌহ আকর সম্পদের শতকরা ৪০ ভাগ পাওয়া গেছল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। মিনেসোটায় লোহা তুলতে ড্রিলিং যন্ত্র বা বিস্ফোরকেরও দরকার হয় না—লোহা পাওয়া যায় প্রায় ভূত্বকের উপরেই। তেল, সীসে, দস্তার সম্পদও প্রচুর। দেশের একটা দিক অতলান্তিক মহাসাগরের উপর, অন্যদিক প্রশান্ত মহাসাগরের উপর। ফলে বহির্বাণিজ্যের সুবিধে। অন্তত দুটি দীর্ঘ নদী মিসিসিপি, মিসৌরি, ওহিও, কোলামবিয়া, কলোরাডো, রিও গ্রান্ড দেশকে জল যোগায়, শক্তি যোগায়, কখনও কখনও অন্তর্বাণিজ্যের সুযোগ করে দেয়। এই সমূহ সুযোগ ও সম্পদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নতুন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের স্পৃহা। মার্কিন পেটেন্ট আপিসের হিসেবে দেখা যায়, ১৮৫০ থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে বছরে গড়ে ২,০৭০ পেটেন্ট নথিবদ্ধ হত; ১৯২০ থেকে ১৯৩০-এর মধ্যে এই সংখ্যা দাঁড়ায় বছরে ৪৪·৭৫০। কৃষিক্ষেত্রেও যন্ত্রের প্রয়োগে ফলন বাড়ে। কিন্তু দেশের আসল কর্তৃত্ব থাকে শিল্পপতিদের হাতেই। বিংশ শতাব্দীর সূচনা হয় নিজেদের অধিকারের দাবিতে একদিকে কৃষিব্যবসায়ী, অন্যদিকে শ্রমিকদের সংগ্রামের মধ্যে। উভয়েরই প্রতিপক্ষ শিল্পপতিশ্রেণী। কিন্তু তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পপ্রসারে প্রায় আঁচড়ই লাগে নি। ১৮৫৯ থেকে ১৮৯৯-এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ে তিন গুণ, বেতনভোগীর সংখ্যা বাড়ে চার গুণ, শিল্পে উৎপন্ন সামগ্রীর পরিমাণ (দাম হিসেবে) বাড়ে সাত গুণ, পুঁজির লগ্নী বাড়ে নয় গুণ। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি ক্রমশই অতিকায় হতে থাকে। ১৯১৩ সালে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন লেখেন : "...অল্প কিছু লোক এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের মালিক; অল্প কিছু লোক জলশক্তির মালিক...ঐ একই সংখ্যক লোক রেলপথগুলির মালিক। নিজেদের মধ্যে নানা চুক্তির জোরে তারাই জিনিসপত্রের দাম নির্ধারণ করে, এই একই গোষ্ঠী দেশের ঋণব্যবস্থাও নিয়ন্ত্রণ করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকচক্রের প্রভু যারা ...মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের সংহতি।" এই পুঁজিপতি-শিল্পপতিদের স্বার্থেই ১৮৯৮ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কখনও কোন প্রাকৃতিক সম্পদের লোভে, কখনও উদ্বৃত্ত পুঁজি বিনিয়োগ করবে বলে, কখনও উৎপন্ন সামগ্রী বেচবার সুবিধে হবে বলে, অন্য দেশের দিকে হাত বাড়াচ্ছে শুরু করে। কিউবা, পোর্তোরিকো, গুয়াম, ফিলিপিনস, নিকারাগুয়া, ক্রমে ক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দখলে আসে। ১৯২৫ সালে দেখা যায়, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ক্যানাডারও শিল্পব্যবস্থার এক-তৃতীয়াংশই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দখলে। এ ধরণের দখলদারি এখন তো আরো ব্যাপক।

১৯০০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পদের হিসেব ধরা হয়েছিল ৮৬,০০০,০০০,০০০ ডলার। ১৯২৯-এ এই হিসেব দাঁড়ায় ৩৬১,০০০,০০০,০০০ ডলার। ১৮৯৯ ও ১৯২৭-এর মধ্যে ইস্পাত ও ইস্পাতদ্রব্যের উৎপাদন বাড়ে শতকরা ৭৮০ ভাগ, পরিবহন ও পরিবহনোপকরণে ৯৬৯ ভাগ, যন্ত্রপাতিতে ৫২৬ ভাগ। জীবনধারণের মানও উচ্চতম বিন্দুতে পৌঁছয় এই বিশের দশকেই। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি আয়তনে ও ক্ষমতায় বড় হতে লাগল। খুবই অল্প লোকের হাতে দেশের সমূহ সম্পদ জমা হতে লাগল। ১৯২৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমন ৫০৪ জন কোটিপতি ছিলেন যাঁরা গড়ে ১,১৮৫,০০০,০০০ ডলার বছরে উপার্জন করেছেন। এই ৫০৪ জন লোক মনস্থ করলে ১৯৩০-র দেশের সমগ্র উৎপন্ন গম ও সুতো কিনে ফেলতে পারতেন। দেশের মোট যত পরিবার, তার শতকরা ৪২·৫ ভাগ পেতেন জাতীয় আয়ের শতকরা ১৩ ভাগ। অন্যদিকে মোট পরিবারের শতকরা এক ভাগের এক-দশমাংশও পেতেন জাতীয় আয়ের শতকরা ১৩ ভাগ। এক কোটি কুড়ি লক্ষ পরিবার জাতীয় আয়ের যে অংশ উপার্জন করতেন, অন্য ছত্রিশ হাজার পরিবারও সেই একই পরিমাণ উপার্জন করতেন। ঐ এক কোটি কুড়ি লক্ষ পরিবার জীবনের যা অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপকরণ, তারও সবটা কিনতে পারতেন না। কিন্তু তাতে কি আসে যায়? ঐ অল্পসংখ্যক সুখী মানুষের মজার নেশায় সারা দেশ মেতে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসায়ের কলাকৌশল পাঠ্য হল। ঘরে ঘরে 'সেলসম্যানের' আনাগোনা শুরু হল। ধারে ইনস্টলমেন্টে কেনার লোভ চারিদিকে। জমি কিনে বেশি দামে বেচার লোভও দেখা দেয়। ডাক্তার, আইনজীবী, দোকানদার, অবসরপ্রাপ্ত চাকুরে ১৯২৫-২৬-এ ফ্লোরিডায় ছুটলেন সস্তায় জমি কিনতে। 'হার্পার্জ' পত্রিকায় ১৯২৬-এ এক প্রবন্ধকার লেখেন : "রক্তের গন্ধ যেমন বন্য পশুকে আকর্ষণ করে, গত বসন্তে তেমনি টাকার গন্ধ মানুষকে ফ্লোরিডায় টেনেছিল। বুদ্ধিমান লোক কানে কানে একে অন্যকে বলে, 'চলুন না, মশাই, এই গ্রীষ্মে চুপিচুপি গিয়ে কিছু সস্তায় জমি কিনে ফেলা যাক'। প্রতিবেশীদের কাছে উদ্দেশ্য গোপন করে এরা বড় গাড়িতে করে কিংবা ট্রেনে ফ্লোরিডা

যাত্রা করতে লাগল।" শেয়ারের বাজারে ফাটকাবাজি চলল। যেমন করে হোক, আরো টাকা চাই! টাকা যেন ছড়িয়ে রয়েছে! সপ্তাহে আর ষাট ঘণ্টা কাজ করতে হয় না, আটচল্লিশ ঘণ্টা কাজের রেওয়াজ চালু হয়ে গেছে। ফলে হাতে সময় আছে অনেক। কী করা যায়? ১৯২৪ সালে এক সাময়িক পত্রিকা যুগটাকে নাম দিলেন "খেলার যুগ"। ১৮৭৫ সাল থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে লন টেনিস চলছিল। গলফ চালু হয়েছিল গত শতাব্দীর শেষ দশকে—দুটোই ছিল অল্প লোকের খেলা। হঠাৎ দেখা গেল ২০ লক্ষ গলফার, ১০ লক্ষ টেনিস খেলোয়াড়। শিপরেক কেলি নামে একটি লোক ১৯২৯ সালের মাঝামাঝি এক খেলা দেখিয়ে বেড়াতে শুরু করে মাটিতে এক পোল পুঁতে কেলি তার উপর চড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকত। তারই দেখাদেখি বাল্টিমোর শহরের একটি পনেরো বছরের ছেলে আভিন ফোকম্যান দশ দিন, দশ ঘণ্টা, দশ মিনিট, দশ সেকেণ্ড পোলের উপর বসে থেকে রেকর্ড করল। শহরের মেয়র তাকে সংবর্ধনা জানালেন। ছেলেদের মধ্যে, মেয়েদের মধ্যে খেলাটা চালু হয়ে গেল। যেমন করে হোক অবসরটা উপভোগ করতে হবে! ১৯২০ সালে বেতারে জাহাজ থেকে শহরে খবর পাঠানো হয়। ঐ বছরই প্রথম বেতার কেন্দ্র থেকে অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু হয়। দশ বছরের মধ্যেই ঘরে ঘরে রেডিও সেট ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বেতারে তখন যেমন বিজ্ঞাপন প্রচার হয়, তেমনি সংগীতও প্রচার হয়। বিশেষত দ্রুত ও জটিল ধ্বনির বৈচিত্র্য ও অবাধ সমাহার জ্যাজ সংগীতের জনপ্রিয়তার সূত্রপাত বেতার থেকেই। এই যুগেই নির্বাক চলচ্চিত্রের বিপুল জনপ্রিয়তা—কে যেন নাম দিয়েছিলেন "স্বপ্নের কারখানা"—এখানে গড়েপিটে নানা আকারের স্বপ্ন তৈরি হয়, তারপর লোকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, লোকে অন্ধকার ঘরে বসে হয়ে দেখে, তুলকালাম যুদ্ধ, বাগদাদের চোর, উড়ন্ত কার্পেট, চার্লি চ্যাপলিন বুটজুতো রান্না করে খাচ্ছেন। এই যুগে মেয়েরা হঠাৎ যেন অনেকটা স্বাধীন হয়ে গেলেন—চলাফেরায়, পুরুষদের সঙ্গে সম্পর্কে, সাজগোজে, পৃথিবীর অনেক গভীর কথা নিয়ে গভীর চিন্তায়।

আরেকদিকে এল এই সুখ ঐশ্বর্য আঁকড়ে থাকার সাধ। সেই সাথেই প্রগতিশীল পরিবর্তনকামী যাবতীয় চিন্তা, যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ও বিদেশীদের বিরুদ্ধে জেহাদ। ১৯২০ সালে মার্কিন অ্যাটর্নি জেনেরাল দাবি করলেন, সব বিদেশাগত মার্কিন অধিবাসীকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হোক—"ডাকাতিই হল কমিউনিজম-এর আদর্শ।...'কমিউনিস্টরা অপরাধপ্রবণ বিদেশী। এবং মার্কিন সরকার অপরাধ নিবারণে বদ্ধপরিকর, এই দুই স্বতঃসিদ্ধ গ্রহণ করে নিয়েই আমরা সিদ্ধান্ত করি, উগ্রপন্থ আদর্শের বিপ্লবী দিক ও জাতীয় আইন লঙ্ঘনের মধ্যে কোন ভেদ মানা হবে না। ..যে তত্ত্বই কোন অপরাধের সপক্ষে ব্যবহার করা যায়, তা আমেরিকায় আমরা সহ্য করব না।" এই সময়েই কু ক্লুকস ক্ল্যানের ভয়ংকর কর্মকাণ্ডের সূচনা। 'আমেরিকানিজম'-এর নামে এরা ইহুদী ও কৃষ্ণাঙ্গদের নিশ্চিহ্ন করার সংকল্প গ্রহণ করে। এই গোষ্ঠীর লোকেরা তারপর থেকেই বহু বছর ধরে নিগ্রোদের হত্যা করেছে, জীবন্ত দগ্ধ করেছে, তাদের অঙ্গহানি করেছে, তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে।

অন্ধ উন্মত্ত মুনাফাশিকারের অবশ্যম্ভাবী ফল ঘটে—১৯২৯-এর অক্টোবরে হঠাৎ শেয়ারের দাম প্রচণ্ড নেমে যায়। অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। ১৯৩২-এ দেড় কোটি বেকার কাজ খুঁজছে—যে কোন কাজ। ১৯২৯ থেকে ৩২-এর মধ্যে ৮৫,০০০ ব্যবসায় ফেল পড়ল। লাখ টাকা থেকে ছেঁড়া কাঁথায় এই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত পতনের রূপ দেখা গেল—গৃহহীন মানুষ নিউ ইয়র্কের স্টেশনে শুয়ে ঘুমোচ্ছে; টিন, কার্ডবোর্ড আর ভাঙা টুকরো-টাকরায় তৈরি ঘরে বাস করছে। লঙ্গরখানায় গিয়ে মানুষ দাঁড়াচ্ছে। বেশিদিন যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ এই সংকট সহ্য করে নি। ১৯৩২-এই নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ফ্র্যাংকলিন রুজভেল্টের 'নয়া ব্যবস্থায়' সুপরিকল্পিতভাবে ধাপে ধাপে এই সংকট থেকে উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু ততদিনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রায় এসে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নীতি তখন গা বাঁচানোর নীতি, সারা পৃথিবীর সঙ্গে ব্যবসায় চালিয়ে যাবার নীতি। স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্র্যাংকোর ফ্যাশিস্ত শক্তি জর্মনি ও ইতালি থেকে যে অস্ত্রশস্ত্র পায় তার অনেকটাই যুক্তরাষ্ট্র থেকে কেনা। ১৯৪০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনকে পঞ্চাশটি বহু পুরনো যুদ্ধজাহাজ দেয়, পরিবর্তে বৃটিশ উপনিবেশে আটটি বিমান ও নৌ-ঘাঁটির ৯৯ বছরের দখল আদায় করে নেয়। ১৯৪১ সালের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে "গণতন্ত্রের অস্ত্রাগার" বলে বর্ণনা করে। মিত্রশক্তিকে অস্ত্রশস্ত্র যোগাতে শুরু করে। ঐ বছরের শেষেই যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্র ন্যূনতম প্রাণহানি স্বীকার করে, মূলত বোমাবর্ষণে ও অস্ত্র সরবরাহেই যুদ্ধে তার দায়িত্ব পালন করায় পরবর্তীকালে মার্কিন সমরাধিনায়ক আইজেনহাওয়ার সন্তোষ প্রকাশ করেন।

যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকা [illegible] জাপানে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে [illegible] এক [illegible] প্রায় সমান [illegible] প্রমাণ হয়ে [illegible] অথচ দুটি শহরের এবং [illegible] ও নিরপরাধ মানুষের প্রাণহানি ঘটে [illegible] এই বোমার সম্ভাবনার [illegible] আইনস্টাইনই প্রথম রুজভেল্টকে [illegible] ছিলেন, এই কারণে জাপানের [illegible] হত্যাকাণ্ডের অপরাধের গ্লানি আইনস্টাইনকে তাঁর জীবনের শেষ কয়েক বছর প্রচণ্ড পীড়িত করেছিল। রুজভেল্টের মৃত্যুর পর তাঁর টেবিলে পাওয়া গেছে আইনস্টাইনের একটি চিঠি—তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন জাপানী শহরের উপর এই বোমা যেন বর্ষিত না হয়। খাম শেষ পর্যন্ত বন্ধই ছিল—রুজভেল্ট চিঠিটি পড়বার সুযোগ পান নি। বোমাবর্ষণের দায়িত্ব তাঁর পরবর্তী রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের।

জানি না, এইভাবে বলা যায় কি না তবু মনে হয়, অন্তত বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধ জুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি মহল ও গরিষ্ঠ অংশ বাকি পৃথিবীর ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে আভ্যন্তরিক সমৃদ্ধি লাভ করবার দুরন্ত নেশায় মজেছিল। একদা টম পেন প্রমুখ যে মার্কিন মুক্তিযোদ্ধারা দেশকে স্বাধীন করে ফরাসী বিদ্রোহে মদত যোগাতে গেছলেন, তাঁদের ঐতিহ্য পরিত্যক্ত হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে য়ুরোপ যে কষ্ট স্বীকার করে, তার সমগ্র চিত্র যখন মার্কিন দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, হিরোশিমা নাগাসাকির পাপের গ্লানি যখন মার্কিন বিবেককে দংশন করে, তখনই যেন আরো বিশ্বতোমুখ, সামাজিক দায়িত্বে আরো সচেতন একটা মনের উন্মেষ ঘটে। এর পিছনে ছিল এই পঞ্চাশ বছর ধরে মার্কিন লেখকদের জীবনবীক্ষণের গভীর অভিজ্ঞতা। এই নতুন মনকে বাধাও পেতে হয় প্রচুর। সরকারি দৃষ্টিকোণ ও জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান অংশের মধ্যে বিচ্ছেদ বাড়তে থাকে। ১৯৫০-এর ফেব্রুয়ারী মাসে এক টেলিভিশন ভাষণে আইনস্টাইন বলেন : "আমাদের পররাষ্ট্রনীতির প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্ন কর্মের ভিত্তি একই দৃষ্টিকোণ : যুদ্ধ বাধলে শত্রুপক্ষের

[illegible] ছোড়া [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের এখন কী করা উচিত? পৃথিবীর সমস্ত সম্ভাব্য সামরিক গুরুত্ব-পূর্ণ জায়গাতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন। সম্ভাব্য সকল মিত্রকে অস্ত্রসজ্জিত করা, অর্থনৈতিক সাহায্য দান। দেশের মধ্যে: সামরিক বাহিনীর হাতে বিপুল আর্থিক 'শক্তির সমাবেশ; জনসমাজকে সামরিক-মনস্ক করে তোলা; নাগরিকদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপর, বিশেষত সরকারি কর্মচারী-দের আনুগত্যের উপর, ক্রমবর্ধমান পুলিশ বাহিনীর কড়া খবরদারি। যাঁরাই স্বাধীন চিন্তা করেন, তাঁদেরই উপর শাসানি। বেতার, পত্রপত্রিকা ও বিদ্যালয়গুলি মারফত জনসাধারণের চিন্তাকে সুপরিকল্পিতভাবে একই ছাঁচে প্রবাহিত করার চেষ্টা।" পরবর্তী এই প্রায় ত্রিশ বছরের ইতিহাস তাঁর বিরোধের ইতিহাস। তাতে যেমন সমাজও কিছুটা বদলেছে, সাহিত্য বদলেছে ততোধিক। সে-তুলনায় প্রথম পঞ্চাশ বছরের কাহিনী অনেকটা নিস্তরঙ্গ বিবর্তনের।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মামাবাবুর 'সাগরসঙ্গীত' যখন প্রথম বের হল, আমাদের সকলের মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগল তাঁর প্রথম কবিতাটি, আজো দেখছি মুখস্থ আছে—

—'আজিকে পাতিয়া কান
শুনেছি তোমারি গান
হে অর্ণব, আলোঘেরা প্রভাতের মাঝে,
এ কি কথা এ কি সুর
প্রাণ মোর ভরপুর,
বুঝিতে পারি না তবু কি জানি কি বাজে
তব গীত মুখরিত প্রভাতের মাঝে।'

বই ছাপাবার আগে মামাবাবুর মুখে 'সাগরসঙ্গীত'-এর অনেক কবিতাই শুনেছি। শুধু নিজের কবিতা নয়, কবিতা পড়তেই তিনি খুব ভালোবাসতেন। আর পড়তেনও ভারি চমৎকার। বড় বড় ইংরেজ কবিদের কবিতা, বাংলা নামকরা কবিদের অনেক কবিতা, বৈষ্ণব পদাবলী, এ সব আমরা মামাবাবুর মুখে কত যে শুনেছি। এখানে পন্ডিচেরীতে এসে শ্রীঅরবিন্দের 'সাগরসঙ্গীত'-এর ইংরেজী অনুবাদ 'The songs of the sea' পড়ে মনে হল 'সাগরসঙ্গীত' নতুন করে শুনলাম! আমার এই ছোট্ট 'স্মৃতির খেয়া'য় 'সাগরসঙ্গীত'-এর দোলা দিয়ে যাব এই হল মনের সাধ। তাই কয়েকটি মূল বাংলা কবিতা ইংরেজী অনুবাদ-সহ তুলে দেবার লোভ সম্বরণ করা গেল না। কি অপূর্ব অনুবাদই করেছেন শ্রীঅরবিন্দ। কেই বা পড়ে এসব, ক'জনই বা খোঁজ রাখে।

'হে আমার আশাতীত, হে কৌতুকময়ী,
দাঁড়াও ক্ষণেক, তোমা ছন্দে গেঁথে লই।
আজি শান্ত সিন্ধু ওই ম্লান চন্দ্র করে
করিতেছে টলমল কি যে স্বপ্নভরে!
সত্যই এসেছ যদি, হে রহস্যময়ি;
দাঁড়াও অন্তরমাঝে ছন্দে গেঁথে লই।
দাঁড়াও ক্ষণেক, আমি অর্ণবের গানে
পরিপূর্ণ শব্দহীন অন্তরের তানে
ছন্দাতীত ছন্দে আজি তোমারে গাঁথিব,
অন্তর বিজনে আমি তোমারে বাঁধিব।
তুমি কি রবে না সেথা, হে স্বপ্ন-অঞ্চলা,
ছন্দবন্ধ পরিপূর্ণ নিত্য অচঞ্চলা।'

O thou unhoped-for elusive wonder of the skies,
Stand still one moment!
I will lead thee and bind
With music to the chambers of my mind.
Behold how calm to day this sea before me lies
And quivering with what tremulous
heart of dreams
In the pale glimmer of the faint moonbeams.
If thou atlast art come indeed,
O mystery, stay
Woven by song into my heart-beats
from this day.

Stand, goddess, yet!
Into this anthem of the seas.
With the pure strain of my full voiceless hear
Some rhythm of the rhythmless, some part
Of thee I would weave to day,
with living harmonies
Peopling the solitude I am within.
Wilt thou not here abide on that vast scene,
Thou whose vague raiment edged with
dream haunts us and flees.
Fulfilled in an eternal quiet like this sea's ?"
(Songs of the sea I).

জানি না কথার মোহ, ভাষার বিন্যাস,
জানি না গানের সুর, তান লয় মান,
আমার অন্তরতলে মুক্ত চিদাকাশ,
অনন্তের ছায়াভরা আমার পরাণ!
সাড়া পাই আমি তারি সঙ্গীতে তোমার
প্রভাতের আলো মাঝে; সাঁঝের আঁধারে।
তাই আমি খুলিয়াছি হৃদয় দুয়ার;
তোমারি গানের মাঝে খুঁজি আপনারে,
অপূর্ব এ মিলনের গোটা কত গীতে
পরাণ ভরেছি আজ তব পায়ে দিতে!

I have no art of speech, no charm of song,
Rhythm nor measure nor the lyric pace.
No words alluring to my skill belong.
Now in me thought's free termless
heavens efface
Limit and mark upon my spirit is thrown
The shadow of infinity alone.

I at thy voice in brilliant dawn or eve
Have felt strange formless
words within my mind
Then my heart's door wide to thy cry I leave
And in thy chant I seek myself and find.
Now some few hymns of that dim union sweet
Have filled my soul. I bring them to thy feet.
(Songs of the sea VIII)

তোমারি এ গীত প্রাণে সারাদিনমান,—
আমি যে হয়েছি তব হাতের বিষাণ!
আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী,—বাজাও আমারে
দিবস রজনী ভরি আলোকে আঁধারে,
বাজাও নির্জন তীরে, বিজন আকাশে,
সকল তিমির ঘেরা আকুল বাতাসে,
মায়ালোকে, ছায়ালোকে, তরুণ উষায়,
বাজাও বাসনাহীন, উদাসী সন্ধ্যায়।
ওগো যন্ত্রী, আমি যন্ত্র, বাজাও আমারে
তোমার অপূর্ব এই আলো অন্ধকারে!

All day within me only one music rings
I have become a lyre of helpless strings
And I am but a horn for thee to wind,
O vast musician! Take me, all thy mind
In light, in gloom, by day, by night express
Into me, minstrel, breathe thy mightiness.
On solitary shores, in lonely skies,
In night huge sieges when the winds blow wild,
In many a lovely land of mysteries,
In many a shadowy realm, or where a child.
Dawn, bright and young,
sweet unripe thoughts conceives.
Or through the indifferent calm desireless eves,
In magic night and magic light of thee,
Play on thy instrument, O Soul, O Sea.
(Songs of the sea IX)

আমার জীবন লয়ে কি খেলা খেলিলে!
আমার মনের আঁখি কেমনে খুলিলে!
আমার পরাণ ছিল কুঁড়ির মতন,
তোমার সঙ্গীতে তারে ফুটালে কেমন!
সকল জীবন যেন প্রস্ফুটিত ফুল,
বিচিত্র আলোকে গন্ধে কাঁপিছে আকুল!
সমস্ত জনম যেন অনন্ত রাগিণী
তব গীতে [illegible]! [illegible]!

What is this play thou playest with my life!
How hast thou parted lids [illegible] [illegible] so still
Against the vision, that like a bud shut long
My mind has opened only to thy song,
And all my life lies like a yearning flower
Hued, perfumed, quivering in thy
murmurous power
And all my days are grown an infinite strain
Of music sung by thee, O shoreless main?
(Songs of the sea X)

রাখ, রাখ রথ তব, হে অন্ধবিজয়ী,
নামাও হস্তের অস্ত্র, সন্ধ্যা আসে ওই
শান্তিময়ী, ধীরে ধীরে মৃদুল চরণে,
গগন ভরিয়া গেল ধূসর বরণে।
রাখ রাখ, শান্ত হও, ওগো রণশ্রান্ত,
হে মোর বিজয়ী বীর, হে আমার ক্লান্ত।
আমার পরাণ তরে বৃথা যুদ্ধ করা
আমি ত আপনা হতে দিতেছিনু ধরা।
জ্বেলে দিব সন্ধ্যাদীপ তোমার পরাণে
হৃদয় মন্দির তব ভরি দিব গানে।
পাতিব তোমার তরে শয্যা সুশীতল,
তোমার চরণতলে রবে শান্তিজল।
আমার পরাণ লয়ে মিছে যুদ্ধ করা
আমি যে আপনা হতে দিতেছিনু ধরা।

O loud blind conqueror, stay thy furious car,
Lay down thy arrow. Evening from afar
Comes pacing with her smooth and noiseless step
And dust pale light of quiet in heavens of sleep.
Stay then thy chariot, rest!
O tired with strife!
O wearied soul of death! Conqueror of life!
Vain was thy war, O Lord, my soul to win,
Myself was giving myself without that pain.
Now I will light the evening lamps for thee,
My soul with vesper hymns thy fane shall be,
And I will spread a cool couch for thy sleep
And at thy feet calm's holy water keep.
What need to conquer me,
hadst thou to strive,
Who only longed unasked myself to give?
(Songs of the sea XIX)

এখনো জাগে নি কেহ, আমি জাগিয়াছি,
নীরবে নিভৃতে হবে দেখা দুজনায়,
এখনো উঠে নি রবি আমি উঠিয়াছি
সিনান করিব তব প্রাণ মহিমায়।
বাহিরের গীত রবে বাহিরে পড়িয়া,
সবাই শুনে যা সে ত সবাকার তরে—
দিও মোরে লয়ে যাব হৃদয় ভরিয়া
যে গীত অতলে তব নিশিদিন ঝরে!
হে সিন্ধু হে বন্ধু, একা তাই জাগিয়াছি
সে গীত বাজিবে বলে [illegible] [illegible]।

None is awake in all the world but I ;
    While the sun hesitated, I upstood
And met thee in a grandiose secrecy
    To lave my soul in thy majestic flood.

Be outward songs the outward nature's part !
These are for all and all their tones may hear.
There is a strain that fills the secret heart :
Reveal that music to my listening ear.

Therefore, O sea, O friend, I came alone,
That I might hear that rapture or that moan.
(Songs of the sea XXV)

এপার ওপার করি পারি না ত আর
আজ মোরে লযে যাও অপারে তোমার।
পরাণ ভাসিয়া গেছে কূল নাহি পাই,
তোমার অকূল বিনা কোথা তার ঠাঁই।
আজি যে ঘিরেছে মোরে গাঢ় অন্ধকার,
সাড়া শব্দ নাহি পাই পরাণ মাঝার।
নীরব ক্রন্দনে ভরা চোখে নাহি জল,
আজি যে তোমার তরে পরাণ পাগল।
খুঁজেছি তোমারে কত রঙ্গের মাঝে
খুঁজেছি যেখানে তব গীতধ্বনি বাজে,
তোমার অপূর্ব ওই আলো অন্ধকারে
প্রতিদিন প্রতিরাত্র খুঁজেছি তোমারে।
হে মোর আজন্ম সখা! কান্ডারী আমার ;
আজ মোরে লয়ে যাও অপারে তোমার।

This shore and that shore,—
I am tired, they pall.
Where thou art shoreless, take me from it all.
Thy spirit goes floating and can find oppressed
In thy unbanked immensity only rest.
Thick darkness falls upon my outer part,
A lonely stillness grips the labouring heart,
Dumb weeping with no tears to ease the eyes.
I am mad for thee, O king of mysteries.
Have I not sought thee on a million streams,
And where so ever the voice of music dreams,
In wondrous lights and sealing shadows caught,
And every night and every day have sought ?
Pilot eternal, friend unknown embraced,
O, take me to thy shoreless self at last.—
(Songs of the sea XL)

'সাগরসঙ্গীত' সেই অনাদি অনন্ত যিনি তাঁরই সঙ্গীত। তাঁরই গান গেয়েছেন কবি, বাঁধতে চেয়েছেন তাঁকেই ছন্দে। তাঁরই চরণে জানিয়েছেন প্রাণের প্রণাম, জানিয়েছেন প্রার্থনা, দিতে চেয়েছেন আপনাকে। কাছে থেকে, দূরে থেকে, আপন অন্তরে বাহিরে রূপে রসে বর্ণে গন্ধে স্পর্শে কবি কিভাবে দেখছেন সেই অপ্রকাশের নানা প্রকাশ, উপলব্ধি করছেন সেই ভগবৎসত্তাকে, সেই সব অনুভূতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রতিটি কবিতায়। বুঝতে পারা যায় সাগরের বুকে কোন্ সঙ্গীত তিনি উন্মুখ হয়ে শুনছেন, কোন্ সঙ্গীত তাঁকে মুগ্ধ করছে, কোন্ সঙ্গীতের আকুল টানে নোঙর ছিঁড়ে পাগল হিয়া তার ভেসে চলে যেতে চাইছে, মানা মানছে না। শেষে দেখা যাচ্ছে, এপার ওপার এই দোটানার মাঝে আর তিনি পারছেন না, অন্তরাত্মা তাঁর অধীর হয়ে উঠেছে এপার ওপারের অতীত সেই অপার অনন্তের জন্যে। সেই সুরই আমরা শুনতে পাই এই লাইনগুলির মাঝে—

—'এপার ওপার করি পারি না ত' আর
আজ মোরে লয়ে লাও অপারে তোমার।'—

এই প্রার্থনাই 'সাগরসঙ্গীতে' কবির শেষ প্রার্থনা ও শেষ কবিতা।

সারা জীবনই তিনি ভগবানকে খুঁজেছেন। অন্তরে তাঁর ডাক শুনেছেন। সুখে দুঃখে জীবনের সব কিছুর মধ্যেই তাঁকে চেয়েছেন। অনুভব করেছেন তাঁর স্পর্শ তাঁর অস্তিত্ব। লাভ ক্ষতি সবই ছিল তাঁর কাছে ভগবানের অশেষ করুণা আশীর্বাদ। তাঁর কাব্যে আমরা দেখতে পাই পাতায় পাতায় ভগবানের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের কত চিত্র, শুনতে পাই তাঁকে চাওয়ার কত সুর, কত ব্যাকুল আকুতি। আর দেখতে পাই ভগবানকে কতখানি আশ্রয় করে আছে তাঁর সত্তা। 'অন্তর্যামী'র কবিতাগুলি তাঁর সবই সেই ভগবতমুখীভাবের অভিব্যক্তি। দু-একটা তুলে দেখাচ্ছি—

'সুখের মাঝারে শুধু সুখ খুঁজি নাই
তুমি জানো দুঃখ মাঝে করেছি সন্ধান,
তোমারে, তোমারেই শুধু .'

যে পথেই নিয়ে যাও, সে পথেই যাই
মনে রেখো আমি শুধু তোমারেই চাই'—

'যখনি দেখিতে নারি অন্ধকার আসে
পথ খুঁজে মরে প্রাণ তাঁরই চারিপাশে,
কোথা হতে জ্বলে দীপ সম্মুখে তাহার,
নয়নে দরশ আসে। চলে সে আবার।
যখনি হৃদয় যন্ত্রে ছিঁড়ে যায় তার
সুরহীন হয়ে আসে সঙ্গীতের ধার,
কোথা হতে অলক্ষিতে তুমি দাও সুর
মহান্ সঙ্গীতে হয় প্রাণ ভরপুর।'—

'যেখানেই থাকো নাথ, আছ তুমি, আছ তুমি,
সকল পরাণ মম তোমার চরণভূমি।
ভাবনা ছাড়িনু তবে এই দাঁড়াইনু আমি
যে পথে লইতে চাও লযে যাও অন্তর্যামী।'—

শেষের কবিতাটির শেষ দুটি লাইনে ভগবানে আত্মসমর্পণের সুর খুবই সুস্পষ্ট। ভগবানের জন্যে যে তাঁর ব্যাকুলতা ক্রমেই বাড়তে থাকে তা আমরা জানি। কেন না শ্রীঅরবিন্দের কাছে তিনি এসেছিলেন যোগসাধনার জন্যে। তখন তাঁর শরীর একেবারেই ভেঙে গেছে। শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে বলেন যে রাজনীতি ও যোগসাধনা দুটো একসঙ্গে করা সম্ভব নয়। শুনেছি পরে তিনি পাবনার অনুকূল ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তার কিছুকালের মধ্যেই দেহত্যাগ করেন।

রসা রোডের বাড়িতে যে সময় খুব পালাকীর্তন হত সেই সময় দেখা যেত মামাবাবুর ভক্তিভাব। সেই সময়েই তাঁর এত বড় দিকটি আমাদের চোখের একেবারে সামনে চলে আসে। তখন থেকে তাঁকে ভক্তিরসে ডুবে যেতে দেখা যায়। পদাবলী কীর্তন শুনতে শুনতে দেখেছি কেমন যেন হয়ে যেতেন,—ভাবে বিভোর, দুই চোখে ধারা বইছে। মনে হত তাঁর অন্তর ভরে

আছে কানায় কানায়। অনেক সময় মুখে এমনভাব প্রকাশ পেত, যে তিনি এ জগতে আছেন তা বোধ হত না। কোন্ এক রসসাগরে ভেসে চলেছেন সেই রসের রসিক হয়ে, তৃপ্তিতে, আনন্দে, কখনও মুখে হাসি, কখনও চোখে জল। এই সব আত্মহারা ভাবের মাঝে ফুটে উঠত তাঁর ভক্তরূপটি। ভক্তিমার্গে হয়ত বা তিনি তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছেন। কত সময় এমনও দেখেছি যে কা'রো সঙ্গে কথাবার্তায় বা গল্পে লিপ্ত আছেন, সেই সময় আমাদের মধ্যে কেউ একজন কিছু না ভেবেচিন্তে, কথার ছলে কীর্তনের এক লাইন হয়ত গেয়ে উঠেছে, মামাবাবুর কানে সে সুর যাওয়ামাত্র অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন। মনে হত সেখানে আর তিনি নেই, ডুব দিয়েছেন গভীরে কোথাও। কীর্তন তাঁকে গভীর-ভাবে স্পর্শ করত, পরশমণির মত ছুঁতে না ছুঁতেই ভিতরটি সোনা হয়ে যেত। বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতির 'মাধব বহুত মিনতি করি তোয়' গানটি আমি বহুবার মামাবাবুকে কাছে গেয়েছি। শুনে ও'র যেন আর আশ মিটত না, সেটা যে আমার গাওয়ার জন্য, তা নয়। গানটিই উনি খুব ভালোবাসতেন। বিশেষ করে এই লাইনটি—

'গণইতে দোষ গুণলেশ না পাওবি
যব তুহুঁ করবি বিচার।'—

বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে চণ্ডীদাস ছিলেন মামাবাবুর সবচেয়ে প্রিয় কবি। শ্রেষ্ঠ কবি বলে তাঁকেই স্থান দিয়েছেন। চণ্ডী-দাসের কথা বলতে আরম্ভ করলে যেন আর শেষ হত না। বলতেন তাঁর কবিতা যে স্তরে পৌঁছেছে সে স্তরে আর কোনও কবির কবিতা পৌঁছতে পারে নি। চণ্ডীদাসের কত গানের কথা, কত গানের কত লাইনের কথা তাঁর মুখে একবার নয় বহুবার শুনেছি, তার মধ্যে কতগুলি আমাদের জানা হয়ে গেছে। তাছাড়া সেই সব গানের মধ্যে অনেক গান আবার কীর্তনেও গাইতে শুনেছি, তাই মনে আছে। মামাবাবুর সেই সব প্রিয় গানগুলির কয়েকটা থেকে কিছু কিছু তুলে দিচ্ছি। তাঁরই কাছে শুনে শুনে এসব গান আমাদেরও খুব প্রিয় খুব পরিচিত হয়ে ওঠে এবং আমরাও বেশ রস পাচ্ছি বুঝতে পারি।

(১) 'সই কে বা শুনাইল শ্যাম নাম
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।' (চণ্ডীদাস)

(২) 'বঁধু কি আর বলিব আমি
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি।
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী।' (চণ্ডীদাস)

(৩) 'মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা
কাজ নাই সখি তাদের কথা
বাহিরে রহুন তারা।
আমার বাহির দুয়ারে কপাট
ভিতর দুয়ার খোলা
তোরা নিসাড় হইয়া আয় না সজনি
আঁধার পেরিলে আলা।
আলোর ভিতরে কালাটি আছে
চৌকি রয়েছে সেথা
এজনের কথা ওদেশে কহিলে
লাগিবে মরম ব্যথা।' (চণ্ডীদাস)

(৪) 'চণ্ডীদাস কহে শুন বিনোদিনি
সুখ দুখ দুটি ভাই
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ যায় তারি ঠাঁঞি।'

(৫) 'পুত্র পরিজন সংসার আপন
সকল ত্যজিয়া লেখ
পীরিতি কারণে তাহারে পাইবে
মনেতে ভাবিয়া দেখ।' (চণ্ডীদাস)

(৬) 'জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।
কত মধুযামিনী রভসে গমাওল
না বুঝল কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখল
তৈঁও হিয়ে জুড়ন না গেল।' (বিদ্যাপতি)

(৭) 'আধ জনম হম নিদে গমাওল
জরা শিশু কতদিন গেলা।
নিধুবন রমণী রভসরসে মাতল
নিধুবন রমণী রসরঙ্গে মাতল
তোহে ভজব কোন বেলা।

কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসান
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগরলহরি সমান।' (বিদ্যাপতি)

'নব রে নব নিতুই নব
যখনি হেরি তখনি নব।' (চণ্ডীদাস)

'কভু না জানিনু কভু না শুনিনু
শ্যাম কানু কি গোরা।'—(চণ্ডীদাস)

এই সবের এক-একটি লাইন ধরে মামাবাবু চলে যেতেন গভীরে ডুবুরীর মতন, যখন সেই গভীরের বস্তুর বিষয়, কখনও অল্পের ভিতর দিয়ে, কখনও বিশদ করে বলতেন, তখন পেতাম নতুন আলো, দেখতে পেতাম একটা নতুন দিক। মনে হত নতুন কিছুর মধ্যে যেন জেগে উঠলাম। বৈষ্ণব মহাকবিদের কাব্য-সম্পদের কথা বলবার সময় মামাবাবুকে দেখতে হত, এমন অভিভূত হয়ে বলতেন, চোখে ভাসে তাঁর মুখচোখের সেই ঔজ্জ্বল্য, তিনি যেন এসবের তুলনা খুঁজে পেতেন না। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বড় বড় কবিদের কথাই যে শুধু বলতেন তা নয়, সব বৈষ্ণব কবিদের কবিতা নিয়েই তিনি তন্ময় হয়ে আলোচনা করতেন। তবে চণ্ডীদাসের সমকক্ষ কাউকেই মনে করতেন না। অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গে চণ্ডীদাসের কোথায় পার্থক্য এবং চণ্ডীদাস কেন এত বড় সেই সব এত সুন্দর প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতেন, যখনি শুনতাম তখনি মনে হত নতুন কিছু শুনছি, এত ভালো লাগত।

[ক্রমশঃ]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

দ্বিতীয় পর্বের প্রান্তসীমা ১৯২৫ সালের জুন, দেশবন্ধুর মৃত্যুকাল পর্যন্ত।

'অনেক দূরে শান্তিনিকেতন' অধ্যায়ে চিত্তরঞ্জন রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের বিষয়ে কিছু আলোচনা করেছি। চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক ও হৃদয়গত নৈকট্যের বিষয়েও সেখানে কিছু বলা হয়েছে। এখানে দেশবন্ধুর রাজনৈতিক কার্যাবলীর একটা সংক্ষিপ্ত খসড়া করা যাক। এইকালে দেশবন্ধু মহাত্মাজীর সংযোগের রূপ কি ধরণের ছিল?

সুভাষচন্দ্র বলেছেন, দেশবন্ধু মোতিলাল ইত্যাদির সহায়তা ভিন্ন ১৯২১ সালের আন্দোলন গান্ধীজী গড়ে তুলতে পারতেন কি না সন্দেহ। গান্ধীজীর জেলে যাওয়া পর্যন্ত দেশবন্ধু ছিলেন গান্ধীজীর 'অধীনস্থ' সহযোগী। সেই আনুগত্যকালে দেশবন্ধু বারবার দেখলেন মহাত্মার রাজনৈতিক বুদ্ধির শোচনীয় অভাব। চৌরাচৌরির ঘটনার পরে গান্ধীজী যখন নিজ দায়িত্বে আন্দোলন থামিয়ে দিলেন, তখন দেশবন্ধু গান্ধীজীর দায়িত্ববোধে আর আস্থা রাখতে পারলেন না। অসহযোগ বন্ধ, অথচ দেশের সামনে পথ খুলে দিতে হবে। দেশবন্ধু তাঁর স্বরাজ্য দলের পরিকল্পনা করলেন জেলে বসে। তাঁর পরিকল্পনার মূল কথা, 'আইনসভার ভিতরে অসহযোগ'। দেশবন্ধুর মতে, কংগ্রেসের উচিত আইনসভা বর্জন না করে তার সদস্যপদগুলি অধিকার করা, এবং আইনসভার মধ্যে 'ধারাবাহিক' 'অবিরাম' 'সমজাতীয়' প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়া। কংগ্রেস কর্তৃক আইনসভা বর্জনের ফল ভাল হয় নি কারণ একটিও আসন শূন্য নেই, আর তা পূর্ণ হয়েছে অবাঞ্ছিত লোকদের দ্বারা। সরকার এইসব লোকদের সাহায্যে বহির্বিশ্বে দেখাচ্ছে যে, তাদের আচরণের সমর্থনে আছে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা। যুদ্ধকালে শত্রুর হাতে দুর্গ ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। তাছাড়া, দেশবন্ধু বললেন, নির্বাচনের সুযোগে কংগ্রেস নিজেকে জনসাধারণের কাছে প্রচারের সুযোগ পাবে।

দেশবন্ধুর এই নতুন পরিকল্পনার বিরুদ্ধে গোঁড়া গান্ধীবাদীরা না—না রব তুলে 'নো চেঞ্জার' হয়ে দাঁড়ালেন। কাউন্সিল প্রবেশের ব্যাপারে তাঁদের এই কালের নীতিগত শুচিতা বা ছুঁৎমার্গ ভয়াবহ কঠিন হয়ে উঠেছিল। ১৯২৩ সালের গয়া কংগ্রেসে সভাপতি ছিলেন দেশবন্ধু। তিনি তাঁর সভাপতির প্রস্তাব পাশ করাতে পারেন নি। গান্ধীবাদী-দেরই জয় হয়েছিল সেখানে। তাঁদের সমস্ত জয়োল্লাসের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে পণ্ডিত মোতিলাল একটি উদ্বেগজনক ঘোষণা করলেন—স্বরাজ্য দল গঠিত হবে।

স্বরাজ্য দল গঠিত হয়েছিল। গান্ধীজী তখন জেলের মধ্যে, জেলের বাইরে দেশবন্ধু—মোতিলালের প্রতিভা ও সংগঠন। ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লী কংগ্রেসে মৌলানা মহম্মদ আলী মহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে "গোপন বেতারবাণী" লাভ করে দেশবন্ধুর সঙ্গে আপোষ করলেন। বলা বাহুল্য, করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঠিক হয়েছিল, প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস নয়, ব্যক্তি হিসাবে কংগ্রেসসেবীরা নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন।

তার পরে অব্যাহত চলল স্বরাজ্য দলের যাত্রা। বাংলা এবং ভারতের অন্যত্র স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয়তাবাদীদের হাতে এসে গেল (যার দৃষ্টান্ত কলকাতা কর্পোরেশন) আইনসভাসমূহে সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হতে লাগল এবং অসহযোগ যে-ডায়ার্কিকে অচল করতে পারে নি, তাকে বাতিল করে দিল স্বরাজীরা।

গান্ধীজীর মুক্তির জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভায় বিশেষ চাপ দিয়েছিল স্বরাজ্য দল। গান্ধীজী খুবই অসুস্থ ছিলেন। ১৯২৩ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী মুক্তি পেলেন। মুক্তির পরে গান্ধীজী, যেমন আশংকা করা গিয়েছিল, সেভাবে কিন্তু স্বরাজ[illegible]দের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধালেন না। তিনি দেশবন্ধুর সঙ্গে চুক্তি করলেন। এই চুক্তির নাম গান্ধী-দাশ চুক্তি। স্থির হোলো, চুক্তি অনুযায়ী, গান্ধীজী খাদি প্র[illegible]ব নিয়ে থাকবেন, স্বরাজ[illegible] রাজনৈতিক প্রচারের ভার [illegible]। গান্ধীজী অনিবার্যের কাছে [illegible]। শুধু তাই নয়, স্বরাজ্য দলের বিশেষ প্রশংসা পর্যন্ত গান্ধীজী করলেন। একবার বললেন, 'আমার রাজনৈতিক বিবেক স্বারাজীদের সঙ্গে বাঁধা', অন্য সময় বললেন, 'মা যেমন করে ছেলেকে জড়িয়ে থাকে, আমি তেমন করে স্বরাজ পার্টিকে জড়িয়েছি'।

১৯২৪ সালের মাঝামাঝি স্বরাজ্য-দলের প্রয়াসের ফলে সরকার যে অসুবিধার মধ্যে পড়েছিল, তা দূর করবার জন্য কামড় দিল প্রচণ্ডভাবে: সুভাষচন্দ্র প্রমুখ স্বরাজ্য-কর্মীরা গ্রেপ্তার হলেন। দেশবন্ধুর উপর এই গ্রেপ্তারের মর্মান্তিক প্রতিক্রিয়ার কথা পূর্বে বিশদভাবে বলা হয়েছে। এর কিছুদিন পরে দেশবন্ধুর সঙ্গে সরকারের আবার চুক্তির চেষ্টা দেখা যায়। এই চুক্তির চেষ্টা দেশবন্ধুর সঙ্গেই হয়েছিল, তার কারণ প্রথমত, তখন মহাত্মা গান্ধী রাজনৈতিকভাবে পিছনের সারিতে, কংগ্রেসের সঙ্গে মীমাংসা মানে দেশবন্ধুর সঙ্গে মীমাংসা;

দ্বিতীয়ত, ২১শে ডিসেম্বরের ঘটনার পরে সরকার বুঝেছিল, দেশবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা চালানো সম্ভব, গান্ধীজীর সঙ্গে নয়। লর্ড বার্কেনহেড, লর্ড রীডিং-এর সঙ্গে আলোচনা করে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা উপস্থিত করবেন বলে সরকার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল।

সকলে যখন প্রত্যাশায় সূচীমুখ, তখন "সহসা দেশবন্ধুর মৃত্যু হোল— ১৬ জুন ১৯২৫"।

'প্রধান শত্রুর মৃত্যু হয়েছে।' সরকারের ঘোষণা প্রতিশ্রুতিমত বেরিয়েছিল —কিন্তু তাতে আকর্ষণীয় কিছু ছিল না।

আলোচ্য পর্বের প্রথম দিকে গান্ধীজী কারারুদ্ধ, শেষের দিকে দেশবন্ধুর কাছে হার স্বীকার করে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়েছেন। গান্ধী-দাশ চুক্তির পূর্ব পর্যন্ত 'নো-চেঞ্জার'-দের মধ্য দিয়ে অনুপস্থিত গান্ধী প্রকাশিত। কিন্তু ভক্তদের আচরণের জন্য সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর সমালোচনা করেন নি। এবং মুক্তি পাবার পরে স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণকারী গান্ধীজীর সম্বন্ধে তাঁর সমালোচনার কারণ ছিল না।

গান্ধীজীর রাজনীতি সম্বন্ধে এই পর্বে সুভাষচন্দ্রের মনোভাব গান্ধীজীর সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের তুলনার মধ্যে প্রকাশিত। গৌরবের শিখরে আসীন থাকা অবস্থায় চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের ধারণা, আরো কিছুকাল বেঁচে থাকলে চিত্তরঞ্জন ভারত-ইতিহাসকে ভিন্ন পথে চালিত করতে পারতেন। দেশবন্ধুর হাতে-গড়া স্বরাজ্য দল সম্বন্ধে কলকাতার বৃটিশ বাণিজ্য পত্রিকার 'ক্যাপিটাল'-এর সম্ভ্রমসূচক উক্তি তাঁর মনে ছিল : আইরিশ সিনফিন দলের তুল্য এই দল, কিন্তু এঁদের এক দেড় বছরের কৃতিত্ব আইরিশ সিনফিনদের ৭০ বছরের কৃতিত্বকেও ম্লান করে দিয়েছে। এই পার্টির জন্মদাতা, ভারতীয় রাজনীতিতে যিনি বুদ্ধি ও হৃদয় যোগ করেছেন, সেই দেশবন্ধুর সঙ্গে গান্ধীজীর তুলনা করে সুভাষচন্দ্র বলেছেন—

> "১৯২৫ সালের ১৬ই জুন দেশবন্ধুর মৃত্যু হল—সে মৃত্যু ভারতের পক্ষে প্রচন্ড ধরণের দৈব দুর্বিপাক। তাঁর সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন পাঁচ বছরও নয়, কিন্তু তাঁর উত্থান বিস্ময়কর। বৈষ্ণব ভক্তের বৈাহিসেবী উন্মাদনায় সর্ব মনপ্রাণ নিয়ে তিনি রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তিনি কেবল নিজেকেই দেন নি, যা-কিছু ছিল, সকলই দিয়েছিলেন। যখন মারা গেলেন, দেখা গেল, তখনো-অবশিষ্ট পার্থিব সম্পত্তি জাতির জন্য উৎসর্গীকৃত। সরকার তাঁকে ভয় করত, আবার শ্রদ্ধা করত; ভয় করত তাঁর শক্তিকে, শ্রদ্ধা করত তাঁর চরিত্রকে। তারা জানত, তিনি কথার মানুষ, তারা এও জানত, তিনি সংগ্রামে কঠোর কিন্তু সে সংগ্রামে মালিন্য নেই। কোনো চুক্তির জন্য কথাবার্তা বা দরকষাকষির যোগ্য মানুষ তিনি। তাঁর মাথা পরিস্কার, তাঁর রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি নিখুত, ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁকে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন, যে সচেতনতা মহাত্মা গান্ধীর নেই। অপর যে কোনো মানুষের চেয়ে তিনি বেশি করে জানতেন যে, শত্রুর হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা আদায় করে নেবার সুযোগ প্রায় আসে না, যখন সত্যই আসে তখনও বেশিক্ষণ থাকে না। তাদের সংকটের ক্ষণ যতক্ষণ বজায় আছে তারই মধ্যে দরকষাকষি শেষ করতে হয়। তিনি আরও জানতেন, যখন জনসাধারণের উন্মাদনা চরমে উঠে আছে তখন কোনো আপোষব্যবস্থা করতে বিশেষ সাহসের দরকার হয় এবং তার দ্বারা জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হবার আশংকাও থাকে। কিন্তু তাঁর অন্ততঃ সাহসের অভাব ছিল না। তিনি নিজের নির্দিষ্ট ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন—সে ভূমিকা বাস্তববাদী রাজনীতিকের,—এবং সেই জন্য জনপ্রিয়তা খোয়াবার ভয় করতেন না।
>
> দেশবন্ধুর পাশে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা মোটেই পরিস্কার নয়। বহু ব্যাপারে তিনি চূড়ান্ত রকমের আদর্শবাদী ও স্বপ্নবাদী। আবার অনেকক্ষেত্রে বিচক্ষণ রাজনীতিক। কখনো তিনি ধর্মান্ধের মত একগুঁয়ে, অন্যত্র শিশুর মত আত্মসমর্পণকারী। রাজনৈতিক দরাদরির জন্য প্রয়োজনীয় অন্তর্দৃষ্টি বা বিচারবুদ্ধির অভাব তাঁর আছে। যখন দরাদরির যথার্থ সুযোগ আসে, যেমন ১৯২১ সালে, তখন সামান্য জিনিস আঁকড়ে থেকে সব কিছু গন্ডগোল করে দেন। আর যদি তিনি চুক্তির জন্য যান, যেমন ১৯৩১ সালে, তখন পাওয়ার থেকে দিয়ে আসেন বেশি। সমস্ত জড়িয়ে ধুরন্ধর বৃটিশ রাজনীতিকদের কূটনীতির সঙ্গে যুঝবার যোগ্য তিনি নন।"

কতকগুলি সোজা কথা। নির্ভয় ও নির্মম। সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক নেতা. রাজনীতিক্ষেত্রে রাজনৈতিকদের শ্রদ্ধা করতে প্রস্তুত। মাথা-পরিস্কার অথচ হৃদয়বান দেশবন্ধুকে তিনি গুরুরূপে বরণ করেছিলেন, যাঁকে ইংরেজ কূটনৈতিকদের সঙ্গে লড়বার যোগ্য বলে মনে করতেন। গান্ধীজীর রাজনীতিক্ষ উর্ধ্ব ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি মোটে ব্যস্ত ছিলেন না। 'ধুরন্ধর বৃটিশ রাজনীতিকদের সঙ্গে যুঝবার জন্য যোগ্য তিনি ছিলেন না'—তাঁর এই কথাগুলোর মধ্যে গান্ধীজীর সম্ভাব্য আধ্যাত্মিক মহিমা সম্বন্ধে আগ্রহের অভাব দেখা গেল।

॥ তৃতীয় পর্ব ॥

তৃতীয় পর্ব ১৯২৮ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। ১৯২৮ সালে গান্ধীজী রাজনীতিতে ফিরে এলেন। ১৯২৮ সালেই সুভাষচন্দ্র গান্ধী-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে স্পষ্টভাবে দাঁড়ালেন। ১৯২৮ সালের কংগ্রেস এবং সেই কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকার কথা পৃথক অধ্যায়ে পূর্বে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। এখানে গান্ধী-নেতৃত্বের বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের মোট বক্তব্যই উপস্থাপিত হবে।

দেশবন্ধু যখন মারা যান (১৯২৫ জুন) সুভাষচন্দ্র ব্রহ্মদেশে অন্তরীণ। ভগ্নস্বাস্থ্য সুভাষচন্দ্র মুক্তি পেলেন ১৯২৭ সালের ১৬ই মে। দেশবন্ধুর মৃত্যু এবং সুভাষচন্দ্রের মুক্তির মধ্যবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র স্বরাজ্য দলের রূপান্তর, তাদের বিপ্লবী মনোভাব পরিহার ইত্যাদিকে লক্ষ্য করেছেন। দেশবন্ধুর দেহান্তের ফলে স্বরাজ্য দলের মধ্যে অন্তর্বিরোধের সৃষ্টিও হয়েছিল। ঐ সময়ের মধ্যে গান্ধীজী খাদি আন্দোলনের বিপুল প্রসার ঘটিয়েছেন এবং তাঁর নিজস্ব সংগঠন নিখিল ভারত কাটুনি সংঘ ছড়িয়ে পড়েছে দেশের সর্বত্র। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে যে-নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই অন্ধকারের মধ্যে এই খাদি আন্দোলনকে সুভাষচন্দ্র রূপালি রেখা বলেছেন।

গান্ধীজীর ব্যক্তিগত আন্দোলন যেমন আশার আলোকরেখা আনল, তেমনি দেশের যুবকদলের মধ্যেও নতুন চেতনার সঞ্চারও একই কাজ করল। সুভাষচন্দ্র মুক্তি পাবার পরে, এবং জওহরলালের দেশে প্রত্যাবর্তনের পরে (১৯২৭), দেশে একদিকে যুব-আন্দোলন জোরালো হয়ে উঠল, অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের ধারণা প্রচারিত হতে লাগল। এর সঙ্গে যুক্ত হল শ্রমিক-অসন্তোষ।

এই কালে 'সম্পূর্ণ শ্বেত' সাইমন কমিশনের আগমনও দেশের তাপমাত্রাকে বাড়িয়ে দিল প্রচণ্ডভাবে। ১৯২১-এর
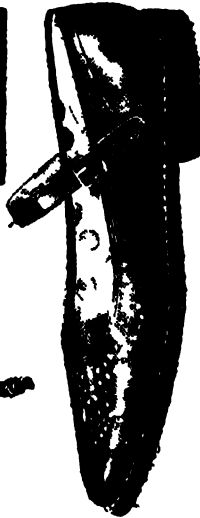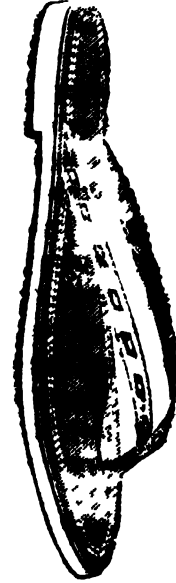
দেশের দিকে প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমনকে কেন্দ্র করে অসহযোগ আন্দোলন যেমন নতুন শক্তি অর্জন করেছিল, সাইমন কমিশনও সেই কাজই করল।* হরতাল, [illegible] সংঘর্ষ। দেশ সমুদ্র [illegible] উত্তপ্ত, প্রস্তুত।

[illegible] ও দুঃখে সুভাষচন্দ্র বলেছেন, তাহলে হবে কি, নেতারা অপ্রস্তুত। ১৯২৮ সালের মে মাসে সুভাষচন্দ্র গেলেন সবরমতীতে মহাত্মা গান্ধীর কাছে। বললেন, দেশের জনসাধারণের মধ্যে এখন বিপুল উদ্দীপনা, আপনি অবসর ছেড়ে চলে আসুন, নতুন আন্দোলনে দেশকে নেতৃত্ব দিন। মহাত্মা উত্তর দিলেন, 'তিনি কোন আলো দেখছেন না।' অথচ তাঁরই চোখের সামনে, সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য, বরদৌলি কর বন্ধ আন্দোলন করে দেখিয়ে দিচ্ছে দেশ প্রস্তুত। ১৯২৮-২৯ সালে এমন শ্রমিক অসন্তোষ ছিল যে, আন্দোলন আরম্ভ করলে তার সুযোগ নেওয়া চলত। বাংলা ও পাঞ্জাবের উন্মাদনাও এই সময় চরমে উঠেছিল। এইসব উন্মাদনা নেমে যায় ১৯৩০ সালে। দুঃখের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ১৯৩০ সালে আন্দোলন আরম্ভ করে মহাত্মা তাঁর পত্র ইয়ং ইন্ডিয়ায় লিখলেন, তিনি দু'বছর আগেও আন্দোলন আরম্ভ করতে পারতেন।

দোষ কেবল গান্ধীজীর নয়, স্বরাজীদেরও। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে তাঁরা গতিশীলতা হারিয়ে ফেলেছিলেন।

গান্ধীজীকে প্রভাবিত করতে না পারলেও সুভাষচন্দ্ররা থামেন নি। পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য তাঁরা সারা দেশে আন্দোলন চালিয়েছেন; ১৯২৭ সালের মাদ্রাজ কংগ্রেসে যে-আধিপত্য তাঁরা বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তাকে বিস্তৃততর করতে সচেষ্ট ছিলেন সর্বসময়। মাদ্রাজ কংগ্রেসে গৃহীত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল, কলকাতা কংগ্রেসে সেই প্রস্তাব ওঠানো হল আবার। গান্ধীজীর ব্যক্তিগত প্রভাবে সে প্রস্তাব ভোটাভুটির পরে বাতিল হল। গান্ধীভক্তেরা প্রচার করেছিলেন, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গান্ধীজীর প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব, এ জিনিস পাশ হলে আবার তিনি অবসর নেবেন। পরাভূত বামপন্থীরা ক্ষোভে ক্রোধে দেখতে লাগলেন—দেশের মনে আগুন কিন্তু নেতার চোখে আলো নেই। গান্ধীজী বলেছিলেন, ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস না দেওয়া হলে তিনি 'ইন্ডিপেন্ডেন্সওয়ালা' হয়ে পড়বেন। সুভাষচন্দ্র তিক্তভাবে ভাবলেন, কী অপূর্ব পাগলামি, কিংবা কী অপূর্ব মূঢ়তা! মহাশক্তিশালী বৃটিশ সরকার বিনা লড়াইয়ে স্বাধীনতা দিয়ে দেবে!!

এই সমস্ত সমালোচনার একটা করুণ দিক আছে। গান্ধী ছাড়া আন্দোলন আরম্ভ করার নেতা নেই দেশে। গান্ধীর বিকল্প নেতৃত্ব কোথায়? নেতৃত্ব করতে কিংবা গান্ধীকে প্রভাবিত করতে যিনি পারতেন, সেই দেশবন্ধুর দেহান্ত হয়েছে। সুতরাং দুটি পথ খোলা আছে, এক, গান্ধীজীর পায়ে মাথা-খোঁড়া, আন্দোলন শুরু করার জন্য। দুই, গান্ধীজী যাতে আন্দোলন আরম্ভ করতে বাধ্য হন, এমন অবস্থার সৃষ্টি করা। এই উভয় চেষ্টাই সুভাষচন্দ্রাদি করেছিলেন। তার ফল কি হল, আমরা পরে দেখব।

কিন্তু গান্ধী-নেতৃত্বের শক্তি কোথায়? তাঁর বিরুদ্ধে কি কোনো উপযুক্ত বিদ্রোহ হয় নি? সুভাষচন্দ্রের উত্তর, বিদ্রোহ হয়েছিল, যুক্তিবাদের সেই বিদ্রোহের নাম স্বরাজ্য বিদ্রোহ। দেশবন্ধু যখন সে বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন তখন গান্ধীজীকে আত্মসমর্পণে ও অবসর গ্রহণে তিনি বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে স্বরাজীরা দুর্বল হয়ে পড়ল এবং ১৯২৯ সালে গান্ধীজী রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করলে স্বরাজী নেতা মোতিলাল তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করলেন।

স্বরাজ্য দলের যে বিদ্রোহকে সুভাষচন্দ্র যুক্তিবাদের বিদ্রোহ বলেছেন, তার বিপরীত প্রান্তে আছে ভক্তিবাদের আত্মসমর্পণ। গান্ধীকেন্দ্রিক সেই ভক্তিবাদের রূপ সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিতে এই প্রকার—

> "হিন্দু সমাজে য়ুরোপের মত সুপ্রতিষ্ঠিত চার্চ জাতীয় ধর্মসংস্থা না থাকলেও অধিকাংশ মানুষ 'অবতার', পুরোহিত বা গুরুর দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয়। ভারতে সর্বসময় আধ্যাত্মিক মানুষ সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁদের বলা হয়, সাধু, মহাত্মা, ঋষি। ভারতের অবিসংবাদিত রাজনৈতিক নেতা হবার পূর্বে গান্ধীজী নানা কারণে জনসাধারণের দ্বারা মহাত্মা বলে গৃহীত হয়েছিলেন। ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুর কংগ্রেসে মিঃ এম এ জিন্না, যিনি তখনো জাতীয়তাবাদী নেতা ছিলেন, গান্ধীজীকে মিঃ গান্ধী বলে যখন সম্বোধন করেছিলেন, তখন তাকে হাজার হাজার লোক চীৎকার করে বসিয়ে দিয়েছিল—মিঃ গান্ধী বলা চলবে না, বলতে হবে মহাত্মা গান্ধী। গান্ধীজীর কৃচ্ছ্রসাধন, তাঁর সরল জীবন, নিরামিষ ভোজন, সত্যের প্রতিজ্ঞা এবং নির্ভীকতা—এ সব কিছু তাঁকে একটা আধ্যাত্মের জ্যোতির্বলয়ের মধ্যে স্থাপন করেছিল। তাঁর কটি মাত্র বস্ত্র খৃষ্টকে মনে পড়ায়, বুদ্ধকে মনে পড়ায় বক্তৃতার সময়ে তাঁর বসবার ভঙ্গী। এই সকলই তাঁর দেশবাসীর মনোযোগ ও আনুগত্য আকর্ষণের পক্ষে পরম সম্পদস্বরূপ। আমরা ইতিপূর্বে দেখে এসেছি, বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ তাঁর বিরোধী ছিল; কিন্তু তাঁদের বিরোধিতা গান্ধীজীর পক্ষে জনসাধারণের সোৎসাহ সমর্থন দেখে নম্র হয়ে এসেছিল। জ্ঞাতে অথবা অজ্ঞাতে মহাত্মা গণমনকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পেরেছেন, যেমন পেরেছেন রাশিয়ার লেনিন, ইতালীর মুসোলিনী বা জার্মানীর হিটলার। কিন্তু এই রকম করবার কালে মহাত্মা এমন একটা অস্ত্র ব্যবহার করছিলেন, যা নিশ্চিতভাবে তাঁর কাছে ফিরে আসবে। তিনি দেশবাসীর চরিত্রের অনেকগুলি দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছিলেন, যে সব দুর্বলতাগুলি ভারতের পতনের জন্য বহুলাংশে দায়ী। ঐহিক এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে ভারতের পতনের [illegible] কারণটা কি? তা হল, অদৃষ্ট এবং অতিপ্রাকৃতে অসাধারণ বিশ্বাস, বৈজ্ঞানিক উন্নতি সম্বন্ধে উদাসীনতা, বৈজ্ঞানিক যুদ্ধব্যবস্থা সম্বন্ধে পশ্চাৎপদ অবস্থা, পরবর্তী দর্শনসমূহের দ্বারা প্ররোচিত শান্তিময় আত্মতুষ্টি এবং অত্যন্ত উদ্ভট অবাস্তব স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে এমন অহিংসায় আসক্তি। ১৯২০ সালে কংগ্রেস যখন অসহযোগের রাজনৈতিক নীতি প্রচার করতে সুরু করল, তখন এক বিরাট সংখ্যক কংগ্রেসী,—যাঁরা মহাত্মাকে কেবল রাজনৈতিক নেতারূপে গ্রহণ করেন নি ধর্মীয় গুরু রূপেও বরণ করেছিলেন,—এই নূতন 'মেসায়ার' জীবনাদর্শ প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। তার ফলে বহুলোক মাছ-মাংস ত্যাগ করল, মহাত্মার মতই পোষাক ধরল, সকাল সন্ধ্যায় প্রার্থনা ইত্যাদি তাঁর দৈনন্দিন অভ্যাসগুলি আয়ত্ত করল এবং রাজনৈতিক স্বরাজের চেয়ে আধ্যাত্মিক স্বরাজ নিয়ে বেশী কথা বলতে আরম্ভ করে দিল। দেশের কোনো কোনো অংশে মহাত্মা বাস্তবিক অবতার রূপে পূজিত হলেন। এমনই পাগলামিতে দেশকে পেয়ে বসেছিল যে, ১৯২০

*—পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

সালের এপ্রিল মাসে বাংলার মত রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন প্রদেশেও যশোহর প্রাদেশিক সম্মেলনে উত্থাপিত একটি প্রস্তাব,—যার মর্ম কংগ্রেসের লক্ষ্য আধ্যাত্মিক স্বরাজ নয়, রাজনৈতিক স্বরাজ,—উত্তপ্ত বিতর্কের পর পরাভূত হয়। ১৯২২ সালে বর্তমান লেখক যখন জেলে আছেন, তখন জেলের ভারতীয় ওয়ার্ডাররা বিশ্বাসই করতে চায় নি, মহাত্মা বৃটিশ সরকারের দ্বারা বন্দী হয়েছেন। তারা পরম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলত, গান্ধীজী যেহেতু মহাত্মা, তিনি সহজেই পাখীর রূপ ধরে যে কোন মুহূর্তে ইচ্ছামত জেল থেকে বেরিয়ে পড়তে পারেন। ব্যাপারটা আরও মন্দ হয়ে উঠল যখন রাজনৈতিক বিষয়গুলি আর যুক্তির শীতল আলোকে বিচার্য রইল না, তা আবেগাত্মকভাবে সেগুলির সঙ্গে ধর্মীয় ব্যাপার মিশিয়ে ফেলা হতে লাগল। মহাত্মা ও তাঁর অনুগামীরা বৃটিশ দ্রব্যের বয়কটের দিকে আর মন দেন না, কারণ তাতে বৃটিশের প্রতি ঘৃণা জাগবে। সুবিখ্যাত কবি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর মত মনস্বিনীও ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে গয়া কংগ্রেসে ভাষণ দান কালে স্বরাজ্যনীতিকে নিন্দা করেছিলেন, কারণ, কাউন্সিল হল 'মায়া রাজ্য'. সেখানে গেলে কংগ্রেসীরা আমলাতন্ত্রের কথার ফাঁদে পড়বেন। সবচেয়ে জঘন্য হল, মহাত্মার গোঁড়া ভক্তবৃন্দের মধ্যে তাঁর যে কোনো উক্তিকে বিনাবুদ্ধিতে বা বিচারে একেবারে বেদবাক্য বলে শিরোধার্য করবার ঝোঁক এসে গেল, এবং তাদের কাছে তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকা বেদস্বরূপ হয়ে উঠল।"

এইখানে রবীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হতেন, সুভাষচন্দ্রের বিশ্লেষিত চৈতন্য। রবীন্দ্রনাথ কি অসহযোগ আন্দোলনের পিছনে এই বিজ্ঞান-বিরোধী মনের ষড়যন্ত্র ছিল, তার চাক্ষুষ দর্শন করে দেন নি? এবং এই অসহযোগ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই আপত্তিকে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ আন্দোলনকারীরা সংগতই আপত্তির সঙ্গে কি লক্ষ্য করেন নি? আমরা ইতিপূর্বে 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' থেকে এই বিষয়ে যে প্রাসংগিক অংশ উদ্ধৃত করেছি, তাতে অসহযোগ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের ঈষৎ অপ্রসন্নতা দেখা গেছে। গান্ধী আন্দোলনের মধ্যে আধুনিকতার দিকে একটা পশ্চাৎপ্রদর্শন ছিল, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে তা প্রথম থেকেই ধরা পড়েছিল, এবং সুভাষচন্দ্রের চোখে তা যদি ধরা না পড়ে থাকে, তাহলে সেটা তাঁর অদূরদর্শিতা (দূরদর্শী হবার পক্ষে তিনি তখন যথেষ্ট তরুণ, বয়স মাত্র ২৫)।

রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ মনস্বিতার আরো প্রমাণ, তিনি গান্ধী ও গান্ধীবাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পেরেছিলেন। গান্ধী দেশে একজন, গান্ধীবাদী সংখ্যায় অগণ্য। শরৎচন্দ্রের বিদ্রূপ মনে পড়ে। গান্ধীজী তাঁর ফোকলা মুখে বাঁধানো দাঁত পরতে পারেন কিন্তু অধিকতর গান্ধীরা কাঁচা দাঁত উপড়ে ফেলেন।

রোমা রোলাঁ একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আদর্শে পৌঁছবার জন্য শৃঙ্খলার প্রয়োজন। শিষ্যের সেই শৃঙ্খলাকেই আদর্শ করে ফেলেন। অসহযোগের কালে 'গান্ধীজীর মতবাদকে তার অনাবিল উৎসমুখে যাঁরা পান করেছেন' তাঁদের অন্যতম শ্রী ডি বি কালেলকর 'স্বদেশীর বাণী' রচনা করেছিলেন। এই পুস্তকে শ্রীযুক্ত কালেলকর বলেছেন, স্বদেশীর বাণীর মধ্যে ত্রাণকর্তা ভগবান আবির্ভূত হয়েছেন। মানুষ যেমন তার জন্ম, পরিবার ও দেশ নির্বাচন করতে পারে না, তেমনি পারে না তার সংস্কৃতিকে নির্বাচন করতে। তাই স্বদেশীর অনুচরেরা সমগ্র পৃথিবীকে সংস্কৃত করবার বৃথা দায়িত্ব গ্রহণ করবে না। 'ভারতের কলকারখানাগুলিকে উন্নত করবার ইচ্ছা অপদার্থ উচ্চাশা মাত্র। নিজেদের দেশের মাল যেমন বাইরে রপ্তানি করা অপরাধ, তেমনি অপরাধ বাইরের মাল আমদানি করা। ইতিহাসে ভারতবর্ষের শোচনীয় হীনতার কারণ সে প্রাচীন মিশর ও রোমের সঙ্গে বাণিজ্য করার মত অপরাধ করেছিল।'*

এই 'অবিমিশ্র সংকীর্ণতম জাতীয়তা', এই 'মধ্যযুগীয় ভিক্ষুকদের মন্ত্র' যে গ্রন্থে লিখিত তার সংগে ভূমিকা-লেখক হিসাবে গান্ধীজী নিজের নাম যুক্ত করেছিলেন। এবং এই সমস্ত রচনা পড়েই রবীন্দ্রনাথ আর্তনাদ করে উঠেছিলেন।

সুভাষচন্দ্রের 'অদূরদর্শিতায়' যদি রবীন্দ্রনাথ কৌতুকবোধ করেন, তাহলে সুভাষচন্দ্র প্রণাম করে বলবেন, ঠিক কথা, কিন্তু আমি কর্মী। গান্ধী-আন্দোলনের বিজ্ঞান-বিরোধী দিক সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম না তা নয়, কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে আঘাত হানারও প্রয়োজন আছে। তাই ১৯২০ সালে নৈরাশ্যের মধ্যে গণজাগরণ যিনি এনেছেন, সেই গান্ধীর দানের ইতিবাচক দিকটিকেই ধরবার চেষ্টা করেছি আন্দোলন কালে, এবং একই সংগে যে নেতিবাচক দিক, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে দিয়েছি।

এবং সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করে বলতে পারেন, যত দিন গিয়েছে এদেশে বিজ্ঞানমুখী রাজনীতি-চিন্তা গান্ধীনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম-মুখী হয়ে উঠেছে অপর দিকে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ক্রমেই সমালোচনা ত্যাগ করে গান্ধীজীর পক্ষপাতী হয়েছেন। 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগলে'র রবীন্দ্র-প্রসংগের শেষের দিকে বাস্তবিক সেই অভিযোগই আছে।

সুভাষচন্দ্রের মনের এই পটভূমিকা মনে রাখলে ১৯২৮ সালের যুব-সম্মেলনে গান্ধী-অরবিন্দের নীতির ক্ষতিকর দিকের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণের কারণ বোঝা যাবে। 'গান্ধীজী গোরুর গাড়ীর যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন'—তাঁর সেই বিতর্কিত উক্তি, যার আলোচনা বিস্তারিতভাবে আমরা পূর্বে করে এসেছি।

[ক্রমশঃ]

---

* রোমা রোলাঁ-মহাত্মা গান্ধী—অনুঃ ঋষি দাস—৯৬—১০০।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

নিজেই ক্ষিতিনাথ আরম্ভ করে দিয়েছেন। তখন শ্মশান-বন্ধুরাও অগত্যা দড়ি খুলতে লাগল। খুলছে অতিশয় ধীরে, ক্ষিতিনাথের দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে। কোন রকম যদি ইঙ্গিত পাওয়া যায়, চোখ-টেপাটেপির পরে মকুব হয়ে যায় বাঁধনের দাঁত খেলা।

ঝুনু ক্ষিতিনাথ মড়ার পাশটিতে উবু হয়ে বসল। একটা লোক চিরকালের মতো চলে গেছে ক্ষিতিনাথ কী নিষ্ঠুর গো, হাসছে সে টিপে টিপে। বলে, কিসে মারা গেলেন — জল উদরি বুঝি?

আজ্ঞে?

পেট নিদারুণ রকম মোটা। এমনি এমনি হয় না, জল-উদরি রোগ—পেটের ভিতর জল জমে জমে ঢাকের মতন হয়ে দাঁড়ায়। পিটলে বাজে। পায়েও রস জমেছে, মোটাসোটা তাই এমন। জলের পিপে বয়ে এনেছেন কাঁহা-কাঁহা মুলুক থেকে, এতগুলো মরদ হাঁসফাঁস করছেন। জিরিয়ে নিন হাত-পা ছড়িয়ে।

ক্ষিতিনাথ রোগলক্ষণ বলে যাচ্ছেন, আর দেখি হাত ঢুকিয়ে দিয়েছেন মড়ার গায়ে জড়ানো কম্বলের তলায়। ধরেছেন বস্তা একটা, টানাটানি করে বাইরে এনে ফেললেন। চালে ভরতি, মুখ সেলাই-করা। হো-হো- করে হেসে উঠলেন: বঙ্গভূমির মতো স্বর্গধামেও চাল বাড়ন্ত বুঝি ভেবেছেন—মড়ার সঙ্গে চালও দিয়ে দিচ্ছেন?

নির্দেশ মতো সিপাহিরা দড়ির বাঁধন কেটে ফলের বোঝা সরিয়ে সম্পূর্ণ আলগা করে ফেলল। চালের থলি, ছোট মাঝারি বড় যেখানটা যেমন মানায়, মড়ার সর্ব অঙ্গে পরিপাটি করে সাজানো। রীতিমতো শিল্পকর্ম। সাজিয়ে পরম যত্নে কম্বলে জড়িয়ে শক্ত করে বেঁধেছে, থলি যাতে স্থানচ্যুত না হয়। এই কারণে মানুষটা স্থূলকায় ও জল-উদরি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, বস্তা-থলি সরিয়ে ফেলতে রোগমুক্ত হয়ে মড়া আবার রোগা-মানুষ হল।

শ্মশান-বন্ধুরা বিন্দুমাত্র লজ্জা পায় না। মাতব্বরটি এগিয়ে এসে হাত বাড়াল: পদধূলি দিন। হেরেছি। আমরা বেড়াই ডালে ডালে, আপনি ঘোরেন পাতায় পাতায়। রিটায়ার করার পর দল পাল্টে আমাদের দিকে আসবেন স্যার। দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ান—দেখতে হবে না মোটে। ওদিককার ঘাঁতঘোত সমস্ত জানা, তার উপরে এই রকম তাজ্জব মাথা একখানি! আপনাকে তখন এঁটে ওঠা কংসমামার বাপের ক্ষমতায় কুলোবে না।

তোয়াজে মন ভিজিয়ে তারপর সরাসরি প্রশ্ন: হাতে-নাতে ধরা পড়েছি, বলার কিছু নেই। তবে মাল অসামান্য, পুরো তিনটে মণও নয়—দু মণ তিরিশ সের। মিথ্যে বলছি নে, মেপে দেখতে পারেন। এতগুলো মানুষ আমরা এত হাঙ্গামা করে বেঁধে বয়ে এনেছি। তা ছাড়া মড়ি যিনি কাঁধে চেপে এলেন, গঙ্গায় দেবো বলে তাঁকেও প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে। মরে গিয়ে বোবা হয়েছেন বলে দাবি নাকচ করা যাবে না। এই সমস্ত বিবেচনা করে কি আদেশ হয় বলুন এইবারে।

ক্ষিতিনাথ উদারভাবে বললেন, দেখ, চুনোপুঁটি আমি ধরি নে—পাত্তেও নিই নে। রুই-কাতলার জন্যে জাল পাতা আছে, আপনা-আপনি তোমরা এসে খপ্পরে পড়লে। এসে ভালই হল—পরোপকার করে একটু পরকালের কাজ করুন। সিকি পয়সা লোকসান করব না তোমাদের —আজটা কেবল তোমাদের মনোমত বাজাবে না বেচে আমার মানুষকে শিক্ষা করা। যেমন যেমন ছিল, সাজিয়ে নিয়ে কাঁধে তোল। মড়া গঙ্গাও পাবে ঠিক—একটু ঘুর-পথে দেরি হবে হয়তো এক-আধ বেলায়।

হাত ঘুরিয়ে সিপাহিদের ইঙ্গিত করলেন, মুখে কিছু বলতে হয় না। তারা যে যার জায়গায় নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হল।

ক্ষিতিনাথ আদেশ করলেন, কাঁধে তোল মড়া। আমি আগে আগে যাচ্ছি।

বলো হরি, হরিবোল—

শঙ্কা নেই আর, খোদ কর্তাই সঙ্গে। অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিল—কাঁধে মড়া, তা যেন ধ্যান করতে করতে চলেছে। তারই শোধ তুলছে এবার: বলো হরি, হরি-বোল—

॥ উনিশ ॥

বাংলার ছেলে মরতে পিছপাও কখনো নয়। সেকালে মরেছে। এখন তো পটপট করে মরছে—মেরে ফেলছে হেঁসোদায়ের কোপে কচুগাছ-কলাগাছ মারার মতন। ভবিষ্যতেও মরবে—অল্পে-স্বল্পে হবে না, মরতে দিতে হবে অনেক—অনেক জনাকে।

সেকাল ধরে বলছি। কয়েকটি মৃত্যুর উপাখ্যান। ভোরবেলা কানাইলাল দত্তকে নিতে এসেছে। বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছেন তিনি। ডেকে তুলতে কিছু অপ্রতিভ হয়ে বললেন, সময় হয়ে গেছে বুঝি? গেঞ্জিটা গায়ে ঢুকিয়ে চোখে চশমা পরে তৈরি: চলুন। 'বন্দেমাতরম্' বলে নিজ হাতে ফাঁসির দড়ি গলায় দিলেন। গোপীনাথ সাহা প্রাতঃস্নান সেরে পট্টবস্ত্র পরে গীতা-পাঠ করতে করতে ফাঁসিমঞ্চে গিয়ে দাঁড়ালেন। সর্বশেষ কণ্ঠধ্বনি: Every drop of my blood will sow the seeds of freedom in every Indian Home—আমার প্রতিটি রক্ত-বিন্দু দেশের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ বপন করবে। ক্ষুদিরামেরও এমনি। ফাঁসির হুকুম শোনার পর থেকে ধাঁধাঁ করে ওজন বেড়ে গেল। এত বড় স্ফূর্তিতে ওজন না বেড়ে পারে! প্রদ্যোত আচার্য বললেন, ভয়ের কি আছে? মরণের মধ্যে আমি আনন্দের গান শুনতে পাচ্ছি!

দীনেশ আর বাদল পার্কসার্কাস-সেন্টারে। রাইটার্স বিল্ডিংস আক্রমণে যাবেন সেদিন—মেনু নিজেরা তৈরি করে দিয়েছেন : মাংস-ভাত, দই-মিষ্টি। চুক্তি : যতক্ষণ না 'আর দিও না', 'আর দিও না' বলছি, দিয়ে যেতে হবে। হাসি-তামাসা ফুর্তি-স্ফূর্তিতে ভরপেট খাওয়া হল, খাওয়ার পরে মগ্ন হয়ে বলাকা পড়ছেন : 'বন্দরে বন্ধনকাল হল শেষ।' সময় হল, বলাকা বন্ধ করে তখনই খাড়া—পরেটে বিভলভার ও সাইনাইড বিষ। আর দলপতি বিনয় বসু মেডিক্যাল সেন্টারে। আহার ও বিশ্রাম অন্তে যাত্রামুখে সেন্টারের বউদিকে প্রণাম করলেন। বউদি'র চোখে জল। বিনয় ভর্ৎসনা করলেন : ছিঃ বউদি, হাসতে হয় সৈনিক যখন বিদায় নেয়।

এমনিধারা কত মৃত্যু জানি। কাকে রেখে কার কথা বলব, ধাঁধা লেগে যায়। যাক সেকাল, একালে আসি। একাল সেকালকে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছে মৃত্যু বাবদে। গান্ধী-শিষ্যেরা মসনদে বসে তাজ্জব খেল দেখাচ্ছেন। গুলি, গুলি, গুলি—পাইকারি হারে গুলি চালাচ্ছে। সশস্ত্র চীনারা নেফা অঞ্চলে হামলা দিলে পলায়নের পাল্লাপাল্লি চলেছিল বটে, কিন্তু এবারের শত্রুর অস্ত্র নেই, তবে আর পরোয়া কিসের? ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি, এবং পাল্টা মিছিল। সরব মিছিল, মৌন মিছিল। হাজার হাজার নরনারী মিছিলের অংশীদার। মিছিল কলকাতায়, দুর্গাপুরে, শিলিগুড়ি সাঁওতালডিহি কোথায় বা নয়। অভিশপ্ত পুলিশ—বন্দুকধারিতে যাদের শান্তি বজায় রাখতে হয়। মৌন মিছিলের মৌন ধিক্কার পুলিশের উপর গভর্নমেন্টের উপর শাসনযন্ত্রের উপর।

সন্ধ্যার পর স্তিমিত চারিদিক—শ্মশানের শান্তি। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কাটা, বিদ্যুৎ-সরবরাহ বন্ধ। নগরী নিষ্প্রদীপ। যেন শত্রুপক্ষের আক্রমণে সমস্ত ছত্রখার হয়ে গেছে। এবং পরের দিনের আক্রমণের ব্যবস্থা চলছে অন্ধকারে গোপনে গোপনে।

বেরিয়ে আসছেন বিশেষত মহর্ষি অর কৃপা-আন্দোলন। উনিশ বছরের স্বাধীনতায় যত মানুষ হতাহত, ইংরেজের দু'শ বছরেও এত বোধহয় হয় নি। কালোবাজারি মুনাফাখোর সমাজশত্রুরা নয়—টাকা জমানো বাড়োর্ট লুঠক নরখাদকদের হত্যা করে না। হত্যা করছে যারা চাল চায় ন্যায্য দরে জীবন-ধারণের জিনিসপত্র চায়, যারা বাঁচতে চায়। ভিন্ন রাজ্য থেকে কর্তারা চাল চেয়েছিলেন, অবশেষে পুলিশ চাইলেন। পুলিশ দিয়েছে, চাল তারা দিল না। নাথুরাম গডসে গান্ধীজীর বুকে গুলি মেরে কী-ই বা করল, তিলে তিলে তাঁকে শেষ করে দিল শিষ্য-নামধারী এই ভণ্ডের দল।

খাদ্য দাও—রাজ্যে রাজ্যে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘুরেছে। সবাই বিমুখ। ক্ষুধার্ত মানুষ পেটের জ্বালায় হন্যে হয়ে উঠেছে, কখন কি কাণ্ড ঘটে বলা যায় না। খাদ্য না দিলে, পুলিশ দাও তা-হলে। মিলিটারি পুলিশ। আন্দোলনের যা বহর পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ যথেষ্ট নয় তাদের পক্ষে। এবং নির্ভরযোগ্যও নয়। প্রতিবেশী উড়িষ্যা উদ্বৃত্ত রাজ্য হয়েও চাল দেয় নি, তবে পুলিশ দিল। নয় শ' পুলিশের এক এক কোম্পানী—এমনি ছ'টা কোম্পানী পাঠাল। তবে খরচ-খরচা যাবতীয় তোমাদের, অতিরিক্ত এই পুলিশ-মানুষদের খাওয়াবেও তোমরা। উপায় কি—বাঙালী পুলিশগুলোকে বিশ্বাস নেই, শুষ্কমুখ ক্ষুধাতুর জাতভাইদের ঠ্যাঙাতে নারাজ হয় যদি? বাইরে থেকে কিছু এনে মিশাল করে দেওয়া নিরাপদ। ইংরেজরা ঠিক এই রকম করত। নেটিভ পুলিশ বিশ্বাস করত না, নিজেদের স্বজাত গোরা সার্জেন্ট মিশাল করে দিত তাদের সঙ্গে। ইংরেজের কায়দা-কানুনগুলো হুবহু নিয়ে নিয়েছি আমরা।

গা-ঘরে চক্কোর দিয়ে আসি চলুন।

দু'দিন কেটে গেছে। মৃত্যুতাণ্ডব আপাতত মুলতুবি, কিন্তু বাতাস ভারী এখনো। চাপা কান্না শুনি পাড়ার মধ্যে। পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, আর ক্ষোভের সঙ্গে আতঙ্ক। একটা সন্ত্রাসের ভাব। শুধু মানুষ মেরেই তা নয়—পুলিশের খুশি মতন দিনাতে চড়া, দরপাশে লেপাবোয়া মারপিট। জোয়ান-মরদ কেউ বাড়ি শোয় না রাত্রে—আত্মগোপন ও নিশিত্রাণের ক্লেশ কালি মেড়ে দিয়েছে মুখের উপর। দুয়োরাই সাঁঠি ঠুক ঠুক করে সারা রাত পাড়া পাহারা দেয়।

পুলিশের কর্মকাণ্ডের বিস্তর স্মারক—ঘরে ঘরে কিছু নমুনা দেখছি। বাড়ির দরজা-জানলায় আস্ত কবাট বড় একটা নেই। মানুষের দেহেও অস্ত্র-চিহ্ন। বারো বছরের মেয়ে মঞ্জু ঘোষের চোখের নিচে সন্তর্পড় কাটা—আরেকটু জন্য চোখ বেঁচে গেছে। বাঁ-হাতি সরু বাক্স ধরে আছিল মিত্রাক্ষ কৃষ্ণ। আর্তনাদ উঠেছে—ও বিভারাণী মাথা কুটছেন দেয়ালে : ওরা আমায় কেন মেরে ফেলল না বাবা?

কী করে মারল আপনার নারায়ণকে?

রাস্তায় ব্যারিকেড, পুলিশ সরিয়ে ফেলেছিল। দু-চারটে ইটপাটকেল পড়েছে। দল চড়ে গেল অমনি। [illegible] পুলিশ। আর বেধড়ক গুলি।

বাড়ির একমাত্র রোজগেরে ছেলে নারায়ণ। ছুটে এসে ঘরের মধ্যে সে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করল। কাটল দুটি আজকের কাড়া—বলছিল নারায়ণ। বলতে না বলতে ফট-ফট করে বাইরে একঝাঁক গুলি। দরমা-ঘেরা ঘর—বেড়া ভেদ করে পয়লা গুলি টিনের চালে গিয়ে লাগল। পরের গুলি নারায়ণের উরুতে। মাগো—বলে মুখ থুবড়ে ঘরের মেঝেয় পড়ে গেল।

বিভারাণী বলছেন, আর ওঠে নি আমার নারাণ। শেষবার সেই তার 'মা' বলে ডাকা। কাপড়ের কলের ক্যানটিনে কাজ করত, বিড়ি টানত অবসর সময়ে। মা আর ছোট ছোট ভাইবোন কতকগুলো। দেশ ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে। একলা সে-ই রোজগার করে খাওয়াত।

পাশের ঘরের লক্ষ্মীমণি হি-হি করে হাসে। টেনে নিয়ে বিছানায় কাপড়-চোপড়ে পোড়া-দাগ দেখাল। গুলি এ-ঘরের বেড়াও ভেদ করেছিল, শুধুমাত্র কাপড়-বিছানা পুড়িয়েই বিদায় হয়েছে। কী করে প্রাণ বাঁচিয়েছিল, কৌশলটা দেখাল হাসতে হাসতে। সদর রাস্তা থেকে দুপদাপ করে বুট বাজিয়ে পুলিশ গলিতে এলো, সঙ্গে সঙ্গে এরাও খাটের তলায়। হি-হি-হি—গুটিসুটি হয়ে বোধকরি এক-হাত মাত্র জায়গার মধ্যে গোল হয়ে ছিল।

লাবণ্যপ্রভা মুখে আঁচল দিয়ে ফোঁপাচ্ছেন। কোল-মোছা ছেলে সুধীর ইস্কুলে পড়ে। ছবি আঁকার শখ। সেই সকালে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর ছবি আঁকছিল। লাবণ্য ডাকাডাকি করছেন : ঢের বেলা হল। চান করে খেতে বোস। খেয়েদেয়ে তারপরে শাস্ত্রীর ছবি হবে। বকাবকিতে সুধীর চান করে এলো। ভাত দিয়েছেন মা, খেতে বসতে যাবে, এমনি সময় রাস্তায় কলরব। ছোট ছেলে—কৌতূহলে গিয়েছে বড় রাস্তায়। পুলিশে একটা দল তাড়া করল, ভয় পেয়ে সুধীরও বাড়ি ছুটেছে। গুলি—চলে পড়ল রাস্তার উপর। রক্তের স্রোত। আর খেতে বসবে না ছেলে। শাস্ত্রীজীর ছবি আর শেষ হল না।

মড়া সেই থেকে রাস্তায় পড়ে পুলিশ-পাহারায়। ছাড়বে না মড়া হাসপাতালের লাসঘরে নিয়ে যাবে। পাড়ার একজনে ফটো তোলে, তার কাছে মা কেঁদে গিয়ে পড়লেন : সুধীরের একটা ছবি তুলে দাও।

না, ছবি তুলতেও দেবে না। যে পুলিশ হত্যা করেছে, তাদের কাছে মা সজল চোখে আকুলি-বিকুলি করছেন : হুকুমটা দিয়ে দাও, সুধীর আমার ছবি হয়ে দেয়ালের গায়ে থাকবে।

দিল না। এই সেদিন ছিল—আজ সুধীর কোথাও নেই দুনিয়ার ভিতর।

সন্তোষ দে মৌলিক কিন্তু ভাগ্যবান। ছবি উঠেছে আজকের কাগজে। সে কাগজ লাখ লাখ ছাপা হয়—সন্তোষের অতএব লক্ষ ছবি। সেদিন সকালে এই কাগজ পড়েই দেশের খবরাখবর নিচ্ছিলেন

সন্তোষের গুলির আওয়াজ শুনলেন বাইরে। রাস্তায় মেয়ে, এটা-ওটা কিনবার জন্য মুদিখানায় পাঠিয়েছেন। আরে, গোলমাল দেখে মুদিখানায় তো ঝাঁপ ফেলে দিয়েছে। ও খুকি, কোথায় গেলি রে? ব্যস্ত হয়ে মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। দুম করে এক গুলি। রাস্তার উপরেই সন্তোষ মুখ থুবড়ে পড়লেন। এই যে আমি, ও বাবা, এই তো আমি এসেছি—। ইতিমধ্যে মেয়ে বাড়ি চলে গিয়েছিল, ছুটতে ছুটতে সেইখানে এলো। একা সে নয়, ভাইবোনে পাঁচটি, সবাই এসেছে। বাবা, বাবা—বলে বুক ছেড়ে কাঁদছে। ভাগ্যবান পুরুষ সন্তোষ—আশি বছরের মা-জননী এখনো জীবিত। আমরা যখন গেলাম, বুড়ি-মা আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে খবরের কাগজের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। চারিদিক ঘিরে আছে—কালোপাড়-ধুতি পরনে সন্তোষের সদ্য-বিধবা স্ত্রী এবং অপোগণ্ড পাঁচটি ছেলে-মেয়ে। পরশুও যে সন্তোষ ছিলেন, মেয়ে। পরশুও যে সন্তোষ ছিলেন, আজকের কাগজে সকলে মিলে সেই সন্তোষের ছবি দেখছে।

পাঁচ-বছরে ইব্রাহিম জানলায় বসে মুড়ির বাটি থেকে মুড়ি খাচ্ছিল, পঞ্চাশ বছরে দীনেশ বর্ধন পুকুরে স্নান করে ভিজে লুঙি মেলে দিচ্ছিলেন ঘাসের উপর। পর পর দুই গুলিতে ছিটকে পড়লেন উভয়ে। কতদিকে কত এমনি মরছে, সীমা-সংখ্যা নেই। সব জিনিস আগুন, একমাত্র সুলভ জিনিস প্রাণ। খুশি মতন তাই নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে। কিন্তু মরণ সামনের ভবিষ্যতেও—সেই যে গানের কলি 'এখনো অনেক প্রাণ, চাই যে বলিদান'। সে মৃত্যু কী চেহারা নেবে, কে বলবে? ঈশ্বর আছেন কিনা জানি নে, তাঁরই নামে তবু প্রার্থনা জানিয়ে রাখি, বাংলা দেশকে রক্ষা করুন তিনি।

ঐতিহাসিক নীলকণ্ঠ বর্মা বই থেকে মুখ তুললেন। সকলে উৎকর্ণ। বলছেন, প্যারির উপকণ্ঠে বাস্তিলের বিরাট স্মৃতিস্তম্ভে অগণিত নাম রয়েছে—দুর্গ-ধ্বংসে যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন। আমার চোখে পড়ে নি, কিন্তু শুনতে পাই ভারতীয় একটি নামও তাঁদের মধ্যে। মস্কোর রেড স্কোয়ারের পাশে ক্রেমলিনের গা ঘেঁষে পাইকারি কবর। বিপ্লবের কালে এক নিশিরাত্রে প্রকাণ্ড দুই গর্ত খুঁড়ল। শহিদদের দেহগুলো শহরময় ছড়িয়ে ছিল, এনে এনে গাদা করল সেখানে। গর্তের তলায় তারপর ইটের গাঁথা সাজানোর জন উপর-নিচে ও পাশাপাশি মড়াদের সাজিয়ে মাটি চাপা দিল। কবরের উপর পরিপাটি পুষ্পোদ্যান এখন। চীনেও এমনি সব আছে। একটা দেখেছিলাম ক্যান্টনে—বাহাত্তর শহিদের সমাধি। জায়গাটার নাম বাংলায় তর্জমা করে দাঁড়াবে, 'হলদে ফুলের পাহাড়'। মর্মরসৌধের চারিদিকে লক্ষকোটি তারার মতো হলদে হলদে ফুল ফুটে রয়েছে।

ঈশ্বর যদি থাকেন—কামনা জানাচ্ছি, ভারতকে বাঁচান যেন তিনি।

[ক্রমশঃ]

হনন

দিলীপ রায়চৌধুরী
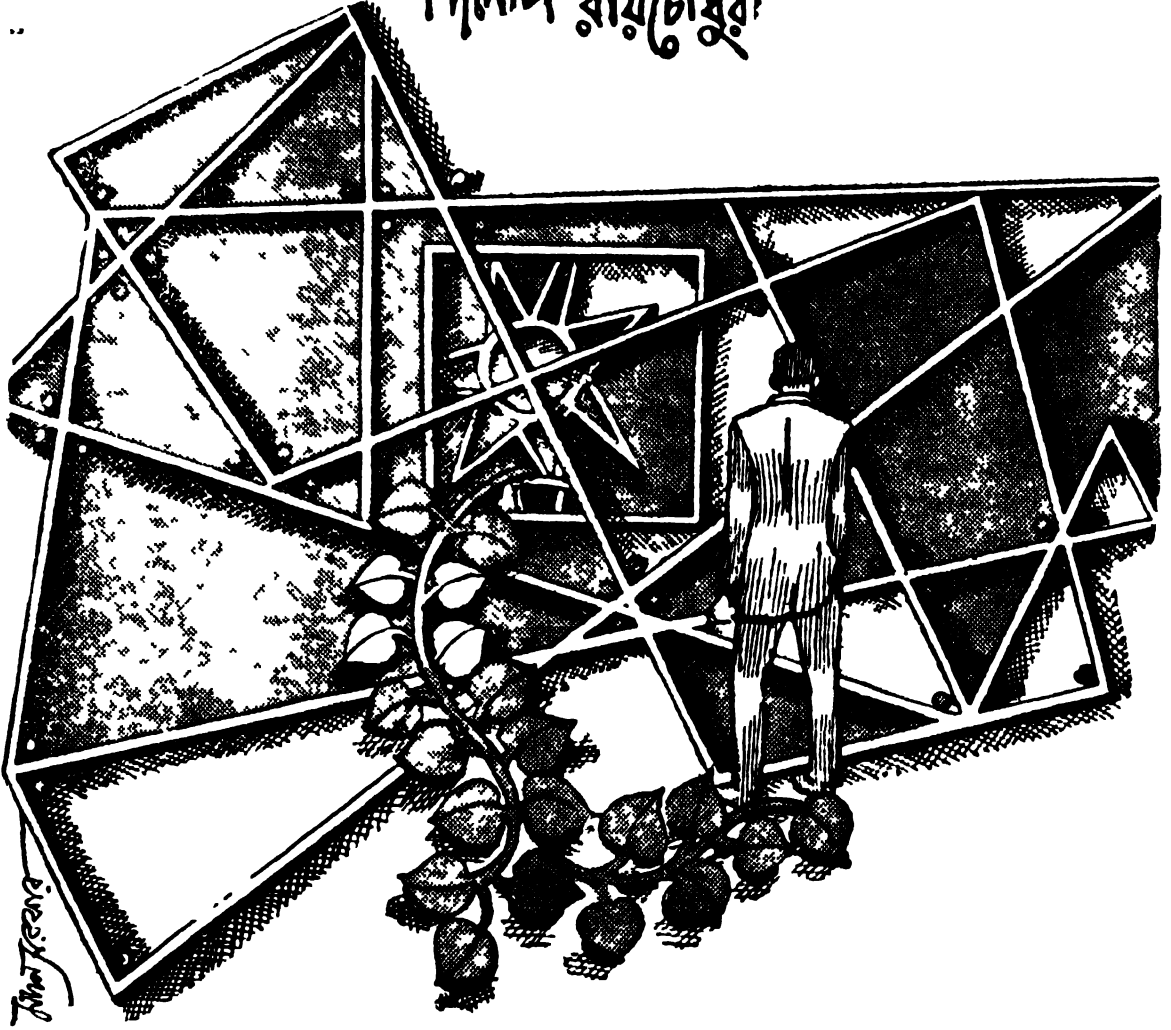
ডক্টর চিরঞ্জীব সিনহা নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিলেন। সকালের কাঁচা রোদ ঘরের জানালা দিয়ে মানি-প্ল্যাণ্টের লতাগুলোর উপর পড়েছে। বাতাসে হাল্কা শীতের আমেজ। দূরে রেডিওতে কি যেন এক বিচিত্র ভাষায় একটানা কি সব বলে চলেছে। দেওয়ালে চলমান আণবিক ঘড়ি থেকেই বোঝা যায় সময় দাঁড়িয়ে নেই।

ডক্টর সিনহা ভাবছিলেন : অন্তত আজ কি আদেশটা সেক্রেটারিয়েট থেকে বার করা যাবে। আজ এক মাস হলো রোজ সকালে উঠেই এই একই কথা ভাবেন। তারপর বেলা হলে হাইকোর্টের ট্রেন চড়ে সেক্রেটারিয়েটের সামনে যান। সেখানে গিয়ে লাইনে দাঁড়াতে হয়। দীর্ঘ অজগরের মতো সেই লাইন অত্যন্ত ধীর-মন্থর গতিতে এগোয়। রোদ বাড়ে—অজগর দীর্ঘতর হয়। ক্রমে বিকেলের ম্লান ছায়া ফেলে সূর্য যখন নদীর ওপারে ডুবে যায় সেক্রেটারিয়েটের দরজা দিনের মত বন্ধ হয়ে যায়। অপেক্ষমাণ মানুষের সারি বিষণ্ণভাবে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় আরেক-দিনের মত। ডক্টর সিনহা নিরাশভাবে ফেরবার ট্রেন ধরেন। ভিড়ে ভর্তি ট্রেনের জনস্রোতে মিশে যান।

অভ্যাসবশে আজও উনি ডেস্ক ক্যালেণ্ডারটার দিকে তাকালেন—৫ই প্লুটোযানদের পৃথিবী অধিকারের দশম বিজয় বার্ষিকী উৎসব প্রতিপালিত হবে। তার আগেই আদেশটা পেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দিবাস্বপ্ন দেখে লাভ কি—ভাবলেন কয়েক মুহূর্ত। তার চেয়ে দিনের জন্য প্রস্তুত হয়ে নেওয়াই ভাল। সবই চিরাচরিতভাবে চলছে। ছোকরা চাকরটা কাগজ দিয়ে গেল। খবর বিশেষ কিছুই নেই—ইণ্টারপ্ল্যানেটারী ন্যাশনাল কমিটির বৈঠক বসছে নিউ ইয়র্কে। লণ্ডনের প্লুটোয়ান মন্ত্রী সার্কনান ভারত সফরে আসছেন। এই সব মামুলি খবর ক্লান্তি আনে। সকাল থেকেই মন্থর করে দেয়।

ডক্টর সিনহা দাড়ি কামিয়ে স্নান সেরে পোষাক পরে নিলেন। চিরকালের অভ্যাস অনুযায়ী মেরুন টাই পরলেন। কোর্টের পকেটে ঢোকালেন সাদা রুমাল; বাটন হোলে একটা লাল কার্নেশান। প্রাতরাশের টেবিলে কেবল ব্রাউন রুটি, ডিম নেই। আজ আট মাস হোলো দরখাস্ত করেছেন। ডিমের স্বাদ ভুলে গেছেন কিন্তু কেবল মনে করে রাখতে হয়েছে একটা নম্বর ৪০—১০২—ডিমের দরখাস্তের নম্বর।

ভাবতে পারেন না চিরঞ্জীব সিনহা স্যুটগুলো ছিঁড়ে গেলে কি করতেন উনি! দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয় ওঁর—সেক্রেটারিয়েটের পথে জরাজীর্ণ বেশে পোষাকের দরখাস্ত হাতে।

দেওয়ালের ঘড়িতে টং করে সটা

[illegible]জলো। পঁচিশ বছরের পুরনো অভ্যাস অনুযায়ী মনে হয় ল্যাবরেটরীতে যাওয়ার সময় হোলো। কিন্তু সে কথা ভুলতে হয়েছে। ল্যাবরেটরীর দরজা ওঁর কাছে গত বছর ১২ই ফেব্রুয়ারী থেকে রুদ্ধ। প্রথম প্রথম বড়ো কষ্ট হতো। কতবার ভেবেছেন চুপি চুপি সন্ধ্যার পর গিয়ে গোপনে ঢুকে রাত্তিরে কাজ চালিয়ে যাবেন। কিন্তু প্রুটোয়ানদের গামা-রে এ্যালার্ম-ব্যূহ ভেদ করে ল্যাবরেটরীতে একটা মাছি গলবারও উপায় নেই। ক্রমে পরমাণুবিজ্ঞানের পরীক্ষামূলক কাজ ভুলতে হোলো। বাড়িতে বসে গোপনে অঙ্কের কাজ করে যাচ্ছিলেন। গত নভেম্বরে তাও বন্ধ হয়েছে। ওরা লাইব্রেরীতে যাওয়ার অধিকার গত আগস্ট মাসেই কেড়ে নিয়েছিল। তারপরও কোন রকমে স্মরণশক্তির উপর ভিত্তি করে অনেক কষ্টে চলছিল।

কিন্তু নভেম্বরের এক সন্ধ্যায় প্রুটোযান সিক্রেট পুলিশ বাড়িতে হানা দিল। এখনও ভাবলে চোখ জলে ভরে আসে। ওঁর অতীদিনের সঞ্চিত লাইব্রেরীর একটা বই কি জার্নাল আস্ত রাখলো না। গোপনে রাখা সমস্ত রিসার্চের কাগজ ছিঁড়ে ছড়িয়ে তছনছ করে দিয়ে গেল। এর চেয়ে দৈহিক শাস্তি অনেক ভাল ছিল। চোখের সামনে জীবনের সমস্ত জ্ঞানের সঞ্চয় এভাবে ধ্বংস হতে দেখলে কারো পক্ষেই ঠিক থাকা সম্ভব নয়। ভাবলে আশ্চর্য লাগে ডক্টর সিনহার—কেন উনি পাগল হয়ে যান নি! মনের উপর কতটা নিয়ন্ত্রণ থাকলে, শৃঙ্খলাবোধ কতটা দৃঢ় হলে এমন শান্ত থাকা যায় তা আগে কেউ বলতে পারে না। এক হিসেবে অবশ্য ভালই হয়েছিল বলতে হবে। মনটা চিরকালের মত মোহমুক্ত হয়ে গেল।

সাড়ে নটা বেজে গেছে। বেরোতে হবে। সার্কুলার ট্রেনে মধ্য সপ্তাহের গাদাগাদি ভিড়। তার মধ্যে সেক্রেটারিয়েটে যাবার যাত্রীই বেশি। কারো মুখে কোনও কথা নেই। কচিৎ দু'-একজনের মধ্যে দু'-একটা মৃদু অস্ফুট সম্ভাষণ বিনিময় হয়।

হাতল ধরে ঝুলতে ঝুলতে ডক্টর সিনহা ভাবলেন হাতলটা ছেড়ে দেবেন। গাড়ি পূর্ণগতিতে চলেছে। চোখের পলকে গুঁড়িয়ে যেতেন। হারিয়ে যেতেন, কেউ জানবার আগে। কিন্তু পারলেন না, কিছুতেই পারলেন না। এরকম তো আগেও কতবার ভেবেছেন। কিন্তু ভাবতে গেলেই মনে পড়ে

আউটরাম ঘাট স্টেশন। কিছু যাত্রী নামলো। ডক্টর সিনহা ভেতরে ঢুকলেন। তাকালেন সহযাত্রীদের দিকে। ঐ তো অধ্যাপক কল্যাণশশী মুখোপাধ্যায়। ছ মাস আগে একটা খন্দরের পাঞ্জাবীর দখলস্বত্ত করেছিলেন। আজও মেলে নি। রোজই ঘুরছেন। বিবর্ণ মুখে হতাশার বোঝা বাড়িয়ে চলেছেন।

সেক্রেটারিয়েট এসে গেল। আজ একটু আগেই এসে পড়েছেন। ডক্টর সিনহা বন্ধ দরজার দিকে তাকালেন একবার। এখনও দপ্তর খোলে নি। বিরাট দরজার বিচিত্র কারুকার্য দেখতে দেখতে বারবার ভাবলেন : ঐ অদ্ভুত ডিজাইন যদি হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন তাহলেও হয়তো বা প্রুটোয়ানদের বুঝতে পারতেন! আজ দশ বছর হোলো ওরা এখানে এসেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত ওদের সম্পর্কে মানুষ খুব কমই জানে। অথচ পৃথিবীর বুকে ওরা কায়েমী হয়ে বসেছে। কোনদিনই ওরা যাবে না।

সাড়ে দশটা—দরজা খুললো। প্রুটোযান সামরিক পুলিশের উপস্থিতি সকলকে সন্ত্রস্ত করে তুললো।

'নিয়মমাফিক চলো!'—একটা কর্কশ চাপা আদেশ। এই নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণের যে শাস্তি কি তা এখানে সকলেরই

জানা আছে। এক ঋজু সবলরেখায় জনতা ধীরে ধীরে এগোতে লাগলো। কেউ কাউকে ধাক্কা দিলো না। কোনো গণ্ডগোল হলো না।

ডক্টর সিনহা লিফটের সামনে এলেন। দরজাটা আপনা-আপনি খুলে গেল। যন্ত্রচালিতের মত বোতাম টিপলেন—মাইনাস তিন। আগে লিফট উপরে যেত—প্রটোয়ানরা পৃথিবীতে আসার আগে! কিন্তু এখন মাটির তলায় অফিসের সংখ্যা বেড়ে গেছে। বড়ো বড়ো উঁচু বাড়ি প্রটোয়ানরা পছন্দ করে না। তাই অত সুন্দর চোদ্দতলা সেক্রেটারিয়েট বাড়িটা গুঁড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে মাটির তলায় অসংখ্য অফিস-ঘর গড়ে তোলা হয়েছে একেবারে নদীর সীমানা পর্যন্ত।

লিফট থামলো। ডক্টর সিনহা নেমে এগোতে লাগলেন। অফিস ঘরের সামনে এসে একবার পিছনে তাকালেন। তার পেছনে প্রায় জনা বারো লোক। আজ কতগুলো অর্ডার বেরোবে কেউ জানে না। কিন্ত উনি যে একেবারে সামনে থেকে সকলের ঈর্ষার পাত্র হয়েছেন সেটা পেছনের লোকদের দৃষ্টি দেখলে সহজেই বোঝা যায়।

অফিসের দরজা খোলা ছিল। কেউ কোথাও নেই। খালি দেওয়ালের গায়ে একটা কাউন্টার। চাপা গর্জনের মত একটা কণ্ঠস্বর জিজ্ঞেস করলে: 'নাম!' নাম বলতেই একটা ফর্ম বেরিয়ে এলো, সেই সঙ্গে আবার ক্রুদ্ধ আদেশ—নাম লিখো না! নম্বর লেখো।'

দীর্ঘ দশ বছরেও প্রটোয়ানরা পৃথিবীর ভাষা আয়ত্ত করে নি করতে চায় নি। পৃথিবীর মানুষকে ফর্ম ভর্তির জন্য প্রটোয়ান ভাষা শিখতে হয়েছে।

ফর্ম হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন ডক্টর সিনহা। তারপর নম্বর বসালেন ৬৫৩—৩৩৬। আবার কিছুক্ষণ ভাবলেন। মনে হয় ভুল হয় নি। ভুল হলে সমস্ত আশা নির্মূল হয়ে যাবে। ফর্মটা খুব সতর্কতার সঙ্গে ফিল-আপ করতে হবে। যদি কোনও কারণে গণ্ডগোল হয়ে যায় এবং কাটাকুটি হয় তবে আবার এক বছরের মত নিশ্চিন্ত। বছরে একটার বেশি ফর্ম দেওয়া প্রটোয়ানদের রীতি নয়।

তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে হবে। কারণ এগারোটার সময় চাকরীতে হাজরী দেওয়ার কথা। এগারোটা থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত কম্পিউটারের কার্ড পাঞ্চ করতে হবে। এই একটা কাজেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের লাগাতে প্রটোয়ানদের বিশেষ দুশ্চিন্তা হয় নি। প্রথমটা অসহ্য মনে হত। এর চেয়ে নৈষ্কর্মও অনেক ভাল ছিল। গত এক মাস হোলো সব চিন্তা ছেড়ে দিয়েছেন ডক্টর সিনহা। উদ্বেগ নেই, অশান্তি নেই। মনটা হাল্কা হয়ে গেছে। যন্ত্রচালিত মানুষের মত কাজ করে যান। মস্তিষ্কটা আর খাটান না শুধু শুধু।

তবু ভাবতে হয়। ফর্মটা ভরতে হবে—বয়স, পেশা, পূর্বতন পেশা—চকিতে মনটা ছটফট করে ওঠে। নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট—কি প্রয়োজন ছিল পরমাণু-বিজ্ঞানী হওয়ার? একেবারে সময়ের অপব্যয়।

গবেষণাগার নেই, বই নেই রিসার্চ পেপার নেই। কিছুই ত' অবশিষ্ট নেই। দীর্ঘ পঁচিশ বছরের অপচয়ের নিদর্শন ধুলোয় মিশে গেছে।

লম্বা ফর্মটা ভরা হয়ে গেল। দেওয়ালের ক্যাবিনেটে ঢুকিয়ে দিতে কর্কশ গলায় আদেশ এল:

'তেইশ নম্বর অফিসে যাও—দেরি নয়!' ডক্টর সিনহা দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এলেন। যখন প্রটোয়ান যন্ত্র 'সচল' হয়েছে তখন আর দেরি নয়। দেরি করে আর লাভ নেই। এবার সময় হয়েছে।

তেইশ নম্বর অফিস—আবার কতগুলো ফর্ম সেখানে ফিল-আপ করতে হোলো। কাগজে প্রটোয়ান ছাপ পড়লো। আরেকটা কর্কশ আওয়াজ নির্দেশ দিল:

'সতেরো নম্বর অফিসে যাও!

সতেরো নম্বরে ছাপমারা কাগজ কাউন্টারে ধরতেই নির্দেশ এল—'চিরঞ্জীব সিনহা নম্বর ৬৫৩—৩৩৬ তোমার আগেকার একটা দরখাস্ত আছে ৪৩—১০২ এই দরখাস্তটা বিবেচনা করার আগে আমরা জানতে চাই কোনটা তোমার কাছে বেশি জরুরী—এইটা না এর আগেরটা। শীগ্‌গির বলো!'

উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে লাগলেন ডক্টর সিনহা। ভুলে গেছেন এই মুহূর্তে কি ছিল ঐ ৪৩—১০২ নম্বর দরখাস্তে। ক্ষোভে, আক্ষেপে মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলেন। বারবার শূন্য মস্তিষ্কটা খুঁজে ফিরলেন।

দেওয়ালের ঐ রূঢ় কণ্ঠস্বর প্রশ্ন করে চলেছে:

'বলো! বলো! জবাব দাও!!'

হঠাৎ বিদ্যুতের মতো মনে পড়ে গেল—'না না চাই না আমার আর কিছু। আগেকার সব কিছু বাতিল। সব মুছে ফেল!'

জবাব এল: 'সাত নম্বর অফিসে যাও—দেরি কোরো না।'

সাত নম্বর অফিস। অপেক্ষা করতে হবে।

এক-একটা মুহূর্ত যেন এক একটা বছর। টেলিভিসন পর্দায় দেখতে পাচ্ছেন স্থির নিশ্চল প্রটোয়ান মূর্তি। সেই চোখ স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। শরীরটা কেঁপে ওঠে। ডক্টর সিনহা এর আগে কখনো কোনো প্রটোয়ানের সামনা-সামনি হন নি।

দেওয়ালের সামনের ফুটো থেকে একটা কাগজ বেরিয়ে এল। বিচিত্র তার গায়ের আঁকজোক। সেটা হাতে নিতেই যেন কবরের ওপার থেকে এক শীতল কণ্ঠস্বর ভেসে এল: 'চিরঞ্জীব সিনহা নম্বর ৬৫৩—৩৩৬! তোমাকে মুক্তি দেওয়া গেল। আত্মহত্যা করার দরখাস্ত গ্রাহ্য হোলো। ডেথ সার্টিফিকেটের জন্য এক নম্বর অফিসে যাও।

আনন্দে ডক্টর সিনহার চোখ জলে ভরে উঠল। এতদিনে ওঁর চেষ্টা সফল। এগারোটা বাজতে আর দশ মিনিট। তার আগে ডেথ সার্টিফিকেটটা পেতেই হবে ওঁকে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন।*

[* একটি বিদেশী গল্পের ছায়ায়]

[illegible] ব্রেশট : এপিক থিয়েটার সম্বন্ধে ব্রেশটের থিওরিগুলো যে পিসকেটরের চিন্তাধারার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়েছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ব্রেশটও চাইছিলেন বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মার্ক্সিস্ট ড্রামার প্রচলন করতে—এর গাঠনিক দিকে একটা আলগা আলগা ভাব থাকবে, যাতে নাটকের বিস্তৃত সামাজিক এবং ঐতিহাসিক পটভূমিকার ছায়া দেওয়া সম্ভব হয়। তাঁর এই নতুন নাটীক আবিষ্কারের দিকটা বুঝতে না পেরে, কেউ যদি তাঁর নাটকের গাঠনিক দিকের ত্রুটি হিসাবে এই 'আলগা-ভাবটার' ব্যাখ্যা দিতেন তাহলে ব্রেশট খুবই বিরক্ত হতেন। ব্রেশটও পিসকেটরের মতন নাটকে পোস্টার, প্ল্যাকার্ড, গান এবং কোরাসের ব্যবহার করতেন। কিন্তু নানা বিষয়ে এক রকমের ঐক্য থাকা সত্ত্বেও একটি ব্যাপারে দুজনের ভেতর মতানৈক্য ছিল। পিসকেটর নাটকের সাহিত্যিক-মূল্যের ওপর তত জোর দিতেন না। ব্রেশট কিন্তু এই জাতীয় নাটকের কাব্যিক পরিস্ফুটন এবং কাব্যিক সৌন্দর্যকে অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য হিসাবেই মনে করতেন—নাটকের একটা নিজস্ব সাহিত্যিক মূল্য থাকবে এই ছিল তাঁর সুচিন্তিত মতবাদ। ১৯২২ সালে তাঁর 'বাল' নাটকটি বার্লিনে অভিনীত হয়। কিছু কিছু সৌন্দর্যবিলাসী লোক থাকেন যাঁরা মনে করেন থিয়েটারের চারপাশে ঘিরে থাকবে শুধু সমাজের সম্ভ্রান্ত এবং শিক্ষিত লোকের দল—কিন্তু ব্রেশট এই জাতীয় পোলাইট এসথেটিক এ্যাটমস্‌ফিয়ারে বিশ্বাস করতেন না। তিনি চাইতেন থিয়েটারটা হয়ে উঠুক স্পোর্টস এরিনার মত। অবশ্য এই নতুন থিয়েটারের জন্য নতুন ধরণের মঞ্চগৃহ এবং নতুন রকমের নাটকের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও তিনি ভালভাবেই অবহিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে ১৯২৬ সালে ব্রেশট বলেছিলেন :

In the old kind of theatre we are as out of place with our plays as Jack Dempsey would be unable to show his skill in a tavern brawl, where someone could knock him out by hitting him over the head with a chair...

ক্ষয়িষ্ণু বুদ্ধিবাদীশ্রেণীর প্রতি ব্রেশটের চিরকালই একটা বিরূপ মনোভাব ছিল—সেই কারণে তিনি সঙ্গী-সাথী খুঁজতেন মুষ্টিযোদ্ধাদের এবং সাইকেল রেসের চালকদের চক্র থেকে। এই কারণেই জার্মান লাইট হেভী-ওয়েট চ্যাম্পিয়ন পল স্যামশন কোরেরনার ব্রেশটের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং প্রায় নিত্য-সঙ্গী হয়ে পড়েন। ১৯২৬ সালের জুলাই মাসে ব্রেশট ঘোষণা করেন যে তিনি স্যামশন কোরেরনারের জীবনী লিখতে শুরু করেছেন। ১৯২৬ সালে যখন বার্লিনের একটি চিত্রগৃহে ডেম্পসী-টানীর মুষ্টিযুদ্ধের ছবি দেখানো হয়—শো শুরু হবার ঠিক আগে জনপ্রিয় অভিনেতা ফ্রিট্‌জ কোর্টনার ব্রেশট রচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করতেন।

ব্রেশট বিশ্বাস করতেন যে কাব্যের কিছুটা ব্যবহারিক গুণ থাকা দরকার। তাই তিনি বলেছেন :

Poetry must surely be capable of being examined from the point of view of its practical value ... All great poems have the value of documents. They show how their

বার্লিনার আনসম্বল
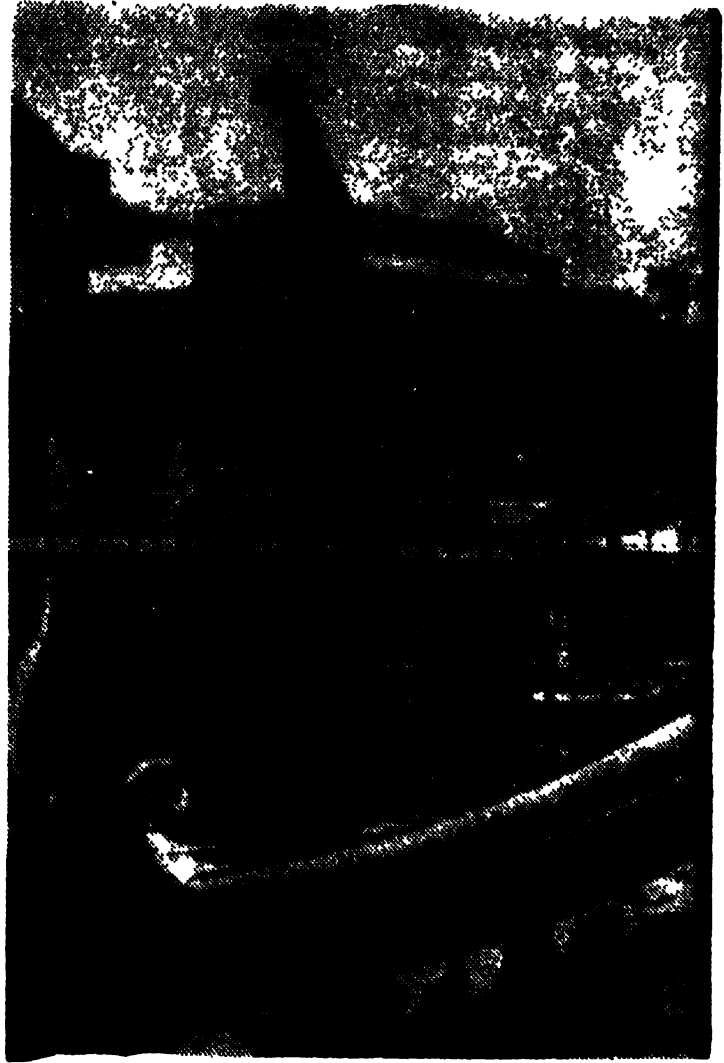
author, a significant human being, expressed himself.

এই সময়টায় ব্রেশট প্রচুর পরিশ্রম করতেন। ভাগ্যবশত তাঁর একজন অতি সুযোগ্য সেক্রেটারীও জুটে যায়—মহিলার নাম এলিজাবেথ হাউপ্টমান। এলিজাবেথের সহযোগিতায় ব্রেশট কয়েকটি নাটকও রচনা করেছিলেন। ইনি এখনও বার্লিনার আসেম্বলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এ বছরের ব্রেশট-ডায়ালগের সময় অনুষ্ঠাতাদের কমিটির সভাগুলোতে তাঁর যোগ দেবার কথা ছিল—কিন্তু বার্লিনার আসেম্বলের ড্রামাটার্গ জার্নার ব্রেসট প্রথম মিটিং-এর দিন আমাদের জানালেন যে মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। হাসপাতালে আছেন এবং সেই কারণেই মিটিং-এ আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।

এলিজাবেথ হাউপ্টমানের ১৯২৬ সালের ডায়েরীর কিছুটা প্রকাশিত অংশ থেকে জানা যায়—ব্রেশট এই সময় অর্থ উপার্জনের জন্য অনেক ছোট গল্প লিখছিলেন। 'মান ইস্ট মান' নাটকটিকেও মেক্কে-হুবে ডার্মস্টাটের প্রথম প্রদর্শনীর জন্য প্রস্তুত করে দিচ্ছিলেন। শিশু অপরাধীদের সম্বন্ধে একটি কমেডীও ব্রেশট এই সময় রচনা করেছিলেন। তাছাড়া চার্লস দি বোল্ড সম্বন্ধে একটি নাটক, রাইনহার্টের জন্য একটি রেভ্যু, একটি উপন্যাস এবং জ্যান জু এন্ড দি এরি রেল রোড নাটকটি ব্রেশট এই সময়েই লিখেছিলেন। শিকাগো স্টক মার্কেটে যে সব ব্যবসায়ীরা গম নিয়ে ফাটকাবাজী করে তাদের আসল চেহারাটা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরবার জন্য আর একটি নাটকে ব্রেশট এই সময়েই হাত দেন—এরই পরিণত রূপ তাঁর পরবর্তীকালের বিখ্যাত নাটক 'সেইন্ট জোন অভ দি স্টক ইয়ার্ডস'। এই সময়েই অর্থাৎ ১৯২৬ সালে আবার তাঁর প্রধান কবিতাগুলোর একটি সংগ্রহ প্রকাশিত হয়।

নিজেকে সব দিকে সুশিক্ষিত করে তোলবার জন্যও ব্রেশট এই সময়টায় [illegible] পড়তে লাগেন। শাসার ঘটকার দের

গ্যালী দে, বেগাবিক এবং [illegible]

অবশেষে নাটকটি লেখবার জন্য ব্রেশটকে খুবেই যত্নের সঙ্গে অর্থনীতি বিষয়ে যথেষ্ট পড়াশুনো করতে হয়েছিল। বাণিজ্য এবং অর্থনীতি সংক্রান্ত সমস্যাগুলোকে কিভাবে নাটকীয় বিষয়বস্তু করা যায় এ নিয়ে ব্রেশটকে যথেষ্ট মাথা ঘামাতে হয়। এ বিষয়ে এলিজাবেথ হাউপ্টমান তাঁর ডায়েরীতে লিখেছিলেন—

that the forms of drama as they had existed hitherto were not suitable for the exposition of such modern

'ম্যান ইস্ট ম্যান'-এর একটি দৃশ্য

'মান ইস্ট মান'-এর অপর দুটি দৃশ্য

processes as the world distribution of wheat, nor the presentation of the life story of present-day human beings. 'These things', he said, 'are not dramatic in the accepted sense and if you try to translate them into poetic terms they are no longer true....But if it is realised that the present day world does not fit the established dramatic form,

[illegible]

'মান ইস্ট মান' নাটকটির প্রথম প্রদর্শনীর পর কিছুদিন অবসর নিয়ে খুব মনোযোগের সঙ্গে কার্ল মার্কসের 'ডাস ক্যাপিটাল' অধ্যয়ন করেন। এবার ইস্ট বার্লিনে ব্রেশট পার্টি অভিনীত যে কটি নাটক দেখেছি তার ভেতর অন্যতম সেরা নাটক হচ্ছে এই 'মান ইস্ট মান'। গ্যালি গের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় প্রতিভা দেখিয়েছিলেন হিলমার থেট—এঁর উপর চার্লি চ্যাপলিনের এ্যাকটিং-এর প্রভাব বেশ স্পষ্টভাবেই নজরে পড়ে।

নাটকটির স্থান হচ্ছে—ভারতবর্ষের এক উদ্ভট কাল্পনিক ব্যারাকে। কিপলিং-এর ব্যারাক রুম ব্যালাডের উপর ভিত্তি করে নাটকটি রচিত। ঘটনা ঘটছে ১৯২৫ সালে। গ্যালি গের রূপান্তর ঘটানোর মূলে রয়েছে এই সত্য—

One man is as good as another and human personality can be taken apart and resembled like a motor car.

এই নাটক থেকেই ব্রেশটের মানসিক বিবর্তনে একটা নতুন দিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। যৌবনের বিদ্রোহাত্মক মৌতিবাদ পরিবর্জন করে তিনি এবার সামাজিক জীবন এবং সমাজতন্ত্র বিষয়ে সচেতন এবং অবহিত হয়ে লেখার ভঙ্গী পাল্টে ফেলেন। The theme of the play is the malleability of man, the possibility of social engineering.

এই সময়ই আর একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে—কম্পোজার কুরট ভাইলের সঙ্গে ব্রেশটের সহযোগিতা শুরু হয়—এই সহযোগিতা অব্যাহত ছিল ভাইলের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত (১৯৫০)।

মিউজিক সম্পর্কে ব্রেশট ছিলেন অত্যন্ত খেয়ালী—বেটোফেন এবং ভাগ্নো-লিন সম্বন্ধে তাঁর ছিল আন্তরিক বিরাগ, বাখ এবং মোৎসার্ট তাঁর ভাল লাগতো। কনসার্ট জিনিসটাকে তিনি একেবারে দেখতে পারতেন না।

কনসার্ট জাতীয় মিউজিককে তিনি এত অপছন্দ করতেন যে, তার পরিবর্তে যে সঙ্গীতকে তিনি ব্যবহার করবার ব্যবস্থা করলেন তার নাম দিলেন Misuk। ব্রেশটের কম্পোজার বন্ধু হানস আইসলার বলেছেন এই Misuk-এর সংজ্ঞা নিরূপণ করা প্রায় অসম্ভব—'It is above all popular, and it is best described as reminiscent of the singing of working women in the back-yards of tenements on Sunday afternoons'. [ক্রমশ]।

"গান্ধীবাদ কি সচল?"—এই আলোচনার সূত্রপাত করার জন্য অধ্যাপক দিলীপ ঘোষরায়কে ধন্যবাদ জানাই। তবে বিগত সংখ্যায় শ্রদ্ধেয় সজীবকান্তি গুহরাজা মহাশয়ের সমালোচনা পাঠ করে আমার ব্যক্তিগত মতামত একটু না জানিয়ে পারলুম না।

মাননীয় সমালোচকের মন্তব্যগুলোতে যুক্তির পরিবর্তে উত্তেজনা ও সহনশীলতার অভাবই প্রকাশিত হয়েছে। গান্ধীগত প্রাণ মাননীয় গুহরাজা আপনার সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে অন্য কারো মতবাদকে এতটুকুও মানতে নারাজ। পরন্তু নিজের বক্তব্যকেই অপরিহার্য বলে [illegible] [illegible] আছেন। গান্ধীজী যে [illegible] তিনি [illegible] করেছেন [illegible] প্রমাণের ইঙ্গিত [illegible] [illegible] দিয়েছেন একথা [illegible] সমালোচকেরাই [illegible]। তার [illegible] পারে [illegible] এগুলোকে নতুন নামকরণ ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়ে [illegible] প্রমাণ করবেন। চৈতন্য [illegible] বিবেকানন্দের দরিদ্রনারায়ণের সেবা এবং [illegible] [illegible] [illegible] সামাজিক গণ্ডীর মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু গান্ধীজী [illegible] নতুন [illegible] "হরিজন" দিয়ে [illegible] রাজনৈতিক [illegible] এনেছেন। [illegible] পরিণামে মানসিক ও সামাজিক [illegible] দিকে [illegible] দৃষ্টি না দিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যই হয়ে উঠেছে বড়। এতে বর্ণহিন্দু ও অস্পৃশ্যদের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। গান্ধীজী সৃষ্ট এই নতুন শ্রেণীর জন্য অন্যান্য প্রদেশের দাবিতে হয়তো অদূরভবিষ্যতে আমরণ অনশনও অসম্ভব নয়। তাছাড়া গান্ধীজী নিজেই কি "মানসিক" বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পেরেছিলেন? তবে নেতাজীকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করবার সময় মহাত্মার "বন্ধনমুক্ত মানসিক" কাঠামো সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তার এই পন্থাগুলোর অপব্যবহারই যে বর্তমান ভারতবর্ষে সমস্ত বিশৃংখলতা ও অশান্তিতে পরিণত হয়েছে কি না—এই বিষয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে না কি? অন্যান্য বিষয়ে সমালোচক শ্রদ্ধেয় দীপক মজুমদারের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। অথচ গান্ধীভক্তদের শোচনীয় পরিণতি সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় মুন্সি আবদুল আজিজ মহাশয় শেষোক্ত কয়েক লাইনে যে ইঙ্গিত করেছেন—সেদিকে মাননীয় গুহরাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

"You can befool some people for sometime not all people for all time.'

—ডক্টর এ. সি. রায়
সিন্ধ্রি (বিহার)

*

আপনার পত্রিকার "গান্ধীবাদ কি সচল" এই শিরোনামায় যে রচনাটি প্রকাশ করেছেন এবং প্রসঙ্গত যেসব আলোচনা ছেপেছেন তজ্জন্য ধন্যবাদ জানাই। বস্তুতপক্ষে চিন্তায়, জীবনযাত্রায় পোষাকপরিচ্ছদে অহিংস আন্দোলনের প্রবর্তনায় গান্ধীজী একান্তভাবেই হিন্দু ছিলেন। যে যুগে দর্শন ঈশ্বরের হাত থেকে মুক্তিলাভ করে নতুন মানসিক এবং বাস্তব সমস্যা এবং মুক্তির প্রশ্নকে আলোকিত করছে সেই যুগে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক এবং ধর্ম [illegible] পথে সমগ্র জাতিকে পরিচালনা করে গান্ধীজী রামমোহন বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত রেনেসাঁসকে ব্যাহতই করেছিলেন। দেশ বিভাগের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা প্রত্যক্ষ কিংবা অপ্রত্যক্ষ কতোখানি কার্যকর ছিল তা দেখানোর জন্য আমি Ronald Sogal-এর Crisis of India থেকে একটি উদ্ধৃতি দিতে চাই। He (Jinnah) had been largely responsible for bringing Congress and the Muslim League closer together. and had himself been a member of Congress till the celebrated Calcutta meeting of 1920, which had initiated the era of Gandhi's leadership with its appeal to the Hindu masses, its stress on the wearing of 'Khadi', its increasing use of Hindi at Congress meetings, its employment of Satyagraha as sanctioned by Hindu doctrine and tradition—P. 106/7.

প্রসঙ্গত গান্ধীজীর স্বাধীনতাচেতনাকে 'negation of freedom', 'fear from freedom' এবং 'innersly identical with fascism' বলে উল্লেখ করে মানবেন্দ্রনাথ রায় যে [illegible] শ্রেণীর [illegible] উৎসাহী পাঠককে তা পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। গান্ধীজীর মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে পিছনে না বসিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখলে জাতিরই উপকার হবে। চিন্তাশীল মানবেন্দ্রনাথের 'Problem of Freedom' গ্রন্থে পাঠক এই বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক বিশ্লেষণের শুরু খুঁজে পাবেন বলেই আমার বিশ্বাস।

—কালীকৃষ্ণ গুহ
৪১/১ নেপাল ভট্টাচার্য ফার্স্ট লেন
কলকাতা-২৭

*

'সাপ্তাহিক বসুমতী' প্রসঙ্গে

আমি সাপ্তাহিক বসুমতীর একজন নিয়মিত পাঠক। প্রবাসে বাস করেও বাংলা দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাই আপনার পত্রিকার মাধ্যমে। বিশেষত আপনার সুচিন্তিত সম্পাদকীয় এবং বঙ্গদর্শন, ভারতদর্শন ও আন্তর্জাতিক বিভাগগুলি যে বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গিতে লিখিত হয় তা সচরাচর অন্য কোন পত্রিকায় নেই। শুধুমাত্র এখানেই আপনার কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ না। পল্লীবাংলার যে সত্য পরিচয় আপনি তুলে ধরেছেন এবং [illegible] যে পথ আপনি দিয়েছেন (যদিও [illegible] রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাবিদরা [illegible] মূল্য দিচ্ছেন না) আমার [illegible] ধারণা ঐ পথেই হবে আমাদের [illegible] সমস্যার সমাধান।

বাংলার বিপ্লববাদ সম্পর্কে আমরা আধুনিক যুবকরা একেবারে অজ্ঞ বললেই চলে। শ্রীঅনন্ত সিংহ বাংলার ত্রিংশ দশকের যে বিপ্লবী যুবমানসের পরিচয় দিয়েছেন, সেই যুববিদ্রোহের অগ্নিশিখাকে আমরা যেন মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারি। আমরা সশ্রদ্ধভাবে মাথা নত করছি আমাদের বিপ্লবী পূর্বসূরীদের কাছে। যাঁরা মৃত্যুকে জয় করে মৃত্যুঞ্জয় সেই অমর শহীদদের শ্রীসিংহ আমার পাদপ্রদীপে এনেছেন, তাঁকে সহস্র নমস্কার।

বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন যখন হুজুগে হাওয়া প্রবলভাবে বইছে, তখন এমন আদর্শবাদী মননশীল পত্রিকা আপনার সম্পাদনায় প্রকাশিত হচ্ছে সে কারণে আপনাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। পরিশেষে শ্রী[illegible]প্রসাদ বসুকে তাঁর মূল্যবান [illegible] প্রবন্ধের জন্য আমার অভিনন্দন জানাবেন।

—শ্রীকিরণ মুখোপাধ্যায়
ঝরিয়া (ধানবাদ)
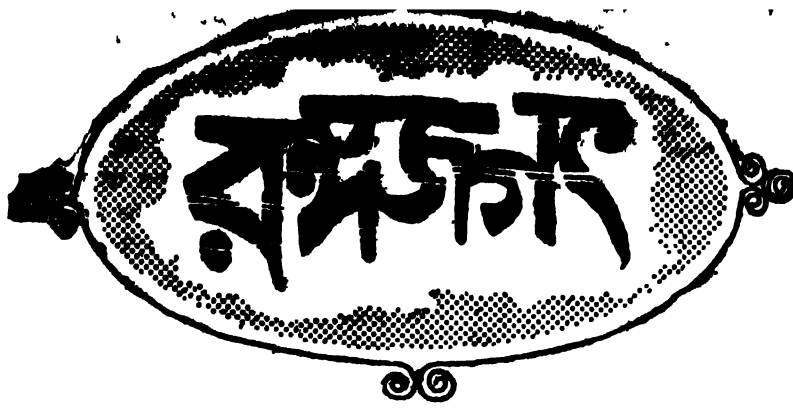
বুলগেরিয়ার চলচ্চিত্র

বুলগেরিয়ার ২৪তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কলকাতার প্রাচী সিনেমায় বুলগেরীয় চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়েছে গত ১১ই সেপ্টেম্বর। উৎসব উদ্বোধন করেছেন নয়া দিল্লীস্থ বুলগেরিয়ার রাষ্ট্রদূত মিঃ ক্রিস্টো ডিমিত্রভ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিখ্যাত চিত্রস্রষ্টা শ্রীমধু বসু। এই উৎসব আয়োজিত হয়েছে কলকাতার বুলগেরিয়ার [illegible]শিল্প প্রতিনিধি দপ্তর, ইন্দো-বুলগেরিয়া মৈত্রী সমিতি এবং সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটার যুক্ত উদ্যোগে। উৎসবে চারটি ছবি দেখান হচ্ছে, রেস্টলেস হোম, পাঁচ থিফ, নাইট উইদাউট আর্মার এবং এ সাইড ট্রেক। শেষোক্ত ছবিটি মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে স্বর্ণপদক লাভ করেছে, বাকি তিনটিও বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত। এই সঙ্গে কয়েকটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি দেখান হচ্ছে। প্রত্যেকটি ছবি বিশেষ নৈপুণ্য-পূর্ণ। ছবিগুলি দেখে মনে হয় বুলগেরীয় ছবি কলকাতার দর্শকদের কাছে বিশেষ প্রশংসা লাভ করবে।

বুলগেরিয়ার চলচ্চিত্র-শিল্পের বিকাশ মাত্র পনের বছরের। মহাযুদ্ধের পূর্বে বুলগেরিয়ায় চলচ্চিত্র-শিল্প ছিল না। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই বুলগেরিয়া এদিকে মনোনিবেশ করার সুযোগ পেয়েছে। এই পনের বছরে প্রায় ১৫০টি পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্র ও ২ হাজার স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি নির্মিত হয়েছে। স্বল্প দীর্ঘ ছবির মধ্যে রয়েছে কার্টুন, উপকথা, তথ্যচিত্র, প্রামাণিক-চিত্র, বিজ্ঞান ও শিক্ষামূলক চিত্র। বর্তমানে বুলগেরিয়ায় তিনটি ফিল্ম স্টুডিও রয়েছে। রাজধানী সোফিয়ার নিকটে মাউন্ট ভিটোশা পর্বতের পাদদেশে এক ফিল্ম নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে ফিল্ম নির্মাণের সর্বাধুনিক ব্যবস্থাদি রয়েছে। বর্তমানে বছরে ১৪/১৫টি পূর্ণাঙ্গ [illegible] এবং [illegible] করে স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি নির্মিত হয়। বুলগেরীয় ছবি এই পনের বছরে দেশে এবং বিদেশে জনপ্রিয় হয়েছে। এ-পর্যন্ত ১৩৩টি চলচ্চিত্র উৎসবে বুলগেরীয় ছবি প্রতিযোগিতা করেছে, তার মধ্যে ৯৩টি ছবি ১৪৫টি পুরস্কার পেয়েছে। একটা ছোট দেশের পক্ষে, বিশেষ করে মাত্র পুরস্কার অর্জন করা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। প্রতিটি উৎসবে বুলগেরীয় ছবি কাহিনীর গভীরতা, চমৎকার অভিনয়, দক্ষ পরিচালনা এবং উচ্চমানের ফটোগ্রাফি ও সংগীতের জন্য প্রশংসিত হয়েছে। স্টার্স, সান এন্ড স্যাডো, দি ক্যাপ্টেন, উই আর ইয়ং প্রভৃতি কানস, ভেনিস, মস্কো, কার্লোভি ভ্যারি সানফ্রানসিসকো প্রভৃতি উৎসবে তিনটির বেশি পুরস্কার পেয়েছে। ১৯৬৭ সালে এ সাইড ট্রেক' পরিচালনার জন্য মস্কো উৎসবে পুরস্কার পেয়েছে, 'নাইট উইদাউট আর্মার' পেয়েছে ভেনিস উৎসবে ১৯৬৬ সালে এবং মস্কো উৎসবে ১৯৬৭ সালে। কার্টুন চিত্রের ক্ষেত্রে গত কয়েক বছরে ২০টির বেশি পুরস্কার লাভ করেছে। বুলগেরিয়ার ছবির এখন এত সমাদর যে, পূর্ণাঙ্গ ও স্বল্পদৈর্ঘ্যের মিলিয়ে আট শর বেশি ছবি প্রায় ৯০টি দেশে প্রদর্শিত

বুলগেরিয়ার ছবি 'এ সাইড ট্রেক' এবং 'পাঁচ থিফ'-এর [illegible]

হয়েছে। বিভিন্ন দেশে ফিল্ম ক্লাব ও সরকারী উদ্যোগে বুলগেরীয় চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফ্রান্স, ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, মরোক্কো, তিউনিশিয়া আরব যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে উৎসব হয়েছে। ভারতে ইতিপূর্বে কয়েকটি বুলগেরীয় ছবি দেখান হলেও উৎসব এই প্রথম। যুক্ত-ভাবে ছবি নির্মাণের ব্যাপারেও বুলগেরিয়া উৎসাহ প্রদর্শন করছে। সোভিয়েত, আমেরিকা, ইতালী, চেকোস্লোভাকিয়া, অস্ট্রিয়া এবং দুই জার্মান রাষ্ট্রের সহযোগে বুলগেরিয়া প্রায় পনেরটি ছবি নির্মাণ করেছে। বর্তমানে লিথুয়ানিয়া, ইতালী, চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে যুক্তভাবে ছবি নির্মাণ করছে। বৃটেন, ফ্রান্স, স্পেন, আমেরিকার সঙ্গেও যুক্ত ছবি করার কথা চলছে।

ফ্যাসিজমকে পরাজিত করে বুলগেরিয়া স্বাধীন হয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করেছে। অতীতের ইতিহাস, জনগণের সংগ্রামকে যেমন ছবিতে প্রকাশ করা হয়েছে, বর্তমানে সমসাময়িক কালের কথা, যুবমানসকেও প্রকাশ করা হচ্ছে অতীতের অভিজ্ঞতার শিক্ষায়। তারই নিদর্শন 'এ সাইড ট্রেক', 'রেস্টলেস হোম' ইত্যাদি। সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রেম এবং দাম্পত্যজীবনকে কিভাবে দেখা হচ্ছে, জীবনকে কিভাবে দেখা হচ্ছে, কিভাবে নতুন যুগের ছেলেমেয়েদের কথা ভাবা হচ্ছে—তার নিদর্শন এ দুটি ছবিতে পাওয়া যাব।

আমরা আশা করি বুলগেরিয়ার ছবি আমাদের দেশে সমাদৃত হবে। আমাদের দেশে ব্যবসায় ভিত্তিক বুলগেরীয় ছবির প্রদর্শন হওয়া উচিত!

—সুজন

রেস্টলেস হোম : মাকারস্কোর তত্ত্ব

পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-সমূহের মধ্যে বুলগেরীয় চলচ্চিত্র কিছুটা স্বতন্ত্র মনে হয়। চারটি ছবি দেখে এ কথা বলা ঠিক না হলেও, এই ছবিগুলি যে বক্তব্যে ও মেজাজে নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, অন্তত দুটি ছবি দেখে আমার তাই মনে হল।

'রেস্টলেস হোম' একটি পরিবারের ঘরোয়া কাহিনী, কিন্তু সমগ্র সমাজের সমস্যা এতে প্রতিফলিত হয়েছে। একটি পরিবারের ঘটনা হয়েও সামগ্রিক আবেদনে ছবিটি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার একটি উপভোগ্য রূপায়ণ। প্যাভেল বেজিনভের চিত্রনাট্যের প্রধান চরিত্র একজন মধ্যবয়সী ইঞ্জিনিয়ার। তার স্ত্রী ডাক্তার। তাদের এক মেয়ে ও এক ছেলে। ইঞ্জিনিয়ার মেনাসিয়েভ সৎলোক। সংসারে নিজের মতটাকেই তিনি খাটাতে চান। স্ত্রী এদিক থেকে বেশি বুদ্ধিমতী, তিনি ছেলে-মেয়েদের দিকটাকে সহানুভূতির সঙ্গে দেখেন। তাঁর নজরও রয়েছে সকলের প্রতি। ছেলেমেয়ে মা'র কাছে তেমন লুকোয় না, যতটা লুকোয় বাবার কাছে। মেয়ে নিজের পছন্দ মত বিয়ে করতে চাইলে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। মা সম্মত থাকলেও বাবার আপত্তি। ইঞ্জিনিয়ারের চোখে পাত্রটি মোটেই যোগ্য নয়। কিন্তু স্ত্রীর সমর্থন থাকায় শেষ পর্যন্ত বিয়ে হল। বিয়ের পর কন্যা ও জামাতা তাঁর বাড়িতেই থাকে, কারণ স্বতন্ত্রভাবে থাকার মত তাদের আর্থিক অবস্থা নয়। ইঞ্জি-নিয়ার মেনাসিয়েভ এ কারণেও জামাতাকে কিছুটা তাচ্ছিল্য করেন। এদিকে বাড়িতে ছোট ছেলেটি বাবার রাশভারী মেজাজে বেশিক্ষণ বাইরে কাটাতে চায় এবং গোপন করার অভ্যাস থেকে বখাটে ছেলেদের সঙ্গে গিয়ে পড়েছে। মা'র চোখে সহজে ধরা পড়ে কিন্তু তিনি কি আর করতে পারেন। একদিন জামাতা মত্ত অবস্থায় আর এক যুবতীর সঙ্গে ধরা পড়ে হাজতে আটক হলে মেনাসিয়েভ তার সঙ্গে এমন ব্যবহার করলেন যেন তাঁর কন্যার সঙ্গে সম্পর্কে সেখানেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু মেয়ের মনের কথা তিনি জানতেও চাইলেন না। আর একদিকে ছেলে ধরা পড়েছে চুরির দায়ে। শেষ পর্যন্ত মেনাসিয়েভকে তাঁর মনোভাব পরিবর্তন করতে হল। তিনি সহানুভূতির সঙ্গে ব্যবহার করে জামাতাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনলেন, ছেলেকেও মুক্ত করে আনলেন। তিনি বুঝতে পারলেন নিজের ধারণাই চূড়ান্ত নয়। ছেলেমেয়ের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টা আরো সহানু-ভূতির সঙ্গে দেখা দরকার। ওদের মতামত এবং ওদের জগৎটাকে জানতে চেষ্টা না করলে বিপদ সৃষ্টি হয়। তাতে ছেলে-মেয়েদের যেমন বিপদ, নিজেদেরও অশান্তি।

পরিচালক ইয়াকিম ইয়াকিমভ বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ মাকারেঙ্কোর তত্ত্ব অবলম্বন করে ছবিটির বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। দৃশ্য রচনায় পরিচালকের কৃতিত্ব সম্পাদনা বৈশিষ্ট্য এবং সঙ্গীত ছবিটিকে উপভোগ্য করেছে। ছবিটির রূপায়ণরীতি কিছুটা মঞ্চ ঘেঁষা।

ছবির চরিত্রগুলিকে রূপদান করেছেন আইভান কনডভ (ইঞ্জিনিয়ার), এমিলিয়া রাদেভা (ইঞ্জিনিয়ারের স্ত্রী), এলেনা রাইনোভা (মেয়ে), মিলেন পানেভ (জামাতা), ভ্যালেনটিন রুসকভ (ছেলে)।

এ সাইড ট্রেক : দুটি হৃদয়ের কাব্য

'এ সাইড ট্রেক' ছবিটি মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে স্বর্ণপদক লাভ করেছে। লালিত্য-পূর্ণ রূপায়ণ, কাব্যিক মেজাজ এবং অনবদ্য অভিনয়ে ছবিটি বাস্তবিকই পরম উপভোগ্য। বিষয়বস্তুর দিক থেকেও আকর্ষণীয়। নরনারীর প্রেমের উৎস কি এবং সার্থকতা কোথায় এই জিজ্ঞাসা চিরন্তন। বিশ্বের কাব্যে ও সাহিত্যে একই জিজ্ঞাসা বার বার নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। ছবিটি মধুর মেজাজে এই জিজ্ঞাসাকে চিত্রে উপস্থিত করেছে

বুলগেরিয়ার ছবি 'দি ট্রায়াল'-এ ড্যানিয়েলা এন্তোনোভা ও আইভান এন্তোনোভ

'মেরে মম্মা' ছবিতে নূতন

দু-টি চরিত্রের মাধ্যমে। এই দুটি চরিত্র বয়ান ও নেদা। দু'জনাই ছাত্র। ছাত্রজীবনের উদ্দামতার মধ্যে তাদের প্রথম প্রেম। অজস্র তত্ত্ব ও জিজ্ঞাসার মধ্যে বয়ান ও নেদা প্রেমের মাধুর্যে ডুবে থেকেও সামাজিকভাবে মিলিত হতে পারল না। বিচ্ছিন্ন হল। চার বছর পরে তাদের আবার দেখা অপ্রত্যাশিতভাবে। বয়ানের গাড়ি করে চলেছে সোফিয়ার দিকে। পথে ক্ষণে ক্ষণে দুজনারই মনে পড়ছে পূর্ব স্মৃতি—তাদের প্রেমময় অতীত দিনগুলির কথা। দু জনেই মনে মনে প্রশ্নের জবাব খুঁজছে। এভাবে যেন এক স্বপ্নের জগতের মধ্য দিয়ে দু-জনে সোফিয়ায় এসে পৌঁছল। শেষ মুহূর্তে বয়ান জিজ্ঞাসা করল আমরা কি আবার মিলতে পারি না? নেদা নেতিবাচক জবাব দিলেও সেই জবাবে যেন একই প্রশ্ন প্রচ্ছন্ন রয়েছে। বয়ানের ভিয়েনা রওনা হতে মাত্র আর কিছুক্ষণ বাকি। শেষ মুহূর্তে নেদা যেন অনুভব করল সেই একই মানসিক জটিলতা—যা তাদের প্রথম প্রেমকে ব্যর্থ করেছে। এতক্ষণ তারা মনে করেছে সময়ের ব্যবধানেই বুঝি তারা দূরে চলে গেছিল, এবং সময়ের জটিলতা বুঝি তাদের প্রথম প্রেমের অসার্থকতার জন্য দায়ী। কিন্তু এখন নেদা অনুভব করল সময় নয়; মানসিক জটিলতাই এর জন্য দায়ী। বয়ান জ্ঞানে, বুদ্ধিতে প্রখর, তত্ত্বের দিক থেকে প্রেমকে ব্যাখ্যা করতে পারলেও প্রেমকে বিজয়ী করার ব্যাপারে ব্যর্থ।

ছবির শুরু ছাত্রছাত্রীদের এক সিম্পোসিয়ামে। সেই সিম্পোসিয়ামে আলোচ্য বিষয় 'প্রেমের সার্থকতা কিসে'। কোলাহল ও সঙ্গীতমুখর পরিবেশে যে কাহিনীর শুরু—শেষ তার গভীর জিজ্ঞাসা ও দুটি হৃদয়ের মিলন ব্যর্থতার বেদনায়। কিন্তু ছবিটি কোথাও বক্তব্য ভারাক্রান্ত বা বেশি গম্ভীর হয়ে ওঠে নি। পরিচালক অসাধারণ দক্ষতায় অত্যন্ত সহজ গতিতে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। দর্শক প্রতি মুহূর্তে উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে শেষ পরিণতি দেখার জন্য।

এই ছবিটির সার্থকতায় যেমন পরিচালকের দক্ষতা রয়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে দুটি চরিত্রে নেভেনা কোকানোভা (নেদা) এবং আইভান এন্ডোনভের (বয়ান) অনবদ্য অভিনয়। এই অভিনয় আশ্চর্য সুন্দর।

ছবির চিত্রনাট্য রচয়িতা ব্লাগা ডিমিট্রোভা। পরিচালনা করেছেন গ্রিসা ওস্ট্রভস্কি এবং টোডর স্টয়ানভ।

ছবিটি অংশত সত্যজিৎ রায়ের 'কাপুরুষ'-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। একই জিজ্ঞাসা এখানে আরো স্পষ্ট, সুন্দর এবং কাব্যরসে পরিপূর্ণ হয়ে একটি সার্থক কাহিনীচিত্র সৃষ্টি করেছে।

'দাবী'র স্মারক রজনী

স্টার থিয়েটারের 'দাবী' নাটকের পাঁচ'শ পঞ্চাশ রজনী স্মারক উৎসব সমারোহের সঙ্গে গত ৭ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং প্রধান অতিথি ছিলেন সাহিত্যিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী অভিনেতা-অভিনেত্রী ও কর্মীদের পুরস্কার দান করেন। স্টার থিয়েটার কর্তৃপক্ষ, শিল্পী, পরিচালক, সঙ্গীত পরিচালক ও কর্মীদের নগদ অর্থ ও বিভিন্ন দ্রব্য পুরস্কার দেন। শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর ভাষণের পর 'দাবী' নাটকের (৫৫৪তম রজনী) অভিনয় হয়। দাবী নাটক রচনা ও পরিচালনা করেছেন শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত।

ইয়ুথ পাপেট থিয়েটার

ইয়ুথ পাপেট থিয়েটারের পক্ষ

...নিক অনুষ্ঠান গত ৭ই সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান বিচারপতি শ্রী ডি এন সিংহ এবং লেডি রাণু মুখার্জী।

সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকারীদের পুরস্কার দানের পর শুরু হয় পুতুল নাচ। ম্যারিওনেটস সুরের সংগে সংগে নানা রঙের নানা বেশের পুতুলরা সব মঞ্চে হাজির হয়। মনে হয় যেন এক রূপকথার দেশ, কিশোরবৃন্দ ছেলেমেয়েদের তো আনন্দ আর ধরে না। এরূপ ম্যারিওনেটস এ অঞ্চলে এই প্রথম প্রদর্শিত হয়েছে।

এই পুতুল নাচের পরিচালক ... চক্রবর্তী। সংগীত পরিচালনা করেছেন শৈলেন মুখোপাধ্যায় এবং ... ছিলেন কণিষ্ক সেন। এঁরা প্রত্যেকেই প্রশংসার যোগ্য কাজ করেছেন। পুতুল নাচের পরে সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চারমূর্তি' নাটিকা অভিনীত হয়। ইয়ুথ পাপেট ... পুতুল ... যোগায়, সেখানে নাটিকা অভিনয় ঠিক সংগতিপূর্ণ মনে হয় নি এবং পুতুল নাচ সুষ্ঠ পরিবেশনের ... ।

ক্লাসিক এণ্ড জনী' ছবিতে ডোনা ভগলাস

স্টুডিও খবর

পা...লী-চিত্রদীপ-এ... ...ম্যান রক্তের ছাব 'রাহগীর'-এর কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে ১২ই সেপ্টেম্বর থেকে এই হিন্দী ছবিটির কাজ হচ্ছে। বাংলা ছবি 'পলাতকা'র হিন্দী চিত্ররূপ 'রাহগীর' পরিচালনা করছেন একই পরিচালক তরুণ মজুমদার। তরুণ মজুমদার এই প্রথম হিন্দী ছবি পরিচালনা করছেন। বর্তমান চিত্র গ্রহণে অংশ গ্রহণ করেছেন: বিশ্বজিৎ, সন্ধ্যা রায়, নিরূপা রায়, পদ্মা, আনওয়ার হোসেন, রাশিদ খান, সি এস দুবে। ছবিতে আরো যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন: শশীকলা, বসন্ত চৌধুরী, কানাইয়ালাল, পাহাড়ী সান্যাল, ইফতেখার, জহর রায়, সবিতা চ্যাটার্জী, চমনপুরী, অসিত সেন, রামঅবতার।

সংগীত পরিচালনা করছেন: হেমন্তকুমার। গীত ও সংলাপ রচনা করেছেন গুলজার। ক্যামেরার কাজের দায়িত্বে রয়েছেন কানাই দে এবং সুখেন্দু রায়। সম্পাদনা করছেন: অমিয় মুখার্জী। নৃত্য পরিকল্পনা ...: সত্যনারায়ণ

'তিন অধ্যায়' ছবিতে উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী, অজয় গাঙ্গুলী ও শিবানী বসু

উদয়শংকরের আমেরিকা যাত্রা

ভারতের বিখ্যাত নৃত্যবিদ উদয়শংকর আবার সদলে আমেরিকা যাত্রা করছেন। ২৮শে থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর তিনি নিউইয়র্কে নৃত্যানুষ্ঠান করবেন। তার পরে তিনি তিন মাস আমেরিকা ও কানাডার ২৫টি শহরে অনুষ্ঠান করবেন। এবার নিয়ে তিনি এগারবার আমেরিকা পাড়ি দিলেন নৃত্য প্রদর্শনের জন্য। এবার তাঁর দলে থাকছে ১৫ জন মহিলা ও ৮ জন পুরুষ নৃত্যশিল্পী এবং ৮ জন সংগীত শিল্পী। চণ্ডালিকা অবলম্বনে 'প্রকৃতি ও আনন্দ' নৃত্যনাট্যের সঙ্গে ভারতের লোকনৃত্য ও ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্য প্রদর্শন করবেন।

স্বর-বিতান-এর বার্ষিক অনুষ্ঠান

গত ৯ই সেপ্টেম্বর মহাজাতি সদনে 'স্বর-বিতান' নৃত্যগীত শিক্ষায়তনের বার্ষিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন বসুমতীর বার্তা সম্পাদক শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতিত্ব করেছেন শ্রীবিনয় চক্রবর্তী। স্বর-বিতানের অধিকর্ত্রী শ্রীআরতি রায়চৌধুরী শিক্ষায়তনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষায়তনের ছাত্রছাত্রীরা রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প 'নতুন পুতুল' অবলম্বনে নৃত্যনাট্য প্রদর্শন করে।

চেকোশ্লোভাক চলচ্চিত্র উৎসব

চেকোশ্লোভাক কনসালেটের সহযোগিতায় সিনে সেণ্ট্রাল, ক্যালকাটা আগামী ১৫ই থেকে ১৯শে সেপ্টেম্বর প্রাচী প্রেক্ষাগৃহে এক চেকোশ্লোভাক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করেছেন। এই উৎসবে পাঁচটি সাম্প্রতিক কাহিনীর 'ক্যারেজ টু ভিয়েনা', 'রোমান্স ফর বিউগল', 'সান ইন সি নেট', 'দি এণ্ড অফ এজেন্ট ডব্লিউ সি ফোর' ও 'স্টোলেন এয়ারশিপ' এবং কয়েকটি খণ্ডচিত্র প্রদর্শিত হবে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, এ বছর এপ্রিল মাসে তথ্য ও বেতারমন্ত্রকের উদ্যোগে এ ছবিগুলি দিল্লী ও বোম্বাইতে দেখান হয়েছিল।

বাটানগরে নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠান

বাটানগর গত ৭ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় বাটানগর রিক্রিয়েশন ক্লাবের সৌজন্যে উক্ত ক্লাব হলে নৃত্যবিদ্ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রীদের দ্বারা 'রাবণ বধ' (নৃত্যনাট্য) 'পুতুল বিয়ে' (নৃত্যনাট্য) উচ্চাংগ ও পল্লীনৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমতী দীপ্তি চক্রবর্তী, সংস্থার কার্যকরী সভাপতি শ্রী বি ঘোষ মহাশয় ছেলেমেয়েদের নৃত্যকলার উপকারিতা সম্বন্ধে সময়োপযোগী ভাষণ দেন। নৃত্যে পাপড়ি বোস, নন্দিতা চক্রবর্তী, শুভ্রা ব্যানার্জী, পূর্ণিমা হালদার, কৃষ্ণা হালদার, মিতা পাল, শিপ্রা সেন, কৃষ্ণা সেনগুপ্তা, মধুমিতা সেন, মায়া ভট্টাচার্য, বৃন্দ সেন, কঙ্কণ বোস তন্দ্রা রায়, অনিতা ঘোষ, চন্দিমা ভট্টাচার্য, ইন্দ্রাণী সেনগুপ্তা, বিন্দু ভাদুড়ী, অরুণ দে, শর্মিলা গুহ, বিদুষী বসু, শোভা ধর, কণিকা রায়, ঝুমু ব্যানার্জী ঠাকুরতা প্রমুখ প্রশংসা অর্জন করেন।

আমরা এক অদ্ভুত সময়ে বাস করছি। চারদিকে আজ শুধু ছড়িয়ে আছে অরাজকতা। আজ আমাদের চারদিকে শুধু কলঙ্ক আর কিছু ব্যর্থ হাহাকার। সমস্ত ক্রীড়াঙ্গন জুড়ে আজ চলেছে চরম নৈরাশ্যের রাজত্ব। বিশেষ করে ফুটবল জগতের হাল আজ একেবারেই শোচনীয়। কোন দিকেই দেখা যাচ্ছে না এতটুকুও আশার আলো। মুঠো মুঠো অন্ধকারকে কে যেন ছড়িয়ে দিয়েছে বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষের ফুটবল জগতের ওপর। কিন্তু এর জন্যে বাংলা দেশের ফুটবল খেলা যতো না ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি হচ্ছে ভারতীয় ফুটবল। কারণ আজো যে বাংলা দেশই ভারতীয় ফুটবলের পিঠস্থান। অথচ বাংলা দেশের ফুটবলের হর্তা-কর্তা-বিধাতাদের খামখেয়ালিপনায় আর বড় বড় ক্লাব কর্তৃপক্ষের হঠকারিতার বাংলা দেশের ফুটবল খেলা আজ সত্যি-সত্যিই ডুবতে বসেছে।

কিন্তু সে জন্যে আজ হতাশায় ম্রিয়মাণ নন কেউই। হতাশা আসতে পারে কাদের—খেলোয়াড়দের, ফুটবল-রসিকদের বড় জোর ক্রীড়োৎসাহী জনগণের। ফুটবল কর্তৃপক্ষের? কদাচ নয়। ওঁদের মধ্যে হতাশা এলে যে অন্তত কিছুটা আশা থাকতো। ও সব ওঁরা থোড়াই কেয়ার করেন। আর সমালোচনা? দূর, দূর ও সব কি কেউ গায় মাখে না কি! তা ছাড়া ও সব নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে আর যাই হোক খেলার মাঠের কর্মকর্তা সাজা যায় না। তাই ওঁদের দোষ শোধার প্রশ্নও যেমন ওঠে না—তেমনি ঠেকেও শেখেন না তাঁরা। শিখলে—এইভাবে বার বার আমাদের দেশের মান-ইজ্জৎ নিয়ে বিদেশের মাটিতে লোক হাসাতে হতো না। হতো না এইভাবে পরাজয়ের লজ্জায় মাথা নিচু করে দেশে ফিরে আসতে।

কিন্তু 'কা কস্য পরিবেদনা'......! কে কার কথা শোনে। মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা নিয়ে অনেক কথা লেখা হয়েছে। ও কথা আজ না হয় থাক। কিন্তু চোখের সামনে কলকাতার ফুটবলের আই এফ এ শীল্ড খেলায় সম্প্রতি যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে—জেনে-শুনে সেপ্রসংগ তো বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ ময়দানী ফুটবলের সাম্প্রতিক এই ঘটনাটি অরাজকতার চরমতম লক্ষণ। আজ একটু ভেবে দেখুন—কলকাতার ফুটবল আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কথায় কথায় আইন-আদালতকে খেলার মাঠে টেনে আনা কি আজ সত্যিই দরকার। সত্যিই কি আজ আইনের সাহায্য নিয়ে কলকাতার ফুটবল দলগুলোকে আই এফ এ-র বিরোধিতা করে অংশ গ্রহণ করতে হবে ফুটবল প্রতিযোগিতাগুলোয়।

জানি আই এফ এ-র অনেক দোষ আছে অনেক অন্যায় আচরণ তাঁরা করেন। তাঁদের চোখে কলকাতা ময়দানের ছোট আর বড় দলগুলোর মধ্যে ভেদাভেদ বড় বেশি প্রকট। আই এফ এ-র অন্যায় আচরণ আর জেদের ফিরিস্তি দিতে গেলে, লেখা সহজে ফুরবে না— কিন্তু এ কথাও তো সত্যি যে ক্লাব কর্মকর্তারাও কিছু আর ধোয়া তুলসীপাতা নন। তাঁদেরও দোষের সীমা নেই, অন্যায় আচরণ করতে তাঁরাও পিছপা নন। আর আই এফ এ-র সংগে অসহযোগিতা করে তুলে তাঁরা মাঝে মাঝে ময়দানী ফুটবলে সৃষ্টি করে থাকেন এমন সব অদ্ভুত নজীর যার তুলনা মেলা ভার। তাই আজ আর বলতে বাধা নেই যে কলকাতা ময়দানের এই ফুটবল অরাজকতার জন্যে শুধু মাত্র আই এফ এ-ই নয়, ময়দানের ছোট বড়, ক্লাব কর্তৃপক্ষের সংগে সমানভাবে আমরাও দায়ী.....! —পার্থজিত

অলিম্পিক আসছে। আর সেই সংগে তাল দিয়ে মেক্সিকোতে ভারতীয় অলিম্পিক দল পাঠানো নিয়ে নাটকটাও বেশ জমে উঠেছে। একদিকে ভারতীয় অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশন আর অপরদিকে নিখিল ভারত স্পোর্টস কাউন্সিল।

ভারতীয় অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশন ভারতীয় দলের প্রতিনিধি হিসেবে মোট ৩৯ জনকে মেক্সিকো অলিম্পিকে পাঠাবার জন্যে সুপারিশ করেছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের কাছে। এই সভায় রাজা ভালিন্দার সিং-এর ওপর সেফ দ্য মিশন এবং সম্পাদক কোষাধ্যক্ষ মনোনয়নের ভার দেওয়া হয়েছিলো।

ভারতীয় অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশনের সুপারিশ মতো ৩৯ জন প্রতিনিধির বিভিন্ন বিভাগের নাম নিচে দেওয়া হলো—

হকি—১৮ জন খেলোয়াড় ও দুজন কর্মকর্তা।

কুস্তি—৫ জন মল্লবীর ও একজন কর্মকর্তা।

এ্যাথলেটিক—৪ জন এ্যাথলেট ও একজন কর্মকর্তা।

স্যুটিং—২ জন লক্ষ্যবিদ ও একজন কারিগর।

বক্সিং—১ জন মুষ্টিযোদ্ধা।

ভারোত্তোলন—১ জন প্রতিযোগী ও একজন কর্মকর্তা।

এ ছাড়া দলের সংগে যাবেন একজন শেফ দ্য মিশন ও সম্পাদক-কোষাধ্যক্ষ।

কিন্তু এর পরেই নিখিল ভারত স্পোর্টস কাউন্সিল এক সভায় মেক্সিকোগামী ভারতীয় দলে প্রতিযোগীর সংখ্যা কমিয়ে আনলেন ৩২ জনে।

যতোদূর জানা গেছে তাতে মনে হয় যে স্পোর্টস কাউন্সিল ভারোত্তোলন দলটিকে পুরোপুরি বাদ দিয়েছেন। এ্যাথলেটিক দল থেকে বাদ পড়েছেন দুজন প্রতিযোগী। আর কুস্তি দলে মল্লবীরের সংখ্যা পাঁচ থেকে কমিয়ে তিন করেছেন ভারতীয় স্পোর্টস কাউন্সিল।

তাই এখন সব কিছু নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের ওপর। কিন্তু ভারতীয় অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশন ও নিখিল ভারত স্পোর্টস কাউন্সিল—এই দুটি জাতীয় সংস্থার মতভেদ, আর যাই হোক, খুব সহজভাবে মেনে নেবার নয়।

ভারতীয় অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশন যে চারজন এ্যাথলেটকে মেক্সিকোয় পাঠাতে চেয়েছিলেন তাঁরা হলেন—

পারভীনকুমার—হ্যামার ও ডিসকাস থ্রো বিভাগে।

লাভ সিং—ট্রিপল জাম্প ও লং জাম্প।

ভীম সিং—উচ্চলম্ফন।

কৃপাল সিং—পাঁচ হাজার ও দশ হাজার মিটার দৌড়।

কিন্তু এই চারজনের মধ্যে নিখিল
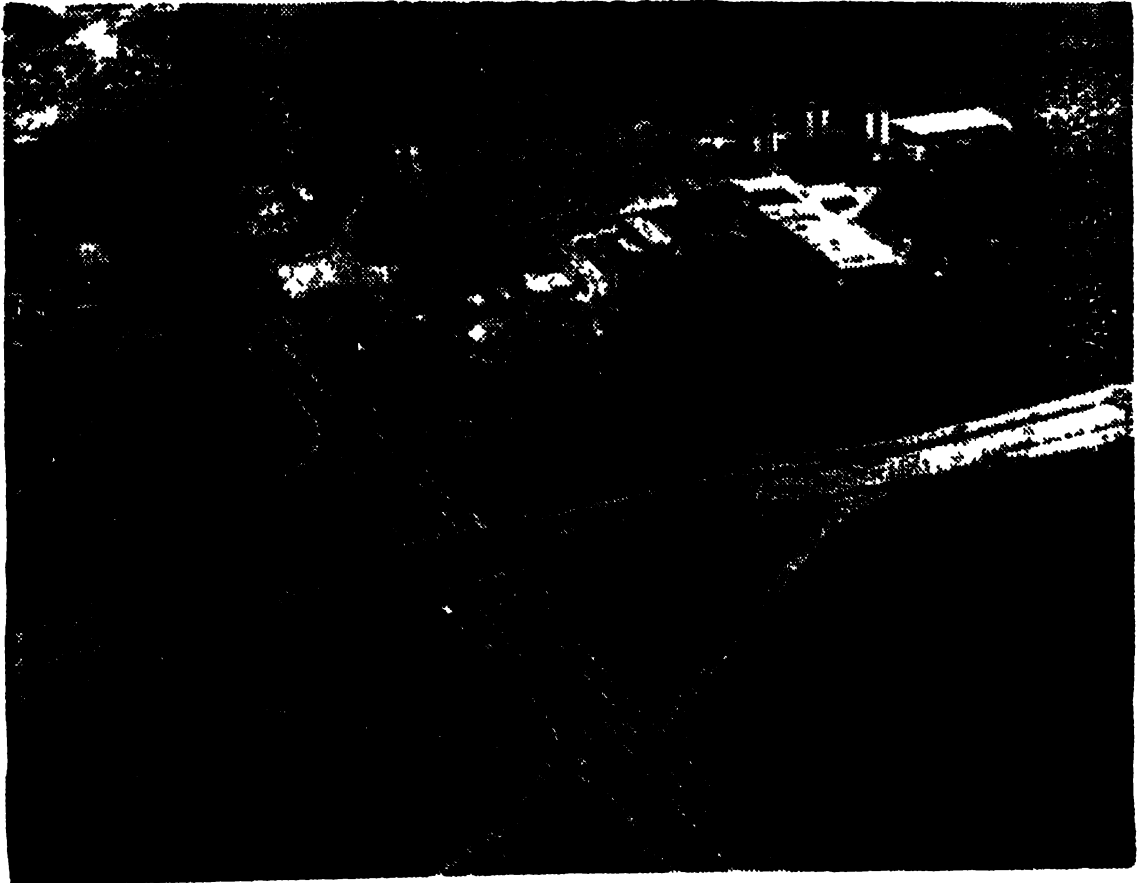
॥ ভবিষ্যতের সম্পূর্ণ শহর : আজকের অলিম্পিক গ্রাম ॥
মেক্সিকো অলিম্পিকে যোগদানকারী প্রতিযোগীরা সকলেই থাকবে ঐ অলিম্পিক গ্রামে। আর অলিম্পিক প্রতিযোগিতার পরে গ্রামটি একটি সম্পূর্ণ শহরে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

ভারত স্পোর্টস কাউন্সিলের বিচারে দু'জন প্রতিযোগী মেক্সিকোগামী অলিম্পিক দল থেকে বাদ পড়তে চলেছেন। স্পোর্টস কাউন্সিল এ'দের মধ্যে থেকে পারভীন কুমার আর ভীম সিংকে যেতে দেবার জন্যে অনুমোদন করেছেন।

দেখা যাক শেষ পর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রকের কৃপায় অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দলের হাল কি হয়......!

হকি ছাড়া ভারত মেক্সিকো অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যে সব বিষয়ে যোগদান করবে সেই সব বিষয়ের প্রতিনিধিদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে এ্যাথলেটদের বিশেষ আলোচনা প্রসংগে প্রতিযোগীদের নামও উল্লেখ করা হয়েছে, বাকী বিষয়গুলি ও তার প্রতিযোগীদের নাম নিচে দেওয়া হলো। তবে সব কিছুই এখন নির্ভর করছে ভারতীয় অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশন আর নিখিল ভারত স্পোর্টস কাউন্সিলের মনকষাকষির নিষ্পত্তির ওপর।

কুস্তি—বিশ্বম্ভর সিং (ব্যান্টম—রেলওয়ে) মুক্তিয়ার সিং (ওয়েল্টার—সার্ভিসেস) সামসের সিং (ফেদার—সার্ভিসেস) উদয়চাঁদ (লাইট—সার্ভিসেস) সুদেশ উমর (ফ্লাই—দিল্লী) ম্যানেজার ও কোচ—এ আর ভার্গব। ভারোত্তোলন—এম এল ঘোষ (রেলওয়ে)

স্যুটিং—মহারাজা কর্ণি সিং (বিকানীর) রাজকুমার রণধীর সিং ম্যানেজার ও গান মেকানিক—ঠাকুরলাল সিং।

মুষ্টিযুদ্ধ—স্টিভিস

আশা না পুরিল

শেষ পর্যন্ত সর্বভারতীয় ক'জন ক্রীড়া কর্মকর্তার সাধও মিটলো না, আশাও পূরলো না, অথচ মেক্সিকো অলিম্পিকে যাবার দিন যে ফুরিয়ে এলো।

বড় আশায় তাঁরা বেঁধেছিলেন বুক। মেক্সিকো অলিম্পিকের মহান অতিথি হিসেবে তাঁরা সেখানে যাবেন ভারতের কর্মকর্তা সেজে। কিন্তু আশার ছলনায় তাঁরা ভুল করলে কি হবে, ভুল হয় নি আসল জায়গায়।

তাঁরা সরাসরি বাতিল করে দিয়েছেন ওঁদের মেক্সিকো অলিম্পিকে যাবার প্রস্তাব। ভারতীয় ক্রীড়াজগতের নিরাশ হর্তাকর্তা-বিধাতাদের মধ্যে এঁরাও আছেন: সর্বশ্রী এম দত্তরায়, পঙ্কজ গুপ্ত, অশ্বিনীকুমার প্রমুখ।
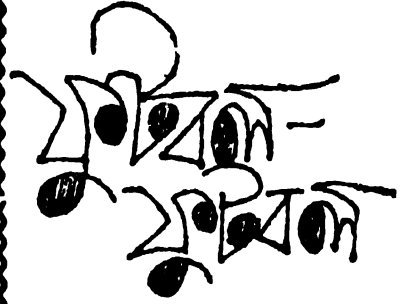
কলকাতার ফুটবল নাটকটা আবার বেশ জমে উঠেছে। আই এফ এ-র হঠকারিতায় কলকাতা ফুটবলের নাভিশ্বাস এবার বোধ হয় উঠবেই। কারণ দিন দিন চারদিক দিয়ে পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে বড় বিশ্রীভাবে।

সব থেকে বিশ্রী ব্যাপার হয়েছে রেফারীর বিষয়টি নিয়ে। আমরা অনেক দিন আগে থেকে লিখছি যে সি আর এ

আই-এফ-এ. শীল্ডের তৃতীয় রাউন্ডে মোহনবাগান বনাম ব্যাঙ্গালোরের এ-এস-সি (সাউথ) দলের খেলায় মোহনবাগানের শীতেশ বলকে গোল করতে দেখা যাচ্ছে।

অর্থাৎ ক্যালকাটা রেফারির এ্যাসোসিয়েশনের সংগে আই এফ এ-র সম্পর্কের অবনতি ঘটছে দিনের পর দিন।

এর জন্যে পুরোপুরি সব দোষটা বোধ হয় আই এফ এ কর্তৃপক্ষকেই দেওয়া যায়। ফুটবল ম্যাচে রেফারী পোস্টিং এর দায়িত্বের বেশির ভাগই সি আর এ-র। কিন্তু আই এফ এ কর্তৃপক্ষ বার বার মাথা গলাতে চাইছিলেন রেফারী পোস্টিং এর বিষয়ে। এই নিয়ে সি আর এ আর আই এফ এ-র মধ্যে চলছিলো দারুণ মতভেদ। আই এফ এ-র রেফারী পোস্টিং কমিটি সি আর এ সম্পাদক শ্রীরাসবিহারী চক্রবর্তীর মতামতকে ঠিক যেন গুরুত্ব দিতে চাইছিলেন না।

ফলে দিন কয়েক আগে নিজের সম্মান বজায় রাখার জন্যে সি আর এ সম্পাদক শ্রীরাসবিহারী চক্রবর্তী পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

তাঁর পদত্যাগের প্রধান কারণ হলো যে, তাঁর মতামত ছাড়াই আই এফ এ-র পোস্টিং কমিটি আই এফ এ শীল্ডের কোয়ার্টার ফাইন্যালে মোহনবাগান বনাম বি এন আর দলের খেলায় রেফারী পোস্টিং করেছিলেন।

এ ছাড়া আরো একটা সমস্যা হঠাৎ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। টিকিটের সমস্যা। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সভ্যসংখ্যা না কি এখন ছ' হাজার। কিন্তু শীল্ডের সেমি-ফাইন্যালে মহামেডান স্পোর্টিং-এর বিরুদ্ধে তাদের চ্যারিটি খেলায় সাড়ে পাঁচ হাজার টিকিট দিতে চেয়েছিলেন আই এফ এ। ফলে টিকিটের প্রশ্নে আবার শুরু হলো টানাবাহানা। সব সভ্যকে টিকিট দিতে না পারলে ইস্টবেঙ্গল খেলে কি করে......!

যাই হোক শীল্ডের খেলায় এবার বোধ হয় সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছিলো জেলা দল ২৪ পরগনা। তারা প্রথমে একটি বাইরের দলকে হারায়। কিন্তু কোয়ার্টার ফাইন্যালে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে সাংঘাতিক ভালো খেলে শেষ পর্যন্ত হেরে যায় ২—১ গোলে। খেলার প্রায় শেষ সময়ে ইস্টবেঙ্গল করেছিলো বিজয়সূচক গোলটি।

তবু এবারের শীল্ডের খেলায় ২৪ পরগনা দল যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে তার তুলনা মেলা ভার। ২৪ পরগনা দলের প্রতিটি খেলোয়াড়ের মধ্যে ছিলো অদ্ভুত একটা বোঝাপড়া, দলগত সংহতির অপূর্ব পরিচয় পাওয়া গেছে তাঁদের খেলায়! এক কথায় বলা যায় যে ২৪ পরগনার খেলোয়াড়েরা চেয়েছিলেন সত্যিকারের ফুটবল খেলতে। তাই তাঁরা লাভ করেছিলেন সাফল্য।

শেষ পর্যন্ত আই এফ এ-র সভাপতি শ্রীস্নেহাংশু আচার্যকেও পদত্যাগ করতে হলো। আমরা অবশ্য অনেকদিন আগে থেকেই এই রকম ধরণের একটা কিছুর আশংকা করছিলাম। তবে শ্রীআচার্য তার পদত্যাগের কারণ হিসেবে কিছুই বলেন নি। [illegible] "বর্তমানে আমি কেবল-মাত্র বলতে পারি যে আই এফ এ সভাপতি হিসেবে আমার পক্ষে আর থাকা সম্ভবপর নয় !

কিন্তু এতো দিন যে কি করে সম্ভব হচ্ছিলো সেটাও যথেষ্ট চিন্তার বিষয়। কারণ কলকাতার ফুটবলে এখন চলেছে শনির দশা। গতবারের শীল্ড ফাইন্যাল শিকেয় উঠেছে। এ বছরের লীগের

খেলা সুপার লীগের ব্যাপারটা কমপ্লেক্সে ভুগছে। আর শীল্ডের খেলার তো কথাই নেই। আইন-আদালত তো ইতিমধ্যেই এসে গেছে। এবার কি আসবে কে জানে।

কারণ ইস্টবেঙ্গল আর মহামেডান স্পোর্টিং-এর চ্যারিটি খেলা নিয়ে আই এফ এ কর্তৃপক্ষ যে কর্মদক্ষতার পরিচয় দিলেন তার তুলনা মেলা ভার। ইস্টবেঙ্গলের সভ্যসংখ্যার কথা জানা থাকা সত্বেও কেন বার বার আই এফ এ টিকিটের বিষয়ে টানাটানি করেন বোঝা যায় না। অথচ জল ঘোলা করে আবার তাঁদের নিজেদের মাথা নিচু করতে হয়। কিন্তু কেন এই [illegible]......!
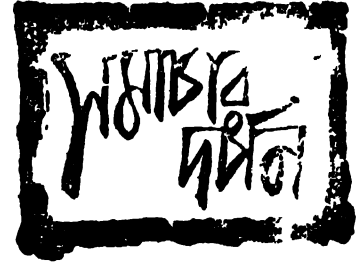
ডেভিস কাপ টেনিস [illegible] পূর্ব অঞ্চলের ফাইন্যাল [illegible] জাপানের বিরুদ্ধে খেলবে [illegible]। আগামী ২১, ২২ ও ২৩শে সে[illegible] পর্যন্ত চলবে এই প্রতিযোগিতা। ভারতের দলের খেলোয়াড়রা কিছু দিন আগেই জাপানে চলে গেছেন। জাপানের পক্ষে ভারতের বিরুদ্ধে খেলবেন—[illegible] মাবে, কিসিরো ইযানাগি [illegible] নাবে আর জুনজো কাওয়াস[illegible] নন প্লেয়িং ক্যাপ্টেন ও ম্যানেজার হয়েছেন যোশিরো ওতো।

* * *

আগামী ১৮ই সেপ্টেম্বর ভারত থেকে চারজন এ্যাথলেট বারো দিনের জন্যে রাশিয়া সফরে যাচ্ছেন। [illegible] জন খেলোয়াড় হলেন—এডোয়ার্ড সিকোয়েরা (১৫০০০ মিটার দৌড়) কে [illegible] (রড ও ট্রিপল জাম্প), ডি. এস [illegible] (৪০০ ও ৮০০ মিটার দৌড়), অজমীর সিং (২০০ ও ৪০০ মিটার দৌড়) সি এল [illegible] দলের ম্যানেজার হিসেবে রাশিয়া যাবেন।

* * *

নিগ্রো তরুণ খেলোয়াড় আর্থার অ্যাস আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মুক্ত টেনিস প্রতিযোগিতাতেও চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছেন। ফাইন্যালে তিনি তিন ঘণ্টা ধরে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাবার পর নেদারল্যান্ডের টম ওক্কারকে ১৪—১২, ৫—৭, ৬—৩, ৩—৬ ও ৬—৩ সেটে হারিয়ে দেন।

*

বিদেশ ভ্রমণরত ভারতীয় অলিম্পিক হকি দল কেনিয়ার কাছে প্রথম টেস্টে ০—১ গোলে হেরে গেছে। অলিম্পিক হকির প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদকের প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় দলের এই পরাজয় সত্যিই বিস্ময়কর। ভারতের এই হার হয়তো পাকিস্তানী খেলোয়াড়দের অনুপ্রেরণা জাগাবে। তবে এই পরাজয় থেকে ভারতীয় খেলোয়াড়রা যদি দোষ শোধরাবার আসল শিক্ষাটুকু গ্রহণ করতে পারেন তাহলে সেইটাই হবে আমাদের সব চেয়ে বড় পাওয়া।

প্রশ্ন : ভারতীয় ক্রিকেটদল আজ শুধু কলঙ্কে ভরা। কি করলে এই কলঙ্ক তোলা যায় বলতে পারেন?

উত্তর : ছাই দিয়ে ঘষে ঘষে দেখুন...!

প্রদীপকুমার ও অভিজিৎকুমার ঘোষ (টাউনহল, বসিরহাট, ২৪ পরগনা)

উত্তর : বাঙালী টেস্ট খেলোয়াড়দের নাম তোমরা মিলিয়ে দিচ্ছো নিশ্চয়ই। ডি চ্যাটার্জী বলে কোন ক্রিকেটার টেস্ট খেলেন নি।

পংকজ রায়ের ব্যাটিং এ্যাভারেজ নিচে দিলাম বোরদেরটা আপ টু ডেট করে পরে জানাবো।

	টেস্ট	ইনিংস	অপ্র	রান	সর্বোচ্চ	শতরান	গড়
পংকজ রায়—৪৩		৭৯	৪	২৪৪২	১৭৩	৫	৩২.৫৪

পরিতোষ নাগ (প্রসন্ননগর, ফালা-কোনা, জলপাইগুড়ি)

উত্তর :

বোলিং এ্যাভারেজ

	টেস্ট	রান	উইকেট	গড়
মরিস টেট	৩৯	৪০৫১	১৫৫	২৬.১৩
লিন্ডওয়াল	৬১	৫২৫৭	২২৮	২৩.০৫

আর যাঁদের বোলিং এ্যাভারেজ জানতে চেয়েছিলেন, বোলিং-এ তাঁদের উল্লেখযোগ্য খুব একটা রেকর্ড নেই। অর্থাৎ তাঁরা কেউই ৭৫টি বা তার বেশি উইকেট পান নি।

মোঃ হাফিজুদ্দিন (ধনেকী, হাওড়া)

উত্তর : ভারতের এখনকার অধিনায়ক পাতৌদির নবাব প্রথম টেস্ট খেলেন ১৯৬১ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে। সেবার তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন ৩টি টেস্টে। তারপর ১৯৬৩ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে খেলেন ৫টা টেস্টে ১৯৬২ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ৩টি ও ১৯৬৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩টি টেস্ট ম্যাচে অংশ গ্রহণ করেছিলেন পাতৌদি। এর পরের খেলাগুলোর কথা তো আপনার জানাই আছে।

দীপক দেব (চন্দ্রকোনা)

উত্তর : আপনার চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। আপনার সংগে আমরাও ঐ বিষয়ে একমত। সাপ্তাহিক বসুমতীর খেলা-ধুলো বিভাগ আপনার কেমন লাগে জানালে খুশি হবো।

জিতেশরঞ্জন দত্ত (লংকা, নগাঁও, আসাম)

উত্তর : আপনার চিঠিটি পড়ে এবং সাপ্তাহিক বসুমতীর খেলাধুলো বিভাগটা আপনার খুব ভালো লাগছে জেনে আমরা উৎসাহিত হয়েছি।

কাউড্রে প্রসংগে আপনি যা জানতে চেয়েছেন তার বিস্তারিত বিবরণ গত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। আশা করি দেখে থাকবেন।

এবারের অলিম্পিক হকি দলে একজনও বাঙালী খেলোয়াড় নেই।

অজয় চ্যাটার্জী (সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলকাতা—৬)

উত্তর : শান্ত মিত্রের কোন একটি ক্লাবে যোগদান নিয়ে বাজারে যে গুজব চলছে সে সম্বন্ধে এখনই কিছু বলতে পারবো না। আগে শান্ত মিত্রের সংগে এই বিষয়ে কথা বলে নিই, তারপর আপনাদের জানাবো।

অরুণ গুহকর্মকার (তেজগঞ্জ, বর্ধমান)

প্রশ্ন : ইস্টবেংগলের প্রাক্তন খেলোয়াড় বলরাম জাতিতে কি?

অশোককুমার ... (মেদিনীপুর)

প্রশ্ন : আপনার মতে ফুটবল খেলার মধ্যে জয়, পরাজয় এবং ড্র—এই তিনটির মধ্যে কোনটি বেশি হয়ে থাকে?

উত্তর : তিনটেই !!

যে ঠিকানায় লিখেছেন সেই ঠিকানায় চিঠি দিলেই আমি পাবো।

নির্মলকুমার ঘোষ (গোমস্তাপাড়া, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লেফট আউট কে? তিনি কোন দেশীয় খেলোয়াড়?

উত্তর : বিশ্ব একাদশ তালিকা প্রকাশিত হলেই জানাবো।

তপংকর সরকার (হসপিটাল রোড, শালবনী, মেদিনীপুর)

উত্তর : আইন-কানুনের দুনিয়া বিভাগটা আপনাদের সকলকে সাহায্য করতে পেরেছে জেনে উৎসাহিত হয়েছি। কিন্তু আপনি হয়তো খেয়াল করেন নি যে অফ সাইড নিয়ে লেখার ঠিক আগেই আমরা পর পর কয়েকটি সংখ্যায় ছবির সাহায্যে ডাইরেক্ট ফ্রি কিক সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। আপনি একটু দেখে নেবেন। ইন ডাইরেক্ট ফ্রি কিক সম্বন্ধে শীঘ্রই আলোচনা করবো।

দুলাল চ্যাটার্জী (লামডিং, আসাম, এন· এফ· রেল)

উত্তর : অলস্টার দলের খেলোয়াড়দের বিষয়ে পরে লেখার ইচ্ছে আছে।

বি· বি· শ্যামল (অশোক এ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর—৪)

প্রশ্ন : তামানে, কুন্দরন ও ইঞ্জিনীয়ারের মধ্যে কে ভালো? ওঁরা ক'টি উইকেট পেয়েছেন?

উত্তর : মনে হয় ইঞ্জিনীয়ারই ভালো! উইকেটকীপাররা কিন্তু উইকেট পান না—ক্যাচ ধরেন...!

প্রিয়ব্রত ঘোষ (গৌহাটি, কামরূপ, আসাম)

উত্তর : আপনার দীর্ঘ চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। আপনি ঠিক পথেই চলেছেন। ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে চিঠি দিচ্ছি।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

৪৩ বর্ষ ; ১৫শ সংখ্যা—মূল্য ; ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ৯ই আশ্বিন, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 26th September, 1968

শারদোৎসব

এখন আর নেই অতিবর্ষণ, নেই মেঘলা আকাশে গুরুগুরু ধ্বনি। প্রকৃতিতে এখন চির নতুন শরতের আমেজ। পল্লীর প্রান্তরে প্রান্তরে লতায় পাতায় গাছের শাখায় রোদের মেলায় শরতের হাস্যমুখর খেলা। শহরেও তার সুখকর স্পর্শ।

শরতে প্রকৃতির নতুন রূপ দেখে মুগ্ধ হতে হয়। শারদোৎসবের আনন্দে সাধারণ মানুষের মনেও জাগে নব-জীবনের ছন্দ। তাদের আনন্দ উৎসারিত হয় প্রাণ থেকে প্রাণে।

এবারেও আনন্দ আছে; কিন্তু নিত্য-নৈমিত্তিক অর্থনৈতিক টানা-পোড়েনে বিঘ্নও কম নয়।

উৎসব যখন আসে, তখন সমাজের প্রতিটি মানুষের কর্তব্য সেই আনন্দ সমানভাবে ভাগ করে নেওয়া। একদা এমন দিন ছিল—যখন ব্যক্তিগত উৎসবও সর্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করত। এ যুগে সর্বজনীন উৎসব প্রচলনের বহুলত্ব পরিলক্ষিত হলেও, উৎসবের আসন্ন মুহূর্তে এক শ্রেণীর লোক ব্যক্তিগত স্বার্থকে বড় করার উদ্দেশ্যে মুনাফার ফাঁদ পেতে রাখে। ফলে আর্থিক কৃচ্ছ্রতা বৃদ্ধি পায় সাধারণ মানুষের। উৎসবের ভাবী আনন্দ সুরুতেই ম্লান হয়ে আসে। স্বয়ং অন্নপূর্ণাকে নির্ভর করতে হয় রেশনের বরাদ্দ নৈবেদ্যের উপর। স্বভাবতই সাধারণ মানুষগুলির অবস্থা কি হয়—তা বলাই বাহুল্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় প্রতিটি দ্রব্যের মূল্য ইতিমধ্যে বেশ বেড়ে গেছে।

শারদোৎসব বা দশহরার শুভ মুহূর্ত আসার আগেই বোধ হয় আনন্দ-বিদায় পর্ব শুরু হোল, কেন্দ্রীয় সরকারের [illegible] কর্মচারীদের। বিশেষত যারা অস্থায়ী কনিষ্ঠ কর্মী—তাদের মানসিক অবস্থা বোধ হয় সবচেয়ে খারাপ।

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের দাবি ছিল—প্রয়োজনভিত্তিক মজুরীর। শ্রীনেহরুর মৃত্যুর পর ভারতে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটলেও এবং সমাজের সর্বস্তরে প্রয়োজনভিত্তিক মজুরী স্থিরীকৃত হওয়া প্রয়োজন মনে হলেও, অন্যান্য স্তরে অন্যায় করা হবে—এই বিবেচনায় কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী-দের ন্যায্য দাবি থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। কেন্দ্রীয় সরকার সত্য-সত্যই যদি ন্যায়বিচার করতে চান—তাহলে আমরা মনে করি সমাজের এক শ্রেণীকে ক্রমাগত ধনী হতে দেবার সুযোগ এখনি বন্ধ করে আর্থিক বৈষম্য দূর করা উচিত। কিন্তু এ ব্যাপারে সরকার কি কঠোর হতে পারবেন? সরকারের আইন ও হুমকি খাটে একমাত্র নিরীহ সাধারণ মানুষের উপর। সাধারণ মানুষের পক্ষে বলা বিপদ যে, উঁচু মহলের ব্যক্তিদের বিদেশ ভ্রমণ ও অন্যান্য বহুল ব্যয় দেশের রুচিসম্মত আর্থিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপন্ন নয়।

ইতিপূর্বে আমরা বহুবার বলেছি যে, সরকারী কর্মচারীরা সরকারের অন্দর-মহলের লোক। সুতরাং অসন্তুষ্ট সরকারী কর্মচারী নিয়ে সরকারী কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে না। আমরা তাই মনে করি, ধর্মঘট নিয়ে যা হবার হয়ে গেছে (বিশেষভাবে পুলিশের হাতে রক্তপাত ও মৃত্যু কম বেদনাদায়ক ব্যাপার নয়), এখন উভয়পক্ষ পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি ও প্রতিহিংসার পথ পরিহার করে সমাধানের পথ গ্রহণ করুন। কেন্দ্রীয় সরকার আপিসে আপিসে ছাঁটাই, সাময়িক পদচ্যুতি ও চাকরি খতম করে দিয়ে নতুনভাবে চাকরিতে কর্মীদের নিয়োগ করার আইন প্রয়োগ না করে কর্মীদের আর্থিক সঙ্কট বিমোচনে কিছুটা সহায়তা করুন। দশহরা ও শারদোৎসবের প্রাক্কালে জনজীবনে অশান্তি যাতে বৃদ্ধি না পায়—সহানুভূতি ও দরদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার তা বিবেচনা করুন।

শারদোৎসবের আগে আর একটি সংবাদ হচ্ছে,—আগামী সতেরই নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচন অবশ্যম্ভাবী—তার ফলাফলে জয় বা পরাজয় যে কোন পক্ষের ভাগ্যেই থাকতে পারে। আমাদের অনুরোধ, শারদোৎসবের আনন্দে যে দ্বেষ ও দ্বন্দ্ব দূরীভূত হয়, রাজনৈতিক দলগুলিও পারস্পরিক দ্বেষ ও দ্বন্দ্ব মন থেকে দূর করে, দেশের সার্বিক কল্যাণে আনন্দের মধ্য দিয়ে আত্মত্যাগ করুন।

সর্বশেষে বলা প্রয়োজন, দেশের আর্থিক অনটন সত্ত্বেও শারদোৎসব উপ-লক্ষে এক শ্রেণীর চতুর পত্র পত্রিকা ব্যবসায়ী সাহিত্য প্রচারের নামে বিকৃত রুচির লেখার চকচকে মলাটে বাজার খাত করতে চায়। সাধারণ পাঠকশ্রেণী অন্যান্য সতর্ক পাঠকদের সাহায্যে এই ব্যাপারে প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পাবেন বলে আমাদের ধারণা। শারদোৎসবের আনন্দ বিকৃত রুচির আনন্দ নয়, সেকথা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

সম্পাদকীয়

ফেব্রুয়ারী না নভেম্বর, নভেম্বর না ফেব্রুয়ারী?

নিদেনপক্ষে ডিসেম্বরের শেষাশেষি?

এই সব তর্ক প্রশ্নের অবসান ঘটিয়ে, রাজ্যপালের সঙ্গে জরুরী সাক্ষাৎ সেরে, মহাকরণে সাংবাদিকদের কৌতূহল মিটিয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্বর্তী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জমে-ওঠা অনিশ্চিতির অবসান দূর করে যিনি যোধপুর পার্কের ছিমছাম বৈঠকখানা ঘরে বসে অভ্যাগতদের সঙ্গে সাময়িক বিরাম উপভোগ করছিলেন, তিনি নিজে কিন্তু পরম নিশ্চিন্ত কেন না তিনিই স্বচক্ষে দেশের অবস্থাটা সরেজমিনে তদন্ত করতে সবে কলকাতায় ফিরেছেন। দেখে এসেছেন কোথাও খটখটে শুখা, কোথাও হাঁটুতক জল, কিন্তু মধ্যবর্তী নির্বাচনের মুখোমুখি হওয়ার ব্যাপারে ভয়ঙ্কর বাধা পথ আগলে নেই।

স্বচক্ষে এইটুকু দেখার জন্যই দিল্লী থেকে ছুটে এসেছিলেন এস পি সেনবর্মা, ভারতের মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার, বাঙলার কৃতী সন্তান। পূর্ব-বাংলার বরিশালের সেই কর্মঠ পরিশ্রমী কিশোর শ্যামাপ্রসন্নের আত্মপ্রত্যয়দীপ্ত ক্লান্তিহীন কৌতূহলটি আজকের সুপ্রতিষ্ঠিত এবং এই মুহূর্তের বহুবিতর্কিত পুরুষ মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার এস পি সেনবর্মার পদমর্যাদাও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও হারিয়ে যায় নি। তাই দুর্দিনে যিনি যানবাহনহীন দুর্গম বন্যাপীড়িত জেলাগুলি পরিদর্শন করে ফিরলেন তাঁর মুখে ক্লান্তির রেখা বা অবসরলোলুপ ব্যস্ততার চিহ্নমাত্র খুঁজে পাই নি। তবু সন্দেহ নিরসনের জন্য প্রশ্ন করেছিলাম: সুদূর গ্রামদেশে পায়ে হেঁটেই ঘুরতে হল তো?

সৌম্যকান্তি সেনবর্মা স্মিতমুখে উত্তর দিয়েছিলেন: তবে কি কেউ পাল্কী পাঠিয়ে দেবে? হাতে ছাতি আর টান টান মালকোঁচা। মাইলের পর মাইল হাঁটতে হয়েছে। কোথাও জীপ-ঠেলা সার্ভিসও পেয়েছি। কিন্তু...উদ্ভাসিত মুখে বললেন: কোথাও দেখেছি ওরা ঘিরে দাঁড়িয়েছে। যত্ন করেছে। ডাব-কেটে খাইয়েছে।

আমার সাক্ষাতের উদ্দেশ্য জেনে জেনেই স্মিতমুখে [illegible] কী আর দিয়েছি! [illegible] আর কতটুকু? [illegible]

[illegible] নিজেকে [illegible] আর [illegible] কঠোর পরিশ্রম দরকার।

মিথ্যে নয় সেনবর্মার এই উক্তি। তাই তিনি মানেন, সেই সঙ্গে আরো বেশি করে মানেন পুরুষকার। কিন্তু নিজের পদমর্যাদার জন্য সাধারণের সঙ্গে এতোটুকু ব্যবধানবোধের দাবি তাঁর নেই।

তাকিয়ে দেখলাম আজকের বিতর্কিত মানুষটিকে। পরনে একটি [illegible] গেঞ্জি আর সাধারণ ধুতি। মুখে প্রফুল্ল প্রত্যয়স্নিগ্ধ আন্তরিকতার আলো। দু'চোখে কর্তব্যনিষ্ঠার দ্যুতি।

সেনবর্মা [illegible] মানেন [illegible] ঠিকুজীকুষ্ঠীর ওপর নির্ভরতা। [illegible]

এস পি সেনবর্মা

তাঁকে পরিশ্রমের মর্যাদা এবং মূল্য সম্পর্কে সচেতন করেছিল। পিতা স্বর্গত অমৃতলাল সেনবর্মা ছিলেন বরিশালে পনের টাকা মাসিক সাম্মানিকের টোল পণ্ডিত।

: [illegible] মধ্যে বড় হয়েছি। বাবা আশীর্বাদ করতেন, আশীর্বাদ করি তোমার পঞ্চাশ টাকা মাইনে হোক। সেনবর্মা [illegible] বলেছেন। [illegible]

[illegible]

এস পি সেনবর্মা [illegible]

: বড় [illegible] এক [illegible] আমাদের স্কুলে দাঁড় করিয়েছিলেন। সেনবর্মা স্বর্গত বড় দাদার স্মৃতির মধ্যে মুহূর্তের জন্য হারিয়ে গেছলেন। আর সেই সময় মানুষটিকে বড় কাছের জন বলে মনে হয়েছিল।

১৯০১ সালের ফেব্রুয়ারীতে বরিশালে স্বর্গত অমৃতলালের দারিদ্র্যজর্জরিত আবাসে এস পি সেনবর্মার জন্ম। কিন্তু দারিদ্র্য তাঁকে দমাতে পারে নি, পায়ে পায়ে কৃতিত্ব যেন বাধা পড়েছিল।

১৯৩৭ সাল থেকেই তিনি নির্বাচনী আইন সংক্রান্ত দপ্তরে। বাঙলা দেশে। এরপর এলো দেশভাগের পর সেই মর্মান্তিক দিনগুলি। এস পি সেনবর্মা ভারত সরকারের বিচার বিভাগে প্রথমে অফিসর অন স্পেশ্যাল ডিউটি পদে যোগ দিলেন। তারপর থেকে বিচার বিভাগেই তাঁর একটানা কর্মজীবন। ১৯৫১ সালে ভারত সরকারের আইনমন্ত্রকের ডেপুটি সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। অতঃপর সেক্রেটারী। মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার পদে যোগদানের আগে তিনি ছিলেন ভারতীয় আইন কমিশনের সদস্য।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছল। যোধপুর পার্ক থেকে বিদায় নিচ্ছি, আকাশবাণীর সংবাদে—তখন তারস্বরে ঘোষণা চলছে, ১৭ই নভেম্বরেই পশ্চিমবঙ্গে মধ্যবর্তী নির্বাচনের সঠিক তারিখ।

আমার দেখা সাদা-মাটা প্রশান্ত এস পি সেনবর্মা আর ঐ রেডিওর ঘোষণার অন্তরালে সিদ্ধান্তকারী একরোখা মানুষ এস পি সেনবর্মা—এ দুই কেন দুটি বিচ্ছিন্ন সত্তার পৃথক। আজকের যুগেও প্রতিভা মানুষকে আত্মম্ভরী করে নি এও এক বিস্ময়।

শুধু যদি বাঙলার মাটির প্রাণ থাকলেই এটা সম্ভব। আর তাই এ প্রসঙ্গে বাঙলার আর এক কৃতী সন্তান, স্বর্গত সুকুমার সেনের কথাও মনে পড়ে গেল। স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্বাচনী কমিশনার [illegible]

বঙ্গদর্শন

[illegible] / [illegible] পুলিশী জুলুম

দুর্গাপুরে কারখানার চেয়ারম্যানকে মারবার চেষ্টা / পশ্চিম দিনাজপুরে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীদের পাল্টা সংগঠন / লবণহ্রদ উপনগরী প্রকল্প এখনো জলে জলে / ধর্মঘটের সিদ্ধান্তে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মীরা অবিচল / শ্রী ডি-এম-সেনের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা / বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্মচারীদের লাগাতার ধর্মঘট সুরু /

কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের প্রতীক ধর্মঘট

শেষ পর্যন্ত দশটি প্রাণের বিনিময়ে, চারশো মানুষকে আহত করে, এবং চার হাজারেরও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করে, সারা দেশজোড়া প্যানিক সৃষ্টি করে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের একদিনের প্রতীক ধর্মঘটের যে মোকাবিলা কেন্দ্রীয় সরকার করলেন তা দেখার মত। কিছু কাল আগে ফরাসী দেশে যে বিদ্রোহ ঘটে গেল তাতেও বোধহয় দশটি প্রাণ বলি হয় নি, মানুষের মূল্য এখানে এতই কম। ধর্মঘট ভাঙার জন্য কম চেষ্টা হয় নি, প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়নগুলিকে পর্যাপ্তভাবে উস্কানী দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ধর্মঘট আংশিক সাফল্য লাভ করেছে। [illegible] কিছু কিছু ট্রেন চলাচল করলেও মোটের বেশির ভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী ধর্মঘটে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ডাক বিভাগের ধর্মঘট প্রায় [illegible] আনাই সাফল্যলাভ করেছে। এই ধর্মঘটকে উপলক্ষ করে কলকাতা ও আশেপাশের অঞ্চলে কিছু হাঙ্গামাও হয়ে গেছে। ব্যাপারটাকে বর্তমানে জয়-পরাজয়ের নিরিখে দেখা শুরু হয়ে গেছে। [illegible] পক্ষই সাফল্যের দাবি করছেন। [illegible] অফিস [illegible] না [illegible] এটা বড় কথা নয়। [illegible] সরকারী কর্মচারীদের দাবি-[illegible] ন্যায্য ছিল কি না এবং এই বিষয়ে সরকারী মনোভাব কতদূর সঙ্গত। কর্ম-চারীদের দাবি যে ন্যায়সঙ্গত [illegible] [illegible] না [illegible]

নি, এবং এখন সরকারের পক্ষে তা সম্ভব-পর কোন দিনই হবে না, তখন বেতন বাড়ানো ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই এটাই সহজ বুদ্ধির কথা। কিন্তু সরকার তাও করবেন না। কাজেই ধর্মঘট ও আন্দোলন ছাড়া আর কোন পথ নেই, অন্তত কর্ম-চারীদের পক্ষে। আলাপ-আলোচনার দ্বারা এ সমস্যা সমাধান হবার নয়, তা ইতি-পূর্বে বহুবারই হয়েছে কিন্তু এক ফাঁকা আশ্বাস ছাড়া কর্মচারীদের কপালে আর কিছুই জোটে নি। ধর্মঘট দমাবার জন্য সরকারের প্রচেষ্টা এবং কর্মচারীদের আন্দোলনের প্রতি সরকারের মনোভাব সমর্থন করার একটাও যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। ধর্মঘটি কর্মচারীদের প্রতি সরকার 'কংকার্ড পীপলের' মত আচরণ করেছে, এবং গোড়া থেকেই সরকারের মনোভাব এ বিষয়ে সভ্যতা ও শালীনতা-বিহীন, সরকারী কর্মচারীরা যেন এক দিনের প্রতীক ধর্মঘটের দ্বারা বিপ্লব করে সরকারকে উৎখাতের চেষ্টা করছেন, ভাবটা যেন এই। বস্তুত প্রচণ্ড প্রোভোকেশন ও ভীতির মুখে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারী-দের অধিকাংশ যে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

[illegible]

আমাদের সংবিধানে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারকে, দাবি আদায়ের জন্য ধর্মঘটের অধিকারকে [illegible] স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু কর্মচারীরা যখনই এই অধিকার প্রয়োগ করতে যান তখনই তা [illegible]

আগে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মচারী-দের একদিনের প্রতীক ধর্মঘটের সময় দেখেছি, এবং এবারেও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের প্রতীক ধর্মঘট পালন উপলক্ষে দেখা গেল যে ধর্মঘটিদের যেন আগে থেকেই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকারের তরফের 'সাজ সাজ' রবটা ধর্মঘটিদের চেয়েও বেশি, সৈন্যবাহিনী, পুলিশ, লাঠি, বন্দুক, কাঁদানে গ্যাস সব রেডি, ধর্মঘটিদের পূর্বাহ্নেই গ্রেপ্তার, যেন একটা যুদ্ধের মহড়া। সংবিধানকারেরা যদি জানতেন যে তাঁদেরই প্রদত্ত মৌলিক অধিকার কার্যত এই অবস্থায় পরিণত হবে তাহলে তাঁরা বোধ হয় এই ধারাটি যোগ করতেন না।

যে সরকার কোন কিছুরই গ্যারান্টি দিতে পারে না, ধর্মঘটিদের ওপর হামলা করার অধিকার সেই সরকারের আছে কি না সে প্রশ্নের আগেই সেই সরকারের অস্তিত্বের যৌক্তিকতা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে। দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি সরকার রোধ করতে পারেন নি। গত পাঁচ বছরে প্রতিটি জিনিসের দাম দ্বিগুণ হয়েছে, অথচ বেতন সেই তুলনায় বাড়ে নি। সরকার বেতন বাড়াবেন না, অথচ আন্দোলন করতে গেলে কুকুর লেলিয়ে দেবেন। সরকারের দেখা-দেখি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিও নির্মম ভাবে ধর্মঘটের মোকাবিলা করছে, কথায় কথায় কারখানা লক-আউট করে দিচ্ছে, কয়েক মাস কারখানা বন্ধ করে মালিকের কোটিপতির লোকসান নেই, শেষ পর্যন্ত পেটের জ্বালায় বাধ্য হয়ে অপমানজনক শর্তে [illegible] কাজে [illegible]

"কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র" মালিকেরই কল্যাণ করে শ্রমিকের নয়। মার্টিন-বার্ন কোম্পানীর ধর্মঘটের সময় এটাই দেখা গেছে, সিনেমা-হল কর্মীদের ধর্মঘটের সময়ও একই দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে। শ্রম-বিরোধের ক্ষেত্রে সরকার কোন দিনই শ্রমিকের পক্ষ অবলম্বন করে না।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে গত কয়েক বছর ধরে শ্রমিক-কর্মচারীদের কোন আন্দোলনই সাফল্য লাভ করছে না, যার ফলে তথাকথিত ট্রেড ইউনিয়নের দ্বারা সত্যকারের শ্রমিক-কর্মচারীদের কোন সুরাহা আদৌ হওয়া সম্ভব কি না সে বিষয়েও প্রশ্ন তোলার সময় এসেছে। প্রতিটি শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের দ্বারা পরিচালিত, প্রত্যক্ষে না হলেও, পরোক্ষে। একটি প্রতিষ্ঠানে একাধিক ট্রেড ইউনিয়নের অস্তিত্ব অত্যন্ত প্রকট, কাজেই একটি ইউনিয়ন যদি ধর্মঘটের পক্ষে যায়, অপরটি বিপক্ষে যাবে যার ফলে ধর্মঘট ব্যর্থ হতে বাধ্য।

তাহলে সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে যে, ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে রাজনৈতিক দলের আওতার বাইরে আনা উচিত। কথাটা মুখে বলা সহজ কিন্তু বাস্তবে অসম্ভব। কেন না দলীয় রাজনীতিই সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি। যতদিন রাজনৈতিক দল থাকবে ততদিন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেগুলির অনুপ্রবেশ থাকবে, এটা স্থূল সত্য। কল-কারখানা, অফিস-আদালতের কথা বাদ দিলাম, স্কুল বা কলেজের এমন কি সাধারণ খেলাধুলোর ক্লাবেও পরিচালনার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কম্পিটিশন শুরু হয়ে যায়। সম্প্রতি একটি স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির গার্জেন রিপ্রেজেন্টেটিভ নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা গেল যে, রাজনৈতিক নেতারা জীপ নিয়ে অভিভাবকদের বাড়ি বাড়ি ঘুরেছেন তাঁদের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ানোর জন্য। কাজেই ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে রাজনৈতিক দলের আওতা থেকে বার করে আনার যাঁরা পরামর্শ দেন তাঁরা মূর্খের স্বর্গরাজ্যে বাস করছেন।

আমাদের আলোচনার ধারা যদি সঠিক হয়, তাহলে একটা সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ। ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে এই দলীয় অনুপ্রবেশ থাকবে। ফলে শ্রমিকশ্রেণী চিরকাল দ্বিধা-বিভক্ত থাকবে, এবং তাদের আন্দোলন কোনদিন সাফল্যমণ্ডিত হবে না।

পশ্চিমবঙ্গে শ্রমবিরোধ

রাষ্ট্রপতির শাসনে আশা করা গিয়েছিল যে, শ্রম-বিরোধের সমস্যাগুলো দূর হবে, রাজ্যপালের জবর শাসনে মালিক-শ্রমিক একই ঘাটে জল খেতে বাধ্য হবে এবং প্রচলিত অর্থে আইন-শৃঙ্খলা ফিরে আসবে। অর্থাৎ সংবাদপত্রে ধর্মঘট আন্দোলন ইত্যাদির সংবাদ থাকবে না, বাস্তবে তা ঘটলেও। কিন্তু কার্যত সেটা হল না। রাষ্ট্রপতির শাসনের আমলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মচারীরা সাফল্যের সঙ্গে একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করলেন। মার্টিন-বার্ন ও টেক্সম্যাকোর ধর্মঘট রাজ্যপালের চোখের সামনেই ঘটল। তারপর এল সিনেমা হল কর্মচারীদের ধর্মঘট, যা রাষ্ট্রপতির শাসনের একটি কলংকজনক অধ্যায়। সিনেমা কর্মীদের দাবির প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েও শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির প্রশাসন মালিকশ্রেণীর চরণেই আত্মসমর্পণ করল। এই রকম দৃষ্টান্ত বড় একটা দেখা যায় না। এদিকে যত না ধর্মঘট হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে লক-আউট ও লে-অফ। গত সপ্তাহ থেকে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মীরা ধর্মঘট শুরু করেছেন, আবার গত সপ্তাহ থেকেই ব্রেথওয়েট কোম্পানীগুলিতে লক-আউট ঘোষিত হয়েছে।

কাজেই রাষ্ট্রপতির শাসনের মহিমায় যাঁরা গদগদ তাঁরা নিশ্চয়ই এই সব নিদর্শন দেখে মোহমুক্ত হবেন। আসলে রাষ্ট্রপতির প্রশাসন কোন দিক থেকেই কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারে নি, অবশ্য পারা সম্ভবপর কি না সে বিষয়েও প্রশ্ন তোলা যায়। তবে এ বিষয় নিয়ে সংবাদপত্রে বিশেষ হৈ চৈ করা হয় নি, এই যা। দুর্গাপুরে রাজ্যপালের আমলেই যে একটা এত বড় কেলেঙ্কারী ঘটে গেল, সে বিষয় আশ্চর্য নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু সত্য কোনদিনই চাপা থাকে না, থাকবে না।

প্রতীক ধর্মঘট ও আকাশবাণী

এযুগে বোধ হয় প্রচারের জোরেই সত্যের সৃষ্টি হয়, এবং প্রচারের বাহনগুলো কোন ব্যক্তি বা দল যতটা করায়ত্ত করতে পারবে ততই তাদেরই জয়-জয়কার। এই বাহনগুলি হাতে থাকলে হয়কে নয় এবং নয়কে হয় করতে মোটেই সময় লাগে না। প্রচারের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার এদেশে দুটি, রেডিও ও সংবাদপত্র। প্রথমটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন এবং সরকারের গুণকীর্তন করা ভিন্ন অন্য কোন কাজ তার নেই। এই কারণেই রেডিওর প্রচারিত সংবাদ বা তথ্যের ওপর কোন গুরুত্ব না দেওয়াই [illegible] [illegible] বেতার কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ পরিবেশন ও ভাষ্যের যে-সব নমুনা পাওয়া যাবে সেটা কোন গণতান্ত্রিক দেশের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা উনিশে সেপ্টেম্বর তারিখে যে প্রতীক ধর্মঘট পালন করেছেন সে সম্পর্কে আকাশবাণী প্রচারিত সংবাদে এবং ভাষ্য-সমূহে ধর্মঘটের সমর্থকদের গালিগালাজ করা হয়েছে, এবং যে সব প্রতিষ্ঠান ধর্মঘটের বিপক্ষে মত দিয়েছে তাদের প্রশংসা করে আকাশ ফাটানো হয়েছে। যেখানে ধর্মঘটিরা এবং সরকার পরিষ্কার দুটি পক্ষ সে ক্ষেত্রে একটি পক্ষের বক্তব্যের সাফাই গাওয়া আকাশবাণীর পক্ষে কি উচিত কাজ হয়েছে? একথা এখনও প্রমাণ-সাপেক্ষ যে ধর্মঘট প্রসঙ্গে সরকারের বক্তব্য ঠিক, এবং ধর্মঘটিদের বক্তব্য ভুল। সরকার ন্যায়সঙ্গত পথ অবলম্বন করেছেন কি না, সরকারের বক্তব্য সত্য কি না তা কি আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ যাচাই করে নিয়েছিলেন? ধর্মঘটিদের বক্তব্যগুলিকেও বা একই সঙ্গে প্রচার করা হল না কেন? ধর্মঘটের সমর্থকদের আগে থেকেই হুলিগান আখ্যা দেওয়া হলো কেন?

আকাশবাণীকে সরকারী প্রচারযন্ত্র বলে মনে করতে অনেকেই অভ্যস্ত, কিন্তু আজ এ-বিষয়ে কিছু প্রশ্ন তোলার সময় এসেছে। সরকার যদি জনসাধারণের কাছ থেকে লাইসেন্স ফি না নিয়ে আকাশবাণী মারফত নিজেদের ঢাক পেটাতেন, তাহলে হয়ত কিছুই বলার ছিল না। কিন্তু শ্রোতারা যখন বছরে পনের টাকা করে আকাশবাণীর মজুরী দেন তখন এটাই স্বতঃসিদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় যে আকাশবাণী চলে জনসাধারণের অর্থে। এখন এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই করা যেতে পারে যে জনসাধারণের অর্থে পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠান কিভাবে একদেশদর্শী ও পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ পরিবেশন করেন? সংবাদ বা তার ভাষ্য নিঃসন্দেহে আপেক্ষিক দলীয় রাজনীতি কোন দেশে প্রচলিত থাকলে, একটি বিশেষ ঘটনার তাৎপর্য দু দলের নিকট দুরকম হবে। সে ক্ষেত্রে কোন একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে সংবাদ বা তার ভাষ্য প্রচার করলে তা শাসকমহল তথা সরকারের মনস্তুষ্টির কারণ হতে পারে বটে, কিন্তু তাতে জনসাধারণকে বিপথ-চালিত করা হয়।

যদি প্রকৃতই গণতন্ত্রের স্বার্থে বিদ্-[illegible]
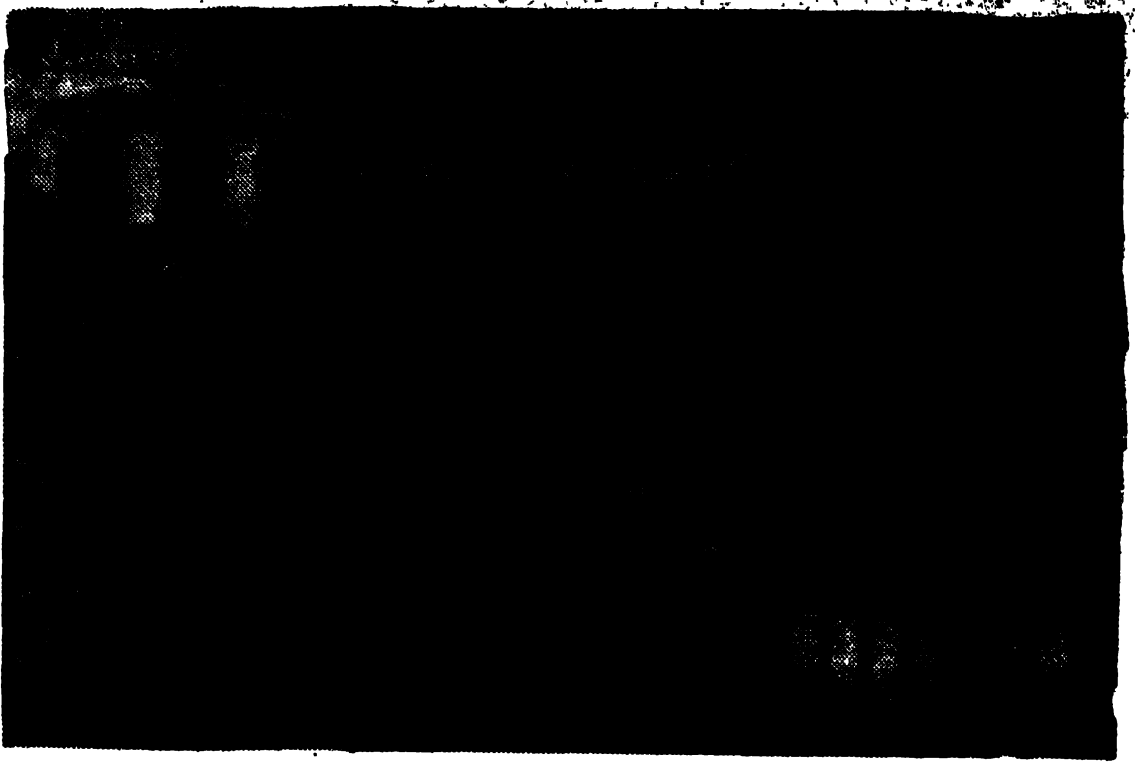
কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘটের দিনে অফিস টাইমে হাওড়া স্টেশনের এক চিত্র—যাত্রী আছে, কিন্তু অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেক কম।

রাত দশটায় ছেড়ে শিলিগুড়িতে পৌঁছবে বেলা আড়াইটায়। শিলিগুড়ি থেকেও কলকাতামুখী বাস ছাড়বে রাত সাড়ে দশটায়। এসপ্ল্যানেডে এসে পৌঁছবে বেলা তিনটেয়। রাস্তার দূরত্ব ৩৭৫ মাইল। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া যথাক্রমে ৪৫ ও ৩০ টাকা। বাসগুলির নামকরণেও রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ডঃ বি কে ভট্টাচার্য যথেষ্ট রসজ্ঞ মনের পরিচয় দিয়েছেন। রাতের বাস। স্বভাবতই নিদ্রাতুর যাত্রীদের বাসগুলিরও নাম দেওয়া হয়েছে 'স্বপ্নযানা', 'সুপ্তিযানা', 'স্বপ্নায়না' ও 'তন্দ্রায়না।' বেনিয়াগ্রামঘাটে কর্পোরেশন ব্যবস্থিত স্টীমলঞ্চে পারাপারের সুচারু ব্যবস্থাও করা হয়েছে। হঠাৎ কোনো বাস পাছে বিগড়ায়, সে কারণে 'স্টাণ্ড বাই' বাসের বন্দোবস্ত থাকবে।

মোট ২৮ জন (প্রথম শ্রেণীতে ১২+দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৬ যাত্রীর ব্যবস্থা-সম্পন্ন এই সব বাসে শৌচাগারও রয়েছে।

নৈহাটি-চুঁচুড়া লঞ্চ সার্ভিস

নৈহাটি-চুঁচুড়া লঞ্চ সার্ভিসের গুরুত্ব অত্যধিক কেন না প্রত্যহ দশ হাজারেরও বেশি যাত্রী এখান দিয়ে পারাপার করে। ১৯৪১ থেকে ১৯৬৮-র গোড়ার দিক পর্যন্ত কে এম ঘোষ এই ফেরী সার্ভিসের ইজারাদার ছিলেন, ১৯৬৮ সালের গোড়ার দিক থেকে মা-কালী লঞ্চ কোম্পানী নতুন ইজারা নিয়েছে, বর্তমান ইজারাদারের নাম . . .

কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এই প্রতিষ্ঠানটি মোটেই কর্মক্ষমতা দেখাতে পারছে না, যার ফলে যাত্রীদের ভোগান্তি এবং হয়রানির সীমা নেই। পারাপারের লঞ্চ কোন সময় মেনে চলে না, একটি লঞ্চ সর্বদাই অচল অবস্থায় পড়ে থাকে, সর্বোপরি দুই পারের দুই জেটির অবস্থা এমনই শোচনীয় যে, যে কোন মুহূর্তেই খুব বড় ধরনের এক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। ভাঙা জেটির ওপর দিয়ে যাত্রীদের, রোগী, শিশু ও মহিলাদের প্রাণ হাতে নিয়ে যাওয়া-আসা করতে হয়। যে কেউ অকস্মাৎ স্বচক্ষে দেখে আসতে পারেন, কলকাতা থেকে খুব দূরে নয়।

লঞ্চ কোম্পানী এ সব বিষয়ে নির্বিকার। পুরাতন কোম্পানী তবু কিছুটা দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ছিল, এদের কোন চক্ষুলজ্জাই নেই। হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটি ও তার অকর্মণ্য পৌরপিতাদের ঔদাসীন্যও লক্ষ্য করার মত, কিন্তু কথা হচ্ছে ওই মিউনিসিপ্যালিটি এই সার্ভিসের ইজারা বাবদ মোটা টাকা নিয়েও কাজের বেলায় কিছুই নয়। অবশ্য অপদার্থতার সুনাম হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির চিরকালের। এই মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এত ঘন ঘন বদলায় যে, তাঁদের নামই মনে রাখা যায় না।

এ বিষয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কিছু দায়িত্ব আছে সেই কথাটা তাঁকে আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। আশা করি তিনি জনস্বার্থ ও ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় লঞ্চ কোম্পানীকে নতুন জেটি তৈরি করতে এবং ভালভাবে লঞ্চ চলাচলের ব্যবস্থা করতে বাধ্য করবেন। যাত্রীরা চিরকাল মুখ বুজে দুর্ভোগ সইবে না, যে কোন মুহূর্তে গণ্ডগোলের সম্ভাবনা আছে, আশা করি তিনি এদিকে নজর দেবেন।

কালিন্দীখাল অভিযান

২৭শে সেপ্টেম্বর পরিতোষ সেনের নেতৃত্বে একটি অভিযাত্রী দল গঙ্গোত্রী গোমুখ অতিক্রম করে নন্দনবন [illegible] পথ ধরে কালিন্দীখাল (১৯৫০০ ফুট) অভিমুখে চলেছেন। [illegible] মৃগেশ ভৌমিক, সরোজ গুহরায়, মনোজমোহন হাজরা, দুর্গাপদ দত্ত, শংকর ভৌমিক, শচীন্দ্র চ্যাটার্জী ও ডঃ অমিয় ঘাঁটি এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন।

গ্রাম-গ্রামান্তরে

আমাদের আবেদন একেবারে ব্যর্থ হয় নি। এবারকার বন্যার পশ্চিম বাংলার হাজার হাজার গ্রাম ভেসে যাওয়ার পর সাপ্তাহিক বসুমতী'র মাধ্যমে বারে বারে সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছি যে, বন্যার্তদের স্থায়ী পুনর্বাসনের জন্যে স্বর্গত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরিকল্পনা সংশোধন করে কাজে লাগানো হোক। সে আবেদনে আমলারা সাড়া দেন নি, তাঁরা রিলিফের দিকেই বেশি করে ঝুঁকেছিলেন। রাজ্যপাল ডাঃ রায়ের 'বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় নিজের বাড়ি নিজে তৈরি করো' পরিকল্পনাটি আনিয়ে পড়েন এবং সেইটেই কিছু সংশোধন করে কার্যকর করতে চলেছেন।

রাজ্যপাল সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে বন্যাবিধ্বস্ত গ্রামগুলি পুনর্গঠনের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের নির্দেশ দিয়েছেন। যাঁরা পাকাবাড়ি তৈরি করতে চান তাঁদের প্রয়োজনীয় ইট সরবরাহেরও তিনি নির্দেশ দিয়েছেন; ইটের দাম লাগবে না, ইট পোড়াবার জন্যে যে কয়লা লাগে তার দামটুকু দিলেই চলবে। বন্যায় যারা সর্বস্বান্ত হয়েছে তাদের পক্ষে এখন ঐ কয়লার দামটুকু দেওয়াও সম্ভব নয়; কয়লার দাম না দিতে পারার জন্য অনেকে আবার সেই কাঁচা বাড়িই তৈরি করবে—তাহলে আগামী বছর আবার সর্বনাশ হবে। কাজেই কয়লার দাম যাতে পাকা-বাড়ি তৈরি করার ব্যাপারে কোন অন্তরায় সৃষ্টি না করে সেটা দেখা সরকারের কর্তব্য। এ ব্যাপারে এমন একটা রফা বন্যার্তদের সঙ্গে সরকারকে করতে হবে যাতে তাঁদের অবস্থা ফিরলে কয়েক বছর পরে ঐ দেনা শোধ করে দিতে পারে। পাকা ঘর তৈরির সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধের ব্যবস্থা করে সরকারকে ঘোষণা করতে হবে যে, বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে কেউ আর কাঁচা বাড়ি তৈরি করতে পারবে না। আগামী বছরের বন্যার হাত থেকে গ্রামবাসীদের রক্ষা করতে হলে সরকারের এ ঘোষণা চাই আর সঙ্গে সঙ্গে ঘর তৈরির সরঞ্জামের সর্বপ্রকার আয়োজনও চাই।

বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় ব্যাপকভাবে ইট তৈরির জন্য রাজ্যপাল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট-দের নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন টেস্ট রিলিফের মাধ্যমে ঐ সব ইট তৈরি করা হবে। অর্থাৎ বন্যার্তরা অনেকেই কাজ পাবে এই সব ইট-খোলায়। তা ছাড়া গ্রামের রাস্তাঘাট, কালভার্ট, ব্রীজ, বিদ্যালয় ভবন এবং অন্যান্য ঘরবাড়ি তৈরির কাজ এখন থেকে ঠিকাদারদের ওপর ভার না দিয়ে টেস্ট রিলিফের মাধ্যমে বন্যার্তদের দিয়েই করানো হবে। এতেও বন্যার্তদের আয়ের একটা সুযোগ হল। যাদের জমি এখনও জলে ডুবে রয়েছে তারা নিশ্চয়ই টেস্ট রিলিফেরও এ সুযোগ নিয়ে নিজেদের সংসারকে বাঁচাবার চেষ্টা করবেন।
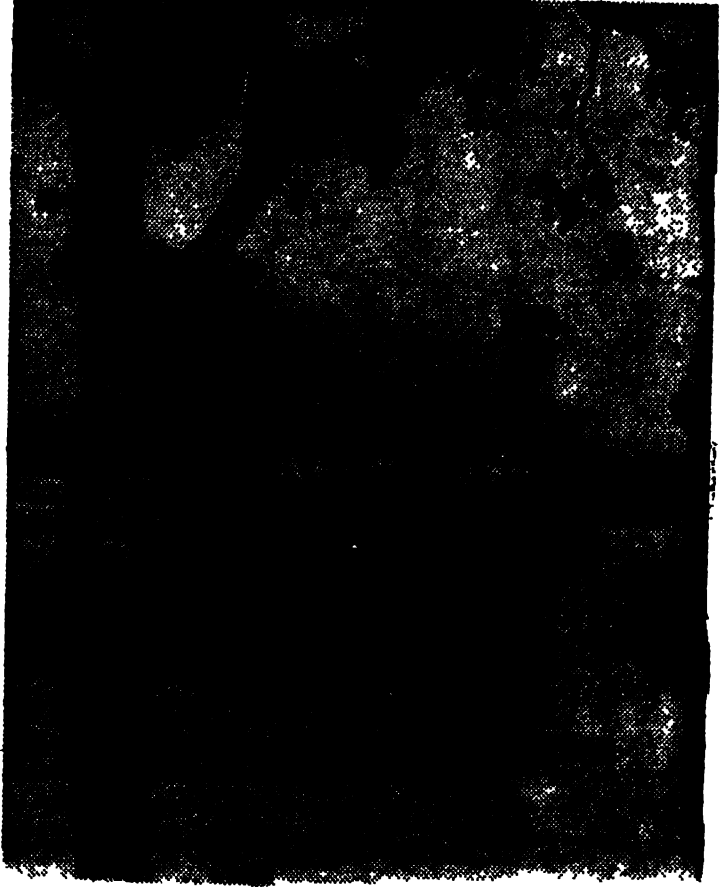
বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে এক-একটি আদর্শ গ্রাম তৈরি করারও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্যপাল নাকি বলেছেন এই সব কাজ করতে যা টাকার প্রয়োজন হবে তা সবই পাওয়া যাবে, অর্থাৎ টাকার কোন অভাব হবে না।

গ্রামবাসীদের আমি বলবো, বিশেষ করে বন্যায় যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমার একান্ত আবেদন সরকারের এ সুযোগ তাঁরা পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করুন। বন্যার্তদের পুনর্বাসনের একটি পয়সাও যাতে বাইরে না যায় সেদিকে গ্রামবাসীদের বিশেষ করে লক্ষ্য রাখতে হবে। আমনের চাষের কাজ তো আগামী সপ্তাহেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, কাজেই যাঁরা ক্ষেত-খামারে রয়েছেন তাঁদের প্রত্যেককেই কায়িক শ্রমের সমবেত প্রচেষ্টায় রাজ্যপালের আদর্শ গ্রাম নির্মাণ পরিকল্পনা সার্থক করে তুলুন।

যদি গ্রামবাসীরা আমলাদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে বসে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই জানবেন 'আদর্শ গ্রাম' কেন, বন্যার্তদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের যে কোন পরিকল্পনাই ব্যর্থ হবে। অতীতের কথা মনে করে দেখুন ডাঃ রায়েরও এ পরি-কল্পনা ছিল: কিন্তু আমলাতান্ত্রিক ঔদাসীন্যে তা ব্যর্থ হয়ে যায়।

তবু ডাঃ রায় নিজের অসম্ভব ব্যক্তিত্বের জোরে বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় অনেক পাকা-বাড়ি তৈরি করিয়েছেন, পানীয় জলেরও ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু আদর্শ গ্রাম তাঁর জীবদ্দশায় আমলাদের অপদার্থতায় আর তৈরি হয়ে উঠলো না। এর প্রধান কারণই হল গ্রামের বিভিন্ন সরকারী উদ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আমলাদের বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গ্রামীণ দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে নেই বললেই চলে। কাজ করার প্রবণতা যত না থাক তাদের মাসের ১লা তারিখের দিকেই লক্ষ্য বেশি। আর তা ছাড়া বেশির ভাগ আমলাদের গ্রামের মাটির সঙ্গে কোনো

প্রতীক ধর্মঘটের সমর্থনে

একদিনের প্রতীক ধর্মঘট

কেন্দ্রীয় কর্মচারীরা প্রয়োজনভিত্তিক মজুরীর দাবিতে একদিনের জন্য (১৯শে সেপ্টেম্বর) প্রতীক ধর্মঘট করে বিক্ষোভ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রকাশকে বে আইনী কার্যকলাপের আওতায় ফেলে অর্ডিন্যান্স জারি করলেন যার বিরুদ্ধে আদালতে নাগরিকদের তরফে মামলাও দায়ের করা হয়েছে।

.. অর্ডিন্যান্স নয় তাকে কার্যকর করবার জন্য সরকার সশস্ত্র সৈন্য-বাহিনীকেও প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যার অবশ্য প্রয়োজন হয় নি, পুলিশবাহিনীই লাঠি কাঁদানে গ্যাস ও গুলীর মুখে একদিনের প্রতীক ধর্মঘটের মোকাবিলা করেছেন উপযুক্তভাবেই। তাঁরা কয়েকটি অমূল্য জীবনকে পৃথিবীর আলো বাতাস এবং প্রয়োজনভিত্তিক মজুরীর দাবি থেকে অবসর গ্রহণ করে লোকান্তর যাত্রার দ্বারা জীবনজ্বালা জুড়ানোর সাহায্য করেছেন। আঘাতে আঘাতে শত কয়েক দুর্বিনীতকে ধূলি-মলিন মাটির ওপর শুইয়ে দিয়েছেন, যদিও সংবাদে প্রকাশ, প্রহৃতদের মধ্যে অশীতিপর বৃদ্ধা, শিশু এবং কিশোরীরও অভাব হয় নি। এঁরাও দুর্বিনীত এমন কথা কেউ বললে সহসা বিশ্বাস করা অসম্ভব, কিন্তু ভারতীয় পুলিশবাহিনী যখন নাগরিকদের সহবৎ শিক্ষা দেন তখন তর্কের বালাই তাঁদের রাখলে চলে না। তাঁরা তাই কর্তব্যরত সাংবাদিকদেরও রেহাই দেন নি। জনৈক প্রবেশনার এ এস পির (আর সি কোহলি) হুকুমে রাজধানীর ইন্দ্রপ্রস্থ ভবনে পুলিশ নির্বিচারে সাংবাদিকদের প্রহারেণ হাসপাতালে প্রেরণ করেছিল এ জন্য একটি বিশেষ তদন্তের দাবি তোলা হয়েছে ও সংশ্লিষ্ট অফিসরকে সাসপেন্ড করবার দাবিও সেই সঙ্গে রাখা হয়েছে।

ধর্মঘটের আগের দিন থেকেই গ্রেপ্তার, লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। গ্রেপ্তারের সংখ্যা এই দিনই ছিল দু'হাজার। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন নেতৃবর্গ ও সাংগঠনিক কর্মীরা। যেন একটা প্রকাণ্ড বিপর্যয়ের আশঙ্কায় চতুর্দিকে সাজ সাজ রব উঠেছিল। এবং সত্যিই ১৯শে ভারতব্যাপী যে কাণ্ডটা ঘটে গেল তা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনিই অভূতপূর্ব।

অথচ পরে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলে মনে হবে, সত্যিই কি এতো কিছুর প্রয়োজন ছিল? এই সাজ সাজ রব তুলে সরকার কি নিজেই নিজের স্নায়বিক দুর্বলতা প্রকাশ করলেন না? কি হত একটা দিন বিক্ষোভ প্রকাশের ব্যাপারটাকে শান্তভাবে মোকাবিলা করলে। বস্তুতই যে কর্মীরা বিক্ষুব্ধ তা কি দমননীতির মাধ্যমে অস্বীকৃত হয়ে যায়! নাকি সরকারের প্রকৃত হিসাবই বিশ্বাসযোগ্য বলে হয় আপামর জনসাধারণের কাছে। বরং যাঁরা বলেন এই বিরাট আয়োজনের দ্বারা সরকার নিজেই তাঁদের পরাভূত মনোভাব প্রকাশ করে ফেলেছেন, হয়ত তাঁদের কথার সারবত্তা সর্বৈবভাবে অস্বীকার্য নয়।

সরকার বহুতরভাবে কর্মী-মনে ভীতির সঞ্চার করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন, কিন্তু ধর্মঘটের ফলাফলে দেখা গেছে এ কৌশল খুব একটা কাজে লাগে নি। ধর্মঘট পূর্ণ সাফল্য অবশ্য অর্জনে অক্ষমই হয়েছে। তবে তা কি শুধু সরকারের কড়া মেজাজ ও কঠোর ব্যবস্থাবলম্বনের জন্য? ধর্মঘট যে আংশিকভাবে নিষ্ফল হবে তা আগের রাত্রের আকাশবাণীর সংবাদ লক্ষ্য করেই কিছুটা টের পাওয়া গেছল। কর্মী ইউনিয়নের মধ্যেই ঐক্যের অভাব ছিল, ছিল প্রতিপক্ষীয় বাধা। তাই আংশিক নিষ্ফলতাকে সরকারী তরফের জয় বলে গণনা করলেও ঘটনার যথার্থ বিচার হয় না। এই আংশিক ব্যর্থতার জন্য কর্মীদের মধ্যে বিভেদই দায়ী।

তথাপি সরকার কতকগুলি প্রাণ হরণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে গেলেন কেন? কেনই বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থার পরবর্তী জের টেনে চলার সরকারী দৃঢ়তা। এই এক-একটি ধর্মঘট এবং তাতে যোগদান বা যোগদানে অনিচ্ছার ওপর সাধারণ কর্মীদের কতদূর কর্তৃত্ব আছে সরকার কি তা অনবগত। অনেক কর্মী জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ দেখে ভড়ান। অনেক আনুনৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব-দোলায় শিকার হন। আর

তাবৎ কর্মচারিবৃন্দ নিত্যদিনের আকাশ-ছোঁয়া বাজার দরের সঙ্গে পাল্লা দিতে দিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে [illegible] তর্ক ও [illegible]।

[illegible] নেই। তাঁরা নির্মম মালিক পক্ষ হন, দেশ-[illegible] সেজে বলে নিজেদের দাবি করে থাকেন। জনগণের অশেষ দুর্গতিকে তবে মালিকী রোষ নিয়ে বিচার করলে জনগণের প্রতিনিধির মর্যাদা তাঁদের থাকে কেমন করে। সাধারণ কর্মীদের দুঃখ ও দুঃসহ অবস্থার কথা বিচার ও বিবেচনা করার জন্যই তাঁরা গেছেন স্বেচ্ছায় 'দেশ-সেবা' করতে। তাঁদের অত নির্মমতা অশোভন। তাঁদের মালিকী রোষ বেমানান।

সরকার ভেবে দেখুন, যাঁরা ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন এবং হাজিরা দিতে পারেন নি তাঁরা যেমন সরকারের মুখের আশ্বাসে ভরসা পান না, তেমনিই ভরসা পান না ইউনিয়নের ডাককে অগ্রাহ্য করতে। এই দুর্বল অসহায় কর্মচারীদের, যাঁরা এখনো সম্পূর্ণ ক্রীতদাস হন নি, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে নিযুক্ত প্রশাসনের বুনিয়াদ, তাঁদের ওপর নিষ্ঠুর বদলা নেওয়া কতখানি অবিবেচনাপ্রসূত প্রতিহিংসাপরায়ণ কাজ। এই কাজ যদি একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় সরকার সত্যিই করেন তবে তার থেকে দুঃখের ও বেদনাদায়ক ঘটনা আর কিছুই হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত কর্মী বিক্ষোভের [illegible] না বলেই সরকার স্বীকার করে [illegible] স্বাধীনতার দাবি, কিন্তু [illegible] করতে পারেন না প্রয়োজনভিত্তিক মজুরীর দাবিকে। যেন যা সরকার জানেন, প্রয়োজন ততদিনই মিটবে না যতদিন বাজার দর ইচ্ছেমত ব্যবসায়ীর পুঁজি বৃদ্ধির জন্য বেড়ে চলবে। সুতরাং সরকার নিজের অক্ষমতাকে ঢাকতে পারেন না দেশবাসীর ওপর শাস্তির বোঝা চাপিয়ে দিয়ে।

তৃতীয়ত যে সরকার বেকার সমস্যার মোকাবিলা করে উঠতে অক্ষম, বেকার সৃষ্টির হুমকি তাঁর মুখে মানায় না।

যে সমস্ত কর্মী হাজিরা দিতে অক্ষম হয়েছেন, আশু সরকারী প্রতিহিংসার শাস্তিমূলক ব্যবস্থায় তাঁদের যদি কর্মচ্যুত হতে হয় তবে বেকারময় ভারতে তাঁরা কোথায় যাবেন। তাঁরা না হয় চুলোয় গেলেন। কিন্তু তাঁদের পরিবার, তাঁদের সন্তান-সন্ততি। কোন কল্যাণব্রতী সরকার পারেন কি [illegible]

[illegible] হয়ে [illegible]।

ছাঁটাই! কথাটার মধ্যেই যে মুনাফাখোর মালিকী গন্ধ! গণভোটে নির্বাচিত একটি গণতান্ত্রিক সরকার সেই রোগ থেকে আপনাকে সরিয়ে নিন, অন্যথা বর্তমান [illegible] সরকারের চেহারাই জনসমক্ষে কলুষিত হয়ে পড়েছে।

আর একটি কথা, জিনিসপত্র এবং পশুপাখি পশুর চাইতে মানুষের মূল্য এদেশে ভয় ভয় করে পড়ে যাওয়ায় (নিহত পিছু ২০০ থেকে ১,০০০ টাকা অবধি সাধারণত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়ে থাকে। জীবনের দাম!) আমরা দফায় দফায় ঘটনার গুরুত্ব বিচার না করেও নির্বিচারে প্রাণ হনন করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি। মানুষের মূল্য পড়ে যাওয়াটা ভারতের নাগরিকবৃন্দের ত্রুটি নয়, ত্রুটি ভারতের অর্থনৈতিক বিপর্যয়। এই কথা স্মরণে রেখে আমরা একটু সময়ে মানুষ মারলে

দিল্লীতে [illegible]

[illegible] তা সহনীয় এবং [illegible] হবে। পুলিশের ওপর এই সব নির্দেশ থাকলেই [illegible] [illegible]

[illegible]

মৃতদেহ—সাত। পার্লামেন্ট চার। বিকানীর—তিন। ইন্দ্রপ্রস্থ ভবন—এক। মরিয়ানী—এক। আম্বালা জগাধরিতে পিকেটিং করার সময় একজন নিহত হয়েছেন ট্রেনে কাটা পড়ে। আহত—কয়েক শত ছাড়িয়ে গেছে। গ্রেপ্তার—পাঁচ সহস্রাধিক। সাংবাদিক প্রহৃত। রাজধানীর ইন্দ্রপ্রস্থ ভবনে ঢুকে এ-এস-পি (প্রবেশ-নাম) আর সি কোহলির আদেশে বিভিন্ন কর্তব্যরত সাংবাদিকের ওপর মারমুখী পুলিশের বীরদর্পে আক্রমণ ও সাংবাদিকদের গলাধাক্কায় আহতকরণ। কলোনীতে ঢুকে নির্বিচারে নারী ও

বিজ্ঞপ্তি

শারদোৎসব উপলক্ষে আগামী ৩রা অক্টোবর সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রকাশন বন্ধ থাকবে।

—সম্পাদিকা

শিশুকে পুলিশ পরমানন্দে প্রহার করে আইন ও শৃংখলার মর্যাদা রক্ষা করেছে। নারী ও শিশু প্রহার—কিষাণগঞ্জ রেল কলোনীতে ঢুকে নির্বিচারে নারী ও শিশুকে পুলিশ পরমানন্দে প্রহার করে আইন ও শৃংখলার মর্যাদা রক্ষা করেছে। এই অপারেশন কিষেণগঞ্জে পুলিশী আক্রমণের শিকার হয়েছেন অনেকে আশি বছরের অথর্ব মহিলা। সরকারকে বা পুলিশকে বিড়ম্বনায় ফেলবার জন্য উনি কি ইষ্ট দেবতার কাছে প্রার্থনা করছিলেন? এর বেশি কীই-বা করতে পারতেন বৃদ্ধা? দুধের শিশুদের শোণিতপিপাসু পুলিশী লাঠি অচৈতন্য করে ফেলে রেখে যায়। আহতা বৃদ্ধা এবং একটি বার বছরের আহতা মেয়ে সহ কয়েকজন কলোনীবাসিনীকে নিয়ে শ্রীমতী ডাংগে প্রধানমন্ত্রীর সংগে সাক্ষাৎ করতে গেছলেন, ফলাফল জানি না। তবে শ্রীমতী

গান্ধী নিশ্চয় গভীর সহানুভূতি এবং মর্মবেদনা প্রকাশ করবেন। এ দেশের লোক ওতেই খুশি। হয়ত শ্রীমতী গান্ধীর বাণীও তাঁরা সযত্নে বাঁধিয়ে কলোনীর দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখবেন।

গান্ধী সরকার কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মী ধর্মঘটকে ববং উস্কেই দেবেন যদি এর পরেও প্রদত্ত হুমকী অনুযায়ী শাস্তি-মূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে যান।

তবে সরকার ততদূর এগোতে পারবেন বলে মনে হয় না। ঐ পেটানো পর্যন্তই সরকারী কর্তা এবং পুলিশী কর্তাদের (প্রবেশনার হলে আর এককাঠি ওপরে) সুখ। দুনিয়ায় এমন শোণিতপিপাসা অন্যত্র বড় একটা লক্ষিত হয় না। কে যেন বলেছিলেন, ভারতের লোক এমন নিষ্ঠুর, এতো সহজে হাসতে হাসতে স্বদেশবাসীকে হত্যা ও আঘাত করতে পারে যে, সেখানে কখনো গৃহযুদ্ধ হলে পৃথিবীর ইতিহাসে নিষ্ঠুরতম নজীর সৃষ্টি হবে। সেই বিদেশী সাংবাদিকের নাম-ধাম মনে নেই, তবে উক্তিটি মিথ্যা নয়, তার প্রমাণও দাঙ্গা-হাঙ্গামার ইতিহাস বদ্ধ আছে। তার প্রমাণ একুশ বছরের জাতীয় সরকারী আমলে জনগণের ওপর নিষ্ঠুরতম সরকারী দলের বারম্বার আক্রমণ।

বাজার দর নিয়ন্ত্রণে অক্ষম, মুদ্রাস্ফীতিজনিত অর্থনৈতিক বিপর্যয় রুখতে ব্যর্থ সরকার আজ তাঁরই কর্মচারীদের ওপর আক্রমণের নেশায় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন শুধু পরাভূত মনের বিকার নিয়ে। ঠাণ্ডা ও সুস্থ মস্তিষ্কে দেশ শাসনের ক্ষমতা না থাকলে নেতৃত্ব ক্রমেই বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নেতৃত্ব করতেই হবে এমনি মায়ার বাঁধনে যাঁরা আজ আটকে পড়েছেন তাঁদের সচেতনভাবে ঐ অবশম্ভাবী বিকারের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকার দরকার।

ধর্মঘটের হিসাব-নিকাশ অভিনন্দনের কম্পিটিশন

কর্মচারী যুক্ত এ্যাকশন কাউন্সিলের সম্পাদক পিটার আলভেয়ার বোম্বের লৌহ গারদ থেকে মুক্ত হয়েই ধর্মঘটি কর্মীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। এ আই টি ইউ সি বলছে ধর্মঘট অপ্রত্যাশিত সাফল্যের প্রমাণ রাখল। অপর পক্ষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অভিনন্দিত করছেন তাঁদের যাঁরা নিঃশব্দে কাজ করে গেছেন ও আই এন টি ইউ সি বলছে, ধর্মঘট কিস্সু হয় নি। কিন্তু নিহত আহত গ্রেপ্তার অত্যাচার দিচ্ছে অন্যতর সাক্ষ্য। যাঁরা ধর্মঘটে যোগ না দিয়ে নিয়মানুবর্তী সুবোধ সংখ্যায় নিজেদের ধরে রাখতে পেরেছেন, চ্যবন সাহেব তাঁদের বকশিস স্বরূপ খুব ভালো ব্যবহারের আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি নাকি তাঁদের সমস্যা বিবেচনা করে দেখবেন।

কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা সরকারের কঠোর নীতি গ্রহণে খুব খুশি হয়েছেন। তিনি বলেন, অর্ডিন্যান্সের আশ্রয় নিয়ে সরকার যুক্তিযুক্ত আচরণ করেছেন।

ওদিকে এ আই টি ইউ সি সতর্ক করে বলেছে, অবিলম্বে সরকার তাঁর দমননীতি প্রত্যাহার না করলে, অর্ডিন্যান্স তুলে না নিলে এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে বিরত না হলে অবস্থার আরও অবনতি ঘটবে। তাঁরা ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি, পুলিশী নির্যাতনের তদন্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন।

পণ্ডিচেরীতে রাষ্ট্রপতির শাসন

গত বুধবার পণ্ডিচেরীর আইনসভা বাতিল করে সেখানে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করা হয়েছে।

১৯৬৪ সালের নির্বাচনে ত্রিশটি আসনের বাইশটিই ছিল কংগ্রেসের, চারটি পেয়েছিল 'পিপলস ফ্রন্ট' ও বাকি চারটি ছিল স্বতন্ত্র চার ব্যক্তির দখলে। ১৯৬৭-র মার্চ থেকে কংগ্রেসী ঘরে ভাঙন শুরু হল। যার দশেক কংগ্রেস ও বিরোধী ক্যাম্পে দলত্যাগের পাল্টাপাল্টি হয়েছিল। অবশেষে গত ঊনত্রিশে আগস্ট দুই পক্ষের আসন সংখ্যা এমন পর্যায়ে এলো যখন আর সভা ভেঙে না দিয়ে উপায় নেই।

দলত্যাগের হিড়িকে শাসন সংকট বর্তমানে গা সওয়া ব্যাপারে দাঁড়িয়েছে। সরকার তবুও উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে উৎসাহ দেখান নি। অবাধে দলত্যাগ চলতে দিলে কেন্দ্রে যতক্ষণ কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত ততক্ষণ অন্তত কেন্দ্রীয় শাসন কায়েম করার সুযোগ আছে। সুতরাং দলত্যাগটা কেন্দ্রীয় দৃষ্টিতে মন্দের ভালো।

এ বিষয়ে অধিক মন্তব্য অরণ্যে রোদন মাত্র

হরিয়ানার নয়া সংকট

হরিয়ানার কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় পুনশ্চ ভাঙন ধরেছে। পদত্যাগী মন্ত্রীত্রয় সর্বশ্রী রামধারি গৌর, রাণ সিং ও মহাবীর সিং মুখ্যমন্ত্রী বংশীলালকে আক্রমণ করে বাক্যবাণও ছুটিয়েছেন।

ঘরের মধ্যেই বিবাদের বাসা থাকলে এই সব বিপর্যয় ঠেকানো অসম্ভব। হরিয়ানা কংগ্রেসেও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভগবৎ দয়ালের নেপথ্য হস্ত সক্রিয়। সুতরাং বংশীলালকে এই বিপর্যয়ের সম্মুখীন অবধারিতভাবেই হতে হয়েছে। হরিয়ানার নতুন সংকট কংগ্রেসী ক্ষমতার লড়াই-এর আর একটি নজীর মাত্র। যদি তাড়াতাড়ি মিটমাট হলে আবার মিটে যাবে। (২১।৯।৬৮)
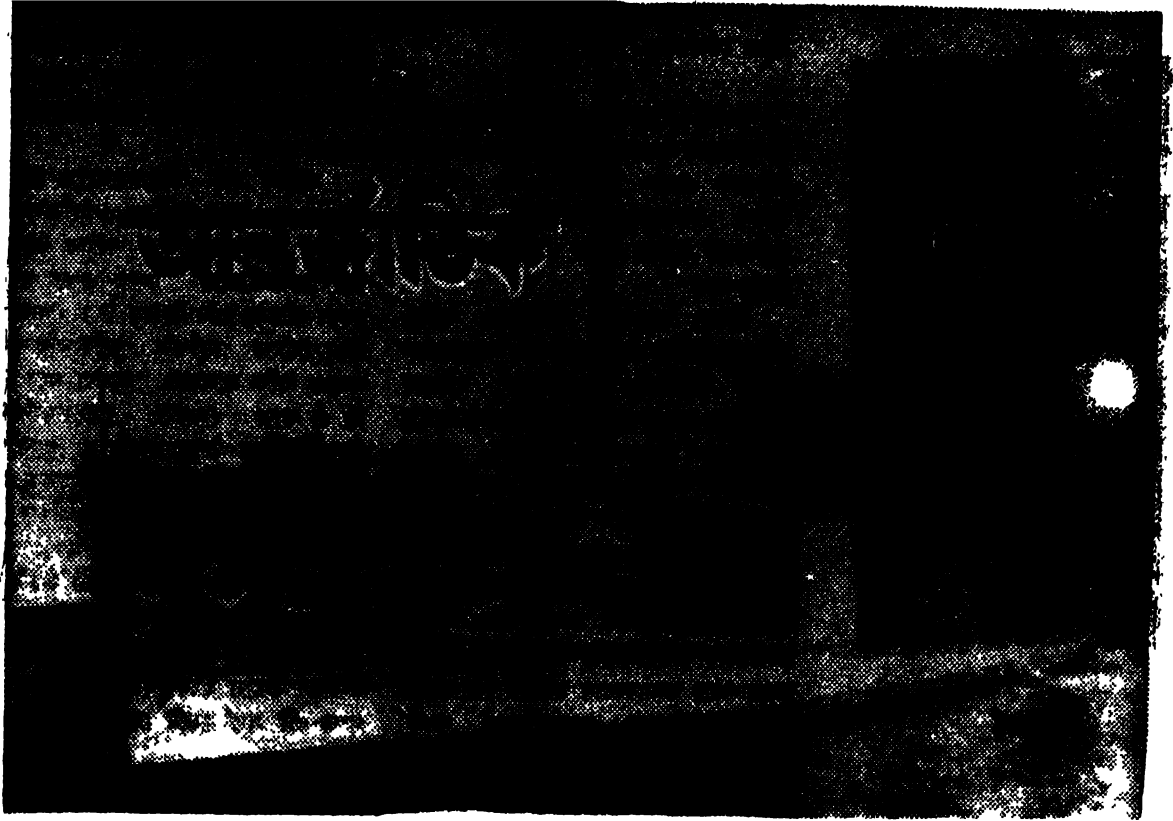
মার্কিন গোয়েন্দা জাহাজ পুয়েবলো

মালয়েশিয়া :

মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইনসের মধ্যে কি যুদ্ধ বেধে যাবে? সাবার প্রশ্নে এই দুই রাষ্ট্রের বিবাদ এমন এক পর্যায়ে পৌঁচেছে যে, যে কোন সময়ে সংঘর্ষ শুরু হয়ে যেতে পারে। এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

সাবা (প্রাক্তন বৃটিশ উপনিবেশ উত্তর বোর্নিও) মালয়েশিয়ার অংশ। কিন্তু ফিলিপাইনস কিছুতেই এ কথা মানতে রাজী নয়। তারা সাবাকে ফিলিপাইনসের মধ্যে চায়। সোয়েকার্নোর আমলে ইন্দোনেশিয়াও সাবার ওপর মালয়েশিয়ার অধিকার মানতে চায় নি। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে সাবা ও সারাওয়াকে গণভোট নেওয়া হয় এবং গণভোটে এই অঞ্চলগুলির জনসাধারণ বিপুল ভোটাধিক্যে অঞ্চলগুলির জনসাধারণ বিপুল ভোটাধিক্যে মালয়েশিয়ার সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে রায় দেয়। তবু ফিলিপাইনস সন্তুষ্ট নয়। নানাভাবে তারা মালয়েশিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। সমগ্র ফিলিপাইনসে সাবার দাবিতে বিক্ষোভ গড়ে উঠেছে। নতুন করে তারা সাবার ওপর আলোচনা শুরু করতে চায়। কিন্তু মালয়েশিয়া তাতে রাজী হবে কেন? সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে, আঞ্চলিক অখণ্ডতার ব্যাপারে কোনরূপ আলোচনায় বসতে মালয়েশিয়া প্রস্তুত নয়।

ফিলিপাইনসের সর্বত্র সাবার দাবিতে সভা-সমাবেশ, মিছিল হচ্ছে। যুবকেরা অবিলম্বে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দাবি করেছে। কিন্তু এ সব

টুংকু আবদুল রহমান

কিছুকে ছাড়িয়ে গেছে খাস ফিলিপাইনস আইনসভা। আইনসভা একটি বিল পাশ করে ঘোষণা করেছে, সাবা ফিলিপাইনসের অংশ—এই রাষ্ট্রের একটি এলাকা! আরও আশ্চর্য, তিনি রাষ্ট্রপতি ফার্দিনান্দ মারকোস এই বিলে তাঁর সম্মতিও জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের পর এটি আইনে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ, এখন ফিলিপাইনসের রাষ্ট্রীয় আইনের দৃষ্টিতে সাবা ফিলিপাইনস রাষ্ট্রের একটি রাজ্য। (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা যদি প্রস্তাব পাশ করে যে পশ্চিমবঙ্গ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫১তম রাজ্যে পরিণত হল; আর জনসন তাতে স্বাক্ষরও করেন, তাহলে কেমন হয়?)

স্বাভাবিকভাবেই মালয়েশিয়া অত্যন্ত [illegible] ও [illegible] হয়েছে এই ঘটনায়। ১৯শে সেপ্টেম্বর, মালয়েশিয়া সরকার ঘোষণা করেছেন, তাঁরা ফিলিপাইনসের সঙ্গে তাঁদের কূটনৈতিক সম্পর্ক সাময়িকভাবে বাতিল করে দিয়েছেন। ম্যানিলা থেকে তাঁদের রাষ্ট্রদূতে ও অন্যান্য কূটনৈতিক কর্মচারীদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দু' দেশের মধ্যে চোরাই চালান বন্ধ করার জন্য যে চুক্তি হয়েছিল—অও বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুল রহমান দুঃখ করে বলেছেন, "ভেবেছিলাম দারিদ্র্য আর মাও সে-তুং চক্র, এই দুই শত্রুর বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই করতে হবে। এখন দেখছি, নিজেদের মধ্যেও লড়তে হবে।"

কুয়ালালামপুরে হাজার হাজার মালয়েশীয় [illegible]

মারকোস

করেছে, শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও তারা মাতৃভূমির অখণ্ডত্ব রক্ষা করবে।

জমায়েত হচ্ছে ম্যানিলাতেও। এখনই ফিলিপাইনসের সৈন্য ও বেসামরিক 'স্বেচ্ছাসেবকরা' মালয়েশিয়ায় ঢুকে পড়তে চায়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি মারকোস এদের শান্ত থাকতে বলেছেন। ২০শে সেপ্টেম্বর তিনি বলেছেন, দু' দেশের মধ্যে যুদ্ধের কোন আশঙ্কা নেই। তিনি সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত হবার আদেশ দেবেন না। ফিলিপাইনসের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নার্সিসো রামোসও বলেছেন; তাঁরা শান্তিতে থাকতে চান, যুদ্ধের কোন মতলব তাঁদের নেই।

দূরপ্রাচ্যে বৃটিশ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক স্যার মাইকেল কারভারও এই কথাই বলেছেন। তিনিও মনে করেন, এখনই কোন যুদ্ধের আশঙ্কা নেই।

তবু দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা পূর্ণমাত্রায় বজায় রয়েছে। ইতিপূর্বে থাইল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী থানম কিটিকাচরন ও ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আদম মালিক মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইনসের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু বৃটেন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি করছে? মালয়েশিয়া বৃটেনের প্রভাবাধীন, আর ফিলিপাইনস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। এরা কি চেষ্টা করলে এই সামান্য বিরোধ মিটিয়ে দিতে পারে না? না, তারা ইচ্ছা করেই বিরোধ জিইয়ে রাখছে, তাদের নিজেদের স্বার্থে?

উত্তর কোরিয়া:

মার্কিন গোয়েন্দা জাহাজ 'পুয়েবলো' কোরীয়দের হাতে আট মাসের ওপর আটক রয়েছে। এখন পর্যন্ত এই জাহাজ, কিংবা জাহাজের জীবিত ৮২ জন নাবিকের মুক্তির কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

উত্তর কোরিয়া সরকারের বক্তব্য, গোয়েন্দাগিরির উদ্দেশ্য নিয়ে 'পুয়েবলো' উত্তর কোরিয়ার আঞ্চলিক দরিয়ায় (উপকূল থেকে ১২ মাইল পর্যন্ত সমুদ্র আঞ্চলিক ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত) প্রবেশ করেছিল। তাই, কোরিয়ার সার্বভৌমত্ব ভঙ্গ করার অপরাধে তারা এই জাহাজটি আটক করেছে। আর মার্কিন পক্ষের বক্তব্য, তাদের জাহাজ আঞ্চলিক দরিয়ার বাইরে আন্তর্জাতিক সাগরে ছিল, উত্তর কোরিয়ার নৌবাহিনীর লোকেরা তাদের জোর করে অন্যায়ভাবে আটকে রেখেছে।

গত সপ্তাহে 'পুয়েবলো'র বন্দী ক্যাপ্টেন লেফটেন্যাণ্ট কমোডর লয়েড এম বুচারের একটি বিবৃতি উত্তর কোরিয়া থেকে প্রচার করা হয়েছে। এর আগেও একাধিকবার এরূপ স্বীকারোক্তি প্রচারিত হয়েছে। তবে এবারের স্বীকারোক্তিটি বেশ বিস্তৃত ও মার্কিন সরকারের পক্ষে রীতিমত অস্বস্তিকর। বুচার বলেছেন, মার্কিন সরকারের নির্দেশে গোয়েন্দাগিরির উদ্দেশ্যে তিনি জেনেশুনেই উত্তর কোরিয়ার আঞ্চলিক দরিয়ায় প্রবেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, এই কাজ করার জন্য মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। উত্তর কোরিয়া উপকূলের তিন মাইল পর্যন্ত যাবার জন্য তাঁর ওপর নির্দেশ ছিল। ৫ই জানুয়ারী ('পুয়েবলো' আটকের তিন সপ্তাহ পূর্বে) জাপানের সাসেসকোতে বসে তিনি এই নির্দেশ পান। বুচার আরও বলেছেন, এর আগেও তিনি বহুবার গোয়েন্দাগিরির জন্য উত্তর কোরিয়ার আঞ্চলিক সাগরে প্রবেশ করেছেন।

উত্তর কোরিয়া থেকে প্রচারিত 'চাপ দিয়ে আদায় করা' (under duress) এই বিবৃতিতে বিচলিত হয়ে মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে যে পাল্টা বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, তাতে মার্কিন সরকারের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। মার্কিন বিবৃতিতে স্বীকার করা হয়েছে, হ্যাঁ, 'পুয়েবলো'কে উত্তর কোরিয়া অঞ্চলে সোভিয়েট নৌবাহিনীর ইউনিটের ওপর গোয়েন্দাগিরির জন্য পাঠানো হয়েছিল। তবে, 'পুয়েবলো'র ওপর স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, আঞ্চলিক দরিয়ার ১২ মাইল তো বটেই, তার পরেও ১ মাইলের বাইরে যেন তারা থাকে। মার্কিন সরকার এই গোপন [illegible] সবকটাই প্রকাশ করেছেন, উত্তর কোরিয়ার প্রচার-অভিযানকে প্রতিরোধ করার জন্য। কিন্তু, গোয়েন্দাগিরির কথা তো স্বীকার করতে হল।

নাবিক সহ 'পুয়েবলো'কে ছাড়িয়ে আনার জন্য উত্তর কোরিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের মধ্যে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন মতৈক্য প্রতিষ্ঠা হয় নি। পানমুনজান বৈঠকে মার্কিন প্রতিনিধি এমন কথাও নাকি বলেছেন, "আমরা মনে করি না এ কাজ (অর্থাৎ, গোয়েন্দাগিরির উদ্দেশ্য নিয়ে উত্তর কোরিয়ার আঞ্চলিক দরিয়ায় প্রবেশ) আমরা করেছি. তবু যদি করে থাকি তার জন্য আমরা দুঃখিত।"

মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব ডিন রাস্ক বলেছেন, 'পুয়েবলো'র মুক্তির সর্তরূপে উত্তর কোরিয়া সরকার দাবি করছে, জাপান সাগরে মার্কিন নৌবাহিনীর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মার্কিন সরকারের পক্ষে এই সর্ত মেনে নেওয়া শক্ত।

আলজিরিয়া:

আফ্রিকার ৩৮টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়েছেন আলজিয়ার্সে। আফ্রিকা ঐক্য সংস্থার (অরগানাইজেশন অব আফ্রিকান ইউনিটি, বা ও এ ইউ) উদ্যোগে এই সম্মেলন চলছে। আলজিরিয়ার রাষ্ট্রপতি হুয়েরী বুমেদিয়েন সভাপতিত্ব করছেন এই শীর্ষ সম্মেলনে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী-জেনারেল উ থান্ট বিশেষভাবে এই শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য এসেছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে নাইজিরিয়া সমস্যা সমাধানের জন্য আফ্রিকার রাষ্ট্রনেতাদের উদ্যোগী হতে আহ্বান জানান। নাইজিরিয়ার গৃহযুদ্ধ এবং একে উপলক্ষ করে আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মতভেদ ও মনোমালিন্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আফ্রিকার শান্তি ও ঐক্য বিশেষভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে নাইজিরিয়া বিরোধের ফলে।

নাইজিরিয়া নিয়ে আফ্রিকার রাষ্ট্রনেতারা ভারি বিপদে পড়েছেন। আফ্রিকা ঐক্য সংস্থার পক্ষ থেকে নাইজিরিয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও বিচ্ছিন্নতাকামী রাষ্ট্র বায়াফ্রার মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির যে চেষ্টা হয়েছে, তা সফল হয় নি। কামপালা, নাইজার ও আদ্দিস আবাবায় উভয়পক্ষের মধ্যে যে সব বৈঠক হয়েছিল তাতে কোনরূপ মতৈক্য হয় নি। বরং, যুদ্ধের গতি আরও তীব্র হয়েছে।

আফ্রিকার অধিকাংশ রাষ্ট্র নাইজিরিয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পক্ষে থাকলেও, [illegible]

সমর্থন করছে। ইতিমধ্যেই জাম্বিয়া, তানজানিয়া, আইভরি কোস্ট ও গাবন বায়াফ্রাকে পৃথক রাষ্ট্ররূপে স্বীকার করেছে। আলজিয়ার্স সম্মেলনে জাম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি কেনেথ কাউণ্ডার সঙ্গে নাইজিরিয়া প্রশ্নে আলজিরিয়ার রাষ্ট্রপতি হুয়েরী বুমেদিয়েনের বেশ এক হাত হয়ে গেছে। রেগে গিয়ে কাউণ্ডা সম্মেলনের সহকারী সভাপতির পদ গ্রহণ করতে পর্যন্ত অস্বীকার করেছেন।

ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসি অবশ্য এখনও মীমাংসার আশা ছাড়েন নি। আপোষ প্রচেষ্টায় প্রথম থেকে অন্যতম প্রধান উদ্যোগী হাইলে সেলাসি। দেখা যাক, কোন মীমাংসা হয় কি না। তবে এদিকে বায়াফ্রার অবস্থা কাহিল। যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্যদল বীরবিক্রমে একের পর এক বায়াফ্রা অঞ্চল দখল করে অগ্রসর হচ্ছে। বায়াফ্রার সৈন্যরা ক্রমেই পিছু হটছে।

আলজিয়ার্স শীর্ষ সম্মেলনে সবাই একমত হয়ে যে প্রস্তাব গ্রহণ করতে পেরেছেন, তা হল, দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারে। ১৬ই সেপ্টেম্বর গৃহীত এই প্রস্তাবে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও অন্যান্য রাষ্ট্রকে অবিলম্বে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইতালী ও জাপান তাদের কার্যকলাপের দ্বারা দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতিকে 'প্রশ্রয় দিচ্ছে, সাহায্য করছে।' রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে তারা দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে সহযোগিতা করছে। পশ্চিম জার্মানী, ইতালী ও ফ্রান্স প্রকাশ্যে দক্ষিণ আফ্রিকাকে অস্ত্র বিক্রয় করছে। প্রস্তাবে দক্ষিণ রোডেশিয়ার আয়ান স্মিথ সরকার কর্তৃক দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে সহযোগিতারও তীব্র নিন্দা করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:

আগামী ৫ই নভেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল ডেমোক্রাটিক পার্টি ও রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী মনোনয়নপর্ব শেষ হয়েছে। উভয়পক্ষই পুরোদমে নির্বাচনী প্রচারে নেমে পড়েছে।

তবু কিন্তু নির্বাচনী অভিযান জমছে না। এর আগে কোন রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনে এত কম উৎসাহ, উদ্দীপনা ও উত্তেজনা দেখা যায় নি। ভোটদাতা তথা জনসাধারণের মধ্যে রীতিমত ঔদাসীন্য ও [illegible] ভাব। অনেকে হয়তো শেষ পর্যন্ত [illegible] দেবে না।

[illegible] কি? প্রধান কারণ, দুই দল থেকে যে দু'জন প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা কেউই তেমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নন, চিত্তাকর্ষক নন, জনমনে আশা-উদ্দীপনা সৃষ্টির মত মানুষ নন।

অনেকে বলছেন, আসলে দুই দলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, দুই প্রার্থীর বক্তব্যের মধ্যেও কোন তফাৎ নেই, তাই কোনরূপ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হচ্ছে না। কিন্তু দুই দলের যে রাজনৈতিক পরিচয়, তা তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন কিছু নয়। আর, দুই প্রার্থীর বক্তব্যের মধ্যে যে একেবারে কোন তফাৎ নেই তাও নয়।

রিপাবলিকান প্রার্থী রিচার্ড নিকসন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে কঠোর মনোভাব গ্রহণের পক্ষপাতী, অর্থনীতি ক্ষেত্রে জনকল্যাণমূলক কাজে সরকারী ব্যয় হ্রাসের সমর্থক, দেশে ও বিদেশে দৃঢ়তার সঙ্গে কমিউনিজম প্রতিরোধ করতে চান, আবে ফরটাসকে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগের অনুমোদনের বিরোধী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের উদ্যোগে সম্পাদিত পরমাণু-প্রসার চুক্তি অনুমোদনে বিলম্ব করার পক্ষপাতী। অপর দিকে, ডেমোক্রাটিক প্রার্থী হুবার্ট হামফ্রে শান্তি-শৃঙ্খলার প্রশ্নটির সঙ্গে ন্যায় বিচারের বিষয় যোগ করতে চান, কেন্দ্রীয় সরকারের জনকল্যাণমূলক ব্যয় বৃদ্ধি [illegible] বস্তি অঞ্চলে ('ঘেটো') আরও ব্যয় বৃদ্ধির পক্ষপাতী, কমিউনিস্টদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপোষের মনোভাব গ্রহণ করতে চান, ফরটাসকে প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ অনুমোদন করতে চান এবং তিনি অবিলম্বে পরমাণু-চুক্তি অনুমোদনের পক্ষপাতী।

দু'জনের মধ্যে যে ব্যাপারে বলতে গেলে একেবারেই কোন তফাৎ নেই, তা হল, ভিয়েতনামের প্রশ্ন। দু'জনেই জনসনের ভিয়েতনাম নীতির সমর্থক। উত্তর ভিয়েতনাম কিছু 'কনসেসনে' রাজী না হলে বোমাবর্ষণ বন্ধ বা সৈন্যবাহিনী অপসারণের কোন কথাই ওঠে না।

মার্কিন পর্যবেক্ষকদের ধারণা, এই মুহূর্তে নির্বাচন হলে নিকসন বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করবেন। হামফ্রের কোন আশা নেই। জনসন শাসনের বিরুদ্ধে মার্কিন নাগরিকদের বিক্ষোভ এত তীব্র যে তারা এখন একটা পরিবর্তন চায়। তাছাড়া হামফ্রের বক্তব্য এমন হচ্ছে যে, তাঁর নিজের দলের প্রগতিশীল প্রতিক্রিয়াশীল কেউই তাঁর পক্ষে আসছেন না। প্রগতিশীলরা (ইউজিন ম্যাকার্থি যাঁদের প্রার্থী ছিলেন) ভিয়েতনামের ব্যাপারে তাঁর বক্তব্যে ক্ষুব্ধ, তাঁরা উৎসাহের সঙ্গে তাঁর জন্য কাজ করছেন না। আবার প্রতিক্রিয়াশীলদের মতে, হামফ্রে কমিউনিস্টদের প্রশ্নে, দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে (অর্থাৎ নিগ্রোদের প্রশ্নে) বড় 'নরম', তাই তাঁরাও তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসছেন না।

এই কয় সপ্তাহে হামফ্রে এই অবস্থার পরিবর্তন করে তাঁর পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবেন, এই ভরসা কম।

অনেকের ভয়, হামফ্রে শেষ পর্যন্ত তৃতীয় প্রার্থী উগ্র বর্ণবৈষম্যবাদী জর্জ ওয়ালেসের চেয়েও কম ভোট না পেয়ে যান! আলাবামার প্রাক্তন গভর্নর ওয়ালেস জোর প্রচার চালাচ্ছেন। তিনি নিগ্রোদের পৃথক রাখার নীতির (segregation) কথা তো বলছেনই, তার চেয়েও জোরের সঙ্গে যে-কথা বলছেন তা হল, রাজ্য-স্বাতন্ত্র্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার কথা। এইটিই তাঁর প্রধান নির্বাচন-ধ্বনি। ১৯৫৭ সালে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ওয়ারেনের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সৈন্য আরকানসাসের লিটল্ রকে প্রবেশ করে, বিদ্যালয়ে পৃথকীকরণ ব্যবস্থা বন্ধ করার জন্য। তখন থেকে দক্ষিণের বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গরা কেন্দ্রের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে চেঁচিয়ে আসছে।

ওয়ালেস ভাল সমর্থনও পাচ্ছেন। আলাবামা, জর্জিয়া, লুসিয়ানা, মিসিসিপি, পশ্চিম ভার্জিনিয়া প্রভৃতি দক্ষিণের রাজ্যে তিনি ভাল ভোট আশা করছেন। তারপর যদি উত্তরাঞ্চলের বর্ণবৈষম্যবাদী শ্বেতাঙ্গরা তাঁকে সমর্থন করে, তাহলে, ওয়ালেসের আশা, তিনি জিতে যাবেন। এখন তিনি উত্তরে সফর করছেন।

ওয়ালেস হয়তো শেষ পর্যন্ত জিতবেন না। তবু তাঁর পক্ষে এই ব্যাপক সমর্থন লক্ষণীয়।

(২১-৯-৬৮)

সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনায় মৌলিক পরিবর্তন দরকার

শ্রীপতি সরকার

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার রূপরেখা আবার তৈরি করা হচ্ছে। মাদ্রাজে মুখ্যমন্ত্রীদের অধিবেশনে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনাকে বজায় রাখা হবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, সংবাদে প্রকাশ যে ১৯৫২ সালের ২রা নভেম্বর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনের শুভারম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত ৭৫০ কোটি টাকা এই সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প বাবদ ব্যয় করা হয়েছে। অবশ্য এই অর্থের মধ্যে জনসাধারণের চাঁদা হিসাবে ২৫০ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে। এই বিরাট অর্থব্যয়ের পর বিশেষ করে দেশজোড়া অর্থনৈতিক মন্দার চাপে আমাদের অবস্থা যখন হতাশায় ডুবুডুবু, তখন সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের এক ব্যালান্সসীট তৈরি করে লাভ-ক্ষতির অঙ্ক কষে দেখা উচিত মুখ্যমন্ত্রীদের এ সিদ্ধান্ত সমীচীন কি না।

সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার রচয়িতারা দেশের দ্রুত সার্বিক উন্নতির প্রশ্নে ও সম্ভাবনায় এই কাজে হাত দিয়েছিলেন। গ্রামময় ভারতের অনগ্রসর অচলায়তন জনসমাজকে আধুনিক যুগোপযোগী করে তোলার জন্য শাসনযন্ত্রকে বিকেন্দ্রীকরণ করার এক সুনির্দিষ্ট প্রয়াস ছিল প্রকল্পের মূলে। পঞ্চবার্ষিক যোজনার সাথে অগণিত কোটি কোটি মানুষের সদিচ্ছা ও সহযোগিতার যোগসাধনও ছিল অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ল যে বাঞ্ছিত ফললাভ হচ্ছে না, বরং নতুন ধরণের আমলাতন্ত্র প্রসারিত হচ্ছে। সেই লাল ফিতা, কুঞ্চিত ভ্রূ ও প্রভুত্বের ঔদ্ধত্যের কোন হ্রাস না ঘটে বরং দেখা গেল আমলাতন্ত্রের এক নতুন সমাজের নতুন পরিধি তৈরি করেছে। দেশহিতৈষী নেতৃবৃন্দ সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের এই অবাঞ্ছিত সৃষ্টিকে প্রতিরোধকল্পে পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হলেন। বলবন্তরায় মেটাকে নিয়ে এক উচ্চক্ষমতা-সম্পন্ন কমিশন গঠন করা হল ও তার রিপোর্টের ভিত্তিতে জনগণের অংশগ্রহণকারী পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থাকে এক সুষ্ঠু সংগঠন-ভিত্তিক করে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হল। বিভিন্ন স্তরে বিশেষত তিনটি স্তরে পঞ্চায়েতী কাঠামো রচিত হল। গোড়ায় গ্রাম-পঞ্চায়েত, মাঝে পঞ্চায়েত সমিতি ও শেষে জেলা পরিষদ হল ঐ রিপোর্টের কল্পপ্রতিমা। কেবল পশ্চিমবঙ্গে পূর্বের ইউনিয়ন বোর্ডকে বাতিল না করে অঞ্চল পঞ্চায়েত সৃষ্টি করে চারটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতিকে পশ্চিমবঙ্গে আঞ্চলিক পরিষদ নাম দেওয়া হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের সরপঞ্চকে আমাদের পশ্চিম বাংলায় অধ্যক্ষ আর অঞ্চল পঞ্চায়েতের কর্তাকে প্রধান নামে অভিহিত করা হয়েছে। মোদ্দা কথা আমলাতন্ত্রের কুপ্রভাব ও প্রসারতাকে যতদূর সম্ভব বন্ধ করে সমষ্টি উন্নয়ন কাজে জনসাধারণের সক্রিয় অংশ গ্রহণোপযোগী করে তোলাই হল অন্যতম লক্ষ্য। অবশ্য পঞ্চায়েতী প্রতিষ্ঠার পিছনে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর ভারতীয় সভ্যতার বিশ্লেষণাত্মক দর্শনের প্রভাব ও পঞ্চায়েতী রূপকারদের অনুপ্রাণিত করেছে।

সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প চালু হবার পর পনের বৎসর পার হয়ে গেছে। অবশ্য সারা অঞ্চলে একই সাথে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হয় নি। '৫২ সালে যে ব্লকগুলিতে এই প্রকল্প চালু করা হয়েছিল সেইখানের মূল্যায়ন করা হবে সমীচীন। প্রতি ব্লকের এই প্রকল্পের প্রথম পাঁচ বৎসরের অর্থ বরাদ্দ ছিল ১২ লক্ষ ও দ্বিতীয় পাঁচ বৎসরের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা। আজ '৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত কোন ব্লকে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এক চরম বিষাদময় চিত্র। এই ব্লকগুলিতে আজ কোন অর্থের বরাদ্দ না থাকায় জনসাধারণ যেন সকল আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। প্রথম পাঁচ বৎসরে জনসাধারণের মধ্যে নিঃসন্দেহে এক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। ব্লক অফিসগুলিতে রীতিমত ভিড় জমে থাকত ও নিত্য-নতুন মানুষকে নানা সাহায্যের আশায় দরবার করতে দেখা যেত। কিন্তু যখন দ্বিতীয় স্তরে জনগণকে ব্যয়ের অংশ গ্রহণ করতে বলা হল তখন দেখা গেল যে সে উৎসাহ ও উদ্দীপনা আর নেই। আস্তে আস্তে ব্লক অফিসে ভিড় কমে গেছে। আর আজ সেইসব অফিসে পঞ্চায়েতের কর্মকর্তারা ছাড়া বড় একটা কাউকে দেখা যায় না। পঞ্চায়েতের কর্মকর্তারা ছাড়া যাঁরা আসেন তাঁরা 'ঠেকায় পড়া'-র দলে অর্থাৎ বিভিন্ন ধরণের পারমিটের প্রয়োজনে। প্রথম পাঁচ বৎসরে ব্লক ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের সভায় আশাতীতরূপ উপস্থিত হ'ত। কেন না উপস্থিতেরা সবাই প্রার্থী, শুধু চাই চাই ছিল তাদের উৎসাহের প্রধান প্রেরণা। আজকের ঐ সব ব্লকের আঞ্চলিক পরিষদের সভায় ব্লক ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের (ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে) কোরাম হওয়া রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যাপার। জনসাধারণের সক্রিয় অংশ গ্রহণের এই নমুনা। মৌচাকে মধু চলে যাওয়ার সাথে সাথে মৌমাছিদের অন্তর্ধানের ঘটনার সঙ্গে বিশেষ তফাৎ নেই। এ প্রকল্প সার্থক কি ব্যর্থ হল এই চিত্র কি তার কোন ইঙ্গিত বহন করছে না?

প্রশ্ন উঠতে পারে যে জনসাধারণ যে ২৫০ কোটি টাকা ব্যয়ের অংশ হিসেবে চাঁদা দিয়েছে সেটার মূল্য কি কিছুই নয়? একটু গভীর অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে এই অংশ গ্রহণ একটি প্রতারণাবিশেষ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মাছের তেলে মাছ ভাজা হয়েছে, জনসাধারণের দেয় অংশ সরকারী অর্থের প্রাপ্য অংশ থেকে ম্যানেজ করে মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও সরকারী কাগজ-কলমে জনসাধারণের অংশ হিসেবে রেকর্ড-ভুক্ত হয়ে জমা পড়েছে। অবশ্য সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগে যে কেবল এই প্রথা উদ্ভাবিত হয়েছে একথা ঠিক নয়। যে বিভাগে ও যেখানে এই ধরণের শর্ত আরোপ হয়েছে সেখানে এই ধরণের এক নতুন দুর্নীতির জন্মলাভ ঘটেছে। এই প্রতারণাকারীরা আজ সারা সমাজদেহে ছড়িয়ে পড়েছে এবং অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে তারা শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে ভীষণভাবে সংক্রামিত হয়েছে। ২৫০ কোটি টাকা অঙ্কের মোবিলাইজেশান অব রিসোর্সের নামের এই চিত্র আসলে এই বিভাগের আত্মপ্রচারণার আড়ালে আত্মপ্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। আসলে দুর্নীতি সৃষ্টি ও বিস্তৃতির আর এক অংগন খোলা হয়েছে।

সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য ছিল প্রশাসনিক দক্ষতা সৃষ্টি করা। বিকেন্দ্রীকরণ করে ছোট ছোট ইউনিটে প্রশাসন বিভাগ গড়ে তুললে পরিচালনা দ্রুত ও দক্ষতাপূর্ণ হবে। এক-একটি ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসকে একটি ক্ষুদ্রাকার সেক্রেটারিয়েট সংস্করণ বলা চলে। গ্রামের মানুষদের ব্যয়বহুল দূরের জেলা অফিস ও সেক্রেটারিয়েট অফিসে যাতায়াত ও হয়রানিকে কমিয়ে এনে ব্যয়হীন দ্রুত কাজকর্মের সুবিধা করে দেওয়া অন্যতম লক্ষ্য ছিল। কিন্তু বাস্তবচিত্র বিপরীত। অত্যন্ত কম সীমাবদ্ধ কাজের ভার আছে এই উন্নয়ন অফিসগুলির কাঁধে। উপরন্তু দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, অপেক্ষাকৃত দুর্বল ... ব্লকের কার্যায় কাজ ...

কিছু নেই। অবশ্য উন্নয়ন বিরুদ্ধ বহু বোঝা চাপানো হয়েছে। কিন্তু আসল লক্ষ্য প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিশেষ সুবিধা হয়েছে এমন কিছু নজীর দেখা যায় না। অবশ্য বরাদ্দকৃত অর্থের খরচ করা দ্রুততর হয়েছে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দাবা। কিন্তু দায়িত্বের বোঝাটা অতি সহজেই প্রশাসনিক অফিসারেরা এই প্রতিনিধিদের ঘাড়ে ফেলে দেন কোন অসুবিধা বুঝলে। কিন্তু প্রশাসকদের সঙ্গে জনসাধারণের যে হৃদ্য সম্পর্ক গড়ার আশা করেছিল তার কোন ইতর বিশেষ ঘটে নি। এবং দুর্নীতির বিকেন্দ্রীকরণ হয়ে নতুন দিগন্ত রচনা হয়েছে। ইদানীং বেশীরভাগের অপরিহার্য অঙ্গ শস্য-সংগ্রহ ব্যবস্থাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে লেভির লিস্ট তৈরি করা, চোরা করা ও ডি-হোর্ডিং করা। জাতীয় দমন-মূলক সকল কাজের দায়িত্ব ব্লক অফিসের ঘাড়ে দেওয়া হয়েছে। জনসাধারণ আজ পুলিশের থানার মত ঘৃণা ও ভীতির চোখে এই অফিসকে দেখছে। জন-সাধারণের সঙ্গে প্রশাসনিক সংযোগ নিকটতর হয়েছে তবে তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তিক্ততা ও দুর্নীতির সহযোগিতা সৃষ্টি করে। উন্নয়নকারীদের এই লুণ্ঠনকারী কাজে নিয়োজিত করে উন্নয়নের মূলে শিকড়ে কুঠারাঘাত করা হয়েছে—সে কথা কি কেউ ভেবে দেখেছি? আবার প্রতি-নিধিদের সঙ্গে সম্পর্ক হৃদ্য না হয়ে বরং প্রতিযোগীতামূলক বা স্থান বিশেষে ঈর্ষা-মূলক হয়েছে। আমাদের দেশের প্রতিটি আঞ্চলিক পরিষদের সভাপতি ও প্রতি-নিধিদের অভিযোগ যে তাঁরা সহযোগিতা ঠিকমতো ত' করেন-ই নি বরং নানা প্রকারে বাধা ও অসুবিধা সৃষ্টি করেছেন। এই প্রশাসনিক পদাধিকারীরা যেন কি একটা হারানোর কমপ্লেক্সে ভুগছেন। জনপ্রতি-নিধিদের বিপদে পড়তে দেখলে তাঁরা সুখী হন এই অভিযোগ সর্বত্র।

সমষ্টি উন্নয়ন একটি নিবিড় প্রকল্প। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যত কর্মসূচী আছে সবই প্রায় সমষ্টি উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত। শিল্প, শিক্ষা, সমবায়, পঞ্চায়েত ও কৃষি ইত্যাদি সকলের জন্য বিশেষ পদাধিকারী ভারপ্রাপ্ত অফিসার আছে। এই প্রতিটি ব্লক অফিসের জন্য বৎসরে লাখখানেক নিশ্চয়ই বাজেট বরাদ্দ আছে। কিন্তু যে পরিমাণ অর্থ শুধু মাহিনা খাতে বায়িত হয় তার রিটার্নের অনুপাত কি কখনও দেখা হয়েছে। সমস্ত অর্থব্যয়কে নিষ্ফলা ও অপচয়ের খাতে অতি সহজেই ফেলা যায়। প্রতি ব্লক অফিসের এক-একটি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাজের অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে তাঁরা কিছু পরিসংখ্যান অঙ্ক পরিবেশন করার কাগজ

পরিসংখ্যান অঙ্ক পরিবেশন করার কাগজ-পত্র তৈরি করে রেখেছেন। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়, যদি সমবায় পরিদর্শকের রেকর্ড দেখেন তবে দেখান হবে ব্লকে কতগুলি সমবায় প্রতিষ্ঠান আছে বা নতুন করা হয়েছে। সেগুলি সত্যই জীবন্ত ও সচল আছে কিনা যদি সরেজমিনে তদন্ত করা হবে নিঃসন্দেহে হতাশ হবেন। এই সমবায় প্রতিষ্ঠান রেজেস্ট্রী করানোর পর তাঁদের দায়িত্ব প্রায় শেষ। তার পর কোন যোগাযোগ থাকে না এক অডিট করা সময় ছাড়া। প্রত্যেকটি বিভাগ সম্বন্ধে এই কথা সত্য। ইদানীং সমষ্টি উন্নয়নকে মূলতঃ কৃষিদপ্তরে পরিণত করা হয়েছে। দেশের সর্বাধিক প্রয়োজন মেটাতে হয়ত আপত্তি না করাই যুক্তি-সঙ্গত। কিন্তু ক'জন বি ডি ও ও কৃষি অফিসার কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন আর মাঠে মাঠে গিয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন? তাদের সমস্ত দায়িত্ব তারা গ্রামসেবকের ঘাড়ে চালান করে দিয়ে নিশ্চিন্ত। তবে কাগজ-কলমে কাজটি সবাই পাকা করে রাখেন। প্রশাসকদের সঙ্গে সেই দূরত্ব হ্রাস রাখার লক্ষ্য এখনও সমান দূরত্বে আছে। অবশ্য অনেক অকপট অফিসারেরা তাঁদের ত্রুটি স্বীকার করে বলেন যে তাঁদের এত বেশি অনাবশ্যক চিঠিপত্রাদি ও ফাইল নিয়ে কাজ করতে হয় যে তাঁদের পক্ষে যথার্থ মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। এটা ঠিক যে পিরামিড কাঠামোর সরকারী যন্ত্রের সকল চাপটা ঐ এক অফিসের ওপরে পড়ে। তাই চিঠিপত্র ও ফাইলের কাজ ক্রমশ ঊর্ধ্ব-মুখী হয়ে চলেছে। এই জন্য জয়েন্ট বি ডি ও সৃষ্টি করতে হয়েছে। কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি। এখনও খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রচেষ্টার সমস্ত দায়িত্ব মূলত ঐ অল্প বেতনের গ্রাম-সেবকের ওপর পড়ে আছে। সেখানেও দুর্নীতির অভিযোগ। অর্থ ও শক্তির এত বড় অপচয় (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সেই মূঢ় অপব্যয়) সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার সময় এসেছে।

তাহলে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা কি কোন বিশেষ আশীর্বাদ বহন করে নি? একথা ঠিক যে সরকারী সাহায্য নেবার জন্য এক সক্রিয় গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। সমাজের অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল কৃষকরা সাহায্য পেয়েছে ও উপকৃত হয়েছে। কিন্তু নিঃস্ব বা ভূমিহীন কৃষকদের কোন মঙ্গল সাধন করতে পারে নি। যে কুটিরশিল্প-গুলি সরকারী সাহায্যে খোলা হয়েছিল সবই প্রায় লালবাতি জ্বেলেছে। সরকারী সাহায্য নেবার এক উন্মুখ গোষ্ঠী যেমন তৎপর হয়েছে তেমনি প্রতিদানে সমাজকে কিছু দেবার মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয় নি।

এ এক পরিষ্কার লেভির চরিত্র। এক-তরফা চাহিদাবৃদ্ধি নিশ্চয়ই সামাজিক স্বার্থের পরিচায়ক নয়। অবশ্য একটা লাভ হয়েছে সমষ্টি উন্নয়ন কাজের সঙ্গে পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থাকে যুক্ত করে। রাজনীতি প্রিয়দের রাজনৈতিক অঙ্গনের বিরাট বিস্তৃতি ঘটেছে ও একটু বিচিত্র স্বাদের সুযোগ করে দিয়েছে। এম এল এ'র রাজনীতি ছাড়া এখন গ্রাম থেকে জেলা পর্যন্ত অনেক স্তরের রাজনীতির অঙ্গন প্রশস্ত হয়েছে। গ্রাম্য দলাদলিকে একটা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক করার সুবিধা হয়েছে। গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ হয়েছে, কিন্তু গণতান্ত্রিক বিকাশ কোথায়? পরস্পরের সম্মতি সহযোগে আত্মনির্ভরশীলতা ও প্রতি গ্রামে স্বাস্থ্য শিক্ষা শিল্পে স্বাবলম্বিতা গড়ে তুলে এক উচ্চ নাগরিক সভ্যতা সৃষ্টি হল কৈ? সম্পদ যত সৃষ্টি হয়েছে দৈন্যের পরিমাণ তত প্রকট হয়ে উঠেছে। জাতীয় চরিত্রে আজ অবক্ষয়ের সকল লক্ষণ পরিস্ফুট। নৈরাশ্য বিক্ষোভ ও অসন্তোষ ধূমায়মান এবং তা গ্রামে গ্রামে ঘাঁটি গেড়েছে। যুবচিত্ত ক্রমশ আয়ত্তের বাহিরে চলে যাচ্ছে। বিশ্বব্যাপী আজ তারুণ্যের বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। প্যারিস, জার্মান, যুগোস্লাভিয়া ইত্যাদি দেশে যে বিক্ষোভ তার সঙ্গে আমাদের দেশের তফাৎ থাকতে পারে কিন্তু ছোঁয়াচ লাগা বিচিত্র নয়। চলমান যে প্রথা ও পদ্ধতি রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক জগৎকে পরিচালিত করছে তা আশা পূরণ করাতে পারছে না বলেই ঐ সব দেশে বিদ্রোহ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশেও একথা সমানে প্রযোজ্য। কল্যাণ সাধনের সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনায় ৭৫০ কোটি টাকার বিনিয়োগ যুবচিত্ত ও যুব-শক্তিকে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে। যে প্রণালীর ও যে দৃষ্টিভঙ্গির সমষ্টি উন্নয়ন চালানো হচ্ছে তার আকৃতিগত ও গুণগত পরিবর্তন না হলে তা আরও অপচয় সৃষ্টি করবে। প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক যে গণতন্ত্র এতদিন ইউরোপ ও আমেরিকায় চলে এসেছে তা মানুষের বিকাশ সাধনে সহায়ক হচ্ছে না। আমরা সেই প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক গণতন্ত্র গড়তে গিয়ে বিকাশের আধুনিক চাহিদা মেটাতে পারব কি না সে চিন্তা দরকার। ব্যক্তির দাবি আজ সোচ্চার। ব্যক্তির অস্বীকৃতি না ঘটে এমন বিকাশ প্রয়োজন। ব্যক্তিভিত্তিক ও প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক গণ-তান্ত্রিক বিকাশের মাঝে সেতুবন্ধ প্রয়োজন কি না বা অন্য চিন্তার প্রয়োজন আছে তাও ভাবতে হবে। তাই সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার মৌলিক পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ ক্ষুব্ধ ॥

গুজব ছড়াল, এক ব্যাটালিয়ন কোথায় নাকি গুলি চালাতে অস্বীকার করেছে। সত্যি মিথ্যে খোদায় মালুম। নাকি বলেছে, ভারতের শত্রু যারা তাদের দিকে আমরা বন্দুক তুলব। দেশ-সেবক আমরা, মাইনে-খাওয়া কশাই নই। দেশের মানুষ ওরা, তায় নিরস্ত্র, ওদের আমরা মারতে পারব না।

বলেছে এই নাকি। এবং বন্দুক নামিয়ে লাইন ভেঙে বেরিয়ে এসেছে।

সত্যি কথাই বলেছে। দেশের নরনারীর নয়নপুত্তলি এই জওয়ানেরা। ভালবাসার দুলাল। লড়াইয়ের সময় কলকাতা শহরেই কত দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। খাবারের টানা-টানি কর্তাদের ব্যবস্থার গুণে—পয়সা দিয়েও সব সময় মেলে না। কপালগুণে তাই হয়তো মিলেছে, বসে গেছে খাবার টেবিলে। ঠিক এই সময় জওয়ান ক'জন রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ল। বুড়োআঙুল নেড়ে ম্যানেজার বলে, ঢনঢন। যা ছিল ঐ খতম হয়ে গেল। খদ্দেররা কিন্তু টেবিল ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ায়: খান—

আপনারা ?

না-ই খেলাম আজ আমরা। পাহাড়ে জঙ্গলে কতদিন আপনারা নিরাহারে থাকেন—আমাদেরই জন্যে। আজকে সকলের মতন খাবার না জোটে তো আপনারাই খাবেন, আমাদের উপোস।

দুর্গম ফ্রন্টে ভাইফোঁটার সময় বোনেরা ফোঁটা পাঠায়, শীতের জন্য সোয়েটার বুনে পাঠায়। লেখকেরা বই পাঠায়। আমরা এখানে যত কষ্টেই থাকি, অভাবের আঁচ না লাগে যেন তাদের গায়ে। জওয়ানেরা মনে রাখে এসব। তারাও বলে, তোমাদের ভালবাসা বর্মের মতন ঘিরে থাকে বলেই আমাদের শৌর্য-সাহস। সামান্য অস্ত্র নিয়ে প্যাটন-ট্যাঙ্ক ধ্বংস করি, ভেঙেচুরে ডানা পাকিয়ে জঙ্গি-বিমান ভূতলে ফেলে দিই। শাসকদল নিজেরা অপদার্থ। হালে পানি পাচ্ছে না, বন্দুক বাগিয়ে আমাদেরই তাই সামাল দিতে হবে। পরিণামে, ভালবাসা উপে গিয়ে ঘৃণা হবে দেশের মানুষের।

বৃত্তান্ত শুনে নীলকণ্ঠ বর্মা শিউরে উঠলেন: জল্লাদের কাজে জওয়ানদের লাগানো—সর্বনেশে জিনিস, বড় বড় সাংঘাতিক। বন্দুক যত্রতত্র তাক করবার হুকুম দেয়, সেই সব বন্দুকই একদিন হুকুমদারদের দিকে তাক করে। দুনিয়ায় হাজার গণ্ডা নজির—যার নাম মিলিটারি ক্যু। নাইজেরিয়া গণতন্ত্রে একেবারে হালফিল যা ঘটল।

নাইজেরিয়ার প্রধানমন্ত্রীটি নিজে তত খারাপ ছিলেন না, কিন্তু সঙ্গীরা অতি জঘন্য। মন্ত্রী বানিয়ে যাদের সব মসনদে তুলেছেন, বেপরোয়া ঘুসখোর তারা, কোনরকম নীতির বালাই নেই। অর্থমন্ত্রী ঘুস খান রেখেঢেকে নয়, পুরো-দস্তুর খোলাখুলি। যথা, আমদানি-লাইসেন্সের দরবার নিয়ে এসেছে এক ব্যক্তি। এসে নিজের ফার্মের গুণপনা বলছে: এমন সাচ্চা কাজকারবার দুনিয়ার উপর অন্য কারো নেই। অর্থমন্ত্রী হাত ঘুরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে দেন, তবে আসুনগে মশায়।

থতমত খেয়ে দরখাস্তকারী বলেন, আজ্ঞে ?

লাইসেন্স পাবেন না আপনি। পেয়েই বা কি হবে? লোকসান খেয়ে মরবেন।

সরল সাফ কথা অর্থমন্ত্রীর—রেখে ঢেকে কিছু বলেন না। বলেন, গণতন্ত্রের দেশে মন্ত্রিত্ব হল পদ্মপত্রে জল। আজকে আছে, কাল যদিই বা থাকে, পরশু কদাপি নেই। ভোটে জিতে অন্য লোকে নিয়ে নেবে। তাড়াহুড়ো করে যাবতীয় খরচ-খরচা আমায় তুলে নিতে হবে। দেবেন আপনারাই—এই পারমিট বাবদেও দেবেন। [illegible] আসবেন না। [illegible]

আপনি সরে পড়ুন, আপনাকে দিয়ে হবে না।

পদ্মপত্রে জল—ঐ যে উপমা দিলেন, সেটা কিন্তু নিতান্তই বিদেশের কথা। গণতন্ত্রের (বিলাতি গণতন্ত্রের কথা বলছি নে। তাদের ঘাঁটি থেকে গণতন্ত্রের নামে যে মাল নিরক্ষর দরিদ্র অঞ্চলে রপ্তানি হয়েছে।) মজা হল, যথোচিত তদ্বির-বন্দোবস্তের ফলে পার্টি চিরকালই ক্ষমতায় থাকে। এবং পার্টির ভিতরে দ্বিতীয় দফা তদ্বিরের ফলে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির মন্ত্রিত্বও। (পশ্চিমবঙ্গেরই এক সত্য ঘটনা—গত ইলেকসনের মুখে কাগজে পড়েছেন। ভোটারদের তালিকায় বাদ পড়ে গেছে বলে পার্টির এক কেষ্টবিষ্টু আরোপ ফরম সহ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির। বিভিন্ন নাম, ভিন্ন ভিন্ন ঠিকানা। ম্যাজিস্ট্রেট সন্দেহ করলেন: আঙুলের ছাপ সবই যেন একরকম। কক্ষণো না, হতেই পারে না, ভুল ধারণা আপনার। প্রতিবাদ কানে না নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট বিশেষজ্ঞ এনে পরীক্ষা করালেন। ভুল ম্যাজিস্ট্রেটেরই বটে—আঙুলের ছাপ একখানা হাতের কেন হবে, চার-চারখানা হাতের। অনুসন্ধান-ক্রমে সেই একগণ্ডা হাতের মালিকদেরও নিশানা পাওয়া গেল—কেষ্টবিষ্টু প্রভার স্বয়ং, তাঁর স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে।) ক্ষমতাসীন পার্টির টাকার অনটন নেই। কালো পথ ধরে ধারাস্রোতে টাকা আসছে। তালিম-দেওয়া লাখো লাখো কর্মী—ভোটের ব্যাপারে তারা বাস্তুঘুঘু এক-একটি। কিন্তু নাইজেরিয়ার অঘটন—এত সব দরাজ ব্যবস্থা সত্ত্বেও ইলেকসনে জুত হচ্ছে না। তখন শেষ অস্ত্র প্রয়োগ—ব্যালট-বাক্সের লেবেল পালটে দেওয়া। সর্বক্ষেত্রে তাতেও সুবিধে হল না দেখে ফলাফল-ঘোষণায় কারচুপি—পরাজিতকে জয়ী বলে ঘোষণা। গদি থেকে কেমন করে নামায় আমাদের, দেখি।

লোকে তিতিবিরক্ত: যাচ্ছেতাই হোক [illegible]

[illegible] আঘাত আসেনি [illegible] হয় নাই। সৈন্যেরা বিদ্রোহ [illegible]।

প্রধানমন্ত্রীর ঘরে গিয়ে সবিনয়ে নিবেদন জানাল, একবার বাইরে আসতে হবে যে হুজুর। মানুষ বড় উতলা হয়ে দেখতে চাইছে। ঝানু লোক তিনি, বুঝতে কিছু বাকি নেই। তাড়াতাড়ি পোশাক পরলেন—নির্বাচনের প্রার্থনার পোশাক। দুই হাত উঁচু করে এসে দাঁড়ালেন জনতার সামনে। চারিদিক এক নজর দেখে নিয়ে সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে খানিকটা আবেগের সুরে বললেন, হ্যান্ডকাফ পরাও—আমি অপরাধী। প্রধানমন্ত্রীর হাতে হাতকড়া পরাল—না বললেও পরাত, এসেছে তারা এইজন্যেই। বন্দী মন্ত্রী ধীরপায়ে গিয়ে কয়েদির গাড়িতে উঠে বসলেন। গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিল, আর দেখা যায় না।

অর্থমন্ত্রীর বাড়িতেও সৈন্য ঢুকে গেছে। পায়জামা পরে দ্রুত তিনি বেরিয়ে এলেন। নোটের বোঝা পাঁজা করে এনেছেন। বলছেন, যত টাকা ইচ্ছে নাও। টাকা নিয়ে রেহাই দিয়ে যাও বাপধনেরা। বাণ্ডিল খুলে নোট চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন। অতি-দরিদ্র সব মানুষ—এক টাকা দু-টাকার দিন ভোর মজুরবৃত্তি করে। কিন্তু কী হবে আজ হঠাৎ—লক্ষপতি কোটিপতি রাজাধিরাজ যেন এক-একটা। মন্ত্রীর টাকা জনতা আজ পায়ে দলছে, কেউ বা দু-হাতে নোট তুলে ধরে টুকরো টুকরো করে বাতাসে উড়িয়ে দিচ্ছে। বেগতিক বুঝে অর্থমন্ত্রী এইবারে দৌড়ে পালাচ্ছেন। চোর নির্বিঘ্নে চুরি করছিল, গৃহস্থ এতদিনে সজাগ হয়ে তাড়া করেছে—এমনি একটা ভাব।

তাড়া করে ধরে ফেলল মন্ত্রীকে। বুক-ফাটা আর্তনাদ, প্রাণের জন্য কী কাকুতি-মিনতি! মেরো না বাপসকল বাঁচতে দাও। যথাসর্বস্ব নিয়ে প্রাণ ভিক্ষা দিয়ে যাও আমায়।

জনতা বলল, পুলিস ধরে কত লোক এ যাবৎ মেরেছে, গোনাগণতি নেই। হাজার হাজার জীবনের বদলা একটা মাত্র জীবন—তাতে আপত্তি করলে হবে কেন?

জনতা রাস্তার উপরে হিড় হিড় করে টেনে চিত করে ফেলল। জনা দুই বুকের উপরে নাচছে উন্মত্তভাবে। নিঃসাড় হল, মরা-ইঁদুরের লেজ ধরে ফেলে দেওয়ার মতন, ঠ্যাং ধরে টেনে নর্দমায় ফেলে দিল। প্রধানমন্ত্রীকেও ভিন্ন এক নর্দমার মধ্যে পাওয়া গেল কয়েকটা দিন পরে।

আর একজন ছিলেন আমির [illegible]—[illegible]দলের নেতা, গভর্নমেন্টের [illegible]। আমিরের প্রাসাদের [illegible] ঘিরে [illegible] করছে। সেই সব মূর্খ ভীতু মানুষেরা অবলীলাক্রমে প্রাসাদে ঢুকে গেল, আমিরকে ধরে আনল টানতে টানতে। দেয়ালে ঠেসে ধরে বুকের উপরে বন্দুকের নল ঠেকানো দিল। তারপর ধীরেসুস্থে ট্রিগার টিপল একেবারে অনুত্তেজনার মধ্যে গল্প করতে করতে। শেষে। লাথি মেরে নর্দমায় ফেলল।

বিদ্রোহ ধোঁয়াচ্ছিল, একটা পাকাপোক্ত দল গড়ে উঠছিল ক্রমশ। চরের মুখে কর্তারা খবর পেয়ে সন্ত্রস্ত হলেন। সৈন্যদের উপর ফরমাস হল বিদ্রোহীদল সায়েস্তা করবার জন্য। পরিবর্তে কি চাই বলো। কত টাকা চাই? খাদ্য, সুখ-সুবিধা, মদ, স্ত্রীলোক? তাতেই আরো সৈন্যদল ক্ষেপে গেল: দেশের জন্য আমরা প্রাণ অবধি দিতে রাজি, অই বলে কি দুষ্টচক্রের ওই নায়কদের জন্য?

গণতন্ত্রী মন্ত্রীরা পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পায় নি। বিদ্রোহ সফল হল। জনচিত্তে উল্লাসতরঙ্গ। শোভাযাত্রা বেরিয়েছে—তার মধ্যে সকল সম্প্রদায়। এ-দলে ও-দলে কতরকমের বিরোধ ছিল, এই মুহূর্তে ধুয়ে মুছে পরিচ্ছন্ন সে সব। মানুষের মর্যাদা ও আত্মশক্তি কোন বিবরে এতকাল যেন লুকিয়ে ছিল, মুক্ত হয়ে সূর্যালোকে আজ বেরিয়ে এসেছে। বিশাল শবাধার কাঁধে বয়ে চলেছে—গায়ে লেখা রয়েছে 'অন্ধকার-অনাচারের মৃতদেহ'।

নীলকান্ত বর্মা মন্তব্য করলেন, গোখরো নিয়ে খেলা বিপজ্জনক। হোক না পোষা গোখরো। যে খেলাচ্ছে তার উপরেই কোন সময় ছোবল ঝাড়বে, ঠিক-ঠিকানা নেই। ওস্তাদ সাপুড়ে সাপ খেলায় বটে, কিন্তু ঝাঁপি খোলার আগে ভাল করে দেখে নেয় বিষদাঁত ভাঙা আছে কি না। [ক্রমশঃ]

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

এবার পূজোর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণের প্রকাশের সংগে তাল রেখে এবার নির্বাচনের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। পূজোর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ সিনেমাতে শঙ্করের 'চৌরঙ্গী', অপ্সরা ফিল্মসের 'তিন অধ্যায়' বিভিন্ন সিনেমায় মুক্তি পেয়েছে আর একই সংগে মুক্তি পেয়েছে তথা প্রকাশিত হয়েছে পশ্চিমবংগে তৃতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক দলিল 'বিপ্লবী পার্টি গড়ার কাজে হাত দিন' আর 'লোকদল—লক্ষ্য আদর্শ ও কর্মপন্থা'। চিত্ররসিকরা পূজো মরশুম উপভোগ করতে নিশ্চয়ই 'চৌরঙ্গী' ও 'তিন অধ্যায়' দেখবেন, একইভাবে রাজনৈতিক কর্মী ও রাজনীতিতে উৎসাহীরা নিশ্চয়ই পশ্চিমবংগের আগামী দিনের দুটি রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কর্মপন্থা অনুধাবনের চেষ্টা করবেন। পশ্চিমবংগের মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির নকশাল-পন্থীরা নিজেদের সরকারী দল থেকে আলাদা করে নিয়েছিল অনেকদিন, নিজেদের মুখপত্র প্রকাশ, কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন মারফৎ নিজেদের সংগঠন পরিচালনার কাজ অনেকদিন থেকেই চলে আসছে। এইবার এই নতুন দলের লক্ষ্য ও আদর্শ প্রকাশ করেছেন নকশালপন্থী কম্যুনিস্ট দলের তাত্ত্বিক শ্রীচারু মজুমদার তাঁর লেখা "বিপ্লবী পার্টি গড়ার কাজে হাত দিন" নিবন্ধে। নকশালপন্থী কম্যুনিস্টরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকেন 'কম্যুনিস্ট পার্টির বিপ্লবী অংশ' বলে আর দলের আদর্শ ও লক্ষ্যও লেখা হয়েছে 'বিপ্লবী পার্টি গড়ার কাজে হাত দিন' বলে। আগামীদিনের এই নতুন কম্যুনিস্ট পার্টি কেমন হবে, কি আদর্শ, লক্ষ্য ও কর্মপন্থায় পার্টি কাজ করবে তার চিত্র এঁকে দিয়েছেন শ্রীচারু মজুমদার তাঁর নিবন্ধে।

নতুন দলের লক্ষ্য-আদর্শ-কর্মপন্থা কি হবে সেই কথা বলতে গিয়ে শ্রীচারু মজুমদার লিখেছেন—"বিপ্লবী পার্টির দায়িত্ব কৃষকদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থেকে গ্রামাঞ্চলে সশস্ত্র সংগ্রামের এলাকা গড়ে তোলা। ভারতবর্ষে চেয়ারম্যান (মাও) নির্দেশিত মুক্ত অঞ্চল গড়ার কাজে হাত লাগিয়েছে। এই যুগে বিপ্লবী পার্টি গড়ার পক্ষে চেয়ারম্যানের চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসার করাই একমাত্র কাজ নয়, আজকের বিপ্লবী পার্টিকে চেয়ারম্যানের কর্মধারা আয়ত্ত করতে হবে, তবেই তাকে আমরা বিপ্লবী পার্টি বলতে পারি।... আজকের ভারতবর্ষে বিপ্লবীতত্ত্বে ও প্রয়োগের সমন্বয় ঘটাতে হবে। পার্টিকে এখনই গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রামের এলাকা গড়ে তুলতে হবে। তাই তত্ত্ব ও প্রয়োগের সমন্বয় করতে হলে কৃষকশ্রেণীর বিশ্লেষণ শিখতে হবে এবং দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক, যারা কৃষি বিপ্লবের প্রধান শক্তি, তাদের মধ্যেই পার্টিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। জনতার সংগে গভীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এই ভূমিহীন এবং দরিদ্র কৃষকদের পার্টি ইউনিটগুলিকে চেয়ারম্যানের চিন্তাধারার রাজনৈতিক প্রচার ও প্রসার মারফৎ ব্যাপক কৃষক জনসাধারণের জন্য সংগ্রাম সংগঠিত করতে হবে। এই গেরিলা ইউনিটকে রাজনীতি প্রচার ও প্রসার এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মারফৎ পার্টির গণ-ভিত্তিকে আরো ব্যাপক ও দৃঢ় করতে হবে। এইভাবেই দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মারফৎ জনতার স্থায়ী সশস্ত্রবাহিনী গড়ে উঠবে ও এই সংগ্রাম জনযুদ্ধের রূপ নেবে। এই কর্মধারায় উপস্থিত হলে যে নতুন বিপ্লবী পার্টি জন্ম নেবে, সেই পার্টি বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়গুলির উপর নিশ্চয়ই নির্ভরশীল থাকবে না, শ্রমিক-শ্রেণীর মধ্যে অবিরাম কৃষি-বিপ্লবের রাজনীতি, চেয়ারম্যানের চিন্তাধারায় প্রচার চালিয়ে যেতে হবে। তার ফলে শ্রমিক-শ্রেণীর যে অগ্রণী অংশ চেয়ারম্যানের চিন্তাধারা ও তার কর্মধারায় অভ্যস্ত হবে, তাকে সক্রিয়ভাবে কৃষি-বিপ্লব সংগঠিত করতে গ্রামাঞ্চলে পাঠাতে হবে। এইভাবেই কৃষি-বিপ্লবের উপর শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্ব কার্যকর রূপ নেবে। এই বিপ্লবী পার্টি যেমন নির্বাচনী পার্টি হবে না, তেমনি শহরকে কেন্দ্র করেও গড়ে উঠবে না। বিপ্লবী পার্টি কখনই প্রকাশ্যে পার্টি হতে পারে না ও কাগজ বের করা তার প্রধান কাজ হতে পারে না এবং বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের উপর নির্ভরশীল

গ্রহণে প্রান্তিক গণসংগ্রামের নির্ভর বিপ্লবী পার্টির প্রকৃত বিপ্লবী কৌশল উপর নির্ভরশীল। 'কৃষকের মুক্তির জন্য কৃষক-সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে, গোপন সংগঠন গড়ে তুলতে হবে. তা না হলে প্রতিবিপ্লবের আক্রমণের সামনে পার্টি অসহায় হয়ে পড়বে। বিপ্লবী পার্টি তাকেই বলা যে পার্টি গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের বিপ্লবী সংগ্রাম সংগঠিত করতে পারবে। এই রকম একটি পার্টি গড়ার জন্য আজ সমস্ত বিপ্লবীর সক্রিয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।"

১৯৬৭ সালের ১৪ই জুন নকশাল-বাড়ির ঘটনার পর রাজ্যের তৎকালীন মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার শিলিগুড়ি জেলে নকশালবাড়ি আন্দোলনের নেতা শ্রীপঞ্চানন সরকারের সঙ্গে দেখা করলে শ্রীসরকার প্রথম বলেন—শ্রীকোঙার প্রমুখ নেতারা শ্রেণীসংগ্রামের মৌল চরিত্র পরিবর্তনের চেষ্টা করছেন ও শোধনবাদ প্রবর্তন করছেন। তারপর মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিকে নয়াশোধনবাদী আখ্যা দিয়ে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির একটি অংশ ধীরে ধীরে নিজেদের ঐ পার্টি থেকে আলাদা করে নেন। কিন্তু আলাদা হয়ে যাওয়া শেষ কথা হতে পারে না. পার্টি থেকে আলাদা হয়ে আলাদা পার্টি গড়াই হল শেষ কথা, শ্রীচারু মজুমদার এই দলিলে সেই শেষ কথাই বলে দিয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি সৃষ্টির মূলে যদি থাকে এক পক্ষের স্বার্থ তার অপর পক্ষের বিক্ষোভ, এক পক্ষের রাজনীতি মতাদর্শ-কর্মধারার বিচ্যুতিতে অপর পক্ষের নতুন দল গড়ার তাগিদ, তবে অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের লোকদল গড়ে তুলবার মূলে আছে একটি অভিমান —ঠিক ব্যর্থ প্রেমিকের হৃদয়ব্যথার মত। "লোকদলের লক্ষ্য, আদর্শ ও কর্মপন্থা" বইটিতে অধ্যাপক কবির সেই হৃদয়ব্যথা প্রকাশ করে কংগ্রেসের প্রতি অভিমানের প্রতিহিংসা গ্রহণ করতেই নতুন দল গড়েছেন, আর লক্ষ্য, আদর্শকেও সেই পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। 'লোকদলের লক্ষ্য আদর্শ' প্রকাশ করে অধ্যাপক কবির অনেক কথাই বলেছেন—কেমন করে রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছিল. কেমন করে তিনি সেই সরকারের পতন ঘটিয়েছিলেন. কবে কিভাবে তিনি ডঃ ঘোষকে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে প্রথমে নিষেধ ও পরে সম্মতি দিয়েছিলেন। কেমন করে রাজ্যে কংগ্রেস-পি-ডি-এফ মন্ত্রিসভা গঠিত হল, কেমন করে সেই সরকারের পতন হল—তারপর কি কি পরিস্থিতিতে তিনি কংগ্রেসে ফিরে যেতে চাইলেন আর কংগ্রেস কেমন করে তাঁর আলাপ করে সেই চেষ্টা বানচাল করল। সব কথা বলে অধ্যাপক কবির নিজ

লক্ষ্য, আদর্শ সম্পর্কে অনেক ভাল ভাল কথা বলেছেন আর ব্যাখ্যা দিয়েছেন কংগ্রেস আর লোকদলের মৌলিক প্রভেদ কোথায়? কিন্তু স্পষ্ট নিশ্চিতভাবে এই সব কথার মধ্যে যে কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে, সেটা হল যদি কংগ্রেসের কাছে সেই দিন দরে বনতো তবে আজ লোক-দল প্রতিষ্ঠিত হত না আর দেশবাসীও লোকদলের এই আদর্শ সম্পর্কে এত ভাল কথা শুনতে পেত না। অধ্যাপক কবির বলেছেন—"যুক্তফ্রন্টের দুঃশাসনে যখন দেশ জর্জরিত হয়ে পড়েছিল, তখন প্রদেশকে রাহুমুক্ত করবার জন্য আমরা যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দিই .....। সেই সময় কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা না করলে বাংলা দেশকে বাঁচানো যেত না, কংগ্রেস-পি-ডি-এফ

"মন্ত্রিসভা গঠনের এই একমাত্র কারণ। পথ চলতে চলতে যদি পাগলা ষাঁড়ে বা কুকুরে তাড়া করে, তখন সেই বিপদ থেকে বাঁচতে মানুষ পচা পুকুরে ঝাঁপ দেয়।" "কংগ্রেসের দুর্বলতা ও কয়েকজন কংগ্রেস নেতার ষড়যন্ত্রে পি-ডি-এফ-কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ভেঙে গেল।' এইসব নেতারা পি-ডি-এফ মন্ত্রীদের কর্মকুশলতা ও সাফল্য দেখে ভয় পেয়েছিলেন, ভেবেছিলেন যে, যদি পি-ডি-এফ-কংগ্রেস মন্ত্রিসভা এই রকম কৃতিত্বের সঙ্গে তিন-চার বছর শাসন জারী রাখতে পারে, তবে পি-ডি-এফ যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করবে, তাতে ভবিষ্যতে কংগ্রেসের পক্ষে একক শাসন চালানো সম্ভব হবে না। তাই বাংলাদেশে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ মুখে কোয়ালিশন সমর্থন এবং আগামী নির্বাচনে যুক্তভাবে নির্বাচন পরিচালনার অঙ্গীকার করলেও পরে সে অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারে নি।"

কংগ্রেস কেন অঙ্গীকার রক্ষা করে নি সেই ব্যথায় ও দুঃখে পতন হল লোকদলের—কিন্তু অধ্যাপক কবির তাঁর আরও ব্যথার কথা বলেছেন। "কেবলমাত্র চৌদ্দজন পি-ডি-এফ সদস্য কংগ্রেসে যোগদান করলে কংগ্রেসের বিশেষ কোন লাভ হবে না এবং যাঁরা যোগ দেবেন তাঁদের উপর জনগণের আস্থা কমে যাবে।. ... বাংলার জনসাধারণের সামনে যদি কেবলমাত্র কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট এই দুই জোট ছাড়া অন্য কোন তৃতীয় পথ না থাকে, যদি অজয়বাবু এবং অতুল্যবাবুর মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমিত থাকে, বাংলার জনসাধারণের একটি অংশ সেই অবস্থায় হয় ভোট দেবেন না, কিংবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও অজয়বাবুর দিকে ঝুঁকবেন।" কাজেই বাংলা দেশের মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও যাতে অজয়বাবুর দিকে না ঝুঁকতে পারে, তার ভারসাম্য রক্ষা করতে লোকদলের সৃষ্টি—এই কথাটাও সম্ভবত অনিচ্ছা সত্ত্বেও অধ্যাপক কবির বলে দিয়েছেন। কিন্তু শেষ সেইখানেই নয়—অধ্যাপক কবির নিজে চেষ্টা করে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর দলের মিলনপর্ব সমাধা করতে পারেন নি, তাই সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের ভার জনগণের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। কংগ্রেস-লোকদল মিলনপর্বের ব্যর্থতা ও পরবর্তীকালে কংগ্রেস লোকদলের সঙ্গে কোন ঐক্য করবে না এই কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক কবির বলেছেন—"সম্প্রতি বাংলাদেশের দু'-একজন কংগ্রেস নেতা বলেছেন যে, লোকদল এবং কংগ্রেসের মিলনের শর্ত নিয়ে কোন আলোচনা হয় নি। এপ্রিল মাসের শেষে এই সমস্ত কংগ্রেস নেতাই নিজেরা উপযাচক হয়ে আমাদের কংগ্রেসে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। মে মাসের শেষ পর্যন্ত আলোচনা চালু ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই আলোচনা ব্যর্থ হল। এই কয়েক মাস ধরে যে কথাবার্তা হলো, সেইগুলি কেবল খোসগল্প অথবা আবহাওয়া আলোচনা—কংগ্রেস নেতারা এবং তাঁদের অনুগামীরা হলফ করে বললেও সেই কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। অতুল্যবাবু এই কথাও বলেছেন যে, লোকদলের সাথে মিলে কংগ্রেস কোনদিনই মন্ত্রিসভা গঠন করবে না। এই রকম মত প্রকাশের অধিকার তাঁর নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু নির্বাচনের পর কি হবে সেই বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত আপনাদের। শ্রীঅতুল্য ঘোষ গত নির্বাচনের পর কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে বলেছিলেন এবং নির্বাচনের পরও বলেছিলেন কংগ্রেস কোন কোয়ালিশনে যোগ দেবে না—তাঁর একটি কথাও টেকে নি, এবং এবারও আমার বিশ্বাস আপনারা তাঁর কথাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করবেন। লোকদল-কংগ্রেস কোয়ালিশন হবে কি না, সেই সিদ্ধান্তের অধিকার একমাত্র আপনাদেরই আছে, অন্য কেউ এখনি সেই সম্বন্ধে চূড়ান্ত রায় দিলে তাকে অনধিকার চর্চা বলা ভিন্ন উপায় নেই।"

লোকদলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে অধ্যাপক কবিরের বইটিতে নিশ্চয়ই আরো অনেক ভাল ভাল কথা আছে, আরো মূল্যবান দর্শন ও তথ্যের কথা আছে, কারণ অধ্যাপক কবিরের মত পণ্ডিত ব্যক্তির লেখায় সেটা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু বহু কথার মধ্যে উপরের কথাগুলিও আছে, আর এই কথাগুলি থাকবার পর অন্য কথাগুলি পড়তে ঠিক স্বাদ পাওয়া মুস্কিল। তবু পুজোর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণে শ্রীচাবু মজুমদারের ও অধ্যাপক কবিরের লেখা দুটি খুবই সময়োপযোগী, আর এই দুই লেখারই তাৎপর্য হল—লেখা পড়বেন তাজা, কিন্তু অর্থ বুঝবেন অনেক দিন পরে।

[illegible] ১৯০৩-৬৩ ঃ

[illegible] ও [illegible]

[illegible] একটি কবিতায় লিখে-ছেন ঃ "আমরা এদেশের অংশ হবার [illegible] এদেশটা ছিল আমাদের।/আমরা এদেশের মানুষ হবার শতবর্ষেরও আগে/এদেশ ছিল আমাদেরই।/ম্যাসাচুসেটস্-এ, ভার্জিনিয়ার এদেশ আমাদের।/কিন্তু আমরা তখনও ইংলন্ডের, তখনও উপনিবেশের মানুষ,/যে আমাদের ছেড়ে দিয়েছে তাকেই আঁকড়ে রয়েছি,/যা আমাদের আর নেই, তা-ই আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে।/কী যেন দূরে সরিয়ে রেখেছি, তা-ই আমাদের দুর্বল করে,/পরে দেখলাম, নিজেদেরই দূরে সরিয়ে রেখেছি,/নিজেদেরই সরিয়ে রেখেছি আমাদের দেশের মাটি থেকে" রাজনৈতিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম দিকের অধিবাসীরা ইংলন্ডের প্রভাব থেকে মুক্ত হবার যতই প্রাণপণ চেষ্টা করুন, ভাবনা ও সংস্কৃতির দিক থেকে তাঁরা আদি নিবাস ইংলন্ডের ছোঁয়াচ বাঁচাতে পারেন নি। প্রথমত, মার্কিন ভূমির দেশজ রেড ইনডিয়ন সংস্কৃতির প্রতি এঁদের কোন শ্রদ্ধাই ছিল না। বরং এই আদিবাসীদের কাছ থেকে দেশ ছিনিয়ে নিতে গিয়ে এঁরা ঘৃণা করতে শিখেছিলেন এই দেশের মাটির আদিম সন্তানদের। এই দুই জাতির মধ্যে কখনই আত্মীয়তা গড়ে ওঠে নি। [illegible] রেড ইনডিয়ন লোককথা ও লোক-

বিংশ শতাব্দীর মার্কিন সাহিত্য

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

গীতির শিকড় প্রোথিত ছিল আমেরিকার জলবাতাস মাটির গভীরে। দ্বিতীয়ত, "যে সমাজের মুখ্য ভূমিকা...প্রকৃতির সঙ্গে শারীর সংগ্রাম, এবং সেই প্রকৃতি নির্দয় ও প্রবল, সেই সমাজে বুদ্ধিজীবীর তেমন কোন গুরুত্ব নেই। বুদ্ধিজীবীসুলভ ও শৌল্পিক রুচি যাঁদের সহজাত, তাঁরা যখন দেখেন তাঁরা অবজ্ঞাত অবহেলিত সংখ্যা-লঘু শ্রেণী, তখন তাঁরা স্বভাবতই নিজে-দের সমাজকে রুচিহীন বিবেচনা করে আরো পরিশীলিত আরো আয়েশী কোন সংস্কৃতির মায়ায় বিভোর হন।" কথাগুলো অডেনের, বিশেষত এমার্সন, পো ও থোরো সম্পর্কে। সতেরো থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত মার্কিন কবিরা যে কবিতা রচনা করেছেন, তা প্রধানত ইংলন্ডেরই কাব্য-ধারার অন্তর্গত। ইংলন্ডের বিভিন্ন কবিতা আন্দোলনের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ

স-প৮। অবশ্য তারই মধ্যে একদিক থেকে মার্কিন কবিতার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে জন ডান্, মারভেল, হারবার্ট, ডন প্রমুখ কবিরা ইংলন্ডে মেটাফিজিকাল কবিগোষ্ঠী নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁদের প্রতিষ্ঠা তাঁদের স্বদেশে কিছুটা ক্ষয়িত হলেও মার্কিন কবিতার ঐতিহ্যে তাঁরা থেকে গেছিলেন। এই কাব্যধারায় বুদ্ধির তীক্ষ্ণ প্রয়োগে প্রেম, ধর্মীয় আবেগ বা এমন কি যুক্তিতর্কের কূটকচাল বা বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত তথ্য একই সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মিশিয়ে য়োরোপের নবজাগরণের বিস্তৃত ও জটিল মানসপটের অভিজ্ঞতাকে ধারণ করার চেষ্টা হয়েছিল। কবিতার পরবর্তী-কালের ভাষায় অনেকদিন কল্পনার এই মুক্ত বিস্তার খুঁজে পাওয়া যায় নি। কবিতা যেন বুদ্ধি ও আবেগের বিপরীত প্রান্ত থেকে প্রান্তে হন্যে হয়ে ছুটে বেড়িয়েছে। আবেগের কবিতাই রাজত্ব করেছে বেশি দিন। মেটাফিজিকাল কবিতার উত্তরাধিকার সেদিক থেকে মার্কিন কবিতাকে প্রাণবান রেখেছিল। এডওয়ার্ড টেলর (১৬৪৫-১৭২৯) ও রাল্ফ ওয়ালডো এমার্সনের (১৮০৩-১৮৮২) কবিতায় তত্ত্ব ও দিনানুদৈনিক জীবন, আবেগ ও বুদ্ধির এই মেলবন্ধন তো আছেই। এমিলি ডিকিনসনের (১৮৩০-১৮৮৬) কবিতাতেও প্রায়ই এই মেটাফিজিকাল কল্পনার প্রবণতা লক্ষ করা যায় ঃ "আমি বাস করি সম্ভাবনায়/গদ্যের চেয়ে ঢের খাসা বাড়ি,/জানালাও বেশি,/দরজাও ঢের ভালো।" কিংবা, "আত্মা বেছে নেয় নিজের সমাজ,/তারপর দরজা বন্ধ করে দেয়।" কিংবা, "মানুষের মস্তিষ্ক আকাশের চেয়েও প্রশস্ত,/পাশাপাশি রাখলেই দেখবে,/একটার মধ্যে অন্যটা/স্বচ্ছন্দে ঢুকে যায়, সেই সঙ্গে তুমিও।/মানুষের মস্তিষ্ক সমুদ্রের চেয়েও গভীর,/নীলে নীলে মিলিয়ে দেখলেই দেখবে,/একে অন্যতে হারায়,/যেমন বালতির মধ্যে স্পঞ্জ।/মানুষের মস্তিষ্ক আর ঈশ্বর ওজনে এক,/হাতে নিয়ে দেখলেই দেখবে,/পাউন্ডে পাউন্ডে মিলে যায়,/আর যদি ওজনে তফাৎই হয়,/সেও মাত্রাগতই।"

রবার্ট ফ্রস্ট

মুখোস ইউনিয়ন

রাণী দেবী

শকুন যখন গলায় পরে কণ্ঠী, তখন এমন হয়।

তখন রাজপথে সিংহী প্রসব করে দুমুখো সাপ,
হাটে বাজারে চণ্ডালেরা নাচ দেখায়।

সারা জীবন চোরের খেয়ে, চোরের মায়ের দুঃখে যারা
কেঁদে ভাসায়,

আজ যে দেখি তারাও জনগণের সর্দার!
'সারা জীবন তোরা স্বদেশের গলা টিপলি, রক্ত তুললি
এখন তার মৃতদেহকে খুঁটে খাবার সাধ হ'য়েছে?'

গলায় তবু কণ্ঠী, মুখে রামধুন গান, নাচে শকুন, স্বদেশ
করে নরক।

প্রকাশ পায় না : "লোকটা কোনদিনই বেশি কথা বলে না,/যা বলে, তারও অর্ধেকটাই শুনতে পাই নি/আমরা অনেকেই : আমরা বুঝতাম না/লোকটার খামখেয়ালি সব তত্ত্বকথা। তারপর লোকটা মরতেই তার শূন্য চোখ দুটো/কথা বলে উঠল। আমরা তখনই সব শুনলাম, প্রত্যেকটা কথা।" এবেন ফ্লাড, মিনিভার চীভ, কিংবা 'লুপাইং প্রেম' (এরস্ তুরান্নুস্) কবিতার সেই নায়িকা, এদের সকলেরই জীবনের ব্যর্থতা রবিনসনকে স্পর্শ করেছে। এই ব্যর্থতার কথা এরা কাউকে বলতে পারে না। সংযোগহীনতার শামুকের খোলের বদ্ধ অস্তিত্বই এদের পীড়িত করে। ছোট্ট টিলবেরি টাউন, তারও মধ্যে মানুষ মানুষের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে না। হুইটম্যানের মতই রবিনসনও এক দীর্ঘ কবিতায় এই জীবনের সমগ্রতাকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন, স্পর্শ করে অন্য কোন স্তরে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছিলেন।

সেই কবিতা 'সূর্যের মুখোমুখি যে মানুষ'। "সূর্যাস্ত আর আমি, তারই মধ্যে একটা গম্বুজের মত/অগ্নিদীপ্ত পৃথিবীর মুখোমুখি/এখনই জ্বলে উঠল অতর্কিত পাহাড়,/ধূসর, গোল, উন্নত, শিখার আলোর আরো উন্নত,/তার উপর শূন্যতা, আগুনে কাউকে পোড়াতে পারবে না,/কেবল একজন সেইখানে চলেছে একা সেইখানে,/সেই বিভাসিত ভয়ংকরের মুখোমুখি জ্বলে উঠেছে/যেন দেবকুলের শেষ দেবতা ঘরে ফিরে চলেছেন/শেষ কামনা স্মরণ করে।" জীবনের সঙ্গে আপস করে বেঁচে থাকার অনেক পথই তো খোলা ছিল এই মানুষটির সামনে। তবুও সে যেন বুঝেছিল, "যারাই জানে তারাই ডোবে/শূন্যতার অন্ধকার স্রোতোহীন জলে।" তাহলে তুচ্ছ বেঁচে থাকায় কী লাভ? তাতেই সে সাহস পেয়েছিল, "একা আকাশের মুখোমুখি দাঁড়াতে।" ছোট কবিতায় টুকরো জীবনদৃশ্যে রবিনসন যতটা সার্থক, দীর্ঘ কবিতায় ততটা নয়: [illegible] [illegible] [illegible]তাও শেষ [illegible] [illegible] [illegible]।

রবিনসনের সঙ্গে একদিক থেকে রবার্ট ফ্রস্টের (১৮৭৫-১৯৬৩) সম্পর্ক আছে। ফ্রস্টও তাঁর কবিতায় বিধৃত অভিজ্ঞতার সীমা বেঁধে নিয়েছিলেন, রবিনসনের মত কোন কাল্পনিক মফস্বল শহরে নয়, নিউ ইংলণ্ড অঞ্চলের গ্রামদেশে। নিউ ইংলণ্ড অঞ্চলটাই পাহাড়ে, শক্ত পাথরে পরিকীর্ণ, মাটি অনুর্বরা; শীত দীর্ঘ, গ্রীষ্ম সুখকর, শরৎকাল-"নাটকীয়রকম সুন্দর" (কথাটা অডেনের)। একদা এই অঞ্চলে বসতি গাঢ় হলেও পরে অনেকেই বাড়ি ছেড়ে অন্য অঞ্চলে উঠে গেছেন। এমনি অনেক ভাঙা ছেড়ে যাওয়া বাড়ি এই অঞ্চলে আজও ছড়িয়ে রয়েছে। এমনি এক-একটা বাড়ির কথা ফ্রস্টের কবিতার মধ্যেও প্রায়ই পাওয়া যায়। এই নিউ ইংলণ্ড অঞ্চলের খামারের, গ্রামের প্রতি-দিনকার জীবন ফ্রস্টের কবিতার উৎস। জীবন যেখানে পরিশ্রমনির্ভর, সেখানে মানুষের সঙ্গকামনাও যেমন তীব্র, নৈঃসঙ্গ-বোধও তেমনই তীব্র। একাকী জীবনের প্রতি ফ্রস্টের নিজের আকর্ষণ প্রবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বৃদ্ধ ফ্রস্টের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে অমিয় চক্রবর্তী বলেছিলেন, তাঁর দেখাশোনা করবার জন্য কাউকে রাখা উচিত। ফ্রস্ট ঠাট্টা করে বলেছিলেন, "ভারতবর্ষের লোক নির্জনতা নিয়ে নালিশ করছে, এটা মনে রাখবার কথা।"

যে জীবনযাত্রাকে নিজের প্রসঙ্গক্ষেত্র বেছেছিলেন, তার অসংখ্য খুঁটিনাটি তিনি লক্ষ করেছেন—অচল কুঠারের ওজর তুলে অপরিচিত ফরাসি প্রতিবেশীর ভাব জমানোর চেষ্টা: "নিতান্তই সকালের আনন্দে" চাষীর ঘাস-কাটার ফাঁকে একগুচ্ছ বুনো ফুল পার পেয়ে যায়। "বুনো আঙুর" কবিতায় একটি মেয়ে সাদা বার্চগাছের ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে হঠাৎ আর নামতে সাহস পায় না—"তখনও শিখি নি, হাত দুটোকে ছেড়ে দিতে, আজও যেমন পারি না হৃদয়কে খুলে দিতে।" 'ভয়' কবিতায় স্বামী-স্ত্রী [illegible] ঘরের সামনে ফিরে এসে ভয় পায়, কে-কেন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে; শেষে দেখা যায়, নিতান্তই শিশুসন্তানসহ পথচারী।

সন্দেহ নিরসনেও ভয় কাটে না : "যদি তা-ই হয়, জোয়েল, বুঝতে পারছ—/তুমি কিছু ভাববে না। বুঝতে পারছ?/বুঝেছ, আমাদের সাবধানে থাকতে হবে।/এ বড় নির্জন, নির্জন দেশ, জোয়েল।"/স্ত্রী কথা বলছে, কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতে পারছে না।/দুলতে দুলতে লণ্ঠনটা মাটিতে ঠেকল।/ঠেকল, ধাক্কা লাগল, আওয়াজ হল, নিভে গেল।" 'বরফ' কবিতায় এক আগন্তুক এক দম্পতির বাড়িতে আশ্রয় নেয়, তারপর তুষারঝড়ের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ে। স্বামী-স্ত্রী দুর্ভাবনায় পড়ে, আগন্তুকের স্ত্রীকে কী কৈফিয়ৎ দেবে? প্রথমে পরস্পরকে দোষারোপ করে, তারপর দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়ে। শেষে খবর আসে, আগন্তুক নিরাপদে ঘরে পৌঁছেছে। স্ত্রী বিরক্ত হয়, বৃথা এত ভাবনা। স্বামী কিন্তু আনন্দ পায়, অন্য মানুষের জীবনের ভাবনায় তারাও ভাগ পেয়েছে।

ফ্রস্টের কাব্যভাষায় একটা প্রাজ্ঞ মনের ছাপ আছে। স্বপ্ন বা উদ্দাম আবেগ নয়, সংযত আত্মজিজ্ঞাসাই তাঁর ভাষায় এক গম্ভীর শুচিতা এনে দিয়েছে : "আমার বিষাদ আমার সঙ্গে দিন কাটাতে এসে ভাবে,/হৈমন্তী বর্ষার এই অন্ধকার দিন-গুলি/বুঝি অপরূপ সুন্দর।/সে ভালোবাসে নিষ্পত্র মরা গাছ,/সে হাঁটে কাদা সপসপে মেঠো গলি ধরে।/তার সুখ আমাকে টিকতে দেয় না।/সে কথা বলে যায়, আমি শুনতে চাই না।/পাখীরা উড়ে গেছে, তাতেই সে খুশি।/তার সাদাসিধে ধূসর বসন রুপোলি কুয়াশায় জাপটে ধরেছে,/তাতেই সে খুশি।/বিবর্ণ নিঃসঙ্গ গাছের সারি,/ধূসর মাটি, ভারাবনত আকাশ,/এতেই সে দেখে যা-কিছু সুন্দর,/আর ভাবে, আমার এদিকে চোখ নেই কেন,/সেই জেরায় আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে।…" ফ্রস্টের কবিতায় সীমিত ভৌগোলিক ক্ষেত্রের মধ্যেও একটা সম্পূর্ণতা আছে, বিশেষত খুঁটিনাটি বাছবার ব্যাপারে এবং বিচ্ছিন্ন মুহূর্ত-গুলিতেও গভীর কোন অর্থ বোধ করার মধ্যে।

কে পাগল?

শশাঙ্কশেখর সান্যাল

রাঁচী মানসিক আরোগ্যশালার পরিচালক সমিতির আনুষ্ঠানিক অধিবেশন বসবে। আমি অন্যতম সদস্য। একদিন আগেই এসেছি—উদ্দেশ্য বিনা নোটিশে আভ্যন্তরীণ অবস্থা যাচাই করা।

সকালে চা-পর্ব শেষ করে উন্মাদাগারের প্রথম ফটকে আমার পরিচয় জানিয়ে সুপারের অফিসে উপস্থিতি। লৌকিকতা ও আন্তরিকতা বিনিময় অন্তে একজন বাঙালী ডাক্তার ও অবাঙালী প্রহরী আদি সহ সুপার সাহেব দ্বিতীয় ফটক পার করে আমাকে পাগল এলাকায় ছেড়ে দিলেন।

একটু এগিয়েই চোখে পড়ল কয়েদী সাজে সম্ভ্রান্ত একজন অল্প গণ্ডীর মধ্যে পায়চারি করছে। সারি সারি গাছের ছায়া পাছে দেহ স্পর্শ করে তাই বৃক্ষবীথি এড়িয়ে উন্মুক্ত ও উত্তপ্ত আকাশের আশ্রয় নিয়েছে। দৃষ্টি কখনও দিগন্তে কখনও কখনও নিজ অঙ্গ অবলোকনে নিযুক্ত।

ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করল, "ইনি বুঝি পরিদর্শক—তা এত আগে কেন? একদিন পরে এলেই ত' দেখতে পেতেন সব মাজা-ঘসা পরিষ্কার—এখন ত' সব ঝুটা" বচন ও বাচন ভঙ্গিমায় কোন ঝাঁজ নেই ঝোঁক নেই—স্বাভাবিক সাবলীল।

বয়স যৌবনের প্রায় শেষ অধ্যায়ে তবু ঋজু দেহ যেন খোলা তরবারি। মাথার ধারে ধারে বিক্ষিপ্ত পাকা চুল অবশিষ্ট কেশরাশির ঘনকৃষ্ণ বিন্যাসকে আরও ফুটিয়ে তুলেছে। একটু থেমেই আমাকে প্রত্যক্ষ সম্বোধন, "তা এসেছেন ভালই। ভেতরে যান—অনেক পাগল দেখতে পাবেন। কতরকমের পাগল—দুঃখে পাগল, শোকে পাগল—সখের পাগলও আছে। কেউ নিজে পাগলামি করতে করতে পাগল হয়েছে—কাউকে জোর করে পাগল সাজিয়ে আটকে রেখে পাগল করেছে।" মনে হল জেদ দিয়ে কথা কইছে। চাহনিতে আমাদের ব্যর্থতা ও বিদায়ের ব্যথা পরস্পর জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে।

ভেতরে আরম্ভ হলো, শ্রীন উকীল ছিলেন কিন্তু চিকিৎসকের পরিচয় দেন"। শুনতে পেয়ে অথবা বুঝতে পেরে মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ—'উকীল পাগল করে, পাগল হয় না—আমি ডাক্তার—সকলকে সারিয়ে দেব"।

ডাক্তার আরও বলেন, "ইনি ভাল গাইতে পারেন—বিশেষ রবীন্দ্রসংগীত"।

আমি অনুরোধ করলাম, "একটা গান শুনবো"।

"ভিতর থেকে ঘুরে আসুন, চা বিড়ির ব্যবস্থা করুন তা হলেই শুনতে পাবেন।"

ঘুরে এসে গান শুনলাম।

পরদিন সকালে আমাদের সভা। আমার প্রস্তাবে ও সকলের সম্মতিতে সভা অন্তে সুপারের অফিস ঘরে গানের ব্যবস্থা হয়েছে, চা-সিগারেট খেয়ে আরোগ্যশালার সেই শিল্পী বন্দী হারমোনিয়ামযোগে গান ধরল।

"আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী" ... বিভিন্ন

সহজ, মধুর ও [illegible] [illegible] কণ্ঠ [illegible] [illegible] [illegible]

নয়ন আছড়ে আছড়ে আঘাত করছে। সকলেই মাধুর্যে অভিভূত। আমি বহুদিনের ছেড়ে-দেওয়া অভ্যাসকে টেনে এনে ডুগি তবলাতে আস্তে আস্তে ঠেকা দিচ্ছি। সংগীতের আবেগে এবং হাতের অবশে মাঝে মাঝে তাল কাটবার উপক্রম হচ্ছেই গায়ক তার উদাস নয়নের মৃদু ভর্ৎসনায় আমাকে সতর্ক করে চলেছে। এত যার জ্ঞান সে কি পাগল?

গানের পালা শেষ করে এবার বিদায়ের পালা। সরকারি বেসরকারি সদস্যগণ একে একে ফটক পার হলেন। সুপার আমাকে বললেন, "আপনার গায়ক বন্ধু আপনার সাথে কি কথা বলবেন।"

দু'জনে গাছতলায় দাঁড়ালাম—আমি ছায়ায়, বন্ধু ছায়া এড়িয়ে তপ্ত রোদ্রে।

বন্ধু: দেখুন স্ত্রী যদি স্বামীকে ভালবাসে কেমন হয়?

আমি: বেশ ভাল হয়—এই ত' স্বাভাবিক—বিবাহ জীবনের শুরু ও শেষ কথা।

প্র: যদি স্ত্রী স্বামীকে ভাল না বাসে?

তার মর্ম কোথায় কিছুই জানি না—এই প্রশ্নই বা কেন? অস্ফোটে বললাম, "দুঃখের বিষয়"।

প্র: যদি স্ত্রী স্বামীকে ভাল না বেসে অন্য কাউকে ভালবাসে? [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible]

[illegible]

— যদি কোন স্ত্রী স্বামীকে ও অন্য [illegible]কেও ভালবাসে ?

[illegible] উত্তর বেরিয়ে এল, "পাগল, [illegible]"

[illegible] হয়ে সজোরে আমার হাত চেপে ধরে আরোগ্যশালার বন্দী চীৎকার করে উঠল।

"কে পাগল ?"

আশেপাশে কাছে ও দূরে আরও অনেকে প্রতিধ্বনি করে সাড়া দিল, "কে পাগল ?"

এর পর রাঁচী যাই নি।

অলস ও অবসর সময়ে ক্ষণেকের বন্দীর সেই আর্তনাদ—আজও আমার মনের আঙিনায় নিঃশব্দে জিজ্ঞাসার চিহ্ন তুলে ধরে—?

গ্রন্থমেলা

বাঙালী জীবনে রমণী—শ্রীনীরদ সি চৌধুরী। প্রকাশক: মিত্র ও ঘোষ পৃষ্ঠা সং: ৩২০। মূল্য: দশ টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি ফিল পাওয়ার জন্য পাঁচ বছরের কিতাব-ঘাঁটা কিতাব-টোকা পরিশ্রম এক জিনিস, আর অন্তরের তাগিদে একটি জাতির পূর্বাপর সামাজিক আচার আচরণ, ভাব ভাবনা, রীতি প্রকৃতি, অধোগতি পুনর্জাগরণের একটি বিস্তৃত বিশ্বাসযোগ্য গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করা আর এক জিনিস। এই অন্তরের তাগিদ গ্রন্থকারকে তাঁর বিষয়ের প্রতি যেমন নিষ্ঠাবান এবং অনুসন্ধিৎসু করে, পরীক্ষার্থীর মনোভাব এবং ডিগ্রী শিকারের আগ্রহ তেমনভাবে গ্রন্থের প্রতি একাত্ম নিষ্ঠায় গ্রন্থের সঙ্গে গ্রন্থকারের সত্তাকে ওতপ্রোত করে না বলেই আমার বিশ্বাস। প্রথমোক্ত ডি ফিল সংগ্রহকারীর প্রয়াস এ্যাকাডেমিক, দ্বিতীয়টি অন্তঃপ্রেরণা-সম্ভূত একক সাধনার ফসল। রসিক পাঠকের কাছে তাই দ্বিতীয়ের আবেদন ঢের বেশি আনন্দবর্ধক। তা ছাড়া প্রথমোক্ত অপেক্ষা দ্বিতীয়ের ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের স্বাধীনতাও অনেক বেশি এবং সে কারণ তার একটি সার্বিক রসাবেদন সৃষ্টির ক্ষমতা আপনি বর্তমান থাকে। অবশ্য উভয়ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রমের অস্তিত্ব নস্যাৎ করছি না।

স্বনামধন্য চিন্তাশীল ও পণ্ডিত জার্নালিস্ট শ্রীযুত নীরদচন্দ্র চৌধুরীর (যিনি নীরদ সি চৌধুরী বলেই সমধিক প্রসিদ্ধ) 'বাঙালী জীবনে রমণী (আবির্ভাব)' গ্রন্থটি পাঠ করে দ্বিতীয় কোটির গবেষণা গ্রন্থের রসাবেদন সম্পর্কে হাতেফলে উপরোক্ত অপূর্ব অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। শ্রীচৌধুরীর এটিই প্রথম বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থ। তিনি ইংরেজিনবিশ রূপেই পরিচিত। অথচ তাঁর কলমে তাঁর মাতৃভাষাও যে সঙ্গীত ঝঙ্কার তুলে বিচিত্র রসের আয়োজনে কেমন ও কত দূর সার্থক হয়ে উঠতে পারে, তাঁর প্রথম গ্রন্থ তারই জাজ্বল্য সাক্ষ্য। এমন একটি রসাত্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ সচরাচর পাঠ করার সৌভাগ্য হয় না। এবং শ্রীনীরদ সি চৌধুরীও তাঁর পাণ্ডিত্যের জোরে এমনই এক শিখরচূড়ায় আপন আসন বিছিয়ে নিয়েছেন, যার ফলে যে-কোনও ইতরজনের পক্ষে তাঁর গ্রন্থরাজি সমালোচনা করার সাহসও বড় একটা ঘটে ওঠে না। শ্রীচৌধুরী যদি আলোচ্য গ্রন্থটি আপন মাতৃভাষায় রচনা না করে সেই বিদেশী ইংরেজিরই দ্বারস্থ হতেন, বাঙালী হিসেবে সাধারণের পক্ষ থেকে তাহলে তাঁর প্রতি যথেষ্ট অভিযোগ করার কারণ থাকত। শ্রীচৌধুরী অতঃপর স্বজাতিকে আরও কয়েকটি বাঙলা গ্রন্থ উপহার দিলে বাঙালী এবং বাঙলা সাহিত্য তাঁকে স্মরণে রাখবে।

আলোচ্য গ্রন্থটি গবেষণামূলক আলোচনা গ্রন্থ। কিন্তু শ্রীচৌধুরীর রসসমৃদ্ধ সাবলীল রচনাশৈলী পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধের মতো একটির পর একটি কথা-চাবির মধ্যে আকর্ষণ করে নিয়ে যাবে। আলোচনা গ্রন্থ পাণ্ডিত্যী সমাজের মোবসী-পাট্টা এই প্রচলিত কনভেনশন শ্রীচৌধুরী আলোচ্য গ্রন্থে একেবারেই ভেঙে দিয়েছেন; আর সে হিসেবেও গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

এক এক জায়গায় লেখক গম্ভীর বিষয় থেকে আত্মকথনমূলক কাহিনী বিস্তারে ভেসে গিয়েছেন। বর্ণনার চিত্রল সৌন্দর্যে, ভাষার পারিপাট্য এবং লালিত্যে এই সমস্ত অংশ পাঠককেও অভিভূত করবে। মনে হয় আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস পাঠ করছি। তাঁর চিত্রাঙ্কন ক্ষমতার যে পরিচয় ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে লোভ হলেও স্থানাভাবে তা উদ্ধার করা গেল না বলে দুঃখিত। রসিক পাঠকের অবগতির জন্য বলি, এই উপন্যাসোপম আলোচনা গ্রন্থের কোথাও ভয়াবহ পাণ্ডিত্যিয়ানার বিস্তার নেই, আছে সর্বস্তরের পাঠককে আকর্ষণ করার মতো আপন মনের মাধুরী দিয়ে আলোচ্যকে উপস্থাপিত করার প্রয়াস এবং সম্ভবতই তা সচেতন প্রয়াস নয়। অবশ্য শ্রীচৌধুরীর অবিসম্বাদিত পাণ্ডিত্য কয়েক ক্ষেত্রে গভীর আত্ম বিশ্বাসের হাত ধরে একটি সুপণ্ডিতের সেলফকে উপস্থাপিত করেছে যা রসিক পাঠককে আহত করতে পারে।

'বিষয়টা কি' ভূমিকাংশে নিতান্তই গদ্যগন্ধী। অতঃপর যতই অগ্রসর হওয়া যায়, পাঠক ততই বিষয়ীভূত একাত্ম ও তন্ময় হয়ে পড়েন। গ্রন্থের প্রতিটি পরিচ্ছেদ স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখলেও এখানে তার সুযোগ কম। সংক্ষেপে মোদ্দাকথাগুলি নীরসভাবেই সাজাতে হবে। আলোচনার ক্ষেত্রে এই এক দুঃখ।

ইদানীং সাহিত্যে অশ্লীলতা ও কামাচারের বর্ণনার যে প্লাবন পশ্চিমের ঘূর্ণি হয়ে বাঙলা ভাষা-সাহিত্যের সীমানা ঝাঁপিয়েছে, তাতে একটি প্রশ্ন সবার মনেই আলোড়িত হচ্ছে: এই কামাচারী সাহিত্য কি অনিবার্য? কামাচরণের এই রীতিই বলিষ্ঠ শিল্পভাবনার ফসল? বাস্তব আলেখ্য কি এরই নাম? শ্রীচৌধুরীর 'কাম ও প্রেম' পরিচ্ছেদটি এ বিষয়ে জিজ্ঞাসুদের একটি যুক্তিপূর্ণ মীমাংসায় উপনীত হতে সহায়তা করবে। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় কাম ও প্রেমের স্থান কেমন ছিল, কেমন হয়েছে, তারই লোকাচার দেশাচার ও কাব্যসাহিত্যালোচনা-গত একটি ঐতিহাসিক গবেষণামূলক দুঃসাহসিক আলেখ্য এই গ্রন্থ। পাঠের পর কাম ও প্রেমের মধ্যে একটি অঙ্গাঙ্গী স্নিগ্ধ ও পবিত্র সম্পর্ক সম্বন্ধে পাঠকের প্রতীতি উপস্থিত হবে। তখন তিনি নিজেই উপলব্ধি করবেন, অকারণ কামোত্তেজনা সৃষ্টির ব্যবসায়ী প্রবণতা একটি বুজরুক সাহিত্যাদর্শের ধোঁয়া সৃষ্টি করে সমাজজীবনকে পচনশীল অন্ধকার গহ্বরের দিকে আকৃষ্ট করছে। কামহীন প্রেম অবাস্তব, কিন্তু কাম-সর্বস্বতা এবং কামকলুষতার মধ্যে ব্যভিচারী প্রবৃত্তির তৃপ্তি থাকলেও রূপরস-গন্ধস্পর্শে সৌন্দর্যশালিনী প্রকৃতির জগতে তার এতটুকু সমর্থন নেই।

শ্রীচৌধুরীর গ্রন্থটিতে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের, শরৎচন্দ্র এবং তাঁর উত্তরসূরীদের রচনার মাধ্যমে বাংলা-দেশের বিশেষ মানসিকতা এবং মানসিক বিবর্তনের রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে যা তন্নিষ্ঠ গবেষকদের সহায়ক বিবরণী হিসেবে কাজে লাগবে। তবে অনেকক্ষেত্রে মনে হয়েছে আলোচনায় বসে শ্রীচৌধুরী আলোচ্য গদ্যাংশের রসাস্বাদনে মশগুল হওয়ায় কিছুবা বিষয়বহির্ভূত হয়ে পড়েছেন, ফলে গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ স্থান স্বাধীন রসগ্রাহীর জন্য প্রিয়তর বস্তুর যোগান দিলেও বিষয়নিবিষ্ট পাঠকের কাছে গ্রন্থের স্থানবিশেষ অবাস্তর এবং কিছু বা বিরক্তিকরও মনে হতে পারে। কিন্তু শ্রীচৌধুরীর রচনানৈপুণ্য হঠাৎ পাঠকমনকে টানে। গ্রন্থটির সবচেয়ে বেশি সাফল্য সেখানেই।

যে সব কথা উপসংহারে বললে সমাপ্তি প্রথাবদ্ধ হয়, আবেগের বশে সেগুলি রচনারম্ভে বলে রাখার নতুন করে পুনরুক্তির ভার বাড়াব না।

অতঃপর যেমন সব ক্ষেত্রেই বলতে হয়, সেই রীতি বজায় রেখে বলব গ্রন্থের ছাপা বাঁধাই ভালোই। অবশ্য তিনশ' কুড়ি পৃষ্ঠার গ্রন্থের পক্ষে প্রকাশক গ্রন্থের দামকরণ কিছু বাড়িয়েই করেছেন যা আরও কমক পরিমাণে করতে পারতেন।

চার্লি চ্যাপলিন ঃ অশোক সেন। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী। ৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯। মূল্য ঃ ৭·৫০।

চার্লি চ্যাপলিন সর্বজন পরিচিত একটি নাম। এই নামটি উচ্চারণের সংগে সঙ্গে মনে পড়ে 'দি কিড', 'মডার্ন টাইমস', 'গোল্ড রাশ', 'মঁশিয়ে ভের্দু', 'দি গ্রেট ডিকটেটর', প্রভৃতি ছবির নায়ক বাটারফ্লাই গোঁফ এক ক্ষুদে মানুষকে। অতি সাধারণ চেহারায় এই ক্ষুদে মানুষটি হাতে একটি ছড়ি নিয়ে, অদ্ভুত সরল এক হাসিতে সারা জগতের মানুষকে মুগ্ধ করেছে। একই রকম গোঁফ নিয়ে হিটলার রাজনীতির রণমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিল বলে চার্লি চ্যাপলিন হিটলারের বিরুদ্ধে গোঁফ চুরির অভিযোগ করেছিল। কথাটা রসিকতার হলেও তার মধ্যে বিরাট এক সত্য ছিল। এই কথাটার মধ্যেই প্রকাশ পায় চার্লি সমাজ-বিমুখ শিল্পী নয়, তাঁর শিল্প মানুষের জন্য, মানুষের আত্মিক উন্নতি ও আনন্দের জন্য। পৃথিবীব্যাপী চার্লি চ্যাপলিনকে নিয়ে আলাপ-আলোচনার শেষ নেই। আইনস্টাইন থেকে আইজেনস্টাইন, মেরী পিকফোর্ড থেকে আপটন সিনক্লেয়ার, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, সাহিত্যিক এবং অগণিত মানুষ তার বন্ধু। আবার তাঁর শত্রুও আছে, যে শত্রুদের দ্বারা বিরক্ত হয়ে তিনি আমেরিকা ছেড়েছেন। যারা তাঁর শত্রু, তারা বিশ্বমানবের শত্রু, প্রগতি ও স্বাধীনতার শত্রু, সে কথা আজ প্রমাণিত হয়ে গেছে। ইতিহাসের কাঠগড়ায় তারা ধিকৃত ; চার্লি অভিনন্দিত। আজো পৃথিবীর সর্বাধিক জনপ্রিয় ব্যক্তি চার্লি।

এই মহৎ শিল্পী চার্লি চ্যাপলিন সম্পর্কে জানার আগ্রহ স্বাভাবিক। তাঁর সম্পর্কে ইংরেজী ভাষায় কয়েকটি বই আছে, তাঁর নিজের আত্মজীবনীও প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় উপযুক্ত তথ্যপূর্ণ কোন বই ছিল না। শ্রীঅশোক সেন লিখিত চার্লি চ্যাপলিন এই অভাব পূরণ করেছে। তিনি বহু আয়াসে এমন একটি বই বাঙালী পাঠকদের জন্য লিখেছেন যা কেবলমাত্র চার্লি চ্যাপলিনের জীবনী নয়। জীবনীর সূত্রে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংলণ্ডের জীবন ও শিল্প সংস্কৃতি ; একালের আমেরিকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে শিল্প সংস্কৃতির ইতিহাসের অনেক উপাদান এতে রয়েছে। সেই সঙ্গে আছে [illegible] শিল্পের প্রকাশ-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কথা। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে যে সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির সংগে চার্লির পরিচয় হয়েছে তার মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞান ও শিল্পজগতের অনেক জ্ঞাতব্য খবর। এই সংগে জানতে পারা যায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা চার্লিকে কমিউনিস্ট বলে কেন, এবং কমিউনিস্টদের সম্পর্কে চার্লির কি ধারণা। চার্লির জবাবে পৃথিবীর সৎ ও চিন্তাশীল মানুষের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর শোনা গেছে। তাই বলছিলাম—এই বই কেবল জীবনীমাত্র নয়, এতে ইতিহাস, গল্প, উপন্যাস, বৈজ্ঞানিক ও শিল্পের তথ্যের সমাবেশে একটি অতি সুখ-পাঠ্য প্রেরণাদায়ক বই। একজন দরিদ্র সন্তান মাত্র পাঁচ বছর বয়সে মায়ের সম্মান রক্ষার জন্য যিনি মঞ্চে দাঁড়িয়ে গান গেয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলেন নিজের উদ্যোগ ও পরিশ্রমে তিনি কি করে এত-বড় হলেন তার প্রেরণামূলক ঘটনা এ বইতে রয়েছে। চার্লির জীবনের সাফল্যের মূলে সমাজচেতনা ও মানবিকতা। কেবলমাত্র শিল্পী সাহিত্যিকদের নয়, ছাত্র ও যাঁরা বর্তমান শিল্পজগৎকে জানতে চান এই বইটি তাঁদের অবশ্য-পাঠ্য। ৩১৫ পৃষ্ঠার মধ্যে এত ঘটনা সন্নিবেশ রচনা-নৈপুণ্য ও সুযোগ্য সম্পাদনাশক্তির পরিচায়ক।

অন্ধকার থেকে আলো... মুক্তি ঃ কান্তি গুপ্ত। প্রকাশক—অধ্যাপক বি চৌধুরী, ১৪৪এ, বকুল বাগান রোড, কলকাতা—২৫। দাম ঃ তিন টাকা পঁচিশ পয়সা।

সহজ সুরে রচিত দশটি ছোট গল্পের মধ্যে দিয়ে অতি সুন্দর, কোমল এবং বিষাদময় জীবন সংগ্রামের চিত্রাবলী এঁকেছেন কান্তি গুপ্ত। বই পড়া শেষ হয়ে যায় কিন্তু পাঠকের মনে এ সুরের মূর্ছনা নিরন্তর ঝংকার তুলতে থাকে। গল্পগুলির মধ্যে দিয়ে যে মানুষটির পরিচয় পেলাম তিনি সত্যিকারের উঁচু জাতের শিল্পী অথচ একজন সংবেদনশীল সাধারণ মানুষ। গল্পগুলির ভিতর দিয়ে মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা, ভীতি, ভালোবাসা এবং মর্যাদাবোধের যে পরিচয় পেলাম তা মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়ে যায়।

'সম্পত্তি' গল্পটির শেষ পরিণতিতে যে চমকটুকু আছে তাতে কোন 'স্টান্ট' নেই। আছে লেখকের জীবন সম্পর্কে মূল্যবোধের যথার্থ পরিচয়। এই গল্পটি [illegible] [illegible] লেখক তাঁর [illegible] কোন চরিত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান নি। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শারীরিক বাধা-বিপত্তির ফলে প্রাণটি মানুষ কত অসহায় সে সত্যটিকে অপূর্ব ভাবে ও ভাষায় উপস্থাপিত করেছেন লেখক। আজকের দিনের মনস্তাত্ত্বিকেরা বলেন যে, কোন মানুষই পুরোপুরি ভাল কিম্বা মন্দ নয়। তাঁদের মতে ভালো-মন্দ মিশিয়েও কেমন মনুষ্যচারত্র সৃষ্ট হয় না, তেমনি কতকগুলি গুণাগুণের সমাবেশের ভিতর দিয়েই মানুষের চরিত্রের বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। মনস্তত্ত্ব বলে যে মানুষের চরিত্র অনেকটা নদীর মত। কখনো দ্রুতবেগে ধাবিত হচ্ছে, আবার কখনো এগিয়ে চলেছে ঢিমে তালে। তার জলের ধারা কখনো স্বচ্ছ, কখনো ঘোলাটে। এই মুহূর্তে সে এক বিরাট ত্যাগ স্বীকার করে ফেলল, তার পরেই তার এক জঘন্যতম ক্ষুদ্রতার পরিচয় পাওয়া গেল। সতী নারী লক্ষ্মীর পরপুরুষের কাছে আত্মসমর্পণের কাহিনীর মধ্যে দিয়ে মানুষের এই অসহায়তার দিকটি সুন্দরভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে। 'ষাঁড়' এবং 'অন্ধকার থেকে আলো ... মুক্তি' গল্প দুটি পাঠকের গভীরতর চিন্তা এবং উন্নততর বৃত্তিগুলিকে জাগিয়ে তোলে। লেখক তাঁর কথা ও কল্পনার সাহায্যে ট্র্যাজিডি রচনা করবার চেষ্টা করেন নি। কিন্তু প্রতিটি কাহিনীর মধ্যে দিয়ে Pathos-এর সুরে এক অদ্ভুত ঐকতান অতি সার্থকভাবে রচনা করেছেন। 'বাব' এবং 'অহেতুক' গল্প দুটি পড়ার পর মনে হল এগুলির কথা বহুদিন মনে থাকবে।

কালপুরুষ—মিহির মুখোপাধ্যায় ঃ প্রকাশক—শ্রীঅধীরকুমার চক্রবর্তী বিদ্যা-ভারতী, ৮-সি টামার লেন, কলকাতা ৯। মূল্য—আট টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

দেশ বিভাগের ফলে বাংলা দেশের, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সামাজিক জীবনে যে অপ্রতিরোধ্য পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তাই এই উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। কাহিনীর বিন্যাস বা চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে মৌলিকত্বের কোন পরিচয় নেই। এ ধরণের একাধিক উপন্যাসের সংগে বাঙালী পাঠকসমাজ পরিচিত। লেখকের ভাষা সুন্দর এবং তিনি সাবলীল ভঙ্গিতে তাঁর কাহিনীটি উপস্থাপিত করেছেন।

উজান জাহ্নবী—বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী ঃ প্রকাশক—শ্রীঅধীরকুমার চক্রবর্তী, বিদ্যা-ভারতী, ৮-সি, টামার লেন, কলকাতা—৯। মূল্য—[illegible] টাকা।

[illegible] আত্মা [illegible] রায় নামে একটি [illegible] জীবনকাহিনী। লেখক মনস্তত্ত্বমূলক এক রচনা পরিবেশন করতে গিয়ে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। গ্রন্থটি পড়ে অধিকাংশ পাঠকেরই মনে হবে আত্মার এই উলঙ্গ চিত্রটিতে কেবলমাত্র অশ্লীলতা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই নেই।

মৌন শিলালিপি : মহামাত্য : প্রকাশক কে, ঘোষ, ৩এ, ডঃ জগবন্ধু লেন, কলিকাতা-১২। মূল্য : তিন টাকা।

হিমালয়ের পাদদেশে পাইন ঘেরা ছোট গ্রাম মংনামে যুগ যুগ ধরে মনপা জাতির নরনারী বাস করে এসেছে। বাইরের জগতের সঙ্গে এদের যোগাযোগ নেই বললেও চলে। এই গ্রামেরই মেয়ে পেমা। তার রূপে-গুণে মুগ্ধ একাধিক যুবক তাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু সে তাদের কাউকে বরণ করতে পারে নি। পেমা যাকে ভালবাসল, সে সুদূর পাঞ্জাব থেকে আগত এক জওয়ান। চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মাতৃভূমি রক্ষা করবার জন্য সে এসেছে ভারতের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে। শত্রুসৈন্যের আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে এই জওয়ান শরণ সিং যখন প্রাণ বিসর্জন দিল তখন পেমাও তার পাশে ছিল এবং শত্রুর গুলীতে তারও মৃত্যু হল। বইটি পড়বার সময় বারবার মনে হয়েছে এ যেন একটি ছোট গল্পকে জোর করে উপন্যাসে রূপান্তরিত করবার প্রয়াস। স্থানে স্থানে ভাবাবেগ এবং অপ্রয়োজনীয় উচ্ছ্বাসের আধিক্যে কাহিনীটি জমে উঠতে পারে নি।

যাত্রী : (৭ম বার্ষিক সংকলন, ১৩৭৫) ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিস্টস এসোসিয়েশন, ৪৩, নিউ জি টি রোড, উত্তরপাড়া, হুগলী। গ্রন্থনা : মনোমোহন ঘোষ।

বাঙালীর যতই ঘরকুণো অপবাদ থাকুক না কেন, আসলে চিরকাল সে ভ্রমণ-পিপাসু। দূর দুর্গমকে জানবার জন্যে বাঙালী তরুণদের সাম্প্রতিক অভিযানগুলি প্রাণচাঞ্চল্যেরই প্রমাণ দেয়। "যাত্রী" ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিস্টস এসোসিয়েশন নামে একটি সংস্থার বার্ষিক সংকলন পত্রিকা। একঘেয়ে জীবনে স্বল্প ব্যয়ে ভ্রমণের বৈচিত্র্য এনে দিচ্ছেন বলে এই সংস্থার উদ্যম প্রশংসনীয়। "যাত্রী"র লেখকগোষ্ঠীতে আছেন কুমার মুখোপাধ্যায়, বিমলকুমার মিত্র, সুজল মুখোপাধ্যায়, কমলা মুখার্জী, নিতাই রায়, অতীশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীরকুমার বসু, সুজয়া গুহ, কার্তিক পাঠক ও অমিয়কুমার হাটি প্রমুখ। ভারতের বিভিন্ন স্থানের বিচিত্র তথ্য সম্বলিত লেখগুলি ভ্রমণ-কাহিনীই সুলিখিত। বিদেশের মধ্যে একমাত্র [illegible] ভ্রমণ-কাহিনী [illegible] পরিবেশিত হয়েছে। রবীন্দ্র-[illegible] একটি সুন্দর।

La Verite—সম্পাদক এবং প্রকাশক ডঃ বিমলানন্দ শাসমল ; ৫২, ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য : ৪০ পয়সা।

এটি ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্রিকা। এ বছর থেকেই এটির প্রকাশনা শুরু হয়েছে। পত্রিকাটির যে কয়েকটি সংখ্যা আমাদের হাতে এসেছে সেগুলি পড়ে বিনা দ্বিধায় একথা বলতে পারি যে, এটি না পড়ে ফেলে রাখার মত কাগজ নয়। দেশের রাজনীতি, শিক্ষা-ব্যবস্থা ও সমাজ-জীবনে বিভিন্ন উপায়ে কি পরিমাণ দুর্নীতি আজ অনুপ্রবেশ করেছে সেকথা আজ আর কারোর অজানা নেই। কিন্তু অতীত ও বর্তমানের এই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির সম্পর্কে অস্পষ্ট ইঙ্গিত না করে নানা তথ্য সম্বলিত সম্পাদকীয় রচনা করেছেন ডঃ শাসমল। এ ছাড়া তাঁর রচিত কিছু প্রবন্ধও রয়েছে। ডঃ শাসমলের নির্ভীক মতামত বহু ক্ষেত্রেই অন্যের গভীরতর চিন্তাকে জাগিয়ে তোলে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, তাঁর ভাষায় কিছুটা সংযমের অভাব চোখে পড়ে। চিত্তরঞ্জন সম্পর্কে তাঁর অসহিষ্ণুতা এমন এক স্তরে নেমে এসেছে যে, দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথের লেখা অবিস্মরণীয় 'কবিতা-টির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন—**Truly speaking this couplet is a meaningless assemblage of certain poetic words.**

চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতান্তরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেই তিনি এ বিষয়ে এক ধরণের পূর্ণচ্ছেদ টেনেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। চিত্তরঞ্জনের সমতুল্য রাজনীতিবিদ ভারতবর্ষে খুব বেশি জন্মগ্রহণ করেন নি। তাঁর অকালমৃত্যু না ঘটলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক রূপ যে অন্যপ্রকার হোত একথা তাঁর শিষ্য এবং উত্তরসাধক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বহুবার বলে গেছেন এবং মৌলানা আজাদ প্রমুখের গ্রন্থেও পরিষ্কারভাবেই বর্ণিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে কেউ প্রশস্তি না করলেও তাঁর মহত্ত্ব খর্ব হত না।

ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত অধ্যাপক এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক শ্রীসাধনকুমার ঘোষের প্রবন্ধগুলি বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করেছে। তাঁর লেখাগুলি পাকা হাতের রচনা এবং সেগুলির মধ্যে যে শ্লেষাত্মক সুর বেজে উঠেছে তা সহজে ভোলা যায় না। তাঁর সাহিত্য সমালোচনাও অপূর্ব। পুলিশ বিভাগের প্রাক্তন [illegible] [illegible] বিভিন্ন কাহিনী [illegible] বিভাগের রচনাও উচ্চমানের।

শারদীয়া কিশোর ভারতী—সম্পাদক : দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ৮।৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৯। দাম : পাঁচ টাকা।

কিশোরদের উপযুক্ত এই পত্রিকায় প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি শারদীয় সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় কিশোরদের মনের মতো পত্রিকার সংখ্যা বড়ই কম। 'কিশোর ভারতী'র শারদীয় সংখ্যাটি এক নিমেষে ছেলেদের মন জয় করতে পারবে এবং পরবর্তী মাসিক সংখ্যাগুলিও (প্রতি সংখ্যা ৭৫ পয়সা) যে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হবে—তা আন্দাজ করতে পারা যায়।

আলোচ্য শারদীয়া সংখ্যাটিতে কত বিচিত্ররকমের যে লেখা দেওয়া হয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না। বড় লেখকদের বড় লেখা তো আছেই, ছোট ছোট লেখার সংখ্যাও প্রচুর। নগণ্য দু'একজন শিশু ভেঙে ঢুকে পড়লেও বড় বড় নামজাদাদের এসব গল্প পুজোর সময় যে খুব জমবে—তা না বললেই চলে। শিশুদের সেরা লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন উপন্যাসের মতো বড় ঘনাদার গল্প। এবারের এটি শ্রেষ্ঠ ঘনাদার গল্প বলে আমাদের ধারণা। শিবরাম চক্রবর্তী লিখেছেন হর্ষবর্ধনের গল্প, শৈলজানন্দ 'ভূতের গল্প', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও আশা দেবী হাসির গল্প। মহাজীবনের কাহিনী শুনিয়েছেন স্বপনবুড়ো, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, নীহার গুপ্ত ও আশরাফ হোসেন লিখেছেন ভৌতিক গল্প। বোধ হয় যা নেই ভারতে—তা নেই শারদীয়া কিশোর ভারতীতে। ছেলেমেয়েরা যা পড়ে কখনো চমকে উঠবে, কখনো বা মুগ্ধ হবে। আর বড়রা হবে বিস্মিত—তাদের মনে হবে এ ধরণের লেখা আগে পড়লেও এমন স্বাদের লেখা ত পড়ি নি। যেমন বিজ্ঞাননির্ভর গল্প, ভ্রমণকাহিনী, দুঃসাহসের গল্প, সামাজিক উপন্যাস, গোয়েন্দা গল্প, বিজ্ঞানের সরস কাহিনী, প্রাচীন রচনার সংকলন, সঙ্গীত, খেলাধুলো, সিনেমা, ইন্দ্রজাল, ছড়া, কবিতা, ইতিহাসনির্ভর গল্প, নাটক, ছবিতে কার্টুন ও গল্প। প্রায় শত লেখকের সমাবেশ এবং কারো প্রিয় লেখক বোধ হয় বাদ পড়ে যায় নি। এ ছাড়া আছে বিশেষ আর্ট প্লেটে কতকগুলি মজাদার ছবি। প্রচ্ছদপটও সুন্দর কিন্তু বোর্ড বাঁধাই হওয়া উচিত ছিল। আর একটি কথা 'কিশোর ভারতী'র আগে 'শারদীয়া' ব্যবহার না করে 'শারদীয়' শব্দটি চালু করলে ক্ষতি কি ছিল? আশা করি, এবারের ছোটদের উপহারযোগ্য অতুলনীয় শারদীয় সংকলন হিসেবে 'কিশোর [illegible] [illegible]।

[illegible] চেতনার কথাই বা [illegible] অনাদিকাল [illegible] আদিকাল সময় থেকে শুরু করে একেবারে আজকের দোরগোড়া অবধি শক্তিপূজোর বিভিন্ন রূপ বিধৃত হয়েছে যার সাক্ষী ধর্মের ইতিহাস, শিল্পের বিন্যাস। কালের কোলে পূজো এবং পূজনীর রূপরীতির পরিবর্তন হয়েছে—মানসিকতার, প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে।

আমাদের ধর্মচেতনার ভিতরে, জীবনচর্যার ভিতরে শক্তির প্রাধান্য বরাবরই ছিল, এখনও আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে সবচেয়ে লক্ষণীয় হলো আমাদের শক্তিরূপিণী কোনদিনই নিছক 'মিলিটারী মেজাজের' দেবী নন, এ তাঁর মাতৃমূর্তির এক বিশিষ্ট রূপ। তিনি একদিকে দানবদলনী, মহিষাসুরমর্দিনী অন্যদিকে 'শান্তিরূপেণ সংস্থিতা', 'মাতৃরূপেণ সংস্থিতা'। এমন কি ঋগ্বেদে তাঁকে উৎপাদনী ক্ষমতা বৃদ্ধির দেবী হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে, আবার কখনও সমগ্র সৃষ্টির জন্মদাত্রী রূপেও ('সর্বপ্রপঞ্চজননী') তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনি মায়ের মতনই সর্বগুণসম্পন্না, মা যেমন আপন সন্তানকে বিপদ থেকে আড়াল করে রাখেন ঠিক তেমনই পার্থিব-অপার্থিব সমস্ত বিপদের হাত থেকে আড়ালে রাখার প্রয়োজনে তাঁর এই মহিষাসুরমর্দিনী বা শক্তিরূপিণী রূপটির বিকাশ হয়েছিল, কিন্তু স্মরণাতীত কাল থেকেই শক্তিরূপা হয়েই তিনি আমাদের দ্বারা পূজিতা হচ্ছেন—আর সব গুণ আমাদেরই প্রয়োজনের অবগুণ্ঠনের আড়ালে পড়েছে। দেবতারা নিতান্তই নিজেদের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছিলেন দুর্গাকে শক্তিরূপিণী রূপে, শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা প্রধান অংশ নিয়েছিলেন এই সৃষ্টিযজ্ঞে। মহিষাসুরের কাছে পরাজিত স্বর্গভ্রষ্ট দেবতারা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তাঁদের যা তেজ আছে সব উজাড় করে দিলেন, জন্ম নিলেন মহিষাসুরমর্দিনী:

ততঃ সমস্ত দেবানাং তেজোরাশি সমুদ্ভবাম্
তাং বিলোক্যমুদং প্রাপুরমরা মহিষার্দিতা॥

শিব দিলেন ত্রিশূল, বিষ্ণু দিলেন চক্র, বরুণ দিলেন শঙ্খ, পদ্ম, পাশ, অগ্নি দিলেন শক্তি, বায়ু দিলেন তীর ধনুক, ইন্দ্র দিলেন বজ্র ও ঘণ্টা, যম দিলেন চর্ম, অসি ও দণ্ড, ব্রহ্মা দিলেন অক্ষমালা ও কমণ্ডলু, বিশ্বকর্মা দিলেন পরশু, কুবের দিলেন পানপাত্র এবং ত্বষ্টা দিলেন গদা। এই রণসজ্জায় সজ্জিতা হয়ে শক্তিশালিনী আশ্বাসবাণী শোনালেন দেবতাদের, অসুরকে বললেন "যুদ্ধং দেহি"। তাঁর এই "যুদ্ধং দেহি" মূর্তিই আজ আমাদের উপাসনাপর্বের শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণ

স্মরজিৎ দত্ত

দেবী দুর্গার প্রথম উল্লেখ পাই তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিকা উপনিষদে, সেখানে দুর্গা গায়ত্রীতে বলা হচ্ছে 'কাত্যায়নায় বিদ্মহে, কন্যাকুমারীং ধীমহি, তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ'। আমাদের প্রচলিত ধারণায় দুর্গাকে দুর্গতিনাশিনী বলেই জানি কিন্তু অনেক সময়ে 'দুর্গ' কথা থেকে দুর্গা নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। শব্দকল্পদ্রুমে বলা হয়েছে—

দুর্গো দৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্মণি
শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি॥
মহা ভয়েঽতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃবাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্তিতা॥

"দুর্গ শব্দের বাচ্য দুর্গনামক দৈত্য, মহাবিঘ্ন, ভববন্ধ, কুকর্ম, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয় এবং অতিরোগ; আ-শব্দ হোল হন্তৃবাচক। এই সকল হনন করেন যে দেবী তিনিই দুর্গা নামে পরিকীর্তিতা"। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে (৪।১১, ৫।১২) আবার তাঁকে দুর্গা বলা হচ্ছে তিনি দুর্গম ভবসাগরে নৌকাস্বরূপ বলে। মহিষাসুর অর্থ নিরূপণের ব্যাপারেও যথেষ্ট মতদ্বৈত রয়েছে। বেদে 'মহিষ' কথাটি যেমন মহিষ-পশু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তেমনই সায়নাচার্য কোনো কোনো জায়গায় (ঋগ্বেদে ৮।১২।৮) 'মহিষ' শব্দটিকে 'মহান' অর্থেও নিয়েছেন।

দেবীমূর্তি সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেই শিবের সঙ্গে দুর্গার সম্পর্কের কথা স্বভাবতই এসে পড়ে এবং দেবীমূর্তির মধ্যেও ইঙ্গিতে শিব-দুর্গার সম্পর্কটিকে দেখানোর অল্পবিস্তর চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু বিষ্ণু এবং কৃষ্ণের সঙ্গেও তাঁর সম্বন্ধ ছিল। যার উল্লেখ মহাভারতের দুর্গাস্তোত্রে এবং হরিবংশের আর্যাস্তবে পাওয়া যায়। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।

ভাস্কর্যে দেবীমূর্তির ক্রমবিকাশের বর্ণনা দেবার আগে শিল্পশাস্ত্রে দেবীমূর্তির রূপকল্পনার দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। 'শিল্পরত্ন'-তে মহিষাসুরমর্দিনীর যে বর্ণনা আছে তা হলো: দেবী হবেন ত্রিনয়না, দশভুজা, দশপ্রহরণধারিণী। তাঁর ডানহাতগুলিতে থাকবে ত্রিশূল, খড়্গ, শক্ত্যায়ুধ, চক্র এবং ধনু এবং বাম হাতে পাশ, অঙ্কুশ, খেটক, পরশু এবং ঘণ্টা। মাথায় জটামুকুট ও চন্দ্রকলা। তাঁর দেহবর্ণ হবে অতসী ফুলের মতো এবং চোখ হবে নীলোৎপলের মতো। সুউচ্চ স্তন এবং ক্ষীণ কটির দেহ ত্রিভঙ্গে রূপায়িত হবে। তাঁর পায়ের কাছে থাকবে মুণ্ডহীন রক্তাক্ত মহিষের দেহ, তার ভিতর থেকে অর্ধেক বেরিয়ে আসবে অসুর যে বাঁধা পড়েছে দেবীর নাগপাশে। অসুরের হাতে থাকবে ঢাল-তলোয়ার এবং দেবীর ত্রিশূলে তার গলায় ওপর গাঁথা—অজোরে রক্ত ঝরছে ক্ষতস্থান দিয়ে। দেবীর ডান পা তোলা থাকবে সিংহের পিঠে, বাম পায়ে ছোঁয়া থাকবে মহিষের দেহ। 'বিষ্ণুধর্মোত্তর'-এর বর্ণনা কিন্তু 'শিল্পরত্নে'-র বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মেলে না। এখানে বলা হচ্ছে চণ্ডিকামূর্তি মহিষাসুরমর্দিনীর রঙ হবে তপ্ত কাঞ্চনের মতো। প্রচণ্ড আক্রোশে এক অপূর্ব সুন্দরী যুবতীর মতো তিনি সিংহের পিঠে বসে লড়াই করছেন। তাঁর কুড়িটি হাতে বিভিন্ন অস্ত্র থাকবে। দেবীর সিংহ কামড়ে ধরবে অসুরকে যে দেবীর নাগপাশেও বদ্ধ। রক্তাপ্লুত মহিষাসুর ঢাল-তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করবে।

মহিষাসুরমর্দিনীর রূপের বর্ণনা অনুযায়ী এবং প্রতিমা লক্ষণের প্রস্তাবিত ব্যাকরণসম্মত পদ্ধতিতে আমাদের দেশে মূর্তি তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ রূপটি বা শাস্ত্রসম্মত রূপটি হঠাৎই ভাস্কর্যে বা শিল্পে ফুটে ওঠে নি—সেখানেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে বহুদিন ধরে। হাতের সংখ্যায় এবং বিন্যাসে, দেবীর ভঙ্গিতে, বাহনে এবং পার্শ্ববর্তী

[illegible]নতাদের উপাস্থ্যাত সম্বন্ধে [illegible] মন্তব্য করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ এদেবীদের রূপরীতির এবং কালানুক্রমের সম্বন্ধে যথেষ্ট মতদ্বৈত রয়েছে শিল্পশাস্ত্রীদের ভিতরে। যেমন দেবীর দুই থেকে বত্রিশ হাতবিশিষ্ট রূপের উল্লেখ রয়েছে এমন কি অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে 'সহস্রভুজা' বলেও কল্পনা করা হয়েছে। এছাড়া পার্শ্বচর দেবদেবীদের সম্পর্কে একথা যথেষ্ট জোরের সঙ্গে বলা যায় যে দেবীমূর্তি পূজার বিবর্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে এঁদের কারোরই দেখা পাওয়া যায় না, এঁরা এসে চালচিত্রের নিচে, দুর্গার পাশে নিজেদের গর্বিত আসনগুলি দখল করেছেন অনেক পরে।

মাতৃমূর্তির প্রচলন যদিও বহু প্রাচীনকাল থেকেই পাওয়া যায়, অর্থাৎ একেবারে সিন্ধুসভ্যতা, মহেঞ্জোদাড়োর যুগ থেকেই মাতৃপূজার প্রচলন থাকলেও ভাস্কর্যের অঙ্গনে মহিষাসুরমর্দিনীর আবির্ভাব খুব প্রাচীন নয়। ভারতীয় ভাস্কর্য যখন শিল্প-বিবর্তনের ক্লাসিক পর্যায়ের সিঁড়িতে পা দিয়েছে, অর্থাৎ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহিষাসুরমর্দিনী সগৌরবে আবির্ভূতা হলেন। ভিটা নামক জায়গায় স্যার জন মার্শাল মহিষাসুরমর্দিনীর দ্বিভুজা মূর্তি সমন্বিত এক প্রস্তর ফলক আবিষ্কার করে গুপ্ত যুগকে আরও গৌরবান্বিত করলেন।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের চম্বাতে খৃস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর এক দেবীমূর্তি পাওয়া গেছে। তৎকালীন যুগে এই অঞ্চলের রাজা ছিলেন মেরুবর্মণ—তাঁর তৈরি এই পিতলের মূর্তিটিতে 'যুদ্ধং দেহি' ভাব আরও স্পষ্ট। মূর্তিটিতে দেবী মহিষের লেজটি তুলে ধরেছেন সামনের বাম হাত দিয়ে এবং ডান হাত শূলবিদ্ধ করছে অসুরের গলা। দেবী পিছনের বাম হাতে তলোয়ার আর ডান হাতে ঘণ্টা ধরে আছেন। এর সঙ্গে একটি লিপিও উৎকীর্ণ রয়েছে:

'এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য সারূঢ়া তং
মহাসুরম্।
পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ
শূলেনৈনতাড়য়ৎ।'

দেবীর এই মূর্তির সঙ্গে উদয়গিরির (ভিলসা, মধ্যপ্রদেশ) মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিটির প্রচুর সাদৃশ্য আছে। বিশেষ করে যুদ্ধ করার ভঙ্গিতে এঁদের অদ্ভুত মিল। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে মূর্তিটি এতো প্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও দেবী কিন্তু দ্বাদশভুজা, বিভিন্ন হাতে বিভিন্ন আয়ুধ। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে মার্কণ্ডেয় পুরাণবর্ণিত দেবীমূর্তির সঙ্গে উত্তর এবং মধ্যভারতের শিল্পীরা যথেষ্ট সুপরিচিত ছিলেন এবং যুদ্ধ করার ভঙ্গিতে বর্ণনাকে পাথরের বাঁধনে বন্দী করেছেন।

এখানে একথা বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে এতোদিন পর্যন্ত আমরা দেবীকে বাহনবিহীনাই দেখেছি, তাঁর সিংহবাহিনী মূর্তি তখন পর্যন্ত প্রাধান্য লাভ করে নি। গঙ্গাইকোণ্ডচোলপুরমে আমরা সিংহের আবির্ভাব দেখলাম দেবীমূর্তির সঙ্গে। কিন্তু মণ্ডনরীতির যথেষ্ট উন্নতি না হওয়ায় মূর্তিটির মধ্যে যুদ্ধোন্মাদনার রূপ অনুপস্থিত, সিংহটিও যথেষ্ট নির্জীব। মধ্যযুগীয় শিল্পধারার আদিপর্বে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঐ যুদ্ধের দৃশ্য-কল্পনায় এবং তার রূপায়ণে পরিবর্তন এসেছে। এদিকে ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত আইহোলের অষ্টভুজা দেবী মহিষাসুরের উল্টোনো ঘাড় ত্রিশূলবিদ্ধ করছেন, সিংহ পাশে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছে। [illegible] আর [illegible] জিনিস-কল্পনার [illegible] সেই [illegible] কোনো অসুরের আবির্ভাব হচ্ছে না—[illegible] মহিষের দেহের ভিতর থেকে অসুরের আবির্ভাব কিছু পরবর্তী ঘটনা। অন্য দিকে ময়ূরভঞ্জের হরিপুরের ভাস্কর্যে ঐ ঘটনার রূপায়ণ চোখে পড়ে। এখানে যুদ্ধরতা দেবীমূর্তি আরও বলিষ্ঠ, আরও আকর্ষণীয়।

ইলোরার পর্বতগাত্রে অষ্টভুজা দেবীকে দেখি সিংহের পিঠে চড়ে প্রচণ্ড বিক্রমে আক্রমণ করছেন মহিষাসুরকে। মহিষাসুর এক প্রবল পরাক্রমশালী যোদ্ধার মতো যুদ্ধ করে যাচ্ছে, মাথায় তার মহিষের শিং। মহিষাসুরের সঙ্গী-সাথীরা কেউ মরে পড়ে আছে, কয়েকজন তখনও লড়াই করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। ওপর থেকে দেবদেবীরা যুদ্ধের প্রচণ্ড দৃশ্য দেখছেন প্রচুর আশা নিয়ে। এই মূর্তিটির মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় হলো সমস্ত ভাস্কর্যটির মধ্যে একটা প্রচণ্ড যুদ্ধোন্মাদনা রয়েছে, কিন্তু দেবী যেন অত্যন্ত সহজে অসুরকে বধ করছেন। মহাবলীপুরমের ভাস্কর্যে দেবী সিংহবাহিনী। বিরাট আকারের মহিষাসুর (মাথাটা মহিষের মতো) ঢাল হাতে লড়াই করছে। অন্যান্য দেবদেবীরা চারপাশ থেকে ঐ যুদ্ধের দৃশ্য দেখছেন। এখানেও ভাস্কর্যটির ভিতরে একটা প্রচণ্ড গতিময়তা ফুটে উঠেছে কিন্তু কোথাও ভাবসাম্য নষ্ট হয়েছে বলে মনে হয় না।

ইদানীংকালে দেবীর মহিষমর্দিনী রূপের সর্বাধিক প্রচলন হয়েছে পূর্ব ভারতে—বিশেষ করে বাংলা দেশে এবং বিহারে। এখানে দেবীমূর্তিগুলির ঐতিহ্যও যথেষ্ট প্রাচীন। পূর্ব ভারতে শাক্তধর্মের বহুল প্রচলনের জন্যেই বোধ হয় দেবীর মহিষমর্দিনী রূপ এখানে এতোটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এখানে আমরা প্রধানত তিন ধরণের দেবীমূর্তির দেখা পাই—অষ্টভুজা, দশভুজা এবং দ্বাদশভুজা। এগুলির মধ্যে অবশ্য দশভুজা মূর্তিকল্পটিই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। কোথাও কোথাও আবার চতুর্ভুজা দেবীমূর্তিরও দেখা পাওয়া যায়। সিংহবাহিনী দুর্গা এখানে অবশ্য শুধুই মহিষাসুরমর্দিনী হিসাবে জনপ্রিয় নন, তাঁর মাতৃকারূপও যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করেছে। তাঁর মাতৃকারূপের জন্যেই এখন মূর্তিগুলির মধ্যে 'যুদ্ধং দেহি' ভাব অনুপস্থিত থাকায় দেবীমূর্তির রূপ এবং রীতি সৌম্য, স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে— হাতের সংখ্যা কমেছে, আয়ুধ কমেছে, অসুর প্রায়ই অনুপস্থিত এবং সিংহের [illegible] একটা [illegible] সৌন্দর্য বিরাজ করছে।

পাক-ভারতের রূপরেখা

প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী

পূর্বেই বলেছি যে, আমাদের অবস্থা প্রগতিশীল দলের মধ্যে দুই ভাগ হয়ে গেল। আমাদের দলে ছিলেন তেরজন সদস্য। কুমিল্লার প্রখ্যাত নেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন দলের নেতা এবং শ্রীপ্রভাস লাহিড়ী (বর্তমান প্রবন্ধের লেখক) ছিলেন তাঁর সহকারী। কোন্ দলের সংগে আমরা সহযোগিতা করবো, তাই-ই নিয়েই আমাদের মতভেদ হয়। ধীরেনবাবুর সাথে গেলেন দলের ছয়জন সদস্য এবং দলের সহকারী নেতা শ্রীপ্রভাস লাহিড়ীর সাথে থাকলেন, সাতজন সদস্য। ধীরেনবাবু; সুরাবর্দী সাহেবের নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামি লীগের সাথে যোগ দিলেন। আমরা সাতজন আবু হোসেন সরকারের দলের সাথে যোগ দিলেম। আওয়ামি লীগ ও তার সহযাত্রী 'ন্যাপ' দল অবশ্যই প্রগতিশীল দল ছিল তা সত্ত্বেও আমরা কেন যে আবু হোসেন সরকার সাহেবের "জগা-খিচুড়ি", 'হচ্-পচ্" দলের সাথে যোগ দিয়েছিলেম সেই কথাটাই এখানে তুলে ধরছি। নেতাই করেন, দল-পরিচালনা। দল যতই প্রগতিশীল হোক-না-কেন, নেতা যদি শক্তিশালী অভীষ্ট-পরায়ণ মতলববাজ হন, তাহলে তিনি দলকে বিপথে ও কুপথে পরিচালনা করতে পারেন। সুরাবর্দী সাহেব শুধু শক্তিশালীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন মহা-শক্তিশালী এক অভীষ্ট-পরায়ণ নেতা। তাঁকে তাঁর অভীষ্ট বি-পথ বা কু-পথ থেকে প্রতি-নিবৃত্ত করার ক্ষমতা দলের ছিল না। সেই জন্যই আমরা আওয়ামি লীগের ও ন্যাশনাল আওয়ামি দলের মত প্রগতিশীল দলের সাথেও যোগ দিই নি। আমার তো আমার নির্বাচকমণ্ডলীরও নির্দেশ ছিল, সুরাবর্দী সাহেবের সাথে হাত না মেলাতে। আমার নির্বাচকমণ্ডলী [illegible] আমাকে কোন অন্যায় বা ভুল নির্দেশ দেন নি এবং আমিও যে তাঁদের নির্দেশ মেনে চলে কোনও ভুল করি নি, সেই কথাটাই এখানে পাঠকদের বিচারের জন্য তুলে ধরতে চাই।

পূর্ব - পাকিস্তান বিধানসভার (এসেম্বলির) অধিবেশন সেদিন আরম্ভ হবে। এসেম্বলির স্পীকার জনাব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এসে [illegible] যে, তাঁর ঘরের [illegible] তালা বন্ধ। তিনি সেক্রেটারিকে ডেকে তালা খুলে দিতে বললেন। সেক্রেটারি সাহেব জানান যে, চাবি তাঁর কাছে নেই। মুখে তিনি তার বেশি কিছু না বললেও তাঁর হাবভাবেই বেশ বোঝা গেল যে, চাবি সুরাবর্দী সাহেবের কাছে। স্পীকার সাহেবকে এসেম্বলি হাউসের 'করিডোর'-এর মধ্যে একখানি চেয়ার দেওয়া হল এবং সেখানে তিনি বসে থাকলেন এবং তাঁকে প্রায় বন্দী অবস্থায় সদ্য নিযুক্ত পাঠান পাহারাদার দিয়ে ঘিরে রাখা হল। এদিকে এসেম্বলির অধিবেশনের ঘণ্টা বাজতে সুরু করল। স্পীকার থাকলেন করিডোরে বন্দী অবস্থায়। ডেপুটি স্পীকার জনাব সাহেদ আলি সাহেবকে শোভাযাত্রা সহকারে স্পীকারের আসনে নিয়ে গিয়ে বসান হল। জনাব সাহেদ আলি সাহেব ছিলেন, জনাব ফজলুল হক সাহেবের 'কৃষক-প্রজা' দলের সদস্য; সুতরাং জনাব আবু হোসেন সাহেবের বিশেষ বন্ধু, সাহেদ আলি সাহেব ছিলেন, অতি উচ্চ শিক্ষিত অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির অমায়িক ভদ্রলোক। তাঁর সাথে আমারও যথেষ্ট বন্ধুত্ব হয়েছিল। কেন যে তাঁর মত একজন ভদ্রলোক ঐরূপ বে-আইনী ও নীতি- বিগর্হিত কাজ করতে গেলেন, তা' আমি সঠিক জানি না; সুতরাং সে সম্বন্ধে আমার পক্ষে কিছু মন্তব্য করাও ঠিক ও যুক্তিসংগত নয়। অনেকেই অবশ্য অনেক কথা বলেছেন; আমি সঠিক না-জেনে কিছু বলতে চাই না। সাহেদ আলি সাহেব স্পীকারের আসনে বসার পরেই বিরোধী দলের অনেক মুসলমান সদস্যেরা গিয়ে তাঁকে ঘিরে ধরেন এবং বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্য থেকেই কেউ তাঁকে ঘুষি মারেন। সাহেদ আলি সাহেব সেখানে সেই স্পীকারের আসনের উপরই ঘুষি খেয়ে এলিয়ে পড়েন এবং সেখান থেকেই 'আম্বুলেন্স' গাড়ি করে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং ২।৩ দিন পরেই তিনি মারা যান। পরে, শব-ব্যবচ্ছেদের ফলে জানা যায় যে, তাঁর পাঁজরার দুইখানি হাড় ভেঙে 'লিভারের' (যকৃতের) মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। এইভাবে একজন অতি নিরীহ প্রকৃতির অমায়িক [illegible] [illegible] হল এবং পূর্ব-পাকিস্তানে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। , [illegible] সুরাবর্দী সাহেবের এই পরিকল্পনা জানতে পেয়েই সম্ভবত পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর নেতা, যথা সর্বজন শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা, বিপ্লবী নায়ক শ্রীভূপেন দত্ত, অবিভক্ত বাংলার কংগ্রেস নেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীক্ষেত্র মিত্র প্রমুখ আওয়ামি লীগের সংগ ছেড়ে এসে বিরোধী দলে আমাদের সংগেই বসেন। আমি বসতেম একটি রাস্তার ধারে। আমি আমার জায়গা ছেড়ে দিই শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা মহাশয়াকে। তাঁর ও আমার মাঝখানে বসেন, শ্রীভূপেন দত্ত মহাশয়। এই অবস্থা যখন চলছে তখন পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল জনাব সামসুদ্দোহা সাহেব সদলবলে এসেম্বলি-হাউসের মধ্যে এসে ঢুকে বসে সদম্ভে ঘোষণা করেন যে, তিনিই এখন 'হাউসের' প্রভু। এই অবস্থায় তাঁর সিপাহী দলের একজন 'ক্রস-বেল্ট ধারী 'অফিসার' এসে শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা মহাশয়ার হাত ধরে টানাটানি সুরু করে। পুলিশের সেই অমার্জনীয় দুঃসাহস দেখে ভূপেন দত্ত মহাশয় সিংহের মত গর্জন করে ওঠায় পুলিশ অফিসারটি খেঁক্-শেয়ালের মত লেজ-গুটিয়ে দূরে সরে পালায়।

এইভাবেই একজন অতি নিরীহ প্রকৃতির ভদ্রলোক—সাহেদ আলি সাহেব প্রাণ হারালেন। সেদিনে পূর্ব-পাকিস্তান 'এসেম্বলি-হাউসে' যে দৃশ্য দেখেছি তাতে আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি যে, সেদিন কি সরকারপক্ষ, কি বিরোধীপক্ষ কেউই 'এসেম্বলি-হাউসের' সম্মান ও পবিত্রতা রক্ষা করে চলেন নি। এই অবস্থা দেখার পরে সাম্প্রতিককালের পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভার গতি ও প্রকৃতির নমুনা দেখে আমার মনে আশঙ্কা হয়েছিল যে, পশ্চিমবঙ্গও কি পূর্ব-পাকিস্তানের বিধানসভারই পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চলেছে? তাই, আমি আমার পূর্ব প্রবন্ধে সাবধানতার বাণী উচ্চারণ করেছিলেম। ভগবানকে ধন্যবাদ যে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা আমার আশঙ্কাকে অমূলক প্রতিপন্ন করেছেন।

পূর্ব-পাকিস্তান এসেম্বলি-হাউসে সেদিন যে দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছিল, সেইটারই সুযোগ নিয়ে পরবর্তীকালে সামরিক শাসন ও এক-নায়কতন্ত্র পাকিস্তানে 'কায়েম' হয়েছিল।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বাংলার গীতিকাব্যে বৈষ্ণব গীতিকবিতাকেই মামাবাবু যথার্থ গীতিকাব্য মনে করতেন এবং শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন। বাংলা কাব্য, সাহিত্য; বাংলার গীতিকবিতা এবং তার মাঝে বৈষ্ণব মহাজন-পদাবলীর স্থান কোথায় এই সব সম্বন্ধে তিনি অনেক লিখেছেন এবং অনেক কথাই বলেছেন। 'নারায়ণ' নামে যে মাসিক পত্রখানি বের করেছিলেন এবং নিজে যার সম্পাদক ছিলেন, সেই 'নারায়ণ'-এ এই সব অনেক লেখাই বের হয়েছিল। সেই সব অনেক লেখা বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে 'দেশবন্ধু গ্রন্থাবলী' নামক পুস্তকে ওঁরা প্রকাশিত করেন। তার মধ্যে 'কবিতার কথা', 'বাংলার গীতি-কবিতা', 'রূপান্তরের কথা' ও 'দেশের কথা' থেকে আমি কিছু কিছু লেখা তাঁর উদ্ধৃত করে দিচ্ছি যাতে তাঁর বক্তব্যের মাঝে তিনি পরিষ্কার হয়ে ওঠেন। তাই তুলে দেবার সময় আমি অন্য কিছু ভাবছি না, তাঁর লেখার পিছনে তাঁকে দেখানোই আমার আসল উদ্দেশ্য। এই সব লেখা এখন আর কারো হাতের সামনে আছে বা থাকা সম্ভব বলে মনে হয় না। এবং খুঁজলে পাওয়া যাবেই এমন নিশ্চয়তা কিছু আছে কি না তাও জানি না। ভাবলে দুঃখবোধ করি যে এমন সব জিনিস এরই মধ্যে মুছে যেতে বসেছে। অবশ্য সবই জানা কথা যে, কালের গর্ভে এমন কতই চলে গেছে কতই যাবে—তবু কোথায় যেন বাজে। বহুদিন বাদে তাঁর লেখাগুলি সব পড়তে পড়তে বিস্মিত হয়ে এই কথাই ভাবছিলাম, কত দিকই যে তাঁর দেখতে পাই নি, বুঝতে পারি নি, সে সবই চোখের সামনে নিজেকে খুলে ধরল, তুলে ধরল—অবাক হয়ে দেখলাম সমস্তই। যেদিক দিয়ে দেখি মুগ্ধ না হয়ে পারি নি, বিস্ময় আরও বেড়ে গেল যখন দেখতে পেলাম আধ্যাত্মিকতা তাঁর সত্তার কতখানি জুড়ে আছে। আর তা কিভাবে তাঁর জীবনের মূলে রসসঞ্চার করে চলেছে, যার ফলে সবকিছুই তিনি দেখেছেন তারই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে। কল্পকলা ইত্যাদি সবেতেই দেখতে চেয়েছেন আধ্যাত্মিক উপলব্ধির রসসৃষ্টি, এবং মূল্য নির্ধারণ করেছেন তারই স্তর হিসেবে। জ্ঞানাবধিই দেখেছি ভগবানে তাঁর একান্ত বিশ্বাস, কিন্তু আধ্যাত্মিকতাকে যে তিনি এইভাবে গ্রহণ করেছেন, এইভাবে ধরেছেন, আধ্যাত্মিকতা যে তাঁর জীবনের এতখানি, এতবড় অবলম্বন—এতটা ঠিক বুঝি নি, হয়ত বা বুঝবার সে ক্ষমতাও ছিল না। এইবার তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি। এইসব লেখা বেশির ভাগ কাব্য, সাহিত্য ইত্যাদি কল্পকলা সম্বন্ধে।

"আধ্যাত্মিকতা জীবনের প্রাণ—প্রাণের অন্তরতম জ্বলন্ত পাবকশিখা। মানব-জীবন সেই শিখার জ্বলন্ত জাগ্রত মূর্তি। ভাব ও ভাষা তাহার রঙ ও রঙের মিলনমাধুর্য্য।"

"এই মানব প্রাণের অন্তরভূমির সহিত বিশ্বপ্রাণের মিলনভূমির অপরূপ দৃশ্য, এই প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ের সহিত যে অতীন্দ্রিয় মহা-মিলনের রস, তাহাই শ্রেষ্ঠ কল্পকলার রাজ্য। তাহাই সংসার ও পরমার্থের মিলনে সম্পূর্ণ জীবন। এই মহামিলনের প্রধান দূতী প্রেম। বিশ্লেষণে কোন নূতন সম্পদ গড়িয়া ওঠে না। বিশ্লেষণে প্রাণের সমগ্র অনুভূতি হয় না, এবং বিশ্লেষণে ভাঙিতে পারে, সৃষ্টি করিতে পারে না। বিশ্লেষণ আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সমগ্রতা হইতে দূরে রাখে, একাত্মবোধে অসহায় করিয়া তোলে,—একমাত্র প্রেমই এই মিলনের মহামন্ত্র। কবিতা যদি এই প্রেমের রাজ্যে না পৌঁছায়, এই প্রাণ চিন্তামণির 'মণিকোঠায়' মণি না মিলাইতে পারে, তবে তাহা প্রাণের কবিতা নয়। গীতিকবিতা সে অতলস্পর্শ রূপসাগরে ডুবিয়া সেই সাগরের কাহিনী ফুটাইয়া তুলে।"

"বাঙ্গালাদেশের এই যে গানের ধারা,—এই যে কল্পকলার ধারা, তাহাকে জীবনের সাধনাঙ্গ হইতে তফাৎ করিয়া দেখিতে গেলে ভুল হয়, কেন না বাঙ্গালাদেশ সাধন-ধর্ম্মের উপরই সকল কর্ম্মের, সকল সৃষ্টির, সকল কল্পকলার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।"

"বাঙ্গালাদেশের গান ও চিত্রে সেই অধ্যাত্মসাধনের রূপ ও রূপান্তরই ফুটিয়াছে। তাই আমি সেই গানের চরিত্রের ধারায় বাঙ্গালাদেশের স্বরূপকে দেখিতে পাই।.. ..গীতিকবিতার প্রাণ কবিকে আত্মানুভূতিতে ও আত্মস্থ অনুরাগের আনন্দে।"

"কেহ, কেহ বলেন যে, কল্পকলার সাধনা এ জীবনে শুধু বিলাসের জিনিষ, ইহার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। তাহারা ধর্ম্ম অর্থে ইংরেজরা যাহাকে religion বলে, শুধু তাহাই বুঝেন। আমরা জীবনটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিতে শিখি নাই, আমাদের ধর্ম্ম জীবনের কোন একটা বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। আমরা জানি ও বুঝি যে সকল কল্পকলার ভিত্তি রস-সাধন, সকল কল্পকলার উদ্দেশ্য রস-সৃষ্টি। সুতরাং সকল রসের আকর যে রসময়, তাহাকে ছাড়িয়া দিলে কোন রস-সাধনই সার্থক হইতে পারে না।"......

—"যে প্রদীপে আমার প্রাণ জ্বালিয়াছে, সে প্রদীপ আমার বাঙ্গালার ঘরে ঘরে জ্বালাইতে চাই। বাঙ্গালা আপনার আত্ম-বিকাশ আপনি আপনি করিবে। আপনার গান আপনি গাহিবে, আপন সকল [illegible] নিষ্পন্ন করিবে ও আপন গৌরবে

জয়যাত্রার সম্মুখে দাঁড়াইবে।......চাই শুধু—প্রাণের আন্তরিকতা, চাই শুধু—জীবনকে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করা, চাই শুধু—আত্মার দীপ হাতে করিয়া প্রতি পদক্ষেপ গণনা করিতে করিতে পথ চলা।"—

"এই সমগ্র জীবনের অনুভূতিই সাহিত্য।......মনস্তত্ত্ববিদ্ বলেন, এই রূপতৃষ্ণা স্বভাব, সৃষ্টি রক্ষার জন্যে মিলিবার পন্থা। কল্পকলার স্রষ্টা বলেন, এ তৃষ্ণা নয়, এ স্ফূর্ত্তি, রূপের ভিতর দিয়া রূপকে পাইবার, আপনাকে ফুটাইবার।"—

"কল্পকলার মূল কথা হইল সত্য। জীবনের বিশিষ্ট অনুভূতির সত্য, সে চিরন্তন সত্য কাল-দেশের পরিবর্তনের ভিতরেও তাহার অন্তরঙ্গকে বদল করে না।......কল্পকলা, সেই দিব্য দৃষ্টির কথা। এই যে সাধারণ মানুষের অনুভূতি, কল্পকলাবিদ তাহার ভিতরে দেখেন, সেই অনন্তের রসাভাস, সেই রসাভাসের জাগ্রত ছবিখানি তাহার জীবনের এক অনন্ত মুহূর্ত্তের ঋদ্ধি।......জীবন যে সাধনা, সে ত' স্বপ্ন নয়। এই বিশ্ব যে অনুপম বিশ্বনাথের বিরাট শিল্প। এ মহাকাব্যে সকলেরই যথাযথ স্থান আছে, আলোও আছে আঁধারও আছে।......এই রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ গন্ধময়ী পৃথিবীই কলাবিদের প্রাণ।"

"চম্পক বরণী, হরিণ-নয়নী.....
চলে নীল সাড়ী নিঙ্গাড়ী নিঙ্গাড়ী
পরাণ সহিত মোর—

ইহাই বাঙ্গালার গীতিকবিতার প্রাণ। প্রাণের সঙ্গে, মর্ম্মের সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে,—ভাবের সঙ্গে কর্ম্মের সঙ্গে, ধর্ম্মের সঙ্গে,—জীবনের সঙ্গে, বাহিরের ও ভিতরের এমনই প্রাণস্পর্শী মিলন। বাঙ্গালী জানুক আর নাই জানুক, বুঝুক আর নাই বুঝুক, আমার বাঙ্গালার প্রাণ সে মহামিলনে ভোর হইয়া আছে। সেই মহামিলন মন্দিরে পূজা যে চলিতেছে; বাঙ্গালার গান, তাহার আরত্রিক—বাঙ্গালার ভাষা তাহার মন্ত্র। সেই বাঙ্গালার কবি চণ্ডীদাস। সেই কবিতা বাঙ্গালীর কবিতা।

চণ্ডীদাসের লিখিত গীতিকাব্য, ইহাই বাঙ্গালার যথার্থ গীতিকাব্য, এই কবিতাগুলির মধ্যে যে প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়, তাহাই বাঙ্গালা গীতিকবিতার প্রাণ"—

"শুধু নায়ক-নায়িকার হাবভাব বর্ণনা করিলেই প্রেমের কবিতা হয় না। প্রেমের রাজ্যে যে না পৌঁছিতে পারে, তাহার পক্ষে প্রেমের কবিতা লেখা বিড়ম্বনামাত্র। আমাদের প্রত্যেক
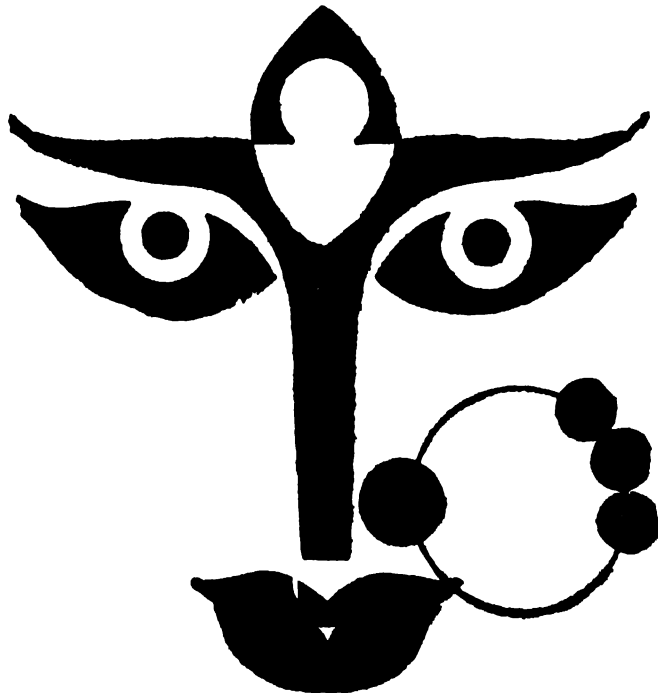
প্রত্যেকের, প্রত্যেক ভাবের, প্রত্যেক সম্বন্ধের একটা অন্তঃপ্রকৃতি আছে। সকল বহিরাবরণের মধ্যে এই অন্তঃপ্রকৃতির অনুসন্ধানই মনুষ্যজীবন। সকলেই সেই একই অনুসন্ধান করিতেছে। কেহ জানে করে, কেহ না বুঝিয়া করে। আমরা সকলেই সেই অন্তঃপ্রকৃতির—সেই প্রাণের খোঁজে ব্যস্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াই। যাহাকে জীবনের অনন্ত মুহূর্ত্ত বলিলাম, সেই অনন্ত মুহূর্ত্তে সেই প্রাণেরই সাক্ষাৎলাভ হয়। আর সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের হৃদয়মন রসোচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া পড়ে। তখন কবিতার সৃষ্টি হয়।

তবে কবিতার রাজ্য কোথায়? আমি পণ্ডিত নহি, কথা লইয়া তর্ক করা অভ্যাস নাই। একটা উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। সেদিন হিমালয়ে যে দৃশ্য দেখিলাম তাহারি কথা বলিব। ধরণী অনেক উপরে উঠিয়া আকাশের গায় ঢলিয়া পড়িয়াছে। আকাশ তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া আছে। ধরণী আকাশের গায় ও আকাশ ধরণীর গায় মিলাইয়া আছে। এ মিলন অপূর্ব্ব, গভীর, অনন্ত,। দেখিয়া দেখিয়া আমার চোখে জল আসিল। মনে মনে নমস্কার করিলাম, বলিলাম, এই ত' জীবন। এইখানে সংসার ও পরমার্থ; ধরণী ও আকাশ, দেহ ও আত্মা, বহিরাবরণ ও অন্তঃপ্রকৃতি মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া আছে। এই সেই মিলনভূমি, অপূর্ব্ব, অনন্ত। বুঝিলাম যাহা আত্মা, তাহাই দেহ, যাহা অনন্ত তাহাই সান্ত; যাহা পরমার্থ, তাহাই সংসার।

জীবন এই মহামিলন মন্দির। ইহাই কবিতার রাজ্য। এখানে শুধু সংসার নাই, শুধু পরমার্থও নাই, শুধু ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ বাস্তবতা নাই, বস্তুহীন কল্পনাও নাই,—যাহা আছে তাহাই জীবনের স্বরূপ। এ জীবন লইয়াই কবিতা।"

বাংলাদেশকে যে মামাবাবু কত ভালোবাসতেন, বাংলাদেশ ছিল তাঁর গৌরবের বস্তু—প্রাণের প্রাণ। এই বাংলাদেশের কথা বলতে গেলে তিনি কখনো শুধু 'বাংলা' বা 'বাংলাদেশ' বলতেন না, সমস্ত প্রাণের দরদ নিংড়ে বলতেন 'আমার বাংলা'। নিজের প্রিয় পরিজনের মতই বাংলাদেশ তাঁর প্রিয় ছিল, তার থেকে একটুও কম নয়। এখানে তাঁর বাংলাদেশ সম্বন্ধে লেখা তুলে দিচ্ছি—কি গভীর ভালোবাসা, আর কি গভীর প্রাণের টান।

'বাঙ্গালার জল, বাঙ্গালার মাটির মধ্যে একটা চিরন্তন সত্য নিহিত আছে। সেই সত্য যুগে যুগে আপনাকে নব নব রূপে নব নব ভাবে প্রকাশিত করিতেছে। শত সহস্র পরিবর্ত্তন, আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই চিরন্তন সত্যই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যে, দর্শনে, কাব্যে, যুদ্ধে, বিপ্লবে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, অজ্ঞানে, অধর্ম্মে, স্বাধীনতায়, পরাধীনতায় সেই সত্যই আপনাকে ঘোষণা করিয়াছে, এখনও করিতেছে। সে যে বাঙ্গালার প্রাণ, বাঙ্গালার মাটি, বাঙ্গালার জল, সেই প্রাণেরই বহিরাবরণ। বাঙ্গালার ঢেউ-খেলানো শ্যামল শস্য-ক্ষেত্র, মধু-গন্ধবহ মুকুলিত আম্রকানন, মন্দিরে মন্দিরে ধূপ-ধুনা-জ্বালা সন্ধ্যার আরতি, গ্রামে গ্রামে ছবির মতন কুটীর প্রাঙ্গণ, বাঙ্গালার নদ-নদী, খাল-বিল, বাঙ্গালার মাঠ, বাঙ্গালার ঘাট, তালগাছঘেরা বাঙ্গালার পুষ্করিণী, পূজার ফুলেভরা গৃহস্থের ফুলবাগান, বাঙ্গালার আকাশ, বাঙ্গালার বাতাস, বাঙ্গালার তুলসীপত্র, বাঙ্গালার গঙ্গাজল, বাঙ্গালার নবদ্বীপ, বাঙ্গালার সেই সাগরতরঙ্গে চরণবিধৌত জগন্নাথের শ্রীমন্দির, বাঙ্গালার সাগরসঙ্গম, ত্রিবেণী-সঙ্গম, বাঙ্গালার কাশী, বাঙ্গালার মথুরা-বৃন্দাবন, বাঙ্গালীর জীবন, আচার-ব্যবহার বাঙ্গালার সমগ্র ইতিহাসের ধারা যে সেই চিরন্তন সত্য, সেই অখণ্ড অনন্ত প্রাণেরই পবিত্র বিগ্রহ! এই সবই সেই প্রাণ-ধারায় ফুটিয়া ভাসিতেছে, দুলিতেছে।"

"আমার বাঙ্গালার বড় মধুর রূপ। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিধি [illegible] রূপ কই আর ত' কাহাকেও দেন নাই। আমার বাঙ্গালার রূপের কি তুলনা আছে। [illegible] সরিৎবিপুলা উচ্ছ্বাসময়ী ভাগীরথী, যা'র বুকে অবিরাম নৃত্য করিতেছে, চরণতলে উদ্দাম উচ্ছল মহোর্ম্মি কিঙ্কিণিত সাগরের দিগন্ত মুখরিত হলহলা, শিরে নাগাধিরাজ ধূর্জ্জটি, সূর্য্যকিরণে ধক্-ধক্ জ্বলিতেছে। মা আমার এক হাতে ধান্যশীর্ষ, অপর হস্তে বরাভয়, কোলে বীণা, পদতলে সহস্রদল শ্বেতপদ্ম, আকাশ উজ্জ্বল, তরুণরবি হিরণ-চূর্ণ দিগ্বিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে। আশে পাশে ললিতকণ্ঠে পিককুল কলঝঙ্কারে মুখরিত করিতেছে। এ রূপের কি তুলনা আছে!"

"বাঙ্গালার যে জীবন্ত প্রাণ, তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বাঙ্গালার প্রাণে প্রাণে আবহমান যে সভ্যতা ও সাধনার স্রোত, তাহাতে অবগাহন করিয়াছি। বাঙ্গালার যে ইতিহাসের ধারা, তাহাকে কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। বৌদ্ধের বুদ্ধ, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের ভক্তি, সবই যেন চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির গান মনে পড়িল।......রামপ্রসাদের সাধন-সঙ্গীতে আমরা মজিলাম। বুঝিলাম রামমোহনের তপস্যার নিগূঢ় মর্ম্ম কি? বঙ্কিমের যে ধ্যানের মূর্ত্তি—

'তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম তুমি হৃদি, তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে'—

সেই মাকে দেখিলাম। বঙ্কিমের গান আমাদের 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল।' বুঝিলাম রামকৃষ্ণের সাধনা কি—সিদ্ধি কোথায়, বিবেকানন্দের বাণীতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল। বুঝিলাম বাঙ্গালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক বাঙ্গালী বাঙ্গালী। ....অনন্ত লীলাধারের রূপ-বৈচিত্র্যে বাঙ্গালী একটি বিশিষ্ট রূপ হইয়া ফুটিয়াছে। আমার বাঙ্গালা সেই রূপের মূর্ত্তি : আমার বাঙ্গালা সেই বিশিষ্ট রূপের প্রাণ। যখন জাগিলাম, মা আমার আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন। সে রূপে প্রাণ ডুবিয়া গেল। দেখিলাম রূপ বিশিষ্ট, সে অনন্ত। তোমরা হিসাব করিতে হয় কর, তর্ক করিতে চাও কর,—আমি সে রূপের বালাই লইয়া মরি।"—

"আত্মার অন্তরের পরতে পরতে যে দীপ জ্বলিয়া আলোক বিকিরণ করে, সে আলোকের ধর্ম্মই অন্ধকারকে জ্বালাইয়া দীপ্ত করা। .... সেই দীপ একদিন বাঙ্গালার কবি চিন্তামণির বুকের ভিতর জ্বলিয়াছিল, সেই দীপ একদিন মহাপ্রভুর বুকের মণিকোঠায় জ্বলিয়াছিল, সেই দীপের আলোক মুসলমান যুগের আবহাওয়ার ভিতরেও রামপ্রসাদের প্রাণের ভিতর জ্বলিয়াছিল, সেই দীপ এই ফেরঙ্গ যুগেও গঙ্গাতীরে পঞ্চবটীতলে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালার সাধনার ধারা এমনি করিয়া ধীরে ধীরে রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই সাধনার ধারাতেই বাঙ্গালার গানের জন্ম।"—

তাই ভাবি এমন করে যিনি বাংলাদেশকে ভালোবেসেছিলেন, বাঙ্গালার জন্যে, বাঙালীর জন্যে এতখানি বুকভরা ভালোবাসা, দরদ নিয়ে আজীবন যিনি ভেবেছেন, লড়েছেন,—যে দেশ, যে জাতিকে তুলবার জন্যে, সকল দীনতা অপমানের অভিশাপ থেকে বাঁচাবার জন্যে, নিজের জীবনকে এমন করে মরণের মুখে তুলে দিলেন, সেই বাংলাদেশ, সেই বাঙালী কেমন করে এত সহজে এরই মধ্যে তাঁকে ভুলে গেল। ভাবলে বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে ওঠে।

[illegible]

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

॥ চতুর্থ পর্ব ॥

চতুর্থ পর্ব ১৯২৯ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পাঁচ বৎসর ভারতের ইতিহাসে প্রচণ্ডবেগে আছড়ে পড়ছে। মহাত্মার নেতৃত্বের শক্তি ও দুর্বলতা এমন-ভাবে একই সঙ্গে আর কখনো উদ্ঘাটিত হয় নি। ১৯২০-২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষেত্রেও প্রায় একই ব্যাপার ঘটেছিল কিন্তু সেবার আন্দোলন এমন ব্যাপক হয় নি বা এবারের মত লজ্জাজনক পরাভবে সমাপ্তও হয় নি।

এই পাঁচ বছরের ইতিহাসের সূচনা ১৯২৯ সালে গান্ধীজী কর্তৃক পুনরায় কংগ্রেসের পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করার পর থেকে। আভ্যন্তরীণ শক্তি করায়ত্ত করার ব্যাপারে গান্ধী-কৌশলের সমস্ত প্রশংসা সুভাষচন্দ্র করেছেন।

আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে গান্ধীজীর বুদ্ধি সত্যই অতুলনীয়। ১৯২৭ সালের মাদ্রাজ কংগ্রেস থেকে বামপন্থীদের শক্তি বৃদ্ধি হচ্ছে। মাদ্রাজ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হয়েছিল সেটা বিবেচনাহীন হঠকারিতা বলে গান্ধীজী উড়িয়ে দিলেন। ১৯২৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে নিজের প্রতি অনাস্থার চ্যালেঞ্জ উঁচিয়ে গান্ধীজী পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব ঠেকালেন। কিন্তু দেখলেন ওটাকে সত্যই আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।

তাছাড়া ঐ পূর্ণস্বাধীনতার প্রোপাগ্যাণ্ডায় বামপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটছে। সুভাষচন্দ্র-জহরলালের তৈরি ইনডিপেনডেন্স লীগ করে ঐ বিষয়ে পুরোদমে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। ভগৎ সিং ইত্যাদির গ্রেপ্তার এবং যতীন দাসের আত্ম-ত্যাগ দেশে এমন উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে যে, তাঁর বিরোধিতা সত্ত্বেও পূর্ণ স্বাধীন-তার প্রস্তাব পাশ হয়ে যাবে।

গান্ধীজী ১৯২৯ সালের লাহোর কংগ্রেসে স্বয়ং পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব আনলেন।

কেবল এই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব এনেই তিনি বামপন্থীদের 'পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিলেন' না, তিনি অতীব কৌশলে আরও একটি মারাত্মক আঘাত হানলেন। বামপন্থীদের নেতা জহর-লাল নেহরু গান্ধীজীর দ্বারাই ১৯২৯ সালের লাহোর কংগ্রেসে সভাপতি নির্বা-চিত হলেন।

সুভাষচন্দ্র মুগ্ধ হয়েছেন মহাত্মার রাজনীতিতে। বামপন্থীরা চান নি তাঁদের নেতা কংগ্রেসের সভাপতি হোন, কারণ তাঁরা জানতেন, ঐ সভাপতি গান্ধীজীর হাতের পুতুল হবেনই। তাই হল। দুটি নমুনা সত্বর পাওয়া গেল। লাহোর কংগ্রেসের পরে যে-কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হল, তাতে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ কোনো বামপন্থীর নাম রইল না। জহরলাল ব্যাপারটা স্বীকার করে নিলেন। তারো আগে, ডোমিনিয়ন কনস্টিটিউশন গঠনের ব্যাপারে সাধু প্রচেষ্টার জন্য ভাইসরয় লর্ড আরউইনকে ধন্যবাদ দিয়ে যখন মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর অনুগামী নেতৃবৃন্দ বিবৃতি প্রচার করলেন, (যে-বিবৃতির তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র ডাঃ কিচলু আবদুল বারি) সেই বিবৃতিতে না না করেও ইনডিপেন-ডেন্স লীগের পাণ্ডা-নেতা জহরলাল স্বাক্ষর দিলেন কারণ গান্ধীজীর ভাষায়, 'তিনি লাহোর কংগ্রেসের প্রস্তাবিত সভাপতি।' বলা বাহুল্য, আরউইনের কাছ থেকে কংগ্রেস কর্তাদের শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছিল।

লাহোর কংগ্রেসে গান্ধীজীর কাছ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার চাপড় খেয়ে সুভাষচন্দ্রাদি দুঃখে হাসলেন। যতদিন পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নি, ততদিন ঐ প্রস্তাবের গুরুত্ব ছিল, লাহোর কংগ্রেসে প্রস্তাবটা গ্রহণ করে গান্ধীজী দেখালেন ব্যাপারটাকে কিভাবে 'মূল্যহীন' করে দেওয়া যায়। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করলে সেটাকে কার্যকরী করবার উপায়ের কথা ওঠে। প্রস্তাব উত্থাপন করে গান্ধীজী প্রগতি-শীল হলেন কিন্তু কার্যকরী করার ব্যাপারে নীরব থেকে প্রগতিশীলদের নিষ্ক্রিয় করে রাখলেন। সুভাষচন্দ্র লাহোর কংগ্রেসে সমান্তরাল সরকারের যে প্রস্তাব তুললেন, সেটা বাতিল হয়ে গেল। বাতিল হলই, কারণ ব্যাপারটা আবার দাঁড়াল গান্ধীজীর প্রতি আস্থা কি অনাস্থার প্রশ্নে।

সুভাষচন্দ্র বলছেন—

"প্রস্তাবটি পরাভূত হল। তার অর্থ কংগ্রেস যদিও পূর্ণ স্বাধীনতাকে নিজেদের লক্ষ্য বলে গ্রহণ করল, তথাপি সে লক্ষ্যে পৌঁছবার পন্থা কি, তা বলে দিল না—আগামী বছরের জন্য কোনো কার্যবিধিও গ্রহণ করল না। এর থেকে উদ্ভট ব্যাপার কল্পনা করাও যায় না। তবে, জাতীয় ব্যাপারে আমরা কখনো কখনো কেবল যে বাস্তববোধ হারিয়ে ফেলি তাই নয়, সাধারণ বুদ্ধিও হারিয়ে ফেলার দিকে ঝোঁক থাকে।"

পূর্ণ স্বাধীনতার আরও দুর্গতি হয়। কিছুদিনের মধ্যেই গান্ধীজী জানাবেন তিনি স্বাধীনতার নির্যাসেই খুশি। পরবর্তী করাচী কংগ্রেসের সভাপতিরূপে বল্লভভাই প্যাটেল ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসকে, কংগ্রেসের অনুগত সৈনিক থেকেও, কংগ্রেসের আদর্শ বলবেন।

এইখানেই শেষ নয়। গান্ধীজী স্বরাজীদের ওপর প্রতিশোধ তুলবেন এই

বছরেই। সেই যজ্ঞে আত্মাহুতি দেবেন স্বরাজীদের নেতা মোতিলাল নেহরু।

১৯২৯ সালের জুলাই মাসে হঠাৎ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব নিয়ে বসল—আইনসভার কংগ্রেসীরা পদত্যাগ করুক। কেন্দ্রীয় আইনসভার স্বরাজী নেতা মোতিলাল সে প্রস্তাব সমর্থন করলেন, যিনি ক' মাস আগে বাংলা দেশের নির্বাচনে বিশেষ উৎসাহ দিয়েছিলেন। মোতিলালের এমন পরিবর্তনের কারণ বহুবিধ হতে পারে বলে সুভাষচন্দ্র অনুমান করেছেন। হয়ত তিনি নিজ দলের আনুগত্য সম্বন্ধে বিব্রত হয়েছিলেন, হয়ত শ্বাকবাদের আচরণ দেখে ভয় পেয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে চেয়েছিলেন। সে যাই হোক, সমবেত প্রতিবাদে এই প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয়, কিন্তু প্রস্তাবটা গান্ধীজীর মনে থেকেই গিয়েছিল। কয়েকমাস পরে লাহোর কংগ্রেসকে নিজের মুঠোর মধ্যে পুরে গান্ধীজী আইনসভা থেকে পদত্যাগের প্রস্তাব করিয়ে নিলেন।

সুভাষচন্দ্র বলেছেন—'১৯২৩ সালে স্বরাজীদের জয়ের শোধ তোলা হল ১৯২৯ সালে।"

'লাহোর কংগ্রেস মহাত্মার বিরাট জয়ের ক্ষেত্র।' এখানে তিনি বামপন্থীদের দুর্বল করে দিলেন কংগ্রেসকে মুঠোর মধ্যে পুরলেন, তাঁর কাউন্সিল-বর্জনের নীতিতে জয়যুক্ত করলেন, যার ফলে সরকার কর্তৃক নতুন শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবের মুখে তাঁর দোষ-গুণের আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। যে কোন বিরোধিতার মুখে গান্ধীজী তুলে ধরলেন অনশনের বা অবসরের হুমকি। এর ফল কি?

মারাত্মক। এর ফলে 'তাঁর পক্ষে ১৯৩১-এর মার্চ মাসে লর্ড আরউইনের সঙ্গে চুক্তি করা, নিজেকে কংগ্রেসের পক্ষে রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে একমাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন করা, ১৯৩২ সালে পুণা চুক্তি সম্পাদন করা, এবং আরও বহু জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর কাজ করা সম্ভবপর হল।"

তবু লাহোর কংগ্রেসে যে পূর্ণ-স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, সেই মহৎ লাভ।—

"জনসাধারণের কাছে লাহোর কংগ্রেস বিরাট প্রেরণা এনে দিল। ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রির পরে কংগ্রেসের সভাপতি স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করতে এলেন। লাহোরের তীব্র শীতের কামড় সত্ত্বেও বিরাট জনতা সমবেত হয়েছিল—পতাকা যখন উড়তে লাগল বিশাল জনমণ্ডলীর মধ্যে শিহরণ খেলে গেল। কংগ্রেস যখন শেষ হল, পূর্ব দিগন্তে তখন ফুটেছে উষার আভাস। সদস্যেরা বিদায় নেবার আগে বহন করে নিয়ে গেলেন নতুন আশা ও নতুন বাণীর দীপ্তিকে।"

ডাণ্ডী যাত্রা শুরু হল। ১২ই মার্চ ১৯৩০, আমেদাবাদ থেকে সমুদ্রতীরের দিকে নির্বাচিত সংগীদের নিয়ে মহাত্মা চললেন ভারত সমুদ্রের লবণাম্বু থেকে ভারতের প্রাণশক্তিকে আহরণ করে আনতে। তিন সপ্তাহ ধরে মহাত্মা চলেছিলেন, তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে স্পন্দিত হয়েছিল ভারতের আত্মা। এই মহাযাত্রা সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের আবেগের সীমা ছিল না।

গান্ধীজীর নেতৃত্ব-মহিমায় সম্মোহিত সুভাষচন্দ্র দেখলেন, বুদ্ধি এখন প্রজ্ঞায় উপনীত। যদি মহাত্মা যানে যাত্রা করতেন, কিছু ফল হত কি না সন্দেহ, কিন্তু তিনি চললেন মাটি মাড়িয়ে দিনের পর দিন, স্পর্শ করে চললেন সেই সব মানুষদের যাঁদের জন্য তাঁর এই যাত্রা, যারা ভাত জোটাতে পারে না, ভাত জুটলে নুন জোটাতে পারে না, অথচ সেই নুনটুকু থেকেও যাদের বঞ্চিত করবার চক্রান্ত চলেছে।

মহাত্মা যাত্রা করার আগে অনেক দ্বিধা করেছিলেন। তাতে তাঁর স্বভাবগত নিজের 'হৃদয় যাচাই' ছিল, আপোষের ক্ষেত্রে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসেও রাজী, এই কথা বলে পথ খোলা রেখেছিলেন, কিন্তু যখন আন্দোলন আরম্ভ হল, তখন বললেন স্থিরকণ্ঠে, শেষ সত্যাগ্রহী বেঁচে থাকাতেও আন্দোলন থামবে না। কিন্তু হিংসার ক্ষেত্রে—যদি চৌরিচোরার মত ব্যাপার ঘটে? না তখনও নয়, যদিও আন্দোলনকে সর্বপ্রকারে অহিংস রাখতে চেষ্টা করা হবে।

"একথা সত্য, হিংসার শক্তিসমূহকে সংযত রাখতে সর্বপ্রকার সম্ভবপর চেষ্টা করা হবে, কিন্তু এইবার আন্দোলন আরম্ভ হলে তা কিছুতে থামবে না, বা তাকে থামানো উচিত হবে না যতক্ষণ একজনও সত্যাগ্রহী মুক্ত বা জীবিত আছে।"

এই নেতৃত্ব সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র বললেন, "এর পর মহাত্মা যে কয়েকটি কার্যক্রম গ্রহণ করলেন তা তাঁর নেতৃত্বের ইতিহাসে সর্বকালের অপূর্বতম কীর্তি বলে গৃহীত হবে; সেগুলি দেখিয়ে দিয়েছে, সংকটের মুহূর্তে তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা কোন সমুন্নতির শিখরে উঠতে পারে।"

ভারতবর্ষের আত্মা জেগে উঠল আরপর। ভারতের প্রান্ত থেকে প্রান্তে বয়ে গেল রক্তের ঢেউ। আইন অমান্য আন্দোলন, নির্ভীক ধ্বনি, উদ্দীপ্ত প্রতিজ্ঞা। পাড়ন, লণ্ঠন, কারাগার; লাঠি, গুলী, ফাঁসী। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার ক্রূরতম মুখ খুলে ধরল। অর্ডিনান্সের পর অর্ডিনান্সের দাঁত দিয়ে চিবোতে লাগল শেষ রক্তের আশায় রক্তশূন্য শুধু অস্থিময় ভারতবর্ষকে। সে ইতিহাস সংযতভাবে গান্ধীজী লিখে পাঠালেন ভাইসরয়কে, সামান্যভাবে প্রকাশ করলেন মিস ম্যাডেলিন শ্লেড (মীরা বেন), এবং তারই সারসংক্ষেপ করেছেন সুভাষচন্দ্র তাঁর গ্রন্থে।

১৯৩০ সালের ৫ই মে গান্ধীজী গ্রেপ্তার হলেন এবং বিনা বিচারে তাঁকে কারারুদ্ধ করে রাখা হল।

তারপরে? 'সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে।' ১৯৩০ সালের ৫ই মার্চ গান্ধী আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। "এই প্যাক্ট কংগ্রেসীদের মধ্যে একটি বিমর্ষকর প্রভাব বিস্তার করল।" গান্ধী-আরউইন আলোচনাকালে এই প্যাক্টের সম্ভাব্য শর্তাবলী সম্বন্ধে যখন সংবাদপত্রে নানা বিবরণ প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন 'সেই ভবিষ্যৎ-বাণীগুলি পড়ে মহাত্মার অন্ধ ভক্তরাও বলেছিলেন, কখনই নয়, তাঁদের নেতা অর্থাৎ মহাত্মা এ রকম শর্তে রাজী হয়েছেন ভাবাই যায় না।' কিন্তু মহাত্মা 'এ রকম শর্তে' সত্যই রাজী হলেন, তখন ভক্তদের একমাত্র দায়িত্ব রইল উক্ত অভাবনীয়ের সমর্থনে যুক্তি সংগ্রহ করা।

দিল্লী প্যাক্টের শর্তাবলী পড়ে সুভাষচন্দ্রের নিশ্চয় মনে পড়েছিল দেশবন্ধুর কথাগুলি পুনরায়। গান্ধী অদ্ভুতভাবে আন্দোলন আরম্ভ করেন, কিন্তু শেষকালে পড়েন ভেঙে।

দিল্লী প্যাক্টের মধ্যে ইনডিপেনডেন্স দূরের কথা, 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের' কথাও ছিল না, ছিল ডোমিনিয়ন কনস্টিটিউশান সম্বন্ধে আলোচনার কথা, তার জন্য রাউণ্ড টেবল কনফারেন্স হবে, যার গলায় 'ফেডারেশন' এবং 'বৃটিশ স্বার্থের সংরক্ষণ,' এই দুটো বড়ো আকারের পাথর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রথম রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে কংগ্রেস যায় নি, কেন না কংগ্রেস আন্দোলন করেছিল। ঐ কনফারেন্সে 'সেফগার্ড' ও 'ফেডারেশন'—এই দুটি দান বৃটিশ সরকার ভারতকে দিয়েছিল। বৃটিশ স্বার্থের 'সেফগার্ড' যে চাই তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেই সেফগার্ড যে রক্ষিত হবে তার নিশ্চয়তা কি? সেই জন্যই তো ফেডারেশন—ভারতীয় রাজারা বৃটিশরাজকে দেখাশোনা করবে ফেডারেল আইনসভার আসন গ্রহণ করে।

কিন্তু ইংরেজ সরকার জানত এই 'ফেডারেশন' এবং 'সেফগার্ড' এই দুই মহার্ঘ বস্তুকে ভারতীয় [illegible] যা কম্যুন্যালদের দ্বারা [illegible]

একমাত্র কংগ্রেস। সুন্দরতম চালাকিতে কংগ্রেসকে তাই রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে ডেকে আনা হল। তার দ্বারা, ভারতে আন্দোলনের নিবৃত্তি, মধ্যবর্তীকালে সরকারের প্রত্যাঘাতের জন্য প্রস্তুতি, এবং নিজেদের স্বার্থরক্ষায় কংগ্রেসকে নিয়োগ করার চেষ্টা।

দিল্লী প্যাক্ট কেন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল তার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন সুভাষচন্দ্র। দেশের আইন অমান্য ও বয়কট আন্দোলন, বিপ্লববাদের ক্রমপ্রকাশ এবং সীমান্ত উপজাতিদের মধ্যে বিদ্রোহভাব সরকারকে বিশেষ বিচলিত করে তুলেছিল। তাছাড়া যদি আপোষ করতেই হয় "মহাত্মা গান্ধী যতক্ষণ কংগ্রেসের নেতা, ততক্ষণ আপোস করাই ভালো, কারণ বুদ্ধিমান ইংরেজের মতে 'ভারতে তাঁদের পক্ষে সেরা পুলিশম্যান হলেন গান্ধী'।" এর সঙ্গে অধিকন্তু কারণ ছিল, ইংলণ্ডে তখন শ্রমিকদলের শাসনতন্ত্রে থাকা এবং লর্ড আরউইনের ভাইসরয় থাকা। এই 'দীর্ঘ কৃশ খৃস্টানটির' ব্যক্তিগত উদারতায় সুভাষচন্দ্রও সন্দেহ করেন নি।

দিল্লী প্যাক্টের আগে গান্ধীজী ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা মুক্তি পেয়েছিলেন। এলাহাবাদে ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং বসল। 'উদারতাবাদী,' 'শান্তিবাদী' ও 'গুজববাদীতে' এলাহাবাদ ভরে গেল। বৈঠক শেষে মহাত্মা গান্ধী দিল্লীতে চললেন, পণ্ডিত মোতিলাল যেতে পারলেন না গুরুতর অসুস্থতার জন্য। সুভাষচন্দ্রের মতে সেটা বিশেষ দুর্ভাগ্য, কারণ দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে মোতিলালই কংগ্রেসে শেষ বুদ্ধি-নেতা।

'দিল্লীতে মহাত্মা ধনী অভিজাত এবং আপোষের জন্য মাথা খুঁড়ছে এমন রাজনীতিকদের দ্বারা পরিবৃত রইলেন।' মোতিলাল অনুপস্থিত। ওয়ার্কিং কমিটিতে এমন কেউ নেই, যিনি মহাত্মাকে প্রভাবিত করতে পারেন। অধিকন্তু তাঁরা মহাত্মারও চেয়ে আপোষে ব্যস্ত। এক পারতেন জহরলাল, পারা উচিত ছিল, কারণ তিনি কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট এবং বামপন্থী মতের সঙ্গে পরিচিত বলে পরিচিত। তিনি কি করলেন? ৪ঠা মার্চ তারিখে যখন গান্ধী-আরউইন কথাবার্তা শেষ হল, তখন আপোষের শর্তাবলী গান্ধীজী এনে ফেলে দিলেন ওয়ার্কিং কমিটির সামনে। ওয়ার্কিং কমিটির সম্মতি না পেলে তিনি এক পা এগোচ্ছেন না। ওয়ার্কিং কমিটি সম্মতি দিয়েছিল, জহরলালও, কিন্তু ৫ই মার্চ যখন প্যাক্টের বিবরণ প্রকাশিত হয়ে দেশে হটগোল শুরু হল, তখন 'পণ্ডিত জহরলাল বিবৃতি হাতে বেরিয়ে এলেন— তিনি প্যাক্টের সকল শর্ত সমর্থন করেন না, কিন্তু অনুগত সৈনিক হিসাবে তিনি লীডারকে মানতে বাধ্য হয়েছেন।' সুভাষচন্দ্র বলেছেন, হায় দেশ যে তাঁকে অনুগত সৈনিকের চেয়ে আরো বেশি কিছু ভেবেছিল।

দিল্লী প্যাক্টে গান্ধী রাজী হলেন; রাজী হলেন আন্দোলন প্রত্যাহার করতে, 'ফেডারেশন' 'রেসপনসিবিলিটি', 'ভারতের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সেফগার্ড'(!) ইত্যাদির ভিত্তিতে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগ দিতে এবং পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি জানাতে। ভাইসরয় রাজী হলেন, অহিংস আন্দোলনের বন্দীদের মুক্তি দিতে, বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরে দিতে, জরুরী অর্ডিন্যান্স প্রত্যাহার করতে, সমুদ্রের কাছাকাছি অধিবাসীদের লবণ তৈরি করতে দিতে, সীমাবদ্ধভাবে বিদেশী দ্রব্য ও মদ্যাদির বিরুদ্ধে বয়কট করতে দিতে।

স্বাধীনতার কথা কোথাও নেই। দেখা গেল, স্বাধীনতা মানে নুন তৈরির ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস। তদুপরি রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগদানের অধিকার।

এই প্যাক্টের প্রতিক্রিয়া বহুমুখী হল। বামপন্থীরা ভাবল পরাজয়, সাধারণ মানুষ ও দক্ষিণপন্থীরা ভাবল জয়, ব্যবসায়ীরা ভাবল স্বস্তি, ইংরেজ ভাবল অপমান। সুতরাং প্যাক্ট সম্বন্ধে এরা সকলেই নিজস্বভাবে সক্রিয় হল। বিপ্লবপন্থী সহ বামপন্থীরা বিরোধিতা করতে প্রস্তুত হল, ব্যবসায়ী সহ দক্ষিণপন্থীরা প্রস্তুত হল সমর্থনে। জনতা দিল জয়ধ্বনি, এবং ইংরেজপক্ষ এই প্যাক্টকে ব্যর্থ করতে ও প্যাক্টের ফাঁকে তৈরি হয়ে নিতে হল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

গান্ধীজীর পক্ষে মূল দায়িত্ব এখন দাঁড়াল, পরবর্তী করাচী কংগ্রেসে এই প্যাক্টের পক্ষে স্বীকৃতি আদায় করে নেওয়া। এবং ভবিষ্যতের ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য একনায়করূপে প্রতিষ্ঠিত থাকা।

মহাত্মাজী সে উদ্দেশ্যে সফল হলেন। ওয়ার্কিং কমিটি প্রচলিত রীতিকে লঙ্ঘন করে নিজেরাই বল্লভভাই প্যাটেলকে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত করে নিল। 'তাঁর থেকে মহাত্মার গোঁড়াতর ভক্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন।' সভাপতির ভাষণে বল্লভভাই পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এই প্যাক্টের বলবৃদ্ধিতে শুধু বল্লভভাই নন, আরও নানা স্বার্থ, বিশেষত ব্যবসায়ীস্বার্থ কিভাবে উদ্যোগী হয়েছিল, তার কিছু বিবরণ দিয়েছেন সুভাষচন্দ্র—

"ওয়ার্কিং কমিটির প্রত্যেকটি সদস্য অনুভব করলেন, তাঁদের মর্যাদা [illegible]; তাই করাচী কংগ্রেসে নিজেদের প্রদেশ থেকে সর্বাধিক সংখ্যক সমর্থক নিয়ে যাবার জন্য তাঁরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটতে লাগলেন। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছাড়াও প্রতিটি দক্ষিণপন্থী নেতাও অনুভব করলেন, করাচী কংগ্রেসে এই চুক্তির পক্ষে সমর্থক যোগাড় করতে আপ্রাণ করতেই হবে। সমস্ত ব্যবসায়ীস্বার্থও চাইল এই চুক্তি যেন স্থায়ী ব্যবস্থায় পরিণত হয়, যাতে তারা নিরুপদ্রবে ব্যবসা করতে পারে। তার ফলে যারা মহাত্মার সমর্থনে করাচী কংগ্রেসে যেতে চায় তাদের জন্য পয়সার অভাব রইল না।"

চুক্তির বিরোধী বামপন্থীদের অবস্থা অপরদিকে শোচনীয়। একদিকে জনতা জয়ধ্বনি দিচ্ছে গান্ধীজীর* অন্যদিকে জহরলালকে গান্ধীজী আয়ত্ত করে ফেলার পর থেকে বামপন্থী নেতৃত্বের মধ্যে বিভক্তি দেখা দিয়েছে, এবং সকলে করাচী কংগ্রেসে গিয়ে প্রতিবাদ জানাবেন এমন অর্থবলও তাঁদের নেই। তাছাড়া প্রতিবাদ করার অর্থ নতুন করে আন্দোলন আরম্ভ করা— সে ক্ষমতা নেই তাঁদের। উপায়ান্তরহীন বামপন্থী নেতারা তখন প্রতিবাদ-বিবৃতিতেই সন্তুষ্ট রইলেন।

অতঃপর গান্ধীজী কয়েকটি কাজ করলেন, যার ফলে সুভাষচন্দ্রের মতে 'মারাত্মক'। প্রথমত তিনি নিজেকে নির্বাচিত করালেন কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে। সুভাষচন্দ্র বলেছেন—

> "তাঁর এই সিদ্ধান্তের পিছনে ঠিক কি ছিল তা আমি কখনো উপলব্ধি করতে সমর্থ হই নি। এটা কি মহাত্মার অহঙ্কারের জন্য—যিনি বিশ্বের সামনে ভারতের কোটি কোটি মূক মানুষের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে দাঁড়াতে চাইছিলেন? অথবা এটা কি ওয়ার্কিং কমিটির

---

*সুভাষচন্দ্র নিজে গান্ধীজীর এই সময়ের বিপুল জনপ্রিয়তার সাক্ষ্য দিয়েছেন। গান্ধীজীর সঙ্গে তিনি বোম্বাই থেকে দিল্লী গিয়েছিলেন। জনতার অভিনন্দন দেখে বলেছেন, তাঁর জনপ্রিয়তা চূড়ান্তে পৌঁচেছে, ১৯২১ সালকেও ছাড়িয়ে গেছে। তিনি অন্যত্র বলেছেন, "আমি তাঁর সঙ্গে কয়েকদিন ভ্রমণ করেছিলাম। পূর্বে কখনো দেখা যায় নি এত মানুষ তাঁকে সর্বত্র অভিনন্দিত করেছে। কোনো নেতাকে আর কখনো এমন স্বতঃস্ফূর্ত সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে কি না সন্দেহ। জনসাধারণের সামনে রাজনৈতিক নেতারূপে শুধু নন, রাজনৈতিক [illegible] রূপেও বর্তমান ছিলেন।

আর একটি বিচারভ্রান্তি? কিংবা এই সিদ্ধান্তের পিছনে অপর কোনো মতলব ছিল? প্রশ্ন কথ্যটি গ্রহণ করা অসম্ভব। যথার্থ ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন এটি একটি সমূহ ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত। শখানেক লোকের মধ্যে তিনি একেবারে একলা। চতুর্দিকে যত রাজ্যের খোসামুদে আপনি মোড়লের দল—তারা সংঘবদ্ধ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে রুখে আছে, সেখানে যে তিনি অতীব জলে পড়বেন, সন্দেহ কি? তদুপরি প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাঁকে সমর্থন করারও কেউ নেই সেখানে। কিন্তু উপায়ও নেই। মহাত্মার অন্ধ ভক্তেরা তাঁকে কোনোপ্রকার সমালোচনার অধিকার বর্জন করে বসে আছেন, অপরদিকে যাঁরা তাঁর নিরেট সমর্থক নন, তাঁদের চরিত্রশক্তি, বিবেচনাবুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা যতই থাক না কেন তাঁরা মহাত্মার উপর কোনোই প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ নন।"

দ্বিতীয়ত মহাত্মা বিলাত যাবার আগে ভারতবর্ষে বিশেষভাবে মুসলমান-তোষণ শুরু করলেন। তার ফলে কংগ্রেসের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের আপোষের আগ্রহ দেখে যে সব প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান নেতা ঝিমিয়ে ছিল এবার তারা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনাকালে গান্ধীজী মুসলমানদের পৃথক নির্বাচন স্বীকারের প্রশ্ন পর্যন্ত তুললেন। সুভাষচন্দ্র প্রতিবাদ করলেন। মহাত্মার আসল চৈতন্য অবশ্য হল জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের তীব্র প্রতিবাদে।

একসময় মহাত্মা উদারভাবেই আর একটি ব্যাপারে রাজী হলেন, যার ক্ষতিকর ফল পরে দেখা গিয়েছিল। পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য যে দাবি তিনি জানিয়েছিলেন আরউইনের অনুরোধে পরে তা প্রত্যাহার করে নেন। অথচ চাপ দিলে তখন প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিতে পারতেন। এ বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের কথা—

"যাঁরা ধারণার লোকেরা রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের উপযোগী হতে পারেন না। নাছোড় হয়ে থাকা কিংবা সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে বসে থাকা—মহাত্মার ক্ষেত্রে এই দুই বিকল্প। তদুপরি তিনি ব্যক্তিগত আবেদনে বড় বেশি ধরা দেন, যাঁর এই ধরনের মেজাজ, তাঁর পক্ষে রাজনৈতিক দরকষাকষিতে [illegible] থেকে বেশি কিছু আদায় করা সম্ভব নয়।"

অথচ পুলিশী অত্যাচারের তদন্তের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল—যদি ভবিষ্যতে অত্যাচার বন্ধ করতে হয়। সাধারণ সত্যাগ্রহীদের উপরে কি জাতীয় অত্যাচার করা হয়েছিল তা বোঝা যাবে যদি কেউ কলকাতার মেয়র সুভাষচন্দ্র, বা পণ্ডিত মোতিলালের স্ত্রী ও জওহরলালের মাতা স্বরূপরাণীর মত বিখ্যাত জনদের উপর পুলিশের নির্মম প্রহারের কথা স্মরণ করেন।

এইকালে গান্ধীজীর আর একটি আচরণে সুভাষচন্দ্র দুঃখের হাসি গোপন করেছেন। বিপ্লবী ভগৎ সিংয়ের ফাঁসী হয়ে গিয়েছিল। ভগৎ সিংয়ের বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের প্রশংসা করে করাচী কংগ্রেসে প্রস্তাব নেওয়া হল, অবশ্য হিংসাত্মক কাজের বিরুদ্ধে যথারীতি নিন্দাবাণী ছিলই। সুভাষচন্দ্র বিদ্রূপ করে বলেছেন, "দেখা যাচ্ছে, এ ব্যাপারে গান্ধীজী তাঁর বিবেককে কিছুটা শিথিল স্থাপক করেছিলেন।" এমন বলার কারণ, বিপ্লবী গোপীনাথ সাহার ফাঁসী সম্বন্ধে অনুরূপ প্রস্তাব যখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন গ্রহণ করেছিল তখন মহাত্মা কঠোর আপত্তি জানিয়েছিলেন এবং যতীন দাসের (যিনি ভগৎ সিংয়ের সহযোগী) মৃত্যুতে যখন সমস্ত ভারতবর্ষ মথিত, রবীন্দ্রনাথ বেদনায় নিদ্রাহীন, তখনো মহাত্মা একটি কথা উচ্চারণ করেন নি। সুভাষচন্দ্র তাঁর বাণী চেয়ে টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম করেছিলেন। দৈনন্দিন রাজনীতি, আহার্য, স্বাস্থ্য প্রভৃতির আলোচনায় পূর্ণ ইয়ং ইণ্ডিয়ার পৃষ্ঠায়—যতীন দাসের জন্য একটুখানিও স্থান মেলে নি। মেলে নি যে তার জন্য, কারণ মহাত্মা জানিয়ে দিলেন তাঁকে মুখ খুলতে হলে 'অরুচিকর কিছু বলতে বাধ্য হতেন।'

ভগৎ সিং-এর ফাঁসী হবে না মনেই সকলে ভেবেছিল। গান্ধীজী এ-ব্যাপারে আরউইনের সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন কিন্তু ফাঁসী হয়েছিল। ভগৎ সিং-এর প্রশ্ন নিয়ে গান্ধীজী আরউইনের সঙ্গে তাঁর চুক্তি ভেঙে দিতে চান নি।

ভগৎ সিং-এর ফাঁসীতে কঠিন বেদনার স্রোত বয়ে গিয়েছিল দেশে। সেই আবেগপূর্ণ কালে মুখে ভগৎ সিং-এর বীরত্বের প্রশংসা করে প্রস্তাব না নিয়ে উপায় ছিল না ওয়ার্কিং কমিটির পক্ষে।

কংগ্রেস অধিবেশনের কাছেই করাচীতে নওজোয়ান ভারতসভার অধিবেশন হয়। [illegible] সুভাষচন্দ্র গান্ধী-আরউইন প্যাক্টের বিরুদ্ধে যে-সমালোচনা করেন, তা তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। এই সমালোচনায় 'ফেডারেশন' ব্যাপারটির ক্ষতিকরতার দিকটা বড় করে দেখানো হয়। আমরা পরে দেখব, ১৯৩৮-৪০ সালে এই ফেডারেশন প্রশ্ন সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে যাবে।

১৯৩১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর গান্ধীজী ফ্রান্সের মাটিতে পদার্পণ করলেন। লণ্ডন গেলেন তার পরদিন। 'কটিমাত্র বস্ত্র, পায়ে চটি, প্রচণ্ড ঠাণ্ডার বিরুদ্ধে গায়ে একটিমাত্র শাল'—মহাত্মার এই মূর্তি। এই বেশে ইউরোপে যাওয়া উচিত কি না সে বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের সন্দেহ ছিল। গান্ধীজী সাংবাদিকদের হেসে বললেন, 'আমি এখানে একটি বিশেষ ও মহান উদ্দেশ্যে এসেছি, তোমরা যাকে আমার কটিমাত্র বস্ত্র বলছ তা আমার প্রভু, ভারতের জনগণের পোশাক।' সুভাষচন্দ্র তখন গর্ববোধ করলেন। বলেছেন শ্রদ্ধার সঙ্গে, "তাঁর দেশবাসী আজ গর্ব অনুভব করে যে তিনি তাঁর 'প্রভুদের' পোশাক ধরে রেখেছিলেন এবং একই পোশাকে বাকিংহাম প্রাসাদের পার্টিতেও গিয়েছিলেন।"

বিলেতে গান্ধীজী প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছিলেন। মাত্র দু' ঘণ্টা ঘুমিয়েছেন, বেড়িয়েছেন, লিখছেন, দিয়েছেন নানা মানুষের কাছে দিনভর কর্ম এবং বাণীর চিন্তা তিনি দেশকে দিয়েছিলেন। তাঁর দেশবাসী তার জন্য তাঁকে নমস্কার করে।

সুভাষচন্দ্রও নমস্কার করেছেন। তারপর বলেছেন, কিন্তু সকলি বিফলে গেল। যাবেই—সেকথা বহু জনের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র তাঁকে আগেই জানিয়েছিলেন। গান্ধী আরউইন প্যাক্টের আড়ালে আত্মরক্ষা করে সরকার শক্তি সঞ্চয় করেছিল: তাদের মতলব পাকে-প্রকারে প্যাক্টকে ব্যর্থ করে দিতে হবে, স্বাধীনতার মূল প্রশ্নে পাশ কাটিয়ে নানা গৌণ প্রশ্নে গান্ধীজীকে ব্যস্ত রাখা হবে। এই সংবাদ বিশ্বস্তসূত্রে জানবার পরে, সুভাষচন্দ্র গেলেন গান্ধীজীকে সতর্ক করতে। গান্ধীজী আশ্বাস দিয়ে বললেন, ভয় নেই, মূল প্রশ্নের মীমাংসাই আদায় করবার চেষ্টা করব আমি।

সে চেষ্টা গান্ধীজী করেছিলেন, কিন্তু সফল হতে পারেন নি। সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মধ্যে তাঁকে টেনে নামানো হয়েছিল। [illegible]

যেহেতু তিনি সংখ্যায় এক, একের মর্যাদাই তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।

গান্ধীজী একা লড়াই করেছিলেন, উদ্দীপ্ত ভাষণ দিয়েছিলেন, আক্ষেপ করেছিলেন করুণভাবে, তারপর সংক্ষিপ্ত ইউরোপ ভ্রমণ সাঙ্গ করে দেশে ফিরে এসেছিলেন শূন্য হাতে—বামপন্থীদের আশংকাকে শোচনীয়ভাবে সত্য প্রমাণ করে।

এতদ্‌সত্ত্বেও ইংলণ্ডে গান্ধীজীর তেজোদ্দীপ্ত কথাগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কংগ্রেস কর্তৃক সমান্তরাল সরকার স্থাপন চেষ্টা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—

"সরকার দোষ দিয়ে বলেছে, আমরা হঠকারিতার সঙ্গে সমান্তরাল সরকার গঠনের চেষ্টা করেছি, সেই অভিযোগ আমি নিজের মত করে স্বীকার করে নেব। আমরা কোনো সমান্তরাল সরকার যদিও স্থাপন করি নি কিন্তু নিশ্চয় আশা রাখি একদিন না একদিন বর্তমান সরকার আসনচ্যুত হবে এবং কালক্রমে বিবর্তনের পথে আমরা স…র ভার গ্রহণ করব।"

সেনাবাহিনীর জাতীয়করণে বৃটিশ বিরোধিতা প্রসঙ্গে—

বৃটিশ জাতি মনে করে এ জিনিষ ঘটতে শতাব্দী কেটে যাবে। এ যদি ঠিক হয় তাহলে সেই গোটা শতাব্দী ধরে কংগ্রেস অরণ্যে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াবে এবং কংগ্রেসকে সেই অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতেই হবে। যদি দরকার হয়, যদি এ ঈশ্বরের বিধান হয়, যেতে হবে গুলিবর্ষণের ভিতর দিয়ে।"

'বৃটিশ বাণিজ্যস্বার্থের সংরক্ষণের প্রতিবাদ করে তিনি পূর্ণ অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব দাবি করলেন এবং বিশেষ জোরের সঙ্গে বললেন—স্বাধীনতা চাই—

'গোলাপকে যে নামেই ডাক না কেন তার সুগন্ধ সমানই থাকবে—আমি স্বাধীনতার আসল গোলাপ চাইছি কোন কৃত্রিম জিনিষ নয়।"

তারপর যখন তিনি দেখলেন তাঁর আবেদন অরণ্যে রোদন, তখন জ্বলন্ত ভাষায় বললেন—

"তোমরা কি দেখতে পাচ্ছনা নিজেদের রক্ত দিয়ে বিপ্লবীরা কি লিখে গিয়েছে দেওয়ালে?"

কিন্তু ইংরেজেরা তা দেখতে পায় নি। কিংবা দেখতে পেলেও তাদের লেখা মুছে দেবার মত আলকাতরার যোগাড়

আছে ভিতর। গান্ধীজীকে তাই বিলাপ করতে হল ইংলণ্ডে বসে। তিনি দেখলেন, রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্সে ভারতের ভাগ্য নিরূপণে যেসব প্রতিনিধি এসেছে, তাদের নির্বাচন করছে আর কেউ নয় ভারতের পরাধীনতার জন্য যারা দায়ী তারাই। সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন মীমাংসার নিজের অক্ষমতার জন্য 'গভীর

দুঃখ এবং নিদারুণ অপমানকে' স্বীকার করে তিনি প্রতিনিধি নির্বাচন পদ্ধতির অযৌক্তিকতার কথাই বললেন। কংগ্রেসকে সকলের সঙ্গে একাসনে বসানোর সম্বন্ধে বললেন—'অন্য সকলে আংশিক স্বার্থের পক্ষে এসেছে, কংগ্রেস এসেছে সমগ্র ভারতের পক্ষে, যৌথ স্বার্থের জন্য, অথচ এখানে কংগ্রেসকে অন্য সকলের

সঙ্গে একাসনে বসানো হয়েছে।...তোমরা কংগ্রেসকে ডেকেছ কিন্তু বিশ্বাস কর না তাকে।" ভোটের বেলায় কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি গান্ধীজীর ভোট যে একটিই, একথা স্বীকার করতে হল তাঁকে, এবং প্রায় ভেঙে পড়ে বললেন—

"যতক্ষণ প্রয়োজন হবে আমি এখানে থাকব, কারণ আমি আর সত্যাগ্রহ জাগিয়ে তুলতে চাই না। দিল্লী চুক্তির যুদ্ধবিরতিকে আমি স্থায়ী ব্যাপারে রূপান্তরিত করতে চাই। কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, এই বাষট্টি বছরের দুর্বল বৃদ্ধকে তোমরা একটা সুযোগ দাও। সে এবং তার প্রতিষ্ঠানকে এককোণে একটু ঠাঁই দিও।"

হতভম্ব সুভাষচন্দ্র বলেছেন, বান্দু ব্রিটিশ রাজনীতিকদের উপর এইসব প্রভাব কি ধরনের হবে? এই জনঅবীর্দেরা কি 'তাঁর মহত্ত্ব, সরলতা, নম্রতা, বিপক্ষদের সম্বন্ধে বিশেষ সহৃদয় বিবেচনাকে' তাঁর দুর্বলতার লক্ষণ বলে ধরবে না? টেবিলে সব কার্ড মেলে ধরার এই কাণ্ডটা ব্রিটিশ রাজনীতিকদের কাছে তাঁর মর্যাদা নামিয়েছিল। অর্থনীতি, আইন ইত্যাদি সম্বন্ধে বুদ্ধির অভাবের স্বীকৃতি শুনেও তারা শ্রদ্ধা করতে পারে নি এবং সহযোগিতা সম্বন্ধে তাঁর নিরন্তর নিবেদন শুনে তারা মনে করেছিল—গান্ধীর শেষ হয়ে গেছে।

আলাপ-আলোচনায় উত্যক্ত গান্ধীজী মূল প্রশ্ন—স্বাধীনতার প্রশ্ন—সমাধানের জন্য চাপ দিয়ে ব্যর্থ হলেন। ইতিমধ্যে তথাকথিত সংখ্যালঘু প্রতিনিধিরা মিলে একটি প্যাক্ট করে ফেলেছিল। এই 'মাইনরিটিজ প্যাক্টে' জড়িত হবার আগে ডাঃ আম্বেদকর গান্ধীজীর সঙ্গে আপোষে আসতে চেয়েছিলেন। তাঁর দাবি ছিল, সকল শ্রেণীর হিন্দুর যৌথ নির্বাচনের ভিত্তিতে অনুন্নতদের জন্য কিছু আসনের সংরক্ষণ। গান্ধীজী তার প্রচণ্ড বিরোধিতা করে বললেন—

"আমি পূর্বে যা বলেছি, তাই আবার বলতে চাই, কংগ্রেস সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণ বা পৃথক নির্বাচনের মধ্যে নেই।"

গান্ধীজীর কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা—যেখানে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা রয়েছে—তাকে প্রত্যাখ্যান করেন নি এবং পরবর্তীকালে এই গান্ধীজীই পুণা প্যাক্টের দ্বারা অনুন্নতদের অতিস্ফীত সংরক্ষণের প্রবর্তন করেছেন—ভিন্নভাবে ভেবেছেন সুভাষচন্দ্র।

গান্ধীজী ব্যর্থ হয়ে ফিরলেন। সে ব্যর্থতার যে সব কারণ বলা হয়েছে তা' ছাড়াও আরও অনেক কারণ আছে। একটি কারণকে সুভাষচন্দ্র খুব বড় করে তুলে ধরেছেন। গান্ধীজী এক দেহে দুই ভূমিকা নিতে চেয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র ধারালো ভাবে লিখছেন—

"ইংলণ্ডে অবস্থানকালে একই দেহে দুটি ভূমিকায় তাঁকে অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল—রাজনৈতিক নেতার ভূমিকা এবং জগৎগুরুর ভূমিকা। কখনো কখনো তিনি নিজেকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে যেন সরিয়ে দিতেন; তিনি ভুলে যেতেন নিজের দেশের জন্য আলোচনায় তিনি এসেছেন; তখন তিনি একটি নূতন আদর্শ—অহিংসা ও বিশ্বশান্তির আদর্শের প্রচারক-গুরুর আসন নিতেন। তাই এই দ্বিতীয় ভূমিকার জন্য তাঁকে এমন অনেক লোকের সঙ্গে বহু সময় ব্যয় করতে হত, যাঁরা তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সহায়ক নন কোনোমতেই। তাঁর স্বদলের পরামর্শদাতাদের অনুপস্থিতিতে ব্রিটিশ অনুরাগীরা সেই স্থান পূরণ করেছিল। ইউরোপে পদার্পণ করা থেকে ইউরোপ ত্যাগ করা পর্যন্ত তাঁরা তাঁকে ঘিরে রেখেছিল। বিশ্বপ্রেম এবং ন্যায়পরায়ণতা দেখাবার জন্য তিনি একজন ইংরেজ মহিলার আতিথ্য নিয়েছিলেন। মহাত্মার বিপরীত দিকে রয়েছে ১৯২১ সালে লণ্ডনে আইরিশ সিনফিন প্রতিনিধিদলের আচরণ ও পৃথক জীবনযাত্রা। তারা সম্পূর্ণ নিজেদের মধ্যে থাকত এবং ইংরেজদের সঙ্গে সকল সামাজিক সম্পর্ক এড়িয়ে চলত, যদিও তার মধ্যে তাঁদের টেনে আনবার চেষ্টা করা হয়েছিল। তাদের এই বিচ্ছিন্নতা এবং স্বাতন্ত্র্য মহাত্মা গান্ধীর বন্ধুভাবের চেয়ে অনেক বেশী প্রভাবিত করেছিল ব্রিটিশ রাজনীতিকদের। কিন্তু মহাত্মা যেহেতু বিশ্বশিক্ষক—তাঁর রীতিই আলাদা।"

ব্যর্থ মহাত্মা যখন ফিরে এলেন, তখন ভারতে তাঁর প্রতিরোধের আয়োজন সম্পূর্ণ। 'শীর্ণ দীর্ঘ খৃস্টান' আরউইন আর বড়লাট নন, এখন বড়লাট জবরদস্ত উইলিংডন। গান্ধীজীকে ইংলণ্ডে দেখে ব্রিটিশ রক্ষণশীলেরা ভেবে ছিল—'এই দুর্বল, খাটোকাপড়-পরা মানুষটি কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাছে এমন শক্তিশালী যে, তার কাছে নতজানু হতে হবে? বিপদ হবার যোগ্য একজন মানুষের দ্বারা ভারত এতদিন শাসিত হয়েছে বলেই এত গোলমাল। অতঃপর একজন করে কড়া লোক ইণ্ডিয়া অফিস ও দিল্লীতে বসিয়ে দিলেই সব মিটে যাবে।'

কড়া লোক দু' জায়গাতেই বসল। গান্ধী ফিরে এলেন তাঁদের শক্ত চোয়াল দাঁতালো মুখের মধ্যে।

গান্ধীজী আবার অসহযোগের ডাক দিলেন। ডাক দেবার ইচ্ছা ছিল না—'বারুদ তিনি শুকনো রাখেন নি'—কিন্তু উপায়ও ছিল না—দেশে বামপন্থীরা ইতিমধ্যে শক্তিবৃদ্ধি করেছে ধারাবাহিক চেষ্টায়, এবং ভাইসরয় অভদ্রভাবে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বারবার।

গান্ধীজী বড়লাটের সাক্ষাৎকার চেয়েছিলেন, তিনি রাজী হন নি।

রাজী হবার কোন ইচ্ছা সরকারের ছিল না। গান্ধী-আরউইন প্যাক্টকে আবর্জনার ঝুড়িতে ফেলে দিয়ে সরকার প্রস্তুত হয়ে নিয়েছে; প্রস্তুত হয়েছে 'রক্ষণশীল' সরকার (ইংলণ্ডে শ্রমিক সরকার বদলে গেছে) দিল্লী প্যাক্টে যেটুকু অসম্মান হয়েছিল, সর্বশক্তিমান ব্রিটিশ প্রভুরা তার পূর্ণ প্রতিশোধের জন্য এখন তৈরি। গান্ধীজী সংগ্রামে পুরাতন পদ্ধতি ব্যবহার করলেন, সরকারও বর্বরতার অতি পুরাতন অস্ত্রই প্রয়োগ করল। 'বীরের রক্তস্রোত ও মাতার অশ্রুধারায়' বৃহৎ ভারতবর্ষ কর্দমাক্ত হয়ে উঠল।

এমন সময়ে ১৯৩২ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর একটি মারাত্মক ঘোষণা শোনা গেল—মহাত্মা গান্ধী আমরণ অনশন করবেন। কারণ? ম্যাকডোনাল্ড অ্যাওয়ার্ডে অনুন্নতদের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার প্রতিকার চান তিনি।

শুনে সমস্ত ভারতবর্ষ স্তব্ধ হয়ে গেল।

গান্ধীজীর এই অনশন ও অনশনের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। বিষয়টি কিছু পরিষ্কার করে বলা দরকার। সুতরাং পরবর্তী পরিচ্ছেদে যাওয়াই ভাল। সুভাষচন্দ্রের গান্ধী-বিচারের এই অধ্যায়টি এমনিতে বিশেষ দীর্ঘ হয়েছে। দীর্ঘ করতে বাধ্য হয়েছি কারণ বিপ্লবী কংগ্রেসের পটভূমিকা বুঝতে এই বিবরণের প্রয়োজন আছে। সুভাষচন্দ্রের গান্ধী-বিচারের পরবর্তী অধ্যায়ে পাওয়া যাবে।

[এর পরবর্তী অধ্যায় 'অনশন থেকে অনশন এবং রবীন্দ্রনাথ।' ভুল করে সেটি আগেই দেওয়া হয়েছে। এজন্য লেখক সহৃদয় পাঠকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।]

[ক্রমশঃ]

টং টং করে দুটো বাজার সময় সংকেত হল গির্জার পেটা ঘড়িতে। রাত দুটো।

এখনো ফিরলো না তপু!

বৃষ্টির ছাটের একটা কণা এসে ছিটকে লাগলো সুরমার গালে। চমকে উঠলো সুরমা।

সেদিনও নিদ্রাহীন রাতের প্রহর গুণেছিল সুরমা বিছানায় শুয়ে শুয়ে। সেই রাতের প্রতিটা প্রহরের সাক্ষী ঐ ঘড়ি—কালের নির্বাক, অতন্দ্র প্রহরী। আজো দেখে যাচ্ছে সব, ধরে রাখছে কালের ইতিহাস শুধুমাত্র ওর কাঁটা দুটোর মধ্যে।

মুহূর্তে সুরমা যেন ফিরে গেল তার ফেলে-আসা দিনগুলোর মাঝে। বহু রাতই তাকে জেগে কাটাতে হয়েছে। ঠিক এইভাবেই জানলার গরাদ ধরে অপেক্ষা করতে হয়েছে বিজনের জন্যে। কতদিনের কত স্মৃতিই জমা আছে তার স্মৃতির মণিকোঠায়। কত বেদনা-বিধুর রাতের ইতিহাস লেখা আছে তার জীবন ইতিহাসের পাতায় পাতায়। শুধুই কি বেদনা? আর কি কিছু নেই? দুঃখ-বেদনার ফাঁকে ফাঁকে আছে বৈকি কিছু কিছু সুখের পরশ।

সেদিনও সমস্ত পাড়াটা ছিল এমনিই নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে শুধু রাস্তার বেওয়ারিশ কুকুরগুলোর ঘেউ ঘেউ চীৎকার শোনা যাচ্ছিল। পুরোনোদিনের বিশাল খাটের ওপর নরম বালিশে বিছানায় শুয়ে সুরমা আর বিজন। বিজন গভীর ঘুমে অচেতন। তার নাক ডাকার শব্দ ঘরের স্তব্ধতার ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল।

সুরমার চোখে ঘুম নেই। গির্জার পেটা ঘড়িটা মাঝে মাঝে বেজে উঠে ওকে রাতের গভীরতার সংকেত দিচ্ছে। যেন বলছে, তোমার ব্যথায় ব্যথী হয়ে আমিও জেগে আছি। রোজই থাকি জেগে, তুমি জানতে পাও না। আবহমানকাল ধরে জেগে আছি। জেগে জেগে দেখি—কত মিলন, কত বিরহ,—কত নবজন্ম, কত মৃত্যু, অপমৃত্যু,—মরার জন্যে কত তোড়জোড়। সব দেখি আমি। আমার চেয়ে বড় সাক্ষী তুমি আর পাবে না। আমি তোমার নিত্যদিনের সহচরী।

চুপ করে শুয়ে আছে সুরমা। আকাশ-পাতাল চিন্তার স্রোত তার মাথার ভেতর দিয়ে তরতর করে বয়ে যাচ্ছে।

বাপ-মায়ের একমাত্র মেয়ে। বেশ আদরেই মানুষ। বাবা ছিলেন বিজনের অফিসেরই একটা ডিপার্টমেণ্টের ইনচার্জ। মাইনে পেতেন মোটা, খরচ করতেনও মোটা রকমের। ডাক্তারী পড়ার ইচ্ছে ছিল সুরমার, হয় নি তার মায়ের অনিচ্ছার জন্যে।

বাবার ডিপার্টমেণ্টেই কাজ করতো বিজন। সুরমার বাবা ভালোও বাসতেন বিজনকে যথেষ্ট, তাই মাঝে-মধ্যে বিজন আসতো সুরমাদের বাড়িতে। মা'র চোখ পড়ে বিজনের দিকে। সে নিজেও কি কিছুটা আকৃষ্ট হয়েছিল? হয়েছিল বৈকি।

ঘুমের ঘোরে বিজনের একটা হাত এসে পড়লো সুরমার বুকের ওপর। চমকে ওঠে সুরমা। বাধা পড়ে চিন্তার স্রোতে। বিজনের হাতটাকে দু হাত দিয়ে চেপে ধরে নিজের বুকের ওপর। জানলা দিয়ে চাঁদের আলোর একটা ফালি এসে পড়েছে বিছানায়। তারই আবছা আলোয় সুরমা চেয়ে দ্যাখে বিজনের মুখের দিকে। প্রশান্ত সে মুখ, শুধু কিসের যেন একটা ক্লান্তির ছাপ রয়েছে মুখটায়। একটা অব্যক্ত বেদনার রেখা যেন খুঁজলে দেখতে পাওয়া যায় মুখটাতে।

হঠাৎ সুরমার মনে হয় সে কি আর আগের মত সেরকম ভালোবাসে না বিজনকে? ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সুরমা। মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে বিজনের মুখটাকে দ্যাখে ভালো করে। না, সেই একই মুখ তো! তবে? আগে বিজন মদ খেত না। সুরমার বাবা মারা যাবার পর থেকে মদ খাওয়া ধরেছে। তাই কি সুরমা আজকাল তাকে ঘৃণা করে?—না না, ঘৃণা তো সে করে না। সে যে একান্তভাবে পেতে চায় বিজনকে।

—আর বিজন? সুরমাকে নিয়ে কি তার জীবনে একঘেয়েমি এসে গেছে? তাই কি সে নেশার আবরণে সেই ফাঁকটুকু পূরণ করে নিতে চায়? তপুর জন্মদিনেও

নেশা করে বাড়ি ঢুকলো! এতটুকু বাধলো না! একমাত্র ছেলে তাদের, কোন মূল্য এখন নেই ওর কাছে! মনে পড়ে গেল কয়েকটা বছর আগেকার কথা। সুরমাকে খুশি করার কি আপ্রাণ চেষ্টা ছিল বিজনের। বাড়ির বার হতে চাই তো না বিজন। সন্ধ্যের পর বাড়ি থেকে বার করার জন্যে কত সাধ্য-সাধনা করতে হ'ত বন্ধুদের। সেই মানুষের এ কি রূপান্তর! রাত দশটা-এগারোটার আগে বাড়ি ফিরতেই চায় না। যখন বাড়ি ফেরে তখন কথা বলার মত অবস্থা থাকে না।

চোখ মুছে শুয়ে পড়ে সুরমা। চেষ্টা করে ঘুমোবার। কিছুতেই আসতে চায় না ঘুম। ঘুম যেন তাকে ছেড়ে চলে গ্যাছে। আবার উঠে বসে সুরমা। আবার ভাবে বিজনকে। তবে কি তার নিজেরই কিছু ত্রুটি হচ্ছে, যার জন্যে দিন-দিন পালটে যাচ্ছে বিজন? সে কি আর আগের মত নেই?—যেদিন ওকে দেখে চোখ ফেরাতে পারে নি বিজন। এক কথাতেই বিয়ে করতে রাজী হয়ে গিয়েছিল। সে কি আর পারছে না আকৃষ্ট করতে বিজনকে? পারছে না তাকে বেঁধে রাখতে? সে তো মনে-প্রাণে ভালোবাসে বিজনকে। তার বয়েস হচ্ছে, রূপের নদীতে ভাটার টান পড়েছে, তা সত্যি। কিন্তু তার জন্য সে কি করতে পারে?

হঠাৎ সুরমার চিন্তার স্রোতটা বিপরীত দিকে বইতে থাকে। সে কি আর আগের মত প্রতিটা মুহূর্ত সঙ্গ দিতে পারে না বিজনকে? তাই কি অন্য সঙ্গীর প্রয়োজন এসেছে তার জীবনে? হ্যাঁ, অতটা সময় আর সে দিতে পারে না, পারে না প্রতিটি মুহূর্তে বিজনকে খুশির রঙে রাঙিয়ে দিতে। অনেকটা সময় তার কেড়ে নিয়েছে তপু। বিজনের হিসেবের ভাগ থেকে তাই খানিকটা ঘাটতি পড়েছে। তাই কি অব্যক্ত ঈর্ষার বহিঃপ্রকাশ তার ঐ সুরার ওপর আসক্তি? কিন্তু তপু তো ওরই অংশ। ওরই সৃষ্টি তপু। ঘুমাতে গেলে ওরই ছায়া। তবে?

কিছুতেই ঘুম আসে না সুরমার। মাথাটা বেশ গরম মনে হয়। ঘাড়ে মাথায় জল দেবার জন্যে খাট থেকে নেমে পড়ে সুরমা। দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কিসের যেন একটা শব্দ হল পাশের ঘরে। ওটা তপুর ঘর। ঠিক তাদের ঘরের পাশেই।

খুট্ করে একটা শব্দ হল কিসের। জানলার গরাদ থেকে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে সুরমা। না, কিছু নয়। বিজন পাশ ফিরলো, তাই বোধ হয় খাটের ছত্রির শব্দ হল। দুটো ঘরের মাঝখানের দরজাটার দিকে চেয়ে দেখলে সুরমা। দরজাটা বন্ধ। তপু যখন ছোট ছিল, শুতো এই ঘরটায়। রাতে তখন দরজাটা খোলাই থাকতো। আগে অবশ্য বন্ধ থাকতো। শোবার আগে বন্ধ করে দিত বিজন। একদিন ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল তপু, সেই থেকেই ওটা খুলে রাখতো সুরমা। কিছুতেই বন্ধ করতে দিত না বিজনকে।

সুরমার চিন্তাটা আবার চলে গেল অতীতের ফেলে-আসা সেই রাতে। অনেক রাতই তার জীবনের সঙ্গে পাকে পাকে জড়িয়ে আছে। কিন্তু সে রাতটার কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারে না। অন্য সব রাতের ইতিহাসকে ম্লান করে দিয়ে সে যেন সবার আগে এগিয়ে আসে তার মনের পাতায়।

তপুর ঘরে ঢুকে আলোটা জ্বালে সুরমা। ঘুমোচ্ছে তপু। বোধ হয় পাশ ফিরতে গিয়ে পাশের বালিশটা মাটিতে পড়ে গ্যাছে, তারই শব্দ। সুরমা বালিশটা উঠিয়ে রাখে তপুর পাশে। নিজেও বসে বিছানার এক পাশে। চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে তপু। হাত দুটো পড়ে রয়েছে বুকের ওপর। ঘড়িটা বাঁধা রয়েছে বাঁ হাতের কব্জিতে। জন্মদিনে তার বাবা-মা'র উপহার।

দ্বিতীয় প্রহর রাতের শেষে উন্মত্ত অবস্থায় বাড়ি ঢুকে বিজন বাক্সসুদ্ধ ঘড়িটাকে বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল—ওটা তপুর হাতে পরিয়ে দিয়ে এস। কালকে জন্মদিনে ওর বাপ-মায়ের উপহার।

সুরমা অপলক দৃষ্টিতে তপুর মুখের পানে চেয়ে থাকে। তপু তাদের একমাত্র সন্তান। তপুর আগে আর একটা ছেলে হয়েছিল, কিন্তু আজ আর সে বেঁচে নেই। চার বছর বয়েসে জলে ডুবে মারা যায়। মৃত পুত্রের শোকে সুরমার চোখ দুটো এতদিন পরেও আবার জলে ভরে গেল।

—টপ করে এক ফোঁটা জল পড়ে তার হাতের ওপর। তাড়াতাড়ি নিজের আঁচল দিয়ে চোখ মুছে নেয় সুরমা। সেই সময় পাশ ফেরে তপু, তার বাঁ হাতটা এসে পড়ে সুরমার কোলের ওপর। ঘুমন্ত তপুর হাতটাকে তুলে নিয়ে সুরমা নিজের গালের ওপর চেপে ধরে। নিটোল মোমের মত হাত। হাতটাকে খানিকক্ষণ আপন খেয়ালে নাড়াচাড়া করে নামিয়ে রাখে সুরমা। তারপর এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তপুর মুখের দিকে। ঠিক সুরমার মত দেখতে হয়েছে শুধু চোখ দুটো হয়েছে বাপের মত। তপুর বালিশটা ঠিক করে আলোটা নিভিয়ে দেয় সুরমা। সুরমার মনটা তখন অনেক শান্ত। মাথার সে গরম ভাবটা অনেক কমেছে। হঠাৎ তার মনে হয় সবই তো ঠিক আছে।—তবে? সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ। শুধু ঘড়িটা টিক্ টিক্ করে তখন তার অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়।

......বাধা পড়লো সুরমার চিন্তার স্রোতে। একটা রিক্সা টুং টুং করতে করতে চলেছে রাস্তা দিয়ে। প্রায় অচেতন হয়ে একটা মাতাল রিক্সার ওপর বসে আছে। বৃষ্টির ঝাটে ভিজে যাচ্ছে সর্বাঙ্গ। হুঁস নেই তার। মনের আনন্দে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে।

সুরমার মনে পড়লো অতীতের বিজনকে। মদিরা আর সুরমাকে পাশাপাশি রেখে চলতে চেয়েছিল বিজন। হল না।—নিয়তি বাধ সেধে পঙ্গু করে দিলে বিজনকে। আর সুরমা? তপু আর বিজন, দুজনকে দু'পাশে রেখে চলতে চেয়েছিল। পারলে না। বিজনের জীবনধারার মোড় যখন খানিকটা ফিরলো, তপুর জীবনের মোড় তখন ঘুরে গেল সম্পূর্ণ বিপরীতে।

সে রাতটা তার কাছে বিভীষিকার মত এসেছিল, সত্যি। কিন্তু তার পরের দিনটার সোনালি ইংগিত এখনো তার মনে ছবির মত আঁকা আছে।

বরাবরই বিজনের একটু দেরি করে ওঠা অভ্যেস। সেদিন সকালে যখন তার ঘুম ভাঙলো তখন বেলা আটটা বাজে। তোয়ালেটা কাঁধে ফেলে বাথরুমে যাবার জন্যে পা বাড়ালো বিজন। দুটো ঘরের মাঝখানের দরজাটার দিকে চোখ পড়লো দরজাটা এখন বন্ধ। স্নান সেরে ঘরে এসে একটা লুঙ্গি পরে বসে পড়ে চেয়ারে। শরীরটা ঠাণ্ডা হওয়ায় একটু তন্দ্রা ভাব এসেছিল। আমেজটা কাটলো সুরমার ডাকে—কি গো, আজ আপিস যাবে না?

—আপিস? শরীরটা আজ বিশেষ ভাল লাগছে না।— জবাবে বলে বিজন।

—তবে আপিস আজ নাই গেলে। একটা দিন বিশ্রাম কর।- বলে যাবার জন্যে পা বাড়ায় সুরমা।

শোন না, যাচ্ছ কোথায় -বলে সুরমার আঁচলটা ধরে ফেলে বিজন।

—অনেক কাজ বাকি পড়ে রয়েছে যে।

—তবে তুমি কাজ করগে যাও, আমি আপিস চলে যাই।

কথাটা বলেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বিজন।

—না না, আমি যাব না, বস তুমি, —বলে সুরমা বিজনের হাতটা চেপে ধরে।

বিজন আবার বসে পড়ে চেয়ারে। সুরমাকে নিজের চেয়ারের এক পাশে বসিয়ে একহাত দিয়ে তুলে ধরে সুরমার চিবুকটা। অনেকক্ষণ সেই মুখটার পানে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বিজনের বুক কাঁপিয়ে বেরিয়ে আসে একটা দীর্ঘশ্বাস।

সুরমা জিজ্ঞেস করে—কী হল?

—কিছু না,—বলে বিজন সুরমার মাথাটা নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে গভীর আবেগে।

সুরমা বিজনের বুক থেকে মাথা না সরিয়েই চুপি চুপি বলে—পাশের ঘরে তপু রয়েছে যে।

—থাক, দরজা বন্ধ আছে,—বলে বিজন সুরমার বাঁ হাতটা নিজের গালের ওপর চেপে ধরে।

অনেকদিন পর স্বামীর ভালবাসার স্পর্শ পেয়ে বেশ খানিকটা চঞ্চল হয়ে ওঠে সুরমা। স্বামীর বাহুবেষ্টনী থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে পড়ে বলে—যাই, তোমার চা নিয়ে আসি।

—এস, আজ থেকে কিন্তু রাত্রেও মাঝের এই দরজাটা বন্ধ থাকবে,—সুরমার মুখের পানে তাকায় বিজন।

প্রথমে ফিক করে হেসে ফেলে সুরমা। পরে বলে ওঠে—কিন্তু তপু যে ভয় পায়।

—ঘরে একটা কম পাওয়ারের নীল আলোর ব্যবস্থা করে দেবো, তাহলে আর ভয় পাবে না।—তা ছাড়া তপু আর সেই ছোট্টটি নেই যে রোজ রোজ ভয় পাবে,—বলে বিজন চেয়ার থেকে উঠে শুয়ে পড়ে বিছানায়।

সারা দুপুর শুয়েছিল সুরমা বিজনের খাটটিতে। সুরমা যেন ফিরে গিয়েছিল আগে অনেক আগে। যে আদর সোহাগ পেয়েছিল বিজনের কাছ থেকে বিয়ের পরের ক'টা বছর- সেই দিনগুলোতে। পাশের ঘরে পড়াতে পড়াতে তপু এসেছিল কয়েকবার মা'র আদরের আশায়। দরজা বন্ধ দেখে ফিরে গেছে। জানলার পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে ডেকেছিল মাকে। বিজনের [illegible] গিয়ে পড়ায় মন দেবার চেষ্টা করেছে। পরে মা'র কাছে নালিশ জানিয়েছিল- কেন মা তার কাছে আসে নি? তার কিশোর মনের কাছে অন্তত জিজ্ঞাসা সেদিন জানতে পেরেছিল সুরমা। সে তাড়াতাড়ি বাবার মত বড় হয়ে যাবে, তাহলে কেউ আর তাকে বকতে পারবে না। এমন প্রশ্নও তার মনে জেগেছিল যেন তার আর তার মা'র মাঝখানে আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী। বাবাটা স্বার্থপর, বাবাটা [illegible], বাবাটা যেন কি।

নিয়মের ব্যতিক্রম করে সন্ধ্যেবেলায় তপুকে নিয়ে পড়াতে বসেছিল বিজন। সুরমা আড়াল থেকে কয়েকবার এসে দেখে গেছে। না চাইতেই চা দিয়ে গ্যাছে বার-কয়েক। খানিকটা বিস্ময়, খানিকটা আনন্দ সুরমার মনে। সন্ধ্যে পার হয়ে গেল, এখনো বিজন ঘরের মধ্যে! বেশ কিছুকাল এ বাড়ির সন্ধ্যের আলো জ্বলা দ্যাখে নি বিজন।

এবার কেবলই মনে হচ্ছিল, এইবার বেরোবে। এতদিনের অভ্যেস কি এত সহজে ছাড়তে পারবে। যদিও দুপুরে সুরমাকে ছুঁয়ে শপথ করেছে বিজন, তবুও সুরমা ঠিকমত বিশ্বাস করতে পারে নি। কিন্তু রাত সাড়ে ন'টার পর যখন খেতে চায় বিজন তখন সত্যি সত্যিই একটা অভাবনীয় আনন্দ অনুভব করে সুরমা। একটা বিজয়িনীর ভাব বোধ হয় মনের কোণে উঁকি দিতে থাকে।

আহারপর্ব শেষ করে বেশ খানিকটা খুশি মনেই ঘরে ঢোকে সুরমা। দুটো ঘরের মাঝখানের দরজাটা বন্ধ। চেয়ে দ্যাখে সুরমা। নিজের মনেই খানিক হাসে। বিজন পরিপূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় খাটে শুয়ে। সুরমার পানে চেয়ে হাসছে মিটিমিটি। সুরমার মনে হয়—কে জানে এ ভাবের স্থায়িত্ব কতক্ষণ! মদিরার যে মাদকতা তার আকর্ষণও তো বড় কম নয়!

আজো বেজে চলেছে ঘড়িটা। শুধু কালের জাবেদা খাতায় ক'টা বেশি দাগ টেনেছে। এগিয়ে দিয়েছে ক'টা বছর। ঘুরিয়ে দিয়েছে সময়ের চাকাটা।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়ে দিয়েছে সুরমার সংসারের চাকাটাকেও। দামাল দুরন্ত বিজন এখন আবদ্ধ তার ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে। একটা অংগ তার প্রায় পড়ে গ্যাছে। সুরমার সাহায্য ছাড়া ওঠা শক্ত হয়ে পড়ে বিজনের পক্ষে।

আপিসে কাজ করতে করতেই বুকে ব্যথা অনুভব করে বিজন। অজ্ঞান হয়ে পড়ে। কোম্পানীর ডাক্তার ছুটে এসে পরীক্ষা করে।—থ্রম্বোসিস। হাসপাতালে বিমুভ করতে হবে এখনি।

পুরো তিনটে মাস হাসপাতালে ছিল বিজন। অথর্ব পংগু হয়ে ফিরে আসে বাড়িতে। সুরমার পরিচর্যায় এখন অনেকটা ভালো বিজন। কিন্তু ওঠা হাঁটা বেশি করতে পারে না সুরমার সাহায্য ছাড়া। নির্ধারিত সময়ের আগেই বাধ্য হয়ে চাকরী থেকে অবসর নিতে হয়েছে।

তপু—এখন তপন বোস। বাবার আপিসেরই গ্রেড টু অফিসার। গ্রেড এ পাশ করার পর বিজন চেষ্টা করে দিয়েছিল ট্রেনিং অফিসার হিসেবে। এখন পার্মানেন্ট অফিসার—যদিও গ্রেড টু।

ঘরেরও পরিবর্তন হয়েছে। বিজন-সুরমার ঘরটা অধিকার করেছে তপু। বিজনকে নিয়ে সুরমা সরে এসেছে পাশের ঘরে যেখানে আগে থাকতো তপু।

বাবার মাঝ-বয়েসের অভ্যেসটা তপু বেশ কিছুকাল আগে থেকেই রপ্ত করে নিয়েছে। জানতে পেরে বুকটা কেঁপে উঠেছে সুরমার। বলতে গেলে একরকম জোর করেই বিয়ে দিয়েছে তপুর। যদি মতিগতিটা ফিরে আসে। ভাল স্ত্রী হলে হয়তো এ অভ্যেসটা চলে যেতে দেরি হবে না ওর।

তপুর বউ বীথা। বড়লোকের মেয়ে। কলেজেও পড়েছে। দেখতেও ভাল। গান বাজনাও জানে। শুধু জানে না সংসারের কাজ। বিজনের সমস্ত দায়-দায়িত্ব ছাড়াও সংসারের দায়িত্বটাও তাই বাধ্য হয়ে বহন করতে হয় সুরমাকে।

গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বিজনকে ঘুম পাড়ায় সুরমা। তারপর সেই ছোট্ট ঘরটায় জেগে বিছানায় শুয়ে থেকে কত চিন্তাই তার মাথায় খেলা করে বেড়ায়। কখনো রাত কাবার হয়ে যায়, ঘুম আসে না চোখে। জেগে জেগে গির্জার পেটা ঘড়িটার শব্দ শোনে। ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে দ্যাখে। মাঝের দরজাটা বন্ধ। ওটা আজকাল সব সময়েই বন্ধ থাকে। ঘুমন্ত বিজনের মুখের পানেও চেয়ে চেয়ে দ্যাখে। বড় বেশি রকমের ক্লান্তির ছাপ ফুটে উঠেছে মুখটায়। একটা পরনির্ভরতার বেদনা রয়েছে যেন সমস্ত মুখটাকে ঘিরে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে সুরমার বুকটাকে খালি করে।

সদর দরজার কড়াটা থেকে থেকে নড়ে ওঠে। শুয়ে শুয়েই বুঝতে পারে সুরমা, তপু এল। বীথা ঘুমোচ্ছে গভীর নিদ্রায় অচেতন। হয়তো বা জেগেই আছে ইচ্ছে করে খুলছে না দরজা। [illegible] বিজন [illegible] উপায় নেই। [illegible] শরীর [illegible] হবে।

[illegible] হয়। [illegible] একটা [illegible]। [illegible] জ্বলো।

রাত বারোটা!—অর্ধেক রাত তো শেষ হয়ে এল! এত রাত করে ফেরে ছেলেটা! নাঃ, এমনি করেই শরীরটা নষ্ট করবে তপু! ছেলের দুশ্চিন্তায় চোখের ঘুম কোথায় চলে যায় সুরমার।

খানিক পরেই পাশের ঘরে রীতার সুতীক্ষ্ণকণ্ঠ শোনা যায়—লজ্জা করে না তোমার, ছোটলোকের মত বাইরে থেকে মদ গিলে বাড়িতে আসতে! তোমার জন্যে বাবা-মা বন্ধু-বান্ধবদের কাছে মুখ দেখাতে আমার লজ্জা করে। সে কথার জবাব দেয় না তপু। নিজের মনেই জড়ানো স্বরে গান ধরে হেসে ওঠে।

খানিক পরেই নিস্তব্ধ হয়ে আসে তপুর ঘর। সুরমা বুঝতে পারে, ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে। মাঝের বন্ধ দরজাটার দিকে চেয়ে চেয়ে দ্যাখে সুরমা, আর ভাবে তার দুরদৃষ্টের কথা। এ জীবন তো চায় নি সে? তবে কেন এমন হল? কার পাপে? কিসের অভিশাপে? ভাবতে ভাবতে একসময় ভোরের দিকে ঘুম এসে সব ভাবনা-চিন্তার দায় থেকে মুক্ত করে দেয় তাকে।

রোজ রাতেই তপুর ঘরে চীৎকার চেঁচামেচি হয়। এক-একদিন অসহ্য মনে হয়। ঘুম ভেঙে যায় বিজনের। বিছানায় শুয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। সে দৃষ্টির ভাষা বুঝতে পারে সুরমা। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে সুরমা—ঘুমোবার চেষ্টা কর।

একদিন আর নিজেকে সামলাতে পারে নি সুরমা। তপুর ঘরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলে উঠেছিল সুরমা—একটু আস্তে কথা বল বউমা, পাশের ঘরে একটা অসুস্থ মানুষ শুয়ে আছে। কাঁচা ঘুম ভেঙে গেলে শরীর খারাপ হবে। আর তোকেও বলি তপু, দিন দিন কী আরম্ভ করেছিস! মাত্রা একেবারে ছাড়িয়ে যাচ্ছিস! এ কথার বিশেষ কিছু জবাব দেয় নি তপু। শুধু বলেছিল—তুমি শুয়ে পড়গে মা।

গতকাল রাত্রে চীৎকার চেঁচামেচিটা হয়েছিল মাত্রাতিরিক্ত। জিনিসপত্তর ছোঁড়ার শব্দও শুনেছিল সুরমা। একবার ওঠবার চেষ্টা করেছিল। উঠতে পারে নি। বিজন ওকে জড়িয়ে ধরে ঠকঠক করে কাঁপছিল ভয়ে।

সকালে উঠেই বৌ ট্যাক্সি ডেকে বাপের বাড়ি চলে গ্যাছে। বলে গ্যাছে, এমন অভদ্র ছোটলোক স্বামীর ঘর সে করবে না।

রাত দুটো বাজার সংকেত শুনেছে সুরমা খানিকটা আগেই। বিজনকে ঘুম পাড়িয়ে বাইরের জানলাটার ধারে এসে দাঁড়িয়েছে সুরমা। রীতা নেই, তাকেই আজ দরজা খুলতে হবে। জানলার গরাদ ধরে বাইরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল সুরমা। ঠাণ্ডা জোলো বাতাস বইছে। পথে লোক চলাচল নেই বললেই চলে। মাঝে মাঝে দু-একটি রিক্সা টুং টুং শব্দ করতে করতে পথ বেয়ে চলেছে। সামনের বাড়ির রকে দুটো কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। রিক্সার শব্দে একবার ঘাড়টা উঠিয়ে দেখল। আবার শুয়ে পড়লো কুণ্ডলী পাকিয়ে। বৃষ্টির ছাটের ছোট ছোট কণাগুলো সুরমার মুখে চোখে গালে এসে লাগছে। মন্দ লাগছে না সুরমার। ছোট্ট মেয়ের মত জানলা দিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিলে সুরমা। ভিজে হাতটা ঘাড়ে মাথায় বুলিয়ে নিলে একবার। আঃ, বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগলো। বৃষ্টিটা জোরে এল এবার। ছাটগুলো তীব্র হয়ে বিঁধছে সুরমার মুখে। তবুও নিজেকে সরিয়ে নিলে না সুরমা। দাঁড়িয়ে রইল গরাদ ধরে।

অনেক কিছু চিন্তা তখন একসঙ্গে এসে জড় হয়েছে সুরমার মাথায়। শেষের দিকের জীবনটা তার সবই কণ্টকময় হয়ে পড়লো। অনেক জ্বালা তাকে জ্বলতে হয়েছে বিজনকে নিয়ে। এখন আরম্ভ করেছে তপু। রীতার জন্যে এক এক সময় তার দুঃখ হয়। আহা, ভদ্রলোকের মেয়ে। কত আর সহ্য করবে? পরক্ষণেই মনে পড়ে যায় তার নিজের অতীত জীবন। সে-ও তো তখন খুব বৃদ্ধ হয়ে ওঠে নি। সবদিক তাকে মানিয়ে নিতে হয়েছিল। কোনদিন ঘুমোতে পারে নি বিজন বাড়ি ঢোকার আগে। জানলার গবাদ ধরে দাঁড়িয়ে থেকেছে রাতের পর রাত। আশ্চর্য লাগে তার! কী করে ঘুমোয় রীতা!

হঠাৎ বিজনের ওপর বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে সারা মন। এ-সবের জন্যে সেই দায়ী। যে দৃষ্টান্ত বিজন রেখে গ্যাছে, আজ সাহস নেই তপুকে কিছু বলবার। কোন মুখ নিয়ে বলবে?

পরক্ষণেই চিন্তার মোড় ঘোরে সুরমার। না না, এ সবই তার কর্মফল। তার পাপেই আজ সংসারের এই হাল। একটামাত্র ছেলে তার। কত আশা ছিল মনে, ছেলে মানুষ হবে, ছেলের কথা বলতে বুকটা দশ হাত উঁচু হয়ে উঠবে। হল না, কিছুই হল না। স্বপন, স্বপনই হয়ে রইল। কিন্তু তার তো মনে পড়ে না কোন পাপ সে করেছে! তবে? কেন এই বিড়ম্বনা? কার অভিশাপ? কিসের অভিশাপ?

একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো। ভেতর থেকে টলতে টলতে নেমে এল তপু। না দেখেই পকেট থেকে টাকা বার করে দিয়ে দিলে ড্রাইভারের হাতে। ট্যাক্সি চলে গেল শব্দ করে।

সুরমা নিজেকে একটু আড়াল করে নিয়েছে জানলার পাশে। তপু একবার চেয়ে দেখলে বাড়িটার পানে। তারপর টলতে টলতে গিয়ে দাঁড়ালো গ্যাসপোস্টের নিচে। বৃষ্টির বেগটা কমে এসেছে, পড়ছে টিপ্ টিপ্ করে। কোট ভিজে গ্যাছে দূর থেকে দেখলেই বোঝা যায়। প্যান্টের জায়গায় জায়গায় কাদার ছাপ।

সুরমা একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে তপুর পানে। তপু তাকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু সুরমার চোখ দুটোর সামনে তখন শুধুই তপু। পৃথিবীর আর সব বস্তু যেন নিঃশেষে বিলীন হয়ে গ্যাছে তার চোখের সামনে থেকে। কি যেন বলছে তপু বিড় বিড় করে। দাঁড়িয়ে আর দেখতে পারলে না সুরমা। ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সদর দরজা খুলে গিয়ে দাঁড়ালো তপুর সামনে। তপুর একটা হাত ধরে শুধু বললে—আয়।

তপুকে ঘরে শুইয়ে দিয়ে সুরমা আবার এসে দাঁড়িয়েছে সেই জানলার ধারে। তার দু' চোখ তখন জলে ভরে গ্যাছে। গণ্ড বেয়ে নেমেছে জলের ধারা। হঠাৎ পিঠে কার স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠলো সুরমা। ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে—বিজন দাঁড়িয়ে আছে তার পেছনেই। থর থর করে কাঁপছে। বিজন কখন চুপি-সারে উঠে এসেছে বিছানা থেকে জানতেই পারে নি সুরমা। দু' হাত দিয়ে বিজনকে জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে সুরমা—একি! তুমি জেগে উঠেছো?

—ঘুমোলুম কখন, যে জাগবো? সারাক্ষণ জেগে জেগে দেখছিলুম তোমাকে—ম্লান হেসে সুরমার কাঁধে হাত রাখলো বিজন। সে হাসি তো হাসি নয়, হৃদয় নিঙড়ানো এক অঞ্জলি অশ্রু।

এক হাত দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বলে সুরমা—তপু এইমাত্র ফিরলো!

—জানি! এস, শোবে এস,—বলে বিজন সুরমার কাঁধে ভর দিয়ে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল।

গির্জার পেটা ঘড়িতে তখন ঢং ঢং বাজনার শব্দ হচ্ছে। ঢং—ঢং—ঢং তিনটে বাজলো। রাত তিনটে।

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে ✻ শিল্পী এবং এদেশে

খালন (১৯২৪—১৯৬০). আবাল টোয়েণ্টিজ থেকে ব্রেশটের কুর্ট ভাইলের সঙ্গে পরিচয়। ভাইল ছিলেন বুসোনীর শিষ্য। তখনকার জার্মানীতে যে নবম-জাতের নিও রোমাণ্টিক স্টাইলের সঙ্গীতের প্রচলন ছিল—তার প্রতি ব্রেশটের মতই অন্তর থেকে ঘৃণা পোষণ করতেন ভাইল। ব্রেশটের মতনই তিনিও চাইতেন জনপ্রিয় আধুনিক ধরণের রূপ দিয়ে সঙ্গীত সৃষ্টি করতে -যার জন্য অর্কেস্ট্রার বহুল বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োজন হবে না। অর্থাৎ যে সংগীত সময়ের মেজাজের সংগে মিল খাইয়ে নিয়ে জনগণের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে মিশে যেতে পারবে। হাউসপোস্‌টিলের (ব্রেশটের লেখা প্রার্থনা কবিতার সংকলন) ধারাবাহিক মেহগনী সঙ্গীতগুলো নিয়ে কাজ করবার সময় ভাইল নিজের ভাব, চিন্তাধারা এবং কল্পনাকে কার্যকরী করবার যথেষ্ট সুযোগ পেলেন। ১৯২৭ সালের বেডেন-বেডেনের আধুনিক সঙ্গীতের উৎসবে তাঁর ওপেরা জাতীয় মেহগনী সঙ্গীতের একটি অনুষ্ঠান হল। এই ছোট সংগীতসমষ্টির ভেতরই বীজরূপে নিহিত ছিল ব্রেশটের ভবিষ্যতের বিখ্যাত ওপেরা 'দি রাইজ এণ্ড ফল অব দি সিটি অব মেহগনী' এবং এই সময়েই প্রথম শুরু হল ব্রেশট এবং ভাইলের সঙ্গীত রূপায়ণে সহযোগিতা—যার পরিণত সাফল্য আমরা দেখতে পাই 'থ্রী পেনি ওপেরা'-তে। এই ওপেরাটিতে এবং অন্যান্য আরও বহু এই জাতীয় বড় পরিকল্পনায় ব্রেশট এবং ভাইল একসঙ্গে কাজ করেছেন এবং একে অপরের দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিতও হয়েছেন। **Brecht's theory of the function of opera and of the 'epic' theatre in general owes a great deal to Weill's ideas**

এই সময়ে আর একটি প্রভাব—যদিও এটি সম্পূর্ণ অন্য জাতের—ব্রেশটের ওপর এসে পড়েছিল। এ প্রভাবটিও মোটেই হেলাফেলা করবার মত নয়। এই সময়টাতেই ব্রেশট পরিচিত হলেন জারোস্লাভ হাসেকের রচিত 'গুড্ সোলজার সাওয়েক'-এর সঙ্গে—এটি উপন্যাস আশ্রিত একটি বিরাট চরিত্র।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন এই বিখ্যাত কমিক উপন্যাসটির প্রোডাকসনের পরিকল্পনা করেছিলেন পিসকেটর। কিন্তু আইনানুমোদিত যে নাট্যরূপটি ছিল, পিসকেটর দেখলেন তা দিয়ে মঞ্চাভিনয় করা চলে না। তখন তিনি করলেন কি কমিউনিস্ট নাট্যকার গ্যাসবারা, লিও লানিয়া ও ব্রেশটকে যৌথভাবে লিখে এই নাটকের একটি নবরূপায়ণ তৈরি করতে লাগিয়ে দিলেন—পাছে কপিরাইট-এর ব্যাপারে কোন গোলমাল লাগে. এজন্য প্রোগ্রামে আগের ভার্সনের নাট্যরূপদাতাদের নামই দেওয়া রইল।

পিসকেটরের 'গুড সোলজার সাওয়েকের' প্রদর্শনী শুরু হল ১৯২৮ এর জানুয়ারীতে। এটি তাঁর একটি সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত কাজ। সেই সময়ের বিখ্যাত হাস্যরসাভিনেতা ম্যাক্স পালেনবার্গ—ইনি জাতে অস্ট্রিয়ান—সাওয়েকের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

সাওয়েক কি ধরণের চরিত্র? পিসকেটরের মতে: **round-faced, genial in his simulated simplicity, coorse and gentle at the same**

কুর্ট ভাইল
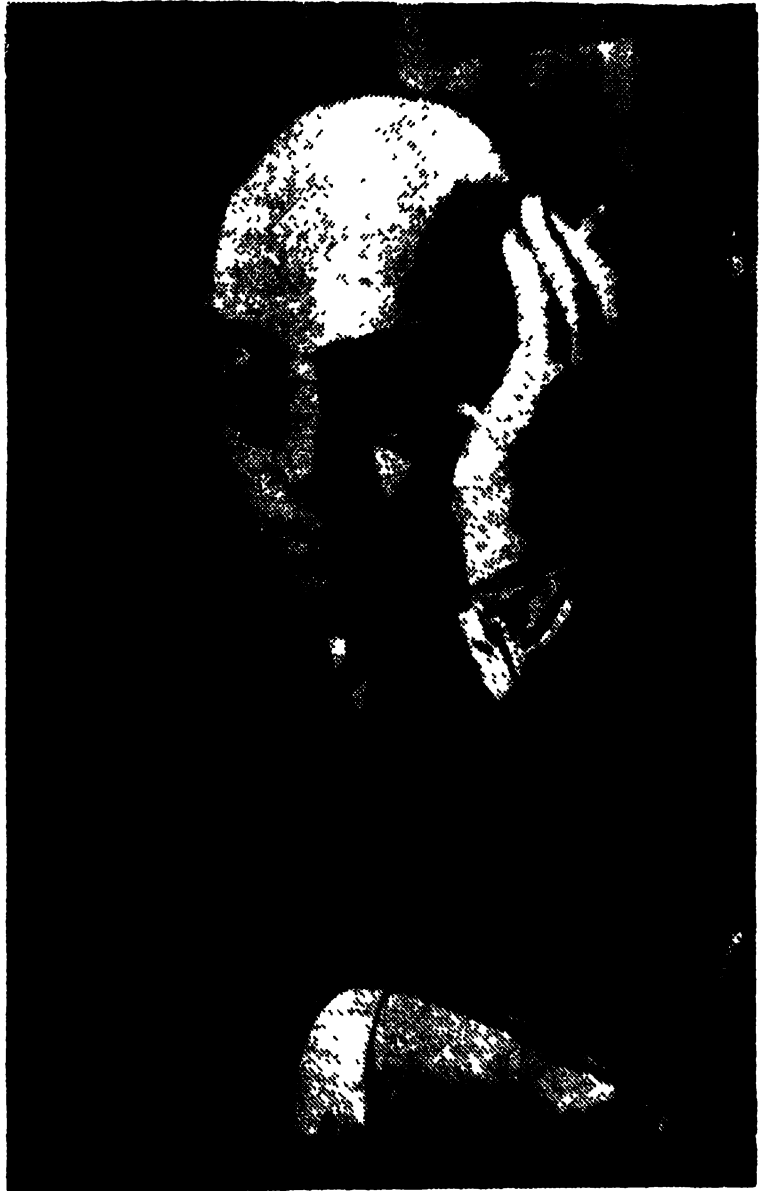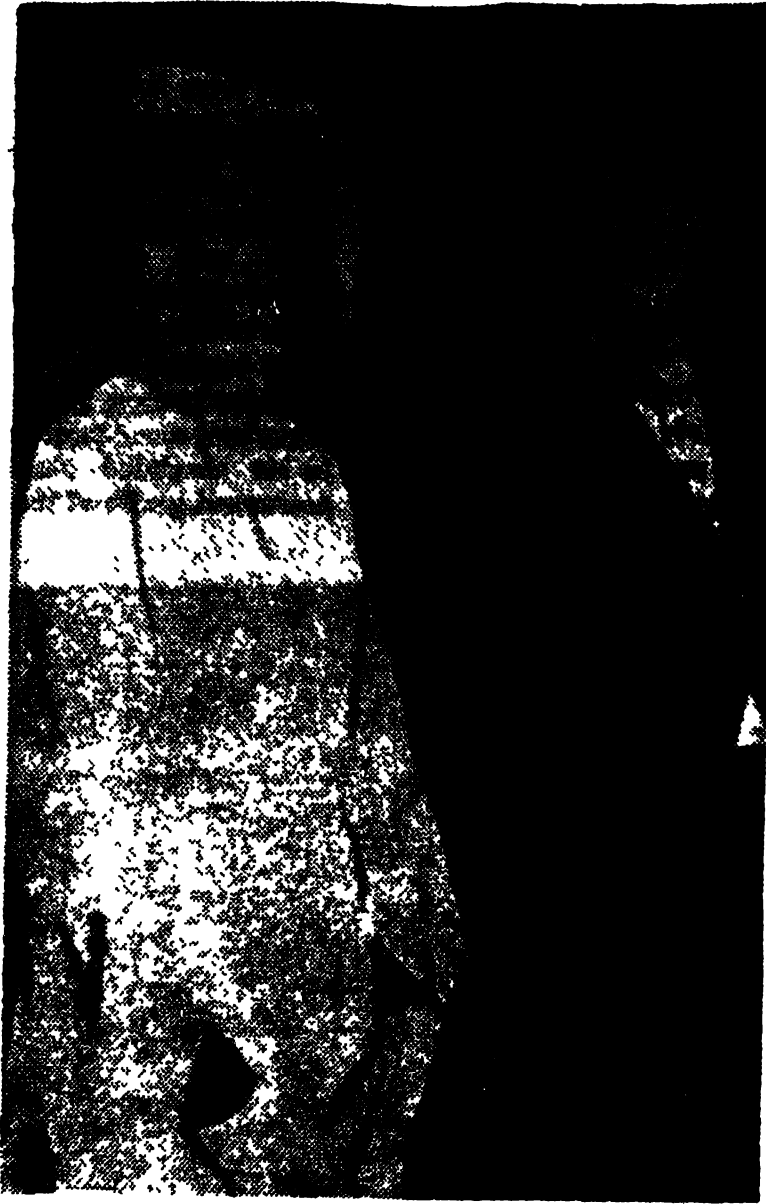
"মেহগনী" নাটকের দুটি ভূমিকায় মঞ্চে লোনিয়া ও হ্যারল্ড পলসেন

time. This great character moved through a brilliantly conceived comic world, designed by the most bitter of German post-war satirical artists George Gorsz. Or, rather, the scenery moved round Schweik. As the good soldier's 'anabasis' proceeded, the backdrop behind him showed the landscape passing as he marched and the house, sheds, privies, railway stations, taverns, and trees he encountered came rolling on to the stage as he approached them

সাওয়েক তো শুধুমাত্র একটি চরিত্রই নয়। সে হচ্ছে মানুষের মূল মনোভাবের প্রতীক। সারা পৃথিবীর উন্মত্ততা, শক্তির অনুশাসন প্রবৃত্তিকে সে পরাভূত করে—বিদ্রোহাচরণের সাহায্যে নয়, সেসবকে অম্লানবদনে স্বীকার করে নিয়ে। সে এত বেশি দাস্যভাব অবলম্বন করে, এত আগ্রহ সহকারে এবং খুশির সঙ্গে কর্তৃপক্ষের আদেশ অনুসারে কাজ করতে চায়, নিয়ম-অনুশাসনের প্রতিটি লিখিত শব্দ পালন করে চলে। যে পরিণতিতে কর্তৃপক্ষের মূর্খতা, আইনের অন্তর্নিহিত অজ্ঞতার দিকটা প্রকটভাবে প্রতিভাত হয়ে পড়ে।

ব্রেশট হাসেকের এই অমর চরিত্রটির চিন্তাধারাকে এমন নিজস্ব করে নিয়েছিলেন যে এই সময় থেকে বিশ বছর বাদে যখন নিজের নাটক 'সাওয়েক ইন দি সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার' রচনা করেন, তখনও সৈনিকটির চরিত্রের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো নিজের সৃষ্ট সাওয়েক চরিত্রে সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাছাড়াও ব্রেশট এরপরে নিজের রচিত কয়েকটি নাটকের চরিত্রে সাওয়েক চরিত্রের এই বিদ্রূপাত্মক দাস্যভাবের দিকটা ফুটিয়ে তুলেছিলেন—যেমন পান্টিলার মাট্টিতে, ককেশিয়ান চক-সারকেলের দুষ্টু বিচারক আজডেককে এবং তাঁর বিখ্যাত নাটক গ্যালিলিও গ্যালিল্যাইয়ের গ্যালিল্যাই চরিত্রে।

ব্রেশট এবার একটি ছোট গল্পের সংকলন প্রকাশ করেন—এই সব গল্পের নায়ক হচ্ছেন কয়নার। কয়নারের জীবন-দর্শনের সঙ্গে সাওয়েকের জীবন সম্বন্ধে মতবাদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। 'মেজার ফর ভায়োলেন্স' হচ্ছে কয়নার সংক্রান্ত একটি নামকরা গল্প। এতে আছে—কয়নার একবার দৈহিক অত্যাচার এড়াবার জন্য অত্যন্ত ভীতুর মত ব্যবহার করেন। এ নিয়ে তাঁর অনুগামীরা যখন তাঁকে প্রশ্ন করেন যে তাঁর কি মেরুদণ্ড বলে কিছু নেই, তখন কয়নার উত্তর দেন মার খেয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হবার জন্য মেরুদণ্ড না থাকাই তিনি ভাল মনে করেন এবং দৈহিক অত্যাচারকে এড়িয়ে বেঁচে থাকতে পারাটাই তাঁর কাম্য। তাঁর কথার তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে কয়নার একটি গল্প বলেন। একজন কর্তৃপক্ষের তরফের প্রতিনিধি জোর করে একটি লোকের বাড়িটি অধিকার করে নেন এবং গৃহস্বামীটিকে জিজ্ঞাসা করেন সে তাঁর দাসত্ব গ্রহণ করবে কি না। গৃহস্বামী মুখে কোনো উত্তর না দিয়ে সাত বছর ধরে এই অত্যাচারী লোকটির সেবা করে কাটায়। প্রভুটি মোটা হতে হতে শেষে একদিন অত্যধিক স্থূলত্বের জন্য মারা যায়। গৃহস্বামী অত্যাচারীর দেহটিকে একটি পুরনো কম্বলে জড়িয়ে বাড়ির বাইরে ফেলে দিয়ে আসে। এরপর সে বাড়ির আসবাবপত্র ভালভাবে ধুয়ে ফেলে, দেওয়ালে নতুন চুনকাম করায় এবং তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সাত বছর আগে অত্যাচারী তাকে যে দাসত্ব নেবার জন্য প্রশ্ন করেছিল—তার উত্তর হিসাবে বলে "না"।

১৯২৮ সালে ব্রেশট ডিসেম্বর মাসে বার্লিনার ইলাসট্রেরটে জিটুং-এর আয়োজিত ছোট গল্পের প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার হিসাবে পেলেন তিন হাজার মার্ক—সে সময় এই টাকার অংকটির যথেষ্ট আর্থিক মূল্য ছিল। অবশ্য এই

আগেই গ্রীষ্মের সময় তাঁর বিরাট সাফল্য-প্রাপ্ত হয়েছিল 'থ্রী পেনি অপেরা'-র সার্থক রূপায়ণের ফলে। ৩১শে আগস্ট এই অপেরাটির প্রথম উদ্বোধন রজনী—অপেরাটি প্রথম রাত্রেই ব্রেশট এবং ভাইলকে খ্যাতির শীর্ষে উন্নীত করলো।"

লণ্ডনের সেফেনারের, লণ্ডনে জন গের দি বেগার্স অপেরা'-র রিভাইভ্যাল বিরাট জনপ্রিয়তা এবং সাফল্য অর্জন করেছিল। এর যশ এবং খ্যাতি বিস্তৃতিলাভ করলো এমন ব্যাপকভাবে যে ইউরোপের অন্যান্য রঙ্গালয়ের মালিকেরাও এই অপেরাটি সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। ব্রেশটের সহযোগী এবং সেক্রেটারী এলিজাবেথ হাউপ্টমানও 'বেগার্স অপেরা'-র একটি জার্মান অনুবাদ করলেন। ব্রেশট এই অনুবাদ পড়ে এত মুগ্ধ হলেন যে তিনি নিজেই এর থেকে একটি এডাপ্টেশন করতে শুরু করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত ব্রেশটের রচনার সঙ্গে মূল নাটকের অবশ্য বিশেষ সাদৃশ্য রইল না। ব্রেশটের রচনাটি হল প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধোত্তর জার্মান বুর্জোয়া সোসাইটির উপর তীব্র কশাঘাতপূর্ণ একটি স্যাটায়ার। ভাইলের রচিত উজ্জ্বল, দীপ্তিমান সাংগীতিক স্বরগ্রাম ব্রেশটের অপেরাটির সৌন্দর্যকে যেন আরও আকর্ষণীয় করে তুললো। এই প্রথম একটি গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীতনাট্যে জ্যাজ মিউজিকের স্থান হল।

দি থিয়েটার অম সিফবাউয়েরডাম জানালো যে এই নতুন ধরণের অপেরাটি তারা মঞ্চস্থ করবে। এই থিয়েটারটিরই বর্তমান নাম বার্লিনার আসেম্বল এবং ব্রেশট পার্টি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রেশটের পূর্ব বার্লিনে স্থায়িভাবে বসবাসের সময় থেকেই এই রঙ্গালয়টিতে অভিনয় করে থাকেন।

'দি থ্রী পেনী অপেরা'-র উদ্বোধন রজনী হচ্ছে ১৯২৮ সালের ৩১শে আগস্ট। সুদীর্ঘকাল অত্যন্ত জনপ্রিয়তার সঙ্গে অপেরাটি বার্লিনে প্রদর্শিত হয়েছিল। এরপর এই নাটকের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের রঙ্গমঞ্চেও সাফল্যের সঙ্গে অনেকবার অভিনয় হয়েছে। এর ভেতর বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী হয় নিউইয়র্কের রিভাইভ্যাল। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় অপেরাটি কত প্রাণবন্ত এবং সঙ্গীতের দ্বারা মহিমামণ্ডিত।

এরপর ১৯২৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে সিফবাউয়েরডাম থিয়েটারে এলিজাবেথ হাউপ্টমান রচিত 'হ্যাপী এণ্ড' সঙ্গীত-নাট্যটি মঞ্চস্থ হয়। এর গানগুলো লিখেছিলেন ব্রেশট, আর সঙ্গীত পরিচালনার ভার ছিল কুর্ট ভাইলের ওপর। এটি বিশেষ ... হয়ে নি। পরে এরই ওপর ভিত্তি করে ব্রেশট তাঁর অসমাপ্ত শ্রেষ্ঠ নাটক 'সেইণ্ট জোন অব দি স্টক-ইয়ার্ডস' রচনা করেন।

কুর্ট ভাইলের সহযোগে ব্রেশট এই সময় কয়েকটি নীতিমূলক অপেরা লেখেন। এই সময় ব্রেশট গভীরভাবে মার্কসিজম অধ্যয়ন করছিলেন। ফলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতেও একটা বিরাট পরিবর্তন এসে যাচ্ছিল। রচনায় সংযম, স্বল্প কথায় মনোভাব প্রকাশ করা, সামাজিক উপযোগিতার দিকটাতে বিশেষ নজর দিয়ে লেখা—এই সব উদ্দেশ্যই ক্রমশ ব্রেশটকে প্রভাবান্বিত করছিল। Poets were to become social engineers, their work was to be useful in a very practical and concrete sense by stimulating desirable social attitudes. এই সব ভেবেই ব্রেশট এবং ভাইল নতুন ধরণের সংগীতনাট্য রচনার ফরমূলা তৈরি করলেন। এ নতুন ধাঁচের গীতিনাট্যের নাম হবে 'স্কুল অপেরা' বা 'নীতিমূলক গীতিনাট্য'। এতে ব্যক্তিবিশেষের জীবনের ভাগ্য বর্ণনা করতে গিয়ে দর্শকের মনকে ভাবাবেগে আপ্লুত করবার প্রচেষ্টা করা হবে না—এতে সামাজিক ধরণ-ধারণ আচরণ গতিপ্রকৃতির ব্যাখ্যা দেওয়া হবে কার্য কারণের নিয়ম বিশ্লেষণের সাহায্যে। এইজাতীয় সঙ্গীতনাট্যে দর্শককে আনন্দ দেওয়ার থেকে, শিক্ষাদানের ওপরই সর্বাধিক প্রাধান্য থাকবে। এমন কি দর্শকের শিক্ষাদানের থেকে, যারা নানাভাবে এ নাটকে অংশ গ্রহণ করবে—মুখ্যত তাদেরই শিক্ষাদানের জন্য এইসব মিউজিক্যাল প্লেইজ রচিত হবে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এই শ্রেণীর নাটক না পাঠিয়ে, ছেলেমেয়েদের স্কুলগুলোতেই হবে এর অভিনয়ের যথাযোগ্য পীঠভূমি। এই উদ্দেশ্য নিয়েই ব্রেশট 'সম্মোপান' বা স্কুল-অপেরা লিখতে শুরু করেন।

১৯২৯ সালে বেডেন-বেডেন আধুনিক সঙ্গীত উৎসবে দর্শকদের সামনে ব্রেশটের এই শ্রেণীর দুটি নাটক প্রদর্শিত হয়। 'দি ফ্লাইট অব লিণ্ডবার্গস'-এ ব্যক্তিগত চরিত্রপূজা পরিহার করবার জন্য বীর আকাশযান পরিচালক চার্লস লিণ্ডবার্গের ভূমিকায় বিভিন্ন দৃশ্যে বিভিন্ন অভিনেতা অভিনয় করেন। এর ড্রামাটিক ক্যানটাটা (সঙ্গীত) যৌথভাবে রচনা করেন ভাইল এবং পল হিণ্ডেমিথ। ব্রেশটের অন্য গীতি-নাট্যটির নাম 'দি ডাইড্যাকটিক প্লে অব বেডেন অন কনসেণ্ট'। একদল ট্রান্স-আটলাণ্টিক ফ্লায়ার্স, যাদের আকাশযানটি চূর্ণ হয়ে গেছে, তাদের জন্য-... এ নাটকের বিষয়বস্তু।

[ক্রমশঃ]

'সাপ্তাহিক বসুমতী' পত্রিকার ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৭৫ সংখ্যায় শ্রীঅসীম মুখোপাধ্যায় 'গ্রাম বাংলার কথা' শীর্ষক নিবন্ধে সুন্দরবনের মাছ ও জেলেদের সম্বন্ধে যা' বলেছেন তা' অভিনন্দনযোগ্য। সুন্দরবনের জেলেদের সমস্যা কৃষকদেরই মত। কিন্তু স্বাধীনতার ২১ বছর পরেও সরকারী পরিকল্পনায় এই হতভাগ্য জেলেরা স্থান পায় নি। 'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে, প্রকাশিত ঐ নিবন্ধ যদি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়, তবে সুন্দরবনের জেলেদের সংগে আমরাও এই পত্রিকার নিকট কৃতজ্ঞ থাকব।

অসীমবাবু-প্রদত্ত আড়তদারদের ঘাঁটিগুলির নামের তালিকায় ক্যানিং-এর নাম বাদ গেছে। যেখানে ক্যানিং থানাতে মাছের ভেড়ির (এখনকার ভাষায় ঘেরি) সংখ্যা ৩১। তাই মনে হয় উনি ক্যানিং থানায় ভ্রমণ করেন নি। এছাড়া গোসাবা, বাসন্তী প্রভৃতি থানাতেও যথেষ্ট সংখ্যক ভেড়ি রয়েছে। ক্যানিং টাউনের উপরেই একাধিক ভেড়ির মালিক ও অসংখ্য আড়তদারদের বাস। নামের তালিকা দিয়ে চিঠির কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। এবং এখান থেকে দৈনিক কত শত মণ মাছ কলকাতা শহরে ও বিভিন্ন শহরতলীর বাজারে চালান যায়, তা' প্রত্যক্ষ করবার জন্য অসীমবাবুকে ক্যানিং-এ আসতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। যে কোন দিন রাত বারোটা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত ক্যানিং মেছোঘাট পরিদর্শন করলেই বুঝতে পারা যাবে এখানে কত মাছ আমদানী হয়। এবং এখানে কত ভেড়ি মালিক ও আড়তদারের বাস তারও কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। স্বভাবতই এ প্রসংগে ১৩৭১ সালের ইলিশ মাছ আমদানীর কথা মনে পড়ে। তবে ৫।১০ বৎসর পূর্বেও যা মাছ আমদানী হত এখন তার চেয়ে পরিমাণে অনেক কম আমদানী হয়।

মাছ ধরা অর্থাৎ জাল বোনা, নৌকা তৈরির জন্য জেলেরা শুধু আড়তদারদের নিকট থেকেই নয়, অতি মুনাফালোভী পাইকারদের নিকট থেকেও টাকা দাদন পেয়ে থাকে। ফলে জেলেরা সব মাছই এদের কাছে বিক্রি করতে এবং এদের মাধ্যমে বিক্রি করতে বাধ্য থাকে। এই সব আড়তদাররা তাদের দাদন প্রাপ্ত জেলেদের আমদানীকৃত মাছ মোট যত টাকায় বিক্রি হবে, সেই টাকা থেকে দাদন দেওয়া টাকার সুদ বাবদ একটা নির্দিষ্ট পয়সা কেটে নেয়। আসল তো রইলই। প্রত্যেক আড়তদার একাধিক জেলেকে টাকা দাদন দিয়ে থাকেন। এর উপর রয়েছে মাছের ভেড়ি মালিকদের চক্রান্ত। এই ভেড়ি মালিকরাই প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মন্ত্রিত্বকালে মৎস্যমন্ত্রী ফজলুর রহমানকে একবার ঘেরাও করেছিল। যখন মাছের দর বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। এখনও এদেরই (সহযোগী বন্ধু আড়তদার) কব্জায় সমস্ত মাছের বাজার। এই সব ভেড়ি মালিকরা বাজারে অল্প মাছ আমদানী করে কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করেন বেশি মুনাফার আশায়। তাছাড়া এরা আরও নানারকম দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। তাই একবার দাবি উঠেছিল—সরকার মাছের ভেড়িগুলির মালিক হোন।

এছাড়া খালে-বিলে ও নদী-নালাতে যে মাছ রয়েছে তা ধরে বাজারে পাঠাবার ব্যবস্থাটাও অন্তত সরকার করতে পারেন। জেলেদের সমবায় সমিতি গঠন করেই হোক অথবা অন্য কোন উপায়ে জেলেদের হাতে নৌকা, জাল ও কিছু টাকা দাদন দিলেই এ কাজ করা অসম্ভব হয় না। এতদ্ব্যতীত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভ্যদিগকে জাল, নৌকা প্রভৃতি ক্রয় করবার জন্য সমিতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত জামিনে ঋণ দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। নতুবা আড়তদার ও পাইকারদের খপ্পর থেকে মাছ আসবে না। এরা সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রতিদিন কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে চলেছে।

তবে গত বছর থেকে শুনেছি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্যদপ্তর রাজ্যে মাছের চাষের উন্নতি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের পতিত জলাভূমি-বিল-বাওড়-পুকুর এবং দীঘির উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাই সুন্দরবনের কয়েকটি স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে গবেষণা করার কথা হয়েছে। সেহেতু একটি বিশেষজ্ঞ দল এ-ব্যাপারে সুন্দরবনের কয়েকটি অঞ্চলে আসছেন বলেও সংবাদ পাওয়া গেছিল। এই দলটিতে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকজন প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞ থাকবেন। কিন্তু প্রায় এক বছর হতে চলল এখন পর্যন্ত বিশেষজ্ঞ দল সুন্দরবন পরিদর্শনে এলেন না। না পরিকল্পনার ফাইল সহ বিশেষজ্ঞরাও সুন্দরবনের বাঘের পেটে চলে গেছেন? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমানে বাঘের উপদ্রব প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যাওয়ায় এবং বাঘের হাতে বহু মৎস্যজীবী নিহত হওয়ায় কেউ আর অন্তরে সুন্দরবন জঙ্গলের অভ্যন্তরে মাছ ধরতে যায় না। সরকার কি পারেন না—সুন্দরবন জঙ্গলের অভ্যন্তরে অবস্থিত মজে যাওয়া পুকুরগুলি সংস্কার করে অথবা নতুন করে মাছের ভেড়ি সৃষ্টি করে সুফল পাওয়ার আশা আছে কি? যদি না বাঘের হাত থেকে মৎস্যজীবীদের রক্ষা করা যায়।

আবার, বরফের জন্যও জেলেরা তথা মৎস্যজীবীরা সবচেয়ে বেশি মার খায়। মাছ ধরার পরে জেলেদের গড়ে ১০।১৫ মাইল জলপথ (স্থলপথসহ) অতিক্রম করে প্রধান প্রধান বন্দর-বাজারে আসতে হয়। এতে সহজে পচনশীল মাছই পচে বেশি। কমবেশি সব মাছেরই ক্ষতি হয়। উদাহরণস্বরূপ গত ১৩৭১ সালের (ক্যানিং-এ) ইলিশ মাছের কথা বলা যেতে পারে। আমাদের মৎস্যদপ্তরের বড়কর্তাদের, অতি মুনাফালোভী পাইকার ও আড়তদারদের নোটিশ না দিয়েই ঝাঁকে ঝাঁকে সমুদ্র থেকে ইলিশ মাছ উঠে এসে ধরা দিয়েছিল গোসাবা ও বাসন্তী অঞ্চলের জেলেদের জালে। পর্যাপ্ত বরফের অভাবে তাদের কলকাতার ঠাণ্ডাঘরে পাঠানো সম্ভব হয় নি। পচে উঠতেই আড়তদারেরা বাজারে ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল; এবং ঐ মাছ বিক্রি হয়েছিল প্রতি কিলোগ্রাম ৬ থেকে ১০ পয়সা দরে। প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে নিজেও সেদিনের কথা কোনদিন ভুলতে পারব না।

সকলের ভোগে কিন্তু সেদিনের মাছ আসে নি। কলকাতার মানুষদের এক আনার ভোগে তো নয়ই। কেন না, সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগ প্রায় ১৫০ মণ পচা মাছ নদীর চরে নিয়ে কেরোসিন সহযোগে পুড়িয়ে দিয়েছে। তাই রাজ্য সরকার সুন্দরবনের জেলেদের কথাটা একটু ভাবতে পারলে জেলেদেরও উদরের চিন্তা যেমন কিছুটা লাঘব হত, তেমনি সুন্দরবনের মানুষ সহ শহরের মানুষেরা প্রাণভরে দুদিন দুটো মাছ খেতে পারতো। সুন্দরবনের জেলেদের ও মৎস্যব্যবসায়ীদের তাই অনেকদিনের দাবি এখানকার প্রধান প্রধান বন্দরে বরফ-কল ও ঠাণ্ডাঘর প্রতিষ্ঠার।

বোধ হয়, ঐ ইলিশ মাছের ঘটনার পর সরকারের কিছুটা চৈতন্যোদয় হয়েছিল, তাই এ-সম্বন্ধে একটা প্রকল্পও রচনা করেছিলেন। ঠিক হয়েছিল, ক্যানিং ও ডায়মণ্ডহারবারে একটি করে বরফ-কল ও হিমঘর স্থাপন করা হবে। এতে ব্যয় হবে যথাক্রমে ৫ লক্ষ ও ১১ লক্ষ টাকা। ক্যানিং ও ডায়মণ্ডহারবার হিমঘরগুলিতে প্রতিদিন ১০ টন পর্যন্ত মাছ রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে। যদি সরকারের আর্থিক অসুবিধা থাকে তাহলে বনগাঁর মতো এখানেও সমবায়ের মাধ্যমে বরফ-কল ও হিমঘর স্থাপন করতে পারেন।

—মাখনলাল ঘোষ
ক্যানিং টাউন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা

কথক নৃত্যে বন্দনা দেব

শারদীয় উৎসবে বাংলাছবি

এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা'। শারদীয় উৎসব উপলক্ষে সিনেমাগুলিতে আবার দর্শকের ভিড় জমেছে। একসঙ্গে কয়েকটি বাংলাছবি মুক্তি লাভ করছে—তাই দর্শকরা উন্মুখ। প্রায় পাঁচ মাস পরে বাংলাছবি দেখার সুযোগ দর্শকরা ছাড়বেন না। বিশেষ করে মহিলারা। যাঁরা বাংলাছবির বড় পৃষ্ঠপোষক। 'বাঘিনী' এসেছে; 'চৌরঙ্গী' ও 'তিন অধ্যায়' মুক্তি লাভ করেছে। 'বাল্যবন্ধু' ও আরো কয়েকটি ছবি রয়েছে মুক্তি প্রতীক্ষায়। ছবিগুলির মুক্তির দিন সিনেমার সামনে তরুণ দর্শকরা দাঁড়িয়ে থাকছে বাংলাছবির তারকাদের দেখবে বলে। মফস্বলে বন্যায় দাপট গেছে। মানুষের জন-কলতা একেবারে থেমে গেছে। দিনান্তে ভাত জোটে না—এখনো রিলিফের ওপর নির্ভর করে রয়েছে অসংখ্য মানুষ। তবু শারদীয় উৎসবের দিনকে ব্যর্থ হতে দিতে চায় না। মফস্বলের সিনেমাগুলিও টিমটিম করে বাতি জ্বালাবার চেষ্টা করছে। বছরে এই কটি তো দিন। অন্তত একটা ছবি যদি দেখা যায়।

পাঁচ মাস পরে বাংলাছবিগুলি যেন আরো আগ্রহের হয়ে উঠেছে। বাংলা-ছবি নিয়ে যে ঝড় উঠেছিল সকলে তার খবর রাখে। তাই বাংলা ছবি দেখার আগ্রহ আরো বেড়েছে। পাঁচ মাস পরে বাংলাছবি দেখে দর্শকরা কতদূর খুশি হবেন জানি না। কারণ হিন্দীর সঙ্গে প্রতিযোগিতার কারণে হোক, অথবা অন্য যে কোন কারণে বাংলাছবির চরিত্র কিছুটা বদলে গেছে। বাংলার বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে রূপালসের মেলায় হিন্দীছবির প্রভাব বাংলাছবিকেও কিছুটা হয়ত ভারাক্রান্ত করেছে। অন্তত মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলি দেখে আমার তাই মনে হল। লক্ষণীয় বিষয় যে এতদিন পরে বাংলাছবি মুক্তি পাচ্ছে কিন্তু যাঁরা বাংলা ছবিকে মর্যাদা দিয়েছেন ও বাইরে পরিচিত করেছেন, তাঁদের কোন ছবি মুক্তি লাভ করছে না। এটা মোটেই ভাল কথা নয়। এ সময় যাঁরা ভিন্ন রাজ্য থেকে আসবেন এবং প্রবাসী বাঙালীরা ফিরে হয়ত বাঙালী বৈশিষ্ট্যের ছবি দেখতে পাবেন না।

বাংলা চলচ্চিত্রের সংকট ছবিতে যেমন প্রতিফলিত, তেমনি সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও। গত কয়েক মাস ধরে সিনেমা কর্মীদের ধর্মঘট, চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতির পিকেটিং ইত্যাদি ঘটনায় এই সংকট প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু সংকট থেকে পরিত্রাণ পাবার মত অবস্থা আজো দেখা যায় নি। এই সংকটের আর এক প্রকাশ অভিনেতৃ সঙ্ঘের ভাঙন। দীর্ঘকাল অভিনেতৃ সঙ্ঘ শিল্পীদের ঐক্যবদ্ধ সংগঠন হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সম্প্রতি এই সংগঠন ভেঙে দু-ভাগ হয়েছে। এক ভাগে রয়েছেন উত্তমকুমারের মত জনপ্রিয় তারকা, আর এক ভাগে রয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মত জনপ্রিয় তারকা। দুটি সংস্থা গঠিত হয়েছে। এই ভাঙন যেমন সংকটের প্রকাশ, তেমন আদর্শগত দ্বন্দ্ব। সমাজের সর্বস্তরে যে দ্বন্দ্ব রয়েছে সে দ্বন্দ্ব এখানে আত্মপ্রকাশ করেছে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রগতিশীল শিল্পীরূপে শ্রদ্ধেয়। সিনেমা শ্রমিকদের প্রতি তাঁর সমর্থনকে নিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। সৌমিত্রকে বয়কট করার, চলচ্চিত্র জগৎ থেকে তাঁকে হটাবার চক্রান্ত চলতে থাকে। সাময়িকভাবে একটা মীমাংসা হলেও শেষ পর্যন্ত দেখা গেল অভিনেতৃ সঙ্ঘ ভেঙে গেল। এতে বাইরের চাপ কতদূর ছিল জানি না। তবে শিল্পীদের মধ্যেও আজ আদর্শগত দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। গত পাঁচ মাসের ঘটনাবলীর মধ্যে অভিনেতৃ সঙ্ঘের ভাঙন সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ও দুঃখজনক ঘটনা।

দর্শকরা বাংলাছবি দেখতে যেমন ভালবাসেন, তেমনি বাঙালী শিল্পীদেরও ভালবাসেন। তাই এই ভাঙনে কেউ খুশি হবেন না। সৌমিত্রকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করলে তাও কেউ মেনে নেবেন মনে হয় না।

শারদীয় উৎসবে—বাংলাছবি মুক্তি লাভ করছে। এই খুশির দিনেও বাংলা-ছবিতে সংকটের ছায়া যেন অনেক বিস্তৃত। —দুর্জন।

তিন অধ্যায়

অপ্সরা ফিল্মসের 'তিন অধ্যায়' গত ২০শে সেপ্টেম্বর মুক্তি লাভ করেছে। ছবির পরিচালক মঙ্গল চক্রবর্তী।

ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে এক নবীন শিল্পপতিকে কেন্দ্র করে। ভগ্নি বিয়োগে যিনি এত মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন যে সাময়িকভাবে কাজ থেকে ছুটি নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছেন। ফিরে এসে দেখেন নবাগত স্টেনো দেখতে অবিকল তাঁর বোন মল্লিকার মত। তাই তিনি স্টেনো জয়ন্তীকে সবসময় নিজের কাছে রাখতে চাইলেন। এতে ভুল বুঝল ওয়েলফেয়ার অফিসার অনন্ত। যার সঙ্গে জয়ন্তীর বিয়ে হবার কথা। সে রাতারাতি বিয়ে বাতিল করে আর এক স্টেনো শীলাকে বিয়ে করার মনস্থ করে।

এই শীলার সঙ্গে ইতিপূর্বে জয়ন্তর

প্রেম ছিল। কিন্তু আর্থিক কারণে এবং এক শয়তান কর্তৃক বোন মীনা প্রতারিত হওয়ায় ক্ষোভে দুঃখে সে নাইট ক্লাবে নর্তকীর কাজ নিয়েছিল। এ কারণে জয়ন্ত তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে।

এই ঘটনা জানতে পেরে নবীন শিল্পপতি জয়ন্তীকে জানায় কেন সে তাকে এত স্নেহ করে। এবং জয়ন্তকে ঘটনাটি জানিয়ে জয়ন্তীর সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করে দেয়। আর নিজে বিয়ের প্রস্তাব করে শীলাকে। এ সময় জয়ন্তীর মা'র কাছ থেকে যে কাহিনী শোনে তাতে প্রমাণ হয় জয়ন্তী তার হারানো বোন যূথিকা ছাড়া আর কেউ নয়। যে বোনকে সে হারিয়েছিল বার্মা থেকে ফিরে আসার পথে।

ছবির আর একটি চরিত্র জয়ন্তর বন্ধু (অনুপকুমার) উদার চরিত্রের যুবক। যে সকলের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করেছে।

ছবিটি পাঁচমিশালী রসের। এতে প্রেম, বিরহ, ও আনন্দ পাশাপাশি চলেছে দর্শকদের মনরাখার মত সংলাপ ব্যবহার করে। নবীন ও প্রবীণ শিল্পপতির দুই মানসিকতা প্রতিফলিত, এবং সকল রকমে সংঘর্ষ এড়িয়ে ধনীরা যে আসলে ভাল লোক তা বলার চেষ্টা হয়েছে। নাইট ক্লাবের নাচ, হাল্কা গান ইত্যাদিও রয়েছে। যাতে এককথায় বলা চলে হিন্দী ছবির ছকে বাঁধা বাংলা ছবি।

প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছেন: উত্তমকুমার, সুপ্রিয়া দেবী অনুপকুমার, সন্ধ্যা রায় ছায়া দেবী বিকাশ রায় জহর রায় সুমিত্রা সেন বঙ্কিম ঘোষ সীতা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সকলের অভিনয় যথাযথ সুপ্রিয়া দেবীর অভিনয় সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

সংগীত পরিচালনা করেছেন গোপেন মল্লিক।

তিনটি চেকোশ্লোভাক ছবি

গত ১০ই সেপ্টেম্বর সমারোহের সঙ্গে প্রাচী সিনেমায় চেকোশ্লোভাক চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়েছে। এই উৎসবে পাঁচটি ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। এবারের পাঁচটি ছবির মধ্যে 'ক্যারিজ টু ভিয়েনা' নিয়ে যথেষ্ট আলোচনার অবকাশ আছে। এই ছবির পরিচালক ক্যারেল কাচিনা এক নতুন পরিচালক। তাঁর ছবি চেক-চলচ্চিত্রশিল্পে নতুন দৃষ্টিতে গণতন্ত্রীকরণের নিদর্শন। অতীত এবং বর্তমানকে এরা কিভাবে বিচার করছে তারও নিদর্শন এই ছবি।

'রোমান্স ফর বিউগল' ছবির একটি দৃশ্য

'ক্যারিজ টু ভিয়েনা' কি ধনতন্ত্রের পথে?

ছবির নায়িকা ক্রিস্টি সদ্য-বিধবা। সামান্য সিমেন্ট চুরির অপরাধে নাৎসী জার্মানরা তার স্বামীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। স্বামীকে কবর দিয়ে সে ঘরে ফিরেছে মাত্র, এমন সময় দু'জন নাৎসী এসে তাকে হুকুম দিল তাদের কৃষির কাজে ব্যবহারের গাড়ি করে ভিয়েনার সীমান্তে পৌঁছে দিতে। বিনা বাক্যব্যয়ে সে তাতে রাজী হল এই মনে করে যে প্রতিশোধ নেবার হয়ত সুযোগ পাওয়া যাবে। সারা পথে সে প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজেছে। মাঝপথে নাৎসীরা তাকে সন্দেহ করে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেয়—গুলী করতে চায়। কিন্তু তরুণ নাৎসীটির মনে একটু দয়া থাকায় সে ওকে পালিয়ে যাবার সুযোগ দেয়। কিছুক্ষণ পরে আহত নাৎসীটি মারা যাওয়ার পরে ক্রিস্টি সুযোগ পায় তরুণ নাৎসীকে কাবু করতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তাকে হত্যা করতে পারে না, জীবনের বদলে জীবন নিয়ে কি হবে? তারপরে সদ্য-বিধবা তার শত্রুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে গেছে। রাত ভোর হলে গেরিলারা এসে দেখল তরুণ নাৎসীর বুকে মাথা রেখে ক্রিস্টি ঘুমিয়ে আছে। তারা নাৎসীটিকে হত্যা করল এবং ক্রিস্টিকে বলাৎকার করল। ক্রিস্টি

'তিন অধ্যায়' ছবিতে সন্ধ্যা রায়, সুপ্রিয়া দেবী ও উত্তমকুমার

জাতি বিরুদ্ধ অস্ত্র নাৎসীর পথ বন্ধ করে।

ছবিটির ঘটনাস্থান একটি জংগল। এই জংগলে পথ ভুলে তারা সর্বক্ষণ ঘুরেছে। অপূর্ব উত্তেজনা সৃষ্টি করে কাহিনী অগ্রসর হয়েছে এবং শুরু থেকে তরুণ নাৎসীকে কাবু করে ফেলা এবং হত্যা করতে গিয়েও থেমে যাওয়া পর্যন্ত ছবিটি অপূর্ব। তার পরে শুরু হয়েছে পরিচালকের রাজনীতি। যাতে নাৎসী আর গেরিলা উভয়কেই একই পর্যায়ে অপশক্তি হিসাবে দেখান হয়েছে। ইঙ্গিত করা হয়েছে যে সাধারণ জর্মান আর চেকদের মধ্যে বিরোধ নেই। তারা দুই বিরুদ্ধ শক্তির শিকার হয়েছে মাত্র। যে গেরিলারা জার্মান দখল থেকে চেকভূমিকে মুক্ত করল অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার ও জীবন দিয়ে সেই গেরিলা যোদ্ধাদের নাৎসীসমতুল্য বর্বর শক্তি হিসাবে দেখান হয়েছে। এদিক থেকে বলা যায় ছবির বক্তব্য মারাত্মক এবং সমাজতন্ত্রের আদর্শ-বিরোধী।

আশ্চর্যের কথা নয়াদিল্লীর চেক দূতাবাস এই ছবিটিকেই বাছাই করেছেন অগ্রাধিকার দিয়ে।

চেক ছবি 'দি রোমান্স অব এজেন্ট অর্জিউ কোর নি' ছবির একটি দৃশ্য

প্রথম প্রেমের কান্না

'রোমান্স ফর বিউগল' একটি উপভোগ্য ছবি। এই ছবিটি দেখার জন্য প্রচন্ড ভিড় হয়েছিল। কারণ পূর্বে থেকে ধারণা হয়েছিল এতে নিষিদ্ধ ছবির উপভোগ্যতা পাওয়া যাবে।
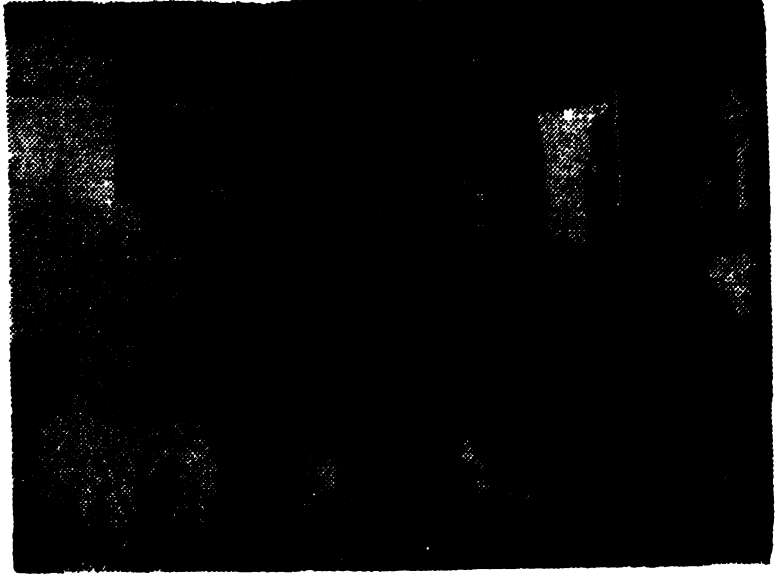
ছবির কাহিনী সরল—এক প্রেমের কাব্য। গ্রামে আগত কার্নিভ্যালের তরুণী টৌরিনার প্রেমে পড়েছিল ছাত্র ভজটা। টৌরিনার বিয়ে তার মা আগেই স্থির করে রেখেছিল তার চেয়ে বেশি বয়সের ভিক্টরের সঙ্গে। সুতরাং টৌরিনা আর ভজটা পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে ঠিক করল। কথামত টৌরিনা বনের পথে এসেছিল। কিন্তু ভজটা আসতে পারে নি—সেই মুহূর্তে তার ঠাকুর্দা মারা গেল। পরের দিন টৌরিনারা গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। ভজটা ছুটে গেল কিন্তু টৌরিনা তার দিকে ফিরেও তাকাল না।

ত্রিশ বছর পরে ভিক্টরের সঙ্গে ভজকার দেখা। মাঝরাতে নাটকীয়ভাবে ভিক্টর জানাল টৌরিনা এই গ্রাম ছাড়ার দু'মাস পরেই মারা গেছে। সে বাঁচতে চায় নি।

ছবির প্রথমদিকে আছে গ্রামের এক চাষীর মেয়ে কিভাবে ভজটাকে প্রলুব্ধ করছে নগ্ন হয়ে পাহাড়ী নদীতে স্নান করতে।

একটি কবিতা এই ছবির প্রেরণা। পরিচালক কাব্যিক মেজাজ রেখে ছবিকে দক্ষতার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন। প্রেমের জীবন, তরুণমন আবেগ এবং বিরহ-ব্যথায় ছবিটি দর্শকদের অভিভূত করে। পরিচালক পুরানো হলেও তাঁর রূপায়ণ-রীতি আধুনিক।

হলিউডের স্পাই ছবির বিকল্প

হলিউডের স্পাই ও সেক্স ছবিকে

চেক ছবি 'রোমান্স ফর বিউগল' ছবির একটি দৃশ্য

... অজয়, উজ্জ্বলের ও দীপ্রা চৌধুরী।

শেষ করে 'দি কেস অব এজেন্ট ভবানি ফোব সি' ছবিটি দর্শকদের যথেষ্ট হাসিয়েছে। যদিও ছবির প্রিন্ট মোটেই ভাল ছিল না, তবু এই ছবিটি অধুনা প্রদর্শিত হলিউডের স্পাই সিরিজের ছবিগুলির এক হাল্কা প্যারডির মত। এখানে বাহাদুর নায়ককে নিয়ে অনেক কাণ্ড এবং গতানুগতিক রেস্তোরাঁ হচ্ছে ঘটনাস্থল। বোকা স্পাইটি শেষ পর্যন্ত জিতে যায় এবং দর্শকদের সহানুভূতি লাভ করে।

অপর দুটি ছবি সান ইন দি নেট' এবং 'দি স্টোলেন এয়ারশিপ।

স্টুডিও খবর

এই ছায়াটুকু

২২শে সেপ্টেম্বর ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে কথাচিত্রের 'এই ছায়াটুকু' ছবির মহরত সঙ্গীত গ্রহণের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। হরিনারায়ণ চ্যাটার্জীর লেখা কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করবেন অমল দত্ত। ছবিটির জন্য গান লিখেছেন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীতে সুরারোপ করছেন শৈলেশ রায়। নেপথ্যসঙ্গীতে রয়েছেন মান্না দে, আরতি মুখার্জী। সম্পাদনা করবেন রমেশ যোশী।

নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি

নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি কয়েকটি সোভিয়েট ও চেকোস্লোভাক ছবি দেখাবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই ছবিগুলির মধ্যে প্রযোজকদের যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছবির অবলম্বন ম্যাক্সিম গোর্কির 'মাদার'। ২৯শে সেপ্টেম্বর—লেনস আর ড্রাইং, ২রা অক্টোবর 'মাদার' এবং 'ভেলেন্টিন অব এ ম্যান'। চেক ছবির মধ্যে থাকবে এই অক্টোবর ক্যারিজ টু ভিয়েনা, ৬ই—দি সান ইন দি নেট, ১৩ই—রোমান্স ফর বিউগলস। ছবিগুলি দেখান হবে ছায়া সিনেমায়—সকাল দশটায়।

কথক নৃত্যে বন্দনা সেন

সুরদাস সঙ্গীত সম্মেলনের সারারাত্রব্যাপী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে কুমারী বন্দনা সেনের কথক নৃত্য ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে।

তাঁর তৎকার এবং ভাওয়ের কাজ নিখুঁত এবং প্রশংসনীয়।

কুমারী বন্দনা সেনের সংগে সংগত করেন অন্যতম বাদক শ্রীশান্তাপ্রসাদ।

সঙ্গীতশিল্পী চিত্ত রায় স্মরণে

প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী পরলোকগত চিত্ত রায়ের স্মরণে গত সপ্তাহে চিৎপুর ঘাটায় এক ঘরোয়া অনুষ্ঠান হয়েছে। পুষ্পস্তবক ও মাল্য শোভিত শিল্পীর প্রতিকৃতির সামনে সঙ্গীত শিল্পিগণ সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত সঙ্গীত নিবেদন করেন। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন সুকুমার মিত্র, সুধাংশু মাইতি, কল্যাণী বসু, দীপিকা সেন, চামেলী গুপ্ত, সন্তোষ ঘোষ, স্মৃতিকণা পাল। তবলা সঙ্গতে ছিলেন সুরজিৎ বিশ্বাস। অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ হয়েছিল।

সঙ্গীতশিল্পী চিত্ত রায় কাজী নজরুল ইসলামের সহযোগী ছিলেন এবং তাঁর সুর রসধারী সঙ্গীত জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর পুত্র ও কন্যা রতন রায় এবং মাধুরী রায় এবং অন্যান্যরা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন।

মাধবী মুখোপাধ্যায় * নবাগত স্বপন রায়
বসন্ত চৌধুরী

দিবারাত্রির কাব্য

চাঁপপুর নৃত্যকলা মন্দিরের ভানুসিংহের পদাবলী

গত ১০ই সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রসদনে চাঁপপুর নৃত্যকলা মন্দিরের এক অনুষ্ঠান হয়েছে। ভানুসিংহের পদাবলীর তাঁরা নৃত্যরূপ দিলেন। এই নৃত্য রূপায়ণ যথার্থ সার্থক না হলেও গানে ও নৃত্য-লালিত্যে দর্শকরা একেবারে হতাশ হন নি। গানের দিকে—শুনহ শুনহ বালিকা, সজনি সজনি রাধিকা লো, শাঙন গগনে প্রভৃতি কোরাস গানগুলি সংগীত হয়েছে। একক গানে সুমিত্রা তিনি সম্ভবত শ্রীমতী প্রজ্ঞাপারমিতা। দরদ দিয়ে গানগুলি গেয়েছেন। তাঁর পরে আরো একজনের গান ভাল লেগেছে, তিনি সম্ভবত শ্রীমতী প্রজ্ঞা পারমিতা।

নাচের দিকে মনে হয়েছে সমবেত নাচে সকলের অনুশীলন একরকম নয়। তাই দেহের ছন্দ সকলের একরূপ হতে পারে নি। রাধা ও কৃষ্ণের নাচ অবশ্য ভালই

ভারতীয় সংগীত মহাবিদ্যালয়

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে ভারতীয় সংগীত মহাবিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন অধ্যক্ষ শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সংগীত শিক্ষিকা শ্রীমতী শান্তি রায়। প্রাক্তন এ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রীঅজিতকুমার দত্ত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। কার্যবিবরণী পাঠ করেন সম্পাদিকা শ্রীমতী নিশা চক্রবর্তী।

উপাধি ও অভিজ্ঞানপত্র লাভ করে ১৬ জন ছাত্রী, এবং পারিতোষিক পায় ৪৮ জন ছাত্রী।

অনুষ্ঠানে সমবেত গীটার বাদ্য পরিবেশন করে কমল মজুমদারের পরিচালনায় ছাত্রীবৃন্দ এবং 'সীতাহরণ' নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হয়।

—শনির দশা—

কলকাতার ফুটবলের বরাতে এবার বোধ হয় শনির দশা! তা না হলে কি আর একের পর এক ঘটে এমন সব অঘটন। আর সেই সংগে জড়িয়ে যায় অনাচার, অবিচার আর স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্ন। মোট কথা তালে-গোলে কলকাতার ফুটবল এ বছর যে জটের মধ্যে জড়িয়ে গেছে—তার গিঁট খুলতে আই এফ এ কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত কতোটা সমর্থ হবেন কে জানে। তবে এ কথা ঠিক যে কলকাতার ফুটবল এ বছর ইতিমধ্যেই উপস্থিত হয়েছে অন্তিমাবস্থায়। আর সেখান থেকে সহজে উদ্ধার পাবার কোন উপায় আছে কি না সন্দেহ। উদ্ধার পাবার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম—কিন্তু কলকাতার ফুটবল এবার যে আবর্তের মধ্যে পড়েছে তা থেকে চট করে বেরিয়ে আসাও বোধ হয় এক রকম অসম্ভবই।

অঘটনের শুরু কলকাতার লীগ ফুটবল আরম্ভ হবার আগে থেকেই। আই এফ এ-র তুঘলকী সিদ্ধান্তে লীগ ফুটবলকে ভেঙে ভাগ করা হলো। বন্ধ হয়ে গেলো ফিরতি লীগের খেলা। চালু হলো সুপার লীগ প্রথা। সত্যি কথা বলতে কি আই এফ এ-র এই সিদ্ধান্তকে কলকাতার লীগ ফুটবলের ইতিহাসে একটি [illegible] অঘটন বলা যেতে পারে। আর এই নয়া ব্যবস্থা নিয়ে আই এফ এ ক্লাব কর্তৃপক্ষ আর জনসাধারণের মধ্যে যে টালবাহানা চলেছিলো তার তুলনা মেলা ভার। তবু শেষ পর্যন্ত শুরু হলো কলকাতার ফুটবল লীগ। আর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এক সময় শেষও হলো লীগ ফুটবলের প্রথম ভাগের খেলাগুলো। ঠিক ছিলো আই এফ এ শীল্ডের খেলা শেষ হয়ে গেলে বসবে সুপার লীগের আসর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবার এসেছে বাধা।

আর এ বাধার দৌড় অনেক দূর পর্যন্ত গড়ালো। আইন-আদালতকেও টেনে আনা হলো খেলার মাঠে। অচলাবস্থা সৃষ্টি হলো কলকাতা ময়দানে। ময়দানী ফুটবলের ইতিহাসে ঘটতে লাগলো একের পর এক নয়া অঘটন। আইন-আদালত এর আগেও হয়তো ময়দানে এসে হাজির হয়েছে কিন্তু আদালতের হুকুমে আর আইনের দোহাই দিয়ে মাঝ পথে খেলা বন্ধ করে দেবার নজীর বোধ হয় খুব একটা বেশি নেই। এখানেও কিন্তু [illegible] হলো না। শনির দশা পড়লে যা হয় আর কি! এর পর ইস্টবেংগল আর মহামেডান স্পোর্টিং-এর শীল্ডের [illegible] নিয়ে বাধলো গোলমাল। এই গোলমালের জন্যে এক দিক দিয়ে অবশ্য আই এফ এ কর্তৃপক্ষকেও দায়ী করা [illegible] যে তাঁরা বারবার টিকিটের প্রসংগ টেনে এনে খোঁচিয়ে ঘা করলেন কে জানে! কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের [illegible] ইস্টবেংগলের দাবিই।

তবে গোলমালটা এবার এগুলো আরো খানিকটা। শেষ মুহূর্তে আই এফ এ রাজী হলেন ইস্টবেংগলের চাহিদা মতো টিকিট দিতে। কিন্তু অল্প সময়ে অতো টিকিট বিক্রি করা [illegible]—এই অজুহাতে ইস্টবেংগল টিকিট নিলো না। আর খেলার দিন মহামেডান দল এলো মাঠে। এলেন রেফারী আর [illegible]ও। কিন্তু ইস্টবেংগল এলো না। আর শেষ পর্যন্ত ইস্টবেংগলের [illegible] আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা থেকে ইস্টবেংগল [illegible] হয়ে গেলো। শেষ পর্যন্ত কি হবে কে জানে। তবে [illegible] চালু হয়েছে। কিন্তু সময়ও [illegible] গড়িয়ে গেলো। [illegible] অক্টোবর মাস। তখন পনেরো দিনের জন্যে বন্ধ হয়ে [illegible] ময়দানের সব খেলাধুলা। তাই [illegible] খেলার ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত যে কি আছে কে জানে। তবে শনির দশায় ময়দানী ফুটবলের [illegible] হবে [illegible] এই [illegible] কল্পনা করাও [illegible]।

—[illegible]

ইংলণ্ডের ডলিভিয়েরাকে কেন্দ্র করে ক্রিকেট নাটকটা এখন বেশ জমে উঠেছে। তবে এই জমাটি নাটক এখন এসে উপস্থিত হয়েছে শেষ পর্যায়ে। আর যতোদূর দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় যে শেষ পর্যন্ত হয়তো বা এম সি সি-র দক্ষিণ আফ্রিকা সফর বাতিল হয়ে যাবে।

তবে ডলিভিয়েরাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ আফ্রিকার তীব্র বর্ণবৈষম্যনীতির সমর্থন আর ইংলণ্ডের এক শ্রেণীর লোকের এই বৈষম্য নীতির পৃষ্ঠপোষকতা বেশ স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে। তাই ইংলণ্ডেও উঠেছিলো প্রতিবাদের ঝড়।

শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ, এম সি সি-কেও জনমতের রায়ে সায় দিতে হলো। ককরাইটের জায়গায় এম সি সি ডলিভিয়েরাকে দলভুক্ত করলেন। এ খবরে শুধু মাত্র ইংলণ্ড নয় সমস্ত ক্রিকেট বিশ্বে এলো আনন্দের জোয়ার।

কিন্তু এই অভাবনীয় সংবাদে হতবাক করে দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী আর বর্ণবৈষম্য নীতির গোঁড়া সমর্থক ফরসটার সাহেব আবার নতুন করে মুখ খুললেন।

কিছুদিন আগে তিনি বলেছিলেন যে সাংবাদিক হিসেবে এলেও ডলিভিয়েরাকে এম সি সি দলের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ করতে দেওয়া হবে না। বাধা দেওয়া হবে তাঁকে।

ফরসটার সাহেবের এই কথা শুনে ইংলণ্ডে তখন উঠেছে আর এক দফা প্রতিবাদের ঝড়। কয়েকটি সংবাদপত্র একযোগে তুললো এম সি সি দলের দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণের প্রস্তাব বাতিল করার দাবি।

ডলিভিয়েরাকে ঘিরে যখন ব্যাপার গরম হয়ে উঠলো তখনই এম সি সি কর্তৃপক্ষ তাঁকে করলেন দলভুক্ত। অবশ্য আগেই বলা হয়েছিলো যে কোন খেলোয়াড় ভ্রমণে অসমর্থ হলে তাঁর জায়গায় ডলিভিয়েরাকেই নেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত হিসেবও হলো তাই। ককরাইট অসমর্থ হওয়ায়, এম সি সি দলভুক্ত হলেন দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনে জন্ম যাঁর— সেই বর্ণসঙ্কর ডলিভিয়েরা।

আর ডলিভিয়েরার এম সি সি দলভুক্ত হবার সংবাদ শোনার পর দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী মিঃ বি জে ফরসটার প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে ডলিভিয়েরা দলে থাকলে এম সি সি-কে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করতে দেওয়া হবে না।

ফরসটার সাহেব আরো বলেছেন যে

॥ ডলিভিয়েরা ॥
শেষ পর্যন্ত ডলিভিয়েরার প্রশ্নে এম সি সি-র দক্ষিণ আফ্রিকা সফর বাতিল হয়ে যেতে বসেছে।

বৃটিশ ক্রিকেট দলটা প্রকৃতই এম সি সি দল নয়। দলটিকে তিনি বর্ণবৈষম্য-বিরোধী আন্দোলন উদ্ভূত একটি দল বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে রাজনীতিতে যারা দক্ষিণ আফ্রিকার শত্রু তারাই এইভাবে দল নির্বাচন করে। এমন একটি দলকে দক্ষিণ আফ্রিকার ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করা হলে তাঁরা তা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না।

তাই মনে হয় অবস্থা এখন যে পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে এম সি সি ক্রিকেট দলের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর বোধ হয় বাতিলই হয়ে যাবে। এম সি সি এখন দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট এসোসিয়েশনের বক্তব্য শোনার জন্যেই অপেক্ষা করে আছে।

ময়দানের ভাঙা হাটে আবার ফুটবলের আসর জমে উঠবে বলে মনে হচ্ছে। আই এফ এ শীল্ডের চতুর্থ রাউণ্ডে উয়াড়ী আর বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের খেলাটা মাঝ পথে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো—রাজস্থান ক্লাব খেলা বন্ধের জন্যে আদালতে আবেদন করায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজস্থান ক্লাব তাদের মামলা তুলে নিয়েছে।

তাই আই এফ এ শীল্ডের খেলাগুলোকে কেন্দ্র করে কলকাতার ময়দান ফুটবলানন্দে আবার মেতে উঠেছে। আবার আনন্দ-হাসি-গানে ময়দানের আকাশ-বাতাস হয়ে উঠছে মুখরিত।

শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলকে আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা থেকে স্ক্রাচড

করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই খেলাটির বিষয় চট করে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি আই এফ এ কর্তৃপক্ষ। অথচ

বিশেষ ঘোষণা

আগামী ১২ই অক্টোবর শনিবার মেক্সিকো শহরে বসবে ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান। ক্রীড়াজগতের এই মহোৎসব উপলক্ষে সাপ্তাহিক বসুমতীর ১০ই অক্টোবরের সংখ্যাটি অলিম্পিক সম্বন্ধে লেখায়, রেখায় আর আলোকচিত্রে সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হবে।

অলিম্পিকের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই সংখ্যায় লিখবেন—

অজয় বসু, আরবি, মুকুল দত্ত, পুষ্পেন সরকার ও শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই খেলাটার বিষয় নিয়েই ক্রীড়ারসিক-মহল আজ আলোচনায় মুখর।

ওদিকে আবার সুপার লীগের খেলার আসরও বসছে। আর আই এফ এ কর্তৃপক্ষও ঘোষণা করেছেন যে খেলাগুলো নির্ধারিত সূচী অনুযায়ীই হবে। হলেই ভালো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি যে হবে কে জানে।

সুপার লীগে খেলবে এ বছরের লীগ ফুটবল তালিকার ওপরের চারটি দল—মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং আর এরিয়ান্স।

এখনো পর্যন্ত যা ঠিক আছে তাতে সুপার লীগ খেলার সূচী নিম্নরূপ। তবে এ লেখা যখন আপনাদের হাতে পৌঁছবে তখন হয়তো সুপার লীগের অর্ধেক খেলাই হয়ে যাবে—অবশ্য যদি ঠিকভাবে হয়।

এখন আর অলিম্পিক আসছে বললেই বোধ হয় চলবে না। বরং বলতে হবে—অলিম্পিক এসে গেলো। অলিম্পিক প্রাঙ্গণের সাজসজ্জা এখন সম্পূর্ণ। দেখতে দেখতে জম জম করে উঠবে অলিম্পিক গ্রামও।

শীল্ডের খেলা শিকেয় উঠলো।

এ বছরের আই এফ এ শীল্ডের খেলা বোধহয় শেষ পর্যন্ত শিকেয় উঠবে। রাজস্থান ক্লাবের সংগে গোলমালটা, মুখে চুণকালি মেখে আই এফ এ কর্তৃপক্ষ মিটিয়ে নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু এবার ঘা পড়েছে আরো বড় জায়গায়। ইস্ট-বেঙ্গল নেমেছে এবার আদালতের আসরে। কিন্তু কলকাতা ময়দানের হলোটা কি? আইন-আদালতই এবার বোধহয় গড়ের মাঠে জাঁকিয়ে বসবে..... ....;

শুধু তাই নয়। গত সপ্তাহ থেকে অলিম্পিক গ্রামে আরম্ভ হয়ে গেছে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান। নিউজিল্যাণ্ড আর অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধিদের সংগে

॥ অলিম্পিক আসছে ॥

আগামী ১২ই অক্টোবর মেক্সিকো অলিম্পিকের উদ্বোধনী দিন। আনন্দে উদ্বেলিত মেক্সিকো এখন সেই দিনটির প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটা স্টেডিয়াম আর তার পাশে অলিম্পিক গ্রাম। ছবির ভেলোড্রোমটিতে অনুষ্ঠিত হবে সাইকেল রেস প্রতিযোগিতা।

চেকোশ্লোভাকিয়ার অ্যাথলেটরাও তুলে-ছেন নিজের দেশের পতাকা।

কিন্তু মেক্সিকোর অলিম্পিক গ্রামে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানের অভিষেক হয়েছে চোখের জলে। চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিনিধিরা নিজেদের পতাকা তোলার সময় দেশের কথা ভেবে কেঁদে ফেলে-ছিলেন।

মেক্সিকো শহর আর অলিম্পিক গ্রাম দেখতে দেখতে আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছে। দেশ-বিদেশের সেরা প্রতিযোগীরা এখন আসছেন মেক্সিকোয়। কিন্তু অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় পদক লাভ করাই সকলের লক্ষ্য নয়—প্রতিযোগিতায় যোগদান করাই আসল।

ভারতীয় প্রতিযোগীরাও যাবেন কিছুদিনের মধ্যেই। ভারতীয় অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশন আর নিখিল ভারত স্পোর্টস কাউন্সিলের মধ্যে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী প্রতি-যোগীর সংখ্যা নিয়ে যে টালবাহানা চলছে তা মিটে গেলেই বোধহয় ভারতীয় প্রতিযোগীরা যাবেন মেক্সিকোর পথে।

ভারতীয় হকি দল তো বেশ কিছু-দিন আগেই যাত্রা করেছে। মেক্সিকো যাবার আগে ভারতীয় দল এখন সফর করছে কয়েকটি দেশ। অল্প [illegible] মধ্যেই তারা গিয়ে হাজির হবে মেক্সিকোয়।

এম সি সি কি ভারতে আসবে

এম সি সি কি শেষ পর্যন্ত ভারত ভ্রমণে আসবে? সেই রকমই একটা প্রস্তাব এসেছে এম সি সি-র কাছ থেকে। যদি দক্ষিণ আফ্রিকা সফর বাতিল হয়ে যায় তাহলে এই শীতে এম সি সি ভারত কিম্বা পাকিস্তানে আসতে পারে। প্রস্তাবটা এখন ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীনে। পাকি-স্তান কিন্তু এম সি সি-র প্রস্তাবে সমর্থন জানাতে দেরি করে নি। তবে ভারত যদি কুড়ি হাজার পাউন্ড গ্যারান্টি হিসেবে দিতে রাজী থাকে তাহলে এম সি সি ভারতেই আসবে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়।

রাজকুমারী ইয়াদভিগার সম্মানে মহাভোজ

দক্ষিণ জার্মানীতে ল্যান্ডশাট একটি ছোট্ট গ্রাম, কিন্তু প্রতি তিন বছর অন্তর গ্রীষ্মকালে এখানে এক জমকালো অনুষ্ঠান হয়।

পাঁচশো বছর আগে এখানে ব্যাভেরিয়ার ডিউক জর্জের সঙ্গে পোল্যান্ডের রাজকুমারী ইয়াদভিগার বিয়ে হয়েছিল। স্থানীয় লোকেরা আজও ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণ করে নানারকম আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে। ঘটনার দুই প্রধান পাত্র-পাত্রীকে নির্বাচিত করা হয়: যিনি ডিউক সাজেন তিনি হবেন ছিপছিপে [illegible] এবং অশ্বারোহণে পটু। আর যাকে রাজকুমারী সাজানো হয়, তাকে মনোনীত করা হয় কোন সম্ভ্রান্ত বংশ থেকে যার চুল হবে কালো, রূপে গুণে সে হবে অসামান্যা।

এদের নিয়ে যে শোভাযাত্রা বেরোয়, তা দেখতে দেশবিদেশ থেকে লোক ছুটে আসে। শোভাযাত্রায় দেখানো হয় মধ্যযুগের নাইটদের মল্লযুদ্ধ, দেহরক্ষী ও নগর আরক্ষাবাহিনীর কুচকাওয়াজ। তারপর চলে অফুরন্ত খানা-পিনার সমারোহ। তবে ১৪৭৫ সনের আসল বিয়েতে যে ভূরিভোজের আয়োজন হয়েছিল, তার নাগাল পাওয়া এখন আর কোন মতেই সম্ভব নয়। নিমন্ত্রিত অতিথিরা সেই বিবাহে খেয়েছিলেন কম করে ৩৩টি ষাঁড়, ৪১০টি বাছুর, ৭,০০০টি শূকর, ৪০,০০০টি মুরগী ও ১২টি হাঁস।

এ [illegible]। [illegible] সেই দৃশ্যের ছবিই দেখা যাচ্ছে ওপরে।

আসাম)

প্রশ্ন : খেলাধুলোর ওপর একটা জোক শোনাবেন ?

উত্তর : কি মুশকিল এতো কথার পর এই প্রশ্ন? আপনার চিঠিটাই যে একটা জোক। তবু শুনুন—তবে আগে থেকেই বলে রাখি ঘটনাটা সত্যি কি না জানি নে। মাঠে শুনেছি।

মিলখা সিং সেবার অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় বেশ ভালো রেজাল্ট করেছিলেন। হিটের পর ক্লান্ত মিলখা শুয়ে বসে রিলাক্স করছিলেন।

সেই সময় প্রতিযোগীদের অনেকা সাহায্যকারিণী এসে জিজ্ঞেস করলেন, “আর ইউ রিলাক্সিং (ঠিলাক্সসিং)?”

মিলখা থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “নো, নো—আই এ্যাম মিলখা সিং......!”

অরবিন্দ পালিত (ডাঃ কে· ডি মুখার্জী রোড, কলকাতা—৬০)

উত্তর : ধন্যবাদ! আপনার চিঠির কিছু অংশ তুলে দিলাম।

* * গত ১৩শ সংখ্যায় আপনার প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে ১৯০১ সালে বয়েল আইরিশ দল কোন খেলায় পরাজিত না হয়ে এবং কোন গোল না খেয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলো। ফলাফল নিম্নরূপ—

খেলা—১৪, জয়—১৪, পরাঃ—০, ড্র—০, স্বঃ ৪৫, বিঃ—০, পয়েন্ট২৮। (চিঠির অংশ তুলে দেওয়া হলো)

মনোরঞ্জন দাস, তারকনাথ দাস, রবীন্দ্রনাথ হালদার (হিগলগঞ্জ, ২৪ পরগনা)

উত্তর : টেস্ট ক্রিকেটে পাঁচ হাজার রান অনেকেই করেছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম দেওয়া হলো। সকলের ব্যাটিং এ্যাভারেজ দিতে গেলে অনেক জায়গা লাগবে যে—ইংলণ্ডের—হ্যামণ্ড, হাটন, কম্পটন, হবস, কাউড্রে, ব্যারিংটন প্রমুখ।

অস্ট্রেলিয়ার—ব্রাডম্যান, হারভে প্রমুখ।

ওঃ ইণ্ডিজ—সোবার্স প্রমুখ।

হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র (শিলিগুড়ি, সুভাষপল্লী)

প্রশ্ন : বর্তমানে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় কে ও তাঁর এ্যাভারেজ জানতে চাই।

উত্তর : কোন্ বিভাগে—ব্যাটিং না বোলিং...... ?

পরিতোষ নাগ (বেলাকোবা প্রসন্ননগর জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : ভ্যালেনটাইন, ওরিলী ও এ্যালেক বেডসারের বোলিং এ্যাভারেজ জানতে চাই

উত্তর

	টেস্ট	রান	উইকেট	গড়
ভ্যালেনটাইন	৩৬	৪২১৫	১৩৯	৩০·৩২
ও'রিলী	২৭	৩২৫৪	১৪৪	২২·৫৯
এ, ভি, বেডসার	৫১	৫৮৭৬	২৩৬	২৪·৮১

আপনি আর একজন কার যেন নাম লিখেছেন—ঠিক বুঝতে পারলাম না)।

আমরা সাধারণত চেষ্টা করে থাকি সব চিঠিরই জবাব দিতে। তাই মাঝে মাঝে খেলোয়াড়রা কি খেতে ভালোবাসেন সে প্রশ্নেরও জবাব দিতে হয়।

প্রদীপ (পাঁচু) ও রঞ্জন ঘোষদস্তিদার (লালপুর, বর্ধমান কম্পাউণ্ড, রাঁচি)

প্রশ্ন : হকি ছাড়া ভারত এখন কোন খেলাতে উন্নতি করছে?

উত্তর : টেনিসে!

অরুণ গুহকর্মকার (তেজগঞ্জ বর্ধমান)

প্রশ্ন : আজ পর্যন্ত কোন বাঙালী খেলোয়াড় ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ও সহ-অধিনায়ক হয়েছেন ?

উত্তর : পংকজ রায়—ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক আর সহ-অধিনায়ক হবার সম্মান লাভ করেছেন।

সোমনাথ গাঙ্গুলী, দেবাশীষ গাঙ্গুলী ও খগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (ঋষি বঙ্কিম-চন্দ্র কলেজ, নৈহাটি, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : বর্তমানে ভারতীয় ফুটবলের নিম্নমানের কারণ কি?

করেছে।

মারডেকা ফুটবলে ভারত কোনবারই বিশেষ সাফল্যলাভ করতে পারে নি।

সাপ্তাহিক বসুমতীর খেলাধুলো বিভাগটা আপনাদের ভাল লাগে জেনে উৎসাহিত হয়েছি।

গৌর, খোকা, অনুপ, শুভ ও বাবুল (লক্ষ্মীনারায়ণ কলোনী, গড়িয়া, কলকাতা-৪৭)

প্রশ্ন : এবারকার মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় কোন্ কোন্ ভারতীয় খেলোয়াড় খুব ভাল খেলেছেন ?

উত্তর : নঈম, ইন্দার সিং আর সি প্রসাদ যখন অলন্টার দলে চান্স পেয়েছেন—তখন ও'দের তিনজনের কথাই বলতে হবে।

সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ইউনিক পার্ক, কলকাতা-২৪)

উত্তর : দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে খেলাগুলোর রেকর্ডকে আন্তর্জাতিক রেকর্ড হিসেবে ধরা হয় না। আর ডলিভিয়েরা সম্বন্ধে আপনি য লিখেছেন তা ঠিক নয়। আশা করি এতোদিনের এতো লেখা-টেখা পড়ার পর আপনার ভুল ভেঙেছে। আপনাকে সাপ্তাহিক বসুমতীর গত সংখ্যায় আজকের মানুষ বিভাগে ডলিভিয়েরা সম্বন্ধে লেখাটা পড়তে অনুরোধ করি।

নির্মলকুমার ঘোষ (গোমস্তাপাড়া, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : সর্বপ্রথম কোন বাঙালী কমনওয়েলথ রাইফেল প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন ?

উত্তর : আমার ঠিক জানা নেই। কারো জানা থাকলে জানালে খুশি হবো।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সম্পাদিকা জয়ন্তী সেন

সাপ্তাহিক বসুমতী

৭৩ বর্ষ ঃ ১৬শ সংখ্যা—মূল্য ঃ ৩০ পয়সা | বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা | PRICE : 30 Paise

বৃহস্পতিবার, ২৩শে আশ্বিন, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ | Thursday, 10th October, 1968

গান্ধী জন্ম-শতবর্ষের সূচনা

মহাত্মা গান্ধী জন্ম শতবার্ষিকী সুরু হলো। এই জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান ১৯৬৯ সালের ২রা অক্টোবর বা তারো বেশি সময় পর্যন্ত চলবে। কেবলমাত্র ভারত ভূখণ্ডেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র পালিত হবে ভারতাত্মা গান্ধীজীর জন্ম-শতবার্ষিকী।

গান্ধীজী সম্বন্ধে বুদ্ধিজীবীমহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার অভাব আজো নেই। এবং বুদ্ধদেব ও শ্রীচৈতন্যের মতো অহিংসার বাণী শুধুমাত্র মুখের কথায় প্রচার করে নয়, তা জীবনাদর্শে প্রতিফলিত করেও তিনি দেখিয়ে গেছেন [illegible] মাত্মা বলহীনেন লভ্য। তাই গান্ধীজীর পক্ষে রবীন্দ্র-নাথের ভাষায় বলা সম্ভব ছিল ঃ আমার জ[illegible]নে [illegible] জাগো রে সকল দেশ

[illegible] কথা হলেও গান্ধীজীর জন্ম[illegible] বার্ষিকী অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে বলতে হয় [illegible] আখ্যারূপে আমরা যাঁকে গ্রহণ করেছি, যাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যবৃন্দ কর্ণ-ধাররূপে দেশের শাসনভার গ্রহণ করছেন, তাঁদের কথাবার্তায় গান্ধীর নাম শতবার উচ্চারিত হলেও মহাত্মার আদর্শায়িত পথ থেকে ভয়ংকর করুণভাবে তাঁরা বিচ্যুত।

এই দেশে অহিংসার বাণী কোনো নতুন বস্তু নয়, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য পণ স্বীকার কিম্বা দেশের জন্য ত্যাগ বরণ ঊনবিংশ শতকেও ছিল, কিন্তু ঐসব চিন্তাধারার সঙ্গে বাস্তবতার যোগ ছিল সামান্য মাত্রই। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে এই মরণ পণ ধ্বনিতে গান্ধীজী ভারতীয় সমাজের সর্বস্তরে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। তবু ভারতের অর্ধনগ্ন বুভুক্ষু মানুষেরই তিনি শুধুমাত্র প্রতীক ছিলেন না, নিখিল বিশ্বমানবতার দুর্গের তিনি ছিলেন দুর্ভেদ্য প্রহরী। টলস্টয়ের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন চিন্তা-মুক্তির পথের সন্ধান; সেই সন্ধানেই দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষের জাল ভেদ করে তাঁর মহৎ কর্মজীবনের সুরু। আর তার সমাপ্তি কোটি কণ্ঠ নিনাদিত ভারতবর্ষে—যে ভারতবর্ষ এখন দ্বিজাতিতত্ত্বের শিকারে দ্বিখণ্ডিত।

স্বাধীনতা লাভের আগে মহাত্মাজীর সঙ্গে বহু স্বনামধন্য ব্যক্তিরই মতভেদ ঘটেছিল। সেই সঙ্গে এ কথাও সত্য যে, তার প্রতি তাঁদের আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। গ্রামময় ভারতের অন্তর্লোকে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন তিনি। আলোর দূতরূপে তিনি অশিক্ষিত ও নিরক্ষর মানুষের প্রাণে আশার আলো সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। এই কারণে মহাত্মার চিন্তাধারায় সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন যাঁরা দিতে পারেন নি তাঁরাও এই আলোর দূতকে ভালবাসতে পেরে-ছিলেন। গান্ধীজীর শিষ্যদের মধ্যে ধনিক সম্প্রদায় থাকলেও নিঃস্বদের তিনি ছিলেন একান্ত আপন জন। এবং রবীন্দ্র নাথের ভাষায়—

'এক জায়গায় আছে মোদের মিল—
গরিব মেরে ভরাইনে পেট
ধনীর কাছে হইনে তো হেঁট
আতংক মুখ হয় না কভু নীল।'

—ইত্যাদি।

গান্ধীজীকে ঘিরে আর একদল ভক্ত-গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল পরাধীন ভারতে যাঁরা গান্ধীমানসে প্রতিবাদহীন সম্পূর্ণ আস্থার পরিচয় দিয়েছিলেন। স্বাধীন ভারতের এঁরাই হলেন মুখ্য বা অর্ধমুখ্য কর্ণধার। স্বাধীন ভারত পরিচালনার ক্ষেত্রে উপযুক্ত মতামত যা গান্ধীজী পরবর্তীকালে দিয়েছিলেন তা এঁরা বর্জনের ইচ্ছা প্রকাশ না করলেও গ্রহণ করতে পারেন নি। সর্বাপেক্ষা বেদনার কথা, পরাধীন ভারতে গান্ধীজীর প্রাণ-হানির আশংকা ঘটে নি বরং তিনি দীর্ঘায়ুর আকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ করেছিলেন। এতদ্‌সত্ত্বেও এই মহামানবের রক্তে স্বাধীন ভারতের মৃত্তিকা [illegible] হয়েছিল।

কিন্তু ফলাফল কি দাঁড়িয়েছে? গান্ধীজীর অনুগামী শিষ্যরা পরবর্তে আত্মত্যাগের কতটুকুই বা নিদর্শন রাখতে পেরেছেন? এ দেশের সাধারণ মানুষই আজ সর্বাপেক্ষা শোষিত লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত। এ দেশের হরিজনকে এখনো ঘটি চুরির দায়ে প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়। গ্রামের মানুষের মধ্যে যে [illegible] তুলে ধরেছিলেন মহাত্মাজী সেখানে [illegible] ঘনীভূত অন্ধকার [illegible] কেন গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের চোখে স্বাধীনতা [illegible] মোহ ছিল [illegible] ছিলেন, দেশের সমগ্র মানুষকে স[illegible] সত্যিকারের মানুষ [illegible] ভিত গড়ে ছিলেন। [illegible] এক শ্রেণীর স্বার্থপর মানুষে[illegible] ধনের লালসায় সেই [illegible] আর পরিদৃশ্যমান নয়।

[illegible] তাই আমাদের অনুরোধ এখনো যদি একজনো মহাত্মাজীর [illegible] শিষ্য থাকেন তিনি দেশের মানুষের [illegible] আত্মত্যাগের নমুনা [illegible] শত-বার্ষিকীর একটি বছর। [illegible] যখন ক্রমাগত পু[illegible] নিভর করছে, তখন তিনি যেন প্রমাণ করতে পারেন, এই দেশের কল্যাণ নির্ভর করছে অনাহুত, অনিগৃহীত, অপাপবিদ্ধ অশোষিত দেশের সমস্ত মানুষের [illegible] পর। সেই কল্যাণেই গণতন্ত্রের সিদ্ধি, মহাত্মাজী প্রতিশ্রুত রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠা। তা নইলে স্বদেশ থেকে গান্ধী মতবাদ লুপ্ত হয়ে একদা সবর্মতী প্রচার মাহাত্ম্যে হয়তো বিদেশেই গান্ধীজী কিম্বদন্তী হয়ে স্মরণীয় থাকবেন। গান্ধী জন্ম শতবর্ষে আমাদের উদ্দেশ্য কি হবে তাই।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

আধুনিক পৃথিবী খুব বেশি দুর্ধর্ষ লোকের জন্ম দেয় নি। আজকের পর্তুগাল আয়তনে ছোট হলেও অর কৃতিত্ব এখানে যে, সে একজন দুর্ধর্ষ নায়কের জন্মদাত্রীর গৌরব অর্জন করেছে। গত ছত্রিশ বছর ধরে পর্তুগাল ও সালাজার—এই দুটি নাম একাত্ম হয়ে ছিল। পর্তুগাল বলতে সালাজারকে বুঝেছে বিশ্ববাসী, সালাজার মানে পর্তুগাল। দীর্ঘ তিন যুগ ধরে আন্তোনিও দ্য অলিভিয়েরা সালাজারই ছিলেন পর্তুগালের প্রধানমন্ত্রী। অবশ্য পদটাই প্রধানমন্ত্রীর, আসলে তিনিই ছিলেন পর্তুগালের হর্তাকর্তাবিধাতা। সালাজার ডিক্টেটর।

মানুষের বিত্তসম্পদ, যশগৌরব সমস্তই তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে বলে কবি মানুষকে পার্থিব জিনিস সম্পর্কে সতর্ক করে গিয়েছেন। সালাজারের এখনও মৃত্যু অবশ্য হয় নি, কিন্তু তিনি মৃতবৎ, দু' সপ্তাহ ধরে তিনি অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। চিকিৎসক জবাব দিয়েছেন সালাজার যতই ক্ষমতা ও দাপটেরই অধিকারী হোন না কেন, এ ধকল কাটিয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না, কিংবা প্রাণে বেঁচে উঠলেও কোন কাজ করার শক্তি তিনি আর কখনই ফিরে পাবেন না। প্রধানমন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব তো নয়ই। কাজেই প্রেসিডেন্ট আমেরিকো দ্য দিউস রডরিগুস টোমাসকে প্রধানমন্ত্রীর পদের জন্যে নতুন লোকের সন্ধান করতে হয়েছে। সে লোক হাতের গোড়ায়ই ছিলেন অবশ্য—মার্সেলো সীটানো হলেন সালাজারের দীর্ঘকালের বন্ধু।

লিসবন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক ৬২ বছরের সীটানোকে তাড়াহুড়ো প্রধানমন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত করার পেছনে গভীর রাজনৈতিক কারণও রয়েছে। সালাজার ৩৬ বছর ধরে দেশে নিষ্পেষণের স্টীম রোলার চালিয়েছেন। শুধু তাঁর দেশেই বা বলি কেন, পর্তুগালের উপনিবেশগুলিতেও। অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক ইত্যাদি আফ্রিকার দেশগুলিতে বার বার রক্ত ঝরেছে। কোন প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক আন্দোলন সালাজার বরদাস্ত করেন নি, বেয়নেটের আঘাতে আঘাতে আন্দোলন গুঁড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। গোয়ায়ও সেই একই নারকীয় অত্যাচার-নিপীড়নের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। একমাত্র ভারত সরকারের বলিষ্ঠ নীতিই সালাজারের বিষদাঁত নড়িয়ে দিতে পেরেছে, গোয়াকে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছে। সালাজার পর্তুগালে দীর্ঘদিন ধরে একটা সন্ত্রাসের

মার্সেলো সীটানো

রাজত্ব কায়েম রেখেছিলেন, উদারনীতিক বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত তাঁর রোষের ভয়ে জুজু হয়ে ছিলেন।

সীটানো ক্ষমতালাভের ফলে দেশে কি নতুন হাওয়া বইতে শুরু করবে? বলা শক্ত। কারণ সালাজারের মত সীটানোও রক্ষণশীল, গোঁড়া ক্যাথলিক। দুজনের মধ্যে মিল যেমন, তেমনি গরমিলও অবশ্য রয়েছে। সালাজার ছিলেন অবিবাহিত, সীটানো বিবাহিত এবং চারটি বড় বড় ছেলেমেয়ে রয়েছে তাঁর। সালাজার পর্তুগালের চতুঃসীমা ছাড়িয়ে বিদেশ বড় একটা বেড়াতে যান নি, সীটানো বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন। তিনি নিজের ভাষা ছাড়াও ফরাসী ও ইংরেজী জানেন এবং এ ভাষাতে কথা বলেন। অন্যদিকে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগও আছে।

সীটানোকে তাড়াতাড়ি প্রধানমন্ত্রীর পদ দেওয়ার পেছনে রাজনৈতিক কারণ এই যে, প্রেসিডেন্ট টোমাস দেশে একটা গণ্ডগোলের আশঙ্কা করছিলেন। সরকারী নীতিতে যেমন একটা গুরুতর পরিবর্তনের কথা পর্যবেক্ষকরা আলোচনা করছিলেন, তেমনি সামরিক অভ্যুত্থানের কথাও কোন কোন মহলে শোনা যাচ্ছিল। সেজন্যেই সালাজারের সেরে ওঠার জন্যে অযথা অপেক্ষা না করে তাঁর জায়গায় নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হল।

কিন্তু সীটানো কেন, আর কি কোন লোক দেশে ছিল না? হয়ত ছিল, কিন্তু সীটানোর ওপর যতখানি ভরসা করা যায়, কর্তৃপক্ষ অতটা আস্থা হয়ত আর কারও ওপর স্থাপন করতে পারছিলেন না। সীটানো একাধারে চার্চ, সেনাবাহিনী এবং ব্যবসায়ীমহল অর্থাৎ দেশের দণ্ডমুণ্ডের আসল কর্তা যাঁরা—তাঁদের আস্থা অর্জন করেছেন। কারণ সীটানোই এতদিন ছিলেন সালাজারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে তাঁর সমস্ত নীতির থিয়োরিটিসিয়ান বা প্রবক্তা। সালাজার যে নীতির ওপর ভর করে এতদিন দেশ শাসন করেছেন, তার মূলে স্থপতি ছিলেন সীটানোই। তাই কর্তৃপক্ষ মনে করেন, সালাজারের অনুপস্থিতিতে একমাত্র সীটানোই সালাজারিজম—সালাজারবাদ বিশ্বস্ততা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে চালিয়ে যেতে পারবেন। বাস্তবিক সীটানো প্রধানমন্ত্রী হয়ে তাঁর প্রথম ভাষণেও উল্লেখ করেছেন যে, মৌলিক বিষয়ে নতুন সরকার কোন পরিবর্তন আনবে না, সালাজারের সব মন্ত্রীকেও স্ব স্ব পদে রেখে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে সীটানো উদারতা দেখাতে পারেন।

সীটানো ক্ষমতায় আসার ফলে ভারত কি পর্তুগালের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃসংস্থাপন করবে? সবই নির্ভর করছে সীটানো কী নীতি অনুসরণ করেন তার ওপর। তবে কিছুই একটা কিছু আশা না করাই ভালো।

ভিজিলেন্স কমিশন কর্তৃক সরকারী হাসপাতালে ভেজাল ওষুধ সরবরাহের দুর্নীতিচক্র আবিষ্কার / কমিশনের রিপোর্ট চাপা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য অধিকারের (হেলথ ডিরেক্টরেট) একজন উচ্চপদস্থ আমলার তৎপরতা

কাঁদর্শন

গভীর রাতে পুলিশের সাহায্যে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় কম্পিউটার মেশিন চালু / রাজ্যপালের ব্যক্তিগত দপ্তরে শুধু অবাঙালী / বিদ্যুৎ বন্ধে পল্লী জীবন বিপর্যস্ত / কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নরককুণ্ড /

পাঠক-পাঠিকাদের ‘বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাই। আশা করি পুজোর দিন কটা ভালই কেটেছে। বাঙালীর জীবনে দুর্গাপুজোর এই চারটি দিন একান্তই প্রত্যাশার সামগ্রী। সারা বছরের জীবনযন্ত্রণা শরতের নীলাকাশের বুকে শুভ্র পেঁজা সাদা মেঘের মতই যেন হাল্কা হয়ে ভেসে যায় পুজোর এই কটি দিনে। আর কোন উৎসব বাঙালীর জীবনে এতটা আবেগ সৃষ্টি করে না।

কিন্তু এবারের দুর্গোৎসব সকলের জন্য আনন্দের ডালি বহন করে নিয়ে আসে নি। পল্লীবাংলা বন্যায় প্লাবিত হয়ে গেছে এবং সেই জলমগ্নতার মাঝে মানুষে পুজোর আনন্দে সামিল হবার মত মানসিক অবস্থা অধিকাংশ মানুষের নেই। শিল্পপতিদের অতিরিক্ত মুনাফা-লোলুপতার জন্য শিল্পরাজ্যে মন্দা এসেছে এবং তার মাশুলটা উশুল করে নেওয়া হয়েছে শ্রমিকদের ছাঁটাই করে, লে-অফ করে। শত শত কারখানায় লক-আউটের পালা চলছে, হাজার হাজার শ্রমিক পুজোর আগেই বেকার হয়েছেন, অনশনই এখন তাঁদের সম্বল। যে কোন কারখানার সম্মুখে গেলেই দেখতে পাবেন বন্ধ দরজার সামনে ধর্মঘটী শ্রমিকেরা বসে আছেন। তাঁরা শুধুমাত্র প্রাণধারণের যোগ্য বেতন দাবি করেছিলেন, মালিক সেই দাবি মানার চেয়ে কারখানা বন্ধ করে দেওয়াই শ্রেয় মনে করেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা উনিশে সেপ্টেম্বর প্রতীক ধর্মঘট পালন করেছিলেন, এবং সরকারের তরফ থেকে এখন তার প্রতিশোধ নেবার পালা চলছে। হাজার হাজার কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হয়েছে। দমনমূলক ব্যবস্থা চরমে উঠেছে। ডাক-তার বিভাগে অচল অবস্থা চলেছে। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ধর্মঘটে সারা পল্লীবাংলা অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে। এই তো পুজোর দিনের চিত্র!

দেবী [illegible] হচ্ছে এই [illegible] উৎসবে অংশ গ্রহণ করতে অক্ষম হয়েছে। দেবীশক্তি একদা অসুরের বিরুদ্ধে [illegible], মহিষাসুরেরাই আজ দাপাদাপি করছে. তাদের বিষাক্ত নিশ্বাসে বাংলা দেশটা ক্রমে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। কবে যে দেবী সত্যই আবির্ভূত হয়ে এই অসুরদের নিধন করবেন, সেই প্রত্যাশা নিয়েই আমাদের বেঁচে থাকা. এ প্রত্যাশা কি আমাদের জীবনে পূর্ণ হবে?

মধ্যবর্তী নির্বাচন

নির্বাচন কমিশনার শ্রীসেনবর্মা নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করেছেন। আমরা বার বার বলেছি মধ্যবর্তী সাধারণ নির্বাচন যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল। তার কারণ এই নয় যে, নভেম্বরে নির্বাচন হলে যুক্তফ্রন্টের সুবিধা হবে, আর ফেব্রুয়ারীতে হলে কংগ্রেসের সুবিধা হবে। আমরা দ্রুত নির্বাচন দাবি করেছিলাম এই কারণে যে, কেয়ার-টেকার সরকার কোন সরকারই নয়। রাজ্যপালের যোগ্যতা সম্পর্কে কোনরূপ কটাক্ষপাত না করেই বলছি, রাজ্যপালের শাসনে দপ্তরগুলি কায়ক্লেশে কাজ চালিয়ে যেতে পারে মাত্র, কিন্তু কোন মৌলিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে না, সংবিধান সে অনুমতি দেয় নি।

প্রকৃতপক্ষে প্রায় এক বছর রাজ্যপালের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের থাকার একটিই তাৎপর্য দাঁড়িয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় এক বছর পিছিয়ে গেছে। অফিসগুলি চালু রাখতে যেটুকু খরচ লাগে তার চেয়ে এক পয়সা বেশি পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ করা হয় নি, এমন কি বন্যার মত জরুরী অবস্থাতেও কেন্দ্রের হাত দিয়ে একটি পয়সাও গলে নি। নির্বাচিত মন্ত্রিসভা থাকলে এটা ঘটত না। মনে আছে গত বছরে ত্রাণ-কার্যে রেকর্ড পরিমাণ ব্যয় করা হয়েছিল, এবং তা সম্ভব হয়েছিল বৈধ মন্ত্রিসভা [illegible] দেবার অধিকার বৈধ সরকার স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত রাজ্যপালের নেই। এই কারণেই আমরা দ্রুত মধ্যবর্তী নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিলাম।

কতিপয় সংবাদপত্র ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচনের জন্য ব্যাপক প্রচার অভিযান চালিয়েছিল। পণ্ডিতদের দ্বারা লিখিত প্রবন্ধ এবং অজস্র চিঠিপত্রও ফলাও করে ছেপে সেগুলির মারফত ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচন দাবি করা হয়েছিল এবং নানা ধরণের যুক্তিজালও বিস্তার করা হয়েছিল, যেমন বন্যা, ফসলকাটার সময়, পরীক্ষা ইত্যাদিক ওজর।

শ্রীসেনবর্মার বুকের পাটা আছে বলতেই হবে। বহু নেতার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শাসানি, কোন কোন পত্রিকার ফেব্রুয়ারীর পক্ষে ওকালতি এ সকল বিষয়কে তিনি অগ্রাহ্য করতে পেরেছেন। তাই নির্বাচনের দিন ঘোষিত হবার পরে কোন কোন পত্রিকা ক্ষেপে উঠে শ্রীসেনবর্মাকে গালিগালাজ করেছে। অনেক-ক্ষেত্রে সেই গালিগালাজ সভ্যতা ও শালীনতাকে পর্যন্ত অস্বীকার করেছে। দু-চারটে নিদর্শন দিলে হয়ত ভাল হত, কিন্তু অনাবশ্যক কাদা ঘেঁটে আর লাভ কি?

এদের চাবকানো হোক

সরকারী হাসপাতালগুলিতে যে ভেজাল ওষুধ সরবরাহ করা হয় এ বিষয়ে অনেকের মনে অণুমাত্র সন্দেহ না থাকলেও বিষয়টি প্রমাণ করা যায় না। মাঝে মাঝে দু-একটা কেস ধরা পড়ে, একটু চাঞ্চল্যেরও সৃষ্টি হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন কোন অফিসারের কৃপায় সেগুলি যথারীতি চাপা পড়ে যায়।

সম্প্রতি ভিজিল্যান্স কমিশন এইরকম একটি বড় ধরণের কেস ধরে ফেলেছেন। কমিশন সাত মাস আগে কোন একটি সূত্র থেকে খবর পান যে, সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্স থেকে সরকারী

মানের ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে। যদু হাসপাতালের ডাক্তার ভেজাল ওষুধ দেওয়া হচ্ছে বুঝতে পেরে স্বাস্থ্য দপ্তরকে তা জানান, কিন্তু প্রাক্তন স্বাস্থ্য-অধিকর্তার আমলে কার্যত যে আমলাটি সর্বেসর্বা ছিলেন, যাঁর কীর্তির কথা লিখতে আমরা কোনোদিন ক্লান্ত হই নি, সেই আমলা মহোদয়ের কারসাজিতে ব্যাপারটি চাপা পড়ে যায়।

স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে উপরে উল্লিখিত ডাক্তাররা বিষয়টি ভিজিল্যান্স কমিশনের নিকট উপস্থাপিত করেন এবং কমিশন ঐ ব্যাপারে বিশদ তদন্ত করে একটি দীর্ঘ রিপোর্টে মন্তব্য করেন যে, অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে, যারা হাজার হাজার রোগীর জীবন নিয়ে ছিনি-মিনি খেলছে তাদের কঠোর সাজা হওয়া উচিত, সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে।

কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা গেছে যে, সালফিউরিক এসিড, সোডিয়াম, ক্লোরোফর্ম, সোডি-বাই-কার্ব ও অ্যানাস্থেটিক এই পাঁচ শ্রেণীর ওষুধে ভেজাল দেওয়া হয়েছে, সোডি-বাই-কার্বের বদলে কাপড়-কাচা সোডা দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের সেন্ট্রাল স্টোর্স এবং বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার পর এই ভেজাল ধরা পড়েছে। একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান এই বিশেষ জিনিসগুলি সরবরাহ করে, এখান থেকে স্বাস্থ্য দপ্তর শুধু সোডি-বাই-কার্বই ক্রয় করেছিলেন ১৯৬৬-৬৭ সালে ২ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকার, '৬৭-৬৮ সালে ৬ লক্ষ ৯০ হাজার টাকার এবং '৬৮-৬৯ সালে ৮ লক্ষ টাকার। সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্স ওষুধ তৈরি করে না, বিভিন্ন কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে এ বিষয়ে টেন্ডার আহ্বান করা হয় এবং সেখানে একটি বিশেষ কোম্পানীই এই কন্ট্রাক্ট পায়। এর পিছনে কার হাত আছে সেকথাও ভিজিল্যান্স কমিশন উল্লেখ করেছেন।

ওষুধে ভেজাল সংক্রান্ত অভিযোগ পাবার পর স্বাস্থ্য অধিকর্তা সংশ্লিষ্ট কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্সের জন্য ওষুধ নেওয়া বন্ধ করেন। এতে সংশ্লিষ্ট অফিসারেরা, যাঁরা 'সুহৃদ ভাণ্ডারের' সভ্য হিসাবেই বেশি পরিচিত, ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং যাতে উক্ত কন্ট্রাক্টরের কাছ থেকে পুনরায় ওষুধপত্র কেনা হয় তার জন্য প্রাক্তন স্বাস্থ্য-অধিকর্তার আমলের কার্যত সর্বেসর্বা, আমলাটির নেতৃত্বে বর্তমান অধিকর্তার উপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। সেখানে সুবিধা করতে না পেরে, বাঁকা পথ তাঁরা রাজ্যপালকে রাজী করার চেষ্টা করেছেন। এমন কি 'সুহৃদ ভাণ্ডারের' নায়ক স্বাস্থ্য অধিকারের এই প্রভু আমলাটি ভিজিল্যান্স কমিশনের অভিযোগ সম্পর্কিত কাগজ-পত্র নষ্ট করে ফেলবার চেষ্টা করছেন বলে জানা গেছে।

নাটের গুরুটিকে আমরা দীর্ঘকাল ধরেই চিহ্নিত করে আসছি। এবারেও স্বাস্থ্য-অধিকর্তা পদে ডঃ সর্বাধিকারী আসার পর আমরা বঙ্গদর্শন মারফত এই আমলাটি ও তাঁর গ্রুপ সম্বন্ধে তাঁকে বারবার সাবধান করে দিয়েছি। ভিজিল্যান্স কমিশনের এই রিপোর্টের পর সংশ্লিষ্ট অফিসারদের বিরুদ্ধে কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় তা দেখার জন্য আমরা অবশ্যই অপেক্ষা করব। **মানুষের জীবন নিয়ে যারা অর্থের জন্য এভাবে ছিনিমিনি খেলতে পারে, তাদের নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত করা হবে না কেন? দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের আইন তেমন দৃঢ় নয়, আইনকে কার্যে পরিণত করার ভার যাদের উপর তাদের অধিকাংশই দুর্নীতিপরায়ণ এবং অনেকক্ষেত্রেই দুষ্কর্মের প্রশ্রয়দাতা। এইসব অফিসারেরা নিছক অর্থলোভে ঠান্ডা মাথায় এতগুলি রোগীকে ভেজাল ওষুধ সেবনে বাধ্য করেছে এবং কারো কারো মৃত্যুও ঘটিয়েছে, এদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হোক। শুনেছি, পাকিস্তানের মত দেশেও এই জাতীয় অপরাধের জন্য প্রকাশ্যে বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা আছে। আমাদের অহিংস মুলুকে বোধ হয় এদের পদ্মশ্রী দেওয়া হবে!**

বিদ্যুৎ কর্মী ধর্মঘট

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মীরা শেষ পর্যন্ত ধর্মঘটে নামতে বাধ্য হয়েছেন এবং দীর্ঘকাল ধরেই তা চালিয়ে যাচ্ছেন। যদিও বছরখানেকের বেশি সময় ধরে তাঁরা ধর্মঘটের হুমকি দিচ্ছিলেন এবং তাঁদের দাবিগুলির প্রতি কর্তৃপক্ষের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি থাকলে আজকের এই বিপর্যয় অনায়াসেই এড়ানো যেত।

বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্মীদের ধর্মঘটের ফলে সারা পল্লীবাংলায় গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছে। কলকাতা মহানগরী ছাড়া সারা বাংলায় কল-কারখানা, সিনেমা, হিমঘর, হাসপাতাল, গম পেষাই কল, গভীর নলকূপ, সবই অচল হয়ে পড়েছে। যে সব এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়েছে, তার মধ্যে আছে বারাসত, হাবড়া, মধ্যমগ্রাম, গোবরডাঙা, জয়নগর-মজিলপুর, ডায়মন্ডহারবার, মাথলা, চণ্ডীতলা, জনাই, আরামবাগ, তারকেশ্বর, খড়্গপুর, দীঘা, কাঁথি, হিজলী, ঝাড়গ্রাম, কল্যাণী, চাকদহ, ঘুম, কার্শিয়াং, হ্যামিল্টনগঞ্জ, কোচবিহার প্রভৃতি।

বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মীদের এই ধর্মঘটের জন্য দেশের লোককে দুঃসহ দুর্গতি অবশ্যই ভোগ করতে হচ্ছে, অথচ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মকর্তারা তথা সরকার এই ব্যাপারে একেবারেই নির্বিকার। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মকর্তারা সংবাদপত্রে বিশদ বিজ্ঞাপন দিয়ে একথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, কর্মীদের দাবিগুলি নাকি একেবারেই অযৌক্তিক। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেবার এই কৌশলটি বেসরকারী মিল-মালিকরাও রপ্ত করেছে। কিন্তু এগুলি একতরফা প্রচার। শ্রমিকপক্ষের বক্তব্য কি, তা জানার উপায় নেই বললেই চলে। ব্যয়সাধ্য বিজ্ঞাপন দেবার ক্ষমতা শ্রমিক শ্রেণীর নেই। ইউনিয়ন নেতাদের বিবৃতি অতি সংক্ষেপে ছাপা হয়, যার থেকে কোন সারবস্তু উদ্ধার করা যায় না। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কর্মীদের বিরুদ্ধে নাশকতার অভিযোগ আনা হয়েছে এবং তা ফলাও করে প্রকাশ করা হয়েছে। এই বিষয় সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের মন্তব্য বৃহৎ সংবাদপত্রে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে খুঁজে বার করতে হয়।

রাজ্যপালের শাসনে শ্রমবিরোধ ও অশান্তি গত বছরের রেকর্ডকে ভঙ্গ করেছে। যদিও এই অবস্থায় সংবাদপত্রসমূহে সোনা সোনা রব তোলা হয় নি গতবারের মত। ধর্মবীরের প্রশাসন সম্পর্কে অতিকথা সৃষ্টি বড় কম হয় নি। কিন্তু আইন ও শৃঙ্খলার যে গঙ্গাযাত্রা ঘটেছে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করার মত কোন কারণ নেই। গত বছরের তুলনায় লক-আউটের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। ছোট-বড়-মাঝারি সকল ধরণের কারখানাতেই তালা ঝুলছে, দুর্গাপুরে এই সেদিন যে অঘটনটা ঘটে গেল, সেটাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। খুন-জখম ও অপরাপর অপরাধের মাত্রা পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, রাজ্যপালের পুলিশও নিরীহ ব্যক্তির উপর প্রহারের নব নব কৌশল উদ্ভাবন করছে। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও পুলিশের হাতে মার খান এবং তার জন্য প্রশাসনিক স্তরে কোন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় না।

বিদ্যুৎ পর্ষদ কর্মীদের ধর্মঘটের কথায় আবার ফিরে আসা যাক। তাঁদের দাবি যে ন্যায়সঙ্গত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এমতাবস্থায় সরকারের কর্তব্য তাঁদের দাবির সবটা না পারুন, কিছুটা মেনে নিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা।

কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক

আমাদের সংবিধান প্রণেতারা ভেবেছিলেন যে, ভারতবর্ষ হয়ত চিরদিনই কংগ্রেসের শাসনে থাকবে, কেননা যখন
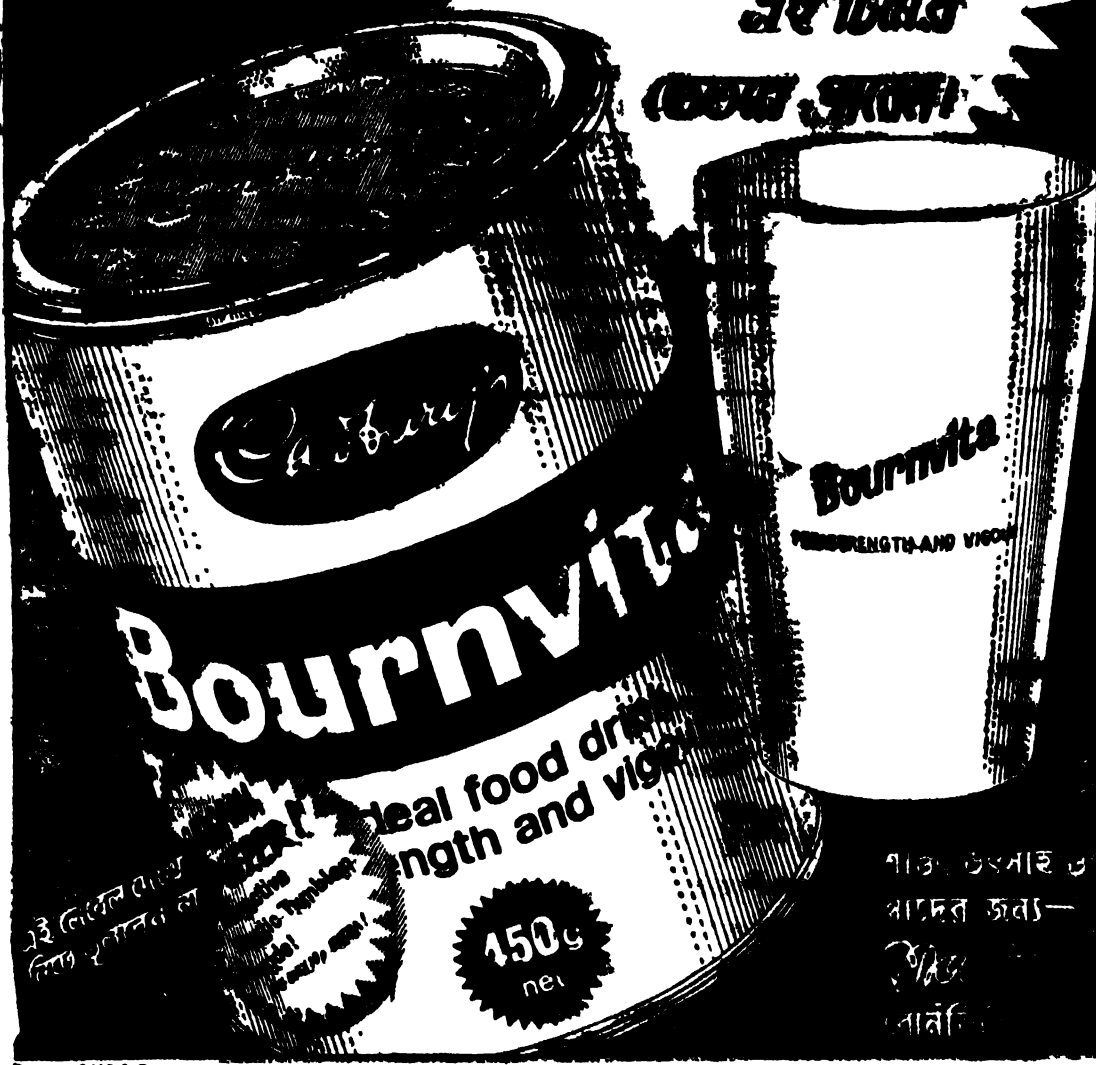
৫০ পয়সা লাভ!
স্টক থাকা পর্যন্ত
৬০ পয়সা দামের
সুন্দর প্লাস্টিকের গেলাস
এখন মাত্র ১০ পয়সায়
এই টিনের
Bournvita
STRENGTH AND VIGOUR
Bournvita
ideal food drink
ngth and vig
150g
net

সংবিধান রচিত হয়েছিল [illegible] ছিল জনপ্রিয়তার তুঙ্গে, আর তাছাড়া কংগ্রেসী শাসন যে সত্যই বন্ধ্যা হবে, এটাও তাঁদের মাথায় আসে নি। কাজেই কেন্দ্রে এবং রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন দলের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সমস্যাগুলি যে কোন্ কোন্ দিক দিয়ে আসবে, তা তাঁরা ভেবে উঠতে পারেন নি। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের ধর্মঘট উপলক্ষ করে কেরল সরকার ও নয়াদিল্লীর মধ্যে যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে, তাতে কেন্দ্র ও রাজ্যের সাংবিধানিক সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তোলার সময় উপস্থিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও এই সমস্যাটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলের রাজনৈতিক অবস্থাটাও অনেকটা একরকম। কেরল সরকার প্রায়-বামপন্থী, কিছুকাল আগেও পশ্চিমবঙ্গে প্রায়-বাম-পন্থী সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং আগামী অন্তবর্তী নির্বাচনের পর কি হবে তা বলা যায় না। অবশ্য অন্যান্য যেসব রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত আছে, সেগুলি চরিত্রের দিক থেকে কংগ্রেসের চেয়ে বিশেষ ভিন্ন নয়, কাজেই সেগুলির সঙ্গে কেন্দ্রের সংঘর্ষ আজও বাধে নি।

গতবারের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যুক্তফ্রন্ট সরকারকে খাদ্য সরবরাহের ব্যাপারে কেন্দ্র রীতিমত নাকিলাতি খাইয়েছিল এবং তাতে কিছুটা রাজ-[illegible] [illegible] [illegible] কালে পি-ডি-এফ আসলে কেন্দ্র বরং খাদ্য পাঠাতে বিলম্ব করে নি। রাজনীতি মানেই দলীয় রাজনীতি এবং এটাই স্বাভাবিক যে, কেন্দ্রে একটি দল এবং রাজ্যে আর একটি দল শাসন ক্ষমতায় থাকলে, কেন্দ্র যতটা পারবে রাজ্যগুলিকে ডিসক্রেডিট করার চেষ্টা করবে।

কংগ্রেসের একচেটিয়াত্ব ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে দূর হয়েছে, কালের স্বাভাবিক নিয়মেই। মনে রাখতে হবে যে, পঁচিশজন সদস্য ডিগবাজী খেলেই কেন্দ্রীয় সরকার উল্টে যাবে এবং আজকে এই সম্ভাবনাটা হেসে উড়িয়ে দেবার নয়। কাজেই পরিবর্তিত অবস্থার ভিত্তিতে সংবিধান নতুন করে প্রণয়ন করা বা তার আমূল সংশোধন করার প্রয়োজন ঘটেছে।

আসন্ন নির্বাচন

নির্বাচনের আর বিশেষ দেরি নেই, সতেরোই নভেম্বর দেখতে দেখতে এসে যাবে। তাই শারদোৎসবের পালা কাটতে না কাটতেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। বিভিন্ন দলের নেতারা নির্বাচনী প্রচারে ইতিমধ্যেই নেমে পড়েছেন, গ্রামাঞ্চলে জন-সভা শুরু হয়ে গেছে। দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার পড়তে শুরু করেছে। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মগুলি সাদা-কালো লেখায় ভরে উঠেছে, তবে এখনও পর্যন্ত সুরটা একটু হালকা। তবে আশা করা যাচ্ছে যে, [illegible] একটা রণাঙ্গনে পরিণত হবে।

আসল দ্বন্দ্বটা কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্টের মধ্যে এবং প্রধান প্রস্তুতিটা এই দুই দলেরই। জনসভা ইত্যাদি, এই দুই দলই আহ্বান করছে। বাকিগুলির কোন কর্মোদ্যোগ চোখে পড়ে না। এরা শুধু নিজে-দের অস্তিত্বটুকু কোনগতিকে ঘোষণা করেই ক্ষান্ত আছে। তার কারণ এসব দলে কর্মীর একান্তই অভাব। লোকদল বা জনসঙ্ঘ স্থানীয় অর্থবান কিছু কিছু লোককে প্রার্থী করেছে, অর্থাৎ তোমরা নিজের ভরসায় করে খাও, জিতলে কৃতিত্ব আমাদের, হারলে তুমিই হারলে। দু-একটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র ছাড়া, এসব দলগুলির সাফল্যের আশা নেই বললেই চলে, অন্তত বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করে মনে সেই ধারণাই জন্মায়।

এবারে নির্বাচন কমিশনার পাঁচ দফা আচরণবিধি পালনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে আহ্বান জানিয়েছেন যেগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে নির্বাচনী প্রচারকার্যে যেন সাম্প্রদায়িকতার আমদানী না করা হয়। এটি অত্যন্ত সময়োচিত নির্দেশ, কেননা গত নির্বাচনে চব্বিশ পরগনার একটি লোকসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বী উভয়পক্ষই এমন সাম্প্রদায়িকতার আমদানী করেছিলেন যাতে পাকিস্তানও লজ্জা পাবে। অনুরূপভাবে মুর্শিদাবাদ জেলার একটি লোকসভা কেন্দ্রে ও কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচন উপলক্ষেও চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িকতার আমদানী করা হয়েছে। যা মিথ্যা তাকে ভোটের লোভে সত্য বলে প্রচার করলে তার পরিণামটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তা আর আশা করি খুলে বলতে হবে না। কতিপয় মহা-মহোপাধ্যায় ব্যক্তি আছেন যাঁরা নিজেদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জিম্মাদার মনে করেন এবং সেটাকেই তুরুপের তাস মনে করে রাজনৈতিক বার্গেন করতে চান। এঁরা আবার দেশের বাইরে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েও "মানবতার স্বপক্ষে" বড় বড় কথাও বলেন। সুখের বিষয়, সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায় নিজেদের বিষয়টা নিজেরাই বুঝতে শিখেছেন, অন্তত কৃষ্ণনগরের উপনির্বাচন প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ব্যক্তি-বিশেষকে তোয়াজ না করেও সংখ্যালঘু ভোট পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, সাম্প্র-দায়িকতায় যাঁরা ক্যাপিটালিস্ট তাঁরা এবার কিছুটা 'আইসোলেটেড' হয়ে গেছেন, কংগ্রেস এবং যুক্তফ্রন্ট উভয় তাঁদেরকেই রেহাই দিয়ে।

আগামী সংখ্যায় বিভিন্ন দলের নির্বাচনী ইস্তাহার ও প্রচারের বিষয়-বস্তু তুলে ধরবার চেষ্টা করা হবে।

(৩।১০।৬৭)

গান্ধী-শতবার্ষিকী

সারা ভারতব্যাপী গান্ধী-শতবার্ষিকী উৎসব যখন শুরু হয়েছে তখন সারা ভারতব্যাপী হাজার হাজার কেন্দ্রীয় কর্মচারী ছাঁটাই ও তাদের ওপর নানা অজুহাতে ক্ষমতাবানের শাস্তির দণ্ড আন্দোলিত হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এতোবড় একটা ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেও ভারতের সাধারণ মানুষ কিঞ্চিন্মাত্র আন্দোলিত হচ্ছেন বলে মনে হয় না। একদিকে অহিংসা ও ক্ষমার মূর্ত-প্রতীক বলে বর্তমান ক্ষমতাসীন নেতাকুল (যাঁরা নিজেদের বাপুজীর বরপুত্র জ্ঞান করে থাকেন) কর্তৃক একবাক্যে স্বীকৃত গান্ধীজীর শতবার্ষিকী উৎসবের আয়োজন, অন্যদিকে সহস্রাধিক পরিবারকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে নিমজ্জন, এই পরস্পর-বিরোধী অতি চমকপ্রদ ঘটনা ঘটছে। ভারতের জনগণ প্রস্তরবৎ সাক্ষীগোপাল। ভারতের নেতারা বাণীসমুদ্রে অবগাহনরত আর প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর উপ-প্রধান সহযোগী বিদেশে ভ্রাম্যমাণ। গান্ধীজীর দুর্ভাগ্য, তাঁর বহু ঢক্কানিনাদিত শতবার্ষিকী এই ত্র্যহস্পর্শের অন্যতম স্পর্শকরূপে চিহ্নিত হয়ে রইল।

কর্মীদের যাঁরা নাচিয়েছিলেন, তাঁরা বর্তমানে চ্যবন সাহেবের করুণাভিখারী। এই শক্তি এবং ঐক্য সম্বল করে যাঁরা কর্মী ক্ষেপিয়ে বেড়ান তাঁদের দায়িত্বহীনতায় বিস্মিত না হয়ে পারি না। এঁরা এখন একদিকে চ্যবন সাহেবের কৃপা এবং অন্যদিকে কর্মীদের অকৃপণ শ্রদ্ধা দাবি করে বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন। আর এই ফাঁকে কম্পিউটার অটোমেশন তার জায়গা কায়েম করে নিচ্ছে। এ-সবের পরেও আবার বাংলা বন্ধের পরিকল্পনা ফাঁদা হচ্ছে। যত নির্বাচন কাছাবে ততই বন্ধ-ছন্দের আয়োজনও শুরু হবে। কিন্তু সরকার কঠিন মূর্তি ধারণ করলে যাঁরা তার মোকাবিলা করেন করুণাভিখারীর বেশে, তাঁদের ডাকে কি ঐসব বন্ধ আবারও তখনও সফল হবে! উদ্-বাসভাবের [illegible] এখন [illegible] তার। [illegible] কর্মীর আমাদের কর্তারা তো এখন শাসক-শোষক যা বলা যায়, তবে কেউ যে দেশদরদী ক্ষমার অবতার গান্ধী-শিষ্য নন, তা বলাই বাহুল্য। দেশের অবস্থা এবং হাল যা হয়ে এলো তাতে কর্ম অতঃপর কর্তার ইচ্ছায়ই হবে, কেন না ক্ষমতাহীন নেতারা লাউডস্পীকার মাত্র। ভরসা তাঁদের ওপর কর্মীসংসার আর রাখতে পারবেন কি। আপনি বাঁচলে বাপের নাম, ছেলের প্রাণ।

সুতরাং 'বন্ধ' আর হবে কি করে। শেষে কি যে-কটা বা মানুষ দুবেলা শ্রম-বিক্রয়ের সুযোগ পেয়েছে তাদেরও পথে বসানো হবে!

ইংরেজ রাজাও বিশেষ রাজানুষ্ঠান উপলক্ষে প্রজার ওপর ক্ষমা ও করুণা প্রদর্শন করতেন। আমাদের দিল্লীর মসনদাধীশরা কী গান্ধী-শতবার্ষিকী উপলক্ষে সরকারী কর্মীদের ওপর সামান্য প্রীতি-নিতে পারে না। বিদেশী রাজার কয়েদী পর্যন্ত মুক্ত করতেন, মেয়াদ কমাতেন হাজতবাসীর, স্বদেশী রাজারা ভোট-নির্বাচিত বলেই কি ততদূর অগ্রসর হতে লজ্জা পান! গান্ধী-শতবার্ষিকীর দিনগুলিকে এমনভাবে মসীলিপ্ত করায় অনেক ভারতবাসী হিসেবে যথার্থ আপত্তি জানাবার অধিকার দাবি করলে কি অর্ডিন্যান্সের খড়্গ চাপবে?
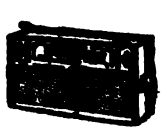
গান্ধী-শতবার্ষিকীতে অন্ধ্র প্রদেশীয় নৈবেদ্য

'রাম' 'রাম' আর 'হরিজন' 'হরিজন' এই মন্ত্র ছিল গান্ধীজীর কাছে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই অপরিহার্য। কিন্তু আমরা চিরকালই গান্ধীজীকে বাদ দিয়ে তাঁর প্রতিকৃতির প্রচার প্লাকার্ডটা বহন করে বেড়িয়েছি, তাঁকে রাজনীতির [illegible] হাট-বাজারে সচল টাকার মতো ঘুরিয়ে এবং ভাঙিয়ে মুনাফাবাজী ব্যবসা-চালিয়ে যাচ্ছি। তাই গান্ধী-শতবার্ষিকীর অন্তঃসারশূন্য ভড়ং-এর পরিচয় আরও প্রকট ও নিষ্ঠুরভাবে ধরা পড়ছে দেশের-এখানে-সেখানে।

অন্ধ্রপ্রদেশ (যেখানে গত ফেব্রুয়ারী মাসে অনেক হরিজন যুবাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল) গান্ধী-শতবার্ষিকীর উদ্বোধন একটি পঞ্চাশ বছরের পোড় হরিজনকে দা কুড়ালের আঘাতে নির্মমভাবে হত্যা করে। আহত হরিজনকে পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়ার সময় তার অচ্ছুৎ প্রাণবায়ু পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়। জীবন্ত হরিজন যুবাকে অগ্নিদগ্ধ করে মেরে ফেলার

[illegible] বিশ্ব বরাবরই গান্ধীজিকে বুদ্ধের পরেই শ্রেষ্ঠ ভারতীয় বলে গণনা করেছে।

কে কখন কবে কোথায় ঠিক আক্ষরিকভাবেই একথা বলেছেন সে প্রশ্নে যাই না গেলাম। এই বাগাড়ম্বরের প্রমাণ তো সেখানে নেই। আছে ইতিহাসে। অর্থাৎ ইতিহাস কোনদিনই বুদ্ধের পর গান্ধীর কথা বলবার দুঃসাহস প্রকাশ করবে না। কেন না ইতিহাসের হাতে ডিনামাইট নেই। সে মধ্যবর্তীকালকে অস্বীকৃতির দ্বারা উড়িয়ে দিতে পারে না। ইতিহাস দায়িত্বহীন উক্তির স্বচ্ছন্দ আনন্দেও মশগুল থাকতে পারে না। তা কালের দ্বারা, প্রতিটি মুহূর্তে জন্মক্ষণ দ্বারা অর্থাৎ সত্যের দ্বারা আবদ্ধ। বাগাড়ম্বরের ধোঁয়া দিয়ে সত্যের অপহ্নুতি সাধনের স্বাধীনতা ইতিহাসের নেই। সে-কারণ ভারতের প্রেমভক্তি শান্তির আদর্শ প্রচার ও সমাজ সংস্কার, অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রতি বর্ণহিন্দু বিদ্বেষের অবসান ও ধর্মীয় বিদ্বেষ প্রশমনের জন্য অক্লান্ত সাধনা—বুদ্ধের পর এই মানবিক চেতনায় যিনি পুনশ্চ অন্ধজনে আলোকদানের ব্রত নিয়ে ভারতভ্রমণে বার হয়েছিলেন, মিসেস গান্ধী না জানুন বিদেশী পণ্ডিত কারও পাণ্ডিত্যের এলাকায় তাঁর সংবাদ না পৌঁছে থাক। ইতিহাস তাঁকে বাংলার ভাববিপ্লবী সন্তান শ্রীচৈতন্য বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে বাধ্য। তারপর ভারতে যে ভাববিপ্লবের বন্যা বইতে শুরু করেছিল তারও জন্ম এই বাংলার সুজলা সুফলা মাটির উর্বরতায়।

বিনোবা ভাবেজী তাই গান্ধীজীকে যথার্থ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় স্থাপনা করে তাঁকে বাংলার মানসপুত্র বলে বর্ণনা করেছেন। ভাববিপ্লবের শুরু চৈতন্য যুগের পর রামমোহন বিদ্যাসাগরের যুগে এবং তারপর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ঐশ্বরিক সাধনার উত্তরাধিকারে। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এবং সর্বশেষে শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে ভাবেজী ভারতের বলবীর্য এবং প্রেমভক্তি সাধনার ধারাকেই প্রত্যক্ষ করেছেন—আর এই ধারাস্নানে অবগাহন করেই গান্ধী হয়েছেন ভারতের ভাবসাধনার ঐতিহ্যে মণ্ডিত রাজনীতির রূপকার। মিসেস গান্ধী বুদ্ধের পর গান্ধীকে স্বয়ম্ভূ বলে ভ্রান্ত প্রচার যদি কোথাও হয়ে থাকে তবে সেই ভুল শুধরে গান্ধীজীকে চৈতন্যময় ভারতের রাজনৈতিক ভাবমূর্তিরূপে ব্যাখ্যা করলে গান্ধীজীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হত না। মানুষের স্বাভাবিক ইতিহাসসম্মত বিকাশই বিশ্বাস্য সত্য। অন্যথা তা অন্তঃসারশূন্যতা কিম্বা বাগাড়ম্বর হিসেবে প্রত্যাখ্যাত হয়। ভাবেজীই গান্ধীজীর সত্যরূপকে যথার্থ ব্যাখ্যা করেছেন।

উত্তর-পূর্ব ভারতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ

আকাশবাণীর এক বিশেষ ঘোষণায় হঠাৎ জানানো হয়েছিল, আসামের ওপর দিয়ে ঘূর্ণি ঝড় ও বারিপাতের সম্ভাবনা ঘনীভূত হয়েছে। এই ঘোষণার পরে সেই ঝড়বৃষ্টি শুধু আসামকেই নয়, আসাম অতিক্রম করে পশ্চিমমুখো গতিতে উত্তরবঙ্গ ডুবিয়ে ভাসিয়ে তোলপাড় করে বিহারের কিষাণগঞ্জ পর্যন্ত তার তাণ্ডব নর্তন প্রদর্শন করে গেছে।

আসামের সঙ্গে রেলপথে দেশের অন্যান্য স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় এ পর্যন্ত শতাধিক নিহতের সংবাদ পাওয়া গেছে, জলের প্রচণ্ড আঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তিস্তা নদীর সেতু। দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং, শিলিগুড়ির অবস্থা শোচনীয়। বর্তমান বছরে এমন প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলার খবর আর শোনা যায় নি।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে চতুর্দিক ঘন অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। জলঢাকা পাওয়ার হাউসের দেওয়াল জলের তোড়ে ভেঙে পড়ায় দার্জিলিং জলপাইগুড়ি সম্পূর্ণ নিষ্প্রদীপ।

গিরিরাজ-কন্যা হিমালয় পাদদেশ কাঁপিয়ে দিয়ে ফিরে গেলেন।

(৫।১০।৬৮)

মেক্সিকোর পুলিশের বেদম প্রহারের ফলে আহত একটি যুবককে স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

মেক্সিকো ঃ

প্যারিস, বন, রোম, লণ্ডন, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ের পর মেক্সিকো ছাত্র আন্দোলনের চেউয়ে উত্তাল হয়ে উঠেছে। উত্তর মেক্সিকোর প্লাজা অফ থ্রি কালচারস-এ সেদিন ছাত্র-পুলিশে যে ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ হয়ে গেল মেক্সিকোর সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে তার কোন তুলনা নেই। মেক্সিকোর ছাত্র-পুলিশ লড়াইয়ের বৈশিষ্ট্য আছে। অন্যান্য দেশের ছাত্রেরা পুলিশের বিরুদ্ধে লড়েছে খালি হাতে বা বড় জোর ইঁট-পাটকেল বা হাত-

বোমা নিয়ে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছাত্রদের দেখা গিয়েছে আক্রমণাত্মক নয়, আত্মরক্ষামূলক ভূমিকায়। কিন্তু মেক্সিকোর ছাত্ররা পুলিশী আক্রমণের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণও করেছে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে। এ সংঘর্ষে শেষ পর্যন্ত জনকে প্রাণ দিতে হয়েছে, আহত হয়েছে কয়েকশ' আর গ্রেফতার হয়েছে দু' হাজারের উপর।

প্যারিসে যেমন এখানেও তেমনি বিক্ষোভটা প্রথম বাধে সামান্য বিষয় নিয়ে। প্রথমেই বাধে দু' দল ছাত্রের মধ্যে কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি মারামারি। পুলিশ এসে পড়ল অকুস্থলে। আর পুলিশ এলেই তো সর্বত্র বেদম প্রহার। এখানে প্রহারের মাত্রাটা এত বেশি হয়ে পড়েছিল যে, কয়েকজন ছাত্র নিহত হয় এবং বেশ কিছু ছাত্র আহত হয়। তার চেয়েও বড় কথা, মেক্সিকোর ইতিহাসে গত ৪০ বছরে যা হয় নি, পুলিশ এবার তাই করেছে। অর্থাৎ এখানকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে পুলিশ ঢুকে পড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি দখল করে নেয়, তার প্রতিবাদে সমস্ত ছাত্রসমাজ যেমন গর্জে উঠেছে, তেমনি অভিভাবকেরাও কিছুতেই পুলিশের এ বাড়াবাড়িকে বরদাস্ত করতে অস্বীকৃত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর জাভিয়ের ব্যারোস সিয়েরা তো পদত্যাগই করে বসলেন; এবং তাঁর দেখাদেখি সমস্ত অধ্যাপক।

মেক্সিকো সরকার অবিশ্যি বলেছেন যে, পুলিশকে এতটা যাবার অনুমতি দেওয়া হয় নি, তারা বাড়াবাড়ি করে হঠকারিতারই পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু সরকারী ঘোষণাটা বড্ড দেরিতে এসেছে, ইতিমধ্যে ছাত্ররা ক্ষেপে আগুন হয়ে গিয়েছে। তারা ছাত্র হত্যার বদলা নেবার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

স্বভাবতই সরকারকেও সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে। সতর্কতা প্রধানত এ জন্যে যে, এ ধরণের সরকার-বিরোধী আন্দোলন মেক্সিকোয় হাল আমলে হয় নি। এবং ছাত্র আন্দোলন যে, শেষ পর্যন্ত সরকার-বিরোধী গণ-আন্দোলনের রূপ নেবে তাও কেউ ভাবতে পারে নি।

সরকার সমস্যাটা নিয়ে আরো বিব্রত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন এ জন্যে যে, মেক্সিকো শহরে এবার ১৯তম অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে এবং এ বাবদে সরকার ইতিমধ্যেই ১৫ কোটি ডলার ব্যয় করে ফেলেছেন। অলিম্পিকের দৌলতে সরকারের কোটি কোটি ডলার মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হবে যা দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে বলে সরকার বিশ্বাস করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানটি যাতে মাঠে না মারা যায়, সে চিন্তায় সরকারের চোখে ঘুম নেই। কিন্তু তা হলে কী হবে, অলিম্পিক উৎসবের জন্যে যে জায়গাগুলো নির্দিষ্ট হয়েছে, ছাত্ররাও ঠিক সেই সেই জায়গাগুলোয় হাঙ্গামা বাধাতে সুরু করেছে।

স্বভাবতই বিভিন্ন দেশের অলিম্পিক কমিটি প্রধানদের মনে এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে এ হাঙ্গামা গণ্ডগোলের মধ্যে অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান করা যুক্তিযুক্ত হবে কি না। অর্থাৎ অনুষ্ঠানে যোগদানকারী এ্যাথলেটদের নিরাপত্তা যেখানে বিঘ্নিত হয়ে পড়েছে, সেখানে অলিম্পিক ক্রীড়ার অনুষ্ঠান করা বিবেচনাপ্রসূত হবে কি না এ নিয়ে অনুষ্ঠানের মাতব্বরদের বিস্তর ভাবনায় পড়তে হয়েছে। অবিশ্যি আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির কার্যকরী সমিতি এক জরুরী বৈঠকের শেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১২ই তারিখ থেকে অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান যথারীতি সুরু হবে।

কিন্তু ঘোষণা করলেই কি আর শান্তি শান্তি নিরুপদ্রবে ক্রীড়ানুষ্ঠান হতে পারছে? এখানে এক নতুন মুক্তি ফৌজের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এদের পেছনে নাকি গেরিলা যোদ্ধারা রয়েছে। এই সৈন্যদের পক্ষ থেকে বিদেশী আগন্তুকদের হুঁশিয়ারী দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের ময়দান থেকে দূরে থাকে। একটা স্বাক্ষরবিহীন বিবৃতিতে এ কথাও বলা হয়েছে যে, উৎসবের উদ্বোধন দিবসে সামরিক তৎপরতা দেখানো হবে এবং প্রত্যেক অনুষ্ঠানেই সামরিক আক্রমণ চালানো হবে। 'নিয়মতান্ত্রিক মুক্তি ফৌজের' পক্ষ থেকে এ দাবিও করা হয়েছে যে, তাদের দলে ছাত্র, কৃষক এবং শ্রমিকেরা রয়েছে এবং "অত্যাচারী সরকারের" বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ চালাবার জন্যেই এ গুপ্ত সংস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।

এ অবস্থায় সরকার এবং পুলিশ কঠোরতম নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবলম্বনের চেষ্টা অবশ্যই করছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়রা কি নিরাপদ বোধ করতে পারবেন? মেক্সিকো সরকার বা তার প্রেসিডেন্ট এতদিন প্রায় সমালোচনার ঊর্ধ্বে বলে বিবেচিত হতেন, তাঁর বিরুদ্ধে সংবাদপত্রগুলো পর্যন্ত তীব্র সমালোচনা করছে। এ পরিস্থিতিতে শান্তিতে বিশ্ব ক্রীড়ানুষ্ঠান করা সত্যিই কঠিন হবে না কি?

পেরু ঃ

'সামরিক অভ্যুত্থান' কথাটি যেন তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলতে বসেছে। আজকাল কোন একটা দেশে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে শুনলে খুব অল্প লোকই চমকিত হন, লোকে যেন ধরে নিয়েছে যে, সূর্যের উদয়-অস্তের মত সামরিক অভ্যুত্থানটিও একটা সাধারণ এবং স্বাভাবিক ব্যাপার, এতে অভিনবত্ব বা বিস্ময়কর কিছু নেই। কিন্তু মানুষের এ ঔদাসীন্য বা নিস্পৃহ মনোভাব সব দেশের ক্ষেত্রে কি খাটে। তা অবশ্যই খাটে না। বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ এমন কি চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি দেশে—যেখানে কোন-না-কোন ধরণের নিয়মতান্ত্রিক সরকার দীর্ঘকাল ধরে কায়েম রয়েছে এবং সহসা একটা আমূল পরিবর্তন সম্ভব নয়—সেখানে সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটলে মানুষ অবশ্যই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে।

কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য বা লাতিন আমেরিকা কিম্বা হাল আমলে আফ্রিকার কোন দেশে সামরিক অভ্যুত্থানের সংবাদ আজকাল জনমনে খুব একটা বিস্ময় উৎপাদন করতে
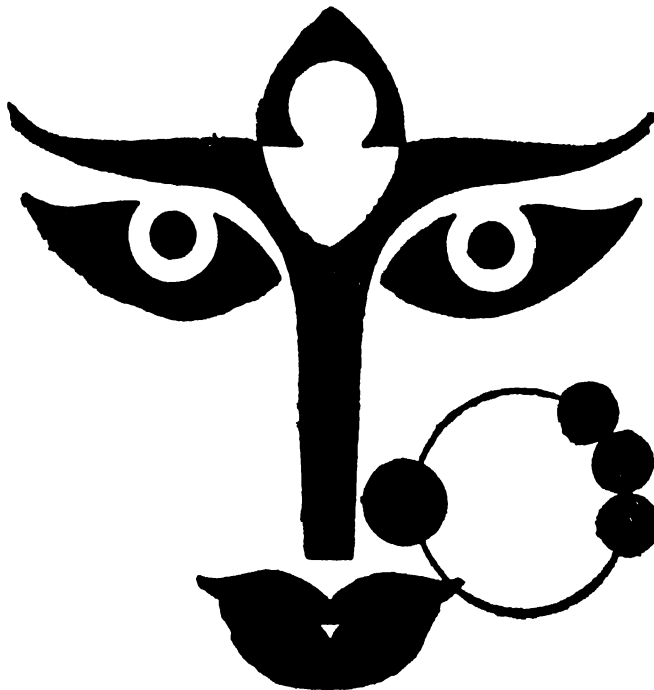
পারে কি? পেরুতে সম্প্রতি যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে গেল তার প্রতি ভারতবাসীর মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে এজন্য যে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে ওই অভ্যুত্থানের কারণে পেরু সফর বাতিল করতে হয়েছে। তা নইলে রাজনীতির উৎসাহী ছাত্রেরা ছাড়া পেরু নিয়ে কে মাথা ঘামাত?

গত ৩রা অক্টোবর ভোর রাত্রে পেরুর সেনাবাহিনী এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা দখল করেছে। পদচ্যুত প্রেসিডেন্ট ফার্নান্ডো বেলাউন্ডি টেরি বুয়েনস আয়ার্স পালিয়ে গিয়ে আর্জেন্টিনা সরকারের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় ভিক্ষা করেছেন। এদিকে "বিপ্লবী সামরিক পরিষদ' দেশের পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করে নতুন সরকার গঠন করেছেন। সামরিক মন্ত্রিপরিষদের নেতা হয়েছেন সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ভালেস্কো আলভারেডো এবং বলাই বাহুল্য প্রতিরক্ষার তিনটি শাখার লোক নিয়েই সামরিক পরিষদ গঠিত মন্ত্রিসভায় কোন অসামরিক ব্যক্তির স্থান হয় নি।

পেরুবাসীরা এ সামরিক অভ্যুত্থানের জন্যে যেন তৈরিই ছিল, তারা জানতো যে সরকারের একটা বড় রকমের পরিবর্তন আসন্ন। তবে সে-পরিবর্তন এত আকস্মিক এবং ত্বরিত হবে এটা কেন কারো ধারণার মধ্যে ছিল না. পেরুবাসী ধরে নিয়েছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত পেরু সফরের পরই পেরুর রাজনীতিতে ওলট-পালট আসবে। কিন্তু সেনাবাহিনীর তর সয় নি।

ক'দিন ধরেই পেরুর রাজনীতিতে গভীর অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল। সঙ্কট গভীর করে তুলেছিল স্ট্যান্ডার্ড অয়েলের একটা শাখা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট টেরির এক চুক্তি। তাঁর বিরুদ্ধ দল তো বটেই, প্রেসিডেন্ট টেরির স্বদলের মধ্যেও এই চুক্তি ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে, দ্বিধাবিভক্ত করেছে দলকে। অভ্যুত্থানের মাত্র দু'দিন আগে মঙ্গলবার যখন প্রধানমন্ত্রী অসভাল্ডো হারকেলিস এবং তাঁর মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেন, তখনই অনুমান করা গিয়েছিল যে, সরকারের পতন এবং সামরিক অভ্যুত্থান প্রায় অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য ওই চুক্তিতে পেরুর জাতীয় স্বার্থেরই উন্নতি হতো এবং বিদেশী তেল কোম্পানীটিকে রাষ্ট্রীয়করণের পথে পেরু সরকার এক ধাপ এগিয়েছেন বলেই সরকার দাবি করেছিলেন। কিন্তু বিরোধীরা ঠিক উল্টোটিই গাইতে সুরু করেছিলেন। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রেসিডেন্ট টেরি পেরুবাসীদের ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করে কয়েকটি জরুরী আদেশ দিয়েছিলেন। সামরিক পরিষদ, বলাই বাহুল্য, সে সমস্ত আদেশেই বহাল রয়েছেন। অর্থাৎ পেরুবাসীর ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে আপাতত কিছু রইলো না।

অভ্যুত্থান রক্তপাতহীন এবং বিনা বাধায় ঘটে গেলেও পেরুবাসীরা যে তা নতশিরে মেনে নিতে রাজী নয়, তার কিছু কিছু প্রমাণ ক্রমশ পাওয়া যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই পেরুর বিভিন্ন প্রদেশে সামরিক পরিষদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে, কয়েকটি ক্ষেত্রে পেরুবাসীরা এবং রাজনৈতিক দলগুলি প্রস্তাব নিয়েছেন যে, সামরিক পরিষদকে তাঁরা কোনরকম সাহায্যই করবেন না। বিভিন্ন সরকারী সংস্থা সংগঠন থেকেও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা দলে দলে পদত্যাগ করছেন সামরিক পরিষদ বা সামরিক অভ্যুত্থানের প্রতিবাদে। এ সমস্ত প্রতিবাদ আন্দোলনের মোকাবিলা সামরিক পরিষদ কতখানি করে উঠতে পারবেন, আগামী দিনই কেবল তা বলতে পারে। তবে অসামরিক ব্যক্তিদের একেবারে বাদ দিয়ে সামরিক শাসন যে এখানে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারবে না সে কথা অনায়াসে বলা চলে।

ইতিমধ্যে সামরিক পরিষদ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে পেরু সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কিন্তু পেরুর বর্তমান জটিল পরিস্থিতিতে শ্রীমতী গান্ধী সেখানে যাওয়া আপাতত মুলতুবী রাখবেন বলেই মনে হয়।
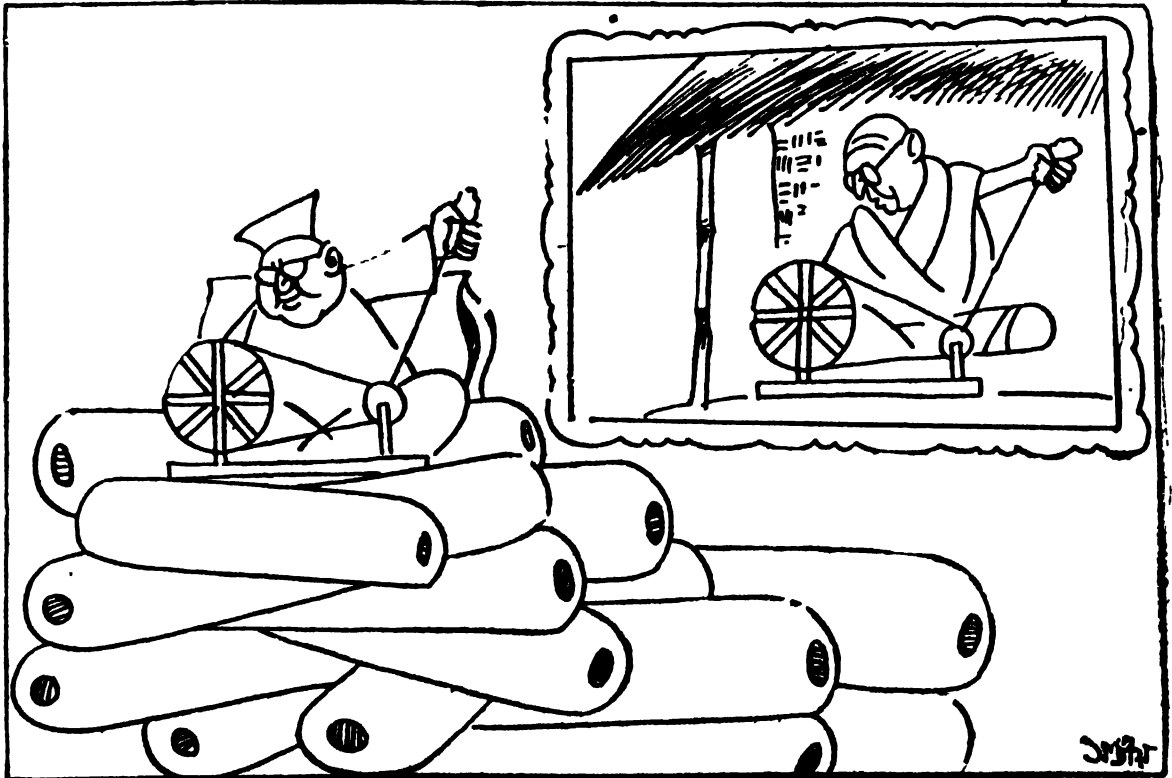
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

রবীন্দ্রনাথ-রোলাঁ-গান্ধী-সুভাষচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথকে লেখা সুভাষচন্দ্রের পত্র থেকে জানতে পারছি, ১৯৩৩ সালে ইউরোপ যাওয়ার পর থেকে তিনি নিজেই রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে পত্রালাপ করতে শুরু করেছিলেন এবং তিনি 'প্রচণ্ড রকমের গান্ধীভক্ত Rolland মহাশয়কে' জানিয়েছিলেন যে, তিনি গান্ধীভক্ত নন। সুভাষচন্দ্রের আশঙ্কা—'সুতরাং Rolland মহাশয় যে আমার পুস্তকের সূচনা লিখিতে রাজী হইবেন সে আশা করিতে পারি না।'

রবীন্দ্রনাথের গান্ধীভক্তির চেহারা আমরা দেখেছি। এবং সংক্ষেপে দেখব রোলাঁর গান্ধীভক্তি। বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর ইতিহাসে মানবতাকে অব্যাহত রাখবার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী ও রোমাঁ রোলাঁর নাম বিখ্যাত [illegible]

নিজের ভূমিকার মহিমা সম্বন্ধে কোনো অনাবিষ্ট বিভ্রম রোমাঁ রোলাঁর মধ্যে ছিল না। মহামানবের সাগরতীরের সঙ্গীহীন মহাজন রবীন্দ্রনাথকে সান্ত্বনা ও প্রেরণা দিয়ে পত্র লিখেছিলেন রোমাঁ রোলাঁ। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে রোলাঁ ইউরোপের সন্ন্যাসী, নিজ সাধনায় যিনি নিঃসঙ্গ, 'দেশের লোকের দ্বারা বর্জিত।' রবীন্দ্রনাথ যখন অসহযোগ আন্দোলনের কালে নিজের ভাবনায় ও বেদনায় একাকী হয়ে পড়লেন, তখন রোলাঁ এই একলা-পথিক ভারতীয় সন্ন্যাসীকে শোনালেন 'সন্ন্যাসীর গীতি'—গর্বিত মহিমার অনবদ্য কয়েকটি কথা—

> "জগতের প্রতি দেশেই আমাদের মত মানুষেরা নিঃসঙ্গ। শুধু আজ নয়, তাঁরা নিঃসঙ্গ চিরদিনের জন্য।
>
> "ভবিষ্যৎ আমাদের-গৃহ। এমন কি ভবিষ্যতেরও পারে—কারণ চিরন্তনের বৃক্ষের উপরে আমরা আমাদের বাসা বেঁধেছি। ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে আমরা আমাদের গান গেয়ে যাব শান্ত সুরে।" [২৭শে মার্চের পত্র, ১৯২৫]
>
> "আমি মনে করি, আমরা যারা 'যুদ্ধের উপরে বাস করি', সেই আমরাই জগতে সবচেয়ে বড় সংগ্রামী—চিরন্তন সংগ্রামী। আমাদের যুদ্ধে আপোষ নেই চুক্তি নেই, শান্তি নেই। অন্তরের জয়, বা ভিতরের শান্তি ছাড়া আর কোনো জয় বা শান্তির প্রত্যাশাও এখানে নেই; নিয়তির সকল আঘাতের বিরুদ্ধে তাকে অধিকার করতে হবে ও রক্ষা করে যেতে হবে। আমাদের পৃথিবী আমাদেরই ভিতরে।" [২২শে ডিসেম্বর, ১৯২৫-এর চিঠি]

রোলাঁ রবীন্দ্রনাথকে আরও বলেছিলেন, 'আমরা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আমাদের ভগবান ও তাঁর মহৎ সৃষ্টিকে বহন করি' বলেই আমরা নিঃসঙ্গ। এমন মানুষেরা ভগবানের দায়িত্বকে গ্রহণ করেন পৃথিবীতে, কখনো ঘাড়ে নেন ক্রুশকে, কখনো তুলে ধরেন ত্রিশূলকে। যখন ক্রুশকে কাঁধে নিয়েছেন তখন শুনিয়েছেন প্রেমের সামগান, যখন ধরেছেন ত্রিশূলকে, বিজয়ী সভ্যতার হিংস্র ঐশ্বর্যের বুকে গিয়ে বিঁধেছে ন্যায়ের কঠিন ছায়া।

ইউরোপ রোলাঁকে হতাশ করেছিল। সভ্যতার দ্বারা বিষাক্ত ইউরোপের অমর জটায়ু যখন আশ্রয়হারা, তখন ভারতবর্ষ থেকে চারিটি মানুষ আহ্বান আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরল অন্তর্যের আকারে সেই মহাবিহঙ্গের দিকে; গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ রোলাঁর দিকে তাঁদের বাহু মেলে দিয়েছিলেন।

রোলাঁ বললেন, আমি আশ্রয় পেলাম। হে রবীন্দ্রনাথ, তোমার জ্যোতির্ময় চেতনায়, এবং হে গান্ধী, তোমার নিবিড় ভক্ত হৃদয়ে যে-ভারত প্রকাশিত—সে আমাকে আশ্রয় দিল।

রোলাঁ আরও বললেন—

> 'আমার কাছে এখন থেকে ভারত আর বিদেশ নয়—সকল দেশের মধ্যে মহত্তম সেই দেশ—সেই প্রাচীন ভূমি—যেখান থেকে একদা এসেছি আমি। তাকে আবার আমি আমার গভীরে দেখতে পাচ্ছি।'

রোলাঁ ছিলেন বীটোফেন, টলস্টয়, গোটের 'ভাবনার, বেদনার, সংগ্রামের সন্তান'। তিনি এখন—গান্ধীর, রবীন্দ্রনাথের সাথী; কিন্তু পরে হবেন রামকৃষ্ণের, বিবেকানন্দের বাহক। রোলাঁর ভারত সন্ধানের শেষ প্রান্তে আছেন 'মানুষের মধ্যে শিব' বিবেকানন্দ এবং 'খৃষ্টের কনিষ্ঠ ভ্রাতা' রামকৃষ্ণ।

রোলাঁ রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছিলেন সভ্যতার বড় দুঃসময়ে। জাতীয়তা যখন অন্য জাতির শোণিত পান করে তৃপ্ত ওষ্ঠ মার্জনা করছে, তখন শুনলেন রক্তহীন ভারতীয় জাতির পাঁজরের ভিতর থেকে উঠেছে ধিক্কারের বজ্রকণ্ঠ। জাতীয়তা যে-জাতির সাধনার বস্তু, সেই দেশের কবি জাতীয়তার পিশাচ-পিশিত রূপকে দেখিয়ে দিলেন। রোলাঁ অবাক হলেন—আনন্দে চমকে উঠলেন—রবীন্দ্রনাথের মধ্যে চিনলেন এক চিরন্তন মানবকে—জাপানে [illegible] রবীন্দ্রনাথের 'ন্যাশনালিজম' [illegible] প্রচারের ব্যবস্থা করলেন ইউরোপে।

রবীন্দ্রনাথ ও রোলাঁ কাছাকাছি [illegible] হাত ধরে দাঁড়ালেন।

'ভাবী শতাব্দীগুলির জন্য আ[illegible] [illegible]' বর্জন করার দায়িত্ব [illegible] রবীন্দ্রনাথ নিয়েছিলেন, কিন্তু [illegible] সবচেয়ে [illegible] এই দুই [illegible]

শিখরের পরিণতির দিনগুলির সম্বন্ধে 'রোলাঁড এন্ড টেগোর' গ্রন্থের সম্পাদক লিখেছেন—

'তাঁদের শেষ চিঠিগুলি চরম সর্বনাশের দিনগুলির মধ্যে লেখা হয়েছিল। পর্বতের উপরে নেমেছে রাত্রি। ঝড়ের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে স্বর। দুটি নিঃসঙ্গ মহিমা পরস্পরের হাত চেপে ধরেছেন, কখন প্রভাত আসবে তারই প্রতীক্ষায়—ঐ প্রভাতের গান তাঁরা গেয়েছেন চিরজীবন।"

কিন্তু রোলাঁ চিরসন্ধানী—অবিরাম অবিশ্রামে পণবদ্ধ। তিনি চলমান প্রশ্ন, বহমান বিস্ময়, জ্যোতির্ময় 'সত্য'পাত্রের ক্লান্তিহীন দর্শনে 'বিমুগ্ধ আত্মা। যে-গান্ধীকে ও রবীন্দ্রনাথকে তিনি 'নির্ভর করার যোগ্য দুই স্তম্ভরূপে' দেখেছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধেও তাঁর প্রশ্ন শেষ হয় নি। গান্ধীর মধ্যযুগীয়তার শীতল সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েও তিনি আশঙ্কিত ছিলেন; রবীন্দ্রনাথের আধুনিক চিন্তাপ্রখর মনের মধ্যেও শেষ পর্যন্ত অস্পষ্টতার, সিদ্ধান্তহীনতার কুহেলি দেখেছিলেন. মুসোলিনির আতিথ্যতৃপ্ত রবীন্দ্রনাথকে তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন—যে-পাত্রে ভারতীয় ঋষিকে অর্ঘ্য দেওয়া হয়েছে, তাতে লুণ্ঠনের রক্তের দাগ লেগে আছে। রবীন্দ্রনাথকে সচেতন করাতে তাঁকে বেগ পেতে হয়েছিল, এবং তাতে উদ্বেগও পেয়েছিলেন তিনি, তবু শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল তাঁদের এক পরমাত্মবর্তিতা। তাঁরা কখনই ভুলতে পারেন নি একই যজ্ঞান্ন তাঁরা ভোজন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর দুটি ছবি এঁকেছেন রোলাঁ স্মরণীয় হবার মতো। প্রথমে রবীন্দ্রনাথের চিত্র—

"ঋষিকবির সুমহিম মুখচ্ছবি, রহস্যাচ্ছন্ন এক বিশাল দেহ, তাঁর শান্তকণ্ঠ, সমন্বিত ভঙ্গি, গভীর কৃষ্ণ পল্লবচ্ছায়ে প্রদীপ্ত পিঙ্গল কেশ—এ সকলই পরমা শান্তির মহিমা বিকিরণ করে। তাঁর সান্নিধ্য অজান্তে প্রভাব বিস্তার করবে—যেন কোনো উপাসনালয়ে গিয়েছ তুমি—নতকণ্ঠে কথা বলতে হবে তোমাকে। তারপর যদি নিকট থেকে তাঁর সুন্দর মহান মুখের প্রান্তরেখা দেখার সুযোগ হয়—সেই রেখাসমূহের ঐকচ্ছন্দ ও সঙ্গীতের অন্তরালে অবশিত বশীভূত বিষাদকে তুমি দেখবে,—দেখবে তাঁর নির্মোহ দিব্যদৃষ্টিকে, দেখবে জীবনদুঃখের সম্মুখীন অনুদ্ভ্রান্ত পুরুষ—প্রশান্ত যুধিষ্ঠিরকে।

"আর তখন সহজ বুঝবে আলো-

সঙ্গীতগুলিকে। সঙ্গীতগুলির ভিতরে বৈদিক বিদ্রোহ চিরন্তন আত্মার গুণ্ঠনমোচন করে ঝলসে উঠছে—বেজে উঠেছে পরম প্রেমময়ের জন্য লোকে লোকান্তরে রহস্যযাত্রার চরণধ্বনি। তুমি আরও স্মরণ করবে—পৃথিবীর জাতিসমূহের উদ্দেশ্যে তাঁর গভীর সতর্কবাণীকে, বিজয়ী সভ্যতার উপরে মহাকালের ছায়াপাতের প্রতি তাঁর অঙ্গুলীসংকেতকে।"

প্রেমশূন্য ইউরোপের আকাশে রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির খণ্ড মেঘকে প্রেরণ করেছিলেন, তার উষর ভূমিতে গান্ধী পাঠিয়েছিলেন ভারতবর্ষের এখনো-নবীন বোধিবৃক্ষের কয়েকটি পত্র। কৃতজ্ঞ রোলাঁ ইউরোপের পক্ষ থেকে গান্ধীবন্দনা করেছিলেন একটি গ্রন্থে—রবীন্দ্রনাথও অনেকখানি স্থান জুড়ে ছিলেন তাঁর লেখাতে।

রোলাঁর গান্ধী—

"ক্ষুদ্রকায় দুর্বল মানুষ, শীর্ণ মুখ, প্রশান্ত দুটি চোখ, বাহিরের দিকে প্রসারিত দুটি কান। মাথায় সাদা রঙের একটি পাগড়ি, পরণে মোটা সাদা রঙের একখানি থান, অনাবৃত দুটি পা। খাদ্য, চাল, ফল ও জল। ভূমিতে শয়ন, স্বল্পকাল মাত্র নিদ্রা অক্লান্ত কাজ। তাঁহার দৈহিক প্রকাশ আদৌ গ্রাহ্য করিবার মত নয়। তাঁহাকে প্রথমে দেখিলেই এক বিরাট ধৈর্য ও অসীম ভালবাসার প্রতিমূর্তি মনে হয়। পিয়ার্সন যখন তাঁহাকে ১৯১৩ সালের দক্ষিণ আফ্রিকায় দেখেন, তখন ঋষি ফ্রান্সিস অব আসিসির কথা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল। পরম শত্রুর প্রতিও তাঁহার অগাধ স্নেহ, অপার সৌজন্য। অসীম তাঁহার দীনতা। সদা সচেতন—'আমি ভুল করিয়াছি' একথা স্বীকার করিতে তিনি যেন সর্বদা প্রস্তুত। তিনি কদাপি তাঁহার ভুল গোপন করেন না; কখনো আপোষের মধ্যে আসেন না, কখনো কূটনীতির আশ্রয় লন না, কখনো বক্তৃতায় মাত করিতে চান না—বরঞ্চ বক্তৃতার কথা তিনি ভাবেনও না। এই মহাপুরুষ, মহাত্মা জনসাধারণের স্তুতিতোষণে একেবারে ভীতিবিরক্ত হইয়া পড়েন। অন্তরে অন্তরে গণ-শক্তে তাঁহার অবিরল অবিশ্বাস, গণশাসন যা বিশৃঙ্খল জনতার প্রতি তাঁহার পরম ঘৃণা। ......নির্জন চৈতন্যে থাকিতে তিনি ভালবাসেন, কারণ তখন তিনি নিস্তব্ধতার মধ্যে নির্জন

"হান সেই মানুষ, যিনি ত্রিশ কোটি মানুষকে কর্মপ্রেরণায় জাগাইয়া তুলিয়াছেন, সারা বৃটিশ সাম্রাজ্যকে কম্পমান করিয়া দিয়াছেন, যিনি মানুষের রাজনীতির মধ্যে প্রবর্তন করিয়াছেন প্রায় দুই হাজার বৎসরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান এক নীতির আন্দোলন, আদর্শ।" *

গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ কথাগুলি। গান্ধীজীর দক্ষিণ আফ্রিকায় কুড়িটি বছর রোলাঁর কাছে 'বিশ বৎসরের আত্মার যুগ।' ভারতের দিনগুলি—'বর্বর শক্তির বিরুদ্ধে বিবেকের যুগান্তকারী সংগ্রামের' দিন। রোলাঁর কাছে এই যুগে গান্ধী টলস্টয়ের চেয়ে টলস্টয়, কারণ মূলে টলস্টয় প্রয়াসে খৃষ্টান, গান্ধী খৃষ্টান—স্বভাবে। গান্ধী নামক বিশাল সৌধের কিছুটামাত্র দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু 'সে সৌধের মূল অংশটা হইল ভূগর্ভস্থ এক মন্দির, গভীর এবং বিশাল, গান্ধীজী সেখানে প্রতিদিন আসেন বিশ্রামের জন্য, সংগ্রহ করেন বাহিরের কাজের জন্য নূতন শক্তি।'

এই গান্ধীর সঙ্গে অসহযোগের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের যখন সুবিখ্যাত মতান্তর হয়েছিল, তখন রোলাঁর সত্তা সাড়া দিয়েছিল গান্ধীর ডাকে। বিপুল শ্রদ্ধার সঙ্গে এই বিতর্কের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছিলেন—

"ইঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম. কিন্তু মনোভাব ও অনুভূতির মধ্যে ব্যবধান ছিল ভয়াবহ, যে-ব্যবধান থাকে দার্শনিক ও প্রচারকের মধ্যে, একজন প্লেটো ও একজন সেন্ট পলের মধ্যে। আমরা একদিকে দেখি ধর্মবিশ্বাস এবং করুণা চাহিতেছে এক নূতন মানবতার প্রতিষ্ঠা করিতে; অন্যদিকে দেখি, প্রশান্ত প্রমুক্ত উদার এক ধীশক্তি চাহিতেছে সহানুভূতি ও বুদ্ধির মধ্য দিয়া সমগ্র মানবতার আকাঙ্ক্ষা-কামনাকে ঐক্যবদ্ধ করিতে।"

গান্ধী-আন্দোলন সম্পর্কে রোলাঁ রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কার প্রতি সমুচিত সচেতনতা দেখিয়েছেন· তিনি বলেছেন, '১৮১৩ খৃস্টাব্দে গোয়েটে যেমন ফরাসী সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বর্জন করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি পাশ্চাত্য সভ্যতাকে নির্বাসিত করিতে অস্বীকার করিলেন'; তিনি স্বীকার করেছেন অহিংসার সম্ভাব্য বিকার সম্বন্ধে গান্ধীজী অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির স্বচ্ছতা বেশি; অসহযোগীর

বিশ্বপ্রেমিক গান্ধীর' তুলনায় বুদ্ধি-চেতনায় আধুনিক বিশ্বপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথকে বোঝা ও সমর্থন করা তাঁর পক্ষে বেশি সহজ, কিন্তু তবু রবীন্দ্রনাথ যখন অসহযোগ-বিতর্কের কালে প্রভাতপাখীর আকাশবিহারের আনন্দের কথা তুলেছিলেন, তখন সেই সুন্দর কথাগুলির প্রশস্তির মধ্যেই বেজে উঠেছিল রোলাঁর সমালোচনা—

> "রবীন্দ্রনাথের সুন্দর এই কথাগুলি, এ যেন সূর্যালোকের কবিতা! মানুষের সংগ্রামের ঊর্ধ্বে ইহার স্থান। এই কথাগুলিকে কেবলমাত্র এই বলিয়া তিরস্কার করা চলে যে, এইগুলির স্থান অতি বেশী ঊর্ধ্বে। চিরন্তনের দিক হইতে রবীন্দ্রনাথ নির্ভুল। এই বাণী-[illegible] পক্ষীর মতো [illegible] হাইনে [illegible] শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকারকে বলিয়াছিলেন—ইনি কালের ধ্বংসস্তূপের উপর বসিয়া গান করেন। ইনি বাঁচিয়া থাকেন সনাতনের মধ্যে। কিন্তু বর্তমানের দাবিকে তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই দিক হইতে গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথের মতো। যাঁহার সেই কাব্যময় ঊর্ধ্বলোকগতির ক্ষমতা নাই কিংবা হয়তঃ তিনি করুণার বোধিসত্ত্বের মতো সর্বহারাদের মধ্যে বাস করিবার উপযুক্ত হইবার কামনায় সেই ক্ষমতা ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়াকে শিশুর ক্রীড়া বলিয়াই জানিয়াছেন।"*

* অনুবাদ—[illegible]

পাকা চুল কাঁচা

আমরা বেশী প্রশংসা করিতে চাহি না। আমাদের "কেশরঞ্জন" তৈল ব্যবহারে পাকা চুল চিরতরে স্বাভাবিক কাল রং-এ পরিণত হয় ও চুল পাকা বন্ধ হয়। ভবিষ্যতে নূতন কাল চুল গজায়। ইহা মানসিক শক্তি ও দৃষ্টিশক্তির উন্নতি সাধন করে। যদি আপনি মনে করেন যে এই তৈল অন্য কোন কাল কেশতৈলের মতন: একবার অবশ্যই ইহার শক্তির বিকাশলাভ প্রত্যক্ষ করুন। গুণের তুলনায় ইহার মূল্য কিছুই নয়। দাম ১০. টাকা। বিশ্বাস না হইলে টাকা ফেরৎ লইবেন।

Western India Co. (S.N.),
P.O. Katrisarai (Gaya)

বিশ্বের যত দারিদ্র্য, দুঃখ, বেদনা যখন রবীন্দ্রনাথের কবিস্বপ্নের সামনে নিজের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আর্তনাদ করছিল —তখন রোলাঁ স্বয়ং দরিদ্র গান্ধীর মঙ্গলগান করেছেন।

অসহযোগের যুগে গান্ধীজী দাঁড়িয়েছিলেন সভ্যতার সুরা এবং সুরার সভ্যতার বিরুদ্ধে। এ সভ্যতা যন্ত্রের তৈরি, তার গোলামি থেকে মুক্তির ডাক দিয়েছিলেন। এ সভ্যতা হিংসার সন্তান—তার থেকে ত্রাণ চাই।

অহিংসার এই সংগ্রামমূর্তি রোলাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি অনুভব করেছিলেন, ভারতের সংগ্রাম বিশ্বেরই হিতার্থে।

রোলাঁ বললেন—'গান্ধীজীর বাণী—ইহাতে যাহা নাই—তাহা কেবলমাত্র ভ্রম।'

এমনই মহাত্মার রাজনৈতিক নেতৃত্বের কঠিনতম সমালোচনা করেছেন সুভাষচন্দ্র। তাঁর ছুরির মত কতকগুলি কথা ঝক-ঝক করেছে আধুনিক বুদ্ধির আলোকে—

> "মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে এমন কিছু আছে যা ভারতীয় জনগণের বৃহৎ অংশে আবেদন জানায়। অন্য দেশে জন্মালে তিনি সম্পূর্ণ বেখাপ্পা হতেন। [illegible] ধরা যাক, রাশিয়া, জার্মানী বা ইটালির মত দেশে তিনি কি করতেন? তাঁর অহিংসার মন্ত্র তাঁকে ক্রুশে কিংবা পাগলা গারদে [illegible]। [illegible] তাঁর [illegible] জীবন, [illegible] পান, প্রতি সপ্তাহে মৌন দিবস পালন, [illegible] তাঁর [illegible] তাঁর [illegible] প্রাচীন কালের [illegible] মহাত্মার একজন বলে তাঁকে দেখিয়ে দেয় এবং তার ফলে তিনি তাঁর দেশবাসীর আরও নিকট হয়ে ওঠেন। যেখানেই তিনি যান না কেন [illegible]কার দরিদ্রতম মানুষ অনুভব করে তিনি ভারতের মাটির সন্তান। ভারতেরই রক্ত-মাংসে গড়া তাঁর দেহ। মহাত্মা যখন কথা বলেন, তিনি স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি প্রভৃতির মত হারবার্ট স্পেনসার বা এডমান্ড বার্কের ভাষায় কথা বলেন না তিনি বলেন ভগবৎ গীতা বা রামায়ণের ভাষায়, জনসাধারণকে [illegible]। [illegible] কর্তৃত্ব, যুক্তরাষ্ট্র, ইত্যাদির গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা করবার পরিবর্তে তিনি রামরাজ্যের মহিমার কথা স্মরণ করিয়ে দেন, এবং জনসাধারণ তা বুঝে নেয়। আর তিনি যখন প্রেম ও অহিংসার দ্বারা জয়ের কথা বলেন—তখন মনে পড়ে যায় বুদ্ধ ও মহাবীরকে—জনগণ তখন তাঁকে বরণ করে নেয়।"

ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীর সাফল্যের কারণ কি? সুভাষচন্দ্র বলেছেন—ভারতের নিরস্ত্র অবস্থা, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পরাভব, সশস্ত্র বিপ্লব চেষ্টার ব্যর্থতা। তাঁর সাফল্যের আরও একটি গূঢ় কারণ তিনি দেখিয়েছেন,—"যদিও ডায়ন্যামিক শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর অধিকাংশ দেশবাসীর পক্ষে অত্যধিক বৈপ্লবিক ছিলেন না। অহলে তিনি তাদের ভীত করতেন, উদ্বুদ্ধ করতে পারতেন না, টেনে আনার পরিবর্তে ঠেলে দিতেন।" গান্ধীজীর ঐক্যনীতি চেয়েছে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের, উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের, মালিকের সঙ্গে শ্রমিকের, জমিদারের সঙ্গে কৃষকের মিলন ঘটাতে। গান্ধীজীর মানবতা এবং অহিংসা শত্রুপক্ষের মনেও সহানুভূতি এনেছে।

কিন্তু তবু, গান্ধীজী বিপুল জনসমর্থন ও ১৪ বছরের চেষ্টা সত্ত্বেও (১৯৩৪ সালের কথা) ভারতের স্বাধীনতা আনতে পারেন নি কেন? সুভাষচন্দ্রের উত্তর—শুধু অনুগামীদের সংখ্যায় নয়, তাদের আনুগত্যের প্রকৃতির উপরও সাফল্য নির্ভর করে। তাছাড়া শত্রুর সঙ্গে কূটনৈতিক আচরণে কৌশলের প্রভাব এবং একই দেহে রাজনৈতিক নেতা বিশ্বধর্মনেতা—এই দুই ভূমিকা গ্রহণ করার অসুবিধাও আছে।

সুভাষচন্দ্রের সিদ্ধান্ত—মহাত্মা যতদিন তাঁর রাজনৈতিক একনায়কত্ব বজায় রাখতে পারবেন, ততদিন রাজনীতিতে থাকবেন, এবং সেটা নির্ভর করছে বৃটিশ সরকারের আচরণের উপরে। যদি সরকার কিছু সুবিধা দেয়, তাহলেই মহাত্মা সেই সাফল্যের ভিত্তিতে কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পারবেন, নচেৎ নেতৃত্ব চলে যাবে চরমপন্থী দলের হাতে। তবে কালের ধর্ম স্বীকার করে গতিশীল হবার ক্ষমতাও তাঁর আছে।

সুভাষচন্দ্র আরও একটি কথা বলেছেন· কংগ্রেসে অর্থনৈতিক চিন্তার সূচনা ঘটেছে। কংগ্রেসের মধ্যে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সমন্বিত পার্টির আবির্ভাব ঘটেছে ও ঘটবে। মহাত্মার নেতৃত্ব সম্বন্ধে মত চালানো [illegible] আসবে। [illegible] বণিক, শ্রমিক, জমিদার, কৃষক, ধনী, দরিদ্রকে মেলাতে পেরেছিলেন—এইখানেই তাঁর ব্যর্থতার ক্ষেত্রও প্রতিষ্ঠিত হবে। কারণ

কালক্রমে অর্থনীতির প্রশ্ন উঠবেই। সে প্রশ্ন উঠলে মহাত্মার ঐক্যবিধায়ক রাজনৈতিক নেতৃত্বের ভিত্তি দুর্বল হয়ে যাবে, অবশ্য তাতে মহাত্মার মহিমার ক্ষয় হবে না, কারণ 'অন্য রাজনৈতিক নেতাদের মত মহাত্মার জনপ্রিয়তা ও মর্যাদা কেবল তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপর নির্ভর করে না, তা তাঁর চরিত্রের উপরই মূলত নির্ভরশীল।'

একজন ভারতীয় যুক্তিবাদীর লেখা। তিনি 'মহামানবতার সংগঠক' হতে চান নি, ভারতের স্বাধীনতার মত প্রয়োজনীয় সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর মরণীয় জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। কারণ তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল—'ভারতের মুক্তি মাঝে সর্বমানবের ত্রাণ।'

সুভাষচন্দ্রের আশঙ্কা তাই অতি স্বাভাবিক—"Rolland মহাশয় আমার গ্রন্থের সূচনা লিখিতে রাজী হইবেন না।"

[ক্রমশঃ]

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ একুশ ॥

ফুল্লরা অধীর কণ্ঠে বলল, আর কতক্ষণ ভাই?

ফজলি বলে, অন্ধকার হোক। সিগন্যাল দেখাবে ওপার থেকে: বেরিয়ে পড়ো এইবার। তখন। বললাম তো, আগে এত সব বায়নাক্কা ছিল না—দিনে রাত্রে যার যখন দরকার পার করে দিত। কর্তাব্যক্তিদের কেউ ঘাটের কাছাকাছি নেই, বেমক্কা ধরে ফেলবে না, এইটুকু শুধু জেনে নেওয়া—সিগন্যাল চালু হল এইজন্যে। মিলিটারি ফৌজ এসে পড়ল, ঘাটোয়ালরা সেই থেকে কড়াকড়ি করছে। দুম করে ঘাড়ে যদি একটা গুলী এসে পড়ে, বদনাম ঘাটোয়ালেরই তো।

পুরুষদের ঘরেও ঠিক সেই প্রশ্ন। বীরেশ্বর বললেন, কখন রওনা?

আনোয়ার বলল, আমরা তো ছটফট করছি। কিন্তু ফাঁকা মাঠে সময় না বুঝে নামা চলবে না।

দিনের আলো সম্পূর্ণ নেভে নি, আকাশের কোণে চাঁদ দেখা দিয়েছে। পাণ্ডুর খণ্ডচাঁদ। চাঁদ দেখে আনোয়ার ক্ষেপে উঠল: যাবেন কি করে? ঘোর না হতেই চাঁদ শালা আকাশে চড়ে বসে আছে। দশমী তিথি, বিশ দণ্ড জ্যোৎস্না। তার মানে রাত দুটো-আড়াইটে। ততক্ষণ ভোগান্তি আছে কপালে। এড়ানোর উপায় নেই।

পরক্ষণেই ভরসা দিয়ে বলে, কী আর হবে? জলে পড়েন নি স্যার, মজিবভাইয়ের উপর আছেন। শুয়ে-বসে কাটিয়ে দিন যতক্ষণ না ওপারের সিগন্যাল আসছে। লম্বা উঠোন পড়ে রয়েছে, মাঠের দিব্যি খোলা হাওয়া, চাঁদের আলোয় চক্কোর দিয়ে বেড়ান—সময় দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তবে যা-কিছু করবেন, পাঁচিলের ভিতরে। বাইরে কদাচ নয়। উঁকি-ঝুঁকিও দেবেন না মাথা বের করে। বিপদ ঘটতে পারে, ফট করে গুলী এসে লাগতে পারে। কী দরকার। সময় হলে দলবদ্ধ হয়ে সকলে বেরিয়ে পড়ব।

আনোয়ার এ-ঘরে শুয়ে-বসে সময় কাটানোর কথা বলল। ফুল্লরার সত্যি সত্যি প্রয়োজন তাই—তক্তাপোষের উপর শুয়ে পড়া, নিতান্তপক্ষে চোখ বুজে চুপচাপ বসা দেয়াল ঠেসান দিয়ে। সমস্তটা দিন বড্ড ধকল গেছে, চোখ ভেঙে আসছে ঘুমে।

কিন্তু আনোয়ার ব্যবস্থা দিলে কি হবে, ভাগনীটি তাই হতে দিল আর কি! জড়িয়ে ধরেছে ফুল্লরাকে। কথার ফুলঝুরি—অবিরাম বকে যাচ্ছে সেই থেকে। হাই তুলেছে ফুল্লরা তো হাঁ-হাঁ করে উঠল: ও কি হচ্ছে? মতলব তোমার ভাল নয়। চুপচাপ থাকতে হলে দম ফেটে নির্ঘাৎ আমি মারা পড়ব। কপালগুণে তোমায় একজন পেলাম, তা তুমিও ঘুমিয়ে থাকতে চাও। একটা রাত্রি না-ই ঘুমুলে? বলি, নাক ডেকে ঘুমুতে চাও তো বিয়ের চেষ্টায় যাচ্ছ কোন বিবেচনায়? এর পরে তো কোন রাত্রেই ঘুমুবে না।

ফুল্লরা বলে, ঘুমোব না কেন?

ঘুমুতে দিলে তো?

একগাল হেসে আবার বলল, হয় তুমি একেবারে গোবেচারা নয় তো অতি-সেয়ানা—ধরা-ছোঁওয়া দিতে চাও না। বিয়ের পরে দুনিয়ায় কোন্ বর ঘুমুতে দেয় শুনি? তোমাকেও দেবে না। না ঘুমোনো অভ্যেস করো ভাই। আজ থেকেই।

ফুল্লরার মুখে এসেছিল: তুমিই বা জানলে কিসে? কটা বরের সঙ্গে ঘর করে পাকা গিন্নি হয়েছ এমন?

বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, মুখে আটকাল। অম্বুজিনীর মতন [illegible] সে ভাব জমাতে পারে না।

প্রজাসাধারণ নিতান্তই [illegible]। মাটির [illegible]—[illegible] তো [illegible] ঢুকে যায়।

দয়াবিগলিত সম্রাজ্ঞী মেরি আন্তোনিয়েত এক-কথায় কেমন সমাধান করে দিলেন। তবু তারা দাপাদাপি হাঁকাহাঁকি করে মরে—জিনিসটা রাণীর মাথায় ঢোকে না কিছুতেই। আমাদেরও এখন ভাত জুটছে না—মানুষে ভাতের বদলে পোলাও-বিরিয়ানি খাক, কর্তাদের মধ্যে সুবুদ্ধিমান কেউ বাতলেছেন কি না কানে আসে নি। তবে ফল এবং কাঁচকলার পরামর্শ দেদার পেয়েছি।

রাণী তো ঐ বললেন, কিন্তু সমাধানটা শেষ অবধি কি রকম দাঁড়াল? মাঝপথে গল্পটা চাপা পড়ে আছে—যাত্রাওয়ালা প্রমথ বিশ্বাস উসকে দিয়ে বলে, তারপর?

বই থেকে মুখ তুলে নীলকণ্ঠ বর্মা সংক্ষেপে বললেন, মুণ্ডচ্ছেদ—রাজার, রাণীর।

বোমা ফাটল যেন কথায়, শ্রোতাদের আপাদমস্তক কেঁপে উঠল। রাজা-রাণী তো ঠাকুর-দেবতার সামিল। আমাদেরও অঢেল ছিল। সাফ হয়ে গেছেন। নমুনা হিসাবে মিউজিয়ামেও রেখে দেওয়া হয় নি কোন-একটিকে। অথচ আজও দেখতে পাবেন, ঝুড়ি কাঁধে কোন চাষীপ্রজা ব্যস্তসমস্ত হয়ে হাটে চলেছে—রাজবাড়ির সামনে এসে সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে পড়বে। কাঁধের ঝুড়ি মাটিতে নামিয়ে, কাপড়ের প্রান্ত গলায় তুলে নতজানু হয়ে পথের ধুলোর উপর সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করবে রাজবাড়ির উদ্দেশে। যে রাজবাড়ি অধুনা একেবারেই রাজাবিহীন—রাজার আমলের টিকটিকিটা আরশোলাটা অবধি থাকে না আর সেখানে।

স্তম্ভিত প্রমথ প্রশ্ন করে, মেরে ফেলল রাজা-রাণীকে?

গলা কেটে দিল।

শান্তকণ্ঠে নীলকণ্ঠ বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন: আঁশ-বঁটিতে মাছ কোটার মতন করে রাজা-রাণীর মুণ্ড কেটেছিল গিলোটিন যন্ত্রে। প্যারী শহরের ভিতরে ঠিক সেই জায়গায় সেই গিলোটিন আজও রয়েছে। হত্যা করে ওরা তিলেক লজ্জিত নয়, জাঁক করে দেশবিদেশের মানুষের কাছে বলে, অকুস্থল দেখিয়ে দেয়। ভার্সাই প্রাসাদের দিকে সামান্য-সাধারণে একদা বোধহয় চোখ তুলে তাকাতেই ভরসা পেতো না—কী হয়ে গেল তারপর—রে-রে

করে করে বিদ্রোহী জনতা ঢুকে পড়ল। প্রকাণ্ড উঠান ভরে গেল মানুষে মানুষে, যাদের তোমরা সুখের অন্নে বঞ্চনা করেছ। গোলমাল শুনে রাণী দোতলার ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন—সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে উঠে গেল মানুষ, ধাক্কা দিতে দিতে রাণীকে নামিয়ে আনল। রাজাকেও ধরেছে। রাজা বন্দী, রাণী বন্দী। বন্দী করে দ্য টেম্পল কারাগারে রেখেছে। যে ফটক দিয়ে শত্রুরা প্রাসাদে ঢুকেছিল, সোনার রং তার এখন। নাম—গোল্ডেন গেট, সোনালি ফটক।

থেমে একটুখানি দম নিয়ে নীলকণ্ঠ বললেন, বন্দী করেই রাখত বোধহয়, হত্যা অবধি যেত না। কিন্তু নানা সূত্রের খবর, প্রতিবিপ্লবের জোর ষড়যন্ত্র চলেছে—রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনবে। রাজা ষোড়শ লুই আসামীর কাঠগড়ায়। রাজা, তুমি চিরকাল সকলের বিচার করে এসেছ, তোমার বিচার আজকে। আইনের নানা রকম তর্ক—রাজা বিচারের ঊর্ধ্বে। কিন্তু রাজকীয় ভাবমূর্তি একেবারে বিলয় হয়ে গেছে, কূটতর্ক কারো মনে আঁচড় কাটে না আজ। রায় দিল মৃত্যুদণ্ড। ২১শে জানুয়ারি, ১৭৯৩—গিলোটিনে রাজমুণ্ড কাটা পড়ল। সুন্দরী রাণীরও রেহাই হল না। গিলোটিন কবলিত হলেন ন' মাস পরে ১৬ই অক্টোবর। সে হত্যা কতদূর নৃশংস, চোখে দেখে আন্দাজ নেবেন তো ব্যবস্থা রয়েছে লণ্ডনে মাদাম তুসোর মিউজিয়ামে। গিলোটিনের ফলায় মেরি আন্তোনিয়েতের গলা দুই খণ্ড হচ্ছে, দৃশ্যটা জীবন্ত হয়ে আছে মোমের মূর্তিতে। মূর্তিকার রাণীরই এক অন্তরঙ্গ সহচরী—চোখে যা দেখেছিলেন, হুবহু তাই বানিয়ে রেখেছেন। কী বীভৎস! গায়ে আপনার কাঁটা দিয়ে উঠবে।

॥ নিজস্ব সংবাদদাতার রিপোর্ট ॥

বিক্ষোভের আগুন কৃষ্ণনগরকে দুই দিন সম্পূর্ণ গ্রাস করেছিল। তিনজন মারা পড়ল, আর শত শত মানুষের নিগ্রহ।—তার মূলে কি? পেটে ভাত নেই, পরনের কাপড় নেই, আলো জ্বালবার একফোঁটা কেরোসিন নেই। তার উপর রয়েছে লেভি। লেভি ধরার মুখে অবিচার, আদায়ের সময় অত্যাচার। তার বিরুদ্ধে গান বেঁধেছে, গোপীযন্ত্র বাজিয়ে গায়:

জুলুমে ধান নিতে দেবো না—
(আমরা) ভীরুও নই, ক্লীবও নই—
জুলুমে ধান নিতে দেবো না।
ছেলের মুখের অন্নটুকু, চাষীর
ঘরের প্রয়োজন,
রাখতে না দেয়, কাড়তে সে চায়—
চোরা রাজা দুঃশাসন।
(তাই) জুলুমে ধান নিতে দেবো না।
নামেই শুধু নিয়ন্ত্রণ (রে ভাই),
লেভির নামে অত্যাচার,
চাষীর কেড়ে দস্যু শাসক পুষতে
জয় রে চোরাবাজার।
(আজ) হাহাকারে ভরল মুলুক,
বিচার হোক সে দোষী কিনা।

বছরের পর বছর ক্ষোভ জমে জমে পুঞ্জীভূত হয়েছিল। গঙ্গার ঠিক ওপারে বর্ধমান জেলায় অজস্র ধান, চালের কেজি পঁচাত্তর পয়সা থেকে এক টাকা। খালের মতন নদীটুকু পার হবেই সেই দর উঠে গেল পৌণে দুই থেকে সওয়া দুই টাকা। তা-ও মেলে না। ধান গম রেশনে যা দেয়, কারো তাতে পেট ভরে না। পেট ভরাতে হলে কালোবাজারে যাও। হিন্দুস্থানের মধ্যেই আবার যেন দেশ ভাগাভাগি—আবার এক দফা হিন্দুস্থান-পাকিস্তান। নিশ্বাস ফেল গঙ্গার এপার থেকে বর্ধমানের দিকে তাকিয়ে, এবং দু-হাতে খালিপেট বাজাও। মানুষের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। ঠিক সেই মুখে গুলী। গুলী চালিয়ে পুলিশপুঙ্গবদের সঙ্গে সঙ্গে পলায়ন, কারো আর টিকিটি দেখা যায় না—

সরকারি কর্তারা কথাবার্তায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন: কী রকম বুঝছেন? আগুন দেওয়া-দেওয়ির শুরু না হয়ে যায়!

হবেই। সামাল হোক, কাগজপত্র সরিয়ে ফেলুন।

আয়রনসেফের টাকাকড়ি সরাল, কাগজপত্র যেমন-কে-তেমন পড়ে রইল। ঐ গন্ধমাদন কোথায় নিয়ে তুলবে, কে-ই বা তার ঝামেলা পোহায়?

নিজেদের মধ্যেই আবার প্রবোধ দিচ্ছেন: আগুন দেবে না। অত সাহস হতেই পারে না, কি বলেন?

ঘটল তাই সত্যি সত্যি। শহর জুড়ে লঙ্কাকাণ্ড। রেলস্টেশন পোড়ে, মন্ত্রী-মশায়ের বাড়ি পোড়ে। সরকারি অফিস-গুলো পুড়ছে। কর্তারা হায়-হায় করছেন: কী সর্বনাশ বল তো? জরুরি কাগজপত্র সমস্ত আগুনের গর্ভে, কত রকম লেনদেনের হিসাব—

বুক চাপড়াচ্ছেন সাব, তবু কিন্তু মুখের হাসি তো চাপতে পারেন নি। চতুর্দিক দাউ দাউ করে জ্বলল, সেই আগুনে দিব্যি আপনারা হাত পা সেঁকে নিলেন।

একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে—না? হিন্দুস্থানের কী হাল হয়েছে, তারই বৃত্তান্ত কেবল। ওপারের পাকিস্তানেও একটু-আধটু উঁকি দিয়ে দেখা যাক, পাকিস্তানের কাগজগুলোর চোখ বুলিয়ে নিই। একুশে ফেব্রুয়ারি আর তো কয়েকটা দিন পরে।

"একুশে ফেব্রুয়ারি,
ভুলি নাই, ভুলবো না, ভুলতে কি পারি?"

আত্মাহুতি আর ইন্টারসিন্ধির দিন। একুশে ফেব্রুয়ারির এক চোখে অশ্রু, আর চোখে হাসি। শহীদদের বিয়োগ বেদনা, বঙ্গভাষার বিজয়োল্লাস।

"ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়্যা
নিতে চায়।
ওরা কথায় কথায় শিকল পরায়
আমার হাতে পায়।
কইতো যাহা আমার দাদার
কইতো যাহা আমার বাবার—
এখন, কও দেখি ভাই মোর মুখে কি
অন্য ভাষা শোভা পায়?"

[মাঝে টুকরো খবর একটা নিয়ে নিন—কাগজের উদ্ধৃতি: "স্টেশনের প্রতিটি সাইনবোর্ড দেখলাম। হিন্দীতে নাম লেখা আছে, ইংরেজিতে আছে। বাংলায় লেখা স্টেশনের নাম সকলের নিচে ছিল—আলকাতরা দিয়ে মুছে দেওয়া হয়েছে। হাঁ, বাংলাদেশের বুকে—কলকাতা থেকে মাত্র বারো মাইল দূরে—টিটাগড়ে।"]

বাংলা ভাষার উপর হিন্দু-পৌত্তলিকতার প্রভাব—মুসলমানের পক্ষে গুণাহ্ হয় বাংলায় পঠন-পাঠনে। বাংলা লেখকের মধ্যে মুসলমান ক'জনই বা—গল্প-উপন্যাসে ক'টা মুসলমান চরিত্র ইত্যাদি,

ইত্যাদি। অতএব বাংলা বর্জন করো. উর্দুর পূর্ণ-প্রতিষ্ঠা চাই পাকিস্তানের পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলে। দেশ যখন একটা—হোক না হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান পশ্চিম ও পূর্বের মধ্যে—ভাষা একটিমাত্র থাকবে উভয় অঞ্চলে। উর্দু ভাষা। হিন্দু দেবদেবীরা ছদ্মবেশে বাংলা হরফের মধ্যে ঢুকে বসে আছে—ওদের বিসর্জন দিয়ে আরবি হরফ চালু করো। ঢাকা রেডিও-র বাংলা প্রোগ্রামে অন্ততপক্ষে চল্লিশ পার্সেন্ট উর্দু জবান মিশাল দিয়ে বলো, ইস্কুলের বাংলা বইয়ে দেদার উর্দু কথা ঢোকাও। সরকার দরাজ হাতে টাকা ঢালছে, মৌলবি-মোল্লাদের ছুটোছুটি পড়ে গেছে—

শহীদুল্লা ইত্যাদি বাঘা বাঘা পণ্ডিতের ঘোরতর প্রতিবাদ—কে বা শোনে কার কথা! ১৯৪৮, ফেব্রুয়ারিতে করাচির গণ-পরিষদে ধীরেন দত্ত বললেন, উর্দুর মতন বাংলারও ব্যবহার চাই রাষ্ট্রিক কাজ-কর্মে। লিয়াকত আলি সঙ্গে সঙ্গে নস্যাৎ করে দেন: কখনো না। মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের একমাত্র জাতীয় ভাষা উর্দু। চোখ-টেপাটেপি করে অনেকে: বাঙালি হিন্দু কিম্বা—হিন্দুস্থানের দালাল আর ঢাকায় পা দিতেই সেই ধীরেন দত্তর কী উত্তাল অভিনন্দন বাংলাভাষার দাবি তুলে ধরেছেন বলে।

কায়েদে আজম জিন্নাহ্ সাহেব পরের মাসে নিজেই ঢাকায় চলে এলেন। কার্জন হলে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন: আমি পাকিস্তানের স্রষ্টা। বাজেলোক ভালমন্দ অনেক বলেন। উর্দু, একমাত্র উর্দুই রাষ্ট্রভাষা—অন্য কোন ভাষা নয়। যারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে, চিনে রাখো তাদের। পাকিস্তানের দুশমন!

না—

বক্তৃতা থামিয়ে কঠিন দৃষ্টিতে জিন্নাহ্ তাকিয়ে পড়লেন। চতুর্দিকে বোল উঠেছে: না, না, না—। বাংলার ছাত্রছাত্রী বড় কঠিন ধাতুতে গড়া। এমন যে কায়েদে-আজম, মুখোমুখি তাঁরও কাছে স্পষ্টকথা বলতে ভয় পায় না। সরকারি ইজ্জত আর রাজ্যের অকল্যাণ—দেখা যাক, কাদের জোর কতখানি—কার হারে কারা জেতে। 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা কমিটি' গড়লেন ছাত্রেরা। ভূত একেবারে সর্ষের ভিতরেই ঢুকে পড়েছে। ক্যাবিনেট মন্ত্রী হবিবুল্লাহ্ বাহার, কবি ও সাহিত্যিক মানুষ, 'বুলবুল' কাগজের সম্পাদক—জিন্নাহের অত বড় অসম্মানের পরেই জাঁকিয়ে 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী' উৎসব করলেন। বেগতিক বুঝে মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন তখন কথা দিলেন, উর্দুর সঙ্গে বাংলার দাবিও সমর্থন করবেন তিনি।

চার-চারটে বছর নিরাপদে চলল। ১৯৫২। জিন্নাহ্‌র এন্তেকাল হয়েছে। লিয়াকত আলিও মারা গিয়েছেন। নাজিমুদ্দিন গবর্নর জেনারেল। ভেক গিললেন ভদ্রলোক: কী করব, কায়েদে ঠিক করে রেখেছেন উর্দু রাষ্ট্রভাষা। বাংলা-উর্দু নয়, একলা উর্দু।

বটে রে! 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়্যা নিতে চায়—'। কথার খেলাপ—প্রতারণা। জ্বলছে পূর্ব-বাংলা অপমানে—ভাষার লাঞ্ছনায়। দেশ-জোড়া ছাত্র-হরতাল। সারা পূর্ব-বাংলার ধর্মঘট ঘোষণা—২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২। ৪ ফেব্রুয়ারির ছাত্র-ধর্মঘটে পরখ হয়ে গেল: ঠিক আছি তো সকলে? হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী মিছিল করে ঢাকা টহল দিল: হাঁ, ঠিক—

তারপরে ছকবাঁধা কার্যকলাপ—নতুন করে পরিচয় দিতে হয় না। এ ব্যাপারে এপারের স্বাধীনবাদী অহিংস সরকার আর ওপারের লীগপন্থী সহিংস সরকারে কণামাত্র ফারাক নেই। একশ চুয়াল্লিশ ধারা—পাঁচজনের বেশি একত্র চলাচল বে-আইনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় পুলিশ আর পাঞ্জাবি-বেলুচি ফৌজ কাঁধে কাঁধ দিয়ে মোতায়েন আছে। দৃশ্যটা এপারের ভারতখণ্ডে একেবারে আজব ঠেকছে নাকি? বলুন।

সূর্য ঠিক মাথার উপরে। টং টং করে ঘড়িতে বারোটা বাজে—আর সেই সঙ্গে দশজন করে এক-একটা দল আইন ভাঙতে আগুয়ান। ধরো, কয়েদির গাড়িতে ঢুকিয়ে দাও। গ্রেপ্তার করে করে পুলিশ নাজেহাল। একটি জনও আর জেলের বাইরে থাকবে না, বুঝি পণ করেছে। গাড়ি বোঝাই করে করে কত আর চালান দেবে! অতএব লাঠি আর কাঁদানে গ্যাস। দৃশ্যটা বড্ড নতুন ঠেকছে নাকি? বলুন।

বেলা দুটোয় বান ডাকল ঢাকা শহরে। বান এসে আছড়ে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে। মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ঢাকা হল, জগন্নাথ হল, সলিমুল্লা হল, ফজলুল হক হল—সবদিক হতে ছাত্র আসছে বানের জলের মতো। আকাশ চৌচির করে সকল মুখের একটিমাত্র দাবি। বাংলা চাই—

বন্যা রুখবে, কার এত ক্ষমতা! নিশ্চিহ্ন পুলিশের কর্ডন। পরবর্তী কাহিনী অতিশয় সংক্ষিপ্ত। রাইফেল রয়েছে হত্যা করো। নিরস্ত্র উনিশটি কিশোর হত্যা—জব্বর, বরকত, সালাম, রফিক, সফি এবং আরো সব। অপরাধ সাংঘাতিক বটে! মাতৃভাষা মুখ থেকে কেড়ো না, এই চেয়েছিল তারা।

অ্যাসেম্বলি চলছে তখন, বাজেট অধিবেশন। মনোরঞ্জন ধর বললেন, আমাদের ছেলেদের খুন করেছে, অধিবেশনের এই-মুলতুবি চাই। মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশও তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আরও অনেকে। সবাই য়ুনিভার্সিটির দিকে ছুটলেন। জনতা উত্তাল। ঢাকার ইমাম ভাষা-শহীদদের উদ্দেশে 'গৈবি জানাজা' পাঠ করলেন। তারপরে প্রার্থনা: খোদা তালা, আমাদের প্রাণের সন্তানদের যারা হত্যা করেছে, তাদের তুমি ক্ষমা কোরো না।

তিন বছর তিন মাস পরে—তিন মাস পুরো নয়, দুটো দিন কম—১৯ মে, ১৯৬১ এপারে শিলচরেও অবিকল অমনি নরমৃগয়া। একই অপরাধ—'বাংলা চাই' বলেছিল, মাতৃভাষা মুখ থেকে ছিনিয়ে নিও না প্রভুগণ। এগারোটি হত্যা রাইফেলের মুখে—একটি তার মধ্যে মেয়ে, কমলা ভট্টাচার্য। কিন্তু ভারতের ঈশ্বর অতিশয় ক্ষমাশীল এবং ভারত সরকারও বটে। খুনেদের গায়ে আঁচড়টি পড়ে নি। ১৯ মে প্রতি বছর আসে এবং নিঃশব্দে চলে যায়। লোকাগুলিতে কয়েকটা চাপা নিশ্বাস পড়ে হয়তো। এগারোটি নামও কেউ মনে করে রাখে নি।

[ক্রমশঃ]

আকাশবাণী পরিক্রমা

মেঘদূত

শুভ সূচনা

২৮শে সেপ্টেম্বর 'সাম্প্রতিক বাংলা রচনা ও লঘু সাহিত্য' সম্পর্কে আলোচনা করলেন শ্রীনারায়ণ চৌধুরী। বেতার জগতে বক্তার নাম ছাপা হয়েছে,—শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। ইদানীংকালে বেতারজগতে ছাপার ভুল ভূরি ভূরি; সেজন্য অবশ্য এই পত্রিকাটির সম্পাদকের জন্য প্রমোশনের সুপারিশ করা চলে। আশা করা যেতে পারে তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় সম্পাদকের বিষয়ে একটু ভেবে দেখবেন। প্রতি সংখ্যায় ডজনখানেক মারাত্মক ভুল থাকলেও যদি প্রমোশন না হয় তবে বলতে হবে আমাদের জাতীয় চরিত্র গোল্লায় যেতে বসেছে।

যাক এবার মূল বক্তব্যে আসা যাক। শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর আলোচনাটি সময়োপযোগী হয়েছিল। আকাশবাণী এ জাতীয় একটি আলোচনার ব্যবস্থা করার কর্তৃপক্ষের প্রশংসা করি। যে সাহিত্য সাহিত্যের মুখোশ পরে সমাজে ভাঙন ধরাতে চায় আকাশবাণী তার মুখোশ খুলে দিলে বাঙালি জাতি সমাজ গঠনে আকাশবাণীর দান কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করবে। যারা ভয়াবহ সাহিত্য-বিবর সৃষ্টি করছে, যারা পাঁক খেলায় মেতে উঠেছে, তাদের কপালে বেতার প্রতিষ্ঠান চন্দন-তিলক পরাতে চাইলে জাতির আস্থাভাজন হতে পারে না। কর্তৃপক্ষ সম্ভবত আজ এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

শ্রীচৌধুরীর আলোচনার বিষয়বস্তু প্রণিধানযোগ্য। সাম্প্রতিক লঘু সাহিত্যের নির্লজ্জ সৃষ্টিকে এবং তার স্রষ্টাদের কঠোর সমালোচনার কশাঘাতে জর্জরিত করেছেন। সত্য কথাগুলো রেখে ঢেকে বলতে চান নি। মেঘদূত মনে করে তিনি সংসার-সমালোচক মন। সাম্প্রতিক সমালোচকদের বেশির ভাগই তো এ দলের। এঁরা সবদিক বাঁচিয়ে চলতে চান। নারায়ণ চৌধুরী মশায় যে একেবারে স্বতন্ত্র সেজন্য তিনি প্রশংসার্হ।

দুর্গাপূজা ও বাঙালি

দুর্গাপূজা বাঙালির উৎসব না কেবলমাত্র বাঙালি হিন্দু? আমরা হিন্দুরা মুসলমান খৃস্টান বৌদ্ধ সকলকে নিয়ে তো এ উৎসব পালন করি না। তবে একটি ধর্মীয় উৎসবকে জাতীয় উৎসব বলি কোন অধিকারে? বাঙালি হিন্দু ও বাঙালি জাতি কী সমার্থক? আকাশবাণী একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান, অথচ আকাশবাণী মারফৎ পরে পরে শুনলাম, দুর্গাপূজা বাঙালির জাতীয় উৎসব ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে যেখানে নানা ধর্মের নাগরিক রয়েছেন সেখানে , এমনতরো কাণ্ডজ্ঞানহীন উক্তি সমীচীন নয়।

পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলা বর্ণমালা

২৭শে থেকে ২৯শে সেপ্টেম্বর তিন দিন ধরে সংবাদ পরিক্রমায় আলোচনা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বানান সরলীকরণের প্রস্তাব সম্পর্কে।

বাংলাদেশের দু'-একখানা পত্রিকায় এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত সংবাদ বার হয়েছিল। কোথাও কোন পত্রিকায় এ সম্পর্কে বিশেষ কোন আলোচনা না হওয়ায় সংবাদ পরিক্রমার মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। আলোচনা না হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে, যে খবরটুকু আমাদের হাতে এসেছে তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। আশা ছিল সংবাদ পরিক্রমায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত মূল প্রস্তাবটি আমাদের শোনানো হবে। বক্তা যা শোনালেন তা যৎকিঞ্চিৎ, তার ওপর নির্ভর করে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। বক্তা শুধু কটি বর্ণের উল্লেখ করলেন মাত্র, বাকীটুকু তাঁর সংশয় ও ক্ষোভ মেশানো সমালোচনা। কটি বর্ণের উল্লেখ শেষ কথা নয়: মূল প্রস্তাবটি হাতে পাওয়া চাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের জানার প্রয়োজন করে। আশা করছি আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ মূল প্রস্তাবটি শোনাবেন। মূল প্রস্তাবটি সম্পর্কে সঠিক ধারণা হলে তবেই যথাযথ আলোচনা সম্ভব। সুতরাং বিস্তারিত আলোচনা থেকে মেঘদূত আপাতত বিরত রইলো।

এই পর্যন্ত জেনেছি যে, বাংলা বর্ণমালা থেকে কয়েকটি বর্ণ মুছে ফেলার কথা হয়েছে। আমরা জানি, বাংলা বানান ও উচ্চারণ এক নয় সর্বত্র। বানানকে ভাষা-বিজ্ঞান মতে phonemic করতে হলে বর্ণমালা ও ধ্বনিবর্গের সমতার প্রয়োজন। যে বর্ণগুলি ধ্বনিসম্মত নয়, অথচ বানানে রয়ে গেছে সেগুলি বর্জন করা যায় কি না সে সম্পর্কে ভেবে দেখা দরকার। যা কিছু প্রাচীন তা ছাড়তে আমাদের কষ্ট হয় এটা তো খুব স্বাভাবিক। আবার প্রাচীন বলেই ত্যাগ করতে হবে তাও বলি না। যার প্রয়োজন মিটে গেছে তাকে ত্যাগ করতে হলেও রয়েসয়ে ভেবেচিন্তে করা চাই। এবং কতটুকু ত্যাগ করা যেতে পারে তা বুঝতে হবে। বানান উচ্চারণ প্রভৃতি সংস্কার বা সে সম্পর্কে সমালোচনা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। কেবল মাত্র ভাষাতত্ত্ববিদরাই এ ব্যাপারে রায় দেবার অধিকারী। তাই মেঘদূত একজন কমন ম্যান বলে এ নিয়ে বেশি দূর নাক গলানোর পক্ষপাতী নয়। এখন জানা দরকার পূর্ব পাকিস্তানে কমন ম্যান ছাড়া যে সব ভাষাবিদ রয়েছেন তাঁরা কী বলেন। প্রবীণ ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেবের মতামত আমাদের গোচরে আসে নি। তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক জনাব আবদুল হাই যিনি স্বয়ং একজন ভাষাবিদ এবং ভাষাতত্ত্বের অতি আধুনিক মতবাদগুলি যাঁর জানা আছে তাঁর মতও আমরা জানি না।

বাংলা ভাষাকে মান দিতে যাঁরা একদিন শহীদের রক্তে স্নান করেছিলেন নিশ্চয়ই তাঁরা মাতৃভাষার পক্ষে যা ক্ষতিকর তেমন কিছু করবেন বলে আশা করা উচিত হবে না।

আকাশবাণী সুর তুলছে, 'ওপারের বাঙলা গেল গেল!' এপারের বাঙলার মান বাড়াতে আকাশবাণী কী করছে? হিন্দীর পৃষ্ঠপোষকদের বিশেষ অবদান

জাল পার্ট হলে বাংলার কী ঘটিতে পারে! বাংলা স্কুলে সেদিন তো আমাদের ছেলে-মেয়েরা হিন্দী শিখবে বলবে লিখবে। আর নিরক্ষর হিন্দিভাষী আল্লুআল্লাও লেংগি মেরে যাবে এই বলে যে, আমরা নাকি বিশুদ্ধ হিন্দি বলতে পারি না। এ সম্পর্কে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের যে বিরাট দায়িত্ব রয়েছে তা কি ঠিকমতো পালিত হচ্ছে? নিজের ঘর সামলাবার ক্ষমতা আজ আমরা হারিয়েছি। সুতরাং কোন্ অধিকারে পরের ঘরের সমালোচনা করি!

আমাদের বর্ণমালা নিয়ে স্বল্প আলোচনা করলে এইমাত্র বলা যায় যে, বানান পদ্ধতি সংস্কৃত ঘেঁষা; কিন্তু উচ্চারণ খাঁটি বাংলা। বাঙালির মুখের ভাষাকে হুবহু লিখতে হলে বর্ণমালাকে ধ্বনিমূলক করতে হয়। বর্ণমালা যেখানে phonemic নয় সেখানে শিশুশিক্ষা এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে দেখা যায় বানান পদ্ধতি অসুবিধার সৃষ্টি করছে। হয়তো অনেকে বলবেন যে, এই পদ্ধতিতেই তো বাবা-দাদারা চিরটা কাল লেখাপড়া শিখে এসেছেন। তখন প্রশ্ন উঠতে পারে, আমাদের মধ্যে শতকরা কতজনের অক্ষর-জ্ঞান হয়েছে? নিরক্ষরতাকে ঝটপট সমূলে উৎপাটন করতে হলে বানান সংস্কারের প্রয়োজন একেবারে বিচিত্র নয়। কে জানে তেমনতরো কোন প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে হয়ত পূর্ব পাকিস্তানের পণ্ডিতরা বানান সংস্কারে মন দিয়েছেন। সুতরাং আন্দাজে না ঢিল ছুঁড়ে আমাদের একটু ধৈর্য ধরে দেখা দরকার কী ধরণের সংস্কার হতে চলেছে।

সংবাদ পরিক্রমার আলোচনায় বলা হলো, বানান পাল্টে গেলে অর্থাৎ কয়েকটি বর্ণ লোপ পেলে phonetic পরিবর্তন এসে যাবে। বক্তার ভুল সংশোধনার্থে এবং শ্রোতা-পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানাই বর্ণ ও ধ্বনি এক নয়। বানান ধ্বনিসম্মত হলে phonetic পরিবর্তন হয় না বরং phonetic-ধর্মী হয়। 'ঈশ্বর' এবং 'ইশ্শর' মুখের ভাষায় এক তবে লেখায় নিয়বল ভিন্ন। এতে ভাষার কোন পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে না। কেবলমাত্র লেখায় যথাক্রমে দুটি রীতি থাকছে সংস্কৃত এবং বাংলা অর্থাৎ প্রাচীন ও নতুন। মুখের ভাষা পরিবর্তনশীল, বানান পদ্ধতি রক্ষণশীল। বানান সংস্কার ও সরলীকরণ যদি পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা প্রসারের সহায় হয় তবে কালে আমরাও হয়ত তা গ্রহণ করতে পারি।

বাংলা বানান সংস্কৃতের অনুরূপ হতে হবে এমন কোন কথা নেই। সংস্কৃত ও বাংলার structure যেমন এক নয়, উচ্চারণও তেমনি স্বতন্ত্র—কারণ দুটি ভিন্ন ভাষা। বানানের বিভিন্ন সংস্কার হওয়া বোধহয় দোষণীয় নয়। যাঁরা ভাষার ইতিহাস চর্চা করবেন তাঁদের সুবিধার্থে সংস্কার বাধাগ্রস্ত হতে পারে না। গবেষককে শব্দের ইতিহাস খুঁজতে পরিশ্রম করতে হবে; বিনা আয়াসে গবেষণা হয় না। তাছাড়া বানান যদি উচ্চারণ সম্মত হয় সেখানে তো ধ্বনি-বিজ্ঞানের আইন অনুসারে পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা যাবে। সংস্কৃত বানান ও বাংলা ভাষার মধ্যে যে পরিবর্তন দেখি তা ভাষাতাত্ত্বিক বিদ্যার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা কঠিন নয়। আমাদের মুখের ভাষা সংস্কৃত থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে; লেখার ভাষা বা বানানের মাধ্যমে চিরকাল সংস্কৃতকে ধরে রাখা হয়ত যাবে না। সংস্কৃতকে জানবার বোঝবার এবং বাঁচিয়ে রাখার উপায় খুঁজে পেতে হবে অন্যভাবে। প্রথার সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষাই সংস্কৃতকে বাঁচিয়ে রাখার একমাত্র পথ। সংস্কৃত আমরা অনেকে পড়ি, ব্যাকরণের সূত্রও কিছু কিছু আওড়াতে পারি; অথচ পৃথিবীর প্রথম ব্যাকরণবিদ কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করে সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্র রচনা করলেন যা আজও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ববিদদের বিস্ময় উদ্রেক করে সে সম্পর্কে কী এদেশে কোন গবেষণা হয়েছে? হয়েছে বলে মেধদূতের জানা নেই; কেউ জানলে দয়া করে জানালে বাধিত হবো। তাই বলি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংস্কৃত শিক্ষাও আমাদের দেশে হচ্ছে না। কোন আধুনিক আর্য ভাষায় বানান সংস্কার হলেই সংস্কৃতের প্রভাব অস্বীকার করা হয় তা বোধ হয় সত্য নয়।

•

২০শে সেপ্টেম্বর শ্রীবাণী ঠাকুর গাইলেন, 'তোমরা যা বল তাই বলো'। এ গানে 'ওই আকাশ-হাওয়া কাহার চাওয়া পাই'। অথচ শ্রীমতী ঠাকুর বারে বারে 'কাহার হাওয়া' বলে গেয়ে গেলেন।

•

ওই একই দিনে শ্রীতপতী সিংহ রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করলেন। তিনি গাইলেন 'এসো শরতের অমল মহিমা'। গান জমলো না। এ গানের সুর বড়ো কঠিন, সকলের গলায় আসে না। নতুন শিল্পীরা ছন্দপ্রধান ছকে বাঁধা গান গাইলে ভালো করবেন। ওস্তাদী গানের গলা না থাকলে সে গান শিল্পীর কণ্ঠে জমে না। নতুন শিল্পী যাঁরা বেতারে গাইবেন তাঁরা এ সম্পর্কে একটু সতর্ক হলে ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা বাড়বে আশা করা যায়। কঠিন সুরের গান ঠিকমতো গাইতে না পারলে শ্রোতাদের বিরক্তি উদ্রেক করে; ফলে শিল্পী শিল্প-জীবনের সূচনাতে অপ্রিয় হয়। এ-সম্পর্কে আকাশবাণীর সংগীত বিভাগের কর্তৃপক্ষ অবহিত হলে সুফল ফলবে। শিল্পী তো গানের কথা পাঠিয়ে দেন রেকর্ডিং-এর পূর্বে, কর্তৃপক্ষ তখন নতুন শিল্পীদের গান মনোনয়ন ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। নবীন শিল্পীদের অভিজ্ঞতা কম, সুতরাং সংগীত বিভাগের সহানুভূতি ও সাহায্য ছাড়া তাঁদের পক্ষে কৃতিত্ব দেখানো সম্ভব নয়। নচেৎ এইসব শিল্পীদের সংগীত শিক্ষকদের এ দায়িত্বটি নিতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের ঠিকমতো গান বেছে দেওয়ার কাজে শিক্ষকের অভিজ্ঞতা জ্ঞান প্রভৃতি ধরা পড়ে।

•

২৪শে সেপ্টেম্বর শ্রীবুদ্ধদেব দাস রবীন্দ্রসংগীত গাইলেন। তাঁর কণ্ঠে 'শুভ্র আসনে বিরাজো' গানখানি মনকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। এই শিল্পীটি সম্পর্কে মেঘদূত উৎসাহ পোষণ করে। আশা করি শিল্পী নিবিষ্টমনে সংগীত সাধনা চালিয়ে যাবেন।

•

৩০শে সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' নাটকটি আকর্ষণীয় হয়েছিল। 'রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেল, মহাকালের রথ অচল' এই ভাবটি অভিনয়ে ফুটিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে।
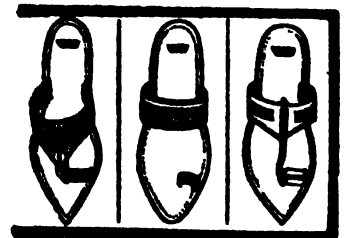
কার্ল মার্কস : ব্যর্থ ভগবান ?

এই বছর কার্ল হাইনরিখ মার্কস-এর একশো পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলো। দেশে-বিদেশে এই সুযোগে মার্কসকে আবার নতুন করে পড়ে দেখার ও আলোচনা করার এক উৎসাহ এসেছে সন্দেহ নেই—মার্কসবাদে বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী উভয় মহল থেকেই। অসুবিধের বিষয় হচ্ছে এই যে আমাদের মতো পল্লবগ্রাহীদের পক্ষে মার্কস-মনীষার সমগ্রতাকে বোঝা প্রায় অন্ধের হস্তীদর্শনের মতো একদেশদর্শী এবং অনেকাংশে হাস্যকর ব্যাপার। তিনি কি ছিলেন না—এই প্রশ্নের উত্তর ভাবতে গিয়েও আমাদের চিন্তাশক্তি রুদ্ধ হয়ে আসে, কেন না, জ্ঞানের বহু বিবিধ শাখা-প্রশাখায় ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ যাতায়াত। দার্শনিক-বিজ্ঞানী, মানবতাবাদী-ঐতিহাসিক, ধর্মবিদ্-শিল্পী, ভাবুক-কর্মী,—তাঁর মধ্যে এসে মিলেছে এই সমস্ত আপাতবিরোধী বিষয় ও বিষয়ের চর্চা। সব মিলিয়ে যে মার্কস, তাঁকে সম্ভবত, এক মানবজীবনে সম্পূর্ণ বোঝা যাবে না; অথচ যে বিচ্ছিন্ন মার্কস আমাদের ওষ্ঠে অবলীলাক্রমে উচ্চারিত হন, যাঁর নাম শুনলেই আমরা বুঝি গরিবদের অবস্থার কথা বলা হচ্ছে এবং আজকাল যে নাম আমাদের বেশ খানিকটা আত্মপ্রসাদও দেয়—সে মার্কস আমাদেরই হাতে তৈরি, আমাদের অবসরের সঙ্গী, আমাদেরই সংকীর্ণতায় সংকীর্ণ, বুদ্ধির ক্ষুদ্রতায় ক্ষুদ্র।

কার্ল হাইনরিখ মার্কসের জন্ম ১৮১৮ সালের ৫ই মে রাইনল্যান্ডে ট্রিয়ের শহরে। ১৮৩৬ সালে যখন তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র, তখন তাঁর সঙ্গে তরুণ হেগেলপন্থীদের পরিচয় হয়। যদিও সেই সময় হেগেলীয় দর্শনকে জার্মান সরকার রাষ্ট্রীয় দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছিল, তথাপি হেগেলের দর্শনের গতিশীলতার দিকটি তাদের কাছে পরিত্যক্ত ছিল—কারণ সেখানে বলা হয়েছে যে বাস্তব অবস্থা কখনো চিরকাল টিকে থাকে না, তারও অস্তিত্ব লোপ পেতে বাধ্য। কিন্তু হেগেলপন্থীরা মার্কসকে বার্লিনে থাকতে দিলেন না। তাঁরা যখন শুধু বাস্তবের ব্যাখ্যা দিয়ে পৃথিবীকে ব্যাখ্যা করছিলেন, মার্কস তখন মগ্ন হলেন বাস্তবের সঙ্গে বস্তুবাদের সম্পর্ক বিচারে। তাঁর থিসিস 'ডিমোক্রিটাস ও এপিকিউরাসের দর্শনচিন্তার পার্থক্য'-এ মার্কস বস্তুবাদের দুই জনককে পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ঈশ্বর নয়, মানুষই নিজের কর্তা ও বিধাতা।
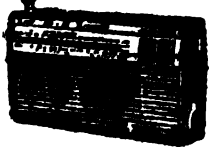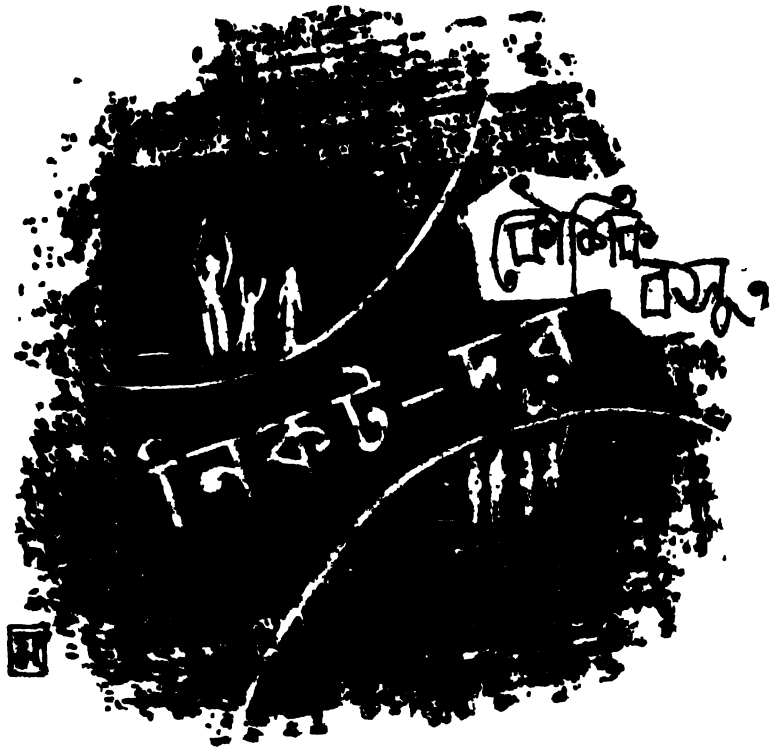
তখন ১৮৪১ সাল : এর পর, মার্কস নানা পত্রিকায় প্রাশিয়ান সরকারের নীতিকে সমালোচনা করে প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। তাঁর চিন্তা রাজনীতির দিকে মোড় ঘুরল। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চাকরি গেল। ১৮৪৩ সালে সপত্নী প্যারি যাত্রা করলেন—সেখানে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হলো এঙ্গেলস-এর সঙ্গে। ১৮৪৮ সালে পুনর্গঠিত কমিউনিস্ট লীগের তত্ত্বাবধানে জর্মন কমিউনিস্ট পার্টির জন্য কার্যসূচী তৈরি করলেন। বক্তৃতা ও উস্কানির জন্য মার্কস ১৮৪৯ সালে প্রথমে প্রাশিয়া ও পরে প্যারি থেকে বহিষ্কৃত হলেন : তিনি চলে এলেন লন্ডনে, সেখানেই তিনি আমৃত্যু বসবাস করেন। ১৮৪৮ সালে মার্কস ও এঙ্গেলস যুগ্মভাবে লন্ডনে জর্মান ভাষায় যে 'সাম্যবাদী ইস্তাহার' প্রকাশ করেন, তাই মার্কসীয় চিন্তাধারার আত্মপ্রকাশ। এই ইস্তাহার সম্পর্কে একজন তাই লিখেছেন : "তাঁর ইস্তাহার শুধু যে তত্ত্বগতভাবে সম্পূর্ণ তাই নয়, গতিময়ও বটে। কি দর্শন, কি বিজ্ঞানে, কি অর্থনীতিতে, কি মানবসমাজের যত প্রশ্ন আছে, সমস্তের উত্তর দিতে প্রস্তুত এই ইস্তাহার।...তাই, এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, এই ইস্তাহার তার সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে আজ খৃস্টধর্মেরই জোরালো প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে."

সাম্যবাদী ইস্তাহার তার প্রকাশমুহূর্তেই পৃথিবীব্যাপী বিপ্লবকে ডাক দিয়েছিল। গণ-সংগ্রাম শুরু হয়েছিল জর্মানি, অস্ট্রিয়া, ইটালি, ফ্রান্সে। ফ্রান্সে বিপ্লবভীত লুই ফিলিপের পলায়নে সাময়িকভাবে জনপ্রিয় সরকারের প্রতিষ্ঠা হলো বটে, কিন্তু পরবর্তী সরকার হলেন একেবারে শ্রমিকবিরোধী। আর তারই ফলে, ফ্রান্সে গণতন্ত্র বিকাশের অন্তরায় দূর হলো—এই ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল সমগ্র ইউরোপে। মার্কস অবশ্য এই প্রতিক্রিয়ার জবাব দিলেন তাঁর 'ফ্রান্সে শ্রেণীসংগ্রাম' রচনায়। তাঁর মতে 'গোলাৎসাইজেন' বা শ্রেণীসমাবেশের ব্যাপারটি পরিষ্কার বোঝা যায় না গণতন্ত্র চরম বিকাশ লাভ না করলে, কেন না ফ্রান্সে দেখা গেছে যে বিপ্লবের শেষ পর্যায়ে ক্ষুদ্র শিল্পপতি বা মধ্যবিত্তরা শ্রেণী পাল্টে বুর্জোয়া পক্ষে যোগ দিয়েছে।

কিন্তু শুধু বিপ্লব এবং বিপ্লবের জন্য কর্মসূচী প্রণয়ন নয়, এবার মার্কসের দৃষ্টি গেল অর্থনীতির দিকে। ১৮৫০ থেকে শুরু—এই এগারো বছর অর্থনীতি-সংক্রান্ত যাবতীয় বই পড়া শেষ করে মার্কস তাঁর যুগান্তকারী 'দাস ক্যাপিটাল' গ্রন্থের খসড়া তৈরি করলেন। তিন খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত :

মরেস্ক
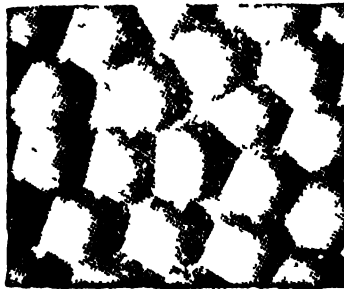
আজকালকার স্থপতিরা গৃহনির্মাণে এইচ পি জি গ্লাস ব্যবহার করেন

হেক্সাগোনাল ওয়্যারড

স্যারো রীডেড

আজকের দিনের বাড়ীঘর ও অফিস-কাছারি, কলকারখানা, ইস্কুল ও হাসপাতালে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়াররা সর্বত্রই এইচ পি জি গ্লাস লাগান, কেননা তাঁরা জানেন যে এইচ পি জি গ্লাস উৎকর্ষের নিখুঁত মান বজায় রেখে তৈরী হয়। বিলাতের শতাধিক বৎসরের কাঁচনির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান পিলকিংটন ব্রাদার্স-এর কারিগরী কুশলতার সাহায্য নিয়ে হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস এই এইচ পি জি গ্লাস তৈরী করেন।

এইচ পি জি কেনা মানেই নির্ভরযোগ্য ভাল জিনিস কেনা।

হিন্দুস্থান পিলকিংটন গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড

শীট গ্লাস

মরক্কো পিনহেড

জর্জিয়ান ওয়্যারড

রাফকাস্ট

হ্যামার্ড
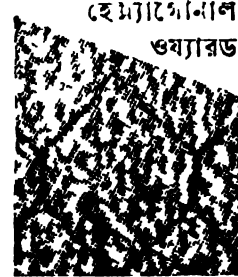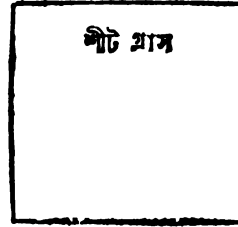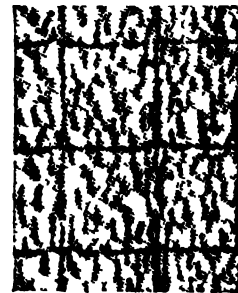
ম্যানেজিং এজেন্টস
তালুকদার ল' অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ,
কলিকাতা-১৩

JWTHP 1775A

হলো ১৮৬৭ সালে—বাকী খণ্ডগুলি মার্কসের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডে মার্কস দেখিয়েছেন যে উৎপাদনকারী শ্রম উদ্বৃত্ত মূল্য (surplus value) সৃষ্টি করে; এই বর্ধিত পুঁজি বিনিয়োগ (invest) করা হলে, উৎপাদনকারী শ্রমের দ্বারা আবার উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হয়। এইভাবে উদ্বৃত্ত মূল্যের ক্রম-বিনিয়োগের মধ্য দিয়ে মুনাফাও ক্রমবর্ধিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডে মার্কস পুঁজির 'প্রসেস অব সারকুলেশন' বা সঞ্চালন-প্রক্রিয়ার ব্যাপারটি আলোচনা করেছেন এবং তৃতীয় খণ্ডে ফুটিয়ে তুলেছেন পুঁজিপ্রধান উৎপাদনব্যবস্থার চিত্র যাতে মুনাফার হার, মূল্যমান, সুদ, খাজনা তাঁর বিস্তৃত আলোচনার বিষয়।

মার্কসের জীবনের আর একটি উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা ১৮৭১ সালে পারি শহরে কমিউনের জন্ম। এই কমিউনের তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হলো মার্কসের কলমে, ঐ বছরেই প্রকাশিত 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থে। কমিউনের অনিবার্য পতন সত্ত্বেও মার্কস তার স্বল্পকালীন অস্তিত্বের মধ্যে দেখতে পেলেন 'প্রলেতারীয় ডিকটেটরশিপ'-এর চরিত্র। 'দাস ক্যাপিটাল'-এ শ্রমিকশোষিত উদ্বৃত্ত মূল্যের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদের জয়-যাত্রা একমাত্র ব্যাহত হবে তখনই যখন পৃথিবীতে বিত্তহীনরা শাসনব্যবস্থার পরি-চালক হবে—তখনই শ্রেণীসংঘর্ষের অবসানে এক 'শ্রেণীহীন সমাজ'-এর উদ্ভব হবে।

* * *

এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য যে এই সামান্য আলোচনা থেকে মার্কস-মনীষার বিস্তৃতি ও গভীরতা অনুধাবন করা কষ্ট-সাধ্য। তবু মার্কস সম্পর্কে আমরা একথা সবাই জানি যে তিনি মানুষকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের এক স্বপ্ন দেখিয়েছেন। এবং সেই স্বপ্নের বিষয় শুধু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নির্যাতনের অবসান নয়, বৃহত্তর অর্থে মানবমুক্তিও বটে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কেন শতাধিক বছর ধরে মানুষ এই স্বপ্নকে সত্যেরও অধিক মূল্য দিয়েছে? তার কারণ মার্কসবাদের মধ্যে অনিবার্যতার দাবি আছে; অর্থাৎ ভবিষ্যতে কী ঘটবে, মার্কসের প্রজ্ঞায় তা আগে থেকেই ধরা পড়েছে। মার্কস জানেন যে 'ডায়ালেকটিক মেটেরিয়ালিজম'-এর তত্ত্ব ইতিহাসের গতি নিরূপণ করে অভ্রান্তভাবে, ভবিষ্যৎ তাই অজানা নয়, ভবিষ্যতের স্বপ্নও নয় কোনো স্বকপোলকল্পনা। মানুষকে নিয়েই ইতিহাস, মানুষেরই জন্য। শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে মানুষ সেই ইতিহাসকে অমোঘভাবে এগিয়ে নিয়ে যায় সামনের দিকে—ভাবীঘটনা পূর্বঘটনার মতোই ঐতিহাসিক সত্য হয়ে ওঠে 'তখন'। মার্কস সম্পর্কে তাই আমরা বলতে পারি যে সাফল্যের দ্বারা তিনি ভাবীকথনকে প্রমাণ করেন না, ভাবীকথনের দ্বারাই সাফল্যকে প্রমাণ করেন।

এই নিশ্চিতির বোধই মানুষকে এতকাল ধরে মার্কসবাদের দিকে টানছে। এবং কোনো একদিন মার্কসবাদের আকর্ষণ-শক্তি কমে যাবে, তাও বলা অসম্ভব—কারণ মার্কসবাদ একটি জঙ্গম তত্ত্ব, ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ সময়ের বাস্তব সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে তার নবব্যাখ্যা হবে মাত্র, বিলুপ্তি ঘটবে না। তাই মার্কসবাদের 'সেকেলে' হয়ে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই; বস্তুত, খৃস্টধর্ম, হিন্দুধর্ম বা বৌদ্ধধর্মকে সেকেলে বলে পরিত্যাগ করা যেমন হাস্যকর ব্যাপার, তদ্রূপ হাস্যকর মার্কসবাদকে ঐ বিশেষণে বাতিল করা।

মার্কসবাদ যে খৃস্টধর্মের জোরালো প্রতিদ্বন্দ্বী তা অনেক ধর্মপ্রাণ চিন্তাবিদও স্বীকার করেছেন; এমন কি, মার্কসকে হিব্রু বাইবেলের prophet-র সঙ্গেও তুলনা করে দেখানো হয়েছে। পরিত্রাতা মার্কস আশ্রয় দিয়েছেন এমন মানুষদের, যাঁরা বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেন নি সাধারণ মানুষের সঙ্গে, দূর থেকে তাঁকে পূজো করেছেন। আবার সে আশ্রয় ত্যাগ করে চলেও গেছেন অনেকে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা নিয়ে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মার্কস মানুষকে আশ্রয়চ্যুত করেন নি কখনোই, করেছে মার্কসবাদের নিত্য-নতুন প্রয়োগ এবং হয়তো বা কমিউনিস্ট পার্টিসমূহের কর্ম-প্রণালী।

যদি সমস্ত তত্ত্ব থেকে বিচ্যুত করে নিতান্ত আক্ষরিকভাবে মতো মার্কসের মূল বক্তব্যকে গ্রহণ করি, তবে দেখতে পাবো যে 'ডায়ালেকটিক' বা দ্বন্দ্ব মানবজীবনের একটি সামান্য সত্য। মানুষের নিশ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যেও দ্বন্দ্ব আছে, যেমন আছে তার চালচলনের মধ্যে। বিপরীতের মিলনেই আমরা বেঁচে থাকি—সমন্বয়েই প্রাণ স্ফূর্ত হয়। কিন্তু সমন্বয় থেকে যে মুক্তি, মার্কস তাকে 'দর্শনের দারিদ্র্য' বলেই আখ্যাত করেন; তাঁর মতে মুক্তি বিপ্লবের পথে, সংগ্রামের শেষেই আছে সুখ। একজন মার্কস-ভক্ত জার্মান কবি-নাট্যকার বারটল্ট ব্রেখট-এর 'সেন্ট জোয়ান' নাটকে মুমূর্ষু নায়িকার কথা দিয়ে এই রচনার উপসংহার টানতে ইচ্ছে করছে:

এই লোকেতে থেকো যখন তুমি শিখর
মৃত্যুর শেষ প্রহরে
তুমি নিজে যেন আরো ভালো হয়ে
ওঠো
এই কামনাই তোমায় লাভ হোক,
[illegible]

প্রমথ চৌধুরী এবং আমরা (২)

জয়ন্ত গোস্বামী

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য-চিন্তা সম্পর্কে সাপ্তাহিক বসুমতীর পাতায় ইতিপূর্বে আলোচনা করেছিলাম। সেই সময়ে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। বর্তমান প্রবন্ধ সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের চেষ্টা।

আমাদের কালে বেশ কিছু সাহিত্যিক আছেন যাঁরা রাজনৈতিক নেতাদের পিছনে পিছনে ছুটতে ভালবাসেন। রবীন্দ্র পুরস্কার, আকাদমী পুরস্কার প্রভৃতি অনেকগুলি টোপ চোখের সামনে ঝুলছে; সুতরাং রাজনৈতিক নেতাদের মনস্তুষ্টি সাধনের চেষ্টার কারণ অনুমান করা শক্ত নয়। প্রমথ চৌধুরী কিন্তু একটু ভিন্ন জাতের সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি জানতেন মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার লেখকের স্বাভাবিক অধিকার। সারা জীবন তিনি এই অধিকারকে নির্ভীকভাবে প্রয়োগ করেছেন। তিনি তাঁর কালের একজন নিরংকুশ সমালোচকের পদ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর তীক্ষ্ণধার বিদ্রূপের চাবুকে তাঁর কালের সাহিত্য সমাজ এবং রাজনীতির প্রতিটি কর্মকেন্দ্রকেই নির্বিধায় আঘাত করেছে।

সুতরাং চৌধুরী মশাইয়ের রাজনৈতিক চিন্তার আলোচনায় তাঁর সমালোচনার বারিধারা কোথায় কোথায় বর্ষিত হয়েছিল তার সন্ধান নেওয়া ভাল। ১৯১৬ সালে তিনি 'কনগ্রেসের আইডিয়াল' নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন। ভারতবর্ষে তখন কংগ্রেসই একমাত্র রাজনৈতিক দল না হলেও প্রধান রাজনৈতিক দল। তথাপি কংগ্রেস সেদিন আমাদের জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়েও চৌধুরী মশাইয়ের বক্রোক্তির আঘাত এড়াতে পারে নি। একটি উদ্ধৃতি থেকেই তার প্রমাণ মিলবে :

'কনগ্রেসের এবার ভোল ফিরেছে এবং সেই সঙ্গে বোল ফিরেছে। এতদিন কনগ্রেস ছিল বড়দিনের দুর্গোৎসব। তিন দিন ধরে "ধনং দেহি মানং দেহি" বলে দুসন্ধ্যা ইংরাজীতে মন্ত্র আওড়ানো এবং সেই উপলক্ষে খানাপিনা নাচ-তামাসা আমোদ-আহ্লাদ, এবং তারপরে বিসর্জন এবং তারপর কনগ্রেসওয়ালাদের পরস্পর কোলাকুলি করে গৃহাভিমুখে যাত্রা।—এই ছিল কনগ্রেসের হাল ও চাল।'

পরে লেখক ভোল পরিবর্তনের ব্যাখ্যা করেছেন। কনগ্রেস সেবারের অধিবেশনে স্থির করেছিল যে মাত্র তিন দিনের আনন্দোৎসবের ব্যাপার না হয়ে তা সারা বছর ধরে স্বধর্ম প্রচার করবে। বীরবল ঠাট্টা করে বলেছেন : কনগ্রেস এবার জাতীয় রাজনৈতিক শিক্ষাপরিষদে পরিণত হল।' এ সদিচ্ছাব কার্যে পরিণত হবে কি না সে বিষয়ে তাঁর মনে যথেষ্ট সংশয়

আশঙ্কার কথা সেটাও তিনি এ প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন। কংগ্রেস তাঁর নিজের আদর্শ প্রচার করবে এ তো ভাল কথা, কিন্তু তার আদর্শটা কি? তখনকার কংগ্রেসীরা এ প্রশ্নের উত্তরে বলতেন 'সাম্রাজ্যের ভিতর স্বরাজ্য, অর্থাৎ ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস্। এই আদর্শ সম্পর্কে বীরবলের কোন প্রশ্ন নেই। তাঁর প্রশ্ন এই যে এই আদর্শে পৌঁছনোর প্রস্তুতি আয়োজন এবং বাস্তব সম্ভাবনা কোথায়! এটা যদি নিছক দূর ভবিষ্যতের একটি আদর্শ হয়, তবে বর্তমানের জন্যেও তো একটি আদর্শ দরকার। সুতরাং বীরবলের মতে 'কনগ্রেসের পক্ষে জাতীয় রাজনৈতিক আদর্শ অনুসন্ধান সমিতি হওয়া কর্তব্য।'

আমার বিশ্বাস অনেক বছর আগে এই তীক্ষ্ণধী লেখক কংগ্রেস সম্পর্কে যে সমালোচনা করেছিলেন এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে তার চেয়ে যথার্থ সমালোচনা আর কিছু হতে পারে না। জন্মকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত কংগ্রেস কখনো স্পষ্ট করে নির্দিষ্ট করে কোন আদর্শ এবং সেই আদর্শ রূপায়ণের পন্থা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে নি। স্বরাজ, স্বাধীনতা, পূর্ণ স্বাধীনতা প্রভৃতি কথাগুলি এক একটি অস্পষ্ট বায়বীয় ভাবাবেগ হিসাবে কংগ্রেস মঞ্চ থেকে উচ্চারিত হয়েছে। কোন সুনির্দিষ্ট কর্ম পন্থার উল্লেখে এই আদর্শগুলি স্পষ্ট রূপমূর্তি লাভ করতে পারে নি। স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেস যে সমাজতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করেছিল, তাও প্রকৃতপক্ষে বীরবল-কথিত দূর ভবিষ্যতের আদর্শ। কারণ এই আদর্শ রূপায়ণের কোন বাস্তব কর্মপন্থা কংগ্রেসের সামনে অনুপস্থিত। নিশ্চয়ই দিনের পর দিন ধন-বৈষম্যের অনুপাতকে বাড়িয়ে তুলতে দিয়ে সমাজতন্ত্র স্থাপন করা যায় না।

সেকালের বিভিন্ন রাজনৈতিক সম্পর্কে বীরবল এমন এক একটি মন্তব্য করেছেন যা একালের অনুরূপ পরিস্থিতিতেও প্রযোজ্য। তার একটি কারণ এই যে রোগ নিরূপণের ডাক্তার হিসাবে প্রমথ চৌধুরী অনবদ্য। পাণ্ডিত্য ও অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে নিরপেক্ষতা যুক্ত হয়ে তাঁকে এই শক্তি দান করেছিল। আর একটি কারণ এই যে আমরা সেকালেও যে রোগে ভুগতাম এখনো সেই রোগেই ভুগছি; অর্থাৎ সনাতন জাতি বলে

অপরিবর্তিত। মন্টেগু সাহেব যখন আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের অভিমত সংগ্রহের জন্য এ দেশে আসবেন বলে জানা গেল, তখন বাংলা দেশের কংগ্রেস দুভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেকটি দলই দাবি করছিল যে সে-ই আমাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকৃত প্রতিনিধি। এর থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে উভয় উপদলের মধ্যে বুঝি যথেষ্ট মতাদর্শগত পার্থক্য ছিল। এ সম্পর্কে বীরবল কী বলছেন শোনা যাক :

'এখন ন্যায্য পাওনাটা কি, তাই নিয়েই যত গোল। এ বিষয়ে কোন পক্ষের যে একটা পরিষ্কার ধারণা আছে, তার পরিচয় তো তাঁদের কথা-বার্তায় বড় একটা পাওয়া যায় না। গোলের মূল তো ঐখানেই। আমাদের ভাবী "স্বরাজের" একটা স্পষ্ট রূপ কারও চোখে নেই—অথচ তার নাম সকলের মুখেই রয়েছে। অতএব আসল বস্তু চাইতে তার নামের মাহাত্ম্য বেড়ে গেছে। তাই "হোম রুল" এবং "সেলফ-গভর্নমেন্ট" উভয়েই স্বরাজং দেহি বলে কংগ্রেসের আসরে নেমেছেন। তা এই দুটি শব্দের যে একই অর্থ ... কংগ্রেস ও মোসলেম লীগের দস্তখতি দরখাস্ত। অতএব দেখা গেল রূপালী পালা নিয়েও নয় ... উভয়পক্ষের মতেই এবার কংগ্রেসে ... অভিনয় হবে। সুতরাং দাঁড়াল এই যে, "বর বড় কি কনে বড়" এই নিয়েই আড়াআড়ি।'

['কংগ্রেসের দলাদলি'—১৯১৭]

কংগ্রেসের মধ্যে 'বর বড় কি কনে বড়' এই নিয়ে কোন্দল সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। সুভাষ বড় কি জে এম সেনগুপ্ত বড় অতুল্য ঘোষ বড় কি আশু ঘোষ বড়—এই দ্বন্দ্ব নিয়ে হট্টগোলে আকাশমন্ডল কেঁপে উঠেছে। অথচ মতাদর্শে যে তফাৎ তা শুধু ভাষাগত, উভয় দলের ক্ষেত্রেই তা সমান অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট, এবং কর্মনীতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। মাপ করবেন, সুভাষের নামটি শুধু কথা প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছি : তাঁর যা সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে কোন বক্রোক্তি করা আমার উদ্দেশ্য নয়] এই নেতৃত্ব-ঘটিত মুরগীর লড়াই নিয়ে বীরবল 'রাম ও শ্যাম' নামে একটি চমৎকার গল্প-গল্প রচনা করেছিলেন।

আর শ্যাম ছিল দুই যমজ ভাই। ইস্কুলে পড়ার সময় তারা নিজেদের স্কুলের টিম খেলায় হেরে গেলে রেফারীকে জুয়াচোর বলে বিপক্ষ দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। এইভাবে মারামারি বাধিয়ে দিয়ে নিজেদের স্কুল পেট্রিয়টিজমের প্রমাণ দিয়ে তারা অবশ্য অক্ষত দেহে সরে পড়ত। কলেজ-জীবনে রাম প্রত্যেকটি সভায় উপস্থিত থাকত আর গরম গরম বক্তৃতা দিত; আর শ্যাম তার উপর ভিত্তি করে সত্য মিথ্যা জড়িয়ে নানারকম প্রবন্ধ লিখত আর বিভিন্ন পত্রিকায় তা ছাপা হত। কালক্রমে রাম হল একজন নামজাদা উকিল এবং শ্যাম হল ন্যাশন্যালিস্ট নামক পত্রিকার এডিটর। শ্যাম একবার স্বদেশী আন্দোলনের সময় রাজদ্রোহজনক কথা কাগজে লিখে মামলায় পড়লে রাম বুদ্ধির জোরে তাকে ছাড়িয়ে আনল। সুতরাং স্বদেশী আন্দোলনে অনেক লোক জেলে গেল, চাকরি-চ্যুত হল, কিন্তু কোন ক্ষতি স্বীকার না করেও রাম এবং শ্যাম জনপ্রিয় হয়ে উঠল। দশ বছর পর তারা আবার রাজনীতিতে আবির্ভূত হল: কিন্তু এবার স্ব স্ব মূর্তিতে। একজন হলেন রিফর্মার, আর একজন নব্যহিন্দু। রাম বলতেন জাতিভেদ তুলে দিতে, আর শ্যাম বলতেন বর্ণাশ্রম ধর্ম ফিরিয়ে আনতে হবে। আসলে তাদের মধ্যে তফাৎ যা ছিল তা শুধু বাক্যে, আচারে বিচারে কোন তফাৎ ছিল না। দুজনে তুমুল লড়াই লেগে গেল, এবং লড়াইটা জোরদার করার জন্য রাম 'ন্যাশানেলিস্ট' নামে আর একখানা কাগজ বার করল। উভয়ের মধ্যে লড়াই চরমে উঠল যখন ইংরেজ শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রস্তাব দিল। রাম বললেন: 'রিফরম গ্রাহ্য, কিন্তু তার বদল চাই।' শ্যাম বললেন: 'রিফরম অগ্রাহ্য, কেন না, তার বদল চাই।' সুতরাং পরিষ্কার বোঝা গেল—রাম হাঁ-ধর্মী এবং শ্যাম না-ধর্মী। কিন্তু তাদের মতামত নিয়ে জনতা বেশিদিন মাথা ঘামাল না। জনতার কাছে শেষ পর্যন্ত রাম বড়, না শ্যাম বড় এইটেই হয়ে দাঁড়াল একমাত্র বিচার্য বিষয়। এবং তা নিয়ে প্রচণ্ড দলাদলি শুরু হল।

বীরবলের এই প্রবন্ধটির সঙ্গে তাঁর অন্যান্য রাজনৈতিক আলোচনা মিলিয়ে পড়লে সহজেই বোঝা যায় যে আজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে একটি মূল ব্যাধি তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। আমাদের দেশে আদর্শগত বা মতামতগত লড়াইয়ের প্রকৃত গুরুত্ব খুব বেশি নয়। অন্তত একই দলের মধ্যে যে মতামতগত লড়াইয়ের অন্যের দেখা যায় তা যতখানি ভাষাগত ততখানি প্রকৃত নয়। আসল লড়াইটা ব্যক্তিগত, নেতৃত্বের জন্য লড়াই।

পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বলে এবং নিরপেক্ষভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেয়েছিলেন বলে প্রমথ চৌধুরী মুখ্যত সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাই বলে তিনি যত্র-তত্র নিতান্ত তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর ব্যাপারে সমালোচনার মূল্যবান অস্ত্রের অপব্যবহার করতেন না। যে-সব ক্ষেত্রে নীতিগত এবং তত্ত্বগত প্রশ্ন জড়িত কেবল সেই সব ক্ষেত্রেই তিনি মুখর হয়ে ওঠার প্রয়োজন বোধ করতেন। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলাদলির প্রশ্নে তাঁর বিভিন্ন আলোচনা পড়লে বুঝতে পারা যায় এ-ক্ষেত্রে তিনি একটি সুষ্ঠু নীতি-সম্মত ঐতিহ্য সৃষ্টির পক্ষপাতী ছিলেন। আদর্শ বা চিন্তার সংঘাতের জন্য যে দলাদলি তিনি তাকে কখনো আক্রমণ করেন নি, বরং তাকে স্বাভাবিক ও সহজ বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু ব্যক্তির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বা দল রাখার জন্য যে দলাদলি, এবং দলাদলির প্রয়োজনেই যেখানে একই আদর্শের বা লক্ষ্যের মধ্যে ভাষাগত কুয়াশা সৃষ্টি করা হয়, সেখানেই বীরবলী বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ চাবুক বাতাসে সন্ সন্ আওয়াজ তুলেছে। কিন্তু শুধু দলাদলির ব্যাপারেই নয়, অন্যত্রও তার আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুর সঙ্গে তত্ত্বগত বা নীতিগত প্রশ্ন জড়িত। এখানে আমি দু-একটি উদাহরণ উল্লেখ করব।

আমাদের দেশের প্রার্থিত স্বরাজের রূপ এবং প্রকৃতি কি হবে তা নিয়ে বিভিন্ন দলের চিন্তাধারা অত্যন্ত ধোঁয়াটে এবং অস্পষ্ট ছিল। এই সত্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যখন মণ্টেগু সাহেব এ দেশে এলে তাঁর কাছে স্বরাজের আরজি পেশ করার ডাক আসে। দেখা গেল এ কাজের জন্য সকলেই অপ্রস্তুত। বড়লাট সভার উনিশজন দিশি সভ্য রাতারাতি যে দরখাস্তখানা রচনা করে পেশ করেছিল, কংগ্রেস এবং লীগ সেখানাই সামান্য অদল-বদল করে পেশ করলেন। 'দেশের কথা' (১) নামক প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের এই দুর্বলতাকে আক্রমণ করেছেন। কিন্তু তিনি বিশেষভাবে মুখর হয়ে উঠেছেন তিলকের একটি মন্তব্যের সমালোচনায়। তিলক কংগ্রেসের উচ্চ মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঝাড়া এক ঘণ্টা ধরে আমাদের মনে এই কথা বসিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন যে, মানুষ যখন তার বাসগৃহ তৈরি করে, তখন সে গৃহ ভিত থেকে গেঁথে তুলতে হয়; কিন্তু কোন জাতি যখন তার বাসগৃহ তৈরি করতে চায়, তখন সে গৃহ ছাদ থেকে গেঁথে নামাতে হয়।' [দেশের কথা (১)] কথাটির ব্যাখ্যা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মামাবাবু-মামিমার শোবার ঘরের একদিকে বসবার আয়োজন ছিল। সেইখানে রাত্রে রোজ ঘরোয়া বৈঠক বসত। সব কাজকর্মের পরে মামাবাবু অবসর হলে এসে ওইখানে বসতেন। সেই সময় চলত নানা রকম কথাবার্তা, নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ-আলোচনা। তার মধ্যে কাব্য, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত কিছুই বাদ যেত না। তারি চিত্তাকর্ষক হত সে সব কথাবার্তা। মামিমারা সকলেই যোগ দিতেন। সভা বেশ জমে উঠত। শুধু যে আত্মীয়রা থাকতেন তা নয়, অনেক সময় অন্তরঙ্গদের মধ্যেও কেউ কেউ উপস্থিত থাকতেন। সে সময় মামাবাবুর অনেক মূল্যবান আলোচনা শুনবার সুযোগ পাই। বঙ্কিম সাহিত্য ছিল মামাবাবুর প্রাণ, এত অসম্ভব ভালোবাসতেন। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে মামাবাবু বলেছেন 'বঙ্কিমচন্দ্র শুধু একজন ব্যক্তি নহেন, বঙ্কিমচন্দ্র একটা যুগ, বঙ্কিম সাহিত্য একটা যুগের সাহিত্য।'—বঙ্কিম গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'আনন্দমঠ ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। মাসিমার (অমলা দাস) মুখে বঙ্কিমচন্দ্রের গান শুনতে মামাবাবু ভারি ভালোবাসতেন। আমরাও তাঁর কয়েকটা গান মাসিমার কাছে শিখেছিলাম। তার মধ্যে এখনো দেখছি—'এ জনমের সঙ্গে কি সই সাধের তরণী আমার'—'মেঘ দরশন আসে চাতকিনী ধায় রে'—'মধুরবাসিনী মধুরহাসিনী' গানগুলি বেশ ভালোই মনে আছে। স্বদেশী যুগের বহু গান মামাবাবু যতবার শুনতেন ততবারই দেখতাম চোখ দুটি জলে উঠত। বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম্'-এর 'তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম'—এই জায়গাটি শুনলেই উনি এত অভিভূত হয়ে পড়তেন, এতই ওঁকে নাড়া দিত,—যেন থাকতে পারতেন না—এরকম মনে হত। সে সব কথা মামাবাবুর যেরূপ চোখে দেখেছি তা জীবনে ভুলবার নয়। মনে আছে রবীন্দ্রনাথের 'সার্থক জনম আমার', 'আমার সোনার বাংলা', 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' এই সব গান মাসিমা যখন গাইতেন মামাবাবুর চোখের পাতা কেবলই ভিজে উঠত। বাংলা দেশের কিছু হলেই ওঁর ভালো লাগত। এত নরম মানুষ ছিলেন মামাবাবু। অন্তরটি ছিল ভাবের ঐশ্বর্য দিয়ে গড়া। বৈষ্ণব পদাবলী ছাড়াও অন্যান্য কীর্তন বা কীর্তনাঙ্গ কিছু, কিম্বা ভাবরসাত্মক, ভক্তিমূলক গান হলেই তাঁকে গভীরভাবে স্পর্শ করত। মুগ্ধ তন্ময় হয়ে শুনতেন। কত সময় ভাবান্তর হত দেখেছি।

আদালত থেকে ফিরে এসে প্রায়ই মামাবাবু 'টেনিস' খেলতেন। আমরাও খেলতাম। এই সময় মামাবাবুর জুনিয়র ব্যারিস্টাররাও কেউ কেউ খেলতে আসতেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুধীরচন্দ্র রায়, যিনি পরে মামাবাবুর বড় মেয়ে মোনার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। সুধীরকে নিয়ে মোনাকে সব কি ঠাট্টাই তখন করত। দাদাবাবু তখনো বেঁচে, মোনাকে দেখলেই রঙ্গ-রসিকতা করতে ছাড়তেন না। মামাবাবুকেও দেখতাম মোনাকে ঠাট্টা করছেন। মামাবাবু খুব সুরসিক ছিলেন। ভালো রসিকতার তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত সমজদার। খুব হাসতে ও হাসাতে পারতেন নানা রকম হাস্যরস সৃষ্টি করে। বিশেষ করে ঠাট্টা সম্পর্কীয় কাউকে কাছে পেলে মামাবাবু যেন অন্য মানুষ হয়ে যেতেন। এত ঠাট্টা করতেন আর সে সব এমনই ঠাট্টা যে আমরা অনেক সময় পালাবার পথ খুঁজতাম। তিনি যে অমন সব ঠাট্টা-তামাসা করতে পারেন তা অন্যসময় তাঁকে দেখলে কে বলবে।

১৯১৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী (৬ই ফাল্গুন) রসা রোডের বাড়িতে আমার বিবাহ হয়। মামাবাবু বিয়ে দেন। সেই থেকে মামার বাড়িতে মামাতো ভাই-বোনেদের সঙ্গে সদাসর্বদা একসঙ্গে থাকার সেই অনাবিল আনন্দের পর্বে ছেদ পড়ে। মামার বাড়ির সকলের সংসর্গ, মামাবাবুর সান্নিধ্য, তাঁর সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়ে খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। এই সময় থেকেই মামার বাড়ির সম্বন্ধ ক্রমে কমে আসতে থাকে, ওদের সবকিছুর সঙ্গে আগের মত যোগাযোগ রাখাও আর যেন তেমন সম্ভব হত না। ফলে জীবন হয়ে আসে শূন্যময়। মামার বাড়ি ছেড়ে আসার সঙ্গে আমার জীবনের অনেক কিছুকেই বিসর্জন দিতে হয়েছিল, যার মূল্য আমার কাছে ছিল অমূল্য।

মনে আছে বিয়ের পরের দিন সকালে মামার বাড়ির সুবৃহৎ বৈঠকখানার ঘরে আমাদের পিসতুতো ভগ্নীপতি তাতাবাবু (সুকুমার রায়) কি রকম জমিয়েছিলেন তাঁর সদ্যলেখা 'চলচ্চিত্ত চঞ্চরী' ও অন্যান্য কিছু কিছু লেখা থেকে আবৃত্তি পাঠ করে। এখনো কানে বাজে, বাজে সেই অসাধারণ, একেবারে নিজস্ব ঢঙে এই লাইনগুলি তাঁর পড়া—

'কাছে এসে ঘেঁষে ঘেঁষে
হেসে হেসে কেশে কেশে
এত ভালো বেসে বেসে
টাকা মেরে পালালি শেষে'—

ঘরভরা লোক সেদিন কি হাসিটাই হেসেছিলেন। কি অদ্ভুত ঢং যে ছিল ওঁর এই সব পড়ার। ও রকম আর শুনি নি। কবিতার যে কয়টি লাইন এখানে লিখলাম তাতে হয়ত ভুল থাকতেও পারে, কেন না সেই সেদিনে যা শুনেছিলাম তারই যতটা স্মরণে আছে তাই থেকে লিখলাম। তখনও তাতাবাবুর 'আবোল তাবোল' বা 'হ য ব র ল' বের হয় নি। পরে 'আবোল তাবোল' বাজারে বের হবার

[illegible]
মন কেড়ে নিলেন।

কাশীতে গিয়ে দেখি হিন্দুস্থানী সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলারা তাদের পারিবারিক অনুষ্ঠানে, বিশেষ করে বিয়ে সাদিতে নিজেদের মধ্যে নিজেরা বেশ নাচ গান করে থাকে। বাল্যাবধিই নাচের দিকে আমার বিশেষ ঝোঁক। আমাদের সমাজে তখন এ সব ইচ্ছে আমল পেত না। কাজেই মনের ইচ্ছে প্রকাশ করি নি। কাশীতে এসে এদের নাচ দেখে ইচ্ছে হল নাচ শিখতে। ভাবলাম, আরম্ভ ত' করে দেওয়া যাক, পরে দেখা যাবে। অবশ্য এ নাচ কোনও উচ্চাঙ্গের নাচ নয়। অতি সাধারণ ঘরোয়া নাচ। গান গেয়ে গেয়ে এরা নাচে। আমার একটি অতি অন্তরঙ্গ বান্ধবী বাঙালী [illegible] তার শ্বশুরবাড়িতে এ সব নাচ-গানের খুব চল ছিল, তাদের সঙ্গে মেয়েরা [illegible] নাচতে শিখেছিল। এই বান্ধবীটি আমার [illegible] মহিলা, শ্বশুরবাড়ি [illegible] কাছে এটাওয়ায়। [illegible] পিতামহ, বোধ হয় দু-তিন পুরুষ [illegible] এঁরা কাশী-বাসী। এঁরই কাছে [illegible] আমি নাচ শিক্ষা করি। কাশীতে [illegible] সিলভারের সুন্দর সুন্দর সব পায়ের অলঙ্কার পাওয়া যেত। আমি এক জোড়া ঘুঙুর কিনলাম। ঘুঙুরের কাজ চালাবার [illegible]। ঘুঙুরের আওয়াজ একটু বেশি জোর হয়ে গেলেই স্বামী আপত্তি করতেন তাঁর প্র্যাকটিসের ক্ষতি হবার আশঙ্কায়। কাজেই একটু সতর্ক হয়েই সব সারতে হত। কলকাতায় এসে মামাবাবুকে নাচ দেখালাম, মামা-বাবু ত' মহাখুশি। বিয়ের [illegible] এসব সামাজিক সংস্কারের গণ্ডী [illegible] আমি যে বের হতে পেরেছি এইটাই [illegible] মনকে খুব তৃপ্তি দিয়েছিল [illegible]। সন্ধ্যার দিকে সময় পেলেই [illegible] দেখতে চাইতেন। মামিমা [illegible] আমায় সাজিয়ে দিতেন, [illegible] নাচতাম সে সব হিন্দী গান [illegible]। একদিন অতুলদার (অতুলপ্রসাদ সেন) 'ধুধু ধর ধর মালা পর' গানটির সঙ্গে নাচ তৈরি করে দেখিয়েছিলাম। গানটির কথা মনে হলেই [illegible] মামা-বাবুর খুশিতে উপছেপড়া সেই মুখটি। তাঁর কাছে কিছু করে খুব আনন্দ পাওয়া যেত। এত অল্পেতে খুশি হতেন, এবং এত খুশি মনে সবেতে যোগ দিতেন, রাজীও হয়ে যেতেন ভারি সহজেই। আমার মা প্রথমে আমার নাচ দেখতে চাইতেন না। বোধকরি তাঁর [illegible] কোথাও বাধত। শেষে মামিমা একদিন জোর করে নিয়ে এসে মাকে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'দিদি, আপনি আগে দেখুন ত' তারপর বলবেন।'—নাচ দেখার পর বোধ

[illegible] তাঁর আপত্তি [illegible] মামিমা খুব খুশি মনে মাকে বলতে লাগলেন, 'দেখলেন ত' দিদি, [illegible] আপত্তি কত অকারণ?' [illegible] নাচের সময় দেখা যেত মা-ও এসে বসেছেন, সংস্কার তাঁর ভেঙে গেছে। মামাবাবু খুব উৎসাহ দিতেন, বলতেন, 'মোনা, বেবীকে তুই শিখিয়ে নে।'—

এসময় ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষ, পেশাদার নট-নটীদের অভিনয় দেখা, বিশেষ করে বাংলা রঙ্গালয়ে গিয়ে থিয়েটার দেখা, বাঈজী প্রভৃতির গান শোনা বা নাচ দেখা—এ সব অত্যন্ত গর্হিত কর্ম বলে মত প্রকাশ করতেন। এবং বাড়িতেও এ সব করার উপায় ছিল না—ছেলে-মেয়েদের একসঙ্গে অভিনয় ইত্যাদি করা সম্বন্ধেও ততোধিক আপত্তি তুলতেন। শুনে মামাবাবু একদিন রেগে বলেছিলেন, 'বাইরেও দেখতে পাবে না, বাড়িতেও করতে পারে না, অথচ এ দেখছি এত বড় একটি আর্টকে একেবারেই নাকচ করে দিতে হয়!'—

মেজমামা প্রফুল্ল[illegible] দাশ কোন সালে বিলাত গেলেন তা আমি ঠিক জানি না, কেন না আমি তখন খুবই ছোট। তবে তাঁর নবপরিণীতা ইংরেজ পত্নী যেদিন পুরুলিয়ায় এসে গাড়ি থেকে নামলেন সেই দিনটির কথা বিশেষভাবে মনে আছে। আইন পড়তে মেজমামা বিলাত যান। পাশ করে বিলাতেই এই মহিলাটিকে বিবাহ করেন। বিয়ের পরই পত্নীকে আগে দেশে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে এসে পৌঁছান তার পরে। এই বিদেশিনী নারী তাঁর ভারতীয় শ্বশুরকুলের সকলকে এত সহজেই আপন করে নিলেন, [illegible] অনায়াসে [illegible] সঙ্গে মিশেছিলেন [illegible] শিখে নিলেন যে কারুরই আর মনেও থাকত না যে, তিনি বিদেশিনী। পরিবারের সকলের হৃদয়ে স্থান করে নিয়ে মেজমামিমা তাদের রেল অন্তরঙ্গ আপন-জন হয়ে রইলেন। [illegible]-পরা, [illegible] তাঁর শ্বশুরবাড়ির সকলের মতনই হয়ে গিয়েছিল। তফাৎ [illegible] মনে হত না। তবে কথাবার্তা [illegible] ইংরেজীতেই বলতেন। মনে আছে পুরুলিয়ার বাড়িতে তাঁর এসে পৌঁছা-নোর কথা। আমাদের প্রত্যেকেরই মনে তাঁর সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহল ছিল। তাঁকে দেখে এবং তাঁর ব্যবহারে কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। নতুন মামি-মাকে সাজিয়ে দেওয়া হল আমাদের বাঙালীদের মতন করে শিখিয়ে খোঁপা বেঁধে শাড়ি ও পায়ে আলতা পরিয়ে। হাতে লোহা ও সিঁথিতে সিঁদুর দিদিমা তার আগেই পরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই

[illegible] বরাবর শাড়ি পরতেই দেখেছি। তাঁদের [illegible] পোষাকে আর তাঁকে মনে করতে পারি না।" মেজমামিমার কথা ভাবতে গেলে তাঁর শাড়িপরা চেহারাটিই ভেসে ওঠে। শাশুড়িকে তিনি খুব বেশি রকম ভালবাসতেন ও ভক্তি করতেন। আমাদের দিদিমাও ত' লেখাপড়া কিছু জানতেন না। মেজমামিমাকে বলতে শুনেছি 'লেখাপড়া না শিখেও যদি আমার শাশুড়ির মত এমন মানুষ হয়, তবে আমার মেয়েদের আমি লেখাপড়া শেখাব না।' এমনই শ্রদ্ধার চোখে শাশুড়িকে দেখতেন। দিদিমা আর মেজমামিমার কথাবার্তা। কেমন হত! একজন বলে যেতেন বাংলায় (খাস বাঙাল ভাষায়) আরেকজন ইংরেজীতে, আশ্চর্য এই যে দুজনকে দুজনের বুঝবার কোনও অসুবিধাই হত না। ভারি সুন্দর একটি সম্বন্ধ ছিল এঁদের পরস্পরের।

ছেলেপিলে মাত্রই মেজমামিমা এত ভালবাসতেন যে সচরাচর এরকম দেখা যায় না। তাদের কোনও রকম অযত্ন বা অবহেলা তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। তাছাড়া তাঁর সেবা করবার ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ ওটা তাঁর প্রকৃতি-গত গুণ ছিল। পরের বাড়ি হলেও গিয়ে রুগীর সেবা করে আসতেন। সংক্রামক ব্যাধির ভয়ও তার দেখি নি। এবং রুগীর সেবা সম্বন্ধে আপন পর ছিল না। শুনেছি একটি বসন্তরুগীকে ওইভাবে পরের বাড়ি গিয়ে সেবা করে আসতেন। আমার একবার কাশীতে খুবই অসুখ হয়। সর্বক্ষণ 'অক্সিজেন' দিয়ে রাখা হয়েছিল। মেজমামিমা খবর পেয়েই চলে এলেন আমাদের কাশীর বাড়িতে, এবং যা করলেন তার তুলনা নেই। মায়ের মতন করে সব ত' করলেনই, খরচপত্রও যা করলেন তারও হিসেব হয় না। মাতৃত্ব দিয়ে গড়া ছিল হৃদয়টি তাঁর। গরীব দুঃস্থদের প্রতি তাঁর যে সহৃদয়তা, যে মমতা দেখেছি তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। শুনলে গল্পের মতন মনে হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। অল্প হাতে মেজ-মামিমা কাউকে কিছু দিতে জানতেন না। তাঁর দেওয়ার কি রকম হাত ছিল তারই দু-একটি ঘটনা বলছি। দার্জিলিং-এ অতি দূর সম্পর্কীয় একটি পরিবার বাস করতেন। অবস্থা তাঁদের স্বচ্ছল ছিল না। মেজমামিমা নিজের বাড়ির জন্যে রোজ তরিতরকারী মাছ মাংস ইত্যাদি যা বাজার করতেন, এমন কি বিলিতি টিনের খাদ্যদ্রব্য পর্যন্ত, ঠিক সেই রকম সব এবং তত্গুলিই, টুকরী বোঝাই করে তাদের বাড়ির জন্যে প্রতিদিন দিয়ে পাঠাতেন। নিজেদের জন্যে যা কিছু তাঁর প্রয়োজন

হত, উনি ভাবতেন অন্যেরও ঠিক সেই সবই প্রয়োজন, সেই জন্যে নিজে যা কিনতেন অন্যকে দেবার সময়ও ঠিক সে রকম সব কিনে দিতেন। আমাদের একটি মাসতুতো বোনের স্বামী জাপানে রাজনৈতিক কোনও সন্দেহজনক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার জন্যে বোনটিকে তিনটি শিশু সহ কলকাতায় আত্মগোপন করে থাকতে হয়। মেজমামিমা বহু চেষ্টার পর তার ঠিকানা জানতে পেরে তিনটি শিশু সহ তার যা কিছু দরকার সব পাঠাতেন। ভারতীয়কে বিবাহ করার জন্যে তাঁর পিতৃকুল কোনওদিন আর তাকে গ্রহণ করেন নি। শেষ জীবন তিনি প্রায়ই বিলাতে কাটাতেন, কিন্তু বাপের বাড়ির সংগে কোনও যোগাযোগ আর কখনও হয় নি। তাই ভাবি জীবন থেকে পিতৃকুলকে এমন করে মুছে ফেলা বড় কম স্বার্থত্যাগের কথা নয়। বিলাত থেকে ফিরে এসে মেজমামা সপরিবারে কলকাতায় রসা রোডের বাড়িতে থাকেন। তখন কয়েকবছর ওঁদের সংগে একসংগে সব বেশ গুলজার করে থাকা গিয়েছিল। পরে আরো কিছুদিন হেস্টিং স্ট্রীটের একটি বাড়িতে থেকে ওঁরা পাটনা চলে যান। মেজমামিমার তিনটি ছেলেমেয়েই কলকাতা থাকতেই জন্মায়। পাটনায় যাবার পর মেজমামা লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী পি, আর, দাশ নামে সুপ্রসিদ্ধ হন। এই সব দিকে মেজমামা মামাবাবুর মতই কৃতী ছিলেন। আইন ব্যবসায়ে তাঁর উপার্জন মামাবাবুর চেয়ে বেশি ছাড়া কম ছিল না। আমরা জানি তাঁর দৈনন্দিন ফি পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত হয়েছিল।

ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞানে মেজমামা ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর মতন আইনশাস্ত্রজ্ঞ তখন আর কেউ ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর কাগজে বের হয়—'He was the greatest jurist of our time'. উপায়ও যেমন প্রচুর করেছেন তেমনি স্বামী-স্ত্রী উভয়েই দুই হাতে খরচও করেছেন। দান-ধ্যানও মেজমামার যথেষ্ট ছিল। তবে তার দ্বারা দেশ কিভাবে কতদূর উপকৃত তা জানি না। বৈষ্ণব সাহিত্যে মেজমামারও মামাবাবুর মতই গভীর শ্রদ্ধা ছিল বলা যায়। শেষ জীবনে তিনি তাইতে মশগুল হয়ে থাকতেন। কণ্ঠী ধারণ করেন, এবং প্রাণগোপাল গোস্বামীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। বাড়িতে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপনা করেন। সে সময় তাঁর বাড়িতে রোজ কীর্তন হত। মেজমামা খুব ভালো ইংরেজী কবিতা লিখতেন। তাঁর কবিতার বই 'The moth and the stars' ইংরেজী কাব্যরসিকদের কাছে বেশ সমাদৃত হয়। জীবদ্দশায় তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা উমা, (রণজিৎ গুপ্ত, আই. সি. এস্,-এর পত্নী) দু'টি ছেলে রেখে মারা যায়। এবং তারপর তাঁর সহধর্মিণী, আমাদের মেজমামিমা। ও এক বছরের মধ্যেই একমাত্র পুত্র শঙ্কর মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সব নিদারুণ শোক বহন করেও জীবনের শেষ পর্যন্ত আইন ব্যবসায়ের কাজ চালিয়ে যান। যখন অসুস্থ হতেন, তখন বাড়িতে যতক্ষণ থাকতেন ততক্ষণই বোঝা যেত যে তিনি অসুস্থ। নইলে একবার কোর্টে গিয়ে দাঁড়ালে, মামলার কাজে এমনই তন্ময় হয়ে যেতেন যে বুঝতেও পারা যেত না যে তিনি অসুস্থ। মাত্র দু'বছর আগে, সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৬০) জ্যেষ্ঠা কন্যা গৌরীকে (ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, ডি, এম্, ও'র পত্নী) রেখে ৮৪ বছর বয়সে পাটনার বাড়িতে তিনি পরলোকগমন করেন। মামাবাবুর অনেক গুণাবলী মেজমামার মধ্যেও ছিল। তিনিও ছিলেন খুবই অসাধারণ। তবে মামাবাবু মানুষই ছিলেন আলাদা ভিন্ন স্তরের, ভিন্ন আধারের, ভিন্ন জগতের।

১৯১৭ সালে, আমার বিয়ের ঠিক পরের বছর, মামাবাবু রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্র্যাকটিস অবশ্য তখনো ছাড়েন নি। তখন থেকে তাঁর সান্নিধ্য যা সঙ্গ আমরা আর তেমন করে পেতাম না। তাঁর রাজনৈতিক জীবন থেকে আমরা খানিকটা দূরে গিয়ে পড়লাম। যদিও দেখা হলেই হাসিতে স্নেহ ঢেলে দিতেন আগেরই মত। রসা রোডের বাড়িতে তখন অন্যধারা এসে গেছে। গেলে বোঝা যেত সেই পরিবেশ আর নেই। এ'দের জীবনের লক্ষ্য ভিন্ন, আদর্শও অন্য, কাজেই জীবনধারা চলেছে সেই ছন্দে, পারিপার্শ্বিক পূর্ণ তারি প্রভাবে। সুখের নীড় ভেঙে ফেলে স্বাচ্ছন্দ্যকে তুচ্ছ করে এ'রা চলেছেন আরো মহান্, আরো মহত্তর প্রেরণাকে অনুধাবন করে। চলার ব্যাকুলতায় চরণ এ'দের চঞ্চল, মন-প্রাণ সব উন্মুখ, চোখে ভরা তারই নেশা, তারই স্বপ্ন। যখনই কলকাতায় আসতাম তখনই দেখতাম মামাবাবু কাজের ভিড়ে নিজেকে কোথায় হারিয়ে ফেলেছেন। একে নিজের আইন ব্যবসায়ের কাজ, তার উপর রাজনৈতিক কাজের অসম্ভব চাপ, কি করে যে তিনি এই দুই কূল মিলিয়ে চলতেন সে এক অভাবনীয় ব্যাপার। নিত্য সভা-সমিতি বক্তৃতাদি, ঘোরাঘুরি ছোটাছুটি হরদাম্ লেগেই আছে। মামাবাবুর বক্তৃতা শুনে সে সময় আমার একজন বলেন—সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতায় মাতান্ কিন্তু দেশবন্ধু বক্তৃতায় কাঁদান। কথাটি ভারি ভালো লেগেছিল। রসা রোডের বাড়ির দ্বার অবারিত, উন্মুক্ত। জনস্রোতের বিরাম নেই। সবক্ষণ আসা-যাওয়ার মধ্যে কর্মকোলাহলপূর্ণ এমন এক চঞ্চলতা যে মনে হত ঝড় বইছে। আর তার মাঝে মামাবাবু ঘোড়ার মুখে লাগাম দিয়ে চলেছেন উদ্দামবেগে তার খুরে খুরে ধুলা উড়িয়ে—বুকে তার থম্ থম্ করছে প্রচণ্ড শক্তি, প্রবলবেগ, আর চোখদুটি যেন দুচ পণের অভ্রান্ত স্বাক্ষর। মুখে কিছু না বললেও ওই চোখ ওই অধরের রেখা ঘোষণা করছে—কোনও সর্তেই সন্ধি নয়, শুধু জয়, চাই জয়, পূর্ণ স্বাধীনতা, স্বরাজ। সে সময় মামাবাবুকে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না কোনও মানুষ এত পরিশ্রম করতে পারে। এত ব্যস্ততার ভিতরেও কিন্তু আমাদের কিছু হলে মামাবাবু সমান আগ্রহে এগিয়ে এসে যা করবার সব করতেন। কোনও কিছু তাঁর বাদ যেত না, কোনও কর্তব্য অবহেলা করতে পারতেন না! আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করে অবাক হয়েছি যে, দায়সারাভাবে তাঁকে কোনও কিছু কখনও করতে দেখি নি। সব বিষয়েই ছিলেন পুরো-পুরি আন্তরিক।

১৯২০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে কলকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন হয়। তাতে সরলা দেবী চৌধুরাণীর নেতৃত্বে 'বন্দেমাতরম এবং তাঁর রচিত 'অতীত গৌরব বাহিনী' সমবেত সংগীতে আমরা অনেকেই যোগদান করি, ও কংগ্রেসমণ্ডপে বসে সেই আমি প্রথম গান করি। এবং কংগ্রেস সম্বন্ধেও সেই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। এই অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ প্রস্তাব উপস্থিত [illegible] করেন। প্রস্তাবের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে বহু বাগবিতণ্ডার পরে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। তার পরেই আমরা চরকা কাটতে আরম্ভ করি, ও সেই থেকে খদ্দর পরা সুরু হল। মামাবাবুকে খদ্দর পরতে দেখে খুবই কষ্ট হত। ৬০ ইঞ্চি বহরের অর্ডার দেওয়া শান্তিপুরী কোঁচানো ধুতি ছাড়া অন্য কিছু যিনি পরেন নি, তিনি যখন ৪৪" ইঞ্চি বহরের খদ্দর পরতে লাগলেন, তখন মনে আছে প্রায়ই দেখতাম হাঁটুর কাছে কেবলই ধুতিটাকে ধরে টেনে নামিয়ে দিতে চাইতেন। বুঝতাম মুখে কিছু না বললেও অত খাটো ধুতিতে ওঁর অস্বস্তি হচ্ছে। এই সময় একটি উল্লেখযোগ্য হাসি-ঠাট্টার কথা মনে পড়ছে। আমাদের এক পিসিমার বাড়িতে বিকেলের দিকে মামাবাবু বেড়াতে এসেছিলেন। এই পিসিমা দুর্গামোহন দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ। মামাবাবুর

পায়খানার খদ্দরের ধুতি চাদর ইত্যাদি ছিল, কিন্তু পায়ে ছিল বিলাতি জুতো। দেখে দিদিমা ঠাট্টা করে দেওরকে বললেন, এদিকে ত খদ্দর পরেছ, পায়ে ত' দেখি বিলাতি জুতো!' মামাবাবু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—'বিলিতি বলেই ত' পায়ের নিচে রাখতে ভালোবাসি!'—যেমন মন্তব্যটি তেমন বলার ভঙ্গিটি হয়েছিল উপভোগ্য। আমি সে সময় দিদিমার কাছে ছিলাম, তাই এমন উচ্চদরের পরিহাসটি শুনতে পেলাম। মামিমাকে খদ্দর পরা দেখেও আমাদের ভীষণ খারাপ লাগত। মামিমা কোনও দিনই সাজগোজ করতেন না, তবে মোটা কাপড় একেবারেই পরতে পারতেন না, কষ্ট হত। সদাসর্বদা ঢাকাই শান্তিপুরী শাড়িই তাঁকে পরতে দেখেছি, মিলের শাড়ি পর্যন্ত পরতেন না, জ্বরি লাগত। কংগ্রেসে অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হবার পরে বোধহয় আর চার-পাঁচ মাস মাত্র মামাবাবু প্র্যাকটিস করেছিলেন। তার পরেই ছাড়লেন তাঁর বিপুল আয়ের আইন ব্যবসায়। সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলেন বহুদিনের অভ্যস্ত ঐশ্বর্যময় জীবনের বিলাসিতা সব। এমন কি তামাক খাওয়া পর্যন্ত। কোনও অসুবিধার কথা তাঁর মুখে শোনা যায় নি। কি ত্যাগ! কেবলি চোখের জল মুছেছি। এবং যাঁরাই শুনছেন সকলেরই একই অবস্থা। চারিদিকে তখন মুখে মুখে শুধু তাঁর এই মহান ত্যাগের কথা, আর ধন্য ধন্য রব। সকলের জীবন গৌরবদীপ্ত করে মামাবাবু বরণ করলেন ত্যাগীর জীবন। তাঁর এই দৃষ্টান্তে ছোট-বড় বহুলোক কাজ ছেড়ে দিয়ে দেশের কাজে যোগ দেন।

১৯১৯ সালে দাদা বিলাত থেকে ফিরে এলে মা তাঁকে নিয়ে ভাড়াবাড়িতে এসে রইলেন। সেই থেকে আমরা কলকাতায় এলে মায়ের কাছেই উঠতাম। দেখা করতে যাওয়া ছাড়া মামারবাড়িতে গিয়ে থাকা আর বড় একটা হত না। বেবীর বিয়ের সময়ই বোধহয় শেষ সব একসঙ্গে থেকে আমোদ-আহ্লাদ করেছি। রসা রোডের বাড়িতে গেলে মন কেমন করত, কতদিনের কত ছোট-বড় ঘটনার, কত যাওয়া-আসা কান্না-হাসির স্মৃতি বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই বাড়ি। প্রতিটি ঘরের কাছে গেলে মনে পড়ত তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে অতীত, তারই সব কথা, মনে হত এরা আমাদের কত আপন, কতকালের সব সঙ্গী-সাথী, কত রেখেছি এদের এক-একটির কাছে। সুখে-দুঃখে, রোগে-শোকে, আনন্দে-উৎসবে এরা আমাদের বুকে করে রয়েছে, স্থান দিয়েছে কোলে। এই বাড়ি চিত্তরঞ্জন সেবা সদন হবার পরে আমি আর দেখি নি। শিক্ষিত, দানশীল, মামাবাবুদের পুণ্যস্মৃতির আলয় আনন্দ নিকেতন, দেশজননীর কত সুসন্তানের, কত ঋষি, কবি, ভক্ত, জ্ঞানী গুণী মহাজনের পদধূলোয় রঞ্জিত তীর্থসম সেই বাড়ি আমার নয়ন ও মনের পটে তেমনি আঁকা আছে, তার পরিবর্তিত রূপ যে আমাকে দেখতে হয় নি আমি তাইতে খুশিই।

ডিসেম্বর মাসের শীতের সকাল। কাশীর দারুণ শীতে কাঁপতে কাঁপতে বারান্দায় একটু রোদ এসেছে দেখে বেশ আরাম করে সবে বসেছি, আমার স্বামী খবরের কাগজ হাতে ব্যস্ত হয়ে এসে বললেন—'ভোম্বলকে এ্যারেস্ট করেছে। খুব গোলমাল চলেছে কলকাতায়।'—গোলমাল চলেছে জানতাম, তবে ঠিক এমন খবরটা আশা করি নি। খবর শুনে আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল, জিজ্ঞেস করলাম—'ভোম্বলকে কেন ধরল, কি ব্যাপার?'—বললেন 'ব্যাপার খুবই গুরুতর।' বলে মামাবাবুর নতুন অভিযান—ভলেনটিয়ার তালিকাভুক্ত হয়ে দলে দলে খদ্দর বিক্রী ও হরতাল ঘোষণা করতে যাওয়া—ইত্যাদি সব খবর সবিস্তারে উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগলেন, এবং ভোম্বলও যে ভলেনটিয়ার হয়ে ওই দলে ছিল সে কথাও বললেন। মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। কোথাকার জল এখন কোথায় গড়ায় তাই ভাবছি। কাগজ পড়ে বুঝতে বাকি রইল না যে ব্যাপারটি বেশ ঘনিয়ে উঠেছে এবং পুলিশের অত্যাচার কি আকার ধারণ করেছে। গভীর উৎকণ্ঠায় সেদিনটি কাটল। পরের দিন সকাল থেকে কাগজের জন্যে যাকে বলে পথচেয়ে বসে থাকা, তাই আছি। কাগজ খুলতেই চোখে পড়ল যে খবর তাতে মন আরো বেসামাল হয়ে গেল— মামিমা (বাসন্তী দেবী), নমাসিমা (ঊর্মিলা দেবী) এঁদের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এঁদের গ্রেপ্তার নিয়ে কলকাতায় হুলস্থূল ব্যাপার। আমার মনের অবস্থাও শোচনীয়। কলকাতায় এই সব কাণ্ড চলেছে আর আমি কাশীতে বসে এই সব খবরের ধাক্কা সামলাচ্ছি। খবরের কাগজে সেসব বিবরণ পড়ছি, আর চোখের জলে বারবারই কাগজের লেখা অস্পষ্ট হয়ে আসছে। একদিকে গর্বে বুক ভরে উঠছে, অন্যদিকে মনে হচ্ছে বুকভেদ করে শেল চলে যাচ্ছে একেবারে ভিতরে। ভোম্বল, মামিমা নমাসিমা সব জেলে আর আমি এখানে এমনি করে পড়ে আছি—অসহ্য মনে হচ্ছে। মামাবাবুকেও যে ধরবেই তা বোঝা যাচ্ছে। কি বীরদর্পে সব এঁদের [illegible] সব নিগ্রহকে [illegible] করে—ভীষণ পরিশ্রম জেনেও, ঘরে ঘরে ছেলেরা আসছে, যোগ দিচ্ছে, মার খাচ্ছে জেলে যাচ্ছে—এই সব খবরে কাগজ ভর্তি। তারপর যা ভেবেছিলাম তাই—খবর বের হল কিছু পরেরদিনই মামাবাবুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সমস্ত বাংলা দেশে আবার আগুন জ্বলে উঠল। আবার সেই [illegible] আন্দোলনের অত্যাচার সুরু হল, সেই নৃশংসতা, সেই [illegible] ধরে নেওয়া, ছেলেদের সেই নির্ভীকতা, দলে দলে জীবন দেওয়া, জেলে যাওয়া। মামাবাবুর সঙ্গে তাঁর অনুচরগণের মধ্যে অনেকেই ধৃত হলেন। সুবিধে পেলে সুভাষবাবুকে যে ওরা ছেড়ে দেবে না, এ ত' জানা কথাই, কাজেই তিনিও বাদ পড়লেন না। প্রায় দু' মাস পরে মামাবাবুর বিচার হয়। বলা বাহুল্য তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন না। বিচারে তাঁর ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হল। সমস্ত ব্যাপারটির সূত্রপাত হচ্ছে ইংলণ্ডের যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্-এর ভারত ভ্রমণ কালটি উপলক্ষে হরতাল করা নিয়ে। কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী ভারতব্যাপী হরতাল পালন এমনই অসম্ভব সাফল্যমণ্ডিত হয় যে তাই দেখে বৃটিশ সরকারের টনক নড়ে, কংগ্রেসের এই ক্ষমতাকে ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে অসঙ্গত সব আইন-কানুন প্রয়োগপন্থা অবলম্বন করে দেশের সব বড় বড় নেতাদের কারারুদ্ধ করতে আরম্ভ করে। দেশময় বিক্ষোভ ও তার প্রতিক্রিয়া সুরু হয়ে যায়। মামাবাবু জানতেন বৃটিশ গভর্নমেন্ট শেষ এই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করবেই। কেন না কংগ্রেসের সবকিছুকে প্রচণ্ড আঘাতে বাধা দিতে এই দমননীতিই হচ্ছে ওদের একমাত্র ব্রহ্মাস্ত্র। আইন না থাকলেও আইন তৈরী করে নেবে, ক্ষমতা ওদের হাতে। সেই ক্ষমতাকে অস্বীকার এবং অমান্য করতেই মামাবাবু তাঁর অস্ত্র ধারণ করলেন—সুরু করলেন তাঁর এই নতুন অভিযান। তাঁর মত এমন করে বৃটিশ শক্তির সঙ্গে যুঝতে [illegible] করে তেজের সঙ্গে, সাহসের সঙ্গে পদে পদে তাকে অস্বীকার করে বাধা দিয়ে, লড়াই দিয়ে, বিব্রত করে তোলপাড় করতে আর কোনও নেতাকে অগ্রসর হতে দেখা যায় নি। এই পুরুষসিংহের আঘাতেই বৃটিশরাজের অহংকারের ভয়। কারাবাসের অল্প দিনের ভিতরেই মামাবাবু জ্বরে কাবু হয়ে পড়লেন। সেই জ্বরই তাঁকে ক্রমে দুর্বল করে ফেলেছে আমরা শুনেছিলাম। এত কষ্ট হত তাঁর কথা ভেবে! কিছুই ভাল লাগত না। মন ব্যাকুল হয়ে থাকত [illegible]। এই জেলেই তাঁর

দূর হয়, এবং সবাই যোগ্য হয়ে যেতে থাকেন। যেখানে জন্যে প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করত। যেতে যে পারছি না তার জন্যে মনে কম অশান্তি হচ্ছে না। তখনো নারীজাতি নিজের গৃহে নিজে পরাধীন। বারবার মনে পড়ছে মামাবাবুর সেই কথাটি আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে ... যে বলেছিলেন 'তোমারও পায়ে বেড়ি পড়ল।' জেল থেকে বের হবার পরে তাঁর যে ছবি কাগজে বের হয়, দেখে কি রকম যে দাদাবাবুর মত লাগছিল, বোধহয় বড় বড় দাড়ি রাখার জন্যে। খালাস পেয়েই কোনওদিকে না তাকিয়ে ওই ভাঙা শরীর নিয়েই আবার উনি ... পরিশ্রমে যেতে গেলেন। বেবীর বিয়ে উপলক্ষে কলকাতায় এসে তাঁর চেহারা দেখে নিজেকে চেপে রাখতে পারি নি। বেবীর বিবাহ হয় স্যর সুরেন্দ্রনাথের দৌহিত্র ভাস্করব্রত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

(আগামীবারে সমাপ্য)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পাইলট তার ভাগ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো, মেকানিকস্‌রা মানবজাতির প্রগতি এবং উন্নতির জন্য মৃত্যুবরণ করতে সম্মতি জানালো—একটি ইণ্টারলিউডে দেখানো হয়েছে মানুষ মানুষের প্রতি কিরকম নৃশংস হতে পারে—রণ-পার ওপর দাঁড়ানো একটি বিরাটাকার মূর্তির হাত-পাগুলো দুটি ক্লাউন করাত দিয়ে কেটে ফেলে স্টেজের ওপর। এ দৃশ্য দেখবার সময় অনেক দর্শক ফেইণ্ট করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অগসবার্গ মিলিটারি হাসপাতালে ব্রেশটের যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয়েছিল তারই স্মৃতি এ দৃশ্যের সঙ্গে জড়িত। The then grand old man of the German theatre, Gerhart Hauptmann, left in disgust. হাউপ্টম্যান বড় নাট্যকার, বড় কবি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিরাট শিল্পী—একথা কেউ অস্বীকার করবে না। তবে মানুষের প্রতি মানুষের অত্যাচার যে কি নারকীয় রূপ ধারণ করতে পারে, তার বাস্তবতার দিকটা তিনি সহ্য করতে পারেন নি—পারেন নি বলেই ঐভাবে ব্রেশটের নাটকটি দেখতে দেখতে সেই দৃশ্যান্তে বিরক্তি প্রকাশ করে উঠে এসেছিলেন। পরবর্তী সময়ে নাৎসী বর্বরতার আসল স্বরূপকেও তিনি জানতে চান নি বলেই দৃষ্টির সামনে থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন—নিজেও নাৎসী দলে যোগদান করেছিলেন। আর এইদিক থেকেই বিচার করলে দেখা যায় ব্রেশটের মানবতাবোধ অনেক উচ্চশ্রেণীর—সারা জীবন তিনি নাৎসীবাদের নৃশংসতার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে এসেছেন—এর জন্য দেশ, বৃত্তি, যশ খ্যাতি সবকিছু বিসর্জন দিয়ে বছরের পর বছর তাঁকে নির্বাসিতের জীবনযাপন করতে হয়েছে—ঘুরে বেড়াতে হয়েছে এদেশ থেকে ওদেশ সামান্য আশ্রয়ের জন্য—কিন্তু সেসব কথা পরে আসছি।

বার্লিন (১৯২৪—১৯৩০) ঃ এই যে স্বীকৃতির ব্যাপারটা, অর্থাৎ মানবজাতির প্রগতির জন্য ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দেওয়া—এই বিষয়বস্তুটিই এ সময় ব্রেশটের মন এবং চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। নামহীন সুসংস্কৃত বিরাটত্বের মাঝে নিজের সত্তাকে বিলীন করে দেওয়া—এই ভাবটির ভেতর দিয়েই যেন প্রতিফলিত হচ্ছিল ব্রেশট কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে যুক্ত করে ফেলতে চাইছেন। আগেকার ইম্‌মরালিস্ট, নিহিলিস্ট এবং এনার্কিস্ট ব্রেশট যেন অন্তর থেকে উপলব্ধি করছিলেন যে তাঁর একটা প্রত্যক্ষ মতবাদ গ্রহণ করে নেওয়া দরকার। ঐ সময়টাতেই জার্মানীতে বীভৎস বর্বরতার এক নবসংস্করণের অস্ফুট প্রকাশ হতে শুরু হয়েছিল, অর্থাৎ নাৎসী আন্দোলন দানা বাঁধতে আরম্ভ করেছিল। বহুসংখ্যক জার্মান বুদ্ধিজীবী মনে মনে ভাবছিলেন এই পাশবিক নাৎসী শক্তিকে দাবিয়ে রাখবার ক্ষমতা যদি কারোর থাকে, তা একমাত্র কমিউনিস্টদেরই আছে।

এই সব দিকগুলো ভেবেই ব্রেশট তাঁর নীতিনাট্যগুলোতে বারবার একই বিষয়বস্তুর ওপর সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছিলেন—সমষ্টির বৃহৎ স্বার্থের জন্য ব্যক্তিবিশেষকে নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিতে হবে—কারণ ব্যক্তি-স্বার্থের থেকে সামগ্রিক স্বার্থের দিকটাই আদর্শ হিসাবে অনেক বড়।

ব্রেশটের পরের স্কুল-ওপেরা 'হি হু সেজ ইয়েস'-এ, দশের স্বার্থে বিশেষ ব্যক্তির নিজের আত্মবলিতে স্বীকৃত হওয়াকে বিষয়বস্তু করা হয়েছে। একটি জাপানী রিলিজিয়াস রিচুয়েল থেকে এর আখ্যানবস্তু আহরণ করেছেন ব্রেশট। আসলে 'তানিকো' নামে একটি জাপানী নো-প্লের অনুবাদ করেন আর্থার ওয়েলী। এই অনুবাদের ওপরই ভিত্তি করে ব্রেশট তাঁর ওপেরাটি রচনা করেন—এর গানগুলো লেখেন ভাইল। কাহিনীতে আছে পাহাড়ে রাস্তা দিয়ে পরিভ্রমণের সময় একটি বালক অসুস্থ হয়ে পড়ে। ফলে তার সঙ্গীরা ভয়ানক বিপদগ্রস্ত হয়। পুরনো রীতি অনুসারে বালকটি মেনে নেয় যে তাকে মেরে ফেলা হোক—কারণ তা না করলে তার সঙ্গীদের অগ্রগতিতে বাধা পড়বে।

ভাগ্যের এমনই পরিহাস, এই স্কুল-ওপেরাটি যখন ১৯৩০ সালে বার্লিনে প্রদর্শিত হল, সব শ্রেণীর লোকেরাই খুব উৎসাহ এবং উত্তেজনার সঙ্গে অভিনন্দন জানালো। কারণ দর্শকেরা মনে করেছিল ওপেরাটির মাধ্যমে প্রাশিয়ান আজ্ঞানু-স্বার্থ, [illegible] এবং স্বার্থ-ত্যাগের আদর্শগুলি সবার সামনে তুলে ধরা হয়েছে। ব্রেশট এবং ভাইল কয়েকটি স্কুলে গিয়ে এই ওপেরার রিহার্সাল দেখলেন। সেখানে ছাত্রদের ইচ্ছা এবং প্রস্তাব অনুসারে নাটকের কিছু কিছু অদল-বদলও করে দিলেন। কার্ল মার্কস্‌ স্কুলের ছাত্ররা তাঁকে জানালো এ কাহিনীর বালকটিকে হত্যা করবার কোন দরকার করে না। ব্রেশটও সেকথা মেনে নিয়ে ওপেরাটিকে নতুন করে লিখলেন এবং এবার এর নাম দিলেন, 'হি হু সেইজ নো।' এর দ্বারা এই কথাই বোঝায় যে নিজের চিন্তাশক্তিকে তিনি সব সময়েই সক্রিয় এবং পরিবর্তনশীল রাখতে চেষ্টা করতেন। কোন মতবাদকেই তিনি জোর করে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইতেন না। যুক্তির দ্বারা পূর্বগৃহীত মতবাদের ভ্রান্তি সব সময়েই সংশোধন করে নেবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। Brecht's decision to alter the 'DER JASAGER' (He who says Yes) into 'DER NEINSAGER' (He who says No) at the request of a group of schoolboys shows that he genuinely tried to keep an open mind and that he wanted to resist the temptation of becoming dogmatic. আবার একথাও তাৎপর্যপূর্ণ যে ব্রেশট যখন এই একই বিষয়বস্তু নিয়ে তৃতীয়বারের জন্য নাটক লিখলেন—নাটকের এ্যাকসনের স্থান পরিবর্তিত হল প্রাচীন জাপান থেকে আধুনিক চায়নার কমিউনিস্ট আন্দোলনকারীদের মাঝে—নায়ক আবার প্রথমবারের মত মেনে নিল যে তাকে হত্যা করা হোক। The ancient custom of discipline and obedience to orders prevailed, whether the discipline was Prussian, Samurai, or Stalinist, the orders those of an ancient religious rite or Communist policy.

এই নতুন নাটকের নামকরণ হল 'DIE MASSNAHME' (The Measure)—এটি ব্রেশটের অন্যতম একটি মহৎ রচনা—এর সঙ্গীত রচনার কাজে ব্রেশটের সহযোগী ছিলেন হান্‌স আইস্‌লার।

বেরটল্ট ব্রেশট এবং কুর্ট ভাইলের সহযোগিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হচ্ছে 'রাইজ এণ্ড ফল অব দি সিটি অব মেহগনী' ওপেরাটি। ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে এটি লাইপজিগে প্রথম প্রদর্শিত হয়। ওপেরা হাউসে এসে লোকে আনন্দ উপভোগ করে যাবে এই চিরাচরিত রীতির অবসান ঘটাবার জন্যই এই ওপেরাটি রচিত হয়েছিল। It was an attack

against the whole conception of opera as a pleasure of the senses. 'দৈহিক আনন্দ উপভোগ করাই হচ্ছে বুর্জোয়া সমাজের জীবনের আদর্শ—মেহগনী হচ্ছে এমন একটি সীমান্তবর্তী শহর যেখানে কোনরকমের বোনো গানের বালাই নেই, যেখানে স্বাধীনতার নামে যে যা-খুশি করতে পারে। এখানে অর্থাভাবই হচ্ছে একমাত্র সত্যিকার অপরাধ। নাটকীয় গতি যখন শীর্ষ-বিন্দুতে ওঠে, অর্থাৎ ঋণ শোধ করতে অসমর্থ হওয়াতে নায়ককে যখন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, বুর্জোয়া জনসাধারণকে তখন পর্দায় প্রতিফলিত নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তির দ্বারা জানানো হয়:

Many among you may watch the now following execution of Paul Ackermann with distaste. But you too in our opinion would not want to pay for him So highly is money esteemed in our time

পূর্ব বার্লিনে গত ফেব্রুয়ারী মাসে DEUTSCHE STAATOPER এ এবার AUFSTIEG UND FALL DER STADT MAHAGONNY দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিল। জর্মানদের গানের গলাও সত্যিই শোনবার মত।

মার্কসিস্ট দর্শন ব্রেশটকে এতোটা মুগ্ধ করেছিল যে ১৯২৮ এবং ১৯২৯ সাল—এই দু' বছর নিয়মিতভাবে তিনি মার্কসিস্ট ওয়ার্কার্স কলেজে মার্কসিজম বিষয়ক বক্তৃতা শুনতে যেতেন। এরপরেই তাঁর ইচ্ছা হোল প্রত্যক্ষভাবে একটি মার্কসিস্ট বিষয়বস্তুর ওপর নাটক লেখবার। What fascinated him most about the Communist party was the problem of the subordination of the individual to the collective will. তাই তিনি 'ডেয়ার ইয়াসগের' নাটকের জাপানী স্কুল-বালকের কাহিনীটি পাল্টিয়ে দিয়ে, চায়নাতে শ্রমিক সংগঠনে কমিউনিস্ট প্রচেষ্টার রিপোর্টগুলো ভালভাবে অধ্যয়ন করে ঐ নাটককে নতুনভাবে রচনা করে নাম দিলেন 'ডি মাসনামে'। এই কঠিন নীতিমূলক বক্তৃতাপূর্ণ নাটকটির সঙ্গীত রচনা করলেন হান্স আইসলার। ব্রেশট এই নাটকটির রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন হান্স আইসলারেরই ভাই গেরহার্ডের কাছ থেকে। এই গেরহার্ডকে কমিনটার্ন কয়েক বছর আগে চায়নাতে পাঠিয়েছিলেন সংগঠনের কাজে। আগে ঠিক ছিল 'ডি মাসনামে' নাটকটি ১৯৩০ সালের গ্রীষ্মকালে বার্লিনের 'নিউ মিউজিক ফেস্টিভ্যালে' প্রদর্শিত হবে। কিন্তু 'নিউ মিউজিক' কমিটির পর হিণ্ডেমিথ এমন খোলাখুলিভাবে একটি রাজনীতি বিষয়ক নাটক মঞ্চরূপায়ণের ব্যাপারে ভয় পেয়ে গেলেন এবং নাটকটির পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন। এর ফলে [illegible] সঙ্গে তাঁর গণ্ডগোল বাধল—নিউ মিউজিক ফেস্টিভ্যালে নাটকটির অভিনয় হল না এবং ১৯৩০ সালের দশই ডিসেম্বর 'ডি মাসনামে' প্রথম মঞ্চস্থ হল [illegible] 'বার্লিন ওয়ার্কার্স কয়ার'-এর দ্বারা।

এরপর ব্রেশট গর্কির 'দি মাদার' উপন্যাসটির ওপর ভিত্তি করে তাঁর ঐ নামের নাটকটি রচনা করলেন। এর প্রথম অভিনয় হয় ১৯৩২ সালের গোড়ার দিকে। গত ফেব্রুয়ারী মাসের ব্রেশট ডায়ালগের সময় বার্লিনে এ নাটকটির অভিনয় দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। এই পরিণত বয়সেও হেলেনা ভাইগেল অর্থাৎ মিসেস ব্রেশট মাদারের ভূমিকায় যে সংযত অথচ প্রাণবন্ত অভিনয় দেখালেন তার তুলনা হয় না।

যাই হোক 'মাদারের' সেট ডিজাইন করেছিলেন নেহার—সেট এমনভাবে তৈরি হয়েছিল যাতে সহজেই সব কিছুকে যে কোনও পাবলিক হাউস বা স্থানীয় হলে গিয়ে ঠিকঠাক খাটিয়ে নেওয়া যায়। এরপর 'দি মাদার' নাটকটি বার্লিনের শ্রমিক-শ্রেণীদের বিভিন্ন বস্তিতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখানো হতে লাগল। তদানীন্তন সরকার এই সব প্রদর্শনী বন্ধ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন। সুযোগ [illegible] খুঁজে না পেলে সরকারের তরফ থেকে কারণ দেখানো [illegible] হলে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে ঠিকমত [illegible] রেগুলেশনস অনুসারে [illegible] বেরোবার বিধিব্যবস্থা করা হয় নি। এই বিপাক এড়াবার জন্য অভিনেতারা অনেক সময় প্লে-রিডিং-এর ব্যবস্থা করতো—কিন্তু পুলিশ এসে কড়া নজর দিয়ে লক্ষ্য করতো তারা প্লে-রিডিং-এর নামে সত্যিকার চরিত্র-রূপায়ণ এবং অভিনয় করছে কি না। ব্রেশট এতে কিন্তু খুশিই হয়েছিলেন। প্লে-রিডিং-এর প্রতিক্রিয়া নাট্যাভিনয়ের
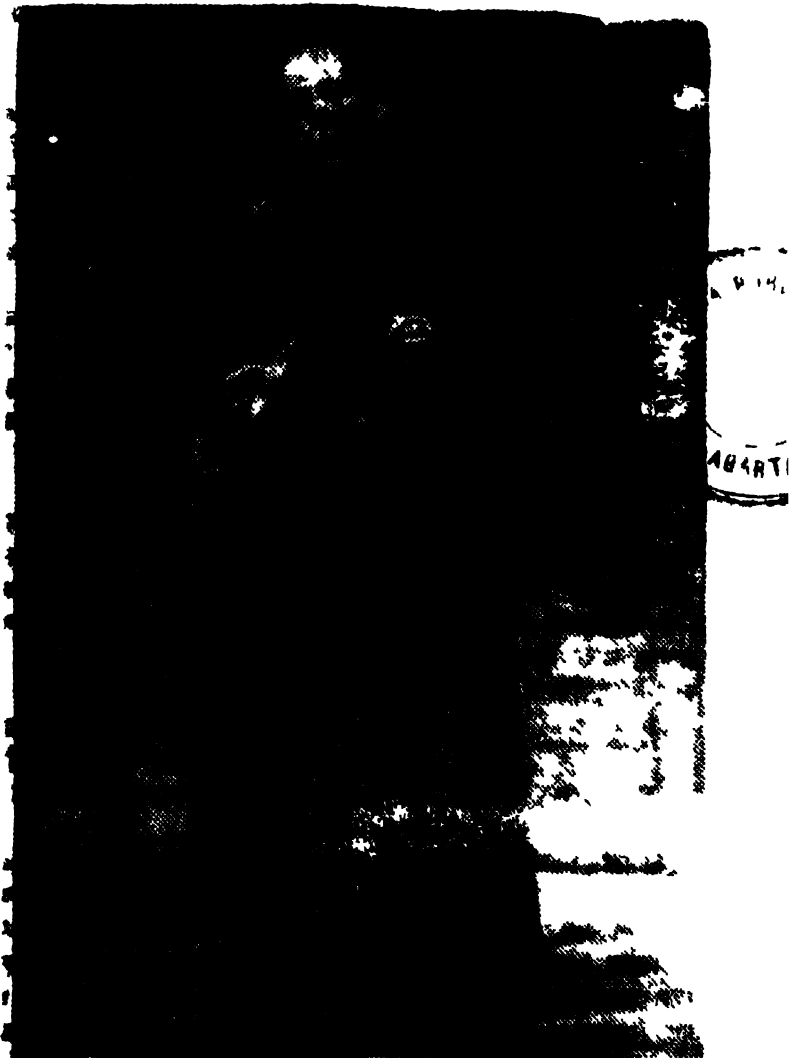
মান ইস্ট মানের একটি দৃশ্য

থেকে কম ফলপ্রদ তো হোতই না, বরং কিছু বেশিই হোত বলা চলে—Conclusive proof of his pet theory that the actors should not even try to pretend to be the characters they impersonate. এ নাটকেরও সঙ্গীত রচনা করেছিলেন হানস আইসলার। নাটকটির সাফল্যের জন্য এই সঙ্গীতের অবদান যে কতখানি তা বেশ পরিষ্কারভাবেই বুঝতে পাওয়া যায় 'দি মাদার'-এর প্রদর্শনীর সময়।

১৯৩২ সালে কয়েকটি কমিউনিস্ট সংগঠনের সাহায্যে ব্রেশট 'কুলে ভাম্পে' ছবিটি তৈরি করতে সমর্থ হলেন। বার্লিনের শহরতলীতে যেখানে শ্রমিকেরা বসবাস করতো সেখানকার খানিকটা জায়গার নাম ছিল কুলে ভাম্পে—এখানে অত্যন্ত জরাজীর্ণ কুঠরিতে থাকতো বেকার শ্রমিকের দল। ছবির কাহিনী লেখেন ব্রেশট এবং আর্নস্ট অটওয়াল্ট। সঙ্গীত রচনা এবং পরিচালনা করেন হানস আইসলার। ব্রেশটের বন্ধু বুলগেরিয়ান চিত্রপরিচালক স্লাটান ডিউডো ছবিটির পরিচালনা করেন।

কুলে ভাম্পেতে অর্থনীতিক মহাসঙ্কটের সময়কার বেকারদের দুর্বিষহ জীবনের বর্ণনা আছে। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে এতে প্রচণ্ডভাবে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের আক্রমণ করা হয়েছে তাদের প্রাচীনপন্থী পাতি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য। প্রথমে দেখানো হয়েছে কিভাবে তরুণ শ্রমিক কিভাবে আলস্য এবং কর্মহীনতার নৈরাশ্যের দ্বারা নির্বীর্য এবং আত্মবিশ্বাসহীন হয়ে পড়েছে। আর শেষটায় নাটকের গতি ফিরেছে বিরাট আশাবাদ এবং ক্রিয়াশীলতার দিকে—এরই প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে ওয়ার্কার্স স্পোর্টস র‍্যালিটি।

আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'কুলে ভাম্পেকে' নিয়ে দেখা দিল নতুন গণ্ডগোলের বিপদ। সরকারের আদেশে ছবিটির প্রদর্শনী হল নিষিদ্ধ। কারণ হিসাবে বলা হল এই ছবিতে প্রেসিডেন্ট অভ দি রিপাবলিকের প্রতি এই সব কারণে অসম্মান দেখানো হয়েছে—

১। প্রেসিডেন্টের একটি জরুরি সঙ্কটকালীন আইন ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে একটি যুবক শ্রমিক আত্মহত্যা করে—ছবিতে এ দুটি ঘটনাপরম্পরা এমনভাবে দেখানো হয়েছে যাতে মনে হয় এ দুটি ঘটনা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত।

২। একটি জায়গায় আছে পুলিশ একটি পরিবারকে গৃহচ্যুত করলো—এই উচ্ছেদ ব্যাপারটা যেন শাসকশ্রেণীর অন্যায় আচরণ এবং কু-শাসনের প্রতীক হিসাবেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

৩। এ ছবিতে আছে চার্চের ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে উলঙ্গ যুবকের দল নদীতে ঝাঁপ দিচ্ছে—এর দ্বারা রিলিজিয়নের প্রতি বিদ্রূপ ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ব্রেশটের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত একটি লেখায় এই ছবির নির্মাতাদের, অর্থাৎ ব্রেশট, আইসলার এবং ডিউডোর, সঙ্গে সেনস্যারের সাক্ষাৎকারের একটি বিবরণী পাওয়া যায়। সেনসার এই ছবির বিরুদ্ধবাদী হয়েছিলেন এই কারণে—ছবিটিতে চরিত্রগুলোর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলোকে অগ্রাহ্য করা হয়েছিল এবং ঐ সব

হয়েছিল। যে যুবক শ্রমিক এ ছবিতে আত্মহত্যা করে, সে বিশেষ একজন ব্যক্তি হিসেবে প্রদর্শিত হয় নি, তাকে করা হয়েছে সেই সব যুবক শ্রমিকদের প্রতিনিধি যারা বাঁচবার অধিকার থেকে বঞ্চিত। সেনস্যার ভদ্রলোকটি মত প্রকাশ করেছিলেন—'না, মশাইরা, আপনারা এ ছবিতে শিল্প সৃষ্টি দেখাতে চান নি—কোন বিশেষ ব্যক্তির জীবনের ট্র্যাজেডী দেখাবার উদ্দেশ্য নিয়ে আপনারা কাজ করেন নি। তা যদি করতেন আমরা কখনই আপনাদের প্রচেষ্টায় বাধা দিতাম না।'

'কুলে ভাম্পের' স্রষ্টারা খুবই মুষড়িয়ে পড়লেন। সেনস্যার বেশ স্পষ্ট ভাষাতেই তাদের চিত্র নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। নিজেদের উদ্দেশ্যমত বেশ সুন্দরভাবেই তাঁরা ছবিটি তৈরি করেছিলেন—কিন্তু এত করেও ধরা পড়ে গেলেন। ব্রেশট তাঁর নিজস্ব সিনিক্যাল ঢং-এ এবার এগিয়ে এলেন এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার লাভের জন্য। ব্রেশট বলেছেন :

"আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং যদিও আমি বক্তৃতা দিতে বিরক্ত বোধ করি, ওক্ষেত্রে একটি বক্তৃতাও দিলাম বিশেষভাবেই অ-সত্যের আশ্রয় নিলাম। আমাদের বক্তব্য. দের যেসব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আমরা দেখিয়েছি, সে সব উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরলাম : যেমন, বেকারটি জানলা দিয়ে বাইরে ঝাঁপ দেবার আগে কব্জিঘড়িটি খুলে সরিয়ে রেখে দিয়েছিল......আমরা শিল্পসৃষ্টি করতে চাই নি এই অন্যায় অভিযোগের বিরুদ্ধে আমি তীব্র প্রতিবাদ জানালাম......and I shamelessly asserted that my honour as an artist has been called into question . . ."

এই বক্তৃতাটা খুব কাজ দিল। কয়েক জায়গায় ছোটখাট ছাটাই করে ছবিটি দেখাবার অনুমতি পাওয়া গেল।

ব্রেশট লিখেছেন : "সেনস্যারের অফিস থেকে বেরিয়ে ওই ভদ্রলোকটি সম্পর্কে আমাদের কি রকম উচ্চ ধারণা হয়েছে সে কথাই আলোচনা করছিলাম। আমাদের প্রতি সব থেকে সহানুভূতিসম্পন্ন সমালোচকদের থেকেও সেনস্যার অনেক বেশি উদার মনোভাব নিয়ে আমাদের ছবির শিল্পসম্ভারের দিকটা বিচার করেছেন।" 'কুলে ভাম্পে' আমেরিকাতেও দেখানো হয়েছিল 'হুইদার জার্মানী' এই নামে। এটিই একমাত্র কমিউনিস্ট ছবি যেটি ভাইমার রিপাবলিকে প্রদর্শিত করা হয়েছিল।

রঙ্গজগৎ

নটশেখর নরেশ মিত্র

বঙ্গ নাট্যমঞ্চের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিল্পী নটশেখর নরেশ মিত্রের জীবনাবসান হয়েছে ৮১ বছর বয়সে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি অভিনয় করে গেছেন। কয়েকদিন আগে একটি যাত্রাপালার অভিনয়েও তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যৌবনে অভিনয়জগতে এসে যে সুনাম অর্জন করেছিলেন প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেও নাটক ও চলচ্চিত্র অভিনয়ে সেই সুনাম রক্ষা করেছেন। কেবল অভিনেতা হিসাবে নয়, নাটক ও চলচ্চিত্র পরিচালক হিসাবেও তিনি জনসাধারণকে আনন্দ দিয়েছেন।

মঞ্চে নরেশ মিত্রের চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে আজ পর্যন্ত প্রবীণদের কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে কর্ণার্জুন নাটকে তার শকুনী। কেদার রায় নাটকে শ্রীমন্ত, চন্দ্রগুপ্ত নাটকে কাত্যায়ন আর শাহজাহান-এর ভূমিকা অভিনয় তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হয়ে রয়েছে।

শিশির যুগের শুরুতে এমন একদল যুবক নাট্যমঞ্চে এসেছিলেন যাঁরা বাংলা নাট্যমঞ্চকে নতুনভাবে রূপদানের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের পরে বাংলা নাট্যমঞ্চের প্রাণশক্তির মূলে ছিলেন এঁরাই। নাট্যমঞ্চের প্রাণদান কেবল নয়, তার সঙ্গে দিয়েছিলেন বিশেষ মর্যাদা। কারণ শিশিরকুমার যেমন অধ্যাপক ছিলেন তাঁর সহযোগী অন্যান্যরা ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। নতুন ভাববস্তু ও বিশ্লেষণী ক্ষমতায় এঁরা মঞ্চের সঙ্গে দর্শকের নতুন করে সম্পর্ক ঘটালেন। নাট্যমঞ্চের প্রতি এই প্রীতির মূলে ছিল বাঙালীর দেশাত্মবোধ এবং এই দেশাত্মবোধের পুষ্টির জন্য নাটক সহায়ক হয়েছিল বলে এঁরাও জনপ্রিয় হয়েছিলেন। শিশির যুগের এই শিল্পীদের মধ্যে যে কজন বেঁচে আছেন তাঁরা নাট্যজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন। নরেশ মিত্রের মৃত্যুতে শিশির যুগের সঙ্গে সম্পর্কের শেষ হল। যিনি মঞ্চে উপস্থিত হলে একটা যুগের কথা দর্শকমনে উদয় হত এখন থেকে তা' আর হবে না।

যদিও তিনি একাশি বছর বয়স অর্থাৎ শেষ দিন পর্যন্ত অভিনয় করে গেছেন, কিন্তু তাঁর শেষ দিনগুলির অভিনয় কি কেবলমাত্র শিল্পের প্রতি ভালবাসা না আরও কিছু কারণ আছে? শেষ দিকে তাঁর উচ্চারণ ও দেহ সঞ্চালনে জড়তার চিহ্ন যথাযথ রসসৃষ্টির সহায়ক হতো এমন কথা বলা সত্যের অপলাপ, তা' সত্ত্বেও তাঁকে দেখতে দর্শকরা যেতেন, একটা যুগের শেষ অভিনেতাকে দেখার স্মৃতি রক্ষার জন্য। অভিনয় পরিতৃপ্তি না হলেও তাঁরা ভাবতে আনন্দ পেতেন যে নরেশ মিত্রের অভিনয় দেখছেন। নরেশ মিত্রের পক্ষে এটা আনন্দ ও গর্বের কথা হলেও শুধু কি এরই জন্য তিনি মঞ্চে আসতেন? যে বয়সে সাধারণ মানুষ অবসর ভোগ করে, যে বয়সে সভ্যদেশগুলিতে শিল্পীদের অবসর ভোগের জন্য সরকারী ব্যবস্থা থাকে সে বয়সে আমাদের দেশের একজন নটকে জড়দেহ নিয়ে পরিশ্রম করতে হয়েছে—একথা কি খুবই গর্বের? তাঁর যদি পেন্সনের ব্যবস্থা হত, টাকার জন্য যদি তাঁকে মৃত্যুর কয়েকদিন আগে যাত্রার আসরে উঠতে না হত তবে তা' হত গৌরবের। জাতির পক্ষে সম্মানের। কেবল নরেশ মিত্র নয়, আমাদের দেশের অধিকাংশ নাট্যশিল্পীর ভাগ্যে এই ঘটেছে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের মত প্রতিভাও এই নিষ্ঠুর নিয়তি থেকে রক্ষা পায় নি। দেশ স্বাধীন হলেও—প্রতিভার স্বীকৃতি সরকারীমহলে এখনো আমলাতান্ত্রিক নিয়মে বন্দী হয়ে রয়েছে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ছিলেন অত্যন্ত স্বাধীনচেতা মানুষ। কারো কাছে তিনি মাথা নোয়াতেন না। যখনই প্রয়োজন হয়েছে তিনি শাসকশ্রেণীকে সমালোচনা করেছেন। বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি, জাতীয় নাট্যমঞ্চ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট ও নির্ভীক বক্তব্যের কথা সকলে জানে। এই কারণে তিনি যে সরকারী দাক্ষিণ্য হতে বঞ্চিত হয়েছিলেন সে কথাও কারো অজানা নয়। কিন্তু নরেশ মিত্র ছিলেন অন্য জাতের শিল্পী। তিনি নাট্যজগতের বাইরের বিষয় নিয়ে খুব বেশি কথা বলেন নি। তা সত্ত্বেও তাঁর প্রতি সরকারের যে কর্তব্য পালন উচিত ছিল তা' কি হয়েছে? যদি হত তবে ৮১ বছর বয়সে তাঁকে যাত্রার আসরে নামতে হত না।

নরেশ মিত্রের মৃত্যুতে একজন শ্রেষ্ঠ নটকে হারিয়ে বাংলার নাট্যজগৎ ক্ষতিগ্রস্ত। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র একে ছিন্ন হল। এই সংখ্যে উপস্থিত করেছে [illegible] জীবন ও [illegible]। —সম্পাদক।

নরেশ মিত্র

নটকের কথা

একটি পয়সা

সত্যম্বর অপেরার নতুন যাত্রাপালা

এই সমাজকে আমূল পরিবর্তন করে নতুন করে গড়ে তোলার যে চিন্তাধারা তা যাত্রাপালাগানে গিয়েও পৌঁচেছে। থিয়েটারে যেমন শ্রেণী-শোষণের অবসান ও বিপ্লবের কথা আলোচিত হচ্ছে, যাত্রাপালায়ও সেই চিন্তার ছায়া পড়েছে। কারণ দর্শকদের মন বুঝে পালা সাজাতে হয়। একদিন পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও রূপক কাহিনীর মধ্যে যাত্রাপালা স্বাধীনতা যে মানুষের জন্মগত অধিকার সে কথা শুনিয়েছে। আজ দেশ স্বাধীন, কিন্তু সেই স্বাধীনতার ফল সকলে ভোগ করতে পারছে না। সুতরাং দেশে আজ যে বিক্ষোভ ও আন্দোলনের ঢেউ উঠেছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে না চললে দর্শকরা খুশি হবেন না। যাত্রাপালা তাই আজ কেবলমাত্র পৌরাণিক ও ঐতিহাসিকে সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তবধর্মী নাটকও গ্রহণ করেছে। যাত্রার ইতিহাসে বাস্তবধর্মী বিষয়বস্তু নিয়ে পালাগান এক নতুন পদক্ষেপ।

সত্যম্বর অপেরার 'একটি পয়সা' এরূপ একটি বাস্তবধর্মী নাটক। গত ৩রা অক্টোবর এই পালাটি মহাজাতি সদনে অভিনীত হয়েছে। শুরুতে অনুনাট্য সঙ্গের রীতি ও আঙ্গিকে দীর্ঘ একটি সাজে [illegible]

সঙ্গে ধারণা করলাম আজকের সমাজ নতুন রূপে। এই নাচের সঙ্গে [illegible] গণনাট্য সংঘের সেই বিখ্যাত গান "জান দেব তো ধান দেব না" ইত্যাদি। হাসি-খুশি চাষীদের ধান রোয়া, ধান কাটা, তারপর নেমে এল বন্যার রূপে বিপর্যয়, প্রকৃতির অসুর পরাজিত হলেও দ্বিতীয়বার তারা রুখলো, জিতলো, জীবনকে সুন্দর করল। এই নাচে যাত্রার কনসার্টের সঙ্গে মেলে হৃদয়ের আলো-তরঙ্গ। নাচ ও গানের মধ্যবর্তী সময়ে তবলাতরঙ্গের সঙ্গে কনসার্টে বেজেছে 'সংকোচের বিহ্বলতা—নিজেরে অপমান'—রবীন্দ্রসঙ্গীত। কয়েক বছর আগে যাত্রাপালায় এরূপ নৃত্য ও সঙ্গীত আশা করতে পারতাম কি? এইরূপ বলিষ্ঠ রুচির নাচ, গান সংযোজন করার জন্য আমরা সত্যম্বর অপেরাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

'একটি পয়সা' যাত্রাপালাটি একালের চোরাকারবারি, মজুতদার, ওষুধে ভেজাল-কারী এবং নারী ব্যবসায়ীদের দ্বারা সমাজে যে দুর্বিষহ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই সমাজ-বিরোধীদের শায়েস্তা করার জন্য উদয় হল দস্যু নিশাচর। সে একে একে সব পাপীদের শায়েস্তা করল। অতিস্নেহের বোনের মৃত্যুতে ধরা পড়ার সময় সে বুঝলো একক বীরত্বে সমাজের পরিবর্তন আনানো যায় না। তার জন্য চাই সকল দেশবাসীর অভ্যুত্থান।

বক্তব্য সময়োপযোগী হলেও এই যাত্রা-নাটকটি সুগ্রথিত হয় নি। আঙ্গিক হয়ে পড়েছে হিন্দী ফিল্মধর্মী। যার জন্য টুইস্ট নাচ, গানের হাল্কা সুর এবং ঘটনা ও সংলাপের অসংলগ্নতা ইত্যাদি এসে পড়েছে।

[illegible] অভিনয়ে সকলেই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ভূমিকালিপিতে [illegible] সম্ভাব নাম জানাচ্ছে পারলাম না। [illegible] যাত্রাজগতের সকল অভিনেতা-অভিনেত্রী আমাদের পরিচিত নন। তবে অভিনয় দেখে মনে হল—এঁরা সকলেই যাত্রাজগতের প্রথম শ্রেণীর শিল্পী। বিশেষভাবে উল্লেখ করব, পাগলা, মির্জা বা বিবেকের ভূমিকায় অভিনয়কারী শিল্পীকে তাঁর অভিনয় ও বলিষ্ঠ কণ্ঠ-সঙ্গীতের জন্য।

যদিও এই যাত্রাপালাটি আর একবার সম্পাদনা করলে আমরা খুশি হব, তবু যাত্রায় এই নবরূপায়ণের জন্য আমরা সত্যম্বর অপেরাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মহাজাতি সদনে এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা করেছিলেন শ্রীসাতকড়ি পাল।

শিল্পী সংসদ গঠন

শিল্পী সংসদ নামে একটি নতুন সংস্থা গঠিত হয়েছে। সম্প্রতি এই নব-গঠিত শিল্পী সংসদ প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁদের উদ্দেশ্য ও সংগঠনের শক্তির কথা ঘোষণা করেন। সংসদের সভাপতি শ্রীউত্তমকুমার চ্যাটার্জী বলেন, তাঁরা কিছুদিন থেকে এমন একটা সংস্থা গঠনের কথা ভাবছিলেন যেখানে সংস্কৃতিজগতের সকলকে একত্রিত করা যায়। এই উদ্দেশ্য নিয়ে কেবলমাত্র অভিনেতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, যাত্রা, সংগীত ও নৃত্যজগতের শিল্পীদের নিয়ে বৃহত্তর উদ্দেশ্যে এই সংস্থা গঠন করেছেন।

সংস্থা দুস্থ শিল্পীদের সাহায্যের জন্য একটি ফাণ্ড গঠন করবে। একটি মেডিক্যাল বেনিফিট স্কীম গ্রহণ করেছে। বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে পুনর্গঠন কাজের উদ্দেশ্যও তাদের আছে। সমিতির অফিস [illegible] করা হয়েছে।

নবগঠিত এই সংস্থার সভাপতি হয়েছেন শ্রীউত্তমকুমার চ্যাটার্জী। সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅর্ধেন্দু মুখার্জী। সহ-সম্পাদক অনিল চ্যাটার্জী ও শ্রীশ্যামল মিত্র। কোষাধ্যক্ষ শ্রীজহর রায়। কার্যকরী সমিতিতে আছেন সর্বশ্রী মলিনা দেবী, জহর গাঙ্গুলী, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, জয়শ্রী সেন, মাধবী মুখার্জী, বিকাশ রায়, তরুণকুমার চ্যাটার্জী, নির্মলকুমার চক্রবর্তী, তরুণ মিত্র, তরুণ রায়, অজয় গাঙ্গুলী, দ্বিজেন মুখার্জী, দিলীপ ভট্টাচার্য, আনন্দ মুখার্জী প্রমুখ।

সাংবাদিক সম্মেলনে এঁদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন এতদিনের অভিনেতৃ সঙ্ঘ নামক সংস্থা থাকতে আর একটি সংস্থা গঠনের মত এমন কি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে? কেনই বা অভিনেতৃ সঙ্ঘ থেকে তাঁরা বেরিয়ে এলেন? অভিনেতৃ সঙ্ঘে এখনো রয়েছেন এমন সকলকে (যেমন সৌমিত্র চ্যাটার্জী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার প্রমুখকে) তাঁরা এই সংস্থার সদস্যরূপে গ্রহণ করবেন কি না ইত্যাদি প্রশ্ন করলে বিকাশ রায় হাতজোড় করে অনুরোধ করেন এই প্রশ্নগুলি না করতে এবং তাঁরা এই প্রশ্নের জবাব দেবেন না জানান। কিন্তু বার বার এই প্রশ্নগুলিই আসতে থাকে —কারণ এসব প্রশ্নের জবাব পাওয়া না গেলে অভিনেতৃ সঙ্ঘ থেকে বেরিয়ে আসার কারণ বোঝা যায় না। শেষ পর্যন্ত কিছুটা বিরক্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং তিক্ততার মধ্যে সাংবাদিক সম্মেলন শেষ হয়। অভিনেতৃ সঙ্ঘ থেকে কেন এঁরা বেরিয়ে এলেন সেই প্রশ্ন থেকেই গেল।

[illegible] বিপিন [illegible], সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনিল চ্যাটার্জী, [illegible] বিশ্বাস, [illegible] মুখার্জী,

'অশ্বিভীয়া' ছবিতে ডেইজী ইরানী, মাধবী মুখার্জী ও সুবর্ণপ্র

দিল্লীতে সি এন টি'র নাট্যানুষ্ঠান

কলকাতার চিলড্রেন্স নভেল থিয়েটারের শিল্পীরা ২৮শে সেপ্টেম্বর থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর দিল্লীর সফদরজঙ্গ, নয়াদিল্লী বেঙ্গল ক্লাব, দক্ষিণী লজপতনগর ও মিণ্টো রোডে তাদের "সোনালী শিং" ও "নকল রাজা" মুখোস নাটিকা দু'টি সুনামের সংগে মঞ্চস্থ করে দর্শকদের মন জয় করেছে। নাট্য রচনা ও পরিচালনা সুশীলচন্দ্র দাস। বিভিন্ন ভূমিকায় রাজ্যশ্রী দাশগুপ্তা, শুক্লা চক্রবর্তী, কাকলি দাস—কণ্ঠসঙ্গীতে তপতী দাস ও সুমনা বসু কৃতিত্ব দেখান। দিল্লীতে শীঘ্রই সি এন টি'র শাখা খোলা হচ্ছে।

চন্দ্রগুপ্ত

আরবান হেল্থ সেণ্টার রিক্রিয়েশান ক্লাব গত ২৩শে সেপ্টেম্বর বালিগঞ্জ শিক্ষাসদন মঞ্চে নবম বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বহু অভিনীত 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। পুরাতনধর্মী নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে এই অফিস প্রমোদ-সংস্থার নাট্যামোদীদের কাছে নতুন নাটাস্বাদের বিতরণ ঘটায়। দেখা গেছে এ'রা বছরের আধুনিক নাটকই বার বার মঞ্চস্থ করে থাকেন।

রূপসজ্জা, আলোকসম্পাত, দৃশ্যপরিকল্পনা, আবহসঙ্গীত ও সর্বোপরি সমষ্টিগত অভিনয়ের দক্ষতা সকলের প্রশংসা অর্জন করে। বিশেষ করে চাণক্য, এ্যাণ্টিগোনাস, চন্দ্রগুপ্ত, সেলুকাস, সেকেন্দার, চন্দ্রকেতু, কাত্যায়ন, ভিক্ষুক, নন্দ ও হেলেনের ভূমিকায় যথাক্রমে ডাঃ ভূপতি সান্যাল, তরুণ মৈত্র, ডাঃ দেবলকুমার সেন, শ্যামলবরণ সেনগুপ্ত, দিলীপ সাহা, পরীক্ষিৎ বসু, কিরণকুমার ভট্টাচার্য, কার্তিক মন্ডল, প্রভাত মুখার্জী ও শ্রীমতী রেবা সেনের অভিনয় আকর্ষণীয়।

উদীয়মান মূকাভিনেতা তপন দত্ত

সম্প্রতি পূর্ব রেলওয়ের ভ্রাম্যমাণ গ্যাস প্রেসার ওয়েল্ডিং প্ল্যান্টের পরিচালনায় পানাগড় রিক্রিয়েশন হলে উদীয়মান মূকাভিনেতা তপন দত্ত একক মূকাভিনয় প্রদর্শন করেন। তাঁর অভিনয় দর্শকের কাছে বিশেষ প্রশংসিত হয়। বেকার যুবক, চোর, বাসযাত্রী, রিক্সাওয়ালা, মাছধরা ইত্যাদি তিনি প্রদর্শন করেছেন। তপন দত্ত সুপরিচিত মূকাভিনেতা যোগেশ দত্তের কাছে মূকাভিনয় শিক্ষা করেছেন।

নটশেখর নরেশ মিত্রের মৃত্যুতে শোকসভা

গত ১লা অক্টোবর ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ হলে অনুষ্ঠিত এক সভায়

বি, কে, প্রোডাকসন্সের 'শুক-সারী' ছবিতে অঞ্জনা ভৌমিক, সাধনা রায়চৌধুরী ও প্রতিমা চক্রবর্তী।

চলচ্চিত্র, সংগীত, নৃত্য ও যাত্রাজগতের শিল্পীরা নরেশ মিত্রের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন। সভার সভাপতিত্ব করেন শ্রীমন্মথ রায়। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়—দক্ষিণ কলকাতার বেলতলা রোডের নাম নটশেখর নরেশ মিত্র রোড রাখা হোক।

শাস্ত্রীয় সংগীতের আসর

আকাশবাণী আয়োজিত শাস্ত্রীয় সংগীতের আসর গত ২৫শে সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র সদনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠান নিঃসন্দেহে উপভোগ্য ও মনোজ্ঞ হয়েছিল। শাস্ত্রীয় সংগীতের ক্ষেত্রে জনপ্রিয় বহু শিল্পী একে একে সংগীত পরিবেশন করে পরম তৃপ্তিদান করেন। শিল্পীদের মধ্যে শ্রীমতী মালবিকা কানন শ্যামকল্যাণ রাগে খেয়াল, ঠুংরী ও মীরার ভজন গেয়ে এবং শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র স্বরোদে কেদারা ও পিলু ঠুংরী বাজিয়ে শ্রোতাদের যে আনন্দ দিয়েছেন সে কথা তাঁরা অনেকদিন মনে রাখবেন।

অনুষ্ঠানটি উপভোগ্য ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সময় নির্দিষ্ট করে দিয়ে এবং গানের সময় বার বার মাইকের কাছে লোকের যাতায়াতে শ্রোতাদের প্রতি কিছুটা অবিচার করেছেন।

মিতালী সুর-ছন্দমের শ্যামা

মিতালী সুর-ছন্দমের পরিচালনায় গত ২২শে সেপ্টেম্বর শ্যামা নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হলো। নৃত্যনাট্যটি পরিবেশনার দিক থেকে উপভোগ্য হয়েছিল। সুপ্রতিষ্ঠিত সংগীত ও নৃত্যশিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেন। শ্যামা, বজ্রসেন এবং কোটালের নৃত্য-চাতুর্য উল্লেখযোগ্য।

তপন দত্ত

শ্যামার ভূমিকায় শ্রীআরতি মজুমদারের নাচের আঙ্গিক প্রশংসনীয়। সখীদের সমবেত নাচগুলি অনুশীলনের অভাবে জমলো না এবং সময়ে সময়ে চোখে লাগছিল।

রবীন্দ্রনাথের নাটকে আমরা জানি অঙ্গ স্পর্শ করা হয় না। হাতে হাত মিললে দুটি হাত পাশাপাশি স্লাইড করে যায় মাত্র, স্পর্শ করে না। যেখানে শুধু মেয়েরা অংশ গ্রহণ করে সেখানেও এই ভাবই লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এই অনুষ্ঠানে সে রীতি অনুসরণ করা হয় নি।

গানগুলি আকর্ষণীয় হয়েছিল। শ্যামার গানগুলি শ্রীকণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। নাচ ও গানের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকায় অনাস্বাদিত নির্বস্তুক আনন্দের স্বাদ পান দর্শকমণ্ডলী। বজ্রসেনের গানগুলি শ্রীহেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে জমেছিল। তবে 'এ কী খেলা হে সুন্দরী' গানের পরিবেশ হবে বসন্তে। সে-ভাবটি গানে ঠিকমতো ফুটে উঠলো না। নৃত্যনাট্যের গান অভিনয়ের মাধ্যমে ফোটাতে হবে। 'ধর ধর ঐ চোর, ঐ চোর' গানে সে ভাবটি ধরা গেল না। পরিচালনা আমাদের ভালো লেগেছে তবে নাটকের শুরুতে কোটাল এবং প্রহরীর স্টেজের উপর ঘুরে বেড়ানো কেমন খাপছাড়া বোধ হলো। শুরু তো বজ্রসেনের পথচলাকে কেন্দ্র করে। তথাপি মিতালী সুর-ছন্দম পরিবেশিত শ্যামা নৃত্যনাট্য নিঃসন্দেহে প্রশংসা দাবি করতে পারে। [illegible] পরিবেশিত [illegible] নৃত্যনাট্যের [illegible] নৃত্যনাট্যের পরিবেশনায় [illegible]

সোভিয়েট ইউনিয়নে ইয়ং ব্যালে এনসেম্বলের 'পোয়েট্রি অব লিভিং ব্যালে' [illegible] আলেকজান্ডার ও এ, [illegible]।

এথেন্স থেকে মেক্সিকো

(১৮৯৬—১৯৬৮

এথেন্স	প্যারিস	সেন্টলুইস	লণ্ডন	স্টকহলম
এন্টোয়ার্প	প্যারিস	লসএঞ্জেলস	বার্লিন	লণ্ডন
হেলসিঙ্কি	মেলবোর্ন	রোম	টোকিও	মেক্সিকো
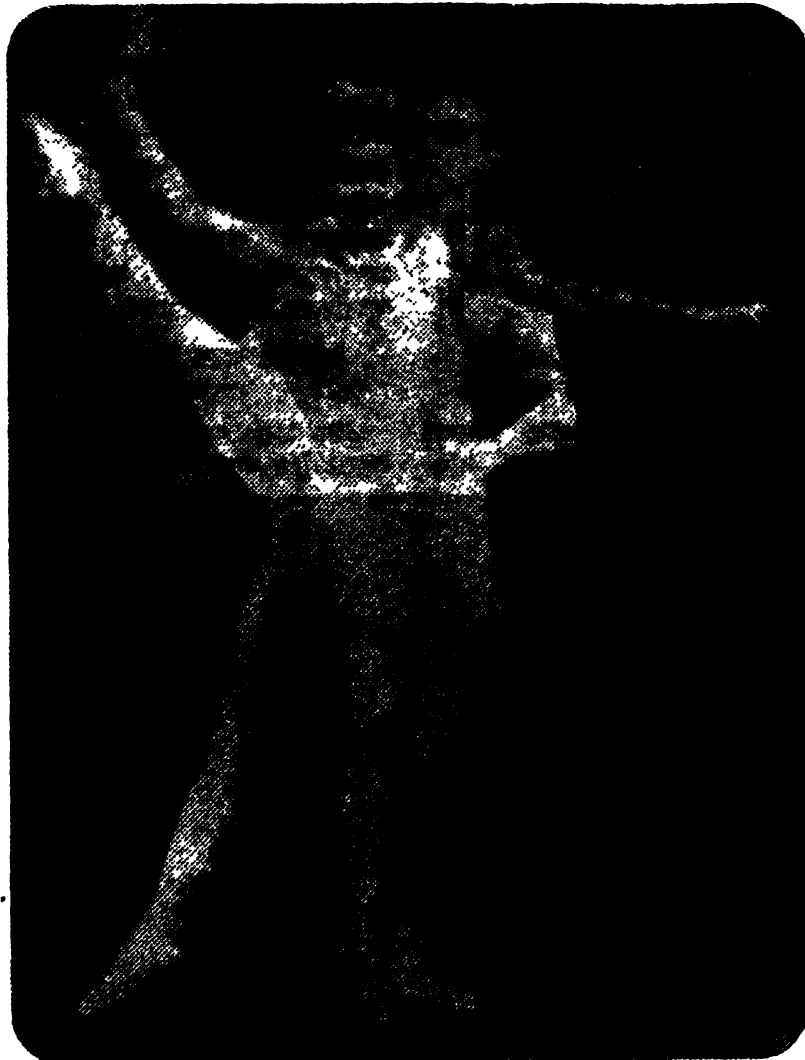
বিশ্ব ফুটবলের দরবারে ভারত আজো একেবারেই অপাংক্তেয়। কোন ঠাঁই-ই নেই তার। শুধু কি তাই? এশীয় কিম্বা মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় আমাদের বরাতে শুধু জুটছে পরাজয়ই।

স্বাধীনতা লাভের এক বছর পরেই অর্থাৎ ১৯৪৮ সাল থেকে ভারতীয় দল অলিম্পিকের ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করছে। এর মধ্যে একমাত্র ১৯৫৬ সালে ভারতীয় দল দেখেছিলো কিছুটা সাফল্যের আলো।

১৯৫৬ সালের মেলবোর্ন অলিম্পিকে ভারত লাভ করেছিলো চতুর্থস্থান। অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ফুটবল দলের সাফল্যে নতুন আশার আলো দেখে আনন্দে আমরা হয়ে উঠেছিলাম উদ্বেলিত।

কিন্তু তারপর । তারপর আবার যে কে সেই। কিছু কলঙ্ক আর কিছু ব্যর্থ হাহাকারে ভরে উঠলো ভারতীয় ফুটবল জগৎ।

১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকে ভারত দল প্রতিযোগিতায় যোগদান করার যোগ্যতাই অর্জন করতে পারলো না। প্রি অলিম্পিকের খেলাতেই হেরে গেলো ভারত ইরানের কাছে।

আর এ বছর অর্থাৎ ১৯৬৮ সালের অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ফুটবল বিভাগে ভারত যোগই দেয় নি। অবশ্য না দিয়ে একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে। কারণ অন্যর হয়তো ভারত প্রি-অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়ে লোক হাসাতো।

সে যা হোক অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ভারতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড়দের নাম নিচে দেওয়া হলো :

বিশ্ব অলিম্পিকে প্রথম ভারতীয় দল

॥ লণ্ডন—১৯৪৮ সাল ॥

গোল : জে ভরদ্বাজ (মহীশূর), সঞ্জীব কে উচিল (বম্বে)

ব্যাক : এস মান্না (বাংলা), তাজ মহম্মদ (বাংলা) ও প্যাপেন (বম্বে)

হাফব্যাক : বাসির (মহীশূর), টি আও (অধিনায়ক বাংলা), মহাবীর প্রসাদ (বাংলা), অজিত নন্দী (বাংলা) ও কাইজার (বাংলা)

ফরোয়ার্ড : বি বজ্রভেলু, আমেদ খাঁ, এস রমণ, কে পি ধনরাজ (সকলেই মহীশূরের), পরাব (বম্বে), মেওয়ালাল, সন্তোষ নন্দী ও রবি দাস (সকলেই বাংলার)।

ফলাফল—ফ্রান্স (২) : ভারত (১) (রমণ)

বিশ্ব অলিম্পিকে দ্বিতীয় ভারতীয় দল

॥ হেলসিংকি : ১৯৫২ সাল ॥

গোল : ভরদ্বাজ (মহীশূর) ও এণ্টনি (বাংলা)

ব্যাক : এস মান্না (অধিনায়ক বাংলা), ব্যোমকেশ বসু (বাংলা) ও আজিজুদ্দিন (হায়দ্রাবাদ)

হাফ ব্যাক : লতিফ, চন্দন সুভাষ সর্বাধিকারী, এস রায় (সকলেই বাংলার) ও নূর (হায়দ্রাবাদ)

ফরোয়ার্ড : ভেঙ্কটেস রুনু গুহঠাকুরতা, মেওয়ালাল সাত্তার আমেদ, সালে, জে এণ্টনি (সকলেই বাংলার) ও কে মঈন (হায়দ্রাবাদ)

ফলাফল—যুগোশ্লোভাকিয়া (১০) : ভারত (১) (আমেদ)

বিশ্ব অলিম্পিকে তৃতীয় ভারতীয় দল

॥ মেলবোর্ন : ১৯৫৬ সাল ॥

গোল : থঙ্গরাজ (সার্ভিসেস) ও নারায়ণ (বম্বে)

ব্যাক : রহমান (বাংলা), আজিজ (হায়দ্রাবাদ) ও লতিফ (হায়দ্রাবাদ)

হাফ ব্যাক : কেম্পিয়া (বাংলা), সালাম (বাংলা), নিখিল নন্দী (বাংলা), আমেদ হোসেন ও নূর (হায়দ্রাবাদ)

ফরোয়ার্ড : প্রদীপ ব্যানার্জী, সমর ব্যানার্জী (অধিনায়ক), কৃষ্ণ পাল, কিট্টু, কানাইয়ান (সকলেই বাংলার), নেভিল ডিসুজা (বম্বে), জুলফিকার ও বলরাম (হায়দ্রাবাদ)

ফলাফল—ভারত (৪) : অস্ট্রেলিয়া (২) (নেভিল ডিসুজা ৩ ও কিট্টু ১টি গোল করেন)

যুগোশ্লোভাকিয়া (৪) : ভারত (১) (ডিসুজা)

বুলগেরিয়া (৩) : ভারত (০)

বিশ্ব অলিম্পিকে চতুর্থ ভারতীয় দল

॥ রোম : ১৯৬০ সাল ॥

গোল : থঙ্গরাজ (সার্ভিসেস) ও নারায়ণ (বম্বে)

ব্যাক : চন্দ্রশেখর (বম্বে), লতিফ (বম্বে) ও অরুণ ঘোষ (বাংলা)

স্টপার : জার্নেল সিং (বাংলা) ইউসুফ খাঁ (হায়দ্রাবাদ)

হাফ ব্যাক : ফ্রাঙ্কো (বম্বে), কেম্পিয়া (বাংলা), রামবাহাদুর (বাংলা) ও হাকিম (হায়দ্রাবাদ)

ফরোয়ার্ড : প্রদীপ ব্যানার্জী (অধিনায়ক) চুনী গোস্বামী, কানন, বলরাম (সকলেই বাংলার), সুন্দররাজ (মাদ্রাজ), দেবদাস (বম্বে) ও হামিদ (হায়দ্রাবাদ)

ফলাফল—ভারত (৫) : আফগানিস্থান (২)

ভারত (৪) : ইন্দোনেশিয়া (২) (সুন্দররাজ ২, বলরাম ও কানন)

ভারত (২) : ইন্দোনেশিয়া (০) (প্রদীপ, চুনী)

হাঙ্গেরী (২) : ভারত (১) (বলরাম)

ভারত (১) : ফ্রান্স (১) (সুন্দররাজ)

পেরু (৩) : ভারত (১) (প্রদীপ ব্যানার্জী)

অলিম্পিকে আমরা

অজয় বসু

অলিম্পিক ক্রীড়ার সঙ্গে ভারত খুব কমদিন প্রত্যক্ষে জড়িয়ে নেই। নয় নয় করে একটানা প্রায় আটচল্লিশ বছর ভারত অলিম্পিকে অংশ নিয়ে আসছে। তাছাড়া তারও অনেক আগে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে আর একজন এ্যাথলিটেরও অলিম্পিকের আঙিনায় হাজির থাকার কথা শোনা যায়।

তিনি শুধু হাজিরই ছিলেন না, এ্যাথলেটিকের দু'-দুটি বিভাগে রৌপ্য-পদকও পেয়েছিলেন। এ্যাথলিটটির নাম নর্মান (অলিম্পিকের প্রামাণিক বিবরণীতে লিপিবদ্ধ ডব্লিউ জি) প্রিচার্ড। ১৯০০ খৃস্টাব্দে ব্যারন পিয়ের দ্য কুবার্টিনের স্বদেশে আধুনিক অলিম্পিক ক্রীড়ার দ্বিতীয় আসর বসলে নর্মান প্রিচার্ড ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় প্যারিসে গিয়ে উপস্থিত হন এবং ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করে দুশো মিটার দৌড় ও দুশো মিটার হার্ডল রেসে দ্বিতীয় স্থান পান।

এই নর্মান প্রিচার্ড? ইতিহাস অনুসন্ধিৎসুরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও উত্তরপর্বে আর তাঁর হদিশ পান নি। হয়তো প্যারিস অলিম্পিকের পর নর্মান প্রিচার্ড আর ফিরেই আসেন নি, ইউরোপের কোনো অঞ্চলে স্থায়ী বাসা বেঁধেছিলেন। ভারতবর্ষের এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়েরও কেউ প্রিচার্ড সম্বন্ধে বিশেষ কোনো আলোকপাত ঘটাতেও পারে নি। শুধু জানিয়েছিলেন, হ্যাঁ, ওই নামে কলকাতায় একজন ছিলেন বটে। খেলা-ধুলোয় তাঁর অনুরাগ ছিল। কিন্তু কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ তিনি একদিন উধাও হয়ে যান। পরের খবর তাঁদের কারুরই জানা নেই।

আমরা ধরে নিতে পারি যে প্রিচার্ডের পরের খবরই হলো প্যারিস অলিম্পিকে তাঁর সাফল্য সংবাদ। ভারত আনুষ্ঠানিক-ভাবে অলিম্পিক ক্রীড়ায় যবেই যোগ দিক না কেন, 'আরম্ভের আরম্ভ' কিন্তু ওই ১৯০০ খৃস্টাব্দেই। যদি না নর্মান প্রিচার্ডের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে চাওয়া হয়। কিন্তু তা চাওয়া হবেই বা কেন?

তখনও আমাদের দেশে অলিম্পিক [illegible] প্রতিষ্ঠিত হয় নি। অন্য [illegible] দেশেও তাই। ব্যারন [illegible] কুবার্টিনের নেতৃত্বে সবে অলিম্পিক আন্দোলনের সূচনা ঘটেছে। যোগদানের নিয়মকানুনও শিথিল। দেশের নাম নিয়ে ক্রীড়াবিদেরা এবং ক্রীড়াসংস্থাগুলিও সেই দেশের জাতীয় প্রতিনিধির ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। তাই অন্য কারুর সুপারিশ ছাড়াই হয়তো নর্মান প্রিচার্ড এই শতকের সূচনাতে নিজের চেষ্টায় প্যারিসে গিয়ে হাজির হয়ে ব্যক্তিগত সাফল্যের স্বীকৃতিতে
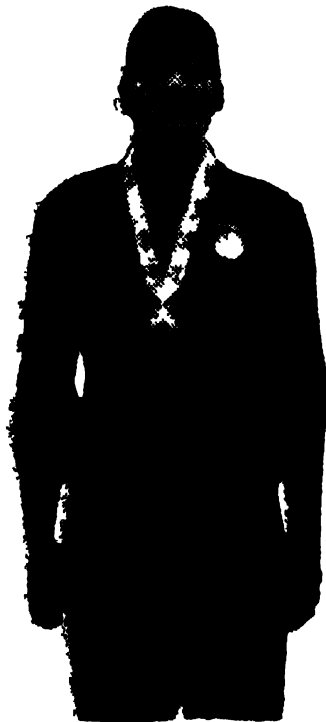
॥ পারভিনকুমার ।
টোকিও অলিম্পিকে ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি।

ভারতের নামটি অলিম্পিক ক্রীড়ার বিজয়ী তালিকায় উৎকীর্ণ করে দিয়েছিলেন।

এ্যাথলেটিকে সেই প্রথম এবং সেই শেষ সম্মান।

তারপর অনেক কাল অতিক্রান্ত হয়েছে, ভারতের স্বীকৃত প্রতিনিধিরা কতোবার ওই আসরে হাজির হয়েছেন, কিন্তু কেউই অলিম্পিক ক্রীড়াভূমির মূল অনুষ্ঠান এ্যাথলেটিকে পূর্বসূরী প্রিচার্ডের কৃতিত্বকে স্পর্শ করতে পারেন নি। [illegible]

প্যারিস অলিম্পিকের বিশ বছর পর রীতিমতো তোড়জোড় করে ভারত থেকে এ্যাথলিট ও মল্লবীরে গড়া একটি দল পাঠানো হয় অ্যান্টোয়ার্পে। সেই দলে বাঙালী দৌড়বীর পি সি ব্যানার্জী ছিলেন।

যদিও তখন দেশের মাটিতে অলিম্পিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নি তবুও ১৯২০ সাল থেকেই ভারতীয় দলের অলিম্পিক যাত্রা শুরু হয়ে যায় এবং সেই থেকে সেই পরিক্রমণ নিরবচ্ছিন্নই রয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে লণ্ডনে ও হেলসিঙ্কিতে ঝাঁকে ঝাঁকে ভারতীয় ক্রীড়া-বিদ ও কর্মকর্তা পাঠানোর সময় মনে হয়েছিল যে মাঠের খেলায় হালে পানি পাক বা না পাক, অলিম্পিকের নাম নিয়ে বিদেশে যাওয়া-আসা বুঝি এক ফ্যাশনেই দাঁড়িয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্কট যে দেশের বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে, সেই দেশের পক্ষে এই ফ্যাশন রীতিমতো মহার্ঘ। চোখ চেয়ে যারা চলে তাদের পক্ষে দীর্ঘদিন এই বিলাসের প্রশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয়। উচিতও নয়। তাই অধুনা ভারতীয় অলিম্পিক দলে অন্ত-র্ভুক্তির প্রশ্নে যোগ্যতার ন্যূনতম মান বেঁধে দেওয়া হচ্ছে।

ন্যূনতম মান স্থির করে দেওয়ার অযোগ্য, অশক্ত ক্রীড়াবিদদের হুট্ বলতে অলিম্পিক ক্রীড়াভূমিতে যাওয়ার পথ কিছুটা সঙ্কুচিত হয়েছে। সংযমের এই শাসনি একান্ত প্রয়োজনীয়ও। বাঁধনটি আরও কিঞ্চিৎ কঠোর হলেই আরও ভাল। বিশেষত সেই বাঁধন যদি কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যেই প্রসারিত হয়।

এখনও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে ক্ষেত্রবিশেষে দলভুক্তির যোগ্যতার মানকে শিথিল করা হয় এবং কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে তা দৃষ্টিকটুভাবে আলগা হয়েই থাকে। এই কর্মকর্তাদের আবার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী রয়েছে। একদল যান দলের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে। আর একদল যান অলিম্পিক-কালে নানান আন্তর্জাতিক ক্রীড়াসংস্থার বৈঠকে যোগ দিতে। তত্ত্বাবধায়কদের ভূমিকা না হয় বোঝা গেল। কিন্তু মিটিংয়ের যোগদানকারীদের [illegible] ঠিক [illegible] যায় না। যে দেশ চতি

ছাড়া অন্য সব খেলাতেই পিছিয়ে রয়েছে সেই দেশের কর্মকর্তাদের দলে দলে সভা-সমিতিতে যোগ দেবার অছিলায় বিদেশ বিহার করাও এক অশোভনীয় বিলাস।

এই অশোভনীয় নজিরটি নিশ্চিহ্ন করা দরকার। এ সম্পর্কে ভারত সরকার যদি সুস্পষ্ট নীতি অনুসরণ করতে পারেন তাহলেই কাজের কাজ হয়। একটি নীতির আভাষও আমি দিতে পারি। বলা হোক যে, অলিম্পিকে ভারতীয় দল যে যে বিভাগীয় ক্রীড়ায় নিদেনপক্ষে একটি করে পদক পাবে শুধুমাত্র সেই বিভাগীয় খেলার নিয়ামক সংস্থার সভাতেই ভারতীয় প্রতিনিধিরা যোগ দিতে পারবেন। অর্থাৎ সভায় যোগদানের অধিকারটি আগে খেলার মাঠে অর্জন করে নিতে হবে। আর সেই অধিকারটুকু হাতে এলে ভারতীয় প্রতিনিধিদের মুখ কাচুমাচু করে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াসংস্থার বৈঠকে একেবারে পেছনের সারিতে বসেও থাকতে হবে না। এগিয়ে যাওয়া অন্য সব দেশের প্রতিনিধিদের পাশে কিছুটা মানানসই হয়ে বসতেও পারবেন তখন।

উনিশ শ' বিশ সাল থেকে আমরা তোড়জোড় করে অলিম্পিক ক্রীড়ায় যোগ দিয়ে চলেছি—অ্যান্টোয়ার্প, প্যারিস, আমস্টারদাম, লস এঞ্জেলস, বার্লিন, লণ্ডন, হেলসিঙ্কি, মেলবোর্ন, রোম, টোকিও, সোনোটিতেই কামাই পড়ে নি। কিন্তু বিশ্ব ক্রীড়াভূমিতে নিয়মিত যোগদানের সূত্রে আমরা কি করতে পেরেছি?

অবশ্যই পেরেছি হকিতে মস্ত মূল্যের এক সাম্রাজ্য গড়তে। ১৯২৮ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত হকিতে ভারত ভূ-বিজয়ী। ষাট সালে উপমহাদেশের আর এক অংশ পাকিস্তান সে সম্মান কেড়ে নিলেও টোকিওতে হৃত ঐশ্বর্য ছিনিয়ে নিয়েছি। অলিম্পিক ক্রীড়ার একটি বিভাগে এতোদিন এমন নিরঙ্কুশ প্রাধান্যে প্রতিষ্ঠিত থাকতে অন্য দেশকেও বড় একটা দেখা যায় নি। কোনো দলগত খেলায় এমন নজির আছে কিনা তাই সন্দেহ।

সুতরাং হকিই ভারতের গৌরব। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াভূমিতে ভারতের বর্ণোজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি আঁকার মস্ত উপকরণ। ধ্যানচাঁদ, রূপ সিং, বাবু, বলবীরদের ধন্যবাদ। তাঁরা স্টিক হাতে নিছক এক খেলাকে শিল্পকর্মের পর্যায়ে তুলে ধরে তামাম দুনিয়াকে মুগ্ধ, বিস্মিত করছেন। তাঁরা স্টিক হাতে নিছক এক খেলাকে শিল্পকর্মের পর্যায়ে তুলে ধরে তামাম দুনিয়াকে মুগ্ধ, বিস্মিত করেছেন। তাঁরা ছিলেন এবং আজও ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন বলেই চতুর্বার্ষিকী ক্রীড়া, অলিম্পিকে যোগদানের প্রেরণা ও সান্ত্বনা এখনও আমরা খুঁজে পাই। নইলে হা-হুতাশ করে হয়তো বলতে বাধ্য হতাম, অলিম্পিক দূরেই থাক; সব কাজ কি সকলে করে উঠতে পারে!

কিন্তু হকি এবং চতুর্বার্ষিকী অনুষ্ঠানে একটিমাত্র সোনার মেডেলের (একবার রূপোর) চাকচিক্যে বিশাল ভারতবর্ষের মন ভরে কই!! তাই অলিম্পিক বর্ষে সেই প্রশ্নটিই বারে বারে ঘুরে-ফিরে মনে উঁকি দেয়, অলিম্পিকের অন্য আসরে আমরা কি করে উঠতে পেরেছি এবং অদূর-ভবিষ্যতে কি করতেই বা পারি?

মিথ্যে বলবো না, এই প্রশ্নের উত্তর হাতড়াতে গেলে আমাদের রীতিমতো নিরাশই হতে হয়। নর্ম্যান প্রিচার্ডের কথা বাদ দিলে আধুনিক অলিম্পিক ক্রীড়ায় আর যিনি একমাত্র ভারতীয় পদক পেয়েছেন তিনি হলেন মল্লবীর কে ডি যাদব। দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছরে একমাত্র সংগ্রহ মল্লক্রীড়ায় কেদারওয়েটে একখানি ব্রোঞ্জ পদক।

আর বলার মতো কৃতিত্বের নজির হলো রোমে মিলখা সিংয়ের চারশ' মিটার দৌড়ে চতুর্থ স্থান.. টোকিওতে হার্ডলার গুরুবচন সিংয়ের পঞ্চম স্থান, উনিশ শ' চব্বিশ সালে প্যারিসে দলীপ সিংয়ের সপ্তম স্থান এবং হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে যাদবের সতীর্থ মঙ্গাভের চতুর্থ স্থানাধিকার। অস্বীকার করবো না যে একালের

[illegible]

আন্তর্জাতিক ক্রীড়ায় চড়া চাহিদা মিটিয়ে কোনো বিভাগে চতুর্থ বা পঞ্চম স্থান পাওয়াও কম কীর্তি নয়। তাই মিলখা, গুরুবচন, মঙ্গাভেদের তারিফে আমাদের উচ্চকণ্ঠ হতেই হবে।

কিন্তু তবুও কথা থেকে যায়! এবং যতো কথা ততোই কপাল চাপড়ানোর পালা! অবশিষ্ট ভারতীয়েরা কোথায়? কোথায় পাই তাঁদের খুঁজে!

সামনেই মেক্সিকো অলিম্পিক। তার আগে যে প্রাক্-অলিম্পিক নির্বাচনী প্রতিযোগিতা হয়ে গেল তাতেই বা আমরা কি দেখতে পেলাম? একমাত্র পারভিন-কুমার ছাড়া আর কোনো ভারতীয় এ্যাথ-লিট দলভুক্তির ন্যূনতম মানে উঠে দাঁড়াতে পারলেন না। দুজন লক্ষ্যবিদও সেই মান ছুঁয়েছেন। ব্যাস্, ওই পর্যন্তই। তারপর সবই যেন অন্ধকার!

তাও পারভিনকুমারের সেরা নজির টোকিও অলিম্পিকের দশম স্থানাধিকারীর কৃতিত্বের সমতুল্য। মেক্সিকোতে এই নৈপুণ্যের বিনিয়োগেও তাঁর ভাগ্যে কিন্তু দশম ঠাঁইও জুটবে না। যেহেতু চার বছরের ফাঁকে এ্যাথলেটিকসের আন্তর্জাতিক মান আরও অনেক এগিয়েছে। এতো এগিয়েছে যে আজ জনদশেক মার্কিন তরুণ শত ফুটের ওপর হাই জাম্প করলেও আমেরিকার অলিম্পিক দল বাছাইয়ের সময় কম করে তাঁদের মধ্যে আটজনকে ছাঁটাই করে দিতে হবে। আর স্বল্পপাল্লার দৌড়ে তো কথাই নেই। সেসব বিভাগে মার্কিন তরুণেরা যতো দৌড়চ্ছেন ততোই প্রচলিত ও সাবেকী বিশ্বাসে গড়া এ্যাথলেটিকের 'খাধাগুলি' বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং ধরেই নেওয়া যায় যে ভারতীয় তরুণ পারভিনকুমার যোগ্যতার ন্যূনতম মান ছুঁলেও যে যোগ্যতার পরিচয় পেয়ে অলিম্পিক ক্রীড়ার দর্শকেরা দু'হাতে তালি বাজাবার প্রেরণা পান সে পরিচয়ের সংগতি পারভিনকুমার বোধহয় আগামী অক্টোবরে যোগাড় করতে পারবেন না।

ভারতীয় লক্ষ্যবিদেরা কি করবেন? বলা কঠিন। কারণ ভারত শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য-বিদ বিকানীরের কার্নি সিং যেন মস্ত এক হেঁয়ালী।

কার্নি সিং কায়রোতে বিশ্ব সুটিংয়ে একবার একটি পদক পেতেই তাঁকে ঘিরে অলিম্পিকে স্বর্ণ-রৌপ্য, নিদেনপক্ষে ব্রোঞ্জ সম্পর্কে স্বাভাবিক আশা জেগেছিল। কিন্তু বার বার বিদেশ যাওয়ার সুযোগ পেয়েও আর তিনি সে আশা সার্থক করে তুলতে পারেন নি। অলিম্পিকে গিয়েছেন এবং শূন্যহাতে ফিরে নানান অজুহাত তুলে ব্যর্থতার কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করে-ছেন। [illegible]

ভারতের ভারোত্তোলন প্রতিযোগী এম এল ঘোষকে ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকের ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় ১০০ কিলোগ্রাম তুলতে দেখা যাচ্ছে।

হাত। তাই বলছিলাম যে মেক্সিকোতে গিয়ে হাতিয়ার হাতে বিকানীর রাজ এবার যে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করন তা কেই বা বলতে পারে!

ভারতীয় কুস্তিগীরদের সম্পর্কেও আজ হলপ করে কিছু বলা যায় না। দিল্লীতে বিশ্ব কুস্তির সর্বশেষ অনুষ্ঠানে ভারতীয় মল্লবীরেরা অবশ্যই যোগ্যতার পরিচয় রেখেছিলেন। এ পরিচয়ের কথা মনে রাখলে তাঁদের সাফল্য সম্পর্কে আশা ছাড়া যায় না। কিন্তু তার আগে একথাও কি মনে রাখা উচিত নয় যে দিল্লীতে অনেক দেশের কুস্তিগীরেরাই হাজির থাকেন নি? আন্তর্জাতিক কুস্তি নিয়া-মক সংস্থা অনুমোদিত দেশগুলির অর্ধেকেরও বেশি ছিল দিল্লীর 'আখড়ায়' গরহাজির। কাজেই দিল্লীর ফলাফলকে মেক্সিকোর সম্ভাব্য ভূমিকার একমাত্র মাপ-কাঠি বলে ধরে নেওয়া বোধ হয় ঠিক হবে না।

মোটামুটি অবস্থা এই। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাই প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যে এতবড় দেশ ভারতবর্ষের তরুণ-তরুণীরা খেলাধুলোর ক্ষেত্রে এখনও পিছিয়ে রয়েছে কেন? বার বার যোগ দেওয়া সত্ত্বেও ভারত কেন অলিম্পিক আসরে সম্মানিত স্থান দখল করতে পারছে না?

অলিম্পিক ক্রীড়াকেন্দ্রে হাজির থাকার একমাত্র উদ্দেশ্য শুধু যোগদানই করা? না, সংগ্রামমুখী অস্তিত্বকে জিইয়ে রেখে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে ক্ষুরধার লড়াইয়ে মাতা? আধুনিক অলিম্পিকের জনক ব্যারন পিয়ের দ্য কুবারটিন যেদিন অলিম্পিক ক্রীড়ার মূল লক্ষ্যের ব্যাখ্যা [illegible] সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ার গুরুত্বকেও ব্যক্ত করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু আমরা বোধ হয় এখনও সেই গুরুত্বের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারি নি।

আসলে খেলাধুলো চিরদিনই আমাদের জাতীয় জীবনে 'খেলার' মতোই হেলা-ফেলায় থেকে গিয়েছে। স্বাধীন ভারতে দেশ ও রাষ্ট্রনায়কের সোচ্চার বক্তৃতায় খেলাধুলোর কিঞ্চিৎ ঠাঁই হলেও কাজের হিসেবে খেলাধুলো নবীন ভারত গঠনে মূল প্রকল্পের একটি [illegible] বিবেচিত হয় নি।

সারা ভারতের স্কুল-কলেজে খেলাধুলো এখন আবশ্যিক পাঠ্য হতে পারে নি। বিদ্যায়তনগুলির নিজস্ব ক্রীড়াঙ্গন নেই। গ্রাম ও শহরতলীতে খেলাধুলো সুসংগঠিত নয়। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ক্রীড়া গবেষণায় হাত পড়ে নি। নতুন প্রতিভার সন্ধান নেওয়া অথবা স্বীকৃত প্রতিভার বিকাশের পথকে সুগম রাখার নিষ্ঠার পরিচয় দেওয়া হয় নি। এবং সবার ওপরে এক-গোষ্ঠীভুক্ত স্বার্থপর কর্মকর্তাদের হাতে

জাতীয় ক্রীড়ার নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকে ছেড়ে রাখা হয়েছে। তাঁরা নিজেদের কোলেই ঝোল টানছেন, জাতীয় ক্রীড়ার কপাল গড়ায় তাঁদের কোনো মাথা ব্যথাই নেই।

এতো ফাঁকি ভাগ্য সহ্য [illegible] কাজেই যা অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটছে। ঘটবেও। এ থেকে মুক্তি নেই, যতোই কেন না আমরা ভাবি যে আমাদের দেশে মাল-মশলার অভাব নেই।

মাল-মশলার কথা পরে আসে। আগে চাই গড়ার নিষ্ঠা ও নিপুণ কারিগর। [illegible] কারিগরের হাত পাকা হলে, নিম্ন মানের মশলা দিয়েও সে কাজ চালাবার মতো কাঠামো গড়তে পারে। কিন্তু সে [illegible] কারিগর কই? [illegible] না নেই আন্তরিকতা।

ক্রীড়া ব্যবস্থাপনায় ও নিয়ন্ত্রণে যদি নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থ চিন্তার পরিচয় দেওয়া যায় তবেই মুস্কিল আসানের আবির্ভাবের লগ্ন ত্বরান্বিত হয়। কিন্তু তা না করে যদি সার্বিক ধারাকে ধরে রেখে এবং কিছু [illegible] কর্মকর্তাদের হাতে জাতীয় ক্রীড়াকে সমর্পণ করে আত্মপ্রসাদ খোঁজার প্রয়াস পাওয়া যায় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে তো দূরের কথা, এই শতাব্দী পেরিয়েও দেশে বিদেশের দৃষ্টিতে ভারতীয় ক্রীড়ার মর্যাদামণ্ডিত প্রতিচ্ছবির প্রতিফলন ঘটানো সম্ভবপর হবে না।

কথাটা শুনতে খারাপ, কিন্তু খাঁটি। খেলাধূলায় যারা এগিয়েছে খেলাধূলার [illegible] তারা সাধনা করেছে [illegible]

টোকিও অলিম্পিকে মহিলাদের দীর্ঘ লম্ফনে স্বর্ণপদকের অধিকারিণী [illegible] মেরী র‍্যান্ড।

[illegible]

পারি যে খেলাধূলার চাহিদার কাছে জাতি হিসেবে তারা নিজেদের উৎসর্গ করেছে। ক্রীড়া উন্নয়ন প্রকল্পকে তারা জাতীয় কর্তব্য সাধনের সামিল করে তুলেছে। এই পরিকল্পনায় ফাঁক নেই। তাই তারাও ফাঁকিতে পড়ে নি। তাদের উঁচু মাথা দিনে দিনে আরও উঁচুতে উঠে যাচ্ছে। যাবেও। অবাক হবার কিছুই নেই।

আমরা ফাঁকি দিয়েছি। দিচ্ছিও। তাই খেলার মাঠ আজও আমাদের জীবন খেলার পাশে ঠাঁই করে নিতে পারে নি। অলিম্পিক ক্রীড়ার পেছনের সারিতে পড়ে রয়েছি বলে আমাদের আক্ষেপ হয়তো স্বাভাবিক। কিন্তু এমন কি গঠনমূলক কাজ আমরা হাতে নিয়েছি যার কল্যাণে আমরা এগোবার আশা রাখতে পারি?

আমাদের জাতীয় মানসে ক্রীড়া চেতনার উন্মেষ যদি ঘটাতে না পারি তাহলে এমনি করে কপাল চাপড়াই [illegible]

ওলিম্পিকের নব রূপায়ন

আরুণি

পুরানো জগৎ মানেই ফুরানো জগৎ। কিন্তু একান্তভাবে ফুরিয়ে যাওয়া হেলেনিক (এ যুগের ভাষায় প্রাচীন গ্রীক) জগৎ আজ যে মহাসমারোহে সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হয়ে জাতিধর্ম গাত্রবর্ণ ও নরনারী নির্বিশেষে কোটি কোটি মানুষের মনে অসাধ্যসাধনের প্রেরণা জাগাচ্ছে, তা সম্ভব হয়েছিল একটি মানুষের স্বপ্ন দেখার ও সে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার তাঁর অপরিমেয় কর্মশক্তির ফলে।

তামাম দুনিয়া তখন অন্ধকার। আলো জ্বলছে এখানে সেখানে। মিশরের ও চীনের জ্ঞানের আলো তখন তেলের অভাবে স্তিমিত। মধ্যপ্রাচ্যে জ্বলছে শক্তিদম্ভের নগ্ন শিখা, সে শিখা আলো দেয় না, নিজে পোড়ে, অন্যকেও পোড়ায়। ভারতবর্ষে জ্বলছে ব্রহ্মানুভূতির আলো, আত্মা ও বিশ্বস্বরূপকে প্রত্যক্ষ করার সে আলো তৃতীয় নয়নে উদ্ভাসিত। আর গ্রীসে জ্বলছে যৌবনের ও প্রাণশক্তির দীপ্ত আলো, সে আলো মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে তুরীয়ান, স্বর্ণযান ও অজেয়যানের সাধনায়, ওলিম্পিয়ার পুণ্যক্ষেত্রে।

বিধাতা মানুষকে পশুরূপেই সৃষ্টি করেছিলেন হেলেনিক মনীষী অ্যারিস্টটলই তাকে সর্বপ্রথম সংজ্ঞা দিয়েছিলেন "বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন পশু" বলে। বস্তুত পশুমানবের প্রধান সম্পদ তার দেহশক্তিকে বিচারবুদ্ধি দ্বারা পরিমার্জিত করে মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করাই ছিল ওলিম্পিক ক্রীড়া উৎসবের লক্ষ্য।

রোম সাম্রাজ্যবাদ যখন তার বিজয়রথের চাকার সঙ্গে হেলেনিক রাষ্ট্রকে শৃঙ্খলিত করে ওলিম্পিক ক্রীড়া উৎসবকেও নিজেদের খুশিমত চালাতে চাইল, তখনই ঘটলো ওলিম্পিকের আদর্শচ্যুতি আর আদর্শচ্যুতির অনিবার্য পরিণতি হল তার পতন। যে ওলিম্পিক ক্রীড়াঙ্গন মানুষে মানুষে মিলনের ক্ষেত্র হিসাবে দৈহিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শান্তি ও মৈত্রীর আদর্শ প্রচার করেছিল হাজার বছরের ওপর রোমান জঙ্গীবাদ তাকে হীন প্রতিযোগিতায় ছলে বলে কৌশলে জয়লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করলো যখন, তখনই তার বিলুপ্তি ঘটলো।

খৃস্টান সম্রাট আদেশ জারি করে গ্রীকদের পৌত্তলিকতা প্রভাবিত ওলিম্পিক বন্ধ করে দিয়েছিলেন, সেটি উপলক্ষ মাত্র। কিন্তু গ্রীসের আলো-নেভানো রোমান সাম্রাজ্যবাদের ওপরেও নেমে এল উত্তর ইয়োরোপের বর্বরতা। ৩৯৪ খৃস্টাব্দে বর্বর আক্রমণকারীরা ওলিম্পিয়ার ক্রীড়াঙ্গন, তার মহিমামণ্ডিত মন্দির, অজস্র মর্মর ভাস্কর্য সব গুঁড়িয়ে দিয়ে গেল। তার পর সেখানে নেমে এল বিধাতার চরম অভিশাপ। দু-দুটি ভূমিকম্পে ওলিম্পিয়া নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, তার দু পাশের দুই নদী আলফিয়াস ও ক্যালডিয়াস-এর ধারা গেল ঘুরে, সমগ্র ওলিম্পিয়া নগরী ২৫ ফুট বালি ও পলিমাটির নিচে চাপা পড়ে গেল, তলিয়ে গেল বিস্মৃতির অতল গর্ভে।

কিন্তু মরে না মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর—এই কল্যাণী ম... হল। তেরশ বছর পরে ভস্ম ... শয্যা ছেড়ে জলদর্চি তনু নিয়ে আবার জেগে উঠলো ওলিম্পিক ওলিম্পিয়ার শ্মশানে—শব সাধনা নয়, সেই নগরীর জীবন্ত যুগের প্রাণবহ্নি ছড়িয়ে পড়লো দিকে দিগন্তরে।

অজস্র গৌরবগাথায় নিবন্ধ হেলেনিক সভ্যতার প্রতি বিশ্বজনের আগ্রহ রূপায়িত হল, প্রত্নতাত্ত্বিক ও গবেষকদের সক্রিয় প্রয়াসে। ফরাসী স... উদ্যোগে ১৮২৯ খৃস্টাব্দে ওলি... মাটি খোঁড়া শুরু হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে জার্মান সরকার সে কাজ ... এগিয়ে নিয়ে গেল ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে, অবশেষে ১৮৯১ খৃস্টাব্দে ওলিম্পিয়ার ধ্বংসাবশেষ
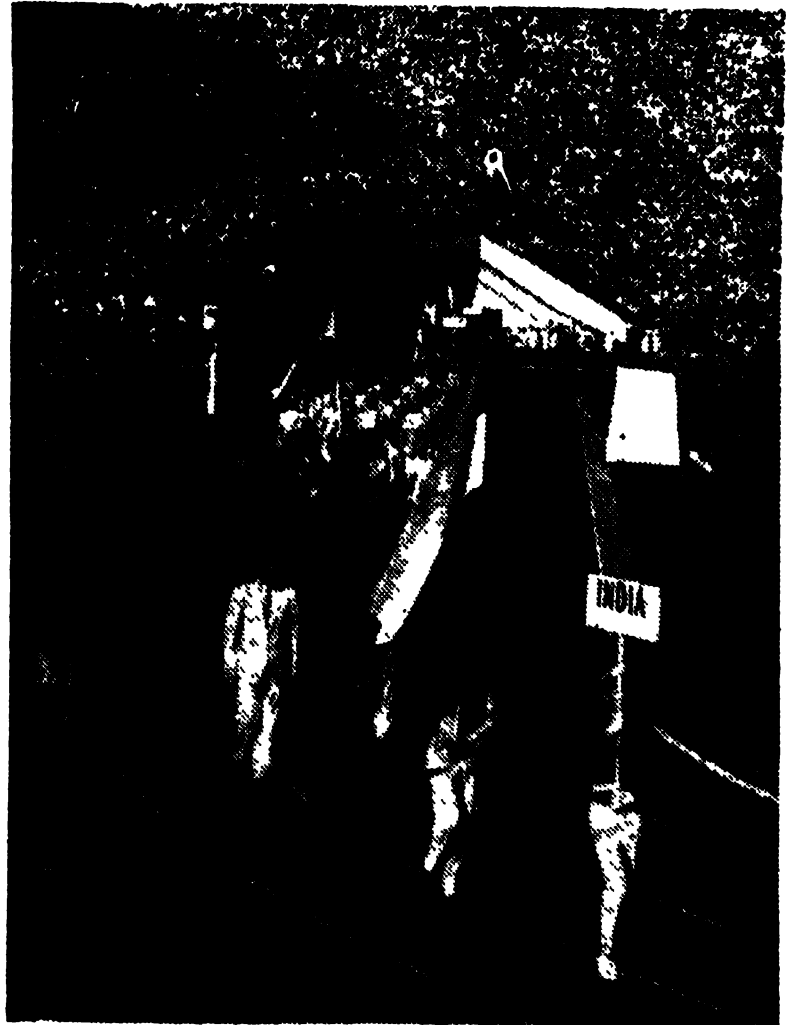
টোকিও অলিম্পিকের উদ্বোধনী দিনে ভারতীয় দলকে পতাকা নিয়ে মার্চ পাস্ট করতে দেখা যাচ্ছে।

অলিম্পিকে তিনবার পদক অর্জনকারিণী এবং বিশ্ব, ইউরোপ ও চেকোশ্লোভাকিয়ার জিমন্যাস্টিক চ্যাম্পিয়ন ভেরা কাস্লাভস্কাকে 'দি ক্রিস অব দি সিটি অব কাসলাভ' উপাধি দানের পর তিনি বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য রক্ষিত খাতায় এই সই করছেন।

সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হল, সেই সঙ্গে উদ্ভাসিত হল ইতিহাসের এক সভ্য যুগ, যে যুগে দেবতারা মর্তকায়ায় পৃথিবীতে বিচরণ করতেন। যে যুগের প্রস্তর রূপই শুধু নয়, যে যুগের জীবনদর্শন ও জীবনাদর্শ প্রতিভাত হল সেই ধ্বংসাবশেষে প্রাণসন্ধানী গবেষকবৃন্দের অনুসন্ধিৎসার ফলে।

আবার জাগাতে হবে ওলিম্পিয়াকে, তার বহিঃস্বরূপে শুধু নয়, তার চৈতন্যরূপে, এই সঙ্কল্পে সর্বপ্রথম এগিয়ে এল এ যুগের গ্রীস, অবহেলিত পরপদানত গ্রীসের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস রূপ পেল যখন গ্রীক সরকার ১৮৫৯ ও ১৮৭০ খৃস্টাব্দে ওলিম্পিক ক্রীড়া উৎসবের পুনঃপ্রবর্তন করতে চাইলেন। ইউরোপের প্রত্যন্ত দেশ গ্রীস তখনও তুর্কী অধীনতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় নি, সেখানেই বসবে সমগ্র সভ্য জগতের যৌবন সমাবেশ এমন স্বপ্নে সর্বপ্রথম উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন রুমানিয়া প্রবাসী গ্রীক বণিক ইভাঞ্জেলিস জ্যাপাস। জ্যাপাসেরই আগ্রহে ও অর্থব্যয়ে এবং গ্রীক সরকারের সমর্থনে ১৮৫৯ সালে এথেন্সে প্রাচীন ওলিম্পিক পুনঃপ্রবর্তনের প্রথম প্রয়াস হয়। স্টেডিয়াম নেই, কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনাও নেই, শুধু মনে আগ্রহ আর চোখে স্বপ্ন। রেল লাইন পার্কে ও এথেন্সের রাজপথে হল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা। সিংহাসনে উপবিষ্ট রাজা রাণী ও সভাসদদের উপস্থিতিতেই গ্রীক সম্মান রাখতে গিয়ে যোগদানকারী পুলিশ হিসেবে নেমে গেল, দলে দলে লোক ঢোকয়ায় ভেতরে খেলার অধিকার পাওয়ার জন্য শেষ মুহূর্তে প্রতিযোগী হিসেবে নাম লেখালো। এক অন্ধ ভিখারী নাম দিয়ে ভিতরে ঢুকে গান গেয়ে প্রচুর পয়সা ভিক্ষা পেয়ে গেল। পুলিশের ঘোড়ার পায়ের চাপে জনকয়েক দর্শকের মৃত্যু ঘটলো। আর দু মাইল দৌড়ে একজন প্রতিযোগী আধ পথে ক্লান্তিতে ঢলে পড়ে আর উঠলো না। ওই দু মাইল ছিল দূরপাল্লার দৌড়। তাছাড়া আরও তিনটি বিষয়ের প্রতিযোগিতা হয়েছিল ২০০ গজ দৌড়, ত্রি-লম্ফন (হপ-স্টেপ-জাম্প) ও ডিসকাস থ্রো।

জ্যাপাসের প্রয়াস ব্যর্থ হল। ওলিম্পিকের আদর্শ বা ঐতিহ্য কাউকে উদ্বুদ্ধ করলো না। নতুন ধরণের এক তামাসা দেখতে যারা ভিড় করেছিল, তারা তামাসাই করলো।

কিন্তু জ্যাপাসের মনের আগুন তাতে স্তিমিত হয় নি। মরবার সময় সে বিরাট সম্পত্তি গ্রীক সরকারের হাতে তুলে দিল ওলিম্পিক পুনঃ প্রবর্তনের জন্য। সরকারী প্রয়াসে আর একবার ওলিম্পিক পুনঃ প্রবর্তনের ব্যর্থ চেষ্টা হল ১৮৭০ খৃস্টাব্দে। এবারেও ওলিম্পিক আদর্শ বা ঐতিহ্য প্রচারের কোন ব্যবস্থা না থাকায়, সেই তামাসা দেখা ভাব ও চরম বিশৃঙ্খলা। কুস্তি এবং টাগ-অব-ওয়ার প্রতিযোগিতা বিষয় তালিকায় সংযুক্ত হল।

প্রাচীন গৌরবকে জাগিয়ে তোলার দু-দুটি প্রয়াস ব্যর্থ হতে গ্রীকদের মধ্যে এল নৈরাশ্য। তারা ক্ষান্ত হল। কিন্তু ওলিম্পিয়ার ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাচীন উৎসব ও প্রতিযোগিতার বাণী তখন বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকের কানই তা স্পর্শ করলো, একজনের ক্ষেত্রে তা কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো আকুল করিল মন প্রাণ। সে একজন কিন্তু গ্রীক নন, ফরাসী অভিজাত সম্প্রদায়ের ব্যারন পীয়ের দ্য কুবার্তিন।

ইয়োরোপের পরিস্থিতি তখন ভয়াবহ। সারাটা মহাদেশ তখন বারুদের স্তূপের উপর বসে আছে। প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে ফ্রান্সকে যুদ্ধে বিধ্বস্ত করে। ভেঙেপড়া তুরস্ক সাম্রাজ্যের ভাগ দখল করতে রুশ ও অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের সঙ্গে জার্মানও হল দাবিদার। আর প্রাচ্য সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ব্রিটেনের লক্ষ্য হল পূবে যাওয়ার জলপথে অন্য কোন বিরোধী শক্তি যাতে প্রবল না হতে পারে। সর্বত্র সংঘর্ষ, অবিশ্বাস, বৈরিতা ও ত্রাস।

সব দেখে শুনে মনে প্রবল অশান্তিতে তাড়িত হয়ে পশ্চিম ফ্রান্সের অভিজাত সেন্ট সির-এর ছাত্রে আর মিলিটারী শিক্ষার ক্

কুবার্তিন। যুদ্ধ, রক্ত, একমাত্র ক্ষমতা-লিপ্সা, পরদেশে প্রভুত্ব বিস্তার—এই সব দানবের হাতছানিতে নাচতে নাচতে গিয়ে বলি হচ্ছে সারা ইয়োরোপের তরুণ সমাজ। কেন? কেন? কেন? এই প্রশ্ন উতলা করে তুললো কুবার্তিনকে।

প্রাচীন ওলিম্পিয়ার ক্রীড়া উৎসব ক্ষেত্র খনন করে বার করেছে জার্মানরা, তারও আগে ফরাসীরা বার করেছে সেখান-[illegible] প্রাণের। সেই [illegible] প্রাচীন অলিম্পিকের অনুসরণে যদি বিস্তৃততর ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যায়, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষের আদিম কামনা বৈরিতাবিহীন ও নির্দোষ সেই প্রতি-যোগিতায় পরিতৃপ্ত হতে পারবে। প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে নিত্য সংগ্রাম বন্ধ করে সংগ্রামী বিপক্ষীয়রাই পাশাপাশি দৌড়তো, কুস্তি করতো, ডিসকাস ছুঁড়তো, অলিম্পিকের আলোয় হত উদ্ভাসিত তাদের ঐক্য। সেই আদর্শে আজকের যুদ্ধরত, যুদ্ধ প্রস্তুতিরত ও যুদ্ধং দেহি মনোভাবসম্পন্ন দেশগুলি থেকে যদি তরুণদের একই ক্রীড়াক্ষেত্রে পাশাপাশি দাঁড় করানো যায়, কেন সর্বমানবের ঐক্য বোধে উদ্বুদ্ধ হতে পারবে না তারা?

যুদ্ধশিক্ষা ছেড়ে দিয়ে কুবার্তিন

অলিম্পিকের পতাকা গ্রহণের দৃশ্য

[illegible] ধরে রাখা হয়েছে।

পড়লেন ইতিহাস ও সমাজতত্ত্ব, ঘুরে বেড়ালেন দেশে দেশে। অ্যাংলোস্যাক্সন জাতি-সম্পন্ন দেশগুলিতে বিশেষ করে ব্রিটেনে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্কুল-কলেজে খেলা-ধুলোর প্রসার ও জনপ্রিয়তা তাঁকে আরো অনুপ্রাণিত করলো। সর্বত্র প্রচার কার্য চালাতে লাগলেন তরুণ ব্যারন।

"ওলিম্পিক—নবযুগের ওলিম্পিক বিশিষ্ট জাতি বা রক্তধারার ধারকদের সীমায়িত ক্ষেত্র হবে না, হবে সর্বমানবের মিলনক্ষেত্র, সব রকম খেলার প্রতিযোগিতা চলবে সেখানে"—এই কথা লিখলেন ব্যারন। ১৮৯২ খৃস্টাব্দে প্যারিসের এথলেটিক স্পোর্টস ইউনিয়নকে জানালেন।

"দেশে দেশে আমাদের রপ্তানির সওদা হোক, নৌচালক, দৌড়বিদ, অসিচালক প্রভৃতি খেলোয়াড়। তাই হোক ভবিষ্যতের অবাধ বাণিজ্য। ইয়োরোপময় এই ব্যবস্থা যেদিন প্রবর্তিত হবে, শান্তির সপক্ষে তাই হবে নতুন ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ"—"অতএব ওলিম্পিক গেমস-এর পুনঃপ্রবর্তনে আমায় সহায়তা করুন"—মিনতি জানালেন কুবার্তিন।

১৮৯৪ খৃস্টাব্দে খেলাধুলোর অপেশাদার ব্যবস্থাবিষয়ক আন্তর্জাতিক কংগ্রেস বসলো প্যারিসে, ফরাসী স্পোর্টস ইউনিয়নের উদ্যোগে। সেখানে দেশ বিদেশের প্রতিনিধিদের সামনে ওলিম্পিক গেমস পুনঃপ্রবর্তনের নিজস্ব পরিকল্পনা পেশ করলেন ব্যারন। উপস্থিতদের মধ্যে ছিলেন স্পার্টার ডিউক, প্রিন্স অব ওয়েলস, সুইডেনের ক্রাউন প্রিন্স, বেলজিয়ামের রাজা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। এ ছাড়া প্রতিনিধি এসেছিলেন ফরাসী, ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রীস, রাশিয়া, সুইডেন, বেলজিয়াম, ইতালী ও স্পেন থেকে। সকলেই সাগ্রহে অনুমোদন করলেন ওলিম্পিকের পুনঃপ্রবর্তন। পত্রযোগে সমর্থন এল হাঙ্গেরি, বোহেমিয়া, হল্যাণ্ড ও অস্ট্রিয়া থেকে। সিদ্ধান্ত হল প্রতি চার বছর অন্তর বিভিন্ন রাষ্ট্রে ওলিম্পিক গেমসের অনুষ্ঠান হবে। কুবার্তিনের একটি প্রস্তাব অবশ্য বাতিল হয়ে গেল, তাহল ১৯০০ খৃস্টাব্দ থেকে এই নব পর্যায়ের ওলিম্পিক শুরু করার প্রস্তাব। তর সইলো না কারোর। তাই ১৮৯৬ খৃস্টাব্দেই পুনঃপ্রবর্তিত হল ওলিম্পিক গেমস। ওলিম্পিয়া যে দেশে ছিল, এবং ওলিম্পিক ছিল একান্তভাবে যাদের নিজস্ব, তাদের দেশেই স্থির হল প্রথম অনুষ্ঠান।

গ্রীক সরকার দিল এক লক্ষ ডলার। আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রীক বণিক জর্জ আভেরফ তিন লক্ষ ডলার খরচ করে প্যান এথেনিক স্টেডিয়ামটি নতুন করে গড়িয়ে দিলেন।

॥ তামারা প্রেস ॥
রাশিয়া শুধু নয় তামারা আজ বিশ্বের অন্যতম সেরা মহিলা এ্যাথলেট।

প্রাচীন ওলিম্পিককে জাগানো হল বটে, কিন্তু তাতে মূল ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার বিষয়গুলি প্রায় সবই বাদ পড়ে গেল। এথলেটিকসের দৌড়, লাফ, থ্রো রইল। ব্যস ওই পর্যন্ত, বক্সিং, কুস্তি—প্রাচীন ওলিম্পিকের দুটি মুখ্য প্রতিযোগিতার বিষয় এ যুগের ওলিম্পিকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অনেক পরে। ওয়েট লিফটিং অবশ্য ছিল। আর যে সব প্রতিযোগিতা এথেন্সের প্রথম ওলিম্পিকে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার কোন খবর প্রাচীন গ্রীকরা জানতো না, যথা সাইক্লিং, ফেন্সিং বা অসিচালনা, শুটিং, জিমনাস্টিকস্, সাঁতার ও টেনিস (লন টেনিস ও কভার্ড কোর্ট)।

তেরটি দেশের ৪৮৪ জন প্রতিযোগী ছিল। সবই পুরুষদের প্রতিযোগিতা।

টোকিও অলিম্পিকে পদকের খতিয়ানে প্রথম ছ'টি দেশ

		স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
আমেরিকা	—	৩৬	২৬	২৮
রাশিয়া	—	৩০	৩১	৩৫
জাপান	—	১৬	৫	৮
জার্মানী	—	১০	১২	১৮
ইটালী	—	১০	১০	৭
হাঙ্গেরী	—	১০	৭	৬
ও				
ভারত	—	১	০	০

একটি জিনিষ লক্ষ্য করার বিষয়, ৮০০ মিটার ও ১৫০০ মিটার দুটি দৌড়েই একজন অস্ট্রেলিয়ান জয়ী হয়েছিল। বাকি সব কটি ট্রাক ও ফিল্ড ইভেন্ট জিতেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছেলেরা, ডিসকাস বিজয়ী, ডিসকাস কাকে বলে না জেনেই, আন্দাজী অনুশীলনের ফলেই ১৫ ফুট ৭½ ইঃ ছুঁড়ে স্বর্ণপদক জিতেছিল।

আমেরিকানদের একের পর একটিতে জয়লাভে গ্রীক দর্শকরা ক্ষেপে আগুন হয়ে গিয়েছিল। সব ভণ্ডুল করে দেয় দেয়। শেষ পর্যন্ত গ্রীক মেষপালক স্পাইরেওন লুয়েস মারাথন জিতে গ্রীকদের মেজাজ ঠাণ্ডা করতে পেরেছিল ও হৃদয় আনন্দে উদ্বেল করে দিতে পেরেছিল।

শুটিং, টেনিস যত যাই হোক না কেন, প্রথম ওলিম্পিকে নবজাগ্রত ওলিম্পিকের সবচেয়ে বিশিষ্ট প্রতিযোগিতা মারাথন রেস, প্রাচীন গ্রীসের স্পোর্টস নয় বটে, তাদের সভ্যতার জীবন-মরণ সংকট এড়ানোর স্মারক।

প্রাচীন ওলিম্পিকের দীর্ঘতম দৌড় ছিল আড়াই মাইল। ওলিম্পিক পুনঃপ্রবর্তনের পরেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত প্রচলিত দৌড় প্রতিযোগিতাগুলির মধ্যে দীর্ঘতমই ছিল ১,৫০০ মিটার। এ হেন অবস্থাতে একটি ২৬ মাইল দৌড় যে হঠাৎ এ যুগের প্রথম ওলিম্পিকেই অন্তর্ভুক্ত হল, তার মূলে ছিল একজন গ্রীক সংস্কৃতি পাগলের আজগুবি খেয়াল, অথচ সে লোকটি জীবনে সর্বসমেত দশ কদম দৌড়েছেন কিনা সন্দেহ।

প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির সে এক মহা সংকট। পারস্য সম্রাটের বিরাট বাহিনী গ্রীস অভিযানে চলেছে, মুষ্টিমেয় গ্রীক সৈন্য তাকে প্রতিরোধ করলো মারাথনের প্রান্তরে এবং দেবতার কৃপায় জিতেও গেল। এথেন্স তথা সমগ্র গ্রীসে তখন বিনিদ্র প্রহর গণনা চলছে কখন এসে যায় পারস্যের বাহিনী, ধুলোয় মিশিয়ে দেয় গ্রীক সভ্যতাকে। এমন সময় মারাথন প্রান্তর থেকে ছুটতে ছুটতে এসে সংবাদ দিল ফিডিপাইডিস—"আমরা জিতেছি আমোদ কর, আনন্দ কর।" বলতে বলতেই সে লুটিয়ে পড়লো মাটিতে, শেষ নিশ্বাস ফেলে। সহযোগিতা সংগ্রহে এথেন্স-স্পার্টা দৌড়াদৌড়ি করে ফিডিপাইডিস আগে থেকেই চূড়ান্ত অবসন্ন হয়েছিল। জীবনমরণ সংকট থেকে সমগ্র জাতি ও সভ্যতা ত্রাণ পেয়েছে এই খবর বহন করার উদ্দীপনায় সে ছুটে এসেছিল, কিন্তু সংবাদটি উচ্চারণ করতেই তার প্রাণশক্তি ফুরিয়ে গেল।

ঘটনাটি কতদূর সত্য তা নিয়ে মতভেদ আছে। তাতে কি যায় আসে। গ্রীক সংস্কৃতির বাতিকগ্রস্ত পণ্ডিত কুবার্তিনের বন্ধু মাইকেল ব্রিল বলল স্বপ্নেলেন যে

কুবার্তিনের উচির ফাঁক দিয়ে কখন জাপান থেকে শুরু করে আজ কেনিয়ান ইথিও-পিয়ান প্রভৃতি রাজ্য মানুষগুলিও অংশগ্রহণ করতে আসছে, তখন তাদের ঠেকাবে কে? তা ছাড়া ১৯০৪ সালে সর্ব-প্রথম একজন কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিন দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে সংখ্যা বাড়তে বাড়তে আজ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ এথলীট নিগ্রো সমাজ থেকেই আসছে।

বড়লোক, রাষ্ট্রনায়ক, ব্যবসাদার, পণ্ডিতদের অভিমানের ঘেরাটোপে ঢাকা হয়ে বিদেশ সফর নয়। দেহে মনে সতেজ টগবগে সাধারণ জীবনের হাজার হাজার তরুণ-তরুণীর একসঙ্গে একপক্ষকাল অবাধ মেলামেশা ওলিম্পিকের শ্রেষ্ঠ সুফল।

আরো আছে, তা হল রেকর্ড ভাঙার হিড়িক। এককালে যা মানুষের অসাধ্য বলে বিবেচিত হয়েছে, ওই হিড়িকের ধাক্কায় ক'বছরের মধ্যেই তা অতিনিম্ন মানে নেমে গেছে। এমন হয়েছে যে, এক ওলিম্পিকে যা নতুন রেকর্ড, পরবর্তী দু-তিন ওলিম্পিকের মধ্যেই তা অংশ গ্রহণের ন্যূনতম মানেরও নীচে। ওলিম্পিক মানুষকে তুরীয়ান তুলনীয়ান তেজীয়ানের কোন পর্যায়ে পৌঁছে দেবে আজ তা কল্পনায়ও আনা অসম্ভব।

প্রাচীন ওলিম্পিকক্ষেত্র থেকে দীপ-শিখা জ্বালিয়ে সেই শিখায় ওলিম্পিক অনুষ্ঠানক্ষেত্রে অগ্নিস্থলী প্রজ্বলিত করার প্রথা প্রথম প্রবর্তন হয় বার্লিনে। আর সাংস্কৃতিক ওলিম্পিকেরও প্রবর্তন ওখানেই, ভাস্কর্য, চিত্রাঙ্কন ও নৃত্য প্রতি-যোগিতার মাধ্যমে [illegible] প্রতিযোগি[illegible] স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন [illegible] লীলা সোখে বা মেনকা।

ওলিম্পিক চলেছে, চলছে, চলবে। ১৮৯৬ সালে ১৩টি দেশের ৪৮৪টি প্রতিনিধি নিয়ে এথেন্সে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, প্যারিস-সেণ্টলুই-লণ্ডন-স্টকহোম-অ্যাণ্টোয়ার্প - প্যারিস - আমস্টার্ডাম - লস এঞ্জেলস - বার্লিন - লণ্ডন - হেলসিঙ্কি-মেলবোর্ন - রোম - টোকিও হয়ে এবার সে পৌঁচেছে মেক্সিকো শহরে। প্রথম মহাযুদ্ধে একবার, আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দুবার থেমে পড়তে হয়েছিল। প্রাচীন গ্রীসে যুদ্ধ থামিয়ে ওলিম্পিক হত, আর এ যুগে ওলিম্পিক বন্ধ থাকে যুদ্ধকালে। অনুষ্ঠান বন্ধ থাকলে গণনা বন্ধ থাকে না। অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে মেক্সিকোতে ১১৮টি দেশের ৭২২৬ জন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবে। আর প্রতি-যোগিতার বিষয়ও প্রভূত বিস্তৃতি লাভ করেছে। ১৯২৪ থেকে পৃথক গণনায় বরফের দেশের খেলাধুলা নিয়ে চতুর্বার্ষিক শীতকালীন ওলিম্পিকের প্রবর্তন হয়েছে।

তবু আধুনিক ওলিম্পিকের সব চেয়ে বড় ত্রুটি তা রাজনীতির শিকল মুক্ত হতে পারে নি। মহাযুদ্ধের শেষে পরাজিত দেশকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বাইরে রাখা হয়েছে দুবারই আর যাট কোটি মানুষের দেশ মহাচীন—খেলাধুলার বিভিন্ন বিভাগে অবিশ্বাস্য উন্নতি করেও, ওলিম্পিকের বাইরে রয়ে গেছে ওলিম্পিকে প্রভাবশালী পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে কমিউনিস্ট চীনের বিদ্বেষ মনোভাবের ফলে।

উনিশ শতকের শেষ [illegible] বিস্তৃত সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে জাতীয়তাবাদ খুবই প্রবল ছিল। সাম্রাজ্য-বাদীদেরও কথা ছিল—বাই কালি, রাইট অর রং। সেই উগ্র জাতীয়তাবাদ থেকে মুক্ত থাকতে পারেন নি বলে কুবার্তিন ওলিম্পিক শপথবাক্যে অংশগ্রহণকারীকে দিয়ে নিজের দেশের গৌরববৃদ্ধির কথা বলিয়েছেন। বিজয় অনুষ্ঠানে বিজয়ী দেশের জাতীয় পতাকা ওড়ে, তার জাতীয় সঙ্গীত বাজে। ফলে রাজনৈতিক রেষা-রেষি ওলিম্পিকের ক্ষেত্রেও পরিব্যাপ্ত হয়। ওলিম্পিকে অর্জিত মেডেল সংখ্যা দিয়ে এবং বেসরকারিভাবে পয়েন্ট গণনার অবাঞ্ছিত পন্থায় ওরা প্রমাণ করতে চায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে কোন দেশ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ। এতদিনে অংশ[illegible] প্রস্তাব এসে গেছে ওলিম্পিকে অংশগ্রহণ-কারীরা সমগ্র মানুষের গৌরবের জন্যই লড়বে, দেশ বিশেষের গৌরবের জন্য নয়। ১৯ ফুট পোল ভল্ট, ২৮ ফুট লং জাম্প ও আট ফুট হাই জাম্প যেই করুক, তাতে সমগ্র মানুষের গৌরব বাড়বে। এই বোধ আজ জাগ্রত, কিন্তু স্বীকৃতিতে এখনো যে বাধা, তা রাজনীতিকদের ও তাদের তাঁবেদার সাংবাদিকদের হীন কারসাজির ফল। তবু ওলিম্পিকই মানুষের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার প্রধান হাতিয়ার হবে একদিন। ওলিম্পিকই সাময়িকভাবে হলেও দুই জার্মানিকে এক পতাকাতলে মিলিয়ে-ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ নিপীড়নে সব চেয়ে জোরালো আঘাত হেনেছে ওলিম্পিক। সুফল [illegible] [illegible] দুদিন আগে না পাব।

[illegible]

অলিম্পিক ও ভারতীয় হকি

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

আবার ঘুরে এলো সেই দিন, ঘুরে এলো সেই মুহূর্ত। দেখতে দেখতে কেটে গেলো চারটে বছর। টোকিওর পর এলো মেক্সিকো। মেক্সিকোর আকাশে এখন উড়ছে দেশ-বিদেশের পতাকা, আর বাতাসে অলিম্পিক উৎসবে মুখরিত আনন্দের উচ্ছলতা।

মেক্সিকোর অলিম্পিক গ্রাম এখন সরগরম। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার প্রতিযোগী এসে হাজির হয়েছেন বিশ্ব প্রতিযোগিতার আসরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্যে।

অলিম্পিক প্রাঙ্গণের সেই স্মরণীয় সমাবেশে গিয়ে হাজির হয়েছেন ভারতীয় প্রতিযোগীরাও। সংখ্যায় তাঁরা মুষ্টিমেয় ঠিকই, কিন্তু সম্মানের পাত্র হিসেবে আজ তাঁরা অনন্য। কারণ আমাদের এই বিশাল দেশ ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্ব দরবারে যাবার ছাড়পত্র যে পেয়েছেন তাঁরা।

কিন্তু সব থেকে দুঃখ আর পরিতাপের বিষয় হলো যে, স্বাধীনতা লাভের এতো বছর পরেও একমাত্র হকি ছাড়া আর কোন বিষয়ে গর্ব করে বলার মতো কিছু আজো করতে পারলাম না। অলিম্পিকের আসরে আজো হকি প্রতিযোগিতাই আমাদের সবে ধন নীলমণি!

একমাত্র হকি প্রতিযোগিতাতেই ভারত বছরের পর বছর পেয়ে আসছে অলিম্পিকের স্বর্ণপদক। অলিম্পিকের বিজয়স্তম্ভে ভারতের জাতীয় পতাকা ওড়ে ঐ একবারই—ঐ একবারই বাজে ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের সুর। অলিম্পিক প্রাঙ্গণের আকাশ-বাতাস ভারতের সাফল্যের আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ঐ একবারই।

॥ পৃথিপাল সিং ॥
ভারতীয় অলিম্পিক ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক।

আর বছরের পর বছর ভারতকে সে সম্মান এনে দিয়েছে হকি খেলাই। তাই আজ হকিই আমাদের একমাত্র সম্বল, একমাত্র হকি খেলাই দেয় আশার আলোর সন্ধান। একমাত্র হকি খেলাকেই কেন্দ্র করে অনাবিল আনন্দে মেতে ওঠে আমাদের মন-প্রাণ।

তাই আজ মেক্সিকো শহরের বুকে অলিম্পিকের আসর জমে ওঠার আগে

॥ গুরুবক্স সিং ॥
ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলের যুগ্ম অধিনায়ক।

আমরা চাই অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় হকি দল সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে নিতে। এবারের অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় একচালে বাজীমাৎ করার দুঃস্বপ্ন দেখার সাহস আজ আর আমাদের নেই। কিন্তু চোখের সামনে আজো ভাসছে অতীতের সেই সোনাঝরা দিনগুলোর কথা। মনে পড়ছে অলিম্পিক প্রাঙ্গণে ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের কথা, ভারতের প্রাধান্যের কথা। হোক না সে পুরোন কাহিনী, শুধু অলীক পূর্বস্মৃতি তো নয়......!

ইতিহাসের পাতা উল্টে আমরা তাই যাই অনেক পিছিয়ে। এ আজকের কথা নয়। অনেকদিন আগের সেই ১৯২৮ সালের কথা।

মেজর আই বার্নমুডফই অলিম্পিকের আসরে ভারতীয় হকির পথপ্রদর্শক। মেজর বার্নেস তখন ছিলেন ভারতীয় হকি এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। সেই সময় সোবার ভূত অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় হকি দলের যোগদানের বিষয়টি তুললেন। কথাটা মনে ধরলো মেজর আই বার্নমুডফের।

আর তারই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯২৮ সালের আমস্টার্ডামের নবম অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় হকি দল যোগদান করলো। সেই প্রথম—অলিম্পিকের ইতিহাসে শুরু হলো ভারতীয় হকি দলের জয়যাত্রা।

সেবার হকি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলো মাত্র সাতটি কিম্বা আটটি দেশ। দুটি দলে ভাগ করে লীগ হিসেবে খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। ভারত ৬—০ গোলে অস্ট্রিয়াকে, ৯—০ গোলে বেলজিয়ামকে ও ৫—০ গোলে সুইজারল্যান্ডকে পরাজিত করে নিজের গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান হয়ে ফাইন্যালে ওঠে। আর ফাইন্যাল খেলায় হল্যান্ডকে ৩—০ গোলে পরাজিত করে ভারত সর্বপ্রথম অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক লাভ করে।

জয়পাল সিং ছিলেন সেবারকার ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক। আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন—আর এ্যালেন, এম রক, এল হ্যামন্ড, নরিস পিনিজার, এস ইউসুফ, এম ক্যালেন, গ্যাটলে মার্থিনস, ধ্যানচাঁদ, সিম্যান, কেহার সিং, সৌকত আলী, ফিরোজ খান, পাতৌদির নবাব ও আর কারবারি। দলের ম্যানেজার হয়ে গিয়েছিলেন এ বি রসার।

দেখতে দেখতে কেটে গেলো চারটে বছর। অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় হকির

॥ জিমি ॥

স্বর্ণপদক লাভের কথা তখনো সকলের মনে প্রতিফলিত উজ্জ্বল। আবার এলো

॥ হরবিন্দার সিং ॥

গ্যাকেন, ফ্রান্সিস, ডিসুজা, জানসেন, ফার্নান্ডেজ ও লতিফুর রহমান। ডাঃ এ সি চ্যাটার্জী ও পঙ্কজ গুপ্ত দলের সঙ্গে যুগ্ম ম্যানেজার হিসেবে গিয়েছিলেন।

লন্ডনের পর এলো হেলসিংকি। ভারতীয় হকি দল তাদের অব্যাহত জয়যাত্রা নিয়ে হাজির হলো সেখানে। সেবার প্রথম রাউন্ডের খেলায় ভারত ৪—০ গোলে হারিয়ে দিলো অস্ট্রিয়াকে। সেমি-ফাইন্যালে ৩—১ গোলে ব্রিটেনকে পরাজিত করার পর ফাইন্যালে ৬—১ গোলে হল্যান্ডকে হারিয়ে দিয়ে লাভ করলো অলিম্পিকের স্বর্ণপদক।

কে ডি সিং ওরফে বাবু ছিলেন সে বছর ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক। অন্যান্য খেলোয়াড়দের মধ্যে ছিলেন—ফ্রান্সিস, ধরম সিং, জেন্টল, দেশমুখ, ক্লডিয়াস, স্বরূপ সিং, যশোবন্ত সিং, গ্রহনন্দন সিং, কেশব দত্ত, এস দুবে, পেরুমল, রঘুবীর লাল, ডালুজ, বলবীর সিং, সি এস গুরুং, উধম সিং ও এস রাজাগোপাল। দলের ম্যানেজার ছিলেন এম এল মিত্র।

১৯৫৬ সালে অলিম্পিকের আসরে ভারত প্রথম সম্মুখীন হলো তীর বাধার। তবে সব থেকে বেশি করে আঘাত হেনেছিলো পাকিস্তান। যাই হোক ১৯৫৬ সালের ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলে ছিলেন—লক্ষ্মণ, বকশীস সিং, সুখু, জেন্টল, ফ্রান্সিস, পেরুমল, আমির কুমার, হরদয়াল সিং, বালকিষণ, এ বক্সি, রঘুবীরলাল, গুরুদেব সিং, স্টিফেন্স, হরিপাল, উধম সিং, ভোলা ও মালহোত্রা। ও মেহেরা ও হরবৈল সিং গিয়েছিলেন ম্যানেজার ও কোচ হিসেবে।

॥ জগজিৎ সিং ॥

সেবার প্রাথমিক প্রতিযোগিতায় আমেরিকাকে ১৬—০ গোলে, আফগানিস্থানকে ১৪—০ গোলে আর সিঙ্গাপুরকে ৬—০ গোলে হারিয়ে দিয়ে ভারত সেমি-ফাইন্যালে উঠলো। আর ১—০ গোলে জার্মানীকে হারিয়ে ভারত গেলো ফাইন্যালে। আর ফাইন্যালে কোনক্রমে ১—০ গোলে পাকিস্তানকে হারিয়ে ভারত লাভ করলো অলিম্পিকের স্বর্ণ পদক।

১৯৬০ সালের রোম অলিম্পিকে আমাদের সমস্ত আশার মুখে ছাই দিয়ে ভারত হকি প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে এক গোলে হেরে গেলো পাকিস্তানের কাছে। সেই প্রথম ভারতের হাত ছাড়া হলো অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় হকির স্বর্ণপদকটি।

ক্লডিয়াসের নেতৃত্বে সেবার ভারতীয় দলের পক্ষে ছিলেন—লক্ষ্মণ, দেশমুখ, পৃথিপাল সিং, শান্তারাম, জে শর্মা, বালকিষণ সিং, এন্টিক, মহেন্দ্রলাল,

॥ ইনাম-উর-রহমান ॥

চরণজিৎ সিং, সারাশু, উধম সিং, কে আরোরা, হরিপাল, যোগিন্দর সিং, ভোলা, আর্মান ব্যাস্টিন, বি পিটার, ম্যাস্কারেনাস ও যশোবন্ত সিং।

১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকে ভারত আবার ফিরে পেয়েছে তার হারানো সম্মান—অলিম্পিকের স্বর্ণপদক। অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে ভারত ১—০ গোলে পাকিস্তানকে হারিয়ে লাভ করেছিলো বিজয়ীর সম্মান।

টোকিও অলিম্পিকে ভারতীয় দলে ছিলেন—চরণজিৎ সিং, মহীন্দারলাল, লক্ষ্মণ, পৃথিপাল সিং, গুরুবক্স সিং, ধরম সিং, জগজিৎ সিং, পিটার্স, বলবীর সিং, হরবিন্দার সিং, আলি সৈয়দ, দর্শন সিং, উধম সিং, বান্দু পাতিল, হরিপাল কৌশিক, যোগীন্দার সিং, জগজিৎ সিং ও রাজিন্দার সিং।

টোকিও অলিম্পিক ছিলো ভারতীয় দলের কাছে চরম পরীক্ষা। হকির

॥ ধরম সিং ॥

স্বর্ণপদক ফিরে পাবার জন্যে তুমুল সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিলো ভারতীয় দলকে। শেষ পর্যন্ত ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক চরণজিৎ সিং সে সম্মান বজায় রেখে দেশে ফিরেছিলেন। ফাইন্যালে পাকিস্তানকে এক গোলে হারিয়ে দিবেছিলো ভারত। আর সে গোলটা করেছিলেন মহীন্দারলাল।

যাক সে কথা। টোকিওর পর মেক্সিকোতে ভারত কি করবে সেইটাই এখন প্রশ্ন। অভিজ্ঞ খেলোয়াড় পৃথিপাল সিং-এর ওপর পড়েছে ভারতীয় দল পরিচালনা করার ভার। আর যুগ্ম অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করবেন কলকাতার খেলোয়াড় গুরুবক্স সিং।

নিচে এবারকার খেলোয়াড়দের পরিচিতি দেওয়া হলো।

(১) পৃথিপাল সিং(৩৫)—অধিনায়ক। দৃঢ়চেতা, কঠোর পরিশ্রমী, প্রবীণ, অভিজ্ঞ ব্যাকের খেলোয়াড়। কুশলতার সঙ্গে বলদৃপ্ত খেলার সমন্বয় সাধন তাঁর খেলার বিশেষত্ব। পেনাল্টি কর্নার বিশেষজ্ঞ। ভারী স্টিকে জোরালো হাতের পেনাল্টি কর্নার হিট বিশেষ কার্যকরী। টোকিও অলিম্পিকে ভারতের মোট ২২টি গোলের মধ্যে একাই করেছিলেন ১১টি গোল পেনাল্টি কর্নার হিটে। তাঁর পেনাল্টি কর্নার হিটের সাফল্যের ওপর এবারেও অনেকখানি নির্ভর করতে হবে ভারতীয় দলকে। এবার নিয়ে তৃতীয়বার অলিম্পিকে যাচ্ছেন।

(২) গুরুবক্স সিং (৩২)—ব্যাক ও যুগ্ম-অধিনায়ক। কলকাতার মাঠে পরিচিত খেলোয়াড়, এ মরসুমে মোহনবাগান দলে

॥ ইন্দার সিং ॥
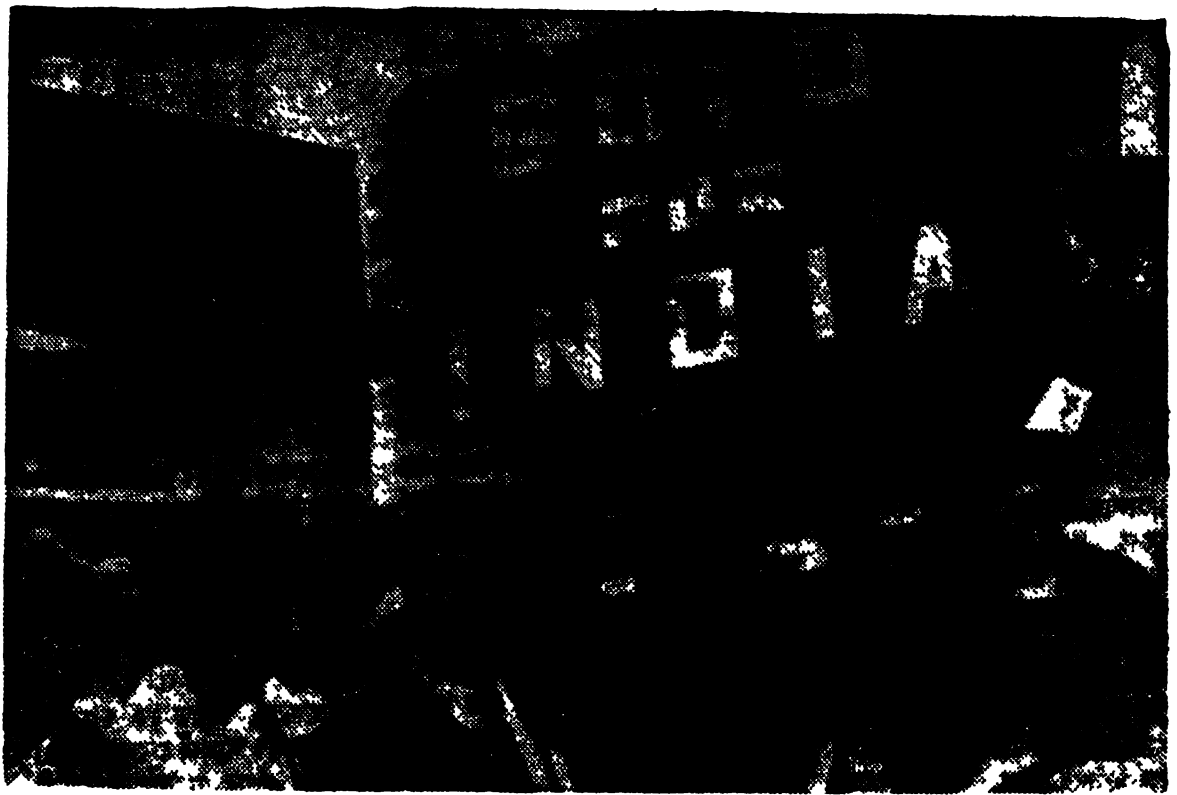
১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতার ফাইনালে পাকিস্তানকে হারিয়ে দেবার পর ভারতীয় প্রতিযোগী ও সমর্থকদের আনন্দোচ্ছ্বাসের দৃশ্য।

খেলেছেন। চশমা পরে খেলেন। পরিণত, অভিজ্ঞ খেলোয়াড়, 'টেম্পারমেন্ট ও জাজমেন্টের' জন্য খ্যাতি আছে। টোকিও অলিম্পিকেও খেলেছেন।

(৩) ক্রিস্টি—প্রবীণ ও অভিজ্ঞ গোলরক্ষক। কিন্তু দ্বিতীয় গোলরক্ষক হিসেবে দলের প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্ব পড়েছে তাঁর ওপর।

(৪) মনীব শেঠ (গোলরক্ষক) ২৬)—অলিম্পিকে নবাগত। প্রথম গোলরক্ষক হিসেবেই দলে স্থান পেয়েছেন।

(৫) ধরম সিং (৩১)—ব্যাক। টোকিও। অলিম্পিকে খেলেছেন। রক্ষণভাগের নুচেতা খেলোয়াড় হিসেবে যথেষ্ট সুনাম আছে।

(৬) হারবিন্দ সিং (২১)—হাফ-লাইনের নবাগত খেলোয়াড়।

(৭) বলবীর সিং (২২)—হাফ-লাইনের নবাগত খেলোয়াড় হলেও ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করার মতো যোগ্যতা এঁর যথেষ্ট আছে।

(৮) অজিত পাল (২০)—হাফ-লাইনের নবাগত খেলোয়াড়.

(৯) জগজিৎ সিং (২৪)—সেন্টার হাফ। টোকিও অলিম্পিকে খেলেছেন। সেইকওর অভিজ্ঞতা মেক্সিকোতেও কাজে লাগাতে পারবেন।

(১০) কৃষ্ণমূর্তি (২২) হাফলাইনের নবাগত খেলোয়াড়।

(১১) পিটার (৩২)—ইনসাইড ফরোয়ার্ড। প্রবীণ, অভিজ্ঞ খেলোয়াড়। এবার নিয়ে তৃতীয়বার অলিম্পিকে যাচ্ছেন।

(১২) তারসেম সিং (২১)—ফরোয়ার্ড। অলিম্পিকে নবাগত, কিন্তু নির্ভরযোগ্য।

(১৩) ইন্দর সিং (২৩)—ফরোয়ার্ড। দলে নবাগত হলেও ভারতজোড়া সুনাম আছে এঁর।

(১৪) বলবীর সিং (২৬)—ইনসাইড ফরোয়ার্ড। দরকার পড়লে উইং ফরোয়ার্ডেও খেলতে পারবেন।

(১৫) বলবীর সিং (২২)—রাইট উইং ফরোয়ার্ড। ব্যাঙ্ককে এশীয় ক্রীড়ায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের একমাত্র গোলদাতা। ভারতীয় অলিম্পিক দলের যোগ্য প্রতিনিধি।

(১৬) গুরুবক্স সিং (২৫)—উইং ফরোয়ার্ড। রাইট উইং-এর খেলোয়াড় বলবীরের ছোট ভাই।

(১৭) ইনাম-উর-রহমান (২৪)—ইনসাইড ফরোয়ার্ড। কলকাতা মাঠের পরিচিত ও জনপ্রিয় খেলোয়াড়। এ মরসুমে মোহনবাগানে খেলেছেন।

(১৮) হরবিন্দর সিং (২৫)—সেন্টার ফরোয়ার্ড। ক্ষিপ্রগতি কুশলী খেলোয়াড়—যদিও এবারে কিছু মন্থর। টোকিও অলিম্পিকে সুনামের সংগেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

মেক্সিকোর টুকি টাকি

১৯তম অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের জন্যে মেক্সিকো সরকার বিরাট আয়োজন করেছেন। গড়ে উঠেছে নতুন শহর—অলিম্পিক গ্রাম। মেক্সিকোর সব থেকে বড় আকর্ষণ দর্শনীয় আজটেক স্টেডিয়াম। এ ছাড়া ছড়ানো আছে অনেক স্টেডিয়াম, অলিম্পিক পুল, অলিম্পিক জিমন্যাসিয়াম, স্পোর্টস প্যালেস আরো অনেক কিছু।

* * *

মেক্সিকো অলিম্পিকের অনুষ্ঠান-সূচীতে আছে উনিশটি বিষয়—এ্যাথ. বাসকেট বল, সাইক্লিং, ক্যানোইং, হকি ফুটবল, জিমন্যাসটিকস, ওয়েট লিফটিং, ফেনসিং, ইকুয়েস্ট্রিয়ান স্পোর্টস, সুইমিং ও ডাইভিং, রোয়িং, মডার্ন পেন্টাথলন ওয়াটার পোলো, সুটিং, ভলিবল, বোক্সিং ও ইয়েটিং।

* * *

প্রায় আড়াই হাজার ইঞ্জিনীয়ার, কারিগর, ও শ্রমিকেরা দিনে প্রায় বারো ঘণ্টা কাজ করে গড়ে তুলেছেন মেক্সিকোর অলিম্পিক গ্রাম। বিভিন্ন

দেশের প্রতিযোগীদের থাকার জন্যে ঊনত্রিশটি বড় বড় বাড়ি তৈরি করা হয়েছে সেখানে। ছ'তলা থেকে আরম্ভ করে দশ তলা পর্যন্ত উঁচু বাড়িগুলোতে আছে ন'শ চারটে ফ্ল্যাট। প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটে আছে বড় বড় তিনটে করে শোবার ঘর, বসার ঘর আর রান্নাঘর। প্রত্যেকটা ঘরে দশ-বারোজন করে প্রতিযোগী থাকতে পারবেন।

* * *

অলিম্পিকের আসরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অভিনব আয়োজন করা হয়েছে। গ্রীক স্টাইলে থিয়েটারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে থাকবে লোকসংগীত ও লোকনৃত্যের ব্যবস্থা। দেশ-বিদেশের শিল্পীরা নেবেন প্রতি-যোগী আর আমন্ত্রিত অতিথিদের মনোরঞ্জনের ভার।

অলিম্পিক ফুটবলের চূড়ান্ত ফলাফল

(১৯০৪ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত)

সাল	বিজয়ী	গোল		বিজিত	গোল
১৯০৪	ডেনমার্ক	২	:	বেলজিয়াম	০
১৯০৮	ইংলণ্ড	২	:	ডেনমার্ক	০
১৯১২	ইংলণ্ড	৪	:	ডেনমার্ক	২
১৯২০	বেলজিয়াম	২	:	চেকোশ্লোভাকিয়া	০
১১২৪	উরুগুয়ে	৩	:	সুইজারল্যাণ্ড	০
১৯২৮	উরুগুয়ে	২	:	আর্জেন্টিনা	১
১৯৩৬	ইতালী	১	:	অস্ট্রিয়া	১
১৯৪৮	সুইডেন	১	:	যুগোশ্লাভিয়া	১
১৯৫২	হাঙ্গেরী	২	:	যুগোশ্লাভিয়া	০
১৯৫৬	রাশিয়া	১	:	যুগোশ্লাভিয়া	০
১৯৬০	যুগোশ্লাভিয়া	৩	:	ডেনমার্ক	১
১৯৬৪	হাঙ্গেরী	২	:	চেকোশ্লোভাকিয়া	১

রেকর্ডের পাতা থেকে

টোকিও অলিম্পিকে প্রথম পুরস্কার বিজয়ীদের নাম

॥ এ্যাথলেটিকস ঃ পুরুষ বিভাগ ॥

	বিজয়ীর নাম	দেশ	সময়
১০০ মিটার	আর হেজ	আমেরিকা	১০ ০ সেঃ
২০০ মিটার	হেনরি কার	আমেরিকা	২০'৩ সেঃ
৪০০ মিটার	এম লারাবি	আমেরিকা	৪৫'১ সেঃ
৮০০ মিটার	পিটার স্নেল	নিউজিল্যাণ্ড	১ মিঃ ৪৫'১ সেঃ
১৫০০ মিটার	পিটার স্নেল	নিউজি াণ্ড	৩ মিঃ ৩৮'১ সেঃ
৩০০০ মিটার (স্টিপলচেজ রেস)	জি রোল্যাণ্টস	বেলজিয়াম	৮ মিঃ ৩০'৮ সেঃ
৫০০০ মিটার	আর সিহল	আমেরিকা	১৩ মিঃ ৪৮'৮ সেঃ
১০০০০ মিটার	ডব্লিউ মিলস	আমেরিকা	২৮ মিঃ ২৪'৪ সেঃ
ম্যারাথন	আবেবে বিকিলা	ইথিওপিয়া	২ ঘণ্টা ১২ মিঃ ১১'২ সেঃ
২০ কি, মিঃ ওয়াক	কে ম্যাথুইস	বৃটেন	১ ঘণ্টা ২৯ মিঃ ৩৪'০ সেঃ
৫০ কি, মিঃ ওয়াক	এ প্যামিচ	ইটালী	৪ ঘণ্টা ১১ মিঃ ১২'৪ সেঃ
১১০ মিঃ হার্ডলস	এইচ জোন্স	আমেরিকা	১৩'৬ সেঃ
৪০০ মিঃ হার্ডলস	ডব্লিউ কাউলে	আমেরিকা	৪৯'৬ সেঃ
৪০০ মিঃ রিলে	----------	আমেরিকা	৩৯'০ সেঃ
১৬০০ মিঃ রিলে	----------	আমেরিকা	৩ মিঃ ০'৭ সেঃ
হাইজাম্প	ভি, ব্রুমেল	রাশিয়া	৭ ফুঃ ১¾ ইঞ্চি
ব্রড জাম্প	এল ডেভিস	বৃটেন	২৬ ফুঃ ৫¾ ইঞ্চি
হপ স্টেপ এণ্ড জাম্প	জোসেফ স্টিমিডট	পোল্যাণ্ড	৫৫ ফুঃ ৩½ ইঞ্চি
পোলভল্ট	এফ হ্যানসেন	আমেরিকা	১৬ ফুঃ ৯ ইঞ্চি
হ্যামার থ্রো	আর ক্লিম	রাশিয়া	২২৮ ফুঃ ৯½ ইঞ্চি
ডিসকাস থ্রো	আলভাটার	আমেরিকা	২০০ ফুঃ ১½ ইঞ্চি
জ্যাভলিন থ্রো	পি নিভালো	ফিনল্যাণ্ড	২৭১ ফুঃ ২ ইঞ্চি
শট পাট	ডি লং	আমেরিকা	৬৬ ফুঃ ৪½ ইঞ্চি
ডেকাথলন	ডব্লিউ হলড্রুক	জার্মানী	৭৮৮৭ পয়েণ্ট

মহিলা বিভাগ

১০০ মিটার	ডব্লিউ টায়াস	আমেরিকা	১১'৪ সেঃ
২০০ মিটার	ই মেগুইরে	আমেরিকা	২৩'০ সেঃ
৪০০ মিটার	বি কাথবার্ট	অস্ট্রেলিয়া	৫২'০ সেঃ
৮০০ মিটার	এ প্যাকার	বৃটেন	২ মিঃ ১'১ সেঃ
৮০ মিঃ হার্ডলস	কে বলজার	জার্মানী	১০'৫ সেঃ
হাই জাম্প	আই বালাস	রুমানিয়া	৬ ফুঃ ২ ইঞ্চি
লং জাম্প	এম র‍্যাণ্ড	বৃটেন	২২ ফুঃ ২ ইঞ্চি
শর্ট পাট	তামারা প্রেস	রাশিয়া	৫৯ ফুঃ ৬ ইঞ্চি
ডিসকাস থ্রো	তামারা প্রেস	রাশিয়া	১৮৭ ফুঃ ১০½ ইঞ্চি
জেভলিন থ্রো	এম পেনেস	রুমানিয়া	১৯৮ ফুঃ ৭½ ইঞ্চি
পেণ্টাথলন	আই প্রেস	রাশিয়া	৫,২৪৬ পয়েণ্ট
৪ X ১০০ মিটার	---- ------	পোলাণ্ড	৪৩'৬ সেঃ

সাঁতার—পুরুষ বিভাগ

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল	ডি স্কল্যাণ্ডার	আমেরিকা	৫৩'৪ সেঃ
৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল	ডি স্কল্যাণ্ডার	আমেরিকা	৪ মিঃ ১২'২ সেঃ
১৫০০ মিটার ফ্রি স্টাইল	আর উইণ্ডেল	অস্ট্রেলিয়া	১৭ মিঃ ১'৭ সেঃ
২০০ মিটার ব্যাক	জে গ্রেফ	আমেরিকা	২ মিঃ ১০'৩ সেঃ
২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক	আই ও ব্রেন	অস্ট্রেলিয়া	২ মিঃ ২৭'৮ সেঃ
২০০ মিটার বাটার ফ্লাই	কে বেরী	অস্ট্রেলিয়া	২ মিঃ ৬'৬ সেঃ
৪০০ মিটার ইণ্ড মিডলে	আর রোথ	আমেরিকা	৪ মিঃ ৪৫'৪ সেঃ
৪ X ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল	-----------	আমেরিকা	৩ মিঃ ৩২'২ সেঃ
৪ X ২০০ মিটার ফ্রি স্টাইল	-----------	আমেরিকা	৭ মিঃ ৫২'১ সেঃ
৪ X ১০০ মিটার মিডলে	-----------	আমেরিকা	৩ মিঃ ৫৮'৪ সেঃ
হাই বোর্ড	আর ওয়েবস্টার	আমেরিকা	১৪৮'৫৮ পয়েণ্ট
স্প্রিং বোর্ড	কে সিটজবার্জার	আমেরিকা	১৫৯ ৯০ পয়েণ্ট

সাঁতার—মহিলা বিভাগ

১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল	ডি ফ্রেসার	অস্ট্রেলিয়া	৫৯ ৫ সেঃ
৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইল	ভি ডুয়েনকেল	আমেরিকা	৪ মিঃ ৪৩ ৩ সেঃ
১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক	সি ফারগুসন	আমেরিকা	৬৭ ৭ সেঃ
২০০ মিটার ব্রেস্ট স্ট্রোক	জি প্রজুমেনশ্চিকোভা	রাশিয়া	২ মিঃ ৪৬ ৪ সেঃ
১০০ মিটার বাটার ফ্লাই	এস স্টাউডার	আমেরিকা	১ মিঃ ৪'৭ সেঃ
৪০০ মিটার ইণ্ড মিডলে	ডি ডেভারোনা	আমেরিকা	৫ মিঃ ১৮'৭ সেঃ
৪ X ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল	-----------	আমেরিকা	৪ মিঃ ৩'৮ সেঃ
৪ X ১০০ মিটার মিডলে	-----------	আমেরিকা	৪ মিঃ ৩৩'৯ সেঃ
হাইবোর্ড	এল বুশ	আমেরিকা	৯৯ ৮০ পয়েণ্ট
স্প্রিং বোর্ড	[illegible]	জার্মানী	১৪৫ পয়েণ্ট

॥ ব্রুমেল ॥

দুর্ভাগ্য ব্রুমেলের—এবারের অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় আর যোগ দিতে পারছেন না। হাই জাম্পের কৃতী প্রতিযোগী কয়েক মাস আগে এক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন।

স্থান	সাল	প্রতিযোগী দেশ	বে-সরকারী চ্যাম্পিয়ন
এথেন্স (গ্রীস)	১৮৯৬	১৩	গ্রীস
প্যারিস (ফ্রান্স)	১৯০০	১৬	ফ্রান্স
(সেণ্ট লুইস) ইউ এস এ	১৯০৪	৭	ইউ এস এ
লণ্ডন (ইংলণ্ড)	১৯০৮	২২	ইংলণ্ড
স্টকহলম (সুইডেন)	১৯১২	২৭	সুইডেন
এণ্টোয়ার্প (ইউ এস এ)	১৯২০	২৬	ইউ এস এ
প্যারিস (ফ্রান্স)	১৯২৪	৪৫	ইউ এস এ
আমস্টারডাম (নেদারল্যাণ্ড)	১৯২৮	৪৬	ইউ এস এ
লস এঞ্জেলস (ইউ এস এ)	১৯৩২	৩৯	ইউ এস এ
বার্লিন (জার্মানী)	১৯৩৬	৫১	জার্মানী
লণ্ডন (ইংলণ্ড)	১৯৪৮	৫৯	ইউ এস এ
হেলসিংকি (ফিনল্যাণ্ড)	১৯৫২	৬৯	ইউ এস এ
মেলবোর্ন (অস্ট্রেলিয়া)	১৯৫৬	৭০	ইউ এস এ
রোম (ইটালী)	১৯৬০	৮[illegible]	রাশিয়া
টোকিও (জাপান)	১৯৬৪	৯৪	রাশিয়া

প্রথম আধুনিক অলিম্পিকের ফলাফল

॥ এথেন্স ঃ ১৮৯৬ সালে ॥

দেশ	সাইক্লিং	ফেন্সিং	জিমন স্টিক	স্যুটিং	সুইমিং	টেনিস	ট্র্যাক এণ্ড ফিল্ড	রেস্টলিং	মোট
আমেরিকা	0	0	0	২	0	0	৯	0	১১
গ্রীস	১	১	২	৩	0	0	১	0	৮
জর্মানী	0	0	৫	0	0	½	৬	১	৬½
ফ্রান্স	৪	১	0	0	0		0	১	৫
গ্রেট বৃটেন	0	0	0	0	0	১½	১	0	১½
অস্ট্রেলিয়া	0	0	0	0	0	0	২	0	২
অস্ট্রিয়া	১	0	0	0	১	0	0	0	২
হাঙ্গেরী	0	0	0	0	২	১	0	0	২
ডেনমার্ক	0	0	0	0	0	0	১	0	১
সুইজারল্যাণ্ড	0	0	১	0	0	0	0	0	১

সম্পাদিকা—[illegible] সেন
[illegible] (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-১২
[illegible] প্রেস হইতে শ্রী[illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

এ.সরকার এণ্ড সন্স

সম্পাদিকা
জয়ন্তী সেন

সাপ্তাহিক বসুমতী

৭৩ বর্ষ : ১৭শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা | বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা | PRICE : 30 Paise
বৃহস্পতিবার, ৩০শে আশ্বিন, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ | Thursday, 10th October, 1968

উত্তরবঙ্গের বন্যা

উত্তরবঙ্গের এক বৃহত্তর অংশকে নিদারুণ বন্যায় ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাবার পর সেখানে এখন বিরাজ করছে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। গত বছর পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল যখন শুষ্ক হয়ে উঠেছিল তখন দ্রুত সরকারী সাহায্য প্রেরিত হওয়ায় দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মানুষকে মৃত্যুর ছোবল থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। এ বছর পশ্চিমবঙ্গে চলছে রাষ্ট্রপতির শাসন। আমলাতন্ত্রই এখন আদি ও অন্ত্যতন্ত্র। তাদের মন্ত্রগুণেই সরকারী যন্ত্রমুগ্ধবৎ চলছে। মাত্র কয়েক মাস আগে বর্ধমান মেদিনীপুর অঞ্চলে বন্যার প্রাদুর্ভাব ও তার ফলে অসংখ্য জনপ্রাণীর প্রাণহানি ও ধন-সম্পদের ক্ষতি দু' চোখে দেখেও সে যন্ত্রের অঙ্গে কোথাও যেন ক্ষতচিহ্ন অঙ্কিত হয় নি। যদিও পলিমৃত্তিকাবাহিত বন্যা মরশুমে কারো কারো কাছে বাঞ্ছনীয়, কিন্তু বন্যার ফলে ক্ষয়ক্ষতি সম্বন্ধে যারা নির্বিকার তারা দেশের জনহিতকার্যে নিযুক্ত থাকার পক্ষে অযোগ্য।

এর ওপর, চোখের সামনে দিয়ে ভয়ঙ্কর বন্যা যাওয়ার পর যদি তন্মুহূর্তে বন্যা-গ্রস্ত এলাকায় সরকারী সাহায্য প্রেরিত না হয় এবং আমলারা আগেভাগে নিজে-দের নিরাপত্তার ব্যবস্থার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে, তাহলে সে ধরণের অপদার্থ সরকারী আমলাদের প্রশংসা শোনার মত ধৈর্য কার থাকতে পারে? সর্বাপেক্ষা দুঃখের কথা, সেই সব আমলাদের কাছ থেকে জবাবদিহি করার মতো সুদৃঢ় ব্যক্তির সংখ্যাও বোধ হয় অঙ্গুলিমেয়।

এমতাবস্থায় বন্যার্ত মানুষের বিক্ষোভের সম্মুখীন হয়ে কেন্দ্রীয় উপ-প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, জলপাইগুড়ি ও তৎপার্শ্ববর্তী হাজার হাজার জন-অধ্যুষিত অঞ্চলে সরকার উদ্ধারকার্যে যথা সময়ে আত্মনিয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

হাজার হাজার লোক গরু-মহিষ ছাগল [illegible]-শেয়াল-কুকুরের সঙ্গে প্রাণ দিয়েছে। তাদের গলিত শবের দুর্গন্ধে বেঁচে থাকা প্রাণগুলি যখন এক ফোঁটা পানীয় জলের জন্য দিনের পর দিন উদ্‌গ্রীব—তখন সরকার কর্তৃক এ ধরণের নিষ্ক্রিয় আচরণ করা কি করে সম্ভব হোল—তার খোঁজ কি রাজ্যপাল একবারও করেছেন?

আরো বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, বন্যার আবির্ভাবের পূর্বাভাষ সেচদপ্তর পেয়েছিলেন। জেলা শাসকের কাছে সে সংবাদ প্রেরিতও হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসক কোন্ এক রহস্যময় কারণে সে-বার্তায় কর্ণপাত করেন নি। তাই উত্তর বঙ্গের বন্যার বিপদের সঙ্কেত জ্ঞাপনের জন্য যে ছটি স্থান রয়েছে তার প্রত্যেকটি অসীম নীরবতায় সময় কাটিয়েছে। ফলে, এক শ্রেণীর মানুষের কাছে ভয়ঙ্করী বন্যার সংবাদ গুপ্ত থাকায় হাজার হাজার সমস্ত মানুষ হাসপাতালের পঙ্গু রোগী অসহায়-ভাবে প্রাণ হারিয়েছে। এই প্রাণ-হারানোর দায় এখন কার? কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ দপ্তরের মন্ত্রী ডঃ কে এল রাও বলেছেন যে, ৪ঠা অক্টোবর সকালে বন্যার সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল বলে এঞ্জিনিয়াররা তাঁকে জানিয়েছেন। কিন্তু জলপাইগুড়ি ও আশেপাশের অঞ্চলের কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছিলেন কিনা তা জানা যায় নি। ও সম্পর্কে তদন্ত চলছে।

কিন্তু এই তদন্ত কি বিচার বিভাগীয়? না এ বিচার করবে প্রশাসনিক যন্ত্রের আর এক অংশ—যাদের জবাবদিহি করতে হয় না প্রত্যক্ষ মন্ত্রিমণ্ডলীর কাছে? এই নিষ্ক্রিয় প্রশাসনিক যন্ত্রই একেক সময় হয়ে ওঠে দারুণ সক্রিয়। জনগণের স্বার্থের বেলায় এঁদের এক অতি ক্ষুদ্র অংশকেই তৎপর হতে দেখা যায়।

কেউ কেউ পরিহাস করে বলেন, পশ্চিমবঙ্গের দুর্গতিসম্পন্ন সাধারণ মানুষ বেঁচে মরে ছিল। এবার বন্যায় মরে বেঁচে গেল। কিন্তু অন্য মত হচ্ছে এই—এক [illegible] স্বর্গসেবার নিযুক্ত মানুষ ছোট-বড় দলের সমাহার দেখে মনে হচ্ছে হয়তো এবার কেউ বেঁচে গেলে দানের বখরায় কেঁচেগণ্ডূষ করলেও করতে পারতো। সামরিক সাহায্য ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য এক কোটি টাকার ওপর তদুপরি রয়েছে রাজ্য সরকারের সাহায্য বিবৃতি ও ভাষণ। জনহিতকর প্রতিষ্ঠান বা রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষে সাহায্য দানের ব্যাপারে এগিয়ে আসাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে দেশের মানুষ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পঁচিশে বৈশাখে ব্যবসা করে, সে দেশেই হঠাৎ গজিয়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্তদের 'সাহায্যকল্পে' সক্রিয় হতে দেখলে ভয় হয়। মনে হয় মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশি। এই প্রসঙ্গত আমরা পশ্চিমবঙ্গের এমন দুর্দিনে গৌরবের সঙ্গে স্মরণ করি শিলিগুড়ির কথা—যার সদয় হস্ত ছাড়া জলপাইগুড়ি সরকারী সাহায্য পাবার আগেই হয়তো সম্পূর্ণ সমাধি লাভ করতো।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য : উত্তর-বঙ্গ এখন শ্মশান প্রায়, তিস্তা নদীর এপার-ওপারে সহজ যোগাযোগ নেই; মাপাজোপা সরকারী সাহায্য দেওয়া সুরু হয়েছে, এরই মধ্যে আগামী অন্তর্বর্তী নির্বাচনের দিন ফেব্রুয়ারিতে হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বন্যার পুনরাবির্ভাবের ভয় থেকে মানুষকে মুক্ত করার কি ব্যবস্থা হয়েছে? এবং যে সব বিপদ-সংকেত ঘাঁটিগুলি বিপদের মুহূর্তে নীরব হয়ে ছিল, প্রয়োজনের সময় আবার সেগুলি কর্মচঞ্চল হয়ে উঠবে তো? না বিশেষ কারণে ঐ সব ঘাঁটি নীরব হয়ে ছিল? সীমান্ত এলাকায় এ ধরণের নিষ্ক্রিয়তা গুরুতর অপরাধের সামিল। তাই অবিলম্বে আমরা সমস্ত ঘটনার প্রকাশ্য বিচার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিবেচনা করি।

সম্পাদকীয়

[illegible], তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠ—পাঁচ আঙুলের ডগায় পূর্ণচন্দ্রের মত বিরাট এক কাঁসার থালায়, যুঁই ফুলের মত বাসমতি চালের ভাতে ঘি মাখতে মাখতে মনে হচ্ছিল কাঁড় খেলাছি। ঠিক এই রকম অঙ্গুলিবিন্যাসেই বাংলাদেশের বিয়ের কনেরা বিয়ের পরদিন কাঁড় খেলে।

গিয়েছিলাম কলকাতার বাইরে এক সাংবাদিক বন্ধুর বাড়ি দুপুরে খাওয়ার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। মনে হচ্ছিল সে এক অন্য জগৎ। কুয়োতলা থেকে থলথলে মোটা একটা কুমড়োলতা টুকটুকে লাল সিমেন্টে বাঁধান বারান্দাটাকে ছুঁই ছুঁই করছিল। অস্পৃশ্য বাগদীদের কালো এক প্রগলভ মেয়ে যেন বামুনের ছেলেকে ছুঁয়ে দিয়ে তার জাত মারতে চাইছে। বারান্দার সেই লাল মেঝেতে ফুলকাটা আসনে বসে আমরা খাচ্ছিলাম। অনেক দূরে আকাশে পাক খেতে খেতে একটা চিল ডাকছিল টু-ই-ই-ই।

বছর তিরিশ আগে হলে এমন একটা সামান্য ঘটনা নিয়ে কাব্য করার কোন অবকাশ থাকত না। মেঝেতে আসন পেতে বসে কাঁসার থালায় যুঁই ফুলের মত ধপধপে চালের ভাতে ঘি মেখে খাওয়াটা বাঙালী-জীবনে একদিন ছিল ডাল ভাতের সামিল। ডাল ভাত নিয়ে আর যাই জমুক, কাব্য জমে না। কিন্তু আজ শুধু আমার নয়, আমার মতই মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবনে এ এক দুর্লভ স্বপ্ন।

চর্যাপদের যুগ থেকেই বাঙালী কুন্দ-শুভ্র ভাতে ঘি মেখে, সদ্য-ভাজা পুঁটিমাছ দিয়ে খেয়ে আসছে। অবশ্য কাঁসার থালায় নয়, ঢলঢলে সবুজ কলাপাতায়। দ্বিপ্রাহরিক ভোজনে বসে কান্তা পরিবেশিত এই একই আহার্য মুখে তুলতে গিয়েও সেদিনের বঙ্গসন্তানকে যে কাব্যে পেয়েছিল তার ছন্দোবদ্ধ স্বাক্ষর রয়েছে সাহিত্যে।

ইতিহাসে ইতিমধ্যে যত উত্থান-পতনই হোক না কেন, আমার মনে হয় চর্যাপদের যুগ থেকে বিগত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে পর্যন্ত বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবন এগিয়েছে মার্টিন কোম্পানির রেলের গতিতে ধিকিধিক করে। বিগত কয়েক দশক আগে মাত্র সেই জীবন হঠাৎ এক উল্কার বেগ অর্জন করেছে। আমাদের জীবনের বিগত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের তোলপাড় আমাদের স্বভাব ও অভ্যাস থেকে শুরু করে প্রত্যাশাটুকু পর্যন্ত যুগ-যুগান্তরের ছায়াদের মতই যেন মুড়িয়ে খেয়ে নিয়েছে।

আজ প্রাত্যহিক ভাতের থালার সামনে বসে বাঙালী খাবারই কাঁসার বা চীনা মাটির সৌষ্ঠ লক্ষ্য করার অবকাশ যেমন হয় না তেমনি জ্যোতিপাত্রের ভাতের উদয় আমরা, সদ্য-ভাজা বাদামী রংয়ের পুঁটি মাছের স্মৃতি স্মরণেও আনতে পারি না। অবশ্য ভাতের রং ও গন্ধের কথা যদি ওঠে তাহলে স্বীকার করতেই হবে এমন বর্ণ ও গন্ধ-বৈচিত্র্য বাঙালী তার ভাতের থালায় ইতিপূর্বে কোনকালে প্রত্যক্ষ করার গৌরব অর্জন করে নি। এ সপ্তাহে রেশনের দোকান কি রংয়ের চাল দেবে তার পূর্বাভাষ একমাত্র সম্ভবত তাঁরাই বলতে পারেন যাঁরা দৈনিক পত্রিকাগুলিতে রাশিচক্রের সাপ্তাহিক ফলাফল লেখেন। ধনু লগ্নে জাতক-জাতিকা এ সপ্তাহে রেশন দোকান হইতে বৌটিকা গন্ধযুক্ত রক্তবর্ণ চাউল পাইবে—সাপ্তাহিক রাশিচক্রের ফলাফলে এমন একটা পূর্বাভাষ পেলে আমার মত বাঙালী মাত্রেই কৃতজ্ঞ হবে, কাগজের কাটতিও বাড়বে সন্দেহ নেই।

সুতরাং এহেন জীবন-সংগ্রামে অজস্র বাঙালীর পক্ষে কোন এক দ্বিপ্রহরে শব্দ-কণ্টকিত কলকাতা থেকে অনেক দূরে, কোন নির্জন বাড়ির কুয়োতলার প্রগলভ কুমড়ো লতার মুখোমুখি খেতে বসে, কাঁসার থালায় বাসমতি চালের ভাতে ঘি মাখতে মাখতে এক মুহূর্তের জন্য অভিভূত হয়ে পড়াটা নিশ্চয়ই অপরাধ নয়।

কিন্তু অভিভূত হবার মত ঘটনা জীবনে আরও আছে। জীবনে বিস্ময়ের শেষ নেই। একটু পায়ে হেঁটে চলার কষ্ট স্বীকার করলে প্রতি পদে পদে এর চেয়েও বড় বিস্ময় অপেক্ষা করে থাকে। সেইদিনই এটা বুঝেছিলাম আর সেই বিস্ময়ের কাহিনীই আজ আমার মুখ্য বক্তব্য। এ পর্যন্ত যাহাই বলেছি তা ভূমিকা মাত্র।

বন্ধুর বাড়ি থেকে ফিরতে সন্ধ্যে পার হয়ে গিয়েছিল। হাওড়া স্টেশনে বাস থেকে নেমে ঠিক করলাম হাঁটব। ঐখানেই ভুল করেছিলাম। বাসের হাতল ধরে ঝুলতে ঝুলতে বাড়ি ফিরলে অমন প্রাগৈতিহাসিক বিস্ময়ের মুখোমুখি হতে হত না।

ব্রিজের ওপর দিয়ে হেঁটে আসতে ভালই লাগছিল। নদীর পশ্চিম তীরে, ব্রিজের শেষ প্রান্তের কাছাকাছি এসে হঠাৎ কি মনে হল ডান দিকের সিঁড়িটা দিয়ে নেমে গেলাম গংগার ঘাটে যেখানে ফুলের বাজার বসে।

নিচে নামতেই চোখে পড়ল ব্রিজের নিচের বিরাট বাঁধান চত্বরে অসংখ্য হাঁড়ি চড়েছে। তিনটে করে ইঁটে সাজান উনুনে কালো কালো মাটির হাঁড়িতে জীবনধারণের অমৃত উথলে উঠছে—ভাত সেদ্ধ হচ্ছে। একটা নয়, দুটো নয়, অসংখ্য উনুনে, অসংখ্য আগুনের শিখার মুখে অসংখ্য অমৃতভাণ্ড। সেই এক-একটি অগ্নি-কুণ্ডকে ঘিরে বসে আছে এক-একটি মানব পরিবার, অমৃতের পুত্রকন্যারা। মানব সমাজের এক-একটি প্রাথমিক ইউনিট—নর, নারী ও পুত্রকন্যারা।

বাসমতি, না কামিনী, না দেরাদুন কি ফুটছিল সেই অমৃত-কুণ্ডগুলিতে জানি না। আমার শুধু মনে হচ্ছিল কোটি কোটি বছর আগে এক প্রাগৈতিহাসিক প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সেই প্রান্তরে অসংখ্য অগ্নিকুণ্ডে যেন বন্য পশু ঝলসিয়ে খাচ্ছে কতকগুলি আদিম মানুষ-মানুষী।

ব্রিজের আলোয় স্বল্পালোকিত সেই চত্বরের এক কোণায় সারাদিনের ভিক্ষালব্ধ চালগুলি হাঁড়িতে একটি একটি করে বাছছিল এক বুড়ি। সাহস করে এগিয়ে গিয়ে

সেই লোলচর্মা প্রাগৈতিহাসিক পিতামহীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কোথা থেকে এসেছ গো?

বিরক্ত বুড়ি দন্তহীন মাড়ি ধীরে ধীরে নেড়ে জবাব দিয়েছিল—পটাশপুর গো।

প্রাগৈতিহাস থেকে নয়, ওরা এসেছে মেদিনীপুর থেকে।

ওপরে পা আর নিচে মাথা দিয়ে সভ্যতা যেন শীর্ষাসন অভ্যাস করছে—বাড়ি ফেরার পথে এ কথাটা হঠাৎ কেন সেদিন মনে হয়েছিল ভুলে গেছি।

সমগ্র উত্তরবঙ্গ আজ বিপন্ন। সাম্প্রতিক ইতিহাসে এরকম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বোধ হয় কোন নিদর্শন নেই। প্রলয়ঙ্করী বন্যা উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ মানুষকেই সর্বহারা করেছে। নগর ও জনপদগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, রেলপথের প্রায় প্রত্যেকটি সেতুই ধ্বংস হয়েছে, পথঘাট ভাঙ্গে গেছে, টেলিগ্রাফ-টেলিফোন লাইন ছিন্ন হয়েছে। এক জলপাইগুড়ি শহরেই এক ফুটের উপর পলি পড়েছে আর তার উপর কুকুর-বিড়াল-গরু-বাছুরের সঙ্গে নরনারী ও শিশুদের মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে। এই চিত্রটাই উত্তরবঙ্গের অবস্থাকে প্রতিফলিত করার পক্ষে পর্যাপ্ত।

ঘটনাগুলির মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়ে করুণ রস পরিবেশন করার উদ্দেশ্য আমাদের নেই। প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে ঠেকানো যায় না, কিন্তু পূর্বাহ্ণে তা বোঝা যায় এবং জনসাধারণকে সাবধান করে দেওয়া যায়। সংবাদ প্রকাশ, দার্জিলিং-এর ডি সি জলপাইগুড়ির ডি সি মহোদয়কে জলপাইগুড়ি শহর সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, কিন্তু সে সতর্কবাণীকে কাজে লাগানো হয় নি। তিস্তার জল কত ফুট উঁচু হয়ে নামছে, এ সাবধানবাণী মানুষকে শোনানো হয় নি। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্যাদির ভিত্তিতে আসন্ন বন্যা সম্বন্ধে আগেই স্থানীয় অধিবাসীদের সতর্ক করে দেওয়া কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল। কিন্তু তাঁরা তা করেন নি। এই দুর্দিনে সরকারী কর্তৃপক্ষের শোচনীয় অকর্মণ্যতার হিসাবটাই আগে নেওয়া দরকার।

বন্যা পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সরকার চূড়ান্ত অপদার্থতা ও হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়েছেন। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে সরকারী পয়সায় ভি আই পি-রা আকাশ পথে বন্যা পরিস্থিতি দেখে ভ্রমণানন্দ উপভোগ করেছেন, কিন্তু ত্রাণকার্যের কোন ব্যবস্থাই নেই বললেই চলে। জলপাইগুড়ির কথাই ধরা যাক। সেখানে সরকারের কোন অস্তিত্ব ছিল বলেই মনে হয় না। সরকারী কর্তারা আপন প্রাণ বাঁচাতে শিলিগুড়িতে চলে যান। শহরের এক লক্ষ মানুষকে দেখাশোনা করার জন্য সরকারী তরফে কেউ ছিল না, কোন উদ্যোগও ছিল না। এই প্রসঙ্গে দৈনিক বসুমতীর নিজস্ব প্রতিনিধি জলপাইগুড়ি থেকে যে বিবরণ পাঠান, তা নিম্নে উদ্ধৃত করছি। এতেই বোঝা যাবে সরকারী অপদার্থতা আজ কোন স্তরে এসে দাঁড়িয়েছে।

"চতুর্থ দিনে সরকারী সাহায্যের প্রথম পর্যায় শুরু হল। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। অবশ্য ইতিমধ্যে সরকার বাহাদুর তাঁদের সাহায্য পাঠানোর পূর্বেই বেসরকারী সাহায্যের উপর এমন বাধা-নিষেধ আরোপ করে বললেন যে বেসরকারী সাহায্য চতুর্থ দিনে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। তারপর বৈঠকের পর বৈঠক বসিয়ে বিলম্ব করাতে ৮ই অক্টোবর জলপাইগুড়ির মানুষের মুখে বেলা তিনটা পর্যন্ত কোন আহার্য বা পানীয় গিয়ে পৌঁছায় নি। বন্যাপীড়িত, হতভাগ্য জলপাইগুড়ির প্রতি চরমতম পরিহাস করা হয়েছে বন্যা বা মানুষের প্রাণ বিনষ্টির সংবাদগুলির চেয়ে সরকারী ঘোষণার সংবাদের উপর গুরুত্ব দিয়ে। যে সময় সরকারী সাহায্য পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলে সংবাদপত্র ও আকাশবাণী একযোগে উর্ধবাহু হচ্ছে—প্রকৃতপক্ষে তার বাহাত্তর ঘণ্টার পর থেকে সরকারী সাহায্য শুরু হয়েছে।

"৮ই অক্টোবর থেকে প্রথম শহরের বুক থেকে মৃতদেহগুলি স্থানান্তর করার কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে কয়েকটি লুঠতরাজ ও ছিনতাই-এর ঘটনার ফলে সশস্ত্র পুলিশবাহিনীকে গুলীর আদেশও দেওয়া হয়েছে। যে শহরের আইন-শৃংখলা সব কিছুই ভেঙে পড়েছে, সেখানে যখন আইন পাশ হয় গুলীর আদেশ দিয়ে। তাও কতকগুলি নোংরা ধরনের রাজনীতিক এই সুপারিশ করেছেন।"

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। ধর্মবীরের প্রশাসনের বড় সমর্থক একটি পত্রিকা উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে সরকারী অপদার্থতা দেখে শেষ পর্যন্ত সম্পাদকীয় স্তম্ভে, মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন, ধর্মবীরের দরকার নেই, কর্মবীর চাই। আমাদের অবশ্য সরকারী আমলাতন্ত্রের কার্যকারিতার

উপর কোন ভরসাই নেই, মেদিনীপুরের বন্যায় ত্রাণকার্যের ব্যাপারেই আমরা তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছি। রাজ্যপালের প্রশাসন সম্পর্কে সংবাদপত্রসমূহ মারফত একটি অতিকথার সৃষ্টি করা হয়েছিল, পর পর কয়েকটি ঘটনা তা মিথ্যা প্রমাণিত করেছে। বৃটিশ আমলে জনসাধারণকে দাবিয়ে রাখার জন্য যে আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনযন্ত্র গড়ে তোলা হয়েছিল, স্বাধীন ভারতে সেটিকে বহাল তবিয়তেই রাখা হয়েছে, কিন্তু ঘটনাচক্রই প্রমাণ করছে চিতাবাঘের দেহের ছাপ যেমন বদলাতে পারে না, আমলাতন্ত্রও কখনো সহৃদয় ও দরিদ্র জনজীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না। বন্যাপ্রপীড়িত উত্তরবঙ্গে ত্রাণকার্যের ব্যাপারে সরকারী ঔদাসীন্যই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

আরও দু-একটা কথা অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। উত্তরবঙ্গে বন্যার সংবাদ যেদিন প্রথম প্রভাতী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল সেই দিনই একই সঙ্গে কবির সাহেবের বিবৃতি বেরুল, নির্বাচন পিছিয়ে দিতে হবে। ভদ্রলোক যদি একদিন পরেও দাবিটা করতেন তাহলেও শোভন হত। আশ্চর্য, বন্যার্তদের প্রতি একটি সহানুভূতিসূচক কথা নেই, ত্রাণকার্যের প্রয়োজনীয়তার কোন উল্লেখ নেই, নিজের পুরাতন রাজনৈতিক দাবিটাই তিনি এই মওকায় করে বসলেন। তাঁর দাবি উত্থাপনের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলছি না, শুধু বলছি চক্ষুলজ্জা বলতে একটা বস্তু এখনো বাজারে আছে; আর এই বিবৃতিই প্রমাণ করে দিল পেশাদার রাজনীতিকদের কাছে জনসাধারণের সুখদুঃখের স্থানটা কোথায়?

চতুর্থ পরিকল্পনা ও পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের চতুর্থ পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্যের কোন সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি নয়াদিল্লী থেকে না আসায় রাজ্য সরকার এক গভীর সংকটের মধ্যে পড়েছেন। রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর এই ব্যাপারে নয়াদিল্লীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে কয়েকটা চিঠি লিখেছিলেন, কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। কেন্দ্রের এই টাল-বাহানায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার গোটা চতুর্থ পরিকল্পনার কাঠামো তৈরি করা তো দূরের কথা, ১৯৬৯-৭০ সালের পরিকল্পনা সম্বন্ধেও এখনো কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি।

পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাজ্য সরকারের চতুর্থ অর্থ কমিশনের রিপোর্ট পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এখনো পর্যন্ত তা এসে পৌঁছায় নি। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর তাদের উন্নয়ন ব্যয় সম্পর্কে উন্নয়ন দপ্তরের কাছে বিস্তারিত প্রকল্প রচনা করে পাঠিয়েছেন, কিন্তু এ নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তো দূরের কথা, কোন আলোচনাও সম্ভব হয় নি।

কেন্দ্রের চতুর্থ পরিকল্পনার আয়তন নিয়ে এখনো যে টালবাহানা চলছে তাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আশংকাও বেড়েছে। রাজ্য সরকার মনে করছেন যে এই অবস্থায় হয়তো কেন্দ্রের কাছ থেকে প্রত্যাশিত অর্থও পাওয়া যাবে না। গত জুন মাসে ও আগস্ট মাসে দুটি ভয়াবহ বন্যাজনিত পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের যে অর্থ ব্যয় হয়েছে তা বাজেটে ধরা অর্থের চেয়ে অনেক বেশি। মে ও সেপ্টেম্বর মাসে সরকারী কর্মচারীদের দুবার মহার্ঘভাতা বাড়ানোর ফলে রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত প্রায় তের কোটি টাকার ব্যয় বেড়েছে, কিন্তু ব্যয় যেভাবে বেড়েছে রাজস্ব সেভাবে বাড়ে নি।

বিক্রয় কর থেকে রাজ্য সরকারের সর্বাধিক আয় হয়। গত বছরের ব্যাপক মন্দার জন্য বিক্রয় কর থেকে রাজ্য সরকারের হাতে এ বছর আশানুরূপ অর্থ আসে নি। আবগারী শুল্ক থেকে আয়ের যে একটা বড় পথ আছে তার অবস্থা খুব ভাল নয়। কারণ কোলাগুড়ের অভাবে পশ্চিমবঙ্গের ডিস্টিলারীগুলি বেশ কিছুকাল বন্ধ থাকার ফলে রাজ্য সরকার বহু টাকার আবগারী শুল্ক থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। পাঞ্জাবের মত একটা ক্ষুদ্র রাজ্য আবগারী শুল্ক থেকে বছরে ১৮ কোটি টাকা আয় করে থাকেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ১০ কোটির বেশি আয় হয় না। তিন মাস সিনেমাগৃহগুলি বন্ধ থাকায় সরকারের দৈনিক এক লক্ষ টাকা করে লোকসান গেছে।

টাকাকড়ি বরাদ্দের ব্যাপারে ল্যাজে খেলাটা কেন্দ্রের অভ্যাস হয়ে গেছে, এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রের মনোভাব যে বরাবরই বিরূপ এটা প্রমাণের জন্য বেশি দূর যেতে হবে না। কেন্দ্রীয় নেতাদের অদূরদর্শী ও পক্ষপাতমূলক নীতির ফলে শেষ পর্যন্ত ভারতের ফেডারেল স্ট্রাকচার থাকবে না এ কথা পণ্ডিতেরা বহু দিন আগে থেকেই বলে আসছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের মতিগতির যে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে সেটা ভারতের সংহতির পক্ষেও ক্ষতিকারক। বুঝতে কষ্ট হয় না কেন নাম্বুদ্রিপাদ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে খোলাখুলি লড়াইয়ে নেমেছেন। উত্তরপ্রদেশ মহারাষ্ট্র কেন্দ্রের কৃপায় লাল হবে আর পশ্চিমবঙ্গ বা কেরল অনাহারে ও নানা সমস্যায় অনন্তকাল ধরে ভুগবে, নিশ্চয়ই এই রকম অবস্থা দীর্ঘকাল ধরে কেউ সহ্য করবে না।

দার্জিলিং জেলার চুং স্টেশনের নিকট ধস নেমে রেলের লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ফটো : অজয় দাস

জলপাইগুড়িতে উপ-প্রধানমন্ত্রী

১০ই অক্টোবর তারিখে উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই হেলিকপ্টারযোগে জলপাইগুড়িতে নামলে ক্ষুধার্ত উত্তেজিত এক জনতা তাঁকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভসূচক ধ্বনি দিতে থাকে। জলপাইগুড়ি শহরে ত্রাণ-ব্যবস্থা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হওয়ার বিপন্ন

মানুষ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রাঙ্গণে নামার সঙ্গে সঙ্গে জনতা উপমুখ্যমন্ত্রীকে ঘেরাও করেন এবং তাঁকে কাদার উপর দিয়ে হাঁটতে বলেন।

কিছু লোক ধ্বনি দিতে থাকেন "মোরারজী দেশাই ফিরে যাও", "রাজ্যপাল এসেছো কেন?" "এই অবস্থার মধ্যে তোমরা কি তামাসা দেখতে এসেছো?" ইত্যাদি। সেখান থেকে উপপ্রধানমন্ত্রী কিছু পথ হেঁটে শ্রী বি সি ঘোষের বাড়ি যান। সেখানেও একদল লোক তাঁকে ঘিরে ধরেন। এর পর কড়া পুলিশ ও মিলিটারী প্রহরায় উপপ্রধানমন্ত্রী জলপাইগুড়ি শহর ত্যাগ করেন।

শিলিগুড়িতেও উপপ্রধানমন্ত্রীর ভাগ্যে অনুরূপ সংবর্ধনা জোটে। এক জনতা শ্রীদেশাই-এর জীপ লক্ষ্য করে ব্যাপক ইটপাটকেল ছুঁড়তে থাকে। শিলিগুড়ি শহরের কাছাকাছি এলে আর একদল নরনারী তাঁকে ঘিরে ধরে পায়ে হেঁটে যেতে বলেন। তখনো ব্যাপকভাবে ইটপাটকেল ছোঁড়া হয়। রাস্তার কাদা তুলে তাঁর জীপ থামিয়ে দেওয়া হয়। ফলে মোরারজীর জামাকাপড়ও নষ্ট হয়।

সাংবাদিকদের নিকট শ্রীদেশাই বলেন যে, শহরবাসীরা যে দুর্দশার মধ্যে পড়েছেন তাতে তাঁদের ক্রোধের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। তিনি নিজেও অভিযোগ করেন যে দুর্গত ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য সরকারী আমলারা এগিয়ে আসেন নি, তাঁরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন।

তিনি রাজ্যপালকে জানিয়েছেন যে, জেলা কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতায় মানুষের দুঃখ-দুর্দশা আরও বেড়েছে। তিনি রাজ্যপালের কাছে জানতে চান এখনো কেন জলপাইগুড়ি হাসপাতাল পরিষ্কার করা হয় নি, তা করা হলে আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেত। তিনি বিভাগীয় কমিশনারকে প্রশ্ন করেন, জল নেমে যাবার চারদিন পরেও পলি সরানো হয় নি কেন? প্রশ্নের উত্তরে খুশি না হয়ে তিনি বলেন যে "এখন বুঝতে পারছি জনসাধারণ এত ক্রুদ্ধ কেন?"

দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানার সম্প্রসারণ মুলতুবী

পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বহু অবিচারের মধ্যে সম্প্রতিতম আর একটি ঘটনা হচ্ছে দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানার সম্প্রসারণ মুলতুবী রেখে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মূলধন অপসারণের চক্রান্ত। কথা ছিল দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ষোল লক্ষ টনকে বাড়িয়ে ছত্রিশ লক্ষ টন করা হবে। কিন্তু গত বছর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার আমলে ভারত সরকার পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন এবং কারখানার সম্প্রসারণ বাতিল করে দেন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা এই ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, কিন্তু ভারত সরকার কান দেন নি।

পি-ডি-এফ সরকার এ ব্যাপারে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করে নি, রাজ্যপালের প্রশাসনও তাই। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের ডিরেক্টর অফ ইণ্ডাস্ট্রিজ শ্রীউদয়ন চ্যাটার্জী বলেছেন যে, ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তে আগামী দশ বছরের জন্য দুর্গাপুরের সর্বনাশ হয়ে যাবে। "ইস্পাত কারখানা সম্প্রসারণ প্রস্তাব বাতিল করার ঘটনা হচ্ছে এই রাজ্য থেকে মূলধন সরিয়ে নেবার একটা জলন্ত উদাহরণ। বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে মূলধন সরানোর ব্যাপারে বাধা দিতে হলে দুর্গাপুর পরিকল্পনা কোনমতেই মুলতুবী থাকতে দেওয়া উচিত হবে না।"

আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই ব্যাপারে কোন প্রতিবাদের লক্ষণ দেখা যায় নি। এর সঙ্গে অন্য রাজ্যের ঘটনা তুলনীয়। সেখানে একটি ইস্পাত কারখানার দাবিতে দেশময় আন্দোলন এমন কি রক্তের বন্যা বয়ে গেছে, আর এখানে প্রতিশ্রুত পরিকল্পনা বাতিল করে দেবার কোন প্রতিক্রিয়াই নেই। নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের ইস্তাহারেও এ দাবি তোলা হয় নি। অথচ এতে পনের হাজার নতুন নিয়োগের সুযোগ রয়েছে।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার আমলে ডিরেক্টর অফ ইণ্ডাস্ট্রিজ এই অবস্থার পরিচয় তুলে ধরায় তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় এই অযৌক্তিক নির্দেশ প্রত্যাহারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছু হবার আগেই মন্ত্রিসভার পতন ঘটল। পি-ডি-এফ ও রাজ্যপালের আমলে এ বিষয়ে ডিরেক্টর অফ ইণ্ডাস্ট্রিজের তরফ থেকে সরকারকে বার বার সচেতন করে দেওয়া সত্ত্বেও কোন কাজ হয় নি।

শ্রীচ্যাটার্জী এই প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা আমরা এখানে উদ্ধৃত করছি: "ইস্পাতের চাহিদা কমার অজুহাতে দুর্গাপুরে সম্প্রসারণ মুলতুবী রাখার যুক্তি ধোপে টেকে না। কেন না বোকারোতে নতুন কারখানা হচ্ছে। কুশাসন কিম্বা কম উৎপাদন রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়মিত রোগ। আজকে দুর্গাপুরে এই রোগ দেখা দিতে পারে। অতীতে রাউরকেল্লায় এই রোগ ছিল, এমন কি ভিলাইতেও উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। যদি দুর্গাপুরে কারখানা ভালভাবে চালানো সম্ভব না হয়ে থাকে তবে তার ব্যবস্থা করতে হবে। যে পরিকল্পনাটি গৃহীত হয়েছিল, প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেই পরিকল্পনাটি অবিলম্বে কার্যকর করে বাড়তি শ্রমিকদের কাজ দেওয়া দরকার। যদি শ্রমিক গোলযোগই মুলতুবী রাখার পক্ষে আসল কারণ হয়, তবে সর্বোচ্চ স্তরে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। চতুর্থ পরিকল্পনায় দুর্গাপুরে সম্প্রসারণ পরিকল্পনা গৃহীত না হলে শুধু চাকরীর ব্যাপারেই নয়, আগামী দশ-বারো বছরের জন্য দুর্গাপুরের সমগ্র আর্থিক কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দুর্গাপুরে কারখানায় যদি অতিরিক্ত শ্রমিক থেকে থাকেন, তবে তাদের কাজ দেবার জন্যই পরিকল্পনাটি কার্যকর করা দরকার। এই পরিকল্পনা মুলতুবী রাখার ব্যাপারটি হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে মূলধন সরিয়ে নেবার জলন্ত দৃষ্টান্ত। বেসরকারী শিল্পকে মূলধন সরানোতে যদি বাধা দিতে হয় তবে আগে দুর্গাপুর সম্প্রসারণ পরিকল্পনা মুলতুবী রাখার ঘোষণা বাতিল করতে হবে।

(১০।১০।৬৮)

॥ এক ॥

ইংরাজ রাজত্বে, পরাধীন পাক-ভারতে, ৩০ বৎসর জেল খাটার ১৮ বৎসর পর, ৭৭ বৎসর বয়সে, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সন, স্বাধীন পাকিস্তানের ময়মনসিংহ জেলে রাত্রি দশটার সময় পৌঁছিলাম। দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁহারা সংগ্রাম করিয়াছেন, যাঁহাদের নির্যাতনভোগের ফলে আসিয়াছে দেশের স্বাধীনতা,—আমি তাঁহাদের একজন। ১২৯৬ সনে ২২শে বৈশাখ শনিবার, ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কলিয়াবচর থানার কাপাসাটিয়া গ্রামে আমার জন্ম। আমার পিতার নাম দুর্গাচরণ চক্রবর্তী, মাতার নাম প্রসন্নময়ী দেবী। আমরা ৪ ভাই ২ বোন। শ্যামাচরণ চক্রবর্তী, কামিনীমোহন চক্রবর্তী, চন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, মনোমোহিনী দেবী, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, বসন্তকুমারী দেবী। ১৯০৭ সনে আমার পিতার এবং তৃতীয় ভ্রাতার মৃত্যু হয়। আমার অপর দুই ভ্রাতার এবং দুই বোনেরও মৃত্যু হইয়াছে, আমিও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া আছি।

আমি ১৯০৬ সনে বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতির সভ্য হই। ১৯০৮ সনে প্রথমবার জেলে যাই। দ্বিতীয়বার জেলে যাই ১৯১২ সনে, একটা গুপ্ত বিভাগের পুলিশ অফিসার খুনের মামলা উপলক্ষে। তখন আমি ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামী ছিলাম। প্রথম জার্মান মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর আমি বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার (রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন—১২১ক ধারা) পলাতক আসামী ছিলাম, ১৯১৪ সনের শেষ ভাগে কলিকাতা গঙ্গার ঘাটে স্নান করার সময় ধৃত হই। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় দশ বৎসর নির্বাসন দণ্ড লাভ করিয়া ১৯১৫ সনে আন্দামান প্রেরিত হই। পেনাল সেটেলমেন্ট উঠিয়া যাওয়ার পর আমরা বাঙালীরা সর্বপ্রথম (সম্ভবত ১৯২০ সন) আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে প্রেরিত হই। ১৯২১ সনে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। তখন আলিপুর জেলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (তেলিরবাগ, বিক্রমপুর, ঢাকা), দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (চট্টগ্রাম), বীরেন্দ্রনাথ শাসমল (মেদিনীপুর), সুভাষচন্দ্র বসু (কলিকাতা), মৌলানা আক্রাম খাঁ, কবি নজরুল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, পীর বাদশা মিঞা (ফরিদপুর), ময়মনসিংহ-করটিয়ার জমিদার চাঁদ মিঞা সাহেব, প্রঃ নৃপেন ব্যানার্জি (বিক্রমপুর), বসন্তলাল মুরারকা, পদ্মরাজ জৈন মূলচাঁদ আগরওয়ালা, হীরালাল লোহিয়া (রামমনোহর লোহিয়ার পিতা), চিররঞ্জন দাশ (দেশবন্ধুর পুত্র), হাজী আব্দুর রসিদ খাঁ (নোয়াখালী), প্রঃ জে, এল, ব্যানার্জি, ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (বিক্রমপুর) মহিমচন্দ্র দাস (চট্টগ্রাম), ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী (চট্টগ্রাম), বসন্তকুমার মজুমদার (কুমিল্লা), সতীন্দ্রনাথ সেন (বরিশাল), কিরণশঙ্কর রায় (জমিদার, তেওতা, ঢাকা) ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সহ শতশত স্বাধীনতাকামী হিন্দু-মুসলমান অসহযোগ আন্দোলনে বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

লেখক

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের বম্ ইয়ার্ডে ছিলেন অমৃতলাল হাজরা (শশাঙ্ক হাজরা—মাণিকগঞ্জ, ঢাকা—বাজাবাজার বোমার মামলা—১৫ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড) ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (কাপাসাটিয়া, ময়মনসিংহ—বরিশাল ষড়যন্ত্র—১০ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড), মদনমোহন ভৌমিক (ডুমনী ঢাকা—বরিশাল ষড়যন্ত্র—১০ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড), খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী (মাণিকগঞ্জ ঢাকা বরিশাল ষড়যন্ত্র—৭ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড), আশুতোষ লাহিড়ী (পাবনা প্রাগপুর ডাকাতি ১০ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড), গোপেন্দ্রলাল রায় (পাবনা প্রাগপুর ডাকাতি ১০ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড) ফণিভূষণ রায় (কুষ্ঠিয়া-প্রাগপুর ডাকাতি ১০ বৎসর), প্রফুল্লচন্দ্র রায় (শ্রীহট্ট ডাকাতি ৮ বৎসর), মধুর চক্রবর্তী (কুমিল্লা ডাকাতি ৮ বৎসর), সুধীরচন্দ্র মজুমদার (লাহিড়ী-মোহনপুর, পাবনা ডাকাতি ৮ বৎসর), অতুলচন্দ্র দত্ত (বরকামতা-কুমিল্লা ডাকাতি ৮ বৎসর), নিকুঞ্জবিহারী পাল (কুমিল্লা-সিরাজগঞ্জ খণ্ডযুদ্ধ ১০ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড), গোবিন্দচন্দ্র কর (ঢাকা-সিরাজগঞ্জ খণ্ডযুদ্ধ ১০ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ড), হরিচৈতন্য দে (বরিশাল-ঢাকা কলতাবাজার খণ্ডযুদ্ধ ১০ বৎসর জেল), নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষচৌধুরী (দত্তপাড়া-নোয়াখালী, শিবপুর ডাকাতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড), সত্যরঞ্জন বসু (বরিশাল-শিবপুর ডাকাতি, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড), যতীন নন্দী (ময়মনসিংহ, শিবপুর ডাকাতি, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড), সানকেজ চ্যাটার্জি হুগলী শিবপুর ডাকাতি, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড) ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ (কলিকাতা শিবপুর ডাকাতি, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড), নিখিলচন্দ্র গুহরায় (ইদিলপুর, ফরিদপুর, শিবপুর ডাকাতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড), সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (বরিশাল শিবপুর ডাকাতি, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর), নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি (ফরিদপুর, বেনারস ষড়যন্ত্র মামলা ১১ বৎসর), মোহিনীমোহন বসু (ফরিদপুর ডাকাতি ৮ বৎসর দণ্ড)।

জেলের প্রচলিত প্রথা অনুসারে আমরা, যাহারা বম ইয়ার্ডে ছিলাম, আমরা ছিলাম কুলীন। কারণ আমাদের সুদীর্ঘ দণ্ড ছিল। অসহযোগ আন্দোলনে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা তিন মাস হইতে ২ বৎসর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। জেলে অল্প-সংখ্যক রাজবন্দী থাকিলে ডিসিপ্লিন রক্ষা করা সম্ভব কিন্তু বহুসংখ্যক রাজবন্দী থাকিলে তাহা সম্ভবপর হয় না। আলি-পুর জেলের বম ইয়ার্ড ছিল "অন্দর ফাটক" (ভেতর জেল)-এর মত, সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। সেখানে [illegible] প্রহরীর ব্যবস্থা ছিল। অসহযোগ আন্দোলনকারী-দের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, জেলের ডিসিপ্লিন ততই শিথিল হইয়া পড়িল। অসহযোগী [illegible] টপ্‌কাইয়া বম ইয়ার্ডে আসিতে লাগিল, অবশেষে বম ইয়ার্ডের দরজা খুলিয়া [illegible]। অসহযোগীদের অনেকেরই বাড়ি হইতে খাবার জিনিস আসিত। চীফ মিত্রা সাহেবের জন্য প্রত্যহ বড় টুকরী ভরিয়া ফল আসিত, সকলেই তাহার ভাগ পাইত। বম ইয়ার্ডের কুলীন বিপ্লবীরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইত না। আমরা চিড়া-মুড়ি, সন্দেশ-রসগোল্লার স্বাদ ভুলিয়া গিয়াছিলাম, এখন আবার নতুন করিয়া স্বাদ গ্রহণ করিতে লাগিলাম। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আমাকে খুব স্নেহ করিতেন, তিনি একদিন আমাকে ও বাজাবাজার বোমার মামলায় দণ্ডিত অমৃত হাজরাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার পাশে বসাইয়া খাওয়াইয়াছিলেন। বাহির হইতে বাসন্তী দেবী রান্না করিয়া তরকারী পাঠাইয়াছিলেন, পরিবেশন করিয়াছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। ঐ সময় পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের জেলগুলি অসহযোগ আন্দোলনকারীদের দ্বারা ভর্তি ছিল। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন ময়মনসিংহ জামালপুরের ভূতপূর্ব মন্ত্রী গিয়াসুদ্দিন আহম্মদ, পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের স্পীকার তমিজুদ্দিন খাঁ, ভূতপূর্ব মন্ত্রী আবদুল হোসেন সরকার, ভূতপূর্ব মন্ত্রী আস্রাফ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী (কুমিল্লা) "কৃষক" সম্পাদক মুজিবর রহমান কুলপুরী (ময়মনসিংহ), মৌলানা [illegible] হোসেন, ভূতপূর্ব এম-পি প্রভৃতি। তাঁহারা বিভিন্ন সময় দেশের স্বাধীনতার জন্য কারাবরণ করিয়াছিলেন। ১৯২৪ সনের প্রথমভাগে মুক্তির জন্য আমি ময়মনসিংহ জেলে স্থানান্তরিত হই। আমি ময়মনসিংহ জেলে মাত্র কয়েক দিন ছিলাম, তাহার ৪১ বৎসর পর আবার ময়মনসিংহ জেলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পূর্বে যে দো-তলায় ছিলাম সেই দো-তলা দালানের আগের জায়গাতেই অবস্থান করিতেছি।

আমি ১৯৪৬ সনে পরাধীন ভারতের দমদম জেল হইতে সর্বশেষ মুক্তি লাভ করি। ঐ সময় দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া গরম ছিল। যাহাতে সাম্প্রদায়িক কোন গণ্ডগোল না হয়, সেজন্য আমি আমার রাজনৈতিক বন্ধুদিগকে সঙ্গে লইয়া শান্তি স্থাপনের জন্য বিভিন্ন স্থানে যাইতেছিলাম। ইতিমধ্যে সংবাদ পাইলাম নওয়া (শ্রীহট্ট) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। আমি নওয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করি। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া হবি-গঞ্জ রওয়ানা হই। আমি পূর্বে কখনও হবিগঞ্জ যাই নাই, সেখানে আমার পরিচিত কোন লোকও [illegible]। আমি শায়েস্তাগঞ্জ [illegible] হইতে হবিগঞ্জের গাড়িতে উঠিলাম, তখন বেলা প্রায় ১১টা হইবে। গাড়িতে এক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হয়, তিনি হবিগঞ্জ শহরে থাকেন। কথা প্রসঙ্গে আমার হবিগঞ্জ যাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলাম এবং ইহাও বলিলাম যে, হবিগঞ্জে আমার পরিচিত কেহ নাই এবং উঠিবারও কোন স্থান নাই। তিনি আমাকে তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন এবং বৈকালে কংগ্রেস নেতা ও এম-এল-এ, সুরেশচন্দ্র বিশ্বাসের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। সেইদিন রাত্রে এক ঘরোয়া বৈঠক হয়, প্রায় ৪০।৫০ জন লোক উপস্থিত ছিল। আমি দাঙ্গা সম্বন্ধে তাহাদের সহিত আলোচনা করিয়া বলিলাম, "আমি দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে যাইব, এখন আমার সঙ্গে কে কে যাইবেন?" সকলেই কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সুরেশবাবুর দিকে চাহিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার অনেক শত্রু আছে, আমার যাওয়া উচিত হইবে কি?" আমি বলিলাম, "আপনার যাওয়ার প্রয়োজন নাই, আর কে কে যাইতে প্রস্তুত? আমি ৩।৪ জন সঙ্গী চাই।" সভা নিস্তব্ধ। তখন ছিল বর্ষাকাল। দাঙ্গা কয়েকদিন পূর্বেই ঘটিয়া গিয়াছে। দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে লোকচলাচল বন্ধ, নৌকাযোগে যাইতে হয়। সভা নিস্তব্ধ। এমন সময় ঘরের এক কোণ হইতে এক ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমি যাইতে প্রস্তুত, যদি আমাকে দয়া করিয়া সঙ্গে লইয়া যান।" তিনি বলিলেন, "আমি সংবাদ পাইয়াছি, আমার গ্রাম বিধ্বস্ত হইয়াছে, আমার ভাই আহত হইয়াছে।" পরে জানিতে পারিলাম, তিনি ভাদিগিরার জমিদার অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট বিনোদ বর্মণবাবু। বিনোদবাবু আমাকে গোপনে বলিলেন, "আমার নিজের নৌকা আছে এবং পাশ করা বন্দুক আছে।" বিনোদবাবুকে পাইয়া আমি খুব খুশি হইলাম। বন্দুকের কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। আমি বিনোদবাবুকে বলিলাম, যত বেশি পারেন কার্তুজ সঙ্গে লইবেন। পরদিন প্রাতে আমরা রওয়ানা হইলাম। সঙ্গে যথেষ্ট কার্তুজ আছে, ভয়ের কোন কারণ নাই। আমরা ভাদিগিরা যাইবার পথে দু-একটা বিধ্বস্ত গ্রামের সংবাদ লইয়া বৈকালে ভাদিগিরা বিনোদবাবুর বাড়ি পৌঁছিলাম। বিনোদবাবুর ছোট ভাই, সম্প্রতি দাঙ্গায় আহত হইয়া হবিগঞ্জ হাসপাতালে ছিলেন, অপর ভাই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

... রওনা হইলাম। আমরা বিকালে ... পৌঁছিলাম। নদীর ঘাটে ভেড়ার পূর্বে দেখিলাম একজন গুর্খা সিপাহী বন্দুক কাঁধে করিয়া টহল দিতেছে। আমরা চিন্তিত হইলাম। নৌকা ঘাটে ভিড়িল, এমন সময় গুর্খা সিপাহী বিনোদবাবুকে সেলাম দিল। আমরা নিশ্চিন্ত মনে টানে উঠিলাম। বিনোদবাবু যখন সিলেট শহরে হাকিম ছিলেন, গুর্খা সিপাহী তাঁহাকে দেখিয়াছে। এখন পূর্বাভ্যাসবশত তাঁহাকে সেলাম দিল।

অপরিচিত দুইজন ভদ্রলোক দেখিয়া গ্রামের কয়েকজন লোক আমাদিগকে এক জায়গায় বসিতে দিলেন, গ্রামের আরো কয়েকজন লোক উপস্থিত হইল। আমরা আমাদের পরিচয় দিয়া তাহাদের অবস্থা জানিতে চাহিলাম, কিন্তু তাহারা আমাদের নিকট বিশেষ কিছু বলিতে চাহিলেন না। ইতিমধ্যে একটি যুবক, কলেজের ছাত্র, উঠিয়া গিয়াছিল। ঐ সময় আনন্দবাজার পত্রিকার "স্বাধীনতা সংখ্যায়" যে সব স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাদের ফটো বাহির হইয়াছিল, তাহার মধ্যে আমার ফটোও

ছিল। ঐ যুবকটি কলিকাতা কলেজে পড়িত, বাড়ি আসার সময় এক কপি আনন্দবাজার স্বাধীনতা সংখ্যা ক্রয় করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। সে আমার পরিচয় পাইয়া স্বাধীনতা সংখ্যার ফটোর সহিত আমার চেহারা মিলাইয়া সকলকে এই সংবাদ দিল এবং বলিল, ভয়ের কোন কারণ নাই। তাহারা তখন সকল ঘটনা ব্যক্ত করিল। ঘটনার বিবরণ এই:—অতি সামান্য কারণে। দুই সম্প্রদায়ের দুইজনের ব্যক্তিগত ঝগড়া গ্রাম্য বিবাদে পরিণত হইল এবং গ্রাম্য বিবাদ সাম্প্রদায়িক দাংগায় পরিণত হইল। গ্রাম্য ঝগড়ায় কৈবর্তরা এবং মুসলমান পাড়ায় আগুন লাগাইয়া দেয়, ফলে কয়েকটা বাড়ি পুড়িয়া যায়। এই সংবাদ অতিরঞ্জিতভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং একটা ভয়ানক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। চারিদিকে নানা প্রকার গুজব রটিতে থাকে। উত্তেজনা বৃদ্ধি করার লোকের অভাব হয় না, স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট লোকেরা তিলকে তাল করিয়া প্রচার করিতে লাগিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল, দলে দলে লোক নৌকা বোঝাই করিয়া নওগাঁ দখল করার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল।

এদিকে নওগাঁর কৈবর্ত সম্প্রদায়ের লোকেরাও নিশ্চিন্ত ছিল না, ভাবী বিপদের আশংকা তাহারাও করিতেছিল। তাহারা তখন দেশত্যাগের কল্পনা করে নাই। তাহারা স্থির করিল, গ্রামে থাকিয়াই আক্রমণকারীদিগকে বাধা দিবে, গ্রামরক্ষা করিবে। তাহারা ব্যূহ রচনা করিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিল। নওগাঁ একটি দ্বীপের মত ক্ষুদ্র গ্রাম চারিদিকে জল। গ্রামবাসীরা গ্রামের চারিদিকে জলের মধ্যে, পাড় হইতে ১৫।২০ হাত দূরে, বাঁশ পুঁতিয়া ব্যূহ রচনা করিল। বাঁশ ও সুপারীগাছের ফালি করিয়া বল্লম তৈয়ার করিয়া ও ইটের টুকরা লইয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। পাহারার ব্যবস্থা ছিল। প্রহরীর ইংগিতে হঠাৎ চারিদিকে শংখঘণ্টা বাজিয়া উঠিল গ্রামের সমর্থ ব্যক্তি সকলেই চারিদিকে নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইয়া গেল। তখনও দ্বিপ্রহর হয় নাই, আকাশ পরিষ্কার ছিল। কয়েক সহস্র আক্রমণকারী প্রায় এক শত নৌকায় নওগাঁ আক্রমণ করিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কোনপক্ষেই বন্দুক ছিল না। আক্রমণকারীদের অসুবিধা ছিল, তাহাদের প্রত্যেক নৌকা বোঝাই লোক ছিল, নিক্ষেপ করার মত অস্ত্র বিশেষ ছিল না। গ্রামের বৃক্ষের আড়ালে থাকিয়া কৈবর্তগণ বল্লম, ইটের টুকরা প্রভৃতি তাহাদের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। নৌকা বোঝাই লোক থাকায় আক্রমণকারীরা আহত হইতে লাগিল। কৈবর্ত মেয়েদের মধ্যে কান্নাকাটি নাই, কাহারও মধ্যে ত্রাসের চিহ্ন নাই, সকলেই গ্রামরক্ষার কাজে ব্যস্ত। সংগ্রাম যখন চলিতেছিল, মেয়েরা এবং ছোট ছোট ছেলেরা চারিদিকে ঘুরিয়া সংগ্রামকারী-দিগকে পান-তামাক খাওয়াইয়াছে, জল খাওয়াইয়াছে, চিড়া-মুড়ি খাওয়াইয়াছে, অস্ত্র সরবরাহ করিয়াছে। এইভাবে মধ্যাহ্ন অতিক্রম হইল, আক্রমণকারীরা নৌকা পাড়ে ভিড়াইতে পারিতেছে না। প্রবল বাধা পাইতেছে, তাহারা আহত হইতেছে, ক্ষুধায় কাতর হইয়াছে। অবশেষে আক্রমণ-কারীরা রণে ভংগ দিয়া পলায়ন করিল। তাহারা পলায়ন করার সময় কয়েকটা গ্রাম বিধ্বস্ত করিয়া চলিয়া গেল। নওগাঁর অধিবাসীরা সন্ধ্যার পর তাহাদের অর্থ দলিলপত্র এবং মেয়েলোকদিগকে বিভিন্ন গ্রামে পাঠাইয়া দিল, পাহারা দেওয়ার জন্য বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দল এবং কিছু যুবক গ্রামে রহিল। ইতিমধ্যে গভর্নমেণ্টও কিছু বন্দুকধারী গুর্খা সিপাহী নওগাঁ গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন। গুর্খা সিপাহীর আগমনে গ্রামের লোক আশ্বস্ত হইল। কৈবর্তদের আত্মরক্ষার বীরত্বকাহিনী, বিশেষত মেয়েদের বীরত্বকাহিনী ঐ সময় আমার বিবৃতিতে আনন্দবাজার পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। অবশ্যই এই ঘটনার দুই বৎসর পর নওগাঁ বিধ্বস্ত হইয়াছিল। আমরা বিধ্বস্ত মুসলমান পল্লীতে যাইয়া ক্ষতিগ্রস্তদের সহিত আলাপ করিলাম। আমরা কয়েকজন মৌলবী এবং হাজী সাহেবের সহিত দেখা করিলাম। আমরা হিন্দু-মুসলমান সকলের সহিত দেখা করিয়া শান্তিতে বাস করার উপদেশ দিলাম। আমি নওগাঁ হইতে লখাই যাই এবং জজ বাড়ির শচীন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িতে উঠি। কৈবর্ত সম্প্রদায়ের বিখ্যাত ধনী শ্যামাচরণ দাসের বাড়ি লখাই। এই দাংগা উপলক্ষে শ্যামাচরণ দাস এবং অন্যান্য কিছু কৈবর্ত সম্প্রদায়ের লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। আমি শচীন্দ্র চক্রবর্তীকে সংগে লইয়া শ্যামাচরণবাবুর বৃদ্ধ পিতাকে দেখিয়া আসিলাম। আমি ইহার পর ঢাকা হইতে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেবের সহিত দেখা করিয়া দাংগা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করি।

খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব ঢাকার প্রসিদ্ধ নবাব পরিবারের লোক। তিনি উচ্চ শিক্ষিত, আভিজাত্যের অভিমান তাঁহার ছিল না। ঢাকার হিন্দু নেতাদের সহিতই তাঁহার অধিক বন্ধুত্ব ছিল। ১৯৩৬ সনে তিনি যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, তখন হিজলী জেলে আমাদিগকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ১৯৩৫ সনে বাংলার বিপ্লবী নেতাদিগকে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হিজলী জেলে একত্র করা হয়। হিজলী জেলে ১৬ জন নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন, রমেশচন্দ্র আচার্য (ঢাকা) ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (ময়মনসিংহ), প্রতুলচন্দ্র গাংগুলী (ঢাকা), রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (ঢাকা), সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (ময়মনসিংহ), পূর্ণচন্দ্র দাস (ফরিদপুর), প্রঃ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ (হুগলী), রসিকলাল দাস (খুলনা), ভূপতি মজুমদার (হুগলী), সত্যরঞ্জন গুপ্ত (ঢাকা), প্রতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য (ময়মনসিংহ), ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত (ঢাকা), জীবনলাল চ্যাটার্জি (ঢাকা), অরুণ গুহ (বরিশাল), মনোরঞ্জন গুপ্ত (ঐ), ভূপেন দত্ত (যশোহর)। খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব প্রাতে ১১টার সময় হিজলী জেলে উপস্থিত হন। তিনি জেলার এবং সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে বিদায় দিয়া রাত্রি ৯টা পর্যন্ত আমাদের মধ্যে অবস্থান করেন। তিনি আমাদের সংগে এক টেবিলে বসিয়া পান ভোজনাদি সম্পন্ন করেন। সারাদিন তাঁহার সহিত বন্ধুভাবে আলাপ-আলোচনা ও গল্প হয়। তিনি জানিতে চাহিয়াছিলেন, আমাদের মনের পরিবর্তন হইয়াছে কি না। তিনি আমাদের কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা দিয়া যান। পূর্বে রাজবন্দীরা সরকার অনু-মোদিত সংবাদপত্র ছাড়া জাতীয়তাবাদী কাগজ পাইত না। আমাদের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল যে কোন বিশেষ কাগজ পড়িলে আমাদের মনের পরিবর্তন হইবে না, তাহার প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। আমরা সকল জাতীয়তাবাদী কাগজই পড়িতে চাই। তিনি তাহা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে জেলে রাজবন্দীরা যে সকল জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র পড়ার সুযোগ পাইয়াছেন, তাহা খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেবের দান। আমাদের অনুরোধে তিনি নির্দেশ দেন যে, রাত্রে আমাদের লক-আপ হইবে না, দরজা খোলা থাকিবে। ইহার পর বাংলার অর্থমন্ত্রী শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় হিজলী জেলে গিয়া আমাদের সহিত দেখা করেন। তিনিও প্রাতে ১১টার সময় আসিয়াছিলেন, সারাদিন আমাদের মধ্যে ছিলেন এবং আমাদের সংগে একত্র আহার করিয়া-ছিলেন। তিনি আমাদের জন্য প্রচুর মিণ্ট এবং ফল আনিয়াছিলেন। ইহার পর ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শ্রীশচন্দ্র চ্যাটার্জি, সরোজিনী নাইডু হিজলী জেলে গিয়া আমাদের সংগে দেখা করেন। ইহার পর মহাত্মা গান্ধী আমাদের সহিত হিজলী জেলে দেখা করেন। ঐ সময় ভারতবর্ষের সর্বত্র বিপ্লবী দলের ধ্বংসাত্মক কাজ চলিতেছিল, কংগ্রেস আন্দোলনও জোরে চলিতেছিল।

গভর্নমেণ্ট মহাত্মা গান্ধীর মাধ্যমে

চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিপ্লবীদের মতের পরিবর্তন করিতে। মহাত্মা গান্ধীর আগমন সংবাদ আমরা পূর্বেই পাইয়াছিলাম। মহাত্মা গান্ধীকে সাদরে অভ্যর্থনা করার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম। তাঁহার বসার স্থান ফুল দিয়া সাজান হইল, ফুলের তোড়া তৈয়ার করা হইল। তিনি নির্দিষ্ট সময়ে হিজলী জেলে উপস্থিত হইলেন, আমরা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলাম। তিনঘণ্টা আলাপ আলোচনা হইল, সেখানে জেলের কোন কর্মচারী উপস্থিত ছিল না। মহাত্মা গান্ধী চাহিয়াছিলেন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমাদের মতের পরিবর্তন করিতে। তিনি চাহিয়াছিলেন, আমরা যেন হিংসা নীতি পরিত্যাগ করিয়া মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী হইয়া দেশের স্বাধীনতার কাজে অগ্রসর হই। বিপ্লবীরা যদিও মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না, তবুও তাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সংগ্রামে যোগদান করিয়াছেন, খাঁটি সত্যাগ্রহীর ন্যায় পুলিশের লাঠিচার্জের সম্মুখীন হইয়াছেন; কোন প্রকার দুর্বলতা দেখান নাই বা হিংসা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন মহাত্মার অহিংস আন্দোলন দেশকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিবে। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন, আমরা যদি এই প্রতিশ্রুতি দিই (মৌখিক) হিংসায় আমাদের বিশ্বাস নাই, আমরা অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী, তবে মহাত্মা গান্ধী আমাদের মুক্তির জন্য গভর্নমেণ্টকে সুপারিশ করিবেন এবং আশা করা যায়, গভর্নমেণ্ট সকল রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিবেন। বিপ্লবীরা অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী নন। তাঁহারা মনে করেন স-শস্ত্র বিপ্লব দ্বারাই ভারতের স্বাধীনতা আসিবে। বিপ্লবী নেতারা মহাত্মা গান্ধীর সহিত এক মত হইতে পারিলেন না। মহাত্মা গান্ধী আমাদের নিকট হইতে বিদায় লওয়ার সময় বলিলেন, "ইহার পর আমি আবার তোমাদের এখানে আসিয়া তিনদিন তোমাদের সঙ্গে একত্রে থাকিব এবং তোমাদিগকে আমার মতে আনিব।" মহাত্মা গান্ধীর সহিত সকলেই খুব সম্মানের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়াছিলেন। ইহার কয়েক মাস পর আমরা সংবাদ পাইলাম, মহাত্মা গান্ধী আমাদের সহিত দেখা করিবেন। এ যাত্রা তিনি হিজলী আসিতে পারিবেন না তিনি অসুস্থ, প্রেসিডেন্সী জেলে দেখা করিবেন। আমাদিগকে প্রেসিডেন্সী জেলে স্থানান্তরিত করা হইল। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে বেলা ৩টার সময় মহাত্মা গান্ধীর সহিত আমাদের আবার দেখা হইল, আলাপ-আলোচনা সুরু হইল। আলাপ-আলোচনায় কেহ কাহারও মতে আসিতে পারিলেন না, প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতে অটল রহিলেন। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দুইঘণ্টা আলাপ হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী হাসিমুখেই বিদায় লইলেন। ইহার পূর্বেও একবার গভর্নমেণ্টের সহিত মিটমাটের চেষ্টা চলিয়াছিল ১৯৩১ সনে, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মাধ্যমে।

১৯৩০।৩১ সনে স্বাধীনতা আন্দোলন খুব জোরে চলিতেছিল। জেলগুলি রাজনৈতিক বন্দীদের দ্বারা ভর্তি ছিল, তখন আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হইয়াছে। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বাংলার গভর্নরের সহিত দেখা করিয়া বাক্‌সা ক্যাম্প জেলে বিপ্লবীদের সহিত আলাপ-আলোচনার জন্য গিয়াছিলেন। হিমালয়ের পাদদেশে জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত বাক্‌সা ক্যাম্প কাঁটাতারের বেড়া দিয়া জেলে পরিণত করা হইয়াছিল এবং সেখানে বাংলা দেশের বিভিন্ন বিপ্লবী দলের নেতৃস্থানীয় দেড়শ বিপ্লবীকে বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন, প্রঃ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ (হুগলী), বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী (কলিকাতা), ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (ময়মনসিংহ), প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী (ঢাকা), রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (ঢাকা), জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার (ময়মনসিংহ), সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (ময়মনসিংহ), আনন্দকিশোর মজুমদার (ময়মনসিংহ), অমূল্যচন্দ্র অধিকারী (ময়মনসিংহ), রমেশচন্দ্র আচার্য (ঢাকা), মদনমোহন ভৌমিক (ঢাকা), অনিলচন্দ্র রায় (ঢাকা), সত্য গুপ্ত (ঢাকা), ভবেশচন্দ্র নন্দী (ঢাকা), হেমচন্দ্র ঘোষ (ঢাকা), স্বদেশরঞ্জন নাগ (ঢাকা), পূর্ণচন্দ্র দাস (মাদারীপুর-ফরিদপুর), কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত (ফরিদপুর), পঞ্চানন চক্রবর্তী (মাদারীপুর), অমরেন্দু দাশগুপ্ত (মাদারীপুর), ফণী মজুমদার (মাদারীপুর), দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ (বরিশাল), যতীন (ফেগু) রায় (বরিশাল), মনোরঞ্জন গুপ্ত (বরিশাল), দেবকুমার (মনা) ঘোষ (বরিশাল), প্রতাপচন্দ্র রক্ষিত (চট্টগ্রাম), যশোদারঞ্জন চক্রবর্তী (চট্টগ্রাম), শান্তিময় দত্ত (নোয়াখালী), মাখন পাল (নোয়াখালী), অতীন্দ্রমোহন রায় (কুমিল্লা), মণীন্দ্র চক্রবর্তী (কুমিল্লা), অমূল্য মুখার্জি (কুমিল্লা), ক্ষিতীশ ব্যানার্জি (আগরতলা), প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী (রাজসাহী), সুধাংশু (চেরু) চৌধুরী (রাজসাহী), সুশীলচন্দ্র দেব (রংপুর), ক্ষিতীশচন্দ্র দেব (কুড়িগ্রাম—রংপুর), ভূপতি মজুমদার (হুগলী), ইন্দ্রচন্দ্র নারাং (লাহোর), মিহির মুখার্জি (মুর্শিদাবাদ), ত্রিদিব চৌধুরী (মুর্শিদাবাদ), প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (হিলি—বগুড়া), চারু রায় (শেরপুর), শ্যামানন্দ সেন (ময়মনসিংহ), জ্যোতিষচন্দ্র জোয়ারদার (ময়মনসিংহ), আবুরফউদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী (কুমিল্লা), আব্দুল রেজ্জাক (মৌলানা আক্রাম খাঁ সাহেবের জামাতা, কলিকাতা), ধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি (কলিকাতা), পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত (ঢাকা), নিতাই কুণ্ডু (বগুড়া), রবি ভট্টাচার্য (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), রাখাল ঘোষ (ঢাকা), জগদানন্দ বাজপাই (মুর্শিদাবাদ), বরদা চক্রবর্তী (দিনাজপুর), প্রতুল দেব (রংপুর), সুশীল সরকার (ঢাকা), মন্মথ গাঙ্গুলী (কলিকাতা), মণীন্দ্রকিশোর রায় (ঢাকা), গোপাল হালদার (নোয়াখালী), সবল সেন (ঢাকা), অনন্ত দে (কুমিল্লা), শ্যামাচরণ বিশ্বাস (চট্টগ্রাম), জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী (ময়মনসিংহ), জানকী রায় (ময়মনসিংহ), কৃষ্ণ লাহিড়ী (রাজসাহী), মণি গুপ্ত (ঢাকা), দেবেন্দ্র করগুপ্ত, নীলকৃষ্ণ সাহা (নোয়াখালী), কিরণচন্দ্র মুখার্জি (খুলনা), ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (যশোহর), অরুণচন্দ্র গুহ (বরিশাল), নরেশচন্দ্র সোম ময়মনসিংহ, কবিরাজ যতীন রক্ষিত (চট্টগ্রাম), তরণীভূষণ সোম (ঢাকা), ফণীন্দ্রকিশোর আচার্য (ময়মনসিংহ) দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার (ময়মনসিংহ) প্রভৃতি। দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত একদিন ছিলেন। বিপ্লবীদের সহিত আলাপ-আলোচনার পর তিনি কলিকাতা চলিয়া যান। তাহার কিছুদিন পর আমরা গভর্নরের নিকট হইতে একখানা পত্র পাই। এই পত্রের উত্তর যথাসময়ে দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তাহার আর কোন উত্তর আসে নাই, ঐখানেই ইতি।

পাক-ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে

মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের সময়। মহাত্মা গান্ধী ব্যারিস্টারী পাশ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যবসা করিতেন। সেখানে বর্ণবৈষম্যের জন্য ভারতীয় নাগরিকদিগের প্রতি নির্যাতন হইত। তিনি সেখানে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাইয়াছিলেন এবং নিজেও অশেষ নির্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইংলণ্ড যখন বিপন্ন হইয়াছিল তখন ভারতবাসীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। ঐ সময় জাতীয় কংগ্রেস নেতারা গভর্নমেণ্টের সহিত দর কষাকষি করিতেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর মত ছিল, শত্রুকে বিপদের সময় বিপন্ন না করিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। শত্রু যখন বিপদ্মুক্ত হইবে, তখন তাহার সহিত সংগ্রাম করিব। অতএব এই বিপদের সময় গবর্নমেণ্টকে সাহায্য করিতে হইবে। কংগ্রেস নেতারা বলিলেন, ভারতবাসীকে স্বরাজ অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে, নতুবা যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করিব না। বিপ্লবী নেতারা স্থির করিলেন ইহাই সুযোগ। এখন শত্রুকে আঘাত হানিতে হইবে। ইংলণ্ড ভারতবাসীর

প্রতিশ্রুতি দিল, যুদ্ধে জয়লাভের পর ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হইবে। মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেস নেতাগণ গভর্নমেন্টের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে লাগিলেন, বিপ্লবী নেতারা ভাবতে স-শস্ত্র বিপ্লবের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫ সনে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, লালমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাভাই নৌরজী, গোখলে প্রভৃতি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। তখন প্রতি বৎসর কংগ্রেস অধিবেশন বসিত, রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা হইত এবং সভার প্রস্তাব গভর্নমেন্টের নিকট পাঠান হইত। তখন ছিল আবেদন-নিবেদনের যুগ। আবেদন-নিবেদনে কোন ফল হয় নাই। ১৯০৫ সনে লর্ড কার্জন বাংলাদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন, ইহাই বঙ্গ ভঙ্গ। এই বঙ্গ ভঙ্গের প্রতিবাদে জাতীয় কংগ্রেস যে আন্দোলন সুরু করেন, তাহাই স্বদেশী আন্দোলন। কংগ্রেস নেতাদের ধারণা ছিল, ইংরাজ বণিকের জাতি, ভারতবাসী যদি বিলাতী পণ্য বর্জন করে, তবে ইহার ধাক্কা ইংলণ্ড লাগিবে এবং ইংলণ্ডের বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে হৈ-চৈ পড়িবে। ইংলণ্ডের বণিক সম্প্রদায়ের চাপে ভারত গভর্নমেন্ট ভারতবাসীদের দাবি মানিয়া লইতে বাধ্য হইবে। ১৯০৬ সনে কংগ্রেস অধিবেশনে বিলাতী পণ্য বর্জন প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন ময়মনসিংহ এর বিখ্যাত ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসু। স্বদেশী আন্দোলন ভারতের নব জাগরণ। বাংলাদেশই এই আন্দোলনের ঝড় প্রবল বেগে বহিতে ছিল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এবং বিপিনচন্দ্র পাল ভারতের সর্বত্র ঘুরিয়া প্রচার করিতে ছিলেন। বাংলাদেশের প্রতি শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে সভা-সমিতি হইতে লাগিল, দোকানে দোকানে পিকেটিং চলিল, যুবকের দল বিলাতী বস্ত্র সভায় পোড়াইতে লাগিল, বিলাতী লবণ ফেলিয়া দিতে লাগিল, পুলিশের লাঠিচার্জ চলিল, দলে দলে লোক গ্রেপ্তার হইতে লাগিল। ঐ সময় বাংলার নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, ললিতমোহন রায় (ঢাকা) আনন্দচন্দ্র রায় (ঢাকা), আনন্দচন্দ্র পাকড়াশী (ঢাকা), ডাঃ পি সি সেন (ঢাকা), কবি হরিচরণ আচার্য (নরসিংদী—ঢাকা), শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ঢাকা), অম্বিকা মজুমদার (ফরিদপুর), অশ্বিনীকুমার দত্ত (বরিশাল), মুকুন্দ দাস (বরিশাল), আনন্দমোহন বসু (ময়মনসিংহ) কৃষ্ণকুমার মিত্র (ময়মনসিংহ—সম্পাদক, সঞ্জীবনী, কলিকাতা) যাত্রামোহন সেন (চট্টগ্রাম), সুদর্শন চক্রবর্তী (রাজসাহী), সুরেন্দ্রমোহন সেন (জমিদার—রাজসাহী), অখিলচন্দ্র দত্ত (কুমিল্লা) হরদয়াল নাগ (চাঁদপুর—কুমিল্লা) কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী (জমিদার—গোলকপুর, ময়মনসিংহ), অনাথবন্ধু গুহ (ময়মনসিংহ) মহারাজ সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী (ময়মনসিংহ), হেমেন্দ্রকিশোর আচার্যচৌধুরী (জমিদার—ময়মনসিংহ), ডাঃ বিপিনবিহারী সেন (ময়মনসিংহ) প্রভৃতি। ঐ সময় বিলাতী বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী গ্রহণ নীতি গ্রহণ করা হইল। চারিদিকে স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিল। দেশী দ্রব্য সকলে ব্যবহার করিতে লাগিল। শহরে শহরে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। ৩০শে আশ্বিন রাখীবন্ধন ধার্য হইল। ঐ দিন প্রাতে স্নান করিয়া বিলাতী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণের প্রতিজ্ঞা করিতে হইত। ঐ দিন অ-রন্ধন ছিল। বৈকালে সভা ও শোভাযাত্রা হইত। ঐ সময় অনেক স্বদেশী গান রচিত হইয়াছিল। গভর্নমেন্ট দমন-নীতি প্রয়োগ দ্বারা স্বদেশী আন্দোলন দমন করিয়া দিল। ঐ সময় জাতীয় কংগ্রেস নরম ও গরম দলে বিভক্ত হইল ১৯০৭ সনে সুরাট কংগ্রেস অধিবেশনে। ইহার পর বৃটিশের দমন নীতি চলিতে লাগিল। দমন নীতির ফলে কংগ্রেসের নরম দল, গরম দল, কোন দলই অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। স্বদেশী আন্দোলনের বন্যায় ভাটা পড়িল। এখন আর "বন্দেমাতরম ও আল্লাহো আকবর" ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস আলোড়িত হয় না, চারিদিক নিস্তব্ধ, এখন সভা-সমিতি বন্ধ। যুবকের দল, যাহারা "বৃটিশের গোলামখানা" স্কুল কলেজ ছাড়িয়া আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল, সকলেই আস্তে আস্তে স্কুল-কলেজে ভর্তি হইতে লাগিল। তখন চারিদিকে নৈরাশ্য ও ভয় বিরাজমান ছিল। দেশের ঐ জাতীয় দুর্দিনে, অন্ধকার যুগে, বৃটিশের দমন নীতিকে তুচ্ছ করিয়া, ফাঁসি—দ্বীপান্তর, কারাদণ্ড—বেত্র-দণ্ড গ্রাহ্য না করিয়া একমাত্র ভারতের বিপ্লবী দল অনুশীলন সমিতি, রাজনীতি ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)
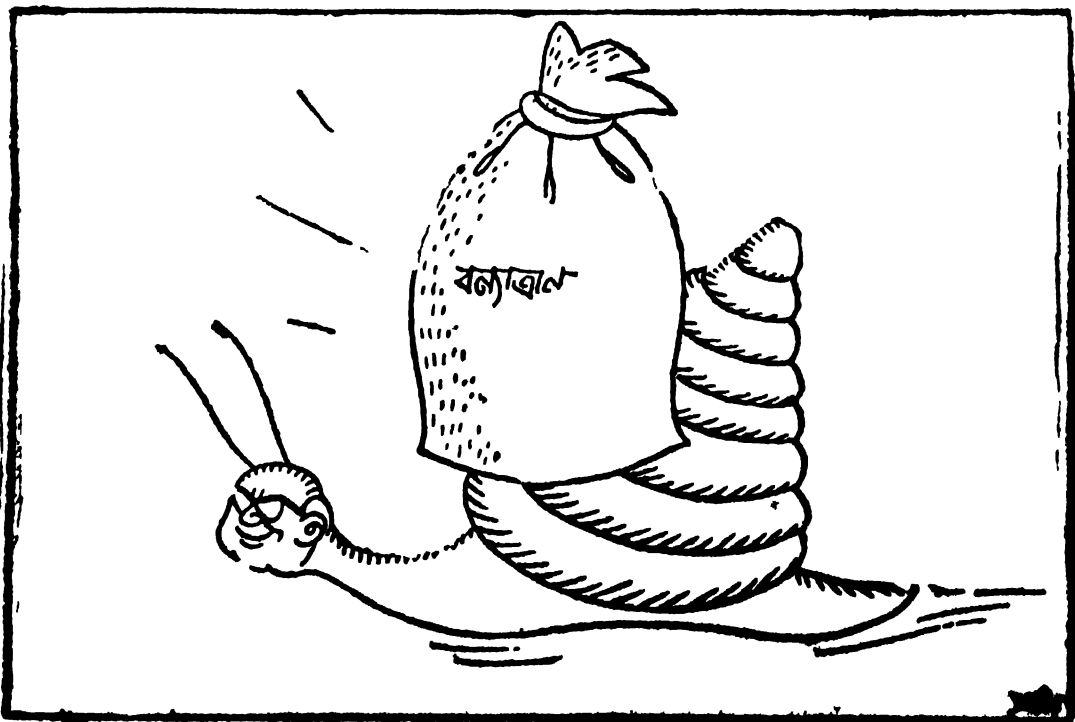
চতুর্থ পরিকল্পনার চতুর্থ।

উপ-প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফরের ফলে দেশের যে টাকাটা যাতায়াত ও থাকা খরচে উবে গেল সেটুকু যে সদ্ব্যবহৃত হয় নি, তা তাঁর সংগে প্রত্যাবৃত্ত শূন্য ঝোলাটি নাড়াচাড়া করলেই টের পাওয়া যাব। ইতিপূর্বে বিদেশী দান-অবদান ও ধারকর্জের জন্য অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীদের উড়ন্ত জাহাজ ভ্রমণ ঢের হয়েছে। এবার স্বয়ং ভ্রাম্যমাণ হয়েছিলেন উপ-প্রধান তথা অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই সাহেব। ফিরেছেন তিনি শূন্য হাতে। এবং ফিরে এসে সাড়ম্বরে ঘোষণা করেছেন, কিছু পাওয়া গেল না। বিদেশী দান সংগ্রহ করে যে দেওয়া যাবে না বিশেষ পশ্চিমী দেশগুলি থেকে তা অবশ্য দেশাই সাহেবের আগেই উপলব্ধি করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি বি[illegible]শ ভ্রমণের দ্বারা বাজারটা একবার বাজিয়ে আসাই শ্রেয় জ্ঞান করেছিলেন। তিনি যে বিমুখ হাতেই ফিরবেন এবং উন্নত দেশগুলির সম্পর্কে বড় মুখে বড় কথা বলার বড় একটা সুযোগ পাবেন না, তা অবশ্য অনেকেই জানতেন। শুধু যা না জানা ছিল তা হল এই যে এমতাবস্থায় পরিকল্পনার বোঝা নামানোর খেলাটা ঘটা করেই শেষ করা হবে। পরিকল্পনার শ্রাদ্ধ করা না হোক ছোট করে 'চতুর্থী' করার আয়োজন এখন প্রায় সমাপ্ত।

পরিকল্পনার প্রতি আ[illegible] টান ঠিক বর্তমান নেতাদের যে পুরোপুরি নেই, এমন সন্দেহও বহু মহলে দানা বেঁধেছে। তাই পরিকল্পনার কাজ অর্থাৎ 'শ্রাদ্ধ' করার অধিকারও এঁদের নেই। পরিকল্পনাটা এখন যেন স্বসংসার ছাড়া একটা পালনীয় কর্তব্যে এসে ঠেকেছে। সে কারণেও বর্তমান অবস্থাটাকে পরিকল্পনার শ্রাদ্ধ না বলে 'চতুর্থী' বলাই সম্ভবত সঠিক।

কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সভায় মুখ্যমন্ত্রীদের উপস্থিতিতে উপ-প্রধানমন্ত্রী জানান, লণ্ডন ওয়াশিংটনে তাঁকে বিশেষ আমলা দেওয়া হয় নি। ভারতের মত বড় দেশকে বিদেশীরা যেভাবে ভর্তি করে দেবেন বলে আশা করা গেছল, সে আশায় ছাই পড়েছে।

অবস্থা বিপাকে অগ্রাধিকারের পরিবর্তন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ যে 'অগ্রাধিকার' জাতির স্বার্থ এবং চাহিদানুসারেই স্থিরীকৃত হয় তা এদেশে বিদেশী বদান্যতার ওপরই একান্ত নির্ভরশীল।

সেচ ও শক্তির ওপরই অগ্রাধিকার দানের পক্ষে সি ডব্লু সি-র অনেকে একমত হন। পরে কংগ্রেস সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পার অভিমত অনুসরণে পানীয় জলের ব্যবস্থার ওপর অগ্রাধিকার দানের প্রশ্নটি সমর্থিত হয়। পাথুরে পাহাড়ে এলাকায় নলকূপ খনন করে এই ব্যবস্থা করা হবে।

বাইরের টাকা না পাওয়া গেলে ঘরের লক্ষ্মীর ঝাঁপিটিই উল্টে দেখতে হচ্ছে। তবে ডেফিসিট ফিন্যান্সিং-এর প্রতি দেশাই সাহেবের আগ্রহ মোটেও নেই। তবে তিনি পুনশ্চ মজুরীবৃদ্ধি বন্ধের তাঁর সেই ভৌতিক দাবিটির প্রেতাত্মাকে মঞ্চে এনে নাচিয়ে দিতে এখনো উৎসাহ বোধ করছেন। অন্তর্চাপ বাড়িয়ে অর্থ সংগ্রহের জন্য। যে মানুষের হাতে গ্রাসাচ্ছাদনের মতো পয়সাও নেই কর্তারা তাঁদের ব্যাঙ্ক ইনসুর্যান্স, পোস্টাফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা জমাবার পরামর্শ দেবেন।

কিন্তু অর্থের অপচয় বন্ধ করা, মাথাভারি অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন করা এবং মুনাফাশিকারের অর্গলহীন পথে সংগ্রহের জাল পাতা—সমাজতন্ত্র ভাঁড়িয়ে দেশের বর্তমান নেতৃত্ব নিশ্চয় এই সমুদয় উৎসের সন্ধান জেনেও কিম্বা চাপ পড়েও করবেন না। পরিকল্পনার চতুর্থী পর্ব নমো নমো করেই সারা হবে।

কেরালা সরকারের বিরুদ্ধে
ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি

কেরালার রাজ্য কংগেস সভাপতি কার্যকরী কমিটির সদস্য এবং কংগ্রেস পরিষদীয় দলের প্রধান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচাবন, উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীদেশাই ও কংগেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই মুহূর্তে কেরালার দুর্বিনীত যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে বরখাস্ত করার জন্য আবেদন জানান।

বস্তুত মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদ বড় বেশিদূর এগিয়ে গেছেন। যে চ্যবন সাহেবের আদেশে তামাম ভারতবর্ষে হাজার হাজার কেন্দ্রীয় কর্মীর চাকরী যাচ্ছে অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ মানুষের (কর্মী পরিবারের) গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, তেমন এক প্রতাপান্বিত মন্ত্রীমহোদয়ের সব ক্ষমতা গ্রহণের প্রিন্সিপলটাকে নাম্বুদ্রিপাদ এককথায় [illegible] দিতে চেয়েছেন। তিনি [illegible], রাজ্য সরকার সংসদের আদেশ মাথা পেতে নিতে বাধ্য, কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর খেয়ালখুশিকে রূপায়িত করার বাধ্যবাধকতা তিনি স্বীকার করেন না।

এতবড় ভারতবর্ষে কেন না একটি দ্বীপের মতন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তাঁর এই শাসনতন্ত্র ব্যাখ্যা অচল, কেন না বাকি রাজ্যগুলি যেখানে মাথা পেতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর শাসনই মেনে নিয়েছেন তখন তিনিই একমাত্র সংসদের নির্দেশকেই নির্দেশ বলে ধরে বসে থাকবেন কেন? কেরলা রাজ্য কংগ্রেসের স্বভাবতই উত্তেজিত [illegible]ধ করার কারণ আছে। এই দুর্বিনীত সরকারটিকে প্রশ্রয় দেওয়া হলে কেরালার পদাঙ্ক অনুসরণে অন্যত্র কোনও যুক্তফ্রণ্ট সরকার (আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচনে পুনশ্চ যুক্তফ্রণ্ট সরকার দেখা দিতে পারে) যদি রাজ্য ক্ষমতার প্রশ্ন তোলেন তাহলে শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট ঘনিয়ে উঠবে। ইতিমধ্যেই পাঞ্জাবে দুই আকালি দলের ঐক্যবদ্ধ সম্মেলনের নেতা সন্ত ফতে সিং-ও রাজ্যের অধিক [illegible] স্বায়ত্তশাসন দাবি করেছেন। চাবন [illegible] এইসব ব্যাপার বাড়তে দেবেন অথবা অংকুরে বিনাশ করবেন।

চাবন সাহেবের উত্তর, এখন অবস্থা পরিপক্ক হয়ে ওঠে নি। মহার্ঘতা থাকলেই যথাসময়ে সব ঠাণ্ডা করা হবে।

তাছাড়া কেরালা রাজ্য কংগ্রেস তো কেবল কেরালার কথাই চিন্তা করছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতাদের তো ভারতের মানচিত্রটিকে সামনে রেখেই শাসন করতে হবে।

সামনেই চার-চারটি রাজ্যে মধ্যবর্তী নির্বাচনের হাওয়া বইছে। [illegible] কেরালাকে শাসন করা [illegible] হতে পারে। তাছাড়া গণতন্ত্র [illegible] কেরালারও মধ্যবর্তী নির্বাচন [illegible] সেই মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস কি বেরিয়ে আসতে পারবে? এইসব জটিল ব্যাপারগুলির ফয়সালা না হলে দুম করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পক্ষে কেরালা শাসনও সম্ভব নয়।

সুতরাং ততক্ষণ পর্যন্ত নাম্বুদ্রিপাদও আট-ঘাট বেঁধে তাঁর বোধবুদ্ধি প্রয়োগ করে যাবেন। কেরালা কংগ্রেসের উতলা হলে চলবে কেন?

পাঞ্জাব:

মধ্যবর্তী নির্বাচন এবং মতদ্বন্দ্বের রফা নিষ্পত্তি

ভারতবর্ষের সমস্ত রাজনীতিটাই নির্বাচন মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ছে নাকি এমন সন্দেহ ক্রমেই সাধারণের মনকে আক্রান্ত করতে শুরু করেছে। সম্প্রতি মধ্যবর্তী নির্বাচনকে সামনে রেখে পাঞ্জাবের দুই প্রতিযোগী শিখ দল, সন্ত আকালি এবং মাস্টার দল-এর একীকরণ এই সন্দেহকে আরও ঘনীভূত আরও স্পষ্ট করে তুলল।

এ পর্যন্ত ঐ দুই দলকে দুই বিবদমান প্রতিযোগী গোষ্ঠী বলেই শুধু নয়, দুই বিপরীত কোটির মত ও লক্ষ্যের পরিপোষকরূপেই সকলে জানতেন। কিন্তু বর্তমান একীকরণের চূড়ান্ত রূপ আকার গ্রহণ করার পর সন্তজী যখন বললেন: আমার 'মিশন' এতদিনে সার্থক হল। তখনই রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকগণ তাঁদের নিচে আঙুল বোলাতে বোলাতে ভাবতে শুরু করলেন তাই তো, সন্তজীর এহেন 'মিশন' যে তাঁর এতদিনের রাজনীতির নেপথ্যচারী গুপ্ত বাসনা ছিল, কৈ সে কথা তো একবারও মনে হয় নি। এখন এই অসবর্ণ মিলনে তাঁদের কূটনৈতিক দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, পাঞ্জাব রাজ্যে এই মিলন নব দক্ষিণী [illegible] সৃজন করে আনছে; কেন না সন্ত আকালি দলের সব রকম প্রগতিশীল চিন্তা এবার উল্টো খাতে বইতে শুরু করল। দরিদ্র শিখগোষ্ঠীর ভরসাস্থল সন্ত আকালি মুখ ফেরালেন সুযোগসন্ধানী সমাজের দিকে।

বাতালার পুরোনো নগরে গৃহীত [illegible] নিখিল ভারত আকালি সম্মেলনের সাত-দফা প্রস্তাবের আপেক্ষিক চরিত্র দক্ষিণী গণতান্ত্রিক দলগুলির বৈশিষ্ট্যকেই ধারণ করে আছে।

সপ্তম দফায় সৎ দুর্নীতিমুক্ত এবং [illegible] একটি সরকার জনগণকে উপহার দেওয়ার সেই মামুলী প্রতিশ্রুতি দান করা হয়েছে, যে সরকার [illegible] পেয়ে সাধারণের উপকারার্থে এই ধারায় [illegible]

পাঞ্জাবের ভারী শিল্প গঠনে [illegible] নেওয়া; কৃষি ও শিল্পখাতে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা; অনুন্নত ও তপশীলভুক্ত জাতিগুলির সর্বথা উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখা ইত্যাদি। আকালি দলের চেষ্টা হবে পাঞ্জাবী ভাষাভাষী এলাকাগুলিকে (চণ্ডীগড়-ভাকরা-নাঙ্গাল সহ) পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত করা এবং গুরুমুখী হরফে পাঞ্জাবীর উন্নতি ও উৎকর্ষসাধন।

একরকম এই সাত-দফাই আকালি দলের নির্বাচনী ইস্তাহার বলে গ্রহণ করা যায়। এই ইস্তাহার কোন সমস্যারই মূলে পৌঁছতে নারাজ। কৃষির ক্ষেত্রে ঋণভার বাড়িয়ে কৃষি-উন্নতির প্রচেষ্টা ছাড়া কোনও নতুন চিন্তার গন্ধ নেই।

আকালি দল অবশ্য আরও স্বাধীন, গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষপাতী। ভারতের শাসনতন্ত্রে রাজ্যের স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার আরও বিস্তৃত করার দাবি আছে তাঁদের।

বাতালা সম্মেলনেই মাস্টার দলের সঙ্গে একীকরণের আশা ব্যক্ত হয়েছিল। অথচ মাস্টার দলের বিচ্ছেদমূলক চিন্তার সঙ্গেই সন্তজীর উদার দৃষ্টিকোণের পার্থক্যই একদিন এই দুই দলকে ভিন্ন কোটিতে বিভক্ত রেখেছিল। ক্রমে সন্তজীর সেই ঔদার্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কি পরিবর্তন শুরু হয়েছে। দরিদ্র শিখ-সমাজের ভরসাস্থল আকালি দলে কি সুযোগ-ভোগীদের পাল্লাই শক্ত হয়ে উঠল; আর সে কারণেই কি বিচ্ছিন্নতাকামী মাস্টার দলের সঙ্গে অতীতের চিন্তা প্রভাব বিস্তার করল আকালি দলে?

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকমহলের ধারণা এই পশ্চাদপসরণের সূত্র রয়েছে গিল মন্ত্রিসভার পতনের পর মধ্যবর্তী নির্বাচনের পথ পরিষ্কৃত হওয়ায়। নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার শিখরে গিয়ে পৌঁছনোর জন্য ভারতব্যাপী যে রাজনৈতিক তৎপরতার সৃষ্টি হয়েছে তা যেন দুই চোখে ঠুলি পরে ছ্যাকরা গাড়ির ঘোড়ার মতো নির্বাচনী চাবুকে নাক-বরাবর ছুটে চলেছে মাত্র।

সন্ত আকালি ও মাস্টার দলের [illegible] যাত্রাও সেই লক্ষ্যাভিসারী। অন্যতর কোনও [illegible] রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের ইঙ্গিত এ-যাত্রায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

আকালি-মাস্টার ঐক্য [illegible]

আকালি ও মাস্টার দলের একীকরণে দক্ষিণী শক্তি উল্লসিত হয়ে উঠলেও, প্রদেশ কংগ্রেস প্রধান শ্রীজৈল সিং কিন্তু এই অসবর্ণ সংযোগকে দেশের স্বার্থের পক্ষে 'ভয়াবহ' বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি মনে করেন, এই সংযোগ কেবলমাত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং সাম্প্রদায়িক শক্তির [illegible]

[illegible] সংযোগ শুধু পাঞ্জাবেই 'না', [illegible] সংকটের ইশারা।

[illegible] আশংকা করেন যে, আকালি-ঐক্য আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসী ক্যাম্পে [illegible] প্রভাব বিস্তার করবে না। নির্বাচনী [illegible] জন্য প্রদেশ কংগ্রেসের গৃহীত পরিকল্পনাদি একই রকম থাকবে।

আকালি-ঐক্যে পাঞ্জাবের দুই রাজনৈতিক কোটি, প্রগতিশীল শিবির ও দক্ষিণপন্থী শিবিরে স্বভাবতই আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। বলা বাহুল্য প্রগতিশীল শিবির এই মিলনকে খুব প্রীতির চোখে দেখছেন না। অন্যদিকে দক্ষিণী শিবির মুক্তকণ্ঠে আকালি মিলনকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

হরিয়ানা:

বংশীলাল-বর্জন প্রচেষ্টার ইতি

হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবংশীলালকে সরানোর জন্য ভগবৎদয়াল গোষ্ঠীর প্রচেষ্টার সরাসরি ইতি করে দিয়েছেন কংগ্রেস কার্যকরী পরিষদ।

হরিয়ানার পরিষদীয় দলে শ্রীভগবৎদয়ালের অনুরাগীবৃন্দের সংখ্যা পনের। এঁরা চেয়েছিলেন ক্ষমতাসীন বংশীলাল মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের অধিকার। বংশীলালের মন্ত্রিসভা থেকে তিনজন সদস্যও পদত্যাগ করে রাজ্যে এক নয়া মন্ত্রিত্ব সংকটও উপস্থাপিত করেছিলেন। কিন্তু সি ডব্লু সি না দিলেন দয়াল দলকে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি, না মানলেন বংশীলালকে দিয়ে নতুন করে আস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করানোর পরামর্শ। উল্টে এখন সি ডব্লু সি শ্রীযুত ভগবৎদয়াল শর্মার বিরুদ্ধেই হয়ত কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন দলীয় নিয়মানুবর্তিতা ভঙ্গ করার চেষ্টার জন্য।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা মন্তব্য করেছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তনে কংগ্রেসের ক্ষমতার খুঁটিই দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তারই প্রভাব দেখা দেবে চার-চারটি রাজ্যের আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনের ওপর।

এখন সাজানো বাগানে নতুন করে [illegible] ফসল উঠবে না এটা তো সাধারণ কথা; কিন্তু ভগবৎদয়ালদেরও এটাই সুবর্ণসুযোগ সময়। যতভাবে সম্ভব চাপ সৃষ্টি করে সুযোগ-সুবিধা ও ক্ষমতা করতলগত করার এটাই আসল মুহূর্ত। দয়াল দল তাই সহজে চুপ করবেন না। আর রাজ্য কংগ্রেসের দলাদলি ও ভাঙন [illegible] অন্যান্য রাজ্যের মধ্যবর্তী নির্বাচনে কম-বেশি প্রভাব বিস্তার করবেই।

কিন্তু ভগবৎদয়াল শর্মার বিরুদ্ধে নিয়মানুবর্তিতাভঙ্গের ব্যবস্থা গ্রহণের [illegible]

জিব্রাল্টারে হ্যারল্ড উইলসন
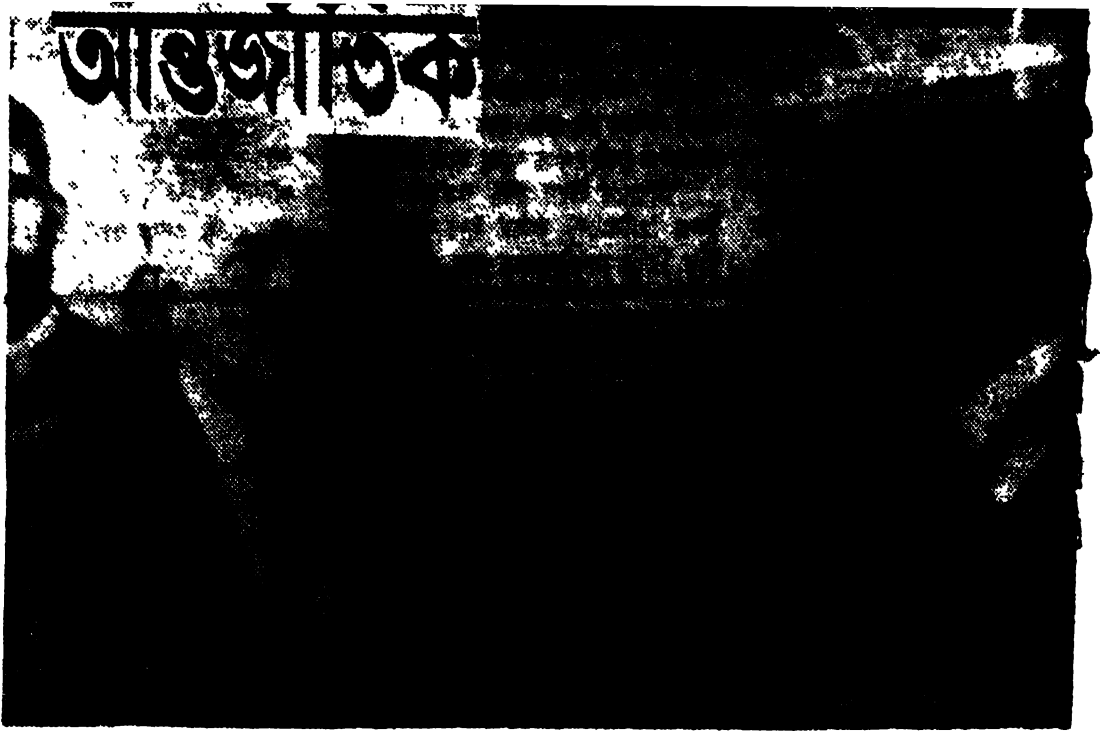
রোডেশিয়া :

দ্বীপের নাম জিব্রাল্টার, জাহাজের নাম 'ফীয়ারলেস'। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী দু' নেতা হলেন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন আর রোডেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আয়ান স্মিথ। উইলসনের সঙ্গে রয়েছেন কমনওয়েলথ সেক্রেটারী জর্জ টমসন এবং এ্যাটর্নি-জেনারেল স্যর এলউইন জোনস। আর স্মিথকে সহায়তা করার জন্যে এসেছেন বিচারমন্ত্রী ডেসমণ্ড লাউনার বার্ক, নতুন প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন হাউম্যান। বৃটেন-স্বীকৃত রোডেশিয়ার গভর্নর স্যর হামফ্রে গিবসও আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন।

কিন্তু কী আলোচনা? গত তিন বছর ধরে ইঙ্গ-রোডেশিয়ার সম্পর্কে একটা তথাকথিত অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মিঃ উইলসন খানিকটা চাপে পড়ে খানিকটা লোক দেখানোর জন্যে সেই অচলাবস্থার অবসান ঘটানোর জন্যে মিঃ স্মিথের সঙ্গে আপোষ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। অচলাবস্থাটা কী নিয়ে? তিন বছর আগে বৃটিশ নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে মিঃ আয়ান স্মিথ একতরফাভাবে রোডেশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। বৃটিশ সরকার রোডেশিয়ার সেই সরকারকে স্বীকার করে নেন নি। অথচ রোডেশিয়া বৃটিশ কমনওয়েলথের সদস্যরাষ্ট্র। স্মিথ যে সরকারের এখানে প্রতিষ্ঠা করেছেন তা আসলে একটা সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গদের বেআইনী সরকার। রোডেশিয়ায় কৃষ্ণাঙ্গদের সংখ্যা ৪০ লক্ষ, কিন্তু সরকার গঠনে

> ## সাপ্তাহিক বসুমতীর আগামী আকর্ষণ
>
> চেকোশ্লোভাকিয়া এখন সঙ্কটের মধ্যে দুঃখে। শ্রীমতী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেকোশ্লোভাকিয়ায় গেছেন; জেনেছেন সেখানের ইতিহাস, ঐতিহ্য, কিংবদন্তী; মিশেছেন সেখানের সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে। লেখিকাকে মুগ্ধ করেছে সেখানের প্রকৃতির অপরূপ প্রাকৃতিক সম্পদ।
>
> শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'অতীতের দেশে' ধারাবাহিক লেখায় সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়াকে বর্তমান রাজনৈতিক পটভূমিতে এমন সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন—যা সবাইকে বিস্মিত বিমুগ্ধ ও পুলকিত করবে।

তাদের কোন ভূমিকা নেই। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গরা যাদের সংখ্যা মাত্র দু' লক্ষ। সংখ্যাগুরু কৃষ্ণাঙ্গদের বাদ দিয়ে এমন কি তাদের ভোটাধিকার থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত করে যে-সরকার এখানে মিঃ স্মিথ গড়েছেন গণতন্ত্রের দেশ বৃটেন তাকে কী করে অনুমোদন করে? তাই বৃটেন মিঃ স্মিথের কাছে বার বার প্রস্তাব করেছে কৃষ্ণাঙ্গদের সরকারে নেবার জন্যে। কিন্তু মিঃ স্মিথ বার বার সে প্রস্তাব তাচ্ছিল্যভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বৃটেন তখন রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবরোধের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেয়। অর্থাৎ বাহ্যত রোডেশিয়া কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্র হলেও বৃটেন তাকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দিতে পারছে না বলেই একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সেই অবস্থার উন্নতি ঘটাবার জন্যেই দুই প্রধানমন্ত্রী মিলিত হয়েছেন জিব্রাল্টারে বৃটিশ রণতরী 'ফীয়ারলেস'-এ।

কিন্তু এ আলোচনা কি কিছু সুফল প্রসব করবে? কারণ গোড়া থেকেই মিঃ স্মিথ যে অনমনীয় মনোভাব অবলম্বন করে আসছেন তার কোন পরিবর্তন ইতিমধ্যে ঘটে নি। মিঃ স্মিথ বার বার মিঃ উইলসন বা বৃটেনের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি বৃটেনকে তোয়াক্কাই করেন না। সেই তিন বছর আগে যখন মিঃ স্মিথ দেশে নতুন আইন জারি করে সংখ্যাগুরু কৃষ্ণাঙ্গদের সমস্ত নাগরিক এবং রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেন, তখন বৃটেন তাতে আপত্তি

জানিয়েছিল এবং মিঃ স্মিথকে সে আইন প্রত্যাহার করে নেবার নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু সে নির্দেশে কোন কর্ণপাত করেন নি মিঃ স্মিথ। তারপর এখানে নতুন আইন অনুযায়ী নির্বাচন হল যাকে নির্বাচন না বলে প্রহসন বলাই ঠিক। কারণ, এ আইনে কৃষ্ণাঙ্গদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় নি। তাদের প্রার্থী দাঁড়াবার অধিকার দেওয়া হয় নি। বরং কৃষ্ণাঙ্গদের সমস্ত রাজনৈতিক পার্টি, সংগঠন বে-আইনী করে দেওয়া হয়েছিল। বৃটেন এ অগণতান্ত্রিক নির্বাচনেরও প্রতিবাদ করেছিল। কিন্তু মিঃ স্মিথ সে প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে যথারীতি নির্বাচন করালেন এবং নতুন শ্বেতাঙ্গ সরকার গঠন করলেন।

মিঃ স্মিথ বৃটেনের কাছে স্বাধীনতা চেয়ে আসছেন কিছুকাল থেকেই। কিন্তু যেহেতু স্বাধীনতা বলতে তিনি কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্বের স্বাধীনতা বোঝাতে চেয়েছেন, সেহেতু গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী বৃটেন তাতে প্রকাশ্যে রাজী হতে পারে নি। স্মিথও দমবার পাত্র নন, তিনি বৃটেনের অনুমতির তোয়াক্কা না করেই একতরফাভাবে রোডেশিয়াকে স্বাধীন ঘোষণা করেছিলেন। বৃটেন কী করতে পেরেছেন?

হ্যাঁ, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী কিছুর লম্ফঝম্ফ করেছিলেন। তিনি মিঃ স্মিথকে এই বলে শাসিয়েছিলেন যে, রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করা হবে। জবাবে মিঃ স্মিথ বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন যে, বৃটেন যদি রোডেশিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে না নেয় তবে রোডেশিয়া কমনওয়েলথের বন্ধন ছিন্ন করবে, নিজেকে সে একটা প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করবে। সারা বিশ্ব মাসের পর মাস ধরে দেখল সিংহ-মূষিকের লড়াই, কথার বা বিবৃতির লড়াই। কোন বৃটিশ সৈন্য বৃটিশ ভূমি ছেড়ে রোডেশিয়ায় যায় নি, একটা বুলেটও ব্যয় হয় নি বৃটিশ প্রতিরক্ষাদপ্তরের।

অবশ্যই বৃটিশ সরকার অন্য কায়দায় [illegible] করতে চেষ্টা করেছেন। রাষ্ট্রসংঘ [illegible] করতে চেষ্টা করেছেন। রাষ্ট্রসংঘে বৃটেন রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে সদস্য-রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক অবরোধনীতি গ্রহণ করে, তার [illegible] করেছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। [illegible]

রোডেশিয়াকে ভাতে মারতে চেয়েছিল থাকলেও মিঃ স্মিথ দু' বেলা দিব্যি চর্বচোষ্যলেহ্যপেয় দিয়ে চালিয়ে গিয়েছেন, কিছুর অভাব ঘটে নি রোডেশিয়ার অর্থনৈতিক অবরোধের কারণে।

এত কাণ্ডের পরেও বৃটেন আবার রোডেশিয়ার সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসেছে। বসেছে এমন একটি সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে যে-সরকার বৃটেনকে কোন মর্যাদা দিতেই রাজী হয় নি। গত বছর যখন তিনজন আফ্রিকান নেতাকে ফাঁসির নির্দেশ দেন রোডেশিয়ার হাইকোর্ট, তখন বৃটিশ রাণী এলিজাবেথ নেতাদের প্রাণ ভিক্ষা দেন, ফাঁসির হুকুম মকুব করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু কমনওয়েলথভুক্ত রোডেশিয়া রাণীর আদেশ

আয়ান স্মিথ

পর্যন্ত মানতে রাজী হয় নি। কৃষ্ণাঙ্গ নেতাকে যথারীতি ফাঁসিতে লটকে বৃটিশ সার্বভৌমত্বকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেবার স্পর্ধা দেখিয়েছেন। বৃটিশ সরকারের প্রতি এ-অভাবনীয় অবমাননার কী প্রতিকার বৃটেন করেছে?

সেই উদ্ধত রোডেশিয়া সরকারের সঙ্গে আবার আলোচনায় বসেছেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী। এবং দু' বছর আগে একই জিব্রাল্টারে একই আলোচনা ব্যর্থ হবার পরেও। তা ছাড়া মিঃ উইলসন যেভাবে আলোচনায় উদগ্র হয়ে জিব্রাল্টার ছুটে গেলেন তাতে মনে হচ্ছে যেন মহম্মদ না গিয়ে পর্বতই মহম্মদের কাছে ছুটে গিয়েছেন। মিঃ উইলসনের মনে অবশ্য

প্রগতিশীল দুনিয়ার কাছে পরিষ্কার। সারা দুনিয়ার বিশেষত আফ্রিকার এবং রোডেশিয়ার কৃষ্ণাঙ্গ নেতারা স্পষ্ট বলেই দিয়েছেন যে, কৃষ্ণাঙ্গদের বাদ দিয়ে রোডেশিয়ার বে-আইনী সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোন আলোচনাই হতে পারে না। তাঁরা এ কথাও বলেছেন যে, মিঃ উইলসন একটা লোক-দেখানো আলোচনা বৈঠক করছেন বটে, তবে এতে কোন সুফলই পাওয়া যাবে না।

তবে মিঃ উইলসন আলোচনায় বসলেন কেন? বসলেন এ জন্যে যে, তাঁকে বৃটেনের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে। বৃটেন রোডেশিয়ার সংখ্যালঘু সরকারের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারেন না, কারণ সংখ্যালঘু হলেও সেটা শ্বেতাঙ্গ সরকার, বৃটেনের শাসকদের গায়ের চামড়া যে রঙের রোডেশিয়ার সরকারী নেতাদেরও একই রঙ যে। ঘটনাটা যদি উল্টো হত অর্থাৎ যদি রোডেশিয়ার আজ সংখ্যাগুরু শ্বেতাঙ্গদের ওপর সংখ্যালঘু কৃষ্ণাঙ্গ শাসন প্রতিষ্ঠিত হত, তবে সে সরকার যতই ভাল কাজ করুন না কেন, বৃটেন সে রোডেশিয়ার ওপর এ্যাটম বোমা ফেলতেও বোধ হয় দ্বিধা করতো না।

গায়ের চামড়ার স্বার্থ ছাড়া বৃটেনের অর্থনৈতিক স্বার্থও রয়েছে রোডেশিয়ায়। বৃটেন জানে যে রোডেশিয়া হয়ে বৃটেনে যে জাম্বিয়া থেকে অতি প্রয়োজনীয় তামার আমদানী হয়, তা বেশিদিন চলবে না, যদি ইতিমধ্যে রোডেশিয়ার ওপর থেকে অর্থনৈতিক অবরোধের প্রাচীর না ভেঙে ফেলা হয়। তা ছাড়া বাজার হিসেবে রোডেশিয়াকে একেবারে খরচার খাতায় ফেলে রাখলেও বৃটেনের প্রচণ্ড ক্ষতি। বিশেষ করে বৃটেনের রক্ষণশীল দল রোডেশিয়ার সঙ্গে বিবাদটা মিটিয়ে ফেলার জন্যে সরকারের ওপর চাপ দিচ্ছে। এ অবস্থায় মিঃ উইলসনের জিব্রাল্টার না ছুটে গত্যন্তর কোথায়? এমন কি রোডেশিয়ার কাছে বৃটেন যে ছটা নীতির প্রস্তাব দিয়েছেন সেগুলোও মিঃ স্মিথ মেনে নেবেন বলে মনে হয় না। কারণ প্রথম দফার ১০৫ মিনিটের বৈঠকে মিঃ উইলসন ওই ছ' দফা নীতির প্রথম দুটো মিঃ স্মিথকে দিয়ে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করছিলেন। অর্থাৎ মিঃ উইলসন বলেছেন সংখ্যাগুরু সরকার গঠনের পথ মিঃ স্মিথকে পরিষ্কার করতে হবে এবং আফ্রিকানদের অধিকার খর্ব করার নীতিকে বাতিল করতে হবে। অর্থাৎ মিঃ উইলসন এরই মধ্যে অনেকটা সুর নরম করেছেন, কাজেই শেষ পর্যন্ত মিঃ স্মিথ যদি মিঃ উইলসনের কোন প্রস্তাবই মেনে না নিয়ে জিব্রাল্টার ত্যাগ করেন, তাতে কি বিস্ময়ের কোন অবকাশ থাকবে?

৩। মার্কিন কবিতা : ১৯০০—৫০ : আধুনিকতার চরিত্র

এডউইন আর্লিংটন রবিনসন কিংবা রবার্ট ফ্রস্ট, চেষ্টা করেছিলেন, মার্কিন দেশের মানুষ তথা তাঁদের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও ব্যর্থতার সঙ্গে একটা সংযোগ স্থাপন করবার। মার্কিন দেশেরই মানুষের সঙ্গে। অথচ বোধ হয় বলা যায়, বিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিকতা আধুনিকতার অপরিহার্য লক্ষণ। একই ধরনের যন্ত্র ও উপকরণের প্রয়োগে সারা পৃথিবীর উৎপাদন ব্যবস্থা একই ধাঁচে গড়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে সারা পৃথিবীর মানুষও। কবিতাতেও মার্কিন মানুষকে ছেড়ে মানুষের কথা বলবার তাগিদ আসে। শুধু তা-ই নয় ঊনবিংশ শতাব্দীর ওয়র্ডস-ওয়র্থ, শেলি, বায়রন, কীট্‌স্‌-এর কীর্তির সঙ্গে জড়িত রোমান্টিক কাব্যধারার বিরুদ্ধেও ভাবনা শুরু হয়েছিল। এজরা পাউণ্ডের তাত্ত্বিক বন্ধু টি ই হিউম (১৮৮৩—১৯১৭) ঘোষণা করেন, রোম্যান্টিক কবিতার কাল বিগত ; প্রকৃতি, প্রেম, ধর্ম, আদর্শ, মানুষ নিয়ে ভাবাবেগ-সর্বস্ব কবিতা পরিহার করে ধ্রুপদী কবিতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময় এসেছে : "দুটো মতাদর্শ আছে। এক, মানুষ আদতে ভালো ; ঘটনাপরিবেশই তাকে নষ্ট করে। অন্যমতে মানুষ আদতে সীমিত, শৃঙ্খলা ও ঐতিহ্যের কড়া শাসনেই সে মোটামুটি ভদ্রগোছের হয়ে ওঠে। এক দলের কাছে মানবচরিত্র কুয়ো, অন্যদলের কাছে বালতির মত। যে দৃষ্টি-ভঙ্গি থেকে মানুষ কুয়োর মত, সম্ভাবনায় পূর্ণ এক আধার, সেই দৃষ্টিভঙ্গিতেই আমি বলি রোম্যান্টিক ; অন্য যে দৃষ্টি-ভঙ্গি থেকে মানুষ সসীম ও স্থানকাল-নির্দিষ্ট শ্রেণী মাত্র, আমি তাকেই বলি ধ্রুপদী।......রোম্যান্টিক কবি মানুষকে অসীম ভাবেন বলেই সব সময় অসীমের কথা বলেন ; এবং যেহেতু মানুষের যা করতে পারা উচিত বলে মনে হয় এবং মানুষ যা পেরে ওঠে, এ দুয়ের মধ্যে একটা তিক্ত দ্বন্দ্ব থাকবেই, এই কবিতাও তাই অন্তত শেষের দিকে কিছুটা বিষণ্ণ হবেই।......ধ্রুপদী কবিতায় কল্পনার সব-চেয়ে দুরন্ত আকাশচারিতার মধ্যেও একটা পিছুটান থাকে, সংযমবোধ থাকে। ধ্রুপদী কবি কখনই মানুষের সসীমতা কিংবা সীমাবদ্ধতা বিস্মৃত হন না। তিনি সর্বদাই স্মরণ রাখেন, মানুষ মর্ত্যেরই অঙ্গ। মানুষ লাফিয়ে উঠতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে মাটিতেই ফিরে আসতে হয়, মানুষ কখনই বহুধাবিস্তীর্ণ কোন বায়বীয় লোকে উড়ে যেতে পারে না।" রোম্যান্টিক কবিতার "ঘ্যানঘ্যানানি" পরিহার করে "শুষ্ক ও কঠোর" কবিতার, "সাধারণ দিনের আলোয়" দেখা জীবনের, "ক্ষুদ্র, কঠিন বস্তুর" সৌন্দর্য আবিষ্কারের এবং "সঠিক, যথাযথ ও স্পষ্ট বর্ণনা"র যে দাবি হিউম তুলেছিলেন, ইমেজিস্ট কবিতার ধারায় তার প্রথম স্বাঙ্গীকরণ ঘটে।

১৯১২ সালে এজরা পাউণ্ডের লেখায় ইমেজিজম-এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। ইমেজ বলতে এই কবিরা যা বুঝতেন তা হল অভিজ্ঞ-তার একটি টুকরোকে ভাষার সতর্ক প্রয়োগে এমন জীবন্ত করে তুলে ধরা, যাতে ভাষায় নির্মিত এই প্রতিমা তার আত্যন্তিক স্বকীয়তায় খাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। আবেগ বা অনুভবের অনির্দিষ্টতা পরিহার করে যথাসম্ভব বস্তুলগ্ন অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে পারলে পাঠকের মন সেই অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করতে পারে, তাকেই চিন্তা বা কল্পনার প্রস্থানক্ষেত্র করে নিতে পারে। ১৯১৮ সালে লেখা এক প্রবন্ধে এজরা পাউণ্ড

এজরা পাউণ্ড

ওয়ালেস স্টীভেন্‌স্

এই কবিতার চরিত্র নির্দেশ করেন : "এই কবিতা যতটা সম্ভব গ্র্যানিট পাথরের মত কঠিন হবে, এর সত্যভাষণের মধ্যেই এর ক্ষমতা নিহিত থাকবে, এর জীবনকে তাৎপর্য দেবার মধ্যেই......। আমি যা বলতে চাই, এই কবিতা বাক্‌সৌকর্যের বাহ্যাদম্বরে কিংবা বেপরোয়া উচ্ছ্বাসাতিশয্যে ক্ষমতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করবে না। ......আমি চাই, কবিতা হবে সাত্ত্বিক, প্রত্যক্ষ: আবেগের পিচ্ছিলতা থেকে মুক্ত।"

ইমেজিস্ট কাব্য আন্দোলনের সূচনায় এমি লাওয়েলের (১৮৭৪-১৯২৫) কবিতায় বাক্‌প্রতিমার এই ঋজু স্পষ্টতা লক্ষ করা যায় : "আমি কি পাগল হলাম, না কি নিতান্ত ক্লান্ত./রেলের লাইনের ওপারে নীল সমুদ্রের বাঁকা ঘের/কেন আমার অতর্কিত সুরের মত তীক্ষ্ম মধুর লাগে./ শহরের চৌমাথায় সবুজ গাছের মাথা ছাড়িয়ে ওঠা শাদা গির্জার ছবি/কেন আমার চোখকে আবিষ্ট করে, যেন পার্থেনন।/স্পষ্ট, সংযত, অভাবনীয় চূড়ান্ত/তার সারিবাঁধা স্তম্ভের এক একটায় কী সতর্ক সৌজন্য./দুর্বল গাছগুলো ওদের দাপটে বিনম্র./মিনারের ঊর্ধ্বগতি/শীতল অলজ্জ,/অবাধে পৌঁছেছে আকাশে।/কী অদ্ভুত মিলনভূমি/পাহাড়ের বিবর্ণ শিখরে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে/আমি দেখলাম সেই মিনার আকাশে ব্যাপ্ত/আকাশের চঞ্চলতায় আপন পা টলে ওঠে./আমি যেন দেখছি জাহাজের মাস্তুল/তার পালের স্ফীত চাঁদোয়া/পাগলের মত লড়ছে বাতাসের সঙ্গে।/আমি যেন দেখছি চায়ের হালকা জাহাজ/নীল উপসাগরে ঢুকছে./সদ্য ফিরেছে ক্যান্টন থেকে/সবুজ নীল চিনেমাটির বোঝা নিয়ে./বোলডের উপর ঝুঁকে পড়ে এক চীনা কলি/শাদা গম্বুজের দিকে তাকিয়ে/নিষ্প্রাণ, সম্ভ্রমে শ্রান্ত দৃষ্টি।"

শাদা বক্র, ঋজু কিংবা কাঠামোর ভঙ্গিমা অনুধাবনের এই পদ্ধতির সঙ্গে গোগ্যাঁ ভ্যান গগ দেগা প্রমুখ শিল্পীদের ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রধর্মের যোগ আছে। এই ফরাসি শিল্পীরাও বস্তুর বাহ্যিক চরিত্রকে যথাসম্ভব স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছিলেন। আলোর উপর জোর দিতে গিয়ে তাঁরা রঙের স্বীকৃত যে চরিত্র বর্তমান, তাকে বারবার ভেঙেছেন, রঙে রঙে মিশিয়ে বা একই রঙকে বিকৃত করে তাঁরা বিচিত্র সব রঙ রচনা করেছেন। বস্তুর সাত্ত্বিক চরিত্রকে স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করার এই প্রবণতা শেষ পর্যন্ত প্রায় অনিবার্যভাবেই যথাযথতার এক যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হয়। ফরাসি ইমপ্রেসনিস্ট চিত্রকলায় ও মার্কিন ইমেজিস্ট কবিতায় উভয়তই এই একই পরিণতি ঘটে।

পাউন্ড কবিতার জটিলতর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রবেশ করলেন। কিন্তু এমি লাওয়েল বয়ে গেলেন ইমেজিস্ট কাব্যসাধনায়। পাউন্ড খোঁটা দিয়ে বললেন, ইমেজিজম্‌ হয়ে দাঁড়াল এমিজিজম্‌।

ইমেজিজম্‌-এর যথাযথতা কাটিয়ে উঠতে গিয়ে পাউন্ড বিভিন্ন ধরনের কবিতার অনুবাদে হাত লাগান—ত্রোভাদোরের ফরাসি প্রেমের কবিতা, প্রোপারটিউসের ল্যাটিন কবিতা, চীনা কবিতা, গীদো কাভালকান্তির ইতালীয় কবিতা, অ্যাংলো স্যাক্সন কবিতা, গ্রীক কবিতা, র‍্যাঁবো-লাফোর্গের সাংকেতিক কবিতা, এমন কি কালীমোহন ঘোষের ইংরেজি ভাষ্য থেকে কবীরের দোহাও অনুবাদ করেছেন। অনুবাদকালে আক্ষরিকতার পরোয়া না করে কবিতার এই বিভিন্ন ধরনগুলিই তিনি ইংরেজি ভাষায় আনবার চেষ্টা করেছেন। ফলে তাঁর নিজের কবিতাও প্রায়ই এমনি কোন ধরনের মধ্যে গড়ে উঠেছে। বিশেষত চীনা কবিতার ধরনে : "রেশমের খড়খড়ানি আর শোনা যায় না./ উঠোনে ধুলো উড়ছে./পায়ের শব্দ নেই. আর বাশিকৃত পাতা/উড়ে এসে জমছে, পড়ে থাকছে/ আর সেই মেয়ে যে হৃদয়কে নন্দিত করেছিল, সে রয়েছে ওদেরই নিচে : / চৌকাঠে লেগে আছে একটা ভিজে পাতা।" কিংবা, "ভিড়ের মধ্যে মুখগুলোর বিদেহী মূর্তি : / ভিজে কালো ডালের গায়ে ফুলের পাপড়ি।" কিংবা আরো দুরূহ সেই অদ্ভুত কবিতা 'প্যাপিরাস' : "বসন্ত ঋতু /আরো কত দিন /গংগুলা...।" প্রথম দৃষ্টিতে এই শব্দযোগ কবিতাটি সহসাই মনে হয়। ধ্রুপদী বিদ্যায় পণ্ডিত গিলবার্ট হাইএট রহস্যভেদ করেছেন। ইজিপ্‌ট্‌-এর গ্রীকভাষী গ্রামগুলির মাটির নিচ থেকে পনেরো কি বিশ শতাব্দীর পুরনো প্যাপিরাস ঘাসের কাগজে লেখা কিছু পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। এই ছেঁড়া টুকরোগুলিতে পাওয়া টুকরো কবিতার আদলেই পাউন্ডের এই কবিতা। গ্রীক মহিলা কবি স্যাফো-র (খৃঃ পূঃ ৬১২) কবিতায় গংগুলার নাম/ পাওয়া গেছে। গংগুলা ছিলেন স্যাফোর ছাত্রী ও প্রিয়পাত্রী. স্যাফোর আবেগ ও আর্তিই এই কবিতার ভিত্তি।

কাব্যশিক্ষার এই স্বনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় পাউন্ড প্রবীণতর য়েটস্‌-এর কবিতা (পাউন্ড ১৯১৩ থেকে ১৯১৬ সাল প্রতি বছর শীতকালে "উইলিয়ম খুড়োর ব্যক্তিগত সচিবের" দায়িত্ব পালন ক'রেছিলেন) সংস্কার করেছেন. টি. এস্‌. এলিয়টের 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর আয়তন খর্ব করেছেন ('গেরনশিয়ন' কবিতাটি পাউন্ডই 'দি ওয়েস্ট ল্যান্ড' থেকে বাদ দিয়েছিলেন), জয়েসের প্রথম উপন্যাস প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন. হেমিং

ভয়ের সঙ্গে যুদ্ধের দেখতে পেয়েছেন। অন্য সমকালীন লেখকদের সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে পাউণ্ড তাঁদের সাহিত্যরীতি আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তীকালে পাউণ্ড তাঁর নিজস্ব কাব্যভঙ্গি লাভ করেছেন 'হিউ সেলউইন মবারলি' ও 'ক্যানটোজ' দীর্ঘ কবিতায়। 'মবারলি' পাউণ্ড লিখেছিলেন নিজেকে নিয়ে গণ্ডপিণ্ডের সভ্যতার সঙ্গে তাঁর নিজের বিরোধকে উপলক্ষ করে : "তার যুগ দাবি করেছিল/অতিশায়িত মুখভঙ্গির প্রতিরূপ,/একেলে মঞ্চে যা তরে যায়, এমন কিছু,/অ্যাটিক সুষমা তো কিছুতেই নয়;/না, সে কিছুতেই নয়,/অন্তরের দিকে ফেরানো দৃষ্টির/সেই অন্ধকার কল্পনা;/ধ্রুপদী কাব্যের গদ্যানুবাদের চেয়ে/ঢের ভালো সমূহ মিথ্যাচরণ!/'যুগ দাবি করেছিল' প্লাস্টারের ছাঁচ,/ত্বরিতে তৈরি,/গদ্যে রচিত চলমান ছবি, আলাবাস্টার নয়, কিছুতেই নয়,/কিংবা ছন্দের 'ভাস্কর্য'!" [উদ্ধৃতিচিহ্নের নির্দিষ্টতায় এক-একটি কথায় জোর দেওয়ার রীতি লক্ষণীয়।] 'ক্যানটোজ'-এর প্রথম দিকে গ্রীক পুরাণলোক ও প্রাচ্যজগতের প্রাচীন কাহিনী ও চরিত্রাবলী দুই ভিন্ন রীতির স্বাতন্ত্র্যে পরিবেশিত হয়, এবং সেই প্রাচীন পর্বের সঙ্গে ইদানীন্তকালের সংঘর্ষ রচিত হয়। 'ক্যানটোজ'-এর শেষ দিকে আরো বিচিত্র সাহিত্যস্মৃতির সমাহারে একটা যেন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের চেষ্টা চলে, যৌনতার আকর্ষণ ও ফ্যাসিবাদের মাহাত্ম্য দুই-ই ক্রমশ কবিকে আচ্ছন্ন করতে থাকে। পাউণ্ডের পরবর্তী পরিণতি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বেতারে ফ্যাসিবাদী প্রচারকর্ম ও যুদ্ধান্তে প্রথমে উন্মাদাশ্রমে আশ্রয়লাভ পরে মুক্তি ও ইতালিতেই বসতি স্থাপন। ১৯৫৬ সালে সোফোক্লেসের একটি নাটকের অনুবাদ ('ট্রাকিনায়ে') তাঁর সাম্প্রতিকতম প্রকাশিত রচনা। একদা গুণগ্রাহী সমালোচক এফ আর. লীভিস বলেছেন : "পাউণ্ডের অধঃপতন দেখা এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতা একে আর কোন রূপে দেখার ভান যেন কেউ না করেন."

পাউণ্ড সিদ্ধান্ত করেছিলেন, "এক দেড়শো বছরের রোগই ছিল নির্বস্তুকতা।" অথচ ওয়ালেস স্টীভেন্স্ (১৮৭৯-১৯৫৫) যেন সেই নির্বস্তুক কবিতা—"মনেরই ক্রিয়ার যে কবিতা", "কিসে তৃপ্তি, তারই সন্ধানে মনেরই ক্রিয়ার যে কবিতা"—রচনা করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাই বলে কোন বাস্তব-বিরাগ তাঁর প্রেরণার উৎস নয়। 'চরম কল্পনার কথায়' ('নোট্স্ টুওয়ার্ড্স্ এ সুপ্রীম ফিক্শন') নামে দীর্ঘ কবিতায় স্টীভেন্স্ খুঁজেছিলেন সেই "চরম কল্পনা" যা অবলম্বন করে মানুষ অর্থপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে। কবিতাটি তিনটি অংশে বিভক্ত। এই তিনটি অংশের নাম—"সে হবে নির্বস্তুক"; "সে হবে পরিবর্তনশীল"; "সে হবে সুখদ"। "হবে" বোঝাতে স্টীভেন্স্ 'মাস্ট্' কথাটি ব্যবহার করেছেন—অর্থাৎ 'হবেই'। স্টীভেন্স্ মেনেছেন, কবিতা ও আমাদের যাবতীয় ধারণার উৎস আমাদেরই বাস্তব অতীত ও বর্তমান; গভীরতম সত্যের উৎস বাস্তবেই; বাস্তবকে আমরা আমাদের অধিকারে আনতে পারি, কবিতার মধ্য দিয়েই: সবচেয়ে বড় নির্বস্তুক সত্য তা হল ব্যক্তি মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন মানবতার নির্বস্তুক চেতনা; এই চেতনা "কল্পনা দেবে না কোন পরিত্রাতা [illegible] দেবে না, শুধুই নিজেকে ঘোষণা করবে।" এই চেতনাই কবি উদ্ধার করেন, "কল্পনার দেবভাষার সঙ্গে জনতার ভাষাকে যুক্ত করে"। অন্যত্র স্টীভেন্স্ লিখেছেন : "আমরা যা খুঁজি/তা বাস্তবের বাইরে নয়। তারই মধ্যে/ সবকিছু..." কিংবা "বাস্তবই চেতনার যথার্থ কেন্দ্র।" বাস্তবের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, মানুষের কল্পনা, মানুষের বিশ্বাসের সমগ্র গভীর অন্তর্লোকই স্টীভেন্সের কবিতার প্রসঙ্গভূমি. তাঁর কাব্যভাষাও এই বিরোধাত্মক মানসলোককে ধারণ করে। তাঁর কবিতা তাই গভীরতর অর্থে মননের কবিতা, নির্বস্তুকের কবিতা।

ওয়ালেস স্টীভেন্স্ যেমন বিশেষের মধ্যে কেবল নির্বস্তুক সত্যকেই সন্ধান করেছেন, ই. ই. কামিংস্ (১৮৯৪—১৯৬২)। মুখ্যত বিচ্ছিন্ন বিশেষের কবি। বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র কোন অভিজ্ঞতার নিশিতায় পৌঁছতে চান বলে কামিংস ভাষাকে বহুভাবে ভেঙেছেন, এক-একটি শব্দকে ভেঙে টুকরো-টুকরো করে দিয়েছেন একই শব্দকে ভেঙে তার টুকরোগুলিকে একাধিক ছত্রে ছড়িয়ে দিয়েছেন বড় হরফের অক্ষর দিয়ে ছত্র শুরু করার রেওয়াজ বর্জন করেছেন। কামিংসের

[illegible]

সারা দিন কালো মেঘের করাল ভ্রূকুটি;
তরাই-এর নিবিড় জঙ্গলে, তিস্তার নীলাভ জলোচ্ছ্বাসে
আলোর দিকে মুখ ফেরানো শিশুচারার উজ্জ্বল মুখে
আর সুখ-দুঃখের বাটালি ছেনির ঘায়ে রেখায়িত
মাটির মানুষগুলোর ইতিহাসে নামে
তার নিস্পন্দ ভয়াল ছায়া।
তবু ঘরের দাওয়ায় বসে বুড়ো চাষীটা স্বপ্ন দেখতে চায়।
টুকরো টুকরো ইচ্ছার শাণিত কাস্তে দিয়ে
স্বপ্নের সোনালী ফসল সে কেটে তোলে
বুকের মরাই ভরে।
তার কানে এখনও বাজে আগমনীর বাজনা
চোখে ভাসে ধূপের ধোঁয়া
মনে দোলে চন্দনের গন্ধ।
আর ঝুলে-পড়া কুঞ্চিত মুখে ফুটে ওঠে সাদা ফুলের হাসি।
ফসল উঠবে ঘরে, ক্ষুধার্ত মানুষ অন্ন পাবে
আর অফুরন্ত রোদের উষ্ণতা
তার বার্ধক্যের হিমশীতল অনুভবে হাত রাখবে
ছাই এর মতো, ভালবাসার মতো।

আকাশ ভেঙে হঠাৎ বৃষ্টি নামে অঝোরে
বিষণ্ণ ঘাসের বুকে।
নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্ন ঘরের তক্তপোষে ঘুমের কোলে শুয়ে
তখনও জেগে দেখা স্বপ্নের হাতের তুলি
আরও রঙ চড়ায়।
হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ তারই মত মানুষ
ঘুমিয়ে পড়ে একই স্বপ্ন দেখে, একই বিশ্বাস নিয়ে—
জীবনের হাত ধরেই তারা ভবিষ্যতের
দিকে এগোবে।

মেটে প্রদীপের ক্ষীণ সলতের পরমায়ু ফুরিয়ে গেলে
অন্ধকার নেমে আসে ঘরের দেওয়ালে।
খড়ের চালে একটানা জলের শব্দ।
এত বৃষ্টি! এত বৃষ্টি।
ঘুমন্ত মানুষগুলোর নিশ্বাসের শব্দ ছাপিয়ে
জলের উচ্ছল বেপরোয়া মাতাল পায়ের
অন্তহীন শব্দ।
বুড়ো চাষীটা তবুও ভাবে
কাল আকাশছোঁয়া পাহাড়ের মাথায়
মোরগফুলের মত টকটকে লাল সূর্য উঠবেই।

হঠাৎ প্রচণ্ড গর্জনে ভয়ের স্রোত নামল
তার শরীরে, মনে—তার সর্বাঙ্গে।
কি উদ্দাম ঢেউ, কি শীতল বরফগলা
তার ছোঁয়া।
দারুণ শব্দ করে মৃত্যু কি এমনিভাবেই জীবনের
বাঁধন ছিঁড়তে চায়?
বুড়ো চাষীটা ভালো করে কিছু বোঝার আগেই
ঢাক ঢোল পিটিয়ে বেজে উঠল
অনন্ত বিসর্জনের বাজনা।

কবিতার কৌতুক ও প্রচণ্ড গভীর উত্তেজনা ভাষাকে নিয়ে এমনই বেপরোয়া ছিনিমিনি খেলেছে যে অনুবাদে তার স্বাদ পাওয়া যাবে না। কামিংসের মেজাজ চড়া যৌবনের মেজাজ, শারীর প্রেমের তাৎক্ষণিক আর্তি ও সার্থকতায় উচ্ছ্বসিত, জীবন সম্পর্কে এক আদিম জৈব আসক্তিতে তিনি যেন সব চিন্তা সব তত্ত্বকথাই অবহেলা করতে পারেন। শুধু শুনলে বা পড়লেই নয়, ছাপার হরফে চোখে দেখলেও কামিংসের কবিতার উদ্দাম দুরন্তপনা বোঝা যায়। মাঝে মাঝে অবশ্য তারই মধ্যে এমন ছত্রও আসে: "আমি যেন আর কাউকে দেখতে পেলাম/সেই নারী, যার নাম অতঃপর/সে বসে আছে তরুণ মৃত্যুর পাশে, সেই তন্বী;/সে ভালোবাসে ফুল।" কিন্তু এহেন ছত্র কামিংস-এর কবিতার ব্যতিক্রম। শারীর অনুভূতির তীব্রতাই তাঁর কবিতার সাধারণ সুর; ফলে তাঁর ভাষা শ্লীলতার বিধিনিষেধও প্রায়শই অগ্রাহ্য করে।

ছাপার হরফে মেরিয়ান মুরের (১৮৮৭—) কবিতাও অনেকটা কামিংসের কবিতার মত লাগে। ছত্রের শুরুতে বড় হরফ নেই: ছত্রকে কবিতার সূত্র না ধরে স্তবককে কবিতার সূত্র ধরায়, প্রায় গদ্যপাঠের মধ্যেই অতর্কিত ছন্দের রেশ আনার সাধনায় শব্দ প্রায়ই ভেঙে একাধিক ছত্রে বিচ্ছিন্ন। মেরিয়ান মুর প্রায়ই লেখেন পশুপাখি সম্পর্কে; জীববিজ্ঞানের তথ্য ও প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ, উভয়কেই তিনি মেলান, কাব্যগঠনের অত্যন্ত সযত্ন শৃঙ্খলায়, খুঁতখুঁতে কারু-কার্যে। অনেকের মনে হয়, মেরিয়ান মুরের কবিতা "আনন্দ দেয়, শুধু বুদ্ধিজারিত, সংবেদনশীল ও সুন্দর রচনা বলেই নয়, বরং পাঠকের মনে এই বিশ্বাস আনে যে যে-মানুষটি এই-গুলি রচনা করেছেন, সেই মানুষটি বড় ভালো লোক, এই কারণেই।" বিষয় নির্বাচনে উদারতা ও আপাত অকাব্যিককে গ্রহণ করে যথাযথতার নিষ্ঠা মেরিয়ান মুরের আধুনিকতার লক্ষণ।

"বস্তুতে ছাড়া ভাব নেই"—এই নাটকীয় কথাটি বলেছিলেন উইলিয়ম কার্লস উইলিয়মস্ (১৮৮৩—)। উইলিয়মস্ কাব্য আঙ্গিকে হুইটম্যানের অনুগামী, কবিতাকে "সামাজিক উপকরণ" বিবেচনা করেন: "আমরা যা কিছু, কবিতা তার সবকিছুকেই নিয়ে। একথাও মানেন, "যে-কোন কবিতাপদবাচ্য কবিতাই কবির সমগ্র জীবনকে প্রকাশ করে। কবি কী, তারই পরিচয় দেয়।" এখনও জীবিত বর্ষীয়ান কবি-দের মধ্যে জন ক্রো র‍্যানসম (১৮৮৮—) ও অ্যালেন টেট (১৮৯৯—) সমালোচক হিসেবেই বেশি মাননীয়। হুইটম্যানের ধারায় এখনও আর্চিবল্ড্ ম্যাক্‌লীশ (১৮৯২—) কবিতা লিখে থাকেন।

পথ কে রুখবে?

মনোজ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ বাইশ ॥

নমাজের পর লাখ লাখ মানুষের মৌন মিছিল। মিছিল হাইকোর্টের কাছাকাছি গেছে—গুলী। গুলী, গুলী—মাথা ফাটল, হাত পা ভাঙল কতজনার। মারাও গেল কত। সদরঘাটে পুনশ্চ লাঠিচার্জ। মিছিল ভাঙে না।

পরের দিন সকালবেলা মানুষ তাজ্জব হয়ে দেখে, মেডিকেল কলেজ হস্টেল-গেটের পাশে ছেলেরা রাতারাতি শহীদ মিনার তুলে ফেলেছে। সেই রাত্রে যেখানে যত ফুল ফুটেছিল, সমস্ত বুঝি কুড়িয়ে এনে মিনার সাজিয়েছে। উদ্বোধন করলেন শহীদ সফিউরের বাপ। তার চেয়ে মানী মানুষ ঢাকা শহরে আজ কে আছেন? বাঙালি মাত্রেই এক—মুসলমান-হিন্দু নেই, নারী পুরুষ নেই, বয়সের বাছবিচার নেই, দলে দলে মিনারের সামনে প্রতিজ্ঞা নিতে আসছে। ভয় পেয়ে গেল সরকার পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে: মিনার চুরমার করে দাও। সেটা বড় সহজ নয়, ছাত্র পুলিশ লড়াই। তিন দিন ধরে চলল। তিন দিন বাদে ভাঙল সেই ইটের মিনার

[illegible] মিনার ভেঙেছে তোমার ?

[illegible]

আমরা এখনো চার কোটি পরিবার।"

[illegible] লিখেছেন :

তারা পঞ্চাশজন আজ নেই—

তারা [illegible] সেই অমর শহীদদের জন্য

তাদের প্রিয় মুখের ভাষা বাংলার জন্য

এক চাপ পাথরের মতো—

এক হয়ে গেছি,

হিমালয়ের মতো অভেদ্য বিশাল হয়ে গেছি।"

একুশে ফেব্রুয়ারি এসে পড়ল। পূর্ব-বাংলার মস্তবড় পরব। ঝাণ্ডাওয়ালা প্রমথ বিশ্বাস চলল সেখানে। যত ঝামেলাই থাকুক, অবশ্যই সে এই সময়টা। তিনটে-চারটে দিনের জন্য হলেও যাবে। প্রণব ও রঞ্জন দত্ত এসে বসেছে। রঞ্জন দত্ত পরিচয় দিয়েছিল প্রণবের—বাপ-পিতামহর ভিটে বিনিময় করে নিশ্চিন্ত হয়েছে প্রণবরা।

প্রমথ খিল-খিল করে হাসে: খাসা করেছেন—সম্পর্ক ঘুচিয়ে দিয়েছেন, কখনো আর যাতে যেতে না হয়। জন্তু-জানোয়ার থাকে সব সেখানে। কাছে পেলেই টপ করে মুখে পুরে ফেলবে। খবরদার, খবরদার—ও-মুখো ভুলেও যাবেন না।

পাকিস্তানের কাগজ একগাদা বের করে আনল। শ্রীধর মল্লিকের বাড়ি কোথায় কি আছে, প্রমথর জানা। বলে, পড়ে পড়ে দেখুন তো মানুষের বদলে বাঘ না ভালুক না কুমির—কী সব ঘর-বসত করে সেখানে। চেঁচিয়ে পড়ুন, সবাই যাতে শুনতে পান।

॥ মাইকেল জন্মোৎসব ॥

গত ২৭ জানুয়ারি যশোর বি, সরকার মেমোরিয়াল হলে সন্ধ্যা সাতটায় যশোর তথা বাংলার গৌরব মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মোৎসব উদযাপিত হয়। সাহিত্যালোচনা ও গীতি বিচিত্রার মাধ্যমে মহাকবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন হয়। স্বরচিত কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেন মিস সলিমা শহিদ ও মীর আবুল হোসেন। কবির বিভিন্ন রচনা হইতে আবৃত্তি করেন মনীর আকতার। কবি অবলাকান্ত মজুমদার রচিত মধুগীতির গানের উপর ভিত্তি করিয়া শেখ হাসানউদ্দিন একটি গীতিনক্সা গ্রন্থন করেন। উহাতে অংশ গ্রহণ করেন—এম, জি হায়দার, শাহ মোহাম্মদ [illegible] ও গৌরগোপাল তালদার।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য গত ২৬ জানুয়ারি বেলা দুই ঘটিকার যশোর শহর হইতে আঠাশ মাইল দূরে কপোতাক্ষ নদীতীরে সাগরদাঁড়ি গ্রামে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের গৃহ-প্রাঙ্গণে কবির জন্মদিবস উপলক্ষে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়......

প্রমথ বিশ্বাস বলে, আরো শুনুন। এ বছর বলে নয়, ফি বছর বছর বছর হয়ে থাকে। পাকিস্তান হাসিল হওয়া ইস্তক। হাটে হাটে চাঁদা তোলে, যার যেমন সাধ্য দিয়ে দেয়—এক আনা থেকে এক টাকা। লেখক মানুষ, বিশেষ করে বাংলা বই যাঁরা লেখেন—পীর-পয়গম্বরের সামিল তাঁরা সকলের কাছে। সাগরদাঁড়ি যাওয়ার বড্ড কষ্ট ছিল আগে। বিশেষ করে শেষ ছয় মাইল। পথ ঘাট ছিল না—এর ঘর-কানাচ দিয়ে ওর ভুঁইয়ের আইল দিয়ে জঙ্গল-জাঙ্গাল ভেঙে উঠতে হত। এখন সোজা সড়ক বানিয়ে দিয়েছে—মাইকেল রোড। চোখ বুজে চলে যান মধুপল্লী [illegible]। সাহিত্য-অনুষ্ঠানে গিয়ে উঠবেন।

যানও তাই লোকে। বিশেষ [illegible] কবির জন্মদিনে যে [illegible] বসে সেইদিন। মেলা [illegible]। এক দিনের পথ [illegible] অনেকজন পায়ে হেঁটে হেঁটে আসে। [illegible] গাড়িতে আসে মেয়েলোক ও ছেলেপুলেরা। গাছতলায় রাঁধাবাড়া করে খায়। দত্তবাড়ির আশেপাশে অস্থায়ী দোকানপাট বসে। হিন্দু হোক মুসলমান হোক গ্রামের যে বাড়িতে যাবেন আদর যত্ন ও সাধ্যমতো অতিথসেবা করবে। এত কষ্ট করে আসে—বেশির ভাগই কিন্তু নিরক্ষর। মাইকেলের কবিতা পড়া দূরস্থান—অ-আ ক-খই পড়তে পারে না। তবু আসে তারা কবির মজবে—আমাদেরই জাতের কবি মাইকেল বলে দেমাকে মটমট করে।

সংবাদের পর সংবাদ পড়ে যাচ্ছে প্রণব:

॥ সিরাজগঞ্জে সরস্বতী পূজার প্রস্তুতি ॥

আগামী ৬ ফেব্রুয়ারির তারিখে সিরাজগঞ্জে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠানের জন্য স্থানীয় হিন্দু ছাত্রগণ বর্তমানে তোড়জোড় করিতেছেন। শহরের প্রায় সব কয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই প্রতিমা উঠিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতার তুলনায় নিজেদের প্রতিমাটি

সুন্দরতর করিয়া তুলিবার জন্য হিন্দু ছাত্রগণের মধ্যে এক প্রকার প্রতিযোগিতা শুরু হইয়াছে। ...

॥ ঈদের বাণী ॥

মাহে রমজান বিদায় লইয়াছে এবং ঈদের আনন্দ সম্মুখে লইয়া মুসলিম জাহান প্রহর গণিতেছে। রোজার ফাজিলত ও ঈদের অনুষ্ঠানের গূঢ় ইঙ্গিত সারা অন্তর দিয়া মুসলমানকে উপলব্ধি করিতে হইবে। মাহে রমজান ছিল রিয়াযের মাস, সংযমের মাস, সাধনা ও এবাদতের মাস। একটি মাস ভরিয়া উপবাসী আমরা পানাহার বর্জন করিয়া চলিয়াছি। সারাদিন লোভ, মোহ, লালসা, ভোগ, অসংযমকে কঠোর শক্তি ও দৃঢ়তায় দমন করিয়াছি, এবং পরাজিত করিয়া চলিয়াছি। হিংসা দ্বেষ কাম ক্রোধ নীচতা হীনতা প্রভৃতি সকল পাপাচারকে সাধনার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে দাহন করিয়াছি।

নীলকণ্ঠ বর্মা বই থেকে মুখ তুলে বললেন, একুশে ফেব্রুয়ারি এসে যাচ্ছে—তবে বাংলা পড়ুন কিছু। সে তো আমাদেরও নিজেদের বাংলা কথা বলি যারা বাংলা বই পড়ি।

সশব্দে নিশ্বাস ফেলে আবার বললেন, আরও একদিন আছে—উনিশে মে। কজনেই বা মনে রেখেছে।

॥ চিরস্মরণীয় একুশে ফেব্রুয়ারি ॥

ভুলতে পারি নে একুশে ফেব্রুয়ারিকে। একুশে ফেব্রুয়ারি পূর্ববাংলার মানুষের কাছে এক রক্তাক্ত শপথ আর সুদৃঢ় ঘোষণা: বাংলাভাষার মৃত্যু নেই। যে ভাষাকে ভালবেসে জীবন দিয়েছে বরকত সালামেরা সে ভাষা আমাদের জীবনের চেয়েও প্রিয়—

পাঠে সহসা বাধা পড়ল। বাধা দিলেন সুধী প্রবীণ পণ্ডিত নীলকণ্ঠ বর্মা। প্রণবের কণ্ঠের অনুকৃতি করে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, যে ভাষাকে ভালবেসে কমলা-সুকমল-সুনীলেরা জীবন দিয়েছে, সে ভাষা আমাদের জীবনের চেয়ে প্রিয়। বাংলা ভাষার মৃত্যু নেই—

যত জন ছিল মল্লিকের বৈঠকখানায়, সমস্বরে অচঞ্চল দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল, বাংলা ভাষার মৃত্যু নেই!

মুখের উচ্ছ্বাস মাত্র! উচ্ছ্বাসের কতটুকু মূল্য! আপনার আমার ট্যাক্সের লাখ লাখ টাকা নিয়ে বাংলা এবং অপরাপর রাজ্য-ভাষার অপমৃত্যুর জন্য যারা চক্রান্ত-জাল বিস্তার করছে, তাদের কি আসে যায় হাজার কয়েক মানুষ গলা ফাটিয়ে চেঁচাল, কি শ' কয়েক প্রাণ বিসর্জন দিল ভাষার নাম নিয়ে? ভারত-ভাগ্যবিধাতা মহাপুরুষেরা নিরাপদ ব্যবধানে পরম নিশ্চিন্তে আছে।

প্রণব চুপ করে গিয়েছিল। ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে আবার শুরু করল:

একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির বিজয়ের দিন। সূর্য ওঠার আগেই রমনার পথ প্রভাতফেরীর গানে গানে মুখরিত হয়ে উঠবে। ভোর হতে না হতে দলে দলে সবাই আসবে শহীদ স্মৃতিস্তম্ভের পাদদেশে। বাংলা ভাষাকে ভালবাসার, জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাকে বরণের প্রতিজ্ঞা নিয়ে তারা এগিয়ে যাবে আজিমপুর গোরস্থানের দিকে। সেখানে তারা ফুলে ফুলে ঢেকে দেবে ভাষা শহীদদের কবর। কামনা করবে তাদের আত্মার অক্ষুব্ধ শান্তি। তারপর আবার সমবেত হবে শহীদ-মিনারের পাদমূলে। ভাষা-সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ফুলের পাপড়ি দিয়ে সাজাবে সেই মিনার। বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব এটাই। সভা হবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রয়োগে গড়িমসি নীতির নিন্দা করে দাবি জানানো হবে বাংলা ভাষার পরিপূর্ণ মর্যাদা-দানের

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের জন্য প্রদেশব্যাপী সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। কালো পতাকা উত্তোলন, কবর জিয়ারত, নগ্নপায়ে মিছিল, জনসভা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভার মাধ্যমে প্রদেশের ছাত্র জনতা শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন একুশে ফেব্রুয়ারির পবিত্র স্মৃতির প্রতি। এই উপলক্ষে ঢাকার কর্মসূচী: ভোর পাঁচটায় সকল বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে ও ইস্কুল কলেজে কালো পতাকা উত্তোলন। ভোর ছ'টায় আজিমপুর গোরস্থানে জিয়ারত ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন। সাতটায় গোরস্থান থেকে খালিপায়ে মিছিল। নটায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জনসভা। দুপুর দুটায় কার্জন হলে আলোচনা সভা। সন্ধ্যা সাতটায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়াও সকাল দশটায় বুলবুল ললিতকলা একাডেমিতে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হবে। অধ্যাপক অজিত-কুমার গুহ, জনাব আহম্মদ শরিফ এবং জনাব সালাউদ্দিন মোহাম্মদ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবেন। তারপর ছাত্র-ছাত্রীদের দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের আসর বসবে।

রঞ্জন দত্ত ওরফে রমজান আলি 'পূর্ব-দেশ'-এর সংখ্যা টেনে নিয়েছিল। সে বলে, ঢাকার বৃত্তান্ত শুনলেন—পূর্ব-বাংলার যা হল মাথা-শহর। মফস্বলের খবরাখবর নিন—রংপুরের মতন জায়গাতেও কি হচ্ছে, শুনুন:

॥ রংপুরে 'বাংলা চালু কর' অভিযান শুরু ॥

১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকার রাজপথ ছাত্র জনতার বুকের রক্তে রাঙা হয়েছিল, সেই একুশে ফেব্রুয়ারির স্মরণে রংপুরের ছাত্রসমাজের উদ্যোগে 'বাংলা চালু কর' অভিযান শুরু হয়েছে। যতদিন পর্যন্ত বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে পূর্ণ বাস্তব মর্যাদা লাভ না করে, ততদিন পর্যন্ত নিম্নোক্ত কর্মসূচী পালন করে বাংলা ভাষার পূর্ণ মর্যাদা দান করার জন্য পাকিস্তান ছাত্রশক্তির পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয় (১) সদাসর্বদা বাংলায় কথা বলা, (২) সাইনবোর্ড ক্যাসমেমো হ্যান্ডবিল-পত্র নামফলক ইত্যাদি বাংলায় লেখা, (৩) মোটর সাইকেলের নম্বর বাংলায় লিখা, (৪) পত্র নিমন্ত্রণপত্র ঠিকানা ইত্যাদি বাংলায় লিখা।

রাষ্ট্রভাষা বাংলা শুনে [illegible] কানে [illegible] মন ভরে গেল [illegible] মাতৃভাষার [illegible] বিধা মাত্র [illegible] পার [illegible] গিয়ে। এখানে [illegible] বাংলা ভাষা—হিন্দীর রথচক্রের তলায় গুঁড়িয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় যখন। [illegible] সাধনা [illegible] ঐশ্বর্য অপরিমেয়—[illegible] তার হিসাব নিতে যায়! গণতন্ত্র মুড়ি মিছরির এক দর—শুধুমাত্র ভোটের বিচার। অতএব হিন্দী বিজয়ী চেয়ারম্যানের কাস্টিং ভোট তার দিকে। কাস্টিং ভোটই যখন চূড়ান্ত মীমাংসা চেয়ারম্যান তেমন তেমন ক্ষেত্রে [illegible] দিকেই [illegible] ভোট দিয়ে [illegible]। অলিখিত বিধি হল তাই। ভাবতে বিপরীত। দেশমান্য রাজেন্দ্র-প্রসাদের শাস্ত্রের তারিফ করি—সুভাষচন্দ্র বিতাড়নের সময় তিনিই অগ্রবর্তী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কলকাতা পৌরসভার ঘোর কলঙ্ক-রাজেন্দ্রপ্রসাদের নামে আজও একটা রাস্তা হল না।

নীলকণ্ঠ বর্মা উঠে দাঁড়ালেন। গাছপালার ফাঁকে খানিকটা ফাঁকা মাঠ, এবং মাঠের ওপারে আবার গাঁ গ্রাম দেখা যায়। আঠারো বছর আগে এ গাঁয়ের মানুষ হাট করতে যেত ও-গাঁয়ে, ও-গাঁয়ের ছেলে-পুলে মাঠ ভেঙে নিত্যিদিন এ গাঁয়ের ইস্কুলে আসত। কী করে দিল কলমের খোঁচায়! যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, বাংলা ভাষা এখানে মুমূর্ষু রোগীর মতন—কখন আছে কখন নেই। বিলাস রাষ্ট্রের সর্বশক্তি ও বিপুল অর্থ দিয়ে হিন্দীর

জন্য আহিমাচল-কুমারিকা হাইওয়ে বানাচ্ছে, মাটির নিচে বাংলা ও অন্যদের চাপা দেবার ষড়যন্ত্র। আর ওপারে কয়েক শ' গজ মাত্র দূরে বাংলার বিজয়-পতাকা পত পত করে উড়ছে।

রঞ্জন দত্ত আবার এক বৃত্তান্ত পড়ল: করাচী থেকে এ-পি পি পরিবেশিত এক খবরে প্রকাশ, করাচী মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড এক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন যে নবম ও দশম শ্রেণীর পরীক্ষার ছাত্র-ছাত্রীদের বাংলা ভাষাতেও প্রশ্নপত্রের জবাব দানের সুযোগ দেওয়া হবে।

নীলকণ্ঠ বললেন, ভাষাকে পূর্ব-বাংলা পাগল হয়ে ভালবাসে। জান দিয়েছে তাদের ছেলেরা—লোকের বুকের মধ্যে সে আগুন অনির্বাণ।

বাংলা একাডেমি গড়েছে তারা—আত্মনিবেদিত অক্লান্ত জ্ঞানীগুণী ভাষার সেবার কাজ করে যাচ্ছেন। একটা মহা-কীর্তির কথা বলি। ডক্টর শহীদুল্লাহ্-র নেতৃত্বে একাডেমি পূর্ব-বাংলার আঞ্চলিক ভাষার অভিধান সংকলনে হাত দিয়েছেন। অধ্যাপক ছাত্র ভাষাপ্রেমী সামান্য সাধারণ মানুষও গাঁয়ে গাঁয়ে শব্দ সংগ্রহের কাজে লেগে আছেন। প্রথম খণ্ড বেরিয়ে গেছে। পাতায় পাতায় ছত্রে ছত্রে নিষ্ঠা আর ভাল-বাসা ছড়ানো। শেষ হয়ে গেলে এপার-ওপারের সকল বাঙালি মাথায় তুলে নেবে এ বই। যদি অবশ্য এপারের বাঙালির মুখে বাংলা ভাষা টিকে থাকে ততদিন।

নিশ্বাস ফেললেন নীলকণ্ঠ বর্মা। মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বললেন, আয়োজন দেখে এ ব্যাপার অসম্ভব মনে করি নে। ধরো সত্যি সত্যি তাই ঘটল।

ফিল্মীর দাপটে হিন্দুস্থানের উপর আরা-ব্যাণ্ডের মৌলিক ভাষার মতন বাংলা ভাষা পুরোপুরি বাতিল। তেমন দিনে কোন বাঙালির বাংলা বলার জন্য প্রাণ কেঁদে উঠল, উপায় তখন পাকিস্তান। এই আজকে যেমন ব্লকে চলেছি, সেই মানুষ শুধুমাত্র বাংলা বলার লোভে পার হয়ে চলে যাবে—একটা-দুটো দিন মনের সুখে বাংলা কথা বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘরে ফিরবে আবার।

প্রণব বিশ্বাস উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলে, খাঁটি কথা বলেছেন স্যার। পূর্ব-বাংলা তাজ্জব দেখাল বটে। আমি মধুসূদন্যু মানুষ—যেখানে যত কাজেই থাকি, এই সময়টা একবার ওদের মজলিসে না গিয়ে পারি নে। বাঙালির কতজনকে খোসামোদ করেছি, ভাষার লড়াই নিয়ে একটা পালা বেঁধে দিন। আসরে নামব সেই পালা নিয়ে। সবাই উড়িয়ে দেয়: ঐটুকু জিনিস নিয়ে কী আবার পালা হবে? নাকি সামান্য জিনিস—শোনেন তো কথা!

রঞ্জন দত্ত প্রণবকে দেখিয়ে বলে, এঁকে ধরো। এঁর কলম [illegible] হবে। এমন জিনিসে তাঁর হাত খুলবে। আনন্দে হয়ে গেছেন—আমি দেখে এসেছি।

প্রণব বলে, সীতাহরণ দুর্যোধন-বধ করছি, ভাষার লড়াই নিয়ে একটা পালা লিখবেন?

হেসে প্রণব বলে, আসলে জিনিস একই, রূপে নূতন। অশোকবনে আটকে রেখে চেড়ি লাগিয়ে সীতাকে বশ করতে চাইছিল। রামে রাবণে লড়াই—রাম লড়াই জিতলেন, রাবণের দশমুণ্ড কাটা গেল। রাজধানী অযোধ্যায় ফিরে সীতা রাজরাজেশ্বরী হয়ে সিংহাসন আলো করে বসলেন। সীতার জায়গায় ধরুন মাতৃভাষা। পালা দাঁড়িয়ে গেল কিনা বলুন।

নীলকান্ত জুড়ে দেন: পুরাণ-ইতি-হাস বাদ দিয়ে যাত্রাগানে নতুন কালের কথা—এ জিনিসও অনেক পুরনো। মুকুন্দ দাস স্বদেশী পালা করতেন, [illegible] সে-বারে স্বদেশী যাত্রাদল। সে এক-দিন গিয়েছে। অনেকের, শুনতে পাই, দুপুরবেলা দীপক রাগিণী গাইলে অগ্নি-কাণ্ড ঘটে যেত। যাত্রার আসরে তেমনি আমি শ্রোতাদের বুকের মধ্যে আগুন ধরে যেতে দেখেছি।

[illegible]

প্রণব বলে, তেমনি আগুন ভাষার পালাতেও ধরাতে পারে ঠিক ঠিক যদি লিখে দেন কেউ। [illegible]

[illegible]

যায় হার-জিত। খ্যাঁচ করে খাপ থেকে তলোয়ার খুললাম। ঢুমাঢুম বীরাতবলা বাজতে লাগল। পাঁয়তারা কষছি আসরের এমুড়ো-ওমুড়ো, লম্ফ দিচ্ছি, বীররসের আস্ফালন করছি। তলোয়ার গেঁথে দিলাম অরাতির পেটে। বিজয়বাদ্য বেজে ওঠে অমনি। হুবহু সেই জিনিস স্যার। ঝড়ে কলাগাছ সুপারিগাছ পড়ে, গুলী খেয়ে ছোঁড়ারা অমনি পটাপট ভূঁয়ে পড়তে লাগল। তার পরেই দেখি লড়াই ফতে। বেলুচি-পাঞ্জাবিরাই বাংলার ছেলে মারতে আগুয়ান হয়েছিল। কোন পুরুষে কেউ বাংলা জানে না। সেই তারাই দেখি আজকে লাইন দিয়ে বুড়ো বয়সে অ-আ ক-খ'র পাঠ নিতে বসে গেছে, রাষ্ট্রভাষা বাংলাটা শিখে না নিলে সরকারি চাকরি বজায় থাকবে না। যা বললাম স্যার—এত কম সময়ে এমনধারা ষোলআনা জিত যাত্রাদলেই হয়ে থাকে। বাঙালিরে অমত হেলা করেন, একুশে ফেব্রুয়ারির একটামাত্র ঘটনা—আসরের পুরো পালা তাতে কেমন করে হয়?

আরও এক তারিখ আছে—উনিশে মে। দুটো তারিখ জুড়ে নিয়ে পালা বানাতে বলো—

নীলকণ্ঠ গম্ভীরকণ্ঠে বলতে লাগলেন, সেই পালা পাগল করবে পাকিস্তান হিন্দুস্থান উভয় দেশের মানুষকে। হয়েও এসেছিল তাই। তারপরে দেখি, উনিশে মে চাপা পড়ে গেল—কলে-কৌশলে চাপা দিয়ে দিল, সংহতিতে নয়তো চিড় ধরবে নাকি। কুশিয়ারা নদী—তার এপারে হিন্দুস্থানের করিমগঞ্জ, ওপারে পাকি-স্তানের [illegible]। শিলচরে উনিশে মে [illegible] হত্যা করল বাংলা ভাষার দাবি [illegible]। [illegible] শোক-সভা—[illegible] এসেছে [illegible] বলে। এপারের হিন্দুস্থান বলে, [illegible]—' ওপারে পাকিস্তান বলে, 'জিন্দাবাদ!' [illegible]

[illegible]

'জনড—৫' স্মরণে

বাহবা দিতেই হবে। বলতেই হবে, সাবাস! কারণ, আবার কিস্তি মাৎ করল রাশিয়া, চাঁদে যাবার দৌড়ে আবার সবাইকে টেক্কা মারল।

টেক্কা মারল কেন বললুম? না, সত্যি মেরেছে বলে। 'জনড—৫' নাম দিয়ে যে মহাকাশযানটিকে চাঁদের আকাশে পাঠিয়েছিল ওরা, তাকে সত্যি পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনেছে বলে।

মহাকাশযানকে চাঁদের আওতা থেকে ফিরিয়ে আনার কায়দাটা এতকাল মানুষের জানা ছিল না; এবং ছিল না বলেই চাঁদে গিয়ে 'রিটার্ন টিকিট' পাওয়ার কথা ভেবে ভেবে এতদিন ধরে অনেকেই আকুল হচ্ছিলেন।

এই আকুলতার অবসান হল এইবার। 'রিটার্ন টিকিট' যে অচিরেই পাওয়া যাবে, 'জনড—৫'-এর গতিগতি দেখে তা' আঁচ করা সম্ভব হল।

আঁচ অবিশ্যি অনেক কিছুই করছি আমরা। মহাকাশ-বিজয়ের দৌড়ে রাশিয়া থেকে থেকে বিজয় নিশান ওড়াচ্ছে বলে করছি। বিজয় নিশান ওড়ানো সুরু সেই ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর থেকে।

হ্যাঁ, ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৫৭: এই তারিখটিকে পৃথিবীর মানুষ কোনদিন ভুলবে না। কারণ, এইদিনই প্রথম জানতে পারলুম আমরা যে সোভিয়েট স্পুটনিক পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে পৃথিবীকেই প্রদক্ষিণে রত।

—প্রদক্ষিণের শেষ আছে বুঝি! সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা বললেন, বুঝি শূন্য রকেটকে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খাওয়ালেই জ্ঞানের শূন্যতা ভরাট হয়!

সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের এইসব কথার তাৎপর্য প্রথমটায় আমরা বুঝতে পারি নি। বুঝেছি তখন যখন শুনেছি, লাইকা নামে একটি কুকুর রকেটের শূন্যতা ভরিয়ে দিয়েছে এবং মহাবিক্রমে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে সে।

লাইকা বাঁচে নি; তবে শহীদ হয়ে মহাকাশচারীদের বাঁচানোর পথটা বাতলে দিয়েছিল। ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল যা' ঘটল তারই নিশানা দিয়েছিল।

হ্যাঁ, ১২ই এপ্রিল ১৯৬১। সেদিন গ্যাগারিন নামে একটি মানুষ স্পুটনিককে করে পৃথিবীকে চক্কর মেরেছিলেন। এরপর থেকেই চক্কর মারা রোগ হল মানুষের। ছ'মাসে ন'মাসে একবার স্পুটনিককে করে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে না পারলে মানুষের যেন আর মন উঠল না।

এবারেও রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা এগিয়ে এলেন যথারীতি; একসঙ্গে ওঁরা দুজন মানুষকে পাঠালেন মহাকাশযানে।

—কিন্তু পুরুষ যাবে মহাকাশযানে, আর নারী থাকবে পিছিয়ে?

ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা একদিন চরকির মতো পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খেতে খেতে সবাইকে জানিয়ে দিলেন,—না, নারীও পিছিয়ে থাকবে না।

সবাই বলল, বেশ! না থাকল পিছিয়ে! কিন্তু শুধুমাত্র পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খেলেই কি স্বপ্ন সফল হবে? চাঁদে যেতে পারবে মানুষ?

সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা বললেন,—মানুষ নয়, রকেটকে চাঁদে পাঠানো যাক আপাতত।

রকেট গেল ঠিক। ঠিক একদিন আমরা শুনলুম, সোভিয়েট রকেট চাঁদের মাটিকে স্পর্শ করেছে। চাঁদের উল্টো-পিঠের ছবি তুলেছে সে।

ছবি তোলার পর চাঁদের পিঠে রকেটের মন্থর অবতরণ করাল রাশিয়া। আবার রাশিয়াই প্রথম দুজন মহাকাশচারীকে দিয়ে শূন্যে সাঁতার দেওয়ালো।

কিন্তু সাঁতার দেওয়াই বলি, অথবা বলি ছবি-তোলা—ও সব কিছুতে কি আর মন ভরে? প্রতিবেশীর ঘরে অতিথি হতে না পারলে মন কি ভরে কখনও?

এই অতিথি-হবার আয়োজনটাই ঘটা করে চলছে এখন। 'জনড—৫' চাঁদের দেশে অতিথি হয়ে আবার ফিরে এসেছে।

গত ২২শে সেপ্টেম্বর মস্কো থেকে এক ঘোষণায় বলা হয়, 'জনড—৫'-এর এই ফিরে-আসার দৌলতে জানা গিয়েছে অনেক কিছু। জানা গিয়েছে যে, গ্রহান্তর-ভ্রমণে মহাজাগতিক রশ্মি আমাদের বিশেষ কিছু ক্ষতি করতে পারবে না। আর জানা গিয়েছে, কিভাবে মানুষের মতো মানুষের হুকুম তামিল করেছে এই রকেট।

১৫ই সেপ্টেম্বর চাঁদের দেশে যাত্রা করে 'জনড—৫' এবং তারপর চাঁদের রাজ্যে পৌঁছে সে ১৮ই সেপ্টেম্বর চাঁদের আকাশকে প্রদক্ষিণ করে। ২১শে সেপ্টেম্বর পৃথিবীতে ফিরে আসে সে; ভারত মহাসাগরে নেমে পড়ে।

নেমে পড়ার ঠিক পূর্ব-মুহূর্তে মহাকাশযানটির গতিরোধ করা হয়। প্যারাসুটের সাহায্যে নামিয়ে আনা হয় তাকে; যথানির্দিষ্ট স্থানেই নামানো হয় এবং একটি সোভিয়েট জাহাজ তাকে উদ্ধার করে।

জাহাজটি আগে থাকতেই তৈরি ছিল এবং মহাকাশযানটিকে উদ্ধার করার সময় লক্ষ্য রাখা হয়েছিল, যাতে তার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির এতটুকু ক্ষতি না হয়।

ক্ষতি অবিশ্যি কিছুই হয় নি। জার্মানীর বোকাম মানমন্দির থেকে ঘোষণা করা হয়, সেকেন্ডে ৭ মাইল গতিতে 'জনড—৫' পৃথিবীর দিকে নেমে আসে। দক্ষিণ আফ্রিকা ও পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার মাঝামাঝি একটি স্থানে নামে সে। স্থানটি মরিসাস দ্বীপ থেকে ৬২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে।

সোভিয়েট সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'তাস' এই সাফল্যকে বিজ্ঞানের এক অনন্যসাধারণ কীর্তি বলে অভিহিত করেছেন। ওদিকে মার্কিন মহাকাশ-বিশেষজ্ঞরাও মেনে নিয়েছেন, মহাকাশ-অভিযানে রাশিয়া অনেকদূর এগিয়ে গেল।

বৃটেনের জডরেল ব্যাংক মানমন্দিরের ডিরেক্টার স্যার বারনার্ড লোভেল বড় অদ্ভুত মানুষ। সব সময় তিনি দূরবীণ হাতে নিয়ে বসে আছেন। মহাকাশ-বিজয়ের আশায় কে কোথায় কোন্ রকেট পাঠাল, তা' সকলের আগে তিনি ধরবেনই।

এবারেও ঠিক ধরেছেন তিনি। 'জনড—৫'-এর গতিবিধি ঠিক লক্ষ্য করেছেন এবং বিশ্ববাসীকে যথাসময়ে তা' জানিয়েও দিয়েছেন।

স্যার বারনার্ড লোভেল বলেছেন, রাশিয়া খুব শীঘ্রিরই চাঁদে মানুষ পাঠাবে। তবে মানুষ-পাঠাবার পূর্বে আর একটি মহড়া সে দিতে পারে।

মহড়া দিক রাশিয়া। রাশিয়া জয়ী হোক। আর আমরা বুড়ো স্যার বারনার্ড লোভেল-এর দিকে তাকিয়ে থাকি। তাকিয়ে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করি সেই দিনটির যেদিন তাঁর কাছ থেকেই আমরা প্রথম শুনবো, রাশিয়া মহাকাশ-বিজয়ের পথে আর একটি বিজয় নিশান উড়িয়েছে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

রোমা রোলাঁ কি বলেন

সুভাষচন্দ্রের আশংকা স্বাভাবিক হলেও সত্য হয় নি। 'ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থটি খুললে দেখা যাবে, সেখানে বার্নার্ড শ বা এইচ জি ওয়েলসের ভূমিকা নেই, উদ্ধৃত আছে একটি পত্রাংশ—পত্রটি রোমা রোলাঁর লেখা। রোমা রোলাঁর চরিত্রবিচারে সুভাষচন্দ্রের স্বভাবতই কিছু ভুল হয়েছিল। পত্রটি এই—

ভিলনাভ, ভিলা ওলগা
ফেব্রুয়ারী ২২ ১৯৩৫

'প্রিয় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু,

আপনি সহৃদয়তাবশে আপনার দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল ১৯২০—৩৪' পাঠিয়েছিলেন এবং আমি যথাসময়ে তা পেয়েছি। বইটির জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করছি। বইটি আমাদের কাছে এত আকর্ষণীয় মনে হয়েছে যে, আমি আরও এক খণ্ডের জন্য অর্ডার দিয়ে দিয়েছি, যাতে করে আমার পত্নী ও ভগিনী প্রত্যেকের কাছেই একখণ্ড করে বই থাকে। ভারতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের এ একটি অপরিহার্য পুস্তক। এর মধ্যে আপনি ঐতিহাসিকের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলী দেখিয়েছেন: প্রাঞ্জলতা এবং উচ্চ মানসিক ন্যায়পরতা ও বিচারক্ষমতা। আপনার মত কাজের মানুষেরা দলীয় স্বার্থের উপরে উঠে বিচার করতে সমর্থ হয়েছে এমন প্রায় দেখাই যায় না।

আমাদের মত চিন্তাজগতের মানুষদের কাছে ক্লান্তি ও মানসিক অস্থিরতার ক্ষণে যেসব প্রলোভন আসে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যেতে হবে। আমাদের প্রলোভন—সংগ্রামকে ত্যাগ করে ভিন্ন জগতে প্রস্থানের জন্য—যে-জগৎ কখনো কখনো ভগবানের, ক[illegible] শিল্পের, কখনো স্বাধীন সত্তার, কখনো মরমী আত্মার দূরবর্তী রহস্যালোকের। কিন্তু আমাদের লড়াই করতেই হবে। আমাদের কর্তব্য সমুদ্রের এপারে যেখানে রচিত হয়েছে মানুষের সংগ্রামক্ষেত্র।

ভারতের প্রয়োজন আপনাকে। ভারতের মঙ্গলের জন্য আপনি দ্রুত আরোগ্যলাভ করুন, একান্তমনে তাই প্রার্থনা করি। আমার গভীর সহানুভূতিতে আস্থা রাখবেন। ইতি—

রোমা রোলাঁ

সুভাষচন্দ্র আনন্দে শিউরে উঠেছিলেন সন্দেহ নেই। এই পত্র তাঁর কাছে অকল্পনীয়। গান্ধীতে ও অহিংসাতে রোলাঁর গভীরতম অনুরাগের কথা তিনি জানতেন। প্রাচ্যের শুভ্রজ্যোতি দীপকে রোলাঁ প্রতীচ্যের রক্তসন্ধ্যার বুকে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, গান্ধীজী তাঁর কাছে এক নতুন ঊষার স্বর্ণদ্বার উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য বিপ্লবীদের মত ও আদর্শ রোলাঁর কাছে ক্ষীণমূল্য হয়ে গিয়েছিল গান্ধীর অধ্যাত্ম-রাজনীতির নিকটে। যে-নৈতিক মূল্যবোধের স্বপক্ষে রোলাঁ ধর্মযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন,—তিনি যখন দেখলেন সেই নীতির প্রতিমাকে গান্ধীজী রাজনীতির চলচ্চিত্রের তলায় স্থাপন করার পৌরোহিত্য নিয়েছেন, তখন রোলাঁ অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

সেই গান্ধীর কঠোর সমালোচক সুভাষচন্দ্র। গান্ধীজির রাজনৈতিক [illegible] [illegible] ভূমিকাকে তিনি মূল্যবান মনে তো করেনই না, উপরন্তু তাকে ক্ষতিকর মনে করেছেন জাতীয় আন্দোলনের স্বার্থের পক্ষে। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ভারতবন্ধু অনেক বিদেশীর সাক্ষাৎ হয়েছিল, যাঁরা ভারতের স্বাধীনতা অপেক্ষা ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের অভিনব পন্থা সম্বন্ধেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের ধারণা ছিল—রোমা রোলাঁ তাঁদেরই স্বজাতীয়।

তবু সুভাষচন্দ্র কৃতজ্ঞ ছিলেন রোলাঁর প্রতি—তাঁর ভারতপ্রেমের জন্য। গান্ধীজী যখন গোলটেবিল বৈঠক শেষে রোলাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন—তখন তাঁদের সাক্ষাৎকারের মূল্য সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন—

> "বিরাট মানুষ ও বিরাট মনীষী, ভারতের ও ভারতের সংস্কৃতির সুমহান বন্ধু মসিয়ে রোমা রোলাঁর সাহচর্যে গান্ধীজী যে-সময় কাটিয়েছিলেন, সেই সময়টুকু ছিল তাঁর সুইজারল্যাণ্ডে অবস্থানের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় কাল। ভারতের বাইরে এই মহাপ্রাণ মানুষটির চেয়ে বড়ো কোনো বন্ধু ভারতের নেই। তাই মহাত্মা এই ফরাসী মনীষীর সাহচর্যে কিছু সময় কাটিয়ে ভারতের জন-স্বার্থের বিশেষ সেবা করে গেছেন।"

সুতরাং যদিও সুভাষচন্দ্রের আশঙ্কা ছিল রোমা রোলাঁ অন্য পাঁচজন ভাব-বিলাসী ভারতবন্ধুর সমতুল হতে পারেন, তবু তিনি রোলাঁর প্রতি কি বিপুল শ্রদ্ধা বোধ করেছিলেন তা উপরিউক্ত অংশ থেকে বোঝা যায়। রোলাঁ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের ধারণা আরও কিছু পরি-বর্তিত হয়েছিল—রোলাঁ, [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

অবশ্য ২২শে ফেব্রুয়ারীতে (১৯৩৫) লেখা তাঁর চিঠির এই উদ্দীপনাময়ী কথাগুলি আমাকে ভরসা দিয়েছিল—

> কিন্তু আমরা যারা চিন্তার জগতের মানুষ, আমাদের কাছে শ্রান্তি ও অস্থিরতার দিনে যেসব প্রলোভন আসে, তার সঙ্গে লড়াই করে যেতে হবে —সে প্রলোভন হল.—সংগ্রামের জগৎকে ত্যাগ করে ঈশ্বর বা সাহিত্য বা সত্তার মুক্তি কিংবা মরমী আত্মার অতিদূর রাজ্যে প্রস্থানের বাসনা ইত্যাদি। এ সবের বিরুদ্ধে লড়াই আমাদের করতে হবেই, হাঁ নিশ্চয়ই, কারণ আমাদের কর্তব্য হল সমুদ্রের ওপারে,—এই মানবজীবনের রণক্ষেত্রে।"

লেমানভার হ্রদের প্রান্ত স্পর্শ করে যে চক্রাকারে পথ প্রসারিত রয়েছে সেই পথে পুরো দু ঘণ্টা ধরে আমাদের গাড়ি ছুটে চলল। আবহাওয়া অতি মনোরম, সুইস রিভিয়েরার পাশ দিয়ে ছুটে চলবার সময়ে আমরা সুইজারল্যাণ্ডের এক সুন্দরতম প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করলুম। ভিলনাভে পৌঁছলে গাড়ির গতি কমে এল এবং অবশেষে ওলগা ভিলার সামনে একেবারে থেমে গেল। এইটেই ফরাসী মনীষীর বাসভবন। সত্যই সুন্দর জায়গা। বৃত্তাকার পাহাড়ের কোলে আশ্রিত বাড়িটি থেকে দেখা যায় হ্রদের অপূর্ব দৃশ্য: আমাদের চারিদিকে শান্তি সৌন্দর্য ও মহিমার বিস্তার। সত্যই আশ্রমের উপযুক্ত স্থান।

ঘণ্টা বাজাতে খাটো চেহারার এক মহিলা দরজা খুলে দিলেন—গভীর সহানুভূতিতে পূর্ণ প্রাণবন্ত তাঁর মুখচ্ছবি। মাদাম রোমাঁ রোলাঁ। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে না জানাতে আর একটি দরজা সামনে খুলে গেল, সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন দীর্ঘ এক পুরুষ যাঁর ফিকে রঙের মুখের উপরে দুটি অপূর্ব অন্তর্ভেদী চক্ষু। এই তো, এই তো সেই মুখ ছবিতে আমি কতবার আগে দেখেছি, এ-মুখ মানুষের জন্য বেদনায় ভারাক্রান্ত। সেই পাণ্ডুর মুখে কি একটা নিবিড় বিষাদের ছায়া—তা কিন্তু পরাজয়ের মনোভাব থেকে আসে নি। কারণ কথা শুরু হবা মাত্র শ্বেতাভ গালে রক্তোচ্ছ্বাস দেখা গেল—দীপ্ত হয়ে উঠল চোখ অসামান্যভাবে, এবং যে-শব্দরাজি নির্গত হল তা প্রাণে ও প্রত্যাশার অগ্নিগর্ভ।

শুভেচ্ছা বিনিময় এবং ভারত ও ভারতীয় বন্ধুদের সম্বন্ধে খোঁজখবর ইত্যাদি শীঘ্রই শেষ হোল। তারপরেই আমরা গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হলুম। মঁসিয়ে রোলাঁ ইংরেজী বলতে [illegible] না, বা বলেন না। আর আমি ফরাসী বলতে পারি না। সুতরাং মাদমোয়াজেল রোলাঁ ও মাদাম রোলাঁকে দোভাষীর কাজ করতে হল। সর্বশেষে ভারতীয় পরিস্থিতির আলোচনা এবং মূল বিশ্বসমস্যাগুলির সম্বন্ধে মঁসিয়ে রোলাঁর অভিমত জানাই আমার উদ্দেশ্য। সুতরাং আলোচনার গোড়ার দিকে আমাকেই বেশি বলতে হল। আমার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আমি ভারতীয় পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে গেলুম।

দুটি মূল নীতির উপর গত চোদ্দ বছরের আন্দোলন গড়ে উঠেছে—প্রথমত, সত্যাগ্রহ বা অহিংস অসহযোগিতা; দ্বিতীয়ত, সর্বশ্রেণীর ভারতীয়—যেমন বণিক ও শ্রমিক, জমিদার ও কৃষকের যুক্ত সংগ্রামে। সত্যাগ্রহ আন্দোলন শান্তিপূর্ণ সমাধানে ফলবতী হবে, এ বিষয়ে ভারতে গভীর আশার সৃষ্টি করেছে; তার রূপ হচ্ছে—ভারতের অভ্যন্তরে এই আন্দোলন ক্রমে দেশের অসামরিক শাসনব্যবস্থা অচল করে তুলবে; এবং ভারতের বাইরে সত্যাগ্রহের সমুচ্চ আদর্শ বৃটিশজাতির বিবেক জাগ্রত করবে। এইভাবে সংঘাতের সমাপ্তি ও সমাধান—যার ফলে ভারত স্বাধীনতা পাবে অথচ তাকে আঘাত বা রক্তপাত কিছুই করতে হবে না। কিন্তু সে আশা বিপর্যস্ত। ভারতের মধ্যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন নিঃসন্দেহে অহিংস বিপ্লব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে, কিন্তু সামরিক বা অসামরিক উভয়প্রকার উচ্চ চাকুরী পূর্ববৎ অবিচলিত রয়ে গেছে, ফলে 'রাজার সরকার' চলে যাচ্ছে যথারীতি। ভারতের বাইরে 'মুঠিখানেক' উচ্চমনা ইংরেজ অবশ্যই গান্ধীনীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু সমগ্রত ইংরেজ জাতি নির্বিকার; স্বার্থে ডুবে গেছে নীতির আবেদন।

স্বাধীনতা অর্জনে ব্যর্থতা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে তীব্র আত্মজিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছে। একদল কংগ্রেসী প্রত্যাবর্তন করেছেন পুরোনো নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পন্থাতিতে। মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর গোঁড়া ভক্তেরা আইন-অমান্য আন্দোলন (বা সত্যাগ্রহ আন্দোলন) স্থগিত হওয়ার পরে গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়েছেন। অপরপক্ষে অপেক্ষাকৃত চরমপন্থীরা হতাশ হয়ে নতুন আদর্শ ও কর্মপন্থার দিকে ঝুঁকেছেন, এবং তাঁদের বেশিসংখ্যক লোক মিলিত হয়ে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আমার দীর্ঘ ভূমিকার শেষে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'মঁসিয়ে রোলাঁ, যদি যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যায় এবং তার ফলে গান্ধী-সত্যাগ্রহের সঙ্গে সম্পূর্ণ মেলে না এমন নতুন কোনো আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, সে বিষয়ে আপনার মনোভাব কি ধরনের হবে?'

'গান্ধী সত্যাগ্রহ ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে ব্যর্থ হলে খুবই দুঃখ ও নৈরাশ্যবোধ করব'—মঁসিয়ে রোলাঁ জানালেন। 'মহাযুদ্ধের শেষে, যখন সারা পৃথিবী রক্তাক্ত সংঘাত ও ঘৃণার রূপ দেখে পীড়িত হয়ে আছে, তখন দিগন্তে নতুন আলোর উদ্ভাস দেখা গেল—গান্ধী যখন তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রামের অভিনব অস্ত্র নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন। সমস্ত পৃথিবীতে বিপুল আশা জাগালেন গান্ধী।'

আমি বললুম, 'কিন্তু আমরা অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি যে, এই বস্তুবাদী জগতের পক্ষে গান্ধীজীর পথ নাগালের বাইরে; রাজনৈতিক নেতারূপে বিপক্ষের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার নিতান্তই সরল। আমরা আরো দেখেছি যে, বৃটিশরা ভারতে তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে।

'সত্যাগ্রহ আন্দোলন তাদের অসুবিধা ও উদ্বেগ সৃষ্টি করলেও তারা ভারতে থাকতে পারছে। শেষ পর্যন্ত সত্যাগ্রহ যদি বিফল হয়, তাহলে জাতীয় প্রচেষ্টা অন্য পথে চলতে থাকুক—মঁসিয়ে রোলাঁ কি এই চাইবেন, কিংবা সেক্ষেত্রে ভারতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁর সমস্ত আকর্ষণ বিলুপ্ত হবে?'

'লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, সে যে ভাবেই হোক'—সজোরে উত্তর এল।

'কিন্তু কয়েকজন য়ুরোপীয় ভারতবন্ধুকে আমি জানি, যাঁরা আমাকে স্পষ্টভাবে বলেছেন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁদের আকর্ষণ সম্পূর্ণভাবে গান্ধীর অহিংস প্রতিরোধের জন্যই।'

মঁসিয়ে রোলাঁ তাঁদের সঙ্গে মোটেই একমত নন। সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হলে তিনি দুঃখিত হবেন, কিন্তু যদি বাস্তবিক তা ব্যর্থ হয় তাহলে জীবনের কঠিন তথ্যের সম্মুখীন হতেই হবে এবং মঁসিয়ে রোলাঁ আন্দোলনের খাত বদল দেখতে চাইবেন।

আমার প্রায় মনোমত এই উত্তর। ইনি তা হলে এমন একজন আদর্শবাদী যিনি শূন্যে সৌধ নির্মাণ করেন না, যিনি কঠিন জমিতে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছেন'

আমি বললুম, 'ইউরোপে কেউ কেউ মনে করেন, রাশিয়ার মত ভারতেও ক্রমান্বয়ে দুটি বিপ্লব হবে—গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া বিপ্লব এবং সমাজবিপ্লব। আমার মতে অবশ্য, রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। যে দল রাজনৈতিক মুক্তি আনবে, সেই দলই সামাজিক অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের [illegible] পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবে। এ ব্যাপারে মঁসিয়ে রোলাঁর অভিমত কি?'

[illegible]

ঘনিষ্ঠভাবে জানা নেই বলে এ ব্যাপারে তিনি স্পষ্ট মত দেওয়া অসুবিধাজনক মনে করলেন।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলুম, 'যদি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের যুদ্ধ সংগ্রাম-নীতি স্বাধীনতা অর্জনে ব্যর্থ হয় এবং তার ফলে কৃষক ও শ্রমিকের স্বার্থে গঠিত কোনো চরমপন্থী দলের অভ্যুদয় হয়,—সে বিষয়ে ম'সিয়ে রোলাঁর মনোভাব কি ধরণের হবে ?'

ম'সিয়ে রোলাঁ স্পষ্ট মত জানালেন—অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উপর সুনির্দিষ্টভাবে নির্ভর করবার সময় এসে গেছে কংগ্রেসের। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে এখনি মনস্থির করা উচিত, এই মর্মে ইতিমধ্যেই গান্ধীকে আমি চিঠি লিখে দিয়েছি।'

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ মত-সংঘর্ষের সম্বন্ধে নিজের মনোভাবের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি আরো বললেন—দুই রাজনৈতিক গোষ্ঠী বা দুই দলের মধ্যে বাছাই করা ইত্যাদি ব্যাপারে আমি আগ্রহান্বিত নই, একটি বৃহত্তর প্রশ্ন নিয়ে আমি ব্যস্ত এবং সেইটেই আমার কাছে মূল্যবান। রাজনৈতিক দলটল আমার কাছে ধর্তব্যের নয়, তার থেকে অনেক বড় জিনিষকে আমি ধরি—পৃথিবীর শ্রমিকদের স্বার্থ। আরো স্পষ্টভাবে বলতে গেলে—যদি দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির ফলে গান্ধী (বা আর কোনো দল) শ্রমিকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হন, যদি তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর বিবর্তনের বিরুদ্ধে বিবাদ করেন, যদি গান্ধী (কিংবা অন্য কোনো দল) শ্রমিকদের স্বার্থ সম্বন্ধে নির্বিকার কিংবা ভিন্নমন হন,—তাহলে আমি চিরদিনের জন্য নির্যাতিত শ্রমিকদের পক্ষে আছি, তারা আমাকে চিরদিন তাদের আন্দোলনের সহযোগিতায় পাবে, কারণ তাদের দিকে আছে মানবসমাজের প্রয়োজনীয় বিকাশের আদর্শরূপ।'

আমি আনন্দে চমকে উঠলুম। এই মহান মনীষী এমন মুক্তভাবে, এমন সাহসের সঙ্গে শ্রমিকস্বার্থের সমর্থন করবেন—এ যে অতিবড় আশায় কখনও আশা করতে পারি নি!

আমাদের তীব্র ভাবপূর্ণ কথাবার্তার চাপ খুবই বেশি, তাই আমি গৃহস্বামীর ক্ষীণ স্বাস্থ্যের কথা ভেবে উদ্বেগ বোধ করলুম। চায়ের ডাক আসতে বিরাম ঘটল, আমরা সকলে পাশের ঘরে উঠে গেলুম।

চায়ের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহতগতিতে এগিয়ে চলল। আমাদের আড়াই ঘণ্টার আলোচনায় বহু সমস্যার মধ্যে দ্রুতভাবে প্রবেশ করা গেল। ম'সিয়ে রোলাঁ কংগ্রেস সোসিয়ালিস্ট দল ও তার গঠন-ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহী। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের ক্রমান্বয় কারাবাস সম্বন্ধে তাঁর অপরিসীম ভাবনা। মহাত্মা গান্ধীর কাজ, বক্তৃতা বা লেখা সম্বন্ধে তাঁর বিস্ময়কর আগ্রহ। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, তিনি তাঁর পুরনো ফাইল থেকে মহাত্মা গান্ধীর এক বিবৃতি টেনে বার করলেন, যাতে গান্ধীজী সমাজতন্ত্রের পক্ষে সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।

মহাত্মা গান্ধী সম্বন্ধে বিস্তারিত কথাবার্তা হোল। আমি সাহসের সঙ্গে মন্তব্য করলুম, মহাত্মা অর্থনৈতিক বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো নীতিগ্রহণ করবেন না। রাজনৈতিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক যে ব্যাপারেই হোক না কেন তিনি স্বভাবে দুদিক বজায় রেখে চলবার পক্ষপাতী। তরুণ সম্প্রদায় তাঁর নেতৃত্ব এবং কর্মপন্থার ত্রুটি বলে যেসব জিনিষকে মনে করে থাকে, সেগুলোর উল্লেখ করলুম। যেমন, সব 'দান' বিপক্ষের সামনে খুলে ছড়িয়ে দেওয়ার অসংশোধনীয় অভ্যাস, যেমন, রাজনৈতিক শত্রুদের সামাজিকভাবে বয়কটের প্রস্তাবে গররাজি হওয়া, যেমন, বৃটিশ সরকারের হৃদয়ের পরিবর্তনে বিশ্বাস করা, ইত্যাদি। সাম্প্রতিক ইতিহাসে তিনি অন্য যে-কোনো মানুষের চেয়ে দেশের জন্য বেশি কাজ করেছেন, ভারতকে সমস্ত জগতের সামনে যথেষ্ট সম্মানের আসনে তুলেছেন—সুতরাং তাঁর বিরোধিতা করতে, কি তাঁর সমালোচনা করতে আমরা খুব খুশি হয়ে উঠি না, কিন্তু—আমরা ব্যক্তির চেয়ে দেশকে বেশি ভালবাসি—ম'সিয়ে রোলাঁকে জানালুম।

ম'সিয়ে রোলাঁকে অনুরোধ করলুম, যে মূল নীতির উপর দাঁড়িয়ে আপনি সারাজীবন সংগ্রাম করেছেন, তা অনুগ্রহ করে খুব সংক্ষেপে জানালে ভাল হয়।

'ঐ মূল নীতিগুলি হল'—ম'সিয়ে রোলাঁ জানালেন—(১) আন্তর্জাতীয়ত্ব (প্রতি জাতির সম অধিকার ও বৈষম্যলোপ) (২) শোষিত শ্রমিকের প্রতি ন্যায়বিচার—অর্থাৎ আমরা এমন এক সমাজের জন্য সংগ্রাম করব, যেখানে কোনো শোষক বা কোনো শোষিত থাকবে না—প্রত্যেকেই সমগ্র সমাজের জন্য শ্রমিক হবে। (৩) প্রত্যেক পরাধীন দেশের স্বাধীনতা এবং (৪) পুরুষ ও নারীর সমানাধিকার। এর পর তিনি তাঁর কতকগুলি বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে লাগলেন।

আমাদের আলোচনা সমাপ্তির দিকে আমি মন্তব্য করলুম, আজ অপরাহ্নে কথিত আপনার বক্তব্যগুলি নানা মহলে

তিস্তার পলিমাটির শ্মশানে*

দুর্গাদাস সরকার

জলমশাসনের বাড়ি গিলে
অন্ধকারে পার হোল তারা বৈতরণী।
রাস্তার বাস্তভিতে বারান্দায়
মানুষ এবং গোরুর শব। সব একাকার।
ছাগল শেয়াল ভেড়া কুকুর কুক্কুট
বৈতরণী পার হয়ে গেল। পাশে পচা যমরাজের বাহন।
জেগে ওঠা ছাদের পলিমাটিতে
বন্যার্তদের করুণ আর্তনাদ :
এবার এক লাখ শকুন পাঠান হুজুর।
আকাশে গর্জমান হেলিকপ্টারে ক'টা শকুন ধরতে পারে?
এখানে এখন মৃতদেহের নরক গুলজার।

পাহাড় প্রতিনিয়ত ধসছে,
পাথর চিরদিনই ভাঙবে।
তবু ভূ-সমীক্ষক ঘুমিয়ে থাকেন না কি?
পাহাড়ের বুক চিরে জলস্রোত নামে,

দুর্ভেদ্য পাথরের কোলেই জন্ম হয়
দুটি পাতায় একটি কুঁড়ি।
কোন্ দরিয়ায় চলছে এখন জাহাজ ...... মস্ত লোটিই
খাজাঞ্চিখানায় রপ্তানীর কড়াক্রান্তির হিসেব।

তিস্তা, তোমার দুরন্ত জলস্রাব জেনেও সবাই ঘুমন্ত।
আত্রেয়ী, জলঢাকা, করলা, বালাসন,
ভয়ঙ্কর উন্মাদ করতে করতে তোমরা
শেষে কোন্ দুঃখে নিজেরাই ভেঙে পড়লে?

ছেঁড়া আকাশ থেকে ছড়িয়ে পড়ে ছেঁড়া চট
পানীয় জল, ওজনমাফিক গুঁড়ো দুধ।
তারি মধ্যে আর্ত মানুষের দুঃখ চিৎকার থামাতে
কখনো বা ভারী হয় বারুদের গন্ধে বাতাস।

আপাতত শেষ সংবাদ :
তিস্তার পলিমাটির শ্মশানে
আগামী ফসল ফলবে খুবই!

বিস্ময়ের সঞ্চার করবে—এগুলি আপনার চিন্তাজীবনের সাম্প্রতিক বিকাশ মনে হয়। ইলেকট্রিক সুইচে চাপ দিলে যেমন হয় ঠিক সেইভাবে আমার এই মন্তব্য যেন তাঁর চিন্তাধারার সমগ্র রূপটিকে এক মুহূর্তে, গতিশীল করে তুলল। 'কী অসহ্য মানসিক যন্ত্রণা'—ফুঁসিয়ে রোলাঁ বললেন—'আমার সমাজবোধ এবং সমগ্র ধারণার সংশোধনের জন্য কী যে যন্ত্রণা যুদ্ধের পর নিরন্তর আমাকে ভোগ করতে হয়েছে!' তিনি বললেন, 'আমার অন্তর্দ্বন্দ্ব অতি ব্যাপক এবং বহু বিষয় নিয়ে, অহিংসার সমস্যা তার একটা অংশ মাত্র। অহিংসার বিরুদ্ধে এখনো আমি মতস্থির করি নি। কিন্তু এটা স্থির করেছি যে, অহিংসা আমাদের সম্পূর্ণ সমাজকর্মের নির্ভরকেন্দ্র হতে পারে না। বড় জোর একটা পথ হতে পারে—প্রস্তাবিত পথের একটা—যা এখনো কিন্তু পরীক্ষাধীন।'

জোর দিয়ে তিনি বললেন, 'আমাদের সকল প্রয়াসের মূল লক্ষ্য অপর এক সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা—যা অধিকতর সর্ববিস্তারপূর্ণ ও মানবিক।' কর্মপন্থার উল্লেখ করে বললেন,—মানবতাকে শোষণ ও বন্ধনে গ্রাস করে রেখেছে যে পুরোনো ব্যবস্থা, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধশক্তিকে একবদ্ধ করবার চেষ্টা আমি করে যাচ্ছি, সেইটেই আমার বিগত কিছু বছরের কাজ। ১৯৩২ সালে আমস্টার্ডামের রাজনৈতিক দল-সমাবেশে (ওয়ার্ল্ডস কংগ্রেস অব অল পলিটিক্যাল পার্টিজ) ফাসিজম ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে এই ছিল আমার ভূমিকা; ঐ কংগ্রেস কর্তৃক মনোনীত স্থায়ী কমিটিতেও আমার একই কাজ। আমি এখনো বিশ্বাস করি, অহিংসার মধ্যে প্রবল, যদিও প্রচ্ছন্ন, বিপ্লবকর শক্তি আছে যা ব্যবহার করা যেতে পারে এবং করা উচিত।

এই কথার মধ্যে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, বহির্বিশ্ব কি করে তাঁর বর্তমান ধারণাদির কথা জানতে পারবে? উত্তরে তিনি বললেন, আমার গত পনেরো বছরের সমাজবিষয়ক ধারণার পরিচয় মিলবে সদ্য-প্রকাশিত দুই খণ্ড পুস্তকে। প্রথম খণ্ড, 'পনেরো বছরের সংগ্রাম' গ্রন্থে আমি আমার ভিতরের সংঘাত এবং সমাজধারণার বিবর্তনের কথা বলেছি। দ্বিতীয় খণ্ডে, 'শান্তির জন্য বিপ্লব' পুস্তকে যুদ্ধ, শান্তি, অহিংসা ইত্যাদি প্রশ্নের বিচার করেছি—এইসব জিনিসগুলি কিভাবে পুরোনো সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনসাধনে একীভূত হতে পারে সেখানে তার আলোচনা আছে। কথাপ্রসঙ্গে তিনি আরো বললেন, তাঁর কোনো কোনো বন্ধু তাঁর সমগ্র ধারণাকে স্বীকার করতে চান না—নিজেদের পছন্দমত অংশেই বেছে নেন। এই দুই খণ্ড বই অবশ্য তাঁর ধারণার বিবর্তনের বিশ্বাসযোগ্য বিবরণী হয়ে থাকবে।

বহুকথিত ও বহুআশঙ্কিত ইউরোপীয় যুদ্ধপ্রসঙ্গ ছাড়া আমাদের আলোচনা শেষ হল না। 'অত্যাচারিত দেশ ও জাতির জন্য'—আমি বললুন—'যুদ্ধ অবিমিশ্র অমঙ্গল নয়।' 'ইউরোপের পক্ষে কিন্তু যুদ্ধ মহা সর্বনাশ'—তিনি বললেন—'এর ফলে সভ্যতার লয় পর্যন্ত হতে পারে। আর রাশিয়ার পক্ষে, যদি তাকে সমাজ-পুনর্গঠনের পরিকল্পনা সফল করতে হয়, শান্তি তো চরম প্রয়োজন।' *

---

* উত্তরের এই সাক্ষাৎ ও আলোচনার কিছুদিন পরে ১৯৩৬ সালের ২৩শে,

বিদায় নেবার আগে গৃহস্বামীকে তাঁর সহৃদয়তার জন্য আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানালুম। যে সত্য তিনি প্রকাশ করলেন তার জন্য জানালুম আমার পরম পরিতৃপ্তি। ভারত এবং ভারতের প্রয়োজনের জন্য তাঁর সহানুভূতিকে আমি এতই মূল্যবান বলে মনে করি যে, ভারতীয় পরিস্থিতির সর্বশেষ পরিণতি সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব কি ধরণের হবে তার ভাবনায় আমার অন্তর চিন্তাকুল থাকেই।

ভিলা ওলগা থেকে বেরিয়ে পড়লুম। জেনিভার হ্রদের সুনীল জলের উপর সূর্য এখনো জ্বলছে। আমার চারিদিকে সার সার তুষারশৃঙ্গ। আনন্দাবিদূরিত পারিপার্শ্বিক—তা আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করল। মন থেকে বিরাট ভার নেমে গেছে। আমি সুনিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করলুম যে, এই মহান মনীষী ও শিল্পী ভারত ও ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়াবেন—নিকট ভবিষ্যতে ভারতের কর্মপন্থা যে রূপই গ্রহণ করুক না কেন। সেই বিশ্বাস নিয়ে ফিরে এলুম জেনেভায়, পূর্ণ চিত্তে।

[ক্রমশঃ]

ফেব্রুয়ারীতে জওহরলালকে লেখা রোলাঁর একটি চিঠি জওহরলালের "পত্রগুচ্ছে" বেরিয়েছে। ঐ চিঠিতে রোলাঁ পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধের যে আগুন জ্বলে উঠছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে আহূত "বিশ্বশান্তি সম্মেলন"-এর পক্ষে জওহরলাল ও গান্ধীজীর সমর্থন চেয়েছেন। এ সমর্থন কিন্তু তিনি [illegible]
[illegible]
[illegible]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

১৯২২ সালে ডিসেম্বর মাসে গয়াতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। মামাবাবু সভাপতি মনোনীত হন। আমিও তাঁদের সঙ্গে গয়ায় যাই। কাশী ছেড়ে আমরা সবে কলকাতা এসেছি। গয়া কংগ্রেস-যাত্রী বহু লোক আমরা সেবার কলকাতা থেকে একসঙ্গে গিয়েছিলাম হৈ হুল্লোড় করতে করতে। এত লোক একসঙ্গে ভ্রমণ করার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। সুভাষবাবু ছিলেন সহযাত্রী, সর্বদাই তাঁকে মামাবাবু মামিমার আশে পাশে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছিল। মামাবাবুর মেয়েরা কেউ আসতে পারে নি। ভোম্বল, তার স্ত্রী সুজাতা ও ছোট্ট মেয়ে মিনু সঙ্গে এসেছিল। মামিমার দাদা সুরেন হালদার ও পত্নী বেলা দেবী ছিলেন। মিলি (সুপ্রভা মুখার্জি), মামিমার ছোট বোন (আমার পিসতুতো ভাই চারুচন্দ্র দাশ, ব্যারিস্টারের পত্নী) মাধুরী বৌঠান ও তাঁর মেয়েরা (সতী দেবী রমা গুহঠাকুরতার জননী ও বিজয়া, সত্যজিৎ রায়ের পত্নী) সকলে ছিলেন। আরো বহু লোক দেখতাম যাদের আমি চিনি না। প্রতি স্টেশনে কি ভিড় মামাবাবুকে দেখবার জন্যে। তাদের বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে রেলের কামরাগুলি কেঁপে উঠছে। গয়ায় ট্রেন থেকে নেমে জনসমুদ্রে ভেসে চললাম, তারপর যে মোটরে আমায় উঠিয়ে দিল তাতে উঠে চেয়ে দেখি সুরেন মামা, বেলা মামিমা ওই গাড়িতে রয়েছেন। মামাবাবুর জন্যে সুসজ্জিত একখানা মস্তবড় গাড়ি, তাইতে মামাবাবু মামিমার সঙ্গে ভোম্বল সুজাতা এরাও আছে। আস্তে আস্তে শহর ঘুরে সভাপতির শোভাযাত্রা চলতে লাগল। মামাবাবুর গাড়ির ঠিক পিছনেই আমাদের গাড়ি যাচ্ছিল। পর পর গাড়িগুলি চলেছে লম্বা লাইন হয়ে। তার উপর রাস্তার দু'পাশে বিপুল জনতার স্রোত চলেছে পাশে পাশে সমানে 'বন্দেমাতরম্' রব তুলে। প্রথমে আমাদের নিয়ে তোলা হয় একটি দোতলা বাড়িতে। সেখানে একরাত্রি থাকার পর নিয়ে যাওয়া হয় একটি প্রকাণ্ড একতলা বাড়িতে। সেই বাড়ির অর্ধেকাংশে মামাবাবুর সঙ্গে তাঁর দলবল আমরা রইলাম। বাকি অংশে রইলেন সরোজিনী নাইডু। বাড়িতে অনেক ঘর। যে যেখানে পেয়েছে জায়গা করে নিয়েছে। সুজাতা তার শিশুকন্যা মিনু ও আমি রইলাম একটি ঘরে। মস্ত বারান্দা এবং খাবার বড় ঘর থাকা সত্ত্বেও খাওয়া-দাওয়ার সময় স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় দফে দফে খেতে বসতে হত। মামাবাবুকে দেখতাম প্রায়ই সুভাষবাবুর সঙ্গে সকালে বিকালে বাড়ির ভিতর দিকের বাগানে বেড়াচ্ছেন। মামিমাও কখনো সঙ্গে থাকতেন। কি হৈ হৈ করে যে আমাদের দিন কাটত। এই গয়া কংগ্রেসে মামাবাবু কাউন্সিলে প্রবেশের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। উদ্দেশ্য, কাউন্সিলে প্রবেশ করে ভিতর থেকে সরকারের সব কাজে কেবল বাধা দিয়ে সব বিষয়ে তাকে অপারগ করে ধ্বংস করা। সেই সময় দেখেছিলাম পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুর পরিবারবর্গকে। কংগ্রেসের দৌলতে জওহরলালকেও কদিনই খুব কাছে থেকে নানাভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁর স্ত্রী কমলা ও পাঁচ বছরের সুন্দর টুকটুকে মেয়ে ইন্দিরাদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত। এই নাতনীটি ছিল মোতিলালের গলার মালা। ভোম্বলের মেয়ে মিনুও ছিল মামাবাবুর ঠিক এমনি আদরের। পণ্ডিত মোতিলাল ও মামাবাবু, যশস্বী এই দুই আইনজীবীই খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে এঁদের দুজনকে প্রায়ই একসঙ্গে একই পরামর্শ করতে দেখা যেত। গয়া কংগ্রেসে আমি, সতী দেবীসহ, 'বন্দেমাতরম্' গান করি। তখন মাইক ছিল না, গান কিন্তু চতুর্দিক থেকে পরিষ্কার শোনা গিয়েছিল। এই কংগ্রেস মণ্ডপে প্রথম দিলীপকুমার রায়কে দেখি, তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছে একটি গজল গান গেয়েছিলেন মঞ্চের ঠিক সামনেই যাতায়াতের জন্যে রাখা পথটিতে একটি টেবিল হারমোনিয়ম বাজিয়ে। যেমন অপূর্ব কণ্ঠ, তেমন গায়কীঢং আমাদের আকর্ষণ করেছিল। মনে হয়েছিল এ ঢং-এর গান পূর্বে আর কোথাও শুনি নি। যখন শুনলাম তিনি সুভাষবাবুর বিশেষ বন্ধু, তখন আমরা গিয়ে সুভাষবাবুকে ধরলাম তাঁর বন্ধুটির গান আরেকদিন শোনাবার জন্যে। কিন্তু সুভাষবাবু তখন কংগ্রেসের ব্যাপারে মেতে আছেন, কাজেই বেশি বিরক্ত করা গেল না। সরোজিনী নাইডুর ভাষণও শুনি এইখানেই প্রথম, কি অদ্ভুত ভালো যে লেগেছিল। গয়া কংগ্রেসে মামাবাবুর কাউন্সিল প্রবেশ প্রস্তাব গৃহীত হল না। কিন্তু তিনি দমবার মানুষ ছিলেন না। পরাজিত হয়েও অকম্পিতকণ্ঠে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন—

"Although today I d ffer from the majority of the members, I have not given up the hope that a day will come when I shall get the majority on my side."—

এক বছরও লাগল না তাঁর কাউন্সিল-প্রস্তাব কংগ্রেসে গৃহীত হতে। অন্য মতাবলম্বীদের কেমন করে মামাবাবু যে নিজের মতে নিয়ে আসতেন—সে এক

আশ্চর্য ক্ষমতা দেখেছি তাঁর। পরে কংগ্রেসের পর 'স্বরাজ্যদল' নামে একটি আলাদা নতুন দল মামাবাবু গঠন করেন। কংগ্রেসের মধ্যে থেকেই এই দলটি তাদের কাজ শুরু করে। মামাবাবুকে চিরদিনই, কি সাংসারিক জীবনে, কি রাজনৈতিক জীবনে, বাধার পর বাধার দুর্গম পথ অতিক্রম করে চলতে হয়েছে। কোনও দিকেই পথ তাঁর সুগম ছিল না। বিপুলকায় দৈত্যের মতনই এক-একটি বাধা সম্মুখে এসে তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। দৃঢ়পদক্ষেপে, তাদের বুকে কুঠারাঘাত করতে করতে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছে গন্তব্যের দিকে। কোনও সংকল্প হতে কোনও বাধাই, তা সে যত বড়ই হোক না কেন, তাঁকে টলাতে পারে নি। জীবন বিপন্ন জেনেও যা করতে বা বলতে চেয়েছেন তার সাহসের অভাব কখনও তাঁর হয় নি। সত্য বলে যা জেনেছেন বা মনে করেছেন, উন্নতশিরে বুক ফুলিয়ে তা করে গেছেন। মামাবাবুর এই দলটি ক্রমেই এতই প্রাধান্য লাভ করে যে কংগ্রেসে সে এক রকম সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। এই দলে ছিলেন সুভাষবাবু, অনিলবরণ রায়, সত্যেন মিত্র প্রমুখ মামাবাবুর বিশেষ অন্তরঙ্গরা। এঁরা সব ছিলেন তাঁর সন্তানতুল্য, এত ভালোবাসতেন। সেই সময় দেখেছি এঁরা সব কি যে অদম্য উৎসাহে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সুভাষবাবু ছিলেন মামাবাবুর পরম প্রিয় শিষ্য—দক্ষিণহস্ত। এই সময়ে 'ফরওয়ার্ড' নামক দৈনন্দিন একটি খবরের কাগজ মামাবাবু প্রকাশ করেন ও নিজে তার সম্পাদনা করেন। এই কাগজে খুব জোর সব লেখা বের হতে থাকে, সে সব লেখা থেকে স্বরাজ্য দলের অভিমত, আদর্শ, কর্মপদ্ধতি, পন্থা, এ সব সম্বন্ধে আলোক আলো পাওয়া যায়। লোকমত গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই এ কাগজ তিনি বার করেন এবং তাঁর সে উদ্দেশ্য সফল হয়। স্বায়ত্তশাসনের আটঘাট বাঁধবার প্রচেষ্টায় স্বরাজ্য দল আপনাকে নিয়োজিত করে কাউন্সিলে প্রবেশ, ও ধীরে ধীরে কর্পোরেশন প্রভৃতি অধিকার করে। সাফল্যের পর সাফল্যে স্বরাজ্য পার্টির তখন চারিদিকে এতই প্রভাব ও প্রতিপত্তি যে জনমত, এমন কি স্বরাজ্য দলের বিরুদ্ধবাদীরাও, ক্রমে তাদের সমর্থক হয়ে ওঠে ও তাদের জয়যুক্ত করতে সহায়তা করে।

১৯২৪ সালে অক্টোবর মাসে সুভাষবাবুদের আবার গ্রেপ্তার করায় খবরে মামাবাবু তীব্র উত্তেজিত হন। সে সময় কলকাতা কর্পোরেশনে তিনি যে ভাষণ দেন তা যেমন একদিকে অপমানজনক, অন্যদিকে তা যেন স্বাধীনতার উদাত্ত ঘোষণা, যেমন জোরালো তেমনি তেজোদীপ্ত। প্রতিটি কথায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝরে পড়ছে—যারা শুনেছে, যারা পড়েছে সেই ভাষণ, তারা প্রত্যেকেই নিজের ভিতর অনুভব করেছে একই জিনিস—সেই চ্যালেঞ্জের ভাব। আমি তুলে দিচ্ছি সেই অগ্নিগর্ভ ভাষণের কিছু কিছু অংশ—

"If a bomb was thrown anywhere or a pistol fired, we are accustomed to cry out 'It is a dastardly outrage'. We cry out 'this is a dastardly outrage', because we feel it is a dastardly outrage. But the time has come now to condemn not only the violence of the people who are addicted to violent methods, but also to condemn the violence of the Government (hear, hear). This is a clear illustration of what I consider to be a violence on the part of Government. They have passed a law which a lawless law..... Subhas Chandra Bose was arrested under Regulation III on Oct. 25, 1924. One fine morning he went out to do his work as the Chief Executive Officer of the Corporation. He returned home and found the police force in his house. Not one charge was made against him. Not one explanation was asked of him, not one reason was urged before him, but he was simply told—'We have got the physical-brute force here and we will drag you to imprisonment (cries of hear, hear). Is this not violence? Is this law? Is this justice? If it was one, we would have expected the officer to say 'Well, we charge you with this, you have done this, that, or other thing. What have you got to say for your explanation?' No, not one charge was formulated. Not one explanation was taken. But they simply carried him by force from his home and lodged him in jail.'

I really do not think that when a revolutionary, in the enthusiasm of his heart fires pistol or throws a bomb he is guilty of more violence than what the Government is today, (cries of hear, hear).

....I tell them again that no amount of repression will ever put a check to this revolutionary movement. You cannot wipe out a nation from the face of the earth! You cannot check a people who are bent upon attaining freedom!

I shall lay down my life for liberty. I am not a revolutionary so far as far as the methods are concerned, but I feel like that. Standing here today I proclaim that if it is necessary to lay down my life for my liberty, I am prepared to do it (Applause and loud cheers).

If I believed in revolutionary movement,—If I believe today that it will be a success—I shall join the revolutionary movement tomorrow. But my belief is that, it will not succeed, that is why I do not join it. So far as their enthusiasm for liberty is concerned I am with them. So far as their love of freedom is concerned I am with them. But if my suffering or struggle or every drop of my blood is necessary to achieve this freedom, I am ready.

I was told at Simla that as soon as I got down at Howrah I should be arrested. I am not afraid of being arrested. I have done nothing wrong. I have done what every honest man in India is bound to do (loud applause and cries of hear, hear).

Every honest man in this country is bound to say "I love my country—I love my freedom. I will have the right

—the birth right, to manage my own affairs."

If that is a crime, I plead guilty to that charge. If that is a crime, I am willing to be hanged for that rather than to shirk the duty which I feel to be the only duty of every Indian of the present day.

*** * * * All that I say is that Mr. Subhas Chandra Bose is no more a revolutionary than I am. Why have they not arrested me? I should like to know why? If love of country is a crime, I am a criminal. If Mr. Subhas Chandra Bose is a criminal, I am a criminal—not only the Chief Executive Officer of this Corporation, but the Mayor of this Corporation is equally guilty (cries of hear, hear and applause).**

আজও যখন ভাবি প্রাণের মধ্যে কেমন করে ওঠে। এখনো সেই সব ঘটনার ঢেউ এসে লাগে হৃদয়তটে, নাড়া পড়ে অন্তরে। চলে নানাভাবের আনাগোনা, নানা চিন্তার উদয়-অস্ত। কখনও মন স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তে রাঙা ইতিহাসের পাতা খুলে বসে, কখনও ভাবতে শুরু করে আমাদের মহান দেশ এই ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের কথা আর তার গৌরবোজ্জ্বল বর্তমানের কথা। সেই যুগের আমাদের সব সোনার ছেলেদের বীরত্বের কথা, আর এই যুগের দেশের রত্ন আমাদের সব জওয়ানদের বীরত্বের কাহিনী। কখনও পেছে বসে তাদের কথা, কখনও এদের। কখনো মন উড়ে বেড়ায়। মধুমক্ষিকার মতন একবার এখানে বসে একবার ওখানে। দেশের কথা ভাবতে ভাবতে মন যুক্ত হবে ওঠে তখন ভেসে আসে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের অমর লাইনগুলি—

'এ দেবভূমির প্রতি তৃণ পরে আছে
বিধাতার করুণা দৃষ্টি,
এ মহাজাতির মাথার উপরে করে
দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি!'—

ভেসে আছে—

ভগবৎগীতা গাহিল স্বয়ং ভগবান যেই
জাতির সঙ্গে,
ভগবতপ্রেমে নাচিল গৌর যে দেশের
ধূলি মাখিয়া অঙ্গে'—

জনপ্রাণ সব সমস্বরে গেয়ে ওঠে এই ত' সেই দেশ, আমাদের এই ভারতবর্ষ, যুগে যুগে যেখানে অবতীর্ণ হয়েছেন মানুষের জীবনে উদ্ধার করতে, তাঁদের

সবিনয় নিবেদন

'স্মৃতির খেয়া'র একাংশে বসুমতীতে অমৃত ত্রুটি প্রকাশিত হওয়ায় লেখিকা নিম্নলিখিত সংশোধিত অংশটুকু পাঠিয়েছেন। সঃ সঃ সঃ

১৯১৬ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী (৬ই ফাল্গুন) রসা রোডের বাড়িতে আমার বিবাহ হয়। মামাবাবু বিয়ে দেন। সেই থেকে মামার বাড়িতে মামাতো ভাই-বোনেদের সঙ্গে সদা-সর্বদা একসঙ্গে থাকার সেই অনাবিল আনন্দের পর্বে ছেদ পড়ে। মামার বাড়ির সকলের সংসর্গ, মামাবাবুর সান্নিধ্য, সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়ে খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। এই সময় থেকেই মামার বাড়ির সংস্রব ক্রমে ক্রমে কমে আসতে থাকে, তাদের সবকিছুর সঙ্গে আগেকার মত যোগাযোগ রাখাও আর যেন তেমন সম্ভব হত না। ফলে জীবন হয়ে আসে শূন্যময়। মামার বাড়ি ছেড়ে আসার সঙ্গে আমার জীবনের অনেক কিছুকেই বিসর্জন দিতে হয়েছিল, যার মূল্যে আমার কাছে ছিল অমূল্য।

মনে আছে বিয়ের পরের দিন সকালে মামার বাড়ির সুবৃহৎ বৈঠকখানায় মধ্যে আমাদের পিসতুতো ভগিনীপতি তাতাবাবু (সুকুমার রায়) কি রকম জমিয়েছিলেন তাঁর 'চলচিত্তচঞ্চরী'র পাণ্ডুলিপি আবৃত্তি করে এবং তাঁরই অন্যান্য লেখা থেকেও কিছু কিছু পাঠ করে। এখনও কানে বাজে সেই অসাধারণ একেবারে নিজস্ব ঢঙে এই লাইনগুলির তাঁর পড়া—

—'কাছে এসে ঘেঁষে ঘেঁষে
হেসে হেসে কেশে কেশে
এত ভালো বেসে বেসে
টাকা মেরে পালালি শেষে'—

ঘরভরা লোক সেদিন কি হাসিটাই হেসেছিলেন। কি অদ্ভুত ঢঙই যে ছিল তাতাবাবুর এসব পড়ার। ও রকম আর শুনি নি। যে লাইনগুলি আমি তুলেছিলাম, তার মধ্যে হয়ত ভুল-ত্রুটি থাকতেও পারে। কেন না সেই সেদিনের তাঁর মুখে যা শুনেছিলাম তারই যা মনে আছে, তাই থেকে দিয়েছি। তখনও তাতাবাবুর 'আবোল তাবোল' বা 'হ য ব র ল' বের হয় নি। পরে 'আবোল তাবোল' আকারে বের করার সঙ্গে সঙ্গে সুকুমার রায় বাংলা দেশের মন কেড়ে নিলেন। অমন প্রতিভা আর হল না।

পদধূলি মাথায় নিতে। এই ত' সেই ভারতবর্ষ ভগবানের পদরজে বিধৌত যে পুণ্যভূমি। এই সেই ভারত, আসমুদ্র হিমাচল যার ভগবদ্‌জ্ঞানের জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান, যে জ্ঞানের আলো থেকে আলোকসমৃদ্ধ এ মহীমণ্ডল।

ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েই মামাবাবু পূর্ণোদ্যমে তাঁর কাজ করে চললেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে অসুস্থ অবস্থায় তাঁর কাউন্সিলে যাবার দৃঢ়পণের কথা বলি। দৃঢ়পণের চাইতেও মৃত্যুপণ বললে বোধহয় কথাটি আরো ভালো বোঝায়। গভর্নমেন্ট কর্তৃক 'অর্ডিনান্স' বিল এর প্রস্তাব কাউন্সিলে উপস্থিত করার কথা। সে বিল কিছুতেই যাতে পাশ না করতে পারে তারই জন্যে মামাবাবুর কাউন্সিলে যাবার এই মরণপণ। যে তারিখে এই বিল প্রস্তাব করার কথা (৭ই জানুয়ারী, ১৯২৫), তার মাত্র ক'দিন আগে তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। বালিশ দিয়ে রাখা হয়, উত্থানশক্তি রহিত। শরীরের এই অবস্থা তবু মুখে ওই কথা 'কাউন্সিলে আমাকে যেতেই হবে।' ডাক্তাররা জানতেন তাঁকে কেউ ঠেকাতে পারবে না মরে গেলেও যাবেনই। তাই ওঁরা আপত্তি করার দিক দিয়ে না গিয়ে কি করলে ওঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয় তারই চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এমনই দুর্বল অবস্থা যে সভায় যাওয়ার আগে পর্যন্ত কথা বলতে হাঁপিয়ে পড়ছেন। বাড়ি শুদ্ধ সব চিন্তাকুল। শেষ পর্যন্ত স্ট্রেচারে শুইয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল, এবং সভাকক্ষেও শায়িত অবস্থায় রইলেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ও ডাক্তার জে এম দাশগুপ্ত সঙ্গে রইলেন ডাক্তার হিসেবে। এঁরা কাউন্সিলের সদস্য, তাই এঁদের সঙ্গে থাকার কোনও আপত্তি ওঠে নি। বক্তৃতাদির পরে ভোট গণনা করে দেখা গেল গভর্নমেন্ট পক্ষ পরাজিত হয়েছেন, বিল পাশ হয় নি। মামাবাবুকে এইভাবে, এই রুগ্ন অবস্থায় কাউন্সিলে আসা,—দেশের প্রতি তাঁর এই ভালোবাসার, এই কর্তব্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত কাউন্সিলের সদস্যদের এতই স্পর্শ করল, তাঁদের চক্রান্ত নিষ্ফল হবে গেল। যাঁরা মামাবাবুর বিপক্ষে ভোট দেবেন স্থির করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই মামাবাবুকে ভোট দিয়ে বসলেন। এই অসম্ভব সম্ভব হল শুধু তাঁর উপস্থিতির জন্যে। তাই ভাবি তাঁর ব্যক্তিত্বের কি যাদুকরী প্রভাব। আর কি তার অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি। অবাক না হয়েই পারা যায় না। মামাবাবু বাড়ি ফিরলেন জয়ী হয়ে। এর পর একটু সুস্থ বোধ করলে মামীমাকে নিয়ে পাটনা গেলেন মেজমামার কাছে। আমিও সে সময় মায়ের কাছে পাটনায় গিয়েছি। অনেক দিন মাকেই যা ভুগলেন। দাদা তখন কলকাতায়

ছেড়ে পাটনা আদালতে প্র্যাকটিস করছেন। মামাবাবু মামিমা রোজই মাকে দেখতে আসতেন, মেজমামাও কখনো সঙ্গে থাকতেন। এই সময় মামাবাবু একদিন মাকে বললেন, 'দিদি, মহাপ্রস্থানের ত' সময় হয়ে এল, এখন কে আগে যায়।'—মায়ের মনে এই কথাটি গাঁথা হয়ে যায়। এর অল্পদিনের মধ্যেই মামাবাবু মহাপ্রস্থান করেন। তাঁর দেহাবসানের পরে প্রায়ই কথাটি বলতেন। মামাবাবু যাবার এগার মাস বাদে মা যান এবং তার এক মাস পরেই আমাদের আদরের ভাই ভোম্বল শোকাতুরা জননী, তরুণী পত্নী সুজাতা ও তিনটি শিশুকন্যা রেখে মাত্র ২৮ বছর বয়েসে জীবনের সব খেলাধুলো সাঙ্গ করে অকস্মাৎ চলে যায়। মনে পড়ে তার মৃত্যুর ক'দিন আগেও, আমাদের মায়ের শ্রাদ্ধের দিন এসে কত কাজই করেছিল।

মামাবাবু তাঁর রসা রোডের বিরাট বাড়িটি দান করে দিলেন দেশের কাজের জন্যে, নিজে দাঁড়ালেন পথে এসে। তাঁর বাল্যবন্ধু এ্যাটর্নী পল্টু কর তাঁর নিজের এবং বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়ির একটি ফ্ল্যাট মামাবাবুদের থাকার জন্যে ছেড়ে দেন। সেই বাড়িতে গিয়ে তিনি উঠলেও ঘটনাচক্রে দু-চার দিনের বেশি আর সেখানে তাঁর থাকা হয় নি। এর পরেই প্রাদেশিক সম্মিলনে সভাপতি হয়ে ফরিদপুর যান। কিন্তু সেখান থেকে ব্যর্থ-মনোরথ হয়ে ফিরে এলেন বুকভরা ব্যথা নিয়ে। তাঁর নিজের দলের মধ্যেই অনেকেই যে তাঁর মতের বিরুদ্ধে গেল এই মর্মান্তিক ধাক্কা তিনি আর সামলে উঠতে পারলেন না। দেশবাসী তাঁকে বুঝল না—এই ব্যথায় তাঁর ভাঙা শরীর আরো ভেঙে গেল। অবস্থা ক্রমেই যথেষ্ট চিন্তার কারণ হয়ে ওঠায় সে মাসের মাঝামাঝি তাঁকে দার্জিলিং-এ নিয়ে যাওয়া হয়। দার্জিলিং ছিল তাঁর বড় প্রিয় স্থান। মোনার বাড়িতে তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়। বার বার তাঁদের কাছে দার্জিলিং-এ গিয়ে থাকবার জন্যে কতই বললেন। যাবো যাবো কতবারই ভাবলাম, কিন্তু তাঁর কাছে গিয়ে পোঁছাবার আগেই তিনি চলে গেলেন এমন এক জায়গায় যেখানে গেলে কেউ আর দেখা পায় না। মামাবাবু ভুগছিলেন, তিনি যে খুবই অসুস্থ, সবই বুঝতাম, কিন্তু তিনি যে একেবারেই চলে যাবেন এ কথা একবারও মনে আসে নি। ২৫শে জুন, ১৯২৫, বিকাল ৫টার সময় দার্জিলিং-এ 'স্টেপঅ্যাসাইড' নামক বাড়িতে, আপন পর, ধনী নির্ধন একাধারে সবাইকে কাঁদিয়ে মামাবাবু চলে গেলেন সেই অলোকধামে।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখনো নামে নি। আমার স্বামী দ্রুতপদে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এসে বললেন, 'খবর খুব খারাপ, মামাবাবু আর নেই। ৫টার সময় মারা গেছেন খবর এসেছে।' মুখ তাঁর ম্লান, গম্ভীর। শুধু বললেন, 'দেশের কি ক্ষতিই যে হল, কল্পনা করা যায় না'— আমার চোখে অন্ধকার নেমে এল! সন্ধ্যা হবার আগেই মনে হল অন্ধকার......কি অন্ধকার। সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আমি একা বসে রইলাম স্তব্ধ হয়ে কতক্ষণ জানি না। তারপর গেলাম মোনার বাড়ি। সেখানে গিয়ে দেখি বাড়ি নিঝুম, চারদিক নিস্তব্ধ—যদিও ঘরভর্তি লোক। তারই মাঝে এক কোণায় মুখখানি নিচু করে সুধীর বসে আছে চুপ করে। আস্তে আস্তে মোনার ঘরে গেলাম, গিয়ে দেখি মামাবাবুর ছবিখানি বুকে নিয়ে সে কি কান্নাই কাঁদছে! সেই খাটের উপর তার কাছে বসে আছেন ন' মাসিমা ও ছোট মাসিমা। ন মাসিমা মামাবাবুদের কাছেই ছিলেন, মাত্র ক'দিন আগেই ফিরেছেন। সকলেরই চোখের কোল বেয়ে ঝরে পড়ছে অঝোরধারা। মাকে সেখানে কোথাও দেখতে পেলাম না। চলে এলাম আমার সেজদির বাড়ি। ওখানেই মা এসে রয়েছেন কিছুদিন থেকে, শরীর তাঁর অনেকদিন থেকেই খারাপ চলেছে, তাই খগেনবাবুর চিকিৎসায় আছেন। দেখলাম মা বসে আছেন স্থির, শান্ত সমাহিত, মুখেও কথা নেই, চোখেও জল নেই। মনে পড়ছে মায়ের একখানি চিঠির কথা। মামাবাবুর মহাপ্রয়াণের পরে 'সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা' কাগজে আমি 'স্মৃতি তর্পণ' বলে একটি প্রবন্ধ লিখি। সেই প্রবন্ধটি পড়ে পাটনা থেকে মা আমায় লেখেন—'তোমরা যে তোমাদের মামাকে এমন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছ ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য। সে যে আমার কতখানি ছিল তাহা তোমরা কল্পনাও করিতে পার না। তার অন্তর্ধানে আমার দুঃখ নাই কারণ তাহাকে আমি হারাই নাই, যেখানে বিচ্ছেদ নাই সেখানে শোক দুঃখের স্থান নাই।'—

১৮ তারিখে সকালে শিয়ালদা স্টেশনে মামাবাবুর শবাধার নিয়ে দার্জিলিং মেল এসে পোঁছাবার কথা। আমি তার আগের দিন রাত্রে মোনার বাড়িতে রইলাম। মিলিও রইল। ওখান থেকে আমরা শিয়ালদা স্টেশনে যাব তারই ব্যবস্থা হয়েছে। ১৭ তারিখে মহাত্মা গান্ধী এবং ১৮ তারিখে মেজমামা পাটনা থেকে এসে পোঁছালেন। মহাত্মাজী সে রাত্রে মোনার বাড়িতেই রইলেন। রাত থাকতেই মোনা সুধীর মহাত্মা গান্ধী ওঁরা মোটরে চলে গেলেন ব্যারাকপুরে দার্জিলিং মেল ধরবার জন্যে। ভোম্বল সুজাতা ওরাও অনুকূল ঠাকুরের আশ্রম থেকে এসে দার্জিলিং মেল ধরে। আমি, মিলি, আরো অনেকে, আমরা চলে গেলাম শিয়ালদা স্টেশনে ট্রেন পোঁছাবার অনেক আগেই। তখনই গিয়ে যে ভিড় দেখলাম এমন ভিড় কখনো দেখি নি। তিলার্ধ জায়গা কোথাও নেই। এমন কি যে প্ল্যাটফর্মে গাড়ি এসে দাঁড়াবে, তার করোগেটের টিনের চালের নিচে যে সব লোহার ফ্রেম রয়েছে, তাই ধরে সব ঝুলছে। কিম্বা ওরই মাঝে যে একটু ঠাঁই করে নিতে পেরেছে, সে তাইতেই অতিকষ্টে কোনও রকমে বসে আছে। সে যে কি দৃশ্য, যারা দেখেছে তারাই জানে। দেশবাসীর হৃদয়ে দেশবন্ধুর স্থান কোথায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম যেখানটায় মামাবাবুর জন্যে পালঙ্ক রাখা ছিল তারই একেবারে পাশে। মিলি সুন্দর করে বিছানাটি ঠিক করে দিল। মাথার কাছে গীতাখানা রেখে দেওয়া হল। ফুল হাতে সবাই দাঁড়িয়ে, সকলেই থেকে থেকে চোখের জল মুছে নিচ্ছে। কি গভীর শোকের দৃশ্য যে দেখেছিলাম! ওই ভিড়, কিন্তু কি নিস্তব্ধ শিয়ালদার স্টেশন। তারপর মনে আছে ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে ট্রেনের প্রবেশ করা—মনে হচ্ছিল বিশ্বের শোক বহন করে সে আসছে...ধীরে, অতি ধীরে। মহাত্মা গান্ধীকে দেখা গেল যে গাড়িটিতে শবাধার আছে সেই গাড়ির দরজা খুলে দরজাটির সামনে দাঁড়ানো, দুটি হাত নেড়ে ভিড়কে শান্ত হয়ে থাকতে অনুরোধ করছেন। কিন্তু সেই বিপুল জনতা সে সব কিছুই দেখতে পাচ্ছে না তাদের প্রিয় দেশবন্ধুকে একটিবার দর্শনের আকুল আকাঙ্ক্ষায় ভিড় ঠেলে সেই কামরার দিকে এগিয়ে আসবার চেষ্টা করছে। মামাবাবুর শবাধার ট্রেন থেকে আস্তে আস্তে নামিয়ে এনে পালঙ্কটির পাশে রাখা হল। তাঁকে দেখার ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে কখন থেকে অপেক্ষা করছি। দেহটি তুলে খাটে রাখা হলে মামাবাবুকে দেখতে পেলাম। কিন্তু দেখে আরো কষ্ট হতে লাগল। যে চেহারা দেখলাম মামাবাবু বলে আর তাকে চেনাই যাচ্ছে না। আমি ও মিলি গিয়ে শেষ প্রণাম করলাম। কাঁধ দেবার জন্যে তখন কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে, সকলেই পাগল কাঁধ দিতে। মহাত্মা গান্ধী সে ভিড় সামলাতে পারছেন না। তারপর দেখা গেল ফুলে বোঝাই শবসুদ্ধ পালঙ্কটি যে উড়ে চলেছে। তবে কোনও ওজন আছে বলে বোঝাই যাচ্ছে না। খাটের চারি পাশে অত ফুলের স্তূপ উঁচু হয়ে থাকায় মামাবাবুর মুখখানি আর দেখাই যাচ্ছে না। শবশোভাযাত্রায় পুরোভাগে চলেছেন মহাত্মাজী। আমরা যখন বাড়ি ফিরবার জন্যে পা বাড়ালাম, তখন ভিড়ের

চাপে নিষ্পিষ্ট হয়ে মরে যাবার মত অবস্থা হয়েছিল। কি করে যে বের হয়ে আসতে পারলাম জানি না। ভলাণ্টিয়ারদের জন্যে সে যাত্রা কোনও রকমে বেঁচে গেলাম। স্টেশন থেকে চলে গেলাম মোনার বাড়ি। আমরা এসে পৌঁছাবার পরে মামিমারা সকলে এসে নামলেন। তার আগে থেকে মা এসে অপেক্ষা করছিলেন, মামিমা গাড়ি থেকে নামতেই মা তাঁকে বুকে টেনে নিলেন। সে দৃশ্য যেমনই করুণ তেমনই হৃদয়বিদারক! খানিকক্ষণ মামিমার কাছে থেকে মা ফিরে এলেন খগেনবাবুর বাড়িতে, সেইখান থেকে শবশোভাযাত্রা দেখবেন বলে। সে বাড়িও রসা রোডের একেবারে উপরেই। নতুন বাজার থেকে টুকরী বোঝাই ভালো ভালো ফুল আনিয়ে জানালার কাছে গিয়ে মা বসে রইলেন মামাবাবুকে শেষবার দেখার জন্যে। রাণী মাসিমা (নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের পত্নী) এসে বসলেন মায়ের পাশে। বাকথা করা হল বাড়ির সামনে শোভাযাত্রার ভিড় একটু থামিয়ে মায়ের ফুলের গুচ্ছ তুলে দেওয়া হবে। আমিও এলাম সবাব দেখব বলে। এই বাড়ি থেকে ভালো করে দেখতে পাওয়া যাবে এই আশায়। যদিও শিয়ালদা স্টেশনে তাঁকে খুব ভালো করেই দেখতে পেয়েছি, এবং চেহারা দেখে কষ্টও হয়েছে, তবু, আর ত' কোনওদিন তাঁকে দেখতে পাব না! মামাবাবু বলে চিনতে পারা না গেলেও আমাদের মামাবাবুই ত'। তখন বোধহয় দুপুর একটা কি দেড়টা হবে। দূর থেকে দেখা গেল শবশোভাযাত্রা আসছে। কি দ্রুতগতিতেই আসছে আর কি বিরাট শোভাযাত্রা। না দেখলে এর বিরাটত্ব কোনও ধারণাই আসত না। শহরের নানা পথ ঘুরে আসছে তাই হয়ত এত দেরি। ফুল দেওয়া হতে না হতেই আবার বেগে বেরিয়ে গেল ভালো করে দেখবার অবকাশ হবার আগেই। বড়ই ইচ্ছে হল কত স্মৃতি-বিজড়িত সেই রসা রোডের বাড়ি থেকে একবার তাঁকে দেখবার। চেষ্টা করলাম, কিন্তু তখন রসা রোডের বাড়ির ফটক পার হয়ে শোভাযাত্রা অনেকটা এগিয়ে গেছে কেওড়াতলা শ্মশানের পথে। মামিমারা সব দেখবেন বলে মুহূর্তে মুহূর্তে মোনার বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। সকলেই ওঁরা রসা রোডের বাড়ির ফটকের সামনে বসে ছিলেন শেষ দেখা দেখবার জন্যে।

চিরদিনের মত মামাবাবু অদৃশ্য হয়ে গেলেন আমাদের চোখের সামনে থেকে।

তারপর—কেওড়াতলা শ্মশানে সব ক্লান্তি তাঁর পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আমাদের আগুন নিভল। সেই সঙ্গে নিভে গেল সেই আলো যে আলোর ভিতর ছিল অফুরন্ত জ্বালবার অগ্নি।

শ্রীঅরবিন্দের কথা তুলে দিয়ে আমার মামার পুণ্যকথা এইখানে শেষ করি—

"Chittaranjan's death is a supreme loss. Consummately endowed with political intelligence, constructive imagination, magnatism, a driving force combining a strong will and uncommon plasticity of mind for vision and tact of the hour, he was the one man after Tilak who could have led India to Swaraj'.

॥ সমাপ্ত ॥

জননী জন্মভূমি
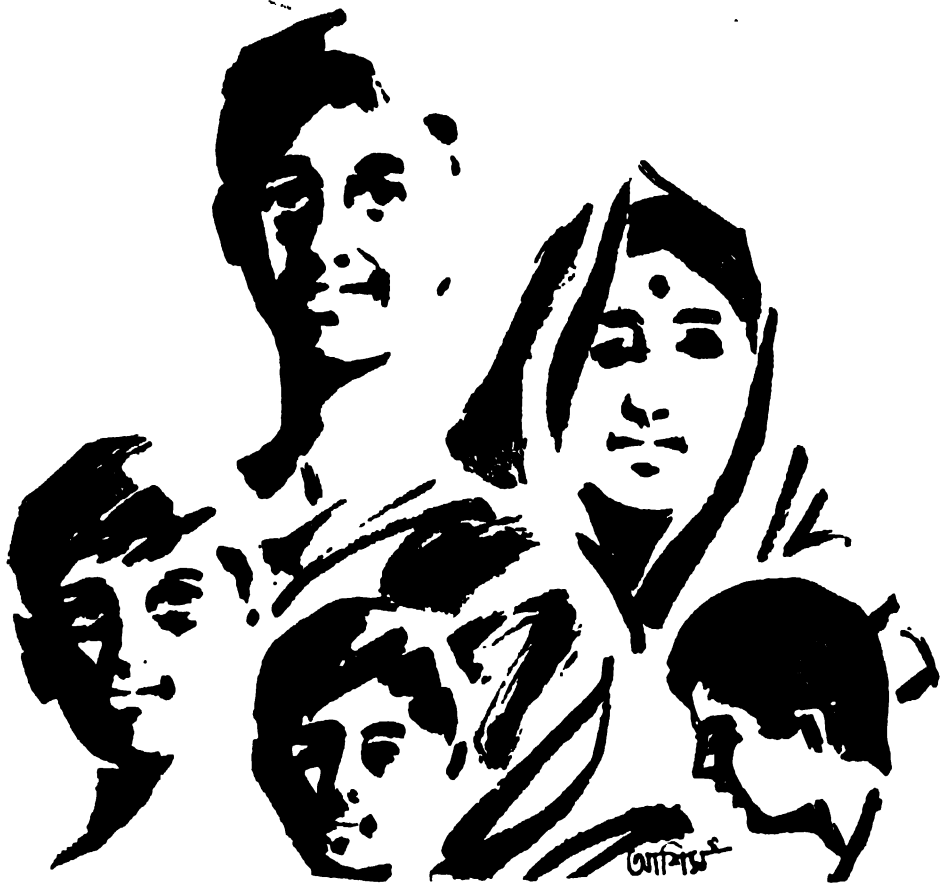
সমীর মুখোপাধ্যায়

আমি ভুলু, দুলু আর বুলু দুভাই আমার, আমার বাপ, মা, আমরা সবাই খুবই গরীব ছিলাম। পড়শীরা বলতো, এক বামুনের তিন পুত, তার একটা ছতি্য, একটা দানো, একটা ভূত। আমরা ত' ভাই ছিলাম। পরনে উলিডুলি পোষাক, শতচ্ছিন্ন, ময়লা, চিমসে-ধরা প্যান্ট, মাঝে মাঝে হাত দুটি পেছনে জপা দেবার দরকার হ'ত, পোড়া খড়ের মত আমাদের এলোমেলো উড়নচণ্ডে চুল, এঁটেল মাটির মত শুকনো হাতে পায়ে খাঁড়, আমরা তিন ভাই ছিলাম জন্ম হাঘরে। আমাদের লোভ ছিল দুর্দান্ত। কাউকে যদি খেতে দেখতাম ভালো-মন্দ, তাহলে লকলকে, লম্বা জিভ বার ক'রে ঢোক গিলতাম অনবরত, একদৃষ্টে সতৃষ্ণ-চোখে চেয়ে থাকতাম, একটু যদি জোটে তাহলে যেন বর্তে যাই এমনি ছিল আমাদের ভাবখানা। বাড়িতে একবার একজনকে বাবা খাওয়ায়। প্রকাণ্ড মাছের মুড়ো পাতে দেওয়া হয়েছে। আমরা তখন নিতান্ত কচিটি নই। তিনজনেই ঠিক করেছিলাম আমরা ভীষণ অন্যমনস্ক থাকবো। ছিলামও এতোক্ষণ। খুবই দুলছিলাম আমরা। হঠাৎ মাছের মুড়োটা আমাদের ঘাড়টা তার দিকে বাঁকিয়ে দিলো। আমরা কেউ আর স্থির থাকতে পারলাম না। অতোবড়ো মাছের মুড়োটা লোকটা একা খাবে? বড় বড় ঢোক গিলতে লাগলাম আমি। শেষে, যদিও আমিই ওদের মধ্যে বয়সে সব থেকে বড়ো, আর থাকতে পারলাম না, করলাম কি, মাছের মুড়োর ঘাড়ে দুলতে দুলতে পড়ে গেলাম। ফলে সেই লোকটির সামনেই বাবার হুড়কো দিয়ে বেদম প্রহার আমাকে। মারের চোটে আমার পিঠে কালসিটে দাগ পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে আর ঠাকুমা ফিট হয়ে গেল। লোকটি ত' অপ্রস্তুতের একশেষ। এরকম একটা দৃশ্যের তাকে মুখোমুখি হতে হবে এটা সে ভাবে নি কখনো। সাতদিন আমার গায়ে মারের সেই কালসিটে দাগগুলি ছিলো। আমাদের একটা গ্যাঙ থাকতো। যেখানে যতো বিয়ে, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন থাকতো আমরা ঠিকই তার খবর পেতাম। কেউ নেমন্তন্ন করুক ছাই না করুক আমরা ঠিকই হাজির থাকতাম। এসব ব্যাপারে আমাদের মানাপমান ছিলো না একেবারে। খেতে কেউ লজ্জা করেছে শুনলে আমরা কেমন অবাক হয়ে যেতাম। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, কোথা থেকে ভরপেট খেয়ে এলে, মা ও বাবা দুজনে হিসেব চাইতো কি কি খেলাম, কেমন খেলাম, কি কি মিষ্টি খেয়েছিলো, দই [illegible]

খেয়ে আসা যায় ত', ছানাবড়ার সাইজ কি রকম করেছিলো, রাবড়িও করেছিলো কি, কতোটা খেলি এই সব।

মা আবার আমকে বলতো 'আঁব' আর লুচিকে বলতো 'নুচি'। কম 'নুচি' খেয়েছি শুনলে মা মুষড়ে পড়তো। ছাঁদা বেঁধে না আনলে বাবা আমাদের সংগে কথাই বলতো না। মাঝে মাঝে রীতিমত অনুযোগও করতো, 'শুয়োর পেটে গিলে এলে একা একা আর বুড়ো বাপের কথা মনেই পড়লো না, অদ্ভুত জানোয়ার তৈরি হয়েছো ত'!

২

ঠাকুর্দা যখন বেঁচে ছিলেন তখন প্রায়ই উঠোনে জ্যোৎস্না নামলে আমাদের এই অবস্থা কেন এমন তার গল্প বলতেন। একসময় আমাদেরই নাকি ছিল সুবর্ণপুরী। ঠাকুর্দার দোষেই নাকি সেই সুবর্ণপুরী দেখতে দেখতে হয়ে গেল ছাইপুরী। এখন আমাদের খালি ছাই নেড়ে নেড়ে যেতে হবে। ঠাকুর্দা একদিন তখন এই সবে সান্ধ্য হয় হয়। লশুনে একটু ঝোপের নেমেছে কি নামে নি। জোনাকি একটা দুটো উড়ছে ফর ফর করে। পুকুর-পাড়ে একঘটি জল ভরে ঠাকুর্দা জলে ডুব দিচ্ছে এমন সময় একটা কালো কুকুরের ছদ্মবেশে শনিঠাকুর এসে সেই জলভর্তি ঘটে ত' মুখ দিয়ে দেয়। যদি জানতে পারতো তাহলে ত' ঠাকুর্দা জলটা ফেলে দেয়। কিন্তু 'অদৃষ্ট' এমনিই যে কিছুই জানতে পারলো না ঠাকুর্দা। ঐ নিয়েই সন্ধ্যা-মন্ত্র জপ করলো। ব্যাস, যা' হবার তা' হয়ে গেল। দেখতে দেখতে পুকুর আমাদের শুকিয়ে গেল। যে মাচায় লাউকুমড়ো আর ধরতো না সেই মাচা শূন্য হয়ে গেল। গরুর বাঁট দুধ আর ফিরে এলো না। খবার মাঠ হেজে পড়ে গেল। খামারে পড়ে রইলো মরা ইঁদুর। দেখতে দেখতে দৈন্যদশায় ভরে উঠলো আমাদের সংসার। এর ওপর বাবার বিষয়বুদ্ধি ছিলো না একদম। বাবা আমার অবোধ-গোবোধ মানুষ। সেই যে ঠাকুর্দার কাছে একটা গল্প শুনেছিলুম একবার, অবিকল বাবা সেইরকম। সত্যযুগের এক ব্রাহ্মণের কলিযুগের পথে হাঁটতে হাঁটতে একদিন খুব তেষ্টা লেগে গেল। ঝাঁ ঝাঁ দুপুর। বাতাসের এক-একটা ঝাপটা আসছে। গায়ে যেন ফোস্কা ধরে ধরে যাচ্ছে। খাঁ খাঁ মাঠ। জন-মনিষ্যি নেই। একটা খানা-খন্দ নেই পর্যন্ত। কি করে ব্রাহ্মণ? সামনে দেখলো মাঠে পেকে লাল হয়ে পড়ে রয়েছে বসে টাটটুম্বুর অনেকগুলো ফুটি। ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে। পরের জন যাই, ওতে হাত বাড়ানো গর্হিত কর্ম কিন্তু তেষ্টা বড়ো বালাই, না হলে প্রাণ বাঁচে না, অতএব সত্যযুগের ব্রাহ্মণ কলিযুগের একটি ফুটি সোঁ সোঁ করে খেয়ে ফেললে। তারপর সেই যেখান থেকে ফুটিটা পেয়েছিলো সেখানে একটা পয়সা রেখে যেই উঠে আসছে তখন পেছন থেকে কে একজন হাঁকিয়ে উঠলো তুমি ত আচ্ছা বেল্লিক হে। এই ভর দুপুরে মাঠের পড়তে তুমি বসে বসে মদ টানছিলে ওখানে বসে? ছিঃ ছিঃ। ও অতি গর্হিত কর্ম। ছিঃ।' এই বলে লোকটা থুতু ছিটোলো বার কতক। সত্যযুগের ব্রাহ্মণ ত' বেকুব। মদ সে কখন খেলো। কাঁদো কাঁদো মুখে ব্রাহ্মণ বলল, 'আমি যদি মদ খাই তা'হলে যেন আমার সাতজন্ম নরকবাস হয়। আমি এই মাত্র একটা ফুটি খেলাম। আর আপনি আমার নিশ্চয় পেছনে ছিলেন। আড়াল থেকে সবই লক্ষ্য করেছেন। সব দেখে শুনেও এ কি আপনার বিচারবোধ? আপনি কি রসিকতা করছেন?'

'আমাকে কি রসিক রসিক দেখায়?' বলে লোকটা ভয়ংকর মূর্তিতে ওর সামনে এগিয়ে গেল, তারপর ব্রাহ্মণের মুখের কাছে মুখ এনে বারকতক শুঁকলে তার পর বিদ্রূপের সুরে বলল, 'আমার চোখে ধুলো দেওয়া হচ্ছে? গর্হিত আচরণ করেছো আবার লুকোচ্ছো? তোমার মুখে স্পষ্ট ধেনোর গন্ধ পাচ্ছি।'

সত্যযুগের ব্রাহ্মণ যতো প্রতিবাদই করুক সমস্তই সেই দুর্বিনীত, রূঢ়, ভয়ংকর লোকটির অট্টহাসিতে খান খান হয়ে ভেঙে পড়লো। শেষে লোকটা বিচারের জন্যে একটা মাঠ পেরিয়ে জমিদারের বাড়িতে গেল। ব্রাহ্মণেরও তাতে আপত্তি নেই। কেন না মিথ্যেটা লোকটার মনে কেন বঁড়শির মত গেঁথে থাকবে সারাক্ষণ?

বিচার থেকে উঠে পড়েছিলেন জমিদার। বেলা চড়ে গেছে অনেক। দেউড়িতে প্রহরের ঘন্টা বাজলো। এমন সময় ওরা দু'জন হন্তদন্ত হয়ে জমিদারের কাছে গিয়ে করজোড়ে বিচার চাইলো। জমিদার আর কি করেন! যদিও স্নানাহারের সময় হয়েছে তবু উঠতে পারলেন না। জলদগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপারটা কি?' সবিস্তারে লোকটা বলে গেল। জমিদার সব শুনে বললেন, 'এর মীমাংসা খুব সহজেই হবে। তুমি বলছো তুমি ফুটি খেয়েছো। মদ খাও নি। এক্ষুণি প্রমাণ হবে যাবে কোনটা সত্যি। বেশ, মুখে আঙুল দিয়ে বমি করতো বাপু! ফুটি খেলে ফুটিই বেরুবে। ভয়টা তোমার কি।' ব্রাহ্মণ সানন্দে মুখে আঙুল দিয়ে বমি করলো। কিন্তু এ কি, ওরা নাক-মুখে হাতচাপা দিলেন কেন? সত্যিই তো ধেনো মদের গন্ধ আসছে। গন্ধে যে আমার গা'ই গুলোচ্ছে। কিন্তু পেতে, তামা-তুলসী নিয়ে বলছি আমি কখনো মদ খাই নি।

জমিদার চোখ লাল ক'রে বললেন, 'আমার সামনে মিছে কথা। এই কে আছিস? পিঠে পঁচিশ ঘা কোড়া লাগিয়ে একে ফাটকে পোর।'

ব্রাহ্মণ তখনো বিস্মিত। কিন্তু একটা ব্যাপার সে বুঝেছে। এই লোকটাই কিছু একটা গোলমাল পাকিয়ে দিয়েছে। যমদূতের মত প্রহরীর সংগে পথে যেতে যেতে ব্রাহ্মণ কাঁদো কাঁদো মুখে লোকটাকে বলল, 'ভাই, জেলে গিয়েও আমার ধাঁধা ঘুচবে না। সত্যি ব্যাপারটা কি বল ত'!' এতোক্ষণে লোকটা একটু প্রসন্ন হল মনে হল। বলল 'তুমি কালধর্ম জানো না। এইটে তোমার অপরাধ। সে অপরাধের শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। তোমার যখন ফুটি খাবার ইচ্ছেই হল তখন কলিযুগের আচার অনুযায়ী কিছু খাবে, কিছু নষ্ট করবে কিছু ফেলবে ছুঁড়ে কিছু তুলে নিয়ে গিয়ে বাজারে বিক্রি করবে, তা' নয় তুমি করলে কি, তোমার ঠিক যতোটুকু দরকার তার দাম'ও অনেক কম নিলে তাতেও তুমি থামলে না, আবার একখানি পয়সা সেখানে পুঁতে এলে! এ মানুষের ফুটির বমিতে মদের গন্ধ বেরুবে না ত' কিসের গন্ধ বেরুবে বলতে পারো! ব্রাহ্মণকে ঠেঙাতে ঠেঙাতে যখন যমদূতের মত প্রহরী নিয়ে গেল চৌমাথায় সকলের সামনে, ন্যাড়া মাথা করিয়ে ঘোল ঢালবার জন্যে, লোকটা তখন বত্রিশ পাটি দাঁত বার ক'রে 'কালধর্ম কালধর্ম' ক'রে চেঁচাচ্ছে আর হাসছে।

আমাদের যা'ওবা কিছু জমি-জেরাত ছিলো তা'ও যখন নীলামে চড়ছে তখন বাবা তালো-ওঠা বালিশে ঠেস দিয়ে শুয়ে শুয়ে ভড়াক ভড়াক ক'রে তামাক টানছে আর মোহমুদ্গর পড়ছে আর আমার চিরদিনের ভালো-মানুষ মা ঘন্টায় ঘন্টায় কপালে পাল্টে পাল্টে দিয়ে যাচ্ছে।

বণ্ডেশ্বরতলায় ছিলো 'অনাথ-ভাণ্ডার'। হপ্তায় ত' সের চাল দিতো। আমি আনতে যেতাম। কোনো কোনো দিন দুলু সঙ্গে। বলিদার সকালে অনাথ ভাণ্ডারের অফিসে গেলে ওরা বলে দিলো 'আজ তুমি যে পাড়ায় অনাথভাণ্ডারের চাল আনতে যাও কাল যাবে ঝকি-ঝামি গলিতে। পরশু.. হাতে চটের থলি নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরতে হত। হাঁকতাম দরজার সামনে দাঁড়িয়ে, 'অনাথ ভাণ্ডারের চাল দিন মা।' যা' দিতো সবাই যে যেমন পারতো।

মুখ ঝামটাও খেতে হত। 'যাও যাও, আজ হাত জোড়া, আজ হবে না। আর

বাড়িতে অসুখ। আজ হবে না। পূর্বজন্মে কি ঋণ করেছিলাম যে এজন্মে ঋণ শোধ দিতে হবে?' 'কিন্তু এসব শুনে আমার হাড় ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এসবে আমার আর কিছু হবে না। মুখ-ঝামটা খেয়েও চাল নিয়ে আসতাম পাঁচ বাড়ি ঘুরে ঘুরে পাঁচমিশালী চাল। চাল এনে চাল জমা ক'রে দিতে হত অনাথ-ভাণ্ডার'-এ। তখন তখন ত' পাবো না। তাই বিকেলে চাল আনতে যেতাম। যেদিন সকালে ভিক্ষেতে বেরুতাম অথবা বিকেলে চাল আনতে যেতাম সেদিন বাবুরা খ্যাঁকাতো 'চাল আনতে যাস নি কেন রে, ঘুটেকুড়ুনীর বেটা? ভিক্ষেতে বেরুস নি কেন? ভিক্ষেতে বেরুতে লজ্জা কিন্তু ভিক্ষের চাল নিতে ত' লজ্জা করে না? সকলের আগেই না ডাকতেই এসে দাঁড়িয়েছিস?' এ সব শুনে আমি কাঁদতাম না। আমি কাঁদতাম আমি ঠিক জাত-ভিখিরী হতে পারলাম না কেন এই ভেবে। তাহলে যতো আমায় মারো ধরো, অপমান করো, আমার কিছুই হত না। তোদিন মনে হত থলিটা 'অনাথ ভাণ্ডার'-এর বাবুদের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে চলে যাই। কিন্ত যাবো-টা কোথায়? যেতে ত' হবে সেই বাড়িতে। চাল না থাকলে ত' বাড়িতে হাঁড়ি চড়বে না। চাল এনে বাড়ির পেছনের ছাইতলা খুঁড়ে একটা ওল এনে মায়ের পায়ের কাছে বসিয়ে দিতাম। তাই খেয়ে পাঠ-শালায় যেতাম আমরা তিন ভাই। আমি, দুলু আর বুলু।

মা তখনকার দিনে ফার্স্ট বুক পর্যন্ত পড়েছিলো। পেটে বিদ্যে ছিলো। রামায়ণ মহাভারত, পাঁচালী ছড়া সব মুখস্থ। তার ওপর গলাটিও ছিলো মিষ্টি, লোকেদের হাতে তখন অঢেল পয়সা। মা 'ঠাকুরঘর' করে উপায় করতো। বারোমেসে ঠাকুর চার পাঁচঘর ছিলো। এ ছাড়া দুপুরের দিকে মা বেনে বাড়িতে যেত। আমিও মায়ের সঙ্গে কতোদিন গেছি। বেনে বৌরা সব গলায় আঁচল দিয়ে মাকে ঘিরে বসতো। গিন্নী-বান্নীদের চওড়া সিঁদুর, পায়ে এ্যাত্তোখানি আলতা, হাতে মোটা মোটা অনন্ত কোমরে চন্দ্রহার, নাকে টানা নথ। বয়েস যাদের অল্প তাদের পায়ে থাকতো মল। তারা ঝম ঝম করে অঙ্গ হেলিয়ে রূপ বাজাতে বাজাতে আসরে আসতো। বড়োরা থাকলে বলতো, 'বামুনদি আজ একটু মাঠাকরুণের কথা বলো।' অমনি সবাই হাতে এক একটা ফুল নিয়ে বা দূর্বা নিয়ে বসে যেত। মা করুণসুরে সীতার দুঃখের কাহিনী বলতো। চোখ সবার জলে ভরে যেতো। বড়োরা যেদিন থাকতো না, সেদিন বয়েস যাদের অল্প তারা মাকে চোখ ঠেরে বলতো, 'বামুনদিদি আজ একটু অন্য-ধরণের জিনিস হোক।' মাও আসর বুঝে আরম্ভ করতো ফাল্গুন-সংক্রান্তিতে ঘেঁটুর গান। কখনো বা মনসার ভাসানের গান।

আসর খুব জমে উঠতো যেদিন মা এই গানটা গাইতো, 'একশো টাকা লিলি, বাবা, দিলি বুড়া বরে হে, বরের সঙ্গে যাতে হল পুরুলা শহরে গো। পুরুলার লকে বলে ইটা তোমার কে বটে? লজ্জাকে কারণ বলি ঠাকুরদাদা বটে গো।' আসর শেষে এ দিলো চার পয়সা, ও দিলো দশ পয়সা, আঁচল খুলে যে যেমন পারতো দিতো। এইভাবেই চলতো আমাদের ভাঙা নাও অকূল দরিয়ায়।

এরকম অবস্থাতেও, কায়ক্লেশে চলছে চলতে, এর বাগানের চালতা একজোড়া, ওর পুকুরের দুটো চারা পোনা, আমের সময় কোঁচড় ভরে আম কুড়িয়ে এনে, যা সামান্য সোনাদানা ছিলো সে সব চুপি চুপি স্যেকরার দোকানে বন্ধক দিয়েও যখন এর থেকেও উল্টো-পাল্টা হাওয়া বইতো সংসারে, এক-একসময় যখন মনে হত সংসারের শেকড়টা এবার উপড়ে পড়ে যাবে ঝড়ে, বাবা পাগলের মত গজরাতে গজরাতে দু'-চারদিন নিখোঁজ হয়ে যেত, তখন আমি আর দু' ভাইকে বুকে আঁকড়ে ধরে আসন্ন সর্বনাশের কূলে বসে। মায়ের সে কি অঝোরঝরে কান্না, কান্নার শেষে মায়ের সে কি পরম আশ্বাসের গল্প, 'একদিন দেখবি আসবে সেই সংক্রান্তি-পুরুষ। দুপুরবেলা, হাতে ছাতি, মাথায় ভিজে গামছা, খট খট খড়ম পায়ে এসে হাঁকবে, কই গো গেরস্থের বৌ। অতিথ এলো। তখন নিজের মুখের ভাত যদি অতিথি নারায়ণকে দিয়ে দিতে পারি তাহলে কোথায় যাবে এই সব খানা-খন্দ, এঁদো ডোবা, বেতের ঝাড়, হাওর। এসব হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। ছাইপুরী আমার সুবর্ণপুরী হয়ে উঠবে!'

মায়ের পুণ্যির জোর আছে বলতে হবে। সংক্রান্তি-পুরুষ এলো, সত্যি সত্যি। ঠিক দুপুরবেলা, মাথায় ভিজে গামছা, হাতে ছাতি, সংক্রান্তি-পুরুষের মাথাই ভরাট গলা, ডোবার পাশ থেকে হাঁক উঠলো নাচদুয়োরে, 'কই গো গেরস্থের বৌ, অতিথ এলো।' আমাদের বুকটা খড়াস করে উঠলো। চিরদিনের ভীতু মানুষ মা আরও জবুথবু হয়ে গেল। ঘাবড়ে গিয়ে বাবা আরো জোরে জোরে হুঁকো টানতে লাগলো। সাহস করে আমিই বেরিয়ে এলাম বাইরে।

দেখলাম সামনে বিরাট পুরুষ [illegible] এলো-আলতায়। [illegible] যেন ফেটে পড়ছে। কদমফুলের মত করে ছাঁটা চুল। সব পেকে গেছে। চোখ দুটো করমচার মত লাল। নাকের ফুটো দুটো ফোলা ফোলা। প্রকাণ্ড কামানো মুখ ঠিক যেন ছাড়ানো আনারসের মত উত্তাপে ভরা। আমি সাহস করে বললাম, 'আপনিই কি সংক্রান্তি-পুরুষ?' বলার সঙ্গে সঙ্গেই হো হো ক'রে হেসে নাচদুয়োর কাঁপিয়ে সেই বিরাট, দশাসই পুরুষ ভরাট, গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি তোমার পিসেমশাই। ছেলেটি বেশ কথা বলে, আপনিই কি......, ছেলেটি ত' বেশ, তুমি কে বাবা?'

আমাদের যে একজন পিসেমশাই আছে এদ্দোদিন আমরা তা' জানতাম না। প্রত্যেকের বাড়িতে কতো পিসেমশাই আসে। আমাদের বাড়িতে কস্মিনকালেও কোনও পিসেমশাই আসে না। মা বলতো, 'কে আসবে বল এখানে? দুঃখীদের কি কোনো আত্মীয় থাকতে আছে?' বলতাম, 'কেন মা, থাকতে নেই কেন?'

মা বলতো, 'সে অনেক কথা।'

'অনেক কথায় কাজ কি? এককথায় বলো না?'

'আমরা যে বড়ো গরীব বড়ো দুঃখী বাবা।'

ক্রমে ক্রমে ব্যাপারটা স্পষ্ট হল। পিসেমশাই আমার সঙ্গে হেসে হেসে কতো কথা বলল। বুঝলাম, আমাকে পিসেমশাই-এর খুব পছন্দ হয়েছে। এক সময় পিসেমশাই বলল, 'ভুলুর আমার মুখখানি বেশ। বেশ ডাগর ডাগর চোখ। এ ছেলে বংশের সন্তান দেখবে খুব যশস্বী হবে।' পিসেমশাই চলে গেল। আবার এলো। এবার আর একা নয়। সঙ্গে পিসীমা। আহা রূপ কি! সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী প্রতিমা। ধবধব করছে গায়ের রঙ। কে যেন বলল, 'যেন শোভিত হয়েছে।' 'কোনকালের রাণী-টানি হবে বোধ হয়।' 'কিম্বা পরী-টরী।' [illegible] মত তেলা-তেলা নরম [illegible] গড়ন। টানা টানা [illegible] [illegible] দুটি চোখ। [illegible] [illegible] [illegible] ঠোঁট দুটি [illegible] ফাঁক করে পিসীমা যখন কথা বলল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পিসীমাও [illegible] [illegible] করে কথা [illegible]। পিসীমা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], পরনে এক-[illegible] [illegible] কী [illegible] শাড়ি, আর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দাসী-বাঁদী, [illegible] [illegible], [illegible] সেলাই-করা [illegible], [illegible] থেকে [illegible] [illegible]। এক-[illegible] ঘোমটায় [illegible] [illegible] মত [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

সদা সতর্ক ভাব, কাডলণ্ঠনের সামনে রেড়ির তেলের মিটমিটে আলো।

পিসীমা ঠোঁটটা কুঁচকে বলল, 'এ কি ছিরি হয়েছে গা তোমার বৌ? দশ বছর আগেও দেখেছিলাম পদ্মকলি। এখন এ যে দেখছি শ্যাওড়া গাছের পেত্নী। বলি দাদাকে বাঁধবে কি দিয়ে? মেয়েমানুষের রূপ যৌবন খোয়ালে ত' সব গেল, আদরই বলো সোহাগই বলো'

এত্তোবড়ো মানী অতিথি, তায় ননদ, তার অতো রূপ, অতো জেল্লা, মা ত' আমার এমনিই কাচুমাচু, পিসীমার কথায় কুঁকড়ে-মুকড়ে এ্যাত্তোটুকু হয়ে বলল 'আমরা দুঃখী মানুষ, আমাদের রূপ-যৌবন' ..

'থাক থাক। নাকি কান্না কেঁদো না বাপু। ওসব ভালো লাগে না। তোমাদের দেশে একটু বেড়াতে এলাম। একটু আনন্দ করবো। একটু রঙ্গ করো। তা' নয়, যত্তোসব নাকিকান্না ইনিয়ে-বিনিয়ে, ভালো লাগে না বাপু, পান-দোক্তা আছে?'

পান-দোক্তার পাট এখন আর অনেক-দিন এ বাড়িতে নেই। মা তাড়াতাড়ি পান-দোক্তার বন্দোবস্ত করতে গেল পাশের মুখুজ্যেদের বাড়িতে।

'তোর নাম কি রে?' পিসীমা আমার দিকে তাকালো।

আমি যেন বর্তে গেলাম। বললাম, 'ভুলু।'

'ভুল, আবার নাম নাকি?' পিসীমা আমার গাল টিপে আদর করে বলল, 'টুলু। তোর গালে যে টোল পড়ে।'

'আর এই ছোঁড়া, তোদের?'

'দলু বলু।'

'তা' ঠিকই হয়েছে। দালে বাঁদরে মস্ত চেহারা।' পিসীমা হেসে উঠলো।

সে হাসি আমার কানে কটকট করে বাজলো।

সংক্রান্তি পরমেশের কপাল আমার জেগে গেল। আমার গায়ে উঠলো সার্টিনের পাঞ্জাবী। মাথায় কাজ করা টুপি। পায়ে মখমলের জুতো। বোঝা গেল পিসেমশাই আসবার সময় এসব কিনে এনেছেন সংগে করে। আমি পিসেমশাইয়ের হাত ধরে একটা ছড়ি নিয়ে ছাগলছানার মত লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াতে লাগলাম। দলু বলু প্রথম প্রথম আমার দিকে আমার এই অদ্ভুত পোষাকের দিকে হ্যাংলামোর মত তাকিয়ে থাকলো। ওরা প্রথমটা ব্যাপারটা বুঝে নিতে চাইলো গোল গোল চোখে। আমি ত' ওদেরই ভাই, তবু আমার গায়ে এসব দামী দামী পোষাক কেন আর আমার ভাই হ'য়ে ওদেরই বা এই দৈন্যদশা কেন, এই সব।

তারপর কিছু একটা এঁতে নিয়ে আমাকে ওরা এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে লাগলো।

দলু, বলু, আমি মনে মনে বললাম, ঠিক আছে। এড়িয়ে চলছিস চল। ভেবেছিলাম পিসীমা ভালোমন্দটা খেতে দিলে তোদের 'শেয়ার' দোব। তা' তোরা যখন চাস না ওসবে তখন কাজ কি আমার! আমি একা-একাই ভালো জিনিস খাবো। এই তো সামনেই রাম-নবমীর মেলা। সেই পিপিডাকা লাল, নীল সিরাপ। এই হাতীর কানের মত বড় বড় পাঁপরভাজা। বেলুনের মত ইয়া ইয়া মোটা মোটা শশা। তাছাড়া কাঠের ঘোড়া, স্প্রিং দেওয়া মোটরগাড়ি এসব আমার কতোদিনের শখ। পিসী-মাকে সঙ্গে নিয়ে মেলা দেখতে যাবো। আমি বুঝে নিয়েছি আমি কোন কিছু বললে পিসীমা 'না' করতে পারবে না। তোদের দেখিয়ে দেখিয়ে তখন সিরাপ খাবো, দেখিয়ে দেখিয়ে স্প্রিং-দেওয়া মোটর গাড়ি চালাবো। তখন আসিস বড়দা বলে খাতির করতে রে!

অভিমানে চোখ ফেটে জল এসে গেল আমার।

পিসেমশাই, পিসীমা যেন মায়ের গুরুঠাকুর।

'ওগো, এটা রান্নাঘর না আঁস্তাকুড়? কি করে রেখেছো এটাকে? বাসি কেন, এঁটোর মধ্যে বসে আছো কি করে নিশ্চিন্তে?' পিসীমার মুখনাড়া খেয়ে মা শশব্যস্ত হয়ে উঠলো। বলল, 'চা করে দি?'

'থাক। আর আদিখ্যেতা করতে হবে না।' পিসীমা ভেংচে উঠলো, 'বেলা আটটা বাজলো, এখনো বাসিপাট চোকেনি ছিঃ ছিঃ, সেইজন্যেই এই অলক্ষ্মীর দশা।'

অর্ধেক দিনই যে আমাদের উনুনে হাঁড়ি চড়ে না, চড়লেও পাশের বাগান থেকে মোচাটা থোড়টা লুকিয়ে চুরিয়ে এনে, একটা কিছু কুঁচিয়ে, একগলা তেল আর একটু জিরে দিয়ে সাঁৎলে একবেলা-ওবেলার যাদের রান্না হয় সেখানে বেলা আটটাই বা কি, এঁটোকাঁটাই বা কি, ঘরদোর 'পাম্বাকার'-পরিচ্ছন্ন রাখাই বা কি এসব পিসীমা কেমন করে জানবে?

কি এমন 'রাজ্যির' কাজ থাকে যে মাত্র বেলা আটটায় বাসিপাট চোকাতে হবে?

পিসেমশাই একসময় খেতে বসলো। মা জায়গাটা ভিজে গামছা দিয়ে আগে ভালো করে মুছে দিলো। তারপর ফের আবার আঁচল দিয়ে মুছে গংগাজল ছিটিয়ে দিলো। ঠাঁই করে দিয়ে, থরে

থরে বাটি সাজিয়ে খেতে দিলো পিসে-মশাইকে।

মা আমাদের খেতে দিতো হেলা-ফেলা করে। কিন্তু পিসেমশাইকে খেতে দেওয়া এ যেন ঠাকুরের সামনে নৈবেদ্য সাজানো। ভাত যে ভাত, তাও চূড়ো করে, পরিপাটি করে গন্ধমের মত সাজানো। পিসেমশাই থামের আড়ালে খড়মজোড়া রেখে গলা খাঁকারি দিয়ে আচমন করে আসনে বসলো। আর মা অর্ধ থামের আড়ালে, একগলা ঘোমটার ভেতর চেহারা লুকিয়ে, 'ও খোকা, দেখ না বাবা তোর পিসের কি দরকার? হ্যাঁ রে, জিগ্যেস কর সুক্তোটা একটু দোবো কি না? হাঁ হাঁ হাঁ, মাছটা ফেলতে যাবেন না, গেরস্থের অকল্যাণ হবে'... মা আমাদেরকে দিয়ে অনবরত শশব্যস্ত হয়ে পিসেমশাইকে এটা-ওটা জিজ্ঞেস করে খাওয়াতে লাগলো।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। মা আমাকেও খাতির করতে আরম্ভ করেছে। 'তুই তোকারি' এতোদিন করে আসছে। হঠাৎ 'তুমি তুমি' আরম্ভ করলো। যেন আমি অন্য কারুর ছেলে, ঐ পিসেমশাই, পিসীমাদেরই কেউ যেন হবেন, দু'দিন এখানে বেড়াতে এসেছি আর দু'দিন পরেই চলে যাবো।

আমি মায়ের কাছটিতে এসে বসলাই, মা হ্যাঁৎ করে চমকে ওঠে, বলে 'মেঝেতে অমন ধপ করে বসলে ওনারা যে তোমাকে অসভ্য বলবেন, ওখানে ধপাস করে বসো না বাবা, ওঁরা বলবেন ছেলেকে আমরা কোন সহবৎ শেখাই নি।' আমি মায়ের কাছটিতে ঘুরঘুর করলে মা এক-একবার আগের মত আমাকে যেন বুকের কাছে আনতে চাইতো, কিন্তু আমার জরির কাজ-করা তাজ মখমলের জুতো, সাটিনের জামায় তখন আমি একটু অন্যরকম হয়ে গিয়েছিলাম নিশ্চয়, তাই কাছাকাছি এসেও আমাকে ছুঁতে পারতো না, পাছে দামী জামা-কাপড়ে হলুদের ছোপ ধরে যায়, পাছে হাতের ময়লা লাগে, শুধু কি তাই, তা' নয়, যেন কিসের এক অজানা আশংকায় মা আঁৎকে উঠতো কেন, বলতো, 'ওনারা কি মনে করবেন? কেন তুমি এখানে ঘুরঘুর করছো? যাও, খেলো গে।'

আমি ত' অতো বুঝতাম না। আমার মা'র কাছে আমি ঘুরঘুর করলে ওনারা কিছু মনে করবেন কেন? ওনারা আমাকে দামী জামা-কাপড় দিয়েছেন বলে? কিন্তু ওসব আমার ভালো লাগলেও, খুব ভালো লাগলেও এসব ত' আমি চাই নি। তা'-ছাড়া মায়ের আমার এসব কি কথা? আমি যদি আমার মা'র কাছে যেতে পারবো না? শুধু দলু বলুই মা, আমার

মা! অজান্তে আমার চোখে জল আসতো।

ফলে হল কি, আমি দেখিয়ে দেখিয়ে, যাবার দিন পর্যন্ত, মাকে, বাবাকে, ভাই দুজনকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে লাগলাম। পিসীমা আর পিসেমশাই খুব খুশি। আমার যে এঁদের খুব পছন্দ হয়েছে সেটা ওঁরা বুঝলেন। সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে ওঁরা বলতে লাগলেন, 'টুলুর মতন ছেলে হয় না। দ্যাখো, একদিনে আপন করে নিয়েছে কত্তো!'

অবশেষে এখান থেকে যাবার দিন এলো। সকলের ব্যবহারে এটা আমি ক্রমে ক্রমে আঁচ করেছিলাম। আমাকে এখানে আর থাকতে দেওয়া হবে না। আমাকে কোথাও যেতে হবে। কবে—সেটা ঠিক আন্দাজ ছিলো না। তবে আজ বাদে কাল যেতে যে হবেই, ক্রমে ক্রমে সকলের আচরণে এটা স্পষ্ট হচ্ছিলো।

যাবার দিন এলো। তুলো-ওঠা বালিশে ঠেস দিয়ে বাবার তামাক টানার হিড়িক হঠাৎ বেড়ে গেল। মা কল্কে পাল্টানোর ফাঁকে একবার কাছে এলো, বলল, 'টুলুর আমার যাবার আনন্দে চেহারাই পাল্টে গেছে। চেনাই যায় না।'

'তুমি আমার টুলু বলছো কেন? আমি ত' ভুলু।'

'না। ও নাম এখন ভুলে যাও। এখন তুমি টুলু। ওনারা বলেছেন।'

'ওনারা কে? আমি মানি না।' রাগে দুঃখে আমি চিৎকার করে উঠলাম। মা তাড়াতাড়ি আমার মুখ চাপা দিয়ে বলল, 'ছিঃ ছিঃ বাবা। তুমি যে আজ কলকাতায় যাচ্ছো।'

'সে আমি বেশ বুঝেছি। তোমরা আমাকে তাড়াতে চাইছো। আমিও কম যাই না। দেখবে আমি আর এখানে আসছি নে।'

'বালাই ষাট।' মা অজানা আশংকায় কেঁপে উঠলো তারপর আদর করে বলল, 'ও কথা কি বলতে আছে!'

যাবার সময় হল। কাউকে পেন্নাম না করে সোজা গিয়ে পাল্কীতে চড়ে বসলাম। ঠিক একেবারে পিসীমার কোলের কাছে। স্পষ্টই বুঝলাম, আমি যে বাপ, মা কাউকে পেন্নাম করলাম না এতে পিসেমশাই, পিসীমা খুব খুশি। ওঁদের যে সরাসরি অস্বীকার করে, একেবারে কাটছাঁট করে, পাল্কী চড়ে বসলাম. পাল্কী যখন চলতে আরম্ভ করলো দুলকি চালে, তখন পিসেমশাই পাশে যেতে যেতে বললেন, শুনেছো, টুলু আমাদের জাতের ছেলে। তাই না? ওর সবকিছু বড়-লোকের ছেলের মত। চাল-চলন, সাজ [illegible] পর্যন্ত। আর ও দু'টিকে [illegible] [illegible] [illegible]?'

স্পষ্টই বুঝলাম 'ওদু'টিকে' বলতে পিসেমশাই কাদের বলছেন। আমার খুব রাগ হলেও, আমি যে ওঁদের সুনজরে পড়তে পেরেছি এর জন্যে আমি পাল্কীর ভেতরে হাসিমুখে পিসীমার মুখের দিকে তাকালাম, আর সত্যি সত্যি যে দুলু, বুলুর জন্যে আমার একটুও মায়া নেই সেটা বেশি করে জানাবার জন্যে বললাম, 'জানো পিসীমা, ওরা কিরকম অসভ্যের মত ভাত খায়! বেড়াল ডিঙোতে পারে না।'

'তা থাক।' পিসিমা বলল, 'ওরা ত' গরীব। ভাত ছাড়া আর কি খেয়ে পেট ভরাট করবে বল। ভালোমন্দটা ত' চোখেও দেখে নি। তাই ভাত খেয়ে পেট ভরাট না করা ছাড়া ওদের উপায় কি? তুমি যেন ওরকম কোরো না টুলু।'

'না, না।' আমি মৃদু হেসে উঠলাম, 'আমি ভাত খেতেই পারি না। এই জন্যেই ত' মা আমার বকে। বলে, তোর সুক্মুদু সুক্মুদু খাওয়া। খাওয়া ত' নয় শোকা। হেলাফেলা করে খেতে হলে বড়লোকের ছেলে হলেই ত' পারতিস।'

'বড়লোকেরই ত' ছেলে।' পাল্কীর পাশে পাশে চলতে চলতে পিসেমশাই হেঁকে উঠলো, 'এই চ' বাবারা সব। কিন্তু মেরে গেলি কেন বাপধন? ছোটো লাইনের ট্রেন। একবেলা একখানা। ওবেলা একখানা। এখানা ফস্কে গেলে, ঘা অসভ্য স্টেশন, কাড়া ছ' ঘন্টা বসে থাকতে হবে। চালা, চালা।'

এসেছি কলকাতায়। দু'-চার মাস কেটে গেছে। বুঝেছি এখানেই আমাকে

থাকতে হবে। মায়ের চিঠি আসে। তাতে খালি বারণ খালি বারণ। ওখানেই থাকো। আমার নামও কোরো না। আর পোস্ট-কার্ড জুড়ে খালি পিসীমা আর পিসেমশাই-এর প্রশংসা। তবু এক-একবার মনে হয় ছুটে চলে আসি। থাকতে পারি না। কলকাতা কিরকম সাংঘাতিক লাগে। এখানে কতো নির্জনতা, সেই বিশালাক্ষীতলা, ষণ্ডেশ্বরতলায় চারদিন ধরে যাত্রা, কথকতা, নেনোর বটতলার আড়ালে কেমন করে রক্তে চান করে ওঠে সূর্য। গড়ানবেলায় মাঠ থেকে ফেরা গরুর খুরের ধুলোর ভেতর গলার ঘণ্টা কেমন উদাস সুরে বাজে, বেগুনি ফুল ফুটিয়ে কচুরিপানা পুকুরপাড় আলো করে থাকে, সোঁদা গন্ধ ওঠে মিঠে মিঠে বনতুলসী আর আকন্দের ঝোপ থেকে। একহাত উঁচু হয়ে হৈ-হৈ করতে করতে, ধুলো কেমন চৌঘুড়ি হাঁকিয়ে যায়, মনটা কলকাতার বাড়ির চিলেকোঠায় টনটন করে ওঠে ভাই দুটির কথা বড়ো মনে পড়ে। আসবার সময় ওরা ভালো করে কথা বলে নি। শুধু একফাঁকে, গোয়ালঘরের সামনে বলেছিলো, 'চললি বড়দা আমাদের ছেড়ে। তুই তাহলে বড়লোক হয়ে গেলি, না রে?' তখন কোনো জবাব দিই নি বটে কিন্তু আমার দুলু, বুলুর সেই কথা 'তুই তাহলে বড়লোক হয়ে গেলি, না রে', কাঁটার মত বুকে বিঁধে আছে, অন্তরের খচখচ করছে। খুব কষ্ট হলে একটা উপায় বার করেছি আমি। পিসেমশাইকে বলে, দুটি পেন্সিল জোগাড করেছি। একটার নাম দিয়েছি 'দুলু' আর একটি 'বুলু'। মন খুব খারাপ হলে, পেন্সিল দুটিকে বুকে মাঝখানে চকচকে করে খুব করে ঘসি আর চেঁচিয়ে বলি না পাছে কেউ শুনতে পায় তাই মনে মনে জোরে জোরে বলি 'দুলু বুলু রে' 'দুলু বুলু ভাই আমার', 'দুলু বুলু ভাই রে', 'দুলু বুলু সোনা রে।' আর হু-হু করে চোখ দিয়ে জল পড়ে অনবরত।

পিসেমশাই লোক খারাপ নন। তবে ব্যাটাছেলে ত', একটু হাঁকডাক আছে। অবশ্য আমার ওপর। পিসীমার সামনে জুজু। ঐ একটা কাজ। আমার ভালো লাগে না। তবু করতে হয়। পিসেমশাই-এর গড়গড়াটা সাজা। সবগুলো সাজিয়ে রাখতে হবে। প্রথমে ফুটোর মুখ বন্ধ করতে হবে ঠিকরে দিয়ে। তারপর তামাক ছিটিয়ে দাও ঝুরো ঝুরো। শেষে সোলা ঠুকে টিকে ধরাও। নলটা এগিয়ে দাও হাতে। এ কাজ বাবার জন্যে করি নি কখনো। পিসেমশাই-এর [illegible]

হবেই। আমি যে বড়লোক হয়ে গেছি। আমার ভায়েদের মত ত' নই আর। সেই উলিঝুলি পোষাক, উড়নচণ্ডে চুল, জন্ম হাঘরের মত খাই খাই।

পিসেমশাই বলতো, 'যাও তো টুলু, টেরিটিবাজার থেকে মিঠেকড়া তামাক নিয়ে এসো ত'। মিঠেকড়া বোঝো ত'? মিঠেও নয়। কড়াও নয়। তাই মিঠেকড়া। দেখে নেবে। যাও চলে যাও।'

কাপড়ের খুঁটটি গায়ে জড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেই মুরগীহাটা ছাড়িয়ে টেরিটিবাজারের দিকে ভোঁ ভোঁ ছুট। কি ভয়ই করতো প্রথম প্রথম। মুসলমানরা সব বসে আছে। তাদের সব এ্যাতো এ্যাতো দাড়ি। সামনে ডাঁই করে রাখা তামাকের পাহাড়। নানারকমের গন্ধ মেশানো মশলার ঝাঁঝ উঠে আসছে। কোন কথাবার্তা নেই। পঁচিশ পাওয়ারের আলো জ্বলছে ম্যাড় ম্যাড় করে। আর ওরা নির্বিবাদে হাই তুলতে তুলতে কলাপাতায় মুড়ে তামাক দিয়ে দিচ্ছে।

একদিন কেউ কোথাও নেই, পিসীমা কাদের বাড়ি যেন বেড়াতে গেছে, পিসেমশাই গেছে মল্লিক রাজাদের বাড়িতে ম্যানেজারি করতে, পিসেমশাই ঐ কাজই ত' করতো, তাতেই পয়সা, আমি কপাটে খিল লাগিয়ে কল্কে সেজে সবে একটি টান দিয়েছি এমন সময় গলা খাঁকারি শুনতে পেলাম পেছনে।

'কে?'

'আমি ভগবান।' বিরাট বাজখাঁই গলা। ভগবান? তাই ওরকম গলা। হাত থেকে ছিটকে কল্কে পড়ে গেল। আর একটু হলে গায়ে ফোস্কা ধরে যেতো।

'কেউ নেই নাকি?'

'না।' কোনরকমে বললাম। তারপর পায়ের শব্দে বুঝলাম যে এসেছিলো সে চলে যাচ্ছে। ভগবান এসেছিলো? ভগবান ত' সব বুঝতে পারে। ভগবান কি তাহলে বুঝতে পেরেছে আমার কল্কে টানা? বলে দেবে নাকি পিসেমশাইকে? পিসেমশাই ত' তাহলে আস্ত রাখবে না। বুড়ো নল নিয়ে মাঝে মাঝে তাড়াও করে। পিসীমা মাঝখানে থাকে তাই রক্ষে। বেশ কদিন ভয়ে ভয়ে থাকলাম। তারপর এদের কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম সেদিন যে এসেছিলো সে এ'দেরই রান্নার ঠাকুর। ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছিলো মাসখানেকের জন্যে। তাই আগে তাকে দেখি নি। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। কলকাতা আমাকে এমন করে বোকা বানালো। অথচ আমি ত' ঠিক বোকা ছিলাম না।

পিসেমশাই একবার মল্লিক রাজাদের বালিশে মাথা [illegible] পিসেমশাই [illegible]

পরনে ধবধব করছে মাজা গা, খালি গা, কোমরে পাছে কষা লাগে তাই ঢাকাই ধুতির পার ছিঁড়ে কাপড় জড়ানো। পিসেমশাই এদের এস্টেটের ম্যানেজার, এদের চাকর হলে কি হয়, শত হোক ব্রাহ্মণ ত' বটে, সুতরাং দণ্ডবৎ প্রণাম না করলেও বড়বাবু পিসেমশাই-এর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। পিসেমশাই সংস্কৃত মন্ত্র চোখ পিটপিট করে মাথায় হাত রেখে বলে গেলেন। গাজীপুরের গোলাপ জলের গন্ধে জায়গাটা ম' ম' করছে। লাল, নীল ঝাড়লণ্ঠনের আলো, গ্যাসবাতি, টানা পাখা, পাইক বরকন্দাজে জায়গাটা ঠাসা। ওদিকে আবার মন্দিরে মন্দিরে দেবার্চনা হচ্ছে। পিসেমশাই সব দেখাতে দেখাতে মুরুব্বী চালে বলল, 'হুঁ, হুঁ। এ চারটিখানি জায়গা নয়। এখানে যো সো চাকরি পয়সা। বুঝেছো?'

আমি কি বুঝবো? আমাকে এসব বলাই বা কেন? আমি যথেষ্ট ছোটো হলেও, কলকাতা আমাকে বোকা বানালেও, এটা ঠিকই বুঝতে পারলাম পিসেমশাই আমাকে ছোটো পেয়ে খুব জাঁক করে নিচ্ছে। বড়দের এসব ছেলেমানুষি এর আগেও আমি অনেক দেখেছি আর মনে মনে খুব একচোট হেসেছি। মাথার চুল কাঁচা কি পাকা দেখে তাহলে বড় ছোট হয় না!

নিমতলার শেষ ট্রাম চলে যেত রাত ন'টার সময়। তারও অনেক পর পীতাম্বরের খাবারের দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হত। তারপর চলতো দোকানের লাগোয়া ওদের তিনতলার বাড়িতে 'রামা হো রামা হো' চীৎকার। খোল, করতাল, ঝাঁঝর বাজতো। রাত আরও খানিক আগালে সামনের হোটেলে ফুটপাতের হাইড্রেনের জলে বাসন-কোসন ধোয়া-মোছার শব্দ হত ঝমঝম। ঘুমের ঘোরে মনে হত কারা যেন আমাকে ধোয়া-মোছা করবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। কে যেন বলছে, মাগো মা গেঁয়ো রামেশ্বরপুরের ঘেমো গন্ধটা এখনো গায়ে লেপ্টে রয়েছে কলকাতার সাবান যতোই ঘসো না কেন।'

মল্লিক রাজাদের পেটাঘণ্টার পর পর চারটে বাজলে ঘুম আমার ভেঙে যেত। গঙ্গার দিক থেকে সাইরেন বাজতো। মাথায় বড় বড় ঘোমটা, পেট কিন্তু বেরিয়ে আছে, নাকে এই এ্যাতোবড় কাঁদি নথ, মল বাজাতে বাজাতে অমন জনা পঞ্চাশ-ষাট হিন্দুস্থানী মেয়ে আস্নান করতে চলল। আরো খানিক পর পিসীমা উঠবে। পিসীমার সঙ্গে আমাকেও উঠতে হবে। পিসীমা প্রসন্নঠাকুরের ঘাট থেকে স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে উঠে আসবে। প্রথমে [illegible]

সকালে বাবা আপাদমস্তক, তারপর জোড়া-বাজারের একটা বটগাছের কোটরের সিঁদুর-লিপ্ত রাধাগোবিন্দের যুগলমূর্তি, এইভাবে বাবা লোকনাথ, বজরংবলী, একে একে সকলের মাথায় জল ঢালতে ঢালতে পিসীমা ঘরে ঢুকবে। এসব আমার মন্দ লাগতো না। বিকেলের দিকে নিমতলার ওখানে বাবা ভূতনাথের মন্দিরের সামনে এই এ্যাতোখানি আলুকাবলি দিতো। ছুরি দিয়ে পরিপাটি করে কাটা, কাঁচালঙ্কা মেশানো, তেঁতুলের জল ছিটোনো জিনিষটা কাঠি বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে খেতে যা অপূর্ব লাগতো সে কি আর বলবো। সত্যি বলতে কি কলকাতা থাকার যা কিছু রস তা পেতাম আলুকাবলিতে।

তাছাড়া কিনে আনতাম বড়বাজার থেকে চড়ামাঞ্জা দেওয়া এক নাতাই সুতো। আঙুলের একটা গাঁটে সুতো লাগিয়ে অপর পাশে সুতো জড়িয়ে হাতটা এমন এমন করে বার ত্রিশেক ঘোরালে এক 'নাতাই' সুতো হয়ে গেল। সেই মাঞ্জা দেওয়া সুতোর সঙ্গে মোটা গুলিসুতো মিশিয়ে খেলা চলতো। 'বোমা' লাটাই পাওয়া যেত। এগুলো খুব বড় বড়। দুপাশে আবার ঝুমঝুমি থাকতো। ঘোরালে ঝুমঝুম করে শব্দ হত। লাটাই-গুলো ঘুড়িগুলোর মতই ছিলো নানা রঙের। শত শত ঘুড়ি উড়ছে। চোখ বন্ধ করলেই দেখা যায়। এ-বাড়ি ও-বাড়ি, কোনো বাড়ি বাদ নেই। আর, কতো রকমের, কতো রঙের, ছোট আর বড়, সে এক আশ্চর্য রঙের খেলা, নীল আকাশের নিচে এক অপূর্ব বিস্ময়, রোমাঞ্চ, কেবলি সুতো ছাড়ছি, কেবলি সুতো ছাড়ছি আর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের জগৎ তৈরি হয়ে যাচ্ছে, আমার হাত পায়ের শেকলগুলো মনে হচ্ছে খুলে খুলে যাচ্ছে, মনে হত আমি তেমনিই রয়েছি, অবোধ আর মুখই আছি, আর গড়িয়ে আমার মুখ দিয়ে আনন্দের ফেনা গড়িয়ে পড়ছে।

ঘুড়ির ল্যাজ করতাম প্রকাণ্ড শাড়ির পাড় দিয়ে। সেই পাড় তেতলা থেকে নেমে আসতো একতলায়, এ্যাতোবড়ো। তাতে ঘুড়ি একে বেঁকে যেতো না। সামান্য একটু কাঁপতো।

ঐ যে মল্লিকদের ঘুড়ি সুতো ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে, এগিয়ে আসছে। এইবার প্যাঁচ লেগে গেল। ওরা ঘরর, ঘরর করে সুতো ছাড়ছে। আমি ঘুড়ি নামিয়ে নিচ্ছি-লাটাই গুটিয়ে। ওদের ঘুড়ি যেই মাথার সামনে এসে গেল অমনি ছোঁড় ছোঁড় টিল-নোঙর। হ্যাঁ, ওদের ঘুড়ি ঠিক নামিয়ে নিয়েছি। এবার সুতোটা বাগাতে হবে। দামী, মাঞ্জা দেওয়া সুতো। কি করি। মারলাম ডাকবুই। সুতোটাকে নিয়েই মাকে বরাবর টেনে শুয়ে পড়া। পট করে একটা আওয়াজ হল। ব্যস। হয়ে গেছে। কাজ ফতে। এইবার ঘাপটি মেরে থাকতে হবে। খোঁজ করতে করতে মল্লিকদের দরোয়ান ঠিক এ বাড়ি এসে যাবে। 'হেই টুলু, হামরা সাথ খেলু', এ গলির গাড়োয়ানের মেয়ে মাদারিয়া এক-একদিন ওদের বাড়ির ছাদ থেকে চেঁচিয়ে উঠে আমাকে তাতিয়ে দিতো। ওকে আমি এড়িয়ে চলতাম। ও মেয়েছেলে হলে হয় কি, সাংঘাতিক খেলতো। একদিন ও আমার পর পর তিনটে ঘুড়িই কেটে দিয়েছিলো।

সবচেয়ে আনন্দ লাগতো যখন চিনি না, জানি না কোথা থেকে কাদের সব বড় বড় কেটে যাওয়া লাল, নীল ঘুড়ি আমাদের বাড়ির ছাদে এসে পড়তো, কোনটা বা ছাদ থেকে হাতখানেক উঁচু দিয়ে উড়ে যেতো, যেন মনে হত এক-একটা বড় বড় জাহাজ বিশাল নীল সমুদ্রে ভেসে ভেসে যেতে যেতে হঠাৎ চেনা বন্দরে এসে ভিড়েছে।

একটা বিদেশী বিদেশী গন্ধ পেতাম ঘুড়িগুলির গায়ে। আর ভাবতাম, হয় না, রামেশ্বরপুর থেকে কোনো ঘুড়ি কি আসতে পারে না উড়ে উড়ে, হাওয়ায় ভর করে? ওরা, ঐ দুলু, বুলু, ওরা কি ঘুড়ি ওড়াচ্ছে এখন নীল, লাল, সবুজ, হলুদ? অথবা পাবে না কি আমার কাটা ঘুড়ি ওদের ওখানে যেতে? লিখে রাখবো কি নাম, নিবাস আমার ঘুড়ির গায়ে? লেখা আর হত না। একটা অভিমানও হত। ওরাও ত' পারে ওদের ঘুড়িতে ওদের নাম, নিবাস লিখে রাখতে যাতে চিনে নিতে পারি!

পিসীমা আমাকে ভালোবাসতো এ কথা ঠিক। কিন্তু পিসীমার মধ্যে আমাকে গ্রাস করার একটা প্রবৃত্তিকে আমি দেখতে পেতাম। ক্ষুধা, যদি সেটা প্রচণ্ড হয়, যদি টান করে বাঁধা ছিলার মত তীব্র হয় তবে তার তীব্রতাই একটা আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে। এমনিতে রসগোল্লা, সন্দেশ ইত্যাদি ভালো ভালো খাবার আমি যথেষ্ট পেতাম। ওরকম করে খাইয়ে পিসীমার কিন্তু তৃপ্তি হত না। পিসীমা চাইতো আমি যেন চুরি করে খাই। আর পিসীমা পেছন থেকে এসে আমাকে যেন মালমাল সমেত চেপে ধরে।

'ওখানে কে রে? কিসের খটখট শব্দ হচ্ছে?' পিসীমা এরকম বললেই বুঝতাম এখন চোঁ করে দৌড়ে পালালে চলবে না। পিসীমাকে সুযোগ দিতে হবে আমাকে চোর সাব্যস্ত করার।

'এ্যাতো খাওয়াই তাতেও সোনার নোলাটির সকসকানি যায় না? এ্যাতো লোভ! আজ তোর জিভে খুন্তিপোড়া দেবো!' এই বলে পিসীমা একাই হুলুস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়ে ফেলতো। আশেপাশের বাড়ির লোকেরা মজা দেখতে জুটে যেতো। সকলেই সব বুঝতো। সামনে সবাইকে খুশি খুশি দেখাতো। পিসীমা পেছন ঘুরলেই বলতো, 'আদিখ্যেতা!' কেউ কেউ বলতো, 'আহা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছে', অন্য একজন বলতো, 'কার দোষে হচ্ছে না কে জানে, হয়তো কর্তারই দোষ, অমন দশাসই চেহারা হলে কি হবে'। এসবের মধ্যে যেটুকু রহস্য, রোমাঞ্চ ছিলো সেটা চুরি করার মধ্যে ছিলো না। আমার চোর সেজে চুরি করে খাওয়ার বদলে আমার কাছ থেকে পিসীমার সত্যি সত্যি চোর হয়ে কিছু একটা ছিনিয়ে নেবার ভীষণ ক্ষুধার নিজস্ব একটা টান ছিলো। তারই প্রচণ্ড টানে এ খেলা আমার মন্দ লাগতো না। কিন্তু খেলার সাময়িক উত্তেজনা ফুরিয়ে গেলেই মনে পড়ে যেতো আমার দু' ভায়ের কথা। এখানে চুরি করে খাওয়ার আনন্দ উপভোগ করার জন্যে আমার জন্যে বাটি বাটি ভর্তি খাবার মজুত আছে আর আমার দুটি ভাই, আমার জীর্ণ শীর্ণ বাবা ছিন্ন-ভিন্ন মা একমুঠো মুড়ি চিবাতে পর্যন্ত পায় না। তখন আসতো বিষাদ হু হু করে, আর তা ঠেকাবার জন্যে আমার সেই পেন্সিল দুটি, যার একটার নাম 'দুলু', আর একটার নাম, 'বুলু' ঘসতে থাকতাম, জোরে জোরে ঘসতাম যতোক্ষণ না চোখ দিয়ে আমার টসটস করে জল ঝরে পড়ে রসগোল্লার ঘন রসকে পর্যন্ত ফিকে করে দিতো।

কি চায় এরা? কেন আমাকে এখানে ধরে রেখেছে? আমাকে কেন বই কিনে দিচ্ছে? কেনই বা স্কুলে ভর্তি করলো?

আমি পরীক্ষায় ফার্স্ট হলে এদের আহ্লাদ কেন? কেন, কেন বাটিভর্তি রসগোল্লা খাওয়াচ্ছে? কে এদের এসব করতে মাথার দিব্যি দিয়েছিলো? আমি ত' ছিলাম বেশ আমার ওখানে, আমার গরীব ভাই দু'টি আর মা, বাপের কাছে? ওরা কেন আমাকে ওখান থেকে ছিঁড়ে নিয়ে এলো? আমি গরীব হই, মূর্খ হই, গেঁয়ো যতোই হই না কেন, আমি জানতাম আনন্দ, গংগাফড়িং-এর মত ঘাসের ডগায় ডগায় লাফ দিয়ে বেড়াতাম, এরাই আমাকে চেনালো বিষাদ। কেন তোমরা আমাকে বিষাদ চেনালে এ্যাতো ছোটোবেলায়? আমি কি তোমাদের পাকা ধানে মই দিয়েছিলাম কোনদিন?

একদিন রাত্রে আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা হল। এর আগে পুষ্যি নেওয়া সম্বন্ধে কোন কথা আমার মনে আসে নি। শুধু এইটুকু জানতাম এদের যেহেতু কোনো সন্তান নেই তাই আমাকে পুষ্যি নিয়েছে। কিন্তু পুষ্যি নিলে যে ইচ্ছে করলে পদবী বদলে দেওয়া যায় স্কুলে গিয়ে অন্য ছেলেদের মুখে যেদিন জানতে পারলাম সেদিন থেকে একটা অন্য ধরণের দুঃখ আমাকে পেয়ে বসলো। কাকে আর দুঃখের কথা জানাই? কেই বা শুনবে? আমার মা যদি তেমন হত? মা যা ভীতু। কোথায় বলবে আমাকে, 'তা'ও হয় নাকি? তা' কখনোই হবে না। তোর পদবী তোরই থাকবে। কেউ তা' কেড়ে নিতে পারবে না।' তার বদলে সেই কুঁজোবুড়ো মানুষটি ভয়ে ভয়ে বলবে, 'ওঁরা যা' বলছেন খোকা তাই তুমি কোরো। ওঁরা যদি পদবী বদলে দিতে চান ত' বদলে দেবেন। সর্বদা ওঁদের কথা শুনো। ওঁরা তোমার গুরুজন। আমিও ওঁদের কথা শুনি।' এই ত' মা। অসহায় জীব, পলিমাটির মতন নরম, একদলা কাদা। যা' ইচ্ছে করা যায়। দেওয়া যায় যে কোন গড়ন। আদর করে গালে মাখতেও পারো আবার ইচ্ছে করলে পায়েও দলতে পারো। কাদা যে!

মনের এইরকম যখন অবস্থা তখন একদিন রাত্রে, অনেক রাত্রে, ঘুম হঠাৎ ভেঙে গেল চাপা, ফিসফিস শব্দে।

'পরের ছেলেকে ত' মানুষ করছো কিন্তু পর কখনো আপন হয়?' আলো হাতেও আমার হাতের সেজে রাখা আলোতে পিসেমশাই বালিশে উপুড় হয়ে শুয়ে ভড়াক ভড়াক করে তামাক টানছে।

'বালাই ষাট, ওকথা বোলো না। পর বলছো কেন?'

'পর বলবো না? একশোবার বলবো। তুমি কি সত্যিই ওর পিসীমা? তুমিই ত' ওর মা। তোমাকে ও মা ডাকে? আমাকে বাপ ডাকে?'

বুকটা আমার ধড়াস্ ধড়াস্ করে উঠলো। বলে কি পিসেমশাই? পিসীমাকে মা বলতে হবে আর পিসেমশাইকে...!

'হ্যাঁ। ছেলেটা বড় ভালো। ওর অতো বুদ্ধি এখনো হয় নি। ওকে ত' এখনো বলে দিই নি। বলে দোবখ'ন মা ডাকতে।'

'আমাকেও বাবা বলে ডাকতে হবে বলে দিচ্ছি নাহলে আমি অনর্থ করবো।'

'না, না।' পিসীমা ঝাঁঝিয়ে উঠলো, 'মুখে আগুন মিনসের। বয়েস বাড়ছে না কমছে? তোমাকে যদি বাপ ডাকতে ওর প্রবৃত্তি না হয় ত' বলবে না বাবা। পচা, গলা, হড়হড়ে তিরিশটা আম খেলে কি বলে আজ সকালে? খেতে ঘেন্না করলো না পোকা কিচকিচ করা আম? অমন রাক্কুসে নির্ঘিন্নে লোককে যদি 'বাবা' টুলু না বলে না বলবে। অনর্থ করবে? কতো মুরোদ!'

'দেখবি তবে? তাড়া করবো নল নিয়ে? একবার ত' ভয়ে বাপের বাড়ি পালিয়েছিলি।' পিসেমশাই বিছানায় শুয়ে শুয়ে হা হা করে হেসে উঠলো।

'আঃ, কি হচ্ছে? ছেলেটার ঘুম ভেঙে যাবে।' পিসীমা একটা ছোটো ধমক দিয়ে উঠলো।

'ছেলেটার ঘুম ভেঙে যাবে', বেশ একটু বিরক্তি নিয়ে কথাটা উচ্চারণ করে পিসেমশাই আবার তামাক টানতে লাগলো ভড়াক ভড়াক করে।

আর আমার বুকের মধ্যে বেজে বেজে চললো, পিসেমশাইকে 'বাপ', পিসীমাকে 'মা', পিসীমাকে 'মা', পিসেমশাইকে 'বাপ', পিসীমাকে ......।

সকাল থেকেই পিসীমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে লাগলাম। পিসীমার সঙ্গে খাওয়ার সময় দেখা হবেই। অবশ্য ভগবান ঠাকুর আছে। তার কাছে আগে-ভাগে গিয়ে ভাত চেয়ে নেওয়া যায়। পিসীমা ত' এখন ঠাকুরঘরে। বাড়া এক ঘণ্টার দায়ে নিশ্চিন্দি। পিসিমাকে ক্রমাগত এড়িয়ে চলতে লাগলাম। যদি এই করে করে পিসীমা ব্যাপারটা ভুলে যায়। কতোদিন আর মানুষ একটা কথা মনে রাখতে পারে। দু'-চারদিন চোখ কান বুজে কাটিয়ে দিতে পারলে পিসীমা ঠিক ভুলে যাবে। পিসীমার যা' ভুলো মন। এখানো, এতোদিন শিখছে, তন্ত্র-কারীতে কতোদিন নুন দিতে ভুলে যায়।

দিন চারেক ভালোয় ভালোয় কাটলো। কিন্তু একদিন মাঝরাতে কিসের খোঁচায় ঘুম ভেঙে গেল আমার। পিসীমার চোখ দু'টি, কুপির আলোয় দেখলাম, কিসের খিদেতে ছটফট করছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝলাম সবই। নিজেকে মনে মনে প্রস্তুত করে তুলতে লাগলাম।

'কেন তুই আমাকে এড়িয়ে চলছিস টুলু? কি হয়েছে তোর?'

'কে বলেছে আমি এড়িয়ে চলছি? তোমার যতোসব'

'তুই আমাকে এড়িয়েই চলছিস টুলু। আমাকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করিস না। আমি সব বুঝি।'

আমি নির্বাক। বিষণ্ণ। বিপন্নও তার চেয়ে বেশি। এমন অসহায়তা জীবনে কখনো বোধ করি নি। বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত কষ্ট। তার সঙ্গে মেশানো সন্দীদশা। যেন হাতে শেকল, পায়ে শেকল।

'তুই জানিস আমাকে এড়িয়ে চললে আমার কত কষ্ট হয়। আমাকে তুই 'মা' বলে ডাকবি, বুঝলি? ওকে 'বাবা' বললেও পারিস না বললেও পারিস। কিন্তু 'মা' আমাকে ডাকতেই হবে।'

সত্য। যে জিনিসের জন্যে এতোদিন লুকিয়ে-চুরিয়ে বেড়াচ্ছিলাম, যাকে এড়াতে তিন-চারদিন পলাতক হয়েছি, যার জন্যে মনে মনে পেতেছি কটিল জাল, নিজের কানে নিজেই দিয়েছি কতো মন্ত্রণা সে-সবেরই আজ শেষ। আর কিছুরই দরকার হবে না। আমার মাতার আদেশ ঘোষণা করে দিলো পিসীমা। কাল থেকে আমার নতুন জন্ম। কাল থেকে আমার নিজের মা আর নিজের নয়। আমার পাতানো মা-ই আসল মা।

ওঃ। বুকের মধ্যে আবার সেই অব্যক্ত কষ্ট। কষ্ট, বিষাদ তুমি এসেছো? এসে গেছ? খসে একটা পাতলা মিহি কিন্তু ধারালো ছুরি যেন গায়ে আমার কেটে কেটে বসছে। শেকলগুলো ঝন ঝন করে বাজছে। বন্দী বন্দী, বন্দী! এ আমার কি হল? কেন বন্দী?

'বলবো, বলবো একদিন।' পিসীমাকে সান্ত্বনা দিলাম।

'আচ্ছা।' যেন এইটুকুই শুনতে চেয়েছিলো। যেন এইটুকুতেই অনেক লাভ। পিসীমা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো।

'টুলু, ঘুমো এখন।' পিসীমা পরম নিশ্চিন্তে বিছানায় শুয়ে পড়লো। আশ্চর্য, মিনিট কয়েক যেতে না যেতেই নাক ডাকতে পর্যন্ত লাগলো। অন্য অন্য দিন আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে শোয়। আমার মাঝে মাঝে দম বন্ধ হয়ে যায়। আজ, কি জানি কেন, ছেড়ে দিলো আমাকে।

এ ছাড়া না আর এক নতুন ফাঁদ মা জাকার?

পিসীমা এমন কি, দিনকতক পর, আমাকে দেশে যাবার জন্যে নিজে থেকে বলল। আমি ত' অবাক। বলে কি পিসীমা? ভূতের মুখে রামনাম? হরি হরি যাবো কোথায়? মোট দু'বছর আছি। অন্ততঃ বার দশেক দেশে যাবো বলে ঘ্যানর ঘ্যানর করেছি। প্রতিবারই পিসীমা 'না' করেছে। বলেছে বিরক্ত হয়ে, 'কেন, এখানে কি তোমার আদরযত্ন ঠিক মত হচ্ছে না?'

'না, না। তা' নয়।' ক্ষীণভাবে আপত্তি তুলেছি। বলতে সাহস হয় নি মায়ের জন্যে, দুলু বুড়োর জন্যে, বাবার জন্যে, বিশালাক্ষীতলার জন্যে, পুকুরের পাড় আলো করে রাখা কচুরি পানার জন্যে, নেনোর মাঠ থেকে, রোদ নেবে গেলে, গরুগুলোর ঘরে ফেরা দেখবার জন্যে, পিসীমা, মনটা ছটফট ছটফট করছে। আমি এসব কিছু না বললেও পিসীমা এ-সবই আঁচ করে নিয়েছে। নিয়ে মুখটা হঠাৎ খুব গম্ভীর করেছে। কিন্তু যেতে দেয় নি। এমন কি একটা পোস্ট-কার্ড যে দোব তার উপায় রাখে নি। বলেছে, 'কি হবে পোস্টকার্ড দিয়ে? আমাদের নামে লাগানি-ভাঙানি দেওয়া চিঠি দিয়ে তোর লাভটা হবে কি?'

'চিঠি কি অমনি কেউ দেয় না? যারাই দেয় তারাই লাগানি-ভাঙানি-দেবার জন্যে দেয়?' ক্ষীণভাবে বলবার চেষ্টা করেছি। বলতে সাহস হয় নি, মাকে এমনি এমনি, শুধু শুধু, যেমন আকাশ নীল দেখলেই বিকেলে ঘুড়ি ওড়াতে ইচ্ছে করে, তেমনি কতকগুলো অক্ষর লিখতে ভীষণ ইচ্ছে করছে। আমি এসব কিছু না বললেও পিসীমা এ-সবই আন্দাজ করে নিয়েছে। তার-পর হঠাৎ মুখটা অসাধারণ গম্ভীর করেছে। কিন্তু আসল ব্যাপারে ঠিকই আছে। পোস্টকার্ড লিখতে দেয় নি।

তাই পিসীমা যখন আজ হঠাৎ আমাকে নিজে থেকে দেশে যাবার কথা বলল তখন অবাক হয়ে গেলাম। পিসী-মার এই উদারতা না বোঝারই কথা। আমি এখনো পিসীমাকে 'মা' বলি নি। পিসীমাও বলছি না আর। অন্যসময় হলে বলতাম, 'পিসীমা, ভাত দাও।' এখন বলি, 'ভাত দাও।' পিসীমা শব্দটা বাদ দিয়ে দি। তবু পিসীমার মুখে স্পষ্ট আনন্দের রেশ। না। টুলু চেষ্টা করছে। পিসীমা ভাবছিলো। পিসীমা ডাক বাদ দিয়েছে। এবার কোন নতুন নামে ডাকবে। যে ডাক শোনার জন্যে আমি কতোকাল কান পেতে আছি, অথচ কানে শুনতে পাই নি, শুধু কোন একলা প্রহরে নির্জনে, হঠাৎ শুনতে পেয়েছি রক্তের মধ্যে 'মা' আর চমকে, কান্নায় অন্ধ দু' চোখ চারিদিকে মেলে হাতড়ে ফিরেছি, 'কোথায় রে, কোথায়? কে ডাকে রে এমন করে?' তারপর সাড়া না পেয়ে সমস্ত শরীরটা কেঁপে আবার ধীরে ধীরে স্থির হয়েছে, সেই ডাক একদিন টুলু সোনা আমায় ডাকবে—এ কি সহজ ডাক, এ যে রক্তের, এ যে প্রাণের, বুকের অনেক গভীরের জিনিস, দুঃখিনীর নাড়ী-ছেঁড়া ধন, এ কি সহজ! টুলু আমার চেষ্টা করছে সেই ডাকটি ডাকবার জন্যে, কি করে একদিনে ডাকবে? এ্যাতো তাড়া-তাড়ি কি করে করবে? সময় লাগবে না?

দেশে এলাম। সেই জরির কাজ-করা তাজ। পায়ে মখমলের জুতো। মুসলমানী পাজামা আর মির্জাপুরী নকসাদার পাঞ্জাবী। এসব জড়িয়ে হাজির হলাম কতোদিন পর। যেন এক যুগ।

ভোলা কুকুরটা পর্যন্ত, যাকে খিড়কি থেকে ডাকতাম এঁটো ভাত হাতে নিয়ে, 'এ ভোলা, ভোলা, আঃ, আঃ, তু, তু,' আর ভোলা যেখানেই থাকুক, আমার গলার স্বর শুনে তীরবেগে হুঁসজ্ঞান হারিয়ে ছুটে আসতো, আমার চোখের দিকে একবার, আরেকবার তাকাতো আমার হাতের এঁটো ভাত কাঁটির দিকে, অসহিষ্ণু হয়ে ল্যাজ নাড়তো, সেই ভোলা, আমার এঁটো খেয়ে মানুষ, সেও আমায় চিনতে পারলো না, বলল অজানা গলায়, ঘেউ ঘেউ। পেছন পেছন অনবরত ঐ শব্দ। ঘেউ ঘেউ।

ভাতের পাতে মায়ের হাতের রান্না মুখে রুচছিলো না। একদিন কিন্তু এই রান্নাই অমৃত লাগতো। বাড়িতে অন্য কেউ রাঁধলে আমি ঠিক আলাদা করে কোনটা মায়ের হাতের রান্না, কেউ না বলে দিলেও, একটু জিভে ঠেকিয়ে বলে দিতে পারতাম।

কোন বাড়ির তরকারি খেয়ে মন ভরতো না। বলতাম, 'গাঙ্গুলী বৌ সুক্তো ভালোই রেঁধেছে কিন্তু তুমি যেরকমটি রাঁধো তেমনটি আর হয় না।' মা হাসতো ভুবন-ভোলানো হাসি। ঐ একটা জায়গায় ছিল মায়ের গর্ব। অদ্ভুত একটা লজ্জাও পেত। প্রশংসায় যে ধরণের লজ্জা মেয়েরা পায়। মা মেঝেতে মখ খুঁটতে খুঁটতে বলতো, 'তবু ত' জিনিস পাই না। তেল পুড় পুড় করে ব্যাভার করতে হবে। ওটা নেই সেটা নেই। এই 'নেই নেই'-এর সংসারে এর থেকে আর কি ভালো হবে বল।' সেই মায়ের রান্নাই বিশ্রী লাগলো। খেতে পারছিলাম না। দুলু ঠিক বুঝেছে। বলল চিপটেন কেটে, 'বড়লোকদের ভালো ভালো পোলোয়া, কালিয়া খেয়ে বড়দা কি গরীবদের এইসব থোড় বড়ি খাড়া খেতে পারে?'

'না না।' প্রবল প্রতিবাদ করতে গেলাম আমি। কিন্তু নিজেই শুনলাম প্রতিবাদে তেমন আর জোর পাচ্ছি না। খেতে সত্যিই পারছি না একদম। জোর করে খাচ্ছি। মা একদৃষ্টে চেয়ে আছে আমার দিকে। ঐ একটা জায়গায় মায়ের গর্ব। ঐ একটা জায়গায় মায়ের দুর্বলতা। মা চেয়ে আছে আমার দিকে গভীর চোখে। মা হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আর আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম, আমার সামনে, পিছনে, চারপাশে কারা যেন অচেনা গলায় বলল, ঘেউ ঘেউ।

শব্দগুলো দূর থেকে জটলা করতে করতে এসে ক্রমশই কাছে এসে আমাকে ঘিরতে লাগলো। আর আমি আতঙ্কিত হলাম।

ওদের কি আমি কেউ নই আর? ওরা ত' আমায় চেনে বলে মনে হল না। চিনলে শব্দ করবে কেন ঘেউ ঘেউ? পরিবর্তন হয়েছে মাত্র দু'বছরেই? আমি কি সত্যিই অন্যরকম হয়ে গেছি? বড়-লোকদের একজন? এই সব দামী দামী জিনিস দিয়ে যে ঢাকা তবে সে কে? কেন অমন যে মায়ের হাতের রান্না তা' আমার মুখে রুচলো না? কেন অমন হল? আমি যে এখানে আসবার সময় ভেবে-ছিলাম সবাই আমাকে বুকে আঁকড়ে ধরবে এ্যাতোদিন পর যাচ্ছি বলে! কিন্তু এ কিসের শব্দ শুনছি! ভোলা, কুকুরটা অমন অচেনা গলায় বলছে কেন, ঘেউ ঘেউ?

দুলু মগরার বাজারে সাইকেল মেরামতির কারখানায় ঢুকে গেছে। বুদ্ধু বাস যখন 'রেস্টিং'-এ যায় তখন বাস ধোয়া-মোছার জন্যে বয়ের কাজ পেয়েছে। বাবার নতুন রোগ হয়েছে। মাঝরাতে বাবা যখন বুক চেপে ধরে ঘং ঘং করে কাশে, তখন পাড়াগাঁর খাঁ খাঁ নির্জন প্রহরে যখন ঘরে জ্বলছে মিটমিটে রেড়ির তেলের আলো ছেঁড়া মশারিতে শান্তি টাঙিয়ে সারাদিনের ক্লান্তির শেষে হা-ক্লান্ত মা ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করে পাগলের মত ঘুমোচ্ছে, দুলু আর বুলু সবদিন তো ঘরে ফেরে না, গঞ্জের বাজারে পড়ে থাকে, তখন সেই নোনাধরা, ভাঙা বাড়িতে আমার যে কি হয়, কাউকেই আমি ঠিক চিনতে পারি না, ভীষণ ভয় করে, মনে হয় আর দু'দিন এখানে থাকলে পাগল হয়ে যাবো।

একমাস থাকবো বলে দেশে এসে-ছিলাম। দশদিনের মাথায় পালিয়ে গেলাম কলকাতায়। পিসীমা যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে। ভাবতেই পারে নি এ্যাতো তাড়াতাড়ি চলে আসবো। খুশি আর

চেপে রাখতে পারছে না। বুঝতে পারছি এ শুধু স্নেহ নয়, এ সেই অধিকার বোধ, গ্রাস করে নেবার সেই অদ্ভুত প্রবৃত্তি, সেই প্রবৃত্তি আজ অসাধারণভাবে তৃপ্ত হল, কেড়ে নিতে পেরেছে পিসীমা মা'র হাত থেকে আমাকে, আনন্দে উল্লাসে তাই ডগমগ করছে।

কলকাতায় এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মনে হল এখানেই থাকতাম চিরকাল। দুদণ্ডের জন্যে বাইরে কোথাও গিয়েছিলাম। আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছি। কিন্তু দিনকতক যেতে না যেতেই মনটা অবুঝ হয়ে উঠলো। নিজেই বুঝতে পারছি না কি আমি চাই। দেশের জন্যে মনটা হা হা করে ওঠে। বুড়ো বাপ, মাঝরাতে হাফর টানার মত অনবরত ঘং ঘং করে কাশে, উঁসকো খুসকো মুখ, শুকনো মুলোর মত গাল চোখ ঢুকে গেছে গর্তে, ভাই দুটির, কাউকে বলি নি, মাকেও নয়, তোমাই মদের গন্ধ সেদিন পেয়েছিলাম বড়দার মুখে, দুলুটা ত' সামনেই সিগারেট ফোঁকে আর মা মায়ের সেই রোগা, ছেঁড়া মশারির গায়ে ছিন্ন শাড়ি জড়িয়ে হা মুখ খোলা হা-ক্লান্ত মায়ের সেই ম্লান বেড়ির তেলের মিটমিটে আলোয় দেখা ভয়ংকর ঘুম আমার বুকের মধ্যে ক্রমে ক্রমে বিষাদকে ঘন করে তুলল। ডুকরে ডুকরে মনে মনে কেঁদে উঠি। এ আমার কি হল? কিছুতেই যে সে সব দৃশ্য ভুলতে পারছি না কিছুতেই না।

পিসীমা খুবই নিশ্চিন্ত। মুখে জয়লাভের সুনিশ্চিত হাসি। খুশি চোখে উপচে পড়ছে। হঠাৎ একদিন পিসীমা বলল 'তোর মা যে আসছে এখানে?' 'মা?' চমকে উঠলাম। 'হ্যাঁ। আমিই ডেকে পাঠিয়েছি।' পিসীমা ডেকে পাঠিয়েছে মাকে? আমি বিমূঢ় হয়ে গেলাম। 'তোরই জন্যে।' পিসীমা আমার দিকে চেয়ে বিজয়িনীর হাসি হাসলো। আমার জন্যে আনছে পিসীমা মাকে? আমার মনের কথা বুঝে?

পিসীমা, তবে তোমার মুখের হাসিতে কেন চাতুরি? কিছু যেন তুমি লুকোচ্ছো আমার কাছ থেকে? আমি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পিসীমার দিকে তাকিয়ে থাকি।

'অমন করে কি দেখছিস?' পিসীমা হাসতে লাগলো।

আমি গম্ভীর হয়ে গেলাম। হাসিটা আমার ভালো লাগলো না। হঠাৎ আমার মনে পড়লো এখনো পর্যন্ত পিসীমার সেই ভয়ংকর দাবি, 'আমায় মা ডাকতে হবে,' সেটাই নি।

আমারই জন্যে আমার মাকে আনছে পিসীমা? কিছু যেন বুঝতে পারছি না। কোথাও যেন খটকা লাগছে। কিছু যেন হয়েছে। পিসীমা ত' সুন্দর হাসে। পিসীমার হাসিটা সুন্দর তবু লাগলো না কেন? খালি ঘুরে-ফিরে মনে হচ্ছে পিসীমাকে ত' এখনো 'মা' ডাকি নি আর পিসীমা এ্যাতোদিন চুপ করে রয়েছে যে বড়?

মা এলো। দেশের ভাঙা বাড়ি, রং-ধরা স্বামী, ছন্নছাড়া সংসারে মা মানিয়ে যায়। কিন্তু এখানে মা একেবারে অচল। বারবার মনে হচ্ছিলো, মা এখানে কেন এলো? পিসীমা ডাকলো বলেই আসতে হবে? এলো: যদি জগদ্ধাত্রীর মত রূপের ডালি নিয়ে এলো না কেন? লক্ষ্মীর মত সম্পদ নিয়ে এলো না কেন? পিসীমা কি জন্যে মাকে এখানে এনেছে?

মাকে দেখার পর থেকেই খারাপ লাগছিলো। মায়ের সেই চোরের মত চুপিচুপি চাউনি, যেন নিজের ছেলের দিকে চুপি চুপি তাকাতেও ভয়, সেই অদ্ভুত জেটিড়ে মেউড়ে যাওয়া মুখ, দুটো কথা বলতে এসেও সরে সরে যাওয়া পিসীমার ভয়ে, এ সমস্ত, আমাকে আর দুঃখ নয় বিষাদ নয়, ক্রমশই অন্য পথে, সম্পূর্ণ বিচিত্র পথে, আমি যা নই সেই পথে ঠেলে দিতে চাইলো। মনে মনে প্রবল প্রতিবাদ করে উঠলাম। না। সহ্য করবো না। ভাঙবো। ভেঙে চুরমার করবো। কেন? কেন আমি বন্দী? কিসের এই কষ্ট? কেন শেকল? কেন? যতোবার নিজের মনে নানারকম প্রশ্ন দেখা দিতে লাগলো ততোই গুমরে গুমরে উঠছিলাম। একটা প্রচণ্ড কিছু, একটা ভয়ানক কিছু করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলাম।

তারপর সেই দৃশ্য এলো। তখন সন্ধ্যে হয়েছে। গ্যাসবাতি জ্বলছে মেঝে-মেঝে। এ বাড়ি ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় [illegible] করছে। পিসীমা [illegible] রাজেন্দ্রাণীর মত বিরাজিত [illegible]। মা কি পিসীমার পাশে বসতে পারে? [illegible]

[illegible]

নিজেকে [illegible] কোনরকমে একটা চেয়ারে, অত্যেন্ত, [illegible] নেই চেয়ারে বসে, বসছে পুটলির মত জড়োসড়ো।

পিসীমা ক্রমশই উজ্জ্বল হয়ে উঠছিলো। কি জানি কি মৎলব আছে পিসীমার। সেই ক্ষুধা অকস্মাৎ আমি লক্ষ্য করলাম আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে সেদিন মাঝরাতে যেমন দেখেছিলাম। একটা অদ্ভুত কোনো চক্রান্ত আমি যেন টের পেলাম। হো হো করে হেসে উঠলো পিসীমা। যেন একটা রক্তবর্ণ আপেল ভেঙে দু' টুকরো হয়ে গেল। চোখ দুটি থেকে একটা উগ্র ক্ষুধা, সেই গ্রাস করে নেবার আদিম প্রবৃত্তি হঠাৎ লক্ লক্ করে উঠলো।

'এসো বৌদি। এবার আমরা একটা খেলা খেলবো। নতুন ধরনের খেলা টুলু। তৈরি হয়ে নে' আমি তৈরিই ছিলাম। খেলা কোনধরণের হবে আমি যেন ধরতে পেরে গিয়েছিলাম। খেলা আমাকে নিয়ে। আমার মাকে নিয়ে। আমাদের নিয়ে এ্যাতো খেলা কেন? আমরা কি খেলনা? হাতের মুঠি দুটো অসহ্য আবেগে শক্ত হয়ে থর থর করে কাঁপছে।

'খুবই সামান্য খেলা।' পিসীমা আবার হেসে উঠলো জোরে জোরে। তারপর চকচকে চোখে বলল, 'টুলু, তুমি যেখানে আছো সেখান থেকে তোমার মায়ের কাছে চলে এসো।'

আমি এইরকমই কিছু একটা আঁচ করছিলাম। আমি এ্যাতোদিন পিসীমাকে 'মা' ডাকি নি। আমাকে এ যেন পিসীমার 'মা' ডাকিয়ে নেওয়া। পিসীমার কাছে যাওয়া মানেই তাই।

সোনার বকলেশ-আঁটা কুকুরের মত যেন আমি চেন-বাঁধা আছি কতোকাল। কতোদিন কে যেন আমায় বন্দী করে রেখেছে। আমি, আমি, মুক্ত হতে চাই। হঠাৎ মা আমার দিকে চাইলো একবার। মায়ের সেই ভীরু চোখ, সংকোচ মেশানো সেই দ্রুত ক্লান্ত ভঙ্গি, হঠাৎ আমার নিজে-আমায় প্রতিজ্ঞাকেই দপ্ করে জ্বালিয়ে তুলল। পিসীমার দিকে তাকলাম। চাপা অহংকারে পিসীমার মুখ ভরে গেছে। একটা বিজয়িনী বিজয়িনী ভাব। জয় যেন সুনিশ্চিত, এমনি পরিপূর্ণ হাসি মুখে। চোখ দুটি তীর [illegible] জ্বলছে ধক্ ধক্ করে।

মায়ের দিকে তাকলাম।

যে [illegible] পরিয়ে [illegible] [illegible]

[illegible]

নিজের ছেলেকেও নিজের বলতে ভয় পায়, ধরে রাখতে পারে না, সেই ভাঙা বাড়ি, জং-ধরা স্বামী, ছন্নছাড়া সংসারের যে মা, সে আমার মা? মায়েরই দিকে আবার চোখ পড়লো। আরো জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে গেছে। মুখটায় আর কিছু নেই। ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। সেলাইকরা শাড়িতে এখনো লেগে রয়েছে রান্নার হলুদ। মা, মাগো। গভীর, গভীর আবেগ। আর যেন নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না। আর যেন পারা যাচ্ছে না। মন পিষে যাচ্ছে অপমানে। মায়ের সামনে মায়ের অপমান? আর কোনোদিকেই তাকালাম না। আমি আমার মায়ের কাছে চলে গেলাম খেলতে খেলতে শেষের খেলায়।

[পর্ব-প্রকাশিতের পর]

বার্লিন (১৯২৪—১৯৩৩) : ১৯৩০-৩১-এর শীতকাল—সারা বার্লিন শহর তখন বেকারে ভরে গেছে, ব্রেশট এবং এলিজাবেথ হাউপ্টম্যান স্যালভেশন আর্মি'র পরিচালিত সূপ-কিচেনগুলো পরিদর্শন করে বেড়াতে লাগলেন। ১৯২৬ সাল থেকেই ব্রেশট মনে মনে আশা পোষণ করে আসছেন যে ধনতান্ত্রিক সমাজের পরিচালনপদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি একটি নাটক রচনা করবেন। শিকাগোর স্টক এক্সচেঞ্জের গমের ফাটকাবাজী ব্যবসায়ীদের নিয়ে যে নাটকটি লিখবেন ভেবেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হোলো না। 'দি ব্রেড শপ' নাটকটিও তখন পর্যন্ত শেষ করে উঠতে পারেন নি। 'সেইন্ট জোন অভ দি স্টকইয়ার্ডস' নাটকে ব্রেশট স্যালভেশন আর্মির মেয়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। দারিদ্র্যের দ্বারা অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে যাওয়া যে একটা উদ্ভট পরিকল্পনা একথাই বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে এ নাটকে। হ্যাপী এন্ড গীতিনাট্যের মিস হিপগার হয়ে দাঁড়িয়েছে 'সেইন্ট জোন অভ দি স্টকইয়ার্ডসের' নায়িকা জোন ডার্ক'।

সেইন্ট জোন ব্রেশটের অন্যতম সেরা নাটক লেখকের রচনাভঙ্গির বহু বৈশিষ্ট্য এ নাটকে পাওয়া যায়। তাঁর অন্যান্য ভাল রচনার মত এটিরও গতি বিভিন্ন স্তর দিয়ে। বিরাট আকারের বস্তি এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ভেতরকার কার্যপদ্ধতির দিকটা সহজভাবে সাধারণ দর্শকের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন ব্রেশট। এংড্রস এান্ড মিসেস সমস্যারও অনুসরণ করা হয়েছে। ব্রেশটের নাটকটির সার্থকতা শুধু সেইন্ট জোন এবং মেজর বারবারার কতগুলো উপাদানকে একত্রীভূত অবস্থায় দেখা যায়।

১৯৩২ সালেই ব্রেশট একজন বিখ্যাত নাট্যকার হিসাবে জনগণ এবং সমালোচকদের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন রঙ্গালয়ই তাঁর সেইন্ট জোন মঞ্চস্থ করতে রাজী হোল না। অগত্যা অনেক কাটছাঁট করে ১৯৩২ সালের বসন্তকালে নাটকটির রেডিও ভার্সন ব্রডকাস্ট করা হোল। এর থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে আগে ভবিষ্যতের জার্মানী কোন্ পথ ধরে অগ্রসর হবে। ব্রেশটের এ নাটকটি সর্বপ্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৯৫৯ সালের ৩০শে এপ্রিল হামবুর্গে।

কবি বলতে আমাদের চিরাচরিত একটা ধারণা আছে যে তিনি এক রহস্যময় ব্যক্তি জনসাধারণের অগোচরে একাকী বসে তিনি তাঁর সৃষ্টির কাজ সমাধা করেন। মানুষ দেখলে সঙ্কুচিত হয়ে নিজেকে গুটিয়ে নেন। ব্রেশট কিন্তু এই জাতীয় ধারণার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে মার্টিন এজলিন লিখেছেন :

In his desire to destroy the legend of the poet's mysterious and lovely act of creation Brecht liked to work surrounded by crowds of friends.

জানলার ধারে একটি লম্বা টেবিলের ওপর খোলা অবস্থায় তাঁর টাইপরাইটারটি সাজানো থাকতো—আর তার চারপাশে দেখা যেত বহুসংখ্যক কেলভার। এই সব কেলভারে ঠাসা থাকতো ইউরোপিয়ান এবং আমেরিকান কাগজের কাটিংস। কেউ দেখা করতে এলে ব্রেশট তাঁর রচনার বাছাই অংশ আগন্তুককে পড়ে শোনাতেন বুঝতে চেষ্টা করতেন তাঁর লেখার মর্মার্থ ওই দর্শনপ্রার্থী ঠিকভাবে ধরতে পেরেছেন কি না—এ নিয়ে আরও আলাপ-আলোচনা করতেন। বিশদভাবে এবং ভুলত্রুটি দিয়ে টাইপরাইটারে টাইপ করা থাকতো সদ্য আলোচিত রচনার পরিশোধিত এবং পরিমার্জিত ভার্সনটি। ব্রেশট মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন এভাবে অন্যান্য লোকের সহযোগিতায় কাজ করলে তাঁর রচনার উৎকর্ষ অনেক বেশি উন্নত হবে। এই কারণেই যুবকদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে কাজ করতে তিনি আনন্দ পেতেন—

They did research, discussed his plans with him, made suggestions for alterations and amendments.

ক্যারোলা নাহার—নামের সাদৃশ্য থাকলেও ইনি ডিজাইনার ক্যাসপার নাহারের কোন আত্মীয়া নন—ছিলেন ব্রেশটের দলের অন্যতম প্রধানা নায়িকা। ব্রেশটের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কবি ক্লাবুন্ডকে ইনি বিয়ে করেছিলেন। পলি এবং সেইন্ট জোন অভ দি স্টকইয়ার্ডস লেখবার সময় নাট্যকার যেন এঁরই জন্য নায়িকা চরিত্রগুলি রচনা করেছিলেন। কুর্ট ভাইল বিয়ে করেছিলেন লটি লেনিয়াকে—ইনি 'দি থ্রি পেনী ওপেরা' এবং 'মেহগনীর' অন্যতম প্রধানা নায়িকা।

ব্রেশটের প্রথম স্ত্রীর নাম মারিয়েন জফ—অল্পদিন বাদেই এ বিবাহের অবসান ঘটে। এই মহিলা ছিলেন লেখক অটো জফের বোন। এরপর ব্রেশট অভিনেত্রী হেলেনা ভাইগেলকে বিয়ে করেন—১৯২৭ সালের ম্যান ইস্ট ম্যানের বার্লিন প্রডাকসনে ইনি প্রধান স্ত্রী-ভূমিকাটিতে অভিনয় করেছিলেন। হেলেনা ভাইগেল হচ্ছেন ভিয়েনার মেয়ে—বয়সে ব্রেশটের থেকে দু বছরের ছোট—বেশ শিক্ষিতা মহিলা। এঁকে

'ডেজ অব দি কমিউন'-এর একটি দৃশ্য

প্রথম দেখি ১৯৫৬ সালে লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চে 'মাদার কারেজ' এবং 'ককেশিয়ান চক সার্কল' অভিনয় কালে। এ বছরে ব্রেশট তারপরে [illegible] 'মাদার' নাটকে মায়ের ভূমিকায় ও 'কোরিওলেনাস' নাটকে ভলামনিয়ারূপে অদ্ভুত অভিনয়-প্রতিভা দেখালেন হেলেনা ভাইগেল। 'ডেজ অব দি কমিউন' নাটকে একবার অল্পক্ষণের জন্য মঞ্চে দেখা দিয়েছিলেন। আর তাঁকে দেখেছিলাম টেলিভিশনের মাধ্যমে 'দি ভিজনস অব সিমন মার্শার্ড' নাটকে ভূমিকায়। এবার ব্রেশট আসামের হেলেনা ভাইগেলের সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ-আলোচনা হয়েছে। আমাদের দেশে ব্রেশট কতোটা জনপ্রিয় এবং তাঁর নাটকের বাংলা অনুবাদ করার বিষয়ে আমাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা সম্বন্ধে জানবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করলেন মিসেস ব্রেশট। হেলেনা ভাইগেলের অভিনয়ে ভাবাবেগের প্রলেপ মাখানো থাকে—তবে সে ভাবাবেগ অসংযত বা অসংহত নয়—এর থেকেই বোঝা যায় তিনি হচ্ছেন একজন প্রথম শ্রেণীর ইন্টেলেকচুয়াল এ্যাকট্রেস। এই জিনিসটাই অনেক অভিনেতা, অভিনেত্রী সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন না—কেউ কেউ অভিনয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদের সৃষ্টি করতে গিয়ে চরিত্রকে প্রাণহীন পুতুল-চরিত্র তৈরি করে ফেলেন। আবার যাঁরা বিচ্ছিন্নতাবাদে বিশ্বাস করেন না, তাঁরা চরিত্রকে অনেক সময়েই হৃদয়-তাপের তাপে ভরা ফানুসে পরিণত করেন। ব্রেশট তাঁর এলিয়েনেশন থিওরীতে একথা কখনই বলেন নি যে অভিনয়ের সময়ে চরিত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হবে না। এ বিষয়ে তাঁর একটি চিঠি থেকে কিছুটা প্রাসঙ্গিক অংশ তুলে দিচ্ছি:

Brecht in 'A Letter to an Actor'

Does my demand that the actor should not completely identify himself with his character, but should remain as it were by his side criticising or praising him, turn his acting into mere artifice and destroy the humanity of it?

This is not the case in my opinion. It must be entirely the fault of my writing, which takes so much for granted that such an impression should ever have been created. To hell with it! Of course, on the stage of a realistic theatre there must stand live, three dimensional, self-contradictory people with all their passions, their direct utterances and actions. The stage is no herbarium, no zoological museum with stuffed animals. The actor must create these people (and if you could see our productions you would see such people. They are human not in spite of, but because of, our principles!).

There exists however a kind of identification by actor with his character, which is so **complete that it** causes him to portray the figure so authentically? So unequivocally, that the audience is forced to accept it. This gives rise to **the quite sterile "to know everything is to forgive everything", as it was found most strongly in Naturalism.**

[From Adam & Encore No. 254, 1956, page 21.]

এই চিঠিটি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় ব্রেশটিয়ান স্টাইল অভ এ্যাকটিং-এ চরিত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবার কথাটার ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে। এবং ব্রেশটের নীতি বা পদ্ধতি অনুসারে অভিনয় করলেই নাটকীয় চরিত্রগুলো সত্যিকার প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ব্রেশট আপত্তি করেছেন সেই ধরণের অভিনয়ে যেখানে অভিনেতা সম্পূর্ণভাবে নিজের সত্তাকে অভিনীত চরিত্রের ভেতর অবলুপ্ত করে ফেলেন। ঠিক এই কথাটাই শিশিরকুমারও বলে গেছেন তাঁর বিভিন্ন লেখা, আলোচনা এবং বক্তৃতার সময়—"ভাবে অভিভূত হয়ে আত্মহারা অবস্থায় অভিনয় করলে সু-অভিনয় হয় না। সু-অভিনয় মানে সম্পূর্ণ সজাগ পরিচ্ছন্ন, পারিপার্শ্বিক, আলোক-

[illegible] একটি দৃশ্য
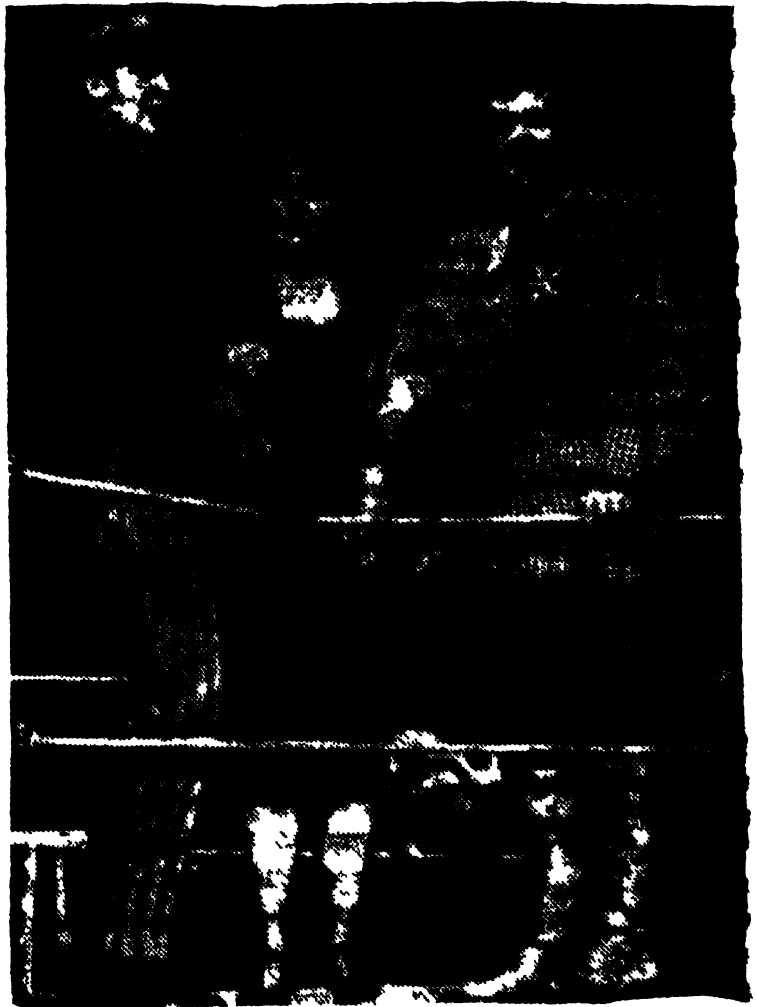
সম্পাত—সর্ব বিষয়ে সজাগ থাকা। এ থাকতে না পারিলে, শুধু 'ভাবাহত' হলে 'সু-অভিনয়' করা চলে না।

আর্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে 'সৃষ্টি'। স্রষ্টা যদি সজাগ না থাকেন, তাহলে তিনি সৃষ্টি করবেন কি প্রকারে?"

অভিনয় সম্বন্ধে শিশিরবাবুর এই মতবাদটি আমি ব্রেশট-ডায়লগে আমার বিভিন্ন বক্তৃতায় এবং লেখায় ডেলিগেটস-দের কাছে তুলে ধবি এবং বার্লিনার অ্যাসেম্বলের কর্তৃপক্ষও এর বহুল প্রচার করেছিলেন তাঁদের নানা বুলেটিন এবং প্রচার পুস্তিকায়। ১৯৬৮ সালের ব্রেশট-ডায়লগের যে পাবলিকেশনটি হবে তাতে আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে—সেই প্রবন্ধেও শিশিবকুমারের উপরি উক্ত অভিনয় সম্বন্ধে মতবাদটি আমি উদ্ধৃত কর্বেছি। বলা বাহুল্য ব্রেশট পার্নিব লোকেরা নাট্যাচার্য এবং ব্রেশটেব মতবাদের ভেতর অদ্ভূত সাদৃশ্য দেখে খুবই বিস্মিত এবং আনন্দিত হযেছিলেন এবং আমাব সংগে এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনাও করে-ছিলেন।

এঞ্জলিন লিখেছেন:

Helena Weigel combines the emotional intensity of a great, through always an intellectual actress, with an acute and cultivated mind and prodigious organizing ability. At the same time she was always a very competent house-wife and mother. Her loyalty and devotion to Brecht never faltered.

'ডেজ অব দি কমিউন'এর অপর একটি দৃশ্য

এ কথাগুলি খুবই সত্যি। এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও এ বছরের ব্রেশট-ডায়লগে সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা সুষ্ঠুরূপ দেবার জন্য হেলেনা ভাইগেলকে যে অমানুষিক পরিশ্রম করতে দেখেছি এবং সবার ওপর তাঁর সংগঠন শক্তির যে অদ্ভূত দক্ষতার পবিচয় পেয়েছি তা সত্যিই বিস্ময়কর। নাটকে অভিনয় করা ছাড়াও প্রত্যেক ডায়লগে তিনি অংশ গ্রহণ করতেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অনুবাদকদের নিয়ে যে অনুবোদক-কমিটি গঠিত হয়েছিল তার সভাপতিত্ব করতেন হেলেনা ভাইগেল। এই কমিটির বিভিন্ন অধিবেশনে আলো-চনার সময় লক্ষ্য করেছি ব্রেশটের রচনার প্রতি তাঁর কি অগাধ শ্রদ্ধা। হেলেনা ভাইগেল বেশ ভাল ইংরাজী জানেন—এজন্য তাঁর সংগে কথাবার্তা বলতে আমার কখনও কোন অসুবিধা হয় নি।

১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে আনাতোলী লুনাচারস্কি—ইনি ১৯২৯ সাল অবধি সোভিয়েট শিক্ষা বিভাগের কমিশনার ছিলেন—বার্লিনে এলেন চোখ অপারেশন করাতে। ব্রেশটের সংগে আগেও তাঁর যথেষ্ট পরিচয় ছিল। এবার এসে একদিন দেখা করতে গেলেন নাট্যকারের সংগে। লুনাচারস্কির বিধবা স্ত্রী এই সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে পরে লিখেছিলেন: যে বিভীষিকাপূর্ণ পরিবেশ—অর্থাৎ হিট-লারের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি এই সময় সারা জার্মানীর আকাশ-বাতাসকে বিষাক্ত করে তুলছিল সে সম্পর্কেই আলোচনা হয়েছিল। ব্রেশট সম্প্রদায়ের লোকেরা দেশান্তরে গিয়ে বসবাসের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে কথা তুলে-ছিলেন। লুনাচারস্কি ব্রেশটকে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন যে নির্বাসিত হলেও অন্য দেশে গিয়ে ব্রেশট তাঁর নাট্যরচনা চালিয়ে যেতে পারবেন। এই কথা শুনে একজন অভিনেত্রী হেসে উঠে বললেন—"থিয়েটার না পেলে ব্রেশটের পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন এমন কি প্রম্পটার হয়েও যদি কোনো থিয়েটারের সংগে যুক্ত থাকা যায়, তাহলে ব্রেশট ঐ প্রম্পটারের কাজ গ্রহণ করবেন।"

অপর একজন বলেছিল: "ঐ অবস্থায় পড়লে এমন কি ব্যাকস্টেজ ফায়ারম্যান হয়ে কাজ করতেও তাঁর আপত্তি হবে না।"

এর কয়েক সপ্তাহ বাদে হিটলার জার্মানীর সর্বময় কর্তা হয়ে বসলেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারী রাইস্টার্গ বিল্ডিংস-এ আগুন লাগলো, সংগে সংগে স্টর্ম ট্রুপার্স বামপন্থী ইন্টেলেকচুয়ালদের এবং কমিউ-নিস্টদের খুঁজে বের করবার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। এর পরের দিন ব্রেশট বার্লিন পরিত্যাগ করলেন নির্বাসিতের জীবন-

'বাহারোঁ কি মঞ্জিল' ছবিতে মীনাকুমারী ও ধর্মেন্দ্র

সংসার চালায়। ডাক্তার অভিজিতের সংগে তার ভালবাসা, কিন্তু সংসারের দায়িত্ব না মিটিয়ে সে নিজের সুখ ভাবতে পারে না। এখানেই তাদের বিবাহের অন্তরায়। অভিজিৎ অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করতে রাজী আছে। বাবার মৃত্যুর পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে একটা স্কুল করে ভাইবোনকে সে মানুষ করে। ভাই চাকরি নিয়ে বড়-লোকের মেয়ে বিয়ে করে ঘরজামাই হয়ে থাকে। নিজের সাহায্যে সে দু'বোনকে বিয়ে দেয়। এভাবে সব দায়িত্ব সমাধা করে যখন তার ছুটি নেবার সময় হয়েছে তখন তার দেহে ও মনে বয়সের চিহ্ন। তখন আর বিয়ের রোমাঞ্চ অনুভব করা বা নতুন করে সংসার সাজাবার মত মনের অবস্থা নয়। এই ভেবে সে যখন দূরে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে তখন অভিজিৎ এসে তাকে ডেকে নিল, প্রেমের পরীক্ষায় নিজে উত্তীর্ণ হয়ে মন্দিরাকে মুক্ত করল কর্তব্যপালনের ভারে ভারাক্রান্ত জীবন থেকে।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে নারীর মহীয়সী রূপ এবং নির্মল প্রেমের কাহিনী বাঙালীর মানসলোককে প্রকাশ করেছে। তাই সেই সাহিত্য ছিল এত প্রিয়। দেশ-ভাগের পরে সমাজের অনেক পরিবর্তন হয়েছে জীবনের জটিলতা অনেক বেড়েছে। আধুনিক সাহিত্যিকেরা নারীকে দেহ-বিপনি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না, দেহভোগ বাদ দিয়ে প্রেম তারা কল্পনাও করতে পারে না। নরনারীর সম্পর্ক যে যৌনতার উর্ধে থাকতে পারে সেকথা তাদের কল্পনায় স্থান পায় না। এই যৌন সর্বস্বতার দিনে আশাপূর্ণা দেবীর লেখা অবলম্বনে 'বালুচরী'-তে রয়েছে মানসিক সুস্থতা ও মানবিক দৃষ্টি। যা মানুষকে শান্তি দেয়, প্রেরণা দেয়, সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সুতরাং এরূপ ছবির সামাজিক সার্থকতা আছে। কারিগরি দিক থেকে যতই অপূর্ণতা থাকুক, মানুষকে মহৎ করে তোলা, মানুষের প্রতি বিশ্বাস জাগিয়ে তোলার গুরুত্ব কম কি।

ছবির অভিনয়াংশে মন্দিরার ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এবং অভিজিৎ-রূপে অনিল চট্টোপাধ্যায় যথার্থরূপে চরিত্র দু'টি রূপায়িত করেছেন। বিশেষ করে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় নিজের অভিনয় শক্তিতে শেষ পর্যন্ত দর্শকদের একাগ্র করে রাখতে পেরেছেন। তিনটি ভূমিকায় অনুপকুমার, লিলি চক্রবর্তী এবং জ্যোৎস্না বিশ্বাস উপভোগ্য চরিত্র উপস্থিত করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় মঞ্জুলা দেবী গীতা দে, দীপিকা দাস, প্রসাদ বসু, গঙ্গাপদ বসু, জহর রায়, তরুণ চ্যাটার্জী, পাহাড়ী সান্যাল যথার্থ অভিনয় করেছেন। রেণুকা রায় একটি ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করেছেন, সম্ভবত এইটিই তাঁর জীবনের শেষ অভিনয় ছিল। অভিনেতাদের মধ্যে রেখাপাত করতে পারেন নি অজয় গাঙ্গুলী। তাঁর হাঁটার ভঙ্গি থেকে কথা বলা ব্যক্তিত্বহীন।

ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছেন রাজেন সরকার। চিত্র গ্রহণ করেছেন বিজয় ঘোষ। পরিচালনা করে-ছেন অজিত গাঙ্গুলী।

রাজধানীর অনুষ্ঠানে মূকাভিনয়

দুর্গাপূজা উপলক্ষে সম্প্রতি মূকাভিনেতা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, দিল্লীর কয়েকটি সাংস্কৃতিক সংস্থার আমন্ত্রণে বিভিন্ন পূজামণ্ডপে মূকাভিনয় পরিবেশন করেন। শ্রীভট্টাচার্যের প্রতিটি অনুষ্ঠানেই প্রচুর ভিড় হয়, বিশেষ করে সিণ্টো রোড ও দিল্লী বেঙ্গলী ক্লাবে প্রচুর জনসমাগম হয়। "দিল্লী বাস প্যাসেঞ্জার ও চোর" ফিচারটি খুবই সুনাম অর্জন করেছে।

একক অভিনয়

বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব প্রদর্শনীতে একক অভিনয়ে শাহাদাৎ হোসেন সকলের প্রশংসা লাভ করেছেন। এককভাবে 'কলকাতার বুকে' ও 'বৌদির প্রেম' দু'টি নাটিকা পরিবেশন করে দর্শক-দের আনন্দ দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আবহসঙ্গীতে ছিলেন শরদিন্দু বসু।

বিয়োগ

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর গোল্ডউইন অর্কেস্ট্রার সদস্যরা সংগীত, নৃত্য ও নাটকের মাধ্যমে তাঁদের বার্ষিক উৎসব পালন করলেন। তাঁরা দিলীপ বসাকের 'বিয়োগ' নাটক অভিনয় করেন। নাটকে বর্তমান যুগের সমাজমনের ছবিকে নাট্যকার তুলে ধরতে চেয়েছেন। শিল্পী-দের অভিনয় সেদিনের প্রতিটি দর্শক আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করেন। নাটকে অংশ গ্রহণ করেন—সুনির্মল দত্ত, দিলীপ বসাক, দীপক দত্ত, অপূর্ব বিশ্বাস, দীপক কন্দোজিয়, সন্তোষ দাস, শম্ভুপ্রসাদ সিং ও নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য। নাট্য-নির্দেশনায় ছিলেন সন্তোষ দাস।

অজিত লাহিড়ী পরিচালিত 'গড় নসিমপুর' ছবিতে বিশ্বজিৎ ও মাধবী মুখার্জী

সংবাদিকী
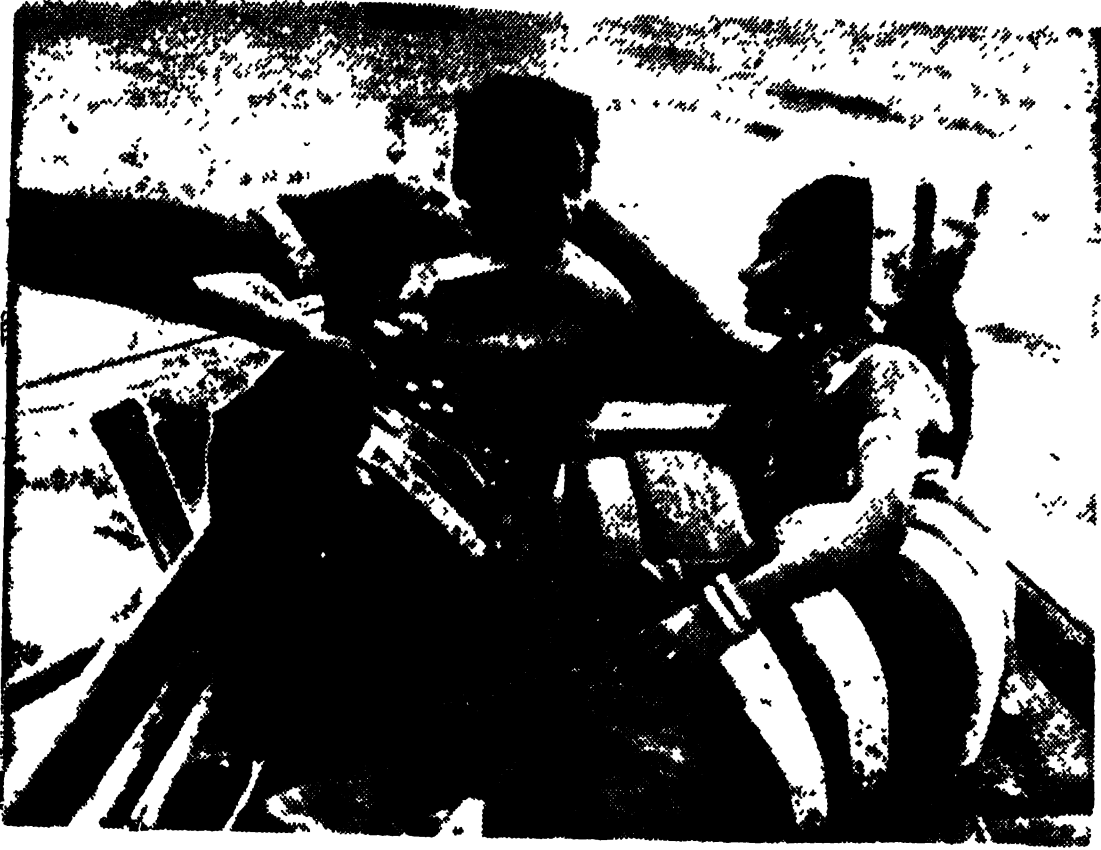
ডবঝেঙ্কো ফিল্মস

জুলিয়া সলনেৎসেবার সৃষ্টি-সাফল্য

বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্রস্রষ্টা আলেকজান্দার ডবঝেঙ্কো আজ জীবিত নেই। তাঁর অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তাঁর স্ত্রী জুলিয়া সলনেৎসেবা। ডবঝেঙ্কো যে কয়টি ছবি করে গেছেন—সব কয়টি ছবিই চিরন্তন আবেদনের জন্য সর্বজনস্বীকৃত এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ছবির পর্যায়ভুক্ত। আরো যে ছবিগুলি করার জন্য তিনি চিত্রনাট্য লিখেছিলেন অথবা কাহিনী রচনা করেছিলেন সেগুলিকে চিত্ররূপ দেবার মত যোগ্যতা রয়েছে শ্রীমতী সলনেৎসেবার। শ্রীমতী সলনেৎসেবা নিজে অভিনেত্রী ছিলেন। তাঁর অভিনয় দেখেছি 'দি আর্থ' ছবিতে। সলনেৎসেবা পরিচালিত ছবি "দি স্টোরী অব ফ্লেমিং ইয়ার্স" কলকাতায় কয়েক বছর আগে প্রদর্শিত হয়েছে। সেই ছবিতে দেখেছি—শ্রীমতী সলনেৎসেবা প্রথম শ্রেণীর পরিচালকদের একজন।

সোভিয়েত রাশিয়ায় সলনেৎসেবা পরিচালিত 'আনফরগেটেবল' ছবির কাজ শেষ হয়েছে। ১৯৬৫ সালে তিনি 'দি এ্যানচেনটেড ডেশনা' ছবিটি নির্মাণ করেছেন। এই ছবিটি প্যারিস ও লণ্ডনের দর্শকদের কাছেও প্রশংসিত হয়েছে। এই তিনটি ছবিরই চিত্রনাট্য লিখে গেছেন আলেকজান্দার ডবঝেঙ্কো। 'দি এ্যানচেনটেড ডেশনা' ডবঝেঙ্কোর গ্রামকে ভিত্তি করে লেখা। ছবির কাজ শুরু করে তিনি মারা যান। বাকি কাজ শেষ করেন শ্রীমতী সলনেৎসেবা। 'দি স্টোরী অব ফ্লেমিং ইয়ার্স' ক্যানস চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার লাভ করেছে, এবং ভারত সহ ৬৮টি দেশে প্রদর্শিত হয়েছে। ডবঝেঙ্কোর লেখা এবং তাঁর রীতিতে প্রস্তুত ছবিগুলি 'ডবঝেঙ্কো ফিল্মস' নামে পরিচিত।

'আনফরগেটেবল' নির্মাণ প্রসঙ্গে শ্রীমতী সলনেৎসেবা এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন : গত যুদ্ধের সময় ডবঝেঙ্কো যুদ্ধের একেবারে সম্মুখ সারিতে ছিলেন 'রেড স্টার' পত্রিকার সংবাদদাতা হিসাবে। সে সময় তিনি জনসাধারণের শারীরিক ও নৈতিক দুঃখ-দুর্দশা দেখেছেন। ফ্যাসিস্ট অবরোধ থেকে মুক্তির পর জনগণের মানসিক অবস্থা দেখেছেন। এ সময় তিনি অনেক ইস্তাহার, পুস্তিকা, প্রবন্ধ এবং গল্প লিখেছেন পত্রিকায় প্রকাশের জন্য। এ সব লেখা মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। এই লেখা অবলম্বনে পরবর্তীকালে 'দি মাদার' 'অন দি বারবড ওয়্যার', 'আনফরগেটেবল', 'দি ফুনারেল ফিস্ট', 'ভিক্টরী' প্রভৃতি ছবি হয়েছে।

'আনফরগেটেবল'-এর চিত্রনাট্য যদিও বিষাদাত্মক—কিন্তু জনগণের বীরত্ব এবং ভবিষ্যৎ জয় এতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ১৯৪২ সালের ২রা এপ্রিল ফ্রন্টে এক ভয়ংকর যুদ্ধের সময় যখন আমরা পিছু হটছি তখন "শত্রুর কাছে—নাজি-বাহিনীর এক অফিসারের কাছে খোলা চিঠি" তিনি লিখেছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন, "আমার বিশ্বাস আছে আজ যাই ঘটুক শেষ জয় আমাদেরই

'তিন অধ্যায়' ছবিতে সুপ্রিয়া দেবী

অলিভিয়া, স্যার জন জিলগার্ড প্রমুখ অভিনয় করবেন।

প্যারিসে ভারতীয় চলচ্চিত্র

ফিল্ম আর্কাইভের সহযোগিতায় প্যারিসে ভারতীয় ছবির এক প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। এই প্রদর্শনীতে নতুন পুরাতন পঞ্চাশটি ছবি দেখান হবে। বাছাই করা ভারতীয় ছবির মধ্যে নিম্নলিখিত বাংলা ছবি রয়েছে : অতিথি, অযান্ত্রিক, গঙ্গা, কৃষ্ণকান্তের উইল, মেঘেঢাকা তারা, সাগর সঙ্গমে, সুবর্ণরেখা, ঘুম ভাঙার গান, আলিবাবা, বাইশে শ্রাবণ।

ফিল্ম সেন্সার সম্পর্কে আলোচনা সভা

ভারত সরকার নিয়োজিত 'খোসলা কমিটি' ১৪—১৬ই অক্টোবর কলকাতা আসছেন ফিল্ম সেন্সার বিষয়ে তদন্ত করবার জন্য। ফিল্ম সেন্সার বিষয়ে তথ্য এবং মতামত সংগ্রহ করবেন এবং সরকারের নিকট নিজেদের সিদ্ধান্ত সুপারিশ করবেন।

এই উপলক্ষে ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটির ফিল্ম স্টাডি গ্রুপ দুই দিনব্যাপী সেমিনারের আয়োজন করেছে কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে। ১৪, ১৫ই অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টায় আলোচনা শুরু হবে। আলোচনার বিষয় : (১) ফিল্ম সেন্সারে কি দু'রকমের মান চলছে ? (২) চলচ্চিত্র ও সমাজ (৩) ভারতীয় ছবির সাম্প্রতিক প্রকৃতি (৪) চলচ্চিত্র ও তরুণসমাজ।

১৬ই অক্টোবর সন্ধ্যায় আলোচনার সমাপ্তি এবং প্রস্তাবাদির জন্য নির্ধারিত হয়েছে।

সুরসভার শারদোৎসব

গত ৭ই অক্টোবর বালিগঞ্জস্থিত রবিতীর্থ ভবনে দক্ষিণ কলকাতার সাংস্কৃতিক সংস্থা 'সুরসভা'র শারদোৎসব ডাঃ বি, ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়।

এই উপলক্ষে আয়োজিত এক মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি ও অতুলপ্রসাদের গান পরিবেশন করেন পূর্বা সিংহ, সুমিত্রা ঘোষ, চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়, মমতা ঘোষ, ইন্দ্রাণী দে, পুতুল বসাক, জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রগতি রায়, গৌতম বসু, তপন রায়চৌধুরী ও অলোক বসু।

সব শেষে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে খেয়াল গেয়ে শোনান কান্তি মৈত্র (আভোগী), কমল বন্দ্যোপাধ্যায় (শুদ্ধ কল্যাণ) ও গৌর বসাক (শ্যামকোষ)। এঁদের সঙ্গে তবলায় ও হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করেন দুলাল ভট্টাচার্য, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভু পাল, স্বপন মুখোপাধ্যায় ও রথীন চৌধুরী।

ই· আই· এম· পি'র নতুন কর্মকর্তা

ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশান পিকচার এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় গত ২১শে সেপ্টেম্বর নতুন বছরের কার্যনির্বাহক কমিটি গঠিত হয়েছে। নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা নির্বাচিত হয়েছেন : সভাপতি—এস, এল, জালান। সহ-সভাপতি—জে, জে, টাটা; এস, এন, সরকার। প্রযোজক শাখার সভাপতি—অজিত বসু; পরিবেশক শাখার সভাপতি—এস, বি, মেহতা, প্রদর্শক শাখার সভাপতি—এস, বি, মণ্ডল। কোষাধ্যক্ষ—পরিমল সরকার। সদস্যগণ—সুধীর মুখার্জী, গিরীন্দ্র সিংহ, অসীম পাল, প্রণব বসু, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, কে, জি, দোসানী, এ, কে, সরকার, এ, করিম, রায়জাদা নারীন্দ্রকুমার, এন, জি, দত্ত, অনুকূল মুখোপাধ্যায়, প্রভাত দাস, শক্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সৌরীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ মিত্র।

দেখা যাচ্ছে এবার নির্বাচনে যাঁরা চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি গঠন করেছিলেন তাঁদের নেতৃস্থানীয় সকলেই কমিটিতে স্থান লাভ করেছেন। সুতরাং ই আই এম পি এর সঙ্গে সংরক্ষণ সমিতির আর কোন বিরোধ না থাকাই স্বাভাবিক।

তেহেরান উৎসবে ভারতীয় ছবি

তেহেরান তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ভারত সরকার পাঁচটি ছবি পাঠাচ্ছে। এই পাঁচটি ছবি ফিল্ম [illegible] শনের 'জ্যাকোয়া ফ্যানটাসিয়া এবং চিলড্রেন ফিল্ম সোসাইটির ঘৈসে কা তৈসা, ভোলা মোহন, এক থা ছোটু, এক থা নটু, জবাব আয়েগা। ৩১শে অক্টোবর থেকে উৎসব শুরু হবে।

লা-প্লাটা চলচ্চিত্র উৎসব

আর্জেণ্টিনা লা-প্লাটা সপ্তম আন্তর্জাতিক শিশু চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের জন্য ভারত সরকার তিনটি ছবি নির্বাচিত করেছেন। এই তিনটি ছবি—ডাকঘর, টিট ফর ট্যাট, ওয়াইল্ড লাইফ।

বার্গামো উৎসবে আব্বাসের ছবি

ইতালীর বার্গামো চলচ্চিত্র উৎসবে নয়া সংসার প্রযোজিত 'বোম্বাই রাত কি বাহমে' প্রদর্শনের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছে।

বিচিত্র এই দেশ

ভেবেছিলাম এই সংখ্যাটা সীমাবদ্ধ রাখবো বিজয়ার মধুর মণ্ডলের মধ্যে। ভেবেছিলাম অপ্রিয় সত্য প্রকাশ না করে অন্তত এই সময়টা আর কারো কাছে বিস্ময় করে তুলবো না। কিন্তু উপায় নেই, ঘটনার পর্যবেক্ষণে সময়ের দামাকে এই মুহূর্তে আর বেঁধে রাখা যায় না। বিশেষ করে বিগত কয়েক দিন ধরে খেলাধুলোকে কেন্দ্র করে কলকাতায় যে সব কাণ্ড ঘটে গেলো তার নেপথ্য কাহিনী প্রকাশ করে না দিলেও, সেই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা না লিখে আজ যে আর গত্যন্তর নেই। হয়তো বা লেখার প্রয়োজনও আছে। কেন না ভারতীয় ক্রীড়াঙ্গনের আজ যা হাল হয়েছে আর তার জন্যে যারা দায়ী, আর যাই হোক তাদের ছেড়ে কথা বলা উচিত নয়।

প্রথমেই ধরা যাক কলকাতার ফুটবলের কথা, আর আমাদের আলোচনায় টেনে আনা যাক আই এফ এ অর্থাৎ ইণ্ডিয়ান ফুটবল এ্যাসোসিয়েশনকে। আই এফ এ-র বয়েস হল্যে পঁচাত্তর বছর। এই বছরই পালন করা হচ্ছে আই এফ এ-র প্লাটিনাম জয়ন্তী উৎসব। কিন্তু আই এফ এ-র সেই উৎসবের ঢেউ-এ কলকাতার ময়দান যে আজ অন্ধকার। গালভরা কথা, আর মুখ ভরা মন নিয়ে আর যাই হোক মহৎ কোন কাজ করা যায় না। তাই আজ বাংলা দেশ তথা কলকাতার ফুটবল জগতের পরিচালনার ক্ষেত্রে আই এফ এ কর্তৃপক্ষ দিচ্ছেন চরম ব্যর্থতার পরিচয়। মুষ্টিমেয় লোকের স্বেচ্ছাচারিতায় আই এফ এ আজ আত্মহননের পথ এগিয়ে চলেছে। তা যদি না হবে তবে কেন এই উৎসব-মুখরিত বছরে আই এফ এ-র সভাপতিকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়? কেন গত বছরের আই এফ এ শীল্ড খেলা পরিত্যক্ত হলো? কেন এমন কাজ করা হয় যার জন্যে আইন আদালতের শমন বারবার এসে হাজির হয় খেলার মাঠে? জানি এ প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার প্রয়োজন কেউই বোধ করবেন না। আর একথাও সকলে জানেন যে খেলাধুলোর উন্নতির দিকে মন দেওয়ার চেয়ে গদি আঁকড়ে থাকার দিকেই ওঁদের নজর অনেক বেশি প্রখর—আর এ ব্যাপারে অনেক বেশি সক্রিয়ও তারা।

বেশিদূরে যাবার দরকার নেই—বেচুবাবু অর্থাৎ শ্রী এম দত্তরায়ের কথাই ধরা যাক না কেন। গদি আঁকড়ে থাকতে উনি যে কতো ব্যগ্র তার প্রমাণ মাত্র কয়েক দিন আগেই পাওয়া গেছে। ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীর চেয়ারম্যানের পদটি তাঁর গেছো বটে—কিন্তু অতিকষ্টে এবার তিনি বজায় রেখেছেন নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য পদ। আর এই পদটি বজায় রাখার জন্যে ভোটযুদ্ধে তাঁকে হারাতে হয়েছে তাঁরই দলের আজীবন ও বাংলা দেশের কৃতী খেলোয়াড় পংকজ রায়কে। অনেকেরই মনে পড়ছে এই ভোটযুদ্ধে মাত্র এক ভোটে পংকজ রায়কে হারিয়ে দিয়েছেন বেচুবাবু। সত্যি অবাক হবার কথাই বটে। অবশ্য অবাক হবার মতো এর চেয়ে অনেক বেশি ঘটনা ঘটেছে ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের কলকাতায় অনুষ্ঠিত বার্ষিক সভার সময়। সে সব কথা না তোলাই ভালো।

কিন্তু মুখ যে আমাদের দিনকে দিন কালো হয়ে যাচ্ছে সে খবর কি [illegible] ক্রীড়াজগতের হর্তা-কর্তা-বিধাতারা রাখেন? কলকাতার ফুটবলের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে বাংলা দেশের কাগজে [illegible] অনেক কথা লিখেছে—তার অনেকগুলোই হবে একটা মুখ-পাঠ্য নয়—এমন কি [illegible] কিছু বলেন? [illegible] তাদের দেওয়া হবে আমাদের বিরুদ্ধে ঐ সব কথা [illegible]? [illegible] এসেছে মাঠে আর মাঠ দিয়ে [illegible] কোর্টে। [illegible]

অলিম্পিকের আসর

মেক্সিকোর অলিম্পিকের আসর এখন জমজমাট। খেলাধুলোর মহামিলন ক্ষেত্র মেক্সিকো শহরের সর্বত্র আজ বসেছে আনন্দের হাট। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত হাজার হাজার ক্রীড়াবিদদের সমবেত উচ্ছ্বাসে মেক্সিকোর অলিম্পিক প্রাঙ্গণ আজ উচ্ছ্বসিত।

এখন সেখানে একদিকে যেমন চলেছে সাফল্যের পালা, অপরদিকে ব্যর্থতার গ্লানিতে মন-প্রাণ ভরে উঠেছে অনেক প্রতিযোগী প্রতিযোগিনীদের। আনন্দ-হাসি-গানের আসরে আজ তাই আর এক-দিকে বসেছে নিরানন্দের মেলা।

টোকিওর পর মেক্সিকো। ১৯৬৪ সালের টোকিও অলিম্পিকের স্মৃতি আজো সকলের মনে উজ্জ্বল। তাই আজ যখন শুরু হয়েছে ভাঙা-গড়ার পালা— টোকিওর প্রতিষ্ঠিত নতুন রেকর্ডের স্থানে যখন স্থাপন করা হচ্ছে নতুন রেকর্ড, যখন টোকিওর সেরা প্রতিযোগীরা পরাজিত হচ্ছেন—তখনই মন আবার পিছিয়ে যেতে চাইছে চার বছর আগে ফেলে আসা টোকিও অলিম্পিকে।

প্রথম পদার্পণ

এবার অনেকে চেয়েছিলেন যে যখন প্রথম স্থান লাভকারীকে পুরস্কার প্রদান করা হবে তখনকার অনুষ্ঠান থেকে দুটি বিষয় বাদ দিতে। তাঁদের মত ছিলো যে পুরস্কার প্রদানের সময় সেই দেশের পতাকা উত্তোলন আর জাতীয় সঙ্গীতের সুরে বাজাবার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেছে। তাই মেক্সিকোর আকাশে এবারও উড়বে বিজয়ী দেশের পতাকা আর বাতাসে ধ্বনিত হবে বিজয়ী দেশের জাতীয় সঙ্গীতের সুর।

তবে মেক্সিকো অলিম্পিকে অংশ গ্রহণকারী মহিলা এ্যাথলেটদের এবারও জরুরী পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। মেক্সিকো অলিম্পিকে অংশ গ্রহণকারী মহিলা প্রতিযোগীর সংখ্যা ৯৬২। তবে জানানো হয়েছে যে এই পরীক্ষার কথা গোপন রাখা হবে। আর এও জানানো হয়েছে যে ১৯৭২ সালের মিউনিক অলিম্পিকের সময় সেই সব প্রতিযোগিনী-দের আর জরুরী পরীক্ষা করা হবে না যাঁরা মেক্সিকোর এই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন।

মেক্সিকো অলিম্পিকে এ্যাথলেটেরা মাদক দ্রব্য কিম্বা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করার আগে উত্তেজক কোন জিনিষ ব্যব-হার করছে কিম্বা করেছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্যে একটা বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। যদি কোন এ্যাথলেট কোন উত্তেজক পানীয় গ্রহণ করে মাঠে নামেন তাহলে তাঁকে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। শুধু তাই নয় বিশেষ পরীক্ষায় যদি দেখা যায় যে মাদক দ্রব্য কিম্বা উত্তেজক পানীয় গ্রহণ করে কোন প্রতিযোগী কোন বিষয়ে অংশ নিয়ে সাফল্য লাভ করেছেন তাহলে তাঁর ফলাফল বাতিল করে দেওয়া হবে।

জানা গেছে আগামী ১৯৭২ সালের শীতকালীন অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে জাপানে। ফেব্রুয়ারী
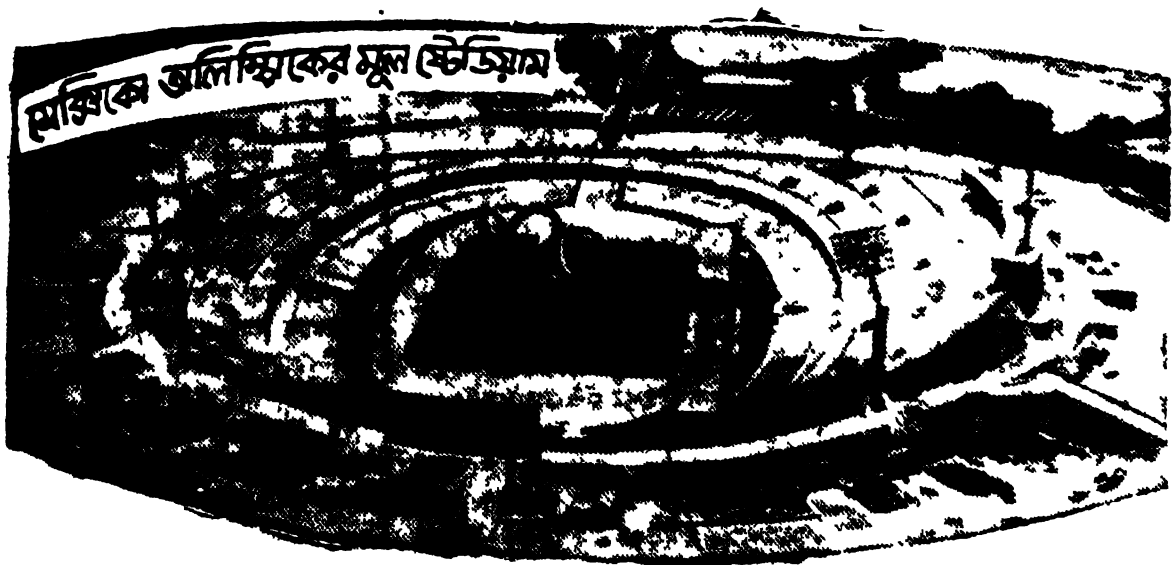
ভারতের হকি খেলোয়াড় অজিতপাল সিং মেক্সিকোয় পৌঁছলে রাশিয়ার দুই মহিলা-প্রতিযোগী ভারতীয় হকি দলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে অজিতপাল সিংকে একটি টাই পিন আর একটি রুমাল উপহার হিসেবে দেন। ছবিতে তাঁদের একসঙ্গে দেখা যাচ্ছে।

মাসের ৩ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত চলবে এই প্রতিযোগিতা।

মেক্সিকো শান্ত
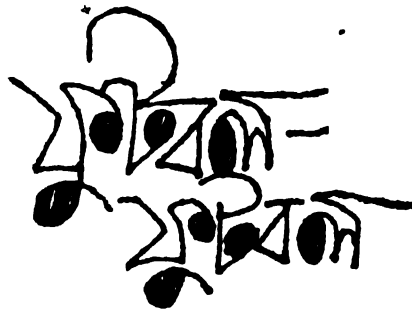
অলিম্পিক প্রতিযোগিতার মহান্ আদর্শের কাছে মাথা নত করেছেন মেক্সিকো শহরের বিদ্রোহী ছাত্ররা। অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যাতে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় তার জন্যে ছাত্ররা সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছেন তাঁদের রক্তাক্ত সংগ্রাম।

তাই মেক্সিকো শহরের সাত লক্ষ অধিবাসী আগের মতোই কর্মচঞ্চল। অলিম্পিকানন্দে তাঁরাও আজ মেতে উঠেছেন। মেক্সিকো শহরের পথে পথে আজ আর তাই নেই সামরিক পাহারা, নেই বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের বিদ্রোহী ধ্বনি, নেই গুলীর শব্দ। মেক্সিকো আজ শান্ত। মেক্সিকোর আকাশে-বাতাসে আজ অলিম্পিকের আদর্শের মহান বাণী, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের গুঞ্জনধ্বনি—শান্ত মেক্সিকো আজ আনন্দে মুখর......!

কলকাতার অন্ধকার ময়দানে আবার আলো জ্বলবে ১৫ই অক্টোবরের পর। আর তারপরই আবার নাকি কলকাতা ময়দানে বসবে ফুটবল খেলার আসর। অসমাপ্ত সুপার লীগের খেলা শেষ করতে নাকি বদ্ধপরিকর আই এফ এ কর্তৃপক্ষ।

সুপার লীগের মাত্র একটা খেলাই অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাকী খেলাগুলো কোন রকমে শেষ করে আই এফ এ কর্তৃপক্ষ প্লাটিনাম জুবিলী বছরে অন্তত লীগের খেলাটা শেষ করতে চাইছেন।

শীল্ডের খেলা তো আগেই শিকেয় উঠেছে। শীল্ডের খেলা এ বছর আর আদৌ হবে কি না সে ফয়সালা হবে আদালতের রায়ে। তাই অন্তত লীগের খেলাটা শেষ করে আই এফ এ কর্তৃপক্ষ আত্মসম্মানটা বজায় রাখতে চাইছেন।

যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়। কারণ কলকাতার ফুটবল নিয়ে এ বছর যে সব কাণ্ড ঘটছে তাতে শুধু একটা কথাই বলা যায় যে না আঁচালে বিশ্বাস

কলকাতায় টেস্ট ম্যাচ হবে তো?

আমরা নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানতে পেরেছি যে আগামী শীতকালে যদি এম সি সি দল ভারত সফরে আসে তাহলে কলকাতায় ভারত বনাম এম সি সি-র টেস্ট ম্যাচ হবে কিনা সে বিষয়ে নাকি সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

কিছুদিন আগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের সভার সময় সি এ বি-র কয়েকজন সদস্যের আচরণে নাকি ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের কর্তারা ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

তাঁদের কয়েকজন নাকি এমন মত প্রকাশ করেছেন যে কলকাতায় টেস্ট সেন্টার রাখা হবে কিনা সে বিষয়ে তাঁরা চিন্তা করে দেখবেন। কারণ সি এ বি-র বর্তমান পরিচালক-গোষ্ঠীর ওপর তাঁরা নাকি ঠিকমত নির্ভর করতে পারছেন না। তা ছাড়া তাঁদের মনে এখনো ১৯৬৭ সালের ১লা জানুয়ারীর স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে।

যাই হোক কলকাতার সভার সময় সি এ বি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের কিছু কিছু সদস্যদের যে মতভেদ হয়েছিলো—সে খবর আজ অনেকেই জানেন।

তবে এ কথা ঠিক যে কলকাতায় টেস্ট সেন্টার সহজে বন্ধ করা সম্ভব হবে না। দরকার হলে খেলা পরিচালনার বিষয়ে পরিবর্তন হতে পারে—কিন্তু টেস্ট ম্যাচ কলকাতায় হবেই। কারণ আর কিছুই নয়—টাকার প্রশ্ন। কলকাতার মতো পেয়িং টেস্ট সেন্টার যে ভারতে আর একটাও নেই।

তবু কলকাতাকে নিয়ে এমন একটা কথা যদি সত্যিই উঠে থাকে তাহলে তার চেয়ে দুঃখের আর পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে! আর এ কথা যদি সত্যি হয় তাহলে সি এ বি কর্তৃপক্ষকে বাংলা দেশের ক্রীড়ামোদীদের কাছে এর জবাবদিহি করতেই হবে......!

চাই। কারণ কখন যে কোন্ মুহূর্তে কি ঘটবে তা আজ আর কেউ বলতেই পারবেন না।

তবে হ্যাঁ, সুপার লীগের খেলা যদি শেষ পর্যন্ত হয় তাহলে আমরা অর্থাৎ বাংলা দেশের ক্রীড়ামোদীরা সত্যিই খুশি হবো। কারণ আমরা এবার সকলেই চাতক-দৃষ্টিতে চেয়েছিলাম সুপার লীগের দিকে।

সবারই আশা ছিলো মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং আর এরিয়ান্স দলের সুপার লীগের খেলা-গুলো সত্যিকারের খেলার মতো খেলা হবে—আর ভালো খেলা দেখার সুযোগ পাবো আমরা। কিন্তু সে-গুড়ে এতোদিন পড়েছিলো বালি। তাই যদি শেষ পর্যন্ত আবার সুপার লীগের খেলাগুলো অনুষ্ঠিত হয় তাহলে তার চেয়ে আনন্দের খবর আমাদের কাছে আর কি হতে পারে.. '
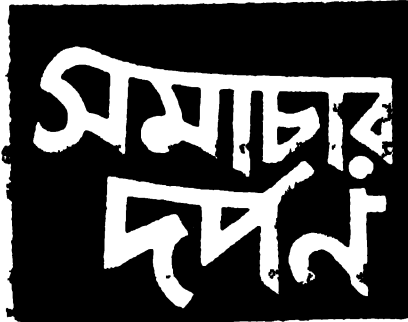
ভারত এ বছরও ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক ফাইন্যালে উঠেছে। কয়েকদিন আগে মিউনিকে অনুষ্ঠিত সেমিফাইন্যালে ভারত ৩-২ খেলায় পশ্চিম জার্মান দলকে হারিয়ে দিয়ে দেশে ফিরে এসেছে। ভারতের পক্ষে খেলেছিলেন আর কৃষ্ণন, প্রেমজিৎ-লাল আর জয়দীপ মুখার্জী। ডেভিস কাপের আঞ্চলিক ফাইন্যালে ভারতকে খেলতে হবে আমেরিকার বিরুদ্ধে। আর খেলা হবে আমেরিকাতেই। কিন্তু আমেরিকার কোন স্থানে হবে তা এখনো ঠিক হয় নি।

* * *

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এম্প্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত "সুকুমার সেন মেমোরিয়াল ফুটবল টুর্নামেন্টে"র ফাইন্যাল খেলা গত ২৪-৯-৬৮ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব মাঠে সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যা-লয়ের প্রথম উপাচার্য স্বর্গত সুকুমার সেন মহাশয়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে উক্ত এম্প্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশন বর্ধমান সহরের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন অফিস ক্লাব ও এ্যাসোসিয়েশন-গুলির মধ্যে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় বর্ধমান কালেক্টরেট রিক্রিয়েশন ক্লাব, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া স্টাফ এ্যাসোসিয়েশনকে ২—০ গোলে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমূহের নিয়ামক শ্রীআর্যকুমার ব্যানার্জী এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এবং পুরস্কার বিতরণ করেন বর্ধমান জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রী এম· কে· চক্রবর্তী।

* * *

ভারতের একমাত্র মুষ্টিযোদ্ধা প্রিন্স স্টিভ অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারবেন না। কারণ তাঁর ভারতীয় পাশপোর্ট নেই। অথচ ভারতীয় দলের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর জন্যে ছাড়পত্র মঞ্জুর করা হয়েছিলো ও কিছু বৈদেশিক মুদ্রারও ব্যবস্থা করা হয়েছিলো।

* * *

শেষ পর্যন্ত আই· এফ· এ'র সফর সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে গেলো। বেশী আগে শেষ হয়ে গেলো অনেকের অনেক সাধের বিদেশ ভ্রমণ। বাতিলের কারণ-টাও অবশ্য প্রণিধানযোগ্য। আই· এফ· এ'র বিলম্বিত অনুমোদনের জন্যেই নাকি এই সফর সম্ভব হলো না।

* * *

এ বছরের দুরাণ্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হচ্ছে আগামী ৩০শে নভেম্বর। আর এই প্রতিযোগিতা চলবে ৯ই জানুয়ারী পর্যন্ত। অর্থাৎ ৯ই জানুয়ারী দুরাণ্ড কাপ ফুটবল প্রতি-যোগিতার ফাইন্যাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

* * *

একশো বছর বয়স্ক এভারি ব্রাণ্ডেজ আবার আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভাপতি হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্সের কাউন্ট দ্য বমোণ্টকে ভোটযুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছেন।

আসাম)

উত্তর : ক্রিকেট, ফুটবল আর হকি এই তিনটে বিভাগেই খেলেন বা খেলতেন এমন ক'য়েকজন আছেন বা ছিলেন বলে শুনেছি কিন্তু কোন খেলোয়াড় এই তিনটে [illegible]গই আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন কিনা ঠিক মনে করতে পারছি না। মনে হয় নেই । কারো জানা থাকলে জানালে জানিয়ে দেবো।

পূজা সংখ্যায় আমার লেখা 'মাই ডিয়ার গোপালদা' আপনার ভালো লেগেছে জেনে উৎসাহিত হয়েছি। গল্পটির কোন চরিত্রই কাল্পনিক নয়।

অলিম্পিক হকি দল সম্বন্ধে যা জানতে চেয়েছিলেন আশা করি গত অর্থাৎ অলিম্পিক সংখ্যা থেকে আপনি তা জেনেছেন।

স্বপন মণ্ডল (গুসকরা, হাটতলা, বর্ধমান)

প্রশ্ন : পরিমল দের ঠিকানাটা জানাবেন কি

উত্তর : পরিমল দে, C/o ইস্টবেঙ্গল টেন্ট কলকাতা ময়দান, কলকাতা।

অসিতবরণ মজুমদার ও জয়দেব বিশ্বাস (রবীন্দ্রনগর, দমদম ক্যান্ট)

প্রশ্ন : শীল্ডের খেলার মীমাংসা কবে হবে ?

উত্তর : আই এফ এ শীল্ড এখন আইন-আদালতের দুনিয়ায়। তাই কবে যে মীমাংসা হবে তা তো বলা সম্ভব নয়।

পরিতোষ নাগ (প্রসন্ননগর, বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

উত্তর : আপনার তিনটি চিঠি পেয়েছি। কিন্তু এই মুহূর্তে আপনাদের সংবাদের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। চিঠি দিয়ে আপনাদের কুশল সংবাদ জানাবেন।

প্রদীপকুমার বসু (পঞ্চাননতলা লেন, বেহালা)

উত্তর : এ বছরের শীল্ডের খেলার যে কি হবে তা এখনই বলা অসম্ভব।

সুভাষরঞ্জন দত্ত ও কাজল দাশগুপ্ত (টোংগুলার কলোনী, পান্ডু, গৌহাটি-১২, আসাম)।

প্রশ্ন : গুরুকৃপাল সিং কি লীডার্স ক্লাবে খেলেন ? চুনী গোস্বামী, বলরাম, পি কে ব্যানার্জী এখন কোথায় আছেন ?

উত্তর : না। কলকাতায়।

হীরেন্দ্রমোহন চন্দ্র (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

উত্তর : আপনাদের কুশল সংবাদ

জানাবে[illegible] [illegible]র সবচেয়ে বেশিবার কে রান আউট হয়েছেন তা আমার ঠিক জানা নেই।

বাসন্তি দাস, তারক দাস (হিংগলগঞ্জ, ২৪-পরগনা)

উত্তর : সোবার্স ও অঞ্জু মহেন্দ্রুর বিয়ে হয় নি—হবেও না।

নির্মলকুমার ঘোষ (গোমস্তাপাড়া, জলপাইগুড়ি)

উত্তর : আপনার 'বিজয়ার চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। আপনি লেখা পাঠাতে পারেন। আপনাদের কুশল সংবাদ জানাবেন।

কাজল ভট্টাচার্য ও পুলক (কাশীপুর, কলকাতা-২)

উত্তর : ১৮৮৯ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত মোহনবাগান ক্লাবের ফুটবল

বিজয়া সম্ভাষণ

সাপ্তাহিক বসুমতীর অনেক পাঠক-পাঠিকাই চিঠি দিয়ে 'বিজয়ার তাঁদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আমাদের। সকলকে ব্যক্তিগতভাবে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় বলে আমরা এই লেখার মাধ্যমেই সকলকে জানাচ্ছি 'বিজয়ার আমাদের আন্তরিক সম্ভাষণ।

অধিনায়কদের নাম জানাবার মতো জায়গা তো নেই। যদি বিশেষ কোন বছরের জানার ইচ্ছে থাকে তবে জানাবেন। খেলোয়াড়দের ঐ ট্রফিটা ফিরিয়ে দিতে হয় না।

বি. বি শ্যামল (অশোক এ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর—৪)

প্রশ্ন : প্রশান্ত বর্মণ কি এখন মোহন-বাগানে নেই? তিনি আর খেলছেন না কেন?

উত্তর : প্রশান্ত বর্মণ বলে কোন খেলোয়াড় গত দু'-এক বছরের মধ্যে মোহনবাগান ক্লাবের পক্ষে খেলেন নি। তবে প্রদ্যোৎ বর্মণের কথা আপনি জানতে চাইছেন কি না বুঝতে পারলাম না।

অনুপ চক্রবর্তী (রেস্টক্যাম্প, পাণ্ডু, আসাম)

প্রশ্ন : আপনার মতে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহিলা সাঁতারু কে এবং তিনি কোথায় থাকেন ?

উত্তর : এতোদিন অস্ট্রেলিয়ার ডন ফ্রেজারকে সেরা মহিলা সাঁতারু বলা যেতো। মেক্সিকো অলিম্পিকের পর এ বিষয়ে জানা যাবে।

প্রদীপ বসু (পঞ্চাননতলা লেন, বেহালা)

প্রশ্ন : অলিম্পিক গেমসে কি পেশাদার প্রতিযোগীরা যোগদান করতে পারেন ?

উত্তর : না পারেন না—অলিম্পিক প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র অপেশাদারদের জন্যে।

মহম্মদ সাকিরুদ্দিন (দেবীদাসপুর, কাঁকুড়িয়া, মুর্শিদাবাদ)

প্রশ্ন : টেস্ট খেলায় রিচি বেনো ও'নীল হার্ভের ব্যাটিং ও কেন ম্যাকে ও এ্যালেন ডেভিডসনের বোলিং এ্যাভারেজ জানতে চাই।

উত্তর :

	টেস্ট	ইনিংস	অপঃ	রান	সর্বোচ্চ	শতরান	গড়
বেনো	৬৩	৯৭	৭	২২০১	১২২	৩	২৪·৪২
হার্ভে	৭৯	১৩৭	১০	৬১৪৯	২০৫	২১	৪৮·৪১

বোলিং—

	টেস্ট	রান	উইকেট	গড়
ডেভিডসন	৪৪	৩৮২৮	১৮৬	২০·৫৩

ম্যাকে টেস্ট খেলায় ৭৫টিও উইকেট পান নি।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

৭৩ বর্ষ : ১৮শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ৭ই কার্তিক, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষার দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 24th October, 1968

উত্তরবঙ্গের বন্যা (২)

বন্যাবিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের আর্ত মানুষগুলির জন্য মহাজনদের বেদনা জানাবার ভাষা রীতিমাফিকভাবে সংবাদপত্রে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু ঐ নিঃস্ব অসহায় মানুষগুলির ভাগ্য এখনো শিকেয় ঝুলছে! প্রলয়ঙ্কর বন্যায় বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গকে পুনরুদ্ধার কল্পে, আমরা আশা করেছিলাম, সেখানে অতি দ্রুতগতিতে সাহায্য গিয়ে পৌঁছবে; অন্তত বেঁচে থাকা মানুষগুলি অনুভব করতে পারবে যে, প্রকৃতি তাদের একেবারে নিঃস্ব করলেও দেশের জনগণ ও সরকার বন্ধুর মতো তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

বে-সরকারী সাহায্য বলা যেতে পারে অবিলম্বেই পৌঁচেছিল। কিন্তু শিলিগুড়ি থেকে প্রথম ক্ষেপেই সাহায্যের জন্য হস্ত সম্প্রসারিত হলে সেখানে নাকি সরকারী বাধা নিষেধের বেড়াজাল নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। আর প্রশাসনিক যন্ত্র 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'র নীতি অনুসরণ করেছিল--যার বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছিলেন উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই বন্যাবিধ্বস্ত জলপাইগুড়ি পরিদর্শনকালে।

এখন প্রশ্ন এই: এই ঘটনার পরও কি বন্যার্ত ব্যক্তিরা যথার্থ সাহায্য পাচ্ছেন এবং জলপাইগুড়ি ও তার আশপাশের সমস্ত অঞ্চলে দুর্গন্ধযুক্ত যে কবরখানা, শ্মশান ও গো-ভাগাড়ের সৃষ্টি হয়েছিল তা অপসৃত হয়েছে? চরম লজ্জার কথা, ৬ই অক্টোবর বেলা তিনটে থেকে জলপাইগুড়ির বন্যার জল কমতে সুরু করলেও শহরের অভ্যন্তরের মৃত গরু ও অন্যান্য জন্তুর দেহ অপসারণ শেষ না হওয়ায় দেড়-দুই সপ্তাহ সেখানে বিকট দুর্গন্ধে নরক গুলজার। এমন অবস্থা হবার কারণ কি? প্রসঙ্গত দৈনিক বসুমতী পত্রিকায় ১৮-১০-৬৮ তারিখে (শহর সংস্করণ) প্রকাশিত একটি সংবাদ তুলে দিলে এবং সে সংবাদ সত্য হলে আসল চিত্র কিছুটা অনুমান করা সম্ভব হবে। ঐ সংবাদে বলা হয়েছে, "জলপাইগুড়ির বাতাস আজও পচা দুর্গন্ধে ভরপুর। এই সব কারণে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ ঘনীভূত হওয়ার কারণ ঘটেছে যে—জলপাইগুড়ির হতভাগ্য মানুষগুলিকে নিয়ে রাজনীতির খেলা সুরু হয় নি তো?

"যদিও তাঁরাও বন্যাপীড়িত তবুও বন্যার জল সরে যাওয়ার পর জলপাইগুড়ির যাঁরা রাজনৈতিক নেতা তাঁরা ঘন ঘন প্রশাসন ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করা ছাড়া জনসাধারণের মধ্যে এসে দাঁড়ান নি। শুধু তাই নয়—বন্যার পর এ সপ্তাহের মধ্যেও তাঁদের সাধারণ মানুষ দেখতে পায় নি। অথচ তাঁরা জলপাইগুড়িতেই ছিলেন। বন্যার জল নেমে যাওয়ার পর পাঁচ দিনের মধ্যেও যখন সরকারী সাহায্য গিয়ে জলপাইগুড়ি পৌঁছলো না, তখন জলপাইগুড়ির নেতৃবৃন্দ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেন নি। বন্যার পর পাঁচ দিনের মধ্যেও জলপাইগুড়িতে কোন ধরনেরই সাহায্য তো সরকার পাঠান নি—উপরন্তু যেসব বে-সরকারী সাহায্য শিলিগুড়ি থেকে যাচ্ছিলো—তার উপর এমন বাধা-নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল যে, ওই সাহায্য পাঠানো সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এই কারণগুলির পেছনে কি কোনো রহস্য আছে?" সংবাদটিতে রাজনৈতিক দলের বন্যাত্রাণ সম্বন্ধ করার উদ্দেশ্য কি তাও জানিয়ে বলা হয়েছে যে, "এমনও হতে পারে যে, জলপাইগুড়ির কিছু প্রভাবশালী মহল চেয়েছিলেন, জলপাইগুড়িতে একটু বন্যা হলে মন্দ হয় না।...তবে এটাও সত্য এত বড় সর্বনাশা বন্যা তাঁদের কল্পনায় ছিল না এবং তা চান নিও।" সংবাদটিতে আরো বলা হয়েছে, "একদল উচ্ছৃঙ্খল যুবক-যুবতী জলপাইগুড়িতে বে-সরকারী সাহায্য বিতরণে বাধা সৃষ্টি করছে" ইত্যাদি।

হতভাগ্য মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বোধ হয় রাজনীতির চক্রে একমাত্র এই দেশেই সম্ভব।

কিন্তু উপরি উক্ত সংবাদ কি সরকারের অজানা, না, তারা দেখেও দেখছেন না? আমরা চাই আর্তদের সেবায় রাজনীতির অনুপ্রবেশ যেন কোথাও না ঘটে। বর্তমানে টাকা তোলার হিড়িক দেখেও আমাদের ভয়, ঐ টাকা এবং প্রাপ্ত জিনিসপত্রাদির বিতরণ-ব্যবস্থা কি ভাবে হবে।

অবশ্য সরকারের ব্যবস্থাপনার গুণে এখনো উত্তরবঙ্গের বহু স্থলে সাধারণভাবে যোগাযোগ করাই সম্ভব হয় নি—যদিও সংক্রামক রোগের মারাত্মক রকম প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন রকম নির্দেশের টানাপোড়েনে সরকারী চিকিৎসকদেরও জেলে প্রবেশ করতে হয়েছে। কিন্তু এমন অবস্থা ঘটবে কেন? যদি বর্তমান বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে যুদ্ধকালীন তৎপরতা গ্রহণ করা হয়, তাহলে সমস্ত বিপদ কি অতিক্রম করা সহজ নয়? তবে সরকারী ব্যবস্থার মধ্যেও যদি রাজনীতির সূচ প্রবেশ করতে পারে তাহলে সেখানেও রক্ত নিষ্কাশ হয়। এই ধারণাক্রমে আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি, ভোটার লিস্ট তৈরি হওয়া অবধি সেখানের পচা দুর্গন্ধ একেবারেই অপসৃত হয়তো হবে না। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কিছুটা বিবেক থাকলে—এটাই কি কাম্য হবে?

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

ভারতের অত্যন্ত গর্ব একজন ভারতপুত্র এ বছর বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মান নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। ভারতের সীমাহীন লজ্জা, এই যশস্বী সন্তানের জন্য মা'র কোলে কোনো ঠাঁই হয় নি।

ডঃ খোরানা এ বছর চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর অমূল্য দানের জন্যে আর দুজন মার্কিন চিকিৎসাবিজ্ঞানীর সঙ্গে একযোগে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এ পুরস্কার জেতার জন্যে ভারতের চেয়েও বোধ হয় মার্কিন সরকারের গর্ব এবং আত্মতৃপ্তির কারণ বেশি এজন্যে যে, ভারত সরকার যখন বার বার ডঃ খোরানাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তখন এই প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে মার্কিন কর্তৃপক্ষ তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়েই সাদরে সম্মানের আসন দিয়ে বরণ করে নিয়েছেন। বছর দুয়েক আগে ডঃ খোরানাকে মার্কিন নাগরিকত্বও দেওয়া হয়েছে।

তবু হরগোবিন্দ খোরানার ধমনীতে, তাঁর শিরা-উপশিরায় ভারতীয় রক্তের অন্তহীন প্রবাহ, তাঁর গায়ে ভারতের মাটির জল হাওয়ারই মিষ্টি গন্ধ। অবিভক্ত ভারতে পাঞ্জাবের মুলতানে হরগোবিন্দের জন্ম ১৯২২ সালে। তাঁর বাবার পাটোয়ারী ব্যবসা ছিল, হরগোবিন্দ পিতার চতুর্থ সন্তান। গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর হরগোবিন্দ মুলতানের ডি-এ-ভি হাই স্কুলে পড়তে থাকেন। এখান থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেন, পরীক্ষায় প্রথম স্থান না পেয়ে "মাত্র' দ্বিতীয় স্থান অধিকার করার জন্যে সেদিন তাঁর কী আফশোষ [illegible]। হরগোবিন্দকে সবারই মাস্টারমশাইরা হীরের টুকরো বলে স্নেহ করতেন। লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বি-এসসি ও এম-এসসি পাশ করার পর ভারত সরকারের বৃত্তি পেয়ে তিনি ইংল্যাণ্ড যান এবং লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৮ সালে পি এইচ-ডি লাভ করেন।

কেতাবী পড়াশুনোর ইতি করে হরগোবিন্দ শুরু করেন তাঁর স্বপ্ন-সাধনা, গবেষণা। প্রথমে ভারত সরকারেরই একটা বৃত্তি নিয়ে গেলেন সুইজারল্যাণ্ডে। জুরিখের ফেডারেল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে পোস্ট-ডক্টরেট ফেলো হিসেবে গবেষণা করার সুযোগ পেলেন। এরপর বৃত্তির শর্ত অনুযায়ী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলেন ডঃ খোরানা। শর্ত ছিল, দেশে যে-কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজ নিতেও তাঁকে প্রস্তুত থাকতে হবে। ডঃ খোরানা একপায়েই খাড়া ছিলেন। কিন্তু কাজ তাঁকে দেবে কে? ভারতের অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স তাঁকে কোন উচ্চ পদ দিতে, ফেলো করে নিতে অস্বীকার করলেন। ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চও তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলো। না, কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজেরও অযোগ্য ডঃ খোরানা! এখানে অর্থও আছে, গবেষণা করার যন্ত্রপাতিও রয়েছে, নেই শুধু

ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা

স্বাধীনভাবে গবেষণা করার সুযোগ, ভারতে শুধু একটা জাত, একটা গোষ্ঠীই স্বাধীন, তার নাম আমলা; লাল ফিতের দাপটে নতুনের সন্ধানী ডঃ খোরানার কোন কাজ তাঁর মাতৃভূমিতে জুটলো না।

বোধ হয়, সেটাই তাঁর পক্ষে আশীর্বাদ। বৃহত্তর সুযোগ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল বিলেতের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে একটা বৃত্তি পেয়ে ডঃ খোরানা নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রখ্যাত রসায়নবিজ্ঞানী ডঃ আলেকজাণ্ডার টড-এর অধীনে জৈব-রসায়ন বিষয়ে গবেষণা করার দুর্লভ সুযোগ পেলেন। ডঃ টডই তাঁকে উৎসাহিত প্রকাশ ও বৈশিষ্ট্য উদ্ঘাটনে আত্মনিয়োগ করতে।

১৯৫২ সালে ডঃ খোরানা একটা বড় সুযোগ পেলেন, অবশ্যই বিদেশে। যারা গুণীর মর্যাদা দিতে কার্পণ্য করে না। ব্রিটিশ কমনওয়েলথ রিসার্চ কাউন্সিলে তিনি জৈব-রসায়ন বিভাগের প্রধান হলেন। এখানে একটানা আট বছর গবেষণা চালাবার পর তাঁর ডাক এলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইনকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এখানে তিনি জৈব-রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ পেলেন, সুযোগ পেলেন আরও স্বাধীনভাবে সাধনায় ব্রতী হবার। কিছুকাল (১৯৫৯ সালে) তিনি কানাডার বৃটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েও জৈব-রসায়নে গবেষণা করেছিলেন এবং এখানেই তিনি সর্বপ্রথম নিউক্লিক এ্যাসিডের যৌগিক নিওক্লিও টাইড সম্পূর্ণরূপে সংশ্লেষণ করে আরউইন, মেণ্ডেল থিওরিকে উন্নত করেন এবং পরবর্তী ধাপের জন্যে নিজেকে তৈরি করতে থাকেন।

পরম বিস্ময়ের কথা, যে জেনেটিক কোড নিয়ে গবেষণা করে ডঃ খোরানা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার জয় করলেন, সেই জেনেটিক কোড বা বায়োকেমিস্ট্রিকে ভারতের গবেষণাকেন্দ্র বা সরকার একটা কুলীন বিষয় বলে মানতেই চান নি, যদিও গত ২৫ বছরে পৃথিবীতে বড় বড় আবিষ্কার হয়েছে তা এই বিশেষ ক্ষেত্রেই হয়েছে। ডঃ খোরানা ডি-এন-এ এবং আর-এন-এ (ডি-অক্সিরিবোপলিনিউক্লিওটাইডস এবং রিবোনিউক্লিক এ্যাসিড) স্তর ছাড়িয়ে আরো ঊর্ধ্বলোকে আরোহণ করছেন। তিনি জীবনের রহস্যের একটা অতি মূল্যবান সন্ধান দিলেন। এ আবিষ্কারই একদিন মানুষের দৈহিক ও মানসিক গঠনকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

ডঃ খোরানার ব্যক্তিগত জীবন অত্যন্ত সাদাসিধে, অমায়িক ও সদালাপী ব্যক্তি। তিনি কখনই প্রচার চান নি, তবুও একটার পর একটা পুরস্কারে তিনি ভূষিত হয়েছেন। নোবেল পুরস্কার পাবার মাত্র দুদিন আগেও তিনি ২৫ হাজার ডলার মূল্যের পুরস্কার লাভ করেছেন নিউ ইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে—লুইসা গ্রস হোরোউইটজ পুরস্কার—ডঃ নিরেনবার্গেরই সঙ্গে। কানাডা থাকাকালীন ডঃ খোরানা বিয়ে করেছেন এক সুইস ভদ্রমহিলাকে, তাঁদের এখন দু' মেয়ে ও এক ছেলে।

স্বদেশের আমলাতন্ত্রের ব্যবহারে তিক্তবিরক্ত হয়েই ডঃ খোরানা বিদেশে পাড়ি জমাতে তাঁর ভাগ্য অন্বেষণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, সন্তানকে মা ত্যাগ করলেও সন্তান কি মাকে ভুলতে পারেন? ডঃ খোরানা কি মাতৃভূমিকে ভুলতে পারবেন না?

জলপাইগুড়ি থেকে বন্যার জল নেমেছে, বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলি আবার দেশের অপরাপর অংশের সঙ্গে সংযুক্ত হতে চলেছে, কিন্তু বন্যাকবলিত হাজার হাজার মানুষের ভগ্ন কপাল আর জোড়া লাগবে না। জলপাইগুড়ি শহরের প্রায় প্রতিটি পরিবারেরই কোন কোন প্রিয়জন বন্যার জলে চিরকালের জন্যই হারিয়ে গেছে। সরকারী তরফ থেকে ক্ষয়ক্ষতির একটা মামুলি হিসাবনিকাশ করা হচ্ছে, কিন্তু তার দ্বারা যে কোন্ উদ্দেশ্য সাধিত হবে তা সরকারী কর্তারাই জানেন। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে একটা কথাই বড় সত্য বলে মনে হয়, এদেশে মানুষের প্রাণের দামই সর্বাপেক্ষা সুলভ। আজ বিশ বছর ধরে প্রতি বছরই ভারতের কোন না কোন প্রান্তে বিধ্বংসী বন্যায় হাজার হাজার মানুষ ধনে-প্রাণে মারা যাচ্ছে, কিন্তু এত হিসাবনিকাশ সত্ত্বেও তা রোধ করা যায় নি, ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান সরকারী রেকর্ড রুমে কড়াবন্দী হয়ে আছে, উত্তরবঙ্গের হিসাবনিকাশও সেখানে যথারীতি জমা পড়বে, কিন্তু ওই পর্যন্তই।

নদীশাসন কেন এদেশে তেমন সাফল্যমণ্ডিত হল না, আমাদের দেশে এত অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ার থাকা সত্ত্বেও, কাদের প্ররোচনায় ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল, বিশেষ করে যখন পৃথিবীর কোন স্থানেই আজ নদী কোন সমস্যা নয়, সে আলোচনা আমরা আপাতত এই নিবন্ধে করছি না, তবে মা আশা করি শীঘ্রই একটি বিশেষ কমিশন গঠন করে প্রকাশ করা হবে এবং এই বিষয়ে পণ্ডিত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিশেষ আলোকপাত করবেন। তবে একটি মন্তব্য আমরা এখানে না করে পারছি না যে, ভারতবর্ষে কোন নদীশাসন পরিকল্পনাই সার্থক হয় নি। তা করার যোগ্যতা যে ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারদের নেই সে কথা বলা বাতুলতা, বিশেষ করে এ দৃশ্যও যখন দেখতে হল যে, এখানে পেটের অন্নের সংস্থান করতে না পেরে তরুণ কোন বিজ্ঞানী বিদেশের নাগরিকত্ব নিয়ে নোবেল পুরস্কারের মত দুর্লভ সম্মানেরও অধিকারী হতে পেরেছেন। তাহলে অভাবটা দক্ষতার নয়, গোলমালটা অন্য কোথাও। কাজেই যদি কেউ নদীশাসন পরিকল্পনা সমূহের ব্যর্থতার মধ্যে কালো রাজনীতি ও অর্থনীতির কুটিল হস্তের প্রভাব অনুভব করে থাকেন, তাহলে বোধ হয় তাঁকে দোষ দেওয়া চলবে না। মনে পড়ে অধুনা-মৃত বিগত যুগের একজন বিখ্যাত মনীষী মানবেন্দ্রনাথ রায় বলতেন, দুর্ভিক্ষ-বন্যা-মহামারীও সময় বিশেষে রাজনীতিবিদ্‌দের নিকট প্রয়োজন কেন না জনসাধারণের সংগে পার্থক্যটা সুবিশাল হয়ে গেলে, এই সকল ঘটনাগুলি জনসংযোগের লোভনীয় ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়।

উত্তরবঙ্গ, বিশেষ করে জলপাইগুড়ির কথায় আবার ফিরে যাই। বন্যায় যে পরিমাণ লোকক্ষয় ও সম্পদহানি হয়েছে তা অনায়াসেই এড়ানো যেত, যদি সরকারী আমলারা এ বিষয়ে মনোযোগী হতেন। এ কথাটা আমাদের নয়, এ বিষয়ে সর্ব-প্রথম প্রশ্ন তুলেছিলেন কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎমন্ত্রী ডঃ কে এল রাও। তাঁকে নিশ্চয়ই কেউ বামপন্থী বলে ভুল করবেন না এবং এ কথাও বলা যাবে না যে, তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ধরমবীর ও তাঁর অধীনস্থ আমলাদের অপদস্থ করার জন্যই এ কথা বলেছেন। তিনি শুধু একজন কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীই নন, একজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারও বটে। তিনি শাবুতেই যে তাৎপর্যপূর্ণ কথাটা তুলেছেন, আগে থেকে মানুষদের সতর্ক করে দেবার জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছিল, চেষ্টা করলে এই বন্যাজনিত ক্ষতিকে এড়ানো যেত কি না— এই প্রশ্নগুলির জবাব কি? উপ-প্রধান-মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইও নিশ্চয় ধরমবীরের প্রশাসনের অপযশ গাইবেন না। কিন্তু সরেজমিনে তদন্ত করে তিনি কি সিদ্ধান্তে এলেন? জনসাধারণের নিকট লাঞ্ছিত হয়েও তিনি প্রকাশ্য ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন যে, জনসাধারণের ক্রোধ প্রকাশের সংগত কারণ আছে। তিনি একথাও বলতে দ্বিধাবোধ করলেন না যে, সরকারী অফিসারেরা কর্তব্যহীনতার যে নিদর্শন এখানে দেখিয়েছেন তাকে কোন যুক্তি দিয়েই সমর্থন করা যায় না। প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বলেছেন জলপাইগুড়িতে দিনের পর দিন কোন সরকার ছিল না, পদস্থ কর্মচারীরা দায়িত্ব পালন না করেই পালিয়েছিলেন।

পক্ষান্তরে যুক্তফ্রন্ট বন্যা প্রতিরোধ উপযুক্ত সময়ে জনসাধারণকে সতর্ক করে দেবার ব্যাপারে এবং পরবর্তী কয়েকদিন দুর্গত মানুষদের সাহায্যে সরকারের শোচনীয় ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানের জন্য বিচার-বিভাগীয় অথবা বেসরকারী তদন্তের দাবি করেছেন। তদন্তসাপেক্ষে দায়িত্বশীল অফিসারদের সাসপেন্ড করে রেখে পরে দোষী সাব্যস্ত হলে শাস্তিদানের

দাবিও তারা তুলেছেন। যুক্তফ্রন্টের মতে উত্তরবঙ্গে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তার মোকাবিলা করতে সরকার শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। ত্রাণ ব্যবস্থার যে সব প্রচার করা হচ্ছে তার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। অধিকাংশ গ্রামে এখনো পর্যন্ত সাহায্য দেওয়া দূরের কথা যোগাযোগও করা হয় নি। বেসরকারী সাহায্য তো উৎসাহিত হচ্ছেই না, উপরন্তু তাতে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই মহাবিপর্যয়ে পতিত মানুষকে উদ্ধার করতে হলে ত্রাণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থার ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়ে সরকারকে এগিয়ে যেতে হবে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সরকারের পদস্থ অফিসার এমন কি রাজ্যপালের বিগত কয়েকদিনের কার্যকলাপে সরকার যে এই পথে অগ্রসর হবেন তার বিন্দুমাত্র আভাষ নেই।

যুক্তফ্রন্টের বৈঠকে উত্তর বাংলার অবস্থার বিস্তৃত বিবরণী দিয়ে জানানো হয় যে, রাজ্যপাল নিজে দার্জিলিং থাকা সত্ত্বেও উপ-প্রধানমন্ত্রী না আসা পর্যন্ত জলপাইগুড়িতে আসেন নি। এদিকে আরও একটি অভিযোগ এনেছেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত। একটি বিবৃতিতে তিনি জানিয়েছেন যে, গত ৪ঠা অক্টোবর জলপাইগুড়ির পদস্থ অফিসারেরা স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। বন্যার বিপদ সম্পর্কে সাইরেন বাজিয়ে জনসাধারণকে সতর্ক করা হবে কি না, এই প্রশ্ন নিয়ে সেখানে আলোচনা হয়। একমাত্র শ্রীচারুচন্দ্র সান্যাল ছাড়া আর সকলেই নাকি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সাইরেন বাজালে আতংক ছড়িয়ে পড়বে।

সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে স্থানীয় জনসাধারণের অভিযোগের অন্ত নেই। অনাবশ্যক ভিড় বাড়ানো ভিন্ন বিশেষ কোন কাজ তাদের দ্বারা সাধিত হয় নি। তা ছাড়া সেনাবাহিনীর ব্যবহারও অনেক সময় দুর্ব্যবহারে পরিণত হয়েছে। এর ওপর ব্যঙ্গস্বরূপ যুক্ত হয়েছে আকাশবাণীর সংবাদ। এটা আজ প্রমাণিত সত্য যে বন্যার চারদিন পরে প্রথম সরকারী সাহায্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে, অথচ রেডিওতে তারস্বরে যেভাবে দ্রুত সাহায্য করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে তাতে যেন নিরাশ্রয় অভুক্ত শোকগ্রস্ত মানুষগুলির কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের অপরাপর অঞ্চলেও ক্ষোভ এই কারণে। শিলিগুড়িতে উপ-প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই যে ক্রুদ্ধ জনসাধারণের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন তার একটা বড় কারণই হচ্ছে সরকারের তরফ থেকে মিথ্যা প্রচার। বিধ্বস্ত জলপাইগুড়ির মানুষগুলিকে দিনের পর দিন বাঁচিয়ে রেখেছিল একমাত্র শিলিগুড়ি থেকে প্রেরিত সাহায্য। আকাশবাণীর প্রচারে সত্যের অপলাপ আই এখানকার মানুষদের সংযমের বাঁধ ভেঙে দিয়েছিল। অনুরূপভাবে গত ১৬ই অক্টোবর তারিখে বন্যা দুর্গত অঞ্চল পরিভ্রমণ করতে এসে রাজ্যপাল প্রায় দেড় হাজারেরও অধিক এক জনতার দ্বারা ঘেরাও হন কোচবিহারে। জনতা তাঁকে ঘেরাও করে তাঁর পদত্যাগ দাবি করে।

জলপাইগুড়ির অধিবাসীদের বন্যা সম্পর্কে সময়মত সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল কি না তা তদন্তের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন চীফ সেক্রেটারী শ্রী এস এন রায়কে পাঠানো হয়েছে। তাঁর প্রতি কোনরকম কটাক্ষপাত না করেই বলছি যে, এইরকম ক্ষেত্রে শাসন বিভাগীয় তদন্ত না হয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তই হওয়া উচিত, কেন না নানান কারণে গত বিশ বছরের অভিজ্ঞতার প্রচ্ছদপটে শাসন-বিভাগীয় তদন্তের প্রতি জনসাধারণের আস্থা নেই বললেই চলে। তা ছাড়া বিচার বিভাগীয় তদন্তের গুরুত্ব অনেক বেশি।

গত ৪ঠা অক্টোবর তিস্তা নদীর জল বৃদ্ধি পাবার সংবাদ পূর্বাহ্ণে জানা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ শহরবাসীকে সতর্ক করে দেন নি। ওইদিন রাত্রি পৌনে এগারোটায় সামরিক বাহিনী এই জলোচ্ছ্বাসের আশংকার কথা কর্তৃপক্ষের নিকট জানিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। ওইদিন-ই শেষ রাত্রে প্রায় ৩-৭০ মিঃ জলপাইগুড়ি শহরের কাছে রংধামালী ও তিস্তা নদীর বাঁধ ভেঙে বন্যার জল শহরে প্রবেশ করে হাজার হাজার নিদ্রিত নরনারীকে গ্রাস করে। প্রায় সাত-আট মিনিটের মধ্যে শহরটা আট-দশ ফুট জলের তলায় তলিয়ে যায়। সেচবিভাগের চীফ ইঞ্জিনীয়ার সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে, সেচ দপ্তরের লোকজন তিস্তার ভয়াবহ জলস্ফীতির কথা জেলা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা কর্ণপাত করেন নি। জলপাইগুড়ি শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অভিযোগ করেছেন যে, তিস্তার জল বিপদসীমা অতিক্রমের সংবাদ পেয়েও জেলা কর্তৃপক্ষ শহরবাসীকে জানান নি। সংবাদ আগেভাগে জানতে পারলে, এত মানুষের প্রাণহানি ঘটত না।

বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলেও প্রায় তিন লক্ষ গৃহহীন নরনারী এক অসহনীয় অবস্থার মধ্যে বাস করছে। ত্রিপলের অভাবে সামরিক ছাউনিও তোলা সম্ভবপর হয় নি বহু ক্ষেত্রে। দার্জিলিং জেলার প্রায় এক হাজার বাড়ি ধসে পড়ায় অন্তত নয় হাজার নরনারী গৃহহীন হয়েছে। শুধুমাত্র জলপাইগুড়ি শহরে প্রায় চল্লিশ হাজার অধিবাসী গৃহহারা, এই জেলার মোট পনের হাজার বাড়ি বিধ্বস্ত হওয়ার কয়েক লক্ষ নরনারী আশ্রয়হীন। কোচবিহার জেলার দুটি মহকুমায় ষোল হাজার মাটির বাড়ি ধসে পড়ায় ফলে অর্ধ লক্ষ লোক গৃহহীন। মালদহে ও পশ্চিম দিনাজপুরেও সর্বহারা নরনারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় সত্তর হাজার।

রিলিফ ব্যবস্থার মাধ্যমে হয়ত কয়েকদিনের নিরম্বু উপবাসের পর কিছু আহার জুটেছে, কিন্তু আকাশকে চাঁদোয়া করে এভাবে আর কদিন চলবে? এই কয়েক লক্ষ নরনারী শুধুমাত্র আশ্রয়ই হারায় নি, ঘটিবাটি বিছানাপত্র থেকে শুরু করে পরণের জামাকাপড় পর্যন্ত বন্যা কেড়ে নিয়ে গেছে। এদিকে বেশ দ্রুতই উত্তরবঙ্গে শীত পড়ছে। এটাও একটা মস্ত আশংকার কথা। পুরাতন সমস্যার জের মিটতে না মিটতেই নিত্য-নতুন ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে, জানি না রাজ্যপালের সুনামহীন প্রশাসন এ বিষয়ে কি করবে?

নন-প্রাকটিশিং চিকিৎসক সম্মেলন

গত ১৩ই অক্টোবর কল্যাণীতে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে কর্মরত নন প্রাকটিশিং চিকিৎসকদের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এই সম্মেলনে সকল সরকারী ডাক্তারদের প্রাইভেট প্রাকটিশ বাধ্যতামূলকভাবে বন্ধ করার দাবি জানান হয়। উদ্যোক্তারা আরও দাবি করেন যে, যারা প্রাইভেট প্রাকটিশের স্বাধীনতা ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক তাঁরা যেন সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদগুলি অন্য ডাক্তারদের জন্য ছেড়ে দেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী ডাক্তারদের যথোপযুক্ত বেতন, কাজের নির্দিষ্ট সময়, পক্ষপাতশূন্য বদলী-নিয়োগ প্রভৃতির জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান হয়।

উপরোক্ত দাবিগুলির প্রত্যেকটি ন্যায্য এবং সরকারের উচিত এই সমস্ত দাবির বিষয়ে সুবিবেচনা করা।

সরকারী চিকিৎসক তথা সরকারী চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে জনসাধারণের সবিশেষ কতকগুলি দাবি আছে—যে দাবি আজও অবহেলিত ও উপেক্ষিত। বিভিন্ন হাসপাতালে প্রাত্যহিক অব্যবস্থাজাত ঝামেলা ও জনসাধারণের হয়রানির স্বরূপ সম্পর্কে সাপ্তাহিক বসুমতী বহুবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য-দপ্তরের অধিকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। হাসপাতালের চিকিৎসকবৃন্দের অধিকাংশই এত দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং অর্থ-লোলুপতা তাঁদের এত তীব্র যে হাসপাতালের রোগীদের তাঁরা দেখেন না তো বটেই, এমন কি

নির্দিষ্ট সময়ে ডিউটিতে আসার খেয়াল পর্যন্ত তাদের থাকে না। অর্থাৎ, যে জনসাধারণের সেবকরূপে তাদেরই অর্থ থেকে তারা মাস মাস মোটা মাইনে নিয়ে পকেটে পুরছেন, তাদের জন্যে ওই অর্থের বিনিময়ে যে কিছু করবার আছে এই সরল-সহজ কথাটুকুও তাঁরা বোঝেন না। এ বিষয়ে কল্যাণী হাসপাতালের কর্তাব্যক্তিদের বেপরোয়া অনাচার ও দুর্নীতি সম্বন্ধে, সাপ্তাহিক বসুমতী বিস্তারিত আলোচনা করেছে। এখানে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। সেই সব দুর্নীতি অল্প-বিস্তর আজ সর্বত্র।

দুঃখের বিষয় যে সর্ষে দিয়ে ভূত ছাড়ানোর কথা চিন্তা করা হয়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভূত থাকে তারই মধ্যে। অত্যন্ত দেখা যায় বিভিন্ন সরকারী পদে অধিষ্ঠিত বড় বড় ডাক্তারেরা প্রকাশ্য সভায় সরকারী বেতনভোগী ডাক্তারদের প্রাকটিশ করা উচিত নয় বলে তারস্বরে গগন বিদারণ করেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁরা নিজেরাই এই কর্মে ঘোরতরভাবে লিপ্ত। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিন, সার্জারী ও গাইনোকোলজি বিভাগে কর্মরত কয়েকজন লেকচারার, এ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর, প্রোফেসর-এর তালিকা আমাদের কাছে আছে, যাদের সম্বন্ধে প্রমাণ করা যায় যে, কেমন কেন নন-প্রাকটিসিং ডাক্তার প্রাকটিশ করেন গোপনে এবং বেপরোয়া ভাবে। যদি স্বাস্থ্যদপ্তর চান, তাহলে আমরা নথিপত্র সেখানে পেশ করতে রাজী আছি, এবং তাতে দেখা যাবে নন-প্রাকটিসিং ডাক্তারদের শতকরা পঁচানব্বই ভাগই গোপনে প্রাকটিস করেন এবং এঁদের প্রাকটিসের ধরণও বিচিত্র, কেউ কেউ আবার নার্সিং হোমের অবৈতনিক (?) উপদেষ্টাও বটে। কল্যাণীতে অনুষ্ঠিত নন-প্রাকটিসিংদের সভায় এইরকম বহু ডাক্তারকে অনেকেই দেখা গিয়েছিল। সুতরাং অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

কল্যাণী জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতাল

নৈহাটি কাঁঠালপাড়া থেকে শ্রীমুকুল সেনগুপ্ত কল্যাণী হাসপাতালের দুর্নীতি সম্পর্কে লেখার জন্য একটি তথ্যমূলক দীর্ঘ পত্র আমাদের নিকট অভিযোগ-স্বরূপ পাঠিয়েছেন, যার মর্মার্থ এখানে পেশ করা হল। দীর্ঘদিন ধরে এই হাসপাতালের দুর্নীতি ও অনাচার নিয়ে অনেক লেখালেখির ফলে অতিরিক্ত স্বাস্থ্য অধিকর্তা এখানকার ব্যাপারে তদন্ত করেন এবং তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে চারজনকে বদলীর সুপারিশ করা হয়। তিনজনের ক্ষেত্রে এই আদেশ কার্যকরী হয়েছে, কিন্তু চতুর্থ জন যিনি ওই হাসপাতালের একজন পদস্থ কর্মচারী, এখনো এই বদলী এড়িয়ে আছেন। পত্রলেখক জানাচ্ছেন যে, উক্ত পদস্থ কর্মচারীটির প্রতি নাকি অন্যান্য বার বার বদলীর নির্দেশ আসে কিন্তু তিনি তা এড়িয়ে গেছেন রহস্যজনকভাবে।

পত্রলেখক ওই হাসপাতালের আরও কয়েকটি দুর্নীতির নিদর্শন দিয়ে তার সঙ্গে উক্ত পদস্থ কর্মচারীকে সংযুক্ত করেছেন। অধিকাংশ ডাক্তারকেই হাসপাতালে দেখা যায় না, হাসপাতালের গাড়িটি যথেচ্ছভাবে প্রমোদ-ভ্রমণ ও ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহৃত হয়, হাসপাতালের চারজন জি-ডি-এ-কে নাকি হাসপাতালের কোন কাজ না করিয়ে উক্ত পদস্থ কর্মচারীর নিজস্ব বাড়ির কাজ করানো হচ্ছে। তা ছাড়া কিছুদিন পূর্বে একজন এ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের নেতৃত্বে যখন তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়, তখন যারা ঐ পদস্থ কর্মচারীর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে তাদের প্রেরিত নরজনকে নাকি অতিরিক্ত বেডের জন্য নির্দিষ্ট জি-ডি-এ পোস্টে চাকরী দেওয়া হয়েছে। উক্ত কর্মচারীর জনৈক পেটোয়া ডাক্তার, যিনি পূর্বে একটি পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ছিলেন, একই সঙ্গে নাকি তিনটি বিভাগের বিশেষজ্ঞ ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক হয়ে বসে আছেন। রোগী ভর্তির ব্যাপারে তিনিই কর্তা। গভীর রাত্রে অন্যের ডিউটিকালীন অবস্থাতেও তিনি রোগী ভর্তি করেন, এমন কি ছুটিতে থাকাকালীন অবস্থাতেও তিনি রোগী ভর্তি করেছেন। এ বাবদ তাঁর মোটা কমিশন প্রাপ্তির কাহিনী এতদঞ্চলে প্রবাদে পরিণত। বদলীর আদেশপ্রাপ্ত জনৈক কর্মচারীকে (যাঁর স্ত্রীও এখানে কাজ করেন) স্থানীয় ই-এস আই হাসপাতালে বদলী করে নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে। উক্ত পদস্থ কর্মচারী আবার জনৈক স্থানীয় কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে, যিনি এক টাকার ফিতা ১০১ টাকায় হাসপাতালকে বিক্রী করেছেন, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা করছেন। আর রোগীদের অবস্থা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন।

একুশে অক্টোবর

একুশে অক্টোবর আজাদ হিন্দ সরকার প্রতিষ্ঠার রজত-জয়ন্তী উৎসব। নেতাজী ছিলেন আজীবন সংগ্রামী। দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য তিনি বলেছিলেন : আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। দেশকে সাম্রাজ্যবাদের বজ্র মুষ্ঠি থেকে উদ্ধার করার জন্য তিনি রক্ত দিতেও প্রতিশ্রুত ছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতির সার্থক রূপদান হয়েছিল ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর। সেইদিন বিদেশে প্রতি-

ষ্ঠিত হয়েছিল আজাদ হিন্দ্ সরকার। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধ চালিয়েছিল তাতে দলে দলে এসে যোগ দিয়েছিল জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভারতবাসিগণ। নেতাজীর স্বপ্ন ছিল স্বাধীন ভারতের। আর সেই ভারতের নাগরিকদের থাকবে না ধর্মের গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির কলুষতা, জাতির নামে বজ্জাতি।

আজাদ হিন্দ্ সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে পর সে সংবাদ যখন ভারতের নিপীড়িত মানুষের কাছে এসে পৌঁছে, সেদিন ছিল আনন্দের দিন উত্তেজনার দিন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় দিন।

একথা আজ ঐতিহাসিক সত্য যে, নেতাজীর আজাদ হিন্দ্ ফৌজের চূড়ান্ত আঘাতের সম্মুখীন হয়েই ব্রিটিশ সরকার বুঝতে পেরেছিল তাদের বিদায়ের দিন আসন্ন।

এ প্রসঙ্গে নেতাজীর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ স্মরণযোগ্য 'যে সিঙ্গাপুরের সমরাঙ্গন ছিল প্রাচ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যশক্তির প্রধান শিবির সেইখানেই ভারতীয় বাহিনী আজ রণসজ্জায় সজ্জিত হয়েছে। এ-বাহিনীই ভারতজননীকে বৃটিশের কবল থেকে মুক্ত করবে। এ ভারতীয় বাহিনী ভারতীয় নেতার সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনেই সংগঠিত হয়েছে—এ কথা মনে উদিত হলে ভারতবাসী মাত্রই নিশ্চয় গর্ববোধ করবে।

নেতাজীকে জানতে হলে যেমন—জানতে হবে তাঁর বীরত্বময় ও আত্মত্যাগে পূর্ণ জীবন সংগ্রামের কথা তেমনি তাঁর

আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণাপত্র পাঠ করছেন নেতাজী

জীবন-সংগ্রামের কথাতেই জানা যাবে কেন তিনি চেয়েছিলেন ভারতীয় মুক্তিবাহিনী গড়তে। তিনি বলেছেন, "আমার জন-সেবার জীবন অধ্যায়ে বরাবরই আমি বিশেষভাবে অনুভব করে এসেছি যে যদিও ভারতমাতা পূর্ণ স্বরাজ অর্জন করবার শক্তিতে সর্বতোভাবে যোগ্য হয়ে উঠেছেন, তথাপি তাঁর একটা বিশেষ অভাব ছিল—তা হচ্ছে ভারতীয় মুক্তি-বাহিনী। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়ক জর্জ ওয়াশিংটন বিজয় পতাকা উড্ডীন করতে সমর্থ হয়েছিলেন, কারণ তাঁর পশ্চাতে ছিল এক প্রবল সামরিক-বাহিনী। গ্যারিবল্ডীও ইটালীর গগনে স্বাধীনতা-সূর্যের উত্থান ঘটিয়েছিলেন তাঁর সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর মাধ্যমেই।"

প্রলয়ের কোপ পড়েছে। অত্যধিক বৃষ্টির ফলে সেই যে আষাঢ় মাস থেকে গ্রামাঞ্চলের সর্বনাশ শুরু হয়েছে তার জের শেষ হল উত্তরবঙ্গে এসে। মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী ও বর্ধমানের প্রলয়ঙ্কর বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষের সাহায্য ও পুনর্বাসনের সমস্যা নিয়ে যখন সকলে হিমসিম খাচ্ছেন, সেই সময় ধ্বংসের দেবতা উত্তরবঙ্গে গিয়ে রাতের অন্ধকারে যে হাজার হাজার মানুষকে অকস্মাৎ গ্রাস করতে উদ্যত হবে এ-কথা কেউই কল্পনা করতেও পারেন নি। বিশেষ করে সারা বাংলাদেশের মানুষ সুন্দর প্রাণোচ্ছল আবহাওয়ার মধ্যেই এবার শারদীয় উৎসব শুরু করেছিলেন, আশা হয়েছিল অসুর-বিনাশিনী মা সকল দুঃখ-দৈন্যের অবসান ঘটিয়ে এবার বাঙালীর জীবন সুন্দর ও লাবণ্যমণ্ডিত করে তুলবেন। কিন্তু তা হল না।

বিসর্জনের বাজনা বাজার সাথে সাথেই উত্তরবঙ্গে প্রকৃতির যে তাণ্ডবনৃত্য শুরু হল ধ্বংসের ইতিহাসে তা এক অভূতপূর্ব ঘটনা। সাধারণত নদীতে বান এলে গ্রামাঞ্চলের মানুষই বিপদগ্রস্ত হয়, কিন্তু উত্তরবঙ্গে যা হল গ্রাম তো দূরের কথা বড় বড় শহরই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। যে সরকারী আমলাদের শোচনীয় গাফিলতির ফলে মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়ার লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ পথের ভিখারী, সেই অপদার্থ আমলাদেরই নিষ্ঠুর অবহেলা, দায়িত্বহীনতা ও অপরিণামদর্শিতায় উত্তরবঙ্গের হাজার হাজার নিরীহ মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। কত গ্রাম যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কত মানুষ যে প্রাণ হারিয়েছে, কত পরিবারের যে কি সর্বনাশ হয়েছে তার হিসেব-নিকেশ উত্তরবঙ্গের শ্মশানের ওপর বসে এখন করা যাবে না। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে—জলপাইগুড়ি, দার্জিলিঙ, কালিম্পং শহর ও সন্নিহিত গ্রাম, পশ্চিম দিনাজপুর, কুচবিহার মালদা প্রভৃতি কোন জেলাই এই প্রলয়ঙ্করী ধ্বংস বন্যা ও ঝঞ্ঝার হাত থেকে রেহাই পায় নি। অন্যান্য জেলায় যে বন্যা হয়ে গেল তার ফলে মানুষের ঘরবাড়ি গিয়েছে, মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েছে, কিন্তু সৌভাগ্য-ক্রমে খুব বেশি প্রাণহানি হয় নি। কিন্তু উত্তরবঙ্গে যে প্রলয় হয়ে গেল তাতে মানুষকে মানুষ সংসারকে সংসার সব চিরতরে ভেসে গেছে। এমন শহর নেই, এমন গাঁ নেই যেখানে বুকফাটা কান্না নেই। অন্য কোথাও বন্যা সুরু হলে মানুষ আশ্রয়ের চেষ্টা করে, প্রিয়জনদের নিয়ে ঘর ছাড়ে। কিন্তু এ এমন বন্যা, এমন ধ্বস, এমন ঝঞ্ঝা যে হাজার হাজার মানুষ বাঁচার কোন সুযোগই পেল না। ধ্বস কখন নামবে সে-সম্পর্কে অবশ্য কেউ পূর্বাভাষ

দিতে পারে না; কিন্তু খারাপ আবহাওয়া ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি বা বন্যার খবরগুলো তো মানুষকে আগেভাগে দেওয়া যেতে পারতো—সেটা জানানো হল না কেন? আবহাওয়া অফিস তো খারাপ আবহাওয়ার খবর আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন, সে খবর জন-সাধারণকে সময় মতো জানিয়ে দিয়ে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব কার? রংধামালীতে তিস্তার বাঁধে যে ফাটল ধরেছে এ খবর তো সরকারী আমলারা ২রা অক্টোবর পেয়েছিলেন খবর পেয়ে তাঁরা কি ঘুমিয়েছিলেন, না নিজেদের পরিবারগুলিকে নিরাপদ জায়গাতে পাঠাতে ব্যস্ত ছিলেন? ৭ঠা অক্টোবর রাত্রি ৭টার সময় তিস্তার ঐ সেতু ভেঙে প্রচণ্ড শব্দে ও প্রবল বেগে জলরাশি জলপাইগুড়ি শহরের দিকে নামতে থাকে, তারপর রাত্রি ৩টেয় জলপাইগুড়ি শহরকে গ্রাস করে। এই ৭।৮ ঘণ্টা সময় পাওয়া সত্ত্বেও কেন নিচের দিকের মানুষগুলিকে সতর্ক করে দেওয়া হল না—'তোমারা শহর ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় চলে যাও'? কেন্দ্রীয় আবহাওয়া অফিসের অবজারভেশন পোস্ট আছে বাগডোগরা, কালিম্পং, দার্জিলিঙ, বালুরঘাট, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি ও মালদাতে; এ ছাড়া রাজ্য সরকারের প্রতিটি মহকুমাতে সেচদপ্তরের কর্মচারীরা রয়েছেন বন্যার সংকেত দিতে। তা ছাড়া আছে জনসাধারণের পয়সাতে আরও অসংখ্য প্রশাসনিক দপ্তর, আছে বিরাট পুলিশ বাহিনী—তাদের কি একবারও খেয়াল হয় নি ঘন ঘন সাইরেন বাজিয়ে মানুষকে সতর্ক করে দিই? শিলিগুড়ি বেতার কেন্দ্র মারফৎ-ও যদি এই ভয়াবহ বিপদের কথা বারে বারে প্রচার করা হতো—তাহলে সাবধান হবার বা নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবার অনেকের সুযোগ হতো—এভাবে বেঘোরে হাজার হাজার পরিবার মৃত্যু-কোলে আশ্রয় নিতো না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সরকারী আমলারা আজ আর রক্ষক নয়, ভক্ষক। মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী ও বর্ধমানের লক্ষ লক্ষ মানুষকে পথে বসাবার পর আশা করা গিয়েছিল সরকারী আমলারা এবার ঠেকে শিখবেন। দুর্নীতি, গাফিলতি ত্যাগ করে, ডানলোপিলোর আরামকেদারা ছেড়ে এবার সত্যিকারের জনদরদী হয়ে কাজ করবেন, কিন্তু উত্তর-বঙ্গের জেলায় জেলায় যে ধ্বংসলীলা সংগঠিত হল সেই মৃতের শ্মশানে ও ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে অ স্ত একটি-মাত্র উত্তরই আমি দেবো—আর এক মুহূর্ত কালবিলম্ব না করে ঐ সব অপদার্থ, অকর্মণ্য, দুর্নীতিগ্রস্ত আমলা-দের সরকারী দপ্তর থেকে বিদায় দিতে হবে, কোন রকম দয়া, মায়া, মমতা নয়; বুঝিয়ে দিতে হবে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে যারা সর্বনাশ ডেকে এনেছে তাদের স্থান সরকারী প্রশাসনিক দপ্তরে নয়; রাস্তায় বা কারাগারে। এ না হলে বাংলা-দেশের কোন গ্রামই বাঁচবে না।

মেদিনীপুরের ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে সেদিন আমি বক্তাপালকে অনুরোধ করেছিলাম—'আপনি প্রশাসনিক দপ্তর চাবুক হাতে দাঁড়ান; দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসারদের টেনে নামান; জনসাধারণের পয়সায় লাটসাহেবী

করবো, জনসাধারণের সেবা করবো না— এমন মনোবৃত্তি নিয়ে যারা প্রশাসনিক দপ্তরে বাসা বেঁধেছে সে বাসা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিন, আমলাদের মর্মান্তিক আকিলতির হাত থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করুন—রাজ্যপালের এ-সব আবেদনে বিশেষ অন্তরে যোগ হয় নেন নি, নিজে মেদিনী-পুরের পর উত্তরবঙ্গের এত বড় সর্বনাশ হতো না। আরও পরমাশ্চর্য, সর্বনাশের খোলকলা পূর্ণ হওয়ার পরও কি রাইটার্স বিল্ডিংসে, কি জেলা প্রশাসনিক দপ্তরে আমলাদের মধ্যে এতটুকু অনুশোচনা, দুঃখবেদনা প্রকাশ করতেও কাউকে দেখলাম না। বন্যা বা ধ্বসের পাঁচদিনের মধ্যে কোন আমলাকে আটকে পড়া মানুষগুলোকে বাঁচাবার এতটুকু আগ্রহও দেখা গেল না, পথেঘাটে অসহায় কেউ চিকিৎসা পেল না; এমন কি রাজ্যপাল নেই সময় দার্জিলিঙে থেকেও বন্যার্তদের পাশে এসে দাঁড়ালেন না। প্রশাসনিকদপ্তর হাতের কাছে থেকেও নির্জীব হয়ে পড়ে রইল। সেই ভয়ঙ্কর দুর্যোগের পর পাঁচটি দিন, পাঁচটি রাত কেটে গেল—কোথাও ধ্বংস-স্তূপ সরাবার চেষ্টা নেই, জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহের কোন ব্যবস্থা হল না, যারা বন্যা ধস বা বজ্রের হাত থেকে কোন-রকমে রক্ষা পেয়েছিল পাঁচদিন অনাহারে, তেষ্টায় ছটফট করে তারাও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। বন্যায় যারা মরে নি, তারা এখন মরছে। আর বিমানে করে কলকাতা থেকে আমলারা আসছেন তাঁদের কীর্তির হিসেব-নিকেশ করতে। তবু তাঁরা বিমান থেকে নেমে বিপদগ্রস্ত মানুষগুলিকে উদ্ধার করতে ছুটে যেতেন না। কল-কাতায় ফিরে গিয়ে বেতার মারফৎ বিবৃতি দিয়ে তাঁরা জনসেবার কর্তব্য শেষ করলেন। আশ্চর্য এ দেশ, আর আশ্চর্য এ দেশের নেতৃবর্গ, আর ততোধিক আশ্চর্য প্রশাসনিক দপ্তর! পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এমন ঘটনা ঘটলে বোধ হয় যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে তাদের সেবার কাজ এতদিনে শেষ হয়ে যেতো। কিন্তু আমাদের দেশে প্রলয়ের পাঁচদিন পরেও কাজের ঘুম ভাঙে না। দিল্লী থেকে উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই এসেছিলেন। ক্ষুধার্ত, সর্বহারা মানুষের বিক্ষোভ তিনি অবনত মাথায় মেনে নিয়ে-ছিলেন, সকলের সামনেই প্রশাসনিকদপ্তরের পাণ্ডাদের চরিত্রহনন করতে তিনি দ্বিধা-গ্রস্ত হন নি। কঠোর ভাষায় আমলাদের ভৎসনা করে তিনি পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিয়ে গেছেন মানুষের বিক্ষোভের প্রধান কারণই হল আমলারা। আমলাদের নেতা রাজ্যপালও স্বকর্ণে ভর্ৎসনা শুনলেন। কিন্তু তাতেও কি কিছু হবে?

রিলিফ দেওয়ার কাজ চলছে, কিন্তু সবই শহরাঞ্চলে; গ্রামের দিকে যেতে বড় একটা কাউকে দেখা যাচ্ছে না। রাস্তাঘাট সবই দুর্গম হয়ে আছে। এ সময় দরকার সামরিকবাহিনী; আরও সামরিকবাহিনীর লোকজন আনা হোক; দুর্গম পথগুলো তারা পরিষ্কার করে গ্রামের সঙ্গে শহরের যোগসূত্র তৈরি করুক। গ্রামের লোক যারা মরেছে তাদের লাশ আর বোধ হয় খুঁজেও পাওয়া যাবে না; যারা আত্মরক্ষার জন্যে আশেপাশের গাছে বা পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে তাদের খুঁজে বার করতে হবে এখনই। এতদিন অন্ন হয়তো না খেয়ে থেকেছে। যাঁরা রিলিফ দিতে এসেছেন তাঁদের একদল শহরাঞ্চলের কাছাকাছি থাকুন, আর একদল সামরিকবাহিনীর লোকজনদের নিয়ে একটু গ্রামাঞ্চলে যান। মানুষগুলো যদি এখনও বেঁচে থাকে রিলিফ পেলে হয়তো বাঁচবে। দুর্গম পাহাড়ী বস্তিতে গরীব মানুষগুলো কোথায় কিভাবে ধস চাপা পড়েছে তা জানা যাচ্ছে না—কারণ যাবার রাস্তা এখনও রুদ্ধই হয়ে পড়ে আছে। এই মানুষগুলির খোঁজখবর নিতে হবে, তাদের কাছে সাহায্য নিয়ে যেমন করেই হোক পৌঁছে দিতে হবে। যুদ্ধকালীন জরুরী ভিত্তিতে এ কাজ করতে না পারলে অসহায়ের মতো আরও হয়তো কতো প্রাণ আমাদের চোখের সামনে নিভে যাবে। —সমর চট্টোপাধ্যায়

বন্যাত্রাণ—
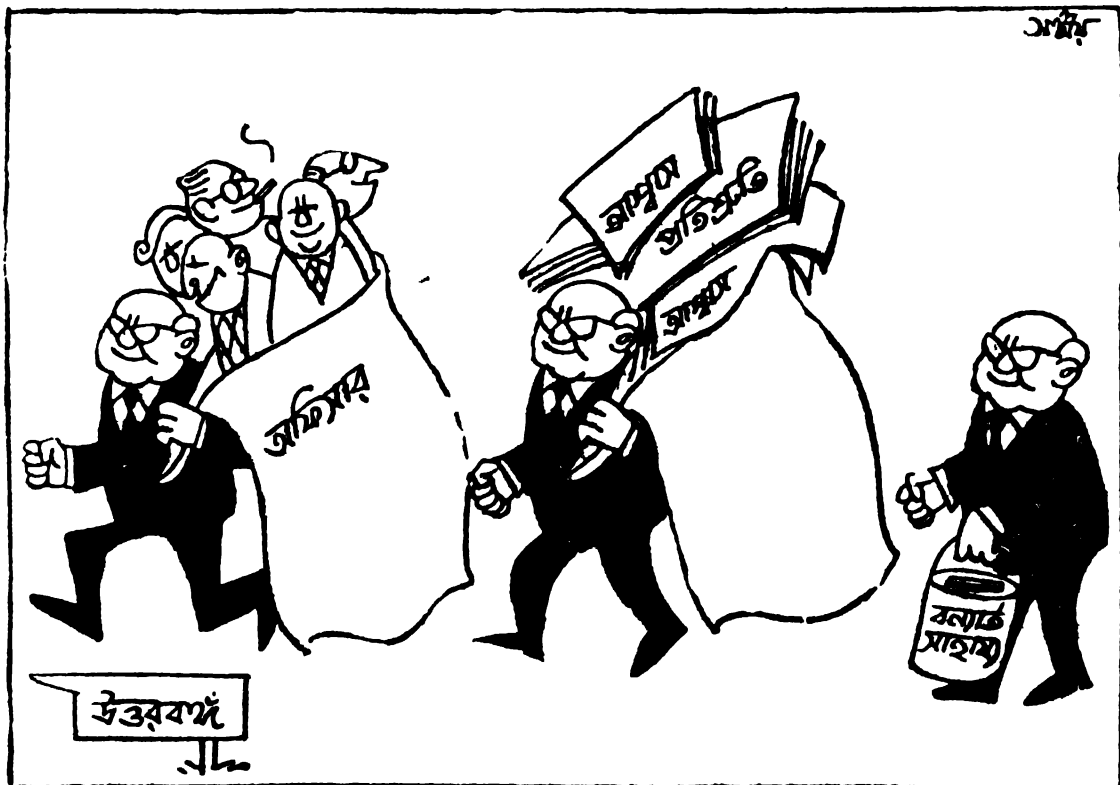
ভারত আবার জগৎ সভায়

অসাধু রাজনীতির পাল্লায় ভারত যখন জগৎ সভায় ধাবে ও ভারে ক্রমেই হাল্কা হযে আসছে, যখন মগজ শূন্য, মস্তিষ্কে দুর্বুদ্ধি বই আর কিছু নেই। প্রতিটি তালেবর মানুষ স্বার্থসিদ্ধির তাল খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর চাতুরীর দ্বারা আপাতলাভের পেছনে অন্ধ হযে দৌড়চ্ছে, ঠিক তখনই সমস্ত অন্ধকার ভেদ করে, সমস্ত নৈরাশ্য দু হাতে সরিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ালেন ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা। তাঁর একাগ্র সাধনা তাঁকে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীর মর্যাদা দান করল। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর মহামূল্য অবদানের স্বীকৃতি বর্তমান বছরের নোবেল পুরস্কার।

ডঃ খোরানার সঙ্গে একই সাথে পুরস্কৃত হয়েছেন তাঁর দুজন সতীর্থ মার্কিন বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক হাল ও মার্শাল নিরেনবার্গ। আজ দুর্ভাগা দেশ ভারতের অবহেলায় ডঃ খোরানাও অ-ভারতীয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। কিন্তু সাধারণ ভারতবাসী ভুলতে পারে না ডঃ খোরানা একই মায়ের সন্তান, ভারত মায়ের গৌরবান্বিত সন্তান। দেশটার কর্ণধার হযে যাঁরা বসেছেন তাঁদের দৃষ্টি প্রকৃত প্রতিভার আলোকদ্যুতিতে ধাঁধিযে যায়, তাই ভারতের প্রকৃত কৃতী সন্তানদের ভারতত্যাগী হতে হচ্ছে। ডঃ খোরানাও গবেষণার সুযোগ ভারতে পান নি বলেই আজ বিদেশী। আর ডঃ খোরানাকে যে ভারত ত্যাগ করতে হয়েছিল, সেজন্য বর্তমান ভারতের কর্ণধাররা লজ্জা পান, অধোবদন হন, আমরা সাধারণ ভারতবাসীরা নিঃসংকোচে তাঁকে নিযে আজ উল্লাস করার অধিকারী। তিনি আবার বিশ্বাস স্থাপন করলেন সাধারণের নিরুৎসাহী হতাশ মনেঃ জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা।

শুধু ডঃ খোরানাই নন, আর একজন প্রখ্যাত মার্কিন বৈজ্ঞানিক ডঃ মেলভিন কোহন আমাদের আরও উৎসাহিত করে জানিয়েছেন যে, মার্কিন দেশে আরও পাঁচজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণারত আছেন যাঁরা কোন একদিন নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হবেনই। অর্থাৎ গেঁয়ো যোগী ভিখ না-পান, যেখানে প্রতিভার সত্যিই মূল্য আছে, সেখানে এইসব কাঁচা সোনার কদরে এতোটুকু উনিশ বিশ হবে না।

আসল কথা হল, একমাত্র জহুরীতেই জহর চিনতে পারে। ভারতে আজ যে আমলাতন্ত্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, তাঁদের জহর চেনার সে ক্ষমতা নেই। তাঁরা প্রকৃত জহুরী নন বলেই তাঁরা ক্ষমতায় আসছেন মুরুব্বী ধরে, ক্ষমতার অপব্যবহারও করছেন মুরুব্বীর জোরেই। আর সমগ্র ভারতের প্রতি সেই নির্মম পরিহাসই ভারতবর্ষকে সীমাহীন অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত করছে।

আমরা ভৈরব ভট্টাচার্যের কথা বিস্মৃত হই নি। যিনি তাঁর সম্ভাবনাময় গবেষণার বিষয়টি জানিযে ফেলেই যেন মহা অপরাধ করে বসেছিলেন। ভারতবর্ষ ধরে রাখতে পারে নি এই তরুণ প্রতিভাকে। আর প্রফেসর হ্যালডেন। ভারতের ধ্যান-ধারণার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যিনি এসে ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন, বাংলাদেশ তাঁর প্রতিভাকে কাজেও লাগাল না। অন্যদিকে ভারতীয় প্রতিভাকে পূর্ণ সুযোগ দান করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই প্রতিভা বিকাশে সাহায্য করলেন। মধ্যপ্রদেশী ডঃ খোরানা হলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। এর পরেও যখন ভারতের ক্ষমতার শিরোমণিরা বড় বড় ফলাও বাণী বিতরণ করে ডঃ খোরানাকে অভিনন্দন জানান, তখন লজ্জাও লজ্জিত হয়ে মুখ লুকোয।

পরাধীন ভারতে গবেষণা করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ডঃ সি ভি রমণ (১৯৩০, পদার্থ বিজ্ঞান)। পরাধীন ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করেছিল পশ্চিমা কাব্যরসিক সমাজ। নোবেল পুরস্কারই শুধু নয, একটি যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী হিসেবে সমগ্র জগৎ তাঁকে মাথায তুলে নিয়েছিল।

কিন্তু স্বাধীন ভারত? স্বাধীন ভারতের ছেলেদের বিদেশে যেতে হচ্ছে গবেষণার সুযোগ লাভের জন্য! নিতে হচ্ছে বিদেশের নাগরিকত্ব। আর ভারতের কর্ণধারগণ মোটা টাকায় ভাড়া করে আনছেন বিদেশী টেকনিসিয়ান্স। কেন না স্বদেশী প্রতিভার ওপর তাঁদের আস্থা ও বিশ্বাস নেই। খুঁজে নেওয়ার আগ্রহ নেই। সে আগ্রহ প্রকাশ করতে হলে স্বজনতোষণের স্বর্গটি ভেঙে পড়বে। সুতরাং সে চেষ্টা ডঃ খোরানার পুরস্কার প্রাপ্তির পরেও শুরু হবে না, তাও জানা কথা। স্বাধীন ভারত কয়েক গোষ্ঠী প্রতিভাহীনের ক্রীড়াভূমিতে পরিণত হযেছে।

তবুও লজ্জা প্রকাশ করব না, হয়ত দুঃখ প্রকাশ করব। আমরা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা তবুও অমৃতের সন্তান। ডঃ হরগোবিন্দ খোরানা এ-সত্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন, এবং সেই পাঁচজনের দিকে আমরা, ভারতের সাধারণ মানুষ, তাকিযে রইলাম, কবে তাঁরা ডঃ মেলভিনের উক্তিকে বাস্তবে রূপদান করবেন তারই ভরসায়।

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি

এক দিনের প্রতীক ধর্মঘট করে কেন্দ্রীয কর্মচারিগণ যে 'অন্যায়' করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী বিদেশ পরিক্রমা সেরে দেশে ফিরেই তার প্রথা মাফিক সমালোচনা করার পর আশ্বাস দিলেন যে কর্মীদের বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গেই বিবেচনা করা হবে, সরকারের প্রতিশোধমূলক কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা উদ্দেশ্য নয।

সরকারের কর্ম ও প্রধানমন্ত্রীর বাণীতে কিন্তু খাপ খায নি।

আটচল্লিশ হাজার অস্থায়ী কর্মীর চাকরী খতমের নোটিশ অবশ্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হযেছে, কিন্তু নিঃশর্ত প্রত্যাহার নয়। স্থায়ী ও অস্থায়ী দুই শ্রেণীর কর্মচারীরাই অতীত চাকরীর সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হলেন। তাঁদের চাকরীর ধারাবাহিকতাও ছিন্ন হল। অতঃপর পাঁচটি বছর নিজেকে লয়াল সারভান্ট বলে প্রমাণ করতে পারলে তবেই বিশ-পঁচিশ বছরের ধারাবাহিক শ্রমের মূল্য দেওয়া হবে। অর্থাৎ কর্তার মনোরঞ্জন করার জন্য পাঁচ বছরের দাসত্বের শৃঙ্খল পরে নিতে হবে হতভাগ্য কেন্দ্রীয় সরকারী

কর্মীদের। সুতরাং শ্রীমতী গান্ধীও যে কর্মীদের ব্যাপারটি পূর্ণ সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করার জন্য তাঁর মন্ত্রিসভাকে প্রভাবিত করেন নি, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে তারই পরিচয় পরিস্ফুট হল।

সংবাদে প্রকাশ, ডঃ ভি কে আর ভি রাও, ডঃ কর্ণ সিং, শ্রী কে কে শাহ এবং শ্রীদীনেশ সিং প্রমুখ মন্ত্রীরা না কি আরও উদার মনোভাব গ্রহণেরই পক্ষপাতী ছিলেন।

কিন্তু গান্ধী-সরকারের পক্ষে যতটুকু না করলেই নয়, কেবলমাত্র ততটুকুই করা হয়েছে, কেন না কর্মীদের প্রতি বিক্ষুব্ধ মনোভাব শ্রীমতী গান্ধী নিজেই ত্যাগ করে উঠতে পারেন নি।

তিনি বলেছেন : কয়েক স্থানে কর্মীদের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব দেখা গেছে। বলেছেন : সরকারী কর্মীদের অন্যান্যদের তুলনায় বেতন-কাঠামো অনেক ভালো। তাছাড়া দেশের সংকটজনক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা তাঁদের বিবেচনা করা উচিত ছিল।

আন্দোলনে শৃঙ্খলা সর্বত্র বজায় রাখা যে দেবেরও অসাধ্য তা বলাই বাহুল্য। তবে শৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণই বাঞ্ছনীয়, তাও অনস্বীকার্য। কিন্তু ভারতবর্ষে স্বাধীনতা-পূর্ব যুগ থেকে কোন দলের নেতৃবৃন্দই তো দেশের মানুষকে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণের শিক্ষা দেন নি। যে দলের যখন প্রয়োজন, সাধারণকে তাঁরা শুধু তাতিয়ে আপন কাজ হাসিল করে গেছেন। কেউ তো অন্যতর কোন শিক্ষা দেন নি। আজ সে দুঃখ করে লাভ কি। তাছাড়া অবস্থার বিস্ফোরক পেকে না উঠলে পুলিশ পাঠিয়ে হাঙ্গামা দমনের ডামাডোল না সৃষ্টি করে আমাদের সরকারও যে কোন সমস্যার মীমাংসায় যান না। সুতরাং দেশবাসীর এমনই ধারণা হয়েছে যে, দু-চারটি আন্দোলনের বলি (নিহত আহত) সমান না দেখালে সমস্যার সমাধান হয় না। তাই যখন দেশে যা চায়। এখন সে দুঃখের গাজন গেয়ে লাভ নেই। অবস্থা সমান হলে উপদ্রবও আপনি কমবে।

কিন্তু দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন শ্রীমতী গান্ধী যখন বলেন উঁরা তো ভালই পয়সা-কড়ি পাচ্ছেন এবং অন্যের তুলনায় বেশিই পাচ্ছেন তখন কর্মীদের ভালো লাগে না। উত্তরে কেউ যদি বলেন, তাঁরা যা পাচ্ছেন, দেশের ঊর্ধ্বগতি দ্রব্যমূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে তা নগণ্য। তবে প্রধান-মন্ত্রীকেই কি বুঝিয়ে কোন বোঝাতে হবে না কেন তার থেকেও অল্পের বেতনভুক তাঁর দেশে বহাল আছে! বলতে হবে না, কেন তাঁর সরকার প্রত্যেককে এমনভাবে বাঁচতে পারছেন না যাতে স্বল্প বেতন-ভোগীরাও খেয়ে পরে বাঁচতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী নিজের যুক্তিতেই, সত্যি বলতে কি, নিজেই বেকায়দায় পড়েছেন। অবশ্য দেশের এই দুর্ভাগ্যের জন্য বস্তুতই যদি সরকার মনে মনেও অন্তত বেকায়দা বোধ করার মতো চক্ষুলজ্জা ধরে রাখেন। না হলে, তাঁদের মুখের সামনে মাইক আছে, তাঁরা বলবেন বৈ কি।

আর সংকটজনক অর্থনৈতিক অবস্থা? এই কথা তো সেই শিশু রাষ্ট্রের আমল থেকেই শুনে আসছিলাম, কিছু নতুন বাণী বলে মনে হল না।

সংসদ ঘেরাও

জে সি এ সভাপতি শ্রী এস এম যোশী বলেছেন, বরখাস্ত নোটিশ প্রত্যাহারে কর্মীদের পয়লা দফা জয় সূচিত হয়েছে। কারণ কর্মীদের শেষ পর্যন্ত আর ক্ষমা ভিক্ষা করতে হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ১৯শে সেপ্টেম্বরের দাবি মানার ব্যাপারে সরকার সমুচিত ইঙ্গিত রাখতে অস্বীকার করলে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন আরম্ভের দিন, ১১ই নভেম্বর সংসদ ঘেরাও অভিযান করা হবে।

জে সি এ কর্মচারী আন্দোলনকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত এখনো পরিত্যাগ করেন নি। আন্দোলন চলবে, প্রয়োজনভিত্তিক মজুরী, মূল্যমানের সঙ্গে সমতা রক্ষা এবং অধিকতর মাগ্গীভাতার দাবিতেই আন্দোলন চলবে।

কিন্তু তাহলেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে কৈ। কর্মীদের ওপর পাঁচ বছরের জন্য যে আতঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হল, ৪৮ হাজার কর্মীর ক্ষেত্রেই শুধু নয় এ বোঝার প্রভাব কর্মী সমাজের ওপর ব্যাপকভাবেই বর্তাবে। যাঁরা কারাগারে রইলেন যাঁরা ইহলোক ত্যাগ করে গেলেন তাঁদের ও তাঁদের পরিবারবর্গের ক্ষতিপূরণের কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সর্বোপরি সরকারী কর্মীদের ক্ষেত্রে সরকার যে চরম-পন্থা অবলম্বন করলেন এবং সেই সরকারী রোষ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আজ কর্মীদের যেভাবে বরখাস্ত নোটিশ প্রত্যাহার করিয়ে নিতে হল, জে সি এ নেতারা যাই আস্ফালন করুন না কেন, সে অবস্থা কর্মীদের নৈতিক বলকে দুর্বলতর করেছে বলে মনে হয় না। আঘাতটা ঢের তীব্র আকার গ্রহণ করল এবার। যার সঙ্গে সমতালে মোকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতির অভাবই বরং লক্ষিত হয়েছে। অতঃপর লক্ষ লক্ষ পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে রাজপথে নামার আগে আরও একটু চিন্তা ও প্রস্তুতির প্রয়োজন হবে, নেতাদের সেকথা ভাববার সময় নিশ্চয় উপস্থিত হয়েছে।

> **একটি ঘোষণা**
>
> **উত্তরবঙ্গের বন্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ ও প্রত্যক্ষদর্শী-দের মূল্যবান রচনায় ও বিবরণে সমৃদ্ধ হয়ে সাপ্তাহিক বসুমতীর বিশেষ বন্যা-সংখ্যা আগামী ৩১শে অক্টোবর প্রকাশিত হবে।**

দিশাহারা নেতৃত্ব

প্রধানমন্ত্রীর সেই জরুরী ভ্রমণের আগে যা করণীয় ছিল, জল ঢের ঘোলা করার পর তাই করার অর্থ বিশ বছরের দিশাহারা নেতৃত্বেরই পুনরাবৃত্তি। দেশে লক্ষ পরিবার যখন অশ্রুসাগরে ভাসছেন তখন প্রধান ও উপ-প্রধানমন্ত্রী ভাসছেন উড়োজাহাজে। জানি না এই ভাসাভাসিতে দেশের কোন উপকারটা সাধিত হল। কতকগুলি সাধারণ জীবন এবং সাধারণের ঘর্মার্জিত অর্থের শ্রাদ্ধ বৈ দ্বিতীয় ফলের সংবাদ তো চোখে পড়ল না।

যদিবা প্রধানমন্ত্রী অবশেষে ফিরেই এলেন এবং একটা ক্যাবিনেট মিটিংও ঘটা করে ডাকা হল, কিন্তু তার ফলশ্রুতি হল আরও চমকপ্রদ।

সরকার বিচার-বিবেচনা করে ঠিক করলেন, আটচল্লিশ হাজার কর্মীকে দেশের প্রতি কতকগুলি প্রীতিহীন, নিজের কোলে ঝোল টানা ব্যুরোক্র্যাটের দয়াদাক্ষিণ্য এবং খেয়ালখুশির হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক। যেন ভারতবর্ষ ব্যুরোক্র্যাটদেরই স্বর্গভূমি, গণতান্ত্রিক দেশপ্রিয় সরকারের জনসেবার ক্ষেত্র নয়। যাঁরা আজ সরকারী গদীতে আসীন যে তাঁরা সাধারণ নাগরিককে পরিণত হচ্ছেন না, কৈ গত নির্বাচন এমন কোন গ্যারান্টি তো তাঁদের সামনে রাখে নি। রাজ্য যদি অন্যতর উপায় অবলম্বিত হয় তবে সে আশঙ্কা এঁদের নেই। কিন্তু এই নিরাপদ তুণ্ডে সহজ নেই অন্যতর সম্ভাবনা কম। তাই গদীতে তাঁরাই থাকবেন যাঁরা সব দিক বজায় রেখে চলবেন। গদী-ভোগীরা কিন্তু দেশটাকে পুলিশ আর ব্যুরোক্র্যাটদের হাতে সমর্পণ করে দিচ্ছেন ক্রমশ। এর সাংঘাতিক ফল যেদিন ফলবে সেদিন ভ্রান্ত নেতৃত্ব হাত কামড়েও যে কূল পাবেন না অথবা স্বখাত সলিলে।

(১১।১০।৬৮)
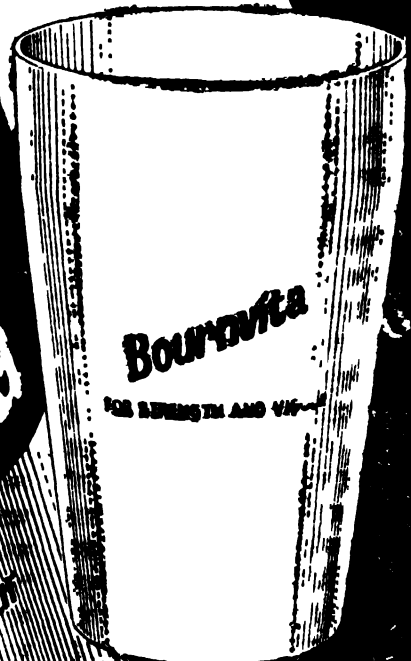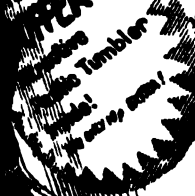
সাবা (পূর্বতন উত্তর বোর্নিও) রাজ্যকে ফিলিপাইনের অন্তর্ভুক্ত করে ফিলিপিনো প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্ড মার্কোস যে বিলে স্বাক্ষর করেছেন তার প্রতিবাদে মালয়েশিয়ার জনতাকে প্রেসিডেন্ট মার্কোসের কুশপুত্তলিকা দাহ করতে দেখা যাচ্ছে।

মালয়েশিয়া :

ফিলিপিন্স-মালয়েশিয়া বিরোধটা ক্রমশ চরমে উঠছে। উত্তর বোর্নিও বা সাবাকে নিয়ে দু দেশের বিরোধ। সাবার ভৌগোলিক অবস্থান মালয়েশিয়ার কাছা-কাছি বলে মালয়েশিয়া সরকার বরাবরই সাবাকে নিজেরই অঙ্গরাজ্য বলে মনে করে এসেছে। অন্যদিকে ফিলিপিন্স সরকার এই মর্মে তার পার্লামেন্টে এক বিল পাশ করেছে যে, সাবা প্রকৃতপক্ষে ফিলিপিন্সেরই অন্তর্ভুক্ত। সাবার প্রকৃত মালিকানা স্থির করার জন্যে দু দেশের মধ্যে একটা শীর্ষ সম্মেলনও হবার কথা ছিল। জাপান সরকারও রাজী হয়েছিলেন টোকিয়োকে প্রস্তাবিত শীর্ষ সম্মেলনের স্থান হিসেবে ব্যবহার করার। কিন্তু দু দেশের নেতা-দের গরম গরম বুলি শুনে মনে হচ্ছে শীর্ষ সম্মেলন আপাতত হিমঘরে নিক্ষিপ্ত হল।

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে দাঁড়িয়ে ফিলিপিন্সের পররাষ্ট্রসচিব নার্সিসো রামোজ বলেছেন যে, শীর্ষ সম্মেলনে মালয়েশিয়া যদি সাবার ওপর হকদারি করতে চান তবে তাঁর সরকার তা মেনে নেবেন না। অর্থাৎ সাবার ওপর মালয়েশিয়ার কর্তৃত্ব স্বীকার করতে ফিলিপিন্স সরকার রাজী নন। মালয়েশিয়ার প্রধান-মন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমানও প্রত্যুত্তরে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সাবার ওপর মালয়েশিয়ার কর্তৃত্বই যদি না স্বীকৃত হল, তবে মালয়েশিয়া সরকার কারো সঙ্গে বৈঠকও করবেন না, কোন সম্মেলনেও যাবেন না। টুঙ্কু একথাও বলেছেন যে, তাঁর সরকারের প্রতিনিধি কেবল তখনই শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করতে পারেন যখন ফিলিপিন্স সরকার তাঁর এই পূর্ব-শর্ত মেনে নেবেন যে, সাবা মালয়েশিয়ারই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বিশেষ। মালয়েশিয়া পার্লামেন্টেও এ মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যে, এ শর্ত মানা না হলে মালয়েশিয়া কোথাও কারো সঙ্গে আলো-চনা করতে যাবে না। পার্লামেন্ট উত্তর বোর্নিওর ওপর ফিলিপিন্সের দাবি অগ্রাহ্য করেছে এই বলে যে, ফিলিপিন্স সরকার কেবল কাগজে-কলমেই তার "অন্যায়" দাবি প্রতিষ্ঠা করতে চান। এ অবস্থায় আর শীর্ষ সম্মেলন হয় কী করে?

এদিকে মালয়েশিয়া সরকারের পররাষ্ট্রদপ্তর অভিযোগ করেছে যে, ফিলিপিন্স না কি তার সাবা সীমান্তে ১৫ হাজার থেকে ২০ হাজার সৈন্যের সমাবেশ ঘটিয়েছে। মালয়েশিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্যেই না কি এই শক্তি প্রদর্শন করা হচ্ছে।

ফিলিপিন্স সরকার অবশ্য সাবা বিরোধের প্রশ্নটা রাষ্ট্রসংঘে তোলার কথা চিন্তা করছে। সেক্রেটারী-জেনারেল উ থান্টও এ বিরোধে মধ্যস্থতা করবেন বলে সরকার মনে করেন।

অন্যদিকে সাবার শাসক পার্টি সাবা এ্যালায়েন্স পার্টি এই মর্মে এক বিবৃতি দিয়েছে যে, ফিলিপিন্স পররাষ্ট্রসচিবের উক্তি সাবার জনগণের পক্ষে অবমাননাকর, তার সার্বভৌমত্বের ওপরও এ উক্তি একটা আঘাত স্বরূপ বলে পার্টি নেতৃত্ব মনে করে।

অর্থাৎ সাবা নিয়ে মালয়েশিয়া-ফিলি-পিন্স সম্পর্ক ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। এবং এ বিরোধের যদি আশু নিষ্পত্তি না করা হয় তবে উভয়পক্ষেই প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হবার আশংকা রয়েছে।

ইন্দোনেশিয়া :

শুধু সাবা নিয়ে মালয়েশিয়া ফিলি-পিন্সই নয়, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিরোধের আরো ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। আমরা ইন্দোনেশিয়া সিঙ্গাপুর বিরোধের কথা বলছি।

সিঙ্গাপুর সরকার দুজন ইন্দোনেশীয় নাবিককে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল। ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে যখন মালয়-সিঙ্গাপুরের বিরোধ চলছিল এবং ইন্দো-নেশিয়া "মালয়েশিয়া ধ্বংস কর" শ্লোগান বা সংকল্প নিয়েছিল তখন নাবিক দুজন সিঙ্গাপুর পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। এরা না কি শহরে একটা বোমা নিক্ষেপ করে যার ফলে তিনজন সিঙ্গাপুরীর মৃত্যু ঘটে। সেই অপরাধেই নাবিক দুজন মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা পেয়েছিল।

কিন্তু এখন তো দিন পাল্টে গিয়েছে,

মালয়েশিয়া-ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে এখন মধুর সম্পর্ক। 'মালয়েশিয়া দখল কর' ইত্যাদি উগ্র ধ্বনি তো অবসান হয়ে গিয়েছে, বিরোধও চুকে-বুকে গিয়েছে। তবু কেন সিংগাপুর দুজন ইন্দোনেশীয় যুবক সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইছে? বিশেষত ইন্দোনেশীয় সরকার যখন সিংগাপুর সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন হতভাগ্য নাবিক দুজনকে ক্ষমা করতে তখন কি সিংগাপুর সরকারের উচিত ছিল না তাদের প্রাণ ভিক্ষা দেওয়া?

কিন্তু সিংগাপুর সরকার নাবিক দুজনের অপরাধ ক্ষমা করে মহত্ত্ব দেখাতে পারেন নি। (আর সিংগাপুর সরকারকেই বা দোষ দিয়ে কী হবে? কে কবে কোথায় কোন রাজনৈতিক অপরাধীকে ক্ষমা করেছে?) ইন্দোনেশীয় তরুণদের ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে। প্রতিবাদে সারা ইন্দোনেশিয়া গর্জে উঠেছে। একদিকে ওই দুজনের মৃতদেহকে ১০ হাজার ইন্দোনেশীয় তরুণ বন্দুকধারীর সম্বর্ধনা জানিয়েছে, অন্যদিকে কয়েক শ' তরুণ জাকার্তাস্থ সিংগাপুরী দূতাবাস ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে, সিংগাপুরী রাষ্ট্রদূত প্রাণভয়ে ভীত হয়ে হোটেলে আশ্রয় নিয়েছেন যদিও পরে ইন্দোনেশীয় সরকার তাঁদের নিরাপত্তার সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন।

ইন্দোনেশীয় ছাত্ররা কিন্তু তাদের সম্বর্ধনা কণ্ঠে এ দাবি নিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছে যে, এবার যেন সরকার সিংগাপুর ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী আদম মালিক ছাত্রদের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাতে পারেন নি। তিনি ছাত্রদের সতর্কতার সঙ্গে সংযম শিক্ষা করার উপদেশ দিয়েছেন। ইন্দোনেশিয়া সরকার সিংগাপুরের কাছে অবশ্য একটা আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদলিপি পাঠিয়েছেন, কিন্তু এর বেশি কিছু এখনি করবেন বলে মনে হয় না, বিশেষত প্রেসিডেন্ট সুহার্তো যখন ছুটিতে রয়েছেন। কিন্তু এটাও ঠিক যে, দুজন ইন্দোনেশীয়কে ফাঁসি দিয়ে সিংগাপুর তার প্রতিবেশী ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কটা তিক্ত করে তুললো।

ভিয়েতনাম :

ভিয়েতনামে কি শান্তি আসন্ন। দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের কি অবসান হতে চলেছে?

গত ক'দিন রাজধানীতে রাজধানীতে যে ধরণের তৎপরতা লক্ষ্য করা গিয়েছে তাতে এ ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, দু পক্ষের মধ্যে মীমাংসার নীল সঙ্কেত দেখা যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন আসন্ন। ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী প্রেসিডেন্ট জনসনের আশীর্বাদ-ধন্য হুবার্ট হামফ্রে ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন যে, তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করবেন। বস্তুত শান্তির কথা না বলে হামফ্রের উপায় নেই। ভিয়েতনামই হল আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুর্গতির প্রধান কারণ। ভিয়েতনামের জন্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত, এখানে অস্ত্রশস্ত্রের বন্যা বইয়ে দিয়েও সে যুদ্ধ জিততে পারে নি, এখন সম্মানের সঙ্গে যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে তবেই তার মর্যাদা খানিকটা রক্ষা পাবে।

প্রেসিডেন্ট জনসন তাঁর ৩০শে মার্চ-এর বিখ্যাত ভাষণেই উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণ সীমিত করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। তারপর শুরু হয়েছে প্যারিসে আমেরিকা-উত্তর ভিয়েতনাম শান্তি আলোচনা। কিন্তু সে আলোচনাধারা মাসের পর মাস কেবল বয়েই চলেছে, কোন মীমাংসায় পৌঁছতে পারছেন না হ্যারিম্যান-থুই। এ অবস্থায় কোন উদ্যোগ না দেখানো হলে শান্তি আসবে এখানে কোন্ পথে।

তাই প্রেসিডেন্ট জনসন না কি উত্তর ভিয়েতনামের কাছে নতুন করে শান্তির প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন। সে প্রস্তাবে কী কী শর্ত তা এখনো জানা যায় নি, তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা অনুমান করছেন যে, উত্তর ভিয়েতনামে বোমা বর্ষণ বন্ধের বিনিময়ে উত্তর ভিয়েতনামকেও দক্ষিণ ভিয়েতনামে তার তৎপরতা বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। শান্তি আলোচনায় দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার যেমন অংশ গ্রহণ করবেন, তেমনি ভিয়েতকঙদের জাতীয় মুক্তি ফৌজের উপস্থিতিতেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন আপত্তি নেই।

কিন্তু মুশকিল বেধেছে দুটি কারণে। প্রথমত দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার উত্তর ভিয়েতনামে এখনই বোমাবর্ষণে রাজী নয়। তাঁরা আগেই উত্তর ভিয়েতনাম সরকারের কাছে প্রতিশ্রুতি আদায় করতে চান। দ্বিতীয়ত শান্তি আলোচনায় তাঁরা মুক্তি ফৌজকে ঢুকতে দিতে চান না। অর্থাৎ বাবু যা বলেন পারিষদবর্গ তার চতুর্গুণ করেই বলছেন।

অন্যদিকে হ্যানয়ের পক্ষ থেকেও জনসনের নবতম প্রস্তাবে খুব আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না—তাঁরা বলছেন যে, এ প্রস্তাবে নতুন কিছু নেই, উত্তর ভিয়েতনাম কোন শর্তের বা প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বোমাবর্ষণ বন্ধ হতে দিতে চান না ইত্যাদি।

সে যাই হোক, একটা বিষয় আজ পরিষ্কার হয়েছে যে, ভিয়েতনামের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চড়া সুর অনেক খাদে নেমেছে। আর একটু কোমল কেন করেন না? তাঁরা কোন রকম শর্ত আরোপ না করেই উত্তর ভিয়েতনামে বোমা ফেলা বন্ধ করে ফলটা কী হয় দেখেন না কেন? বিশেষত উত্তর ভিয়েতনাম সম্প্রতি তার সামরিক তৎপরতা বন্ধ রেখে যে সং দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং শান্তি আলোচনার জন্য উপযুক্ত বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে তার সুযোগ কেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিচ্ছে না?

দশই অক্টোবর উপপ্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের সঙ্গে রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর যখন জলপাইগুড়ি পৌঁছলেন, তখন একজন অধ্যাপক সাহিত্যিক চিৎকার করে উঠছিল ইংরেজীতে অশ্লীল গালি দিয়ে. আর একজন প্রবীণ প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা শ্রীধরমবীর ও শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের মধ্যে একজনের প্রায় শরীর ছুঁয়ে গালি দিয়েছিলেন হিন্দিতে। সেই মুহূর্তে এই দুই ব্যক্তিকে দেখে ক্ষোভে দুঃখে শোকে রাগে পাগল ছাড়া আর কিছু মনে হয় নি। শুধু শ্রীদেবেশ রায়, শ্রীবিমল হোড় নন শ্রীখগেন্দ্র দাশগুপ্ত, শ্রীননী ভট্টাচার্য শ্রীনির্মল বস শ্রীসুবোধ সেন সকলেই বুঝি পাগল হয়ে গেছেন। হ্যাঁ শ্রীমোরারজী এবং শ্রীধরমবীর দেখলেন জলপাইগুড়ির জীবিত মানুষেরা সব বুঝি পাগল হয়ে গেছে। জলপাইগুড়ির মাটি-আকাশ বাতাস সবই বিষাক্ত হয়ে গেছে যে বিষে অধ্যাপক ডাক্তার রাজনীতিবিদ সাহিত্যিক সকলকে পাগল করে দিয়েছে। তাই শ্রীমোরারজীকে যখন মোটর থেকে নেমে পায়ে হেঁটে যাবার জন্য দাবি উঠল. তখন শ্রীদেশাই বললেন 'ডু ইউ ওয়ান্ট টু কিল মি'। শ্রীমোরারজী বুঝেছিলেন জলপাইগুড়ির মাটিতে পা দিলে মানুষ বাঁচে না তাই তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তোমরা কি আমাকে জলপাইগুড়ির মাটিতে নামতে বলে মারতে চাও।

এই হল জলপাইগুড়ির চিত্র। যেখানে মৃতের বিষাক্ত গন্ধে বাতাস ভারী, শত শত মানুষ আর পশুর দেহ বুকে নিয়ে মাটি স্পর্শের অযোগ্য আর জীবন্ত মানুষগুলি সব পাগল হয়ে গেছে। ভূমিকম্প বন্যা প্রাকৃতিক বিপর্যয় অনেক হয়েছে এবং সব সময় বিপর্যয় রোধ মানুষের আয়ত্তে থাকে না। কিন্তু বিপর্যয়ের পর বিপর্যস্ত মানুষদের উদ্ধারের যে সব নজীর আছে জলপাইগুড়িতে সেই নজীরের ক্ষেত্রে এক নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপিত হলো। আজ পর্যন্ত কোথাও এমন চরম সরকারী ঔদাসীন্য, দীর্ঘসূত্রতা, হৃদয়হীনতা ও অবহেলার নিদর্শন কেউ দেখে নি, কেউ শোনে নি। কোন সভ্য দেশের ও সভ্য সরকারের কাছে এমন অমানবিক ও অদূরদর্শী ব্যবহার কেউ কোনদিন পায় নি। কিন্তু এই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের সৌভাগ্য যে, বন্যা শুধু জলরাশি, বন্যা কোন পররাজ্যগ্রাসী সৈন্যবাহিনী নয়। জলপাইগুড়ির বন্যা যদি কোন আগ্রাসী সৈন্যবাহিনী হত, তাহলেও তো এই একই অবস্থা সৃষ্টি হত তাদের, যাদের উপর আমাদের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বভার রয়েছে. যারা উত্তরবঙ্গের নিরাপত্তা বিধানে ১৯৬২ সাল ও তার আগে থাকতে কোটি কোটি টাকা খরচ করে আসছে।

শুধু বিপুল অর্থ ব্যয়ে সুদৃঢ় বাঁধ ও পরিবেষ্টনী রচনা করা হয় নি। সকল প্রকার বিপদ সংকেতের আধুনিকতম বহু মূল্য ব্যবস্থাসমূহ রক্ষা করা হয়ে আসছে উত্তরবঙ্গে। অথচ প্রলয়ঙ্কর বন্যার স্রোত অবিশ্বাস্য রকমে সব প্রকার সামরিক ও বেসামরিক ব্যবস্থাকে নিস্তব্ধ ও অচল করে দিয়ে রাতের গভীর মানুষকে সামান্য আত্মরক্ষার অবকাশ না দিয়ে মৃত্যুর গহ্বরে টেনে নিয়ে গেল। হাজার হাজার ঘুমন্ত মানুষ একটু নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ না পেয়ে জল আর পলি মাটির তলায় কবরস্থ হল। হ্যাঁ শত্রু তো ঠিক এই ভাবেই আসে রাতের অন্ধকার আর মানুষের অসতর্ক মুহূর্তগুলিই তো শত্রুর প্রধান সহায় হয়। সেই শত্রু প্রাকৃতিক হোক আর পররাজ্যগ্রাসীই হোক। এই শত্রুর মোকাবেলা করবার জন্যই দরকার হয় সরকারের—বছরের পর বছর কোটি কোটি টাকা সরকারকে ব্যয় করতে দেওয়া হয়, যাতে সঠিক সময়ে সরকার এই শত্রুর মোকাবেলা করে—মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। সেটা যদি সম্ভব না হয়—তবে সরকারের প্রয়োজন মানুষের কাছে নিরর্থক হয়ে পড়ে। চাঁদে মানুষ বাসা বাঁধবার কথা ভাবছে যে যুগে সেই যুগে হাজার হাজার মানুষ শুধুমাত্র অবহেলায় মরে যাবে—আর সেই মরা মানুষের দেহ রাস্তা থেকে সরাতে সাত দিন লাগবে এ অবস্থা সহ্য করা যায় না।

উত্তরবঙ্গে বন্যার ধ্বংসলীলায় কোটি কোটি টাকার বিষয়, ঘর, ফসল, সম্পত্তি, আর হাজার গৃহপালিত পশুর জীবন কয়েক হাজার মানুষ নিঃশেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এর জন্য দোষী কে এই ক্ষতির পূরণ করবে কে, সেই প্রশ্নের মীমাংসা প্রয়োজন? উত্তরবঙ্গের বন্যার পরিস্থিতি সম্পর্কে সব কথা এখনো প্রকাশ পায় নি অথবা সব সত্যের যাচাই হয় নি, তবে বিভিন্ন সূত্রে যে সকল তথ্য প্রকাশ পেয়েছে সেইগুলি সকলেরই জেনে রাখা ভাল। অনেক তদন্ত হবে অনেক বক্তৃতা হবে, অনেক অফিসার নিয়োগ হবে, অনেক অর্থ ব্যয় হয়ত হবে, অনেক ফাইল তৈরি হবে, কিন্তু পিছনের প্রশ্নগুলি যেন পিছনে পড়ে না যায়। বিষাক্ত ক্ষতকে চাপা দিয়ে রাখলে হয়ত ক্ষণিকের জন্য চোখের আড়ালে রাখা যাবে, কিন্তু সেই ক্ষতের নিরাময় হবে না ক্ষত আরো বিষাক্ত আরো জীবনহানির সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে।

দেশ স্বাধীন হয়েছে বিশ বৎসর, তিনটি পরিকল্পনা রূপায়িত হয়ে গেছে—এই সব কথাগুলি মনে রেখে উত্তরবঙ্গের বিপর্যয় পূর্ব ও পরবর্তী ঘটনাগুলি বিচার হওয়া দরকার। পশ্চিমবঙ্গে এই বৎসর দুবার বন্যা হবে এই কথা আবহাওয়াবিদরা অনেক আগে থাকতেই বলেছিলেন। মেদিনীপুর বর্ধমান, হুগলীতে বন্যা হবার পরই শোনা গেছিল পূজার সময়ে আবার একবার বন্যা হতে পারে। মহাপূজার সময়েই উড়িষ্যার উপকূলে থেকে বায়ুর নিম্নচাপ সৃষ্টি হল এবং সেই বায়ুমণ্ডল দক্ষিণবঙ্গ পেরিয়ে উত্তরবঙ্গে গেল। বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি ও যাত্রা কোন গোপন ব্যাপার নয়। বিজয়া দশমীর পর দিন থেকে সিকিমের পার্বত্য অঞ্চলে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়, তিস্তার জলস্ফীতি ঘটতে থাকে। ৩রা অক্টোবর রাত্রে দোমহনী ও মণ্ডলঘাটে বন্যা সুরু হয়। ৪ঠা অক্টোবর তিস্তার জল আরো বৃদ্ধি পায়। কালিম্পং থেকে জলপাইগুড়ি পর্যন্ত তিস্তার জল মাপবার ও বিপদবার্তা পাঠাবার কয়েকটি ঘাঁটি আছে। এরপর বিপদবার্তা কেউ পাঠিয়ে ছিল কি না অথবা বিপদবার্তা শুনে কেউ গ্রাহ্য করেছে কি না, গেজ রিডারের দোষ অথবা জেলা শাসক বা কমিশনারের দোষ এই সব বিচার যাঁরা করতে চান করুন কিন্তু মূল কথা হল জলপাইগুড়ির মানুষকে কোন প্রকার সতর্ক করা হয় নি। সেচদপ্তর বলছে তারা সময় মত খবর পেয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়েছিল শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছেন—শুধু সরকারী অফিসার নয়, কংগ্রেস নেতারা পর্যন্ত বন্যা আসছে জানতেন, কিন্তু কারো কারো আপত্তিতে সাইরেন বাজানো হয় নি। আবার সেচদপ্তর বলছে তারা সতর্কের কথা জানাতে চেয়েছিল, কিন্তু শত চেষ্টা [illegible]

কারো সংগে যোগাযোগ করতে পারে নি। এরপর আবার শ্রী এস এন রায়ের নেতৃত্বে এক তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে, যে কমিটি তদন্ত করার পর হয়ত আরো অনেক কথা শোনা যাবে। কিন্তু উত্তর-বঙ্গের যে সর্বনাশ হয়ে গেল, সমগ্র জাতির জীবনে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হল তার প্রতিকার কে করবে। দেশে বর্তমানে কোন নির্বাচিত সরকার নেই, যে সরকারের জনসাধারণের সংগে কৈফিয়তের সম্পর্ক থাকবে, দায় ও দায়িত্বের সম্পর্ক থাকবে। রাজ্যপালই বর্তমানে রাজ্য প্রশাসনের সর্বেসর্বা, সাফল্য ও ব্যর্থতার দায়িত্ব রাজ্যপালের উপরই বর্তায়। এই ক্ষেত্রে আরো খোঁজ খবর হল, স্বয়ং রাজ্যপাল এই

বিপর্যয়ের সময় উত্তরবঙ্গে তথা দার্জিলিং-এ ছিলেন। পশ্চিম বাংলায় যখন রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হয় তখন শোনা গেছিল সরকারী আমলা আর প্রশাসন দপ্তর নাকি টাট্টুঘোড়ার মত চলবে। তাদের মাথার উপর আর দলীয় প্রভাব পড়বে না, অর্থাৎ মন্ত্রী উপমন্ত্রীর চাপ পড়বে না, সরকারী আমলারা দেখিয়ে দেবে কাজ করা কাকে বলে, মাথার উপর কর্মবীর ধর্মবীর আর নিচুতে এতোদিনের দমে থাকা অফিসাররা এইবার দেখিয়ে দেবে। এমন কথাও উঠেছিল যে সরকারী আমলারা এবার এমন কাজ দেখাবে যে, দেশের মানুষ নাকি চাইবে, রাষ্ট্রপতির শাসনই বরাবর কায়েম থাক, দলীয় সরকার আর দলবাজীর সরকার দরকার নেই।

বন্যা হয়ে গেল শুক্রবার শেষ রাত্রে আর প্রকৃতপক্ষে সেই সংবাদ বুঝতে বা অনুভব করতে রাজ্য সরকারের প্রশাসনের সময় লেগেছিল কম করে ৩৬ ঘণ্টা। ৩৬ ঘণ্টা পর মহাকরণের কর্তাব্যক্তিরা বুঝলেন উত্তরবঙ্গে নাকি সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে। শুক্রবারের পর রবিবার পর্যন্ত সরকারী প্রচারের মাধ্যম রেডিওতে মৃত্যুর সংবাদ প্রচার করা হল—৩৭ জন। গত ১৭ই অক্টোবর রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন বলেছেন, উত্তরবঙ্গে মৃতের সংখ্যা ২০ হাজার হলেও অবাক হবার থাকবে না। একবার ভাবুন কোথায় কুড়ি হাজার আর কোথায় ৩৭! রাজ্য সরকারের প্রকৃতপক্ষে ঘুম ভাঙলো সাত তারিখে রিলিফ কমিশনার শ্রী [illegible] বার উত্তরবঙ্গে যাবার পর। রিলিফ কমিশনার শ্রীরায় বিমানে উত্তরবঙ্গে গেলেন, তার আগে পর্যন্ত জলপাইগুড়ির আকাশে কোন বিমান বা হেলিকপ্টার দেখা যায় নি। শ্রীরায় গিয়ে আবিষ্কার করলেন প্রশাসন কাঠামো বলতে জলপাইগুড়িতে কিছু নেই। রাজ্যপাল শ্রীধবনবীর এই সময় দার্জিলিং-এ ছিলেন এই কথা আগেই বলা হয়েছে। ৪ তারিখের পর ৮ তারিখে রাজ্যপাল ধবনবীর মেজর অরোরাকে নিয়ে বিমানে উঠলেন ও বন্যা এলাকা দর্শন করলেন। এই ৮ তারিখেই রাজ্য সরকার প্রথম এক সেরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানালো উত্তরবঙ্গের বিপর্যয় যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে মোকাবিলা করা হবে। অর্থাৎ ৪ তারিখের ৪ দিন পরে রাজ্য সরকার যুদ্ধকালীন তৎপরতা শুরু করালেন। এ যেন সেই প্রবাদ—যে কোন এক স্থানে আগুন লেগে সব পুড়ে যাবার সাতদিন পরে এক বড় লাঠি নিয়ে এক সিপাই উপস্থিত হয়ে ভীমবিক্রমে জিজ্ঞাসা করলো "কাঁহা আগ লাগা হৈ"। রাজ্য সরকার প্রেস নোটে যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বললেও কার্যত কিন্তু দেখা গেল রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসনের এক মুখপাত্র বলছেন—দেখুন কি করবো? আমাদের হাতে মাত্র একখানা বিমান? বিপর্যয়ের তিন-চার দিন পরেও রাজ্য প্রশাসন মুখে কলম গুঁজে ভাবছেন—তাঁরা কি করবেন, তাদের হাতে মাত্র একখানা বিমান। ৯ তারিখে প্রথম ছয়জনের এক সরকারী দল প্রথম উত্তরবঙ্গে যাত্রা করলো। ৮ তারিখে একটি বিমানে ব্লিচিং পাউডার নিয়ে উত্তরবঙ্গ যাচ্ছিল, সেই পাউডার নামিয়ে সেই বিমানে কেমন পুলিশ গেল, আবার ১১ তারিখে কাগজোগরা একটা বিমানে যাদের আনবার কথা ছিল তাদের না এনে আনা হল কয়েকজন অফিসার পত্নীকে, এই খবর কাগজে বেরিয়েছে। ১০ই কেন্দ্রীয় উপপ্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই জলপাইগুড়ি এলেন আর এই প্রথম রাজ্যপাল জলপাইগুড়ির মাটিতে পা দিলেন। অর্থাৎ বন্যার ছয়দিন পরে রাজ্যপাল, যিনি রাজ্যের সর্বোচ্চ কর্তা তাঁর আগমন ঘটলো জলপাইগুড়িতে। আর এই ছয়দিন পরেও জলপাইগুড়ির অবস্থা কি। তখন পর্যন্ত সারা শহরে পড়ে রয়েছে নরনারীর মৃতদেহ, পশুর গলিত শব। শুধু মোরারজী যে পথে শহরে যাবেন, সেই পথ পরিষ্কার করবার জন্য অবশ্যগুলি মৃতদেহ সরিয়ে জাতীয় সড়কের পাশে সরিয়ে রাখা হয়। যেদিন শ্রীমোরারজী দেশাই আর শ্রীধবনবীরের বিমান জলপাইগুড়ি নামে, সেইদিন সকাল থেকে মৃত শবের গাদাতে শকুন নামতে শুরু করে।

১০ই তারিখ পর্যন্ত জলপাইগুড়ি শহরে প্রকৃতপক্ষে কিছু সামরিক বাহিনী ছাড়া পুলিশের কোন চিহ্ন ছিল না। বন্যার তিনদিন পরে প্রথম শহরে বাইরে থেকে পানীয় জল আসে, ১০ তারিখে রাজ্যপাল জলপাইগুড়িতে জানান যে, তিনটি টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। অনুমান করুন—৪ তারিখে বন্যার পর মানুষের যেখানে বৃষ্টির জল ছাড়া পানীয় ছিল না সেখানে এক লক্ষ লোকের শহরের জন্য প্রায় ছয়দিন পরে তিনটি টিউবওয়েল বসানোর ঘোষণা করলেন রাজ্যপাল। ১১ই অক্টোবর শ্রীপ্রজিত গুপ্ত জলপাইগুড়ি যাবার পর অবস্থার একটু পরিবর্তন হয়। এইদিন প্রথম এম আর শপ খোলা হয়। এ হল শহরের অবস্থা—গ্রাম তখনও দূর অস্ত। সমস্ত গ্রামের সঙ্গে ঠিক মত যোগাযোগ স্থাপন হল ১৭ই অক্টোবর। ৪ঠা অক্টোবরের বন্যার প্রায় ১২ দিন পরে সব গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়—এই হল যুদ্ধকালীন জরুরী তৎপরতার নমুনা। ১১ই অক্টোবর প্রথম রাজ্যপাল রাইটার্স বিল্ডিংসে পৌঁছে সরকারী অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করলেন এবং তখনও ভাবনা কি করতে হবে, কিভাবে করতে হবে। এই ১১ তারিখের পর সিদ্ধান্ত হল বিভিন্ন স্থানে খাদ্যদ্রব্য এয়ার ড্রপিং প্রয়োজন। এই ১১ তারিখেই মরা গরু ও মানুষের শব অপসারণে বিশ্বকর্মা ব্রিগেডকে নিয়োগ করা হল।

এই হল উত্তরবঙ্গে জাতীয় বিপর্যয়ের মোকাবিলা করার সরকারী তৎপরতার কিছু নমুনা; শুধু খবরের কাগজে বেরনো খবরগুলি এক জায়গা করে এই তৎপরতার তালিকা রচনা করা হয়েছে—আর যারা প্রত্যক্ষদর্শী বা ভুক্তভোগী তাদের কথা বা বক্তব্য না বলাই ভাল। তবে একটি তৎপরতা খুবই জোর দেখা গেছে, সে হল বিমানযোগে আকাশপথে দুর্গত অঞ্চল পরিদর্শন। এই কাজে অন্তত কোন গাফিলতির অভিযোগ কেউ আনতে পারবেন না। উপ প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল, শ্রীহুমায়ুন কবির বাদ্যা সরকারের কজন পদস্থ অফিসার [illegible] বার বিমানে দুর্গত এলাকা দেখছেন—মাটি থেকে নিরাপদ দূরত্বে যেখানে পচাগলিত শবের গন্ধ বেশি হয় না, জনগণের আর্তনাদ শোনা যায় না সেখান থেকে দুর্গত অঞ্চল আর দুর্গত মানুষদের দেখেছেন। অতি মূর্খ ও গেঁয়ো লোকের মত শুধু প্রশ্ন জাগে এই নেতৃবৃন্দ আর সরকারী অফিসারদের দিল্লী থেকে জলপাইগুড়ি, আর কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গ আকাশপথে দুর্গত অঞ্চল দর্শনের জন্য যে খরচা হয়েছে, সেটা এক জায়গায় করলে হয়ত অনেক হাজার সর্বহারা ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন হত। তবে দূরে থাক, অজ্ঞ লোকের বেফাঁস কথার কি দাম থাকতে পারে তাদের কাছে, যাঁরা যুদ্ধের মোকাবিলা করবার মত উত্তরবঙ্গের বিপর্যয়ের মোকাবিলা করছেন। তবে কথা হল ১০ই তারিখেও দেখা গেল জলপাইগুড়ি শহরের বুকে রাস্তার পাশে একটি কুকুর একটি শিশুর শব ছিঁড়ে খাচ্ছে। শিশুর মুখখানা দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। যে দৃশ্য দেখে শ্রীশম্ভু ব্যানার্জীর মত ক্যামেরাম্যানের ক্যামেরা অচল হয়ে যায়। না এ ছবি তোলা যায় না বলে ক্যামেরা বন্ধ করেন। এই দৃশ্যের সঙ্গে সরকারী তৎপরতার দৃশ্য মিলালে মানুষ পাগল হয়ে যান। যেমন পাগল হয়ে গেছে জলপাইগুড়ির একজন, যে শুধু রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে আর বলছে—"ওগো এক্সেলেন্সি গভর্নর ধবনবীরের কাছে আমার একটি আর্জি আছে?" আর একজন—পরিবারের আটজন সকলে বন্যায় ভেসে যাবার পর অনেক খুঁজে কাউকে না পেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার, ১৯৬৮ : কাওয়াবাতা

সোমা মিত্র

সাহিত্যে ১৯৬৮-র নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন জাপানী কথাসাহিত্যিক ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা। গত প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে য়ুনিচিরো তানিজাকি, রিয়ুনোসুকে আকুতাগাওয়া, য়ুকিয়ো মিশিমা, ওসামু দাজাই, ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা প্রমুখ যে কথাসাহিত্যিকেরা এক আধুনিক জাপানী কথাসাহিত্যের ধারা রচনা করেছিলেন, সেই ধারাই এই পুরস্কার প্রদানে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। জাপানী জীবনযাত্রায় পুরনো রীতি আচার ও আধুনিক জীবনোপকরণের যে বিচিত্র সমাবেশ স্বতঃই চোখে পড়ে, তাতে আধুনিক জাপানী কথাসাহিত্যেও যে জাপানী চিরাযত কবিতার তীব্র আবেগজারিত বাক-প্রতিমা ও জটিলতর মনোবিশ্লেষণের সমাবেশ ঘটবে, তাও স্বাভাবিক। এই নব্য ধারার লেখকেরা প্রায় সকলেই আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যের সংগে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে সম্পর্কিত। অথচ জাপানী জীবনযাত্রার চরিত্রই এমন যে তার প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহিত ছোট ছোট লক্ষণগুলি খুঁজে বেড়াতে হয় না, আপনা থেকেই চোখে পড়ে যায়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, অতীত ও বর্তমান, ক্রমানুবর্তন ও অগ্রগমনের মধ্যে যোগ রেখে চলতে এই লেখককুলের বেগ পেতে হয় নি।

বিশেষ করে কাওয়াবাতাকে তো নয়ই। ১৮৯৯ সালে ওসাকার কাছে জন্মগ্রহণ করায় দু' বছরের মধ্যেই কাওয়াবাতা অনাথ হয়েছিলেন। এই একান্তই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাকে কতটা গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, তাঁর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ, মৃত্যুর অবলেপ ও স্মৃতির বিপুল ভার থেকে তা হয়ত কিছুটা অনুমান করা যায়। এই ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা এবং টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্য পাঠের শিক্ষা তাকে যে বিশেষ মানসিকতা দিয়েছিল, তা থেকেই তিনি তাঁর যৌবনকালের কঠোর বাস্তববাদী উপন্যাসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। নাগাৎসুকা তাকাশি কিংবা কোবায়াশি তাকাজির লেখার উগ্র জীবনানুগত্য তাঁর ভাল লাগে নি। যে ঘরানায় মধ্যে কাওয়াবাতার প্রতিষ্ঠা, তাকে বলা হয়েছে নব্যরোমান্টবাদ। জীবনের দিনানুদৈনিক টানাপোড়েনের বাইরে, মানুষের ভিড়ের বাইরে, প্রায়শই পুরনো রীতি-আচারের ক্রমান্বয়তার নিশ্চিন্ত শৃংখলায় আবিষ্ট কোন আশ্রয়ে একটা মানব সম্পর্কের শান্ত সংযত বিকাশ। বাইরে প্রায় কিছুই ঘটে না: আসা-যাওয়া, দেখাশোনা, সামান্য কিছু কথাবার্তা। অথচ অনেক গভীরে যেন একটা প্রবল রোমাঞ্চের প্রবাহ চলেছে। এইভাবে হয়ত কাওয়াবাতার গল্প উপন্যাসগুলির সাধারণ কাঠামো বর্ণনা করা যায়।

১৯৪০ সালে লেখা 'আঁচল' গল্পটিতে একটি মেয়ের ছোটবেলার অভ্যাস তার পিঠের আঁচলে বারবার হাত দেওয়া; আঁচলটা ডানদিকে; অথচ মেয়েটি বাঁ হাত দিয়ে আঁচলটা ছোঁবে, নিজের বাহু দিয়ে বুকটাকে চাপা দিবে। মেয়েটির স্বামী বিরক্ত হয়, বিব্রত হয়। অথচ মেয়েটি পারে না অভ্যাস পাল্টাতে। তারপর একদিন সে দেখে, অভ্যাসটা কবে কেটে গেছে, স্বামীর সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, স্বামী কান দেয় না। ওদের সম্পর্কটাই ততদিনে শিথিল হয়ে গেছে। স্বামীর আর ওতে কিছুই আসে যায় না। মেয়েটি ভাবে: কেন? অভ্যাসটাকে সে একদিন আঁকড়ে ধরেছিল কেন? ওর স্বামীও কি বুঝবার চেষ্টা করেছিল?

১৯৪৭-এর উপন্যাস 'বরফের দেশ' ও তৎপরবর্তী 'সহস্র সারস', দুটি উপন্যাসেরই বাঁধুনি পুরনো প্রথার পরিবেশের মধ্যে। প্রধান ব্যক্তি পশ্চিমোপকূল 'বরফের দেশে' ছুটি কাটাতে এসে এক সৌখিন শহুরে তরুণ ওখানকার এক গীশা প্রমোদসঙ্গিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, অথচ তার রহস্য যেন কখনও ভেদ করতে

ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা

উত্তর

মনোরঞ্জন হাজরা

জলের তলায় তলিয়ে যাবার আগে
ওরা অবকাশ পর্যন্ত পায় নি
আর্তনাদ করার।
সেই ওদের শেষ ঘুম
অথবা ঘুমের শেষ।
পৃথিবীতে আর ওরা আসবে না ঘুমোতে
—তার হয়েছে পূর্ণচ্ছেদ।

ওখানে এখন শৃগালের নির্ভয় বিচরণ,
শকুনির ডানার ঝাপটা।
লক্ষ্যসীমায় পৌঁছেছে
সর্বনাশ আর মহামারীর অধিক ফলন।

কিন্তু এখানে?
এখানে ফাঁসা জয়ঢাকে প্রাণপণে কাঠি
'আমি তো কলা খাই নি।'
অথচ ট্রানজিস্টার খুললেই
মানবতার একটানা ধারা বিবরণী।

সত্যি এও এক দুর্যোগ
নির্বিচারে সভ্যতা আর সততার সতীত্ব হরণ।

বিয়োগান্ত এ নাটকের নট-নটী কারা?
এ কি শুধু সর্বনাশী তিস্তার সৃষ্টি
অথবা করলা আর পাহাড়িয়া ঢলের?
কিংবা সেই দুর্বিনীত মৌশুমী বাতাস
তূণীরে যে এনেছিল কালো মেঘ ঠেসে?
জানি এর উত্তর দেবে না কেউ।

উত্তর তবুও আছে।
জলের এ জতুগৃহে দেশ কখনো
পাণ্ডব বর্জিত হবে না।
এবং আগামীদিনে কুরুক্ষেত্রেই
কৌরবের শেষ পরিণতি।

গঙ্গা

প্রফুল্লকুমার দত্ত

এখানেই শেষ নয় জীবন। নতুন বাঁকে চলা
জীবনের ধ্রুবনীতি। আমি তাই বুকে হেঁটে হেঁটে
ক্রমশ এগোচ্ছি। আমি বাঁধা পড়েছিলাম বলেই
থেমে যাবো না কি? তবে আজন্ম সঞ্চিত জলরাশি
কোথায় দাঁড়াবে মধ্যপথে? কোনো ঐশ্বর্য নিষ্ফলা
রবে না কখনো। আমি সন্তোষ বাঁধ কেটে কেটে
চলেছি; যে কোনো পোড়ামাটি আর ছাই-এর কোলেই
ফসলের জন্ম দিতে বাজাবো এ জীবনের বাঁশী—
অন্ধকারে অভিশপ্ত যে সমস্ত আত্মারা উতলা,
আলো তথা আশীর্বাদ হয়ে আমি রসাতল ঘেঁটে
তাদের বুকের কাছে পৌঁছে যাবো; কোনো দ্বিধা নেই,
ভগীরথ, শঙ্খ বাজাও—জগৎ ভাসিয়ে নিজে ভাসি॥

পারে না, বোধ হয় ভেদ করতে চায়ও নি, এমন একটা প্রচ্ছন্ন তিক্ত অনুযোগও যেন অনুভব করা যায়। 'সহস্র সারস' উপন্যাসে আরেকটি ধনী তরুণ তার মৃত পিতার এককালীন প্রেমসী তথা প্রণয়িনীদের দৃষ্টি ও আকর্ষণ কাটিয়ে উঠতে পারে না। তারা তাবই মধ্যে তার মৃত পিতাকে যেন ফিরে পায়, অনেক অপূর্ণ সাধ যেন এখনও পূর্ণ করতে চায়। পরিণতি কষ্টকরই হয়। কিন্তু তরুণটিও স্বাভাবিক জীবন যেন আর পারে না। শিমামুরা ও কিকুজি, দুজনেই একই ছাঁচে ঢালা—বড় সৌখিন, পরিশীলিত, বড় অসমর্থ, ভিতরে কামনা বাইরে মুখোস; মানুষের প্রতি কঠোর, অথচ আপাতদৃষ্টে বেশ তো ভদ্রলোক। কাওয়াবাতার লেখার একটা নিরুত্তাপ সংযত বাঁজ আছে। কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার শান্ত এলাহি বিস্তারে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়তে হয়। যেন আর কিছু ভাবা যায় না। কাওয়াবাতার অভিজাতজগতে তেমন গভীরতাও নেই, বৈচিত্র্যও নেই। যা আছে, তা কেবল কান্না, তাও বড় স্মৃতি-ভারনত, ক্লান্ত।

মুকিয়ো মিশিমা এই পুরস্কার পেলে বোধ হয় আরো খুশি হওয়া যেত। তবে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার তার খাম-খেয়ালির জনাই বেশি খ্যাত। সেদিক থেকেও কাওয়াবাতার এই পুরস্কার লাভ উল্লেখযোগ্য:

বিংশ শতাব্দীর মার্কিন সাহিত্য

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

৪। মার্কিন উপন্যাস : ১৯০০—১৯৫০ : বাস্তববাদের সন্ধানে

উনিশ শতকে মার্কিন উপন্যাস বা আরো ব্যাপকভাবে মার্কিন সাহিত্যের যে ঐতিহ্য, তাতে দুটি পৃথক ধারার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। একজনেরা জোর দিয়েছিলেন মানুষের মনের উপর, যে মন নিজেকে নিয়ে ভাবে, বাঁচে, অনেকটা নিজেকে নিয়েই কাটিয়ে দেয়। অন্যেরা জোর দিয়েছিলেন বাইরের জগৎ বা সমাজের সঙ্গে মানুষের বিচিত্র সম্পর্কের উপর : এই সমাজ তার নানা সমস্যা নিয়ে পরিবর্তিত হচ্ছে, নতুন সমস্যার বোধ মানুষের মনে আনছে : মানুষ তার সামাজিক জীবনে কী ভূমিকা গ্রহণ করবে, কীভাবে সমাজের সঙ্গে মোকাবিলা করবে, এই প্রশ্ন নিয়েই এঁরা ভাবিত। এই দুই ধারাকে নৈতিক বা আত্মিক বাস্তবতা এবং সমাজবাস্তবতা, এই দুই নামে অভিহিত করা হয়েছে। এমার্সন, হথর্ন, হিরট্ইয়ার প্রমুখ প্রথম পর্বের লেখকদের সম্পর্কে হেমিংওয়ে মন্তব্য করেছিলেন : "এঁরা সকলেই ছিলেন ভদ্রলোক, নয়তো সেই-রকমই সাধ ছিল। এঁরা সকলেই বড় সুচারু শোভন। সাধারণ লোকে যেসব কথা চিরকাল ব্যবহার করেছে, যেসব কথা নিয়েই ভাষা, সেইসব কথা তাঁরা ব্যবহার করেন না। তাঁদের লেখা পড়ে যেন ভাবাই যায় না, তাঁদের শরীর বলে কিছু ছিল। তাঁদের ছিল মন। সূক্ষ্ম, শুকনো, পরিচ্ছন্ন মনগুলো। সমগ্র আধুনিক মার্কিন সাহিত্যের সূত্রপাত একটি বই থেকে। মার্ক টোয়েনের 'হাক্‌লবেরি ফিন্' থেকে। তার আগে কিছুই ছিল না।" মার্ক টোয়েনের (১৮৩৫—১৯১০) 'হাকলবেরি ফিন্' এক তথাকথিত 'রাস্তার ছেলে'র অমার্জিত, অশুদ্ধ জবানীতে লেখা। কোন এক মমতাময়ী বর্ষীয়সীর আশ্রয় থেকে পালিয়ে এক পলাতক নিগ্রো ক্রীতদাসের সঙ্গে হাক্ ফিন্ বিশাল মিসিসিপি নদীতে ভেসে পড়ে। কখনও কখনও গ্রামে বা মফস্বল শহরে ডাঙায় ওঠে আবার নদীতে। মানুষের শঠতা, প্রবঞ্চনা, ঘৃণা, বর্ণবিদ্বেষ, ইতরতা, সবই হাক্ দেখে। যেহেতু পাঠশালার সার্থক শিক্ষায় সে লালিত নয়, তাই তার ন্যায়-অন্যায় বোধও অনাস্বাদের। যে শিক্ষায় মানুষ কালো মানুষের ক্রীতদাসত্বকে স্বীকার করে নিতে শেখে, সেই শিক্ষার অমানুষিকতা হাক্ লাভ করে নি। সে ভাগ্যবান। তাই ঐ পলাতক ক্রীতদাসকে বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করার দায় হাক্ অত সহজেই নিজের ঘাড়ে তুলে নেয়। 'রাস্তার ছেলে' হাক্-এর প্রবল আপত্তি, সে কিছুতেই 'সভ্য' হবে না। হাক্‌লবেরি ফিনের এই উদার মানবিক বর্বরতার ধর্ম পরবর্তীকালের মার্কিন উপন্যাসেও বারবার এসেছে। বাস্তব জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার যে উপন্যাস, তার বিপরীত প্রান্তে হেনরি জেম্স্-এর (১৮৪৩—১৯১৬) উপন্যাস। জেম্স্ তাঁর এক প্রবন্ধে 'অভিজ্ঞতা"র সংজ্ঞা নির্দেশ করেন : "অভিজ্ঞতা কখনই সীমিত নয়, আবার কখনই সম্পূর্ণ নয়। অভিজ্ঞতা এক বিপুল সংবেদনশীলতা, চেতনার কক্ষে বিলম্বিত সূক্ষ্মতম রেশমি তন্তুর যেন এক বিপুল মাকড়সার জাল, তার তন্তুতে বায়ুবাহিত প্রতিটি অণুকে ধরছে। অভিজ্ঞতা মনেরই আবহাওয়া। মন যখন কল্পনাপ্রবণ হয়—বিশেষত যখন কোন প্রতিভাধরের মন—তখন তা জীবনের ক্ষীণতম ইংগিতগুলিকেও গ্রহণ করতে পারে, বাতাসের স্পন্দনও যেন জীবনের কোন প্রকাশকে পেয়ে যায়।" অভিজ্ঞতা প্রতিদিনকার বাঁচার অভিজ্ঞতা, একটা বিশেষ স্থানকালিক জমিতে দাঁড়িয়ে বাঁচার অভিজ্ঞতা, না "মনেরই আবহাওয়া"—অভিজ্ঞতার এই দুই সংজ্ঞা থেকেই বাস্তবতার দুই ভিন্ন ধারণার সূত্রপাত।

গত শতাব্দীর শেষের দিকেই লক্ষ করা যায়, সমাজবাস্তবতা ক্রমশ প্রবল হচ্ছে। এই ধারার প্রথম কীর্তিমানদের —১৯৪১), জ্যাক লন্ডন (১৮৭৬—১৯১৬), আপটন সিনক্লেয়ার (১৮৭৮—) ও ফ্র্যাংক নরিস্ (১৮৭০—১৯০২)। অ্যানডারসনের 'ওয়াইনসবর্গ ওহিও,' আপাতদৃষ্টিতে গল্পসমষ্টি হলেও প্রায়ই উপন্যাসরূপে বিবেচিত। জর্জ উইলার্ড নামে এক সাংবাদিক তার সর্বাত্মক সহানুভূতির গুণে ওয়াইনসবর্গের নিঃসংগক্লিষ্ট অনেকগুলি মানুষের অন্তরঙ্গ গোপন ব্যথা ও আর্তির স্বীকৃতি যেন তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। এই গল্পগুলির অধিকাংশই জর্জ উইলার্ডকে উপলক্ষ করে। এই কারণেই গল্পগুলি একত্রে উপন্যাস বলে মনে হয়। এর সবকটি চরিত্রকেই 'অদ্ভুত' বলা যায় : এরা কেউই স্বাভাবিক নয়। কোন এক স্মৃতি কিংবা গ্লানি কিংবা কোন ব্যর্থতাবোধের তাড়নায় এরা সকলেই নিঃসঙ্গ। একটি গল্পে অ্যানডারসন লেখেন : "অনেক সত্য ছিল। কৌমার্যের সত্য, আবেগের সত্য, সম্পদ ও দারিদ্র্যের সত্য, কার্পণ্য ও অমিতব্যয়ের সত্য, অযত্ন ও বেপরোয়াপনার সত্য। লাখো লাখো সত্য। প্রত্যেকটাই সুন্দর। তারপর মানুষ এল। প্রত্যেকে এক-একটা সত্য তুলে নিল। যারা শক্তিমান তারা একসঙ্গে অনেকগুলো সত্য তুলে নিল। এই সত্যগুলোই মানুষকে অদ্ভুত করে তুলল। যে মুহূর্তে একটি মানুষ একটি কোন সত্যকে গ্রহণ করে তাকে তার নিজের সত্য বলে ধরে নেয়, সেই সত্যকেই অবলম্বন করে জীবনাবসান করতে চায়, সেই মুহূর্তেই সে অদ্ভুত হয়ে ওঠে যে সত্যকে সে অবলম্বন করেছিল, তাও মিথ্যা হয়ে যায়।" এই 'অদ্ভুত' বলতে অ্যানডারসন যা বোঝেন এই মানুষগুলি নিজেদের এক-একটি বিশ্বাস লালন করতে করতে আশপাশের মানুষ থেকে যেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তেমনি নিজেরাও ব্যর্থতাবোধে পীড়িত হতে থাকে, সহসা কোন অসংযমে ভেঙে পড়ে। অ্যালিস হাইনডম্যান নেড কারিকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু নেড ফিরে আসার কথা দিয়ে অনেকদিন হল শহর ছেড়ে চলে গেছে। অ্যালিস অপেক্ষা করে থাকে বহু বছর, বিবাহিত জীবনের জন্য টাকা জমায়, নেড-এর শখ-সাধ কী করে পূর্ণ করবে, তা-ই ভাবে। আর কর্মক্ষেত্রে আরো বেশিক্ষণ কাজ করে।

অ্যালিস কোন কোন রাত্রে একটা বালিশকে কাপড়ে জড়িয়ে আরেকটা মানুষের আদল দেয়, তাকে খাটে শুইয়ে তার উপর হাত বোলায়, তার সংগে ফিসফিস করে কথা বলে। শেষে একদিন রাত্রে প্রবল বৃষ্টির মধ্যে সে বিবস্ত্রা হয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে : "সে ভেবেছিল বৃষ্টি বুঝি তার শরীরে আশ্চর্য প্রাণময় কিছু ঘটিয়ে দেবে। বহু বছর সে এমন যৌবন, এমন সাহস তার শরীরে অনুভব করে নি। সে চাইছিল, লাফাবে, ছুটবে, চেঁচিয়ে উঠবে, আরেকটা কোন নিঃসঙ্গ মানুষকে খুঁজে বার করে জড়িয়ে ধরবে।" শেষ পর্যন্ত অন্ধকারে ধারাবর্ষণের মধ্যে একটি মানুষকে দেখতে পেয়ে অ্যালিস তাকে ডেকে ওঠে : "দাঁড়াও। চলে যেও না। তুমি যে-ই হও তোমাকে দাঁড়াতেই হবে।" লোকটি বধির। সে কথাগুলো বুঝতে পারে না। ক্ষণকাল বুঝবার চেষ্টা করে, চলে যায়। ওদিকে "অ্যালিস মাটিতে শুয়ে পড়ে কাঁপতে থাকে। নিজে যা করেছে, তাতে সে এতই ভয় পেয়ে গেছে যে, লোকটি চলে গেলেও সে সাহস করে উঠে দাঁড়াতে পারে না। ঘাসের মধ্য দিয়ে বুকে হেঁটে সে বাড়িতে গিয়ে পৌঁছয়।" রাত্রে শুয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করে, "ওয়াইনস্‌বার্গেও বহু মানুষকে একাই বাঁচতে হবে, একাই মরতে হবে।" এমনিই অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন গল্প, একটি ছোট শহরের আপাততৃপ্ত মানুষের নৈঃসঙ্গ নিয়ে। গল্পগুলিকে বিচ্ছিন্ন গল্প হিসেবে নিলে গদ্যকবিতা মনে হয়। সবগুলো মিলিয়ে একটা আগোছালো উপন্যাস খুঁজে পাওয়া যায়।

স্যানডারসনের লেখার কাব্যধর্মিতা ফ্র্যাংক নরিসের লেখায় নেই। নরিসের প্রত্যক্ষ যোগ ফরাসি স্বাভাবিকবাদী লেখকদের সংগে, বালজাক ও এমিল জোলার সংগে। এঁরা বিশ্বাস করেন, মানুষ কখনই নিজের নিয়তি নির্ধারণ করতে পারে না। মানুষ তার জন্মসূত্রে প্রাপ্ত মানসিকতা ও প্রতিবেশের দাস, সমাজযন্ত্রের ক্রীড়নক। 'দি অক্টোপাস' উপন্যাসের শেষে নরিস লেখেন, "মানুষ কিছু নয়। জীবন কিছু নয়। আছে কেবল শক্তি। শক্তিই মানুষকে পৃথিবীতে আনে, শক্তিই গম ফলায়। শক্তিই তাকে মাঠ থেকে বার তুলে পরের ফসলের জন্য জায়গা করে দেয়।" ব্যক্তিমানুষের এই সীমাবদ্ধতা মেনেও মানবসমাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর আশা পোষণ করতে অবশ্য নরিসের বাধে নি। জোলার মতই নরিসও বিশ্বাস করেছেন জন্মসূত্রে প্রাপ্ত মানসিকতার উপর। 'ম্যাক্‌টীগ' উপন্যাসে ম্যাকটীগ সম্পর্কে নরিস লেখেন : "তার মধ্যে যা কিছু ভালো তার পরিচ্ছন্ন বুননের নিচে প্রবাহিত ছিল বংশগত পাপের দূষিত ধারা...। তার পিতা, পিতামহ, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চশত পুরুষের পাপ তাকে দূষিত করে রেখেছিল। একটা সমগ্র বংশের পাপ তার ধমনীতে প্রবাহিত। কেন এমন হবে?...তার দোষ কতটুকু?" প্রথম দিকের উপন্যাসে বংশগত উত্তরাধিকারের উপর জোর দিলেও শেষের দিকের উপন্যাসে নরিস জোর দিয়েছিলেন ব্যক্তির সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবেশের উপর। নরিস লিখেছিলেন : "জনসাধারণের যেমন জীবন, স্বাধীনতা ও সুখের অধিকার আছে, তেমনি সত্যেও অধিকার আছে। জীবন সম্পর্কে মিথ্যা ধারণা, মিথ্যা চরিত্র, মিথ্যা ভাবাবেগ, মিথ্যা ইতিহাস, মিথ্যা দর্শন, মিথ্যা অনুভব, মিথ্যা বীর্য, আত্মত্যাগের মিথ্যা ধারণা, ধর্ম, দায়িত্ব, আচরণ ও ব্যবহার সম্পর্কে মিথ্যা ধারণার প্রবঞ্চনায় তাদের শোষণ করা অন্যায়।" 'ম্যাকটীগ' উপন্যাসে একটি মানুষ হঠাৎ আপাত সুখ ও নিশ্চিন্ততার মধ্যে একটি ঘটনায় সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে—প্রথমে নিজের প্রতিবেশের উপর ক্ষমতা হারায়, তারপর প্রতিবেশীদের উপর, শেষে নিজের উপর, ক্রমশ লোভে যেন জান্তব হয়ে ওঠে। বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে নরিস গম সম্পর্কে এক উপন্যাসত্রয়ী রচনার পরিকল্পনা করেন। এর মধ্যে শেষ পর্যন্ত দুটি লেখা হয়—'দি অক্টোপাস' ও 'দ পিট' (খাদ)। প্রথমটিতে ক্যালিফোর্নিয়ায় গমের উৎপাদন ও রেলওয়ে ব্যবস্থার প্রচণ্ড ব্যবসায়িক ক্ষমতার উদ্ভব, এবং দ্বিতীয়টিতে শিকাগোর গম মজুতের ব্যবসা -এই দুই বাস্তব অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা। 'দি অক্টোপাস'-এ রেলওয়ে ব্যবসায়ের অধিকর্তা শেলগ্রিম বলেন, "গম এক শক্তি, রেলপথ আরেক শক্তি। এই দুটোকেই চালনা করে চাহিদা ও যোগানের আইন। পুরো ব্যাপারটায় মানুষের কিছু করার নেই।"

মানুষকে সমাজপ্রতিবেশের দাস ভাবতে ভাবতে ঐ সমাজপ্রতিবেশকে নিজের বশে আনার প্রবণতা সতই বাড়ে, ঐ সমাজপ্রতিবেশকে বদলাবার তাগিদও সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। এইভাবেই স্বাভাবিকবাদী লেখকেরা সমাজবাদী ও কমিউনিস্ট চিন্তাধারার দিকে এগোতে থাকেন। মাস্কো তোলা, সীল মাছ শিকার, ট্রেনের ইনজিনের কাজ ভবঘুরে জীবন, বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে উপন্যাসে কাজে লাগিয়েছিলেন জ্যাক লন্ডন। কিন্তু আজ স্বল্পপঠিত হলেও লন্ডনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস 'দি আয়রন হীল' (লোহার খুর) লেখা হয়েছিল মার্ক্‌স-এর 'ক্যাপিটাল' পাঠ ও সমাজবাদী চিন্তা প্রচারের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায়। এই উপন্যাসটি এমনভাবে লেখা যেন আজ থেকে সাত শো বছর পরে এই বিংশ শতাব্দীর এক সমাজবাদী নেতার স্ত্রী অ্যাভিস এভারহার্ডের স্মৃতিকথা টীকা-পাদটীকাসহ মুদ্রিত হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটি যেন একটি বাক্যের মাঝখানে শেষ হয়ে গেছে। রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম বৈপ্লবিক সংগ্রাম কীভাবে শাসকশক্তির সৈন্যদের লোহার খুরের তলায় দমিত হল, তারই কাহিনী। ১৯১৭-র সোভিয়েত বিপ্লবের অনেক আগে লেখা এই উপন্যাসে তিরিশের যুগের জর্মনিতে শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদী স্টর্মট্রুপারদের দমননীতির রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রথম শ্রমিক আন্দোলনের কাব্যময় উচ্ছ্বসিত স্বপ্নচারিতা ও প্রবল কর্মোদ্দীপনা এই উপন্যাসে পরাভবেই অবসিত হয়। তবুও এই উপন্যাসের ভূমিকা লিখতে গিয়ে ফরাসি কথাসাহিত্যিক আনাতোল ফ্রাঁস লেখেন : "মেহনতি মানুষের উত্তরাধিকারীরা শোন। ভবিষ্যতের মানুষ, অনাগত দিনের সন্তানেরা শোন। তোমরা সংগ্রাম করবে। পরাভবের তাড়নায় যখন তোমাদের মনে সংশয় আসবে, তখন তোমরা মহান এভারহার্ডের বাণী থেকেই সাহস পাবে, তাঁরই সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলবে : 'এবার আমরা হেরে গেলাম। কিন্তু এই হার চিরকালের জন্য নয়। আমরা অনেক শিখেছি। আগামী দিনে আমাদের আদর্শ আবার আমাদের চোখের সামনে উঠে আসবে প্রজ্ঞায় শৃঙ্খলায় আরো বলীয়ান হয়ে।'"

সমাজবাদী আন্দোলনের এই পর্বের সংগে জ্যাক লন্ডনের যেমন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল, তেমনি সম্পর্ক ছিল আপটন সিনক্লেয়ারের। আপটন সিনক্লেয়ার ও তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা যে আন্তঃকলেজ সমাজবাদী পরিষদ গঠন করেছিলেন, তার প্রথম সভাপতি হন জ্যাক লন্ডন। তবুও আপটন সিনক্লেয়ারের উপন্যাসে রাজনৈতিক চেতনার দীনতা বড় স্পষ্ট। স্বাভাবিকবাদী রীতিতে বিভিন্ন শহর ও বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে মানুষের দুর্দশার সাংবাদিকসুলভ বর্ণনার চেয়ে বেশি তিনি কিছু দিতে পারেন নি। এমন কি তার একমাত্র মোটামুটি সার্থক উপন্যাস 'দ জাংগল' রচনার পঞ্চাশ বছর পর ১৯৫৭ সালে তিনি এই বলেই সান্ত্বনা পান যে, এত দিনে সমস্ত সরকার বাহাদুরের করুণা

অথচ দুর্দশার মাঝে রয়েছেন। এইভাবেই আপোষরফায় সব অনাচার ঠিক হয়ে যাবে; ওসব নিয়ে ভাবনা-চিন্তার কোন কারণ নেই। সিনক্লেয়ার বরং আজ এতেই খুশি যে তিনি নব্বই বছর বয়সে ভবিষ্যতে বেঁচে আছেন। তাঁর ভাবনাচিন্তা 'ডায়েট' নিয়ে (সিনক্লেয়ার নিরামিষাশী, তাঁর খাদ্য ও পানীয় বলতে চাল, ফল, ফলের রস, সামান্য দুধ)।

স্বাভাবিকবাদী ঐতিহ্য ও সমাজবাদী চিন্তার মেলবন্ধন পরিণতি লাভ করে থিওডোর ড্রাইজারের (১৮৭৫-১৯৪৫) রচনায়। উল্লেখযোগ্য, ড্রাইজারের প্রথম উপন্যাস 'সিস্টার ক্যারি' প্রকাশে উদ্যোগ ছিল পূর্বসূরী ফ্র্যাংক নরিসের। শেরউড অ্যানডারসন তাঁর গল্পগ্রন্থ ড্রাইজারকে উৎসর্গ করেছিলেন। কঠোর কর্মজীবন, দারিদ্র্য ও সাংবাদিকতা, ড্রাইজারের সাহিত্য-চিন্তার পটভূমি রচনা করেছিল। 'দ জীনিয়স' উপন্যাসে তিনি লেখেন : "এই তরুণদের অধিকাংশই জীবনকে ধরে নিয়েছিলেন এক ভয়ংকর, নিষ্করুণ, অনিঃশেষ সংগ্রাম। এই সংগ্রামে কেউ কাউকে করুণা দেখায় না। এখানে সব মানুষই ফাঁদ পাতে, মিথ্যাচরণ করে, নিজেদের নষ্ট করে, মোহবশে ভুল করে। এই সিদ্ধান্তে আমারও আজ সম্পূর্ণ সম্মতি।" হার্বার্ট স্পেনসারের লেখা পড়ে সমাজের যান্ত্রিক শক্তিসমূহ মানুষের উপর কী প্রচণ্ডভাবে কার্যকর, তা-ই ড্রাইজারকে আবিষ্ট করে : "আমি স্পেনসার পড়ে কেবলই দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি।" প্রথম দুটি উপন্যাসে—'সিস্টার ক্যারি' ও 'জেনি গেরহার্ডট'—ড্রাইজার নায়িকা নিয়ে উপন্যাস লিখেছিলেন, বোধহয় ঘটনাপরম্পরার চাপে মানুষের অক্ষমতাকে আরো প্রকট করে তুলতে পারবেন বলে। তা ছাড়াও অবশ্য ছিল কিছু পারিবারিক স্মৃতির উপকরণ—ড্রাইজারের দুই ভগিনীর অভিজ্ঞতার স্মৃতি। দুটি উপন্যাসেই চিরাচরিত নৈতিক মূল্যবোধ বর্জিত। ক্যারি মীবার কেবলমাত্র সম্পদ ও পার্থিব সুখের আকর্ষণে ব্যক্তিগত যাবতীয় সম্পর্ক দলিত করে সাফল্যের সুখের সিঁড়ি বেয়ে ধাপে ধাপে এগোয়, তার প্রেমিক হার্স্টউড প্রায় বিনা অপরাধেই দুর্দশার পংক ক্রমশই নিমজ্জিত হয়। শেষ পর্যন্ত নীতিবোধমুক্ত ক্যারি শাস্তি পায় না বলে সমালোচকেরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উপন্যাসের প্রচার বন্ধ করতে প্রকাশককে বাধ্য করেছিলেন। অথচ জীবন কোন নীতিবোধ মেনে চলে না, কোন অর্থ চলে না, এই তত্ত্বই ড্রাইজারকে চালিত করেছিল। জেনি গেরহার্ডটও এক ধনীর রক্ষিতামাত্র, যদিও "যা কিছু সৎ, যা কিছু মমতাময়, তা-ই তার প্রবৃত্তির উৎস।" যে লেস্টারের জন্য জেনি সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত, সেই লেস্টার সামাজিক মর্যাদা ও পৈতৃক সম্পত্তির লোভে তাকে ত্যাগ করে নিঃসঙ্গে রেখে যায়। গিয়েও অবশ্য শান্তি পায় না, জেনির কাছে স্বীকার করে : "তোমার কাছে যত সুখ পেয়েছিলাম, আর কখনও তা পাব না।...আসলে ব্যক্তির কোন দামই নেই। আমরা সকলেই দাবার বোড়ে। ঘটনাচক্র দাবার গুটির মত আমাদের নিয়ে খেলা করে। জীবন একটা প্রহসন। একটা নির্বোধ খেলা। আমরা যা করতে পারি, আমাদের ব্যক্তিত্বকে অটুট রাখার চেষ্টা করতে পারি। সততার কোন দাম আছে বলে আর মনে হয় না।" জীবনের কোন নৈতিক ভিত্তি নেই, মানুষের কোন নৈতিক ভূমিকা নেই, এহেন দর্শন থেকে ড্রাইজার নীটশের চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দর্শনের সঙ্গে আত্মীয়তাবোধ করতেন, বন্ধু মেংকেনকে বলেছিলেন নীটশে যেন তাঁর "পরম দোস্ত"। এই চিন্তা থেকেই ড্রাইজার মার্কিন শিল্পপতিদের জীবন গভীরভাবে লক্ষ করে, প্রচুর কাঠখোট্টা তথ্য আহরণ করে 'দ ফিন্যানসিয়ার', 'দ টাইটান' ও 'দ স্টইক' উপন্যাসত্রয়ী রচনা করেছিলেন। ফ্র্যাংক কুপারউডের অতিমানবিক ক্ষমতা, সর্বনীতিবোধবিবর্জিত, ধূমকেতুর সঙ্গে, প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে তুলনীয়। জীবনের গতিময়তা ও পরিবর্তনশীলতা ড্রাইজারের কল্পনায় লক্ষ্যহীন অর্থহীন, অপার্থিক। কুপারউড অল্প বয়সে একদিন দেখেছিল, একটা গলদাচিংড়ি একটা পোকাকে আত্মসাৎ করে, দেখে শিখেছিল, "প্রাণীমাত্রই একে অন্যকে গ্রাস করে বাঁচে।" জীবনের ধর্ম বলে এই জান্তব ধর্মকে মেনে নিয়ে ড্রাইজার প্রায় এক নৈতিক নিরপেক্ষতায় পৌঁছে যান।

ড্রাইজারের মহত্তম কীর্তি 'অ্যান আমেরিকান ট্র্যাজেডি' উপন্যাসে ক্লাইড গ্রিফিথস দারিদ্র্য থেকে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টায় ধনী আত্মীয়ের দাক্ষিণ্য ও বংশমর্যাদার সুবিধা কাজে লাগায়, একটি গরীব মেয়ের প্রেমে পড়ে, কিন্তু ধনী-কন্যার লোভে তাকে মারবার কথা ভাবতে থাকে। অথচ ক্লাইড রোবার্টাকে হত্যা করার সাহসও পায় না। রোবার্টা ঘটনাক্রমে জলে পড়ে যায়। ক্লাইড তাকে ডুবে যেতে দেখে, তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করে না। শেষ পর্যন্ত রোবার্টাকে হত্যার দায়েই ক্লাইডকে মরতে হয়। একে ঠিক কোন অর্থে কি সত্যিই ট্র্যাজেডি বলা যায়, এতেও আপাতিকতারই জয়জয়কার, ব্যক্তির ক্ষমতার ন্যূনতা। বরং সমগ্র পরিবেশের চিন্তা ও কল্পনার দীনতাই, সমাজে অর্থলোভের প্রচণ্ড অন্ধ তাগিদই বিপর্যয় ঘটায়। একটা প্রচ্ছন্ন নৈতিক সমালোচনা এই উপন্যাসেই যেন প্রথম ধরা যায়। ১৯৪৫-এ ড্রাইজারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় তাঁর বন্ধু চার্লস্ চ্যাপলিন ড্রাইজারের যে কবিতাটি পাঠ করেছিলেন, তাতে "যে পথে এসেছি" সেই পথ নিয়েই প্রশ্ন ছিল : "মনে হয় জানি/অথচ জানি না/...অথচ জানা গেলে/প্রজ্ঞা--/হয়ত ক্ষমতাও,/সৃষ্টির শক্তি।" জীবনের একটা অর্থ পাওয়া যাবে, এই ভরসায় জীবনের শেষতম বছরে ড্রাইজার মার্কিন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ প্রার্থনা করেন : "আমার মনে হয়, মানুষের প্রতি আস্থাই এক অত্যন্ত সহজ অথচ গভীর সত্য, বর্তমান বিশ্ব সংকটে তা-ই প্রমাণ হল। মানুষের মহত্ত্ব ও মর্যাদায় আস্থা আমার জীবন ও সৃষ্টিকে রূপ দিয়েছে। আমার জীবন ও রচনার অন্তর্নিহিত যুক্তিই আমাকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ প্রার্থনায় অনুপ্রাণিত করেছে।" এই চিঠি লেখার তিন মাস আগেই ড্রাইজার গির্জায় গিয়ে কমিউনিয়ন অনুষ্ঠানে ঈশ্বরপুত্রের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন। গুড ফ্রাইডের দিন থেকে ২০ জুলাই-এর মধ্যে ড্রাইজার কি সত্যিই বদলে গেছিলেন? না কি দুটোই সত্য, আশ্বাস ও ভরসা লাভের দুটো বিচ্ছিন্ন শেষ চেষ্টা? ড্রাইজারের চিঠিতে রাজনীতির কথা, তত্ত্বের কথা বিশেষ নেই, যা আছে, তা হল স্তালিন, মাও-সে-তুঙ, চৌ এন লাই, জোলিও কুরি, ল্যাজভ্যাঁ, হলডেন, পিকাসো, আরাগঁ, মার্টিন অ্যানডারসেন নেকসো, শন ও' কেসি এবং পরমসাহসিক মার্কিন কমিউনিস্টদের সঙ্গে এক পংক্তিতে দাঁড়িয়ে খানিকটা জোর পাবার সাধ।

'মেলাবেন তিনি মেলাবেন'
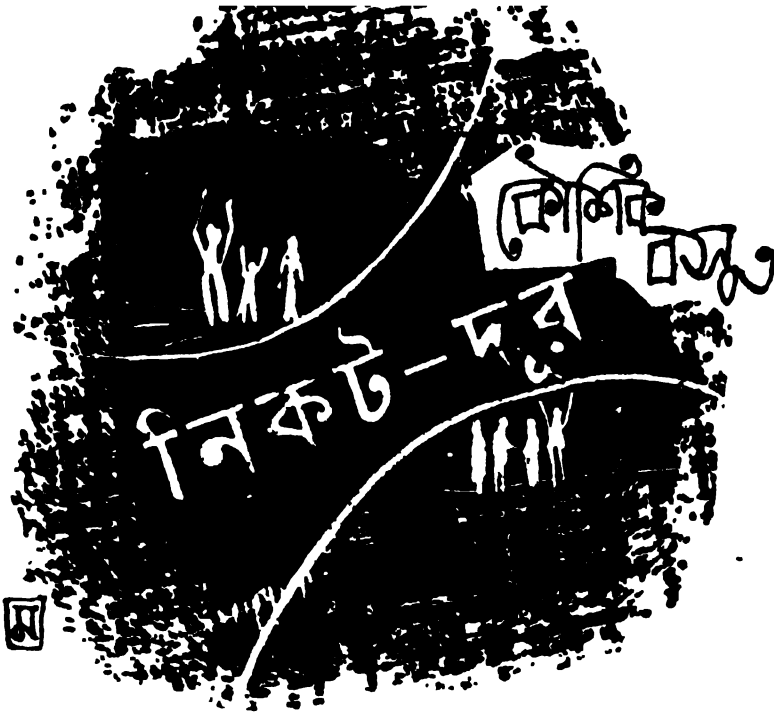
ইংরেজ কবি কিপলিঙ-এর এই লাইনটির সঙ্গে বাঙালি পাঠক মাত্রেরই পরিচয় আছে—

Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet.

এই ইংরেজ কবি বোম্বাই শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সাংবাদিকতার কাজে ভারতভূমিতে তাঁকে অনেকদিন থাকতে হয়েছিল। কিপলিঙের কবিখ্যাতির সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্মৃতি জড়িত আছে; তাঁর বিবিধ কবিতায় ইংরেজ দেশপ্রেমকে জাগ্রত করার দিকে ঝোঁক দেখা যায়, সে যুগের ভারতবাসীর চোখে তা খুব অভিনন্দনীয় ছিল না, বলাই বাহুল্য। তাই যখন তিনি লিখেছিলেন—'পূর্ব পূর্বই এবং পশ্চিম পশ্চিমই এবং তারা কখনোই মিলিত হবে না' তখন তাতে পরাধীন জাতের মানুষের আত্মসম্মানে লেগেছিল এমন অনুমান কল্পনা করে নিতে পারি। আর ভৌগোলিক অর্থে পরাধীন হলেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বাধীন হতে তো কোনো বাধা নেই। সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা মানে গ্রহণ-বর্জনের সুযোগ, চিন্তার বিনিময়—যা কিপলিঙের পূর্ববর্তী এবং সমকালীন প্রাতঃস্মরণীয় ভারতবাসীরা পুরোমাত্রায় ভোগ করেছিলেন। সুতরাং এই সত্যের উচ্চারণ মানুষের মুক্ত চেতনাকে আহত করলে তাতে আর সন্দেহ কি?

'Never the twain shall meet' —সত্যি কি তাই? কবির দৃষ্টিতে যাই হোক না কেন, যদি পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো পূর্ব-পশ্চিম সত্যসত্যই এক জায়গায় এসে মিলেছে। পূর্ব ও পশ্চিম অর্থে আমি এখানে এশিয়া ও ইউরোপের কথাই বলতে চাইছি। মানচিত্র আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে যে, এই দুই মহাদেশ উরল পর্বতমালার দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আর একটু নিচের দিকে যদি তাকাই দেখতে পাবো যে অন্য একটি পর্বতমালা, ককেশাস, যার দুদিকে কৃষ্ণসাগর আর কাস্পিআন সাগর, এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে সেতুবন্ধনের মতো বিরাজ করছে। ককেশাস পর্বতমালা আর তার নিকটবর্তী ভূখণ্ডের প্রতি বর্তমানে আমি মনোযোগ সংহত করতে চাই, কারণ এই জায়গাটি পৃথিবীর ইতিহাসে এবং মানুষের জয়যাত্রায় পুরাকাল থেকেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পুরাকাল থেকে বলছি তার কারণ ককেশাস পর্বতের প্রথম উল্লেখ পাই আমরা গ্রীক পুরাণে। এই পর্বতেই জিউস্ মানবহিতৈষী প্রমিথিউসকে বেঁধে রেখেছিলেন ভয়ংকর শাস্তি দিয়ে, কেন না প্রমিথিউস স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে পৃথিবীর মানুষকে আগুনের সবরকম ব্যবহার শিখিয়েছিলেন। ককেশাস পর্বতে বন্দী প্রমিথিউসকে এক অসহনীয় এবং দুঃস্বপ্নময় যন্ত্রণা দিবারাত্রি ভোগ করতে হতো—দিনের বেলা একটি ঈগল তাঁর যকৃৎ খুঁটে খেতো, পরবর্তী রাত্রে আবার তা সম্পূর্ণ তাজা হয়ে উঠতো। এইভাবে অনবচ্ছিন্ন যন্ত্রণা ও আরোগ্য, জৈব উদ্বেগ ও মরণাধিক কষ্ট ভোগ করে করে অবশেষে একদিন তাঁর শাপমুক্তি ঘটলো হারকিউলিসের হাতে, যিনি জিউসের অনুমতি নিয়ে ঈগলটিকে হত্যা করলেন। এই হচ্ছে প্রমিথিউস-পুরাণের সাদামাটা বিবরণ—কিন্তু নিছক গল্পের মধ্যেই তো পুরাণের আগুনে, তার জন্ম-ইতিহাস ব্যাখ্যাত হয়েছে এই পুরাণে আর এইখানেই ধ্বনিত হয়েছে দেবভোগ্য ক্ষমতার বিরুদ্ধে মানুষের প্রথম বিদ্রোহের কথা। লক্ষ করবার বিষয় এই যে এই পৌরাণিক ঘটনা ঘটেছিল ইউরোপ ও এশিয়ার সংগমস্থলে। যেন দুই মহাদেশের অন্তর্বর্তী এই স্থলে মানুষের পরিত্রাতাকে স্থাপন করে দেবাধিপতি জিউস এই কথাই বলতে চাইলেন যে, মানুষ মূলত এক এবং অবিচ্ছিন্ন। এই কথাটিই যেন আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে নোআ-র উপাখ্যানে। মানুষের পাপে ও দুর্নীতিতে অতিষ্ঠ হয়ে ভগবান তাঁরই সৃষ্টি মানুষকে ধ্বংস করবার অভিপ্রায়ে চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত ধরে পৃথিবীকে বৃষ্টির জলে ধুইয়ে দিলেন—ভেসে গেল মানুষ, পশু, উদ্ভিদ, যা কিছু প্রাণময় সব। শুধু বেঁচে রইলো ভালোমানুষ নোআ—তাঁরই পরামর্শ মতো নির্মিত একটি নৌকোয় নোআ কতিপয় জোড়া জোড়া পশু-পাখি সমেত জলের উপর ভেসে রইলো। এইভাবে দিনের পর দিন অবিরাম জল, তারপর 'আকাশের জানলা' বন্ধ হলো, জল নেমে যেতে লাগলো ক্রমে ক্রমে, এক দৈবপ্রেরিত হাওয়া বইতে লাগলো পৃথিবীর উপর দিয়ে এবং নোআর দেবাদিষ্ট নৌকো এসে ঠেকলো আরারাত পর্বতের উপর। আরারাত পর্বত—মানে আবার আমরা এসে গেলুম এশিয়া-ইউরোপের সংগমস্থলে। এবং নোআর নৌকো যে এখানেই পৃথিবীর মাটিকে পেয়েছিল, মানুষের এই নবজন্মভূমিতেই যে তার দেবাদিষ্ট যাত্রা শেষ হলো—এই ব্যাপারটি নিশ্চয়ই মানবসভ্যতার ইতিহাসে অনুপেক্ষণীয়।

শুধু পুরাণ বা বাইবেলের ঘটনার জন্যই বিখ্যাত নয় এই জায়গা। ইতিহাসের পাঠকরা জানেন এই অঞ্চলেই চেঙ্গিস খান এবং তৈমুরলঙ একদা বহু রক্তপাত ঘটিয়ে নিজেদের দেশবিজয় সম্পূর্ণ করেছিলেন। একদিন যেখান থেকে মানুষের সম্মিলিত যাত্রা শুরু হলো, পরবর্তীকালে সেখানেই মানুষে মানুষে কাটাকাটি হানাহানি এক বীভৎস চেহারা গ্রহণ করলো। তবু তারও তো প্রয়োজন ছিল ইতিহাস গঠনের জন্য। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের ধমনীতে এশিয়ার দুই শ্রেষ্ঠ বীর চেঙ্গিস খান এবং তৈমুরলঙের রক্ত প্রবাহিত ছিল—ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে এই তথ্যটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। একথা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না যে রাজা-রাজড়ার যুদ্ধ আপাতভাবে যতোই বিধ্বংসী হোক না কেন, তারও গঠনের দিক আছে। তাই এশিয়া-ইউরোপের মিলনভূমিতে নির্বাসিত প্রমিথিউস যে আগুনের সন্ধান মানুষকে দিয়েছিলেন, সেই আগুনে যদি আলোর সঙ্গে সঙ্গে

দাহ ও সৃষ্টি করে থাকে তাহলে বুঝতে হবে প্রবাহ ছাড়া মানব এগোতে পারে না। মানব এক এবং অখণ্ড এই সত্য-দ্রষ্টারা যতোই এ কথা বলুন না কেন অনাদিকাল থেকে, সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা কিন্তু ভিন্ন। সে অভিজ্ঞতা বলে যে পৃথিবীতে বিরোধই সত্য, আর সেই হেতু একাকে নিয়ে ঐক্য হয় না, তাই ভিন্নতা ও বিরোধ মানুষকে সাম্প্রতিক দুঃখের মধ্য দিয়ে অনাগত ঐক্যের দিকেই এগিয়ে দেয়।

এশিয়া ইউরোপের ভৌগোলিক মিলন-ভূমিতে এই যে পৌরাণিক সময় থেকে এতো ঘটনা ঘটে গেল, তা কি এই দুই মহাদেশকে কোনো আন্তরিক মিলনে ধরে রাখতে পেরেছে? পারে নি, এবং তার কারণ খুঁজে বার করাও খুব কষ্টকর নয়। নানা দেশে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও ইউরোপীয় সংস্কৃতি কথাটির একটি নির্দিষ্ট মানে আছে আমাদের কাছে—তা ফ্রান্সের সভ্যতা নয় জর্মানির সভ্যতা নয়, ইংরেজ সভ্যতাও নয়। 'ইউরোপীয় মহাকাব্য', 'ইউরোপীয় দর্শন' 'ইউরোপীয় চিন্তাধারা' ইত্যাদি শব্দবন্ধ যখন আমরা ব্যবহার করি, তখন আমরা ভুলে যাই যে ইউরোপ একটি বিরাট জায়গা, সেখানে বিভিন্ন দেশ আছে, সেই সমস্ত দেশের ভাষাও এক নয়, আচার-আচরণ রীতি-নীতিও স্বতন্ত্র। তৎসত্ত্বেও 'ইউরোপ' শব্দটি এবং তৎসংলগ্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্যা আমাদের কাছে একটি সামগ্রিক চেহারা নিয়ে হাজির হয়—আমরা ইউরোপ সংক্রান্ত ব্যাপারগুলিকে আমাদের সমস্যা থেকে পৃথক করে দেখতে চাই। অন্যপক্ষে, 'এশিয়া'র সেই ধরে রাখার ক্ষমতা নেই, এশীয় সভ্যতা, এশীয় চিন্তাধারা, —আমাদের কাছে উদ্ভট প্রস্তাব। এই বিশাল মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রিক (ভাষাগত ব্যবধানের কথা তো ছেড়েই দিলুম) ইত্যাদি নানাবিধ কারণে এতোই স্বতন্ত্র যে তাদের 'এশীয়' এই শব্দের মধ্যে বেঁধে রাখা অসম্ভব। এত দূরেই বা যাই কেন, আমাদের দেশ ভারতবর্ষও তো আবেগের দ্বারাই সংহত (emotionally integrated—সরকারি ভাষায়)—ভারতীয় সভ্যতা, ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি, এমন কি ভারতীয় চিন্তাধারাও বোধ হয় সম্ভব, কিন্তু ভারতীয় সাহিত্য? সেটা কী ব্যাপার? আসলে যাকে আমরা 'প্রাচ্য' বলি, সে ব্যাপারটা এতোই অস্পষ্ট, আমাদের ভালো করে দেখার পক্ষে এতোই বিরাট তার চেহারা যে, তার সংগে প্রতীচীর তুলনামূলক আলোচনা শেষ পর্যন্ত ইউরোপের সংগে এশিয়ার তুলনা না হয়ে, ইউরোপের সংগে এশিয়ার কোন অংশের (যেমন ভারতবর্ষ) তুলনা হয়ে দাঁড়ায়।

পৃথিবীর স্থলভাগের এক তৃতীয়াংশ জুড়ে এই যে বিরাট মহাদেশ, সে নিজেই আজ ছিন্নভিন্ন। তবে আর কেন তার সংগে ইউরোপের মিলন নিয়ে মাথা ঘামাই? কিন্তু আমাদের কাছে 'এশিয়া' যতোই অপরিচিত, মতবাদে বিচ্ছিন্ন, সমাজব্যবস্থায় বিচিত্র এবং রাষ্ট্রনীতিতে দীর্ণ হোক না কেন, ইউরোপীয়দের চোখে এশিয়া এখনো পতিত অনগ্রসর মানুষের বাসভূমি, অখৃস্টান হীদেনদের স্বদেশ। এমন কি প্রাচ্য দেশসমূহের মধ্যেকার ভাষাগত পার্থক্যেও তাঁরা সম্ভবত উদাসীন। তাই আলবার্তো মোরাভিয়া নামক একজন বৃহৎ লেখক রবীন্দ্রভারতবর্ষ-পূর্তির সময় ভারতভূমিতে আমন্ত্রিত হয়ে বক্তৃতাকালে এমন কোন প্রমাণ রেখে যেতে পারেন নি যার সাহায্যে আমরা ধরে নিতে পারি রবীন্দ্রনাথ যে বাংলাভাষার লেখক এই গোপন কথা তাঁর জানা। আমাদের সৌভাগ্য এই যে মোরাভিয়া-সদৃশ লেখক-জন দ্বারা ইউরোপ এখনো সম্পূর্ণ আক্রান্ত হয় নি, অন্তত সেখানেও কিছু সংখ্যক মন এবং কর্মঠ কলিজার আছে। তবু কতিপয়কে নিয়ে তো আমরা তৃপ্ত থাকতে পারি না—অধিকাংশের মতামত বা অশিক্ষিত মন্তব্যেই শেষ পর্যন্ত আমরা এশিয়াবাসী, সুতরাং অনুন্নত, প্রশংসা-ভাজন এবং তালগোল পাকানো জড়পিন্ড।

প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিলন যদিও নিঃসন্দেহে উদ্ভট কল্পনা, তবু আমরা কি এইটুকু আশা করতে পারি না যে আমাদের সম্পর্কে অর্থাৎ প্রাচ্যবাসী সম্পর্কে একদিন পাশ্চাত্যের ভুল বোঝা-বুঝির অবসান হবে? ভুল বোঝা-বুঝি কথাটি অবশ্য ব্যবহার করছি শত্রুতা অর্থে নয়—কারণ শত্রুতার সম্পর্ক রাজনীতির সঙ্গে এবং যতদিন পৃথিবী শিবিরবিভক্ত থাকবে ততোদিন শত্রুতার অবসান ঘটবে না, তার চেহারা পাল্টাবে মাত্র। ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটানো মানে প্রাচ্যের মানুষকে, তার সভ্যতা, ভাষা, সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা-শীলভাবে জানা—তার সংগে পাশ্চাত্যের গরমিলকে মনোযোগসহকারে বোঝা। আজকাল অবশ্য 'এশীয়' সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর পেঙ্গুইন-পেলিকান গ্রন্থমালাতেও বিদেশীদের লেখা নানা ঝকঝকে বই বেরুচ্ছে কিন্তু তার পিছনেও যেন মাঝে মাঝে অর্থদাতার পৃষ্ঠপোষকতা লক্ষ করা যায়। স্বাধীন ভারত সম্পর্কেও আগ্রহ রয়েছে নিঃসংশয় না হলে আর সাহেবরা জলপানি নিয়ে সাতসমুদ্র পাড়ি দিয়ে এই তথাকথিত সাপুড়ে আর মহারাজাদের দেশে আসবে কেন গবেষণা চালাতে? আসছেন অবশ্য তাঁরাও যাঁদের লক্ষ যোগ-শিক্ষা (শান্তি পাবেন বলে) যদিও দেশে ফিরে গিয়ে তাঁরাই আজকাল শুনছি নিদারুণভাবে যোগভ্রষ্ট হয়ে পড়ছেন এদেশের সঙ্গে! আবার ছবির উল্টো পিঠটাও কম চমকপ্রদ নয়—বিদেশী আনকোরা যত ছেলেদের বাইরে টেনে নিয়ে যাওয়া সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে। কিন্তু এইভাবেই কি কার্যসিদ্ধি হবে, লক্ষে পৌঁছনো যাবে, না কি লক্ষ কিছু নেই? আর এইভাবেই যদি হবে, তবে মেটার্লিংক ব্রেখট কেন অসীম মানবপ্রেমে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংযোগসাধনকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর ককেশিয়ান চক্ সার্কল-এর জন্য? আসলে মিলনের মন্ত্রটি কোনো প্রতিষ্ঠানের বা মিশনের জানা নেই। জানা আছে সেই মানুষেরই যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'মহামানব' বা Universal man—যিনি কোনো দেবতা বা অতিমানব নন, বলাই বাহুল্য। কিন্তু যে যুগ মহাকাব্যের পক্ষে অনুপযুক্ত, তা যে মহামানবের পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল হবে, তাই বা কে বলতে পারে?

॥ দুই ॥

স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিপ্লব দল অনুশীলন সমিতির জন্ম হয়। অনুশীলন সমিতির নেতা ছিলেন ব্যারিস্টার পি, মিত্র। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র কানুনগো প্রভৃতি প্রধান কর্মী ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ শাখার নেতা ছিলেন সতীশচন্দ্র বসু এবং পূর্ববঙ্গের নেতা ছিলেন পুলিনবিহারী দাস (লৌন সিং—ফরিদপুর)। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান কেন্দ্র ছিল কলিকাতা, পূর্ববঙ্গের প্রধান কেন্দ্র ঢাকা। পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্র বেশি বিস্তারলাভ করিতে পারে নাই, পূর্ববঙ্গের কেন্দ্র বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিস্তারলাভ করিল। অনুশীলনের নেতারা এরূপ একটি সমাজের কল্পনা করিয়াছিলেন, যে সমাজের প্রত্যেক নরনারীর মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ লাভ করিবে। মানুষের দেহ ও মন লইয়া মনুষ্য। প্রত্যেক মানুষের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির পূর্ণ বিকাশই মনুষ্যত্ব এবং ইহা অনুশীলন দ্বারাই সম্ভব। এখানে প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা নাই, উঁচু-নিচু নাই, সকলের সমান অধিকার। অনুশীলন পরিকল্পিত সমাজে প্রত্যেক নরনারী বিদ্বান, বুদ্ধিমান, চরিত্রবান, স্বাস্থ্যবান ও সাহসী হইবে। অনুশীলন পরিকল্পিত সমাজ সমত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরাধীনতার মধ্যে এরূপ সমাজ গঠন সম্ভবপর নয়, এজন্য পরাধীনতার বিরুদ্ধে অনুশীলনের যুদ্ধ ঘোষণা। অনুশীলনের মতে—স-শস্ত্র বিপ্লব দ্বারাই ভারতের স্বাধীনতা সম্ভবপর। স-শস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন ধনবল, লোকবল, অস্ত্রবল। অনুশীলন সমিতির নেতারা দেশবাসীর মধ্যে ক্ষাত্রশক্তি জাগানোর জন্য প্রকাশ্যে লাঠি খেলা, ড্যাগার খেলা ও ড্রীল শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। গোপনে বোমা তৈয়ার, অর্থ সংগ্রহ ও অস্ত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। দলে দলে লোক অনুশীলন সমিতির সভ্য হইতে লাগিল।

১৮৫৭ খৃস্টাব্দে সিপাহী যুদ্ধ হয়। সিপাহী যুদ্ধের পর ইংরাজ গভর্নমেন্ট ভারতবাসীর উপর এরূপ অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল, যাহার ফলে ভারতবাসীর মনোবল সম্পূর্ণ-ভাঙিয়া গিয়াছিল। সেই যুগে স্বাধীনতার কল্পনা করা দূরের কথা, গভর্নমেন্টের নিকট অভাব-অভিযোগ জানাইতেও কেহ সাহসী হইতেন না। অভাব-অভিযোগ জানাইলে না জানি কি বিপদ হয়, সেই কাল্পনিক ভয়েই সকলে অস্থির থাকিত। এজন্য জাতীয় কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন দেশবাসীর নিকট দুঃসাহসিক কাজ বলিয়া গণ্য হইত। তখন সাহেব দেখিলেই লোকে সেলাম দিত। সিপাহী যুদ্ধের পর ভারতের জেল সমূহ যুদ্ধ-বন্দীদের দ্বারা পূর্ণ ছিল, তখন জেলের চাপ কমানোর জন্য আন্দামান আবিষ্কার করা হইল। আন্দামানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত সুন্দর। সমুদ্রের মধ্যে ছোট-বড় প্রায় দুই শত পাহাড়, ইহা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ নামে পরিচিত। ঐ দ্বীপপুঞ্জ পূর্বে অত্যন্ত অ-স্বাস্থ্যকর ছিল, গভীর অরণ্যে আদিম অধিবাসী বাস করিত, তাহারা উলংগ থাকিত। সিপাহী যুদ্ধের বন্দীদের দ্বারা আন্দামান পত্তন হয়, আবার ভারত বিপ্লবীদের দ্বারা পেনাল সেটেলমেণ্ট বন্ধ হয়। আন্দামানে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা ছিল না, সেখানে বছরে ৮ মাস বর্ষাকাল। বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখা হইত এবং তাহাই পানীয় জলরূপে ব্যবহৃত হইত। এ জন্য সেখানে পেটের অসুখ খুব বেশি হইত এবং ম্যালেরিয়াও ছিল। ঐ স্থান এত অ-স্বাস্থ্যকর ছিল যে, ৮।৬ মাসের বেশি কেহ টিকিত না, মৃত্যু হইত। সিপাহী যুদ্ধের বন্দীরা ম্যালেরিয়া ও ডিসেন্ট্রির সহিত লড়াই করিয়া রাস্তাঘাট তৈয়ার করিয়াছে, বন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া ছোট ছোট শহর পত্তন করিয়াছে। এক দল লোকের মৃত্যু হইয়াছে, নূতন দল তাহাদের স্থান পূরণ করিয়াছে। আমরা যখন আন্দামানে ছিলাম, তখন আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ৭টি জেলায় বিভক্ত ছিল, ৭ জন শ্বেতাংগ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিল, একজন শ্বেতাংগ চীফ কমিশনার ছিল। প্রধান কেন্দ্র ছিল রস্ দ্বীপ। রস্ দ্বীপে চীফ কমিশনার থাকিত, সেখানে ম্যালেরিয়া ডিসেন্ট্রি ছিল না, সেটা ছিল স্বাস্থ্য-নিবাস। পোর্ট ব্লেয়ার পাহাড়ের উপর ছিল সেলুলার জেল। সেলুলার জেলে তে-তলা ৭টি দালান ছিল এবং ৭ শত সেল ছিল। ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও সিলোনের দুর্দান্ত কয়েদীদিগকে সেলুলার জেলে পাঠান হইত, তাহাদিগকে ৩ মাস হইতে ২ বৎসর পর্যন্ত জেলে রাখা হইত, পরে তাহাদিগকে বিভিন্ন টাপুতে বা দ্বীপে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত। সেখানে তাহারা বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হইত, সরকারী পাহারায় থাকিত, সরকারী খানা খাইত। রাজনৈতিক বন্দীদিগকে সেলুলার জেলের বাহিরে দেওয়া হইত না। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে হাজার হাজার নারিকেল গাছ আছে, ৪ বৎসরে নারিকেল ধরে।

১৯০৮ সনে গভর্নমেন্ট কতকগুলি দমনমূলক আইন ঘোষণা করিয়া সমিতিগুলিকে বে-আইনী ঘোষণা করিল, ফলে অনুশীলন সমিতি, আত্মোন্নতি সমিতি, সুহৃদ সমিতি, সাধনা সমিতি প্রভৃতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইল। ঐ সময় পুলিনবিহারী দাস, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ভূপেশ নাগ প্রভৃতি বাংলার ৯ জন রাজনৈতিক নেতাকে ১৮১৮ সনের তিন আইনে গ্রেপ্তার করিয়া ভারতের বিভিন্ন জেলে আটক করিল। অনুশীলন সমিতির প্রধান কেন্দ্র ছিল ঢাকা ওয়ারী। সেখানে একটি জাতীয়-বিদ্যালয় ছিল, পুলিনবাবু ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছিলেন। এবং ঐ বিদ্যালয়ই ছিল অনুশীলন সমিতির আড্ডা। দল বৃদ্ধির সংগে সংগে জাতীয় বিদ্যালয়ে স্থান সংকুলন না হওয়ায় দক্ষিণ মৈশুণ্ডী ভূতের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হইল। ভূতের বাড়িতে

দুইশত বাড়িঘর জোড়া সভ্য থাকত, তাহাদের ব্যয়ভার সমিতি বহন করিত। ভূতের বাড়িতে সভ্যদিগকে লাঠি খেলা, ড্রীল শিক্ষা দেওয়া হইত এবং অনুশীলনের আদর্শে তাহাদিগকে গড়িয়া তোলা হইত। তাহারা সেখানে শিক্ষা লাভ করিয়া বিভিন্ন শহর ও গ্রামে যাইয়া মফস্বল সমিতির সভ্যদিগকে শিক্ষা দিত। প্রত্যেক বৎসর মক্‌ফাইট হইত। অনুশীলন সমিতির মফস্বল ও শহরের সভ্যগণ ঢাকায় একত্র হইয়া দুই দলে বিভক্ত হইয়া কৃত্রিম যুদ্ধ করিত। উভয়পক্ষে প্রায় ৭।৮ হাজার লোক থাকিত। ছোট লাঠি, বড় লাঠি ও ড্যাগার লইয়া যুদ্ধ হইত। আহতদিগকে বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার জন্য এম্বুলেন্স থাকিত হাসপাতাল ও ডাক্তারের ব্যবস্থা থাকিত। শহরের দুই প্রান্তে দুইটি বড় গাছের উপর জাতীয় পতাকা উঠান হইত। যে দল বিপক্ষের সেনাপতিকে গ্রেপ্তার করিয়া পতাকা হস্তগত করিতে পারিত, সেই দলেরই জয় হইত। এই কৃত্রিম যুদ্ধ দেখার জন্য বহু লোক উপস্থিত থাকিতেন, তাহাদের মধ্যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট প্রভৃতিও থাকিতেন। এই কৃত্রিম যুদ্ধে আমিও অংশ গ্রহণ করিতাম।

অনুশীলন সমিতির বাড়িঘর ছাড়া সভ্যদের এখন ঘোর দুর্দিন। গভর্নমেন্ট সমিতি বে-আইনী ঘোষণা করিয়াছে, পুলিনবাবু জেলে আটক সমিতির বোর্ডিং ছাড়িয়া দিয়াছে, সমিতির সভ্যদিগকে কেহ আশ্রয় দিতেছে না, পুলিশের ভয়ে সকলেই অস্থির। সমিতি বে-আইনী ঘোষণা করায় অনুশীলন সমিতি গুপ্ত সমিতিতে পরিণত হইল। অনুশীলন সমিতির কাজ এখন গোপনে গোপনেই চলিতে লাগিল দল ক্রমশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমি ১৯০৯ সনে জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাড়ি গেলাম, গুপ্ত পুলিশ আমার গতিবিধি লক্ষ্য করিত। দেশের তখন এরূপ অবস্থা, কেহ ভয়ে আমার সহিত আলাপ করিতে সাহসী হইত না, আত্মীয়স্বজনের বাড়ি গেলে দূর-দূর করিয়া তাড়াইয়া দিত, বলিত, তুমি আমাদিগকে বিপদে ফেলার জন্য এখানে আসিয়াছ? এখানে আর আসিও না, পুলিশ আমাদিগকে বিপদে ফেলিবে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় জেলে যাওয়ার বাহবা ছিল, ফুলের মালা পাওয়া যাইত, এখন জেল হইতে বাহির হওয়ার পর দেখিতেছি, আমি যেন একজন অস্পৃশ্য—কতই না অপরাধ করিয়াছি। আমার মনে হইল, এ দৃশ্য দেখা অপেক্ষা জেলেই ভাল ছিলাম। জেলের ঘানি ঘুরান, গমের চাক্কি পিষা, বড় বড় কড়া টানা, জেলের অখাদ্য এবং কম খাওয়া আমাকে দুর্বল করিতে পারে নাই। কিন্তু বাড়ি আসিয়া যেন দুর্বল হইয়া পড়িলাম, আমার কিছুই ভাল লাগিতে ছিল না, আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। বন্ধুরা কে কোথায় আছে কোনই খবর পাইতেছি না। এমন সময় গুপ্ত সমিতির কেন্দ্র হইতে সংবাদ পাইলাম, আমাকে বাড়ি ছাড়িয়া ঢাকা যাইয়া নেতাদের সহিত দেখা করিতে হইবে। আমি মনে মনে খুবই আনন্দিত হইলাম এবং গর্ববোধ করিতে লাগিলাম, আমার নেতারা আমার কথা ভুলেন নাই, আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। আমাকে যাইতে হইবে বাড়ি হইতে পলাইয়া, পুলিশ যেন টের না পায়। আমার হাতে টাকা ছিল না। একদিন সুযোগ ঘটিল, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কামিনীমোহন চক্রবর্তী কয়েক দিনের জন্য অন্যত্র গিয়াছিলেন, সিন্দুকের চাবি আমার নিকট দিয়া গিয়াছিলেন। আমি ৫্ টাকা সঙ্গে লইলাম এবং একখানা কাগজে লিখিলাম, "সমিতির কাজে যাইতেছি, ৫্ টাকা সঙ্গে নিলাম, হৈ-চৈ হইলে বিপদে পড়িব"। আমি বাড়ি হইতে পলায়ন করিলাম, পুলিশ চারিদিকে আমার অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

কোন লোক ইচ্ছা করিলেই অনুশীলন সমিতির সভ্য হইতে পারিত না, আবার ইচ্ছা করিলেই দলত্যাগ করিয়া যাইতে পারিত না। অনুশীলন সমিতির সভ্য হইতে হইলে কতকগুলি স্তর পার হইয়া যাইতে হইত। অনুশীলন সমিতির সভ্যদের স্তর ভেদে তিন প্রতিজ্ঞা ছিল, আদ্য প্রতিজ্ঞা, মধ্য প্রতিজ্ঞা এবং অন্ত্য প্রতিজ্ঞা। সমিতি যখন প্রকাশ্য ছিল, তখন লাঠি খেলা ড্রীল শিক্ষা এবং বিভিন্ন সমাজ-হিতকর কাজের মধ্য দিয়া যাহাদিগকে ভাল মনে হইত তাহারা আদ্য প্রতিজ্ঞার অধিকারী হইত, তাহারা ছিল বিপ্লব দলের সাধারণ সভ্য। আবার তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়া পরীক্ষিত, তাহারা ছিল মধ্য প্রতিজ্ঞার অধিকারী। আবার মধ্য প্রতিজ্ঞার সভ্যদিগকে বাছাই করিয়া অন্ত্য প্রতিজ্ঞা করান হইত। অন্ত্য প্রতিজ্ঞার সভ্যই পূর্ণ সভ্য। প্রতিজ্ঞাগুলি অতি সাধারণ। যেমন—আদ্য প্রতিজ্ঞা, (১) আমার চরিত্রটি নির্মল ও পবিত্র রাখিব। (২) আমি কোন প্রকার মাদক দ্রব্যের বশীভূত হইব না। (৩) আমি কখনও এই সমিতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইব না। (৪) আমি নেতার আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে প্রতিপালন করিব। অনুশীলন সমিতির নেতারা জানিতেন চরিত্রই জাতির মেরুদণ্ড। তাই তাঁহারা প্রথম হইতেই জাতীয় চরিত্র গঠন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নিজেরা আদর্শ চরিত্রবান না হইলে অপরে তাঁহাকে অনুসরণ করিবে না। এক সময় দেশের শাসনভার সমিতির সভ্যদের উপর ন্যস্ত হইবে। যাহাদের উপর দেশের শাসনভার ন্যস্ত হইবে, তাহারা যদি চরিত্রহীন স্বার্থপর হয়, তবে তাহারা জাতীয় স্বার্থ বলি দিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থই চরিতার্থ করিবে। বিশেষত যাহারা বৈপ্লবিক কাজ করিবে, তাহাদিগকে বিপদ এবং প্রলোভনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, তাহাদের মধ্যে যদি দুর্বলতা থাকে তবে বিপ্লব ব্যর্থ হইবে। এজন্য সভ্যদিগকে ত্যাগী বিপ্লব ও দেশ শাসনের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোলা হইত। তাহাদের দেহ এবং মনকে অনুশীলনের ভাবধারায় গড়িয়া তোলা হইত। অনুশীলনের প্রত্যেক কর্মী চরিত্রবান ছিল, চরিত্র দোষ দেখা দিলে এবং প্রমাণ হইলে তাহাকে গুলী করিয়া মারা হইত। বিপ্লব দলের সভ্যরা ছিল দেশপ্রেমিক, চরিত্রবান, সাহসী এবং নিঃস্বার্থপর। নিজের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার দিকে তাহারা কখনও তাকায় নাই, অম্লান বদনে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলিয়াছে, সম্মুখ সংগ্রামে বীরত্ব দেখাইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, জেলে দ্বীপান্তরে সুদীর্ঘকাল অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে, কোনপ্রকার দুর্বলতা দেখায় নাই। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ সুরু হইয়াছে, ভারতের বিপ্লব দলগুলি ভাবী বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। ইহার পূর্বে আলিপুর বোমার মামলা হইয়া গিয়াছে, ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা, বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা হইয়া গিয়াছে। বড়লাটের উপর দিল্লীতে বোমা পড়িয়াছে দক্ষিণ ভারতে নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা হইয়া গিয়াছে, চারিদিকে বোমা ফাটিতেছে, খুন হইতেছে, রাজনৈতিক ডাকাতি হইতেছে আসর

১৯১০ সনে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা সুরু হয়। সরকারপক্ষে অভিযোগ ছিল, পুলিনবাবু ঢাকা অনুশীলন সমিতির ছয় শত শাখা সমিতির সভ্যদিগকে লইয়া রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র (১২১ক ধারা) করিতেছিলেন। এই মামলায় ৪৮ জন আসামী ছিলেন ৩৮ জন ধৃত হইয়াছিলেন, বাকী ১০ জন পলাতক ছিলেন। পলাতক আসামীর মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ছিল। ১৯১১ সনে এক খুনের মামলা উপলক্ষে আমি ঢাকার এক রাস্তায় ধৃত হই। পূর্বদিন সন্ধ্যার সময় একজন গুপ্ত পুলিশের কর্মচারী নিহত হইয়াছিল। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলিয়াছিল, হত্যাকারীর লম্বা দাড়ি আছে। ইহার পূর্বে আরও কয়েকটি রাজনৈতিক খুন হইয়াছে, প্রত্যক্ষদর্শীরা বলিয়াছিল, হত্যাকারীর লম্বা দাড়ি আছে। ঘটনাক্রমে আমারও লম্বা দাড়ি ছিল। এখন বিভিন্ন স্থান হইতে লোক আনাইয়া দাড়ি পরীক্ষার কাজ চলিতে লাগিল, "এ দাড়ি সে দাড়ি কি

না?” সকলেই একবাক্যে বলিল, এ দাড়ি সে দাড়ি নয়। খুনের মামলা চলিল না, ঢাকা ষড়যন্ত্রের মামলাও গভর্নমেন্ট চালাইলেন না, অবশেষে অগতির গতি ১০৯ ধারা চালাইল, তাহাও টিকিল না, আমি কয়েকমাস হাজত ভোগ করার পর ঢাকা সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্ত হইলাম। এ যাত্রা মুক্তির পর দুইজন গুপ্ত পুলিশ নিযুক্ত হইল আমাকে সর্বদা অনুসরণ করার জন্য। আমি বাড়িতে কয়েকদিন ছিলাম, তাহার পর হঠাৎ একদিন বাড়ি হইতে চম্পট দিই। পুলিশের গুপ্ত বিভাগ আমাকে ধরার জন্য চারিদিকে টেলিগ্রাম করিল, অনুসন্ধান চলিতে লাগিল, আমি তখন ঢাকায় একজন রায়সাহেব, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের বাসায় নিরাপদে আছি। এই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে আমার ১০৯ ধারার মামলা চলিয়া ছিল, তিনি তখন ময়মনসিং বদলী হইয়া গিয়াছিলেন। এই রা...াহেবের পুত্রগণ অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিল। আমার ঢাকা আগমনের পর যিনি ঢাকা সমিতির চার্জে ছিলেন, তিনি আমার থাকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন রায়সাহেবের বাড়িতে, কারণ এখানে পুলিশ সন্দেহ করিবে না, রায়সাহেব ছিলেন খুব রাজভক্ত। আমি কয়েকদিন ঢাকা থাকিয়া বিরজা নাম গ্রহণ করিয়া উত্তরবঙ্গ যাই। আমার তখন লম্বা দাড়ি ছিল না। আমার যখন লম্বা দাড়ি ছিল, তখন আমি নৌকায় কালীচরণ মাঝি (জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত “নমামী” দ্রষ্টব্য) এবং টানে কালীচরণদা নামে পরিচিত ছিলাম। ইতিমধ্যে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা সুরু হইয়াছে, রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ষড়যন্ত্র, ১২১ক ধারা, অভিযুক্ত ৩৬ জনের মধ্যে ৫ জন ছিল পলাতক। এই পলাতক আসামীদের মধ্যে ছিল, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, (ঢাকা) মদনমোহন ভৌমিক (ঢাকা) রমেশচন্দ্র চৌধুরী (ময়মনসিং) খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী (ঢাকা)।

১৯১২-১৪ সনে যাঁহারা ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তাঁহাদের বয়স কত ছিল? তাঁহাদের বয়স ১৮ হইতে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ছিল। তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ছিলেন না, পূর্ণ অভিজ্ঞতা তাঁহাদের ছিল না, লোকসমাজে তাঁহারা ছিলেন অপরিচিত। তাঁহারা প্রকাশ্য সভায় লোকমাতান বক্তৃতা দিয়া “বাহবা” লইতে যাইতেন না, মন্ত্রী হব, বড়লোক হব, এরূপ কল্পনা তাঁহাদের ছিল না, নাম যশের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের ছিল না—তাঁহারা ছিলেন নিষ্কাম কর্মী। তাঁহাদের সম্বল ছিল আত্মবিশ্বাস। তাঁহাদের মধ্যে ছিল একতা। নেতৃত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাঁহাদের মধ্যে ছিল না, তাঁহাদের মধ্যে ছিল সহযোগিতা। নেতা হওয়া তখন প্রলোভনের বিষয় ছিল না, নেতাদের বিপদই ছিল বেশি,—মৃত্যুদণ্ড। অনুশীলনের নেতাদের মধ্যে ইলেকশন ছিল না, সকলেই কাজের মধ্য দিয়া বড় হইয়াছেন। প্রত্যেক সভ্যকে প্রথমে বাড়িঘর ছাড়াইয়া গ্রামে বসান হইয়াছে, সেখানে যাহারা সংগঠনশক্তি, সংযম ও বিভিন্ন দুঃসাহসিক কাজের মধ্য দিয়া দক্ষতার পরিচয় দিয়াছে, তাহারা মহকুমা সমিতির ভারপ্রাপ্ত হইয়াছে। আবার মহকুমা সমিতির ভারপ্রাপ্তদের মধ্যে যাহারা দক্ষতার পরিচয় দিয়াছে তাহাদের মধ্য

হইতে জেলা সমিতিতে গ্রহণ করা হইয়াছে। জেলা সমিতি হইতে প্রধান কেন্দ্রে স্থান পাইয়াছে। একদল লোক ধৃত হইতেছে, তাহাদের স্থান নূতন দল পূরণ করিয়াছে।

বঙ্গভঙ্গ রদ হইয়াছে, স্বদেশী আন্দোলন বন্ধ হইয়াছে, বিপ্লবীদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ হয় নাই, গভর্নমেন্টের দমননীতি ব্যর্থ হইয়াছে। সেই যুগে কংগ্রেস নেতারা ছিলেন নরমপন্থী, তাহারা ভয়ে এবং গভর্নমেন্টকে খুশি করার জন্য বিপ্লবীদিগকে গালি দিতেন, তাহাদের কার্যকলাপের নিন্দা করিতেন। স্টেটসম্যান কাগজ বিপ্লবীদিগকে আখ্যা দিল টেররিস্ট", কাগজে লিখিল টেররিস্টরা বিপথগামী, টেররিজম দ্বারা দেশের কল্যাণসাধন হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে দেশী খবরের কাগজওয়ালারা এবং কংগ্রেস নেতারা স্টেটসম্যান কাগজের সুরের সহিত সুর মিলাইয়া বলিতে লাগিলেন, সন্ত্রাসবাদীরা বিপথগামী, সন্ত্রাসবাদ দ্বারা দেশের স্বাধীনতা আসিবে না। শুধু সন্ত্রাসবাদ দ্বারা যে দেশের স্বাধীনতা অসম্ভব না, সে জ্ঞান বিপ্লবীদের ছিল। বিদেশী গভর্নমেন্ট বিপ্লবীদিগকে দেশের লোকের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এরূপ প্রচার করিত, দেশের লোকও তাহাই বিশ্বাস করিল, এজন্য আজও বিপ্লবীরা দেশবাসীর নিকট টেররিস্ট নামেই পরিচিত রহিল। বিপ্লবীরা যে টেররিজম (সন্ত্রাস সৃষ্টি) না করিয়াছে তাহা নহে, তাহারা গভর্নমেন্টের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে পাল্টা সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছে। প্রকাশ্য সভায়

নিরস্ত্র নিরীহ দেশের জনসাধারণের উপর লাঠিচার্জ, গুলী চালান সন্ত্রাসবাদ নয় কি? একজনকে গ্রেপ্তারের পর তাহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করা সন্ত্রাসবাদ নয় কি? গভর্নমেন্টকে বিপ্লবীরা জানাইয়া দিয়াছে, একতরফা সন্ত্রাসবাদ চলিবে না, প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইবে। গভর্নমেন্ট নরমপন্থী নেতাদের সহিত পরামর্শ করিলেন, কিভাবে সন্ত্রাসবাদ দমন করা যায়। নরমপন্থী নেতাদের সহিত বিপ্লবী নেতাদের কোন সহযোগিতা ছিল না, বিপ্লবী নেতাদের সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা ছিল অস্পষ্ট। নরমপন্থী নেতারা গভর্নমেন্টকে বুঝাইলেন, বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে এই আন্দোলন সুরু হইয়াছে, এখন বঙ্গভঙ্গ রদ হইলেই সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন থামিয়া যাইবে। পূর্বে বৃটিশ পার্লামেন্ট ঘোষণা করিয়াছিল, বঙ্গভঙ্গ Settled Fact ইহা রদ হইবে না। এখন এই Settled fact, un settled হইতে চলিল। গভর্নমেন্ট বঙ্গভঙ্গ রদ করিলেন, নরমপন্থী নেতারা সুখী হইলেন। কিন্তু সন্ত্রাসবাদ বন্ধ হইল না, বড়লাটের উপর বোমা পড়িল।

১৯১২ সনে, প্রকাশ্য দিবালোকে, বড়লাট রাজকীয় শোভাযাত্রায় হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যাইতেছিলেন। দিল্লীর প্রশস্ত রাজপথ, সহস্র সহস্র লোকের সমাবেশ, হঠাৎ বোমার প্রচণ্ড আওয়াজে সকলে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল, বোমা পড়িয়াছে বড়লাটের উপর, হস্তীর মাহুত মৃত, বড়লাট আহত, অজ্ঞান, চারিদিকে হৈচৈ। সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রোপচারে বড়লাটের প্রাণ রক্ষা পাইল। বড়লাটের প্রাণ রক্ষার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়া, আক্রমণকারীর তীব্র নিন্দা ও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া, ভারতের সকল প্রদেশ হইতে প্রকাশ্য সভায় প্রস্তাব পাশ করিয়া, সমবেদনা জানান হইল। সংবাদপত্রে অন্য কোন সংবাদ নাই, শুধু সমবেদনা প্রকাশের সংবাদ। রাসবিহারী বসু দেরাদুন ফরেস্ট বিভাগে চাকুরী করিতেন, তিনি এক প্রকাশ্য সভায় সমবেদনা প্রকাশ করেন, সভার সভাপতি রাসবিহারী বসুই ছিলেন। বড়লাটের উপর বোমা পড়ায় সরকারী পুলিশের গুপ্ত বিভাগ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, চারিদিকে অনুসন্ধান চলিতে লাগিল, খানাতল্লাসী, গ্রেপ্তার চলিতে লাগিল। প্রকাশ্য দিবালোকে, সহস্র সহস্র লোকের সম্মুখে এরূপ ঘটনা ঘটিল, বোমা নিক্ষেপকারীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, ইহা গভর্নমেন্টের গুপ্ত পুলিশ বিভাগের পক্ষে অত্যন্ত কলঙ্কের কথা। অবশেষে পুলিশের গুপ্ত বিভাগ সংবাদ সংগ্রহ করিল, এই বোমা নিক্ষেপকারী অপর কেহ নয়, দেরাদুনে সভায় যিনি সমবেদনা প্রস্তাব পাশ করিয়া ছিলেন,

সেই রাসবিহারী বসু। পুলিশ রাসবিহারী বসুকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয় নাই। রাসবিহারী বসুর বাড়ি চন্দননগর। তিনি চন্দননগর প্রবর্তক সঙ্ঘের অধ্যক্ষ শ্রীমতিলাল রায়ের সহকর্মী। মতিবাবু চন্দননগরের বিপ্লব দলের নেতা ছিলেন, এই দলের যাঁহারা প্রধান ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, রাসবিহারী বসু, মণীন্দ্রচন্দ্র নায়েক, অরুণচন্দ্র দত্ত (প্রবর্তক সঙ্ঘের বর্তমান প্রেসিডেন্ট) চন্দননগরের দল অনুশীলন সমিতির সহিত এক হইয়া গিয়াছিল।

রাজাবাজার (কলিকাতা) বোমার মামলা সুরু হইয়াছে, প্রধান আসামী অমৃতলাল (শশাঙ্ক) হাজরা। ইনি অনুশীলন সমিতির বাড়িঘর ছাড়া সভ্য, ঢাকা দক্ষিণ মৈশুণ্ডী সমিতির বোর্ডিং-এ থাকিতেন, প্রসিদ্ধ বাহ্রা ডাকাতির সময় তাঁহাকে কেহ কেহ চিনিতে পারিয়াছিল, তাঁহার নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা ছিল, পুরস্কার ঘোষণা ছিল, পুলিশ তাঁহাকে এতকাল ধরিতে পারে নাই। কলিকাতা পুলিশের বড়সাহেব খবর পাইয়া সদলবলে অমৃত হাজরার রাজাবাজার বাসা ঘেরাও করে এবং তল্লাসী করিয়া বোমার খোল এবং বিরজা নামে একখানা চিঠি পায়। বিরজাকে পুলিশ চিনিত না, [illegible] নাম পুলিশের খাতায় ছিল না, পুলিশ [illegible] অনুসন্ধান করিতে লাগিল। [illegible] চক্রবর্তী তখন বিরজা নামে [illegible] নিরাপদে [illegible]। [illegible] সরকারী [illegible] বাসা [illegible] উপর যে বোমা পড়িয়াছে [illegible] শেল এবং আর যে সব [illegible] পড়িয়াছে, সেই সব শেল এবং [illegible] অমৃত হাজরার বাসায় যে শেল পাওয়া গিয়াছে সব এক। সব রাজাবাজার টাইপ। অমৃত হাজরা কোর্টে বলিলেন, ইহা বোমার শেল নহে, তিনি নূতন ধরণের গ্যাস লাইট তৈয়ার করিতেছিলেন, ইহা তাহার খোল। তিনি একদিন ঐ খোল দিয়া কোর্টে গ্যাস লাইট জ্বালাইয়া সকলকে তাক্ লাগাইয়া দিলেন। শেষ পর্যন্ত গ্যাস লাইটের থিওরী টিকিল না, অমৃত হাজরা ১৫ বৎসর দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। অমৃত হাজরার বাসা বোমার কারখানা ছিল না, বোমার শেল অমৃত হাজরার তত্ত্বাবধানে অন্যত্র তৈয়ার হইত, বোমা তৈয়ার হইত চন্দননগর প্রবর্তক সঙ্ঘের নেতা মতিলাল রায়ের তত্ত্বাবধানে। [ক্রমশঃ]

[-পূর্ব-প্রকাশিতের পর-]

রবীন্দ্রনাথ-রোলাঁ-গান্ধী-সুভাষচন্দ্র—২

সুভাষচন্দ্রের রচনা স্বভাবতই এত স্বচ্ছ যে, তাঁর বক্তব্য অনুধাবনে কোনই অসুবিধা হয় না। রোলাঁর কাছে গান্ধী-নীতি সম্বন্ধে মতপ্রকাশের কালে ভাষা বা ভঙ্গিগত কোনো চাতুরীর আশ্রয় তিনি নেন নি। ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল পড়বার পরেও রোলাঁ যে, সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতে অনিচ্ছুক ছিলেন না, তা থেকে অনুমান করা যায়, রোলাঁ বুঝতে চেয়েছিলেন যে-মানুষটি ঐ বই লিখেছেন, সে মানুষটি কেমন?

উদ্ধৃত রচনায় রোলাঁ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের আশা ও আশঙ্কার রূপ সুন্দর ফুটেছে। আশা অসীম—নিজ মত ও পথের পক্ষে এই শ্রেষ্ঠ বিদেশী ভারতবন্ধুর সমর্থন চাই। আশঙ্কা হল—এইসব আদর্শবাদীরা সাধারণত পাঁক ও সাপ এড়িয়ে শুধু পদ্মমধুটুকু পান করেন। এবং পাঁকের গন্ধ ও সাপের ছোবল এড়াতে কল্পনার পাখা মেলে দেন। সুভাষচন্দ্র চিন্তান্বিত ছিলেন—এই মহান্ স্বাপ্নিক ও আদর্শবাদী কি বাস্তব রাধাগুলির বিশ্রী চেহারা সম্বন্ধে চোখ খুলতে চাইবেন!

বিস্ময়ে ও আনন্দে অভিভূত সুভাষচন্দ্র দেখলেন, রোলাঁর এখন একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—শ্রমিকস্বার্থকে জয়যুক্ত করা। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় রোলাঁ জানালেন—গান্ধী যদি কোনোভাবে শ্রমিকস্বার্থের পরিপন্থিতা করেন—তিনি আসবেন গান্ধী-বিরোধী শিবিরে।

উভয়ের আলোচনার থেকে আর একটি জিনিস দেখা গেল—সুভাষচন্দ্র নতুন দল তৈরি করতে চান নতুন আদর্শে। গান্ধী-নেতৃত্ব সম্বন্ধে নিছক অনাস্থায় সন্তুষ্ট থাকবার পাত্র ছিলেন না তিনি। রাজনৈতিক জীবনের সূচনায় তিনি চিত্তরঞ্জনের গান্ধী-বিরোধী দলের [illegible]।

গান্ধীজীর সংগ্রামশীলতার ক্ষেত্রে অবশ্য তাঁর সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা বজায় ছিল। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পরে নতুন নেতৃত্ব-সৃষ্টির বাস্তব সামর্থ্য যখন আসে নি, তখনো চলেছে মানসিক প্রস্তুতি। কর্মক্ষেত্রে সেই প্রস্তুতির ফল প্রথম দেখা গেল ১৯২৮ সালে। তারপরেই এসে গেল সত্যাগ্রহ আন্দোলন—তাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেই আন্দোলনের শোচনীয় ব্যর্থতার মধ্যে পুনশ্চ গান্ধী নেতৃত্বের পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সংগঠনের নিরুপদ্রব সুযোগ বিধাতা বা ইংরেজ-বিধাতা তাঁকে দেয় নি। কারাবাস ও অসুস্থতা তাঁর অভিপ্রায়-সিদ্ধির পথে বাধা দিয়েছে বারবার। অথচ মন গঠিত হয়ে গেছে—অবশ্যই চাই নতুন মত—নতুন দল। সেই প্রস্তুত মনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ লিখিত নিদর্শন 'ইন্ডিয়ান স্ট্রাগল।' এই গ্রন্থে গান্ধী-আন্দোলনের যে ব্যাপক সমালোচনা আছে, তা নিছক ধ্বংসাত্মক নয়—সুভাষচন্দ্র ধ্বংসের ভিতরে সৃষ্টির বীজ পুঁততে চেয়েছেন। ইন্ডিয়ান স্ট্রাগলের শেষাংশে 'ভবিষ্যৎ কী' বলে একটা পরিচ্ছেদ আছে। তাতে তিনি ভাবী নতুন বামপন্থী দলের রূপ ও নীতি ঘোষণা করেছেন। সে দল এখনো সুভাষচন্দ্রের মনে—কিন্তু তাকে গঠন তিনি করবেনই—রোলাঁর সামনে সেই ভাবী দলের চরিত্র সংক্ষেপে প্রকাশ করলেন—'কৃষক ও শ্রমিকের স্বার্থে গঠিত চরমপন্থী দল।'

রোলাঁর সঙ্গে এই আলোচনাকালে আর একটি বিষয় খোলাখুলি জানিয়েছেন, যা রোলাঁর ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। রোলাঁ বললেন, যুদ্ধ সর্বনাশ আনবে ইউরোপের। সুভাষচন্দ্র বললেন, যুদ্ধ মুক্তি আনবে ভারতের। ভারতের মুক্তি যদি আকাঙ্ক্ষিত হোক, ইউরোপের বিপর্যয়ের মূল্যে তাকে সংগ্রহ করতে রোলাঁ নিশ্চয় প্রস্তুত ছিলেন না। সুভাষচন্দ্র [illegible] সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপের সুস্থ শরীরে বজায় থাকার চেয়ে ভারতের মুক্তিকে কম মূল্যবান মনে করতে রাজী ছিলেন না। অধিকন্তু তাঁর ধারণা, যুদ্ধের ক্ষতে ইউরোপের কিছু রক্তহীন হওয়ার দরকার আছে, নইলে সে মুঠি আলগা করবে না। তাঁর বিবেচনায়, নতুন ভারত ও নতুন পৃথিবী বেরিয়ে আসবে যুদ্ধক্ষত ইউরোপের ধমনীতে নতুন রক্ত-সঞ্চালনে, যে-রক্ত দেবে মুক্ত ভারত ও মুক্ত এশিয়া। পরম আন্তর্জাতিক তথাপি ইউরোপীয় রোমাঁ রোলাঁ ইউরোপের বিপর্যয় যাতে তেমন যুদ্ধকে বন্দনা করতে পারেন নি; আর ভারতীয় সুভাষচন্দ্র যে-যুদ্ধে ভারতের মুক্তি, তাকে আহ্বান না করেও পারেন নি। দুজনে একমত হন নি, কিন্তু তাঁরা পরস্পরের ভাষা বুঝেছিলেন।

এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়, রোলাঁর কাছে ইউরোপ তখন আর প্রথম মহাযুদ্ধের হিংস্র ক্রেদাক্ত ইউরোপ নয়—রাশিয়ার শ্রমিকবিপ্লব তাঁর কাছে নতুন ভরসা এনেছে। যুদ্ধ রাশিয়ার ক্ষতি করবে। সুতরাং যে-কোনো মূল্যে রাশিয়াকে রক্ষা করো—এই তাঁর মনোভাব। এই মনোভাব থেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে মিত্রপক্ষের সমর্থনে ভারতীয় কম্যুনিস্টদের জনযুদ্ধের আওয়াজ।

অপরপক্ষে যুদ্ধ সম্বন্ধে ঐ মনোভাবের জন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে

সুভাষচন্দ্রের রাশিয়ার সাহায্য প্রার্থনা; আত্মরক্ষায় ব্যস্ত সতর্ক রাশিয়া তাতে গররাজি হওয়ায় অগত্যা জার্মানীতে আশ্রয় গ্রহণ। প্রলয়ের আগুনও আগুন, সুভাষচন্দ্র ভেবেছিলেন, প্রমিথিউস আগুনের জাতিভেদ করে না।

রোলাঁর কাছ থেকে তৃপ্তচিত্তে যখন বিদায় নিলেন, তখন সুভাষচন্দ্র বুঝেছিলেন, দেওয়ালের লিখনের সামনে দাঁড়িয়ে ইনি চোখ বুজবেন না। বুঝেছিলেন যে এঁর কাছে ভারতের স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা চেয়ে মূল স্বাধীনতা আরও মূল্যবান। এই 'আবিষ্কার' সুভাষচন্দ্রকে উৎফুল্ল করেছিল—এটা তখন সত্যই আবিষ্কার ছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র রোলাঁ-মনোভাব সম্বন্ধে কত কম জানতেন—সুভাষচন্দ্রের মত বিশ্বরাজনীতি সম্বন্ধে উৎসুক মানুষও! না জানবার যথেষ্ট কারণও ছিল। ভারত ও ইউরোপের ভৌগোলিক ব্যবধান অল্প নয়। চিন্তার বিনিময়ের পথে এই স্থান-ব্যবধান তো ছিলই, রাজনৈতিক বাধাও অল্প নয়। ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রবেশরোধের জন্য ইংরেজ শাসকদের চেষ্টার অবধি ছিল না। ইংরেজী বাদ দিলে অন্য ইউরোপীয় ভাষায় রচিত চিন্তা ভারতের মত পরাধীন দেশে অবিলম্বে অনূদিত হয়ে হাজির হয় না। হাজির হলেও তার সাক্ষাৎ সংস্পর্শে তৎক্ষণাৎ আসা সুভাষচন্দ্রের পক্ষে সহজে সম্ভব নয়, কারণ হয় তিনি জেলে আছেন, নয় তিনি রাজনীতির কাজে ডুবে আছেন। অধিকন্তু, রোলাঁর যে মানসিক পরিবর্তনের কথা আমরা বলতে যাচ্ছি, তার লিখিত বিবরণ তখন সবে প্রকাশিত হচ্ছে। আর মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বহু কথাই ডায়েরীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল, (যার সাহায্য আমরা অল্প পরেই নেব) তা প্রকাশিতই হয় নি। রোলাঁ তাঁর পরিবর্তিত মতের কিছু কিছু গান্ধীজীকে (এবং কিছুটা রবীন্দ্রনাথকেও) জানিয়েছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত চিঠির সেইসব অর্থপূর্ণ বক্তব্যকে গান্ধীজী (বা রবীন্দ্রনাথ) সুভাষচন্দ্রের গোচর করবেন, তা আশা করা যায় না। তাই ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্র যখন ঐ প্রবন্ধ লিখেছেন—সবিস্ময়ে লেখা ঐ প্রবন্ধটি ভারতীয় পাঠকসমাজে প্রভূত বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল। এর থেকেই বোঝা যায়, রোলাঁর সর্বশেষ ধারণা সম্বন্ধে ভারতীয় পাঠকসমাজ কতখানি অনবহিত ছিল।

গান্ধীজী ও গান্ধীনীতি সম্বন্ধে রোলাঁর মনোপরিবর্তনের যে-কাহিনী উপস্থিত করতে যাচ্ছি, তার ভিত্তি শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত রচিত "কালান্তরের পথিক রমাঁ রলাঁ" গ্রন্থ। রোলাঁর যে ইমেজ আমাদের মনে গড়ে উঠেছে, শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত তাকে কঠোরভাবে আঘাত করে চূর্ণ করতে চেয়েছেন। গ্রন্থমধ্যে তিনি বারবার তিক্তভাবে বলেছেন, বাংলা ও ভারতের 'কালচার'-ভক্তেরা রোলাঁকে গান্ধী, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, টলস্টয়, বড় জোর জাঁ-ক্রিসতফের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চান; রোলাঁ কিন্তু এই গণ্ডী পেরিয়ে গিয়েছিলেন। চড়া ও কড়া ভাষায় লেখা, প্রচুর আকর্ষণীয় তথ্যসংবলিত বইটির জন্য শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তকে ধন্যবাদ জানাই; এ ধন্যবাদ আমার পক্ষে একেবারে আবশ্যিক, কারণ রোলাঁর মানস-বিবর্তনের কাহিনী বলার সময়ে উপাদানের জন্য তাঁর রচনার উপরই প্রধানত নির্ভর করব, কিন্তু এই সঙ্গে সবিনয়ে জানাতে পারি, শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের গ্রন্থ পড়ে আমার মত নগণ্য বিবেকানন্দ-ভক্তের পক্ষে আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন হয় নি (শ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দ-ভক্ত সুভাষচন্দ্র রোলাঁর পরিবর্তিত মত জেনে উল্লসিতই হয়েছিলেন), কারণ বিবেকানন্দ সব সময় সত্য চেয়েছেন—ভেঙে চুরমার করে দেবে, এমন সত্যকেও।*

এই অধ্যায় যাঁরা পড়বেন, তাঁদের আর একটি বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত তাঁর গ্রন্থে স্পষ্টই গান্ধীজী সম্বন্ধে ভারতীয় জনগণের মোহনাশ করতে চেয়েছেন রোলাঁর সঙ্গে। গ্রন্থ-ভূমিকায় শ্রীঅমিয়ভূষণ চক্রবর্তী বলেছেন, "নাম্বুদিরিপাদের 'মহাত্মা' সম্বন্ধে ইংরেজী বইখানির পর এ রকম মোহমুদ্গর আর এদেশে প্রকাশিত হয় নি।" সেনগুপ্ত-রচিত মোহমুদ্গরে গান্ধীজী অনেক সময়ই নরকের দ্বার হয়েছেন। আশঙ্কা হয়, 'শয়তানকেও তার প্রাপ্য দিতে কার্পণ্য কোরো না'—এ-ধরনের বুর্জোয়া প্রবাদকে উগ্র হাস্যের সঙ্গে লেখক লাঞ্ছিত করবেন, তাঁর গ্রন্থ পাঠে তাই মনে হয়। [ক্রমশঃ]

জন্য ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসার, সমাজতন্ত্রের অনিবার্যতা প্রভৃতি বিবেকানন্দ যেভাবে স্বীকার করে গেছেন সেভাবে অপর কোনো ভারতীয় মনীষীর ক্ষেত্রে দেখা যায় না। রোমাঁ রোলাঁও তাঁর গ্রন্থে এসব কথা যথেষ্ট বলেছেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত সেসবের উল্লেখে বিরত। কারণটা অনুমান করা কঠিন নয়। বিবেকানন্দ শূদ্র মানুষের সমানাধিকার চান, কিন্তু ধর্মকে বাদ দিতে চান না, তিনি মানুষের ঐহিক উন্নতি আকাঙ্ক্ষা করেও মানুষের অতীন্দ্রিয় অনুসন্ধান; অর্থাৎ ধর্ম যতই প্রগতিশীল হোক না কেন, 'ধর্ম' শব্দটাকে তা বর্জন করে নি—সুতরাং তিনি সমাজতন্ত্রধর্মী প্রগতিশীল হলেও শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত স্পষ্টই লিখেছেন, অধ্যাত্মবাদের কোনো সুদৃঢ় ভিত্তি নেই, সবই কাল্পনিক। সর্বপ্রকার অতীন্দ্রিয়বাদই আত্মপ্রবঞ্চনা ও পলায়নী মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত—আত্মকেন্দ্রিকতা ও দম্ভই তার পরিণতি।" এখানে সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়, অতীন্দ্রিয়বাদীরা যখন বলেন 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' ইত্যাদি, তখন তাঁরা যেমন আধ্যাত্মিক দম্ভে পূর্ণ, সাম্যবাদীরাও অনুরূপ দম্ভে আক্রান্ত হন যখন তাঁরা অভ্রান্ত মার্কসবাদ-ধর্মগ্রন্থের উপরে হাত তোলেন। এখানে আরও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, বিমূর্ত মানবতাবাদী রোমাঁ রোলাঁ মূর্ত সমাজতান্ত্রিক হয়েও যাঁকে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য সংশোধন বা প্রত্যাহার করেন নি, গান্ধী সম্বন্ধে যা কিয়দংশে করেছিলেন, করা সম্ভবও ছিল না, কারণ রোলাঁ যখন বিবেকানন্দ সম্বন্ধে লিখেছেন, তখন বিবেকানন্দ গত হয়েছেন—তাঁর সম্বন্ধে সব তথ্য যোগাড় করেই তবে লিখেছিলেন।

* শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের লেখার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ এখনি করা যায়, তিনি সর্বত্রই বিবেকানন্দ ও গান্ধীকে বন্ধনীবদ্ধ করেছেন—স্বয়ং রোলাঁ যা করেন নি। কর্ম-সাফল্যে গান্ধী বিবেকানন্দকে অবশ্যই ছাড়িয়ে যাবেন (বিবেকানন্দ রাজনীতিক ছিলেন না), কিন্তু জনগণের সমস্যা ও অধিকার সম্বন্ধে বিবেকানন্দের পরিণত ধারণার সঙ্গে গান্ধীর দুর্বল শিথিল ধারণার কোনো তুলনাই হয় না। জন-শিক্ষার বিস্তার, অর্থনৈতিক উন্নয়নের

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ তেইশ ॥

বাংলাভাষা জিন্দাবাদ।

জান দেবো, জবান দেবো না।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা জুড়ে হিংসার আগুন : বঙাল খেদাও—আসাম অসমীয়াদের জন্য। বাঙালির ঘরবাড়ি দোকানপাট দাউদাউ করে জ্বলছে। প্রাণও যাচ্ছে বাঙালির। গৌহাটীর ডেপুটি কমিশনার অবধি বাঙালি হওয়ার অপরাধে আক্রান্ত হলেন। প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে বাঙালি। পূর্ববাংলা থেকে পালাতে হয়েছিল এক সময়, এবারে ভারতবাসী হয়েও ভারতের একটি রাজ্য থেকে।

বঙ্গভাষা বিল পাশ হল : আসামের একমাত্র সরকারি ভাষা অসমীয়া। বাংলা ভাষা দাবি ছাড়বে কেন? সভা সমিতি, আন্দোলন। বাংলাকেও অন্যতম রাজ্যভাষা মেনে নিতে হবে। কাছাড় সম্মেলন তারিখ চিহ্নিত করে দিলেন—৩১শে চৈত্র (১৩৬৭ বঙ্গাব্দ) এর মধ্যে।

মেয়াদ পার হয়ে গেল। ১লা বৈশাখ সবর্ণ কাছাড় শপথ নিল : জান দেবো, জবান দেবো না। সংগ্রাম অহিংস সত্যাগ্রহের পথে। বুকের রক্ত নাম লিখে দিচ্ছেন সত্যাগ্রহীরা। হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে নাম লেখাবার জন্য।

॥ সংগ্রাম-পরিষদের ইস্তাহার ॥

দিল্লি আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার জন্য আমরা সংগ্রামী জনসাধারণ হতাশ হই নাই। প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমরা জানাইয়া দিতে চাই সম্পূর্ণ দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম বন্ধ করিব না। মাতৃভাষা জিন্দাবাদ।

তারিখ ঘোষণা হল ১৯শে মে, শুক্রবার। হরতাল, পিকেটিং—ঐদিন থেকে। উত্তাল কাছাড়ভূমি। পুরুষ মেয়ে ছেলে বুড়ো সকলের ঘুম হরে গেছে,—কত আর দেরি সেই উনিশের। সরকারও ছেড়ে কথা কইবে না। সৈন্যে সৈন্যে ছেয়ে ফেলেছে। মাদ্রাজ রেজিমেন্ট, আসাম রাইফেলস, সেন্ট্রাল রিজার্ভ ফোর্স। ছাউনি পড়ছে এখানে-সেখানে। ছাই-রঙের মিলিটারি গাড়ির অস্থির ছুটোছুটি। তার সঙ্গে অস্ত্রধারী পুলিশ—সবগুলো থানা পুলিশে ভরভরতি। একশ-চুয়াল্লিশ ধারা—পাঁচজনের বেশি একসঙ্গে হতে পারবে না। আর এন্তার ধরপাকড়। সত্যাগ্রহ না লাগতেই জেলখানা দস্তুরমতো জমে গেল।

উনিশে মে। ভোরবেলা কে ভেবেছে, শিলচরের বিশেষ দিন একটি। ইতিহাসের পাতায় নৃশংসতার একটা কলঙ্কের কথা। আজকে কলে কৌশলে চেপেচুপে রাখলেও এইদিনটা ভেবে চিরকালের মানুষের নিশ্বাস পড়বে। বারো ঘণ্টা হরতাল—ভোর চারটে থেকে বিকাল চারটে।

॥ ইস্তাহার ॥

উনিশে মে কাছাড়বাসীর সামনে এক অগ্নিপরীক্ষার দিন। এইদিন প্রমাণ হবে, আমরা আমাদের মাকে—মাতৃভাষাকে কতটুকু ভালবাসি। ভাষা দিয়েই জাতির পরিচয়। ভাষা না থাকলে জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাই আহ্বান জানাই, ওরে ভাই, এগিয়ে এসো, তোমাদের মাতৃকণ্ঠকে অত্যাচারীর হাত থেকে মুক্ত কর, উত্তর-পুরুষের ভবিষ্যৎ নির্মল কর।

শিলচর রেলস্টেশনে লোকারণ্য। পয়লা ট্রেন ৫টা ৪০ মিনিটে। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে ট্রেন। একটা টিকিটও বিক্রি হয় নি এখনো। সত্যাগ্রহীরা সারবন্দী বসে পড়েছে লাইনের উপর—হাজার হাজার সত্যাগ্রহী। সৈন্যদলও অদূরে মোতায়েন।

গাড়ি করে ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ-সুপার পৌঁছে গেলেন। সত্যাগ্রহীদের এক কর্তাব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা : গ্রেপ্তার করলে কি গোলমাল হবে? বাধা দেবে তোমরা?

কখনো নয়। আমরা সত্যাগ্রহী—অহিংস।

তবু গ্রেপ্তারের ঝামেলায় গেল না তারা। পিটিয়ে তাড়াবে। মানুষজন তাড়িয়ে নিঃশেষ করে ট্রেন ছাড়বে। মারমূর্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সৈন্যরা। বেদম মার মারছে। ছেলে মেয়ে শিশু বৃদ্ধ বাদ নেই।

কিন্তু মার ওদের গায়ে লাগে না। মন্ত্র জানে। আঘাত যত প্রচণ্ড, মন্ত্রের ততই আকাশ মন্দ্রিত ধ্বনি। মাতৃভাষা জিন্দাবাদ। এ মন্ত্র মুখে থাকতে ঠাঁই থেকে নড়াবে কার সাধ্য?

মেরে মেরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সৈন্য-দল। হাঁপ ধরে গেছে, খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে নেয়। কিন্তু শেষ নয়। সমুদ্রে এক ঢেউ শেষ হয়ে আবার ঢেউ আছড়ে পড়ে। তেমনি এদের। বিশ্রাম নিয়ে দ্বিগুণ বিক্রমে লাঠিচার্জ। লাইন আঁকড়ে ধরে সত্যাগ্রহীরা ঘাড় নিচু করে আছে। যত খুশি মেরে যাও। সাড় নেই বোধ হয় কোন অঙ্গে। একটুকু নড়ে না।

আবার খানিক জিরিয়ে নিয়ে তৃতীয় দফা। কাঁদানে গ্যাস ফাটাচ্ছে। বার বার তিনবার। দম বন্ধ হয়ে আসছে তবু একটি সত্যাগ্রহী নড়বে না, যতক্ষণ অন্য কেউ এসে জায়গা না নিয়ে নিচ্ছে।

জব্দ করা গেল না। সৈন্যদের হাতের অস্ত্রই বুঝি বাঙ্গ করছে। ছেলেদের ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবার মেয়েদের ভিতর। লাথি, লাঠি আর বুটের গুঁতো। তলপেটে লাথির পর লাথি ঝাড়ছে কয়েকটা মেয়ের। গৌরী বিশ্বাস, সীতা দে, রজনী মালাকার গড়িয়ে পড়ল—ক্ষতবিক্ষত অর্ধমৃত। ঠোঁট নড়ছে তবু, শব্দ বেরুচ্ছে : বাংলাভাষা জিন্দাবাদ। অস্থায়ী রেডক্রস-কেন্দ্র খোলা হয়েছে। কিন্তু মেয়ে হোক ছেলে হোক লাইন ছেড়ে কেউ সেদিকে যাবে না। দু-হাতে অশ্রান্ত রক্ত মুছছে, আর ফাঁকে

কাছে ধ্বনি তুলছে : জান দেবো, জবান দেবো না।

হম্বিতম্বি দেখল কর্তারা। জোর-জবরদাস্তিতে সবুরে না মালুম পেয়েছে। মারধোর বন্ধ করে এবারে সন্ধির প্রস্তাব : গ্রেপ্তার করা হবে এক একটা দল ধরে। সত্যাগ্রহীরা আগুয়ান হও।

তাই চলল। গ্রেপ্তার করে কিন্তু জেলে নিয়ে যায় না, ট্রাকে তুলে শহর থেকে অনেক দূরে মাঠে জংগলে ছেড়ে দিয়ে আসে। খবর পেয়ে সংগ্রাম-পরিষদ বাসের বন্দোবস্ত করল। ট্রাকের পিছু পিছু বাসও ছুটেছে। পুলিশ সত্যাগ্রহীদের ট্রাক থেকে নামিয়ে দিল, বাস সংগে সংগে তুলে নিয়ে ছুটতে ছুটতে আবার তার নিজের জায়গায় পৌঁছে দেয়। কাঁহাতক এই খেলা ভাল লাগে? গ্রেপ্তার বন্ধ করে দিয়ে পুলিশ চুপচাপ রইল।

দুপুর গড়িয়ে যায়। হরতাল নিখুঁত—একটি ট্রেন 'চলে নি'! লাইনের মাল একখানিও না। বেলা দুটো—আর দুই ঘণ্টা কাটিয়ে চারটা বাজিয়ে দিলেই হয়ে গেল। পূর্ণ বিজয়ী।

হঠাৎ চেঁচামেচি, ছুটোছুটি। কোথা থেকে একদল সত্যাগ্রহী পুলিশ গাড়ি ভরতি করে নিয়ে যাচ্ছিল—গাড়িতে আগুন। স্টেশনের সত্যাগ্রহীরাই ছুটল আগুন নেভাতে, কাদা কচুরিপানা বালি চাপা দিয়ে নেভাল সে আগুন।

পরাজয়ের আক্রোশ পুলিশকে পেয়ে বসেছে—বেধড়ক লাঠি চালাচ্ছে। দু-পাঁচ-খানা ইটও এসে পড়ল, কারা মেরেছে খোদায় মালুম। এক কনস্টেবল চিৎকার করে উঠল, তার যেন রাইফেল পাওয়া যাচ্ছে না।

বহুদর্শীরা বুঝেছেন, পরিপাটি একখানা গোলমাল জমানোর আয়োজন। মাতব্বররা লাউডস্পিকারে সামাল করছেন : [illegible] 'জিতবই আমরা'। মাতৃভাষা 'জিন্দাবাদ'। শান্তি বিঘ্নিত হতে দেব না আজ।

চতুর্দিকের অগণিত মুখে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল : মাতৃভাষা জিন্দাবাদ! সাগর-গর্জনের মতো আলোড়ন। তারই সংগে সহসা দুম—দুম—দুম—

বন্দুকের গুলি। সতর্ক করে নি জনতাকে। ফাঁকা আওয়াজও নয়। ক্ষিপ্ত পুলিশ চালাচ্ছে ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে। সত্যাগ্রহীরা লুটিয়ে পড়ছেন। আর্তনাদ, রক্তস্রোত। ঝাঁকে ঝাঁকে স্বদেশী পুলিশের গুলি। সাত মিনিটে সতেরো রাউন্ড। পাকা হাত সন্দেহ কি! প্লাট-ফরম রাঙা, রেললাইন রাঙা। কী আশ্চর্য, মাটি আঁকড়ে তবু সত্যাগ্রহীরা। চোখে আগুন, মুখে অগ্নি-শপথ : জান দেবো জবান দেবো না।

নয় জনকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন

হাসপাতালের সিভিল-সার্জন। কমলা ভট্টাচার্য, হিতেশ বিশ্বাস, কুমুদ দাস, তরণী দেবনাথ, চন্ডী সূত্রধর, সুকমল পুরকায়স্থ, কানাই নিয়োগী, শচীন পাল, সুনীল সরকার। দুদিন পরে আরও দুটি যোগ হল নয়ের সঙ্গে। সত্যেন্দ্র দেবের দেহ ঝেলের পুকুরের জলে ভেসে উঠল, হাসপাতালে বীরেন্দ্র সূত্রধর চোখ বুজলেন। এগারো হল. এগারোটি ভাষা-শহিদ।

প্রমথ বিশ্বাস হঠাৎ গায়ের জামা তুলে দেখায় : কান্ড দেখুন. সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। হাত বুলিয়ে দেখতে পারেন। বীরের মৃত্যুকালে স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি—পৌরাণিক পালায় মধ্যে দেখে থাক আমরাই। দেবতা-গন্ধর্ব অন্তরীক্ষ এসে নিরীক্ষণ করেন। সেদিনও ঠিক তাই হয়েছিল—শিলচরের মরণ দেখতে দেবতারা অলক্ষ্যে এসেছিলেন ।

নীলকণ্ঠ টিপ্পনী কাটলেন : অ্যাটম-বোমা ফাটানোর যা পাল্লাপাল্লি, ধকল কাটিয়ে দেবতারা আজও যদি টিকে থাকেন।

খানিকটা ব্যঙ্গের সুরে প্রমথ আবার বলল, বরকত-সালাম-জব্বরের আত্মারাও এসেছিলেন, এপারের এগারো শহিদকে পাশে টেনে নেবার জন্য।

রঞ্জন বলে, মরার পরে ভারি সুবিধা, বর্ডার পারাপারে আমাদের মতন দালাল ডাকতে হয় না। হিন্দু-মুসলমানেও ভেদ থাকে না আর তখন।

প্রণব বলে, জ্যান্ত থাকতেই বা সত্যিকারের ভেদাভেদ কোথা ? আপনার কাছেই তো খবর শুনি। আইন করে দেশের মাটি খন্ডবিখন্ড করল। মাটিটুকুই পেরেছে, মানুষের বেলা পয্যন্ত। ভাষার ঘাড়ে কোপ পাড়তে গিয়েছিল—কোপ ফিরে এলো অস্ত্র ভোঁতা হয়ে। বর্ডারের ওপারে পারে নি, এ-পারেও হতে দেবো না আমরা। বঙ্গদেশ দু-টুকরো—বঙ্গভাষা এপার-ওপার আজও এক করে বেঁধে রেখেছে।

রঞ্জন জুড়ে দিল : শুধু ভাষা। দেশ ভাগ হয়ে গিয়ে সমাজ-সামাজিকতা চাল-চলন খাওয়াদাওয়া আরও যেন বেশি একাকার। সাদা চোখে আর তফাৎ বুঝবেন না হিন্দু-মুসলমানে, অণুবীক্ষণে দেখতে হবে। মোল্লাদের মুখে চিরকাল শুনে এসেছি, মুসলমান মেয়েদের সিঁদুর পরলে গুণাহ্ হয়। কত মেয়ে এখন এ্যাবড় এ্যাবড় সিঁদুরফোঁটা পরে ঘোরেন। শাঁখা-আলতাও পরতে দেখেছি। বলেন, হিন্দুয়ানা নয় এসব, বাঙালিয়ানা। বাঙালির আচার হিন্দুরা একচেটিয়া করে রেখেছিল, হকের দাবি ছাড়ব কেন—এদ্দিনে দখল নিয়ে নিচ্ছি।

প্রমথ বিশ্বাস রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে পড়ে খপ করে প্রশ্ন করল : খাঁটি জবাব দাও দিকি। তুমি নিজে কি—হিন্দু না মুসলমান ? নাম কখনো শুনি রঞ্জন দত্ত, কখনো রমজান আলি। আসল কোনটা ?

রঞ্জন উড়িয়ে দিল একেবারে : দরকার বুঝে ব্যবস্থা। যা-হোক একটা হলেই হল। ওসব নিয়ে কে মাথা ঘামাতে যায় ? —সত্যি বলছি।

কী আশ্চর্য, ধর্ম নেই তোমার ?

ক'জনার থাকে, আপনিই বলুন না। বিশেষ করে আমাদের বয়সের মানুষের—

একটু থেমে রঞ্জন দত্ত আবার বলে হিন্দু বলুন মুসলমান বলুন, সবই লোকের বুড়ো বয়সে হয়ে থাকে। দুনিয়ার লীলাখেলা খতম করে অন্যত্র যেতে হবে যখন। আর দেখেছি ভোটের সময়টা ধর্মের খোঁজখবর পড়ে। স্বাতন্দ্র্যবোধ কখনো নজর করে নি, সেই মানুষ দেখেছি মীটিং করতে করতে উঠে গিয়ে নমাজে বসে। আরে ভাই, পথে না বেরিয়ে এমন-এমনি কে খোঁজলোকোর খবর নিতে যায়। রাজনীতি করিনে, হাবাগবা লোক পটাতে হবে না, কিম্বা বয়সেও বুড়িয়ে যাই নি এখনো—ধর্মে আমার গরজটা কি বলুন তো।

প্রণব যদিও অন্যমনস্ক নিয়েই আলাপ করছিল একরকম মনে মনে। উদাসকণ্ঠে বলে ওঠে, দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষ তো কতই শহিদ হয়েছেন, কিন্তু দুনিয়ার ইতিহাসে ভাষার জন্য প্রাণদান শুধু এই ভারতবর্ষে—ভাগ হয়ে গিয়ে যার নাম এখন পাক-ভারত। নরনারী প্রাণ দিয়েছেন বাংলাভাষার জন্য—

উঁহু, উঁহু—বলে নীলকণ্ঠ প্রতিবাদ করে ওঠেন : তামিল বাদ দিয়ে শুধু বাংলা কেন ? তামিলের কথা বেশি করে বলতে হবে। স্বাধীনতা-দিবসে দিল্লীতে আর রাজ্যে রাজ্যে রোশনাই। তামিল ছেলে রোশনাই করল মাতৃভাষার নামে গায়ের উপর দাউদাউ করে পেট্রোল জ্বালিয়ে। রোসনাইয়ের জৌলুষে হারিয়ে দিল সেদিন ভারতের তাবৎ রাজ্যগুলোকে।

একটু থেমে প্রদীপ্তকণ্ঠে আবার বললেন, বাঙালি আর তামিল দুই জাতি প্রাণ দিয়েছে। আপাতত এই অবধি। চক্রীদের কিন্তু চোখ ফোটে নি। মানুষও কোমর বাঁধছে—প্রাণ দেবার আরও কত মানুষ এগিয়ে আসবে দেখো।

বলো হরি, হরিবোল—

মড়া শ্রীধর মল্লিকের উঠলে। শ্রীধর কোন দিকে ছিলেন, হন্তদন্ত হয়ে এলেন।

কী ব্যাপার, ঘাটের উপর মড়া কেন ?

ক্ষিতিনাথ মড়ার মধ্যে। মহাজন বললেন, ঘাট ছাড়া মড়া আর কোথায় যায় ? সেই ভদ্রলোক আছেন তো এখানে ? বুঝতে পারলেন না—যাঁর কথা বলতে আপনি আমবাগান অবধি গিয়েছিলেন। বাপকে গঙ্গায় দেবেন বলে কান্নাকাটি করে এঁরা মড়া নিয়ে এসেছেন। পাকিস্তানের গেঁয়ো মানুষ—গঙ্গা-টঙ্গা চেনা নেই। ভদ্রলোককে ডেকে আনুন, ব্রাহ্মণের সৎকারের ব্যবস্থা তাঁকেই করে দিতে হবে।

হেসে পুনশ্চ বললেন, খাটনিটা মুফতের নয়। তা হলে আনতে যাব কেন ? পাওনাগন্ডা আশার অধিক।

ঘাটের ঘাটেয়াল, পাকা লোক—এতেই মোটামুটি বুঝে নিলেন। প্রণবকে ক্ষিতিনাথ বললেন, দীনদয়াল চাটুয্যের নাম শুনেছেন ? শুনবেন কি করে, পাকিস্তানে তো যাতায়াত নেই। ধনী-মানী হয়েও পরোপকারী মানুষ। গঙ্গায় দেহ সমর্পণ করতে যাবেন। আপনাদের বাড়ি অতিথ হলে নাকি বড্ড আরাম। এঁরাও তাই হবেন। ঘন্টাখানেক ওখানে জিরিয়ে যাবেন সেই ব্যবস্থা হয়েছে।

কলার চড়ক শ্রীধর হাসছেন। প্রণব একটুখানি ভেবে বলল, শ্মশান অবধি মিছে কেন যেতে যাব ? এখান থেকেই বাড়ি হালকা করে দিয়ে সোজা ওঁরা কলকাতার নিমতলায় চলে যান। বিচার করে আপনারা বলে দিন, খরচখরচা সেই মতো আমি মিটিয়ে দিচ্ছি।

দীনদয়ালের পুত্রেরা — পিতৃভক্তির জোরে এই কষ্ট করে চলেছে—প্রস্তাবে অতিশয় প্রসন্ন। বলে, তা হলে তো ভাল হয়। খুবই ভাল হয়। ঝামেলা সহজে মেটে। হোক তাই, আমরা রাজি।

আর এক পুত্র বলে, তবে আর অত দূর নিমতলাই বা কেন ? পথে কি আর গাঙ-খাল নেই ? সব গাঙই সাগরে গেছে—জলে জলে মেশামেশি, গাঙ মাত্রই গঙ্গা। তো গঙ্গা।

ক্ষিতিনাথ বললেন, সাচ্চা কথা! কথা এখান থেকে মিটিয়ে বাপকে কাঁধে তুলে একটা কোন গাঙ কি খানা-ডোবা তাক করে স্ফূর্তিতে আপনারা বেরিয়ে পড়বেন। কিন্তু প্রণববাবু নিজের উপায়টা তলিয়ে ভাবছেন না। মাল নিয়ে তিনি কেমন করে ঘরে পৌঁছবেন ?

প্রণব বলে, ভেবেছি বইকি। কিন্তু আরো বড় ভাবনা, মড়ার গায়ে বাঁধা চাল—মায়ের বড্ড ঘেন্না—মরে গেলেও এই চাল রান্নাঘরে নিতে চাইবেন না। আবার এ-ও ঠিক, মড়া দিয়ে শুধু আমাদের ক্ষমতায় চাল ঘরে তোলা যাবে না। পথের মানুষ টের পেলে কেড়েকুড়ে নেবে। পুলিশে টের পেলে ডি-আই রুলে ধরবে।

ক্ষিতিনাথ বললেন, ধরবার লোক আমরাও তো। সরকারের চাকর হলেও অনায্যটা কী আর বুঝিনে ? ব্ল্যাকে চারগুণ পাঁচগুণ দামে কিনে নিজেই আবার চোরের দায়ে পড়া। অথচ পেটে না খেয়ে মানুষই বা বাঁচে কেমন করে ? দু-দিন চারদিনের ব্যাপার নয় যে, কচুঘেচু ঘাসপাতা খেয়ে কাটিয়ে দিলাম। বছরের পর বছর ধরে এই

রকম। দেখেশুনে আমরাও তাই একরকম চোখ বুজে থাকি। চাকরি বাঁচানোর মতন একটু-আধটু কাজ দেখিয়ে বাকি সব ছেড়ে দিই। মুফতে করি, সেটা বলছি নে। নিজেকেও ব্লাক-মার্কেটে কিনতে হয়, সে খরচা মাইনের কড়িতে কুলোয় না।

আপত্তি শ্রীধরের : প্রণববাবু তা বলে এখনই যেতে পাচ্ছেন না। ভাল-ভাবের ব্যবস্থা হচ্ছে। পাত পেড়ে পাশাপাশি বসে খাবো। আপনিও কিন্তু ছাড় পাচ্ছেন না বাগচিমশায়।

ক্ষিতিনাথ বল্লেন, না পেলাম ছাড়—আমার কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু শ্মশানবন্ধুদের লহমাও দেরি করা চলবে না। এমনিই দু-দিনের বাসি মড়া—এর পরে গন্ধ ছাড়বে, নাকে কাপড় চেপেও বমি ঠেকানো যাবে না।

প্রণব অনুনয় করে বলে, নেমন্তন্ন আজ মুলতুবি থাকুক মল্লিকমশায়। যে আপ্যায়ন পেয়ে গেলাম, আবার আসতে হবে। বারান্তার আসব। আর রঞ্জনবাবু ঠিক ধরেছেন : আপ্যায়ন ওপারেও—আঠারো বছর ধরে বুক-ভরা সব আপ্যায়ন মজুত করে রেখেছে। সরেজমিনে দেখে আসতে হবে বই কি। চেনা-জানা করে আসব ওপার থেকে। বাংলা কেটেছে বলে কেন মানুষ মুশড়ে যায় জানি নে। পার হতে ভয় লাগে তো আপাতত বর্ডার অবধি এসে ঘাড় উঁচু করে ওপার পানে তাকিয়ে দেখতে পারে। যাবা পারাপার হচ্ছে, কানে শুনতে পাবে তাদের কথা—

রঞ্জন মাঝখানে টিপ্পনী কেটে উঠল : জুজুর ভয় দেখিয়ে রেখেছে—যেমন এপারে তেমনি ওপারে। মানুষ এদিকে ভাওতা ধরে ফেলেছে। চুক্তিপত্র বানিয়ে দেশ কেটে দুখানা করা আর মাঝে মাঝে দাঙ্গা উসকে দিয়ে আসর গরম রাখা—চিরকালের সম্বন্ধ ওতে মুছে যাবে না। (ক্রমশঃ)

গ্রাম বাংলার কথা

অসীম মুখোপাধ্যায়

"আর যাবে নি গাড়ি।"

"কেমনে বলিব সি কথা? পটোপাড়ায় থাকতি আপনারে দুখান গাড়ির কথা বলেছিলাম, তা' মোর কথা তো শোনলেন নি। ছাওয়াল, কন্যা সবাকারে একত্র করি দিলেন।"

"তার জন্যি কি মাঝ রাস্তায় দাঁড়ে থাকতি হবে?"

"নিশ্চয়। যেমন কম্ম, তেমন ফল।"

"খবরদার বেটা শ্যালের বাচ্চা, কারে কি বলিস তুই?"

"বলি আপনারে, আপুনি অন্যায় করিছেন।"

"বেটা গাড়োয়ান, তোমারে আমি আজ"—

চায়ের কেৎলী নামিয়ে রেখে যজ্ঞেশ্বর দৌড়ে এল।

"করেন কি মোশাই? একে সদর রাস্তা, তায় আবার পুজো-পাব্বনের দিন। আপনাদের গুঁতোগুঁতিতে ঠ্যাঙ্গোওয়ালরা হাসতিছে।"

"ও ব্যাটাই তো আগে।"

"থাক না মোশাই, বাজে কথায় কাজ কি? আসেন, সবাই মিলি ঠেলা দিলি গাড়ি উঠি যাবে। পাঁক বেশি নাই মোটে।"

সাগরে শম্ভুচরণকে ডাকল যজ্ঞেশ্বর। "একবার আস হেথা শম্ভু, চাকা ধরাতি হবে।"

মিনিট দশেক পর গরুর গাড়িটা কাদা ছেড়ে রাস্তায় উঠল। "চক্কোত্তি" মশাই সদলবলে গড়ভবানীপুরে রওনা হলেন। যজ্ঞেশ্বর আর শম্ভুচরণ পাশের "টিউকলে" হাত-পা ধুতে গেল।

সাতসকাল থেকে শ্রীমান যজ্ঞেশ্বরের দোকানে বসে আছি। লোকজন আসছে, যাচ্ছে। এ' তল্লাটে চায়ের দোকান আর নেই। গলা ভেজাতে সবাই এখানে আসে। কাজেই যজ্ঞেশ্বর চুটিয়ে ব্যবসা করছে। পয়সা আর খাতির দুটোই আছে তার। আমিও এসেছি সুলুক-সন্ধান নিয়ে। তার সুপারিশে কেউ যদি আশেপাশের গাঁয়ে ঘুরিয়ে আনে। এ পর্যন্ত চা গিলেছি বার দশেক, তারিফ করেছি অজস্র।

"কি চমৎকার বস যজ্ঞেশ্বর, কি চমৎকার সোয়াদ, কোথাকার চা এটা, দার্জিলিং?"

মনে মনে অবশ্য মুণ্ডুপাত করছি। চা'র রং দেখে নাম রাখব ভাবছি "মা কালী ব্রান্ড", আর স্বাদ? ওয়াক!

যজ্ঞেশ্বর ফিরে আসতে আবার কথাটা তুলতুম, অবশ্য চায়ের সাথে।

"কেঁদুয়ার মাঠে ক'ঘর তিয়র আছে যজ্ঞেশ্বর।"

"সেথা যাবার উপায় এখন নেইকো বাবু।" পাশে বসে-থাকা আধবুড়ো এক চাষী উত্তর দিল।

"কেঁদোর মাঠ এখন সমুদ্দুর, যেথায় তাকান, কেবল অথৈ জল। তার মধ্যি তিয়রদিগের ভিটে ভাসতিছে। ডোঙা আর শালতি ছাড়া পারাপারের সব উপায় বন্ধ। আধেক রাত্তিরে কান পাতিলে শোনবেন জল ছলাৎ, ছলাৎ ডাকতিছে, যেন নদীর বুকে শোয়ে আছেন।"

কেঁদুয়ার মাঠে যাওয়া কঠিন জানি। প্রকৃতি আর অপদার্থ সরকার তাকে আজ এক বিভীষিকায় পরিণত করেছে। জলের তাড়ায় মানুষগুলো দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করে সারাটা বর্ষা। এ পাড়ার সাথে ও-পাড়ার কোনও যোগাযোগ থাকে না। রাত-বিরেতে কারো কিছু ঘটলে খবর দেওয়া-নেওয়ার সুবিধে নেই। ডাক্তার-বদ্যি কেঁদো থেকে ডাক এসেছে শুনলে পাশ ফিরে শোয়। কেঁদো যাব, কেঁদোর মাঠ দুটোই সমান ভয়ঙ্কর।

বললুম—"গত মাসে ওদিকে যাব ভেবেছিলুম। কেউ যেতে দিল না। বলল বাঁধ ভেঙে জল ঢুকছে। পথে-ঘাটে ভীষণ কাদা, ও-সব জায়গায় এখন যাবেন না। এবার তাই একবার ঘুরে আসব ভাবছি।" এতক্ষণে যজ্ঞেশ্বর সদয় হয়েছে মনে হলো। চায়ের গ্লাসে চামচ দিয়ে নাড়তে নাড়তে বলল, "মনোদাদা, উদয়নারায়ণপুরের খপর কিছু বলদিকি।"

মনোদাদা এককোণে বসে চায়ে রুটি ভিজিয়ে খাচ্ছিল। উদয়নারায়ণপুরের খবর দিল সে।

বছর কয়েক আগে আমতা থানার এক অংশ নিয়ে গড়ে উঠেছে উদয়নারায়ণপুর। একটি সম্পূর্ণ পৃথক থানা। প্রশাসনিক কাজের সুবিধের জন্যই এটা করা হয়েছে। কিন্তু এই থানার সবচেয়ে বড় ত্রুটি বোধহয় যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব। আমতা সদর থেকে সরাসরি কোনও ভাল পথ সেখানে গেছে কি না জানি না। একটানা বাস বা টেম্পো চেপে যাওয়ার উপায়ও নেই। মুন্সীর হাট থেকে খানিকটা এসে হুদ হুদ করে, তারপর রিক্সা চাপ। ধকর ধকর করে এক-সময় উদয়নারায়ণপুরে উদয় হবে। দেখবে সুবিধেব গড়াতে গড়াতে একেবারে চিৎপটাং, সন্ধ্যে হব হব করছে।" মহকুমা শহর উলুবেড়ে ক'মাইলই বা। তাও উদয়নারায়ণপুর থেকে সাত-আট ঘণ্টার পথ।"

যাতায়াতের অসুবিধে গ্রাম-বাংলার আর এক বড় সমস্যা এবং অন্যান্য বড় সমস্যার মত আজও সমান উপেক্ষিত। দশটি অঞ্চল নিয়ে ছোট্ট থানা এই উদয়-

নারায়ণপুরের। প্রধান সড়ক আর গ্রামের ভেতরের পথগুলোর সংস্কারের জন্য মনে হয় খুব বেশি খরচ পড়ত না। বড় থানা হলে, যেমন আমতা বা শ্যামপুর, সবদিক থেকেই অসুবিধে দেখা দিতে পারত। উদয়নারায়ণপুরকে সাজিয়ে-গুছিয়ে একটা মডেল থানা হিসেবে সামনে রাখলে ক্ষতি কি? বিভিন্ন গ্রামের অধিকাংশ পথে এখনও জল দাঁড়িয়ে আছে। মাটি ধুয়ে গিয়ে এখানে-সেখানে ছোট-বড় গর্ত হয়েছে। এমনি এক গর্তে পড়ে "চক্কোত্তি" মশাই নাকাল হয়েছিলেন।

অন্ধকার রাতে যারা হেঁটে বা সাইকেলে বাড়ি ফেরে, তাদের মনের অবস্থাটা আন্দাজে টের পাচ্ছি। পৈতৃক প্রাণটুকু সদা-সর্বদা হাতে নিয়ে ফিরছে। ফসকালেই গেল। চাকপোতার কথা মনে পড়ছে খুব। আমতা সদর থেকে একেবারেই কাছে। নৌধর মুখে রিক্সা ছেড়ে খানিক দূর এগিয়ে আবার নেমে গেলুম এবং সাথে সাথেই "গেলুম" "গেলুম" ডাক ছাড়তে লাগলুম। ঠিক, ঠিক হাঁটু এঁটেল মাটির কাদা, গোবরও ছড়ানো রয়েছে এখানে সেখানে। কিছুতেই পা ওঠে না, প্রতিজ্ঞা করেও বার-চারেক চিৎপাত খেতে হল। নিমাই সাহার বাড়িতে যখন পৌঁছলুম, চেহারা দেখে সবাই হেসে উঠল। ভোরে উঠে দেখি চারদিকেই কাদা। এই পথ ঠেলে সবাই আসছে, যাচ্ছে। নিমাইকে দেখলুম তখন থেকেই তোড়জোড় করছে। বললুম, "তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাবেন বুঝি।" শুনে হেসে ফেললেন, বললেন—"অনেক বেশি দূরে নয় মাইল দূরে হবে। কিন্তু কাদা ভাঙতে ভাঙতে মনে হয় মাইল পাঁচেকেরও বেশি।"

আমতা সদর থেকে চাকপোতা বড় জোর দু' মাইল। কিন্তু তার চেহারাই যদি এত খারাপ হয়, তাহোলে দূর গ্রামের কথা ভাবতেও ভয় লাগে!

গ্রামের মানুষজনও যেন কেমন নির্লিপ্ত, উদাসীন। বছরের পর বছর ভুগছে অথচ মুখে টুঁ শব্দটি নেই। মাটির মত সর্বংসহা হয়ে বসে আছে। ভাবছে এই বন্যা, এই মারী, এই অভাব, এই নোংরা পথঘাট, সবকিছুই গ্রাম্য-জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ছাটতে যাওয়া, কাটতে যাওয়া অন্যায়, অর্থহীন। একটা উদাহরণ দিই। এইবারেই, বর্ষার শুরুতে শ্রীধরের সাথে শ্যামপুরে গিয়েছিলুম। ভারি মিষ্টি নাম গ্রামটার। "সজনেগাছি।" সারা রাত বৃষ্টি পড়েছে। সকালে উঠে শ্রীধরের সাথে লক্ষ্মী-জনার্দনের মন্দির দেখতে বেরিয়েছি। প্যাচপেচে কাদায় পথ-ঘাট ভরে গেছে। হঠাৎ বুড়োমত এক চাষী সশব্দে পা পিছলে পড়ল। তাকে তুলে ধরাধরি করে একটা দোকানের দাওয়ায় বসিয়ে দিলুম। সে কেবলই বলতে লাগল—"এ আর কি হয়েছে, গাঁয়ে থাকলে বর্ষাকালে এমনতর পড়তে হবেই দু'-একবার।" মনে হচ্ছিল দুবারের জায়গায় দু'শ'বার পড়তেও তার আপত্তি নেই। বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে মানুষ এভাবেই সবকিছু সহ্য করতে শিখেছে। আজ তাই "সহ্য করব না" এ কথা বললে খুব অবাক হয়ে যায়, আর তা' না হলে পাগল ঠাউরে বসে।

বেলা দুটো নাগাদ আবার পথে নামলুম। সাথে বজেশ্বরের বড় সম্বন্ধী নিবারণ। ছেলো হুঁকোর টান মারছে আর আজব-গুজব করছে, কোথায় কবে কি টকি দেখেছে, সার্কাস দেখেছে। মাঝে মাঝে হুঁ, হাঁ করছি। লোকটা কেটে পড়লেই বিপদ। পথঘাট চিনি না এদিকের।

অনেক রাতে ফিরলুম। দামোদরের বুকে সবুজ-স্নিগ্ধ আলো-ছড়ানো, দামাল নদ এখন অনেকটা শান্ত। খেয়াঘাটে মাঝি-মাল্লার হাঁক-ডাক থেমে গেছে। লাইব্রেরীতে ঢুকে দেখি অনিল দেয়াসি জেগে বসে আছে।

গোটা আমতা থানার শতকরা পঁচিশ ভাগ গ্রাম এখনও বর্ষায় জলে দুর্গম। কবে জল নামবে কেউ জানে না। অনেক উল্লেখযোগ্য জায়গায় যাওয়াই হল না। তাই বলে সদরের চেহারাটাও এমন কিছু আহা মরি নয়। আমতা থানার সবরকমের লোকই অভিযোগ করছেন যে, ভেতরের চেহারা যাই হোক না কেন আমতা টাউনের সাথে মহকুমা হেড অফিস উলুবেড়ে আর জেলা সদর হাওড়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা

"জলা যে পথ এল" ঃ শ্যামপুরের গ্রাম-পথ

উন্নত হওয়া, দাবি এবং এ ব্যাপারে টাল-বাহানা সহ্য করতে তারা একেবারেই নারাজ। [illegible] বাঁশ কাটে? বিবাদ এই [illegible] মোটে তিনটি — হাওড়া-আমতা, আমতা-রাণীহাটি আর বেতাই-[illegible]।
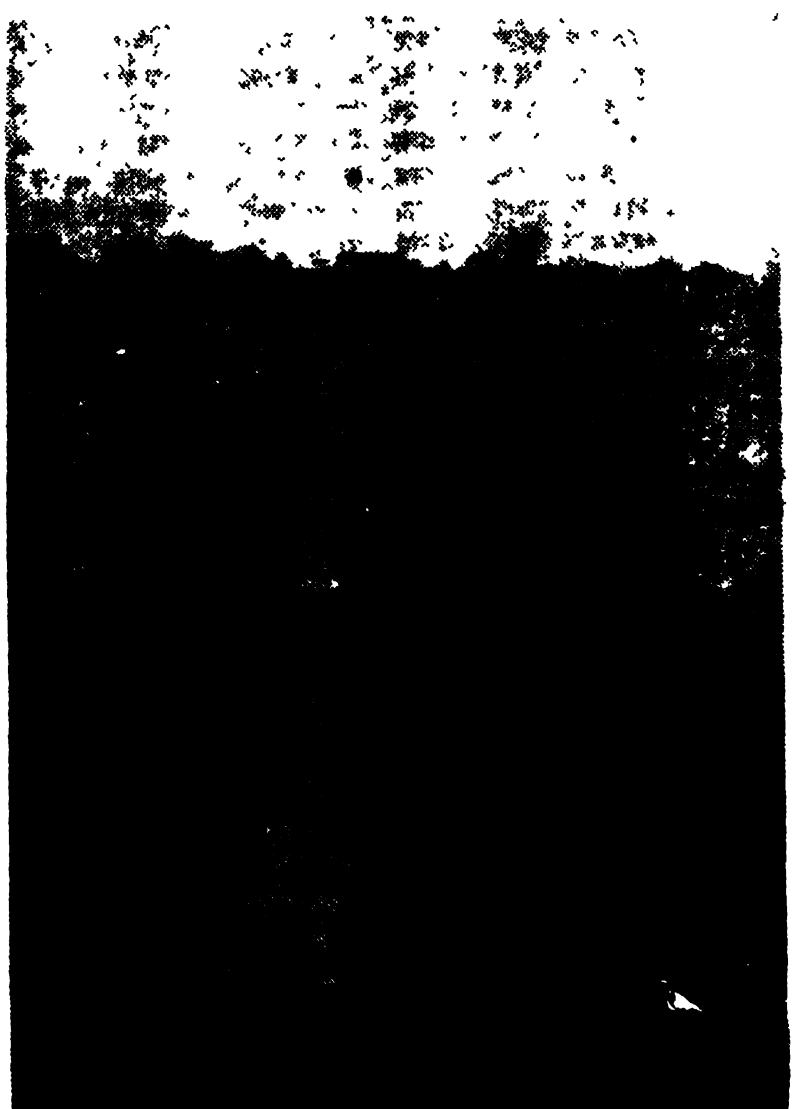
এবং দুটি নতুন রাস্তা তৈরি হচ্ছে, বেতাই-ভুবশুট এবং আমতা-বাগনান। এই দুটি রাস্তা তৈরি হলে বাগনান আর আমতা দুদিকের লোকেরই সুবিধে হবে সত্যি কিন্তু আসল সমস্যাটা হোল উলুবেড়ে আর হাওড়া নিয়ে। উলুবেড়ে আর হাওড়ার সঙ্গে আমতা টাউনের সরাসরি যোগাযোগ নেই। অর্থাৎ বাসে চেপে এ দুজায়গা থেকে সরাসরি আমতা যাওয়া যায় না। হাওড়া-আমতা পথে বা রাণীহাটি-আমতা পথে কোনও বাস সার্ভিস নেই। মার্টিনের খোকাগাড়িতে চেপে যাঁরা যাতায়াত করেন তাঁদের হয়রানির একশেষ। [illegible] আমতা থেকে টেম্পোতে চাপলেও সেই একই ব্যাপার। বসতে পারে ৮ জন। কিন্তু বসেছে বারজন আর দাঁড়াচ্ছে [illegible] শনিবার বিকেলে বা সোমবার সকালে এলে টের পাওয়া যাবে সেটা। একটা টেম্পো কম করেও জনা পঁচিশেক [illegible] নিচ্ছে। কেউ কোনও প্রতিবাদ করে না। ঝুলতে ঝুলতে যায় আর আসে। মাঝে মাঝে গাছপাকা ফলের মত টেম্পোর [illegible] থেকে খসে পড়ে।

হাওড়া রিজিওন্যাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটি হাওড়া-আমতা রুটে আঠারখানা বাস দিতে রাজী হয়েছিল। রাণীহাটি-আমতা রুটেও বাস সার্ভিস চালু করার কথা হচ্ছিল। স্থানীয় জনসাধারণ অভিযোগ করেছেন যে মার্টিন কোম্পানী এবং আমতা টেম্পো সংস্থার বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত সবকিছু ধামাচাপা পড়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার এই বিশেষ ত্রুটি থাকার দরুণ কোনও ব্যাংক এখানে তার শাখা খুলতে চাইছে না।

আমতার যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য প্রস্তাবিত দামোদর সেতুটির কাজও শুরু করে দেওয়া উচিত। এটি তৈরি হলে অসংখ্য লোকের বিশেষ উপকার হবে। তাছাড়া হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমায় সহজে ঢোকা যাবে। আমতার মানুষ তাই আশায়, আগ্রহে দিন গুণছে।

যোগাযোগ, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য, এই তিনটি সমস্যা নিয়ে আমতা, বাগনান আর শ্যামপুরের অধিবাসীরা একইরকম বিব্রত। তাই ঠিক করেছিলাম যে আমতার মোটামুটি না ঘুরে এই বিষয়গুলোর কোনটি নিয়েই পৃথক আলোচনা করব না। যে বিষয়টিই শুরু করি না কেন, তিনটি থানার কথা একসঙ্গেই বলব।

যোগাযোগের কথা যখন উঠেছে তখন শ্যামপুর আর বাগনানের খবরও দিচ্ছি। এবার বন্যায় শ্যামপুরের মানুষ নাকের জলে চোখের জলে এক হয়েছে। আমড়দহ, বাবগ্রাম, খাড়ুবেড়ে, বাছারি, শশাটি ইত্যাদি অঞ্চলে তার প্রমাণ এখনও বর্তমান। হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে হাঁটছে সবাই। অনেক গ্রামে চিঠি বিলি বন্ধ।

ডাকপিওন তাই এক অভিনব উপায় বাৎলেছে। হাটবারে থলে নিয়ে হাটে এসে বসে। তোমার স্বজন, বন্ধু বাইরে আছে তো "ইনকুরি" কর। চিঠিপত্র এসে থাকলে নিয়ে যাও। দেউলির হাটে গিয়েছিলুম। "পিওন এয়েছে", "পিওন এয়েছে" বলে সবাই ছুটছে বটতলায়। গিয়ে দেখি ডাকপিওন বসে আছে মুরুব্বীচালে। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে তার থলের ওপর। "নিধুর চিঠি এয়েছে, নিধুর?"

"গোলক মান্নার খপর আছে, সজনেগাছির গোলক?"

"গজেনের পোস্টকার্ট কই গো পিওন ভায়া?" পঞ্চাশ জোড়া চোখ থলের দিকে। যেন থলের মুখ ফুঁড়ে জলজ্যান্ত নিধু, গোলক, গজেনরাই বেরিয়ে আসবে।

শ্যামপুরের রাস্তাঘাটের খবর দিচ্ছিলুম, তাই না? এই থানায় বাসপথ মাত্র দুটি, বাগনান-কমলপুর আর বাগনান-শিবগঞ্জ, মাঝখানে শ্যামপুর টাউন। ছিপছিপে, সরু আঁকাবাঁকা পথ। মালে-মানুষে ঠাসা বাসগুলো ছোটে খানাখন্দ পেরিয়ে, যেন কেউ তাড়া করেছে। আবার হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে যেখানে-সেখানে। কি ব্যাপার! নাঃ, এমন কিছু নয়। পোয়াটাক দূর থেকে হাত তুলে ছুটে আসছে কেউ, তাকে তুলে নিতে হবে। কন্ডাক্টরকে গালি দিলে সে একগাল হাসবে। বলবে, "হেঁ, হেঁ, ওকে না নিলে যাবে কি করে?" একেবারে দয়ার সাগর, করুণাসিন্ধু সেজে বসবে। আসল কথা কিন্তু মুনাফা! সত্যি বলছি মুনাফা। যত পার লোক তোল। "২২ জন বসিবেক।" ৪৪ জনকে বসিয়ে দাও। আরও ডজন দুয়েক লোককে দাঁড় করিয়ে রাখ। ছাদেও [illegible] কিছু, তারপর "চলো —ও —ও ঠিখ্যায়" বলে তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে কন্ডাক্টর ঘণ্টা বাজাবে। চায়ের ভাঁড়টা দূরে ছুঁড়ে দিয়ে "পাইলট" উঠে বসবে আসনে। ফাঁকা রাস্তায় দূর থেকে দেখলে মনে হবে এক-দল মানুষ শূন্যে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে! বাসের বডি দেখা যায় না এমন অবস্থা! বাস মালিকরা ভাড়া আদায় করছে, মুনাফা লুঠছে কিন্তু যাত্রীরা কি পাচ্ছে? কোনও সভ্যসমাজে কেউ এভাবে প্রতিদিন ঝুলতে ঝুলতে মাইলের পর মাইল যেতে পারে বলে আমার জানা ছিল না। বাসের সংখ্যা আরও বাড়ান উচিত। নির্দিষ্ট সময়ে বাস ছাড়া উচিত। অনেক কিছুই তো উচিত কিন্তু কোনটাই হচ্ছে না!

মালিকরা কেমন সুবিধেবাদী তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি। বিকেল সাড়ে ছটার পর কোনও বাস আর কমলপুর বা শিবগঞ্জ থেকে ছাড়বে না, কেন না তখন বাগনানের দিকে লোকজনের যাতায়াত কমে আসে। কিন্তু যাদের বিশেষ প্রয়োজন থাকে হাওড়ায় যাওয়ার, তারা কি করবে? বাস চলবে পয়সার লোভে, সাধারণ মানুষের সুবিধের জন্যে নয়।

উলুবেড়ে থেকে গড়চুমুক একটা রাস্তা এসেছে। দামোদর পার হয়ে শিবগঞ্জ অবধি যাবে। এটার কাজ শেষ

[illegible]

হলে উলুবেড়িয়ায়, ভগবতীপুরে, দানসপোতা, গাজীপুরে আরও সব গ্রামের লোক হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। কাদা-জল ভেঙে পশাটি এসে বাস ধরতে হয় না।

এবার বাগনান। আমতার মত বাগনানের লোকও টাউন অঞ্চলের উন্নতি আগ চাইছে। বাগনান স্টেশন দিয়ে রোজ সকালে হাজার হাজার লোক কলকাতায় যাচ্ছে। মানথলি টিকেট কম পক্ষে ১০ হাজার লোক যাতায়াত করে। এহেন বাগনান স্টেশনের কাছে না আছে কোন বাসটার্মিনাস না কোনও ভাল রাস্তা। বাসগুলো যেখানে থামে সেটা রেলওয়ের জমি। বর্ষার জল জমে জায়গাটা চলাচলের অযোগ্য হয়ে আছে নোংরা গন্ধে কাছে যাওয়াই কঠিন। সারিয়ে টারিয়ে দেওয়া রেলওয়েরই উচিত। লাখ লাখ টাকা আসছে বাগনান স্টেশন থেকে অথচ যাত্রীদের সুবিধের জন্য দু'গাড়ি মাটি ফেলাও কর্তব্য বলে মনে হয় না।

বাগনান স্টেশন রোডে পা ফেলাই দায়। ১০ ফিট চওড়া রাস্তা ঠেলা, রিক্সা লরি বাস আর দোকানপাত্রে বোঝাই। সকালবেলা আপিসযাত্রীরা স্টেশনের কাছে এসে দুর্গা নাম জপতে থাকেন যেন ভালয় ভালয় পৌঁছে যেতে পারেন। দিনের পর দিন এ রকমটিই ঘটছে। হাওড়া জেলা পরিষদ রাস্তার দু'পাশের দোকান থেকে টাকা তুলছে অথচ সংস্কারের দায়িত্ব হাওড়া কনস্ট্রাকসান ডিভিশনের। দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার চমৎকার উপায়। কিন্তু স্টেশন রোডের ভিড় না কমলে বা এর সংস্কার না করলে বাগনানের আর্থিক উন্নতি ব্যাহত হবে। যাতায়াতের অসুবিধের দরুণ আমতার মত এখানেও কোনও ব্যাংক তার শাখা খুলছে না। আনন্দনিকেতনের কর্ণধার অমল গাঙ্গুলী স্টেশন রোডের

ভিড় কমাবার জন্য যে পরিকল্পনা দিয়েছেন, তা অনেকেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করছেন। বাগনান কমলপুর লেভেলক্রসিং থেকে একটি সমান্তরাল রাস্তা মুরলীবাড় হয়ে জাতীয় সড়কে পড়বে। এই রাস্তা দিয়ে রিক্সা, গরুরগাড়ি, লরি ইত্যাদি যেতে পারবে। ফলে স্টেশন রোডের ভিড়ও অনেক কমে যাবে বিশেষ করে সকাল বেলা।

স্টেশন থেকে কিছুদূরে ঝাঁটিয়া গড় ইটপুর' রোডের কাজ অন্তত পাঁচ বছর চলছে। রাস্তা তৈরির মালমশলা সব এসে গেছে। কিন্তু আসল কাজ এখনও শুরু হয় নি। ঝাঁটিয়া, হরিনারায়ণপুর ও দেউলি হাটের হাজার হাজার ক্রেতা বিক্রেতার আজ একটাই প্রশ্ন 'রাস্তা কবে হবে?'

আরও একটি রাস্তা তৈরি করা যেতে পারে ... রোডের মুখ থেকে বাঁ দিকে বি ডি ও অফিস ঘুরিয়ে বাগনান কলেজের পাশ দিয়ে এই রাস্তাটিকে নিয়ে যেতে হবে ...পুরের সড়কে। কিছু বাস এদিক দিয়েই শ্যামপুর চলে যাবে। বাগনান বাজারের গুরুত্বও বাড়বে। স্টেশন রোডের উত্তর ও দক্ষিণ অংশের মধ্যে এখনও কোনও যোগাযোগ নেই। ওভার ব্রীজ না উঠে অনেকেই লাইন পার হয়ে এ পারে আসে দুর্ঘটনাও ঘটে। আরও কতদিন ঘটবে কে জানে?

গতকাল চিঠি পেয়েছি। প্রভাকর লিখেছে। বাগনানের রাস্তাঘাটের অদল-বদল কিছু হবে ভরসা পাওয়া গেছে।

বসুমতী মারফৎ উত্তর দিচ্ছি,—

"নাকের বদলে নরুণ পেলে,
তাক ডুমা ডুম ডুম।" *

* আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত।

কোং, শিবালয়, বরদা এভিনিউ, পোঃ গড়িয়া (২৪-পরগনা) মূল্য : দুই খণ্ড যথাক্রমে ৯·০০ ও ১০·০০ টাকা।

দেশের তরুণ সম্প্রদায় যখন বিভিন্নমুখী রাজনৈতিক মতবাদের চাপে বিভ্রান্ত ঠিক সেই সময়ে শ্রীঅনন্তলাল সিংহ লিখিত "চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ" গ্রন্থখানি যুবসম্প্রদায়ের স্বদেশচেতনার আলোকদিশারীর কাজ করবে। বইখানি বাংলা ভাষার গ্রন্থভাণ্ডারে এক অমূল্য সম্পদ। বইটির সাহিত্যমূল্য যতখানি, ইতিহাসমূল্যও ততখানি। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন—তারই একটি অধ্যায় বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ যার একটি বিশেষ পরিচ্ছেদ বলা চলে চট্টগ্রামের সন্ত্রাসবাদীদের পরিচালিত সশস্ত্র বিদ্রোহ। লেখক স্বয়ং এই বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক হওয়ায় ঘটনার ঐতিহাসিকতা বর্ণনা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছে অপরপক্ষে গুলিচালনায় তৎপর বিপ্লবীর পক্ষে মসীচালনায় সমান দক্ষতা সম্ভব সে-কথা প্রমাণ করেছেন শ্রীসিংহ এই গ্রন্থ রচনায়। নীরস ঐতিহাসিক তথ্য তাঁর লেখনীর গুণে শুধু ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত বিপ্লবীদের স্মরণই ব্যক্ত করে নি, তৎকালীন জনসাধারণের চিন্তাধারাও যেমন এতে প্রতিফলিত—সেই সময়ে শাসকশ্রেণীর এই সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্কে চিন্তা, ভয় ও তৎপরতাও পুস্তকখানিতে সমভাবে প্রতিফলিত। অথচ আবেগ বা বর্ণনার আতিশয্য কোথাও ইতিহাসকে লঙ্ঘন করে যাওয়া হয় নি। প্রত্যেকটি ঘটনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জীবিত ব্যক্তিদের স্মৃতি ও জ্ঞানকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন—কারণ সব ঘটনাই তাঁর উপস্থিতিতে ঘটে নি বা ঘটা সম্ভব নয়। বিশেষত জেল সংস্থানকাল বা অজ্ঞাতবাসকালে ঘটনার বর্ণনায় তিনি সহকর্মীদের সাহায্য যেমন পদে পদে গ্রহণ করেছেন—তেমনি সরকারী দলিলপত্র মামলার কাগজপত্র, বিভাগীয় বা অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় দলিল বা আদালতের নথিপত্রও তিনি ঐতিহাসিক সত্যতা প্রদর্শন এবং প্রমাণের জন্য ব্যবহার করেছেন। এমন কি ঐতিহাসিকতা রক্ষার ক্ষেত্রে এই বিদ্রোহের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের সশস্ত্র আন্দোলনগুলির সঙ্গে তুলনামূলক বিচারও করা হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা চলে ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্নভাবে বা অসম্পূর্ণভাবে বর্ণিত নয়। ঘটনার খুঁটিনাটি বর্ণনার সময় কোন জাতীয় আন্দোলনের দ্বারা কত সংখ্যক গ্রামী কে কেমনভাবে চালিয়েছিলেন তার বর্ণনাই যে শুধু আছে তাই নয়—প্রতিটি ঘটনার

প্রস্তুতিপর্ব এবং প্রতিক্রিয়া নিপুণ ও নিখুঁতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

বিশেষ করে চট্টগ্রামের সশস্ত্র যুববিদ্রোহ যে সমস্ত ভারতব্যাপী সশস্ত্র আন্দোলনের থেকে পৃথক নয় সে-সম্বন্ধে উপলব্ধি ঘটে বইখানি পাঠকালে। যদিও সত্যাগ্রহ আন্দোলনরূপে কোন সারাভারতব্যাপী আন্দোলনের অংশ নয় চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ, লেখকের মতে অত বিরাট পরিকল্পনার সশস্ত্র আন্দোলন করা সম্ভব ছিল না—অতএব আন্দোলনের নেতৃত্বও সহজ ছিল না—তথাপি এই বিদ্রোহের নায়কেরা জানতেন যে তাঁদের কর্মধারা সমস্ত ভারতের পক্ষে যত ক্ষুদ্র এবং বিচ্ছিন্নই হোক না কেন তার সুদূরপ্রসারী ফল আছেই। তাই বারবার লেখক উল্লেখ করেছেন যে এই একটি বিদ্রোহের দ্বারাই তাঁরা ভারত স্বাধীন করবার স্বপ্ন কোনদিনও দেখেন নি এবং মাত্র চট্টগ্রামকে স্বাধীন করতে পারলেই তাঁদের কর্তব্য শেষ হয়ে যাবে এমন চিন্তাও তাঁদের ছিল না। তাঁদের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল তাঁদের প্রচেষ্টা সমস্ত ভারতের মনে প্রেরণা জাগাবে—যার ফলে যুবসমাজ স্বাধীনতা আন্দোলনের পথে অগ্রসর হবে। তাঁদের নিঃস্বার্থ আত্মদান যে দেশের অন্যান্য অংশের মধ্যে একটি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করবে এই দৃঢ়বিশ্বাস তাঁদের ছিল। তবে বিশেষ করে চট্টগ্রামেই একটি সশস্ত্র বিপ্লব পরিকল্পনার হেতু কি এবং কেমন করে তা সম্ভব হয়েছিল সে কথার বর্ণনাপ্রসঙ্গে লেখক অবিস্মরণীয় নেতা মাস্টারদা শ্রীসূর্য সেনের কথা উল্লেখ করেছেন। কি প্রকারে তাঁর বৈপ্লবিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বিদ্রোহ সাফল্যমণ্ডিত হয় সে-কথার বর্ণনাপ্রসঙ্গে নেতার প্রতি লেখকের অসীম শ্রদ্ধা যেমন দেখা যায়—অযথা নেতাকে দেবতার আসনে বসাবার জন্যে ভাবাবেগ বা বর্ণনাতিশয্যও তেমনি সযত্নে পরিহার করা হয়েছে—কারণ সেক্ষেত্রে গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য বিনষ্ট হত।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে জনসাধারণের কোন অংশ ছিল কি না তার উত্তর পাওয়া যাবে গ্রন্থখানির ২য় খণ্ডে ৯১ পৃষ্ঠায়—"..চট্টগ্রামের প্রায় প্রতিটি ঘরে—প্রতিটি মানুষের অন্তরে নীরব দেশপ্রেমের জোয়ার এসেছিল। বিপ্লবীরা তার সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ পেয়েছে—দেখেছে হিন্দু, মুসলমান, খৃশ্চান—জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই তারা অকুণ্ঠিতচিত্তে কিম্বা দ্বিধায় সাধ্যমত সাহায্য করেছে। ..." অতএব দেখা যায় যে সর্বসাধারণের এই বিপ্লবে যে অংশ ছিল লেখক সে কথাও বিস্মৃত হন নি। শুধু বিপ্লবী কার্যকলাপ বর্ণনায়ই তিনি ক্ষান্ত হন নি—দেশের সেই জনসাধারণ যারা তাঁদের আশ্রয় দিয়ে খাদ্য দিয়ে নিরাপত্তা দিয়ে বিপ্লবকে জয়যুক্ত করতে সাহায্য করেছে—সেই সমস্ত মানুষকেই এই গ্রন্থে অমর করে রাখা হয়েছে। চন্দননগরের সুহাসিনী গাঙ্গুলী (২য় খণ্ড ১২ পৃঃ)। অথবা সেই জেলে পরিবার (২য় খণ্ড ৪ পৃঃ) সেই সুরেন চন্দ্র (২য় খণ্ড ১৩ পৃঃ) প্রমুখ সকল হিতৈষী বন্ধুকেই তিনি সশ্রদ্ধায় স্মরণ করেছেন এবং এদের দানের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন।

সবশেষে বলতে হয় যে ১৯৩০ সালে যুববিদ্রোহকে সফল করবার জন্য লেখকের যে ঐকান্তিক চেষ্টা ও অদম্য লক্ষ্য ছিল—গ্রন্থখানিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্যও সেই প্রচেষ্টাই লক্ষিত হয়। একদিন যেমন দেশকে স্বাধীন করবার জন্যে তাঁদের বিপ্লবী কার্যকলাপের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছিলেন সেই সশস্ত্র বিদ্রোহের নিখুঁত ইতিহাস রচনার দায়িত্বও আজ একইভাবে তিনি অনুভব করেছেন এবং এইজন্য বিভিন্ন সূত্র ও বিভিন্ন ব্যক্তির সাহায্য তিনি গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে আর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। এযুগে সুযোগ মত আত্মপ্রচার করতে পারাটা যখন প্রায় সর্বজনস্বীকৃত সত্য হয়ে উঠেছে—সেই সময়ে এই বিরাট সুযোগ ত্যাগ করে আর একবার শ্রীসিংহ দেশবাসীর শ্রদ্ধাভাজন হলেন। সেইজন্য এই গ্রন্থটির প্রতি এ সাধারণ পাঠকের

সেই যুগ ও তৎকালীন বিপ্লবীদের কার্য-কলাপ সম্বন্ধে কৌতূহল চরিতার্থ করবে তাই নয়—পরন্তু ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসকার গবেষকের কাছেও গ্রন্থখানি অমূল্য বলে বিবেচিত হবে।

লালগোলা প্যাসেঞ্জার—জীবন দে। ম্যাশনাল পাবলিশার্স। ২০৬, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬। মূল্যঃ চার টাকা।

'লালগোলা প্যাসেঞ্জার'-এর লেখক জীবন দে সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত না হলেও লেখার প্রাচুর্যের অভাবের জন্যই তিনি খুব বেশি পরিচিত নন। তবে ইতিমধ্যে তাঁর 'অন্তবাল' প্রথম গল্প-সংগ্রহটি সাহিত্যক্ষেত্রে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। কেন না তাঁর লেখার ভঙ্গিটি অভিনব। অন্যান্য পাঁচজন লেখকের ন্যায় তিনি গতানুগতিক ভঙ্গিটি অনুসরণ করেন নি। সেদিক থেকে এই সংকলনটিও সার্থক। এই গল্পসংগ্রহের মধ্যে অধিকাংশ গল্প বিষয়-বৈচিত্র্যে ও ভাবের অকৃত্রিমতার জন্য প্রশংসনীয়। প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যে রয়েছে লেখকের বাস্তবতার পরিচয়। কখনও লেখক তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করছেন চরিত্র ও ঘটনার বিশ্লেষণের মাধ্যমে আবার কখনও বা শ্লেষের মাধ্যমে। দেশবিভাগ, শিক্ষাভার প্রভৃতি অস্থাদের সমাজকে করেছে পঙ্গু। এই পঙ্গু সমাজেরই প্রতিচ্ছবি পাই এই গল্পগুলির মাধ্যমে। 'লালগোলা প্যাসেঞ্জার' এই গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প হিসেবে পাঠকের কৌতূহল আকর্ষণ করে। ঐতিহাসিক সমস্যা বিজড়িত সমাজকে কেন্দ্র করেই এই গল্পটি রচিত। এটি ইদানীং সাহিত্যক্ষেত্রে অন্যতম সার্থক সৃষ্টি বললে অত্যুক্তি হবে না। 'ইলিশ' গল্পটি এই সমাজব্যবস্থার প্রতিবাদের স্বাক্ষর বহন করে। 'জন্মশতবার্ষিকী', 'ক্ষুধা', 'সংশয়', 'দেবদারু ওরা' 'তান্ত্রিক লালসা', 'অভিনয়' গল্পগুলি মানবিক অনুভূতির এক-একটা দিককেই উন্মোচন করেছে বলেই নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর গল্প পর্যায়ে ফেলা যায়।

নবজাতক—সম্পাদিকা : মৈত্রেয়ী দেবী। ১৩।১, পাম এ্যাভিনিউ, কলিকাতা—১৯। মূল্যঃ ২.০০।

সাধারণ সংখ্যার মতো নবজাতকের শারদীয় সংখ্যাও ভূয়সী প্রশংসা লাভ করবে। সমাজের একাংশ যখন উন্মার্গ-গামিতা, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে শঠতা, সাহিত্যে তিক্ততা ও কর্দম নিক্ষেপের প্রয়াস এবং মানুষে মানুষে সাম্প্রদায়িকতা- সে সময় নবজাতক এ সবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে বলিষ্ঠ চিন্তাধারায় জীবননিষ্ঠ রচনা প্রকাশ করে চলেছে—যা পড়লে সচেতন পাঠকেরা মিথ্যা ও সত্যের মধ্য দিয়ে আসল সত্যকে খুঁজে পাবেন এবং অন্ধ পাঠকেরা আলোর ইশারা লাভ করবেন। আলোচ্য সংখ্যাটিতে আছে উৎকৃষ্ট উর্দু গল্পের অনুবাদ (অনুবাদক : ক্ষিতীশ রায়), পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধিত্বমূলক গল্প ও কবিতা। মৈত্রেয়ী দেবী অনূদিত ভ্রমণ একাই কাবাগুচির 'তিব্বতে তিন বৎসর' ভ্রমণকাহিনীতে আছে অনেক গোপন সংবাদ। অন্যান্য স্বাদের রচনায় আছে : কতকগুলি কাহিনী, প্রবন্ধ, চলচ্ছবি, নাটক, গ্রন্থ-পরিচয়, ব্যঙ্গচিত্র প্রভৃতি। উল্লেখযোগ্য লেখকদের মধ্যে রয়েছেন বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, আশাপূর্ণা দেবী, মন্মথ রায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, চিত্রিতা দেবী, সুশীল রায়, গোপাল ভৌমিক, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দিলওয়ার সৈয়দ আব্দুল মান্নান, দুর্গাদাস সরকার প্রভৃতি। প্রচ্ছদপট পরিচ্ছন্ন ও মনোরম।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি (শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৫)—সম্পাদক : **সঞ্জীবকুমার বসু।** ১০নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলকাতা-১। দাম : তিন টাকা।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক এই পত্রিকাটির একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি একটি প্রবন্ধ পত্রিকা—এর শারদীয় সংখ্যায় মোট ১২টি সুচিন্তিত প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। লেখকদের মধ্যে আছেন : দেবকুমার চক্রবর্তী, কালিদাস দত্ত, সুনীলচন্দ্র সরকার, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকনাথ ঘোষ প্রবোধচন্দ্র সেন, সঞ্জীবকুমার বসু, কানাই সামন্ত, সুশোভন মুখোপাধ্যায় নারায়ণ চৌধুরী ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। প্রবন্ধগুলির মান উচ্চ-স্তরের। ২৫টি চিত্র পত্রিকাটির অন্যতম আকর্ষণ। বিশেষ করে বাংলার সাময়িক পত্র পত্রিকার চিত্রগুলি। ছাপা সুন্দর, ঝরঝরে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আগ্রহী পাঠকের কাছে পত্রিকাটি আদরণীয় হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীমতী (সচিত্র)—প্রধান সম্পাদিকা : শ্রীমতী আভা চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদিকা : শ্রীমতী আভা পাকড়াশী। ২৯, ওয়াটারলু স্ট্রীট, কলিকাতা—১। মূল্য : ৩.৭৫।

এই শারদীয় সংখ্যাটিতে আছে প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, আভা পাকড়াশী ও সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পাঁচজনের ৫টি সম্পূর্ণ উপন্যাস। গল্প, রম্যরচনা প্রভৃতি লিখেছেন বনফুল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, আশাপূর্ণা দেবী, অমিতাভ চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, কুমারেশ ও শান্তনু দাস প্রমুখ। বিমল করের 'অতুল সংবাদ'-কে গল্প না বলে বলতে হবে অতুলনীয় এক নবাঙ্কিকের একাঙ্কিকা। কাব্যাংশে নজরুল ইসলাম, দিনেশ দাস, মণীন্দ্র রায়, কৃষ্ণ ধর, দুর্গাদাস সরকার সুসিত রায়, মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, শিপ্রা পাল, নচিকেতা ভরদ্বাজ, তমাল চট্টোপাধ্যায়, গৌতম গুহ, মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের কবিতা আনন্দের আস্বাদ দিতে পেরেছে। বিভিন্ন ধরণের ফিচারগুলিও আকর্ষক। চিত্রতারকাদের নেপথ্য কাহিনীতে উত্তেজনা থাকলেও সম্পাদিকার ঘোষণা অনুযায়ী রুচিশীলতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

নর-নারী—সম্পাদক : সুবোধ মিত্র। ৭, নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা—৯। মূল্য : ৩.০০।

'নর নারী'র উদ্দেশ্য মূলত চিত্ত সমীক্ষা থেকে সমাজ সমীক্ষা। শারদীয় সংখ্যাটিতে প্রবন্ধগুলির মধ্যে তারই সুষ্ঠু প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করলাম। প্রথিত কবি-সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 'নৈতিক পতনের একটি চিত্র'। পশ্চিমবঙ্গের একশ্রেণীর মানুষের অর্থ-নৈতিক কারণে অধঃপতনের চিত্র এতে যেমন আছে, তেমনি আছে উত্তরণের পথ। দেশের সমাজসেবী ও কল্যাণকর্মীদের এই প্রবন্ধটি পড়তে অনুরোধ করি। অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'আধুনিক না আদিম' থেকে অশ্লীলতার পক্ষপাতী এবং বিকৃত রুচির সমর্থকরাও নিজেদের পক্ষে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবেন। এছাড়া ডক্টর আদিত্য ওহদেদার, ডাঃ এ কে. রায়-চৌধুরী ডাঃ মদন রাণা, সমরজিৎ বসু ও প্রভাতকুমার গোস্বামীর প্রবন্ধগুলি শিক্ষামূলক। গল্প লিখেছেন বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রমুখ পাঁচজন। বিমল করের গল্প পড়ে মনে হোল এই লেখকের চিন্তাশক্তি ও লেখার ভঙ্গি শুধু অসাধারণই নয়, তিনি বাংলা সাহিত্যে নতুন জগৎ সৃষ্টি করলেন। গল্পটি ঠিক হত্যা নয়, আত্মহত্যা প্রসঙ্গে মনো-বিশ্লেষণের ও সমাজতত্ত্বের উপর লিখিত। নাটিকা রম্যরচনা ছাড়া একটি সুবৃহৎ উপন্যাস আছে মহাশ্বেতার রায়ের। মহাশ্বেতার বাজে একের শক্তির অপব্যয় করছেন। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় নবনীতা দেবসেন মিত্রের বহু লেখা আগে আমাদের আনন্দ দিয়েছে। এবার তাঁর লেখা নেই কেন?

মুকুলবীথি সম্পাদিকা : রেণুকা সেন। ১৮৮।১, সি-আই টি রোড, ফুলবাগান। কলিকাতা—৫৪।

'মুকুলবীথি' শিশুদের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মুকুলবীথির শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে আলোচ্য পত্রিকাটি সংকলিত। এই সংখ্যায় **'Parents are also teachers' and 'Needs of your**

ক্যোর্ল.' এই দুইটি রচনা অভিভাবক ও অভিভাবিকারা আগ্রহ সহকারে পড়বেন।

কিশোরী—সম্পাদনা: সুধা সেন। ৫০এ, সেক্সপীয়ার সরণি। কলিকাতা—১৭। মূল্য: ২·৫০।

কিশোর ও কিশোরীদের মনের চাহিদা মেটাবার জন্যই এই পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। পূজার বাজারে কিশোর-কিশোরীদের জন্য প্রকাশিত পত্রিকাবলীর মধ্যে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এই সংখ্যাটি। প্রিয়ম্বদা দেবী, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রলাল ধর প্রভৃতি নামকরা লেখকদের লেখায় ভরা এ সংখ্যাটি। তার সঙ্গে আছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বসুর ছবি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরলিপি এবং আরও অনেক কিছু। ভালো কাগজে, সুন্দর ছাপা এবং চমৎকার একটি প্রচ্ছদে মোড়া এই সংখ্যাটি শুধুমাত্র ছোটদের না বড়দেরও আকর্ষণের বস্তু নিঃসন্দেহে।

প্রগতি—সম্পাদক: মৃণাল চট্টোপাধ্যায়। ৩৯বি, ডেপুটি মিশন রোড কলিকাতা—২০। মূল্য: ২·৫০।

পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় এবারের শারদীয় সংখ্যাটি রচনাসম্ভারে অধিকতর আকর্ষণীয়। এ সংখ্যায় উপন্যাস লিখেছেন মিন্টু দাশগুপ্ত ও শ্রীরূপ। গল্প লেখকদের মধ্যে আছেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, মনোজেন্দ্র পাল, বিমল মিত্র, নীহাররঞ্জন গুপ্ত প্রভৃতি। প্রবন্ধ লিখেছেন—কালিদাস রায়, সুকুমার সেনগুপ্ত, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় নরেন্দ্র দেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র, গোপাল ভৌমিক, দুর্গাদাস সরকার, উমাকুমার হাটি প্রমুখ কবির কবিতা আছে। এছাড়া রম্যরচনা লিখেছেন শক্তিপদ রাজগুরু। চিত্রশিল্প আলোচনায় সুনীতি রায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

এক সাথে—শারদীয় সংখ্যা। সম্পাদিকা। কনক মুখোপাধ্যায়। ২, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য: ১·৫০।

'এক সাথে' মহিলাদের পত্রিকা। মহিলাদের রচনায় সমৃদ্ধ। এই পত্রিকার সম্পাদকীয়তে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আজ্কের দিনে পশ্চিম বাংলার ঘরে ঘরে ... ... বঞ্চিত ... ... প্রেরণা। এই সম্পর্ক থেকে বিচার করলে দেখা যায় এই সংখ্যার প্রত্যেকটি রচনা সুনির্বাচিত। বৈচিত্র্যপূর্ণ মননশীল প্রবন্ধ ও হৃদয়গ্রাহী কবিতা ও গল্পের অপূর্ব সংকলন এই সংখ্যাটি।

বর্ধমানের বার্তা—সম্পাদক—সরল সেন। মূল্য—দুই টাকা।

'বর্ধমানের বার্তা' সুখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনাসম্ভারে সমৃদ্ধ। এর লেখক তালিকায় আছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শক্তিপদ রাজগুরু, এস মোহাম্মদ, অজিত ভট্টাচার্য, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, অমিয়কুমার হাটি, দুর্গাদাস সরকার, রজত রায়চৌধুরী, প্রবীর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

মল্লার—সম্পাদক: পুলক দাশগুপ্ত। ১১, রবীন্দ্র ঠাকুর রোড, কলকাতা—৫৩। মূল্য: ·৭৩ পয়সা।

প্রগতিশীল সাহিত্য পত্রিকা। কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধে পরিপুষ্ট এই সংকলনটি। রচনাগুলি পাঠকদের খুশি করবে। লেখকদের মধ্যে নবীন ও প্রবীণের সমারোহ।

সাত্ত্বিক—শারদীয়া সংকলন। সম্পাদক: বরুণ মজুমদার। ১২০/১, রামকৃষ্ণ লেন, শিবপুর, হাওড়া। দাম: ৫০ পয়সা।

সাত্ত্বিক বর্তমান শারদীয়া সংকলন নবীন ও প্রবীণ লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ। এ সংখ্যায় লিখেছেন অশোককুমার সেনগুপ্ত সোমনাথ..., সত্যেন্দ্রনাথ, মিত্র, নচিকেতা ভরদ্বাজ, রবীন্দ্র গুহ এবং আরো অনেকে।

চলন্তিকা—সম্পাদক: অনিমেষ চট্টোপাধ্যায় ও গৌরগোপাল দাশ। বি-৫৯, রবীন্দ্রনগর, কলকাতা—১৮। মূল্য: ১·২৫।

প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতায় সমৃদ্ধ এই শারদীয় সংকলনে লিখেছেন হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলা দে, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, সমরেশ বসু রজত রায়চৌধুরী, দুর্গাদাস সরকার প্রমুখ।

তরুণের অভিযান—শারদীয় সংখ্যা ১৩৭৫: সম্পাদক- শ্রীপিনাকীরঞ্জন চক্রবর্তী ও শ্রীসুনির্মল চট্টোপাধ্যায়: ১৭, জাস্টিস দ্বারকানাথ রোড, কলকাতা—২০ হইতে সুনির্মল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত: মূল্য—এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

তরুণের অভিযানের দ্বিতীয় বর্ষের শারদীয় সংখ্যাটি নানা দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। এটি সম্পূর্ণভাবে তরুণদের পত্রিকা। এই সাহিত্যিকগোষ্ঠী মনে করেন যে নামী সাহিত্যিকদের দরজায় ধর্ণা না দিয়ে অপরিচিত তরুণ সাহিত্যিকদের সুযোগ দেওয়া হলে সেভাবেও উচ্চ মানের সাহিত্য সৃষ্টি করা যেতে পারে। সীমাবদ্ধ আয়তনের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের রচনা প্রকাশ করে আলোচ্য সংখ্যাটিকে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। সুখরঞ্জন রায়ের 'জন্মান্তর' প্রবন্ধটি ও শিবব্রত চট্টোপাধ্যায়ের অনুদিত রিল্কের কবিতা 'শরতের দিনগুলি' আমাদের বেশ ভাল লেগেছে। এ ছাড়াও বেশ কয়েকটি চমৎকার ছোট গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ সংখ্যাটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। শ্রীসজল রায়ের প্রচ্ছদ পরিকল্পনা খুবই সুন্দর হয়েছে। গতানুগতিক পথে না চলে এভাবে সৃষ্টিমূলক কাজ হাতে নেওয়ার প্রচেষ্টা সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য।

কৃশানু—সম্পাদক: দীনেশ সিংহ ও মৃন্ময় চক্রবর্তী। ১৮, সূর্য সেন স্ট্রীট। কলিকাতা—১২। মূল্য: ১·০০।

সাহিত্যসেবায় উৎসর্গীকৃত পত্রিকা হিসেবে কৃশানু সুধীজনকে পরিতুষ্ট করবে। প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, উপন্যাস—কলতত্ত্ব সাহিত্যের সকল বিভাগের রচনায় এই শারদীয়া সংখ্যাটিকে একটি মূল্যবান সংকলনে পরিণত করা হয়েছে।

বজ্রার্ক—শারদ সংকলন '৭৫। সম্পাদনা: বৈশ্বানর গোষ্ঠী। পোঃ বেলডাঙ্গা। মুর্শিদাবাদ। মূল্য: ১·০০।

মুর্শিদাবাদ হতে প্রকাশিত একটি উৎকৃষ্ট সংকলন। এতে আছে মননশীল প্রবন্ধ ও হৃদয়গ্রাহী গল্প ও কবিতা। পুলকেন্দু সিংহের মুর্শিদাবাদের 'ভাদুই গান' উল্লেখযোগ্য রচনা।

খড়দহ বার্তা—শারদীয়া সংখ্যা। সম্পাদক: নীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—খড়দহ জনকল্যাণ সমিতি। মূল্য: ১·০০।

প্রবন্ধগুলি সিরিয়াস পাঠকদের খুশি করবে। এ সংখ্যায় প্রকাশিত কবিতা ও গল্পগুলি ভাল লাগল। লেখকদের মধ্যে রয়েছেন, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুধীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ চৌধুরী, কুমুদ দাশগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

অভিনব অগ্রণী—সম্পাদক: দিলীপকুমার নাগ। ৫৩, গোপাল ব্যানার্জী লেন, হাওড়া। মূল্য: ১·০০।

এই শারদীয় সংকলনটি ছোটদের খুশি করবে। লেখকদের মধ্যে সকলেই প্রায় নবীন।

পাঞ্চজন্য—শারদীয় সংকলন। সম্পাদক: নিখিলরঞ্জন চক্রবর্তী। ৩।৪, সেন্ট্রাল সি থি রোড, কলকাতা-৫০। মূল্য: ১·০০।

এ সংকলনে প্রত্যেকটি রচনা সুখপাঠ্য। এতে লিখেছেন শক্তিপদ রাজগুরু, চিত্তরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, প্রভাকর মাঝি প্রমুখ লেখকগণ।

ঘেরাও হলেন মিঃ রায়

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

সওদাগরী অফিস হলে চেহারা ছবি আর পোষাক আষাকের জন্যেই চাকরি যেত মিস্টার রায়ের। গরুর গাড়ির চাকার মত গোল মুখ, খাব্‌লান চোখ, পুরনো টুথব্রাশের মত অমসৃণ ভুরু; গায়ের রং এমন যে ঘামও মনে হয় কালিগোলা জল। অনেকে আড়ালে বলে, উনি এফিডেভিট্‌ করে রায় হয়েছেন। সেকথা থাক।

মোটা একটা কাবলী বেড়াল স্বচ্ছন্দে গলে যেতে পারে গোড়ালির ওপর এমন ঘেরওয়ালা প্যান্ট; উপযুক্ত বোতাম প্রায়ই থাকে না—কষে দড়ি বাঁধেন কোমরে, তাতেই ঘের নিটোল বৃত্তাকার দেখায়। অফিসের কেরানিরা বলে, রায়সাহেবের দোনলা। ঊর্ধ্বাঙ্গে ঝলঝলে হাওয়াই সার্ট, বাঁ দিকটা তার সর্বক্ষণই কাম্রিক্‌ মেরে থাকে বুক-পকেটের ভারে। কোমরের দড়ির বাঁধন বেমালুম ঢাকা পড়ে বলে হাওয়াই সার্ট বেশি পছন্দ করেন মিস্টার রায়। বগলে শীত গ্রীষ্ম বার মাস একটা পুরনো লেডিজ ছাতা, খাটো ছাতা নিয়ে নাকি ট্রামে বাসে চড়ার সুবিধে। হাতে একটা সর্বার্থ-সাধক চামড়ার ব্যাগ, উদরীর রোগীর মত পেটটা ফুলেই আছে, বোতাম বিকল, তাই মুখও হাঁ হয়ে আছে। তাতে কখনও বৈঠকখানা বাজার থেকে সস্তায় কিছু কেনেন, কখনও আবার মফস্বলে ট্যুরে যাবার সময় বিছানা ভরে নেন। বিছানা বলতে অবশ্য একখানা

অপ্রমাণ সাইজের চাদর, আর আঁতুড়ে শিশুর জন্যে যেমন বালিশ করে তেমনি একটা বালিশের শিশু-সংস্করণ।

এ-জন্যে বাড়িতে রায়-গিন্নী দু'বেলা মুখ ঝামটা দেন। একবার ঐ পুরনো বিবর্ণ ব্যাগটা লুকিয়ে রেখেছিলেন, তাতেও যদি একটা নতুন ব্যাগ আসে। কিন্তু অযথা পয়সা খরচ করবেন না মিস্টার রায়। ব্যাগটা, বলতে গেলে একটা আস্ত বাহুর লাগে যা বানাতে, অমন ভারী জিনিষটা তো আর বাড়ি থেকে উড়ে যেতে পারে না। পাওয়া এক সময় যাবেই। সুতরাং দিন দু'য়েক একটা রেশনের থলি নিয়ে অফিস গেলেন তিনি। রাগে ফেটে পড়েছিলেন গৃহিণী 'আজকালকার পিওন-আর্দালিরা তো শুনি ভদ্রঘরের ছেলে, ছিমছাম ফিটফাট, তোমার ঐ ব্যাগ তারা ছোঁয়? ঐ হা-ঘরে অভ্যাসের জন্যেই তোমার কপালে অল্ ইন্ডিয়া ক্যাডারে যাওয়া হল না।'

গিন্নী প্রায়ই শোনান মিস্টার রায়ের জুনিয়ার কে কে কোন স্তরে অল ইন্ডিয়া সার্ভিসে প্রমোশন পেয়ে গেছে, কোন্ অফিসার শুধু টেনিস আর টেবিলকেটের জৌলস দেখিয়ে বেশ নিজের চোখ বাঁডিয়ে ওপরওয়ালার নজর পড়ে আখের গুছিয়ে নিয়েছে। অনেক উস্কানি করেও মিস্টার রায়কে একটা টেনিসের সর্ট কেনাতে পারেন নি গিন্নী। মিস্টার রায়ের এক যুক্তি—একহাঁড়ি টাকার মাল, ও কী জামা না গয়না! পরলেই মনে হবে এই বুঝি কেউ গা থেকে খুলে নিল।'

গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়ে বলেন, 'তোমার ঐ পোড়া কাঠের মত চেহারা, সঙের মত পোশাক অফিসে যে তোমার কী দাপট তা আর বুঝতে বাকি নেই। কেরানিদের কাছে তুমিই ধমক খাও কিনা তাই বা কে

দেখতে গেছে। একবার তো নদীতে চুবিয়ে মারতে গেছলো।'

একটু সলজ্জ হেসে মিস্টার রায় বলেন, 'তখন ননগেজেটেড ছিলাম। তবুও ছোঁড়াদের টাইট্ দিয়েছিলাম।'

সেসব অনেকদিন আগের কথা। তখন ননগেজেটেড সুপারভাইজার ছিলেন মিস্টার রায়। মফস্বলে গিয়ে যা-যা ঘটত সবই চিঠিতে লিখতেন, বাড়ি ফিরে সবিস্তারে বলতেন। সেইগুলোই যে গিন্নী আবার উঠতে বসতে এমন করে ব্যবহার করবেন তা কী তখন জানতেন। এই জন্যেই মেয়েদের কাছে অফিসের কথা বলতে নেই। কবে কার প্রমোশনের কথা বলেছিলেন সব মনে করে রেখেছেন গৃহিণী। মফস্বলের অনেক বৃত্তান্ত তার কাছে রীতিমত লজ্জার ও ঘেন্নার, মনে তো রাখবেনই।

কলকাতার বাইরে ডিউটিতে গেলে সবকারী রাহাখরচ যথাসাধ্য বাঁচিয়ে চলতেন মিস্টার রায়। দু'জন ক্লার্ক আর একজন পিওন নিয়ে পার্টি, তিনি তার সুপারভাইজার, ওরা বলত বড়বাবু। মফস্বলের গরু-ঘোড়ার হাসপাতাল অডিট করে বেড়াতে হত। সাধারণত মেস করেই থাকতেন সবাই মিলে। পিওন রান্নাবান্না করত বলে ফ্রি, খরচ খরচা সমান তিন ভাগ হত। বিনা ভাড়ায় থাকার জায়গা জোগাড় করতে অসীম উৎসাহ ছিল মিস্টার রায়ের। ডাকবাংলো খালি নেই দেখলে মনে মনে খুশি হতেন, পশু-হাসপাতালের আস্তাবলে রাত কাটাতেও আপত্তি করতেন না। একবার ঐ রকম আস্তানার ব্যবস্থা দেখে একজন ক্লার্ক একেবারে না বলেকয়ে সটান কলকাতায় ফিরে গিয়েছিল, গিয়ে ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়েছিল মিস্টার রায়ের নামে। এমন পাজি ছেলে, খামের ওপর মিস্টার রায়ের নাম লিখে ঠিকানা লিখেছিল—অডিট সুপারভাইজার, কেয়ার-অফ কাউ শেড, অমুক ভেটেরিনারি হসপিটাল।

সেই থেকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ডাকবাংলোয় উঠতে হত। মিস্টার রায়কে দেখলে বেশির ভাগ ডাকবাংলোর চৌকিদারই নিশ্চিন্তে আর ঘর খুলে দিতে চাইত না। নানা ছলছুতো করে ফিরিয়ে দিত। একবার মিস্টার রায়ের নাকিশকলমে এক এস ডি ও'র নাজির চৌকিদারকে বলেছিল, 'বড়বাবুকে ঘর দিস নি কেন রে?'

চৌকিদার বলেছিল, 'বড়বাবু! ও, ঘোড়ার বাবুর কথা বলছেন? উনি ভাড়া দিতে গোলমাল করেন। গতবার বলেছিলেন, আমরা না থাকলে ঘরটা তো বাপু ফাঁকাই পড়ে থাকত। সরকারী বাড়ি, ভাড়া পেলেই বা কী, না পেলেই বা কী।'

নাম খারাপ হয়ে গেছে, সুতরাং যথারীতি চৌকিদারের খাতায় সই সাবুদ করে ডাকবাংলোয় ঢুকতে হয়। গ্রীষ্মকালে ডাকবাংলোর ঘর থেকে খাট টেনে এনে বারান্দায় শুতেন মিস্টার রায়, তাতে হাওয়া পাওয়া যায় বেশি, আরামে ঘুম হয়। কিন্তু ভাড়ার হিসেবের সময় আপত্তি তুলতেন, 'ওর মধ্যে আবার আমাকে জড়াচ্ছেন কেন? আমি তো ঘরে শুই নি, ওটা দু' ভাগ করুন।'

খাওয়া-খরচের তিন ভাগের এক ভাগ দিতেন ঠিকই, কিন্তু কৌশলে সব সময়েই একটু বেশি আদায় ক'রে নিতেন। ক্লার্ক দুজনের আড়ালে পিওনকে একা পেলেই বেশ ঘরোয়াভাবে মিষ্টি ক'রে বলতেন, 'পুরুষ মানুষ, রান্নাবান্না করছ এই ঢের, যখন যেমন পারবে করবে। সব সময়ই যে আহামরি কিছু একটা হতে হবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু একটা কথা মনে রেখ, পরিবেশনের ওপরই তোমার সুনাম-দুর্নাম নির্ভর করছে। কেরানিবাবুরা আজ আছে কাল নেই,—এ পার্টিতে যাচ্ছে ও পার্টিতে যাচ্ছে, কিন্তু আমি তো খাঁটি, আমি থাকব। তোমার কনফিডেন্সিয়ালও আমিই লিখব। কত পিওন আমার পার্টিতে কাজ করল, অনেকে দপ্তরি হয়ে গেছে, তারা দেখেছি বেশ নির্লোভ, যত্নে-সুখে দেয় থোয়, তাই আমিও ভাল লিখেছি। বেচাল না দেখলে খারাপ লিখব কেন, বল?'

মোক্ষম ইঙ্গিত। মাছের মুড়ো অনিবার্যভাবে পড়ত মিস্টার রায়ের পাতে। ক্লার্ক ছিল তখন প্রণব আর রমেন, ওরা পিওনকে আড়ালে ডেকে শাসালো, নির্দেশ দিল অন্যরকম। সুতরাং একদিন মুড়ো খেল প্রণব, আর একদিন রমেন। তৃতীয় দিনও মুড়ো প্রণবের পাতে পড়ছে দেখে গাম্ভীর্য রক্ষা করতে পারলেন না মিস্টার রায়, পিওনের দিকে রূক্ষ দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার মাথা?'

প্রণব মুড়োতে একটা প্রচণ্ড চাপ দিয়ে কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, 'এই ভাঙছি।'

সেই নিয়েই বেধেছিল গোলমাল। ভাত ফেলে উঠে গিয়েছিলেন মিস্টার রায়। অফিসের সময়টুকু ছাড়া বাক্যালাপ বন্ধ করেছিলেন প্রণব আর রমেনের সঙ্গে। উভয় পক্ষই পিওনকে মাঝখানে রেখে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলত। যেমন, 'হরিপদ, বাবুদের খেতে আসতে বল।' উত্তর হতো, 'হরিপদ, আমরা পরে খাব, তোমার বড়বাবুকে খেয়ে নিতে বল।'

সেইবারই ঘটনাটা ঘটল।

অফিস থেকে একটু আগেভাগে ডাক-বাংলোয় ফিরে আসতেন মিস্টার রায়। ক্লার্কদের সঙ্গে কথা নেই, পিওনের সঙ্গেই একটু কথাটথা বলতেন। এসেই শুয়ে পড়তেন, শুয়ে শুয়েই গল্প করতেন হরিপদর সঙ্গে। অনেক দেরি করে ফিরত প্রণব আর রমেন, ওরা এসে দেখত মিস্টার রায় ঘুমুচ্ছেন। পরে টের পেয়েছিল, ওদের দেখলেই ঘুমের ভান করতেন মিস্টার রায়, কী বলেটলে শোনবার জন্যে। একদিন ওরা ঘরে ঢুকতেই মিস্টার রায় নাক ডাকাতে সুরু করলেন, অমনি প্রণব বেশ জোরে জোরে বলল, 'এই রমেন শোন, ব্যাটা ঘুমুচ্ছে খুব. এই সুযোগ। তুই ওদিকটা ধর, সতরঞ্চিসুদ্ধ পাটিসাপটার মত জড়িয়ে ওকে নদীতে ফেলে দিয়ে আসি।'

তড়াক করে উঠে বসেছিলেন মিস্টার রায়। সদ্য ঘুমভাঙার ভানটা বজায় রেখে ভাত দেবার জন্যে তাড়া দিয়েছিলেন, 'কী হরিপদ, হলো?'

কলকাতার অফিসে লিখে ওদের দুজনকেই অন্য পার্টিতে ট্রান্সফার করিয়েছিলেন মিস্টার রায়। রমেনের কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট এমন লিখেছিলেন যে এর ইনক্রিমেন্ট বন্ধ হয়েছিল বছর তিনেক। প্রণবকেও এক সাসপেনশন দিতে হয়েছিল।

এসবও যথাসময়ে গিন্নীকে বলেছিলেন মিস্টার রায়, কিন্তু কোনদিন ভুলেও তিনি তা উল্লেখ করেন না। গিন্নীর বদ্ধমূল ধারণা মিস্টার রায় নেনিমুখো, একটি নির্বিষ ঢোঁড়া সাপ, নইলে এ্যাদ্দিনেও অল ইন্ডিয়া ক্যাডার পান না।

অথচ মিসেস রায়ের এক দেওর কোন এক তেলের কোম্পানীতে এই তো সেদিনও এ্যাকাউনটেন্ট ছিল, দেখতে দেখতে কত বড় অফিসার হয়ে গেল। কী ঠাট-বাট! কোম্পানী ঝকঝকে গাড়ি দিয়েছে, ছোট জা নন্দিতা সেই গাড়িতে চড়ে বেড়াতে আসে মিসেস রায়ের কোয়ার্টারসে। বলে, 'এমন পায়রার খোপে থাকেন কী করে দিদি!'

কোনদিন জলের গেলাস মুখ থেকে নামিয়েই বলে, 'দাদাকে একটা ফ্রিজ কিনতে বলেন। না হয় দিশিই কিনবেন, এমন আর কী দাম!'

'আর ভাই, আমাদের আবার ফ্রিজ!' দার্শনিকভাবে বলে প্রসঙ্গ চাপা দেন মিসেস রায়। তারপর মিস্টার রায় ফিরলেই মুখের তোড়ে একেবারে ধুইয়ে দেন তাকে। একের পর এক বলে যান কবে কোথায় কেমনভাবে মিস্টার রায় গেজেটেড হবার পরেও অপদস্থ হয়েছেন ক্লার্কদের কাছে। দার্জিলিংয়ের ঘটনাটাই বেশি মনে আছে মিসেস রায়ের, একেবারে প্রত্যক্ষদর্শীর মত বর্ণনা করে যান।

সুপারভাইজার থেকে সবে তখন অফিসার হয়েছেন মিস্টার রায়। দু-তিনটে পার্টি তখন দার্জিলিং-এ, তাদের কাজকর্ম তদারকি করতে যেতে হল তাঁকে। আইনত খাওয়া থাকার পৃথক ব্যবস্থা করা উচিত ছিল, তাতে খরচ অনেক, সুতরাং এক পার্টির সঙ্গে ভিড়ে পড়লেন। সবাই চেনে মিস্টার রায়কে, তাই কোন পার্টিই প্রথমে রাজী হয় নি। শেষটায় এক পার্টিতে প্রণবকে পেয়ে তাকেই ধরে পড়লেন। রমেন আর প্রণব অনেকদিন তার পার্টিতে ছিল। গুরুতর অপরাধেও লঘু দণ্ডই হয়েছিল প্রণবের, সেজন্যে নিশ্চয়ই মিস্টার রায়ের কাছে কৃতজ্ঞ সে। এই মনে করেই প্রণবকে ধরে পড়লেন, বললেন, 'আপনি তো ঐ ঘরটায় শোন, রাত্তিরটুকু আপনার পাশেই কাটিয়ে দেব।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল প্রণব, তারপর কী জানি কী ভেবে রাজী হয়ে গেল।

প্রণবের ঘরেই শুতে এলেন মিস্টার রায়। প্রণবের খাটের পাশেই একটা ক্যাম্প খাট আনানো হয়েছে পশু-হাসপাতাল থেকে, তাতেই বিছানা পাতালেন। বিছানা সামান্যই, তা-ও বোধ হয় দার্জিলিং বলেই। প্রণব দেখল, শোবার আগে জামা ছাড়ছেন মিস্টার রায়। কোটের নিচে সেই বুশসার্ট, তার নিচে একটা ফুল সার্ট, তার নিচে মিলিটারীদের সবুজ গরম গেঞ্জি, তার নিচে একটা ফতুয়া, তারপর গেঞ্জি—এক, দুই, তিন। খুলছেন তো খুলছেনই, যেন মোচা ছাড়ান হচ্ছে। শেষের গেঞ্জিটা ছিঁড়ে খ্যাপলা জাল হয়ে গেছে। দুর্গন্ধ!

প্রণব একদৃষ্টে চেয়ে আছে দেখে আলাপ জমালেন মিস্টার রায়, 'গেঞ্জি ছিঁড়ে গেলে কী করেন?'

'গায়ে দিই না।'

'তাই তো বলছি, যখন গায়ে দিতে পারেন না তখন কী করেন?' নিজেই সে প্রশ্নের উত্তর দিলেন মিস্টার রায়, 'আমি কী করি জানেন? ঐ দিয়ে তুলির মত করে গাড়ির দরজা জানলা রং করি।'

'গভর্নমেন্টের কোয়ার্টারে?'

'আমি বাড়ি করেছি জানেন না বুঝি? টপ সিক্রেট অবশ্য। কোয়ার্টারসেই আছি, বাড়িখানা ভাড়া দিয়েছি।' মিস্টার রায় বললেন, 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, রং মাখা গেঞ্জিটেঞ্জিগুলো ফেলে দিই না, শুকিয়ে রেখে দিই। রং হাইলি ইনফ্লেমেবল জানবেন, শুকিয়ে কড়মড়ে হলে উনুন ধরানোর কাজে লাগে।'

প্রণব শুধু বলে, 'ও, তাই বুঝি!'

তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ, হঠাৎ বিছানার ওপর উঠে বসে প্রণব, বলে, 'রাত অনেক হল, এবার ঘুমোনো যাক, কী বলেন। পিওনকে ডাকি, আপনার খাটটা বাইরে বার করে দিক।'

'সে কী! কেন?' বিব্রত বোধ করেন মিস্টার রায়।

'ঘরে শুলে ভাড়ার আদ্দেক দিতে হবে কিন্তু।' বলেই শুয়ে পড়ে কম্বল ঢাকা দেয় প্রণব। মনে মনে বেজায় চটে যান মিস্টার রায়, প্রণব কী জানে না তিনি গেজেটেড হয়েছেন!

আলোটা নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন মিস্টার রায়, কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'প্রণববাবু কি ঘুমুলেন?'

'না।'

'আচ্ছা প্রণববাবু, আমি অফিসার, আমার সঙ্গে এক ঘরে পাশা-পাশি শুতে আপনার ভয় করে না?'

প্রণব ইঙ্গিতটা বুঝল, কম্বল দিয়ে মুখ ঢাকা ছিল, সেটা সরিয়ে অন্ধকারেই মিস্টার রায়ের দিকে তাকাল একবার, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'কেন স্যার'—সম্বোধনটা নতুন ঠেকল মিস্টার

রায়ের কানে—'আপনার কি কোন খারাপ অসুখটসুখ আছে?'

সবটা বলে এখনও মন্তব্য করেন মিসেস রায়, 'ঠিকই বলেছে, অমন নোংরা লোকের অসুখবিসুখ না থাকাই বিচিত্র। তোমার মত মানুষকে কেরানিরা চিমটে দিয়েও ছোঁবে না, এই যা ভরসা।'

তবুও একদিন ঘেরাও হলেন মিস্টার রায়।

সম্ভবত গৃহিণীর গঞ্জনায় উত্তেজিত হয়েছিলেন মিস্টার রায়, কলকাতার অফিসে দাপট দেখাতে তৎপর হয়ে উঠলেন। কয়েকজন ক্লার্কের টি-এ বিল সই না করে চেপে রাখলেন, ইচ্ছে, আসুক ওরা, একটু অনুনয়-বিনয় করুক, তখন দেখা যাবে। কেউ আসে না, আর্দালিকে জিজ্ঞেস করেন মিস্টার রায়, 'বাবুরা কিছু বলছে?'

'না ত'।'

আক্রোশ আরো বেড়ে যায় মিস্টার রায়ের। বড় তেল হয়েছে কেরানিদের, একজন গেজেটেড অফিসারকে একটু সাধ্যসাধনা করতে তাদের মান যায়! মিস্টার রায় মনে মনে ভাবলেন, প্রণবও এর পেছনে নেই তো!

দিন পাঁচেক পরেই অফিসে লেঞ্চের সময় আর্দালি মিস্টার রায়ের কোয়ার্টার্সে গিয়ে হাজির। সে খবর দিতে এসেছে, জনা পাঁচেক বাবু আজ সাহেবকে ঘেরাও করবে।

শুনে কেমন মিইয়ে গেলেন মিস্টার রায়।

মিসেস রায় টেলিফোন করলেন তাঁর দেওরকে। সব শুনেই সে বলল, 'এ্যাদ্দিনে তাহলে দাদার কপাল খুলল।'

'সে কী ভাই!' মিসেস রায় কিছুই বুঝতে পারেন না। বলেন, 'তুমি এক্ষুণি একবার এস ঠাকুরপো।'

টেলিফোন রেখেই প্রচণ্ড ঝঙ্কার দেন রায়-গিন্নী, 'ও কী, জামা ছাড়লে যে! অফিস যাবে না?'

'যদি ইয়ে করে?' আতঙ্কগ্রস্ত মিস্টার রায়।

হিন্দুস্থানী আর্দালি হরিরাম খুব সাহসী ও বিশ্বস্ত। বলে, 'ভয় পাবেন না স্যার, আমি আছি।'

অল্পক্ষণের মধ্যে মিসেস রায়ের দেওর সুমন্ত তার স্ত্রী নন্দিতাকে নিয়ে এসে হাজির। আর্দালি হরিরাম বাইরে গিয়ে বসল।

নন্দিতা মিসেস রায়ের কাছে গিয়ে বলে, 'কখন খবর পেলেন?'

সুমন্ত বলে, 'ট্যাক্টফুলি ফেস্ করতে হবে, দাদা। এমন অপরচুনিটি খুব কম আসে। আমার অফিসের চেম্বারে কমোড বসিয়ে আটচল্লিশ ঘণ্টার মত স্লাই রেশন স্টক্ করে বসে আছি, বাট্ নো গ্রাও সো ফার।'

'আমি কি ঘেরাও হচ্ছি?' মিস্টার রায় বিপন্ন বেন। বলেন, 'এখন উপায়? যদি ঘেরাও না করে দু-চার ঘা দিয়ে পালায়?'

'যদি দোতলা থেকে গঙ্গায় ফেলে দেয়?' উদ্বিগ্ন প্রশ্ন মিসেস রায়ের। 'একবার তো জলে চুবিয়ে মারতে গেছলো।'

'তুমি থাম।' ধমক দেন মিস্টার রায়। 'তোমার জন্যেই—'

'যে জন্যেই ওরা জমায়েত হোক,' সুমন্ত বলে, 'ওটাকে ঘেরাও-এ টার্ন করাতে হবে। হরিরাম, ও হরিরাম—'

হরিরামকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিল সুমন্ত, দাদাকেও পরামর্শ দিল, কখন কী বলতে হবে।

হরিরামের পেছন পেছন অফিসের ছোট কামরার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন মিস্টার রায়। সাত-আটজন ক্লার্ক দাঁড়িয়ে আছে, একজন বলল, 'আমাদের টি-এ বিলগুলো—'

হরিরাম বলল, 'সরে যান বাবুরা, সাহেবকে ভেতরে ঢুকতে দিন।'

ওর বলার ভঙ্গিতে কৌতুক অনুভব করল ক্লার্করা। সরে দাঁড়াল, ঘরে ঢুকলেন মিস্টার রায়। সেই সঙ্গে অপেক্ষমাণ কয়েকজন ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিল, হরিরাম বাধা দিল, 'সাহেবের মানা আছে!'

'ইস্!' অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করল একজন। 'মাইরি আর কী!'

দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালেন মিস্টার রায়, বললেন, 'আপনারা যেভাবে দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন, জানেন ইট অ্যামাউন্টস্ টু ঘেরাও?'

'হ্যাঁ তাই।' একজন বলেই বসে পড়ল মেজেতে। 'আমরা আপনাকে ঘেরাও করলাম। বল ভাইসব, আমাদের দাবি—'

'মানতে হবে, মানতে হবে।' শ্লোগানের জবাব দিয়ে বাদবাকিরাও বসে পড়ল।

মিস্টার রায় ঘরে ঢুকে গিয়েই টেলিফোন তুললেন, গিন্নীকে জানালেন, 'ওরা রাজী হয়েছে, আমাকে ঘেরাও করিয়েছি।'

গিন্নী জানালেন, 'দেখো চট্ করে যেন উইথড্র না হয়।'

বাড়ির চাকরকে দিয়ে মস্ত টিফিন কেরিয়ারে করে লুচি, আলুর দম, হালুয়া, আর ফ্লাস্কে দুধ পাঠালেন গিন্নী। টেলিফোন করলেন মিস্টার রায়কে, 'খাবার পেঁছেছে?'

সন্ধ্যে নাগাদ টেলিফোন করলেন আবার, ঘেরাও চলছে জেনে খুশি হলেন। দেওর বলেছে, এবার মিস্টার রায়ের অল্ ইণ্ডিয়া ক্যাডার হবেই। নন্দিতার চোখে-মুখেও যেন একটু ঈর্ষার ভাব। খুব খুশি মিসেস রায়। এবার শেষ টেলি-ফোনটা করতে হবে মিস্টার রায়ের অফিসের বড়কর্তাকে।

'মিস্টার পাকড়াশী বলছেন? আমি অডিট অফিসার মিস্টার রায়ের বাড়ি থেকে মিসেস রায় বলছি।' টেলিফোনে কথা হচ্ছে।

পাকড়াশী সবই জানেন, সুতরাং বললেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মিসেস রায়, আপনার স্বামী এক্ষুণি ফিরবেন। সরকারী অফিসে ঘেরাও ইল্লিগাল, এবং এ ধরনের ঘটনা এই প্রথম। সেজন্যে আমি লজ্জিত।'

মিসেস রায় উৎসাহিত হন, বলেন, 'না না লজ্জার কী আছে! এফিসিয়েন্ট অফিসারদের বিরুদ্ধে—'

কথা শেষ করার আগেই পাকড়াশীর গলা শোনা গেল, 'এক্সকিউজ মী ম্যাডাম, মিস্টার রায় ইচ্ছে করলেই এটা এড়াতে পারতেন। ক্লার্কদের সঙ্গে ওঁর রিলেশন ভাল নয়, হি ইজ ট্যাকটলেস।

কুসুম কোমল
পাপড়ি পেলব তনু
সবচেয়ে বড়
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
আধুনিকারা তাই
প্রশংসায় মুখর।
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
আধুনিক

শিলাজি
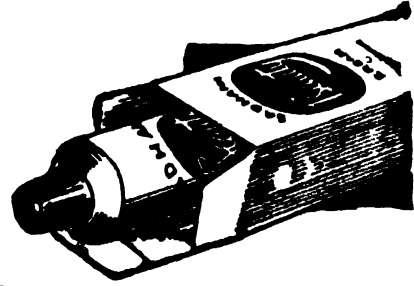
নির্বাসনে বের্টল্ট ব্রেশট
(১৯৩৩—১৯৪৮) ঃ

..changing counties more often than shoes..

Brecht AN DIE NACHGEBORENEN

To teach without pupils
To write without fame
Is difficult....

Brecht, UBER DAS LEHREN OHNE SCHULER (1935).

সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এমনিতেই নির্বাসিতের জীবনের দুঃখ, দুর্গতির সীমা-পরিসীমা নেই। তারপর তিনি যদি আবার সাহিত্যিক হন তাহলে সে দুর্গতি যেন আরও চরমে ওঠে। লেখা—প্রকাশ করা এবং প্রকাশিত রচনার পাঠক পাওয়া সবই যেন অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ব্রেশটের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটা আরও কঠিন এবং নিষ্করুণ হয়ে দাঁড়াল। প্রথমত তিনি ছিলেন একজন অতি বড় দরের কবি—তাঁর মূল কবিতার অবার চমৎকারিত্ব এবং মাধুর্য সর্বজনস্বীকৃত। তা ছাড়া তাঁর গদ্যের ভাষাও কাব্যমাধুর্যে বিভূষিত। ব্রেশটের লেখার ইংরাজী অনুবাদে অবশ্য তাঁর মূল রচনার চমৎকারিত্বের পরিচয় আমরা পাই না। কোন অনুবাদেই তা পাওয়া সম্ভব নয়। যে সব মূল বাংলা কবিতার অনুবাদ করে ইংরাজী গীতাঞ্জলি রচিত হয়েছে, তাতে কি মূলের সৌন্দর্য এবং মাধুর্যের আভাস পাওয়া যায়? তা হয় না।

সুতরাং নির্বাসিতের জীবনযাপনের সময় ব্রেশট যে তাঁর রচনার (জার্মান ভাষায়) পাঠক এবং সত্যিকার সমঝদার পাবেন না এ তো সবাই বুঝতে পারেন। আর কবি হলেও ব্রেশট প্রধানত ছিলেন নাট্যকার শুধু নাট্যকার নন—এ যুগের ইওরোপের নাট্যজগতের পথিকৃৎ—an experimenter and innovator in the theatre. সুতরাং তাঁর কাজ ঠিক মত করবার জন্য অপরিহার্যভাবে দরকার ছিল একটি রঙ্গমঞ্চ, দক্ষ্যাপটাদি অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং যাঁরা অভিনয় দেখবেন সেই দর্শক দলের। একজন চিকিৎসককে যদি জনমানবহীন কোন জায়গায় নিয়ে গিয়ে বলা হয়, তুমি তোমার চিকিৎসার কাজ চালিয়ে যাও তাহলে তাঁর যেমন অবস্থা হয়, নাট্যকার ব্রেশটের অবস্থা হল সেইরকম। এককভাবে কবি তাঁর কাব্য রচনা করতে পারেন, চিত্রকর তাঁর ছবি এঁকে যেতে পারেন—এভাবে কাজ করে যেতে তাঁদের বিশেষ অসুবিধা নাও হতে পারে। কিন্তু সত্যিকার নাট্যকার হতে হলে তাঁর সঙ্গে রঙ্গমঞ্চ এবং দর্শকের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলে চলে না।

ব্রেশটের পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে, অর্থাৎ যখন যশ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, আর্থিক সাফল্য সবই তিনি পেতে শুরু করেছেন—এই সময়েই হঠাৎ যেন তাঁকে সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হোল।

অবশ্য জার্মান-ভাষাভাষী অঞ্চলের বাইরেও এ সময় দি থ্রি পেনী অপেরা নানা দেশে প্রচুর সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হচ্ছিল। এই অপেরাটির ফরাসী এবং জার্মান ভাষায় চিত্ররূপায়ণও নানা জায়গায় দেখানো হচ্ছিল এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ইওরোপের সব বড় বড় দেশের রাজধানীতেই তখন দি থ্রি পেনী অপেরা মঞ্চস্থ হয়েছিল—এমন কি ১৯৩৩ সালে নিউ ইয়র্কেও। তবে নিউ ইয়র্কে অপেরাটি জনপ্রিয়তা পায় নি। ছবির ব্যাপারে স্ক্রিপ্ট লেখা নিয়ে পরিচালকদের সঙ্গে ব্রেশটের মতভেদ হয় এবং সে জন্য তিনি ছবি নির্মাণের ব্যাপার থেকে সরে আসেন। তবে নাটক এবং ছবির জন্য তাঁকে যথেষ্ট রয়্যালটি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেটাই তো বড় কথা নয়। নতুন নাটক লেখা এবং মঞ্চস্থ করার সুযোগ-সুবিধা নেই। আর নতুন নাটক অনুবাদ করিয়ে অভিনয় করাতে গেলে, সাফল্যলাভ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

তখনও কয়েকটি দেশ অবশিষ্ট ছিল যেখানকার অধিবাসীরা ছিল জার্মান-স্পিকিং এবং যেখানে তখন পর্যন্ত হিটলারের আধিপত্য শুরু হয় নি। এই-সব দেশে—যেমন অস্ট্রিয়া, সুইটজারল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়ার কিছুটা অংশ, বলকানের কয়েকটা জায়গা এবং সোভিয়েট রাশিয়ার যে জায়গায় ভলগা জার্মানদের প্রাধান্য ছিল—নির্বাসিত জার্মান শিল্পীরা এসে শিল্পচর্চার সুযোগ পাবেন, এই ভেবেছিলেন। প্রাহা এবং জ্যুরিক থেকে জার্মান-ভাষী অন্য সব জায়গাই ছিল শিল্পরুচি এবং শিল্পমান সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রাদেশিক ভাবাপন্ন। আর ভিয়েনা, প্রাহা এবং জ্যুরিকে হিটলারের রাইস থেকে নির্বাসিত সমস্ত লেখক, প্রডিউসারস, কম্পোজারস, অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং সাংবাদিকদের যথাযোগ্য স্থানসঙ্কুলান এবং শিল্পচর্চার সুবিধা হবে এ পরিকল্পনাটা ছিল বাস্তবতাবর্জিত। দু'-একজন জার্মান বাস্তুহারা লেখক — যথা, আর্থার কোয়েস্টলার, রবার্ট নিউমান প্রমুখ মাতৃ-ভাষা পরিত্যাগ করে বিদেশী ভাষা সম্পূর্ণ-ভাবে আয়ত্ত করে নিয়ে সেই ভাষায় রচনা করতে শুরু করেন। এঁদের সাহস এবং দক্ষতা সত্যিই খুব প্রশংসনীয়। কিন্তু এঁরা হচ্ছেন নিয়মের ব্যতিরেক। অন্যের ভাষা আয়ত্ত করে নিয়ে সে ভাষায় লেখার ক্ষমতা সবার হয় না। সুতরাং নির্বাসিত জার্মান লেখকদের একমাত্র ভরসার জায়গা ছিল সামান্য কয়েকজন জার্মান পাবলিশার যাঁরা তখন পর্যন্ত সাহস করে নাৎসী কর্তৃত্বের বাইরে ছিলেন এবং প্রস্তুত হয়েছিলেন হিটলারের লোমদুষ্টিতে পতিত লেখকদের রচনা প্রকাশ করতে—যদিও তাঁরা জানতেন তাঁদের এই ধরণের কাজের ফলে জার্মানীতে তাঁদের বইয়ের বাজার সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর একভাবে নির্বাসিত লেখকদের লেখা প্রকাশের একটা সুবিধা দেখা দিয়েছিল। ভিয়েনা, প্রাহা, আমস্টারডাম এবং প্যারিসে নাৎসী-বিরোধী কিছু কিছু পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হতে শুরু হয়েছিল। এসব ম্যাগাজিনগুলোর আয়ু ছিল খুব স্বল্প-কালের। যাঁরা এইসব ম্যাগাজিন প্রকাশ করতেন তাঁরা ছিলেন ঘোর নাৎসী-বিরোধী। ইওরোপের বিভিন্ন দেশের কফেরেস্তোরাঁতে বসে নিরাপদে তাঁরা জার্মানীর নাৎসী-শক্তি উৎখাত বিষয়ক ষড়যন্ত্রের জল্পনা-কল্পনা এবং পরিকল্পনা করে সময় কাটাতেন। নাৎসী কর্তৃত্বের আসল স্বরূপকে অন্যান্য দেশের সামনে তুলে ধরবার জন্যই তাঁরা পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হতেন। প্রথম দিকে এঁরা আশা করেছিলেন যে, হিটলারের রাজত্ব আপনা থেকেই কয়েকদিন বাদে ভেঙে পড়বে। কিন্তু দেখা গেল এ আশা কাজে পরিণত হচ্ছে না। হিটলার এবং তাঁর নাৎসীবাদ ক্রমশ জার্মানীতে নিজেদের আধিপত্য সুদৃঢ়ভাবে বিস্তৃত করে ফেলেছিল। এরপর এইসব নাৎসী-বিরোধীদের মনে হয়েছিল যে, ইওরোপের অন্যান্য শক্তিশালী দেশগুলো নিশ্চয় আলস্যে দিন যাপন করবে না—কারণ এ সময় হিটলার বেশ প্রকাশ্যভাবেই নিজের দেশকে প্রস্তুত করছিল ঐ সব দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য। বছরের পর

বছর এভাবে কাটছিল, অথচ ঐ সব দেশ কিন্তু হিটলারের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ইচ্ছে করেই চোখ বুজে ছিল। হিটলার-বিরোধী ইন্টেলেকচুয়ালরা পড়লেন মহা সমস্যায়। তাঁরা হিটলারকে বেশ ভালভাবেই জানতেন এবং স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছিলেন এর পর কি ঘটবে।

কিন্তু সত্যিকার কোন কার্যকরী উপায় তাঁরা খুঁজে পাচ্ছিলেন না, যার মাধ্যমে ওঁদের মতবাদের দ্বারা ইওরোপের বড় বড় শক্তিগুলোকে জাগিয়ে তুলবেন। অপঠিত রেফিউজি পরিচালিত পত্রিকা এবং নাটকের ভেতর দিয়েই তাঁরা নাৎসী বর্বরতার বিষয়ে সারা পৃথিবীকে জাগিয়ে তোলবার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় রত ছিলেন। এইসব নাটকের অভিনয় হোত কোথায়? অনেক সময়েই কাফেগুলোর পেছনের দিকের ঘরে—কারণ ভাল স্টেজ নিয়ে সাধারণ দর্শকের সামনে অভিনয় করবার পয়সা এঁদের ছিল না। দর্শক বলতে যারা থাকতো তারাও রেফিউজির দল—যারা নাৎসীবাদের বীভৎসতার দিকটা নিজেদের জীবন দিয়েই উপলব্ধি করেছে এবং এই সব থেকে নতুন কিছু জানবার যাদের দরকার ছিল না। কত বড় বড় নির্বাসিত শিল্পী, সাহিত্যিক এইসব দল ঘুরে বেড়াতেন। সাধারণ লোকেরা এঁদের পূর্ব-খ্যাতি, মত এবং অন্যান্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং অনবহিত ছিল। এইসব শিল্পীদের অনেককেই চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশনসের দানের ওপর নির্ভর করে জীবন নির্বাহ করতে হোত। এইসব কারণেই এ সময় বহু নির্বাসিত জার্মান সাহিত্যিক আত্মহত্যা করে অথবা অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে তাঁদের অভিশপ্ত জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন।

রাইসটাগে আগুন লাগবার পরদিন ব্রেশট তাঁর স্ত্রী এবং ছোট ছেলে স্টেফানকে সঙ্গে নিয়ে ভিয়েনায় পালিয়ে গেলেন। নাৎসীদের হত্যা-তালিকায় ১৯২৩ সাল থেকেই ব্রেশট ছিলেন পঞ্চম স্থানের অধিকারী। তাঁর অপরাধ? না, 'দি লেজেন্ড অভ দি ডেড সোলজার' কবিতায় তিনি জার্মান ফ্রন্ট লাইন সোলজারদের সম্মান এবং মহত্বের ওপর কলঙ্ক লেপন করেছেন। নাৎসীরা ক্ষমতায় আসবার পর তাদের যে-সব বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের বইকে আগুনে জ্বালিয়েছিল, ব্রেশটের নাম তাদের প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। এর পর ব্রেশটের জার্মান নাগরিকত্ব বাতিল করে দেওয়া হয়। এবারে তাঁর অপরাধ? ঐ একই অপরাধ—'দি লেজেন্ড অভ দি ডেড সোলজারের' তিনি রচয়িতা।

বের্টল্ট ব্রেশট

কিন্তু একটা বড় বিপদ ঘটল। ব্রেশট এবং হেলেনা ভাইগেলের দু' বছর বয়সের মেয়ে বারবারাকে জার্মানীতে ব্রেশটের বাবার কাছে রেখে যেতে হল। ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে ভিয়েনাতে গুজব পৌঁছল যে, নাৎসীরা ব্ল্যাকমেইল করে ব্রেশটকে জার্মানীতে ফিরিয়ে আনবে এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মেয়েটিকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করবে। ভিয়েনাতে ওয়েলফেয়ারের কাজে রত একজন ইংরাজ মহিলা এই ভয়ানক বিপদের কথা শুনে প্রস্তাব করলেন যে, ব্রেশটের শিশুকন্যাটিকে তিনি স্মাগল করে জার্মানীর বাইরে নিয়ে আসবেন। ১৯৩৩ সালের ১লা এপ্রিল বহু বিপদ-আপদ কাটিয়ে এই উদ্ধারকার্য সাফল্যের সঙ্গে সমাধা করা হোল। শিশু বারবারাকে অগসবার্গের সীমান্ত থেকে তুলে নিয়ে ট্রেনে চাপিয়ে দেওয়া হোল—সে গিয়ে পৌঁছল সুইটজারল্যান্ডে। তার মা-বাবা অবশ্য আগেই সেখানে চলে এসেছিলেন তাকে নিয়ে যাবার জন্য।

'দুর্ভাগ্য অব দি কমিউন'-এর একটি দৃশ্য
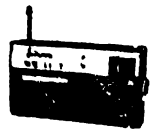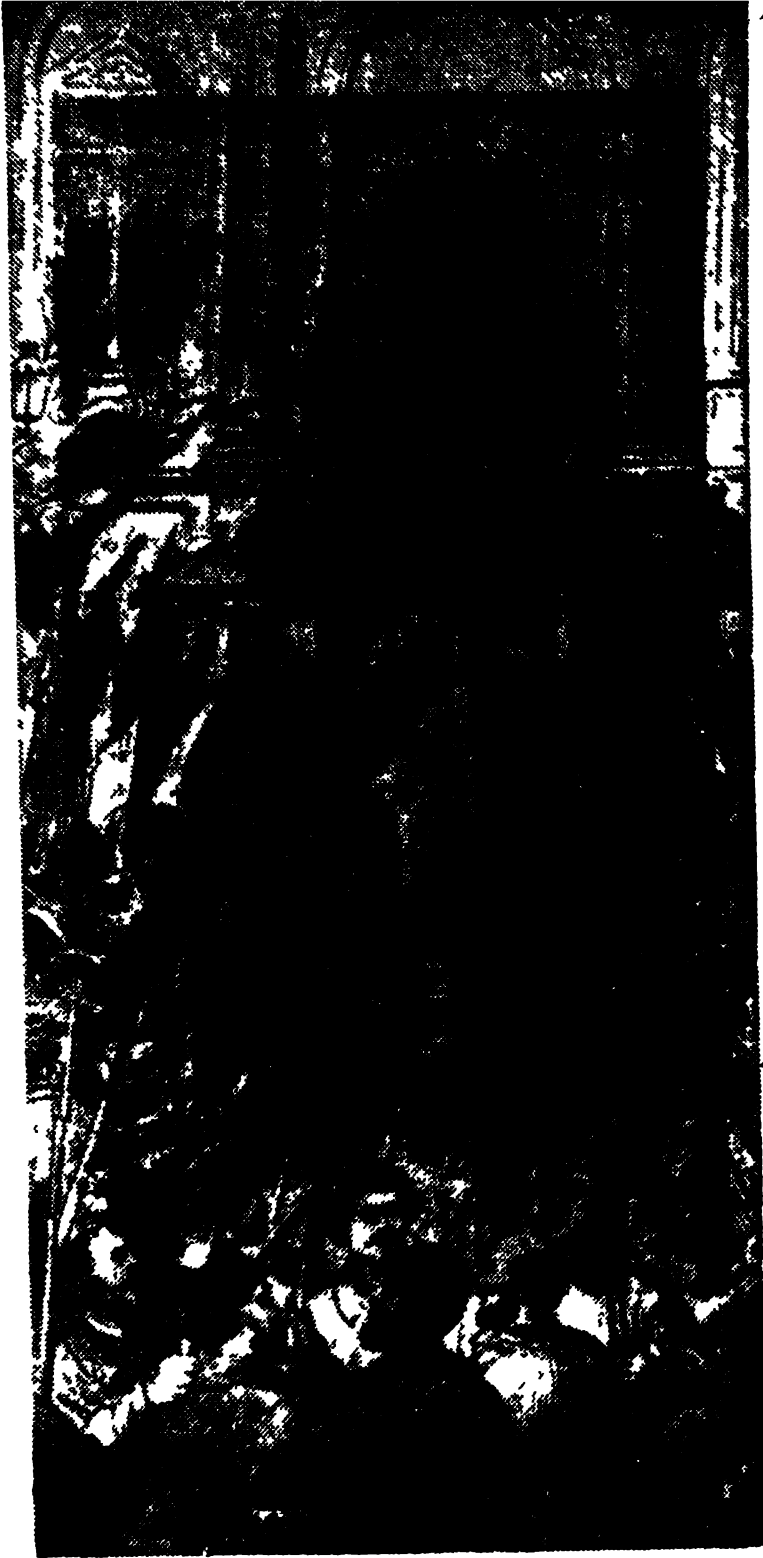
এর কয়েক বছর পরে অন্যান্য নির্বাসিত জার্মান সাহিত্যিকদের মত ব্রেশটও ইউরোপের নানা দেশ সফর করে বেড়াচ্ছিলেন—উদ্দেশ্য যদি কোন জায়গা পাওয়া যায় যেখানে বসবাস করতে পারেন এবং লেখার কাজও চালাতে পারেন। এই নৈরাশ্যপূর্ণ বসতি অন্বেষণের সফরে বেশির ভাগ নির্বাসিত লেখকই হয় ভিয়েনা না হয় প্যারিস অথবা প্রাহাতে এসে নেমে পড়তেন থাকবার জন্য। ১৯৩৩ সালের বসন্তকালে একদল নাৎসী-বিরোধী নামকরা লেখকের দল সানারি-সুর-মের-এ এক সভার আয়োজন করলেন—তাঁরা ঠিক করেছিলেন নিজেদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধেই এখানে তাঁরা আলোচনা করবেন। টমাস ও হাইনরিখ মান, ফরেৎ ওয়াল্ডার, আর্নল্ড জাইগ। টমাস মানের ছেলে ক্লাউস মান, আর্নস্ট টোলার এবং ব্রেশট এই সভায় উপস্থিত থাকতেন। পরে এই সভার আরও বেশ কয়েকটি অধিবেশন হয়—এইসব সভায় আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল নির্বাসিত জার্মান লেখকদের জীবন সমস্যার সমাধানের উপায় অন্বেষণ এবং হিটলারের পতন ঘটানোর জন্য কিভাবে তাঁরা সাহায্য করতে পারেন সে বিষয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনা করা। এঁদের উদ্দেশ্য কোনদিক দিয়েই যে খুব সফল হয়েছিল তা অবশ্য বলা চলে না। তবু এঁরা যে এত বিপর্যয়ের ভেতরও হতাশ হয়ে না পড়ে পশুশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন সেটাই বড় কথা। হিটলারের রাজনীতি এবং হিটলারের জীবনদর্শন ভবিষ্যৎ পৃথিবীর কাছে একটা বিকৃত এবং পাশবিক উন্মত্তভাব উদাহরণ হিসাবেই তুলে ধরা হয়ে থাকে। কিন্তু ঐ সব নির্বাসিত শিল্পী এবং লেখকের দল তাঁদের নির্ভীক মনোভাব এবং মতামতের জন্য ভবিষ্যতের চিন্তাশীল লোকেদের কাছে চিরকাল সম্মান এবং শ্রদ্ধার পাত্র হিসাবে বিবেচিত হবেন।

সত্যিকার বড় শিল্পী বা সাহিত্যিককে কোনো বিশেষ দেশ বা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা যায় না। সেই জন্যই আজ ধনতন্ত্রবাদের দেশগুলোতেও বিনা দ্বিধায় স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, বের্টল্ট ব্রেশট এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। এই কারণেই পূর্ব এবং পশ্চিম জার্মানী সোভিয়েট রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ড প্রভৃতি সব দেশেই ব্রেশটের নাটকের এত আদর। আমাদের বাংলাদেশেও এরই ভেতর ব্রেশটের দশ কয়েকটি নাটক বাংলায় অনূদিত হয়ে মঞ্চস্থ হয়েছে। এসব নাটক দর্শকরাও খুবই উৎসাহের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। গত শনিবার আমার অনূদিত 'সেৎজুয়ানের মহৎ নারী' তিনটি দৃশ্য ইন্দো-জার্মান ফ্রেণ্ডশিপ সোসাইটি ... -সভ্যরা মঞ্চস্থ করলেন জার্মান ড্রামাটিক বিশপ সদস্যের উনবিংশ জন্মবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে। সুপরিচালনা এবং ওয়াং-এর ভূমিকায় সু-অভিনয়ের জন্য শ্রীরমেন লাহিড়ী সেদিন সবারই প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তা ছাড়া 'মহিলার' ভূমিকায় মিসেস লাহিড়ী এবং দ্বিতীয় দেবতার ভূমিকায় আর একজন সভ্য সত্যিকার অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। এঁদের সামগ্রিক অভিনয়ও যথেষ্ট প্রশংসনীয় হয়েছিল। [ক্রমশঃ]

মূকাভিনেতা যোগেশ দত্তকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হচ্ছে

অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটায় মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে ও ৩রা নভেম্বর রবিবার বেলা চারটায় সংস্থার কার্যালয় ১০২/১এ, বিধান সরণিতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রথম সন্ধ্যায় সম্পূর্ণ নতুন ধরণের স্যাটায়ার কুইন্ট লিখিত 'কল্মাষপাদ' নাটক অভিনীত হবে। উদ্বোধন করবেন সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। দ্বিতীয় সন্ধ্যায় 'নাটক ও আধুনিক জীবন' সম্পর্কে আলোচনাচক্রের উদ্বোধন করবেন নাট্যকার মন্মথ রায়।

মূকাভিনেতা যোগেশ দত্তের সম্বর্ধনা

ভারতীয় মূকাভিনয় শিল্পের পথিকৃৎ শ্রীযোগেশ দত্তের মূকাভিনয় বিদেশে প্রভূত প্রশংসা অর্জন করে। সেই উদ্দেশ্যে গত ২৮শে সেপ্টেম্বর বসুশ্রী প্রেক্ষাগৃহে এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন রূপদক্ষ নাট্য সংস্থা। অনুষ্ঠানে সংস্থার সভাপতি শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু বলেন, মূকাভিনেতা শ্রীযোগেশ দত্তের বিদেশ সফর আমাদের শিল্পজগতে আর একটি আনন্দের ঘটনা। রবীন্দ্রভারতীর অধ্যক্ষ শ্রীসাধন ভট্টাচার্য বলেন, যোগেশ দত্তের মূকাভিনয়ের মধ্যে ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্য বিরাজমান। সত্যিকারের গুণ ও নিষ্ঠা না থাকলে কেউ যে বড় হতে পারে না, তার প্রমাণ যোগেশ দত্ত।

এই অনুষ্ঠানে শ্রীদত্ত আটটি বিষয়ে তাঁর পূর্ণাঙ্গ মূকাভিনয় পরিবেশন করেন। তাঁর সব কয়টি মূকাভিনয়ই দর্শকদের কাছে জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে। বিশেষ করে 'কলকাতার বাস প্যাসেঞ্জার', 'চোর', 'ও আমার দেশের মাটি', 'সীতা ও হনুমান' এবং 'জন্ম থেকে মৃত্যু' দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। আলোকসম্পাতে তাপস সেনের দক্ষতা প্রকাশ পায়। অনন্ত দাস রূপসজ্জা ও খালেদ চৌধুরী সাজ-সজ্জায় বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। মঞ্চসজ্জায় সুবেশ দত্ত যে চোখ দুটি ব্যবহার করেছেন তাতে জীবনের হাসি কান্নার দুটি দিক প্রকাশ পায়। হিমাংশু বিশ্বাসের আবহ সঙ্গীতে ভারতীয় সুর প্রকাশ পায়।

আরবান হেলথ রিক্রিয়েশন ক্লাবের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের একটি দৃশ্যে

স্টুডিও খবর

দি গুরু

জেমস আইভরি ইসমাইল মার্চেন্টের 'দি গুরু' এখন মুক্তি প্রতীক্ষায়। নাম শুনে কেউ হয়ত মনে করতে পারেন যে কোন সাধু-সন্ন্যাসী নিয়ে বুঝি ঘটনা। কারণ আজকাল বিদেশে ভারতীয় সাধুদের কদর কিছুটা বেড়েছে। ইউরোপ-আমেরিকা নৈতিক দিক থেকে যত শূন্যতার দিকে যাচ্ছে তত সাধুদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে।

এই গুরু আসলে এক সংগীত গুরু। রূথ জাবওয়ালা লিখিত কাহিনীর এই গুরুর দুই স্ত্রী। একজন প্রাচীনা (মাধবী জাফরী) আর একজন নবীনা (অপর্ণা সেন)। কাহিনীর অন্য চরিত্রগুলির মধ্যে ফুলওয়ালী হয়েছেন রীতা টুসিংহাম একজন পপ গায়ক মাইকেল ইয়র্ক। গুরু হয়েছেন উৎপল দত্ত।

ছবিটি করবার জন্য জেমস আইভরি মার্চেন্টকে সদলে যেতে হয়েছে—বারাণসী, বিকানীরের পুরাতন দুর্গ, বোম্বাইয়ের মালাবার হিলের পুরাতন বাড়ি ইত্যাদিতে। বেনারসে এক সাধুকে ইসমাইল মার্চেন্ট অনুরোধ করেছিলেন গঙ্গার ঘাটে বসে তাঁর ক্যামেরাকে সাহায্য করতে যাতে দেশবাসের একটা প্রামাণিক দিক দেখান যায়। সাধু মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেন। তবে বিখ্যাত

সাপ্তাহিক বসুমতীর উত্তরবঙ্গ

বন্যা ত্রাণ কমিটি

সমস্ত উত্তরবঙ্গ প্রলয়ঙ্কর বন্যায় ও ধসে বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত। উত্তরখণ্ডের মানুষ সব হারিয়ে আজ নিঃসহায়, নিঃসম্বল, আর্ত, ক্লিষ্ট, মুমূর্ষু ও আত্মীয়স্বজনহীন। কল্পনাতীত এই দুর্যোগের দিনে সামান্যতম সাহায্যও তাদের অশেষ উপকার করবে। উত্তরবঙ্গবাসীর চরম দুঃসময়ে সাহায্য সংগ্রহের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে সাপ্তাহিক বসুমতীর পক্ষ থেকে একটি ত্রাণ কমিটি গঠিত হয়েছে। দেশবাসী তাঁদের সাহায্য (অর্থ, বেবী ফুড, ব্যবহারযোগ্য ও শীতকালীন বস্ত্র) নিম্নলিখিত ঠিকানায় অবিলম্বে পৌঁছে দেবেন—আমাদের এই প্রত্যাশা।

সভাপতি : শ্রীঅশোককুমার সেন। সহ-সভাপতি : শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীমনোজ বসু, শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীনির্মল বসু। সম্পাদিকা : শ্রীমতী জয়ন্তী সেন। কোষাধ্যক্ষ : শ্রীমতী গৌরী সেন। সদস্যবৃন্দ : সর্বশ্রী সুশীলকুমার গাঙ্গুলী, সুন্দর এ্যাডভানি গোপাল রায়চৌধুরী হরেন ঘোষ সুকুমার গুহমজুমদার, শম্ভুনাথ মুখার্জী, নারায়ণ বসু, অশোক সেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কল্পতরু সেনগুপ্ত, আশা দেবী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেবব্রত মুখোপাধ্যায় মীরা মল্লিক, বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় রমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী, সত্যজ্যোতি সেন (জলপাইগুড়ি), হরেন ঘোষ (দার্জিলিং), নির্মল ঘোষ (শিলিগুড়ি) অপরাজিতা গোপ্পী (কুচবিহার) মৃণাল সান্যাল (জলপাইগুড়ি) তাপস সেন গায়ত্রী রায় অধীর চক্রবর্তী সমীর মুখোপাধ্যায় জ্ঞান দত্ত, রজত রায়চৌধুরী, দিলীপ চক্রবর্তী দুর্গাদাস সরকার, মদন প্রামাণিক ও দিলীপ ঘোষরায় (পঃ দিনাজপুর)।

সাহায্য পাঠাইবার ঠিকানা :

(১) ৫৭/৩, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা—১৯ টেলিফোন : ৪৭-৪৪৪২ (সময় : সকাল ৮টা থেকে ১০টা ও বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা)।
(২) সাপ্তাহিক বসুমতী কার্যালয়, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা—১২। টেলিফোন : ৩৪ ৭০৭১। (সময় : বেলা ৩টা থেকে রাত ৮টা)।

বিলায়েৎ হোসেন খাঁ ছবিতে সহযোগিতা করেছেন আর পপ সংগীত করেছেন বার্ণার ফস্টার। ছবির চিত্রগ্রহণ করেছেন সুব্রত রায়।

টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্সের টাকায় ছবিটি হয়েছে। টেকনিশিয়ানরা সবাই ভারতীয়

অজয় দত্ত পরিচালিত 'আয়া-গাঁয়ে-চলো' ছবির একটি দৃশ্যে অনুপকুমার ও ... দাস

নৃত্যশিল্পী সম্মেলন

আন্তর্জাতিক নৃত্য আকাদেমির আসর বসেছিল কোলোনে। এতে যোগ দিয়েছিলেন পণ্ডিত শিক্ষক ও ছাত্র। নাচের খ্যাতিতে যাদের নাম বিশ্বজোড়া এরকম অনেকেই এসেছিলেন এই আসরে।

যেমন আমেরিকা থেকে ব্যালেনৃত্য-শিক্ষক ভ্যালেনটিনা পেরিয়াস্লাভেভ, জাজের গুরু ফ্র্যাংক হ্যাগনার, ব্রিজিং গারস্কি। এছাড়া এই আকাদেমিতে এসেছিলেন সুইচের জুটি মারিয়েন মানিগেল ও তাঁর স্বামী হ্যান্স। পোলিস ও রাশিয়ান লোক-নৃত্যে আসর মাৎ করেছেন ওয়ারস থেকে আগত দুই শিল্পী ক্রুস্লাউ ভোলস্-জেনস্কি ও মারিয়া সুরোভিযাক।

উচ্ছ্বাস ও উদ্দামতার সমন্বয়

সুবিখ্যাত নৃত্য-পরিচালক ক্র্যানকোর নবতম সৃষ্টি 'ক্যাটালিস্ট'। এই ব্যালে নৃত্যে তিনি উচ্ছ্বাস ও উদ্দামতার সমন্বয় ঘটিয়ে দর্শকমনে এক অনবদ্য রসের সৃষ্টি করেছেন। এব বিচিত্র আবহসংগীতও সমান অপরূপ।

ব্যালে শিক্ষা স্কুলে অনুশীলন

ভিটানিশিয়া চলচ্চিত্র উৎসবে 'চারুলতা'

ভিটানিশিয়ার কার্থেজ চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব করবেন প্রযোজক আর. ডি. বনসাল। এই উৎসবে সত্যজিৎ রায়ের 'চারুলতা' দেখান হবে। এই উদ্দেশ্যে ছবিটির ফরাসী সাবটাইটেল এবং প্রচারের বিশেষ ব্যবস্থাদি করা হয়েছে।

তাসখন্দ উৎসবে 'অনুপমা'

এল. বি. ফিল্মসের 'অনুপমা' তাসখন্দ আফ্রো-এশীয় চলচ্চিত্র উৎসবে সরকারী-ভাবে প্রেরিত হচ্ছে। পরিচালক হৃষীকেশ মুখার্জী এবং নায়িকা শর্মিলা ঠাকুর উৎসবে যোগ দেবেন বলে আশা করা যাচ্ছে। উৎসব আরম্ভ হয়েছে ২১শে অক্টোবর।

পশ্চিম জার্মানী ছবির বাজার

পশ্চিম জার্মানীতে সিনেমা দর্শকের সংখ্যা কমতির পথে। এক পরিসংখ্যানে প্রকাশ গত বছর শতকরা ১১ ভাগ দর্শক ছবি কম দেখেছে। কেবলমাত্র মানুষ দেখতে চায়—সিরিয়াস ছবি। খুব হাল্কা ছবি আর দর্শকদের পছন্দ নয়। আর্ট সিনেমাগুলি এখন ভাল চলছে।

এ-কারণে সিনেমা ব্যবসায়ীরা ছবির কাহিনীতে যাই থাকুক নগ্ন নারীচিত্র বিজ্ঞাপন করে, যৌনরসের ইঙ্গিত দিয়ে দর্শক আকর্ষণ করতে চেয়েছে। তার ফলও তেমন ভাল হয় নি।

শিশু স্বর্গ

মহাজাতি সদনে, রবিবার ২৭শে অক্টোবর, সকাল ৯টায় শিশু স্বর্গের নিয়মিত আসরে, মেট্রো গোল্ডউইন -মায়াবের "বাঙ্গো গোজ টু টাউন" চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে।

উত্তরবঙ্গের দুঃস্থদের সেবায় সিনেমা কর্মীদের প্রস্তাব

বেঙ্গল মোশন পিকচার্স এসোসিয়েশন এক বিবৃতিতে প্রস্তাব করছে যে, পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সিনেমায় আগামী ১লা থেকে ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত বিক্রিত সমস্ত টিকেটের অর্থ উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের সাহায্যে দেওয়া হোক। এই সাত দিনের টিকেটের উপর প্রমোদকর রেহাই দিতে সরকারকে বলা হয়েছে এবং প্রযোজক ও পরিবেশকদের অনুরোধ করা হয়েছে তাঁদের অংশ ছেড়ে দিয়ে আর্ত মানুষের সেবায় সহযোগিতা করতে। এই বিবৃতিতে ফিল্ম টেকনিশিয়ান ও স্টুডিও-কর্মীদের অনুরোধ করা হয়েছে বিভিন্ন স্থানে 'শো' করে অর্থ সংগ্রহ করে উত্তরবঙ্গের দুঃস্থদের জন্য প্রেরণ করতে। এই টাকা উত্তরবঙ্গের সিনেমা কর্মীদের পুনর্বাসন এবং কমপক্ষে দুটি বিধ্বস্ত গ্রাম পুনর্গঠন কাজে ব্যয় করা হোক।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে এ সময় সরকারের নজর রাখা উচিত সব সিনেমা ঠিকমত চালু করা হচ্ছে কি না। প্রসঙ্গত লাইট হাউস, নিউ এম্পায়ার, টাইগার সিনেমা চালু করার জন্য এই সিনেমাগুলির মালিকের উপর চাপ দেবার জন্য বলা হয়েছে।
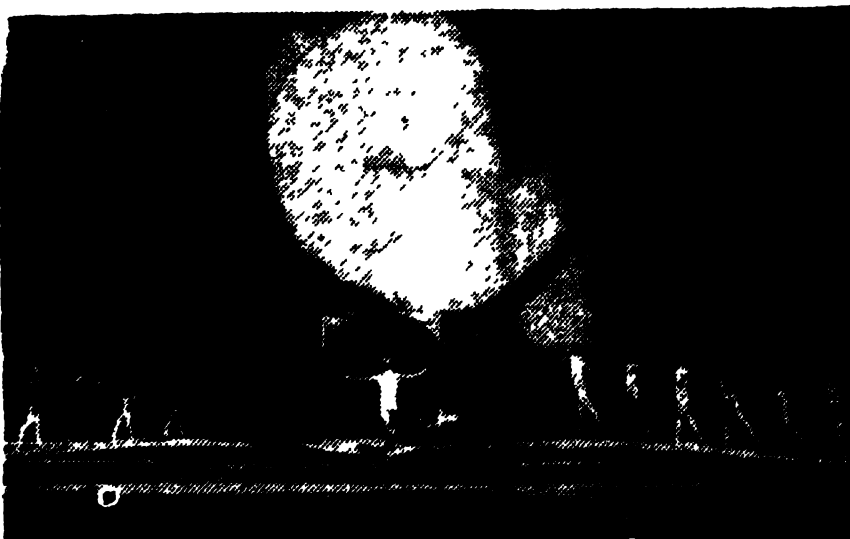
ভাব সংগীত সমন্বয়ে ক্র্যানকোর নতুন সৃষ্টি 'ক্যাটালিস্ট' ব্যালে

আপনার ২০শে আশ্বিনের মহাত্মা গান্ধী জন্মশতবর্ষ সূচনা সংখ্যায় "অলিম্পিক" অংশে শ্রীযুক্ত অজয় বসু তাঁর রচিত "ওলিম্পিকে আমরা"-র মধ্যে ১৯০০ খৃস্টাব্দে প্যারিসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ওলিম্পিকে ভারতের পক্ষে দু'খানি রৌপ্যপদক বিজয়ী নর্মান প্রিচার্ড-এর বিষয়ে অনুত্তরিত প্রশ্ন রেখে দিয়েছেন, কে এই নর্মান প্রিচার্ড? আরো লিখেছেন যে "ইতিহাস অনুসন্ধিৎসুরা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও উত্তরপর্বে আর তাঁর হদিস পান নি?"

আমি সাংবাদিক হিসেবে অনেক খোঁজাখুঁজি করে নর্মান প্রিচার্ড সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। এবং ইতিপূর্বে তা একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে। তবু আপনার পাঠকদের অবগতির জন্য এবং ঊনবিংশ ওলিম্পিকের প্রাক্কালে স্মৃতি ঝালিয়ে নেবার প্রয়োজনে [illegible] তার পুনরাবৃত্তি করছি।

[illegible] অ্যাথলেটিক্স এর [illegible] প্রশ্নে আধুনিক ওলিম্পিকের শুরু থেকে [illegible] প্রতিযোগিতার প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীর তালিকায় উল্লিখিত [illegible] (ভারত) উল্লেখ দেখে আমি [illegible] প্রবীণতম অ্যাথলেটিক্স-আম্পায়ার [illegible] বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ও মিঃ [illegible]-এর কাছে অনুসন্ধান করি। তাঁরা আমাকে জানান যে, তাঁদের খেলার সাথী প্রিচার্ড প্যারিসে অনুষ্ঠিত তাঁর ওলিম্পিক রৌপ্যপদক দু'খানি এনে এখানে সবাইকে দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত ওলিম্পিক গেমস নিয়ে এদেশে কারো কিছু জানা ছিল না বলে কেউ সেই রৌপ্যপদক ও তার বিজেতাকে কোন বিশেষ গুরুত্ব বা মর্যাদা দেয় নি।

সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের ছাত্র হিসেবে প্রিচার্ড কলকাতার প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল—১৮৯৭ খৃস্টাব্দে ট্রেডস কাপের প্রথম বছরে প্রথম রাউণ্ডে শোভাবাজার বনাম সেন্ট জেভিয়ার্স খেলায় একাই তিন গোল দিয়ে হ্যাট্রিক করেন।

তারপর কিভাবে তিনি ভারতের বাইরে চলে যান সে খবর তাঁর আত্মীয়রাও দিতে পারেন নি। প্রসঙ্গত নর্মান প্রিচার্ড এর ভাইঝি ডরোথী প্রিচার্ড টালা পার্কে অনুষ্ঠিত ১৯৩৮-এর জাতীয় অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় বাংলা মহিলা দলের অধিনায়িকা ছিলেন।

ওলিম্পিক থেকে ফেরার পরে প্রিচার্ড কিছুদিন আই. এফ. এ র অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। তারপর আবার নিরুদ্দেশ হন। তাঁর পরবর্তী জীবনের খবর সেই সময় স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে ছিল: ভারত থেকে নিরুদ্দিষ্ট হবার পর প্রিচার্ড
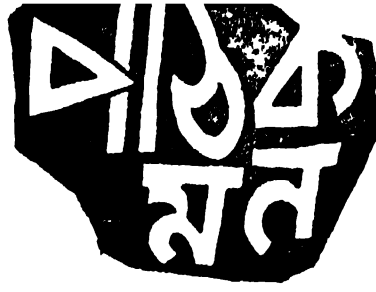
ইংল্যাণ্ডে আবির্ভূত হন। সেখানে দু'-একটি মঞ্চাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর উচ্চারণে খাঁটি ইংরেজী শুদ্ধতা না থাকায় মঞ্চাভিনয়ে তিনি সার্থকতা লাভ করতে পারেন নি। তার পরেই প্রিচার্ডকে দেখা যায় হলিউডে; নির্বাক ছায়াচিত্র "বো জেস্ত"-এ রোনাল্ড কোলম্যানের উপনায়ক হিসেবে। আরো দু' চারখানি নির্বাক ছবিতে অভিনয় করেন তিনি এবং আমেরিকাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। -আরবি.

(রাখাল ভট্টাচার্য)

*

'নজরুল ভবন প্রসঙ্গে'

গত ১১।১।৬৮ তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীর 'বঙ্গদর্শন' ফিচার পর্যায়ে সম্ভাব্য নজরুল ভবন প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। আলোচনাটি পড়ে যুগপৎ আনন্দ ও বেদনা দুই ই পেলাম।

বিদ্রোহী কবি বাংলার তারুণ্যের কবি নজরুলের আবাস পরিবেশ যা দেখে এসেছি তাতে বার বার মনে হয়েছে যোগ্য মর্যাদা থেকে কবি আজ বঞ্চিত। এ অমর্যাদা থেকে, অবমাননা থেকে যোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের জাতীয় কর্তব্য।

একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যে বিষয়ে অগ্রণী হয়ে একটি নজরুল ভবন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী মহোদয়া যে এ বিষয়ে বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন সেটি খুব আনন্দের কথা।

কিন্তু 'অপ্রিয় হলেও সত্য' হিসাবে যে তথ্য উক্ত আলোচনায় প্রকাশিত হয়েছে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বাস্তবিক, হীনতার কোন স্তরে আমরা আজ নেমে এসেছি! পঙ্গু ভাগ্যাহত কবির নাম ভাঙিয়ে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির মত জঘন্য প্রবৃত্তি যে মানুষের থাকতে পারে তা ভাবতেও আমরা ঘৃণায় সংকুচিত হই।

আপনাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমি তথা বাংলার মানুষ দাবি জানাই কবির মর্যাদার উপযোগী বাসস্থান (পরে সংগ্রহশালা ও গবেষণাকেন্দ্রে রূপান্তরযোগ্য) একটি স্থাপিত হোক। কিন্তু অ

কারী তত্ত্বাবধানে এবং সর্বকালীন সরকারী পরিচালনাধীনে। —শচীন সেন
ব্যারাকপুর

*

গত ২রা আশ্বিনের 'সাপ্তাহিক বসুমতী'-র 'বঙ্গদর্শন'-এ নজরুল ভবন সম্বন্ধে যে মন্তব্য বেরিয়েছে সে বিষয়ে দু'-একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। গত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার আমলে কবি নজরুলের স্থায়ী বাসস্থানের জন্য লবণ হ্রদে একখণ্ড জমি দেওয়ার প্রস্তাব মঞ্জুর হয়। তারপর আর সে বিষয়ে বিশেষ কিছু করা হয় নি, নানা টালবাহানাতে প্রস্তাব এখনো অপূর্ণ রয়ে গেছে। এ অবস্থায় জমি ও বাড়ি করবার টাকা মঞ্জুর হলে তার সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে এখনই বক্তব্য অহেতুক ও অসময়োচিত বললে অন্যায় হবে না। সরকারী টাকা সরকারী তত্ত্বাবধানেই খরচ হয়ে থাকে—তা' ব্যক্তিবিশেষের হাতে দেবার বা বোতলে উড়ে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। এক্ষেত্রে তা' বড়জোর নজরুল একাডেমির সহযোগিতায় খরচ হতে পারে।

আলোচ্য মন্তব্যে কবির "এককালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের" প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। তাঁদের একমাত্র অপরাধ এই যে সরকারী ঔদাসীন্য ও দীর্ঘসূত্রতার মোকাবিলা করে তাঁরা প্রস্তাবটি কার্যকরী করাবার চেষ্টা করছেন। মন্তব্যকার দাবি করেছেন নজরুল ভবনে যাতে সরকারী মালিকানা বজায় রাখা হয়। অথচ রবীন্দ্রসদনকে জাতীয় সংস্থায় পরিণত করার দাবি 'সাপ্তাহিক বসুমতী'-তেই বহুবার উত্থিত হয়েছে। নজরুল ভবন যদি গড়ে ওঠে তবে একটা অছি-পরিষদ গঠন করে পরিচালনাভার সহজেই তার হাতে দেওয়া যেতে পারবে। "নতুন গজিয়ে ওঠা সংস্থা" বলতে বোধ হয় 'অগ্নিবীণা'-র কথাই বলা হয়েছে। এই সংস্থা কবির সাহিত্যকীর্তি জনসমাজে প্রচার ও পরিচিত করবার চেষ্টা করছেন: দু'-একটি অনুষ্ঠানে টাকা যা তুলেছেন তা নিতান্ত ব্যয়নির্বাহের জন্যই। রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা ও নাটক ব্যবহার করে অগণিত সংস্থা টাকা তুলে থাকেন, তাতে কাউকে আপত্তি করতে দেখা যায় না। এ অবস্থায় কবির এককালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়—যাঁদের জনসাধারণ অতি সহজেই চিনতে পারবে, তাঁদের আঁতে ঘা দিয়ে অনাহূত মন্তব্য করা কতদূর শোভন ও সঙ্গত হয়েছে, তা আপনাকে ও মন্তব্যকারকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। —বসুধা চক্রবর্তী

১১৭।১, সাদার্ন এভিনিউ
কলিকাতা—২৯

সম্পাদকের বক্তব্য

বঙ্গদর্শনে 'নজরুল ভবন প্রসঙ্গে'লেখার

প্রতিবাদে শ্রীবসুধা চক্রবর্তীর চিঠির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। শ্রীচক্রবর্তীর মত বিশিষ্ট ব্যক্তি এত সহজে ব্যাপারটা নিজের পক্ষে টেনে নিয়ে বিচলিত বোধ করছেন, তা আশ্চর্যের ব্যাপার। একটু স্থিরভাবে ভেবে দেখলে এবং অনুসন্ধান করলে হয়ত তিনি চিঠি লেখার প্রয়োজন বোধ করতেন না। শ্রীচক্রবর্তীর প্রশ্নগুলির জবাব দিচ্ছি :

'নজরুলের জন্য বাড়ি করবার টাকা মঞ্জুর হলে তার সদ্ব্যবহার সম্পর্কে ব্যস্ততা অহেতুক বা অসময়োচিত' শ্রীচক্রবর্তী এই মন্তব্য করেছেন। হয়ত সব ঘটনা তিনি জানেন না। তিনি জানেন না যে গত ছয় বছর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ নজরুল জন্ম-জয়ন্তী কমিটি কবির জন্য জমি ও বাড়ির দাবির সঙ্গে কবির ভাতা বৃদ্ধি, প্রকাশকদের হাত থেকে গ্রন্থস্বত্ব উদ্ধার, সরকারী উদ্যোগে নজরুল রচনাবলী প্রকাশ ইত্যাদির জন্য আন্দোলন করেছে (উক্ত কমিটি প্রচারিত স্মারক পুস্তিকাগুলিতে এই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে)। বৎসর বৎসর প্রকাশিত স্মারক পুস্তিকা থেকে জানা যায়, ১৯৬৬ সালে এই জন্ম-জয়ন্তী কমিটি নেতাজী ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে নজরুল একাডেমিতে পরিণত হয়। কবি-সুহৃদ শ্রীমুজাফ্‌ফর আহমদ এই একাডেমি উদ্বোধন করেন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হলে এই একাডেমি এক স্মারকপত্র পেশ করে পূর্বোক্ত দাবি করে এবং কয়েকবার মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে। আমি যতদূর জানি এই আলোচনার ফলেই কবির একশত টাকা ভাতা বৃদ্ধি হয়েছে, জমি দানের সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সরকারী উদ্যোগে নজরুল রচনাবলী প্রকাশেরও আয়োজন চলেছিল। নজরুল একাডেমির পক্ষ থেকে এন্টালী সি-আই টি রোডের অংশবিশেষকে "নজরুল সরণি" করার প্রস্তাবও মেয়রের নিকট করা হয়েছিল। নজরুলের স্বরলিপি প্রকাশ এবং 'বিদ্রোহী' সহ কয়েকটি কবিতার হিন্দী, মারাঠি ও তেলেগুতে অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। সংবাদপত্র মারফৎ এ-খবর সবাই জানেন যে একাডেমি প্রতি মাসে নজরুল গৃহে 'নজরুল সন্ধ্যা' নামে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠান করতেন কেবলমাত্র কবিকে গান শুনিয়ে প্রফুল্ল রাখার জন্য। সংবাদ সংগ্রহ করে জানা গেল, 'নজরুল ভবন' নামটাও একাডেমির প্রস্তাবিত। আরও সংবাদ থেকে জ্ঞাতব্য, একাডেমির সুস্পষ্ট ও লিখিত অভিমত (যা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত) থেকে জানা যায় সরকারী ও বেসরকারী (নজরুলের ব্যক্তিগত বন্ধু সহ) প্রতিনিধি নিয়ে এই ভবন পরিচালনায় ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হবে এবং নজরুলের অবর্তমানে এই ভবন হবে প্রধানত নজরুল সঙ্গীত অনুশীলন কেন্দ্র।

এরূপ প্রস্তাব উত্থাপনের পরেই দেখা গেল কেউ কেউ রাজ্যপাল ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য বিশেষ তৎপর হয়ে উঠেছেন এবং কেবলমাত্র জমির দাবিই করছেন। ট্রাস্টি বোর্ড গঠনের কথাটা উচ্চারণও করা হয় না। কথাটা না বলার কারণ কি?

কবির জন্য ভারত ও পাকিস্তান সরকার মাসে সাড়ে সাতশত টাকা দিয়ে থাকে। ভারতে আর কোন লেখক এত টাকা পেন্সন পান না। তার ওপর বই এর রয়্যালটিও কিছু পাওনা হয়। একজনের জন্য এই টাকাটা যথেষ্ট। অথচ কবির জন্য একজন এটেনডেন্ট পর্যন্ত নেই, এবং যেরূপে অবস্থায় তাঁকে রাখা হয়েছে, বসুধাবাবু যদি কোন জানানী না দিয়ে কবিকে দেখতে যান, তবে প্রকৃত অবস্থাটা জানতে ও বুঝতে পারবেন। প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসা করলে আরো জানতে পারবেন। সাড়ে সাতশত টাকা পাবার পর কবির দীন অবস্থা দেখে আমি যদি অর্থ সদ্ব্যবহারের প্রশ্ন করে থাকি তাতে কি অন্যায় হয়েছে।

এবার জন্মদিন উপলক্ষে মহাজাতি সদনে 'অগ্নিবীণা'-র উদ্যোগে এক বিরাট অনুষ্ঠান হয়েছে। শোনা যায় টিকেট বিক্রয় হয়েছে প্রচুর এবং স্মারক পুস্তিকায় বিজ্ঞাপনও বসেছে অনেক। এই টাকা কবির সেবায় লেগেছে এমন খবর কি বসুধাবাবু জানেন? বরং এমন খবর পাওয়া গেছে যে, অনুষ্ঠানের পরে সদলে উদ্যোক্তাদের কেউ কেউ নাকি চৌরঙ্গী অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন এবং একটা ক্লাবে রাত কাটিয়েছিলেন। সত্যাসত্য বসুধাবাবু জানতে চেষ্টা করতে পারেন। সুতরাং বোতলে উড়ে যাবার আশঙ্কার দোষ কোথায়?

শ্রীচক্রবর্তী লিখেছেন, 'অগ্নিবীণা' কবির সাহিত্যকীর্তি জনসমাজে প্রচার ও পরিচিত করবার চেষ্টা করছেন। এই প্রচার ও পরিচিত করার একটা নমুনা কি নজরুলকে নিয়ে সংস্কৃত নাটক? এই নাটকে নজরুলের বিপ্লবী সৃষ্টিকে প্রায় অস্বীকার করে যেভাবে হিন্দু দর্শনের ছাপ দেখান হয়েছে তা কি নজরুলের পক্ষে সম্মানজনক? নজরুলের আসল পরিচয় মুক্তি-সংগ্রামের গানে ও কবিতায়, অথচ 'অগ্নিবীণা'-র সাম্প্রতিক এক অনুষ্ঠানে এই পরিচয় অপেক্ষা প্রেম ও ধর্মের গানের প্রাধান্যই ছিল বেশি।

বসুধাবাবুর কথায়—"রবীন্দ্রনাথের, গান, কবিতা ও নাটক ব্যবহার করে অজানিত সংখ্যক টাকা তুলে থাকেন তাতে কাউকে আপত্তি করতে দেখা যায় না?" কথাটি খুবই সত্য। কিন্তু তিনি জানেন না নজরুল-অনুষ্ঠানে আপত্তি করা হয়েছে। 'অগ্নিবীণা' ছাড়া আর কোন সংস্থা যাতে অনুষ্ঠান করতে না পারে সেভাবে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে এমন অভিযোগ পেয়েছি। কবির জন্মদিন উপলক্ষে যে সংস্থাগুলি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে সেসব সংস্থা সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে একটি পত্রিকায় সংবাদও প্রকাশ করা হয়েছিল। নজরুল একাডেমির সাধারণ সম্পাদক আমাদের জানিয়েছেন, একাডেমির বার্ষিক অনুষ্ঠান পণ্ড করার জন্য নানাভাবে নাকি চেষ্টা হয়েছিল। শিল্পীদের নাকি টেলিফোনে বারণ করে দেওয়া হয়েছিল। অনুষ্ঠানের সময় সাজঘরে গিয়ে শিল্পীদের বিরত করার পর্যন্ত নাকি চেষ্টা হয়েছে। (অবশ্য কবিপুত্র কাজী সব্যসাচী এসবে ছিলেন না।)

নজরুল একাডেমির পক্ষ থেকে আমাদের জানানো হয়েছে যে, নজরুল গৃহে প্রতিমাসে যে নজরুল সন্ধ্যা হত, সেটা বন্ধ করতে বাধ্য করা হয়েছে। উপরন্তু এই নামটি ব্যবহার করে টিকেট বেচে শো করা হচ্ছে। যে নামটি ছিল একান্তভাবে কবির জন্য সে নামটিকে কি ব্যবসার প্রতীক না করলে চলত না?

শ্রীবসুধা চক্রবর্তীর চিঠির জবাবে অনিচ্ছাকৃতভাবে এমন অনেক কথা আমাকে জানাতে হল যা জানাবার আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। নজরুল ভবন শুরু থেকে কেন সরকারী মালিকানায় রাখার কথা বলেছি আশা করি শ্রীচক্রবর্তী এবার বুঝতে পারবেন। কবির ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অনেকের সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছিল, তাঁদের মতামত আমি জানি। সুতরাং তাঁদের আঘাত দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। আমি লিখেছি জাতির স্বার্থে কবির সৃষ্টিকে রক্ষা করার আগ্রহে, কারো ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নয়।

বসুধাবাবু লিখেছেন, "সরকারী টাকা সরকারী তত্ত্বাবধানেই খরচ হয়ে থাকে।" আমাদের ধারণা, কবি সাহিত্যিকদের ব্যাপারে বিশেষত নজরুলের মতো মহৎ কবির ব্যাপারে সরকারও কিছুটা ঔদার্য প্রকাশ করে থাকেন। তা যদি করে না থাকেন তাহলে সরকার কি প্রদত্ত অর্থের হিসাব গ্রহণ করেন এবং নজরুলকে মাসে মাসে যে অর্থ প্রদান করা হয়ে আসছে, অডিটর মারফৎ তার কি হিসেব অনুমোদন করা হয়ে থাকে?

সুতরাং "জমি ও বাড়ি করবার টাকা মঞ্জুর হলে তার সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে এখনই ব্যস্ততা অহেতুক ও অসময়োচিত বললে অন্যায় হবে না"—এমন কথা বসুধাবাবু কি করে বলতে পারলেন?

পরিশেষে কল্যাণ চক্রবর্তীকে ধন্যবাদ, তিনি কিছু প্রশ্ন তুলে সত্য উদ্‌ঘাটনে আমাকে সহায়তা করেছেন।

মেক্সিকো মহামেলায়

মেক্সিকোর আকাশে যে নতুন সূর্যের আলো সমস্ত বিশ্বকে আলোকিত করে রেখেছে গত ১২ই অক্টোবর থেকে—আজ সেই আলো চলেছে অস্তাচলের পানে। দেখতে দেখতে ফুরিয়ে এলো দিন, ঘনিয়ে আসছে মেক্সিকো অলিম্পিকের সমাপ্তি উৎসবের মুহূর্তটি। হাতে আছে আর মাত্র কয়েকটি দিন। তারপর ফাঁকা হয়ে যাবে মেক্সিকোর অলিম্পিক গ্রাম। মেক্সিকো আবার ফিরে পাবে তার পুরনো বাহার। এতোদিনের কতো প্রাণান্ত পরিশ্রমের সার্থক উৎসব কেন্দ্র মেক্সিকোর বুকে শুধু ছড়ানো থাকবে এযুগের ক্রীড়ামহোৎসবের সফলতার চিহ্ন। আর মেক্সিকোবাসীদের মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ঐ দিন কটির স্মৃতি।

হয়তো মেক্সিকো শহরের বিদ্রোহী ছাত্রদের মন থেকে মুছে যাবে না অলিম্পিক প্রতিযোগিতার মহান আদর্শের কথা। হয়তো তারা আবার বিধ্বংসী আন্দোলনে নামতে ইতস্তত করবেন। অলিম্পিক প্রতিযোগিতার মাত্র কয়েকদিন আগেও মেক্সিকো শহরে বিদ্রোহী ছাত্রদের সংগে সেনাবাহিনীর চলছিলো তুমুল সংঘর্ষ। সংঘাত এতই তীব্র হয়েছিলো যে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা আদৌ অনুষ্ঠিত হতে পারবে কি না সে বিষয়ে দেখা দিয়েছিলো সন্দেহ। তবু সেই উত্তাল শহরে একের পর এক দেশ থেকে প্রতিযোগীরা গিয়ে হাজির হচ্ছিলেন অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্যে। শেষ পর্যন্ত ছাত্রেরাও এগিয়ে এলেন। মেক্সিকো শহরের ১৯ তম অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান যাতে ঠিকভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে তার জন্যে তারা সাময়িকভাবে তুলে নিলেন সংগ্রাম। জানালেন যে এমন কিছু তাঁরা করবেন না যাতে অলিম্পিক অনুষ্ঠানে বাধার সৃষ্টি হতে পারে। তাই মেক্সিকোর ছাত্ররা আজ সমস্ত বিশ্ববাসীর ধন্যবাদের পাত্র। কারণ অলিম্পিক প্রতিযোগিতার মাত্র কদিন আগেও যে মেক্সিকো শহরে চলছিলো গুলির পর গুলি, চলছিলো তীব্র আন্দোলনের বীভৎসতা—অলিম্পিক প্রতিযোগিতা শুরু হবার আগেই ঐ আন্দোলনের নেতা ছাত্রসমাজ অলিম্পিকের মহান আদর্শের কাছে মাথা নত করে তুলে নিলেন তাঁদের সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। তাই আজ আর বলতে দ্বিধা নেই যে মেক্সিকোর ছাত্রসমাজের সহায়তার জন্যেই ১৯ তম অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান ঠিকভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারছে। ধন্যবাদ তাই তাদের একান্তই প্রাপ্য।

এখনো মেক্সিকো শহরের প্রান্তে পাওয়া যাবে প্রাণের স্পর্শ, এখনো সেখানে আনন্দের হাট—হাসি-গানে মুখরিত মেক্সিকোর অলিম্পিক প্রাঙ্গণ। কিন্তু সেখানে আজ একই সংগে দেখা যাচ্ছে দুটি ভিন্ন দৃশ্য। এক দিকে অলিম্পিকের পদক বিজয়ী সফল প্রতিযোগীদের আনন্দ হাসি-গান আর একদিকে পরাজিত প্রতিযোগীদের মুখে ম্লান হাসির রেখা। পরাজয়ে দুঃখ আসা স্বাভাবিক, বিশেষ করে যে পরাজয়ের সংগে মিশে আছে দেশের মান-সম্মানের প্রশ্ন। কিন্তু অলিম্পিক প্রতিযোগিতার লক্ষ্য শুধু মাত্র পদক পাওয়াতেই নয়—অলিম্পিকে যোগ দেওয়াই আসল। তবু যাঁরা সাফল্য লাভ করে নিজের দেশে ফিরবেন তাঁদের কেন্দ্র করেই সেই দেশ আবার উৎসবে হয়ে উঠবে মুখর—আর যাঁরা পদক না পেয়ে ফিরবেন সফল প্রতিযোগীদের সাফল্যের স্পর্শে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে তাঁরা ব্রতী হবেন কঠোর অনুশীলনে। তবু প্রতিটি অলিম্পিকের মতো মেক্সিকোর বুকেও জয়-পরাজয়ের দুই ভিন্ন দৃশ্য বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ হতে দেখা যাচ্ছে। [illegible] স্বাভাবিক এই ঘটনা—যাঁরা জিতবেন [illegible] আনন্দ তাঁরা উদ্ভাসিত আর পরাজিত [illegible] ম্লান হবেই। —[illegible]

লন্ডন থেকে

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য

কথায় বলে কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ। পৌষ মাসটা কি এতই মিষ্টি। ধরে নিচ্ছি এককালে ছিল। যখন পেট ভরে পুলি পিঠে খাওয়া যেত। এখন ত শীতে থরহরি কম্পমান হওয়া ছাড়া আর কিছু নজরে পড়ে না।...তবে একটা সুখবর। পৌষ মাসে যদি ক্রিকেটের মরশুম বসে। তবু সরগরম হবে কয়েক দিন।

সর্বনাশের কথাটা পাড়া যাক। সেটা হল দক্ষিণ আফ্রিকার কালা-ধলার বাছ-বিচার। যার প্রকোপ ক্রিকেট খেলাতেও ঘোট পাকাচ্ছে। সবাই ওয়াকিবহাল, ইংলণ্ড ক্রিকেট দলের এবার দক্ষিণ আফ্রিকায় খেলতে যাবার কথা। বাধ সাধল বর্ণবৈষম্য নীতি।

এদেশের ক্রিকেট উদ্যানে সর্বাধোরা নাম হলেন বেসিল ডলিভিয়েরা। রঙ কালো। দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর জন্ম। গত কয়েক বছর ইংলণ্ডে আছেন। এদেশের হয়ে খেলেন। আগেও কথা উঠেছিল, দক্ষিণ আফ্রিকায় যে দল যাবে তাতে ডলিভিয়েরা থাকবে কি না। অনেকে তখন বলেছিলেন, ইংলণ্ডের দলে কে থাকবে না থাকবে তা এম-সি-সির দায়িত্ব। দক্ষিণ আফ্রিকার মতামত নিয়ে তাঁরা দল গড়বেন না।

ইতিমধ্যে ডলিভিয়েরার খেলায় হাত খারাপ হয়ে যায়। ইংলণ্ডের দলের হয়ে যাওয়ার কথা লোকে ভুলে যায়। প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে। অনেকে হয়ত হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। অস্ট্রেলিয়া এ বছর বিলেতে খেলতে এসেছিল। প্রথম দিকে টেস্ট খেলায় ডলিভিয়েরা সুযোগ পান না। কিন্তু শেষ টেস্টে তিনি হলেন হিরো। ১৫৮ রান করেন। এখন তাঁর অগ্রগতি রোধ করে কে?

অবশ্য তোলপাড় নয়। ইংলণ্ডের নির্বাচকেরা দল থেকে ডলিভিয়েরাকে বাদ দিলেন। হৈ-চৈ হল খুব। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় এবং ধর্মযাজক ডেভিড শেপহার্ড। অবশ্য ক্রিকেট কর্মকর্তাদের গায়ে আঁচড় লাগে না। কিন্তু দুর্দিপাক শুরু হতে বসেছিল। দুজন খেলোয়াড় অসুস্থ হলেন। তাঁদের মধ্যে টম কার্টরাইট। মিডিয়াম পেস বোলার। ডলিভিয়েরা পেস বোলার, তবে কার্টরাইট-এর মত দক্ষ নন। কিন্তু ব্যাটসম্যান হিসেবে ডলিভিয়েরার যোগ্যতা বেশি।

ইতিমধ্যে এখানকার সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা, "ডেলি মিরার" ডলিভিয়েরাকে তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠাবার তোড়জোড় করলেন।

ডলিভিয়েরা

দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইংলণ্ডের খেলার বিবরণ পাঠাবেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সাংবাদিক হিসেবে ডলিভিয়েরাকে গ্রহণ করতে রাজী হলেন না।

এখন অবস্থা দাঁড়াল ইংলণ্ড যদি ডলিভিয়েরাকে দলে না নেন, বুঝতে হবে হয় তাঁরা বর্ণবৈষম্যের রোগে ভুগছেন, না হয় দক্ষিণ আফ্রিকাকে ভয় করে চলেন। তিনি দলভুক্ত হলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী ভোরস্টার বাধ সাধলেন। ডলিভিয়েরাকে দল থেকে বাদ দিতে হবে। এম-সি-সির মনোগত ভাব যাই হোক না কেন, আত্মসম্মান বজায় রাখতে গেলে তা করা সম্ভব নয়। সুতরাং খেলা বাতিল হল। গত আশি বছর ধরে বিনা বাধায় খেলা চলেছে দুই দেশে। মোট ১০২টা টেস্ট খেলা হয়েছে। প্রতিবন্ধকতা এই প্রথম।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দুজন প্রতিনিধি এলেন। এ দেশের লোক ভাবল, হয়ত তাঁরা কোন সমাধানের ফর্মুলা এনেছেন। আসলে ১৯৭০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার এদেশে আসার কথা। সেটা যাতে বন্ধ না হয় তারই এই ছুটোছুটি। মনে হয় তাঁরা সফল হয়েছেন।

বেসিল ডলিভিয়েরা দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনের খেলোয়াড়। কয়েক বছর আগে কমনওয়েলথ দলের হয়ে খেলতে যান। করাচীতে নামেন। কিন্তু তাঁর পাসপোর্ট দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের। সুতরাং পাকিস্তানের ইমিগ্রেশন অফিসারের অনুমতি পাওয়া সহজসাধ্য নয়। দুশো পাউণ্ড জমা রাখলে ব্যবস্থা হতে পারে। অন্যান্য খেলোয়াড়েরা ট্রাভেলার্স চেক ভাঙিয়ে টাকা জমা দেন। ১৯৬৬ সাল থেকে অবশ্য তিনি বৃটিশ পাসপোর্টের অধিকারী। যাই হোক এবার পাকিস্তানে বা ভারতে পা দিলে নিশ্চয় সমাদরে বেশি সম্বর্ধনা পাবেন।

যে ১৬ জন খেলোয়াড় দক্ষিণ আফ্রিকায় যেত তারাই যাবে ভারত ও পাকিস্তানে। এখনও ষোল আনা সাব্যস্ত হয় নি। তবে আটঘাটটি ঠিক আছে। সপ্তাহ দশেকের সফর। ভারত ও পাকিস্তানে তিনটে করে টেস্ট খেলার কথা। তবে ভারতে হয়ত চারটে টেস্ট খেলা হতে

পারে। এম-সি-সি দল খ্রসেমাসের পরেই যাত্রা করবে। দলের অধিকাংশ খেলোয়াড় বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ এ'দের মধ্যে আছেন টম গ্রেভনি। ভদ্রলোককে টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিদায় দেওয়া হয়েছিল গত কয়েক বছর। তাঁর পুনরাগমন হয়েছে। কলিন কাউড্রে, ব্যারিংটন, ডলিভিয়েরা ভেটারান-দের দলে পড়েন। কেবলমাত্র ফ্লেচারের বয়স ২৫ বছরের কম। দলের ক্যাপ্টেন কাউড্রে, সহকারী নেতা টম গ্রেভনি।

তবে সব থেকে বড় কথা, দক্ষিণ আফ্রিকার মাঠে ফাস্ট বোলারদের কারিকুরি বেশি খাটে। সেই জন্যে নেওয়া হয়েছে চারজন ফাস্ট বোলার—ব্রাউন, জোনস, স্নো এবং ফ্রেটস। স্পিন বোলার আছে দুজন—পোকক ও আণ্ডারউড। তারাও ভারতের স্লো পিচে কতটা সুবিধে করতে পারবে না খেললে বলা মুস্কিল। সুতরাং ইতি-মধ্যে যদি কিছু রদবদল হয় আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবে বলা যায় ইংলণ্ডের সেরা টিম যাচ্ছে। খেলা জমবে বলেই মনে হয়।

কিশোরকিশোরীদের অসিচালনা

আজকাল আর বড় কাউকে অসিচালনা শিখতে দেখা যায় না কারণ বোধহয় এই আণবিক যুগে অসি তার মান খুইয়েছে। যাই হোক পশ্চিম জার্মানীতে আবার এর রেওয়াজ হচ্ছে। অসিচালনায় পারদর্শী অস্কার অ্যাডলার শ'খানেক দশ থেকে পনের বছরের কিশোরকিশোরীদের বছর দেড়েকের মধ্যে অসিচালনায় বেশ রপ্ত কোরে তুলেছেন। এরা এখন আক্রমণ ও আত্মরক্ষায় সমান পটু।

বিশ্বের ক্রীড়াপাগল মানুষ দীর্ঘ চার বছর ধরে যে দিনটির দিকে তাকিয়ে ছিল অধীর আগ্রহে সেই ঐতিহাসিক ১২ই অক্টোবরেই শান্ত, শুভ্র, অভূতপূর্ব পরিবেশের মধ্যে ঊনবিংশতিতম অলিম্পিকের শুভ উদ্বোধন সূচিত হয়েছে ৮০ হাজার মানুষের সামনে। ১১৬টি দেশের প্রতিনিধিরা মার্চ পাস্টে যোগ দিয়ে এক অনন্য নজির এ'কে দিলেন অলিম্পিক ইতিহাসে। আকাশে উড়ল ছ' হাজার পায়রা—শান্তির বিজয়কেতন ছেয়ে ফেললো মেক্সিকোর হঠাৎ-বিক্ষুব্ধ আকাশকে—আনন্দমুখর হ'ল সে।

১২ই উদ্বোধন হলেও ১৩ তারিখ থেকেই শুরু হয়েছে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। বহু বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শিত হয়েছে—নতুন নতুন রেকর্ড হয়েছে অনেক—জয়-পরাজয়ের আলো-আঁধারী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সেখানে। অনেক আশা ছিল যাদের ওপর তাঁদের অনেকেই অসাফল্যের নিরিখে হতাশ করেছেন সকলকে, আর সম্ভাবনায় উজ্জ্বল প্রতিভার উঠতি-তরুণেরা অত্যাশ্চর্য ফল প্রদর্শন করে চমকের পর চমক সৃষ্টি করেছেন।

পৃথিবীর ক্ষিপ্রতম মানুষ আমেরি-কার জিম হাইনস ১০০ মিঃ দৌড়ে ৯·৯ সেকেণ্ডে বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড করেছেন। ২য় ও ৩য় স্থান দখল করেছেন জামাইকার মিলার ও আমেরিকার চার্লস গ্রীন উভয়েই ১০ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে।

১০ হাজার মিঃ দৌড়ে কেনিয়ার খ্যাতিমান দৌড়বীর নাফতালি তেমু ২৭·৪ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে প্রথম হয়েছেন। ইথিওপিয়ার উলডে (২৯ মিঃ ২৮ সেঃ) ও তিউনেসিয়ার গামুদি (২৯ মিঃ ৩৪·২ সেঃ) পরের দু'টি স্থান পেয়েছেন।

লৌহ বল নিক্ষেপে প্রথম তিনটি স্থান দখল করেছেন যথাক্রমে ম্যাটসন (আমে-রিকা, ২০·৫৪ মিঃ) উডস (আমেরিকা, ২০·১২ মিঃ) ও গুসাচিন (রাশিয়া, ২০·০৯ মিঃ)। এ বিভাগে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ম্যাটসন কিন্তু হিটে ২০·৬৮ মিটার দূরে লৌহ বল নিক্ষেপ করে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড করেছেন।

২০ কিলোমিটার ভ্রমণে রাশিয়ার গোলুবনিচি ১ ঘঃ ৩৩ মিঃ ৫৮·৪ সেকেণ্ডে প্রথম হয়েছেন। মেক্সিকোর পেদ্রাজ (১ ঘঃ ৩৪ মিঃ) ও রাশিয়ার স্মাগা (১ ঘঃ ৩৪ মিঃ ৩·৪ সেঃ) দখল করেছেন যথাক্রমে রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক দু'টি।

২১২ ফুট ৬½ ইঞ্চি দূরে ডিসকাস নিক্ষেপ করে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন আমেরিকার এ অর্টার। তিনি এ নিয়ে পর পর ৪ বার ডিসকাসে অলিম্পিক স্বর্ণপদক পেলেন। এ এক অসাধারণ নজির। পরের দু'টি স্থান পূঃ জার্মানীর মিলডে ও চেকোশ্লোভা-কিয়ার এল ডানেকের দখলে গেছে।

৪০০ মিঃ দৌড়ে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন আমেরিকার ডোনেল (১ মিঃ ৪৪·৩ সেঃ)। কেনিয়ার কিপরুগট ও আমেরিকার ফার্নার রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন।

ভারোত্তোলনের ফেদার ওয়েটে জাপা-নের ইউশিনোবু জার্কে ১৫২·৫ কিলো-গ্রাম ও স্ন্যাচে ১১৭·৫ কিলোগ্রাম তুলে নিজ বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ ও নতুন অলিম্পিক রেকর্ড করেছেন। (মোট ৩৯২·৫)। ২য়—ডি· শানিজ (রাশিয়া) ও ইউশিউকি (জাপান)। আর ব্যান্টম ওয়েটে ইরানের মহঃ নাসিরি জ্রিন ও জার্কে ১৫০ কিঃ গ্রাঃ তুলে বিশ্ব রেকর্ড করেন ও মোট ৩৬৭ কিঃ গ্রাঃ তুলে বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ করে স্বর্ণপদক পেয়েছেন। হাঙ্গেরীর ইমরে ফোলিভি ও পোল্যাণ্ডের চেবেকি পরের দু'টি স্থান দখল করতে সমর্থ হয়েছেন। মিডল ওয়েটেও বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১ম—কোরেসেৎশোভা (রাশিয়া) (১৫২·৫, ১০৫, ১৮৭·৫ কে·জি· নতুন বিশ্ব রেকর্ড') মোট—৪৭৫ কে·জি· (নতুন অলিম্পিক রেকর্ড)। ২য়—ওহ্‌তি

মেক্সিকো অলিম্পিকে পদকের খতিয়ান

১৮ই অক্টোবর

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
আমেরিকা	১২	৪	৮
রাশিয়া	৬	৯	৬
হাঙ্গেরী	৩	৪	৬
পোল্যাণ্ড	৩	০	৬
রুমানিয়া	৩	১	০
ফ্রান্স	৩	০	১
অস্ট্রেলিয়া	২	৪	২
কেনিয়া	২	৩	১
পঃ জার্মানী	১	৪	১
পূঃ জার্মানী	১	২	২
ইংলণ্ড	১	২	১
জাপান	১	১	১
সুইডেন	১	১	১
ইরান	১	১	০
ফিনল্যাণ্ড	১	১	০
চেকোশ্লোভাকিয়া	১	০	১
তিউনেশিয়া	১	০	১
হল্যাণ্ড	১	০	০
ডেনমার্ক	০	২	০
অস্ট্রিয়া	০	১	১
জামাইকা	০	১	০
মেক্সিকো	০	১	০
ইথিওপিয়া	০	১	০
ব্রাজিল	০	১	০
ইতালী	০	০	৩
তাইওয়ান	০	০	১
সুইজারল্যাণ্ড	০	০	১

(জাপান) (১৪০, ১৪০ কে·জি·—নতুন অলিম্পিক রেকর্ড, মোট ৪৫৫ কে.জি.)। ৩য়—বাকোস (হাঙ্গেরী, মোট ৪৪০ কে.জি)।

২০০ মিঃ দৌড়ে নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড করেছেন আমেরিকার স্মিথ (১৯·৮ সেঃ)। ২য়—পিটার নরম্যান (অস্ট্রেলিয়া)। ৩য়— জন কারলোস (আমেরিকা)।

বর্শা ছোড়ায় রাশিয়ার লুসিস (৯০·১০ মিটার) অলিম্পিক রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। ২য়—কিন্নুনেন (ফিনল্যাণ্ড)। ৩য়—কুলচার (হাঙ্গেরী)।

হাতুড়ি ছোড়ায় হাঙ্গেরীর জিভোৎস্কি ৭২·৬২ মিটার ছুঁড়ে অলিম্পিক রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। ২য়—লোভাজ (হাঙ্গেরী)। ৩য়— বোনডার (পঃ জার্মানী)।

পোলভল্ট-এ বিশ্ব রেকর্ড করে স্বর্ণ পদক পেয়েছেন আমেরিকার সি গ্রীন (১৭ ফুঃ ৮½ ইঃ)। এ বিভাগে আমেরিকার বাইরে অলিম্পিক স্বর্ণ পদক কোনদিন যায় নি। ২য়—স্চিপ্রসকি (পঃ জার্মানী)। ৩য়—নরডিভা (পূর্ব জার্মানী)।

৩ হাজার মিঃ স্টিপলচেজে ১ম—বিওউ (কেনিয়া) ৮ মিঃ ৫১ সেঃ; ২য়—কগো (কেনিয়া) ও ৩য়—ইয়ংগ (আমেরিকা) কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

পেনটাথেলনে সুইডেনের ফারম স্বর্ণপদক পেয়েছেন। অপর দু'টি পদক পেয়েছেন হাঙ্গেরীর বাকজো ও রাশিয়ার লেভলেভ। এর দলীয় প্রতিযোগিতায় হাঙ্গেরী, রাশিয়া ও সুইডেন প্রথম তিনটি পদক পেয়েছে।

লং জাম্পের হিটে আমেরিকার র‍্যালফ বোসটন (২৭ ফুঃ ১½ ইঃ) অলিম্পিক রেকর্ড করেছেন। আর স্কীয়িং-এর বাছাই টিম পারসুটে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন সুইজারল্যাণ্ডের কারম্যান (৪ মিঃ ৪০·৪১ সেঃ)।

মেয়েদের বিভাগেও সাফল্যের বন্যা বয়ে গেছে। ১০০ মিঃ দৌড়ে নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড করেছেন আমেরিকার টাউস ১১ সেকেণ্ডে। তিনি পর পর দু'বার ১০০ মিঃ অলিম্পিক স্বর্ণ পদক পেয়ে অভূতপূর্ব রেকর্ড করেছেন। ফারেল (আমেরিকা) ও কিরজেনস্টাইন (পোল্যাণ্ড) পরের দু'টি পদক দখল করেছেন।

৪০০ মিঃ হার্ডলে ইংলণ্ডের হেমেরি ৪৮·১ সেকেণ্ডে নতুন অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। পঃ জার্মানীর জি হেনিংজ ও ইংলণ্ডের শেরউড ২য় ও ৩য় স্থান দখল করতে সমর্থ হন।

দীর্ঘ লম্ফনে বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড ভেঙেছেন রুমানিয়ার ভিসকোপোলিস; ৬·৪২ মিটার অতিক্রম করে। ইংলণ্ডের শেরউড ২য় ও রাশিয়ার তালিশেভা ৩য় হয়েছেন।

আর বর্শা ছোড়ায় হাঙ্গেরীর লেমেথ (৬০·৩৬ মিটার), রুমানিয়ার তিনটি পদক দখল করেছেন।
তিনটি পদক দখল করেছেন।

মেয়েদের ৪০০ মিঃ দৌড়ে অলিম্পিক রেকর্ড স্পর্শ করেছেন ফ্রান্সের বেসন (৫২ সেঃ)। ২য়—বোর্ন (ইংলণ্ড)। ৩য়—পিচেনাকিনা (রাশিয়া)।

মেয়েদের পেনটাথেলনে পঃ জার্মানীর বেকার (৫০৯৮ পয়েণ্টে), অস্ট্রিয়ার প্রোকোপ ও হাঙ্গেরীর কোভাকাস প্রথম তিনটি স্বর্ণপদক দখল করেছেন।

২০০ মিঃ হিটে আমেরিকার ফেরেল ২২·৯ সেকেণ্ডে নতুন অলিম্পিক রেকর্ড করেছেন।

এখনো প্রতিযোগিতা শেষ হতে অনেক বাকী আছে। এরই মধ্যে অবশ্য বলা হচ্ছে যে আমেরিকা ও রাশিয়া দলগত চ্যাম্পিয়নশিপে ১ম ও ২য় স্থান দখল করবে। অন্যান্য খেলা যেমন হকি,
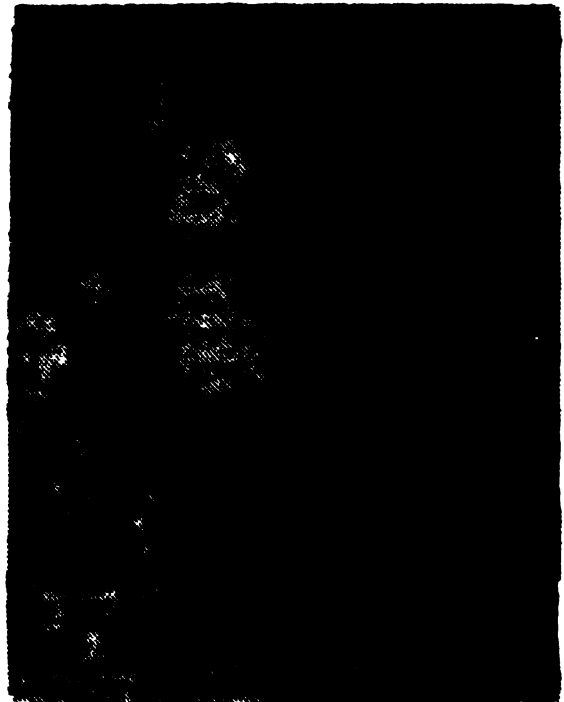
পৃথিবীর দ্রুততম মানুষ আমেরিকার জিম হাইনস ৯·৯ সেকেণ্ডে ১০০ মিঃ অতিক্রম করে নয়া অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন ও বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ করেছেন

ফুটবল, ওয়াটারপোলো বাস্কেটবল, ভলি প্রভৃতির প্রাথমিক পর্যায়ের খেলা চলছে। এখনই বলা যায় না কে চূড়ান্ত

অলিম্পিকে প্রথম

* অলিম্পিক প্রতিযোগিতা প্রথম শুরু হয় গ্রীসের অলিম্পিয়াতে খৃঃ পূঃ ৭৬৬ অব্দে।

* প্রথম অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান হলেন এলিসের করইবস। তিনি ৭৬৬ সালেই অংশ নিয়েছিলেন অলিম্পিক প্রতিযোগিতায়।

* অ-গ্রীসবাসীদের মধ্যে প্রথম চ্যাম্পিয়ান হন আর্মেনীয় মল্লবীর ভারাসডেট। তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন খৃঃ পূঃ ৩৮৫ অব্দে ক্রীড়ানুষ্ঠানে।

* প্রথম মহিলা চ্যাম্পিয়ানের স্বীকৃতি পেয়েছেন গ্রীক-ললনা বেলিসি। তিনি ১২৮ তম অলিম্পিকের রথ-দৌড়ে বিজয়িনীর সম্মান অর্জন করেছিলেন।

* আধুনিক অলিম্পিকের সূচনা ১৮৯৬ সালে এথেন্সের নস প্যারেনাথিয়ান স্টেডিয়ামে।

* ১৯২০ সালের এ্যান্টোয়ার্পের ক্রীড়ানুষ্ঠানে প্রথম উত্তোলিত হলো পঞ্চবলয় সম্বলিত অলিম্পিক পতাকা।

* সর্বপ্রথম 'অলিম্পিক গ্রাম' স্থাপন করা হয় ১৯৩২ সালের লস-এঞ্জেলসের অলিম্পিক প্রতিযোগিতায়।

* অলিম্পিক মশাল নিয়ে দৌড়ের প্রথা চালু হয় ১৯৩৬ সালের বার্লিন অলিম্পিকে। সেবারকার ঐ মশালদৌড়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন ৩০০০ জন প্রতিযোগী।

* এশিয়ার প্রথম অলিম্পিকের আসর বসে ১৯৬৪ সালে টোকিওতে।

* প্রথম মহিলা হিসেবে মূল স্টেডিয়ামে রক্ষিত পূতাগ্নি প্রজ্বলিত করেন কুড়ি বছরের মেক্সিকো-ললনা মিস বাসিলি—১৯৬৮ সালের মেক্সিকো অলিম্পিকে।

খেলায় জয়ী হবে। হকিতে ভারত নিউজিল্যাণ্ডের কাছে হেরে গেলেও পরে অবস্থার উন্নতি করেছে। এবং স্বর্ণ পদক লাভের সম্ভাবনার আশা আবার জেগেছে।

ভারতের এ্যাথলেট পরভীনকুমার ও এল এন. ঘোষ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। পরভীন ডিসকাস ছোড়েন নি, হাতুড়ি ছোড়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের ঘেরা পেরোতে পারেন নি। এল. এন. ঘোষ ভারোত্তোলনে পঞ্চদশ স্থান পেয়েছেন।

ভারতের আশা যা ঐ হকিতেই। ভারতীয় হকি দলের খেলায় উন্নতি হচ্ছে, ফাইন্যালে উঠলে পাকিস্তানকে হারাতে ভারতকে বেগ পেতে হবে খুবই।

ত্রাস-বিক্ষোভের ঘোর কেটে গিয়েছে, অলিম্পিক প্রতিযোগিতা চলছে—কিন্তু উত্তর কোরিয়া যোগদান না করায় অথবা না করতে পারায় খেলাধূলোর ক্ষেত্রে রাজনীতির ছোঁয়া লেগেছে—এ অলিম্পিক আদর্শের ঘোর বিরোধী। অলিম্পিক সর্বাঙ্গসুন্দর হোক—এই কামনা আজ শান্তিকামী বিশ্ববাসীর।
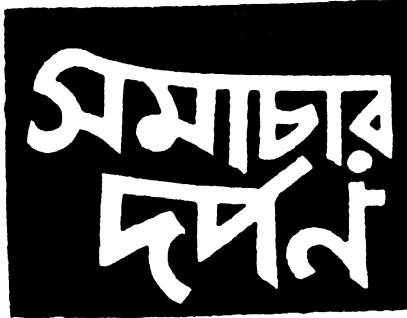
পূর্বাঞ্চল স্কুল ক্রিকেট দল রাজা মুখার্জীর নেতৃত্বে পশ্চিমাঞ্চল দলকে ৬৩ রানে পরাজিত করে নিখিল ভারত স্কুল ক্রিকেট কোচবিহার ট্রফি জয় করেছে। সংক্ষিপ্ত স্কোর : পূর্বাঞ্চল—১১৪ রান ও ৬৫ রান এবং পশ্চিমাঞ্চল ৯৬ রান (৭ উইঃ ডিঃ) ও ৫০ রান।

* * *

কলকাতার আই এফ এ শীল্ডের মত সুপার লীগের ভাগ্যও আদালতের এক্তিয়ারে চলে গিয়েছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সম্পাদকের আবেদনক্রমে নগর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি এক অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে লীগ ম্যাচ খেলার ব্যবস্থা করতে বিরত থাকতে আই এফ একে নির্দেশ দিয়েছেন।

* * *

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় সন্তরণ প্রতিযোগিতায় কলকাতা পর পর আটবার পুরুষদের দলগত চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছে। কলকাতা দখল করেছে ৭৫ পয়েন্ট। তারপরেই পাঞ্জাব ৩১ পয়েন্ট পেয়েছে।

অলিম্পিক পেন্টাথলনে আমেরিকার দি গ্রীন স্বর্ণপদক পেয়েছেন। তিনি ৫ ৪০ মিটার অতিক্রম করেছেন।

মহিলাদের দলগত চ্যাম্পিয়ানশিপ পেয়েছেন রাজস্থান ৪৭ পয়েন্ট পেয়ে। দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে কলকাতা ২৬ পয়েন্ট লাভ করে।

এবারের প্রতিযোগিতায় মোট ১টি নতুন রেকর্ড হয়েছে। তার মধ্যে রাজস্থানের রিমা দত্ত একাই ৫টি রেকর্ড করে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

* * *

আগামী ১ নভেম্বর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সানজুয়ানে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের ডেভিস কাপের আন্তঃ আঞ্চলিক ফাইন্যাল শুরু হবে। রামনাথন কৃষ্ণন, প্রেমজিৎলাল ও জয়দীপ মুখার্জী ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন। আর কে খান্না দলের ম্যানেজার নির্বাচিত হয়েছেন।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

জয়শ্রী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-১২

জয়শ্রী প্রেস হইতে শ্রীসুরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বর্ষ ঃ ১৯শ সংখ্যা মূল্য ঃ ৩০ পয়সা | বাংলা ভাষার দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা | PRICE : 30 Paise
বৃহস্পতিবার, ১৪ই কার্তিক, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ | Thursday, 31st October, 1968

উত্তরবঙ্গের বন্যা (৩)

ত্রাণের নামে আমাদের সরকার পঞ্চমুখ! কিন্তু কখন?—যখন গরজ বড় বালাই হয়।

সরকারের প্রশাসনিক যন্ত্র কি রকম ত্রাণকার্য করেছেন—তা অবশ্য যাচাই করে দেখতে গেলে আর একটা তদন্ত কমিশন বসাতে হয়।

তবে সত্য এই, ত্রাণ যখন বাণরূপে লক্ষ্যভেদ করতে চায় দুর্গত নর নারীদের উপর তখন তাদের পক্ষে পরিত্রাহি ডাক ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সেই পরিত্রাণ প্রয়োজন হয় কাদের হাত থেকে? দুর্গত-জনেরাই বলেন, আমলাদের তথাকথিত করাঘাত থেকে।

কেন্দ্রীয় সরকার—টাকার অঙ্কের পরিমাণ অনেক শোনালেও প্রয়োজনের তুলনায় তা সমুদ্রে গোষ্পদ—এক কোটি টাকা উত্তরবঙ্গের ধসবিধ্বস্ত ও বন্যা-বিপর্যস্ত ব্যক্তিদের সাহায্য দিলেও ও রাজ্য সরকারের অফিসারগণ প্রত্যক্ষ তদারকীর ভার নিলেও এবং প্রধানমন্ত্রী ও উপ প্রধানমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের শ্মশান পরিদর্শন করে এলেও—এমন ধারণ করা অনুচিত যে, বন্যার্ত নিঃস্বরা আশার আলো দেখতে পেয়েছেন। কারণ সরকারের কাজ অপেক্ষা আমলাদের ঢাকের শব্দে জলপাইগুড়ি, মেখলিগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের স্বাভাবিক অবস্থা'র যে-রকম প্রচার সুরু হয়েছে—তাতে সেখানের লোক সুখী হওয়া দূরের কথা, তাদের এ রকম ধারণা হয়েছে, অস্বাভাবিক অবস্থাই যদি স্বাভাবিকত্ব প্রাপ্ত হয়, তা হলে তাদের ভবিষ্যৎ কি?

মোট কথা, উত্তরবঙ্গবাসীদের যা বন্যায় ভেসে গেছে, তা আর ফিরে আসবে না, সরকারেরও সাধ্য নেই তার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করার।

কিন্তু দেশের সরকার জনগণের দুঃসময়ে শোক জ্ঞাপনের আগেই এমন কল্যাণমূলক কাজ করতে পারেন—যাতে সাহায্যদানের অর্থের প্রয়োজন হয় না। বরং সেই অর্থে সামগ্রিক বিপদ রুখবার আয়োজন সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়।

পারমাণবিক যুগে একথা লেখাপড়া জানা কোন্ ব্যক্তি না জানেন যে, প্রকৃতি-গত বিপদের সম্ভাবনা সর্বদাই রয়েছে এবং এই বৈজ্ঞানিক যুগে প্রকৃতিকে জয় করে মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিই প্রধান কাম্য।

যাহোক, প্রকৃতিগত বিপদ হচ্ছে অনেক রকম—তাদের মধ্যে বহু ঘোষিত বিপদ হচ্ছে বন্যা। সেই মহাপ্লাবনের যুগ থেকে যে প্লাবন বা বন্যার কথা মানুষ বংশানুক্রমে শুনে আসছে—তাকে পরাস্ত করার জন্যে বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টার অন্ত নেই। বিজ্ঞানে অগ্রসর দেশগুলিতে বন্যার ফলে হাজার হাজার লোকের মৃত্যুর কথা আজকাল আর শোনা যায় না।

আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু এই দেশ যে সময় ইংরেজ শাসনের অধীন ছিল তখন বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা প্রলয়ঙ্কর নদীগুলিকে যুক্তির বাঁধে বেঁধে নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন। মুক্ত ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সুরু হয়। বহু-মুখী নদী পরিকল্পনার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। পরবর্তী ঘটনা দেখে শুনে মনে হয় ঐ টাকা গেছে ভূতের বেগারে। তা নইলে ভৌতিক কাণ্ডের মতো বহুমুখী নদী পরি-কল্পনাগুলির মুড়ো থাকে না লেজ থাকে—এমন পরিণতি ঘটে কেন?

নদী থাকলেই বন্যা হয়, পাহাড় থেকেই প্রচণ্ড জলস্রোত নামে—এ সব অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু সেই বন্যা ও জলস্রোতকে নিয়মিত করার পথ তৈরি করে রাখতে না পারাটাই ভয়ঙ্কর রকমের অস্বাভাবিক ব্যাপার। কেন্দ্রীয় সেচ দপ্তরের মন্ত্রী ডঃ রাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, উত্তরবঙ্গের নদীগুলিতে পর্বতবাহিত জলস্রোত আসে, সুতরাং ঐ সব নদীর বাঁধ যে রকম হওয়া উচিত ছিল, তা হয় নি।

তাহলে এখন এটাই ধরে নিতে হবে যে, স্বাধীনতার একুশ বছরে সরকার যা করেছেন—তার জন্য বিদেশ থেকে প্রচুর অর্থ ঋণ করা হলেও এখন দুস্থ জন-গণের সাহায্যার্থে বিদেশী সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যা দিচ্ছেন—তা নিতেও হাত পাততে হচ্ছে। বোধহয়, সমস্ত জাতিটা দুস্থ হয়ে নির্লজ্জভাবে হাত পাতলেও আমাদের গণতান্ত্রিক সরকার লজ্জাবোধ করবেন না।

সরকারের সব লজ্জা সব দ্বিধা বোধ হয় ধুয়ে মুছে দিয়েছে সরকারী পুলিশ বিভাগ। জলপাইগুড়িতে প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে পুলিশ যেভাবে বন্যার্ত মানুষগুলির উপর লাঠি চালিয়েছেন—তাতে অন্যান্য সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান-গুলিও লজ্জিত হয়েন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী পুলিশের এ রকম কাজে খুশি হন নি। প্রকৃতপক্ষে পুলিশের কোন কাজেই বা লোকজন সহজে খুশি হন? কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা পুলিশে ছুঁলে বিশ ঘা। অমরা বলি ঃ বিষ ঘা। আশ্চর্যের ব্যাপার, সেই ঘা পড়ে না সেখানে যেখানে ডাকাতি দুর্নীতি এবং যেখানে মুহূর্তের মধ্যে পুলিশের সাহায্যের প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে এখন পুলিশ বিভাগের কর্তব্য কি—সেটাই বড় প্রশ্ন। পর পর দুটো বিরাট ডাকাতি দিনদুপুরে হওয়ার পর উত্তরবঙ্গে বন্যার্ত মানুষের উপর লাঠি চালনার কসরৎ যারা দেখায় তাদের জন্য হয়তো বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকতে পারে কিন্তু একুশ বছরে জনসাধারণের সামগ্রিক কল্যাণে সরকার কি কি করতে পেরেছেন তার আত্মসমালোচনাও প্রয়ো-জন। বিশেষভাবে একালের খরা ও বন্যা জাতীয় অতি সাধারণ বিপদগুলি আত্ম-তুষ্ট সরকারের মোহভঙ্গ ঘটাতে না পারলে ধরে নিতে হবে বিজ্ঞানকে যথার্থ-স্থানে কাজে লাগাতে সরকার অক্ষম।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

সংগ্রহ করার ব্যক্তিকে খুব একটা দোষারোপ বলা যাবে না। সে সংগ্রহ ডাকটিকিটই হোক আর বিখ্যাত শিল্পকর্ম ভাস্কর্য বা এমন কি গাছ-গাছড়াই হোক। কিন্তু সংগ্রহের নেশায় মাথায় যখন খুন চেপে যায়, তখন তাকে কী বলবো? অ্যারিস ওনাসিসের সেই খুনে রূপটাকেই কি আর একবার দেখা গেল না বিধবা জ্যাকেলিন কেনেডিকে সংগ্রহ করার দুর্মর প্রচেষ্টার মধ্যে? অবশ্য অনেকেই বলবেন স্বামীর মৃত্যুর পরে ববি কেনেডিও নিহত হবার পর জ্যাকির জীবনে যে শূন্যতা নেমে এল যে নিঃসংগ জীবন যাপনে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন সে মরুজীবনে ওনাসিসই ছিলেন ওয়েসিস।

গ্রীসের ধনকুবের অ্যারিস্টটল সক্রেটিস ওনাসিসের সঙ্গে আমেরিকার সেরা সম্ভ্রান্ত মহিলা জ্যাকেলিন কেনেডির বিয়ে দুনিয়ার তাবৎ সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় চাঞ্চল্যকর সংবাদ হিসেবে পরিবেশিত হয়েছে। চাঞ্চল্যকর এ জন্যে যে, ডালাসে আততায়ীর গুলীতে নিহত মার্কিন প্রেসিডেন্ট সর্বজনপ্রিয় জন কেনেডির নিষ্ঠাবতী বিধবা যে আবার কারো গলায় মালা পরাতে পারেন, এটা যেন কেউ বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলেন না। কিন্তু ওনাসিসকে যারা চেনে তারা জানে যে, এ ব্যক্তিটির পক্ষে কিছুই সাধ্যের বাইরে নয়। তবে হ্যাঁ, তুচ্ছ জিনিষের দিকে ইনি ফিরেও তাকান না তা সে ব্যবসাক্ষেত্রই বলো, আর মানজাগতিক লোক বা নারীই বলো।

সামান্য অবস্থা থেকে ওনাসিস বিরাট বড় হয়েছেন, এবং বড় ঠকে হয়েছেন। স্মার্ণাব (বর্তমানে তুরস্কের দখলীকৃত ইজমির) এক তামাক ব্যবসায়ীর ঘরে ওনাসিসের জন্ম। তুরস্ক কর্তৃক গ্রীস অভিযানের সময় বাবা সক্রেটিস তুর্কীদের হাতে বন্দী হন, এক কাকাকে ফাঁসিতে লটকানো হয়। চতুর ওনাসিস জেলরক্ষীকে ঘুস দিয়ে পিতার মুক্তি আদায় করেন। কিন্তু তারপরই তিনি মাত্র ৬০টি ডলার পকেটে ফেলে দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনা পালিয়ে যান ভাগ্য অন্বেষণে। বয়স তাঁর মাত্র ১৭। এখানে একটা নগণ্য চাকরি জুটলো—টেলিফোন অপারেটরের। একটানা নাইট ডিউটি, রাতের অলস কাজ, পারিশ্রমিকও অনুল্লেখ্য। তাই দিনের বেলায় ওনাসিস পৈতৃক ব্যবসার সম্ভাবনাটা আর্জেন্টিনায় বাজিয়ে দেখতে চাইলেন। দোকানে দোকানে তামাক সাপ্লাই করতে লাগলেন তিনি, সে তামাক আমদানী করলেন তুরস্ক থেকে, বুলগেরিয়া থেকে। হু হু করে কাটতি হলো তাঁর তামাকের, অচিরেই সারা দক্ষিণ আমেরিকায় ওনাসিসের তামাকের ব্যবসা অভাবনীয়ভাবে ফেঁপে উঠলো। ব্যবসা সুরু করার তিন বছরের মধ্যে তিনি ২০ হাজার ডলারের পুঁজি করে ফেললেন। আর তিন বছর বাদে বয়স যখন তাঁর মাত্র ২৩ তখন তিনি দশ লাখ ডলারের মালিক।

কিন্তু কেবল তামাক নিয়ে পড়ে থাকার বান্দা ওনাসিস নন, ব্যবসার

ওনাসিস

কায়দা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছেন, বিদেশের মাটিতে বসে তিনি নিজেও ব্যবসায় প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছেন। কাজেই নতুন ব্যবসাক্ষেত্রে উঁকিঝুঁকি দিতে দোষ কোথায়? তাঁর কপালজোর বলতে হবে, সারা বিশ্ব তখন সংকটের বেদনায় অস্থির, ইউরোপে তখন গ্রেট ডিপ্রেসন বা অর্থনৈতিক মহাসংকট চলছে। ওনাসিসের নজর পড়লো বাণিজ্য জাহাজের ব্যবসার দিকে (আর তাঁর আদর্শ পুরুষ তো মহাকাব্যের ওডিউসিস!)। কানাডিয়ান ন্যাশনাল রেলওয়ের কাছ থেকে তিনি ছখানা, প্রতিটি ২০ লাখ ডলার দামের বাণিজ্যতরী মাত্র ২০ হাজার ডলার করে ক্রয় করলেন। আর [illegible] যুদ্ধের সময় [illegible] বন্ধু [illegible] তো ওনাসিসের কাছ থেকেই অবিশ্বাস্য চড়া দামে কিনতে বাধ্য হয়েছিল। সেদিন আধ ডজন জাহাজ নিয়ে যাত্রা সুরু করেছিলেন, আজ ওনাসিস শতাধিক বাণিজ্য জাহাজের মালিক।

তাঁর সবচেয়ে মজার খরিদ হলো কানাডারই কাছ থেকে ৫২ লাখ ডলার দিয়ে ফ্রিগিট জাহাজ কিনে এবং আরো লাখ লাখ ডলার খরচ করে তাকে একটা প্রথম শ্রেণীর লোভনীয় প্রমোদতরীতে রূপান্তরিত করা। এই ক্রিটিনা প্রমোদতরী তার বক্ষে চার্চিল, গ্রেটা গার্বো, জন কেনেডি, রিচার্ড বার্টন, এলিজাবেথ টেলর, ক্যারী গ্রান্ট, মেরিয়া কালাস প্রমুখ বিশ্বখ্যাত নায়ক-নায়িকাদের ধারণ করার গৌরবে গর্বিত। জাহাজের ব্যবসা ছাড়াও ওনাসিস হোটেল ব্যবসায়েও প্রচুর সাফল্য অর্জন করেছেন। বিখ্যাত মন্টি কার্লো তো কিনে নিয়েছেনই, তা ছাড়া পৃথিবীর রাজধানীতে আরো আধুনিক হোটেলের মালিকানা তিনি লাভ করেছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হয়েছে তাঁর বিমানপথ কেনা। তাঁর ব্যক্তিগত বিমান সার্ভিসের নাম অলিম্পিয়া। স্করপিয়স দ্বীপটিও তো তিনি কিনে নিয়ে তাকে লোভনীয় বাসস্থান করে তুলেছেন।

গ্রীসের আর একজন জাহাজ ব্যবসায়ীর কন্যা টিনা লিভানোসকে বিয়ে করেছিলেন ওনাসিস ১৯৪৬ সনে। জ্যাকির যেমন দু' ছেলেমেয়ে [illegible] (১১) আর জন (৮) তেমনি টিনা [illegible] ছেন তাঁকে এক ছেলে আলেকজান্ডার (২০) ও এক কন্যা ক্রিস্টিনা [illegible]। কিন্তু '৬১ সনে সে [illegible] ভেঙে [illegible]। ওনাসিস তখন পৃথিবীর [illegible] কণ্ঠের অধিকারিণী জনৈক ইতালীয় ব্যবসায়ীর স্ত্রী মারিয়া কালাসের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বিয়ে করলেন সেই জ্যাকেলিন কেনেডিকে। যাঁর নাম প্রতিপত্তি খ্যাতি বিশ্বজোড়া। একদা বুয়েনস আয়ার্সে তিনি রাষ্ট্রদূত ছিলেন, সেই সূত্রে আলাপ। তারপর জ্যাকেলিনের তৃতীয় সন্তান প্যাট্রিকের মৃত্যুতে শোকের সময়। তখন ওনাসিস তাঁর ক্রিস্টিনাকে দু' সপ্তাহের জন্যে জ্যাকেলিনের হেফাজতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আরো ঘনিষ্ঠতা হলো জন কেনেডির মৃত্যুতে নতুন করে যে শোক ও আঘাত পেলেন সে সময়ে। সেদিন জ্যাকেলিনের চরম দুঃখের দিনে যিনি পিতার মত সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, সেই বাবার বয়সী ওনাসিসকেই (৬২) জ্যাকেলিন (৩৯) শেষ পর্যন্ত বিয়ে করে জীবনের নতুন অধ্যায় সুরু করলেন।

॥ তিন ॥

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ সুরু হইয়াছে, বিপ্লব দলের প্রস্তুতি চলিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের দমন নীতিও চলিতেছে। ঐ সময় পার্লামেণ্ট শুধু বাংলাদেশেই প্রায় ১২শ বিপ্লবীকে বিনা বিচারে আটক করিয়াছে। প্রথম গ্রেপ্তারের পর কলিকাতা দালান্দা হাউসে স্বীকার উক্তির জন্য বিপ্লবীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছে। অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ কেহ স্বীকারোক্তি করিয়াছে, ফলে আরও লোক ধৃত হইয়াছে, বহু অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছে, মামলা সুরু হইয়াছে, এপ্রুভারের দল (রাজসাক্ষী) সেই সব মামলায় সাক্ষী দিয়াছে। আমার নামে ৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা আছে, আমি তখন কলিকাতাতেই আছি। পুলিশের খবর ছিল বিপ্লবীরা জনবহুল স্থানে একত্র হইয়া পরস্পর আলাপ আলোচনা করে, এ জন্য পার্কগুলির উপর পুলিশের গুপ্তচরদের নজর ছিল। আমি একদিন বৈকালে প্রায় [illegible] সময় ইডেন গার্ডেনে একাকী বসিয়া আছি, একজন লোক আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া আমার নিকট বসিল। আমি মনে করিলাম ঐ লোকটি পুলিশের গুপ্তচর, সেও সম্ভবত ভাবিল, আমি বুঝি পলাতক বিপ্লবী। অপরিচিত লোকটি আমার সহিত আলাপ আরম্ভ করিল। আমার নাম, বাড়িঘর, কি করি, কোথায় থাকি, কলিকাতা কেন আসিয়াছি ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিল।

আমি মাঝে মাঝে কাসিতে কাসিতে উত্তর দিতেছিলাম, আমি বলিলাম, আমার যক্ষ্মাকাস হইয়াছে চিকিৎসার জন্য কলিকাতা আসিয়াছি, কোন ফল পাইতেছি না, দুই এক বার কফ মাটিতে ফেলিলাম, অপরিচিত লোকটি একটু সরিয়া বসিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বিবাহ করিয়াছি কি না? আমি অনুতাপ করিয়া বলিলাম, বিবাহ ত' একটা করি নাই, দুইটা বিবাহ করিয়াছি, ছোটটি নিতান্ত শিশু। আমার চোখ দিয়া জল পড়ার উপক্রম হইল। অপরিচিত লোকটি বলিল বহু বিবাহ নিতান্ত অন্যায়। আমি বলিলাম, সবই অদৃষ্টের লেখা। লোকটি চলিয়া গেল। সে জানিত না, যাহার সহিত আলাপ করিতেছিল, তাহার নামে ৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা আছে। সবই অদৃষ্টের ফের।

বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক আসামীরা একে একে ধৃত হইতে লাগিল, এখন আমার পালা। ১৯১৪ সনের শেষ ভাগে, আমি একদিন গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিলাম, আমার পূর্বপরিচিত একজন পুলিশ ইনস্পেক্টার আমার নিকটে আসিয়া, আমার পা ধরিয়া বলিলেন, "কর্তব্যের অনুরোধে আপনাকে গ্রেপ্তার করিলাম।" তিনি বলিলেন, "আমি দুই সপ্তাহ পূর্বে ঢাকা হইতে আসিয়াছি, একজন ইনফর্মার (দলের লোক) টেগার্ট সাহেবকে খবর দিয়াছে, আপনি গঙ্গার ঘাটে প্রত্যহ স্নান করেন, সে আপনার বাসা চিনিত না। আমি আপনার পরিচিত, এজন্য আমাকে ঢাকা হইতে আনাইয়া নির্দেশ দিয়াছে গঙ্গার ঘাটে আপনাকে পাওয়া যাইবে, আপনাকে গ্রেপ্তার করিতে। আপনি কোন্ ঘাটে স্নান করেন সে জানিত না। আমি এত দিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রত্যেক ঘাটে খুঁজিতেছি। আমাকে একখানা ঘোড়ার গাড়িতে করিয়া তিনি এবং তাঁহার সঙ্গিগণ [illegible] পুলিশ আফিসে লইয়া গেল। পুলিশ মহলে মহা হৈ চৈ, আমাকে দেখার জন্য লোম্যান সাহেব আসিলেন, টেগার্ট সাহেব আসিলেন, আরো বহু লোক আসিয়া দেখিতে লাগিলেন। কলিকাতা হইতে আমাকে বরিশাল জেলে চালান দিল। হাতে হাতকড়ি, কোমরে দড়ি, সম্মুখে পিছনে ৪জন বন্দুকধারী সিপাহী আমাকে লইয়া যাইতেছে, আমি মনে মনে গর্ব বোধ করিতে লাগিলাম। আমাদের বিরুদ্ধে বরিশাল সাপ্লিমেণ্টারী কনস্পিরেসি কেস—১২১ ক ধারা (রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র) সুরু হইল। এই মামলার আসামী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, ওরফে হরেন্দ্র চক্রবর্তী, ওরফে বিরজা, ওরফে কালীচরণ মাঝি, [illegible] প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী [illegible] ভৌমিক, রমেশচন্দ্র চৌধুরী, [illegible] চৌধুরী। সরকার পক্ষে ছিলেন [illegible] ব্যারিস্টার, উকিল [illegible] সাহেব এবং স্থানীয় কয়েকজন উকিল। [illegible] পক্ষে ছিলেন [illegible] ব্যারিস্টার, শ্রীশচন্দ্র [illegible] উকিল, মনোরঞ্জন ব্যানার্জী—উকিল এবং স্থানীয় কয়েকজন উকিল। দুইজন রাজসাক্ষী ছিল। এই মামলা প্রায় এক বৎসর চলে। সরকার পক্ষে খরচ হইয়াছিল [illegible] লক্ষ টাকার উপর। আমরা বরিশাল জেলে এক বৎসরের উপর ছিলাম। মামলায় আমার ১৫ বৎসর [illegible] দণ্ড, প্রতুলবাবু, মদনবাবু ও [illegible] চৌধুরী—প্রত্যেকে দশ বৎসর [illegible] এবং খগেন চৌধুরী ৭ বৎসর [illegible] দণ্ডপ্রাপ্ত হইলেন। [illegible] সঙ্গে সঙ্গে [illegible] আমাদের দণ্ড অধিক [illegible] পলায়ন [illegible]। [illegible] বরিশাল জেল হইতে [illegible] প্রেসিডেন্সী জেলে [illegible] হইল [illegible] ৪৪ ডিগ্রিতে রাখা হইল [illegible] বাস, [illegible] কথা বলার উপায় নাই পায়ে ডাণ্ডা বেড়ি।

॥ চার ॥

[illegible] ভারতে বিপ্লবীদের স-শস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে [illegible] ষড়যন্ত্র মামলা, দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা, বেনারস ষড়যন্ত্র মামলা বার্মা ষড়যন্ত্র মামলা সুরু হইয়াছে। (লেখকের [illegible] নছর ও ভারতের বিপ্লব সংগ্রাম দ্রষ্টব্য)। রাসবিহারী বসু, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী [illegible] (শ্রীহট্ট), পৃথ্বী সিং, জোয়ালা সিং মোহন সিং, কর্তার সিং, পণ্ডিত জগৎ রাম, পণ্ডিত পরমানন্দ প্রমুখ নেতাগণ স-শস্ত্র বিপ্লবের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। বড় লাটের উপর বোমা পড়ার পর রাসবিহারীর নাম প্রকাশ পাইয়াছে, সরকার পক্ষ হইতে তাঁহাকে

ধরাইয়া দেওয়ার জন্য ১৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজারা রাসবিহারীকে ধরাইয়া দেওয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছে. রাসবিহারীর নামে লক্ষাধিক টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরিয়া দিতে হইবে। প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে অনুশীলন সমিতির নেতাগণ ইংলন্ড-বিরোধী রাষ্ট্রসমূহের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য কেদারেশ্বর গুহকে (বজ্র-যোগিনী—ঢাকা) জার্মানীতে পাঠাইয়াছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর তিনি আমেরিকা যান এবং বাংলার বিপ্লবীদের সহিত দেখা করার জন্য গোপনে ট্যাস-ফিরিঙ্গী বেশে বাংলাদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি যখন দেশে ফিরিলেন, তখন তাঁহার পরিচিত সকল বিপ্লবীই জেলে ছিলেন। জার্মান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর জার্মান গভর্নমেন্ট সকল ভারতীয়কে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন ভারতে বিপ্লব করার জন্য। জার্মান গভর্নমেন্টের চেষ্টায় ভারতীয় নাগরিকদিগকে লইয়া "বার্লিন কমিটি" গঠিত হইল। আমেরিকায় বহু ভারতীয় নাগরিক ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শিখ সম্প্রদায়ের লোকই ছিল অধিক। তাঁহারা অর্থ উপার্জনের জন্য আমেরিকা গমন করিয়াছিলেন। জার্মান কনসাল তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা এখানে কি করছ? তোমরা দেশে যাও, বিপ্লব কর, তোমাদের দেশ স্বাধীন কর, জার্মান গভর্নমেন্ট সকল প্রকার সাহায্য করিবে।" ঐ সময় বাবা গুরুদিৎ সিং জোয়ালা সিং-এর নেতৃত্বে কোমাগাটামারু ও টাসামারু নামে দুই জাহাজ বোঝাই ভারতীয় নাগরিক, শিখ এবং পাঞ্জাবী, আমেরিকা হইতে কলিকাতার বজবজ বন্দরে উপস্থিত হইলেন। ভারত গভর্নমেন্ট পূর্বেই তাঁহাদের আগমন সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ বজবজ উপস্থিত ছিল, খণ্ড যুদ্ধ হইল, উভয় পক্ষে হতাহত হইল, কিছু লোক গ্রেপ্তার হইল, অবশিষ্ট পলায়ন করিতে সক্ষম হইলেন। তাঁহারা বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া বজবজ হইতে পাঞ্জাব যাইতে সক্ষম হইলেন। তাঁহারা পূর্বেই বাংলার বিপ্লব দলের কথা জানিতেন, রাসবিহারী বসুর নাম শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা রাসবিহারী বসু-শচীন সান্যালের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহাদিগকে পাওয়ায় বিপ্লবের প্রস্তুতি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। আমেরিকা প্রত্যাগত শিখদের বহু আত্মীয় সৈনিক বিভাগে কাজ করিতেন। এখন রাসবিহারী বসু তাঁহাদের মারফৎ ভারতীয় সৈনিকদিগকে হস্তগত করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কর্তার সিং, জোয়ালা সিং, পণ্ডিত জগৎ রাম, পণ্ডিত পরমানন্দ প্রমুখের চেষ্টায় কয়েকটি ভারতীয় রেজিমেন্ট বিপ্লবীদের সহিত যোগ দিল। ঐ সময় সৈনিকদের আত্মীয় ফোর্টের মধ্যে বেড়াইতে যাইতে পারিতেন এবং প্যারেডের (কুচ-কাওয়াজের) পর বন্দুক তাঁহাদের নিকট থাকিত। রাসবিহারী বসুর নামে যখন লক্ষাধিক টাকা পুরস্কার ঘোষণা, তখন সময় সময় তিনি সৈনিকদের আত্মীয় পরিচয় দিয়া ফোর্টের ভিতর যাইয়া সৈনিকদের সহিত ভাবী বিপ্লবের আলাপ-আলোচনা করিতেন। ঐ সময় ভারতে ১২ হাজার আন-ফিট শ্বেতাঙ্গ সৈন্য ছিল। এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল, ভারতীয় বিপ্লবী সেনারা অতর্কিতে শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ফোর্টে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিবে। বিপ্লব দলগুলিও বিভিন্ন স্থানে একই দিন স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিবে। ১৯১৫ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী স্বাধীনতা ঘোষণার দিন ধার্য হইয়াছিল। (সিডিসন কমিটি রিপোর্ট বা রাউলাট রিপোর্ট দ্রষ্টব্য) নির্দিষ্ট তারিখে উত্থান (রাইজিং) সম্ভবপর হয় নাই, তারিখ পরিবর্তন করিতে হইয়াছে। কয়েকটি রেজিমেন্ট অনুরোধ জানাইয়াছিল, তারিখ পরিবর্তন করিতে, কারণ—তাহারা অপর রেজিমেন্টের সহিত আলাপ চালাইতেছে, তাহাদের উত্তর এখনও পায় নাই। এইরূপভাবে দুইটা তারিখের পরিবর্তন হইল, এই পরিবর্তনের ফলে মন্ত্রগুপ্তি বেশি-দিন রহিল না, আস্তে আস্তে খবর পুলিশের কানে চলিয়া গেল। গভর্নমেন্ট এই সংবাদে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, চারিদিকে প্রচণ্ড দমননীতি চলিতে লাগিল। এই দমননীতির ফলে বহু সৈনিকের ফাঁসি হইল, তাহাদের মধ্যে ২২ বৎসরের যুবক কর্তার সিং ছিল। জোয়ালা সিং, পৃথ্বী সিং, শের সিং প্রমুখের ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল, পরে আপীলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়। (লেখকের 'জেলে ত্রিশ বছর ও ভারতের বিপ্লব সংগ্রাম' দ্রষ্টব্য) ঐ সময় জার্মানী হইতে ভারতীয় বিপ্লবীদের জন্য তিন জাহাজ বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র ভারতে আসিতেছিল। (সিডিসন কমিটি রিপোর্ট বা রাউলাট রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)। মাল গ্রহণ করার জন্য যতীন মুখার্জী সদলবলে সুন্দরবন গিয়াছিলেন। জার্মান জাহাজ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বন্দরে পৌঁছিতে পারে নাই। তখন যুদ্ধ চলিতেছিল, সমুদ্র-পথ বৃটিশ ক্রুজার পাহারা দিতেছিল। জাহাজ তিনটির একটি জাহাজকে বৃটিশ ক্রুজার ডুবাইয়া দিয়াছিল, দ্বিতীয়টি ডাচ্ গভর্নমেন্ট তাহাদের ব্যাটাভিয়া বন্দরে আটক করিয়া রাখিয়াছিল, তৃতীয়টি রাস্তা ভুল করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছিল, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পুলিশ সংবাদ পাইয়া যতীনবাবুর দলকে বালেশ্বরের নিকট "বুড়ি বালাম"-এর তীরে ঘেরাও করে, সেখানে খণ্ডযুদ্ধ হয়, উভয় পক্ষে হতাহত হয়। ("জেলে ত্রিশ বছর ও ভারতের বিপ্লব সংগ্রাম" দ্রষ্টব্য)।

রাসবিহারী বসু দেখিলেন, বিপ্লব

সাপ্তাহিক বসুমতী।

১৪ই নভেম্বর

বুকের রুধির মুখের ভাষা। সেই ভাষাকেই বলতে পারি বাংলা ভাষা। পূর্ববঙ্গের বাংলা ভাষা-ভাষী জনসাধারণ রক্তের অক্ষরেই বাংলা ভাষার গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এখন সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল বাংলা বর্ণমালা, লিখন-রীতি এবং বানান পদ্ধতির পরিবর্তন সাধনে তৎপর। কেন এই তৎপরতা? যদিও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"পণ্ডিতদের কাছে আমি এই আবেদন করে থাকি যে, ব্যাকরণ বাঁচিয়ে যেখানেই বানান সরল করা সম্ভব হয় সেখানেই সেটা করাই কর্তব্য"—তবুও পূর্ব-বঙ্গের বিদগ্ধজন বানান সংস্কার সম্বন্ধে কবির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত ঘোষণা করেও ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সি-লের বানান পদ্ধতির পরিবর্তন সাধনে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এই প্রতিবাদ কেন?—এ সম্বন্ধে পূর্ববঙ্গের বিদ্বজ্জনের লেখা কয়েকটি বিজ্ঞানসম্মত বৈয়াকরণিক নিবন্ধ সাপ্তাহিক বসুমতীর আগামী ১৪ই নভেম্বরে প্রকাশিতব্য সংখ্যায় থাকবে। ভাষার সৌন্দর্য-সাধনে বানানের প্রয়োজনীয়তার মর্ম জ্ঞাপনে প্রবন্ধগুলি যেমন পণ্ডিতমহলে তেমনি সাধারণ পাঠকদের কাছেও অত্যন্ত চিন্তা-কর্ষক বিবেচিত হবে। অপিচ এগুলি ভাষার দলিল হিসেবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণযোগ্য।

নদী তো ভাঙবেই

[illegible]

নদী তো ভাঙবেই তার শৃঙ্খল
প্রচণ্ড তেজে
উপড়ে ফেলবে শিল্প, উপশিলা
ঘর, বাড়ি ;
সে-তো ফিরবেই তার স্বধর্মে
স্বাধীন, রুদ্র, ভয়ঙ্কর।

মানুষের কাজ ছিল পাহারা দেবার
কাজ ছিল
শাসনের ; বুভুক্ষু নদীর গর্জন
তার চেয়ে জোরে ছিল, প্রলয়ের মুখোমুখি
উচ্চকণ্ঠে এ কথাটি জানিয়ে দেওয়ার।

কাজ ছিল সহোদর মানুষের পিছে
নিশাচরী, পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া থেকে
দুদণ্ড বিরত থেকে
তাদের পিছনে গোয়েন্দা রাখা ;
কাজ ছিল
কলকারখানায় মানুষের জন্য শিকল বেড়ীর
অর্ডার কমিয়ে
আরো শক্ত নদীর শিকল তৈরি করা।

মানুষের কাজ ছিল
উলঙ্গ, বুভুক্ষু সহোদরদের মিছিলকে ঠাণ্ডা করার
কুৎসিত নিয়ম থেকে উঠে এসে
সমস্ত চেতনা কেন্দ্রীভূত করে স্বাধীন সহর, গ্রাম
গড়ে তোলা
যা দুর্ভেদ্য, স্বেচ্ছাচারী প্রকৃতির প্রচণ্ড মারে-ও।

কিন্তু লঙ্গরখানা এবং শৃঙ্খল তৈরি করা ছাড়া
স্বাধীন ভারতবর্ষে
মানুষের আর কোনো কাজ নেই ;
অন্য কিছু হারাবারও নেই।

[illegible]

[illegible]

অনুভবে দেখি তারে, এইখানে
হৃদয়ের ভিতরে বাইরে
চিরন্তন তরঙ্গ বিস্তার
উচ্ছ্বলিত রূপোলি হাসির
বিমুগ্ধ ঝর্ণার মতো অবারিত
মোহিনী বিস্তার।

প্রিয়সখি ব্যবহারে, যেন এক
নতুন কিশোরী
দেখেছি বিস্মিত চোখে রাত্রিদিন
গভীর নিস্বন
চলা তার যেন ক্ষুধা, প্রমত্ত প্যাশন
উৎসারিত সুখে।

তারে দেখি অন্যরূপে ক্ষুধার্ত
বাঘিনী যেন
হা হা শব্দে উচ্চকিত
হৃদয়ের বাসা-বাড়ি, হানা দেয়
প্রাণেরও শিকড়ে
কী দুরন্ত খেলার মত্ততা।

বনস্পতি ভাসে বুকে এবং তৃণও
খেলাচ্ছলে যেন বা পুতুল
করতালি দিয়ে নাচে দুই ধারে
এমনি প্রকৃতি।

তার কাছে আজ সব অচেনা পড়শী
হাসি নেই সে উজ্জ্বল মুখে
কাঁদাতেই তার সুখ, হৃদয়ের
এত কাছে থেকে—
বানভাসি মানুষের ঘর-বাড়ি ভালবাসা
ভেঙে দিয়ে, নিজেকেই সে মোহিনী
শুধু ভালবাসে।

ব্যর্থ হইয়াছে, ভারতে থাকিয়া আর কিছু করা সম্ভবপর নয়, তাহার ভারতে থাকাও নিরাপদ নয়, তিনি স্থির করিলেন, ভারতের বাহিরে যাইবেন, সেখানে গিয়া যদি কিছু করিতে পারেন। তিনি জাপান রওয়ানা হইলেন। তিনি কলিকাতা বন্দর হইতে জাপানী জাহাজে রওয়ানা হইলেন, তাঁহাকে বিদায় দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন, পলাতক বিপ্লবী নেতা শচীন্দ্রনাথ সান্যাল এবং পলাতক বিপ্লবী গিরিজা দত্ত। বিদায়ের সময় সকলের চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, করুণ দৃশ্য। বেনারস ষড়যন্ত্র মামলায় শচীন্দ্রনাথ সান্যালের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইয়াছিল এবং তিনি আন্দামান সেলুলার জেলে প্রেরিত হইয়াছিলেন। রাসবিহারী বসু নিরাপদে জাপান পৌঁছিলেন। তিনি টোকিও শহরে এক হোটেলে উঠিলেন। বৃটিশ গভর্নমেন্ট যখন খবর পাইল, রাসবিহারী বসু গভর্নমেন্টকে ফাঁকি দিয়া জাপান পৌঁছিয়াছেন, তখন বৃটিশ গভর্নমেন্ট তাহার মিত্র জাপান গভর্নমেন্টের নিকট অনুরোধ জানাইল, রাসবিহারী বসুকে বৃটিশ গভর্নমেন্টের হাতে সমর্পণ করিতে। জাপান গভর্নমেন্ট কতকটা রাজী ছিল, এমন সময় জাপানের একটি প্রসিদ্ধ কাগজ রাসবিহারী বসুকে বৃটিশের হাতে সমর্পণের বিরুদ্ধে এরূপ তীব্র সমালোচনা করিতে লাগিল, যাহার ফলে জাপান গভর্নমেন্ট রাসবিহারী বসুকে বৃটিশের হাতে সমর্পণ করিতে সাহসী হইল না। রাসবিহারী বসু জাপানের নাগরিক হইলেন এবং উক্ত সংবাদপত্রের সম্পাদকের কন্যাকে বিবাহ করিলেন। রাসবিহারী বসু জাপানে নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকেন নাই, ভারতের স্বাধীনতার কাজে মগ্ন হইলেন, জনমত গঠন করিতে লাগিলেন। সুযোগ পাইলেন দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের সময়। ("জেলে ত্রিশ বছর ও ভারতের বিপ্লব সংগ্রাম" দ্রষ্টব্য)। তিনি বৃটিশের পরাজিত ও বন্দী ভারতীয় সৈন্যদিগকে লইয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিলেন, তাঁহারই চেষ্টায় সুভাষচন্দ্র বসু জার্মানী হইতে জাপানে নীত হইলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের এক সভায় রাসবিহারী বসুর সভাপতিত্বে সুভাষচন্দ্র বসুকে রাসবিহারী বসু প্রকাশ্য ঘোষণায় নেতা পদে বরণ করেন। রাসবিহারী বসু বলেন, "আজ হইতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আমাদের নেতা, তিনি আমা অপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি, আমি তাহার সহকর্মী হিসাবে ভারতের স্বাধীনতার কাজে অগ্রসর হইব।" রাসবিহারী বসু নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে মাল্যভূষিত করেন। জাপানী ফৌজের সহযোগিতায় আজাদ হিন্দ ফৌজ যখন ব্রহ্মদেশ দখল করে, সেই আক্রমণকারী ফৌজের সহিত রাসবিহারী বসুর পুত্র লেফটেনেন্ট ভারতচন্দ্র বসু ছিলেন। রাসবিহারী বসুও ব্রহ্মদেশে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সহিত আসিয়াছিলেন। আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে মুসলমান সৈন্যই অধিক ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন মেজর জেনারেল শাহ-নেওয়াজ। [ক্রমশঃ]

পশ্চিমবঙ্গের প্লাবন সমস্যা

কপিল ভট্টাচার্য

নদ-নদীই বাংলা দেশের বৈশিষ্ট্য। বাংলা দেশের কোনও অংশকেই নদ-নদী বাদ দিয়ে কল্পনাই করা যায় না। আর বাংলা দেশের মনের ছবি এখানকার কবিরা চিরদিনই নদ-নদীকে অবলম্বন করেই ফুটিয়ে তুলেছেন। ছড়ায়-গানে, কিংবদন্তীতে কাব্যে, মহাকাব্যে বাংলা দেশের রূপ যে নানাভাবে নদ-নদীর ছবি দিয়ে আঁকা তা কোনও বাঙালীকে মনে করিয়ে দিতে হয় না। সুতরাং বাংলা দেশকে চিনতে হ'লে তার নদ-নদীকে চিনতেই হবে।

পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর জেলার প্রধান অংশ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, বর্ধমান জেলার আংশিক ভূ-ভাগ বৃষ্টি, বায়ু ও হিমবাহ দ্বারা বাহিত মাটি দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। অবশিষ্ট বাংলা দেশের ভূ-ভাগ নদ-নদীর দ্বারাই গঠিত। দক্ষিণাংশে এই ভূ-ভাগ গঠনের কাজ অদ্যাপি চলেছে। উত্তরাংশে নদ-নদীর প্লাবন এই গঠনের অদল বদল করতে প্রতি বৎসরই চেষ্টা করে। নদ-নদী থেকেই বাংলা দেশের জন্ম, তাই বাংলা দেশ নদীমাতৃক। এখানকার মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে নদী কৃষিভূমিকে সরস রেখে। অধুনা শিল্পাঞ্চলে হুগলীর মত নদীর জল দূষিত হ'য়ে মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছে। মাঝে মাঝে মহাপ্লাবনে ঘরবাড়ি শস্যক্ষেত্র ভাসিয়ে, ধনসম্পদ বিনষ্ট করে বহুসংখ্যক মানুষের প্রাণহানিও ঘটায়।

পশ্চিমবঙ্গের ময়ূরাক্ষী অজয় দামোদর রূপনারায়ণ ও কংসাবতীর প্লাবন যতটা শস্যহানি ও ঘরবাড়ি ধ্বংস করে, ততটা প্রাণহানি করে না। দামোদর ও কংসাবতী পরিকল্পনায় ভুল ত্রুটির জন্যে প্লাবনের ভয়াবহতা যে বৃদ্ধি পাবে, সে কথা আমরা পূর্বাহ্নেই জানিয়েছিলাম। ভ্রান্ত নদী পরিকল্পনার ফলে আজ পশ্চিমবঙ্গে চিরদুর্ভিক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্লাবনের জলে ডুবে না মরলেও এখানকার অধিকাংশ মানুষ জীবন্মৃত দশায় রয়েছে বিগত দুই দশক ধরে। এ-দশা থেকে তাদের নিস্তারের উপায় দেখা যাচ্ছে না। নদী-পরিকল্পনার ভুলের মাশুল গুণতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, কংসাবতী ও সুবর্ণরেখা প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গের নদ-নদীগুলি শুধুমাত্র বর্ষাকালে ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলের অববাহিকায় বৃষ্টির জলের বন্যা আনে। সুবর্ণরেখা উড়িষ্যার উপকূলে সমুদ্রে পড়েছে। বাকি নদ-নদী সবাই ভাগীরথী-হুগলীর উপনদী। দামোদর, রূপনারায়ণ ও কংসাবতীর নিম্নাংশে সমুদ্রের জোয়ারের জল উজানে বয়। এই শেষোক্ত নদীগুলির উপত্যকায় পরিকল্পনার বাঁধ নির্মাণের সময়, আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও, এই মূল তথ্যটিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। বহুমুখী পরিকল্পনায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ও জলাধারে মৎস্য চাষকে প্রাধান্য দিয়ে এই নদীগুলির খাতে সারা বছর জলপ্রবাহের অব্যাহত ব্যবস্থা করে নাব্য জলপথ সৃষ্টি করা উচিত ছিল। খাল মারফৎ সেচের কাজ যথাসম্ভব বর্জন করা উচিত ছিল। ফলে এই নদ-নদীগুলির জল নিকাশ ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ না করে এরা বছর বছর বন্যা বিতরণ করছে। উত্তরোত্তর প্লাবনের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিকল্পনার পূর্বকালে যে প্লাবনের জল ২।৩ দিন থাকতো, এখন সেটা ২০।২৫ দিনেও নামে না। পরিকল্পনার ভুলের ফলে নিম্নহুগলীর জল নিকাশ ক্ষমতা যে কতটা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, সেটা পরিলক্ষিত হয়েছিল ১৯৫৯ এর প্লাবনে যখন ১০৯৩০ বর্গমাইল এলাকার (সমগ্র পঃ বঙ্গের প্রায় এক তৃতীয়াংশ) জল বহুদিন ধরে দাঁড়িয়েছিল, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী, হাওড়া ও ২৪ পরগনার বিস্তৃত অঞ্চল ডুবিয়ে রেখে। নিম্নহুগলীর নাব্যতা ধ্বংস হ'য়ে গিয়েছে, কলিকাতা বন্দরে আর বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজ যাতায়াত করতে পারে না। হলদিয়ায় নতুন বন্দর পত্তন করতেই হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের এমনি দুর্দশা যে হবে, সে কথা দৃঢ় ভাষায় বার বার বলে আমরা কর্তৃপক্ষকে সাবধান করেছিলাম। কিন্তু আমাদের কথায় কেউ কর্ণপাত করেন নি। তাই আজ আর দুর্ভোগের পরিসীমা নেই।

উত্তরবঙ্গের সমস্ত নদীই (এমন কি ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত) গঙ্গা-পদ্মার উপনদী। মানচিত্রে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে পরপর সাজানো হিমালয়জাত এই সব উপনদীর নাম—মহানন্দা, পুনর্ভবা, আত্রাই, যমুনা-নাগর সংযুক্ত হ'য়ে বরাল নদী এবং করতোয়া। আর একটি প্রধান নদী তিস্তা বা ত্রিস্রোতা। মহানন্দা করতোয়া ছাড়া অপর কয়টি নদী ব্রহ্মপুত্রে পড়ে গঙ্গা-প্রবাহে মিলিত হয়েছে। মহানন্দা ছাড়া সবকয়টি নদীই ভারতরাষ্ট্র ত্যাগ করে পূর্ব-পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে। দার্জিলিং-জলপাইগুড়ি জেলার প্রলয়ঙ্করী তিস্তা নদীর শেষাংশ পূর্ব পাকিস্তানে। ব্রহ্মপুত্র তার বিশালতার জন্যে স্বতন্ত্র নদ হিসেবেই পরিচিত—আসাম থেকে নির্গত হ'য়ে সরাসরি পূর্ব পাকিস্তানে নেমেছে। বৈজ্ঞানিক আলোচনার জন্যে পূর্ব-পাকিস্তানকে পূর্বতন সমগ্র বাংলা দেশ ভাবেই বিবেচনা করা উচিত। কারণ, সুষ্ঠু নদী পরিকল্পনায় সার্থকতা পেতে হ'লে সমতল বাংলায় (সেটা পূর্ব-পাকিস্তান রাষ্ট্র হ'লেও) তাদের নিম্নাংশের অবস্থিতি উপেক্ষা করবার উপায় নেই।

ব্রহ্মপুত্রকে গঙ্গা-পদ্মার উপনদীরূপে গণ্য করাই ভালো। বর্তমানে যেখানে ব্রহ্মপুত্র বাংলা দেশে প্রবাহিত হচ্ছে তার স্থানীয় নাম যমুনা। ঢাকা জেলায় ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত লক্ষ্যা বা শীতলক্ষ্যা নামে পরিচিত। মেঘনা ও গোমতী নদী পূর্ব-ভারতের পাহাড় থেকে নির্গত হ'য়ে পদ্মায় মিশেছে। পূর্বাঞ্চলের পাহাড় থেকে আরও কয়েকটি ছোট ছোট উপনদী একেবারে পদ্মার মোহানার কাছে মিশেছে। মেঘনা, পদ্মা ও শীতলক্ষ্যায় সমুদ্রের জোয়ার ভাটা খেলে।

উত্তরবঙ্গের নদীগুলির বন্যা-নিয়ন্ত্রণে সাফল্য অর্জন করতে হ'লে উল্লিখিত সমস্ত নদীর অবস্থিতি ও বছরের

বিভিন্ন সময়ে তাদের খাতে জলপ্রবাহের অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়। মনে রাখতে হবে, ভারত-পাকিস্তান মহাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বর্ষা নামে মে মাসের শেষ সপ্তাহেই। ক্রমশ বর্ষা পশ্চিমে অগ্রসর হয় আর জুন মাসে প্রথম দুই সপ্তাহের মধ্যেই উত্তর-বঙ্গে উপস্থিত হয় আর অক্টোবর মাস পর্যন্ত হিমালয়ের সানুদেশে ও উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। যদিও মাঝে মাঝে বিরতি থাকে তবুও বৃষ্টিপাত নিরবচ্ছিন্ন বলেই ধরা যেতে পারে। এদিকে জুন মাসের শেষদিকে বিশেষ করে জুলাই মাস থেকে বিহারে ও উত্তরপ্রদেশে প্রবল বর্ষণ আরম্ভ হয়। সেই বর্ষণের জল গঙ্গা-পদ্মার খাত পূর্ণ করে রাখে অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত। কাজেই, সবদিক দিয়ে হিসেব করলে সহজেই বোঝা যায়, উত্তরবঙ্গের বন্যা-নিয়ন্ত্রণের সুষ্ঠু পরিকল্পনা মোটেই সহজ-সাধ্য নয়। বর্তমান বৎসরে উত্তরবঙ্গের বন্যা হয়েছে অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে, হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাত ও ধস নামার ফলে জলপাইগুড়ি জেলার ওপর বন্যার প্রলয়ঙ্করী লীলায় সহস্র সহস্র মানুষের জীবনহানি হয়েছে। বাংলা দেশের সমস্ত মানুষই আজ গভীর শোকে আচ্ছন্ন। কিন্তু এই বন্যা যদি আগস্ট-সেপ্টেম্বরে নামতো, তাহলে তার ধ্বংস-করী শক্তি আরও তীব্রতররূপে দেখা দিতো। কারণ অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে ব্রহ্মপুত্র শীতলক্ষ্যা ততটা "ভরানদী ক্ষুর-ধারা খরপরশা" ছিল না। কাজেই তিস্তার বন্যার জল ২৪ ঘণ্টাতেই দ্রুত নেমে যেতে পেরেছে। ওই সময়ের কোশী ও মহা-নন্দার বন্যাও গঙ্গা সহজেই টেনে নিতে পেরেছে নতুবা উত্তর বিহারে ও মালদহ-পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অবস্থা আরও সাংঘাতিক হয়ে যেতো।

আজ সকলের কাছে একথা সুস্পষ্ট যে, তিস্তার বন্যায় এ বছর জলপাইগুড়ি শহরে ও জেলায় যে প্রাণহানি ঘটেছে, তার প্রধান কারণ সময়োচিত সাবধানতা অবলম্বিত হয় নি বলে। নদীর ধারে বাঁধের আড়ালটিতে অত্যধিক আস্থা রেখে জনসাধারণ নিরাপত্তার আশ্বাসে নিশ্চিন্ত হতে শিখেছে। কিন্তু তিস্তার মত নদীতে উঁচু বাঁধের আড়াল যে নদীগর্ভ উচ্চতর করে উচ্চতর বন্যা সৃষ্টি করতে সাহায্য করছে সে কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। হিমালয়ের নদীগুলি উত্তরবঙ্গে দ্রুত ঢাল থেকে অকস্মাৎ উত্তরবঙ্গে সমতল ঢালে নেমেছে। তাছাড়া অত্যধিক বৃষ্টি-পাতের জল সমস্ত ডুয়ার্স অঞ্চলটির ভূমি অবলম্বন করে প্রবাহিত হয়। সে জল নিকাশে রাস্তা ও রেলপথের বাঁধের বাধা সমস্ত অঞ্চলটিকেই বৃহৎ হ্রদ বা সমুদ্রে পরিণত করে দেয়। নদীগর্ভে পোস্তা গেঁথে সেতু নির্মাণের ফলে যে নদীগর্ভ ভরাট হয়ে যায় সে কথাও অজানা নয়। অথচ বৃটিশ আমল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে সেই একই ভুলের নিরবচ্ছিন্ন পুনরাবৃত্তি চলেছে। কাজেই প্রতিটি পরবর্তী বন্যা যে পূর্ব-বর্তী বন্যার চেয়ে ভীষণতর হবে, তাতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে?

এ বছরের বন্যার পরে বন্যা-প্রতি-কারের নানা জল্পনা-কল্পনা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী ডঃ কে এল রাও (স্বয়ং একজন বিশিষ্ট নদী বিশেষজ্ঞ) আমেরি-কায় ছুটেছেন, মিসিসিপির বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে যাতে সে ব্যবস্থা ব্রহ্মপুত্রে প্রয়োগ করা যায়। অথচ নদ-নদী সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ যে মিসিসিপি নদীর শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে আজও অজ্ঞ, সেকথা বিশ্বাস করবো কি করে? সেখানে যে রি-ইনফোর্সড্ কংক্রিটের পাইল ঠুকতে কোটি কোটি ডলার ব্যয়িত হয়েছে, সে অর্থ-সামর্থ্য আমাদের কোথায়? আমরা বহু পূর্বেই জানিয়েছি, আমাদের দেশের সহজলভ্য বাঁশ ও শালের খুঁটি দিয়েও নদী-শাসন করা সম্ভব। সে কথা কে শোনে?

টেনেসিভ্যালি পরিকল্পনার অন্ধ অনুকরণে দামোদর পরিকল্পনায় পশ্চিম-বঙ্গের দক্ষিণাংশের সর্বনাশ হয়েছে, কলিকাতা বন্দর অবধি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আবার মিসিসিপি নদী শাসন পদ্ধতির কবলে ছায়া যদি আসাম উত্তরবঙ্গ ও বিহারের নদীতে এসে পড়ে তাহলে এদেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হবেই।

যতদিন ক্ষমতাসীন বাক্তিবর্গ বন্যার ধ্বংসলীলার পরে বন্যা-প্রতিকার পরি-কল্পনার নামে অঢেল অর্থব্যয়ের দিকে লোলুপ নয়নে তাকিয়ে থাকবেন, ততদিন দেশের মানুষের নিস্তার নেই। কারণ, দেশের সামর্থ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুষ্ঠু পরিকল্পনা এঁদের মাথায় আসবে না। উত্তরবঙ্গের নদীগুলির জল নিকাশী ব্যবস্থা উন্নয়ন করতে যে নদী শাসনপদ্ধতি অবলম্বিত হওয়া উচিত তা আমাদের সামর্থ্যের বাইরে নয়। তবে সমগ্রভাবে বন্যার কবল থেকে এ অঞ্চলকে রক্ষা করা সহজসাধ্য নয়। সড়কগুলিতে স্থানে স্থানে কজওয়ে ভাঙাডাকা নির্মাণ করে এবং নদীগর্ভে পোস্তা না গেঁথে সেতু নির্মাণ করে বর্ষার জলপ্রবাহের অবাধ পথ খোলা রাখা দরকার। সুষ্ঠু নদী-শাসনপদ্ধতিতে নদীগর্ভ সহজেই গভীর-তর করা যায়। নদীর উচ্চতর অংশ সাহিত্য শিলাস্তূপের সাহায্যে দুই কাজ রিভেটমেন্ট করা যায়, লোহার তারের জালে তাদের আবদ্ধ রেখে। এর ফলে নদীর খাত পরিবর্তনে বাধা পড়বে এবং নদী স্বখাতে বইবে। কিন্তু নিম্নাঞ্চলে পূর্ব-পাকিস্তানেও, নদী খাত উন্নয়ন না হলে, এ-সমস্ত কাজই বৃথা যাবে। সুতরাং উত্তরবঙ্গের বন্যা প্রতিকারের জন্যে পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ণ সহযোগিতা পেতেই হবে। সহযোগিতা না করলে সেখানেও ক্ষয়ক্ষতিও হবে অপরিসীম।

গঙ্গায় ফরাক্কা ব্যারেজ পরিকল্পনার সময়ে ভারত একপক্ষীয় নীতি অবলম্বন করেছিল। ফলে পাকিস্তান এখন এক-পক্ষীয় নীতি অবলম্বন করে ফরাক্কা ব্যারেজের কয়েক মাইল দক্ষিণে পদ্মা-কবোতক পরিকল্পনা রূপায়িত করতে উৎসুক। ব্রহ্মপুত্র (যমুনা) নদের উদ্বৃত্ত জল এনে ফরাক্কা ব্যারেজ ও পাকিস্তানি ব্যারেজের মধ্যে হ্রদ সৃষ্টি করা হবে। অত্যধিক বন্যার জল নিকাশ করতে ভৈরব, জলাঙ্গী, মাথাভাঙা, ইছামতীর খাতে চালাতে হবে। ফলে পশ্চিমবঙ্গে নদীয়া ও চব্বিশ পরগনা জেলায় ভয়াবহ বন্যা দেখা দিতে পারে। এমন কি খাস কলকাতা মহানগরীও অকস্মাৎ গভীর বন্যার জলে ডুবে যেতে পারে।

ফরাক্কা ব্যারেজের ফলে বিহারে ও পশ্চিমবঙ্গের মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় যে প্রতিবছর ভয়াবহ প্লাবন দেখা দেবে সে কথা আমরা বার বার দৃঢ় ভাষায় জানিয়েছি। অর্ধসমাপ্ত ফরাক্কা ব্যারেজ এখনই তার ইঙ্গিত দিচ্ছে। তাছাড়া ফরাক্কা ব্যারেজের সহায়তায় ভাগীরথীতে গঙ্গার জল অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে যে কলকাতা বন্দরকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো যাবে না সে কথাও বারংবার বলেছি। গঙ্গা পারাপারের জন্যে রেল ও সড়কপথের যে সেতু নির্মিত হচ্ছে ফরাক্কা ব্যারেজের ওপর দিয়ে তার পরিবর্তে অনেক অল্প-ব্যয়ে সুড়ঙ্গ পথ নির্মাণ করা যেতো। আমরা দুটি কিলোমিটার দিছ, মাত্র ৪।৫ কোটি টাকা ব্যয়ে সুড়ঙ্গ পথ নির্মাণ করা যেত গঙ্গার নিচে গঙ্গার জলপ্রবাহ অব্যাহত রেখে।

দেশের মানুষেরা যেমন দাম দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন, নদ-নদীর খাত মজালেও তাঁদের আপাতত ক্ষতি হয় না। প্লাবনের প্রকোপে দরিদ্র সাধারণ মানুষ শুধু প্রাণেই মারা যায় না তাদের বৃত্তি রোজগারের পথও নষ্ট হয়, তাঁদের ফের দয়া দাক্ষিণ্য নির্ভর করে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে যায় তাদের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। এইভাবে মানুষ নষ্ট হলে দেশের আর কি থাকে? সুষ্ঠু বিজ্ঞান-সম্মত বন্যা প্রতিকার ব্যবস্থা যে দেশের পক্ষে কতোদূর গুরুত্বপূর্ণ কাজ তা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি।
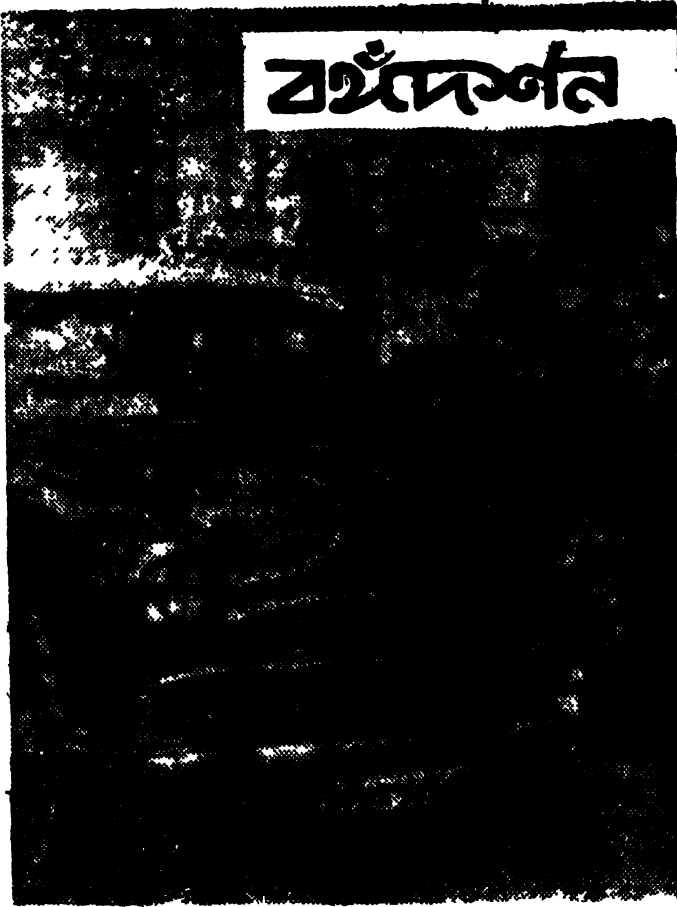
বন্যার্তদের পুনর্বাসনে সরকারের চরম ঔদাসীন্য। জলপাইগুড়ির সরকারী কর্মকর্তাদের বদলি দাবী। বন্যার্ত শিবিরে কান্নার রোল। হাজার হাজার বন্যার্তের বিক্ষোভ জলপাইগুড়িতে রিলিফের ভাল ব্যবস্থা এখনও হয়নি। উত্তর বাংলার নদী শাসন প্রকল্পগুলো কি এখনও ফাইল চাপা থাকবে। রাষ্ট্রপতি শাসনে একশ চৌদ্দ দিনের মাথায় কলকাতায় দিনদুপুরে আর একটি দুঃসাহসিক ডাকাতি।

যেখানে পরিস্থিতি এইরকম সেখানে আকাশবাণী মারফত চালাও রিলিফের সংবাদ প্রচারে বা সংবাদপত্রে সরকারী পরিকল্পনার বড় বড় ফিরিস্তি প্রকাশেই বন্যাক্রিষ্ট মানুষদের দুর্গতি ঘুচবে না, এ তো জানা কথাই।

জলপাইগুড়িতে প্রধানমন্ত্রী

সরকারী ঘোষণায় প্রকাশ যে, জলপাইগুড়ির অবস্থা নাকি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। আকাশবাণী মারফত এরকম খবর প্রতিনিয়তই শোনানো হচ্ছে, ফলে কেউ কেউ ভাবছেন বুঝি এতদিনে সরকারী কর্মকর্তারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসেছেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থা যে কে সেই। শুধুমাত্র সরকারী ঘোষণার দ্বারাই যদি কাজ হত তাহলে বোধহয় কোন সমস্যাই থাকত না। জলপাইগুড়ির প্রধান বাজারের নাম দিনবাজার। আজও সেখানে দু' ফুট কাদা, সেখানে প্রবেশ করাই দুঃসাধ্য, সুতরাং দোকান-বাজার চলছে এ দাবি সরকার কিভাবে করতে পারেন? জলপাইগুড়িতে আজও পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ, কোন গৃহেই আলো জ্বলে না, পৌরসভা জল সরবরাহেও ব্যর্থ অতএব পানীয় জল পাওয়াও দুষ্কর। বিদ্যুতের অভাবে গমের কল চালের কল বন্ধ। সরকারী সাহায্য হিসাবে মাথাপিছু দৈনিক একশো গ্রাম করে চাল দেওয়া হচ্ছে বটে কিন্তু তা ফুটিয়ে খাবারও উপায় নেই, কেন না কয়লা নেই কেরোসিন নেই, হাঁড়িকুঁড়ি, থালাবাসনও নেই। তদুপরি ইতিমধ্যেই শীত পড়ে গেছে, অথচ পরিধেয় নেই বললেই চলে।

এদিকে এই সুযোগে কিছু লোক দু' পয়সা ভালই রোজগার করছে। শিলিগুড়ি থেকে জিনিস এনে কতিপয় অসৎ ব্যবসায়ী দ্বিগুণ এমন কি চতুর্গুণ মূল্যেও তা বিক্রী করছে। পৌরসভার ধাঙড়দের হয়েছে পোয়া বারো, এক-একটা মরা গরু সরাতে এরা মোটা টাকা আদায় করছে, হিন্দুস্থানী শ্রমিকরাও এক-একটি গৃহকে পলিমুক্ত করতে মোটা টাকা নিচ্ছে। অথচ এরা সকলেই বেতনভোগী কর্মচারী, এগুলিই তাদের কাজ। তারা মাইনেও নিচ্ছে উপরি আদায়ও করছে, আবার সরকারী সাহায্য গ্রহণ করছে।

বড় বড় ঘোষণা ছাড়া সরকারী তরফ থেকে সত্যিকারের কাজের কিছু করা হচ্ছে কি না সে বিষয়ে রীতিমত সন্দেহ দেখা দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার রিলিফ ও পুনর্গঠনের কাজে সর্বতোভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতিকে কার্যে রূপান্তরিত করার মত কোন সংগঠন গড়ে তোলা হয় নি। রিলিফকে রাজনীতির কাজে লাগানো হচ্ছে বলে প্রকাশ্যেই অভিযোগ উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন, গভর্নমেন্ট রিলিফ বিতরণের নামে একটি বিশেষ দলকে চাঙ্গা করে তোলবার চেষ্টা করছেন। রাজ্যের ভয়াবহ বন্যার পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য সর্বদলীয় প্রচেষ্টা প্রয়োজন। কিন্তু সরকার নির্বাচন সামনে রেখে কোন একটি দলকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য অনুগ্রহ বিতরণ করে চলেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বৃহস্পতিবার ২৭শে অক্টোবর বন্যাবিধ্বস্ত জলপাইগুড়ি শহর পরিদর্শনে গেলে শত শত বন্যাপীড়িত নরনারী তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ক্যাম্পাসে তাঁর হেলিকপ্টার অবতরণ করলে সেখানে সমবেত লোকজন তাঁর বিরুদ্ধে নিপাত যাক ধ্বনি দিতে থাকে। সেখান থেকে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোয় আসার পথে কয়েক স্থানে তাঁর প্রতি কালো পতাকা প্রদর্শিত হয়। বাংলোয় তিনি উপস্থিত হলে একটি বিরাট মিছিল সেখানে হাজির হয় এবং পুলিশ তাদের গতিরোধ করে। জনতা নানাপ্রকার ধ্বনি দিতে থাকে। রিলিফ ও পুনর্বাসনের ব্যাপারে সরকার কি করছেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে শোনবার জন্য জনতা দাবি জানাতে থাকে। একজন পুলিশ অফিসার এসে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এখন বাইরে আসার সময় নেই। তখন কয়েকজন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান। এই অবস্থায় পুলিশ জনতার উপর বেপরোয়া লাঠি চালায়। পুলিশের লাঠিচার্জে কমপক্ষে ৫০ জন আহত হয়। এই ঘটনাটিকে মোটেই লঘু করে দেখা উচিত নয়। শ্রীমতী গান্ধী এই বিক্ষোভ প্রদর্শনকে ছেলেমানুষী বলে উপেক্ষা করে সঙ্গত করেছেন, কিন্তু মোরারজী দেশাই তাঁর

অভিজ্ঞতার বিবরাটির প্রত্যেক ও জনসাধারণের ক্ষোভ সার্থকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

আবার খাদ্য প্রসঙ্গ

গত বছর ২১শে নভেম্বর তারিখে যুক্তফ্রন্ট সরকারের উচ্ছেদ হয়েছিল, ঠিক সেই সময় উক্ত সরকার ১০ লক্ষ টন ধান সংগ্রহের জন্য একটি বিস্তৃত কার্যসূচী গ্রহণ করেছিলেন, বোধ হয় সেইটাই যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের অন্যতম কারণ ছিল। কেন না পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ধান-চালের রাজনীতি।

ধান-চাল সংগ্রহের অপ্রিয় ব্যাপারটাকে এড়াবার জন্যই এবারে কতিপয় রাজনৈতিক দল নভেম্বরের পরিবর্তে ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচনের দাবি জানিয়েছিলেন, জলপাইগুড়ির বন্যায় অবশ্য তাঁদের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে।

এখন ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনের পর যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, তার পক্ষে গুছিয়ে বসে ধান-চাল সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না, কেন না ততদিনে ধান চাল যথাস্থানে পাচার বা মজুত হয়ে যাবে। বিশেষ করে যদি যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে। তাহলে তাকে সংগ্রহের ব্যাপারে নিদারুণ সংকটে পড়তে হবে। এ কথা ভেবেই যুক্তফ্রন্টের তরফ থেকে নভেম্বরে নির্বাচনের দাবি উঠেছিল।

সে যাই হোক যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, ফেব্রুয়ারীর পর সংগ্রহকার্য সম্ভবপর হবে না বলে তা আগে থেকেই করা প্রয়োজন। রাজ্যপালের প্রশাসন সাড়ে চার লক্ষ টন চাল সংগ্রহের একটা পরিকল্পনা নিয়েছেন সত্য কিন্তু এই অল্পসংগ্রহে নির্ভর রেশনিং চালু রাখা যাবে তা বুঝতে পারা কষ্টকর। মনে রাখতে হবে গত বছর পর্যাপ্ত ফলন সত্ত্বেও রেশনে মানুষকে প্রয়োজনীয় চাল দেওয়া হয় নি পর্যাপ্ত ফলনের ছত্রেও তাকে কালবাজার থেকে চাল কিনতে হয়েছে ও হচ্ছে। এ বছরেও ফসল ভাল হবার আশা আছে। কাজেই জনসাধারণ সঙ্গত কারণেই এবার রেশনে পেট ভরাবার মত চাল দাবি করতে পারেন। কিন্তু সংগ্রহের যা টার্গেট তাতে দেখা যাচ্ছে এবারেও চাল নিয়ে চালবাজি চালানো হবে। বর্তমানে রেশনে যে পরিমাণ খাদ্যের যোগান দেওয়া হচ্ছে তাতে পরিষ্কারই বলা হচ্ছে যে কালবাজার থেকে কিনে বাকিটা পুষিয়ে নাও। প্রাচুর্যের বছরেই এই অবস্থা যদি হয় তা হলে বুঝতে হবে দেশের লোককে অন্ন যোগানোর চেয়ে খাদ্য নিয়ে রাজনীতি করাটাই বোধ হয় বেশি কাম্য।

জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ-প্রাঙ্গণে বিক্ষুব্ধ জনতা শ্রীমতী গান্ধীকে ঘিরে ধরে

কাজেই সংগ্রহের পরিমাণকে আরও অনেক বাড়াতে হবে। বারান্তরে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হবে।

আইন শৃংখলার গঙ্গাযাত্রা

পার্ক স্ট্রীটের ডাকাতির কোন কিছুরই হদিশ পুলিশ করতে অপারগ হল এবং পুলিশকে ব্যঙ্গ করেই যেন গত ২৩শে অক্টোবর তারিখে সদর স্ট্রীটে আরও একটা বিরাট ডাকাতি হয়ে গেল। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমল হলে বোধ হয় এতক্ষণ ত্রাহি ত্রাহি রব উঠত আইন শৃংখলার গঙ্গাযাত্রা হয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে খাস কলকাতা শহরে প্রকাশ্য দিবালোকে যখন একের পর এক এই জাতীয় ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তখন কি এই সিদ্ধান্তটাই অনিবার্য হয়ে ওঠে না যে এখানকার প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর কারুরই কোন আস্থা নেই যে যা খুশি তাই করতে পারে। ১৯৬৭ সাল থেকে ১৯৬৮ সালের অক্টোবরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে মোট ১৪৮৭টি ডাকাতি ও রাহাজানি ঘটেছে, নগদে ও সম্পত্তিতে প্রায় দুই কোটি টাকা গেছে পঞ্চাশ জন লোকের প্রাণহানি ঘটেছে। এ বছরের প্রথম পাঁচ মাসে খোদ রাজ্যপাল ধরমবীরের আমলে ডাকাতি হয়েছে ৪৩৫টি। অর্থাৎ আইন ও শৃংখলা, যা রক্ষার জন্য কর্তাদের নাকি মাথাব্যথার অন্ত নেই তার্কত্র একটা তামাশার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। পুলিশ যদি মানুষের ধনপ্রাণ সম্পত্তির নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি না রেখে [illegible] পুলিশকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে নিযুক্ত করা হয় অথবা চালানো [illegible] ধরার [illegible] তাহলে সে তাব [illegible] এরকম [illegible] চলতে এই স্বাভাবিক। [illegible] পুলিশ [illegible] হয়েছে [illegible] এই হচ্ছে এই যে [illegible] আসল কর্তব্য থেকে [illegible] হয়েছে। [illegible] উপর পুলিশ চালানো প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের পিছনে লেগে থাকা [illegible] এমন কোন ক্ষেত্র নেই [illegible] পুলিশ নেই শুধু আসল ক্ষেত্র ছাড়া। [illegible] আইন ও শৃংখলাকে [illegible] হয় তাহলে পুলিশের কর্মক্ষমতাকে [illegible] করে তাকে জনগণের ধনপ্রাণের [illegible] রক্ষার দায়িত্বটুকুই অর্পণ করতে হবে। পুলিশী ব্যবস্থারই আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। (২৫।১০।৬৮)

মহা প্রলয়ের পর

সরকারী প্রশাসনিক দপ্তরের কৃপায় পশ্চিমবাংলার সাড়ে ৩ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ১ কোটি মানুষ আজ পথের ভিখারী! পাঁচ জনের সাহায্যই এখন তাদের ভরসা সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। হাওড়া হুগলী, মেদিনীপুর, বর্ধমান, ২৪ পরগনা ও নদীয়ার বন্যায় প্রায় ২০ হাজার বর্গমাইল বিস্তীর্ণ শস্যশ্যামল এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবার উত্তরবঙ্গের বন্যায় প্রায় এগার হাজার বর্গমাইল এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হল। উত্তরবঙ্গে কত হাজার মানুষ যে প্রাণ হারিয়েছে তার হিসেব হয়তো কোনদিনই পাওয়া যাবে না সর্বনাশা বন্যায় কোনক্রমে যাঁরা প্রাণে বেঁচেছেন তাঁদের সংখ্যা আন্দাজ করা হচ্ছে ৫০ লক্ষ আর ওদিকে প্রায় ৬০ লক্ষ। হাওড়া, হুগলী মেদিনীপুর বর্ধমান ২৪ পরগনা ও নদীয়ার ৬০ লক্ষ সর্বহারাদের পুনর্বাসন দেওয়া খুব অসুবিধা হত না যদি সরকার 'নিজের বাড়ি নিজে বানাও" পরিকল্পনায় অবিচল থাকেন। কিন্তু মুস্কিল হবে উত্তরবঙ্গের প্রলয়ের মোকাবিলা করতে। **সরকারের যে অপদার্থ প্রশাসনিক যন্ত্র তাদের দিয়ে যদি এ কাজ করানোর চেষ্টা হয়। তাহলে ৩০ কোটি কেন ৩০০ কোটি টাকা আবার জলের তোড়ে ভেসে যাবে। লোকের আস্থা ছিল সামরিক বাহিনীর লোকজনদের উপর। উত্তরবাংলায় যদি কেন বহিঃশত্রু হানা দিত তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাদের জোয়ানরা কিভাবে সংগ্রাম করতেন তা আমি বলতে পারবো না, কিন্তু মহাশত্রু বন্যার হাত থেকে উত্তরবঙ্গবাসীদের উদ্ধার করার কাজে তাঁদের যে অমিতবিক্রম সকলেই আশা করেছিলেন, তা দেখা যায় নি।** সামরিক আইনকানুনে কি সংজ্ঞা আছে যার জন্য তাঁরা এ কাজের দায়িত্ব পুরাপুরি নিতে পারলেন না সেটা অনেকের কাছে অবোধ্য রয়ে গিয়েছে। **সমগ্র উত্তরবঙ্গের শুধু নিরাপত্তার প্রয়োজনেই নয়, প্রলয়ের পর যে ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করছে তার সর্বাঙ্গীণ মোকাবিলা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে বিশেষ অনুমতিবলে সামরিক বাহিনীর নেওয়া দরকার। উত্তরবঙ্গের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকার পুনর্গঠনের কাজ রাজ্য সরকারের অপদার্থ ও দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসনিক দপ্তরের উপর কখনই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।** আমার বিশ্বাস যদি সামরিক বাহিনীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে উত্তরবঙ্গের পুনর্গঠনের কাজ শুরু করা হয় তাহলে ছ' মাসের মধ্যেই অনেকটা নিশ্চিত ফল আশা করা যাবে।

দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদা শহরাঞ্চলে মোটামুটি সাহায্য এসে পৌঁছচ্ছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলের দিকে বড় একটা লক্ষ্য কারো নেই। পথঘাট অবশ্য সবই দুর্গম, তাছাড়া যেখানেই যাওয়া যায় সর্বত্র পচা মানুষ জন্তুর দুর্গন্ধে কারুর পক্ষে সেবার কাজ চালানোও অসুবিধে। জলপাইগুড়ির মতো শহরে যেখানে বন্যার পর ধরতে গেলে সারা পৃথিবীরই দৃষ্টি পড়েছে সেখানে এখনও মৃতদেহ এখানে-সেখানে পড়ে রয়েছে। সেই ৪ তারিখে বন্যা হয়ে গেছে বিশ দিন পরেও শহরের এই অবস্থা, তাহলে গ্রামগুলি কি অবস্থায় আছে কল্পনা করুন।

সরকারী প্রশাসনিক যন্ত্র কিভাবে দুর্গত মানুষের সেবার কাজ চালাচ্ছেন তার দু-একটা দৃষ্টান্ত দিই। আলিপুরদুয়ারে ফালাকাটার অঞ্চলের সিধাবাড়ি, কাঠালবাড়ির বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল, পাতলাখাওয়া, সিমলাবাড়ি প্রভৃতি গ্রামগুলির এখনও যা অবস্থা রিলিফ যে আসবে বলে তো মনে হয় না। **মাঝে মাঝে বন বিভাগের একটি হাতী যোগ রয়েছে। [illegible], আসামের যোগাযোগের মূল রাস্তাটি ১২টি জায়গায় খাদ হয়ে গেছে, সামরিক বাহিনীর লোকজন একদিন দেখা গেল খাদ ভরাট করছেন, তারপর নিরুদ্দেশ। ফলে লরীতে করে কোন** খাদ্য এখানে আসবে না, রিলিফও আসছে না। এখানকার দুর্গত মানুষগুলিকে বাঁচানোর কি উপায় হবে? পাথরীগুড়ি, মাঝিরডাবরি, বিত্তিবাড়ি, বারুইপাড়া, চকচকা, ছোটদলদলি, দলদলি, দক্ষিণ চ্যাংমারী, হেমাগুড়ি, রাধানগর, পূর্ব-নারার থলি, ফলিমারী, নাজিরাম, দেউতিখাগ, খাগড়ীবাড়ি—এ রকম প্রায় শত শত গ্রাম এখনও শুধু বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়ে নেই—সেখানে সাহায্যও পৌঁছচ্ছে না, আর সেখানকার আধমরা মানুষগুলি রাস্তায় হোগলা খাটিয়ে তার তলায় আশ্রয় নিয়েছে। বলা বাহুল্য ঐ সব গ্রামের শতকরা ৯৫টি বাড়ি মাটিতে মিশে গেছে। কালীখোলাবাজার ও তার উপরের দুটি ভুটানী গ্রামের চিহ্ন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এখানকার ভুটানী অধিবাসীরা বেঁচে আছে কি মরে গেছে কেউ তা বলতে পারছে না। বিড়িবাড়ি, পুখুরীগ্রাম, উত্তর ও মধ্য হলদিবাড়ির বিপন্ন মানুষগুলির কাছে শোনা গেল বন্যার প্রচণ্ড তোড়ে তারা বহু মানুষকে ভেসে যেতে দেখেছেন, জলের এত তোড় যে ইচ্ছে থাকলেও তাদের উদ্ধার করা কারোর পক্ষেই সম্ভব ছিল না।

বন্যাবিপন্ন গ্রামগুলিতে কোথাও আর একটি গবাদি পশু নেই। লাঙ্গল হাল কোথায় যে বন্যার জলে ভেসে গেছে তার হদিসও বোধহয় কোন দিন পাওয়া যাবে না। শস্যভর্তি ক্ষেতের বেশির ভাগই পলি চাপা পড়ে গেছে। পাহাড়ী এলাকার ক্ষেতগুলি থেকে ধসের মাটি সরাতে বুলডোজার ছাড়া আর কেউ পারবে বলে মনে হয় না। কারিগর, রাজমিস্ত্রি, সূত্রধর, কুম্ভকার সব পেশার লোকই এখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে দিন গুণছে—সকলেই নিঃস্ব। বন্যার হাত থেকে এঁরা কোন রকমে বেঁচেছেন এখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে না মরতে হয়। সুষ্ঠুভাবে রিলিফের কাজ যদি চলতো তাহলে হয়তো এ প্রশ্ন উঠতো না। দুর্ভাগ্য এই যে, ৫০ লক্ষ দুর্গত মানুষ একই সাথে রিলিফ সমানভাবে পাবে এমন প্রশাসনিক যন্ত্র আমাদের এদেশে নেই—তাই মানুষের দুর্গতির সীমা নেই, কোন মানুষের এ রাজ্যে স্বস্তিও নেই।

এই যে প্রধানমন্ত্রী উত্তরবঙ্গে এলেন তাঁকে কি দেখানো হল সেই সব এলাকা যেখানে এখনও রিলিফ মোটেই পৌঁছয় নি? যে সব গ্রাম এখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে, যেখানে মরা মানুষ, গরু এখনও সরানো হল না সে সব গ্রামের কথা ভুল করেও কি প্রধানমন্ত্রীর সামনে আমলারা

তুলে ধরতে পারেননি। পারেন নি, পারবেনও না—কারণ তা করতে হলে যে দৃষ্টিভঙ্গীর দরকার সে দৃষ্টিভঙ্গী এদেশের আমলাদের নেই। এঁদের দিয়ে রিলিফ, পুনর্বাসন যে কোন কাজই করানো হোক না কেন দুর্গত মানুষের দুর্গতি আরও বেড়ে যাবে। তাই সঙ্গতভাবেই দাবি উঠেছে যে সব আমলাদের উপর রিলিফের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁদের সরিয়ে নিয়ে এসে যদি সরকারী দপ্তরে দক্ষ ও মানবদরদী আমলা থাকেন তাঁদের সেখানে পাঠানো হোক, না হলে সামরিক বাহিনীর লোকজনদের দিয়ে এ সব কাজ করানো হোক। রিলিফের জন্য খাদ্য ও পানীয় জল সরবরাহ করা তো অপরিহার্য, তার সঙ্গে আর একটি জিনিষ এখনই দরকার—তা'হল শীতবস্ত্র, শীত তো পড়ে গেছে বললেই চলে, আরও উপরে তো বেশ শীত। কাজেই খোলা আকাশের নিচে যারা রয়েছে তাদের জন্য এখনই সাধারণ জামা কাপড়ের চেয়ে শীতবস্ত্র পাঠানো দরকার। আমার বিশ্বাস হয়তো কিছু দেরি হতে পারে, কিন্তু প্রধান প্রধান শহরগুলিতে সরকারী ও বেসরকারীসূত্রে অনেক কিছুই রিলিফ এসে যাবে, অবহেলিত হবে বিপর্যস্ত গ্রামাঞ্চল। তাই কলকাতার শহরবাসীদের কাছে আমার আবেদন—রিলিফের জন্যে টাকা পয়সা, কাপড়চোপড় যা কিছু তাঁরা পাঠাচ্ছেন তার একটা মোটা অংশ গ্রামাঞ্চলের জন্য চিহ্নিত করে তাঁরা দয়া করে পাঠান। খুব ভাল হয় যদি ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ওপর তাঁরা এ কাজের দায়িত্ব দেন। কারণ পশ্চিমবাংলার অন্যান্য জেলায় দেখেছি যেখানে সরকারী আমলারা রিলিফ নিয়ে যেতে পারেন নি, সেখানে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কর্মীরা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে দুর্গতদের রিলিফ পৌঁছে দিয়ে এসেছেন; উত্তর-বাংলাতেও দেখছি এঁরা নিঃস্বার্থভাবে, দরদ দিয়ে সেবার কাজ করে যাচ্ছেন। যদি কোন রকমে যাবার রাস্তা খুঁজে পান এঁরা ঠিক সেই দুর্গম এলাকার মানুষকেও রিলিফ দিয়ে আসবেন। ঠিক এই মুহূর্তে রিলিফই এখন সবচেয়ে বড় কথা এবং আরও বড় কথা বিচ্ছিন্ন গ্রামগুলোতে সেই রিলিফ পৌঁছে দিয়ে আসা।

রিলিফের সাথে সাথেই প্রশ্ন উঠবে পুনর্বাসনের, শহর অঞ্চলের খেটে খাওয়া মানুষ যারা আজ নিঃস্ব তাদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা সরকার কি করছেন তা জানা যায় নি; নিশ্চয় ব্যবস্থা একটা কিছু হবে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের মানুষের পুনর্বাসন সে দৃষ্টি নিয়ে করলে চলবে না। উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের সমস্যা আলাদা এবং জটিল—তা করতে গেলে রাইটার্স বিল্ডিংসে বসে হবে না—এখান-কার জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করে করতে হবে। জনপ্রতিনিধিদের পরামর্শ উপেক্ষা করে রাইটার্স বিল্ডিংসের কর্তারা আত্রেয়ী নদীর ওপর যেভাবে বাঁধ বেঁধে-ছিলেন তার ভয়াবহ ফল তো তাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন; সামান্য কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকে এখন তাঁরা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পারছেন জনপ্রতিনিধিরা নেহাৎ গাধা-ছাগল নয়, তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করলে অনেক বিপদই এড়ানো যেতো, অনেক পয়সাও বাঁচতো। ভুল যা হয়েছে তা স্বীকার করে ভবিষ্যতে নিজেদের চাকরির ইজ্জত আর লক্ষ লক্ষ মানুষের ধনপ্রাণ বাঁচানোর জন্যে আমলাদের বলি—শহর গ্রাম সব মানুষের সঙ্গেই একটু ঘনিষ্ঠ-ভাবে মিশুন—তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে, তাঁদের অভিজ্ঞতায় শ্রদ্ধা জানিয়ে কাজ করুন; তাতে গ্রাম বাঁচবে, শহর বাঁচবে, দেশ বাঁচবে—আপনারাও বাঁচবেন।

—সমর চট্টোপাধ্যায়

আজাদ হিন্দ ফৌজের রজত-জয়ন্তী

সামনেই অন্তর্বর্তী নির্বাচন থাকায় এবার বিস্মৃতপ্রায় দেশপ্রেমিক নেতাজীর স্বপ্নে গড়া আজাদ হিন্দ ফৌজের রজত-জয়ন্তী উৎসব প্রত্যাশিত রকম ইমপর্টান্স পেয়ে গেল দেখে বড় তৃপ্ত হল। যাক নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময়টা কাকতালীয় যোগ লাভ করায় এখন বিতাড়িত নেতার অমর কীর্তিকে নয়াদিল্লী এতোদিনে একটু বিশেষ মূল্যায়ন করল।

যে চ্যবন সাহেব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের চাইতে একটু বড়া আদমি হওয়ার প্রচেষ্টায় রত ছিলেন ও খোদ দিল্লী থেকে দৌড়ে (উড়ে এসে হাজির) কলকাতায় এসে পড়েছিলেন। তাঁর কী ভয়ানক পথশ্রম-পরিতপ্ত' (দৈনিক সংবাদপত্রের রিপোর্ট) বেলা দশ প্রহরের সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামসুভগ সিংও উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন বেতার ও তথ্যমন্ত্রী কে কে শাহ ও শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন।

শোনা গেল কতকগুলি অদ্ভুত ঐতিহাসিক বাণী (অর্থাৎ প্রাক্‌নির্বাচনী বক্তৃতা যা রেকর্ড হয়ে রইল। অতঃপর স্বাধীনতা লাভের বাইশ বছর পর নেতাজীর অবদানকে এতকাল উপেক্ষা করার যে [illegible] [illegible] স্বীকৃতির [illegible] দর্শন-তার ধাক্কা [illegible] চাপা রইল)। শ্রী রামসুভগ সিং বললেন: নেতাজীর সৈনিক প্রচেষ্টা ভারতের স্বাধীনতা তাড়াতাড়ি আনতে [illegible]। (শুধু সত্য কথা হলেও কদাচিৎ স্বীকৃত হয়। চরকা সমর্থকগণ যে নেতাজীর সশস্ত্র সংগ্রামের সহায়তার দরুণই স্বাধীনতা [illegible] ফসল মর্যাদা ভোগ করছে এমন তারই স্বীকৃতি।)

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীযশবন্ত রাও বলবন্ত রাও চ্যবন বললেন: আমাদের নেতাদের ইতিহাস—আত্মত্যাগেরই ইতিহাস এবং নেতাজীর অন্য এক নাম আত্মত্যাগ।

খট করে কানে বিঁধল তাঁর এই বিশিষ্ট বাণী। **নেতাজীর আর এক নাম যে আত্ম**ত্যাগ তা অবশ্যই ঐতিহাসিক সত্য যা অস্বীকারের উপায় কারও নেই। কিন্তু সেই মহান ত্যাগীর সঙ্গে 'আমাদের নেতৃত্ব'কে আনার টানা কেন। চ্যবন সাহেবের এ জাতীয় 'অশ্বত্থামা হত, ইতি গজ' বাণীটি হজম করতে পারলাম না বলে দুঃখিত। হ্যাঁ নেতাজীর আগেও দেশবন্ধু দেশপ্রাণ প্রমুখ ত্যাগী পুরুষের মহান কীর্তির কথা আমরা নিশ্চয়ই ভুলিনি এবং যতদিন ভারতে একটিমাত্র সৎপুরুষ থাকবে ততদিন সে কথা ভারতবর্ষ ভুলবে না। কিন্তু যশবন্ত রাও বলবন্ত রাও চ্যবন যে নেতাকুল সমভিব্যাহারে আজ বলবন্ত তাঁদের মধ্যে আত্মত্যাগ খোঁজার পরিশ্রমে ক্লান্ত হওয়ার উপদেশ যেন কেউ না দেন। সে বড় কঠিন কাজ কৃপণের জমবাটিতে সাঁতার দিয়ে ডল খোঁজার মত। সে এক অসম্ভব কান্ড হবে। ভগবান রক্ষা করুন।

নির্বাচন ও নেতাজী

ভারতের অনেক সৌভাগ্য নির্বাচনের পাঁকে ভারতের সাবেক নেতাদল আকণ্ঠ ডুবে যাবার ভয়ংকর সুযোগ পাবার বহু আগেই নেতাজীর তিরোধান ঘটেছে। নেতাজী উপস্থিত থাকলে দেশপ্রেমহীন নির্বাচনপ্রসূ ভারতে তাঁকে নিশ্চিত ভিন্ন পথের মহাপুরুষরূপে চিহ্নিত হতেই হত। তিনি নেই, কিন্তু যদি থাকেন এই নোংরামির মধ্যে তাঁর প্রত্যাবর্তন আর বাঞ্ছনীয় নয়। তিনি দূরেই থাকুন এবং আমাদের হৃদয়েই থাকুন।

নেতাজী এবং তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজকে সামনে রেখে কেমনভাবে একমাত্র হীন কুটিল রাজনীতি ও নির্বাচনী লড়াই চালানো যায় তারই কিছু নিদর্শন আজাদ হিন্দ সরকারের ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর (১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর এই ঘোষণায় নেতাজী স্বাক্ষর দেন) দিবসের রজত-জয়ন্তী উৎসবের ওপর রচিত সাংবাদিক রচনায় পাওয়া গেল।

একটি নিবন্ধে দেখলাম নেতাজীর নামে রচনা শুরু হলেও বক্তব্য বিষোদ্গারে পূর্ণ। লেখকের অননুমোদিত কোন দল ও গোষ্ঠীর আদ্য শ্রাদ্ধান্তে জনৈক পশ্চিমবঙ্গীয় নেতার ওপর দেশদ্রোহের অভিযোগ আনয়ন এবং তার প্রতি যথেষ্ট শাসানি বর্ষিত হয়েছে সেখানে। নেতাজীর নামে রচনা লিখতে বসে কেউ নির্বাচনের ঢাকের কাঠিতে আঙুল নাড়ছেন, কেউ মাইকের সামনে বক্তৃতা করছেন। এ দুর্ভাগা দেশে নেতাজী না তাঁর স্বপ্ন সাধ নিয়ে মিছে আর ঘটাপটা কেন। দেশটা যখন নির্বাচনের পাঁকই পিছলেছে তখন দেশপ্রেমের ওপর আর দু' কলম ব্যয়ের বেহিসেবের গলগ্লানি কিসের জন্য।

কারণ আছে। নেতাজীকে এবারও প্রাক নির্বাচনী প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে ঠিক আগের মতোই ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু আগে অর্থাৎ সাধারণ নির্বাচনে যদি কোন ফল না হয়ে থাকে, তবে অন্তর্বর্তী নির্বাচনে আর কি নতুন করে ফল পাবার সুযোগ ঘটবে।

ব্যাপারটা আর একটু খোলসা করেই বলা যাক।

নেতাজী ও আজাদ হিন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে বসে কোনও সহযোগী যদি কোনও বিশেষ দলের কীর্তিকলাপের ঐতিহাসিক কোন্‌বা ঘাঁটিতে শুরু করেন। যদি নেতাজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত একটি গোষ্ঠী লেখকের সেই অননুমোদিত দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিপরীত গোষ্ঠীর বিরাগভাজন হওয়ার দরুণ নেতাজীর নামে রচনার শুরুতে আক্রমণের লক্ষ্য হন এবং যদি কোন আঞ্চলিক নেতার একটি সাধারণ বক্তব্যকে ব্যাখ্যার জটে ঘোলা করে তাঁকে জব্দ করার প্রয়াস সেই রচনায় ব্যক্ত হয়ে পড়ে তবে নেতাজীর নামে লিখিত সে রচনাই শুধু অশ্রদ্ধেয় হয় না তদ্দ্বারা দেশের অধুনাতন মতিগতিরও কিছু হদিশ মেলে। হদিশ মেলে এই যে আমরা নেতাজীর পবিত্রতা রক্ষায়ও অক্ষম হয়ে নির্বাচনী পাঁকে সেই মহান নেতাকে পর্যন্ত টেনে নামানোর অপচেষ্টার দ্বারা নিজেদের কলঙ্কিত করছি। বলা বাহুল্য, দেশের সবচেয়ে প্রিয় নেতা এবং তাঁর

কীর্তিকে এইভাবে [illegible] করার [illegible] যে দেশদ্রোহেরই সমতুল দুষ্কার্য [illegible] দেশপ্রিয় সাধারণ অন্তত তাই মনে করবেন। এই প্রসঙ্গে না এসে উপায় নেই এই কারণেই যে, আমরা আজ কত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির আওতায় বিলীন হয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ চোখে-দেখা ঐ একটি স্তম্ভ সে কথাই মনে করিয়ে দিয়ে একেবারে স্তম্ভিত করেছে।

সরকারী উদ্যোগের কর্মীদের অভিরিক্ত বন্ধন

ধীরে ধীরেই ন্যায়ের দণ্ড নেমে আসে। ভারত সরকারের ন্যায়ের দণ্ডও সেইভাবে নামছে। কেন্দ্রে বর্তমানে যাঁরা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এককালে যদিও তাঁদের কাছেই এ পাঠ নেওয়া হয়েছিল, যে সরকারের কার্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভ জানানোর শান্তিপূর্ণ উপায় হল, সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা। কিন্তু সরকার হাতে পাওয়ার পর এই জিনিসটাকে [illegible] সম্ভবপর হল না। [illegible] নীতি নির্ধারণ [illegible] ফলপ্রদ [illegible] লাঠি গুলী, টিয়ার-গ্যাসে। সম্প্রতি [illegible] শ্রম সচিব শ্রী পি সি ম্যাথু বলেছেন [illegible] উদ্দেশ্য সব সময় সফল হচ্ছে না, বিক্ষোভ প্রদর্শন ব্যাপারটাই বন্ধ করে দিতে হবে, অন্ততপক্ষে সরকারী সংস্থায়।

তিনি কয়েকটি দেশের নজীর টেনে বলেছেন, সরকারী কর্মীদের ক্ষেত্রে ও সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ধর্মঘটের দ্বারা বিক্ষোভ প্রদর্শন নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। বিরোধ মীমাংসার জন্য সালিশ ব্যবস্থাই যথেষ্ট। এই নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন, এই ব্যবস্থার দ্বারা জনসাধারণের একাংশ নিজেদের আর্থিক উন্নতির জন্য অপরাংশের জীবনযাত্রা বানচাল করতে পারে না।

বস্তুত সমাজের একাংশের কোনই অধিকার থাকতে পারে না অপরাংশের জীবনযাত্রা বানচাল করার। এ যুক্তি আজ সাধারণ মানুষেরই যুক্তি। কিন্তু সমাজের একাংশকে যদি সরকারী কর্মচারী হিসেবে পৃথক করে নেওয়া হয় এবং অপরাংশকে চর্ব চোষ্য লেহ্য পেয়র সুযোগ দান করা হয় তবে ঐ দুর্ভাগা একাংশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করাটাও কি যৌক্তিকতার দ্বারা সমর্থিত হবে।

সমাজের অপরাংশের এক অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রাংশ যদি সাধারণের জীবনযাত্রা বিপন্ন করে ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য প্রতিদিন অবাধে বাড়িয়ে যান ও ফলে তথাকথিত পূর্বোক্ত একাংশ যদি গ্রাসাচ্ছাদনের প্রশ্নটি ধর্মঘট বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে সরকার সমীপে জ্ঞাপন করার চেষ্টা করেন, তবে তাকেই

এস এম যোশী

যা সচিব মহোদয়ের সাধারণ প্রীতির নিক্তিতে বিচার করে কেমনভাবে দুষ্ট উদ্দেশ্য বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে! শ্রম সচিব মহোদয় যে সালিশীর কথা বলেছেন সেই সালিশী যে কত দূর ফলপ্রসূ তা ইতিপূর্বে বহুবার সাধারণেই বিচার করে দেখছেন। সাধারণের একাংশ যদি সেই সালিশীকে সর্বদা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষকের ভূমিকায় দেখতে না পান, তবে তাঁদের কাছে স্বার্থসংরক্ষণের অন্যতর উপায় কী থাকবে। সচিব মহোদয়ই

যা সাধারণের একাংশের মৌলিক অধিকার খর্ব করার এহেন প্রস্তাব কোন যুক্তিতে রাখবেন।

বলা বাহুল্য, যুক্তি মানতে হলে সচিব মহোদয়ের প্রস্তাব ধোপেই টেঁকে না। এবং তা জেনেও তিনি যে এমত প্রস্তাব রাখছেন সেটাই প্রমাণ করে যুক্তির ধার বড় একটা এ সব প্রস্তাব ধারে না।

জে সি এ নেতা শ্রী এস এম যোশী সচিব মহোদয়ের বক্তব্যের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, শ্রীম্যাথুর বক্তব্য সরকারের কর্মী-নিয়োগকর্তা সম্পর্কে মনোভাবকেই ব্যক্ত করেছে। শ্রীযোশী বলেন, ঘন ঘন ধর্মঘট বন্ধ করার আরও ঢের পন্থা আছে। যেমন : সরকার একটি-মাত্র কর্মী স্বার্থ সংরক্ষক ইউনিয়নকেই স্বীকৃতি দিয়ে কর্মী-স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও বাধ্যতামূলক সালিশীর বোঝা কর্মীদের ওপর চাপানো ঠিক নয়। [illegible] নিজের প্রদত্ত স্বীকৃতি [illegible] প্রত্যাহার করে নেন। শ্রীযোশী [illegible] [illegible] অধিকার বিসর্জন দেবেন না।

এ আই ডি ই [illegible] এর [illegible] এম পি শ্রী এস এম ব্যানার্জিও সরকারকে সতর্ক করে বলেন যে, শ্রীম্যাথুর বক্তব্যই যদি সরকারের বক্তব্য হয়, তবে সারা ভারত জুড়ে অশান্তি ঘনিয়ে তোলা হবে।

বিয়ের পর জ্যাকেলিন এবং ওনাসিস

গ্রীস :

সেই ফরাসী খবরের কাগজের হকারের রসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার তারিফ না করে পারি নে। সাইকেল-বোঝাই করে খবরের কাগজ নিয়ে সে যখন প্যারিসের রাজপথ বেয়ে প্যাডেল করে যাচ্ছিল তখন সে পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে হাঁকছিল : 'তাজা খবর : সর্বশেষ কেনেডী বিপর্যয়!' অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট জন কেনেডীর বিধবা পত্নী জ্যাকেলিন কেনেডীর পুনর্বিবাহকেই ব্যঙ্গ করে সংবাদ পরিবেশন করতে চেয়েছে ফরাসী ছোকরা হকারটা।

কিন্তু এ অশিক্ষিত ফরাসী খবরের কাগজ হকারই কেবল নয় জ্যাকেলিন কেনেডীর এই বিয়ের সংবাদ শুনে সারা পৃথিবী স্তম্ভিত বিস্ময়াবিষ্ট। অথচ একথা কে না জানে যে ইয়োরোপ আমেরিকার বিধবাদের দ্বিতীয়বার কেন দশমবার পতি বেছে নিতেও বাধা না, জ্যাকিই বা কী দোষ করলো! জ্যাকির মা স্বয়ং হিউ ডি. অকিনক্লসকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন নি? জ্যাকি আজ যাঁর গলায় মালা পরালেন সেই ওনাসিসও তো দোজবর, তবে? দোষ কি কেবল জ্যাকিরই বেলায়?

না দোষ জ্যাকির নয়. উনি তাঁর প্রাণের পুরুষকে বেছে নিয়েছেন আরো আগে নিলেও কেউ আশ্চর্য হতো না. বরং সেটাই হোত "শোভন"। দোষ তাদের যারা জ্যাকেলিন কেনেডীর মধ্যে তাদের প্রিয় প্রেসিডেন্ট জন কেনেডীর ছায়া দেখতে ভালোবাসতো. যারা তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা জ্যাকির মহিমময়, শোকাতুর ধীর-স্থির মূর্তি দেখে দেখে নীরবে চোখের জল ফেলতো—দোষ তাদেরই। যারা এই ভেবে জন কেনেডীর বিয়োগব্যথা ভুলতে চেয়েছিল যে, বাকি জীবনটা জ্যাকেলিন কেনেডী স্বামীর দুই সন্তান ক্যারোলিন আর জন-জনকে—স্বামীর স্মৃতিচিহ্ন বুকে নিয়ে কাটিয়ে দেবেন, ভুল তারাই করেছে, জ্যাকি কোনো ভুল করেন নি তো।

বিধবা হবার পর জ্যাকিকে, তাঁর গতিবিধিকে যাঁরা গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেছেন তাঁরাই দেখেছেন যে জনের বিরহ-ব্যথা, নিঃসঙ্গ একক জীবন দীর্ঘকাল বয়ে চলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। বয়স তাঁর "মাত্র" ৩৯, যৌবনের উত্তাপ তাঁর দেহে-মনে এখনো অটুট তিনি কেমন করে নিষ্প্রাণ বৈধব্যজীবন যাপন করবেন? পাত্র হিসেবেও অ্যারিস্টটল সক্রেটিস ওনাসিস মোটেই ফেলনা নন, পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী প্রথম ১০ জনের তালিকায় গ্রীক জাহাজব্যবসায়ী ওনাসিসেরও নাম রয়েছে। ওনাসিসের সম্পত্তির পরিমাণ কোটি কোটি টাকার কম নয়। শতাধিক বাণিজ্য জাহাজের মালিক তিনি, তাছাড়া রয়েছে প্রচুর লাভজনক তেলবাহী জাহাজ, হোটেল মায় এয়ারলাইন পর্যন্ত। সত্যি বটে, জ্যাকেলিন কেনেডী একদিন হোয়াইট হাউসের ঘরণী ছিলেন, ছিলেন আমেরিকার ফার্স্ট লেডি বা প্রথমা মহিলা। কিন্তু আজই বা তাঁর সম্মান কম কিসে? গ্রীসের অদূরে ওনাসিসের কেনা রয়েছে স্কর্পিয়স দ্বীপ—কৃত্রিম প্রাকৃতিক শোভায় যাকে অপরূপ করে তোলা হয়েছে। সে দ্বীপটি তো আজ জ্যাকেলিনেরই। তাছাড়া বাড়ি রয়েছে এথেন্স প্যারিস, বুয়েনস আয়ার্স, মণ্টিভিডো, নিউ ইয়র্ক, মণ্টিকার্লোতে। নিউ ইয়র্কের ফিফথ এভিনিউতে জ্যাকির ছিল মাত্র ১৫খানা ঘরের এ্যাপার্টমেণ্ট, আর ওনাসিস তাঁর জন্যে 'ক্রিস্টিনা' প্রমোদ-তরীতেই ১৬০খানা সুসজ্জিত বিলাস-কক্ষের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আর সম্মান? বিত্ত ও প্রতিপত্তিকে বাদ দিয়ে ঠুনকো সম্মানের কী অর্থ থাকতে পারে, অন্তত জ্যাকেলিনের কাছে—যাঁর কাছে ফ্যাশানদুরস্ত প্যারিসই স্বর্গ?

স্কর্পিয়স দ্বীপে ছোট্ট চার্চে ওনাসিস-জ্যাকেলিনের বিবাহকার্য বিনা আড়ম্বরে সম্পন্ন হলো। সরকারী কোন অতিথি নিয়ন্ত্রণ বিধি না থাকলেও ৬২ বছরের বর ওনাসিস এ ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে বেশি হৈ চৈ করতে চান নি. মাত্র ৪০ জন অতি-আপনার জনকে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। সাংবাদিক-ফটোগ্রাফাররা নৌকো—এমন কি হেলিকপ্টার নিয়ে স্কর্পিয়স দ্বীপে হুমড়ি খেয়ে পড়তে চেয়েছিলেন, কিন্তু ওনাসিসের দুর্ধর্ষ প্রাইভেট রক্ষীবাহিনী সাংবাদিকদের সে প্রচেষ্টা বানচাল করে দিয়েছে। ওনাসিস তাঁর নববধূকে যে হার উপহার দিয়েছেন হীরা-মণি-মুক্তাখচিত সে-হারের দাম প্রায় ৯০

লাখ টাকা? এত ভালো জ্যাকিকে কে ভালবাসতো গো?

বিধবা হবার পর থেকে জ্যাকির গতিবিধি যাঁরা লক্ষ্য করেছেন তাঁরাই দেখেছেন এবং বুঝেছেন যে তিনি একজন সঙ্গী চান, আশ্রয় চান। সে-সঙ্গ তাঁকে কখনো দিয়েছেন ওয়াশিংটনস্থ প্রাক্তন বৃটিশ রাষ্ট্রদূত লর্ড হারলেক, কখনো ভ্যাটিক্যানে স্পেনের রাষ্ট্রদূত আন্টোনিয়ো গ্যারিগস ই দিয়াজ কানাবেটে, কখনো বা চিত্র পরিচালক মাইক নিকল্‌স অথবা ক্রীড়া-সম্পাদক জর্জ প্লিম্পটন। এঁদের কারোর সঙ্গে তিনি রোমে গিয়েছেন, কারোর সঙ্গে কাম্বোডিয়া। স্বামীকে হারিয়ে তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরেছেন—আয়ার্ল্যান্ড, স্পেন, ইতালি, সুইজারল্যান্ড, হাওয়াই, ক্যারিবিয়ান, ক্যানাডা, গ্রীস, মেক্সিকো। হ্যাঁ পুরুষ বন্ধু কেউ-না-কেউ ছিল সঙ্গে। ওনাসিসও। কিন্তু বোধ হয় ৩৯ বছরের জ্যাকি ৬২ বছরের প্রায় বাবার বয়সী ওনাসিসের মধ্যেই শান্তি, নিশ্চিত আশ্রয়ের সন্ধান পেয়েছিলেন, তাই মালা বদল করলেন তাঁরই সঙ্গে।

ওনাসিস আগে বিয়ে করেছিলেন গ্রীসের আর একজন জাহাজ ব্যবসায়ীর ষোড়শী কন্যা আথিনাকে ১৯৪৬ সালে। সে ঘরে ওনাসিসের এক ছেলে আলেকজান্ডার (২০) ও এক মেয়ে ক্রিস্টিনা (১৮)। জ্যাকিরও এক ছেলে জন জন (৭) ও এক মেয়ে ক্যারোলিন (১০)। আথিনার সঙ্গে ওনাসিসের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে ১৯৬০ সালে কারণ তখন ওনাসিস বিখ্যাত অপেরা গায়িকা ও পরস্ত্রী মারিয়া কালাসের প্রেমে মশগুল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জ্যাকিই কালাসকে বোল্ড আউট করে দিয়ে ওনাসিসকে জয় করেছেন, তাঁর হৃদয় শক্তই বলতে হবে।

হোয়াইট হাউসের ফার্স্ট লেডি থেকে ধনপতির ধর্মপত্নী। তাতে কী হয়েছে। শোনা যাচ্ছে ওনাসিসকেই গ্রীসের প্রেসিডেন্ট করা হবে যদি ইতিমধ্যে সেখানকার সংবিধানটা একটু উল্টে-পাল্টে দেওয়া যায়। তা যদি যায় তবে ফের জ্যাকেলিন ওনাসিস আবার ফার্স্ট লেডি। আহা, এমন দিন কি হবে মা মেরী!

পশ্চিম এশিয়া ঃ

পশ্চিম এশিয়ায় এক অদ্ভুত পরিস্থিতি চলছে—না যুদ্ধ, না শান্তি। গত বছর আরব এবং ইস্রায়েলের মধ্যে পুরোদস্তুর যুদ্ধ হয়েছিল; যে যুদ্ধে অপ্রত্যাশিতভাবে লাভবান হয়েছিল ইস্রায়েল। রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপে সে-যুদ্ধ তখনকার মত বন্ধ হয়েছিল বটে কিন্তু বিবদমান দুপক্ষের মধ্যে শান্তিচুক্তিও স্বাক্ষরিত হয় নি, কিম্বা ইতস্তত গুলী-বিনিময়ও বন্ধ হয় নি। শান্তি প্রচেষ্টা যে হয় নি তা নয় তবে শর্ত ও পাল্টা শর্তের টানাপোড়েনে বিরোধের কোনো মীমাংসা হয় নি। ভিয়েৎনামের মত এখানেও পাশাপাশি দুটো বিপরীত দৃশ্য একদিকে শান্তি আলোচনা, অন্যদিকে অস্ত্রের ঝনঝনানি। আবার ভিয়েৎনামে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে বলে যেমন এখন জোর আশাবাদিতা দেখা যাচ্ছে, তেমনি পশ্চিম এশিয়ায়ও নতুন করে আবার মীমাংসা প্রচেষ্টা শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সংযুক্ত আরব অবশ্য গোড়া থেকেই শান্তি আলোচনার জন্যে ইস্রায়েলের ওপর চাপ দিয়ে আসছে। কিন্তু ইস্রায়েল মুখে যদিও শান্তির কথাই বলে থাকে, কিন্তু

আব্বা এবান

যুদ্ধের ফলে যে পররাজ্য সে গ্রাস করেছে, তার সূচ্যগ্র মেদিনীও ফেরৎ দিতে রাজী নয়।

ইতিমধ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষ থেকেও ইস্রায়েলের ওপর শান্তি স্থাপনের জন্যে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে গত ৮ই অক্টোবর রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে ইস্রায়েলী পররাষ্ট্র-মন্ত্রী আব্বা এবান শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আরব দুনিয়ার কাছে একটা ৯-দফা প্রস্তাব রেখেছিলেন। আরব পক্ষ থেকে সে প্রস্তাবের কোন জবাব এখনো দেওয়া হয় নি, তবে সংযুক্ত আরবের জনৈক কূটনৈতিক ওই প্রস্তাব সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের ২২শে নভেম্বরের প্রস্তাবের মর্মানুযায়ী যে-কোনো প্রস্তাব তাঁরা মেনে নেবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য নিরাপত্তা পরিষদের ওই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, পশ্চিম এশিয়ায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে ইস্রায়েলকে জুনযুদ্ধে অধিকৃত আরবভূমি ফিরিয়ে দিতে হবে এবং আরব দুনিয়াকে নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে ইস্রায়েলী সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিতে হবে।

মন্ত্রী এবান অবশ্য বলেছেন যে ওপর থেকে কোনরকম মীমাংসার শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হলে ইস্রায়েল তা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেবে না। শান্তি আলোচনা ইস্রায়েলের মাটিতেই হোক—এ দাবি তাঁর নেই, রাষ্ট্রসঙ্ঘে এ আলোচনা চালাতে উভয় পক্ষই রাজী। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষর করবে অবশ্যই দুই প্রধানপক্ষ আরব দুনিয়া এবং ইস্রায়েল এবং এখানে তৃতীয় পক্ষের কোন ভূমিকা নেই। তাঁর মতে ইস্রায়েলের সার্বভৌমত্ব যদি আরব দুনিয়া স্বীকার করে নেয়, তবে বাকী সব প্রশ্নেরই সহজ মীমাংসা হয়ে যাবে, এমন কি ইস্রায়েল-অধিকৃত আরবভূমি প্রত্যর্পণও কোন দুরূহ সমস্যা হবে না।

এদিকে শান্তি প্রচেষ্টার একটা বাহ্যিক রূপ দেখা গেলেও প্যালেস্টাইন গেরিলা আন্দোলনের আল ফাতাহ কিন্তু ইস্রায়েলের সঙ্গে কোনরকম রাজনৈতিক মীমাংসায় আসতে রাজী নয়। জর্ডানেও ইতিমধ্যে সাধারণ ধর্মঘট হয়ে গিয়েছে। জর্ডানের সঙ্গে ইস্রায়েলের গুলীবিনিময় তো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার ওপর সংযুক্ত আরবের সঙ্গেও বিমান-যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এদিকে আবার সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্ট পশ্চিম এশিয়ায় আসবেন বলে শোনা যাচ্ছে। অর্থাৎ তৃতীয় কোন পক্ষ যদি মধ্যস্থতা না করে বা আলোচনার সূত্রটা না ধরিয়ে দেয়, তবে, আরব-ইস্রায়েল শান্তি আলোচনাটা গবেষণার মধ্যেই থেকে যাবে বলে মনে হয়। অথচ উদ্যোগটি যদি এখনই না নেওয়া হয়, তবে উভয় পক্ষে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বাড়বে এবং উত্তেজনা শেষ পর্যন্ত দুপক্ষকে কোথায় নিয়ে যাবে, তাই বা কে জানে?

(২৫-১০-৬৮)

স্বপ্নদীপ—নীরদবরণ : প্রকাশিকা : সুজাতা মিত্র, ২২/১, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড কলকাতা—১৯। প্রাপ্তিস্থান : শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী—২। মূল্য: ৪ টাকা।

স্বপ্নদীপের প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্বে ছেচল্লিশটি কবিতা আছে। কবিতাগুলি ১৯৩৩-৩৭ সালের মধ্যে লিখিত, শ্রীঅরবিন্দের যোগশক্তির প্রেরণায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের লেখা একখানা চিঠির কিছু অংশ গ্রন্থটির ভূমিকাতে উদ্ধৃত করে লেখক বলেছেন যে, শ্রীঅরবিন্দ শুধু কবি নন কবিস্রষ্টাও। তখনকার আশ্রমের যেটি শিল্পগোষ্ঠী সে সময়ে নলিনী গুপ্ত সুরেশ চক্রবর্তী, সাহানা দেবী দিলীপ রায় প্রমুখ কিছু খ্যাতনামা লেখক ও শিল্পী যোগের অঙ্গ হিসাবে সাহিত্য, সঙ্গীত ও অন্যান্য শিল্পের সাধনায় তৎপর ছিলেন। এই পরিবেশের হাওয়ায় বর্তমান গ্রন্থ লেখকেরও প্রাণ ভরে উঠেছিল। কিছুকাল কঠিন সাধনার পর তাঁর কবিত্বের উৎস খুলে গেল। তিনি সে সময়কার ঘটনাবলী বর্ণনা করে বলেছেন— 'অনর্গল লিখে যাচ্ছি না ভেবে, না চিন্তে, বিনা প্রশ্নে মনকে যথাসম্ভব নিবাত নিষ্পন্দ করে। একজন শ্রীঅরবিন্দকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করলেন, এই সব দুর্বোধ্য কবিতার সত্যি কোন অর্থ আছে কি না, তাদের মূল প্রকৃতিই বা কি আর তিনি বা কেন এত যত্ন সহকারে তাদের ব্যাখ্যা করেন। শ্রীঅরবিন্দ উত্তর দিলেন যে এগুলোকে এক ধরণের সুররিয়ালিস্টিক কবিতা বলে অভিহিত করা যায়।' [কবিতাগুলির মধ্যে পনেরটি শ্রীঅরবিন্দ নিজে সংশোধন করেছিলেন বাংলা অনুবাদসহ সেই সংশোধিত পাঠের পরিশিষ্টে মুদ্রণ করায় গ্রন্থটির সাহিত্যিক মান অসাধারণভাবে উন্নীত হয়েছে।]

সুররিয়ালিজম হল যুদ্ধোত্তর বিক্ষোভ সংগ্রামের এক ধরনের প্রেতাদ। সুররিয়ালিজমের নেতা আঁদ্রে ব্রেতোঁ এমন কাব্য চেয়েছিলেন যা বুদ্ধি বিচারের লজিকের শাসনমুক্ত মনের ফসল। সুররিয়ালিস্টিক কবি স্বেচ্ছায় কিছু করেন না। শুধু লিখে যান। তাঁর মনের মধ্যে চলতে থাকে একটা স্বয়ংক্রিয় রচনা—কতকগুলো image বা চিত্রের সজ্জা, কোন প্ল্যানের উপর নির্ভর না করে। কতকগুলো ভাব, অনুভূতি এবং sentiment সূচক ধ্বনি। পড়লে অর্থ-সংগতি যে একটা পাওয়া যাবেই তা নয়, তবে প্রেম, বিদ্রোহ অপূর্ব কোন আবির্ভাবের বিস্ময়, মুক্তির উল্লাস কামনার কল্পনার বিকাশ, সম্ভোগের নৃত্যলীলা বা বিষাদ বিমর্ষতার আক্রমণ—কবিতার নানা উপাদান ও আঙ্গিকের গুণে তা পাঠকমনকে অধিকার করে। তথাকথিত বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করে বোঝে নেওয়ার জিনিস এ নয়। পাঠকের মনে এর প্রভাব অসাধারণ। স্বপ্নদীপ ২০/২৫টি এই ধরণের কবিতা আছে। সমগ্র শিল্পে রচিত অন্য কবিতাগুলির সৌন্দর্য এবং নানাপ্রকারের প্রতীকও সুন্দর। সেদিক থেকে নীরদবরণের এই কাব্যিক প্রয়াস সার্থক হয়েছে বলে আমরা মনে করি। বাংলা কবিতায় একটু দিগন্ত উন্মোচন করার জন্য তাঁর এই গ্রন্থটি কাব্যরসিকদের কাছে সমাদৃত হবে বলে আশা করা যায়।

শিশুমেলা (শারদ সংখ্যা)—সম্পাদক : অরুণ চট্টোপাধ্যায়। ৩৬, বরদা বসাক স্ট্রীট, কলিকাতা—৩৬। মূল্য : ·৫০ পয়সা।

শিশুসাহিত্য প্রকাশ ও চর্চার দৈন্যের দিনে অরুণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'শিশুমেলা' পত্রিকাটি সত্যই একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। শিশুদের উপযোগী কবিতা, ছড়া, গল্প সমৃদ্ধ এই পত্রিকাটি ছোটদের সারাক্ষণের সঙ্গী হবার মতো। এই সংখ্যায় লিখেছেন শিবরাম চক্রবর্তী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, স্বপন-বুড়ো, গোপাল ভৌমিক প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকরা।

চলার পথে—সম্পাদক : কানাই গঙ্গোপাধ্যায়। বাস্তুকার দপ্তর (পূর্ত বিভাগ) জলপাইগুড়ি। মূল্য : পঞ্চাশ পয়সা।

চলার পথে একটি সাহিত্য সংকলন জলপাইগুড়ি হতে প্রকাশিত। আলোচ্য সংখ্যাখানির বৈশিষ্ট্য এতে শুধু কবিতাই প্রকাশ করা হয়েছে। মফস্বল শহরের এই সংকলনে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন গৌর গোস্বামী, দেবাশিস ঘোষ, হরিহর দাশ, গজেন মজুমদার, শ্যামাপ্রসন্ন ঘোষ, অনন্তদাস চক্রবর্তী, সুব্রত গোস্বামী, হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায় ও কানাই গঙ্গোপাধ্যায়।

সবুজ কলি (শারদীয়া সংখ্যা)—সম্পাদক : উৎপল হোমরায়। ৩৫।২এ, বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা—৩৭। মূল্য : ·৫০ পয়সা।

ছোটদের জন্য এই আলোচ্য শারদীয়া সংখ্যাটি রচনাসম্ভারে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। এখানে আছে ছোটদের উপযুক্ত গল্প, রূপকথা, কবিতা, ছড়া, এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী প্রভৃতি। পত্রিকাখানি ছোটদের ভাল লাগবে।

বিচিত্রা ভারতী সম্পাদক : [illegible] চক্রবর্তী। ৭১এ, নেতাজী সুভাষ রোড (রুম নং ডি ২৭) কলিকাতা ১। দাম—দুই টাকা।

'বিচিত্রা ভারতী' শারদীয়া সংখ্যায় প্রবন্ধ, বাংলা গল্প, নাটক ও আলোচনার মধ্যে সাহিত্যরসের আস্বাদ পাওয়া যায়। সংখ্যাখানি প্রকৃত সাহিত্যরসিকদের ভাল লাগবে।

সোনার কাঠি শারদীয় সংখ্যা। ৩০, মদন চ্যাটার্জি লেন, সি আই টি বিল্ডিংস, এ-১৫, কলিকাতা-৭। দাম : ১·৫০ পয়সা।

ছোটদের মাসিকের এই শারদীয় সংখ্যা ছোটদের উপযোগী রচনায় সমৃদ্ধ। প্রত্যেকটি রচনাই চিত্তাকর্ষক ও সুখপাঠ্য। এই সংখ্যায় রচনাগুলি ছোটদের বার বার পড়ার মত।

দশপাতা—শারদ সংকলন। সম্পাদনায় : শিবেন চট্টোপাধ্যায়। ৫১, বিধান সরণি, কলিকাতা। মূল্য : ·৫০ পয়সা।

এটি একটি কবিতা পত্রিকা। যে সমস্ত কবি এ সংখ্যায় লিখেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রাম বসু, অভিতাভ চট্টোপাধ্যায়, তুষার চট্টোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রমুখ কবিরা।

পথিক—পূজো সংকলন। সম্পাদনা : রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিয় চট্টোপাধ্যায়। ২৩৫, বাগমারী রোড, কলিকাতা-৫৪। দাম : এক টাকা।

প্রবন্ধ কবিতা গল্প প্রভৃতি রচনায় এবারের অন্যতম আকর্ষণীয় শারদীয় সংকলন। এখানে লিখেছেন ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, সুরেশ মৈত্র, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক গোবীমোহন মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

[illegible] ভূগোলের [illegible] করবে না।
আমি ভূগোলের কথা বলছিও না। বলছি-লাম কলকাতার সাধারণ মানুষের মনের মানচিত্রের কথা।

কলকাতা শহরের পাড়ায় পাড়ায় অলিতে-গলিতে মৌচাকের মত এই ফ্ল্যাট বাড়িগুলির বাসিন্দাদের, পথচারী মানুষের এমনকি ফুটপাতে রাতকাটানো ভিখিরী ছেলেমেয়েগুলির মনের অতলে পর্বত পাহাড়ী নদীর মতই বেদনা ও সহানুভূতির প্রবাহ যদি দেখতে চান তাহলে বন্যাত্রাণের সাহায্যের আবেদন নিয়ে পথে নামুন। দেখবেন শহরের সাধারণতম মানুষটির মনের অতলেও সমবেদনা ও সহানুভূতির নদী বয়ে চলেছে। তিস্তার মতই সারা বছর সেখানে হাঁটু জল, কিন্তু ঢল নামলে রক্ষা নেই—হঠাৎ দুকূল ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

"উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের সাহায্য করুন—আপনার দানে দুর্গতদের বাঁচিয়ে তুলুন"—এই আবেদন নিয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে সেদিন সাহিত্যিক, গায়ক, সাংবাদিক, চিকিৎসক ছাত্র কবি আর সংস্কৃতি কর্মী-দের একটি দল পথে বেরিয়েছিলেন। সে দলে আমিও ভিড়ে পড়েছিলাম। আমার সেদিনের মাত্র তিন ঘণ্টার পথপরিক্রমার অভিজ্ঞতা দিয়েই শুরু করি আজ কথায় কথায়।

সকাল থেকে মাত্র ঘণ্টা তিনেক শহরের একটি পল্লীর পথে পথে ঘুরে সাহায্য সংগ্রহ করতে গিয়ে আমার বার বার মনে হচ্ছিল লিভিংস্টোনের মত আমরাও যেন এক নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করতে চলেছি। শুধু নতুন দেশ নয় নতুন মানুষও।

যে পথ দিয়ে অনেকদিন, অনেকবার হেঁটেছি সেই অতিপরিচিত পথেরই এক প্রান্তে যে এমন একটা অজানা নির্জন পায়ে হাঁটা গলি ছিল তা কে জানত? আর কে জানত যে সে গলিরই শেষপ্রান্তের বাড়িটায় যাঁরা বাস করেন তাঁদেরই ঘরে দেখতে পাব এই শতাব্দীর হর্ষবর্ধন ও রাজশ্রীকে।

দেখেই বোঝা যায় ওরা ভাইবোন। বড় রাস্তা থেকে মাইকে বন্যা সাহায্যের আবেদন শুনে দরজায় ছুটে এসেছে। ভাইয়ের বয়স আটের উর্ধ্বে নয় বোন হয়তো ছয়ের কোঠায় পা দিয়েছে। পুরনো জামা-কাপড়ের স্তূপ এনে ঢেলে দিল দুজনে আমাদের ঝোলায়। মা পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন: "পিন্টু তোমার পুজোর জামা একটা এনে দাও।" তীরের মত ছুটে গিয়ে পিন্টু এল পুজোর নতুন জামা এনে সগর্বে এগিয়ে এসে ঝোলায় ফেলে দিল। আমার মনে পড়ল প্রয়াগে দাঁড়িয়ে কনৌজের রাজা হর্ষবর্ধন এইভাবেই একদিন আপন রাজবেশ খুলে

দিয়েছিলেন গ্রহীতার হাতে। পিন্টুর বোন যা দিয়েছিল তার মধ্যে ছিল একটা লাল টুকটুকে রিবনও।

একটু এগোতেই এবার দুতলার বারান্দা থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন যিনি তাঁর বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। মাথায় চুল সব শাদা হয়ে গেছে, সিঁথিতে সিঁদুর। অনেক অভিজ্ঞতার রেখাঙ্কিত কপালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছাপমারা ডবল পয়সার আকারে এক সিঁদুরের ফোঁটা। চোখে ঘষা কাঁচের চশমা। "দাঁড়াও"—বিরাট পরিবারের একচ্ছত্র কর্ত্রীর কণ্ঠে দুতলার বারান্দা থেকে আমাদের হুকুম করলেন। তারপর ফুট-পাতের উপর ঢেলে দিলেন দুটো কম্বলে জড়ানো জামা কাপড়ের স্তূপ। উপর থেকে বললেন: আবার এসো আবার দেবো।

শিশি বোতল আর পুরান খবরের কাগজ বিক্রিওয়ালার সঙ্গে গলির মোড়ে দেখা। ফতুয়ার পকেটে হাত দিয়ে একটা চারআনি বের করে কৌটায় দিল। বাজারের কাছে এসে ফুটপাতে সব্জী-ওয়ালার কাছে হাত বাড়াতেই বলাপাতার তলা থেকে একটা পাঁচ নয়া পয়সা এগিয়ে দিল। সব্জীওয়ালারা পথচারীরা কেউ ফেরাল না।

ফুটপাতের ওপর বসে ছিল তিনটে ভিখিরি ছেলে। আমাদের দলটা কাছে আসতেই ওরাও উঠে দাঁড়াল। একজন তার এ্যালুমিনিয়ামের ভিক্ষার বাটিটা থেকে একটা পাঁচ নয়া পয়সা ঢুকিয়ে দিল কৌটায় তারপর তিনজনেও ভিড়ে পড়ল আমাদের সঙ্গে। বাড়ির দুতলা থেকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেওয়া কাপড় জামাগুলি কুড়িয়ে এনে গাড়ি বোঝাই করতে করতে ভিখিরি ছেলে তিনটেও চলল আমাদের দলের সঙ্গে সঙ্গে।

গম ভাঙানোর দোকানের পাশ দিয়ে চলছিলাম। দোকানদার বেরিয়ে এলেন একটা টাকা আর একটিন গম নিয়ে ঢেলে

দিলেন ঝোলায়। ওষুধের [illegible] দরজায় দাঁড়াতেই মালিক উঠে [illegible] এনে দিলেন দু[illegible] প্যাকেট খাওয়া।

মাত্র তিন ঘণ্টার প[illegible] সংগৃহীত হল দুগাড়ি জামা কাপড় চাল, ময়দা, গম এবং টাকা পয়সা। এ [illegible] একদিনের [illegible] না নয়। আমি [illegible] প্রতি সপ্তাহে একটি পল্লীতে [illegible] দরজায় এক[illegible]ক সং[illegible] [illegible] গেছেন। খুব কম গৃহস্থ [illegible] দিয়েছেন [illegible] থেকে সাহায্য[illegible]। ছাত্র, সাহিত্যিক রাজনৈতিক দল [illegible] প্রতিষ্ঠান পৌর প্রতিষ্ঠান [illegible] বেরিয়েছেন—সাহায্য সং[illegible] অগণিত।

একটি সর্বদলীয় [illegible] কর্মীর দপ্তরে আমি [illegible] কর্মী [illegible] পরিশ্রম করে চলেছেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] এসে [illegible] [illegible] [illegible] বন্যাত্রাণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দর্শনের [illegible] [illegible] [illegible] নিজানসাদন [illegible] পথে নেমেছিলেন [illegible] সাহায্য সংগ্রহে। দেশবাসী সাড়া দিয়েছে সে ডাকে। আজও সাড়ার ত্রুটি নেই।

* * *

কিন্তু সেদিন আর এদিনে কি কোন

ফেরিঘাটে গেলে দেখতে পাবেন কলকাতা থেকে সাহায্যবাহী উত্তরবঙ্গগামী ট্রাকের বিরাট কনভয় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টায় সেই কনভয়ের দৈর্ঘ্য

উত্তরবঙ্গে সাহায্যবাহী এই ট্রাকের কনভয়কে নদীপার করার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। সরকার গাধাবোটও জোগাড় করে উঠতে পারছেন না। কলকাতার মানুষের

দিনের এই পরিশ্রম শেষ পর্যন্ত নিস্ফল হয়ে যেছে খেজুরিয়াঘাটে এসে। সেদিন ও এদিনের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য এইটাই।

বিপন্ন মানবতার ডাকে

বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়
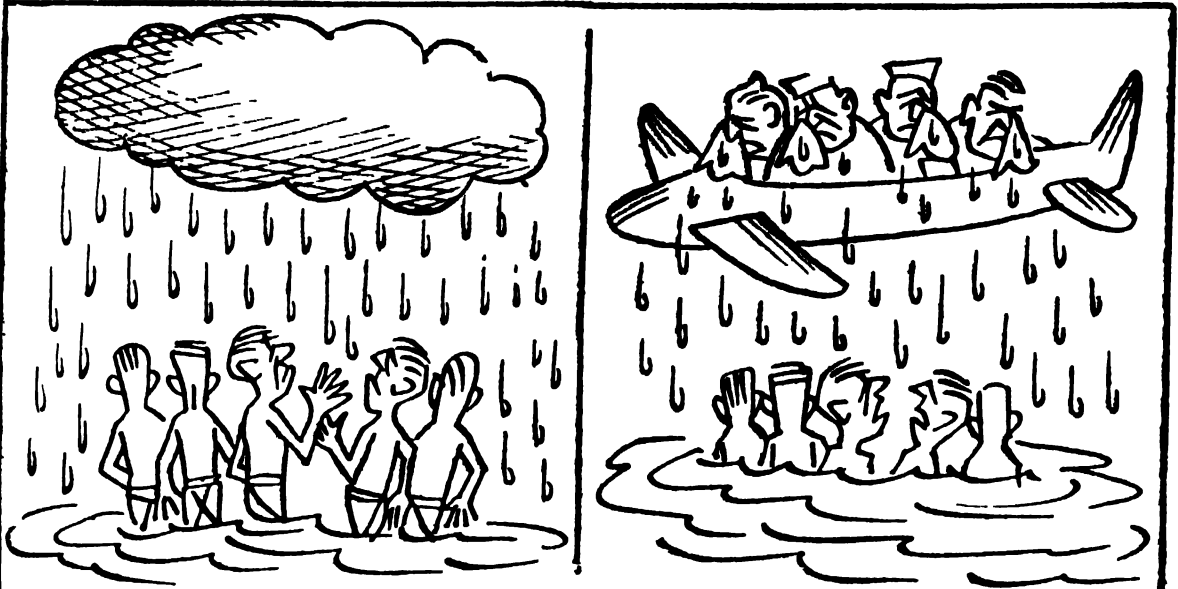
ধ্বংসী বন্যার সময় সরকারী আমলারা এবং তাঁদের পোষা মিথ্যাচারী পত্রিকা... করেছেন, তেমন তারাই দায়ভাগ বহন করতে এই পত্রিকা বাংলাদেশের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের নিয়ে বাংলার রাজপথে নেমে এসেছেন। যদিও জলপাইগুড়ি এবং সমস্ত উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যার মারকে প্রতিরোধ করা সেদিন অনেক দূরের কলকাতার মানুষদের পক্ষে সম্ভব ছিল না; কিন্তু পাপ তো হয়ে গেছে: যে পাপ সমস্তটাই প্রকৃতির নয়, বরং অনেকটাই মানুষের।

এই পাপকে কিছুটাও স্খালন করা যায়, একমাত্র মানুষ এবং মনুষ্যত্বের পক্ষে দাঁড়ালেই। শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির যুবশক্তি সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যেভাবে সাক্ষাৎ মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়েছে আজ তা আমাদের সামনে অন্য এক উদাহরণ: যা মানুষ ও মনুষ্যত্বের জন্য। যাদের আমরা চিরদিন মস্তান বলে জেনে এসেছি, তারাও যেভাবে নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করে দিনের পর দিন বন্যার বিরুদ্ধে লড়েছেন, একদিন তা মানবতারই ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তাঁদের অনুসরণ করে বাংলা দেশের রাজনৈতিক দলগুলি, বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠান এবং সেবায়তন থেকে ইতিমধ্যেই বন্যার্তদের বাঁচাবার জন্য চেষ্টা শুরু করে দিয়েছেন। যারা একেবারেই গেছে, তাদের আমরা নিশ্চয় আর জীবন ফিরিয়ে দিতে পারবো না। কিন্তু যারা বেঁচে? গৃহহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন আমাদেরই কয়েক লক্ষ ভাই-বোন, আমাদেরই জননী; আমাদেরই পুত্র-কন্যা। সাপ্তাহিক বসুমতী ব্রত নিলেন, বাংলার কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের কলকাতার রাস্তায় একসঙ্গে মেলাবেন; তাঁদের ভিক্ষালব্ধ খুদ-কুঁড়ো দিয়ে যতটা সম্ভব এই মহামারীর মুখোমুখি হবেন। শিল্পী এবং সাহিত্যিকেরা তো জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নন; মানবতার সাড়ায় তাঁরাই তো চিরদিন পথে নেমে এসেছেন। ভিয়েতনামে মার্কিনী বর্বরতার বিরুদ্ধে, এবং এই সেদিনও যুক্তফ্রন্ট-বিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিক মানুষ ও মনুষ্যত্বের জন্য মিছিল করেছেন, কারাবরণ করেছেন। আজ তাঁরা দূরে দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন?

সাপ্তাহিক বসুমতীর পক্ষ থেকে বাংলাদেশের কিছু কবি-সাহিত্যিকদের কাছে এ নিয়ে আবেদন জানানো হলো: এবং তৎক্ষণাৎ সাড়া মিললো। ২০শে এবং ২৭শে অক্টোবর কলকাতার পথে সাহিত্যিক এবং শিল্পীরা, এমন কি তাঁদের ছোট ছোট পুত্র-কন্যারা পর্যন্ত মুষ্টিভিক্ষার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। দু' দিনই তাঁদের মুখপাত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন শিল্পী সবিতাব্রত দত্ত। তাঁর অক্লান্ত কথকতা, গান ও সাহায্যের আবেদনে বিভিন্ন রাস্তায় যে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গেল, তা অনেকদিন ভুলবার নয়। তাঁর এক পাশে শিল্পী তাপস সেন, অন্য পাশে কাজী সব্যসাচী এবং দরজায় দরজায় ভিক্ষাপাত্র হাতে প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু, দিনেশ দাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ চৌধুরী, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, অরুণ ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুশীল রায়, প্রাণতোষ ঘটক, গোপাল ভৌমিক, জয়ন্তী সেন, আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, সিদ্ধেশ্বর সেন, জগন্নাথ সাহা, মনীষী রায়, ডাঃ অমিয়কুমার হাটি, ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ডাঃ নীহার মুন্সী, ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্র মিত্র, শক্তিপদ রাজগুরু, হারেন ঘোষ, গোপাল রায়চৌধুরী, বসন্ত রায়চৌধুরী, স্বর্ণদাস সরকার, দিলীপ চক্রবর্তী, জ্ঞান দত্ত, প্রবীর চট্টোপাধ্যায়, বর্ণজিৎ বসু, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শেলী দত্ত প্রমুখ। কবি-সাহিত্যিকদের পুত্র-কন্যারাও বাদ যায় নি। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়-এর কন্যা কৃষ্ণকলি ও ভ্রাতুষ্পুত্র আশিস, কবি বীরেন্দ্র

শ্যামবাজারের মোড়ে সাহিত্যিক ও শিল্পীদের আবেদনে এগিয়ে এসেছেন জনসাধারণ। ছবির মধ্যভাগে রয়েছেন (বাঁ দিক থেকে) সবিতাব্রত দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রাণতোষ ঘটক, কাজী সব্যসাচী, মনোজ বসু (মাইক হাতে)

সাহিত্যিকদের আহবানে সাড়া দিয়ে সারদা হোস্টেলের ভগিনীরাও দিলেন তাঁদের মূল্যবান বস্ত্র এবং হাত খরচের সমুদয় অর্থ

চট্টোপাধ্যায়ের দুই কন্যা বেলা ও মিঠুনও শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর পুত্র প্রত্যেকেই তাদের হাতের কৌটা নিয়ে এক রাস্তায় ও-রাস্তায় ছুটোছুটি করছে, এবং বাক্সে কেউ পাঁচ টাকা বা দশ টাকার নোট ফেললেই তাদের কী আনন্দ! তারা জানে হয়তো ঐ টাকা দিয়ে একটি শীতের কম্বল কেনা যাবে, যদিও তা সস্তায় এবং হয়তো গায়ে দিতে অনেক কষ্ট।

নগরবাসীদের কাছ থেকে সাড়াও এসেছে অভূতপূর্ব। আধ ঘণ্টা আগে যেসব রাস্তা থেকে অন্য সেবাব্রতীরা এসে সাহায্য নিয়ে গেছে, সে রাস্তার মানুষেরাও শিল্পী সাহিত্যিকদের ডাকে আবার সাড়া না দিয়ে পারেন নি। অনেকে কিছু না পান, কিছু চাল বা গম তো আছে। এক বৃদ্ধা, যিনি বন্যার সময় জলপাইগুড়িতে ছিলেন, চোখের জলে ভাসতে ভাসতে একটি দশ টাকার নোট এক কবির বাক্সে দিলেন। এক রাস্তায় মুচি অনাথান থেকে টাকা ধার করে ঐ টাকাটি একজনের বাক্সে দিলেন। এসব দৃশ্য যাঁরাই সেবার কাজে মাঝে-মধ্যে রাস্তায় নামেন, কত আনন্দের সঙ্গে তাঁদের দৃষ্টিগোচর হয়। এক রাস্তায় চলতি গাড়িকে জোর করে রাস্তায় থামিয়ে একটি শীতের ওভারকোট দিলেন; বললেন 'আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।'

অত্যন্ত দুঃখের মধ্যেও এবং সব নাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শুধু পথ পরিক্রমায় আনন্দ আছে কেন না এভাবে পথ হাঁটলে তবেই মানুষ অনুভব করতে পারে, সে শুধু মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পালাতেই জানে না, মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে পারে। বাংলাদেশের শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা এই লড়াইয়ের সামিল হয়ে আবার তাঁদের মনুষ্যত্বের পরিচয় দিলেন।
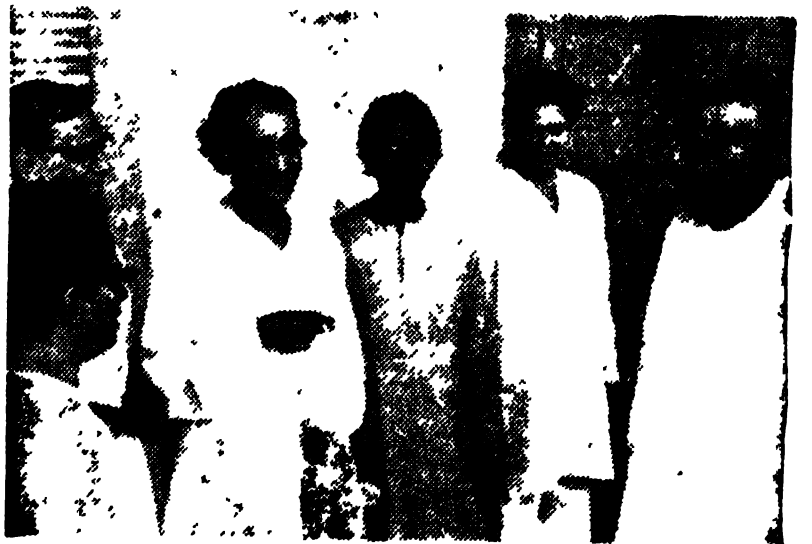
দ্বিতীয় দিনের পথ-পরিক্রমা শুরু করার আগে একে একে মিলিত হলেন (বাঁ দিক থেকে) প্রেমেন্দ্র মিত্র, ডাঃ নীহার. নন্দী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, দিনেশ দাস, সবিতাব্রত দত্ত, মনোজ বসু

প্রথমে কথাটা হাওড়ায় বললেন রাজ্যপাল শ্রীধবমবীর, পরে প্রায় একই সুরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীও ঐ একই কথা বললেন জলপাইগুড়িতে—বন্যা নিয়ে রাজনীতি নয়। রাজ্যপাল শ্রীধবমবীর হাওড়া রোটারী ক্লাবে বললেন—[illegible] বা কোন বিভেদের প্রশ্ন এনে [illegible] বণ্টনে জটিলতা সৃষ্টি না [illegible]। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী [illegible] ত্রাণ কার্যকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে [illegible] কথা দুইটি শুনে জলপাইগুড়ি [illegible] হাজারের সর্বহারা মানুষেরা তথা মেদিনীপুরের সর্বস্বান্ত মানুষেরা হয়ত [illegible] হাত দিয়ে ভাববে রাজ[illegible] কার কথা।' আর রাজ্যের [illegible] ভাববেন প্রধানমন্ত্রী [illegible] রাজ্যপাল ভাল কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন তিন মাস পরে সাধারণ নির্বাচন, আমরা শুধু রিলিফ রিলিফ করছি, রাজনীতি তো করা হচ্ছে না।' কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যিনি ভারত রাষ্ট্রের প্রধান আর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল যিনি পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনের প্রধান তাঁরা দু'জনে একই সুরে একদিনের ব্যবধানে এই কথা দুটি বললেন কেন? পশ্চিমবঙ্গ রিলিফ নিয়ে কি সত্যি কোন রাজনীতি হচ্ছে? যদি হয় তবে কারা করছে সেই রাজনীতি? প্রশ্নটার মীমাংসা হওয়া দরকার।

প্রথমেই একটি কথা মনে রাখতে হবে—বর্তমানে রাজ্যে কোন জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার নেই, আর জনপ্রতিনিধির সব কাজ ও দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে রাজ্যপালের ওপরই বর্তেছে। কাজেই মানুষের আজ সব অভাব-অভিযোগ জানাবার যেমন একমাত্র স্থান রাজ্যপাল ও তাঁর দপ্তর, তেমনি সব অভাব অভিযোগের প্রতিকার করাও রাজ্যপালের অনুগ্রহনির্ভর। কাজেই মানুষের অভাব অভিযোগ জানাতে হলে রাজ্যপালকেই জানাতে হবে আর রাজ্যপাল যদি এই অভাব অভিযোগ জানানোকেই রাজনীতি বলে মনে করেন। রাজনীতির বর্তমান মূলকথা হল রাজ্যের অভাবগ্রস্ত নিপীড়িত সর্বহারা মানুষদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন। এই ত্রাণ ও পুনর্বাসন ছাড়া সম্ভবত রাজ্যের কেউ এক্ষুণি বলছেন না যে আমরা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু করেছি বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু করেছি। জোরে বা আস্তে সকলেই যে কথাটা বলছেন সেটা হল রাজ্যের কয়েক লক্ষ মানুষের দুর্গতি নিরসনের কথা। এ কাজ যদি সরকার তার সাধ্যমত চেষ্টায় ও আন্তরিকতার সাথে করে তবে এই রাজ্যে কার এমন বুকের পাটা আছে যে সে বলতে পারে [illegible] অথবা রাজনীতি করছি—এ রাজ্যের বর্তমান সমস্যার সমাধান রাজনৈতিকভাবেই করতে হবে। সম্ভবত সেই কথা কেউ বলছেন না বা এখনো বলেন নি।

কিন্তু প্রশ্ন হল সরকার কি সত্যই আন্তরিকতার সাথে দুর্গত মানুষদের [illegible] জন্য নিষ্ঠার পথে এগিয়ে চলেছেন? উত্তরবঙ্গের বন্যার কয়েক মাস আগে দক্ষিণবঙ্গে মেদিনীপুর সহ কয়েকটি জেলায় ভয়াবহ বন্যা হয়ে গেছে। এইখানেও মানুষ সর্বহারা নিঃস্ব হয়েছে। মেদিনীপুরে মানুষের প্রাণহানি হয় নি সত্য তবে উত্তরবঙ্গের মানুষের ঘর যেভাবে ভেঙেছে সেরূপ এইভাবে ভগবানপুর, কেশপুর, পটাশপুর, পিংলা সবং, কেশিয়াড়ীতে ঘর ভেঙেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যেইমাত্র সরকারের নজর উত্তরবঙ্গে চলে গেছে অমনি সরকার মেদিনীপুর থেকে তার পাততাড়ি গুটিয়ে নিয়েছেন। মেদিনীপুর প্রভৃতি এলাকায় দুই শত লঙ্গরখানা খোলা হয়েছিল ৮০টা চীপ ক্যান্টিন খোলা হয়েছিল শতকরা ৩০ জনকে রিলিফ দেবার পরিকল্পনা করা হয়েছিল কিন্তু দেখা যাচ্ছে গত ১৫ই অক্টোবর থেকে সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কেউ হয়ত বলবেন—তা কেন অনেকদিন কাজ করে সরকার ত্রাণের কাজ সমাধান করেছেন। [illegible] বন্ধ করে দিয়েছেন। সরকার কি ত্রাণ করেছেন তার সামান্য হিসাব দেখলে বোঝা যাবে।

৬৪ লক্ষ বন্যা-দুর্গত মানুষের জন্য সরকার ৩১ দিনে ৭২ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। অর্থাৎ গড়ে মাথাপিছু খরচ করেছেন তিন পয়সা। মাথাপিছু তিন পয়সা খরচ করে সরকার যদি বলেন অনেক করেছি আর সেখানকার মানুষ যদি আরো ত্রাণ ও সাহায্যের জন্য আন্দোলন করে, তবে সেটা কি রাজনীতি হবে?

এবার উত্তরবঙ্গের কথায় আসা যাক। উত্তরবঙ্গে বন্যা হয়ে গেল সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেল এবং তারপর সরকার সেই মানুষদের ত্রাণ ও দুর্গতি মোচনে কি তৎপরতা দেখিয়েছেন সেই কথা পরে বলাই ভাল। কিন্তু বন্যার পর যখন ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ এল, তখন উত্তরবঙ্গের সর্বস্তরের মানুষ একটি দাবি তুললো। সেই দাবি হল—বন্যার সম্পর্কে একটি তদন্ত চাই, আর তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত জেলার সরকারী আমলাদের সরিয়ে নাও—নতুন আমলা নিয়োগ কর, কারণ এই আমলাদের ওপর সাধারণ মানুষের কোন আস্থা নেই। এই দুইটি দাবির মধ্যে কি এমন ভয়ঙ্কর প্রশ্ন ছিল যে সরকার সেই দাবির প্রতি কোন প্রকার শ্রদ্ধা দেখালেন না। মানুষ একটা তদন্ত কমিটি চেয়েছিল এই কারণে যে, [illegible] চাষ [illegible] ও [illegible] কারণে [illegible] সংস্থান হারিয়েছে [illegible] হারিয়েছে, স্ত্রী পুত্র হারিয়েছে সর্বস্বান্ত হয়েছে। [illegible] হাজার মানুষের প্রাণহানি হল কোটি কোটি টাকার বিষয়সম্পত্তি বিনষ্ট হল সেই কথা কেউ অস্বীকার করেন নি, অথচ সেই মানুষগুলির আস্থাভাজন একটি তদন্ত কমিটি গঠনে সরকারের এত অনীহা কেন? সরকার প্রাক্তন চীফ সেক্রেটারী শ্রী এস এন রায়কে দিয়ে একটা তদন্ত করালেন। শ্রী এস এন রায় শুধু একজন প্রাক্তন সরকারী আমলা নন, রাজ্য সরকারের যে সকল কর্মচারীর ওপর

সাধারণ মানুষের রোষ, ঘৃণা, ক্রোধ ও অনাস্থা, তাদের অনেকেই শুধু শ্রীরায়ের প্রাক্তন সহকর্মী নন—অনেকে জুনিয়ার হিসাবে স্নেহের পাত্র। সরকারী আমলাদের মধ্যেও ঘোঁট আছে, দল আছে, এবং শ্রীরায়ও যখন এই সরকারী আমলা ছিলেন, তখন তিনিও এর ঊর্ধ্বে ছিলেন না। কাজেই শ্রীরায় যদি পরম নিরপেক্ষ তদন্ত করেন বা শ্রীরায়ের রায় যদি অতি সাত্ত্বিকও হয়, তবুও মানুষ কি করে ভুলবে—শ্রী এস, এন, রায় আর শ্রী এস, কে ব্যানার্জী সেম কেদারের বার্ডস্‌। কাজেই মানুষ যদি আজ এই শ্রীরায় তদন্ত কমিশনের বিরুদ্ধে কথা বলে যদি কোন বিচারপতির মাধ্যমে বে-সরকারী বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য সোচ্চার হয়—তবে সেটা কি রাজনীতি হবে। অথচ কি মহাভারত অশুদ্ধ হত, কি মহাপ্রলয় ঘটত, যদি রাজ্যের কোন একজন বিচারপতিকে দিয়ে তদন্ত করানো হত। বাংলাদেশে শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ বা শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী প্রমুখ ব্যক্তিরা আজও আমাদের মধ্যে রয়েছেন, তাঁদের অস্তিত্ব স্বীকার করে তাঁদের কাজে লাগালে তাতে সরকারেরই ইজ্জৎ বাড়তো, সরকারী কাজে মানুষের আস্থা বাড়তো, সরকারী কাজে সহায়তা করতে মানুষ এগিয়ে আসতো।

দ্বিতীয় দাবি ছিল—বিপর্যস্ত এলাকার দায়িত্বে সরকারী কর্মচারীদের অপসারণ কর। এই দাবিটিও সরকার অতি নিপুণভাবে এড়িয়ে গেছেন ও যাচ্ছেন। জলপাইগুড়ির মানুষ সব বিপর্যয়ের জন্য যাদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে, যাদের অপদার্থতা, সীমাহীন শৈথিল্য, মানুষকে স্বামী পুত্র পরিজনহারা করেছে, রিক্ত নিঃস্ব সর্বহারা করেছে—সেই সরকারী কর্মচারীদের প্রতি সাধারণ মানুষের কোন আস্থা থাকা সম্ভব নয়। শুধু সাধারণ মানুষ কেন—কংগ্রেসের জনৈক সর্বোচ্চ নেতা বলেছেন, দে আর ওয়ার্স্ট দ্যান ওয়ার্স্ট। শ্রীমোরারজী দেশাইও ঐ একই মনোভাব প্রকাশ করে গেছেন, স্বয়ং ধরমবীরকে যেদিন রাইটার্স বিল্ডিংসে শ্রীজ্যোতি বসু বলেছিলেন আমরা আপনারও অপসারণ চাই—তখন শ্রীধরমবীর বিড়-বিড় করে যেকথা বলেছিলেন, স্মরণ করলে দেখবেন তিনি প্রায় ঐ একই কথা বলেছেন; তবু কেন অন্তত সিম্বল হিসাবে একজন সরকারী অফিসারকে সরিয়ে জনসাধারণের দাবির প্রতি মর্যাদা দেওয়া হল না। আজ যদি রাজ্য সরকার বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণকাজ পরিচালনা ও পুনর্গঠনে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়ে শ্রীশৈবাল গুপ্ত বা শ্রী কে কে হাজরার মত কোন প্রাক্তন সরকারী অফিসারকে সমন্বয় অফিসার হিসাবে নিয়োগ করতেন, তবে অসহায় মানুষ মনোবল ফিরে পেত, সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসতো। নইলে, যে সরকারী অফিসারকে জলপাইগুড়ির সাধারণ মানুষ এক নম্বর আসামী মনে করে তার সঙ্গে যদি শ্রীমোরারজীকে দেখে, তবে তখন হাত থেকে কাদা ছোটে, প্রধানমন্ত্রীকে দেখলে বিক্ষোভ ধ্বনি ওঠে। এই বিক্ষোভ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বা উপ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নয়, এই বিক্ষোভ দোষী অফিসারদের বিরুদ্ধে, কিছুটা রাজ্যপালের বিরুদ্ধেও বটে। কারণ তিনিও তো বিপর্যয়ের সময় দার্জিলিং থেকেও চৌদ্দ দিন পরে জলপাইগুড়ি এসেছিলেন।

মাননীয় রাজ্যপালকে যদি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করা যায়—রাজ্যে নির্বাচিত সরকার নেই বিধানসভা নেই, জনপ্রতিনিধি বা মন্ত্রী নেই, মানুষ তার অভাব অভিযোগের কথা কাকে জানাবে আর কিভাবে জানাবে? অভিযোগ জানানোই কি রাজনীতি অভাবের কথা বলাই কি রাজনীতি? কিন্তু তিনি কেন একটা অতি সামান্য কাজ করতে পারলেন না? সেই কাজটি হল সকল দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি বৈঠক। জাতীয় বিপর্যয়ের জাতীয় উদ্যোগে মোকাবিলা করতে হবে এই কথা ভেবে সমস্ত জাতির প্রতিনিধি হিসাবে সর্বদলের প্রতিনিধিদের নিয়ে কি করা যায় কি করলে ভাল হয় কিভাবে সকলকে সঙ্গে নিয়ে সকলকে সহযোগী হিসাবে পেলে কাজ করা যায়—সেই কাজ করালেন না। এইসব দলই তো আইনসভা পরিচালনা করে। এইসব দলের লোকেরাই তো জনপ্রতিনিধি, মন্ত্রী হিসাবে কাজ করে, তাদের সকলকে ডেকে একবার বললে বা সকলকে নিয়ে একটা পরামর্শদাতা কমিটি করলে, তাতে শ্রীধরমবীরের কি ধর্ম নষ্ট হত! আজ কেন সব দলকে স্মারকলিপি পেশ করে তাঁর কাছে দাবি জানাতে হয়। আজ কেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য শ্রীজ্যোতি বসুকে দিল্লীতে গিয়ে উমেদারী করতে হয়! কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা, এমন কি স্বয়ং চ্যবন কংগ্রেস নেতাদের বাড়ি গিয়ে, শ্রীমতী গান্ধী দিল্লী থেকে বা দার্জিলিং থেকে টেলিফোনে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন, কিন্তু রাজ্যের রাজনীতির অন্যতম প্রধান শরিক যুক্তফ্রন্টকে কেন সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করার প্রবণতা দেখানো হয়। শ্রীহুমায়ুন কবিরকে শ্রীধরমবীর বিমানসঙ্গী করে ভ্রমণ করতে পারেন আর যুক্তফ্রন্ট নেতারা অনুরোধ করেও দেখা পাবেন না—এই নীতি কি করে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে? যে রিলিফ কমিটি কংগ্রেস থেকে সব জেলায় করা হয়েছে, সেই রিলিফ কমিটিকে জলপাইগুড়ির বিভাগীয় কমিশনার ও ডি, আই, জি অনুমোদন করলেন, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রীপরিমল ঘোষ বিনা ভাড়ায় সেই কমিটির মাল বহনের ছাড়পত্র দিলেন—কিন্তু যুক্তফ্রন্ট জেলায় জেলায় ত্রাণ কমিটি করা সত্ত্বেও তাঁদের স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠা কেন? কংগ্রেসের রিলিফ কমিটিতে জেলার প্রধান কংগ্রেস নেতারা আছেন, যুক্তফ্রন্টের রিলিফ কমিটিতেও জেলার যুক্তফ্রন্ট নেতারা আছেন উভয় কমিটিতেই প্রাক্তন মন্ত্রীরা আছেন। কিন্তু সরকারের কাছে একজন স্বীকৃতি পাবে সহযোগিতা পাবে অনুগ্রহ পাবে আর একজন দূরে থেকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখবে—এই কাজ কি করে সম্ভব হবে। তাছাড়া পশ্চিমবাংলা কংগ্রেস ও যুক্তফ্রন্ট উভয়েই প্রায় একই শক্তিতে শক্তিমান, জনপ্রতিনিধিত্বে উভয়েই সমান মর্যাদা। কাজেই সরকার নিরপেক্ষভাবে চললে উভয়কেই একই মর্যাদা দিলে নীতিসম্মত হত। কিন্তু সরকার কি সেই পথে চলেছেন? সরকার যদি জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বকে স্বীকার না করেন, জনসাধারণের সাধারণ দাবিগুলি ধৈর্যের সঙ্গে বিবেচনা না করেন, পরন্তু কূট চালে একের বিরুদ্ধে অন্যকে লড়িয়ে দেন তখন সংঘর্ষ অনিবার্য। মুখে ত্রাণ নিয়ে রাজনীতি করো না বলবো আর কাজে রাজনীতির বাপান্ত করবো—দুটো কাজ একসঙ্গে চলে না অন্তত পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে একেবারেই অচল।

(২৫।১০।৬৮)

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

রোমা রোলাঁ যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশকের ইউরোপীয় মানস-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, তাতে সন্দেহ নেই। যে ইউরোপ মানুষকে ভালবেসেছে, সক্রিয়ভাবে তার উন্নতি করতে চেয়েছে, যে ইউরোপ গভীর, সন্ধানী এবং চলমান—রোলাঁ সেই ইউরোপের আত্মার সন্তান। রোলাঁর জীবনের ধ্রুববাণী—I will not rest—আমি থামব না। রোলাঁ থামেন নি, চলার পথে ভারতবর্ষকে পেয়েছিলেন, তার তীর্থবারি পান করেছেন, সেই বারি ঐ তীর্থের পংককুণ্ডের উপরে ছড়িয়েছেন, নিয়ে গেছেন ইউরোপের জন্য, কিন্তু চলেছেন সমগ্র মানবমুক্তিতীর্থের সন্ধানে, তাঁর দেহ হয়ত থেমেছে, কিন্তু আত্মার যাত্রা অব্যাহত মনে করলে রোলাঁর প্রতিই আস্থা দেখান হবে।*

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে আশ্রয়ভূমিরূপে ভারতবর্ষকে যখন রোলাঁ বেছে নিতে চেয়েছিলেন, তার পূর্বে তাঁর জীবনের প্রধান একটি পর্ব সমাপ্ত হয়ে গেছে। সেই পর্বের বড়ো অংশ তিনি প্রধানত সাহিত্যিক। সঙ্গীত ও শিল্পের প্রতি ভক্তিতে বিমুগ্ধ আত্মা। অনেকগুলি নাটক লিখেছেন, যাদের বিষয়—বিশ্বাসের সংগ্রাম ও তার বিষাদান্ত পরিণতি—*Tragedies of Faith*. লিখেছেন বিপ্লবের জন্য আত্মোৎসর্গের নাটক—*Tragedies of Revolution*. লিখেছেন—মহান পুরুষদের জীবনীমালা—বীঠোফেন, মাইকেল এঞ্জেলো, টলস্টয়। সর্বোপরি সৃষ্টি করেছেন দশখণ্ডে 'জাঁ ক্রিসতফ'—যার ফলে তিনি হয়ে উঠেছেন বিশ্বসাহিত্যিক।

জাঁ ক্রিসতফের দশম খণ্ডের ভূমিকায় (১৯১২) রোলাঁ বড় আনন্দে, আশায় লিখেছিলেন—'ক্রিসতফের নবজন্মের জন্য আমাদের মৃত্যুবরণ করতে হবে।' কিন্তু রুদ্ধশ্বাস আতঙ্কে দেখলেন, সূতিকাগৃহ ভরে গেছে বারুদের ধোঁয়ায়। প্রথম মহাযুদ্ধ। নবজন্ম কোথায়—ইউরোপ জুড়ে চিতা জ্বলছে—পুড়ছে দেহ, তারও বেশি মন, আত্মা।

আতঙ্কিত, বিপর্যস্ত তবু অপরাজেয় রোলাঁ এই সর্বনাশের—সর্বনাশা যুদ্ধের—উপরে উঠতে চাইলেন, রচনা করলেন "যুদ্ধের ঊর্ধ্বে"। এই বিখ্যাত যুদ্ধবিরোধী রচনাটি ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯১৪, প্রকাশিত হয়েছিল সুইজারল্যাণ্ডের একটি পত্রিকায়। অবিলম্বে এটি বিপুল অখ্যাতিতে তাঁকে ডুবিয়ে দিল। ফ্রান্সে তিনি দেশদ্রোহী আখ্যা পেলেন। বন্ধুবান্ধব তাঁর সংস্রব ত্যাগ করলেন। যুদ্ধের বিরুদ্ধে নিঃসঙ্গ যোদ্ধা নিজের ধ্বজা নিজে ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন বছরের পর বছর।

রোলাঁ পথ খুঁজছিলেন—যুদ্ধের মধ্যে এবং অব্যবহিত পরে দুটি দেশ তাঁর কাছে আলোকের পথ দেখাল, ভারত ও রাশিয়া। রাশিয়ায় বিপ্লব ঘটেছে ১৯১৭ সালে; তাকে অভিনন্দন জানালেন তিনি, বললেন—'তোমরা যে মুক্তির বিজয়পতাকা ওড়ালে তার দ্বারা তোমরা শুধু নিজেদের মুক্তির পথই খুলে দিলে না তোমাদের পুরাতন পশ্চিমের ভাইদের পথও পরিষ্কার করে দিলে।' তবু রাশিয়া সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে পারলেন না। তিনি মনে করলেন, 'যে দুঃসাহসিক শৃঙ্খল ভেঙে ফেলে দিয়েছেন, তাঁরা আবার নতুন শৃঙ্খল তৈরি করেছেন।' বিপ্লবীদের হিংসাত্মক পথ তাঁকে পীড়িত করেছে, রক্তাক্ত উপায়ের সমর্থনে তিনি অসমর্থ, (এ বিষয়ে রোলাঁ পন্থীদের সঙ্গে বারবুস পন্থীদের দীর্ঘ বিতর্ক হল ১৯২০–২২-এ) রুশ সরকার যখন বুদ্ধিজীবীদের দমন করলেন এবং গোর্কী রাশিয়া থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন নিলেন, তখন তাঁর প্রতি নৈতিক সমর্থন জানালেন রোলাঁ, সোভিয়েত সরকারকে নিন্দা করে বিবৃতিও দিলেন।

হিংসাকে রোলাঁ সমর্থন করতে পারছেন না, অথচ বিপ্লবের প্রয়োজনও অগ্রাহ্য করা ··

* এখন পুনশ্চ অভিযোগ শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত প্রভৃতির বিরুদ্ধে। ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের গুহা থেকে উদ্ধার করে কেন তাঁরা রোলাঁকে ক্রেমলিনের প্রাসাদবন্দী করতে চাইছেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে রোলাঁ কমিউনিজমে আস্থা জানিয়েছিলেন বলে? কিন্তু রোলাঁর মানস জীবনের শেষ পর্যায় ওটাই, একথা ভাবলে রোলাঁকেই যে শেষ করে দেওয়া হবে। ১৯৪৪-এর ৩০শে ডিসেম্বর ৭৮ বৎসর বয়সে রোলাঁর দেহান্ত না হয়ে ধরা যাক আরও ২৫ বছর আগে যদি তাঁর দেহান্ত হত (তখনো তিনি পঞ্চাশোর্ধ্ব), তাহলে তাঁকে সেবাগ্রামবাসী ধরে ফেলতে গান্ধীবাদীদের তো অসুবিধা হত না। রোলাঁর *Quinze Ans de Combat* গ্রন্থের বাংলা অনুবাদের নাম 'শিল্পীর নবজন্ম' করার বিরুদ্ধেও আপত্তি জানাচ্ছি। ঐ অনুবাদ উদ্দেশ্যমূলক সুতরাং আপত্তিকর। মূল নামের বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, "পনের বছরের সংগ্রাম।" সুভাষচন্দ্রও তাঁর প্রবন্ধে ঐ নামই দিয়েছেন। ইংরেজী সংস্করণের নামও যথাযথ রাখা হয় নি; করা হয়েছে *I will not rest* ইংরেজী নামকরণটি খাঁটি অনুবাদ না হলেও রোলাঁর জীবনরূপের দিক দিয়ে সার্থক। রোলাঁ জীবন দিয়ে বলতে চেয়েছেন, আমি থামব না, আমি সংগ্রামে চির গতিশীল। এক্ষেত্রে তাঁকে কোনো একটি নবজন্মের মধ্যে বেঁধে ফেলা অসঙ্গত। কোনো সন্দেহ নেই যে, কমিউনিজমে বিশ্বাসের মধ্যে শিল্পী রোলাঁর নবজন্ম হয়েছিল, যে-নবজন্ম পূর্বেও তাঁর হয়েছে এবং পৃথিবীতে অবিচার অসাম্য থাকতে যেহেতু তিনি মুক্তি পাবেন না, ভবিষ্যতেও (হিন্দু মতে) তাঁর নবজন্ম হবে।

জেনে না—পথ কোথায়? ভারতবর্ষের গান্ধী সেই পথ দেখালেন, অহিংস বিপ্লবের আদর্শ তুলে ধরে— মুগ্ধ রোলাঁ তাঁকে 'মাই মাস্টার' বলে বরণ করে নিলেন।

যুদ্ধ-বিরোধী হয়ে রোলাঁ যখন সুইজারল্যান্ডে একাকী বেদনায় কাল কাটাচ্ছিলেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তখনই বিশেষভাবে পড়াশোনা আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। এই কালে (১৬ জুন, ১৯১৬) টোকিওতে ভারতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যুদ্ধ-বিরোধী বক্তৃতা যুদ্ধ-বিরোধী রোলাঁকে বিশেষভাবে আশ্বস্ত করে। নিজের ডায়েরীতে লিখেছিলেন, "এই বক্তৃতাটি জগতের ইতিহাসে একটি সন্ধিক্ষণের বার্তা।" পরে ডঃ অমিয় চক্রবর্তীকে লেখেন, তিনি ইয়োরোপ ও এশিয়ার মানসকে মেলাবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন, এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র, কারণ, আমি অনুভব করতে পারছি যে একই ঐকতান তাঁর মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে।

বুদ্ধিজীবীদের অগ্রণী ভূমিকা সম্বন্ধে তখনো আস্থাশীল রোলাঁ মহাযুদ্ধের পরে "মানবাত্মার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র" রচনা করে তাতে স্বাক্ষর দেবার অনুরোধ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন (১০ এপ্রিল, ১৯১৯)—"আমার খুবই ইচ্ছা যে, এখন থেকে এশিয়ার চিন্তা নিয়মিতভাবে ইউরোপের চিন্তার সঙ্গে সহযোগিতা করুক। একদিন চিন্তার এই দুইটি জগৎকে ঐক্যবদ্ধ দেখবো, এইটাই আমার স্বপ্ন। এই বিষয়ে অন্য যে কোন ব্যক্তির চেয়ে আপনার অবদান বেশি—সেইজন্য আমি আপনাকে সম্মান করি।" স্বাক্ষর দিতে রবীন্দ্রনাথ সম্মত হন। তাঁকে আর এক পত্রে রোলাঁ লেখেন (২৬ আগস্ট)—"স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ইউরোপ একাকী নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। তার চিন্তায় এশিয়ার চিন্তার প্রয়োজনীয়তা আছে, যেমন ইউরোপের চিন্তায় এশিয়া উপকৃত হয়েছে।"

ইউরোপ ও এশিয়ার মানসমিলন রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্যকে রোলাঁ আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করেছেন, কিন্তু অভিভূত হয়ে প্রণাম করেছেন এইকালে আবির্ভূত মানবমুক্তির অবতার গান্ধীকে। পরবর্তীকালে 'শিল্পীর নবজন্ম' গ্রন্থে তাঁর স্বীকারোক্তি:

> "আমার চিন্তাগগনের দিগন্তে গান্ধীর সুদূর তারকা দেখা দিল। এই তারকার আলোককেই আমি পরে সমস্ত ইউরোপে প্রতিফলিত করি।"

অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীর ভূমিকা দেখে মুগ্ধ রোলাঁ তাঁর সম্বন্ধে ব্যাকুল আগ্রহে সর্বপ্রকার সংবাদ সংগ্রহ করতে থাকেন। ১৯২০ সালের আগস্ট মাসে দিলীপকুমার রায়ের কাছ থেকে খুঁটিয়ে সব জেনে নিলেন। ১৯২১ সালের ১৯শে এপ্রিল প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল (প্রথম সাক্ষাৎ)। সেইসময়ও উভয়ের মধ্যে গান্ধীজীর বিষয়ে আলোচনা হল। রবীন্দ্রনাথ ভারতের আত্মিক ও নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়ে জোর দিয়ে নানা কথা বললেন। তিনি সবে আমেরিকা ঘুরে এসেছেন; আমেরিকার যান্ত্রিকতা, দম্ভ ও অর্থলালসা তাঁর কাছে দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল। তাঁর কাছ থেকে রোলাঁ শুনলেন, 'ভারত হিংসা দিয়ে হিংসার প্রতিরোধ করে না।' এই সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথ খুবই আনন্দিত হন। রোলাঁ সম্পর্কে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে তিনি ডঃ কালিদাস নাগকে লেখেন—"সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্যই রোমা রোলাঁ তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন; পশ্চিম দেশে যেসব মনীষীর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে, তাঁদের মধ্যে রোলাঁই হচ্ছেন আমার মনের ও হৃদয়ের সব থেকে নিকটতম। রোলাঁর নিকট তাঁর দেশ ও জগতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই; সেইজন্যই জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিকতার চ্যাম্পিয়ানদের দ্বারা তিনি নির্যাতিত হচ্ছেন।" রোলাঁ কিভাবে নির্যাতিত হচ্ছিলেন, তার একটা দৃষ্টান্ত তিনি স্বচক্ষে দেখে এসেছিলেন। প্যারিসে সিলভাঁ লেভীর বাড়িতে থাকা কালে যখন তিনি রোলাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে বিশেষ উদ্গ্রীব, তখন ফরাসী বন্ধুরা রোলাঁর বাড়ির ঠিকানা পর্যন্ত তাঁকে দেন নি। বহু চেষ্টায় ঠিকানা সংগ্রহ করে তাঁকে রোলাঁর দরিদ্র আবাসে হাজির হতে হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রত্যক্ষ মিলিত হয়ে রোলাঁও কম খুশি হন নি। ১৯২৩ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন—"এশিয়া ভ্রমণে শান্তিনিকেতনে কিছুকাল থাকবার আমার খুব ইচ্ছা। আপনার কাছ থেকে আমার অনেক কিছু শিখবার আছে। ...ভারত আমার কাছে এখন আর একটা বিদেশী দেশমাত্র নয়; তা হচ্ছে সব থেকে মহৎ দেশ, একটি প্রাচীন দেশ, যেখান থেকে একদিন আমি এসেছিলাম।"

এসব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ নন, গান্ধীই রোলাঁর কাছে এখন দেবতা। রোলাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ তাঁরই মত একজন আন্তর্জাতিক মানব, কিন্তু গান্ধী তাঁর সমস্ত মধ্যযুগীয়তা সত্ত্বেও নতুন মেসায়া।

সুতরাং রোলাঁ "গান্ধীর *Young India* ভিত্তি করে দুই মাস অসাধারণ পরিশ্রম করে *Mahatma Gandhi* লিখলেন।" ১৯২৩ সালের গোড়ার দিকে তা প্রকাশিত হবার পরে নানা ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয়ে গেল অচিরে। ১৯২৪ সালে গান্ধীজীর 'ইয়ং ইন্ডিয়া'-র ফরাসী অনুবাদের ভূমিকা লিখলেন রোলাঁ (ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকা লিখতে কিন্তু রোলাঁ একদা অস্বীকার করেছিলেন); এবং ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে গ্রন্থখানির ব্যাপক সাফল্যে উল্লসিত নিজ ডায়েরীতে লিখলেন—

"রুশ ভাষাতেও 'গান্ধী' প্রকাশিত হল। প্রায় সব ভাষাতেই এর অনুবাদ হল। ফ্রান্স ও জার্মানীতে দ্রুত একটার পর একটা সংস্করণ বেরিয়ে যাচ্ছে। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের মধ্যে, বিশেষ করে, প্রটেস্টান্টদের মধ্যে খুবই প্রভাব বিস্তার করছে। আমার মনে হয় মহাত্মা হচ্ছেন পুনরুজ্জীবিত খৃস্ট।"

মনে রাখতে হবে, যুদ্ধ-বিরোধী, আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী রোলাঁ তাঁর 'মহাত্মা গান্ধী'-তে গান্ধীজীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অসহযোগের প্রশ্নে সংঘর্ষের ক্ষেত্রে কিন্তু গান্ধীকেই সমর্থন করেছিলেন। এ ব্যাপারে রোলাঁর বক্তব্য কি ছিল, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে তিনি চিত্রিত করেছেন, তা পূর্বের এক অধ্যায়ে বিশদভাবে জানিয়ে এসেছি।

মোটামুটি বলতে গেলে, ১৯২৪ সালেই রোমা রোলাঁর গান্ধীভক্তির পূর্ণিমা কোটাল। এর পরেই ভাটার টান যদিও খুব ধীরে। রোলাঁর মত বুদ্ধিজীবীর কাছে গান্ধীজীর চিন্তাশক্তির দুর্বলতার রূপ প্রথমাবধি স্পষ্ট ছিল। 'মহাত্মা গান্ধী' গ্রন্থে ভাবস্রোতের মধ্যেও দু-একটি নুড়ির পাথর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। চৌরিচৌরার পরে গান্ধীর আন্দোলন প্রত্যাহারকে 'সমগ্র মানবতার আধ্যাত্মিক প্রগতির ইতিহাসে কদাচিৎ দৃষ্ট সমুন্নত ঘটনা বিশেষরূপে, আখ্যাত করলেও এর রাজনীতির দিক থেকে তার বিপজ্জনক রূপকে তিনি পুরোপুরি খুলে ধরেছিলেন—

> "সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করিয়া, তাহাকে একটি সুচীবদ্ধ কোনো আন্দোলনের জন্য অধীরভাবে দীর্ঘকাল প্রতীক্ষিত রাখিয়া অবশেষে হাত তুলিয়া শেষ আদেশ প্রদান করিবার পর অকস্মাৎ শেষ মুহূর্তে যখন সেই দুর্বার যন্ত্র গতিশীল হইয়াছে, তখন তাহাকে হাত নামাইয়া তিনবার থামিতে বলা, ইহা নিতান্তই বিপজ্জনক। ইহাতে ব্রেক ভাঙিবারও যেমন ভয় আছে, তেমনি ভয় আছে, সমস্ত গতিবেগকে পঙ্গু করিয়া দেওয়ার।"

এই সমস্ত বুদ্ধিবিচার কিন্তু ভক্তির পুষ্পপত্রে চাপা পড়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাকে সমঝাবার খানিক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হন নি, এবং দেখা

যাবে, তিনিও ক্রমে নিজস্ব উদ্যান থেকে কুসুম আহরণ করতে ব্রতী, এই দেবতার অর্চনায়।

১৯২৪ থেকে কিন্তু সত্যই ফিরতি স্রোত। গান্ধীজীকে কয়েক বৎসর ধরেই রোলাঁ ইউরোপে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। ১৯২৫ সালে বিশেষভাবে তাগিদ দিলেন। দেওয়ার একটা বিশেষ কারণ উপস্থিত হয়েছিল। গান্ধীজী ইতিমধ্যে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে নিজ বক্তব্য প্রকাশ করে ফেলেছেন; আর রোলাঁ, তাঁর সমস্ত গান্ধীভক্তিসহ চাইলেন গান্ধীর অহিংসার সঙ্গে যদি কমিউনিজমকে কোনো প্রকারে মিলিয়ে দেওয়া যায়।

ইয়ং ইন্ডিয়ার এক প্রবন্ধে (ডিসেম্বর ১৯২৪) গান্ধীজী যখন কমিউনিজমের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন, স্বভাবতই ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী কাগজগুলো তা ফলাও করে ছেপেছিলেন সত্য-মিথ্যা মিশিয়ে (যথা, ভারতে বিদ্রোহ সৃষ্টির জন্য প্রেরিত মস্কোর বহু স্বর্ণমুদ্রা গান্ধীজী প্রত্যাখ্যান করেছেন), মিথ্যা প্রচারে পীড়িত রোলাঁ স্বভাবতই প্রশ্ন করে পাঠিয়েছিলেন, তার উত্তরে গান্ধীজী খোলাখুলিভাবে বলশেভিজমের বিরুদ্ধে তার মত জানালেন—

> আমেরিকা কিংবা রাশিয়া, কোনো দেশ থেকেই আমি কোনো নিমন্ত্রণ পাইনি। এই দেশ দুটি ভ্রমণ করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। বিদেশে ভ্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়বার কোনো বাসনা নেই। আমার কাজকর্ম ও চিন্তা সম্বন্ধে সকলেই বেশ অবহিত আছেন, আমার লুকোবার কিছু নেই, আমি খোলাখুলিভাবেই চলি। সকল প্রকার হিংসার পন্থা আমার চিন্তার বিরোধী। বলশেভিজম কি, সে সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তার চিন্তাধারা আমি অধ্যয়ন করি নি। জানি না, রুশিয়ায় এর কোনো ভাল ফল হয়েছে কি না। ভারতের পক্ষে এটা উপযুক্ত হবে কি না সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু বলশেভিকরা যেসব হিংসাত্মক কাজকর্ম করছে, তার ফলে তাদের সমর্থন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি হিংসাকে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করি, এমন কি সবচেয়ে বড় আদর্শের জন্যও। সুতরাং বলশেভিজম ও আমার মধ্যে কোথাও এতটুকু মিল নেই।"

এই কথা পড়ে রোমা রোলাঁ অবশ্যই ধাক্কা খেয়েছিলেন। যাদের মেলাতে যাচ্ছেন, তারা যদি একেবারে মুখ ঘুরিয়ে থাকে, মধ্যস্থের মানসিক যন্ত্রণার অবধি থাকে না। রোলাঁ ভেবেছিলেন, গান্ধীজীকে যদি সান্নিধ্যে পান, সেই আলোকের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ স্থানে-অস্থানে জমে থাকা বহু খণ্ড অন্ধকারকে দূর করে দেবে। গান্ধীর ইউরোপে আসা দরকার। 'ইয়ং মেনস্ ক্রিশ্চিয়ান এ্যাসোসিয়েশন'-এর আন্তর্জাতিক কমিটি যখন তাদের হেলসিংফর্স কংগ্রেসে যোগদানের জন্য গান্ধীজীকে আমন্ত্রণ জানাল—রোলাঁ দেখলেন এই সুযোগ—আসবার জন্য গান্ধীজীকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করে পাঠালেন। উত্তরে, ২৯ অক্টোবর, ১৯২৫ তারিখের চিঠিতে গান্ধীজী রোলাঁকে জানালেন, তিনি অবশ্যই যেতেন যদি অন্তরের আহ্বান পেতেন; কিন্তু সে আহ্বান পান নি। 'আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, যখন সে আহ্বান আসবে, আমি নিশ্চয়ই যাব।'

সুতরাং উৎকণ্ঠিত রোলাঁ নিজ মানস-সংকটের সমাধানে গান্ধীজীর 'অন্তরের আহ্বানের' সহায়তা পেলেন না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে এমন কিছু পেলেন, যাতে রোলাঁর ভক্তির পরীক্ষা হয়ে গেল। ১৯২৬ খৃস্টাব্দে রোলাঁর ৬০তম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিতব্য গ্রন্থে রোলাঁ সম্বন্ধে গান্ধীজীর একটি রচনার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। উত্তরে সম্পাদককে গান্ধীজী লেখেন:

> আপনার যেসব প্রশস্তচিত্ত ব্যক্তিদের নিকট লেখা চেয়ে পাঠিয়েছেন, আমি নিজেকে তাদের মত যোগ্য বলে মনে করি না। এ আমার কৃত্রিম বিনয় নয়, আমার অন্তরতম অনুভূতি।.....আরও একটা কারণে আমি নিজেকে অযোগ্য বলে মনে করি। আমি স্বীকার করছি যে, আমার এই উত্তম বন্ধুটি সম্বন্ধে কার্যত আমি কিছুই জানতাম না, যে-পর্যন্ত না তিনি আমার ঢাক বাজাবার দায় স্বেচ্ছায় নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন। (I knew practically nothing about our good friend before he imposed upon himself the task of becoming my self-chosen advertiser). আপনারা শুনে হয়ত বিস্মিত হবেন যে, তাঁর সম্বন্ধে আমার জ্ঞান, তিনি আমার সম্বন্ধে যে পুস্তিকাটি লিখেছিলেন, তার উপর চোখ বুলিয়ে যাওয়াতেই সীমাবদ্ধ। আমি যেসব জিনিস পড়তে চাই, কাজের চাপে তা পড়বার সময় পাই না। সুতরাং এখন পর্যন্ত তাঁর বিশিষ্ট বইগুলি আমি পড়ে উঠতে পারি নি।"

সমহান অসভ্য সরলতা। এই কথাগুলি গান্ধীজী ছাড়া আর কারো পক্ষে লেখা সম্ভব নয়। রোমা রোলাঁর সর্ব-মনপ্রাণ অতঃপর একটি গানই গেয়ে উঠেছিল, গানটি না জেনেও—'এই করেছ ভাল নিঠুর, এই করেছ ভাল—'। আমি এতটুকু বাড়িয়ে বলছি না। ব্যাপারটা জেনে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীকে মিষ্ট করে কিছু লিখেছিলেন; গান্ধীজী তদনুযায়ী রোলাঁকে লিখলেন, কবির কাছে শুনলাম, আমার কথা শুনে আপনি নাকি অসন্তুষ্ট। তাতে ব্যস্ত হয়ে রোলাঁ মীরাবেনকে লিখলেন, মহাত্মা যেন তাঁকে ভুল না বোঝেন—"ভগবানের আত্মার সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য যখন আমার ঘটেছে, তখন আমার পক্ষে আত্মচিন্তা বা আত্মশ্লাঘা খুবই শোচনীয় হবে।"

আর স্বয়ং গান্ধীজীকে লিখেছিলেন—

> "আপনার কাজে নিজেকে লাগাতে পেরেছি বলে আমি আমার জীবনকে গৌরবান্বিত মনে করি। আপনার স্বেচ্ছাসেবকের এই ভূমিকা বজায় রাখতেই চাই। আপনার সান্নিধ্য সকল প্রকার আত্মাভিমান বিলীন হয়ে যায়। কারণ আপনি উদাহরণ স্থাপন করেন। যিনি কর্ম করেন, যেমন আপনি, তাঁর নিকট যিনি লেখেন যেমন আমি, মাথা নত করে।"

অর্থাৎ রোলাঁ আর একটি গান গেয়েছিলেন—'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে।'

[ক্রমশঃ]

উত্তরবঙ্গের বন্যা: প্রকৃতির প্রতিশোধ, না মানুষের দায়িত্বহীনতা?

তুষার চট্টোপাধ্যায়

উত্তরবঙ্গের বন্যার প্রলংকর ধ্বংস সকলকে হতভম্ব করেছে। বন্যার সঙ্গে আমাদের দেশ, বিশেষ করে বাংলাদেশ পরিচিত। কিছুদিন আগেই যে বিধ্বংসী বন্যা হয়ে গেল, তা গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দেখা যায় নি। উত্তরবঙ্গেও প্রায় প্রতিবারই বন্যা হয়ে থাকে। পার্বত্য অঞ্চলে ধস নামাও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, তার সঙ্গেও লোকে অল্প-বিস্তর পরিচিত। সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে ঘূর্ণীঝড়ের তাণ্ডবও লোকে অনেক দেখেছে। কিন্তু কোনো কিছুর সঙ্গেই তুলনা হয় না উত্তরবঙ্গের এই ধ্বংস তাণ্ডবের। সমুদ্র থেকে এত দূরে অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় থেকে যে এমন প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি হতে পারে, জলস্রোতের এত আকস্মিক বৃদ্ধি নিমেষে গ্রাম-শহর ভাসিয়ে নিয়ে হাজার হাজার লোকের মৃত্যু ঘটাতে পারে, শহর-গ্রামকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে শ্মশানে পরিণত করতে পারে—লোকের অকল্পনীয় এ ঘটনা। জলপাইগুড়ি শহর পম্পাই নগরীর ধ্বংসকে মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু সে তো অগ্ন্যুৎপাতে। ভূমিকম্পের ধ্বংসও অতর্কিত ও আকস্মিক। এ দুর্যোগের হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় বিজ্ঞান এখনও করতে পারে নি। কিন্তু ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় কি বিংশ শতাব্দীর এই শেষার্ধেও মানুষ করতে পারে না? আবহাওয়া অফিসের কাছ থেকে প্রতিদিন পূর্বাভাষ পাওয়া যাচ্ছে বৃষ্টি ও ঝড়ের। বন্যা-নিরোধের পরিকল্পনা বহুদিন হতেই চলে আসছে। কত বাঁধ, কত জলাধার নির্মাণ করা হচ্ছে। সব কিছুকে অকেজো করে দিয়ে প্রকৃতির এমন নির্মম প্রতিশোধ ঘটবে আজকের দিনে—এ দেখে মানুষ হতভম্ব তো হবেই। প্রকৃতির নির্মম প্রতিশোধের সামনে মানুষ আজও এত অসহায়!

উত্তরবঙ্গের মর্মান্তিক মৃত্যু-কাণ্ডে শোক ও দুঃখ আছে, দুর্গতদের ত্রাণ ও সাহায্য দান আছে, পুনর্বাসনের বিরাট সমস্যা আছে। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে প্রশ্ন জেগে ওঠে: এ কি সত্যই প্রকৃতির প্রতিশোধ বলে মেনে নিতে হবে, না এ মৃত্যু-তাণ্ডবের জন্য দায়ী মানুষ?

হাঁ, উত্তরবঙ্গের বন্যা এই প্রশ্নকেই আজ সবার উপরে এনে দাঁড় করিয়েছে। বন্যাস্রোতে ভেসে যাওয়া জলপাইগুড়ির মানুষের কাতর আর্তনাদের মধ্যে এ প্রশ্ন শোনা গিয়েছে; আত্মীয়-বন্ধু হারিয়ে সর্বহারা হয়ে কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে বাঁচতে পেরেছে যারা, আকুল ক্রন্দনের মধ্যেও ক্ষোভে ফেটে পড়ে তারা এ প্রশ্ন করেছে; নিরাপদে থেকে যারা দূর থেকে এই মৃত্যু দেখে শিউরে উঠেছে সেই সমব্যথীদের মুখ থেকেও এই প্রশ্নই বেরিয়ে এসেছে। সারা পঃ বঙ্গের মানুষ, সারা দেশের মানুষ এই প্রশ্নই করছে: উত্তরবঙ্গের এই সর্বনাশ কি কিছুতেই ঠেকানো যেত না?

ঠেকানো যে যেত তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ঘূর্ণিঝড়কে ঠেকানো না যেতে পারে, উপযুক্ত বিপদ-সংকেত দিয়ে সাধারণ মানুষকে আত্মরক্ষার কিছুটা সুযোগ দেওয়া যেত। বন্যা আটকানো না যেতে পারে, বন্যার বিপদ-সংকেত যদি জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জায়গার মানুষ সময়মত জানতে পারত, তা হলে এত মৃত্যু হত না। স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ বিপদ-সংকেত পেয়েও তাতে গুরুত্ব আরোপ করে নি, সাধারণ মানুষের কাছে সে-খবর পাঠাতে অবহেলা করেছে—প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের এই মারাত্মক অবহেলা আজ প্রমাণিত। তাই জলপাইগুড়ির মানুষ ফেটে পড়েছে ক্রোধে, আক্রোশে। পঃ বঙ্গের মানুষ ফেটে পড়েছে ক্রোধে, দাবি করেছে তদন্ত চাই কাদের অবহেলায় এত প্রাণ বলি হল। প্রথমদিকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষরা অবহেলা অস্বীকার করেছেন। পঃ বঙ্গের স্বরাষ্ট্রসচিব যেন খানিকটা হুমকী দিয়েই বলেছিলেন, পোস্টমর্টেম এখন বন্ধ থাক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবহেলা যে হয়েছে তা স্বীকার করতেই হয়েছে এবং তদন্তের ব্যবস্থাও করতে হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকেও উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনার সিদ্ধান্ত করতে হয়েছে বন্যা-সংকেত ও অন্যান্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে।

কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যাবার পর তদন্ত, এ তো আমাদের দেশের সরকারের চিরাচরিত ব্যাপার। এবং এ তদন্ত মানেও যে কিছুটা ত্রুটি স্বীকার ও কিছুটা অস্বীকার এবং তারপর যথাপূর্ব ব্যবস্থা চালু রাখা—সরকারী তদন্তের এই পরিণতিও তো মানুষ অনেক দেখেছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের ঘটনা কি তেমনি চিরাচরিত একটা ত্রুটি? এ কি একটা ট্রেন অ্যাকসিডেন্টের মতো ব্যাপার যে, সিগন্যালিং-এর ত্রুটি কার দোষে সেটা অনুসন্ধান করে একটা কিছু করলেই এখনকার মতো ব্যাপারটা মিটে গেল? প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের মারাত্মক অবহেলা-জনিত অন্যায়টা সবচেয়ে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে তা ঠিকই। কিন্তু শুধু সেই একটা জায়গাতেই দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত রাখলে চলবে না। স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের অবহেলার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে আবহাওয়া বিভাগ, সেচ বিভাগ থেকে আরম্ভ করে সব বিভাগেরই এমন এক অক্ষমতা ও অপদার্থতা এবং সর্বোপরি উচ্চের পর্যায়ে এমন এক অমনোযোগিতা, যাকে সামগ্রিকভাবে না দেখলে উত্তরবঙ্গ থেকে আমাদের প্রকৃত শিক্ষালাভ হবে না।

প্রথমত, প্রশাসনিক বিভাগের অবহেলা বন্যা-সংকেত সেচ বিভাগের কাছ থেকে পেয়েও সাধারণ লোককে তা না জানানো। দ্বিতীয়ত, অতিবৃষ্টির সংবাদ ভালভাবে জানতে পেরেও সেচ বিভাগ বুঝতেই পারে নি যে, এর ফলে আকস্মিক প্রবল বন্যা হতে পারে। তৃতীয়ত, আবহাওয়া অফিস ঘূর্ণিঝড়ের সম্বন্ধে যে পূর্বাভাষ দিয়েছে তার মধ্যেও সাধারণ অতিবৃষ্টিপাত ছাড়া আর কিছু গুরুতর বিপদের সংকেত ছিল না। চতুর্থত, তিস্তা প্রভৃতির বাঁধের শক্তি সম্বন্ধেও সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনীয়ারদের কোনো নিশ্চিত জ্ঞান ছিল না। এবং পঞ্চমত যা সবচেয়ে মারাত্মক, প্রত্যেক বিভাগই মনে করেছেন যে, তাঁদের কোনো ত্রুটি হয় নি, তাঁরা যা বোঝেন তা ঠিকই।

এর কোনটাই আমার নিজের তৈরী বক্তব্য নয়। সংশ্লিষ্ট বিভাগের

"মানুষের অদৃষ্টের মস্তকে অনায়াসে অভিশাপ ধরে সে নীরবে।"

ফটো: অমল ব্যানার্জী
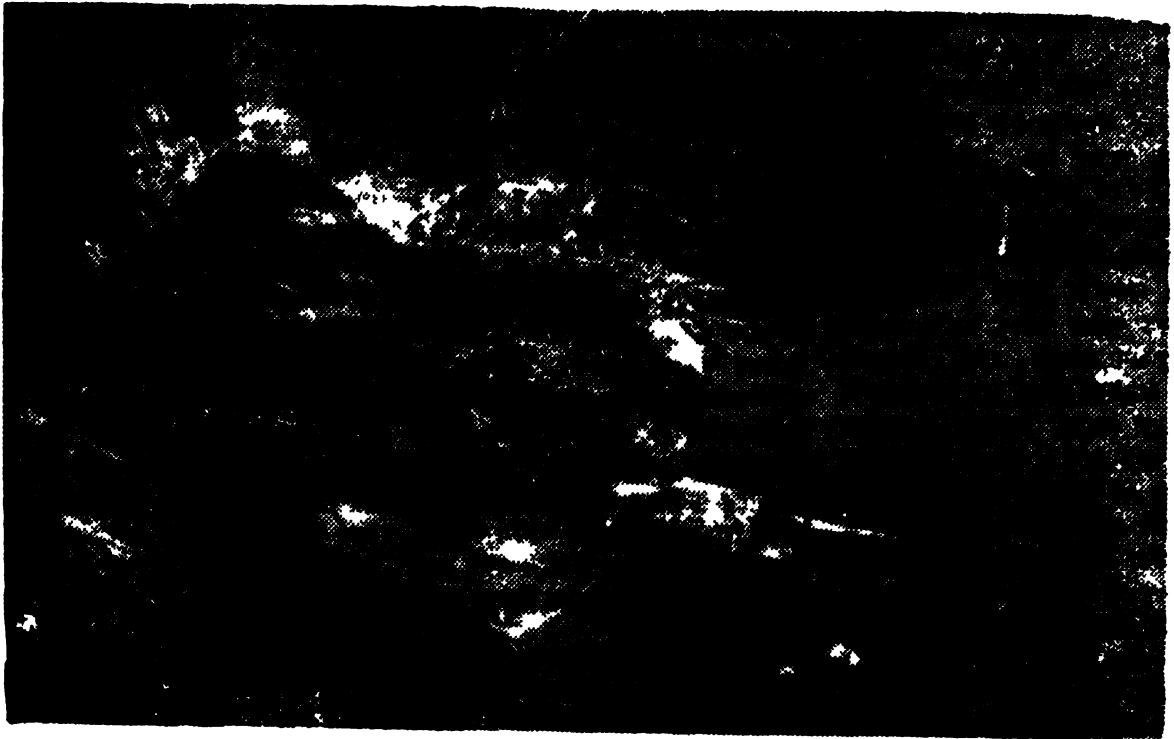
প্রাপ্ত সংবাদগুলি থেকেই এই মন্তব্যগুলি বেরিয়ে আসে।

১১ই অক্টোবরের এক খবরে প্রকাশ যে, আবহাওয়া অফিস মনে করে যে তাদের কাছ থেকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সম্বন্ধে যে সতর্কতা সেচ বিভাগ পেয়েছিল, তা থেকেই সেচ বিভাগের বোঝা উচিত ছিল যে, এর ফলে পার্বত্য অঞ্চলে কি সাংঘাতিক বন্যা হতে পারে এবং সে বিষয় জেলা কর্তৃপক্ষকে অনেক আগেই উপযুক্ত সতর্কতা জ্ঞাপন সেচ বিভাগের স্বাভাবিক দায়িত্ব ছিল। অর্থাৎ, পাহাড় অঞ্চলের বন্যা সম্বন্ধে সেচ বিভাগের উপযুক্ত জ্ঞানেরই অভাব রয়ে গিয়েছে এবং সেই জন্যই তাদের সতর্কতা জ্ঞাপনটাও হয়েছে বন্যা এসে পড়ার পর। সেচ বিভাগের এই অক্ষমতা যদি সত্য হয়, তা হলে সেটা তো মারাত্মক ব্যাপার। কিন্তু এ অক্ষমতা নিরূপণ করা দূরে থাক, সেদিকে যাতে কারুর নজরই না আসে তার জন্য উচ্চতর কর্তারা প্রশ্নটিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টায় অতিমাত্রায় ব্যস্ত। ঐ দিনেরই এক খবর এই যে, সেচ বিভাগের চীফ ইঞ্জিনীয়ার বলেছেন যে, তাঁর 'থিওরী' হচ্ছে যে, পার্বত্য অঞ্চলে বন্যা এত হঠাৎ আসে যে, আগে থেকে বোঝা যায় না। দিল্লীর সেচ বিভাগীয় দপ্তরও সেই কথা বলেই বন্যা-সতর্কতা না জানানোর ত্রুটি অস্বীকার করেছেন।

তিস্তা বাঁধের উপযুক্ততার সম্বন্ধেও বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এতটুকু ইতস্তত ভাব প্রকাশ করতে রাজী নন। তাঁরা জোর দিয়ে বলেছেন যে, অত্যন্ত শক্ত বাঁধই তাঁরা তৈরি করেছেন। এমন কি প্ল্যান মাফিক বাঁধ নির্মাণের ব্যাপারে কোনো ত্রুটি হয়েছে কি না সেটা অনুসন্ধান করে দেখার প্রশ্নও ওঠে নি। শুধু তাই নয়। বন্যাস্রোতের হাত থেকে জলপাইগুড়ি ও অন্যান্য জায়গাকে বাঁচান গেল না কেন তার একটা সহজ কৈফিয়ৎও সরকারী কর্তারা দেবার চেষ্টা করেছেন এই বলে যে, তিস্তার গতিপথ পরিবর্তন হচ্ছে, তাই স্রোতধারা ঠেকাবার উপায় নেই। কিন্তু নদীর গতিপথ কি একদিনে হঠাৎ পরিবর্তন হয়? গতিপথ পরিবর্তনের ইঙ্গিত যদি আগে থেকেই বুঝতে পারা গিয়েছিল তবে আগে থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি কেন? তিস্তার গতিপথ পরিবর্তনের বিষয় বুঝতে পারায় এই বন্যা সম্পর্কে সেচ বিভাগের দায়িত্ব অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছে।

অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তারা সব বিষয়েই কৈফিয়ৎ তৈরি করে রেখেছেন। পাহাড় অঞ্চলে অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে কি রকম বন্যা হতে পারে সেটা না বুঝতে পারাটাও দোষের নয়; বাঁধ নির্মাণের কোনো ত্রুটি হয় নি; নদীর গতিপথ পরিবর্তন হলেও আগে থেকে বোঝা যায় না—কোনো কিছুই করা যায় না যখন, তখন সব কিছুকেই স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে হবে। এইভাবে মৃত্যুকে 'স্বাভাবিক' বলে সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য যেন তাঁরা আগে থেকেই তৈরি হয়ে আছেন।

তবু আবহাওয়া অফিসের বক্তব্যের মধ্যে সত্য গোপন করার চেষ্টা বেশি হয় নি। আবহাওয়া অফিস স্বীকার করেছে (১০।১০।৬৮) যে উড়িষ্যা থেকে আগত নিম্নচাপ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়লেও হিমালয় অঞ্চলে এসে তা এত প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত ঘটিয়েছে—এতে তাঁদের হিসাব গোলমাল হয়ে গিয়েছে। তাঁরা একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন, আবার নিজেদের ব্যবস্থার ত্রুটিও স্বীকার করেছেন। দিল্লীর আবহাওয়া অফিস স্বীকার করেছে যে, ১৮৯১ থেকে মাসে একটা করে ঝড় উত্তর-পূর্ব ভারতে হয়ে আসার দরুণ

উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের সাহায্য করুন

ঝড়ের গতিপথ তাঁদের খুবই জানা। কিন্তু তাতেই বা কি হবে? গোটা পূর্ব উপকূলব্যাপী অঞ্চলের জন্য মাত্র তিনটি ঝড় সংকেত জ্ঞাপক রাডার স্টেশন আছে, যা 'জঙ্গলে মশা ধরার মতই' অকিঞ্চিৎকর এবং ভারতে একটিমাত্র ছোট কম্প্যুটার মেশিন আছে যা অনেক ছোট দেশের তুলনাতেও অতি সামান্য (১০।১০।৬৮)।

এই যদি সামগ্রিক অবস্থা হয়, তাহলে উত্তরবঙ্গের প্রলয়ংকর বন্যার সামনে মানুষ যে কত অসহায় হয়েছিল তা বুঝিয়ে বলার দরকার করে না।

কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত করেছে যে, বন্যার সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগুলি সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা হবে। কিন্তু পর্যালোচনার মধ্যে থাকবেন তো এই সব বিভাগেরই কর্তারা, যাঁরা নিজেদের ত্রুটিহীন বলে জাহির করছেন, যাঁরা মৃত্যুকে 'স্বাভাবিক' বলে সার্টিফিকেট দেবার জন্যই বেশি আগ্রহী। সুতরাং অনেক সোরগোল করা কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যালোচনা থেকে পর্বতের মূষিক প্রসবই যে হবে না, সে ভরসা কই?

এ তো গেল সতর্কতা ব্যবস্থার দিক। বন্যা রোধের মূল কাজ সম্বন্ধে ভাবতে গেলে তো আরো গুরুতর প্রশ্ন ওঠে। উত্তরবঙ্গে বন্যা রোধ করতে গেলে যে ধরনের প্রকল্প দরকার, যুক্তফ্রন্ট সরকার তা করেছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের উপেক্ষায় তা আটকে আছে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার অনেক দিন আগেই যে প্রকল্পটি সম্পাদন করেছে, অর্থাৎ দামোদর প্রকল্প, তা দিয়েও কি বন্যা রোধ হয়েছে? ১৫ বছর আগেই কেন্দ্রীয় সরকার জোর গলায় বলেছিল যে, দামোদর পরিকল্পনার দ্বারা পঃ বঙ্গের প্রধান বন্যা অঞ্চলে বন্যা রোধ করা সম্ভব হবে। কিন্তু তা হয় নি, বরং যে বন্যা ছিল সীমিত, তা আরও ব্যাপক হয়েছে। দামোদরের নিম্ন অঞ্চলের কাছে দামোদর পরিকল্পনা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা অভিশাপস্বরূপ। নদীর জলের সঙ্গে সঙ্গে জলাধারের জল এসে এমনভাবে সব ভাসিয়ে দিচ্ছে যে, প্রতি বছরই নিম্ন অঞ্চলে প্রবল বন্যা দেখা দিচ্ছে। সেচ-ব্যবস্থার দিক থেকে দামোদর পরিকল্পনার সার্থকতা যতটাই থাকুক না কেন, বন্যা রোধের দিক থেকে যে এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে তা সকলেই জানে।

সুতরাং বন্যা রোধের প্রশ্নটিকে আগাগোড়া নতুন করে ভাবা দরকার। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বন্যা নিরোধের ব্যবস্থা হিসাবে কতকগুলি কাজের উল্লেখ করা হয়েছিল: (১) বাঁধ নির্মাণ, (২) জলাধার নির্মাণ, (৩) অতিরিক্ত জল আটকে রাখার জলাধার, (৪) একটা নদী থেকে আরেকটা নদীতে জলের গতি ফিরিয়ে দেওয়া, (৫) নদীর ঢাল (Slope) ঠিক রাখা, (৬) ড্রেজিং করে নদীর মজে যাওয়া বন্ধ করা, (৭) নদীর দ্বারা তীরের ক্ষয় রোধ করা ইত্যাদি। এতগুলি কাজের মধ্যে কোন্ কোন্‌টা কোথায় বেশি জরুরী বন্যা রোধের দিক থেকে, কোন্ কাজকে কোথায় অগ্রাধিকার দিতে হবে, সেটা নির্ধারিত না হলে একটা বাঁধা ছকে পরিকল্পনা চালু করলে তাতে বন্যা নিরোধ হয় না। এই জায়গাতেই সরকারী ব্যর্থতা চরম আকার ধারণ করেছে। উত্তরবঙ্গের ঘটনার পর বন্যা রোধ সম্পর্কে সত্যই যদি কেন্দ্রীয় সরকারের টনক নড়ে থাকে তাহলে সমস্ত বিষয়টাকে অধিকতর বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে দেখার প্রয়োজন সরকার অনুভব করুন। তা হলে তবু কিছু হতে পারে।

জলের গর্ভে মরেছে—মানুষজন কেউ ডুবেছে, কেউ ভেসে গেছে দূরে, দূরান্তরে। চরে যারা বাড়ি-ঘর করে বাস করতো—তাদের ত' কোনও চিহ্নও নেই।

শহরের কথা কাগজে কাগজে ফলাও করে বেরোচ্ছে কিন্তু গ্রামগুলোর কথা কেউ জানছে না। অথচ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কত গ্রাম। এখন বানের জল সরে যেতে মনে হচ্ছে পলি-ঢাকা এক বিস্তীর্ণ মরুভূমি। এখানে যে কোনদিন এক-একটা জনপদ ছিল তার চিহ্ন নেই।

এরই মধ্যে ভাগ্যের জোরে যারা বেঁচেছে তারা একেবারে হতভম্ব। বিড়-বিড় করে বকছে : সর্বনাশী কিচ্ছু রাখে নি। সব চেটে-পুটে নিয়ে গেছে।

কেউ কেউ বলেছে : বাপ-ঠাকুর্দার কালে এমন বানের কথা শুনি নি, এ যে একেবারে প্রলয়কাণ্ড।

ওরই মধ্যে আবার কেউ কেউ বলেছে : দোষ আমাদের লোভের?

কেন? লোভ কিসের?

বাঁধে মাটি ঢালে নি ঠিকাদার ঠিক-মত। বাঁধ কি আরও উঁচু করা যেত না? যেত। কিন্তু করে নি। লাখ লাখ টাকা লুঠে নিয়ে কাজে ফাঁকি দিয়েছে। আমাদের লোভ, তাই ত' তিস্তা আমাদের শাস্তি দিয়েছে।

শহরের মানুষের কণ্ঠে সোচ্চার প্রশ্ন : তিস্তাবাজার যখন ভেসেছে তখন কেন সরকারী কর্তৃপক্ষ শহর জলপাইগুড়ির মানুষকে জানায় নি। তাহলে ত' সুদীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে শহরের মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে পারত। এমনভাবে তাদের সর্বস্বান্ত হতে হত না। চেক-পোস্টের পাহারাদাররা যদি সময় থাকতে খবর দিত : জল বাড়ছে, সামাল হও—তাহলেও মানুষ সাবধান হতে পারত।

কিন্তু কিছুই করা হয় নি।

হয়ত পাহারাদাররা খবর দিয়েছিল—কিন্তু শহরের কর্তৃপক্ষ সে খবরে আমল দেন নি—কিংবা খবর আদপে পৌঁছয় নি তাঁদের হাতে। কিন্তু আসল কথা, এই প্রলয়ের সর্বনাশকে কিছুটা রোখা যেত যদি সেচ বিভাগ ও সরকারী কর্তৃপক্ষ 'সিনসিয়ার' হতেন। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের কর্তব্য ঠিকমতন পালন করতেন। -

একটা কথা উঠেছে তিস্তার গতিপথে কোথাও পাহাড়ের প্রচণ্ড ধস নেমেছিল যার ফলে গতিপথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তারপর ফুলে-ওঠা জলের তোড়ে এক সময় সব বাধা ভেসে গিয়েছিল। বাধামুক্ত জল ভীষণ বন্যার রূপ নিয়েছিল। মানুষের করণীয় আর কিছু ছিল না। প্রবহমান লক্ষ লক্ষ কিউসেক জলের স্রোতকে নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতা 'সেবক-পুলের' ব্যবধান-মুখের ছিল না। ছিল না কারও। তিস্তাবাজার ভাসিয়ে এই জল-স্রোত আরও নিচে নেমেছিল প্রচণ্ড শক্তিতে।

কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে ত অমিত তেজের অধিকারী করেছে। এমন কি সদ্য-স্বাধীন এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশ তাদের ভয়ঙ্কর নদ-নদীকে শাসন করতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে মিশর। নীল আজ অসোয়ান বাঁধের বন্ধনে সুবোধ বালকে পরিণত হয়েছে।

তবে কেন উত্তরবঙ্গের সর্বনাশী পাহাড়ী নদীদের শাসন করা যাবে না? নিশ্চয় যাবে। তার জন্য প্রয়োজন প্রকৃতির সাথে সংগ্রামের যথোপযুক্ত প্রস্তুতি—একটি ব্যাপক পরিকল্পনা—যাকে বলা যেতে পারে মাস্টার প্ল্যান। এই মাস্টার প্ল্যানের রূপায়ণই আজকের বাঙালীর প্রধান দাবি।

যাচ্ছে। কোথাও কোথাও তাদের সঙ্গী গোটাকয়েক কুত্তা।

আর সারা শহর একেবারে স্তব্ধ, শব্দ-শূন্য। আকাশে প্রখর রৌদ্র। তবু শহর জুড়ে একটা ভয়ংকর নিথর বাতাস।

দু'-এক জায়গায় সামরিক বাহিনীর লোক আছে। স্পেশ্যাল কোর। লোকদের ইনজেকশন দিচ্ছে। শুনলাম, সেনাবাহিনীকে নাকি আর কোনো কাজ করতে বলা হয় নি। তাই তারা মোটামুটি নীরব সাক্ষীমাত্র।

রাস্তায় টহল দিচ্ছে রাইফেল কাঁধে বি এস এফ এর সেপাইরা। কোথাও পুলিশ নেই। সরকারী অফিসগুলি সব বন্ধ।

শহর ছেড়ে অনেকে পালিয়েছে। আরো যারা চলে যেতে চায় তাদের জন্য পরিবহনের কোনো ব্যবস্থা নেই। যে-কোনো গাড়ি দেখলেই তারা করজোড়ে আবেদন করছে, একটু শিলিগুড়ি পৌঁছে দেবেন!

হাসপাতালের সামনে দেখি, 'Govt. of West Bengal' মার্কা দেওয়া একটা গাড়ি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। যথার্থ প্রতীক বলে মনে হল আমাদের। একটা রাজ্যের সরকার এমন করে অকেজো হয়ে যেতে পারে, জলপাইগুড়ি শহর না দেখলে কল্পনা করতে পারতাম না।

রাজ্যপাল এবং তাঁর অফিসারগণ ছাড়াও মানুষ আছে, তাই রক্ষা। এই হাসপাতালেরই কাহিনী শুনলাম। এক-তলার কক্ষগুলিতে রোগী ছিল প্রায় ৬০ জন। সবার ডুবে মরে যাবার কথা। কিন্তু ৯ জন ছাড়া আর সকলকে বুকে করে একগলা জল সাঁতরে উদ্ধার করে ওপরতলায় নিয়ে এসেছেন হাসপাতালের নার্সরা। আপ্রাণ চেষ্টা করেও ৯ জনকে তাঁরা বাঁচাতে পারেন নি।

অধ্যাপক দেবেশ রায়ের কাছে শোনা গিয়েছিল আর একজন সেবিকার কথা। তিনি শহরের জল সাঁতরে সাঁতরে একটি নতুন ব্লেড ভিক্ষে করছিলেন। ঐ প্রলয়ের মধ্যে সদ্যপ্রসূত একটি শিশুর নাড়ী কাটবার জন্য।

বস্তুত জলপাইগুড়ি শহরে যাঁরা অন্যকে বাঁচিয়েছেন তাঁরা প্রত্যেকে সর্বস্ব খুইয়েছেন। সেন পাড়ার শ্রীত্রিদিব চক্রবর্তীর সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছিল। ভদ্রলোক ১৭টি মানুষকে প্লাবনের গ্রাস থেকে বাঁচিয়েছেন। তাঁর নিজের বাড়িতে একখানা তক্তপোষ ছাড়া আর সবকিছু ধুয়ে-মুছে সাফ।

রাজ্যপালের অফিসাররাই ব্যতিক্রম। অজুহাত শোনা যায়: বেচারীরা কী করবে। তাদেরও তো সব গেছে। কেন জলপাইগুড়ির সকল মানুষেরই সব যায় নি।

অজুহাত ঐ অজুহাত মাত্র নয়।

দলে দলে লোক জলপাইগুড়ি ছাড়ছে। সরকারী পরিবহনের সাহায্য নয়—বে-সরকারী সংস্থার উদ্যোগে সংগৃহীত যানে। ফটো: শম্ভু ব্যানার্জী

রাজ্যের অফিসাররা সেচ বিভাগের বিপদ-সঙ্কেত পেয়ে শহরবাসীদের সতর্ক করেন নি। কিন্তু নিজেরা শিলিগুড়ি পালিয়ে গিয়েছিলেন। একজন অফিসারের কথা জানি যিনি তাঁর মোটর গাড়িটিও বাঁচাতে পারেন নি বলে মর্মাহত।

জলপাইগুড়ির মানুষ অত্যন্ত সঙ্গত-ভাবেই এই সব অফিসারদের অপসারণ ও শাস্তি দাবি করেছেন। অনেককে আমরা বলতে শুনেছি, "এই ক্রিমিন্যালগুলি দূর হলেই আমরা বাঁচব।"

রাজ্যের সর্বোচ্চ প্রশাসক শ্রীধবন-বীরকেও অভিযোগ থেকে রেহাই দেওয়া যায় না। তিনি ৩ তারিখ থেকে দার্জিলিং-এ ছিলেন। তাঁর হেলিকপ্টার পেতে এক-দিনও দেরি হয় নি। বস্তুত রাজ্যপাল ৭ তারিখে হেলিকপ্টার চেপে নানা জায়গায় ঘুরেছেনও।

কিন্তু তিনি জলপাইগুড়িতে আসবার সময় পেলেন ১০ অক্টোবর। যেদিন কেন্দ্রী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই সামান্য সময়ের জন্য জলপাইগুড়িতে পদার্পণ করেছিলেন।

পদার্পণ মাত্রই। শত আবেদন সত্ত্বেও শ্রীদেশাই শহরটির ধ্বংসাবশেষ দেখতে রাজী হন নি। কারণ তাহলে তাঁকে পায়ে হাঁটতে হত। তাঁর মতো লোকের পক্ষে এমন পাঁকে হাঁটা কী করে সম্ভব।

শ্রীদেশাই এবং রাজ্যপালের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ জানিয়েছে জলপাইগুড়ি। তাদের ধিক্কার দিয়েছে। একটা সময়ে এই ভি-আই-পিগণ ক্রুদ্ধ জনতার তাড়াও খেয়েছেন। তাড়া খেয়ে মিলিটারীর জীপে করে ও'রা পালিয়েছেন।

হেলিকপ্টারে চাপবার আগে আমাদের কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে মন্ত্রী মহো-দয়ের কথা হয়। সরকারী প্রশাসনের কাছে জলপাইগুড়ি সমেত সমগ্র উত্তরবঙ্গ যে অবহেলা পেয়েছে তার জন্য তিনি কোনো দুঃখ প্রকাশ করেন নি। রাজ্যপালও না।

বরং শ্রীদেশাই বললেন, "কিছু লোক এখানে রাজনীতি করছে। সরকারের বিরুদ্ধে লোককে ক্ষেপাতে চাইছে।"

একটু হুমকীর সুরে বললেন, "আমার অসুবিধে করলে কি আর জলপাইগুড়ির লোকের সুবিধে হবে?"

"হবে যে প্রশাসন বলতে কিছু নেই, আমরা একথা উল্লেখ করতে ও'রা বললেন, লোকেরাই প্রশাসন চালু রাখতে দিচ্ছে না।

আমরা বিস্মিত। তবু বললাম শহর এবং সমগ্র এলাকার ভার সেনাবাহিনীর হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না।

এর জবাবে শ্রীদেশাই বললেন, "সেনাবাহিনী কোথায় পাওয়া যাবে।" তিনি জানালেন, তাঁর নির্বাচনী এলাকার অন্তর্ভুক্ত সুরাট জলে ডুবে ছিল। কিন্তু কই, সেখানে তো সেনাবাহিনী যায় নি।

এর পর আর আমাদের আলাপ এগোয় নি। আমাদের ধারণা ছিল, উত্তরবঙ্গ সারা দেশের প্রতিরক্ষার পক্ষে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। গত দশ বছর ধরে ঐ অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং উন্নয়নের বহু কাহিনী শুনেছি। কিন্তু বা[illegible] মহিমা উপলব্ধি! এক এলাকার [illegible] এলাকায় পৌঁছয় না সাতদিন [illegible]

[illegible] ধারণা ছিল এই [illegible] এই [illegible] পথই সব থেকে বড় [illegible] চাঙা [illegible]।

[illegible] নাম, দেশের কর্তারা অন্য [illegible]।

[illegible] প্রশ্ন জেগেছে: এই কর্তারা দেশের কথা কি সত্যিই ভাবেন? না কি এ[illegible] দেশ সেবা মানে আত্মসেবা, [illegible] এবং পার্টি সেবা?

[illegible] সাথীদের নিয়ে শ্রীদেশাই এবং [illegible] প্রমুখ ভি আই পিগণ হেলিকপ্টার করে চলে গেলেন।

অপরাধ হয়ে গেছে রাজ্যের প্রতি মন্ত্রী শ্রী[illegible] ঘোষের নাম উল্লেখ করতে ভুলে গেছি। ওঁদের সঙ্গে তিনিও ছিলেন। সবাই একসঙ্গেই গেলেন।

জলপাইগুড়ি তেমনি রইল। মড়া কোলে করে। শকুন আর কুকুরের পাহারায়। দুর্গন্ধ বুকে নিয়ে।

তখন লাঞ্চ টাইম। ভি-আই-পিগণ বাগডোগরায় নেমে চলে গেলেন শিলিগুড়ির কাছে আর্মি মেসে। সেখানে খানাপিনার টেবিলে ছিল: স্যালাড, পোলাও, সাদা ভাত, মটর রেগানজোস, চিকেন [illegible] মাছ ভাজা, মটর পনির, দই-রায়তা, পুরি, আলু-কপির তরকারী, আলুর কাটলেট, অড়হর ডাল; ফলের মধ্যে কলা, আপেল ও কমলালেবু; পানীয় সফট এবং হার্ড দুই-ই।

জলপাইগুড়ির উপকণ্ঠে পাহাড়পুর বাঁধের দুধারে হাজার কয়েক নরনারী শিশু। এক ভদ্রলোককে দেখলুম রিক্সা করে এক ঝুড়ি ফুচকা নিয়ে যাচ্ছেন। প্রত্যেককে দুটি করে ফুচকা দিয়ে চলেছেন।

পাহাড়পুর ছিল পাঁচ হাজার লোকের বসতি ছিল। এখন সেখানে [illegible] পর্যন্ত দাঁড়িয়ে নেই। তিস্তা একেবারে চেটে পুটে সব সাফ করে দিয়েছে। প্রখর রৌদ্রে সমগ্র এলাকা ধু ধু করে। [illegible] এক মড়ার মাথার খুলির ওষ্ঠহীন হাস্যের মতো। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে তাকালে মাথা ঝিম ঝিম করে। যেন নেশা লাগে।

৩১নং জাতীয় সড়ক। রাস্তার ঢালুতে ইলেকট্রিকের [illegible] পড়ে রয়েছে। পাটকাঠির মতো। দূরে দেখা যায় রেল লাইন শূন্যে ঝুলছে।

পথের দুপাশে স্তূপীকৃত মড়া। পুলের নিচে তিস্তা। তাতেও ভেসে যাচ্ছে মড়া গরু মোষ মানুষ।

এই পরিবেশেই বাঁচবার দুস্তর সংগ্রাম করছে একদল মানুষ। জানি না ওরা বাঁচতে পারবে কি না। রিলিফ কোথায়। সামান্য রিলিফ শহরেই [illegible]। এ[illegible] তাই হিটে ফোঁটাও আসে না। [illegible] জল নেই। নদী বা ডোবার এ[illegible] জলও তো সাক্ষাৎ মারী। আতঙ্কে [illegible] বদনাম, অনেকে সেই জল নিয়েই [illegible] নিবারণ করছে।

অ[illegible] এলাকায় এরপর [illegible] মহামারী। তাদের আর কার হবে [illegible] ভগবানও বোধ হয় তা জানেন না।

ডানদিকে ঘুরে ময়নাগুড়ি[illegible] পথ। [illegible] বিরাট ভাঙন সে পথকে চলাচলের অযোগ্য করে দিয়েছে। [illegible] কয়েক নৌকা করে জল পার হতে হল।

আট মাইল দূরবর্তী [illegible] কালানী দোমোহানি যাবার রাস্তা [illegible] তো কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। শুনেছি সেখানে ধ্বংস ও মৃত্যুর [illegible] জলপাইগুড়ি অপেক্ষাও বেশি [illegible]।

[illegible] গুড়ি ফেরার পথে [illegible] শুনেছি জলপাইগুড়ি [illegible] যথাস্থানে বাহাল যাবে না। [illegible]

জলপাইগুড়ি শহরে মৃত পশুর সারি — ফটো: শম্ভু ব্যানার্জী

হাব গাত বদলে শহরের অনেক কাছে এসে পড়ছে। অতএব শহর সরাবার কথা উঠছে।

তোর আগে গাড়ি জুতবার মতো বেশ্ন যুক্তি।

১৯৬৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের সেচ দপ্তর উত্তরবঙ্গের বন্যা নিয়ন্ত্রণের একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন। এই পরিকল্পনার একটি অংশ ছিল কালিমপঙ সদর পথে তিস্তা সেতুর কাছে একটি জলাধার নির্মাণ করা। যাতে বন্যার সময় অন্তত ৪ লক্ষ কিউসেক জল ওখানে ধরে রাখা যায়। এই জলাধারটি তৈরি করা হলে কখনো উত্তরবঙ্গে বন্যা বিধ্বংসী হয়ে উঠতে পারত না।

পরিকল্পনার মধ্যে পাহাড়ী ধস নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত পরিকল্পনা বাতিল করে দেন।

পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার এই পরিকল্পনাটি নিয়ে কেন্দ্রের কাছে বহু তদ্বির করেছেন। সব ব্যর্থ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ভদ্রলোকের এক-কথা আবৃত্তি করে কেবল বলেছেন, টাকা নেই।

কে না জানে, প্রতি বছর উত্তরবঙ্গের চা বিদেশে রপ্তানী করে শত কোটি টাকারও বেশি আয় হয়। অথচ এই উত্তরবঙ্গকে রক্ষা করার একটি বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কিছুমাত্র আগ্রহ দেখাতে পারেন নি।

দেশের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের গুরুত্বের কথা আগেই বলা হয়েছে।

আসল কাজটা উপেক্ষা করে এখন বলা হচ্ছে জলপাইগুড়ি শহরই সরিয়ে নিতে হবে। এরকম বেকুবের যুক্তি ধরে এগুলে সব শহর এবং জনপদকেই তো সরিয়ে নিতে হবে। শেষ পর্যন্ত সরিয়ে নেবার জায়গাও পাওয়া যাবে না।

মূঢ়তার একটা সীমা আছে। কিন্তু সরকারী মূঢ়তা বোধ হয় সীমাহীন।

শিলিগুড়িতে ফিরে আমাদের সবাইকে ছুটতে হয় বড় তারঘরে। যার যার অফিসে তারযোগে সংবাদ পাঠাতে হবে। তারঘর লোকে লোকারণ্য। সারা উত্তরবাংলার সংবাদ বাইরে পাঠাবার এই একটি মাত্র কেন্দ্র। হাজার হাজার টেলিগ্রাম আসছে। পাঠানো হচ্ছে আরো হাজার হাজার। তার ওপর আমাদের প্রেস টেলিগ্রাম। সে এক অদ্ভুত অবস্থা।

বিজলীর আলো নেই। মোমবাতি জ্বলছে। মাঝে মাঝে তারঘরের নিজের ডাইনামো চালিয়ে একটু আলো পাওয়া যায়। তারপর আবার ঐ মোমবাতি ভরসা।

কিন্তু আশ্চর্য এই তারঘরের কর্মীরা। মুখ বুজে এক নাগাড়ে চোদ্দ কি ষোল ঘণ্টা কাজ করে চলেছেন। সভয় উৎকণ্ঠিত জিজ্ঞাসার জবাব পাবে না মা-বাবা ভাই-বোনেরা। অতএব তারঘরের কর্মীদের বিরাম নেই। আমাদের সেদিন মনে হয়েছিল, শিলিগুড়ির ছোঁয়াতেই বোধ হয় যাদু আছে।

কোকাকোলা জাতীয় কিছু জিনিস ছাড়া শিলিগুড়িতে অন্য কিছুর দাম বাড়ে নি এই বাজারেও। এটা সামান্য কথা নয়। অবশ্য সব্জি অগ্নিমূল্য হয়েছিল; কাঁচালংকা বিক্রি হয়েছে ১০ (দশ) টাকা কেজি। এর কারণ সব্জির চালান একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

শহরের যুবকরা দ্রব্যমূল্য বাড়তে দেয় নি। বলেছে, মানুষের সর্বনাশের বিনিময়ে মুনাফা লুটতে দেওয়া হবে না। ব্যবসায়ীদের মধ্যেও আশ্চর্য সহৃদয়তা লক্ষ্য করা গেছে। তাঁরাও পরিপূর্ণ সহযোগিতা করেছেন বিপন্ন মানুষের সাহায্যের কাজে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই সমগ্র ব্যাপারের মধ্যে সরকারী কর্তাদের কোনই ভূমিকা নেই।

আর একটি জিনিষও আমাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। কথায় বলে, Every cloud has its silver lining। এও তাই। এই বিপর্যয়ের দিনে জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ যে বিপন্নের উদ্ধারকার্যে একত্রিত হয়ে দাঁড়িয়েছে তা আমরা দেখে এসেছি। হাজার দুর্ভাগ্যও যে আমাদের মারতে পারবে না, সেই ভরসা রাখার কারণ সত্যিই আছে।

এই কথাটিই বলছিলেন মকাবাড়ি টী এস্টেটের একজন; সম্ভবত বাগিচা মালিকের স্ত্রী। কার্সিয়াং থেকে ফিরবার পথে আমাদের জীপ পথ হারিয়ে ফেলেছিল। সেই ভদ্রমহিলা তাঁর ড্রাইভারকে দিয়ে আমাদের সাহায্য করেন। অল্প সময় আলাপ। তখনই তিনি বলেছিলেন, "এই বিপদের দিনে সবাই একত্রে না দাঁড়ালে উপায় নেই।" ওঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেখেছেন, "আজ আর বাঙালী-অবাঙালী কোনো ভেদ নেই।"

একই কথা অন্যভাবে বলেছিলেন, এক পাহাড়ী বন্ধু। তাঁর নাম বিমল লামা। তিনি নিজে দার্জিলিং-এর পাহাড়ী এলাকার স্বায়ত্তশাসনের দাবির উগ্র সমর্থক। এখন শ্রীলামা কিন্তু অন্য কথা ভাবছেন। তিনি বললেন: "একটা কথা পরিষ্কার। সমতলকে বাদ দিয়ে আমরা বাঁচতে পারি না। আমাদের বাদ দিয়েও সমতলের চলবে না। আমরা একসূত্রে বাঁধা পড়ে গেছি।"

কংগ্রেস নেতা শ্রীখগেন দাশগুপ্তেরও একটি শিক্ষা নেবার আছে। তিনি শিলিগুড়িকে পেছনে ফেলে জলপাইগুড়িকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। তার জন্য দুই শহরের মধ্য কত না বিবাদ আর বিসম্বাদ। এই সেদিনও—কোথায় মেডিক্যাল কলেজ হবে তাই নিয়ে কত না তিক্ততা দেখা দিয়েছিল।

কিন্তু আজ? শিলিগুড়ি পাশে না দাঁড়ালে জলপাইগুড়িতে ক'টি মানুষ বেঁচে থাকতেন।

আমরা তৃতীয়বার জলপাইগুড়ি যাই ১২ অক্টোবর। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি, সেদিনও শহরের মধ্যে মরা মানুষ ও গোরু মোষ কাঠ চাপা পড়ে রয়েছে। শহর পরিষ্কার হয় নি তখনো। ঐ দিন শ্রীজ্যোতি বসু গিয়েছিলেন জলপাইগুড়ি। তাঁকে খালি পায়ে হাঁটতে হয়েছে। তিনিও শহরে সেদিন গলিত শব দেখে এসেছেন।

১৩ অক্টোবর গিয়েছিলেন শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্জি। তখনও শহরের চেহারা বদলায় নি।

প্রশ্ন জাগে: রাজ্যে গভর্নমেন্ট থাকার সার্থকতা কী? প্রলয়ের বিপদ সংকেত সময় থাকতে জানানো হবে না। হাজার হাজার মানুষ তার ফলে বেঘোরে মারা যাবে। তারপরও পুরো আট দিন একটা শহর নরক হয়ে থাকবে। তবু কর্তাদের হুঁস নেই।

১০ অক্টোবর বাদ্যপাল শহরের বলেছিলেন, শহরে তিনটি নলকূপ খনন করা হয়েছে এবং ১৭টি লঙ্গরখানা চালু করা হয়েছে।

একটা গোটা শহরে তিনটি নলকূপ। যেখানে এক ফোঁটা পানীয় জলের সংস্থান নেই। যেখানে মানুষ জলের জন্য সেই ৫ অক্টোবর থেকে পদমুখাপেক্ষী।

আর লঙ্গরখানা। ১২ অক্টোবর সারা শহর ঘুরে আমরা লঙ্গরখানা দেখেছি ৪টি।

মানুষের চূড়ান্ত সর্বনাশের সামনে সরকারী রসিকতা এমন বীভৎস নির্মম হতে পারে তা আমরা আগে ভাবতেও পারি নি।

১২ অক্টোবর জলপাইগুড়িতে একটি নতুন জিনিষ দেখলাম। পাঁকের তলা থেকে যে যা পারে টেনে টেনে বার করছে। বস্তা বস্তা ডাল বের হল। সব পচে গেছে। দুর্গন্ধে কাছে এগুনো যায় না। মনিহারী দ্রব্য কিছু। চিনবার উপায় নেই, সবই কাদা। ওখানে একতাল কাদা আরো। ৪ অক্টোবর এগুলি ছিল ওষুধ।

কাদার তলা থেকে টেনে বার করা জামা-কাপড় কি পরা যায়? কেউ কেউ সেরকম চেষ্টা করা যায় কি না ভাবছে।

এক উকীলবাবু কাদা থেকে তুলবার চেষ্টা করছেন বই আর নথি। হায় রে মমতা! কিন্তু কোনো কিছুর অস্তিত্ব মাত্র নেই।

কোথায় যেন কাদার তলা থেকে

ঘোরাফেরা করছে একটি শিশুর মৃতদেহ। অ. ওখানে আর যাই নি। আর দেখা যায় না। অসহ্য মনে হয়।

এলাম থানায়। পুলিশ-টুলিশ আছে। কিন্তু কোনো সাড়া শব্দ নেই। সব কেমন যেন ঝিমোনো। হাজার প্রশ্ন করেও উপযুক্ত জবাব পাওয়া যায় না।

এদিন শ্রীচ্যবনের আসার কথা ছিল জলপাইগুড়িতে। শেষ মুহূর্তে তিনি তাঁর প্রোগ্রাম বাতিল করেন। থানার পুলিশ কিন্তু এসব বিষয় কিছু জানে না।

কোথাও কোনো সরকারী কর্তার দেখা নেই। শুনলাম, সবাই গেছেন বাগডোগরা। শ্রীচ্যবনকে অভ্যর্থনা করতে। শ্রীচ্যবন কিন্তু আসেন নি।

শ্রী বি সি ঘোষের বাড়িতে আর এক অভিজ্ঞতা। শ্রীঘোষ উত্তরবঙ্গের একজন [illegible]। কিন্তু এ হেন [illegible] বললেন, আমাদের প্রত্যেককে তিনি আধা কাপের বেশি চা ও দিতে পারবেন না।

প্রলয়ের ফলে শ্রীঘোষের মতো লোকেরই যদি এই অবস্থা হয়ে থাকে তবে সর্বসাধারণের অবস্থাটা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

১২ অক্টোবর আমরা যখন ফিরে আসি তখনও জলপাইগুড়ি ধুঁকছে। মড়ার গন্ধেই পাগল হয়ে যাবার অবস্থা। কাজে কাজেই জলপাইগুড়ির এক দল যুবকের মন্তব্য শুনে আমরা বিস্মিত হই নি।

ওরা আমাদের বলেছিল: কলকাতা থেকে আমাদের এখানে বরং কগুলো শকুন আরো পাঠিয়ে দেবেন। ওরা [illegible] খেয়ে খেয়ে মড়া সাফ করে দিতে পারবে।

জানি না আমাদের কোনো সরকারী কর্মচারীর কানে এমন কোনো কথা গিয়ে পৌঁছেছে কি না।

শিলিগুড়িতে সেদিন এসে আলাপ হল ভারত ড্রাম এণ্ড ব্যারেল ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর শ্রী এ কে রায়ের সঙ্গে। শ্রীরায় শিলিগুড়িতে এসেছেন একখানা গাড়ি ভর্তি ৬টি মৃতদেহ উদ্ধার করতে।

সে আর এক মর্মান্তিক কাহিনী। ৪-৫ অক্টোবর ভোর বেলা ঐ কোম্পানীর ফ্যাক্টরী ম্যানেজার সমেত ৫ জন অফিসার আর ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে রওয়ানা হয়েছিলেন শিলিগুড়ি থেকে। ইচ্ছে: পাটনা হয়ে কলকাতা ফেরা।

তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। গাড়ির কাচের জানালা সব বন্ধ।

বালাসন নদীর উপর মাটিগাড়া পুল দিয়ে এগুতে হবে। সেতুর কাছে একটি পানের দোকান। রাত এগারোটায় দোকানদার টের পায়। পুল ভেঙে গেছে। রাত আড়াইটা পর্যন্ত জেগে থেকে সে বহু মিলিটারী ও অন্যান্য গাড়ি ফিরিয়েছে। তারপর সে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

কিন্তু ভোরের দিকে গাড়ির আওয়াজ পেয়ে সে আবার উঠে গাড়িকে সতর্ক করতে থাকে। ঢিল ছোঁড়ে, আলো দেখায়, পথ আটকাতে চেষ্টা করে।

"লেকিন বাবু, কিছুতেই ওরা শুনল না। এখানে মাঝে মাঝে ডাকু আসে। আমার মালুম হয়, ওনারা ডাকুর ভয় পেয়েছিলেন।" গাড়ির স্পীড তাই হঠাৎ যায় বেড়ে।

তারপর ছয়জন আরোহী নিয়ে গাড়ি ভাঙা সেতুর ওপর দিয়ে এসে বালাসনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

এই ক'দিন ধরে গাড়ি তুলে মৃতদেহ বার করবার বহু চেষ্টা হয়েছে। ফল হয় নি। টানাটানি করতে গিয়ে দেখা গেছে, গাড়ির একটি অংশ আলগা হয়ে উঠে আসছে।

শ্রীরায় এবার নিজের তদারকিতে গাড়ি তুলে মৃতদেহ বার করবেন বলে শিলিগুড়িতে হাজির। মিলিটারীর সাহায্য নিতে হবে, তিনি জানালেন।

হুঁশিয়ারী পেয়েও তা না মেনে মরে যাওয়ার এই কাহিনীর সঙ্গে মনে পড়ে আমাদের গাড়ির ড্রাইভার প্রেম বাহাদুরের কাহিনী।

প্রেম বাহাদুরের একটি কুকুর আছে। ভালো করে তাকে খেতে দিতে না পেরে আর তার জ্বালাতনে অতিষ্ঠ হয়ে প্রেম বাহাদুর ৪ অক্টোবর ওকে বেচে দেবে বলে ঠিক করেছিল। সেদিনই বেচত, কিন্তু সঙ্গে কুকুরটা ছিল না।

৪ তারিখ রাতে মদ খেয়ে বেহুঁস প্রেম বাহাদুর ঘুমিয়ে ছিল জলপাইগুড়ি শহরের একটি ঘরে। শেষ রাতে কুকুরের কামড় খেয়ে আর বিকট চীৎকারে [illegible] তার নেশা যায় টুটে। [illegible] সে এক ঘা মেরেও ছিল। তার পরই সে দেখল, "সে এক সমুদ্র বাবু।"

আর কোনো কথা নয়। কুকুর নিয়ে প্রেম বাহাদুর পালিয়ে বাঁচে।

কাহিনী শেষ [illegible] "[illegible] বাবু। ও শালা কুকুর [illegible] আর আমি বেঁচেছি না।"

জলপাইগুড়িতে [illegible] কাহিনী শোনা যায়। [illegible] বীভৎস, কোনো [illegible]।

সব শুনে দেখে [illegible]: জলপাইগুড়িতে যা হল তার যেন আর পুনরাবৃত্তি কোথাও না হয়। আমার শত্রুর জীবনেও যেন অনুরূপ দুর্ভাগ্য না দেখা দেয়।

জলপাইগুড়ি আবার সুস্থ হয়ে বেঁচে উঠবে কি না তা নির্ভর করছে দেশের মানুষের উপর। ভরসা রাখি, আমার দেশের মানুষ এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবেন।

তিস্তার গ্রাস

চোমংলামা

সেদিনও বিজয়ার আলিঙ্গন এবং প্রীতি বিনিময় চলছে। পথে ঘাটে পরিচিত জনের সংগে, ঘরে ঘরে প্রিয়জন পরিজনের সংগে। মিষ্টিমুখ-আপ্যায়ন ইত্যাদি। কিন্তু সন্ধ্যার মুখে আর বিজয়া হল না। মেঘ করে বৃষ্টি এল। সাধারণ বৃষ্টি, হয়তো একটু পরেই ছেড়ে যাবে—কিংবা সারা রাত বর্ষাবে; তা নিয়ে সেদিন আর কেউ ভাবে নি।

তার পরের দিন সন্ধ্যায়, যখন চব্বিশ ঘণ্টা একটানা বর্ষার পরও বৃষ্টি ক্ষণেকের জন্যও বিরতি দিল না। সুতরাং জলপাইগুড়ির লোক খানিকটা চিন্তিত না হয়ে পারে না। করলায় জলস্ফীতি ঘটেছে ইতিমধ্যেই। যদিও ১৯৫০ সালের বন্যার পর তিস্তায় বাঁধ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তবুও যদি বাঁধ ভেঙে যায়। মাটির বাঁধ, ভাঙতে কতক্ষণ! এ ভাবনা জলপাইগুড়ির মানুষ না করে পারে না। ভরসা তো ওই তিস্তার বাঁধ! কিন্তু প্রতি বৎসরই ছোট বড় বন্যায় ডোবা জলপাইগুড়ির এ এক বাৎসরিক দুর্ভাবনা।

ইতিমধ্যেই সেন পাড়ায়, বাবুপাড়া, নয়াবস্তী, পাণ্ডা পাড়ায় এক হাটু জল জমে গিয়েছে। দোলনা ব্রীজের পাশেই সেন পাড়া সমাজপাড়ার লোকের ঘর প্রাঙ্গণে করলার জল উঠে পড়েছে। তাতেও চিন্তার কিছু নেই। কেন না করলা তো আর স্রোতের টানে টেনে নিয়ে যাবে না। কিন্তু যদি তিস্তা চাপ দেয়।

শুধু জলপাইগুড়ি নয়, বর্ষা নেমেছে সমগ্র এলাকাই জুড়ে, দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং, ডুয়ার্সের সমস্ত অরণ্যাঞ্চল এবং ছোট বড় প্রত্যেকটি আধা শহরেও প্রবল বর্ষা চলছে চব্বিশ ঘণ্টা ধরে। এবার বর্ষাকালে যখন কলকাতা, হুগলী, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে প্রবল বর্ষায় বন্যার চাপ দিচ্ছে, তখন অনাবর্ষণ, উত্তরবঙ্গে একফোঁটা বৃষ্টি নেই। ফলে উত্তরবঙ্গের আমন ধান তখন আশংকাজনকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বোধ হয় এ বছর আর বর্ষাকালে জল হল না—এই ভেবেই উত্তরবঙ্গের মানুষ অস্বস্তিবোধ করছিল।

ইতিমধ্যে বিজয়ার ঠিক পরেই এই অকালবর্ষণ।

সেদিন অক্টোবরের দুই তারিখ। সন্ধ্যার মুখে মেঘ জমল আকাশে আর তার একটু বাদেই চেপে বৃষ্টি নামল। সারারাত্রি ধরে বর্ষা। একমুহূর্তের জন্যও বিরাম নেই।

উনিশ শ' পঞ্চাশ সালের বর্ষার পরই যখন সমগ্র উত্তরবঙ্গের নদীতে জলস্ফীতি এবং স্থানে স্থানে বন্যার প্রকোপ দেখা দিয়েছিল—তখন থেকেই তিস্তা, মহানন্দা, করতোয়া, তোরষা, সংকোশ, জলঢাকা, প্রভৃতি নদীগুলি সম্পর্কে সতর্ক হয়ে গিয়েছিল সেচ দপ্তর। সে বছরও বন্যার তোড়ে ডুয়ার্সের ডায়ানা ব্রিজ ভেঙেছে, শিলবাড়ি ঘাটের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিনষ্ট হয়েছে—আসামের সংগে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে সে এক বিপর্যয় কান্ড। ডুয়ার্সের লিস, ঘিস, ফেপে ফুসে সেভোকের কাছে রেল সেতুটি ভেঙে ফেলেছে। ডাক্তার বিধান রায় তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। নদীবহুল উত্তরবঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়তো কঠিন হবে না—কিন্তু এই পার্বত্য নদীগুলির গতি প্রকৃতি জানা এবং সেই অনুযায়ী ব্রীজ ও বাঁধ তৈরি করার জন্য একদল জার্মান ইঞ্জিনিয়ারকে আহ্বান করে এনেছিলেন সেদিন ডাক্তার রায়।

উক্ত ইঞ্জিনিয়াররা দীর্ঘদিন ধরে এই পার্বত্য নদীগুলিকে পর্যবেক্ষণ করে যে অভিমত দিয়েছিল—মনে হয় সেগুলি এখনও সরকারী মহাফেজখানায় খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। তাদের মোটামুটি বক্তব্য ছিল উত্তরবঙ্গের ছোট বড় সমস্ত নদী প্রতি বৎসর এত বেশি পরিমাণ পলিমাটি বহন করে যে, প্রতি বৎসরই নদীগুলি তার গভীরতা হারাচ্ছে। ফলে প্রতিটি বাঁকের মুখে জমে-ওঠা বালি পাথর ও পলিমাটির বাধা পেয়ে নদীগুলি গতি পরিবর্তন করবার চেষ্টা করছে কিংবা কোন কোন নদীর গতি পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।

সেই সময়েই উক্ত অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়াররা তাদের অভিমত জানিয়েছিল যে, অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিস্তার নদীতল থেকে জলপাইগুড়ি শহর নীচু হয়ে যাবে। কে জানে সেই অল্প কয়েক বৎসরের শেষ সীমা উনিশ শ' আটষট্টি সাল কি না।

জলপাইগুড়ির প্রলয়ের পর আমাকে একজন ইঞ্জিনিয়ার বোঝাচ্ছিলেন—ধরুন, একটা সিলিং ফ্যানের ব্লেড! একখানি ব্লেডের একপাশটা কেমন বাঁকা এবং উঁচু অন্য ধারটা ঢালু দেখেছেন! জলপাইগুড়ির কাছে এসে তিস্তাও ঠিক ওই আকার নিয়েছে। ফলে উপরের যত জল নিচে নেমে আসে—তা জলপাইগুড়ি শহরের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ার প্রবণতা থাকবেই। এখন বলুন কত ফুট উঁচু বাঁধ দিয়ে জলপাইগুড়িকে রক্ষা করবেন। এবং সেটা কাঁচা বাঁধ না পাকা বাঁধ?

আমি ভূ-বিজ্ঞানী নই। তবুও উক্ত ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুর কথা বুঝতে কষ্ট হয় নি। এই যদি অবস্থা হয় তবে এটুকু অন্তত বুঝতে পারি যে তিস্তার গভীরতা ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন এবং জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন এলাকা—এর মাঝামাঝি আর কোনও পথ খোলা নেই। কেন না তিস্তার পলিমাটি সরিয়ে তার স্রোতধারাকে স্বাভাবিক রূপ না দিলে এখন যেখানে জলপাইগুড়ি শহর—তিস্তা তার গতি পরিবর্তন করে ওই স্থান দিয়েই প্রবাহিত হবে। মাটির বাঁধ বা যে কোন ধরণের বাঁধ হোক না কেন, তিস্তা তার গতি পরিবর্তনের প্রবণতা ত্যাগ করবে না। উনিশ শ' পঞ্চাশ এবং উনিশ শ' চুয়ান্ন সালের বন্যার প্রচন্ডতা দিয়ে তিস্তা অন্তত তার প্রচ্ছন্ন ইংগিত জানিয়েছে—আটষট্টির এই প্রলয় ঘটিয়ে তিস্তা বোধ হয় সতর্ক করে দিল।

যাই হোক অক্টোবরের তিন তারিখে, যখন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেও বৃষ্টির বিরাম হল না, এমন কি বৃষ্টির বেগ পর্যন্ত ওঠানামা করল না, তখন তিস্তার এই সর্বগ্রাসী ক্ষুধার ইংগিত অন্তত একজন পেয়েছিল। সে হল—তিস্তা বাজারের নিকট সেচ বিভাগের একজন সামান্য গেজ রীডার। তিস্তাবাজার থেকে নদীগর্ভের জলের স্রোত স্বাভাবিক সময়ে ত্রিশ ফুট মত নিচে থাকে। সেদিন শুধু জল বিপদ সীমাই ছাড়িয়ে যায় নি—যে উচ্চতায় বিপদ সীমা চিহ্নিত করা হয়, তিস্তার জল এক রাত্তিরে ঠিক আরও ততখানি
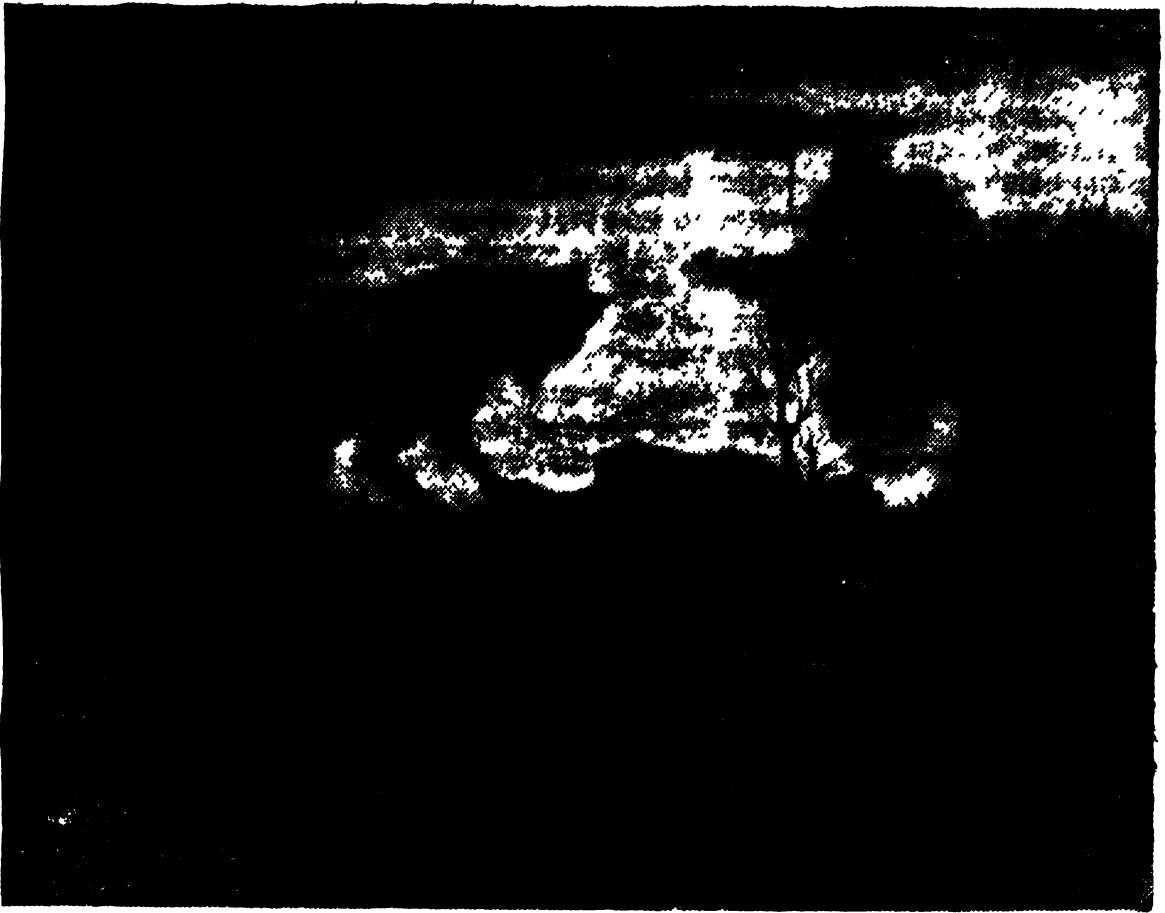
বন্যার বীভৎস ধ্বংসলীলায় উত্তরবঙ্গের জনজীবনের অবস্থা আজ নিদারুণ। এই নিদারুণ অবস্থা শিল্পীর মনকেও গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। ভারত-বিখ্যাত ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর আঁকা উপরের ছবিটি সেই নিদারুণ অবস্থারই অভিব্যক্তি।

উঠে এসেছে। ভোরবেলায় উঠেই উক্ত গেজ রীডার জলের চেহারা দেখে আর এক মুহূর্ত দেরি করে নি। নিকটস্থ আউটপোস্টে গিয়ে সে ওয়ারলেস মারফৎ কালিম্পং এ খবর পাঠিয়ে দিল। নিজের যে কোয়ার্টারটি তিস্তাবাজারের খানিকটা নিচে ছিল, সেই কোয়ার্টার থেকে যতদূর সম্ভব জিনিসপত্র সরিয়ে সে তিস্তাবাজারের মধ্যে নিয়ে এল। খবরে প্রকাশ—তিস্তা যখন তার সংহার মূর্তি ধরেছিল তখন ত্রিশ ফুট উঁচুতে তিস্তাবাজারের অর্ধেক অংশ নিজের গর্ভে টেনে নিয়েছে—বৃটিশ আমলের তৈরি প্রাচীন তিস্তা ব্রীজের একটুকরো ভাঙা লোহার টুকরোও আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। সেই গেজ রীডারটি তিস্তাবাজারে আশ্রয় নিয়ে জীবনরক্ষা করতে পেরেছে কি না সে সংবাদ আর পাই নি।

খবর দিয়েছিল সেভোকের করোনেশন ব্রীজের পরিদর্শক—তিস্তার জল বিপদ সীমা অতিক্রম করেছে। সাবধান। খবর এসেছিল সামরিক বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারদের কাছ থেকে—সাবধান।

কিন্তু এ সাবধান বাণী জলপাইগুড়ির হতভাগ্য নরনারীর কানে পৌঁছালো না। আজ শোনা যাচ্ছে, এবং শোনা কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য বলে ধারণা হওয়ায় কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী তদন্তেরও নির্দেশ দিয়েছেন যে, ওই রাত্রেই—দার্জিলিং-এর ডি সি মিঃ সুব্রাহ্মণিয়ম জলপাইগুড়ির ডি সিকে টেলিফোনে বিপদবার্তা জানিয়ে সতর্ক হতে বলেছিলেন।

তখন রাত্রি দুটো। তারপর অফিসগুলি বন্ধ। পুজোর ছুটি। সুতরাং এত রাত্রে কাকেই বা পাওয়া যায়—কিই বা করা যেতে পারে। সুতরাং সকালে দেখা যাবে। এটা অনুমান! —জলপাইগুড়ির ডি সির এই মনোভাবের সঙ্গত কারণও হয়তো খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে।

সকালে অর্থাৎ অক্টোবরের তিন তারিখ আবার বিপদবার্তা। এবার জলপাইগুড়ির সেচ বিভাগের দপ্তর থেকে। সুতরাং এই বিপদবার্তা জলপাইগুড়ির শহরবাসীকে জানানো হবে কি না সে সম্পর্কে জলপাইগুড়ির কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে এক বৈঠক হল। এই বিশিষ্ট ব্যক্তি কারা—কি জন্যে শহরের মধ্যে তাঁদের বৈশিষ্ট্য, তাঁরা রাজনীতি করেন কি না, করলে কোন দলের, এসব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। জলপাইগুড়ির বন্যার জন্য এ পর্যন্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত যে সব অসতর্কতা ও গাফিলতির সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে এই তদন্তের শেষে আশা করি তার সঙ্গে আরও নতুন কোনও তথ্য সংযোজন করা চলবে।

শুধু ওই বৈঠকের একমাত্র ব্যতিক্রম—শ্রীচারুচন্দ্র সান্যাল। শ্রীসান্যাল ওই বৈঠকে বলেছিলেন যে—শহরবাসীকে সতর্ক করার জন্য সাইরেন বাজানো হোক। কিন্তু বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে এই স্থির হল যে—সাইরেন বাজালে শহরবাসী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে—সুতরাং সাইরেন বাজানোর প্রয়োজন নেই। হায়। সেদিন যদি সাইরেন বাজানোর অনুকূলে সবাই মত প্রকাশ করতেন—তবে বন্যায় প্রাণহানি হত না একথা বলা যায় না—কিন্তু এত বেশি আর এমন অসহায়ভাবে হত কি না সন্দেহ।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য সেক্রেটারী এই ঘটনার উপর শুধু নিরপেক্ষ তদন্তই দাবি করেন নি—তিনি সমগ্র ব্যাপারটি সক্রোধে গভীর চক্রান্ত বলেও ইঙ্গিত করেছেন। কি সে চক্রান্ত যা কি না আবালবৃদ্ধবনিতা সহ একটি শহরে সমস্ত নাগরিকদের বিরুদ্ধে করা চলে? এর রহস্য অবশ্যই উদ্‌ঘাটিত হওয়া প্রয়োজন—নচেৎ জলপাইগুড়ি নয়—সমস্ত

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে আমরা কলঙ্কভাগী হয়ে থাকব। জলপাইগুড়ির সেই সব বিশিষ্ট নাগরিকরা জলপাইগুড়ি শহরের বন্যা চেনেন। তিস্তার জলস্ফীতি ঘটলে কাছারী, করলার দুই তীর দিয়ে নিচু পল্লীগুলি প্লাবিত হয়। প্রাণহানি ইতিপূর্বে কোনদিন ঘটে নি। সুতরাং এবারও যদি ওই ধরণের বন্যা হয়—তবে আগামী মধ্যবর্তী নির্বাচনের পূর্বে বন্যাত্রাণের অজুহাতে জনসংযোগ এবং ইলেকশন ক্যাম্পেন দুটোই এক সঙ্গে হবে—এইরূপ কোনও অসদুদ্দেশ্য চিন্তা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মস্তিষ্কে কাজ করে নি তো? এ ছাড়া শহরবাসীর বিরুদ্ধে অন্য কোন চক্রান্তের সূত্র খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

সাইরেন শুধু সতর্ক করার জন্য নয়—প্রথমে আতঙ্ক, এবং আতঙ্ক থেকেই সতর্ক হবার তাগিদ। তা সে যুদ্ধের সময়েই হোক—কোনরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাসেই হোক—আতঙ্কিত তো মানুষ হবেই। অথচ জলপাইগুড়ির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এবং ডেপুটি কমিশনার এই সাধারণ তথ্য উপলব্ধি করেন নি কিংবা করতে চান নি।

জনরব—জলপাইগুড়ির সেচদপ্তরের একজন সাধারণ কর্মচারী তার অভিজ্ঞতা থেকে এই বিপদে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন এবং সাধারণ কর্তব্যবোধে একটি চোঙা সংগ্রহ করে—শহরের প্রধান কয়েকটি স্থানে দাঁড়িয়ে শহরবাসীর এই আসন্ন বিপদের কথা তারস্বরে চীৎকার করে জানিয়ে দিয়েছিলেন। আর সতর্ক হয়েছিলেন [illegible] পাড়ার কিছু মুষ্টিমেয় অধিবাসী [illegible] দিনের বর্ষাতেই যাদের বাড়িতে এক কোমর করলার জল ঢুকে পড়েছিল। তারা তিস্তা সম্পর্কে হয়তো কোনরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করেন নি কিন্তু—করলার জলই তাদের ঘর ছাড়া করে দিল। কেউ কেউ শহরের উঁচু দিকে চলে গিয়েছিলেন—কেউ বা শহরের মধ্যস্থলে ক্লাব বোর্ডিং-এ এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এমনি একটি পরিবার হল শ্রীসুনীল সেনের। সেন পাড়ায় দোলনা ব্রীজের ঠিক মুখেই তাঁর বাসা। মহাপ্রলয়ের পর সুনীলবাবু জানালেন তিনি ৩রা অক্টোবর তাঁর পরিবারবর্গকে নিয়ে ক্লাব বোর্ডিং-এ আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেন পাড়ার আরও দু-একজন পান্ডা পাড়া এবং আদর পাড়ার দিকে চলে গেলেন।

করলার অপর পারেই হল রায়কত পাড়া এবং হাসপাতাল। জলপাইগুড়ি হাসপাতাল—যার নিচের তলাতে অন্তত দেড় শ জন রোগী মারা গিয়েছেন অথবা বন্যার জলে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন। রায়কত পাড়া এবং হাসপাতাল পাড়াও ঠিক সমান নিচু। করলার জল ছোঁয়াছুঁয়ি ঘর-বাড়ি। জলপাইগুড়ি শহরের মধ্যভাগ দিয়ে করলা নদী প্রবাহিতা। তিনটি সেতু দিয়ে শহরের অভ্যন্তর ভাগ সংযোজিত। একটি কাছারীর কাছে পায়ে চলা সেতু অপরটি তার একটু দূরে পাকা ব্রীজ—যানবাহন চলার উপযোগী; জার্মান পদ্ধতিতে তৈরি তৃতীয়টি দিনবাজারের কাছে পুরনো কাঠের সেতু। নড়বড়ে।

জলপাইগুড়ি শহরও পুরনো। পুরনো অর্থে বৃটিশ আমলে এখানে ইংরাজ সিভিলিয়ানরা বাস করতে পছন্দ করত। বৃটিশ আমলের কতকগুলি নাম ও নিদর্শন এখনও রয়েছে। চা-বাগান মালিকদের পুরনো ধরণের বাড়িগুলির মাঝে মাঝে হালফ্যাসানের পাকাবাড়ি যথেষ্ট চোখে পড়বে। তা সত্ত্বেও শহরটি কেমন যেন এবড়ো-খেবড়ো, অগোছালো, অপরিকল্পিত ভাবে গড়ে উঠেছে বলে মনে হয়। শহরের উপকণ্ঠ অথচ সংলগ্নভাবে গড়ে উঠেছে উদ্বাস্তু উপনিবেশগুলি। জলপাইগুড়ি রাজবাড়ি করলার অপর পারে—একটেরের রায়কত পাড়ার শেষে। রাজবাড়ির বেশ কিছুটা দূরে জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক প্রভৃতি, যাকে এক্সটেন্ডেড জলপাইগুড়ি বলা হয়।

৪ঠা অক্টোবরের রাত্রি শেষ হতে পারলো না। রাত্রির প্রথম প্রহর থেকেই বৃষ্টির বেগ আরও বাড়ল। সাথে দমকা হাওয়া। তবুও—যেহেতু কোন বিপদ সংকেত নেই এবং করলার জলস্ফীতি ঘটলেও শহরগ্রাসী রূপ ধরে নি—সুতরাং জলপাইগুড়ির মানুষ বৃষ্টি এবং ঠান্ডার আমেজে ঘুমিয়ে পড়ল। শহর জনকোলাহলশূন্য হয়ে গেল। শুধু একটানা বৃষ্টির শব্দ ছাড়া—আর কোনও সাড়া শব্দ নেই। রাত্রি পৌনে দুটোয় নিরালা হোটেলের দোতলা থেকে (শহরের মধ্যস্থলে) একটা দমকলের গাড়ির ঘণ্টি শোনা গেল মাত্র। গাড়িটি বিপদ সংকেত ধ্বনি করতে করতে দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল। অনুমান—সর্বনাশ তখনই শুরু হয়েছে। প্রথম জলের তোড়ে ভাসা কোনও আর্ত ব্যক্তি পরিবারের উদ্ধারের জন্য হয়তো দমকলকে খবর দিয়েছিল।

হায়—তখনও পুলিশ লাইনে পুলিশ পাহারা থাকবার কথা—যে পুলিশ ফাঁড়ি করলা থেকে মাত্র সামান্য দূরে—থাকবার কথা বাঁধের প্রহরী, যে কিনা বাঁধের অবস্থা খারাপ হলে—তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দেবে।

অথচ সব থাকা সত্ত্বেও সর্বনাশ কেমন অবলীলাক্রমে—বিনা বাধায় বিজয়ী শত্রুপক্ষের মত শহরের মধ্যে প্রবেশ করল মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। অনুমান রাত্রি তখন তিনটা। শহরবাসীর অনেকের ঘুম পাতলা হয়ে গিয়েছে। কেউ কেউ বাইরে বেরিয়ে শেষ রাতের আমেজটুকু গ্রহণ করে আবার একটু গড়িয়ে নেবেন এইরূপ ইচ্ছা। কিন্তু যারা একবার বিছানা ছাড়লেন তাঁরা আর বিছানায় যেতে পারলেন না। কারও বারান্দায় উপর জল উঠেছে, কারও বা বারান্দা ছোঁয় ছোঁয় অবস্থা। কারও উঠোনে এক কোমর জল। আর সবিস্ময়ে এবং আতঙ্কগ্রস্তভাবে লক্ষ্য করা গেল—এ তো বৃষ্টির জল নয়—কিংবা করলার জলও নয়। এ জল ঘোলা এবং রীতিমত স্রোতের টান। পা ঠিক থাকে না জলের তোড়ে।

সুতরাং চীৎকার করে উঠলেন জেগে ওঠা মানুষগুলি। বাড়ির সবাইকে সাতঙ্কে ডেকে তুললেন—ওরে ওঠ ওঠ, তিস্তার বাঁধ ভেঙেছে।

জেগে উঠল শহর। আতঙ্কে বিহ্বল। অসহায়।

তিস্তা বাঁধ ভেঙেছে, তিস্তা ক্ষেপে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে শহরের সমস্ত নিকট দূর প্রান্ত থেকে আর্ত চীৎকার—বাঁচাও—বাঁচাও। কখনও চাপা সুরে—কখনও বা তীব্র এবং তীক্ষ্ণস্বরে।

কিন্তু বাঁধ ভাঙা জলের গর্জনে সে আর্তস্বর চাপা পড়ে যাচ্ছে। আকাশ ফাটানো জলের গর্জন, তার সঙ্গে বাড়িঘর ভেঙে পড়া বিকট শব্দ, মানুষের আর্ত চীৎকার, গরু এবং ছাগলের প্রাণভয়ে এক সঙ্গে ডেকে ওঠা, কুকুরগুলির মিলিত সুরের কান্না! সেই মুহূর্তে—৪ঠা অক্টোবরের রাত্রি ৩টা কিংবা সাড়ে তিনটায় জলপাইগুড়ি শহরের উপর মনে হল যেন শেষের সেদিন নেমে এসেছে।

বৃষ্টির বেগ তখন অনেকটা কমে এসেছে। আকাশ পরিষ্কার হয় নি—কিন্তু অন্ধকার অনেকটা পাতলা। দেখতে দেখতে জল বেড়ে উঠল। বারান্দা থেকে ঘরের মধ্যে—ঘরের ভিতরেও এক কোমর জল দাঁড়িয়ে গেল।

মানুষ প্রথমে চৌকীর উপর আর একখানা চৌকী রেখে বাকসো, বিছানা চাপিয়ে উঁচু হল। কিন্তু তাও বুঝি ভেসে যায়। কেন না জলের উপর কাঠের চৌকী ভেসে উঠতে চায়। সুতরাং ঘরের সিলিং ফুটো করে টিনের ছাদে উঠিয়ে চালের উপর উঠে পড়া। মুস্কিল হল যাদের একতলা কংক্রীটের ছাদ—, তাদের। দ্বিতল পাকা বা কাঠের বাড়ি যাদের তারা কোনমতে প্রাণে বাঁচল। এমনও হয়েছে, হয়তো পরিবারের সকলে টিনের ছাদে গিয়ে উঠল—কিন্তু জলের তোড়ে সমস্ত বাড়িটাই ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

জলপাইগুড়ির শান্তি পাড়ার অনুকূলচন্দ্র রায়—পান বিড়ির দোকান করেন, তিনি বললেন—জলের প্রথম বেগের সঙ্গেই আমি আমার পরিবারের হাত ধরে টিনের ছাদের উপর উঠে পড়েছি। সঙ্গে দুই বছরের ছেলে। পাশের আর একখানি টিনের ঘরের ছাদের উপর আশ্রয় নিয়েছে

ছত্রিশজন মানুষ। কস্তুত তখন তারা ছত্রিশজন কি না গুণে দেখি নি তবে ওরা ছত্রিশজনই এক সঙ্গে থাকত। শহরের বিভিন্ন গুদামের নিম্ন শ্রমিক, কয়েকজন মোষের দুধের ব্যবসা করে, কয়েকজন রিক্সাওয়ালা ইত্যাদি। দেখতে দেখতে ঘরখানা জলের তোড়ে ভেঙে পড়ল। ডুবে গেল জলের নিচে। আর সেই ছত্রিশজন মানুষ জলের উপর ভেসে উঠে বাঁচাও বাঁচাও বলে হাত আন্দোলিত করেছিল।

বন্যা যখন আসে—তখন জলপাইগুড়ি হাসপাতালে রাতের ডিউটিতে একজন মাত্র মহিলা নার্স এবং কয়েকজন ওয়ার্ডবয়, জমাদার ইত্যাদি। ওয়ার্ডবয়রা মদ্যপান করে শুয়ে পড়েছিল। নিচের তলায় অন্ততঃ দেড়শোজন রোগী ছিলেন বলে অনুমান। এই দেড়শোজন রোগীই মৃত্যু ও বন্যার কবলে। শিলিগুড়ির একজন প্রবীণ নাগরিক শ্রীপরেশ ভট্টাচার্যের মৃত্যুও কম মর্মান্তিক নয়। এই হাসপাতালেই পায়ের তিনি অপারেশন করেছিলেন এবং তাঁর সীটের সঙ্গে পা বাঁধা ছিল। সেই অবস্থাতেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর।

হাসপাতালের যে একজন মাত্র নার্স প্রাণ বাঁচাতে দোতলায় উঠে গিয়েছিলেন—তিনি দোতলার বারান্দা ছোঁয়া জলের উপর দিয়ে দুটি সদ্যজাত শিশুকে ভাসতে দেখে—একটিকে টেনে বাঁচান—অন্যটিকে আর ধরতে পারেন নি।

শহরের এক প্রান্তে করলার বাঁধের উপর আশ্রয় নিয়েছিল বহু মানুষ। তার মধ্যে পশ্চিমা মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী উচিত মজুয়া বলে, রাতের অন্ধকার যখন পাতলা হল—তখন করোলার জল দিয়ে সে হাজার হাজার মানুষ ভেসে যেতে দেখেছে। তার মধ্যে মৃতই বেশি—অবার অনেকে বেঁচে-ছিল। যারা বেঁচেছিল—তারা হাত আন্দোলিত করে সাহায্য চাইছে। কেউ বা প্রাণপণে কূলের দিকে আসতে চাইছে। গরুর সংখ্যা কত তা ঠিক বলা যায় না। আর তার সঙ্গে অসংখ্য পাহাড়ী অজগর —ফরেস্ট থেকে ভেসে আসা অসংখ্য গাছ গাছালি।

জলপাইগুড়িকে এখন যুদ্ধান্তে কোনও বোমা বিধ্বস্ত শহরের মত দেখায়। অক্টোবরের ছয় তারিখের জলপাইগুড়ি শহরকে যে দেখেছে—সে চিরদিন মনে রাখবে সেই চেহারা।

৫ই অক্টোবর-এর ভোরবেলা পর্যন্ত শিলিগুড়ির মানুষ কিছু বুঝতে পারে নি। সকালে যে যাত্রীবাহী বাসখানির জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছানোর কথা—সে বাসখানা এল না। হয়তো ব্রেকডাউন—কিংবা অন্য কোনও অসুবিধা। মফস্বলের বাস সার্ভিস—সুতরাং তা নিয়ে ভাবনার বিশেষ কিছু ছিল না।

আর তাছাড়া শিলিগুড়িতেও তখন জনসাধারণের মধ্যে দারুণ উদ্বেগ। একটানা বাহাত্তর ঘণ্টা বর্ষণের শেষে-যখন বর্ষা থামল সকালে তখন শিলিগুড়ির অর্ধেক মানুষ গিয়ে ভিড় করেছে মহানন্দা নদীর তীরে। মহানন্দার বালির চরে গড়ে ওঠা গুমটি বস্তী ভেসে গেছে। ভেসে গেছে কয়েকজন মানুষ এবং অসংখ্য ঘরবাড়ি।

তখন পর্যন্ত কেউ কল্পনা করে নি —যে সর্বনাশের সবচেয়ে মারাত্মক খবর অপেক্ষা করছে।

বেলা আটটা নাগাদ জলপাইগুড়ির বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীঅমিয় সেন (দাদু সেন) কিভাবে যে শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছেছিলেন—তা একমাত্র তিনিই জানেন।

তিনিই প্রথম শিলিগুড়িবাসীকে জানালেন জলপাইগুড়ির সর্বনাশের কথা। সেবক রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে পাগলের মত চীৎকার করে তিনি লোকজন ডেকে বললেন।

বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন।

এদিকে খবর আসছে অন্যভাবেও। জলপাইগুড়িকে টেলিফোনে পাওয়া যাচ্ছে না। পাওয়া যাচ্ছে না, কার্শিয়াং, কালিম্পং, দার্জিলিং, ময়নাগুড়ি কোচবিহার,
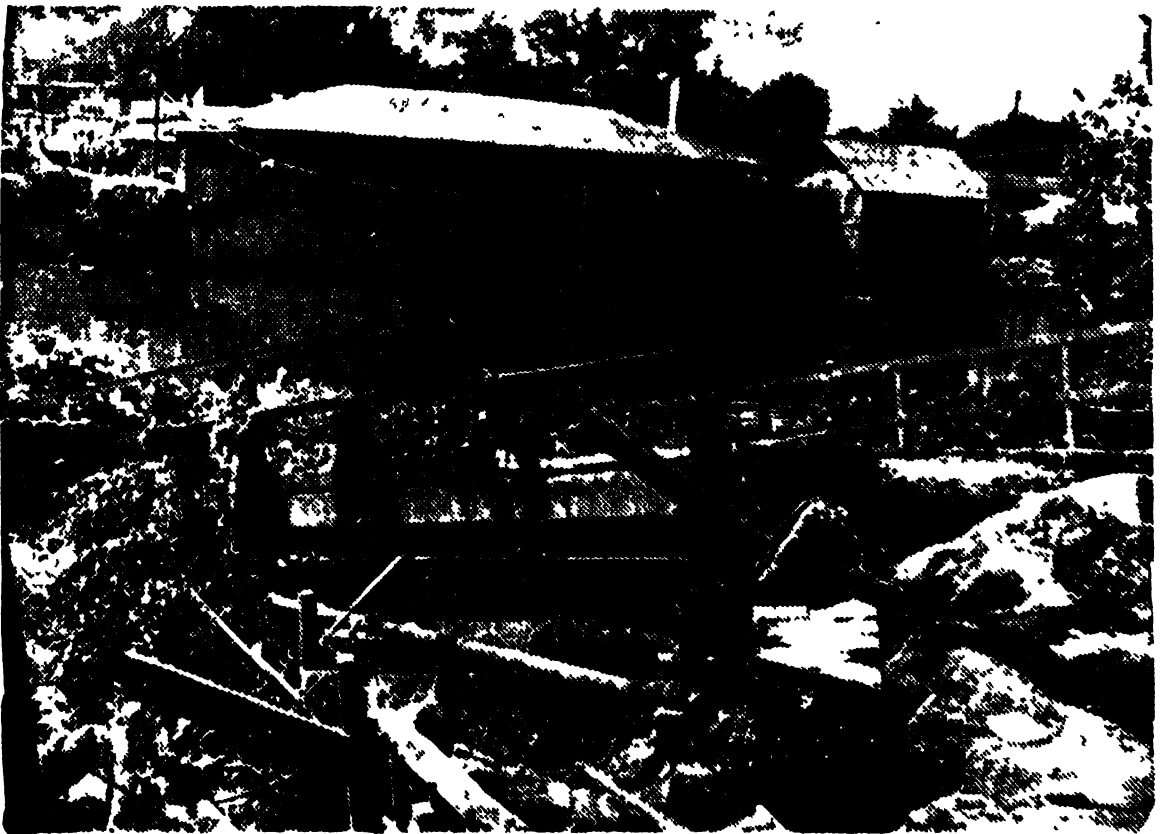
জলপাইগুড়ি শহরে করলা নদীর উপরের এই সেতুটি বন্যায় বিধ্বস্ত হয়েছে। ফটো: শম্ভুনাথ ব্যানার্জী

দোমহনী, মেখলীগঞ্জ, আলিপুরদুয়ার, তুফানগঞ্জ, হলদিবাড়ি, মণ্ডলঘাট অনেককেই। জল—জল—জল।

বন্যায় ভেসে গিয়েছে সমস্ত উত্তরবঙ্গ।

শহর, আধা-শহর, গ্রাম-গঞ্জ, চা বাগান, বস্তী হয় জলের নিচে, নয়তো ধ্বংসের নিচে। খবর ছুটছে দিগ্বিদিকে, কার্শিয়াং-এর নিচে মিরিখ বস্তী নেই। পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র থেকে মিরিখ বস্তী চিরদিনের মত মুছে গিয়েছে। করলার চারটি ব্রীজ, সেভোকের কাছে তিস্তার রেল সেতু, শিলিগুড়ির কাছে ফুলেশ্বরীর রেল সেতু, বালাসন ব্রীজ কিছু নেই।

৬ই অক্টোবর বন্যার জল সরে যাওয়া জলপাইগুড়ি শহরের পলিমাটির পরে জলপাইগুড়ি শহরের মানুষের প্রথম কাজ হল চিতায় অগ্নিসংযোগ করা। যে সমস্ত লোক তাদের আত্মীয়স্বজন, প্রিয়জন এবং পরিজনের মৃতদেহ সংগ্রহ করতে পারল—তারা চিতা সাজালো মাষকলাইবাড়ির মহাশ্মশানে। সারি সারি অসংখ্য অগণিত চিতা। দিনরাত্রি চিতাগ্নি জ্বলল কয়েকদিন ধরে। তা সত্ত্বেও শহরের বুকে, পলিমাটির নিচে আরও অসংখ্য অসনাক্ত মৃতদেহ ইতস্তত ছড়িয়ে থাকল। বায়কত পাড়া, সেন পাড়া, নয়াবস্তী, তখনও জলের তলে। তখনও সেখানে মানুষ গিয়ে পৌঁছতে পারছে না—কিংবা সেখানকার মানুষ বেরিয়ে আসতে পারছে না। দার্জিলিং, কালিম্পং-এর অবস্থা, দোমহনী, মেখলীগঞ্জের অবস্থা, কিংবা মণ্ডলঘাটের অবস্থাও তাই।

মৃত্যু আর মৃত্যু। মৃতদেহের ছড়াছড়ি। গরু, মানুষ, সাপ, হরিণ, বুনো শুয়োর, মোষ-এর মৃতদেহে যেন প্রতিযোগিতা।

৬ই অক্টোবরের সংবাদপত্রগুলি অবাক করে দিল সমস্ত সভ্য মানুষকে। দার্জিলিং থেকে রাজ্যপাল জলপাইগুড়ির অধিবাসীদের জন্য যে সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন—তার কলাও বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে—প্রকাশিত হয়েছে, সাহায্যদানের ত্রিম [illegible], সামরিক বাহিনী অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে উদ্ধার এবং সাহায্যের কার্যে এগিয়ে গিয়েছে—তারও বিবরণ। অথচ—১০ই অক্টোবরের আগে কোনও সামরিক বা বেসামরিক সাহায্য গিয়ে পৌঁছায় নি। সামরিক বাহিনী জলপাইগুড়ির উপকণ্ঠে ছাউনী ফেলে, সাহায্যের সমস্ত রকম উপকরণ প্রস্তুত রেখে ১০ই অক্টোবর পর্যন্ত হয় তাস খেলেছে না হয় ট্রানজিস্টর খুলে আকাশবাণী গৌহাটির প্রোগ্রাম শুনেছে। সরকারী প্রচার দপ্তরের টাইপ করা বিবৃতির বাংলা অনুবাদ পাঠিয়ে দিয়ে যে সব সাংবাদিক জলপাইগুড়ির অধিবাসীদের প্রতি তাঁদের কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন—আশা করি জলপাইগুড়িবাসী তা মনে রাখবেন দীর্ঘকাল।

একমাত্র এবং প্রথম বসুমতী প্রতিবাদ করল এই মিথ্যাচারণের। দৈনিক বসুমতী লিখল—যাঁরা জলপাইগুড়ির ধন-সম্পত্তি ও প্রাণবিনষ্টির সংবাদকে লঘু করে আকাশবাণীর প্রচারকে গুরুত্ব দিচ্ছেন, জলপাইগুড়ির প্রাণহানির সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে এখনই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন তাঁরা জলপাইগুড়ির মৃত ও জীবিত মানুষদের প্রতি চরমতম পরিহাস করছেন।

জলপাইগুড়ির ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানির সংখ্যা নিরূপণ আজও সম্ভব নয়। কতদিনে সম্ভব হবে তাও ঠিক নেই, অথচ একশ্রেণীর সংবাদপত্র জলপাইগুড়ির প্রাণহানির একটি নগণ্য সংখ্যা প্রচার করল—শুধু তাই নয়—সেই সংখ্যাটিকেই শেষ সংখ্যা হিসাবে অচলপ্রতিষ্ঠ করে তোলার জন্য নির্লজ্জ প্রচেষ্টা চালালো—আশা করি সংবাদপত্রের পাঠকরা তা ইতিমধ্যেই ভুলে যান নি। এই বিভ্রান্তি প্রচারের প্রবণতা অনেকটা কম হল—যখন কলকাতা থেকে আসা সাংবাদিকরা জলপাইগুড়িকে কভার করতে থাকলেন।

বিপর্যয়ের খবর পাওয়া মাত্র শিলিগুড়ি থেকে জাতীয় যুবসংঘ নামে একটি ক্লাবের সভ্যরা প্রথম খাদ্য ও পানীয় ভর্তি একটি ট্রাক নিয়ে জলপাইগুড়ি পৌঁছলেন। তখন বেলা বারোটা—তারিখ ৫ই অক্টোবর। তখন শিলিগুড়ি শহর চঞ্চল। স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেছে শিলিগুড়ি শহরের। ট্রাক, বাস, ট্যাক্সী যে যা পাচ্ছেন—নিয়ে ছুটছেন জলপাইগুড়ি শহরের দিকে। সকলেই উদ্বিগ্ন তাঁদের আত্মীয়স্বজনের জন্য। তখনও পর্যন্ত শিলিগুড়ি থেকে সাহায্যের সম্ভার তত যথেষ্ট হয় নি। তাঁরা যখন ফিরে এলেন—এবং জলপাইগুড়ির অবস্থা শিলিগুড়ির নরনারী ভালভাবে বুঝতে পারল, তখনই খুলে গেল সাহায্যের ভাণ্ডার।

শিলিগুড়ির প্রায় এক লক্ষ নরনারী কোন না কোনভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন জলপাইগুড়ি শহরের দিকে। ব্যবসায়ী থেকে রিকসাওয়ালা, ধনী থেকে দরিদ্র, বৃদ্ধ থেকে শিশু পর্যন্ত সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেলেন। প্রত্যহ আটাত্তরখানা ট্রাক ছুটছে জলপাইগুড়ির দিকে। এই আটাত্তরখানা ট্রাকের মধ্যে বেশির ভাগই রান্না করা খাদ্য আর পানীয়—তা ছাড়া জামা-কাপড়, ঔষধ, বেবীফুড, চুণ, ব্লিচিং পাউডার, কোদাল, দড়ি, এমনকি যে কটি গরু বেঁচে আছে সেগুলির জন্য খড় পর্যন্ত। কেন না জলপাইগুড়িতে ঘাস নেই। সর্বত্র ঢেকে গিয়েছে পলিমাটিতে।

যারা সাহায্য নিয়ে যাচ্ছে—তারা সব সন্দেহের [illegible] তো বটেই—কিন্তু বেশির ভাগ যুবক এবং অন্য প্রত্যেকেই। অবাঙালীদের [illegible] বাঙালীর উদ্যমে রাস্তায় [illegible] বসে থাকা ছেলে বলি, যাদের প্রত্যহ দেখি রাস্তার মোড়ে, কিংবা চায়ের দোকানে গুলতানি করতে, স্কুল কলেজগামী মেয়েদের পিছনে দাঁড়িয়ে শিস দিতে কিংবা টিপ্পনী কাটতে, চোঙা প্যান্ট পরে যারা কিংগুলির শোভাযাত্রায় টুইস্ট [illegible]—বাদের [illegible] ছেলে তারাই। কি অপরিসীম আগ্রহে, অমানুষিক পরিশ্রম করে তারা জলপাইগুড়ির ঘরে ঘরে জল এবং খাবার পৌঁছে দিয়েছে। এরা মধ্যবিত্ত বাঙালী ঘরের শিক্ষিত কিংবা অর্ধশিক্ষিত যুবক। কিছু একটা করার মোহে, কিংবা মহত্ত্বের শিক্ষানবী দেখাতে যে এই সেবাব্রতে তারা নামে নি—তা প্রমাণ হয়েছে। যদি তাই হত—তবে দুদিনেই তাদের অবসাদ আসত এবং 'ধুত্তোরি' বলে অন্য কোন নতুন মোহের সন্ধান করত। অপরিসীম দরদ এবং মানবত্ববোধ জাগ্রত না হলে—এই ধরণের সেবাকার্যে নিয়োগ করা মানুষের পক্ষে কঠিন।

এই যুবশক্তি, এই মহৎ প্রাণগুলি আমাদের রাষ্ট্রনায়কেরা, অবহেলায় [illegible] একটু সুযোগ দেওয়ার [illegible] বিপথগামী করে তুলেছেন, জলপাইগুড়ির বন্যার্তদের মধ্যে সেবাকার্যে নিয়োগ করে ওরা তাই-ই আমাদের বুঝিয়ে দিল।

এই বোমা কি [illegible], স্লোগান এবং ঘেরাও থেকে কিছু কম?

বিপর্যয়ের পর পাঁচ দিন [illegible]। গোটোমা সংবাদপত্র ও আকাশবাণী ছাড়া [illegible] সরকারী সাহায্যের কোনও [illegible] নেই। জলপাইগুড়ির অবশিষ্ট মানুষগুলির জীবনমরণ নির্ভর করছে শিলিগুড়ির বেসরকারী সাহায্যের পরে। আর এমনি সময়ে সরকার কি ভাবছিলেন জানি না, হঠাৎ সমস্ত বেসরকারী সাহায্য বন্ধ করে দিলেন।

জলপাইগুড়ির সমস্ত মানুষের আশয়, সম্বল, ধনসম্পত্তি সব গিয়েছে, আর অবিবেচক, অপদার্থ শিলিগুড়ির এস ডি ও বাহাদুর সাহায্যের গ্রাসটুকুও কেড়ে নিলেন তাদের মুখ থেকে।

ট্রাক ভর্তি সাহায্য সহ অসংখ্য ট্রাক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শিলিগুড়ির পথে। ওদিকে মা তাঁর শিশুপুত্রকে এক ঝিনুক দুধ দেওয়ার জন্য সজল নয়নে তাকিয়ে রয়েছেন শিলিগুড়ি থেকে আসা ট্রাকগুলির পথ চেয়ে। অসংখ্য মানুষ ছটফট করছে ক্ষুধায় তৃষ্ণায়। সেদিন একবিন্দু জলপানি গিয়ে পৌঁছলো না জলপাইগুড়িতে। বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির মানুষ। সেদিন শিলিগুড়ির সর্বদলীয় রাজনৈতিক নেতা এবং সমাজসেবী গর্জন করে উঠেছিলেন শিলিগুড়ির প্রশাসকদের

বিরুদ্ধে। আমরা দেখতে চাই হয় দরাজ হাতে সরকারী সাহায্য পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, নতুবা শিলিগুড়ির ছেলেদের সাহায্য নিয়ে যেতে দিতে হবে জলপাইগুড়ি। পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে বেসরকারী সাহায্যের উপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে নিলেন শিলিগুড়ির অতিবুদ্ধিসম্পন্ন মহকুমা শাসক বাহাদুর। আর সেইদিনই মোহিতনগর এবং মাষকলাইবাড়ির পথে-ঘাটে জলপাইগুড়ির মানুষ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পোস্টার টানিয়ে দিল "Long Live Siliguri" "শিলিগুড়ি দীর্ঘজীবী হোক!"

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, এই সময় জলপাইগুড়ির অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা, সমাজসেবী বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কি করছিলেন? নিঃসন্দেহে তাঁরাও বন্যা-পীড়িত। তাঁদের পরিবারের প্রাণহানির তেমন কোন গুরুতর সংবাদ পাওয়া যায় নি বটে, তবে ধনসম্পত্তি অবশ্যই বিনষ্ট হয়েছে। তবুও আশা করা গিয়েছিল, তাঁদের যত ক্ষয়ক্ষতিই হোক না কেন অন্তত এই সময় তাঁরা বন্যার্ত শোকার্ত দিশাহারা মানুষগুলির পাশে এসে দাঁড়াবেন। তাদের সাহস যোগাবেন সান্ত্বনা দেবেন। কিন্তু দুঃখের কথা তা তাঁরা দেন নি। শ্রীমোরারজী দেশাই-এর জলপাইগুড়ি পরিদর্শনের দিন তাঁদের প্রথম দেখা গিয়েছিল প্রকাশ্যে। এর মধ্যে তাঁরা আর জনসমক্ষে বের হন নি।

মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় দার্জিলিং থেকে জলপাইগুড়ির জন্য সমবেদনা জানাতে একমুহূর্ত দেরি করেন নি। সরকারী সাহায্য কিভাবে দ্রুত পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, হেলিকপ্টার থেকে কিভাবে খাদ্য নিক্ষেপ করা হচ্ছে (বস্তুত তখনও পর্যন্ত সেসব কিছুই করা হচ্ছে না।) তার বিবরণও তিনি দিয়েছিলেন—অথচ এত কাছে থাকা সত্ত্বেও রাজ্যপাল মহোদয় প্রথম জলপাইগুড়ি পরিদর্শনে এলেন ১০ই অক্টোবর। ফলে জলপাইগুড়ির মানুষের মনোবল একেবারেই ভেঙে পড়ছিল। যাঁরা জীবিত রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে হতাশা আর হতাশাজনিত বিকার উপস্থিত হয়েছিল। শিলিগুড়ি থেকে বেসরকারী সাহায্যে খাদ্য ও পানীয় পেয়ে কোনমতে জীবনধারণ করলেও—তাঁরা সমাজ ও জীবনের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই সময়ে এই সবচেয়ে বড় সর্বনাশকে উপলব্ধি করেছিলেন শিলিগুড়ির যুক্তফ্রণ্টের নেতৃবৃন্দ। তাঁরা প্রত্যহ দলে দলে জলপাইগুড়ি শহরে গিয়ে বন্যার্তদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করেছেন সাহায্যের এবং পুনর্বার প্রতিষ্ঠার জোরালো আশ্বাস দিয়েছেন—শোকার্তদের সান্ত্বনা দিয়ে তাঁদের শোক লাঘব করেছেন।

বন্যার পাঁচ-ছয়দিন পরেও যখন মানুষ ও গরুর মৃতদেহগুলি অপসারণের কোন ব্যবস্থা হল না, তখন তা থেকে পচা দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকল। একে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর, তদুপরি এই দুর্গন্ধ—তারপর আশা-আশ্বাসের কোন আলোই তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন না চোখের সামনে—সুতরাং জলপাইগুড়ির মানুষের বিকার উপস্থিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অংশত বিচ্ছিন্ন কিছু বিছু ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি।

শিলিগুড়ি থেকে নিয়মিত যাওয়া সাহায্যের একখানি ট্রাককে জলপাই-গুড়িতে ঢুকতে দিল না একদল যুবক। জলপাইগুড়িরই ছেলে তারা। তাদের মধ্যে দু একটি যুবতীও রয়েছে। তাদের দাবি আপনারা নাকে রুমাল বেঁধে সাহায্য দিতে আসতে পারবেন না। ইউক্যালিপটাস ব্যবহার করতে পারবেন না। সাহায্যকারী দলের নাকে বাঁধা রুমালগুলি তারা কেড়ে নিল। একজনকে মারল। তারপর নিজেদের মধ্যে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি জড়াজড়ি করল। শেষ পর্যন্ত শিলিগুড়ির সাহায্যভর্তি ট্রাকখানিকে তারা ফিরিয়ে দিল। ঘটনাটি খুবই সামান্য। তবুও জলপাইগুড়ির কিছু সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ শিলিগুড়িতে এসে উক্ত সাহায্যকারী দলের নিকট দুঃখ প্রকাশ করে, পুনর্বার তাঁদের সাহায্য নিয়ে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত জানা গিয়েছিল উক্ত বিকৃত-বুদ্ধিসম্পন্ন যুবক-যুবতীরা শিক্ষিত-কিন্তু তাঁদের বুদ্ধি বিবেচনাবোধ এই দারুণ বিপর্যয়ে, পচা দুর্গন্ধে, স্বাভাবিক ছিল না। তাঁদের অনুভূতিপ্রবণতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। শিলিগুড়ির যুক্তফ্রণ্টের নেতৃবৃন্দ অবশ্য এই স্বাভাবিক জীবন-ভাবনাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবার কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

জলপাইগুড়ি পরিদর্শনান্তে বিদায় নেওয়ার প্রাক্কালে শ্রীমোরারজী দেশাই বিরূপ সম্বর্ধনা, অসম্মান সত্ত্বেও বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের বলেছেন - জলপাইগুড়ির মানুষের অস্বাভাবিক ক্রোধের পিছনে সঙ্গত কারণ আছে। শ্রীদেশাই যখন এই মন্তব্য করছিলেন - তখন জলপাইগুড়িতে একশ্রেণীর দলের রাজনীতিক দেশের উপপ্রধানমন্ত্রীর প্রতি অসদাচরণ করা হয়েছে বলে সখেদে আক্ষেপ করছিলেন। শ্রীদেশাই রাজ্য সরকারের জনৈক পদস্থ কর্মচারীর কাছে অসন্তুষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন বন্যার পাঁচদিন পরেও কেন সরকারী সাহায্য পৌঁছয় নি। কেন উদ্ধারকার্য, পলি-মাটি সরানো, মৃতদেহ অপসারণ হয় নি। উক্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তি কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন—সরকারী কর্মচারীরা সবাই বন্যাপীড়িত শোকার্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত।

শ্রীদেশাই পুনর্বার জিজ্ঞাসা করতে পারতেন তাহলে সেকথা সময়মত কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে সামরিক বাহিনীর সাহায্য নেওয়া হয় নি কেন? কিন্তু শ্রীদেশাই সে প্রশ্ন আর করেন নি। এ প্রশ্ন আমরাও আর এখন তুলছি না—তবে একটা সন্দেহ আমাদের প্রথম থেকেই ঘনীভূত হয়েছিল—এবং সেই সন্দেহটাই এখন জানাচ্ছি।

বন্যা আসার আগে থেকে বন্যাপ্লাবিত হওয়ার পর এক সপ্তাহ পর্যন্ত জলপাই-গুড়ি জেলার হতভাগ্য মানুষগুলিকে নিয়ে কোনও অসুস্থ এবং দুষ্ট রাজনীতি কাজ করেছিল কি?

এর জবাব আমাদের পেতেই হবে।

যদি না পাই তবে আমাদের সভ্যতার গর্ব, শিক্ষার অহমিকা আমাদের সামাজিক চেতনা এবং মানবতাবোধ আরও এক শতাব্দী পিছিয়ে থাকবে- এগিয়ে যেতে পারবে না।

দেখা পেলাম মধুভাসা গ্রামনিবাসী ম্যার্ডে এক কৃষক পরিবারের। তিন-তিনটে হাতী তাদের ভেসে যেতে দেখেছেন বললেন। নিজে যখন দেখি নি, খুব একটা গা করি নি আমি তখন। তবে তিস্তা-তোর্ষা-কালজানি-রায়ডাক থেকে গদাধর কাউকেই বিশ্বাস নেই। কোন দিন যে কি মূর্তি ধরবে কেউ বলতে পারে না। জলঢাকা-লিস্-থিস্-চেল থেকে ডিম-তিস্তা-ডায়না কাউকেই আস্থাভাজন মনে করি নে আমরা। ডাকাতে চরিত্রের নদী এরা সব। পাহাড় ভেঙে, বন উপড়ে বাঘ-ভালুক হাতী থেকে গণ্ডার সবাইকে পারে ফুলোনোর মতো ধারালো স্রোতে খান্ খান্ করে দিয়ে চারিপাশ খাওয়াতে। লোকালয় সেখানে কোন ছার? একমাত্র জলহস্তীকে ফেলে দিলে কি হয়—বলতে পারব না। ... পরেই এলেন আরো ডাউনে ... ফলিমারীর লোকেরা। একবাক্যে ... তাঁরাও দেখেছেন হাতী ভেসে যেতে। ... একটা হাতী নাকি কাছে-পিঠে কোথায় ঠেকেও আছে। জলপাইগুড়ি ঘুরে এলেন শ্রীঅজিত তালুকদার। হাতীর জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপশোস করলেন তিনি। জলপাইগুড়িবাসীদের পরম উপকারী বন্ধু। জন্তু নয়, জনপদের অধিবাসী ছিল 'চাঁদ-পিয়ারী।' কয়েকদিন ধরেই পায়ে বেঁধে মড়া টানে। করলা নদীর জল খেয়ে অনেক মিনিটের মধ্যেই তার সব শেষ। ঠিক সন্ধ্যা হয়ে তখন। এমন বন্ধুর জন্যও এতটুকু জল ছিল না সেদিন।

জলপাইগুড়ির জন্য সংগৃহীত ... বার্লি নিয়ে ভক্তনগর থেকে চলেছি, আমরা কয়েকজন। সকলরে, বিমল, মনোজ থেকে নন্দলালবাবু—প্রত্যেকেরই ঘাড়ে ১০/১২ সের-কি মন্দ। ময়নাগুড়ি হয়ে ময়নাগুড়ি রোড। জায়গা বিশেষে জল তখনও এত বেশি যে কাপড় বাঁচে না। বাঁ দিকের ঝিগা-গাছটা দেখিয়ে একজন বললেন পরশু এরা মৃতদেহটা দেখতে পেয়েছেন ঝুলে আছে। বেচারার স্ত্রী-পুত্র সবাই ভেসে যায় রাক্ষসে বন্যায়। এরা আর বেঁচে থেকে কি হবে? মনের দুঃখেই ঝুলে পড়লেন এসে। কিন্তু শেষ খবর জানেন? কেউ তারা মরে নি, ফিরে এসেছে সবাই। মাঝ থেকে মারা পড়াটাই সার হলো তার।

যেখানে ভাঙা সেখানেই দুর্গন্ধ। এমন তীব্র যে গায়ের চামড়া ভেদ করে ভেতরে গিয়ে হানা দেয়। আজ অবধি এমন কোন সেন্ট আবিষ্কার হয় নি যা পারে এর সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে। দু' হাতে দশ বোতল জল ঝুলিয়ে পাশা-পাশি চলেছেন এক সেপাই। প্যান্ট তুলে ধরতে না পারায় ভিজে তিতে একাকার। বুট পরেই জলে নামা ছাড়া উপায় কি? তবু নাক ঢাকার সমস্যা তার পূর্ববৎ। 'হে ভগবান এই জল খেয়ে আজ রাত্রেই যেন সব শালা কলেরায় মরে, আর আমার চাকরিটাও চলে যায় সেই সঙ্গে।' ... বুট আর প্যান্টের মধ্যে—বার্লি ... একটাস ডিনাস্ট হলেন তিনি। উদ্বাস্তুর অভিশাপই জানাচ্ছিলেন পুলিশটি, কর্তৃপক্ষরূপী বিধাতাপুরুষ-দের। যাদের সামলাতেই অবশিষ্ট শাসন ব্যবস্থা বেসামাল তখন জলপাইগুড়ি শহর।

মৃত্যু নয়, সবই অপমৃত্যুর কাহিনী—আর কত শুনবে? বন্যার জল এবং তার ধ্বংসাবশেষ এখানে-সেখানে তখনও যা ... জল শুকিয়ে যাবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। তবু একবার না হেসে পারলাম না। তিস্তার তরঙ্গ অন্য অনেকের মতই সঙ্গীত ভাসিয়ে নেয় আমাদের কমরেড যোগেন বাবুকে। পাকিস্তানীদের সেবাযত্নে প্রাণ ফিরে পান তারপর। পাক সরকারই ভারতে পৌঁছে দিল তাঁকে। স্ত্রীও বেঁচে আছেন খবর পাওয়া গেছে, দেখা পাওয়া যায় নি।

পাকিস্তান তো ঘুরে এলে, পাস-পোর্ট পেলে কোথায়? প্রশ্ন করলেন কমরেড বিশ্বনাথ মুখার্জী।

তিস্তা নদীর পাসপোর্টেই ঘুরে এলাম—এই যাত্রায়। জবাব দিলেন যোগেন রায়। তিস্তা নদীর প্রজা আমরা, কি আর কেউ সেই তিস্তাকে যে শাসন করতে পারে? সবার মনে এক প্রশ্ন।

শিলিগুড়ি অফিসে দেখলাম বিপ-র্যস্ত আরো এক বন্ধুকে। মাথা হেঁট করে বসে বসে ভাবছেন। বাগানে টিউমল কোম্পানীর পাথর ভাঙা শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক তিনি। পরিবারের ছ'জনই ভেসে যায় একসঙ্গে। তিনজনকে নিয়ে আছড়ে ফেলে চার থেকে সাত মাইল দূরে—চিকনিকাটা, রাঙাপানি এবং রাণীডাঙায়। গৌরাঙ্গ দে, শৈলবালা এবং শ্যামলতা জীবিতাবস্থাতেই ফিরে এলেন। অবশিষ্ট তিনজনের কোন খোঁজ নেই। কাঠামবাড়ির বাঁধ ভেঙে ভেসে যাওয়া ৩২ জন ফিরে আসেন তিস্তার চর জলপাই-গুড়ি থেকে। দূরত্বের দিক থেকেও যা পঁচিশ থেকে ত্রিশ মাইলের কম নয়!

তবু আজ অবধি আমরা যা পারি নি, সাময়িকভাবে হলেও তিস্তা তা করে দিয়েছে। তিস্তার উপকূল ধরে পাস-পোর্টের ঝামেলা এখন বন্ধ। পাক পুলিশই যে অধিকতর উদারতা দেখায় কোন সন্দেহ নেই তাতে। 'এ-পার ও-পার যে কোন ক্যাম্পে যেতে পারেন আপনি।' এটা হলো—তাদের ভাষা। খাদ্য খাওয়ার দায়িত্ব পর্যন্ত নিয়েছে। "বোদা" আর "পচাগড়" থেকে শত শত অধিবাসী এসে তাদের প্রিয় জলপাইগুড়িকে দেখে চোখের জলে বিশ বছরের স্মৃতির গঙ্গে তর্পণ করতে ভোলেন নি। এ যেন সব শোকে শোক শোভাযাত্রায় যোগদানের আমন্ত্রণ। কেউ যা চাই নি কোনদিন। তবু কথাটা মনে রাখবার মত।

বামেভাসা টুনটুনি বৈষ্ণব। জল-খোয়ামাটে সরকারী এবং বেসরকারী লোকেরা নিলিপ্ত নিয়ে তখন পারাপারে ব্যস্ত। প্রথমটায় মনে হলো একটা কাক পড়িল। সামান্য দেখা দেওয়ার কাপড়ের সাথে বাঁশ জড়িয়ে টেনে তোলা হয় তাকে। হাত-পা সেঁকে জ্ঞান ফিরলে তাকে শিক্ষামত পাঠিয়ে দেন স্থানীয় অধিবাসীরা। সদর আসাম থেকে ভেসে আসেন ফলিমারীর নেতাজী কলোনীর আর একজন। বেঁচে গিয়ে নিজেই তিনি ফিরে যান নিজ মোকামে। যত ঘর-বাড়ি বিনষ্ট হয়েছে, গাছের আঘাতেই তার মধ্যে সর্বাধিক। সেই গাছ ধরে ধরে কিংবা গাছের সাথে ভেসেই প্রাণ ফিরে পাওয়ার কাহিনী অসংখ্য। এক-তরফা দোষ কিংবা গুণ ধরে বিচার করার যো নেই।

সকল ধ্বংসের মধ্যেই নাকি সৃষ্টির বীজ অন্তর্নিহিত থাকে। উত্তরবঙ্গের বন্যায় তার ... পাওয়া গেল?—পাঁচ আর কাঠ। জলপাইগুড়ির ... পাড়ায় এক-খানা কাঠের দল এসে ঠেকেছে ...

হাত। আগা নেই, মাথাও নেই। একটা বাঁধের মতোই ভীমকায় এই তরুবর যেখানে শয্যা রচনা করেন, তার পেছনে অন্তত ৫০ বিঘা জমিতে পড়ে আছে কেবল কাঠ, কাঠ আর কাঠ। কাঠের পাহাড়।

কিছুসংখ্যক বন্যার্ত কয়েকজন ভদ্রলোককে তাঁদের বাড়ির আশপাশে ঘুরতে দেখে প্রশ্ন করেন—রিলিফ আছে বাবু?—আমরা বন বিভাগের লোক। গাছের নম্বর মেরে সীল দিতে এসেছি। জবাব দিলেন তাঁরা। হে ভগবান গাছ বানিয়ে জন্ম দিলেও এতক্ষণে খবর হয়ে যেত। নিশ্বাস ফেলে বললেন বানভাসাদের একজন। তখন পর্যন্ত কোন রিলিফ পান নি তাঁরা।

শ্রীরামপুর হয়ে লাইন পর্যবেক্ষণ করতে চলল এন-এফ রেলের পাইলট ইঞ্জিন জোড়াই অভিমুখে। ভাঙা কালভার্টেই তার সমাধিলাভ ঘটে। সমাহিত হন ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে। জল এখন নেমে গেছে। যে নদী ছিল ঘরের কাছে, আজ তা এক মাইল দূরে সরে গেছে। অধিবাসীদের জন্য রেখে গেছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্ত। কত হাত গভীর তা কে জানে? তার সাথে পলি। কুল এবং কলাগাছের মাথাটা কেবল জেগে আছে। আর সবই পলির তলে অতল। বন্ধ ঘরের দরজা এখন খুলতে পারা যায় না পলি নয়ত কাঠের জন্য।

জীবনে অনেক লাইন দেখেছি এ পর্যন্ত। কিন্তু বন্যার পর তুফানগঞ্জ হাটে সেদিন যে লাইন দেখলাম তা অকল্পনীয়। তপন মার্সারী ছোট্ট একটা বীজের দোকান। কিন্তু কিউ যা পড়েছে কল্পনাতীত। "তিনটার বেশি লাউ বীচি কেউ পাবেন না" দোকানদারের এক কথা। "একজনই সব নিয়ে নিলে অন্যরা নেবে কি" লাইনের লোক সমর্থন জানায় তাকে। গম হোক, কলাই হোক, কিছু একটা দিন অন্তত। আমাদের যে সবই গেছে। কিছু বীজ ফেলাতে পারলে ভবিষ্যতের জন্য দেখে নিতাম। সম্পূর্ণ অপরিচিত কান্না। কিন্তু বীজ নেই। এর পর যদি আসেও পলি শুকিয়ে পাউডার হয়ে যাবে ততদিনে।

গংগাধরের জলে ভাসতে ভাসতে পলিনস্থ এসে ঠেকে যায় কে একজন প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় গলা বসে গেছে। হাত নেড়েই যথাসাধ্য সাহায্যের জন্য আবেদন জানাতে থাকে। কিন্তু কার সাধ্য প্রশস্ত পলির চর এগিয়ে যেতে পারবে? দেখতে দেখতেই ডুবতে থাকে বেচারা। মাথা অবধি তলিয়ে গেল পলির মধ্যে। হাতখানা তখনও বাইরে। চারদিকে লোকের ভিড় এই দেখবার জন্য। কেবল একখানা হাত। কাঁজিতে বাঁধা তার ঘড়িটা তখনও চলেছিল কি না কে বলতে পারে?

আর আছে মাছ। জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনেই আধমরা এমন অনেক মাছ পাওয়া গেছে যার ওজন পাঁচ থেকে দশ কে-জি! রিলিফের কর্মীরাও অনেকেই পলির মধ্যে নাকমুখ গুঁজে বড় বড় মাছ পড়ে থাকতে দেখেছেন। যেমন ঘোলা তেমন ঠাণ্ডা জল, মাছের বেঁচে থাকার পক্ষেও দুষ্কর। মানুষ সেখানে কোন্ ছার? তবু কাঠ সঞ্চয়ের মতো মাছ শুকিয়ে রাখতেও কার্পণ্য করে নি অনেকে। তাদের ভয় কলেরার অজুহাতে কে এসে কবে ঐ শুকনো মাছ আবার নিয়ে না যায়।

জলপাইগুড়ি ছেড়ে শিলিগুড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন ভাগ্যাহত মা আর এক ছেলে। ছেলের বয়স পাঁচ-সাত বছর। খাবার সাথে এক গ্লাস জল দেখেই ছেলেটি সমানে চিৎকার জুড়ে দিল—জল-জল! সমস্ত শরীর তার কাঁপছে। লোকজন এসে ধরে ফেলল তাকে। আর এক মহিলাকে দেখলাম চোখ বুজলেই যিনি পিঠের নিচে করলা নদীর জল কিলবিল করার আঁৎকে ওঠেন। ঘুম নেই আজও চোখে।

আলিপুরদুয়ারের এস· ডি ও'র আপশোষ বারংবার চেয়েও মিলিটারীর কোন সাহায্য তিনি পান নি। তুফানগঞ্জে বন্যার তৃতীয় দিনে সর্বপ্রথম মিলিটারী ট্রাক চেপে এল একটা বোট। জলে ভাসাতে গিয়ে দেখা গেল গংগাধরের জলে অকেজো। উজানে চলাতে পারে না। ফিরে গিয়ে হাসিমারা থেকে আবার এল একটা। এস· ডি· ও থেকে রিলিফ কর্মীরা তার যাত্রী হলে হবে কি? মোটরই স্টার্ট নিল না। কংগ্রেসকর্মী সিরাজ মিঞা বললেন 'যত সব পচা মিলিটারী।' এস· ডি· ও মহা বিপদে পড়েন মনে মনে। তৃতীয়খানা যখন এল—জল তার আগেই নেমে গেছে তার কার্য সমাধা করে। রেখে গেছে শুধু পলি আর বালুচর। বোট ছেড়ে একটা ড্রেজারের প্রয়োজন তখন।

কোচবিহারের ফেরসানাড়িতে পাওয়া গেছে বানের জলে ভেসে আসা এক মহা বিস্ফোরক পদার্থ। ডেপুটি কমিশনার শ্রীভাস্কর ঘোষ না দেখতেই আঁৎকে ওঠেন। এ যে দেখছি মাইন! এসিস্ট্যান্ট কমাণ্ডার পি· এস· এম বললেন হ্যাণ্ড গ্রানেড বলেই আমার বিশ্বাস। ফাটবে না তো! এস· ডি· ও তুফানগঞ্জ বললেন ডিনামাইট হোক আর যাই হোক আগুনের কনটাক্টে না এলে বিস্ফোরণ ঘটবে না। দোকানের কৌটাস মুক্তি বন্ধ করে দিলেন তিনি। কি দিন কি হয়েছে! এমন একটা মোক্ষম বস্তু হাতে কেউ চেয়ে দেখল না? উত্তরবঙ্গের বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ঠিক সময়মতই এমন ভুবনে ডুবিয়েছে, যে দুঃখ বললে সারে না।

নামাপাড়ায় এক বৃদ্ধের ধান-চাল থেকে ছাগল, ভেড়া সব গেছে বন্যায়। খাওয়া নেই বেশ কয়েকদিনের কথা। রিলিফ কর্মীর পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন তিনি। অনেকেরই চোখে জল এসে যায় তাতে। বৃদ্ধের জন্য কিছু একটা না করলেই নয়।

একটা বিড়ি দিবেন বাবু? বললেন বৃদ্ধ। ভলান্টিয়ারদের মুখ হাঁ হয়ে গেল তাতে। সব স্মৃতি মুছে গিয়ে কেবল নেশাটাই তখনও জেগে আছে তার মনে। জলপাইগুড়ির সাথে শিলিগুড়ির বেশ একটা 'কোল্ড ওয়ার' চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। শিলিগুড়ির প্রাণখোলা সামগ্রিক রিলিফে তা ধুয়ে গেছে বলেই বিশ্বাস। সরকার যেমন ভেসে গিয়েছিল, শিলিগুড়ি ছাড়াও আলিপুরদুয়ার, বীরপাড়া, ময়নাগুড়ি, কোচবিহার, দিনহাটা, তুফানগঞ্জ থেকে ভেটাগুড়ির সর্বশ্রেণীর নরনারীকে রিলিফের জন্য এমনি করে জেগে উঠতে আর কোনদিন দেখা যায় নি। সমগ্র উত্তরবঙ্গব্যাপী এক মহাজাগরণেরই একে সূত্রপাত আখ্যা দেওয়া চলে। এ শুধু দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি কিংবা কোচবিহারকেই রিলিফ দেওয়া মনে করাটা মূর্খামি। মালদহ এবং দিনাজপুরের ভাগ্য একই সূত্রে গ্রথিত। ফলে একটিমাত্র প্রশ্নই আজ দেশের সামনে উপস্থিত। পরিত্যক্ত উত্তরবঙ্গ দ্বিতীয় দণ্ডকারণ্যে পরিণত হবে, না শান্ত নিরাপত্তা ফিরে পেয়ে নতুন করে গড়ে উঠবে। উত্তরবঙ্গের অংশবিশেষ ইতিমধ্যেই জনমনে শঙ্কা এবং অনাস্থার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। সমগ্র পশ্চিমবাংলা তো বটেই, গোটা দেশের অর্থনীতি এবং রাজনীতি তার সাথে যুক্ত। সামান্য রিলিফ অর্থাৎ 'দয়ার দান' কিংবা চালাকির দ্বারা এ সমস্যার সমাধান দূরের কথা, ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারা যাবে না।

ব্যাঙ্কের চেক, পাশবই, উকিলের নথি দোকানীর হিসাব অফিস আদালতের যাবতীয় রেকর্ড এবং ঘরবাড়ি জমিজমার দলিলপত্র উধাও হয়ে যাওয়াটা সাধারণ কথা নয়। কেবলমাত্র রেশন কার্ড বিলি করতে গিয়েই আজ তার নমুনা উপলব্ধি করা যাবে। আমলাতান্ত্রিক অপদার্থতার যে পথ শেষ এই সর্বনাশের বোঝা ভারী হয়েছে, একই পথে তার কোন সমাধান নেই। বিকল্প পথ জনগণের সর্বাঙ্গীণ উদ্যোগ এবং আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া তা প্রশমনের আর সুদূরপরাহত।

পুজোর ঠিক পরে জল, ধস আর বন্যার যে অতর্কিত আক্রমণ উত্তরবঙ্গের সমতলে আর দার্জিলিং, সিকিমের পাহাড়ের ওপর হল তার নজীর এদেশে কেন সমস্ত পৃথিবীতে বোধ হয় আধুনিককালে খুব কমই আছে। অক্টোবর চারের রাত বহুদিন তাদের মনে বিভীষিকা হয়ে থাকবে যারা মৃত্যুর নিশ্চিত হাত থেকে বেঁচে গেল। তাই দার্জিলিং-এর সিংমারী বস্তির বৃদ্ধ রতনলালের ১৯০৩-এর প্রলয়ের স্মৃতিও চাপা পড়ে গেল এই ১৯৬৮-র ধসে, দার্জিলিং পাহাড়ের ইতিহাসে যার [illegible] মত চিরকাল লেখা থাকবে।

অবশ্য দার্জিলিং ও তার আশেপাশের পাহাড়ী অঞ্চলে যা ঘটে গেল তাতে [illegible] আমরা হতবাক এবং প্রকৃতির কাছে নিঃশর্তভাবে পরাজিত। কিন্তু ধস এই পাহাড়ের মানুষদের গত কয়েক বছর ধরে অনেকবারই মারাত্মক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করেছে। এর মধ্যে ১৯৩৪, ১৯৫০ এবং ১৯৫৮-র ধস বহু জীবন ছিনিয়ে নিয়েছে। আর তাছাড়া প্রত্যেক বর্ষায় ছোটখাটো ধসে কিছু বাড়ি বসে যাওয়া বা ভেঙে পড়ার খবর তো পাওয়াই যায়। সুতরাং ধস এবং তার ধ্বংসলীলার সঙ্গে পাহাড়ী মানুষের সম্পর্ক খুব নিবিড় বড় করুণ আত্মীয়তা। তাই না দেখি [illegible] আর আত্মবিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে মৃত্যুর নাগাল [illegible] এসেছে তারা [illegible] কাজে পুরোদমে লেগে পড়ছে। সর্বস্বান্ত হয়ে যে এখন আকাশের নিচে একা সে কি কালের ফাঁদে নিজে একবারও প্রকৃতিকে [illegible] দোষী করবে না? ভাবে না ঐ নিরীহ পাহাড়টার ঢাল বেয়ে পাথরের বন্যা কেন নেমে এলো? সবকিছু ভেঙে বস্তির একটা অংশ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে এখন ঐ অন্ধকার উপত্যকায় স্থির হয়ে আছে।

প্রকৃতির বিচিত্র লীলা এই অঞ্চলে শুরু হয়েছে হিমালয় পাহাড়ের জন্মের শুরু থেকে। হিমালয় পাহাড়ের রাজ্যে খুবই নবীন। গভীর সমুদ্র থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুলে নগাধিরাজ হিমালয় আজকের উচ্চতায় এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে পলি থেকে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ধরণের পাথর। দার্জিলিং ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে দাঁড়িয়ে আছে এমন কতকগুলো পাথরের ওপর যেগুলোতে এত ভাঁজ এবং চ্যুতি রয়েছে যে পাথরের সামগ্রিক বিন্যাসে বেশ কিছুটা অসংলগ্নতা রয়েছে। এই জন্যেই ভূত্বকে ছোটখাটো নাড়াচাড়া হলে এই পাথরের সমষ্টিতে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয় আর ধ্বংসের সীমা-পরিসীমা থাকে না।

দার্জিলিং পাহাড়ের বিরাট বিস্তৃতি ছোট-বড় অনেক নদী-নালায় সমাকীর্ণ। এইসব জলধারা পাহাড় কেটে কেটে গভীর খাদের সৃষ্টি করেছে যার ফলে কতকগুলো উঁচু পাহাড়ের শিরদাঁড়ার দু'পাশে নদী পর্যন্ত নেমে গেছে পাহাড়ের ঢাল। যদিও এই পাহাড়ী শিরদাঁড়াই হচ্ছে ঘর-বাড়ি বানাবার উপযুক্ত স্থান, কেন না ধসের সম্ভাবনা সেখানে খুবই কম, কিন্তু একটি শৈলশহর যখন বিস্তৃত হতে থাকে তখন পাহাড়ের ঢাল বেয়েই তার বসতি নিচে নেমে যায়। পাহাড়ের এই ঢালই হচ্ছে বর্ষায় সম্ভাব্য ধসের অঞ্চল। তার ওপর এই ঢাল যদি খুব বেশি খাড়াই থাকে তাহলে যত শক্ত পাথর দিয়েই পাহাড় তৈরি হোক না কেন যে-কোন দিন পাথরের চাঁই অথবা মাটির স্তূপ ঢাল বেয়ে ধসে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

পাহাড়ী ঢালের প্রকৃতি ছাড়াও পাথরের বিন্যাস ও সংমিশ্রণের ওপর ধসের সম্ভাবনা নির্ভর করে। হিলকার্ট রোড দিয়ে দার্জিলিং যাবার সময় সুকনা ছাড়ালেই যে পাথর রাস্তার দু'পাশে চোখে

[illegible] শ্রেণীর)। এই পাথর চুনাভাটি পর্যন্ত দেখা যায়, তারপর আসে কয়লা মেশানো আর একটি নরম পাথরের শ্রেণী (গণ্ডোয়ানা শ্রেণী) যার মধ্যে বালিপাথর, 'শেল' ইত্যাদি অন্যতম। কিন্তু তিনধরিয়ার পর থেকে গয়াবাড়ি পর্যন্ত যে পাথর দেখা যায় তা হচ্ছে পরিবর্তিত শিলা—অথচ অত্যন্ত নরম এবং ধসে যাবার পক্ষে উপযুক্ত। এই পাথরগুলো মূলত হচ্ছে 'ফিলাইট' (ডালিং শ্রেণীর)। গয়াবাড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত শক্ত 'নাইস' পাথর পাওয়া যায়। সুতরাং এই পাথর বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে এটা অনুমান করা যায় যে সুকনা থেকে গয়াবাড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে ধসের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি হবে কেন না এখানকার পাথরগুলো নরম এবং জলে সংপৃক্ত হবার উপযুক্ত। তবে দার্জিলিং-এর কাছাকাছি যেসব ধস নামে তা হয় মাটির ধস না হয় চাঁই চাঁই শক্ত পাথরের ধস। এই সমস্ত পাথর কিন্তু কোথাও নিরেট নয়, এদের মধ্যে অগণিত ফাটল রয়েছে। বৃষ্টির পর যদিও কিছু জল ঢাল বেয়ে নিচে নামে, কিছুটা পরিমাণ ফাটল দিয়ে পাথরের মধ্যে ঢুকে যায়। আর বৃষ্টির পরিমাণ অল্প সময়ের মধ্যে খুব বেশি হলে, এবার যেমন হল, পাথরের ভেতরে ঢুকে যাওয়া জলের পরিমাণ বিপজ্জনকভাবে বেড়ে যায়। তখন জলের চাপে ভাঙাচোরা পাথর আরও শিথিল হয়ে যায় এবং একসময় জলের তোড়ে অসংলগ্ন পাথরের চাঁই পাহাড়ের ঢাল দিয়ে গড়িয়ে পড়ে। যেখানে শক্ত পাথরের ভাঁজে ভাঁজে নরম শৈলজাতীয় পাথর থাকে, জলের সংস্পর্শে এসে সেই পাথর কাদার মত নরম ও তরল হয়ে যায়। এই কাদার স্তরের ওপর যে শক্ত পাথরের চাঁই থাকে সেগুলো তখন আর পাহাড় কামড়ে থাকতে পারে না, মাধ্যাকর্ষণের টানে নিচে ধসে যায়। বৃষ্টির জলের যে অংশটুকু পাহাড়ের ঢাল দিয়ে নিচে বয়ে যায় তা-ও কিন্তু অনেক সময় ধসের সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করতে পারে। প্রতি বর্ষায়ই জলে ধুয়ে মাটি ক্ষয়ে যায়, ঢাল অত্যন্ত খাড়া হয়। তারপর যখন হঠাৎ প্রবল বৃষ্টি নামে তখন যেটুকু বাধা পাথর আর মাটিতে পাহাড়ের গায়ে ধরে রাখে তা সরে যেতে দেরি হয় না। তখন প্রলয় আর কতদূর?

দুরন্ত চড়াই-উতরাই-এর জন্যে পাহাড়ের গায়ে মাটিতে কোন-না-কোন সময় ছোট-খাটো ধরণের ধস হয়েই চলেছে। কখনো তা নজরে পড়ে, কখনো পড়ে না। সাধারণত মাটিতে সামান্য পরিমাণ জল থাকলে এবং ঢালের খাড়াই উপযুক্ত হলে ধীরগতিতে সকলের অগোচরে পাহাড়ের কিছুটা অংশ উপত্যকার দিকে নামে। এর প্রমাণ যে-কোন শৈলসহরে পাওয়া যায়। লাইট পোস্ট, টেলিগ্রাফ পোস্ট ইত্যাদি

বাগডোগরা বিমানবন্দরের কাছে বালাসোন নদীর ওপরের এই সেতুটি ৫ই অক্টোবর শেষ রাত্রে ভেঙে পড়ে এবং কলকাতায় আসার পথে ভারত প্লাম ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরীর একটি এ্যাম্বাসাডার গাড়ির সমস্ত আরোহী নিহত হয়।

ফটো : শম্ভু ব্যানার্জী

জলপাইগুড়ির বন্যার ধ্বংসলীলার একটি চিত্র

ফটো : শম্ভু ব্যানার্জী

অনেক সময়ই একদিকে কিছুটা হেলে পড়তে দেখা যায়, যদিও আশে-পাশে কোনরকম বড় ধরণের ধসের হদিস পাওয়া যায় না। তবে কোন কারণে মাটির খাঁজে জল জমে গেলে এবং তা যদি প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম উপায়ে নিকাশের সুযোগ না পায় তাহলে সেই মাটি অবিরাম বৃষ্টিতে ভিজে অচিরেই তরল লাভার মত পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসে। তারপর ছোট ছোট নালার পথ ধরে যতই উপত্যকার নিকটবর্তী হয় ততই দু পাশে ছড়িয়ে পড়ে এবং জনপদ ভাসিয়ে দেয়, রেল লাইন, রাস্তা নিশ্চিহ্ন করে দেয়। মিরিকে আর হিলকার্ট রোড ধরে যে বিপর্যয় হল তা অনেকটাই এই ধরণের ধসের জন্য। এই দু' ধরণের ধসের তুলনায় তৃতীয়টি অর্থাৎ যেখানে অপেক্ষাকৃত শুকনো মাটি অথবা পাথর এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে দুটিই একসঙ্গে প্রচণ্ড বেগে বিরাট আয়তনে পাহাড়ের কোল থেকে খসে পড়ে, ঘনবসতির শৈলশহর এবং গ্রামের পক্ষে তা আরও মারাত্মক। এর ফলে এক নিমেষে একটি বিরাট এলাকা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই রকম ধস যদি কোন বড় নদীর বুকে নেমে আসে তাহলে বিপর্যয় যা ঘটে তা কল্পনার অতীত। কেন না তখন নদীর গতিপথ সাময়িকভাবে আটকে যায় এবং পরে প্রবল বৃষ্টিতে জলের চাপে সেই বাঁধের মুখ খুলে গেলে উত্তাল জলরাশি খুব অল্প সময়ে নদীর অববাহিকায় প্লাবন নিয়ে আসে। অক্টোবরের প্রলয়ে তিস্তা নদীর জল তিস্তা বাজারের কাছে ৫০ থেকে ৬০ ফিট উঠেছিল, বাড়িঘর এমন কি সুদৃঢ় এ্যান্ডারসন ব্রীজটি ভাসিয়ে নিয়ে গেল। তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে ছাড়া পাওয়া জলরাশি জলপাইগুড়িকে অতর্কিতে ডুবিয়ে দিল।

এই ধরণের ধসের নজীর ভারতেও আছে। ১৯৫০-এ তিস্তায়ই এইভাবে একবার বন্যা এসেছিল। আসাম লিংক রেলপথও অনেক দিক ভেঙ্গে গিয়েছিল। তবে সেবার জলপাইগুড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি, হয়েছিল দোমহানী এবং তার নিকটবর্তী অঞ্চল। বিরহী গঙ্গার উপত্যকার গোহনাতে ১৮৯৪-র ২৫শে আগস্ট একটি অতিকায় ধসের ফলে নদীর জল ১৪০ ফিট উঠে গিয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল সর্বনাশা বন্যা। তবে এই প্রাকৃতিক খামখেয়ালীর জন্যে আগে থেকেই সতর্ক থাকার ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেশি হয় নি। কিন্তু ইতালীর পিয়াভ নদীতে ১৯৬৩-র ৯ই অক্টোবর একটি বিরাট ধস নামার ফলে ভিয়ন্ত বাঁধ ভেঙে এমন বন্যা হয়েছিল যে সাম্প্রতিককালে তার নজির আর আছে কিনা সন্দেহ। এই প্রলয়ে তিন হাজারের মত জীবন নষ্ট হয়েছিল। অক্টোবর ১৯৬৮-র উত্তরবঙ্গের বিপর্যয়ই হয়তো শুধু এর সমকক্ষ।

ধসের ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে স্বভাবতই এই প্রশ্নটি মনে আসে। ধস বশে আনা কি সম্ভব নয়? তবে আমরা যখন জানি যে ধসের মূল কারণগুলো নির্ভর করে জলের পরিমাণ, পাথর ও মাটির প্রকৃতি এবং বিন্যাস, এবং পাহাড়ের ঢালের খাড়াই-এর ওপর তখন এগুলো নিয়ন্ত্রণ করলেই ধসের কবল থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া নিশ্চয়ই সম্ভব। কিন্তু এর মধ্যে পাথর ও মাটির প্রকৃতি ও বিন্যাস নিয়ন্ত্রণাধীন নয় কেন না এদের ওপর মানুষের কোন হাত নেই, হাত নেই বৃষ্টির ওপরও। ধসের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে তাই জলের সুষ্ঠু নিকাশ এবং পাহাড়ের ঢালে স্থায়িত্ব আনা প্রয়োজন। সেজন্যে কতকগুলো ব্যবস্থা নেওয়া চলে।

১। বৃষ্টির জল যাতে অতিমাত্রায় পাথরের খাঁজে ঢুকে না পড়ে সেজন্যে উপযুক্ত পয়ঃপ্রণালী থাকা দরকার। অতিবৃষ্টির অ-দরকারী ও বিপজ্জনক জলের অংশ লোকালয় থেকে দূরে সরিয়ে ফেলতে হবে।

২। এই সতর্কতা নেওয়া সত্ত্বেও কিছু জল পাথরে এবং মাটির ভেতরে ঢুকবেই। এই জলই যেহেতু পরে ধসের কারণ হতে পারে ছোট ছোট সুড়ঙ্গের মত গর্ত খুঁড়ে সেই জল যতটা সম্ভব বের করে দিতে হবে।

৩। ঢালের স্থায়িত্ব বজায় রাখতে বিভিন্ন জায়গায় কংক্রিটের বাঁধ দিতে হবে।

৪। মাটির ক্ষয় রোধ এবং মাটি সংরক্ষণের উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন করে মন্থরগতি মাটির ধস বন্ধ করতে হবে যাতে এই ধরণের আপাত নিষ্ক্রিয় ধস থেকে পরে বড় রকমের বিপর্যয় না আসে।

৫। গাছের শেকড় মাটি এবং কিছু পরিমাণে পাথর কামড়ে পাহাড়ের গায়ে ধরে রাখে। তাই বন-সংরক্ষণ এবং নতুন বন-সৃষ্টির ব্যাপক পরিকল্পনা দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করতে হবে।

এই হল ধস রোধ করার কতকগুলো দরকারী ব্যবস্থা। তবে ধসের ধ্বংসে জীবননাশের পরিমাণ কমাতে হলে কিছু সতর্কীকরণ ব্যবস্থাও নিতে হবে। ধস হতে পারে এমন জায়গায় এবং ঘনবসতির অঞ্চলে কংক্রিটের স্তম্ভ বসাতে হবে এবং সেগুলো সময় সময় পরীক্ষা করে দেখতে হবে, বিশেষ করে বর্ষায়। যদি দেখা যায় কোন অংশের স্তম্ভ ঢালের দিকে হেলে পড়েছে তাহলে বুঝতে হবে যে মাটির সঞ্চলন সকলের চোখের আড়ালে শুরু হয়ে গেছে। এই অবস্থায় ভাল করে মাটি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে পাহাড়ের ঢালে ছোট ছোট চন্দ্রাকৃতি ফাটল দেখা দিয়েছে। বৃষ্টির জল সেখান দিয়ে মাটির ভেতরে ঢুকছে। তখনই নিকটবর্তী লোকালয়কে সতর্ক করে দিতে হবে ধস এলো বলে সাবধান!

নতুন রাস্তা বানানো, জনপদের জন্যে ঘর-বাড়ি তৈরি অথবা কোন প্রকল্পের জন্যে স্থান ঠিক করার সময় পাহাড়ের ঢালের প্রকৃতি এবং সেখানকার পাথরের বিন্যাসের ব্যাপক জরীপ প্রয়োজন। সাধারণত যেসব [illegible] পাথরের স্তর ঢালের দিকেই ঝুঁকে থাকে সেসব জায়গা ধসের জন্যে [illegible] এই মূল তত্ত্বটি সব সময় মনে রাখতে হবে। কিন্তু পাহাড়ে লম্বা রাস্তা ঘাট তৈরির [illegible] বিভিন্ন ধরণের এবং বিভিন্ন বিন্যাসের পাথরের ওপর দিয়ে [illegible] সব সময় এই নিয়ম মেনে চলা সম্ভব হয় না। [illegible] বর্ষায় পাহাড়ী রাস্তা প্রায়ই ধসের জন্যে বন্ধ থাকে।

একদিন ছিল যেদিন মানুষ অসহায়ভাবে প্রকৃতির খামখেয়ালীপনা দেখত, সহ্য করত। কিন্তু এখন সেদিন আর নেই। প্রকৃতিকে যদিও সম্পূর্ণ বশে আনা অসাধ্য তবু বিজ্ঞানের যে শক্তি অতর্কিতে [illegible] জীবন কেড়ে নেয় তার হাত থেকে [illegible] চেষ্টা করার মত কৌশল জানা আছে। এই উপযুক্ত ব্যবস্থার সঙ্গে ধস রোধ করার ব্যাপক পরিকল্পনা [illegible] এবং [illegible] জনপদে এবং [illegible] জায়গায় ধসের পূর্বাভাস পাবার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একমাত্র তখনই পাহাড়ের মানুষ গভীর কোন রাতে, ঘুমের ঘোরে আচমকা এক অদৃশ্য টানে নিচে তলিয়ে গিয়ে হারিয়ে যাবার আতঙ্ক থেকে কিছুটা মুক্তি পাবে। তার আগে নয়।

ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাকে আসতে দেখার অবসর কারও থাকে না। সে নির্বিবাদে ঢুকে পড়তে পারে খুকীর ঘরে। অন্য সময় এলে ওদের কারও চোখে ধরা পড়লে বিপদ বাড়তে পারে। শুধু তো খুকীর স্বামীর হাতে ধরা পড়া নয়, লজ্জারও কথা বৈকি। বাবা যে তার কাছে এসে হাত পেতে দু'-পাঁচটা টাকা প্রায়ই নিয়ে যায় এ লজ্জা ঢাকবে কেমন করে। সন্দেহ কি ঝগড়া-বিবাদ হলে খুকী হয়ত বাপের বাড়ির সুখের নাম করে কাঁদে। বেচারার সে আশ্রয়টুকুও যে খোয়া যাবে। মনে হতে পারে পাশের বাড়ির লোক চিনবে কেমন করে? কেমন করেই বা জানবে সে হাত পাততে আসে! না ওই খুকীই ওদের চিনিয়ে দিয়েছে এই তার বাবা! দরজায় দাঁড়িয়ে বাবা বাবা বলে কত কথাই না সে প্রথম প্রথম বলত বাবার মুখে। আর সে কথার মধ্যে বোকা মেয়েটা বলতেও বাকী রাখে নি বাবার তার চাকরি গিয়েছে, বাবা এখন বেকার! সুতরাং পাশের বাড়ির জানালা অথবা দরজায় মুখ সেই বাপকে প্রায়ই যদি ঘোরাফেরা করতে দেখে তবে সন্দেহ না করে যাবে কোথায়। হ্যাঁ সন্দেহ করবে টাকার জন্যেই নির্ঘাত বুড়ো বাপটা জামাইয়ের অনুপস্থিতিতে আসে। সন্দেহ নেই তারপর একদিন জামাইকে সেই জানলা অথবা দরজা সরস করে সব বার্তাটিক শুনিয়ে দেবে। খুকী তাই আগে থাকতেই সতর্ক করে দিয়েছে। বলেছে তুমি যখন সন্ধ্যার মুখে আসবে! কেন আস ওরা জিজ্ঞাসা করছিল। হয়ত ওরা তোমার জামাইয়ের কাছে বলে দেবে। তখন আমার কি হবে বল দেখি! তোমার জামাই সাতটার আগে আসে না। তার মধ্যে তুমি এসো। হ্যাঁ আর কিন্তু আমার হাতে একটাও পয়সা নেই। সেই মাসের গোড়ার দিকে আসার না হয় এস। এত ঘন ঘন কেন তুমি যে আস!

এত ঘন ঘন কেন যে আমি আসি! কেন আসি! সুদাম নিজেকে প্রশ্ন করতে কসুর করে নি। কেমন করে সে বোঝাবে কেন সে আসে! না খুকী তো তাই ভাবে! সুতরাং ও প্রশ্ন মুখে করলেও মনে মনে সে উত্তরটা জানে। তবু কেমন করে সে সে কথা বলে। সম্ভবত বলতে হয় না বলে পারা যায় না। এই যে সে যেমন নিজেকে শত বার বলে, তুমি সুদাম, না এখনও অথর্ব বৃদ্ধ হও নি। কাজ অনায়াসেই করতে পার। এই বয়সে তোমাকে কেউ কাজ দেবে না জানি, কিন্তু তার জন্য ক্ষতি নেই, তুমি অল্প পুঁজিতে ব্যবসা কর। হ্যাঁ খাতা-পেন্সিল কি গামছা বিক্রি কর। তোমাদের দু'টি প্রাণীর অনায়াসে চলে যাবে! কেন মেয়ের কাছে হাত পাততে যাও তুমি?

অথচ কাজের বেলায় সুদাম জানে ও ব্যাপারে সে আদপেই উৎসাহ বোধ করে না।

শেষ বয়সে চাকরি যাওয়ার সঙ্গে যেন সব উৎসাহ নিভে গিয়েছে। সুদাম যেন বুঝে গিয়েছে তার কাজ হল এরপর জীবনটাকে কোনক্রমে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়া! স্ত্রীর ভাঙা স্বাস্থ্য। তাতে বেশি-দিন টিকতে দেবে না, সে জানে। ওষুধ-পত্র না দিলেই নয়, তাই দেওয়া হয়। যে কটা দিন বাতাস টানতে পারবে সে কটা দিন ও কাজ না করলে নিজের কাছেই অপরাধী হতে হবে। সুতরাং সে কর্তব্য সে করে। ভাবনাটা নিজের সম্পর্কে। অথচ চাকরিটা যে বিরাট কিছু ছিল তা নয়। কারখানার কাজ। বাঙালীর ছোট কারখানা। নো ওয়ার্ক নো পে। কাজ না হলেই পয়সার মুখ দেখা যেত না। রবিবারের দামও সে পেত না। এ চাকরিটায় অবশ্য দীর্ঘকাল সে পড়েছিল না। বহু কারখানায় সে ঘুরেছে। না কোথাও সুখ বা স্বস্তি বা বিশেষ অর্থ জোটে নি। বড় জায়গায় সেই যে কোন যুবা বয়সে সে ইন্টারভিউতে হেরে গিয়েছিল—তারপর ও সব দিকে আর পা মাড়ায় নি।

ছোটখাট এক কারখানা থেকে আর এক কারখানায় জুটিয়েছে চাকরি। এ চাকরিটায় অবশ্য সে ছাঁটাই হয় নি। কারখানাই বন্ধ। কাজ নেই। সুতরাং পথ দেখ। ইতিমধ্যে অন্যত্র সে চেষ্টা করেছে। কিন্তু সব জায়গাতেই এক নৈরাশ্য। তারপর হাত পাতার মত এক জায়গা। এই মেয়ের কাছে। তার খুকুর কাছে আসতে হয়েছে। প্রথমে সঙ্কোচ যে লাগে নি লজ্জা যে করে নি, তা নয়। গলা কেঁপেছে, কথা আটকে গিয়েছে, নিজের মেয়ের কাছে চাইতে হচ্ছে, পরের কাছে নয় ভেবে সাহস সঞ্চার এবং দুর্বলতা পরিহার করতে হয়েছে অনেক কষ্টে। প্রথম প্রথম ধার নিচ্ছি শোধ করে দেব ইত্যাদি কথা মুখ দিয়ে বেরুত। এখন আর বের হয় না। এখন খুকী 'নেই বাবা' বললেও সে বলে, তোর মায়ের মুকুলি কি না খুকী এমন অবস্থা এখন। অথচ দেখ এ সময়েই আমার চাকরিটা

সুদাম জানে এ সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলা দরকার। চাউনিটাও করুণ করা দরকার। তা সে করেও। মোটকথা সুদাম এখন খুকীর কাছে করুণা এবং দয়া ভিক্ষায় সম্পূর্ণরূপেই অভ্যস্ত। আপনা থেকেই যে কেমন করে বিরক্ত আহত খুকীর সামনে দাঁড়ায়, কথা বলে তা নিজেও ভেবে পায় না!

শীতের বাতাস যেন সব. গলিটা একেবারে কুঁকড়ে গিয়েছে। কেমন যেন নিবুনিবু ল্যাম্পপোস্টের আলোগুলো পর্যন্ত আশ্চর্যরকমের শীতকাতরতা জড়িয়ে ধরেছে। জানালা-দরজা সব বন্ধ। অন্ধকার ছিটে-ফোঁটা করে সম্ভবত সে কারণেই ছড়ান মনে হচ্ছে। নইলে জানালা-দরজাগুলো আলোর সঙ্গে ল্যাম্পপোস্টের আলো মিশ খেয়ে বেশই উজ্জ্বল করে রাখে গলিটাকে। ডাস্টবিনের ময়লার পাশে কুঁকড়ে শুয়ে থাকা পথের কুকুর পর্যন্ত দেখা যায়। শীতের বাতাস অবশ্য কুকুরকেও পথে থাকতে দেয় নি, সুদাম ডাস্টবিনের পাশে একতাল অন্ধকারের দিকে চেয়ে ভেবে নিতে পারছিল। ভাবতে গিয়ে কাঁটার মত একটা যন্ত্রণা পায়ের তলায় লাগছিল। সুদাম মনে করতে পারছিল না জুতোটার একটা পেরেক উঠে পড়ে গিয়েছে কি না। ঘর থেকে বের হবার সময় তো সে টের পায় নি। হাঁটতে হাঁটতে কি তাহলে পেরেকটা উঁচু হল।

সুদাম বাড়ি চেনে। বাড়ির নং কি দরজার নাম্বারের প্লেট তার দেখার দরকার নেই। সে চোখ বুজে কড়ায় অনায়াসে হাত লাগাতে পারে। নাড়া দিতে পারে। এখন কড়ায় হাত দিয়ে সে শুধু ভাবছিল এক সপ্তাহের মধ্যে এই দু'বার আসা খুকী কেমন করে নেবে'

'বাবা আপনি!'

সুদাম সমরের কণ্ঠস্বর এবং খোলা দরজা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে আসা এক-ঝলক আলোর মুখে পড়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। চোখ যেন ধাঁধিয়ে গেল। মনে হল সে এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্যভাবে দরজাটা খুলে গেল, সে খুব হালকা হাতেও কড়াটা নাড়ে নি পর্যন্ত। মূর্তির মত সে স্থির হয়ে শীতের বাতাস সত্ত্বেও কানের দু'পাশে দু'টি জ্বলন্ত কাঁচা কয়লার অস্তিত্ব অনুভব করতে থাকল।

'ভেতরে আসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন!' জামাই, সুদামের কন্যা খুকীর স্বামী সমর ভেতরের দিকে মুহূর্তের জন্যে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'শুনছ, বাবা এসেছেন!'

সুদাম ম্লান হাসল। পা পা করে ঘরে ঢুকল। কে জানত সমর এখন বাড়িতে আছে! সে মাথার ভেতর একটা চাপ চাপ যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকল। মুখ দিয়ে কথা বের হল না। বোধ করি পায়ের তলায় যে কাঁটাটা লাগছিল খচ্-খচ্ করে তা এখন যেন বিঁধে গিয়েছে।

'কেমন আছেন বাবা?' হাসিমুখে সমর জিজ্ঞাসা করল।

'ভাল।' সুদাম স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বলল, 'তোমরা ভাল আছ তো?'

'ভাল আছি।' জামাই খোলা দরজা দিয়ে উঁকি মারল।

সদামার বুকের মধ্যে ভীষণ একটা জাম হওয়া টের পেতে থাকল। এ ঘর তার চেনা। আসবাবপত্র, বিছানা, র‍্যাক, বার থেকে দেওয়ালের রঙ, দরজা জানালার অবস্থানস্থল সবই বহুবার দেখা। পাশাপাশি দুখানি ঘর, ছোট্ট একটা রান্নাঘর নিয়ে খুকীর সংসার। সে এও জানে এর জন্যে ভাড়া গুণতে হয় সত্তর টাকা। খুকীই সে কথা শুনিয়েছে একদিন। তাদের স্বামী-স্ত্রীর সংসার ছোট সংসার হলেও যে মাসান্তে বেশ মোটা রকমের টাকা গুণতে হয় তা খুকী জানিয়ে বোধকরি বোঝাতে চেয়েছে আমাদের পক্ষে সাহায্য করা অসম্ভব। মা সুদাম তা বোঝে নি। বরঞ্চ গর্বিত হয়েছে। মেয়ে-জামাইয়ের সচ্ছল সংসার বুকের ভেতর আনন্দের হিল্লোল বইয়ে দিয়েছে। অবশ্য সময়ের হাতে মেয়ে দেওয়ার পর থেকেই সে গর্বিত। অমন জামাই ক'জনের ভাগ্যে জোটে! বি-এ পাশ, সুন্দর স্বাস্থ্য, গায়ের রঙ অবশ্য কালো। কিন্তু তাহলেও মুখে চোখে সৌষ্ঠব আছে, পুরুষালি চেহারা আছে। সব চেয়ে বড় কথা ভাল চাকরি করে জামাই। মা সুদাম জানে এ ভাগ্য তার এনেছে মেয়ের রূপ। নিজের মেয়ে বলে নয় খুকী যে সত্যিই সুন্দরী তাতে আর সন্দেহ কি!

'খুকী কোথায়?' সুদাম দু'জনের মধ্যেকার নীরবতা ভাঙল। বেশ সহজ করল তার কণ্ঠস্বর। যদিও বুকের দপদপানির মধ্যে সে শুধু ভাবছে এ ব্যাপারটাকে খুকী কেমন করে নেবে! কেমন চোখে তার দিকে তাকাবে! কি ভাববে! আজকাল বড় রাগ করে খুকী! ভাবতেও কেমন যেন হয় যে খুকী তার ওপর রাগ করে! অথচ সেই ছোট, ঝাঁকড়া-চুলে মাথা বুকে ঠেকিয়ে মুখটা তার লোমশ বুকে গুঁজে ছোট্ট খুকী কতবারই না বলত, 'বাবা গো, আমি তোমার কাছে থাকব। শ্বশুরবাড়ি ছাই! ছাই! আমি যাব না।'

সুদাম হাসত। কত কথাই না সেই ছোট্ট মেয়েকে বুকে নিয়ে বলত। তার ভারি সুন্দর শ্বশুরবাড়ি হবে, রাজপুত্রের মত বর হবে, বিয়ের সভায় হাতী নাচবে, ঘোড়া নাচবে, ঝুমঝুমাঝুম বাজনা বাজবে। কিন্তু কোন কিছুই মেয়েকে আকর্ষণ করত না। বাবাই তখন তার চোখের সামনে সমগ্র জগৎ। যার বাইরে আর কিছু নেই। এখন সুদাম বেশ বুঝতে পারে খুকীর সেই বাবা অনেককাল আগে মারা গিয়েছে! কে মেরেছে সেই বাবাকে? খুকী? সুদাম? সংসার? সময়? কে? কে?

'শুনছ! এস! রান্না একটু পরেই হবে এখন! কতদিন পর বাবা এলেন। সময় আবার খুকীকে ডাক পাড়ল।

খুকীর আসতে দেরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুদামের চঞ্চলতা বাড়ছিল। কত-দিন পর সে এল! হায় রে সময় শোনাচ্ছে বাবাকে সেই কথা! খুকীকে! সঙ্গে সঙ্গে সচকিত হল সে! হ্যাঁ হ্যাঁ অনেকদিন পরেই সে এল! সুদাম তুমি সহজ হও, স্বাভাবিক হও। বহুদিন পরে তুমি মেয়ের বাড়িতে পা দিয়েছ! দেখতে এসেছ মেয়ে তোমার কেমন আছে। এখন তুমি হাঁক পাড়তে পার, আয় মা, ও খুকী আয় মা, তোকে কতদিন দেখি নি! তবু সুদাম ভাবছিল খুকী বড় সংসারী হয়ে উঠেছে। বাবা-মাকে কেমন পর করে দিয়েছে। হ্যাঁ এ সংসারেরই স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু তাহলেও...

'ও মা বাবা!' খুকীর চোখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'কেমন আছ বাবা, মা কেমন আছে?'

'ভাল। তুই?'

'ভাল বাবা।' জললাগা হাত শাড়ির আঁচলে মুছল খুকী। বলল, 'তোমরা গল্প কর বাবা, আমি চা করছি।'

'আর শোন বাবা এখানে খেয়ে যাবেন।'

'না না আবার খাওয়া কেন! আমি তোমরা কেমন আছ দেখতে এলাম। খুকীর মা জোর করে পাঠাল। জান তো মেয়ে-মানুষের মন। যতই বলি তোমার খুকী খুব সুখে আছে, কিছুতেই তা যদি মেনে নেয়। দেখ আমাকে আসতেই হল।' সুদাম সুখের হাসি হাসল।

সমরও হাসল।

খুকী স্বামীর দিকে তাকাল। বলল, শুনছ আমি কিন্তু মাকে একদিন দেখতে যাব।'

'যেও।' সমর বলল, 'এতে আর বলার কি আছে! যাও এখন বাবার জন্যে কিছু ব্যবস্থা কর।'

খুকী হাসতে হাসতেই সরে গেল।

সমর জিজ্ঞাসা করল, 'মায়ের শরীর এখন কেমন বাবা?'

'ভাল।' সুদাম ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, 'এখন যা সময় কোন রকমে টিকে থাকা।'

সত্যি। ভীষণ খারাপ সময় পড়েছে।' সমর ঠোঁট বাঁকাল। বলল, 'রাজ্যেরই একটা অনিশ্চিত অবস্থা, মানুষের ত' হবারই কথা।'

সুদাম রাজ্যের অবস্থা না বুঝলেও একটা ভীষণ গণ্ডগোল, গদির লড়াই ইত্যাদি ইত্যাদি অল্পবুদ্ধির মস্তিষ্কে কয়েকবারই এনেছে।

সুদামের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর না দেওয়া দেখেই বোধকরি সমর বুঝল বর্তমান পরিস্থিতি বিষয়ে বাবা খুব বেশি ওয়াকিবহাল নন। তাই অন্য প্রসঙ্গে গেল। বলল, 'শীতটা কেমন পড়েছে দেখেছেন!'

'শীত!'

'হ্যাঁ।'

'আসলে বুঝতে পারলে না বাবা বাতাসটার জন্যেই এমন হাড়কনকনানি শীত।' সুদাম গায়ের চাদরটা ঠিক-ঠাক করে নিল। আর টের পেল ঘরটা বেশ উষ্ণ। বাইরের বাতাসের প্রচণ্ডতা এখানে নেই। কেমন যেন একটা সুন্দর গন্ধ রয়েছে ঘরটার মধ্যে। খুকী কি অদ্ভুত করেই না ঘরটাকে সাজিয়েছে।

'কলকাতায় তো একেবারেই শীত পড়ে না।'

'এবার পড়েছে।'

'এ আর ক'দিন। বাতাস কমে এলেই দেখবেন শীত নেই।'

খুকী এর মধ্যে দু' কাপ চা দু' হাতে নিয়ে এল। ডিশে বিস্কুট।

সুদাম চায়ের কাপ থেকে দ্রুত মুখ তুলে খুকীকে দেখল। খুকী আজ কেমন অন্যরকম! সেই ছোট্ট দুলাল যাকে তাকে চা দিয়েছিল। তারপর তো শুধু শুকনো কথা। এমন কি একরকম যদি সুখ সুখ মুখ কিছুই তারপর থেকে আর থাকে নি।

সুদাম ইচ্ছে করেই কেশে সচেতন হল। সর্দি টানল।

'কি গল্প হচ্ছে তোমাদের!'

'শীতের।' সমর বলল।

'ও।'

'তা শীতের সময় কিন্তু তোমাদেরই সুখ! উনুনের পাশে কাজ করতে হয়। শীতের ঘেঁষবারই জো নেই।' সমর হাসল।

'ও মা হিংসে হচ্ছে বুঝি, তা ও-কাজ তুমিই কর না। আমি বাবার সঙ্গে গল্প করি।' খুকী মিষ্টি করে হাসল।

'রক্ষে কর।' সমর কৃত্রিম ভয়ে চোখ বড় বড় করল।

'কেন?' খুকী বেশ জোরেই হেসে উঠল।

সুদামও হাসল। সারা শরীর জুড়ে কৌতূহলটা অনুভব করল। এ ঘরের উষ্ণতাভরা বাতাসের মধ্যে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বাইরের শীতের বাতাসের প্রচণ্ডতা শরীর এবং মন জুড়ে টের পাওয়া সত্ত্বেও এ ঘরের তৃতীয় ব্যক্তি সম্মানিত কুটুম্বের মত বলল, 'যার যা কাজ!'

'যা বলেছ বাবা!' খুকী বলল, 'মনে করে আমাদের কাজ খুব আরামের!'

'বেশ বাবা খুব খাটুনির কাজ তোমাদের। এখন যাও। বাবার জন্যে তাড়াতাড়ি খাবার তৈরি করতে হবে। রাত হলে বাবার যেতে কষ্ট হবে। বাইরে যা বাতাস।'

'না। না। কষ্ট আর কি!' সুদাম এ ঘরের উষ্ণতায় ডুবে অনায়াসে বলল, 'আমার একটুও কষ্ট হবে না। কিন্তু আবার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কেন!'

'না বাবা তোমাকে খেয়ে যেতে হবে।' খুকী ঘাড় দোলাল।

সমর বলল, 'এটা নাকি আপনার ঘর নয়!'

'কিন্তু।'

'না কোন কিন্তু নয় বাবা, তোমাকে খেয়ে যেতেই হবে। তুমি লজ্জা করছ!'

'মেয়ের কাছে লজ্জা কি রে।' সুদাম হাসল।

'তাহলে বস তুমি!' খুকী চলে গেল।

খাওয়া-দাওয়ার বিরাট আয়োজন না করলেও খুব অল্প সময়ে খুকী যা করল তাতে অবাক না হয়ে পারল না সুদাম। লুচি, মিষ্টি, তিনটে তরকারি। আঃ কত-কাল সুদাম এ সব খাবার খায় নি, দেখে নি। ঘরের মানুষের মুখটা তার মনে পড়ছিল। তবে এই ঘর, এই ঘরের উষ্ণতা মুহূর্তের জন্যে মনের মধ্যে আরো সুখ সুখ একটা ভাব এমন করে মিশে মিশে রেখেছে, যাতে সে শুধু বলতে পারছিল, 'খুকী কি কাণ্ড করেছিস! এত খাব কি করে রে! তোল, তুলে নে!'

'না বাবা তোমাকে খেতে হবে।' পাশে পরিবেশনরত খুকী মুখে অসন্তুষ্টির ভাব আনল। বলল, 'এই তো দিয়েছি। আরও দেব।'

সমর বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ খান বাবা এই ত' ক'টা মাত্র লুচি।'

'সে বয়স কি আছে বাবা!'

'খুব আছে! কি এমন বয়স হয়েছে!' খুকী আরও দু'খানা লুচি বাবার পাতে তুলে দিল।

সুদাম হাসতে হাসতে বলল, 'তুই একদম গলা পর্যন্ত করে দিবি খুকী!'

সুদাম আপত্তি করলেও এ ঘর থেকে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে সমরও খানিকটা হেঁটে এল। খুকী দরজার মুখে 'আবার এস বাবা' বলে অনেকক্ষণই চেয়ে থাকল তাদের যাওয়ার পথের দিকে। গলিটা শেষ হতেই ঘাড় ফিরিয়ে সুদাম বলল, 'আর এস না বাবা। ঠাণ্ডা লেগে যাবে। তুমি চলে যাও। আমি ঠিক চলে যাব।'

সমর থমকে দাঁড়াল। বলল, 'আবার আসবেন বাবা।'

সুদাম ঘাড় দুলিয়ে বলল, 'আসব বৈ কি বাবা।'

সমর গলির দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

চাদর মুড়ি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সুদাম টের পেল বাইরে শীতের বাতাসের প্রচণ্ডতা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে। হাড়-গুলো পর্যন্ত বাজিয়ে দিচ্ছে। রাস্তা অনেক ফাঁকা। যে যার ঘরে ঢুকেছে। গাড়িও কম। শীতের বাতাস হু হু করে বয়ে একচ্ছত্র নরপতি হয়ে রাজত্ব চালাচ্ছে। বাতাস তার ফাঁকা জায়গায় হিম চালাতে কসুর করছে না। না, কাল আর রেশন আনা হবে না। খুকীর কাছে যে আশায় সে গিয়েছিল তা তার পূরণ হয় নি। কিন্তু না হলেও সুদাম টের পাচ্ছিল সে আলাদা একটা বস্তু ওখান থেকে পেয়েছে। যাকে সে বিসর্জন দিয়েছে। একটা সুন্দর উষ্ণতাভরা আসন ওখানে তার জন্যে ছিল, আছেও এখন। কিন্তু সে আসনে সে বসবে কেমন করে! দারিদ্র্যের হিমকে যে বাতাস তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে গভীর শৈত্যে ডুবিয়ে রেখেছে। স্বভাবতই সে সুখ সুখ ভাবের বদলে পরম দুঃখীর মত দুঃখ হয়ে ভাবতে পারছিল, কাল রেশন আনা হবে না। কাল রেশন আনা হবে না।

তবু সুদাম চাদর মুড়ি দেওয়া অবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে টের পাচ্ছিল পায়ের তলার ইঁটে-পাতা পেভমেন্ট খড় খড় করে লাগছে। বাতাসে পেটে খাচ্ছে যেন।

মনে বোধ হয় রাজশাসনের উপরে খেতাব। খবর পড়ছি—কি পড়ছিলাম? সেজান নাকে সাহায্য করছিলেন?

এদিকে আকাশ-ভাঙা বৃষ্টি। শ্রাবণের পদসংকেত। সে ব্যাপারে আকাশবাণীর চোখ পড়ে না আকাশের দিকে।

জলপাইগুড়ি তখনো ভেসে যায় নি, জলপাইগুড়ি হারায় নি তখনো যথাসর্বস্ব। ডোবে নি তখনো সারা উত্তরবঙ্গ। সাধারণ মানুষ তখন কলকাতার আকাশবাণী থেকে সংবাদ শুনছিলেন কোথায় কোথায় ধস নেমেছে। আর আকাশবাণী ফলাও করে ঘোষণা করছে ধসের ফলাফলে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা মৃতের সংখ্যা। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা মুচকি হেসেছিলেন। বলেছিলেন : বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া না হলেই বাঁচি। মহাজন বাক্য মিথ্যা হয় নি। আকাশবাণীর সংবাদ পরিবেশনের বাহাদুরী দেখে মনে হয়েছে : তাঁরা শেষরক্ষা করতে পারেন নি।

কলকাতাই না কি বাংলা? একচোখ যাঁদের সরকারী টাকার প্রোগ্রামের উপর, আর একপাশে সরকারী খানাপিনায় নিবদ্ধ, তাঁরা অন্যদিকে দৃষ্টিপাতের সময় পাবেন কোথায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন সববাবর তখন সাধারণ মানুষের ছুটোছুটি থাকবে বৈকি। এমন কি যে সময় কলকাতায় বাস-ট্রাম চলে না, রেলপথে গাড়ি চলে না, তখনো ... সমস্ত হয়। শুধু সম্ভবটাই অসম্ভব হয় ... যখন ঘাড়ে বিপদ এসে পড়ে দেশের সাধারণ মানুষগুলির উপর—যারা বৎসরান্তে নির্দিষ্ট দিনে রেডিওর লাইসেন্স ফি সরকারী তহবিলে জমা দেয় এবং ... হয়ে গেলে অতিরিক্ত দণ্ড দিতে বাধ্য হয়।

অনেক দেশেই দেখেছি : চাকরি রক্ষার খাতিরে সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে সরকারের গুণগান করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তা করুন আপত্তি নেই। কিন্তু জলপাইগুড়ি ও তার আশপাশের অঞ্চল প্রলয়ংকর বন্যায় ধ্বংস মুছে নিঃশেষ হয়ে গেল, ডুবে গেল কুচবিহার, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর অর্ধেক জলে ভাসলো—সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠা বন্যার্ত নরনারীর বেদনা ও মৃত্যুর খবরে হোল ভরপুর। কলকাতার আকাশবাণী তখনো নির্বিকার। কী আশ্চর্য। তাঁরা অবশ্য পরে খবর পেলেন, শ্রোতাদের খবর দিয়ে ধন্য করলেন। সে খবর প্রথম বা প্রধান খবর নয়। টাকার প্রোগ্রাম আর খানাপিনার খবর সেরে উত্তরবঙ্গের বন্যার কাহিনীটা বর্ণকণিকার মতন। সে খবর শুনে মনে হয় না, তেমন কিছু ঘটেছে। এবং এখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জনগণের কাছে বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য যে আবেদন

ও সেদিন ... —তার কিছু প্রয়োজন ছিল!

কলকাতার আকাশবাণী বন্যার্তদের খবর যথাসময়ে দিতে পারে নি। সে খবর দেওয়া শুরু হলেও তা প্রধান খবর হিসেবে প্রথম স্থান না পেলেও আমাদের মুখে চুনকালি দিয়ে বন্যার্তদের খবর, উত্তরবঙ্গের প্রলয়ংকর বন্যার সংবাদ বিদেশের রেডিওর সংবাদে শুধু প্রধান খবর হিসাবেই নয় প্রথম বেদনাদায়ক সংবাদরূপে পরিবেশিত হয়েছে।

তবে হ্যাঁ উত্তরবঙ্গের বন্যার খবর কলকাতার আকাশবাণীতে তেমন ঠাঁই না পেলেও বন্যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান সংবাদ হোল শুধু যেন ঘুড়ি ধরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা উত্তরবঙ্গে বন্যাঞ্চলে কোথায় নামছেন আর উঠছেন।

কলকাতার আকাশবাণীর সংবাদদাতারা নিশ্চয়ই ধরে নিয়েছিলেন, তাঁরা যা পরিবেশন করবেন তা ই হবে সোনার মতো খাঁটি। সংবাদপত্র যারা ক্রয় করতে অসমর্থ কিংবা সংবাদপত্র যেসব জায়গায় পৌঁছয় না তারা অথবা সেসব স্থানের বেতার-শ্রোতারা পেতলের চকচকে ভাব দেখে তাকে

কেউ জিগ্যেস করছেন কলকাতার আকাশবাণীর উপর এমন অন্যায় ধারণা কেমন? না, আকাশবাণী, কলকাতা ধরে নিয়েছেন যে, বন্যার্তরা এখন রেডিওহীন, সুতরাং আকাশবাণী যা ইচ্ছে তাই চালিয়ে যেতে পারে।

বন্যার্তরা বেতারহীন হলে কি হয়, আকাশবাণীর দুর্ভাগ্য এই যে, সংবাদপত্রের একজন রিপোর্টার জলপাইগুড়ির মুমূর্ষু লোকগুলির কাছে সংবাদ সংগ্রহ করছিলেন সেই রিপোর্টারের কাঁধে ঝোলানো ছিল একটা ট্রানজিস্টার রেডিও। সংবাদ সংগ্রাহক, সংবাদ জানতেও চায়; সুতরাং আকাশবাণীতে সংবাদ পরিবেশনের সময় হতেই তিনি চালিয়ে দেন রেডিওটা। বেশি বলে লাভ নেই : আকাশবাণী পরিবেশিত উত্তরবঙ্গের বন্যার সংবাদ শুনে ক্ষেপে উঠেছিল সেদিন মৃতপ্রায় লোকগুলি।

কিন্তু অভিমান বা রাগ করলেই কোনো সমস্যার সমাধান হয় না।

সঠিক সংবাদ পরিবেশনের জন্য দরকার তথ্যভিত্তিক বাস্তব সংবাদ। সে রকম সংবাদ পরিবেশনে অসমর্থ হলে আকাশবাণীর মাধ্যমেই জানাতে হবে অসামর্থ্যের কথা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বেতারশ্রোতারা প্রশ্ন করবেন : তাহলে সংসারাক্তে লাইসেন্স নামক দক্ষিণাটি কি দণ্ডদানের জন্যই দিতে হবে?

দ্বিতীয়ত সরকারী প্রতিষ্ঠান হলেও একমাত্র সরকারী ভাষ্য ইত্যাদির স্থান আকাশবাণী রেডিও নয় তা মনে রাখতে হবে।

তৃতীয়ত খবর যিনি পড়েন তাঁর নামও ঘোষিত হওয়ায় সংবাদ পরিবেশন সম্পর্কে তিনি তাঁর দায়িত্ব একেবারেই অগ্রাহ্য করতে পারেন না।

চতুর্থত এদেশের সাধারণ লোক

যাদের কাছে রেডিওর বাংলা সংবাদ শোনা ছাড়া গত্যন্তর নেই, তাঁদের কাছে বহু রকম সংবাদের মধ্যে কোন্ জাতের সংবাদ পৌঁছে দিলে তাঁদের উপকার হবে এবং দেশের কথা তাঁরা ভাবতে শিখবেন—তার উপযুক্ত সমীক্ষা গ্রহণ করা দরকার।

পশ্চাতে প্রধান সংবাদ কি, সে সম্বন্ধেও সংবাদ পরিবেশনকালে অবহিত হতে হবে। যেমন, প্রলয়ঙ্কর বন্যায় হাজার হাজার লোকের মৃত্যুর খবর, না, মন্ত্রী মহোদয়ের ট্যুর প্রোগ্রাম বড়—তা যাচাই করতে হবে।

সংবাদ সমীক্ষা :

আকাশবাণীর সংবাদের ধরণ-ধারণ দেখে হিমসিম খেতে হয়। তাহলে সংবাদ সমীক্ষা শুনে কি মনে হয়? প্রশ্নটিও অবান্তর নয়। একমাত্র কলকাতার আকাশ-বাণী থেকেই 'ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া' সম্ভব। বন্যায় মানুষ মরছে, আর আকাশবাণী করছেন আবোল-তাবোল সমীক্ষা। বন্যা সম্পর্কে কি তেমন কিছু বলার ছিল না, না, বিশেষজ্ঞদের দিয়ে বলানো অসম্ভব ছিল?

সংবাদ বিচিত্রা :

বন্যার্ত, দুঃস্থ, বিপদগ্রস্ত মানুষের কথার বদলে শুধু সভাস্থলের মামুলি বক্তৃতার আসর হবে কি এটি? মনে পড়ছে, কিছুদিন আগে দমদম বিমানপোতের অদূরে বিমান দুর্ঘটনা হলে সেখানের দুর্ঘটনার কিছুটা অভিজ্ঞতা শোনা গেছিল। আমরা প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ শুনে বিধ্বস্ত বিমানের আগুনের আঁচে নিজেরাও বেদনাদগ্ধ হয়েছিলাম। উত্তর-বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের লোকজনের মুখ থেকে সেরকম বিবরণ সংগ্রহ করে প্রচার কি অসম্ভব ব্যাপার ছিল?

আবহাওয়ার খবর :

এদেশে আবহাওয়ার খবর শুনলেই হাস্যোদ্রেক করে। কলকাতার আকাশ-বাণীর আবহাওয়ার খবর শুরু হলেই শ্রোতারা রেডিও শোনা তখন বন্ধ করেন। অথচ বিদেশে আবহাওয়ার খবর শোনার দিকে বিশেষ একটা উৎসাহ লক্ষ্য করেছি। এমন কি কলকাতায় বসে ঢাকা বেতারে প্রচারিত আবহাওয়ার সংবাদ শুনে আন্দাজ করা যায় বঙ্গোপসাগরের ঝড় এসে কল-কাতার আকাশ ঢেকে দেবে কি না। ঠিক তখনো কিন্তু কলকাতার আবহাওয়া খবরে সেই মামুলি দায়সারা খবর। আবাকান উপকূল অঞ্চলে সদা সতর্ক থাকার কারণে যদি ঢাকার বেতারে বিশেষ সতর্কতাজ্ঞাপক আবহাওয়ার খবর প্রচার করা সম্ভব হয়, তাহলে কলকাতা ও শিলিগুড়ির আকাশ-বাণী থেকেই বা কেন সতর্কতাজ্ঞাপক সংবাদ পরিবেশন করা সম্ভব হবে না। আমাদের ধারণা, সেরকম ব্যবস্থা থাকলে এবং বন্যা আসার সংবাদ সুনির্দিষ্টভাবে আকাশবাণী মারফৎ প্রচারিত হলে হাজার হাজার উত্তরবঙ্গের নরনারীকে গরু-ভেড়ার মতো প্রাণ দিতে হতো না। প্রসঙ্গত আমরা সরকারকে অবিলম্বে আকাশবাণী মারফৎ বিপদসংকেতমূলক বার্তা পরি-বেশনের জন্য অনুরোধ করছি।

তথৈবচ :

এতোদিন আকাশবাণীতে রাজপুরুষ-দের বাণী শুনতে জনসাধারণের অর্থ যাচ্ছিল, এখন থেকে ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপন প্রচার করে আকাশবাণীর প্রচুর অর্থাগম হবে ও জনগণের অবস্থা তথৈবচ।

উত্তরবঙ্গের ত্রাণকার্যে চলচ্চিত্র শিল্প ও শিল্পীর ভূমিকা

উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যায় বিপন্ন নরনারীদের সাহায্যের জন্য কলকাতার জনগণ যেভাবে সাড়া দিয়েছে তার তুলনা হয় না। এরূপ স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ইতিপূর্বে অন্য কোন ব্যাপারে দেখা যায় নি। অনেক রিলিফ কমিটি হয়েছে, ছাত্র, কর্মচারী, ব্যবসায়ী, মহিলা, শিল্পী সকলেই নিজ সংগঠনকে এ-কাজে লাগিয়েছেন। সিনেমা ও মঞ্চ শিল্পীদের অনেকেই পথে বেরিয়েছেন অর্থ, বস্ত্র সংগ্রহে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, সবিতাব্রত দত্ত, নীলিমা দাস, তাপস সেন, কাজী সব্যসাচী, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ অনেক শিল্পী এবং দলগতভাবে গণনাট্য সংঘ, ক্রান্তি শিল্পী সংঘ প্রভৃতি আরো অনেক সাংস্কৃতিক সংস্থা সাহায্য সংগ্রহের অভিযানে পথে বার হয়েছে। চলচ্চিত্র-শিল্প থেকে সংস্থাগতভাবে এবং এককভাবে অনেকে সাহায্য করেছেন।

সম্প্রতি বেঙ্গল মোশান পিকচার্স এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে ১লা থেকে ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত সিনেমাসমূহে বিক্রিত টিকেটের সমস্ত টাকা যেন বন্যার্ত তহবিলে দান করা হয়। প্রযোজক, পরিবেশক এবং সিনেমার কর্তৃপক্ষ যেন এই সাতদিনের বিক্রিত টাকা থেকে তাদের অংশ না নেন; আর সরকার এ ব্যাপারে সহায়ক হতে পারেন প্রমোদকর রেহাই দিয়ে। প্রস্তাবটি সুচিন্তিত এবং গঠনমূলক। এই প্রস্তাব কার্যকরী করা নির্ভর করছে প্রযোজক, পরিবেশক, সিনেমা মালিক ও সরকারের ঐক্য এবং সদিচ্ছার উপর। এক সপ্তাহের আয় বন্যার্তদের জন্য যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তা হলে কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগনা, বর্ধমান প্রভৃতি জেলার সিনেমাগুলি থেকে যে টাকা পাওয়া যেতে পারে সেই টাকা দিয়ে দৃষ্টান্তমূলক রিলিফ দেওয়া যায়। বি. এম. পি. ইউ প্রস্তাবে তারও ইঙ্গিত দিয়েছে; বলা হয়েছে দুটির মত গ্রাম বা একটি অঞ্চলের সম্পূর্ণ পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিয়ে চলচ্চিত্র শিল্প সংশ্লিষ্টেরা কাজ করতে পারেন, তার সঙ্গে যোগ হবে উত্তরবঙ্গে যে সব সিনেমাকর্মী সর্বকিছু হারিয়েছে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। বাস্তবিক এভাবে সর্বাত্মক রিলিফ কাজই উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে প্রয়োজন। বস্ত্র, খয়রাতি সাহায্য ইত্যাদির নিঃসন্দেহে প্রয়োজন আছে, কিন্তু এভাবে রিলিফ দিয়ে কি পুনর্বাসিত করা সম্ভব হবে? যাদের ঘর-বাড়ি থেকে জীবিকার উপায় পর্যন্ত ধ্বংস হয়েছে তাদের পুনর্বাসিত করতে হলে বি. এম. পি. ইউ-র প্রস্তাবটি গ্রহণ করা দরকার। সরকার এবং বে-সরকারী রিলিফ কমিটিগুলিও এই দৃষ্টিভঙ্গীতে কাজ করলে সমস্ত জনগণের উপকার হবে।

এরূপ প্রস্তাবকে কার্যকরী করার জন্য চলচ্চিত্র শিল্পের সর্বস্তরের কর্মীরা, প্রযোজক, প্রেক্ষাগৃহের মালিক, শিল্পী থেকে পরিবেশকরা পর্যন্ত, বি. এম. পি. ইউ থেকে ই. এম. পি. এ. এবং অভিনেতৃ সংঘ, শিল্পী সংসদ প্রভৃতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করেন তবে সার্থকভাবে কাজ করা সম্ভব হবে। আমরা আশা করি চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট সকলে এরূপ প্রস্তাব কার্যকরী করার কথাটা ভেবে দেখবেন। উত্তরবঙ্গের রিলিফের ব্যাপারটা ঠিক গতানুগতিক রিলিফ নয়, তার জন্য দীর্ঘকালীন অপারেশনের মত উদ্যোগ আয়োজন চাই। এবং এই আয়োজনে চলচ্চিত্র শিল্প, শিল্পী ও কর্মীরা আরো উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। অনেক শিল্পীর পথে যা সত্যি সীমিতক্ষেত্রে যায় হওয়া উচিত ; তাতে হাজার হাজার টাকা পাওয়া না গেলেও শিল্পীদের আন্তরিকতা বোঝা যায়, জনগণ আরও উৎসাহিত হয়। —সুজন

সৌমিত্র চ্যাটার্জী

ওয়ান হান্ড্রেড এন্ড ওয়ান ডালমাশিয়ানস্

মেট্রো সিনেমায় 'ওয়ান হান্ড্রেড এন্ড ওয়ান ডালমাশিয়ানস্' ছেলেদের জন্য একটি উপভোগ্য ছবি। আমাদের বাংলা সাহিত্যে যেমন দেড় শ' খোকা চোরকে শায়েস্তা করার জন্য এক কাণ্ড বাধিয়েছিল; ইংরেজ লেখিকা ডোডি স্মিথের বইতে ২টি ডালমাশিয়ান কুকুর আর তাদের ৯৯টি বাচ্চাকে নিয়ে তেমনি এক কাণ্ড ঘটেছে। এই কাণ্ডে শহরের সব কুকুররা যোগ দিয়েছিল, তার সঙ্গে বেড়াল, ঘোড়াও বাদ যায় নি। পশুজগৎ যেন চোর ও শয়তান মানুষের হাত থেকে তাদের বাচ্চা উদ্ধার করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। শেষে চোররা শায়েস্তা হয়েছে, নিজেদের গাড়িতে সংঘর্ষ হয়ে ওরা পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়েছে। আর বরফ, জলাভূমি, পাহাড়, চড়াই-উৎরাই পার হয়ে ডালমাশিয়ানরা তাদের বাচ্চাগুলিকে উদ্ধার করেছে।

বইতেই ত' গল্পটি পড়তে ভাল লাগে, সেই গল্পের ছবি এটি। পড়তে পড়তে কল্পনায় যা চোখের সামনে আসে তারও বেশি ছবিতে এসেছে। যেমন শহরে কত জাতের কুকুর, তাদের স্বভাব ও ডাকের বিভিন্ন ধরণ, কুকুরের, বেড়ালের ডাক ও

ঘোড়ার হ্রেষার মধ্যে ধ্বনি বিভিন্নতার অর্থ প্রকাশ ইত্যাদি চমৎকার।

শিল্পীরা কার্টুন ছবি এত চমৎকার এঁকেছেন যে সত্যিকার কুকুর আর আঁকা ছবির তফাৎ বোঝা যায় না। শিল্পীর তুলির টানে কুকুরগুলির এক-এক সময়ের মেজাজ ও অভিব্যক্তি এত সুন্দর হয়ে উঠেছে যে দেখতে খুবই মজা লাগে। এরই সঙ্গে চোরদের চেহারা বিশেষ করে দলনেত্রীকে ডাইনীর মত করে রূপকথার মেজাজে আঁকা হয়েছে। এতে ছেলেদের রূপকথার দেশের পরিবেশে নিয়ে যাবে। ছবিটি সুন্দর ছেলেরা খুবই আনন্দ পাবে। তবে এই পর্যালোচনা প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত মেট্রোয় থাকবে কি না জানি না। 'ওয়ান হান্ড্রেড এণ্ড ওয়ান ডালমাশিয়ানস্'-এর নির্মাতা ওয়াল্ট ডিজনে।

গড়িয়াহাট সরকারী আবাসে সারদা মহিলা নিবাসের সামনে প্রখ্যাত শিল্পী সবিতাব্রত দত্ত উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য আবেদন করছেন।

দি লাস্ট সফারি

'দি লাস্ট সফারি' মুক্তি লাভ করেছে গ্লোব সিনেমায়। আফ্রিকার সাফারি ও কেনিয়ার বন্যপশু সংরক্ষণ ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে একটি শিকারের ছবি। কাহিনীর নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে প্রথমত এক আমেরিকান সখের শিকারীকে নিয়ে। সে তার বান্ধবীকে নিয়ে, নিজের উড়োজাহাজ করে, চাকর-পাচক নিয়ে ফুর্তির শিকারে এসেছে। ফুর্তির নেশা নিয়ে এসে ফিরে গেল সে মানবিক চেতনা নিয়ে। দ্বিতীয়ত এক শ্বেতাঙ্গ শিকারীর শেষ শিকারের ঘটনা। তার বন্ধুকে হত্যা করেছে যে হাতী—সেই বন্য হাতীকে শিকার করার জন্য তার মরিয়া হয়ে ওঠা, অথচ শেষ পর্যন্ত নাগালের মধ্যে পেয়েও সে ছেড়ে দিল হাতীটিকে।

'অনুরমতী' ছবিতে দীপিকা চৌধুরী

এই দুটি নাট্যদ্বন্দ্বকে পরিপূরণ করার জন্য মূল তিনটি চরিত্র উপস্থিত করা হয়েছে। এই তিনটি চরিত্র ক্যাস—কাজ গাবাজ, গিলক্রিস্ট—স্টুয়ার্ট গ্রেঞ্জার এবং মামা—গাব্রিয়ালা লিসুডি। এই তিনজনের অভিনয় চমৎকার।

আফ্রিকার জীবনের টুকরো চিত্রের সঙ্গে বিরাট হস্তীযূথ, জলহস্তীর দল, বিরাট প্রান্তরে পাখী, হরিণের দল, বাঘ, গণ্ডার ইত্যাদিতে ঔৎসুক্য সৃষ্টিকারী। এই সঙ্গে এসেছে আফ্রিকার মানুষ, তাদের নাচ-গান ইত্যাদি যেমন বিটিশ আমেরিকান ছবিতে এসে থাকে। তার থেকেও একটু বেশি এসেছে—কাহিনীর ভিতরে আর একটি কাহিনী উপস্থিত করে। একদল শ্বেতাঙ্গ—তাদের মধ্যে শিশু ও নারী রয়েছে, বন্য আফ্রিকানদের হাতে তারা আটক ছিল, মৃত্যুর মুহূর্ত গুণছিল—ওদের রক্ষা করল গিলক্রিস্ট ও ক্যাসি। শিকার কাহিনীতে এই সাব-প্লট না দিলে ছবির কোন ক্ষতি ছিল না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী দেশের ছবি এবং সাম্রাজ্যবাদীদের চোখে আফ্রিকানরা এখনো

ইতালীয় অভিনেত্রী গিয়তামি রাজি

ধন্য, অসভ্য। এবং কৃষ্ণকায়দের অপেক্ষা মানুষ হিসাবে শ্বেতাঙ্গরা যে উন্নত ও বুদ্ধিমান তারই ইঙ্গিত নানাভাবে ছবিতে উপস্থিত করা হয়েছে। শিকার ও শিকারীর নাটকীয় দিক উপভোগ্য হলেও আফ্রিকানদের উপস্থিত করার দিকটি বাস্তবিকই সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের পরিচায়ক। আশ্চর্যের কথা যে—ভারতের মত কৃষ্ণাঙ্গদের দেশের সেন্সর কর্তৃপক্ষের নজরে এ ব্যাপারটা পড়ে নি।

নাটকের কথা

রূপাঙ্কনের দুটি একাঙ্কিকা

সম্প্রতি রূপাঙ্কন নাট্য গোষ্ঠী রঙমহলে তাঁদের দুটি একাঙ্কিকা নাটক পরিবেশন করলেন। আঙ্গিকের দিক থেকে এই নাটক দুটি প্রশংসনীয়। নাটক দুটির রচয়িতা শ্রীইন্দ্রনাথ উপাধ্যায়। প্রথমে "স্বয়ম্বরা" এই নাটকটি অভিনীত হয়। এই হাসির নাটকে যে জীবনবেদ অন্তর্নিহিত ছিল তার সুষ্ঠু রূপায়ণ ঘটেছে শিল্পীদের একাগ্র সাধনায়। তবে উল্লেখযোগ্যতায় কল্যাণ চক্রবর্তী বিশেষভাবে স্মরণীয়। এবং পান্নালাল তাঁর অংশটি যথাযথ রূপায়িত করেছেন। পরে "এই তো সামনে" অভিনীত হয়। এই নাটকে তীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আলো মজুমদার খুবই প্রশংসনীয়। অন্যান্য চরিত্র যথাযথ বলা চলে। সবচেয়ে কৃতিত্ব যা এই নাটক দুটিকে সাফল্য এনে দিয়েছে তা হল পরি-

...কাজের প্রতীয় একাগ্রতা ও নিষ্ঠা। পরিচালক তীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন।

মুক্তি প্রতীক্ষায় "বৌদি"

পূর্ণেন্দু প্রোডাকসন্সের মর্মস্পর্শী মনোজ্ঞ ছবি "বৌদি" বর্তমানে রাধা, পূর্ণ ও অন্যান্য পরবর্তী আকর্ষণ হিসেবে মুক্তি প্রতীক্ষিত। স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন—দিলীপ বসু। চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গীত রচনা করেছেন—প্রণব রায়। রবীন চ্যাটার্জী ছবিটির সুরকার। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন—সন্ধ্যা মুখার্জী, মানবেন্দ্র মুখার্জী ও শিপ্রা বসু। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে—দেওজীভাই ও অমিয় মুখার্জী। নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে সমৃদ্ধ ছবিটির প্রধান কয়েকটি চরিত্রে রূপদান করেছেন—সন্ধ্যারাণী, কালী ব্যানার্জী, অনিল চ্যাটার্জী, লিলি চক্রবর্তী, বিকাশ রায়, অনুপকুমার, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল,

প্রসাদ মুখার্জী, তরুণকুমার, কালীপদ চক্রবর্তী, জহর রায়, সুখেন দাস, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী, শ্রীমান পার্থ, শ্রীমান বাপী, মলিনা দেবী, পদ্মা দেবী, রাজলক্ষ্মী দেবী, কল্যাণী চৌধুরী ও অনুভা সান্যাল প্রভৃতি। এম কি চিত্রম ছবিটির পরিবেশক।

'দিবারাত্রির কাব্য' ছবিতে নবাগত স্বপন রায়

সংবাদিকী

অশ্লীল সিনেমা পোস্টারের বিরুদ্ধে

মাদ্রাজ সরকার চলচ্চিত্রের প্রাচীর চিত্রে অশ্লীলতা প্রতিরোধ করার জন্য একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সরকার কর্তৃক গঠিত এডভাইজারি কমিটি একটা আইনের খসড়া প্রস্তুত করেছে। এই কমিটির মতে অশ্লীল বলে বিবেচিত হবে নিম্নোক্ত বিবরণগুলি—

(১) কাঁধকাটা ব্লাউজ—যার ফাঁক দিয়ে বক্ষদেশের মাঝখানটা দেখা যায়।

(২) চামড়ার সঙ্গে রং মেশান পোষাক—যা পরলে পরিধেয়হীন মনে হবে।

(৩) স্নানের পোষাক অথবা স্নান করবার সাজ।

(৪) ভরত নাট্যমের পোষাকে কোন রকমেই নিরাবরণ করে দেখান চলবে না।

পুলিশ কমিশনারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আইন যথারীতি বিধিবদ্ধ হবার আগেই যেন এ ধরণের বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

বনহুগলীতে নতুন সিনেমা

বরাহনগর বনহুগলীতে একটি নতুন সিনেমা হল উদ্বোধন করা হয়েছে। এই হলের নাম হয়েছে—আনন্দম।

ভারতীয় সঙ্গীত পরিচালক পুরস্কৃত

যুগোস্লাভিয়ার অনুষ্ঠিত প্লাজে চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় ফিল্ম ডিভিশনের ছবি 'ডিমনেট অব গোয়া'র সঙ্গীত পরিচালক শ্রী এস দত্ত পুরস্কৃত হয়েছেন। ছবিটি টেলিভিশনেও দেখান হয়েছে। আশ্চর্যের কথা পুরস্কারটি গ্রহণ করতে ভারতীয় দূতাবাসের কেউ উপস্থিত ছিলেন না।

সোভিয়েট ছবি 'ওয়ান্‌স এগেন এ্যাবাউট লাভ' ছবির একটি দৃশ্য

বন্যার্ত সাহায্যে 'রাগিণী' সম্প্রদায়

সম্প্রতি 'রাগিণী' সাংস্কৃতিক সংস্থা রবীন্দ্রনাথের সংগীত অবলম্বনে 'বিরহ-মিলন' গীতিনৃত্য অনুষ্ঠান করে যে টাকা পেয়েছে ব্যয় বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ টাকা বন্যার্ত সাহায্যে দান করেছে। সংস্থার পক্ষ থেকে শ্রীদেবব্রত বিশ্বাস ১০০১৲ টাকার একটা চেক ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিনিধির হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে দিয়েছেন।

এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন—দেবব্রত বিশ্বাস, পদ্মিনী দাশগুপ্ত, অসিত চট্টোপাধ্যায়, গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়, চিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণিমা মুখোপাধ্যায়, অরুন্ধতী চাকলাদার।

বন্যাত্রাণে অরোরা টকীজ খড়্গপুর

অরোরা টকীজ খড়্গপুরের কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি মেদিনীপুর জেলার বন্যাদুর্গতদের সাহায্যার্থে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সংগৃহীত ১৫২৫৲ টাকা মেদিনীপুরের জেলা শাসকের হাতে অর্পণ করা হয়।

শোক সংবাদ

পরলোকে সংগীত সাধক শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়

সংগীতাচার্য শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় তাঁর বসিরহাটস্থ বাসভবনে সম্প্রতি ৭০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন।

কলকাতার সুকণ্ঠ সংগীতাচার্য 'বিজয়লাল মুখোপাধ্যায়ের শিষ্য হরিদাসবাবু স্বল্পকালের মধ্যে 'নুলো গোপাল' ('গোপাল চক্রবর্তী), 'সাতকড়িদাস মালাকার, 'গহরজান বাঈ প্রমুখ সংগীতবিদ্‌দের বিশিষ্ট ঘরানাশ্রয়ী মার্গসংগীতের বিভিন্ন বিভাগে বিশেষত খেয়াল, টপ্পা, প্রাচীন বাংলা গান ও শ্যামাসংগীতে সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ করেন। দীর্ঘকাল কলকাতা বেতারকেন্দ্রে উচ্চাঙ্গ কণ্ঠসংগীত-শিল্পী হিসাবে তিনি সংযুক্ত ছিলেন। তাঁর বহু ছাত্র-ছাত্রী সংগীতজগতে স্থায়ী আসন লাভ করেন যাঁদের মধ্যে 'ছায়ারাণী চট্টোপাধ্যায়, পদ্মরাণী চট্টোপাধ্যায়, যূথিকা রায়, রমা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উল্লেখ্য। তিনি 'গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 'হরেন মালাকার, 'অনুপম ঘটক, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, শচীন দেববর্মণ, পাহাড়ী সান্যাল, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, মন্মথনাথ ঘোষ প্রমুখ গুণীজনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, চার কন্যা, পাঁচ ভ্রাতা ও বহু গুণমুগ্ধ আত্মীয়-বন্ধু রেখে গেছেন।

সব হারানোর পালা

মেক্সিকোতে বিদায়ের শেষ রাগিণী নিখিল বিশ্বের কাছে বেদনা বহন করে এনেছে। কেউ হাসিমুখে বিদায় জানিয়েছেন মেক্সিকোকে—এরা তাঁদের অসামান্য সাফল্যের [illegible] আনন্দ; আর যাঁরা পরাজয়ের গ্লানি বহন করে দেশে ফিরে যাচ্ছেন, তাঁরা ম্লানমুখে বিদায় জানিয়েছেন মেক্সিকোকে। ভারত নতুন করে এই শেষ দলেই নাম লিখিয়েছে। আগেই জানা ছিল পরভীন-ভীম-[illegible]সিং-সুদেশ-উদয়চাঁদ-বিশ্বম্ভর-কামাল-[illegible]র দল আমাদের জয়ের গৌরব এনে দিতে পারবে না। তবু "অলিম্পিকে যোগদান করাই বড় কথা, জয়লাভ নয়"—এই আদর্শে বিশ্বাসী ভারত তাঁদের তাঁদের পাঠিয়েছিল।

আশা ছিল যা ঐ হকিতেই। ভারতের হকি দলের পিছনে রয়েছে অসামান্য গৌরবের স্মৃতি। রোম থেকে টোকিও—সে ছিল হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জীবন-পণ সংগ্রাম। আর টোকিও থেকে মেক্সিকো—এ ছিল সেই ফিরে পাওয়া সম্মান বজায় রাখার কঠোর তপস্যা। সে তপস্যায় ভারত সিদ্ধিলাভ করতে পারে নি। অস্ট্রেলিয়ার কাছে ২—১ গোলে হেরে গিয়ে এই প্রথম ভারত ফাইন্যালে পৌঁছতে পারলো না।

এমন কেন হলো? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে কাঠখড় পোড়াতে হয় না। দিন দিন ভারতের খেলাধুলার মান নিচের দিকে নেমেই চলেছে। কি করে খেলাধুলার মান বাড়ানো যায় সেদিকে সরকারের কোন মাথা ব্যথা নেই।

অথচ মেক্সিকোতে ভারতের চরম ব্যর্থতা দেখে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বললেন, "একমাত্র হকি ছাড়া (তখনও ভারত সেমি-ফাইনালে হারে নি!) অন্যান্য ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের কোন আশাই নেই। একটা পরিবর্তন আনা দরকার এবং বিদ্যালয়ের পর্যায় থেকেই এ সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে।"

খেলার মানোন্নতির জন্য শিক্ষামন্ত্রীও অনেকবার বহু কথা বলেছেন। পরিবর্তন নিশ্চয়ই দরকার। কিন্তু সেটা কেমন করে সম্ভব? সেদিকে সরকারের এতটুকু কর্মব্যস্ততা নেই। লক্ষ-কোটি মানুষের এত বড় একটা দেশ খেলাধুলায় বিশ্ব মানচিত্রে স্থান পায় নি—এটা কম লজ্জার কথা নয়।

পরিবর্তন কেমন করে আসবে? প্রথমেই তো তবে পরিবর্তন আনতে হবে খেলাধুলার নানা সংস্থার হর্তাকর্তা বিধাতাদের। তারা আমাদের খেলাধুলার অবনতির জন্য অনেকাংশে দায়ী। এদের বিদেশ ভ্রমণ আর কম্পিটিশনের [illegible] করতে হবে। ওরা পিঠে বেঁধেছে কুলো, আর কানে দিয়েছে তুলো। তাই সরকারী পর্যায়ে কিছু না করলে চিরস্থায়ী মৌরসীপাট্টা নড়বে না তা শিকড়-উপশিকড় গেড়ে বসবে।

এখন বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে পরিবর্তন আনার জন্য চাই সরকারী উদ্যোগ। এদের দিকে সরকার নজর না দিলে বড় বড় ক্রীড়া সংস্থার "নেম প্লেট"-ও হয়তো একদিন খসে পড়বে।

মেক্সিকো অলিম্পিকের অপ্রতিহত জয়যাত্রাকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল যে-কটি অক্ষৌহিণী। 'কালো শক্তি'র নিশান উদ্যত বজ্রমুঠি স্তব্ধ করে দিয়েছিল বর্ণ-বিদ্বেষী সাদা-আদমীদের কণ্ঠকে, তাদের দম্ভ-হুঙ্কারকে। সে ঘোর কাটিয়ে উঠতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগেছিল তাঁদের, কিছুক্ষণ পরে সোচ্চার হয়ে উঠলেন তাঁরা। এ অন্যায় এ অলিম্পিক-আদর্শের ঘোর বিরোধী। সুতরাং আদেশ জারি হল: "টমি স্মিথ আর কারলোস, তোমরা অলিম্পিকের মহান আদর্শ লঙ্ঘন করেছো। তাই তোমরা দেশে ফিরে যাও।" অগত্যা সাসপেন্ড হলেন তাঁরা। টমি স্মিথের অপরাধ, দু'শো মিটার দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড করে গলায় সোনার পদক ঝুলিয়ে বিজয়-মঞ্চে দাঁড়িয়ে কালো দস্তানা পরা বজ্রমুঠি ঊর্ধ্বে তুলে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তিনি বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে। তাঁর অনুসরণ করলেন আর এক কালো দুনিয়ার প্রতিনিধি দু'শো মিটারেই ব্রোঞ্জ পদকের অধিকারী জন কারলোস। খবরে জানা যায় আভেরি ব্রান্ডেজের প্রভাবেই আমেরিকার অলিম্পিক কমিটি ওদের সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেন। এ খবর শুনে চারশো মিঃ দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টিকারী আর এক নিগ্রো এ্যাথলেট লী ইভান্স কান্নায় ভেঙে পড়েন। লং জাম্পে ব্রোঞ্জ পদকের অধিকারী বোস্টন আগে নিগ্রোদের এ ধরণের আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। গত বছর অক্টোবরে "অলিম্পিক বয়কট" সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি বলেছিলেন, "অলিম্পিক বয়কটের সিদ্ধান্তে আমি অযথা সময় ও এনার্জি নষ্ট করেছি।" তিনি এবার মেক্সিকোতে বিজয়মঞ্চে খালি পায়ে এসে প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, "কারলোস ও স্মিথ গ্রাম ছেড়ে যাওয়ায় আমি খালি পা হয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছি।" আরো দু'জন জেমস ও রন ফ্রি বোস্টনকে অনুসরণ করে বিজয়মঞ্চে নগ্ন পায়ে গিয়েছিলেন। দু'শো মিঃ দৌড়ে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী অস্ট্রেলীয় পিটার নরম্যান নিগ্রোদের প্রতিবাদের প্রকাশ্য সমর্থন জানানোয় তাকে সতর্ক করে দেওয়া হল।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতা হঠাৎ থেমে যায় না, তেমনি যা কিছু ঘটে তার একটা পূর্ব সূত্র থাকে। হিস্ট্রি রিপিটস ইট-সেলফ। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে, এবং তাই বোধ হয় টমি স্মিথ ও কারলোস ইতিহাসের ধারাকে অস্বীকার করতে পারেন নি। কালো-সাদার লড়াই ক্রীড়া-ক্ষেত্রে অশুভের ইঙ্গিত বহন করে এনেছে। তাই তো দঃ আফ্রিকা আজ ক্রীড়াক্ষেত্রে 'এক ঘরে' হতে চলেছে—মেক্সিকো অলিম্পিকে তার ঠাঁই করা যায় নি অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও। ইংলন্ড ক্রিকেট দলের দঃ আফ্রিকা সফরও একই কারণে বাতিল হয়ে গিয়েছে। অলিম্পিক আদর্শের কাছে আজ বৈষম্যের পরাজয় ঘটলেও রাজনীতি আর সাদা-কালোর বৈষম্যের অস্তিত্ব এখনো অলিম্পিকের মৌলিক আদর্শকে লজ্জা দিচ্ছে। তাই কালো দুনিয়ার নিগ্রোরা সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লাঞ্ছিত হয়ে, ক্রীড়াক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়ে আওয়াজ তুলেছেন এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে—স্মিথ আর কারলোসরা সেই যুদ্ধে "শহীদ" হলেন!

নিগ্রো এ্যাথলেটদের অলিম্পিক বর্জনের কথা উঠেছিল সেই ১৯৬৭ সালের গ্রীষ্মের দারুণ দাবদাহে। সেদিন নিউ ইয়র্কের রাজপথে নিগ্রো-পুলিশ সংঘর্ষে রক্তগঙ্গা বয়ে গিয়েছিল। হাজার হাজার নিগ্রো-জনতা জমায়েত হল সেই বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে।

তারপর একটি সভা অনুষ্ঠিত হল। নিগ্রো-নেতা অধ্যাপক এডওয়ার্ড সেদিন বলেছিলেন, "তোমরা অলিম্পিকে আমেরিকার বিজয় মুকুট নিজেদের কাঁধেই বহন করে আসছো, যদিও বর্ণবৈষম্যনীতি দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। এখন ওরা রাস্তায় তোমাদের লাথি মারছে। যদি আমেরিকার পরাজয় চাই না। কিন্তু হাঙ্গেরী তারা শীর্ষ স্থান অধিকার করলে ভালোই। যদি তারা চতুর্দশ স্থান পায় তো তা আরো আনন্দের। আমরা আর পশুদের মত দয়া ভিক্ষা করতে চাই না। এটাই হবে তোমাদের সামনে শেষ স্তম্ভ সামাজিক নিরাপত্তা আদায়ের, এ বিনা রক্তপাতেই সম্ভব। আমরা বিশ্বকে জানাতে চাই যে দঃ আফ্রিকার মতই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বর্ণবিদ্বেষী।' তারপর তিনি চিৎকার করে উঠলেন: "এখন তোমরা কি চাও?"

—"বয়কট, বয়কট!" সমস্বরে প্রতিবাদ-ধ্বনি উচ্চারিত হল তাঁদের কণ্ঠে। 'সিদ্ধান্ত
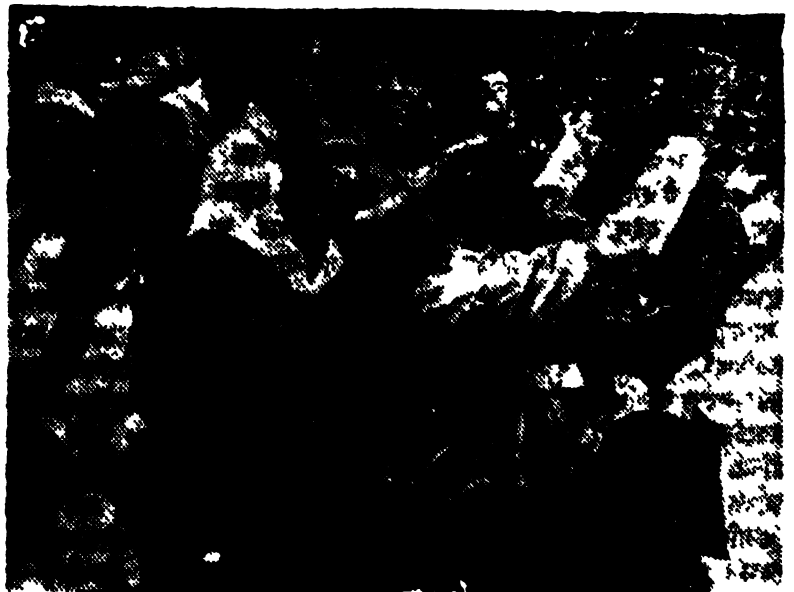
আমেরিকার শাস্তিপ্রাপ্ত এ্যাথলেট জন কারলোস ও স্মিথ পরে শান্ত হয়ে অলিম্পিক স্টেডিয়ামে দর্শকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমেরিকার নিগ্রোদের লজ্জাজনক ভূমিকা দেখছেন। কালো মানুষদের প্রতিবাদের প্রতীক বজ্রমুঠি তুলে চিৎকার করে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন জামাইকার এ্যাথলেটরা।

গৃহীত হয়েছিল সেদিন এই যে, অলিম্পিক বয়কট করা হবে।

আর একার নানা দিকে ঝড় উঠল। নিগ্রো অ্যাথলেটদের স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ মন্তব্যে অলিম্পিক বয়কটের আন্দোলন চলতে লাগল।

[illegible]ষ্টের বিশ্ববিদ্যালয় বাস্কেট বল দলের [illegible] নম্বর নিগ্রো খেলোয়াড় লুই এলসিণ্ডর ভাব বললেন, "যদি তুমি কোন বৈষম্যমূলক সমাজে বাস করো তবে তোমাকে বিদ্রোহ ঘোষণা করতেই হবে। আমরা কালো, তাই নরকে বাস করছি।"

আজকের নিগ্রো-নায়ক টমি স্মিথ তখন ঘোষণা করেছিলেন: "আমি অলিম্পিক ক্রীড়া প্রত্যাখ্যান করতে প্রস্তুত। নিগ্রো ভাইরা আমেরিকায় যে দুঃসহ নির্যাতন ও শোষণ সহ্য করছে তার অবসানের জন্য জীবন যদি দিতে হয় তাতেও আমি রাজী।"

চারশো মিঃ দৌড়ে লী ইভানস এবার বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। তিনি সেদিন স্মিথের কণ্ঠে গলা মিলিয়ে বলেছিলেন: "দৌড়-শিক্ষার প্রথম দিন থেকে অলিম্পিকে দৌড়ানোর স্বপ্ন দেখে আসছি। সে-সুযোগ আমার সামনে আসছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমি যে কোন মূল্যে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে প্রস্তুত। আমি আত্মসম্মান বিকিয়ে দেওয়ার শিক্ষা পাই নি।"

প্রখ্যাত উচ্চ লম্ফনবিদ ওটিশ বারেল ও হুইল বসে পারদর্শী রন কোপল্যাণ্ড এবং হতভাগ্য কেসিয়াস ক্লে অলিম্পিক বয়কটের সপক্ষে মত দিয়েছিলেন। এঁদের সমর্থন জানিয়েছিলেন পরলোকগত নিগ্রো নেতা মার্টিন লুথার কিং ও তাঁর অনুগামী ফ্লয়েড ম্যাকিসিক।

এই সিদ্ধান্তে দেশ-বিদেশে অনুকূল-প্রতিকূল মনোভাব গড়ে উঠেছিল। কিছু কিছু নিগ্রো এ্যাথলেটও এই সিদ্ধান্তে মোটেই সন্তুষ্ট হন নি। খ্যাতিমান নিগ্রো এ্যাথলেট বব হেইস, র‍্যাফার জনসন, আর্ট ওয়াকার প্রমুখ এই সিদ্ধান্তের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

সাংবাদিক মহলেও মিশ্র-প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। "স্পোর্টস ইন দি ইউ এস এস আর" মন্তব্য করেছিলেন, "তারা অলিম্পিক বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়ে পৃথিবীকে জানিয়ে দিতে চেয়েছেন তাঁদের নির্যাতিত, শোষিত অবস্থার কথা।"

ওয়াশিংটন প্রেসের জন চ্যাম্বার লেইনের মন্তব্য: "আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথলেটদের মন কৃত্রিম উপায়ে দূষিত করা হয়েছে কোন এক বিপজ্জনক মহল দ্বারা।"

লাইফের সম্পাদকীয় মন্তব্যে বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা সাফল্য-[illegible] হয়েছে [illegible] হয়েছে, "কিন্তু অলিম্পিক বয়কট করে তারা কি লাভ করবে?"

নিউ ইয়র্ক টাইমস বলেছেন যে নিগ্রোদের অলিম্পিক বয়কটে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে তাঁরা গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেন নি। এতে চাপ দেওয়া যাবে যাতে নিগ্রোদের গৃহশিক্ষা ও বেকারী সমস্যা দূর করায় সরকার প্রয়াসী হন।

আমেরিকার অলিম্পিক কমিটি কিন্তু এ ব্যাপারটি হাল্কাভাবে নিয়েছিলেন। শুধু শ্বেতকায়দের নিয়ে অলিম্পিকে নামার সাহসও তাঁরা দেখিয়েছিলেন।

এরপর অবস্থার পরিবর্তন হয়। নিগ্রোরা "অলিম্পিক বয়কট" সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নেন। তাঁরা হাসিমুখেই মেক্সিকোতে এলেন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে। কিন্তু এরই মধ্যে টমি স্মিথ আর কারলোস জানালেন তাঁদের বিক্ষোভ—কালো দস্তানা পরা বজ্রমুঠি ঊর্ধ্বে তুলে।

আর বিশেষ কেউ সেই প্রতিবাদের ঢেউয়ে গা ভাসালেন না, হয়তো তাঁরা চাইলেন না অলিম্পিকের মহান আসরে রাজনীতি, বর্ণবৈষম্যের ছোঁয়া টেনে আনতে—হয়তো তাঁরা স্মিথ ও কারলোসের পথে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন না। তবু কারলোস বলেছেন: "আমরা কালোরা সব এক।"

মেক্সিকোর মহামেলার বিশ্বক্রীড়ার হাট আজ ভেঙে গেছে। জয়-পরাজয়ের হাসি-কান্নায় ভরে উঠেছে মেক্সিকোর আকাশ-বাতাস। ক্রীড়াবিশেষজ্ঞরা যা ভেবেছিলেন তাই হয়েছে। আমেরিকা প্রথম স্থান অধিকার করেছে, রাশিয়া দ্বিতীয়। তবে এবারের বৈশিষ্ট্য হ'ল যে আমেরিকা রাশিয়াকে অনেক পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে। অনেক বিশ্ব রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে, ভেঙেছে বহু অলিম্পিক রেকর্ডও। এবার শুধু মাত্র সংক্ষিপ্ত ফলাফল দেওয়া হ'ল (অসমাপ্ত)।

তার আগে ভারতের সামগ্রিক ব্যর্থ ভূমিকার কথা উল্লেখ না করলে হচ্ছে না। পরভীন, এম এল ঘোষের ব্যর্থতার পর মহিন্দার সিং, সুদেশকুমার, উদয়চাঁদ ও বিশ্বম্ভর মল্লযুদ্ধে কিছুটা সাফল্য [illegible] সিং ও রণধীর সিং সুটিংয়ে পুরোপুরির ব্যর্থ হলেন। এর পরই হকি দলের পালা, ১৯২৮ সালে প্রথম অলিম্পিকে যোগ দিয়ে এই প্রথম ভারত হকি ফাইন্যালে উঠতে পারলো না। এ কম লজ্জার কথা নয়।

সংক্ষিপ্ত ফলাফল:
এ্যাথলেটিকস (পুরুষ)

৪০০ মিঃ দৌড়: ১ম—লী ইভানস, ৪৩·৮ সেঃ নতুন অলিম্পিক ও বিশ্ব রেকর্ড, ২য়—লারি জেমস, ৩য়—আর ফ্রীম্যান (সকলেই আমেরিকার)।

১,৫০০ মিঃ দৌড়: ১ম—কিপচোগ কিনো (কেনিয়া) ৩ মিঃ ৩৪·৯ সেঃ—নতুন অলিম্পিক রেকর্ড, ২য়—জিম র‍্যায়ান (আমেরিকা), ৩য়—তুমলার (পঃ জার্মানী)।

৫,০০০ মিঃ দৌড়: ১ম—মহঃ গামুদি (তিউনিসিয়া) ১৪ মিঃ ৫ সেঃ, ২য়—কিপচো কিনো (কেনিয়া), ৩য়—নাফতালি তেমু (কেনিয়া)।

ম্যারাথন: ১ম—মেমো ওলডে (ইথিওপীয়া) ২ ঘঃ ২০ মিঃ ২৬ ৪ সেঃ, ২য়—কিমিহারা (জাপান), ৩য়—মাইকেল রিওন (নিউজিল্যাণ্ড)।

৪×৪০০ মিঃ রিলে: ১ম—আমেরিকা (মাথিউজ, ফ্রীম্যান, জেমস ও ইভানস) ২ মিঃ ৫৬ ১ সেঃ নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড, ২য়—কেনিয়া, ৩য়—পঃ জার্মানী।

৪ × ১০০ মিঃ রিলে:

১ম---(আমেরিকা গ্রীন, পেণ্ডার, আর স্মিথ ও হাইনস) ৩৮'২ সেঃ নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড, ২য়---কিউবা, ৩য়---ফ্রান্স। উল্লেখযোগ্য যে, এর সেমি-ফাইন্যালে জামাইকা ৩৮'৩ সেকেণ্ডে পূর্বতন বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেছিলেন।

১১০ মিঃ হার্ডল:

১ম---ডেভেন পোরট (আমেরিকা) ১৩'৩ সেঃ অলিম্পিক রেকর্ডের সমান। ২য়---ই হল (আমেরিকা), ৩য়---ই ওটজ (ইতালী)।

উচ্চ লম্ফন:

১ম---রিচার্ড ফসবারি (আমেরিকা), ২'২৪ মিঃ ৭ ফুঃ ৪ ১।৪ইঃ,—নতুন অলিম্পিক রেকর্ড), ২য়---ক্যারুথারস (আমেরিকা), ৩য়---গ্যাভরিলোভ (রাশিয়া)।
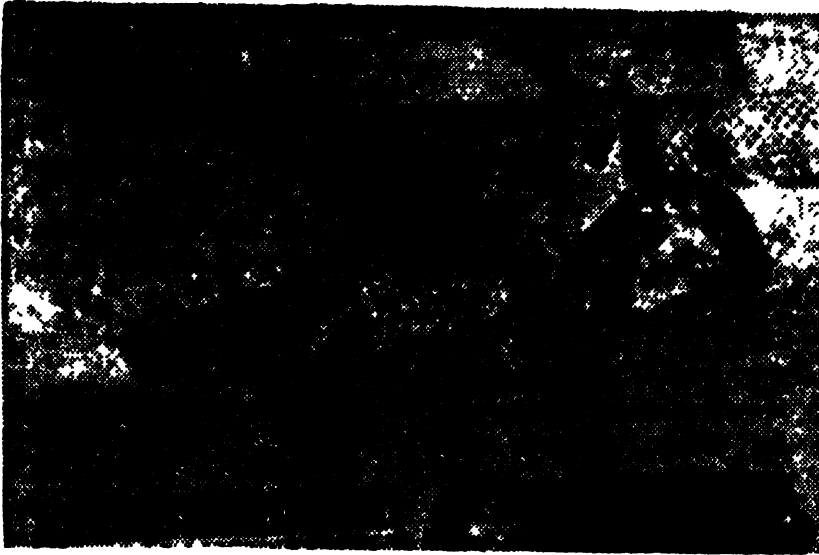
আমেরিকার সন্তরণ পটীয়সী ডেবি মেয়ার মেক্সিকো অলিম্পিকের ২০০, ৪০০, ৮০০ মিটার ফ্রি স্টাইল সাঁতারে স্বর্ণপদক পেয়ে নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছেন।

দীর্ঘ লম্ফন :

১ম---বব বীমন (আমেরিকা) ৮'৯০ মিটার---নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড, ২য়---বিয়াস (পূঃ জার্মানী), ৩য়---বোস্টন (আমেরিকা)।

হপ স্টেপ জাম্প :

১ম---ভ সানিভ (রাশিয়া), ১৭'৩৯ মিটার---নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড, ২য়---প্রুডেনকো (ব্রাজিল), ৩য়---জেনটাইল (ইতালী)।

৫০,০০০ মিঃ ভ্রমণ :

১ম---স, হোনে (পূঃ জার্মানী) ৪ ঘঃ ২০ মিঃ ১৩'৭ সেঃ, ২য়---এ কিস (হাঙ্গেরী), ৩য়---এল ইয়ঙ্গ (আমেরিকা)।

পেনটাথেলন :

১ম---ফেরম (সুইডেন), ৪৯৬৪ পয়েন্ট, ২য়---বালজো (হাঙ্গেরী), ৩য়---লেডনেভ (রাশিয়া)।

ডেকাথেলন :

১ম---বিল টুমি (আমেরিকা), ৮১৯৩ পয়েন্ট---নতুন অলিম্পিক রেকড, ২য়---জোয়াকিম (পঃ জার্মানী), ৩য়---কার্ট বেণ্ডালিন (পঃ জার্মানী)।

এ্যাথলেটিকস (মহিলা)

২০০ মিঃ দৌড় :

১ম---করজেনটাইম (পোল্যাণ্ড), ২২'৭ সেঃ---নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড, ২য়---আর বয়াল (অষ্ট্রেলিয়া), ৩য়---জেনিকারলানি (অষ্ট্রেলিয়া)।

৮০০ মিঃ দৌড় :

১ম---এম ম্যানিং (আমেরিকা) ২ মিঃ ৯ সেঃ---নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড, ২য়---ইলোনা সিলাই (রুমানিয়া), ৩য়---মারিয়া গোমার্স (হল্যাণ্ড)।

৮০ মিঃ হার্ডল :

১ম---মাউরীন (অষ্ট্রেলিয়া), ১০'৩ সেঃ---বিশ্ব রেকর্ডের সমান ও নতুন অলিম্পিক রেকর্ড, ২য়---কিলবরণ (অষ্ট্রেলিয়া), ৩য়---ই চী।

৪ × ১০০ মিঃ রিলে :

১ম---আমেরিকা (ফায়েল, বেলস, নেটার ও তায়আস) ৪২'৮ সেঃ---নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড, ২য়---কিউবা, ৩য়---রাশিয়া।

উচ্চ লম্ফন :

১ম---রেজকোভা (চেক), ১'৪২ মিটার, ২য়---অকোরোকোভা (রাশিয়া), ৩য়---ভ্যালেন্টিন কোজির (রাশিয়া)।

ডিসকাস :

১ম---মানোলিউ (রুমানিয়া), ৫৮'২৮ মিটার---নতুন অলিম্পিক রেকর্ড, ২য়---ওয়েস্টারম্যান (পঃ জার্মানী), ৩য়---কলিবার (হাঙ্গেরী)।

শট পাট :

১ম---এম গামেজ (পঃ জার্মানী) ১৯'৬১ মিটার---নতুন বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড, ২য়---মারিটালাজে (পূঃ জার্মানী), ৩য়---চিযোভা (রাশিয়া)।

পদকের খাতয়ান

২৭শে অক্টোবর

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
আমেরিকা	৪৫	২৭	৩৪
রাশিয়া	২৯	৩১	৩১
জাপান	১১	৭	৭
হাঙ্গেরী	১০	১০	১২
পূর্ব জার্মানী	৯	৯	৭
চেকোশ্লোভাকিয়া	৭	২	৪
ফ্রান্স	৭	২	৫
পশ্চিম জার্মানী	৫	১০	৯
অষ্ট্রেলিয়া	৫	৭	৫
ইংলণ্ড	৫	৫	৩
পোল্যাণ্ড	৫	৫	১১
রুমানিয়া	৪	৬	৫
কেনিয়া	৩	৪	২
ইতালী	৩	৪	৯
হল্যাণ্ড	৩	৩	১
মেক্সিকো	৩	৩	৩
যুগোশ্লাভিয়া	৩	৩	২
বুলগেরিয়া	২	৪	৩
ইরাণ	২	১	২
সুইডেন	২	১	১
তুরস্ক	২	০	০
ডেনমার্ক	১	৪	৩
ফিনল্যাণ্ড	১	২	১
ইথিওপিয়া	১	১	০
নিউজিল্যাণ্ড	১	০	২
টিউনিসিয়া	১	০	১
পাকিস্তান	১	০	০
ভেনেজুয়েলা	১	০	০
কিউবা	০	৪	০
কানাডা	০	৩	১
অষ্ট্রিয়া	০	২	২
সুইজারল্যাণ্ড	০	১	৪
মঙ্গোলিয়া	০	১	৩
ব্রেজিল	০	১	২
বেলজিয়াম	০	১	১
জামাইকা	০	১	০
নরওয়ে	০	১	০
উগাণ্ডা	০	১	০
ক্যামেরুণ	০	১	০
আর্জেন্টিনা	০	০	২
ভারত	০	০	১
তাইওয়ান	০	০	১
কোরিয়া	০	০	১
গ্রীস	০	০	১

হ্যাটট্রিক কিন্তু

অলিম্পিকের ম্যারাথন রেসে ইথিওপিয়া আবার পেয়েছে স্বর্ণ-পদক—এবার নিয়ে পর পর তিন-বার ইথিওপিয়া লাভ করলো এই সম্মান। কিন্তু হ্যাটট্রিক করতে পারলেন না ইথিওপিয়ার সেরা আর বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এ্যাথ-লেট আবিবি বিকিলা। অস্ট্রে-লিয়ার রন ক্লার্কের মতো আবিবি বিকিলাও দৌড়ের সময় হয়ে পড়েছিলেন অসুস্থ। তবে, ক্লার্ক শেষ পর্যন্ত শেষ করেছিলেন তাঁর দৌড়—কিন্তু বিকিলা তাও পারেন নি। মাঝপথেই থেমে যেতে হয়ে-ছিলো তাঁকে। অথচ ম্যারাথন রেসে হ্যাটট্রিক করার জন্যে কি প্রাণান্ত পরিশ্রমই না করতে হয়েছিলো বিকিলাকে। সপ্তায় একশ' মাইলেরও বেশি অনু-শীলনের জন্যে ছুটতেন তিনি। তবু শেষ রক্ষা হলো না। হারিয়ে গেলো অলিম্পিকের ম্যারাথন রেসে পর পর তিনবার বিজয়ী হবার অমূল্য সম্মান লাভের সুযোগ। তবে বিকিলার সান্ত্বনা যে ম্যারাথন রেসে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন তাঁরই দেশের প্রতিযোগী মামো ওল্ডে।

অস্ট্রেলিয়ার সিডনীতে সেদিন শেষ হয়ে গেলো এক অভিনব ক্রিকেট প্রতি-যোগিতা—ক্রিকেট ডাবলস। চারটি দেশ—ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আর সাউথ আফ্রিকা যোগ দিয়েছিলো এই প্রতিযোগিতায়। এই প্রতিযোগিতার শেষ খেলায় ইংলণ্ডের জুটি বেসিল ডলিভিয়েরা আর ফ্রেড্রি ট্রুম্যান হারিয়ে দিয়েছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জুটি গারফিল্ড সোবার্স আর ওয়েসলি হলকে।

সুকুমার সরকার (বনগাঁ), সরলকুমার মুখার্জী (বারাসাত), দীতাংশু হাল-দার (বর্ধমান), স্বপনকুমার নন্দী (কৃষ্ণনগর), দেবাশীষ মুখার্জী (তিলকনগর, নিউ দিল্লী) ও বি, মুখার্জী (কৃষ্ণনগর)।

উত্তর: আমাদের অলিম্পিক সংখ্যা আপনাদের সকলের ভালো লেগেছে জেনে আমরা উৎসাহিত হয়েছি। হ্যাঁ, ঐ সংখ্যায় দু'-একটি ক্ষেত্রে ছাপার ভুল আমাদেরও নজরে এসেছে। এই জন্যে আমরা দুঃখিত।

ত্রিদিবকুমার সাহা (বারাকপুর, ২৪ পরগনা)।

প্রশ্ন: ভারতীয় দল কোন্ সালে প্রথম অলিম্পিকে যায় এবং সেই দলে কোন্ কোন্ খেলোয়াড় ছিলো?

উত্তর: আশা করি আমাদের অলিম্পিক সংখ্যায় আপনি পেয়েছেন আপনার প্রশ্নের উত্তর।

বি, বি, শামল (অশোক এ্যাভিনু, দুর্গাপুর—৪)।

প্রশ্ন: বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড় কে? আপনার ঠিকানাটা জানাবেন কি?

উত্তর: কোন্ বিভাগের—ব্যাটিং না বোলিং? বসুমতী পত্রিকার ঠিকানায় দিলেই আমি আপনার চিঠি পাবো।

প্রদীপকুমার বসু (পঞ্চাননতলা লেন, কলকাতা—৩৪)।

প্রশ্ন: অলিম্পিক গেমস-এ যারা চ্যাম্পি-য়ান হয় তাদের কি বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান বলা যেতে পারে?

উত্তর: অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় পদক লাভের হিসেবে আর সর্বাধিক পয়েণ্ট যে দেশ পায় তারা লাভ করে বেসরকারী চ্যাম্পিয়ানশীপ। সেই দেশকে সেই সালের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান বলা হয়।

বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (ঠিকানা নেই)।

প্রশ্ন: মোহনবাগান কি বাইরে কোথাও খেলতে গিয়েছিল? যদি গিয়ে থাকে তাহলে তার ফলাফলটা জানাবেন।

উত্তর: মোহনবাগান একাধিকবার বাইরে খেলতে গিয়েছিল। আপনি কোন্-বারের ফলাফল জানতে চাইছেন—না কি প্রত্যেক বারের?

ইলা বন্দনার্জী (শিলিগুড়ি, দার্জিলিং)

প্রশ্ন: টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতের পাতৌদি, জয়সীমা, বোরদে ও ওয়া-দেকারের লোফা ক্যাচের সংখ্যা কত?

উত্তর: আমার ঠিক জানা নেই। কারো জানা থাকলে জানালে জানিয়ে দেবো। আপনাদের কুশল সংবাদ জানাবেন।

সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (হালিসহর, গোলাবাড়ি, ২৪ পরগনা)।

উত্তর: আপনার চিঠির উত্তর তো আমরা অনেকবার দিয়েছি। যাই হোক চিঠি লেখার সময় 'সাপ্তাহিক বসুমতী' নামটা স্পষ্ট করে লিখে দেবেন, তাহলে আর হারাবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকার পোলক ব্রাদার্স বিশেষ সুবিধে করতে পারেন নি। কিন্তু বেশ খানিকটা লড়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার লরীরা। তবে শেষ পর্যন্ত পুরস্কারের হিসেবে দেখা গেছে যে সবচেয়ে বেশি জিতেছেন সোবার্স আর হলই...।

* * *

নিগ্রো প্রতিযোগী বব্ বীমনের নাম হয়ে গেছে উড়ন্ত মানুষ। বাইশ বছরের বীমন যখন ২৯ ফুট আড়াই ইঞ্চি লাফিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন অম্লানবদনে তখন ঐ দূরত্ব মাপতে গিয়ে থ হয়েছিলেন বিচারকরা। বিশ্ব রেকর্ডের চেয়ে ২ ফুটেরও বেশি লাফিয়ে বীমন স্থাপন করেছেন সেরা কীর্তি। শুধু তাই নয় শিচারক লং জাম্পে বীমনের দূরত্ব মাপার পর বলেছেন যে এটি এ্যাথলেটিক জগতের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

* * *

অলিম্পিকের কঠিনতম প্রতিযোগিতা হিসেবে ডেকাথলনকে ধরা হয়। মেক্সিকো অলিম্পিকে ক্যালিফোর্নিয়ার স্কুল শিক্ষক বিল টুমে ডেকাথলন প্রতি-যোগিতায় নতুন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চৌকস এ্যাথলেট হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন। নতুন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করলেও বিল টুমে কিন্তু বিশ্ব রেকর্ড স্পর্শ করতে পারেন নি।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২

বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
[illegible]		১২১৯
আজকের মানুষ		১২২০
জীবনস্মৃতি	ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী	১২২১
[illegible]		১২২৪
রাস্তাই একমাত্র রাস্তা	সুখদেব চট্টোপাধ্যায়	১২২৭
নিকট-দূরে	কৌশিক বসু	১২২৯
ভারতদর্শন		১২৩১
আন্তর্জাতিক		১২৩৪
সপ্তাহের বোঝা	কৃত্তিবাস ওঝা	১২৩৮
বিংশ শতাব্দীর মার্কিন সাহিত্য (প্রবন্ধ)	শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৪০

সূচীপত্র

সম্পাদিকা
জয়ন্তী সেন

সাপ্তাহিক বসুমতী

[illegible]৩ বর্ষ : ২০শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা | বাংলা ভাষার দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা | PRICE : 30 Paise
বৃহস্পতিবার, ২১শে কার্তিক, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ | Thursday, 7th November, 1968

উত্তর ভিয়েৎনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ

অবশেষে প্রেসিডেন্ট জনসন ঘোষণা করেছেন : উত্তর ভিয়েৎনামে সর্বপ্রকার বোমা ও গোলাবর্ষণ বন্ধ।

প্যারিসে উত্তর ভিয়েৎনাম ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শান্তি বৈঠক এখনো চলছে। উত্তর ভিয়েৎনাম কর্তৃক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে উত্তর ভিয়েৎনামে বোমা ও গোলাবর্ষণ বন্ধ করার দাবি ইতিপূর্বে বারবার উপেক্ষিত হয়েছে। একের পর এক বৈঠকের শেষ ফলাফল কী দাঁড়াবে—সেই প্রশ্নে সারা বিশ্ব যখন উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা করেছিল—তখন প্রেসিডেন্ট জনসন কর্তৃক বিনাশর্তে ও একতরফা-ভাবে উত্তর ভিয়েৎনামে সর্বপ্রকার বোমা ও গোলাবর্ষণ বন্ধের আকস্মিক আদেশ নিঃসন্দেহে একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঘটেছে একথা বলাই বাহুল্য।

উত্তর ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে যুদ্ধ দীর্ঘকাল ধরে চলে এসেছে—তাতে আমেরিকাকে কম ক্ষয়-ক্ষতি স্বীকার করতে হয় নি। ধনসম্পদে ঐশ্বর্যশালী আমেরিকার যে পরিমাণে অর্থ গিয়েছে, সেই অর্থের ক্ষতিপূরণ করা হয়তো একদা সম্ভব, কিন্তু হাজার হাজার নাগরিক বিদেশে গিয়ে যেভাবে সৈনিক হিসেবে প্রাণ দিতে বাধ্য হয়েছে তাতে আমেরিকার মা-বোনেরা উত্তর যুদ্ধকে মনেপ্রাণে স্বীকার করে নিতে পারে নি। তাই আমেরিকার জনমানসে যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে সুরু করেছিল। এবং প্রেসিডেন্ট জনসন দীর্ঘকাল পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নীতিতে অটুট মনোভাব পোষণ করলেও, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে তিনি জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করেই নিঃশর্ত বোমা ও গোলাবর্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন—এমন ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রেসিডেন্ট জনসনের ঘোষণায় দক্ষিণ ভিয়েৎনামের তাঁবেদার সরকার ছাড়া বিশ্বের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একতরফা বোমা ও গোলাবর্ষণের নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছে।

এখন মৌলিক প্রশ্ন : যে উদ্দেশ্যে বোমা ও গোলাবর্ষণ বন্ধের জন্য প্রেসিডেন্ট জনসনের ঘোষণা সেই উদ্দেশ্য পরিপূর্ণতা লাভ করলে কি পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণার সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, একতরফা-ভাবে আমেরিকা আপাতত যুদ্ধ বন্ধ করলেও উত্তর ভিয়েৎনাম যদি যুদ্ধ বন্ধ না করে—তাহলে পরবর্তী ফলাফলে কি যুদ্ধের গতি আরো মারাত্মক দিকে এগিয়ে যাবে না। এ কথা অস্বীকার করার

এখনো পর্যন্ত উত্তর ভিয়েৎনাম একমাত্র মানসিক শক্তির জোরেই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘকালের যুদ্ধে ধন ও জনই শুধু নয়, তাদের দেশও যুদ্ধাঘাতে বিধ্বস্ত। তারা বারবার যুদ্ধ বন্ধের দাবিও আমেরিকার কাছে জানিয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সে কথায় এতোদিন কর্ণপাত করে নি। এই পরিস্থিতিতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের তাঁবেদার সরকারকে তারা স্বীকার করে নেবে না এবং সেই সরকারের সঙ্গে বৈঠক করতেও রাজী হবে না। এমন যদি ঘটে, তাহলে আমেরিকার নতুন প্রেসিডেন্ট কোন্ নীতি গ্রহণ করবেন—সেটাও লক্ষণীয়।

তা ছাড়া সসৈন্য ও স-রসদ আমেরিকা যদি ভিয়েৎনাম থেকে সরে না যায়—তাহলে উত্তর ভিয়েৎনামে যুদ্ধ বন্ধের নামে শান্তি স্থাপনের আশা হবে সুদূরপরাহত।

কিন্তু আমেরিকার জনগণকে যে শান্তির বার্তা শুনিয়ে নির্বাচনের দিনে হাজির করা হল তারা কি আবার কোনো মতে যুদ্ধের দিকে ফিরে যাবে বা তাদের সে অবস্থায় ফেলা সম্ভব হবে?

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

মুঠো মুঠো টাকা। ঠিক ঠিক বলে দিতে পারলেই সঙ্গে সঙ্গে নগদ দশ হাজার টাকা পুরস্কার মিলে যাবে। কিন্তু কারো উৎসাহ দেখা গেল না, টাকা দিয়ে কেনা গেল না কাউকে। টাকার লোভ হয়তো বহু দুঃস্থ গরীবেরই আছে, কিন্তু কানু সান্যালকে ধরিয়ে দিয়ে টাকা [illegible] শিলিগুড়ি-নকশালবাড়ির কোন লোক যেন চিন্তাই করতে পারে না। কানু সান্যাল কী করেছে না-করেছে তারা জানে, তারা এটুকু জানে কানু তাদের আত্মীয়, তাদের আপনজন।

জনসাধারণের মধ্যে যদি কেউ ধরে দিতে না পারে তো তাদেরই কপাল মন্দ, আর মুফতসে দশটি হাজার টাকা দিয়ে যদি তারা তাদের ফাটা কপালে জোড়া লাগাবার চেষ্টা না করে তো পুলিশ তার কী করবে? পুলিশ তো তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে পারে না। খুন, ডাকাতি, ঘরে আগুন দেওয়া, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ইত্যাদি ১১টি অভিযোগের মামলা ঝুলছে কানু সান্যালের বিরুদ্ধে। শিলিগুড়ির নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া ইত্যাদি অঞ্চলকে কাঁপিয়ে তুলেছেন, ত্রাসের সঞ্চার করেছেন কানু সান্যাল। তাঁকে কী করে বাইরে রাখা যায়, ফাটকে তাঁকে পুরতেই হবে। নইলে পুলিশের, রাজ্য সরকারের মান বাঁচে না।

সেই দুর্ধর্ষ গেরিলা যুদ্ধের সেনাপতি কানু সান্যাল নাটকীয়ভাবে ধরা পড়েছেন পুলিশের হাতে। শিলিগুড়ি থেকে দশ মাইল দূরে বীরসিংজোৎ গ্রামের জোগদেউ ওরাঁওর বাড়িতে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন। হঠাৎ সামান্যতম আওয়াজে সাবধানী সতর্ক নায়কের ঘুম ভেঙে গেল, চোখ খুলতেই দেখলেন সাক্ষাৎ যমরাজার মত জেলা পুলিশ সুপার অরুণপ্রসাদ মুখার্জী দাঁড়িয়ে। না, নকশালবাড়ি আন্দোলনের নেতা, গেরিলা যুদ্ধের উদ্গাতা কানু সান্যাল ঘাবড়ে যান নি, কিম্বা বৃথা শক্তির পরিচয়ও দিতে চেষ্টা করেন নি। সদা সপ্রতিভ সান্যাল বরং বললেন, আরে, আপনি এসে গিয়েছেন! কৈ আমার লোকজন তো কোনো খবর দেয় নি! যাক আমার খোঁজ এতদিনে পেলেন [illegible]

হ্যাঁ, সতেরো মাস ধরে পুলিশ সারা জেলায় তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে কানু সান্যালকে, কিন্তু এতদিন খুঁজে মরাই সার হয়েছে। এমন কি তাঁকে ধরার জন্যে দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেও কোন ফল হয় নি। এমন ঘটনা অনেকবারই ঘটেছে যখন পুলিশ সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসেও ব্যর্থতার বোঝা নিয়ে আবার ফিরে গিয়েছে, কানু সান্যালকে ছুঁই-ছুঁই করেও ছুঁতে পারে নি, ধরি-ধরি করেও ধরতে পারে নি। ধরা পড়েছেন জঙ্গল সাঁওতাল, ধরা পড়েছেন

কানু সান্যাল

কদম মল্লিক, কামাখ্যা চ্যাটার্জী প্রমুখ নেতারা। বস্তুত নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রথম সারির নেতাদের সকলকেই পুলিশ পাকড়াও করে ফেলেছে ইতিমধ্যে, পারে নি শুধু একজনকে—সে ব্যক্তি কানু সান্যাল।

কানুর কারণে পুলিশকে কি কম ভুগতে হয়েছে—শ্রীরাধিকাকেও বোধ হয় কানুর বিরহে এতটা কাতর হতে হয় নি। পুলিশ একবার শুনলো কানু সান্যাল পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন নেপালে, আবার শুনলেন ভুটানে। তারপর শুনতে হল তরাইয়ের জঙ্গলে। প্রায় হাল ছেড়ে দিতে হয়েছিল। আবার শোনা গেল কলকাতায় [illegible]

সেখানে আত্মীয়া তরুণীর চটুল হাসির উপহার ছাড়া পুলিশ আর কী পেলো? শুধু কলকাতায়ই বা কেন? একবার [illegible] কানু আছেন শুনে সশস্ত্র পুলিশ ঘিরে ফেললো গ্রামটাকে, কিন্তু কোথায় কানু? আর একবার পোড়াগঞ্জে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। শিলিগুড়িতে কানু এসেছেন [illegible] আর একবার পুলিশ আশায় বুক বেঁধে, মুখচোখ তাদের সাফল্যের আনন্দে বোধ হয় উদ্ভাসিত হয়েও উঠেছিল। কিন্তু কোথায় কানু? পুলিশ এসে পড়ার আগেই চিড়িয়া উড় গয়া! পুলিশকে বার বার ঠকতে হয়েছে, বেকুব বনতে হয়েছে, হাত কামড়াতে হয়েছে। [illegible] প্রবল [illegible] থেকে [illegible] সাঁতরে কানু নিরাপদে এপারে এসেছেন [illegible] করেছেন।

কৃষিবিপ্লব, জমিদার-জোতদারের জমি জবরদখল ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নকশাল-বাড়ি আন্দোলন এবং তার নেতা কানু সান্যাল বছর দেড়েক আগে যুক্ত-ফ্রন্ট সরকারের আমলে আন্তর্জাতিক সংবাদের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। অথচ কানু সান্যাল লোকটি আসলে একজন অতি সাদাসিধে নিরীহ ধরণের লোক। আসল নাম তাঁর কৃষ্ণকুমার সান্যাল, বাড়ি শিলিগুড়ির বাবুপাড়া। আজ তাঁর কণ্ঠে কৃষিবিপ্লবের জয়গান শোনা গেলেও কানু সান্যাল একদিন ছিলেন সরকারী চাকুরে, কংগ্রেস সমর্থিত আই-এন-টি-ইউ-সির সক্রিয় সদস্য, ঘোর কমিউনিস্ট-বিদ্বেষী। কিন্তু পরে তাঁর মতবাদের পরিবর্তন ঘটে। প্রথমে কমিউনিস্ট পার্টি, দ্বিতীয় পর্যায়ে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট, সর্বশেষে এদেরই পয়লা নম্বরের শত্রু নকশালপন্থী। চারু মজুমদার যদি নকশালপন্থীদের তাত্ত্বিক গুরু হন, তবে কানু তাঁদের সাংগঠনিক নেতা, তাঁদের প্রধান সেনাপতি।

যুক্তফ্রন্ট শাসনের আমলে নকশাল-পন্থীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয় এবং ব্যাপক ধরপাকড় চলে। নকশাল-বাড়িতে [illegible] আন্দোলন [illegible] পড়েছে, তবে [illegible] এখনো রয়েছে। একদা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট থাকলেও কানু সান্যালকে দেখামাত্র [illegible] নির্দেশ নাকি মার্কসবাদীরাই দিয়েছিলেন। [illegible] কিন্তু কানু সান্যালের [illegible] কি [illegible]

এখন নরক গুলজার। ভারতের হুগলিস্থ বিপ্লবীদিগকে আন্দামানের সেলুলার জেলে একত্র করা হইয়াছে, আমাদের সংখ্যা ছিল এক শ'। আমাদিগকে সেলুলার জেলের ৭টি ইয়ার্ডে ভাগ করিয়া রাখা হইল, এক ইয়ার্ডের লোকের সহিত অপর ইয়ার্ডের লোকের দেখার উপায় নাই, এক ইয়ার্ডের মধ্যেও পরস্পরের সহিত কথা বলার হুকুম নাই, কড়া শাসন, কঠিন পরিশ্রমের কাজ, কদর্য খাদ্য ভোজন। বিপ্লবীদের জন্য ৭টি ইয়ার্ডে ৭ জন করিয়া শ্বেতাঙ্গ সৈনিক পাহারায় নিযুক্ত। জেলার একজন শ্বেতাঙ্গ, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট একজন শ্বেতাঙ্গ আই. এম. এস. অফিসার আন্দামানে। কালাপানি। ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও সিলোনের ভীষণ প্রকৃতির কয়েদীদিগকে পাঠান হইত। সেখানকার সাধারণ ভাষা উর্দু, সরকারী ভাষা ইংরাজী। সাধারণ কয়েদীদিগকে ছয়মাস হইতে দুই বৎসর পর্যন্ত সেলুলার জেলে রাখিত, পরে বিভিন্ন টাপুতে (দ্বীপে) পাঠাইয়া দিত। সেখানে কঠোর পরিশ্রমের কাজ করিতে হইত, সরকার হইতে থাকা-খাওয়া ও পাহারার ব্যবস্থা ছিল। রাজবন্দীদিগকে জেলের বাহিরে যাইতে দেওয়া হইত না। আন্দামানে প্রত্যেক কয়েদীর জন্য হিস্টরী-টিকেটে তাহার পূর্ব ইতিহাস লেখা থাকিত। হিস্টরী-টিকেট কয়েদীর সঙ্গে থাকে। আমার টিকেটে লেখা ছিল—

Previous History :—The accused was one of a gang of Bengali students concerned in a conspiracy, conspiracy to wage war against King Emperor and whose operations extended from the year 1908 to December 1914. He was one of the oldest members of the Anushilan Samity, took his training from the Arch Anarchist Pulin Das. Absconded while Dacca Conspiracy case was started, was one of the Leaders of the Revolutionary party, was suspected in 14 murders and Dacoities. Very Dangerous.

আন্দামানের সরকারী রিপোর্ট দেখা যায়, সেলুলার জেলে গড়ে প্রতি মাসে তিনজন কয়েদী আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যা করে কেন? অত্যাচার যখন অসহনীয় হইয়া উঠে, প্রতিকারের কোন উপায় নাই, তখন লোক আত্মহত্যা করিয়া সকল যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করে। আন্দামানে ছিল দুর্ধর্ষ প্রকৃতির লোক, তাহাদিগকে শায়েস্তা করার ব্যবস্থা ছিল দণ্ডনীতি—অর্থাৎ কঠিন পরিশ্রমের কাজ, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, একটু এদিক-ওদিক হইলেই প্রহার। তাহার উপর ছিল, খাওয়া খারাপ এবং কম। সরকার নির্দিষ্ট খাদ্য কয়েদীরা পায় না, চুরি হয় অনেক। কয়েদীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার কয়েদীরাই করে। যেসব কয়েদী প্রথমে অত্যাচার ভোগ করিয়াছে, এখন প্রমোশন পাইয়াছে, মেট-পাহারা হইয়াছে, তাহারাই জেল কর্তৃপক্ষকে খুশি করার জন্য তাহাদের স্বজাতি কয়েদী ভাইদের উপর অত্যাচার করিত। আন্দামান ছিল যমপুরী বিশেষ। ঐ সময় কয়েদীদের মধ্যে কোন শ্রেণী বিভাগ (ডিভিশন) ছিল না, সকলেই ছিল তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী। ব্যারিস্টার বিনায়ক দামোদর সাভারকার, প্রফেসার ভাই পরমানন্দ, বারীন ঘোষ, পুলিন দাস সকলেরই এক অবস্থা। আমাদের সকলকেই সাধারণ কয়েদীদের মত তাহাদের সঙ্গে জোড়া জোড়া বসিতে হইত, চলিতে হইত। সেলুলার জেলে প্রত্যেক কয়েদী বৎসরে একখানা চিঠি বাড়িতে লিখিতে পারিত এবং একখানা চিঠি বাড়ি হইতে পাইতে পারিত। এই এক বৎসরের মধ্যে কোন শাস্তি হইলে চিঠি লেখা বা পাওয়া বন্ধ থাকিত। পায়খানার [illegible] ছিল অদ্ভুত। [illegible] এক একটি [illegible] থাকিত। [illegible] মুখোমুখি করিতে হইত। কিন্তু নিচে পড়ার উপায় নাই, নিচে পড়িলেই শাস্তি। [illegible] অন্ধকার, জোরে পা দিয়া প্রথমে [illegible] খোঁজ করিয়া, ঘটের মুখ ঠিক করিয়া ক্রমে ক্রমে একটির পর আর একটি ত্যাগ করিতে হইত। এক সঙ্গে মল ও মূত্র ত্যাগ করিতে পারিবে না। প্রথমে একটির বেগ বন্ধ করিয়া অপরটি ত্যাগ করিতে হইবে। তিন মাস পর একদিন পায়খানার ঘট রাখার স্থানে চুনা লাগান হইত। আমরা সকলেই আস্তে আস্তে এই বিদ্যায় অভ্যস্ত হইয়া উঠিলাম।

সংগ্রাম শুরু হইল। সেলুলার জেলে দণ্ডিত বিপ্লবীদের উপরও অত্যাচার চলিতেছিল, কঠিন পরিশ্রমের কাজ, গালাগালি, প্রহার, হাতকড়ি-বেড়ি, বেত্রদণ্ড ইত্যাদি। রাজনৈতিক কয়েদীরা স্থির করিল আইন অমান্য করিবে, বাধা দিবে, পাল্টা আক্রমণ করিবে, আর সহ্য করা যায় না। একদিন পণ্ডিত পরমানন্দকে জেলারের সম্মুখে হাজির করিল, সে কথা শুনে না, বে-কাইল চলে। পরমানন্দ একজন রাজপুত যুবক। জেলারের ভুঁড়ি ছিল খুব মোটা, চলার সময় ভুঁড়ি আগে চলিত। প্রচলিত প্রথা অনুসারে জেলার পরমানন্দকে "শুয়ারকা বাচ্চা" বলিয়া অভ্যর্থনা করিল, পরমানন্দ হঠাৎ লাথি ও ঘুষি মারিয়া জেলার সাহেবকে ভূপাতিত করিল, সঙ্গে সঙ্গে জেলারের প্রহরী মেট-পাহারা ও সিপাহীর লাঠির ঘা পরমানন্দের উপর পড়িতে লাগিল। অজ্ঞান অবস্থায় পরমানন্দকে হাসপাতালে বহন করিয়া লইয়া গেল। কয়েক দিনের মধ্যেই পরমানন্দ সুস্থ হইলেন। জেলারকে প্রহার করার অভিযোগে পরমানন্দের ২০ ঘা বেত্রদণ্ড হইল। একদিন ছত্র সিং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে প্রহার করিলেন ছত্র সিং-এরও পরমানন্দের অবস্থা হইল। ছত্র সিংকে ডাণ্ডা বেড়ি দিয়া প্রায় চারি বৎসর নির্জন সেলে রাখা হইয়াছিল। তাহার স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভাঙিয়া গিয়াছিল। সেলুলার জেলে পূর্বে কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই, [illegible] সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট-এর [illegible]

কেহ হাত উঠাইবে। প্রহার খাওয়ার পর তাহাদের ইজ্জৎ নষ্ট হইল, সাধারণ কয়েদী-দেব নিকট রাজবন্দীদের সম্মান বৃদ্ধি পাইল। এখন জেলার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খুব সাবধানে চলেন, যেন কেহ আক্রমণ করিতে না পারে। ইতিমধ্যে আশুতোষ লাহিড়ীর ১৫ বেত এবং শচীন্দ্রনাথ সান্যালের ২০ বেত হইয়া গিয়াছে, অন্যান্য-দের প্রায়ই হাতকড়ি, ডাণ্ডা বেড়ি প্রভৃতি দণ্ড হইতেছে। রাজনৈতিক বন্দীরা এখন স্বাধীন, জেলের কোন আইন-কানুন মানে না, সাধারণ কয়েদীদের উপর অত্যাচার হইলে দলবদ্ধভাবে বাধা দেয়। সাধারণ কয়েদীদের সহানুভূতি রাজনৈতিক বন্দী-দেব উপরই ছিল। রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে শিখদের সংখ্যা ছিল বেশি এবং তাহাদেব প্রায় সকলের বয়সই ছিল চল্লিশের উপর। বাঙালীদের সংখ্যা ছিল ২৫ জন, তাহাদের বয়স ছিল চল্লিশ বছরের মধ্যে। আন্দামানে শিখেরাই সর্বা-পেক্ষা অধিক বীরত্ব দেখাইয়াছে, নির্যাতন ভোগ করিয়াছে। একদিন বৈকালে ৪টার সময় কাজ শেষ হইয়াছে, ভান সিং বারান্দায় পায়চারি করিতেছে, জেলার বেড়াইতে (রাউণ্ডে) আসিয়াছিল, তিনি ভান সিংকে পায়চারি করিতে দেখিয়া ধমক দিলেন, ভান সিং উচ্চৈস্বরে বলিলেন, "আমি কি তোমার বাবার মাথার উপর পায়চারি করিতেছি? কাজ শেষ হইয়াছে, পায়চারি করিতেছি।" পরদিন প্রাতে ভান সিংকে আফিসে লইয়া গেল, তাহাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করিল, অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে লইয়া গেল। কয়েকদিন পর সংবাদ পাওয়া গেল হাসপাতালে ভান সিং-এর মৃত্যু হইয়াছে। ভান সিং-এর এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের জন্য রাজনৈতিক বন্দীরা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু উপায় কি? বিভিন্ন ইয়ার্ডে গোপনে খবরাখবর চলিতে লাগিল, অবশেষে স্থির হইল, জেনারেল স্ট্রাইক করা হইবে এবং যাহারা সমর্থ হাঙ্গার স্ট্রাইক করিবে, রোগীরা বাদ যাইবে। আমি অসুস্থ ছিলাম, বন্ধুরা আমাকে উপদেশ দিলেন, স্ট্রাইকে যোগ না দিতে, আমি তাহাদের উপদেশ গ্রহণ করিলাম না, স্ট্রাইকে যোগ দিলাম। মোট ৭০ জন স্ট্রাইকে যোগ দিল। এই অপরাধের জন্য আমাদের প্রত্যেকের ৬ মাস ডাণ্ডা বেড়ি, ৬ মাস নির্জন সেল বাস, ৭ দিন খাড়া হাতকড়ি ও কম খাওয়া সাজা হইল। স্ট্রাইক চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে আমরা সংবাদ পাইলাম চীফ কমিশনার সাহেব আমাদিগকে দেখিতে আসিবেন। আমাদের মধ্যে স্থির হইল, প্রত্যেক ইয়ার্ডে একজন শান্তভাবে চীফ কমিশনারকে সকল ঘটনা বলিবে। অন্যান্য সকলে গালি দিবে। আমরা জানিতাম ফল কিছুই হইবে না। শান্তভাবে যাহারা আলাপ করিবেন, আমি তাহাদের মধ্যে একজন ছিলাম। নির্দিষ্ট তারিখে চীফ কমিশনার সাহেব আসিলেন, আমরা সেলে বন্ধ, বারান্দা দিয়া তাঁহারা চলিয়া যাইবেন, প্রচলিত প্রথা অনুসারে কেহ দাঁড়াইয়া সেলাম দিলে তাহার অভিযোগ শুনিবেন। তাহার সঙ্গে ছিল, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জেলার, এ্যাসিস্টেণ্ট জেলার বড় জমাদার, বন্দুকধারী ৬ জন সিপাহী, মেট-পাহারা, একটি ছোট প্রসেসন। চীফ কমিশনার যখন সদল বলে আমার সেলের সম্মুখে আসিলেন, আমি তখন দাঁড়াইয়া সেলাম দিলাম, তিনি আমার দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইংরাজীতে ধমক দিয়া বলিলেন, জেল তোমরা গণ্ডগোল তুলিতেছ? আমি ইংরাজীতেই উত্তর দিলাম। আমি শান্ত-ভাবে বলিলাম, ভান সিংকে প্রহার করা হইয়াছে, ফলে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ধমক দিয়া বলিলেন তাহাতে তোমার কি হইয়াছে? He is neither your cha-cha nor nana. (সে তোমার চাচাও নয় নানাও নয়) আমি বলিলাম, ভান সিং আমার রাজনৈতিক বন্ধু। তিনি আমার জেল হিস্টরী-টিকেট দেখিয়া So many names like porana chor. (পুরানা চোরের মত এতগুলি নাম) বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর একজন শিখের দরজার সম্মুখে যখন গেলেন, তখন চীফ কমিশনারকে তিনি ধমক দিয়া বলিলেন, তুমি এখানে কেন আসিয়াছ, তোমার মুখ দেখিতে চাই না, এখান হইতে চলিয়া যাও। প্রত্যেক ইয়ার্ডে এরূপ অভিনয় হইল।

স্ট্রাইকারদিগকে দুইবেলা খাওয়ার সময় সেল হইতে বাহির করিয়া প্রাঙ্গণে বসান হইত, তখন জেলের সমস্ত সাধারণ কয়েদীদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত যাহাতে স্ট্রাইকারদের সহিত তাহাদের দেখা না হয়। একদিন বৈকালে আমা-দিগকে খাওয়ার জন্য সেল হইতে বাহির করিয়াছে, সেই ইয়ার্ডে আমরা ৭।৮ জন ছিলাম, জেলার সাহেব পরিদর্শন করিতে বাহির হইয়াছেন। আমরা খাইতে বসি-য়াছি, এমন সময় জেলার আমাদের নিকটে আসিয়া সোহন সিংকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্যাইসে হ্যায় জী"? তিনি যদি আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, তবে আমি নিশ্চয়ই বলিতাম, ভাল আছি। সোহন সিং-এর বয়স ৬০ বৎসরের উপর হইবে। তিনি উত্তরে পাঞ্জাবী ভাষায় বলিলেন, এত কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তোমার মেয়ের বিবাহের জন্য বর খুঁজিতেছ কি? পায়ে বেড়ি, দিনরাত্র নির্জন সেলে বন্ধ, কম খাবার—আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ কেমন আছি? ঠাট্টা করিতে আসিয়াছ? লজ্জা নাই, নির্লজ্জ কোথাকার? এখান হইতে চলিয়া যাও। জেলার সদল বলে চলিয়া গেলেন। ইহা-দিগকে আর কত সাজা দিবে? সাজা দিলে যেন ইহাদের তেজ আরো বৃদ্ধি পায়।

আন্দামানে কোন পোস্ট আফিস ছিল না, একমাত্র সরকারী জাহাজ "মহারাজা" ছাড়া অন্য কোন জাহাজ আন্দামানে যাইতে পারিত না। ইতিমধ্যে কলিকাতার "বেঙ্গলী" কাগজে ভান সিং-এর মৃত্যু সংবাদ এবং সেলুলার জেলের স্ট্রাইকের সংবাদ বাহির হইল। স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি কাউন্সিলে প্রশ্ন করিলেন, [illegible] হইতে উত্তর দিল, ভান সিং-

এর [illegible] যুক্ত হইয়াছে,
কতকগুলি দুষ্ট আচার, বার্মার জেলের
দণ্ডধারীরা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারা
সেলুলার জেলে স্ট্রাইক করিয়াছে। আমা-
দের স্ট্রাইক চলিতে লাগিল, অবশেষে ৬
মাস পর, আমাদিগকে সেল হইতে বাহির
করিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে বেড়ি কাটিয়া
দিল। বেড়ি কাটার পর মনে হইতে
লাগিল, পা হালকা হইয়া গিয়াছে, চলিতে
ভয় হয়, যেন হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যাইব।
বেড়ির ওজন ৫ পাউণ্ড। আমাদের
সংগ্রাম চলিতে লাগিল। অমর সিং একজন
ইঞ্জিনীয়ার, বয়স ৫৫ বৎসর হইবে,
সিঙ্গাপুরে ছিলেন, বার্মা ষড়যন্ত্র মামলায়
ফাঁসির হুকুম হয়, পরে যাবজ্জীবন
দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং সেলুলার
জেলে প্রেরিত হন। একদিন তাঁহাকে
প্রহার করিয়া, ডাণ্ডা বেড়ি পরাইয়া নির্জন
সেলে রাখিল। এরূপ অবস্থায় তিনি
দুই বৎসর ছিলেন, তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া
পড়িয়াছিল। সেলুলার জেলে পৈতা
রাখার নিয়ম নাই। আমরা যখন
পৌঁছিলাম, জেলের ভিতর প্রবেশ করার
পূর্বেই তল্লাসী সুরু হইল, আমার,
শচীন্দ্র সান্যাল এবং খগেন চৌধুরীর
পৈতা কাড়িয়া রাখিয়া দিল, বলিল পৈতা
রাখার হুকুম নাই, সাভারকারবাবু, উপেন-
বাবু প্রভৃতি কাহারও পৈতা নাই।
সাভারকারবাবু, উপেনবাবুর পৈতা নাই
সংবাদে আমরা কতকটা আশ্বস্ত হইলাম।
পৈতার উপর আমাদের খুব বেশি টান ছিল
না। কিছুদিন পর বার্মা ষড়যন্ত্র মামলায়
দণ্ডিতদের চালান যখন আসিল, তাঁহাদের
মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত রাম রক্ষা, তিনি
হিন্দুস্থানী গোঁড়া ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার
যখন পৈতা কাড়িয়া লওয়া হইল, প্রতিবাদে
তিনি হাঙ্গার স্ট্রাইক করিলেন। তিনি
বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ, পৈতা না থাকিলে
আমি অন্ন-জল গ্রহণ করিতে পারি না"।
তিনি দুই মাস অনশন অবস্থায় ছিলেন,
সেলুলার জেলে তাঁহার মৃত্যু হইল,
তাঁহাকে পৈতা দেওয়া হইল না। বার্মা
ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিতদের মধ্যে বুড়া
সিং ছিলেন, তাঁহার জেল হিস্টরী-টিকেট
ছিল, পূর্ব ইতিহাস তাহাতে লেখা ছিল,
তিনি ব্যাঙ্ককের একজন প্রসিদ্ধ ধনী
ব্যবসায়ী। বৃদ্ধ বুড়া সিংকেও কঠিন
পরিশ্রমের কাজ করিতে হইয়াছিল এবং
ডাণ্ডা বেড়ি পায় দিতে হইয়াছিল। বার্মা
ষড়যন্ত্র মামলায় আলি আহম্মদ এবং
মোহম্মদ মোস্তাফা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর
দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া সেলুলার জেলে
প্রেরিত হন। তাঁহারা স্ট্রাইকে যোগদান
করিয়াছিলেন এবং হাতকড়ি, ডাণ্ডা বেড়ি
প্রভৃতি শাস্তি ভোগ করেন। বুদ্ধদেশের
অন্তর্গত [illegible] বিদ্রোহের নেতা, জ্যাকো
চীফ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত
হইয়া সেলুলার জেলে প্রেরিত হইয়া-
ছিলেন। তাঁহাকে আনিতে দেওয়া হইয়া-
ছিল, পরে বাহিরে পাঠান হয়। তিনি
কোন কথা বুঝিতেন না, বার্মা ভাষাও
ভাল জানিতেন না। তাঁহার Previons
History ছিল—একজন জ্যাকো চীফ,
কাঠের এবং বাঁশের কেল্লা তৈয়ার করিয়া
গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছেন
তিনি হকা বিদ্রোহের নেতা।

[ক্রমশঃ]

তিস্তার বাঁধ রক্ষায় উপদেষ্টা পর্ষদের পরামর্শ শোনা হয়নি।
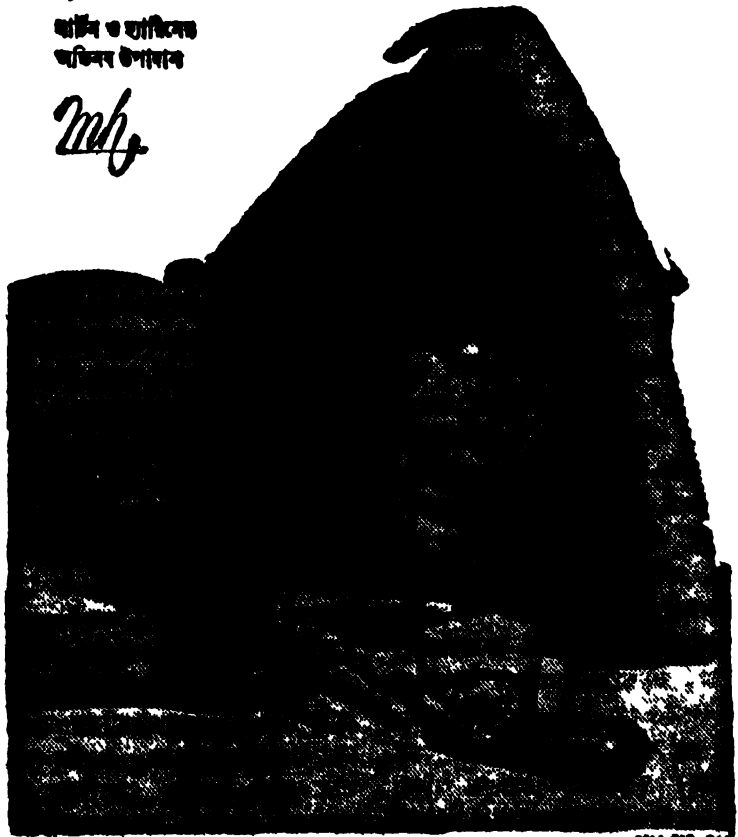
দুষ্টচক্রের আধিপত্যে ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের লক্ষ লক্ষ টাকা লোকসান / বন্যা এলাকায় সাহায্য বন্টনে পক্ষপাতিত্ব, সরকারী অফিসারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ / হাওড়ার গ্রামে আবার রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড / পুরুলিয়ায় পুলিশের লাঠিচার্জ, লোকদলের সভা পণ্ড / ঘুষ নেওয়ার প্রতিবাদ করায় বারুইপুরে পুলিশের তাণ্ডব /

বঙ্গদর্শন

গত সংখ্যার সাপ্তাহিক বসুমতীতে উত্তরবঙ্গের বন্যা সম্পর্কে বিভিন্ন লেখকদের রচনায় যেসব তথ্যের পরিচয় পাওয়া গেছে, তাতে যে-কোন সাধারণ বুদ্ধির মানুষই দ্বিতীয়বার আতঙ্কে উঠবেন। অপদার্থ ও হৃদয়হীন প্রশাসন, নির্বোধ পরিকল্পনা, দুর্নীতি ও কায়েমী স্বার্থ সমগ্র দেশটাকে কোথায় এনে ফেলেছে, জলপাইগুড়ির বন্যায় আরও একবার তার নিদর্শন নতুন করে পাওয়া গেল।

পশ্চিমবঙ্গের নদী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ শ্রীকপিল ভট্টাচার্য যা লিখেছেন তার সার মর্ম হচ্ছে, জলপাইগুড়ির বন্যা শেষ নয়। শুরু। তিনি খোলাখুলি বলেছেন, যেভাবে নদী পরিকল্পনাগুলি করা হয়েছে তাতে বন্যা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে বন্যা বিস্তারিত হচ্ছে, এবং সামগ্রিকভাবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নদী পরিকল্পনা না করলে ভবিষ্যতের জন্য আরও অনেক বিপর্যয় অপেক্ষা করছে। আমেরিকার চারা ভারতের টবে বাঁচে না, অথচ নদী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে তাই করা হয়েছে, এবং এরই ফল ফলেছে, ফলছে ও ফলবে।

শ্রীতুষার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন: সারা দেশের মানুষ আজ এই প্রশ্নই করছে, উত্তরবঙ্গের এই সর্বনাশ কি কিছুতেই ঠেকানো যেত না? ঠেকানো যে যেত তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের অবহেলার জন্যই তা সম্ভব হয় নি। "প্রথমত, প্রশাসনিক বিভাগের অবহেলা বন্যা-সংকেত সেচ বিভাগের কাছ থেকে পেয়েও সাধারণ লোককে তা না জানানো। দ্বিতীয়ত, অতিবৃষ্টির সংবাদ ভালভাবে জানতে পেরেও সেচ বিভাগ বুঝতেই পারে নি যে, এর ফলে আকস্মিক প্রবল বন্যা হতে পারে। তৃতীয়ত, আবহাওয়া অফিস বর্ষণক্ষেত্রের সম্বন্ধে যে পূর্বাভাষ দিয়েছে তার মধ্যেও সাধারণ অতিবৃষ্টিপাত ছাড়া আর কিছু গুরুতর বিপদের সংকেত ছিল না। চতুর্থত, তিস্তা প্রভৃতির বাঁধের শক্তি সম্বন্ধেও সংশ্লিষ্ট ইঞ্জিনীয়ারদের কোন নিশ্চিত জ্ঞান ছিল না। এবং পঞ্চমত, যা সবচেয়ে মারাত্মক, প্রত্যেক বিভাগই মনে করেছেন যে, তাঁদের কোন ত্রুটি হয় নি, তাঁরা যা বোঝেন তা ঠিকই।"

জলপাইগুড়ি প্রত্যাগত জনৈক সাংবাদিক লিখেছেন: মাতব্বর অফিসারেরা সেচ বিভাগের বিপদসংকেত পেয়ে শহরবাসীদের সতর্ক করেন নি, কিন্তু নিজেরা শিলিগুড়ি পালিয়ে গিয়েছিলেন। একজন অফিসারের কথা জানি যিনি তাঁর মোটরগাড়িটিও বাঁচাতে পারেননি বলে মর্মাহত। উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই শহরটির ধ্বংসাবশেষ দেখতে রাজী হন নি, কারণ তাহলে তাঁকে পায়ে হাঁটতে হত। শ্রীদেশাই ও রাজ্যপালের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ জানিয়েছে জলপাইগুড়ি। তাঁদের ধিক্কার দিয়েছে। ভি-আই-পি-গণ ক্রুদ্ধ জনতার তাড়া খেয়ে পালিয়েছেন মিলিটারী কার করে। উপ-প্রধানমন্ত্রী সহ তাঁরা বাগডোগরায় নেমে শিলিগুড়ির আর্মি মেসে খানাপিনা করেছেন। সেখানে খানাপিনার টেবিলে ছিল: সালাড, পোলাও, সাদা ভাত, মটন রোগানজোস, চিকেনকারী, মাছ ভাজা, মটর-পনির, দই-রায়তা, পুরি, আলু কপির তরকারী, আলুর কাটলেট, অড়হর ডাল, কলা, আপেল ও কমলা লেবু, সফ্‌ট এবং হার্ড দু'রকম পানীয়। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

চোমং লামা লিখেছেন: দার্জিলিং থেকে রাজ্যপাল জলপাইগুড়ির অধিবাসীদের জন্য যে সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন তার কথাও বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে, প্রকাশিত হয়েছে মহাপ্লাবনের চিত্র আবণ, সামরিক বাহিনীর তৎপরতার বিবরণ। অথচ ১০ই অক্টোবরের আগে কোনও সামরিক বা বেসামরিক সাহায্য গিয়ে পৌঁছয় নি। সামরিক বাহিনী জলপাইগুড়ির উপকণ্ঠে ছাউনি ফেলে ১০ই অক্টোবর পর্যন্ত হয় তাস খেলেছে না হয় ট্রানজিস্টর খুলে আকাশবাণী গৌহাটির প্রোগ্রাম শুনেছে। অজস্র সারকামস্ট্যানসিয়াল এভিডেন্স তুলে ধরে শ্রীলামা একটি তাৎপর্যজনক প্রশ্ন তুলেছেন, "বন্যা আসার আগে থেকে বন্যাপ্লাবিত হওয়ার পর এক সপ্তাহ পর্যন্ত জলপাইগুড়ি জেলার হতভাগ্য মানুষগুলিকে নিয়ে কোনও অসুস্থ এবং কুট রাজনীতি কাজ করেছিল কি?"

ত্রাণকার্যের নামে যে প্রহসন উত্তরবঙ্গে চলছে সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শ্রীকৃত্তিবাস ওঝা লিখেছেন: "মাননীয় রাজ্যপালকে যদি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করা যায়—রাজ্যে নির্বাচিত সরকার নেই, বিধানসভা নেই, জনপ্রতিনিধি বা মন্ত্রী নেই, মানুষ তার অভাব-অভিযোগের কথা কাকে জানাবে আর কিভাবে জানাবে? অভিযোগ জানানোই কি রাজনীতি? কিন্তু তিনি কেন একটা অতি সামান্য কাজ করতে পারলেন না? সেই কাজটি হল সকল দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একটি বৈঠক। জাতীয় বিপর্যয়ের জাতীয় উদ্যোগে মোকাবিলা করতে হবে এই কথা ভেবে সমস্ত জাতির প্রতিনিধি হিসাবে সর্বদলের প্রতিনিধিদের নিয়ে কি করা যায়, কি করলে ভাল হয়, কিভাবে সকলকে সঙ্গে নিয়ে সকলকে সহযোগী হিসাবে পেয়ে কাজ করা যায়—সেই কাজ করলেন না। এইসব দলই তো আইনসভা পরিচালনা করে। এইসব দলের লোকেরাই তো জনপ্রতিনিধি হিসাবে কাজ

[illegible] তাদের সকলকে ডেকে একবার বসলে বা সকলকে নিয়ে একটা পরামর্শদাতা কমিটি করলে, তাতে শ্রীধরমবীরের কি [illegible] হত ! আজ কেন সব দলকে [illegible] করে [illegible] [illegible] হবে ? [illegible] কেন প্রধানমন্ত্রীর [illegible] [illegible] [illegible] নিয়োজিত করতে [illegible] দিয়ে উমেদারী করতে হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা, এমন কি স্বয়ং চ্যবন [illegible] নেতাদের বাড়ি গিয়ে, শ্রীমতী গান্ধী দিল্লী থেকে টেলিফোনে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন, কিন্তু রাজ্যের রাজনীতির অন্যতম প্রধান শক্তি যুক্তফ্রন্টকে কেন সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করার প্রবণতা দেখানো হয় ? শ্রীহুমায়ুন কবিরকে শ্রীধরমবীর বিমান-সঙ্গী করে ভ্রমণ করতে পারেন আর যুক্তফ্রন্ট নেতারা অনুরোধ করলেও দেখা পাবেন না—এই নীতি কি করে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে ? যে রিলিফ কমিটি কংগ্রেস থেকে সব জেলায় গঠন করা হয়েছে, সেই রিলিফ কমিটিকে জলপাইগুড়ির বিভাগীয় কমিশনার এবং ডি-আই-জি অনুমোদন করলেন, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রীপরিমল ঘোষ বিনা ভাড়ায় সে কমিটির মাল বহনের ছাড়পত্র দিলেন—কিন্তু যুক্তফ্রন্ট জেলায় জেলায় ত্রাণ কমিটি করা সত্ত্বেও তাঁদের স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠা কেন ? .....সরকারের কাছে একজন স্বীকৃতি পাবে, সহযোগিতা পাবে আর একজন দূরে থেকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখবে—এই কাজ কি করে সম্ভব হবে ? ......মুখে ত্রাণ নিয়ে রাজনীতি করো না বলা, আর কাজে রাজনীতির বাপান্ত করব—দুটো কাজ একসঙ্গে চলে না, অন্তত পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে একেবারেই অচল।

মেদিনীপুরের বন্যাপীড়িত অঞ্চল থেকে সাহায্য প্রত্যাহার

দেশের দৃষ্টি যে মুহূর্তে জলপাইগুড়ির দিকে আকৃষ্ট হয়েছে, ঠিক সেই একই মুহূর্তে রাজ্য সরকার মেদিনীপুরে থেকে যাবতীয় সাহায্যমূলক কাজকর্ম কার্যত প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে কোন একটি এলাকার যে-কোন কারণেই জনজীবনে বিপর্যয় নেমে আসুক না কেন, যতদিন তা নিয়ে হৈ-চৈ করা হবে ততদিন সাহায্যের নামে ছিটে-ফোঁটা সেই এলাকার ভাগ্যে জুটবে, কিন্তু যে মুহূর্তে অপর কোন বৃহত্তর ঘটনা জনসাধারণকে পূর্বের বিপর্যয়গুলি ভুলিয়ে দেবে, সরকারও নিঃশব্দে প্রয়োজন দুর্গত মানুষগুলির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন। অর্থাৎ এই বন্যায় সরকার যে ত্রাণকার্য করেন তা [illegible] [illegible] দেখানো। বিশেষ করে [illegible] [illegible] [illegible] নির্বাচিত [illegible]

সাপ্তাহিক বসুমতী

উত্তরবঙ্গ বন্যা ত্রাণ কমিটির তহবিলে দান

১৬১·৫৬ টাকা : স্বামীজী সঙ্ঘ, ৭৫।২।১এ হরি ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৬।

প্রত্যেকে ১০১·০০ টাকা : হরিহর দত্ত, ৪৩, নলিনী শেঠ রোড, কলকাতা-৭। খেজালী, মণিরামপুর, সাধু খাঁ পাড়া (ব্যারাকপুর)। অশোককুমার সেন, নিউ দিল্লী।

১০০·০০ টাকা : পি সি চন্দ, ৮, কুইন্স পার্ক, কলকাতা।

৬১·০০ টাকা : কিশোর সমিতি, উত্তর লক্ষ্মীপুর, আসাম।

প্রত্যেকে ৫০·০০ টাকা : জি এ খান, ফিলিপ কার্বন ব্ল্যাক লিঃ, দুর্গাপুর। মনোজ বসু, কলকাতা-২৯। মহাদেবলাল তুলসান, কলকাতা-১। ডাঃ নীহার মুন্সি, কলকাতা-১৯।

৩২·০০ টাকা : 'দিশারী', বারুই-পুর, চক্রবর্তীপাড়া (২৪-পরগনা)।

৩০·০০ টাকা : হীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত, গোল পার্ক, কলকাতা।

২৫·০০ টাকা : অশোক সেন (শিলালি), কলকাতা-২০। অজিত রায়, কলকাতা-১৯।

প্রত্যেকে ২১·০০ টাকা : অজয়কুমার সুর, কলকাতা-১৪। সুন্দর এডভ্যানী, ৩৭, কুইন্স ম্যানসন, কলকাতা।

প্রত্যেকে ২০·০০ টাকা : শিশির-কুমার সুর, কলকাতা-১৪। মল্লিকা ঘোষ, নিউ দিল্লী।

১৬·০০ টাকা : সম্মিলনী ক্লাব, শেঠ কলোনী, দমদম।

প্রত্যেকে ১৫·০০ টাকা : হরেন ঘোষ, কলকাতা। নির্মলাশিস সেন, কলকাতা। গোপাল রায়চৌধুরী, কলকাতা।

প্রত্যেকে ১০·০০ টাকা : এ কে সিংহ, তিনসুকিয়া (আসাম)। নরেন ভট্টাচার্য, জোড়ঘাট, চুঁচুড়া। কলকাতা থেকে গোপাল ভৌমিক, সনৎকুমার ঘোষ, মানস-কুমার চন্দ্র, ডাঃ অমিয়কুমার হাটি, ইন্দুপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়। চন্দনপুকুরী (২৪-পরগনা) থেকে নীহারকণা দাস, টিটাগড় জুট মিলের হেমন্তকুমার রায়।

প্রত্যেকে ৫·০০ টাকা : মধ্যমগ্রাম থেকে ডাঃ গিরীন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী। দুর্গাপুর থেকে মণি মৈত্র। কলকাতা থেকে নন্দিতা ভৌমিক, সন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্ত সাহা, মৃত্যুঞ্জয় সিংহ, পি বড়ুয়া বেকারী, অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্য, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়, পঞ্চানন হাজরা, পি কে মুখার্জী, প্রদীপকুমার চন্দ্র, প্রবীরকুমার চন্দ্র, [illegible]

জনসাধারণের সামনে এমন কেউ নেই যার কাছ থেকে কৈফিয়ৎ দাবি করা যেতে পারে। সেই সুযোগে রাজ্যপালের প্রশাসন যা ইচ্ছা তাই করছে। মনে রাখতে হবে যে মেদিনীপুরের, হুগলী জেলার কোন কোন অংশে, বর্ধমানের কালনায় এবং পশ্চিমবঙ্গের আরও বহু স্থানে এবারে প্রলয়ঙ্কর বন্যা হয় যার ফলে জনজীবনে যে ক্ষতি হয়েছে তা সহজে পূরণ হবার নয়। এই সব অঞ্চলে রাজ্যপালের প্রশাসন ত্রাণ-কার্যের জন্য কিছুই করে নি বলা চলে। আমাদের স্মরণে আছে মেদিনীপুরের বন্যার সময় সরকারী অফিসারেরা তিন-দিন শুধু বৈঠক করেই কাটিয়েছিলেন, সাহায্য নিয়ে ছুটে যাবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। শেষ পর্যন্ত ত্রাণকার্যের নামে কয়েকটি লঙ্গরখানা খোলা হয়েছিল, যাই হোক তাতে কারো কারো পেটে একমুঠো পড়ছিল, কিন্তু এখন তা-ও বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। ক্ষুধিত বন্যার্ত এই মানুষগুলি এখন দলে দলে গ্রামত্যাগ করে নিকটবর্তী শহরসমূহে ভিক্ষাবৃত্তি অব-লম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। ভিক্ষুকের জাতি হিসাবে আমরা জগৎসভায় পরিচিত, এবং সেই জাতির সরকার মানুষকে পেশা-দার ভিক্ষুকে পরিণত করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না, সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয়।

যথেষ্ট হয়েছে

বলা হত, যুক্তফ্রন্টের আমলে কোন-রকম আইন-শৃঙ্খলা ছিল না, যুক্তফ্রন্টের নীতির ফলে শ্রমবিরোধ বেড়ে গিয়ে শিল্পে অশান্তি ঘটছে এবং দেশকে নাকি সেইসব অবস্থা থেকে মুক্তি দেবার জন্যই রাজ্যপালের শাসন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

আইনশৃঙ্খলা কথাটি আপেক্ষিক, তথাপি যদি ওই উদ্দেশ্যেই রাজ্যপালের শাসন প্রবর্তিত হয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। খুন, জখম, ডাকাতি ও অপরাধের যে রেকর্ড রাজ্য-পালের এক বছরের শাসনে হয়েছে, তার তুলনা অতীতে খুঁজে পাওয়া ভার। পার্ক স্ট্রীট ডাকাতির আজও কোন কিনারা হল না। আবার নতুন করে বেলঘরিয়া জেগে উঠেছে রাজ্যপালের আমলে, মাত্র সাত দিনও হয় নি বেলঘরিয়ার জনবহুল পল্লী বান্ধবনগরে এক নারকীয় হত্যা-কাণ্ড হয়ে গেল। রাজনৈতিক হত্যা-কাণ্ডও বড় কম হচ্ছে না, মাত্র কিছুদিন আগেই বেলেঘাটায়, বাগনানে হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, হত্যাকারীদের একজনকে জনৈক কাউন্সিলরের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জনজীবনেও কোন শান্তি নেই, সামান্য কারণেই অস্ত্র লাঠিবাজি গুলী-বাজি লেগে আছে। রাজ্যপালের প্রশাসন [illegible] [illegible] [illegible], কিন্তু [illegible]

[illegible]রের প্রশাসন চরমতম সীমায় পৌঁছেছে। এই সেদিন দুর্গাপুরে যে স্যাবোটাজের ঘটনা ঘটে গেল, সে ব্যাপারেও সকলকেই দেখছি নীরব। যেহেতু ওই ইউনিয়ন আই-এন-টি-ইউ-সি'র অধিকারভুক্ত, সেই হেতু ওই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অপরাধীরা পার পেয়ে গেল, এবং খোদ ডিরেক্টার সাহেব, যিনি সুস্পষ্টভাবে দুর্গাপুর কারখানার অভ্যন্তরে স্যাবোটাজের অভিযোগ এনেছিলেন, লাঞ্ছিত ও নিন্দিত হলেন। রাজ্যপালের আমলেই রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ধর্মঘট হল। এছাড়া ছাঁটাই, লক আউট ও লে-অফ প্রতিনিয়ত যে হারে হচ্ছে তা পূর্বের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। শ্রমবিরোধের ঘটনারও সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে, ধর্মঘটের সংখ্যা তিনগুণ বেড়েছে। ক্ষুদ্র শিল্পগুলি বন্ধ হতে বসেছে।

প্রশাসনিক দক্ষতার বিন্দুমাত্র বৃদ্ধি রাজ্যপালের আমলে হয় নি। আশা করা গিয়েছিল যে দলীয় শাসনের চাপ থেকে মুক্ত হয়ে সরকারী অফিসাররা অধিকতর কুশলতার পরিচয় দিতে পারবেন। কার্যত দেখা গেল ঠিক বিপরীত। মেদিনীপুরের বন্যায় সরকারী অপদার্থতার চরম নিদর্শন দেখা গিয়েছিল, চরমতম ও নিষ্ঠুরতম দেখা গেছে জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রে। সে ইতিহাস আজ গোপন নেই। পশ্চিমবঙ্গের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে রাজ্যপাল সঙ্গতি রাখতে পারেন নি। রাজনীতির ব্যাপারে তিনি গোড়া থেকেই মাত্রাধিক ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছিলেন এবং সেই কারণে তিনি জনসাধারণের খুব প্রিয় ছিলেন না। তথাপি আশা করা গিয়েছিল যে নিজের হাতে সম্পূর্ণ অধিকার লাভের পর তিনি ও তাঁর প্রশাসন পশ্চিমবঙ্গের জন্য কার্যত কিছু করবেন, কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হয়েছে।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণেও রাজ্যপালের প্রশাসন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। চাল ছাড়া প্রতিটি পণ্যেরই মূল্যবৃদ্ধি রাজ্যপালের আমলে ঘটেছে, এবং এক্ষেত্রে নির্বাক দর্শকের অভিনয় করা ছাড়া রাজ্যপাল ও তাঁর প্রশাসন কিছুই করে নি। অবশ্য চালের মূল্য গতবারের চেয়ে যে অনেক কম, তার জন্য দাবী রাজ্যপাল নন, এ বছরের অপর্যাপ্ত ফসল। অথচ এই অপর্যাপ্ত ফসলের বছরেও রেশনিং এলাকার মানুষদের কালোবাজার থেকে চাল কিনে খেতে বাধ্য করার মধ্যে রাজ্যপালের কৃতিত্বের অভাবই সূচিত হয়। কালোবাজারে চালের দাম কমেছে যদি এই ঘোষণাপত্র জারি করে রাজ্যপাল-শাসনের গুণগান করতে হয়, যা সম্প্রতি করা হচ্ছে, [illegible] রয়।

স্বাস্থ্য অধিকর্তার উদ্যোগে অভিনন্দন

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য অধিকর্তাকে ধন্যবাদ, অবশেষে তিনি সত্যই ঘুঘুর বাসায় আঘাত করতে শুরু করেছেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের জঞ্জাল সাফ করা বড় সহজ কথা নয়, দীর্ঘকাল ধরে নানাধরণের কায়েমী স্বার্থ স্বাস্থ্য দপ্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, এবং এ-বিষয়ে আমরা দীর্ঘকাল ধরেই অভিযোগ করে এসেছি। আমরা স্বাস্থ্য অধিকর্তার একজন ঘনিষ্ঠ কর্মচারীর কথা ইতিপূর্বে কয়েকবার বলেছি, যিনি পূর্বতন স্বাস্থ্য অধিকর্তার আমলে নিয়োগ-বদলী ইত্যাদির ব্যাপারে একটি রীতিমত দুর্নীতিপূর্ণ ব্যবসা খুলে বসেছিলেন। সম্প্রতি সংবাদ এসেছে যে, তাঁর ক্ষমতা সঙ্কুচিত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরকে এখনি ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন, এবং খোদ স্বাস্থ্য অধিকর্তা এদিকে কিছুটা নজর দিয়েছেন দেখে আমরা আশ্বস্তবোধ করছি। আশা করি অতঃপর তিনি আরও সজাগ হবেন এবং এই দপ্তরটির বহুদিনের দুর্নাম ঘুচিয়ে তাকে সত্যকারের একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তুলবেন।

রাস্তাই একমাত্র রাস্তা

সুখদেব চট্টোপাধ্যায়
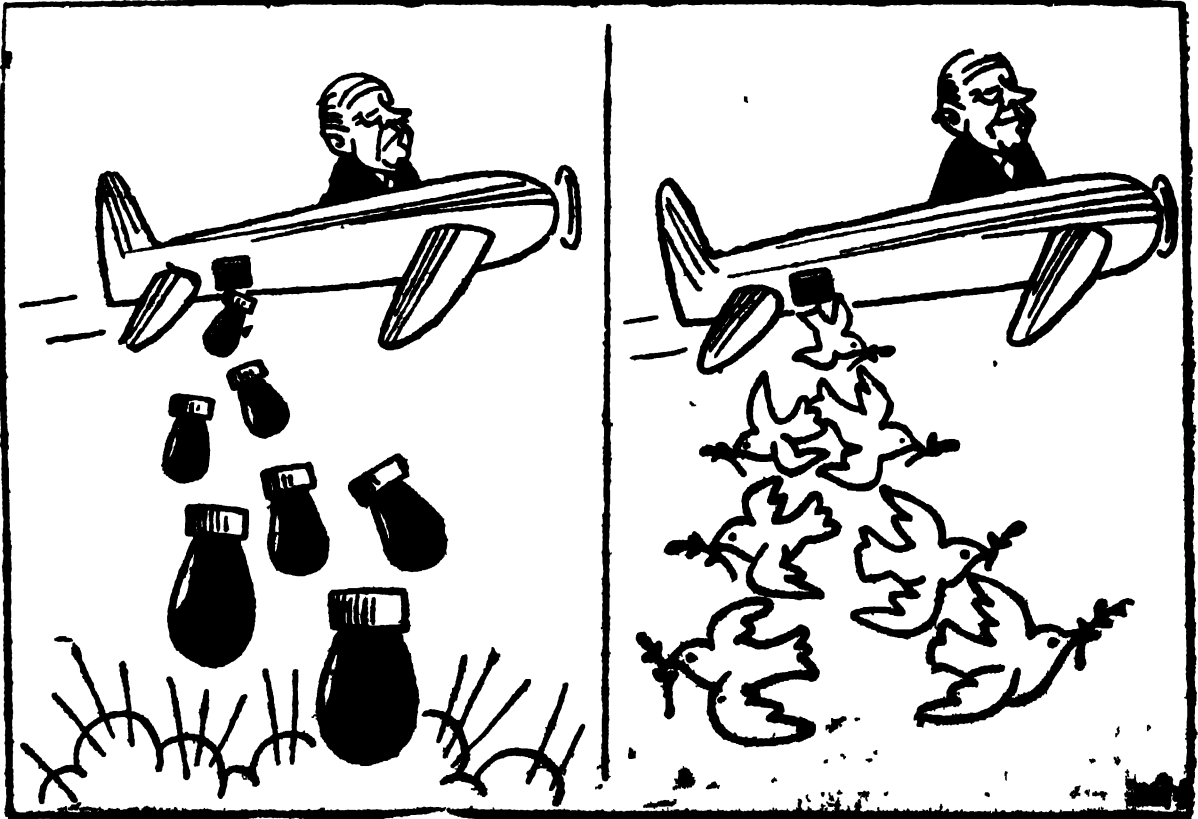
এক বছর আগে এমনই একটি দুর্দিনে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় আহ্বান জানিয়েছিলেন, এখন রাস্তাই একমাত্র রাস্তা। এই আহ্বানের অর্থটি অত্যন্ত স্পষ্ট, মানুষ এবং মনুষ্যত্ববোধ যখন কোন ঘটনা বা চক্রান্তের দ্বারা সরাসরি আক্রান্ত হয়, তখন কোনো বিবেকবান মানুষেরই উপায় থাকে না, রাস্তাকে অগ্রাহ্য করার। রাস্তায় তাকে নেমে আসতেই হয়, সে ফ্যাসিজমের প্রতিরোধের জন্যই হোক, অথবা বন্যার্তদের বাঁচানোর আবেদন জানাতেই হোক। সে মানুষ কবি, শিল্পী, সাংবাদিক, চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক অথবা অধ্যাপক, যা-ই হোন না কেন, রাস্তা তাকে সংগত কারণেই ডাক দেয়: 'বিপন্ন মানুষের সামিল হও, আক্রান্তদের বাঁচবার লড়াইয়ে তুমিও অংশ নাও।'

তাই উত্তরবাংলার ভয়াবহ দুর্দিনগুলিতে বাংলা দেশের সাধারণ মানুষ সবাই আজ আর রাস্তাকে বাদ দিয়ে তাঁদের প্রতিরোধের কথাটি কল্পনা করছেন না। অন্তত সেইসব মানুষ, যাঁরা দেশের শিল্পী, কবি বৈজ্ঞানিক এবং মানুষকে নিরাময় করাই যাঁদের ব্রত সেই চিকিৎসক এবং সমাজসেবীরা। বন্যাকে নিয়ে একটি কবিতা অবশ্যই লেখা যায়, একটি কেন, অনেক কবিতা। সেই কবিতাতেই বন্যাত্রাণের সাহায্য থাকতে পারে। রাস্তায় না নেমেও এই কাজে টাকা দিয়ে, কাপড় দিয়ে, সাহায্য করা যায়। কিন্তু তাতেই কি মানুষের সব কর্তব্য ফুরিয়ে যায়? এই প্রশ্নের মুখোমুখি সাপ্তাহিক বসুমতীর ডাকে রাস্তায় নেমে এসেছেন কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র, দিনেশ দাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, গোপাল ভৌমিক, সুশীল রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, অরুণ ভট্টাচার্য, সিদ্ধেশ্বর সেন, এবং আরো তরুণ যাঁরা। বন্যাত্রাণে মেডিকেল মিশন কোমর বেঁধেই কাজে এগিয়েছেন। তবু ডাঃ নীহার মুন্সী, ডাঃ অমিয়কুমার হাটিয়া ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে পথে না বেরিয়ে পারেন নি। এ যে বিবেকের তাড়না। মনোজ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তিপদ রাজগুরু, প্রাণতোষ ঘটক বা তরুণতর কথাসাহিত্যিকরা কি পারতেন না বন্যা-বিষয়ক একটি ছোট গল্প লিখে সুখী থাকতে? কিন্তু তাঁরা পারলেন না। পারলেন না আশা দেবী, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় অথবা জয়ন্তী সেন ঘরের মধ্যে বসে থাকতে—শুধু লেখা দিয়েই এই দারুণ দুর্দিনে বন্যাপ্রতিরোধের কাজে কিছু করেছি, এই ভেবে নিশ্চিন্ত হতে।

আমরা তিনদিনের পথপরিক্রমায় এইসব কথাসাহিত্যিক ও কবিদের দেখেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে হাঁটতে, অম্লান-বদনে যে-কোন বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে

একটি পয়সা

বন্যার্তদের জন্য সাপ্তাহিক বসুমতীর ডাকে শিল্পী, সাহিত্যিক এবং তাঁদের পুত্র-কন্যারা কলকাতার রাস্তায় বের হয়েছেন। ঘুরতে ঘুরতে একটি বাড়ির সামনে এলেন তাঁরা। মা নিয়ে এলেন কাপড়-চোপড় আর তাঁর শিশু কন্যাটি একটি পয়সা। মাকে লুকিয়ে সে পয়সাটি দিচ্ছে, কিন্তু ধরা পড়ে গেল। মা একটু হেসে বললেন, 'তুই আবার কি দিচ্ছিস?' 'আমার পুতুলের বাক্স থেকে দিয়েছি।'—শিশুটি উত্তর দিল।

এই ধরণের একটি পয়সা, যা পুতুলের কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া, কিন্তু অনেক পাঁচ-দশ টাকা দানের চেয়ে কম মূল্যবান নয়। অন্তত কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় গত কয়েক সপ্তাহ ধরে যেসব শিল্পী ও সাহিত্যিক ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে বেরিয়েছিলেন, তাঁদের কাছে এই সব ঘটনার অনেক মূল্য; কেন না এই একটি পয়সাতেও সেই মনুষ্যত্বের সোনা লেগেছে, যা দুর্দিনে আমাদের বেঁচে থাকার একমাত্র পাথেয়।

পথ-পরিক্রমার সুরুতে : বাঁদিক থেকে— সাঃ বঃ বন্যাত্রাণ কমিটির সম্পাদিকা, সবিতাব্রত দত্ত ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

থেকে ওপর থেকে ফেলে দেওয়া পুরোনো কাপড় ও কম্বল কুড়োচ্ছে। দেখেছি নারায়ণ চৌধুরীর হাত ধরে তাঁর কিশোর পুত্র কেমন ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তায় রাস্তায় দুর্ভিক্ষের অন্ন ও বস্ত্র ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছেন। দেখেছি কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র-কন্যাদেরও। একদিন নয়, তাতে তাদের তৃষ্ণা মেটে না। শুধু রোববারের মিছিলে নয়, তারপরও এরা মোট বয়ে এনেছে সাপ্তাহিক বসুমতীর দপ্তরে; বলেছে, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরছে তারা। আরো এনে দেবে।

তাই মনে হয়, আসলে দুর্দিন যখন আমাদের সামনে থেকে আক্রমণ করে, তখন রাস্তায় বেরুনো ছাড়া সত্যি আমাদের উপায় থাকে না। সবিতাব্রত দত্ত, প্রতি রোববারেই যাঁর দুটি করে থিয়েটারের শো থাকে, পর পর তিনটি রোববার দুপুর বারোটা, একটা পর্যন্ত কী করে ঘুরেছেন কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় একটিই ভিক্ষার আবেদন নিয়ে? মানুষের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা ছাড়া কী করে তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা কথকতা, গান, সাহায্যের আবেদন করে যাওয়া; এবং তাতেও খুশি না হয়ে অবশেষেই ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে রাস্তায় নেমে আসা?

সাপ্তাহিক বসুমতীর ডাকে সাড়া দিয়ে কত গুণী মানুষ এইভাবে পথে নেমে এসেছিলেন। ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়েছিলেন তাপস সেন, কাজি সব্যসাচী, অশোক সেন (শিল্পাদি), শিল্পী ইন্দু মুখোপাধ্যায়, অপরাজিতা গোপ্পী, ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও কল্পতরু সেনগুপ্ত। আর সাপ্তাহিক বসুমতীর সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠ, তাঁরা তো সমস্ত দুর্ভোগকেই নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

এইসব শিল্পী, সাহিত্যিক, কর্মীদের অজস্র ধন্যবাদ, কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য তাঁরাই পালন করেছেন। অন্য অজস্র আরো প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসছেন, এগিয়ে আসবেন, কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় আরো কবি, সাহিত্যিককে নিয়ে মিছিল করতো। তাঁদের প্রতিও আমাদের অভিনন্দন রইলো। এবং আমরা একথাও স্পষ্ট অনুভব করি যে উত্তরবাংলার ভয়াবহ সর্বনাশের মোকাবিলা করতে হবে বাংলা দেশের মানুষকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধরে।

সাপ্তাহিক বসুমতীর প্রতি আমাদের এ প্রসঙ্গে একটি আবেদন রইলো, তাঁরা যেন মানুষ এবং দুর্যোগের পক্ষে আজকের মতোই চিরদিন এগিয়ে আসতে পারেন; এবং এ কাজে ক্লান্ত না হন।

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] জনাটির [illegible] হচ্ছে 'Death by drowning.' পাঠক আমাকে ভুল বুঝবেন না, আমি [illegible] সাহেবের 'ওয়েস্ট ল্যান্ড'-এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এই রচনা লিখতে বসি নি। বন্যা, মহামারী, খরা—এই সমস্ত ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে যেমন সভ্য মানুষের রেহাই নেই, তেমনি তাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আজো জগজ্জয়ী মানুষের অনায়ত্ত—তাই মাঝে মাঝে আমাদের মনে এমন সন্দেহও উঁকি মারে যে খেয়ালি প্রকৃতির কাছে মানুষের হেরে যাওয়া বুঝি বা কোনোদিনই থামবে না। কিন্তু এটা সন্দেহের স্তরেই থাক, যেন বিশ্বাসে পরিণত না হয়। আজ এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই অবিশ্বাস্য বৈজ্ঞানিক প্রগতির আবহে, প্রতিটি সকাল যখন জলে-স্থলে-আকাশে মানুষের অসম্ভব কীর্তির খবর বহন করে আনছে, তখন প্রকৃতির কাছে ছোট হয়ে থাকা শুধু আধুনিকতা নয়, আত্মহত্যাও বটে। মানুষ যতোই মাথা উঁচু করে থাকুক, প্রকৃতি প্রতিশোধ নিতে ছাড়ে না, মুহূর্তে তাকে ধুলোর মিশিয়ে দেয় স্রোতে উধাও করে; যেন এক বিরাট হিংস্র থাবার নিচে মানুষ অহরহ বাস করছে, যে-কোন মুহূর্তে তার নিরাপত্তা আক্রান্ত হতে পারে, কঠিন রোগের বীজাণুর চেয়েও ভয়ঙ্কর সব শত্রু তার জন্য ওৎ পেতে আছে বলে তার শান্তি নেই। মানুষ তবে অসহায়? কোনো কোনো ভয়ঙ্কর মুহূর্তে তাই মনে হয়—আর তখনই বিজ্ঞানীরা আবার কোমর বেঁধে লাগেন দুরন্ত বন্য প্রকৃতিকে শান্ত করার জন্য, দার্শনিকরা প্রাকৃত রোষকে ঈশ্বরের বিধান বলে শান্তি পান আর কবিকুল শিকড়-ছেঁড়া মানুষের কল্পনাকে বাঁধতে থাকেন অমিত্রাক্ষরে।

মানুষ ও প্রকৃতির এই দ্বন্দ্বমান সম্পর্ক কিছু নতুন কথা নয়—মানুষ আত্মরক্ষার জন্য যতো কিছুই করুক না কেন, তবু আকস্মিক ঘটনার হাত থেকে রেহাই নেই। একথা আমরা সবাই বুঝি, এই দারুণ দুর্দিনেও বুঝি যখন বন্যায় শত শত মানুষের সলিলসমাধি হলো জলপাইগুড়িতে। অত্যুক্তি হবে না যদি বলি যে পৃথিবীতে যে কয়টি ব্যাপক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, এই বন্যা তার অন্যতম। মনে পড়ছে ১৩৪৮ সালে ইংলণ্ডে Black Death-এর কথা, যার হাত থেকে মানুষ পশু-পাখী দীর্ঘ তিন বছর রেহাই পায় নি। সেই মহামারীতে দেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক অকালে মৃত্যুবরণ করেছিল, গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। আবার ১৭৫৫ খৃঃ লিসবনের [illegible] প্রচণ্ড ভূমিকম্প বা ফরাসী লেখক ভোলতেয়ারকে প্রকৃতির কল্যাণশক্তি সম্পর্কে সন্দিহান করে তুলেছিল এবং তিনি কাঁদিদ (Candide) নামক ব্যঙ্গাত্মক বইটি লিখেছিলেন। আর বিহারে ১৯৩৪ সালে ভয়াবহ ভূমিকম্পের ঘটনাটি স্মরণ করি, যাকে মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতা-পাপের ভগবৎকৃত শাস্তি বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং যে ব্যাখ্যার প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আমি পঞ্চাশের মন্বন্তরের উল্লেখ করলুম না কেন না তার জন্য দায়ী প্রকৃতি নয়, মানবপ্রকৃতি। ভুল হবে যদি বলি যে সভ্যজগতের ইতিহাসে মাত্র এই কটি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটেছে, অজস্র দুর্ঘটনা ঘটেছে যার কোনো পরিসংখ্যান নেই। তবু কোনো ঘটনা আমাদের প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়ে যায়, আমাদের বুদ্ধি-চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, মূল্যবোধকে পাল্টে দেয়। আমরা যারা ঘটনাস্থলে যাই নি, শুধু কাগজ পড়ে আর ভুক্তভোগীদের মুখ থেকে জলপাইগুড়ির সেই ভয়ঙ্কর রাত্রির কথা জেনেছি, তারাও মানতে বাধ্য যে অপ্রস্তুত অসহায় মানুষের উপর প্রকৃতির এই নির্মম আক্রমণ অতীতে বিরল এবং ভাবীকালে স্মরণীয় হবার মতো।

অপ্রস্তুত নিশ্চয়ই, একেবারেই অপ্রস্তুত। কে জানতো তিস্তা এমন ভয়ঙ্করী হয়ে উঠবে, সোজা পথ ছেড়ে বেছে নেবে সেই পথ যে পথে ধনেপ্রাণে, কল্পনা, চীৎকার? কিন্তু অনন্ত ব্যাপারটিই প্রাকৃতিক দৈব, এমন ভাবতে পারলে নিশ্চয়ই স্বস্তি পাওয়া যেতো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তা নয়। অক্টোবর মাসের ৪ তারিখের বন্যার পর থেকে যতোই দিন যাচ্ছে, আস্তে আস্তে সমস্ত রহস্য আমাদের কাছে উন্মোচিত হচ্ছে, বুঝতে পারছি কয়েকটি মানুষের মেঠো বুদ্ধি আর সীমাহীন আত্মপ্রসাদই অজস্র জীবনহানির জন্য প্রত্যক্ষ দায়ী। কাগজে আমরা পড়েছি যে বন্যা সম্পর্কে সময়োচিত সতর্কতা পাঠিয়েছিল মিলিটারী এবং তিস্তাবাজারের কর্মচারীরা—কিন্তু কর্তাব্যক্তিদের তাতে টনক নড়ে নি। 'ওসব গুজব, গুজবে কান দেবেন না'—বলেছিলেন জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার—তিনি এখন ছুটিতে। কেন সময়মতো বন্যা-সংকেত দেওয়া হয় নি দেওয়ার যথেষ্ট সময় ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও—তা নিয়ে জল অনেকদূর গড়িয়েছে, প্রাক্তন মুখ্যসচিব এস. এন. রায়ের অধীনে একটি তদন্ত কমিটি রিপোর্ট পেশ করেছে—জলপাইগুড়ির ডিভিশনাল কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, মহকুমা শাসক, সেচ বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট—ইঞ্জিনীয়ার প্রমুখ বড় বড় কর্তারা এখন বদলির মুখে। মানতেই হবে যে বন্যা-সংকেতের দ্বারা বন্যা রোধ করা যেতো না—বিপুল জীবনহানি অনেক কমানো যেতো এইমাত্র। কিন্তু সেটা কি খুব বড় কথা নয়? যে পরিবারের পাঁচজনকে জল টেনে নিয়ে গেছে বেঁচে আছে শুধু একজন, যে মায়ের কোল খালি হয়ে গেল, যে সমস্ত ছেলে-মেয়ে পিকনিক করতে গিয়ে আর ফিরে এলো না—সেই ব্যক্তিগত দুঃখগুলি কি কম? জানি এসব কথা বললে স্বায়ত্তশাসকরা মুখ বেঁকিয়ে বলবেন, "মরে

দুর্যোগের বড়ো কাতর দিকটা ভাবুন, এখন কোন ভাবালুতা নয়; ভাবুন, কি করে অর্ধ-শতাব্দী ধরে গড়ে তোলা জলপাইগুড়িকে আবার জীবিতের চেহারা ফিরিয়ে দেওয়া যায়; ভাবুন, সেই বিধ্বস্ত ছোট-বড় দুশো সেতুর কথা, অসংখ্য সড়ক ও যোগাযোগের রাস্তার কথা যেগুলি ছাড়া জীবন অচল, কাজকর্ম বন্ধ, সভ্যতা রুদ্ধশ্বাস। ব্যক্তিমানুষের দুঃখের কথা ভাবার সময় এখন নয়।"

তবু ভাবতে হয় কারণ, দয়া করুণা সমব্যথা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি কখনো আমরা রাজনীতির ধুরন্ধর আর প্রশাসনের পান্ডাদের কাছে অল্পমূল্যে বিকিয়ে দিই নি। আমরা আগামী দিনের উজ্জ্বল জলপাইগুড়ির কথা ভাবছি নিশ্চয়ই, কিন্তু সে ভাবনা যেন দার্শনিকের ভাবনা না হয়। যেন আমরা হাত গুটিয়ে বসে না থাকি, ভবিষ্যতে মানুষের আলস্যে ও দায়িত্বহীনতায় যেন এ জাতের ঘটনা না ঘটে, সেদিকেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আর সেই জন্যেই চাই দায়িত্বহীনের অপসারণ, হ্যাঁ, অপসারণ, শুধু বদলি নয়। শ্রীযুক্ত অমূল্য ঘোষ সম্প্রতি 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত একটি নিবন্ধে [illegible] বৃষ্টির হিসাব-এর কথা উল্লেখ করেছেন। সে বৃষ্টির হদিশ পাওয়া তার সত্যি কথা, তিনি দেখিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গে সারা বছর বৃষ্টির গড় যেখানে ৫২ ইঞ্চি, সেখানে উত্তরবঙ্গে মাত্র ৩৩ ঘণ্টায় ৩৭ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়েছে—এতো বৃষ্টির নজির গত একশো বছরের ইতিহাসে মেলে না। প্রকৃতি সাংঘাতিক বিরূপ, তবু মানুষ তার কর্তব্য করে যাক—মাত্র এইটুকুই আমাদের কাম্য। শ্রীযুক্ত ঘোষ তাঁর রচনায় বন্যা-সতর্কীকরণের প্রশ্নটি এড়িয়ে গেলেন কেন, ভাবতে অবাক লাগে—যিনি সংখ্যাতত্ত্বে নির্ভুল, সত্যে কেন তাঁর এই অনীহা?

শুধু বন্যা-সতর্কীকরণ নয়, উত্তরবঙ্গের নদীগুলিকে বশ করার পরিকল্পনাই বা কতদূর বাস্তব রূপ পেয়েছে? অথচ প্রাচীন বন্যা উপদেষ্টা পর্ষদের সুপারিশগুলি আমাদের সরকারের দ্বারা গৃহীত হয় নি—[illegible] মতানৈক্যের জন্যই পদত্যাগ করেন। বন্যার জন্য কেন্দ্রই দায়ী—বলেছেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় এবং যথার্থ বলেছেন। কেন মান সিং কমিটি অবহেলিত হলো, বন্যা উপদেষ্টা পর্ষদের পর্যবেক্ষণগুলির প্রতি আমাদের সরকার বধির থাকলেন? যেখানে দুর্যোগের সম্ভাবনা বিপুল, নদী দুরন্ত, প্রাকৃতিক শক্তিগুলি ভয়ংকর, কেন সেখানে কোন স্থায়ী পরিকল্পনাকে রূপদান করা হলো না? বিপর্যয়ের পর এখন অবশ্য গঠনের দিকে সবার নজর গেছে, কিন্তু হায়, গৃহস্থের বুদ্ধি কি চোর পালানোর অপেক্ষাতেই ঘুমন্ত থাকবে?

ভাষার মল্লযুদ্ধ, ঠোঁটের লড়াই ক্রমশ শান্ত হয়ে আসবে একদিন জানি, তদন্তের রিপোর্ট বেরোবে শাস্তি হবে, তোড়জোড় চলবে জলপাইগুড়িকে আবার ওর অক্টোবরে ফিরিয়ে আনার—সবই হবে, এমন কি আগামী নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলি এই ভয়ঙ্কর মানব-দুর্ভাগ্যকে ব্যবহারও করবে যথারীতি, কিন্তু কে ফিরিয়ে আনবে তাদের যারা ভগ্নোদ্যম, হৃতস্বাস্থ্য, প্রকৃতির অসহায় বলি? তাই আজ আসুন আমরা মানুষের নামে শপথ নিই, প্রতিষ্ঠানের নামে নয় ত্রাণ কমিটির নামে নয়—যেন মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি, তাদের দুঃখে যেন আমাদের সমানুভূতি জাগে, যেন বলতে পারিঃ

আমার আনন্দে আজ আকাল ও
বন্যা প্রতিরোধ,
আমার প্রেমের গানে দিকে দিকে
দুস্থের মিছিল,
আমার মুক্তির স্বাদ জানে না কো
গৃহহারা নির্বোধ—
তাদেরই অস্তিত্বে বাঁধি
জীবনের উচ্চকিত মিল।
সেকন্দর হন্যের দেশ ছিন্নভিন্ন,
সন্দেহ ও ভয়
[illegible] দুই হাতে, গায় শৃগালে
বাহবা!
তবুও আকাশভরা আমাদের মুক্তি
উচ্চারণা
[illegible]

[illegible]

কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকাঙ্ক্ষা

আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই পাপ পৃথিবীতে। সর্বনেশে আকাঙ্ক্ষা তাই সর্বত্র শান্তি তো কাড়ছেই, বাধাচ্ছে গোলমাল। নচেৎ ভারত সরকার যে ক্ষেত্রে প্রায় সমস্ত ক্ষমতার অধীশ্বর হয়ে বসে রাজ্যগুলিকে শাসনতন্ত্রের দড়িদড়ায় বেঁধে কেবলমাত্র অঙ্গভঙ্গি করার ও বাক্যবাণ বর্ষণের ক্ষমতাটুকু দিয়েছিলেন, সেই কেন্দ্রীয় সরকার মনে করছেন, বস্তুত এতেও যেন কেন্দ্রের তৃপ্তি নেই। রাজ্যগুলির অঙ্গভঙ্গিও অসহ্য। বাক্যবাণ যেহেতু দেশীয় চারিত্র্যধর্ম সুতরাং ওটুকু থাকলেও থাকতে পারে, অন্তত আপাতত। পরে ধীরে ধীরে সেটুকুও বাক্য সংহরণ বাণ প্রয়োগে কেন্দ্র হয়ত স্তব্ধ করে দেবেন। অর্থাৎ কেন্দ্রের অধীনে এক-একটি মূক বধির ও পঙ্গু রাজ্য চাই। শো-কেসে সাজানো রাজ্য। যেগুলিতে রাজত্ব করতে দেওয়া হবে দলের ভরণপোষণের জন্য কতিপয় নেতামার্কা লোককে, এবং তাহলেই ভারতীয় গণতন্ত্রের কুচৌ জয়ঢাকে কাড়ানাকাড়া বেজে উঠবে দিগ্বিদিক মুখরিত করে।

ভারতীয় গণতন্ত্রের সগর্ব প্রচারের আড়া দিল্লী তাই স্থির করেছেন, কেন্দ্রীয় প্রস্তুত পুলিশ (রিজার্ভ পুলিশ) বাহিনীর হাতেই সর্বময় কর্তৃত্ব তুলে দিয়ে রাজ্য সরকারগুলিকে এক-একটি কর্পোরেশনে পরিণত করতে হবে।

স্বাধীন ভারতের বাদশাহী ইতিহাসেও এমন কেন্দ্রীভূত শক্তির কথা জানতে পারা যায় না। সেযুগে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য প্রায় স্বাধীন। বাদশাহের খাজাঞ্চীখানায় ঠিক ঠিক খাজনা জমা দিয়ে দিল্লীশ্বরকে জগদীশ্বর বলে বার কয় কুর্নিশ করলেই ল্যাঠা চুকে যেত।

কিন্তু পরাধীন ভারতের হাতে [illegible] ক্ষমতা তুলে দিয়ে গেলো দেশের [illegible] ইংরেজ [illegible] [illegible] ... [illegible] আবেগে রাজ্যগুলিকে [illegible] [illegible] অধিকার প্রদানও করেছিলেন। ক্রমে ক্ষমতাকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক নিয়মে গগনস্পর্শী হতে শুরু করল।

বর্তমান কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশের বিভিন্ন রাজ্যে শুধুমাত্র গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা আছে। এরপর এই ক্ষমতার পরিধি বাড়িয়ে তাকে বলবন্ত চ্যবন সাহেব আরও বলবান করতে চান।

প্রস্তাবিত ক্ষমতা পেলে রিজার্ভ পুলিশ গ্রেপ্তার তো করবেই, এমন কি আইনানুগ ব্যবস্থাবলম্বনের জন্য কেস তৈরিও তারাই করবে। রাজ্য সরকার শুধু তাকিয়ে দেখবেন। দেশে মিলিটারী ছেড়ে দিলে ঠিক যে অবস্থা হয়, এও প্রায় সেই রকম। রিজার্ভ পুলিশকে গ্রেপ্তারের পর দোষী কিম্বা নির্দোষ ধৃত ব্যক্তিকে আর রাজ্য কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণ করে ব্যাপারটা রাজ্যের বিচারাধীনে রাখবার প্রয়োজনই হবে না; বিভিন্ন রাজ্যান্তরেও বলবন্ত চাবন সাহেবের বলবিক্রম প্রকাশিত হতে থাকবে।

উপায় নেই। এ-ও হবে। কেন না কেরালা ভারতে এক জায়গায়ই আছে। আগেও বলেছি এই কেরালা ভারতবর্ষে একটি দ্বীপের মতন যার চারপাশে গভীর অন্ধকারময় সমুদ্র। সুতরাং প্রতিবাদ আর কোনখান থেকে কি আসবে? যদি বা আসে সে স্বর বড় ক্ষীণ হয়েই বাজবে এবং কর্তার ইচ্ছায় কর্মটিও সাধিত হবে। আর হবে না-ই বা কেন, দেশের লোক তো কংগ্রেসের হাতেই একচ্ছত্র ক্ষমতা একুশ বছর ধরে তুলে দিয়ে এসেছে। সাধারণের জনদরদী জনপ্রিয় সরকার শাসনতন্ত্রকে যেমনভাবে ব্যবহার করবেন সেটাই সুতরাং হবে গণতন্ত্র। বড় বিচিত্র এই গণতন্ত্র।

দুর্বিনীত কেরালার গলাবাজি দেশের লোক ফুৎকারে উড়িয়ে দেবেন। দেশের মঙ্গলের সমস্ত দায়িত্ব তাঁরা যাঁদের হাতে দিয়েছেন, তাঁরাই তাঁদের ভালোমন্দ ভাববেন, দেখে শুনবেন, ভাববেন। এর ওপর আবার কথা কী। [illegible] শিক্ষিত [illegible] পরিচালিত এই গণতন্ত্র [illegible] [illegible] এইটি তো আদর্শ

সতর্কবাণী

কেন্দ্রীয় সরকারকে সতর্ক করে ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা বারম্বার বলছেন, সময়ে চলুন, সময়ে চলুন। হাওয়া বড় দ্রুত ঘোরাতে চাইছেন আপনারা। এর ফল ভালো হবে না। বিপত্তি একটা বাধবেই।

তা সোরগোল একটা হলেও হতে পারে। এই তো কেন্দ্রীয় কর্মীদের নিয়ে এতো কাণ্ড গেল। সেই সঙ্গে চলল কেরালার সঙ্গে কেন্দ্রের ঠাণ্ডা লড়াই। একই সঙ্গে ধর্মঘট সরকারী কর্মীদের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ করা ও রিজার্ভ পুলিশের হাতে এককেন্দ্রিক শাসনের সমতল ক্ষমতা প্রদানের প্রস্তাব রাখা হল। ব্যাপারগুলো বস্তুতই ভয়ানক দ্রুততার সঙ্গে এগোচ্ছে।

কেন্দ্রের প্রস্তাবকে বিরোধীরা সহজেই 'শ্রমিক-বিরোধী' এবং 'দমনমূলক'রূপে প্রতিপন্ন করতে পারবেন। মেজরিটি ভোটে যাই হোক, গণমত সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষ খুব খারাপ সাড়া পাবেন না। অবশ্য ক্ষমতাসীন দলও জানেন, গণমত মানে মুষ্টিমেয় কিছু

শিক্ষিত সাধারণের একাংশের মত, যে মত অন্তত ভোটে সরকার নির্বাচনের খেলায় খুব একটা ভয়ংকর ভূমিকা গ্রহণ করে না। সুতরাং মা ভৈঃ।

কিন্তু ভোটই তো সব নয়। ভোটের পরেও সরকার এবং সেই সরকারকে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে শাসন করতে হয়। ঘটনার গতি যেভাবে দ্রুত এগোচ্ছে তাতে শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। স্বেত মুনিরমন নেতাদের বাণীতে তারই সতর্কীকরণ শোনা যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় নেতাদের তাই উত্তরোত্তর পুলিশ মিলিটারীর ওপর নির্ভরশীল হওয়ার মুহূর্তে খানিকটা চিন্তাশীল হওয়ার নিশ্চয় প্রয়োজন আছে।

কিন্তু চ্যবন সাহাব, মোরারজী সাহাব বড় শক্ত মানুষ। এবং শক্ত মানুষরা চিন্তা অপেক্ষা কর্মেই কৃতিত্ব অধিকতর প্রদর্শন করে থাকেন।

গোলমালটা সেজন্যও বাধতে পারে।

মাদ্রাজ :

পৌর নির্বাচনে ডি এম কে

বিশ মাসের রাজত্ব করেই রাজাজীর ডি এম কে মাদ্রাজের পৌর নির্বাচনে যেভাবে ডিগবাজি খেলেন, তাতে স্বভাবতই মনে হবে কংগ্রেসের কপাল বুঝি ফিরল। অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সাঁইত্রিশ আসনের অধিকারী কংগ্রেস এবার বাহান্ন আসন অধিকার করেছেন। শুধু অধিকারই নয়, অনেক ক্ষেত্রে যে চমকের সৃষ্টি করেছেন সে চমক যেন গত সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসকে চমকে দিয়ে ডি এম কে যা করেছিল তারই বদলা প্রতিদান। অবশ্য মানতেই হবে, সাধারণ নির্বাচন ও পৌর নির্বাচনে চারিত্রিক তফাৎ বহু। তা হলেও নির্বাচনের রায়ে রাজ্যের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি ধরা পড়ে, তা সে নির্বাচন পৌর সংস্থারই হোক, চাই স্কুল-কলেজেরই হোক, হাওয়ার গতি কিছু টের পাওয়া যায়ই।

এই নির্বাচনে এককভাবে ডি এম কে তার অধিকারভুক্ত রাখতে পেরেছেন চল্লিশ আসন, অর্থাৎ কংগ্রেসের চেয়ে মাত্র দুটি আসনে বেশি। এ রাজ্যে বামপন্থীদের জায়গা এখনও সঙ্কীর্ণ, তাই দুই কম্যুনিস্ট পার্টি প্রত্যেকে পেয়েছেন মাত্র একটি করে আসন। যেখানে রাজাজীর রাজকীয় স্বতন্ত্র দল টেনেছেন তিনটি এবং ধর্মভিত্তিক মুশিলম লীগ যে সাতটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন সেই সাতটিই রক্ষা করতে পেরেছেন। আঞ্চলিক অপর দুটি দল ডি এম কেরই সমর্থনে প্রত্যেকে এক-একটি আসন পেয়েছেন। ডি এম কের সহযোগী দল সহ ডি এম কের হাতেই অবশ্য কর্পোরেশন থেকে গেল। কিন্তু কংগ্রেস যে দ্বিতীয় দল হিসেবে এগিয়ে এলো এবং প্রায় ডি এম কের স্কন্ধদেশ ধরে ফেলল, ডি এম কের চৈতন্য এতেই উদিত হওয়ার কথা।

কিন্তু কেন এমন হল। বিশ বছরে কংগ্রেস যা হারিয়েছে মাদ্রাজে, মাত্র বিশ মাসে ডি এম কে তাই হারিয়ে বসল কেন!

এই কেন-র উত্তর ডি এম কে সরকার যেদিন ক্ষমতা গ্রহণ করেছিল সেই সময়ই 'ভারতদর্শন' তা খোঁজবার প্রয়াস পেয়েছে। রাজাজীর আশীর্বাদপুত্র ডি এম কের ভবিষ্যৎ যে রাজকীয় রীতি নীতির ধারক-বাহকরূপে অধিক দিন গণমনে উজ্জ্বল থাকবে না, 'ভারতদর্শন' এমন আশঙ্কাই প্রকাশ করেছিল সেদিন।

বস্তুত কংগ্রেস থেকে ডি এম কে, অর্থাৎ দক্ষিণপন্থী থেকে দক্ষিণতর পন্থায় পদার্পণ করে মাদ্রাজ যে চক্ষু-কজ্জল ধারণ করেছিল সময়ের জলে তা ইতিহাসের নিয়মেই ধুয়ে যাবে এ আর বিচিত্র কি। রাজাজীর ছায়ায় যে সরকার গঠিত সাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে তার কতটুকুই বা সামর্থ্য? সে আশা বিশ মাসে কেন ডি এম কে বিশ বছরেও পূরণ করতে পারত না। মাদ্রাজ নিয়ে দক্ষিণ পন্থানুসারী ভারত তাই খুব একটা বিচলিত বোধ করে নি। ডি এম কে সরকারকে পেছে ফেলে সেখানে রাষ্ট্র-[illegible] করতে হয় নি কাউকে। ডি এম কের এমন চরিত্রই তার দিন ঘনিয়ে আনার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। দিন ঘনিয়ে আসছেও।

পৌর নির্বাচনে দেখা গেছে ডি এম কে অন্তত শ্রমিক শ্রেণীকে হতাশ করেছে, হতাশ করেছে খেটে-খাওয়া মানুষজনকে। রাজাজীর নিশ্বাসের আওতায় সেটাই স্বাভাবিক। ডি এম কের শ্রমনীতি মালিক-শ্রমিক বিবাদে মালিক শ্রেণীর কোলেই ঝোল টানতে [illegible] করলে কাজে কাজেই মাদ্রাজের "মজদুর চরিত" সম্প্রদায় উপলব্ধি করেছেন, যাঁরা বারাম তাহা চন্নান। ডি এম কে মাদ্রাজ সাধারণ মানুষের মধ্যে তার প্রভাব অবশ্যম্ভাবীভাবেই হারিয়ে বসছে।

অথচ মাদ্রাজ দক্ষিণপন্থী। সে কারণ ডি এম কে না হলে তাকে প্রত্যাবর্তন করতেই হয় কংগ্রেসের কোলে, যদিও কংগ্রেসেরও শ্রমিকদরদী বলে কোন রকম বদনাম আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারেন না। তা ছাড়া ডি এম কে শাসনে কংগ্রেসই একমাত্র বিরোধী দল। স্বভাবতই ডি এম কের প্রতি গণ-হতাশা কংগ্রেসের প্রতি পুনরাকর্ষণ হযেই ফিরে আসবে।

কেবলমাত্র কংগ্রেসকে কোণঠাসা করার জন্য শ্রমজীবী মানুষের দল হিসেবে কথিত পার্টিগুলি যদি ঘোরতর দক্ষিণীদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্টে না বসতেন তবে হয়ত বা মাদ্রাজে তাঁদের এই সুবাদে জনপ্রিয়তা বাড়লেও বাড়তে পারত। কিন্তু "গতি যার রাজা-সহ" পতন তারও রাজপতনের সঙ্গে সঙ্গেই স্বাভাবিক। মাদ্রাজে বামমার্গীরা এমনিই অদ্ভুৎ, তার ওপর স্বতন্ত্র ডি এম কের সঙ্গে মন্ত্রিসভা গড়ে একেবারেই মার্কেট মেরে রেখেছেন তাঁরা। অতএব 'দ্বিতীয়ম্' বলতে সেই কংগ্রেস, অন্তত মাদ্রাজে তাই-ই।

কংগ্রেস বস্তুতই তার হারানো রাজত্ব ফিরে পাওয়ার পথে মাদ্রাজে অনেক দূর এগিয়ে এলো। পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনেও কংগ্রেসেরই বিজয়ভেরী বেজে উঠবে যদি সংসর্গ দোষাৎ ডি এম কে একইভাবে আপন জনপ্রিয়তা হারিয়ে বসার নীতিই আঁকড়ে থাকেন।

মোট কথা, রক্ষণশীল ভারতে কংগ্রেস যে কাজ একশত বছরে করবেন, যে কোন অন্যতর দল যদি সেই কাজ একশ দিনে করে দিতে না পারেন তবে সেই দলের এই দেশে ক্ষমতা গ্রহণ করার অর্থ আরও পিছিয়ে পড়া, তা সেই দল [illegible] [illegible]

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও
কুসুম কোমল
পড়ি পেলব তনু
বিউটি ক্রীম-এর
সবচেয়ে বড়
নিজেদের সৌন্দর্য্য
চেতন আধুনিকারা
মুখর।
বিউটি
ক্রীম
অতি আধুনিক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিন প্রার্থী—নিক্সন, হামফ্রে ও ওয়ালেস।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:

৩১শে মার্চ থেকে ৩১শে অক্টোবরে প্রেসিডেন্ট জনসনের ঐতিহাসিক উত্তরণের গুরুত্ব অপরিসীম। সেদিন তিনি দুটো চাঞ্চল্যকর ঘোষণা করেছিলেন: এবারকার প্রেসিডেন্ট পদের জন্য তিনি ডেমোক্রাট দলের মনোনয়ন চাইবেন না—মনোনয়ন দিলেও তা তিনি গ্রহণ করবেন না; উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন বোমাবর্ষণের ক্ষেত্র শতকরা ৮০ ভাগ সঙ্কোচন করা হবে। আর ৩১শে অক্টোবর জাতির উদ্দেশে আর একটি টেলিভিশন ভাষণে প্রেসিডেন্ট জনসন ঘোষণা করলেন যে, উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিনী বোমাবর্ষণ পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হবে। তাঁর নির্দেশমতো ১লা নভেম্বর থেকে [illegible] [illegible] আমেরিকান বিমানকে আর উড়তে দেখা যায় নি, বোমা ফেলতে দেখা যায় নি। প্রেসিডেন্ট জনসন আরো বলেছেন যে, ৬ই নভেম্বর প্যারিসে বৃহত্তর পর্যায়ের শান্তি আলোচনা সম্ভব হবে, যে-বৈঠকে ভিয়েতকং মুক্তি ফৌজেরও অংশ গ্রহণে কোনো বাধা রইলো না। এ-ঘোষণার ঐতিহাসিক গুরুত্ব এখানে যে এই প্রথম আমেরিকা বিনা শর্তে উত্তর ভিয়েতনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ করতে রাজী হলো এবং ভিয়েতকংদের সঙ্গে এক আলোচনা টেবিলে বসতে সম্মত হলো।

আমরা দু' সপ্তাহ আগেই (সাপ্তাহিক বসুমতী, ২৪-১০-৬৮) বলেছি যে ভিয়েতনাম সমস্যা মীমাংসার পথে আশার আলো দেখা গিয়েছে। প্রেসিডেন্ট জনসনের ঘোষণায় [illegible] সেই আলোক-[illegible]।

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, প্রেসিডেন্ট জনসন বিলম্বে হলেও যে আন্তরিকতার পরিচয় প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষই যদি তাতে উপযুক্ত সাড়া না দেন, তবে এ-ঘোষণা কাগজে-পত্রেই সীমাবদ্ধ থাকবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আপাততঃ একতরফাভাবেই বোমাবর্ষণ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অবশ্যই সে আশা করে যে, উত্তর ভিয়েতনামও তার সামরিক তৎপরতা বন্ধ রাখবে, শান্তি বৈঠকের উপযুক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে। কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট থিউ একথা গোপন রাখেন নি যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই উদারতা তিনি খোলা মন নিয়ে গ্রহণ করতে পারেন নি। প্রেসিডেন্ট থিউর আপত্তি সেই পুরোনো দুই কারণে। প্রথমতঃ তিনি উত্তর ভিয়েতনামকে বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না। তিনি মনে করেন যে, আমেরিকা অবশ্য বোমাবর্ষণ সাময়িক বন্ধ রাখলেও উত্তর ভিয়েতনাম তাতে আন্তরিকতার সঙ্গে সাড়া দেবে না, বরং সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে দক্ষিণ ভিয়েতনামের ওপর পুরোদমে আক্রমণ চালাবে। দ্বিতীয়তঃ প্রেসিডেন্ট থিউ কিছুতেই ভিয়েতকংদের নিয়ে আলোচনা টেবিলে বসতে রাজী নন। তিনি ভিয়েতকংদের রাজনৈতিক শাখা জাতীয় মুক্তি ফৌজকে কোনরকম স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নন। কিন্তু একথা তাঁকে কে-বোঝাবে যে, ভিয়েতনামের [illegible] মার্কিন সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই প্রসঙ্গে এবং প্রধানত ভিয়েতকং মুক্তি ফৌজই [illegible] করেছে এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

রাজনৈতিক ইতিহাসের ছাত্রদের আজ মনে পড়ে যাবে সেই বিখ্যাত দিয়েন বিয়েন ফুর লড়াইয়ের কথা—যে লড়াইয়ে ফরাসীদের চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটে এবং ইন্দোচীন ফরাসী কবলমুক্ত হয়। দেশ স্বাধীন হল বটে কিন্তু ১৯৫৪ সালের জেনেভা সম্মেলন দেশ ভাগও করলো দু'ভাগে : উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম। উত্তর ভিয়েতনামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হো চি মিনের নেতৃত্বে গণ সরকার, কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েতনামে কোন শক্তিশালী জাতীয় সরকার গঠিত হয় নি। ভিয়েতকঙরা গোড়া থেকেই অসন্তুষ্ট ছিল। জাতীয় সরকারের চরিত্র দেখে তারা খুশি হতে পারে নি, তারা অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারে অংশগ্রহণের দাবি জানিয়েছিল। তাদের সে দাবি পূরণ করা হয় নি। বাধলো গৃহযুদ্ধ। তার ওপর এখানে দিয়েমের নেতৃত্বে এমন সরকার গঠিত হল যাকে সংখ্যালঘু খৃস্টানদের স্বার্থ রক্ষাই করতে দেখা গেল, সংখ্যাগুরু বৌদ্ধদের কোন মর্যাদাই দিয়েম সরকার দিতে রাজী হন নি। ফলে সুরু হলো গৃহযুদ্ধের মধ্যে আরেকটি গৃহযুদ্ধ। কত বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণী তরুণ-তরুণী যে সারা গায়ে গ্যাসোলিন ঢেলে ধ্যানমূর্তি হয়ে বসে তারপর গায়ে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে আত্মদান করেছেন তার কি কোন হিসেব আছে? বৌদ্ধ ভিক্ষু থিচ তামানা কোয়াঙের নেতৃত্বে একটা প্রচণ্ড বৌদ্ধ প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে উঠলো যাদের একমাত্র দাবি বৌদ্ধদের স্বার্থ রক্ষা এবং দাবি আদায়।

কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েতনামে একটার-পর-একটা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে, মার্কিনীরা হাতের পুতুলের মত একজনের-পর-একজনকে এখানকার গদিতে বসিয়েছেন কিন্তু কোন সমস্যারই সমাধান সে সমস্ত সরকার করতে পারেন নি। ভিয়েতকঙকে প্রথমে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার গেরিলা, ডাকাত দল ছাড়া অন্য কিছু মনে করতে পারেন নি, তাদের শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কেও সরকার এবং মার্কিন কর্তৃপক্ষ ভুল ধারণা পোষণ করে এসেছেন। যার জন্যে মার্কিন সেনানায়করা প্রতি বছরই তিন মাস আগে থেকে মার্কিনী সেনাবাহিনীকে আশ্বাসবাণী শুনিয়েছে যে, এবার তারা দেশে ফিরেই বড়দিনের উৎসব করতে পারবে। কিন্তু আবার প্রতি বছরের গোড়াতেই দেখা গিয়েছে হাজার হাজার নতুন মার্কিনী সৈন্য আমদানী করা হয়েছে, লড়াই থামা সম্ভব হয় নি।

ভিয়েতকঙদের দিকে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার যদি আলোচনায় বসতে রাজী হতেন বা আলোচনা সুরু করতেন, তবে ভিয়েতনাম সমস্যা কবেই মিটে যেতো। কিন্তু একে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের রোখ তার ওপর মার্কিনী গোঁ থাকার জন্যে যুদ্ধের মীমাংসা সম্ভব হয় নি বরং যুদ্ধক্ষেত্র উত্তরোত্তর প্রসারিত হয়েছে। আগে উত্তর ভিয়েতনামীরা ভিয়েতকঙকে নৈতিক সাহায্য দিচ্ছিল কিন্তু সৈন্য নিয়ে, অস্ত্রশস্ত্র বিমান নিয়ে নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে, মুক্তি ফৌজের কাঁধে কাঁধ দিয়ে মার্কিন ও দক্ষিণ ভিয়েতনামী সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই সুরু করেছে। মার্কিন কর্তৃপক্ষ এবং দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার বরাবরই শত্রুর শক্তিকে উপেক্ষা করে এসেছেন, ভেবেছেন এঁদের নিশ্চিহ্ন করতে তাঁদের মোটেই বেগ পেতে হবে না। কিন্তু আসলে ঘটনা ঘটেছে ঠিক উল্টো। দক্ষিণ ভিয়েতনামের বড় বড় শহর ও ঘাঁটিগুলি দ্রুত ভিয়েতকঙদের কবলে যেতে লাগলো এবং শেষ পর্যন্ত গোটা ভিয়েতনামের প্রায় তিন-পঞ্চমাংশেই মুক্তি ফৌজের পতাকা উত্তোলিত হলো। উত্তর ভিয়েতনামে ক্রমাগত ব্যাপক বোমাবর্ষণ করেও মার্কিনীরা উত্তর ভিয়েতনামীদের মনোবল এতটুকু কম করতে পারে নি, বরং তারা দ্বিগুণ, চতুর্গুণ উৎসাহ নিয়ে নতুন করে আত্মদানের জন্যে এগিয়ে গিয়েছে।

প্রেসিডেন্ট জনসনের ঘোষণাকে কমিউনিস্টদের কাছে, উত্তর ভিয়েতনামের হো চি মিনের কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ বলে চিত্রিত করা হয়েছে। আবার এ কথাও বলা হয়েছে প্রেসিডেন্ট পদে হামফ্রের নির্বাচনের সুবিধের জন্যেই প্রেসিডেন্ট জনসন এক সঙ্কটজনক মুহূর্তে এ ঘোষণাটি করেছেন। একথা ঠিক যে, একই প্রস্তাব হো চি মিনের পক্ষ থেকে বহু পূর্বেই এসেছিল, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিনা শর্তে বোমাবর্ষণ বন্ধ করতে কখনই রাজী হয় নি, তারা বলেছে উত্তর ভিয়েতনাম যদি সামরিক তৎপরতা বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি না দেয় তবে তারা একতরফাভাবে বোমাবর্ষণ বন্ধ করার ঝুঁকি নিতে পারে না। মুক্তি ফৌজ সম্পর্কেও তাদের এ্যালার্জি বা আপত্তি ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই তাঁরা রাজী হলেন, কিন্তু মাঝখান থেকে হাজার হাজার লোকের প্রাণ গেল, কোটি কোটি টাকা উবে গেল।

যাই হোক, দেরিতে হলেও বোমাবর্ষণ বন্ধ করার সিদ্ধান্তকে সানন্দে স্বাগত জানাতে আমরা ইতস্তত করবো না। প্যারিসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর ভিয়েতনাম, সায়গন সরকার এবং মুক্তি ফৌজের মধ্যে চতুঃশক্তি বৈঠকে শেষ পর্যন্ত হ্যানয় রাজী হয়েছে। তবে সায়গন সরকার যেমন মুক্তি ফৌজ সম্পর্কে একটা খোঁচা রেখে দিয়েছেন এই বলে যে, তাঁদের যোগদানে সরকারের সম্মতির মানে এই নয় যে, তাদের রাজনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে, তেমনি হ্যানয় সরকারও জানিয়ে দিয়েছেন যে, থিউ সরকারের সঙ্গে তাঁরা চতুঃশক্তি বৈঠকে বসলেও তার দ্বারা সে-সরকারকে স্বীকার করে নেওয়া বোঝায় না। কী বোঝায় না বোঝায় সে সব কূট তর্ক নেতারা করুন, কিন্তু উভয় ভিয়েতনাম এবং বিশ্ববাসী চায় অখণ্ড, নিরবচ্ছিন্ন এবং স্থায়ী শান্তি। প্যারিস চতুঃশক্তি বৈঠক সে শান্তি বিধান করতে পারবে তো?

প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন

পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি শক্তির অধিকারী তার প্রেসিডেন্ট।

সেই পদের জন্যে নির্বাচন। কিন্তু নির্বাচন প্রসঙ্গে এ লেখাটা ছাপার হরফে বেরোবার আগেই প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাবে, ফলাফল ঘোষিত হবে।

মার্কিন নির্বাচকমণ্ডলী তাঁদের ৩৭শ তম প্রেসিডেন্টকে নির্বাচিত করছেন। নানা কারণে এবারকার নির্বাচন বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। শুধু ভোটার সংখ্যাই এবার সর্বাধিক নয়, প্রার্থীর সংখ্যাও প্রচলিত রীতির বেড়া ডিঙিয়ে দুজনের জায়গায় তিনজনকে দেখা গিয়েছে। রিপাবলিকান দলের রিচার্ড নিক্সন, ডেমোক্রাট দলের হুবার্ট হামফ্রে এবং ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট দলের জর্জ ওয়ালেস। রীতি বলছি এজন্যে যে, ১৮৬৯ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসছে প্রধানত দুটো দল—জর্জ ওয়াশিংটন সংগঠিত ডেমোক্রাটিক পার্টি এবং ১৮৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত রিপাবলিকান দল। আমেরিকার গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত ডেমোক্রাটিক দলের প্রাধান্যই দেশে বেশি ছিল, কিন্তু ১৮৬০ সালে রিপাবলিকান প্রার্থী হিসেবে আব্রাহাম লিঙ্কনের জয়লাভের পর এ-দলেরই প্রভাব-প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। এ-পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে ৩৬ জন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে ১৩ জন রিপাবলিকান এবং ১২ জন ডেমোক্রাট।

অবশেষে যে আশংকা করা গেছিল সেটা বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে যেইমাত্র জলপাইগুড়ি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে সুরু করেছে, সেই মাত্র সরকার উত্তরবঙ্গ থেকে পিছন ফিরতে সুরু করেছেন। কয়েকদিন বেশ হাঁক-ডাক, বিমানভ্রমণ আর লম্বা-চওড়া কথা বলে দেখা যাচ্ছে সবই ক্রমে ঢিমে তেতালায় নেমে আসছে। তাই বলছিলাম হাঁকডাক হাহুতাস ও শোকতাপ সবই তো অনেক হল কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালোটা কি? মহাজনরা বলবেন—তুমি ছোকরা বাচাল, বোঝটা কিহে, কত ধানে কত চাল হয়? এই তো দেখ না—রাজ্য সরকার কত কি করছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের টিম আসছে রাজ্যপাল নিজে এখনও তিস্তাবাজার-ময়নাগুড়িতে ঘুরে ঘুরে চোখের জল ফেলে প্রায় আবার বন্যা সৃষ্টির উপক্রম করছেন। আর কি চাও, বলি আর কি চাও। তোমাদের আর কিছুতে মন ওঠে না সহকারী প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী এসে জলপাইগুড়ি ঘুরে গেছেন, খাদ্যমন্ত্রী জগজ্জীবনরাম ঘুরে গেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন শ্রী কে কে শাহ, শ্রীরামসুভগ সিং কলকাতা এসে শ্রীঅতুল্য ঘোষের সঙ্গে পরামর্শ করে গেছেন। শ্রীঅতুল্য ঘোষ উত্তরবঙ্গে ঘুরে ঘুরে অসুস্থ হয়ে পড়লেন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন উত্তরবঙ্গ যাবার আগে শুধু ভেবে ভেবেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন, শ্রীঅজয় মুখার্জী, শ্রীজ্যোতি বসু ঘুরে এসেছেন। শ্রীননী ভট্টাচার্য শ্রীসুশীল ধাড়া ও শ্রীনির্মল বসু তো ওখানে বসেই গেছেন। শ্রীহেমন্ত বসু গেছেন ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু ঘুরেছেন, শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র, শ্রীসৌরীন্দ্র মিত্র অধ্যাপক প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীদেওপ্রকাশ রাই ঘুরে এসেছেন। বলি আর কি চাও? শুধু কি তাই? শ্রী এস এন রায়কে দিয়ে তদন্ত করানো হয়েছে বন্যা সংক্রান্ত অভিযোগ—বলি এর পরে আর কি চাও? শুধু কি তাই, দেখ রেডিওতে কি সুন্দর টেপ-রেকর্ড করে দার্জিলিং-জলপাইগুড়ির দুর্গত সকলের অভিজ্ঞতার বর্ণনা শোনানো হচ্ছে। সকলেই জলপাইগুড়ি থেকে ফিরে সাংবাদিক সম্মেলন করে নিজের অভিজ্ঞতা বলছেন। কত কি দুঃখের ছবি দেখেছেন বলছেন, কলকাতার ফটোগ্রাফাররা একজিবিশন করে উত্তরবঙ্গের বন্যার ছবি দেখাচ্ছেন, বিদেশে টেলিভিশনে দেখানো হচ্ছে। শুধু কি তাই, প্রাবন্ধের উপর শ্রীঅতুল্য ঘোষের প্রায় পৃষ্ঠাব্যাপী লেখা কাগজে ছাপা হয়েছে—বলি এর পর আর কি চাওয়ার থাকতে পারে? তারপর দেখ না—লোকসভায় অধিবেশন আসছে, সেখানে কি পরিমাণ মুলতুবী প্রস্তাব আর কাটমোশান পড়বে, কত বিবৃতি আর বক্তৃতা হবে, প্রধানমন্ত্রী থেকে সব মন্ত্রী কত কথা বলবেন। এখন থেকে বলে রাখছি—লোকসভার বাজেট অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণেও উত্তরবঙ্গের উল্লেখ থাকবে। বলি, এরপর আর কি চাও? আকাশের চাঁদ চাইলে পাওয়া যায় না, আর সেই চাওয়াটাও বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়, তবু কি তাই দেওয়া হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন—উত্তরবঙ্গের দুর্গত মানুষদের জন্য টাকার অভাব হবে না, সহকারী প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন, টাকার অভাব হবে না, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও সেই এক কথা বলেছেন, খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন খাদ্যের অভাব হবে না, বলি এর পরে আর কিসের অভাব রইল—এর পরে আর কি চাইবার থাকতে পারে। বিমান আর হেলিকপটার উত্তরবঙ্গের আকাশে কতবার উড়ছে তার হিসাব রাখো? গ্যাংটক আর কালিম্পং অঞ্চলে বিমান ২৩ বার খাদ্য নিক্ষেপ করেছে, আর হেলিকপটার ৩৯৪ বার উড়ে গিয়ে খাদ্য সরবরাহ করেছে। বিপন্নদের উদ্ধার করেছে। শুধু কি তাই, সেনাবাহিনী ১৭ হাজার মানুষকে কলেরার টিকা দিয়েছে। খাদ্য—সে দেবার তো শেষ নেই। শ্রীঅতুল্য ঘোষ শ্রীজগজীবন রামকে একবার বলেছিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীজগজীবন রাম একশত টন গম দিয়ে দিয়েছেন। ভাবতে পারো [illegible] [illegible] সেপ্টেম্বর [illegible] তারিখে [illegible] শিলিগুড়ি খাদ্য গুদাম থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফ্লাড রিলিফ এ্যান্ড এড কমিটির যে কাউকে দেওয়া হয়, আর হুকুম পাওয়ামাত্র সেই গম শিলিগুড়ির কংগ্রেস নেতা শ্রীঅরুণ মৈত্রকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ি ও উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য সরকার আজ পর্যন্ত প্রায় দুই কোটি টাকা খরচ করে ফেলেছেন। খাদ্য কত দিয়েছে জানো। জানালে আর কথা বলতে না, আজ পর্যন্ত ১১২৩৭ কুইন্টাল চাল, ৫১২১ কুইন্টাল আটা, ৯১৩৯ কুইন্টাল ডাল, এমন কি সামান্য লবণ, সেও পর্যন্ত সরকার দিয়েছেন। আজ পর্যন্ত জলপাইগুড়িতে ২৪৪ কুইন্টাল লবণ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া কম্বল, করগেট টিন সংগ্রহ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে কিছু সংগ্রহ করা হয়েছে, সেটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। একবার অঙ্ক কষে দেখ জলপাইগুড়িতে শুধু চাল দেওয়া হয়েছে ১১,২৩৭,00000 গ্রাম।

সরকারী দান অনুদান ও কর্মতৎপরতার এই হিসাব দেখে শুধু একটি কথাই বলা যায় যে, সরকার দক্ষিণবঙ্গ তথা মেদিনীপুরে দুর্গত মানুষদের জন্য মাথাপিছু তিন পয়সা খরচ করে হাত গুটিয়ে নিয়েছেন, আর উত্তরবঙ্গে মাথাপিছু কয়েক শত গ্রাম চাল আটা দিয়ে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। অনেকে অনেক ক্ষয়ক্ষতির হিসাব দিয়েছেন সব বাদ দিয়ে শ্রীঅতুল্য ঘোষের হিসাবকেই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বলে ধরে নিতে কোন আপত্তি নেই। শ্রীঘোষের হিসাবে উত্তরবঙ্গে দুর্গত মানুষের সংখ্যা ৫০ লক্ষ আর এই ৫০ লক্ষ মানুষের জন্য সরকারী হিসাবে খরচের পরিমাণ আজ পর্যন্ত দুই কোটি টাকা। উত্তরবঙ্গে মোট ক্ষয়ক্ষতির হিসাব কোনদিন হবে কি না জানা নেই—সব মানুষ ও গরুর মৃত্যুর একটা হিসাব সরকার বের করেছেন। কিন্তু সেই হিসাবই শেষ নয়। কারণ তিনদিন আগেও ৫টা মৃতদেহ বের হয়েছে। উত্তরবঙ্গের এই ক্ষয়-ক্ষতিকে অঙ্কের হিসাবে মেলানোর চেষ্টা অর্থহীন। শ্রীঅতুল্য ঘোষ বলেছেন রেল লাইন সব ভেঙেছে, রাস্তা সব ভেঙেছে। ব্রীজ ভেঙেছে—তার সংখ্যা প্রায় দুইশত। ৫০ লক্ষ সর্বস্বান্ত রিক্ত মানুষের জন্য সরকারী প্রচেষ্টা আর উদ্যোগ যে গতিতে এগুচ্ছে তার একমাত্র পরিণাম হল সর্বনাশ। আর উত্তরবঙ্গের ৫০ লক্ষ মানুষ সর্বনাশের আবর্তে থাকলে সারা পশ্চিমবঙ্গকেও এই সর্বনাশের [illegible] [illegible] থাকতে হবে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এই বিপর্যয়ে [illegible]

৫, মার্কিন উপন্যাস ঃ
জীবনধারার সমালোচনা

১৯৩০ সালে সিনক্লেয়ার লিউইসের (১৮৮৫-১৯৫১) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভে মার্কিন উপন্যাসের দিকে পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। পুরস্কার গ্রহণকালে প্রদত্ত ভাষণে লিউইস তাঁর বয়স্কতর ও তরুণতর সমকালীনদের নামোল্লেখ করে তাঁদেরই দেশবাসীর জে "গর্ববোধ" করেন। লিউইসকে লিখিত এক পত্রে সমালোচক মেংকেন লিখেছিলেন : "রাষ্ট্রপতি কুলিজের আমলের পাপ জীবাণুদের স্বরূপ আপনিই উদ্ঘাটন করেছিলেন, রুজভেল্ট, তার পরের আমলের জীবাণুকুল এখনও অনাক্রান্ত—ধর্মী বিপ্লববাদী, অশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ, অপদার্থ সংবাদপত্র-মালিক (অথবা সম্পাদক), মোটা মাইনের চাকুরীজীবী, কুটচক্রী (অথবা আরো যা পরিচিত, নির্বোধ)। শ্রমিক নেতা, সাংবাদিক, এরা। আমি বিশ্বাস করি এই-ই আপনার কাজ। অথচ এই কাজই আপনি অনেকদিন অবহেলা করেছেন। প্রেমের গল্প ও ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণ রচনা করবার লেখক প্রচুর আছেন, যদিও আপনার মত ভালো লিখতে পারেন, এমন লেখক কমই আছেন; কিন্তু মার্কিন জীবন-যাত্রাপদ্ধতিকে নগ্নভাবে প্রকাশ করার যথার্থ ক্ষমতা রাখেন মাত্র একজনই। আমার তো মনে হয় এই জীবনযাত্রা-পদ্ধতি পূতিগন্ধময়। সে যাই হোক, যদি তা দেখাতেই হয়, তবে তা একমাত্র আপনার দ্বারাই সম্ভব।" লিউইস নিজেও তা-ই বিশ্বাস করতেন। ১৯২৬ সালে তাঁকে বিপুল সম্মানবহ পুলিটজার পুরস্কার দান করা হলে, সেই পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করে তিনি লেখেন ঃ "এই পুরস্কারের নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে এটি প্রদান করা হয়, 'এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত যে মার্কিন উপন্যাসে মার্কিন জীবনের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং মার্কিন চালচলন ও মানবতার উচ্চতম মান সবচেয়ে সার্থকভাবে প্রতিফলিত', সেই উপন্যাসকে। এই বিধির যদি কোন অর্থ থাকে, তবে তা এই যে, উপন্যাস বিচার করা হবে সাহিত্য-গুণানুসারে নয়, বিশেষ সময়ে জনপ্রিয় সৌজন্য বা ভদ্রতার বিশেষ নীতি অনুসারে।" লিউইস এই ধরনের কোন নীতি মেনে নিতে রাজী ছিলেন না বরং এমনি আত্মতৃপ্ত স্থিতিবাদী ধারণাকে আঘাত করতেই তিনি ভালবাসতেন।

তাঁর প্রথম সার্থক উপন্যাস 'মেএন্‌ স্ট্রীট'-এর এক ভূমিকায় লিউইস লেখেন ঃ "১৯০৫ সালে আমেরিকায় প্রায় সর্বজন-স্বীকৃত এই ধারণার চল ছিল যে, শহরগুলি যদিও পাপে নিমজ্জিত, খামারে জমিতেও হয়ত কখনও মেজাজী মানুষ থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের গ্রামগুলিকে যেন স্বর্গ বললেই চলে।..ছোট শহরের গৌরবই হল তার জীবনে প্রতিবেশী মানসিকতার প্রাধান্যে। বড় শহরে কেউ কাউকে পোছে না। কিন্তু গ্রামে বা ছোট শহরে প্রতিবেশীরা এক বিরাট সুখী পরিবারে আবদ্ধ।...১৯০৫ সালে আমি আমাদের মিনেসোটার গ্রামে ছুটি কাটাতে ফিরে আসি।...আমি শীগ্‌গিরই ধরে ফেলি যে, এই প্রতিবেশী চেতনার অনেকটাই ভাঁওতা। গ্রামের মানুষও সামরিক ব্যারাকের মত কঠোর হতে পারে।" গ্রামকে বড় বেশি ভালো করে দেখানোর সাহিত্যিক [illegible] নামে মিনেসোটার এক কাল্পনিক গ্রামের সংকীর্ণতা ও [illegible] তিনি [illegible] [illegible]

সেদিন কথায় কথায় দিলীপ বলছিলো—
"আমি জেতাতে মার সেকি আনন্দ যদি দেখতেন!"
Bournvita
the ideal food drink strength and vigour
450

[illegible] আর্থে সর্বকালই তারা নিজেদের উদারতায় আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে। এই জীবনযাত্রা হঠাৎ ভেঙে যায় যখন পুরনো পারিবারিক ইতিহাসের সন্ধানে নীল আবিষ্কার করে এক নিগ্রো পূর্বপুরুষ—অর্থাৎ চিরাচরিত মার্কিন নীতি অনুসারে নীল কিংসব্লাড নিগ্রো, যেহেতু তার রক্তের বত্রিশ ভাগের এক ভাগ নিগ্রো রক্ত। নিগ্রো জাতি সম্পর্কে নিজেরই যাবতীয় পুরনো ধারণা এখন ফিরে এসে তাকেই আঘাত করে; এতকাল যা মেনে এসেছে, এখন নিজের ক্ষেত্রে তার সত্যতা মানতে পারে না; নখের ডগায়, কই, নীল রক্ত তো দেখতে পায় না, মস্তিষ্কের গঠনেও তারতম্য স্বীকার করতে পারে না। সে স্থির করে, "আমার জানতে হবে, নিগ্রো কী; আমায় শুরু থেকে শিখতে হবে, আমি কী।" বর্ণবৈষম্য সে এবার দেখে প্রাচীরের অন্য দিক থেকে। নৈতিক দায়িত্ববোধে সে শেষ পর্যন্ত নিজেকে নিগ্রো বলে ঘোষণা করে। প্রতিক্রিয়ার আক্রমণে নীলের চর্বনি যায়, সে অপমানিত হয়, শেষে শ্বেতাঙ্গ পল্লী ছেড়ে অন্যত্র যাবার হুকুম আসে। স্ত্রী ভেস্টালও পুরনো সংস্কারের তাড়নায় প্রথমে নীলের পাশ থেকে সরে গেছল, কিন্তু নীলের অসহায়তা ও বীরত্ব লক্ষ করে প্রতিপদে সংস্কারকে প্রতিহত করে ভেস্টাল তার কাছে এসে দাঁড়ায়। শেষে শ্বেতাঙ্গ সমাজের মিলিত আক্রমণের মুখে মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গ সমর্থক ও কৃষ্ণাঙ্গ বন্ধুদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়তে লড়তে তাদের হেরে গিয়ে বাড়ি ছাড়তে হয়। এই উপন্যাসের নিগ্রো চরিত্রগুলির মহত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে লিউইস পরে লিখেছিলেন : 'দৈনিক সংবাদপত্রে এঁদের কখনই খুঁজে পাবেন না। কোন দরিদ্র নেশাড়ে নিগ্রো কোন শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে গুলী করলে সেটা খবর হয়। কিন্তু তারই আত্মীয় কোন সুদক্ষ নিগ্রো চিকিৎসক সেই মহিলার প্রাণ বাঁচালে সেটা খবর হয় না।"

সিনক্লেয়ার লিউইসের সমাজ-সমালোচনার লক্ষ্য ছিল ব্যবসায়িক সংস্কৃতির মধ্যে মানব আচরণের যান্ত্রিকতা ও মধ্যবিত্ত সমাজে মানবিক নীতিবোধের শোচনীয় বিলোপ। মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ে অন্ধ ব্যবসায়িকতায় অসুস্থ এক সমাজকে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের সততায় চাক্ষুষ করে তুলেছেন। তুলনায় ফ্রানসিস স্কট ফিটসজেরাল্ড (১৮৯৬—১৯৪১) তাঁর কালের প্রতি অনেক বেশি সহমর্মী। তাঁর কাল বলতে [illegible] ফিটসজেরাল্ড বলেন, [illegible]

[illegible] যৌন কামনা, নাচ, গান। এর যোগ রয়েছে স্নায়বিক উত্তেজনার এক মানসিকতার সঙ্গে।" প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক পরে একদিকে কাঁচা টাকা, অন্যদিকে নর-নারীর সম্পর্কে আরো স্বাধীনতা, আরো খোলাখুলি মেশামিশি, আরো অন্তরঙ্গতা—এরই তাৎক্ষণিক মজা জ্যাজের যুগের লক্ষণ। উপন্যাসে ও ছোটগল্পে ফিটস্-জেরাল্ড এই লক্ষণটিকেই ধরেছেন। এরও বাইরে কিছু আছে, কোন এক স্বপ্ন, কোন এক মহনীয় প্রেম, এমনি একটা ভাব ফিটসজেরাল্ড নিয়ে আসেন। কিন্তু এই স্বপ্নও প্রায়ই (যেমন দি গ্রেট গ্যাটসবি' উপন্যাসে) আবার টাকার ক্ষমতা ও ক্ষমতার সাধের সঙ্গে জড়িয়ে নিজেরই অমোঘ পতন টেনে আনে। যৌবনের আর্তি ও টাকার সাধ বার বার জড়িয়ে যায়। ফিটসজেরাল্ড যখন তাঁর এই যুগের "বিরাট দায়হীনতা'কে আঘাত করেন,

সে আঘাত বড়ই ক্ষীণবল, তার মায়ায় তিনি নিজেও যেন মজেছেন। ফিটস্-জেরাল্ডের গদ্যে উচ্ছ্বাসবহুল পেলবতা ও রঙচঙে দৌরাত্ম্য বোধ হয় কখনই সমালোচনার ধার পেতে পাবে না। অথচ সমালোচনার সাধেই যেন তাঁর রচনা। ফিটস্‌জেরাল্ডের রচনা সম্পর্কে টি এস এলিয়টের উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও অনস্বীকার্য যে আজকের পাঠক তাঁর রচনায় অস্বস্তিকর অতৃপ্তি বোধ না করে পারেন না। তাঁর লেখার বিদেশীয়ানা তাকে কখনই সহজ হতে দেয় না। নিজের শিক্ষা ও অধ্যয়নে অনুৎসাহের কথা তিনি স্বীকার করেছেন; এই দীনতা তাঁর দৃষ্টিকেও বড় সহজ বড় দুর্বল করে রেখে গেছে। তিনি যতই বলুন, "ক্ষমা কথাটা বড় ভালো", ক্ষমার বোধ হয় উপন্যাস প্রাণ পায় না; [illegible]

গ্রাম বাংলার কথা

অসীম মুখোপাধ্যায়

'অ', 'আ', 'ক', 'খ'-তেই যারা বার বার হোঁচট খাচ্ছে, তাদের কাছে স্কুল-কলেজের কথা তোলা অবান্তর। গ্রাম-বাংলার সাধারণ চাষী-ঘরের ছেলে-মেয়েরা আজও "বর্ণ-পরিচয়ে"-র দশ পাতাতেই আটকে আছে। স্কুল-কলেজের স্বপ্ন তারা দেখে ঠিকই কিন্তু স্বপ্ন আর সত্যের বৈষম্যটা অনেকের কাছে খুবই স্পষ্ট। স্বপ্ন দেখে তারা বিষম হয় না। তারা শুধু চায়, যত কমই তারা পাক না কেন, সে পাওয়ায় যেন ফাঁক না থাকে। উচ্চশিক্ষার কথা আর ভাবে না, সামান্য ভাত-কাপড় জোটানোর ভাবনা তাদের আর সব ভাবনা কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু তারা জানে যে বেঁচে থাকতে হলে ভাত-কাপড়ের সঙ্গে আরও একটি জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন, তা হল সাধারণ শিক্ষা। তাদের কপাল মন্দ, তাই এই সাধারণ শিক্ষাও তাদের কাছে দুর্লভ বস্তু হয়ে উঠেছে!

নিষ্ঠা, চেষ্টা সবই তাদের আছে। গরমের দিনে মাটি ফেটে চৌচির, ধান-গাছের শুকনো গোড়াগুলো মুখ উঁচিয়ে আছে, তার ওপর দিয়েই সবাই চলেছে পাঠশালায়, বা জুনিয়র হাই স্কুলে। কাছে-পিঠে কোথাও গাছপালা নেই যে ছায়ায় বসে একটু জিরিয়ে নেবে, ছাতাও নেই অধিকাংশের। ছেঁড়া-খোঁড়া বই-খাতায় মাথার চাঁদি ঢেকে মাইলকে মাইল পাড়ি দিচ্ছে সব। আর শহরে! সিকি মাইল যেতে একই বয়েসের ছেলে মেয়েরা বাসে চড়ছে! দু' দলে কি তফাৎ!

বর্ষার ছবিটাই মনে পড়ে বেশি। যে মাঠ শুকনো ছিল ক'দিন আগে, এখন তা জলে টইটম্বুর। সরু আল কাদা আর গোবরে বীভৎস হয়ে উঠেছে। তাই দিয়ে ছেলে-মেয়েরা রওনা হোল। দু'-একজন টাল সামলাতে না পেরে পড়েও গেল। বাড়ির কাছে-পিঠে যদি পড়ে তা হলে বাড়ি গিয়ে কাপড় পাল্টে আসা যায় আর যদি অনেকটা এগিয়ে ব্যাপারটা ঘটে তা হলে কোনও উপায় নেই কাদামাখা অবস্থায় চলে যাও! কেউ হাসবে না। হাসবার কিছু নেই। গ্রামে থাকলে হবেই ঐ রকম। তবুও ওরা কেউ বিশেষ কিছু শিখতে পারছে না। তবে কি মেধা নেই? খুব আছে। ওদের সাথে মিশে দেখেছি, সহজেই বুঝতে পারে, স্মৃতিশক্তিও প্রখর। জানার আগ্রহ যথেষ্ট। [illegible] চাইলেও, বলতে চাইলেও, শেখার, জানার সুযোগ ওরা পাচ্ছে খুবই কম।

ক'জন চাষী, (আমি ক্ষেতমজুর আর বর্গাদারদের কথা বলছি)—নিয়মিত বাড়ির ছেলে-মেয়েদের পাঠশালায় বা জুনিয়র হাই স্কুলে পাঠাতে পারে? মাইনে, তা সে যত সামান্যই হোক না কেন, গরীব বাপ-খুড়োরা তাই জোটাতেই হিমসিম খায়। এরপর বই-পত্তর, শ্লেট-পেন্সিলের খরচা আছে, মাঝে-মধ্যে দু'-এক পয়সা জলপানির জন্যেও দিতে হয়। কচি-কাঁচা ছেলে-মেয়েগুলো তো আর সকাল থেকে দুপুর অবধি মুখ শুকিয়ে থাকতে পারে না! এতসব হাজার ঝামেলা না পুইয়ে সোজা মাঠে পাঠিয়ে দাও। জমি সাফ-সুতরো করুক। লাঙল দিতে শিখুক। বীজ ছড়াক, আর না হয় দুপুরে জোটায় পান্তা নিয়ে বাপের কাছে পৌঁছে দিক। বাড়িয়ে বলছি না কিছুই। যেমনটি লিখছি তেমনটিই ঘটছে। পাঠশালার প্রথম দু'-এক ক্লাশে বা জুনিয়র স্কুলের প্রথম দু'-এক ধাপে ছাত্র-ছাত্রীর ভিড় বেশ জমজমাট। দেখে মনে হবে সরকারের শিক্ষা-যজ্ঞের কোথাও কোন ত্রুটি নেই। কিন্তু এই সব ছেলে-মেয়েরাই ওপর ক্লাশে উঠে সরস্বতীর সাথে আড়ি করে দেবে। শহরে তো জানি ছেলে-মেয়েরা পরীক্ষায় ফেল করলে পাততাড়ি গুটোয়, গ্রামাঞ্চলে দেখছি ঠিক উল্টোটি! এখানে পাশ করলে পড়া বন্ধ হয়ে যায়। কেন যায়? সে কথাই বলছি। ওপর ক্লাশে উঠলে মাইনে দিতে হবে বেশি, বই-পত্তর ইত্যাদির হাঙ্গামাও বাড়বে। এত করেও ছেলে বা মেয়ে আহা-মরি কিছু হবে না। হতে পারে না, তাদের "বাপ-ঠাকুর্দা" বা মা-দিদিমারাও মাটি চষে কাটাল, তাদেরই যখন কিছু হল না—তখন এদের আর কি হবে? কপাল ঠুকে যখন চাষীর ঘরে জন্মেছে, তখন মাটিতে মুখ থুবড়েই পড়তে হবে একদিন-না-একদিন। কাজেই সময় থাকতে সামলে নাও। দুঃখ বাড়িও না। টিপসই দিতে হোত। সে জায়গায় ইংরেজী, বাংলা, দু' হরফেই নাম লিখতে পায়, এই যথেষ্ট। আবার কত?

আরও এক কারণে ওপরের দিকে ছাত্র-সংখ্যা কমে যাচ্ছে। মাইনে বাকী থাকলে অনেকেই পরীক্ষার বসার অনুমতি পায় না। [illegible]

হেডমাস্টারকে ঘিরে ধরে কাঁদছে ছেলেরা। "এবারটি পাশ করতেই হবে। পরীক্ষার পর যেমন করেই হোক টাকা জোগাড় করে আনবে সবাই।" কেউ কেউ এনেছেও কিছু, পাঁচ টাকা, দশ টাকা, যার যেমন জুটেছে। বাকী পড়েছে কিন্তু অনেক বেশি, কারও আট মাসের, কারও ন' মাসের। একবার, মনে পড়ছে খুব, শ্যামপুরের একটি ছেলে তার বাপের নতুন ছাতা চুরি করে এনেছিল। মাইনে দিতে পারবে না কিন্তু ছাতা তো দিচ্ছে, একেবারে আন-কোরা নতুন। হেডমাস্টার সে ছাতা নিয়ে-ছিলেন কি তার পিঠে ভেঙেছিলেন সে খবর অবশ্য আমার জানা নেই।

জুনিয়র হাই স্কুলের শিক্ষকদেরও [illegible] কিছু করার নেই। স্কুলগুলো "ডেফিসিট গ্রান্ট" পায় না। শিক্ষকরা পুরো বেতন পান খুব কমক্ষেত্রে। সরকারী তরফ থেকে এককালীন সাহায্য যা আসে তা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। সুতরাং ছাত্রদের ওপর চড়াও হওয়া ছাড়া অন্য কোনও পথ খোলা থাকে না। কিন্তু ছাত্ররাই বা দেবে কোত্থেকে? তারা তখন চম্পট দেয়, মাঠ তো খোলা পড়ে আছেই। অনেক প্রতিভা, অনেক শক্তি, এমনি করে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। চিন্তার দৈন্য দেখা দিয়েছে বলেই আমরা এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না! বুঝতে পারছি না যে আমাদের ক্ষতি হচ্ছে এবং সে ক্ষতির পরিমাণ কি? বুঝতে পারি আর না পারি, বুঝতে চাই আর না চাই, ক্ষতির খেসারত কিন্তু দিতে হবে সবাইকেই।

গ্রামাঞ্চলে উচ্চশিক্ষার বিস্তৃতি নিয়ে আমি ভাবছি না। আমি ভাবছি সাধারণ শিক্ষার কথা, যা ছাত্র-ছাত্রীর বনিয়াদকে পোক্ত করবে, তাদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত করে তুলবে। অক্ষর পরিচয় থেকে যার শুরু আর হাই স্কুলের চৌকাঠের এপাশে এসে যার শেষ আমি সেই শিক্ষার কথাই বলছি এবং একথাও বলছি যে এই শিক্ষাই আসল শিক্ষা। এর মধ্যে ফাঁকি থাকলে ছাত্র-ছাত্রীর ক্ষতি আর তাদের ক্ষতি সারা দেশের ক্ষতি। গরীব চাষীর ছেলে বা মেয়ে এই শিক্ষাটুকুই আগে পেতে চায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের এই সামান্য দাবিটুকুও আমরা রাখতে পারি নি। সারাদিন লাঙল ঠেলে ক্লান্ত চাষী অনেক আশা নিয়ে আসত নৈশ-বিদ্যালয়ে বা নাইট স্কুলে, ছাপার হরফের সাথে আলাপ করতে। এখন আর আসে না! তাদের ঘরের বৌ-ঝিরাও "বর্ণ-পরিচয়" বা "ধারাপাত" নিয়ে বসার কথা ভাবে, মাঝে মাঝে বসেও তাই। এত কালের [illegible] তারা তবু অন্ধকারেই আছে। আজও [illegible], মেদিনীপুর, বাঁকুড়া বা [illegible] [illegible]

তাদের বাস, সে থানার বাইরে পর্যন্ত যায় নি। [illegible] দেখেছি পড়ু-য়াদের [illegible] বাইরে [illegible] অন্যের থানায়, [illegible] গুলোকে জানায় ইচ্ছে আছে। লিখতে বসে মনে পড়ছে অনেক। [illegible] একটা। গত বছর ঘটেছিল, তাই সবকিছুই মনে আছে। কলকাতার [illegible] কোনও একটি রাজনৈতিক [illegible] ভাবা হয়েছে। [illegible] আসছে, বেশির ভাগই গ্রামের। হঠাৎ পাথরপ্রতিমার১ নরোত্তমের সাথে দেখা।

—"আরে নরোত্তম তুমি যে! রাজ-নীতিতে ঢুকলে কবে?"

—"আরে আর ক্যান? আপনি কইতেছেন মুখ্যমন্ত্রী? আমি রাজনীতিতে ঢুকছি আর কে কইয়াছে? আমি [illegible] এইসেছি।"

কিন্তু সুবিধাবাদী, স্বার্থপর লোক গ্রামের মানুষকে শোষণ করছে। [illegible] শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থাগুলি [illegible] করায়ত্ত। সেখানে তারা দুর্নীতির এমন বিষাক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে যে কোনও কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীর মনের সৌকুমার্য সহজেই নষ্ট হয়ে যায়।

নাইট স্কুলের কথা দিয়ে শুরু করছি। নাইট স্কুল জিনিসটা এখনও কাগজে-কলমে হয়ত আছে কিন্তু আসলে তার অস্তিত্ব অনেক আগেই লোপ পেয়েছে। শ্যামপুর অঞ্চলে এই ধরনের স্কুল ছিল গত ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত সাতটি। এখন আছে চারটি। চারটি স্কুলই ধুঁকছে। শিকে ফোঁকার সময় হয়ে এসেছে। দু'-একদিন গিয়েছি দেখতে। বসে আছি তো বসেই আছি। পড়ুয়ারা কেউ আসে না। মাতব্বররা তাস পিটছে স্কুল ঘরের দাওয়ায়। কেরোসিন পুড়ছে, হুঁকো ফিরছে এ-হাত থেকে ও-হাত। বিরক্ত হয়ে উঠে এলুম। পরে শুনেছি অনেকদিন ধরেই কেউ আসে না পড়তে। "অক্ষর পরিচয় করে কি হবে" এই প্রশ্নটি নাকি পড়ুয়াদের মনে দেখা দিয়েছে। তাছাড়া "ইস্কুলের হাওয়াটা"-ও তাদের খুব একটা ভাল লাগছে না। সেখানে পড়াশুনো শেখানোর চাইতে দলাদলি করতেই মাস্টার-দের বেশি আগ্রহ।

নাইট স্কুল নিয়ে দুর্নীতি যে কি হারে বেড়ে চলেছে তার একটি হাস্যকর উদাহরণ তুলে ধরছি বাগনান থেকে।

বাগনানের এক গাঁয়ে জনৈক খগেন মণ্ডল নাইট স্কুল খুলেছে সরকারের

১। সুন্দরবন অঞ্চল
২। [illegible]

"শিশু সব করে রব—গুরু ঘুমাইল!" একটি পাঠশালা—হাওড়া (বাগনান)

ঘরে। সে স্কুলের সেক্রেটারী। একদিন এক মহিলা "ডি. এস. ই. ও" এলেন খগেনের স্কুলের খাতাপত্তর পরীক্ষা করতে। খগেনের সাথে তাঁর যে কথাবার্তা হয়েছিল তা এই রকম :—

দিদিমণি—"খগেন মণ্ডল বাড়ি আছেন কি? খগেন মণ্ডল?"

খগেন—"কে আপুনি?"

দিদিমণি—"আমি ডি এস, ই, ও। আপনার খাতাপত্র দেখতে এসেছি।"

খগেন—"খাতা? কিসের খাতার কথা বলিচেন আপুনি?"

দিদিমণি—"সে কি মশাই? আপনার হিসেবের খাতা রাখেন নি? স্কুলের জন্য যে খরচা দেওয়া হয় তার হিসেবের খাতা!"

খগেন—"খাতা? হুম! খাতা মেরামত [illegible]

দিদিমণি—"বলেন কি? খাতা কি চেয়ার টেবিল না ঘড়ি টড়ি যে মেরামত করতে দেবেন? বাজে কথা রাখুন। খাতা বার করুন।"

খগেন—"বাজে কথা আপুনি বলিচেন। আমি বলি নাই। খাতা মেরামত হয়ে এলিপর পাবেন।"

দিদিমণি—"আপনাকে আমি এই শেষবারের মত বলছি আপনি হিসেব দেখান। নইলে আপনার নামে রিপোর্ট করব। স্কুলও উঠে যাবে।"

খগেন—"করুন না, করুন না রিপোর্ট। যত খুশি করুন। কটা টাকা দিইচে সরকার ন্যাট-স্কুলের জন্যি? বি-ডি-ও আপিসের বাবুদের কিছু দিতি হোয়। পাড়ার ছাওলা-পিলেরা ধরি পড়ে, তারা ফিস্টি করবে, তাদের কিছু দিলুম। [illegible] আছে। [illegible]

"আজ রবিবার। স্কুল বন্ধ, দূরও।" হাওড়া (আমতা)

পোঁদে আমাকেও বাঁচতে হবে না, কি? সব টাকা তো ইখানেই শেষ। এবপবে অ[illegible]ব বাতিব খরচা আছে, পড়ুয়াদের হু[illegible]োব খবচা আছে। সি সব কোন্ সদাশয় দিবে শুনি?"

দিদিমণি—"তাই বলে আপনি সরকারী টাকায মচ্ছব লাগাবেন? সংসার চালাবেন? আমি রিপোর্ট করবই।"

খগেন—'কবুন গে, বলেছি তো কবুন গে। সবকাব আমাকে ন্যাট-স্কুলের ট্যাকা না দিবে তো খাঁদু মোড়লকে দিবে। খাঁদুকে না দিলি বদুকে দিবে। তাকে তো দেখাতে হবেই যে দেশে ন্যাট-স্কুল আছ। ট্যাকা খবচা করতে হবেই। আমি না পাই, অন্যে পাবে। মাঝখান থিকি আপুনার বদনাম হবে।"

দিদিমণি—"তার মানে?"

খগেন—'মানে খুব সোজা! সরকার বলবে তুমি আগে থাকতি বোঝ নি কেন যে খগেন লোক খারাপ। হয় তুমি লোক চেন নি নয় খগেনের সাথে তোমারও কিছু ।"

দিদিমণি—"অসভ্য, ইতর!"

আর একটা উদাহরণ দিচ্ছি। বাগনান থেকেই। শোনা গেল কোন গাঁয়ের এক মাতব্বর ব্যক্তি তার নাইট স্কুল দেখাতে শিক্ষাদপ্তরের এক উচ্চপদস্থ অফিসারকে [illegible]

"শিক্ষিতরা" সব সার্টিফিকেট পেল। পরে শোনা গেল যেসব ছাত্রদের সভায় হাজির করা হয়েছিল তারা আনন্দনিকেতনেব (?) ছাত্র! আরও মজা! ঐ গাঁয়ে কোন নাইট স্কুল নেই! নেই তো নেই। কার কি এল গেল তাতে?

আপার প্রাইমারি স্কুলগুলোতে প্রথমেই যা শেখানো হয় তা হচ্ছে রাজনীতি এবং এ রাজনীতি গ্রাম্য দলাদলির সাথে মিশে অত্যন্ত নোংরা একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোবেচারা সাদাসিধে শিক্ষকরা কয়েকটি টাকার জন্য মাথা বিকিয়ে রেখেছেন স্কুলের কর্তাদের কাছে। ভোটের সময় কাজ করতে হবে। স্লোগান দিতে হবে নইলে চাকরি হবে না বা থাকবে না। যদি মাথা মুড়িয়ে দিতে পার তবে অবশ্য কোনও ভাবনা নেই। তোমার ভাবনা তখন কর্তারা ভাববেন।

উদাহরণ আর কত দেব। তবু দিচ্ছি নইলে ছবিটা আপনারা ঠিক বুঝতে পারবেন না। বাগনানের এক প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার, শোনা গেল, এবার একটা সরকারী চিঠি পেয়েছেন। বন-মহোৎসবের প্রতি অনুরাগ দেখাবার জন্য তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। তিনি তো অবাক। কই, কালে-ভদ্রেও তো স্কুলের [illegible]

তাহলে সরকার কেন এত লোক থাকতে তাঁকেই কেবল পুরস্কার দিচ্ছে? এতদিন বাদে শুনছি স্থানীয় কোনও সরকারী কর্মচারীর সুপারিশের [illegible] এমনটি হয়েছে। আধা আধি [illegible] কথা ছিল কি?

জুনিয়র হাই স্কুলের অসুবিধের কথা একবার বলেছি। রাজনীতির [illegible] এখানেও ঢুকেছে। শিক্ষকরা রাজনীতি করেন, গোটাকতক টিউশন করেন আবার স্কুলেও পড়ান! একসঙ্গে এতগুলো কাজ তাঁরা কিভাবে করেন তাই ভাবছি। গণেশ মান্নার মনে ভয় ঢুকেছে। কংগ্রেস ছেড়েছে বলে তাকে হয়ত কোনও দূর গাঁয়ে বদলি করে দেওয়া হবে। এরকম ভয় আরও অনেকের মনেই।

ছাত্ররা পড়তে পায় না টাকার অভাবে। শিক্ষকরাও মাইনে পান না। তবুও যা পান তা বজায় রাখতে গিয়ে কর্তাদের রাজনীতির কাঠগড়ায় পড়ে হাঁপাচ্ছেন।

নেতাদের আমি পক্ষপাতিত্ব দূরে সরিয়ে রেখে একটি প্রশ্ন করছি—এই দেশ কাদের? শুধুই তাদের না সাধারণ মানুষের? *

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অপর শ্রেষ্ঠ ভারতীয়, যাঁর সঙ্গে রোলাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ, সেই রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই সময়ে রোলাঁকে উদ্দীপিত করবার মত অবস্থায় ছিলেন না। বরং তিনিই রোলাঁর কাছ থেকে আলোক ও শক্তি চাইছিলেন। ভারতে গান্ধীবাদের বিরোধিতা করে তিনি নিন্দিত এবং নিঃসঙ্গ। নৈরাশ্যে তাঁর মন এমনই আচ্ছন্ন যে, ইউরোপ যাত্রার ঠিকঠাক হওয়া সত্ত্বেও (১৯২৫, আগস্ট) পিছিয়ে গেলেন, যেহেতু সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে কতকগুলি আক্রমণ হয়েছে। যাত্রা বাতিলের অজুহাতরূপে মন্দ স্বাস্থ্যের কথা বলা হল (রোলাঁ অন্তত তাই মনে করেছেন)। গান্ধীজীর ইউরোপযাত্রায় টালবাহানা নিয়ে রোলাঁ যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছেন, সেবার কারণ ছিল অন্তরের নির্দেশের অভাব ; এবার স্বাস্থ্যের অভাব। নিতান্ত ক্ষুব্ধ হয়ে রোলাঁ ডায়েরীতে লিখছিলেন—

"রবীন্দ্রনাথ আমাদের আবার নতুন করে নিরাশ করলেন। গত তিন মাস ধরে ভিলন্যুভে তাঁর অগাস্ট মাসে আসার কথা তিনি আমাদের জানাচ্ছেন। অবশেষে, আজ রবীন্দ্রনাথ এক টেলিগ্রামে বলেছেন যে, স্বাস্থ্যের কারণে আপাতত ইউরোপ যাত্রা বাতিল করে দিলেন। তাঁর অভ্যর্থনার জন্য সব আয়োজনই করা হয়েছিল। সব ব্যর্থ হল। আমার আশঙ্কা, এই সব ভারতীয়দের উপর নির্ভর করে কোনো কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়া অসম্ভব। এঁরা যেমন সহজে উৎসাহিত হন, তেমনইভাবে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। এঁদের নিজেদের পরিকল্পনাগুলিকে সফল করার জন্য আমাকে অনেক সময় ব্যয় করতে হয় এবং আমি তাঁদের নিকট থেকে বিশেষ কিছু সাহায্যও পাই না।"

ক্লান্ত আর্ত রবীন্দ্রনাথের ২৩ সেপ্টেম্বরের চিঠি পৌঁছল রোলাঁর কাছে।

"ভারতে থাকার জন্য আমাকে কী না প্রচণ্ড মানসিক উত্তেজনার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে! একটা বিরামহীন, অদৃশ্য নৈতিক নিঃসঙ্গতা আমাকে সব থেকে বেশি পীড়া দিচ্ছে ও পাষাণের মত আমাকে চেপে রেখেছে। যদি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে হাত মেলাতে পারতুম তাহলে সব সময়ের জন্য সাধারণ অনুমোদন লাভ করা যেত। কিন্তু আমি এটা কিছুতেই ভুলতে পারি না যে, আমার সত্যের ধারণা ও তার সন্ধানের পন্থা আমূল পৃথক। আজকের ভারতে যদি কেউ প্রশান্তি চায় তাহলে তার গান্ধীর সঙ্গে একমত না হয়ে উপায় নেই।..আমি বিশ্বাস করি যে ইউরোপে আমার বন্ধু রয়েছেন, যাঁরা আমার প্রকৃত আত্মীয় ও যাঁদের সহানুভূতি আমাকে বর্তমানের অবসন্নতা থেকে ঊর্ধ্বে তুলে নেবে।"

বলা বাহুল্য রোলাঁ অতঃপর সান্ত্বনাভরা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। স্বদেশে নিজের কার্যত নির্বাসিত রূপের দৃষ্টান্ত তুলে তিনি লিখেছিলেন, "আমার থেকে আপনাকে কে বেশি বুঝবে?"

তাহলেও রোলাঁর মানসিক অস্বস্তির কারণগুলি যাচ্ছিল না। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিখ্যাত ভারতীয়দের 'ইউরোপীয় ঘটনাবলী সম্পর্কে আশ্চর্য রকমের উদাসীনতা' এবং বিদ্রূপাত্মক মনোভাবে তিনি পীড়া বোধ না করে পারেন নি। ভারত সম্পর্কে তাঁর আবেগ ও শ্রদ্ধাপূর্ণ রচনাগুলি অনেক সময় ভারতীয়দের সংকীর্ণ জাতীয় অহমিকা-বৃদ্ধির কারণ হয়েছে, তাও তিনি আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ করেছিলেন।

এর পরেই ইউরোপীয় ঘটনাবলী সম্বন্ধে সুবিখ্যাত আন্তর্জাতিক ভারতীয়ের উদাসীনতার চরম ঘটনাটি ঘটল। রবীন্দ্রনাথ '১৯২৬ সালে ৩০শে মে মুসোলিনী ও ইতালি সরকারের অতিথি হয়ে ইতালিতে এসে পৌঁছলেন ও তিন সপ্তাহ সেখানে কাটালেন।'

রবীন্দ্রনাথের চারপাশে যে সুচারু আতিথ্যের আয়োজন করা হয়েছিল, এবং মুসোলিনী পরম সৌজন্যের যে-পটভূমিকা বিস্তৃত করেছিলেন, তাতে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না, এবং তাঁর উচ্চারিত মুগ্ধতা মুসোলিনীর উচ্চশক্তি-সম্পন্ন প্রচারযন্ত্রের দ্বারা বহুগুণে পরিস্ফীত হয়ে বিশ্বসংসারে নিনাদিত হতে লাগল।

ভিলন্যুভে রোমা রোলাঁর কানে সেই শব্দগুলি সীসার গুলির মত প্রবেশ করেছিল, সন্দেহ নেই। সংশ্লিষ্ট রোলাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ এসে পৌঁছলেন ২১শে জুন। প্রথম তিন দিনের আলোচনা হল সঙ্গীত, কবিতা প্রভৃতি নিয়ে। চতুর্থ দিনে কবি আলোচনার মাঝখানে ইতালি ভ্রমণ-প্রসঙ্গ তুলে মুসোলিনীর একনায়কত্বকে জনগণের পক্ষে কল্যাণকর মনে করেন বলে জানালেন। কবির কথাগুলি যিনি শুনছিলেন তিনি আর কেউ নন, রোমা রোলাঁ, সুতরাং তাঁর আশাভঙ্গ, ক্ষোভ ও মানসিক তিক্ততা কল্পনা করা যায়। রোলাঁর ডায়েরীতে রবীন্দ্রনাথের এই কালের চিত্র মোটেই আলো-ঢালা নয় :

"একটি কথাও না বলে আমি শুনে যাচ্ছিলাম। রবীন্দ্রনাথের বাক্যপ্রবাহ অবিশ্রান্তভাবে চলতে লাগল (তাঁকে থামানো খুবই মুশকিল), সবই অসংলগ্ন, অস্পষ্ট, তথ্যের ব্যাপারে অনির্দিষ্ট। আমার ভয় হয়, শোনার চাইতে বলাটাই তাঁর বেশি প্রয়োজন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা খুবই কঠিন। দীর্ঘায়িত কথা বলতে তিনি পছন্দ করেন, তাতে কেউ তাঁকে বাধা

দিতে পারবে না। ...শ্রোতার যখন উত্তর দেবার মুহূর্ত আসে, তখন তাকে একটিমাত্র প্রশ্নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হয়, যেখানে রবীন্দ্রনাথ দশটি প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি অনেক কথাই বলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আসল সমস্যাগুলিতে আসছিলেন না। আমি অনেকক্ষণ ধরে কেবল শুনেই যাচ্ছিলাম, এবং কিছু বলতে না পেরে অধীর হয়ে উঠেছিলাম।"

বলা বাহুল্য এর পরে 'কিছু বলতে না পেরে অধীর' রোলাঁ বেশ কিছু বললেন, এবং রবীন্দ্রনাথকে অগত্যা শুনতে হল। মুসোলিনির ভয়াবহ ডিকটেটরির শাসনের রূপ বহুভাবে বর্ণিত হল কয়েকদিন ধরে। মুসোলিনি ও তাঁর শাসনের প্রশংসা বলে রবীন্দ্রনাথের মুখে যেসব কথা ইতালির কাগজগুলিতে বসানো হয়েছে সেগুলিও কবিকে রোলাঁ দেখালেন। ইতালির কাগজে মুসোলিনির পক্ষ সমর্থনে রবীন্দ্রনাথকে দাঁড়াতে দেখে ইউরোপের নানা দেশের মানবতাবাদী বহু বুদ্ধিজীবী ইতিমধ্যে তাঁর নিন্দা করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। কবির মর্যাদার পুনর্বাসনের জন্য রোলাঁকে সচেষ্ট হতে হলই। রবীন্দ্রনাথ যখন ভারতে ইংরাজ অত্যাচারের কথা তুললেন, তখন রোলাঁ তীক্ষ্ণভাবে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'যদি ইতালির অত্যাচার ও মিথ্যাকে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ দিয়ে সমর্থন করা হয়, তাহলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকেও কোনমতে সমর্থন করা চলে না।' বহু আলোচনার পর স্থির হল, ফরাসী সাহিত্যিক দুয়ামেল রবীন্দ্রনাথকে লিখিত প্রশ্ন দেবেন এবং রবীন্দ্রনাথ তার লিখিত জবাব দেবেন। প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পাবে। রবীন্দ্রনাথ সত্যই এক প্রবন্ধ লিখলেন 'যা আগাগোড়া অস্পষ্ট উক্তিতে পরিপূর্ণ। ফ্যাসিবাদের কিছুটা নিন্দা করলেন বটে কিন্তু মুসোলিনি যে দেশের জন্য অনেক কিছু করেছেন সে কথাও বললেন এবং মুসোলিনিকে নেপোলিয়নের সাথে আবার তুলনা করলেন।' দুয়ামেল চটে অস্থির। তিনি হুমকি দিলেন, সব ফাঁস করে দেবেন। রোলাঁ তাঁকে যদিও ঠাণ্ডা করলেন (দুয়ামেলকে রোলাঁ স্মরণ করান, যুদ্ধের সময়ে দুয়ামেলও যথেষ্ট দোমনা ভাব দেখিয়েছেন, এক্ষেত্রে 'ইউরোপীয় রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ বৃদ্ধ ভারতীয় কবির পক্ষে দোদুল্যমান অবস্থা খুব অস্বাভাবিক নয়'), কিন্তু প্রশান্ত মহলানবিশকে কড়াভাবে জানিয়ে দিতে ভুললেন না—

"ইউরোপে রবীন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তার কারণ তাঁর কাব্য যতটা নয়—লোকে তাঁর কবিতা খুব কমই জানে, বা কিছুই জানে না—যতটা যুদ্ধের সময়ে তাঁর মহান উদার বাণী, সাম্রাজ্যবাদ, যান্ত্রিক সভ্যতা ও পাশ্চাত্যের অন্ধ শক্তিগুলির ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টাসুলভ নিন্দা, এবং তাঁর পবিত্র ভূমিকা, যা জনসাধারণ মেনে নিয়েছে। অতি নিকৃষ্ট পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ ও একটা পাশবিক ডিকটেটরশিপের সঙ্গে আপস করার মত অবস্থায় আসার ফলে এক নিমেষে তিনি সমস্ত কিছু হারাতে বসেছেন।"

মুসোলিনি ও তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ মনস্থির করতে রবীন্দ্রনাথের আরও কিছুদিন লাগল। রোলাঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার পরে জুরিখ, ভিয়েনা প্রভৃতি স্থানেও যখন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা রোলাঁরই অনুরূপ কথা বললেন, তখন রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে খোলাখুলি বলতে লাগলেন এবং সেই বিবৃতি ও চিঠিপত্র রোলাঁ তাঁর মাসিকপত্র 'ইউরোপ'-এ ছাপিয়ে কবির সম্মান রক্ষা করলেন। এই সমস্ত ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ খুবই বিচলিত ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এনড্রুজকে ২১শে জুলাই এক চিঠিতে অবসন্নভাবে লেখেন—"ইউরোপের রাজনীতি নিয়ে ঘাটাঘাটি করার ইচ্ছা আমার মোটেই ছিল না, এবং ইতালিতে সব কিছু নিরপেক্ষভাবে বিচার করব, এই আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু কর্মফলের শৃংখলে বাঁধা পড়ে গেলাম।" রোলাঁ তখন এতই অসন্তুষ্ট যে, এই চিঠির উপরে লিখলেন—

> "'কর্ম' একটা সুবিধাজনক অজুহাত। অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আত্মা কখনও নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। পাশ্চাত্যে যখন আমরা একটা ভুল করি, আমরা তখন বলি না—এটা আমার কর্মফলের জন্য হয়েছে—আমরা বলি, অপরাধ আমারই।"

রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা, সংশয়ের আবর্তে তাঁর আত্মার ক্রন্দন, আবার প্রেরণার ক্ষণে পারিপার্শ্বিকের ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা দেখে রোলাঁ তাঁর বিষয়ে এইকালে যা লিখেছেন, মনে হয় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত মোটামুটি সেই ধারণাই বজায় ছিল—

> "এই মহান জীবনের আংশিক বিফলতার ধারণাটা খুবই বেদনাদায়ক। তাঁর সত্তা চিরন্তন দু' ভাগে বিভক্ত। একটি হল—কবিসত্তা, যা তাঁর স্বভাবজাত, অপরটি—সাময়িক ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার ভূমিকা, যে-ভূমিকা গ্রহণ করতে বাস্তব অবস্থা তাঁকে বাধ্য করেছে। এই দ্বিতীয় ভূমিকা সুমহান: এর আবেশময়ী প্রেরণার মুহূর্তগুলিতে রবীন্দ্রনাথ তার উচ্চশিখরে উঠতে পেরেছেন। কিন্তু সেখানে তিনি নিজেকে অবস্থান করান না, কবি এবং অভিজাত তাঁকে দখল করে বসে এবং তারা জনসাধারণ ও তাঁর মধ্যে একটি ব্যবধান সৃষ্টি করে। এই জন্যই তাঁর মনে সব রকমের দোদুল্যমান অবস্থা, এইজন্যই তাঁর ভূমিকার অর্ধসমাপ্তি, পরিকল্পিত কর্ম মধ্যপথে বর্জিত; অনুশোচনা, বিরাগ; আন্দোলিত হওয়ার উত্তেজনা; অনেক অর্থহীন উক্তি এবং অবিরাম খণ্ডিত হওয়া। এমনই দুর্ভাগ্য যে, তাঁর এমন কোনো সঙ্গী নেই, যিনি তাঁর অসম্পূর্ণতা পূরণ করে দিতে পারেন, এবং যে-মুহূর্তে কবি হাল ছেড়ে দেন, তখন শক্ত হাতে সেই বন্ধু হাল ধরতে পারেন। এইসব ভারতীয়দের মধ্যে—এমন কি যাঁরা সব থেকে বুদ্ধিমান তাঁদের মধ্যেও—সংগঠন করার ও লেগে থাকার ক্ষমতা নেই। ...একটা সভা থেকে আর একটা সভায়, একটা শহর থেকে আর একটা শহরে, এই এত দৌড়াদৌড়ি আমার নিকট কী নিষ্ফলই না মনে হয়, কোনো কিছুরই মূলে যাওয়া হয় না, কোনো কিছুই সংগঠিত হয় না।"

গান্ধী-প্রসঙ্গে ফেরা যাক। এই সময় রোলাঁকে গান্ধী সম্বন্ধে মোহমুক্ত করার ব্যাপারে কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয়ের অভিমত কার্যকরী হয়। তাঁদের একজন, আর কেউ নন, বাপুর উত্তরাধিকারী পণ্ডিত জহরলাল নেহরু। প্রথমবার নেহরু যখন রোলাঁর সাক্ষাতে এসেছিলেন, তখন তিনি অতিশয় গান্ধীবাদী, কিন্তু এবার অনেকখানি সরে গেছেন। নেহরু রোলাঁকে অনেক সমাজতান্ত্রিক কথাবার্তা শুনিয়েছিলেন, ভারতে ধর্মঘট প্রভৃতি ঘটছে, বিদ্রোহের ভাব দেখা যাচ্ছে, জনসাধারণের খুবই আর্থিক দুর্দশা ইত্যাদি। গান্ধীজী সম্বন্ধে অভিযোগ করে নেহরু বলেন—"জনসাধারণ এবং শ্রমিকশ্রেণীর...বাস্তব অবস্থার প্রতিকারের ব্যাপারে গান্ধী কিছুই করছেন না; তিনি তাদের দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে কিছুই শুনতে চান না; তাদের দুর্দশার প্রতিকার হিসাবে জীবনে পবিত্রতার কথা প্রচার করেন মাত্র।"

আর একজন ভারতীয়, ভারতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক এবং বহু বৎসর পূর্ব থেকেই আন্তর্জাতিক পুরুষ, ডঃ জগদীশচন্দ্র বসুও গান্ধীজীর বিরুদ্ধে বিরাগ প্রকাশ করলেন রোলাঁর কাছে। জগদীশচন্দ্র জেনিভাতে 'ইণ্টারন্যাশন্যাল কমিটি ফর ইনটেলেকচুয়াল কো-অপারেশন'-এর এক অধিবেশনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। রোলাঁর সঙ্গে তাঁর অনেকবার সাক্ষাৎ ও আলোচনা হয়। জগদীশচন্দ্রের জীবনীশক্তি, বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি ও তেজ রোলাঁকে বিস্মিত করেছিল।* রোলাঁ দেখলেন, জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ থেকে অনেক বেশি সংবাদ রাখেন, লীগ অব নেশনস্-এর কপটতা সহজেই ধরতে পেরেছেন, মুসোলিনির আমন্ত্রণ পরিষ্কারভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। গান্ধী সম্বন্ধে ডঃ বসু রোলাঁকে বললেন—

'গান্ধী অত্যধিক সংকীর্ণমনা। তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় পবিত্র আত্মিক ঐশ্বর্যের একান্ত অভাব।"

গান্ধীজীর 'সংকীর্ণতার এবং 'আত্মিক ঐশ্বর্যের একান্ত অভাবের' একটি দৃষ্টান্ত অবিলম্বে রোলাঁ পেলেন। গান্ধীবাদের বিশ্ববিজয়ের কল্পনায় সুখী রোলাঁ উৎসাহের সঙ্গে বার্থাল' ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা গান্ধীজীকে লিখে পাঠালেন। এরা ফ্রান্সের গান্ধীপন্থী। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে এই দুই কৃষক-ভ্রাতা 'যুদ্ধে যোগ দিয়ে মানুষ মারতে অস্বীকার করেছিল। তার জন্য সামরিক আদালতের বিচারে তাদের শাস্তি হয়েছিল।' রোলাঁর আবেগপূর্ণ চিঠি কিন্তু গান্ধীজীর মধ্যে অভিপ্রেত আনন্দ সঞ্চার করতে পারল না। তাঁর নির্দেশে মীরাবেন লিখে পাঠালেন—"বাপুজী মনে করেন না যে, এই ভ্রাতৃদ্বয়ের মন সত্যকারের অহিংস হবার মত পবিত্র, কেন না যুদ্ধে যোগ দিতে তাদের আপত্তির প্রধান কারণ পৈতৃক মাটির প্রতি তাদের আকর্ষণ।" চিঠি পড়ে রোলাঁ স্তম্ভিত। এইরকম চালুনি দিয়ে যদি অহিংস সৈনিক চালা হয় তাহলে জগৎ-সংসারে গান্ধী ছাড়া যে গান্ধীবাদী মিলবে না! ডায়েরীতে রোলাঁ লিখলেন—'একটু হতাশই হলাম। এমন কি যাঁরা সব থেকে শ্রেষ্ঠ তাঁদের মধ্যেও মতবাদ-প্রসূত কী সংকীর্ণতা! তাঁরা বিশ্ব-বাণীকে একটা ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চান।'" রোলাঁর হতাশার বিশেষ কারণ, গান্ধীনীতিকে তিনি বিশ্ববিপ্লবের পন্থা করতে চেয়েছিলেন—এক্ষেত্রে অধিকারী-অনধিকারী কে, তা নির্ধারণে যদি অতিরিক্ত শুচিবায়ুতা দেখানো হয়, তাহলে অহিংস বিপ্লবের কুসুম ঝরে যাবে কিংবা আকাশকুসুম হয়ে শূন্যে উড়ে যাবে। তিক্ত বিষাদের সঙ্গে রোলাঁ মীরাবেনকে উত্তরে লিখলেন—'বার্থাল' ভ্রাতৃদ্বয় সম্বন্ধে আপনারা যা লিখেছেন, তা পড়ে আমি খুব দুঃখিত। এই সরল অশিক্ষিত কৃষক দুটি, যাদের কোনো গুরু নেই, যারা ধর্মের গভীর তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ, যারা দুনিয়ার ঘটনাবলীর কোনো খবর রাখে না যারা পুরাতন বাইবেলে বিশ্বাসী হয়েও একমাত্র স্বভাবজাত বিবেকের আলোকের দ্বারা চালিত হয়েছে এই রকম দুটি সাধারণ মহৎ ব্যক্তি যদি অহিংসা মন্ত্রের গুরুর ধর্মীয় চাহিদা পূরণে অক্ষম হয়, তাহলে গান্ধীর মহৎ আদর্শ যে কোনোদিন মানবসমাজে প্রবেশ করবে ও ফলপ্রসূ হবে, তার কোনো আশা আছে বলে মনে হয় না। গান্ধীর এই পবিত্র জেদ তাঁকে তাঁর আশ্রমের দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখবে।" 'যে লোকটি মানব ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করতে শুরু করেছিলেন' তাঁর অন্যরকম পরিণতি রোলাঁ আশা করেছিলেন। হতাশায় ও ক্রোধে রোলাঁ তাঁর ডায়েরীতে লিখলেন—"এই বৃদ্ধ একগুঁয়ে লোকটি তাঁর ভুল-ভ্রান্তি এতটুকু সংশোধন করবেন না। বাস্তবিক-পক্ষে এই লোকটি হচ্ছেন একটি অন্তর, একটি সাধু অন্তর।* তিনি নিজে অপরকে তাঁর মতে টানতে পারেন না, নিজের মতও বদলাবেন না! ইউরোপে আসার জন্য এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য হঠাৎ তাঁর মস্তিষ্কে একটা তীব্র ইচ্ছা প্রবেশ করেছে। এই সাক্ষাৎকারের পরীক্ষাকে আমি ভয়ের চোখে দেখছি—তাঁর পক্ষেও বটে, আমার পক্ষেও বটে।

মনোভাবের পরিবর্তন বটে! ইউরোপে যার পদধূলির জন্য মাত্র বছর চারেক আগেও রোলাঁ ব্যাকুল, তাঁর আসার কল্পনায় এখন আতঙ্কিত! বিখ্যাত ভারতীয়দের ইউরোপীয় মিশনকে রোলাঁ এখন ভয়ের চোখে দেখতে আরম্ভ করেছেন। কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ-ভ্রমণ নিয়ে তাঁর যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে।

রোলাঁর সান্নিধ্যে কিছুদিন কাটানোর জন্য গান্ধীজীর বাসনার পিছনে কতকগুলি কারণ উপস্থিত হয়েছিল। কয়েক বছরের মধ্যে গান্ধীজী নিশ্চয়ই রোমাঁ রোলাঁ নামক তাঁর স্বেচ্ছা রাজদূতটির সম্বন্ধে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করে উঠতে পেরেছিলেন। অবশ্যই বুঝেছিলেন যে, রোলাঁর মতামতের দাম আছে এবং তাঁর প্রশ্নের উত্তরও দেবার প্রয়োজন আছে। কিন্তু প্রশ্নগুলি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বেয়াড়া হয়ে উঠেছিল, যেগুলির যথাযথ উত্তর দেওয়া কঠিন, অথচ যদি না দেন তাহলে হয়ত রোলাঁ আর স্বেচ্ছা-রাজদূত থাকবে না। গান্ধীজী স্থির করলেন উত্তর দেবেন, তাঁর শ্রেষ্ঠ উত্তর 'আমার জীবনই আমার বাণী', সেই জীবনভরা দেহখানি নিয়ে হাজির হবেন রোলাঁর নিকটে রোলাঁ সহজেই তাহলে মূল উৎস থেকে তাঁর উত্তরবারি আহরণ করে নিতে পারবেন।

রোলাঁর প্রশ্ন ছিল সুকঠিন। তিনি দেখেছেন বার্থাল' ভ্রাতৃদ্বয় 'অহিংসা মন্ত্রের গুরুর ধর্মীয় চাহিদা পূরণে

---

* ডঃ বসুর ৭০তম জন্মবার্ষিকীতে অভিনন্দন জানিয়ে ১৯২৮ সালের নভেম্বর মাসে রোলাঁ উচ্ছ্বসিত হয়ে যে কথাগুলি লিখে পাঠিয়েছিলেন তার কয়েক লাইন—

"Others more qualified will hail you as a Genius of Science. I hail the Sear; he who by the light of his poetic and spiritual insight has penetrated in the very heart of Nature, beneath the veils of bark and stone wherein are enveloped her throbbings of life. In you .I hail the hero of the mind, who, faithful to the virtues of his warrior caste, has been the conqueror of a continent of the unknown...You have thrown open the gates of the Mind, the world of life, till yesterday held to be unconscious, dead and buried in the night."

(জগদীশ শতবার্ষিকী স্মারক পুস্তিকা থেকে গৃহীত)

---

* উপমাটি যতখানি ভয়াবহ মনে হচ্ছে, ততখানি নয়। যে সাধু পরিব্রাজক জীবটি খ্রীস্টকে বহন করেছিলেন, রোলাঁ নিশ্চয় তার সঙ্গে গান্ধীজীর তুলনা করেছেন। তবে রোলাঁর মনোভাব বদলেছে, সহজেই দেখা যায়। আগে যিনি স্বয়ং খ্রীস্ট ছিলেন, এখন তিনি খ্রীস্টের বাহন!

অসমর্থ' হয়েছিল। রোলাঁ এবার সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু স্বয়ং অহিংসামন্ত্রের গুরু কি নিজের ধর্মীয় চাহিদা পূরণ করতে পেরেছেন? তার জীবন ও তাঁর বাণী কি সত্যই অনুরূপ? রোলাঁর প্রশ্ন—'প্রথম মহাযুদ্ধের মত এমন একটা বর্বর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে অহিংসাবাদী হয়েও কি কারণে ও কি যুক্তিতে গান্ধী ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থন করেছিলেন?' কিছু অস্পষ্ট কথা ও নিজের আত্মজীবনী এগিয়ে দিয়ে গান্ধীজী বলেছিলেন, রোলাঁ উত্তর খুঁজে নিন।

রোলাঁর মারাত্মক পত্রটি অবশ্যই উদ্ধৃতিযোগ্য ঃ

"একথা বলার জন্য আমাকে মাপ করবেন যে, আপনার চিন্তার মধ্যে প্রবেশ করতে ও সেগুলিকে সমর্থন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেও আমি তা পারি নি। যাঁরা দেশের জন্য ও জাতির জন্য যুদ্ধকে পুণ্য কাজ বলে বিশ্বাস করেন ও যুদ্ধকে অনিবার্য বলে মনে করেন, তাঁরা যখন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন আমি তাঁদের বুঝতে পারি। ... আমি তাঁদেরও বুঝতে পারি যাঁরা যুদ্ধকে বিভীষিকা বলেই জানেন এবং জাতির প্রতিও যাঁদের তেমন আকর্ষণ নেই, কিন্তু যুদ্ধে না গিয়ে যাঁদের নিস্তার নেই, পালাতে গেলে বন্দুকের গুলীতে মরতে হবে কিংবা যাঁদের কোনো নৈতিক শক্তি ও বিশ্বাস নেই। ... কিন্তু আপনার মত একজন ব্যক্তি, যাঁর এত প্রচণ্ড সাহস ও বিশ্বাসের জোর, যিনি সর্বক্ষেত্রে মানুষহত্যা ও জাতিতে-জাতিতে যুদ্ধকে আপোষহীনভাবে নিন্দা করেন, তিনি তাতে অংশ গ্রহণ করলেন এবং তাতে বাধা না দিয়ে তিনি সে-পথ স্বেচ্ছায় বেছে নিলেন—এর রহস্য কেউই আমাকে বোঝাতে পারবে না, বা এটা আমি কখনই মেনে নিতে পারব না।

অধিকন্তু, আপনি যেসব যুক্তি দিয়েছেন (আমাকে মাপ করবেন—), তা আমার নিকট মোটেই যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। ... আপনার যুক্তিগুলি বিচার করা যাক। আপনি তিনটি বিকল্প যুক্তি দিয়েছেন; প্রথম, বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রজা হিসাবে (স্বেচ্ছায়ই হোক, আর পশুবলকে স্বীকার করেই হোক) তার রক্ষণাবেক্ষণে উপকৃত হয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে আপনার জাতির জন্য স্বায়ত্তশাসনের আশা করে, তাদের সংকটে তাদের সাহায্য করতে, অর্থাৎ তাদের নৃশংস অত্যাচারে যোগ দিতে নিজেকে বাধ্য বলে মনে করেছেন, এবং আপনি বিশ্বাস করেছেন যে, এইপ্রকার বীরত্বপূর্ণভাবে স্বীকৃত পাপের মধ্যে থেকে কল্যাণের উদ্ভব হবে, অর্থাৎ ইংরাজেরা আপনার জাতিকে স্বাধীনতা দিয়ে দেবে, তারপর নিজের ঘরের মালিক হয়ে আপনারা আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ন্যায় ও মানবতার নীতি, অহিংসা, প্রতিষ্ঠা করবেন। বাস্তব ঘটনাবলী অতঃপর আপনাকে উত্তর দিয়েছে: .. আপনার এই অত্যন্ত রাজভক্তিমূলক সুবিধাবাদ কোনো কাজেই লাগে নি। পক্ষান্তরে যদি বা তা সত্যই সফল হত, আপনারা স্বাধীনতা পেতেন,—হে বন্ধু, আপনার প্রতি একটা কঠিন বাক্য ব্যবহার করতে আমাকে অনুমতি দিন—সাম্রাজ্যবাদের জন্য কোটি কোটি মানুষের রক্তাক্ত আত্মাহুতির ফলে, এই মূল্যে, যদি আপনাদের স্বাধীনতালাভ হত, তাহলে তা হত ভগবানের নিকট বিষম অপরাধ এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ভারতের ললাট সেই রক্তের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকত, আর সেই রক্ত ভগবানের সমক্ষে ভারতকে অভিশাপ দিত। দ্বিতীয়ত, আপনার মতে, বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশে যুদ্ধ বয়কট করা সম্ভব নয়। .. তৃতীয়ত, সেক্ষেত্রে পথ—ব্যক্তিগত অসহযোগ ও কারাগারের যন্ত্রণাভোগ। এই তৃতীয় পন্থা আপনি মুখে ঘোষণা করেই ক্ষান্ত, ঐ সময়ে কাজে পরিণত করেন নি; কেন করেন নি বুঝতে পারছি না। তিনটি পন্থার মধ্যে এই তৃতীয়টিই আমার মনে হয় নৈতিকভাবে একমাত্র গ্রহণযোগ্য পন্থা, যদিও যথেষ্ট নয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে সন্ন্যাসীরভাবে, বৃথা বাক্যব্যয় না করে, [illegible] না করে, বিবেক-অনুমোদিত একমাত্র পন্থা বলে ঐ তৃতীয় পন্থা, আপনি প্রয়োগ করেছেন।...কিন্তু সব থেকে ভয়ানক অপরাধের সময়, যখন কোটি কোটি মানুষ তাদের কু-নেতাদের দ্বারা চালিত হয়ে পরস্পরকে হত্যা করছিল, তখন আপনি ঐ পন্থা প্রয়োগ করেন নি কেন? ...আমার কাছে এটা খুবই বেদনাদায়ক যে, সাম্রাজ্যবাদী নেতারা তাদের ঘৃণিত স্বার্থের যুদ্ধে এশিয়া ও আফ্রিকার হতভাগ্য জনগণকে—যাদের তারা শোষণ করে আসছে ও যাদের তারা কামানের খোরাক হিসাবে ইউরোপীয় মাংসপিণ্ডের চাইতেও কম মূল্যবান দ্রব্যের মত ব্যবহার করে—সৈন্যবাহিনীর তালিকাভুক্ত করার কাজে, আপনার সাহায্যের উদাহরণকে তাদের পৈশাচিক কাণ্ডের অনুমোদনরূপে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছিল। খোলাখুলিভাবে আমি আপনাকে এইসব কথা লিখলাম, আশা করি যে, এইসব বিষয়ে আমাদের চিন্তা শীঘ্রই পরিষ্কার করতে পারব।"

গড়ানো লাভার মত জ্বালানো কথাগুলি। শান্তির ও স্বস্তির প্রয়োজনে গান্ধীজী মীরাবেনকে দিয়ে উত্তর পাঠালেন—

"বাপু চান যে, আপনাকে পরিষ্কার করে আমি জানাই, ইউরোপের কনফারেন্সে যাওয়ার প্রশ্নটা তাঁর নিকট গৌণ। আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য অন্তরের আহ্বানই তাঁকে সব থেকে বেশি প্রভাবান্বিত করেছে। এই আহ্বান সব সময়ই ছিল কিন্তু আপনাদের সাম্প্রতিক পত্র বিনিময়ের ফলে এটা আদেশমূলক হয়ে পড়েছে। আপনি যদি অনুমতি দেন, তাহলে বাপু আপনার সান্নিধ্যে কিছুকাল কাটাতে চান, যাতে করে আপনারা পরস্পরের গভীরে প্রবেশ করতে পারেন, পরস্পরের কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, যাতে করে আপনাদের সামান্যতম ভুল বোঝাবুঝিগুলিও চিরদিনের মত দূরীভূত হতে পারে।"

ইতিমধ্যে রোলাঁর সাধসঙ্গবাসনা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। সাক্ষাতের অনুমতির ব্যাপারে যথেষ্ট কার্পণ্য দেখিয়ে তিনি উত্তর দিলেন—"আমার ভয় হয়, গান্ধী যদি ইউরোপে আসেন, হয়ত আমার দ্বারা তিনি নিরাশ হতে পারেন। আমি তা সর্বান্তঃকরণে পরিহার করতে চাই।" [ক্রমশঃ]

পথ কে রুখবে?

মনোজ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ চল্লিশ ॥

খাঁ-খাঁ করছে হরিহর খাঁর বাড়ি। হঠাৎ এ কেমন ভাব। হিসাব মিলছে না আর যেন। এতকাল যেমনধারা জেনে বুঝে এসেছি, বিলকুল তার উল্টো। লোকের তোয়াজ পেয়ে পেয়ে এমন হয়েছে, একটি দণ্ড সময়ও হরিহর মোসাহেব-শূন্য হয়ে থাকতে পারেন না। অথচ সেই মানুষগুলো অকস্মাৎ ঘোরতর কুলীন হয়ে গেছে। রাজীব ত্রিপাঠী পর্যন্ত। আগে ছিল, তাড়িয়ে দিলেও নড়ত না—সেই মানুষকে ডেকে আনবার জন্য হরিহর ভৃত্য পাঠিয়েছিলেন। বাড়িতে হাজির থেকেও রাজীব ইচ্ছা করে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, বাড়ি নেই বলে দে থুকী লোকটাকে।

ভৃত্য রসিকতা করে বলল, যে আজ্ঞে ত্রিপাঠী মশায়, বাবুকে আমি তাই গিয়ে বলব।

এতেও ভয় পায় না ত্রিপাঠী। বেরিয়ে এসে দুটো খোশামুদি কথা বলে ভৃত্যের মন ভোলাবে, তা নয়। রাগে রাগে ফিরে এসে ভৃত্য ত্রিপাঠীর বৃত্তান্ত মনিবের কাছে ডালপালা জুড়ে সবিস্তারে বলল। হেন ক্ষেত্রে কত হম্বিতম্বি আশা করেছিল হরিহরের মুখে। যথা: ত্রিপাঠীটাকে বাড়ি ঢুকতে দিবি নি আর কখনো, দরজা থেকে ঘাড়ধাক্কা দিতে দিতে পথে নামিয়ে দিবি। ইত্যাদি। কিছুই নয়। রাগের বদলে বরঞ্চ হরিহরের শুকনো মুখ অতিরিক্ত রকম বিমর্ষ হল।

একদিন দুই অচেনা ছোকরা এসে হাজির। ভৃত্য গিয়ে বলল, আহ্নিকে বসেছেন বাবু।

রোয়াকের উপর চেপে বসল দুজনে। হাত উল্টে ঘড়ি দেখে নিয়ে চড়া মেজাজে বলল, পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে সেরে আসতে বলো।

ভৃত্য পুরানো লোক, অতিশয় চৌকস। বলল, ভগবানের নাম করা অমন ঘড়ি ধরে চলে নাকি। ভাব এসে গেলে তো আধ ঘণ্টাতেও কুলোবে না।

ভাব না আসে যেন। আমরা ব্যস্ত মানুষ--

আর একজনে বলে, চরম দিন এসে গেলে ভগবান ভাবতে তখন সিকি মিনিটও তো মঞ্জুর করবে না।

হরিহর আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন। অনতিপরে আবির্ভূত হলেন: কি বলছেন?

ধান-চাল যা আছে ছাড়ুন। আপনারা পেট মোটা করবেন, আর মানুষ না খেয়ে মরবে—সেটি হচ্ছে না আর এবারে।

অপর জন বলল, উপোস করবে লোকে, আর 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম—' রামধুন গাইবে—সে দিন পালটে গেছে। হাতিয়ার তুলে নেবে হাতে।

হরিহরের কাঁপন এসে গেছে। চেপে-চুপে তবু ধীরকণ্ঠে বললেন, কোথায় ধান।

সকলের মুখে ওই এক রা। কিন্তু মানুষে আর ঘাস খায় না—খবরাখবর রাখে। দরকার মতো আদায় করতে জানে খবর। সরকারও এই কথা বলে দায়িত্ব এড়ায়, খুশি মতন রেশন কমায়। যেন পেটের ক্ষিধের হ্রাস-বৃদ্ধি ওঁদের মরজি মতন ঘটবে।

অপরজন তিক্তকণ্ঠে বলল, আঠারো বছরের রাজত্বে মজুত টাকাগুলো নয়-ছয় করে দেশকে ভিখারির বেহদ্দ বানিয়ে এখন ঐসব ছেঁদো কথা কানে নিতে যাবে কেন মানুষে। থাকে না কেন ধান—কারা দায়ী? সাধারণ মানুষ নিশ্চয় নয়।

আগের ছেলেটা করজোড় করে বলে, ধান-চাল যা আছে আপোষে বের করে দিন। চোখ রেখেছি আমরা, ব্ল্যাকে বিক্রির আশা ছেড়ে দিন। নেতামশায় কথা দিয়ে নিজে আবার ঢোক গিললেন। তাঁর প্রতি-শ্রুতি আমরাই রাখব বলে সংকল্প নিয়েছি।

অপর ছেলেটা বলল, সে নেতা জওহরলাল। ল্যাম্পপোস্টে ঝোলাবেন কালোবাজারি সদাগরদের। তিনি পারেন নি, কলকাতার বড় বড় রাস্তায় আমরাই মজবুত দেখে ল্যাম্পপোস্ট সব বাছাই করে এসেছি।

হরিহর শশব্যস্তে বলেন, তা করুন গে। ভালই তো। কিন্তু আমায় কেন ওসব শোনাতে এসেছেন? আমার তো হাটুরে বাড়ি—যে কেউ এসে যথা ইচ্ছা চলে যান, নয় তো গুলতানি করুন এইখানে বসে বসে। আপনাদেরও বলছি: ভিতরে এসে খুঁজে-পেতে দেখুন। পরের মুখে ঝাল খাবেন কেন? ধান তো টাকাপয়সা নয় যে কলসি ভরে মাটির নিচে পুঁতে রেখেছি—

পুঁতে রেখেছেন কিম্বা কী করেছেন আপনি জানেন। তবে পাচার করেন নি এটা ঠিক। খুঁজে-পেতে সহজে কণাগো পাবো না—তেমন কাঁচা লোক আপনি নন। তবে সদয় হয়ে আপনাদেরই কেউ যদি সুলুকসন্ধান বাতলে দেন, সদলবলে আসব সেদিন। কেন না হিসাবে যা পাওয়া যাচ্ছে, ধান রয়েছে পর্যাপ্ত প্রমাণ।

ইত্যাদি শাসিয়ে সে দুটি আপাতত বিদায় হয়ে গেল। কথাগুলো হরিহর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবছেন। আপন লোকের মধ্যে কেউ ফাঁস করে দেবে, সেই ওঁদের প্রত্যাশা। একজন আপন তো রাজীব ত্রিপাঠী। সুদিনের অতিশয় আপন। এখন কি রকম, সঠিক জানা নেই।

হরিহর নিজেই এবার ত্রিপাঠীর বাড়ি গেলেন। টিনের ঘর—দরজা বন্ধ, জানলা বন্ধ। লখিন্দরের লোহার বাসর করে রেখেছে—সাপ কিলবিল করছে যেন বাতাসের সঙ্গে, ঢুকে পড়তে না পারে।

দরজায় ঘা দিলেন। শব্দসাড়া নেই। ডাকছেন হরিহর: সাড়া দাও ত্রিপাঠী। আমি খাঁ-বাবু, নিজে তোমার কাছে এসেছি। চাকরকে সেদিন বলেছিলে, বাড়ি নেই ত্রিপাঠী। আজকে আছ কি নেই, বলবে তো সেটা! রা কাড়ছ না কেন?

মুহূর্তে দরজা খুলে গেল। যুক্ত-করে ত্রিপাঠী বলে, ভিতরে ঢুকে পড়ুন হুজুর। পাড়াটা ভাল নয়।

এবং হরিহরকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দরজায় খিল আঁটল। বলে, পাড়া ধরেই বা বলি কেন, অঞ্চল জুড়ে এই গতিক। খবরের কাগজে দেখছি, সন্দেহ হলেই

আরামের। পাকিস্তানের এখানেই প্রায় বাদ নেই।

হরিহরের কণ্ঠে কেন হাহাকার উঠল : পায়ের নিচের মাটি সরে যাচ্ছে ত্রিপাঠী। এদ্দিন যেভাবে চলে এসেছে, এখন একেবারে উল্টো। টাকাকড়ির সঙ্গে মান-সম্ভ্রম জড়ানো ছিল, লোকে কত খাতির করত। এখন ঘেন্না করে—তাদেরই হকের ধন মেরে বড় হয়েছি, এমনিতরো ভাব। ধর্মপথে আইন মোতাবেক প্রতিটি পয়সার রোজগার, বাপান্ত-দিব্যি করে বললেও মানবে না।

তক্তাপোষে মাদুর পাতা ছিল। হাত দিয়ে একটু ঝেড়েঝুড়ে তার উপরে ধোপ-দুরস্ত একটা চাদর বিছিয়ে দিয়ে ত্রিপাঠী আপ্যায়ন করে : বসুন হুজুর—

ত্রিপাঠী নতুন সংবাদ দিল, তার মতো সামান্য লোকের কাছে এসেও ধমকধামক দিয়ে গেছে : বড়লোকের মোসাহেবি করে আর মুনাফা হবে না। ওরা নিপাত যাবে, সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও। খাঁ-বাড়ির কোথায় কি আছে দেখিয়ে দেবে চলো, রে-রে করে দলবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়িগে।

রাজীব ত্রিপাঠী বলে, রে-রে করে পড়বে শুনেই তো হুজুর বুকের মধ্যে কাঁপুনি ধরে গেল। কত ছেলেপুলে মায় গরু-বাছুর ছাগল-হাঁস অবধি পাচার হয়ে গেছে। নিজে পাহারাদার হয়ে ভিটের উপর আছি, নয় তো আর যা-কিছু থাকে সব ফেলে যেতাম। তবে পথ বাতিয়ে যাচ্ছি, দরকার বুঝলেই ঠিক করে সরে পড়ুন।

হরিহর বললেন, সরতে তো হবেই—কোথায় যাই বলে দিকি?

পোড়া পশ্চিমবঙ্গের ভিতরে নয়। আগুন সবখানে। কোথাও বাইরে দাউ-দাউ করে জ্বলছে, কোথাও মনে মনে জ্বলছে, দপ করে ফুটে উঠলেই হল।

হরিহর ব্যাকুল হয়ে বললেন, উপায় কি তবে?

ত্রিপাঠী বলে, উপায় পাকিস্তান। ওর চেয়ে ভাল জায়গা হয় না। দেশ ভাগের সময় কর্তারা কতদূর তলিয়ে ভেবেছিলেন, দিনে দিনে তা মালুম হচ্ছে। এপারের হামলা বর্ডার পার হয়ে পাকিস্তান পৌঁছুতে পারবে না, অথচ জায়গাটা কাছাকাছিও বটে। আমার শ্বশুরবাড়িটা কপালক্রমে ঐ ঘেরের মধ্যে পড়ে গেছে। অন্য সবাই পার হয়ে এসেছে, ভিটের পিদ্দিম দিতে বুড়ো শাশুড়ি রয়ে গেছেন। শাশুড়ি-ঠাকরুণকে বড্ড কাজে লেগে গেল—বউ পাগল হয়ে উঠল মাকে দেখবার জন্য, ছেলেমেয়েগুলোও নেচে উঠল। লটবহর-সুদ্ধ পাকিস্তানের শ্বশুরবাড়িতে রেখে এলাম।

হরিহর বললেন, কিন্তু বিনি-পাশ-পোর্টে গিয়ে তারপরে যদি ধরা পড়ি?

ত্রিপাঠী বলে, হাকিমের মতন রায় দিয়ে দিল : বিবাদ-বিসম্বাদের কথা সরকারি চাঁইদের কাছেই শুনবেন, লোকে কিছু জানে না। ঐসব বলেই সরকারি মানুষেরা ভয় দেখায় : ওপারে বাঘ-সিংহ সব ঘুরে বেড়াচ্ছে—খবরদার, উঁকিঝুঁকি দিতে যেও না। বর্ডারের এত কড়াকড়ি করেও আলাদা রাখা যাচ্ছে না—সর্ব রকমে চেষ্টা দেখছে, একেবারে কোমর বেঁধে লেগে গেছে। কিন্তু পারবে না। ক'দিন শাশুড়ির কাছে থেকে চাক্ষুষ দেখে এসেছি হুজুর। পাড়াগাঁয়ের মানুষ পড়শি মানুষ বর্তে গিয়েছে যেন এদের পেয়ে। শাশুড়ি ঠাকরুণের মেয়ে নাতি-নাতনি তো তাদেরই বাড়ির মেয়ে নাতি-নাতনি সব। এমনি খাতিরযত্ন। তারা কেউ ধরাবে না। মফস্বল থানায় বাঙালি পুলিশ-দারোগা—তারাও না। বিপদের আঁচ পেলে তারাই বরঞ্চ প্রাণপণ চেষ্টায় আসান দেবে।

হরিহর অতখানি অবশ্য বিশ্বাস করেন না। শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে এসে রাজীব পাকিস্তান সম্বন্ধে গদগদ। তবু বড় বিপদের মধ্যে সমাধানটা উড়িয়ে দিতে পারেন না একেবারে। ভাবছেন।

ত্রিপাঠী ফিক-ফিক করে হাসে। বলল, পাকিস্তান-হিন্দুস্থান হয়ে এক দিক দিয়ে বড্ড সুবিধা। খুন-রাহাজানি করে লোকে আকছার বর্ডার পেরোচ্ছে। থাও কলা—ওপারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা কলা দেখায়। আবার ওপারে যখন গোলমাল লাগে, সুড়ুত করে এপারে পালাল। সেই জন্যে বলি হুজুর, ওপারেও একপ্রস্থ আস্তানা বানিয়ে রাখুন। রাজি হন তো শাশুড়ি ঠাকরুণকে বলি। ঘরে ঘরে তালা ঝুলিয়ে একটা চালাঘরে মাসি-পিশি বা মামা-জেঠা একটিকে স্থাপনা করে হিন্দুস্থানে এসে রয়েছে, এ রকম অনেক পাবেন। তেমনি কোন একজনের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে লেনদেন হতে পারে। কোন রকম ঝামেলা পোহাতে হবে না—সেই মাসি বা পিশি সুদ্ধ ধরেই বন্দোবস্ত। তিনি তখন আবার আপনার মাসি হয়ে রইলেন।

হরিহর বললেন, শিরে সংক্রান্তি—ওসব ভাবনাচিন্তা এখনকার নয়। তোমার হল গরু-জরু সামান্য নিয়ে সমস্যা—ভগবান সে বাবদে একটি শাশুড়িও মজুত রেখেছেন পাকিস্তানে। আমার বেলা অত সহজ নয়। অন্য সমস্ত না-হয় হল—

বলতে বলতে থেমে গেলেন হরিহর। বন্ধ ঘরের মধ্যে নিতান্তই অকারণে এদিক-ওদিক দেখে নেন। ফিসফিসিয়ে বললেন, সেই যে মাথ-কাটে-মানা—তাই নিয়েই তো বিষম [illegible]।

করতে পারছি নে। বাড়ির নিচে ইছামতী রয়েছেন, মোটরলঞ্চ আছে, সাওড়ালীকোও আছে—

ত্রিপাঠী প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ে : খবরদার, খবরদার—ওসব জলে কদাপি যাবেন না হুজুর। ধানচালের জন্য গুলী খেয়ে মানুষজন হন্যে হয়ে রয়েছে, ধর্ম-বুদ্ধি বিচার-বিবেচনা কিছু নেই। আপনার বাড়ির চৌদিকে এমনিই তো গন্ধে গন্ধে বেড়ায়—হাতে-নাতে পেয়ে গেলে রক্ষে রাখবে না। তুলসী মাড়োয়াড়ির গুদামে পেয়েছিল সামান্য পাঁচ-সাত বস্তা চাল। বয়সে বুড়ো, তায় ধার্মিক মানুষ। দান-ধ্যানও যথেষ্ট। রাগের মাথায় কোন বিচারই রইল না—বুড়োকে চিত করে ফেলে পনের-বিশটা হাতে মুঠো মুঠো চাল মুখে ঠাসতে লাগল : খা, একলাই তুই সব খা, দেশের মানুষ না খেয়ে মরুক। কাঁচা চাল গলায় বেঁধে অক্কা পেয়ে গেল বুড়ো। এ তো সেদিনের ঘটনা। হীরে-মুক্তো পাচার করুন, চাল একটি দানাও সরাতে যাবেন না এ জায়গা থেকে।

তবে কি হবে ?

বলব ? প্রশ্ন করে ত্রিপাঠী হরিহরের মুখে তাকিয়ে থাকে।

বলো না : পরামর্শ নিতেই তো পায়ে হেঁটে চলে এসেছি। তুমি ছাড়া কার কাছে এসব কথা বলা যায় ?

দান করুন। মাতব্বর ক-জনাকে ডেকে সোজাসুজি বলে দিন, অমুকখানে আমার ধান মজুত আছে। মানুষের কষ্ট দেখে মন কেঁদেছে। সমস্ত ধান তোমরা নিজেদের মধ্যে বিলি-বাটোয়ারা করে নাও গে। ধারে-কাছে যাবো না আমি। ধন্য-ধন্য পড়ে যাবে চতুর্দিকে। ধান এদ্দিন লুকিয়ে রেখেছিলেন, সে দোষ চাপা পড়ে যাবে। কাগজে নাম উঠবে। দেখবেন কী কাণ্ড!

হরিহর চুপ করে থাকেন, প্রস্তাবটা মনে সাড়া দেয় না। পরের জিনিষ বলেই সদাব্রতের এমন দরাজ উপদেশ। নিজের হলে ভিন্ন উপায় ভাবত। ভাবতে লাগলেন হরিহর।

তারাফুলি তো কথার ফুলঝুরি একেবারে। ফুলরাকে জড়িয়ে ধরে অবিরত বকবক করছে। বাইরের দিকে একবার উঁকি দিয়ে বলল, মেয়েলোক আর কেউ আসবে বলে মনে হচ্ছে না। লোভ অনেকের—এ যাবে সে যাবে, বলেও ছিল অনেকে। শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যায়। বলে, আরও দিন কতক যাক, ভাল করে ঠাণ্ডা হোক চারদিকে। গরম কবে হল সে তো জানি নে, যে ঠাণ্ডা হতে সময় দিতে হবে ? ফৌজ এসেছে—বাজি ফৌজ বুঝি মানুষ না, পাকিস্তান-হিন্দুস্থান হয় নি তাদের

অথচ, খেলা-ধুলা নেই, লোকের দুঃখকষ্ট বুঝি তারা বুঝতে পারে না ?

উচ্ছ্বাস থামিয়ে বলল, তুমি এসে দোসর পেয়ে গেলাম ভাই। বেঁচে গেছি। রাত দুপুরে একলা মেয়ে মাঠ ভেঙে বাহি বাহি করে ছুটেছি—সে বড় বিশ্রী।

ফুলরা অবাক হয়ে বলে, ছুটতে হবে মাঠে ?

তারাফুলি বলে যাচ্ছে, তেপান্তরের মাঠ। জনমানব নেই কোন দিকে, ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। তুমি যদি না আসতে, মেয়ে-লোক বলতে একলা আমি। ডাইনে-বাঁয়ে আগে-পিছে পুরুষের দঙ্গল। ছুটেছি যেন ছুঁচপোরাীর দল একটা—কেউ কারো মুখ দেখতে পাই নে।

খিলখিল করে উচ্ছল হাসি হেসে উঠল। বলে, আনকোরা তুমি ভাই একে-বারে। হুমহাম করে ষোল-বেহারার পালকি তোমায় মাঠ-পারে নিয়ে তুলবে, তাই বোধ-হয় ভেবে এসেছ। আজগুবি তা বলছি নে—মা-দিদিমাদের আমলে তাও এসেছে ভাই। এখন আজাদির দিন। মহাপ্রাণ ইংরেজ আমাদের তা-বড় তা-বড় নেতাদের সঙ্গে শলা করে তাঁদের জোব্বার পকেটে আজাদি ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে। দেশ জুড়ে সেই থেকে চোরাগোপ্তা কারবার। বেদিকে তাকাও দুর্ভোগ মানুষের।

ফুলরা একটুও দমে নি। বলে, আমার তো কানে শুনেই মজা লাগছে। পালকির মধ্যে পুঁটলি হয়ে না থেকে তেপান্তর মাঠ ছুটোছুটি রাত্রিবেলা—

তারাফুলি বলে, শিশির পড়ে মাঠের শক্ত মাটি পিছল হয়ে আছে—পড়ে গেলাম ধরো পা হড়কে। হি-হি-হি। হ্যাঁ ভাই, নাম কি তোমার ? পড়ে গিয়ে—অন্ধকারে চোখে তো দেখছি নে—নাম ধরে তখন ডাকতে হবে। আমার নাম তারাফুলি—তারাফুলি বেগম। পড়ে গিয়ে 'ফুলি' 'ফুলি' করে ডেকো।

আমি ফুলরা—

ও মা, ফুলরা তো তোমার ডাকনামই বা ফুলি হবে না কেন ? এখন থেকে তাই। এক-নামের মিতা আমরা।

আলিঙ্গনের মধ্যে ফুলরা আটক তো ছিলই, মিতার পরিচয়স্বরূপ দুই গালে এবারে দুই সশব্দ চুমু। পাগল ঠিক মেয়েটা। চুমুতে শেষ নয়—শূন্যে আড়-কোলা করে সারা উঠোন এক পাক নেচে এলো। মা গো মা, কী প্রচণ্ড শক্তি ধরে এই ফুলি মেয়েটা!

নেচে কুঁদে খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে ফুলি বলে, ঐ যে কদিন যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা হয়েছিল, সেই থেকে কারফেন। আগে ফৌজ ছিল না, অন্ধকার লাগত না, ছুটতে হত না—দিনে রাতে যখন খুশি সহজে দুলে দুলকি চালে করতে করতে এপার-ওপার করতাম।

ফুলরা বলতে যাচ্ছিল, আপনি বুঝি—

পার্লি কেন থামে যায় : দেবো এক চাঁটি। 'তুমি' ডাকছি, তার জবাবে 'আপনি' 'হুজুর'। কেন রে, পাহাড়-পর্বতের বয়স বুঝি আমার—আর তুমি কচিখুকি ? তুমি বলতে হবে, বলো—

একগাল হেসে ফুলরা বলে, তুমি।

'তুমি' 'তুমি' চলুক আপাতত—

ডান হাত ঘুরিয়ে তারাফুলি হাতঘড়ি দেখে নিয়ে বলে, চলবে এই রকম ধরো আটটা অবধি। 'তুমি' তার মধ্যে রপ্ত হয়ে যাবে। পরের ধাপ তারপর—আটটার পর থেকে 'তুই'। আমি 'তুই' বলব তোমায়, তুমিও 'তুই' বলবে। বুঝলে ? ভুল হলে থাবড়া খাবে কি রকম, তখন বুঝবে। কিন্তু এটা কি হল ভাই, একটিবার 'তুমি' বলেই চুপ। 'আপনি'র সঙ্গে আরও কত সব বলতে যাচ্ছিলে—বলো এইবারে শুনি।

ফুলরা বলে, খুব বুঝি এপার-ওপার করে বেড়াও ?

অন্য সকলের এপার ওপার, আমার এপাড়া-ওপাড়া। মামার বাড়ি ছিল ওপার, হিন্দুস্থানের ভিতরে—বর্ডারের কাছা-কাছি। ছোট বয়স থেকে যাতায়াত। অঢেল চেনাজানা সেই বাবদে, অগুন্তি আপনলোক। মামারা বিনিময় করে চুকিয়ে-বুকিয়ে এসেছেন। আমার যাতায়াত তা বলে বন্ধ হবার নয়। মামার বাড়ি গিয়ে গিয়ে আরও কত বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক জমেছে আমার। মামারা নাই রইল, তারা সব আছে। পালপার্বণ বিয়ে-খাওয়া যাত্রা-জারি হরবখত লেগে আছে। মন কেমন করে ওঠে এক এক সময়—পার হয়ে গিয়ে গুলতানি করে আসি খানিক—

ফুলরা বলে, কিন্তু রাজ্য তো দুটো। কথায় কথায় পার হও কেমন করে ?

আইন মতে দুই রাজ্যই বটে। কে তা বেকবুল যাবে ? কিন্তু দিল্লী-পিণ্ডির কড়া কড়া আইন ধান বিল পাহাড় পর্বত মাঠ-জঙ্গল পার হয়ে এদ্দুর ঠিক মতো পৌঁছয় নি কখনো। এপার আর ওপার—তফাৎটা এই হালে কিছু কিছু বোঝা যাচ্ছে। লড়াইয়ের সময় থেকে। জিনিষটা এত বড় সাংঘাতিক, আঠারো বছরের আজাদির মধ্যে ক-জনে তলিয়ে ভেবেছে ?

[ক্রমশঃ]

জেনেভা থেকে যাব হাঙ্গেরী। সেখানে পিপলস্ ইউনিভারসিটিতে পড়তে যাচ্ছি জলপানি পেয়ে। পথে পড়বে চেকোশ্লোভাকিয়া। পূর্ব ইউরোপের সংগে আমার প্রথম দেখা হবে প্রাগে। সেখানে ক'দিন থেকে চলে যাব বুদাপেস্ত। দু'বছরের স্কলারশিপ্।

কিন্তু মুশকিল বেধে গেল শুরুতেই। তখন সারা ইউরোপ একই সংগে হাসছে আর কাঁদছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এক নতুন মূল্যবোধের অনুভূতিতে তখন বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপের অবস্থা অনেকটা প্রথম প্রসূতির মত। চেকোশ্লোভাকিয়ায় তোলপাড় অবস্থা। পশ্চিম আর পূর্ব ইউরোপের ঠিক মাঝখানে বসে দু'দিকের টানাপোড়েনে পড়া এই অদ্ভুত দেশটার কথাই কেবল ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কানে আসছে। দেশটার সংগে পরিচয় হয়েছিল একবার। একজনের লেখা পড়ে। জুলিয়াস ফুচিকের নাম তখন আমাদের মুখে মুখে। পৃথিবীর সব তরুণ-তরুণীর হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন চেক লেখক—জুলিয়াস ফুচিক।

তাই যখন জেনেভার হোটেলের লাউঞ্জে বসে চেকোশ্লোভাকিয়ার নিন্দে শুনলাম, বিশ্বাসই হত না। ফুচিকের মত লেখক যে দেশে জন্মেছেন, লিখে গেছেন, সে দেশ কখনও খারাপ হতে পারে না। অন্তত আমাদের তরুণ মনগুলো তাই বলত।

আমি হাঙ্গেরীতে পড়তে যাচ্ছি শুনে, নীলনয়না এক ধনী (কে জানে এককালে হয়তো বা জারের মেয়ে ছিলেন) মহিলা বললেন, 'কি কাণ্ড! তুমি পাগল হলে না কি? কোথায় যাবে তুমি ছেলেমানুষ মেয়ে? সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলবে তোমাকে। ওসব দেশে কোনো সদ্‌বুদ্ধি-ওয়ালা লোকেরা যায় না। শোনো নি প্রাগে কি হচ্ছে? খুন খারাবী—সমস্ত পূর্ব ইউরোপ এখন রাশিয়ার মত বর্বর।'

আমার এক সুইস বান্ধবী ছিল। কম কথা বলত। নামটা যতদূর মনে পড়ছে—হেলেনা। সে তিনটে ভাষা বলতে পারত। সুইসদের তিনটে জাতীয় ভাষা—জার্মান, ফরাসী আর ইতালিয়ান। আমি চলে যাব শুনে এক সুইস দম্পতির সংগে আলাপ করাতে নিয়ে গেল। তাঁরা ভারতীয় ছেলেমেয়ে না কি পছন্দ করেন। কিন্তু গিয়ে বুঝলাম, আমাকে ওঁরা বোকাবার জন্যে ডেকেছেন। খানিকটা জ্ঞানও দিলেন। কি করে সভ্য হতে হতে সুইটজারল্যান্ড আজ সভ্যতার চরম শিখরে উঠে বসে আছে তারই কাহিনী শোনালেন। সুইটজারল্যান্ড আজ এত সভ্য বলেই না মহাযুদ্ধের সময় আর পরে সমস্ত সভ্যদেশের স্বাধীনতাকামী লোকে এখানে এসে আশ্রয় প্রার্থনা করেছে? শেষের দিকটায় আসল কথাটা বললেন—'তুমি ভারতবর্ষের মেয়ে। কত পুরনো তোমাদের সভ্যতা। পড়বার আর ইউনিভারসিটি পেলে না? থাক না জেনেভা কিম্বা জুরিখে। কিম্বা নিদেনপক্ষে লণ্ডন বা প্যারিসে পড়। হাঙ্গেরীয়ান তো পুরোপুরি ইউরোপীয়ানই নয়। জিপ্সী আর পাঁচমিশালি জাত। তার ওপর রাশিয়ানরা ওদের একেবারে দফারফা করে দিয়েছে।'

ফেরার পথে অল্প হেসে হেলেনা বলল—'আমি ভেবেছিলাম ওরা তোমার কথা শুনতে ডেকেছিল।' বলে আমায় ঠিক করতে লোসানের ওদিকে কোনো চমৎকার জায়গায় নিয়ে যাবে ঠিক করল। সন্ধ্যেবেলায় অপেরায় গেলাম 'রোমিও জুলিয়েট' দেখতে। এক সুইস দম্পতির বাক্যচ্ছটার জ্বালা থেকে আমাকে নিশ্চিন্ততার আওতায় ফিরিয়ে আনতে হেলেনার বেশ খানিকটা খরচ হয়ে গেল।

জেনেভার হোটেলে বসে অতলান্ত ভাবনা। আমার বোন রেখার মেয়ে ছোট্ট রুণু গিয়েছিল জেনেভায় তার বাবা মা'র সংগে। হোটেলের ধারে 'লাক ল্যাস'-র জল দেখে ও বলত—'কী নীল কী নীল—দেখে যাও। এত নীল ডুবে মরতে ইচ্ছে করছে।' ওর কচি মুখে এমন বঙ্কিমী কথা শুনতে বড় সুন্দর লাগত। রুণুর চোখ খারাপ। তারই চিকিৎসার জন্য ওর বাবা কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সংগে ও আর ওর মা এসেছে ইউরোপে।

রুণুরই মত আমার ঐ নীল জল দেখে মন উতলা হত। মনে হত এমন চমক্ সুন্দর দেশে কেন এত চিন্তার দৈন্য! হোটেলের ঘর থেকে আল্‌প্স্ পাহাড়ের 'ম'-ব্ল' শিখর, রোদ পড়ে অসামান্য সুন্দর দেখাত। মেঘ এলে তার এক রূপ। অল্প আলোর সে রহস্যময়ী। চোখ ভরে দেখে আশ মিটত না। সবচাইতে ভাল লাগত বরফ পড়া দেখতে। সুইটজারল্যান্ডের আবহাওয়ায় কি আছে জানি না, বরফ পড়ার সময় প্রত্যেক কুচি বরফ এক-একটা নক্সাকাটা লেসের রূপ ধরে গায়ে-মুখে পড়ত।—হাল্কা, চোখ জুড়োনো বরফের সাদা সাদা কুচিতে সমস্ত আবহাওয়ায় আসত তৃপ্তির স্বাদ।

সব মিলে জেনেভা এত সুন্দর যে ভাবা অন্যরকম। ছিমছাম, গোছালো রূপসী বিদেশিনীর মত এ শহর আমার মনে একটা অস্বস্তি জাগাত। বাড়ির জন্যে মন কেমন করে ওঠে। চেক্ ভিসা মেলে নি। অথচ যাব শুনে চেনা পরিচিতদের মধ্যে উত্তেজনার অন্ত নেই। "লৌহ পর্দা"-র ওদিকে যাবে এই ভারতীয় মেয়ে? এত অনায়াসে? হয় তো চাপা হিংসা, পুরনো বিদ্বেষ আর প্রচারের হাত ছিল এ সব কিছুর মধ্যে। পশ্চিমীরা পূর্ব ইউরোপকে যত বর্বর বলত, ততই মনে হত ওখানে না গেলে নয়—ওরা নিশ্চয় আমাদের অনেক বেশি আপন।

এক মাস একান অনিশ্চয়তার মধ্যে গেল। এদিকে যে ছাত্র সংগঠনের আমি বলকান্‌বাজ্য-সম্পাদিকা হয়ে জেনেভায় এসেছিলাম তাঁদের সংগে মতান্তর হওয়ায় আমি সে সংগঠন থেকে পদত্যাগ করে বসে আছি। ওদিকে প্রাগ থেকে কোনো আশার আলো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। হাতের সামান্য টাকা গলে গলে বেরিয়ে যাচ্ছে। আদিসেশিয়া ছিলেন ঐ ছাত্র সংগঠনের হর্তাকর্তা। দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোক। তিনি পড়ে গেলেন মহা ফাঁপরে। না পারেন ফেলতে, না পারেন গিলতে। আমার অবস্থা দেখে কিন্তু ভারতীয় ছাত্ররা এগিয়ে এল। বাঁশী (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা সময় ধাঁরেন মিত্রের মেয়ে), নারায়ণ—

ব্যাঙ্কশ জাতীয় গ্রন্থ, উর্মিলার সঙ্গে—কাশ্মীরী মেয়ে, এরা সবাই আমায় ঘিরে ধরল। কি একটা কাজে ভার্জিনিয়া উিমলা রাকায়াও (বিশ্ব ছাত্র সংগঠনে ভারতীয় প্রতিনিধি) এসে পড়েছিল জেনেভায়। ধীরেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন তখন বিশ্ব সংস্থায় ভারতবর্ষের আইন উপদেষ্টা হিসেবে। বাটা আমাগায় আমাদের উড়ু উড়ু মনগুলোকে ভুলিয়ে রাখতেন। কমিউনিস্টদের আদর করে ডাকতেন 'কমা' বলে। ওঁর বড় মেয়ে মনু লতিকা মিত্র, অধ্যাপিকা (চঞ্চল সরকারের স্ত্রী) ছিল ঘোরতর কমিউনিস্ট। কোরিয়া থেকে মার্কিন সৈন্য অপসারণের দাবিতে লন্ডনের রাস্তায়, বুকে 'হ্যান্ডস্ অফ কোরিয়া' প্ল্যাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় তখন কাগজে কাগজে প্রায় পাতাজোড়া ওর একখানা ছবি বেরিয়েছিল। ধীরেন মিত্র গর্বের হাসি হেসে বলতেন মেয়েটা আমার একেবারে কমা হয়ে গেছে। —তবে কাগজওয়ালাদের যেরকম দয়া ওর বিয়ের ভাবনা আর ভাবতে হবে না। ছবিখানা তুলেছে ভাল।'

ধীরেন মিত্র আমাদের এতই আপন করে নিলেন যে, আমরা ওঁকে ওঁর মেয়েদের মত—ছেলকু বলে ডাকতাম। লম্বা চওড়া হাসিখুশি একজন ছেলে। আমরা যেন ওঁর ছোট ছোট সব মা। বাঁশীদের মা- আমরা মাইমা বলে ডাকি, ছিলেন আমাদের বিশেষ বন্ধু। 'কমা'-দের প্রতি উনিও বেশ একটু সদয় ছিলেন। দেশ থেকে সপ্তাহে একদিন ওঁর পান আসত। ছোট ছোট মিঠে পানের খিলি দিয়ে উনি আমাদের দিশি মন-গুলোকে আনন্দ দিতেন। হাতে তৈরি মিষ্টিরও অভাব ছিল না।

এমত অবস্থায় বেশি ভেবে কিম্বা সুইস খাবারের অত্যাচারে জানি না আমার হল অ্যাপেন্ডিসাইটিস। বাঁশী আর ছেলকু আমাকে পরম আত্মীয়ের মত কাছে টেনে নিলেন। মনুর আর মাইমা ছিলেন লন্ডনে। আমার না ছিল টাকা, না আত্মীয় বন্ধু। তাই ওঁরা অনেকের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে টেনে নিলেন।

নারায়ণরা দল বেঁধে আসত নার্সিং হোমে। বসন্ত এসে গেছে। দু' হাত মেলা এদের বসন্তকাল। গাছে গাছে কচি পাতার বন্যা। ফুল ফুটে ওঠার বহর দেখলে তাক লেগে যায়। হুড়োহুড়ি করে অনেকদিনের অদেখা সবুজে, সারা দেশটা ছেয়ে গেল। জানলা দিয়ে সে যে দৃশ্য চোখে পড়ত, মনে আছে তাতে একটা কাঠবিড়ালীর ব্যস্ত ঘোরাঘুরি, দৃশ্যটা জমিয়ে তুলত।

'দেশের খবর আছে?'

'নিশ্চু, আসছে।'

'আরে বাবা, অত-জলদি কেন? জরে তো পড়ে নেই? আর তোমার প্রাণ তো পালিয়ে যেতে পারবে না। ভিসা একদিন দিতেই হবে।'

কথা হচ্ছিল কমিউনিস্ট বিরোধী নারায়ণের সঙ্গে। চেকোস্লোভাকিয়া আর হাঙ্গেরী নিয়ে ছিল ওর নিদারুণ সব ঠাট্টা। আমাকে হাসাবার জন্যে ও নানা গল্প ফেঁদে বসত। অথচ হাসলেই আমার সদ্য অপরেশান হওয়া পেটে লাগত ভীষণ। উর্মিলা ছিল মোটামুটিভাবে আমার পক্ষে। তবে খুব পরিষ্কার মতামত ওর ছিল না। বাঁশী যেন একটু দোমনা। সব চাইতে মজা হত কমিউনিস্ট ভিমলার সঙ্গে নারায়ণের দেখা হলে (এবং আমায় ধরে তা অনবরত হত)। ওরা হাতে, এ ওর মাথা কাটত। আর ছেলকু করছেন কী একটু উসকে দিয়ে বসে বসে মজা দেখতেন। উনি বিশেষ করে আমাকে একটু বেশি প্রশ্রয় দিতেন—বোধ হয় আমার অবস্থার কথা ভেবে।

এমনিই স্বাস্থ্য, দু'দিন যে হাস-পাতালে পড়ে থেকে সকলের আদর-যত্ন ভোগ করব, তারও উপায় নেই। পাঁচ দিনেই সুস্থ হয়ে উঠলাম। ঘর থেকে দিব্যি হেঁটে বেরিয়ে নামলাম লিফ্ট করে। নার্সরা আফশোষ করতে লাগল—'তুমি কি সুন্দর কালো আমাদের হোমে কখনও এরকম কালো মেয়ে আসে নি। তুমি চলে গেলে মনে হবে এক ঝলক ইন্ডিয়ান সামার আমাদের হোম থেকে বেরিয়ে গেল।'

'ধন্যবাদ'। এই ধন্যবাদটা সুইট্জার-ল্যান্ড আর পশ্চিম ইউরোপে জিভের ডগায় রেখে দিতে হয়। সামান্যতম প্রশংসা বা উচ্ছ্বাসকে সব সময় সাধুবাদ না করলে নাকি তা অশিষ্ট আচরণ বলে ধরা হয়।

ডাক্তাররা এলেন। যিনি আমার অপারেট করেছিলেন তিনি আসে তরুণ। সোনালী চুল আর নীল চোখ ছিল ভদ্রলোকের। সব সময় হাসতেন। টেস্ট টিউবে আমার অ্যাপেন্ডিক্স্টা হাতে করে এনে বললেন, 'দেখছ কি কাণ্ড হয়েছিল—আট ইঞ্চি! তুমি আমার প্রথম ভারতীয় রোগী। এটা আমি রেখে দেব যত্ন করে। জানো, আমরা সুইস বা ভারতবর্ষের পরম ভক্ত। অনেকটা জামানদের মত। কলকাতায় যদি কখনও যাই, দেখা করব। আমাকে মনে থাকলে তো?'

'খুব থাকবে। কিন্তু আপনি আমায় পাবেন কি করে? শুধু কলকাতা শহরের জনসংখ্যাই তো সুইট্জারল্যান্ডকে হার মানাবে। তদুপরি অলিতে-গলিতে গীতা।'

উনি একটু চমকে উঠলেন। তারপর স্বভাবসুলভ হেসে বললেন, 'ইচ্ছে থাকলে দুনিয়ায় কি না করা যায়?'

নার্সিং হোমের বাগানে তখন সেই ব্যস্ত কাঠবিড়ালীটা দু একজন বন্ধু জুটিয়ে লম্ফ-ঝম্ফ করতে ব্যস্ত। এই পাঁচদিনে গাছে গাছে আরও ফুল ফুটেছে। ফলের গাছগুলো ব্লসমে ভরা। দেখে দেখে চোখের আশ মেটে না। আজ হঠাৎ সুইটজারল্যান্ডকে ভারি ভাল লাগছে। দূরে 'ম' ব্ল' চোখ ঝলসে দিচ্ছে। রোদ পড়ে সাদা পাহাড়ের চূড়োটাকে মনে হয় যেন ভূরংঠার রাজাদের হীরের মুকুট। সব সময় 'ম' ব্ল' এরকম খুশি থাকে না। মেঘের আড়ালে থাকা এর স্বভাব। রোদ পড়লে আবার এমনই ঝলসে ওঠে যে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না।

উর্মিলা আর বাঁশী কিছুতেই আমাকে হোটেলে ফিরতে দিল না। বলল, 'আর বীরত্ব দেখাতে হবে না।' ওদের ল্যান্ডলেডিকে বলে ওরা আমার

থাকার ব্যবস্থা করেছে ওদেরই ডেরায়। বৃদ্ধা ল্যান্ডলেডি, খবখরে ঝরঝরে মানুষ। জাতে সুইস। ফরাসী বলেন।' আমার ফরাসী তখন পার্লে ভু ফ্রাসে-তে' আটকে আছে। ইসারায় কথা হত। কিম্বা তিশনা ... ধরে। আমার কপালে গালে চুমো খেয়ে বললেন, 'এ বিঁয়া।' মানে ভাল। বোঝা গেল বলবে।

আদিসেশিয়া এসে ধড়াস্ করে শুয়ে পড়লেন সোফায়। প্রাগ এখনও নির্মম নীরবতা বজায় রেখেছে। ভিমলা কিন্তু দিব্যি ড্যাং ড্যাং করে চলে গেছে। প্রাগেই ওর কেন্দ্রীয় অফিস। ওখানে কিছু ভারতীয় আছেন। আদিসেশিয়া ছিলেন সাংবাদিক ডিপ্লোম্যাট (এখনও আছেন বলে শুনেছি)। কিছুতেই কাউকে সরাসরি দোষী করতেন না। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যেভাবে আটকে পড়ে গেছ আমি যদি তোমাকে সাহায্য করতে না পারি তাহলে কি লোকে আমায় দোষ দেবে?'

কেন?'

আমার সংগঠনেই তুমি কাজ করতে এসেছিলে।'

ছেড়ে তো দিয়েছি।'

'তবু আমি ভারতীয় বয়সে অনেক বড়।'

বাঁশী স্পষ্টবক্তা। রেখেঢেকে কিছু বলতে পারে না। কটকট করে বলল, কেন আপনাকে দুষবে কেন? আমরাই তো ওর দেখাশুনো করছি। প্রাগ থেকে ভিসা না আসে আমার বাবা ওকে নিজে নিয়ে গিয়ে কলকাতা পৌঁছে দেবেন।'

ঊর্মিলা ভালমানুষ হলেও এ কথা শুনে তবও ইচ্ছে হচ্ছিল আদিসেশিয়াকে দুকথা শুনিয়ে দেয়। চোখ দিয়ে ও কেবল ওর মনোভাবটা প্রকাশ করল।

দেশ থেকে দিদি, দাদাদের, বোনের উৎকণ্ঠিত চিঠি আসত। আসত ছাত্র-সংগঠনের কর্মীদের কাছ থেকে। ছোট বোন আর দিদি সীমা (এখন অভিনেত্রী) ওদের যার যেমন ক্ষমতা সংগ্রহ করে, টাকা পাঠাল ছাত্র সংগঠনের মারফত। মা বাবা না থাকায় দিদিই খানিকটা সে জায়গা জুড়ে বসেছিল। আত্মীয় এবং বন্ধু দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখলেন 'আর কেন? এবার ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে এসো।' দেবীপ্রসাদ সে সময়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। আমার শীতের জামা-কাপড় থেকে অপারেশনের খরচ পর্যন্ত—যাতে যা কম পড়েছে ওরা সবাই মিলে সে সময়ে তা হাসিমুখে পাঠিয়ে দিয়েছে। সকলেরই ছিল অল্প আয়—এক ভগ্নীপতি সুবিমল মুখার্জী ছাড়া। আমার দাদা গোরা, আমার অগোছালো বুনো ভাবটা সম্পর্কে বলত—'ওকে নিয়েই তো মুশকিল—রাজু, তুমিই ইস্কুলটা ডোবাবে।' রাঙাদাদা উদয়, স্বল্পভাষী কিন্তু বাবার মত রসিকতা করবার একটা নিজস্ব ঢং ছিল। লিখল—'অনেক তো হল আর কেন?' ছাত্র নেতা অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য, অরুণ বসু সবাই খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন আমার অবস্থা দেখে। দেশ থেকে কলকাঠি নেড়ে তেমন কোনো ফল হবে বলে ওদের মনে হল না। কিন্তু তবু ঐ দূর দেশে বসে ওঁরা চেষ্টার ত্রুটি করেন নি।

কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। একদিকে বাড়ির জন্যে মন কেমন। অন্যদিকে নতুনের টান। পূর্ব ইউরোপ না দেখে কিছুতেই ফিরব না। প্রাগ আর কতদিন চুপ করে থাকবে?

স্বল্পভাষী হেলেনা চকলেটের বাক্স নিয়ে এসে হাজির। স্কি করা যাক নিদেনপক্ষে। সাজসজ্জার বাহার দেখে নিজেরই চমক লাগল। সাদা বরফের ওপর সুন্দরী ব্লন্ড নীলনয়না হেলেনার হাত ধরে আমি কালো মেয়ে। একইরকম সাজ দুজনের। সবাই ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। ফারের মোটা জুতো পরে ফির-ফিরে সাদা আ-ছোঁয়া বরফের ওপর হাঁটার কি মজা! যারা স্কি করছিল তাদের অনায়াস যাওয়া-আসা দেখে ভেবেছিলাম আমিও বুঝি পারব। ওমা! পায়ে পরে দেখি—একি! নড়াও দুঃসাধ্য। হেলেনা বলল, 'ছেড়ে দাও। অনেকদিন ধরে অভ্যাস করতে হয়। তাছাড়া দুচারবার হাত-পা না ভাঙলে পাকা খেলোয়াড় হওয়া যায় না।' বলে হেসে অস্থির হল। ওকে এই প্রথম এভাবে হাসতে দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম—'তোমার বয়-ফ্রেন্ড নেই?'

'ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।'

এসব দেশে সবাইকে সুখী মনে হয়। স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় যেমন মনে হয়েছিল। কিছুরই যেন অভাব নেই—এক অভাব-বোধের যন্ত্রণা ছাড়া। এখানকার এই বরফের পাহাড়ী সমুদ্রে সুসজ্জিত স্কি-খেলায় মত্ত মেয়ে-পুরুষ দেখতে দেখতে খিদিরপুরের বস্তির কথা ভাবা—যেন অন্য কোনো পৃথিবীর কথা ভাবার মত।

অবশেষে একদিন ভিসা মিলল। খবরটা পেয়ে নারায়ণের কি লাফানি—'যাক্ বাবা, গীতার গিলোটিনের ব্যবস্থাটা পাকা হয়ে গেল।' ঊর্মিলার চোখে অকারণেই একটু জল এল। বাঁশীর হয়ে গেল মনখারাপ। দল বেঁধে কি হাসাটাই না হাসা যেত। পথে-ঘাটে সুইসদের আত্মকেন্দ্রিকতা নিয়ে, ভারতীয়দের সায়েব-প্রীতি নিয়ে, রাজনীতি, প্রেম, খেলা—সব কিছুই আমাদের হাসির খোরাক জোগাত।

গান্ধীজীর মৃত্যুর পর তাঁকে সম্মান দেখাতে জেনেভাবাসীরা এক সভা ডেকে-ছিলেন। নারায়ণের উৎসাহে আমি ছিলাম প্রধান ছাত্র বক্তা। কিন্তু আমার বক্তব্য শুনে ও বেচারী মর্মাহত হয়েছিল বলবার নয়। আমি বলেছিলাম—'গান্ধীজী খ্রাইস্টের মত মরে বেঁচেছেন। কেন না, বেঁচে থাকলে ওঁকে দেখতে হত যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা মেকি।' কিন্তু বোধ হয় ছাত্রজীবনেই এমনি সব বন্ধুত্ব হয়। কিছুই তখন এসে যেত না। আমি হয়তো হার্ভার্ডে অর্থনীতি পড়ে ভয়ানক কমিউনিস্ট হয়ে যেতে পারি। অথবা জেনেভায় রাজনীতি পড়ে নারায়ণ আর বাঁশী ঘোরতর কমিউনিস্ট বিরোধী হতে পারে (নারায়ণ শুনেছি আন্তর্জাতিক সংস্থায় এখন চাকরি করে)। কিম্বা ঊর্মিলা পড়াশুনো ছেড়ে হয়ে উঠতে পারে ঘোর সংসারী।

এতে কি ই বা এসে যেত তখন? ভাবের কমতি ছিল না কোনোদিকে। বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার মত হৃদয় ছিল সকলের। আর বন্ধু বিচ্ছেদের আশঙ্কায় চোখে বেদনার ছায়া পড়বার মত কয়েক-জোড়া চোখ ছিল।

আমি চলে যাব শুনে ওরা সত্যিই মুষড়ে পড়ল। ঠিক ছেলেমানুষের মত।

আর জেলকু চোখটা একটু পিট্ পিট্ করে বললেন—'যাক্ না দুষ্টু মেয়েটা। কিন্তু চেক্-মেক্ নিয়ে এসে আবার সবাইকে অস্থির কর না।' তারপর হেসে বলেছিলেন—'আর কম্যুনিজমটা একটু সামলে কর।'

জেলকু এখন নেই। অথচ দিনগুলো ছবির মত চোখে ভাসে। স্পষ্ট দেখতে পাই।

[ক্রমশঃ]

হ্রস্ব-দীর্ঘ

লম্বা হতে কে না চায়। কে না চায় দীর্ঘ হতে। কিন্তু শুনলে অবাক হবেন, পাশ্চাত্য মেয়েদের অনেকেই চায় না। ওরা চায় এমন একটা উচ্চতা, যেখানে পৌঁছুলে ওদের লম্বা বলা যাবে না; আবার বলা যাবে না বেঁটে খাটোও। আর ধিঙ্গী হয়ে ওঠা ওদের কাছে তো রীতিমত একটা দুঃস্বপ্ন।

দুঃস্বপ্ন কেন? না ধিঙ্গী হয়ে উঠলে যৌবনের জেল্লা আকর্ষণ আর তেবিক্ত ছড়াবে না। দেহের যে মাপ থাকলে তন্বী আখ্যা পাওয়া যায়, তা আর পাওয়া যাবে না।

এইখানে বিস্মিত হন অনেকেই। বলেন মানুষের দেহটা তো আর রবারের মতো স্থিতিস্থাপক নয় যে ইচ্ছে করলেই তাকে টেনে লম্বা করা যাবে অথবা মন চাইলে খাটো করা যাবে তাকে। মানুষের হ্রস্ব-দীর্ঘ হওয়াটা পুরোপুরি নির্ভর করে সৃষ্টির খেয়ালের ওপর। অতএব ওখানে নাক গলাবার চেষ্টা কেন?

বিজ্ঞানীরা বলেন নাকের প্রশ্ন তুলে ন্যাকামি করো না। সৃষ্টির বিধানের ওপর হাত তো হামেশাই দিচ্ছি আমরা। কিন্তু তাই বলে হাত কি আমাদের খসে গেছে? না কি নাক গলিয়েছি বলে এতটুকু ক্ষতি হয়েছে ওই ইন্দ্রিয়টার?

—না না, ক্ষতি হবে কেন! ক্ষতি হবে কেন! বিজ্ঞানানুরাগীরা জবাব দেন,—বরং আমাদের লাভই হয়েছে। আমরা আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিমান, বিচক্ষণ ও সৌন্দর্যরসিক হয়েছি।

—এই সৌন্দর্যরসিক কথাটা বড় গোলমেলে,—পাশ্চাত্য মেয়েরা বলে, বড় গোলমেলে এই কথাটা। এরই মানে রক্ষা করতে আমরা হ্রস্ব-দীর্ঘ হওয়া নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি। নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে আমরা ভাবছি, ঠিক কতটুকু অবধি দীর্ঘ হলে সৌন্দর্যরসিকদের মন ভোলে।

—প্রমাণ-সাইজের ছাঁদে ওরা ভিজেছেন ঠিক—পাশ্চাত্য মেয়েরা শেষ অবধি সিদ্ধান্ত করল এবং ওদের ঐ সিদ্ধান্তকে কার্যকর করবার জন্যে ডাকা হল বিজ্ঞানীদের।

বিজ্ঞানীরা বললেন, মা ভৈঃ! সব ঠিক করে দিচ্ছি। সাইজ নিয়ে সব ভাবনা দূর করে দিচ্ছি বিজ্ঞানের বাহ থেকে পাওয়া দাওয়াই দিয়ে।

আশার কথা দাওয়াই নিয়ে গবেষণা এরই মধ্যে সুরু হয়েছে এবং বিজ্ঞানীরা বলছেন কোন মেয়ে লম্বা হবে, কি বেঁটে হবে, তা ওর ন'-দশ বছর বয়স হবার আগেই আমরা বলে দিতে পারি। আর আমরা বিশেষ করে পারি, ও অস্বাভাবিক লম্বা হবে কি না তা নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করতে।

মেয়েরা বিজ্ঞানীদের এই আশার বাণী শুনে একসঙ্গে এক হাজার ইন্দ্রধনু ও এক শো অরোরাবোরিয়ালিস দেখল। আর বিজ্ঞানীরাও ইন্দ্রধনু আর অরোরার সংখ্যা আরও কিছু বাড়িয়ে দেখেন বলে উঠে পড়ে লাগলেন। ধিঙ্গী মেয়েদের সমস্যা নিয়ে ওঁরা মাথা ঘামাতে লাগলেন রীতিমত। এবং সম্প্রতি এ নিয়ে ওঁরা রীতিমত বুলেটিন প্রচার করলেন।

ঐ সব বুলেটিন থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত করা যেতে পারে এখানে। দীর্ঘাঙ্গীদের সমস্যা নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণা এখন কোন পথে যাচ্ছে তা নিয়ে এখানে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। তবে এই আলোচনার গোড়াতেই বলে রাখা ভালো যে মেয়েটির মা-বাবা যদি ছ' ফুট বা ছ' ফুটের কাছাকাছি দীর্ঘ হন তো মেয়েটিরও দীর্ঘাঙ্গী হবার সম্ভাবনা। এ ছাড়া দীর্ঘাঙ্গী হবার দ্বিতীয় সম্ভাবনাটি খুঁজে পাওয়া যাবে কোনো মেয়ের হাড়ের গঠন পরীক্ষা করলে।

সুখের কথা, এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ পাশ্চাত্য দেশে বিপুল উদ্যমেই চলছে এখন এবং ওদেশের অনেক মেয়েকেই এখন ধিঙ্গী হবার হাত থেকে বাঁচবার জন্য এস্ট্রোজেন দেওয়া হচ্ছে।

—কিন্তু এই এস্ট্রোজেন দেওয়ার কাজটা সাবধানতার সঙ্গে হয় যেন, বলেছেন জর্জিয়ার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডাঃ জিরাল্ড এইচ হোলম্যান।

ডাঃ হোলম্যান বলেছেন, এ ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা অসাবধান হলে রোগীর অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে। এমন কি তার রজঃস্রাব দেখা দিতে পারে অপেক্ষাকৃত অপরিণত বয়সে। অবশ্য সাধারণত দেখা গেছে, ধিঙ্গী হবার ভয়ে বারো বছরের চেয়ে কম বয়সী যে সব মেয়ের চিকিৎসা করা হয়, রজঃস্রাবজনিত বিপদের মুখে তারাই পড়ে সকলের আগে। এ ছাড়া 'হরমোন'-চিকিৎসার ফলে অনেক সময় তাদের জরায়ুরও ক্ষতি হয় এবং সে ক্ষতি পূরণ করবার জন্যে ডাকতে হয় ছুরি কাঁচি সমেত সার্জেনকে।

—এদিকে মাত্র এক ইঞ্চি বা দু' ইঞ্চি কম লম্বা হবার আশায় এত ডাকাডাকি এবং এত ক্ষতি স্বীকার পোষায় না। বরং মনে হয়, ব্যাপারটা লাভের তুলনায় বড় বেশি হয়ে গেল—বলেছেন হোলম্যান।

কিন্তু হোলম্যানের এ কথা তরুণীরা শুনলে তো! ওরা বলে তো যে মেয়েটা নিঃসন্দেহ ওভারিজের কোনো ত্রুটি যদি ওদের না থাকে, অথবা যদি না থাকে এমন কোনো ত্রুটি যা ওদের যৌন-অঙ্গের গঠনে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম, তবে ধিঙ্গী হবার ভয়ে চট করে এস্ট্রোজেন না নেওয়াই ভালো।

ওদিকে ছেলেদের নিয়েও সমস্যা দেখা দিয়েছে। ওরা চাইছে লম্বা হতে। লম্বা আরও বেশি লম্বা হতে চাইছে ওরা।

ডাঃ হোলম্যান বলেছেন স্পষ্ট ছেলেকে লম্বা করার সমস্যাটা স্পষ্ট জটিল। কেন না বছর দশেক দশটি ছেলের চিকিৎসা করি আমি এবং ওদের লম্বা করতে গিয়ে লক্ষ্য করি, আর কিছু না হোক, আমার নিজের বয়সটা অন্তত আগের চেয়ে আরও দশ বছর লম্বা হয়ে গেছে।

গ্রোথ-হরমোন দিয়ে ছেলেদের চিকিৎসা করার বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছেন হোলম্যান। তিনি

জানিয়েছেন, শ্লেষ্মানিঃসারক-গ্রন্থির মধ্যে কোথাও অস্বাভাবিকতা আছে কি না, সে খবর না নিয়ে আগে থাকতে চিকিৎসা শুরু করলে ভালোর চেয়ে খারাপটাই বেশি হবে। এমন কি হয়তো দেখা যাবে, ছেলেটি স্বাভাবিকভাবে যা বাড়তো, চিকিৎসা-বিভ্রাটের ফলে বাড়বে তার চেয়ে অনেক কম।

অতএব দেখছি, বেঁটেকে লম্বা আর লম্বাকে বেঁটে করার প্রক্রিয়া নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে তোড়জোড় চলেছে, তা নিয়ে যথেষ্ট উত্তেজনা দেখা গেলেও যথার্থ কোনো সাফল্য এখনও অবধি দেখা যায় নি।

অথচ মজার কথা হলো, সাফল্য অন্য এক দিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে; এমন দিক, যাতে মানুষের বিশেষ কোনো হাত নেই।

সম্প্রতি জার্মানী থেকে খবর পেয়েছি আমরা যে, ওখানকার শিশুরা আগের তুলনায় দৈর্ঘ্যে বড় এবং ওজনে ভারী হয়ে জন্মাচ্ছে।

এই খবরটা আমাদের কাছে সাম্প্রতিক বটে; কিন্তু জার্মানীতে নবজাত শিশুদের নিয়ে গবেষণা দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল। চলছিল সেই ১৯৩০ সাল থেকে।

১৯৩০ সাল থেকে আজ অবধি ২৭,০০০ শিশুকে নিয়ে ওখানে যে পরীক্ষা করা হয়েছে তা' থেকে জানা যায়, এই পরীক্ষিত শিশুদের গড় ওজন আগের শিশুদের তুলনায় ৪ আউন্স করে বেশি। আর দৈর্ঘ্য পূর্ববর্তীদের তুলনায় ·৮ ইঞ্চি করে বেশি ওদের।

জার্মানীর গোয়েটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ হেনরি কির্চফ্ বলেছেন, লম্বা হয়ে জন্মানোর প্রবণতা হামবুর্গের শিশুদের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে। গত বিশ বছরের গবেষণা থেকে ওখানেও প্রমাণিত হয়েছে যে, হাল আমলের শিশুরা পূর্ববর্তীদের তুলনায় দীর্ঘতর।

কিন্তু কেন দীর্ঘতর হচ্ছে ওরা? বিজ্ঞানীরা বলছেন,- হচ্ছে, তার কারণ, ওদের মা-বাপরা আগের তুলনায় ভালো খাদ্যদ্রব্য পাচ্ছে। এ ছাড়া বসবাস করার পরিবেশ যা পাচ্ছে তাও আগের তুলনায় অনেক বেশি ভালো।

এইখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে কি মানুষের খাদ্যদ্রব্য ও বাসস্থানের যত উন্নতি ঘটবে, শিশুরাও ততই লম্বা হয়ে জন্মাবে?

ডঃ কির্চফ্ বলছেন, সে সম্ভাবনা আছে। তবে এ নিয়ে এখনই সঠিক করে কিছু বলা যায় না।

—কী দিয়ে বলা যায় তবে? উৎসাহীরা শুধোন, খিলাড়ীদের ভাবী হবার সম্ভাবনা নিয়ে কিছু কি বলা যায়?

বিজ্ঞানীরা বলছেন,—হ্যাঁ, যায় বলা। এমন কথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে মানুষ তার উচ্চতাকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে। উচ্চতার দু-চার ইঞ্চি [illegible] এমন কি [illegible] ইঞ্চি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

নিষিদ্ধ প্রবেশ

খায়রুল বাসার
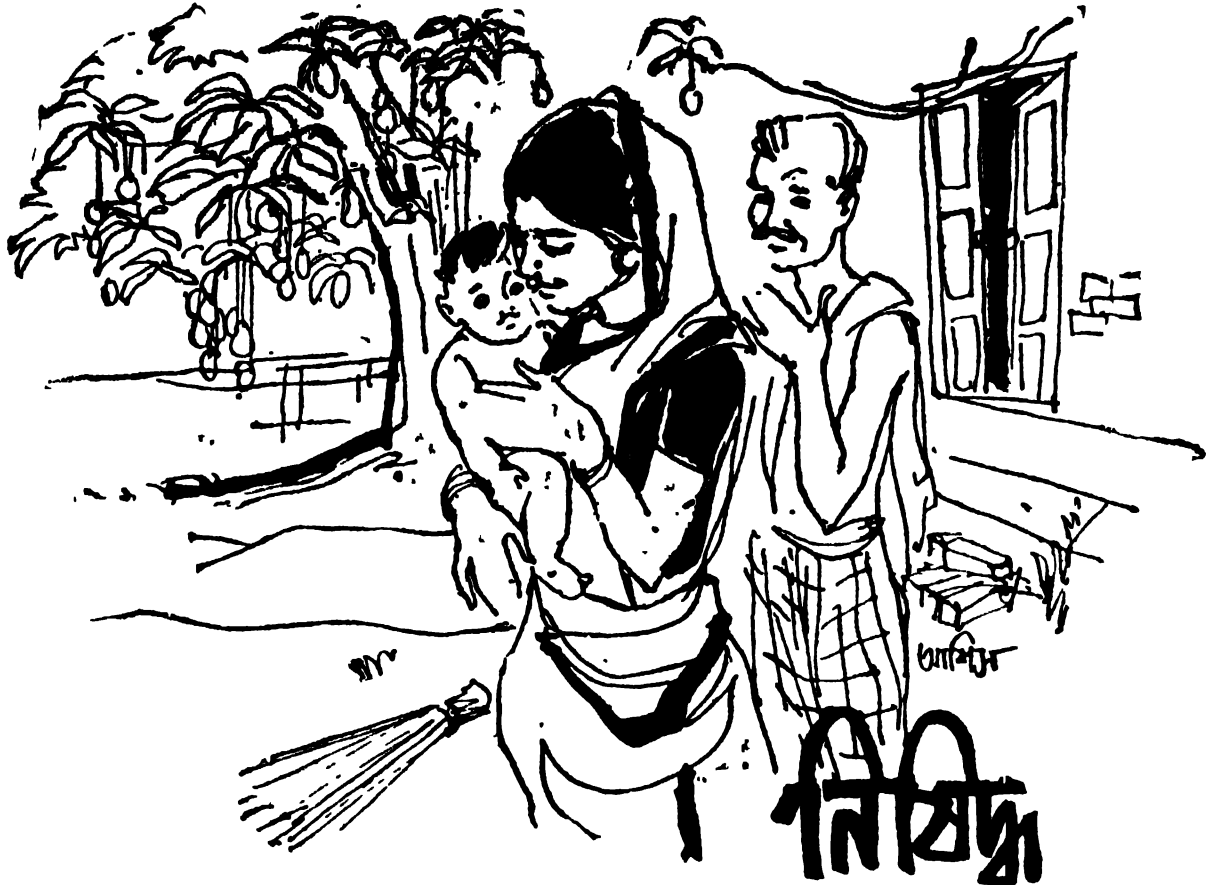
এখানে সূর্যের প্রবেশ নিষেধ। বুড়ো আমগাছটার অগুণতি ডালপালা আর রাশি রাশি পাতা ভেদ করে তবু যখন সূর্য উঁকিঝুঁকি মাবাব চেষ্টা করে, তখন মজাই লাগে। হাসিনা ঝাঁটা নাড়া বন্ধ রেখে ঘাড় বেঁকিয়ে উপবের দিকে তাকায়। সূর্য যেন কাঁচের মত ভেঙে টুকরো টুকরো হযে রাশি রাশি পাতার ভিতরে ছড়িয়ে পড়েছে। যতটুকু রোদ মাটি ছুঁতে পারছে তা মরা মরা। তাপ নেই।

অবশ্য এত সকালে তাপ থাকার কথাও নয়। বড় জায়ের বড় ছেলে মনা বুড়ো আমগাছের তলায় নিচু হয়ে গতরাতে ঝরে পড়া আম কুড়োচ্ছে। খুবই নিশ্চিন্তে। কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। উঁচু পাঁচিলে এ বাড়ির চৌহদ্দি ঘেরা। বাইবের ছেলেপুলের আনাগোনা নেই। বাইরের মানুষেরও প্রবেশ নিষেধ। এ বাড়ির কযেকজন মাত্র মানুষ, দুটো ছোট শিশু, গাই-গরু একটা, বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে কয়েকটা বকরি, গণ্ডা পাঁচ-ছয় হাঁস-মুরগী, বুড়ো আমগাছটাকে ধরে আরও তিনটে আমগাছ, জামরুলগাছ একটা, কয়েক ঝাড় কলাগাছ আর খিড়কির পথে সারগাদার উপর দাঁড়িয়ে থাকা কযেকটা মানকচুব গাছ আর আতাগাছ একটা—রোজ দেখে দেখে হাসিনার বেজায অভ্যেস হয়ে গেছে। নতুনত্ব কিছু নেই। মজা লাগে শুধু সকালের হামাগুড়ি-মাবা বোদটুকু। তাপ নেই, ছেঁড়া ছেঁড়া আলো মাত্র।

বড জা'র ছোট ছেলেটা হামাগুড়ি দিতে দিতে এগনেয নেমে আসছে। ওব মা হযতো এখনও ঘুমিযে। সকালের বাসিপাট হাসিনার হাতে। কচি বাচ্চাটা টলে টলে হামাগুড়ি দিতে দিতে তাবই দিকে এগিযে আসছে দেখে হাসিনা হাতেব ঝাঁটা ফেলে দিযে দু'হাত বাড়িয়ে বলে উঠল, আয, আয়। এই যে রে—।

কচিকে কোলে নিয়েছে মাত্র, তখনই তাদের ঘরটা থেকে দরজা ঠেলে ঘুমভাঙা চোখে বেরিয়ে এল রশিদ। হাসিনা তার দিকে তাকাল, রশিদের বড় বড় চোখ হাসিতে ভরে উঠেছে। হাসিনা চোখ নামিয়ে নিল। রশিদ উসাবা থেকে ডা দিল, এক গেলাস পানি দিযে যাও তো।

ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। এত তুচ্ছ কাজে রশিদ তার সাহায্য তলব করে না। হাসিনা অলস গলায় জবাব দিল, ঝেঁটোতে তাব একটু বাকী আছে। একটু দাঁড়াও।

কিন্তু বশিদ পা পা কবে নিচে নেমে হাসিনার কাছটিতে এসে দাঁড়াল। চারদিকে চোখ ঘুবিযে নিযে নবম গলায় বলল, খুব মানাচ্ছে তোমাকে।

হাসিনা কচিব গালে গাল ঠেকিয়ে চোখ নামিযে রাখল। লজ্জায অথচ খুশিতে তাব গলার ভিতবটা কেমন এক ধবণের এলোমেলো স্পন্দনে ভবে উঠেছে। আড়চোখে দেখল রশিদ আঙুল দিয়ে কচির গাল টিপে টিপে ধবছে। খিড়কীর দরজা ঠেলে খোলার আওযাজ হতে চোখ তুলে দেখল হাসিনা, তার শাশুড়ি আসছে। শাশুড়ি সেখান থেকেই বলে উঠল, ওই দ্যাখ, উ উঠে পড়েছে। কই দাও

ছোট বউ, অকে আমার কোলে দাও। তোমার ঝেঁটোনর এখনও এত বাকী!

রশিদ চম্পট দিল। খুব আস্তে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কচিকে শাশুড়ির কোলে তুলে দিল হাসিনা। অ বটে! সকালের ধাসিপাট সবটাই তার হাতে। এখনও যে অনেকটা বাকী।

এ বাড়ির বাসন-কোসন সবই খুব ভারী ভারী। মরহুম হাজী সাহাবুদ্দিনের বাড়িতে এনামেলের বাসন চালু হয় নি এখনও, কাঁসার ভারী ভারী থালা বাটি গেলাস জামবাটি মাজতে কষ্ট, বইতে কষ্ট নাড়াচাড়ায় কষ্ট। এসবের জন্য হাসিনা শাশুড়ির কাছ থেকে দফায় দফায় বিস্তর হাসিঠাট্টার আর গল্প-সল্প শুনেছে। তার বাপের বাড়িতে এনামেলের বাসন-কোসন এ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ি কড়াই অনেক আগে থাকতেই দেখেছে। রশিদের কাছে হাসিনা এ বাবদে অনুযোগ করতে ছাড়ে নি। রশিদের গল্পের মুখ। বলে শোন একটা গল্প বলি।

প্রথম প্রথম গল্পটা হাসিনা শুনত অবশ্য। হাসত। গল্পের সারকথা যা তা কিন্তু শুনে হাসবার মত নয়। তার শ্বশুরের আমলের ভারী হক হাল্কা হক —যা হোক হচ্ছে হয়েছে। এ আমলে সে সব বদলে হাল্কা ফং ফং এ অথচ দামে সস্তা বাসন একখানাও কেনা রশিদের বা তার দাদা আনিসের পক্ষে সম্ভব না। তারা দু ভাই ই আয়শূন্য। আয় নেই তো ব্যয়! রশিদ বলে আর হাসে। হাসিনা কিন্তু রশিদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসতে পারে না বরং তার রাগ হয়। বুঝে নেন রশিদ প্রায়ই বলে শোন একটা গল্প বলি।

দিন হল হাসিনা রশিদের গল্পের তাড়নায় ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। রাতে হলো, আর কিছু করতে না পেরে বিরক্ত হয়ে নিয়ে পাশ ফিরে শোয়। গল্প না বলতে পেয়ে আফসোসে রশিদ অগত্যা কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। তবে হাসিনা ঘুম নেই চোখে বিছানায় পড়ে এপাশ ওপাশ করতে করতে শোনে খিড়কীর ওধারে শিয়াল ডাকছে পুকুরের বেলগাছে প্যাঁচা ডাকছে। নিশুত পাড়ি... মধ্যে পোড়ো ঘরের মতো বাড়িটা কেমন যেন নেশায় ভয়ের ভয়ের লাগছে। রশিদের দেহের কাছটিতে সরে এসে আকাশ-পাতাল ভাবনার গলা টিপে ধরে হাসিনা তখন তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ে।

মাঝে মাঝে গল্পে সুবিধা করতে না পেরে রশিদ অন্য পথ ধরে, হাসিনাকে বোঝাতে বসে।

—বুঝলে? দেখছো তো বিরাট বাড়ি, তিনটে গোলা, গরু বকরি হাঁস মুরগী, তোমার শ্বশুর ছিল হাজী সাহেব। ঠাট-বাট যা দেখছ অনুর বনিয়াদটা কী জান? সামন্ততান্ত্রিক কৃষি জীবিকা।

হাসিনা জুলজুল চেয়ে থাকে। কথাটা দুর্বোধ্য। রশিদ বলে চলে, মানে কিছুটা নিজ চাষ, কিছুটা ভাগচাষ, কিছুটা মধ্যস্বত্বের আর প্রজাদের কাছ থেকে। এ আমলে ওসব ঘুচেছে। ঘুচেছে ভেবো না আমাদের দু ভাই-এর বদদোষে। আসলে পুরোনো ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়েছে।

হাসিনা হাই তোলে, ব্যাপারটা দুরূহতর হয়ে উঠেছে রশিদ না থেমে বলে যায়, জমিদারি নেই, নিজেদের চাষ-বাস উঠে গেছে। দেশে কল-কারখানা এমন গড়ে ওঠে নি যে আমরা কাজ পাব। সম্বল বলতে ভাগচাষ, যা দুমুঠো চাল-মুঠো পাই ওতেই।

এসব তো হাসিনা নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছে। বিশেষভাবে বোঝার আর কী আছে' বলে ফেলে, চাষটাই তো নিজেরা করতে পার।

রশিদ সামান্য হেসে উত্তর দেয় তা পারি তবে তাতে পথে বসতে হবে। চাষটা এখন চাষীর একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। লাভ লোকসান আর গায়ে মাখে না। কিছু যখন করার নেই তো চাষ কর। আমাদিগকে লাভের হিসাব করতে হয়। বিনা লাভে চাষ বা স্রেফ লোকসান দিয়ে চাষ আমাদের পোষাবে কেন?

ভালা জ্বালাতন! হাসিনা অসহিষ্ণুভাবে বলে তা হলে কিছু একটা তো করতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে রশিদ জবাব দেয়, তা তো হবেই। তবে দরকারটা খুব বড়রকমের। একটা বিরাট আর আমূল পরিবর্তন চাই। টুকরা টুকরো কিছু নয়, আগাগোড়া পরিবর্তন।

হাসিনা হাঁপিয়ে ওঠে। হয় তো হার মানে। রশিদের কথার মাথামুণ্ডু বোঝা দায়। এত লোক যে নানান ফিকিরে নানান ধান্দায় সংসার চালাচ্ছে— কই, আগাগোড়া পরিবর্তনের কথা নিয়ে কেউ তো মাথা ঘামায় না! কথাগুলো রশিদ বলে যেন মুখস্থ। ঘুরিয়েফিরিয়ে যেভাবেই বলা যাক জবাব তার একটাই আগাগোড়া পরিবর্তন।

এখন আর ও প্রসঙ্গটায় হাসিনার তেমন কোন রুচি নেই। শুধু একঘেয়ে বলেই নয়, অন্য কারণও রয়েছে। দিন কয় আগে খুবই অসহিষ্ণুভাবে সে বলে ফেলেছিল, আগা-গোড়া পরিবর্তন না হওয়া অবধি সংসার চালানো যখন অসম্ভবই জানতে তো সংসার ঘাড়ে নিতে গেলে কেন?

মুহূর্তের মধ্যে রশিদ দপ করে জ্বলে উঠে উত্তর দিয়েছিল, সংসারটা ঘাড়ে পেতে না নিলে তোমার কী হত শুনে গেছ বুঝি। অ তো যাবেই এখন। বসে, খায় পেয়েছেলেই কুমারী শালা কি না!

কথাটা আই-ই। তবে রশিদ এভাবে এমন নিষ্ঠুরের মত যে কথা ওঠাবে, হাসিনা বিশ্বাস করতে পারে নি। চার বছর বিয়ে দেবার পর তার বাপের সত্যিই আর সাধ্য ছিল না তাকে পাত্রস্থ করবার। চোদ্দর পর পনেরো। তার পর ষোলো, সতেরো, আঠারো এক এক করে পার হতে সে নিজেই হতাশ হয়ে পড়েছিল। বাপের দাবির বহর তখনও কমে নি অবশ্য। বর ভালো হওয়া চাই। বর ভালো হওয়া চাই। ছেলের তরফে দাবি একেবারে না থাকলে ভালো হয়। একসঙ্গে এত কিছুর যোগাযোগ হয়ে উঠছিল না। এমন সময় তার দাদা আনিসুর রশিদের সন্ধান এনে দিয়েছিল। সন্ধান এনে দিয়েছিল বললে কম বলা হয়। স্বয়ং রশিদকেই এনে হাজির করেছিল। দাদা প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টার। তার পার্টির লোক রশিদ। ছেলে ভাল এই অর্থে যে দেখতে সুশ্রী এবং সচ্চরিত্র। বংশ ভাল বলতে খানদানী বংশ বাপ হাজী সাহেব দাবি দাওয়া একেবারেই নেই।

আনিসুর বড় গলায় তাকে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়ে দিতে ছাড়ে নি যে তাদের পার্টির লোক কখনও এমন চামার হতে পারে না যে বিয়ে করবার নামে মেয়ের বাপকে পথে বসাবে। আপত্তির সামান্য কারণ ছিল এই পর্যন্ত যে রশিদ বেকার এবং ইতিমধ্যেই পার্টির কাজে একদফা জেল খেটে হয়ে এসেছে। কিন্তু সে আপত্তি হাসিনার নয়। হাসিনা রশিদের উদারতায় ঐ সামান্য ঘাটতিটুকুকে আমলই দেয় নি। তাছাড়া—।

তাছাড়া, বিয়ের সাত দিন আগে রশিদ তাদের বাড়িতে এসে উঠেছিল। বিয়ে করবে বলেই আসে নি। এসেছিল পার্টির কী একটা কাজ উপলক্ষে। সাত দিন পরে ঘরে ফিরে গেল বিয়ে করে হাসিনাকে নিয়ে। সেই সাতটা দিনে অভাবিতভাবে আচমকা একটা লুকোচুরির সুযোগ এসে গেছল। যতদিক থেকে দেখা সম্ভব ছিল ততদিক থেকেই সে রশিদকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছে। এবং লুকিয়ে লুকিয়েই সে রশিদের সম্মানী দৃষ্টিতে নিজেকে ধরা দিয়েছে। রশিদ কে লুকোচুরির মর্যাদা দিতে দ্বিধা

[illegible] এ কথা হাসিনার ভুলে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

চাই কি, খুব বিশেষভাবেই সে সব কথা হাসিনা মনে করে রেখেছে। শাশুড়ি রশিদের কাজটাকে মেনে নিয়েছিল প্রথম চোটে একনাগাড়ে কিছুকাল কারণে অকারণে অশ্রুপাত করে আর সেই সঙ্গে তার প্রতি নিরেট ঔদাসীন্য দেখিয়ে। তার জা বনেদী ঘরের মেয়ে। হাজী সাহেব জীবিত থাকাকালে এ বাড়িতে তার আগমন। তার কদর বেশিই। সে কথা শাশুড়ি হাজারভাবে—তাকে সমঝে দিতে কসুর করে নি। এতে অনিবার্যভাবে মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়ে গেলে হাসিনা দু বছর আগের সাতটি মেকি সোনা লুকোচুরির দিনকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরতে আর যেন-তেন-প্রকারেণ বুঝতে চাইত যে রশিদ নিশ্চয় একদিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে এবং তার সব লাঞ্ছনা, সব ক্ষোভ আর দুঃখে দাঁড়ি টেনে দেবে।

কোন সন্দেহ নেই, রশিদ আজও সেই সাতটি সোনা সোনা লুকোচুরির দিনের মতই। সুশ্রী, সুন্দর, বড় বড় চোখের সঙ্গে দরদী চকচকে মন। কথায় চালে চলনে কিছু কিছু রস আর রহস্য। এই পর্যন্তই। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর তার তিলমাত্র আগ্রহ নেই, বড় রকমের একটা পরিবর্তনের কথায় আর ভাবনায় দিনে রাতে সমান মশগুল। আশা আর উৎকণ্ঠা হাসিনার বুকের মধ্যে জমে জমে কতখানি জমাট হয়ে উঠেছে সেদিকে চেয়ে দেখার ফুরসৎই নেই। সন্দেহ নেই, রশিদ তাকে করুণা করে উদ্ধার করেছিল এবং তাকে ভালবাসতেও কসুর করে নি। শুধু তাদের জীবনের ক্ষেতে এখন যে-ফসল যতটুকু ফলছে তাতেই রশিদ ষোলআনা পরিতুষ্ট। সেই সঙ্গে তার হয়তো একটিমাত্র দাবি, সে যে হাসিনার মত অরক্ষণীয়াকে একদা সহজ সরলভাবে উদ্ধার করে দিয়েছে এ কথা যেন হাসিনা কদাচ ভুলে না যায়, হাসিনার আর কীই বা বলার আছে?

দুপুরের দিকে দারুণ গরম যাবার পর বিকেলের শেষাশেষি ভয়ঙ্কর ঝড় উঠল। রশিদ একটু আগেই বেরিয়ে গেছে। কোথায় কোন্ গ্রামে মিটিং আছে, ফিরতে রাত হবে। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে হাসিনা ভাবছিল, রশিদ একটু পরে বেরোলেই ভাল করত। কোথায় কতদূরে যে যাবে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। এই এক জ্বালাতন। বড় রকমের পরিবর্তনের ধান্দায় রশিদ রাতকে রাত, ঝড়কে ঝড়, বাদলকে বাদল বলে মানে না। তবু, হাজার রকমের জড়ানো প্যাঁচানো ভয় হাসিনাকে পেয়ে বসে। ঘরে ফিরলে রশিদকে সব কাজ ফেলে রেখে কিম্ভুত কিরে কসম খাওয়াতে লেগে যায়, রশিদ তখন মোক্ষম অস্ত্রটি ছাড়ে। —শোন গল্প বলি একটা। কখনও দারুণ বিরক্তিতে হাসিনা চুপ করে যায়। কখনও উৎকণ্ঠা থেকে মুক্তি পাওয়ার উল্লাসে ছেলেমানুষের কৌতূহলে গল্পে কান দেয়। কখনও নিজের জেদটা আঁকড়ে ধরে থেকে রশিদকে হার মানাতে চায়, সবই অসার। রশিদের হাল-চাল তাতে বদলায় না। হাসিনা তখন অদৃষ্ট মানে।

বাইরে থেকে শাশুড়ির হাঁক-ডাক শোনা গেল, ও ছোটবউ, বেরিয়ে এস, বেরিয়ে এস। হাঁসগুলো তোল, মুরগী-গুলো তোল। কুথায় গেলে গো? শুনতে পাও নি গা?

হাসিনা দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হাঁসগুলোকে, মুরগীগুলোকে গরুটাকে আর বকরিগুলোকে গোছগাছ করতে করতে ঝড় আর বৃষ্টি আর শিলাবৃষ্টি তুমুল হয়ে উঠল। ভিজে কাপড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরের চৌকাঠে এসে পা দিতেই একটা বাজের প্রচণ্ড আওয়াজে গোটা বাড়িটার ভিতসুদ্ধ দারুণভাবে কেঁপে উঠল। চমকে উঠে অভ্যাসমত আল্লাকে স্মরণ করার সময় তার চোখের সামনে একটা মেঠো রাস্তা আর রশিদ আর তুফান-বাদল শিলাবৃষ্টির ভয়াবহ দাপট একত্রে চকিতে ভেসে উঠল। নিদারুণ ভয়ে শাশুড়ির কাছটিতে ছুটে গিয়ে সে বেকুবের মত বলে ফেলল, এবার আল্লা জানালো না মা। আসলে সে বলতে চেয়েছিল, তোমার ছেলে কোথায় গেছে বলে গেছে মা?

রাতে সবাইয়ের খাওয়া-দাওয়া সারা হতে হাসিনা তার নিজের আর রশিদের খাবার-দাবার ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়ল। এ ব্যাপার নিত্য নৈমিত্তিক। রশিদ বেশির ভাগ দিনই ফেরে নিশি ডাকা রাত করে। তার দাদা আরশেদেরও সেই আদত। কখনও দুই ভাই একসঙ্গে ফেরে কখনও আলাদা আলাদা। বিরাট বাড়িটা রাত বাড়লে ভয়ের হয়ে ওঠে। তার শাশুড়ি জেগে থেকে যতক্ষণ খেজুরপাতার চাটাই বোনে, কি ঢ্যাবাতে পাটের দড়ি কাটে ততক্ষণ কেটে যায় একরকম। কিন্তু তার পর সময় কাটতে মুশকিল। সান্ত্বনার এইটুকুই যে রশিদ এলে একসঙ্গে খেতে বসা যায়। এ ব্যবস্থা সম্বন্ধে গোড়াতেই রশিদ চালু রেখেছে। দিনের বেলায় ওটি সম্ভব না। রাতে একসঙ্গে খেতে বসে রশিদ প্রায়ই দু বছর আগের সোনা সোনা সাতটি দিনের রস-রহস্যময় মানুষটি হয়ে ওঠে। হাসিনার বুকের ভিতর থেকে ভয় আর উৎকণ্ঠার ধোঁয়া সবটা নিঃশেষে বেরিয়ে যায়। মন তার ঝর-ঝরে তক-তকে মিঠে মিঠে হয়ে ওঠে।

একটু ঘুম ধরে এসেছিল। দরজায় ঠুক ঠুক শব্দ হল। হাসিনা ধড়মড় করে উঠেপড়ে খিলটা খুলতে খুলতে অভ্যাসমত জিজ্ঞেস করল, কে?

রশিদ সাড়া দিল, আমি। খিল খোল।

নিমেষে অন্তর আশ্বস্ততায় ভরে উঠল। খিল খুলে বাইরে তাকিয়েই কিন্তু হাসিনা অবাক হয়ে গেল। সামান্য জোৎস্নায় আরও একজনকে দেখা যাচ্ছে, রশিদের পিছনে দাঁড়িয়ে। অভিনব ঘটনা। এত রাত্রে এ বাড়িতে ধারণারও অতীত। হাসিনা আড়ালে সরে এল, রশিদ তাড়া-তাড়ি ঘরে ঢুকেই ফিস্ ফিস্ করে বলল, একজন কমরেডকে সঙ্গে করে এনেছি। অনেক দূরে বাড়ি। এখানে আজ রাতে থাকবে।

হাসিনা প্রচণ্ড কৌতূহল বুকে নিয়ে চুপ করে থাকল।

—তবে সাবধান, রশিদ আরও চাপা গলায় বলল, মা যখন কালকে সকালে কিছু জিজ্ঞেস করবে বলবে তোমার ফুফাতো ভাই। দাঁড়াও ঘরে নিয়ে আসি।

হাসিনা দুহাতে ঘোমটা অনেক-খানি টেনে দিল আর লোকটা ঘরে এসে ঢোকা মাত্রই দরজা দিয়ে বাইরে উঠোনে বেরিয়ে এল। ফুফাতো ভাই! তার ফুফুও আছে, ফুফাতো ভাইও আছে—কাদের, ষোল-সতেরো বছরের কিশোর। এ বাড়িতে কখনও আসে নি। রশিদের বুদ্ধির তারিফ করতে হয়।

রশিদ বেরিয়ে এল।

—কই এসো। রাত প্রায় একটার মত বাজে। যা আছে ভাগাভাগি করে খেয়ে ফেলি এসো।

হাসিনা চাপা গলায় বলল, তাকে লম্ফটা রয়েছে। জেলে নিয়ে এসো।

রশিদ বলল, তুমি এসো না।

—ধ্যেৎ ও আমার লজ্জা হবে না!

হাসিনা যেন শিউরে উঠল।

—আরে, লজ্জার কী আছে? এসো। রশিদ হাসিনাকে প্রায় টানাটানি লাগিয়ে দিল। একটু রাগ হল হাসিনার। তবু যথাসম্ভব সহজ হয়ে ঘোমটা বুক পর্যন্ত নামিয়ে সে রশিদের পিছু পিছু ঘরে এসে ঢুকল। ঘোমটার ভিতর দিয়েও লোকটার দিকে লজ্জায় তাকাতে পারল না। মাটির দেওয়ালের তাক থেকে লম্ফটা উঁচিয়ে নিয়ে হারিকেনের [illegible]

লাগল। রশিদ বলল, দেখছেন কমরেড, আমাদের নারী প্রগতির বহরখানা।

কমরেড তখনই জবাব দিল, এর জন্যে দায়ী তো আপনারাই কমরেড।

চকিতে ঘোমটার মধ্যে আড় চোখে তাকাল হাসিনা। গোলাপী রং-এর মাঝারিরকমের শাড়ির ভিতর দিয়ে লোকটাকে কিন্তু তত স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না। তবে গলার স্বর আদৌ পাকা বলে মনে হয় না।

—আপনারাই যদি এদিকে পর্দায় বন্দী থাকতে বাধ্য করেন, তা হলে প্রগতির হালটা এর চেয়ে আর বেশি কী হবে! কমরেড থামল।

রশিদ কতকটা ঘা-খাওয়া গলায় বলল, এর জন্যে সমাজব্যবস্থাটাও কতখানি দায়ী তাও ভেবে দেখতে হবে আপনাকে।

কমরেড অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল, তা বটে।

লক্ষ জ্বালানো হয়ে গেছে। হাসিনা রান্নাশালের দিকে পা বাড়াল।

প্রায় তার পায়ে পায়েই রশিদও এসে হাজির হল রান্নাশালে। হাসিনা বলল, একটা আণ্ডা ভাজি ভেজে দেবো?

রশিদ বলল দিলে ভালই হত। তবে বড্ড রাত হয়ে গেছে থাক। এখানেই মানে এ গ্রামেই তো থাকবেন। পরে এলে ভাল করে খাইও একদিন।

একটুখানি থেমেই রশিদ গদগদভাবে বলল, দেখতে ঐটুকন, বি এ পাশ। এখানে মাস্টারি করবে বলে এসেছে। তোখড় কমরেড। কাল স্কুলে জয়েন করবে। থাকবে মাস্টারদের মেসেই। আমার সঙ্গে অনেক আগে থেকেই আলাপ-পরিচয় ছিল কি না। বললে, চলুন কমরেড—আপনাদের বাড়িতেই আজ উঠি। আমি এড়াই কী করে বল?

গড়গড় করে বলতে বলতে একটু দম নিয়ে রশিদ আবার বলল, নামটা হল কালাম, আবুল কালাম।

রশিদের কথাবার্তায় উত্তেজনা আর কৈফিয়তের সুর হাসিনার কান এড়ালো না। তার মজা লাগল। তার বাপের বাড়িতে হলে এ ব্যাপার অতি সাধারণ, রশিদই কি তিন দিন না একটানে একটা পুরো সপ্তা!

অথচ অবাক হয়ে গেল হাসিনা নিজেই। খাবার-দাবার বেড়ে ফেলার পর তার ভয়ঙ্কর বাধ বাধ ঠেকল কালামের সামনে যেতে। রশিদ কিন্তুর পীড়াপীড়ি করতে সামান্য হেসে বলল, আবার তো আসবে, আমার ফুফাতো ভাই না!

রশিদ তখনকার মত জবাব দিল, বেশ তাই। তবে মনে রেখো, নামটা কাদের নয়, কালাম।

দরজার এধার থেকে হাসিনা খাবারের বাসন-বাটি রশিদকে এগিয়ে এগিয়ে দিল। ওরা খেতে বসল এদিকে মুখ করেই। আঁধারের আড়াল থেকে হাসিনা দেখল, সত্যি কালামের বয়স খুবই কম। বছর কুড়ি-একুশ হবে হয় তো। রোগাটে চেহারা, আধময়লা রং। মাথায় লম্বা লম্বা চুল, তেমন গুছিয়ে আঁচড়ানো নয়। খেতে যেন লজ্জা লজ্জা করছে। তবু মুখে একবার বলল, কই, ভাবী এলো না যে!

রশিদ বিপন্ন হয়ে তখনই ফিস ফিস করে হুঁসিয়ার করে দিল, ভাবী নয় কমরেড, বুবু।

কালাম সামনের দিকে চোখ তুলে—হাসিনার মনে হল তারই উদ্দেশে—লজ্জার হাসি হেসে বলল তাই তো, তা বুবু এলো না যে!

রশিদ তার স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার সঙ্গে জবাব দিল, সে রান্নাশালে ঘুমিয়েই পড়েছে হয় তো। এত রাত পর্যন্ত তাকেও তো জেগে থাকতে হয়েছে। তাও অকারণে।

কালাম ঘাড় হেঁট করে আস্তে আস্তে খেয়ে চলল। অনাস্বাদিত এক মমতায় হাসিনার মন মধ্যরাতের জ্যোৎস্নার মত তরল হয়ে উঠল।

রান্নাশালেই একধারে ঘুমিয়েছিল হাসিনা। ভোরে ঘুম ভাঙতে মনে হল গত রাতের মমতার রেশটুক বুকে লেগে রয়েছে। বিছানা থেকে উঠে পা পা করে শোয়ার ঘরের জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। দুই কমরেড ঘুমে অচেতন। প্রথমেই কালামের উপর চোখ পড়ল। এদিকে মুখ করে শুয়ে আছে। ডান হাতখানা গালের নিচে। মাথার চুল এলোমেলো হয়ে কপালের উপরে বিছিয়ে রয়েছে। বাঁ হাত কোমরের উপর এলানো। দুটো পা ছোটছেলের মত কোলের দিকে একটু গুটিয়ে রেখেছে। হঠাৎই যেন হাসিনার বুকের ভিতর ব্যথার পরশ লাগল। হারিয়ে-যাওয়া ছোট একটা শিশুর মত কালাম এখানে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছে। সন্ধ্যায় ঝড় গেল, বাদল গেল বাজ পড়ল। তারপর গোটা রাত কেটে গেল। শহরের কোন এক নাম-না-জানা গ্রামে হয়তো এক হতভাগিনী জননী সারাটি রাতের উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষার পর এখনও রাস্তার পথের দিকে চোখ করে বসে রয়েছে। খাপছাড়া ভাবে মনে পড়ে গেল, তার মা নেই। মায়ের মুখটাই আর মনে পড়ে না। কিন্তু কালামের নিশ্চয় মা আছে, মা থাকা অসম্ভব এ কথাটা কেন তার মনের মধ্যে এই মুহূর্তে গেঁথে গেল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে জানালার কাছ থেকে সরে এল।

রশিদের তোখড় কমরেড কালাম ঘুম থেকে উঠেই বিদায় নেওয়ার তাগাদা দিতে লাগল। রশিদ ইতিমধ্যে তার মায়ের কাছে, ভাবীর কাছে রাষ্ট্র করে দিল কালাম আসলে হাসিনার ফুফাতো ভাই। এই অবস্থায় তার মায়ের হাসিনার উপর হুকুম হল—ঘরে চালের আটা আছে, নারকেল আছে, গুড় আছে—অতিথি সৎকারে যেন ত্রুটি না হয়। হাসিনার ভালই লাগল, কেবল একসময় তার মনে হল, তার পক্ষে তার শাশুড়ির ঔদাসীন্যের খবর পেয়ে তার দাদা ও ভাই এ বাড়িতে আসা ছেড়েই দিয়েছে। তাদিকে ডেকে পাঠাবার সাহসও তার কোনদিন হয় নি। এমন কি রশিদ ও তার বন্ধু কমরেড আনিসুর ওরফে তার সহকর্মীকে এ বাড়িতে কোন উপলক্ষে দাওয়াত করে আনার কথাটা বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছে।

চলে যাওয়ার আগে কালাম রশিদের কাছে জেদ ধরল বুবুর সঙ্গে দেখা না করে যাচ্ছি না কিন্তু।

অগত্যা চৌকাঠ ডিঙোবার আগে ঘোমটাকে অনেকখানি নামিয়ে—যদিও বুঝতে পারছে তা অনর্থক—হাসিনা ঘরে ঢুকল। কালাম কিছু বলার আগেই সে গড় গড় করে বলে গেল, শুনলুম এখানেই মাস্টারি করবেন। আবার আসবেন কিন্তু।

কালাম সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিল, নিশ্চয়। তবে আপনি আজ্ঞে করলে সে গুড়ে বালি জানবেন।

ভারী ভাল লাগল হাসিনার। নিজের অজানায় ঘোমটা টেনে খাটো করে ফেলে সে কালামের দিকে ভাল করে তাকাল।

কালাম চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, আমার বুবুটুবু নেই। মস্ত লাভ হল এখানে এসে। আবার আসব। চলি এখন, কেমন?

সে বিদায় নিল।

ক'দিন পরে, রশিদ বাড়িতে নেই। হাসিনা বিকেলে উসারায় বসে বালিশের ঢাকনা মেরামত করছিল। তার শাশুড়ি বলল, ও ছোট বউ, কি করছ এখন? তোমার ফুফাতো ভাই যে এসেছে।

খুশির এক অনুভূতি হাসিনার মনে শিহরণ তুলল, কিন্তু মুশকিল কী, রশিদ যে বাড়িতে নেই। গতিক দেখে শাশুড়ি তাগাদা দিল, কী গো, শুনতে পেলে না বউ? বাইরে ছেলেটা দাঁড়িয়ে রইল।

হাসিনার মুখ থেকে আচমকা বেরিয়ে

গেল, ভিতরে আসতে বল না মা।

শাশুড়ি ভারিক্কি চালে জবাব দিল, তা আনছি। তো তুমি ঊসব সুঁই-সুতো গুটিয়ে ফেল।

খুবই আশ্চর্য লাগল হাসিনার। হাল্কা হাতে ছুঁচ সুতো, কাপড়-চোপড়-গুলোকে সে চটপট গুটিয়ে তুলতে লাগল। ততক্ষণে ওদিকে শাশুড়ির পিছু পিছু কালাম এসে ঢুকল। তাকে সঙ্গে করে নিজের ঘরে নিয়ে এসে হাসিনা বলল, বোসো। ভাল আছ?

তক্তপোষের কিনারায় বসতে বসতে কালাম তারিফের সুরে বলল, বাঃ এই তো বোল ফুটেছে। অথচ কমরেড রশিদ, আর শুধু কমরেড রশিদই বা কেন—

হাসিনা চোখ তুলে কালামের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চাইল, কী সে বলতে চায়।

কালাম তার দিকে চেয়ে মজা করে বলে বলল, মানে আমাদের সব কমরেডেরই ধারণা, ওঁদের বাড়ির জেনানারা অন্তত দু'তিন শ' বছর পেছিয়ে রয়েছেন।

হাসিনা হেসে উঠল। বলল, সরবৎ করে আনি?

কালাম যেন শিউরে উঠল। বলল, সর্বনাশ! সরবৎ আমি খাই না।

সরবৎ নাকি আবার লোকে খায় না। বলো কী!

কালাম মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলল, সত্যি বলছি।

একটু বিরক্ত হয়ে হাসিনা বলল, হতে পারে। তোমাদের তো আবার অনেক নিয়মকানুন আছে!

ওঁসারা থেকে হঠাৎ তার শাশুড়ির গলা কানে এল,—কী করছ বউ? নাস্তা-পানি তৈরি করবে এসো।

কী দামাল ছেলে কালাম! গলা বাড়িয়ে বলে উঠল, না মা, ওসব ঝামেলা করবেন না।

শাশুড়ি স্বভাবসিদ্ধ মৃদু গলায় ওদিক থেকে জবাব দিল, তুমি বললে কি হবে বাবা! এ কি রোজের আসা-যাওয়া যে যেমন-তেমন চলে যাবে।

কালাম তেমনি চড়া গলায় বলল, সে কি! আপনি শোনেন নি? আমি তো এখন রোজই আসতে পারি। আমি এখানেই মাস্টারি করি যে।

হাসিনার মজা লাগছিল। [illegible] করছিল। ওদিক থেকে শাশুড়ির জবাব কানে এল, বেশ তো, রোজই এসো না। সে তো ভালই বাবা। [illegible] সে সবই [illegible]। [illegible], তুমি রোজ এসো [illegible] তো [illegible]। ও [illegible] তুমি [illegible]।

[illegible]

কোন নির্দেশ তার এর আগে এত ভাল লাগে নি। তার ভাই বলেই কালামের এত খাতির এ কথা ভাবতে কোন এক আনন্দে তার বুক ভরে উঠছিল।

নাস্তা নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখল, কালাম বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে। হাসিনা বলল, এবারে ওঠ ভাই।

কালাম উঠতে উঠতে বলল, নাস্তার হাঙ্গামায় আপত্তিটা কোথায় বুঝতে পেরেছেন কি?

হাসিনা কথাটা বুঝতে পারল না।

কালাম বলল, এই চিৎ হয়ে পড়ে পড়ে কেবল কড়িকাঠ গোণাটায়। কোথায় এলাম বেড়াতে, মানে গল্প-সল্প করতে। রশিদভাইও নেই আর আপনিও মাতলেন নাস্তা তৈরিতে। আচ্ছা ফ্যাসাদ।

হাসিনার কালামকে অবশ্য ততটা গল্পবাজ বলে মনে হল না। আসলে খুবই লাজুক। এক-একবার পুরোচোখে তার দিকে তাকায় আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে ফেলে। কথা বলে বেশ গুছিয়ে সুন্দর করে, কিন্তু বেশি করে নয়। এবং দেখা গেল, খাওয়ার ব্যাপারে সঙ্কোচ তার খুবই। হাসিনা তাড়া না লাগিয়ে পারল না। নিজেকে তার খুব হাল্কা হাল্কা লাগছে আজ। হাল্কা গলায়ই বলল, আমি সবে গেলে খাওয়ায় সুবিধে হবে? যাব চলে?

চোখ তুলে তাকাল কালাম এবং যথা-রীতি সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিল। চটপটে ভাব দেখিয়ে বলল, না না, উঠে যাবেন কেন? আমি এমনি করেই খাই।

হাসিনা সুপুরি আনার ছল করে উঠেই গেল।

এ বাড়িতে কালামের আসা-যাওয়ার চমক কিছু দিনের মধ্যেই কেটে গেল। প্রায়ই সে আসে। সপ্তায় অন্তত একবার। কোন দিনক্ষণ নেই। কখনও মনার নাম ধরে ডাকে, কখনও রশিদের নাম ধরে। কদাচিৎ বুবু বলে। হাসিনার কাছে তাকে দূর থেকে বুবু বলে ডাকার চমকটাই এখনও টাটকা রয়েছে। প্রতিবারেই, হাসিনা অবাক হয়ে লক্ষ্য করে, তার শাশুড়ির তরফ থেকে কালামের কাছে প্রথম জিজ্ঞাসা, সে বাড়ি গেছল কি না এবং তার মা ভাল আছে কি না।

তার মা। এ বাবদে হাসিনার কৌতূহলের অন্ত নেই। অনেক কথাই নাড়া-চাড়া করা হয়ে গেছে। জানা গেছে কালামের সম্বল বলতে তার মা-ই। বাবা নেই, দুটি ছোট ভাই আছে। মা তার অভাগিনী, বিস্তর কষ্ট স্বীকার করেছে তাকে লেখাপড়া শেখাতে। সেই মায়ের কথা-প্রসঙ্গে কালাম বেজায় খুশি, [illegible] এত [illegible] [illegible] [illegible] হবে [illegible]।

দেয়, হাসিনাকে এবং তার শাশুড়িকে নিশ্চয় একবার তার মায়ের কাছে নিয়ে যাবে।

অবশ্য রশিদ ঘরে থাকলে, প্রায়ই সে ঘরে থাকে, কালামের কথায় আসর জমে ওঠে তারই সঙ্গে। সে সব কথার মাথা-মুণ্ডু হাসিনার বোধগম্য নয়। কালাম চলে গেলে রশিদ প্রত্যেকবারই তারিফ করে বলে, তোখড় কমরেড।

কথাটা শুনলেই হাসি পায় হাসিনার। কালামের সম্পর্কে রশিদ কি আর কোন ভাল কথা খুঁজে পায় না! তার শাশুড়ির অভিমত, বউ, তোমার ভাইটি বেশ ভাল ছেলে। কী পরিষ্কার কথা। যেন পাখির মত কথা কয়। এও ভয়ঙ্কর হাসির কথা। বি এ পাশ একটা ছেলে কথা বলে পাখির মত, ভাবলেই হাসিতে তার দম বন্ধ হয়ে আসে। তার জা কালামের কাছ থেকে এখনও দূরত্ব বজায় রেখেছে। কথা প্রসঙ্গে বলে কখনও কখনও কত অল্প বয়সে কত লেখাপড়া শিখেছে দ্যাখ তোর ভাই। গাম্ভীর্য বজায় রেখে হাসিনাকে জবাব দিতে হয়, হ্যাঁ, পড়াশুনায় ওর মাথাটা খুব ভাল।

আসলে পাখির মতও নয়, বা রশিদের মত মুখস্থও নয়, কালামের কথার অন্য এক ধরণ আছে। শুধু ধরণই নয়, বিষয়ও। লক্ষ্য করে দেখেছে, রশিদ বারে বারে হার মানে।

—সংসারে উপায় করে নিজেকে বা নিজের পরিবারকে প্রতিপালন করার চেষ্টা বিপ্লব-বিরোধী হতে পারে না। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন কমরেড, সংসারে বাস করে বৈরাগী হওয়ার চিন্তাটা কল্পনাবিলাস, পয়লা নম্বরের পলায়ন-ধর্মিতা। আমরা বাঁচতে চাই, আমাদের পরিবারবর্গকে বাঁচাতে চাই, সেজন্যই বিপ্লব চাই। বিপ্লব রোজার ফুসমন্তর নয় যে অন্যের উপরই শুধু প্রয়োগ করা যাবে, নিজের উপরে না। যে মানুষের মধ্যে বাঁচার চেষ্টা নেই, বাসনা নেই তার সঙ্গে কবরের সম্বন্ধ নিশ্চয় আছে কিন্তু বিপ্লবের সম্বন্ধ কোনমতেই থাকতে পারে না।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কালামের মুখে এমন শক্ত শক্ত কথা হাসিনা দু-একবার কানে শুনেছে, ঠিক ঠিক বুঝতে পারে নি। অগত্যা রশিদকে একবার জিজ্ঞেস করে, কী ব্যাপার? কী বলছিল কালাম? রশিদ হাসতে হাসতে জবাব দেয়, ব্যাপার গুরুতর, আমাকে সংসারী করে তুলতে চাইছিল তোমার ভাই। বলছিল, বেকার হয়ে হাত পা গুটিয়ে [illegible] [illegible] [illegible] থাকবে! কিছু একটা [illegible], না [illegible] [illegible]।

সোবহানাল্লা! ফস্ করে কথাটা হাসিনার মুখ ফিরে বেরিয়ে গেল। এবং সংগে সংগে লক্ষ্য করে দেখল, রশিদ তখনই বেজায় গম্ভীর হয়ে গেল।

কালাম আসতে হাসিনা হঠাৎই খুব যেন প্রগলভ হয়ে পড়ল আজ। রশিদ বাড়িতে নেই। শাশুড়ি খিড়কির দিকে। প্রথম বার দুই কালাম 'মনা' 'মনা' বলে ডেকেছিল। সাড়া না পেয়ে ঈষৎ লাজুক স্বরে—ওর গলার রাও এমনিতে নরম—'বুবু' 'বুবু' বলে ডাক দিল। হাসিনা দরজার খিল খুলেই হেসে হেসে বলল, এসো, আজ তোমার বিচার হবে।

কালাম অবাক হয়ে বলেছিল, বিচার! কিসের বিচার?

তাকে ঘরে এনে বসিয়ে হাসিনা বলল, চুপচাপ বোসো। চাট্টি মুড়ি আনি। বিচার হবে তারপর।

রান্নাশালে মুড়িতে তেল মাখতে মাখতে এবং তারপর বঁটিতে পেঁয়াজ কুটতে কুটতে হাসিনা মনে মনে মহড়া দিতে লাগল, কালামকে কী বলবে, গম্ভীরভাবে কিছুই বলা যাবে না। অথচ হেসে উড়িয়ে দিলেই বা চলবে কী করে! কালামের যেন বুঝতে ভুল না হয় সে কী বলতে চায়, কালাম বুঝলেই রশিদ বুঝবে। রশিদ বুঝলেই—।

মুড়ির ডালাটা কালামের হাতে তুলে দিয়ে হাসিনা বলল, ভেবে মরছ তো! তোমার সাহস তো কম নয় ভাই, তুমি নাকি ওকে সংসারী করে তুলবে ফন্দি করছ।

দমক দিয়ে হেসে উঠল কালাম। বলল, ওঃ এই কথা! আমি সত্যি সত্যিই ভেবে মরছিলাম। ফন্দি নয় বলতে পারেন ষড়যন্ত্র। কেন জানেন? এই রকম মুড়ি চিবোনোর বেজায় আপত্তি। আসর, বসর। দিতে হবে—খাওয়া দিয়ের পরটা আর আমলাটি ... খাসির গোস্তের সমস্যা।

বলেই ছেলেমানুষের মত হি হি করে হাসতে লাগল কালাম। হাসিনার উদ্বেগ হল। হাসি যাতে আর না বাড়ে সেজন্য কালামের একটু কাছে সরে এসে বলল, ও তো মনে হল তোমার কথা শুনে খুব রেগে গেছে। সত্যি ভাই একটু বুঝিয়ে সুজিয়ে যদি পার। আমি তো হার মেনে গেছি।

—তবেই সেরেছে! আপনি যেখানে হার মেনে বসে আছেন সেখানে আমার দৌড় কতটা তা তো বুঝতেই পারছেন।

কালাম হাল্কা সুরেই বলল। হাসিনার আদৌ ভাল লাগল না। গলার স্বর আরও নামিয়ে বলল, ও বুঝি আমার কথা শোনে একটাও!

মুড়ি চিবোনো বন্ধ রেখে কালাম বলল, ভাগ্যিস শোনে না। শুনলে পার্টির একটা ভাল কমরেড অকেজো হয়ে যেতো।

হাসিনা রেগে গিয়ে বলল, তোমাদের পার্টি তো যত বেকার অকেজো লোকেরই পার্টি। বলে যারা সংসারের জন্যে দুটো পয়সা কামাতে পারে না, মা বাপ বউ ছেলে কী মুখে দেবে তার খোঁজ রাখে না, তারা আবার কাজের লোক—তারা করবে দেশ উদ্ধার।

কালামের মুখ, সে লক্ষ্য করে দেখল, যেন একটু কালি মত হয়ে গেল। তখুনই সে কিছু বলল না। অস্বস্তির সংগে দু-এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে হাসিনা চলে যাচ্ছিল, কালাম ডাকল, দাঁড়ান। কী জানেন, কমরেড রশিদ বা কমরেড আরশেদ আমার চেয়ে অনেক আগে থাকতেই পার্টি করছেন, তাঁদের বয়স আর অভিজ্ঞতা আমার চেয়ে অনেক বেশিও। আমি নিজে এ কথাটা এখনও বুঝতে পারি না, সংসারের জন্য একজন কমরেডের দায়-দায়িত্ব কতখানি হওয়া উচিত। নিজের বাপ মা, স্ত্রী সন্তান এদের ভরণপোষণের দায়িত্ব এড়িয়ে চলা বা অস্বীকার করা সংগত কি না। সংসারকে পথে বসানোর অপর নাম ত্যাগ। ভোগের যেমন মোহ থাকে, ত্যাগেরও তেমনি মোহ আছে। সেই মোহের সংগে বিপ্লবের কোন সম্বন্ধ আছে বলে আমি মনে করি না।

একটু দম নিল কালাম। আবার বলল, বলছেন কমরেড রশিদ আপনার কথা শোনেন না। কিসের কথা? সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে পেতে নেওয়ার কথা। কিন্তু উনি কি আমার কথাই শুনবেন?

কালামকে হাসিনার এতক্ষণে আবার ভাল লাগছিল। সে থামতেই বলল, হ্যাঁ শুনবে। দেখো তুমি। ও কি, খাওয়া বন্ধ করলে কেন? এত ভাল করে কথা কইতে পার, খেতে পার না কেন?

কালামের লজ্জা ঘোচাবার জন্য সে ঘর থেকে বাইরে চলে এল।

খিড়কির পুকুরে কিছু পুরোনো মাছ আছে। হাসিনার শাশুড়ির সেগুলোর সম্পর্কে বেজায় সতর্কতা। পালে পার্বণে বিশেষ কোন উপলক্ষে ছাড়া পুকুরে জাল নামাবার জো নেই। শবেবরাতের চাঁদ মিস্কিন খাওয়ানো উপলক্ষে বড় গাছের একটা মাছ ধরা হল। সমারোহ খুব ফুর্তি। মাছ কুটতে বসেছিল তিনজনেই। কালামের কথা মনে পড়ছিল হাসিনার। এ যাবৎ এ বাড়িতে একদিনও, সেই প্রথম রাতটিতে ছাড়া, খায় নি। এসেছে, নাস্তা-পানি করেই চলে গেছে। দাওয়াত দিলে আজ ভাল হত।

কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে তার শাশুড়ি হঠাৎ বলল, রশিদ কতক্ষণে ফিরবে কে জানে, তোমার ভাইটাকে একবার বলে আসবে।

হাসিনা মুহূর্তে খুশি হয়ে উঠল। তার জা বলল, ভাই! কার কথা বলছ মা? কালামের?

শাশুড়ি মাছের মুড়োর উপর বসানো কাটারিতে একটা ঘা লাগিয়ে জবাব দিল, হুঁ।

রাগ হল হাসিনার। সবই জানে তার জা, অথচ যেন ন্যাকা! মুচকি হেসে তার জা বলল, তুই এতদিন বলিস নি ছোট বুন—কালাম তোর ভাই নয়!

হাসিনা শিউরে উঠল। কোন জবাবই তার মুখে এগিয়ে এল না। তার জা বলে চলল, কাল তোর ভাসুর বলছিল—। আমি তো বিশ্বাসই করতে পারি নি। কালাম তো তোর কেউই হয় না। এমনি ওদের পার্টির লোক। তবে হ্যাঁ, তোর ভাসুরও বলছিল, ছেলে খুব ভাল। জান মা?

শাশুড়ি জবাব দিল, হুঁ।

হাসিনা দিশাহারা হয়ে পড়ল। সবচেয়ে মারাত্মক কথা তার শাশুড়ি মুখ খুলছে না। সে ঘাড় তুলতে পারল না।

জা আবার মুখ খুলল।

—আমরাও তো দেখছি মা, কী বল, কালাম ছেলেটি খুবই ভাল। কী বল?

শাশুড়ি আবার জবাব দিল, হুঁ।

উৎকণ্ঠায় হাসিনার বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় পড়তে লাগল। কতকটা অসহায় হয়ে সে হাঁটুর উপর থুতনির ভর রাখল। কথার প্রসংগটা বদলাতে পারলে ভাল হত। তার জা পুনশ্চ টানল, তো আমাদের কাছে বলতে পারতিস তো! কথাটা চেপে রাখার কী দরকার ছিল?

দারুণ বিরক্তি গলায় নিয়ে তাদের শাশুড়ি এবার ধমক দিল, তাতে আর কী এমন হয়েছে বড় বউ যে কথাটাকে নিয়ে এত জিগির তুলছ তুমি।

চূড়ান্ত অপ্রত্যাশিত কাণ্ড, হাসিনা খাড়া হয়ে বসল। শাশুড়ি তাদের কারও দিকে না তাকিয়ে বলল, তোমাদের কারও ভাই নয় বলে কি কালাম পচে গেছে। আমার জানতে কিছুই বাকী নেই। আগো আমি কি কালা, না কাণা, না ন্যাকা? কালাম যদি আমার কুটুমের ছাওয়ালই হবে তাহলে কি আমাকে গোড়াওপরই মা মা করে! নাও নাও, হাত চালাও তোমরা। আমার কাছে আরশেদ যা, রশিদ যা, কালামও তাই। তোমাদের ভাই হয় না তো বয়েই গেল।

শেষের দিকে শাশুড়ির কথায় হাল্কা হাসির সুর মিশেছিল। হাসিনা টের পেল, নিজের অজান্তে তার চোখের কোণে জল জমে উঠেছে। তৃপ্তি কিংবা প্রবল এক উৎকণ্ঠা থেকে [illegible]

পাওয়ার আনন্দে সে যেন আকণ্ঠ পূর্ণ হয়ে উঠেছে। ঘাড় সে আরও কিছুক্ষণ তুলতে পারল না।

দুপুরে আরশেদ বাড়িতে ফিরল, কিন্তু রশিদ ফিরল না। কালামকে দাওয়াত করার ভার পড়ল আরশেদের উপর। বিকেলে সে ফিরে এসে খবর দিল কালামের দেখা পায় নি। সকালেই নাকি বাড়িতে চলে গেছে। হাসিনা মন মরা হয়ে রইল। একটু রাত করে বাড়িতে ফিরল রশিদ। প্রথমেই তার মা বিরক্তির সঙ্গে বলল [illegible] আর আক্কেল হবে নি কোনদিন। আজকের দিনও একটু সবর সবর [illegible] পারলি না?

চোখ পিটপিট করতে করতে রশিদ ঠোঁটের [illegible] হাসি জমিয়ে বলল কী [illegible] ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়েছি।

[illegible] বিরক্তির সঙ্গে তার মা বলল [illegible] ফ্যাসাদ তো খোদার [illegible] আছে। আগে যে [illegible] বসেছি। তারপর [illegible] যাবে। তোরা তো [illegible] মোল্লাকে কি [illegible] দিলি নি। সে আমি তো [illegible] পারাচ্ছি।

—মা [illegible] এ যেমন তেমন ফ্যাসাদ নয়। আমি একটা চাকরি পেয়ে গেছি। আজ সব কথাবার্তা সেটল করে এলাম একজন সুপারিশওয়ালা ভদ্রলোককে সঙ্গে করে নিয়ে। কাল থেকে জয়েন করব। দু-একদিন যাতায়াত—

চাকরি! রশিদ পেয়েছে! বাকি কোন কথাই আর হাসিনার কানে ঢুকল না। ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে উসারার আলো আঁধারি এক পাশটিতে দাঁড়াল সে। তার শাশুড়ি চাটাই বোনা বন্ধ রেখে রশিদের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আর রশিদ খুশি খুশি গলায় হড়বড় করে বকে চলেছে। সে থামতে শাশুড়ি বলল, আল্লা মাবুদ মালিক ইয়া রহমানুর-রহিম ইয়া গফুরউর রহিম। ইয়া বসুল আল্লা। রশিদ হেসে বলল, তুমি যে ফকিরের মত লাগিয়ে দিয়েছ মা।

তার মা মৃদুস্বরে গলায় বলল, তোদের জন্যে আমি সে মালিকের কাছে ফকিরই বাবা ফকির ছাড়া আর কী।

হাসিনা দেখল মাটির দিকে চোখ নামিয়ে তার শাশুড়ি ভাবাবিষ্টের মত আরও কিছু কথা বলে গেল। সেসব কথার প্রভাব তারও উপর এসে পড়ল না এমন নয়। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

তার শাশুড়ি এবার বলল, হ্যাঁ রা, কালাম আজ কি ঘরে গেছে জানিস?

রশিদ যেন চমকে উঠল। বলল, কই না তো। তার খবর তো জানি না। দিন দুই এই ব্যাপারেই ব্যস্ত ছিলুম, তার সঙ্গে তো আমার দেখা হয় নি।

—আরশেদকে পাঠিয়েছিনু, সে নাকি আজ সকালে ঘরে গেছে।

—তা হবে, রশিদ জবাব দিল, কালই রাত্রে ফিরে তার কাছে যাবখন। তাকে তো খবরটা দিতেই হবে।

রাত্রের অনেকটা কথাবার্তায় কাটল। দেখা গেল রশিদ চাকরি পেয়ে বেশ খুশি। [illegible] কাজ। শিখতে কিছুদিন সময় লাগবে। তবে সুপারিশের জোরে প্রথম থেকেই তিন টাকা [illegible]। পরে নিশ্চয় আরও বাড়বে। ওভার টাইমও [illegible]। এসব কথার [illegible] হাসিনা নিজের কল্পনার রং লাগিয়ে চলেছিল। এক সময় এসব কথায় ভাঁটা পড়লে সকালে কালামের ব্যাপারে যে কাণ্ড ঘটেছে হাসিনা তা রশিদকে রসিয়ে রসিয়ে বলল। রশিদ হেসেই অস্থির। শেষে বলল মা আমার অমনিই। সব বোঝে গো, শুধু বুঝতে দেয় না।

সাত সকালে রশিদ বেরিয়ে যায়, ফেরে রাত নটা নাগাদ। পর পর দুদিন এসে খবর দিল কালাম বাড়ি থেকে ফেরে নি। তৃতীয় দিনে একখানা চিঠি এল। রশিদের নামে। এক দিকে কালামের নাম ঠিকানা। তাড়াতাড়ি খাম খুলে হাসিনা চিঠিটা বের করে পড়তে লাগল। কালাম লিখেছে —এম এ-তে ভর্তি হবার সুযোগ পেয়ে যাওয়ায় সে হঠাৎ চলে এসেছে। এম এ-তে ভর্তি হয়েছে। দু-চার দিনের মধ্যেই এসে স্কুলের মাস্টারিতে ইস্তফা দিয়ে যাবে এবং তাদের সঙ্গে দেখা করবে। চিঠিতে কয়েকবার তার কথা লিখেছে। শেষে তার শাশুড়ির কথা, জায়ের কথা, আরশেদের কথা, মনার কথা, কচির কথা—এমন কি খাপছাড়াভাবে বুড়ো আমগাছটার কথাও লিখেছে। লিখেছে প্রথম দিন তোমাদের বাড়িতে ঢুকে বটগাছের মত বিশাল বুড়ো আমগাছটাকে দেখে ভয় হয়েছিল। তখন অবশ্য জানতাম না তোমাদের বাড়িতে ভয়ের কিছুই নেই। বরং অগাধ ভালবাসার [illegible] রয়েছে [illegible]।

হাসিনা [illegible] তার [illegible] চিঠির [illegible] [illegible] [illegible] তার [illegible] [illegible]। মনটা যেন [illegible]।

এবং ঘণ্টা দুই পর [illegible] হয়ে দেখল হাসিনা দুজনে কাঠুরে কাটারি কুড়ুল নিয়ে [illegible] চড়েছে। নিচে দাঁড়িয়ে তার শাশুড়ি। কী ব্যাপার! কাছে এসে দাঁড়াল হাসিনা। [illegible] নিস্পৃহকণ্ঠে [illegible] বলল, সত্যি গাছটা বেন [illegible]। কিছু ডাল-পালা ছেঁটে ফেলাই ভাল। বুড়ো হয়ে গেছে। যত না আম হয় আঁধার করে তার চেয়ে বেশি।

শাশুড়ি কাজের তদারকিতে মন দিল। উঁচুতে তাকিয়ে বলল এই যে বাবা সবচেয়ে উপরের পাঁচিলের দিককার ডালগুলো আগে কাট। ধপেটপ একদম বন্ধ করে রেখেছে। দিনের বেলাতেও দাওয়া ঘর দুয়োর আঁধার হয়ে থাকে।

হাসিনা আস্তে আস্তে সরে এল সেখান থেকে।

হ্‌ইট্‌স্যনের কয়েক সপ্তাহ বাদে, ড্যানিশ ঔপন্যাসিক কারিন মিকেলিশের আমন্ত্রণে ব্রেশট স্ত্রী-পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে ডেনমার্কে চলে গেলেন। এখান থেকে দরকার হলে তিনি মাঝে মাঝে প্যারিস এবং লন্ডনে যেতেন। কুর্ট ভাইলের সহযোগে 'দি সেভন ডেডলি সিনস' ব্যালেটি রচনা করে প্যারিসের Theatre des Champs—Elysees-এ ১৯৩৩ সালের জুন মাসে এটি মঞ্চস্থ করা হল। ব্যালেটির কাহিনী ছিল এই-রকম : একজন আমেরিকান যুবতী টাকা রোজগারের জন্য বের হোল—এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাতটি ভয়াবহ পাপকার্য থেকে তাকে দূরে থাকতে হোত। কারণ সে জানতো স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলোকে নিজের বশে না রাখতে পারলে, অর্থাৎ সংযত জীবনযাপন না করলে তার জীবনের আদর্শ সফলতা লাভ করবে না। আনার চরিত্রে বিভক্ত সত্তার সমাবেশ ঘটেছে—তার ভেতরকার ভাবঘন দিকটা নাচের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছিল—টিলিলসক এই ভূমিকাটিতে নেমেছিলেন। আর আনা চরিত্রের বুদ্ধির দিকটাকে অভিনয়ে প্রাণবন্ত করেছিলেন ভাইলের স্ত্রী লটে লেনিয়া। ক্যাসপার নেহার প্যারিসে এসে এই ব্যালের মঞ্চসজ্জার ভার নেন। প্রচণ্ড সাফল্য না হলেও ব্যালেটি ভালই হয়েছিল। এরপর এর ইংরাজী অনুবাদ 'আনা, আনা' লন্ডনের স্যাভয় থিয়েটারে পয়লা জুলাই থেকে পনেরই জুলাই অবধি প্রদর্শিত হয়। লন্ডনেও এই ব্যালেটি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিল।

ব্রেশট এ সময় প্রায় প্রায়ই লন্ডন এবং প্যারিসে যেতেন—ওই দুই জায়গায় তাঁর নাটকগুলো মঞ্চস্থ করা যায় কি না এ বিষয়ে আলোচনা করবার জন্যই যেতেন।

১৯৩৫ সালের শেষদিকে নিউইয়র্কের বামপন্থী 'থিয়েটার ইউনিয়ন' ব্রেশটের 'দি মাদার' নাটকের (গোর্কীর ঐ নামের বিখ্যাত উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে নাটকটি রচিত হয়েছিল।) অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। পাছে অভিনেতারা অতিরিক্ত উৎসাহ-ভরে 'এপিক স্টাইলে' অভিনয় না করে ওখানকার প্রচলিত 'ন্যাচারেলিস্টিক ভঙ্গীতে' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন (এবং যার ফলে নাটকটির অভিনয় সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে), সেই জন্য ব্রেশট তাড়াতাড়ি নিউইয়র্ক রওনা হলেন ওখানে গিয়ে নাট্য পরিচালকের সঙ্গে এ বিষয়ে বিশদভাবে আলাপ-আলোচনা করতে। কিন্তু পরিচালক ঠিকভাবে তাঁর বক্তব্য বুঝতে পারেন নি—নাটকের অভিনয়ও সে জন্য খুব একটা আকর্ষণীয় বলে দর্শকদের মনে হয় নি।

১৯৩৬ সালে ব্রেশট মস্কো থেকে সদ্য প্রকাশিত 'ডাস ভোর্ট' সাহিত্য পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত হন। এটি ছিল ফ্যাসী-বিরোধী—এর আরও দুজন সম্পাদক ছিলেন, লায়ন ফিউখট-ভাঙ্গের এবং উইলী ব্রেডেল। 'ডাস ভোর্টের' টাইটেল পেজে ব্রেশটের নাম দেখে অনেক সমালোচক এবং ব্রেশট-বিশেষজ্ঞ পরে একটা ভুল ধারণায় এসেছেন—তাঁরা মনে করেছেন ব্রেশট এই সময়টায় মস্কোতে বসবাস করতেন। কিন্তু এ কথা সত্যি নয়—নির্বাসিতের জীবন-যাপন করবার সময় ব্রেশট কয়েকবার মাত্র মস্কোতে গিয়েছিলেন, তাও দুচারদিনের বেশি সেখানে থাকেন নি। ফিউখট-ভাঙ্গেরও অল্পদিন মস্কোতে ছিলেন। উইলী ব্রেডেল গেছিলেন স্পানিশ সিভিল ওয়ারে যুদ্ধ করতে। সুতরাং মনে হয় 'ডাস ভোর্টের' সম্পাদনা বাস্তবটা সম্পন্ন হোত পোস্টেল মেথডের সাহায্যে। ১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মকালে নাৎসী-সোভিয়েট চুক্তি হবার পর 'ডাস ভোর্টের' প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

এ সময় সংসার চালাবার জন্য ব্রেশটকে প্রাণপাত করে কঠোর পরিশ্রম করতে হোত। শোনা যায় 'আই পাগলিয়াচ্চি' ছবিটির স্ক্রিপ্ট রচনায় ব্রেশট রিচার্ড টবেরকে সাহায্য করেছিলেন অর্থপ্রাপ্তির আশায়। কিছু রাজনীতি বিষয়ক কবিতা এবং নাটকও ব্রেশট লেখেন—নাৎসী-বিরোধী প্রচারই ছিল এই সব রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য।

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৮ সাল অবধি যে সব রাজনীতিকতায় ভরা নাটক ব্রেশট রচনা করেন, সে সব লেখায় গুরুত্ব-হীনতা এবং ভাবগাম্ভীর্যের অভাব কোন কোন সমালোচকের চোখে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ 'দি রাউন্ডহেডস এন্ড পিকহেডস', বা 'ফিয়ার এন্ড মিজারি অফ দি থার্ড রাইস'-এর (এটি একাঙ্ক নাটক এবং ছোট ছোট স্কেচেসের সংকলন) নাম করা যেতে পারে। এরই একটি পরি-বর্তিত সংস্করণ 'দি প্রাইভেট লাইফ অফ দি মাস্টার রেস' ১৯৪৫ সালে আমেরিকাতে মঞ্চস্থ হয়েছিল। এর ভেতর কিছু কিছু রচনা চিরাচরিত বাস্তববাদী ভঙ্গিতে লেখা। স্পানিশ সিভিল ওয়ারে কোন দিকে তাঁর আনুগত্য তার সাক্ষ্য রাখবার জন্য ব্রেশট এই সময় লিখলেন 'সেনোরা-কারার্স রাইফেলস'—প্যারিসে ১৯৩৭ সালে জার্মান রেফিউজি অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এর অভিনয় করেন। হেলেনা ভাইগেল নামভূমিকায় অভিনয় করে-ছিলেন। এটি রচিত হয়েছিল সিঙ্গের 'রাইডার্স টু দি সি' নাটকের ছায়া অবলম্বনে। নাটকটি খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এটির রচনাভঙ্গিও ন্যাচারেলিস্টিক।

ব্রেশটের একমাত্র বড় উপন্যাস 'দি থ্রিপেনী নভেল' ১৯৩৪ সালে আমস্টার-ডামে প্রকাশিত হয় এবং ইংরাজী অনুবাদ বের হয় ১৯৩৭-এ। সুইফট-এর 'মডেস্ট প্রোপোজালের' মত এরও অনেক অংশ অতি সুলিখিত, আবার সুইফট-এর মতই ব্রেশটের লেখাটিও তিক্ত স্যাটায়ারে ভরা।

এই সময় অনেক উঁচুদরের কবিতাও লিখেছিলেন ব্রেশট—তিনি ঠিক করেছিলেন এই সব কবিতাকে চার পর্বে প্রকাশ করবেন। এর ভেতর দুই পর্ব ১৯৩৮ সালে [illegible] প্রকাশিত হয়। তৃতীয় [illegible]

ব্রেশটের 'ডেয়ার মেসিংগ কাউফ'-এর অভিনয়

স্লোভাকিয়ার পতন হয়। আর অল্প-সংখ্যক SVENDBORG POEMS প্রকাশিত হয় চতুর্থ পর্বের অগ্রণী-অংশ হিসাবে।

১৯৩৭ সালের পর থেকে ব্রেশটের রচনায় একটা চরম পরিপূর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর প্রতিভার সার্থক বিকাশ এবং বিস্তার হয়েছে এই সময়ের নাটকগুলোতে—উদাহরণস্বরূপ 'দি লাইফ অফ গ্যালিলাই (১৯৩৭-৩৮)'; 'দি ট্রায়াল অফ লুকুলাস (১৯৩৮)'; 'দি গুড পার্সন অফ সেজুয়ান (১৯৩৮-৪০)'; 'মাদার কারেজ (১৯৩৮-৩৯)' প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

প্রবাসে নির্বাসিত জীবনযাপনের সময়ও ব্রেশটের চারপাশে একটি দল গড়ে উঠেছিল। থিয়েটারকে বাদ দিয়ে ব্রেশটের পক্ষে জীবন কাটানো ছিল প্রায় অসম্ভব —এই জন্যই ড্যানিশ বামপন্থী অপেশাদারী নাট্যসংস্থাগুলির মঞ্চাভিনয় ব্যাপারে তিনি এই সময় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন। ১৯৩৬ সালে ড্যানিশ শ্রমিক-শ্রেণীর নাট্য আন্দোলনের অভিনেতারা কোপেনহ্যাগেনে ব্রেশটের দি রাউন্ডহেড্স্ এন্ড পিকহেডসেন' প্রথম অভিনয় করেন। "অভিনয়-শিল্প" সম্বন্ধে ব্রেশটের যে সব লেখা আছে তার ভেতর তাঁর একটি নীতি-পূর্ণ কবিতার নাম হচ্ছেঃ "স্পিচ টু ড্যানিশ ওয়ার্কিং ক্লাস এ্যাক্টরস অন দি আর্ট অফ অবজারভেশন।"

১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মকালে বেশ বোঝা যাচ্ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রায় অবশ্যম্ভাবী —এ সময় ডেনমার্ক আর মোটেই নিরাপদে বাস করবার জায়গা নয় ভেবে ব্রেশট সুইডেনে চলে গেলেন। ক্রমে জার্মানরা ডেনমার্ক এবং নরওয়ে আক্রমণ করলো—এরপর ব্রেশটের মত লোকের—অর্থাৎ যাঁকে নাৎসীরা অন্তর থেকে ঘৃণা করতেন—আর ইউরোপে থাকাটা মোটেই নিরাপদ ছিল না। ১৯৪০ সালে আবার তাঁকে পরিবার, সহযোগী এবং সাহায্যকারীর দলবল নিয়ে অন্যত্র বসতি স্থাপন করতে হল। এবার গেলেন ফিনল্যান্ড। কারণ এখান থেকে তখন আমেরিকা যাবার ভিসা পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। ফিনল্যান্ডে ব্রেশট হেল্লা উওলিয়োকীর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন—এ'রই লেখা লোক-কাহিনীর একটির উপর ভিত্তি করে ব্রেশট তাঁর বিখ্যাত নাটক 'মিস্টার পানটিলা এ্যান্ড হিজ হায়ারড ম্যান মাটি' রচনা করেছিলেন। এবার আমেরিকায় যাবার জন্য তিনি তাঁর প্রস্তুতিপর্ব শুরু করলেন।—আমেরিকান স্টেজে অভিনয় করাবার জন্য তিনি খুব পরিশ্রম করে লিখতে শুরু করলেন, "দি রেসিসটিবল রাইজ অফ আরটুরো উই।" এর বিষয়বস্তু হচ্ছে হিটলারের ক্ষমতালাভের ইতিহাস—কিন্তু সব কিছুই যেন ঘটছে শিকাগোর গুন্ডা-দের আড্ডায়। ১০ই মার্চ তারিখে ব্রেশটের ডায়রীতে এ নাটকটির পরি-কল্পনার উল্লেখ দেখা যায়। ২৮শে মার্চের ভেতর একটি দৃশ্য বাদে নাটকটি লেখা হয়ে গেল।

১৯৪১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস কনসাল হেলসিঙ্কিতে ব্রেশটকে ইমিগ্রেশন ভিসা দিলেন। জুন মাসের প্রথমদিকে তিনি তাঁর পরিবার এবং তাঁর দলের কিছু সভ্য আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন। ফিনল্যান্ড থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন হয়ে এ'রা ভ্ল্যাডিভস্টক গেলেন সাইবেরিয়ান এক্সপ্রেসে। এ'রা ভ্ল্যাডি-ভস্টক থেকে সুইডিশ জাহাজে রওনা হবার দশদিন বাদে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করলেন—ফিনল্যান্ড রাশিয়ার মিত্রশক্তি হিসাবে যুদ্ধে যোগদান করল। সুতরাং ব্রেশট ফিনল্যান্ড ত্যাগ করতে আর সামান্য দেরি করলেও জার্মানরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে ফেলতো।

১৯৪১ সালের ২১শে জুলাই ব্রেশট পরিবার ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান পেড্রোতে এসে হাজির হলেন।

এরপর তিনি হলিউডের প্রান্তে বাসা বাঁধলেন—মধ্য ইউরোপের আরও অনেক

শেক্সপীয়ারের 'কোরিওলান'-এর একটি দৃশ্যে কোরিওলানের ভূমিকায় একহার্ড শ্যাল

শিল্পকলা সমাজদেহের একটি অঙ্গ। মানুষ যেমনি সমাজবদ্ধ—ঠিক তেমনি মনুষ্যসৃষ্ট শিল্পকলাও সমাজ বিচ্ছিন্ন কোন বস্তু নয়। রাষ্ট্র ও সমাজের সঙ্গে শিল্পকলা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, নাট্যকলা প্রভৃতি সারস্বত বিষয়গুলি সমাজ তথা যুগের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বন্ধ। সমাজ ও যুগধর্মের প্রতিচ্ছবি চারুকলার উপর অবিসংবাদিরূপে পড়তে বাধ্য। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই।

অন্যান্য শিল্পীর ন্যায় যাঁরা যুগ যুগ ধরে সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন—তাঁরাও যে যুগে বসবাস করেছেন—সেই যুগের কৃষ্টি, রীতি-নীতি, মানসিক গড়ন, রুচি ও বৈশিষ্ট্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়েছেন। ভারতের সঙ্গীতেতিহাসের পর্যালোচনা করলেও আমরা অনুরূপ দৃষ্টান্তের সন্ধান পাই। হিন্দুযুগের আর্যসঙ্গীতের রূপ-রেখা, মুসলিম যুগের সংগীত-বৈশিষ্ট্য ও ইংরাজ আমলের সংগীতের গতি-প্রকৃতি ও স্বাধীনতা-উত্তরকালের ভারতীয় সংগীতের মধ্যে বহু বিষয়ে নিশ্চয়ই পার্থক্য বিদ্যমান।

সাম্প্রতিককালের সংগীত সমীক্ষায় উপর্যালিখিত বিষয়গুলির অবতারণা (আমি আশা করি) সুধী পাঠকবর্গের নিকট নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হবে না। বর্তমান যুগে রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে যে নৈরাশ্যবাদের কালো ছায়া বিস্তার হয়েছে—তা থেকে স্পর্শ বাঁচিয়ে সমাজ সংশ্লিষ্ট কেউই নিস্তার পেতে পারে না। শিল্পজগতেও এর অশুভ প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই তার কলুষ-পক্ষ নিরংকুশরূপে বিস্তার করেছে। আমাদের সঙ্গীতাঙ্গনও এই সংকট থেকে মুক্ত থাকবে এমন আশা নিশ্চয়ই করা যায় না।

নানা কারণে বর্তমানকালের মানুষ বিবিধ সমস্যায় জর্জরিত। শিল্প-সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি সুকুমার কলার অগ্রগতিরত বাষ্পোদ্ভূত আর্থ-রাজনৈতিক সংকটও ব্যাপক এবং প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করেছে। সঙ্গীতমহলও এই অবক্ষয় থেকে নিরাপদ দূরত্ব রেখে চলতে পারছে না।

উপর উপর দেখলে মনে হয় সঙ্গীতের বুঝি বা বিরাট উন্নতি সাধিত হয়েছে; কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন যে কোন লোকই উপলব্ধি করতে পারবেন যে, পরিমাণগত ব্যাপারে প্রচার-প্রসার কিছুটা ঘটলেও গুণগত ব্যাপারে তা খুব উল্লেখযোগ্য হতে পারেনি না। গভীর অনুভূতি ও আন্তরিক রসই মহৎ শিল্পের প্রধানতম উপাদান; কিন্তু সাম্প্রতিককালের সৃষ্ট অধিকাংশ সঙ্গীতে এদের অস্তিত্ব কোথায়? হাল্কা ও চটুল ভাব যেন গীত-কলার প্রাণবস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সৌন্দর্য সৃষ্টি ও উন্নত ভাব-রসের প্রকাশই যদি শিল্প-কলার আন্তরধর্ম বা সার্থকতা হয়ে থাকে,—তবে অধুনা পরিবেশিত সঙ্গীতে (কি আধুনিক, কি উচ্চাঙ্গ) তার অনুপস্থিতি কি আমরা লক্ষ্য করছি না? বর্তমান কালের সঙ্গীত বহুলাংশে কৌশলসর্বস্ব হয়ে উঠেছে। আনন্দরসে শ্রোতৃবর্গের মন রসাপ্লুত করার পরিবর্তে জাহিরীপনা দেখানো ও চমক লাগানোই যেন শিল্পীদের স্বভাবজাত ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সস্তায় বাজিমাৎ করা ও অসঙ্গীতজ্ঞ জনসাধারণের কাছ থেকে হাততালি কুড়ানো যেন গায়কদের একটা চিরাচরিত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সুলভ জনপ্রিয়তার লোভে গায়ককুল আজ গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যাশ্রয়ী ভারতীয় সঙ্গীতের মানকে নিম্নগামী করতেও কুণ্ঠাবোধ করছেন না। শিল্পের শান্ত সমাহিত সৌম্য ভাব যেন আজকালকার কোন সঙ্গীতেই অনুভূত হচ্ছে না। সংগীতকুললক্ষ্মীর সলাজ বিনম্র ভাব যেন আজ অন্তর্হিত হতে চলেছে। প্রাণহীন দেহ যেমনি মূল্যহীন—প্রাণরস বিবর্জিত সঙ্গীতও তেমনি অর্থহীন। শুধু সুন্দর-নাদ বিশিষ্ট সঙ্গীত বা আঙ্গিকের দিক থেকে উন্নত সঙ্গীতই উচ্চকোটির সঙ্গীতের দাবিদার হতে পারে না। স্বরের আবরণিক সৌন্দর্যই সঙ্গীতের প্রাণবস্তু নয়। প্রাণসম্পদই সঙ্গীতের মূল ও সার বস্তু। আধুনিককালে প্রস্তুত অধিকাংশ সঙ্গীতেই এই বস্তুটি ছাড়া আর সব কিছুই প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্তব্য। বর্তমানকালের গীত-কলা যে, মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করতে পারে না তার প্রধান কারণ এখানেই নিহিত রয়েছে।

বর্তমানের সঙ্গীত যেন ক্ষণিক কালের চমক সৃষ্টি করার জন্যই সৃষ্ট। গায়ক ও শ্রোতার সাঙ্গীতিক মান যেন ক্রমশ নিম্নাভিমুখী হয়ে চলেছে। গভীর রসোপলব্ধির সুযোগ যেন হাল আমলের গীত-ধর্মে মোটেই নেই। আজকাল কিছু কিছু নতুন সৃষ্টি যে না হচ্ছে তা নয়; কিন্তু তাতে প্রায়শই মৌলিকত্বের অভাব পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক বর্গীয় গানে কথার ও সুরের দীনতা যেন বেড়েই চলেছে। যে বাংলা দেশের গানের ঐতিহ্য এত ঐশ্বর্যশালী—সে দেশের সুরকারবৃন্দ আমেরিকান ও বোম্বাই-সুরের নকলনবিশী করার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত। গানে সুরস্রষ্টার কৃতিত্ব অপেক্ষা অর্কেস্ট্রার প্রাদুর্ভাব প্রকটিত। গান যদি হয় দু লাইনের মিউজিক থাকবে তাতে দশ লাইনের। কথায় বলে যাকে বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি।

বর্তমানকালে গানের কথার দিকটাও অতিশয় অবহেলিত। গীতি-কাব্য যেন অর্থহীন ও প্রাণহীন কতকগুলি শব্দের সমষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক গীতিকারদের ভাব-দৈন্য, কাব্য-সুষমাহীনতা ও ছন্দহীনতা যে কোন মননশীল রসিক ব্যক্তিরই নজর এড়াতে পারে না। কাব্যাঙ্গন অশালীন ও স্থূলরুচির শব্দসম্ভারের আগাছায় পরিকীর্ণ। ছন্দোগগনেও অসুরের দাপাদাপি। গীতি-প্রাঙ্গণে গীতহীনতায় ভারাক্রান্ত। সুরকার ও গীতিকাররা যেন অপকৃষ্টতার প্রতিযোগিতায় কোমর বেঁধে লেগেছে।

রামপ্রসাদ, নিধুবাবু, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, ডি এল রায়, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, নজরুল প্রমুখ কবিদের ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলা দেশে—হাল আমলের গীতি-কাব্যের দৈন্যদশা ও মলিন বেশভূষা দেখে যে কোন সংস্কৃতিবান ব্যক্তি হতাশা-নিরাশায় মুহ্যমান হ'তে বাধ্য। এই ডামাডোলের বাজারে সরস সুর ও কাব্যৈশ্বর্যবিহীন গান যে মূল্যহীন এ কথা কে কাকে বোঝাবে?

আধুনিক যুগের আর একটি বিপদের দিকে আমরা সংস্কৃতি-কর্মী ও সমাজ-সেবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। সেটি হচ্ছে মার্কিনী বিকৃত সংস্কৃতির (না সংহর্তব) এদেশে অনুপ্রবেশ। এই কিম্ভূতকিমাকার সংস্কৃতি আজ বাংলার ঐতিহ্যকে গ্রাস ও সংহার করতে উদ্যত হয়েছে। বাঙালীর পোশাকে-আশাকে, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে, শিক্ষা-দীক্ষায় ও রুচির ক্ষেত্রে, এমন কি সঙ্গীত-ক্ষেত্রেও এর অশুভ প্রভাব মারাত্মকভাবে বিস্তৃত হয়ে পড়ছে। এর করাল ছায়া থেকে কেউ নিষ্কৃতি পাচ্ছে না। বাংলার সঙ্গীত-সংস্কৃতিও এর কবলে পড়ে ধবা-শায়ী হ'তে বসেছে। সুরকার, গীতিকার, সঙ্গীত-পরিচালক, গায়ক গায়িকা ও বাদ্য-যন্ত্রিবৃন্দ সবাই এর আবিল ঢেউ-এ গা ভাসিয়ে দিয়ে জাহান্নামের পথে যাত্রা করেছে। সংস্কৃতি-জগতের কেউ এর কলুষ স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে পারছে না বা চাইছে না।

সব চাইতে মর্মান্তিক ঘটনা এই যে, যে বাংলা দেশের সঙ্গীতৈতিহ্য এত সুমহান ও সুপ্রাচীন—যে বাংলার গীত-গৌরব সারা ভারতের সংস্কৃতির অতুল সম্পদ—সেই বাংলার সঙ্গীত-চাতককুল আজ মার্কিনমুলুক ও বোম্বাই-এর আস-মানের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে। এর চাইতে ক্ষোভ ও লজ্জার বিষয় আর কি হ'তে পারে? অবশ্য বাংলার নিজস্ব সাঙ্গীতিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে বিদেশের বা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গীত-উপাদান আহরণের পথে কোন দুস্তর বাধা থাকা উচিত নয়। কিন্তু প্রায়শই দেখা যায় যে, মার্কিনী সস্তা উত্তেজক গান ও বোম্বের ফিল্মী গানার ব্যর্থ-হাস্যকর অনুকরণ করতে আমাদের সুরকারবৃন্দ অতীব মাত্রায় উৎসাহী। সস্তা উত্তেজনা-ময় গানের সুড়সুড়িতে সঙ্গীতানভিজ্ঞ জনসাধারণকে মাতিয়ে রাখাই এদের পরম ধর্ম ও কর্ম।

বর্তমানকালে পাশ্চাত্য জগৎ যখন ভারতীয় সঙ্গীত-সুধা পান করতে আগ্রহশীল—ঠিক তখনই আমরা 'রক-এন-রোল' 'চা-চা-চা', 'ক্যালিপসো', 'টুইস্ট' প্রভৃতি লঘুরসাত্মক গানের জন্য ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে কাঙালীর মত দাঁড়িয়ে আছি। কারণে-অকারণে পাশ্চাত্যের দুয়ারে ধরণা দেয়া যেন আমাদের স্বভাবসুলভ অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমান যুগের বিজ্ঞানলব্ধ আশীর্বাদ হচ্ছে—গ্রামোফোন, মাইক্রোফোন, রেকর্ড, রেডিও, চলচ্চিত্র প্রভৃতি; কিন্তু দুঃখের বিষয় এদের অপপ্রভাব ও এদের পরি-বেশিত হাল্কা ও তরল সঙ্গীত বাংলা দেশের সঙ্গীতের মানকে অতিদ্রুত নিম্ন-গামী করে তুলেছে। অবশ্য এর ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়: এবং এদের অবদান কিয়দংশে অনস্বীকার্য। মূলত মুনাফার লোভে যা তা পরিবেশন করে দু'পয়সা কামিয়ে নেয়াই এদের মহৎ উদ্দেশ্য। এই জগা-খিচুড়ী সঙ্গীতের নাম দেয়া হয়েছে কমার্শিয়াল মিউজিক (Commercial music)। বৈশ্য সভ্যতার আওতায় ও ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সঙ্গীতের এই নিদারুণ পরিণতি বোধ হয় খুব অপ্রত্যা-শিত নয়।

সর্বক্ষেত্রের ন্যায় সঙ্গীতজগতেরও অশিক্ষিত পটুয়ের ছয়লাপ। জ্ঞানী-গুণীর কণ্ঠ বর্তমানে স্তব্ধ—সর্বত্রই মাঝারির মেলা। এইরূপ অপরিচ্ছন্ন আবহাওয়ায়, সঙ্গীত-সরস্বতী যে সুস্থদেহ ও খোলা মনে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট বোধ করবেন—এতে আর আশ্চর্যের কি আছে?

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রেডিও, সিনেমা প্রভৃতি বিজ্ঞানের অবদানগুলির প্রয়োগ আমাদের দেশে সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে না। এইগুলির মারফতে সঙ্গীতের বহুল ও সার্থক প্রচারের সুযোগ ছিল; কিন্তু কার্যত এর বিপরীতই ঘটছে। সিনেমা ও মাইকের কল্যাণে অতি নিম্নরুচির গান ও লোকের মুখে মুখে ফিরছে। শালীনতা বিবর্জিত অতি স্থূল রুচির হিন্দী গান বাংলার পবিত্র সঙ্গীতাকাশ ছেয়ে ফেলেছে। শারদ উৎসবগুলির সময় একশ' গজের মধ্যে দশ-বারোটি মাইক বিকটোৎকট স্বরে একই সঙ্গে বিভিন্ন স্কেলে বোম্বে-মার্কা অতি নিকৃষ্ট ধরণের হিন্দী গান অক্লেশে উদ্গিরণ করে চলে—পরিবেশক ও শ্রোতৃ-সাধারণ কারুর এতে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই।

রেডিও পরিবেশিত সঙ্গীতের অবস্থাও তদ্রূপ। মাঝে মাঝে ভাল ভাল শিল্পীর গান যে আমরা শুনতে পাই না তা নয়; কিন্তু অধিকাংশ গানই মামুলি ধরণের। অনেক সময় এমন সব গান পরিবেশন করা হয়—যা শুনলে আপনি অবাক হ'য়ে ভাববেন—কী করে ঐ সকল শিল্পী প্রোগ্রাম পায়! রেডিওর ব্যবস্থা-পনায় অমিত গলদ পুঞ্জীভূত হ'য়ে রয়েছে। রেডিওর বিরুদ্ধে নানা মহল থেকে প্রচুর অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায়। এর কতকাংশও যদি সত্য হয়—তা হ'লে বুঝতে হবে রেডিওর কর্তৃপক্ষ-মহলে অগণিত দুর্নীতি স্থায়িভাবে বাসা বেঁধেছে। সংশ্লিষ্ট মহল থেকে জানা যায় যে, রেডিওর আস্তাবলে রাশিকৃত জঞ্জাল বহুদিন থেকে জমাট বেঁধে রয়েছে। এই 'অজীয়ান্ স্ট্যাবল' (Augean stable) সাফ না হ'লে সঙ্গীতের মুক্তি সুদূরপরাহত।

শরৎকালাতে শীতের মরশুমে কলকাতায় এখন আবার শুরু হবে মিউজিক কন্‌ফারেন্স নামধারী গানের কারবারের বেসাতি। অল ইণ্ডিয়া নামাঙ্কিত গানের এই জলসাগুলি সরল গীতামোদী জনসাধারণের পকেটমারার এক অভিনব সুচতুর ব্যবস্থা মাত্র। স্বর্গত ভাতখণ্ডেজী, রামপুরের নবাব সাদিক আলী খাঁ, ঠাকুর নবাবালী ছম্মন সাহেব, ডাঃ ডি আর ভট্টাচার্য প্রমুখ সঙ্গীত-গুণিবর্গ সংগীত সম্মেলনের যে উচ্চ আদর্শ নিয়ে এইগুলির প্রবর্তন করে-ছিলেন—আজকের দিনে তথাকথিত 'মিউজিক কনফারেন্সে' এর ছিটে-ফোঁটাও অবশিষ্ট নেই। আজকের দিনে সঙ্গীত-সম্মেলনের বড় আকর্ষণ হল নৃত্য-পটী-য়সীর প্রোগ্রাম এবং তাতে অবশ্যই লেখা থাকবে ব্র্যাকেটে বোম্বে ফিল্ম। বাংলার ঐতিহ্যাশ্রয়ী সঙ্গীত ও বাংলার শিল্পী-গণ যে এসব জলসায় অনাদৃত হবে তাতে আর বিচিত্র কি? এত মিউজিক কনফারেন্স করেও আমরা আজ আবদুল করিম, ফৈয়াজ খাঁ, ওঙ্কারনাথ, গোলামালী খাঁ, পালুশকর প্রমুখ গুণীদের কথা দূরে থাকুক—এমন কি জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, ভীষ্মদেব, তারাপদ ও চিন্ময় লাহিড়ীর তুল্য শিল্পীও পয়দা করতে পারি নি। ধন্য আমাদের বাগাড়ম্বর!

বাংলা দেশের সঙ্গীতের অধোগতি রোধ করতে হ'লে আজ কৃষ্টিগর্বী বিদগ্ধ সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। কেবল নেতিবাচক সমালোচনাই যথেষ্ট নয়; ইতিবাচক কর্মসূচী নিয়ে সঙ্গীতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকে ত্বরান্বিত করতে হবে। শুধু ব্যক্তিগত আক্রমণ নয়; সমষ্টিগত ও সৃজনাত্মক সমালোচনা ও কার্যধারার দ্বারাই সঙ্গীতের মানোন্নয়ন সম্ভব। এ-কাজে আমরা উৎসাহী তরুণ সঙ্গীতশিল্পী ও সঙ্গীতপ্রেমী সুধী বাঙালী সমাজকে আহ্বান জানাচ্ছি॥

রূপজগৎ

তিনটি সিনেমা বন্ধ কেন

সিনেমা ধর্মঘট মিটেও মিটলো না। শহরের তিনটি সিনেমায় ধর্মঘট চলছে প্রায় মাসাধিককাল। চৌরঙ্গীর এই তিনটি সিনেমা খুবই আকর্ষণীয় প্রেক্ষাগৃহ. বিভিন্ন ধরণের বিদেশী ছবি এই সিনেমাগুলিতে দেখান হত। ব্রিটিশ ছবিও দেখান হত। বিশেষ করে মিনিয়েচার হাউসটি ছিল বিশেষ প্রয়োজনীয়। ছবি নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনা ইত্যাদির জন্য এই মিনিয়েচারের একটা ভূমিকা ছিল। যা ফিল্ম সোসাইটিগুলিরও কাজে লাগত। কিন্তু অকস্মাৎ কর্তৃপক্ষ তিনটি হাউসে লক-আউট ঘোষণা করেন।

আমি বলছি লাইট হাউস, নিউ এম্পায়ার ও টাইগার সিনেমার কথা। এই তিনটি সিনেমা এককালে বিদেশী সম্পত্তি থাকলেও বর্তমানে নেপালের রাণা পরিবারের মালিকানাধীন। এই তিনটি সিনেমা শহরের কেন্দ্রস্থলে থাকায় এবং নিত্য নতুন ছবি মুক্তিলাভ করায়, বিলাস-ব্যবস্থা থাকায় সব সময়ে দর্শক সমাগমে পূর্ণ হয়ে থাকত। নিউ এম্পায়ার প্রতি রবিবার কোন না কোন নাটকের দল ভাড়া নিত এবং শহরের মানুষের কাছে তা আকর্ষণীয় ছিল। এ বাবদ প্রেক্ষাগৃহ মালিকের আয়ের অঙ্কটা কম ছিল না। মোটামুটি এই তিনটি সিনেমাকে লাভজনক ব্যবসা না বলার কারণ নেই। কিন্তু হঠাৎ তাঁরা কেন লক-আউট করলেন তার সব খবর আমরা জানি না। জানা যায়—কর্মচারীরা বোনাস দাবি করলে কর্তৃপক্ষ নাকি দাবির এক-চতুর্থাংশের বেশি দিতে রাজী হন না। প্রতিবাদে শ্রমিকরা ধর্মঘটের পথে গেলে কর্তৃপক্ষ লক-আউট করে দেন।

যে পক্ষের দোষেই হোক, বর্তমানে পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়েছে। এই জটিল পরিস্থিতি কিছুটা সহজ করে তোলার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরের, কিছুটা মালিক ও শ্রমিকদের। কোম্পানির আর্থিক অবস্থা সরকারের অজানা থাকার কথা নয়। সরকারের শ্রম দপ্তর এই ব্যাপারে উভয় পক্ষের সম্মানজনক মীমাংসা করে দেবার চেষ্টা করতে পারেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে একমাত্র সরকারই এই কাজটা ভালভাবে করতে পারেন। এই কাজে দেরি হওয়ার মানে শ্রমিককে অযথা কষ্টভোগ করতে দেওয়া। যে সব শ্রমিকের আয়ের উপর পরিবার নির্ভরশীল তাদের অসুবিধা চরমে পৌঁছানর কথা। মালিকপক্ষের লোকসান হলেও শ্রমিকদের মত হবে না। কারণ রাণা পরিবারের টাকার অভাব নেই, দ্বিতীয়ত এতদিন তাঁরা যে মুনাফা করেছেন সে অঙ্কটা নেহাৎ কম নয়।

চৌরঙ্গী অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত তিনটি সিনেমা বন্ধ থাকায় দর্শকদের অসুবিধাও কম নয়। এ কারণে এই তিনটি সিনেমার বিরোধ মীমাংসা হলে আমরা আনন্দিত হব।

—[illegible]।

গড় নাসিমপুর

[পরিচালক : অজিত লাহিড়ী]

ম্যাজো প্রোডাকসন্সের "গড় নাসিমপুর" মুক্তিলাভ করেছে। বাবীন্দ্রকুমার দাস রচিত কাহিনীর চিত্ররূপ দিয়েছেন অজিত লাহিড়ী। অজিত লাহিড়ীর পরিচালনায় এটি তৃতীয় ছবি।

কাহিনীর পটভূমি ঔরংজেব আর শাহসুজার দ্বন্দ্বের—সুজা যখন বাংলায় এসেছিলেন সেই কালের। বাংলার সামন্তরাজা বা জমিদাররা তখন কেউ দিল্লীর পক্ষে কেউ সুজার পক্ষাবলম্বন করেছে। এ-সময় এক পক্ষ আরেক পক্ষের জমিদারী আত্মসাতের জন্য নানা ছলচাতুরী এবং চক্রান্ত [illegible]। তখন এসব সামন্তপতিদের অত্যাচার ও চক্রান্তে বাংলা দেশে অরাজকতা চলছিল। এ-সময় গড় নাসিমপুরে রাজার বাড়িতে দুটি শিশু গভীর অন্তরঙ্গতার মধ্যে বড় হচ্ছিল : একজন রাজার মেয়ে আর একজন আশ্রিত। আশ্রিত শিশুটি লুণ্ঠিত সম্পত্তির সঙ্গে এ-বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে। একসময় সে পালিয়ে গিয়ে ডাকাত সর্দারের আশ্রয় লাভ করে, এবং সেখানে অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষালাভ করে। যৌবনকালে তাদের আবার সাক্ষাৎ ঘটে এবং দু-জনেই যখন মিলনের জন্য আগ্রহী তখন প্রতিদ্বন্দ্বী তাকে হত্যা করার চেষ্টা করে। প্রচণ্ড সংঘর্ষে সব দুর্গের জয়

কিছুই থাকে না. কেবল তারা দু-জন নারীর মুখে নৌকায় করে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করে। যেখানে সামন্তরাজাদের চক্রান্ত নেই, যেখানে প্রতিহিংসা নেই বা প্রতিশোধ নেই।

সম্পত্তির লোভ, চক্রান্ত, প্রতিহিংসা, প্রেম ও সংঘর্ষে এই ছবি চমকপ্রদ কাহিনী ও উপ-কাহিনীতে ভরাট। অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণ, আক্রমণোদ্যত হস্তী বাহিনী, দুর্গ আক্রমণ এবং অসির যুদ্ধ ইত্যাদি বাংলা ছবিতে প্রায় দেখা যায় না। এই দৃশ্যগুলি যথেষ্ট কৃতিত্বের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে প্রেমের অংশ ছাড়া কাহিনী আবেদনহীন। রাজায় রাজায় সম্পত্তির দ্বন্দ্ব ও দুর্নীতিগ্রস্ত নবাব বাদশাহদের ব্যাপার নিয়ে সাধারণ মানুষের মাথা ঘামাবার তেমন কিছু নেই। এদিক থেকে কাহিনী নিষ্প্রভ। চিত্রনাট্যকার অবশ্য জনতাকে আগ্রহী করার জন্য সংলাপ সংযোজন করেছেন, এবং মাঝে মাঝে সংলাপ ভাল। চিত্রগ্রহণ অংশত ভাল হলেও সাধারণভাবে উচ্চমানের নয়। ছবির গতি ধীর হওয়ায় মাঝ সময়ে অস্বস্তি সৃষ্টি করে। ছবিতে সংগীত প্রয়োগ অত্যন্ত সেকেলে ধরণের। তাই সময় সময় পরিবেশ-যথার্থতাকে উপেক্ষা করে অবিশ্বাস্যভাবে গান দেওয়া হয়েছে। কাল ও পরিবেশ বিবেচনা করলে প্রেমের দৃশ্যও কিছুটা বাহুল্য-পূর্ণ। কয়েকটি স্থানে ফটোগ্রাফি ও সম্পাদনা কৃতিত্ব ছাড়া ছবিটি বাস্তবিকই পুরাতন রীতির এবং হিন্দী ছবির অনুসারী।

যাঁরা বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে উত্তমকুমারের অভিনয় সর্বশ্রেষ্ঠ বলা যায়। তিনি যখনই পর্দায় এসেছেন তখনই দর্শকরা উৎসাহিত হয়েছেন। বিশ্বজিৎ ও মাধবী মুখার্জী নাটকীয়তার প্রয়োজন মিটিয়েছেন। এঁদের সঙ্গে দেব মুখার্জী যথার্থ সঙ্গতি রাখতে পারেন নি কেবলমাত্র তাঁর বাচনভঙ্গির দোষে। বিকাশ রায়, কমল মিত্র, অসিতবরণ তাঁদের চরিত্রগুলি যথার্থভাবে উপস্থিত করেছেন। তরুণকুমার, সুব্রতা চ্যাটার্জী, অনুপকুমার, ভানু ব্যানার্জী, দিলীপ রায়, পদ্মা দেবী, রমা গুহ-ঠাকুরতা প্রমুখকে বিভিন্ন ভূমিকায় দেখা গেছে। একটি নাচের দৃশ্যে মধুমতী প্রশংসনীয়।

"শকুন্তলা" নৃত্যনাট্য

গত ১৬ই অক্টোবর পার্ক সার্কাস পূর্ব কলকাতা কল্যাণ সংসদের উদ্যোগে বিদম অব দি ইস্ট-এর শকুন্তলা নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয। নৃত্য-পরিচালনায় ও দুষ্মন্তের নামভূমিকায় কানাই মজুমদার সুনাম অর্জন করেন। শকুন্তলার ভূমিকায় মঞ্জুলা চ্যাটার্জি উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। মঞ্জুলা চ্যাটার্জি ও অনুপশঙ্কর বিভিন্ন নৃত্যে দর্শকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সংগীতাংশ ও "দৃশ্য-সজ্জা" মন্দ হয় নি।

চণ্ডালিকা ও রাবণ বধ নৃত্যনাট্য

গত ২৫শে অক্টোবর, সন্ধ্যায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের চণ্ডালিকা ও রাবণ বধ নৃত্যনাট্য পার্ক সার্কাস বেনিয়াপুকুর সংযুক্ত পূজো কমিটির ব্যবস্থাপনায় পার্ক সার্কাস ময়দান পূজামণ্ডপে নৃত্যবিদ নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন নৃত্যে—সুতপা দত্ত, পাপড়ি বোস, শুক্লা সেনগুপ্তা, শেলী দাস, চৈতালী সেন, অরুণা দে, মিতা পাল, শিপ্রা সেন, রবি হোপ, বনানী চৌধুরী, কৃষ্ণা সেন প্রমুখ নৃত্যে প্রশংসা অর্জন করেন। সংগীত পরিচালনায় ছিলেন, শ্রীনির্মলেন্দু বিশ্বাস।

ধৃতরাষ্ট্র

ড্রাগস কনট্রোল বিক্রিয়েশন ক্লাব গত ২৫শে অক্টোবর বিশ্বরূপায় প্রথম নাট্যনিবেদন ধনঞ্জয় বৈরাগীর ধৃতরাষ্ট্র মঞ্চস্থ করেন তাঁদের প্রথম বার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে। অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের ড্রাগস কনট্রোলার ডঃ বিভূতিভূষণ সরকার ও নাটকটি পরিচালনা করেন অক্ষয়পতি রায়চৌধুরী।

অভিনয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন ঃ সর্বশ্রী আনন্দ ভট্টাচার্য, অসীম ঘোষ, সমর সেন, অঞ্জনা ভট্টাচার্য, লোকনাথ প্রামাণিক, অমল চক্রবর্তী, ব্রজেন দাস ও প্রতিমা চক্রবর্তী।

তুষারতীর্থ অমরনাথ

'আদ্যাশক্তি মহামায়া'র অসাধারণ সাফল্যের পর পরিচালক পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী এবার যে ছবিটির চিত্রগ্রহণ সুরু করেছেন তার নাম হল—"তুষারতীর্থ অমরনাথ।" বিনয়কৃষ্ণ দালাল প্রযোজিত বীণাপাণি পিকচার্সের উক্ত ছবিটির বেশির ভাগ দৃশ্যই কাশ্মীর, কেদারনাথ, বদরিনাথ, অমরনাথ, হরিদ্বার ও হৃষীকেশ প্রভৃতি জায়গায় প্রাকৃতিক পরিবেশে গৃহীত হবে। পুরো ছবির দায়িত্ব নিয়ে-

'বৌদি' ছবির একটি দৃশ্যে দিলীপ চক্রবর্তী

দিবারাত্রির কাব্য

হাটে বাজারে

['৬৭ সালের শ্রেষ্ঠ ছবি]

তপন সিংহ পরিচালিত "হাটে বাজারে" ১৯৬৭ সালের শ্রেষ্ঠ কাহিনী-চিত্র রূপে বিবেচিত হয়েছে। এই ছবিটি ভারতের শ্রেষ্ঠ ছবি রূপে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণ পদক লাভ করেছে। এই ছবির প্রযোজক অসীম দত্ত পাবেন ২০ হাজার টাকা, আর ৫ হাজার টাকা পাবেন পরিচালক তপন সিংহ।

দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ কাহিনীচিত্র বিবেচিত হয়েছে "উপকার"। এই ছবির প্রযোজক আর এম গোস্বামী পাবেন ৫ হাজার টাকা, এবং পরিচালক মনোজকুমার রৌপ্য পদক পাবেন।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার পাবেন বাংলার জনপ্রিয় অভিনেতা উত্তমকুমার, 'এণ্টনী ফিরিঙ্গী' এবং 'চিড়িয়াখানা'র অভিনয়ের জন্য। শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর পুরস্কার পাবেন নার্গিস, 'রাত আউর দিন' ছবিতে অভিনয়ের জন্য। শ্রেষ্ঠ নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীর পুরস্কার পাবেন 'উপকার'-এর মহেন্দ্র কাপুর।

সত্যজিৎ রায় পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার। তাঁর এই সম্মান লাভ হয়েছে 'চিড়িয়াখানা' ছবির জন্য। তিনি ৫ হাজার টাকা পাবেন।

বিজয় বসুর 'আরোগ্য নিকেতন' শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক ছবির পুরস্কার পেয়েছে। অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন এ জন্য পাবে ৫ হাজার টাকা। শ্রেষ্ঠ ফটোগ্রাফির পুরস্কার পেয়েছে "বোম্বাই রাত কী বাহোমে"র জন্য শ্রীরামচন্দ্র। রঙিন ছবির ফটোগ্রাফির জন্য পুরস্কার পাবেন এম এন মালহোত্রা 'হামরাজ' ছবির জন্য।

শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকারের পুরস্কার পাবেন এস ডি পুরম সদানন্দন 'অগ্নিপুত্রী' ছবির জন্য।

স্বল্পদৈর্ঘ ছবির ক্ষেত্রে পুরস্কার পাবে: 'থ্রু দি আইজ অব এ পেইণ্টার' 'সন্দেশ' 'ইণ্ডিয়া-১৯৬৭' 'আকবর', 'আই এম টুয়েণ্টি'।

একাঙ্ক নাট্য-প্রতিযোগিতা

বিধান সংগ্রহশালা প্রাঙ্গণে (নোনা-চন্দনপুকুর, ব্যারাকপুর) শ্রীনাট্যম্-সদ্ভাব মঞ্চের পরিচালনায় একাংক নাটক প্রতিযোগিতার এক আয়োজন করা হয়েছে। সাংবাদিক, নাট্যকার, শিল্পী ও কলা-কুশলীদের নিয়ে গঠিত বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন সংস্থার নাটক, পরিচালক, অভিনেতা, অভিনেত্রী, শিশু অভিনেতা ও আরও অন্যান্য বিষয়ে পুরস্কৃত করা হবে। তাছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দুটি সংস্থাকে মদনমোহন স্মৃতি চ্যালেঞ্জ শীল্ড ও

মেট্রোর 'দি কমেডিয়ানস' ছবিতে প্রযোজক পরিচালক পিটার গ্লেনভিলের সঙ্গে রিচার্ড বার্টন ও এলিজাবেথ টেলর।

ছবিগুলি সর্বসাধারণ দেখতে পাবে। [illegible] প্রবেশমূল্য [illegible] ধার্য করা হবে—যা দৈনিক [illegible] বেশি হবে না। নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির কার্যালয় ৬১, ধর্মতলা স্ট্রীট-এ বিস্তারিত খবর পাওয়া যাবে। এই মেলার জন্য একটি কমিটি গঠনের আয়োজন চলেছে।

[illegible]

নির্মল দে'র জীবনাবসান

চলচ্চিত্র পরিচালক নির্মল দে গত ২৮শে অক্টোবর পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। ১৯৩৭ সালে তিনি নিউ থিয়েটার্সে শিল্প-নির্দেশনা বিভাগে প্রথম যোগ দিয়েছিলেন। পরে তিনি চিত্রগ্রহণ চিত্র-নাট্য রচনা ও পরিচালনার কাজ করেছেন। তাঁর ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে—বসু পরিবার, সাড়ে চুয়াত্তর, চাপাডাঙার বৌ, মুক্তধারা, নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে, বিয়ের খাতা। বোম্বাইয়ের বিমল রায় প্রযোজিত 'বিবেকানন্দ' ছবির চিত্রনাট্য তিনিই রচনা করেছিলেন। তিনি স্ত্রী ও এক কন্যা রেখে গেছেন।

প্যারীমোহন স্মৃতি চ্যালেঞ্জ কাপ দেওয়া হবে। প্রতিযোগিতায় যোগদানের শেষ তারিখ ১৭ই নভেম্বর, ১৯৬৮। বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত যে কোনও কেন্দ্রে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

১। ফিল্ম এ্যান্ড থিয়েটার আরকাইভস অফ ইণ্ডিয়া (৮১, বিধান সরণী, কলি ৪)

২। শৈলেশ মুখোপাধ্যায় (ফোন ঃ ২৪-৬৪৮৩) পানশিলা, সোদপুর।

৩। শ্রীনাট্যম্ (চন্দনপুকুর বাজার) ব্যারাকপুর।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলা

নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি এক উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলার আয়োজন করছে। এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে দশদিনব্যাপী। মেলায় দেশী-বিদেশী ছবি দেখান হবে। সাধারণত ফিল্ম সোসাইটির ছবিগুলি সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে; এই

[illegible] প্রযোজিত 'মুক্তধারা' নাটকে [illegible] ও [illegible]

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের অভূতপূর্ব বন্যার তাণ্ডব ধ্বংস করেছে অনেক জীবন, সম্পদ এবং মানুষের মনোবল। উত্তরবঙ্গের আর্ত মানুষের কান্নারোল ছড়িয়ে পড়েছে কলকাতা ও সারা বাংলায়। এই আর্ত-ঘ্রাণে সাড়া জেগেছে বাংলাদেশের শিল্পী, কবি ও সাহিত্যিকগণের মধ্যে। বাংলা-দেশের বিশিষ্ট শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরা কলকাতার বিভিন্ন পথ পরি-ক্রমা করে উত্তরবঙ্গের বন্যা-বিধ্বস্ত এলাকার নিঃসহায় দুস্থ দুর্গত ও হত-ভাগ্য মানুষদের জন্য সাহায্য গ্রহণ করেন "সাপ্তাহিক বসুমতীর" উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির উদ্যোগে।

সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের পথপরিক্রমার সময় প্রখ্যাত অভিনেতা শ্রীসবিতাব্রত দত্ত তাঁর উদারকণ্ঠে—"বাঁচব রে, আমরা বাঁচব, মোদের ভাঙা বুকের পাঁজর দিয়ে নয়া বাংলা গড়ব" গান গেয়ে সাধারণ মানুষের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। কলকাতা ও শহরতলীর জনসাধারণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে যায়। আর্ত মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য তাঁরা অভিযান করে যাচ্ছেন সাহায্যের ডালি নিয়ে। সাফল্য-মণ্ডিত হোক তাঁদের মহৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত অভিযান এই কামনা করি।

উত্তরবঙ্গের একজন তরুণ হিসেবে আপনাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। পরিশেষে শ্রীসবিতাব্রত দত্তকে তাঁর উদার-কণ্ঠে গানটির জন্য আমার অভিনন্দন জানাবেন।

—নির্মলকুমার ঘোষ
গোমস্তাপাড়া, জলপাইগুড়ি।

*

উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের জন্য আপনাদের আন্তরিকতা ও সম-বেদনার জন্য আমি আপনাকে এবং আপনাদের পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে জানাই আমার অশেষ ধন্যবাদ। আমরা সবাই ভাল আছি। বন্যায় আমাদের কোন ক্ষতি হয় নি। আমি একটি অনুরোধ করবো আপনারা যেন বন্যাপীড়িতদের যথাসাধ্য সাহায্য করতে কুণ্ঠিত বোধ না করেন।

—পরিতোষ নাগ
বেলাকোবা, প্রসন্নগর,
জলপাইগুড়ি।

*

২৪শে অক্টোবরের সাপ্তাহিকে 'উত্তর বঙ্গের বন্যা' শীর্ষক দ্বিতীয় প্রস্থ সম্পাদকীয়তে সরকারী ব্যবস্থার মধ্যেও রাজনীতির সূচ প্রবেশের কার্যকারণ সম্পর্কে যে তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত করেছেন তা পাঠ করে আমরা অত্যন্ত বেদনাবোধ করছি। প্রলয়ঙ্করী বন্যায় সব ধ্বসে, ধুয়ে-মুছে যাবার পর সরকারী চাঁচারা আপন প্রাণ বাঁচার নীতি কার্যকর করার

সময় পেলেন তখন সুরু হয় অপদার্থ সরকারী কর্তা ও রাজনীতির এক শ্রেণীর দাবাড়েদের ভাষণ বিবৃতির তুবড়ী! নয়াদিল্লীর ভাগ্যেশ্বরেরা তারও অনেক পরে গা তুললেন ও হাওয়াই ভ্রমণে যাত্রা করে উত্তরবঙ্গের মহাশ্মশানে যেন ঈশ্বর প্রেরিত দূত হিসেবে আকাশ থেকে পড়লেন। সরকারী অপদার্থতার অপরাধজনক অমার্জনীয় ত্রুটি লক্ষ্য করে এবং সর্বস্বহারা, স্বজনহারা, ক্ষুধার্ত মানুষের অভিযোগ ও ক্রোধাগ্নির মুখে পড়ে "কাগজী টাকা"র চালাও সাহায্য কবুল করে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় জাতীয় সংকট বিবেচনায় ত্রাণকার্য চালানো হবে এই আশ্বাস বাণী দান করে প্রস্থান করেন। যে শিলিগুড়ির জনসাধারণ জলপাইগুড়ির এই খণ্ডপ্রলয়ে বিলুপ্তির মুখে সাহায্যের জন্য দলে দলে ছুটে গিয়ে অনেক বিপন্নকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছিলেন—সংবাদে প্রকাশ, সেই বেসরকারী সাহায্যকেও নাকি পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন থেকে নানা বিধি-নিষেধের বাধায় স্তব্ধ করা হয়েছিল। মনে হয় সরকারী অপদার্থতার ছড়িয়ে থাকা প্রমাণ লুকো-বার জন্যেই কর্তাদের এই মহান আদেশ জারী হয়ে গিয়ে থাকবে!...

আবার দেখি যে, হাজার হাজার সাহায্যদ্রব্য ও খাদ্যবস্তুপূর্ণ লরী খেয়া-পারে আটকে আছে অথবা রাখা হয়েছে। মানুষের জীবন নিয়ে এই যে অবহেলায় এক শ্রেণীর রাজনীতিক অপরাধী আমলা-তন্ত্রের সঙ্গে সহযাত্রী হয়েছে। "ভবিষ্যৎ বাণী" করে বলা যায় বিপন্ন উত্তরবঙ্গের অবশিষ্ট মানুষেরা যেদিন তার বিচারে পথে প্রান্তরে নামবে, সেই দিন আরও মহতী বিনষ্টির মধ্যে তার প্রায়শ্চিত্ত হয়ত হাতছানিতে আহ্বান জানাচ্ছে! রাজনীতি বড় না মানুষের ধন-প্রাণ বড় তার প্রমাণ হওয়া একান্ত দরকার।

—শ্রীবিনয়েন্দ্রকুমার চৌধুরী
শিলচর—১

*

সাহানা দেবীর "স্মৃতির খেয়া" পড়লুম। পড়ে খুবই আনন্দ পেলুম। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, ১৭ তারিখে "মহাত্মা গান্ধী" এবং ১৮ [illegible]

কিন্তু জানালেন না মহাত্মা গান্ধী কোন জায়গা থেকে এলেন। মহাত্মা তখন খুলনায়। এই দুঃসংবাদটি কলকাতা থেকে সত্যানন্দবাবু, কুমুদবাবু এবং হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় খুলনায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে তারযোগে জানান। এই নিদারুণ দুঃসংবাদের সময় মহাত্মাজী স্টীমারের মধ্যে আপন শয়ন-কক্ষে ভগবানের উপাসনায় নিযুক্ত ছিলেন। মিঃ দেশাই দুঃসংবাদটি মহাত্মাকে জানান।

তা ছাড়া সেদিনকার শিয়ালদহ স্টেশনে উপস্থিত অগণিত জনতার মধ্যে তিনি কেবল মহাত্মাজীর নাম করেছেন, কিন্তু মহাত্মাজী ছাড়া আর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হলেন শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, স্যার নীলরতন সরকার, রেভারেণ্ড বি এ নাগ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত কুমারকৃষ্ণ দত্ত, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বোস এবং আরও অনেকে।

অবশ্য মহাত্মা গান্ধী নগ্নদেহে-নগ্নপদে শবানুগমন করেছিলেন এবং সর্বক্ষণ শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন।

সুনীলকুমার নিয়োগী
আপকার গার্ডেন (ওয়েস্ট)
আসানসোল

*

'সাপ্তাহিক বসুমতী'র নিয়মিত পাঠক হিসাবে আমি আপনাদের এই পত্রিকায় শ্রীঅসীম মুখোপাধ্যায়ের 'গ্রামবাংলার কথা' এই পর্যায়ে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করছি। লেখক গ্রাম-বাংলার 'মেঠোপথ' ধরে অগ্রসর হয়ে অনেকগুলি বহু আলোচিত ও নূতন সমস্যার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন—এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযোজিত গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলির আজকের এই জীবনমরণ সঙ্কট ও তার কারণের অবতারণা বেশ মনোগ্রাহী হয়েছে। কলকাতা ও শহর অঞ্চলের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহলের অধিকাংশই গ্রাম সম্পর্কে বর্তমান সর-কারের উদাসীনতা ও বর্তমান সামাজিক অব্যবস্থার নির্দয় সমালোচক, কিন্তু গ্রাম-বাংলার প্রকৃতরূপ অনেকেরই কাছে খুব স্পষ্ট নয়। লেখক সেদিক দিয়ে অনেকটা বিশ্বস্ততার সঙ্গে গ্রামবাংলার মূল সমস্যার সঙ্গে আমাদের পরিচিত করবার চেষ্টা করেছেন। আশা করি, এ বিষয়ে লেখকের নূতনতর রচনা যথাযথভাবে বাংলার গ্রাম সম্পর্কে আমাদের ছায়াচ্ছন্ন ধারণা ও মনোবৃত্তিকে স্বচ্ছ করবার দায়িত্ব বহন করবে।

[illegible]

ছলনা

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়—তাই ভাবি মনে... । মেক্সিকো অলিম্পিকের পর সবার মনে বোধহয় এই একটাই ভাবনা। অনেক দিনের অনেক আশার মুখে ছাই দিয়ে পাকিস্তান অনের অতি-প্রত্যাশিত অলিম্পিকের হকি প্রতিযোগিতার স্বর্ণপদকটি ঘরে তুলতে পেরেছে আর ভারতের বরাতে জোটে নি এবার রূপোর মেডেলটাও। ব্রোঞ্জের পদক নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে ভারতকে। আর তাতেই নাকি ভারতীয় কর্মকর্তারা বেজায় খুশি। খুশি হবার বিষয়ই বটে—প্রথম স্থান থেকে তৃতীয় স্থানে নেমে যাওয়া আর যাই হোক খুব একটা সহজ ব্যাপার তো নয়! তার ওপর যখন মেক্সিকোর ১৯তম অলিম্পিকে ভারতীয় প্রতিযোগীদের হিরো হয়ে হকি দলই শুধু মাত্র লাভ করেছে একটি পদক—ত সে ব্রোঞ্জের হলেই বা ক্ষতি কি!

বোধহয় সেই আনন্দেই এখন মেতে থাকবেন ভারতীয় হকি দলের খেলোয়াড় আর কর্মকর্তারা। মেক্সিকো অলিম্পিকে ভারত যদি শুধু মাত্র স্বর্ণপদকটাই হারাতো তাহলে বলার অনেক কিছু থাকলেও একটু সমীহ করে বলতে হতো। কিন্তু মেক্সিকোর প্রাঙ্গণে ভারতীয় হকি দল ফাইন্যালেও উঠতে পারে নি। অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে গিয়ে বিদায় নিতে হয়েছে সেমিফাইন্যাল থেকেই। তারপর ব্রোঞ্জ পদক লাভের জন্যে লড়াই-এ ভারত যখন কোন রকমে ওয়েস্ট জার্মানীকে হারালে তখন ভারতীয় খেলোয়াড়দের সে কি লম্ফ-ঝম্প—যেন অলিম্পিক হকি প্রতিযোগিতার সোনার মেডেলটাই তাঁরা জয় করে ফেলেছেন।

১৯৬০ সালের অলিম্পিকে পাকিস্তান হকি প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে ভারতকে হারিয়ে সর্বপ্রথম লাভ করেছিলো সোনার মেডেল। সেই থেকে আমরা শুনে আসছি যে বিশ্ব হকির দরবারে পাকিস্তানই ভারতের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। আর সব দেশ .....? ফুঃ—তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে না ভারত তাদের। ভারতীয় হকি দলকে পরাজিত করার চিন্তা তাদের কাছে যে শুধু স্বপ্ন—শুধু অলীক কল্পনাই। তাই পরম নির্ভয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তাঁরা কাটিয়ে দিলেন কাল। অন্য দেশগুলো যে হকি খেলার উন্নতি করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে সেদিকে নজর দেবার প্রয়োজনও বোধ করলেন না কেউ। আর হকি খেলায় পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হলেও নানা রকম গালভরা বুলি দিয়ে আমাদের ভুলিয়ে রাখা হলো—যেমন পাকিস্তান ভারতের আত্মজ দেশ, হকি খেলায় পাকিস্তানের নিপুণতা ভারতের কাছ থেকেই পাওয়া ইত্যাদি...ইত্যাদি। কিন্তু আসল ব্যাপারটা থেকে গেলো চোখের আড়ালে—পাকিস্তান যে ভারতের কাছ থেকে সোনার মেডেলটা ছিনিয়ে নেবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে সেদিকে নজর দেবার প্রয়োজন কেউই বোধ করলেন না।

তাই শেষ পর্যন্ত মেক্সিকোর মাটিতে সেই অতি-প্রত্যাশিত ফলাফলেরই সম্মুখীন হতে হলো ভারতীয় দলকে। তবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলে হারতে হয় নি তাদের—ভারতীয় দলকে বিদায় নিতে হলো তার আগেই। আর সব থেকে মজার বিষয় হলো যে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারত হেরে যাবার পর ভারতের অনেক প্রাক্তন খেলোয়াড় আর কর্মকর্তারা এই পরাজয়কে অতি-প্রত্যাশিত বলে মন্তব্য করেছেন। এখন আমাদের প্রশ্ন—[illegible] আগে থেকেই [illegible] ছিলেন তখন তাঁরা কেন আগে মুখ খোলেন নি? তাহলে আর যাই হোক [illegible] ভারতীয় খেলোয়াড় আর হকি [illegible]

বাসকেট বল (১টি স্বর্ণপদক)

১৯৩৬ সালে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় বাসকেট বল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবার পর থেকে আমেরিকা প্রত্যেক বছরই এই বিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান লাভ করে আসছে। এবারেও

দেখে শেখা

কেউ দেখে শেখে আর কেউ ঠেকে। আমরা অবশ্য ও সব শেখা-টেখার ধার ধারি না। কারণ তাতে যে দেশের, দশের **এমন কি নিজেরও উপকার হবার সম্ভাবনা থাকে। তবু** মেক্সিকো অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দলের খেলোয়াড়দের হাল আর হার দেখে আমরা যদি কিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করে থাকি তাহলে তার চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি হবে! যদিও বেশ জানি ও সবে আমাদের কিছু হয়-টয় না।

তবে মেক্সিকো অলিম্পিকে ভারতের বিরুদ্ধে খেলার সময় জাপান দল ওয়াক আউট করার জন্যে জাপানী হকি দলের ম্যানেজার হিডো ইচিকাওয়াকে যে ভয়ংকর শাস্তি পেতে হয়েছে আমরা বোধহয় তার কল্পনাও করতে পারি না।

ভারতের বিরুদ্ধে খেলায় ঐ ওয়াক আউটের ঘটনা ঘটার পর জাপানী হকি ফেডারেশন জাপানী অলিম্পিক হকি দলের ম্যানেজার ইচিকাওয়াকে সাসপেন্ড করে দেন। শুধু তাই নয় জাপান যখন আর্জেন্টিনার সংগে খেলছিলো তখন ইচিকাওয়াকে জাপানের অলিম্পিক কর্মকর্তাদের সংগে তো বসতে দেওয়া হয়ই নি এমন কি তাঁকে জাপানী হকি দলের ম্যানেজারের পোষাকও পরতে দেওয়া হয় নি। সাধারণ পোষাক পরে ইচিকাওয়া খেলা দেখতে বাধ্য হন অন্য এক স্থান থেকে।

কিন্তু এই ঘটনা থেকে কি আমরা কিছু শিখতে পারবো? মনে তো হয় না। কারণ আগেই বলেছি যে দেখে শেখা তো দূরের কথা আমরা ঠেকেও শিখি না। তাই আজ বড় চিন্তা হয় ভারতীয় হকির ঐতিহ্যের কথা ভাবলে। রোমের জ্বালা আমরা উশুল করেছিলাম টোকিওতে। কিন্তু মেক্সিকোর পরাজয়ের স্মৃতি ভারতীয় হকি দল কি কোনদিন আমাদের ভোলাতে পারবে......?

॥ ব্রোঞ্জ পদক লাভের উল্লাস ॥

পশ্চিম জার্মানীর বিরুদ্ধে ভারত জয়সূচক গোল করার পর ভারতের ইনামুর রহমান আনন্দের চোটে শূন্যে লাফিয়ে উঠে উল্লাস প্রকাশ করছেন। এই খেলায় ভারত ২—১ গোলে জিতেছিলো।

আমেরিকা বাসকেট বল খেলায় সোনার মেডেল পেয়েছে ফাইন্যালে যুগোশ্লাভিয়াকে ৬৫-৫০ পয়েন্টে হারিয়ে দিয়ে। ব্রেজিলকে ৭০-৫৩ পয়েন্টে হারিয়ে রাশিয়া পেয়েছে ব্রোঞ্জ মেডেল।

বক্সিং (১১টি স্বর্ণপদক)

এই বিভাগে রাশিয়া এবার লাভ করেছে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান। তারা পেয়েছে তিনটি সোনার মেডেল। মেক্সিকো আর আমেরিকা পেয়েছে দুটি করে স্বর্ণপদক।

ক্যানোয়িং ও কেয়াক (৭টি স্বর্ণপদক)

হাঙ্গেরী এই বিভাগে লাভ করেছে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান। তারা পেয়েছে ২টি স্বর্ণ, ৩টি রৌপ্য ও ১টি ব্রোঞ্জ পদক। রাশিয়া পেয়েছে ২টি সোনার মেডেল।

সাইক্লিং (৭টি স্বর্ণপদক)

এবার ফ্রান্স আবার ফিরে পেয়েছে তার হারানো সম্মান। এই বিভাগে ফ্রান্স পেয়েছে ৪টি স্বর্ণপদক। এ ছাড়া হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক আর ইটালী পেয়েছে একটি করে সোনার মেডেল।

ইকুয়েস্ট্রেন (৬টি স্বর্ণপদক)

আমেরিকা, ওয়েস্ট জার্মানী আর বৃটেনের ঘোড়সওয়াররা মেক্সিকো অলিম্পিকে দিয়েছেন অভাবনীয় নিপুণতার পরিচয়। ব্যক্তিগত নিপুণতায় বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছেন ফ্রান্সের জে গয়ুন।

ফেন্সিং (৮টি স্বর্ণপদক)

হাঙ্গেরী আর রাশিয়া লাভ করেছে ফেন্সিং বিভাগের শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান। তবে ব্যক্তিগত ও দলগত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে হাঙ্গেরী।

ফুটবল (১টি স্বর্ণপদক)

এ বছরও হাঙ্গেরী ফুটবল প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক লাভ করেছে। ফাইন্যালে তারা বুলগেরিয়াকে ৪—১ গোলে হারিয়ে দিয়েছে। জাপান লাভ করেছে ফুটবল প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জের মেডেলটি।

জিমন্যাস্টিক (১৪টি স্বর্ণপদক)

এই বিভাগে জাপান ও রাশিয়ার প্রতিযোগীরা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হন। মহিলাদের প্রতিযোগিতার রাশিয়ার মেয়ে ভেরা ক্যাসলাভাসকা ৪টি স্বর্ণপদক লাভ করেন। টোকিও অলিম্পিকেও তিনি পেয়েছিলেন চারটি সোনাব মেডেল।

হকি (১টি স্বর্ণপদক)

অলিম্পিক হকির অপ্রতিদ্বন্দ্বী দল ভারত এবার সেমিফাইন্যালেই পরাজিত হয়। ফাইন্যালে ওঠে পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়া। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান পায় সোনার মেডেল, অস্ট্রেলিয়া রূপোর আর ভারতের ভাগ্যে জোটে ব্রোঞ্জের মেডেল।

মডার্ন পেন্টাথলন (২টি স্বর্ণপদক)

ব্যক্তিগত বিভাগে স্বর্ণপদক লাভ করেন সুইডেনের বজর্ন ফের্ম। আর দলগতভাবে সোনাব মেডেল পান হাঙ্গেরী।

রোয়িং (৭টি স্বর্ণপদক)

এই বিভাগে ইস্ট জার্মানী ২টি স্বর্ণপদক লাভ করে ও রাশিয়া, ওয়েস্ট জার্মানী, হল্যান্ড, ইটালী আর নিউজিল্যান্ড পাষ একটা করে সোনার মেডেল।

স্যুটিং (৭টি স্বর্ণপদক)

এই প্রতিযোগিতার পিস্তল স্কিট বিভাগে রাশিয়ার প্রতিযোগী পান ২টি সোনার মেডেল সহ ৫টি পদক। তা ছাড়া রাশিয়া, আমেরিকা ও জার্মান প্রতিযোগীও পদক লাভ করেন।

ভলিবল (২টি স্বর্ণপদক)

ভলিবল প্রতিযোগিতার পুরুষ ও মহিলা বিভাগে রাশিয়া দুটি স্বর্ণপদক লাভ করে।

ওয়াটার পোলো (১টি স্বর্ণপদক)

ফাইন্যালে রাশিয়াকে ১৩-১১ গোলে হারিয়ে দিয়ে যুগোস্লাভিয়া স্বর্ণপদক লাভ করে। টোকিও অলিম্পিকের চাম্পিয়ান দল হাঙ্গেরী এবার লাভ করেছে ব্রোঞ্জের মেডেল।

ওয়েট লিফটিং (৭টি স্বর্ণপদক)

ইরানের মহঃ নাসিরি ক্লিন এ্যান্ড জার্কে সোনার মেডেল পান। ফেদার-ওয়েট বিভাগে জাপান শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করে। লাইটওয়েটে সেরা স্থানটি পান পোল্যান্ডের ওয়ালডেমার বাসজানো-ওয়াসকি। ফিনল্যান্ডের কারলো কান-গাসানিসি মিডল হেভিওয়েটে পান সোনাব মেডেল। অন্য তিনটি সোনার মেডেল লাভ করে রাশিয়া। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী মানুষ হিসেবে সম্মানিত হন রাশিয়ার লিওনিড জ্যাবোটিনস্কি।

রেস্লিং (১৬টি স্বর্ণপদক)

এই প্রতিযোগিতায় জাপান ও রাশিয়ার প্রতিযোগীরাই বিশেষ সাফল্য লাভ করেন। তবে ইরানের প্রতিযোগীরাও এবার কয়েকটি বিভাগে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেছেন।

॥ রাজা মুখার্জী ॥

অস্ট্রেলিয়া সফরকারী ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হয়েছেন বাংলার এই তরুণ খেলোয়াড়টি।

ইয়োটিং (৮টি স্বর্ণপদক)

আমেরিকা ড্রাগন ও স্টার ক্লাশে সোনার মেডেল পায়। সুইডেন ৫·৫ মিটার ক্লাশে, বৃটেন ফ্লাইয়িং ও রাশিয়া ফিন দিঙ্গিস বিভাগে স্বর্ণপদক পায়।

অস্ট্রেলিয়া সফরকারী ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলে বাংলার তিনজন নির্বাচিত খেলোয়াড় (বাঁ থেকে ডান দিক) দীপঙ্কর [illegible], রাজা মুখার্জী (অধিনায়ক) ও রবি ব্যানার্জিকে দেখা যাচ্ছে।

ফুটবল খেলার আইন-কানুনের ১২ নম্বর নিয়মটি হলো ফাউল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। ডাইরেক্ট কিম্বা ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিকের বিষয়টি এই নিয়মের আওতায় পড়ে অর্থাৎ কখন কিভাবে ফাউল করলে ডাইরেক্ট ফ্রি কিক কিম্বা ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক হবে তা জানা যায় এই নিয়ম থেকেই।

পূর্বে কিছুদিন আগে এই নিয়মটি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা ছবি দিয়ে লিখেছিলাম ডাইরেক্ট ফ্রি কিকের সম্বন্ধে। তাই এই সংখ্যা থেকে ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করা হচ্ছে।

সাধারণত পাঁচটি বিশেষ ধরণের অপরাধের জন্যে শাস্তির বিধান হিসেবে দেওয়া হয় ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিকের নির্দেশ। নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয়ের জন্যে ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক দেওয়া হয়ে থাকে ঃ

(ক) রেফারী যদি কোন খেলা অর্থাৎ খেলোয়াড়ের খেলার পদ্ধতিকে বিপজ্জনক মনে করেন তাহলে তিনি দেবেন ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিকের নির্দেশ যেমন গোলরক্ষক হাত দিয়ে বল ধরে রাখা সত্ত্বেও তাই বলে কিক করার চেষ্টা করা প্রভৃতি...।

(গ)

(গ) বল আয়ত্তে নেই অথচ প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের বাধার সৃষ্টি করছেন বিভিন্ন উপায়ে—যেমন বল আর প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়ের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে অথবা নিজে এমনভাবে দাঁড়াচ্ছেন যাতে প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়ের বাধার সৃষ্টি—এইসব অবস্থা সৃষ্টি করলে রেফারী সেই খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে দেবেন ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিকের নির্দেশ।

(খ)

(খ) বল দূরে আছে অর্থাৎ যখন আয়ত্তের সম্পূর্ণ বাইরে তখন যদি কোন খেলোয়াড় বলটা আয়ত্তে আনার চেষ্টা না করে সেই সময় কাঁধ দিয়ে কিম্বা অন্য কোন আইনসংগত উপায়ে প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে চার্জ করেন তাহলে রেফারী তাঁর বিরুদ্ধে দেবেন ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিকের নির্দেশ।

(ঘ) যদি গোলরক্ষক হাত দিয়ে বল না ধরে থাকেন কিম্বা গোল এরিয়ার বাইরে না গিয়ে থাকেন অথবা বাধার সৃষ্টি না করেন তখন তাঁকে কেউ চার্জ করলে রেফারী তাঁর বিরুদ্ধে ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক দিয়ে থাকেন।

(ঙ) ১৯৬৮ সালের প্রযোজ্য নতুন নিয়ম অনুসারে গোলরক্ষক যদি চার পায়ের মধ্যে বল মুক্ত না করেন অর্থাৎ কিক করে কিম্বা ছুঁড়ে কাউকে না দিয়ে থাকেন তাহলে রেফারী তাঁর বিরুদ্ধে ঐ একই শাস্তির বিধান দেবেন।

সাধারণত এই পাঁচটি অপরাধের জন্যে দেওয়া হয় শাস্তি হিসেবে খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিকের নির্দেশ। তবে এই পাঁচটি অপরাধের আওতায় পড়ে এমন ধরণের অনেক ঘটনা মাঠে ঘটে আর সেই অপরাধের জন্যে রেফারী দিয়ে থাকেন ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিকের নির্দেশ।

ওপরের ছবিটা ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিকের একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ। ছবিতে দেখা যাচ্ছে একজন খেলোয়াড় তাঁর নিজের দলের আর একজন খেলোয়াড়কে বল পাশ করার পর প্রতিপক্ষ দলের যে খেলোয়াড়টি বল পাশ করার আগে তাঁকে বাধা দিচ্ছিলো—তাকেই উল্টে সে এবার এমনভাবে আড়াল করে দাঁড়ালো যাতে সে আর বল পেয়ে যে খেলোয়াড় তাঁকে বাধা দিতে না পারে। এটি পড়বে ঐ পাঁচটি অপরাধের তালিকার মধ্যে। ফলে ঐ খেলোয়াড়টির বিরুদ্ধে রেফারী দেবেন ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিকের নির্দেশ।

(ঘ)

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

... বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-১২

৭৩ বর্ষ : ২১শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা | বাংলা ভাষার দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা | PRICE : 30 Paise
বৃহস্পতিবার, ২৮শে কার্তিক, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ | Thursday, 14th November, 1968

দুর্নীতির বিষক্রিয়া

একটা কথা আজকাল হামেশাই শোনা যায় : পরাধীন ভারতবর্ষে তিন পোয়া দুধে এক পোয়া জল মেশানো হতো। এখন সাড়ে সাত শ গ্রাম জলে দুধ মেশানো হয় আড়াই শ' গ্রাম। একালের মিশ্রণের জলেও নাকি ভেজাল। বস্তুত ভেজালের কারবারের ফলাও করে গোড়াপত্তন হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। সাধারণ মানুষের মধ্যে তখন ভেজাল ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে আক্ষেপ ছিল। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ তখনো ছিল সৎপথে অবিচল, দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভয়ংকর বিক্ষুব্ধ। একালে হাজার হাজার মানুষ কেন দুর্নীতির ভ[illegible]দ লাভ করছে, কেনই বা এক শ্রেণীর লোক পা বাড়ালো অসৎপথে—সে ঘটনাও খুঁজে বের করার জন্য সমাজবিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসা উচিত—যদি সত্যিই আমরা মনে করি যে, খেটে খাওয়া মানুষদের মধ্যেও কেউ কেউ আজ দুর্নীতিগ্রস্ত।

জাতীয় নেতারা পুরাতন আদর্শকে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে দেশটাকে দু'ভাগ করে গদিনসীন হলেন। তার পর স্বাধীন ভারত যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধারবৃন্দ জনসাধারণের চোখে এক নিমেষে হারালেন নিজেদের ইমেজ। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের পর ছন্নছাড়া যে জনসাধারণ উদগ্রভাবে স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা করছিল এবং নিজেদের মধ্যে সততা রক্ষা করছিল—স্বাধীন ভারতে তারা দেখল, দেশটা স্বাধীন হলেও তাদের জন্য নেতাদের বড় বড় বাণীর ভরসা ছাড়া আর কিছুই নেই। পরাধীন ভারতের সর্বত্যাগী কোনো কোনো নেতা স্বাধীন দেশের কর্ণধাররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রসারিত করলেন লালসার লোলজিহ্বা। স্বভাবতই তাঁদের এতোদিনের কষ্টসহিষ্ণু আত্মীয়-স্বজনদের কষ্টও লাঘব করার জন্য কর্ণধারগণ সিঞ্চন করলেন তাঁদের ওপর করুণার বারি। দল রক্ষার স্বার্থে ব্যবস্থা হোল যথাস্থানে পারমিট বিলিকরণের এবং স্বাধীন ভাবতে বিশেষ সুবিধাভোগী দালালশ্রেণীরা গ্রহণ করলো নানাবিধ সুযোগ। আর ব্যবসায়ীরা ত' পূর্বের মতো বহালতবিয়তেই থাকলো। ভারতের মতো বিরাট রাষ্ট্রে সব দিক দিয়ে যারা বঞ্চিত হলো তারা হচ্ছে, সাধারণ মানুষ। এদের কেউ কেরানি, কেউ শ্রমিক, কেউ শিক্ষক, কেউ পিয়ন, কেউ কন্ডাক্টর, কেউ ড্রাইভার, কেউ ছাত্র এমন কি এদের মধ্যে আছে স্ট্রীট বেগার পর্যন্ত। অথচ রাষ্ট্রের বাহিরাবরণে চাকচিক্যের অভাব নেই। বিদেশে ঝকমক করতে যেমন অকর্মণ্য লোকে ভর্তি ঝকমকে এমবেসির অভাব হোল না, দেশের বুকেও তেমনি গড়ে উঠল আকাশ উঁচু বড় বড় বাড়ি। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই সব বড় বড় বাড়ির মালিক হলেন হয় ব্যবসায়ী, নয় কন্ট্রাক্টর, কিংবা সমাজের সুবিধাভোগী তথাকথিত গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ। জাকজমকে ভর্তি বড় বড় প্ল্যানিং-এরও অভাব হোল না। দেশের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তার ফলে শ্রীবৃদ্ধি লাভ না করলেও এবং ক্রমাগত কারখানায় কারখানায় লক-আউটের ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পেলেও—নেতারা নীতির গলদ কোন্ জায়গায় অর্থাৎ বিষের ঘা কোথায় সৃষ্টি হয়েছে—তার অনুসন্ধান না করে একের পর এক সৃষ্টি করলেন সমস্যা। আর বেকার যুবকদল নৈরাশ্যে পীড়িত হয়ে দেশময় নেতৃবৃন্দের অভিজ্ঞতার লক্ষ্য করে গ্রহণ করলো ভিন্ন পথ। এ পথ থেকে রক্ষা করার জন্য কেউ চেষ্টা করলো না নতুন পন্থানুসন্ধানের। সমাজে যাঁরা নতুন পথ দেখাতে পারেন—তাদের মধ্যে আজো আছেন সাহিত্য স্রষ্টা, শিল্পী, সাংবাদিক এবং শিক্ষক। কিন্তু দেশে এ'রা নামকা ওয়াস্তে খ্যাতিসম্পন্ন। দেশটা যখন রাজনীতিজ্ঞদের বাঁকা কথায় চলে তখন কোন্ পাষণ্ড এ'দের সরল কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে? ফলে সমাজে সৎপথে আশ্রয় না পেয়ে একালের এক শ্রেণীর যুবক হাতেনাতে পরীক্ষা করল ঘুষ বস্তু কেমন, এবং চোরাই চালানে কিরকম মুনাফা। কী লজ্জার কথা এই ভারত রাষ্ট্রে সাধারণ মানুষের অধিকাংশই আজ মনে করে অসৎপথেই স্বর্গলাভ। স্বাধীন ভারতে দেশনায়কদের আচরিত ধর্ম থেকেই কি তাদের এই ধারণা হোল—আর তাদের ধারণা কি এই—সমাজে শান্তি রক্ষার দায়িত্ব যে আরক্ষাবিভাগের হাতে—তারাই দেশটাকে ক্রমাগত উচ্ছন্নের পথে নিয়ে গেছে?

দেশের মানুষকে এই ধরণের বিভ্রান্তি থেকে উদ্ধার করা অবিলম্বে প্রয়োজন। অনেকে সে আশায় হয়তো জলাঞ্জলি দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন, আগামী দিনের কর্ণধাররা ঘটনার পট-পরিবর্তনে আবার ইমেজ সৃষ্টি করতে পারবেন। সেই ইমেজ সৃষ্টি করার আগে দরকার হবে আত্মত্যাগের কঠিন ব্রত। যিনি সোনার সিংহাসন পেয়েও মাটির আসনে বসে জনতার মাঝখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন—সেদিন আসবে স্বাধীন ভারতে সাধারণ মানুষের যথার্থ মুক্তির দিন।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

নামটি শুনে সারা দুনিয়া যেন চমকে উঠেছিলো। ঠোঁট উল্টে কেউ কেউ সংশয়োক্তিও করে থাকবেন: 'হাতী-ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল!' কোন কোন রাজনীতির পণ্ডিতও ভুরু কুঁচকে আস্তিনের তলায় হয়তো সংক্ষিপ্ত মন্তব্য নিক্ষেপ করেছেন: 'স্টান্ট!' অন্য কেউ হয়তো বলে থাকবেন 'ওরা বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছে না বলেই রামা-শ্যামাকে পাঠিয়ে প্রতিপক্ষকে তাচ্ছিল্য করাতে চাইছে, টেক্কা মারতে চাইছে।' বলা নিষ্প্রয়োজন, বিভিন্ন মহলে এক প্রকার গবেষণা মাদাম গুয়েন থি বিনকে কেন্দ্র করে। প্যারিসে শান্তি আলোচনায় ভিয়েৎনামের জাতীয় মুক্তি ফৌজ প্রতিনিধি দলের নেত্রী হিসেবে মাদাম বিন-এর নাম ঘোষিত হয়েছে।

কিন্তু এ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করার জন্যে দলের উর্ধ্বতন কমিটি থি বিনকেই মনোনীত করেন, তবে তাঁর অপরাধটা কোথায়? ও, মাদাম বিন পুরুষ নন বলে? কিন্তু এটা কেমনতরো যুক্তি হবে যে কেবলমাত্র নারী হয়ে জন্মাবার কারণে কেউ তাঁর দেশকে, তাঁর জনকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না? মেয়ে হওয়াটা কোন অপরাধ হতে পারে না, অযোগ্যতাও না। বরং নিঃসন্দেহে এবং জোরের সঙ্গে বলা যেতে পারে যে, যে গুণ এবং যোগ্যতার বলে একজন পুরুষকে এ কাজের ভার দেওয়া চলে তার সমস্ত গুণ ও যোগ্যতাই থি বিন-এর রয়েছে। এবং তার পরেও বোধহয় বলা চলে যে, মাদাম বিন একজন পুরুষের সমস্ত কর্মক্ষমতা এবং বুদ্ধির অধিক আরো কিছু।

কারণ মাদাম বিন পুরুষের মতোই পড়েছেন, লড়েছেন এবং গড়েছেন। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কর্মতৎপরতা এবং সাংগঠনিক প্রতিভার জোরে তিনি জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের উচ্চতম নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যপদ অর্জন করেছেন। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সরকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ, রণ-কৌশল, রণনীতি এবং দলের রাজনীতি যদি তিনি পরিচালনা করতে পারেন তবে মাদাম বিন শান্তি আলোচনায় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করতে পারবেন না কেন?

[illegible]

অসাধারণ মহিলা বললেও অত্যুক্তি হবে না বোধ হয়। ফরাসী উপনিবেশ ইন্দোচীনে তাঁর জন্ম। পরাধীনতার দুঃসহ জোঁক-মাতৃকার পায়ে, সাম্রাজ্যবাদী শাসনের দাপটে থি বিন-এর দমও যেন আটকে আসছিল। কিন্তু কী সে করতে পারে, সে তো মাত্র স্কুলের একজন সামান্যা ছাত্রী। কিন্তু ছাত্রী বলে কম কিসে? দেশের নেতা হো চি মিন তো সমস্ত দেশবাসীকে ডাক দিয়েছেন ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়তে, বিদেশীদের ইন্দোচীন-ছাড়া করতে। ইন্দোচীন আর সকলের মা হতে পারে থি বিন-এর হবে না কেন? মায়ের প্রতি আর সকলের দায়িত্ব থাকতে

গুয়েন থি বিন

পারে, তার থাকবে না কোন্ কারণে? তার সামান্য শক্তি কিন্তু মনের অসামান্য সাহস এবং উৎসাহ নিয়ে থি বিন ঝাঁপিয়ে পড়লো সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে। বিন একা নয়, ক্লাসের, পাড়ার, গ্রামের আরো মেয়েকে টানলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামে সৈনিক হবার জন্যে।

ফরাসী শাসকেরা কিন্তু সেদিনই এই অবলা নারীর বল, তাঁর তেজ দেখেছিল। এবং বুঝতে পেরেছিল যে, এ মেয়েকে বাইরে রাখা মানে নিরুপদ্রব শাসনের [illegible] ১৯৪২

সালে [illegible] কারারুদ্ধ করা হলো। কিন্তু তখনও ইন্দোচীনে ফরাসী শাসকদের [illegible] পায়ে [illegible]। কারণ থি বিন বিপ্লবের আগুন তার আগেই চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, যে আগুনের লেলিহান শিখা শেষ পর্যন্ত ১৯৫৪ সালে গ্রাস করেছিলো ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে। থি বিন-এর আক্ষেপের কারণ এখানে যে, সেই চূড়ান্ত লড়াইয়ে ইতিহাসে যা খ্যাত হয়েছে দিয়েন বিয়েন ফু'র যুদ্ধ বলে, ফরাসী ঘাঁটিকে তাক করে সে একটা গোলাও ছোড়ার সুযোগ পায় নি। দেশ স্বাধীন হলে পরেই তার কারামুক্তি ঘটে। একটানা চার বছর তাঁর কারান্তরালে কাটে।

ছাড়া পেয়ে থি বিন মুক্ত দক্ষিণ ভিয়েৎনামে প্রাণভরে মুক্তির নিশ্বাস নিতে পারলেন বটে, কিন্তু তবুও যেন স্বস্তি পেলেন না। ১৯৫৪ সালের জেনেভা সম্মেলনে ইন্দোচীন দ্বিখণ্ডিত হলো, কিন্তু স্বাধীনতার সৈনিকরা যেভাবে তাঁদের দেশকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তা যেন হলো না। আবার শুরু হলো লড়াই, বিদেশী পাপ বিদায় নিয়েছে, লড়াই তাই জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে, যে সরকার নামেই কেবল জাতীয় কিন্তু জাতিকে বা তার ইচ্ছেকে প্রতিনিধিত্ব করে না। জাতীয় মুক্তি ফৌজ গঠিত হলো, গেরিলা বাহিনী তৈরি হলো—ভিয়েৎ কং আর গুয়েন থি বিনকেও দেখা গেলো গেরিলা যোদ্ধার বেশে। গেরিলা বিন কখনো শত্রু শিবিরে গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছেন, কখনো মুক্তি ফৌজকে শক্তিশালী জঙ্গী কায়দায় সংগঠিত করেছেন। দেশের প্রতি দলের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা এবং কর্মক্ষমতা দেখে দলনেতৃত্ব তাঁকে দলের মধ্যে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেও কখনো কার্পণ্য করে নি।

গুয়েন থি বিন প্যারিস গেলেন, কিন্তু এখানে তিনি নবাগতা নন। জাতীয় মুক্তি ফৌজের প্রতিনিধি হয়ে তিনি ১৯৬২ সালে যখন ইয়োরোপ সফরে যান তখন তিনি প্রথম এখানে আসেন। তার পরেও আর একবার সুযোগ হয়েছিল প্যারিসে আসার। এই নিয়ে তাঁর তিনবার প্যারিস সফর হলো, প্যারিস তাই তাঁর জল-ভাত। আর চার বছর জেলে থাকা-কালীন ফরাসী ভাষাটিও বেশ ভালো করে রপ্ত করেছেন তখন। প্যারিস সম্মেলনে [illegible]

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

॥ পাঁচ ॥

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ শেষ হইয়াছে, বৃটিশ পক্ষ জয়লাভ করিয়াছে, ভারতের নরমপন্থী নেতারা ভাবিতেছেন সুদিন আসিয়াছে, বৃটিশ তাহার পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবে, ভারতবর্ষ স্বায়ত্তশাসন পাইবে। যুদ্ধ জয়ের পর ইংলণ্ড পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভুলিয়া গেল, ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে দাসত্ব শৃংখলে আরো সুদৃঢ় বন্ধনের জন্য রাওলাট কমিশন বসাইল,—জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটাইল।

বৃটিশের দমননীতি সফল হইয়াছে, এখন চারিদিক নিস্তব্ধ। এখন আর কোথাও বোমার আওয়াজ শোনা যায় না। শ্বেতাঙ্গ বা পুলিশ কর্মচারী আর নিহত হইতেছে না পলাতক বিপ্লবীরা প্রায় সকলেই ধৃত হইয়া জেলে আবদ্ধ। জেলের বাহিরে যে সকল বিপ্লবী ছিল, তাহাদের কোন কিছু করার ক্ষমতা ছিল না, মনে হইতে লাগিল, দেশের যুবশক্তি যেন নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। এ নিদ্রা বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই। ভারতের শত শত বিপ্লবীর আত্মত্যাগ ও নির্যাতনভোগ ব্যর্থ হয় নাই, তাহাদের আত্মত্যাগ ও নির্যাতনভোগের ফলে দেশের মধ্যে আসিয়াছিল নব-জাগরণ, তাহা ভিন্নরূপে দেখা দিল।

বৃটিশ গভর্নমেন্ট যখন সংবাদ পাইল, তাহাদের বংশ পরম্পরাগত বিশ্বস্ত সৈনিকের দল ভারতের বিপ্লবীদের হস্তগত হইয়াছে, তিন জাহাজ বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র জার্মেনী হইতে আমদানী করিয়াছে, তখন বৃটিশ গভর্নমেন্ট চিন্তিত হইয়া পড়িল। গভর্নমেন্ট ভাবিল, প্রচলিত আইন দ্বারা বিপ্লব দলকে সমূলে বিনষ্ট করা যাইবে না, নূতন আইনের প্রয়োজন হইবে। তাই গভর্নমেন্ট একটি কমিশন বসাইলেন, কমিশনের চেয়ারম্যান রাওলাট সাহেব, [illegible] এই কমিশন রাওলাট কমিশন বা সিডিসন কমিটি এবং এই রিপোর্ট, রাওলাট রিপোর্ট বা সিডিসন কমিটি রিপোর্ট নামে খ্যাত। এই কমিশনের কাজ ছিল, বিপ্লব দলের শক্তি এবং কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তাহার অনুসন্ধান করা এবং এই দলকে সমূলে নষ্ট করার জন্য আইনের দিক দিয়া কি কি পরিবর্তন করা প্রয়োজন তাহার নির্দেশ দেওয়া। এই কমিশন বিভিন্ন সরকারী দলিলপত্র ও সাক্ষী-প্রমাণ দ্বারা যাহা পাইলেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলেন এবং কতকগুলি নূতন আইনের খসড়া প্রণয়ন করিলেন। ইহাই রাওলাট রিপোর্ট বা সিডিসন কমিটি রিপোর্ট। গভর্নমেন্ট এই সরকারী রিপোর্ট (রাওলাট রিপোর্ট) প্রকাশ্যে বিতরণ করিলেন এবং এক টাকা মূল্যে বিক্রি করিতে লাগিলেন, বিশ্বাস ছিল, এই রিপোর্টে বিপ্লবীদের ব্যর্থতা এবং দুর্বলতার কথা প্রকাশ পাইলে বিপ্লব দলের উপর দেশের জনসাধারণের আর কোন সহানুভূতি থাকিবে না। আন্দামানে চীফ কমিশনার এক কপি সিডিসন কমিটি রিপোর্ট সেলুলার জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর নিকট এই নির্দেশ দিয়া পাঠাইয়া দিলেন, বিপ্লবীরা যেন তাহাদের ব্যর্থতার ইতিহাস পড়ে। "উল্টা বুঝিলি রাম।" এই সিডিসন কমিটি রিপোর্ট দেশবাসীর নিকট এতটা জনপ্রিয় হইয়া উঠিল, ইহা বাজারে আর পাওয়া যায় না, এক এক কপি অধিক মূল্যে বিক্রি হইতে লাগিল। গভর্নমেন্ট দেখিল, ইহা দ্বারা বিপ্লব দলের প্রচার কার্য চলিতেছে। গভর্নমেন্ট ঘোষণা দ্বারা ইহা নিষিদ্ধ পুস্তক বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পুলিশ খানাতল্লাসীর সময় সিডিসন কমিটি রিপোর্ট পাইলে লইয়া যাইত।

ইংলণ্ড বুঝিতে পারিয়াছে, শুধু দমননীতি দ্বারা ভারতবর্ষ শাসন করা চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে কিছু সুযোগ-সুবিধাও দিতে হইবে। তাই ভারতবাসীর হাতে কতটা ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায়, সে জন্য একটি কমিশন বসাইল, তাহার নাম "মন্টেগু-চেমসফোর্ড কমিশন," তাহাদের রিপোর্ট "মন্টেগু-চেমসফোর্ড" রিপোর্ট নামে খ্যাত। এদিকে ভারত গভর্নমেন্ট পাঞ্জাবে রাওলাট আইন জারি করিল। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতারা দেখিলেন, ইংলণ্ড তাহার পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা ত করিলেনই না, উপরন্তু এখন এরূপ একটি আইন জারি করিয়াছেন, যাহার ফলে ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা সমূলে বিনষ্ট হইবে, রাজনৈতিক আন্দোলন করা আর চলিবে না। মহাত্মা গান্ধী স্থির করিলেন এই আইন চালু হইতে দিবেন না, বাধা দিবেন। জমি প্রস্তুত ছিল। মহাত্মা গান্ধী নির্দেশ দিলেন, রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে অ-হিংস সত্যাগ্রহ করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে, সর্ব ভারতে, রাওলাট বিলের প্রতিবাদে, আইন অমান্য করিয়া সভা-শোভাযাত্রা হইতে লাগিল। গভর্নমেন্টের দমননীতি চলিতে লাগিল, নিরস্ত্র জনতার উপর পুলিশের লাঠিচার্জ হইতে লাগিল। অ-হিংস সত্যাগ্রহীরা আর অধিক দিন অ-হিংস থাকিতে পারিল না—সাড়া দিল। চারিদিকে গুলী চলিতে লাগিল, উন্মত্ত জনতা সরকারী ভবন পোড়াইয়া দিল, একটা ব্যাঙ্ক লুট করিল গভর্নমেন্ট পাঞ্জাবে মার্শাল ল' জারি করিল। জালিয়ানওয়ালাবাগে এক সভা হইতেছিল, কয়েক সহস্র লোকের সমাবেশ ছিল, জেনারেল ডায়ার সদলবলে উপস্থিত হইয়া নিরস্ত্র জনতার উপর গুলীবর্ষণ করিতে লাগিল, পলায়নের কোন পথ ছিল না, শত শত লোক হতাহত হইল। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে ধরপাকড় চলিতে লাগিল, পাঞ্জাব মার্শাল ল' কেসে বহু লোকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হইল। তাহাদের এক দল আন্দামান সেলুলার জেলে প্রেরিত হইল, তাহাদের মধ্যে ছিলেন অমৃতসরের প্রসিদ্ধ ধনী-ব্যবসায়ী চৌধুরী বোগ্গা মল, মহাশয় রতন চাঁদ। তাঁহাদের ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল, আপীলে দণ্ড হ্রাস হয়।

সেলুলার জেলে মাশাল ল' কেসে দণ্ডিত সত্যাগ্রহীদিগকে ঘানিতে দেওয়া হইল। সত্যাগ্রহীরা বলিল, আমরা কলুর বলদ নই, আমরা ঘানি ঘুরাইব না। তাহারা সত্যাগ্রহ করিল, মাটিতে শুইয়া পড়িল। জেলারের ইঙ্গিতে সত্যাগ্রহীদের উপর মারপিট চলিল, পরে তাহাদিগকে ঘানির সহিত বাঁধিয়া প্রহার করিতে লাগিল এবং ঘানি ঘুরাইতে লাগিল। এই সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। আমার একটা জেলে অপরাধের জন্য তিন মাস ডাণ্ডা-বেড়ি ও সেল সাজা চলিতেছিল। রাজনৈতিক বন্দীরা যার যার ইয়ার্ড ও সেল হইতে চিৎকার হৈ-চৈ করিতে লাগিল, জেল কর্তৃপক্ষ একটা গণ্ডগোলের আশঙ্কায় সত্যাগ্রহীদিগকে ছাড়িয়া দিল। এই অপরাধের জন্য আমারও রিপোর্ট হইল। আমি ভাবিলাম, পর দিন জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর সহিত আমার বচসা হইবে। আমি স্থির করিলাম হিন্দীতে কথা বলিব, কারণ ইংরাজীতে কথা বলিলে আমি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে গালি দিলাম, না তোয়াজ করিলাম, কেহ বুঝিতে পারিবে না। পরদিন প্রাতে ১০টার সময় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সদলবলে আসিলেন, আমি প্রচলিত প্রথা অনুসারে সেলাম দিলাম। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আমার সেলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া (আমি সেলে আবদ্ধ) ধমক দিয়া ইংরাজীতে বলিলেন কাল আমি গণ্ডগোল করিয়াছিলাম কেন? আমি হিন্দীতে বলিলাম, সত্যাগ্রহীদিগকে প্রহার করা হইল কেন? তিনি বলিলেন, জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তুমি না আমি? আমি বলিলাম, জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আপনি, এজন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সত্যাগ্রহীদিগকে কেন প্রহার করা হইল? সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "চুপ রহ্ শুয়ার কা বাচ্চা!" আমি দ্বিগুণ আওয়াজে বলিলাম, "তুম্ চুপ রহ্ কুত্তিকা বাচ্চা"। "তেরি মা . " সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মা-বোন-কন্যা কেহ বাদ গেল না। সকলকেই অশ্লীল পাঞ্জাবী ভাষায় গালি দিলাম। ইহার পর সংবাদ পাইলাম, আমার এই অপরাধের জন্য, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফিসে গিয়া, তিন দিন পেনাল ডায়েট সাজা দিয়াছেন। অর্থাৎ দিনে দুইবার এক পাউণ্ড করিয়া লবণ ছাড়া ভাতের ফেন খাইতে পাইব। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে গালি দেওয়ার সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রন্ধনশালার পাচকেরা স্থির করিয়াছে, আমাকে ভাতের ফেন খাইতে দিবে না, ডবল খানা দিবে। পর দিন প্রাতে ১১টার সময় খাবার লইয়া আসিয়াছে, সঙ্গে একজন কয়েদী কর্মচারী (পেটি অফিসার) আমি বলিলাম, আমাকে ফেন দাও, বাবুর্চি বলিল, আমরা তোমার বাহাদুরীর কথা শুনিয়াছি, আমরা স্থির করিয়াছি, তোমাকে ফেন খাইতে দিব না, তুমি যাহা খাইতে চাও, তাহাই দিব। আমি ইতস্তত করিতেছি, পেটি অফিসার ফেন ড্রেনে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "বাঙ্গালী শের হ্যায়, ডবল খানা দাও।"। এই তিন দিন আমার জন্য চারিদিক হইতে চাটনি, রুটি, নারিকেল, ডাবের জল আসিতে লাগিল, আমার আর ফেন খাওয়া হইল না।

ভারত গভর্নমেণ্ট যখন দেখিলেন, আন্দামান সেলুলার জেলে চারি বৎসর যাবৎ অনবরত গণ্ডগোল চলিতেছে, নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখা যাইতেছে না, তখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং জেলারকে বদলী করিয়া দিলেন। নূতন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও জেলার সুনাম অর্জনের জন্য রাজনৈতিক বন্দীদের সহিত সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন, জেলের মারপিট বন্ধ হইল, খাবার ব্যবস্থা একটু ভাল হইল, সেলুলার জেলে শান্তি-স্থাপিত হইল। জেলখানায় একটি প্রেস ছিল, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাজনৈতিক বন্দীদিগকে ছাপাখানার কাজে দিলেন, প্রেসের ফোরম্যান নিযুক্ত হইলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। (শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) আমরা সকলেই প্রেসের কাজে নিযুক্ত হইলাম। একদিন জেলার সাহেব বারীনবাবুকে বলিলেন, জেলের যুবক কয়েদীদিগকে প্রেসের কাজে দিব, তোমাদের তত্ত্বাবধানে থাকিলে তাহাদের উপর কোন উপদ্রব হইবে না। জেলের বাচ্চা ফাইলে (জুবেনাইল গেং) ৭০টি বিভিন্ন প্রদেশের যুবক কয়েদী ছিল। তাহারা সকলেই ছাপাখানার কাজে নিযুক্ত হইল। প্রাতে ছাপাখানার কাজ, বৈকালে স্কুল। আমি আন্দামানে উর্দু ও গুরুমুখী ভাষা শিখিয়াছিলাম, হিন্দী পূর্বেই জানিতাম, আমি শিক্ষক নিযুক্ত হইলাম। অবশ্যই রাজনৈতিক বন্দীরা সকলেই তাহাদের শিক্ষক ছিলেন। ১৯২৪ সনে মুক্তির পর আমি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নির্দেশে দক্ষিণ কলকাতা জাতীয় বিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষকতার কাজ করিয়াছি, তখন সময় সময় হিন্দীর মাস্টার অনুপস্থিত থাকিলে আমি ছাত্রদিগকে হিন্দী, গুরুমুখী ও উর্দু পড়াইতাম। অবশ্যই এখন সব ভুলিয়া গিয়াছি।

আমার ৫ বৎসর আন্দামান বাসের মধ্যে মোট তিন বৎসরের উপর আমার পায়ে ডাণ্ডা-বেড়ি ছিল। আন্দামানের সেলুলার জেলে আমার ক্রস্ বার ফেটার্স, (ইহা বেতের পরিবর্তে দেওয়া হয়) ডাণ্ডা-বেড়ি, সিকলি-বেড়ি, খাড়া হাতকড়ি, পিছনে হাতকড়ি প্রভৃতি জেলের সকল সাজাই হইয়াছে। আমরা সংবাদ পাইলাম, জেলে কমিশন বাহির হইয়াছে, তাঁহারা আন্দামান আসিবেন। জেল কমিশন যথাসময়ে আন্দামান আসিল, রাজনৈতিক বন্দীদের সহিত দেখা হইল, তাঁহারা বলিলেন, পূর্বে কি হইয়াছে—আমরা তাহা জানিতে চাই না, আমরা জানিতে চাই জেল রিফর্ম কিভাবে হইতে পারে। তোমরা ৭ ইয়ার্ড হইতে জেল রিফর্ম কিভাবে হইতে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের নিকট ৭খানা দরখাস্ত দাও, সব লেখা যেন একরূপ না হয়, তোমাদের অভিজ্ঞতা হইতে বিভিন্ন দিক দিয়া আলোচনা করিয়া লিখিবে। দরখাস্ত ৭ খানা দেওয়া হইল। ব্যারিস্টার বিনায়েক দামোদর সাভারকার এক ইয়ার্ড হইতে, প্রফেসার ভাই পরমানন্দ এক ইয়ার্ড হইতে, ভাই জোয়ালা সিং এক ইয়ার্ড হইতে, আশুতোষ লাহিড়ী এক ইয়ার্ড হইতে, পণ্ডিত জগৎ রাম এক ইয়ার্ড হইতে, এরূপভাবে ৭ খানা দরখাস্ত গেল। সেই দরখাস্তের মধ্যে ছিল, পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে পেনাল সেটেলমেণ্ট নাই। পেনাল সেটেলমেণ্ট উঠাইয়া দিয়া শিল্প এবং ব্যবসাকেন্দ্র খুলিলে গভর্নমেণ্টের অনেক লাভ হইবে। জেল কমিশন আমাদের দরখাস্ত পাওয়ার পর নির্দেশ দিলেন, এখন হইতে পৈতা ক্রস প্রভৃতি ধর্মের অঙ্গ রাখিতে পারিবে, ভারতীয় জেলের ন্যায় প্রতি তিন মাসে একখানা চিঠি লিখিতে ও পাইতে পারিবে। ইহার কয়েক মাস পর পেনাল সেটেলমেণ্ট উঠিয়া গেল এবং আমরা বাঙ্গালীরা প্রথম দল আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত হইলাম। আলিপুর জেলে যাওয়ার কিছু দিনের মধ্যেই তখনকার হোম মেম্বার স্যার হিউ স্টিফেন্সন, যিনি পরে গভর্নর হইয়াছিলেন, আলিপুর জেলে গিয়া আমাদের সহিত দেখা করেন। তিনি আমাকে বলিলেন, আমার বিরুদ্ধে তিনি অনেক অভিযোগ শুনিয়াছেন, তিনি আশা করেন এখানে ভালভাবে চলিব। উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, We fought against injustice and tyranny of the Jail authorities there. আলিপুর জেলে জেলার বড় ব্রাউন সাহেবের সদয় ব্যবহারে আমরা কিছুদিনের মধ্যেই আদর্শ কয়েদী বলিয়া গণ্য হইলাম।

[ক্রমশঃ]

ভাবেই ঘটনাকে দুঃখজনক এই আখ্যা দিয়ে সাস… করলেন প্রহরারত সিপাহীকে। পুলিশী কর্তব্য পালন হয়ে গেল। … শাসন কর্তৃপক্ষও নিশ্চিন্ত হলেন। পর পর এগুলি অপরাধের অনুষ্ঠান এবং পুলিশের হাতের মুঠো থেকে আসামীর এভাবে লম্বা দেওয়ায় নির্লিপ্ত শাসকদের যে সামান্য বিচলিত করেছিল বেচারা সিপাহীর সাসপেনশনকে তাঁরা চূড়ান্ত সমাধান মেনে নিয়ে আবার নিজেদের সেই চিরাচরিত অমানুষিক নির্লিপ্ততায় ডুব দিলেন।

লালবাজার থেকে সদর স্ট্রীট ডাকাতির অপরাধে ধৃত আসামী সম্বন্ধে সম্প্রতি শহরে যে গুজব চলছে আমি আপাতত সেই গুজবের সম্পর্কে কোন কথা না বলেও জিজ্ঞাসা করতে চাই—অমন মারাত্মক এক আসামীকে একটি সিপাহীর জিম্মায় এক জনের শৌচাগারে পাঠিয়ে যারা নিশ্চিন্ত ছিলেন তাঁরা কি পুলিশ হেড-কোয়ার্টারে ধৃত আসামীদের সংক্রান্ত নিয়ম ভংগ করেন নি? এবং এই নিয়ম-ভংগের ও শিথিলতার জন্য আসামীর অন্তর্ধানে জনজীবন যেভাবে বিপদাপন্ন হয়েছে সেটা কি শুধু 'দুঃখজনক' না মারাত্মক অপরাধমূলকও? দোষী কি শুধু বেচারা সিপাহী না উচ্চ নিচ সমস্ত ভারপ্রাপ্ত পুলিশকর্তারাও? সর্বশেষে এই অপরাধীদের বিচার ও শাস্তির আয়োজন কোথায়?

ইংরেজ আমল থেকে আজ পর্যন্ত লালবাজারের এই পুলিশ হেডকোয়ার্টারের
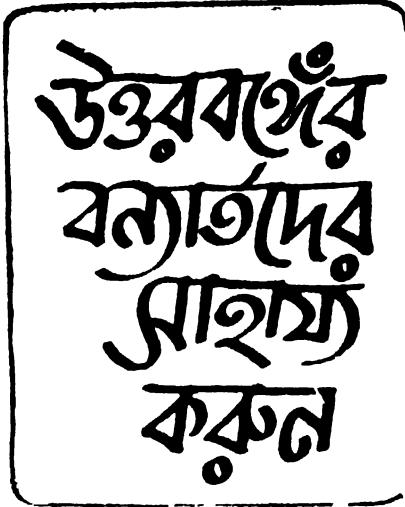
থার্ড ডিগ্রির ঘরে অসংখ্য রাজনৈতিক মামলায় অভিযুক্তের প্রতি পুলিশ তদন্তের নামে যে নির্মম অত্যাচার করেছে তা কারো অজ্ঞাত নয়। পুলিশের মারে মৃত-প্রায় রাজবন্দী তৃষ্ণায় জল চেয়েও অশ্রাব্য গালিগালাজ ও মার ছাড়া আর কিছু পায় নি। টেগার্টের ইস্কুলে শিক্ষিত পুলিশ কোনদিন কোন রাজনৈতিক বন্দীর প্রতি কোনরকম শিথিলতা দূরে থাক, সামান্য মানবিকতার পরিচয়ও দিয়েছে কিনা তা ইতিহাসের অনুসন্ধান সাপেক্ষ। অথচ মারাত্মক ডাকাতির মামলায় অভিযুক্ত অপরাধীর প্রতি এই শৈথিল্য ও সহৃদয়তা স্বাভাবতই যদি পুলিশের উদ্দেশ্য ও দায়িত্বজ্ঞান সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহ জাগায়, গুজব সৃষ্টি করে, তাহলে সেই গুজবেরও তদন্ত হওয়া আবশ্যক।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যাচ্ছে আমরা এমন এক রাষ্ট্রে বাস করছি যেখানে অপরাধ ও অপরাধীরা যত বেশি নিরাপদ, ঠিক সেই পরিমাণেই বিপদাপন্ন নাগরিক জীবন।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হলডেন তাঁর নিজের দেশে পুলিশী অনাচার ও অপরাধনিধির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার আশায় পালিয়ে এসেছিলেন কলকাতায়। এর পর হলডেন পৃথিবী ছেড়েই পালিয়ে-ছেন। কিন্তু খোদ কলকাতার অধিবাসী আমরা পালাব কোথায়? মহাজ্ঞানী হলডেনের পথই হয়তো শেষ পর্যন্ত আমাদের অনুসরণ করতে হবে, যদি বাংলা দেশের এমন হাল আর কিছুদিন চলে।
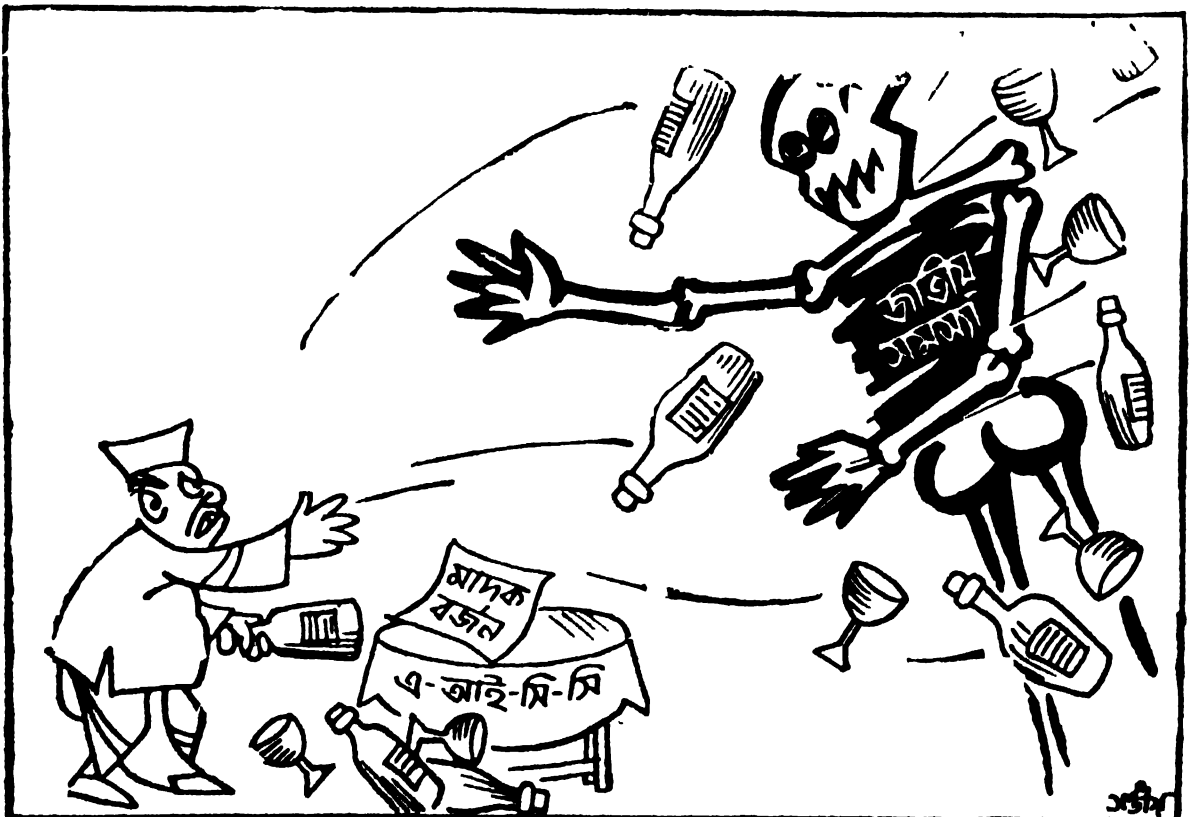
মাদক বর্জন

এ-আই-সি-সি

জাতীয় সমস্যা

পঃবঙ্গে আইন শৃঙ্খলার অবনতিতে উদ্বেগ। রাজ্যপালের আমলে সমাজ-বিরোধীদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। কসবায় বোমা নিয়ে দুর্বৃত্তদলের আক্রমণ। বেলঘরিয়ার খুনের কিনারা হয়নি। পানিহাটিতে উধাও দুর্বৃত্তেরা ধরা পড়েনি। বসিরহাটের গ্রামে দুঃসাহসিক ডাকাতি। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটছে। নদীয়ার গ্রামে নৃশংস খুন।

"কয়েক মাস ধরে যাদবপুর সারকেলের এলাকাধীন কসবা তিলজলা ও বিজয়গড় অঞ্চলে বোমাবাজি, ছুরিকাঘাত, খুন ও সংঘর্ষের ঘটনা বেড়েই চলেছে।

জনমনে এই ধারনা ক্রমেই দানা বাঁধিতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে নানা শ্রেনীর দুর্বৃত্তের স্পর্ধা ও দৌরাত্ম্য যে দিনের পর দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে তাহার মূলে পুলিশের শুধু ঔদাসীন্য, প্রশ্রয়, অকর্মন্যতা ও দায়িত্বহীনতা নয়, দুর্বৃত্তদের সঙ্গে তাঁহাদের এক শ্রেনীর অবাঞ্ছিত ও গোপন সহযোগিতাও।

বঙ্গদর্শন

[illegible] বন্যার জল শুধু জলপাইগুড়ি শহরকেই ধ্বংস করে নি, সেই আঘাতে অনেক কিছুরই ভিত্তি টলে গেছে। বিশেষ করে আমাদের নড়বড়ে আমলাতন্ত্রের ওপর যদিও বা কারুর মনে কোন আস্থার ভিত্তি ছিল জলপাইগুড়ির বন্যার আঘাতে সে ভিত্তিমূল উপড়ে গেছে। উত্তরবঙ্গের বন্যাবিষয়ে তদন্তকারী শ্রী এস এন রায় রিপোর্ট পেশ করেছেন তাতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, বন্যা পরিস্থিতিতে সরকারী অফিসারেরা শোচনীয় দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীরায়ের রিপোর্ট অনুযায়ী তৃতীয় শ্রেণীর কোন কোন কর্মচারীও বিপদের মধ্যে যে দায়িত্বজ্ঞান ও কর্তব্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন, প্রথম শ্রেণীর অফিসারদের কাছ থেকে তার শতাংশের একাংশও পাওয়া যায় নি। তাও এটা নিছক শাসন বিভাগীয় তদন্ত, বিচারবিভাগীয় নয়। তা হলে আরও অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্ঘাটিত হত।

সংবাদে প্রকাশ যে শীরায়ের তদন্তের ভিত্তিতে সরকারী তরফ থেকে কিছু কিছু প্রশাসনিক রদবদল করা হবে বোধ হয় কোন কোন অফিসারের নিকট কৈফিয়ৎ তলবীর নোটিশ গেছে। বিষয়টিকে অফিসারগণ সরলভাবে নিচ্ছেন না তাঁদের বক্তব্য এতে নাকি আমলাতন্ত্রের মনোবল ভেঙে যাবে। আমলাতন্ত্রের মনোবল অটুট থেকে যে দেশের কি উপকার হয়েছে, বা তা ভেঙে গেলেই বা দেশের কি অপকার হবে তা আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। কর্তব্যের অবহেলার জন্য কঠোর শাস্তি হওয়া প্রয়োজন, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশে ওটি হবার উপায় নেই। কেন না অপদার্থ হলেও দাদাদের কৃপায় এদেশে পদ ও অর্থ দুই ই ভোগ করা যায় অচল টাকাও দাদাদের আশীর্বাদে সচল হয়ে মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়। এ রকম একটি দাদাস্থানীয় ব্যক্তি সম্প্রতি মুখ খুলেছেন। তিনি বলছেন 'আহা বেচারীদের দোষ কি? ওরাও তো বউ-ছেলে নিয়ে ঘর করে! বন্যায় তো ওদেরও ক্ষতি হয়েছে।'

বস্তুত কর্তব্যে অবহেলার কোন শাস্তি এদেশে নেই বলেই সত্যিকারের কোন কাজ এখানে হওয়া সম্ভবপর নয়। গত বিশ বছর ধরে যে যা খুশি করার স্বেচ্ছাচারের অধিকারী হয়েছে। যার যেটুক ক্ষমতা আছে তার চূড়ান্ত অপব্যবহার করার অবাধ সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এ সুযোগ দেওয়া হয়েছে বিনা স্বার্থে নয় পিছনে রাজনীতি আছে। রাজনৈতিক স্বার্থে সরকারী প্রশাসনের আনুগত্য আদায় করতে গেলেই প্রশাসনে অবস্থিত ব্যক্তিদের কিছুটা অন্যায় সুযোগ-সুবিধা দিতে হয়। এবং তারা তাদের ওপর প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করলে শাস্তির কথা ভোলাই যায় না। গত বিশ বছর ধরে এমনিই হয়ে এসেছে। সাময়িকভাবে জনমতের চাপে কারো পদাবনতি বা বদলির আদেশের পরেও লক্ষ্য করা গেছে যে, দু-চারমাস পরে তাকে অধিকতর লাভজনক পদে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যুক্তফ্রন্টের শাসনের আমলে আমরা এই প্রশ্নই তুলেছিলাম। জবাবে যুক্তফ্রন্ট সরকারের কোন কোন মন্ত্রী জানিয়েছিলেন যে সমগ্র কাঠামোটাই একটা এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে কি প্রশাসনিক স্তরে কি বাইরে কোথাও কোন উপলক্ষের বিনাশ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার উপায় নেই। সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও যখন তাঁরা একথা বলেছিলেন তখন বুঝতে হবে অবস্থাটা কোথায় দাঁড়িয়েছে।

আমরা বন্যা দিয়েই শুরু করেছিলাম আবার বন্যা প্রসঙ্গেই ফিরে আসা যাক। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ বন্যাকবলিত জলপাইগুড়ির দুর্গত মানুষগুলির জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন ও এখনো করছেন। কিন্তু এই সাহায্য ঠিক মত তাঁদের হাতে গিয়ে পৌঁছচ্ছে না, বা পৌঁছে দেবার পথে নানা অসুবিধা ঘটছে। কোন কোন মহলে থেকে স্পষ্টই অভিযোগ করা হয়েছে যে, বেসরকারী সাহায্য পৌঁছবার পথে সরকারই বাধা সৃষ্টি করছেন। বোধ হয় সরকারী কর্তৃপক্ষ মনে করছেন যে ত্রাণকার্যে বেসরকারী প্রচেষ্টাকে প্রশ্রয় দিলে তাঁদের গৌরব লাঘব হবে। তা ছাড়া ত্রাণকার্যের ব্যাপারে কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের মুখ চেয়ে কাজ করা হচ্ছে এমন অভিযোগও উঠেছে। বস্তুতই যে

দশ বছরের মেয়ে মৃদত্তা সরকার বাড়ি বাড়ি ঘুরে উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের জন্য সাহায্য সংগ্রহ করে সাপ্তাহিক বসুমতীর উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ তহবিলে জমা দিয়েছে।

পূর্ণ ... ...গ্রেস সক্ষম হচ্ছে না। লোক...র এবং অন্যান্য না কংগ্রেস না-... ...টা ... এই অবস্থার সুযোগে হয়ত চেষ্টা ... ... পাবে কিন্তু তারাও পাড়ি দিচ্ছে ... অভিমুখে, বিশেষ ... ... অঞ্চলে জোতদার মহাজনের সংখ্যা ... ... কিছু প্রভাব আছে সেই ... ... প্রার্থী দিয়েছে।

উত্তরবঙ্গে সাপ্তাহিক বসুমতী বন্যাত্রাণ কমিটির সেবাকার্য

সা... ...মতী উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির পক্ষ থেকে উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের মধ্যে বিতরণের জন্য ইতিমধ্যে তিন দফায় ২৫০২.০০ (দুই হাজার পাঁচ শত দুই) টাকা ... পার্টীযুক্ত চাল গম, ঔষধপত্র বেবিফুড, আশু ব্যবহারযোগ্য জামা কাপড় এবং কম্বল ও অন্যান্য শীতবস্ত্র জলপাইগুড়িতে পাঠানো হয়েছে। এ ছাড়া অবিলম্বে বিতরণের জন্য কিছু নতুন বাসনপত্র পুরনো শীত ও সাধারণ বস্ত্র, ঔষধ, হরলিক্‌স বেবিফুড ও ১০১.০০ (এক শত এক) টাকা ...কলিকাতা প্রবাসী উত্তরবঙ্গ ত্রাণ কমিটির হাতে দেওয়া হয়েছে।

সাপ্তাহিক বসুমতী উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির পক্ষ থেকে কমিটির অন্যতম সহ সম্পাদক অধ্যাপক নির্মল বসু সম্প্রতি জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কোচবিহার জেলায় যান। কমিটির অন্যতম দুইজন বিশিষ্ট সদস্য শিলিগুড়ি ... কলেজের অধ্যাপক শ্রীহারান ঘোষ ও জলপাইগুড়ির 'জনমত' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমৃণালেশ সান্যালের সঙ্গে আলোচনা করে তিনি কমিটির ত্রাণকার্য সংগঠনের ব্যবস্থা করেন।

স্থির হয়, বর্তমানে জলপাইগুড়ি জেলায় জলপাইগুড়ি ময়নাগুড়ি ও মাণিকগঞ্জ (দক্ষিণ বেরুবাড়ি) এবং কোচবিহার জেলায় হলদিবাড়ি ও পরে মেখলিগঞ্জে সাপ্তাহিক বসুমতী বন্যাত্রাণ কমিটির পক্ষ থেকে এই পাঁচটি কেন্দ্র খোলা হবে। এ ছাড়া জলপাইগুড়িতে

স্টুডেন্টস এন্ড ... [illegible]

ছাত্রছাত্রীদের ... [illegible]

[illegible]

মহাশ্মশানে রিলিফের কাজ চলছে। এ কাজ করা অত সহজ নয়, বিশেষ করে সরকারের যে সব আমলাদের কাজের নমুনা আমরা দেখেছি তাঁদের দ্বারা তো নয়ই। তাঁদের অকর্মণ্যতা ও অপদার্থতা আজ আর আমাদের মতো সাধারণ মানুষের অভিযোগ নয়, সরকারী পর্যায়ে তড়িঘড়ি যে তদন্ত হয়েছে তাতেও প্রমাণ হয়ে গেছে। বেসরকারী বা বিচার-বিভাগীয় যদি কোন কমিশন বসে আমার বিশ্বাস শতকরা ৬০ জন আমলার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হবে। সরকারী বিচারে যাঁরা দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন তাঁদের কি শাস্তি হবে জানি না। তবে দেশের ও জনগণের স্বার্থে এঁদের আর এক মুহূর্ত প্রশাসনিক দপ্তরে রাখা উচিত নয়। শুধু ঐ কজনকেই শাস্তি দিলে হবে না, গত এক বছরের মধ্যে বিভিন্ন দপ্তরের কাজে চূড়ান্ত গাফিলতির পরিচয় দিয়ে যাঁরা বাংলাদেশকে নানাদিক থেকে ডুবিয়েছেন, যাঁরা লক্ষ লক্ষ মানুষকে চরম দুর্দশায় মধ্যে ফেলে দিয়েছেন, সেই সব বাস্তুঘুঘুদের টেনে বার করে নিয়ে আসতে হবে, দাঁড় করাতে হবে জনগণের আদালতে; তারপর দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হলে পাঠাতে হবে সরাসরি জেলখানায়। রাজ্যপাল যদি একটু চোখ মেলে চান দেখতে পাবেন, এই সব ঘুঘুর দল প্রশাসনিক দপ্তরের উপরমহলেই রয়েছেন, বেশি খোঁজাখুঁজির দরকার হবে না। শুধু সেচ কেন, পুলিশ, পূর্ত, শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য যেখানেই চোখ ফেলবেন সেখানেই দেখবেন এক-একটি চক্র, এক-একটি ঘাঁটি; জনগণের কল্যাণ বা সেবা [illegible] [illegible] এঁদের নেই—শুধু [illegible] [illegible] [illegible] করে দিন- [illegible]

লাটসাহেবী করাই এঁদের ব্রত। ডাঃ রায়ের আমলে এঁরা অত মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেন নি; কিন্তু তারপর থেকেই মন্ত্রী-দের ভালমানুষী ও অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে এঁরা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁচেছেন যে, মনে হবে প্রশাসনিক দপ্তরে গড়ে উঠেছে শত শত জমিদারের দল। এই সব সরকারী জমিদার আর তাঁদের আমলা গোমস্তাদের পাল্লায় পড়ে গ্রাম-বাংলা কিভাবে ডুবতে বসেছে তার কত কাহিনী আপনাদের নিবেদন করেছি। চক্ষুলজ্জার যদি এতটুকু বালাই থাকতো, তবে তাঁরা নিজেরাই হয়তো দপ্তর ছেড়ে চলে যেতেন। তা তো হলই না, রাজ্য-পালও তাঁদের কোন শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা, কোন কৈফিয়ৎ পর্যন্ত তলব করেছেন বলে আমরা শুনি নি। বরং দেখছি যাঁরা লক্ষ লক্ষ মানুষের সর্বনাশ করেছেন তাঁদেরই নিয়ে তিনি উত্তরবঙ্গে রিলিফের কাজে নেমে-ছেন। স্বভাবত সেখানকার জনগণ বিক্ষুব্ধ; কারণ এঁদের আর চোখের সামনে তাঁরা দেখতে চান না। তাঁরা চান বাহবা নেবার জন্যে নয়, দরদ দিয়ে কাজ করবে এমন সব লোক আসুক। আমি আগেই বলেছি, আবার বলছি মহাপ্রলয়ের পর সমগ্র উত্তরবঙ্গের যা চেহারা হয়েছে তার ওপর নয়া উত্তরবঙ্গ যদি গড়ে তুলতে হয় তাহলে সমস্ত দায়িত্ব সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের ওপর দেওয়া হোক। যতই দোষ-ত্রুটি থাক, গত তিন সপ্তাহের মধ্যে অনেক অসাধ্য কাজও এরা সম্ভব করে তুলেছে। রাস্তাঘাট পরিষ্কার করছে, পর্বতপ্রমাণ পলি সরিয়ে ফেলেছে, মরা জন্তু, মানুষ মাটিতে পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলেছে, বড় বড় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ফেলেছে। প্রথমটা হয়তো কিছু অসুবিধা ছিল, কিন্তু এখন [illegible] হয়ে [illegible] সমস্যাকে হাতের মধ্যে এনেছে। কাজেই এদের ওপর সামরিকভাবে উত্তরবঙ্গ পুনর্গঠনের কাজ ছেড়ে দিলে আমার মনে হয় সরকারী প্রশাসনিক দপ্তরের চেয়ে কাজ ভাল হবে; আর তা ছাড়া কড়া সামরিক আইন থাকায় টাকা-পয়সা নয়ছয় হবারও আশঙ্কা কম।

ত্রাণকার্যে সরকারী কর্মকর্তাদের শৈথিল্যের খবর সব জেলা থেকেই আসছে। দার্জিলিং-এর মানুষ আমলাদের ওপর আস্থাবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। তিনটি সপ্তাহ পার হয়ে গেল, জেলার সব অঞ্চলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কত আমলারা তা এখনও নির্ণয়ই করতে পারলেন না, রিলিফই বা কি করে হবে, পুনর্বাসনেরই বা কি ব্যবস্থা হবে? অথচ সমগ্র দার্জিলিং জেলায় এখন বেশ শীত। ধস-এ যাদের বাড়িঘরদোর গিয়েছে তাদের একটি বাড়িও যে সরকার করে দেবার ব্যবস্থা করেছেন এমন খবর এখনও পর্যন্ত নেই। মাত্র তিনজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠানো হল কিছু কম্বল ও শাড়ি দিয়ে দার্জিলিং, কার্শিয়াং ও কালিম্পং মহকুমার দুর্গত অঞ্চলে বিলি করার জন্য: দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চল দিয়ে হেঁটে যেতেই তাঁরা ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়লেন—সব গ্রামে আর রিলিফ গিয়ে পৌঁছুলো না। এত বড় বিরাট এলাকার রিলিফ বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হল ৩ জনের ওপর। এই হল সরকারী প্রশাসনিক দপ্তরের ত্রাণ কাজের নমুনা। অথচ অনেক বেসরকারী সেবা প্রতিষ্ঠান রিলিফের কাজ করার জন্য এগিয়ে এসে-ছিলেন, তাঁদের সাহায্য নেওয়া হল না। কেন নেওয়া হল না তা জানি না। তবে শুনেছি অনেক সংস্থা রিলিফকে নির্বাচনী প্রচারের কাজে লাগিয়েছিলেন—সেটা নাকি সরকারের মনঃপূত হয় নি। নির্বাচন প্রচারের মাধ্যমেই হোক বা অন্য কোন উপায়েই হোক, রিলিফ যদি দুর্গত মানুষের হাতে গিয়ে পৌঁছয়, তাতে কারুর আপত্তি হওয়া উচিত নয়। রাজনীতির ঊর্ধ্বে সকলেই চাইবেন মানুষ আগে বাঁচুক।

ধস সরিয়ে দার্জিলিং-এর দুর্গম অঞ্চলে সামরিক বাহিনীর জোয়ানরা ঢুকেছে। বিভিন্নসূত্রে যা খবর পাওয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

রাখবার বাসনপত্র, খাদ্যদ্রব্য সরকারের কাছ থেকে কিছুই পায় নি। এদের [illegible] তৈরি করার জন্য প্রাথমিক কাজ কোথাও এখন সবে শুরু হয়েছে। ধুবড়ি ও পুরোনো বাজারে বেসরকারী প্রচেষ্টায় কয়েকটি নতুন করে বানানো হচ্ছে। জেলার প্রায় সাত হাজার একর জমির ফসল, কমলা লেবু, বড় এলাচের চাষ সবই প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। আশ্চর্য একটা লক্ষ্য করবার জিনিস, যারা সর্বস্বান্ত হয়েছে তারা কিন্তু মনোবল কেউ হারায় নি; তারা রিলিফ চাইছে না—চাইছে নিজের পায়ে আবার দাঁড়াতে। যা গেছে গেছে, আবার নতুন করে তাদের গাঁকে তারা গড়ে তুলতে চায়; এ ব্যাপারে তারা নিজেরা কর্মক্ষম—অভাব শুধু সরঞ্জাম আর অর্থের।

শুধু দার্জিলিঙ কেন, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম দিনাজপুর, কুচবিহার, মালদার যে সব অঞ্চলে বিচ্ছিন্নতা ঘুচে নতুন করে যোগসূত্র যখন স্থাপিত হয়েছে, তখন সেই সুযোগকে পুরোপুরি সার্থক করে তোলাই প্রথম কাজ হওয়া উচিত। যে সব দুর্গত এলাকায় এতদিন যেতে পারা যায় নি, সেই সব অঞ্চলে প্রত্যেকটি মানুষের কাছে তাড়াতাড়ি জামা-কাপড়, খাবার, কম্বল, পথ্য ও টাকা-পয়সা পৌঁছে দিতেই হবে। রাজ্যপাল যখন উত্তরবঙ্গে রয়েছেন তিনি নিজেই এ ব্যাপারে দায়িত্ব নিন—প্রত্যেকটি দুর্গত মানুষ রিলিফ পেয়েছে বা পাচ্ছে কি না তিনি বেসরকারীসূত্রে খবর নিয়ে নিশ্চিন্ত হন।

রাজ্যপাল নিশ্চয়ই খবর পেয়েছেন বহু জায়গায় মহামারী দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে ইসলামপুরে এ পর্যন্ত অনেকেক মানুষ আন্ত্রিক কলেরায় মারা গেছে। প্রতিরোধ অভিযান তেমন হচ্ছে না। বন্যা-প্লাবিত অঞ্চলগুলিতে জলজ রোগ প্রতিষেধক টিকা দেওয়ার জন্যে আরও আয়োজন এখুনি চাই।

গৃহহারা যে সব পরিবার হাটের চালা, [illegible] [illegible] উঁচু [illegible] তাঁবু খাটিয়ে [illegible] [illegible] দেখা দিয়েছে [illegible] [illegible] [illegible]

কোথাও বন্যার্তরা পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে চাইছে না। সকলেই তো একেবারে সর্বস্বান্ত; এমন পয়সা নেই যে কেউ একটা চালাঘর বানিয়ে নেয়। সরকারী বা বেসরকারীভাবে এদের যদি কাঠকুটো, দড়ি-পেরেক আর করগেটের সিট, নিদেন খড়ও যদি জোগাড় করে এনে দেওয়া হয় এরা নিজেরাই ঘর বানিয়ে নেবে। অনেক গাছ আশেপাশে পড়ে আছে—সেগুলো কাটতে দা বা কুড়ুল দরকার—সে সব তো কিছুই এদের নেই—সবই বন্যার গহ্বরে গেছে।

সরকারের যা কিছু উদ্যোগ আয়োজন সবই প্রায় শহরের দিকে, গাঁয়ের দিকে বড় একটা কেউ যেতে চাইছে না; শহরে রিলিফের কাজ যা চলছে চলুক, তাতে কারুর কোন আপত্তি নেই, কিন্তু গাঁয়ের দিকে সমান দৃষ্টি যদি এখন থেকে না দেওয়া যায় তাহলে আবার এক সর্বনাশ আমরা ডেকে আনবো। এটা ভুললে চলবে না যে, উত্তরবঙ্গের এই মহাপ্রলয়ে ১৩০৫টি গ্রাম একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, আর পথের ভিখারী হয়েছে প্রায় ১২ লক্ষ গাঁয়ের মানুষ। এদের সম্বল একমাত্র চাষ; সেই চাষের জন্য নিযুক্ত এক লক্ষ গরু মোষ মারা গেছে। আর ধান নষ্ট হয়েছে ৮ কোটি টাকার মতো। এই সাংঘাতিক আঘাত গাঁয়ের মানুষ যে এখনও সহ্য করে বেঁচে আছে এইটেই আশ্চর্য। যাতে তারা আবার চাষবাস শুরু করতে পারে শুধু ঋণ দিলেই হবে না—গবাদি পশু জোগাড় করে এনে দিতে হবে, দিতে হবে চাষের আর সব সরঞ্জাম, বীজ সার ইত্যাদি। কাজেই শহরাঞ্চলের মানুষের সমস্যার সাথে গাঁয়ের মানুষের সমস্যা এক করে দেখলে চলবে না—প্রয়োজনের গ্রামীণ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমস্যার মোকাবিলা করতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

—সমর চট্টোপাধ্যায়

অখণ্ড ভারত

জনসঙ্ঘ তার অন্তর্বর্তী নির্বাচনী ইস্তাহারে অখণ্ড ভারত ও দুই বাঙলার একীকরণের প্রতিশ্রুতি রেখেছেন। জনসঙ্ঘ বলেন, দেশবিভাগই পশ্চিমবঙ্গের সব সমস্যার মূল।

জনসঙ্ঘের এবম্বিধ বক্তব্যের সারবত্তায় কোথাও সন্দেহের অবকাশ নেই। পশ্চিম বাঙলার ওপর বঙ্গভঙ্গকে চাপিয়ে দিয়ে বাঙলার মানুষকে ঘরছাড়া ভিখারীতে পরিণত করার মধ্যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট, দূরদৃষ্টিও ছিল প্রচুর। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাঙালীর অগ্রগতি ছিল অনেকেরই চক্ষুশূল। স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়ে সেই বাঙলার পক্ষচ্ছেদে চোখের বালি বাঙলার ওপর অতি সহজে প্রতিশোধ গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতেই বাঙালী আজ হটে যাচ্ছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তো কথাই নেই। এর জন্য অবশ্য তথাকথিত উদারচেতা বাঙালী ভাবপ্রবণতাও কম দায়ী নয়। সে কালিদাসের জাত। নিজের ডাল নিজে কাটার মতো কবিত্ব তাকেই সাজে। ভারতে সুতরাং তার মহৎ পতন খুবই স্বাভাবিক।

'সনস অব দি সয়েল' বলে যে কথাটা প্রচলিত আছে, একমাত্র বাঙলার মাটিতেই তার কোন জায়গা নেই, বাঙলা অভিধানে তার কোন পরিভাষা নেই। অন্যত্র সবখানেই জন্মস্থানের নামে বুক ফুলিয়ে দাবি করা যায়। শুধু বাঙালীর জন্মভূমিই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রসারিত। সে 'বসুধৈব কুটুম্বকম' বাণীতে বিশ্বাসী, যদিও বাঙলার বাইরে তার পা পাতার স্থান নেই।

বাঙলা, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ, দুনিয়ার মানুষের রুজি-রোজগার এবং মুনাফা উত্তোলনের জায়গা। বাঙালী শোষণের নির্বিবাদী শিকার। এমন একটি আত্মবিস্মৃত জাতি তাই যুগ যুগে বহিরাগতদের দ্বারা উত্যক্ত হয়েছে, এবং বাঙলার কর্তাব্যক্তি মানুষেরা নিজেদের গদী টিকিয়ে রাখার জন্য বহু চেষ্টাই সেই বহিরাগতদের সুজলা সুফলা [illegible] নিজে দিয়ে বাঙলার [illegible]

বদলায়ও নি। বর্তমানে কলকাতা মহানগরীর দিকে তাকালেই বোঝা যাবে, এক পক্ষ বাঙলার সমস্ত রসধারা কর্ষণ করে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেখানে কত বিচিত্র নীলকর সাহেবেরই উদ্ভব হয়েছে। কলকাতার গগনচুম্বী অট্টালিকা এবং অফিস বাড়িগুলিই তার সাক্ষ্য। বাঙালী ক্লাশ থ্রি স্টাফে বগ্রেশের 'ক' বনছে দিনকে দিন। তবু তার আত্মবিস্মরণের মোহ আদর্শবাদের পেলব হস্তের পিঠ থাবড়ানিতে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাসুখ অনুভব কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত বোধ করে নি।

সমগ্র ভারতবর্ষে স্বাধীনতা-উত্তর কালে গুছিয়ে নেওয়ার জন্য সাড়া পড়ে গেছে যখন, নিরুপায় বাঙালী তখন পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তুহারা ভাইবোনের মধ্যে তার অর্ধমুষ্টি অন্ন ভাগ করে দিতে ব্যস্ত। আর সেই অতি দুর্বল মুহূর্তে ক্ষীণবল বাঙালী নামক জাতিকে খোদ বাঙলার রাজধানীতেই কোণঠাসা হয়ে পড়তে হয়েছে। বিদেশী সাহেবের স্থানাধিকারী স্বদেশী অ-বঙ্গভাষাভাষী সাহেবের প্রীতি উৎপাদনে বাঙালী আজ সতত ঘর্মাক্ত। ভারতের স্বাধীনতা (বাঙালীর সদানাভাব জন্য) বাঙলার সংগ্রামী ঐতিহ্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বাঙলাকে গ্রাস করেছে।

অবাস্তব কল্পনাবিলাসে মুগ্ধ বাঙলার লেখক আজ গোটা বাঙলাদেশকে শুঁড়িখানার মাতাল হতে দেখছেন। বাঙালীর তাবৎ সংস্কারকে নির্বিচারে হাস্যগেলাসের পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত করে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দান করছেন এবং বেয়াকুফ আহম্মদ লাভ করে ধন্য হচ্ছেন। (কী অবাস্তব কল্পনার ক্যাডবারি, ভাবুন একবার) বাঙলার শিল্পী ক্ষমাবৎটুকু বজায় রেখে পদবীহীন হয়ে বহির্বঙ্গে অর্থোপার্জনে ছুটেছেন, তবে বহির্বাঙলার সে টাকা খুব কমই ঘরে আসছে। বাঙলার রাজনীতিজ্ঞরা বেশির ভাগই বহির্বাঙলার হাই কমাণ্ডের নির্দেশের অপেক্ষায় সৈনিকের মতো জীবনপণ তাকিয়ে আছেন। বাঙলার ব্যবসায়ে বহির্বঙ্গীয় মহাজনের খেরো খাতায় বন্দী। বাঙলার দুঃখিনী [illegible]

এমন এক সময় জনসঙ্ঘের বঙ্গসমস্যা সমাধানের সদিচ্ছায় কে না আকৃষ্ট হবেন যদি তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে রূপসী বাঙলার দীন দশায় ব্যথিত বোধ করে থাকেন। সুতরাং জনসঙ্ঘ খুব সময়কাল বুঝে তাল ঠুকেছেন। ও'রা অন্তর্বর্তী নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে একষট্টি আসনে প্রার্থী দেবেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল, জনসঙ্ঘের এই উচ্চাশা কী আদৌ পূর্ণ হওয়ার স্বপ্ন দেখে। জনসঙ্ঘের ঘাড়ের ওপর যে মাথা সেটিও তো বহির্বঙ্গেই বাঁধা আছে। সেই জনসঙ্ঘ প্রকৃত বঙ্গবাসী দরদী হয়ে বাঙলার আর কতটুকু করবেন। যা কংগ্রেসে সম্ভব নয়, কম্যুনিস্টে একেবারেই অসম্ভব, তা জনসঙ্ঘে সম্ভবপর হবে, এমন বিশ্বাস কি শুধু ইস্তাহার পাঠেই হয়। জনসঙ্ঘ যে গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষণীপুষ্ট ভেতো বাঙালী নিয়ে তাঁরা মস্তিষ্ক ঘর্মাক্ত করবেন স্টক এক্সচেঞ্জ নিয়ে পড়ে থাকবেন কারা? আর বাঙলার যে বদনামই থাক, স্টক এক্সচেঞ্জে চোখ আছে বা শেয়ার বাজারে তিলককাটা অফিস আছে, বাঙালী নামে এতো বড় সার্টিফিকেট বড় একটা শোনা যায় না।

সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্কে জনসঙ্ঘের উচ্চাশার বিচার করলেই হাওয়ার গতির কিঞ্চিৎ হদিশ পাওয়া যাবে।

ইস্তাহারে জনসঙ্ঘ কেবলমাত্র সরকারী কর্মচারীদের মাসিক বেতন সর্বনিম্ন দুইশত এবং সর্বোচ্চ দুই হাজারে বাঁধবার কর্মসূচী রেখেছেন। বাজারদরের সঙ্গে মাহিনাদির হার মিয়ে তাঁরা কতদূর ভাবিত সে প্রসঙ্গ থাক, একটি বিষম পরিষ্কার, তা হল জনসঙ্ঘ সরকারী কর্মীদের ক্ষেত্রেই বেতন বাঁধাধাঁধিটা সীমিত করতে চেয়েছেন। বেসরকারী ক্ষেত্রে দুশো টাকা এখন সর্বনিম্নই দিয়েছে। সুতরাং সরকারী ক্ষেত্রে ঐ পর্যন্ত উঠতে আপত্তি নেই, শাসক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সেটা খুব ম্যাটারও করবে না। সর্বোচ্চ দুই হাজার টাকা সরকারী ক্ষেত্রে [illegible]

[illegible] [illegible] শ্রেণীর [illegible] [illegible]স্বাধীনতায় কে হস্তক্ষেপ করতে যাবেন? সেখানে পাহাড়-পর্বতের আকার গ্রহণ করলেই বা জনসংঘ ঠেকাতে আসছেন কি? সুতরাং জনসংঘের দ্বারা 'হ্যান্ড নটস' ও কেরানিকুলের উপকারে আর দরকার নেই। অবশ্য কেরানিময় বঙ্গ-ভাষাভাষীরা দুশো টাকার জীবনারম্ভে হয়ত পুলকিতই বোধ করবেন।

কংগ্রেস অধিবেশন মদ নিয়ে মতভেদে অবসিত

শুধু মদের ওপর অধিবেশন! শুধু মদের জন্য ডঃ সুশীলা নায়ারের মাদকবর্জন পরিষদ থেকে পদত্যাগ! শুধু মাদকবর্জন বিষয়ে একটি সাত বছরের কর্মসূচী গ্রহণের জন্য বহু অর্থ-ব্যয়ে ভারতের সর্বাপেক্ষা মদ্যাসক্ত রাজ্য গোয়ায় কংগ্রেসকে অধিবেশনে বসতে হবে এমন কথা কে ভেবেছিল। কিন্তু এবার কংগ্রেস অধিবেশন মদ নিয়ে মত-ভেদেই মুখর হয়েছিল।

কেউ কেউ এই মজার ময়দানে প্রশ্ন করে বসলেন, যাঁরা পদত্যাগে মুখর হয়েছেন তাঁদের মধ্যে কজন নিজে মদ্যপ নন। উত্তরে 'হা হা' করে উঠেছিল মণ্ডপ। সুশীলা নায়ার সরোষে বলে-ছেন, কেনিয়ায় বৃটিশ মদে ডুবিয়ে শাসন করে। অর্থাৎ মদ্য-বর্জনে আপত্তিতে আপত্তিকারীদের প্রতি সন্দেহ প্রকাশই তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি বলেছেন কথাটা অশোভন। বস্তুত ডঃ নায়ার নিশ্চয় বলতে চান না, এখানে কংগ্রেস মদে ডুবিয়ে মন্ত্রিত্ব বজায় রাখার পক্ষপাতী। কিন্তু কংগ্রেস সভাপতির চমকে-ওঠা সেই 'ঠাকুর ঘরে কে রে' রব শোনামাত্র 'আমি কলা খাই নি' জবাব-দিহির মতো। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বাপুজী শতবার্ষিকীর শুভারম্ভে ভারত-বর্ষকে শুষ্ক তালু করার শুভেচ্ছা ধোপে টেকে নি। দারুণ মদ্য-বিরোধী মোরারজী দেশাই ম্লান-মুখে বলেছেন, গোয়ারই ভাগ্য ভালো, কারণ ভারতের পামর শতাংশ মানুষ মদ্যপায়ী, একা গোয়ায় তিশ শতাংশই তাই। অর্থাৎ কিনা মদ্যাসক্ত গোয়ার পক্ষে আরও সাত বছর সময় মিলল।

এই সাত বছরে অনেক রকম-ফের হতে পারে। এমন কি তখন এ আই সি সি-কে পরোয়া না করে দেশটাই [illegible] মদে ডুবে যেতে পারে।

কিন্তু আসল কথাটা কি।

[illegible]বর্জনে আসল যে লাভ, তা হল, [illegible] টাকা মাদকবর্জনের ফলে মদে [illegible] [illegible] বিদেশে যাবে না। সেটা [illegible] [illegible]।

হওয়ার যে সুযোগ তার কী হবে। মদ খান, বিশেষ বিলিতি খান যাঁরা, তাঁরা হয় খানদানি, নয় খানদানির পয়সায় মদ খান। তা সে যেভাবেই হোক, পয়সাটা অধিকাংশ স্থলেই অসদুপায়ে অর্জিত। এই পয়সার কিয়দংশও সরকারী জমার ঘরে জমা হচ্ছে মদের দৌলতে। এ আই সি সি-র প্রস্তাবে সেই কোটি কোটি মাদক-কর বন্ধ হয়ে গেলে রাজ্যে রাজ্যে আয়ের ঘরে বিরাট ঘাটতি দেখা দেবে। কালো টাকা পচবে বিছানার তলায়। বিলিতিও চোলাই হবে। কালো টাকা কৃষ্ণতর হয়ে শুঁড়ির ঘরে পাহাড় হবে। মদ কেউ ছাড়বেন এমন ভরসা কম। মদের জন্যই যাঁরা মাতাল; পঞ্চ 'ম'-কারের ব্যবস্থা করতে গিয়ে জীবনে মহৎ কাজ করার সুযোগ যাঁদের ঘটে ওঠে না, তাঁরা মদ্যপান করে দেশের যে উপকারটি করে আসছিলেন তার থেকেও বঞ্চিত হবেন। তখন কালো টাকা বার করার জন্য মোরারজী সাহেবকে আবার ফতোয়া জারি করতে হবে।

সভাপতির বৈপ্লবিক চিন্তা

অতএব আর দেরি নেই, কংগ্রেসী চিন্তায় বিপ্লব এলো বলে, কেন না স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি এতোকালে উপ-লব্ধি করেছেন যে, ঘন ঘন এ আই সি সি-র বৈঠক বসিয়ে লোকসান বই লাভ নেই। প্রস্তাবের লম্বা ফিরিস্তিও কোন কার্যের নয়। নিজলিঙ্গাপ্পাকে ধন্যবাদ, বহু আবেদন-নিবেদন ও সমালোচনার দ্বারা কংগ্রেসের মাথায় যে চিন্তাটি আজ বহু বছর যাবৎ অনুপ্রবিষ্ট করানো সম্ভব হয় নি, সভাপতি হওয়ার পর নিজলিঙ্গাপ্পা তা তড়িং-ঘড়িং উপলব্ধি করেছেন। বলেছেন, এইবার আমাদের চিন্তা করার দরকার, ঘন ঘন কংগ্রেসের বৈঠকে বাস্তবিক কোন ফায়দা আছে কিনা। লম্বা ফিরিস্তির পর কাজ না হলে লোকের মনে অবিশ্বাস জাগ্রত হয়। সুতরাং একাধিক প্রস্তাবও উত্থাপন করা অসঙ্গত।

সভাপতির এহেন বৈপ্লবিক চিন্তায় আশ্বস্ত হওয়া গেল। অতঃপর কংগ্রেস যদি কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়, তবে অভিপ্রেত ফললাভ সহজ হবে। দুঃখের বিষয় সভাপতির এই উপলব্ধি কার্যে রূপদান করায় কিছু বাস্তব অসুবিধা: কংগ্রেস কি সেটুকু লঙ্ঘন করে এগোতে পারবেন। অসুবিধা হল একটি বা দুটি প্রস্তাব রাখলে লম্বা ফিরিস্তির জটলায় এতাবৎকাল কথা দিয়ে কাজ চাপা দেওয়ার যে সুযোগ ঘটে আসছে, সেই [illegible] [illegible] থেকে কংগ্রেসকে স্বেচ্ছা-[illegible] [illegible] কাজের জন্যে [illegible]

মঙ্গল (প্রস্তাব সাধু হলে) সাধন সম্ভব হলেও, সাধ্যের বহির্ভূত কোন প্রস্তাব গ্রহণ করে জনগণকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার সুযোগ আর থাকবে না। ভুবনেশ্বরে গৃহীত সমাজতন্ত্র আনয়নের উচ্ছাসসম্পন্ন মুখরোচক প্রস্তাবগুলি কস্মিনকালে টেবলস্থ করারই সুযোগ ঘটবে না। সে বড় অ-সুখ আনয়ন করবে বক্তৃতাবাগীশ নেতৃকুলে।

কিন্তু তা হোক, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো। বাগাড়ম্বর ত্যাগ করে কাজের প্রস্তাব গৃহীত হোক, কংগ্রেস তাতে জনপ্রিয়ই হবে। লোকসান নেই।

রাজমুকুট অন্যায়ের ঊর্ধ্বে

বৃটিশ অলিখিত শাসনতন্ত্রে বলে, দি কিং ক্যান ডু নো রঙ্। রাজা অর্থাৎ রাজমুকুট অর্থাৎ কিনা ক্ষমতা-বিহীন ক্ষমতার রূপক 'ক্রাউন' কোন অন্যায় কাজ করতে পারেন না। খুব স্বাভাবিক, যিনি কিছুই করেন না তিনি ন্যায়-অন্যায়ের ঊর্ধ্বে তো নিশ্চয়ই। রাজার নামে রাজত্ব চলালেও রাজা স্বয়ং হস্তপদবিহীন জগন্নাথদেব। তিনি ঐক্যের প্রতীক।

কিন্তু বৃটেনের রাজা এবং মহী-শূরের মুখ্যমন্ত্রীতে ঢের তফাৎ। শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা তখন মহীশূরেরই মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, যখন তাঁর বিরুদ্ধে নীতিবিগর্হিত কাজের অভিযোগ উত্থা-পিত হয়েছিল। শ্রী কে হনুমন্তিয়া, যিনি প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান, দুর্ভাগ্যবশত তিনি ভাবতে পারেন নি যে, মহীশূরের প্রাক্তন মুখ্য-মন্ত্রীও 'ক্যান ডু নো রঙ্'। আর সে কারণেই শ্রীযুত নিজলিঙ্গাপ্পার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের তদন্ত করা হবে বলে তিনি তাঁর বক্তব্যে অনড় থাকতে চেয়েছেন।

কিন্তু মুস্কিল হয়েছে, শ্রীনিজ-লিঙ্গাপ্পা ইতিমধ্যে কংগ্রেস সভাপতি হয়ে গেছেন, ফলত তাঁর বিরুদ্ধে পুরানো দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন ও তার তদন্তের ব্যাপারে শ্রীহনুমন্তিয়ার দুঃসাহস কংগ্রেসী সদস্যগণ অনায়াসে সহ্য করতে পারেন নি স্বাভাবিক কারণেই। হনুমন্তিয়ার বিরুদ্ধে তাই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সি ডব্লু সি-তে।

সব শুনে হনুমন্তিয়া বলেছেন, কুছ পরোয়া নেই। অভিযোগ তদন্তের জন্য তিনি তাঁর প্রচার আন্দোলন একইভাবে চালিয়ে যাবেন, তাতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারা তাঁর নিজের ওপর যে দণ্ড নেমে আসুক না কেন।

[illegible]হনুমন্তিয়া তাঁর এই বড় সিদ্ধান্ত [illegible] [illegible] সভাপতিজ্বর [illegible] পর

বলে মনে হয় না। পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খান ১৯৫১ সালের ১৬ই অক্টোবর গুলীর আঘাতেই প্রাণ দিয়েছিলেন। আয়ুব খাঁর ভাগ্য ভালো, আততায়ীর গুলী তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। তবে সামরিক শাসনে হত্যা-প্রচেষ্টার আশঙ্কা কখনো উড়িয়ে দেওয়া যায় কি?

প্যারিস :

প্রেসিডেন্ট জনসন ৩১শে অক্টোবর যখন উত্তর ভিয়েৎনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ করার কথা ঘোষণা করলেন এবং জানালেন যে, ৬ই নভেম্বর থেকে প্যারিসে বৃহত্তর পর্যায়ে শান্তি আলোচনা শুরু হবে, তখন সে-ঘোষণাকে একমাত্র চীন ছাড়া সকলেই আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছে বলে মনে হয়েছিল। সে ঘোষণা সম্পর্কে চীন এখনো কোন মন্তব্য করে নি। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে ততই মানুষের মনে এ সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে যে, প্রস্তাবিত বর্ধিত পর্যায়ে শান্তি আলোচনা আদৌ হবে কি না। খোলাখুলিভাবে ঝগড়া দিচ্ছে অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, দিচ্ছে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকার।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম এবং তাদের মিত্রপক্ষের মনে এ সংশয় বরাবরই ছিল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিনা-শর্তে উত্তর ভিয়েৎনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ করলেও হ্যানয়ের কাছ থেকে বা ভিয়েৎ কংদের পক্ষ থেকে উপযুক্ত সাড়া পাওয়া যাবে না। কিন্তু ঘটনাটা ঘটছে ঠিক উল্টো। অর্থাৎ হ্যানয় প্রস্তাবিত বৃহত্তর শান্তি বৈঠকে অংশগ্রহণে সঙ্গে সঙ্গে সম্মতি দিয়েছে এবং ভিয়েৎ কংদের রাজনৈতিক শাখা জাতীয় মুক্তি ফৌজও আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্যে প্যারিসে প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে দিয়েছে মাদাম গুয়েন থি বিনাকে তার নেত্রী করে।

কিন্তু ৬ তারিখে কি যথারীতি শান্তি বৈঠক শুরু হয়েছে? কথা ছিল, চতুঃ-শক্তি সম্মেলনে অংশ নেবে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র, উত্তর ভিয়েৎনাম, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম এবং জাতীয় মুক্তি ফৌজ। কিন্তু তিন পক্ষ এ সম্মেলনে যোগ দিতে তৈরি থাকলেও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের কোন প্রতি-নিধি সেদিন পর্যন্ত কনফারেন্স হল-এ উপস্থিত হন নি বলে বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারে নি। উত্তর ভিয়েৎনামের প্রতিনিধি অবশ্য বলেছিলেন দক্ষিণ ভিয়েৎ-নামের অনুপস্থিতিতেই সম্মেলন হতে বাধা নেই, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সে প্রস্তাবে রাজী হন নি।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট থিউ সেই আওয়াজ তুলে দিলেন যে তাঁর সরকার কখনোই জাতীয় মুক্তি ফৌজকে স্বীকার করে নেবেন না এবং সম্মেলনের একই টেবিলে সে-প্রতিনিধির সঙ্গে বসবেন না। প্রেসিডেন্ট থিউকে বোঝা-বার জন্যে সম্মেলনে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারের প্রতিনিধি হাজির করার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কম চেষ্টা করেন নি, সায়গনস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত এলসওয়ার্থ বাঙ্কারও তাঁর সঙ্গে ঘন ঘন আলোচনা করেছেন। কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। উল্টে প্রেসিডেন্ট থিউ একটা অদ্ভুত প্রস্তাব দিয়েছেন যে, সম্মেলনে দুটো পক্ষই অংশ নিক, এক পক্ষের নেতৃত্ব করবে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং মিত্রপক্ষের অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতি-নিধিরা তার সঙ্গে থাকবেন এবং অন্য পক্ষে থাকবে উত্তর ভিয়েৎনাম, মুক্তি ফৌজ এ প্রতিনিধিদলের কেবল একটা অংশ হিসেবেই যোগদান করতে পারে। কিন্তু স্বভাবতই সে প্রস্তাবে হ্যানয় কিম্বা মুক্তি ফৌজ রাজী হতে পারে নি, তারা বলেছে যে, বরং দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে বাদ দিয়ে ত্রি-পাক্ষিক সম্মেলন হবে, তবুও মুক্তি ফৌজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হবে। এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও থিউর প্রস্তাবে সায় দিতে পারে নি, কারণ তারা আলাদা পক্ষ হিসেবেই সম্মেলনে যোগদান করতে চায়। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সঙ্গী বা তাঁবেদার হিসেবে নয়।

চতুঃশক্তি সম্মেলন অনুষ্ঠানটি প্রেসি-ডেন্ট থিউর বাধাদানের ফলে হতে পারছে না বলে উত্তর ভিয়েৎনাম এবং মুক্তি ফৌজ তার দায়িত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপরেই চাপাতে চাইছে এই বলে যে, প্রেসিডেন্ট জনসন যে আশ্বাস এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা ভঙ্গ হতে বসেছে। জনসন অবশ্যই মুক্তি ফৌজকে নিয়ে চতুঃশক্তি সম্মেলনের কথা বলে-ছিলেন ত্রিপাক্ষিক সম্মেলন নয়। প্রেসিডেন্ট থিউ হয়তো মনে এ আশা পোষণ করছেন যে নিকসন মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার ফলে ভিয়েৎনাম প্রশ্ন সম্পর্কে আমেরিকার মনোভাবে পরিবর্তন ঘটবে। তিনি ভাবী প্রেসিডেন্টকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে আমন্ত্রণও করে বসেছেন। তাঁর আশা, রিপাবলিকান নিকসন হয়তো উত্তর ভিয়েৎনামে বোমা-বর্ষণ বন্ধের ঘোষণা প্রত্যাহার করে নেবেন।

কিন্তু এতটা আশা করা কি প্রেসিডেন্ট থিউর পক্ষে ঠিক হচ্ছে। দক্ষিণ ভিয়েৎ-নামে তাঁর শক্তির পরিচয় তো সমগ্র বিশ্ব-বাসী পেয়ে গিয়েছে, তবে আর কিসের জোরে তিনি বুলি কপচানো বন্ধ করছেন না? অবশ্য প্রেসিডেন্ট থিউর এটুক বুঝে নিতে কষ্ট হচ্ছে না যে, দক্ষিণ ভিয়েৎনামে যদি শান্তি ফিরে আসে, যদি এখানে অবাধ নির্বাচন হয় তবে তাঁর সাজানো বাগান শুকিয়ে যাবে। তাঁর মাতব্বরির দিন শেষ হয়ে যাবে। সেজন্যেই তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন যাতে চতুঃ-শক্তি শান্তি বৈঠক ভেস্তে যায়, যাতে হ্যানয়ে আবার বোমাবর্ষণ শুরু হয় এবং তিনি আমৃত্যু সরকারী গদিতে বসে যেতে পারেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :

ভবিষ্যদ্বাণী ঠিক প্রমাণিত হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৭তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন রিপাবলিকান প্রার্থী রিচার্ড এম নিকসন। ভোট গণনায় শেষ পর্যন্ত দেখা গিয়েছে যে, নিকসন পেয়েছেন ২৮৭টি ইলেকটোরাল ভোট বা ২,৯১,৮০,০১৭টি জনভোট, ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হুবার্ট হামফ্রে পেয়েছেন ১৭২টি ইলেকটোরাল ভোট বা ২,৮৯,৩৮,৩৭৮টি জনসাধারণের ভোট এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রার্থী জর্জ ওয়ালেস যথাক্রমে ৪৫ বা ১০,৬৪,৪৫৬টি।

নিকসন-হামফ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে খুবই তীব্র হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভোট গণনা শেষ হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কে জিতবে এই নিয়ে জনমনে দারুণ উত্তেজনা বজায় থাকে। ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন নিকসনেরই মনোনীত রিপাবলিকান প্রার্থী স্পিরো এগনিউ। ডেমোক্র্যাট প্রার্থী এডমান্ড মাস্কিকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট দলের প্রার্থীও পরাজিত।

অবশ্য ১৯৬০ সালের নির্বাচনেও নিকসনকে সামান্য ভোটের ব্যবধানে জন কেনেডীর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। তাছাড়া প্রেসিডেন্টের অতি গুরুত্বপূর্ণ পদটি রিপাবলিকান দল পেলেও প্রতিনিধি পরিষদ এবং সেনেট কোনটিতেই তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেন নি। এখানে ডেমোক্র্যাটিক দলের সংখ্যাধিক্যই অক্ষুণ্ণ রয়েছে। ভাবী প্রেসিডেন্ট নিকসন হয়তো সে জন্যেই তাঁর কার্যকালে দলীয় প্রধান দলেরই খাতিরে সকলের নেতা হবার কথা বলেছেন। নিকসন এ ইঙ্গিতও দিয়েছেন যে তিনি মার্কিন প্রশাসনে বড় রকমের রদবদল করবেন। অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তিনি সহ-যোগিতার পক্ষপাতী। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে তাঁর প্রথম ভাষণে নিকসন বলেছেন যে, তাঁর প্রধান লক্ষ্য জাতীয় সংহতি। প্রেসিডেন্ট কেনেডীর মতো নিকসনও বোধ হয় প্রশাসনের প্রধান পদগুলিতে নতুন, সজীব চিন্তাধারার লোক নিয়োগ করবেন।

ভারতকে সাহায্য বন্ধ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না বলে নিকসন আশ্বাস দিয়েছেন, এবং তিনি একথাও বলেছেন যে, এশিয়ায় ভারতের স্থান অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ।

সম্রাট মহানুভব। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাষ্ট্রপতি-শাসনের সরকার জলপাইগুড়ির ভয়াবহ প্রলয়ঙ্কর বন্যার পর দুর্গত মানুষদের একের পর এক অমূল্য ও অভিনব উপহার দিয়ে চলেছেন। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দার্জিলিং-এ যারা মারা গেছে, তারা স্বর্গলোকে বসে রাজ্য সরকারের অভিনব উপহার থেকে বঞ্চিত হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে আর জীবন্মৃত মানুষগুলি জীবনধারণের নরকযন্ত্রণা থেকে ধীরে ধীরে মুক্তির পথে পা রেখে সব সুখ দুঃখ, অভাব-অভিযোগ ব্যথা-বেদনার সীমা পার হতে চলেছে। সময়মত সতর্ক না করে, উপযুক্ত পরিকল্পনায় প্রতিকারের ব্যবস্থা না করে উত্তরবঙ্গের প্রায় দশ হাজার মানুষকে সরকার নিশ্চিন্ত স্বর্গে যাবার পথ সুগম করে দিয়েছেন আর লক্ষ লক্ষ মানুষকে রিক্ত, সর্বস্বান্ত সর্বহারায় পরিণত হবার সুযোগ দিয়ে সমাজবাদী রাষ্ট্রের কাঠামোর ভিত পত্তন করেছেন। কীর্তিস্তম্ভ রচনা করে চলেছেন কীর্তিনিধি ধর্মবীর তাঁর ধর্মবীর পরিচয়ে। এখন শুধু বলবার কথা একটি নামের বদলে নাম পেলাম ঠিকঠাক।

কীর্তিস্তম্ভ রচনা করেছেন রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর। গত ৫ই অক্টোবর দার্জিলিং থেকে আট মাইল দূরে সিনচল আশি হাজার ফুট উঁচুতে একটি গলফ ক্লাবের উদ্বোধন করেছেন। উচ্চতার দিক দিয়ে এই গলফ ক্লাবটি বিশ্বের দ্বিতীয়। বন্যার পর সরকারের দ্বিতীয় স্থায়ী কীর্তি হল জলপাইগুড়ির বন্যার সম্পর্কে এস এন রায় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ। শ্রীরায় তাঁর রিপোর্ট দাখিল করে দিয়েছেন আর সরকারও রিপোর্টের ভিত্তিতে বিদ্যুদ্বেগে ব্যবস্থা গ্রহণ করে ফেলেছেন। কি অভূতপূর্ব ত্বরিত ব্যবস্থা! প্রলয়ঙ্কর বন্যায় হাজার হাজার মানুষের প্রাণ গেল, কোটি কোটি টাকার ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হল, সরকারী প্রশাসন বন্যার জলে ভেসে গেল, মৃত মানুষগুলিকে শকুনে খেল সময়মত অপসারণ না করার কারণে, সর্বহারা স্বজনহারার বিয়োগ ব্যথায় কাতর মানুষগুলি বন্যার ৫ দিন পরেও সরকারের কাছ থেকে এক ফোঁটা তৃষ্ণার জল পেল না, সব দিক দিয়ে নৈরাজ্যের অন্ধকার নেমে এল, সেখানে তদন্ত কমিটি নিয়োগ হল—জলপাইগুড়িতে বন্যা সংকেত সংক্রান্ত নিয়ম চালু আছে কি না, এবং থাকলে যথাযথ কাজ করেছে কি না। অর্থাৎ কেন বন্যা, কেন মৃত্যু কেন প্রশাসন যন্ত্র ও সরকার অচল হল—এই সবের মূলে কার দোষ কার ত্রুটি কারা, অথবা জীবন্মৃত মানুষগুলি কি করে বাঁচবে ছিন্নমূল মানুষগুলি কি করে আবার নতুন জীবন ফিরে পাবে কোন কিছু নিয়ে মাথাব্যথা নয়--মাথাব্যথা হল বন্যা সংকেত নিয়ে। জলপাইগুড়ির যে মৃত্যু ও ধ্বংসলীলা হয়ে গেল তার জন্য যে অভিশাপ দিবারাত্র স্বামীহারা, পুত্রহারা, স্বজনহারা মানুষগুলি দিচ্ছে, বন্যা সংকেত চালু আছে কি না, থাকলে কাজ করেছে কি না, তা নিয়ে তাদের এতটুকু চিন্তা নেই। সাপের কামড়ে মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির চোখটা সাপের ছোবল থেকে বেঁচে গেছে বলে যারা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চান, যারা গবেষণা করতে চান, অথবা তা নিয়ে আর কাউকে দোষী বা কাউকে উদ্যোগী কর্মী বলে প্রমাণিত করতে চান করুন, কিন্তু মৃত ব্যক্তির কাছে অথবা মৃতের আপনজন শোকাতুর মানুষদের কাছে সেটা পাগলের কীর্তি ছাড়া অন্য কোন মূল্য পাবে না। বিচার করেছেন বিচারপতি। কিন্তু বিচারপতি তোমার বিচার করবে কে? ভয়াবহ বন্যা সম্পর্কে সময়মত সতর্ক করে না দেওয়ায় জলপাইগুড়ির ডেপুটি কমিশনার শ্রীসুহৃদ মল্লিক, সেচদপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার শ্রী কে এল মিত্র, ও একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শ্রী কে পি চৌধুরীকে জলপাইগুড়ি থেকে বদলী করে দেওয়া হয়েছে। না, এটা কোন শাস্তি নয়। মুখ্যসচিব বলেছেন—"জনস্বার্থের খাতিরেই এদের বদলী করা হয়েছে, প্রয়োজনবোধে এক অফিসারকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বদলী করা হয়ে থাকে।" আবার বলি সম্রাট মহানুভব। জলপাইগুড়ির মানুষ তথা পশ্চিমবঙ্গের জনগণ অমূল্য উপহার পেয়েছেন রায় তদন্ত কমিশনের রায়ে। কেন উত্তরবঙ্গে বন্যা হল বা বন্যা নিরোধ হয় না কেন, বিশ বছর স্বাধীনতার পর উত্তরবঙ্গের বন্যা প্রতিরোধ সম্ভব হল না কেন, কেন বন্যার পর দুর্গত মানুষ সরকারের কাছে উপযুক্ত ত্রাণ সাহায্য পেল না, কেন বন্যার

এক মাস পরেও দুর্গত মানুষদের উপযুক্ত পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নি এ সবের কোন বিচার নয়—বিচার শুধু বিপদ সংকেতের। যদিও এই বিপদ সংকেতে হয়ত কয়েকটা প্রাণ বাঁচতো, হয়ত কিছু অস্থাবর সম্পত্তি বাঁচতো। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বন্যার ভয়াবহ ধ্বংসলীলার কোন ইতরবিশেষ হত না। কিন্তু বিপদ সংকেতে বিপরীত ফল ফলতো, সন্ত্রাস-গ্রস্ত মানুষ রাস্তায় মাঠে ঘাটে বেরিয়ে এলে বন্যার জলে আরো বেশি ক্ষতি হত। কিন্তু সেই বিচারে কি ফল? কিন্তু বিচার যদি বন্যা সংকেত অবহেলার হয় তবে কেন বিচার হবে না। ছয় বার বন্যার পর শ্রীমান সিংহের নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ কেন কার্যকরী করে স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয় নি, কেন শ্রীমান সিংহের রিপোর্টকে কার্যকরী রূপ দেওয়া হয় নি। কেন বিচার হবে না [illegible] অক্ষমতা ও আপত্তিতে মান সিংহ পরি-কল্পনা রূপদানে বার বার টাকা চেয়ে পান নি, বা বার বার চেয়ে ব্যর্থ হয়েছেন, কে বিচার করবে যুক্তফ্রণ্ট সরকার আমলের সেচমন্ত্রী বিশ্বনাথ মুখার্জী যে পার্বত্য নদী শাসনের [illegible] প্ল্যান তৈরি করে-ছিলেন, সেই প্ল্যান কেন্দ্র কর্তৃক অর্থের [illegible] হয় কেন—কে বিচার করবে [illegible] ঔদাসীন্যের, দায়িত্ব-জ্ঞান[illegible]।

[illegible] কিন্তু বাঙলার [illegible] বাঙলার মুখ্য-মন্ত্রী তথা [illegible] জনপ্রতিনিধিরূপে ক্ষমতাসনে [illegible]। কে বিচার করবে [illegible] দার্জিলিং থেকে জলপাইগুড়ি আসতে [illegible] দিন সময় লেগেছিল, কে বিচার করবে বন্যার একদিন পর দার্জিলিং এ শিলি-গুড়ির কোন এক বাংলো থেকে [illegible] করে জলপাইগুড়ির অবস্থা [illegible] রাজ্যের [illegible] সংগে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছিল, আর [illegible] খবর দিয়ে বলা হয়েছিল—জলপাইগুড়িতে কিছু ব্লিচিং পাউডার দিয়ে লোক পাঠাও। বিচার কে করবে তাঁদের যাঁরা রাইটার্স বিল্ডিংসে বসে জলপাইগুড়ি বন্যার দু' দিন পরেও কোন খবর সংগ্রহ করতে পারে নি বা টেলিফোনে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না বলে দায়িত্ব শেষ করেছেন অথবা রাজ্য সরকারের হাতে একখানি বিমানের বেশি বিমান নেই বলে শুধু হা-হুতাশ করে দায়িত্ব শেষ করেছেন। বিচার করবে কে যে মিলিটারীর কাছে শ্রীখগেন দাশ-গুপ্ত পানীয় জল চেয়ে জবাব পেয়েছেন মিলিটারীর কাছে কোন [illegible] ট্যাঙ্ক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দিতে [illegible] করতে বলে সাতদিন পরে [illegible] ছুতে দেখেছেন।

রাজ্যের পুলিশের সর্বময় কর্তা জল-পাইগুড়ির পুলিশকে তাদের অদ্ভুত কাজের জন্য পুরস্কার দেবার কথা ঘোষণা করেছেন। আবার বলতে হয়—সম্রাট মহানুভব। ১১ই অক্টোবর ডি-আই-জি শ্রীরঞ্জিত গুপ্ত জলপাইগুড়ি যাবার আগে পুলিশের কোন প্রশাসন ছিল না, ১০ তারিখেও জলপাইগুড়ি থানায় গিয়ে শ্রীমোরারজী কখন কোথায় আসবেন জানতে চেয়ে জবাব পান নি। 'কম্পাস'-এ শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত লিখেছেন—শোনা যায় খোদ জলপাইগুড়ির প্রধান থানার সিঁড়ির কাছে ১৪ই অক্টোবর পর্যন্ত একটা মরা গরু পড়ে ছিল। নাকে রুমাল দিয়ে পুলিশ অফিসাররা সেটা সহ্য করেছে কিন্তু নিজেদের উদ্যমে সেটাকে দূরে ফেলে দিতে পারে নি, এরা কবরে মৃত মানুষের খোঁজ, মৃত গরু বলদের হিসেব? হ্যাঁ, তবে পুলিশ অন্য কোন কাজে যোগ্যতা না দেখালেও যোগ্যতা দেখিয়েছে আরো অনেকগুলি কাজে। তার মধ্যে সম্ভবত প্রধান হল প্রধানমন্ত্রীর দর্শনেচ্ছু-দের লাঠিপেটা করে। প্রধানমন্ত্রীর [illegible] আগের দিন রাত্রিতে যুক্তফ্রণ্টের এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর কাছে জনসাধারণের পক্ষ থেকে একটি স্মারকপত্র দেওয়া হবে। ডি-আই-জি'র সংগে দেখা করে বলা হয় জলপাইগুড়ির মানুষেরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে সুশৃংখলভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে মিছিল করে যাবেন, সামনে থাকবেন যুক্ত-ফ্রণ্টের নেতারা। সেই নেতাদের নামও পুলিশের কাছে দেওয়া হয়। মিছিল ডি-সি'র বাংলোর কাছে গিয়ে বসে পড়বে আর নেতারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারক-লিপি দিয়ে আসবেন। ঠিকমত কার্যসূচী [illegible] করা হল, শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্ত, শ্রীকাশীকান্ত মৈত্র, শ্রীননী ভট্টাচার্য, শ্রীম[illegible]শ সান্যাল প্রমুখ মিছিল নিয়ে এগিয়ে চললেন। প্রধানমন্ত্রী আসছেন, জলপাইগুড়ির মত ছোট শহরে তাদের দুঃখের দিনে প্রধানমন্ত্রী আসছেন। সারা শহর তাঁকে দেখতে ভেঙে পড়লো, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে কেউ দেখতে পেল না। বিশ-খানা পুলিশের গাড়ির সারিতে একখানা ঢাকা গাড়িতে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে ডি-সি বাংলোয় চলে যাওয়া হল। কিছু ছেলে স্বাভাবিক কৌতূহল ও উৎসাহে ডি-সি'র বাংলোর পাঁচিল ডিঙিয়ে বাংলো এলাকায় ঢুকে পড়ে। অত্যুৎসাহী পুলিশ সেই সুযোগেই লাঠিচালনা করে বসলো, একটি মহিলার মাথায় লাঠি পড়তেই জনতার [illegible] হল—পুলিশের উদ্দেশ্যে [illegible] [illegible] শুরু করে পুলিশ লাঠিপেটা করে জনতাকে করলা নদীর পারে নিয়ে যায়। এমন অবস্থা রাজ্যপালকে ঠেকাতে হয় হাত চেপে একজন পুলিশের রিভলভার ছোঁড়া থেকে নিবৃত্ত করতে, ডি-আই-জি ছোটাছুটি করেও পুলিশকে বাগে আনতে পারেন না, ফিরিয়ে আনতে পারেন না। শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্তের ভাষায়—"ভাই-ফোঁটার দিনে ভগিনী ইন্দিরা গান্ধী কোথায় ভাইদের কপালে নির্ভয়ের জয়-টিকা পরিয়ে দেবেন—কিন্তু তিনি দিয়ে গেলেন লাঠির আঘাত।" হ্যাঁ, এই পুলিশ আজ বিচারে পুরস্কার পাবে শুধু কি এই, প্রভুর বিচারের আরো আছে। প্রশ্ন করি—কে তাদের বিচার করবে? ৫ই অক্টোবর থেকে তিন দিন তিন রাত্রি যখন সরকারী প্রশাসনযন্ত্র সম্পূর্ণ মুখ থুবড়ে জলপাইগুড়ির পলিমাটিতে ঢাকা ছিল, তখন শিলিগুড়ির সর্বস্তরের মানুষ তাদের সর্বস্ব নিয়ে সর্বস্ব পণ করে এগিয়ে গেল জলপাইগুড়ির মানুষকে বাঁচাতে। খাদ্য আর পানীয় দিয়ে সেই দিন শিলিগুড়ির মানুষ এগিয়ে না এলে জলপাইগুড়ির বহু মানুষ শুধু পিপাসার [illegible] মারা যেত অথচ শিলি-গুড়ির এস-ডি-ও শ্রী[illegible]দাশগুপ্ত হুকুম জারী করলেন—শিলিগুড়ি থেকে কোন [illegible] যেতে পারবে না তাঁর অনুমতি ছাড়া। প্রায় এই হুকুমনামা [illegible] সরকারের পক্ষ থেকে [illegible] যদি কেউ করতে চাও, সরকারী [illegible] ও স্বীকৃতি নিয়ে কাজ করতে হবে [illegible]।

তুফানগঞ্জে বন্যায় কেউ মারা যায় নি—তার একমাত্র কারণ তুফানগঞ্জের যুবকেরা বন্যার সংবাদ পেয়ে সরকারের অপেক্ষা না করে নিজেরা মাইক নিয়ে বেরিয়ে সকলকে সতর্ক করে দিয়েছিল সকলকে সরিয়ে দিয়েছিল নিরাপদ স্থানে। আর বন্যার পর এই এলাকার একখানা প্রচারপত্রকে কেন্দ্র করে এস-ডি-ও কার্তিক সাহা নামে একজনকে গ্রেপ্তার করতে হুলিয়া বের করেছেন—অনেকের বিরুদ্ধে ১০৭ ধারায় নোটিশ জারি করেছেন। গত ১৬ই নভেম্বর মেখলীগঞ্জে বিমান থেকে নিক্ষিপ্ত বস্তায় একটি শিশু নিহত হল, কয়েকজন আহত হল—এর কোন বিচার হলো না, অথচ এস-ডি-ও'কে ঘেরাও করার ও লাঞ্ছিত করার অভিযোগে ছজনকে গ্রেপ্তার করা হল। অনেককে গ্রেপ্তারের জন্য হুলিয়া বের করা হল। প্রভুর এই আচরণের ব্যাখ্যা শুধু একটি কথায় বলা যায়: প্রভু আমার ভাত দেবার কেউ নন, কিন্তু কিল মারবার গোঁসাই।

এস-এন-রায় কমিটির রিপোর্ট

নির্মল বসু

এস এন রায় কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে জলপাইগুড়িতে কিছু প্রশাসনিক রদবদলও করা হয়েছে। জলপাইগুড়ির বন্যায় আগের থেকে সতর্ক করা হয়েছিল কি না, তদন্তটি ছিল প্রধানত এই প্রশ্নের ওপর।

জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের বিধ্বংসী বন্যার পর অনেকগুলি বিষয়ের ওপর তদন্তের দাবি উঠেছে। প্রথমত, সতর্কীকরণের ব্যাপার। স্পষ্ট অভিযোগ উঠেছে, জলপাইগুড়ির সরকারী কর্তারা আগের থেকে বন্যার খবর পাওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণকে সতর্ক করেন নি, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। এ বিষয়ে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, এই ভয়ঙ্কর বন্যা হল কেন? এর কারণ কি? কেবল, বেশি বৃষ্টি হয়েছে, এই কথা বলাই কি যথেষ্ট? বন্যানিরোধক যে-সব ব্যবস্থা আছে, তার কাজ কি ঠিক মত হয়েছে? তিস্তা নদীতে যে বাঁধ দেওয়া হয়েছে, তা ত্রুটিপূর্ণ কি না, এবং এই বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ যথাযথভাবে করা হয় কি না, সে-সম্পর্কে তদন্তের প্রয়োজন আছে। চীনা আক্রমণের পর জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়ির মাঝে তিস্তা নদীর ওপর যে রেল ও সড়ক সেতু নির্মাণ করা হয়েছে, সে-সম্পর্কেও গুরুতর অভিযোগ আছে। অনেকেই মনে করেন তিস্তার বিপুল জলরাশি বের হবার পক্ষে এই সেতু দুটি যথেষ্ট চওড়া নয়। অবৈজ্ঞানিকভাবে এখানে সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। তৃতীয়ত, ত্রাণকার্যের ব্যাপারেও তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। বন্যার সময় সরকারের পক্ষ থেকে কোনরূপ ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয় নি। জল নেমে যাবার পরও ত্রাণকার্য সুরু হতে প্রচুর বিলম্ব হয়েছে, এবং প্রথম দিকে যা-কিছু হয়েছে তা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে। কেন এ রকম হল, সে-বিষয়ে তদন্ত হওয়া দরকার। চতুর্থত, বন্যায় দেখা গেল, জলপাইগুড়ির সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। কোন অফিসার নেই, পুলিশ নেই, কাজ করার কেউ নেই—হুকুম দেবার কেউ নেই, পালন করারও কেউ নেই—এ এক অদ্ভুত অবস্থা। বন্যা শেষ হবার পরেও বেশ কয়েক দিন এই অবস্থা চলেছে। যত বড় বিপর্যয়ই হোক না কেন, সমগ্র প্রশাসন এভাবে ভেঙে পড়বে কেন? পঞ্চমত, ভবিষ্যতে বন্যা প্রতিরোধ কিভাবে হবে, এ সম্পর্কে অবিলম্বে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত এবং ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন। জনসাধারণের আরও দাবি, বন্যা প্রতিরোধের ব্যাপারটি নিশ্চয়ই বিশেষজ্ঞদের দিয়ে বিচার করতে হবে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে বিচারবিভাগীয় তদন্ত চাই। নিছক বিভাগীয় তদন্ত, কিংবা প্রশাসনের সঙ্গে যোগ রয়েছে এমন কোন ব্যক্তিকে দিয়ে এই তদন্ত করলে যথেষ্ট হবে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সব বিষয়ে তদন্তের ব্যবস্থা করেন নি, বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবিও তাঁরা মানেন নি। কেবলমাত্র একটি বিষয়, অর্থাৎ বন্যার সতর্কীকরণের ব্যাপারে তাঁরা একটি তদন্তের ব্যবস্থা করেছেন। তদন্তের ভার ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন মুখ্য-সচিব অবসরপ্রাপ্ত আই-সি-এস শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ রায়ের ওপর।

বিচারবিভাগীয় তদন্ত তো হয়ই নি, প্রকাশ্য তদন্তও হয় নি। সর্বসাধারণকে এই তদন্তের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবার জন্য আহ্বান করা হয় নি। শ্রীরায় যখন তদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি গেলেন, তখন যদি সংবাদপত্র সরকারের পক্ষ থেকে বলা হত, যার যা জানা আছে তা শ্রীরায়ের কাছে পেশ করুন, সাক্ষ্য দিন, কিংবা যদি শহর ও অন্যান্য অঞ্চলে মাইক বা ঢোল মারফৎ জানিয়ে দেওয়া হত, যার যা বলার আছে শ্রীরায়ের সম্মুখে এসে বলুন, তা হলে বোধ হয় ভাল হত। হয়তো আরও কিছু বেশি খবর জানা যেত। শ্রীরায় কবে জলপাইগুড়ি গেলেন, কোথায় বসলেন, কি ভাবে তদন্ত করলেন সাক্ষ্য নিলেন, অনেকেই তা জানতে পারেন নি। সবাই-এর সাক্ষ্য নিয়ে তদন্ত করাটা বোধ হয় সরকারেরও ইচ্ছা ছিল না। তদন্তের অনুরোধ জানিয়ে শ্রীরায়কে রাজ্য সরকারের মুখ্য সচিব শ্রী এম এম বসু যে চিঠি দেন (দি ও নং ৭২৭৭ পি, ১৫-১০-৬৮), তাতে বলা হয়েছে, শ্রীরায় যে-কোন অফিসারকে সাক্ষ্য দেবার জন্য ডাকতে পারবেন, যে-কোন কাগজপত্র দেখতে পারবেন, আর তিনিই স্থির করবেন "জনসাধারণের মধ্য থেকে কারও সাক্ষ্য তিনি গ্রহণ করবেন কি না"। বেসরকারী অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষ্য শ্রীরায় গ্রহণ করেছেন, আবার অনেকে বাদও পড়েছেন। কে এই সাক্ষী-তালিকা প্রস্তুত করেছেন জানি না (যে-সব অফিসারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়তো বা তাঁরাই), তবে দেখা গেল, জলপাইগুড়ি শহর ও জেলার প্রধান ৩টি রাজনৈতিক দল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলা কংগ্রেস ও ফরওয়ার্ড ব্লকের কাউকে ডাকা হয় নি (অন্য কয়েকটি রাজনৈতিক দলকে যদিও ডাকা হয়েছে), বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের প্রাক্তন বামপন্থী এম-এল-এ'দের ডাকা হয় নি (কংগ্রেসী এম-এল-এ'র বাড়ি গিয়ে কিন্তু শ্রীরায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন)। এম-এল-এ'রা এখন নেই, কিন্তু এম এল-সি'রা আছেন। শহরে দু'জন বামপন্থী এম-এল-সি, তাঁরা বন্যার সময় ও তার পর ছিলেনও, তাঁদের কাউকে ডাকা হয় নি, অথচ কংগ্রেসী এম-এল-সি'র সঙ্গে দেখা করার জন্য শ্রীরায় নদী পার হয়েছেন। শহরের নির্বাচিত মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের (অন্ততপক্ষে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার) ডাকা হয় নি।

তবু বলব, শ্রী এস এন রায় এই তদন্তের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। বন্যাবিধ্বস্ত অনেকগুলি অঞ্চল তিনি নিজে ঘুরে দেখেছেন, কাগজপত্র পরীক্ষা করেছেন, এবং অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

এত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এস এন রায় কমিটির রিপোর্টে যে-সব মূল্যবান তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে, তাতে বিস্ময় ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এত বড় সর্বনাশের মূলে রয়েছে দায়িত্বশীল সরকারী অফিসারদের গাফিলতি, এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। প্রশাসনিক ব্যর্থতার এক মূল্যবান দলিল রূপে রায় কমিটির রিপোর্টটি বিবেচিত হবে।

তদন্তের বিষয় ছিল ৪টি:

(১) বন্যার ব্যাপারে বর্তমান সতর্কীকরণ ব্যবস্থা কি এবং কোন্ সরকারী কর্মচারীদের ওপর এর দায়িত্ব রয়েছে?

(২) এবারের বন্যায় এই সতর্কীকরণ ব্যবস্থা কি ঠিক মত কাজ করেছে? যদি কাজ ঠিক মত না হয়ে থাকে, তবে সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় কি কোন ত্রুটি আছে? কোন সরকারী ব্যক্তি কি এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী?

(৩) বিশেষভাবে জানতে হবে,

(ক) ৪ঠা অক্টোবর, '৬৮ তারিখে জলপাইগুড়িতে কি কোন প্রকার সতর্কীকরণ সংবাদ পৌঁছেছিল?

(খ) জলপাইগুড়ির জনসাধারণের কাছে কি এই সতর্কীকরণ সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল? যদি সতর্ক করা না হয়ে থাকে, তবে কোন্ কোন্ সরকারী ব্যক্তি এর জন্য দায়ী?

(গ) জনসাধারণকে পূর্ব থেকে সতর্ক করতে পারলে কি এই জীবন ও সম্পত্তিহানি রোধ করা যেত?

(৪) প্রাসঙ্গিক অন্য কোন বিষয়।

শ্রী এস এন রায় তদন্তের পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন:

(১) বন্যার ব্যাপারে সতর্কীকরণ ব্যবস্থা রয়েছে।

(২) এবারের বন্যায় পাহাড়ের বিভিন্ন স্থান থেকে নদীর জলের বিপদসীমা অতিক্রান্ত হবার সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। তবে সতর্কীকরণ ব্যবস্থায় কিছু ত্রুটি আছে। সতর্কীকরণের ব্যাপারে সেচ বিভাগের কিছু অফিসার দায়ী।

(৩) (ক) ৪ঠা অক্টোবর বিভিন্ন সময় সরকারী ও বেসরকারী সূত্রে জলপাইগুড়ি শহরে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের কাছে সতর্কবাণী পৌঁছেছিল।

(খ) জনসাধারণকে বিপদের ব্যাপারে পূর্বে কোনভাবে সতর্ক করা হয় নি। এই ব্যর্থতার জন্য জলপাইগুড়ি জেলার ডেপুটি কমিশনার বিশেষভাবে দায়ী। সেচ বিভাগের সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ার ও একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারও দায়ী। জলপাইগুড়ির বিভাগীয় কমিশনারও এর জন্য কিছুটা দায়ী। (অন্য ব্যাপারেও শ্রীরায় এঁকে দায়ী করেছেন।)

(গ) পূর্ব থেকে সতর্ক করতে পারলে, সম্পত্তি গবাদিপশু ও ফসল নষ্ট রোধ না করা গেলেও, অনেক মধ্যবিত্ত মানুষ, বিশেষ করে যাঁরা নদীর ধারে বাস করেন তাঁদের জীবন বাঁচানো সম্ভব হত।

এ ছাড়া শ্রীরায় তাঁর রিপোর্টে সামরিক বাহিনীর ব্যর্থতার বিষয়ে উল্লেখ করে, বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় সামরিক বাহিনীর সাহায্য পৌঁছতে কেন এত বিলম্ব হল, সে-বিষয়ে তদন্ত করার জন্য একজন পদস্থ সামরিক অফিসার ও রাজ্য সরকারের একজন অফিসারকে দিয়ে একটি যুক্ত তদন্তের জন্য সুপারিশ করেছেন। স্থায়িভাবে বন্যা প্রতিরোধের বিষয়েও তিনি আলোচনা করেছেন।

প্রশাসনের ব্যর্থতা রিপোর্টের পাতায় পাতায় নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যে ভদ্রলোক দীর্ঘকাল রাজ্যের প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বলতে গেলে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান প্রশাসন ব্যবস্থার অনেকখানি যাঁর নিজের হাতে গড়া, তাঁর রিপোর্টেই এই সব ত্রুটি ধরা পড়েছে। উত্তরবঙ্গ বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরামর্শদাতা কমিটি নামে একটি কমিটি আছে। ৮ই নভেম্বর, ১৯৬৬ তারিখের পর এই কমিটির কোন সভাই হয় নি। (পৃঃ ২১)। বন্যা সতর্কীকরণ নিয়মাবলী সম্পর্কে জলপাইগুড়ির ডেপুটি কমিশনার ওয়াকিবহাল নন, এই সব নিয়মাবলীর কথা তিনি জানেনই না। তাঁর অফিসে এরকম কোন জিনিসই নেই! (পৃঃ ৭)। সতর্কবাণীর নিয়মাবলীতে (Danger Level) আছে নদীর জলের 'বিপদ সীমা' ও 'চরম বিপদ সীমা' (Extreme Danger Level) এই দুটি কথা রয়েছে কিন্তু সরকারী নিয়মের ভাষা অনুসরণ করে তখনও না জেনে সেচ দপ্তরের কর্মীরা সতর্কবাণীতে বলেছেন 'সতর্ক সীমা' (Warning Level) ও 'চরম সতর্ক সীমা' (Extreme Warning Level)। সুতরাং, আর ভয়ের কারণ নেই! আশ্চর্য! (পৃঃ ১৩)। ডেপুটি কমিশনারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জেলা বন্যা কমিটির সভায় বহু দিন পূর্বে স্থির হয়েছিল, বি-ডি-ওদের কাছে নৌকা থাকবে। কিন্তু কোথাও নৌকা নেই। জলপাইগুড়িতেও কোন নৌকা নেই। (পৃঃ ১৮) ক'দিন ধরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, সব নদী বিপদ সীমা অতিক্রম করেছে, ৩রা অক্টোবর থেকে শহরের আশে পাশে বন্যা হচ্ছে, তিস্তার বাঁধ ভাঙবার উপক্রম হয়েছে, অথচ ৫ই অক্টোবর ভোর ৩-৪৫-এর আগে পর্যন্ত ডেপুটি কমিশনার জানতে পারেন নি, জলপাইগুড়ি শহর বিপন্ন! অন্যান্য অফিসারদের অবস্থাও একই। তখন আর কিছু করার নেই। (পৃঃ ২৮)। জলপাইগুড়ির প্রশাসন ভেঙে পড়েছে। কিন্তু মাত্র ২৬ মাইল দূরে শিলিগুড়িতে মহকুমা অফিস রয়েছে। সেখান থেকে কোন সাহায্য আসে নি. বিভাগীয় কমিশনার (শিলিগুড়ির ওপর যাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে) সে-সাহায্যের জন্য বলেনও নি। শ্রীরায় প্রকারান্তরে এর জন্য প্রশাসনকে 'হৃদয়হীন যন্ত্র' বলেছেন। (পৃঃ ১৯)। এরকম বহু তথ্য রয়েছে রিপোর্টে।

রায় কমিটির সব বক্তব্যের সঙ্গে একমত হওয়া সম্ভব নয়। যেমন, রিপোর্টে বলা হয়েছে, আগের থেকে সতর্ক করলে প্রাণ কিছু বাঁচত, কিন্তু সম্পত্তি, ফসল, গবাদি পশুর ক্ষতি প্রতিরোধ করা যেত না ("this would not have prevented any of the damage to property and crops, and loss of cattle....", পৃঃ ১৮)। এ কথা কি সত্যি? আগে খবর পেলে, অনেকেই তাঁদের জিনিসপত্র নিরাপদ জায়গায় রাখতে পারতেন, অন্তত বাড়ির ছাদে বা গাছে, কিংবা নিজেদের সঙ্গে (যেমন, গয়না) নিয়ে উঠতেন। বন্যার ব্যাপার বুঝতে না বুঝতে পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যে গলা জলের বেশি হয়েছে, ফলে কেউ কোন জিনিস বাঁচাতে পারেন নি। পূর্ব-সতর্কবাণী পেলে নিশ্চয়ই অনেক সম্পত্তি রক্ষা পেত। গবাদি পশুও অনেকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে পারতেন। সময় পেলে সেনপাড়া, হাকিমপাড়ার অধিবাসীরা অনায়াসেই বাঁধের ওপর তাঁদের গরু রাখতে পারতেন। অনেকে দোতলা বাড়িতেও তুলতে পারতেন। সতর্কবাণী না দেবার ফলে যে ক্ষতি হয়েছে রায় কমিটির রিপোর্টে তা লঘু করে দেখা হয়েছে।

রিপোর্টে স্থানীয় পুলিশের কাজের প্রশংসা করা হয়েছে। (পৃঃ ২০)। বন্যার সময় কিংবা তার পর কয়েক দিন শহরে পুলিশের কোন চিহ্ন দেখা যায় নি। সবাই নাকি বিপন্ন। প্রথম শহরে ইউনিফর্ম পরা পুলিশ অফিসার দেখা গেল ১০ই অক্টোবর, যেদিন উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই জলপাইগুড়ি এলেন, বন্যার জল নামার পাঁচ দিন পরে। হঠাৎ শ্রীরায় পুলিশের প্রশংসা করলেন কেন?

কিছু অসত্য সংবাদ রয়েছে রায় রিপোর্টে। (সম্ভবত, যা শুনেছেন শুনেছেন, শ্রীরায় তাই লিখেছেন সত্যতা বিচার করার সময় বা সুযোগ পান নি।) যেমন, বলা হয়েছে, বা ধরে নেওয়া হয়েছে, বিভাগীয় কমিশনার নাকি ৬ই অক্টোবর সকালেই 'অনেক কষ্টে' শিলিগুড়ি পৌঁছে সব যোগাযোগ করেছেন। ("I asked the Divisional Commissioner that when he after a great deal of trouble reached Siliguri on the morning of 6th October....", পৃঃ ১৯)। ৬ই অক্টোবর সকালে ৭টা নাগাদ [illegible] বিভাগীয় কমিশনারের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে সাক্ষাৎ করি। তখন তিনি

বললেন, শিলিগুড়ি যাবেন। বেলা ১১-৩০ টায় তাঁর বাড়িতে আবার যাই। তখন তিনি ডেপুটি কমিশনার, সি এম ও এইচ এবং সামরিক বাহিনীর একজন মেজরের সঙ্গে আলোচনা করছেন। তারপর তিনি ডেপুটি কমিশনারকে সঙ্গে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে আহারাদি পর্ব সারলেন, এবং বেরিয়ে এসে আমাদের বললেন, এবার তিনি শিলিগুড়ি যাবেন। আমাদের সঙ্গে তিনি বের হলেন, এবং নেতাজীর মূর্তির কাছে সামরিক নৌকা করে যখন তিনি করলা নদীর ওপারে শহরের পশ্চিমাঞ্চলে গেলেন, তখন একজনের ঘড়িতে দেখলাম, বেলা ১২টা ৪০ মিনিট। সেখান থেকে সামরিক ট্রাকে শহর হয়ে গেলেও বিকালের আগে তাঁর পক্ষে শিলিগুড়ি পৌঁছনো সম্ভব নয়। অথচ তিনি এদিনই সকালে শিলিগুড়ি পৌঁছেছেন।

রায় কমিটির রিপোর্টে পূর্ত বিভাগ সম্পর্কে একটি কথাও নেই। তাঁরা কিভাবে কাজ করেছেন? সতর্কবাণীগুলি তো তাঁদের দপ্তরেও পৌঁছেছিল।

বন্যার খবর পাওয়া সত্ত্বেও সময়মত জনসাধারণকে সতর্ক না করার জন্য জলপাইগুড়ির অফিসারদের দোষী সাব্যস্ত করা হল। একই অপরাধে অপরাধী কোচবিহার জেলার অফিসাররা। তাঁরাও আগে থাকতে খবর পেয়েছিলেন। কিন্তু হলদিবাড়ী-মেখলীগঞ্জের মানুষকে তাঁরা সাবধান করেন নি। সেখানেও সর্বনাশ হয়েছে। তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে কোন কথা রায় কমিটির রিপোর্টে নেই কেন?

যে ত্রুটির জন্য এত বড় সর্বনাশ হল, হাজার হাজার মানুষ মারা গেল, লক্ষ লক্ষ মানুষ সর্বহারা হল, কোটি কোটি টাকার ক্ষতি হল, তার জন্য কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা কোন একজন বা দুজন ব্যক্তিকে দায়ী করলে হবে না এই ত্রুটি মৌলিক। বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সীমাহীন ঔদাসীন্য, মানুষের জীবন ও সম্পত্তি সম্পর্কে চরম তাচ্ছিল্য এবং কর্তব্যে নিদারুণ অবহেলা, এই সবই এর জন্য দায়ী। রাজ্যে যদি কোন নির্বাচিত সরকার থাকতেন, তাহলে অবস্থা এর চেয়ে নিশ্চয়ই কিছুটা ভাল হত। মন্ত্রীদের সঙ্গে জনসাধারণের যোগ আছে, তাঁরা জনসাধারণের কাছে, তাঁদের নির্বাচিত আইনসভার কাছে দায়ী। এই সঙ্গে সরকারী অফিসাররাও দায়িত্বশীল হতেন। কিন্তু এখন কে কার কাছে কৈফিয়ৎ দেবে? খাস রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর? তাঁর অবস্থা কি? বন্যার সময় তিনি দার্জিলিং-এ। তাঁর সঙ্গে হেলিকপ্টার আছে। তবু ১০ই অক্টোবরের (বন্যার সাত দিন পর) আগে, তা-ও শ্রীমোরারজী দেশাই-এর সঙ্গে, তাঁর জলপাইগুড়ি আসার সময় হয় নি।

যেসব অফিসার দোষী রায় কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে তাঁদের কাউকে কাউকে বদলী করা হয়েছে। যাঁদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে, তাঁদের অনেকে এখনও স্বপদে বহাল রয়েছেন। আর কেবল বদলীই কি যথেষ্ট? এত বড় অপরাধের জন্য কোন শাস্তি হবে না? মেখলীগঞ্জে ১৬ই অক্টোবর বিমান থেকে ভুল করে চালের বস্তা ফেলায় একটি শিশু মারা গেল। ক্রুদ্ধ জনতা হাতের কাছে এস-ডি-ও'কে পেয়ে তাঁকে মেরেছে। (এ মার নিশ্চয়ই নিন্দনীয়। এস-ডি-ও বর্তমানে সুস্থ হয়েছেন।) যাদের অপরাধে অপাপবিদ্ধ কচি শিশু পিকু মারা গেল, তাদের কি শাস্তি হয়েছে জানি না, কিন্তু এস-ডি-ও'কে মারার ব্যাপারে পাইকারী হারে মেখলীগঞ্জের যুবকদের (যাঁদের অধিকাংশই এই হাটুরে মারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন) গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। সরকারী অফিসারের দোষে হাজার হাজার মানুষ মারা গেলেও (সরকারের নিজস্ব রিপোর্টে তা প্রমাণিত হলেও) অফিসারদের মাত্র বদলী করা হয়; কখনও কখনও সে বদলী আবার প্রমোশনের নামান্তর।

একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন। বন্যার ব্যাপারে চরম ব্যর্থতার জন্য কিছু সরকারী অফিসারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের রোষ প্রচণ্ডভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তাঁদের শাস্তি দাবি করা হচ্ছে। তাই বলে সকল সরকারী অফিসার ও কর্মচারী নিশ্চয়ই দায়ী নন। এর মধ্যেও কিছু অফিসার ও কর্মচারী অপূর্ব কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিয়েছেন। তিস্তাবাজারে যে ভদ্রলোক নিজের জীবন বিপন্ন করে শেষ পর্যন্ত বন্যার খবর পাঠাবার চেষ্টা করেছেন, তিনি সকলের অকুণ্ঠ প্রশংসা পাবেন। জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে কজন নার্স নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করে বন্যার জলের মধ্যেও রোগীদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। চরম নৈরাজ্যের মধ্যেও কিছু অফিসার শক্ত হাতে হাল ধরেছেন বলে বিলম্বে হলেও, কিছু সরকারী ত্রাণকার্য হয়েছে। এই রকম আরও অনেক।

রায় রিপোর্টের ফলে আরও ব্যাপক তদন্তের দাবি জোরদার হয়েছে। বন্যার কারণ, ত্রাণ ব্যবস্থার ত্রুটি ও বন্যা প্রতিরোধের ব্যবস্থা, এই সব বিষয়ে অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

আর প্রয়োজন, সামরিক বাহিনীর ব্যর্থতার ব্যাপারে তদন্ত। রায় কমিটি এই সুপারিশ করেছেন। তবে তিনি কেবলমাত্র একটি বিষয়ে তদন্ত দাবি করেছেন: জলপাইগুড়ির এত কাছে থাকা সত্ত্বেও সামরিক বাহিনীর সাহায্য পৌঁছতে এত দেরি হল কেন? রিপোর্টে বলা হয়েছে, ৪ঠা অক্টোবর বেলা ৪-৩৫ মিনিটের সময় ব্যাংডুবিতে কোর কমান্ডারের '(Commander, HQ XXXIII Corps Artillery Brigade, C/o. 99 A. P. O.)' কাছে জলপাইগুড়ির জন্য সর্বপ্রকার সামরিক সাহায্য চাওয়া হয়েছিল। ক্যাপটেন যাদব এই সংবাদ টেলিফোনে গ্রহণ করেছিলেন। (পৃঃ ১৪)। ডেপুটি কমিশনারের লগ বুকেও এই কথা লেখা আছে। (পৃঃ ৩৫)। ৫ই অক্টোবরও এই সাহায্য এসে পৌঁছয় নি। লগ বুকে ৫ই ৭-৪৫-এ লেখা হয়েছে: "হায়, যে সৈন্যবাহিনীর ওপর আমরা এত ভরসা করেছিলাম এখন পর্যন্ত তাদের কোন চিহ্ন দেখছি না।" '("No notice of the Army yet on whom we were depending so much. Pity indeed." পৃঃ ৩৯)।

কেবল সামরিক বাহিনীর বিলম্বে পৌঁছোনোই নয় (জলপাইগুড়িতে তাঁদের সাহায্য কিছু ৫ই অক্টোবর সন্ধ্যায় এবং কিছু ৬ই অক্টোবর সকালে এসে পৌঁছেছে), আসার পরেও তাঁরা ত্রাণকার্যে কোন উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন নি। শহরের লোকেদের জন্য কিছু পানীয় জল সরবরাহ, কিছু টীকা দান, এবং গ্রামের দিকে দু'-একটি রাস্তা সংস্কার মোরারজী ভাই-এর সম্মানে শহরের একটি রাস্তা পরিষ্কার, দুটি ছোট নৌকোয় নদীতে লোক পারাপার এবং সাত দিন পরে একটি পনটুন ব্রিজ করা ছাড়া তাঁরা আর কিছু করেন নি। ৬ই তারিখে তাঁরা সাফ বলে দিয়েছিলেন, তাঁদের পক্ষে কোন পনটুন ব্রিজ করা সম্ভব নয়। (সে সময় শহরের সব কটি সেতু ভাঙা, এপার থেকে ওপারে যাবার কোন ব্যবস্থা নেই।) তাঁরা বিদ্যুৎ সরবরাহ কিংবা জল সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারবেন না, শহরের পলি বা কাঠের স্তূপ সরাবেন না, হাজার হাজার মরা মানুষ ও গরু তাঁরা ফেলাবেন না। মেজর গোখেল যখন ৬ই অক্টোবর সকালে বিভাগীয় কমিশনারকে এসব কথা বলেন, তখন আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম। লক্ষ লক্ষ সৈন্য কয়েক মাইলের মধ্যে থাকেন, অথচ জলপাইগুড়িতে পাঁচ শ' জওয়ানকেও ত্রাণ ও উদ্ধারকার্যে পাওয়া যায় নি। হলদিবাড়ি ও মেরুবাড়ি জলপাইগুড়ি থেকে ১৪।১৫ মাইলের পথ। প্রতিরক্ষার দিক থেকে এতবড় গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত সড়ক আট জায়গায় ভেঙে পড়ে আছে। সৈন্যবাহিনী এ রাস্তা সারান নি। জলপাইগুড়ির মানুষ সৈনাবাহিনীর কাজে সম্পূর্ণ হতাশ হয়েছেন। যে বীর জওয়ানেরা দেশরক্ষার কাজে এগিয়ে এসেছেন, তাঁদের এ রকম হল কেন, কোথায় গোলমাল এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। দেশরক্ষার স্বার্থেই আজ এই কাজ করা দরকার।

বানান পরিবর্তনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতি

আমরা সংবাদপত্র মারফত জানিয়া বিস্মিত হইলাম যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল বাংলা বর্ণমালা, লিখনরীতি এবং বানান পদ্ধতির পরিবর্তন সাধনে তৎপর হইয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাংলা ভাষার এইরূপ সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধনে একতরফাভাবে কেন যে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাহা আমরা জানি না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল আজ অবধি তাঁহাদের প্রস্তাবিত সংস্কারের পূর্ণ বিবরণ জনসমক্ষে প্রকাশ করেন নাই। তবে আশংকা করা হইতেছে যে, জনসাধারণের অজ্ঞাতেই টেক্সট বুক বোর্ডের মাধ্যমে তাঁহারা প্রস্তাবিত বর্ণমালা ও বানান পদ্ধতি শিক্ষাক্ষেত্রে কার্যকরী করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, বর্ণমালা হইতে তাঁহারা ঈ, ঊ, ঐ, ঔ, ঙ, ঞ, ণ, ষ এবং ঈ-কার (ী), উ-কার (ু), ঐ-কার (ৈ), ঔ-কার (ৌ) ইত্যাদি বর্জন, যুক্তবর্ণের উচ্ছেদসাধন, ব-ফলা, ম-ফলা, য-ফলা ইত্যাদির পরিবর্তে দ্বিত্ব বর্ণ গ্রহণ, শ-স, জ-য, নবোদ্ভাবিত নিয়মে প্রয়োগ, এ-কারকে (ে) বর্ণের ডানদিকে আনয়ন এবং ঈ-কার (ী) দ্বারা ই-কারের (ি) কাজ সাধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

আমরা জানি না, কী উদ্দেশ্যে তাঁহারা ভাষার এইরূপ ব্যাপক পরিবর্তন সাধনে উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছেন। তথাকথিত সরলীকরণের মাধ্যমে জনশিক্ষা প্রসারই যদি তাঁহাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য এই যে : (ক) প্রচলিত বর্ণমালা এবং বানান পদ্ধতি যে জনশিক্ষা প্রসারের অনুপযোগী, তাহা প্রমাণ হয় নাই। (খ) প্রস্তাবিত লিখনরীতি যে জনশিক্ষা প্রসারে মন্ত্রাসিদ্ধ উপায়ের মতো কার্যকরী হইবে, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? (গ) যে সকল রাষ্ট্র ব্যাপকভাবে জনশিক্ষা বিস্তারে সফলকাম হইয়াছেন, তাঁহারা ভাষা বা লিপি সংস্কারের দ্বারা ঐ কার্য সম্পন্ন করেন নাই। জনশিক্ষা বিস্তারের প্রকৃত উপায় হইতেছে সর্বস্তরে অপরিহার্যরূপে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান, শিক্ষা-পদ্ধতির উন্নতি সাধন এবং সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এই সকল উপায় অবলম্বন না করিয়া জনশিক্ষা প্রসারের অজুহাতে লিখন পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার কৌশল মাত্র। (ঘ) প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক একতরফাভাবে গৃহীত বর্ণমালা, বানান পদ্ধতি ও লিখনরীতি চালু হইলে বর্তমানে যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহাদের বেলায় এবং যতটুকু শিক্ষার প্রসার হইয়াছে, তাহার ক্ষেত্রেও মারাত্মক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইবে। অধিকন্তু ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে চরম বিশৃংখলা ও অরাজকতার সৃষ্টি হইবে। শিক্ষিতদের নূতন করিয়া ভাষা লিখন ও পাঠ শিখাইবার ক্ষেত্রেও আরেকটি অতিরিক্ত সমস্যার সৃষ্টি হইবে, যাহা দ্রুত অগ্রগতি সাধন তো দূরের কথা, সাধিত অগ্রগতিকেই অনেকাংশে ব্যাহত করিবে। এর ফলে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চালু করার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে বানচাল হইয়া যাইবে।

একাডেমিক কাউন্সিলের প্রস্তাবিত পরিবর্তন গ্রহণ করিলে হাজার বছরের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সহিত আমাদের স্বাভাবিক সম্পর্ক বিকারগ্রস্ত হইয়া পড়িবে, শব্দ তাহার পূর্বতন ব্যবহার ও ব্যুৎপত্তিগত ভাবার্থের অনুষঙ্গ হারাইয়া ফেলিবে, কবিতার ছন্দ-প্রকরণের নিয়মাদি বিপর্যস্ত হইবে এবং ভাষাকে ব্যাকরণের সূত্রাকারে বর্ণনা করা দুঃসাধ্য হইবে। ইহা ছাড়াও সৃজনশীল সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক নিদারুণ বন্ধ্যাত্ব দেখা দিবে এবং ভাষা ও সাহিত্য পঙ্গু হইয়া পড়িবে।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বাংলা শব্দ বিভিন্নরূপ ধারণ করে। শব্দগুলি এমন প্রতীক, যা দেখিবামাত্রই ব্যুৎপত্তির ভাবানুষঙ্গে সে সবের মর্ম উপলব্ধি করা যায়। নূতন নূতন শব্দ সৃষ্টির সম্ভাবনাও ইহার ফলে উন্মোচিত হইয়া থাকে। ভাষা সচল ও বিকাশমান থাকার পক্ষেও ইহা অত্যন্ত সহায়ক। আলোচ্য সংস্কার অনেক ক্ষেত্রেই শব্দকে ব্যুৎপত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে, ভাষা শিক্ষা জটিলতর হইয়া পড়িবে এবং ভাষার সৃষ্টিশীলতা ও বিকাশমানতার ক্ষেত্রেও অন্তরায় দেখা দিবে। ধ্বনি বিজ্ঞানের বিচারেও বাংলা বর্ণমালা অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত বলিয়া স্বীকৃত। এই সংস্কার ইহার বিজ্ঞান ভিত্তিকেও বিনষ্ট করিবে।

কৃত্রিম হস্তক্ষেপের দ্বারা ভাষা ও বর্ণমালা সংস্কার সম্ভব নয়। ভাষা এবং লিখনপ্রণালী আপন প্রবণতা অনুযায়ী নিজস্ব নিয়মে স্বাভাবিকভাবে বিবর্তিত হয়। বর্ণমালার সংস্কারকদের এই সংগোপন প্রচেষ্টার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাই স্বাভাবিকভাবে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। ভাষা ও বর্ণমালার প্রকৃত মালিক দেশের জনসাধারণ; তাহাদের অগোচরে ইহার মৌলিক পরিবর্তন সাধনে কতিপয় ব্যক্তির অধিকার নাই। সুতরাং আমরা দেশবাসীর নিকট এই প্রকার সংস্কার প্রত্যাখ্যান করিতে আহ্বান জানাই।

—ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন। আবুল হাশিম, পরিচালক ইসলামিক একাডেমী। অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন। সৈয়দ মুর্তজা আলী। মোহাম্মাদ নাসিরুদ্দিন, সম্পাদক 'সওগাত'। বেগম সুফিয়া কামাল। কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস। সিকান্দার আবু জাফর, সম্পাদক 'সমকাল'। জহুর হোসেন চৌধুরী সম্পাদক 'সংবাদ'। আবদুল গণি হাজারী। শহীদুল্লাহ কায়সার, সভাপতি, পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক সমিতি। হাসান হাফিজুর রহমান, সম্পাদক, পাকিস্তান লেখক সংঘ, পূর্বাঞ্চল শাখা। শামসুর রহমান। ফজল শাহাবুদ্দীন। আহমেদ হুমায়ুন। সানাউল্লাহ নূরী। সাইয়িদ আতীকুল্লাহ। আফলাতুন। লায়লা সামাদ। শহীদ কাদরী। কালাম মাহমুদ। কে. জি. মোস্তাফা। আতাউস সামাদ, সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান সাংবাদিক সমিতি। আনোয়ার জাহিদ, সম্পাদক 'আওয়াজ'। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী। জহির রায়হান। রোকনুজ্জামান খান, সম্পাদক 'কচি ও কাঁচা'। নূরজাহান বেগম, সম্পাদিকা 'বেগম'। এহতেশাম হায়দার চৌধুরী। ফয়েজ আহমদ। আলী আকসাদ। খালেদ চৌধুরী। ওয়াহিদুল হক। কাজী মাসুম। ইসাহাক চাখারী। শওকত আলী। মোহাম্মদ সালেহউদ্দিন। আবদুল আওয়াল। জামালউদ্দীন মোল্লা। গোলাম রহমান। শহীদুর রহমান।

সাহিত্য বা কথাশিল্প, চিত্রশিল্প ও সংগীতশিল্প বিশেষ কোন আদর্শ বা সংস্কৃতি নয়। যে কোন সাহিত্য, চিত্র অথবা সংগীতশিল্পের মাধ্যমে যে কোন আদর্শ ও সংস্কৃতি প্রচার করা যায়। সুতরাং এই সমস্ত শিল্প আদর্শ ও সংস্কৃতির বাহন মাত্র, এগুলি আদর্শ বা সংস্কৃতি নয়। অনেকে মনে করেন বিশেষ ভাষা বিশেষ আদর্শ ও সংস্কৃতির ভাষা, যথা আরবী ইসলামের ভাষা এবং সংস্কৃত ও সংস্কৃতবহুল বাংলা ভাষা হিন্দু ভাষা। একথা সত্য নয়। অবিমিশ্র সংস্কৃত ভাষায় ইসলামের ভূয়সী প্রশংসা করা যায় এবং আরবী ভাষায় ইসলামের নিন্দাও করা যায়। কোন একটি সমৃদ্ধ ও সক্ষম ভাষার মাধ্যমে কোন একটি আদর্শ ও সংস্কৃতি প্রচার করতে পারলে সেই আদর্শ ও সংস্কৃতি সমুজ্জ্বল হয়। কিন্তু কোন একটি নিম্নমানের শিল্পের মাধ্যমে কোন একটি উচ্চ আদর্শ প্রচার করলে সেই আদর্শকে হেয় করা হয়। সুতরাং কোন একটি উচ্চ আদর্শকে গ্রহণযোগ্য করতে হলে তার বাহনের মানও উন্নত হওয়া প্রয়োজন। বাংলা ভাষাকে ইসলামের আদর্শ ও সংস্কৃতির বাহন করতে হলে বাংলা ভাষার মান উন্নত করা অপরিহার্য।

প্রত্যেক ভাষারই দুইটি ধারা আছে। একটি চলতি ভাষা অপরটি সাধু ভাষা। চলতি ভাষা একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম এবং কোন একটি আঞ্চলিক চলতি ভাষাকে সাহিত্যের মর্যাদা দেওয়া যায় না। 'আমার মা যে ভাষায় কথা বলেন সেই ভাষাই আমার সাহিত্য' একথা ভাবপ্রবণতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

বাংলা ভাষায় যে সমস্ত বিদেশী শব্দ চলতি আছে এবং বাংলা ভাষাভাষী সবাই সেগুলোর অর্থ বোঝেন সেগুলোকে বাংলা শব্দ বলে গ্রহণ করা কর্তব্য, সেগুলি মূলত আরবী, সংস্কৃত অথবা ইংরেজী যাই হোক না কেন। এই নীতি যদি মেনে নেওয়া হয়, তবে বাংলা ভাষার পরিভাষার কোন প্রয়োজন নেই। বাংলা ভাষায় ফারসী ও উর্দু ছাড়া বই, কিতাব, কলম, দোয়াত, দোকান শহীদ, জিহাদ, ছবি প্রভৃতির মত প্রায় দুই হাজার সাত শত আরবী শব্দ আছে এবং এগুলি বাঙালী জাতিধর্ম নির্বিশেষে বোঝেন ও ব্যবহার করেন। এইভাবে অফিস, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, চেয়ার, গ্লাস প্রভৃতি বহু ইংরাজী শব্দ বাঙালীর প্রতি ঘরে পরিচিত।

চীনা প্রাচীর আজকের যুগে নিরর্থক এটা আজকের একটি শিশুও জানে। শিল্পের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। কোনও একটি দেশের কোন একটা শিল্পকে বাহিরের প্রভাবমুক্ত করার উদ্দেশ্যে তার চারিদিকে ভাবের চীনা প্রাচীর গড়ার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

উচ্চমানের শিল্পের মাধ্যমে আদর্শ ও সংস্কৃতি প্রচার আদর্শ ও সংস্কৃতিকে বিশ্বসমাদৃত করার একমাত্র উপায়। কোন একটি ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে হলে সাহিত্যচর্চাকে এই ভাষার মধ্যে সীমিত রাখা উচিত নয়। কোন একটি ভাষাকে সমৃদ্ধ করতে হলে বিদেশী ভাষায় বিশ্ব-সমাদৃত সাহিত্য পাঠ করা প্রয়োজন। আবার বলি, সাহিত্য ও শিল্প আদর্শ বা সংস্কৃতির বাহন মাত্র। বর্তমান গ্রীস তথা পশ্চিম ভূখণ্ড খৃস্টান জগৎ, কিন্তু সাহিত্যের খাতিরে হোমার ও ভার্জিল খৃস্টান জগতে অতি সমাদৃত। আরব জগতের প্রাক ইসলামিক ইমরুল কায়েস প্রমুখ সাহিত্যিকদের সাহিত্য সমভাবে সমাদৃত। ইংরেজ কবি মিলটন ছিলেন গোঁড়া খৃস্টান ও গ্রীক দেব-দেবীর সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না কিন্তু তিনি তাঁর কাব্য 'প্যারাডাইস লস্ট'-এ ঐ সমস্ত দেব-দেবীকে টেনে এনেছেন। এর দ্বারা একথা প্রমাণ হয় না যে মিলটন ঐ সমস্ত দেব-দেবীর পূজারী ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন খৃস্টান এবং তাঁর সাথে দেব-দেবীর কোন সম্পর্কই ছিল না। কিন্তু তিনিও রামায়ণ অবলম্বনে তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্ম এবং তিনি সাকার উপাসনার বিরুদ্ধে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। কিন্তু তিনিও তাঁর সাহিত্যে কচ দেবযানি, কর্ণ, কুন্তি প্রভৃতিকে স্থান দিয়েছেন। কাজী নজরুল ইসলাম অনেক শ্যামা-সংগীত রচনা করেছেন এবং তাঁর সাহিত্য পাকিস্তানে অতিশয় সমাদৃত। আমরা হোমার, ভার্জিল, মিলটন, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলামের সাহিত্যে প্রচুর সাহিত্যরস উপভোগ করি, কিন্তু ঐ সমস্ত সাহিত্যের নায়ক-নায়িকার কারণে পৌত্তলিকতার ভক্ত হয়ে পড়ি না।

অনেকে মনে করেন, বাংলা ভাষার কতকগুলি অক্ষরকে বর্জন করা প্রয়োজন। 'ষ' 'ণ' '৯' অক্ষরগুলি বর্জন করা চলে, কিন্তু 'স' ও 'শ'-এর কোনটাই বর্জন করা চলে না এবং দুই 'ব'-এর একটির আকার কিঞ্চিত পরিবর্তন করে আরবী অথবা ইংরাজি (W)-এর মত ব্যবহার করা যেতে পারে। 'ই' ও 'ঈ'-এর কোনটাই বর্জন করা চলে না; কারণ প্রত্যেক ভাষারই স্বরবর্ণের হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণ আছে।

বাংলা সাহিত্যের মান নির্ধারণ করার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন এবং এই সমস্যার সমাধান পল্টন ময়দানে অথবা ইহার অনুরূপ কোন সভা-সম্মেলনে হওয়া সম্ভব নয়। এ সমস্যার সমাধান করবেন কথাশিল্পের [illegible] শিল্পীরা। বাংলা ভাষার ভাবের [illegible] সৃষ্টি করার চেষ্টা না করাই ভাল।

বাংলা ভাষা-সমস্যা

কাজী মোতাহার হোসেন

বেশ কিছুদিন আগে বাংলা বানান-সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল—প্রথমে কলকাতায়, তারপর পূর্ব পাকিস্তানেও বেশ খানিকটা হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু, তার থেকে যে-সব সমাধান বেরুল সাহিত্য-রথীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, তাতে দেখা গেল ব্যাপারটা ছিল অনেকটা পর্বতের মূষিক-প্রসবের মতো, বহ্বারম্ভের লঘুক্রিয়া মাত্র, অর্থাৎ আরম্ভে তোড়জোড় মাত্র- আসলে কোনও সাংঘাতিক সমস্যাই ছিল না।

[illegible] আবার ব্যাপক আকারে সাহিত্য, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি, ধর্ম-নীতি [illegible] পৌঁছিয়ে একটা কোলাহল [illegible] নিয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। এবার শুধু বানানসমস্যা নয়—গোটা ভাষাসমস্যা। এর উদ্দেশ্য কি ভাষাকে [illegible] ভাবে সংস্কৃত করা, না অন্তত বানান [illegible] ভাবে সরল করে নেওয়া, না শব্দ [illegible] এর স্বাভাবিক প্রকাশকে খর্ব করা—[illegible] ইতিমধ্যে [illegible] করে বোঝা যাচ্ছে না।

আমার মনে হয়, বাংলা ভাষায় বা বর্ণমালায় এমন কিছু দোষ বা কাঠিন্য প্রবেশ করে নি, যার জন্য আতঙ্কিত হবার সঙ্গত কারণ থাকতে পারে। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত, দেশজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, ইংরেজী, পর্তুগাল, তুর্কী, আরবী, ফারসী প্রভৃতি যে সমস্ত বিদেশী শব্দ এক সময় একটু আলগাভাবে ঢুকে পড়েছিল, সেগুলোর ব্যবহার বিরল হয়ে পড়েছে—তা আর ধরে রাখা যায় নি। এমন কি অনেক বাংলা শব্দ যেমন - সত্য' অর্থে 'সাচা', 'জাহাজ' অর্থে 'কাহিত', 'সুপারির' অর্থে 'গুয়া', 'পিচল' অর্থে 'সাচন' প্রভৃতি। বিশেষ ক'রে, আগেকার গৃহস্থালীর দ্রব্যাদিরও অনেকগুলো সম্পূর্ণ ব্যবহার বহির্ভূত হয়ে পড়েছে। আজকার লোকে সেগুলো কি রকম ছিল তা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এই হচ্ছে কালের নিয়ম। প্রত্যেক দেশেই এমন হয় : অনেক নতুন শব্দ আসে, পুরনো শব্দ লুপ্ত হয়ে যায়। সে জন্য ভাষার জাত যায় না—ভাষা কাফেরও নয়, মুসলমানও নয়। দেশের লোকে যা বা যেমন, সম্ভবত যেভাবে তারা কথা বলে, তাই হচ্ছে ভাষার বুনিয়াদ। এই বুনিয়াদের উপর গড়ে ওঠে সাহিত্য—নানা স্তরের, যত স্তরের লোক আছে তত স্তরের সাহিত্য ও ভাষা; রূপকথা, ছড়া, ধাঁধা, লোককাহিনী, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, আইন, অফিস, আদালত, ধর্ম, রাজনীতি, বাণিজ্যনীতি, বিজ্ঞান, সমালোচনা, কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, ডিটেকটিভ, রোমাঞ্চ প্রভৃতিতে নানা প্রকারের ভাব ও উদ্দেশ্য আছে। সুতরাং এ-সবের ভাষায়ও পার্থক্য থাকবেই। এ-সব পার্থক্যকে নস্যাৎ করে এক রকম আদর্শ-ভাষা সৃষ্টি করা অসম্ভব। একথা মুখের ভাষা ও সাহিত্যের ভাষা উভয়ের জন্যই খাটে।

সচারচর ই-ঈ, উ-ঊ, ব-ব, ণ-ন, শ ষ স, র-ড় চন্দ্রবিন্দু এবং সংযুক্ত বর্ণ নিয়েই বেশি কথা ওঠে। বাংলা ভাষায় দিন ও দীন; কবি, কড়ি, ও করী, ভাবি ও ভাবী, কুল ও কূল, পুত ও পূত; ধনি, ধনী ও ধ্বনি, মরা ও মড়া, আমরা ও আমড়া, শাপ ও সাপ, অংশ ও অংস; সত্য, সৎ ও স্বত্ব, পরশু ও পরস্ব, শসা ও স্বসা; দ্বিপ, দীপ ও দ্বীপ, বীণা ও বিনা; বাণী, বাণি ও বানী; বান ও বাণ; মন ও মণ, শাণ ও শান; কোন ও কোণ; স্মরণ ও স্বরণ; স্বর্গ ও সর্গ; বর্ষা ও বষা। স্বন ও শন, ষাঁড় ও সার; শস্ত ও সক, শ্বাস ও শ্বাস; বাঁদী ও বাদী, কাঁটা ও কাটা দাঁও ও দাও, চাঁও ও চাও; কাশী, কাঁসি ও কাসি; দ্বারী, দাঁড়ি ও দাড়ি, বাড়ি ও বাঁরি, শাড়ি, শারি ও সারি, অন্য ও অন্ন, প্রভৃতি বহু শব্দের অর্থে পার্থক্য রয়েছে। ন, ণ ও চন্দ্রবিন্দু; র, ড শ ষ, স; উ, ঊ; ই, ঈ; ব, য-ফলা প্রভৃতিকে এক করে ফেলার কথা বলার আগে বহুবার চিন্তা করে দেখতে হবে, তার কতটা সমীচীন, আর কতটা সমীচীন নয়। এ যেমন লিখন-পদ্ধতির কথা, তেমন উচ্চারণ পদ্ধতিরও কথা। এ দুদিক থেকে খতিয়ে দেখলে মনে হয়, লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ বেশি। বর্গীয়-ব ও অন্তঃস্থ-ব সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। বলা বাহুল্য এ স্থলে ব-বর্ণ ও ব-ফলার মধ্যে পার্থক্য আছে ভাষায় য, র, ল, ব এই চারিটি ফলার বহুল ব্যবহার হয়েছে। অতএব বর্ণ হিসাবে অন্তঃস্থ বর্ণের 'ব' বাদ দিলেও ফলার রূপগুলো সংরক্ষণ করাই যুক্তি-সঙ্গত মনে হয়। ফলার এই ব-এর উচ্চারণ আরবী স্বরবর্ণ, (ওয়াও)-এর অনুরূপ। উপরে যে উচ্চারণগুলো দেওয়া হয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই এরূপ সুপারিশ করা যায়।

বাংলা ভাষায় লিখন-রীতিতেই ই-কার, এ-কার ও ঐ-কার ব্যঞ্জন-বর্ণের আগে ও-কার ও ঔ-কার ব্যঞ্জন বর্ণের উভয় দিকে, আর ঋ-কার নিচে বসে। উচ্চারণের দিক দিয়ে অবশ্যই এ-ব্যবস্থা কিছুটা অবৈজ্ঞানিক। কিন্তু, এর সংশোধন করতে হলে এগুলো বদলে নতুন চেহারার 'কার' চিহ্ন উদ্ভাবন করতে হবে। তবে এভাবে সহস্র বৎসরের ঐতিহ্যকে বর্জন করলে নবীনদের কিছুটা সাময়িক সুবিধা হলেও, পরবর্তীকালে এদের পক্ষে একটু আগের পুঁথি পাঠ করাও কঠিন হয়ে পড়বে। গবেষকরা হয়ত কিছু ক্লেশ স্বীকার করে শিখে নিতে পারবেন। কিন্তু, মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানেই এর সাথে সাধারণ পাঠকের সুবিধার দিকে দৃকপাত না করে, গবেষকের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে নতুন লিখন-পদ্ধতি অবলম্বন করলে অন্যায় করা হবে।

[illegible] বিষয়, হালে ঋ-কার রেফ ইত্যাদি ব্যঞ্জন বর্ণের নিম্নে বা ঊর্ধ্বে না দিয়ে লাইনো মুদ্রাযন্ত্রে এ-গুলোকে ব্যঞ্জন বর্ণের পরে দিয়ে কিছুটা ছাপার কাজের সুবিধা করে নেওয়া হয়েছে। এটা ভাল কথা। এভাবে ধীরে ধীরে সইয়ে নিয়ে হরফের আকৃতির ছোটখাট সংস্কার করার কোন আপত্তি নেই। টাইপ-রাইটারের দৌলতে আজকাল ন্ড, ঙ্গ, ষ্ণ, হ্ণ, হ্ন, জ্ঞ, ক্ষ ইত্যাদি স্থলে দ্ভ, ঙগ, ক্ষ, দর এগু হন, জঞ, ঙগ লেখা আরম্ভ হয়েছে। এইভাবে যান্ত্রিক প্রয়োজনে ব্যবহার করতে করতে এ সব কতকটা চোখ সওয়া হয়ে যাচ্ছে এবং ক্রম-বিবর্তনের ভিতর দিয়ে ছোট ছোট সংস্কার ক্রিয়া চলতে থাকবে।

ভাষার এইরূপ স্বাভাবিক বিবর্তন ভাল। কারো নির্দেশে জোর করে

অস্বাভাবিক উপায়ে ভাষা-সংস্কার, বানান-সংস্কার বা লিখন-সংস্কার করলে সর্বক্ষেত্রেই অরাজকতার সৃষ্টি হবে। তালগোল পাকিয়ে শিশু শিক্ষা ও বয়স্কদের শিক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে।

বাস্তবিকপক্ষে, বাংলা বর্ণমালা বহু স্বর-যুক্ত এবং এর ব্যঞ্জন বর্ণগুলোও অত্যন্ত বৈজ্ঞানিকভাবে সহজ নিয়মে বিন্যস্ত। কোনও দেশের বর্ণমালা দিয়েই মুখের কথার আবেগ, উচ্ছ্বাস, হর্ষ, বিষাদ, কৌতুক, সন্দিগ্ধতা, ব্যাজস্তুতি; পরিহাস, অবজ্ঞা প্রভৃতি পরিপূর্ণ প্রকাশ হতে পারে না। তবু বলা যায়, এ-দিক দিয়ে বাংলা ভাষাই সর্বোৎকৃষ্ট। বাক্যাংশের ঝোঁক ও ব্যঞ্জনাটুকুই অবশ্য মানে না বললে কোন ভাষাতেই আনা যায় না; তবু বিদেশীরাও বাংলা শব্দে স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ শিখে নিয়েই যতটা শুদ্ধভাবে পাঠ করতে পারেন, আর কোন ভাষায়ই সম্ভব নয়। এটা একটা অভিজ্ঞতালব্ধ পরীক্ষিত সত্য। তাছাড়া আমরা যখন দেখছি আরবী ভাষাতে শুধু তিনটি স্বরবর্ণ আর আরবী প্রায় সব উচ্চারণের বিভিন্ন হরফের মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখা সহজসাধ্য নয়, এমন কি আরবের অনারব-অধ্যুষিত অঞ্চলে অনেক ক্ষেত্রে দুঃসাধ্য এবং ইংরেজী ভাষার bad, bar, bare, father, fal, infallible me, met, come, comet, mercy indeed, although, design, folk nation, knowledge, health, knel, Psaltery, psalm, psychology প্রভৃতিতে বিবিধভাবে উচ্চারিত স্বরবর্ণ অনুচ্চারিত ব্যঞ্জনবর্ণ, বিভিন্ন অক্ষর-সমাবেশের বিভিন্ন উচ্চারণ ইত্যাদি দেখতে পাই· আর আরবীয়েরা বা ইংরেজরা এসব অসংগতি অসুবিধা বা অনুচ্চারিত অতিরিক্ত অক্ষর বর্জনের জন্য অথবা অতিরিক্ত স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ গ্রহণ করবার জন্য আদৌ ব্যস্ত নয়; তখন আমরা কেন অতি সামান্য কারণে অসামান্য চাঞ্চল্য প্রকাশ করছি, বুঝে ওঠা দায়। আমরা দুনিয়ার আর সব কাজকর্ম ফেলে বিশেষ করে সাহিত্য সৃষ্টির কথা না ভেবে, একার মতো লেগে গেছি ভাষা থেকে ভূত তাড়াতে, অথচ ভূতটা আমাদের কাঁধে চেপেছে, না আর কোনও ক্ষতি করেছে, সেদিকে তাকাবারও অবসর পাচ্ছি না।

ভাষা আপন গতিতে চলবে, কালের প্রভাবে দেশ-বিদেশী বেয়াড়া শব্দ এসে তাদের শব্দ বন্ধতাকে গ্রাস-ঘাড়ীর মত এমন কি ব্যাকরণটিকেও পাল্টে যাবে,—এবং হয়েছেও, আরও হবে। কিন্তু তার জন্য সবুর করতে হবে, সময় মতো তা আপনা-আপনি সময়োচিত রূপ নেবে। এর জন্য প্রতিভাবানেরাও যথেষ্ট সাহায্য করবেন। কিন্তু পণ্ডিতদেরই হোক, সমাজপতি-দেরই হোক, অথবা রাজনীতিকদেরই হোক, কারও নির্দেশ মত ভাষার কোন স্থায়ী সংশোধন বা সমৃদ্ধি লাভ হয় না হবে না। এরূপ অবাঞ্ছিত ও আত্মঘাতী হস্তক্ষেপের ফলে দেশবাসীর চিন্তাশক্তিতে বাধা পড়বে, ভাবের স্বাধীনতা ব্যাহত হবে, ভাষার স্বাচ্ছন্দ্যজনিত আনন্দের অভাব হবে। মোট কথা, সাহিত্যে মৌলিক চিন্তার বিলুপ্তি ঘটবে, আর এ ধাক্কা সামলিয়ে উঠতে হয়ত কয়েক শতাব্দী লেগে যাবে। আমরা চাই ভাষার যথারীতি অগ্রসরতা, তার স্থলে লাভ হবে নিষ্ফল পশ্চাদ্বর্তিতা। আমাদের সাহিত্যিকদের পণ্ডিতদের এবং সংশ্লিষ্ট দেশবাসী ও দেশ নেতাদের মধ্যে শুভ-বুদ্ধির উদয় হোক, মুখের কথা ও অন্তরের কথা এক হোক—এই কামনা করি।

বাংলা ভাষার সংস্কার

ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক

মানুষের মধ্যে আকারে-প্রকারে, ইশারা-ইঙ্গিতেও ভাব-প্রকাশ চলে; কিন্তু তাহা ভাষা নহে। মানুষ যখন উচ্চারিত কথার সমাবেশে অপরের নিকট ভাব প্রকাশ করে, তখন ঐ কথাগুলির সমষ্টিই তাহার ভাষায় পরিণত হয়। এইরূপভাবে ভাব-প্রকাশের যে ভাষা, তাহা একটি চিরাচরিত ধারার অনুসরণ করিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হইয়া যায়। ব্যাকরণ ভাষার এই চিরাচরিত ধারার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়া দেয়। এই জন্যই ভাষাকে অনুসরণ করিয়া ব্যাকরণ হয়,—ব্যাকরণকে অনুসরণ করিয়া ভাষা হয় না। অন্য কথায়, ভাষার প্রকাশ-ভঙ্গি পাল্টাইলেই ব্যাকরণ বদলায়। ভাব-প্রকাশের চিরাচরিত ধারার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন না ঘটিলে, ভাষার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ঘটে না। এই প্রকাশ-ভঙ্গাত্মক চিরাচরিত ধারার নামই ব্যাকরণ পদ-বিন্যাস-পদ্ধতি বা Syntax। প্রকৃত-প্রস্তাবে ভাষায় পদ-বিন্যাস-পদ্ধতিই সেই ভাষার ব্যাকরণ। কারক, প্রত্যয়, ক্রিয়া-বিভক্তি, শব্দ-বিভক্তি প্রভৃতি পদ-বিন্যাস-পদ্ধতিরই খুঁটিনাটি পরিচয় মাত্র। সুতরাং ভাষা-সংস্কারের অর্থ ভাষার পদ-বিন্যাস-পদ্ধতিরই সংস্কার অর্থাৎ কারক, প্রত্যয়, ক্রিয়া-বিভক্তি, শব্দ-বিভক্তি ইত্যাদিরই সংস্কার। শুধু শব্দের গঠন-সংস্কারে অর্থাৎ শব্দের দৈহিক আকৃতির সংস্কারে, ভাষার চিরন্তন প্রকৃতি সংস্কৃত হয় না, ইহার বাহ্যিক আবরণমাত্র পরি-বর্তিত হয়। নিম্নের উদাহরণ হইতে আমাদের মন্তব্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে :—

১। "কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে"।

২। কে না বাঁশী বায় বড়াই কালিন্দী নদী কূলে।

৩। হে বড়াই, কালিন্দী নদীর কূলে বাঁশী বাজাইতেছে, সে কে?

প্রথম বাক্যটি খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ের মধ্যযুগীয় বাংলার খাঁটি নিদর্শন। দ্বিতীয় বাক্য-টিতে আমরা কেবল কতিপয় শব্দের সংস্কার করিয়াছি; এতদসত্ত্বেও বাক্যটি প্রথম বাক্যের অর্থবোধে কোন প্রকারের বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহায্য করিয়াছে কি? না করিবার একমাত্র কারণ, বাক্যটিতে প্রথম বাক্যটির পদ-বিন্যাস পদ্ধতির অর্থাৎ ব্যাকরণের পরিবর্তন ঘটে নাই। ব্যাকরণের দিক হইতে উক্ত বাক্য মধ্যযুগীয় বলিয়া আমাদের কাছে বর্তমান যুগের লোকের নিকট একেবারেই অবোধ্য। যেই মাত্র তৃতীয় বাক্যে পদ-বিন্যাস-পদ্ধতি

লাভ করিয়াছি। এই বর্ণমালার মূলে, অশোক-লিপিতে ধৃত ব্রাহ্মী-বর্ণমালা। সংস্কৃত ভাষাও দেবনাগরীরূপে এই ব্রাহ্মী-অক্ষরকেই গ্রহণ করিয়াছে। আমরা আমাদের ভাষায় উত্তরভারতীয় প্রাকৃত অপভ্রংশ যেমন গ্রহণ করিয়াছি, সংস্কৃত ভাষাও তেমন সমান তালে দুই হাতে বরণ করিয়াছি। তাহার ফলে মূল ব্রাহ্মী-বর্ণমালার রদবদল করা ভাষায় সম্ভবপর হয় নাই। বর্তমান বাংলা-ভাষায়, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের প্রভাব পূর্ব হইতে কোন অংশে কম ত' নহেই, বরং ক্ষেত্রবিশেষে অনেক বেশি এবং বেশি বলিয়াই বাংলা-ভাষা বর্তমানে এত জোরালো হইয়া উঠিয়াছে। নূতন ভাব-প্রকাশক কোন শব্দ এখনও আমদানী করিতে হইলে বাংলার সংস্কৃত ধাতু হইতে তৈয়ারী শব্দ যেমন খাপ খায়, অন্য কোন শব্দ তেমন খাপ খায় না। বাংলা-ভাষায় যদি পরিভাষার সৃষ্টি করিয়া ভাষাকে পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে পরিণত করিতে হয় এবং ভাষাকে যদি আরও বহু প্রকারে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে হয়, তবে এখনও ভাষাগত সুবিধার জন্য, ভাব-প্রকাশের পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্য, সংস্কৃত-ভাষার শরণাগত না হইয়া গত্যন্তর নাই, বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

এমন অবস্থায় বাংলা-বর্ণমালা-সংস্কার, বনাম বাংলা-বর্ণমালার সংখ্যা হ্রাস করা যায় কি না, সে-বিষয় আমাদের ধারণার অতীত। তৎসম শব্দের বানান-বিকৃতি ঘটাইবার অধিকার আমাদের আছে কিনা, তাহা কে বলিবে? অধিকার যদি সম্মতও হয়, তাহাতে দৃষ্টির দিক হইতে অর্থ বুঝিবার যে গোলযোগ ঘটিবে, তাহাকে কিভাবে সামাল দেওয়া যাইবে, তাহার কোন উপায়, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসিতে চায় না।

বাংলা-বর্ণমালার সংস্কার দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। বাংলা সংযুক্ত অক্ষর, দোতলা-তেতলারূপে সুসজ্জিত অক্ষরেরও সংস্কার সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু, বাংলা-বর্ণমালার সংখ্যা কমানো যায় কি না, তাহাই ভাবিবার বিষয়। কেন না, বর্ণমালার বা সংযুক্ত অক্ষরে দৈহিক আকৃতি-সংস্কার এক ব্যাপার, বর্ণমালার সংখ্যা হ্রাস করিয়া সংস্কার অন্য ব্যাপার। বাংলা-ভাষার বর্ণমালার আকৃতি-সংস্কার যুগে যুগে হইয়াছে। প্রাচীন হস্তলিখিত বাংলা পুঁথি দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই সেইদিনও ছাপার কাজের সুবিধার জন্য স্বনামখ্যাত "আনন্দবাজার পত্রিকা" বাংলা ছাপার অক্ষরের, বিশেষ করিয়া সংযুক্ত অক্ষরের আকৃতি সংস্কার করিয়াছেন। কিন্তু, বাংলা-বর্ণমালার সংখ্যা কমাইবার চেষ্টা আজ পর্যন্ত হয় নাই। যাহা আজ পর্যন্ত হয় নাই, তাহা যে হইতে পারে না বা কখনও হইবে না, তাহা বলার মত ধৃষ্টতা আমাদের নাই। তবে, তাহা এখন সম্ভবপর কি না, সে প্রশ্ন মনে দারুণভাবে জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক।

এইখানে, এক ভাষার বর্ণমালাকে অন্য ভাষার বর্ণমালায় লেখার অর্থাৎ প্রত্যক্ষরীকরণের (Transliteration) কথা উঠিতে পারে। যে-ভাষায় মৌলিক-বর্ণ বা আসল-হরফ কম, সে-ভাষায় অধিক সংখ্যক বর্ণযুক্ত ভাষাকে লিখিয়া দিলে, তথাকথিত বানান ও বর্ণবিভ্রাট কমিয়া যায় বলিয়া কাহারও কাহারও ধারণা থাকিতে পারে। বোধ হয়, এইরূপ কোন ধারণার বশবর্তী হইয়াই খৃষ্টীয় শতাব্দীর শেষার্ধে, বাংলার কতিপয় মুসলমান আরবী-হরফে বাংলা লিখিতে শুরু করিয়াছিলেন। এই জাতীয় কয়েকটি পুঁথি দেখিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে। তাহাতে বাংলা-ভাষার লিখন-রীতির যে-দুর্ভোগ ঘটিয়াছে তাহা বলিবার নয়। বাংলায় ইহা চলিল না। এই সেই দিনও (মাত্র আট-দশ বৎসর আগে), চট্টগ্রাম হইতে মৌলবী জুলফকার আলী সাহেব আবার বাংলা-হরফের পরিবর্তে আরবী-হরফে বাংলা লিখিবার চেষ্টা পান এবং স্বয়ং অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয়ে একখানা পত্রিকা বাহির করিয়া আপন খেয়াল পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিলেও, কেহ তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করে নাই। বিশেষ কোন যুক্তি-তর্কের অবতারণা না করিয়াই বলিতে পারা যায়, এইরূপ ব্যাপার বাংলায় চলে না। কারণ, কেহই এখন নূতন করিয়া বাংলায় হিন্দী এবং উর্দুর অপ্রীতিকর বিবাদ সৃষ্টি করিতে রাজী নহে বলিয়াই মনে হয়।

বাংলাকে আন্তর্জাতিক ভাষার পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য, কেহ কেহ বাংলাভাষাকে Romanize বা ইংরাজী-হরফে লেখারও পক্ষপাতী। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রকাশের আবশ্যকতা আছে বলিয়া, আমাদের মনে হয় না। তবে বাংলাকে Romanize করিলে বাংলা-বর্ণমালার সংখ্যা কমিবে না; কেন না বিশিষ্ট চিহ্ন ব্যবহার করার ফলে, ইংরাজী বর্ণমালার সংখ্যা তাহাতে যথেষ্ট বাড়িয়া যাইবে।

আশা করি এখন দেখা যাইবে, উক্ত ত্রিবিধ সংস্কার এক ব্যাপার নহে। ভাষার সহিত এই ত্রিবিধ সংস্কারের একটি সাধারণ যোগাযোগ আছে বটে, কিন্তু প্রত্যেক প্রকারের সংস্কারের জন্য বিশিষ্ট বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক-নীতির অনুসরণ করিতে হইবে। এই নীতির আবিষ্কার করিতে হইলে, ভাষার প্রকৃতি, গতি ও প্রগতির বিষয় বিশেষরূপে অনুশীলন করিতে হইবে, অন্য কথায়, ভাষার প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা, বর্তমান অবস্থার সহিত সম্যক পরিচয় এবং ভবিষ্যৎ প্রগতির প্রতি নিয়মানুবর্তিতামূলক নৈতিক দৃষ্টি রাখিয়া আবিষ্কারকে অগ্রসর হইতে হইবে। নতুবা কাজ হাসিল হওয়ার সম্ভাবনা নিতান্তই কম বলিয়া মনে হয়। এমন কি, বিপন্ন ও বিব্রত হইবার আশঙ্কাও যে ইহাতে খুব কম আছে, তাহা নয়। এই সমস্ত ব্যাপারে নিতান্ত সাবধানতা ও সুবিবেচনার সহিত অগ্রসর হইতে হয় এবং মনে রাখিতে হয়:

ভাবিয়া যে করে কাজ সুখ তার হয়।
না ভেবে করিলে কাজ মরণের ভয়॥

বানান সংস্কার

সম্প্রতি বাংলা বানান লইয়া দেশে কথা কাটাকাটি হইতেছে। উ-কার ঊ-কার এবং দুই ন ণ, ণ ও তিনটা শ, ষ সর অত্যাচারে সারা জীবন আমাকে ভুগিতে হইয়াছে। সেজন্য দুই বৎসর আগে আমার 'বালুচর' গ্রন্থে আমি শুধু মাত্র উ-কার, ই-কার ব্যবহার করিয়াছি। যাঁহারা এইভাবে বানান সংস্কার করিতে চাহেন তাঁহাদের সহিত কতকটা আমি একমত। কিন্তু আমরা পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারণ যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত হরফ ও বানান সংস্কার মানিয়া লই, তবে আমাদের বংশধরদিগের একচক্ষু অন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। যদি কোনো বানান সংস্কার করিতেই হয়, বাংলা ভাষার সকল সাহিত্যসেবীরা যদি তাহা করেন, তাহা হইলে পূর্বসূরীদের গ্রন্থাবলী সহ সকল সাহিত্য প্রায় নতুন বানান পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিবে। কিন্তু একক পূর্ব পাকিস্তান যদি ধীরে ধীরে নিজেদের বানান পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা করিয়া ফেলেন তাহা হইলে আমাদের চক্ষু উৎপাটনেরই সামিল হইবে। আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এই বানান সংস্কার হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতেছি। নতুবা জনগণের মধ্যে মারাত্মক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়া দেশের শাসকবর্গের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রধাবিত হইবে।

—জসীম উদ্দীন

একটি ভাষার জীবৎকালে তার লেখ্য-রীতির বহু রকমের পরিবর্তনের চেষ্টা অদ্যাবধি বেশি হয় নি। আতাতুর্কের তুরস্কে এবং সোভিয়েট রাশিয়ার অঞ্চল বিশেষে যে জাতীয় চূড়ান্ত সংস্কার সাধিত হয়েছে তার সঙ্গে সে-সকল দেশে সর্বাত্মক বিপ্লবের যোগাযোগ অতি ঘনিষ্ঠ। সর্বাবস্থায় সকল দেশে ঐ প্রকার সংস্কারের সরলীকরণ অনুমোদনযোগ্য নয়। পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষার লিখিত রূপের আমূল পরিবর্তন সাধনের আকাঙ্ক্ষা তখন ব্যাপকভাবে দেশবাসীর মধ্যে দেখা দেয় নি। অন্তত দেশের প্রধান লেখকগণ বা বাংলা ভাষার বিশেষজ্ঞগণ নিজেদের রচনার মুদ্রিত আকারের দ্বারা এ বিষয়ে কোনো দৃষ্টান্ত স্থাপনে উদ্যোগী হন নি।

স্বাভাবিকভাবে ভাষার লিখিত রূপের বা বানানের পরিবর্তন যে হয় না তা নয়। তবে সব সময়েই তা অতি ধীরে ধীরে এবং ক্রমান্বয়ে হয়। কখনও রাতারাতি নয়। সাধারণত পরিবর্তনের কোনো নতুন প্রবণতা প্রতিভাবান লেখকদের রচনায় প্রতিবিম্বিত হয়, তখন বৈয়াকরণ তাকে ভাষার নিয়মভুক্ত করে নেন। অভিধান তাকে স্থায়িত্ব দান করে। সকলে তাকে অনুসরণ করেন। সাম্প্রতিককালে বাংলা ভাষার বানান ও বানানের নিয়ম পরবর্তীকালে মুদ্রিত ও পুনর্মুদ্রিত পুস্তকে ব্যাপকভাবে অনুসৃত হয়েছে; সর্বস্তরের শিক্ষার্থিগণও এই আদর্শকে মেনে চলতে অভ্যস্ত হয়েছে।

অবশ্য ভবিষ্যতে আরও কিছু রদবদল হবে, যেমন, যুক্তবর্ণে দন্ত্য ন এবং মূর্ধন্য ণ-এর পরিবর্তে শুধু দন্ত্য ন; ঙ বা ং সর্বত্র, [illegible] স্থলে ঙ, [illegible] ং এই নিয়মে লিখিত হবে। ঙ এবং ং [illegible] এমন মনে হয় না। কারণ [illegible] দুটি স্বাধীন ও সংযুক্ত রূপে [illegible] এ [illegible] শব্দে এত [illegible] ব্যবহৃত হয় যে উচ্চারণ [illegible] বোধ হবে। তিনটি শ-ষ-স স্থলে একটি, দুই প্রস্থ হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের স্থলে একটি [illegible] ব-ফলা য-ফলা [illegible]-ফলার বদলে সর্বত্র হসন্তের ব্যবহার এবং উচ্চারণ অনুযায়ী [illegible] নতুন নিয়মে প্রয়োগ বাংলা বানানে [illegible] সৃষ্টি করবে। পরিবর্তিত বানানের শব্দের ব্যাকরণগত রূপবৈচিত্র্যের অনেক সঙ্কেত লোপ পাবে, ভিন্নার্থের সমধ্বন্যাত্মক অনেক শব্দ একাকৃতির হয়ে পড়বে। বাক্য মধ্যস্থ অবস্থানের দ্বারা অর্থগত পার্থক্য সূচিত করা সম্ভবপর হলেও, ভিন্নার্থের শব্দ অধিক সংখ্যায় অভিন্ন আকৃতির হলে তা ভাষার ব্যবহারে সরলতা সম্পাদিত করে না। এই সকল বানান একাডেমীর বানান-সংস্কারের সুপারিশ লেখকসঙ্ঘের মুখপত্র 'পরিক্রমে' কঠোরভাবে সমালোচিত হয়। সরকারী ভাষা কমিটির রিপোর্ট-এ বাংলা একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভায় বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক অনুমোদিত বা অভিনন্দিত হয় নি।

লাইনো টাইপের প্রচলনও আমাদের লেখ্যরীতির পুরাতন অভ্যাসকে কিছু কিছু পরিবর্তিত করেছে। কিন্তু সে শুধু হরফের আকৃতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে, বানান-সংস্কারের ব্যাপারে নয়। অনেকাংশে লাইনো টাইপের প্রভাবেই আমরা ক্রমশ যুক্তবর্ণকে বিচ্ছিন্ন করে লেখার এবং সর্বাবস্থায় প্রত্যেক হরফের পূর্ণ আকৃতি অবিকৃত রাখার পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি।

অনেকে দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণের সুবিধার্থে বানান সরলীকরণের সুপারিশ করেন। এরকম প্রস্তাব অহেতুক। দেশের নিরক্ষরতার মূলে দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, ও শিক্ষানীতির প্রভাব যে কোনো ভাষাগত প্রতিবন্ধকতার চেয়ে প্রবলতর। বাংলা ভাষার তুলনায় ইংরেজী বানান শতগুণে, ফরাসী সহস্রগুণে এবং চীনা ভাষা শত-সহস্রগুণে অধিক জটিল হওয়া সত্ত্বেও সে সকল দেশে নিরক্ষরতা দূরীভূত হয়েছে। যে কথা বলা যুক্তিসঙ্গত তা হল এই যে, প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার জন্য বা শিশুশিক্ষার জন্য যে সকল পাঠ্যপুস্তক রচিত হয় লক্ষ্য রাখতে হবে তাতে যেন সহজ বানানের পরিচিত শব্দই অধিক সংখ্যায় ব্যবহৃত হয়। এ-বিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না।

সূচনায় হয়ত ভাষার লেখ্য রূপ মৌখিক রূপকে অনুসরণ করে সংগঠিত থাকে, কিন্তু কালক্রমে লিখিত রূপই একটা স্থায়ী মর্যাদাপ্রাপ্ত হয়। তখন শব্দের লিখিত রূপ বা বানান তার ধ্বনিরূপের মাধ্যম ব্যতীতই সরাসরি অর্থ প্রকাশ করে। দেড় শতাধিক বৎসর ধরে প্রকাশিত মুদ্রিত পুস্তকাদি পাঠে অভ্যস্ত

হরফের অঙ্গ এখন আমাদের কাছে এক-একটি বানানই এক-একটি অর্থের বাহক। এর আকস্মিক পরিবর্তন আমাদের অভ্যাসকে বিপর্যস্ত করবে। এই অভ্যাস যে একটা সংস্কারমাত্র তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই অর্থে ভাষা মাত্রেই সংস্কার বা সামাজিক স্বীকৃতির প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে কোনো শব্দের সঙ্গেই তার অর্থের স্বতঃসিদ্ধ যোগাযোগ নেই। চিত্র যে অর্থে বস্তুর রূপায়ণ, শব্দ সে অর্থে অর্থবহ নয়। কুকুর শব্দের বানান বা ধ্বনি কোনটার সঙ্গেই ঐ জন্তুর আকৃতি বা প্রকৃতির অব্যবহিত সম্পর্ক নেই। সংস্কারই এই সম্পর্কের একমাত্র ভিত্তি।

ইচ্ছে করলে একে কুসংস্কারও বলা চলে। ইংরেজের কুসংস্কার ইংরেজী ভাষা, বাঙালীর কুসংস্কার বাঙলা ভাষা। ইংরেজ যাকে ডগ বলে জানে আমরা সেই একই জন্তুকে কুকুর না বললে চিনতে পারি না। বানানও এইরূপ সংস্কারাধীন, একটা প্রতিষ্ঠিত অভ্যাসের প্রকাশ মাত্র। অবশ্য প্রত্যেক ভাষাতেই সেই অভ্যাসের একটা সুশৃঙ্খল নিয়ম আছে, কারণ আছে, ইতিহাস আছে, যা না থাকলে তার ব্যবহার-যোগ্যতাই লোপ পেত। সহস্র বৎসরের সাহিত্য-সাধনার বিকাশ যে ভাষার ব্যবহারকে একটা সুনির্দিষ্ট রূপ ও পরিণতি দান করেছে আজ অকস্মাৎ তার অবয়ব ক্ষতবিক্ষত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা অনুচিত কার্য।

মুদ্রিত পুস্তক পাঠের সময় আমরা স্বতন্ত্রভাবে বর্ণসমূহ উচ্চারণ করে শব্দের অর্থ গ্রহণ করি না। শব্দের মুদ্রিত আকৃতি সামগ্রিকভাবে অর্থের দ্যোতনা করে। এই কারণে বর্তমানে অভিধানে স্মরণ স্মারক স্মৃতি স্বাক্ষর যে রকম লেখা রয়েছে তার বর্ণমূলক ভোল পাল্টে তাকে সম্পূর্ণ নতুন বানানে লিখলে সেটা হয়ে পড়বে নতুন সংকেত। তখন এই নতুন সংকেতের অর্থ সম্পর্কেও আমাদের নতুন করে সংস্কার গড়ে নিতে হবে। এরূপ সংকট দেখা দেয় বলেই লেই হমঅদ স্নাহএব এর শওক্তা বাংলা বা আবুল হাসানাত সাহেবের হলন্ত বাংলা, প্রচলিত বানানে লিখিত বাংলার চেয়ে শতগুণ বেশি বিজ্ঞানসম্মত হওয়া সত্ত্বেও অপাঠ্য। বানানের যত প্রকার সংস্কার সাধনই করি না কেন, শিক্ষার্থীকে সব সময় চাক্ষুষ পরিচয়ের সাধনার দ্বারা বানান আয়ত্ত করতে হবে। পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই কেবলমাত্র উচ্চারণের সূত্র ধরে শুদ্ধ বানানে উপনীত হওয়া যায় না। বরঞ্চ উচ্চারণের ঐক্য বিধানের জন্য ভাষার বানানকে অপরিবর্তনীয় ধরে নিয়ে তা শুদ্ধরূপে পড়বার বিধিসমূহ তৈরি করে নেওয়া হয়। ভাষাতাত্ত্বিক কর্তৃক ব্যবহৃত কোনো কৃত্রিম ভাষা ব্যতীত অন্য কিছুই সম্পূর্ণ উচ্চারণ অনুসারী হতে পারে না।

যদি উচ্চারণের ভিত্তিতে বানান বানাতে হয় তাহলে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ক্রমাগতই বানান পুনর্গঠিত এবং পুরাতন পুস্তকাদি নতুন বানানে পুনর্মুদ্রিত করা আবশ্যক হবে। নয়া বানানে কিছু পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশ করে যদি পূর্ব-প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ পুরনো বানানেই ফেলে রাখি তাহলে ক্রমশ বিগত দিনের বই পাঠ করা আমাদের জন্য দুরূহতর হবে এবং বর্তমান কালেও, দ্বিবিধ রীতির তাড়নায় বানানের ক্ষেত্রে নতুন পর্যায়ের বিশৃঙ্খলা সূচিত হবে।

ভাষা সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট প্রকাশ। তার মূল রূপকে স্থায়িত্ব দানের প্রসারের ফলেই বুলির বদল হওয়া সত্ত্বেও বানান অবিচলিত থাকে। ইংরেজী বা আরবীর ক্ষেত্রেও একথা সত্য। যদি সামান্য কিছু রদবদল হয়েও থাকে তা এত গৌণ আকারের এবং দীর্ঘকালের ব্যবধানে যে আমাদের কোনো কোনো মহলের সাম্প্রতিক তোড়জোড়ের সঙ্গে তার তুলনা চলে না।

বহুকাল ধরে লিখিত হচ্ছে এমন সব ভাষারই বানান-পদ্ধতি জটিল। উচ্চারণের সংকেত তাতে থাকে কিন্তু তা পুরোপুরি উচ্চারণভিত্তিক নয়। যদি তেমন হত তাহলে হরফ শিখে নিলেই যে কোন ভাষা অনায়াসে শুদ্ধরূপে পড়া যেত। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে একটা নতুন ভাষার হরফ-মালা শিখে নিতে আটচল্লিশ ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না।

বাংলার বানান আমাদের কাছে দুরূহ মনে হয় কারণ আমরা অনেকে কষ্ট করে শুদ্ধ বানান শিক্ষা করি না। আরবী উর্দু বা ইংরেজী বানানও যত্ন নিয়ে না শিখলে শুদ্ধরূপে লেখা যায় না। এবং সে যত্ন বাংলা ভাষার চেয়ে একটু বেশি পরিমাণেই নিতে হয়। নিজের ভাষার প্রচলিত বানান আয়ত্ত করাই যদি বৃহত্তর জাতীয় সমস্যা হয় তবে অজানিত বিষয়ে জ্ঞানাহরণ অসম্ভব বিবেচিত হবে।

উচ্চারণ-ভিত্তিক বানান পূর্ব পাকিস্তানে আরও একটি গৌণ কারণে সমর্থন-যোগ্য নয়। আমাদের অধিকাংশের উচ্চারণ এখনও জেলা-ভিত্তিক। উচ্চারণকে অত্যধিক মর্যাদা দান করলে কার্যত তা আঞ্চলিকতাকেই বলশালী করবে। তাতে বানানের ক্ষেত্রে অরাজকতা আরও বাড়বে। ভাষার লেখ্য রূপের মধ্যে যে ঐক্য স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা কাম্য তা বিনষ্ট হবে।*

—পাকিস্তান ফিচার্স সিন্ডিকেট

* 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকা থেকে সংকলিত।

সাপ্তাহিক বসুমতী

উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির তহবিলে দান
(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

৩৮৪.০০ **টাকা :** বাঁশবেড়িয়া হাই স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ, (হুগলী জেলা)। এঁরা পুরনো কাপড়-চোপড়ও দিয়েছেন।

১১০.০০ **টাকা :** কালীঘাট ওরিয়েণ্টাল একাডেমির ছাত্রবৃন্দ।

৭১.৪৩ **টাকা :** পাতুলিয়া হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ (২৪ পরগনা)।

৬০.৮৫ টাকা : বাঁশবেড়িয়া খামার-পাড়ার (হুগলী) শিশুসঙ্ঘ।

৬০.২০ **টাকা :** "শুভম্", ৩৭/৩ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯। এঁরা পুরনো কাপড়-চোপড়ও দিয়েছেন।

প্রত্যেকে ৫১.০০ টাকা : বিভূতিরঞ্জন দে, সভাপতি দক্ষিণ কলকাতা সার্বজনীন শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা (সংগঠনে : নবযাত্রী সঙ্ঘ, বাদেবাযপুর রোড ও নারকেল বাগান) কলকাতা-৩২। ইন্টার ন্যাশানাল কনভার্সান, টালীগঞ্জ, কলকাতা।

৫০.০০ **টাকা:** উমাশঙ্কর সরাফ, বড়বাজার, কলকাতা-৭।

৪১.০০ **টাকা :** "আমরা সবাই"-এর কর্মীবৃন্দ, ১৬২/১ ও ১৬৪-বি, বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২। এঁরা ২৫ খানা (পঁচিশটি) নতুন কম্বলও দিয়েছেন।

১৪ ০০ **টাকা :** হুগলীর জ্যোতীশ বিদ্যাপীঠের ছাত্ররা।

১২ ০০ **টাকা :** বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা-১২।

১০ ০০ **টাকা:** সুধারাণী চক্রবর্তী, কল্যাণ সমিতি, মধ্যমগ্রাম, ২৪ পরগনা। এস পি চ্যাটার্জী, দুর্গাপুর। অঞ্জনা রায়, কলকাতা-১৩।

প্রত্যেকে ৫.০০ **টাকা :** অরুণ সিংহ, কলকাতা-৭। অংশুরঞ্জন সেন, কলকাতা-২৬। সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, কলকাতা-১০। দেবব্রত রায়চৌধুরী, কলকাতা-১০। পি কে মুখার্জী, মৌলালী, কলকাতা। আর পি তেওয়ারী, কলকাতা। রাসবিহারী চ্যাটার্জী, বর্ধমান। আর কে সিংহ, আসানসোল। ভি পি দাশ, বাঁকুড়া। লালাবাবু, খড়্গপুর। জে এন দাশ, এগরা, মেদিনীপুর।

ঔষধপত্র : ডাঃ মুরারিমোহন ব্যানার্জী, টাকী (২৪ পরগনা)। ডাঃ অসিত মুখার্জী, আর জি কর হাসপাতাল, কলকাতা। ডাঃ গিরীন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী, মধ্যমগ্রাম (২৪ পরগনা)।

[ক্রমশঃ]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

গান্ধী-রোলাঁ সংবাদের পরবর্তী পর্যায়ের আগে বলে নেওয়া দরকার, এইকালে রোলাঁ এমন দু'জন ভারতীয়ের জীবনসৌন্দর্যে মগ্ন হয়েছেন, যাঁরা ভারতীয় প্রতিভার সর্বোচ্চ রূপের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিয়েছেন। রোলাঁর মনে যখন গান্ধীনীতির ও গান্ধী-ব্যক্তিত্বের পূর্ণ মহিমা সম্বন্ধে সংশয়ের সূচনা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও বিচারসহ চিন্তা করতে আরম্ভ করেছেন, তখন তাঁর রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনী রচনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

এই দুই জীবনের মধ্যে ব্যক্তিচরিত্রের যে মহিমা রোলাঁ আবিষ্কার করেছিলেন, অন্যত্র তা পান নি, ভারতবর্ষের প্রতিভার পরিচয় তাঁকে আক্রান্ত করেছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে সম্ভবত বুঝেছিলেন, ভারতবর্ষের পথ আর তাঁর পথ নয়। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে লেখা 'রামকৃষ্ণ' গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, রামকৃষ্ণের জীবনী লিখতে গিয়ে 'পশ্চিম দেশীয় মানুষ হিসাবে তাঁর যে স্বাধীন বিচারবুদ্ধি রয়েছে তার কণামাত্রও ত্যাগ করেন নি'। রামকৃষ্ণ-ভক্তরা তাঁকে প্রচলিত অর্থে যেভাবে ঈশ্বরের অবতার বলেন, রোলাঁ সেইভাবে তাঁকে দেখেন নি; 'আত্মার যে বিপুল বাহিনী যুগে যুগে অভিযান করে চলেছে', যাদের মধ্যে যাত্রা করেছেন বুদ্ধ বা খ্রীস্ট, রোলাঁ দেখলেন, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সেই পথেরই যাত্রী। সেই জন্যই রোলাঁ সমসাময়িক ভারতীয় অধ্যাত্ম বীরদের মধ্যেও এই দু'জনকে স্থাপন করে বিচার করেছেন। সমকালের অন্যান্যদের সঙ্গে রামকৃষ্ণের প্রভেদ এইখানে, তিনি 'অন্যান্যদের অপেক্ষা নিজের মধ্যে, সকল নির্ঝর ও সকল নদীর যেখানে মিলন ঘটেছে সেই বিধাতারূপী নদীর মহাসঙ্গমকে পূর্ণতরভাবে অনুভব করেছিলেন।' 'আধ্যাত্মিক জীবনের বিপুল শোভাযাত্রার মধ্যে এই দুইজন অতুলনীয় শক্তি ও সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে বিশ্বাত্মার অনুপম সুর-সঙ্গতিকে উপলব্ধি করেছেন।' পৃথিবীর মহাতৃষ্ণা দূর করবার জন্য রোলাঁ অবশ্যই তার কাছ থেকে শুদ্ধ বারি আহরণ করবেন, ইউরোপের শুষ্ক ওষ্ঠাধরকে অমরতার শোণিতধারায় সহজ-সিক্ত করতে' সেই গঙ্গাবারি দান করবেন, কিন্তু তাই বলে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের মধ্যেই থেমে যাবেন না। রোলাঁ লিখেছেন—

'কিন্তু এই নদীতটেই আমি নতজানু হইয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিব না। এই নদীপথ ধরিয়া সমুদ্রের উদ্দেশে অবিরাম যাত্রা করিয়া চলিব। এই নদীর বাঁকে বাঁকে, যেখানে মৃত্যু আসিয়া আমার পথ-প্রদর্শকদিগকে হাঁকিয়া বলিয়াছে 'ক্ষান্ত হও', সেখানে আমি আমার সহযাত্রীদিগকে একে একে পিছনে ফেলিয়া আগাইয়া চলিব, বহন করিব উৎসের অর্ঘ্য সঙ্গমের উদ্দেশ্যে।...এইরূপেই আমরা এই নদীর মধ্য, ইহার ক্ষুদ্র-বৃহৎ উপনদীগুলির মধ্যে, এমন কি সেই মহাসমুদ্রের মধ্যে আলিঙ্গন করিব জাগ্রত বিধাতার গতিমান সমগ্র বিশ্বকে।'

এক বিধাতার কথা রোলাঁ বললেও তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন, খ্রীস্ট নামক বেদনাবহনকারী বিধাতায় তিনি বিশ্বাসী নন, এমন কি কোনো দেহধারী বিধাতাতেও বিশ্বাস করেন না। কিসে তাঁর বিশ্বাস, তা লিখেছেন মহনীয় ভাষায়—

"যাহারই অস্তিত্ব আছে, তাহাতেই আমি বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি দুঃখে, সুখে। বিশ্বাস করি সর্বপ্রকার জীবনে। বিশ্বাস করি মানবজাতিতে। বিশ্বাস করি বিশ্বে। বিশ্বাস করি তিনিই ভগবান যিনি নিরন্তর জন্মলাভ করিতেছেন। ক্ষণে ক্ষণে নূতন করিয়া সৃষ্টি চলিতেছে। তাই ধর্মের শেষ নাই। ইহা এক অবিরাম কর্ম, এক অবিরাম কামনা, ইহা বদ্ধ জলাশয় নহে, ইহা নির্ঝরের জলোচ্ছ্বাস।"

'রামকৃষ্ণ' গ্রন্থের ভূমিকাতে রোলাঁ আরও জানালেন, তাঁর মতে ধর্ম কী? যাঁরা আনুগত্যের বা স্বার্থের বা আলস্যের কারণে ধর্মে বিশ্বাস ঘোষণা করেও বিশ্বাসের সত্যতা পরীক্ষা করেন না, রোলাঁ তাঁদের ধার্মিক বলতে চান না। আবার যারা নিজেদের ধর্মবিরোধী বলে প্রচার করেন, তাঁরা সোস্যালিজম, কমিউনিজম, মানবিকতা, যুক্তিবাদ প্রভৃতি মতবাদের মধ্য দিয়ে 'সকল যুক্তির ঊর্ধ্বে একটি চেতনার মধ্যে নিজেদের নিমজ্জিত রাখেন।" সুতরাং রোলাঁ জানাচ্ছেন, "যদি কোনো চিন্তা নির্ভীকভাবে সমস্ত ক্ষতির বিনিময়ে, সকল স্বার্থ ত্যাগ করে, একান্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সত্যের সন্ধান করে, তবে আমি এই চিন্তাকেই ধর্মমূলে বলব।' এখানে রোলাঁ বিবেকানন্দের চিন্তারই প্রতিধ্বনি করছেন, কিংবা এখানে উভয়ের চিন্তার ঐক্য রয়েছে।

রোলাঁ, রামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দের কাছে কৃতজ্ঞ এইজন্য, অধ্যাত্মবাদী হয়েও তাঁরা মানুষকে এতখানি মানস-মুক্তি দিতে পেরেছিলেন। ধর্মের মধ্যে আছে আলো—অন্ধতা নয়, আছে যুক্তি ও বুদ্ধির মুক্তি, এবং চেতনার উত্তরণ। গান্ধীর যুক্তিহীন অন্ধতা, কথা ও কাজের অসঙ্গতি যখন রোলাঁর শ্বাসরোধ করে আনছিল, তখন রামকৃষ্ণের মধ্যে রোলাঁ এমন একজনকে দেখলেন, যাঁর জীবন ও বাণীর মধ্যে পার্থক্য ছিল না; বিবেকানন্দের মধ্যে রোলাঁ দেখলেন বিরাট মনীষা (তুলনায় গান্ধীর কোনো মনীষাই ছিল না, রোলাঁ জানিয়েছেন) ও বিরাট হৃদয়ের সমন্বয়, আত্মমুক্তি-বাসনার সঙ্গে লোক-কল্যাণেচ্ছার প্রচণ্ড সংঘাত; দেখলেন, এই

দুই দ্বন্দ্বে জর্জর যোদ্ধার অকাল-মৃত্যুকে। সন্দেহ নেই রোলাঁ অভিভূত হয়েছিলেন। রোলাঁর মধ্যে সমাজবাদের দ্বারা শ্রমিকের মুক্তির ধারণা ইতিমধ্যেই প্রবলতর হয়েছে, বিবেকানন্দ-কাহিনী লিখছেন কেন সেই কৈফিয়ৎ তাঁকে নিজের কাছেও দিতে হয়েছে: বলেছিলেন, তিনি সখের লেখক নন, ক্লান্ত হতাশ পাঠকদের আত্মহারা হবার সুযোগ দিতে তিনি লিখছেন না; ভারতীয়দের মধ্যে বিবেকানন্দ ও গান্ধী, এই দুইজন কর্মের আবেগে স্পন্দমান বলেই তাঁর মনোযোগ পেয়েছে; তবু এ-কথা কদাপি মুছে যাবে না, বিবেকানন্দ যে পরিমাণে কর্মের প্রেরণা দিয়েছেন সেই পরিমাণে কর্মী নন, তাঁর কর্মের চেয়ে তাঁর বাণী অনেক বড়। এবং তাঁর জীবনও তাই। সুতরাং রোলাঁ যে নিজ জীবনের মোট দুটি বছর রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জন্য ব্যয় করেছিলেন, তার মূলে নিশ্চয়ই উভয়ের কর্ম-দর্শন ও বিশ্ববাণী ছিল; আমাদের মনে হয়, সমান-ভাবে ছিল "এই দুই জীবনের বেদনাময় কাহিনীর অপরূপ কাব্যময় সৌন্দর্য ও হোমারীয় গাম্ভীর্য।" রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনের মধ্যে শিল্পী রোলাঁকে খুশি করবার মত উপাদান যথেষ্টই ছিল। মনে রাখতে হবে, রোলাঁর রচিত শেষ জীবনী এই দুইটিই, এবং তিনি মাত্র দুজন ভারতীয়েরই জীবনী লিখেছেন—গান্ধীর উপর তাঁর গ্রন্থটি জীবনী নয়, দীর্ঘ প্রবন্ধমাত্র। রোলাঁর কাছে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ একালে ভারতীয় প্রতিভার সর্বোচ্চ প্রতিনিধি এবং পৃথিবীর প্রতিভার ইতিহাসে দুটি আধুনিক সংযোজন। এঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে, এঁদের জীবনের বক্তব্যকে উদ্‌ঘাটিত করে, রোলাঁ অতঃপর মানবসমস্যার সমাধানে নূতন পথ অবলম্বন করবেন—তাঁর 'পনের বছরের সংগ্রামের' শেষ হবে।*

পরবর্তী পর্যায়ে পাচ্ছি ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রোলাঁর সাক্ষাৎ। রাশিয়া যাওয়ার পথে জেনেভায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রোলাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। ভারতবর্ষে শোচনীয় মানসিক অবস্থার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সময় কাটিয়েছেন। "শান্তিনিকেতন বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ, কবি এখনও বিচ্ছিন্ন; দেশের যুবসমাজ তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে না; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রোলাঁ ছাড়া বন্ধু নেই; উল্লেখযোগ্য বড় কিছু লিখছেন না।" রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া যাচ্ছেন বলে রোলাঁ খুশি হলেন। ঐ নতুন দেশ ও নতুন ব্যবস্থা সম্বন্ধে কবির জ্বলন্ত আগ্রহ লক্ষ্য করলেন। সেই সঙ্গে করুণা ও কৌতুক বোধ করলেন সাহিত্যসৃষ্টিতে ঘাটতি পূরণ করতে, 'নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতে' ছবি আঁকার কবি ব্যাপৃত! ভগ্নস্বাস্থ্য কবির দেশ-ভ্রমণ রোলাঁ যেমন পছন্দ করেন নি ("এটা তাঁর পক্ষে একটা রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে"), অস্মানি ছবি আঁকার মত্ততা দেখেও দুঃখের হাসি গোপন করতে পারলেন না।। রোলাঁ রবীন্দ্রনাথের মুখে শুনলেন—"আমার অন্যান্য কাজে এখন আমি সম্পূর্ণ উদাসীন; কেবলমাত্র একটি বিষয়ে গর্বিত—তা হচ্ছে আমার চিত্র।"

চিত্রাভিমানী রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রোলাঁর কিছু অম্লমধুর বক্তব্যঃ

> "এই চিত্রগুলি যেভাবে ইউরোপে সমাদৃত হয়েছে, তা তাঁকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে। এই সমাদরের মধ্যে কতখানি উন্নাসিকতা ও মিথ্যা ভদ্রতা লুকিয়ে আছে তা কবি দেখতে পাচ্ছেন না।...জার্মান সরকার তাঁর ৩।৪ খানা চিত্র বার্লিন গ্যালারির জন্য কিনেছে। তিনি খুবই খুশি। তাঁর একটুও বলতে বাধল না, 'দুনিয়াতে এখন যাই ঘটুক না কেন, আমার তাতে কিছু এসে যায় না। আমি এখন আমার সত্যকারের আনন্দ খুঁজে পেয়েছি। আমি স্বাধীনভাবে জীবন শুরু করেছিলাম, গান ছাড়া আর কোনো চিন্তা ছিল না, সেই-ভাবেই শেষ করব। পাখি গান করে, যেমন সূর্যোদয়ে তেমনি সূর্যাস্তে।' এইসব কথা বলতে বলতে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধুই পাখির মত গান করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না, নইলে কেন তিনি বিশ্বভ্রমণ করছেন, রাশিয়ায় যাচ্ছেন! স্বতঃই রোলাঁর সঙ্গে আলোচনায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ উঠল, কেন না অল্পদিন আগে রোলাঁর জীবনীগ্রন্থ দুটি বেরিয়েছে। রোলাঁ স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনের শক্তি ও সৌন্দর্যের গভীরে প্রবেশ না করে, তাঁদের ধর্মীয় মতের অংশবিশেষ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন! রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কার একেশ্বরবাদের পক্ষে দাঁড়ালেন। রামকৃষ্ণের সমন্বয় মতের বিরুদ্ধে বললেন, 'ধর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত উদারতা ও সহিষ্ণুতা কল্যাণকর নয়।' কালীপূজক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সার্বভৌম ধর্মাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা না জানিয়ে (বিচিত্র, কয়েক বছর পরেই প্রকাশ্যে এক কবিতায় তা জানাবেন!) রামকৃষ্ণ - বিবেকানন্দের আরাধ্য দেবীকে নিয়ে পড়লেন। "কালী-পূজা ও ধর্মের নামে জীবহত্যাকে কবি তীব্র ভাষায় নিন্দা করলেন (এত উত্তেজনা ও ক্রোধের সঙ্গে তাঁকে কথা বলতে আমি কখনো শুনি নি'—রোলাঁ)। তাঁর বাল্য-কালের কলকাতায় এক কালীপূজার রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার সময়ে রাগে ও ঘৃণায় কাঁপছিলেন। আবেগের সঙ্গে জানালেন, এইসব রক্তাক্ত নীতি প্রবর্তনকারী

* শ্রীযুক্ত প্রমোদ সেনগুপ্ত মহাশয় শেষ জীবনে রোলাঁকে কমিউনিস্ট দেখাবার আগ্রহে বহুবার বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, ভারতীয় ধর্মদর্শনাদিতে তাঁর আর আস্থা ছিল না। এই প্রসঙ্গে তিনি জাঁ-এরবের-কে লেখা ২৯ জুন, ১৯৩৭-এর একটি চিঠি উদ্ধৃত করেছেন, যার মধ্যে ধর্মের চার্চগুলির বিরুদ্ধে রোলাঁর কঠোর বক্তব্য রয়েছে। ঐ চিঠিতেই কিন্তু পাচ্ছি, রোলাঁ লিখছেন, "আমার বিকাশ ঠিক বেদান্তসম্মত হয় নি, যদিও বেদান্তের প্রতি আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রাখি। আমার এই শ্রদ্ধা জাঁ-ক্রিসতফের মত, যে ভণ্ডামি ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।"

তিস্তাকে

অমিয়কুমার হাটি
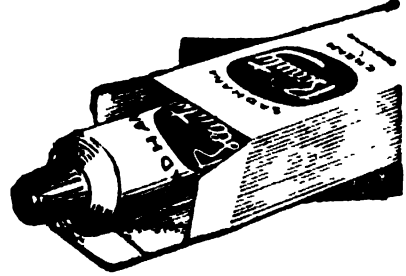
তিস্তা তোমার শীতল গরল অনল ছড়িয়ে দিলে,
হতে পারলে কি ভিসুভিয়াস?
যদিও জমেছে পুরু পলিমাটি শবদেহ আর করুণ কান্না
দীর্ঘশ্বাস

হৃদয় ছেয়েছে শকুন-চিলে,
তবুও গভীর সহানুভূতিতে কেমন করে যে হৃদয় জাগে,
ক্ষত জনপদে ধ্বংসস্তূপে .
সমবেদনায় সমবেত হলে কেমন করে যে প্রলেপ লাগে—
[illegible] এবার জনস্তূপে।
[illegible] দেশের মা-বোন-ভাইরা কাঁদবে না শুধু শপথ নেবে
[illegible] ইস্পাত-দৃঢ় নতুন হোক
জীবন জীবন যদি কাল বন্যা এমন কি শাপ দেবে?
তিস্তা তোমার ফটিক চোখ।

চোখের জলের বাঁধ ভেঙেছে

জয়ন্ত সাহা

রাজা, আমার চোখের জলে বাঁধ বেঁধেছে
শক্ত এবং অনেক উঁচু হিসেবি বাঁধ।
হায় রে! আমার চোখের জলের বাঁধ ভেঙেছে।

অনেক আগে খবর পেয়ে ঠাণ্ডা ঘরে বসে বসে হিসেব মিলল
কত মানুষ মরতে পারে। ফাইল পত্র রেডি তোমার?
আমার চোখের জলে তুমি বাঁধ বেঁধেছ অথচ আমায় বললে . . .
পাছে আমরা সজাগ থাকি।

বাবা, আমার চোখের জলে বাঁধ বেঁধেছ
মরা মানুষ
পান চিবনো স্বভাব তোমার সাপ্তাহিক চুরুট টানা
কেমন করে শিখলে তুমি চোখ মিটমিট পালিয়ে থাকা?

থেকেই আসে যুদ্ধ ও হত্যা করার প্রবৃত্তি।' 'এইসব ব্যাপারে তিনি কোনো আধ্যাত্মিক বা প্রতীকী ব্যাখ্যা মানতে রাজী নন। এই ভয়ঙ্করী দেবীকে যারা পূজা করে তাদের সততা ও মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে কবির যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতে এই দাবি তিনি সম্পূর্ণ বিলোপ কামনা করেন এবং মানবমনের প্রধান শত্রু এই কুসংস্কারের আস্তাবল পরিষ্কার করার জন্য যদি ভারতে নাস্তিকতাবাদের প্রয়োজন হয় তো তাতেও আপত্তি নেই।'*

---

* শাক্ত ধর্ম ও সাধনার প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিরূপতার কথা রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিরা সকলেই জানেন। ঈশ্বরের মাতৃভাবের উপাসকেরা বা ঐ মতের পক্ষপাতীরা (যেমন স্যার জন উডরফ) রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন। যাই হোক, এই আলোচনা-বিবরণী থেকে শাক্তসাধনার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অবসেশনের একটা হেতু পাওয়া

রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে বোলা তাঁকে দৃষ্টান্ত সহযোগে জানালেন, কবির এত

গেছে—বাল্যে বলিদানের এক রক্তাক্ত স্মৃতি তিনি ভুলতে পারেন নি। সত্যই পারেন নি, অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা থেকেও তা পাই. 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয়কালে রঘুপতিবেশী রবীন্দ্রনাথ কালীমূর্তি বিসর্জন দেবার জন্য দুহাতে তুলে নিয়ে স্টেজের বাইরে গিয়ে কিভাবে রুদ্ধ আক্রোশে ঠকঠক করে কাঁপছিলেন, তার উল্লেখ পাই। আলোচ্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অস্বাভাবিক উত্তেজনা দেখে রোলাঁও বিস্মিত হয়েছেন। অতঃপর রোলাঁকে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন তা আত্মহারা অবস্থায় বলা চলে সে-কথাগুলির আক্ষরিক বিচারের চেষ্টা না করাই ভাল। নচেৎ, 'এই ভয়ঙ্করী দেবীকে যারা পূজা করে', 'যাদের মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে কবি সন্দিহান', তাদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ আছেন (কালীই যে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ

মনে হত "সর্বোচ্চ পর্যায়ের এই সকল দেবী মূর্তিগুলির উৎপত্তিও ভারতের কালীপূজার মতই রক্তাক্ত।" [ক্রমশঃ]

এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কালো পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছিলেন, তা আমরা বুঝতে পারি), যাঁর বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা' কবিতা এবং কবিতার শেষ ছত্রে 'প্রণামের' কথা যে-কেউ স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন (কেউ কেউ বলেছেন, কবিতাটি উপরোধে পড়ে লেখা। এঁরা কবির প্রতি সুবিচার করেন নি, কারণ এঁদের কথা মেনে নিলে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিকতা ও সাধুতায় সন্দেহ করা হবে!); কিংবা বিবেকানন্দের বিষয়ে কবির প্রশস্তির মুষ্টিভিক্ষা থেকে আহৃত দু'-একটি লাইন; অথবা কালী-উপাসিকা ভগিনী নিবেদিতার উপরে রচিত সুদীর্ঘ প্রবন্ধের কথা। যে-সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক-নির্ণয় বর্তমান রচনার উপজীব্য, সেই সুভাষচন্দ্রও ব্যক্তি-জীবনে কালী-উপাসক ছিলেন।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ পঁচিশ ॥

বিজ্ঞানজগতে বিপ্লব ঘটে গেছে। কথাটা বস্তু পুরানো, বিস্তর শোনা। দুর্বার বিদ্যুৎ বিজ্ঞানের অভিযান। পথের দূরত্ব আর মনের দূরত্ব। দুনিয়ার কোন ঠাঁই আর অজানা নেই, মানুষের মনোভূমিও নেই।

কূটনীতি কিন্তু বিজ্ঞানকে বানচাল করে দিল, বিজ্ঞান তারই দাসত্ব করছে। কোথায় মানুষ হবে বিশ্বনাগরিক, এদেশ-ওদেশ সীমানা চিহ্নগুলো মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যা, পর উপরি—হচ্ছে বিপরীত। এক ভিয়েৎনামের উপর খাঁড়ার মতন লাইন কেটে দুই ভিয়েৎনাম বানিয়েছে। তেমনি দুই কোরিয়া। ঐতিহ্যময় এমন যে জর্মনি দেশ, দুনিয়াকে বারবার কাঁপিয়ে দিয়েছে—সে-ও আজ দুইখণ্ডে বিচ্ছিন্ন হয়ে ম্রিয়মাণ। সকল জর্মনের প্রাণের অধিক প্রিয় বার্লিন—শহরটার উপরেও পাকা পাঁচিল তুলে পৃথক করা হয়েছে। বাপ মরার পর ছেলেরা যেমন ভদ্রাসনের মাঝে বেড়া তুলে দেয় তেমনি। পূর্ব বার্লিন আর পশ্চিম-বার্লিন। খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গিয়েও তো সোয়াস্তি নেই ধুন্দুমার উভয় তরফ। কূটনীতিজ্ঞ বাহাদুরি এই—এর বিপক্ষে ওকে লাগিয়ে দেওয়া। সম্মিলিত সুখী কেউ না হতে পারে। তা হলে তো মাথা খাড়া করে দাঁড়াবে, পদতলে পড়ে 'আজ্ঞে' 'আজ্ঞে' করবে না। মাতব্বররা কখনো একে কোল দিচ্ছে, কখনো ওকে। আহা, কমজোরি ভাবছ বুঝি নিজেকে—আছে। দিচ্ছি অস্ত্র-সাহায্য, নিয়ে নাও। সাহায্য মানে বিক্রি। এমনি প্যাঁচে ফেলেছে, কিনতে পেয়ে আপনি কৃতকৃতার্থ। ক্ষুধার অন্ন নির্বিকারে বিক্রি করে দাম জোগাড় করছেন। অস্ত্র কিনে কিনে ভাই কখনো কাল অবধি যার সঙ্গে একসঙ্গে ছিলেন তারই মুণ্ডপাতের ব্যবস্থায়। অপর পক্ষ জানিয়েছে লাগিয়েছেঃ আমরা যে নেমে যাচ্ছি এদিকে। কৃপাবানরা অভয় দেনঃ কুছ পরোয়া নেই। কিনুক গে যত খুশি। অস্ত্রশস্ত্র ওদের পলকে লোহার পিণ্ড বানিয়ে দেব, এমনি চিজ আছে আমাদের, ঢাকা লোগাড় করে আনো। ধড়িবাজ জুয়াড়ি গুজোর পায়ে অস্ত্রের বাবদ যথাসম্ভব বিকিয়ে দেবার পাল্লাপাল্লি লেগে গেছে।

সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। ব[illegible]ম্বর ঘর থেকে বাইরে এলেন। উঠানে পায়চারি করছেন। মধুর হাওয়া দিয়েছে। আকাশে চাঁদ। 'আমার সোনার বাংলা, তোমায় আমি ভালবাসি—' কত ছেলের মুখে শুনেছেন এই গান—কী আকুল করা সুর! লাইন টেনে আমার সোনার বাংলাকে চিরে ফেলেছে। কুড়িটা বছরও হয় নি এখনো ঘা দগদগ করছে। তেরশ মাইল বর্ডার লাইন—অ নোয়াবের এই ঘাট-অফিসের সামান্য দূর দিয়ে। অলঙ্ঘ্য গিরি সমুদ্র-নদী নয়, এমন কি জাফিকে-পার হওয়া। যায় এমনি খালও নেই সীমানা চিহ্ন রূপে। ইতস্তত পিলার গেঁথে দিয়েছে। একই ক্ষেতখামার ফলসা-বাগান পুকুর-বাড়ি ভেদ করে লাইন চলে গেছে। কারো পুকুরের সিকিখানা পাকিস্তানে, বাকিটা ভারতে, কারো রান্না-ঘরটা ভারতে শোবার-ঘর পাকিস্তানে—আগে হাজার হাজার ক্ষেত্রে এমনি দেখা যেত মানুষ তারপরে সরিয়ে ঘুরিয়ে ঘর বেঁধে নিয়েছে, পুকুর খানিক-খানিক ভরাট করে ফেলেছে।

কদিনের কথা! কুড়ি বছরও হয় নি এখনো। আঘাত এমন জোরে আর এত আকস্মিক ভাবে এসে পড়ল, জাতির আত্মচেতনা অসাড় হয়ে রইল কিছুকাল। সরল নিরক্ষরগুলো পরম বিশ্বাসে যাঁদের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে বেড়িয়েছে, বিশ্বাসের মর্যাদা তাঁরা রাখেন নি—সাদা-কথায় অন্ধ বলকরে দিন। কত বড় সর্বনাশ হয়েছে, দিনকে দিন সেই জিনিস প্রকট হয়ে পড়ছে। দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধের শেষে সকল প্রায় হাতের নাগালে এসে গেল—এক [illegible] উঠে বসে হিন্দুস্থানের মসনদে বসে যাই, নইলে আর কোন হতভাগা [illegible] থেকে এসে [illegible] চেপে—লোভ আর লালসা [illegible] সহিত্য কঠিন। দেশ [illegible] স্বাধীন হবে নাকি। [illegible] দেশের লোক [illegible] ভারতবর্ষের ঘাড়ের উপর [illegible] কোপ। ভানুমতীর খেল—এক [illegible] দুই দেশঃ পাকিস্তান [illegible] ভারত। চরম প্রতিশোধ নিয়ে ইংরেজ বিদায় হল। ভূত কাঁধ থেকে নেমে [illegible] একখানা বড় ডাল [illegible] এই প্রকার। [illegible] পড়ার, [illegible] ব্যবস্থা করে গেছে। [illegible] সংস্কৃতিবান মানুষ—[illegible] নিমিত্তভাগী হয়ে [illegible] করাছেন বোধহয়। [illegible] —আমার দ্বারা হবে না এবং [illegible] পুতুলি [illegible] উঠলেন তিনি। [illegible] ব্যাটেও কে [illegible] কালেনঃ জাহাজি [illegible] বর্ণ্যাচের আমি কি বুঝি। [illegible] মাথা-ভাঙাভাঙি লাগালেন—দেশ ভাগ ছাড়া উপায় কি ছিল [illegible]। সেই [illegible] উল্টো বাহাদুরি [illegible] স্বাধীনতা দুনিয়া [illegible] এই পথই আদর্শ [illegible] সে দুর্মতি কখনই হবে না [illegible] বহুবর্ষব্যাপী আমাদের এই [illegible] পর। রক্তপাত হয় নি—কত বড় [illegible] ধাপ্পাবাজি, জানাও [illegible] নেই। নাটের গুরু যার [illegible] একজন চার্চিল সাহেবের হিসাব : অন্তত ছয় লক্ষ মানুষ দাঙ্গায় প্রাণ দিয়েছে। এর সিকি পরিমাণও যদি সহজ পথে সাম্রাজ্যবাদী বিতাড়নে প্রাণ দিতে পারত, স্বাধীনতা একেবারে ভিন্ন চেহারা নিত। নেতাজী আহ্বান দিয়েছিলেন : আমায় রক্ত দাও, আমি স্বাধীনতা দিচ্ছি। ধারে কাছে যে সব ভারতীয় ছিল, বিদ্যুৎ-স্পর্শ পেয়েছিল তারা

অন্তরে। নিজেদের উজাড় করে দিয়েছিল তারা। সহস্র বাধা পেরিয়ে সে আহ্বান সুদূরবর্তী আমাদের কানে কতটুকুই বা পৌঁছল! যুবশক্তি তবু ক্ষেপে উঠেছিল, অহিংসার দড়াদড়িতে বেঁধে-ছেঁদে এবং কানে রামধুন-গীতি শুনিয়ে কোনরকমে সামলানো হল তাদের। তেড়ে ফুঁড়ে জওহরলাল তো নেতাজীর সঙ্গে সম্মুখ-সমরে উদ্যত। বস্তুত্র সময় নয়, অস্ত্রশস্ত্রের সময়। দৃশ্যটা উপভোগ্য হত, সন্দেহ নেই, জিনিসটা সত্যি সত্যি যদি ততদূর অবধি যেত।

চিরকালের মাস্টার-মানুষ বীরেশ্বর—ইতিহাসের পড়ুয়া। যে জিনিস নিয়ে ভারত-খণ্ডন, দুনিয়ার কুত্রাপি তার নজির পাওয়া যায় না। জাতবেজাত আছে সকল দেশে এবং সকল সম্প্রদায়ের ভিতরেই। শুধু হিন্দু-মুসলমান কেন, গাঁ-গ্রামে আমাদের ছত্রিশ জেতের ঘরবসত। চিরকাল ধরে আছে। বামুনপাড়া কায়েতপাড়া, শেখপাড়া, বদ্যিপাড়া, জোলাপাড়া এমনি ভাবে আছে সব পাশাপাশি পৃথক আচার-বিচার পূজা-নমাজ নিয়ে।

কিন্তু বীরেশ্বর যাদের পড়িয়েছেন, তাদের ভিতর ছিল না। তারা হিন্দু ছিল না, মুসলমানও নয়—বলতে পারেন বাঙালি-ছাত্র [illegible]। ছাত্রসমাজ থেকে জাতবেজাত বিদায় নিচ্ছিল প্রায় সেই স্বদেশি আমল থেকে। ধরুন, বিয়েথাওয়া কি [illegible] কোন এক বাড়ি ছাত্রদের নেমন্তন্ন খেতে ডাকছে: কায়স্থেরা বসে গেল দক্ষিণের বারান্দায়, ব্রাহ্মণেরা দরদালানে, মুসলমানেরা পুবের বারান্দায়। কই [illegible] কেউ যে ওঠেন না?

ছেলেরা একটি জায়গা নিয়ে একত্র বসেছে, গুলতানি করছে। তারা বলল, ওসব ছাড়ও আমাদের ভিন্ন একটা জাত হয়। ও'দের সব হয়ে যাক—আমাদের সকলের একসঙ্গে ঠাঁই হবে, একত্র বসে খাব।

[illegible] ছড়াচ্ছে দিনকে-দিন। ছাত্র আন্দোলন—বছরের পর বছর দুরন্ত বেগে বাড়ছে। পুরনো ছাত্রেরা পড়াশুনো চুকিয়ে সংসারে ঢুকেছে, নতুনেরা এসে দলে দলে ইস্কুলে কলেজে ঢুকছে। যত্রতত্র ইস্কুল কলেজ খোলা হচ্ছে, ছাত্র ভর্তির তবু জায়গা পাওয়া দায়। কী মুশকিল, সবাই যে একাকার হয়ে যায়। জাতের বজ্রআঁটুনি [illegible] আর টিকিয়ে রাখা যাবে এই অবস্থায়? মুসলমান আর হিন্দু আলাদা জিইয়ে রাখায় যাদের স্বার্থ, উঠে পড়ে লাগল তারা। বিস্তর ক্ষমতা তাদের, অঢেল ঐশ্বর্য, ক্ষুরধার কূটবুদ্ধি। ফলে দেশবিভাগ—মুসলমানের নামে টুকরো কাটা হল ভারতবর্ষ থেকে। অথচ আরও লাখ লাখ মুসলমান যে ভারতে রইলেন তাঁদের সম্বন্ধে নিশ্চুপ। প্রগতির বড়াই করে মানুষে, অথচ এইকালেই এমন সব বিদঘুটে ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে।

একমাত্র ছেলে নকুলেশ্বর, বাপের মতন মাস্টার সে-ও। ধরণীর গুণী-জ্ঞানীরা মানুষকে উঁচুতে তোলবার জন্য যে সব আয়োজন রেখেছেন, তারই অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন নিয়ে ছিল সে। নির্বিরোধী সেই ছেলেটিও স্বাধীনতার বলি। বলি নিতান্তই আক্ষরিক অর্থে—কালীপুজোর সময় পাঁঠার ঘাড়ে খাঁড়ার কোপ মারে, অবিকল তেমনি ব্যাপারই ঘটেছিল সন্দেহ নেই। হামেশাই তো ঘটেছে, কতজনে স্বচক্ষে দেখেছেন। হিন্দুরা ফলাও করে মুসলমানি অত্যাচারের নারকীয় বর্ণনা দিয়েছেন, মুসলমানরাও পাল্টা জাত-শয়তান বলেছেন হিন্দুদের।

হেমকান্ত বোনকে যশোরে শ্বশুরের কাছে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। কী ভয়ানক অবস্থা তখন লীলার! সে চেহারা মনে পড়লে বৃদ্ধ বীরেশ্বর শিউরে ওঠেন আজও। দেশ-জোড়া প্রলয়-আগুন—তারই ভিতর থেকে ছুটোছুটি করে বেরিয়ে এসেছে, লীলার গায়েও আগুন ধরে গেছে যেন। ক্ষীণদেহ দাউদাউ করে জ্বলছে বুঝি তখনো। মাথার ঠিক নেই। ঘোমটার কাপড় ফেলে ঘন ঘন গলার উপরের কালসিটে দাগ দেখায়। আবার হেসে হেসে বলে, আমার দাদা থাকলে তাঁর গলাতেও ফাঁসির দড়ির কালসিটে দাগ থাকত এমনি। ভাই-বোন দুজনেই আমরা ফাঁসিতে মরেছি। মরে গিয়েও আমি নরলোকে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছি। কেন, জানো?

হাসি মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে ধক করে দুটো চোখের মণি জ্বলে ওঠে। চোখে সত্যিই যেন আগুন। বলে, কেন জানো? মরে গিয়েও কেন আমি জ্যান্ত হয়ে বেড়াই? ছোড়দা আমায় এত করে বলল কারো কথা না শুনে নিরাপদ কলকাতা ছেড়ে ছোট্ট মেয়ে নিয়ে পাকিস্তানে বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ীর ঘাড়ে এসে পড়লাম—কেন জানো? কেন জানো?

বীরেশ্বর শশব্যস্তে থামিয়ে দিতেন: জানাতে হবে না মা। কেউ কিছু জানতে চায় না তোমার কাছে। চুপ করো তুমি। শোবে চলো।

ধরে পাকড়ে সরিয়ে নিয়ে যেতেন লোকের সম্মুখ থেকে। ঘুমের ওষুধ খাইয়ে শুইয়ে দিতেন। পাগলামির প্রকোপ বাড়ত এক এক সময়, তখনই এমনিধারা করত, এমনি সব বলত। অন্য সময় শান্ত সেবাময়ী গৃহস্থবধূ, আর দশটা মেয়ের সঙ্গে কিছুমাত্র তফাৎ নেই। চিকিৎসা করেছিলেন ডাক্তার খলিলুর রহমান। দূরদর্শী প্রবীণ ডাক্তার—বহরমপুরে প্র্যাকটিস করতেন, শহরের অনতিদূরে আহমদীঘি গাঁয়ে বাড়ি। অবিভক্ত বাংলায় তখন তো বিস্তর বাঘা বাঘা ডাক্তার, তার মধ্যে ডাক্তার রহমানেরও নাম ছিল দস্তুরমতো। নাম কলকাতা অবধিও ছড়িয়েছিল—সেখান থেকেও মাঝে মধ্যে দুরারোগ্য রোগী আসত। পার্টিশান হবার সঙ্গে সঙ্গে সরকারি কর্মচারী উকিল ডাক্তার ইত্যাদির মধ্যে হিন্দুরা চলে গেলেন ভারতে, মুসলমানরা পাকিস্তানে। খলিলুর রহমানের সেই থেকে যশোরে আস্তানা।

ডাক্তারসাহেবের সামনেই একদিন কাণ্ড। পাগল ক্ষেপে গিয়েছে অকস্মাৎ। বলে, পাকিস্তানে কেন এসেছি জানেন?

ডাক্তার বললেন, কেন মা?

বদলা নেবো বলে। শোনা কথা নয়, এই চোখ দুটো দিয়ে দেখেছি সে জিনিস। ডাইনে বাঁয়ে ছুরি মেরে মেরে খুন করতে লাগল। কসাইয়েও অমন পারে না। আর আমাদের মতন মেয়েলোক যারা, প্রাণ নিয়ে তাদের রেহাই দেয় নি। প্রাণ নেবার আগে—

হাউহাউ করে কেঁদে উঠল লীলা। খলিলুর আর বলতে দিলেন না কথা ঘুরিয়ে নেন তাড়াতাড়ি: বদলা নেবে বই কি মা। আমি একজন মুসলমান—এক্ষুণি, আমার উপর দিয়েই শুরু কর [illegible]।

লীলা সচকিত তাকাল বৃদ্ধের দিকে। মুহূর্তকাল চেয়ে রইল। বলল, নেবো তাই। ভাবছেন কথার কথা। বংশটা আমাদের জানেন না। আমার বড়দা ফাঁসিতে মরেছেন দেশ স্বাধীন করতে গিয়ে—আর দশটা বড়মানুষের মতন খেয়ে ঘুমিয়ে আরামে দিন কাটাতে পারেন নি। স্বাধীন হবার মুখে কলাগাছ কচুগাছ কাটার মতন ফুলবাবুর বাপকে কুপিয়ে কুপিয়ে কেটেছে। আমাকেও মেরে ফেলছে—ওঁর মতন করে যদি কেটে ফেলত, ভাবতাম অনেক দয়া ওদের। তা হয় নি। ছোড়দা-ই কেবল আছে বেঁচে—মরার জন্য তারও আঁকুপাঁকু। বোমার খোল আর পাইপগান গড়ছে কারখানা বানিয়ে, গড়ে গড়ে ডাঁই করছে—

বীরেশ্বর এসে পড়েছিলেন, পাগলামির কথাবার্তা তাড়াতাড়ি চাপা দিতে চান। বললেন, গুণের ছেলে বউমার ভাইটি। আলাপসালাপ করে বড় খুশি হয়েছিলাম। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ত, গণ্ডগোলে পড়া শেষ করতে পারে নি। কিন্তু প্রতিভা আছে, নতুন নতুন ডিজাইনের ঘরব্যাভারি নানারকম জিনিস বানায়। ব্যবসা চলছেও বেশ ভাল।

পাগল খলখল করে হাসে: চলছে ঘোড়ার ডিম। চালানোর ইচ্ছে থাকলে

তো! যেমনের আসমানের ঘুড়ি বানিয়ে বেড়াবে, তেমনি মানুষই বটে আমার দাদা! ও-সব লোক-দেখানো, সরকারকে খুশ্‌-দেওয়া। বদলা আমি যেমন চাই, ছোড়দাও চায় ঠিক তেমনি। তেমনি আরও হাজার-লক্ষ মানুষ এপারে ওপারে—'বদলা চাই' 'বদলা চাই' বুকের রক্তের মধ্যে ফুটছে টগবগ করে।

খলিলুর রহমান পরমাগ্রহে বললেন, আমিও একজন মা, 'বদলা' চাচ্ছি। তোমাদেরই একজন আমি। উদ্বাস্তু। দাদা-ঠাকুরদার ভিটে ছেড়ে প্রাণের জন্যে চলে এসেছি। থাকতে পারলাম না, আসতে হল ভাই।

আবার খলিলুর—কণ্ঠ ভিজে-ভিজে: বয়স বিস্তর হয়েছে, মাটি নেবার দিন এবার। কিন্তু এখানকার এই বিদেশ-বিভূঁইয়ের মাটি এ-দেহের অপছন্দ। যদ্দিন পারি ঠেকিয়ে যাচ্ছি তাই—যদি কোনরকম সুরাহা হয়ে যায় জীবনকালের মধ্যে। নইলে বাবা আর বড়ভাইয়ের হিসাবে আরও পাঁচ সাত বছর আগে আমার কবরে যাবার কথা। আমার আব্বা-দাদার গোরস্থানে তাঁদের পাশে যদি একটু জায়গা করে নেওয়া যায়, সেই আশায় আশায় বেঁচে রয়েছি।

বীরেশ্বর আর খলিলুর দুই বৃদ্ধের মধ্যে ভাব জমেছে খুব। প্রতিবেশীও তাঁরা। প্র্যাকটিশ খলিলুরের প্রায় ছেড়ে দেবার মতো। রোগী বাড়িতে এলে তবে দেখেন। কঠিন রোগে শয্যাশায়ী এবং রোগীর বাড়ি দূরবর্তী নয়—এমনি ক্ষেত্রে যেতে হয় কখনো সখনো। কিন্তু সন্ধ্যার পরে কোন অবস্থাতেও বেরোন না। বীরেশ্বরের বাড়ি আসেন, গল্পগাছা হয়। আবার বীরেশ্বরই এসে একদিন খলিলুরের বাড়ি চলে যান। খলিলুর দাবার ছক-গুটি বের করেন, খেলা হয় খানিকটা রাত্রি অবধি।

বীরেশ্বর নিরিবিলিতে আজ খলিলুরকে খুব ভৎসনা করলেন: পাকা বুদ্ধির মানুষ আপনি, ডাক্তার হয়ে এটা কি করলেন বলুন তো। বউমা'র মাথার ঠিক নেই, আপনার চেয়ে কে বেশি জানেন? সময় সময় এমনি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। কোথায় ঠাণ্ডা করবেন, তা নয়- সেই তালে আপনিও তাল দিতে লাগলেন।

লীলার সঙ্গে কথাবার্তার পর বেশ খানিকক্ষণ কেটেছে। কিন্তু ডাক্তার রহমান গুম হয়ে আছেন তখনো। গল্পগাছা আজ জমে নি। হঠাৎ তিনি বললেন, মাথার ঠিক নেই একলা বউমা'র নয়, আমারও। খোঁজ নিয়ে দেখুনগে, অমন-পাগল লাখ লাখ রয়েছে—অন্তরে আগুন চেপেচুপে তারা দিন কাটায়। আজাদির নামে বাংলাদেশের যে সর্বনাশ হল, তার বদলা আমিও চাই। খোদার কসম খেয়ে বলছি, কথার কথা নয়—সত্যি সত্যি চাই আমি। মুশকিল হয়েছে, সাধারণ মানুষ সাদা-চোখে দেখে, অমুক হাতটা কোপ ঝাড়ল আমার কাঁধে। সেই লোককে দুশমন বলে চিনে রাখে। লোভ আর লালসার তোড়ে যারা তাকে কসাইবৃত্তিতে লেলিয়ে দিয়েছে, তাদের কেউ দেখে না। শিক্ষা কালচার দেশসেবা সদাচারের মুখোশ পরে তারা দিব্যি বহাল-তবিয়তে কাল কাটায়, রাজা-উজির হয়। টাকাকড়ি কুড়োয় দুহাত ভরে। রাস্তা-ঘাটে হাসপাতালে যেখানে পারছে নাম জুড়ে দিচ্ছে তাদের। নিত্যিদিনের কাগজ খুললেই ছবি আর বচনসুধা। দেখে দেখে আর শুনে শুনে চোখ-কানের ঘেন্না ধরে গেল। থাকত আমার হাতে ক্ষমতা, এক-একটাকে ধরে জনতার দরবারে দাঁড় করিয়ে কীর্তিকলাপ ব্যাখ্যা করে বোঝাতাম। শাস্তি দেবে তো আসল আসামীদের দিক, আড়ালে দাঁড়িয়ে যারা কলকাঠি টেপে।

বীরেশ্বর বললেন, বউমাকে আপনি কিন্তু তা বললেন না। বরঞ্চ উল্টো জিনিস—আপনার উপরেই বদলা নিতে বললেন। পাকিস্তানে হিন্দুস্থানে দু-দেশেই যা ঘটে থাকে—ধড়িবাজদের ধরা-ছোঁওয়া যায় না, নিরীহ ভালমানুষরা প্রাণ দেয়।

খলিলুর ক্ষিপ্তস্বরে বললেন, হাঁ তাই, মনের কথাই বলেছি আমি। ন্যায়-অন্যায় চুলোয় যাক—চাই আমি, ঝাঁপিয়ে পড়ে মেরে ফেলুক আমায় কেউ। সাহস নেই, তা হলে জাপানিদের মতন হারাকিরি করতাম। বাঁচতে আমার লহমার তরেও ইচ্ছে করে না। কী আমার আহা-মরি দেশ, তাই আশি-নব্বুই বছর বেঁচে-বর্তে থেকে সুখভোগ করতে হবে!

বড় উত্তেজিত হয়েছিলেন খলিলুর। ছেলেমানুষকে যেমনভাবে ভোলায় হাসিয়ে রসিয়ে তেমনিভাবে বীরেশ্বর ডাক্তারকে শান্ত করলেন। খলিলুর লজ্জিত হয়ে তখন বলছেন, যা গতিক, ভাল মাথা পর্যন্ত খারাপ হয়ে যায়। কে হিন্দু, কে মুসলমান বাচ্চাদের মধ্যেও হয়তো সেঁধিয়ে যাবে। যে সর্বনাশ আমাদের হবার তা হল, কিন্তু তেমন হলে ভবিষ্যৎ বলেও তো কিছু আর থাকবে না। শুনবেন? মজার গল্প, শুনে আমোদ লাগবে। কিন্তু তলিয়ে ভাবুন, চোখ ফেটে জল বেরুবে তখন। অবোধ ছেলেপুলের চোখে পর্যন্ত কী হয়ে যাচ্ছি আমরা। ইতিহাস আমাদের কোন চোখে দেখবে?

[ক্রমশঃ]

স্বর্ণমৃগয়া

বিমল সেন

মালাবার সৈকতে তটভূমির সমান্তরাল রেখায় সারাটা বর্ষাকাল জেগে থাকে একখণ্ড কালোমেঘ—সাগরের বুকে একটা উঁচু পাহাড় যেন। হঠাৎ তাই বলেই ভুল হয়।

ছোট গঞ্জ। নারকেল, শুটকীমাছ আর স্পঞ্জের আমদানী হয় হাটবার, হাটবার। অগভীর উপকূলের মহীচালে ইতস্তত ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ থেকে মালাবারী জেলেরা নৌকো ভর্তি করে আনে ঐ সব। সে সব কিনে নেবার জন্য সওদাগরী গদি আছে বাজারে। মারোয়ারী, দক্ষিণপট্টনী, তামিল ব্রাহ্মণ, খৃস্টান আর দক্ষিণভারতের রোদে-জলে সাতপুরুষে পোড়খাওয়া পর্তুগীজ ব্যবসায়ীরা পাইকারী দরে কিনে চালান দেয় বাইরের দুনিয়ায়। এইটুকু কেনাবেচাই এখানকার প্রাণের স্পন্দন। সপ্তাহের আর ক'টা দিন এখানে, অলস, শান্ত শ্লথ। হাটের দিনে বেচাকেনা শেষ হলে চিনাম্বারামীর খুপরি থেকে আগন্তুকদের মদিরাজড়িত উচ্ছল স্বর ভেসে আসে। আর একটু রাত হলে গঞ্জের টর্চ, স্টোভ আর মোটর সারাবার একমাত্র মেকানিক রাগাপ্পাও তার ভাঙা গীটারটা নিয়ে এসে যোগ দেয় তাদের সাথে। রাত অনেক হলে উঠে দাঁড়ায় তারা। টলতে টলতে গিয়ে নৌকায় ওঠে—নেশার ঝোঁকে দাঁড় টেনে ফিরে যায় সমুদ্রের দ্বীপগুলোতে। সপ্তাহ পরে আবার তাদের পদার্পণ ঘটবে এ গঞ্জে।

নিতান্তই সাধারণ গঞ্জ। সৈকতবিহারী বা স্বাস্থ্যান্বেষীদের আগমনে ধন্য হয় না এখানকার মাটি। তবু এ গঞ্জের স্বাস্থ্য ভাল, উপকূল সুন্দর। বাইরের জগতের আলোড়ন কদাচ এসে পৌঁছয় এখানে। মারোয়ারী ব্যবসায়ী রামলোচন দাস ঝুনঝুনওয়ালার একটা ট্রানজিস্টার রেডিও আছে, বাজার দর শোনবার জন্য। কখনো-সখনো গঞ্জের অধিবাসীরা তাতে রেডিও সিলোনের প্রোগ্রাম শোনে। তাছাড়া সারা গঞ্জের একমাত্র সঙ্গীতকার ঐ সিবাস্টিয়ান রাগাপ্পা। হাটবারের সাথে তাল রেখে মাঝে মাঝে লরী আর টেম্পোগাড়ির আগমন ঘটে। গদির গুদামগুলো থেকে বেঁটিয়ে নারকেল, নারকেলের ছোবড়া, স্পঞ্জ আর শুটকীমাছ নিয়ে তারা চলে যায় শহরে।

জে-লাইটগুলো জবলে জবলে নিষ্প্রভ হয়ে আসে গুদামঘরের বারান্দায়। আর তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত কেনাবেচার হিসাব কষে গুদাম-সরকাররা। ভরা বোতল নিঃশেষ হয়ে আসে ব্রাগাঞ্জা আর তার সাঙ্গোপাঙ্গদের। গীটারের তারে অলস টুং-টাং করতে করতে হাই তোলে ব্রাগাঞ্জা, "বুঝলে দোস্ত্, আমি বোম্বে, পাঞ্জিম, মাদ্রাজ, ত্রিবান্দ্রম, কলম্বো সব ভেজে খেয়েছি। কিন্তু আমাদের এই গঞ্জটা একদম স্বর্গরাজ্য।"

সেই স্বর্গরাজ্যে একদিন এক সৃষ্টি-ছাড়া আগন্তুক এসে হাজির। পরনে ট্রপিকালের প্যাণ্ট আর সার্ট, চোখে চশমা। মাল নেবার জন্য যে টেম্পোভ্যানটা নারায়ণার গুদামের সামনে এসে দাঁড়িয়ে-ছিল, তা থেকেই নামলো সে। কাঁধে একটা ঝোলানো ঢাউস ব্যাগ, আর ডান হাতে লম্বাটে একটা কাঠের বাক্স—ব্যাস্ আর কোন আসবাব নেই সাথে। হিন্দি, ইংরাজীর একটা ভাঙা ভাঙা জগাখিচুড়ি ভাষায় প্রশ্ন করে নারায়ণাকে, "এদিকে একটা আস্তানা মিলবে কর্তা?" চোখ কপালে তুলে নারায়ণা বলে, "আস্তানা, মানে হোটেল? সে বাইশ মাইল দূরে পটনে (শহরে) পাওয়া যেতে পারে, এদিকে ও পাট নেই।"

মালপত্তর গুটিয়ে নিয়ে লোকটা ওঠে ঝুনঝুনওয়ালার গদিতে, সেখান থেকে নদীর ধারে চেরিয়ানের শুঁটকীমাছের আড়তে, কণ্টাক্টার ইসাম্পালনের বারান্দায়, তারপর আবার প্রভুদাসের গোলায়। সর্বত্র একই উত্তর—"খাবার থাকবার জায়গা এখানে কোথায়! গদি আর গুদাম নিয়েই কারবার তাদের। হাটবারে হাটবারে চিন্না-স্বামী তার ঝুপড়িখানায় তাড়ি আর চাট বিক্রি করে, আর গোবিন্দন একটা আধা-রেস্টুরেন্ট আধা-হোটেল খোলে। সেখানে ইডলী, দোসা, বড়া সম্বরম পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় কফি।"

হতাশ হয়ে দূরে ঝাপসা সমুদ্রের দিকে চোখ তুলে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে লোকটা, তারপর বলে, "আচ্ছা, তা ঘরটর ভাড়া পাওয়া যাবে কোথাও।" পালকের কলমটা দিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে উত্তর দেয় প্রভুদাস গাণ্ডেরিয়া,—"কিরুসা হিঁয়া কোথা মিলবে, যার যার আপনা বানিয়ে লেয় এই হোল এখানকার রেওয়াজ".. তারপর চোখটা একটু ছোট করে জিজ্ঞেস করে তা আপনি কি মোতলোবে আসেছেন, কেতোদিন থাকবেন?"

—"মতলবটা তেমন কিছু নয়। আমি জল থেকে কিছু গাছপালা আর পোকা-মাকড় ধরে বিজ্ঞান কলেজগুলোতে চালান দেবো, আর নিজে রিসার্চ করবো। যদি এখানকার সমুদ্রে সব কিছু পাওয়া যায় থাকবো কিছুদিন, নযতো পাততাড়ি গুটোবো।"

—"ওহো, তাই বোলেন,".. তারপর একটু থেকে আবার বলে, "আচ্ছা.. আপনে পূরবদেশের লোক আছেন,...কলকাত্তাসে আসছেন কি?"

—"হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে!"

—"কুছ নেই, ও হাম লহমা দেখে সমঝে নিয়েছি। হামার এক ভাই ভি ছাপরা ঔর কলকাত্তা ভারী কারবার করছে। সরষু তেল আর ডাল বেচে লাখ লাখ রুপেয়া কামাযে লিচ্ছে। হামি ভি কলকাত্তা ছিলম পাঁচ বরষ, দেখছেন থোরা বাংলা ভি বলতে পারি...।...যাক সে বাৎ ছোড়ে দিন.... এক বাৎ বাবুজী, আপনার ঐ জলের শাগশব্জীর ব্যবসাটা ভালো, হামি বোলে কি আপনে দু-চার রোজ হামার হিঁয়া থাকেন, তারপর রাম-জীর কৃপায় সুবিস্তা হোয় একঠো মোকাম বানায়ে লিলেন। নোহি হোয়, চলি গেলেন। ব্যবসার লিয়ে হামি তামাম হিন্দুস্থান ঢুড়ে এখানে আসে বসেছি।" আগন্তক কি বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলে, "লেকেন এক বাৎ বাবুজী, ঐ জলকা পোকা হামি সমঝে লিয়েছি. ওতো মছলি আছে! মছলিকা কারবার এখানে পারি-য়াবা করে, আর করে কিরিস্তান লোক—ঐ যেমন চেরিয়ান সাহাব করছে। রাম-জীর কৃপায় হিঁয়া আসেছেন, হামি আপনের সব সুবিস্তা করে দিবো.. লেকেন মছলিকা কারবার খোলেন তো হামি কি করে কবি বোলেন?"

—"না, না, মাছের কারবার আমি খুলছি না। আমি শুধু জলের পোকা-মাকড় আর শেওলাজাতীয় গাছপালা বেছে বেছে চালান দেবো। সে পোকা তুমি চোখেও দেখতে পাবে না. ঐ কাঠের বাক্সটায় আমার মাইক্রোসকোপ আছে, তাই দিয়ে অনেক মেহনৎ করে দেখতে হয়।"

—"আরে রামজী মালুম হোতা আপনে বহুৎ বড়া সাইন্টিস্ আছেন।.. তাই বোলেন আপকে মুলুকমে বিজ্ঞানকা বড়িয়া কারবার চলছে। তা খাড়িয়ে আছেন কেনো, বোসেন, বোসেন এ বলদেও, এ ব্রীজলাল' বাবুকে লিযে একঠো কুর্শী-তো লা। একটা ঠাণ্ডা-মিঠা ডাব ভি লিযে আয়।। হাঁ কি বোলছিলাম, হমার ভাইয়ের অযেল মিলে ভি তিন তিনঠো কেমিস্টবাবু আছে। মাস গেলে ঢাই শো করে সাড়ে সাতশো টাকা খিঁচে লেয় তিনজন। কেমিস্টবাবু সরষু তেলের সাথে এমুনে একটা কেমিকাল তেল মিশাল করে দিযেছে কি, ভাই আমার এখোন এক টাকায় দশ টাকা কামাচ্ছে। কোই ভি ধরতে পারে নি। যাকগে ও বাৎ ছোড়ে দিন, কিন্তুক আপনে ঐ জলের পোকা আর শব্জী বেচে কি নেফা করবেন বাবুজী?"

—"দেখি, কি হয...।"

— হ্যাঁ সেই ভালো বাবুজী, দেখেন কি হোয়...রামজীর কৃপা হোলে ভূষি বেচে ভি তো কোই কোই লাখ লাখ টাকা কোরেছে। তা থাকেন.. হামার গদিতে থাকেন দশ .পনর ..বিশ রোজ কোই বাৎ নেই ..।"

—"না, আমার একটা ঘরই দরকার। আমি কখন আসবো, কখন যাবো ঠিক নেই। তাছাড়া আমাকে মাইক্রোস্কোপ নিয়ে হয়তো সারাদিনই কাজ করতে হবে। ছোট্ট ল্যাবরেটরীও বানাতে হবে একটা। কাচের জিনিষপত্র, এ্যাসিড, সল্যুশন... তোমার এ গদিতে হৈ-হুল্লোড় সুবিধা হবে না সে সব।"

একটু ভেবে প্রভুদাস গাণ্ডেরিয়া বলে, "বেশ তবে এক কাম করেন, ব্রাগাঞ্জার মিস্ত্রী ঘরের পাশে হামার একটা ঘর খালি আছে, সিটায় আপনে থাকিয়ে যান। জানলা খুলে দিলে রোদে ঘর ভরে যাবে, আর চৌকিতে বসে সমুন্দর ভি দেখতে পাবেন। একটা চৌকা লিয়ে যান খানা বানাযে লিবেন .দিল হোলে ব্রাগাঞ্জার সাথে মছলি-উছলি ভি খেতে পারবেন।"

—"কেনো, তোমার ঘরে মছলি রাঁধা যাবে না?"

—"ঐটা মাপ কোরেন বাবুজী, আর হামি বোলে কি খানা কেনো আপনে পাকাবেন? আপনে বড়া সাইন্টিস্ আছেন, খানা হামি পাঠিয়ে দিবো—পুরী, কচৌরী, জিলাবি, মালপো, গজা কালা-কান্দ দহিবড়া যেমন মন চায় তেমন খাবেন। হামি ডাল, শাগ ভি দিবো।.. আচ্ছা ঘিউ খাবেন, আমি দেশ থেকে আনাই। লেকেন ঐ মছলি খানাটা ছোড়তে হবে।"

—"আচ্ছা থাক সে সব খানা আমি নিজেই জোগাড় করে নেবো। কখন ঘরে থাকবো, কখন থাকবো না তার ঠিক নেই, সুবিধা হলে খানা বানিয়ে নেব, না হলে নারকেল চিনি খেয়েই দু-চারদিন কাটাতে পারবো—অভ্যাস আছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, তোমার ঘরে মছলি-টছলি খাবো না। কিন্তু তোমার ঘরের ভাড়া কত দিতে হবে?"

—"কি যে বলেন বাবুসাব, হামার কি ধরম নেই। আপনে মেহমান আছেন হামি রামজীর কৃপায় আপনের সেবা করছি...ভাড়া কা কোই বাৎ নেই।"

"ইয়োর বস ইজ নো গুড-! সি ম্যান, হি আর্নস নট ইভন হোয়াট এনি টেম্পোকুলি আর্নস দিজ ডেজ। (দেখো তোমার কর্তাটি কোনো কম্মের নয় হে, আজকাল একটা টেম্পোর কুলি যা কামায় লোকটার রোজকার তারও কম!)

লেবরেটরী ঘরের দৈনিক কার্যক্রমের কোন পরিবর্তন হোলো না তাতে। সেই অনুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ রেখে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটানো, তারপর আবার সাগরের চড়ায়, উপকূলে আর খাঁড়িতে দীর্ঘ সময়ের জন্য নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া। এক সকালে এসে দর্শন দিলো প্রভুদাস নয়, তার খাজাঞ্চী ছোটুকলাল। দীর্ঘ একটা সেলাম দিয়ে সে জানালো, "অনেক দিন হয়ে গেলো, বাবু যদি ঘরের কিরায়া এখন কিছু ঠিক করে নেন।"

প্রস্তাবটা অপ্রত্যাশিত নয়। অল্প কথাতেই প্রথম মাসের ভাড়া দশ টাকা নিয়ে চলে গেলো ছোটুকলাল। ছোটুকলাল চলে যেতেই রাগাঞ্জার আবির্ভাব। সে লেবরেটরী ঘরের সব ব্যাপারের নীরব দর্শক এবং ততোধিক নীরব শ্রোতা। বলে, "আই টোল্ড বস দিজ বিজিনেসমেন নো গুড দে নো মানি... ওনলি মানি.. নাথিং বাট মানি অল ব্লাডি সোয়াইন।" (তখন বলি নি কর্তা, এ ব্যবসায়ীরা সুবিধের নয়! ওরা চেনে শুধু টাকা আর টাকা টাকা ছাড়া আর কিচ্ছু চেনে না ওরা; যত সব বজ্জাত, শুয়োরের পাল।)"

বাইরের পৃথিবীতে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে দিন। মাঝে মাঝে মাথার ওপর দিয়ে দু-একটা প্লেন উড়ে যায় দূরে কূল-হারা সমুদ্রের দিকে। শুধু জীবনধারার পরিবর্তন হয় না এ গল্পে।

ছটুকলাল নিয়মিত আসে, মাসের শেষে ভাড়া নিয়ে যায়। লেবরেটরী ঘরের এক কোণে কাচের বয়ামে প্ল্যাস্টিকের থলিতে মাটির পাত্রে শ্যাওলা লতাপাতা আর নানা জলজপ্রাণীর ঝাঁক নিরুপদ্রবে বেড়ে ওঠে, বংশ বিস্তার করে।

প্রভুদাস আর আসে না এদিকে, শুধু অভ্যাসবশে সাইন্টিসবাবুর মনি অর্ডারে টাকার অংকটার হিসেব রাখে নিয়মিত।

বসন্তের শেষে গ্রীষ্ম এলো। বিষুবীয় অঞ্চলের খরদাহে সাগরের জলে ভাটা পড়ে গেল বহু দূর পর্যন্ত। বিকেলের পড়ন্ত রোদে একহাটু ভর্তি ভিজে বালু নিয়ে খানিকটা উত্তেজিত হয়েই ফিরছিল সে। একটা হেলেপড়া কাঠবাদাম গাছের নিচে বসে অলস বিকেলে তাড়ি ও সুরের চর্চা করছিল রাগাঞ্জা। দেখা হয়ে গেল।

"হেলো, বস্, গুড আফটারনুন...হোয়াট নিউজ! (এই যে কর্তা, বেলা শেষের শুভেচ্ছা নিন... কি খবর!)

"ইনটারেস্টিং নিউজ! (জব্বর খবর আছে হে!) দ্বীপের ডুবুরীরা এই বড় জাতের ঝিনুকগুলো এনেছে আজ। এরা আমাকে বড়লোক করে দেবে। দিজ অয়েস্টারস উইল মেক মি রিচ।"

—"হাউ! নো পার্ল ইন দোজ, নট এনি!" (কেমন করে, ও ঝিনুকের ভেতর তো মুক্তো-ফুক্তো কিসসু নেই।)

—"না, তা ঠিক। তবে, আমি এদের পেটেই মুক্তো বানাবো।"

এক ঢোক তাড়ি খেতে খেতে হাসতে গিয়ে দারুণ বিষম খেয়ে গেলো রাগাঞ্জা।

ফিরে এসেছে দক্ষিণে, ঢলে পড়েছে মকর-ক্রান্তির দিকে। ঋতুর আবর্তে দক্ষিণের পাহাড়টার ছায়া কতবার ছোট হয়ে গেছে, কতবার বিস্তার লাভ করেছে দৃষ্টিদীঘল সমুদ্রের বেলাভূমির ওপর। তারই ভেতর প্রতীক্ষার কোটরে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠলো একাগ্র আকাঙ্ক্ষার মুক্তোগুলি।

ডিসেম্বরের শীতে মালাবার উপকূলে বৃষ্টির প্রকোপ। ঝিরঝিরে বর্ষার কাদায় লরী আর টেম্পোভ্যানের চক্রলাঞ্ছনা। ঝুনঝুনওয়ালার গদিতে আকাশবাণী বোম্বাই কেন্দ্রের কোলাহল। হাটবার, তবু বেচাকেনার আজ বিরতি। রাগাপ্পার ঘরে তাড়ির ফেনিল মহোৎসব আর গীটারের চপল ঝংকারে মেঘোৎসব। তারই ভেতর লেবরেটরীর দরজায় কয়েকটি উত্তেজিত করাঘাত, "সাইন্টিসবাবু, এ সাইন্টিসবাবু, দরবাজা তো খুলেন!" প্রভুদাসের দীর্ঘদিনের নির্লিপ্ত মুখে উদ্দীপনার বিদ্যুৎ ঝলক। শুধু প্রভুদাসই নয়, তার পেছনে একটু আগে পিছে গঞ্জের ব্যবসায়ী-মহলের আরো সব মধ্যমণিরাও—রাম-লোচন ঝুনঝুনেওয়ালা, খাজাঞ্চী ছোটুক-লাল, সুব্রাহ্মনিয়াম, চেরিয়ান আর কন্ট্রাক্টার ইয়াম্পালু। তারাও খবর পেয়েছে। প্রভুদাসই প্রথম মুখ খোলে। "কামাল করে দিলেন, সাইন্টিসবাবু, এৎনা রূপেয়া নাফা করে দিলেন।" আজ দুপুরেই বেশ কয়েক হাজারের এক ইনসিওর এসেছে সাইন্টিসবাবুর নামে। সে খবর চাপা থাকে নি এদের কাছে।

—"হ্যাঁ, তা মন্দ হয় নি। বলেছিলাম তো, একদম সম্ভাব মতই মুক্তো তৈরি করলো আমি। বম্বের হ্যামিল্টন এন্ড জিপিভাইযের জুয়েলারীতে পাঠিয়েছিলাম কয়েকটা স্যাম্পল—এ তারই দাম।"

—"বাপরে, বাপ, মেজিক দেখায়ে দিলেন একদম" প্রভুদাসের উক্তি। চেরিয়ান তার নিজ ভাষায় প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো। "আপ্পও, এন্ডেপ্রিয়া পেটো দেবমে এন্তোরু দাগিষম!" (হায় ভগবান কি ভাগ্য লোকটার!) তারপর ইয়াম্পালুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, "এানুম বেল্লা-তোডে কনাকাডা পেটাবান আনে! (আমিও তো জলের প্রাণী নিয়েই কারবার করি হে!)

—"যার যা কাজ মিস্টার। তবে তোমার মাছের আড়তের ওপাশের খাড়িটাই আমি লিজ নেবো গভর্নমেন্ট থেকে—এবার তো বিজিনেস স্কেলেই করতে হবে।"

—"সো তো করনাই চাহি, লেকেন খরচা বহুৎ পড়েগা মালুম হোতা হ্যায়" ঝুনঝুনওয়ালা এগিয়ে এলো সামনে।

—"তা পড়বে বৈ কি! সাইন্টিস্টের কাজ আশ্চর্যরকম নিখুঁত।

"জোয়ানা মাকস করতে গেলে একটু খরচা তো নিশ্চয়ই করতে হবে... তা সে জন্য আর আটকাবে না।" এতক্ষণ মাইক্রোসকোপে ঝুকে পড়েই কথা বলছিল, এবার একটু ঘুরে পেছনে তাকালো, সেখানে টেবিলের ওপর একসারি কাচের জার। তাতে সমুদ্রের লবণ জল আর শ্যাওলার ভেতর ডোবানো রয়েছে অতিকায় কয়েকটি ঝিনুক। তার থেকে তুলে নিলো একটা তারপর টেবিল থেকে একটা বড় স্প্যাচুলা দিয়ে ফাঁক করে ধরলো একটার মুখ। জানালার বাইরে মেঘলা দিনের অস্ফুট আলোও শতমুখ হয়ে ঝকমক করে উঠলো একটা উজ্জ্বল পদার্থের ওপর। সে আলোর নানা পরিবর্তনশীল প্রতিফলন দর্শকদের মুখে চোখে...বিস্ময়—উত্তেজনা—ঈর্ষা—লোভ। খাজাঞ্চী ছোটুকলাল মনে মনে ঝিনুকের সংখ্যা গুণেছে এক...দো...তিন...আর দাম কষছে—ঢোক স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। ঘর আশ্চর্য-রকম নীরব।

প্রভুদাসই প্রথম কথা বললো, "রামজীব কৃপা, সাইন্টিসবাবু আপনে বহুৎ ভাগ্যমান আছেন। আজ সাঁঝের বেলায় হামার গদিতে আসেন। আপকা খাতির খোরা খানাপিনাকা এন্তেজাম কোরবে হাম। গঞ্জে আউর দো চার রইস আদমীকে ভি বলবো আমি। আজ বাড়ি খুশিকা দিন আছে।"

দলটা চলে যেতেই ঢুকলো রাগাপ্পা, "হ্যাপী নিউস বস্..ইউ নাউ মিলিয়-নেয়ার ইউ হ্যাপী..আই হ্যাপী..।" তারপর একটু কাছে এসে ফিস ফিস করে, "বাট দিজ বিজনেসমেন নো গুড. দে নট হ্যাপী! দে নো মানি...ওনলি মানি. নাথিং বাট মানি.. অল ব্লাড—সাকারস, রুশবীচেজ...ডোন্ট মিক্স!" (খুব খুশির কথা কর্তা...তুমিও খুশি, আমিও খুশি কিন্তু এই ব্যবসায়ীগুলো [illegible] খুশি নয়—যতো সব রক্তচোষা, [illegible] দল. একদম মিশবে না ওদের সাথে।)

—"কিন্তু ওরা যে নিমন্ত্রণ করে গেলো সন্ধ্যায়.. খুব নাকমলা খেয়েছে সব।"

—"কিক দেম হেল বস্! কাম উই সেলিব্রেট নাউ!" (লাথিমারো, জাহান্নামে যাক্ সব। এসো একটু উৎসব করা যাক্।)

—"সেলিব্রেট মানে তোমার সাথে তাড়ি গিলতে হবে। মাপ করো হাড়ুড়া সাহেব, জানতো আমি খাই না। তুমি বরং একটু গীটার শোনাও আমাকে।"

—"ওয়েল বস্, আই এলোন ড্রিংক.. আই সেলিব্রেট। ইউ সো গুড..সো মাচ্ মানি নাউ, বাট্ নো ড্রিংক' ওঃ এক্সকিউজ মি আই শ্যাল প্লে ইউ গীটার।"

(ঠিক আছে কর্তা আমি একাই খাই একটু একটু উৎসব করি। তুমি এতো ভালো এতো টাকা তোমার এখন কিন্তু একঢোকও খাবে না ওঃ আচ্ছা, আচ্ছা, এই ঘাট হয়েছে. আমি গীটার বাজিয়ে শোনাই তোমাকে।)

তা খানাপিনার আয়োজন মন্দ [illegible] নি প্রভুদাস। [illegible] খাইরেগা [illegible] সাহানই লোয়া, ক্ষীর [illegible] রাখিয়েসি, [illegible] [illegible] থেংগাইসাদম, এলু[illegible] ভি রাখিয়েসি। মারাঠি শিখন্ড ভি খাইতে পারেন। হিন্দুস্থানের তামাম মুলুকের আদমী যখন সব একসাথ মিলেছি, তখন

সব কুছ্ থোড়া থোড়া খাইতে হোবে. কি বোলেন সব ?"

—"জী, জী জবুর, জরুর", একটা সমর্থনের ঝড় উঠলো চারপাশে।

ছোট্কলাল নিজের গলাটা তার ভেতর যথাসম্ভব উঁচু করে বলে উঠলো, "আরে নজ্দিগে (কাছাকাছি) বোম্বাই, কলকাত্তার মোতো কোন ভারী শহর থাকলে প্রভুবাবু আপনার খাতির একঠো ডিনার পার্টি ঔর বিলাইতি মেমসাহাবের ড্যান্স লাগায়ে দিতেন। শেঠ বোলেন কি,—'বাবুকে লিয়ে বেহ্না কুছ এন্তেজাম করেছি এতে দিল-হামার খুশ হচ্ছে না'।"

চেরিয়ান সাহেব একটু বাঁকা হাসি হেসে বলে, "কিন্তু বাবুর দেশী খানাই কিছু নেই, তাহলে বাবু খুব খুশি হতেন।"

—"ঠিক বলছেন চেরিয়ান সাব, মছলি আর রসগল্লা না হোলে সাইন্টিস-বাবু ক্যায়সে খুশ হোবেন ?" প্রভুদাসের গলা।

—"সচ্ বাৎ!" এবার ঝুনঝুনওয়ালা মুখ খোলেন. "রসগোল্লা বহুৎ উমদা চিজ হ্যায় বাবুজী। গেল সাল কলকাত্তা গিয়েছিলাম, হামার পাঁচ বছরের ভাইঝি বোলে কি—'জেঠা হামি বাঙালি সাদি করে কলকাত্তা থেকে বাপের দেশ যাবো না।' হামি বলি 'কেনো বেটি কেনো ?' তো বেটি বোলে কি "দেসবা কাঁহি তো রসগল্লা মিলবে না। রসগল্লা না খাইয়ে হামি থাকতে পারবো না। সমঝেলেন অবস্থা।"

সুব্রাহ্মনিরাম এতক্ষণ চুপ করে-ছিলো, এবার বললো 'সাইন্টিসবাবুর সে ভাবনা আর থাকবে না এবার। বাবুর কারবার শুরু হোলে প্রথম আসবে সব

'নিজপালদ্রতি বন্দ্কল' (ঘরের লোক), তারপর দেশের লোকেরা আসবে কাজের ধান্দায়। তখন বাবুর মাছ খাবার কষ্ট থাকবে না, দেশের মিঠাইও খেতে পারবে 'নিগাল আগ্রেহিকুন্না' (পছন্দ মত)।

হঠাৎ ভাগ্যফেরা লোকটা এবার বলে, "না ভাই, কাজের জন্য নিজের লোক আনার কোনো ইচ্ছে নেই আমার। এখান-কার মালাবারীরাই যথেষ্ট। আর হিসেব-পত্রের জন্য দরকার হয়তো খাজাঞ্চী ছোট্কলাল না হয় তার জানপয়ছান বা ভাইবেরাদর কোন লোক ঠিক করে দেবে।

কন্ট্রাক্টর ইযাম্পালু এতক্ষণ গদির ওপর গড়ুর পাখীর মত উবু হয়ে খাজাঞ্চীর সাথে ফিসফিস্ করছিল, বলে "তাই কি হয়, বাবুর টাকা হয়েছে শুনলে, ভাই বেরাদর, আম্মাওযাণ্ডে অলিযেন (মামার শালা) বেল্লিয়াম্মাউণ্ডে মেচ্ছিলাল (পিসীর দেওর) কত এসে জুটবে। তখন দেখবে দুনিযাতে তোমার আয়ের বখরা নেবার জন্য কত কানাকাটা বন্দ্কল (আত্মীযস্বজন) কত নানমানেবুন্না ওযাবুম (শুভাকাঙ্ক্ষী)"।

—"সে গুড়ে বালি, আমার আত্মীয-স্বজন যাঁরা আছেন, তাঁরা আমার কোন হদিশই জানেন না। বাবা-মা বহুকাল নেই। দাদারাও আমার কোন খবর জানে না। যাকগে ওসব কথা, আসুন শুরু করা যাক—আমার আবার কিছু কাজ রযে গেছে হ্যাঁ ছোট্কলাল রেজিস্ট্রি অফিসটা এখান থেকে কত দূর—জমির বন্দোবস্তটা তাড়াতাড়িই করবো ভাবছি।"

খাজাঞ্চী চোখ কপালে তুলে, "আরে বাবু আপনে কি এখুনি ঘোড়সওযার হযে চললেন রেজিস্ট্রি অফিস, কোর্ট, থানা-পুলিশ, হাসপাতাল, সব এখান থেকে বাইশ মাইল দূরে শহরে। হাটের দিন লরী আর টেম্পোভ্যান ছাড়া যাওয়া-আসারও সুবিস্তা নেই।"

খাওয়া-দাওয়ার পর ভিড়টা পাতলা হয়ে গেলে আসল কাজের কথাটা পাড়লো প্রভুদাস, "দেখেন সাইন্টিসবাবু, রামজীর কৃপায় আপনে একটা কাম করিযে ফেলে-ছেন, লেকেন বিজিনেস করা বহুৎ কঠিন আছে। এই রোড়ে রুপেয়া কামালেন, এই পয়সা উল্টে গেলো। হামি বোলে কি, আসেন আমরা ফিফটি ফিফটি শেয়ার করে ব্যবসা করি। ডুবুরী লাগাতে হোবে, মাল বানাতে হোবে, জরুর কুছ পয়সা আউড় ভি ঢালতে হোবে। মাল চালাতে হোবে, চাহে কি এক্সপোর্ট ভি হোতে পারে। হরবখৎ ট্যাক্স, সারচার্জ ঔর কত্তো এক্রচেকা ঝামেলা ভি পোয়াতে হোবে। অফিস চালু করতে হোবে প্রোপাগাণ্ডা করতে হোবে। মো-চারঠো কমচারী রাখতে পাহারাওয়ালা ভি খাড়া করে দিতে হোবে—মা কি ভাবেন, দেশে রাম-রাজ্য হইয়ে গেছে, ডাকুলোক সব এমনি ছোড়ে দেবে.. আপনে কেতো দিক সামলা-বেন শোচে দেখেন। আপনে সাইন্টিস আছেন ল্যাবরেটরী দেখেন ম্যানুফ্যাকচার দেখেন। হামি ব্যবসাযী আছি ব্যবসাপত্র দেখি। আসেন বাবু হাতে হাত মিলান।"

—"মাপ করবেন প্রভুদাস! হাতে হাত তো সব সমযই মিলিযে আছি, কিন্তু এ ব্যাপারে যদি কিছু করি নিজেই করবো, নযতো করবো না। আচ্ছা চলি।"

পেছনে নিষ্ফল ক্রোধ হতশ্বাস আর ঈর্ষার যেন একটা খাণ্ডবদহন জ্বেলে রেখে এলো ক'জনের ভেতর। অন্ধকারের ভেতর সাইন্টিস্টের অপসৃযমাণ চেহারার দিকে চেযে রামলোগন ঝুনঝুনওযালা প্রথম মন্তব্য করে, "কমপক্ষে আরো পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকার মাল তৈরি হচ্ছে ওর ঘরে খাড়িতে আরো কত আছে কে জানে। লাখো রুপেয়া জরুর হোগা!"

উত্তেজিত হযে বলে প্রভুদাস গান্ডেরিযা 'শালা সেইমান আমি মুফতে ওকে ঘর ছেড়ে দিযেছিলাম বত্ত পুরী, লাড্ডু ভি খিলাইছি। খাঁটি বলে আমি ওকে বসিযেছিলাম অমিই ওর ব্যবস্থা করছি!"

একটা চুরুটের শেষ টুকরোটা দাঁতে কাটতে কাটতে বলে চেরিযান "লোকটা রাতের বেলাতেও নির্জন সমুদ্রের নির্জন খাঁড়িতে খাঁড়িতে ঘুরে বেড়ায় তুষারের ভিতর (আস্তানা) থেকে বহুদিন দেখেছি।"

সেইদিনই গভীর রাতের অন্ধকারে কযেকটা লোক খাঁড়ির দিকে হেঁটে গেল নিঃশব্দ ছাযার মত। সেই সাইন্টিছাড়া লোকটা যখন ঘরে নেই তখন ঐদিকেই আছে। এ সব কাজে যারা কোন চিহ্ন রাখে না তেমন লোকই বেছে দিযেছে কন্ট্রাক্টর। বাহির সমুদ্রের অন্ধকারের বুকে পাথর বেঁধে একটা গোটা মানুষকে ডুবিযে দিলেও, তার খোঁজ আর পাবে না কেউ।

আর একজন রওনা হযেছিল খাজাঞ্চীর নেতৃত্বে। নিঃশব্দে তারা যখন ফিরে এলো তখন লেবরেটরী ঘরে কোন-দিন যে একটা কিছু ছিল তার কোন চিহ্নও নেই।

একটু আগের ভোজসভার ঠিক পেছনে, আর একটা ছোট্ট ঘরে অতিকায় তিনটে ভীতি বৈরাগ্যগুলিকে নিঃশব্দ বীভৎসতায় পাহারা দিযে উদ্দাম ঘুরে হাসছে কযেকজোড়া ক্ষুধিত চোখ।

বিশ্বভারতীতে তিব্বতী ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন, বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত স্বর্গগত সিলভ্যাঁ লেভি। একথা বললেই বিশ্বভারতীর তিব্বতী সংস্কৃতিচর্চার গোড়ার কথা বলা হোল না। বিশ্বভারতীর জন্ম হয়েছিল কবির ধ্যানমগ্ন কল্পলোকে। তাই তার প্রতি বিভাগ ও প্রত্যেক পরিকল্পনার পিছনে বিশ্বভারতীর প্রাণ-পুরুষের সাধনার চিহ্ন রয়েছে। তাঁর সাধনা ছিল খণ্ডের সঙ্গে সমগ্রের যোগসাধনা। ভারতের সঙ্গে বিশ্বের যে একাত্মতা রয়েছে তার বাস্তব-বিন্যাসের প্রচেষ্টা নিয়েই বিশ্বভারতীর সৃষ্টি। "অত্রয়ং বিশ্বভারতী। যত্র বিশ্ব ভবত্যেক নীড়ম।"

রবীন্দ্রনাথের মনে সে সময়ে কী গভীর ব্যাকুলতা জেগেছিল তা তাঁর ঐ সমসাময়িক কয়েকটি লেখা ও বক্তৃতায় প্রকাশ পেয়েছে। বিশ্বভারতী কেমন করে গড়ে উঠলো সেই প্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় বলছেন

'কিছুদিন পূর্বে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মনে একটা সংকল্পের উদয় হয়েছিল। আমাদের টোলের চতুষ্পাঠীতে কেবলমাত্র সংস্কৃত শিক্ষাই দেওয়া হয় এবং অন্যান্য শিক্ষাকে একেবারে অবজ্ঞা করা হয়। তার ফলে সেখানকার ছাত্রদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ হয়ে যায়। আমাদের দেশের শিক্ষাকে মূল আশ্রয়স্বরূপ অবলম্বন করে তার উপরে অন্য সকল শিক্ষার পত্তন করলে তবে শিক্ষা সত্য ও সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞানের আধারটাকে নিজের করে তার উপকরণ পৃথিবীর সর্বত্র সংগ্রহ ও সঞ্চয় করতে হবে। শাস্ত্রীমশায় তাঁর এই সংকল্পটাকে কাজে পরিণত করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, কিন্তু নানা বাধায় তখন তিনি তা করতে পারেন নি। এই আশ্রমের টানে কিছুদিন তিনি আশ্রম ত্যাগ করে গেছলেন।

"তারপরে তাঁকে পুনরায় আশ্রমে আহ্বান করে আনা হোল, এবার তাঁকে ক্লাশ পড়ানোর থেকে রেহাই দিলুম। তিনি ভাষাতত্ত্বের চর্চায় প্রবৃত্ত রইলেন। আমার মনে হল, এই রকম কাজই হচ্ছে শিক্ষার যজ্ঞক্ষেত্রে যথার্থ যজ্ঞ। যাঁরা যথার্থ শিক্ষার্থী তাঁরা যদি এই রকম বিদ্যার সাধকদের চারদিকে সমবেত হন তবে ভালই; আর যদি আমাদের দেশের কপালদোষে সমবেত না হন তা হলেও এ যজ্ঞ ব্যর্থ হবে না।" (শান্তিনিকেতন পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৯২৬)

আরও তিনি বিদ্যাসমবায় সম্পর্কে স্পষ্ট বলেন—

"আমাদের দেশে বিদ্যাসমবায়ের একটা বড় ক্ষেত্র চাই, যেখানে বিদ্যার আদান-প্রদান ও তুলনা হইবে, যেখানে ভারতীয় বিদ্যাকে মানবের সকল বিদ্যার ক্রমবিকাশের মধ্যে রাখিয়া বিচার করিতে হইবে। তাহা করিতে গেলে ভারতীয় বিদ্যাকে তাহার সমস্ত শাখা-উপশাখার যোগে সমগ্র করিয়া জানা চাই। ভারতীয় বিদ্যার সমগ্রতার জ্ঞানটা মনের মধ্যে পাইলে তাহার সঙ্গে বিশ্বের সমস্ত বিদ্যার সম্বন্ধ নির্ণয় স্বাভাবিক প্রণালীতে হইতে পারে। কাছের জিনিষের বোধ দূরের জিনিষের বোধের সহজ ভিত্তি।" (শান্তিনিকেতন পত্রিকা, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩১৬)

রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে বিশ্ববোধের যে এষণা ছিল তারই বাস্তব রূপ দিয়ে গড়া হোল "বিশ্বভারতী"। বিশ্বভারতী হোল কবির 'বিদ্যাসমবায়ের একটা বড়ো ক্ষেত্র।'

তিনি সেই উদ্দেশে অধ্যাপক লেভি সাহেবকে অভ্যাগত অধ্যাপকরূপে তাঁর বিশ্বভারতীতে কাজে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। ১৯২১ খৃস্টাব্দের ১০ই নভেম্বর পূজাবকাশের পর সস্ত্রীক লেভি সাহেব শান্তিনিকেতনে আসেন। তিনি এর আগে ১৮৯৭-৯৮ খৃস্টাব্দে ভারতে এসেছিলেন। কিন্তু আশ্রমে তাঁর এই শুভাগমন শুধু বিশ্বভারতীর ইতিহাসে নয়, ভারতের পুরাতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেছে। রবীন্দ্রজীবনীর লেখক শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে ঐ দিনগুলির স্মৃতি এঁকেছেন। তাঁর ভাষায়—

"লেভি অধ্যাপকরূপে আসতে বিশ্বভারতীর উত্তর বিভাগের (পরে বিদ্যাভবন) অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সবিশেষ পরিবর্তন হইল। অধ্যাপক মহাশয় প্রাচীন ভারতের সহিত বহির্জগতের সম্বন্ধ ইতিহাসবিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। এ ছাড়া চীনা ও তিব্বতীভাষা শিক্ষাদানের ক্লাশ খুলিলেন। লেভির বক্তৃতা ও কথোপকথন হইতে বোঝা গেল যে এই দুইটি ভাষা জ্ঞান ছাড়া ভারতের সহিত পূর্ব এশিয়ার যে আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার সম্যক ইতিহাস আমাদের নিকট চির অজ্ঞাত থাকিবে।"

বাংলা দেশে তিব্বতী ভাষা বা তিব্বতী বৌদ্ধসাহিত্যের আলোচনা সে সময় অজ্ঞাত ছিল না। খ্যাতনামা পাশ্চমী পণ্ডিত সোমা ডি কোরস এই বিষয়ে পথিকৃৎ। তিনি রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল (এখনকার এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনে বসে তিব্বতী বৌদ্ধসাহিত্যের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। এ প্রসংগে শরৎচন্দ্র দাস ও সতীশ বিদ্যাভূষণ মশায়ের নাম স্মরণীয়। তখনকার বঙ্গ সরকার নিজেদের তত্ত্বাবধানে সরকারী প্রেস থেকে শরৎ দাসের তিব্বতী-ইংরাজী অভিধান প্রকাশ করেন। তা ছাড়া গ্রাহাম স্যাণ্ডবার্গের বইগুলি

বাজারে এসেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কাজী দাওয়া সন্‌ডুপের ইংরাজী-তিব্বতী অভিধান প্রকাশিত হয়েছিল। একদল বাঙালী পণ্ডিত ঐ সময় তিব্বতী চর্চায় বিশেষ উৎসাহবোধ করেন, তাঁদের ভেতরে শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত ও শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মশায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সুতরাং শান্তিনিকেতনে তিব্বতী চর্চার যে নতুন উদ্যোগ দেখা গেল তা বাংলা দেশের তিব্বতী সংস্কৃতিচর্চার ইতিহাসে দ্বিতীয় পর্ব বলা যেতে পারে।

লেভি সাহেব যখন তিব্বতী পড়াতে সুরু করলেন তখন বিধুশেখর শাস্ত্রী (শাস্ত্রীমশায়) ছাড়াও ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী, শ্রীনিতাইবিনোদ গোস্বামী (গোঁসাইজী), শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিদাস মিত্র প্রমুখ বিশেষ উৎসাহে যোগ দিলেন। প্রবোধ বাগচী মশায়ও ঐ সঙ্গে ছিলেন। শাস্ত্রীমশায়কে পরে আবেগভরে বলতে শুনেছি, "লেভি সাহেব ডেকে তিব্বতী শিখতে বললেন। উৎসাহের সঙ্গে লেগে গেলাম। দিন কয়েকের ভিতর অক্ষর পরিচয় হয়ে গেল। তারপর লেভি সাহেবের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'অপ্রমাদবর্গ' (জার্নাল এশিয়াটিক, ১৯১২) আর শে-রব দোঙ বু (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) প্রকাশিত ক্লাশে পড়ানো সুরু হোল। তখন কে জানতো আমাকে আজ অবধি এইভাবে তিব্বতী নিয়ে পড়ে থাকতে হবে। সেদিনের কথা আজও আমার মনে পড়ছে, ভুলিনি।"

১৯২২ সালে ৮ই অগাস্ট (বর্ষামঙ্গলের পরের দিন) লেভি সাহেবের শান্তিনিকেতন ছেড়ে দেশে ফিরে যাবার দিন স্থির হোল। তিনি তখন নেপাল থেকে ফিরে এসেছেন। তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানান হোল। তাঁর উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন তার সারসংক্ষেপ এখানে উদ্ধৃত হোল।

"পাশ্চাত্য দেশের বিদ্যালয়ে the classics-কে the humanities এই আখ্যা দিয়ে থাকি। এই কথাটি গভীর অর্থপূর্ণ। কারণ পাশ্চাত্য দেশের ছাত্রগণ গ্রীকদেশীয় হিব্রুদেশীয় ভাষা ও ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া বিরাট মানবসভ্যতার সহিত চিত্তের যোগস্থাপন করিতে শেখে। ঐ ছাত্রেরা সকলেই ঐ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ না করিলেও স্বদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া ব্যাপকতর মনুষ্যত্বের ও অতীতসভ্যতার সহিত পরিচিত হইতে সমর্থ হয়। ভারতবর্ষও একদিন এইরূপ সর্বদেশের ও সর্বকালের সহিত যোগযুক্ত হইয়া আন্তর্জাতিক মিলনের পরমোচ্চ সহায়তা করিবে এবং শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞানে গরীয়ান হইয়া উঠিবে, আমার এই আশা আছে। বিশ্বভারতীতে সেই শিক্ষার আয়োজন করা হইয়াছে। ঐ শিক্ষা ভারতবর্ষের কোন শিক্ষাকেন্দ্রে পাওয়া যায় না।"

যে সকল মনীষী বিশ্বভারতীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং যে উদার বিশ্বাত্মবোধ কবির মানসক্ষেত্রে উদিত হয়েছিল, তারই প্রত্যক্ষ সাধনায় ব্রতী হলেন শাস্ত্রীমশায় আর তাঁর সতীর্থবর্গ। সিলভাঁ লেভি চলে গেলেন, কিন্তু তিব্বতী সংস্কৃতির চর্চার উৎসাহ গেল না। ১৯২৩ সালের বিশ্বভারতীর বার্ষিক বিবরণীতে শাস্ত্রীমশায় নিজেই তিব্বতী পড়াতে সুরু করেছেন একথা বলা আছে। দুজন ছাত্র তখন তিব্বতী নিয়ে পড়াশুনা করেন।

ধ্যাননয়নে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে বিশ্ববিদ্যাচর্চার যে চিত্র দেখেছিলেন তা ধীরে ধীরে বাস্তবে রূপ নিতে লাগল। ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত শাস্ত্রীমশায় শান্তিনিকেতনে ছিলেন। এই কয়েক বৎসরে বিশ্বভারতীতে তিব্বতী সাহিত্যে ও সংস্কৃতিচর্চার এক বিশেষ কেন্দ্র হয়ে উঠল। সে সময় তিব্বতী বিভাগ বলে কোনো স্বতন্ত্র বিভাগ না থাকলেও সশিষ্য শাস্ত্রীমশায় তিব্বতী-ভাষাশিক্ষার যে বীজ বপন করেছিলেন আজ তা শাখান্বিত বৃক্ষে রূপ নিয়েছে। ঐ সময় শান্তিনিকেতনে তিব্বতী বৌদ্ধ-সংস্কৃতির চর্চা কতদূর উন্নত হয়েছিল তার স্বাক্ষর ঐ সময়ের নানা পত্র-পত্রিকার পাতায় পাতায় আজও দেখা যায়। অনেকে যাঁরা ঐ সময় বিশ্বভারতীতে তিব্বতী পাঠে প্রবেশ করেছিলেন উত্তরকালে তাঁরা দেশ-বিদেশে সুনাম অর্জন করেছিলেন। সে কথা শাস্ত্রীমশায় তাঁর ভোটপ্রকাশ ও নাগানন্দের ভূমিকায় স্পষ্ট করে বলেছেন।

বলা বাহুল্য তিব্বতী লামাকে বাদ দিয়ে তখন তিব্বতী পঠন পাঠন চলে নি। ১৯২৬-৩৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সোনম জোডুর লামা শান্তিনিকেতনের প্রখর গ্রীষ্মতাপ সহ্য করেও তিব্বতী চর্চার প্রেরণা জাগিয়েছিলেন। তিব্বতী বৌদ্ধশাস্ত্রের সংকলন কঞ্জুর ও তঞ্জুর ঐ সময় বিশ্বভারতীতে সংগৃহীত হয়। ঐ সংগ্রহের ভেতর কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ পুনর্লিখন করেন। তাঁর হাতের লেখা বড় সুন্দর ছিল। তাঁর ঐ পুনর্লিখিত গ্রন্থগুলি এখন পুস্তকাকারে মুদ্রণ করে প্রকাশ করলে বিশ্বভারতী তিব্বতী গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতার সমাধানে খানিকটা সহায়তা করবেন। তাতে দুর্মূল্যতাও কমবে।

ঐ সময় বিশ্বভারতীতে তিব্বতী-চর্চার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় পুরাতত্ত্বের যে সকল অজ্ঞাত তথ্য বা নষ্ট গ্রন্থ আজও তিব্বতী ভাষায় বিদ্যমান সেগুলিকে তিব্বতী ভাষা থেকে পুনরুদ্ধার করা। সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বৌদ্ধ দর্শন, পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে তিব্বতী সূত্রাকারে তুলনামূলক আলোচনা ও গবেষণা করা। তাতে উভয় দেশের ভেতর যে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র ছিল তা আবার পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। অন্যদিকে তিব্বতী শিল্পকলার প্রতিও সে সময়ের শান্তিনিকেতনে কলাভবনে আগ্রহ দেখা দিয়েছিল।

কলাভবনের কিছু চিত্রায়নে তার পরিচয় মেলে। ঐ সময় শাস্ত্রীমশায় আর্যদেবের চতুঃশতক, নাগার্জুনের মহাযানবিংশক, শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় জেতারির হেতুতত্ত্বোপদেশ প্রভৃতি বৌদ্ধদর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা করেন। তাছাড়া, অনাথনাথ বসু লুইপাদের তত্ত্বস্বভাবদৃষ্টি-গীতিকা, ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের বিমলরত্নলেখ ও চর্যাসংগ্রহ প্রদীপের আলোচনা করেন। প্রবোধচন্দ্র বাগচী মশায় দোহাকোষের তিব্বতী অনুবাদ নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেন। নগেন চৌধুরী মশায় ডাকার্ণবের তিব্বতী অনুবাদ নিয়ে গবেষণা করেন। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মশায় ধর্মপদের বিস্তৃত আলোচনা করেন। শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় লঙ্কাবতারসূত্রের তিব্বতী ও সংস্কৃত মিলিয়ে পদানুক্রমিক সূচী ও শ্রীআর্যস্বামী শাস্ত্রীজী তঞ্জুরের গ্রন্থসূচীর কাজ সুরু করেন। তা ছাড়া সুধর্মরত্নের তিব্বতী সংস্কৃত শব্দসূচী প্রণয়নের কাজেও আত্মনিয়োগ করেন। পরে শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপর পাণিনি ব্যাকরণের তিব্বতী সংস্করণের সঙ্গে তুলনা করার ভার দেওয়া হয়। ঐ সময়ে তিব্বত থেকে ওরগুণ্ড সংস্করণ কঞ্জুর ও তঞ্জুর সংকলন বিশ্বভারতীতে আনানো হয়।

পশ্চিমের তথাগত অধ্যাপক রুপে তুচিসাহেব শান্তিনিকেতনে এলেন। ঐ সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উইনারনিজ সাহেবও যাতায়াত করেন। কিছুদিন তিনি শান্তিনিকেতনে ছিলেনও। ১৯২৬—২৮ সালের কথা। তিব্বতী বিভাগে তখন অনেকেই আছেন। যেমন ভি ভি গোখলে, প্রভুভাই প্যাটেল। ফণিভূষণ বসু, অনাগরিক গোবিন্দ প্রভুভাই প্যাটেলের চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণ পরে প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক তুচিসাহেবের কাছে আর্যস্বামী শাস্ত্রীর তিব্বতী বিষয়ে গবেষণার কাজ ভালভাবেই এগিয়ে চলে। পরে তিনি অলকনন্দার মাঝে তিব্বতী সংস্কৃত মিলিয়ে

প্রকাশিত করেছেন। অবিশ্যি সেগুলি বিশ্বভারতী প্রকাশন নয়। এককথায় বলা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে তিব্বতীচর্চার কাজ তখন পুরোদমে চলেছে। শুধু তাই নয়, আজও ভারতের যে যেখানেই তিব্বতী ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করেছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই বিশ্বভারতীর তিব্বতী বিভাগের সঙ্গে একদিন না একদিন জড়িত ছিলেন। সেদিক থেকে এই প্রতিষ্ঠান একটা বড় ঐতিহ্যের দাবি রাখে। রাহুল সাংস্কৃত্যায়নজীও এই হিসাবে তিব্বতী জগতের একজন দিকপাল ছিলেন।

১৯৩৪ সালে শাস্ত্রীমশায় কলকাতায় চলে যান। তিব্বতী শিক্ষার প্রবাহে ভাটা পড়ল। শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় তখন বহু যত্নে ঐ ধারা রক্ষা করতে চেষ্টা করেন। ১৯৩৯ সালে লামা আমদো ওয়াঙ্‌দি শান্তিনিকেতনে আসেন। তিনি এসে তিব্বতীচর্চার একটা নতুন ধারা সুরু করেন। এতদিন অবধি সকলে তিব্বতী ভাষায় যে সকল ভারতীয় গ্রন্থ আছে তার পুনরুদ্ধার করতেই ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু ওয়াঙ্‌দি লামা তিব্বতের কবি-দার্শনিক ও ঐতিহাসিকদের স্বকীয় মূল গ্রন্থগুলিকে ইংরাজীতে অনুবাদের দিকে ঝোঁক দেন। তিনি ফালুর রচনাবলী ইংরাজীতে অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন। বিশেষ কারণবশত ঐ কাজ অসমাপ্ত রেখেই তাঁকে শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যেতে হয়। এখন ঐ অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি কোথাও পাওয়া যায় নি। তবে তাঁর এই উদ্যম তিব্বতীচর্চার দিক থেকে একটা নতুন ইঙ্গিত বহন করছে। ঐ সময়ে শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ত্রিস্বভাব নির্দেশ দ্বিভাষিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এইভাবে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত চলল। তারপর শান্তিনিকেতনের ইতিহাসে এলো কালো যুগ। রবীন্দ্রনাথ নেই।

পুনশ্চ রথীন্দ্রনাথের আহ্বানে শাস্ত্রীমশায় কিছুদিনের জন্যে অবৈতনিক গবেষণা পরিচালক হিসাবে শান্তিনিকেতনে আসা-যাওয়া করেন। প্রভুভাই প্যাটেলের বইখানি ঐ সময়ের প্রকাশন। অর্থাভাবে সব বিভাগের কাজকর্ম প্রায় বন্ধ। পরে প্রবোধচন্দ্র বাগচী মশায় গবেষণা পরিচালকের দায়িত্ব নিয়ে শান্তিনিকেতনে এলেন। আবার তিব্বতী বিভাগে গবেষণার তাড়া পড়ল। ধীরে ধীরে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃত হোল। এই সময় মানবের শান্তিভিক্ষু শাস্ত্রীমশায় তিব্বতী ও চীনা বিষয়ে গবেষণা করেন। তিব্বতীকরণ বইখানি ঐ সময় বিশ্বভারতীতে ছাপা হয়। পলহুর্স সাহেব সেটি ফরাসী ভাষা থেকে ইংরাজী ভাষায় তর্জমা করেন।

জাতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে কবির বিদ্যাসমবায়ের পরিকল্পনা এতদিনে সার্থক করার চেষ্টা হোল। ভোট-ভারতীয় তত্ত্বচর্চার জন্যে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ গড়া হোল। তার ইংরাজী নামটি পরিচিত "ডিপার্টমেন্ট অফ ইন্দো-টিবেটান স্টাডিজ্"। এই বিভাগের দায়িত্ব দুধরণের। একদিকে বর্তমান ভারতবাসীর সামনে ভোট-সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির যোগসূত্র স্পষ্ট করে তুলে ধরা। প্রাচীন ভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্পদ যা আজও সংগৃহীত বা পুনরুদ্ধৃত হয় নি তা উদ্ধার করা। অন্যদিকে আধুনিক ভাষা হিসাবে তিব্বতী ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। সে জন্য স্বতন্ত্র পাঠ্যসূচী ও পাঠক্রম তৈরি করা হয়েছে। তিব্বতী কথ্যভাষা শিক্ষার পড়াবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বিভাগের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিকে আজ সবাই আগ্রহশীল কালের খাতায় তার স্বাক্ষর পড়বে।
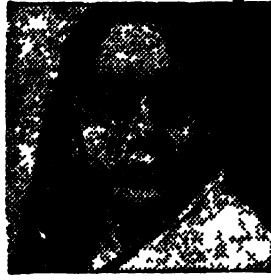
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

জুরিখে পৌঁছতে রাত প্রায় দশটা বাজল। ট্রেনে এক ভারতবন্ধু সুইস ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। নিখুঁত ভদ্র ব্যবহার। চমৎকার ইংরিজি বলেন। মাতৃভাষা জার্মান। জুরিখে পৌঁছে পোর্টার পাওয়া গেল না। এমনিতেই কোথাও না কি পোর্টার বেশি মেলে না। এতো আর ভারতবর্ষ নয়, যে কাজের অভাবে যাত্রীর মাল নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি করবে কুলিরা। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে মনে হল উনি এবং দারিদ্র্যের এই বৈচিত্র্যটা বেশি পছন্দ করতেন। নিখুঁত ছাটকাটের স্যুটের ওপর একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে উনি আমার ব্যাগটা তুলে নিলেন। কাছেই একটা হোটেল ঠিক করে দিলেন ওঁরা স্বামী-স্ত্রী মিলে আলোচনা করে। একেবারে একা যাচ্ছি তায় লৌহ কপাটের ওপারে। ওঁদের বোধ হয় অসম্ভব মায়া হচ্ছিল। তার ওপর ভারতবর্ষ কথাটা বলতেও উনি যেন খুশি হন মনে হল।

এতোদিনে আমি 'ম্যার্সি বোকু—' (অনেক ধন্যবাদ) কথাটা সুইসদের মত সুর করে বলতে শিখে গিয়েছিলাম। সত্যিই ভারি লজ্জা হচ্ছিল। ব্যাগটা বেশ ভারী কারণ ওটাই আমার একমাত্র লাগেজ। হাতে কেবল কোট আর ছোট একটা অ্যাটাচিকেস। ধন্যবাদ দিতে উনি হাসলেন।

হেসে বললেন—'কোনো মেয়ে যে এতো কম লাগেজ নিয়ে বিশ্বভ্রমণে বেরুতে পারে ভাবতে পারা যায় না।' ওঁর স্ত্রী-ও হেসে সায় দিলেন জার্মান ভাষায়। এই অংশের সুইসরা জার্মান বলে। আর জেনেভায় বলে ফরাসী।

কাল ভোরে নতুন জীবন শুরু।

চেকোশ্লোভাকিয়ার বর্ডার বেশি দূরে নয়। কাজেই রাতেই বিদায় নিয়ে নিলাম। কয়েক ঘণ্টার পরিচয়। অথচ কিরকম একটা মন কেমন করতে লাগল। অন্য কোনো দেশের মেয়ে হলে হয়তো উনি আমার ব্যাগ বয়ে দিতেন না। আমার

এক ইউরোপীয় বান্ধবী বলেছিল, ওদের ছেলেরা কেবল ওরিয়েণ্টাল মেয়ে দেখলেই না কি শিভালি দেখায়। একবার সাইবেরিয়ার পথে এক রুশ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বা ঐ জাতীয় একজন উচ্চ দরের সামরিক নেতা আমার স্যুটকেস বয়ে দিয়েছিলেন। আমি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছিলাম—'তোমাদের সত্যিই সোশ্যালিস্ট দেশ। র‍্যাঙ্কের কোনো গর্ব নেই। আমার ব্যাগটা কিরকম বয়ে দিলেন দেখলে?' শুনে আমার রুশ দোভাষী মেয়েটি হেসে বাঁচে না। বলে—'হায়, হায়! আমি যদি কাঁধে-মাথায় ব্যাগ নিয়ে যেতাম তাহলে কেউ আসত? একে তো কালো মেয়ে তায় রক্তে ইণ্ডিয়ান সামার! এ এক ধরণের রোপ্ ট্রিক্।'

হয়তো তাই। সুইস দম্পতি চলে গেলেন। বুঝলাম এই চার মাস দোষে-গুণে এঁদের আমার ভাল লেগে গেছে। আমার গুণে নয়, ওঁদের টানে। আজ বিদায় মুহূর্তে এমন কী জেনেভায় জিপসীদের মত সাজসজ্জা করা মাদাম মোরার আসরগুলোও নিতান্ত ফেলনা মনে হল না। আমরা সেখানে দল বেঁধে চা, চকোলেট আর পেসট্রি ধ্বংস করতে যেতাম। মাদাম মোরা শাড়ি পরে গহনা পরে বসে মেকী ভারতীয় রাণী সেজে বসতেন। ভারি সুন্দর দেখতে ছিলেন মহিলা। ওঁর আসরগুলোয় আধ্যাত্মিক আলোচনার চেষ্টা হত। ভারতীয় মন! প্ল্যানচেট, না, সাইকো-এনালিসিস্? গান্ধীবাদ না কমিউনিজম? ইন্টেলেক্চুয়েল কচকচি না সিম্পল্ লিভিং? আমি প্রচুর খেতাম। কথা যেটুকু না বললে নয় ততটুকু বলতাম। নারায়ণ আর বাণী প্রচণ্ড তর্ক করত। সে-ও এলোমেলো ধরণের।

সবকিছু খুব ছেঁদো মনে হত। তবু এখন সেই মাদাম মোরার আসরগুলোর রূপ আর মজার দিক মনে পড়ছে। মনে পড়ছে মাদাম ক্রিক-কে (বোধ হয় নামটা একটু ভুল হল)। উনি আমাদের

একটা সাইকোলজিকাল পরীক্ষা করেছিলেন। জেনেভায় বসে ভারতীয় ছেলে-মেয়েদের চরিত্রের গভীরতা মাপছিলেন! আমাকে বলেছিলেন,—'এটি গভীর জলে থাকে!' নারায়ণ লাফিয়ে উঠেছিল—'আমরা তো সবাই গভীর—ও কি তার চাইতেও বেশি? অক্সিজেন দরকার হয় না?'

রাত ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। বাইরে ও কি? মেঘ, না অন্ধকার রাতের স্বচ্ছ নীল আকাশ? চেকোশ্লোভাকিয়ার আকাশ কি কাল স্বচ্ছ থাকবে? এপ্রিলের গোড়ায় ফুচিকের দেশকে দেখতে যাচ্ছি সে আমার সৌভাগ্য। কিন্তু যেন ফুলে ফুলে রোদে হাসিতে ঝলমল্ করে! নয়তো আমার মনের ছবির সঙ্গে মিলবে না।

সারাটা রাত ঠাণ্ডা অন্ধকারে ট্রেনের কামরায় ঘুম ঘুম চোখের পাতায় ঘুম একটা বড় আসে নি। জুরিখ ছাড়ার পর থেকেই মনে যে উত্তেজনা ছিল, তা ঠিক ঘুমের উপযোগী ছিল না। একেবারে একা যাচ্ছি। সঙ্গে একটি ব্যাগ, ছোট এ্যাটাচি, পাসপোর্ট, টিকিট, আর সবসুদ্ধ দুখানা দশ ডলারের নোট। এই সম্বল করে নতুনের সন্ধানে যাওয়ার একটা উত্তেজনা আছে। জেনেভার খরচ চলেছিল নিজের রোজগারের টাকায়। আর যে কটি টাকার 'ট্রাভেলার্স চেক' দেশ থেকে সঙ্গে এনেছিলাম তা দিয়েছিল দিদি সীতা আর বোন আবু। টিকিটাকি খরচ জুগিয়েছিল দাদারা। আমার ইউরোপ আসার ভাড়াটা দিয়েছিলেন এক স্নেহ-পরায়ণা আত্মীয়া, এই হিসেবের মধ্যেই ছিল আমার পথের সম্বল ঐ দুখানা মার্কিনী নোট।

বর্ডারে পৌঁছে সে এক ঝামেলা। ঘটাং ঘটাং করে ট্রেন থামল। বেশ জানালি দিয়ে। ইতিমধ্যে ট্রেনের চেকার বহুবার আমাকে দেখে গেছে। বেশ একটু কৌতূহল চোখেই। কেন না, আমার রূপেটায় সে অন্য খানী ঢুকতে দেয় নি। হয়তো ভেবেছে

জেলেমানবে কালো ভারতীয় মেয়েটা ভয় পাবে।

নৌল রং পোষাক-পরা দুজন চেক্ সীমান্তের প্রহরী এসে কামরায় ঢুকল। পাসপোর্ট, ভিসা, মোটঘাট—সব ওরা পরখ করে দেখবে। ভয়ানক কড়াকড়ি দুদিকেই। পর্দার ওধারে গেলে ওরা ভীষণ সতর্ক। এধারে এলে এরা সন্দিগ্ধ। সব কিছু ঠিক থাকলেই তবে পর্দা উঠবে।

প্রহরী দুজনের সঙ্গে এলেন ট্রেনের চেকার। পাসপোর্ট, টিকিট দেখলেন। কোঁচকানো ভুরু স্বাভাবিক জায়গায় ফিরে এল। ঠোঁটের কোণে একটু হাসিও ফুটে উঠল। চেক্ ভাষায় বন্ধুত্বপূর্ণ কয়েকটা কথাও বললেন বলে মনে হল। তারপর পাসপোর্টটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন,—'দোব্রে' মানে, ভাল। বলে দুজনেই আমার করমর্দন করলেন।

দেশে থাকতে ভাবতাম আমার গায়ে খুব জোর। কব্জিও খুব চ্যাটাল। সবাই অন্তত তাই বলতে। আন্তঃকলেজীয় স্পোর্টসে ডিস্কাস্ ছোড়ায় চ্যাম্পিয়নও হয়েছিলাম। কিন্তু ইউরোপে এসে প্রথম করমর্দনেই নিজের শক্তির ওপর আর আস্থা থাকে নি। নিজের কব্জি দুটোকে দেশলাইয়ের কাঠি মনে হত। বিশেষ করে পূর্ব-ইউরোপ আর সোভিয়েট ইউনিয়নে করমর্দনের বহরটা এমন কথায় কথায় আর এমন জোরাল যে, আগে থেকে তৈরি না থাকলে সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠত।

ভারতীয় বলেই বোধ হয় এত সহজে নিষ্কৃতি পেলাম। সে সময় পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই ভারতীয়দের একটা আলাদা খাতির ছিল। বিশেষ করে পূর্ব-ইউরোপে। ওরা এশীয়দের সত্যিই ভালবাসত। ভাবত আমরা শুধু নিপীড়িত নয়,—লড়াকুও বটে। তাছাড়া ভারতবর্ষ এমন রহস্যাবৃত। ও দেশের মেয়েরা আজও শাড়ি পরে। উচ্ছ্বসিত হয়ে ওরা বলত—তোমরা কি ভয়ানক 'একজটিক'!

ভোরের আলো ফুটতে ফুটতে প্রাগ এসে গেল। স্টেশনে ছিলেন কয়েকজন ভারতীয় ছাত্রবন্ধু, ডিমলা বাকাবা আর জনদুই চেক্ সহকর্মী। হোটেলে থাকবার বন্দোবস্ত হয়েছে। শহর জুড়ে শুনলাম তখনও রাজনৈতিক উত্তেজনা। চেকোশ্লোভাকিয়াকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া চলছে। পাল্লা যেদিকে ভারী সেদিকেরই অবশ্য জয় হচ্ছে। পূর্ব-ইউরোপের গোষ্ঠীর মধ্যেই চেকোশ্লোভাকিয়া থাকবে—এটা স্থির নিশ্চয়।

বিরাট স্টেশন থেকে বেরিয়ে আমি অবাক। এই তাহলে প্রাগ। জ্যোৎস্নার চেয়ে উজ্জ্বল কিন্তু তারই মত স্নিগ্ধ সকালের সূর্যের আলো। এপ্রিল মাসের প্রাগের সৌন্দর্যের তুলনা হয় না।

প্রাগ! অনেক অপেক্ষা, অনেক সংশয়, অনেক আশা নিয়ে আমার প্রাগে আসা। বহুক্ষেত্রে এতখানি আবেগ নিয়ে কোথাও গেলে—আশাভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু প্রাগ যা হবে ভেবেছিলাম, এসে দেখলাম, তা তার চাইতে অনেক সুন্দর। ইতিহাসের পাতা থেকে উড়ে এসে শহরটা যেন আমার চোখের সামনে হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠল। এপ্রিল মাসের এই প্রাগ, মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল আর একটি এপ্রিলের প্রাগকে, যার পরিচয় পেয়েছিলাম জুলিয়াস ফুচিকের 'ফাঁসীর মঞ্চ থেকে লেখা' বইতে।

সে বই পড়ে জেনেছিলাম ১৯৪২ সালের এমনি এক ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন প্রাগ শহরের বুকে নাৎসীদের 'গুস্তাপো' স্টেপ' করা এস এস্ সৈন্যরা চেকোশ্লোভাকিয়ার অসামান্য বীর লেখক জুলিয়াস ফুচিককে গেস্টাপোর পানক্রাৎস জেলে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। শুধু ফুচিককে নয়। হাজার হাজার স্বাধীনতাকামী চেক মেয়ে-পুরুষ, তরুণ-তরুণী কিশোর-কিশোরী-এক কথায় আবালবৃদ্ধবনিতাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তারা কেবল অত্যাচার করেছিল তা-ই নয়, বিনা বিচারে ফাঁসী দিয়েছিল। পাঠিয়ে দিয়েছিল মেলে ক্যাম্পে। কাউকে বা দেশের প্রতি, স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি অচল থাকার অপরাধে সবাই মেরেই শেষ করে দিয়েছিল। নাৎসীবাদ যে কি জিনিস, এমন স্পর্শ না এলে যেন ঠিক [illegible] হয় না।

ফুচিককে সমস্তরকম [illegible] যখন রাজি করা যায় নি তখন তাঁর স্ত্রী গুস্তিনাকে নিয়ে এসেছিল ওরা। বলেছিল—বোঝাও, সব বলে দিতে বল নইলে তোমার স্বামীর আর [illegible] ফাঁসী হবে। গুস্তিনা চোখের দৃষ্টি দিয়ে অত্যাচারে ক্ষত বিক্ষত ফুচিককে আদর করতে করতে বলেছিলেন—মিঃ কমিশনার ওকে আমি চিনি না। নইলে ওটাই আমার সবচাইতে বড় আর শেষ আকাঙ্ক্ষা। যদি ওঁকে ফাঁসী দেওয়া হয় তাহলে যেন আমাকেও ফাঁসী দেন।'

এই ঘটনার উল্লেখ করে ফুচিক তাঁর জেলের ডায়েরীতে লিখেছেন—'ওরা আমাদের জীবন নিতে পারে নেই না, গুস্তিনা? কিন্তু ওরা আমাদের ভালবাসা আর সম্মান হরণ করতে পারে না'।

চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষগুলোর মধ্যে এমনি সব ফুচিক আর গুস্তিনা ছড়ানো আছে। এদের সবে ঘরে স্বাধীনতার লড়াইয়ের ঐতিহ্য। যুদ্ধের শেষে যখন সোভিয়েট সৈন্য অবশেষে চেকোশ্লোভাকিয়ার বুক থেকে জার্মান মিলিটারী নাৎসী শক্তির পরাজয় ঘটাল তখন প্রায় প্রত্যেক ঘরে আনন্দ আর শোক মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। কারুর ছেলে, কারুর মা বা বোন, স্বামী বা স্ত্রী, বাবা অথবা মেয়েকে নিয়ে গিয়েছে ফ্যাসিস্টরা। শত অত্যাচারের মধ্যেও তারা আশায় দিন গুণেছে—কবে আসবে মুক্তি, কবে আসবে লাল ফৌজ। কমিউনিস্ট, সোস্যালিস্ট, রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক, মেয়ে-পুরুষ কেবল দিন গুণেছে—এই বীভৎস শাসনের শেষ হোক—ধ্বংস হোক হিটলারের অমানুষিক স্বৈরাচার।

আমার ভাবনার জাল ছিঁড়ে গেল ডিমলার ডাকে—'ঐ দেখো, দেখো বাটার কারখানা। কি বিশাল দেখ।'

বাটার জুতোর জন্ম চেকোশ্লোভাকিয়ায়। বিরাট সংগঠন। এরা বাটাকে বলে 'বাচা'। যুদ্ধের পরে চেকোশ্লোভাকিয়া সমাজতন্ত্রের দেশ হবার সঙ্গে সঙ্গে হাই মেলানোর ভারতবর্ষে বা কানাডা বা অন্যান্য দেশের বাটার কারখানার সঙ্গে এদের সম্পর্কচ্ছেদ হয়েছে। কিন্তু সর্বত্র এদের জুতোগুলোয় তবু দেখায় যেন একটু চেক ভাব আজও রয়ে গেছে।

প্রাগ শহরের রূপ বর্ণনা করা শক্ত। ওদেরই মত বলে উঠতে ইচ্ছে করে—কি একজটিক! একদিকে বহু শত বছরের পুরোনো প্রাসাদ, পাথরের চাতাল দিয়ে ঢাকা রাস্তা, একতলা দোতলা বাড়ি। অন্যদিকে স্কাইস্ক্র্যাপার কারখানা, হোটেল [illegible], আপিস ইত্যাদি। যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে নতুন বাড়িগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। সেগুলো সম্পর্কে এদের মমতা অনেক বেশি। গোল্ডেন তৈরি করা হচ্ছে অনেক [illegible] দিয়ে। ছুটির দিনে দেশের অনেক ছাত্রী, যুবশক্তি স্বেচ্ছাসেবক হয়ে এগিয়ে এসেছেন, ভালবাসা দিয়ে গড়ছেন। ফুচিকের আশাবাদ তাঁর নিজস্ব, আত্মত্যাগ—এ দেশের যুবশক্তির মূলমন্ত্র। এদের কথা কাজে, সবক্ষেত্রে সেটাই অনুভব করছি।

[ক্রমশঃ]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]
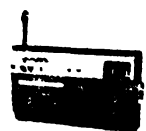
নির্বাসনে (১৯৩৩—১৯৪৮) : এই সময় ব্রেশট সেইণ্ট মনিকায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন। ধীরে ধীরে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে খানিকটা প্রতিষ্ঠা অর্জনের চেষ্টা করছিলেন। ১৯৪২ সালে ম্যাক্স রাইনহার্ট হলিউডে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে ফুরখট্ উনট্ এলেণ্ট ডেস টিট্রেন রাইখেসের (ফিয়ার এণ্ড মিজারি অভ দি থার্ড রাইখ) মঞ্চাভিনয়ের একটি পরিকল্পনা করেছিলেন। এর অনুবাদের ভার পড়ে এরিক বেণ্টলের ওপর। নিউ ইয়র্ক স্টেজে ১৯৭৫ সালে বেরথল্ড ফিয়ারটেল 'দি প্রাইভেট লাইফ অব দি মস্টার রেইস' নাম দিয়ে এই নাটকটি প্রোডিউস করেন—এ অভিনয় বিশেষ জনপ্রিয় হয় নি।

ক্রমে ইংরাজী পর বুদ্ধিজীবীদের ভেতর ব্রেশটের নাম [illegible] পড়তে থাকে। তাঁর [illegible] একটি প্রবন্ধ [illegible] —এটি ১৯৪১ সালে [illegible] পার্টিসান রিভিউতে প্রকাশিত [illegible]। ১৯৫৩ সালে এই আর হেএজ [illegible] একটি [illegible] ইংরাজী অনুবাদ করেন। কাফেক [illegible] এবং ব্রেশট [illegible] নাটকীক [illegible] রূপান্তর করেন। এটি [illegible] ব্রেশট [illegible] সময় [illegible] সৌভাগ্য হয়েছিল এরিক বেণ্টলে খুব প্রচার শুরু করে [illegible] ব্রেশটের নাটক [illegible] অভিনয় পদ্ধতি এবং ব্রেশটিয়ান [illegible] সম্পর্কে—ফলে এই নির্বাসিত [illegible] নামডাক [illegible] ইওরোপে প্রচারিত হচ্ছিল।

এরিক [illegible] দি ককেশিয়ান চক সার্কেল [illegible] অব সেজুয়ান এর ইংরাজী [illegible] ফেললেন। প্রথমোক্ত অনুবাদটি মিনেসোটার কার্লটন কলেজে ১৯৪৮ সালে মঞ্চস্থ হয়। (এ প্রবন্ধের পাঠকদের [illegible] জন্য জানাচ্ছি যে কার্তিক মাস থেকে আমার বাংলায় অনূদিত 'ককেশিয়ান চক সার্কেল' 'প্রবাসী' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।)

এইচ. আর. হেএজ এই সময় ব্রেশটের [illegible] ইংরাজী [illegible] একটি [illegible] করেছিলেন। [illegible]

নিজে বিখ্যাত অভিনেতা চার্লস লটনের সঙ্গে 'গ্যালিলাই'-এর ইংরাজী অনুবাদে ব্যস্ত ছিলেন। চার্লস লটন চাইছিলেন ঐ নাটকটির নামভূমিকায় অভিনয় করতে। ১৯৪৭ সালের ৩০শে জুলাই জোসেফ লোজী করোনেট থিয়েটারে (হলিউডে) 'দি লাইফ অব গ্যালিলাই' প্রোডিউস করলেন—লটনের অভিনয় হয়েছিল অনবদ্য।

১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রেশটের কাছে পরোয়ানা এল কমিটি অব আন-আমেরিকান এ্যাকটিভিটিজের কাছে তার ঐ জাতীয় কাজকর্মের সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে। এই সাক্ষ্যের বাংলা অনুবাদ আমাদের এখানে প্রকাশিত অনেক পত্র-পত্রিকাতে বেরিয়েছে বলে আর তার লিখেছেন :

Brecht left Washington with the thanks of the Committee on Un-American Activities for his exemplary behaviour as a co-operative witness.

ওয়াশিংটন থেকে ব্রেশট নিউ ইয়র্ক ফিরে গেলেন এবং তার কিছুদিন বাদেই আমেরিকা পরিত্যাগ করলেন।

তারপর এসে হাজির হলেন সুইটজারল্যাণ্ডের জুরিখে। হিটলারের ক্ষমতালাভ এবং যুদ্ধের বছরগুলোতে জুরিখের সাওস্পিয়েল হাউসই জার্মান-স্পিকিং থিয়েটারকে তার সম্মানের আসনে বসিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছিল। এই নাট্যমন্দিরটি এবার 'মাদার কারেজ' রিভাইভ করবার ব্যবস্থা করলেন, 'পুনটিলার' সর্বপ্রথম রজনীর শুভ উদ্বোধনের জন্যও এই প্রতিষ্ঠানটিই উঠে-পড়ে লেগেছিলেন। কয়েরে প্রতিষ্ঠিত 'দি মিউনিসিপ্যাল থিয়েটার এ্যাট সুর' ব্রেশটকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর এ্যাণ্টিগোনের (সোফোক্লিস) এডাপ্টেশন মঞ্চস্থ করবার জন্য। তাঁর স্কুলের সহপাঠী এবং বন্ধু ক্যাসপার নেহার চলে এলেন মঞ্চসজ্জার ব্যবস্থাপনা
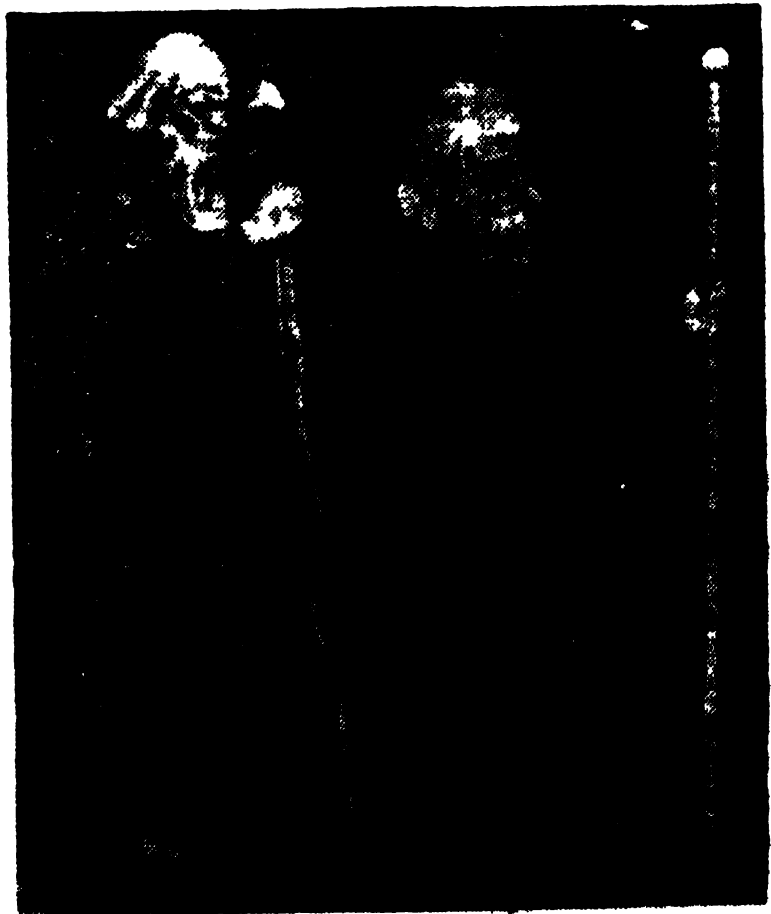
[illegible]

করবার জন্য। হেলেনা ভাইগেল এ্যান্টি-গোনের ভূমিকায় [illegible]—and the performance was a memorable demonstration of the Brechtian style of production.

আবার থিয়েটারের কাজে আত্ম-নিয়োগ করতে পেরে ব্রেশটও যেন প্রাণ-শক্তিতে ভরপুর হয়ে উঠলেন। তাঁর নাট্য-রচনা-পদ্ধতি ছিল চিরপ্রচলিত এ্যারিস্টটল নির্দেশিত পথের সম্পূর্ণ বিপরীত—এই সময় নিজস্ব মতবাদকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলেন 'লিটল অরগেনাম ফর দি থিয়েটার' প্রবন্ধটিতে। 'দি ডেইজ অভ দি কমিউন' প্লেটিও লিখতে শুরু করলেন এইবার। এইটিই তাঁর শেষ সম্পূর্ণ রচনা।

এরপর ব্রেশট ফিরে এলেন পূর্ব বার্লিনে—কিন্তু সে কাহিনী পরের সংখ্যায় আলোচনা করবো।

ব্রেশটকে আজ সারা ইওরোপ এ যুগের শ্রেষ্ঠ নাটাকার বলে স্বীকার করে নিয়েছে। এর প্রধান কারণ বোধহয় তাঁর রচনার ক্লাসিক্যাল সিম্পলিসিটি। উদাহরণ স্বরূপ 'ককেশিয়ান চক সার্কল' থেকে দুটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

গায়ক

প[illegible] (যে সময়টাকে রক্তাক্ত ইতিহাস [illegible] চলে) ককেশিয়ান শহরে (এ শহরকে লোকে বলতো অভিশপ্ত নগরী), শাসন [illegible] একজন গভর্নর। তার নাম ছিল জর্জি আবাসহুইলি। সে ছিল [illegible] মত [illegible]. তার স্ত্রী ছিল পরমাসুন্দরী. তার ছেলেটি ছিল বেশ স্বাস্থ্যবান। গ্রুসিনিয়ায় আর কোনও শাসকের আস্তাবলে এতোগুলো ঘোড়া ছিল না. দ্বারপ্রান্তে ছিল না এত [illegible]। সরকারের চাকরিতে বহু সংখ্যক সৈন্য, আদালত প্রাঙ্গণে বহু শত আবেদনকারী। জর্জি আবাসহুইলি—কিভাবে তার বর্ণনা দেব? জীবনকে সে পরমানন্দে উপভোগ করতো। ঈস্টার সানডের সকালে গভর্নর এবং তার পরিবার পৌঁছল গীর্জায়।

[কয়েকজন এসে বাঁদিকের একটি বিরাট প্রবেশপথের দরজার কাঠামো দাঁড় করিয়ে দেবে। ডানদিকে আরও বড় একটি খিলান দেওয়া সিংহদরজা একই-ভাবে স্থাপিত হবে। ভিক্ষুকের দল এবং বহুসংখ্যক আবেদনকারী সিংহদরজা দিয়ে কাতারে কাতারে বেরিয়ে [illegible]—[illegible] [illegible] [illegible] অভিযোগনামার

মেহগনীর একটি দৃশ্য

শিশু। কেউ ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটছে, কারো হাতে আবেদনপত্র। এদের পেছনে দুজন সৈনিক। এরপর গভর্নরের পরিবারকে আসতে দেখা যাবে—এদের পোষাক-পত্র খুব দামী।]

ভিক্ষুক এবং আবেদনকারীর দল:

দুজন সৈনিক। এরপর গভর্নরের পরিবার।

মহানুভব শাসক! আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি দিন—আমাদের করের হার ভয়ানকরকম বেড়ে গেছে—দেবার মত ক্ষমতা আমাদের নেই।

—পারশিয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে আমার একটি পা খোয়া যায়। আমি কোথায় টাকা পাব.....

—প্রভু! আমার ভাই নিরপরাধ, একটা কিছু ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে .....

—প্রভু! আমার কোলের বাচ্চাটা না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে!

—[illegible] [illegible] [illegible] সৈনিক-বৃত্তি থেকে আমাদের ছেলেকে মুক্তি দেওয়া হোক। এই আমাদের একমাত্র জীবিত সন্তান—বাকী সবাই যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গেছে।

—অনুগ্রহ করে শুনুন প্রভু! জল পরিদর্শনের জন্য নিযুক্ত কর্মচারীটি ঘুষ খায়।

[একজন রাজ্য সরকারের ভৃত্য এসে আবেদনপত্রগুলো সংগ্রহ করে নেবে এবং ভিখারীদের কিছু কিছু পয়সা দেবে। সৈনিকেরা এবার লোকের ভিড় তাড়িয়ে নিয়ে যাবে—চামড়ার তৈরি চাবুক দিয়ে তারা লোকেদের মারতে শুরু করবে—ভয় পেয়ে জনতা পেছিয়ে যাবে।]

[illegible]—[illegible] [illegible]! [illegible]! গীর্জার দরজার কাছে ভিড় [illegible] [illegible]

[illegible]

বিরাট ব্যক্তিরা সব দৃষ্টিহীন। তারা ভাবে তারা দেবতাদের মত শক্তি ধরে, অপদার্থের দল কুঁজো হয়ে হাঁটে. ভাবে ভাড়াটে শক্তির দাপটে সবাইকে দাবিয়ে রাখবে। এতকাল দাপট চালিয়ে এসেছে বলে মনে করে চিরকাল এমনটাই চলবে। যুগে যুগে অনেক কিছুই বদলায়, সেইটেই জনগণের পক্ষে একমাত্র আশার বাণী।

প্রথম উদ্ধৃতিটিতে ধনতান্ত্রিক সমাজের আসল চেহারাটাকে অতি সহজে এবং সুন্দরভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। এ সমাজে থাকে একদিকে ঐশ্বর্যের নির্লজ্জ উল্লাস এবং অন্যদিকে দারিদ্র্যের অভিশপ্ত এবং কদর্য বিলাপ, সৈন্যদলের বীভৎস অত্যাচার, আর সমাজের জনসাধারণের বুভুক্ষার হাহাকার।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটিতে ব্রেশট সামান্য কয়েকটি কথার সাহায্যে আমাদের স্পষ্ট-ভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন ধনতান্ত্রিক সমাজের শক্তি। সম্পূর্ণভাবে ভাড়াটে রক্ষীদের ওপর নির্ভরশীল।

কিন্তু সমাজ একভাবে চিরকাল চলে না। যুগে যুগে অনেক কিছুই বদলায়। সেইটেই জনগণের পক্ষে একমাত্র আশার বাণী।

এরপর আমি ব্রেশটের 'সেইন্ট জোন অফ দি স্টক ইয়ার্ডস' 'দি থ্রী পেনী ওপেরা এবং 'ককেশিয়ান চক সার্কল' থেকে তিনটি গানের বাংলা অনুবাদ তুলে দিচ্ছি। ব্রেশটের জীবনদর্শনের মূলতত্ত্বের আভাস পাওয়া যাবে এইসব গান থেকে। গানগুলির বাংলা অনুবাদ করেছেন শ্রীদুর্গাদাস সরকার।

সেইন্ট জোন অফ দি স্টকইয়ার্ডস থেকে ঃ

শোষকের জীবনদর্শন ঃ

নিচতলা আর ওপরতলার লোকের প্রাণে
উঠে ওঠার শক্তি জাগুক অভয় জানে।
যারা আছে এখন যেথায়
থাকবে তারা সুখে সেথায়।
করবে লোকে যা তার যোগ্য
যে ভুলবে তা—তার দুর্ভোগ গো
সেই কথাটি এই মহাজন কেবল জানে।

বলতে পারো নিচতলাকার মানুষগুলি
যোগ্য জনের অধিকার যায় কেন ভুলি?
যে পারে সে উঠতে পারে আকাশপানে।

শোষিতের জবাব ঃ—

কিন্তু যারা নিচের দিকে তলিয়ে যায়—
রাখছো তাদের আরো নিচের কোন্ তলায়?
ওপরতলায় আছো চরম সুখে,
উঠবে আরো ওপরে কোন্ মুখে?
ওই ওপরের মানুষগুলোর ছোট্ট মন।
হে মহাজন! সাধবে তারা কার প্রয়োজন?
কারণ তাদের সকল কানুন গরীবদেরই কানমলায়।

জানে তারা ভীষণ শোষণ,
ওরা বেনিয়মে রক্তলোচন;
তাইতো বলি, ওপরতলার শোষককে কি সহ্য করা যায়?

দি থ্রী পেনী ওপেরা থেকে ঃ

ভালো মানুষের ভেক ধরবার তো বুদ্ধি বলিহারী।
গরীবকে দাও অর্থ তোমার, চমক লাগাও ভারি।
যখন সকল মানুষজাতি ভালো
তারা যে তার রাজত্বটা পায়,
কী চমৎকার স্বর্গীয় সেই আলো,
বলি, তাতে থাকতে কে না চায়?
লোক ঠকাবার ভড়ং তোমার ধরতে যেন নারি।

বেঁচে থাকার দায়টা তবু মেটে না যে মোটে;
যোগান কম বাজারে, তাই গরীবের প্রাণ ঠোঁটে।
তবু যে চায় শান্তি সহাবস্থান খুব তারিফ করি তারি।

কিন্তু প্রাচীন জগৎটা যে নরক তেমন ঠাঁই,
এই পুরাতন পৃথিবীকে বদল করা চাই।
আমরা সবাই প্রাচীন নিয়ম বদলে দিতে পারি।

ককেশিয়ান চক্ সার্কল্ থেকে ঃ

তোমরা তোমরা তোমরা যারা
চকখড়িতে আঁকা বৃত্তের গল্প শুনেছ,
আর্যবাক্য শ্রবণ করে
কেউ নিজেদের দিন কি গুণেছ?
সজ্জনেরাই ফিরে পাবে হারানো ধন কে না জানে—
আসল মাতা যেভাবে পান চুরি করা তার সন্তানে।
যারাই ভালো চালক তারা চালায় গাড়ি অবশেষে,
সেচকর্মে কুশলী লোক পাবেই জমি দেশে দেশে.
এসব কথা তোমরা ভুলেছ।

[ক্রমশঃ]

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

অন্য অরণ্য ফ্রাংকাইন—বেদুইন। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড। ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য: ৩·৫০।

বেদুইন বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত নন। সাহিত্যক্ষেত্রে ইতিমধ্যে তাঁর স্থান সুনির্দিষ্ট। একটি নাবিকের বিড়ম্বিত জীবনের কাহিনী নিয়েই এই উপন্যাসটি রচিত। ধনবতী মাতা, গুণবতী ও রূপবতী স্ত্রী, একমাত্র পুত্রসন্তান যে-কোন লোকের ঈপ্সিতের বস্তু। এসব থাকা সত্ত্বেও ফ্রাংকাইনের জীবন হয়েছে ব্যর্থ। সামান্য ক'টা কথা, যা স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে অনাবশ্যক হলেও আলোচনা করা হয়। তাই নিয়ে স্ত্রী হিংস্র ফণিনীর মত দংশন করেছে স্বামীকে। সেই নিষ্কণ্ঠ নিয়েই ফ্রাংকাইন মনের জ্বালায় ছুটেছে অজানার উদ্দেশ্যে। প্রতিশোধস্পৃহা নিয়েই স্ত্রী জিজ্ঞার মনে প্রতিহিংসাপরায়ণতা প্রকটরূপে দেখা দিয়াছে। সেজন্যে নিজের সন্তানের পিতৃপরিচয় পর্যন্ত অস্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করে নি।

*

কিশোর ভারতী —সম্পাদক: দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ৮/৩, চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা—৯। দাম প্রতি সংখ্যা ৭৫ পয়সা

বাংলাদেশের কিশোর ও তরুণরা ইতিমধ্যে পত্রিকাটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। আলোচ্য সংখ্যাটি প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা। এই পত্রিকাটি এতো তাড়াতাড়ি কিশোর-চিত্ত জয় করতে পারবে—এ কথা অনেকেই ভাবতে পারেন নি। তবে বাংলা দেশে সত্যিকারের কোন জাতের কিশোর-পত্রিকার প্রয়োজন—তা আমাদের জানা ছিল বলেই এই পত্রিকার শারদীয় সংখ্যাটিকে আমরা অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। হয়তো উক্ত কারণেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের অজাট কবিতাটি এই পত্রিকায় শিরোনামরূপে এবার প্রকাশিত হয়েছে। কিশোর ভারতীতে কোনরকম গাঁজাখুরির বালাই নেই—যা আছে তা একাধারে কিশোর-চিত্তকে উৎসাহিত, উদ্দীপ্ত, রোমাঞ্চিত ও উদ্বুদ্ধ করার মতো দুঃসাহসিক সব কাহিনী। বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমসাময়িক ঘটনা (যেমন উত্তরবঙ্গের বন্যা), স্মরণীয় জীবন-এর ওপর ভিত্তি করে গল্প ও ধারাবাহিক উপন্যাসগুলি ভালো লাগবে। এ ছাড়া আছে লিমেরিক, দেশ-বিদেশের জানার মতো গল্প এবং আরো অনেক কিছু। বিশেষভাবে কিশোরদের শিক্ষণীয় এবং আকর্ষণ করার মতো—যতোগুলি বিভাগ লক্ষ্য করলাম—তা আর কোথাও আছে বলে মনে হয় না। বিদ্যালয়ের পাঠাগারে কিশোর ভারতী থাকলে ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক উপকার সাধিত হবে।

একটি বেদনাদায়ক মৃত্যু

দীর্ঘকাল রোগভোগের পর কবি সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় শেষ পর্যন্ত আমাদের ছেড়ে গেলেন। কবিতা এবং সঙ্গীতের প্রতি আত্মনিবেদিত এই মানুষটিকে সবাই ভালবাসতেন। রোগশয্যায় শুয়ে থেকেও তিনি কিন্তু কবিতাকে এক মুহূর্ত ছেড়ে থাকতে পারেন নি, বরং বলা চলে, যন্ত্রণাদায়ক মুহূর্তগুলিতে কবিতাই তাঁর কাছে ছিল বিশল্যকরণীর মত, এবং কবিতা সৃষ্টিকেই তিনি বেঁচে থাকার মন্ত্র করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে আমাদের হারাতেই হলো। বর্তমান কবিতাটি তাঁর সর্বশেষ রচনা।

বোড়ের চাল

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

এসো বন্ধু এসো এসো। সম্মুখেই তো দাবার ছক ওই পাতা;
সারাদিনটা খেলে-খেলে যদিও ধু-উ-ব ধরেছে আজ মাথা;
তবু তোমায় ফেরাব না। দাবা ছাড়া খাদ্য পরিপাক
করাই মুশকিল। দ্যাখো দ্যাখো বোঁ বোঁ করে উড়ছে মশার ঝাঁক!
একটুখানি দাঁড়াও দাদার, জ্বালিয়ে দিই নিকস্ত ধূনুচি;
হ্যাঁ, কী বলছি, খেলায় যেদিন সত্যিসত্যিই থাকবে না আর রুচি—
সেদিনে এই শর্মা মৃত। বাহা! বাহা! চেলেছ বেশ চাল,
কিন্তু মাথায় থাকে যদি বিধিদত্ত অঢেল তুষিমাল—
শেষরক্ষেটা করতে তুমি পারবে নাকো, হবেই কুপোকাত;
কত রথী-মহারথী বোড়ের চালে হল কিস্তিমাত।

গজ ছোটাবে? নৌকো ঠেলবে? খেলবে নিয়ে আড়াই চালের ঘোড়া?
বোড়ের কাছে সব জব্দ, ঘোড়াদুটোর হবেই যে পা খোঁড়া
মন্ত্রীর বুদ্ধি ভোঁতা এবং রাজা কেবল ঠুঁটো জগন্নাথ!
জীবনভোর তো খেলছ ভায়া, আসল খেলার কোথায় যে তফাৎ
বুঝলে কিছু? মেকি টাকার মতন অচল ঘুণধরা সব চাল;
রাজা-মন্ত্রীর যুগ কি আছে? বোড়ের ঠেলায় সবাই নাজেহাল!

খেলাটা বেশ জমছে নাকো। একটি-দুটি এল-এস-ডি তাই ছাড়ো;
আচ্ছা, নাও এই বোড়ে টিপলাম। দ্যাখো যদি সামাল দিতে পারো!
পারলে না তো? পারলে না তো? পরের চালেই হবে কিস্তিমাত;
এখন উঠে এসো বন্ধু, ঝাঁ-ঝাঁ করছে বাইরে কালো রাত।

অভিনন্দন

এ বছর রাষ্ট্রপতি চলচ্চিত্র পুরস্কার পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অকৃপণ। যদিও প্রতি-বছরই বাংলার ভাগ্যে সর্বভারতীয় না হলেও অন্তত আঞ্চলিক পুরস্কারের একটা টিকা অ্যাশ থাকে। তবে এ বছর এক সংগে বাংলার ঘরে চার-চারটি পুরস্কার এসে পড়েছে। কম সৌভাগ্যের কথা নয়। অবশ্য সুদেশ বহুবছর দিতে সত্যজিৎ রায়কে পুরস্কার দিয়ে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের মর্যাদা লাভ হয়েছে—দেশের মানুষের কাছে।

এবারে ১৯৬৭ সালের শ্রেষ্ঠছবি হিসাবে স্বর্ণপদক লাভ করেছে তপন সিংহের 'হাটেবাজারে'। হাটেবাজারে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ছবি কি না সে প্রশ্ন না তুলেও তপন সিংহের এই সম্মান লাভের জন্য আমরা আনন্দিত এবং তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান পেয়েছেন উত্তমকুমার। এই পুরস্কার তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য ছিল। বর্তমানে ভারতীয় চলচ্চিত্রে যাঁরা অভিনয় করেন তাঁদের মধ্যে উত্তমকুমার প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা কেবল নন, অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। 'নায়ক', 'চিড়িয়াখানা' ইত্যাদি ছবিতে আমরা তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্য দেখেছি। গত দু'-তিন বছরের মধ্যে উত্তমকুমারের অভিনয়-প্রতিভা আরো বিকশিত হয়েছে। তাঁর প্রতি আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন।

পরিচালনার ক্ষেত্রে সত্যজিৎ রায়ের পুরস্কার লাভে নতুনত্ব কিছু নেই। তাঁর পরিচালন দক্ষতার কথা দেশের সীমান্ত পেরিয়ে স্বীকৃত। তবে পণ্যচিত্র বাজারের চাপে তাঁকে যদি কিছুটা নত হতে না হত সেটা হত জাতির পক্ষে আরো গৌরবের। তাহলে চিড়িয়াখানার জন্য তাঁকে পুরস্কার পেতে হত না; পথের পাঁচালী, অপরাজিত, দেবীর চেয়েও ভাল ছবি তাঁর হাত থেকে হয়ত আমরা পেতে পারতাম।

আঞ্চলিক ছবির পুরস্কারটি পেয়েছে বিজয় বসুর 'আরোগ্য নিকেতন'। ছবিটি এখনো মুক্তিলাভ করে নি। কাজেই প্রতিযোগী আঞ্চলিক ছবিগুলির মধ্যে এ ছবির বৈশিষ্ট্য আমাদের জানা সম্ভব হয় নি। বিজয় বসুর 'ভগিনী নিবেদিতা' ইতিপূর্বে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করেছিল। প্রচারে না থেকেও নীরব কর্মীর মত বিজয় বসুর পুরস্কার—ভাগ্য ভালই বলতে হয়।

এই চার-চারটে পুরস্কারে আমরা আনন্দিত। কিন্তু সেই সংগে কিছুটা চিন্তা-যুক্ত। কারণ বাংলা ছবির মান যেভাবে নেমে যাচ্ছে—দ্রুত তা হিন্দীর সংগে হাত মেলাবার দিকে চলেছে মনে হয়। ফলে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ক্রমে ফিকে হয়ে যাচ্ছে।

আমরা আরো পুরস্কার চাই; কিন্তু আমাদের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিয়ে চলচ্চিত্রের হাটেবাজারের ছবি বিনিময়ে নয়। —সুজন।

উত্তমকুমার

পদ্মাবতী-জয়দেব

বাংলার জনপ্রিয় কবি জয়দেব কাহিনীর এক তেলেগু ভাষ্য 'পদ্মাবতী-জয়দেব' ছবিটি। বাংলার লোক-কাহিনীকে দক্ষিণ ভারতে কি দৃষ্টিতে দেখেছে তা জানবার ঔৎসুক্য নিয়ে ছবিটি দেখতে গিয়েছিলাম। যথেষ্ট আনন্দ লাভ করেছি। ছবিটি ঘটনাবৈচিত্র্যে, অভিনয় উৎকর্ষে, গানের প্রাচুর্যে এবং নৃত্য-বৈশিষ্ট্যে যথেষ্ট উপভোগ্য। আর যাঁরা ভক্তিরসে আনন্দ পাবেন তাঁদের জন্য আবেগপ্রধান দিকটি ছবিতে যথেষ্ট রয়েছে। ছবিটি বাংলায় ডাবিং হয়েছে; গানগুলিও বাংলার গায়কীতে গাওয়ান হয়েছে মান্না দে, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র মুখার্জী, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরতি মুখার্জী প্রমুখকে দিয়ে। গানগুলির প্রায় সবগুলি এবং ভক্তিরসে ভরপুর। দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেতাদের উচ্চারণভঙ্গির সংগে তাল রেখে গানগুলি সিনক্রোনাইজ করা খুবই কঠিন; এ কাজটা অতি সুন্দরভাবে করেছেন সুরকার বিজন পাল। তিনি নিজের সুর দিয়ে টাইটেল সংগীতটিও পরিবর্তন করেছেন। ফলে ছবিটি বাঙালী দর্শকদের মনের কাছাকাছি এসে গেছে। দর্শকদের কাছে দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেতারা অপরিচিত হলেও কাহিনী এবং গানের দিক থেকে ছবিটি মন স্পর্শ করতে পারবে। গানের দিক থেকে বিজন পালের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

ছবির কাহিনী জয়দেবের কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ, পদ্মাবতীকে বিবাহ করে তাঁর কবি-প্রতিভার বিকাশ, তাঁদের প্রেম—রাধাকৃষ্ণের প্রেমে বিলীন হয়ে কি-ভাবে এই কবিদম্পতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ লাভ করলেন, নবদ্বীপে রাজা লক্ষ্মণ সেনের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন এবং রাজ-মহিষীর ঠাট্টা শুনে পদ্মাবতীর প্রাণত্যাগ ইত্যাদি ঘটনায় আকর্ষণীয়। লোকগাথার রীতিতে এই কাহিনী অগ্রসর হয়েছে এবং স্থানে স্থানে অলৌকিক ঘটনাবলী আশ্রয় করেছে। হয়ত দক্ষিণ ভারতের দর্শকমন বিচারে এই অলৌকিকতা প্রাধান্য পেয়েছে। কাহিনীকে রসাত্মক করেছে গানগুলি এবং সময় সময় নাচ। নাচগুলি শুদ্ধ ভরত নাট্যম্ রীতির এবং এতে বিখ্যাত গোপীকৃষ্ণ, বি. সরোজা এবং মঞ্জুরী দেবী অংশগ্রহণ করেছেন। নাচগুলি বাস্তবিকই আকর্ষণীয়। ভক্তিরসের ছবি এত নাচে-গানে ভরাট বাংলা দেশে হয় না। এখানে নিছক ভক্তির প্রাধান্য থাকে। অথচ এই ছবিটি দেখে মনে হল ভক্তিরসের ছবিকেও কত উপভোগ্য করা যায়।

'পদ্মাবতী-জয়দেব'-এ যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁরা দক্ষিণ ভারতের প্রায় অভি-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

মাধুরী দেবী। এঁরা [illegible] দর্শকদের আকৃষ্ট করতে পেরেছেন। অন্যান্য চরিত্র-গুলিও সু-অভিনীত।

দোষের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপের ভাষিং গানের মত সার্থক হয় নি। আর শিল্প-নির্দেশ ও ফটোগ্রাফী সময় সময় দুর্বল মনে হয়েছে, অবশ্য বাংলার তুলনায়। ছবির সবচেয়ে সার্থকতার দিক হল পদ্মাবতী-জয়দেবের প্রেমের সহজ-সরল প্রকাশ এবং এই প্রেম প্রেরণায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যদিও বাংলায় প্রচলিত জয়দেব কাহিনীর সঙ্গে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, তবু দক্ষিণ ভারতীয় এই ভাষ্য বাঙালী দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দিতে পারবে।

দিলীপ বসু পরিচালিত 'বৌদি' ছবিতে সন্ধ্যারাণী ও অনিল চ্যাটার্জী

অক্টোবর

একটি বিশ্বখ্যাত ঐতিহাসিক ছবি

সের্গেই আইজেনস্টাইনের 'অক্টোবর' ছবিটি কলকাতার দর্শকরা দেখার সুযোগ লাভ করেছেন। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির মধ্যে 'অক্টোবর' অন্যতম। এতদিন যাঁরা সিনেমার ইতিহাসে এই ছবির কথা পড়েছেন তাঁরা এবার ছবিটি দেখার সুযোগ পেলেন। রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবের পরে যাঁরা নভেম্বর বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য এবং তার ব্যাপ্তিকে চলচ্চিত্রে রূপ দিয়েছেন সের্গেই আইজেনস্টাইন তাঁদের অন্যতম। এটি তাঁর চতুর্থ ছবি। ছবির অবলম্বন বিখ্যাত আমেরিকান সাংবাদিক সাহিত্যিক জন রীডের লেখা বই "টেন ডেইজ দ্যাট স্যুক দি ওয়ার্ল্ড।" ছবিটিতে জারতন্ত্রের পতন ও জনতার বৈপ্লবিক কার্যকলাপ, কেরেনস্কির অস্থায়ী সরকার গঠন এবং জনতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, বলশেভিকদের বিরুদ্ধে চরম দমননীতি এবং সামরিকভাবে বলশেভিকদের প্রস্তুতির সময় গ্রহণ, অবশেষে অস্থায়ী সরকারের বিরুদ্ধে শ্রমিক, সৈন্য ও নাবিকদের অভ্যুত্থান। অরোরা জাহাজ থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা এবং শীতকালীন প্রাসাদ দখল ও লেনিনের আত্মপ্রকাশ ইত্যাদি প্রামাণিক তথ্যসমূহ এই ছবিতে দেখান হয়েছে। ইতিহাসের প্রামাণ্য ঘটনাবলীর সঙ্গে প্রতীকের সাহায্যে কেরেনস্কির চরিত্র উদ্ঘাটন, জারের শক্তির হিংস্রতা এবং জনতার বৈপ্লবিক উৎসাহ প্রকাশ করা হয়েছে। পরস্পর বিরোধী দুই শ্রেণী শক্তির সংগ্রামের চেতনায় ঘটনার পর ঘটনা উপস্থিত করা হয়েছে। এককথায় ছবিটিকে বলা চলে জীবন্ত তথ্যচিত্র। এতে ছোট ছোট মানবিক স্পর্শ রয়েছে, কিন্তু তা এত সংক্ষিপ্ত যে আজকের দর্শকের কাছে হয়ত কাহিনী অংশের অভাব অনুভূত হতে পারে। মনে রাখতে হবে ছবিটি বিশ দশকের তৈরি, তখন এই ধরণের প্রামাণিক তথ্যসম্পন্ন ছবি চলচ্চিত্র জগতে অভাবনীয় ছিল। ছবিটিতে

[illegible] পরিচালিত [illegible] ছবিতে [illegible] ও দেবব্রত [illegible]

কেরেনস্কি সম্পর্কে যেভাবে শ্লেষ করা হয়েছে তা যেমন কৌতুকপূর্ণ তেমনি [illegible]। দর্শকরা ছবির অনেক চরিত্রকে রাজনৈতিক মহলে আজকের দিনেও দেখতে পাবেন।

প্রদর্শিত 'অক্টোবর' ১৬ মিলিমিটারের ছবি। আলোর কাজ আজকের দিনের মত উজ্জ্বল নয়। কিছুটা সম্পাদনাও হয়েছে। এই ছবি নির্বাক যুগে তৈরি, নবসংস্করণে সঙ্গীত সংযোজিত হয়েছে। সম্পাদনার কাজে সাহায্য করেছেন মূল ছবির চিত্রধারক এডওয়ার্ড টিসে।

ছবিটি ক্যালকাটা সিনে ইনস্টিটিউট, [illegible] সেন্ট্রাল প্রভৃতি ফিল্ম ক্লাবগুলি দেখাচ্ছে।

নাটকের কথা

কল্পারণ্য

[illegible] ইনস্টিটিউট নাট্যসংস্থা প্রযোজিত 'কল্পারণ্য' নাটকের (মিনার্ভা থিয়েটার, ২১ অক্টোবর ১৯৬৮) নাট্যকারের ঘোষিত লক্ষ্য "বর্তমানের হাস্যকর নাট্যরীতি ও [illegible]...পরিবেশন" করা; তিনি [illegible] নাট্যধারার নাট্যকার [illegible] যেমন "হাস্যকর" মনে করেন, [illegible] [illegible]। এই "হাস্যকরত্ব" নিয়েই কল্পারণ্য নাটক।

নির্মল ঘোষের পরিচালনায় সমগ্র প্রযোজনায় যে গতি, বৈচিত্র্য ও সাবলীলতা আছে, তাতে সমস্ত ব্যাপারটায় প্রচণ্ড মজা পাওয়া যায়। মজাটা উদ্ভট রসেরই, ডন কিহোটের মত চরিত্রের আবির্ভাব, অন্তরীক্ষ নাট্য কন্ট্রোল কমিশনের পক্ষ থেকে মিস্ মুখার্জির সরেজমিন তদন্ত, এবং মুখোসের ব্যবহারে। মুখোসের পরিকল্পনা যিনি করেছেন এবং যাঁরা মুখোসগুলি তৈরি করেছেন, তাদের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। অভিনয়ে প্রধান কৃতিত্ব উর্মী গঙ্গোপাধ্যায়ের। চলাফেরার ধরনে, কথার আত্মপ্রত্যয়ী দ্রুততা অথচ স্পষ্টতায়, এবং প্রায় সমগ্র মঞ্চকে অবলীলায় কাজে লাগিয়ে তিনি সমগ্র নাটকের মধ্যেই এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব হয়ে

'অক্টোবর' ছবির একটি দৃশ্যে অভ্যুত্থানের পূর্ব-মুহূর্তে

প্যাভলভ ইনস্টিটিউটের 'কল্মাষপাদ' নাটকের একটি [illegible]

দাঁড়িয়েছেন। অভিনয়ে সবিৎ রায়, [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতা মুখোপাধ্যায়, [illegible] চক্রবর্তী ও সুব্রত নন্দী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সম্পর্কেই [illegible] [illegible] [illegible] আরম্ভণ- [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপা[illegible] [illegible] কেউ যে [illegible] না। [illegible] মৌবা[illegible] ও [illegible] [illegible] তাঁদেরও [illegible] পরম উপভোগ্য করে তুলেছেন। [illegible] বোধ হয় নাটকের মূল উদ্দেশ্য [illegible] গেল। তবে বেশ বুদ্ধিদীপ্ত ও সুপ্রযোজিত একটা হাসির নাটক দেখতে পাওয়াও আজকাল সৌভাগ্য বিবেচনা করা [illegible]।

মাল্যদান

চিত্রলিপি ফিল্মস 'পরিণীতা'র কাজ শেষ করে রবীন্দ্রনাথের 'মাল্যদান' কে চিত্ররূপ দিতে অগ্রসর হয়েছেন। মুখ্য ভূমিকায় মনোনীত করা হয়েছে নন্দিনী মালিয়াকে। নন্দিনী মালিয়া কুড়ানীর ভূমিকায় অভিনয় করবেন। তাঁর সঙ্গে অভিনয় করছেন ঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। নন্দিনী 'দুটি' ছবিতে অভিনয় করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ছবিটি পরিচালনা করবেন অজয় কর। চলচ্চিত্র শিল্পে সুপরিচিত বিমল দে এবং অজয় কর ছবিটি প্রযোজনা করছেন।

ভারতীয় প্রামাণ্য [illegible] ডিপ্লোমা লাভ

সম্প্রতি [illegible] অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয় দেশের চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় প্রামাণিক ছবি 'লালবাহাদুর শাস্ত্রী স্মরণে' ডিপ্লোমা লাভ করেছে।

এই উৎসব প্রতিযোগিতামূলক ছিল না। এশিয়া ও আফ্রিকা দেশসমূহের ছবি দেখান হয়েছে মাত্র। কিন্তু যে সব ছবি উৎসবের আদর্শের সঙ্গে সংগতি-সম্পন্ন সেই ছবিগুলিকে সোভিয়েট ইউনিয়নের দর্শটি সংস্থার পক্ষ থেকে ডিপ্লোমা দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে—'ইন ট্রিবিউট টু মেমরি অব লালবাহাদুর শাস্ত্রী' অন্যতম। উজবেক সোসাইটি অব ফ্রেন্ডশিপ এন্ড কালচারাল রিলেশনস্ উইথ ফরেন কান্ট্রিজের পক্ষ থেকে এই সম্মান জ্ঞাপন করা হয়েছে।

'হ্যানয়তে একদিন' (ভিয়েৎনাম), "আমরা একসঙ্গে বাঁচব" (কোরিয়া), 'এগাকোরের উপর কালোছায়া' (কম্বোডিয়া) ছবি তিনটি এবং পাকিস্তানের সিনেমা কর্মীরা ডিপ্লোমা লাভ করেছে।

লখনউ শহরে নট-নাটম্

লখনউ বেঙ্গলী ক্লাবের আহ্বানে স্থানীয় বিদ্যাসাগর পাঠাগারের সাহায্যার্থে নাট্যসংস্থা নট-নাটম্ আগামী ১৮, ১৯ এবং ২০-এ নভেম্বরের সন্ধ্যায় বেঙ্গলী ক্লাব মঞ্চে জগমোহন মজুমদার রচিত, 'করুণা কোরো না', 'শঙ্কর' এবং 'পাখীর বাসা' এই তিনটি নাটক অভিনয় করবেন। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করবেন সংস্থার নির্বাচিত শিল্পীবৃন্দ। নাটক তিনটি পরিচালনা করছেন নাট্যকার শ্রীমজুমদার স্বয়ং।

বাতায়নের অনুষ্ঠান

বাতায়ন নাট্যসংস্থা আগামী ১৯শে নভেম্বর সন্ধ্যা সাতটায় মুক্তঅঙ্গনে মনোজ মিত্রের নেকড়ে নাটক মঞ্চস্থ করবেন। গত ২৮, ২৯ ও ৩০শে সেপ্টেম্বরের [illegible] পর এটি তাঁদের চতুর্থ [illegible]।

সিনে সেন্ট্রাল—ক্যালকাটা

আগামী ১৭ তারিখে ক্যালকাটা সিনে সেন্ট্রালের উদ্যোগে বার্ট হানস্ট্রা কৃত প্রখ্যাত ডাচ ছবি 'ফ্যানফেয়ার' ও ১৫ এবং ১৮ তারিখে বুলগেরীয় ছবি 'ক্যালোযান' অ্যাকাডেমী অফ ফাইন আর্টস হলে দেখান হবে। এছাড়া সংস্থা আগামী ২৯ ও ৩০ তারিখে ১৯৬৬ সালের ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বিজয়ী আলজিরীয় ছবি 'ব্যাটল অফ আলজিরাস' ও ২রা ডিসেম্বর বুলগেরীয় ছবি 'বি হ্যাপী অ্যানী' প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। উত্তরবঙ্গের বন্যাদুর্গত জনগণের সাহায্যার্থে সংস্থা আগামী ১লা ডিসেম্বর প্রাচী প্রেক্ষাগৃহে 'শেকস্‌পীয়ারওয়ালা' ছবিটির বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন।

এলো যে শীতের বেলা
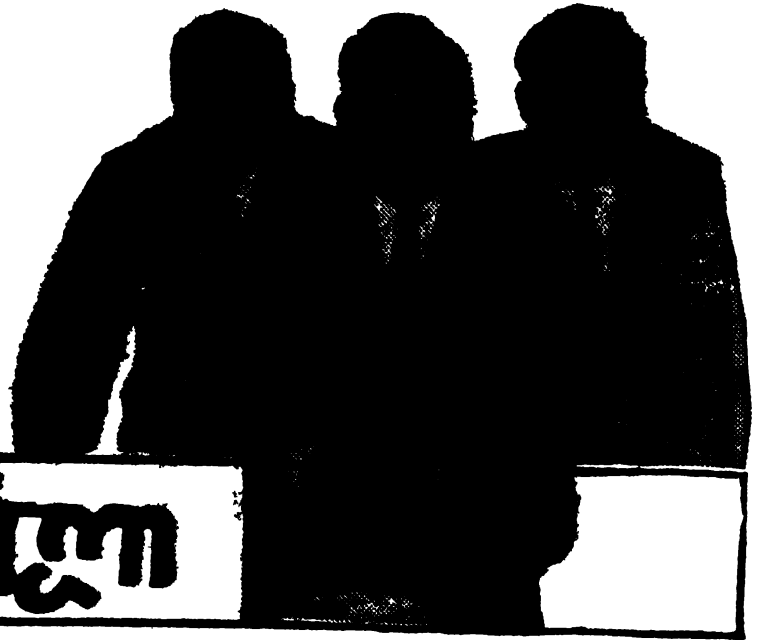
এসে গেল যে শীতের বেলা—আজ তাই ময়দানের আনাচে-কানাচে চলেছে শীতের বেলার প্রস্তুতি। একদিকে মাঠে মাঠে আজ চলেছে পিচ তৈরির কাজ আর একদিকে নেটে নেটে বলপড়ে ব্যাট নড়ে। তবে ব্যাট-বলের মধুর কলতানে ময়দানের আকাশ-বাতাস ভরে ওঠে নি এখনো। এখনো ওঠে নি আউট-নট আউটের প্রশ্ন, এখনো উইকেট থেকে বাউণ্ডারীতে বল করছে না ছোটাছুটি। এখনো আসে নি সময় ক্রিকেট লেখার আইন-কানুন নিয়ে মাথা ঘামাবার। এখন শুধু চলেছে প্রস্তুতি—চলেছে গড়ে-পিঠে নিজেদের প্রস্তুত করে নেবার প্রচেষ্টা।

অর্থাৎ ক্রিকেট আসছে। অবশ্য কলকাতায় ক্রিকেটের মরশুম এখনো পুরোপুরির আসে নি। কারণ অলিতে-গলিতে এখনো শুরু হয় নি ব্যাট-বলের লড়াই। তাই বলতে বাধা নেই যে কলকাতার শীতের মতো ক্রিকেটও আসব আসব করছে। হঠাৎ একদিন যেমন ঝুপ করে শীত পড়ে যাবে তেমনি শুধু কলকাতার নয় সমস্ত বাংলা দেশ জুড়ে বসে যাবে ক্রিকেটের আসর। আরম্ভ হবে লীগ ক্রিকেট, নক আউট, রনজি ট্রফির খেলা আর তারপর হয়তো বা ভারত-এম সি সি-র টেস্ট লড়াই আসর মাৎ করবে। রমণীয় ক্রিকেটের স্মরণীয় ক্ষণগুলি ইডেনে শীতের দুপুরগুলো আনন্দ হাসি-গানে ভরিয়ে তুলবে। আর সেই দিনগুলোর কথা ভেবে এখনই অনেকের মনে জাগছে রোমাঞ্চ, শিহরিত হয়ে উঠেছে মনপ্রাণ। মনে পড়ে যাচ্ছে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। চোখের সামনে ভাসছে ঊনিশ'শ সাতষট্টি সালের পয়লা জানুয়ারীর ইডেনী লঙ্কাকাণ্ডের দৃশ্য।

ইডেনে টেস্ট ম্যাচের কথায় তাই আজ আবার ভাবনা হয়। মনে জাগে সংশয়। ফেলে আসা দিনগুলোর স্মৃতি মনে ধরায় জ্বালা। আবার কি হবে কে জানে! আবার কি সি এ বি কর্তৃপক্ষের অতি লোভের মাশুল দিতে গিয়ে মার খেতে হবে খেলা দেশের ক্রীড়া উৎসাহী জনগণকে? আবার কি ইডেনে বইবে প্রতিবাদের ঝড়? শোনা যাচ্ছে, কলকাতায় যদি ভারত বনাম এম সি সি র টেস্ট ম্যাচ হয় তাহলে না কি টিকিটের বিক্রি ব্যবস্থায় খুব কড়াকড়ি করা হবে। কিন্তু কড়াকড়ি যতোই হোক তাতে কি একই নম্বরে একাধিক টিকিট ছাপা বন্ধ হবে? বন্ধ হবে কি চোরাপথে টিকিট আদান-প্রদানের চিরন্তন প্রথা। মনে তো হয় না। আবার একথাও শোনা যাচ্ছে যে এবারের টিকিট বিলি-ব্যবস্থার ভার নেবেন স্বয়ং রাজ্যপাল! খবরটা কতোটা সত্যি জানি নে। তবে যদি সত্যি হয় তাহলে চিন্তার বিষয় বটে। রাজ্যপাল রাজ্যশাসন ছেড়ে মাঠ শাসনে মন দিলে হয়তো বা আবার মাঠের শাসন-ব্যবস্থাও ভেঙে পড়তে পারে। কারণ—আর যাই হোক সি এ বি কর্তৃপক্ষ কখনই কোনমতেও রাজ্যপালের টিকিট বিলি-ব্যবস্থায় বিষয়টি ভালোভাবে নিতে পারবেন না। তখন শুরু হবে মন কষাকষি। আর শেষ পর্যন্ত যে কি হবে—তা আর কে জানে। তবে সাধারণ ক্রীড়ামোদী হিসেবে আমরা সি এ বি-কে অনুরোধ জানাই যে তাঁরা যেন একটু সতর্ক থাকেন। আর যাই হোক কোন রকমেও যেন আর সাতষট্টি সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে। সমস্ত বিশ্বের চোখে কলকাতা আবার যেন ছোট হয়ে না যায়......। —[illegible]

[illegible]

অলিম্পিকের আসর

এবার মুখ খুলেছেন অশ্বিনীকুমার। সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের পরাজয়ের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক সাফাই গেয়েছেন তিনি। বলেছেন অনেক লম্বা-চওড়া কথা। আর তার মধ্যে দিয়েই অতি বুদ্ধিমানের মতো চেয়েছেন নিজেদের দোষ কাটাতে।

কিন্তু নিজেদের দোষ এড়াতে এবার ও'রা কতটা সফল হবেন জানি না। দেশের লোক এবার সচেতন হয়ে উঠেছেন। অলিম্পিক হকির সেমিফাইনালে ভারতের পরাজয় আজ প্রতিটি ভারতবাসীর মনে দিচ্ছে জ্বালা। তাই শুধুমাত্র অশ্বিনীকুমারের মুখের কথায় তা আমরা ভুলবো না।

অশ্বিনীকুমারের মতে বিশ্বের অন্য দেশগুলো হকি খেলায় যথেষ্ট উন্নতি করলেও ভারতের জাতীয় বিপর্যয় ঘটেছে এ কথা চিন্তা করার দরকার নেই। অর্থাৎ অন্য কোন দেশ ভারতের আশে পাশেও ঘেঁষতে পারবে না। অশ্বিনীকুমার বোধ হয় ভুলে গেছেন যে মেক্সিকো অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দল শুধুমাত্র অস্ট্রেলিয়াই নয়—হেরেছে নিউজিল্যাণ্ডের কাছেও। আর শেষ পর্যন্ত ভারতের বরাতে জুটেছে ব্রোঞ্জের মেডেল।

অশ্বিনীকুমার আবার মেক্সিকো অলিম্পিকের আম্পায়ারিং নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। আমাদের মনে হয় এই বিষয়টি উত্থাপন মর্যাদা হানি করা। কারণ খেলায় পরাজয়ের পরই সাধারণত এই ধরণের প্রশ্ন তোলা হয়ে থাকে। আর ও কথা যে অশ্বিনীকুমার তুলবেন তা এক রকম জানাই ছিলো। কারণ নিউজিল্যাণ্ডের কাছে হেরে যাবার পর ভারত আম্পায়ারিং এর বিষয় নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলো।

এ ছাড়া অশ্বিনীকুমার কতকগুলো টেকনিক্যাল বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। অথচ বিষয়গুলির মধ্যে এমন কয়েকটি আছে যার সম্বন্ধে আগে ভাগেই তাঁদের অর্থাৎ অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের সচেতন হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু তাঁরা তা হন নি। চাপা দিতে চাইছেন অন্যের ওপর দোষ চাপিয়ে।

পরিশেষে অশ্বিনীকুমার খেলোয়াড় নির্বাচনের বিষয়ে বলেছেন যে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়রাই ভারতীয় দলের পক্ষে মনোনীত হয়েছিলো। আর ভারতীয় দল তাদের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের জন্যে যে গোল করতে পারে নি—এ ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক। এ বিষয়ে মন্তব্য করার কোন প্রয়োজন দেখি না। পাঠক-পাঠিকারা নিজেরাই বিচার করে দেখুন......।

চেকোশ্লোভাকিয়ার মেয়ে ভেরা ক্যাসলেভাস্কা মেক্সিকো অলিম্পিকে মেয়েদের বিভাগে সব চেয়ে বেশি স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। মোট ছটি পদক পেয়েছেন ভেরা—এর মধ্যে আছে চারটি স্বর্ণ ও দুটি রৌপ্য পদক।
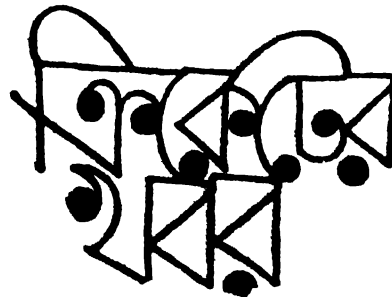
ক্রিকেটের খবর

ক্রিকেটের খবরের কথা বলতে গেলেই আসবে এম সি সি দলের ভারত সফর প্রসংগটি। দক্ষিণ আফ্রিকা সফর বাতিল হওয়ায় এম সি সি দল আসতে চাইছে ভারতে। গরজটা এবার ওদেরই বেশি। কারণ আর যাই হোক ভারতে খেলতে এলে বেশ কিছু টাকা তো পাওয়া যাবে। তাই দাবি তাঁদের টেস্ট ম্যাচের জন্যে কুড়ি হাজার প[illegible] দর।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক এম সি সি দলের ভারত সফরের পক্ষে সম্মতি দিয়েছেন। এখন অর্থমন্ত্রক সম্মতি দিলেই হয়। বাকী শুধু ঐটুকুই। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী আর মোরারজী দেশাই এ আই সি সি-র মিটিং-এর পর দিল্লীতে ফিরলে তাঁদের মত নিয়ে তবে অর্থমন্ত্রক এই ভ্রমণে সম্মতি জানাবেন অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর করবেন।

তাই মনে হচ্ছে যে শেষ পর্যন্ত এম সি সি দল ভারত ভ্রমণে আসবে। এম সি সি-র এই সফর হবে মাত্র

ছ'সপ্তার। এখনো পর্যন্ত ঠিক আছে যে তিনটে টেস্ট খেলা হবে। কিন্তু নয়া দিল্লী এখন বায়না ধরেছে যাতে সেখানেও একটা টেস্ট ম্যাচ হয়।

টেস্ট ম্যাচ যে-ক'টাই হোক না কেন একটা বিষয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষকে সচেষ্ট হতে হবে। ভারত দলকে এবার দেশের মাটিতেই খেলতে হবে শক্তিশালী এম সি সি দলের বিরুদ্ধে। এতোকাল এম সি সি-র ভারত সফরের সময় ইংলণ্ডের সেরা খেলোয়াড়রা নানা অজুহাতে ভ্রমণ এড়িয়ে যেতেন। ভাবতে তাঁরা আসতেই চাইতেন না।

কিন্তু এবারকার ব্যাপারই আলাদা। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের জন্যে মনোনীত এম সি সি দলের সব খেলোয়াড়রাই বোধ হয় ভারত ভ্রমণে আসবেন। অর্থাৎ কাউড্রের নেতৃত্বে যে দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারিয়ে দিয়ে এসেছে সেই দলই আসবে ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে।

তাই ভারতীয় দলকেও সময় থাকতে গড়ে পিঠে নিতে হবে। এম সি সি দল ভারতে আসবে সেই জানুয়ারী মাসের শেষে। তাই এখনো দু'মাসের ওপর সময় আছে। সফরের ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেলে কোচিং-এর মাধ্যমে ভারতীয় খেলোয়াড়দের প্রস্তুত করে নিতে হবে।
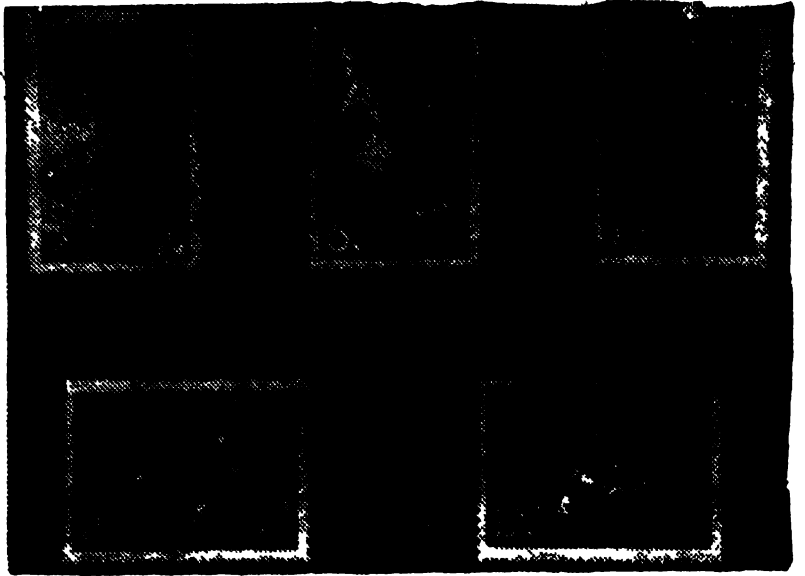
দেশের মাটিতে ভারতীয় দল ভালোই খেলে। কিন্তু বিদেশে গেলেই লবডঙ্কা। তবে এবার দেশের মাটিতে ইংলণ্ডকে হারাতে ভারতীয় দলকে চালাতে হবে প্রাণান্ত সংগ্রাম। আর সেই সংগে ভারতীয় দল গঠনে ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে বিচক্ষণতার পরিচয়। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয় ....!

মেক্সিকো অলিম্পিক উপলক্ষে রাশিয়া প্রকাশ করেছিলো এই পাঁচটি স্ট্যাম্প

দিল্লীতে সম্প্রতি শেষ হয়ে গেল ডি. সি. এম ফুটবল প্রতিযোগিতা। বম্বের মফৎলাল ক্লাব ফাইনালে হারিয়ে দিয়েছেন জলন্ধরের লীডার্স ক্লাবকে। ছবিতে ট্রফি নিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছে মফৎলাল দলের খেলোয়াড়দের।

আগামী ১৫ই নভেম্বর থেকে দিল্লীতে আরম্ভ হচ্ছে সুব্রত মুখার্জী কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা। সর্বভারতীয় এই স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতায় ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এবার যোগ দিচ্ছে মোট ২৬টি দল। বাংলা দেশের বেশ কয়েকটি দল এবারও অংশ গ্রহণ করবে এই প্রতিযোগিতায়। গত বছর সুব্রত মুখার্জী কাপ লাভ করেছিলো কার নিকোবর দ্বীপের গভর্নমেণ্ট হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল।

* * *

এবার জোড়হাটে বসছে জাতীয় জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর। এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করার জন্যে বাংলা দলের ১৮ জন খেলোয়াড় মনোনীত হয়েছেন। শ্রী পি কে দাশ ম্যানেজার ও শ্রীসুশীল ভট্টাচার্য কোচ হিসেবে দলের সংগে গেছেন।

অভিজিৎ [illegible] (হেরিমোহন [illegible] রোড, [illegible] [illegible])।

প্রশ্ন : গত বছর ডেভিস কাপের খেলায় ভারত কার কাছে হেরেছিল? আর এ-বছরের ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক ফাইন্যাল খেলা কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?

উত্তর : গত বছর ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলায় ভারত পরাজিত হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার কাছে। এ বছরের আঞ্চলিক ফাইন্যালে ভারতকে খেলতে হবে আমেরিকার বিরুদ্ধে আর খেলা হবে আমেরিকাতেই।

অজীর সেন (বর্ধমান)।

প্রশ্ন : আমি ফুটবল খেলি। বেশ ভালই খেলতে পারি। কিন্তু কোন সুযোগ পাচ্ছি নে। মনে হয় সুযোগ পেলে আমি একদিন নামকরা ফুটবল খেলোয়াড় হতে পারব।

উত্তর : নিজের ওপর আত্মবিশ্বাস থাকা ভাল। কিন্তু তাই বলে দেখবেন যাতে আপনার মনের মধ্যে গর্বের ভাব না জাগে। তাহলেই সব শেষ। যাই হোক আপনি যদি সত্যিই ভাল খেলতে পারেন আর ভাবেন যে কলকাতার মাঠে খেললেই আপনি নামকরা খেলোয়াড় হতে পারবেন তাহলে আপনাকে আমার সংগে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানাই। আপনার জন্যে আমি যথাসাধ্য চেন্টা করে দেখব।

সরসকুমার ঘোষদস্তিদার (ঠিকানা নেই)।

উত্তর : নিজের ঠিকানা ছাড়া চিঠির উত্তর আমরা সাধারণত দিই নে। যদিও এই সংখ্যাতে দেওয়া হয়েছে।

নিলীমেষ রায়চৌধুরী (কাঁচরাপাড়া)।

উত্তর : তোমার চিঠি পেয়ে সব জানলাম। ব্যক্তিগতভাবে তোমায় চিঠি দিচ্ছি।

মহম্মদ সফিরুদ্দিন (দেবীদাসপুর, কাঁকুড়িয়া, মুর্শিদাবাদ)।

প্রশ্ন : কলকাতার সিনিয়ার ডিভিশন ফুটবল লীগের প্রত্যেক দলের বর্তমান মরশুমের অধিনায়কদের নাম জানতে চাই।

উত্তর : এ প্রশ্নটা আপনি এর আগেও একবার করেছিলেন, কিন্তু জায়গার অভাবে আমরা উত্তর দিতে পারি নি। এবারেই সেই একই উত্তর। তবে আপনার যদি বিশেষ কোন ক্লাবের অধিনায়কের নাম জানার প্রয়োজন হয় তাহলে জানাবেন—নিশ্চয়ই জানাবো।

অনিবন্ধ গুপ্ত (মালিয়াড়া, বাঁকুড়া)।

উত্তর : আপনার চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। চিঠিটি সকলের অবগতির জন্যে হুবহু তুলে দিলাম।

"সাপ্তাহিক বসুমতীর ১৯শ সংখ্যার শিলিগুড়ি থেকে লেখা

শ্রীমতী ইলা ব্যানার্জীর প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে পাতৌদি, জয়সীমা, বোরদে আর ওয়াদেকার টেস্ট ম্যাচে এ পর্যন্ত যথাক্রমে ১৮, ১৭, ৩৬ ও ২৯টি করে [illegible] [illegible]......!"

মহম্মদ সফিরুদ্দিন (দেবীদাসপুর, কাঁকুড়িয়া, মুর্শিদাবাদ)।

উত্তর : ইংলণ্ডের ডেনিস কম্পটন ফুটবল আর ক্রিকেট খেলাতেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন—হকিতে নন। তবে ফুটবল, ক্রিকেট আর হকি এই তিনটে বিষয়ে কোন খেলোয়াড় আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন কি না কারো জানা থাকলে জানালে বাধিত হবো।

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (ইন্দিরা দেবী রোড, কলকাতা—৬০)।

প্রশ্ন : মেক্সিকো অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দল কি তাদের পূর্ব সম্মান বজায় রাখতে পেরেছে?

উত্তর : আপনার কি মনে হয .....?

সুভাষরঞ্জন দত্ত (ট্রান্সপুলার কলোনী, পাণ্ডু, আসাম)।

প্রশ্ন : জার্নাল সিং কি অবসর গ্রহণ করেছেন? ইস্টবেঙ্গল কি কখনো ভারতের বাইরে খেলতে গিয়েছিলো?

উত্তর : একরকম! বেশ কয়েকবার রাশিয়া বুদাপেস্ট ইত্যাদি .....!

বেণু, বাবলু, স্মৃতি ও পান্নু (গোলবাজার খড়্গপুর)।

প্রশ্ন : একজন ব্যাটসম্যান রান আউটের ভয়ে শুয়ে পড়ে ব্যাটটি ক্রীজে ছোঁয়াতে গিয়ে উইকেটে লাগিয়ে ফেললেন। কিন্তু বেল পড়লো না। এরকম ক্ষেত্রে কি ব্যাটসম্যান আউট হবেন?

উত্তর : কখনোই না.. !

সুদীপকুমার (এন লাখিমপুর)।

প্রশ্ন : ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রোহন কানহাই কি ভারতীয়?

উত্তর : বলতে পারেন। তবে বংশে

প্রবেশ হলো ওঁরা ওদেশেই বাস করছেন। সুতরাং .

কাজল ভট্টাচার্য ও পলক খাঁ (সং-চাষীপাড়া রোড, কলকাতা—২)।

প্রশ্ন : অলিম্পিকের পদকগুলো কি খেলোয়াড়দের নিজস্ব হয় না সরকারের হয়ে যায়?

উত্তর : খেলোয়াড়দেরই হয়।

প্রদীপকুমার বসু (পঞ্চাননতলা লেন, বেহালা)।

প্রশ্ন : ক্রিকেট খেলায় উইকেটরক্ষককে প্যাড ও প্লাভস খুলিয়ে বোলিং করানো যেতে পারে কি?

উত্তর : পারে!

মোহিতকুমার বিন্দু (ননীহাটি, বিহার)।

উত্তর : আপনার প্রশ্নের উত্তর আশা করি আমাদের অলিম্পিক সংখ্যায় পেয়েছেন।

না, হকি ছাড়া আর কোন বিষয়ে ভারত স্বর্ণপদক পায় নি।

নিকট ভবিষ্যতে ভারতে অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা নেই।

প্রাণশঙ্কর সাহা (শোভাবাজার স্ট্রীট কলকাতা—৫)।

উত্তর : মেক্সিকো অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দল সম্বন্ধে আপনার আমার সম্পূর্ণ একমত।

ভুত ও ববীন হালদার (হিংগলগঞ্জ, ২৪ পরগনা)।

প্রশ্ন : ভারতের টেস্ট ক্রিকেট অধিনায়ক পাতৌদির নবাব ও শর্মিলা ঠাকুরের মধ্যে বাগ্দানপর্ব করে এবং কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে? এঁদের বিবাহ কি হবে—হলে কবে?

উত্তর : জানি না। সম্ভবত এই বছরেই ..! আপনার চিঠিতে আর একজনের নাম ছিলো। কিন্তু পড়তে পারি নি বলে দুঃখিত।

সোমনাথ গাঙ্গুলী, খগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও রমেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, নৈহাটী, ২৪ পরগনা)।

উত্তর : অলিম্পিকের আসরে ক্রিকেটকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না তার কারণ বোধহয় ক্রিকেট খেলা শেষ হতে অনেক সময় লাগে আর খুব অল্প দেশেই ক্রিকেট খেলে বলে বোধহয়।

আপনারা যে ধরণের বই-এর কথা জানতে চেয়েছেন ঠিক সেই ধরণের কোন বই আছে কি না ঠিক জানি না।

উড়ন্ত মানুষ বব বিমোন

মিউনিখের মাটিতে পরবর্তী অলিম্পিকের অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণার মধ্য দিয়ে শেষ হ'লো আটষট্টির মেক্সিকো অলিম্পিক। নানা অপেশাদার ক্রীড়া-জগতের স্বপ্নরাজ্য—তীর্থক্ষেত্র এই অলিম্পিক। তাই এ আঙিনার কৃতিত্বকে ঘিরে জমে ওঠে নানা মহলের নানা প্রতিক্রিয়া। সদ্যসমাপ্ত মেক্সিকোর রেশ মিলোতে তাই সময় লাগবে দীর্ঘদিন। এ আসরে কোন্ প্রতিযোগী কেমন কৃতিত্বের নজির রাখলেন—এ গবেষণায় তাই স্বাভাবিক কারণেই সারা ক্রীড়া-দুনিয়া মুখর। আর তারই জের হিসেবে বলা যায়, ডিসকাস ছুঁড়িয়ে অল অর্টারের অনন্য নজির, টমি স্মিথ ও জিম হাইনসের নতুন রেকর্ড, সাঁতারে ডেবি মেয়ার মাইক ওয়েনডেন ও আদা ককের অতুলনীয় কৃতিত্ব অথবা জিমন্যাস্টিকের কসরতে ভেরা ক্যাসলভস্কার অনবদ্য নৈপুণ্য আজ সারা দুনিয়ার আলোচনার বিষয়। কিন্তু এ সবই যেন খেই হারিয়ে ফেলেছিল—সমস্ত রেকর্ডই যেন একেবারে ম্লান হয়ে গিয়েছিলো এ্যাথলেটিকের এ-আসরের অন্য আর একটি রেকর্ডের কাছে। সে রেকর্ডের প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে কেউ বলেছেন—"অসম্ভব"। কারো মতে "উনি অতিমানুষ।" আবার কারো মুখ থেকে বেরিয়েছিল একটি মাত্র শব্দ—'অবিশ্বাস্য"। সারা স্টেডিয়ামের ৭০,০০০ দর্শক যেন অলিম্পিক ইতিহাসে এ নতুন অধ্যায় রচনাকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এই অবিশ্বাস্য অসম্ভবকে সম্ভব করলেন যিনি উনি হলেন আমেরিকার নিগ্রো এ্যাথলেট বব বিমোন। দীর্ঘ লাফের আসরে ২৯ ফুট ২½ ব্যবধান অতিক্রম করে সারা পৃথিবীতে চমক লাগিয়ে দিলেন। প্রায় দু' ফুটের ব্যবধানে গড়ে উঠলো নতুন রেকর্ড। সাতাশ ফুটের গণ্ডীতে যে রেকর্ড এতদিন একেবারে থমকে গিয়েছিল সে রেকর্ড যে এমনভাবে চুরমার হয়ে যাবে এ ছিল কল্পনারও অতীত। '৬৮-র বিমোনের কৃতিত্ব যেন ১৯৩৬-র জেসী ওয়েন্সের নৈপুণ্যকেও টিটকারী দিল। তাই উনবিংশ অলিম্পিকের সপ্তম দিনের আসরে তিন-তিনটি নতুন রেকর্ডের দেখা মিললেও—সবার উপরে স্থান পেল বিমোনের অচিন্তনীয় কৃতিত্বের স্বীকৃতি। তাই ওঁর এই নৈপুণ্যকে এ্যাথলেট-দুনিয়ার সর্বকালের সেরা নজির বলে অভিহিত করলেন।

বব বিমোনের এই অভিনব কৃতিত্বের খতিয়ান দেখে হয়তো অনেকেই মনে করবেন বিমোনের এই অলিম্পিক জয় ছিল খুবই স্বাভাবিক, সহজসাধ্য, অতি-প্রত্যাশিত। কিন্তু মেক্সিকোর বুকে দীর্ঘ-লাফের আসর অনুষ্ঠিত হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কে বিজয়ী হবেন এ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেওয়া ছিল খুবই দুরূহ বিষয়। কেন না অলিম্পিক দীর্ঘ লাফের এ আসরে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টিকারী দুই প্রখ্যাত এ্যাথলেট—আমেরিকার

॥ বব বিমোন ॥

র‍্যালফ বোস্টন ও রাশিয়ার তের ওভানেসিয়ান। ও'রা দু'জনেই ২৭-ফুট ৪¾ ইঞ্চি লাফিয়ে এ রেকর্ডের অধিকারী হয়েছিলেন। এ ছাড়া টোকিও অলিম্পিকের বিজয়ী বৃটেনের লীন ডেভিস ও পূর্ব জার্মানীর ক্লাউ বীয়ারের সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল বই কি।

কিন্তু অলিম্পিকের আঙিনায় অন্যান্য সকলের পেছনে ফেলে রাখতে বিমোন যেন ছিলেন বদ্ধপরিকর। আরো উল্লেখযোগ্য ওঁর প্রথম লাফই অন্যান্য প্রতিযোগীদের ঘরে পাঠানোর পথ দেখিয়ে দিল। অলিম্পিকের বুকে বব বিমোনের প্রথম প্রয়াসই ওঁর ক্রীড়া-জীবনের সেরা নজির হয়ে রইলো। এর পর দ্বিতীয় বার লাফিয়েছিলেন—কিন্তু আর পারলেন না। নাই-বা পারলেন আর। তারপর আর লাফান নি বিমোন। দ্বিতীয় স্থান পেলেন পূর্ব জার্মানীর ক্লাউ বীয়ার, আর তৃতীয় স্থান পেলেন রাল্ফ বোস্টন। সোভিয়েত রাশিয়ার তের ওভানেসিয়ান পেলেন চতুর্থ স্থান। আর টোকিওর আসরের স্বর্ণপদক জয়ী লীন ডেভিস? উনি যেন কোথায় তলিয়েই গেলেন।

অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন বব বিমোন। বিশেষজ্ঞদের মতে ওঁর এই কৃতিত্বের সাথে অন্যান্য ক্ষেত্রে যদি তুলনামূলক চিত্র আঁকা যায় তবে তা দাঁড়াবে যেন শত মিটার দৌড় ৯ সেকেণ্ডে শেষ করা অথবা দেড় হাজার মিটার দৌড় ৩ মিঃ ২০ সেকেণ্ডে অতিক্রম করা অথবা উঁচু লাফে ৭ ফুট ১০½ ইঞ্চি অতিক্রম করারই সমান।

ওঁর জন্ম জামাইকা। বয়স বাইশ। শক্ত সামর্থ্য কাঠামোর বিমোনের উচ্চতা ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি। ওঁর যখন বয়স প্রায় ষোল তখনই ও'কে প্রথম দীর্ঘ লাফের বড়-সড় আসরে দেখা যায়—আর সেক্ষেত্রেই উনি ২৪ ফুট ৭ ইঞ্চি লাফিয়ে স্কুলের নজর কাড়েন। এর পর থেকে বিমোনের অধ্যাবসায় চলতে লাগলো একাগ্রভাবে। এ বছর বিমোন রাশিয়ার তের ওভানেসিয়ানের দুবছরকে আবো দু' সেন্টিমিটার পেছনে ফেলে রেখে নতুন ইণ্ডোর বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী হলেন। ওঁর নতুন দূরত্ব হলো—৮·২৫ মিটার। এর অল্পদিন পর সাউথ লেক তাহোর আমেরিকান অলিম্পিক ট্রায়ালে বিমোন ওভানেসিয়ানের বিশ্ব-আউটডোর রেকর্ড ভেঙে গড়েন। এবারের দূরত্ব ছিল ২৭ ফুট ৬½ ইঞ্চি (৮·৩৯ মিটার)। কিন্তু বাতাসের সহায়তার যুক্তিতে ওঁর এ রেকর্ডকে স্বীকৃতি জানানো হলো না। সেদিন বিমোন নাই বা পেলেন এ স্বীকৃতি। আজ তার চেয়ে অনেক অনেক বড় স্বীকৃতি জুটেছে ওঁর ভাগ্যে।

বব বিমোনের খ্যাতি আজ সারা বিশ্বব্যাপী ওঁর এই দীর্ঘ লাফের কৃতিত্বকে ঘিরে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, উনি এ্যাথলেটিকের এই আসর ছাড়া অন্য কয়েকটি বিষয়েও যথেষ্ট পারদর্শী। ১০০ গজ দৌড়ে যেমন উনি ৯·৫ সেঃ দৌড়ানোর নৈপুণ্য দেখিয়েছেন ঠিক তেমনই আবার উঁচু লাফেও উনি সহজেই সাড়ে ছ' ফুটের বেড়া টপকেছেন। এমন চৌকস এ্যাথলেট বিশ্বের গর্ব।

নিকষ কালো নিগ্রোনন্দন বব বিমোন আজ এ্যাথলেট জগতের রাজপুত্র। তামাম ক্রীড়া-দুনিয়া ওঁর নতুনতরো কৃতিত্বের পথ চেয়ে রয়েছে।

—দিলীপ চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদিকা—[illegible] সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রী[illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

৭৩ বর্ষ : ২২শ সংখ্যা—মূল্য: ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 21st November, 1968

অর্থসঙ্কটে বাস-ট্রাম

কলকাতার পরিবহন সমস্যা সমাধানের আশা সুদূরপরাহত। স্টেট বাস, ট্রাম ও বেসরকারী বাসের সাহায্যে সেই সমাধান সম্ভব নয়। তা সম্ভব চক্রবেড় রেল বা মনোরেলের সাহায্যে। মনোরেল স্থাপন করা ব্যয়সাপেক্ষ—সুতরাং সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা নিরর্থক। কিন্তু স্বল্প ব্যয়ে ও স্বল্প আয়াসে যা স্থাপন করা সম্ভব তা হচ্ছে চক্রবেড় রেল। এইভাবে পরিবহন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য। কেন্দ্রীয় সরকার সেই সাহায্য দিয়ে ভারতের সর্বশ্রেণীর নাগরিকদের কলব তার পথে পাথর [illegible] যে প্রাত্যহিক ঝুলন্ত-যাত্রা থেকে [illegible] তা বলা মুস্কিল। তবে প[illegible]ন সমস্যা অপূর্ণ থেকে গেলেও প্রাত্যহিক [illegible] নতুন করে যাত্রীদের অধিক [illegible] বৃদ্ধির পথে।

[illegible] কলকাতার উপকণ্ঠে বেস[illegible] বাস[illegible] ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়েছে। [illegible] উপরি-পাওনার [illegible] পথ ঐসব বাসের কর্তৃপক্ষ [illegible] কলকাতার মুখ দর্শন [illegible] যে ভাড়া বৃদ্ধি করলো তা সাধারণ [illegible] সহজ ব্যাপার নয়। ঐসব বাসের রুট কলকাতার কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত বৃদ্ধি [illegible] পক্ষ এই যুক্তি ছিল যে, উপকণ্ঠস্থ যাত্রীরা এবার গাড়িতে আসতে পারবেন, ফলে স্টেট বাস বা ট্রামের উপর যাত্রীদের ভিড় কিছুটা কমবে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল থেকে এখন দেখা যাচ্ছে যে, বেসরকারী বাসগুলির রুট বৃদ্ধি করার পর তাদের আয় বাড়লেও, যাত্রীদের ভাড়া বেড়েছে। দ্বিতীয়ত ছাত্র ছাত্রীদের কমতি ভাড়ার সুযোগ এতোকাল দেওয়া হলেও কোনো কোনো রুটে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। অথচ বেসরকারী বাসের কর্তৃপক্ষ সেই পুরাতন নীতিতেই বাস চালাচ্ছেন। প্রায়ই শোনা যায়, ঐসব বাসের বহু কর্মচারীর চাকরির কোনো স্থায়িত্ব নেই। উপরন্তু যে সব ড্রাইভার, কণ্ডাক্টার বা ক্লীনার কাজ করেন তাঁদের নাকি না আছে গ্রাচুইটি বা প্রভিডেন্ট ফণ্ডের ব্যবস্থা। তাছাড়া এই ধরণের চাকরিতে যে জীবনবীমার ব্যবস্থা থাকা উচিত—তাও হয়তো নেই।

এর তুলনায় বলা যেতে পারে, স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন একটা দায়িত্ব পালন করেন তার কর্মচারীদের প্রতি। স্টেট বাস চালনার বিরুদ্ধে যাত্রীদের অভিযোগের তবু অন্ত নেই। পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের সাধের স্টেট বাসগুলি ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে—এটা কম দুর্ভাগ্যের কথা নয়। আশাহত যুবক বাঙালী বেকারদের একাংশ স্টেট বাসের জন্যই যে কর্মসংগ্রহ করতে পেরেছে—একথা সকলেই স্বীকার করবেন। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে পরিচালনার গলদের ফলেই যে এই কর্পোরেশনের অস্তিত্ব টলটলায়মান—তাও স্বীকার্য। যাত্রী বৃদ্ধির সংগে পরিচালনার পক্ষে যে নতুন চিন্তা গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল—তার প্রায় কিছুই করা হয় নি। এমন কি কর্পোরেশন জমিদারী সেরেস্তার মতো মনোভাব গ্রহণ করায় কর্মচারীরাও অকুণ্ঠ সহযোগিতা দিতে পারেন নি।

স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের বর্তমান চেয়ারম্যান ডঃ বি, কে, ভট্টাচার্য ক্ষতিগ্রস্ত স্টেট ট্রান্সপোর্টের স্টিয়ারিং-এ এবার নিজেই হাত রেখেছেন। দিন কয়েক আগে তিনি কর্পোরেশনের বহুমুখী সমস্যাগুলিকে তুলে ধরেছেন। এই সবের মধ্যে রয়েছে, জরাগ্রস্ত স্টেট বাসের সমস্যা, ঋণ গ্রহণের সমস্যা, অচল রাজপথে গাড়ি চালনার জন্য রোড ট্যাক্স দেওয়ার সমস্যা, সরকারের কাছে গচ্ছিত রাখা অর্থ ফেরৎ না পাওয়ার সমস্যা, কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া মেটানোর সমস্যা। এই সব সমস্যার মূল কারণ হয়তো এই যে, "গোড়া থেকেই এর পরিচালন-পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ ছিল" (ডঃ বি, কে, ভট্টাচার্য, শহর সংস্করণ দৈনিক বসুমতী ২৩শে কার্তিক, ১৩৭৫) আরো দুর্ভাগ্যের কথা, "লক্ষ লক্ষ টাকার যে যন্ত্রাংশ কেনা হয়েছিল, তা এখন পুরনো লোহার দরে বিক্রী করতে হবে"।

এ [illegible] পরিপ্রেক্ষিতে এখন স্মরণ করতে হবে রাজ্যপালের উক্তি—যে উক্তিতে তিনি ট্রাম ও স্টেট বাসের অবিলম্বে ভাড়া বৃদ্ধি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই বলে জানিয়েছেন। বলা বাহুল্য, পাশাপাশি গাড়ি চালনার ক্ষেত্রে (যেখানে দুটিই সরকারী পরিচালনায় চলছে) একই হারে ভাড়া চালু রাখার নিয়ম—তবু আমরা বলতে চাই ট্রামের দুরবস্থার জন্য বিদেশী মালিককে ক্ষতিপূরণ দেবার কথাটা কি এখনো চিন্তায় রাখা হয়েছে। আর স্টেট বাসের দুরবস্থার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?

আশার কথা, বর্তমান স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান অন্তত এতোদিনের দুর্নীতির পক্ষে কিছু না বলে, গলদের দিকগুলোই সাহসের সংগে তুলে ধরেছেন। তবে আপাত অবস্থায় ভাড়া বৃদ্ধি ছাড়া তিনিও নিরুপায়। একথা ঠিক, সর্বত্রই সর্বক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সরকার কর্মচারীদের এক হাতে কিছু দিলেই যে, অন্য হাত দিয়ে তা কেড়ে নেবেন সেটাও অনুচিত। এ ক্ষেত্রে যদি নিতেই হয়, তাহলে প্রমাণ করে দেখাতে হবে যে, যাত্রীদের কল্যাণের জন্য স্টেট বাস কর্তৃপক্ষও এগিয়ে এসেছেন। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে গাড়ি চালনা, ছাত্রদের জন্য কনসেশনের ব্যবস্থা, দূরবর্তী যাত্রীদের জন্য মাসিক টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা (ট্রামের চেয়ে বা অধিকতর আকর্ষণীয়, এবং সংস্থার পক্ষেও স্থায়ী আয় হিসেবে গণ্য) অবশ্যই করতে হবে। আবার অধিকহারে ভাড়া বৃদ্ধি করাও স্বেচ্ছাচারের তুল্য। তাই দশ পয়সার বর্তমান হারের কোনো রকম ব্যতিক্রম না ঘটিয়ে পরবর্তী স্টেজগুলিতে বড় জোর ১/১৫ হারে বৃদ্ধি পেতে পারে। সর্বশেষ বলা প্রয়োজন, এমন ক্ষেত্রে সোজাসুজি কলকাতাগামী উপকণ্ঠস্থ বেসরকারী বাসের যাত্রীদের ভাড়া বৃদ্ধি নিষ্প্রয়োজন।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

রাজনীতিতে অঘটন নিতুই ঘটে। আজ যে দুই নেতা হরিহর আত্মা, পরদিনই তাদের পরস্পরের বুকে ছোরা মারতে দেখা যায়। তবে বর্তমান কৃত্রিম ভদ্র-সমাজে ছোরাটা নিজে না মেরে লোক লাগিয়ে রাজনৈতিক শত্রুকে খতম করা হয়। এবং কি স্বৈরাচারী শাসন, এক-নায়কত্বের শাসন কিম্বা গণতান্ত্রিক শাসন, প্রায় সর্বত্রই একই কান্ড চলছে অবিরাম। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার ঘটনা কোথাও বেশি, কোথাও বা কম। একই চক্রের সূত্র ধরে প্রেসিডেন্ট আয়ুব তাঁর সুদিনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু, সহকর্মী জুলফিকার আলি ভুট্টোকে গ্রেপ্তার করিয়েছেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী, গ্ল্যামারবয় প্রতিপক্ষ ভুট্টো যাতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদের জন্য আয়ুব খাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী না হতে পারেন, তারই জন্য বোধ হয় তাঁকে পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনের বলে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো—যাতে তিনি নির্বাচনপ্রার্থী না হতে পারেন যাতে তাঁকে বহুদিন পুলিশ হেফাজতে রাখা যেতে পারে।

[illegible] ভুট্টোই ছিলেন একদিন প্রেসিডেন্ট আয়ুবের বড় সুহৃদ। তাঁকে দিয়েই তিনি যত অপকর্ম করিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট আয়ুব ভারত বিরোধী [illegible] ছিলেন (কোন পাক [illegible] খাঁটি [illegible] হতে হলে নাকি ভারত বিরোধী হতেই হবে!) কিন্তু তিনি যে [illegible] ভারত-বিদ্বেষীও হয়ে ওঠেন তার [illegible] জন্যে অবশ্যই কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টো। পাকিস্তানকে চীনাপ্রেমের নিগড়ে বাঁধার কৃতিত্বও ভুট্টোরই। কিন্তু রাজনীতির কী বিচিত্র গতি! ভুট্টোর বিরুদ্ধে আজ পাক সরকার অভিযোগ তুলেছেন যে, তিনি নাকি গোপনে ভারতের সঙ্গে দোস্তী করেছেন, করাচীস্থ ভারতের হাই কমিশনারের বাড়িতে তাঁর চোরাপথে যাতায়াত চলে ইত্যাদি।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক আকাশে ভুট্টোর আবির্ভাব এবং উত্থান লক্ষ্য করার মতো। অবশ্য তাঁর পারিবারিক অবস্থা তাঁকে এ-ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। সিন্ধু প্রদেশের লারকানা শহরের এক অভিজাত পরিবারে ১৯২৮ সনে জুলফিকার আলির জন্ম। তাঁর বাবা স্যর শা নওয়াজ খাঁ ভুট্টো বোম্বাই সরকারের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। দেশ-বিভাগের পর স্যর শা নওয়াজ সিন্ধু প্রদেশ সরকারের প্রথম মুখ্যসচিব নিযুক্ত হয়েছিলেন। জুলফিকার আলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্সসহ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ পাশ করেন। এখানে তিনি আন্তর্জাতিক আইন ও জুরিসপ্রুডেন্স অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি লণ্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্গত ক্রাইস্ট চার্চ কলেজ থেকে অনার্সসহ এম-এ পাশ করেন এবং জুরিসপ্রুডেন্সে ডিস্টিংশন পান। লিঙ্কন্‌স ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করেন তিনি একই বছরে, ১৯৫২ সালে।

ভুট্টো

ভুট্টোর কর্মজীবনের সূচনা হয় বিদেশে—সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ের লেকচারারের পদ নেন। পরের বছর দেশে ফিরেও তিনি প্রথমে অধ্যাপনার কাজই নিলেন—করাচীর সিন্ধু মুসলিম ল' কলেজ সাংবিধানিক আইনের অধ্যাপক এবং সঙ্গে সঙ্গে প্র্যাকটিসও শুরু করেন।

১৯৫৮ সালে ফিল্ড মার্শাল আয়ুব খাঁ পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করে নতুন সরকার গঠন করলে তরুণ জুলফিকারকে তাঁর মন্ত্রিসভায় নেন—বাণিজ্যদপ্তর দিয়ে। বাণিজ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ভুট্টো রপ্তানী [illegible] চালু করেন। তারপর '৬০ সনের [illegible] তাঁকে সংখ্যালঘু বিষয়, জাতীয় পুনর্গঠন এবং মৌলিক গণতন্ত্র সহ [illegible] দেওয়া হয়। এ-সময়ে ক্যাবিনেটের প্রত্যেকটি প্রভাবশালী সাব-কমিটিরই ভুট্টো সদস্য ছিলেন বটে, কিন্তু বহির্জগতে তাঁর বিশেষ পরিচিতি ছিল না। ১৯৬৩ সনে কাশ্মীর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করার জন্যে পাক প্রতিনিধি-দলের নেতৃত্ব করতে যখন অপেক্ষাকৃত তরুণ রাজনীতিক জুলফিকার আলি ভুট্টো এলেন তখনই তাঁর নাম বাইরে ছড়িয়ে পড়লো। এবং ভারতবাসীরও মালুম হলো যে, ভারত-বিরোধিতা এবার উচ্চগ্রামে শুরু হবে।

১৯৬৩ সালে পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী বগুড়ার মহম্মদ আলির মৃত্যু হলে যখন ভুট্টোই সেই গুরুত্বপূর্ণ পদটি পেলেন তখন ভুট্টোর ভারত-বিরোধী জিগীর যেন বাধাহীন হয়ে পড়লো। এই ভারত-বিরোধিতার কারণেই তিনি ভারতের শত্রু চীনের সঙ্গে মিতালী করতে পিকিং ছুটে গেলেন এবং চীনের সঙ্গে অস্ত্র-চুক্তি সম্পাদন করলেন। পাক-চীন সীমান্ত-চুক্তিও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টোরই কীর্তি। একদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অপর দিকে তারই শত্রু চীনের সঙ্গে [illegible] পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে ভুট্টো [illegible]-বাজী দেখিয়ে দিয়েছিলেন। [illegible] ধনতান্ত্রিক দুনিয়া [illegible] চীনের সহায়তা নিয়ে [illegible] সালে পাকিস্তান যে ভারত [illegible] হলো তা ভুট্টোরই [illegible] পরিণতি।

ভুট্টো দেখতে [illegible] বক্তৃতাও চমক [illegible] আছে [illegible] [illegible]-পত্তা পরিষদে বক্তৃতা [illegible]-বাসীকে কুকুর বলে [illegible] নোংরা মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি একথাও বলেছিলেন যে, হিন্দুস্থানের সঙ্গে পাকিস্তান হাজার বছর ধরে লড়াই করবে।

কিন্তু আয়ুবের জঙ্গী সরকার এবং জঙ্গী মনোভাবের এহেন প্রতিভাশালী প্রবক্তাকে প্রেসিডেন্ট আয়ুব বাইরে নিক্ষেপ করলেন '৬৬ সালের আগস্টে। তাঁর জন-প্রিয়তা দেখে আয়ুব ভীত, শংকিত হয়ে উঠেছিলেন। ক্রুদ্ধ অপমানিত ভুট্টো পাকিস্তানে নতুন দলের পত্তন করলেন, 'পিপলস্ পার্টি'। বই লিখলেন তিনি পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে, পরিষ্কার ঘোষণা করলেন যে, আয়ুব খাঁ পাকিস্তানে ফ্যাসিজম কায়েম করেছেন। ......ফ্যাসিজম অবশ্য এখানে নতুন কায়েম হলো না, তবে তার নগ্ন প্রকাশ ঘটলো আজ বিরোধীদের জেলে পোরার মধ্য দিয়ে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ ছয় ॥

আমি ১৯২৪ সনের শেষভাগে ময়মনসিংহ শহরে ধৃত হই। আমি পলাতক অবস্থায় ছিলাম। এক রাত্রে আমি ময়মনসিংহ কলেজের ছাত্র বিনয় চৌধুরীর সহিত এক লেপ গায়ে দিয়া শুইয়া আছি, শেষ রাত্রে পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করিয়াছে, আমার জন্য নহে, অস্ত্র-শস্ত্রের অনুসন্ধানে। পুলিশ বিনয়কে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কে? বিনয় উত্তর দিল, আমার বাবা, বাড়ি হইতে আসিয়াছেন। বিনয়ের উপরই পুলিশের নজর বেশি। বিনয়ের কাকা শিক্ষক ছিলেন এবং সরকার ঘেঁষা লোক ছিলেন, তিনি বাড়ির মধ্যে শুইয়া ছিলেন, আমি মনে করিলাম, তিনি আমাকে দেখিলেই সব ফাঁস হইয়া যাইবে, তিনি বলিবেন, আমাকে তিনি চেনেন না। আমি পলায়নের চেষ্টা দেখিতে লাগিলাম। বিনয় প্রস্রাব করিতে গেল, তাহার সঙ্গে গেল দুইজন পুলিশ। আমি প্রস্রাব করিতে রওয়ানা হইলাম, আমার সঙ্গে চলিল একজন পুলিশ। আমি হঠাৎ দৌড় দিলাম। আমাকে ধরার জন্য কয়েকজন পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিল। কিছু দূরে যাওয়ার পর সম্মুখে দেখিলাম একটি ছোট কর্দমযুক্ত খাল। আমি এক লাফে খাল পার হইয়া গেলাম কিন্তু পুলিশের খাল পার হইতে কিছু বিলম্ব হইল আমি ইতিমধ্যে তাহাদের দৃষ্টির বাহির হইয়া পড়িলাম। এখন আমি বিভিন্ন রাস্তা দিয়া সাধারণভাবে যাইতেছি, এমন সময় একদল পুলিশ আমারই অনুসন্ধানে অপর রাস্তা দিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া পড়িল এবং আমাকে ধরিয়া বিনয়ের বাসায় লইয়া গেল। পুলিশ ইনস্পেক্টার আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি দৌড় দিলাম কেন? আমি বলিলাম, আমি দৌড় দিব কেন? আমি রাস্তা দিয়া যাইতেছিলাম, পুলিশ আমাকে ধরিয়া লইয়া আসিয়াছে। বিনয় বলিল, আমাকে চেনে না। পুলিশ ইনস্পেক্টার আমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বলিলাম, আমি পুলিশকে খুব ঘৃণা করি, আমার নাম বলিব না। আমাকে এবং বিনয়কে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। অবশেষে পুলিশ আমার পরিচয় পাইল এবং বলিল, আপনার নাম বলুন বা না বলুন, আমরা ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী বলিয়া আপনাকে কলিকাতা চালান দিব।

১৯২৫ সনের জানুয়ারী মাসে সুভাষচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র প্রমুখের সহিত আমি ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেলে স্থানান্তরিত হই। আমাদের সঙ্গে চলিলেন, লোম্যান সাহেব স্বয়ং। আমরা কলিকাতা হইতে জাহাজে রেঙ্গুন রওয়ানা হই, আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী, সুভাষবাবু প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। সমুদ্র সমতল ছিল, ঢেউ বিশেষ ছিল না। আমার সমুদ্রযাত্রার প্রথম অভিজ্ঞতা আন্দামান যাওয়ার সময়, তখন ছিলাম ডেক্ যাত্রী, পায়ে ছিল ডাণ্ডা-বেড়ি। তখন ছিল বর্ষাকাল, সমুদ্র ছিল উন্মত্ত, মাথা উঠানের যো নাই, মাথা ঘুরে বমি হয়, খাওয়ার রুচি নাই। প্রাতে এবং বৈকালে কয়েদীদিগকে হাওয়া খাওয়ার জন্য উপরে লইয়া যাইত এবং জোড়া জোড়া বসাইয়া দিত। ঢেউ-এর সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ যখন উপরে উঠিত তখন মনে হইত জাহাজ আকাশ স্পর্শ করিবে, আবার যখন ঢেউ-এর সঙ্গে জাহাজ নিচে যাইত তখন মনে হইত জাহাজ এখন পাতালপুরী চলিল। আন্দামান কলিকাতা হইতে ৮ শত মাইল দূর, যাইতে তিন দিন তিন রাত্রি লাগিত। রেঙ্গুন যাওয়ার সময় জাহাজে আমাদের কতকটা স্বাধীনতা ছিল, কেবিনের সম্মুখে বন্দুকধারী সিপাহী পাহারা দিত। বাহির হওয়ার সময় সিপাহী সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। রেঙ্গুন হইতে ট্রেনে আমরা মান্দালয় রওয়ানা হইলাম, ৪ শ মাইল পথ। লোম্যান সাহেব সঙ্গে থাকায় রাস্তায় আমাদের খাওয়া-দাওয়ার বেশ সুবিধা হইয়াছিল। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের সংবাদ লইতেন এবং কোন অসুবিধা হইতেছে কি না জিজ্ঞাসা করিতেন। মান্দালয় জেল মান্দালয় ফোর্টের মধ্যে অবস্থিত। বাল গঙ্গাধর তিলক এই জেলেই ছিলেন। আমরাও এই জেলের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। একটি দো-তলা কাঠের ঘর, ছোট একটি প্রাঙ্গণ, ইহার মধ্যে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হইল। সুভাষবাবু বলিলেন মহারাজের খাট আমার পাশে থাকিবে। আমি এবং সুভাষবাবু পাশাপাশি ছিলাম, সঙ্গে সত্যেন মিত্র, মদন ভৌমিক, সুরেন ঘোষ প্রমুখ ছিলেন। ইহার দুই বৎসর পর কলিকাতা হইতে পুলিশ ইনস্পেক্টার নরেশ দত্ত আমাদের সহিত দেখা করার জন্য মান্দালয় উপস্থিত হন। তিনি যখন আমার সহিত দেখা করেন, তখন বলিলেন, আমি যদি গভর্নমেন্টের কয়েকটি সর্ত মানিয়া লই, তবে আমাকে ছাড়িয়া দিবে। আমি বলিলাম, আমার তিনটি সর্ত আছে, গভর্নমেন্ট যদি আমার তিন সর্ত মানিয়া লয়, তবে আমি গভর্নমেন্টের সর্ত সম্বন্ধে বিবেচনা করিব। তিনি আমার সর্ত জানিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম, (১) গভর্নমেন্ট যে আমাকে অন্যায়ভাবে আটক করিয়া রাখিয়াছে, এজন্য গভর্নমেন্টের ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে। (২) গভর্নমেন্ট যে আমাকে বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখিয়াছে, এজন্য আমাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। (৩) গভর্নমেন্টের এই প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে, ভবিষ্যতে আমাকে কোন প্রকার নির্যাতন করিতে পারিবে না। নরেশ দত্ত চলিয়া গেলেন। ইহার কয়েক মাস পর আমার তিন সর্ত সঞ্জীবনী কাগজে বাহির হইয়াছিল। আমি মান্দালয় জেল হইতে মিঞান জেলে স্থানান্তরিত হই, আবার কয়েক মাস পর ইনসিন জেলে স্থানান্তরিত হই। এবার ১৯২৮ সনের শেষভাগে মুক্তিলাভ করি।

আমি ১৯২৯ সনে পুলিশকে ফাঁকি দিয়া তিন মাস ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থানে ছিলাম। আমি চট্টগ্রাম হইতে রেংগুন যাই, সেখানে আমাদের দলের লোক ছিল, আমি বিশ্বাস কোম্পানীর দীনেশ বিশ্বাসের লুই স্ট্রীটের বাসায় ছিলাম। আমি রেংগুন হইতে মান্দালয় যাইব স্থির করিয়াছি, এ যাত্রা স্টীমারে রওয়ানা হইলাম। পূর্বে পুলিশ পাহা-রায়, সরকারী খরচে রেংগুন হইতে ট্রেনে মান্দালয় গিয়াছি, এযাত্রা যাইতেছি স্বাধীনভাবে, নিজ খরচে। ইরাবতী নদীর দুই ধারে পাহাড়, পাহাড়ের চূড়ায় মন্দির, দৃশ্য খুব সুন্দর। আমি মান্দালয়ের পথে, স্থানে স্থানে নামিয়া, দলের লোকদের সহিত দেখা করিয়া, তিন সপ্তাহ পর মান্দালয় উপস্থিত হইলাম। আমরা যখন মান্দালয় জেলে ছিলাম, তখন উ, খিং, মং ও উ, চৌক রাজনৈতিক মামলায় দণ্ডিত হইয়া মান্দালয় জেলে ছিলেন, জেলে তাঁহাদের সহিত পরিচয় হইয়াছিল, এখন তাঁহাদের বাড়ি গিয়া আলাপ-আলোচনা করিলাম। আমার আলাপ করার অসুবিধা ছিল, আমি ব্রহ্ম-ভাষা ভালরূপ জানিতাম না, আবার তাঁহাদের মধ্যে অনেকে দেশী ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা জানিতেন না। আমি যখন মান্দালয় জেলে ছিলাম, তখন অন্দরের কাজে নিযুক্ত কয়েদীদের সহিত কাজ চালানোর মত সাধারণ ব্রহ্মভাষা শিখিয়াছিলাম। অবশ্যই বর্তমানে আমার সঙ্গে দো-ভাষী থাকিত। আমি মান্দালয় এক সপ্তাহ থাকার পর ট্রেনে রেংগুন রওয়ানা হইলাম। পথে টাংগু নামিলাম। বাংলার পুলিশ চারিদিকে আমার খোঁজ করিতেছিল, অবশেষে সংবাদ পাইল আমি ব্রহ্মদেশে গিয়াছি। বাংলার পুলিশ ব্রহ্মদেশের পুলিশের নিকট সংবাদ পাঠাইল আমার গতি-বিধি লক্ষ্য করার জন্য। ব্রহ্মদেশের পুলিশ নানাস্থানে আমার খোঁজ লইয়া, আমার কোন সন্ধান না পাইয়া রিপোর্ট দিল, আমি ব্রহ্মদেশে যাই নাই। আমি একদিন একজন বাঙালী বন্ধুর সহিত টাংগু স্টেশনে গিয়াছি, একজন বন্ধুর সহিত দেখা করার জন্য স্টেশনে একজন বাঙালী আই, বি, ইনস্পেক্টার ছিলেন, পূর্বে তিনি আমাকে চিনিতেন, এখন আমাকে দেখিতে পাইয়া মহা আনন্দে হাত উঠাইয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, কি ত্রৈলোক্যবাবু কেমন আছেন? আমার দলের লোকটি সরিয়া পড়িল। তিনি একসংগে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কবে আসিয়াছি, কোথায় আছি, কেন আসিয়াছি ইত্যাদি। আমি যথাযথ উত্তর দিয়া বলিলাম, আমি রাজনীতি ছাড়িয়া দিয়াছি, এখন অর্থ উপার্জনের চেষ্টায় বাহির হইয়াছি, একটা হোটেলে উঠিয়াছি, আপনার সাহায্য চাই, ২টার সময় আপনার বাসায় দেখা করিতে যাইব, আপনাকে কিন্তু বাসায় থাকিতে হইবে। তিনি খুশি হইলেন, আমি বিদায় লইয়া স্টেশন ত্যাগ করিলাম। ৩টার সময় আমি পেগু শহরে এক বন্ধুর বাসায় নিশ্চিন্তমনে চা খাইতেছি। ঐ সময় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত রেংগুন গিয়াছিলেন, আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। চট্টগ্রামের কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য বি, এ, রেংগুনের নিকট এক হাই স্কুলে শিক্ষকতার কাজ করিতেন, তিনি ব্রহ্মভাষা খুব ভাল জানিতেন। আমি একদিন তাঁহার সহিত এক গ্রামে এক ব্রহ্মদেশীয় লোকের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাইলাম। খাইবার সময় দেখিলাম, একটি এক ফুট উচ্চু গোল টেবিল, রন্ধনদ্রব্য তাহার উপর, মধ্যস্থলে রাখা হইয়াছে, চারিদিকে ছোট ছোট আসন পাতা হইয়াছে, বাড়ির সকলে, মেয়ে-পুরুষ এক সঙ্গে বসিয়া পড়িল, আমি এবং কেদার-বাবুও বসিলাম, গৃহকর্ত্রী সকলের প্লেটে চামচ দিয়া ভাত দিলেন, তাহার পর খাইবার সময় চামচ দিয়া নিজেই যাহার যাহা প্রয়োজন, লইতে লাগিল। আমরা নাপ্পি খাই না, এ জন্য নাপ্পির কোন পদ করা হয় নাই।

॥ সাত ॥

আমি ১৯৩০ সনে, সম্ভবত এপ্রিল মাসে রেংগুন হইতে চট্টগ্রাম হইয়া কলিকাতা পেঁৗছিলাম। কলিকাতা পেঁৗছিয়াই সংবাদ পাইলাম, আমার আগামীকল্যই রাজসাহী রওয়ানা হইতে হইবে, আমি একটি কন্ফারেন্সের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছি। আমি পূর্বে কোন সংবাদ পাই নাই, আমার অভিভাষণ লেখা হয় নাই। রাজসাহীতে প্রাদেশিক কংগ্রেস কন্ফারেন্স ডাকা হই-য়াছে, সঙ্গে সঙ্গে যুব কন্ফারেন্স, কর্মী কন্ফারেন্স, শ্রমিক কন্-ফারেন্স হইবে। সভাপতি—বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, ত্রৈলোক্য-নাথ চক্রবর্তী, বঙ্কিমচন্দ্র মুখার্জী। আমার চিন্তা এবং ভয় আমি সভায় কি বক্তৃতা দিব, কারণ আমি বক্তা নই। প্রাদেশিক কন্ফারেন্স, কত লোকের সমাগম হইবে; লিখিত অভিভাষণে সুবিধা আছে, নিজে না পারি, অপরে লিখিয়া দিল, তাহাই নিজ নামে চালাইয়া দিব কিন্তু এখানে ফাঁকি দেওয়ার যো নাই, মুখে বলিতে হইবে। আমি যথা সময়ে রাজসাহী স্টেশনে উপস্থিত হইলাম, ফুলের মালা দিয়া সভাপতি-বরণ করা হইল, আগামীকল্য কন্-ফারেন্স। আলাপ-আলোচনায় রাত্র ১২টা বাজিয়া গেল, রাত্র ৩টার সময় পুলিশ ঘেরাও করিয়াছে, প্রাতে ৪ জন প্রেসিডেন্ট গ্রেফতার হইল। সকলেই মনে করিল সভা পণ্ড করার জন্য ৪ জন সভা-পতিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পরে কলিকাতা হইতে বীরেন দাশগুপ্ত আসিয়া সংবাদ দিল, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুট হইয়াছে, কলিকাতায় বহু লোক ধৃত হইয়াছে। ৪ জন সভাপতিরই ফটো তোলা হইল। বেলা প্রায় ২টার সময় আমাদিগকে জেলে লইয়া যাওয়া হইল। বিরাট প্রসেশন, পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব আস্তে আস্তে মোটর গাড়ি চালাইয়া চলিলেন, সভাপতিরাও মোটর গাড়িতে। মোটর গাড়ির চারিদিকে ভলান্টিয়ার দল জাতীয় পতাকা হস্তে বিভিন্ন ধ্বনি দিতে দিতে জেল গেট পর্যন্ত চলিল। ইহাদের মধ্যে [illegible] ভলান্টিয়ার দলও ছিল। মেয়ে ভলান্টিয়ার দলের ক্যাপ্টেন, রাজসাহীর প্র[illegible] জমিদার এবং কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্র[illegible] মৈত্রের কন্যা মীরা মৈত্র এবং [illegible] ভট্টাচার্য জাতীয় পতাকা হস্তে, আর মোটরের দুই পাশে, আপ আপ [illegible] ন্যাল ফ্লাগ, ডাউন ডাউন ইউনিয়ন জ্যাক" ধ্বনি দিতে দিতে চলিল।

বৃটিশের দমন নীতি ব্যর্থ হইয়াছে, দেশবাসীর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা দমন হয় নাই, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় সমগ্র ভারতে এক হাজারের অধিক লোক কারা-বরণ করে নাই। অসহযোগ আন্দোলনের সময় প্রায় এক লক্ষ লোক কারাবরণ করিয়াছে, আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তিন লক্ষ লোক কারাবরণ করিয়াছে, আরো বহু লোক কারাবরণ করিতে প্রস্তুত ছিল। জেলে তিল ধরার স্থান নাই, কাঁটাতারের বেড়া দিয়া বহু ক্যাম্প জেল খোলা হইয়াছে কিন্তু তাহাতেও স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না, অবশেষে গ্রেপ্তার করিয়া রাত্র ১২টা একটার সময় লরি বোঝাই করিয়া ৩০।৪০ মাইল দূরে কোন মাঠে বা জঙ্গলে ছাড়িয়া দিয়া আসিত। শাসন বিভাগে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হইল কিন্তু দেশ-বাসী তাহাতে সন্তুষ্ট হইল না। রাজসাহী সেন্ট্রাল জেল হইতে আমাকে এবং প্রতুলবাবুকে বহরমপুর জেলে পাঠান হইল, কিছুদিন পূর্বে বহরমপুর জেলে রাজবন্দীদের উপর লাঠি চার্জ হইয়াছিল এবং ইহার প্রতিবাদে কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত প্রমুখ কয়েক জনে অনশন ধর্মঘট করিয়াছিলেন। বহরমপুর জেল হইতে আবার কিছুদিন পর

দৃশ্যকাব্য

সাধনা মুখোপাধ্যায়

ওরে চোখ দেখে নেরে দৃষ্টির অঞ্জলি ভরে ভরে
গাছে গাছে দৃশ্যকাব্য এই যে সাজানো থরে থরে।
মেঘভার নম্র-নীল জম্বুকুঞ্জে আমঞ্জুল ফল,
পুষ্পিত কদম্ব বনে মুগ্ধ ভৃঙ্গ গুঞ্জন চঞ্চল,
উড়ন্ত পাখির মতো শ্যাম-পঙ্ক নারিকেলবীথি,
হাওয়ার ইংগিত পেয়ে ডানা মেলে দেয় উতি ইতি।

ওরে চোখ দেখে নেরে দৃষ্টির পেয়ালা দুটো ভরে,
তন্বী যুবতীর মতো রজনীগন্ধার বৃন্ত 'পরে,
বৃষ্টির আলিঙ্গনভঙ্গে, আত্মসমর্পণরতা
কামিনীর, দলিত ঘাসের বুকে ঝরা।

নবোঢ়া বধূটি যেন কাঞ্চনের রূপের পশরা,
ধূম্র-পত্র গুণ্ঠনেতে কাঁড়ঙের প্রস্তাবনা শুনে,
আরও ঘোমটা টেনে দেয় লাল হয়ে লজ্জার আগুনে।

ওরে চোখ দেখে নেরে দৃষ্টির মঞ্জুষা পূর্ণ করে,
শিশু-যুবা-বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পরিচিতদের প্রাণ ভরে।
পশু পাখি সন্ধ্যাভোর রৌদ্র-শ্রান্ত ক্লান্ত এ দুপুর,
দেখে নেরে চেখে নেরে বিন্দু বিন্দু সুধা সুমধুর,
ঝরে পড়ে ; জানা তো হয় নি কিছু বোঝা তো
গেল না কোন অনিশ্চিত আর্যতত্ত্বকেই,
দেখে নেরে, মেখে নেরে রঙের সুগন্ধ সব,
চশমাটা ভেঙে গেলে আর কিছু নেই, নেই, নেই।

আমাকে এবং প্রতুলবাবুকে বাক্‌সা ক্যাম্প জেলে পাঠান হইল। এখানে আমরা প্রায় এক বৎসরের উপর ছিলাম, তাহার পর আমাকে, প্রতুলবাবুকে, রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং রমেশচন্দ্র আচার্যকে মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত [illegible] সেন্ট্রাল জেলে পাঠান হইল। ঐ সময় মধ্যপ্রদেশের [illegible] রাজনৈতিক বন্দীদের দ্বারা ভর্তি ছিল। সেখানে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন, কণাটকের সদাশিব রাও, [illegible] মেনন, (ইনি কিছুদিন পর কংগ্রেস মন্ত্রী হিসাবে [illegible]। আমাদের সহিত দেখা [illegible]) দামোদর মেনন। [illegible] মধ্যে ছিলেন, [illegible] কম্যুনিস্ট [illegible] শঙ্কর [illegible], এ. কে. গোপালন [illegible] পিলে [illegible]। [illegible] ইনি কংগ্রেস [illegible] ছিলেন, [illegible] সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, [illegible] কম্যুনিস্ট দলভুক্ত হ[illegible]। [illegible] প্রদেশে [illegible] চারটি ভাষা প্রচলিত [illegible] দেশে তেলেগু, মাদ্রাজ তামিল এবং মালাবারে মালয়ালম। কানাড়ি ভাষাও চলে। প্রধান তিন ভাষা প্রায় সকলেই জানে, চট্টগ্রামে যেমন চিটাগঙ্গ ভাষা এবং বাংলা ভাষা। এই প্রদেশের লোকে সরিষার তৈল ব্যবহার করে না, তাহারা তিল তৈল এবং নারিকেল তৈল ব্যবহার করে। তরকারী বেশি পদ হয় না, সাধারণত "রসম, সম্ভারম" হয়, তাহাদের প্রত্যেক তরকারিতেই তেঁতুল থাকিবে এবং ঝালও বেশি থাকিবে। আমরা কংগ্রেস নেতাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতাম, তাঁহারাও মাঝে মাঝে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। আমরা ছিলাম স্টেট প্রিজনার, আমাদের খাদ্য এবং হাতখরচের টাকা ছিল বেশি, এজন্য আমাদের সুবিধা ছিল। এক দিন সদাশিব রাও আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের দেশী রন্ধনদ্রব্য খাওয়াইলেন, তাহার মধ্যে ছিল মুগ ডাইলের মিষ্টান্ন। আমরা প্রত্যহ সকালে তৃতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীদিগকে কফি খাওয়াইতাম। মধ্যপ্রদেশের কুর্গ জঙ্গলে প্রচুর কাফ হয়। সেখানে সাধারণ লোক কফি খায়, উচ্চস্তরের লোক চা পান করেন। আমরা কফি বীজ বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়া কফি পাউডার তৈয়ার করাইতাম। দানাগুলি ভাজিয়া, পিষিয়া গুঁড়া করিলেই কফি পাউডার হইল। আমাদের কয়েদী ফালতুরা (পরিচর্যায় নিযুক্ত কয়েদী) পাউডার তৈয়ার করিতে জানিত। ইহাতে খরচ খুব কম পড়িত। আমরা প্রত্যহ বড় দুই বালতি কফি তৈয়ার করাইয়া বিতরণ করিতাম। আমরা তাহাদের বিড়ি সরবরাহও করিয়াছি।

কংগ্রেস বন্দীদের মুক্তির পর আমরা একদিন জেলারকে পুত্র কন্যা সহ খাওয়ার নিমন্ত্রণ করিলাম। আমাদের রন্ধনের জন্য বাংলা দেশ হইতে একজন বাঙালী পাচক (কয়েদী) পাঠান হইয়াছিল, মালয়ালি কয়েদী পাচকও ছিল। আমরা রসম, সম্ভারম, বড়া প্রভৃতি সেই দেশীয় খাদ্য এবং বাংলাদেশীয় খাদ্য রান্না করাইয়াছি। আমি রসগোল্লা ও পানতোয়া তৈয়ার করিয়াছি। মাছ মাংস ও সেই দেশীয় মিষ্টির ব্যবস্থা ছিল। আমাদের জিনিসপত্রের অভাব ছিল না, ব্যবস্থা ভালই হইয়াছিল। জেলার তাঁহার ছোট বড় ৫। ৬টি পুত্রকন্যা সহ স্বিপ্রহরে ভোজন করিতে আসিয়াছেন, টেবিল চেয়ারে খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। রমেশবাবু তামিল এবং মালয়ালম ভাষা ভাল জানিতেন, প্রতুলবাবুও মন্দ জানিতেন না, আমি এবং রবিবাবু কাজ চালানোর মত জানিতাম। আমরা ছেলেমেয়েদের সহিত তাহাদের ভাষায় আলাপ করিতে লাগিলাম। তাহারা আমাদের মুখে তাহাদের মাতৃভাষা শুনিয়া বেশ আমোদ উপভোগ করিল। তাহার পর খাওয়ার পালা। আমাদের দেশী রান্না ছেলেমেয়েদের পছন্দ হইতেছে না, এক-একটী পদ মুখে দিয়া বলিতে লাগিল "নাল্লা ইল্লেহ। (ভাল নয়) রসগোল্লা, পানতোয়া মুখে দিয়া" "নাল্লা ইল্লেহ" বলিয়া ফেলিয়া দিল। জেলার অবশ্যই আমাদের সহিত গল্প করিতে করিতে সকল পদই খাইলেন। ইতিমধ্যে রমেশবাবু পেটে একটা অপারেশনের জন্য কয়েম্বাটুর জেলে স্থানান্তরিত হইলেন। তিনি কয়েকদিন বার্লি পথ্য করিতেছেন, আজ প্রাতে ডাক্তার বলিলেন, Today you will get [illegible] পায়সম্‌। রমেশবাবু [illegible], আজ মাদ্রাজী পায়েস খাইবো, [illegible] অর্থ তিনি জানিতেন না, যাহা হউক, মিষ্টান্ন ত?

খাবার সময় দেখিলেন পাচক দুধ-সাগু লইয়া আসিয়াছে। [illegible] তিন স্টেজ প্রিজনারী [illegible] দুধ সাবু দেখিয়া চটিয়া [illegible] বাবুর্চিকে ধমক দিয়া বলিলেন, এ কি আনিয়াছ? ফেলিয়া দাও। [illegible] বলিল, ডাক্তার যাহা নির্দেশ দিয়াছেন তাহাই আনিয়াছি। ইহার উপর আর কোন কথা চলে না। বৈকালে ডাক্তার আসিয়া হাসিতে হাসিতে [illegible] করিলেন? পায়সম্‌ কেমন উপভোগ করিলেন? রমেশবাবু [illegible] চটিয়া ছিলেন, ডাক্তারের উক্তি [illegible] বিদ্রূপের মত মনে হইল, [illegible] মেজাজে ডাক্তারকে [illegible] লাগিলেন, ডাক্তার ত অপ্রস্তুত। [illegible] বাবুর্চিকে ডাকাইয়া আনিয়া [illegible] বলিলেন কি খাবার দিয়াছ [illegible] উত্তর শুনিয়া ডাক্তার বলিলেন T[illegible] জবর্শী পায়সম্‌। মাদ্রাজের [illegible] সাগুদানার মিষ্টান্ন খায়। জবর্শী অর্থ সাগুদানা। তাহারা অবশ্যই দুধ [illegible] মিষ্টান্নে তেজপাতা, কিসমিস, [illegible] বাদাম দেয়। আমরা প্রাতে চা'র সহিত সেই দেশীয় খাদ্য ইর্টলি, ধোসা, উপমা খাইতাম। ইর্টলি, ধোসা, টক-ঝাল চাটনী সহ খাইতে হয়, চাটনী নারিকেলের প্রস্তুত। মালাবারের রত্নের নারিকেল হয়। [ক্রমশঃ]

বেতারে বিজ্ঞাপন

যদি 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে এই গানটি শেষ না হতে হতেই কেউ মোটা গলায় বলে ওঠে, 'ছারপোকার বংশ...' ইত্যাদি, তাহলে আপনাদের কেমন লাগবে জানি না, কিন্তু আমার মরে যেতে ইচ্ছে করবে। কিন্তু সেটা যখন সম্ভব নয়, অগত্যা আমি রেডিও বন্ধ করবো এবং এইভাবে স্বাস্থ্যোদ্ধারে সচেষ্ট হবো। বরং আমি আকাশের মেঘ দেখবো, কিন্তু আকাশের বাণী আর শুনতে পাবো না। কিন্তু শুনতে না চাইলেই তো রেহাই পাওয়া যায় না, রেডিও যে পারিবারিক সম্পত্তি—আপনি না শুনলে অন্য কেউ শুনবে, আপনার বাড়ির লোক না শুনলে পাশের বাড়ির লোক। যে দিক থেকেই হোক না কেন, শব্দ কানে ভেসে আসবেই,—ট্রামে বাসে, রাস্তায়, পানের দোকানে, সঙ্গীতপিপাসুদের হাতে হাতে গানের কলি অমর। আর এইখানেই রেডিওর জিত এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের স্বস্তি। এতদিন বাংলাদেশের মানুষ বিজ্ঞাপন পড়েছে খবরের কাগজে, জনপ্রিয় সাপ্তাহিকে কিংবা লিটল ম্যাগাজিনে—সিনেমাতেও দেখেছে স্নো-সাবানের সবাক কেরামতি, শুধু রেডিও বাকি ছিল। রেডিও-তে বিজ্ঞাপন শুরু হবে এই রকম একটা কথা অনেকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল, অবশেষে সত্য-সত্যই বিজ্ঞাপন প্রচার শুরু হলো—এখন 'বিবিধ-ভারতী'র গানের ফাঁকে ফাঁকে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রেশ মিলোতে না মিলোতে আমরা শুনতে পাবো কাশির শব্দ, সাবানের গান, বিস্কুটের মচমচানি, আরো কত কী।

যাঁরা পণ্য উৎপাদন করেন, তাঁদের স্বার্থ এতে রক্ষিত হলো সন্দেহ নেই। আসলে জিনিস উৎপাদন করলেই হয় না, জিনিস বিক্রি করা চাই আর সেইজন্যেই দরকার অনুকূল বাজারের। কিন্তু বাজারকে অনুকূল করে তুলতে হলে পণ্যসামগ্রীর প্রতি ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা একান্তভাবে প্রয়োজন, পণ্যের বিশেষ বিশেষ গুণাবলি, সমজাতীয় পণ্য থেকে তার প্রভেদ কোথায় ইত্যাদি বিষয়ে ক্রেতার মনে যদি স্পষ্ট ধারণা না জাগে তবে তার ক্রয়েচ্ছা হবে না। সবাই জানেন, এই দৃষ্টি আকর্ষণ করার উপায় বিজ্ঞাপন, যাকে উৎপাদনকারীরা স্বার্থে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু বিজ্ঞাপন, যার দ্বারা ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, সেই বিজ্ঞাপনের প্রতিও ক্রেতার দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া চাই, নচেৎ বিজ্ঞাপন নিষ্ফল। বিজ্ঞাপন যদি সবাই বা অধিকাংশ না দেখে বা না শোনে, তবে তাদের পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া অসম্ভব। তাই বিজ্ঞাপনদাতাদের যোগ্য মাধ্যম বা medium-এর সন্ধানে থাকতে হয়। আগেকার দিনে, ধরা যাক সংবাদপত্রের আগের যুগে, media-র বিশেষ অসুবিধা ছিল—ইংলন্ডে নগরঘোষক বা 'towncrier'-এর কথা আমরা জানি যে চেঁচিয়ে প্রবাদ্গণ বর্ণনা করতো। 'ঘোষক'রা অবশ্য এখনও নিশ্চিহ্ন নয়, শহরতলিতে যাত্রা-থিয়েটার সিনেমার অনুষ্ঠান এখনো ঘোষকের মাধ্যমে বিজ্ঞাপিত হয়। কিন্তু ছাপাখানার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনের এই [illegible] হলেন—ক্রমে ক্রমে এলো সংবাদপত্র, জনপ্রিয় সাপ্তাহিক, প্যাম্ফলেট ইত্যাদি। যেগুলি জনসাধারণের কাছে সহজেই পৌঁছে যায়, আর যেখানে বিজ্ঞাপন দিলে তা কখনোই হারাবে না। বিজ্ঞাপন যেহেতু বৃহত্তম জনসংখ্যার উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে, তাই যে 'medium' বা মাধ্যমের প্রচার কিংবা বিজ্ঞাপনের পরিভাষায় coverage সবচেয়ে বেশি, সেই 'মাধ্যম'ই একজন উৎপাদনকারী বেছে নেবেন, এটাই সংগত।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনের media-ও বাড়ছে সন্দেহ নেই। বাংলাদেশে যখন বেতারে বিজ্ঞাপন শুরু হয়েছে বলে আমরা খুশি, সেই মুহূর্তে এই কথাও আমাদের ভাবা দরকার যে, পৃথিবীতে এখন এই ব্যাপারটি অতীতকালের ঘটনা। হায়, অনুন্নত দেশের ভাগ্য! কতদিনে এদেশে টেলিভিশন আসবে, সে কথা আমরা চিন্তাও করতে পারি না, কিন্তু অনেক দেশে আমাদের স্বপ্নের সেই টেলিভিশন-ও তো পুরনো হয়ে গেছে। বিদেশের ব্যবসায়ীরা এখন টেলিভিশনের মাধ্যমে নিজেদের পণ্য-সামগ্রীকে বিজ্ঞাপিত করছেন—একই সঙ্গে ক্রেতার চোখ ও কানকে তৃপ্ত করতে পারছেন তাঁরা, এবং এইভাবে নিজেদের উৎপাদনের বৃহত্তর বাজারকে তৈরি করছেন। বিদেশে রেডিও ও টেলিভিশনের প্রতিযোগিতায়, রেডিও হেরে গিয়েছে; স্বদেশী ব্যবসায়ীদের সামনে রেডিও-র কোনো বিকল্প নেই, সুতরাং ক্ষমতা অনুসারে কেউ রেডিও কেউ বা টেলিভিশনকে মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়ে নিজেদের পণ্যদ্রব্যের বাজার বৃহত্তর করবেন সে আশংকা নেই।

সমস্ত বিজ্ঞাপন দুটি শব্দের ওপর দাঁড়িয়ে আছে—চোখ ও কান। বিখ্যাত ইংরেজ প্রবন্ধকার এ্যাডিসন ১৭১০ খৃ বিজ্ঞাপনের ওপর একটি নিবন্ধ রচনা করেন, সম্ভবত এই বিষয়ে তাঁর রচনাই পথিকৃতের সম্মান দাবি করতে পারে। ঐ নিবন্ধের একটি জায়গায় তিনি বলেছিলেন, 'বিজ্ঞাপন লেখার আসল শিল্প হচ্ছে কী করে পাঠকের চোখকে আটকে রাখা যায়'। ঐ নিবন্ধে অ্যাডিসনের অনেক কথাবার্তাই আড়াই শো বছর পরে পুরনো হয়ে গেছে, কিন্তু এই কথাটি এখনো উজ্জ্বল, কেন না বিজ্ঞাপনে চোখের গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান। সিনেমায় বিজ্ঞাপনের কথা ছেড়ে দিলেও, সংবাদপত্রে যে সমস্ত বিজ্ঞাপন আমরা দেখি তাতে আমাদের চোখকে তৃপ্ত করার অনেক উপাদান আছে। শুধু ছবি নয়, 'layout'-এর দ্বারাও 'চোখকে আটকে রাখার' কৌশল আজকালকার কমার্শিয়াল আর্টিস্টদের আয়ত্তে। এই একটি দিক থেকে রেডিওকে অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়

আহা তোমাদের জন্য

[illegible]ন্দু বড়ুয়া

আহা তোমাদের জন্য লক্ষ্মী-সরার ধান,
স্বর্ণ এনেছি, কাঁঠালিচাঁপার বাগান
করে দেব, তুমি খুব ভালোবাসতে
সোনা-মোড়া চকোলেট, বিটোফেন শুনতে
স্বর্গীয় সুর অমলিন, কয়েক গ্যালন
অশ্রু চাপা-পড়া আছে এই বুকে
নিরেট কঠিন—নয় তো বা সহানুভূতিই
ফেটে বাইরে বেরোবে। তাই ঠোঁট বুজে
আছি। বুক ফেটে যাচ্ছে বেদনায়
তোমাদের জন্য।

রচিত সুখের স্বর্গ। বন্যায় কী আর
নিয়েছে! এখন মুঠিভরা সোনা-দানা,
যা কিন্তু চোখেও দ্যাখ নি কোনদিন—
হাত বাড়ালেই পাবে। সব পেয়ে যাবে।
ওরা রিলিফের কথা বলে। বস্তাপচা
কথা শুনে শুনে কান পচে গেছে। ওদের
কথা শুনো না। ওরা রাজনীতি করে।

মানব-জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা ছাড়া
কিছু নয়। আমাদের 'পরে আস্থা রাখ।
চাল-ডাল-আটা ও-সব গরুতে খায়।
রকমারী জমকালো খানা টন টন
মজুত আছে। তোমাদের দুঃখ ঘোচাতে
এনেছি। দু'টো দিন ধৈর্য ধরে থাক।

আহা তোমাদের জন্য আম-কাঁঠালের
বাগান দেব ছায়া-ছায়ায় যেতে, কাঁচা
উঠোন পাকা করে দেব, কাঁকালে চন্দ্রহার—
যদিও পরনে ছিন্নবস্ত্র পাঁজরের হাড়
এবং জিভ বেরিয়ে পড়ছে ক্ষুধায়—
কালো গরুর দুধ এবং দুধ খাবার বাটি
স্টেনলেস স্টীলের। চাই কি হীরেও।

কয়েকটা দিন সবুর। ভোটের আগে আগেই
সব পাবে। ধৈর্য ধরে কয়েক দিন থাক।

বেহুলা

অসীমকৃষ্ণ দত্ত

বেহুলা নাচে বেহুলা নাচে বেহুলা নাচে রে
ঝিনিক ঝিনিক নূপুর বাজে পায়,
কচিমুখের সবুজ হাসি দিক দিগন্তে
ছড়িয়ে পড়ে লুটিয়ে পড়ে
ভোরবেলাকার শিউলি যেন
সোনার আলোর ঝলমলানি
ঃ বাংলাদেশ বাংলাদেশ
আহা, হীরের কুচি স্মৃতির ঘর
বেহুলা নাচে বেহুলা নাচে বেহুলা নাচে রে।

সেই বেহুলা বড়ো হলো
সিঁথের সিঁদুর মড়া কোলো গাঙুড় জলে ভাসে,
বেহুলা ভাসে বেহুলা ভাসে বেহুলা ভাসে রে।
কলার ভেলার চারপাশেতে লোভলোভানি
হাঙর কুমীর হাতছানি আর
হাজার নরক কাক শকুনি
ঃ বাংলাদেশ বাংলাদেশ
হায়, অথৈ জলে চোখের জল
বেহুলা ভাসে বেহুলা ভাসে বেহুলা ভাসে রে।

—কেন না রেডিওর আবেদন কানের কাছে, চোখের কাছে নয়। এ ছাড়াও আর একটি কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বেতারে বিজ্ঞাপন স্থায়ী ব্যাপার নয়। পরিবেশিত বিজ্ঞাপনটি সঙ্গে সঙ্গেই গ্রহণ করতে হবে, নচেৎ তাকে পুনর্বার পাওয়া যাবে না। যদি কেউ রেডিওতে কোনো বিশেষ বিজ্ঞাপন না শোনেন, তবে তাকে ইচ্ছে মতো আবার শোনা যাবে না—যেমন সম্ভব সংবাদপত্রে। এর থেকেই এই সিদ্ধান্ত টানা যায় যে বেতারে যিনি বিজ্ঞাপনদাতা, তাঁর পক্ষে শ্রোতাকে সংগ্রহ করবার এবং ধরে রাখবার দায়িত্ব ও নৈপুণ্য অর্জন করা আবশ্যিক।

বেতারের এই অসম্পূর্ণতাগুলি কলকাতাকেন্দ্রে সাম্প্রতিক বিজ্ঞাপন-কার্যক্রম সম্পর্কেও প্রযোজ্য। শব্দের সঙ্গে ছবি থাকলে, যেমন সিনেমায় বা টেলিভিশনে থাকে, ব্যাপারটি চুকে যেতো—কিন্তু তা যেহেতু সম্ভব নয়, সুতরাং শব্দ দিয়েই ছবি ফুটিয়ে তুলতে হবে। কী ভাবে তা সম্ভব? কাশির শব্দ শুনলে লোকটির দশা বুঝতে পারবেন কি, কিংবা মাথা ধরলে মানুষের কপালের রেখা কতটা বদলায়? বিস্কুটের মচমচ শব্দ শুনে তার সুডৌল রূপটি হয়তো মনে মনে পাবেন, কিন্তু সাবানের ফেনা দেখতে পাবেন কি? কলকাতাকেন্দ্রে আমরা যে-সমস্ত বিজ্ঞাপন আজকাল শুনছি, তাতে শুধু শব্দ আর গান—ছবি নেই। ছবি যে নেই তার একটা কারণ এই যে কয়েকটি বিজ্ঞাপনের ভাষা ও বাচনভঙ্গী সিনেমা থেকে তুলে নেওয়া। কী ভাবে শব্দের মধ্য দিয়ে ছবি ফুটিয়ে তোলা যায় তা ভাববার বিষয়, শুনলেই যদি দেখতে না পাই তবে কি করে আমরা শ্রোতা হিসেবে বেতারে বিজ্ঞাপনের প্রতি আকৃষ্ট হবো? যাঁরা নিজেদের পণ্য-সামগ্রী বিজ্ঞাপিত করছেন, আশা করা যায়, তাঁরা অচিরেই এই দিক থেকে ভাবতে চেষ্টা করবেন, ব্যবহৃত পথ ছেড়ে নতুন পথ ধরবেন যাতে বিজ্ঞাপনের প্রতি আমাদের আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে।

উৎপাদনকারীরা এবং বিজ্ঞাপনদাতারা ভাবতে থাকুন উৎকর্ষের দিক নিয়ে, কিন্তু আকাশবাণীর দায়িত্ব? [illegible]লো না তাতে। প্রিয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে গেঁথে বিজ্ঞাপন পরিবেশনের যে নীতি সরকার আপাতত গ্রহণ করেছেন, সেই নীতি আমার মতো অনেকের কাছেই এখন পীড়াদায়ক। আলাদাভাবে কোনো সময় কি দেওয়া যায় না? যখন শুধুই বিজ্ঞাপন পরিবেশিত হবে। যেমন আছে আমেরিকাতে? তখন অবশ্য বিজ্ঞাপন শোনার জন্যই রেডিও খুলতে হবে। এ প্রস্তাব প্রাথমিক পর্বে বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে ঝুঁকি বলে মনে হবে—কিন্তু আস্তে আস্তে বেতার শ্রোতাদের মধ্যে একটি বিজ্ঞাপন শোনার অভ্যাস গড়ে তোলা সম্ভব। তা যদি বা এ মুহূর্তে নাও করা হয়, অন্তত বিজ্ঞাপন-গুলিকে যেন লঘু অনুষ্ঠানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়, এই আমাদের অনুরোধ। তাতে বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য যেমন অক্ষুণ্ণ থাকবে, তেমনি আমাদের রুচিবোধ সম্মানিত হবে। জগতে না হোক, অন্তত বেতার-জগতে আমরা কিছুটা সুপ্রতিষ্ঠিত হই।

সংবাদপত্রে ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ির স্থান ছোট হয়ে এসেছে, এ বঙ্গদর্শন যখন প্রকাশিত হবে তখন হয়ত সংবাদপত্রে জলপাইগুড়ির উল্লেখ আর পাওয়া যাবে না। অপরাপর ঘটনা গত অক্টোবরের সেই নিদারুণ দুর্ঘটনাকে ভুলিয়ে দেবে, তা ছাড়া জনমন অত্যন্ত বিস্মৃতিপ্রবণ। কাজেই জলপাইগুড়ি চাপা পড়ে যাবে। যাদের সর্বস্ব গেছে, সর্বনাশা বন্যা যাদের একান্ত আপনজনদের ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, তারাই শুধু এই নিদারুণ ঘটনার স্মৃতি আজীবন বহন করবে।

আমাদের আশংকাটা অন্য দিক। তা হচ্ছে সরকারের মতিগতি নিয়ে। অন্তত মেদিনীপুরের বন্যা থেকে আমরা যা শিক্ষালাভ করেছি তাতে আতঙ্কিত হবার রীতিমত কারণ আছে। স্পষ্টভাবেই মনে করা যায় যে, জলপাইগুড়িতেও মেদিনীপুরের পুনরাবৃত্তি হবে। মেদিনীপুরে মাথাপিছু তিন পয়সা হারে সাহায্য করা হয়েছে সরকারের তরফ থেকে। এবং যে মুহূর্তে মেদিনীপুর বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেল সেই মুহূর্তেই ওই তিন পয়সা সাহায্যও বন্ধ করা হল। আর হুগলী-হাওড়া-বর্ধমান? সেখানে বোধহয় মাথাপিছু আধ পয়সা করেও সাহায্য করা হয় নি।

অথচ সরকারী তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে মেদিনীপুরের বন্যার্তদের জন্য টাকার অভাব হবে না। তার নমুনা হাতে-নাতেই পাওয়া গেছে। তাদের দল আমরা চোখের ওপর দেখেছি। মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলীর মহকুমা শহর-গুলিতে হাজারে হাজারে বাস্তুচ্যুত সর্বহারা মানুষের ভিড়, শহরে ভিক্ষাবৃত্তিই তাদের এখন একমাত্র অবলম্বন। এরা নিশ্চয়ই পেশাদার ভিক্ষুক নয়, কথায় এদের আঞ্চলিক টান, বৌ-ছেলেমেয়ে নিয়ে শহরের রাস্তাকেই এরা এখন আশ্রয় করেছে। সরকারী বন্যাত্রাণের এরাই সবচেয়ে বড় নমুনা।

জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রেও কি ভিন্ন কিছু হবে? আশ্বাস দেওয়া হয়েছে প্রচুর। কাজ কিছু হয় নি। বলা হয়েছিল টাকার অভাব হবে না। কিন্তু টাকার সত্যিই অভাব হচ্ছে। জলপাইগুড়ি পুনর্গঠনের প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার নীরব। অর্থাৎ কার্যত অনুদান খিচুড়ি-খাওয়ানো ত্রাণকার্য ছাড়া আর কোন কিছুরই প্রোগ্রাম নেই।

এর ওপর খেলাধুলা করতে কোন বাধা নেই, খিচুড়ি-খাওয়ানো ত্রাণকার্যও করা হচ্ছে না। বে-সরকারী ত্রাণকার্যে উৎসাহ দেওয়া দূরে থাক উল্টে সেখানে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এমন কি যাঁরা নিজেদের চেষ্টাতে ঘটনাস্থলে ত্রাণ-সামগ্রী নিয়ে যেতে চান, তাঁদের তা করতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বে-সরকারী সাহায্য যেটুকুও বা করতে দেওয়া হচ্ছে তাও দেওয়া হচ্ছে রাজনীতির মুখ চেয়ে।

ডি, আই, পি-এর বন্যা উপলক্ষে জলপাইগুড়ি প্রকল্পের জন্য সরকারের কত টাকা ব্যয় হয়েছে জানি না। তবে এই প্রসঙ্গে আমরা কেন্দ্রীয় তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে একটা পরামর্শ দিই। তাঁরা একবার দয়া করে খোঁজ নিন ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত তাসখন্দ নগরীর পুনর্গঠনে কত সময় লেগেছিল এবং কিভাবে তা করা হয়েছিল? কিন্তু পরামর্শটা দিয়েও স্বস্তি নেই, আশংকা হয় পরামর্শটি গ্রহণ করে ডি, আই, পি-রা অতঃপর দলে দলে বিমানযোগে তাসখন্দ অভিমুখে রওনা না হয়ে যান; সরকারী খরচে বেড়ানোর এমন মওকা তো বড় একটা পাওয়া যাবে না। জলপাইগুড়ির বন্যা আর যাই করুক কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎমন্ত্রীকে মার্কিন মুলুক ঘুরে আসার সুযোগ তো করে দিয়েছে।

তৈল সাম্রাজ্য

শোনা যায় মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলিতে শাসকদের অস্তিত্ব নাম মাত্র, আসলে নাকি মার্কিন তৈল কোম্পানীগুলিই দেশ শাসন করে আর তাদের দেওয়া রয়ালটির টাকায় আমীরবর্গ হারেম পোষেন। এবং এই আসল তৈল সম্রাটদের বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে নকল রাজাদের সিংহাসন যে-কোন মুহূর্তেই উল্টে যেতে পারে। প্রায় ষোল-সতের বছর আগেকারের একটি কাহিনী আমাদের মনে আছে। সেই সময় ডঃ মোসাদেক নামক এক পুরুষসিংহ ইরানের মুখ্যমন্ত্রিত্ব অর্জন করেছিলেন এবং ইঙ্গ-মার্কিন বণিকগোষ্ঠী কবলিত আবাদানের তৈল শোধনাগারটির জাতীয়করণ করেছিলেন। তার পরিণাম হয়েছিল অত্যন্ত শোচনীয়। এর জন্য শেষ পর্যন্ত ডঃ মোসাদেককে কারাবাস করতে হয়েছিল এবং তাঁর অনুগত সহকর্মীদের অনেককেই ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল।

ভারতে এই তৈল-সম্রাটেরা এতটা শক্তিমান না হলেও নেহাৎ কম নয়। পেট্রোলিয়াম শিল্পে নাকি প্রচুর মূলধন লাগে,

এবং এই মূলধন বহনের ভার ভারত সরকার বহন করতে আপাতত অক্ষম এই যুক্তিতে বিদেশী তৈল কোম্পানীগুলি এদেশে একচেটিয়া অধিকার লাভ করে এসেছে। অবশ্য পরে ভারত সরকার ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন গঠন করেছেন, তাহলেও এদেশের সমগ্র তৈলশিল্পে তার ভূমিকা এখনো মুখ্য নয়। মূলত তিনটি কোম্পানী এখনো পর্যন্ত তৈল-জগতের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। এগুলি হচ্ছে বার্মা শেল, ক্যালটেক্স এবং এসো।

প্রচুর মূলধনের জোর থাকায় এবং ভারত সরকার এদের বিরুদ্ধে কার্যত কিছু করতে আপাতত অক্ষম এটা জেনে এই তৈল কোম্পানীগুলি পুরোপুরি স্বেচ্ছাচারী নীতি অবলম্বন করে চলেছে বছরের পর বছর। সম্প্রতি এরা অটোমেশন করতে শুরু করেছে এবং তার ফলে হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হয়েছে। অটোমেশন সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতির অভাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সরকার নিজেই অটোমেশনের পক্ষপাতী হওয়ায়, এরা উৎসাহ পেয়েছে এবং তার জন্য মূল্য দিতে হচ্ছে হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীকে।

পেট্রোলিয়াম শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই-এর প্রতিবাদে অবস্থান ধর্মঘট করছেন, অর্থাৎ তাঁরা তা করতে বাধ্য হয়েছেন। যদিও সংবাদপত্র শ্রমবিরোধের ক্ষেত্রে ধর্মঘটের নিন্দা করাটা মালিকপক্ষ ও এক-শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী এবং অপপ্রচারে বিভ্রান্ত কোন কোন মানুষের পক্ষে বেওয়াজ হয়ে গেছে, তথাপি একটু শান্ত-ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে এই পথটি ছাড়া শ্রমিক-কর্মচারীদের আত্মরক্ষার কোন পথ নেই। ভারতবর্ষে এমন একটিও উদাহরণ নেই যেখানে শ্রমিকশ্রেণী তাঁদের প্রতি অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে সরকারের সাহায্য পেয়েছেন। শ্রমবিরোধ যদি আদালতে টেনে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে ট্রাইবুনালের রায় শ্রমিক স্বপক্ষে এবং মালিকদের বিপক্ষে গেলেও মালিকপক্ষ তা মানতে রাজী নয়। কাজেই ধর্মঘট ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই, যাঁরা বলেন আছে তাঁরা সত্যের অপলাপ করেন। এই কারণেই কোন ধর্মঘটকে নিন্দা করতে আমরা কুণ্ঠিত।

গত ৭ই নভেম্বর থেকে বজবজে পেট্রোলিয়াম শ্রমিক-কর্মচারীরা ছাঁটাই-এর প্রতিবাদে অবস্থান ধর্মঘট করছেন। এই অবস্থান ধর্মঘটের তৃতীয় দিবসে, অর্থাৎ ৯ই নভেম্বর তারিখে রাত্রে বিদেশী তৈল কোম্পানীর একটি তৈলবাহী জাহাজ বজবজের সামনে পোর্ট কমিশনার্সের ৮নং জেটিতে এসে তেল খালাসের জন্য দাঁড়ায়। যখন ওই জাহাজ থেকে পাইপের সাহায্যে তেল খালাস করা হচ্ছিল, তখন অবস্থানকারী শ্রমিক-কর্মচারীরা ওই তেল খালাসে বাধা দেয়। বিরাটসংখ্যক পুলিশ এসে ওই স্থানে হাজির হলে ধর্মঘটী শ্রমিক-কর্মচারীরা জানায় যে, "আমাদের রুটির সংগ্রামে আপনারা হস্তক্ষেপ করবেন না।"

কিন্তু এদেশটা ইংলণ্ড নয়। এখানকার পুলিশ চোর ডাকাত ধরায়, হত্যাকাণ্ডের কিনারা করায়, বা সমাজবিরোধীদের শায়েস্তা করায় মোটেই দক্ষ নয়। তা করতে গেলে তাদের কোমরের বেল্ট আল্গা হয়ে কোমর থেকে খুলে পড়ে। কিন্তু নিরস্ত্র জনতার বিরুদ্ধে গুলী চালাতে, সরকার-বিরোধী নেতাদের গ্রেপ্তার করতে, এবং ধর্মঘটের সময় মালিকপক্ষের ভাড়াটে গুণ্ডা হয়ে কাজ করতে এদের জুড়ি নেই। কাজেই যে দৃশ্যের অবতারণা ভারতের প্রতিটি স্থানে গত বিশ বছর ধরে হয়ে আসছে, এখানেও সেই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হল, পুলিশবাহিনী কোন হুঁসিয়ারী না দিয়েই শ্রমিক-কর্মচারীদের ওপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ করে তাদের হটিয়ে দিল।

এর প্রতিবাদে সমগ্র বজবজ শহর আজ বিক্ষুব্ধ। কয়েকদিন আগে বজবজ-বন্ধ হয়ে গেছে। সংবাদে প্রকাশ যে অটোমেশন ও ঠিকাদারী প্রথা চালু করার ফলে বার্মা শেল, এসো এবং ক্যালটেক্সের শ্রমিক-কর্মচারীরা তাঁদের চাকরীর নিরাপত্তার জন্য ভারত সরকারকে বহুদিন পূর্বেই জানিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশী তেল কোম্পানীগুলিতে বাড়তি শ্রমিক-কর্মচারী আছেন কি-না সেই বিষয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন, অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হবার আগেই, বিদেশী তেল কোম্পানীগুলি ছাঁটাই শুরু করেছে। তদুপরি এসো কোম্পানী তাদের কলকাতার অফিস বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করছে।

ফার্নেস অয়েল ও লাইট ডিজেল অয়েল সরবরাহ বন্ধ থাকায় পশ্চিমবঙ্গের শিল্পজগতে এক দারুণ বিপর্যয়ের আশংকা দেখা দিয়েছে। অনেক কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। কোন কোন কারখানা তেলের অভাবে লে-অফ আরম্ভ করে দিয়েছে।

সব ছাপিয়ে একটা প্রশ্ন অনেকেরই মনে উদিত হচ্ছে। এই তিনটি বিদেশী কোম্পানীকে একচেটিয়া মুনাফা লুটতে আর উৎসাহিত করা উচিত হবে কি? ভারত সরকার কি এই কোম্পানীগুলির জাতীয়করণ করতে পারেন না? অবশ্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে জাতীয়করণের কথা বলছি না। বিনা ক্ষতিপূরণে জাতীয়করণ। সংবিধানে এই রকম কোন ধারা বোধহয় নেই, কিন্তু এই উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধন করা চলতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের [illegible] করা হয়েছে। দেশের মুখ চেয়ে জাতির মুখ চেয়ে এবং শ্রমিক কর্মচারীদের মুখ চেয়ে আর [illegible] না হয় সংবিধানের এ সংশোধন করা হোক। [illegible] বর্তমান [illegible] সরকার ইচ্ছা করলে কোম্পানীগুলির পরিচালনভার নিজের হাতে নিতে পারেন, যেমন যুক্তফ্রন্টের আমলে কলকাতার ট্রাম কোম্পানীর পরিচালনভার নেওয়া হয়েছিল।

স্বাস্থ্য-অধিকর্তার উদ্দেশ্যে

১৫ই নভেম্বর দৈনিক বসুমতীতে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে:

"রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য-অধিকর্তাকে ধন্যবাদ। স্বাস্থ্যদপ্তরের দুজন পদস্থ আমলার উপদলীয় চক্রান্ত, তদ্বির-তদারককে উপেক্ষা করে তিনি কল্যাণী জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতালের দুর্নীতি ও অনাচারের মূল নায়ক ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে তৎপর হয়েছেন। স্বাস্থ্য অধিকর্তার এক আদেশে ওই হাসপাতালের একজন স্টোরকীপার ও একজন ওয়ার্ড-মাস্টারকে অন্যত্র বদলী করা হয়েছে। হাসপাতালের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকেও নাকি বদলীর আদেশ দেওয়া হয়েছে, যদিও তিনি বর্তমানে ছুটি নিয়ে কল্যাণীতে তাঁর নিজস্ব বাসভবনে আছেন। স্টোরকীপার ভদ্রলোক, যাঁকে পুরুলিয়ায় বদলী করা হয়েছিল, ছুটি নিয়ে কল্যাণীতে আছেন এবং খোদ জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতালেই তাঁর স্ত্রীর (স্ত্রী হাসপাতালের স্টাফ) কোয়ার্টারে বসবাস করছেন। তিনি হাসপাতালের আভ্যন্তরীণ কাজকর্মেও নাক গলাচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত সোমবার হাসপাতালের দুজন ডাক্তার কয়েকজন জি, ডি এ ও কিছু স্থানীয় সমাজ-বিরোধী লোককে হাসপাতালের এমার্জেন্সী বিভাগের কাছে উত্তেজিতভাবে বলতে শোনা যায়, 'ডাঃ সেনগুপ্তকে ফিরিয়ে আনতেই হবে, না হলে হাসপাতালের কাজকর্ম অচল করে দেওয়া হবে।' হাসপাতালের কয়েকজন রোগীর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে তাঁরা রোগী ভর্তির ব্যাপারে গুরুতর দুর্নীতির অভিযোগ করলেন। অবশ্য পরে অনুসন্ধানে জানলাম, যিনি এতদিন রোগী ভর্তির ব্যাপারে সর্বময় কর্তৃত্বে আসীন ছিলেন, তাঁকে অন্য কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। হাসপাতালের ঔষধপত্র ও সাজসরঞ্জাম কোন ডাক্তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বেপরোয়াভাবে কাজে লাগাচ্ছেন বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।"

কল্যাণী হাসপাতালের দুর্নীতি সম্পর্কে বঙ্গদর্শনে ইতিপূর্বে বহু

সাপ্তাহিক বসুমতী উত্তরবংগ বন্যাত্রাণ কমিটির পক্ষ থেকে শ্রীমতী আশা গুপ্ত ভায়া জলপাইগুড়িতে বন্যা-দুর্গত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খাতা ও কলম বিতরণ করছেন।

চঞ্চলাবর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে যে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে হলেও, স্বাস্থ্য-অধিকর্তা এই ব্যাপারে কিছুটা ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর নিকট আমাদের অনুরোধ—উপরোক্ত পদস্থ আমলাদের সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে তিনি কল্যাণী হাসপাতালের অনাচারের প্রধান নায়কের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

চব্বিশ পরগনা জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

আমাদের বর্তমান কাহিনীর নায়ক চব্বিশ পরগণা জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের একজন অতি-উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তিনি পূর্বে সেণ্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্সের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি উচ্চপদে আসীন ছিলেন। তাঁর নামে দুর্নীতির বহু অভিযোগ উঠেছিল এবং তদানীন্তন এণ্টি করাপ্শান ডিপার্টমেণ্ট ও এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ তাঁর সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি এখন চব্বিশ পরগনার স্বাস্থ্য বিভাগ আলো করছেন। নীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন এই ভদ্রলোকের অর্থলোভ অতি প্রবল এবং সেই উদ্দেশ্যে এমন কোন পথ নেই যেখানে তিনি যেতে দ্বিধা করেন। সম্প্রতি অর্থোপার্জনের জন্য তিনি একটি নতুন রাস্তা বেছে নিয়েছেন, তা হচ্ছে ভাসেক-টমি অপারেশন। ইনি নিজেই এই কাজটি করেন এবং এঁকে ভাসেকটমির কেস যোগাতে অধীনস্থ কর্মচারীদের বা হেলথ সেণ্টারগুলির ডাক্তারদের নাকহাল হতে হয়। যাঁরা এভাবে অপারেশনের খদ্দের জুটিয়ে দিয়ে এঁকে তুষ্ট করতে না পারেন, প্রতিহিংসাপরায়ণ এই ব্যক্তিটির দ্বারা তাঁরা নানাভাবে নিগৃহীত হন। এঁকে তুষ্ট এবং বাধিত না করতে পারার অপরাধে চব্বিশ পরগনা জেলার অনেক-গুলি হেলথ সেণ্টারের ডাক্তারদের নিদারুণ দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে, অনেককে এখানে-ওখানে বদলী ইনি করিয়েছেন স্বাস্থ্যপ্রসারের ওপরওয়ালাদের মারফৎ। কসবার স্থাটভাগিল, দত্তপি, মধ্যমগ্রাম প্রভৃতি হেলথ সেণ্টারের ডাক্তারদের ওপর ইনি এইভাবে প্রতিশোধ নিয়েছেন। [illegible] স্বাস্থ্য-অধিকর্তা এদিকে একটু নজর দেবেন কি?

উত্তরবঙ্গের বন্যাবিপন্নদের সাহায্যে সাপ্তাহিক বসুমতী

সাপ্তাহিক বসুমতীর উত্তরবঙ্গ বন্যা-ত্রাণ কমিটির তহবিল থেকে গত ১১ই নভেম্বর পাঁচশ এক টাকা জিলাপাড়ার বন্যার্তদের কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও সাংবাদিকদের জন্য পাঠানো হয়েছে। জিলাপাড়ার বন্যার্তদের জন্য উক্ত পার্শ্ববর্তী পশ্চিম দিনাজপুর জেলার [illegible] সাহায্য সেখানে পৌঁছে যাওয়া মাত্রই বিতরণ শুরু হয়েছে।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা বিধ্বস্ত বন্যার কবলে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সেখানকার দুঃস্থ নিঃস্ব মানুষ সাহায্যের জন্য আবেদন করছেন বলে সংবাদ এসেছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই জেলার বিপন্ন মানুষদের সাহায্যে বিশেষ কিছুই করা হয় নি আর করার কোন পরিকল্পনা আছে বলে জানা নেই।

সাপ্তাহিক বসুমতী উত্তরবঙ্গ বন্যা-ত্রাণ কমিটি নিজেদের ব্যয়ে পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় বন্যার্তদের মধ্যে বিতরণের জন্য গত ১৬ই নভেম্বর কিছু সাহায্য পাঠিয়েছে। প্রেরিত সাহায্যের মধ্যে আছে চার শ টাকা পঞ্চাশখানা নতুন কম্বল এবং তিন গাঁটরি সাধারণ ও শীত বস্ত্রাদি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য এই যে রাজ্য সরকার সাহায্যার্থ জিনিসপত্র উত্তরবঙ্গে পাঠানোর ব্যাপারে আর বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করছেন না যদিও বিশেষ বিশেষ সুপারিশের ক্ষেত্রে সব কিছু অনায়াসেই সম্ভব। যেমন কয়েকদিন আগে রাইটার্স বিল্ডিংসের জনৈক পদস্থ আমলার স্ত্রীর অভিভাবকত্বে একদল অভিজাত মহিলার (এঁদের মধ্যে আই সি-এস পত্নী, রিটায়ার্ড আই-সি-এস পত্নী, চার্টার্ড এ্যাকাউণ্টাণ্ট পত্নী প্রমুখেরা নাকি আছেন) সংস্থার তথাকথিত সাহায্য (পাঁচ হাজার টাকা ও কিছু কম্বল—যা নাকি আবার রাজ্যপালের ত্রাণ তহবিল থেকে দেওয়া হয়েছে) লোকজন সহ বিশেষ চার্টার্ড প্লেনযোগে পাঠানো হয়েছে। সত্যি বিচিত্র এই দেশ! বিচিত্র এই দেশের আমলাতন্ত্র! (১৬-১১-৬৮)

আবার গাঁয়ে গাঁয়ে চাল নিয়ে চালাকির খেলা শুরু হয়ে গেছে। লেভী ফাঁকি দেওয়ার জন্যে গত বছর যারা চাল লুকিয়ে রেখে সরকারের দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাদের অপদার্থতা ও অযোগ্যতা প্রমাণ করেছিল, তারাই সেই মজুত চাল প্রকাশ্য বাজারে ঢেলে বিক্রি করে দেখালো—যে সময় চালের দর সব চেয়ে বেশি হবার কথা সেই সময় চাল সব চেয়ে কম দামে বিক্রি হতে পারে। আবার সরকারের যেই নতুন খাদ্যনীতি ঘোষিত হল কোন কারণ থাক আর নাই থাক, অমনি দর বাড়তে শুরু করলো। গাঁয়ে কোথাও নব্বই থেকে এক টাকা দশ পয়সায় পর্যন্ত চাল এই পুজোর মরশুমেও বিক্রি হয়েছে। এখন সেই দর বাড়তে বাড়তে এক টাকা পঞ্চাশ পর্যন্ত উঠেছে। গাঁয়ের লোক বলাবলি করছে বাজারে নতুন ধান উঠুক, ধানধরা বাবুদের কেরামতি শুরু হোক, তখন দেখবেন ঐ চাল ৫।৬ টাকায় উঠছে। আশ্চর্য কিছু নেই; যে বাজারে বাস করছি এখানে যদি অফুরন্ত ফসলও এসে পড়ে তা সত্ত্বেও হয়তো দেশে দুর্ভিক্ষ লেগে থাকবে।

কারণ এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে, সরকার অসাধু ব্যবসায়ীদের হাতে ছেলেখেলার একটি পুতুল বিশেষে পরিণত হয়েছেন। ব্যবসায়ীরা যদি মনে করে চালের দর ৫ টাকায় তুলবো, সরকারের ক্ষমতা নেই সে দর প্রতিরোধ করা। [illegible] প্রতিরোধ করতে [illegible] পকেট ভর্তি করে, দু-একটা চুনোপুঁটি ধরে নিয়ে এসে [illegible] কি সাংঘাতিক [illegible] অসাধু ব্যবসায়ীদের [illegible] চালাচ্ছেন। লেভী আদায়ের ব্যাপারেও সরকারী আমলাদের কীর্তি-কাহিনী আজ গাঁয়ের প্রতিটি মানুষের মুখে মুখে ফিরছে।

গত বছর ৭৭ লক্ষ টন খাদ্য উৎপাদন [illegible] সরকারী প্রশাসনযন্ত্রের আমলারা লক্ষ লক্ষ টাকার শ্রাদ্ধ করে মাত্র ৪ লক্ষ টন খাদ্য সরকারের ঘরে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তাও এই ৪ লক্ষ টনের মধ্যে আছে জোর-জবরদস্তি করে নিরীহ চাষীদের কাছ থেকে আদায় করা চাল। যার উৎপাদন হয়েছে ১০০ মণ মিথ্যা করে তাদের উৎপাদন বেশি দেখিয়ে অপরের প্ররোচনায় আদায় করা হয়েছে ধরতে গেলে তার সারা বছরের সম্বল। গাঁয়ের লোক কি ভুলেছে সেই নিম্নমধ্যবিত্ত চাষীটির কথা, যিনি নির্দিষ্ট সময়ের আগেই লেভীর ধান সরকারের ঘরে নিজেই তুলে দিয়ে এসেছেন হাতে রয়েছে ফুড কর্পোরেশনের পাকা রসিদ? তা সত্ত্বেও তাঁকে গ্রেপ্তার

করে জেলে পোরা হল। অভিযোগ?—পুলিশের ওয়ারেন্টে পরিষ্কার উল্লেখ ছিল যে তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লেভী আদায় দেন নি। তাজ্জব ব্যাপার!! তখন যুক্তফ্রন্টের আমল; মুখ্যমন্ত্রী অজয়বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল, তিনি পাঠালেন ডঃ পি সি ঘোষের কাছে; কিছুই হল না। উপমন্ত্রী জ্যোতিবাবু শুনে তো বিশ্বাসই করতে চান না এমন অঘটন ঘটতে পারে! বর্ধমানের ডি এম-কে খোঁজ করে জানাতে বললেন। ঐ পর্যন্তই। ভদ্রলোক দু' মাস বিনা দোষে জেল খেটে বাড়ি ফিরে এসে দেখলেন সবাই শূন্য, ক্ষেত শূন্য। এই সরকারী আমলারাই আবার প্রস্তুত হচ্ছেন এ বছরে সাড়ে ৭ লক্ষ টন খাদ্য সংগ্রহ করতে! কাজেই কিনে-খাওয়া মানুষ আতঙ্কিত, সাধারণ মধ্যবিত্ত চাষীরাও আতঙ্কগ্রস্ত—কে জানে যে সময় বাংলার ঘরে ঘরে নবান্নের উৎসব হবে সেই সময় হয়তো বর্গীর হাঙ্গামা আবার শুরু হবে। তাই বোধহয় আবার চালের দর বাড়তে শুরু করেছে: আর অসাধু ব্যবসায়ীরা তো আছেই তারা কোন কারণের তোয়াক্কা রাখে না। নতুন ধান উঠছে, সরকার যে দাম দিয়ে কিনবেন তার চেয়ে বেশি দাম দিয়ে কিনে আগে-ভাগে সরিয়ে রাখতে হবে—তার জন্য চাই টাকা। অতএব বাজারে চালের দাম বাড়িয়ে দাও যে অতিরিক্ত টাকা হাতে আসবে তাই দিয়ে মাল কেনা। তাই চলছে এখন সমানে। গত বছর যে চাল আমলারা বাড়ি বাড়ি হানা দিয়েও আবিষ্কার করতে পারেন নি, সেই চাল এখন বাজারে আসছে—কিন্তু দাম ক্রমশ বাড়ছে। ব্রিটেনে রুটির দাম এক পয়সা বাড়লে ৫ কোটি মানুষই সরকারের বিরুদ্ধে এসে দাঁড়াবে, কৈফিয়ৎ তলব করে, প্রয়োজন হলে গভীর রাত্রেও পার্লামেন্টের সভা আহ্বান করতে বাধ্য করায় এবং এ

ব্যাপারে হেস্তনেস্ত না হওয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় না। কিন্তু আমাদের দেশ? এ-বেলা এক দর, ও-বেলা আর এক দর—পরের দিন সকালে হয়তো দেখা যাবে বাজারে চালই নেই। কিন্তু সরকার গদিতে ঠিকই আছেন আর আমলারা খোসমেজাজে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কাজেই দুর্দশা আমাদের হবে না তো হবে কাদের?

যে সরকারের নীতির কোন বালাই নেই, নীতি কার্যকরী করার প্রশাসনযন্ত্র নেই, অপদার্থ, অযোগ্য, দুর্নীতিগ্রস্ত আমলা যাদের হাতিয়ার তাদের আবার নতুন খাদ্যনীতি। কাজেই নতুন খাদ্যনীতিতে চালকল মালিক, ধান-চালের পাইকারী ব্যবসায়ী, বড় জোতের মালিকরা হয়তো উৎসাহিত হবেন, কিন্তু গ্রাম-বাংলার লক্ষ লক্ষ কিনে-খাওয়া মানুষ, দরিদ্রশ্রেণীর জনসাধারণের সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ছাড়া আর কিছুই নেই। বড়লোকদের কথা বাদ দিলে শতকরা বোধহয় ৯০ জন মানুষের আর্থিক অবস্থা আজ এমন অবস্থায় এসে পৌঁচেছে যে কিনে-খাওয়ার ক্ষমতাও লুপ্তপ্রায়। গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা সামনে রেখে যদি আগামী দিনের ভবিষ্যতের কথা কেউ চিন্তা করেন তাহলে এই মুহূর্তে মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানুষ সংসার প্রতিপালনের জন্য কিছু চাল আগে কিনে রাখার চেষ্টা করবেন। বছর কয়েক আগেও তাঁরা তাই করেছেন—বেশি দামে সেই চাল বিক্রি করে মুনাফা লোটার লোভে নয় শুধু সংসারের প্রাণী-গুলিকে যাতে চরম বিপদের দিনে রক্ষা করা যায় তারই জন্যে সে সংগ্রহ। কিন্তু এ বছর এমনই মানুষের আর্থিক দৈন্য যে এক মাসের চাল কিনে রাখারও ক্ষমতা নেই। দিন আনি, দিন খাই গোছের প্রত্যেকটি মানুষের অবস্থা। তাই

বাজারে দেড় টাকা কে-জি চালেও খদ্দের নেই। মানুষ পয়সার অভাবে চাল কিনতে পারছে না মুনাফাখোররা চোখের সামনে তাই দেখছে, তা সত্ত্বেও তারা চালের দর বাড়াতে এতটুকু দ্বিধা করে না।

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে চালের দর বাড়ার কারণ বুঝি, কিন্তু এখন? ক্ষেত ভর্তি ধান, হয়তো রেকর্ড ফলনই হবে, গম তো রেশনে, খোলা বাজারে অঢেল— তা সত্ত্বেও দাম চড়ছে। আর আমাদের সরকার বাহাদুর ঠুঁটো জগন্নাথের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখছেন। শহরের মানুষের জন্য আমাদের চিন্তা নেই, কারণ চাল-গমের দর যতই হোক তাঁরা ঠিক নিয়ন্ত্রিত দরে রেশন প্রতি সপ্তাহে পাবেন। কিন্তু আমাদের মানে গাঁয়ের মানুষের অবস্থা কি হবে? [illegible] কি তাঁরা মুনাফাখোরদের [illegible] ব্যবসায়ীদের হাতের [illegible] হয়ে থাকবেন?

সারা পৃথিবীর [illegible] বোধ হয় জানে গাঁয়ের [illegible] শহরের [illegible]দের ক্রয়ক্ষমতা অনেক বেশি, কারণ শহরের লোকেদের [illegible] টাকা [illegible] রোজগার আছে, আরও বেশি [illegible] কিন্তু গ্রামের লোকেদের আয় [illegible] সীমাবদ্ধ, বেশির ভাগ লোকের হাতেই নগদ টাকা নেই—সংসারে চাষ-বাস করে [illegible] হয়—তাই দিয়ে তাঁরা সারা বছর সংসার চালান, কেউ বা সামান্য পুঁজি নিয়ে ছোট-খাট ব্যবসা চালাচ্ছেন আর বেশির ভাগই দিন-মজুর আর ক্ষেতমজুরের দল। অথচ যে সময় ফসলের প্রাচুর্য সেই সময় এঁদের ১·৫০ টাকা কে-জি করে চাল কিনে খেতে হচ্ছে আর শহরের বাবুরা পাচ্ছেন ১·৩০ বা ১·৩৮ টাকা কে-জি চাল! এই উল্টো পুরাণ আমাদের দেশেই সম্ভব! শহরের লোকেরা নিয়ন্ত্রিত দরে চাল পাক তাতে কারুর কোন আপত্তি নেই: কিন্তু গাঁয়ের লোকেরা তা পাবে না কেন? তাঁরা কি অপরাধ করেছেন যে দেড় টাকা, দু'টাকা, চার টাকা, পাঁচ টাকা যখন যে দর ব্যবসায়ীরা হাঁকবে সেই দরেই তাঁদের চাল কিনে খেতে হবে?

কোথাও কোথাও আংশিক রেশনের দোকান সরকার খুলে দিয়েছেন: কিন্তু সে সব রেশনের দোকানে চালের কোন বালাই নেই, আছে এমন সব বস্তু যা বাংলাদেশের গাঁয়ের মানুষ খেতে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত। কিন্তু পেটের দায়ে তাও তারা নিচ্ছে। এই সব লক্ষ লক্ষ [illegible]-খাওয়া গাঁয়ের মানুষ আশা করেছিলেন যখন কোন রাজনৈতিক দলের বালাই নেই তখন গভর্নর সাহেব নতুন খাদ্যনীতিতে এমন কোন ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবেন যাতে তাঁদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার হয়। কিন্তু নতুন খাদ্যনীতিতে এঁদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, কোন প্রতিশ্রুতিও নেই। আমার বিশ্বাস ইচ্ছে থাকলে তাঁরা করতে পারতেন। যে চাল তাঁরা সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছেন সেই চালের একটা অংশ অনায়াসে গাঁয়ের জন্য বরাদ্দ রাখা যায়। উদ্দেশ্য—যদি কোন গাঁয়ে রেশনে চালের দরের চেয়ে বেশি দামে চাল বিক্রি হয় তখন আংশিক রেশনের দোকান মারফৎ সেই চাল ন্যায্যমূল্যে গাঁয়ের মানুষকে বিক্রি করে বাজারে চালের দরের ঊর্ধ্বগতি রোধ করা যাবে। যদি দেখা যায় রেশনের দরের চেয়ে কমে গাঁয়ের বাজারে চাল বিক্রি হচ্ছে তাহলে সেই চাল গাঁয়েই [illegible] রেখে বছরের শেষে শহরের [illegible] জন্য নিয়ে যাওয়া যাবে। গাঁয়ের [illegible] খাওয়া মানুষ যাতে ন্যায্যমূল্যে চা[illegible] এইরকম ধরণের কোন ব্যবস্থা [illegible] করা উচিত ছিল: [illegible] কে?

নতুন খাদ্যনীতি [illegible] করবার সময় যাঁরা [illegible] আলোচনা করে [illegible] গাঁয়ের সম্পর্কে [illegible] না [illegible] করে গাঁয়ের মানুষ [illegible]? [illegible]। [illegible] মানুষের প্রাণ [illegible] হয়েছে, এখন সরকারের নতুন খাদ্যনীতি গাঁয়ের মানুষের জন্য [illegible] নিয়ে আসে দেখাই যাক।

—অমর চট্টোপাধ্যায়
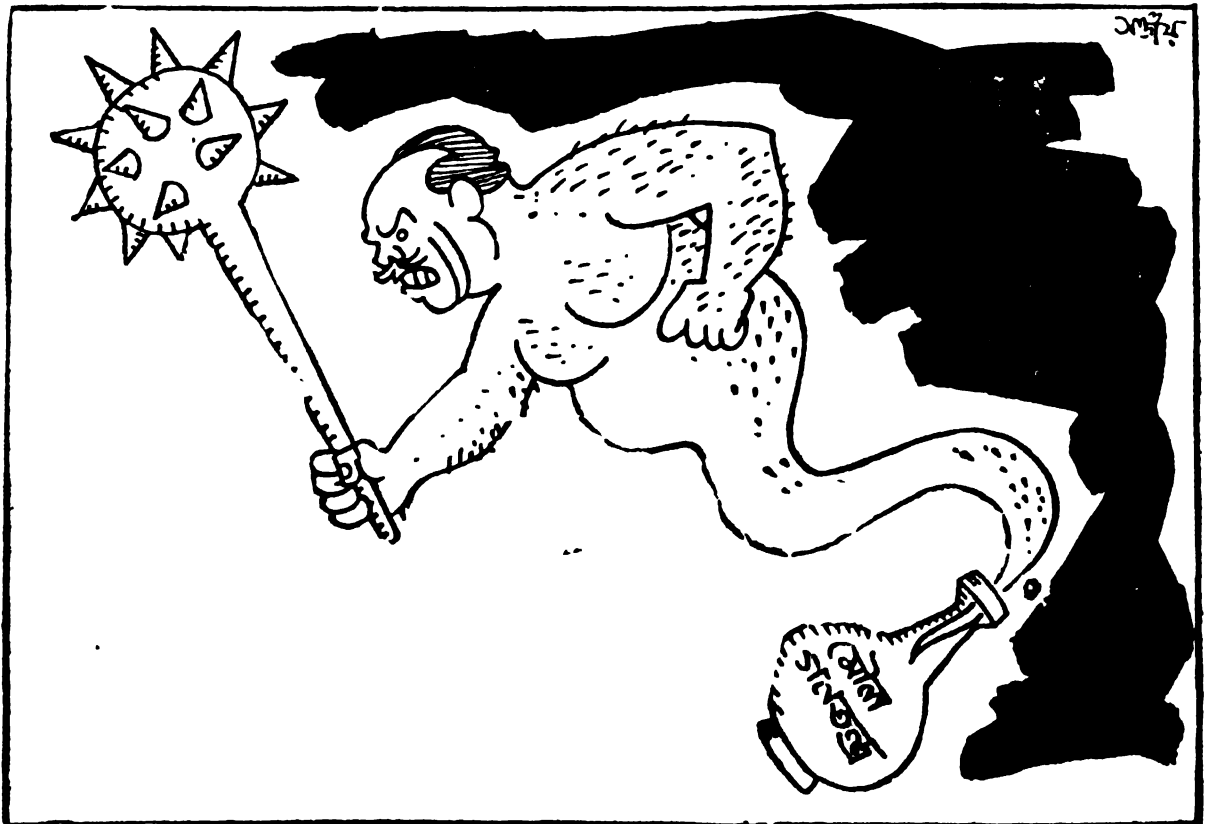
কিছুদিন আগে সাপ্তাহিক বসুমতী অফিসে বাংলাদেশের কিছু কবি, সাহিত্যিক শিল্পী একত্রিত হয়েছিলেন। সম্প্রতি উত্তর বঙ্গে ভয়াবহ বন্যায় যে তাণ্ডবলীলা হয়ে গিয়েছে, তার সর্বনাশ এখনো ঐ ভূখণ্ড থেকে মুছে যায় নি। সাপ্তাহিক বসুমতীর ডাকে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীরা তাই কয়েকদিন রাস্তায় বেরিয়েছিলেন খাদ্য, বস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহের জন্য। সংগৃহীত জিনিসপত্রের বণ্টনের কি ব্যবস্থা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যা সংগ্রহ হবে, তাদের বণ্টনের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার একটা হিসাব এইদিন সাপ্তাহিক বসুমতীর তরফ থেকে তাঁদের সামনে পেশ করা হয়।

দেখা গেল, জলপাইগুড়ি এবং উত্তর বাংলায় এখন পর্যন্ত রিলিফের কি হাল-চাল সে সম্পর্কে শিল্পী, সাহিত্যকরা অনেক খবর রাখেন। সবিতাব্রত দত্ত তাঁর পকেট থেকে একটি চিঠি বের করলেন, জলপাইগুড়ির একটি সাংস্কৃতিক সংস্থার সম্পাদক তাঁকে ঐ চিঠি লিখেছেন। চিঠিতে বিশেষ করে স্থানীয় দুর্গত শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সাহায্য দেবার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। এই সভায় আরো জানা গেল, কলকাতার এল আই-সি'র কর্মীরা নিজেদের মাসিক বেতন থেকে কিছু টাকা পৃথক করে রেখেছেন উত্তর বাংলার সহকর্মীদের সাহায্য দেবার জন্য। বাংলা দেশের শিক্ষক ও অধ্যাপক সমাজও উত্তর বাংলার সহকর্মীদের দুর্দশা লাঘবের জন্য ভিন্নভাবে চেষ্টা করছেন।

সবিতাব্রত দত্ত সমবেত শিল্পী-সাহিত্যিক বন্ধুদের কাছে তাঁর প্রস্তাবটি এই ভাবে রাখলেন: সম্ভব হলে সাপ্তাহিক বসুমতীর উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি তথা উত্তর বাংলার দুর্গত শিল্পী সাহিত্যিকদের পৃথকভাবে কিছু সাহায্য দেওয়া হোক। তিনি আরো জানালেন, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং নাট্য-সংস্থার সঙ্গেও তিনি এই বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করছেন; কিন্তু যেহেতু সাপ্তাহিক বসু-মতীর আহ্বানে শিল্পী, সাহিত্যিক, কবিরাই সবার আগে অন্ন-বস্ত্র-অর্থ সংগ্রহের জন্য রাস্তায় নেমে এসেছেন; সুতরাং দুর্গত শিল্পী সাহিত্যিকদের প্রতি এই কমিটিও যদি সামান্য যত্ন নেন, সেটা খুবই সুখের হবে।

সবিতাব্রত দত্তের এ প্রস্তাবে সমর্থন জানান নারায়ণ চৌধুরী, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু এ সম্পর্কে জনৈক সাংবাদিক বন্ধু প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, ভিন্নভাবে শিল্পী সাহিত্যিকদের সাহায্য পাঠাতে হলে একটি নতুন ফাণ্ড গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে। তাঁর এই প্রশ্নটি নিরর্থক নয়, কেন না যদিও সাপ্তাহিক বসুমতীর বন্যাত্রাণ ফাণ্ডের বেশির ভাগ টাকাই এসেছে শিল্পী সাহিত্যিকদের পথ পরিক্রমা থেকে, তবু সংগ্রহটা হয়েছে সর্বসাধারণের জন্য, কোনো বিশেষ শ্রেণী বা বৃত্তির মানুষদের জন্য নয়।

কিন্তু শিল্পী সাহিত্যিকদের জন্য একটি নতুন ফাণ্ডের ব্যবস্থা করাও তো চাট্টিখানি কথা নয়। একই সংস্থা থেকে এই একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া খুব কাজের কথাও নয়। সুতরাং একটা মীমাংসার পথ নিতে হলো। প্রস্তাব নেওয়া হয় ... সাধারণের কাজ চলেছে, সে-ভাবেই চলবে; তবে ভবিষ্যতে যে অর্থ ফাণ্ডে আসবে, তার একাংশ শিল্পী-সাহিত্যিকদের দুর্গতিমোচনের জন্য ব্যয় করা যেতে পারবে।

আর, এরকম ব্যবস্থা এমনিতেই স্বাভাবিক। যেমন ইতিমধ্যেই বসুমতীর বন্যাত্রাণ কমিটি থেকে জলপাইগুড়ির বিভিন্ন স্কুলে বই-খাতা কলম ইত্যাদির বিতরণ শুরু হয়ে গেছে। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার জন্যই এটা করা হয় নি। আসলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতেই হবে। জলপাইগুড়ি শহর নতুন করে গড়ে উঠতে এখনো অনেক সময় লাগবে, কিন্তু তা বলে শিক্ষা বা সাংস্কৃতিক জীবনকে একমুহূর্তও বিলম্বিত রেখে দেওয়া চলে না। এই ফাঁক অবিলম্বেই পূরণ করতে হবে। সেদিক থেকে শিল্পী সাহিত্যিকদের সংগৃহীত অর্থের একটি ক্ষুদ্র অংশ যদি জলপাইগুড়ির সাংস্কৃতিক জীবনকে অব্যাহত রাখার জন্য ব্যয় করা যায়, তাতে খুব বেশি অপরাধ হবে না। শুধু দেখতে হবে, কোথাও যেন উৎসাহের আধিক্যে বাড়াবাড়ি না করা হয়; যেন শিল্পী ও সাহিত্যিকরাই জলপাইগুড়ির একমাত্র দুর্গত শ্রেণী এবং শুধু তাঁদের প্রতিই এখানকার শিল্পী ও সাহিত্যিকদের কর্তব্য

উত্তরবঙ্গে ত্রাণকার্য সম্পর্কে আলোচনারত কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও সাংবাদিকবৃন্দ

রয়েছে, এমন একটি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি না করা হয়।

এই প্রসঙ্গে আমার আরো কথা মনে হচ্ছে; যা ঐদিন শিল্পী-সাহিত্যিকদের সভায় আলোচিত হয় নি। শুধু কি জলপাইগুড়ি বা কুচবিহারের প্রতি আমাদের কর্তব্য সীমাবদ্ধ থাকবে; অথবা সমগ্র উত্তর বাংলায় এবং মেদিনীপুর প্রভৃতি অন্যান্য দুর্গত এলাকায় আমাদের সাহায্য পৌঁছে দেবার কর্তব্য রয়েছে। সাপ্তাহিক বসুমতী বন্যাত্রাণ কমিটির সাহায্য এখন পর্যন্ত জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলায় পৌঁচেছে। এর বেশি আর কোথাও সাহায্য পাঠাবার মত অর্থ বা বস্ত্র কয়েকদিন রাস্তায় ঘুরেও শিল্পী ও সাহিত্যিকরা সংগ্রহ করতে পারেন নি। কলকাতার ও আশেপাশের বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা, এমন কি ব্যক্তিগত-ভাবে কেউ কেউ, টাকা-পয়সা কাপড়-চোপড় বসুমতী অফিসে পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছেন। তবু সব মিলিয়ে এই সংগ্রহ আর কতটুকু? যেসব সংস্থা তুলনায় অনেক বেশি কেউ বা লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করছেন, তাঁরাই কি পেরেছেন উত্তর বাংলাকে ছাড়িয়ে বাংলা দেশের সমস্ত দুর্গত এলাকায় সাহায্য নিয়ে যেতে?

সংগে এই বিষয়ে আমরা কি করতে পারি? বাংলা দেশের শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক এই সমস্ত বুদ্ধিজীবীরা একত্র হয়ে চিন্তা করলে, পথ খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন হবে না। আমরা অবশ্যই আরো কয়েক বারবার কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে পারি, চ্যারিটি শো থেকে টাকা তুলতে পারি, টিকেট কেটে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে প্রভৃতি প্রবীণ কবিদের কবিতা পাঠের ব্যবস্থা করে তা থেকে কিছু টাকা তুলতে পারি। যাদের পকেটে একাধিকবার আমরা হাত দিয়েছি, আরেকবার তাদের কাছে কিছু ত্যাগ স্বীকারের জন্য আবেদন জানাতে পারি।

কিন্তু তাতে সমস্যা মিটবে না। সমস্যা মিটবে, যদি বাংলা দেশের বুদ্ধি-জীবীরা অন্য রকম আন্দোলন সুরু করেন। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবাংলা তথা ভারত সরকার মেদিনীপুর জেলা থেকে তাদের রিলিফ সরিয়ে আনছেন। পশ্চিম দিনাজপুর বা মালদহের প্রতি কোনোদিনই তাঁদের কোনো কর্তব্য ছিল না, আজও নেই। বাংলা দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক-দের শুধু এই দাবি নিয়েই একদিন রাস্তায় বেরুতে হবে, যে মানুষের দুর্গতিকে নিয়ে সরকারী ছেলেখেলা আর আমরা সহ্য করবো না। বাংলা দেশে আজ বন্যায় যে ভয়ঙ্কর মার প্রকট হয়েছে, তা থেকে আত্মরক্ষা করার সামর্থ্য এই রাজ্যের নেই। কেন্দ্রীয় সরকার অন্য নানা কাজে, এমন কি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রমোদ ভবনের জন্যও প্রতি বছর কয়েক কোটি টাকা খরচ করেন। আজ বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ লোককে ভিক্ষা করার অবস্থা থেকে আবার মানুষের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব তাঁরা পালন করুন।

শিল্পী-সাহিত্যিকদের আরো রাস্তায় বেরিয়ে ধ্বনি দিতে হবে যে, বারবার বন্যার জলে বাড়ি-ঘর সুদ্ধ ভেসে যাওয়ার ব্যাপারটাকে বাংলা দেশের মানুষ পছন্দ করে না। এমনিতেই বন্যার এবং খরার ফলে প্রতি বছর কলকাতা শহরে হাজার হাজার দুর্গতের ভিড় হয়। অন্য কোনো বাঁচবার পথ না থাকাতে তারা শেষ পর্যন্ত ভিক্ষাজীবী অথবা সমাজবিরোধীতে পরিণত হয়। যাদের ভিক্ষা করার বা ভ্রষ্ট জীবনযাপনের কাজটিতে কোনক্রমেই দক্ষতা আসে না, তারা ক্ষুধার জ্বালায়, শীতে এই কলকাতা শহরের ফুটপাথে, রাস্তায় মরে পড়ে থাকে।

একটা গোটা দেশের এই অসহায়, ভিক্ষুক অবস্থা এ প্রাণ চোখে দেখা যায় না। বাংলা দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকরা তো মানবিকতার মুখ চেয়ে বহুবার রাস্তায় নেমেছেন। ভিয়েত-নামের বিরুদ্ধে মার্কিনী বর্বরতার প্রতি-বাদ করেছেন তাঁরা। প্রফুল্ল ঘোষের ফ্যাসিস্ট রাজত্বে অমানুষিকতার প্রতি-বাদে তাঁরা শুধু রাস্তায় বেরোন নি, কারাবরণ পর্যন্ত করেছেন। আজ জল-পাইগুড়ির ভয়াবহ সর্বনাশের সময় আবার তাঁদের আমরা রাস্তার সঙ্গী পেয়েছি।

কিন্তু আসল বন্যার প্রতিরোধে, সমস্ত দেশটিকেই ভিক্ষুক করে ফেলার অমানুষী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে, তাঁরা এক-বার কলকাতার রাস্তায় মিছিল করে নেমে আসুন। তাঁরা এই দাবি তুলুন আমরা ভদ্রভাবে, মানুষের মত বাঁচতে চাই।

রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষার অন্নই শুধু সংগ্রহ করা নয়, যাতে কোনোদিন ভিক্ষা চেয়ে রাস্তায় না নেমে আসতে হয়, তেমন কোনো সুস্থ রাজনীতি, অর্থনীতি, এবং সমাজব্যবস্থার জন্য তাঁরা দাবি তুলুন। রাস্তায় নেমে এসেই তাঁরা এক-বার এই দেশের কয়েক কোটি ক্ষুধার্ত, নগ্ন, বঞ্চিত মানুষের কাঁধে কাঁধ দিয়ে দাঁড়ান।

তবেই তো সত্যিকারের সর্বনাশকে রোখা যাবে। তবেই তো আমরা মানুষের পৃথিবী গড়তে পারবো।

ভারত দর্শন

নেহরুজী এবং নেহরু-উত্তর ভারতবর্ষ
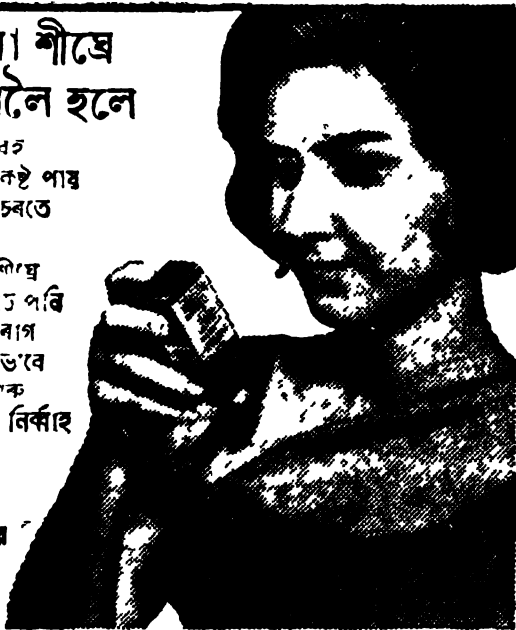
চোদ্দই নভেম্বর। আজ থেকে উন-আশি বছর আগে ভারতের মাটিতে একটি স্বপ্নের জন্ম হয়েছিল। সে স্বপ্ন জওহরলাল নেহরু। সে স্বপ্ন ভূস্বামী-প্রধান ভারতে গণতন্ত্রের স্বপ্ন। কিন্তু জওহরলালের আকৃতির অবয়বে যে স্বপ্ন ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য বিভিন্ন মাধ্যম খুঁজে ফিরেছে দীর্ঘ সময়কাল ধরে ভারতের আত্মা যে স্বপ্নে নতুন প্রাণের সাড়া পেয়ে নবজাগৃতির আলোকরশ্মি দর্শনের জন্য হয়ে উঠেছে উদগ্রীব, অকস্মাৎ নেহরু-বিয়োগের অব্যবহিত পরবর্তীকালেই সে স্বপ্নের কবর খোঁড়ার আয়োজন শুরু করে দিল নবাসপদলেহী [illegible] লোভী-রোমশ হাতের দানবীয় আঘাত। ভেঙে গেল স্বপ্নের আবেশ। কতকগুলি কামনার কালো ডানায় ভারতের মনের আকাশ অন্ধ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হয়ে এলো। প্রতিভাহীনের হাতে পড়ল ভারত-প্রতিমাকে সাজানোর দায়িত্ব। দুঃখের বিষয়, দায়িত্ব আগ বাড়িয়ে [illegible] করার মধ্যে দায়িত্ব পালনের কিঞ্চিন্মাত্র সদিচ্ছাও ছিল না এঁদের। এঁরা সাজানোর দায়িত্বে ইস্তফা দিয়ে সমাহৃত সব সম্পদে নিজেদেরই সাজাতে ব্যগ্র ও ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

গ্রাম গঞ্জ, ক্ষেত খামার, নদী পাহাড়ের বুক আবার হাহাকারের বেদনায় মুখর হয়ে উঠল। সংবেদনশীল নাগরিকের চেতনাবিদ্ধ বেদনা অস্ফুটে পুনশ্চ জানতে চাইল : কেন গো মা তোর মলিন বদন কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ।

[illegible] চিরদুঃখিনী [illegible] মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। এখন ভাগ্যের [illegible] সবাই [illegible]।

[illegible]

নেহরুজীর [illegible] সঙ্গে সঙ্গেই [illegible] চূর্ণ হয়ে গেল। [illegible] করছে ছদ্মবেশী [illegible] দক্ষিণপন্থী [illegible] ভরসা হয় না।

রাজ্যপাল সম্মেলন

[illegible] রাজ্যপাল সম্মেলনে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনাকালে দেশের চরমপন্থী [illegible] সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বটে কিন্তু সমস্যার বাস্তব দিকটিতে দৃকপাতও করেন নি। উল্টে যেখানে চরমপন্থার [illegible] বিশেষ নেই নজর সেখানেই [illegible] রেখেছে রাজ্যপাল সম্মেলন।

রাজ্যপাল সম্মেলনে চরমপন্থীদের সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ [illegible] কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালদ্বয়ের [illegible] থেকেও। ব্যাপারটি লক্ষণীয়। [illegible] বামপন্থী [illegible] কিছু [illegible] সত্য কথা। কিন্তু [illegible] কি সেজন্যই [illegible] কিন্তু [illegible] প্রকৃত চরমপন্থীদের কার্যকলাপের যে সমস্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়ে থাকে তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালার

নেহরু (নৈনিতাল জেলে বন্দী অবস্থায় তোলা ছবি)

উল্লেখ তো চোখে পড়ে না। কিন্তু সমাজবিরোধী ব্যক্তির গুণ্ডামী শিথিল আইন-শৃঙ্খলার ফাঁক দিয়ে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য বিভীষিকার রাজ্য কায়েম করতে চলেছে। কিন্তু চরমপন্থী উত্থান বলতে যা বোঝায়, তার নমুনা সেখানে কৈ। এসব রাজ্যে বাল ঠাকরে কিম্বা আর এস এস অথবা অমুক তমুক সেনারা যে কস্মিনকালেও করে খেতে পারবেন না, তার কারণ উল্লিখিত রাজ্যগুলিতে মানুষ কিঞ্চিৎ রাজনৈতিক সচেতনতা খুব অল্প সময়েই অর্জন করেছে। দুঃখের বিষয় রাজ্যপাল সম্মেলনেও সত্যের যথার্থ যাচাই বিচার্য বিষয় বলে গণ্য করা হয় নি। যদিচ সেখানে বিভিন্ন রাজ্যপাল, স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রপতি ও লেঃ গভর্নর উপস্থিত ছিলেন।

রাজ্যপাল সম্মেলনের ফলশ্রুতি (প্রথম দিনের) লক্ষ্য করে অই হতাশ হতেই হল। এবং মনে পড়ল আজ নেহরুজী আমাদের মধ্যে নেই। আমরা রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি হারিয়ে বসে ফক্কড় রাজনীতি করছি: চরিত্রে যা দুর্বল এবং যার কবরখানায় একমাত্র ফ্যাসিজমের কাঁটাগাছই শাখা বিস্তারের সুযোগ পাবে।

চোদ্দই নভেম্বরের স্বপ্ন দ্রুতভাবে চিরন্তর বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। সম্প্রতিক রাজ্যপাল সম্মেলনও তারই তার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ।

গণতন্ত্র সহিষ্ণুতার পরীক্ষক, গণতন্ত্র শুভবুদ্ধির জাগ্রত প্রহরী। সহিষ্ণুতা এবং শুভবুদ্ধির সমাধির ওপর গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। দুর্ভাগ্য বিষয় ভারতবর্ষে ঐ দুটি জিনিষই এখন মুমূর্ষু। সুতরাং নেহরু স্মৃতি আজ মৃত-আত্মীয়ের [illegible] প্রতিকৃতির মত আবেদনহীন, অনুষ্ঠান থেকে মঞ্চে সাজিয়ে-রাখা ছাড়া নেহরুজীর স্মৃতির ভিন্নতর আবেদন আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। চোদ্দই নভেম্বর এই কঠোর সত্য স্বীকার না করলে নেহরুর বিকৃত ব্যাখ্যা হয়। সে চেষ্টায় বিরত রইলাম।

আশ্চর্যের কথা এই যে, নেহরু-বিয়োগের পরও 'ইলেকশন' হল ও হচ্ছে, কোন মত যাই হোক আজও 'এনকোয়ারী কমিশন' নামক একটি ব্যাপার হামেশাই বসানো হয়ে থাকে।

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিশন বর্জন

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বাধীন তদন্ত কমিশন নিরপেক্ষ হতে পারে না। এই দৃঢ় ধারণা-বশত প্রস্তাবিত তদন্ত কমিশন বর্জন করারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠন। নিরপেক্ষ কোনও তদন্ত কমিশন নিযুক্ত হলে অবশ্যই তাঁরা সহযোগিতা করবেন বলেও জানান।

ডঃ ত্রিগুণা সেন

বস্তুতপক্ষে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন শেষ পর্যন্ত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাবলীর মীমাংসা যে পথে করতে চাইলেন তা খুবই অপ্রত্যাশিত এবং অভাবনীয়। যে উপাচার্যের বিরুদ্ধে ছাত্রদের অভিযোগ সেই উপাচার্য ডঃ যোশীর সুপারিশই গ্রহণ করলেন ন্যায়পরায়ণ হিসেবে সর্বজন শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষাবিদ ডঃ ত্রিগুণা সেন। অথচ ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত সংবাদাদিতে ডঃ যোশীর পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের উল্লেখ একাধিকবার নিশ্চয়ই তাঁর চোখে পড়েছে। তিনিও শুনেছেন ছাত্র-ছাত্রীদের মূল অভিযোগ ডঃ যোশীর পক্ষপাতদুষ্ট আচরণকে কেন্দ্র করেই পরিস্থিতি বিস্তার করছে।

ডঃ ত্রিগুণা সেন নিজেও বিশেষভাবে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। সেখানে উপাচার্যের কার্যভার গ্রহণ করে তিনিই এই শিক্ষামন্দির থেকে সমস্ত কলুষ মালিন্য সম্মার্জিত করে এখানে পুনশ্চ পবিত্র শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন। সেজন্য তাঁকে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হারাতে চায় নি। ডঃ সেনের পর পুনরায় হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলমাল শুরু হল এবং তা চরমে উঠল পুলিশী হস্তক্ষেপে, ছাত্র বিতাড়নে এবং ছাত্রী ধর্ষণের লজ্জাকর ইতিহাসের মধ্য দিয়েই। তথাচ ডঃ সেন উপাচার্য ডঃ যোশীকে নির্ভরশীল ব্যক্তিরূপে গণ্য করেন বলে মৌখিক এবং কার্যত স্বীকৃতি দান করলেন। এই ঘটনায় সমগ্র পরিস্থিতি যেন আরও জটিল আকার ধারণ করল।

ছাত্রনেতার বিবৃতি

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পরিষদের বিতাড়িত সভাপতিও এক সাংবাদিক সম্মেলনে ডঃ ত্রিগুণা সেন কর্তৃক উল্লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন: যিনি বর্তমান পরিস্থিতির হাড়-হদ্দ নিজেই জানেন সেই শিক্ষামন্ত্রী ডঃ সেন প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে এজাতীয় নীরবতা কেন গ্রহণ করলেন সেটাই আশ্চর্যের কথা।

ছাত্রনেতা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সমাজবিরোধী ও আর এস এস বাহিনীর সংগঠিত হাত বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করেছে।

তিনি বলেন: যে উপাচার্য নিজেই গোলমালের একটি পক্ষ, তাঁরই পরামর্শক্রমে গঠিত কোন তদন্ত কমিশন সকল অবস্থাতেই বর্জন করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক স্বয়ং রাষ্ট্রপতি। একমাত্র তিনি কোন তদন্ত করলে তা ছাত্রদের পক্ষে গ্রহণীয় হবে। ছাত্রনেতা অবিলম্বে বিতাড়িত ছাত্রদের পুনর্গ্রহণের দাবি জানিয়ে বলেছেন: উপাচার্য নিজে আর এস এস দমন-পীড়নের সমর্থক এবং রক্ষক।

উপাচার্যের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ এই যে, তিনি ছাত্র পরিষদে হস্তক্ষেপ করেছেন বিশেষ গোষ্ঠীর রক্ষকরূপে, শিক্ষামন্দিরের কর্তারূপে নয়।

এই সমুদয় অভিযোগের পরেও উপাচার্যের পরামর্শ মতো তদন্ত কমিশন গঠিত ও পরিচালিত হলে তা যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি আনয়নের সহায়ক হবে না শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেনও তা জানেন। তথাপি বিস্ময়ের বিষয় এই যে তিনি সমগ্র ব্যাপারটিকে কেবলমাত্র শৃঙ্খলার প্রশ্নরূপে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। সমস্যার মূলে যেতে নারাজ।

এই রেওয়াজটা নিঃসন্দেহে ক্ষমতাসীন সরকারী রেওয়াজ; কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী ডঃ সেনের কাছে অপামর জনসাধারণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা যেহেতু অন্য রকম দাবিও তাই ভিন্নতর। এই সরকারী ঢঙ ডঃ সেনের বিচারেও চলবে, এটা যেন সকলের বিশ্বাসের ওপর এক প্রচণ্ড আঘাত। তাঁর কাছে সাধারণের দাবিই ভিন্নতর। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবি তো আরও বেশি।

রাওয়ালপিণ্ডিতে ভুট্টো-সমর্থক ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষের সময় এই দোতলা বাসে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়

পাকিস্তান ঃ

গত সপ্তাহে এ কলমে আমরা যে-আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম, শেষ পর্যন্ত তাই সত্য প্রমাণিত হলো। জঙ্গী শাসক আয়ুব খাঁ তাঁর পয়লা নম্বরের শত্রু প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোকে গ্রেপ্তার করেছেন। ভুট্টোর সঙ্গে বন্দী করা হয়েছে খান আবদুল গফুর খাঁ-র পুত্র এবং ন্যাশনাল আওয়ামী দলের প্রেসিডেন্ট ওয়ালি খাঁ প্রমুখ আরো ১৩ জন রাজনৈতিক নেতাকে। এর পরে এই দলের আর একজন নেতা মহবুব উল হক, মুক্তার আজি কুরেশী, হামিদ কুরেশী ইত্যাদি নেতাদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এঁদের সকলকেই পাকিস্তান রক্ষা আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যার অর্থ হলো বিনা বিচারে তাঁদের অনির্দিষ্টকালের জন্য আটকে রাখা যাবে এবং কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ আনারও প্রয়োজন নেই। অবশ্য ভুট্টোর বিরুদ্ধে জালিয়াতি, সরকারী তহবিলের অপব্যবহার, প্রবঞ্চনা, সরকারী গোপন তথ্য ফাঁস করা ইত্যাদি ১৬ দফা অভিযোগ আনা হয়েছে। শুধু তাই নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর ফোরেল মহম্মদ মুসা আবার কর্তার চেয়েও একধাপ এগিয়ে গিয়ে হুঁশিয়ারী দিয়েছেন যে, ধৃত ব্যক্তিদের মুক্তি বা তাঁদের সমর্থনে কোন আন্দোলনের চেষ্টা করা হলে তা কঠোর হস্তে দমন করা হবে।

আয়ুবশাহীতে শ্রীমান ভুট্টোর শ্রীঘর বাস যে অবধারিত তা অনুমান করতে কাউকে বেগ পেতে হয় নি। এক সপ্তাহ ধরেই ভুট্টোকে নিয়ে করাচী, রাওয়ালপিণ্ডি, পেশোয়ার ইত্যাদি শহরে প্রচন্ড ছাত্র বিক্ষোভ চলছিলো যা দমন করতে গিয়ে পুলিশকে গুলী চালিয়ে চারজন ছাত্রকে হত্যা করতে হয়েছে, সেনাবাহিনী তলব করতে হয়েছে। তারপর তিনদিন আগে যখন পেশোয়ারে প্রেসিডেন্ট আয়ুবের প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয় তখন তার সঙ্গে ভুট্টোকে জড়াবার লোভ যে পাক সরকার সম্বরণ করতে পারবেন না, তাও আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। আততায়ী পেশোয়ারের পলিটেকনিকের ২২ বছরের ছাত্র হাজি মহম্মদ ইমামকে অবশ্য সঙ্গে-সঙ্গেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু তার জবানীতে সে হত্যার ষড়যন্ত্রে ভুট্টোর হাত আছে বলে স্বীকার করবে বলে মনে হয় না।

সরকারী নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ভুট্টো এবং ধৃত অন্য রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তির দাবিতে পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ ইতিমধ্যে একাধিক প্রাদেশিক শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের আইনজীবীরাও ভুট্টো এবং অন্যান্য নেতাদের মুক্তি অথবা বিচারের দাবি জানিয়ে বিবৃতি প্রচার করেছেন। বেগম ভুট্টো এবং অন্য কয়েকজন ভুট্টো ও তাঁর সহকর্মীদের গ্রেপ্তারকে চ্যালেঞ্জ করে পশ্চিম পাকিস্তান হাইকোর্টে রিট আবেদন করেছেন। আগামী ২০শে ডিসেম্বর তার শুনানী আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়। ইতিমধ্যে সরকার ব্যাপকভাবে ধরপাকড় করছেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে একটা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছেন।

পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং প্রকৃত গণতন্ত্র এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বলতে যা বোঝায় তা এতদিন পূর্ব পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং এখানকার বাঙালী ছাত্ররা এবং বিরোধী দলের নেতারাই তার নেতৃত্ব দিয়েছেন। পশ্চিম পাকিস্তানে আয়ুবশাহী নিরুপদ্রবই ছিল। কিন্তু এবার সেই সুপ্ত পশ্চিম পাকিস্তানও বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে এবং সেই গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার সঙ্কল্পেই চারজন তরুণ বুকের রক্তে সবুজ মাটি রাঙিয়ে দিয়েছেন, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছেন। দশ বছর আগে ১৯৫৮ সালে জেনারেল আয়ুব খাঁ পাকিস্তানের মসনদে

বসেন এবং তাঁর শাসনের দশ বছর পূর্তিকে তিনি গালভরা 'প্রগতির এক দশক' নাম দিয়ে উৎসব উদ্‌যাপন করছেন। কিন্তু তাঁর বাজত্বে দেশের প্রগতি হচ্ছে বলে তিনি যতই আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চেষ্টা করুন না কেন, এ কথাও ঠিক যে, নতুন করে দুঃস্বপ্নও তাঁর শুরু হয়েছে। এতদিন পূর্ব বাহুই তাঁর দিকে উদ্যত মুষ্টি দেখাচ্ছিল, এবার পশ্চিম বাহুও উত্তোলিত হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের গণ আন্দোলনকে মিথ্যা আগরতলা ষড়যন্ত্রের জালে ফেলে তিনি কণ্ঠরোধ করতে প্রয়াস পাচ্ছেন, পশ্চিম শাখার আন্দোলনকেও তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টার সঙ্গে জড়িয়ে অংকুরে বিনাশ করতে তিনি সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম বাহু যেদিন একযোগে তাঁকে সাঁড়াশির চাপ দেবে, সেদিন তিনি আত্মরক্ষা করতে পারবেন তো?

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ঃ

প্রেসিডেন্ট থিউ তাঁর স্বপ্নচূড়া থেকে এখনো নেমে আসতে রাজী হচ্ছেন না। ফলে মুস্কিলে পড়েছেন বেচারা জনসন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসন গত ৩১শে অক্টোবর ঘোষণা করেছিলেন যে, পরের দিন থেকেই আমেরিকা উত্তর ভিয়েৎনামে বোমাবর্ষণ বন্ধ করবে এবং ৬ই নভেম্বর থেকে সম্প্রসারিত প্যারিস শান্তি বৈঠক বসবে যেখানে অংশ নেবেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, উত্তর ভিয়েৎনাম, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকার এবং জাতীয় মুক্তিফৌজের প্রতিনিধিরা। কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট থিউ কিছুতেই মুক্তিফৌজের সংগে এক টেবিলে বসতে রাজী নন। ফলে জনসনের প্রতিশ্রুতি, তাঁর জবান রাখাই দায় হয়ে উঠেছে।

প্রেসিডেন্ট থিউ আবার গত ৮ তারিখে একটা উদ্ভট পাল্টা প্রস্তাবও দিয়েছিলেন ঃ দ্বিপাক্ষিক শান্তি আলোচনা যার একপক্ষে থাকবেন দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারের প্রতিনিধি মাথা হিসেবে এবং অন্যপক্ষে উত্তর ভিয়েৎনাম প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে। দু'দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মুক্তিফৌজ প্রধানদের সহযোগী হয়ে বৈঠকে উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার প্রধান দু'পক্ষেরই থাকবে। কিন্তু এ প্রস্তাব হ্যানয়, ওয়াশিংটন এবং মুক্তিফৌজের কেউ গ্রহণ তো করেন-ই নি, বরং থিউকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন। থিউ-র এই অসহযোগিতা বা অনমনীয় মনোভাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে আর তার জন্য প্রতিরক্ষাসচিব ক্লিফোর্ড বলেছেন যে, পরিস্থিতির উন্নতি না হলে সায়গনকে বাদ দিয়েই ওয়াশিংটন হ্যানয়ের সংগে শান্তি আলোচনা চালাতে বাধ্য হবে। কিন্তু হ্যানয় যে মুক্তিফৌজকে বাদ দিয়ে ওয়াশিংটনের সংগে আলোচনা করতে রাজী নয়, তা ও স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট থিউ যাতে বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করে নেন তার জন্যে তাঁর ওপর চাপের মাত্রা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সায়গনস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত এলসওয়ার্থ বাংকার তো প্রায় রোজ একবার করে থিউ-র সংগে আলোচনায় বসছেন, তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন। এখানকার সংগ্রামী বৌদ্ধদের নেতা রেভারেন্ড হো গিয়াকও এক বিবৃতি দিয়ে বলেছেন যে, ভিয়েৎনামীরা চায় প্রতি সপ্তাহে দু'-ভিয়েৎনামে মিলিয়ে যেখানে গড়ে পাঁচ হাজার লোক প্রাণ হারাচ্ছে সে-যুদ্ধের অবসান। শান্তি স্থাপনের জন্যে তাই তিনি প্রেসিডেন্ট থিউ-র কাছে আবেদন জানিয়েছেন যে, তিনি যেন অবিলম্বে প্যারিস শান্তি বৈঠকে প্রতিনিধি পাঠান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্বশীল এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরা দাবি জানিয়েছেন যেন দরকার হলে থিউকে বাদ দিয়েই সম্প্রসারিত শান্তি আলোচনা শুরু করা হয়। ওয়াল স্ট্রীটের একটা নামকরা সাময়িকপত্রে এ-প্রস্তাবও করা হয়েছে যে, প্রেসিডেন্ট থিউ যদি শান্তি বৈঠকে প্রতিনিধি পাঠাতে এখনো অসম্মত হন তবে তাঁকে সরিয়ে দিয়ে যেন অন্য কোন নেতাকে প্রেসিডেন্টের গদিতে বসানো হয়। সায়গনেও এ-গুজব প্রবল যে সি আই-এ আর কয়েকদিন পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রেসিডেন্ট থিউ-র অপসারণের ব্যবস্থা করবে।

থিউ কার ভরসায় এ গোঁয়ার্তুমি করতে সাহসী হচ্ছেন তা উনিই জানেন। তাঁর সমর্থকদের মধ্যে রয়েছে সেনাবাহিনী এবং ক্যাথলিকরা। ভাবী প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের ওপর তিনি এতদিন ভরসা করেছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি তিনিও জানিয়ে দিয়েছেন যে ভিয়েৎনামের প্রশ্নে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জনসন যে নীতি গ্রহণ করেছেন তিনি তা পুরোপুরি সমর্থন করেন। এ-অবস্থায় প্রেসিডেন্ট থিউ প্যারিসে প্রতিনিধি না পাঠিয়ে গদিই বা বাঁচান কী করে, আর তাঁর প্রাণের নিরাপত্তাই বা কোথায়? অবশ্য তিনি আবার নাকি একটি শর্ত দিয়েছেন যে, প্যারিস বৈঠকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ভিয়েৎ কংদের নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাব যদি বাতিল করা হয়, তবে তিনি সম্প্রসারিত শান্তি বৈঠকে প্রতিনিধি পাঠাতে পারেন। কিন্তু সে শর্ত হ্যানয় কিম্বা মুক্তিফৌজ কখনই মানতে রাজী হবে না, কারণ একটা অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনই শান্তি বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য। তবে অবশ্য নির্বাচনে যদি থিউ-র দল হেরে ভূত হয়, তবে কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রশ্নই উঠবে না। তবে মনে হয়, এখানে শান্তি বজায় রাখার জন্য আপাতত কোয়ালিশন সরকারই দু'পক্ষের ইজ্জৎ রক্ষা করতে পারে। পরের কথা পরে হবে, আপাতত যেটা করা দরকার তা হলো, সম্প্রসারিত শান্তি বৈঠক শুরু করে দেওয়া অর্থাৎ কালবিলম্ব না করে প্যারিসে সায়গনের প্রতিনিধি পাঠানো।

পশ্চিম এশিয়া ঃ

এখানকার আকাশ গত ক'দিনে আরো কালি মেখেছে। যদিও আরব-ইস্রায়েল উভয় পক্ষের মুখেই শান্তির ললিতবাণীর কোনো কামাই নেই, কিন্তু কাজে এখানে-ওখানে গুলী বিনিময় হচ্ছে আকছার। আরব পক্ষের অভিযোগ ঃ ইস্রায়েল আমেরিকার কাছ থেকে নতুন করে জেট বিমান কিনছে, ফ্রান্সের কাছ থেকে মিরাজ বিমান কিনছে। ইস্রায়েলের পাল্টা অভিযোগ আরবরা পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবানের শান্তি প্রস্তাবে এখনো সাড়া দেয় নি। পরিস্থিতি যখন রীতিমত ঘোরালো হয়ে উঠেছে তখন সোভিয়েট সরকার প্রেসিডেন্ট নাসেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তিনি যেন সহসা এমন কিছু করে না বসেন যাতে আবার যুদ্ধ বেধে যেতে পারে এবং সে-যুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়াকে জড়িয়ে পড়তে হয়।

কায়রোর আধা সরকারী সংবাদপত্র আল-আহরাম এই মর্মে এক সংবাদ পরিবেশন করেছে যে, ফ্রান্স ইস্রায়েলকে বেশ কিছু মিরাজ বিমান সাহায্য দিয়েছে।

বিমানগুলি যন্ত্রাংশ বলে গোপনপথে পাঠানো হয়েছে এবং সরাসরি ফ্রান্স থেকে আসে নি, এসেছে তৃতীয় কোন রাষ্ট্রের মাধ্যমে। ফ্রান্সের শিল্পপতিরা নাকি অস্ত্র প্রেরণের ওপর থেকে নিষেধ তুলে দাও বলে গেল যে-নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন তাতে খুবই অসন্তুষ্ট।

এদিকে জর্ডানের একজন সামরিক মুখপাত্র অভিযোগ করেছেন যে, দুটো ইস্রায়েলী জঙ্গী বিমান থেকে জর্ডান নদীর পূর্ব তীরে জল সরোবরের কাছে নাপাম বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে। জর্ডানের সংগে ইস্রায়েলের গুলীগোলা-বর্ষণ তো অবিরাম চলছেই। এমন কি ইস্রায়েলী সৈন্যরা একদিন গভীর রাতের অন্ধকারে জর্ডান নদীর পূর্ব তীর অতিক্রম করার চেষ্টাও করেছিল কিন্তু জর্ডানী সৈন্যরা তাদের মার দিয়ে হটিয়ে দেয়।

সংযুক্ত আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদ রিয়াদ অভিযোগ করেছেন যে, ইস্রায়েলকে নতুন করে ৫০খানা ফ্যান্টম জেট বিমান দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমেরিকা আরব-ইস্রায়েল বিরোধকে জটিলতর করে তুলছে। রিয়াদ একথাও বলেছেন যে, মার্কিন প্রশাসনের বহু উচ্চপদে প্রভাবশালী ইহুদী রয়েছেন এবং তাঁরাই প্রশাসনকে প্রভাবান্বিত করে আরব-বিরোধী ধুয়ো তুলেছেন।

রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী-জেনারেল উ থান্টের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি ডঃ গুনার জারিং-এর সংগে আরব-ইস্রায়েল পক্ষের শান্তি বৈঠকটি কার্যত বানচাল হয়ে গেছে, কারণ আরব-জর্ডানের প্রতিনিধিরাই বৈঠকের আগেই নিউ ইয়র্ক ত্যাগ করে স্বদেশে ফিরে এসেছেন। যদিও ইস্রায়েল বলতে চেষ্টা করছে যে, 'জারিং মিশন মরেও নি, তাকে কবরও দেওয়া হয় নি', কার্যত ডঃ জারিং-এর প্রয়োজনীয়তা আপাতত ফুরিয়েছে।

ইস্রায়েলী প্রধানমন্ত্রী লেভি এশকল বড় গলা করে একদিন বলেছিলেন শান্তি আলোচনার জন্যে তিনি "যে-কোনো জায়গায়, যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো পর্যায়ে" আলোচনা করতে রাজী, কিন্তু কার্যত শান্তি আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করতে তিনি সহযোগিতা করছেন কি? বরঞ্চ তিনি আলোচনায় বসার আগে নিত্য-নতুন শর্ত দিচ্ছেন যা মেনে নেওয়া আরব-দের পক্ষে অসম্ভব। গত বছরের ২২শে নভেম্বর রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ এক প্রস্তাবে ইস্রায়েলকে যুদ্ধে অর্জিত আরব-ভূমি ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাব করেছিল, কিন্তু সে প্রস্তাব ইস্রায়েল প্রত্যাখ্যান করে কার্যত রাষ্ট্রসংঘেরই গুরুতর অমর্যাদা ঘটিয়েছেন। এখন আবার লেভি এশকোল বলছেন যে, আকাবা উপসাগরের মুখে গুরুত্বপূর্ণ তিরান প্রণালীর ওপর অধিকার বা নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্যে শরম্ এল শেখের ওপর ইস্রায়েলের দখল-দারী অব্যাহত থাকবে। শান্তির শর্ত হিসেবে ইস্রায়েল আগেই বলেছিল, সুয়েজ খালে তার অবাধ চলাফেরা এবং তিরান প্রণালীকে রক্ষা করার অধিকার তাকে দিতে হবে। তাছাড়া অধিকৃত প্রাচীন জেরুজালেম শহরটির ওপর অধিকার ত্যাগ করতেও ইস্রায়েল রাজী নয়। জর্ডানের পশ্চিম তীরে যে হাজার হাজার আরব উদ্বাস্তু রয়েছে তাদের ফিরে আসার অনুমতি দেবার জন্যে উ থান্ট ইস্রায়েলী সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন, কিন্তু এশকল সে-আবেদনে কর্ণপাত করেন নি।

পশ্চিম এশিয়ায় যে একটা সঙ্কট ঘনিয়ে উঠছে সে কথা বলাই বাহুল্য। কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতাও একথা বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে, পশ্চিম ইয়োরোপে নয়, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবে পশ্চিম এশিয়ারই মাটিতে। কারণ একদিকে যেমন আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী ইত্যাদি পশ্চিমী দেশ ইস্রায়েলী উচ্চা-কাঙ্ক্ষার মদত দিচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি পূর্ব দিক থেকে সোভিয়েট রাশিয়া সংযুক্ত আরব, সিরিয়াকে দরাজ হাতে সামরিক সাহায্য দিয়ে চলেছে। ভূমধ্যসাগরে সোভিয়েট নৌবহর রাখার একটা উদ্দেশ্যও যে আরব দেশগুলির ওপর পশ্চিম দুনিয়ার সহায়-তায় ইস্রায়েলী আক্রমণ বানচাল করে দেওয়া তা সহজেই বোঝা যায় না কি?

ব্রাসেলস :

সঙ্কটের ধোঁয়া আবার পশ্চিম ইয়ো-রোপেও নতুন করে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। এখানে ন্যাটো শক্তিজোটের যে তিনদিনব্যাপী সম্মেলন হয়ে গেল, সে সম্মেলন সোভিয়েট রাশিয়ার উদ্দেশে কড়া ভাষায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে। ভূমধ্য-সাগরে সোভিয়েট নৌবহরের অবস্থিতিই অবশ্য ন্যাটো সদস্যদের ক্রোধের কারণ।

ভূমধ্যসাগরে সোভিয়েটের ক্ষেপণাস্ত্র-বাহী ৪০টি যুদ্ধ-জাহাজসহ সাবমেরিন টহল দিচ্ছে এবং সোভিয়েট নৌবহর বাড়াবার সম্ভাবনাও রয়েছে। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের তরফে বলা হয়েছে, সোভিয়েট ইউনিয়ন যেহেতু একটি কৃষ্ণসাগরীয় শক্তি, সেহেতু ভূমধ্যসাগরে নৌবহর রাখার অধিকারও তার আছে। সোভিয়েট সেনা-বাহিনীর মুখপত্র 'রেড স্টার' পত্রিকায় প্রকাশিত জনৈক রুশ নৌ-অধ্যক্ষের এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, মার্কিন ৬ষ্ঠ নৌবহর যাতে পেণ্টাগনের খেয়ালখুশি চরিতার্থ করতে না পারে তারই জন্যে ভূমধ্যসাগরে সোভিয়েট নৌবহর পাহারা দেবে। প্রবন্ধটিতে আরো বলা হয়েছে যে, হাজার হাজার মাইল পেরিয়ে এখানে মার্কিন ৬ষ্ঠ নৌবহর রাখার প্রধান উদ্দেশ্যই হলো বাল্টিক প্রণালী এবং ভূমধ্যসাগর এলাকার মধ্য দিয়ে যে সমস্ত যাতায়াতের পথ রয়েছে তার ওপর মার্কিন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। এ নিয়ন্ত্রণ থাকলে আমেরিকার যুদ্ধ-জাহাজগুলো সহজেই শত্রুর ওপর পারমাণবিক ও প্রচলিত অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারবে। সেই শত্রু যে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইয়োরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো সে-কথা নাম ধরেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ অবস্থায় সোভিয়েট রাশিয়া তার দক্ষিণ সীমান্তের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করতে তো চাইবেই।

সোভিয়েট সরকারী মুখপত্র ইজভেস্তিয়ারও বলা হয়েছে যে, ইস্রায়েলের সম্প্রসারণশীল ও আক্রমণাত্মক নীতিকে মদত দেবার জন্যেই মার্কিন ৬ষ্ঠ নৌবহরকে ভূমধ্যসাগরে রাখা হয়েছে। তার আরো লক্ষ্য স্পেনে বিমানঘাঁটি রাখা, তুরস্ককে ঘিরে রাখা, এ-অঞ্চলে নয়া উপনিবেশবাদ কায়েম করে গ্রীসকে তাঁবে আনা ইত্যাদি। তাই ইজভেস্তিয়া মনে করে যে, ৬ষ্ঠ নৌবহর মার্কিন কূটনীতিরই অংগবিশেষ, কাজেই সোভিয়েট রাশিয়াও তার পররাষ্ট্রনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ভূমধ্যসাগরে তার নৌবহর রেখে দেবে।

কিন্তু ন্যাটো পরিষদের আশংকা অন্যত্র। তাঁরা মনে করেন, ভূমধ্যসাগরে সোভিয়েট নৌবহর রাখার অর্থ যুগো-স্লাভিয়া, অ্যালবেনিয়া, রুমানিয়া ইত্যাদি পূর্ব ইয়োরোপের "স্বাধীনচেতা" দেশ-গুলোকে ভয় দেখানো। চেকোস্লোভা-কিয়ায় সশস্ত্র সোভিয়েট সৈন্য অভিযানের পর পশ্চিমী দুনিয়া সোভিয়েট মতিগতি সম্পর্কে খুবই সন্দিহান হয়ে উঠেছে। সে-জন্যেই ন্যাটো থেকে সোভিয়েট রাশিয়াকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, সে যদি ইয়োরোপে নতুন করে কোন হস্তক্ষেপ করে অথবা একটা বিশ্বসঙ্কট সৃষ্টি করে, তার পরিণতি ভয়ানক হতে পারে। ভূমধ্য-সাগর অঞ্চলেও কোন সঙ্কট সৃষ্টি হলে ন্যাটো তা সহ্য করবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ন্যাটো সদস্যরা ঘোষণা করেছেন যে সামরিক জোটটির শক্তিবৃদ্ধির জন্যে সকলেই সক্রিয় সহযোগিতা করবে। অর্থাৎ ঠাণ্ডা লড়াই আবার শুরু হলো বলে, ভূমধ্যসাগরের জল শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, কে জানে!

কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ বামপন্থী হয়ে গেছেন, বামপন্থীদের হার মানিয়েছেন সরকারী নীতির প্রতি তীব্র কশাঘাত হেনে, তীব্র সমালোচনা করে। বামপন্থী কেন, সাদা বাংলায় সরকার-বিরোধীদের কম্যুনিস্ট বলেও বহু সময় চিহ্নিত করা হয়, সে ক্ষেত্রে বহু সময় বিচার করা হয় না তারা সমাজবাদী বা জাতীয়তাবাদী বা গণতন্ত্রবাদী কি না। অর্থাৎ সোজা কথায় বলা যায় যে, যিনি সরকারের নীতির সমালোচক ও বিরোধী, তিনিই কম্যুনিস্ট। ঠিক এই নিরিখে শ্রীঅতুল্য ঘোষ আজ শুধু কম্যুনিস্ট নন, তিনি ডান বা বাম কম্যুনিস্ট ছাড়িয়ে পাকা নকশালপন্থী কম্যুনিস্ট বনে গেছেন। আর শ্রীঘোষকে কম্যুনিস্টে পরিণত করেছে জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের বন্যা ও বিপর্যয়। গত ১৩ই নভেম্বর ও ১৫ই নভেম্বর শ্রীঅতুল্য ঘোষ উত্তরবঙ্গের বন্যার পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, যে কশাঘাত হেনেছেন, তার পর শ্রীঘোষকে আর কট্টর বামপন্থী ছাড়া কিছু বলা যায় না। কারণ শ্রীঘোষ তাঁর কথাগুলি যেভাবে বলেছেন, যেভাবে মনের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, ঠিক সেভাবে কোন বড় বামপন্থী নেতাও সমালোচনা করেছেন কি না সন্দেহ। উত্তরবঙ্গ প্রসঙ্গে 'রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা মন্তব্যের অতীত' এই শিরোনাম অন্য কেউ নয়, খোদ 'জনসেবক' পত্রিকা দিয়ে করেছেন। 'রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা মন্তব্যের অতীত'—এমন ভাষা শ্রীঅতুল্য ঘোষের মুখে আর 'জনসেবক'-এর পাতায় অতীতে কখনও কেউ দেখেছেন বলে নিশ্চয়ই মনে করতে পারবেন না। কিন্তু প্রশ্ন হল উত্তরবঙ্গের প্রশ্নটি কি এইভাবে মন্তব্যের অতীত হয়ে থাকবে? কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষের এই ধিক্কার বাণী কি শুধু সংবাদপত্রের শোভা বর্ধন করে থাকবে?

শ্রীঅতুল্য ঘোষ শক্ত মানুষ এবং কথা ও কাজে তাঁকে এক বলেই লোকে জানে। তাই প্রশ্ন জাগে ধিক্কারের পরে যদি তিনি তাঁর মনোভাবকে কাজে রূপ দান না করেন, তবে আর পাঁচজন দুষ্ট লোকের মত সকলেরই প্রশ্ন হবে—শ্রীঅতুল্য ঘোষ এই কথাগুলি বলেছেন শুধুমাত্র নির্বাচনী স্টান্ট হিসাবে, উত্তরবঙ্গের মানুষের মন জয় করবার জন্য, অথবা ধিক্কারধ্বনি যাঁরা যা বলে থাকে যে, জলপাইগুড়ির মানুষ সরকারী ব্যর্থতায় আজ যেভাবে ক্ষিপ্ত হয়েছে এবং যে ক্ষিপ্ত রূপের ভয়ে শ্রীঅতুল্য ঘোষ বার বার শিলিগুড়ি গেলেও একবারও জলপাইগুড়ি যেতে পারেন নি, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বারো বারো করেও জলপাইগুড়ি যান নি, যেখানে গিয়ে শ্রীমোরারজী দেশাই আর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত নিরাপদে ফিরে যেতে পারেন নি—এই ধিক্কার ধ্বনি সেই জলপাইগুড়ির মানুষের মনের আগুনে জল ঢালবার জন্য, জলপাইগুড়ির মাটিতে পা রাখবার পাশপোর্ট পাবার জন্য। শুধু কথার চাতুরীতে ধিক্কার কাপুরুষের জন্য— কিন্তু শ্রীঅতুল্য ঘোষের মত মানুষ, যাঁর পিছনে রয়েছে কংগ্রেসের মত সংগঠন—যাঁর অঙ্গুলী হেলনে দিল্লীর মসনদে কাঁপুনি ধরে, তিনি যদি শুধু কথা দিয়ে উত্তরবঙ্গের মানুষের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন তবে সেটা ফাঁকির রাস্তা আর সেই ফাঁকির রাস্তায় চিঁড়ে ভিজবে না।

উত্তরবঙ্গের বিপর্যয় ও সরকারী ব্যর্থতা সম্পর্কে অন্য অনেকেই অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু তার ফল ভাল হয় নি। শ্রীজ্যোতি বসু বা শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বা শ্রীননী ভট্টাচার্য যখন বলেছেন, তখন তাঁদের কথাকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী দলের চিরাচরিত বক্তব্য বলে গ্রহণ করে মর্যাদা দেয় নি। অধ্যাপক নির্মল বসু তো সামরিক বাহিনী সম্পর্কে বক্তব্য করে একটি সংবাদপত্রের কাছে চরম অবমাননা ও

সবিনয় নিবেদন

অনিবার্য কারণবশত এ সংখ্যায় গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফুচিকের দেশে' এবং শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিংশ শতাব্দীর মার্কিন সাহিত্য' প্রকাশ করা গেল না—এর জন্যে আমরা দুঃখিত।

আগামী সংখ্যা থেকে রচনা দুটি যথারীতি প্রকাশিত হবে।

—সম্পাদিকা

সমালোচনার পাত্র হলেন। পরে অবশ্য দেখা গেল এই বিরোধী দলের নেতারা যা বলেছেন তা বর্ণে বর্ণে সত্য।

এর পরে সুরু হল শ্রীঅতুল্য ঘোষের বক্তব্য প্রকাশ। এস এন রায় তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হলে যখন কয়েকজন অফিসারকে বদলী করা হল, তখন শ্রীঅতুল্য ঘোষ বললেন—দু-একজন অফিসারকে বদলী করে কোন ফল হবে না। তিনি বললেন—সারা প্রশাসন যেখানে ভেঙে পড়েছিল, সেখানে দু-তিনজন অফিসারকে দোষী করে দায় সারার চেষ্টা অন্য কিছু নয়—লোককে বিভ্রান্ত করা। তিনি বললেন—খোদ রাজ্যপাল যখন বলেন, প্রশাসন ভেঙে পড়েছিল, তখন সেই রাজ্যপালই বা দোষ থেকে বাদ পড়েন কিভাবে? কারণ তিনিই তো প্রশাসনের সর্বময় কর্তা।

এই শেষ নয়। বুধবার ১৩ই নভেম্বর কংগ্রেস ভবনে শ্রীঅতুল্য ঘোষ বললেন—বন্যার পর এক মাস হয়ে গেল, এখনও পুনর্বাসনের কাজ তো সুরুই হয় নি। হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন, আশ্রয়হীন, সহায়হীন, সম্বলহীন রয়েছে অথচ সরকার পুনর্বাসনের কিছুই করেন নি। অনুদান হিসাবে কোথাও কোথাও দুই শত বা এক শত টাকা দেওয়া হচ্ছে আর সেই টাকা দিতেও দলিল দেখাতে চেয়ে টালবাহানা করা হচ্ছে। আবার পৌরসভা এলাকায় এই টাকা দেওয়া হচ্ছে না—এর নাম কি পুনর্বাসন? জি আর দেওয়া হচ্ছে কোথাও কোথাও, দেওয়া উচিত দুই কিলো কিন্তু সরকারী কর্মচারীরা দিচ্ছেন এক কিলো করে। বহু জমি আছে সেখানে যেখানে এখনও চাষ করলে ফসল হতো, সেখানে বীজ দেওয়া হচ্ছে না। চাষ করার গরু নেই, আবার যদি গরু থাকে, তবে তার খাবার নেই।

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, রিক্সাওয়ালা এদের আজ পর্যন্ত কোন সাহায্য দেওয়া হয় নি। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে কোন পুনর্বাসনের কাজ সুরুই হয় নি।

একদিন পরে শুক্রবার অর্থাৎ ১৫ই নভেম্বর আবার অতুল্য ঘোষ বসলেন সাংবাদিকদের সামনে। কিন্তু এবার আরো কঠোর মন্তব্য, আরো কঠোর সমালোচনা। তিনি বললেন, উত্তরবঙ্গে বিভীষিকার রাজত্ব চলছে। প্রায় ডাক লাগবার অবস্থা। শ্রীঘোষ বললেন, উত্তরবঙ্গে প্রলয়ের পর এক মাস দশ দিন কেটে গেছে, কিন্তু এখনও উত্তরবঙ্গে পানীয় জল নেই, আলো নেই, রাস্তাঘাট নেই, খাদ্য নেই, বাসস্থান নেই, দশ লক্ষ মানবের পুনর্বাসনের কোন পরিকল্পনা আজ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে তিনি সরকারী অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারেন নি। তিনি আরো বললেন, রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গের বিশেষ পুনর্বাসনের পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রের কাছে কোন টাকা চেয়েছেন বলে তাঁর অন্তত জানা নেই। কেন্দ্র এক কোটি টাকা দিয়েছিল, সে তো রিলিফের জন্য। কিন্তু সেই টাকা কি খরচ হয়েছে অথবা খরচ হবার পর রাজ্য সরকার কি আরো টাকা চেয়েছেন? তিনি আরো বলেছেন, তাঁকে প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, রেলমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী, যোগাযোগমন্ত্রী সকলেই বলেছেন তাঁদের সহযোগিতার কোন অভাব হবে না। কিন্তু রাজ্য সরকার যদি উদ্যোগ না নেন তবে কেন্দ্র সহযোগিতা করবে কি করে? রাজ্য সরকার যদি চান, তবে তিনি সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন। বিপর্যয়ের ব্যাপকতা স্বীকার্য কিন্তু সেই উদ্যোগ কোথায়, যার দ্বারা এই ব্যাপকতার মোকাবিলা করা যাবে।

এই কথাগুলি অন্য কেউ বললে এইভাবে তুলে ধরবার দরকার হত না। কিন্তু রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন অর্থাৎ বকলমে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী শাসন বহাল থাকাকালে শ্রীঘোষের এই বক্তব্য অনেক কারণে তাৎপর্যময়। তবে 'সপ্তাহের বোঝা'র পাঠকদের কাছে তাৎপর্যময় আরো এই কারণে যে, এই কথাগুলি গত তিন সপ্তাহ একনাগাড়ে 'সপ্তাহের বোঝা'য় বলে যাওয়া হচ্ছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল এই কথাগুলি শ্রীঅতুল্য ঘোষ মুখে না বলে কাজে রূপ দিচ্ছেন না কেন? অন্য পাঁচজনের মত তো তিনি অক্ষম বা শক্তিহীন ব্যক্তি নন। শ্রীঅতুল্য ঘোষ যদি বলেন রাজ্যপাল শ্রীধরমবীরকে দিয়ে রাজ্যের এই ব্যাপক পুনর্গঠনের কাজ সম্ভব নয়, তবে বিকল্প ব্যবস্থা করতে তাঁর বাধা কোথায়? শ্রীমতী ইন্দিরা, দেশাই বা চ্যবন তাঁর কথা শুনবেন না—

এমন দুর্দিনে শ্রীঘোষের মুখ দিয়ে বলাই বেশ জনপ্রিয় আছে। শ্রীঅতুল্য ঘোষ রোগ নির্ণয় ঠিক করেছেন—কারণ এই সরকারী আমলাকুল এরা শুধু একটি কাজই জানে—সেটা হল কেরানীগিরি আর কুপরামর্শ দান। প্রশাসনের যোগ্যতা কি আছে সেটা চোর-ডাকাত-গুণ্ডা দমনেই হোক, আর বন্যা বিপর্যয় রোধে হোক পরীক্ষা হয়ে গেছে। তাই শ্রীঘোষ বলেছেন—সরকারী লাল ফিতের ফাঁসে উত্তরবঙ্গের পুনর্বাসন আটকে রাখলে চলবে না, এর জন্য পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণ একযোগে পরিচালিত করতে হবে এবং তার জন্য চাই একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি। ঠিক এই কথাই দু-সপ্তাহ আগে 'সপ্তাহের বোঝা'য় বলা হয়েছিল যে, শ্রীশৈবাল গুপ্ত বা শ্রী কে কে হাজরার মত দক্ষ ব্যক্তিদের দিয়ে উচ্চক্ষমতার কমিটির হাতে উত্তরবঙ্গের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের ভার দেওয়া হোক। আনন্দের কথা, শ্রীঅতুল্য ঘোষ সেই কথাই বলেছেন। কিন্তু রোগ নির্ণয় করা আর তার দাওয়াই বাতলে দিলেই রোগী বাঁচে না। রোগীকে ডাক্তারের নির্দেশ মত ওষুধ এনে খাওয়াতে হয়। এখানে প্রশ্ন হল—শ্রীঅতুল্য ঘোষ রোগ নির্ণয়ও করেছেন, দাওয়াইও বাতলে দিয়েছেন, কিন্তু ওষুধ আনবে কে আর খাওয়াবে কে? সেই কাজও শ্রীঅতুল্য ঘোষ পারেন, আর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি তিনি তা না করেন অর্থাৎ রোগী যদি তাঁর সামনে মারা যায় তবে কি বলা হবে। তবে শ্রীঘোষকে বুঝতে হবে, কমিউনিস্টদের তথা বামপন্থীদের যে দোষে দোষী করে কথা হয়, তাঁকেও সেই দোষে দোষী করা যাবে এবং বলা যাবে শ্রীঘোষও বামপন্থী বা কমিউনিস্ট হয়ে গেছেন। গুরুতর অপরাধের দায়ভাগও পড়বে শ্রীঘোষের ওপর—কারণ তিনি রোগীকে সাধ্য থাকতেও ওষুধ এনে দিলেন না বা নিরাময়ের সুযোগ করে দিলেন না। শ্রীঘোষ যদি তাঁর বক্তব্য সিরিয়াস হন, তবে দরকার হলে তাঁকে সরকারী এই অপদার্থতা, ঔদাসীন্য ও ব্যর্থতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে, দরকার হলে কঠোর আন্দোলনের নেতৃত্ব করতে হবে। তা যদি তিনি না করেন, তবে অন্য পাঁচজন যে রকম বলে থাকেন এই ক্ষেত্রে সেই কথাই সত্য হবে যে, শ্রীঘোষ হুঙ্কার দেন, কাজ কিছু করেন না। আসামের বাঙালী নিধনের সময় তিনি প্রায় এই রকম গরম কথা বলেছিলেন, কিন্তু সে শুধু কথার কথাই ছিল। বাঙালীর জন্য তিনি স্থায়ী কিছু করেন নি। (১৬।১১।৬৮)

"গান্ধীবাদ কি সচল ?" প্রসঙ্গে

(মতামত লেখকের)

৩০শে শ্রাবণ ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের ১ম সংখ্যায় সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত অধ্যাপক শ্রীদিলীপ ঘোষরায় লিখিত "গান্ধীবাদ কি সচল?" প্রবন্ধটি খুব মূল্যবান। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা গান্ধীবাদের বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন করে তিনি সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। সেজন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাই। তাঁর ভাষা সংযত, তিনি শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করেন নি। তাঁর লেখা সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনার কোন অবকাশ নেই, প্রতিবাদ করারও কারণ দেখি না। আপনি প্রবন্ধটি প্রকাশ করে পাঠকবর্গকে মতামত প্রকাশের সুযোগ দিয়েছেন, এইজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

১৯২০ সাল থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবার সুযোগ আমার হয়েছে, অনেক গণ্যমান্য নেতৃবর্গকে নিকট থেকে দেখবার সুযোগও হয়েছিল। গান্ধীজী অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা ছিল অনেক, কিন্তু প্রকৃত অনুগামী একান্তই বিরল। এইসব অনুরাগী ব্যক্তিরা দার্শনিকতত্ত্ব দিয়ে গান্ধীবাদ যে অভ্রান্ত তা প্রমাণ করতে চেয়েছেন এবং লোককে বিভ্রান্ত করেছেন। কিন্তু গান্ধীজী যা চেয়েছিলেন, রাজনীতিক্ষেত্রে পরিচিত তাঁর অন্ধ ভক্তদের মধ্যেও তা কার্যে পরিণত করবার যোগ্যতা ছিল না।

গান্ধীজীর জীবনাদর্শ, নীতি, মত পথ মিলিয়ে যা তাকেই গান্ধীবাদ বলা হয়। গান্ধীজীর একটি মতবাদ –

"The perfect state is reached only when mind and body and speech are in proper co-ordination. Non-violence is the weapon of the strong, with the weak, it might easily be hypocrisy. Every problem lends itself to solution if we are determined to make the law of Truth and Non-violence the law of life. For, Truth and Non-violence are to me faces of the same coin." (*Young India*, Oct. 1, 1931).

"The police of my conception will be of a wholly different pattern from the present day force. Its ranks will be composed of believers in non-violence. They will be servants, not masters of the people. The police force will have some kind of arms, but they will be rarely used, if at-all. In fact, the police men will be reformers." (*Harijan*, Sept. 1, 1940).

গান্ধীজীকে তাঁর ভক্তের দল কিরূপভাবে অনুসরণ করেছেন তার আলোচনা করতে গেলে ব্যক্তিবিশেষদের কথা এসে পড়বে। গান্ধীবাদী বলে পরিচিত একজন উচ্চশিক্ষিত বিদ্বান ব্যক্তি, বিভক্ত ভারত-রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য খণ্ডিত বাংলার পশ্চিমাংশে প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হয়ে লালবাজারের কন্ট্রোলরুমে বসে বিদেশী শাসনমুক্ত দেশের নাগরিকদের ওপর গুলী চালাবার প্রথম হুকুম উচ্চারণ করেছিলেন। তিনিই সে সময়ে বলেছিলেন উদ্বাস্তুরা সীমান্ত লঙ্ঘন করে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের চেষ্টা করলেই তাদের গুলী করা হবে। হালের সেদিনের কথা, সেই সুধীব্যক্তি কিছুদিনের জন্য পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে অধিষ্ঠিত থাকাকালে, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার নামে, তাঁর অধীনস্থ সশস্ত্র পুলিশের উন্মত্তের মত বর্বর নৃশংস আচরণের কাহিনী, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে, এখানে বিস্তৃতভাবে তা লেখার প্রয়োজন করে না। গান্ধীজীর মত বা আদর্শানুযায়ী কি তথাকথিত গান্ধীবাদীরা এদেশে শাসনকার্য চালিয়েছেন বা চালাচ্ছেন ? অন্ধ গান্ধীভক্তরা কি বলেন ? কয়জন মন্ত্রী পাঁচশত টাকা বেতন নিচ্ছেন ? কয়জন মন্ত্রী রাজভবনের পরিবর্তে কুটীরে বাস করছেন ? এ সর্বজনবিদিত যে, গান্ধীজী চেয়েছিলেন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের বিলোপ-সাধন। তার স্থলে লোকসেবক সঙ্ঘ নামক একটি সংস্থার প্রতিষ্ঠা—যার অধীনে থাকবে সর্বভারতীয় কাটুনী সঙ্ঘ, সর্বভারতীয় গ্রামীণ শিল্প সঙ্ঘ, হিন্দুস্থানী-তালিম সঙ্ঘ, হরিজন সেবক সঙ্ঘ, গো-সেবা সঙ্ঘ ইত্যাদি। গান্ধীজী তাঁর মহাপ্রয়াণের প্রায় ২৪ ঘণ্টা পূর্বে, ১৯৪৮ সালের ২৯শে জানুয়ারী রাত্রে, নিজ হস্তে তাঁর শেষ ইচ্ছা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবেই থেকে গিয়েছে এবং লোকসেবক সঙ্ঘের বদলে ক্ষমতা-ভোগ ও ক্ষমতা দখলের নোংরা রাজনীতি নিয়েই ব্যস্ত আছে।

গান্ধীজী ওয়ার্দার সেবাগ্রামে সবরমতী ত্যাগ করার পর তাঁর আশ্রম করেছিলেন। গান্ধীজীর জীবদ্দশায় সেবাগ্রাম গান্ধীজীর সর্বপ্রকার গঠনমূলক কাজে মুখরিত হয়ে থাকতো। সেই সেবাগ্রামের কি অবস্থা হয়েছিল, একজন নিষ্ঠাবতী সমাজসেবিকা কুসুম নায়ার গান্ধীজীর তিরোধানের ১২ বৎসর পর তাঁর পুস্তকে লিখেছিলেন—

"In Bapu's time, there used to be a charka in every home at Sevagram. Today, there is not a single spinning wheel in the whole village. As for basic education of which the Sevagram was the centre, they (villagers) say with unconcealed contempt 'we donot send our children to the Asram School beyond the fourth class (i.e. Primary), because those who pass out of the Nai-Talim cannot get jobs, so our boys go to Wardha Town, they walk four miles to study in a conventional school' villagers say 'we donot want to remain tillers of the soil for ever. We also want to become lawyers and doctors'."

প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের জীবনে পরীক্ষা করে গান্ধীজীর মতবাদ সম্বন্ধে সাধারণ লোকের এইটাই শেষ সিদ্ধান্ত। ১৯৬৫-'৬৬ সালে ২৬ কোটি টাকা মূল্যের খাদি উৎপাদন হয়েছে বলে গান্ধীবাদী মহাশয় ১৩ই ভাদ্র তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীতে একটা হিসাব দিয়েছেন, কিন্তু ঐ খাদি উৎপাদন ও বাজারে বিক্রয় করার জন্য সরকারী তহবিল থেকে কাটুনী সঙ্ঘ, গ্রামীণ শিল্প সঙ্ঘের কর্মী, কর্মকর্তাদের ভাতা দেবার জন্য এবং খাদি বিক্রয়ের জন্য রিবেট দেওয়া বাবদ কত টাকা ব্যয় হয়েছে সে হিসাবটি তিনি দেন নি। দিলে ভাল করতেন। আমাদের মত দরিদ্র দেশেই বিপুল টাকা ব্যয় করেই বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নানা যন্ত্রশিল্প গড়ে উঠে বড় বড় শিল্প-নগরীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং গ্রামের লোক গ্রাম ছেড়ে এসে শিল্প-নগরীতে কর্ম-সংস্থান করে নিচ্ছে। দেশের [illegible] [illegible] [illegible] ক্ষেত্রে খাদির [illegible]

কোন মূল্য আছে বলে স্বীকার করি না। ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত খদ্দরের বেশভূষা বলতে গেলে ছিল মুক্তি-সংগ্রামীদের পরিচ্ছদ। ১৯২০ সাল থেকে খদ্দর পরিধান করতে শুরু করেছিলেম। আজও পরছি মুক্তি-সংগ্রামের স্মৃতি হিসাবে মাত্র, তাছাড়া অন্য কোন সার্থকতা নেই। খদ্দর খরিদ করা এখন ব্যয়সাধ্য ব্যাপারও বটে।

আচার্য কৃপালনি, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, রাজনীতি ক্ষেত্রে গান্ধীজীর দক্ষিণহস্ত ছিলেন। আচার্য কৃপালনি চম্পারণ আন্দোলনের সময়ে গান্ধীজীর সহযোগী ছিলেন। বরদৌলির সত্যাগ্রহ আন্দোলন সফলতার সঙ্গে পরিচালিত করেছিলেন শ্রীবল্লভভাই প্যাটেল, যে জন্য তিনি পেয়েছিলেন সর্দার উপাধি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ছিলেন গান্ধীজীর মানসপুত্র। তাঁকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন গান্ধীজী। এঁরা তিনজনই শুধু গান্ধীজীর অনুরাগী ছিলেন না, এঁরা প্রত্যেকেই গান্ধীজীর প্রভাবাধীন জাতীয় কংগ্রেসের কর্ণধারও ছিলেন বটে। তবে এঁরা গান্ধীজীর জীবনাদর্শের অনুগামী ছিলেন না যে তা এঁদের উক্তি দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

গান্ধীজীর মতে আধুনিক কালের শহর নগরের সভ্যতা অমঙ্গলজনক, অনিষ্টকারী, তিনি এই সভ্যতাকে খর্ব করে নতুনভাবের সভ্যতা গড়ে তুলে তাঁর কাল্পনিক আদর্শ রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিলেন, সেজন্য তাঁর ধ্বনি ছিল—"Back to village from city", "Back to nature." তিনি বিশ্বাস করতেন যে, গ্রামে ফিরে গেলেই পৃথিবী থেকে হিংসাকে উচ্ছেদ করে, অহিংসার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা যাবে। তাই গান্ধীজী বলেছিলেন—

"India's salvation consists in unlearning what she has learnt during the last fifty years or so. The railways, telegraphs, hospitals, lawyers, doctors and such like have all to go." "You cannot build non-violence on a factory civilisation, but you can build on self-contained villages." "I am convinced that if India is to attain true freedom and through India world also, there sooner or later the fact must be recognised that people will have to live in villages, not in towns. We can realise truth and non-violence only in the simplicity of village life and that simplicity can be found in charka and all that charka connotes." "They (civil regniters) must learn the art and beauty of self-denial and voluntary poverty. They must engage themselves in nation-building activities, the spread of khaddar through personal hand-spinning and hand weaving."

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর উক্তি উদ্ধৃত করা যাক—

"This was the political programme that we were to follow. With a stab of pains, I felt the chodrs of allegience that had bound me to him for many years had snapped. I realised that I had clear and definite views about many matters which were opposed to him. But Gandhiji's greatness or his service to India or the tremendous debt I personally owed to him were not in question. In spite of all that, he might be hopelessly in the wrong in many matters. What after all he was aiming at? In spite of the closest association with him for many years, I am not clear in my own mind about his objectives. He is an extraordinary Paradox."

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আরও বলেছেন—

"Our final aim can only be a classless society with equal economic justice and opportunity for all, a society organised on a planned basis for the raising of mankind to higher material and cultural level, to a cultivation of spiritual values of co-operation, unselfishness, the spirit of service, the desire to do right, good will and love, ultimately a world order. Every thing that comes in the way will have to be removed, gently if possible, forcibly if necessary. And there seems to be little doubt that coercion will often be necessary."

"It is only when India has acquired the ability to design, fabricate and erect its own plants without foreign assistance that it will have become a truely advanced and industrial country."

এর থেকেই পরিদৃষ্ট হবে গান্ধীজীর ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মতাদর্শ বিপরীতভাবী। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে বরণ করার কথা কোথাও বলেন নি। তিনি মানবের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করার কথা বলেছেন, গ্রামে ফিরে যাবার কথা, গ্রামসংগঠন বা কুটীরশিল্পের কথাও তাঁর চিন্তায় স্থান পায় নি। নিজেদের চেষ্টায় বা বিদেশীর সহায়তায় শত শত কোটি টাকা খরচ করে তাঁর সরকার বড় বড় শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও শিল্প-নগরী তৈরি করে নগর-সভ্যতাই গড়ে তুলেছে। তিনি শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের কথা বলেছেন এবং সেটা তৈরি করতে যদি পথে বাধার সৃষ্টি হয় তবে শক্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজন হলে সে কথাও বলেছেন, অহিংস পথের কথা বলেন নি। পরিকল্পনা কমিশন শত-সহস্র কোটি টাকা খরচ করেছে, কিন্তু কয়টি গ্রাম, শিল্প-বাণিজ্য সংস্থাগুলি সমৃদ্ধিশালী হয়ে আত্মনির্ভরশীল ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ আদর্শ গ্রামরূপে গড়ে উঠেছে?

গান্ধীজী বলতেন আত্মনিগ্রহ এবং অহিংস পন্থায় দুষ্কৃতকারী দস্যুদের এমন কি আক্রমণকারীদের মন জয় করা যায়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যদি শক্তিকে পরিহার করে অহিংসা গ্রহণ করা হয় তাহলে রাষ্ট্র, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং আক্রমণকারীকে পর্যুদস্ত করবে কেমন করে। উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন—

"If the Congress could not abstain from the use of force, the Congress must not seek power until it acquired non-violent control over the masses ... in case of foreign aggression it would lead the nation to a discarding of arms in repelling foreign attack and would develop a band of non-violent men who would become a living wall against aggressor ... I do not want the army."

১৯৪৭ সালের ১৪ই জুন তারিখের অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে দিল্লিতে সর্দার প্যাটেল তাঁর বক্তৃতায় অকপটে বলেছিলেন—

"Freedom was coming. They must build up industries.

They must build up the army and make it efficient and strong."
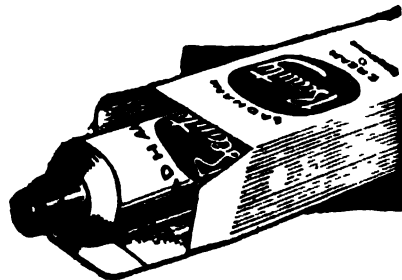
কত-শত কোটি টাকা অস্ত্রসম্ভার প্রস্তুত ও ক্রয় এবং সৈন্যবাহিনী পোষণ করার জন্য ভারত সরকার ব্যয় করছে, শিক্ষিত নাগরিক মাত্রই তা জানে। অহিংসা দ্বারা নিশ্চয়ই দেশরক্ষা করা হচ্ছে না কিংবা প্রতিরক্ষার জন্য অহিংস সৈন্য-বাহিনীও গঠন করা হয় নি, ১৯৬২ সালের ও ১৯৬৫ সালের বিদেশী আক্রমণ প্রতিরোধ নিশ্চয়ই অহিংস স্বেচ্ছাসেবকেরা করে নি।

গান্ধীজী তাঁর Healing Mission নিয়ে বিহারে দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিক্রমা করছিলেন, সেই সময় বৃটিশ রাজ-প্রতিনিধি লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেন গান্ধীজীকে নয়াদিল্লীতে শীঘ্র চলে আসবার জন্য অনুরোধ জানালেন। গান্ধীজী লিখে পাঠালেন তাঁর পক্ষে তখনই নয়াদিল্লী যাওয়া সম্ভব নয়। গান্ধীজীর প্রভাবাধীন কংগ্রেসের নেতৃবর্গ গান্ধীজীর নয়াদিল্লীতে উপস্থিতি কামনা করেছিলেন, দেশ-বিভাগের প্রস্তাবে গান্ধীজীর সম্মতি ও সমর্থন কংগ্রেস নেতৃবর্গের প্রয়োজন ছিল, গান্ধীজী তখনই না যাওয়াতে তাঁর প্রথম শ্রেণীর শিষ্য আচার্য কৃপালনী ভাবাবেগে সত্য কথা বলে ফেলেছিলেন—

"Mahatma was saying that he was solving the problem of Hindu-Muslim unity for the whole of India in Behar. It might be, but it was difficult to see how that was being done. There was no definite steps in non-violent non-co-operation that led to his desired goal."

এতদিনের অভিজ্ঞতায় আচার্য কৃপালনীর মনে অহিংস অসহযোগ সম্বন্ধে যে সংশয় জমে উঠেছিল, তা তিনি কথাচ্ছলে প্রকাশ করে ফেলেছিলেন।

অধ্যাপক শ্রীঘোষরত্ন [illegible] তাঁর প্রবন্ধের শেষে নিজেই একটি প্রশ্ন রেখে দিয়েছেন —"গান্ধীবাদ কি সচল?" তাঁর এই জিজ্ঞাসার উত্তরে সাপ্তাহিক বসুমতীর ১৩ই ভাদ্রের ১১শ সংখ্যায় গান্ধীবাদী শ্রীসত্যবিকাশিত গুহরায়া যা লিখেছেন, বুদ্ধিজীবীর যুক্তির দ্বারা বিচার-বিশ্লেষণ করে লেখার চাইতে তাঁর লেখার মধ্যে উচ্ছ্বাসই বেশি প্রকাশ পেয়েছে।

স্বদেশে ও বিদেশে তাঁর জন্ম-শত-বার্ষিকী উৎসব সরবে ও নীরবে উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি চলছে বলে প্রমাণ হয় না যে "গান্ধীবাদ সচল" অবস্থায় আছে। বিলেত, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়াতে গান্ধী-জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গান্ধীজী বৃটেনের প্রতিটি অধিবাসীকে সম্বোধন করে যে পত্র লিখেছিলেন তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি—

"I venture to present you with a nobler and a braver way, worthy of the bravest soldiers. I want you to fight Nazism without arms or if I am to retain military terminology, with non-iolent arms. I would like you to lay down the arm you have as being useless for saving you and humanity. You will invite Herr Hitler and Signor Mussolini to take what they want of the countries you call your possessions. Let them take possession of your beautiful Island with your many beautiful buildings. You will give all these, but neither your souls, nor your minds. If these gentlemen choose to occupy your homes, you will vacate them. If they do not give you free passage out, you will allow yourself, man, woman and child, to be slaughtered, but you will refuse to owe allegience to them."

ইংরেজ কি গান্ধীজীর এই উপদেশে কর্ণপাত করেছিল? তাদের দেশ, ঘর-বাড়ি, সম্পত্তি হিটলারকে সমর্পণ করা তো দূরের কথা, ইংরেজ, আমেরিকা ও রাশিয়ার সহযোগিতায় যুদ্ধের মাধ্যমে রক্তাক্ত পথে, মানুষ-বিধ্বংসকারী অস্ত্রের সাহায্যে হিটলারকে পর্যুদস্ত করে জার্মানীকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল। রাশিয়া নাজি সৈন্যদের হাত থেকে লেনিনগ্রাড রক্ষা করেছিল কি গান্ধীজীর নীতি অনুসরণ করে? না অস্ত্রের বিনিময়ে লেনিনগ্রাডকে রক্ষা করেছিল? রাশিয়ার বিপ্লবও এসেছিল রক্তের পথেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয় আমেরিকা কর্তৃক পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহারে। হিরোশিমা, নাগাসাকির অধিবাসী, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়েছিল। বর্তমানকালে ভিয়েতনামে আমেরিকা কি করছে? বোমা বিস্ফোরণ করে নরহত্যা, ধ্বংস হচ্ছে। বৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া গান্ধীজীর দর্শন, নীতি ও তাঁর মত, পথ কোন্‌টা অনুসরণ করে চলেছে। অস্ত্র আগ্রহের গান্ধীবাদী কি তা বলবেন? ঐ তিনটি দেশে গান্ধী জন্ম-শত-বার্ষিকী প্রতি-পালিত হচ্ছে বলে গান্ধীবাদ সচল আছে ভেবে আনন্দে উৎফুল্ল হবার কিছু নেই। পাশ্চাত্য দেশসমূহে গান্ধী জন্ম-শত-বার্ষিকী কি জন্য পালিত হচ্ছে অনুধাবন করলেই কারণ বোঝার অসুবিধা হবে না। স্বদেশে গান্ধী জন্ম শত-বার্ষিকী উৎসব পালিত হচ্ছে। কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে শতবার্ষিকী উৎসব যথাযথ-ভাবে পালন করার জন্য রাজ্য সরকার কমিটি গঠন করেছেন, যার সভাপতি হয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত আই, সি, এস রাজা-প্রধান এবং জেলায় জেলায় কমিটির সভা-পতি হয়েছেন জেলা-শাসকগণ, যাঁরা কোনদিন গান্ধীজীর আদর্শ ও নীতি অনুসরণ করে চলেন নি। গান্ধীজীর কোন কথাই শোনার দরকার মনে করেন নি। তাঁরা নেকটাই বেঁধে, ইউরোপীয় বেশে ভূষিত হয়ে গান্ধীঘাট থেকে সর্বত্র মূল্যবান মোটরে সভায় গিয়ে অর্ধনগ্ন ফকিরের ত্যাগের মহিমা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন, অজস্র অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, জীবনের সঙ্গে গান্ধীজীর আদর্শের কোন যোগ না থাকলেও গান্ধীজীর নীতি যে ভাল একথা বলার মধ্যে যে অসংগতি আছে সেজন্য তাঁরা কিছুই মনে করেন না। আর এইরূপভাবে জন্ম শত-বার্ষিকী উৎসব পালিত হচ্ছে বলে কি আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, গান্ধীবাদ সচল অবস্থায় আছে?

স্বরাজ কথাটি গান্ধীজী প্রথম ব্যবহার করেন নি। প্রবীণ, বয়োবৃদ্ধ নেতা দাদাভাই নওরোজী, ১৯০৬ সালের কংগ্রেস সভাপতি, প্রথম উচ্চারণ করে বলেছিলেন, "India's claim is comprised in one word self-Government or Swaraj, like that of the United Kingdom or the colonies."

১৯০৫ সালে ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন রাজনৈতিক দুরভিসন্ধির পরিচালনায় বঙ্গ-বিভাগ করলে, সমগ্র বাংলার তার প্রতিবাদে তীব্র আন্দোলনে মুখরিত হয়ে উঠেছিল, [illegible] বলে অসহযোগিতা, বিলাতী পণ্য বর্জন বা বয়কট এবং স্বদেশী গ্রহণ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। [illegible] বলেছিল, (আমাদের [illegible] বলেছিল) বিলাতী-বসন, [illegible] হয়েছিল। বিলেতী বস্ত্রের বহ্নি উৎসব হয়েছিল। নিজ চোখে দেখেছি। স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করেছি। বাঙালী বিলেতী কাপড় বর্জন করে স্বদেশী গ্রহণ করেছিলো। আমেদাবাদে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করে মিল মালিকরা লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা লুটে নিয়েছিল। জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন,

স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয় জন্য স্বদেশী বা মাতৃভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দেশের রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে বাংলা দেশই প্রথম এইসব প্রবর্তন করেছিল। বাংলায় ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল গান্ধীজীর আন্দোলনের বহু আগে থেকেই। বঙ্গ-ভঙ্গ রদ আন্দোলনের নেতারা সেকালে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন বলেই লর্ড কার্জনের দাম্ভিক উক্তি **"settled fact-কে unsettled" করতে পেরেছিলেন। বাংলারই একজন মৃত্যুঞ্জয়ী বীর সন্তান যতীন্দ্রনাথ দাস অধিকার আদায় করার জন্য ভারতবর্ষে প্রথম আমরণ অনশন করে ১৯২৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জেলে দেহত্যাগ করেছিলেন।** ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের জেল হাজতে দেহাবসান হয়। তিনি ইংরেজের আদালতকে অস্বীকার করে আত্মপক্ষ সমর্থন না করে অসহযোগ করেছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় আত্মপক্ষ সমর্থন না করে ইংরেজের আদালতের সাথে অসহযোগ করেছিলেন। গান্ধীজী কংগ্রেসে ব্যাপকভাবে চেতনা সৃষ্টি করেছিলেন সত্য কিন্তু নতুন কর্ম-কৌশলের আবিষ্কর্তা তিনিই প্রথম নহেন।

ভারতবর্ষের "নিরন্ন, ক্ষুধার্ত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত মানুষ গান্ধীজীর অপূর্ব কেউ কোন দিন ভুলতে পারবে না। তারা গান্ধীজীর মুখে শুনেছিল আশার কথা, গান্ধীবাদী শ্রী ... আশ্রমবাসী মহাশয়ের লেখা থেকে সেই কথাগুলি উদ্ধৃত করে দিই 'ভারতবাসী ও দরিদ্রের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান, তা আমার হৃদয়কে গভীর-ভাবে আন্দোলিত করে। বিদেশী আমলাতন্ত্র এবং স্বদেশী শহরবাসী গ্রামের অধিবাসীদের শোষণ করে থাকে। গ্রাম-বাসী অন্ন উৎপাদন করে স্বয়ং ক্ষুধার্ত থাকে। তাদের ঘরে দুধ হয়, অথচ তাদের শিশুরা এক ফোঁটা দুধের মুখ দেখতে পায় না। এ কী গভীর লজ্জার কথা। প্রত্যেকের জন্য পুষ্টিকর আহার, সুন্দর বাসগৃহ, শিশুদের শিক্ষার যাবতীয় সুবন্দোবস্ত ও রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা হওয়া চাই।" দুঃখ-দৈন্য পীড়িত মানুষ, এ আপাতমধুর বাক্য শুনে, বিদেশী শাসন ও শোষণমুক্ত হয়ে সুখী সমৃদ্ধি-শালী সমাজে বাস করার এক বিরাট প্রত্যাশা নিয়ে, গান্ধীজী প্রভাবাধীন কংগ্রেসের আহ্বানে ভারতবর্ষের মুক্তি সংগ্রামে দৃক্‌পাতহীন হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে-ছিলেন। তাঁরা উৎপীড়ন, অত্যাচার, নির্যাতন ভোগ করেছেন। কেউ কেউ সর্বস্ব হারিয়েছেন, তাঁরা অখণ্ড ভারত-বর্ষের স্বাধীনতা আদায়ের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন কিন্তু দেশ-বিভাগ করে আপোষে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে নেবার ধনী হয়েছে, ধনবৈষম্য আকাশ স্পর্শ করেছে, অবহেলিত যারা ছিলেন বুভুক্ষু, যাঁরা ছিলেন গাছের নীচে শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায় রাস্তায় ফুটপাথে, ... ওভার ব্রীজ, যাঁদের ... চিকিৎসার অভাবে ... মারা যেত, হাসপাতালে স্থান মিলতো না, তাঁরা ঠিক সেই অবস্থাতেই আছেন, বরং তাঁদের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। সংখ্যায় তাঁরা বহুগুণে বৃদ্ধি লাভ করেছেন। কোন স্বাধীন দেশে পথের উচ্ছৃঙ্খলনের দুর্গন্ধময় আবর্জনাস্তূপ থেকে জঠরের জ্বালা নিবারণ করার জন্য দরিদ্র ক্ষুধার্ত নর-নারী তাঁদের আহার সংগ্রহ করে থাকেন? কোন স্বাধীন দেশে পিতা, ক্ষুধা ও অভাবের তাড়নায় শিশু-পুত্রকে রাস্তার ফুটপাথে আছড়িয়ে মেরে ফেলে? প্রকৃত স্বাধীন দেশে এরূপ কোন ঘটনা ঘটলে মন্ত্রীদের গদি ছাড়তে হতো। ভারতবর্ষের দুঃখ দৈন্য পীড়িত মানুষ তথাকথিত স্বাধীনতার রূপ দেখে আশা-হত হয়েছেন।

শ্রীপ্যারেলাল লিখেছেন, 'অবিভক্ত ভারতবর্ষের লক্ষ কোটি মানুষ ১৯২০ সাল থেকে তাঁর (গান্ধীজীর) কণ্ঠস্বর শোনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকতো। একথা ঠিক, কিন্তু তাঁরা গান্ধীবাদের মাহাত্ম্য শোনবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতেন না। ইংরেজের শোষণ ও লুণ্ঠনের হাত থেকে মুক্তির পথের নিশানা গান্ধীজীর কাছ থেকে পাবার এক বিরাট প্রত্যাশা নিয়ে তাঁরা গান্ধীজীর কথা শোনবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। তাঁদের সে প্রত্যাশার মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছেন, তাঁরা শোষণ ও লুণ্ঠনের হাত থেকে মুক্তি পান নি, তা সমানেই চলছে পূর্বেরই মত।

কোন দেশ কোনদিন অহিংস সত্যা-গ্রহ আন্দোলন করে স্বাধীনতা পায় নি। ইতিহাসে সে নজীর নেই। অহিংস আন্দো-লনের মাধ্যমে আপোষে দেশ-বিভাগ করে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে নেওয়া যায়। স্বাধীনতা আপোষরফা, রিফর্ম-এর পথে আসে না। সংগ্রাম করে ক্ষমতা দখল করে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয় সেটা আসে হিংসার পথেই। ১৯৪২ সালের আগস্টের গণ-আন্দোলন, বিপ্লবের আকার ধারণ করেছিল। গান্ধীজী ডাক দিয়েছিলেন, "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" বলে, কিন্তু কোন কর্মসূচী দেবার পূর্বে গান্ধীজী সহ গান্ধীজী প্রভাবাধীন কংগ্রেস নেতৃবর্গ কেউ বা আগা খাঁ প্রাসাদে, কেউ বা আমেদনগর ফোর্টে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন। সেদিনের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দো-লন কিন্তু অহিংস আন্দোলন ছিল না। জনগণ মরার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল,

সংগ্রামের মত হয়ে পড়েছিল। ১৯৪২ সালের গণ অভ্যুত্থান ... ত্যাগ করে ... পথ প্রশস্ত করেছিল। গান্ধীজী ১৯৪২ সালের ... কংগ্রেসের ... নিজে অস্বীকার করেছিলেন। ভারতবর্ষের জন-গণ হিংসার পথ গ্রহণ করেছিল বলে। প্রকৃত স্বাধীন দেশে জনসংখ্যার শতকরা কুড়িজনের অক্ষরজ্ঞান, আর বাকি আশি-জন নিরক্ষর থেকে যায় না। রাশিয়ার দিকে তাকালেই এটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে। **১৯১৭ সাল ও ১৯৩০ সাল, মাত্র তের বৎসরের ব্যবধানে রাশিয়া সমস্ত দেশের নিরক্ষরতা দূর করেছিল।** সে দেশে শিক্ষার প্রসার ও ব্যাপকতা দেখে বিশ্ব-বরেণ্য রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালে রাশিয়া থেকে লিখেছিলেন, "আপাতত রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।" "এখানে এরা যা কাণ্ড করছে তার ভাল-মন্দ বিচার করবার পূর্বে সর্ব প্রথমেই মনে হয় কি অসম্ভব সাহস।... পাশ্চিম মহাদেশ বিজ্ঞানের জাদুবলে দুঃসাধ্য করে, দেখে মনে মনে তারিফ করি, কিন্তু এখানে যে প্রকাণ্ড ব্যাপার চলছে সেটা দেখে যতটা সবচাইতে বেশী বিস্মিত হয়েছি, শুধু যদি একটা ভীষণ ভাঙচুরের কাণ্ড হত তাতে তেমন আশ্চর্য হতুম না; ... নাস্তানাবুদ করবার শক্তি এদের যথেষ্ট আছে, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, বহুদূর-ব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে এরা একটা নূতন জগৎ গড়ে তুলতে কোমর বেঁধে লেগেছে।" রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এসে বলেছিলেন, "Wipe out the blot of illiteracy with all its dirt and uncleanniness". দেশ যদি প্রকৃত স্বাধীন হতো, তাহলে কুড়ি বৎসর পরও

দেশের শতকরা আশিজন লোক নিরক্ষর থাকতো না।

"তথাকথিত স্বাধীনতা" কথাটি অধ্যাপক মহাশয় ব্যবহার করায় শ্রীগুহ-রায় আপত্তি জানিয়েছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি অন্যান্য স্বাধীন দেশের নাগরিকরা উত্তেজনা, উদ্দীপনা, আনন্দের মধ্যে আড়ম্বর সহকারে তাঁদের দেশের স্বাধীনতা উৎসব পালন করে থাকে। কিন্তু বিভক্ত ভারতবর্ষের অংশ ভারত রাষ্ট্রের নাগরিকদের, ১৫ই আগস্ট স্বাধীতা দিবস পালনের জন্য মনে তেমন উত্তাপ সৃষ্টি করে না কেন? স্বাধীনতা দিবস পালন করার জন্য তারা উদ্বুদ্ধ হয় না কেন? শ্রীগুহরায় ভেবে দেখবেন আশা করি।

বিরুদ্ধ মতাবলম্বী কোন ব্যক্তিকে সহ্য করবার মত উদার মনোভাব গান্ধীজীর তেমন ছিল না। গান্ধীজীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি পদের জন্য, ডাক্তার পট্টভি সীতারামায়ার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হবার পর, গান্ধীজী বলেছিলেন, 'Sitaramyya's defeat is my defeat, after all Subash Babu is not an enemy of the country'. সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে এরূপ নাস্তিবাচক বাক্য ব্যবহার করে প্রশংসাপত্র গান্ধীজীর দেবার কি কোন প্রয়োজন ছিল? তিনি তো অনায়াসে সংশয়হীনভাবে বলতে পারতেন সুভাষবাবু দেশপ্রেমিক, একজন ত্যাগী স্বাধীনতা সংগ্রামী সৈনিক। যদিও কোনরূপ প্রশংসাপত্র সুভাষচন্দ্রের প্রয়োজন ছিল না, তবুও এরূপভাবের প্রশংসাপত্র দেওয়াই কি গান্ধীজীর পক্ষে শোভন হতো না? বিরোধী সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করার যে সব কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল তার বিস্তারিত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। ত্রিপুরী কংগ্রেস অন্তে সভাপতির পদত্যাগ করার পর সুভাষচন্দ্রকে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'নেতা' বলেই বরণ করেছিলেন। আর সুভাষচন্দ্রই প্রথম ব্যক্তি যিনি গান্ধীজীকে "জাতির জনক" বলে অভিহিত করেছিলেন।

গান্ধীজী কংগ্রেস আন্দোলনের পুরোভাগে এসেছিলেন ১৯২০ সালে।

গান্ধীজী ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা মিটিয়ে, তাঁদের মিলনের একটা চেষ্টা করেছিলেন বটে। তিনি মুসলমানদের তুষ্ট করার জন্য বহির্মুখীন ধর্মীয় খিলাফৎ আন্দোলনকে জাতীয় কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। স্বয়ং মিঃ জিন্না গান্ধীজীর এ কার্যকে অনুমোদন করতে পারেন নি। গান্ধীজী, মৌলানা সৌকৎ আলী, মৌলানা মহম্মদ আলী ভ্রাতৃদ্বয়কে মুক্তি না দিলে লর্ড রেডিং, লর্ড বারকেন-হেডের প্রস্তাবানুযায়ী আলাপ-আলোচনায় বসতে অস্বীকার করেছিলেন। ক্ষুব্ধ হয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গান্ধীজীর এরূপ কার্যের তখন সমালোচনা করে বলেছিলেন, 'mismanaged and bungled.' যে সব মুসলমান গান্ধীজীর চারিদিকে এসে ভিড় জমিয়েছিলেন, তাঁরা আলী ভ্রাতৃদ্বয় সহ একে একে প্রায় সকলেই কংগ্রেস ছেড়ে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলীম লীগে যোগ দিয়েছিলেন। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদে (communal award) তপশীল সম্প্রদায়ের জন্য যে ব্যবস্থা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে গান্ধীজী আমরণ অনশনের হুমকী দিয়ে অনশন আরম্ভও করেছিলেন, কিন্তু মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথার আইনসভায় আসন সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে গান্ধীজী একটি কথাও বলেন নি। তাঁর প্রভাবাধীন জাতীয় কংগ্রেস একটি অদ্ভুত প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল neither accept nor reject অর্থাৎ ম্যাকডোনাল্ড সাহেব মুসলমানদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করে যে রোয়েদাদ দিয়েছিলেন তা 'না গ্রহণ না বর্জন' এই নীতি কংগ্রেস গ্রহণ করেছিল। গান্ধীজীর কর্মকৌশলের মধ্যে ভুল ছিল বলে তাঁর তথাকথিত হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। অহিংস আন্দোলনের শেষ পরিণতি হয়েছে দেশ-বিভাগ। দেশ-বিভাগ করে আপোষে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে নেবার ইতিহাস আজ বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনা করতে গেলে পৃথকভাবে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখার দরকার হবে। একথাও ঠিক যে, মিঃ জিন্না প্রথমেই দেশ-বিভাগ চান নি, তিনি একটা আপোষের জন্য গান্ধীজীর দরজায় ধর্ণা দিয়ে বিফল মনোরথ হবার পর চরম পথ নেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। ক্যাবিনেট মিশন ভারতবর্ষ বিভাগের জন্য মুসলীম লীগের দাবি প্রত্যাখ্যান করে অখণ্ড ভারতবর্ষকে ক্ষমতা হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়ে একটি পরিকল্পনা দিয়েছিলেন, কিন্তু অখণ্ড ভারতবর্ষের লোকদের দুর্ভাগ্য, গান্ধীজী প্রভাবাধীন জাতীয় কংগ্রেস শেষ অবধি ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান গ্রহণ করে নি। ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যের যে সময় সেই সময়ে দেশে অনেক কিছুই ঘটে গিয়েছিল, তার আলোচনা এখানে দরকার নেই। অখণ্ড ভারতবর্ষের মুসলমানদের বিরাট অংশের সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলীম লীগের ১৯৪০ সাল থেকে অবিসংবাদী নেতা হয়েছিলেন মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না। মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে মুসলীম লীগ ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিজাতি-তত্ত্বের ওপর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবিতে ভারতবর্ষ বিভাগ করে মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি পাকিস্তান দাবি করেছিল। গান্ধীজী পূর্ব থেকে সতর্ক করেছিলেন "Vivi section of India is a sin." তিনি একথাও বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করতে হলে, তা তাঁর মৃতদেহের ওপর দিয়েই করতে হবে, "India could only be partitioned over his dead body alone".

ইংরেজ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেবার ব্যবস্থা করার জন্য লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনকে ভারতবর্ষের বড়লাট ও বৃটিশ রাজপ্রতিনিধি করে পাঠিয়ে দিয়েছিল, লর্ড মাউণ্টব্যাটেন মনস্থির করে নিয়ে ভারতবর্ষের মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন, ১৯৪৭ সালের ২২শে মার্চ তারিখে। কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের নেতৃবর্গ ও ভারতবর্ষের অন্য কয়েকটি সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতবর্ষ বিভাগ করে ক্ষমতা হস্তান্তর করার একটি পরিকল্পনা ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন তারিখে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগকে দিলেন। গান্ধীজী প্রভাবাধীন সংগ্রাম-বিমুখ কংগ্রেস নেতৃবর্গ ক্ষমতা গ্রহণ করবার জন্য অত্যধিক ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন। ভয় ছিল পাছে বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা অধিকার করে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। আর তাদের হাতে এসে সাধের ক্ষমতা আসবার পথ বন্ধ হয়ে যায়। ইংরেজ লেখক (মাইকেল এডোয়ার্ড) সেই জন্য লিখেছেন যে, 'সুভাষচন্দ্র বোসের ছায়া তাঁদের মাথার উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে এরূপ দৃশ্য দেখে তাঁরা আতঙ্কে উঠতেন।' কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ৩রা জুনের মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। মিঃ জিন্নার দাবি সম্পূর্ণ পূরণ না হলেও maimed, mutilated পাকিস্তান নিয়েই ভারতবর্ষের মুসলীম লীগের অবিসংবাদী নেতা মিঃ জিন্না স্বীকার করেছিলেন, কারণ ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিজাতিতত্ত্বের ওপর ভারতবর্ষের মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাস-ভূমি তাঁকে অর্জন করতে হবেই এই ছিল তাঁর সংকল্প। ১৯৪৭ সালের ১৪ই জুন দিল্লীতে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে গান্ধীজী বিহার থেকে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। যে গান্ধীজী বলেছিলেন. "Vivi section of India is a sin." যে গান্ধীজী এক সময় বলেছিলেন, ভারতবর্ষ বিভাগ তাঁর মৃতদেহের ওপর দিয়ে করতে হবে। সেই গান্ধীজী, যিনি মহাত্মা, সত্যাগ্রহী বলে

খ্যাত ছিলেন, তিনি সত্যভ্রষ্ট হলেন। তিনি অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যবর্গকে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ভারতবর্ষ বিভাগের ওয়া অনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছিলেন, কারণ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি উক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করার প্রস্তাব নিয়েছিল। তিনি একথাও বলেছিলেন স্পষ্টভাবে যে তিনি সংগ্রাম করার আর ঝুঁকি নিতে পারবেন না। কংগ্রেস সোসিয়ালিস্ট দল যাতে দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে ভোট দানে বিরত থাকে সে জন্য গান্ধীজী কংগ্রেস সোসিয়ালিস্টদের নেতাকে অনুরোধ করেছিলেন, ফলে সোসিয়ালিস্ট সভ্যরা ভোট দানের সময় নিরপেক্ষ ছিলেন। দেশ-বিভাগের প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল, যদিও গান্ধীজী নিজের উপস্থিতি ও আবেদনে ১৫৭ জন সভ্যের বেশি সংখ্যক সভ্যকে দলে টানতে পারেন নি। সব চাইতে আশ্চর্যের কথা ৪০ কোটি লোক অধ্যুষিত বিশাল ভারতবর্ষের ভাগ্য নিয়ে রাজনীতির খেলা হলো মাত্র ১৫৭ জন ব্যক্তির ভোটে, দেশের ত্রিশ কোটি অমুসলমানের মতামত নেওয়ার কোন প্রয়োজন গান্ধীজী বা গণতন্ত্রবাদী বলে খ্যাত গান্ধীজী প্রভাবাধীন কংগ্রেস নেতৃবর্গ তখন মনে করেন নি। গান্ধীজীর [illegible] ওপর [illegible] দেশ [illegible] হয় নি। [illegible] সমর্থন ও [illegible] হয়েছে [illegible] নেহরু [illegible] বল্লভভাই [illegible] না হয়ে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে দেশ বিভাগের প্রস্তাব সমর্থন না করে যদি দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেন, তাহলে তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আব্রাহাম লিঙ্কনের মত অক্ষয়, অমর হয়ে থাকতেন। গান্ধীজী বিদ্রোহ করলে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিতে দেশ বিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হতো না এবং লর্ড মাউন্টব্যাটেন দেশ বিভাগ করে আপোসে ক্ষমতা হস্তান্তর করতেও পারতেন না। যুদ্ধকালীন বৃটিশ ভারতের তদানীন্তন সেক্রেটারী অব ষ্টেট মিঃ এল. এস. এমেরীর একটি কথার জবাবে গান্ধীজী বলেছিলেন -

"Let them [the British] withdraw from India and I promise that the Congress and the Muslim League will find it to their interest to come together and devise a home-made solution for the Government of India. It may not be scientific, it may not be after any Western pattern but it will be durable. It may be that, before we come to that happy state of affairs, we may have to fight amongst ourselves. But if we agree not to invite the assistanee of any outside power, the trouble will perhaps last for a fortnight."

গান্ধীজী যে কথা মিঃ এমেরীকে বলেছিলেন সে কথা তিনি লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে বলে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিকে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব অনুমোদন না করার জন্য উপদেশ দিতে পারতেন এবং "We may have to fight amongst ourselves." এর জন্য অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিকে প্রস্তুত হতে বলতে পারতেন। দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ত কিছু হতো, কিন্তু দেশ-বিভাগের ফলে যে নারকীয় বীভৎস হত্যা (লিওনার্ড মোজলের তথ্যানুযায়ী ছয় লক্ষ লোক নিহত হয়েছিল), লুণ্ঠন, নারী-ধর্ষণ ও ধর্মান্তরিতকরণ, সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে, রক্তস্রোত বয়েছে, লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি পিতা পিতামহের বাস্তু, নিজের জন্মস্থান চিরজীবনের জন্য ত্যাগ করে শুধুমাত্র নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য অন্য স্থানে চলে গিয়েছে এবং অসহনীয় জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছে তার চাইতে ক্ষয় ক্ষতি যন্ত্রণা অনেকে অনেক কম ছাড়া বেশি হতো না এবং সর্বকালের সর্বসমস্যের মত একটা ফয়সালা হয়ে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যেত যেমন হয়েছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আব্রাহাম লিঙ্কনের নেতৃত্বে, যেজন্য তাঁর নাম অক্ষয় অমর হয়ে রয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ ও উত্তর অংশে বিভাগ হতে পারে নি, যুক্তরাষ্ট্র নামই রয়ে গিয়েছে। কিন্তু গান্ধীজীর নিকট তাঁর অহিংসা ছিল মুখ্য জিনিস আর অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ছিল গৌণ, কাজেই "We may have to fight amongst ourselves" গান্ধীজীর এই উক্তির কোন সার্থকতা ছিল না, তিনি তাঁর অহিংসাকে বজায় রাখার জন্য উদগ্রীব ছিলেন, "fight" করার কথা যে তিনি বলেছিলেন সেটা তাঁর মনের কথা নয়, "fight" করার মত তাঁর মনের দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল না। তিনি আত্মবিশ্বাসও হারিয়ে ফেলেছিলেন।

১৯৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলন আরম্ভ হবার পূর্বে তিনি বলেছিলেন—

'I cannot wait any longer for Indian freedom. I cannot wait until Mr. Jinnah is converted. If I wait any longer, God will punish me. This is the last struggle of my life."

এই কথারও কি সার্থকতা কি? তিনি মিঃ জিন্নাকে convert করার জন্য অপেক্ষা করলেন না ঠিক, কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিজাতিতত্ত্বের ওপর দেশ-বিভাগে সম্মতি ও সমর্থন দিয়ে তাঁর নীতির প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়েছিলেন।

"Compromise is in my very being" ইংরেজের সঙ্গে তিনি আপোষ করবার জন্য সর্বদাই উন্মুখ ছিলেন, তাঁর এই আপোষপন্থী মনোভাব দেখেই এবং গান্ধীজী প্রভাবাধীন কংগ্রেস নেতৃবর্গকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে একটা আপোষের মাধ্যমে ভারতবর্ষকে ইংরেজ শাসনমুক্ত করার প্রয়াস পেতে পেরে গান্ধীজীদের হাতচালে এরূপ সন্দেহ হওয়ায় শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু রামগড় কংগ্রেস অধিবেশনকালে কংগ্রেস মণ্ডপের নিকটবর্তী স্থানে All India Anti-compromise কনফারেন্স করে। এই কনফারেন্সে উপস্থিত থাকার [illegible] সৌভাগ্য হয়েছিল। সেই [illegible] দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দৃপ্তকণ্ঠে শ্রীসুভাষচন্দ্র ১৯৪০ সালের ১৯শে মার্চ দেশ[illegible] আহ্বান করেন—"to resist all e[illegible]ts for a compromise with British Imperialism on this issue (Independence for the t[illegible]ing millions of India), এর জন্য [illegible] মাতৃকার বিপ্লবী বীর সন্তান শ্রীসুভাষচন্দ্রকে গান্ধীজী প্রভাবাধীন কংগ্রেস [illegible] বর্গের নিকট থেকে বিদ্রূপ [illegible] করতে হয়েছিল। দেশ-মাতৃকার [illegible] হীন বীর সংগ্রামী সন্তান শ্রীসুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের মুক্তি, স্বাধীনতার জন্য ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে চরম [illegible]ত হানবার উদ্দেশ্য নিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার সাথে সাথে ইংরেজ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ভারতবর্ষের বাইরে চলে যান। তাঁর আজাদ হিন্দ সৈন্য-বাহিনী গঠনের ইতিহাস আজাদ হিন্দ সৈন্যবাহিনীর মুক্তি সংগ্রামের কীর্তি-কাহিনী সকলেরই জানা আছে। সংগ্রামরত শ্রীসুভাষচন্দ্র ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে সিঙ্গাপুর থেকে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে দেশবাসীকে বলেছিলেন—

"I have no doubt that if India is divided, she will be ruined. I vehemently oppose the Pakistan scheme for the vivi section of our motherland, our divine motherland shall not be cut up."

তাঁর সতর্কবাণী গান্ধীজী প্রভাবাধীন কংগ্রেস নেতৃবর্গের চিন্তাধারা বদলাতে পারে নি, তাই ভারতবর্ষের মুক্তি-[illegible]

প্রভৃতি কংগ্রেস নেতৃবর্গ সম্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন [illegible] দেশ-বিভাগজনিত এক বিরাট [illegible] মধ্যে পতিত হয়েছিল এবং [illegible] ফল দেশবাসী এখনও ভোগ করছে।

গান্ধীজীর একান্ত অনুরাগী ও অনুগামী মহাপ্রাণ ব্যক্তি, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন বীর সৈনিক, যিনি হিন্দুদের শ্রদ্ধা, প্রীতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খুদাই খিদমৎগার দলের নেতা খান আব্দুল গফফর খান (বাদশা খাঁ) রাজনৈতিক কার্যব্যপদেশে ১৯৫৫ সালে পূর্ববঙ্গ সফরকালে, ১৩ই ডিসেম্বর রাজসাহীতে আগমন করেছিলেন এবং ঐদিন সন্ধ্যার পর আমার গৃহে শুভ পদার্পণ করে হিন্দু নরনারীকে দর্শন দিয়েছিলেন। সেইদিন আমরা তাঁকে অনেক কথার মধ্যে পাকিস্তান সম্বন্ধে একটি কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই সৌম্য, সমাহিত পুরুষ কিছুক্ষণ নীরব থেকে গভীর দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন—'গান্ধীজী আমাদের ডুবিয়ে দিয়েছেন' (Gandhiji has let us down)। এই মহাপ্রাণ ব্যক্তি মাতৃভূমি ত্যাগ করে কাবুলে অবস্থান করছেন। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে তিনি বলেছেন—

"It makes me at once happy and sad, happy because the people of India have remembered me in connection with Gandhiji and sad because the force of circumstances has separated us.... Everybody knows how, ever since we (Pakhtoons) formally joined the struggle for India's freedom at Karachi in 1931, we shrank from no sacrifice and continued to struggle for India's Independence. But when freedom came, the settlement was reached without our being consulted."

তাঁর উক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয় দেশবাসীর অধিকাংশের কোন মত না নিয়ে দেশ-বিভাগ করে পাকিস্তান ও ভারত নামক দুটি দেশের সৃষ্টি হয়েছে। দেশ-বিভাগের জন্য কি দারুণ মানসিক যন্ত্রণা, হৃদয়ের বেদনা তিনি এবং তাঁর সাথে দেশের কোটি কোটি নরনারী অহর্নিশ ভোগ করছেন।

বঙ্গ-বিভাগ রদ আন্দোলন সময়ে দেশবাসীর মনে ভ্রাতৃত্ববোধ জেগে উঠেছিল। মৈত্রী ও একতার বন্ধনে তাঁরা আবদ্ধ হয়েছিলেন। এই দৃশ্য দেখে সেই কালে ১৯০৭ সালে বারাণসীতে কংগ্রেস অধিবেশনে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেছিলেন—

"He (Lord Curzon) has built better than he knew; he has laid broad and deep the foundations of our national life, he has stimulated those forces which contribute to upbuilding the nations, he has made us a nation, and the most reactionary of the Indian Viceroys will go down to prosterity as the architect of the Indian National life."

১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ সরকারের প্রথম ঘোষণাপত্রে বলেছিলেন—

"In the name of God, in the name of bygone generations who have welded the Indian people into one nation."

প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের জনগণ একটি জাতি হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল ও সাথে সাথে যে জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেছিল জিন্না সাহেব ও মুসলিম লীগের ধর্মের ভিত্তিতে দ্বিজাতিতত্ত্বের ওপর ভারতবর্ষকে বিভাগের দাবিকে স্বীকার করে নিয়ে দেশ-বিভাগে সম্মতি ও সমর্থন দিয়ে গান্ধীজী সেই জাতিকে দ্বিখণ্ডিত করে জাতীয়তাবাদকে হত্যা করে গিয়েছেন। দেশ-বিভাগের সাথে সাথে গান্ধীবাদও অচল হয়ে গিয়েছে। গান্ধীজী নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন যে গান্ধীবাদ সচল অবস্থায় নেই, সেইজন্য তিনি গভীর দুঃখে নোয়াখালিতে জীবন সিংহকে বলেছিলেন,

"আমার তপস্যা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে।"

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে গান্ধীজী একটি স্মরণীয় নাম, তাঁর অবদানকে যথাযোগ্য মূল্য দিয়েই থাকি। তবে তথাকথিত গান্ধীবাদের [illegible] আমি গান্ধীজীর অন্ধ-স্তাবক নই। গান্ধীজী মহান পুরুষ, কিন্তু তিনি পুরুষোত্তম ছিলেন না। তিনি যে [illegible] প্রমাণ ভুল করেছিলেন তাঁর সেই [illegible] খেসারৎ দিচ্ছি আমরা। ভগবান জানেন আর কতকাল দেশ-বিভাগের [illegible] প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

—[illegible]
কসবা, কলকাতা—৪২

সাপ্তাহিক বসুমতী

উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির তহবিলে দান

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

১৯৬·৭৩ টাকা : লিলুয়া (হাওড়া) রেল কলোনীর বন্ধুবর্গ। এঁরা পুরনো কাপড়-চোপড়ও দিয়েছেন।

১৮৬·২৫ টাকা : 'উদয়ন'-এর কর্মী-বৃন্দ, যতীনদাসনগর, বেলঘরিয়া।

১৭৩·২৮ টাকা : সীতারামপুরের ইউ-নাইটেড ক্লাব, পোঃ সীতারামপুর (বর্ধমান জেলা)। এঁরা পুরনো কাপড়-চোপড়ও দিয়েছেন।

৭০·০০ টাকা : ইটাচুনা কলেজ স্টুডেন্টস্ ফেডারেশন, ইটাচুনা, হুগলী।

৫১·০০ টাকা : 'উত্তরপাড়া অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠে'র পক্ষে শ্রীসুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায়। এঁরা কিছু বস্ত্রও (পুরনো) দিয়েছেন।

৩৬·১০ টাকা : 'বিদ্যুৎ রঙ্গম', লিলুয়া (হাওড়া) পাওয়ার হাউস, ইস্টার্ন রেলওয়ে।

প্রত্যেকে ২০·০০ টাকা : সুশীলকুমার গাঙ্গুলী, কলকাতা-১২। ডি এন সেন, হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলকাতা।

১৫·০০ টাকা : ও কে ট্যাণ্ডন, হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলকাতা।

প্রত্যেকে ১০·০০ টাকা : এস সি রায়, নাকতলা, কলকাতা-৪৭। অনিমেষ দাশগুপ্ত, ল্যান্সডাউন রোড, কলকাতা। সুধীরচন্দ্র পাল, লক্ষ্মীপল্লী, নেতাজী সুভাষ রোড।

প্রত্যেকে ৫·০০ টাকা : শ্যামচরণ দে, কলকাতা-৫। তাপস পাল, কলকাতা ২১। নারায়ণ চৌধুরী, কলকাতা-৭। অরবিন্দ দাশগুপ্ত, নাকতলা, কলকাতা। চামেলী বসু, কলকাতা। বাণী সেন, বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা। মাধুরী সোম, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৩১। অরুণা দে, হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা। আভা বর্ধন, নাকতলা। অশোক চ্যাটার্জী, সেণ্ট জেভিয়ার্স হোস্টেল। শক্তিপ্রসাদ সামন্ত, বালি (হাওড়া)। প্রভূলকুমার রায় জেনিন্স রোড, লিলুয়া (হাওড়া)। জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ, বেলুড় (হাওড়া)। চিত্রা চক্রবর্তী, জেনিন্স রোড, লিলুয়া (হাওড়া)।

প্রত্যেকে ৩·০০ টাকা : শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত, লিলুয়া (হাওড়া)। ইভা সেনগুপ্তা, গ্রীক চার্চ রো, কলকাতা। অপর্ণা মিত্র, সুরেন ঠাকুর রোড, কলকাতা। [ক্রমশঃ]

শরৎচন্দ্র বসু—একটি ঘটনা

শ্রী শশাঙ্কশেখর সান্যাল

৭ই আশ্বিন, ১৩৫৩ সাল (২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬) মঙ্গলবার। চতুর্দশী অমাবস্যার সন্ধিক্ষণে 'মহালয়ার আশ্রয়ে উড়োযানে কলিকাতা থেকে দিল্লী এসেছি। প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য শরৎবাবু অন্তর্বর্তী সরকারের বড়লাটের মনোনীত মন্ত্রিত্বে কতখানি অসুস্থ বোধ করছেন তা যাচাই করা। প্রচ্ছন্ন ও আসল উদ্দেশ্য ছিল বিড়লা ভবনের গভীর গহ্বরে বাঙলা দেশের দুর্ভাগ্যের বনিয়াদ কিভাবে এবং কতখানি গাঁথা হয়েছে তার একটু আঁচ নেওয়া।

একটু ছুঁয়ে রাখা দরকার মে/জুন মাসে কেন্দ্রীয় আইনসভার দীর্ঘ অধিবেশন অন্তে দিল্লীর লুকোচুরির অন্তরালে যে সব আভাস ইঙ্গিত পেয়েছিলাম তাতে বাঙালীদের মধ্যে বোধ হয় আমি অন্যের আগেই বুঝতে পেরেছিলাম যে ভারত তথা বঙ্গদেশ ব্যবচ্ছেদের পূর্বগামিনী ছায়াকায়ার সন্ধানে কংগ্রেস নেতাদের চিন্তার কোণে সন্তর্পণ আশ্রয় পাচ্ছে। এটা আমার রাজনীতি প্রতিভা বা সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচায়ক নয়। ১৯৪৬। জানুয়ারী থেকে এপ্রিলের শেষ ভাগ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় পরিষদ বৈঠকাসীন থাকা কালে সদস্য হিসাবে যে সব তথ্য ও তত্ত্ব আমার আমলে আসার কোন সম্ভাবনা ছিল না সে সব অনায়াস গোচরে আসত নয়াদিল্লীর দুই অভিজাত হোটেলের দুই বন্ধুর মারফতে। এঁরা ছিলেন ইম্পিরিয়াল ও মেডেন হোটেলের খানা পরিবেশক—বাঙালী মুসলমান। মন্ত্রী মিশন গোষ্ঠী ও তৎশ্রেণীর নানাবিধ সংস্থা অনুসন্ধানী মোলাকাতে সারাদিন কর্মব্যস্ত। নৈশ-ভোজনে এই সব ইংরাজ ধুরন্ধর কূট-নীতিবিদরা নিজেদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতেন। পানের কল্যাণে প্রাণের দরজা তখন দরাজ দিলখোলা। আমার বন্ধুরা ভাষা দিয়ে সবটা না বুঝলেও ভঙ্গিমার ও ভাবের ধ্বনিতে অনেকটা অনুভব করতে পারত। তা ছাড়া তাদের সৌজন্যে আমি ২।৪ দিন স্বয়ং খাহালি একটিমির কাজ দিয়ে ভারতবর্ষের ভাগ্যরথের কুয়াশা ঢাকা ধ্বজা দেখতে পেয়েছিলাম। এসব ও আরও অনেক কথা অদূর ভবিষ্যতে দেশভাগের সিদ্ধান্ত অঙ্কন প্রসঙ্গে সবিশেষ জানাব।

॥ দুই ॥

বিমানঘাঁটি থেকে ১৪নং ফিরোজ শা রোডে আমার আস্তানায় এসে টেলিফোনে শরৎবাবুর মন্ত্রিভবনে নোটিশ দিলাম যে আমি সেখানে নৈশ-ভোজের অতিথি। পারিবারিক মজলিস, বেশ জমেছে। বাহিরের লোক আমি ছাড়া পুরুষোত্তম মেঘজী কাবালি। ইনি ছিলেন অসামরিক বিমান চালকদের মধ্যে ভারতীয়দের অন্যতম প্রথম ও প্রধান। তা ছাড়া শ্রীসুভাষচন্দ্র ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত বার্লিনে থাকাকালীন কাবালি তাঁর বিশেষ আস্থাভাজন সহযাত্রী ছিলেন। হিটলার তখনও প্রত্যক্ষ ক্ষমতায় আসেন নি। একই বাড়ির ওপরতলায় হিটলারের অফিস ও আবাস, তারই নিচু-তলায় দেড়খানা ঘরে একটা ভুতুড়ে ফ্ল্যাটে শ্রীসুভাষ ও শ্রীকাবালি অফিস করলেন। হাসি-ঠাট্টার মধ্যে যে-সব কথা হয়েছিল তার মধ্যে মনে আছে যে মন্ত্রী হিসাবে তাঁর আমদানি হয় তাতে এক সপ্তাহ সঙ্কুলান হয় না। খাপছাড়া কাজের প্রতি কটাক্ষ করে বললেন, "শশাঙ্ক! সারা জীবন ধার করেছি ও শোধ করেছি তাতে কোন আক্ষেপ হয় নি, এখন যা করছি তাতে তৃপ্তি বা উৎসাহ পাই না, ন দেবায় ন ধর্মায়।" তাঁর মনের ভাব হাল্কা করার জন্য রসিকতা করে বললাম, "আর আপনার এখানে আসব না, শেষে আমার কাছেই ধার চেয়ে বসবেন।" কাবালি ফোড়ন কাটলেন, "আর হয় ত' তাও শোধ হবে না।"

॥ তিন ॥

২৭।৯।'৪৬। মন্ত্রী বাংলোর অলিন্দ। শরৎবাবু ও আমি মুখোমুখি একান্তে আলোচনারত। দুদিন ধরে মাটির তলার যে সব খবর পেয়েছি তা তিনি জানেন কি জানেন না দেখতে হবে। তাঁর নিজস্ব সচিব—সম্ভবত ভাস্করণ—খবর দিলেন সর্দার প্যাটেল টেলিফোনে। শরৎবাবু উঠে গেলেন, আবার এসে বসলেন।

আমি—সর্দার কি বলেন?

শরৎবাবু—আচার্য কৃপালনী আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি হলে কেমন হয় তাই জিজ্ঞাসা করছিলেন।

সামনে টেবিলে সভাপতি মনোনয়নের একটা ছাপা ফরম আমার নজরে আগেই পড়েছিল।

আমি—জানেন যে মুসলিম লীগ মন্ত্রিত্বে আসছে? (ইতিপূর্বে অন্তর্বর্তী মন্ত্রিত্ব বয়কট করে লীগ বাইরে ছিল)।

শরৎবাবু—অসম্ভব নয়।

আমি—আরও জানেন দুইজন মন্ত্রীকে গদী ছাড়তে হবে—একজন বর্ণহিন্দু, অন্য তপসিলি—কারণ সংখ্যা ভিত্তিতে ত্রৈরাশিক নিয়মে সে দুইটি লীগের কোঠায়।

শরৎবাবু—এটাও অসম্ভব নয়।

আমি—কিন্তু যেটা অসম্ভব সেইটাই হতে চলেছে। অর্থাৎ যে গতকাল বিরোধী নেতা ছিল এবং বর্তমানে গণতন্ত্রের রীতি ও নীতি ধরায় প্রধানমন্ত্রীর আসন পেতে হকদার আগামী কাল তাকে সরতে হবে।

শরৎবাবু—ব্রাহ্মণের অনেক কথা ফলেছে—এটা অভ্রগণার তা বলব না তবু খুবই অসম্ভাবিত। গণতন্ত্রের জবাই হবে যে।

আমি—আপনাকে গণতন্ত্র মন্ত্রী করে নি। কংগ্রেসী ধনতন্ত্র সুভাষের দিকে তাকিয়ে তার দাদাকে আপোষ ব্যবস্থায় পক্ষ করার জন্য গদীতে বসিয়েছে এবং দেশবিভাগ বুনিয়াদে বার্থ স্বাধীনতার নিরাপত্তার জন্যেই বৃটিশ চাপে সুভাষের দাদাকে সরান হচ্ছে।

আমি শুধালাম, "ও ফরম কি জন্য?"

উঃ—আচার্য কৃপালনীর সভাপতি মনোনয়ন আমাকে প্রস্তাব করতে হবে এই অনুরোধ জানিয়ে ওটা আমার কাছে পাঠিয়েছে।

আলোচনা ছোট করে বললাম।

"লিডার' (আমি তাঁকে লিডার সম্বোধনেই ডাকতাম—কখনও মিস্টার বোস বা শরৎবাবু বলিনি) আপনাকে মন্ত্রিত্ব ছাড়তে হবে। এটা মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছা ও নেতৃবৃন্দের প্রয়োজন। যদি ছাড়তে না হয় ভালই। যদি ছাড়তেই হয় তবে কংগ্রেস সভাপতির পদ দাবি করবেন।

আদান-প্রদানের বাহিরে যাবেন না। বন্ধ-ক্লান্ত হয়ে মাথা নিচু করে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়া চলবে না। এই প্রসঙ্গে জানা দরকার ২৬।৯।৪৬ তাং শরৎবাবু, সৈয়দ নওসের আলি ও আমি সর্দার প্যাটেলের ভবনে তাঁর সংগে বাংলার সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা কালীন লীগ আগমনের কোন উল্লেখ হয় নি। সর্দার তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

॥ চার ॥

২৮।৯।৪৬—বিড়লা ভবনে মহাত্মা গান্ধীর প্রাসাদ কুটীর।

মহাত্মা—শরৎ! লীগ আসছে। হয় তোমাকে নয় সর্দারকে পথ ছাড়তে হবে।

শরৎবাবু—এ প্রশ্ন কেন উঠছে?

মহাত্মা—কেন?

শরৎবাবু—একজন কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন। অন্যজন বিরোধী নেতা হিসাবে সম্ভাবিত প্রধানমন্ত্রীর পর্যায়ের।

মহাত্মা—তবে বর্ণহিন্দুদের মধ্যে কে যাবে?

শরৎবাবু—কেন? রাজাজী (রাজাগোপালাচারী)।

মহাত্মা—সে হয় না শরৎ। রাজা মাদ্রাজে খুব অপ্রিয়। তাকে সেখানে পাঠাতে পারব না। দিল্লীতেই রাখতে হবে। তুমি বরং বাংলায় গিয়ে অনেক কাজ করতে পারবে।

শরৎ-সেখানে ত' মন্ত্রিত্ব ও সরকারি শক্তি লীগের হাতে। আমি সেখানে গিয়ে অপসারিত চেহারা নিয়ে কিসের উপর শিকড় গাড়ব?

মহাত্মা—সে পথ বার [illegible] [illegible]।

॥ পাঁচ ॥

দিল্লীতে দম আটকে আসছে। রাগ হচ্ছে সুভাষের উপর। সিংহের অনুপস্থিতিতে রাজনীতিতে গর্জন স্তব্ধ, ফেরুর পাল গুলবাগিচায় প্রেমের গান ধরেছে। বেরিয়ে পড়লাম; সঙ্গে কাঙালি ও যুবক ছাড়দার বন্ধু কুমার সিং। উদ্‌ভ্রান্ত মনে হরিদ্বার, কনখল, হৃষীকেশ, লছমনঝোলা ইত্যাদি চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়ালাম, কোথাও শান্তি নেই। হঠাৎ মনে অপরাধীর ভাব এল, কে যেন বলে দিল শরৎকে যা বলে চলে আসা অন্যায় হয়েছে। এ সময় তাঁর কাছেই থাকা উচিত। ফিরে গেলাম ৩০।৯।৪৬। সোজা তাঁর ডেরাতে। শ্রদ্ধেয়া বিভাবতী চা খাওয়াচ্ছেন। স্নানাগার থেকে উদ্দাম হাসি ফাটিয়ে বার হলেন প্রৌঢ় শিশু। নিতান্ত অগম্ভীর ভাব। "শশাঙ্ক! তোমার হাসি আমি কেড়ে নিয়েছি তুমি এত গুমট কেন?"

আমি বললাম, "হাসিতেই সব। চলুন বাংলাদেশের বুকে বসে যত পারি হাসব।"

"কোথায় উধাও হয়েছিলে?"

আমি—সমস্ত কান্নার লাগেজ হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডে দিয়ে এসেছি। এবার আর কান্না নয়। শুধুই হাসি। তারপর শুধোলাম, "এই বাড়ি [illegible] [illegible] [illegible] এর পর আপনি ত' বেকার—আমার [illegible] [illegible] [illegible]।" [illegible] জানালেন [illegible] জন্য [illegible] [illegible] এসে দিল্লীর দেনা চুকিয়ে যাবেন।

আমি বললাম, "সেই ছাপা ফরমটা কি হল?"

উঃ—কৃপালনীর নাম প্রস্তাব লিখে পাঠিয়ে দিয়েছি।

আমি উদ্ধত উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাকে সভাপতি করার সংগত দাবি কেন সেদিন করলেন না?"

অভিমানে উদ্বেল হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত নিশ্বাস সংযত করে বললেন, "শশাঙ্ক! আমি ত' জীবনে কারুও কাছে কিছু চাই নি।" আমার পিঠে হাত দিয়ে দাঁড়ালেন। আমার চোখে তখন জল। অচঞ্চল নিরুদ্বেগ বিভাবতী বললেন, "আর একবার চা খাবেন না?"

মহাত্মা গান্ধীর অবিসম্বাদী মহত্বকে কত নিচে ফেলে শরৎবাবুর বিশাল বক্ষ সেদিন আরও কত বড় দেখাচ্ছিল আজও সে কথা মনে করে আমার মাথা সম্ভ্রমে আপনি নত হয়।

॥ ছয় ॥

মীরাট—কংগ্রেস অধিবেশন ১৯৪৬ নভেম্বর। প্রকাশ্য মঞ্চে সভাপতি আচার্য কৃপালনীকে দেখাচ্ছে যেন বাজাহারা নৃপতি। কেমন একটা অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া। এক কোণে বসে আছেন সর্দার প্যাটেল—নিথর নিশ্চল, তিনি মঞ্চ-ইঙ্গিতে জানাচ্ছেন তিনিই চাবিকাঠি। আর সব মেজো সেজো নেতারা ছায়ামূর্তির ন্যায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ শ্রোতা মণ্ডপে চাপা গুঞ্জন "বাংলার শিবির থেকে বঙ্গ-বিভাগ দাবি করে ইস্তাহার বিলি হচ্ছে"। সকলেই অবাক হতভম্ব—অবশ্য আমি নই। জানতাম যা হবার তাই হচ্ছে। এই শিবিরে প্রধান নায়ক তখন ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ—যিনি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের পর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং ভবিষ্যতে হয়ত হবেন। এ ছাড়া শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ-মধুদা—যিনি ভারতবর্ষ ছেড়ে স্বাধীন ভারতে বাঙালী বাঙালী হাতে সংসদে বাংলার ও বাঙালীর প্রতিনিধি হয়ে প্রায় কুড়ি বছর জাতির সেবা করছেন। আরও অনেকে যাঁরা দেশকে কসাই দিয়ে কেটে দেশপ্রেমিক হয়ে নেতৃত্ব করছেন। সেই দিন আরও ভাল করে বুঝলাম শরৎচন্দ্র বসু পাছে খণ্ডিত স্বাধীনতার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ান তাই তাঁকে সরকারি মঞ্চ থেকে উৎখাত করা হল এবং সেই কারণেই বেসরকারি নেতৃত্বের দরজাও তাঁর জন্য খোলা রইল না। তবুও অভিশপ্ত আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতিকে সম্বোধন করে বলতে হবে—

"[illegible] [illegible] [illegible] পথ্যাহ"।

আমি খুশি হতে পারি।" তবে কংগ্রেসে রক্ষণশীল এবং প্রতিক্রিয়াপন্থীদের প্রাধান্য দেখে তিনি তখনই অনুধাবন করেছিলেন যে, তাঁর প্রচেষ্টা বোধ হয় সফল হবে না। তিনি সে কথা প্রমাণ করতেও দ্বিধা করেন নি। বলেছিলেন, "তবে আমি বুঝতে পারছি কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য বোধ হয় অতখানি এগোতে রাজী হবেন না। জাতীয়তাবাদের পিছুটান তো আছেই। তার উপর কায়েমী স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হারাবার ভয়ে আমাদের মধ্যে অধিকাংশই দ্বিধাগ্রস্ত। সেই সব কায়েমী স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ইতিমধ্যেই আমাদের বিরোধিতা করতে শুরু করেছে। এমন কি রাজনৈতিক সংগ্রামেও তাদের কাছ থেকে বিরোধিতা ছাড়া আর কিছুই আমরা আশা করতে পারি না।"

ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রাক্কালে নেহরুর বিরোধিতায় কায়েমী স্বার্থবাদীরা এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, গান্ধীজী প্রস্তাব করেছিলেন, নেহরু এবং বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে কংগ্রেস দুটো পৃথক দলে ভাগ হয়ে যাক। নেহরুর খ্যাতি বিবর্জিত কংগ্রেস দক্ষিণপন্থীদের অনুকূলে যাবে না বুঝে সেই প্রস্তাব বাইরের আলো দেখবার সুযোগ পায় নি এবং নেহরুর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসই ইংরাজের হাত থেকে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হয়েও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নেহরু কখনও পান নি। কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূরা পর্দার অন্তরালে থেকে তাঁর সমাজতান্ত্রিক আদর্শ রূপায়ণের প্রতি পদক্ষেপে তীব্র বাধা সৃষ্টি করেছে। নেহরু সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী হলেও গণতন্ত্রের পূজারী ছিলেন। তিনি অকস্মাৎ জোর জবরদস্তি করে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান নি। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অধিকাংশ মানুষের সম্মতি নিয়ে তিনি নতুন সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন। প্রতিক্রিয়াপন্থীরা তাঁর সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সমাজতন্ত্রের পথে ভারতের অগ্রগতিকে শ্লথ করে দেয়।

নেহরুর মৃত্যুর পর আজ কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তারা বোঝাতে চাইছে যে, নেহরু প্রধানমন্ত্রী হবার আগে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন বটে তবে প্রধানমন্ত্রী হবার পর বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হয়ে তিনি Pragmatic হয়ে যান। তখন তিনি আশু সুবিধার কথা বিবেচনা করে তাঁর নীতি নির্ধারণ করতেন। এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে ১৪ই নভেম্বর দিল্লীর হিন্দুস্থান টাইমস' পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখে ডাঃ আন্নাদোরাই বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভের পর নেহরু সমাজতন্ত্র সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে পড়েছিলেন। জনগণের জীবনযাত্রার মান তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি করবার জন্য তিনি পুঁজিবাদের সাহায্য নিতেও দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন না। কিন্তু আন্নাদোরাই বোধ হয় ওখানে জওহরলালকে ভুল বুঝেছেন। জনগণের জীবনযাত্রার মান তিনি তাড়াতাড়ি উন্নত করতে চেয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু সে ব্যাপারে পুঁজিবাদ যে তাকে কোন সাহায্য করতে পারবে না, সে সম্পর্কে জওহরলাল সুনিশ্চিত ছিলেন। পুঁজিবাদের সঙ্কট সম্পর্কে ১৯৩৩ সালেই তিনি লিখেছিলেন, "বিশ্বের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই পুঁজিবাদ উৎপাদন সমস্যার সমাধান করলেও বণ্টন সমস্যা সমাধানে চরম অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। সম্পদ এবং ক্রয়ক্ষমতা সমভাবে বণ্টনের সমস্যা সমাধান করতে হলে পুঁজিবাদী প্রথার মৌলিক অনৈক্য উচ্ছেদ করে তার জায়গায় আরও বৈজ্ঞানিক কোন প্রথার প্রবর্তন করতে হবে।...পুঁজিবাদ শুধু একের পর এক সঙ্কট সৃষ্টি করে যায় এবং প্রত্যেকটি সঙ্কটের মাত্রা ধাপে ধাপে বাড়তে থাকে। ..বর্তমানে আমরা অবিরাম সঙ্কট ও মন্দার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছি এবং তার থেকেই যুদ্ধের মেঘ ঘনায়মান হয়ে উঠছে। ...কম্যুনিস্ট এবং সোসালিস্টরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এই সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করছে সমাজতন্ত্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে। তাদের শক্তি ক্রমবর্ধমান কারণ বিজ্ঞান আর ন্যায়নীতিই তাদের মূলমন্ত্র।"

ভারতের দারিদ্র্য মোচনের জন্য পুঁজিবাদের আরম্ভ হতে দেখা সম্ভব কি? এমন কি ১৯৫৪ সালেও তিনি লোকসভায় বলেছেন, "আমি ভারতে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করতে চাই। আমি স্বত্বাধিকারকামী কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসতে চাই। কিন্তু শুধু প্রস্তাব পাশ করে অথবা ধ্বনি দিয়ে সেটা সম্ভব নয়। আমি চাই ভারতবর্ষ তার অধিকাংশ মানুষকে নিয়ে সেই পথে অগ্রসর হোক।"

এই উক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর একটি মূল্যবান উপলব্ধি প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তিনি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার একমাত্র পথ ছিল পার্লামেণ্টে একটির পর একটি আইন পাশ করে দেশকে সেই পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সেখানে কায়েমী স্বার্থ ক্রমাগত তাঁর বাধা সৃষ্টি করছিল। সমাজতন্ত্রের অনুকূলে দেশে যে পরিমাণ গণজাগরণ হলে, সেই বাধা অতিক্রম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত, সেটা হয় নি বলে মনে মনে তিনি যথেষ্ট ক্ষোভ অনুভব করছিলেন। গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্রকে যুক্ত করার দুরূহ পরীক্ষায় তিনি যে পুরোপুরি সফল হতে পারছেন না, তা তিনি নিজেও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েন নি। ১৯৫৭ সালে তিনি এ-আই-সি-সির বৈঠকে বলেছিলেন, "আইনসম্মত এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে গণতন্ত্রকে কি করে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করা যায়, এটাই আজ আমাদের সামনে মস্ত প্রশ্ন। এ সমস্যা যতই কঠিন হোক, আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এ সমস্যার সম্মুখীন হতে পারি। আমরা অতীতে অনেক কঠিন কর্তব্য পালন করেছি। এটাও না পারার কোন কারণ নেই। গায়ের জোরে অথবা ভয় দেখিয়ে কিছু করা আমাদের উচিত নয়। আগে আমাদের জনগণের সদিচ্ছা এবং সহযোগিতা লাভ করতে হবে। জনগণের সদিচ্ছা ছাড়া কোন ডিক্টেটরী শাসনও চলতে পারে না, গণতন্ত্র তো একেবারেই পারে না।"

শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সমাজতন্ত্রকে গণতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করার অভিনব পরীক্ষায় নেহরু কতখানি সফল হয়েছিলেন, তা জনগণের বিবেচ্য। তবে তাঁর মৃত্যুর পর সমাজতন্ত্রের পথ থেকে আমরা ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছি বলে অনেকের ধারণা। চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনার অকালমৃত্যুই কি তার মস্ত নিদর্শন নয়? নতুন চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া নিয়ে যে টালবাহানা শুরু হয়েছে তাও কি সেই সমাজতন্ত্র বিদ্বেষতার পরিচায়ক নয়? পরিকল্পিত অগ্রগতি ছাড়া

১৯৩৯শের গোড়ার দিকে।

ওয়াশিংটন ফিজিকেল সোসাইটির সভায় আলোচনা চলছে। আমেরিকান এবং নাম করা য়ুরোপীয় নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানীরা সভায় এসেছেন। এঁদের মধ্যে বিখ্যাত ডেনিশ বিজ্ঞানী নীল বোর; ইটালীয়ান বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মি আছেন। কয়েকজন সংবাদপত্রের রিপোর্টারও উপস্থিত।

আলোচনার মধ্যে নীল বোর একখানা চিঠি পড়তে আরম্ভ করলেন। প্রবল চাঞ্চল্য দেখা গেল উপস্থিত বিজ্ঞানীদের মধ্যে চিঠি পড়া শেষ হতে। ফার্মি লাফিয়ে উঠে ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে গিয়ে ফরমুলা লিখতে আরম্ভ করলেন। আমেরিকান বিজ্ঞানীদের একজন উঠে সংবাদপত্রের রিপোর্টারদের বাইরে যেতে বললেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁদের চলে যেতে হল। চিঠির বক্তব্য ও চাঞ্চল্যের হেতু তাঁরা যতটা বুঝতে পেরেছিলেন পরদিন সংবাদপত্রে তা প্রকাশিত হয়ে বিজ্ঞানীমহলে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করল। আমেরিকান বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ সেই দিনই নিজেদের লেবরেটরীতে ফিরে পরীক্ষার কাজ আরম্ভ করলেন। আমেরিকান সরকার আর বিলম্ব না করে সতর্কতামূলক বিধান জারি করে সভায় আলোচিত বিষয় সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করে দিল।

চিঠিখানি লিখেছিলেন প্রোফেসর লিজে মাইটনার অটো হানের ইউরেনিয়াম পরমাণু বিভাজন সম্বন্ধে। এতদিন ধরে ইউরেনিয়াম পরমাণু নিয়ে পরীক্ষা করে যে সব ফল পাওয়া যাচ্ছিল রেডিও কেমিস্ট ও নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানী অটো হান প্রথমে তার সঙ্গত ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করেছেন ইউরেনিয়াম থেকে যে বেরিয়াম পাওয়া যাচ্ছে তার কারণ ইউরেনিয়াম পরমাণু বিভাজন হয়েছে, এই ছিল চিঠির মর্ম।

এই সাফল্যের জন্য অটো হান নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৪৫ খৃস্টাব্দে। যে গবেষণা ও পরীক্ষার কাজ চালাবার ফলে এই আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল সে কাজ অটো হান একা চালান নি। বার্লিনের উপকণ্ঠে ডালেমে কাইজার উইলহেল্ম ইনস্টিটিউটে এই কাজে তাঁর দু'জন সহকর্মী ছিলেন লিজে মাইটনার ও এফ. স্ট্রাসমান। আবিষ্কার যখন হয় তার আগে মাইটনার জার্মানী ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আবিষ্কারের সম্পূর্ণ তাৎপর্য ও গুরুত্ব বিশ্ব-বিজ্ঞানীসমাজের গোচরে আনবার দায়িত্ব তিনি প্রথম নিয়েছিলেন সুইডেন থেকে।

১৮৭৭ খৃস্টাব্দে ভিয়েনার এক ইহুদী পরিবারে লিজে মাইটনারের জন্ম হয়। ভিয়েনার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

নিয়ে তিনি বার্লিনে এসেছিলেন কোয়ান্টাম মতবাদের জনক ম্যাক্স প্লাঙ্কের কাছে নতুন বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা শোনবার জন্য। সেটা ১৯০৭ খৃস্টাব্দ। রেডিও বিকিরণ সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ছিল। মনে করলেন অবসর সময় এই বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য ব্যয় করবেন। বার্লিনের ফিজিক্স ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টার প্রফেসর রুবেন্স তাঁকে অটো হানের সঙ্গে পরিচিত করে দিলেন। একাধিক আবিষ্কারের ফলে ইতিমধ্যে তাঁর নাম হয়েছিল।

এই সময়ে হান রেডিও কেমিস্ট্রি নিয়ে গবেষণা করছিলেন বার্লিনের কেমিকেল ইনস্টিটিউটের নীচতলার একটি ঘরে যেখানে আগে কাঠের কাজ হত। হান তাঁর বয়সী ডাঃ মাইটনারকে গবেষণার সাহায্যকারী বলে নিতে রাজী হলেন। কিন্তু আপত্তি করলেন ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টার এমিল ফিশার। জার্মানীতে মেয়েদের সম্বন্ধে ধ্যানধারণা তখনও আগেকার যুগের মত ছিল। তিনি মাইটনারকে পুরুষ ছাত্রদের সঙ্গে কাজ করতে দিতে রাজী হলেন না কিছুতেই। অবশেষে হানের অনুরোধে তাঁর 'কাঠের ঘরে' কাজ করবার অনুমতি দিলেন এই সর্তে যে পুরুষ ছাত্ররা যে সব ঘরে কাজ করে সেখানে যাবেন না তিনি।

ডাঃ মাইটনারের অভিপ্রায় ছিল দু' বছর বার্লিনে কাটিয়ে ফিরে যাবেন। তা হল না। ত্রিশ বছর অটো হানের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করলেন তিনি। একসঙ্গে পরীক্ষার কাজ চালিয়েছেন, গবেষণার ফল যুগ্ম নামে প্রকাশিত হয়েছে, কাইজার উইলহেল্ম ইনস্টিটিউটে বিশিষ্ট পদে উঠেছেন, য়ুরোপ-আমেরিকার বিজ্ঞানীসমাজে সুপরিচিত হয়েছেন।

যে গবেষণার ফলে ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস বিভাজন আবিষ্কার হল সে গবেষণা হান, মাইটনার ও স্ট্রাসমান একসঙ্গে চালিয়েছেন। কাজ শুরু হল ১৯৩৪এর ডিসেম্বরে। হান পরীক্ষার

Naturwissen Schaften পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠিয়ে দিলেন ১২-১২-৩৮ তারিখে। এর কয়েক মাস আগে তাঁর দীর্ঘ ত্রিশ বছরের সহকর্মী ও বন্ধু লিজে মাইটনারকে বার্লিন থেকে চলে যেতে হয়েছিল।

জার্মানিতে কয়বছর আগে এন্টি-সেমিটিক আন্দোলন আরম্ভ হলেও এতদিন মাইটনারকে কাইজার উইলহেল্ম ইনস্টিটিউটে কাজ করতে বাধা দেওয়া হয় নি। অস্ট্রিয়া নাজি দখলে আসবার পরে তিনি যে জাতিতে আর্য নন সেদিকে নাজি কর্তাদের দৃষ্টি পড়ল। তাঁকে যাতে ইনস্টিটিউট ছাড়তে বাধ্য করা না হয়—সে জন্য ম্যাক্স প্লাঙ্ক স্বয়ং; হান ও অন্যান্য বন্ধুরা অনেক চেষ্টা করলেন, ম্যাক্স প্লাঙ্ক খোদ হিটলারকে পর্যন্ত অনুরোধ করেছিলেন শোনা যায়। কোন ফল হল না। শিক্ষা বিভাগের দপ্তর তাঁকে ভিসা দিতে অস্বীকার করল।

হতাশ হয়ে হান দু'একজন বন্ধুর সহযোগে হল্যান্ডের কয়েকজন নাম করা বিজ্ঞানীকে অনুরোধ জানালেন বিনা ভিসায় ডাচ সরকার যাতে মাইটনারকে প্রবেশ করতে দেন সেই চেষ্টা করতে। তাঁরা অনুরোধ রক্ষা করলেন। ইতিমধ্যে সুযোগে মাইটনার হল্যান্ডে পালিয়ে গেলেন এবং সেখান থেকে সুইডেনে চলে গেলেন।

প্রবন্ধ প্রকাশ করবার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে অটো হান পরীক্ষার ফলে প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং ইউরেনিয়াম পরমাণু বিভাজন যে সত্যই ঘটেছে সে সম্বন্ধে নিজের মনের সংশয় জানিয়ে স্টকহল্মের ঠিকানায় মাইটনারকে চিঠি লিখলেন এবং উত্তরের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলেন। মাইটনারের বিচারবুদ্ধির ওপর তাঁর গভীর আস্থা ছিল। সংশয়ের কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন :

"As chemists we are in

new bodies are not radium but barium...As nuclear chemists we cannot decide to take this step in contradiction to all previous experience in nuclear physics."

স্টকহলম থেকে এই চিঠি সমুদ্র উপকূলের ছোট শহর কুঙ্গেলেভে মাইটনারের হাতে পৌঁছল। নির্বাসনে ছুটি কাটাবার জন্য এখানে একটি পারিবারিক বোর্ডিং হাউজে বাস করছিলেন তিনি। ঐই সময়ে কোপেনহ্যাগেনের নীল বোর ইনস্টিটিউটের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক তার আত্মীয় অটো ফ্রিশ তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য এসেছিলেন। দু'জনে মিলে হানের চিঠিতে বিবৃত তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করলেন। অটো ফ্রিশের কথায়—

"Very gradually we realised that the breakup of a uranium nucleus into two almost equal parts... Had to be pictured in a quite different way. The picture is one...Of the gradual deformation of the original uranium nucleus, its elongation, formation of a waist and final separation into two halves. The striking similarity of that picture with the process of fission by which bacteria multiply caused us to use the phrase 'nuclear fission' in our first publication... The most striking feature of this novel way of fission was the large energy liberated."

কি পরিমাণ শক্তি এই পরমাণু বিভাজনের ফলে মুক্ত পায় তার নির্ভুল হিসাব মাইটনার প্রথম করেছিলেন।

১৯৩৯শের ফেব্রুয়ারি সংখ্যার Nature পত্রিকায় হানের আবিষ্কারের তাৎপর্যের এই ব্যাখ্যা মাইটনার ও ফ্রিশের যুগ্ম নামে প্রকাশিত হয়েছিল। নীল বোরকে লিখিত তাঁর পত্রে মাইটনার হানের আবিষ্কারের তাৎপর্য ও গুরুত্বের কথা জানিয়েছিলেন। এই পত্র বোর ফিজিক্যাল সোসাইটির সভায় পড়েছিলেন।

১৯৬৬ খৃস্টাব্দে আমেরিকার এটমিক এনার্জি কমিশনের প্রদত্ত ফার্মি পুরস্কার অটো হান, লিজে মাইটনার ও স্ট্রাসমানকে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল।

প্রোফেসর মাইটনারের শেষ জীবন কিভাবে কেটেছে জানা যায় না। তিনি বিবাহ করেন নি।

হান ও মাইটনার এক বয়সী ছিলেন বলা হয়েছে। এ বছরের জুলাই মাসে হান মারা গিয়েছেন। তাঁর ত্রিশ বছরের সহকর্মী ও বন্ধু মাইটনার দু'মাস পরে (১৯৬৮, ২৭শে অক্টোবর) মারা গেছেন।*

* অটো হানের 'সায়েন্টিফিক অটোবায়োগ্রাফি' জর্জ গামভের বায়োগ্রাফি অব ফিজিক্স, রবার্ট জুঙ্কের 'Brighter than a thousand Suns' ও জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর 'অটো হান স্মরণে' প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অবশেষে গান্ধীজীর সঙ্গে রোলাঁর দেখা হল, ভিলন্যভে ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে। ইংলণ্ডে গোলটেবিল বৈঠক শেষে গান্ধীজী রোলাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে এসেছিলেন। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে উভয়ের আলাপ-আলোচনা চলেছিল। সে আলোচনার বিস্তৃত বিবরণ শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত তাঁর গ্রন্থে দিয়েছেন। গান্ধীজী আসবার আগে রোলাঁ তাঁকে যুদ্ধ ও শান্তি, হিংসা ও অহিংসা, সমাজতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ, সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি বিষয়ে মনস্থির করে আসতে বলেছিলেন। সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে রোলাঁ গান্ধীবাদকে পূর্বের মত আঁকড়ে নেই, তা বেশ কয়েক মাস আগে (৫ মে, ১৯৩১) গান্ধীবাদী এদ্‌মঁ প্রিভাকে লেখা পত্র থেকে দেখা যায়। তিনি লিখেছিলেন, 'গান্ধীর বিশ্বাস ও কর্মনীতি পবিত্র। কিন্তু তা শাশ্বত নয়। ভারতও শাশ্বত নয়।' সত্যান্বেষী হিসাবে তিনি ইউরোপে ভারতীয় অভিজ্ঞতার বাস্তব মূল্য নির্ণয় করতে চেয়েছিলেন। ধনতন্ত্র ও শ্রমিক-শ্রেণী সম্বন্ধে গান্ধীজীর মনোভাব রোলাঁকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। গান্ধীজী বর্তমান পৃথিবীর বড় শ্রেণীসংঘাতকে উপেক্ষা করছেন, মধ্যযুগের আমলের ধারণা নিয়ে শ্রেণীসম্পর্ক নির্ধারণ করতে চাইছেন, মূলধনের অশরীরিক নিষ্ঠুর রূপ সম্বন্ধে অসচেতন। গান্ধী যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচারে লেগেছেন, খেয়াল করে দেখেন নি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর 'যন্ত্র' হচ্ছে অদৃশ্য মূলধন, যা সমস্ত রাষ্ট্র ও সমস্ত জনমত শাসন করে। রোলাঁ বিদ্রূপ করে বলছেন—গান্ধীর সাধু ধনতন্ত্র 'আমেদাবাদের কয়েকটি ধার্মিক সজ্জনের মালিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।'

যে সব বিষয়ে গান্ধীজীকে মনস্থির করে আসতে রোলাঁ বলেছিলেন, সে সব সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই তাঁর নিজের মনস্থির হয়ে গিয়েছিল। গান্ধীজীকে তিনি খোলাখুলি নিজের মতামত জানালেন। সাক্ষাতের প্রথম দিন গান্ধীজীর মৌন দিবস থাকায় রোলাঁর পক্ষে নিজ বক্তব্য প্রকাশে মুখর হওয়া সম্ভব হয়েছিল। রোলাঁ যখন রাশিয়ার বস্তুবাদ সমর্থন করে, মেকী আদর্শবাদীদের তুলনায় তার সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গের প্রশংসা করলেন, তখন মৌন গান্ধী বিস্ময়ে আরও মৌন। ধনতন্ত্রের নিষ্ঠুর শোষণের ছবি এঁকে রোলাঁ বললেন, 'শ্রমজীবী জনসাধারণকে বিজয়ী হতেই হবে, কিন্তু কোন্ উপায়ের দ্বারা? ...সেই হবে শ্রেষ্ঠ উপায় যা ন্যায়পরায়ণ সমাজব্যবস্থা স্থাপন করবে। অহিংসা কি তা পারবে?' রোলাঁ রাশিয়ার অস্ত্রসজ্জার কথা তুলে বললেন, ধনতন্ত্রী দেশগুলির সম্মিলিত আক্রমণের হাত থেকে বাঁচবার জন্য রাশিয়ার অস্ত্রসজ্জা অবশ্যই প্রয়োজন। কেন না রাশিয়াকে বাঁচাতেই হবে। 'সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে দুনিয়ার মানুষের আশা-ভরসা নষ্ট হয়ে যাবে।' অহিংসার নাম করে শ্রমিকদের আত্মবিসর্জনের কোনো কথাই ওঠে না। কার জন্য তারা আত্ম-বিসর্জন করবে? দয়াময় ভগবানে বিশ্বাস থাকলে তারা না হয় ভগবানের জন্য আত্ম-বিসর্জন করতে পারত। কিন্তু তারা ভগবানে বিশ্বাসই করে না। তারা একটি আদর্শে, সামাজিক ন্যায়ে বিশ্বাস করে। ঐ আদর্শকে বস্তুবাদ নাম দিয়ে কলঙ্কিত করে দেখানোর চেষ্টা করলে তীব্র প্রতিবাদ করতেই হবে। শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ আত্মোৎসর্গ অহিংসার পথে না হলেও অতি শ্রদ্ধেয়, একথা বলার পরে রোলাঁ লেনিনের দৃষ্টান্ত দিলেন—"লেনিনের কোনোপ্রকার ব্যক্তিগত হিংসা ছিল না। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণসাধনই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। যে উপায়কে তিনি কার্যকরী ও শ্রেষ্ঠ ভেবেছেন, সেই উপায়কেই তিনি মানবের কল্যাণের জন্য অবলম্বন করেছেন। এই উপায়ের বিরুদ্ধে অহিংসাকে একটা আদর্শ হিসাবে উপস্থিত করলেই চলবে না, উভয় উপায়ের ফলাফলের মূল্য দিয়েই তাদের বিচার করতে হবে।"

কয়েক দিনের আলোচনা থেকে দেখা গেল, রোলাঁ নানাভাবে শ্রেণীসংগ্রামের কথা গান্ধীজীর কাছে তুলছেন, বলছেন যে, পুঁজিবাদী ও শ্রমিকের সংঘর্ষ জাতীয় ব্যাপার নয়, আন্তর্জাতিক, এক্ষেত্রে তাই সমস্যাটাকে জাতীয় দৃষ্টিতে না দেখে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে দেখাই উচিত। শ্রমিকদের যদি অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে স্বার্থসচেতন শ্রমিকদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করে পুঁজি অধিকার করতে হবে, এবং রাশিয়ায় যেহেতু এই শ্রমিকদের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে কারণে সারা পৃথিবীর শ্রমিকদের উচিত রাশিয়াকে রক্ষা করা তাতে যদি তাদের জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি হয়, তবুও।

গান্ধীজী এসব কথা মেনে নিতে পারবেন না, সহজেই বোঝা যায়। তিনি সোজা বললেন, শ্রমিকরা মূলধন অধিকার করবে, তিনি তার সম্পূর্ণ বিরোধী, "লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য মূলধন দখল একটা নিকৃষ্ট উপায়।" গান্ধীজীর মতে উৎকৃষ্ট উপায় হল— মালিকের সঙ্গে দাবি দাওয়ার সংগ্রাম না চালিয়ে শ্রমিকদের নিজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। তার মানে, "তাদের যা প্রাপ্য ন্যায্য বলে তারা মনে করে, তা যদি কারখানা থেকে না পায়, তাহলে চরকায় সুতো কেটে সামান্য আয়েই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে অথবা পাথর ভেঙে রোজগার করতে হবে।"

হিংসা অহিংসার প্রশ্নেও বিপুল মতপার্থক্য দেখা গেল। রোলাঁ অহিংসার কার্যকারিতা সম্বন্ধে এখন বিশেষ সন্দিহান। অহিংসায় জনসাধারণের রূপান্তর ঘটা সম্ভবপর, যদি সেকথা মেনেও নেওয়া যায়, ব্যাপারটা অবশ্যই দীর্ঘমেয়াদী।

ইউরোপের ক্ষেত্রে সমস্ত ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপে মানবতার মহা-সংকট। শ্রমিকস্বার্থকে রক্ষা করার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। এবং তা অহিংস পথে কদাপি সম্ভব নয়। সম্ভব কি?

গান্ধীজী অহিংসার পক্ষে তাঁর পুরনো যুক্তিগুলি উত্থাপন করলেন। বললেন, ভারতে অহিংস নীতি কিছুটা সফল হয়েছে; তাঁর বিশ্বাস, ইউরোপেও তা সফল হবে। তবে তার সাফল্যের জন্য ইউরোপে কোনো অহিংস মহাপুরুষের আবির্ভাবের প্রয়োজন, ইত্যাদি। গান্ধীজী বিনয় করে নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পাগলের অভিজ্ঞতার তুলনা করলেন—"আমি অনেক পাগলকে জানি, যারা অনেক বিষয়ে বিশ্বাসী, তাদের সেই ভুলগুলি সংশোধন করা অসম্ভব, কারণ সেগুলি তাদের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত। একজন পাগলের অভিজ্ঞতা ও আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে ব্যবধান খুবই কম।" গান্ধীজী একই সঙ্গে জানালেন, তাঁর অভিজ্ঞতা পাগলদের মত বটে, আবার পুরাতন কালের ঋষিদের মতও, "যাঁদের অভিজ্ঞতাগুলি স্বজ্ঞাত অনুভূতির উপর নির্ভরশীল। তাঁরা যে ভুল করেন নি, তা সকলেই জানেন, ইতিহাসই তা প্রমাণ করে দিয়েছে। আমিও গর্ব করে বলতে পারি যে, আমার বিশ্বাসগুলিও ভিত্তিহীন নয়।"

গান্ধীজীর এইসব আধ্যাত্মিক বিনয় বা অবিনয়কে স্নেহচক্ষে দেখবার মত অবস্থায় রোলাঁ ছিলেন না। এমন কি গান্ধীজীর সুবিখ্যাত সরলতাতেও তাঁর অবিশ্বাস এসে গিয়েছিল।* এক মুখে রাশিয়ার হিংস্র পশুবলের নিন্দা সেই মুখেই মুসোলিনির প্রতি বিগলিত করুণা-বর্ষণ তাঁর মনকে তিক্ত করে তুলেছিল। রোলাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পরে গান্ধীজীর মুসোলিনি-দর্শনে যাওয়ার কথা। রবীন্দ্রনাথকে রোলাঁ যেমনভাবে মুসোলিনি-চরিত্র বুঝিয়েছিলেন, সেইভাবে গান্ধীজীকেও বোঝালেন। গান্ধীজী বললেন—"আমি ইতালির লোকদের শান্তির বাণীই শোনাতে চাই—তারা তা গ্রহণ করুক আর নাই করুক।" বললেন—"যদি মুসোলিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান তাহলে আমি ইতস্তত না করে তাঁর সঙ্গেও দেখা করব।"

গান্ধীজী মুসোলিনির সঙ্গে সত্যই দেখা করলেন, ইতালির সংবাদপত্র তাঁর অহিংসা বিষয়ে কোনো কথা ছাপল না, মুসোলিনির সঙ্গে তাঁর করমর্দনাদির ছবি ফলাও করে প্রকাশ করল। রাশিয়ার পশুবলের একান্ত বিরোধী গান্ধীজী মুসোলিনির পশুবলের পক্ষে কিছু ভাল কথা খুঁজে পেয়ে রোলাঁকে লিখে পাঠালেন।*

আর রোলাঁ? তিনি এতদিনে গান্ধীজী সম্বন্ধে সত্যই ক্লান্ত। ডায়েরীতে লিখলেন—

"গান্ধী এসেছেন, কিন্তু আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আসল কথাটা স্বীকার করলে বলতে হয়, এইদিন বুঝতে পারলাম যে, গান্ধীর পথ পরিষ্কারভাবে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছে এবং অনেক ব্যাপারেই আমার থেকে তা এত স্বতন্ত্র যে, আমাদের মধ্যে আলোচনা করার আর বিশেষ কিছু নেই। আমরা উভয়েই জানি অন্যজন কোনদিকে যাচ্ছেন!...নতুন করে বলবার আর কি আছে? আজ সন্ধ্যায় আমার আর কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না।"

এই সব ঘটনা ঘটে ১৯৩১ সালের ডিসেম্বরে। আর সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে রোলাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৩৫ সালের ৩রা এপ্রিল। মধ্যে তিন বছরেরও বেশি সময়ের ব্যবধান। গান্ধীজীর মত বা পথ বিষয়ে রোলাঁর পরিবর্তিত ধারণা তিনি এখন গ্রন্থবদ্ধ করে ফেলেছেন। ১৯৩৫-এ প্রকাশিত হয়ে রোলাঁর নতুন জীবনদর্শনের উন্মোচক গ্রন্থ "১৫ বছরের সংগ্রাম" ("শিল্পীর নবজন্ম")। এই গ্রন্থে অবলম্বনীয় পথ সম্বন্ধে রোলাঁর বহু বৎসর-ব্যাপী তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় আছে। গান্ধীর পথ না লেনিনের পথ—কোন পথ তিনি বরণ করবেন? শেষ পর্যন্ত গান্ধীকে ত্যাগ করে লেনিনকেই অবলম্বন করেছিলেন, এবং এ ব্যাপারে গোর্কীর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। রোলাঁর গান্ধী ভক্তি ছাড়াতে গোর্কী বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। গান্ধীকে ত্যাগ করে লেনিনকে বরণ করার

* রোলাঁর সঙ্গে গান্ধীজীর কথা-বার্তার কালে গান্ধীজীর ইংরেজ শিষ্যা মিস মুরিয়েল লেস্টার কয়েকজনকে নিয়ে সেখানে বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়েন। তাদের মধ্যে বৃটিশ গুপ্তচর বিভাগের উচ্চ কর্মচারী মিঃ ইভানসও ছিলেন। এতে রোলাঁর রাগ ও বিরক্তির সীমা রইল না। ডায়েরীতে লিখেছেন—

"বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ করার জন্য আমি হয়ত মিস লেস্টারকে ক্ষমা করতাম, যদি তিনি অন্য লোকজন সঙ্গে না নিয়ে আসতেন। পূর্বে জানতে পারলে ইভানসকে ঘরে কদাপি ঢুকতে দিতাম না। গান্ধী তাকে 'বন্ধু' বলে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। (এটা কি সরলতা, না উদাসীনতা? আমার মনে হয় দ্বিতীয়টাই, কারণ গান্ধীর মধ্যে কিছুই সরল নয়)। ব্যাপারটা বিপজ্জনক। মনে হয়, এইসব পুলিশদের কাজ হল গান্ধীকে রক্ষা করা। কিন্তু আসলে তারা তাঁর উপর নজর রাখছে। তাঁর গতিবিধি, কাজকর্ম ও সাক্ষাৎকারীদের তারা নিয়ন্ত্রণ করছে এবং বিরাট্‌কায় ইভানস তা লুকোবার চেষ্টাও করল না। সে এদমঁ প্রিভাকে জিজ্ঞাসা করল, গান্ধী ও আমি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। ভাল মানুষ প্রিভা তাকে সারল্যের সঙ্গে বললেন, গান্ধীকে আমি রাশিয়া সম্বন্ধে বোঝাচ্ছি। (তার ফল হল, একটি সুইস সংবাদপত্র সকলকে সাবধান করে বলল, বলশেভিক রোমা রোলাঁ গান্ধীকে সোভিয়েত সম্বন্ধে প্রলুব্ধ করছেন এবং বীর সুইসদের তাঁরা মস্কোর কমিউনিস্টদের হাতে তুলে দেবার জন্য চক্রান্ত করছেন)।"

* মুসোলিনির সঙ্গে সাক্ষাতের পরে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পথে গান্ধীজী ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৩১-এ রোলাঁকে লিখে পাঠান—

"আমার নিকট মুসোলিনি একটি ধাঁধা। তাঁর অনেক সংস্কারের কাজ আমি সমর্থন করি। আমার মনে হল, তিনি কৃষাণদের জন্য অনেক কিছু করেছেন। অবশ্য লৌহদস্তানা সেখানে রয়েছে। কিন্তু যেহেতু পাশ্চাত্যে পশুবলই (হিংসা) হল সমাজের ভিত্তিমূল, মুসোলিনির সংস্কারগুলি সেই প্রেক্ষাপটেই নিরপেক্ষভাবে বিচারের যোগ্য। আমি মনে করি গরীবদের প্রতি তাঁর দরদ, বৃহৎ শহরীকরণের প্রতি তাঁর বিরোধিতা, শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের জন্য তাঁর প্রচেষ্টা—এগুলি আমাদের কাছে বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। ......আমার যেখানে মৌলিক সন্দেহ থেকে যাচ্ছে তা হল, এই সংস্কারগুলি বাধ্যতামূলকভাবে করা হয়েছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজেও তো একই পন্থায় এই কাজগুলি হয়ে থাকে। আমাকে যা আকর্ষণ করেছে তা হল, মুসোলিনির কঠোরতার পশ্চাতে রয়েছে জনসাধারণকে তাঁর সেবা করার বাসনা। এমনকি তাঁর কড়া বক্তৃতাগুলির পশ্চাতে রয়েছে একটা সততা ও তাঁর দেশবাসীর প্রতি উদ্দীপ্ত প্রেম। আমার আরও মনে হয় যে, ইতালির জনসাধারণ মুসোলিনির বজ্রমুষ্টিকে পছন্দ করে।"

ব্যাপারে রোলাঁর মুক্ত স্বীকারোক্তি, 'বিমুগ্ধ আত্মা'র ভূমিকায়—

"আমি গান্ধী ও লেনিন উভয়কেই সম্মান করতাম এবং উভয়কেই শত্রুর বিরুদ্ধে রক্ষা করতাম। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশে তাঁরা নিজেদের মধ্যেই ছিলেন পরস্পরের শত্রু। ..লেনিন ও গান্ধীর দুই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে নিজেকে যোগসূত্ররূপে স্থাপন করার প্রচেষ্টায়, মার্কের মত, আমিও নিঃশেষিত হয়েছিলাম।"

রোলাঁ সেই আত্মক্ষয়ী দুশ্চেষ্টা অতঃপর ত্যাগ করেছিলেন। 'ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশে' তিনি অতঃপর দুই হাতই লেনিনের দিকে বাড়িয়েছিলেন। বিপ্লবকে সমর্থন করেছিলেন পুরোপুরি।*১ 'সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে শান্তি' তাঁর ধ্বনি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গান্ধীর অহিংসা সম্বন্ধে পূর্বমমতার স্মরণসঙ্গীত করুণ কণ্ঠে গাইতে চেয়েছিলেন বটে*২ কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল যখন মীরাট মামলার বন্দীদের অভিনন্দন জানিয়ে বার্তা পাঠিয়েছিলেন (১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩)। তাতে পরিষ্কারভাবে অহিংসার পথত্যাগী, 'নূতন বিদ্রোহশক্তির প্রতীক' মীরাট মামলার আসামীদের উদ্দেশে জয়ধ্বনি দেওয়া হয়েছিল। হিংসার গান্ধীকৃত ব্যাখ্যা মানতে রোলাঁ এখন আর রাজী নন। তাঁর দৃষ্টিতে "হিংসার বজ্রজ্বালা রূপ আছে তাদের মধ্যে

বর্তমানে সব থেকে নির্মম হল অর্থ।.. শ্রমিক-কৃষক-জনসাধারণ এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে।..যে অহিংসানীতি তাদের এই বিদ্রোহকে হিংসা বলে নিন্দা করে, তাকে এটা বুঝতে হবে যে, হিংসার উৎসের বিরুদ্ধেই তাদের এই লড়াই।" সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বেই গান্ধীজী সম্বন্ধে রোলাঁ তাঁর সর্বশেষ সিদ্ধান্ত লিখে ফেলেছেন—

"গান্ধী সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তা গ্রহণও করবেন না, অন্যায়ও করবেন না। মানবজাতি বিভাগ করাই হচ্ছে তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু যে-সময়ে তাঁকে একটা দিক বেছে নিতে হবে, সেই সময়ে তিনি দুইটি দিকের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছেন। সামাজিক সংঘর্ষের সময়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে ইতস্ততঃ করার অর্থই হল তার দ্বারা শোষিতশ্রেণীর বিরুদ্ধে শোষকশ্রেণীকেই লাভবান হতে দেওয়া। গান্ধীজীর এই মনোভাব। অহিংসার প্রতি তাঁর গভীর মৌলিক বিশ্বাস থেকেই উদ্ভূত এবং তিনি নিজেই বলেছেন যে, তাঁর এই বিশ্বাস ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই বিশ্বাস যত পবিত্রই হোক না কেন, তা তাঁর দৃষ্টির স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। সামাজিক অভিজ্ঞতা সব সময়ই মুক্ত, সব সময়ই চলমান। তা কখনো কোনো ধর্মবিশ্বাস বা অনুভূতি-সাপেক্ষ হয়ে থাকতে পারে না। অতীতের এই প্রভাব, যা গান্ধীর অগ্রগতিতে এখন বাধাসৃষ্টি করেছে, তা থেকে তিনি যদি নিজেকে মুক্ত না করতে পারেন, তাহলে মহান ভারতীয় আন্দোলনের গতিপথ তিনি হারিয়ে ফেলবেন, যে-গতিপথ ইতিমধ্যেই তাঁর চিন্তার বাইরে চলে যেতে শুরু করেছে।"

রোলাঁর এহেন মানসিক প্রস্তুতির কিছুমাত্র যে সুভাষচন্দ্র জানতেন না তা তাঁর নিজের লেখা থেকেই বোঝা যায়। বরং উল্টো কথাই শুনেছিলেন। রোলাঁর কোনো কোনো ফরাসী বন্ধু রোলাঁর নাম করে তাঁকে নিশ্চিত করে বলেছিলেন (যার জন্য রোলাঁ বিরক্ত হয়ে বলেছেন, 'আমার হয়ে তাদের সে রকম কথা বলার কোনো অধিকার নেই')- ভারতীয়রা গান্ধীবাদ থেকে সরে গেলে ভারত সম্বন্ধে রোলাঁ সব আগ্রহ হারিয়ে ফেলবেন।

১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে সুভাষচন্দ্র ফুসফুস ও অন্ত্র যক্ষ্মারোগ নিয়ে ইউরোপ গিয়েছিলেন স্বাস্থ্যোদ্ধার উদ্দেশে। ছেদ সহ তিনি কয়েক বৎসর ইউরোপবাস করেন। সুভাষচন্দ্রের এই ইউরোপ-জীবন তাঁর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক উভয় দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এই পর্যায়ে আলোচ্য নয়, রাজনৈতিক জীবনের কথা সংক্ষেপে বলা যাক।

স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সুভাষচন্দ্রের ইউরোপ গমন হলেও তাঁর স্বাস্থ্য এবং ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য এক সাথে জড়িয়ে গিয়েছিল। সুতরাং তাঁর সেখানে

---

*১ 'যে-যুদ্ধ সত্যকারের যুদ্ধ, যে-যুদ্ধের প্রয়োজন ও বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে, সে যুদ্ধ হইবে আন্তর্জাতিক রণাঙ্গনে। সামাজিক নৈতিক ও জাতিগত কুসংস্কারের বিপুল অস্ত্রসম্ভারে সমৃদ্ধ পুরাতন ধনতন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদী জগৎকে ধ্বংস করিয়া যাঁহারা নূতন জগৎ সৃষ্টি করিবার চেষ্টায় আছেন, তাঁহাদের সকল কর্মে, সকল আশায়, সকল দুঃখ-বেদনার মধ্যে আমি আছি। এবং যেহেতু শ্রমিক বিপ্লব আজ আন্তর্জাতিক সংগ্রামে অগ্রসরমান সেনাবাহিনীর পুরোভাগে চলিয়াছে, এবং সে সংগ্রামের জয়লাভের ফলে শ্রেণীহীন, ভৌগোলিক ব্যবধানহীন নূতন মানবসমাজের সৃষ্টি হইবে, সেই হেতু এই বিপ্লবে আমার পরিপূর্ণ সমর্থন রহিয়াছে।"

("শিল্পীর নবজন্ম")

*২ ১৯৩২ সালে গোলটেবিল বৈঠক শেষে ইউরোপ ভ্রমণ সেরে গান্ধীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করার পরে গ্রেপ্তার হন। রোলাঁ তখন গান্ধীজীকে সহানুভূতি জানিয়ে চিঠি এবং প্রবন্ধাদি লিখেছিলেন। ইউরোপের খৃস্টীয় সমাজকে ভারতের সত্যাগ্রহ আন্দোলন সমর্থনে আহ্বান জানিয়ে তিনি লেখেন—

"বৃটিশ সরকারের অত্যাচারের ফলে, অথবা সেই অত্যাচার প্রতিরোধে ভারতীয়দের অক্ষমতার ফলে, যদি অহিংস আন্দোলন বিফল হয়ে যায়, তাহলে হিংসার পথ ছাড়া মানব ইতিহাসে অন্য কোনো পথ খোলা থাকবে না। এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যকেই এর জন্য দায়ী হতে হবে। গান্ধী অথবা লেনিন! যে কোনো পন্থাই অবলম্বন করা হোক না কেন, সামাজিক সুবিচারের প্রতিষ্ঠা করতেই হবে।...এই সংগ্রামে ভারতীয় সত্যাগ্রহ যদি পরাজিত হয়, তাতে যীশুখৃস্টেরই পরাজয় হবে, তরবারির আঘাতে রুশের ধ্বংস হবে। এবার আর 'পুনরুত্থানের'ও আশা নেই। আমি অখৃস্টান হয়েও (যদিও আমি খৃস্টান হয়ে জন্মেছিলেন, কিন্তু আর সেই ধর্মমতে বিশ্বাস করি না) খৃস্টানদের দৃষ্টি এই সম্বন্ধে আকর্ষণ করছি।"

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ ছাব্বিশ ॥

বাংলাদেশ দু-খণ্ড হবে, বেশির ভাগ ভিন্ন রাষ্ট্রে চলে যাবে—সেই মুখটায় কি উত্তেজনা। মনে আছে আপনাদের অনেকের। ডাইরেক্ট অ্যাকশন চলল, তার বদলাও চলছে—মারো ধরো কাটো, কুরুক্ষেত্র-কাণ্ড। খুনখারাবি লুঠতরাজ নারী-লাঞ্ছনা অগ্নি-কাণ্ড—সদাচার-মনুষ্যত্ব বলে কিছু আর নেই। অহিংস মতে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হয়ে মানুষ মানুষের কাছে প্রীতির কথা বলতে গেছে, ঘাড় ধরে দিল ছোরা বসিয়ে। আদর করে কেউ আলিঙ্গন করল, ভাল-বাসার রমণীও, বুকের মধ্যে খচাস-খচাস করে—প্রেমিকারই মুঠোর মধ্যে হয়তো বা চকচকে ছুরি। লাঠিসোটা ইটপাটকেল সড়কি-বল্লম এবং বে-আইনী বন্দুক-পিস্তল যে যদ্দুর পারে সংগ্রহ করছে। দেড় যুগ অতিক্রান্ত হয়ে আজকে বোঝা যাচ্ছে সকলই বাতিক্রান্ত। দেশ-বিভাগ ছত্র নানাঃ গভিবেলাম্বা—জিনিসটা মানুষের হাড়ে হাড়ে মজ্জায় মজ্জায় গেঁথে দেওয়া।

শহরের সংবাদ দূর-দূরান্তর পাড়াগাঁ অবধি যেতে বাকি নেই। কোন এলাকা পাকিস্তানে যাচ্ছে কতখানি হিন্দুস্থানে, তা-ও মোটামুটি জানা। তদনুযায়ী মানুষ পালানোর হিড়িক। হিংস্র নেকড়ের দল ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে—ভাবখানা হল এই। ম্যাপের উপর র‍্যাডক্লিফের লাল পেন্সিলের দাগ পড়তে যে কয়েকটা দিন দেরি। মধ্য-সন্ধিস্থলে তাঁর উদ্দেশে পালাচ্ছে কলকাতার দিকে প্রাণটুকু মাত্র নিয়ে। অন্য সাধ্য যাদের হল না, বাইরে যদিচ সহাস্য মুখ—অপরের কলান্ত হানে ঘরের মধ্যে গোপনে। মুখে অন্ন রোচে না, চোখের ঘুমও হারিয়ে গেছে। সন্ধ্যাকালে বাঘ-কুমীরের মধ্যে কাঠুরে-বাওয়ালি যেমন বেড়ায়, এরাও তেমনিভাবে বেঁচেকুচে সতর্কভাবে বিচরণ করে। বিশ শতকে দুনিয়ার ইতিহাসে দুটো বড় কলঙ্ক: কনসেনট্রেশন-ক্যাম্পে হিটলারের ইহুদি-নিপীড়ন আর আজাদির মুখে ভারতবর্ষ জুড়ে নির্বিচার নরহত্যা।

এ অঞ্চলের মানুষ ভবিষ্যতের যা-হোক একরকম আন্দাজ করে নিচ্ছে। আর কতকগুলো ঠাঁই আছে—ত্রিশঙ্কুর অবস্থা, সীমানা-লাইন এ-ধার দিয়ে না ও-ধার দিয়ে যাবে হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। র‍্যাড-ক্লিফ সাহেবের মন মর্জির উপরে নির্ভর। মুর্শিদাবাদ তেমনি একটা জেলা মুর্শিদা-বাদ এবং তৎসহ ডাক্তার খলিলুর রহমানের বসতি অন্দরদীঘি। আজ শোনা গেল, বাঁটোয়ারা-অফিসের চাপরাশির মুখের খবর—মুর্শিদাবাদ পাকিস্তানে ঢুকে যাচ্ছে। ডাক্তার রহমান লক্ষ্য করলেন, হিন্দু রোগীগুলো আজ যেন বেশি বেশি সন্ত্রস্ত করে আসছে, আর ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পিছনে মুসলমান যে যেদিকে আছে—দেদার 'আলেকুম-সেলাম' দিচ্ছে। আবার পরের দিন ঠিক উল্টো খবর বেরুল: র‍্যাডক্লিফের খাস বাবুর্চি বলেছে, মুর্শিদাবাদ হিন্দুস্থানে। মুসলমান সংগে সংগে হিন্দু চোখে পড়লেই দু হাতে সেলাম বাজাচ্ছে।

রহমান ডাক্তার আর শিবপদ ভৌমিক উকিলের পাশাপাশি বাড়ি। শিবপদর ছোট ছেলে টাটু আর রহমানের নাতনি হাসনার বয়স পাঁচ-ছয় করে বয়স, এক-সংগে খেলাধুলা করে, ভাব খুব দু'টির মধ্যে। রহমান ডাক্তার দুপুরের আহারান্তে দিবানিদ্রার জন্য শুয়ে পড়েছেন, বারান্দা থেকে দুই শিশুর আলাপন কানে এলো। হাসনা টাটুকে জিজ্ঞাসা করে: হিন্দু কেমন রে? দেখেছিস টাটু, দেখলেই নাকি কেটে ফেলে?

রহমানের তন্দ্রা ছুটে গেল। ধড়মড় করে উঠে বসলো। কী সর্বনাশ! বাড়িতে [illegible] প্রধান আলোচনার বিষয় দাঁড়িয়েছে, অমুক জায়গায় হিন্দুরা মুসলমান মেরেছে, এতগুলো ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, হবু-পাকিস্তানের কোন তল্লাটে পালানো যাবে, কী তার বন্দোবস্ত—এই সব। শিশুর কানে অহরহ এই সমস্ত যাচ্ছে। ধরে নিয়েছে হিন্দু হল হিংস্র জন্তু বিশেষ, দেখলেই কেটে ফেলে সেই ভয়ে

মানুষ পালায়। হাসনা শুনেছে জন্তুটার কথা, চোখে দেখে নি। টাটুকে প্রশ্ন করছে: তুই দেখেছিস?

ডাক্তার রহমান উৎকর্ণ হলেন। টাটুর জবাব: দেখব কি করে? দেখলেই তো কেটে ফেলে দিত।

বটেই তো, বটেই তো! মনে মনে রহমান হেসে খুন। বুদ্ধির তারিফ করেন ঐটুকু টাটু ছেলেটার। ছেলেও বড় হবে, বাপের মতন উকিল হবে, সন্দেহ নেই। কেমন দিব্যি সওয়াল করল, দেখলেই যখন কেটে ফেলে—দেখার পরে বলবার ফুরসৎ কেমন করে পাবে?

সংশয়ান্বিতকণ্ঠে টাটু পুনশ্চ বলছে, ভুল শুনেছিস রে হাসনা, কাটে তো হিন্দুতে নয়, মুসলমানে। কাকা-দাদারা সব বলাবলি করে, কতবার শুনেছি। তোরই ভুল শোনা।

দুই শিশুতে তারপর ঘোরতর তর্ক। রহমান ঘরের মধ্যে শয্যার উপর উঠে বসেছেন। ভুল শোনা—বললেই হল। অহরহ শুনছে হাসনা, অমুক হিন্দু মেরেছে অমুক হিন্দু মেরেছে—টাটু বললেই অমনি উল্টো জিনিস মেনে নেবো। আবার কাকা-দাদাদের মুখে টাটুও যে হরদম মুসলমানের নামে শুনছে, তাই বা মিথ্যা হবে কেমন করে?

হাসির সংগে আবার কান্নাও আসে রহমান ডাক্তারের। হায়রে হায়, খোদা-তাআলা'র আশীর্বাদী কসুম এইসব বাচ্চা ছেলে-মেয়ে—এদের মনের মধ্যেও হিন্দু-মুসলমান বিষ ঢুকে যাচ্ছে, তবে আর ভরসা কি রইল?

তবে এক জিনিস হতে পারে বটে।

তর্কাতর্কির পরে অবশেষে মীমাংসা। টাটুর জোখা বুদ্ধি, কথাটা তার মাথাতেই এলো। বাঘে মানুষে মারে, আবার কুমীরেও তো মারে। সর্বজনবিদিত জানা। অতএব তোমার তরফ বলতেই না—হিন্দুতে মারে মুসলমানেও মারে। হিন্দু-মুসলমান কোনটাই দেখে কি দুজনের [illegible]। তোমার অতএব তো [illegible]—

দুতোর সাজা দিতে হত না এই ঠিক-দুপুরে।

সভয়ে হাসনা বলে, দেখে কাজ নেই রে টাটু। তোদের বাড়ি আর আমাদের বাড়িতে খেলব। বাইরে কোথাও যাবো না।

টাটুরও সেই মত: কোনখানে যাবো না আমরা। বাবারে বাবা, হিন্দু-মুসলমান কোথায় কি আছে—হয়তো বা সামনা-সামনি পড়ে গেলাম।

এবং ঘরের মধ্যে রহমান ডাক্তারেরও ঠিক সেই আশার্বাদ। সজল চোখে বিড়-বিড় করে তিনি বলছেন, আহা সোনার বাছারা, জীবনে কোনদিন যেন ওই হিন্দু-মুসলমানের খপ্পরে না পড়িস। অনেক দুঃখে জর্জরপুড়ে অনেক কান্না কেঁদে সর্বনাশের আগুনের ভিতর দিয়ে আমরা জীবনপাত করে চলেছি, তোরা বড় হয়ে সমস্ত কলঙ্ক ধুয়েমুছে নিশ্চিন্ত করে ফেলবি। শুধুমাত্র অতীত বস্তু ইতিহাসের একটি কৃষ্ণ অধ্যায় হয়ে রইবে। শিহরিত হবে উত্তরপুরুষ কাহিনী পাঠ করে থুতু ফেলবে ঘৃণিত নাটকের নায়কদের উদ্দেশে।

রহমান ডাক্তার বান্ধব বীরেশ্বরের কাছে এই গল্প করেছিলেন। একবার নয়, অনেকবার—রসিয়ে রাঙিয়ে নানানভাবে। আজকে তিনি নেই। তাঁর বড় সাধ ছিল, আদমদীঘির কবরখানা ছায়াময় শীতল বাঁশঝাড়ের নিচে বাপ-পিতামহের পাশা-পাশি আরামের ঘুম ঘুমিয়ে থাকবেন।

তিস্তা।

৪ঠা অক্টোবর শেষ রাত্রে তিস্তার আকস্মিক জলোচ্ছ্বাস এবং তার ফলে উত্তর বাঙলার অনেক সমৃদ্ধিশালী জনপদ বিধ্বংসী মহাপ্লাবন স্মরণ করিয়ে দেয় সেই সুদূর একশো আশি বছর আগেকার কথা।

জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার মতে ১৭৮০ খৃস্টাব্দেও একবার এই পাহাড়ী নদী তিস্তায় প্রবল জলস্ফীতি দেখা গিয়েছিল, সেদিন দেখা যায়, সমুদ্রের মত বিস্তীর্ণ জলরাশি ধ্বংস করে দিয়েছিল বহু গ্রাম—বহু নগর .

নিশ্চিন্তপুরের জননেতা সুধীর রায় আত্রাই নদীর বাঁধের আরো এক্সটেনশনের জন্য রিপোর্ট লিখছেন।

খোলা জানালা দিয়ে দেখা যায়, ~ দাইকে বেষ্টন করে রয়েছে একটা বাঁধ—এস· পি'র বাংলোর পিছন থেকে চণ্ডীতলার ঘাট পর্যন্ত প্রসারিত। এই বাঁধটাকেই চণ্ডীতলা থেকে শুরু করে একেবারে দাসপাড়া পর্যন্ত না নিয়ে যেতে পারলে নদীকে রুখতে পারা যাবে না।

তবুও যেটুকু বাঁধ করতে পেরেছেন, সেই বাঁধের দিকে তাকিয়েই তাঁর মনে হল, বাঁধ নয়। খেয়ালী আর দুর্দান্ত আত্রাইকে ইট আর কংক্রীটের বলয় পরানো হয়েছে।

বাঁধের দিকে তাকিয়ে পরম তৃপ্তিতে ভরে উঠল জননেতা সুধীর রায়ের মন। তিনি একদিন থাকবেন না। কিন্তু তাঁর সৃষ্টি এই বাঁধ থাকবে!

আত্রাইয়ের বন্যাও যে ভয়ঙ্কর এবং প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষকে একেবারে গৃহহীন করে দেয়। অতএব বাঁধ না দিলে মেডান মাঠ, শহরের কোর্ট-কাছারী, থানা, ওপারে ডাকরা রেলাইন, চকভৃগুকে একেবারে ভাসিয়ে দেবে সর্বনাশা নদী আত্রাই—এসব কথা বহু কাকুতি-মিনতি করে ওইটুকু সেচ বিভাগের ওপরওয়ালাকে লিখে তবে ওইটুকু বাঁধ করাতে পেরেছেন।

—সুধীরবাবু আছেন না কি?

—আরে, জনাই যে! এত সকালে কি মনে করে!

উত্তরচকভবানীর মিত্রসংঘের সম্পাদক এবং তরুণ নেতা জনার্দন ওরফে জনাই এল।

দাদা, এই সাতসকালেই একটা খুব 'আন প্লেজ্যান্ট' ব্যাপার নিয়ে আপনার কাছে আসতে হলো, জনাইয়ের মুখে সঙ্কোচের ছায়া পড়ল।

তবে কি দাসপাড়ার লোকেরা বাঁধের জন্য বিশ্বজিৎবাবুর কাছে গিয়েছিল? সুধীরবাবু তাড়াতাড়ি করে রিপোর্ট লেখা কাগজটা চাপা দিয়ে ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটিয়ে বললেন, তোমাদের নেতা বিশ্বজিৎ বাঁধের কি করবে হে? ওটুকু বাঁধ আমিই করিয়েছি যখন, তখন বাদবাকীটুকুও—

—না দাদা বাঁধের ব্যাপার নয়—

—ও তাহলে বুঝেছি। মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশানে প্যাক্ট।

—না বলেছি তো মহৎ কোন কাজই নয়—একেবারে নোংরা ব্যাপার দাদা।

এইবার বিরক্তির রেখা ফুটে উঠল সুধীর রায়ের কপালে। কড়া গলায় বললেন, আমার অনেক কাজ আছে জানাই। তোমার যা বলবার তাড়াতাড়ি বলো—

—ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন না কেন?

—তোমাদের মাথাব্যথার কারণ জানতে পারি?

—সেটেলমেণ্ট অফিসের পাকুড়গাছের নিচে বসে কমলালেবু বিক্রি করে নিতাই দাস। তার বৌটার ওপর নজর পড়েছে আপনার ছেলে নালুর। কাল রাত্রে একটা কেলেঙ্কারী—

—ইম্পসিবল! টেবিলে প্রচন্ড একটা চাপড় মেরে ক্ষিপ্ত বাঘের মত গর্জন করে উঠলেন সুধীর রায়—এগুলো তোমাদের রটনা। আমার ছেলে এসব—

শুনুন আত্রাইয়ের জল বাড়ছে—আপনারা খুব সাবধানে থাকবেন—বাঁধের ওপর দিয়ে চলাফেরা করলে আইন অনুসারে দন্ডনীয় হবেন—মাইক্রোফোনে সরকারী পক্ষের ঘোষণা শোনা গেল।

ছুটে বাইরে এল জনাই এবং সুধীর রায়। [illegible] সামনে [illegible] স্বয়ং এস ডি ও ঘোষণা করছেন।

এই সংবাদ [illegible] সারা শহরে একটা [illegible] দিল।

॥ দুই ॥

[illegible] শিবতলীর [illegible] আর বড় [illegible] ঘন ছায়া বিছানো নির্জন পথে [illegible] গলার খিলখিল করা হাসির শব্দ শোনা গেল।

ওরা দুজন। দুটো প্রাণী। যেন [illegible] কল্পনা [illegible]-আত্রাই অধ্যুষিত এই বিধ্বংসী [illegible] আশঙ্কায় ভরা দেশ থেকে অনেক দূরের কোন গানে ভরা, স্বপ্নমাখা আর এক জগতের বাসিন্দা তারা।

শিবতলীর মণ্ডপের সামনে পুকুরের জলে ওদের উল্টো ছায়া কাঁপছে থরথর করে। কাঁপছে ওদের দুজনের বুকের ভেতরেই একটা মস্ত উল্লাস!

—তুমি ঠিক বলছো?

—দেখ সুমি নালু রায় চালিয়াৎ, ফোরটোয়েণ্টি, একটু আধটু নেশা টেশাও যে না করে তা নয়। কিন্তু—

লোহার বালাপরানো বাঁ-হাতটা চওড়া বুকে ঠেকিয়ে আস্তে বলল, এইখানটায় যাকে সে একবার বসিয়েছে তাকে কখনো মিথ্যা বলে না—

সুমিতার অনুরাগের দৃষ্টিটা নালুর খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা মুখে খেলা করে। স্কাউণ্ড্রেলটার খবর কি? কালকেও আরেকটু মেরেছিল!

সুমিতা কোন কথা বলল না। তার মুখে অন্ধকার নেমে এল। চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। কান্নার ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, তুমি তো সবই জানো। কাল রাত্রে তুমি ছুটে না গেলে গলা টিপে মেরে ফেলতো শয়তানটা।

—সে কী! আমি তো দেখলাম, তুমিই একটা লাঠি নিয়ে তেড়ে যাচ্ছো নিতাইকে মারতে—খুক খুক করে হাসল নালু। পরম আদরে তার পিঠে হাত রেখে বলল, তুমি লাঠি খেলা জানো। ছোরা খেলাতেও মেডেল পেয়েছো। আর সেই গেছোমেয়ের স্বামী কি না একটা বেঁটে, ভীতু, কেমন ছুঁচোর মত দেখতে—বলেই চারিদিকের নির্জনতা কাঁপিয়ে হো হো করে হেসে বলল, ঈশ্বর শালা খুব রসিক মাইরী!

—হেসো না ঠাকুরপো, তুমি যা হোক একটা ব্যবস্থা করো। আমি আর ছোটলোকের ঘর করবো না।

মুহূর্তের জন্য চিন্তার ছায়া পড়ল নালুর চোখে। বলল, দাঁড়াও—এসব কাজ কি হুট করলে হয় হাসল নালু। সুমিতার হাতটা নিজের হাতের ভেতরে নিয়ে নাচাতে নাচাতে বলল, খাদিমপুরের রাজেন মল্লিক কালিয়াগঞ্জের রুট পারমিট পেয়েছে। এইবার বাস কিনলেই আমাকে সুপারভাইজারের একটা চাকরি দেবে।

—সত্যি বলছো!

—মানে? আরে একবার চাকরিটা পেয়ে নিই তারপর দেখবে বাবা-মা-নিতাই আর শালার ভগবান সবাইকে কলা দেখিয়ে তোমাকে নিয়ে চলে যাবো একদিকে—

কথা নয়। সুমিতা যেন গান শুনছে। আরে সুমি দেখছো—সারি সারি পিঁপড়ে মুখে খাবার নিয়ে চলেছে—নিশ্চয়ই আজই বান আসবে—

—কেন গবর্নমেণ্ট থেকে যে মাইকে বলে গেল শোনো নি—

—আরে দূর গবর্নমেণ্টের লোক কি জানে! পিঁপড়েগুলো—হলুদ পিঁপড়ে দেখেছো। আমগাছের কি যে কোন উঁচু গাছের মগডালে থাকে। ওরা বুঝতে পেরেছে এইবার আত্রাইয়ের বান গাছের মগডালে গিয়ে ঠেকবে—

॥ তিন ॥

—আমাদের কি হবে বাবু, আপনি এত চেষ্টা করলেন তবুও আমাদের দিকে বাঁধ হলো না—

—এখন আমরা আর একবার নতুন করে সর্বহারা হয়ে যাবো—

জেলেপাড়া, মেডার মাঠের বাসিন্দারা সুধীর রায়কে ঘিরে রয়েছে বাজারের মোড়ে।

চোখের পলকে পেটমোটা পোর্টফলিও ব্যাগটা খুলে গাদা কাগজ বের করে ফেললেন জননেতা সুধীর রায়। এই দেখ—তিস্তার গতিপথ অর্থাৎ কোর্সের ডায়াগ্রাম এঁকে এবং আত্রাই যে তার ডাইরেক্ট ট্রিবিউটারী এসব লিখে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে বহুবার লিখেছি—

—কোন উত্তর আসে নি?

—তাহলে আমরা আবার ভেসে যে পাকিস্তানে চলে যাবো—

—তোমরা একটু শান্ত হও—আমি যাচ্ছি ডি এম-এর কাছে—দেখি কি করতে পারি, বলে বন্যার আশঙ্কায় চঞ্চল, অস্থির মানুষগুলোর ব্যূহের ভেতর থেকে কোন রকমে পালিয়ে গেলেন সুধীরবাবু।

দুপুরের সারালক সূর্য আকাশের মাঝখানে জ্বল জ্বল করছে। নদীর ধারে বাঁধের ওপর দিয়ে চলেছেন হনহন করে বাড়ির দিকে।

যতদূর চোখ যায় একেবারে সেই সদু গোয়ালার ঘাট পর্যন্ত সুদূর বিস্তৃত গৈরিক জলরাশি। রাশি রাশি মল্লিকাফুলের মত ফেনা ভেসে ভেসে চলেছে তীব্র স্রোতে। ওপারে সিদ্ধান্তিক নরেশ ভট্টাচার্যের পঞ্চমুণ্ডী কালীবাড়ির সামনে নদীর বুকে নারকেল গাছের [illegible] পাতায় [illegible] জলের ধাক্কা লেগে সোঁ সোঁ শব্দ হচ্ছে। [illegible] মত্ত হস্তীর মত [illegible] আছড়ে পড়ছে।

সুধীরবাবুর [illegible] একটা নিদারুণ সত্য [illegible] উঠল এইবার এই বাঁধ জলের [illegible] সহ্য করতে পারবে না! বাঁধ ভেঙে [illegible] শহর একেবারে প্লাবিত করে দেবে।

বহু লেখালিখি এবং আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ এমব্যাঙ্কমেণ্টের কাজ অন্ত পর্যন্ত শেষ করল না! না—কিছুই তিনি করতে পারলেন না—মেডার মাঠ, ডাকরা, মেলোইনের একটি প্রাণীকেও বাঁচাতে পারলেন না। অথচ এই জায়গাগুলো তাঁর কনস্টিটুয়েন্সির অন্তর্ভুক্ত।

তাঁর দু'চোখে নেমে এল হতাশা। মনে হল, আত্রাইয়ের বন্যার জলে তিনি একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছেন। আর তাঁর বুকের ভেতরের সেই রঙীন বাসনাগুলো। খবরের কাগজে রেডিওতে তাঁর নামের ঘোষণা আইনসভার সদস্য মন্ত্রী। যেন দূরে—বহুদূরে অন্ধকারময় দিগন্তে দাঁড়িয়ে তাঁকে মুখ ভ্যাঙাচ্ছে।

কি সর্বনাশ হলো? কাঁপিতে পা

ডেপ্রেসার মন্ত্রে মা সুহাসিনী সামনে এসে দাঁড়ালো। চোখ-মুখ থমথম করছে—

—কি হয়েছে কি—

হবে আবার কি। ছেলে যে ফল-ওয়ালা নিতাইয়ের বৌকে ঘরে এনে তুলবার আয়োজন করছে সে খবর রাখো? খেঁকিয়ে উঠলো সুহাসিনী। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, উনি যাচ্ছেন বাঁধ দিয়ে শহরের লোককে বাঁচাতে—নিজের ঘরে বাঁধ দেয় কে তার নেই ঠিক—

কে বলেছে তোমাকে এসব কথা। আমার নান্দু এরকম ছেলে নয়, পোর্ট-ফলিও ব্যাগটা আকাশের দিকে উঁচু করে ধরে দুর্বাসার মত অভিশাপ দিতে দিতে বললেন নিশ্চিন্তপুরের লীডার—যে এসব স্ক্যান্ডাল ছড়িয়েছে—তার বিরুদ্ধে আমি ডিফেমেটোরী স্যুট করবো—দেখে-নিও—

কোন কথা বলল না সুহাসিনী। কেমন বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকালো স্বামীর দিকে। পরনে লাল খদ্দরের জামা। উসকোখুসকো চুল। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পলিটিক্স আর পদমোহের মরীচিকার পিছনে ছুটছে অন্ধের মত।

রাগ হলো না সুহাসিনীর। মাথায় মনটা ভরে গেল। জলেভরা চোখদুটো তুলে ধরে শুধু বলল দেখো ফলওয়ালার বৌকে নিয়ে যেন কোন কেলেঙ্কারী না করে নান্দু—আর একটিও কথা না বলে চলে গেল সুহাসিনী।

—শোভন—জনাই এসেছিল এসব কথা বলতে। জনাই হলো আমার রাইভ্যাল বিশ্বজিৎ বোসের চেলা। তারাই এসব স্ক্যান্ডাল ছড়াচ্ছে—এগুলো হলো ইলেক-শন স্ক্যান্ডাল বুঝলে গিন্নী—সুহাসিনীর উদ্দেশ্যে রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে কথা-গুলো ছুঁড়ে দিয়ে আবার বেরিয়ে গেলেন সুধীর রায়।

॥ চার ॥

নদীর জল বাড়তে লাগল। গেজ-রীডারের চোখদুটো চমকে উঠল—ডেঞ্জার লেবেল ছাড়িয়ে গিয়েছে!

সঙ্গে সঙ্গে সে কন্ট্রোলরুমে খবর পাঠালো। সেখান থেকে থানায় থানায় ওয়্যারলেসে জানিয়ে দেওয়া হলো—বন্যা আসছে!

বিকেল পর্যন্তও নিশ্চিন্তপুরের নিশ্চিন্ত জীবনধারা একটুকু বিঘ্নিত হয় নি। নর্থবেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্টের গ্যারেজ থেকে ঠিক ভোর ছ'টায় কলকাতার বাস ছেড়েছিল। বাজার বসেছিল। স্কুলে [illegible] বসল। এমন কি দুপুরে সিনেমা-হলে ম্যাটিনী শো আরম্ভ হওয়ার আগে লাউডস্পীকারে চটুল হিন্দী গানও বেজেছিল।

কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ কালো করে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। বৃষ্টি পেয়ে আত্রাইয়ের জল নাচতে লাগল ভৈরবী উল্লাসে। বৃষ্টির একটানা ঝম ঝম-শব্দ, ঝড়ো বাতাস আর জলের গর্জন সব মিলিয়ে যেন মহাপ্রলয় নেমে এল।

ওপারে নদীর একেবারে ধারে চকভৃগু, ডাকরা জলঘরের দিক থেকে ভয়ার্ত মানুষের আর্ত চিৎকার শোনা গেল। কিন্তু আত্রাইয়ের জলের গর্জন লুণ্ঠনকারী ডাকাতের দারুণ অট্টহাসির মত বিপন্ন গৃহস্থের সেই করুণ, মর্মান্তিক কান্নাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

চারিদিকে পালাও পালাও রব উঠল। বাক্স-পেটরা মাথায় নিয়ে ছেলেমেয়ের হাত ধরে যে যেদিকে পারল ছুটতে লাগল।

কিন্তু কোনদিকে যাবে—কোথায় যাবে? বেলতলা পার্ক থেকে শুরু করে একেবারে খাড়ির পোলের পাশে স্লুইস গেট পর্যন্ত সমুদ্রের মত বিশাল জলরাশি। মেড়ার মাঠের বাস্তুত্যাগীদের ছ্যাঁচার বেড়া আর খড়ের চালের বাড়িগুলো একেবারে নিশ্চিহ্ন। শুধু উঁচু উঁচু শ্যাওড়া আর যজ্ঞডুমুর গাছের মাথাগুলো জেগে রয়েছে।

ডুবন্ত গরু, ছাগল ভেড়ার একটানা চিৎকার, নারী শিশু বৃদ্ধের আকুল আর্ত-নাদ। সব মিলিয়ে একটা বিচিত্র শব্দের তরঙ্গ ঝড়ো বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

এই ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করেই তারা বেরিয়েছিল। বেরিয়েছিল খুব গোপনে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে। একজনের ঘর ভেঙে দিয়ে পালাতে হবে। তাই এই ভয়ঙ্কর দুর্যোগের সময়টাই তাদের খুব প্রশস্ত সময় মনে হয়েছিল।

সুমিতার হাতে একটা চটের রেশান ব্যাগ।

নান্দুর হাতে টিনের স্যুটকেশ।

ওদের ভবিষ্যৎ সংসারের সামান্য উপকরণ। কিন্তু নান্দু দেখল, হাজার হাজার সাজানো সংসার ভেঙে চলেছে জলের স্রোতে।

হু হু করে জল বাড়ছে। বৃষ্টির বিরাম নেই। সেই সঙ্গে চলেছে মানুষের অশ্রান্ত আর্তনাদ।

—[illegible] নয় সুমি। জলপাই-গুড়িকে [illegible]—এইবার তিস্তা [illegible] নামিয়েছে আত্রাইতে—

—কি হবে ঠাকুরপো। এই [illegible] ভেতরে কি নিশ্চিন্তপুরের মাস বাড়বে?

কোন উত্তর দিল না নান্দু। তার হঠাৎ মনে হল, [illegible] স্বার্থপর! [illegible] জলের [illegible] নিজের [illegible]।

[illegible] সুমির [illegible] উঠেছে চারিদিকে। বিদ্যুতের আলোতেই নান্দু দেখল, রাস্তার কোন চিহ্নই নেই।

—কি করা যাবে সুমি, পথ যে ঠাওর করতে পারছি না। তবুও নিজের শক্ত হাতের মুঠির ভেতরে সুমির হাতটা নিয়ে রাস্তা আন্দাজ করে কোমর জল ঠেলে অগ্রসর হলো।

কোথায় চালের ওপরে কেউ বসে আছে। কোথাও বা তিন-চারটে তক্তাপোষ পর পর সাজিয়ে তার ওপর বসে রয়েছে বাড়ির মালিক একলা। বৌ ছেলেমেয়েকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে দিয়েছে আগেই। এখন যক্ষের মত বসে ঘরের জিনিসপত্র আগলাচ্ছে।

—জল যে ক্রমশ বাড়ছে ঠাকুরপো। সুমির গলায় কান্নার আভাস।

কথা বলার সময় নেই নান্দুর। সুমিকে জড় পদার্থের মত একরকম টেনে টেনেই নিয়ে চলেছে জলের ভেতর দিয়ে।

সুমির দেহটা যেন কেমন বেশি ভারী ভারী ঠেকছে। চোখমুখে [illegible] ছাট আছড়ে পড়ছে [illegible]। তীব্র ঠাণ্ডা হয়ে [illegible] পা দুটো পর্যন্ত [illegible] হয়ে আসছে।

তুমি যে একেবারে গা [illegible] দিয়েছো সুমি—

—আমি আর—আর পারছি না ঠাকুরপো—তার দুর্বল অবসন্ন দেহটা থর থর করে কাঁপতে লাগল।

তাড়াতাড়ি জড়িয়ে ধরল সুমিকে। আকুল স্বরে বলল—আর একটু কষ্ট করো লক্ষ্মীটি। ওই দেখো—বিশ্বজিৎ বসুর দোতলা বাড়ি দেখা যাচ্ছে তার পরেই হাইরোড—

কিন্তু যাওয়া হলো না। পাশে একটা জলে ডুবে যাওয়া পরিত্যক্ত বাড়ির ভেতরে সুমিকে নিয়ে গা ঢাকা দিতে হলো।

এই ছেলেরা তাড়াতাড়ি—ভাই তাড়া-তাড়ি চলো নৌকো নিয়ে—পিছনের সুধীর রায়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল নান্দু।

সে দেখল একদল ছেলে নিয়ে তার বাবা চলেছে মেড়ার-মাঠের দিকে। বলছেন খুব সাবধান ভাই—দেখিস—আমার কনস্টিটুয়েন্সির একটা মানুষ—একটা প্রাণীও যেন না মরে। সামনে ইলেকশান।

ইলেকশান! মানুষ মরছে। সর্বস্ব ভেসে যাচ্ছে। আর তার বাবা নিজের কথা ভাবছে!

বন্যার সর্বহারা মানুষগুলোকে নিয়ে পলিটিক্স হচ্ছে! তার বাবা, সুমি—[illegible] পর্যন্ত [illegible]—সব স্বার্থপর।

জীবন ধাঁড়ির ভেতরে বুক অবধি জলে দাঁড়িয়ে ঘাপের ওপর কোঁসে নাল্টু।

সুধীর রায়ের রিলিফের দল চলে যেতেই নাল্টু বেরিয়ে এল সুমির হাত ধরে। চারিদিকে গাঢ় গভীর অন্ধকার। কানের পাশে বাতাস সাঁ সাঁ করছে।

এখন কি করা যাবে গো ঠাকরুণ? নাগরের হাত ধরে তো বড় বেরিয়েছ—

'নৌকোবিলাস' পালার সেই খেয়াঘাটের মাঝিরূপী শ্রীকৃষ্ণের ঢঙে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলল, এখন যদি দুজনে জড়াজড়ি করে মরি প্রিয়ে—

—হাই রোডে যাওয়া যাবে না? গঙ্গারামপুরের বাস।

—এই তো সামনে হাই রোড দেখ না—সমুদ্দুর বাস নয়—নৌকোর খোঁজ দেখ।

ভয়ে উত্তেজনায় কেঁদে নাল্টুর চওড়া বুকে মুখ লুকালো সে। বিরক্ত হয়ে নাল্টু—ওঃ! করছো কি, কাঁদছো কেন? এখন কি কাঁদবার সময়। চলো কলেজ বিল্ডিং এর দিকে।

কলেজের দিকে যেতেই বিপন্ন মানুষের হাহাকার, হাঁকডাক-চিৎকার আরো বেশি করে কানে আসতে লাগল।

শহরের এ অঞ্চলে জল বেশি। সরু রাস্তার দুদিকে ঘিঞ্জি বাড়ি। প্রত্যেক বাড়ির একতলার ছাদ পর্যন্ত এক হাঁটু জল। ... দামী আসবাবপত্র আলো ... চিৎকার করছে সব —বাঁচাও বাঁচাও—

... এই রাত্রে এক বুক জল ঠেলে ... পড়েছ?

... অস্থির এখনো মানুষের মনে ... এক বিচিত্র দৃশ্য। ... পলিটিক্সওয়ালারা ... আসছে। তাদের ... হাতে লণ্ঠন। কেউ ... করে, কেউ আসছে নৌকো করে।

—... চলে আসুন—আমাদের ... জিনিসপত্র থাক শুধু মানুষগুলো উঠে পড়ুন নৌকোয়—

—... কি যাবেন—ওরা তুলবে নিয়ে ... অন্ধকার ঘরে। সেখানে না পাবেন খাবার—না পাবেন একটু জল—

—কি যা-তা মিথ্যা বকছেন। আমরা স্কুলে চালাও খিচুড়ী বেগুন ভাজার বন্দোবস্ত করেছি। ... একবার স্কুলে গিয়ে দেখে আসবেন।

... হয়ে গেল কথা কাটাকাটি। কে আগে উপকার করবে তাই নিয়ে মারামারি হওয়ার উপক্রম।

হঠাৎ এদের কলরবকে একেবারে স্তব্ধ করে দিয়ে মাইক্রোফোনের কম্বুকণ্ঠ শোনা গেল—খুব সাবধান। বন্যা সর্বনাশ করেছে আপনাদের। আবার নতুন করে সর্বনাশ ডেকে আনবেন না—

ডাকবাংলোর ছাদে দাঁড়িয়ে মাইকে বক্তৃতা করছে জনসঙ্ঘের সেক্রেটারী রসরাজ—যেখানে সত্যিকারের সাহায্য পাবেন—সেইখানে যাবেন—

এমন সময় জলের ভেতরে একটা প্রচণ্ড আওয়াজ হলো।

কী ব্যাপার। সামরিক বাহিনীর উভচর সেই এ্যাম্ফিবিয়ান বোট নিয়ে এল না কি কেউ?

না। জলের ভেতর দিয়ে গরুর গাড়ি ঠেলে নিয়ে আসছে একদল ছেলে। অন্ধকারে তাদের স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে না।

—কারা হে তোমরা?

আমরা ঐকতান সঙ্ঘের ছেলেরা—তাদের মাতব্বর পাড়ার মণ্ডপে টুইস্ট নাচিয়ে বাবু বুক চিতিয়ে এসে দাঁড়ালো।

শুধু বাবু একা নয়। তার সঙ্গে এসেছে তার দোসর নন্টু, সোনা, হীরু, ... আরো অনেকে। শোনা যায় ওরা কেউ নেশা ভাঙ করে কেউ ফাস খেলে। মেয়েদের ওপর, শহরে ওদের অনেক দৌরাত্ম্যের কাহিনী লোকের মুখে মুখে ফেরে।

কিন্তু কাউকে কিছু ভাববার কিম্বা বলবার সুযোগ না দিয়ে ওরা বিপদগ্রস্ত মেয়েপুরুষকে নিয়ে গাড়িতে তুলল। যারা বৃদ্ধ, অসুস্থ, শিশু, তাদের কোলে করে পিঠে করে যে যেমন করে পারল নিয়ে এল গাড়িতে। মাথায় করে বয়ে নিয়ে এল ভারী ভারী বাক্স-স্যুটকেশ।

—আসুন আসুন দেরি করবেন না—আমরা শহরের প্রত্যেকটি গরুর গাড়ি 'সিজ' করে নিয়ে এসেছি—

গরুটরু নেই। এই জলের ভেতর দিয়েই জোয়াল কাঁধে লাগিয়ে গাড়ি টেনে নিয়ে এসেছে! চোখের পলকে মানুষ আর মালপত্র দিয়ে গাড়ি বোঝাই করে ফেলছে আর টেনে নিয়ে যাচ্ছে জন্তুর মত স্কুলের দিকে।

ওদের গায়ের জামা ভিজে সপসপে হয়ে গেছে। হাতের আঙুলগুলোর ডগা একেবারে সিটিয়ে গেছে। ঠাণ্ডায় কাঁপছে ঠক ঠক করে। তবুও ঝড়ের মত রিলিফ করে যাচ্ছে—

—না। আমি আর পারছি না—পারছি না সুমি—অন্ধকার ঘরে জন্তুর মত ফুঁসে উঠল নাল্টু।

-কি বলছো ঠাকুরপো—কি বলছো, ভয়ে জড়িয়ে ধরল নাল্টু!

—দেখতে পাচ্ছো না, বাবুকে, নন্টুকে—হীরুকে—দেখছো না আমার বন্ধুদের—উঃস ওরা কী সুন্দর কাজ করছে। কত ভাল করছে, অস্ফুটস্বরে আপন মনে বিড় বিড় করে বলল নাল্টু—আর আমি—আমি মেয়েছেলে নিয়ে—বলতেই হঠাৎ নিবিড় বেষ্টন থেকে ছিটকে বেরিয়ে চলে গেল নাল্টু।

আমাকে ফেলে চলে যেও না—চলে যেও না ঠাকুরপো—তার আকুল কান্না দুর্গতদের কান্নার ভেতরে কোথায় হারিয়ে গেল।

এদিকে হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটে গেল। বখাটে বাবুর দলের অপূর্ব 'রিলিফে'র কাজ দেখে বিভিন্ন পার্টির ছেলেরা নেতাদের নির্দেশের অপেক্ষা না রেখেই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

জননেতা সুধীর রায় কলেজ হোস্টেলের ছাতে দাঁড়িয়ে দেখলেন, অভূতপূর্ব দৃশ্য—বন্যা নয়, বিপদ নয়, কোন প্রলয়-দুর্যোগের সেই ভয়াল পরিবেশের আভাস পর্যন্ত নেই কোথাও,—চারিদিকে একটা যেন আনন্দময় উৎসবমুখরতার আবহাওয়া। প্রত্যেকটি ছেলে জীবন বিপন্ন করে কাজ করছে। শীতে কাঁপছে। তবুও হেসে হেসে আর খোলা গলায় গান গেয়ে কাজ করছে। আর্তত্রাণের নেশা। পরোপকারের নেশা ওদের একেবারে পাগল করে দিয়েছে—দিয়েছে উদভ্রান্ত করে—

তিনি ভুলে গেলেন নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা—ভুলে গেলেন ইলেকশন—কনস্টিটুয়েন্সি—ভোট ইত্যাদি মনের শান্তি আর ঘুম কেড়ে নেওয়া সব দুশ্চিন্তা। তাঁর বুকটা কেমন উদার ও মহৎ অনুভূতির ভেতরে একটু একটু করে বাষ্প হয়ে গেল।

তাঁর মনে হল প্রয়োজন ছিল—এই বিপর্যয়ের—প্রয়োজন ছিল এই দুঃখ-ঘাতের। এসব না হলে যে মানুষের মনুষ্যত্বের অন্তর্নিহিত উদ্ভাস দেখা যায় না।

তিনি আর দাঁড়ালেন না। দ্রুত পায়ে বাড়ি ফিরে এসেই কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন।

না। অ্যাসেম্বলীর সামনে এক্সটেনশন বার জন্য তদ্বির নয়, ইলেকশনের কোন কাজ নয়। কলকাতার খবরের কাগজে পাঠাবেন বলে নিশ্চিন্তপুরের ভয়াবহ বন্যার রিপোর্ট লিখতে বসলেন।

লিখলেন—বাঙালী তরুণদের এখনো আশা আছে—এখনো তারা তাদের নিয়ে গর্ব।

সংগীতাঞ্জলি—নজরুল ইসলাম : স্বরলিপি : শ্রীনিতাই ঘটক : জেনারেল প্রিণ্টার্স এ্যাণ্ড পাব্লিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট : কলিকাতা—১৩। মূল্য : পাঁচ টাকা।

নজরুল তিন হাজারেরও বেশি গান রচনা করেছিলেন। অত্যন্ত পরিতাপের কথা যে তার মধ্যে অতি অল্প গানই আজ প্রচলিত আছে। এই প্রচলিত গানগুলির মধ্যেও কিছু কিছু ভুল কথা বা সুর অজস্র শুনতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের স্বরলিপিকারের বহুদিন কবির সংগে একত্র বসবাস এবং তাঁর কাছে গান শেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। এছাড়া গান রেকর্ড করার সময়, ফিল্মে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কবির সহকারী হিসাবে তিনি কাজ করেছেন। সেইজন্য তিনি যে স্বরলিপি পরিবেশন করেছেন তা যে সম্পূর্ণ প্রামাণিক সে-বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই।

গ্রন্থটিতে সর্বসমেত ৩১টি গান আছে। এর মধ্যে চারটি গান এক সময় কবি নিজে গেয়ে রেকর্ড করেছিলেন। বর্তমানে সেগুলি দুষ্প্রাপ্য। বর্তমান গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে রাগপ্রধান, [illegible] গজল, ভৈরবী, কীর্তন, বাউল, [illegible] এবং দেশাত্মবোধক [illegible] কিছু গান। আধুনিক [illegible] গীতিকারের এই গানগুলি [illegible] সমাদর আজ [illegible]।

[illegible] : নজরুল ইসলাম : শ্রীনিতাই ঘটক সংকলক : জেনারেল প্রিণ্টার্স এ্যাণ্ড পাব্লিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট : কলকাতা—১৩। মূল্য : তিন টাকা।

নজরুলের নিজের অপ্রকাশিত [illegible] অপ্রকাশিত [illegible] "দেবীস্তুতি" সংকলিত হয়েছে। শ্রীনিতাই ঘটক সংকলকের নিবেদনে বলেছেন—"১৯[illegible] সালের জানুয়ারী মাসে আমার ঐকান্তিক আগ্রহ এবং অনুরোধে কবি 'দেবীস্তুতি' লেখেন। এই সংকলনের কিছুদিন আগে থেকেই কবি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থ [illegible] করেন। সেই সময় তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে জ্ঞানী গুণী সাধু-সন্তদের সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন। তাঁকে এই সময় বিবিধ প্রকার যোগসাধনা করতেও দেখেছি।" আদ্যাশক্তি মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী, সতী, উমা, চণ্ডিকা মহাকালী, রক্তদন্তিকা, শতাক্ষী, ভ্রামরী এবং অন্যান্য স্তোত্র এবং 'বিজয়া' ও 'হরিপ্রিয়া' নাটিকা দুটি পড়ে বারবার মনে হয় "যিনি আজ স্তব্ধ, মূক হয়ে আমাদের মধ্যে বছরের পর বছর কাটাচ্ছেন তাঁর মহামৌনের অতলে ডুব দিলে শুনতে পাওয়া যাবে শুধু মাতৃনামের ঝংকার। কাজী নজরুল ইসলাম স্বভাবে ও স্বরূপে মাতৃসাধক বা পরম শাক্ত। প্রথম জীবনে দেশমাতৃকারূপে এই জননীই তাঁর ধ্যান জ্ঞান আরাধনার বিষয় ছিলেন এবং শেষের দিকে বিশ্বমাতৃকা বা জগজ্জননীরূপে তিনিই তাঁর আরাধ্যা হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর অন্তর্জীবনের এ পরিণতির খবর হয়ত অনেকে রাখেন না, গীতিরচয়িতা বা কবি গায়ক নজরুলের অন্তরালে সাধক নজরুলের অস্তিত্বের কথা অনেকেই জানেন না।" রবীন্দ্রোত্তর বাংলার শ্রেষ্ঠ কবির এই গ্রন্থটির ভূমিকা লিখতে বসে শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় নজরুলের এই অন্তর সত্তাটি সম্যকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

সঙ্গীতচন্দ্রিকা : গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় : রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত : প্রকাশক রবীন্দ্রনাথ মল্লিক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ৬/৪, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলকাতা—৭। মূল্য : পনেরো টাকা।

সঙ্গীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থটিকে দুটি খণ্ডে প্রকাশ করেছিলেন। প্রথম খণ্ডটি ১৩১৬ বঙ্গাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৩২১ বঙ্গাব্দে। ১৯৩২ খৃস্টাব্দে প্রথম খণ্ডটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। এর পর দীর্ঘকাল গ্রন্থটির দুটি খণ্ডই দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছিল। সেদিক থেকে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এটির প্রকাশনার ব্যবস্থা করে একটি [illegible] বড় এবং প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করেছে।

বর্তমান সংস্করণে গ্রন্থখানিকে ব্যবহারের পক্ষে আরো উপযোগী করে খণ্ডকে একত্রিত করে একটি গ্রন্থে বাঁধাই করানো হয়েছে। পূর্ব সংস্করণের দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি বর্জন করে আকারমাত্রিক স্বরলিপি ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রন্থটির ভূমিকায় এ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন সঙ্গীতাচার্য স্বয়ং এই পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। তা ছাড়া আজকের দিনে আকারমাত্রিক স্বরলিপির লোকপ্রিয়তার দিকটি চিন্তা করেও এই পরিবর্তন সুবিধাজনক বলে মনে হয়।

সঙ্গীতচন্দ্রিকাতে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর সারা জীবনের সাধনালব্ধ জ্ঞানকে একত্র সংগ্রহ করে তা পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। গ্রন্থের বিষয়বস্তুর পরিচয় হতেই এটি উপলব্ধি করা যায়। গ্রন্থারম্ভে গান সম্বন্ধে জানবার মত সাধারণ বিষয়গুলির এবং বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

পরবর্তী অংশটিতে রয়েছে অসংখ্য গান এবং সেগুলির স্বরলিপি। এই গানগুলি রচনা করেছিলেন আমাদের দেশের প্রাচীনকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সুরকারেরা। এঁদের মধ্যে আছেন তানসেন, বৈজুবাওরা, বিলাস খাঁ, ধোধি খাঁ, সুরদাস সদারঙ্গ রসরঙ্গ প্রমুখ। অতি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র হতে গান নির্বাচনের ফলে বহু প্রথম শ্রেণীর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গ্রন্থটিতে স্থান লাভ করেছে। ধ্রুপদ, খেয়াল আলাপ তাদের অন্যতম। বহু অপ্রচলিত ও বিস্মৃতপ্রায় গানও স্থান পেয়েছে, যেমন ধামার, ছন্দ, রাগমালা, কণ্ঠ-কলবানা ইত্যাদি। প্রাচীনকালে গুরুশিষ্য পরম্পরায় মৌখিক শুনে এই সব গানের গায়কী স্মৃতিশক্তির সাহায্যে ধরে রাখা হত। এমনি করে কিছু কিছু সঙ্গীত সংরক্ষিত হয়েছে। আবার এই কারণেই প্রাচীনকালের বহু গান একেবারে হারিয়ে গিয়েছে।

এই সকল সম্ভাবনা হতে রক্ষা করবার জন্যই সঙ্গীতাচার্য বিশেষভাবে নির্বাচিত এই গানগুলি স্বরলিপি সহ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেছেন। সেইদিক থেকে গ্রন্থটি সবিশেষ অমূল্য। গ্রন্থটির সম্পাদনার ভার নিয়ে গ্রন্থকারের পুত্র সঙ্গীতবিশারদ অধ্যাপক রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে গুরুদায়িত্ব বহন করেছেন তা অভিনন্দনযোগ্য।

গুরু গোবিন্দ সিং : হরবংশ সিং : অনুবাদক : উপেন্দ্রকুমার দাস : প্রকাশক : হরবংশ সিং, গুরু গোবিন্দ সিং ফাউণ্ডেশন, ৩১, এস. এস. এ ক্যাম্পাস, চণ্ডীগড়, পাঞ্জাব। মূল্য : পাঁচ টাকা।

শৈশবে থেকে যৌবনের শেষ [illegible]

করিওলান নাটকে এগ্রিপার ভূমিকায় ভোলফ্ কাইজার

টোয়েণ্টিজে এই মঞ্চেই ব্রেশটের কয়েকটি নাটক প্রচুর সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল।

রঙ্গগৃহটিকে সংস্কার করে সম্পূর্ণভাবে আধুনিক করে ফেলা হল। এইবার ব্রেশটের একটা দীর্ঘকালের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতা লাভ করল—একটি থিয়েটারের সর্বময় কর্তা তাঁকে করে দেওয়া হোল। এই দলে অভিনেতা-অভিনেত্রীর সংখ্যা ছিল ষাটজন। সব মিলিয়ে এখানে কাজ করতো আড়াই শো জন—এর ভেতর ছিল অভিনেতা, ডিজাইনার, প্রডিউসার, ড্রামাটার্জেন, মেকানিক মিউজিসিয়ান, সিন পেইণ্টার প্রভৃতি—এরা সবাই ছিল ব্রেশটের আজ্ঞাবহ। এই সময় ব্রেশট খানিকটা ঠাট্টার সুরেই বলতেন—একমাত্র চার্লি চ্যাপলিনকে বাদ দিলে—তিনি নিজেকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রডিউসার বলে মনে করেন।

এই উক্তির যথার্থতাও প্রমাণিত হয়ে গেল। এর পর সামান্য যে কবছর তিনি বেঁচেছিলেন, ব্রেশটের প্রডাকসনগুলো নিঃসন্দেহে এ যুগের শ্রেষ্ঠ মঞ্চনাটকরূপে সর্বজনের স্বীকৃতি লাভ করলো। বার্লিনার অসেম্বল ১৯৫৪ সালে 'মাদার কারেজ' এবং ১৯৫৫ সালে 'দি ককেশিয়ান চক সার্কল' নিয়ে প্যারিসে অভিনয় করতে গেল। এর ফলে এদের খ্যাতি ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। দেশ-বিদেশ থেকে নাট্যবিশেষজ্ঞরা পূর্ব বার্লিনে আসতে লাগলেন ব্রেশটের কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ করবার জন্য।

মৃত্যুর আগে ব্রেশট আর একটি নাটক 'টুর‍্যাণ্ডট অর দি কংগ্রেস অব হোয়াইট-ওয়াসার্স' লিখে রেখে যান—এটি প্রায় সম্পূর্ণ কিন্তু অসংশোধিত অবস্থায় ছিল। চাইনিজ সেটিং-এ ধনতন্ত্রবাদের সমর্থক বিদগ্ধ ব্যক্তিদের প্রতি বিদ্রূপ করে নাটকটি লেখা। শোনা যায় বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোডোর' কাউণ্টার প্লে হিসাবে একটি নাটক লেখবার পরিকল্পনাও ব্রেশট করেছিলেন।

১৯৫৫ সালের বসন্তকালে ব্রেশট বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৫৬ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ তাঁর [illegible] বছরের জন্মদিনে তিনি মিলানে [illegible] ও স্ট্রেলারের পরিচালনায় পিচ্চলো [illegible] 'দি থ্রী পেনী ওপেরার' শুভ উদ্বোধন রজনীর উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁর বেশ হার্ট খারাপ দেখা দিয়েছে।

১৯৫৬ সালের ২৭শে আগস্ট থেকে বার্লিনার অসেম্বলের লণ্ডনে [illegible] হবে বলে ইংলণ্ডের [illegible] বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় [illegible] আসলে তখন [illegible] রিহার্সাল চলে [illegible] ১০ই আগস্ট [illegible] বার্লিনের অসেম্বলের একটি রিহার্সালে উপস্থিত ছিলেন। ১৩ই আগস্ট রাত্রি থেকে তাঁর অবস্থা খারাপের দিকে গেল এবং ১৪ই আগস্ট মধ্যরাত্রে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

বার্লিনার অসেম্বল কিন্তু তাঁদের লণ্ডন-প্রোগ্রাম বাতিল করেন নি। প্যালেস থিয়েটারে তাঁদের নাটকগুলো মঞ্চস্থ হয়—এই সময়েই 'মাদার কারেজ' এবং 'ককেশিয়ান চক সার্কল' দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

১৯৬৮ সালের ব্রেশট-ডায়লগের

ও' কেসীর প্লুরপ্লুস্টাউজসের একটি দৃশ্য

অধিবেশনের সময় আমাদের একদিন বার্লিনার অসেম্বলের স্টেজ দেখতে যাবার আমন্ত্রণ ছিল। সেই অনুসারে ১৬ই ফেব্রুয়ারী আমরা সকাল ন'টার সময় ওখানে যাই। আমাদের সব কিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন বার্লিনার অসেম্বলের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর ভালটের ব্রাউনরোথ। তাঁর সঙ্গে আলোচনায় এই সব কথা জানতে পেরেছিলাম :

এই থিয়েটারে বসবার আসন রয়েছে সাতশো কুড়িটি—স্টেজের ডেপ্থ হচ্ছে ১৬ মিটার, উইডথ ১২ মিটার, স্লোপ ৫ ডিগ্রি। অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং অন্যান্য কর্মচারী নিয়ে এখানে সর্বসমেত দুশো আশিজন লোক আছেন। এর ভেতর অভিনেতা-অভিনেত্রীর সংখ্যা ষাটজন।

স্টেজ ওপেরাতে এক হাজার দুশো-জন দর্শকের বসবার ব্যবস্থা আছে।

বার্লিনার অসেম্বলে তিনশো কিলো ওজনের জিনিষপত্র ওপরে লিফট করে নেবার মেকানিক্যাল এ্যারেনজমেন্ট আছে। অন্যান্য থিয়েটারে আছে দুশো কিলো অবধি।

'মান ইসট মানের' মত নাটক মঞ্চস্থ করবার জন্য অসেম্বলের সত্তর-আশিটা রিহার্সালের দরকার হয়। সকাল দশটা থেকে দুপুর দুটো অবধি রিহার্সালের সময়।

এই মঞ্চের আলোক-নিয়ন্ত্রণ করা হয় প্রেক্ষাগৃহের পেছন দিক থেকে। আমাদের ওপর লাইট কন্ট্রোল রুমে নিয়ে গিয়ে মোটামুটি আলোক-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে খানিকটা বোঝালেন ব্রাউন রোথ সাহেব।

এই মঞ্চটি রিভলভিং স্টেজ।

তেজার সৌনিককের একটি দৃশ্য

[ক্রমশঃ]

সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার

'সোভিয়েত দেশ' পত্রিকার উদ্যোগে নেহরু পুরস্কার প্রবর্তিত হয়েছে। গত কয়েক বছর যাবৎ এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। এ বছর আট হাজার টাকার প্রধান পুরস্কারটি পেয়েছেন কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ—তাঁর 'উত্তর আকাশের তারা' কাব্যগ্রন্থের জন্য। নাট্যকার দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় এক হাজার টাকার একটি পুরস্কার পেয়েছেন—ম্যাক্সিম গোর্কি'র 'মা' উপন্যাসের বাংলা নাট্যরূপ দেবার জন্য। এই পুরস্কার লাভের জন্য দিগিনবাবুকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তিনি নাট্যজগতের সঙ্গে বহুদিন জড়িত এবং তাঁর লেখা কয়েকটি নাটক গণনাট্য আন্দোলনে উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাঁর এই পুরস্কার প্রাপ্তি সকলের আনন্দের কথা।

প্রসঙ্গত মনে পড়ছে গত বছর নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় জীবনী ধর্মী (সোভিয়েত) নাট্যরূপ দেবার জন্য ৮ হাজার টাকার পুরস্কারটি পেয়েছিলেন। একইরূপ কাজের ক্ষেত্রে দু-রকমের পুরস্কারে মনে হচ্ছে নেহরু পুরস্কারের কোন বিষয় নির্দিষ্টতা নেই। কোন্ কাজের জন্য কিরূপ পুরস্কার দেওয়া হবে তার নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই।

নেহরু পুরস্কার প্রসঙ্গে আমার আরো একটি কথা মনে পড়ছে। ভারত-সোভিয়েত সম্প্রীতিতে সাহায্য করা এই পুরস্কারের উদ্দেশ্য। আজকের দিনে ভারত-সোভিয়েত সম্প্রীতির সহায়ক কাজ করা কঠিন কাজ ত' নয়ই বরং প্রশংসার কাজ। কিন্তু গত বিশ দশকে যাঁরা সোভিয়েত সাহিত্য অনুবাদ করে এদেশে সোভিয়েত পরিচিতি ঘটিয়েছেন, সে কাজটা আজকের মত এত সহজ, এত প্রশংসার ছিল না। তার জন্য দুঃখভোগ ছাড়া—পয়সা পাবার কথাই ছিল না। তখন সোভিয়েত রাশিয়ার নাম উচ্চারণও নিষিদ্ধ কাজের মত ছিল। সেই সময়, ১৯২৬ সালে সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় গোর্কি'র মা অনুবাদ করে এদেশের মানুষকে প্রথম গোর্কি নামটার সঙ্গে এবং প্রলেটারিয়ান মানবতার সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছিলেন। নেহরু পুরস্কার কমিটি কি শুরুতেই এই সোভিয়েত-দরদীর উদ্যোগকে স্বীকৃতি দিতে পারতেন না? তা হ'ত সোভিয়েতের ভারতপ্রীতির বড় নিদর্শন। ১৯২১ সালে ময়মনসিংহের একজন বাঙালী কবি (সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য) লেনিন সম্পর্কে দীর্ঘ একটি কবিতা লিখেছিলেন। সম্ভবত ভারতে লেনিন সম্পর্কে এটি ছিল প্রথম কাব্য নিবেদন। কবিতাটি পঞ্চাশ দশকে সুজনের সহযোগিতায় 'সোভিয়েত দেশ' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। আজ ভারত-সোভিয়েত সম্প্রীতির দিনে এই পূর্বসূরীদের স্বীকৃতি দেবার কথাটা স্বভাবতই মনে আসে।

গোর্কি'র 'মা'র নাট্যরূপ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে ১৯৫৩ সালে বেহালার দ্বারিকাদাস গঙ্গোপাধ্যায় ও অধীর মুখোপাধ্যায় 'মা'র নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। সেই নাট্যরূপ আয়ামঞ্চ'র উদ্যোগে 'মিনার্ভা' থিয়েটার সহ বহু স্থানে অভিনীত হয়েছিল। 'মা'র ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন শ্রীমতী মঞ্জিনা দেবী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পেশাদার শিল্পীদের মধ্যে নীতীশ মুখার্জী ও আশা দেবী। এই উদ্যোগের পরে শৌভনিক এবং লিটল থিয়েটার গ্রুপ 'মা'র অংশ বিশেষ নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করেছেন। ১৯৬৮ সালে 'মা'র জন্য পুরস্কার প্রাপ্তিতে নেহরু পুরস্কার কমিটির জানা না থাকলেও দুজনের মনে পড়ছে সেই অগ্রগামীদের।

এভাবেই অনেক সাংবাদিক, অনেক শ্রমিক ও সমাজকর্মীর কথা মনে পড়ছে যাঁরা দীর্ঘ ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীর জন্য কাজ করেছেন। শ্রমিক অঞ্চলে, গ্রামের কৃষকদের মধ্যে সোভিয়েতের কথা শুনিয়েছেন; আজো অনেক সাংবাদিক নিরলসভাবে মৈত্রীর সহায়তা করে চলেছেন। হয়ত তাঁরা পুরস্কারের জন্য আবেদন করেন না; কিন্তু পুরস্কার কমিটি কি কেবলমাত্র আবেদনের উপর নির্ভর করে পুরস্কারের মর্যাদা বাড়াতে পারবেন? —সুজন

বসন্ত চৌধুরী

মৃণাল সেনের নতুন ছবি

পরিচালক মৃণাল সেন বনফুলের 'ভুবন সোম' কাহিনীকে চিত্ররূপ দিতে অগ্রসর হয়েছেন। ছবিটির জন্য ফিল্ম ফাইন্যান্স কর্পোরেশন দেড় লক্ষ টাকা ঋণ দিতে রাজী হয়েছে। ছবিটি হিন্দী এবং গুজরাটি ভাষায় তোলা হবে। এই ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবে ষোড়শী স্কুলের ছাত্রী সুহাসিনী মুলে। বিজয় রাঘব রাও সংগীত পরিচালনা করবেন। ছবি তোলার কাজ বোম্বাইতে ২৬শে নভেম্বর থেকে শুরু হবে।

ইসমাইল মার্চেন্টের নতুন উদ্যোগ

সেকস্‌পীয়রওয়ালা খ্যাত ইসমাইল মার্চেন্ট এবার তাঁর মার্কিন সহপ্রযোজক জেমস আইভরির সহযোগিতায় একটি রঙিন হিন্দী ছবি তুলতে অগ্রসর হচ্ছেন। এই ছবি তোলা হবে রাজস্থান এবং জয়সলমিরে। অভিনয়ে থাকবেন শশী কাপুর, অপর্ণা সেন। আগামী ডিসেম্বর মাসে ছবির শিল্পী নির্বাচন ইত্যাদি কাজ শেষ হবে। প্রযোগরাজ রচিত কাহিনী হবে ছবির অবলম্বন।

'আপনজন' ভেনিসে যাবে

তপন সিংহ পরিচালিত 'আপনজন' ছবিটি ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য ভারত সরকার মনোনীত করেছেন। আগামী বছর আগস্ট মাসে এই উৎসব হবে। ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন স্বরূপ দত্ত, পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, সুমিত্র মজুমদার

রেণু চৌধুরী, বাই বন্দ্যোপাধ্যায়, মুকুল মুখোপাধ্যায়, রবি ঘোষ।

যাদুকর রাজকুমারের ইন্দ্রজাল

যাদুকর রাজকুমার তাঁর বিস্ময়কর মোহজাল প্রদর্শনীতে ভারতীয় ইন্দ্রজালের মূল সূত্রধারাটিকে গ্রহণ করে নতুন রহস্যঘন এবারে তাঁর মোহজাল প্রদর্শনীতে ম্যাগবেথ মিস্ট্রী (Magbeth Mystry), আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ, ভূত ও বোতল, ভূত ও বাজনা প্রভৃতি নতুন খেলা সংযোজিত করেছেন। সম্প্রতি উক্ত নতুন খেলার সমন্বয়ে ইনি তাঁর মোহজাল প্রদর্শনী কলকাতার নর্দার্ন রেলওয়ে কর্মীবৃন্দের ব্যবস্থাপনায় এক অনুষ্ঠানে এবং বিহারের দেওঘর, দুমকা ও বাংলাদেশের যোলপুর শহরে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশন করে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেন।

'এই হচ্ছে তুই' ছবির দৃশ্যতে বাঁদিক থেকে মালা দে, শৈলেশ রায়, আরতি মুখার্জী, শিপ্রা ভট্টাচার্য ও পরিচালক অমল দত্ত ও অমল দাস।

পান্না-হীরে-চুনী ছবিতে [illegible]

সংবাদিকী

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলা

নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে আগামী ১৪ই ডিসেম্বর থেকে ২৩শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এক চলচ্চিত্র মেলার প্রস্তুতি চলছে। এই মেলায় বিখ্যাত বিদেশী ও ভারতীয় দশটি পূর্ণাঙ্গ ছবি এবং তার সঙ্গে প্রতিদিন নতুন নতুন স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি দেখান হবে। উদ্যোক্তারা বিভিন্ন দূতাবাস, ভারত সরকারের ফিল্ম আরকাইভ এবং ভারতীয় প্রযোজকদের সহযোগিতায় ছবিগুলি দেখাবেন। এই উদ্দেশ্যে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রতি শোতে চার হাজার দর্শকের উপযোগী প্যাণ্ডেল তৈরি হবে। এই বিষয়ে যোগাযোগ করার স্থান: নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি, ৬১, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩।

'ওবারহাউজেন'-এর ছবি

পশ্চিম জার্মানীর ওবারহাউজেন স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার প্রাপ্ত ছবিগুলি কয়েকদিন প্রদর্শনের আয়োজন হয়েছে ফাইন আর্ট একাডেমি ভবনে। ১৯শে ও ২০শে নভেম্বর ছবিগুলি দেখান হবে। এই ছবিগুলির প্রদর্শন উপলক্ষে ওবারহাউজেন স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবির উৎসবের ডিরেক্টর মিঃ উইল ওয়েলিড কলকাতা এসেছেন। এই প্রদর্শনীতে চেকোশ্লোভাক, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, গ্রেট বৃটেন,

হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড, সোভিয়েত রাশিয়া, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশের সেরা ছোট ছবিগুলি দেখান হবে।

অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকীর পুরস্কার

অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে সোভিয়েত রাশিয়ায় কয়েকজন শিল্পী-সাহিত্যিককে তাঁদের সৃষ্টিশীল কাজের জন্য পুরস্কৃত করা হয়েছে।

পুরস্কৃতদের মধ্যে রয়েছেন সুরকার ডিমিত্রি সসটাকোভিচ চলচ্চিত্র পরিচালক মার্ক ডনস্কয়, চিত্রশিল্পী ভিক্টর ইভানভ এবং ঔপন্যাসিক চিঙ্গিস আইতমাটোভ ও সের্গেই জালিগিন।

সুরকার সসটাকোভিচকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে তাঁর কয়ার অর্কেস্ট্রা "স্টেপান রাজিনের প্রাণদণ্ড", কবি ইয়েভ-টুশেংকোর কবিতা অবলম্বনে দেশপ্রেম-মূলক গীতি আলেখ্য। ফিল্ম ডিরেক্টর মার্ক ডনস্কয় পুরস্কার পেয়েছেন তাঁর নতুন ছবি 'মাদার্স হার্ট'-এর জন্যে। লেনিনের বাল্যকালকে কেন্দ্র করে এই ছবি। ডনস্কয়ের সঙ্গে এই ছবির চিত্রনাট্য লেখার জন্য [illegible] ভসক্রিসেনস্কায়া, লেনিনের মায়ের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য ইলেনা ফাদা[illegible] পুরস্কার পেয়েছেন।

সোভিয়েত ছবি 'ওয়ান্স এগেইন এবাউট লাভ' ছবির একটি দৃশ্য

নাট্যমঞ্চে এই স্টেট প্রাইজ পেয়েছেন বলশয় ড্রামা থিয়েটারে জর্জি টোভ-টনোগভ গর্কির 'ফিলিস্টাইনস' মঞ্চস্থ করার জন্য। এই নাটকে অভিনয়ের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন ইয়েভগেনি লেভেদেভ এবং এমিলিয়া পপোভা। জর্জি সিরি-ডভের 'কুরস্ক সঙ' লোকসংগীতের ঢঙ ব্যবহারের জন্য, সোভিয়েতের জনপ্রিয় গায়ক এস্তোনিয়ার জর্জ অটস প্রমুখ পুরস্কার পেয়েছেন।

[illegible] প্রযোজিত 'চৌরঙ্গী'-র [illegible] চরিত্রে অঞ্জনা ভৌমিক

সাজঘরের 'কান্না নয়'

আগামী ২৬শে নভেম্বর সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার 'মুক্তাঙ্গন' রংগমঞ্চে সাজঘরের 'কান্না নয়' নাটকখানি অভিনীত হবে। খ্যাতনামা নাট্যকার ও চিত্র[illegible] সলিল সেন কর্তৃক নাটকখানি লিখিত ও পরি[illegible]। বিভিন্ন অংশে সাজঘরের শিল্পীবৃন্দ অভিনয় করবেন।

অনুভবের 'শনিবারের বিকেল'

'অনুভব' নাট্যসংস্থা [illegible] নতুন নাটক দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত রচিত 'শনিবারের বিকেল' মঞ্চস্থ করবেন আগামী ২[illegible]শে নভেম্বর, [illegible], সকাল ১০টায় [illegible] মঞ্চে। নির্দেশনায় আছেন [illegible]। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করবেন [illegible] চক্রবর্তী, রতন চক্রবর্তী, [illegible], সমীর ঘোষ, [illegible] দাস, [illegible], শিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, [illegible] গাঙ্গুলী, দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত, [illegible], বিবেক সেনগুপ্ত, তাপস দত্তগুপ্ত, [illegible] ঘোষ, অসীম ভাদুড়ী, [illegible], মন্দিরা দাস, পুতুল চক্রবর্তী, ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়, পঙ্কজ দাসমজুমদার ও চিত্ত ভাদুড়ী।

হারার পালা

এবার বোধহয় এসেছে হারার পালা। বোধহয় এবার আমাদের পর পর সইতে হবে পরাজয়ের জ্বালা। সে জ্বালায় আমাদের মন-প্রাণ ক্ষত-বিক্ষত হলেও, সে পরাজয় আমাদের মান-সম্মানকে ধুলোয় লুটিয়ে দিলেও—প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন কেউই বোধ করেন না। আর করেন না বলেই বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের দরবারে আজ আমাদের এই হাল। কেনিয়ার মতো সীমিত লোকবল সম্বলিত দেশও যখন বেশ কয়েকটা স্বর্ণপদক নিয়ে দেশে ফিরলো আমাদের প্রতিযোগীরা তখন মস্কো থেকে ম্লানমুখে ঘরে ফিরে এলেন গলায় একটা ব্রোঞ্জের মেডেল ঝুলিয়ে।

আজ তাই মনে হয় সময় এসেছে—সময় এসেছে সবকিছু ভালোভাবে বিচার করে দেখার। সময় এসেছে শৃঙ্খলারিক্ত ক্রীড়াঙ্গনের অরাজকতার রাজ্যে ডুব দিয়ে সব কিছু তলিয়ে দেখার। আজ সময় এসেছে পুরনো মোহপাশ থেকে মুক্ত হয়ে তারুণ্য ও নতুনত্বের দিকে মনঃসংযোগ করার। তাহলেই বোধহয় একমাত্র কাজের কাজ হবে। তবে আসল কাজের কাজ বোধহয় আমাদের দেশে কোনদিনই হবে না। হলে তুঘলকী রাজত্ব কি করে চলবে বলুন? তাই মনে হয় এ সব নিয়ে বার বার আলোচনা করতে যাওয়া বোধহয় অরণ্যেই রোদন করা। শুধু রোদন করাই বোধহয় আমাদের একমাত্র কাজ। [illegible] সার। মোক্ষম দাওয়াই। সুতরাং রোদন করতেই হবে। তবে মন খারাপ-টারাপ, কিম্বা কান্না-টান্না এখন আর আমাদের গায়ে লাগে না। ওতে আমরা বেশ ভালোভাবেই পোক্ত হয়ে গেছি। তবে কি না কিছুক্ষণের মাথাটা [illegible] কিন্তু [illegible]। এবারকার রোদনের কারণটা বোধহয় আর বলে দিতে হবে না, কারণ পরাজয় এবার আবার নতুনভাবে জ্বালা ধরিয়েছে আমাদের মনে। ভারতীয় টেনিস দলের পরাজয় অতি প্রত্যাশিত হলেও—খেলার ফলাফলটা কিন্তু সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। তাই বলতে বাধা নেই যে ভারতীয় টেনিস এবার আমাদের মনে ধরিয়েছে জ্বালা।

ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক ফাইনালে ভারত এবার হারলো আমেরিকার কাছে। পাঁচটা খেলার মধ্যে মাত্র একটাতে ভারত জিতেছে। অর্থাৎ চারটির মধ্যে তিনটি সিঙ্গলসের খেলাতেই ভারত হেরেছে আর সেই সঙ্গে হার দিয়ে হেরেছে ডাবলসের খেলাটিতেও। খেলায় জয়-পরাজয় আছেই। পরাজয়ে লজ্জা নেই—কিন্তু দুঃখ আছে, আছে জ্বালা—সে কথাটা যেন ভুললে চলবে না। তাই ডেভিস কাপের খেলায় ভারতের পরাজয় আজ আমাদের মনে শুধু [illegible] করে জ্বালাই ধরায় নি, আমাদের বড় বেশি হতাশ করেছে। —[illegible]

ডেভিস কাপে

ডেভিস কাপের খেলাতেও ভারত এবার হারলো। তবে সান্ত্বনা, ভারত এবারও উঠতে পেরেছিলো ফাইন্যাল পর্যন্ত। কিন্তু ফাইন্যাল খেলায় আমেরিকাকে হারিয়ে এবার আর চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পেলো না ভারত।

আগেই বলেছি, ভারতের পরাজয় অপ্রত্যাশিত না হলেও ফলাফল যা হলো তা কিন্তু সত্যি সত্যিই ছিলো না প্রত্যাশিত। আমরা আশা করেছিলাম যে ভারত যদি হারেও তাহলে আমেরিকাকে জিততে হবে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর।

কিন্তু সে আশার সমস্ত আশার মুখে ছাই দিয়ে ভারত পাঁচটি খেলার মধ্যে হেরে বসলো চারটি খেলাতেই। অথচ এমন হাল যে হবে ভারতীয় দলের তা খেলার প্রথম দিনের শেষে কল্পনাও করা যায় নি। তখন খেলার ফলাফল ছিলো সমান সমান। প্রথম খেলায় জিতেছিলো আমেরিকা আর দ্বিতীয়টিতে ভারত। কিন্তু খেলার দ্বিতীয় দিন থেকেই ভারতীয় খেলোয়াড়রা হলেন একেবারেই নাজেহাল।

কিন্তু এমনটি হলো কেন? আমাদের মনে হয় ডাবলসের খেলার ওপর বড় বেশি নির্ভর করাই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকলেই আশা করেছিলেন যে কৃষ্ণান-জয়দীপের জুটি ডাবলসের খেলায় হারিয়ে দিতে পারবেন আমেরিকান জুটিকে।

শেষ পর্যন্ত হলো ঠিক তার উল্টো ফলাফল। ডাবলসের খেলায় ভারত পরাজিত হলো সরাসরি স্ট্রেট সেটে। কি কৃষ্ণান, কি জয়দীপ—কেউ এতোটুকুও সুবিধে করতে পারলেন না আমেরিকান জুটির বিরুদ্ধে খেলায়।

ভারত ২—১ খেলায় পিছিয়ে পড়ার পরও সকলে আশা করেছিলেন—আর সে আশা এতোটুকুও অমূলক ছিলো না যে ভারত পরাজিত হবে ঠিকই, কিন্তু জিতবে আর একটি খেলাতে। আর খেলার ফলাফল হবে ৩—২।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হলো না। ফিরতি খেলায় কৃষ্ণান আর প্রেমজিৎ পরাজিত হলেন সরাসরি। ফলে ভারতকে মাথা পেতে নিতে হলো ৪—১ খেলার শোচনীয় পরাজয়কে।

ভারতের বদলে ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে উঠেছে আমেরিকা। চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে তাদের [illegible] অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে।

[illegible]

[illegible]: প্রথম দিনের দুটি খেলার প্রথমটিতে আর্থার এ্যাশ ৬—২, ৬—৭, ৬—২ ও ৬—৪ সেটে পরাজিত করেন ভারতের প্রেমজিৎ লালকে। কিন্তু অপর সিঙ্গলসের খেলাটিতে কৃষ্ণান ৭—৫, ৪—৬, ৬—২ ও ৬—১ সেটে পরাজিত করেন গ্রেভনারকে। দ্বিতীয় দিনের ডাবলসে আমেরিকার লুজ ও স্ট্যান স্মিথ ৬—২, ৬—৩ ও ৬—২ সেটে
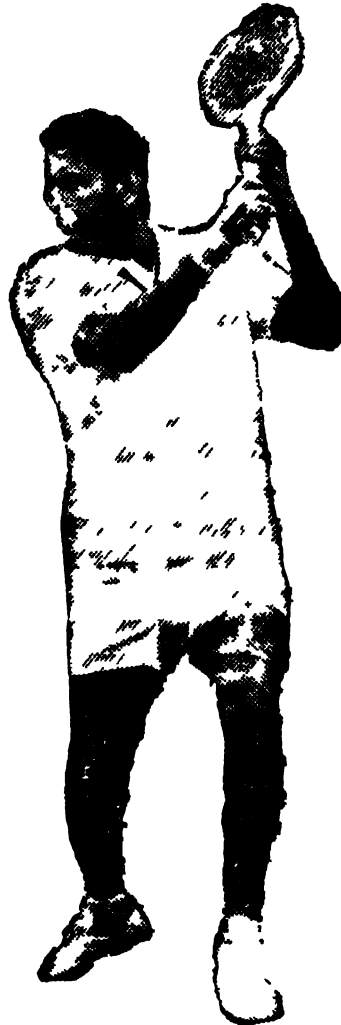
॥ রমানাথন কৃষ্ণন ॥
ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে আমেরিকার আর্থার এ্যাসের বিরুদ্ধে খেলায় এই বিশেষ ভঙ্গিমায় কৃষ্ণান ফিরিয়ে দিচ্ছেন একটি বল।

হারিয়ে দেন ভারতীয় জুটি আর কৃষ্ণান ও জয়দীপ মুখার্জীকে। তৃতীয় দিনের দুটি সিঙ্গলসেই ভারত পরাজিত হয়। আমেরিকার আর্থার এ্যাস ৬—১, ৬—৩ ও ৬—৩ সেটে কৃষ্ণানকে আর ক্লার্ক গ্রেভনার ৯—১১, ৯—৭, ৭—৫ ও ৭—৪ সেটে প্রেমজিৎ লালকে পরাজিত করেন।

ফলে ৪—১ খেলায় ভারতকে হারিয়ে আমেরিকা চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে হলো অস্ট্রেলিয়ার সম্মুখীন।

॥ মহীন্দরলাল ॥
ভারতের এই আন্তর্জাতিক হকি খেলোয়াড়টি সম্প্রতি লন্ডনে গেছেন বেশ কয়েকজন উদীয়মান হকি খেলোয়াড়দের তালিম দেবার জন্যে।

শেষ পর্যন্ত বাতিল হয়ে গেলো এম সি সি ক্রিকেট দলের ভারত ভ্রমণের প্রস্তাব। এমনটি যে হতে পারে—এ আঁচ আমরা অনেকদিন আগেই করেছিলাম আর তার আভাস কণা প্রকাশও করা হয়েছিলো সাপ্তাহিক বসুমতীর পাতায়।
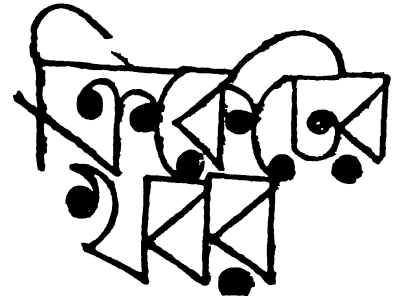
তবু একটু আশা ছিলো—হয় তো বা শেষ পর্যন্ত অর্থমন্ত্রক মঞ্জুর করবেন এই সফরের প্রস্তাবনাটা। হয় তো বা শেষ পর্যন্ত মিটে যাবে বৈদেশিক মুদ্রার সমস্যা। কিন্তু আখেরে হলো না কিছুই। বাতিল হয়ে যেতে বসলো এম সি সি দলের ভারত ভ্রমণের প্রস্তাব।

এম সি সি দলের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর বাতিল হয়ে যাওয়ায় তাঁরা এক যোগে চাইছিলেন সিংহল, ভারত আর পাকিস্তান ভ্রমণ করতে। আসল উদ্দেশ্য কিন্তু অন্য—টাকা তুলে নেওয়া।

কিন্তু এ-ক্ষেত্রে একটা কথা এম সি সি কর্তৃপক্ষের ভুলে যাওয়া ঠিক হয় নি। এ সফরের প্রশ্নে উদ্যোক্তা আমরা নই—স্বয়ং মেরিলিবোর্ন ক্রিকেট ক্লাব। তাই মনে হয় টাকা-কড়ির প্রশ্নে তাঁদের আর একটু সহৃদয়তার পরিচয় দেওয়া উচিত ছিলো। অন্তত ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার সমস্যার দিকে তাকিয়ে তাঁরা যদি একটু সুর নরম করতেন তাহলে ভারতের পক্ষে খুবই সুবিধে হতো। অন্তত সফর বাতিলের প্রশ্ন উঠতো না।

কারণ আর যাই হোক এই মুহূর্তে মাত্র তিনটি টেস্ট আর কয়েকটি খেলার

কোন একজন ইংরেজ ক্রিকেট লেখক স্কোর বোর্ডকে গাধা বলেছিলেন। সত্যিই কি তাই? কে জানে—হয়তো বা! কিন্তু কলকাতার বিরাটকায় (গাধার) ইলেকট্রিক স্কোর বোর্ডের তাহলে এবার বড় দুঃখ। কারণ শেষ মুহূর্তে বানচাল হয়ে যাচ্ছে এম সি সি দলের ভারত সফর। কারণ—সেই পুরোন ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা সংকটের প্রশ্ন।

জন্যে ২০,০০০ (কুড়ি হাজার) পাউণ্ডের বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর করা হয়তো ভারত সরকারের পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য।

আবো একটা কথা এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে। আমরা অর্থাৎ ভারতীয় দল ইংলণ্ড সফরে গেলে তো ঠিক এই ধরণের গ্যারান্টি মানির সুযোগ পায় না।

তবু ভারতীয় অর্থমন্ত্রক এম সি সি

॥ বাপু নাদকার্নি ॥
অবসর গ্রহণ করলেন প্রথমশ্রেণীর ক্রিকেট খেলা থেকে।

দলের ভারত সফরের প্রস্তাবটি পুরোপুরি বাতিল করে দেন নি। তাঁরা বলেছেন যে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক যদি এই সফর সম্বন্ধে নতুন কোন পরামর্শ দেন তাহলে অর্থমন্ত্রক পুনরায় তা বিবেচনা করে দেখতে প্রস্তুত।

তবে যাই হোক না কেন—মনে হচ্ছে এম সি সি দলের ভারত সফর বাতিলই হয়ে গেলো। সফর সম্ভব হতে পারে যদি এম সি সি দলের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা কিছুটা কমে।

মনে তো হয় তা কমবে না। কারণ এম সি সি আগেই গেয়ে রেখেছে যে ভারত সফর বাতিল হলে এম সি সি সেই সময়টা পাকিস্তানে কাটাবে পাঁচটি টেস্ট আর কয়েকটি বেশি খেলায় অংশ গ্রহণ করে।

দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়। তবে, এ কথা ঠিক যে আমরা অর্থাৎ সাধারণ ক্রীড়ারসিকরা হারালাম ইংলণ্ডের তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড়দের খেলা দেখার সুযোগ।

অবসরের ব্যাটিং ... [illegible]

রমেশচন্দ্র গঙ্গারাম নাদকার্নি ওরফে বাপু নাদকার্নি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করলেন. ব্যাটিং, বোলিং আর ফিল্ডিং এই তিনটি বিষয়েই নাদকার্নি ছিলেন নিপুণ খেলোয়াড়।

টেস্ট খেলায় তিনি যোগদান করেছেন শতখানেক টেস্টে। (১৯৬৩-৬৪ সালে) যেমন তার বোলিং এবং ছটায় ভুবন দিয়েছিলেন ভরপুর। তার মতো পর পর মেডেন ওভার লাভ করার সৌভাগ্য পৃথিবীর আর কোন খেলোয়াড়ের হয় নি। ১৯৬৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মাদ্রাজ টেস্টে নাদকার্নি মাত্র ১২২ রানের বিনিময়ে পেয়েছিলেন ১১টি উইকেট, তা ছাড়া নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধেও তাঁর ৬৩ রানে ৬টি উইকেট লাভের কথা সহজে ভোলার নয়। অধিনায়ক হিসেবে তিনি বম্বেকে বার বার এনে দিয়েছিলেন রনজি ট্রফিতে বিজয়ীর সম্মান। ১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন বম্বের অধিনায়ক।

* * *

ইংলণ্ডের ফায়ারি ফ্রেড অর্থাৎ ফ্রেডি ট্রুম্যানও প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা থেকে

॥ ফ্রেডি ট্রুম্যান ॥
অবসর গ্রহণ করার এখন বেছে নিয়েছেন সাংবাদিক জীবন।

অবসর গ্রহণ করলেন। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি উইকেট লাভকারী খেলোয়াড় ট্রুম্যানের ৩০৭টি উইকেট দখলের কৃতিত্ব অনন্য। ট্রুম্যানের এ রেকর্ড ভাঙা হয়তো খুব সহজ হবে না। শুধু তাই নয় প্রথম শ্রেণীর খেলায় (কাউণ্টি সহ) ট্রুম্যান লাভ করেছেন মোট ২০০০ (দু' হাজার) টি উইকেট।

ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের কাছে ট্রুম্যান ছিলেন বিভীষিকার মত। ১৯৫২ সালের ওল্ড ট্রাফোর্ড টেস্টে ট্রুম্যান পর পর আটজন ভারতীয় ব্যাটসম্যানকে আউট করে দিয়েছিলেন

অবসর গ্রহণের পর ফ্রেডি ট্রুম্যান সাংবাদিক জীবন গ্রহণ করবেন বলে খবর পাওয়া গেছে।

জীতেন্দ্রনারায়ণ বসু (লেংকয়, নগাঁও আসাম)।

উত্তর ঃ আপনার চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। আশা করি 'ছলনা' শিরোনামায় আলোচনাটি আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে। আমার লেখা আপনাদের ভালো লাগে জেনে উৎসাহিত হয়েছি।

শোভন, সোমনাথ, প্রলয়, স্বপন ও রতন (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, নৈহাটি)।

প্রশ্ন ঃ আপনার মতে বর্তমান ভারতের সেরা অলরাউণ্ডার কে? নাদকার্নি কি টেস্ট খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন?

উত্তর ঃ সুর্তিকে বলা উচিত। হ্যাঁ, নাদকার্নি অবসর গ্রহণ করেছেন সম্প্রতি।

হীরেন্দ্রমোহন জয় (সুভাষপল্লী শিলিগুড়ি)।

প্রশ্ন ঃ ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ খেলায় অতিরিক্ত খেলোয়াড় ক্যাচ লুফলে তা কি রেকর্ডের মধ্যে ধরা হয়ে থাকে না বাদ দেওয়া হয়?

উত্তর ঃ রেকর্ডের মধ্যে নিশ্চয়ই থাকে। তবে অতিরিক্ত খেলোয়াড়ের নাম থাকে না অধিকাংশ সময়।

প্রদীপ বিশ্বাস (গুলেমা চা বাগান, গুলেমা, দার্জিলিং)।

উত্তর ঃ 'এ্যাসেজ' নিয়ে ভবিষ্যতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার ইচ্ছে আছে। একটু অপেক্ষা করুন। আর মেক্সিকো অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দলের পরাজয়ের কারণ নিয়ে তো আগেই আলোচনা করেছি। আশা করি আপনি দেখেছেন।

রেণু সরকার ও শিখা (কুবাসিয়া কোলিয়ারি, সবগুজা, মধ্যপ্রদেশ)।

প্রশ্ন ঃ চুনী গোস্বামী, প্রদীপ ব্যানার্জী ও পরিমল দে'র ঠিকানাটা যদি জানান তাহলে খুব ভালো হয়।

উত্তর ঃ চুনী গোস্বামী ও পি দেকে যথাক্রমে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল টেন্ট, কেঃ অঃ, কলকাতা ময়দান, কলকাতা-২১ এই ঠিকানায় ও পি কে ব্যানার্জীকে, ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব, ৩০৩/১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯ এই ঠিকানায় চিঠি লিখতে পারেন।

গোবিন্দ ও বাবুয়া (হিলা চা বাগান, নাগরাকাটা)।

উত্তর ঃ অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দলের ব্যর্থতার কারণ নিয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। আশা করি দেখে থাকবেন।

২৩-৯-৬৮ ।বরুদ্ধে বিজয় মার্চেন্ট করেছেন সর্বোচ্চ ১৫৪ রান—১৯৫১—৫২ সালের দিল্লী টেস্টে।

হাওড়া থেকে জনৈক রেফারী—একটা মর্মস্পর্শী চিঠি লিখেছেন। আমরা চিঠিটি হুবহু তুলে দিলাম। কারণ চিঠিতে যেমন ভদ্রলোকের দুঃখের কথা প্রকাশ পেয়েছে তেমনি ঐ চিঠিটাই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে আমাদের খেলাধুলার জগতের পরিচালন বিভাগটি কতো নিচে নেমে গেছে।

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

এই বিচিত্র দেশের 'পুজোর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আপনাকে জানাচ্ছি। দেশ বিচিত্র হলেও একজন সাধারণ জনসেবক আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করলে আনন্দিত হবো। আপনার কথায় এই বিচিত্র দেশে আচার, অনাচার, অরাজকতা, স্বেচ্ছাচারিতা দুর্নীতি এবং অবিচারে জর্জরিত কলিকাতা ময়দানের আমি একজন অবহেলিত ফুটবল রেফারী। দীর্ঘ ১২।১৩ বৎসরের সাধনার মধ্যে কলিকাতা এবং ভারতের প্রায় সব বড় বড় জায়গায় ২।৩ দিন খেলাবার সুযোগ হওয়া সত্ত্বেও মুষ্টিমেয় কয়েকজনের চক্রান্তে অবসরের প্রাক্কালে আর আত্মসম্মান বজায় রাখা সম্ভব হলো না। নিঃশব্দে সরে আসতে বাধ্য হলাম। আমার মত অনেককেই এরূপভাবে সরে যেতে হয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয় এই অবিচার কি শেষ হবে না? কয়েক বৎসর আগে কিছুক্ষণের জন্যে আপনার সংগে আলাপ করে ভালো লেগেছিল। রাজ্য সন্তরণে আপনাকে দেখেও আলাপ করতে পারলাম না। ভবিষ্যতে আশা রইলো। ইতি—

শুভার্থী

....

পরিতোষ নাগ (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)।

উত্তর ঃ ধ্যানচাঁদ সম্বন্ধে আপনি যা জানতে চান তা পাবেন অলিম্পিক সংখ্যায় 'অলিম্পিক হকিতে ভারত' প্রবন্ধটিতে।

বব বিমোন সম্বন্ধে পাকিস্তান রেডিও ভুল খবর দিয়েছেন। আমাদের খবরই ঠিক। তা ছাড়া গত সংখ্যায় বিমোনের পরিচিতি প্রকাশিত হয়েছে ওতেও সঠিক খবর পাবেন।

হীরেন্দ্রমোহন জয় (শিলিগুড়ি, দার্জিলিং)

উত্তর ঃ আপনার কিছু অংশ তুলে দিলাম।

গত সংখ্যায় ওয়াদেকারের লোফা ক্যাচের সংখ্যা ২১টি বলে জানিয়েছেন বাঁকুড়া থেকে অনিবন্ধ গুপ্ত। কিন্তু আসলে ওয়াদেকারের ক্যাচ সংখ্যা হবে ২২টি। ক্যাচ লোফার হিসেব নিচে দিলাম—

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে	—৩টি
ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে	—৬টি
অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে	—৫টি
ও নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে	—৮টি
মোট	২২টি

অরুণকুমার গুহকর্মকার (ভেদিয়া, বর্ধমান)

প্রশ্ন ঃ পলি উম্রিগড় ও কনট্রাক্টরের মধ্যে কে বেশি টেস্ট খেলেছেন?

উত্তর ঃ উম্রিগড়।

নির্মলকুমার ঘোষ (গোমস্তাপাড়া, জলপাইগুড়ি)

উত্তর ঃ মেক্সিকো অলিম্পিকে ভারতীয় হকি দলের ব্যর্থতার কারণ নিয়ে আগেই আমরা আলোচনা করেছি। তবে একথা ঠিক যে, ভারতের এই ব্যর্থতার বিষয়ে আজ আমাদের সকলেরই এক মত।

এই তো বছর কয়েক আগে কলকাতার ইডেন উদ্যানে দেখেছিলাম গ্রাউটের খেলা। দেখেছিলাম উইকেটের পেছনে এক নিপুণ শিল্পীর অবিস্মরণীয় ক্রীড়া-নৈপুণ্য। উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়ে পটাপট বল থামালে, কয়েকটা স্টাম্প আর কিছু ক্যাচ ধরলেই কি আর সত্যিকারের ভালো উইকেটরক্ষক হওয়া যায়।

সত্যিকারের ভালো উইকেট রক্ষক হতে হলে আরো অনেকগুলো গুণ থাকা দরকার—আর সেই গুণগুলো ছিলো বলেই গ্রাউট হয়েছিলেন গ্রাউটই।

গ্রাউটের খেলার মধ্যে ছিলো একটা স্বভাবলব্ধ নিপুণতার ছাপ। ছিলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি। উইকেটের পেছনের যে-কোন ফিকার বল গ্রাউট অতি সহজেই চিলের মতো ছোঁ মেরে তুলে নিতে পারতেন।

আর ক্যাচ? সে কথা বোধহয় না বলাই ভালো। গ্রাউট উইকেটের পেছনে থাকলে অতি সতর্ক ব্যাটসম্যানও অনেক সময় বোকা হয়ে পড়তেন। ঠিক মতো খেলতে পারতেন না। তারপর হয়তো এক সময় ব্যাটে খোঁচা লাগিয়ে ফিরে যেতেন প্যাভেলিয়নে। গ্রাউটের হাত থেকে নিস্তার পাবার উপায় ছিলো না কারো।

কারণ গ্রাউট বাঘের মতো ওৎ পেতে বসে থাকতেন উইকেটের পেছনে। ব্যাটে-বলে ছোঁয়াছুঁয়ির পর সে বল যদি উইকেটের পেছনে যেতো তাহলে গ্রাউটের গ্লাভসকে ফাঁকি দেওয়ার সাধ্য হতো না—ব্যাটসম্যান আউট হতোই।

॥ ওয়ালী গ্রাউট

আর সেইজন্যেই গ্রাউট বিশ্বের অন্যতম সেরা উইকেট রক্ষক হিসেবে সুনাম অর্জন করতে পেরেছিলেন।

তবে গ্রাউটের অবিস্মরণীয় কৃতিত্বের পূর্বাভাষ পাওয়া গিয়েছিলো টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর নতুন জীবন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই। ১৯৫৭-৫৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে জোহানসবার্গের টেস্ট খেলায় গ্রাউট ছ'জন ব্যাটসম্যানকে ক্যাচ ধরে আউট করে এক অভিনব নজির সৃষ্টি করেছিলেন।

শুধু কি তাই। পরের বছরই গ্রাউট আবার দেখালেন অভিনব কৃতিত্ব। তবে এবার দেশের মাটিতেই তার শেফিল্ড শীল্ডের খেলায়। কুইন্সল্যান্ডের পক্ষে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এক ইনিংসে আটজন ব্যাটসম্যানকে আউট করে দিলেন ক্যাচ ধরে। একবার নয় ক্যাচ ধরে আট-জন ব্যাটসম্যানকে গ্রাউট আউট করে দিয়েছেন দু'-দু'বার।

এর পরও আছে। ১৯৬৪ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে খেলার মরশুমে গ্রাউট লাভ করলেন স্মরণীয় সাফল্য। সেবার তিনি ক্যাচ ধরে আউট করেছিলেন ৩৪ জন ব্যাটসম্যানকে আর স্টাম্পড করে ৯ জনকে। একজন উইকেট রক্ষকের পক্ষে মোট ৪৩ জনকে আউট করা নিঃসন্দেহে একটি অভিনব নজির।

আগেই বলা হয়েছে যে গ্রাউট টেস্ট ম্যাচে দু'বার আটজন করে খেলোয়াড়কে আউট করে দিয়েছিলেন। সেই দু'বারের প্রথমবারটি ছিলো ১৯৫৯-৬০ সালের লাহোর টেস্ট। সেবার তিনি ৬টি ক্যাচ লুফেছিলেন আর দু'জনকে করেছিলেন স্টাম্পড। দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৬১ সালের লর্ডস টেস্ট। সেবার অবশ্য তিনি ৮ জন ব্যাটসম্যানকেই আউট করে দিয়েছিলেন ক্যাচ লুফে।

তখন সেই গ্রাউটকে আমাদের হারাতে হলো। হারাতে হলো টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর গ্রহণের মাত্র দু'-এক বছরের মধ্যে। সেবার গ্রাউট অবসর নিয়েছিলেন খেলা থেকে আর এবার নিলেন জীবন থেকে।

কিন্তু কি বা এমন বয়েস হয়েছিলো তাঁর। চল্লিশের ঘরের একটি বছরও পুরলো না। মারা গেলেন গ্রাউট। মারা গেলেন মাত্র ৪১ বছর বয়েসে। অস্ট্রেলিয়ার সেরা উইকেট রক্ষক ওয়ালী গ্রাউটের জন্ম ১৯২৭ সালের ৩০শে মার্চ। আর আজ ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাস। আশ্চর্য কতো অল্প সময়ের মেয়াদ নিয়েই না গ্রাউট এসেছিলেন এই বিশ্বে। ঠিক ফ্রাঙ্ক ওরেলের মতো। খেলা থেকে সরে দাঁড়াবার পর আর বেশি দিন বাঁচলেন না ওয়ালী গ্রাউটও...। ক্রিকেট জগৎ হারালো তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উইকেট রক্ষককে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রী[illegible]কুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

৭৩ বর্ষ : ২৩শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise

বৃহস্পতিবার, ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

Thursday, 28th November, 1968

শ্রীম্যাকনামারার চোখে কলকাতা

কলকাতার বহুমুখী সমস্যা সমাধান করা রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে বোধ হয় সম্ভব নয়। রাজ্য সরকার সমস্যার কথা তুলে যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে মাঝে মাঝে সাহায্য ভিক্ষা করে থাকেন—কেন্দ্রীয় সরকার সমস্যা সমাধানের জন্য প্রায় কিছুই করেন না। এই কারণে শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা হয়েছিল বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেণ্ট শ্রীরবার্ট ম্যাকনামারাকে স্বচক্ষে কলকাতা দেখাবার; তিনি যদি কলকাতা শহরের সার্বিক সমস্যা উপলব্ধি করে সহানুভূতির সঙ্গে অর্থ সাহায্য দানের কথা বিবেচনা করেন।

শ্রীম্যাকনামারা কলকাতা দর্শনে এলেও তিনি এখানের ভেঙে-পড়া পরিবহন ব্যবস্থা দেখে যেতে পারেন নি। তেমনি দেখে যান নি সামান্য বৃষ্টিপাতেই কি ভাবে কলকাতা হাবুডুবু খায়, এক ফোঁটা পানীয় জলের জন্য রাস্তায় পড়ে থাকে শূন্য বালতির সারি। তিনি দেখেন নি হাসপাতালগুলিতে রোগীদের ভিড়, মানুষ চলার বা গাড়ি চালাবার জন্য রাস্তার অভাব, পথে পথে পুঞ্জীভূত জঞ্জাল, মারাত্মক ছোঁয়াচে রোগের আক্রমণ। রাত্রির আধো অন্ধকারে শহর কলকাতার কতটুকুই বা দেখা যায়? নিস্তব্ধ বস্তীর দীর্ঘশ্বাস অথবা ফুটপাতে শুয়ে-থাকা লোকগুলিই কলকাতার জটিল সমস্যার পূর্ণাঙ্গ চিত্র কোনোদিনই তুলে ধরতে পারে না। কলকাতার ছাত্রদের বিক্ষোভের দরুণ রাজ্য সরকারের পরিকল্পনায় মধ্য রাত্রে শ্রীম্যাকনামারার কলকাতা দর্শন সেই কারণে অসম্পূর্ণ। তবু আমাদের পক্ষে এতে খেদ করারও কোনো কারণ নেই। শ্রীম্যাকনামারা যা দেখেছেন—তার চেয়ে তিনি শহর কলকাতার জটপাকানো সমস্যাগুলির খবর রাখেন ঢের বেশি। এক কথায় বলা যেতে পারে সব খবরই তাঁর নখদর্পণে—এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী শহর কলকাতা তিনি যদি দেখে নাও যেতেন তা হলেও ঠিকভাবে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেণ্টের কাছে সাহায্যের আবেদন করলে তা তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতো। এতদসত্ত্বেও আমাদের মনে হয়, শ্রীম্যাকনামারা কলকাতায় আসায় একদিকে কিছুটা উপকার হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে যাঁরা কলকাতার বুকে শুধু বিক্ষোভের কথা বলেন, তিনি তাঁদের বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, কলকাতার অসহনীয় সংকটের তুলনায় বিক্ষোভ এমন আর কি? এর অর্থ বোধ হয়, যেটুকু সাহায্য দেওয়া এখানের সরকারের কর্তব্য—তা দিতেও সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। এখানেই তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত হয় নি। ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন, তদ্দ্বারা তাঁদের পক্ষেও সচেতন হওয়া উচিত। কেন না ব্যবসায়ীরা যে স্থানে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাচ্ছেন সেই জায়গাকে সমস্যামুক্ত রাখা তাঁদেরও কর্তব্য।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর কলকাতার উন্নয়ন সম্বন্ধে সবাই মুখে যতো বলেছেন, কাজে তার কিছুই করেন নি—এ ধারণা এতোদিন পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের মনেই বদ্ধমূল ছিল। কথাটা যে কতোটা খাঁটি—শ্রীম্যাকনামারা ঐ একই কথা বলার পর প্রমাণ পাওয়া গেল। প্রসঙ্গত আমরা এখানে বলতে পারি, পশ্চিমবঙ্গের জননেতারাও কলকাতার উন্নয়নের জন্য কি করেছেন সে খবর আমরা পাই না, একমাত্র খবর পাই রাজধানী দিল্লীতে কিভাবে তাঁরা রাজনীতিচর্চা করছেন। যেন দেশটা উচ্ছন্নে গেলেও রাজনীতিটাই বড়। উত্তরবঙ্গের বিরাট প্র[illegible] পর কেন্দ্রীয় সরকারের এক একটি আশ্বাসের প[illegible] পরিমাণ সাহায্য পাওয়া গেছে বা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে—তা এখন অনেকেই অনুমান করতে পারছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মতো শক্ত মানুষের অভাবেই আজ বোধ হয় এই দুর্দশা।

যা হোক, কলকাতার উন্নয়ন অর্থাভাবে রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়, কেন্দ্রীয় সরকারও নির্বিকার এবং শ্রীম্যাকনামারা কী করবেন—তাও ইঙ্গিতে আভাসে জানিয়ে যান নি। যে ব্যবসায়ীরা বিক্ষোভের দরুণ ব্যবসা সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন—তাঁদের সপক্ষে প্রশংসার বাণী উচ্চারণ না করে ব্যবসার কেন্দ্রস্থলটিকে উন্নয়নের জন্য তাঁদের অগ্রসর হবার কথা বলেছেন তিনি; কিন্তু তাঁরা এখন একথা শোনার পর কতোটা এগোবেন?

বস্তুত সকলেই দেশের কল্যাণের কথা বারবার উচ্চারণ করতে করতে নিজের দায়িত্ব অপরের ঘাড়ে ফেলতে চায়। সুতরাং কলকাতার উন্নয়নের সম্ভাবনা অসম্ভব! এই অবস্থায় কলকাতার সংকট মুক্তির জন্যে বিশ্বব্যাংকের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। এবং শ্রীম্যাকনামারা অন্তত এটুকু বুঝবেন যে, সমস্যা ক্রমশ বৃদ্ধির পথে এবং সকলেই নির্বিকার; তাই কলকাতার মতো শহরকে সমস্যামুক্ত করার জন্য তিনিই এখন [illegible] সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারেন এবং সেই অর্থ পাওয়া গেলে জনসাধারণকেই লক্ষ্য রাখতে হবে তার ব্যয় হচ্ছে কিভাবে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

ভুট্টো, ওয়ালি খাঁ প্রমুখ বিরোধী নেতাদের কারাগারে নিক্ষেপ করে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে পারবেন বলে আশা করেছিলেন, কিন্তু তা আর পারলেন কৈ ? নতুন এক উৎপাত জুটে তাঁর চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, তাকে এখন নতুন ফন্দি আঁটতে হচ্ছে কী করে এই উৎপাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আসগর খাঁ প্রেসিডেন্ট আয়ুবকে আজ ধুতরো ফুল দেখিয়ে দিয়েছেন। প্রাক্তন এয়ার মার্শাল মহম্মদ আসগর খাঁ ঘোষণা করেছেন যে, তিনি বিরোধী দলে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁর ধারণা জন্মেছে যে, আয়ুবের শাসনে দেশ গোল্লায় যেতে বসেছে, কাজেই সবকারকে ঢেলে সাজাতে হলে তাঁর বিরোধী শিবিরে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

স্বভাবতই আসগর খাঁর এ-ঘোষণায় আয়ুব খাঁ বিচলিত হয়ে পড়বেন। কারণ যে সেনাবাহিনী এতদিন তাঁকে শক্তি জুগিয়ে এসেছে, তাঁর ক্ষমতার ভিত্তি-প্রস্তর, সে সেনাবাহিনীতেই আসগর খাঁর সিদ্ধান্তে ফাটল ধরার উপক্রম হয়েছে। দশ বছর আগে ক্ষমতা দখল করার পর থেকে এত বড় চ্যালেঞ্জ আয়ুবকে বোধহয় আর কেউ নিক্ষেপ করে নি।

কারণ বছর দু'য়েক আগে সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করলেও প্রতিরক্ষা বাহিনীতে এয়ার মার্শাল আসগর খাঁর আর প্রতিপত্তি এখনো অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তাঁর ইঙ্গিত পাওয়া মাত্রই যে শত শত তরুণ সেনা অফিসার তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবেন সে বিষয়ে কারো মনে সন্দেহের বাষ্পটুকুও নেই—আয়ুবের তো নেই-ই। প্রেসিডেন্ট আয়ুব আজ আর আগের মত সমগ্র সেনাবাহিনীর পূর্ণ আনুগত্যের ওপর নির্ভর করতে পারছেন না।

আসগর খাঁ সম্পর্কে একথাও বলা চলে যে বিরোধী নেতাদের মধ্যে তিনি যতখানি মর্যাদা ও সম্মান পাবেন ততখানি আর কোন নেতাই দাবি করতে পারবেন না, ভুট্টোও না। আয়ুবশাহীর নিষ্ঠুর নিপীড়নে যারা জর্জরিত তারাও স্বভাবতই আসগর খাঁকে নতুন নেতা পেয়ে নিজেদের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেবে। আর একথাও ঠিক যে, সেনাবাহিনীতে আসগর খাঁর জনপ্রিয়তার কারণে ভুট্টোর মত তাঁকেও সহসা জেলে পাঠাতে আয়ুব সাহসী হবেন বলে মনে হয় না। আর প্রেসিডেন্টপদে আগামী নির্বাচন যদি ভুট্টোকে কারান্তরালেই কাটাতে হয়, তবে আয়ুব-বিরোধীরা আসগর খাঁকেই তাদের প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করাতে সচেষ্ট হবে।

অথচ মাত্র সেদিন পর্যন্ত আসগর খাঁ ছিলেন আয়ুব খাঁর কলিজার দোস্ত, তাঁর পরামর্শ ছাড়া আয়ুব কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন না। দীর্ঘ,

আসগর খাঁ

সুদর্শন আসগর ১৯৫৭ সালে বিমানবাহিনীর অধ্যক্ষ হন। পরের বছর ফিল্ড মার্শাল আয়ুবকে ক্ষমতা দখলে তিনি প্রভূতভাবে সহায়তা করেছিলেন। যদিও প্রতিরক্ষা বাহিনীতে থাকাকালীনই দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়েছিলো, তবে সে বন্ধুত্ব প্রায় আত্মীয়তায় পরিণত হয়েছিলো যখন আয়ুব খাঁ প্রেসিডেন্টের গদিতে বসলেন। আয়ুব অবশ্য আসগরের যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে সেদিন দ্বিধা করেন নি। পাক পররাষ্ট্রনীতিতে যে পরিবর্তন সাধিত হলো আসগরকে তার অন্যতম স্থপতি বলা হয়। আয়ুবের প্রতিনিধি হিসেবে এয়ার মার্শাল আসগর খাঁ পিকিং [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] পাক-চীন [illegible] [illegible] রচিত হলো। চীনের ওপর দিয়ে পাকিস্তানী বাণিজ্য-বিমান যাতায়াতের ব্যবস্থাও আসগর সেরে করে এসেছিলেন। পাক-ভারত যুদ্ধের আগে '৬৫ সনে প্রেসিডেন্ট আয়ুব যখন মস্কো যান, তখন আসগরকেও তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন। ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাক বিমানবাহিনী আসগরের নেতৃত্বেই তার তৎপরতা দেখিয়েছিল।

মহম্মদ আসগর খাঁ '২১ সনে জম্মুতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দেরাদুন সামরিক কলেজে ভর্তি হয়ে তিনি '৪০ সালে ভারতীয় সামরিক একাডেমি থেকে সামরিকবিদ্যায় গ্র্যাজুয়েট হন। পরের বছর তিনি রয়াল ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সে যোগ দেন। আসগর পরে ইম্পিরিয়াল ডিফেন্স কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করে এখানকার স্নাতক হন এবং বিমানযোদ্ধার বিশেষ ট্রেনিং নেন। বৃটেনের এয়ার স্টাফ কলেজেও তিনি ট্রেনিং নিয়েছিলেন। দেশ-বিভাগের পর তিনি পাকিস্তানের হয়ে বিলেতের জয়েন্ট সার্ভিস স্টাফ কলেজে যোগ দেন। এয়ার মার্শাল পদে উন্নীত হবার আগে আসগর খাঁ সিয়াটোর পাকিস্তানী সামরিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন এবং সে সুবাদে সিয়াটোভুক্ত সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রে সফর করেছেন।

আয়ুব খাঁর অকৃত্রিম সুহৃদ হয়েও আসগর খাঁ বর্তমানে আয়ুব বিরোধী হয়ে পড়েছেন। আয়ুবের বাড়াবাড়িই যে এর জন্য প্রধানত দায়ী সেকথা বলাই বাহুল্য। আসগর মনে করেন, আয়ুব ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন। সামরিক পুরুষ হিসেবে তিনি এটাও মনে করেন যে, আয়ুব যে-চালে সরকার চালাচ্ছেন তাতে পাকিস্তানী জনগণের কোন মঙ্গল হবে না, তাদের উৎপীড়িতই হতে হবে।

আসগর খাঁ রাজনীতিক নন, তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ কি, বা আদৌ কোন আদর্শ বা বিশ্বাস তাঁর আছে কি-না তা এখনো জানা যায় নি। তবে প্রেসিডেন্ট আয়ুব যেভাবে দেশ শাসন করছেন, যে-কোন ব্যক্তি গদিতে বসলে বোধহয় তার চেয়ে খারাপ করতে পারবেন না। আসগর খাঁ আজ বিরোধীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন, সে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার মর্যাদা যদি তিনি দিতে পারেন, যদি আয়ুবের কোন লোভজনক প্রস্তাবের টোপ না গেলেন, তবে তাঁর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানে রাজনৈতিক পরিবর্তন আসা অসম্ভব নয়।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

কেনানুর জেলে আইন অমান্যকারী বন্দীদের উপর লাঠিচার্জ হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে ঘরে বন্ধ করিয়া, তাঁহাদের সম্মুখে একে একে ৪ জন আইন অমান্যকারী নেতৃস্থানীয় লোককে বেত মারা হইল। ঐ সময় ভারতের বিভিন্ন জেলেও আইন অমান্যকারী বন্দীদের উপর লাঠি-চার্জ হইতে লাগিল। কেনানুর জেলের এই অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদে আমি হাঙ্গার স্ট্রাইক করিলাম এবং ভারত গভর্ণমেন্টের নিকট একখানা দরখাস্ত পাঠাইয়া সকল ঘটনা জানাইলাম। তখন আমি একা ছিলাম। ১৭ দিন পর জেল কর্তৃপক্ষের সহিত একটা রফা হয় এবং আমি অনশন ভঙ্গ করি। ইহার পর আমাকে ত্রিচিনপল্লী সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানেও প্রায় এক বৎসর ছিলাম, তাহার পর ভেলোর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত হই। এখানে প্রতুলবাবু, রবিবাবু ও রমেশবাবু ছিলেন। ভেলোর জেলে কংগ্রেস নেতা প্রফেসার এন· জি· রঙ্গা ছিলেন এবং মালাবারের মোপলা বিদ্রোহ নেতা নারায়ণ মেনন ছিলেন। মোপলারা জাতিতে মুসলমান। মোপলা বিদ্রোহ দমনের জন্য ভারত গভর্নমেন্ট গুর্খা সৈন্য আমদানী করিয়াছিল এবং গুর্খাদিগকে লেলাইয়া দিয়াছিল। মেননের নিকট শুনিলাম, মোপলাদের মধ্যে ত্রাস সঞ্চারের জন্য কিরূপ বীভৎস অত্যাচার করিয়াছে,-- লুণ্ঠন, গ্রাম পোড়াইয়া দেওয়া, মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার ইত্যাদি। ভেলোর জেল হইতে আমরা মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত হিজলী জেলে স্থানান্তরিত হই।

॥ আট ॥

আমি ১৯৩৭ সনে হিজলী জেল হইতে মুক্তিলাভ করি। মুক্তির পর আমি দল গঠনের কাজে বিভিন্ন জিলায় ভ্রমণ করি। ১৯৩৮ সনে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত নড়িয়া গ্রামে কনফারেন্স হয়। কংগ্রেস কনফারেন্সের সভাপতি ছিলেন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। আমি যুব কনফারেন্সের সভাপতি ছিলাম। কলিকাতা হইতে দুই সভাপতি একসঙ্গে নড়িয়া পৌঁছিলাম, এখানে সভার কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। আমরা ১৯২১ সনের পর হইতে সমাজতন্ত্রবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছি, প্রকাশ্য সভা-সমিতিতে যোগ দিতেছি, শ্রমিক দল গঠন করার চেষ্টা করিতেছি। শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ১৯২২ সনে জামসেদপুর শ্রমিক দলের সেক্রেটারী ছিলেন। আমরা বাক্সা ক্যাম্প জেলে ক্লাস করিয়া কার্ল মার্ক্সের "ক্যাপিটেল" এবং অন্যান্য পুস্তক পড়িয়াছি। ১৯৩৮ সনে আমাদের দলের প্রকাশ্য নাম হইল "বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল"। আমরা ভারতের সমাজতন্ত্রী দলের সহিত এক হওয়ার চেষ্টা করিয়াছি। ১৯৪৭ সনে আমরা দেওঘরে একত্র মিলিত হইয়া আলাপ-আলোচনা করি। দেওঘরে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন, জয়প্রকাশ নারায়ণ, রামমনোহর লোহিয়া, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, রবীন্দ্রমোহন সেন, রমেশচন্দ্র আচার্য, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, ত্রিদিব চৌধুরী, নরেন দাস প্রমুখ। আলাপ-আলোচনায় স্থির হয়, দুই দল এক হইয়া যাইবে।

এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, জাতীয় কংগ্রেস দলের মধ্যে দুই মত। এক দল চান সরকারের সঙ্গে আপোষ করিতে, সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন আপোষ বিরোধী। সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস দল হইতে বাহির হইয়া আসিতে বাধ্য হইলেন, তিনি ফরোয়ার্ড ব্লক নামে নতুন দল করিলেন, অনুশীলন সমিতি সুভাষচন্দ্র বসুকে সমর্থন করিল। সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত অনুশীলন সমিতির নেতাদের স্থির হইল, এই বিশ্বযুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করা হইবে, ভারতে সশস্ত্র বিপ্লবের ব্যবস্থা হইবে। আমি ১৯৩৯ সনে সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত ইউ, পি, পাঞ্জাব ভ্রমণ করি। দিল্লী শঙ্কর লালের বাড়িতে ফরোয়ার্ড ব্লক নেতাদের যে সভা হয়, আমি সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম। ঐ সভায় সীমান্ত প্রদেশ নেতা আকবর শাহ উপস্থিত ছিলেন। সুভাষবাবুর ইঙ্গিতে আকবর শাহ ও আমার থাকার ব্যবস্থা এক কোঠায় হইয়াছিল। (জেলে ত্রিশ বছর ও ভারতে বিপ্লব সংগ্রাম দ্রষ্টব্য) সুভাষবাবুর নেতৃত্বে ভারতের চারিদিকে আপোষ বিরোধী আন্দোলন চলিতে লাগিল। আমি ১৯৪০ সনে চট্টগ্রামে এক সভায় ধৃত হই, কংগ্রেস নেতা আস্রাব উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী সাহেবও উক্ত সভায় ধৃত হন। বিচারে আমার ও চৌধুরী সাহেবের এক বৎসর কারাদণ্ড হয়। চট্টগ্রাম জেল হইতে আমাদিগকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। ইহার কয়েক মাস পর আমাকে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠান হয়। এক বৎসর কারাদণ্ড শেষ হওয়ার পর আমাকে সিকিউরিটি বন্দী করিয়া ঢাকা সেন্ট্রাল জেল ও পরে হিজলী ক্যাম্প জেল ও দমদম সেন্ট্রাল জেলে পাঠান হয়। ঐসময় জাতীয় কংগ্রেসের "ভারত ছাড়" আন্দোলন সুরু হইয়াছে।

ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টা এ-যাত্রারও সফল হয় নাই, সুভাষচন্দ্র বসু জেলে, বিপ্লবী নেতারাও জেলে আবদ্ধ। পূর্বে স্থির হইয়াছিল, রামগড় আপোষ বিরোধী কনফারেন্সে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বিপ্লবী নেতারা একত্র হইয়া সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত আলাপ-আলোচনা করিবেন। জাতীয় কংগ্রেস কনফারেন্সও রামগড়ে হইবে। দুই কনফারেন্স পাশাপাশি হইবে। প্রচণ্ড বৃষ্টির জন্য উভয় কনফারেন্স পণ্ড হয়। সঙ্গে সঙ্গে ধর-পাকড় শুরু হয়। কংগ্রেস নেতারা দেখিলেন, বৃটিশের মতিগতি [illegible]

ইচ্ছা তাহাদের নাই, জাতীয় কংগ্রেস সংগ্রাম সুরু করিল। মহাত্মা গান্ধীর "ভারত ছাড়" ডাকে দেশবাসী সাড়া দিল, সমগ্র দেশবাসী আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িল। কংগ্রেস নেতারা গ্রেপ্তার হইলেন, বৃটিশের চণ্ডনীতি চলিতে লাগিল। জাতীয় কংগ্রেসের সংগ্রাম ছিল অ-হিংস সংগ্রাম। অ-হিংস কংগ্রেসকর্মীরা অধিক দিন অ-হিংস থাকিতে পারেন নাই, বিদেশী গভর্নমেণ্টের অমানুষিক অত্যাচারের ফলে ক্রুদ্ধ উন্মত্ত জনতা প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলিতেছে, কংগ্রেস এবং বিপ্লবী নেতারা এখন জেলে, এখন স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইতেছে দেশের উন্মত্ত জনগণ। তাহারা স্থানে স্থানে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে।

সুভাষচন্দ্র বসু সুকৌশলে জেল হইতে বাহির হইয়া, পুলিশকে ফাঁকি দিয়া, জার্মানীতে পৌঁছিয়াছেন। যুদ্ধে, বিভিন্ন রণক্ষেত্রে, বৃটিশ ও তাহার মিত্রশক্তির পরাজয় ঘটিতেছে, তাহারা শুধু পশ্চাদপসরণ করিতেছে। বাংলা দেশে, ১৯৪৩ সনে, (বাং ১৩৪৯ সন) মানুষের সৃষ্টি দুর্ভিক্ষ চলিতেছে, শত শত হিন্দু মুসলমান নর-নারী, শিশু অনাহারে মরিতেছে, কত লোক মরিয়া রাস্তায় পড়িয়া আছে। ভারতের বাহিরে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুর চেষ্টায় আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁহারা ভারত আক্রমণ করিয়াছেন। আসাম ও আরাকানের রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ ফৌজের নিকট বৃটিশ ও আমেরিকান বাহিনীর উপর্যুপরি পরাজয় ঘটিতেছে, আজাদ হিন্দ ফৌজ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়াছে, ব্রহ্মদেশ অধিকার করিয়া ভারতের পথে আসাম ও আরাকান পৌঁছিয়াছে। আজাদ হিন্দ গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, রাজধানী ছিল আন্দামান দ্বীপ। আজাদ হিন্দ ফৌজের উৎকৃষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র ছিল না, খাদ্যাভাব-বস্ত্রাভাব ছিল। এদিকে বৃটিশ ও আমেরিকান সৈন্যরা উৎকৃষ্ট সাজ-সজ্জায় সজ্জিত ছিল, তাহাদের খাদ্যাভাব ছিল না, অস্ত্র-শস্ত্র ছিল উৎকৃষ্টতর। আজাদ হিন্দ ফৌজের সভ্যরা পূর্বে ছিল বৃটিশের বেতনভোগী পরাজিত ও বন্দী ভারতীয় সৈন্য। এই বেতনভোগী পরাজিত সৈন্যগণই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুর সংস্পর্শে আসিয়া অ-পরাজেয় হইয়া উঠিল। তাঁহারা তখন বেতনভোগী ছিলেন না, তাঁহারা হইলেন দেশপ্রেমিক, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক। দেশপ্রেমিকের নিকট পশুশক্তি পরাভূত হইয়াছে, তাঁহাদের দুর্বার গতি বৃটিশ ও আমেরিকার যুক্ত শক্তি রোধ করিতে সক্ষম হইল না। কোহিমার রণাঙ্গনে বৃটিশ সৈন্যের পরাজয় এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতা জেনারেল শাহ-নওয়াজ কর্তৃক ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন ইহার প্রমাণ। এই জয়ের মুখে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটিল। প্রচণ্ড বারিপাতের ফলে আজাদ হিন্দ ফৌজের যোগাযোগ লাইন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। টোকিও হইতে তাঁহাদের মাল সরবরাহ হইত। টোকিও হইতে কোহিমার দূরত্ব কত? বৃটিশ ও আমেরিকা এই সুযোগ গ্রহণ করিল। বৃটিশ ও আমেরিকার মাল সরবরাহ কেন্দ্র ছিল বাংলা দেশ,—ভারতবর্ষ।

শেষ পর্যন্ত বৃটিশ এবং তাহার মিত্রশক্তি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে। ভারতে কংগ্রেসের ভারত ছাড় আন্দোলন গভর্নমেণ্ট দমননীতি প্রয়োগ দ্বারা দমন করিয়া দিয়াছে। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে সত্য কিন্তু বৃটিশ সিংহের কোমর ভাঙিয়া গিয়াছে। যুদ্ধে জার্মান বোমারু বিমানের অনবরত বোমাবর্ষণের ফলে ইংলণ্ডের শিল্প অঞ্চলগুলি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ড এখন ঋণজালে জড়িত। এদিকে আবার তাহার শত্রু রাশিয়া শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। ভারত বিদ্রোহভাবাপন্ন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারতীয় সৈনিকরা সংক্রামিত হইয়াছে, ভারতীয় সৈনিকদিগকে আর বিশ্বাস করা যায় না। আবার নৌ-বিদ্রোহ, শ্রমিক ধর্মঘট, পুলিশ ধর্মঘট চলিতেছে। ভারতের জনগণ বিক্ষুব্ধ। এমতাবস্থায় ভারতবাসী ইংলণ্ডের সহিত সহযোগিতা করিবে না, ইংলণ্ডের মাল ক্রয় করিবে না। ইংলণ্ডের এখন সমূহ বিপদ। ইংলণ্ডকে এখন আত্মরক্ষার জন্য শক্তিশালী হইতে হইবে, শিল্প অঞ্চলগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে। এখন ভারতবর্ষকে যদি পরাধীন রাখিতে হয়, তবে ভারতবর্ষে বহু শ্বেতাঙ্গ সৈন্য রাখিতে হইবে। ইংলণ্ডের রাজনীতিবিদরা দেখিলেন, এমতাবস্থায় ভারতবর্ষকে পরাধীন না রাখিয়া স্বাধীনতা দিলে অধিকতর লাভ হইবে। ভারতে ইংলণ্ডের ব্যবসা চলিবে, ভারতবাসীর সহযোগিতা পাইলে ইংলণ্ড আবার শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। মহাত্মা গান্ধীর "ভারত ছাড়" ডাক সফল হইতে চলিল, ইংলণ্ড ভারত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল। এখন কূটনৈতিক খেলা চলিতে লাগিল। ভারতের চারিদিকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, নানাস্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু হইল, কত নিরীহ লোক প্রাণ হারাইল, কত গৃহ লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইল, লোকের দুঃখের সীমা নাই, অবশেষে ভারত বিভক্ত হইল, উৎপত্তি হইল দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র—পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান। পাকিস্তান স্বাধীনতা পাইল ১৪ই আগস্ট ১৯৪৭ সন এবং ভারত স্বাধীনতা পাইল ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭ সন।

॥ নয় ॥

আমি ১৯৪৬ সনের মধ্যভাগে দমদম সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি পাইলাম। ১৯৪৬ সনের ১৫ই আগস্ট কলিকাতায় দাঙ্গা হয়। স্বদেশী আন্দোলনের সময়, ১৯০৫-৬ সনে, যখন আমরা বিপ্লব দলে যোগদান করি, তখন আমাদের স্বাধীনতার কল্পনায় সাম্প্রদায়িকতা বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছিল না। আমাদের কল্পনায় ছিল, দেশ এবং জাতি, দেশের স্বাধীনতা সকল সম্প্রদায়ের লোক সমানভাবে ভোগ করিবে। মুক্তির পর আমাদিগকে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। তখন ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুব জটিল ছিল। ইতিমধ্যে কু-খ্যাত নোয়াখালী দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, তাহার প্রতিক্রিয়া বিহারে দেখা গিয়াছে, আমি তখন কলিকাতায়। নোয়াখালী দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে গভর্নমেণ্ট শান্তি-স্থাপনের জন্য স-শস্ত্র পুলিশবাহিনী প্রেরণ করিয়াছেন। আমি নোয়াখালী রওয়ানা হইলাম। দত্তপাড়ায় দেওয়ানজী বাড়িতে কেদারেশ্বর গুহ নামে আমাদের দলের একজন সভ্য ছিলেন, আমি দত্তপাড়া পৌঁছিলাম। তখন দাঙ্গা বন্ধ হইয়াছে, লোক চলাচল সুরু হয় নাই। স্থানে স্থানে রিফিউজী ক্যাম্প স্থাপিত হইয়াছে। ক্যাম্পে স-শস্ত্র পুলিশ পাহারা দিতেছে। এমন সময় মহাত্মা গান্ধী সদলবলে দত্তপাড়া উপস্থিত হইলেন। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ছিলেন, তাঁহার নাতনী মনু গান্ধী, নাতিবৌ আভা গান্ধী, প্যারিলাল, জীবন সিং, সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই, বিভিন্ন সংবাদপত্রের দেশী ও বিদেশী প্রতিনিধিগণ। মহাত্মা গান্ধীর দেহরক্ষার জন্য গভর্নমেণ্ট ২৫ জন বন্দুকধারী সিপাহী এবং হাবিলদার প্রভৃতি পাঠাইলেন। পুলিশের গুপ্ত বিভাগের লোকও কিছু ছিল। সমগ্র ভারত এবং পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের নজর নোয়াখালীর উপর পড়িল। মহাত্মা গান্ধী দত্তপাড়ায় কয়েকদিন অবস্থানের পর ঘোষণা করিলেন, তিনি প্রত্যেক দিন পদব্রজে একটি করিয়া দাঙ্গা বিধ্বস্ত গ্রামে যাইবেন এবং এক রাত্রি

গ্রহণ করিবেন। স্বাস্থ্যকলন জয় হওয়া পর্যন্ত তিনি এইভাবে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে ঘুরিতে থাকিবেন এবং এখানে তিনি মৃত্যুবরণ করিবেন। তিনি রাজনৈতিক প্রতিভার পরিচয় দিলেন। ৭৮ বৎসর বয়সে, এই শীতকালে, তিনি খালি গায়—খালি পায় প্রত্যহ প্রাতে এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে যাইতে লাগিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, রামকৃষ্ণ মিশন এবং আরো বহু দল দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে সাহায্যদানের জন্য বিভিন্ন স্থানে সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন করিলেন। মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের প্রধান কেন্দ্র ছিল কাজিরখিল, নাম "গান্ধী ক্যাম্প"। জাতীয় কংগ্রেসের প্রধান কেন্দ্র ছিল চৌমুহনী, সেক্রেটারী ছিলেন হারানচন্দ্র ঘোষচৌধুরী। আমার প্রধান কেন্দ্র ছিল জয়াগ। জয়াগ জমিদার বাড়িতে একটি রিফিউজী ক্যাম্প ছিল। এই গ্রামের প্রতুল চৌধুরী আমাদের দলের সভ্য ছিল। বিভিন্ন দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্র ছিল।

মহাত্মা গান্ধী যখন এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে রওয়ানা হইতেন, তাঁহার সঙ্গে প্রায় দুইশত লোকের শোভাযাত্রা চলিত। মহাত্মা গান্ধী ও তাঁহার সহচরগণ ব্যতীত সঙ্গে থাকিতেন, বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ, ২৫ জন বন্দুকধারী সিপাহী-হাবিলদার, পুলিশ অফিসার, ভলান্টিয়ার ও দর্শকবৃন্দ। খাবার-থাকার ব্যবস্থা প্রত্যেকের নিজের। মহাত্মা গান্ধী যখন এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে পৌঁছিতেন, তখন সেই গ্রামের সংখ্যালঘুরা মনে করিতেন, ভগবান আমাদের মুক্তির জন্য ত্রাণকর্তা পাঠাইয়াছেন। দুষ্কৃতকারীরা পুলিশ ও বন্দুকধারী সিপাহী দেখিয়া ভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল। প্রত্যহ বৈকালে উভয় সম্প্রদায়ের লোক লইয়া প্রার্থনা-সভা হইত এবং প্রার্থনার পর মহাত্মা গান্ধী উপদেশ দিতেন। সুফল ফলিয়াছে, অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী যখন আমার কেন্দ্রে উপস্থিত হইলেন, তখন আমি সেই দেশী কীর্তনের ব্যবস্থা করিলাম। মহাত্মার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে একদল স্ত্রীলোক খোল-কর্তাল বাজাইয়া নৃত্য করিতে করিতে কীর্তন গাহিতে লাগিল, মহাত্মা দশ মিনিট দাঁড়াইয়া কীর্তন শুনিলেন। মহাত্মা গান্ধী যখন নোয়াখালী ছিলেন, তখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের প্রধান প্রধান নেতারা মাঝে মাঝে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে যাইয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেখা করিয়াছেন। বাংলা দেশ হইতেও শরৎচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মাঝে মাঝে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে গিয়াছেন। বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেবও দত্তপাড়া যাইয়া মহাত্মা গান্ধীর সহিত দেখা করিয়াছেন। আমি তখন দত্তপাড়ায় উপস্থিত ছিলাম।

কিছুদিন পর মহাত্মা গান্ধী তাঁহার সঙ্গীদিগকে নির্দেশ দিলেন, সকলে একত্র থাকিতে পারিবে না, প্রত্যেকে এক-একটি খালি গ্রামে, পোড়া বাড়িতে, নারিকেল পাতা দিয়া ঘর উঠাইয়া একা থাকিবে। তিনি প্রথম নির্দেশ দিলেন তাঁহার ১৮ বৎসর বয়স্কা নাতনী মনু গান্ধীর উপর। মহাত্মার এই নির্দেশের জন্য সকলেই চিন্তিত, ভীত কিন্তু মহাত্মা গান্ধী অচল-অটল। মনু গান্ধী এক খালি গ্রামে, পোড়া বাড়িতে, নারিকেল পাতার ঘরে রাত্রে একা কাটাইতে লাগিলেন। অন্যান্য সকলেও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেন, প্রত্যেকে এক-এক গ্রামে যাইয়া বসিলেন। লোকের মনে সাহস সঞ্চার হইল, যাহারা ভয়ে গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল, আস্তে আস্তে তাহারা আবার নিজ নিজ গ্রামে ফিরিয়া আসিল। সুচেতা কৃপালনী, জীবন সিং, প্যারীলাল প্রমুখ বিভিন্ন গ্রামে বসিয়া গঠনমূলক কাজ করিতে লাগিলেন। কাজের মধ্যে ছিল সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপন ও চরকা প্রচলন।

জয়াগ জমিদার বাড়ির অপর হিস্যার মালিক ছিলেন হেমন্তকুমার ঘোষ, ব্যারিস্টার, তিনি লক্ষ্ণৌ থাকিতেন। তাঁহার পুত্র ছিল না, দুই কন্যা ছিল, তিনি দেশে আসিতেন না, তাঁহার ভগ্নিপতি সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন। হেমন্তবাবুর ভাগিনেয়গণ আমাদের দলভুক্ত ছিল। আমার কেন্দ্র হেমন্তবাবুর বাড়িতে ছিল। জয়াগ রিফিউজী ক্যাম্পে আসকী গ্রামের যশোদাকুমার দে, কবিরাজ, স-পরিবারে ছিলেন। যশোদাবাবুর স্ত্রী আমাকে ধর্মের বাপ ডাকিলেন এবং যশোদাবাবু প্রস্তাব করিলেন তিনি আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। হেমন্তবাবু মহাত্মা গান্ধীর নিকট প্রস্তাব করিলেন, তাঁহার সম্পত্তি গঠনমূলক কাজের জন্য মহাত্মা গান্ধীকে দান করিবেন। মহাত্মা গান্ধী এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। ইহার পর হেমন্তবাবুর ভগ্নীপতি এবং ভাগিনেয়গণ প্রস্তাব করিলেন, আমি যেন এই সম্পত্তি গ্রহণ করি। আমি এই প্রস্তাবে রাজী হইলাম না, কারণ আমার ইচ্ছা ছিল নিজ গ্রামে বসিয়া গঠনমূলক কাজ করিব। ইহার পর সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় হেমন্তবাবুর সহিত ব্যবস্থা করিয়া এই সম্পত্তি নিজ নামে লিখাইয়া লন। আমার জয়াগ ত্যাগ করার পর সতীশবাবু তাঁহার কেন্দ্র কাজিরখিল হইতে জয়াগ গ্রামে স্থানান্তরিত করেন।

দাঙ্গার পর বিধ্বস্ত অঞ্চলে কোন স্কুল ছিল না, ডাক্তার ছিল না, ডিস্পেন্সারী ছিল না। আমার ৪টি কেন্দ্র ছিল, আমি প্রত্যেক কেন্দ্রে স্কুল এবং হোমিওপ্যাথী ডিস্পেন্সারী স্থাপন করিলাম। আমি জয়াগ কেন্দ্রে একটি প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করিলাম এবং উক্ত গ্রামের অপর্ণা ঘোষকে মাসিক ১০৲ টাকা বেতনে শিক্ষিকা নিযুক্ত করিলাম। আমি ছাত্র-ছাত্রীদের বই-শ্লেট পেন্সিলের ব্যবস্থা করিলাম। আমি জয়াগ গ্রামে একটি হোমিওপ্যাথী ডিস্পেন্সারী স্থাপন করিলাম, দাতা মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের পুত্র হেরম্ব ভট্টাচার্যের নিকট হইতে আমার কেন্দ্রসমূহের জন্য ঔষধের ব্যবস্থা করিলাম। জয়াগ কেন্দ্রে ডাক্তার নিযুক্ত হইল আমাদেরই দলের সভ্য ডাঃ কৃষ্ণচন্দ্র সাহা। আসকী কেন্দ্রে যশোদাকুমার দে, কবিরাজবাড়িতে আমার গ্রামের পরিমল রায়কে শিক্ষক, ডাক্তার এবং কর্মী হিসাবে বসাইলাম। আমার গ্রামের রাজেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীকে এক গ্রামে বসাইলাম। কাজ চলিতে লাগিল, সুফল ফলিতে লাগিল। কাজের মধ্যে বড় কাজ ছিল, সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপন, খাদী ও চরকা প্রচলন। আমি বিধ্বস্ত অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেক গ্রামে গিয়াছি, হাইসচর গিয়াছি, দালাল বাজার গিয়াছি, পায়ে হাঁটিয়াই সর্বত্র যাইতে হইয়াছে। সতীশবাবু তাঁহার কাজিরখিল কেন্দ্রে বাঁশের চরখা তৈয়ার করার ব্যবস্থা করিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে বাঁশের অভাব নাই, কাঠের চরকা অপেক্ষা বাঁশের চরকার খরচ খুব কম পড়ে। আমি পরিমল এবং রাজেন্দ্রকে কাজিরখিল পাঠাইয়া বাঁশের চরকা তৈয়ার করা শিখাইলাম, উদ্দেশ্য আমার গ্রামে বাঁশের চরকা তৈয়ার কেন্দ্র স্থাপন করিব।

আমি নোয়াখালীতে প্রায় দেড় বৎসর ছিলাম। দেশ বিভাগ যখন হয় তখন আমি দাঙ্গা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে ছিলাম। ঐ সময় পাক-ভারতের পরিস্থিতি অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। দেশত্যাগের হিড়িক চলিতে লাগিল, রাজনৈতিক নেতা এবং কর্মীরা প্রায় সকলেই চলিয়া গেলেন। আমি স্থির করিলাম, আমি দেশত্যাগ করিয়া যাইব না, আমি পাকিস্তানেই থাকিব, পাকিস্তানের জনগণের সুখ-দুঃখের অংশ

গ্রহণ করিয়াই থাকিব। এই দেশ, পূর্ব-বঙ্গ, আমার দেশ, আমার পিতৃ-পিতামহের স্মৃতি-জড়িত সোনার বাংলা। আমি এই দেশ কেন পরিত্যাগ করিয়া যাইব? আমাদের ব্যক্তিগতভাবে চিন্তা করিলে চলিবে না, সমষ্টিগতভাবে চিন্তা করিতে হইবে। দেশত্যাগ, সমস্যার সমাধান নয়, দেশে থাকিয়াই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। আমি যদি দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, তবে আমি যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলাম, তাহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে। আমি দেখিলাম সাম্প্রদায়িক সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিয়াছে, সংখ্যালঘুদের মনোবল ভাঙিয়া পড়িয়াছে, এরূপ অবস্থায় আমার দেশত্যাগ চলিবে না, এই দেশেই থাকিতে হইবে। আমি এই দেশে থাকিয়াই দেশের জনগণের সেবা করিব। আমি স্থির করিলাম, আমি আমার গ্রামে থাকিয়া গঠনমূলক কাজ করিব। আমার গ্রামকে একটি আদর্শ গ্রামে পরিণত করিব। আমি গান্ধী ক্যাম্পের সহিত সহযোগিতায় কাজ করিতাম। একদিন আমি সতীশ দাশগুপ্ত মহাশয়কে বলিলাম, নোয়াখালীর অবস্থা এখন স্বাভাবিক হইয়াছে, এখন এখানে আপনার এবং আমার, দুইজনের থাকার কোন প্রয়োজন নাই। আমার প্রতিষ্ঠানগুলি আপনার হাতে দিয়া আমি নিজ গ্রামে গিয়া গঠনমূলক কাজ করিব। আমি এক দিন আমার চারটি কেন্দ্রের কর্মিদিগকে সতীশবাবুর নিকট ডাকাইয়া পরিচয় করাইয়া দিলাম, তাহার মধ্যে আসকীর যশোদাবাবুও ছিলেন। আমার প্রয়াগ কেন্দ্রের তহবিলে ৮০ টাকা ছিল। অন্যান্য কেন্দ্রেও কিছু টাকা ছিল, আমি সব টাকা এবং কর্মিদিগকে সতীশবাবুর হাতে দিয়া মুক্ত হইলাম। আমি পরিমল এবং রাজেন্দ্রকে বাড়ি পাঠাইয়া দিলাম। মহাত্মা গান্ধী যখন নিহত হন, তখন আমি প্রয়াগ ছিলাম। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া আমি তৎক্ষণাৎ কাজিরখিল রওয়ানা হইলাম। ১২।১৪ মাইল রাস্তা হাঁটিয়া গেলাম। সেখানে হিন্দু-মুসলমান বহু লোক সমবেত হইয়াছে, কাহারো মুখে শব্দ নাই সকলের চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। কি করুণ দৃশ্য?

॥ দশ ॥

১৯৪৮ সনে বরিশাল শহরে সোস্যালিস্ট পার্টির কনভেনশন ডাকা হয়, আমি ছিলাম সেই কনফারেন্সের সভাপতি। দেশ বিভাগের পূর্বে আমরা সর্বভারতীয় সোস্যালিস্ট পার্টির সভ্য ছিলাম, দেশ বিভাগের পর সোস্যালিস্ট পার্টিও দুই ভাগে বিভক্ত হইল। বরিশাল কনভেনশনে স্থির হইল, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলিতভাবে "পাকিস্তান সোস্যালিস্ট পার্টি" নামে স্বাধীনভাবে সোস্যালিস্ট পার্টি গড়িয়া উঠিবে। ভারতের সোস্যালিস্ট পার্টির সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। কনফারেন্সে বিভিন্ন জিলা হইতে প্রতিনিধি আসিয়াছিল, প্রকাশ্য সভা, আমার অভিভাষণ পুস্তিকাকারে বাহির হইল। কনফারেন্সে স্থির হইল, পাকিস্তান সোস্যালিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, সেক্রেটারী মোবারক সাগর (করাচী) এবং প্রফেসার পুলিন দে (চট্টগ্রাম)। কার্যকরী সভ্যদের মধ্যে ছিলেন, মুহম্মদ ইউসুফ (লাহোর), দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ (বরিশাল) প্রমুখ। পাকিস্তান সোস্যালিস্ট পার্টির ভবিষ্যৎ মন্দ ছিল না কিন্তু অবস্থার চাপে অগ্রসর হইতে পারে নাই। যেখানে সাম্প্রদায়িকতা ও দুর্নীতি সেখানে সমাজতন্ত্রবাদ চলিতে পারে না। সমাজতন্ত্রবাদের জন্য প্রয়োজন সমাজতান্ত্রিক আবহাওয়া তৈয়ার করা। পাকিস্তান সমাজতান্ত্রিক নেতারা সেই আবহাওয়া তৈয়ার করিতে পারেন নাই। দেশের মধ্যে দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার উৎসব চলিতেছিল, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষমতা তাহাদের ছিল না। সমাজতন্ত্রবাদের জন্য প্রয়োজন মানুষের মন তৈয়ার করা, মানুষের প্রতি মানুষের একাত্মবোধ বা মমত্বভাব জাগানো। আমি এবং আমার প্রতিবেশী এক, সকলের একরূপ অভাব, একরূপ প্রয়োজন, সকলে এক সঙ্গে উৎপাদন করিব, সমান ভাবে ভাগ করিয়া খাইব। এই মনোভাব জাগানো বল-প্রয়োগ দ্বারা বা আইন প্রণয়ন দ্বারা সম্ভবপর নয়,—শিক্ষা দ্বারাই সম্ভবপর। সে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা চালানোর ক্ষমতা সমাজতন্ত্রী দলের ছিল না, এমন কি একটা অফিস রাখার ক্ষমতাও ছিল না। সমাজতন্ত্রী দলকে কে অর্থ সাহায্য করিবে? নেতারা সবাই ছিলেন গরীব। যাহা হউক সমাজতন্ত্রী দল কোন প্রকারে অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিল।

এশিয়ান সোস্যালিস্ট কনফারেন্স রেঙ্গুনে হইবে, ব্রহ্মদেশের দেশরক্ষামন্ত্রী অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন। এই কনফারেন্সে ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী এটলী সাহেব উপস্থিত থাকিবেন। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে সব দেশের সোস্যালিস্ট পার্টিকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, পাকিস্তান সোস্যালিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান হিসাবে আমিও নিমন্ত্রণপত্র পাইলাম। আমি শুধু মামুলী নিমন্ত্রণপত্র পাই নাই, অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান,—দেশরক্ষামন্ত্রী, আমাকে ব্যক্তিগতভাবে আর একখানা চিঠি লিখিয়া অনুরোধ করিলেন, আমি নিশ্চয়ই যেন সভায় উপস্থিত থাকি, কারণ তাঁহারা পাকিস্তান সম্বন্ধে Interested. আমার পাসপোর্ট ছিল না, আমি পাসপোর্টের জন্য পূর্বেই দরখাস্ত করিয়াছিলাম। আমি পূর্বে রাজবন্দী হিসাবে ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন জেলে ছিলাম, পলাতক অবস্থায়ও ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থানে ছিলাম, আমার কিছু পরিচিত লোকও সেখানে ছিল, এজন্য ব্রহ্মদেশে যাওয়ার আমার খুব ইচ্ছা ছিল। আমি ঢাকা গিয়া পাসপোর্টের দরবার করিলাম, প্রধানমন্ত্রী, ডি· আই· জি, আই· বি সাহেবকে ধরিলাম, শেষ পর্যন্ত পাসপোর্ট পাওয়া গেল না। কনফারেন্স বসার কয়েক দিন পূর্বে আমি ঢাকা হইতে ১৩৸৵ খরচ করিয়া, কনফারেন্সের চেয়ারম্যান-এর নিকট কনফারেন্সের সাফল্য কামনা করিয়া এবং আমার পাসপোর্ট না পাওয়ায় কনফারেন্সে উপস্থিত হইতে পারিলাম না জানাইয়া টেলিগ্রাম করিলাম। ঐ কনফারেন্সে এট্‌লী সাহেব উপস্থিত ছিলেন, আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানের সেক্রেটারী মোবারক সাগরও উপস্থিত ছিলেন। আমার টেলিগ্রাম কনফারেন্সে পাঠ করা হইল এবং সভায় চাঞ্চল্য দেখা গেল। মোবারক সাগর এবং কয়েকজন প্রতিনিধি পাকিস্তান গভর্নমেণ্টের রেঙ্গুনস্থ এম্বেসেডার-এর সহিত দেখা করিয়া আমার পাসপোর্ট না দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন, তিনি ইহার কিছুই জানেন না। কনফারেন্স শেষ হওয়ার পর মোবারক সাগর রেঙ্গুন হইতে ঢাকা আসিয়া আমাদের সহিত দেখা করেন। ইহার পর গভর্নমেণ্ট আমাকে পাসপোর্ট দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হইলেন। আমি তখন বাড়ি ছিলাম। একজন আই· বি অফিসার ৫১নং হেমেন্দ্র দাস রোডে যাইয়া আমার খবর নিলেন এবং বলিয়া আসিলেন, আমি যেন আই· বি অফিস হইতে আমার পাসপোর্ট লইয়া আসি। ইহার পর কুলিয়ারচর থানার দারোগা সাহেব একদিন আমার বাড়ি যাইয়া এই শুভ সংবাদ দিলেন যে, আমার পাসপোর্ট তৈয়ার হইয়াছে, আমি ঢাকা যাইয়া আই· বি অফিস হইতে যেন আমার পাসপোর্ট লইয়া আসি। আমি ঢাকা গিয়া ডি· আই· জি, আই· বি· এফ· আর খন্দকার সাহেবের সহিত তাঁহার অফিসে দেখা করি। তখন রেঙ্গুন কনফারেন্স হইয়া গিয়াছে, আমি ৬ মাসের জন্য ভারতের পাসপোর্ট পাইলাম। আমি তখন খন্দকার সাহেবকে বলিলাম, আপনারা আমাকে রেঙ্গুনের পাসপোর্ট না দিয়া

[illegible] কাজ করিলেন? আমি লণ্ডন কনফারেন্সে পাকিস্তানের পক্ষেও ত' দু'-চার কথা বলিতে পারিতাম। আর যদি আমি বিরুদ্ধে কিছু বলিতাম, তবে দেশে ফিরিয়া আসিলে পর ত' আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে আটক করিয়া রাখিতে পারিতেন। আপনাদের কি লাভ হইল?

॥ এগার ॥

আমি ১৯০৮ সন পর্যন্ত, হয় গভর্নমেণ্টের অন্নে, নয় বন্ধু-বান্ধবদের অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছি, বাড়ির ভাত খুব কমই খাইয়াছি। আজ সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর পর বাড়িতে বসিলাম, গ্রামে বসিয়া গঠনমূলক কাজ করার জন্য। দেশ এখন স্বাধীন হইয়াছে, এখন সংগ্রাম বিদেশী গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে নয়, নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে, দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। এখন আর ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে না, জেল-দ্বীপান্তরে পচিতে হইবে না, এখন গভর্নমেণ্টই হইবে সহায়ক। স্বাধীনতালাভের পর দেশ-প্রেমিকদের কর্তব্য জাতির সকল প্রকার দুর্বলতা দূর করিয়া জাতিকে সবল করিয়া গড়িয়া তোলা,—জাতীয় চরিত্র গড়িয়া তোলা। চরিত্রই জাতির মেরুদণ্ড। একটা জাতির মধ্যে যদি সাম্প্রদায়িকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুর্নীতি থাকে তবে সেই জাতি কখনও বড় হইতে পারে না। আমি স্থির করিলাম, আমার গ্রাম এবং আমার অঞ্চলকে আদর্শ গ্রামে পরিণত করিব। আমার অঞ্চলে কেহ অশিক্ষিত থাকিবে না, বেকার থাকিবে না, অনাহার-অ-চিকিৎসায় কাহারও মৃত্যু হইবে না, মামলা মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি হইবে। আমি আমার গ্রামে বাঁশের চরকা তৈয়ারের কারখানা স্থাপন করিলাম, চরকা তৈয়ারের যন্ত্রপাতি ক্রয় করিলাম। পরিমল ও রাজেন্দ্র চরকা তৈয়ার করিতে লাগিল। গ্রামে বাঁশের অভাব নাই, কিছু বাঁশ ক্রয় করিলাম, কিছু সংগ্রহ করিলাম। আমি আমার গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলাম, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিলাম, লাইব্রেরী স্থাপন করিলাম, দুইখানা তাঁত বসাইলাম। আমি রাজেন্দ্র চক্রবর্তী এবং পরিমল রায়ের হাত-খরচ বাবদ মাসিক ৩০ টাকা এবং ২০ টাকা ধার্য করিলাম। চরকা তৈয়ার হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের মেয়েদের মধ্যে বিতরণ হইতেছে। তুলা সংগ্রহ করিয়াছি, তুলা বিতরণ করিতেছি, পরিমল ও রাজেন্দ্র সকলকে সূতাকাটা শিখাইতেছে, মেয়েদের মনে খুব উৎসাহ। গ্রামে একটি সরকারী প্রাইমারী স্কুল ছিল, আমি একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলাম, গ্রামের একটি মহিলাকে মাসিক ১০ টাকা বেতনে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিলাম। ছাত্রদের পুস্তক, শ্লেট-পেন্সিল আমি ক্রয় করিয়া দিলাম, স্কুলের কাজ চলিতে লাগিল। আমি মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের দোকান হইতে অর্ধমূল্যে হোমিওপ্যাথী ঔষধ ক্রয় করিলাম এবং আমাদের গ্রামের ডাঃ সতীশচন্দ্র রায়কে দিয়া দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিলাম। আমি জেলখানায় এলাউন্সের টাকা হইতে বহু বই ক্রয় করিয়াছিলাম, আমার বই-গুলি গ্রামের লাইব্রেরীর জন্য দান করিলাম। গ্রামের লোক লাইব্রেরীর নাম রাখিল "ত্রৈলোক্য পাঠাগার"। এই পাঠাগারে কলিকাতা হইতে মাসিক বসুমতী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা আসিতে লাগিল, আরো অনেকে অনেক বই পাঠাইল, দুই আলমারী বই হইল। আমার কেন্দ্রে প্রায় এক শত চরকা তৈয়ার হইয়াছে, কর্মীরা খুব উৎসাহের সহিত সূতা কাটিতেছে। আমি কর্মীদিগকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য চরকা সঙ্ঘের নিয়ম অনুসারে সূতাকাটার মজুরীর টাকা দিয়া সূতা ক্রয় করিয়া লইতাম। আমি তাঁত স্কুল খুলিলাম, আমার কেন্দ্রে দুইখানা তাঁত বসাইয়াছিলাম, আমার এক রাজনৈতিক বন্ধুর সাহায্যে তাঁহার আত্মীয় যতীন্দ্র দেকে তাঁতের মাস্টার নিযুক্ত করিলাম, সে আমার বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া করিবে, তাঁহার হাতখরচের জন্য মাসিক ৩০ টাকা দিব। আমি চিত্তরঞ্জন কটন মিলের কর্তা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসুর নিকট হইতে এক মণ পাঁজকরা তুলা আমার কেন্দ্রের জন্য দান হিসাবে সংগ্রহ করিলাম। আমার কেন্দ্রের কর্মীদিগকে আমি চরকা এবং তুলা বিনামূল্যে দিয়াছি।

২২শে বৈশাখ, গ্রামের লোক খুব উৎসাহের সহিত আমার জন্মতিথি পালন করিত। বৎসরের মধ্যে এই দিনটি ছিল গ্রামের ছেলে-মেয়েদের খুব আনন্দের দিন। এই জন্মতিথি উপলক্ষে বৈকালে সভা হইত, কর্মীরা এবং গ্রামের লোক একত্র হইয়া আলাপ-আলোচনা করিত। চরকা বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগের কাজের প্রতিবেদন করা হইত। গ্রামের রাস্তা-ঘাট, পানীয় জল, মাঠের ফসল—সকল বিষয়েরই আলাপ-আলোচনা হইত। গ্রাম হইবে একটি আদর্শ পরিবার। গ্রামের প্রত্যেক প্রত্যেকের সুখ-সুবিধা দেখিবে। সভায় সূতাকাটা হইত, যাঁহারা ভাল সূতা কাটিতেন তাঁহাদের পুরস্কার দেওয়া হইত। সভা শেষে সকলের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইত। কুলিয়ারচর বাজারে তখন দুধ সস্তা ছিল, মিষ্টান্নের চাউল ক্রয় করার প্রয়োজন হইত না, কাজেই খরচ খুব বেশি হইত না। উৎসবের ব্যয়ভার গ্রামের কয়েকজন বহন করিতেন। আমারও চাঁদা ধরা হইত। ব্যবস্থা প্রচুরই থাকিত, গ্রামের বউ, ছেলে-মেয়ে সকলেই মিষ্টান্নের অংশ গ্রহণ করিত। সভা শেষে গানের ব্যবস্থা থাকিত। আমি প্রথম প্রথম আমার কর্মীদিগকে আমার জন্মতিথি পালনে উৎসাহ দিয়াছি, আমি মনে করিয়াছি, একটা উপলক্ষ করিয়া গ্রামের লোকের একত্র হওয়ার প্রয়োজন আছে কিন্তু পরে যখন আমার কেন্দ্রের দুর্দিন চলিতেছিল, তখন আমিই আমার জন্মতিথি পালন বন্ধ করিয়া দিলাম। আমি মনে করিলাম, আমার জন্মতিথি পালন করা ভণ্ডামী ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ জন্মোৎসব পালনের যোগ্য ব্যক্তি আমি নই। যার প্রতি কাজের মধ্যে ব্যর্থতা, তার আবার জন্মোৎসব কি?

ইতিমধ্যে আমার কেন্দ্রে নানা সঙ্কট দেখা দিয়াছে, প্রথম সংকট অর্থনৈতিক। আমি আমার কর্মীদের হাতখরচের টাকা নিয়মমত দিতে পারিতেছি না। আমার ব্যয় হইতেছে কিন্তু আয় নাই। আমার তাঁতের মাস্টার যতীন্দ্র কয়েক দিনের জন্য বাড়ি গিয়াছিল কিন্তু সে আর ফিরিল না। আমার কেন্দ্রে সূতা অনেক মজুদ হইয়াছে কিন্তু তাহা আমি কাজে লাগাইতে পারিতেছি না। আমার এক-জন তাঁতের মাস্টার রাখিতে হইলে মাসিক ৬০।৭০ টাকা বেতন দিতে হইবে, সে ক্ষমতা আমার নাই। আশার আলো দেখা দিল।

কুলিয়ারচর বাজারে বৃটিশ আমল হইতে প্রায় ১০।১২ বৎসর যাবৎ একটি সরকারী ভ্রাম্যমাণ বয়ন বিদ্যালয় ছিল। সেখানে কোন কাজ হইত না, সরকারী কর্মচারীরা বসিয়া বসিয়াই বেতন পাইতেন, তাঁহারা ছিলেন বেকার। কুলিয়ারচর আমার বাড়ি হইতে এক মাইল দূরে। সরকারী কর্মচারীরা মাঝে মাঝে আমার কেন্দ্রে আসিয়া কাজ দেখিতেন। তাঁহারা আমাকে পরামর্শ দিলেন, কুলিয়ারচর বয়ন বিদ্যালয়টি আমার গ্রামে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করিতে, অথবা উপর হইতে অনুমতি আনিলে তাঁহারা প্রত্যহ আমার কেন্দ্রে আসিয়া আমার কর্মীদিগকে কাজ শিখাইবেন। কুলিয়ারচর বয়ন বিদ্যালয়ের সরকারী কর্মচারীরা আমার কেন্দ্রে আসিয়া আমার কর্মী ছেলে-মেয়ে-দিগকে কাজ শিখাইতে খুবই উৎসুক ছিলেন। আমি ঢাকা রওয়ানা হইলাম এবং ডিরেক্টর অব ইন্ডাস্ট্রিজ আক্রম সাহেবের সহিত দেখা করিলাম। আক্রম সাহেব সহানুভূতির সহিত আমার কথা শুনিলেন, আমাকে আশ্বাস দিলেন, আমি খুশি হইয়া বাড়ি ফিরিলাম। আমি

যাওয়ার আগে,
টুকিটাকি কটা
—কাজ সারতে চাই।
বলতে হবে না,
সারা হলে নিজেই বলব ঃ
আচ্ছা ভাই, চলি তাহলে—।

যাওয়ার আগে,
মুখোশগুলো টেনে খুলে দিয়ে যাব—
ফানুসগুলো,
একটার পর একটা,
সশব্দে ফাটাব ;
মানে, জন্তু-মানুষ দুই-ই চেনাব,
দুটোই।

উইংসের পাশ থেকে
চাপা গলার প্রম্পটার নয়—
বিবেক-টিবেক সাজাও, ধাতে পোষাবে না।

পাদপ্রদীপের আলোয়—
যে পার্টটা করব,
চাই সেটা শিশির ভাদুড়ীর মত
জীবন্ত হোক।

চাইছি,
ছুই-ভুল একটা কিছু ঘটুক।
বাতাস,
তেতে-মেতে উঠুক।
একটা ভয়ঙ্কর কিছু
হঠাৎ চারিদিকে চাউর হয়ে যাক।

অন্তত,
এক-আধজনও উঠে দাঁড়াক,
দেখে যাই।
অন্তত,
এক-আধজনকেও বলে যেতে চাই—
সাবাস ভাই,
ঠিক আছে।

নিশ্চিন্ত হইলাম, ভ্রাম্যমাণ বয়ন বিদ্যালয় আমার কেন্দ্রে ৬ মাস থাকিলে আমি একদল কর্মীকে কাজ শিখাইতে পারিব, ভবিষ্যতে আমার কোন চিন্তা থাকিবে না। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হবিবুল্লাহ বাহার সাহেব আমার কেন্দ্রে দুই কিস্তিতে ৬ গ্রাম পাউডার মিল্ক দান করিয়াছিলেন, পরিমল এবং রাজেন্দ্র প্রত্যহ দুধ তৈয়ার করিয়া গ্রামের এবং পাশের গ্রামের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিতরণ করিত।

মাঝে মাঝে বাহিরের লোক আমার কেন্দ্রের কাজ দেখিতে আসিতেন, তাঁহাদের অনেককেই আমি চিনিতাম না। একদিন এক ভদ্রলোক আমার প্রতিষ্ঠান দেখিতে আসিলেন, তখন আমার কেন্দ্রে প্রায় এক শত চরকা চলিতেছিল, কারখানায় আরো চরকা তৈয়ার হইতেছিল। তিনি চরকা তৈয়ার, সুতাকাটা, মেয়েদের স্কুল, লাইব্রেরী সবই দেখিলেন। যাইবার সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি যে এত টাকা খরচ করিয়া এইসব করিতেছেন, আপনার লাভ কি? আমার কি লাভ কি উত্তর দিব? আমি ত ব্যক্তিগত লাভের জন্য কিছু করিতেছি না। আমার দেশের অশিক্ষিত দরিদ্র জনগণ যদি উন্নত হয়, ইহাই ত আমার বড় লাভ। দেশপ্রেমের স্বাদ, যাহারা পায় নাই, ব্যক্তিগত স্বার্থ চিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা যাহাদের মনে স্থান পায় না, তাহারা কি করিয়া বিশ্বাস করিবে, পাকিস্তানে একজন হিন্দু বিনা স্বার্থে কি করিয়া এইসব জনহিতকর কাজ করিতে পারে? তাহাদের মনে এই ধারণা হওয়া স্বাভাবিক, নিশ্চয়ই ইহার পিছনে কোন মতলব আছে, নচেৎ টাকা খরচ করিয়া কেন এই সব করিবে? কি স্বার্থ? অবশ্যই কেহ কেহ আমাকে বলিয়াছিলেন, অর্থ ব্যয় করিয়া কেন এখানে পণ্ডশ্রম করিতেছেন? আপনার কর্মক্ষেত্র এখানে নয়। যাহা হউক আমি আগন্তুক ভদ্রলোককে বলিলাম, আমার অঞ্চলের লোককে স্বাবলম্বী করিব, ইহাই আমার উদ্দেশ্য। আমি জনগণের সেবার জন্য এইসব করিতেছি। তিনি সম্ভবত তাহা বিশ্বাস করিলেন না।

আমার বিশ্বাস ছিল আমার কেন্দ্র স্বাবলম্বী হইবে, তাঁতের উপরই আমার বিশ্বাস ছিল বেশি। আমি মাঝে মাঝে ঢাকা যাই, হেমেন্দ্র দাস রোড হইতে মিন্টো রোড পর্যন্ত পায়ে হাঁটিয়া যাই, ডিরেক্টার অব ইন্ডাস্ট্রিজ অফিসে গিয়া তাগিদ দিই, একবার শিল্পমন্ত্রীর সহিতও (ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্টার) দেখা করি, সকলেই সহানুভূতি দেখায় কিন্তু আমি কাজে কিছু দেখিতেছি না। তখন বীর মন্ত্রি-মণ্ডলী চলিতেছিল। অবশেষে আজম সাহেব একদিন বলিলেন, [illegible] অঞ্চলে [illegible] উপদ্রব দেখা দিয়াছে, তুলিয়ারচর [illegible], বয়ন বিদ্যালয় সেখানে পাঠাইতে হইবে। আমি বলিলাম, আপনাদের অনেক তাঁতের মাস্টার রিজার্ভ আছে, তাঁহাদের মধ্য হইতে ৬ মাসের জন্য আমার কেন্দ্রে একজন লোক দিতে পারেন। তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ইহার পর ৪ মাস অতীত হইল, কিন্তু বয়ন বিদ্যালয় তুলিয়ারচরে রহিল, আমি তাঁতের মাস্টার পাইলাম না। পরে একদিন সংবাদ পাইলাম, তুলিয়ারচর [illegible] বয়ন বিদ্যালয় [illegible] রওয়ানা হইতেছে। এদিকে তাঁতের মাস্টার না পাওয়ায় আমার কর্মীদের উৎসাহ কমিয়া গেল, সুতা কাজে লাগাইতে না পারিলে সুতা কাটিয়া কি লাভ হইবে। আস্তে আস্তে আমার তাঁতের স্কুল, চরকা তৈয়ারের কারখানা এবং সুতা কাটা বন্ধ হইয়া গেল।

আমার বালিকা বিদ্যালয়টি ৫।৬ বৎসর ছিল। ইহার মধ্যেও গণ্ডগোল। গ্রামের সরকারী প্রাইমারী স্কুলের হেড-মাস্টার মাঝে মাঝে আমার নিকট আসিয়া অনুযোগ করিতেন, তাঁহার স্কুলে কোন মেয়ে যায় না, এ জন্য তাঁহার স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে, আমার স্কুল রাখার ত কোন প্রয়োজন নাই? পরে স্থির হইল বয়স্কা মেয়েরা আমার স্কুলে থাকিবে, ছোট মেয়েরা সরকারী স্কুলে যাইবে। আমার স্কুলে শিক্ষয়িত্রী ছিল মেয়ে, হাতের কাজ কিছু শিখান হইত, বিশেষত বই, পেন্সিল, খাতার সাহায্য পাইত, এ জন্য সহজে কেহ আমার বিদ্যালয় ছাড়িয়া যাইতে চাহিত না। আমার বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যাও ক্রমে ক্রমে কমিতে লাগিল, কাহারও বিবাহ হইল, কেহ অন্যত্র চলিয়া গেল, অবশেষে আমার বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী মারা গেলেন, আমার বালিকা বিদ্যালয়ও বন্ধ হইয়া গেল। "ত্রৈলোক্য পাঠাগার"-এরও অকালমৃত্যু ঘটিল। আলমারী [illegible] খালি, বই, সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকাগুলি চুরি হইয়াছে এবং বাজারে [illegible] হিসাবে বিক্রি হইয়াছে। অবশেষে যখন আমি দেখিলাম, কলকাতায় জড়িত হইয়া পড়িয়াছি, আমার গঠনমূলক কাজের জন্য কাহারও নিকট হইতে অর্থ সাহায্য পাইলাম না, তখন আমার গঠনমূলক কাজের স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল।

[ক্রমশঃ]

ছোটবেলায় 'বাল্যশিক্ষায়' পড়েছি "পৌষ, মাঘ এই দুই মাস শীত ঋতু।" কিন্তু বড় হয়ে দেখলাম কোন ঋতুই পাঠ্য-পুস্তকের সে সংজ্ঞা অনুসরণ করে আসা-যাওয়া করে না। মাঘ মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত আসি আসি করেও যখন শীত এল না, তখন নিরাশ গৃহস্থেরা হয়তো ভাবছেন গরম জামাকাপড়গুলি তাঁকে তুলে লেপগুলিকে রোদে দিয়ে এবার সিলিংয়ে লটকানো পাখাগুলি খোলাবেন, এমন সময় হঠাৎ হুড়মুড় করে শীত এল। সে যেমন তেমন শীত নয়, মাঘেরই শীত। এক রাত্রেই হয়তো ফুটপাতে রাতকাটানো গোটা সাতেক মানুষকে জন্মের মত ঘুমিয়ে দিয়ে শীত এল এবং সে শীত রয়ে গেল ফাল্গুনের অনেকদিন পর্যন্ত। ঋতুরাজের সিংহাসন গায়ের জোরেই দখল করে। এমন ঘটনা প্রতি বছরেই যেন স্বাভাবিক হয়ে উঠছে।

কিন্তু এটা কলকাতার চিরকালের রেওয়াজ নয়। এমন একদিন ছিল যেদিন এ শহরে শীত আসত ভদ্রলোকের মত ধীরেসুস্থে। শীতের আগমন প্রথম জানান দিত বাজারদরে। দর নামত আর সেই সঙ্গে সারা বাজারে মাতত বৈচিত্র্য আর তরকারির সবুজ সতেজ রং।

জিনিসের দাম কখনও নামতে পারে এটা যেন আজকাল অতিপ্রাকৃত বলেই মনে হয়।

প্রকৃতির কথাই যদি ওঠে তাহলে বলি সেদিন কলকাতার আকাশ দেখেই বোঝা যেত শীত আসছে। ধোঁয়াশা মুড়ি দেওয়া এই শহরের ক'দিন থেকে শীতের সেই নীল আকাশ একেবারেই যেন লোপাট হয়ে গেছে আজ।

সেদিন শীতের আগমনে মধ্যবিত্ত বাঙালীর গায়ে দেখা যেত বালাপোশ। একটু স্বচ্ছল যারা, তাঁদের গায়ে উঠত শাল দোশালা, সাধারণ গৃহস্থবাবুদের গায়ে হয় ধুতি আর সার্টের উপর কোট অন্যথায় নক্সাকাটা ব্যাপার।

হালআমলের বিচিত্র ছাঁটের, বিচিত্র বর্ণের ও ধরণের শীতের জামা কলকাতার ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে রীতিমত সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। কলকাতার শীতে পথেঘাটে এস্কিমোদের মত চামড়ার জ্যাকেট গায়ে শীর্ণকায় বাঙালী সন্তান হামেশাই দেখা যায়। অনেকদিন বুঝতে চেষ্টা করেছি সত্যিই কলকাতার শীতে ঐ জ্যাকেটগুলো গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়ানর প্রয়োজন অথবা সার্থকতা কোথায়? প্রয়োজন হয় না বুঝি। আর সার্থকতাটা হয়তো একমাত্র নিজেকে একটু অন্য রকম করে প্রকাশের চেষ্টাতেই সীমাবদ্ধ।

এককালে বাঙালী পুরুষের কাছে শীতের একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। মেয়েরা চিরকালই যেমন ইচ্ছা রং-বেরংয়ের জামাকাপড় পরতে পারেন। মধ্যবিত্ত বাঙালী পুরুষের জীবনে রঙীন পোশাক পরার সুযোগ কম। নেহাৎ গেরুয়া অথবা ধূসর রংয়ের পাঞ্জাবী অথবা হাল্কা ডোরাকাটা ছিটের সার্ট এরই মধ্যে তৃপ্ত রাখতে হত বাঙালী পুরুষের পোশাকে রংয়ের তৃষ্ণা। শীতের দিনে বাঙালী পুরুষ সেটা সুদে আসলে মিটিয়ে নিত। নানা রংয়ের কোট থেকে আরম্ভ করে পাঞ্জাবীর রংদার মালিক কাপড় মোটা লিনেন রংয়ের মোটা শালের সবুজ রংয়ের ব্যাপার থেকে আরম্ভ করে নানা রংয়ের শাল পর্যন্ত স্বাধীনতা ও শীতে বহুবর্ণের রং। শীত এলে বাঙালী পুরুষ একটু রং চড়াবার সুযোগ পেত নিজের পোশাকে।

সেই পরিতৃপ্তিটুকুও আজ আর নেই। বাঙালী পুরুষের পোশাকে রং তার আজ ঋতুনির্ভর নেই। যে কল্কা তাঁরা ছাপের কাপড়ে টেবিল ক্লথ কিংবা পর্দা পর্যন্ত একদিন কল্পনা করা যেত, সেই ছিটের বিচিত্র আকৃতির কামিজ প্রায়শঃ বাঙালীর দেহে আজকাল আকছার দেখা যায়। শুধু রং নয়, আশ্চর্য ঢং অক্লেশে গায়ে এঁটে বাঙালী পুরুষকে আজকাল যেমন বিনা সংকোচে রাস্তায়, বাসে, ট্রামে দেখা যায় সেটা তার যথেষ্ট সাহসের পরিচয় বটে। তবে সাহস ছাড়াও আর একটা জিনিস আছে যার নাম রুচি।

বাঙালীর রুচিবোধ কি কমে গেছে? আয়নার সামনে দাঁড়িয়েও কি সে দেখতে পায় না এই বিচিত্র পোশাকে কিম্ভুত-কিমাকার রংয়ে তাকে কি কদর্য্য ও উনের

আমরা সকলেই ভীষণ রকম অসহায়, নিরুপায় হয়ে পড়েছি। নিজের শক্তি, রুচি, সৌন্দর্যবোধ এমন কি মানবিক বোধশক্তির উপরে আমরা আমাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ যেন হারিয়ে ফেলেছি।

সর্বশক্তিমান বাজার আর তার ফড়েরা আমাদের মনের উপর ভূতের মত চেপে বসে আছে। ফ্যাশনের নাম করে যে ছাঁটের জামা, যে রংয়ের পোশাক, যে ধরনের জুতো উৎপাদকেরা বাজারে ছাড়বে অম্লান বিনা দ্বিধায় তাতে মাথা আর পা গলিয়ে তাকে মেনে নেব। শুধু মেনেই নেওয়া তাই নয়, মেনে নিয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে ঘুরে বেড়াব।

একই ধরণের, একই রংয়ের, একই ছাঁটের পোশাকপরা বাঙালী নারী-পুরুষকে পথে দেখলে আজ আমার তাসের দেশের বাসিন্দাদের কথাই মনে পড়ে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই এক হরতন, রুহিতন, ইস্কাপন আর চিড়িতন। বৈচিত্র্য সীমাবদ্ধ শুধু এইখানেই যে, কেউ সাহেব কেউ বিবি। এই নিতান্তই স্থূল প্রাকৃতিক অর্থাৎ ব্যক্তিভেদে কোন পার্থক্যই তাঁর নেই বাঙালীর দেহে কিংবা মনে।

কথায় কথায় বড় বেশি দূরে চলে এলাম। ফিরে আসা যাক কলকাতার সেই শীত প্রসঙ্গে। শীত আসছে। গায়ের চামড়ার টানে, ভোরের ময়দানের কুয়াশায়, পাতাঝরা গাছের ডালে শীতের স্পর্শ বেশ অনুভব করা যায়। একটু রাতের দিকে পথে বেরোলে চোখে পড়ে ফুটপাতের উপর ভাঙা ঝুড়ি আর শুকনো প্যাকিং বাক্সের কাঠে আগুন জ্বালিয়ে বসে হাত সেঁকছে পথেই আশ্রয় যাদের, তারা। রাত আরও একটু গভীর হলে ঐ অগ্নিকুণ্ড ঘিরেই ওরা শুয়ে পড়বে। ঠিক যেমন জঙ্গলে মানুষ রাত কাটায় আগুন জেলে, হিংস্র শ্বাপদের হাত থেকে আত্মরক্ষার আশায়। আশ্চর্য লাগে, তাহলে এই মহানগর আর অরণ্যে তফাৎ কোথায়? তফাৎ কোথায় নাগরিক সভ্যতায় আর আরণ্যক বর্বরতায়?

সেদিনের শীতের কলকাতায়ও অতিথি সমাগম হত। ইংরেজ আমলে কলকাতার ডেপশায়ে আগতের আতিথেয়তা। ঘোড়দৌড়ের জুয়ের খেলা হত ঘোড়দৌড়ের মাঠে। পরিচ্ছন্ন চৌরঙ্গি ঝলমল করত আলোর আর সাহেব মেমে। সেই জমানা চলে গেছে। তাদের প্রয়োজন আমাদের জীবনে ফুরিয়ে গেছে। এ পরিবর্তনকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। এ এক বিরাট পরিবর্তন নিঃসন্দেহে।

যুগের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, সময়ের পরিবর্তনের পথ বেয়ে শীতের কলকাতার আকাশ বদলেছে, রং বদলেছে, মানুষের মন বদলেছে, জীবন বদলেছে সবই সত্যি কিন্তু বদলায় নি একদল যাযাবর পাখির ডানার গতি। সেদিনও তারা আসত, আজও তারা আসে। সাইবেরিয়া থেকে, মানস সরোবর পার হয়ে, হিমালয়ের মাথার উপর দিয়ে শীতের পাখিরা সেদিনের মত, প্রতিবারের মত, এবারও এসেছে। শীতের কলকাতায় ওরা আসে গরমের খোঁজে। পথে আগুন জেলে যে শহরে মানুষ উষ্ণ হতে চায়, সেই পোড়া শহরে কোন্ উষ্ণতার খোঁজ পায় তা ওরাই জানে।

উত্তরবঙ্গের সেই সর্বনাশা দিনগুলির কাহিনী ধীরে ধীরে বিস্মৃতির দিকে এগিয়ে চলেছে। সংবাদপত্রেও আর তেমন কোন চাঞ্চল্য নেই, উত্তরবঙ্গের স্থান সংবাদপত্রের পাতায় সীমাবদ্ধ হয়ে আসছে। কিছুকাল পরে এই বিষয়টি একেবারেই চাপা পড়ে যাবে, এবং এর গুরুত্বও আগের মত তীব্র থাকবে না। কিন্তু সমস্যা যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে, বরং কালক্রমে অবস্থার আরও অবনতি ঘটবে।

মেদিনীপুর ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, বন্যার্ত-দের পুনর্বাসনের কোনই বন্দোবস্ত হয় নি। সর্বস্ব দিয়ে যাদের ভিক্ষাবৃত্তিই একমাত্র সম্বল হয়েছে তাদের আর্থিক পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থাই সরকারের তরফ থেকে করা হয় নি। লংগরখানা খুলে অস্থায়িভাবে কিছু লোককে কিছু-কাল বাঁচিয়ে রাখা চলতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের এমন একটা পর্যায়ের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়, যাতে তাদের মানবিক শক্তির নিছক অপচয় ঘটে। যে মানুষ একটি উন্নতিশীল দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, কৃষক হিসাবেই হোক, শ্রমিক হিসাবেই হোক, যেভাবেই হোক, তাকে নিশ্চিত ভিক্ষাবৃত্তির দিকে ঠেলে দিলে আখেরে দেশের প্রগতিকেই যে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে সরকারের তরফ থেকে এটা বোঝার কোন প্রচেষ্টাই দেখা যাচ্ছে না।

তা না হলে উত্তরবঙ্গের বন্যাক্লিষ্ট-দের আর্থিক পুনর্বাসনের জন্য কি কেন্দ্রীয় সরকার কি রাজ্য সরকার কোন তরফেরই কোন মাথাব্যথার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না কেন? পরিদর্শন-পর্যবেক্ষণ-সমীক্ষার নামে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃত কাজ কিছুই হয় নি। মনে রাখতে হবে জলপাইগুড়ির সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শহরাঞ্চল, যেখানে নানা বৃত্তিধারী বহু ব্যক্তির বাস। যে লোকটির জীবিকার সম্বল একমাত্র দোকানটি নষ্ট হল, তাকে সেই দোকানটি পুনরায় করে দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন-ভাবেই আর্থিক পুনর্বসতি দেওয়া যায় না। এ ছাড়া এমন অনেকে আছেন যাঁদের জীবিকার উপায় কিছুটা ভিন্নধর্মী, যেমন ধরা যাক আইনজীবী। জলপাইগুড়ির যে অবস্থা বর্তমানে হয়েছে, তাতে আর আগামী দশ বছর ওখানে কোন মামলা-মোকদ্দমার উপায় নেই, এ ছাড়া বন্যায় পুরাতন মামলাসমূহের অনেক কাগজপত্র নষ্ট হয়ে গেছে। এঁদের জীবিকার উপায় কি হবে। সঙ্গীতশিল্পীদের কথাই ধরা যাক না কেন, যাঁরা গানবাজনা শিখিয়ে গ্রাসাচ্ছাদন করেন, কিন্তু এই দুর্বিপাকের পর গানবাজনার শখ মিটিয়ে উঠতে সে মনের অবস্থা কারোরই নেই, কাজেই এঁদের পেট কিভাবে চলবে। শহরটাকে যদি নতুন করে গড়ে তোলা যায় তাতে হয়ত অনেক নতুন প্যাটার্নের বাড়ি উঠবে, কিন্তু দেখা যাবে হয়ত সেখানে প্রকৃত বন্যাক্লিষ্টদের কোন স্থানই হল না। যেমন

ঘটেছে কলকাতায়, বস্তিবাসীদের জন্য যে ক'টি ফ্ল্যাটবাড়ি এ পর্যন্ত সরকারী উদ্যোগে করা হয়েছে, বহুক্ষেত্রেই সেখানে প্রকৃত বস্তিবাসীরা বাস করার সুযোগ পায় নি, মোটা পয়সার মালিক অনেক অবাঙালী প্রশাসনিক দুর্নীতিতে অর্থের ইন্ধন জুগিয়ে অল্প ভাড়ায় অতিনিম্ন আয়ের মানুষের জন্য বরাদ্দ ফ্ল্যাট জোগদখল করছে। কাজেই এ সম্ভাবনাও প্রচুর আছে যে পুনর্গঠিত জলপাইগুড়িতে খোদ জলপাইগুড়িবাসীদেরই স্থান হবে না।

দুঃখের বিষয়, জলপাইগুড়ি নিয়ে রাজ্যপাল থেকে শুরু করে বড় বড় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিবর্গ পর্যন্ত যতটা চোখের জল ফেলেছেন, কাজের বেলায় কিন্তু কাউকেই পাওয়া যাচ্ছে না। জলপাইগুড়ি পুনর্গঠনের কোন পরিকল্পনা এ পর্যন্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নি। যা প্রকাশিত হয়েছে তার নির্গলিতার্থ হল যে জলপাইগুড়িতে কত ব্যয় করা হবে তা নিয়ে দর কষাকষি চলছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে মোটেই উপুড় হস্ত হতে রাজী নন। তবে 'দিও গো কিঞ্চিৎ না কর বঞ্চিত' এই নীতি অবলম্বন করে তাঁরা এ পর্যন্ত চলেছেন। প্রকৃত কত টাকা ব্যয় করা হবে, কিভাবে তা খরচ হবে, ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোন্ নীতি অনুসৃত হবে এ বিষয়ে কিছুই এ পর্যন্ত জানা যায় নি, যদিও সংবাদপত্রে এখনো জলপাইগুড়ির প্রসঙ্গ কিছু কিছু থাকে।

তাই আমরা বলছি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যুগ্ম উদ্যোগে এই মুহূর্তে জলপাইগুড়ির জন্য অনুষ্ঠিতব্য পুনর্বাসন-পরিকল্পনা প্রকাশ করা উচিত যা পড়ে লোকে জানতে পারে জলপাইগুড়িতে কি কি করা হবে। আমাদের মতে পুনর্বাসনের একটিই ক্রাইটেরিয়ন বা মানদণ্ড থাকা উচিত। বন্যার পূর্বে যে যে পেশায় লিপ্ত ছিল তাকে সেই পেশায় পুনর্বসতি দিতে হবে। অর্থাৎ যার কাপড়ের দোকান ছিল তাকে আবার সেই দোকানই করে দিতে হবে। যার ক্ষতি হয়েছে আংশিক তাকে কিছু অর্থসাহায্য করতে হবে, যাতে তার ক্ষতিটার একটা উল্লেখযোগ্য অংশের পূরণ ঘটে। এ ছাড়া পৃথকভাবে প্রত্যেককে বাড়ি করার মত টাকা দিতে হবে। কিন্তু সকল প্রকার সাহায্যই যেন বাস্তবতাসম্মত ও গ্রহীতার পক্ষে নির্ঝঞ্ঝাট হয়। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সময় যে দিন আমরা দেখেছি তার যেন পুনরাবৃত্তি না হয়। গৃহ নির্মাণ বা ব্যবসার নামে হাজার টাকার লোন পাইয়ে দেব কিন্তু দশ টাকা আগাম দিতে হবে—এ তো ছিল বিগত উদ্বাস্তু পুনর্বাসন পরিকল্পনা। ওই দুশো টাকা দালালকে বা অফিসারকে খাইয়ে যে আটশো টাকা রইল তাতে না হয় বাড়ি, না করা যায় ব্যবসা, তা ছাড়া পেটেরও চাহিদা আছে। ফলে ওই আটশো টাকা অল্প দিনেই ফুরিয়ে গেল, ঘাড়ে চাপল হাজার টাকার সরকারী ঋণের দায়, তার পরে হতে হল ফেরার এবং শেষ পর্যন্ত সম্বল হল ফুটপাত। এই কদর্যতার পুনরাবৃত্তি জলপাইগুড়িতে দেখতে প্রবৃত্তি হয় না, যদিও আমাদের সরকারের যা ব্যবস্থাপনা তাতে হয়ত পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের সেই কলঙ্কময় অধ্যায়েরই পুনরাবৃত্তি হবার সম্ভাবনা।

অবশ্য এখনো পর্যন্ত গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেলের অবস্থা, কেন না, না কেন্দ্রীয় সরকার, না পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কারোরই পকেটে কোন বাস্তব পরিকল্পনা নেই, এবং অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে এটা উপলব্ধি করতে বাধ্য হচ্ছি যে, ঘটনার দেড় মাস পরেও যদি সমস্ত বিষয়টা আজও পরিদর্শন ও সমীক্ষার স্তরে আটকে থাকে, তা হলে একটা সিদ্ধান্তই অনিবার্য হয়ে ওঠে যে, জলপাইগুড়ির বিষয়ে কোন তরফেরই কোন সদিচ্ছা নেই। আশঙ্কা হয় মেদিনীপুর, বা হুগলী-বর্ধমান-হাওড়ার বন্যাক্রান্ত অঞ্চলসমূহের জন্য যেটুকু করা হয়েছে, অর্থাৎ মাস দুয়েকের জন্য লঙ্গরখানা ও ত্রিপল, তার চাইতে বেশি কিছু বোধ হয় জলপাইগুড়ির ক্ষেত্রে ঘটবে না।

কলকাতায় ম্যাকনামারা

দমদম বিমান ঘাঁটিতে বিক্ষোভ, পুলিশের লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস, কলেজ স্ট্রীট ছাত্র-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধ, ট্রাম দহন, ও বিশ্ববিদ্যালয় কম্পাউণ্ডের মধ্যে বিনা আহ্বানে পুলিশের প্রবেশ ও হামলা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট ম্যাকনামারা সাহেব কলকাতা শহরে প্রবেশ করলেন। অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে প্রদর্শিত বিক্ষোভের আঁচড় ম্যাকনামারা সাহেবের গায়ে লাগে নি। দমদম বিমান ঘাঁটি থেকে সোজা হেলিকপ্টারযোগে তিনি ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে অবতরণ করেছেন, এবং সেখান থেকে চকচকে হাঙ্গামাহীন রাজপথ ধরে সোজা রাজভবনে। ঠিকমত স্মরণ করতে পারছি না, তবে মনে হয় যে, দমদম থেকে কলকাতায় হেলিকপ্টারযোগে আগমন কোন ভি-আই-পির পক্ষে এই প্রথম। অর্থাৎ কর্তাব্যক্তিরা আগে থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, কলকাতায় ম্যাকনামারা-বিরোধী প্রচণ্ড বিক্ষোভ ঘটবে এবং কার্যতও তাই ঘটেছে।

কিন্তু ম্যাকনামারা-বিরোধী এই বিক্ষোভের কারণ কি? এবং এও লক্ষ্য করার মত কথা যে, এই বিক্ষোভের মাত্রাটা ছাত্রদের ক্ষেত্রেই বেশি। ভিয়েৎনামের যুদ্ধ বাধানোর জন্য যারা বিশেষভাবে দায়ী তাদের মধ্যে এই ম্যাকনামারা অন্যতম। স্বাধীনতাকামী একটি জাতির উপর যারা অন্যায়ভাবে এই যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে বিশ্ব জনমত স্বাভাবিকভাবেই তাদের বিরোধী। বিশেষ করে আদর্শবাদী তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ভিয়েৎনামে মার্কিন ভূমিকা অত্যন্ত অপ্রিয় এবং ভিয়েৎনামে মার্কিনী বর্বরতার প্রতীক তাদের চোখে এই ম্যাকনামারা। এই কারণেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের একটা বড় অংশ উপাচার্য মহাশয়কে অনুরোধ করেছিল যে, তিনি যেন ম্যাকনামারার সম্মানে প্রদত্ত ভোজসভায় অংশ গ্রহণ না করেন। এবং এই বিষয়ে উপাচার্যের কাছ থেকে কোন সুস্পষ্ট জবাব না পেয়ে তারা তাঁকে ঘেরাও করে রাখে এবং এই বিষয়ে সুস্পষ্ট জবাব দাবি করে। ইতিমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে পুলিশ ঢোকে এবং আকস্মিক পুলিশী আক্রমণে সমগ্র এলাকাতেই প্রলয়কাণ্ড শুরু হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীরাও পুলিশী প্রহারের হাত থেকে রেহাই পান নি, পক্ষান্তরে ছাত্ররাও নিশ্চেষ্ট থাকে নি। ইষ্টকবর্ষণ যথারীতি হয়েছে এবং তিনটি ট্রাম পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

এবার ম্যাকনামারা প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। তিনি এসেছেন বিশ্ব ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট হিসাবে এবং তাঁর আগমনের প্রধান কারণ হল কলকাতা উন্নয়নের ব্যাপার। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কলকাতা শহরের বর্তমান অবস্থা বিশ্বে অনেক জায়গাতেই উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে, যদিও নয়াদিল্লীর এই ব্যাপারে কোন মাথাব্যথা নেই। কলকাতা রইল কি গেল তাতে দিল্লীর বোধ হয় কিছু আসে যায় না, এবং কলকাতার অর্থনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক গুরুত্ব সম্বন্ধে দিল্লীর কর্তারা উদাসীন। ফোর্ড ফাউণ্ডেশন কলকাতা উন্নয়নের ব্যাপারে কিছু অর্থ সাহায্য করতে রাজী ছিল, এবং সেই উদ্দেশ্যে কলকাতায় সি-এম-পি-ও নামক একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়েছিল, তা আজও আছে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন কাজের কাজই ওই প্রতিষ্ঠান করে নি তার কারণ অর্থাভাব। কলকাতা উন্নয়ন ব্যাপারে বিশ্ব ব্যাঙ্কের কাছ থেকে টাকা চাওয়া হয়েছে এবং সেই উদ্দেশ্যে সরেজমিনে তদন্ত করার জন্যই ম্যাকনামারার এখানে আগমন।

ম্যাকনামারার সঙ্গে সরকারী অফিসারদের বৈঠক হয়েছে, কোন নির্বাচিত মন্ত্রিসভা না থাকাতে রাইটার্স বিল্ডিংসের

'কর্মকর্তারাই' সেখানে ছিলেন। সরকারী এলাকার বাইরে কলকাতার মেয়র ওই বৈঠকে হাজির ছিলেন। তাঁদের বক্তব্য-সমূহকে ম্যাকনামারা সাহেব বাস্তবতা-সম্মত ও তথ্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাঁরা কি কি তথ্য দিয়েছিলেন সেটা সংবাদপত্র মারফত জানা যায় নি। সি-এম-পি-ওর প্রাক্তন অধিকর্তা ম্যাকনামারার সঙ্গে পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বলেছেন যে, কলকাতা পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বস্তি-উন্নয়ন প্রকল্পকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, এবং এই কাজে কোন বৈদেশিক মুদ্রা লাগবে না, এবং মোট যে ব্যয় হবে তা আনুমানিক প্রতিটি বস্তিবাসীর মাথাপিছু একশো টাকা। অর্থাৎ ব্যয়ের বহরটা এ ক্ষেত্রে খুব বিরাট নয়। ম্যাকনামারা সাহেবকে কি রকম রিপ্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়েছে সেটা বাইরে থেকে বোঝা সম্ভবপর নয়। আমাদের এখন থেকেই বিগলিত হবার কোন কারণ নেই। স্বস্থানে গিয়ে তিনি কি বলবেন তারই উপর প্রত্যাশিত অর্থের পরিমাণ নির্ধারিত হবে। এবং বিশ্ব ব্যাংকের প্রদত্ত অর্থ কি রকম সর্ত-কণ্টকিত হবে সেটাও একটা আশঙ্কার বিষয়।

সি-এম-পি-ও প্রস্তাবিত মাস্টার প্ল্যানকে ম্যাকনামারা সাহেব খুব ভাল সার্টিফিকেট দিয়েছেন। আশী কোটি টাকার এই প্রকল্পের কতটা বিশ্ব ব্যাংক যোগাবে সেটার অবশ্য কোন আভাসই পাওয়া যায় নি। তবে নয়াদিল্লীর এ ব্যাপারে কোন মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। ম্যাকনামারা সাহেব তাঁর সফরের দ্বিতীয় দিনে ঝটিকাবেগে সমগ্র কলকাতা পরিভ্রমণ করেছেন, বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করেছেন, বেসরকারী ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রীঘনশ্যামদাস বিড়লার সঙ্গেও তাঁর কথা-বার্তা হয়েছে। ম্যাকনামারার অবস্থানের দ্বিতীয় দিনেও কলকাতায় ম্যাকনামারা-বিরোধী বিক্ষোভ চূড়ান্তভাবে হয়েছে, দ্বিতীয় দিনেও কয়েকটি বাস পুড়েছে। পুলিশের সঙ্গে জনতার, বিশেষ করে ছাত্রদের, সংঘর্ষ হয়েছে একাধিকবার। ম্যাকনামারার দিল্লী প্রত্যাবর্তনের সময় জানানো হয় নি, তৃতীয় দিনে কোন এক সময়ে হেলিকপ্টারযোগে তিনি দমদম বিমান ঘাঁটিতে পৌঁছেছেন এবং সেখান থেকে পাড়ি দিয়েছেন যথাস্থানে।

বঞ্চিত পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরূপ মনোভাবের কথা কারোরই অজানা নেই। খণ্ডিত, জনভারে বিপর্যস্ত সমস্যা-সংকুল এই রাজ্যটির স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান ভারতের যে কোন রাজ্যের চেয়ে প্রচুর বেশি হওয়া সত্ত্বেও এই রাজ্যটির প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরূপ মনোভাবের কোন পরিবর্তন গত বাইশ বছরে দেখা যায় নি। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ও চীফ সেক্রেটারী স্পষ্ট ভাষাতেই পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতাসুলভ মনোভাবের কথার উল্লেখ করেছেন। দিল্লী থেকে প্রত্যাগত রাজ্যপাল সম্প্রতি বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় কর এবং অন্যান্য রাজস্ব হতে পশ্চিমবঙ্গকে যে পরিমাণ অর্থ দেবার সুপারিশ পঞ্চম অর্থ কমিশন করেছেন তাতে এই রাজ্যের কোন সমস্যারই সুরাহা হবে না। পশ্চিমবঙ্গের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে ২৪ কোটি টাকার মত, ফিনান্স কমিশনের সুপারিশের দরুণ বারো কোটি টাকার মত পাওয়া যাবে এবং আরও বারো কোটি টাকার ঘাটতি থেকেই যাবে। চীফ সেক্রেটারীর মতে পঞ্চম অর্থ কমিশনের সুপারিশ "নিতান্তই হতাশাব্যঞ্জক এবং আগাগোড়াই অসঙ্গত।" প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এ পর্যন্ত যতগুলি অর্থ কমিশন গঠিত হয়েছে কোনটিই পশ্চিমবঙ্গের প্রতি সুবিচার করে নি। এবারে বিশেষ গ্রান্ট হিসাবে কিছু মঞ্জুর করা হয়েছে তবে গত কয়েক বছর যাবৎ এই ব্যাপারে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে এই রাজ্যকে বঞ্চিত করা হয়েছে। উত্তরাধিকার কর এবং রেল-যাত্রীদের ভাড়ার উপর দেয় গ্রান্ট অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। চীফ সেক্রেটারী বলেছেন যে, পঞ্চম অর্থ কমিশনের সুপারিশের ফলে যে অর্থ বরাদ্দ হবে তা প্রশাসনিক ব্যয়েই গ্রাস করে নেবে, উন্নয়নমূলক কোন কার্যই করা যাবে না। তদুপরি পশ্চিমবঙ্গে নতুন কর বসাবার আর কোন স্থান নেই।

একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, অর্থ বণ্টনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি এই ঔদাসীন্য স্বেচ্ছাকৃত। খোলাখুলি বললে বড় স্থূল শোনায়ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীরা তথা উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাদেশিক মনোভাব নিয়ে কাজ করেন। নতুবা বঞ্চনার এই ট্রাডিশানের আর কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে আয়কর মারফত কেন্দ্রীয় সরকার যা উপার্জন করেন তার অতি সামান্য ভগ্নাংশই পশ্চিমবঙ্গের বরাতে জোটে। কেন্দ্রীয় সরকার বৈদেশিক মুদ্রার সর্বাধিক অংশ পশ্চিমবঙ্গের পণ্য থেকেই অর্জন করেন। অথচ তার বিনিময়ে পশ্চিমবঙ্গের বরাতে কি জোটে? পশ্চিমবঙ্গের শোচনীয় বেকার সমস্যা কেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। পশ্চিমবঙ্গের সন্তানের চাকরী পশ্চিমবঙ্গে জোটে না। অথচ রাজস্থানের বেকার সমস্যার সমাধান পশ্চিমবঙ্গে হয়। যদি একটি শ্রমিকের পদের জন্য মধ্য-প্রদেশ, কেরানীর পদের জন্য মাদ্রাজ থেকে লোক আনা হয় পশ্চিমবঙ্গের সন্তানদের বঞ্চিত করে তাহলে একে কি প্রাদেশিক দৃষ্টিভঙ্গী বলা যাবে না? কেন্দ্রীয় সরকারের যা শিল্প প্রতিষ্ঠান-সমূহের অফিসগুলি যখন পশ্চিমবঙ্গ থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এর মূলে কি কোন প্রাদেশিক মনোভাব কাজ করছে না? কথাটা দুঃখের হলেও মিথ্যা নয়, অবাঙালী পরিচালিত যে সব প্রতিষ্ঠানে এখনো পর্যন্ত কিছু সংখ্যক পশ্চিমবঙ্গবাসী কাজ করছে, কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সেই প্রতিষ্ঠানগুলি গুটিয়ে ফেলে নাম বদল করে নতুন প্রতিষ্ঠান খোলা হচ্ছে, পূর্বেকার

জলপাইগুড়ি জেলার দোমহনীর প্রেমগঞ্জ এলাকায় সাপ্তাহিক বসুমতী উত্তর-বঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির পক্ষ থেকে বন্যার্তদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

কর্মচারীদের বাতিল করে দিয়ে দেশোয়ালী ভাইদের দিয়ে পদগুলি নতুন করে পূর্ণ করা হচ্ছে।

কাজেই এই রকম পরিস্থিতিতে যদি পশ্চিমবঙ্গে ডি-এম-কের মত কোন দলের অভ্যুত্থান হয় তাহলে তাতে আশ্চর্য হবার কোন কারণ আছে কি? বস্তুত সেই লক্ষণ ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে দেখা দিয়েছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী, সংকীর্ণতাবাদী ইত্যাদি আখ্যা দিলে এদের প্রতি সুবিচার করা হবে না। মনে রাখতে হবে জাতীয় চেতনা ও শ্রেণী চেতনার চেয়ে ধর্মীয় চেতনা ও প্রাদেশিক চেতনার শক্তি অনেক বেশি এবং তা অনেক প্রত্যক্ষ। এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিই তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গবাসীর আর যাই অপবাদ থাক প্রাদেশিকতার অপবাদ তাদের দেওয়া যায় নি। কিন্তু যদি চোখের উপর দেখা যায় যে, প্রত্যেকেই জাতীয় চেতনার চেয়ে প্রাদেশিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা বিশেষভাবে চালিত হচ্ছে, কি পশ্চিমবঙ্গবাসী শিল্পপতি কি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তাব্যক্তি, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে ডি-এম-কে গড়ে উঠবেই। তা গড়ে ওঠা যদি অনভিপ্রেত হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অবিচারমূলক কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া থেকে বিরত হওয়াই সংগত। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের একচক্ষু হরিণের নীতি জাতীয় সংহতির পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়।

নদীয়া সি-এম-ও-এইচ অফিসের জনৈক করণিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নদীয়া জেলার চীফ মেডিক্যাল অফিসার অফ হেলথ (সি-এম-ও-এইচ) এর অফিসে কর্মরত জনৈক করণিকের বিরুদ্ধে কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ জনসাধারণের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। নদীয়া জেলার সি-এম-ও-এইচ অফিসের পদস্থ এক ব্যক্তির সহযোগিতা ও প্রশ্রয়ে এই করণিক ভদ্রলোকটি নদীয়ার স্বাস্থ্য বিভাগকে একটি দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করেছেন।

প্রারম্ভে এই করণিক ভদ্রলোকের কিছু পূর্ব পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। ইনি পূর্বে স্বাস্থ্য অধিকারের নার্সিং বিভাগে নাকি আট-নয় বছর ধরে কাজ করেছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁকে ঘুষ নেওয়া ও নার্সের চাকরী দেবার অছিলায় দুঃস্থ ও সহায়-সম্বলহীন মেয়েদের সংগে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করার অপরাধে নাকি বদলী করেন। চব্বিশ পরগনা জেলার স্বাস্থ্য বিভাগে কর্মরত থাকাকালীন এই ভদ্রলোক নাকি নিজের সার্ভিস বুক কায়দা করে নষ্ট করান। এই সার্ভিস বুকে চব্বিশ পরগনার তদানীন্তন সি-এম-ও-এইচ নাকি তাঁর বিরুদ্ধে অনেকগুলি গুরুতর অভিযোগ করেছিলেন এবং যে জন্য তাঁকে জলপাই-গুড়িতে বদলী করা হয়। জলপাই-গুড়িতেই ইনি নদীয়ার উপরোক্ত পদস্থ ব্যক্তির (এই পদস্থ ব্যক্তি তখন জলপাই-গুড়িতে কর্মরত ছিলেন) সংগে পরিচিত হন এবং তাঁকে প্রভাবিত করে ওখানে তিনি নতুন করে নিজের সার্ভিস বুক খোলান। অতঃপর জলপাইগুড়ি থেকে তিনি বর্ধমানে, বর্ধমান থেকে হুগলীতে এবং শেষ পর্যন্ত হুগলী থেকে নদীয়ায় এসেছেন এবং আপতত কৃষ্ণনগরে নদীয়া জেলার স্বাস্থ্য বিভাগে বীর বিক্রমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

এইবার তাঁর কয়েকটি কর্মের নমুনা দিচ্ছি। স্বরূপগঞ্জের (টি বি ক্লিনিক) জনৈক শ্রীসেনের নিকট থেকে তিনি নাকি অবৈধভাবে পঞ্চাশ টাকা নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েন। পরে অবশ্য সহকর্মীদের হাতেপায়ে ধরে সে যাত্রা রেহাই পান। এ ত ছোট ঘটনা, কিন্তু এই করণিক ভদ্রলোকটি আসলে বৃহৎ বস্তুর কারবারী। বিভিন্ন হেলথ সেন্টারের কর্মীদের বদলী, ছুটি ইত্যাদির জন্য ইনি তদ্বির করেন এবং মধ্যস্থ ব্যক্তি হিসেবে এঁদের কাছ থেকে কমিশন আদায় করেন। রাইটার্স বিল্ডিংসে এঁর নাকি অনেক হাত আছে এবং অফিস কামাই করে ইনি নাকি প্রায় রোজই কলকাতায় আসেন। 'হাজিরা খাতায়' শুধু 'ক্যালকাটা' লিখে রাখেন। হাজিরা খাতাটি দেখলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

জনৈক ডাঃ সাহা বার বার মিথ্যা টি-এ বিল করার অপরাধে নাকি ধরা পড়েন এবং এই জন্য নদীয়ার সি-এম-ও-এইচ তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করেন, (মেমো নং এইচ-সি-ই-২।৮৪৩, তাং কৃষ্ণনগর, ৩১।১।৬৮ দ্রষ্টব্য।) কিন্তু আমাদের আলোচ্য করণিক মহাশয় নাকি তাঁর কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাঁর কাগজপত্র 'হাস-আপ' করে দেন।

জি-ডি-এ বা চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী-দের নিয়োগের জন্য একটি প্যানেল (তালিকা) আছে। জনৈক মহিলাকে চাকরী দেওয়া হয় নিয়ম ভঙ্গ করে। প্যানেলে মহিলার নামের ক্রমিক সংখ্যা ছিল ২৯। ক্রমিক সংখ্যা ৯ থেকে ২৮ বাদ দিয়ে মহিলাকে নিয়োগ করা হয়েছে। শোনা যায়, এই নিয়ম-বহির্ভূত কাজের জন্য দেড় শত টাকার লেন-দেন হয়েছে।

এর পর শুনুন অপর একজন করণিকের প্রতি তাঁর (সি-এম-ও-এইচ অফিসের করণিকের) কৃপার কথা। এই ভদ্রলোক নাকাশিপাড়া হেলথ সেন্টারে ছিলেন। তাঁকে বদলী করা হয় করিমপুরে একটি গুরুতর অপরাধের ভিত্তিতে, যা তাঁর বিরুদ্ধে এনেছিলেন একস্টেনসন অফিসার। (পঞ্চায়েত নাকাশিপাড়া, ২নং স্টেজ, ডেভালাপমেন্ট ব্লক ৩০।১২।৬৭ তারিখের ৬৬৯৯নং আদেশনামা দ্রষ্টব্য)। উক্ত করণিক একটি রাজনৈতিক দলের সংগে যুক্ত এবং পনের বছর ধরে নাকাশিপাড়াতে আছেন। উপরি তিনি এক কো-অপারেটিভের চেয়ারম্যান এবং সেজন্য মাসে নাকি ১০০ টাকা করে পান, সরকারী কর্মচারী হিসেবে যা নেওয়া বে-আইনী ও দণ্ড-যোগ্য ব্যাপার। এ ছাড়া তিনি নাকি ত্রিশ মণ ধানের বীজ বে-আইনীভাবে পাচার করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েন। উক্ত করণিক নিজ বদলীর আদেশ রদ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিন্তু তদা-নীন্তন সি-এম-ও-এইচ-এর দৃঢ়তায় তা সম্ভব হয় না। ইতিমধ্যে সি-এম-ও-এইচ অফিসের করণিক মহোদয়ের সংগে নাকাশিপাড়ার এই করণিক ভদ্রলোকের যোগাযোগ হয়ে যায় এবং নতুন সি-এম-ও-এইচ কাজে যোগদান করার পর (তাঁর কাছে সব ব্যাপারটা গোপন রাখা হয়) তাঁর পুরনো বদলীর আদেশ নাকচ করে নাকাশিপাড়ার কাছাকাছি কালীগঞ্জ হেলথ সেন্টারে বদলী করা হয় (৯।১০।৬৮ তারিখের ৭০৭৭(৪)নং অর্ডার দ্রষ্টব্য)। এর ফলে আর করণিক ভদ্রলোকের কোন অসুবিধা রইল না, কো-অপারেটিভের চেয়ারম্যান হিসেবেও তিনি কাজ করতে পারবেন।

আমাদের আলোচ্য করণিক মহাশয়ের (সি-এম-ও-এইচ) হাতে সর্বাপেক্ষা লোভনীয় অফিসের ফাইলটি অর্থাৎ রোগীদের পথ্য সরবরাহ সংক্রান্ত ফাইলটি আছে। বলা বাহুল্য তাঁর পারিবারিক খাদ্যবস্তুও এ ফাইল তত্ত্বাবধানের কল্যাণে বিনা পয়সায় জুটে যায়। রোগীদের পথ্য (ডায়েট কন্ট্রাক্টার) সরবরাহকারীদের কাছ থেকেও মোটা সেলামী তিনি আদায় করেন। জেলার সরকারী হাসপাতাল-গুলির জন্য যে দরে পথ্যসমূহ কেনা হয় তা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য তপ-শীলের নির্দিষ্ট দরের চেয়ে নাকি বেশি। এ সব অভিযোগের প্রমাণ সি-এম-ও-এইচ অফিসের নথিপত্র (রেকর্ডস্) ও ইন্সপেক্টার অফ একাউন্টস-এর কাগজপত্র পরীক্ষা করলেই পাওয়া যাবে। সি-এম-ও-এইচ. অফিসের উপরোক্ত করণিক সম্পর্কে আরো বহু চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আমাদের হাতে আছে—প্রয়োজনে বারান্তরে সেগুলো প্রকাশ করা হবে।

বিভীষিকার রাজত্বে

মহাপ্রলয়ের পর উত্তরবঙ্গ আবার আমলাদের গহ্বরে গিয়ে পড়েছে ; লক্ষ লক্ষ মানুষের সর্বনাশ করেও এঁদের আশ মেটেনি ; আবার তাঁরা মানুষকে দুর্গতির পথে ঠেলে দিতে বোধ হয় উঠে পড়ে লেগেছেন। তা না হলে প্রলয়ের দেড় মাস পরেও উত্তরবঙ্গে এখনও বিভীষিকার রাজত্ব কেন? গত ৪ঠা অক্টোবর ধস ঢল নেমেছিল, আজ ২০শে নভেম্বর এখনও রিলিফের কাজ সুষ্ঠুভাবে হল না কেন? শীত এসে গেছে ; অসহায় পরিবারগুলির পুনর্বাসন তো দূরের কথা তাদের গায়ে একটা গরম জামা বা কম্বলও কি আমলারা এই দেড় মাসের মধ্যে তুলে দিতে পারতেন না? পাহাড়ী গ্রামগুলোর সঙ্গে যোগাযোগের জন্য টেস্ট রিলিফ দিয়ে এতদিনে কি রাস্তা বানানো যেতো না? এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে চেষ্টা করলে সব জায়গায় পানীয় জলের বা আলোর ব্যবস্থা করা কি হতো না? পুনর্বাসনের উদ্দেশে বিকল্প বসতি স্থাপনের জন্য অন্তত জমি নেওয়ার কাজটাও কি শুরু করা যেতো না? রিলিফের ভাণ্ডার নিয়ে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসছেন। সরকারী কর্তারা তাঁদের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন কি করতে পারতেন না? আমলারা কি খবর পান নি যে একই জায়গায় লোক বারবার রিলিফ পাচ্ছে, আবার অন্য জায়গায় একেবারেই সাহায্য গিয়ে পৌঁছচ্ছে না? ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে সামান্য ঋণ চেয়েছিলেন ; সে ঋণের টাকা তাঁরা এখনও পর্যন্ত পাচ্ছেন না কেন? যে সব চাষীদের আমন ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছে তাদের রবিশস্য, শাক-সব্জি, গম ও বোরো ধানের চাষ করার জন্য প্রয়োজনীয় সার, বীজ ও কৃষিঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা এতদিনে যদি করা হতো তাহলে চাষীরা কি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারতো না? বানের জলে সব দলিলপত্র ভেসে যাওয়ায় কৃষিঋণ বা অন্য যে কোন ঋণের ব্যাপারে জমির মালিকানা নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে তার সমাধান একমাত্র ভূমিরাজস্ব দপ্তরই করতে পারেন। তারা এ ব্যাপারে কি এক পাও এগিয়েছেন? বন্যার্তদের বাসগৃহ নির্মাণের জন্যে ৫০ থেকে ২০০ টাকার ব্যবস্থা হয়েছে, এ টাকায় বাড়ি তৈরি হয় কি হয় না সে সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্যে আমলারা সরকারী টাকায় একবার বিলেত ঘুরে আসুন, না হয় আমাদের দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদেরই জিজ্ঞাসা করে দেখুন না? উত্তরবঙ্গের পাহাড়ী অঞ্চলে তো গাছপালার অভাব নেই, বন বিভাগের কর্তারা কি পারতেন না সেই সব গাছ কাটিয়ে বিনামূল্যে ঘর তৈরির জন্য বন্যার্তদের সরবরাহ করতে। এখন তো আর কোন মন্ত্রীদের রাজত্ব নয় যে কথায় কথায় হস্তক্ষেপের অভিযোগ উঠবে। তাহলে অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের ব্যাপারে বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের মধ্যে আজও কোন সমন্বয় গড়ে উঠলো না কেন? ৩১ হাজার স্কুলের ছাত্র ছাত্রী ও পাঁচ হাজার কলেজের ছাত্র ছাত্রী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে শিক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারী ডঃ ভবতোষ দত্ত হিসেব করেছেন। এ হিসেব ঠিক কি বেঠিক তা নিয়ে আমি এখন তর্ক করবো না, শুধু জিজ্ঞাসা করবো ডঃ দত্তের হিসেব অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্র ছাত্রীদের কি সাহায্য বা কতটুকু সাহায্য এ যাবৎ সরকারী দপ্তর থেকে দেওয়া হয়েছে? ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্র ছাত্রীদের এককালীন অর্থ সাহায্য দেওয়ার যে ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল তারই বা কতদূর কি হল? মাথার উপর সব ছাত্রদেরই এখন পরীক্ষা ; পরীক্ষা দিতে হবে না বললে সমস্যার সমাধান হয় না। সব ছাত্ররা যাতে পরীক্ষার পড়া করতে ও পরীক্ষা দিতে সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা শিক্ষা দপ্তর থেকে কি কিছু করা হয়েছে? বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কারুশিল্পী সম্প্রদায় ও আদিবাসীদের জন্য ৪০ হাজার টাকা অনুদান মঞ্জুর হয়েছে বলে শুনেছিলাম ; তার কটা পয়সা ঐ সব দুঃস্থদের হাতে গিয়ে পৌঁছচ্ছে বা আদৌ পৌঁচচ্ছে কি না তার হিসেব-নিকেষ কে করবে? ভূমিধসে নিরাশ্রয় দার্জিলিংয়ের তিস্তাবাজার অঞ্চলের অধিবাসীদের দুর্দশা দেখে রাজ্যপাল কেঁদে ফেলেছিলেন মাসখানেক আগে ; রাজ্যপালের আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও মাসখানেক পরে সেখানকার অধিবাসীদের দুর্দশার কোন প্রতিকার হয়েছে কি না রাজ্যপাল একবার খবর নিয়ে দেখছেন কি? ধস ও বন্যার ফলে পরিষদের যে সব রাস্তা ভেঙে চুরে ধসে গিয়েছে

সেগুলি দ্রুত মেরামতের জন্য রাজ্যপালের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কতটুকু কাজ এগিয়েছে তার খবর কি সরকারী পূর্ত দপ্তরে আছে? জীপ বা খচ্চর চলা যে সব রাস্তা বিধ্বস্ত হয়েছে তার একটিও কি মেরামত হয়েছে?

ডুয়ার্স এলাকায় উদ্বাস্তুদের চেষ্টায় একটি বিরাট জনপদ গড়ে উঠেছিল, সে জনপদ যে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেছে পুনর্বাসন দপ্তর নিশ্চয়ই তা জানেন; দেড় মাস হয়ে গেল সেই জনপদ আবার গড়ে তোলার জন্য পুনর্বাসন দপ্তর কিছু করেছেন কি? দার্জিলিঙের পাহাড়িয়া জায়গায় ধসে ক্ষতিগ্রস্ত লোকেদের পুনর্বাসনের জন্য এখনও জমি সংগ্রহ করা হল না কেন? কাঠামবাড়ির সাড়ে তেরো হাজার লোকের পুনর্বাসনের বা কি হল? পশ্চিম দিনাজপুরে মহামারী দেখা দিয়েছে বলে স্বাস্থ্য দপ্তরে বহু আগেই খবর গিয়ে পৌঁছেছে; তা সত্ত্বেও সেখানে নলকূপ বসানোর ব্যাপারে কেন অবজ্ঞা দেখানো হচ্ছে? যেখানে বিদ্যুতের আলো নেই সেখানে কেরোসিন সরবরাহের কোন ব্যবস্থা সরকার এখনও পর্যন্ত করেছেন কি?

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক বন্যায় কতগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার কোন সামগ্রিক হিসাব রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এখনও জানানো হয় নি; এর কারণ কি? কতগুলি প্রাথমিক স্কুলের বাড়ি, কত সংখ্যক শিক্ষক ও ছাত্র এই দুর্বিপাকে পড়েছেন তার হিসেবই এখনও সরকারী কর্তারা করতে পারলেন না, তাঁরা তাঁদের ত্রাণের কাজ কি ভাবে করবেন?

কর্চবিহারে বন্যাদুর্গতদের জন্যে জি আর হিসেবে দু' কে-জি করে গম দেওয়ার কথা, কিন্তু অনেক জায়গায় এক কে-জি গম দেওয়া হচ্ছে কেন?

রাজ্যপাল নিজেই বলেছেন বিভিন্ন দপ্তরের কর্তাদের মধ্যে রেষারেষির ফলে ত্রাণের কাজে সমন্বয় তো হচ্ছেই না, কাজও ভালভাবে এগুচ্ছে না; মানুষের জীবন নিয়ে যাঁরা এই ছিনিমিনি খেলেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কাঁদুনি না গেয়ে রাজ্যপাল কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন না?

রাজ্যপালের আমলারা যেভাবে ত্রাণের কাজ চালাচ্ছেন তা দেখে কি মনে হবে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে কাজ হচ্ছে? আমলাদের কাজে ব্যক্তিগতির মনোভাব যদি প্রকাশ না পেতো তা হলে উত্তরবঙ্গের প্রয়োজন যাচাই করার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিরা দেড় মাস পরে উত্তরবঙ্গ সফরে আসতে কি সাহস করতেন?

সামান্য কাঁথি মহকুমায় বন্যার পর রাজ্য সরকারের যে প্রশাসন যন্ত্র অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের কাজ ভালভাবে আরম্ভ করতে পারেন না, তাঁরা দার্জিলিঙ, জলপাইগুড়ি, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুরের বিস্তীর্ণ এলাকায় কি ভাবে সুষ্ঠুভাবে কাজ করবেন?

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ও উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই বারবার আশ্বাস দিয়েছেন যে উত্তরবঙ্গ বন্যার্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনে টাকার অভাব হবে না, তা সত্ত্বেও কিসব দুঃসাহসে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল রাজ্য সরকারের ৩৮ কোটি টাকার দাবি মেটাতে চাইছেন না? দাবি আদায় করতে গেলে যে বলিষ্ঠ যুক্তি, অভ্রান্ত তথ্য ও কঠোর তর্কের প্রয়োজন রাজ্য সরকারের আমলারা সে ব্যাপারে অপদার্থতা ও ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন বলেই কি কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল বন্যাঞ্চলে পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনে তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতার হাত গুটিয়ে নিয়েছেন?

উত্তরবঙ্গের বর্তমান বিভীষিকার মুখের পিছনে রয়েছে এই সব গূঢ় ও মৌলিক প্রশ্ন,—যে সব প্রশ্নের জবাব সরকারী প্রশাসনিক দপ্তরে পাওয়া যাবে না। যেখানে মিলবে এর জবাব, পাওয়া যাবে প্রতিটি প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর, আসবে সমাধানের দৃঢ় পদক্ষেপ—সেই জনগণের দরবারে প্রশ্নগুলি বিবেচিত হোক; আমলাদের কীর্তির সাক্ষী ধ্বংসস্তূপে গড়ে উঠুক সত্যিকারের নব উত্তরবঙ্গ; আমলাদের কলঙ্কময় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে জনগণের সার্থক শ্রমের প্রতিটি বিন্দু নিয়ে বাঙলায় নব-উপনিবেশ রচিত হোক।

—সমর চট্টোপাধ্যায়
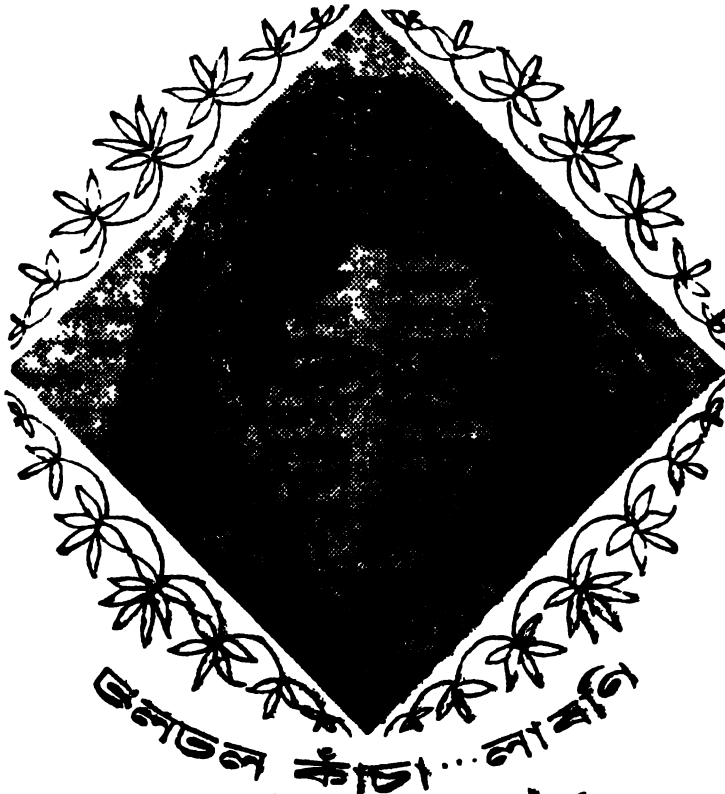
সরকারী ব্যবসায়

কোন বস্তুর বেওয়ারিশ চারিত্র্যধর্ম বোঝাতে এদেশে 'সরকারী' কথাটার ব্যবহার বহুল প্রচলিত। কেউ কোন জিনিস দেদার নষ্ট করলে বলা হয়, 'এ কি সরকারী (বেওয়ারিশ) মাল পেয়েছ'? তেমনি কারও মাথায় যদি থমকা এক-গণ্ডা লোক চপেটাঘাত করতে শুরু করেন, তবে মাথাটিকে সরকারী (বেওয়ারিশ) মাথা বলে গণনা করা যেতে পারে। বেওয়ারিশ জমিকে সরকারী মাঠ বলতে বাধা নেই। কিন্তু সরকারী ব্যবসাকে এ পর্যন্ত বেওয়ারিশ ব্যবসার বলে কেউ আখ্যাত করেন নি। যদিও সরকার কোন ব্যবসায় হাত দিলেই দেখা যায় সে ব্যবসায়ে লালবাতি জ্বলছে, অন্তত ব্যক্তিগত ব্যবসা হলে লোকসানের বহরে লালবাতিই জ্বলত।

সম্প্রতি এই লালবাতির প্রশ্নটি লোকসভার আলোচ্য হয়েছিল দিল্লীর সুপার বাজারকে কেন্দ্র করে।

সভ্যরা অভিযোগ করেন কতিপয় দ্রব্য চালু বাজারী বিক্রয় মূল্য অপেক্ষা বেশি দরে বিক্রি করেও দিল্লী সুপার বাজারে ৭·০৪ লক্ষ টাকা ('৬৬-'৬৭ সালে) লোকসান গেছে। '৬৭-'৬৮ সালের হিসেব দেখলেও ঐ লোকসানই দেখা যাবে। সরকার ব্যবসায়ে হাত দিলেই সে ব্যবসায় এমন লবডঙ্কা প্রদর্শন করে কেমন করে (!) সভ্যরা তা[illegible] রীতিমত বিস্ময় প্রকাশ করেন।

দুই কংগ্রেস সদস্য শ্রী কে কে চ্যাটার্জি এবং শ্রীশিউ নারায়ণ জনসংঘের সদস্যবর্গের সঙ্গে কণ্ঠে কণ্ঠ দান করে বলেন, সরকার ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থ।

সদস্যগণের উপরোক্ত সকল কথাই [illegible]কার্য। কিন্তু প্রশ্নটিকে ঠিক ঐখানেই থামতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে হয় না। বরং প্রশ্নের গভীরে প্রবেশ করলে স্বতই মনে হতে পারে, সরকারী ব্যবসায়ে লোকসানের অংক বড় করে দেখানোর মধ্যে কি কোনও ষড়যন্ত্র আছে? সরকারী ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে হতাশ জনমত এই সংবাদে গড়ে তুলে সরকারী আওতায় ব্যবসার সম্ভাবনাকে একেবারে বরবাদ করিয়ে দেওয়াই কি কোনও বিশেষ মুনাফা-শিকারীচক্রের গূঢ় উদ্দেশ্য? না হলে এমনটাই বা হয় কী করে! যাঁরা পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন, তাঁদের অপদার্থতাই বা ক্ষমার্হ বিবেচিত হয় কেন? সর্ষের মধ্যে ঠিক কোনখানে ভূতের বাসা, তার যথাযোগ্য অনুসন্ধান করা হয় না কেন?

এই সমস্ত 'কেন'র একত্রিত উত্তর খুঁজতে গিয়ে তাই মনে সন্দেহ দানা বেঁধে ওঠে। মুনাফাখোর মালিকানী বাজারে সরকারী ব্যবসার সাধু প্রচেষ্টা অংকুরে বিনষ্ট করার জন্য নিশ্চয় তলে তলে একটি বৃহৎ ষড়যন্ত্রের চক্র সুবিস্তৃত আছে। এবং তাই আছে কি না, থাকলে কতগুলি জায়গায় তা ক্রিয়াশীল—অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে সেই রহস্য নিরেই। নচেৎ 'সুপার বাজার' সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে অসমর্থ হলেও এবং তা তাঁদের নাগালের বহির্ভূত হলেও, একটা সরকারী বক্তব্যের যাথার্থ্য স্বীকার করা যেতে পারে যে বাজারে বিক্রয় মূল্যকে স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রে সুপার বাজারের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। তা আছে। তালিকা[illegible] মূল্যমান সরকার অনুমোদিত। কোনটি সরকারী বিক্রয় মূল্যের নিচে বিক্রিত হচ্ছে তারও থেকে বড় কথা হল, কত বেশি সামগ্রীর বিক্রয় মূল্য খুচরা ব্যবসায়ীর খেয়াল খুশি অনুসারে রোজ চড়ছে। বড় বড় আড়ত-দাররা মাল চেপে দাম বাড়িয়ে যাচ্ছেন। বাজারে টান দেখিয়ে যথেষ্ট মূল্য এবং মুনাফা সংগ্রহ করছেন দুহাতে। সুপার বাজার সে হিসেবে বাঁধা মূল্যের পাকে বাঁধা। এবং সে হিসেবে সমর্থনযোগ্যও বটে। যদিও শহরের ধনী পল্লীতেই বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে বিলাসী ক্রেতার মনোরঞ্জক এই বাজারগুলি খোলা হয়েছে, যেখান পর্যন্ত সাধারণ মানুষ পৌঁছতে পারেন না।

সুপার বাজারের সুফল যদি[illegible] ক্রেতা[illegible] সুতরাং ভোগ করছেন সেই কতিপয় ভাগ্যবান যাঁরা এক পয়সার জিনিস অবহেলাভরে এক টাকায় ক্রয় করতে সক্ষম।

সুপার বাজারকে শ্রীচ্যাটার্জি (কং) 'ফ্যাশনদুরস্ত' বলে অভিহিত করে এই বাজারের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। বস্তুত সুপার বাজারগুলি সমাজের ফ্যাশনদুরস্ত ক্রেতাকে খুশি করার জন্যই খোলা হয়েছে ফ্যাশনদুরস্ত মহল্লায়। যেখান থেকে বাজার সংগ্রহ করতে হলে সাধারণ মানুষকে বহু সময় ও যাতায়াত খরচ বহন করতে হয়। রোজ তার পক্ষে তাই এই বাজারের সুযোগ গ্রহণ করাও সম্ভব হয় না। অথচ এই সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে এমন রেফ্রিজারেটরও নেই যে সপ্তাহান্তে অথবা মাসে একবার এখান থেকে বাজার তুলে নিয়ে বাকি দিন ফ্রিজের কল্যাণে ঘরে বসে [illegible] সমন্দ থাকেন। সুপার বাজারের এই অসুবিধাই ধনিকদলের সুবিধা করেছে।

বাজারের [illegible] এড়িয়ে ধনী ক্রেতা প্রকাণ্ড হাল [illegible] সামনে গাড়ি ভিড়িয়ে [illegible] বাজার তুলে নিয়ে যান, ঘরের ফ্রিজ [illegible] সপ্তাহভর টাটকা রাখে। [illegible] মূল্যমানের সুযোগও তাই যদি কেউ ভোগ করতে পারেন, তবে সে ও ঐ [illegible] সমাজেরই ভোগ্য হয়। সরকার সাধারণের জন্য এই সুবিধা সৃষ্টিতে অক্ষম হয়েছেন।

তা ছাড়া এই অভিযোগও সঙ্গত [illegible], অকল্পনীয় [illegible] বিশেষ অনুগ্রহ-ভাজনের অট্টালিকা ভাড়া করে এইসব বাজার খোলা হয়েছে সরকারী ঘরে লোকসানের বহর বাড়িয়ে দেখানোর জন্য। অর্থাৎ আমাদের সরকারের সব পরিকল্পনাই গরীব-মারা গরীব[illegible] পরিকল্পনা। গরীবের অর্থে ধনীর সুবিধার্থে সুপার বাজার সমাজের সামগ্রিক কল্যাণে লাগছেই না [illegible] সুযোগ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যই বরং এই [illegible] চলেছে।

আমাদের 'সুপার' বাজারের প্রয়োজন নেই। দরকার [illegible] বাজার। [illegible] বাজার ছেদ পাড়ে। সে জন্যই [illegible] বাজার।

কিন্তু যে অন্তঃসলিলা [illegible] সমস্তরকম সরকারী বাণিজ্যের [illegible] ক্ষয়রোগের সংক্রমণ ঘটিয়ে থাকে তারও

অবসান ... দুরবস্থা না হলে সর্বের ... আলেয়ার ফাঁক কালো গরুদোমে ... নিয়ে ভুলবে। সাজানো সম্পদ ... মোহ ত্যাগ করে সরকার স্বল্প খরচে বাজার বসান এবং সেখানে লাভের ওপর কমিশন বরাদ্দ করে কর্মী নিয়োগ করুন। যাঁদের মাহিনা হবে নামমাত্র এবং যাঁদের ওপর খবরদারি করার জন্য কোন বকলেশ-আঁটা নেকটাই-পরা বড় বড় আমলার (যাঁরা সমুদ্র শোষণে অগস্ত্য সমান) নিয়োগ একেবারেই নিষিদ্ধ করা হবে।

একদল মানুষ সরকারী ব্যবসায়ের প্রতি সাধারণ মানুষকে হতাশ করে তুলতে সর্বদাই বদ্ধপরিকর। কেন না সরকার বাজারে খবরদারি করতে এলে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি হবে, মুনাফাখোর সমাজের ভয় সেখানেই। আর এই মুনাফাশিকারীদের অভীষ্ট পূরণে সর্বদা সাহায্য করে চলেছেন একদল বকলেশ-আঁটা আমলা। এঁরা সমস্ত সরকারী প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে মুনাফা শিকারীর 'লেসে-ফেয়া'র বা অবাধ বাণিজ্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত রাখার অনুকূলে আবহাওয়া সৃষ্টি করে চলেছেন সুপরিকল্পিতভাবে। এঁদের মাথা-ভারী প্রশাসনের আওতা থেকে সরকারী ব্যবসায়কে অবিলম্বে মুক্ত না করলে আমাদের গণতান্ত্রিক দেশে 'কল্যাণব্রতী সরকারের (যদি তার অস্তিত্ব রাখতে হয়) দ্বারা কোন কাজ সম্ভব হবে না।

হিন্দী সেনা

স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে খাঁটি ভারতীয় সেনা বলতে বুঝতাম, আজাদ হিন্দ সেনাবাহিনী। উত্তর স্বাধীনতা-কালে ইণ্ডিয়ান আর্মি নেভি এয়ার ফোর্স-ই হল খাঁটি ভারতীয় সেনা।

কিন্তু অধুনা সেনাবাহিনীর দখলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল। যেমন কোথাও লাচিত সেনা, কোথাও বাল ঠাকরের সেনাবাহিনী কোথাও বা আর এস এস সেনা। এ ছাড়া কংগ্রেসের সেনাদল। কিন্তু লোকসভাসদস্য শেঠ গোবিন্দ দাস যে সাম্প্রতিকতম সেনা গঠন করলেন, সেই সেনা দল একাধিক অঞ্চলেই শুধু ছড়িয়ে পড়ার উচ্চাশা রাখে তাই নয়, গোবিন্দ দাসের সেনাবাহিনীর নামটিই আঞ্চলিকতা-মুক্ত। এ সেনা একেবারেই 'হিন্দী সেনা'। এঁদের লক্ষ্য হল, ভারতকে হিন্দী (ভাষা)-ময় করে তুলতে হবে। ভারত সরকার যা 'ঢিল' করে এবং তৃতীয়-ব্যক্তিকে চালাতে চাইছেন, গোবিন্দ দাসের হিন্দী সেনা তাকেই মদত দিতে সদলবলে এগিয়ে আসার জন্য প্রস্তুত। হিন্দী সেনার আক্রমণাদি অহিংস হবে বলে প্রচারিত। কেন্দ্রকারী সেনাবাহিনীর পক্ষে হিংসার আশ্রয় গ্রহণ না করাই বিধেয়, কিন্তু হিন্দী-উন্মাদনা যে কী বস্তু, ইতিমধ্যেই তার যেটুকু পরিচয় এবং বিবরণাদি পাওয়া গেছে, তাতে হিন্দী সেনার মতিগতি গোষ্ঠীর কার্যকলাপ-সমতুল্য হবে বলে আশা-ভরসা কম। 'হিন্দী সেনা' বস্তুত আসরে নামলে হিন্দী নিয়ে যে অহিতকর আবহাওয়ার সৃষ্টি হবে, আশঙ্কা হয় তা ঠাণ্ডা করতে অবশেষে আমাদের বলবন্ত চ্যবন সাহেবকে খোদ ভারতীয় সেনাবাহিনীই তলব করতে হবে। কারণ হিন্দী ভাষাভাষীদের বহু বায়না ও বায়নাক্কা অহিন্দী ভাষাভাষীরা এতাবৎকাল ঘাড় গুঁজে সহ্য করে আসছেন। সহ্য করছেন হিন্দীর রাজকীয় প্রভুত্ব-ও। কিন্তু মায়ের মুখের ভাষা কাড়তে এলে মুখ বুজে কেউ তা সহ্য করবেন এতটা নপুংসক হিসাবে অহিন্দী ভাষাভাষী ভারতবর্ষকে চিন্তা করা অনুচিত। বলা বাহুল্য শেঠ গোবিন্দ দাসের মনেও তেমন আশঙ্কা আছে। তাই তাঁর হিন্দী সেনা আপাতত হিন্দীপ্রধান রাজ্যগুলিতেই তাঁদের বিজয়াভিযান শুরু করছেন বলে সংবাদ। বলা বাহুল্য এই রাজ্যগুলি সরকারী ভাষা হিসেবে হিন্দী চালু করতে ইতিমধ্যেই যেহেতু সম্মত, অতএব এখানে হিন্দী সেনার অভিযান অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। কিন্তু এই পবিত্র হিন্দীপ্রেম যখন অহিন্দী ভাষা-ভাষীর মায়ের মুখের ভাষার ওপর খবরদারি করতে এগিয়ে আসবে তখনই সমস্যায় জট পড়বে। আপাতত সেদিন দূরে আছে জেনে অবশ্য অহিন্দী ভাষা-ভাষীরা নাসিকায় সর্ষপ তৈল দিতে পারেন, কিন্তু হিন্দী সেনা ১৯৬৯-এর প্রথম পাদেই সদর্প অভিযানের জন্য প্রস্তুত। দক্ষিণাপথ শিয়রে আসছে।

মোরারজীর মর্মব্যথা

শ্রীমোরারজী দেশাই এক বিষয়ে নিঃসন্দেহে শক্ত মানুষ, তিনি বড় একটা অভিনয়ের ধার ধারেন না, হিরো হবার সখও তাঁর কম। ঝট করে জনতার মধ্যে লাফিয়ে নেমে পড়া কিম্বা দুটি কচি মেয়ের গাল টিপে আদর করে নিজেকে ক্যামেরাবন্দী করা—এ আদিখ্যেতায় তিনি অনভ্যস্ত। এই সেদিনও উত্তরবঙ্গে কাদায় নামতে অস্বীকার করায় এবং সাবধানী অভুক্ত মানুষ দেখে আসার পরও মন্ত্রী-খানা প্রত্যাখ্যান না করায় তাঁর মুখে-মনে ঐক্য বজায় রাখার দৃঢ়তাটুকু অধীনের প্রশ্নাকে যথার্থই অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। মোরারজী মায়াকান্না কেঁদে অনর্থ না বাধিয়ে যথার্থই অর্থমন্ত্রীসুলভ ব্যবহার প্রদর্শন করেন—এই স্মার্টনেসটুকু তাঁকে অনন্যসাধারণ করেছে। কিন্তু উপ-প্রধান-মন্ত্রীর এই স্টেটমেন্টটিও বুঝি এবার

মোরারজী দেশাই

সংক্রামক রোগের প্রকোপ এড়াতে পারে নি। তিনি দেশের দুর্গত পঞ্চাশ ভাগ মানুষের জন্য অকস্মাৎ শোকাপ্লুত, বলা ভাল, সমবেদনাশ্রু বিসর্জন করে ফেলেছেন সংসদকক্ষে।

ব্যাপারটি ঠিক তখনই ঘটল, যখন কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের মাগ্গীভাতার প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হল দেশাই সাহেবকে। তিনি বললেন, অসম্ভব এ প্রস্তাব। দেশের পঞ্চাশ ভাগ মানুষ সরকারী কর্মচারীদের থেকে ঢের কায়ক্লেশে জীবনধারণ করছে, তাঁদের দুঃখসাগরে ভাসিয়ে কতিপয় সরকারী কর্মচারীদের দিকে তিনি মাগ্গী-ভাতার লাইফ-বেল্ট ছুঁড়ে দিতে পারেন না। তাই যতকাল দেশের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন না হচ্ছে, অর্থমন্ত্রী ততকাল ঐ পঞ্চাশ ভাগ মানুষের সঙ্গে গলা জড়িয়ে সরকারী কর্মচারীদের রোদন করতে দিতে পারেন কিন্তু ...."I cannot go on improving the lot of these people (Govt. servants) at the cost of 50 percent of the people."

[illegible] ... হচ্ছেন। কিন্তু বাদ সাধল বাকি পঞ্চাশ ভাগ (বস্তুতই কি পঞ্চাশ ভাগ, না আরও কম ?)। অর্থাৎ যাঁরা ভালো আছেন এবং বংশ পরম্পরাক্রমে ভালই থাকবেন। যাঁদের শেরকা বাচ্চা শেরই বনেগা। তাঁদের ঐশ্বর্য নিত্যদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে মনে হল, মোরারজীর মর্মব্যথা এক্ষেত্রে চাগিয়ে না উঠলেও এই পঞ্চাশ ভাগের (তাঁর মতে) ঐশ্বর্য বৃদ্ধি দেখে মোরারজীর মনে কিছু জিজ্ঞাসার উদ্রেক হওয়া প্রয়োজন ছিল। যা হয় নি। তিনি একই সঙ্গে একথাও ভাবতে পারতেন পঞ্চাশ ভাগ সুখী মানুষের সুখের যোগান দিতে তাঁর বাকি পঞ্চাশ ভাগ প্রজাই (কংগ্রেসের একটানা রাজত্বের ফলে 'পিপল্' আজ 'প্রজায়' পরিণত) বা কেন মূল্যবৃদ্ধির চাপে ঘটিবাটি বিক্রি করে দিতে বাধ্য থাকবেন। ঠিক এতো সুখের জন্যই কি সাধারণ মানুষ সর্বস্ব পণ করে স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছিল। যার ফলভোগী মোরারজী সাহেবরা তো হয়েইছেন এবং ও'দের সঙ্গে তাঁরাও হয়েছেন, যাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনেও সাবধানে তফাতেই সরে থেকেছিলেন। যে সমুদয় ধনীব্যক্তি স্বাধীনতা আন্দোলনে অর্থব্যয় করেছেন বলে কিংবোলপর্বে সুদ সমেত লগ্নীকৃত অর্থ ফেরৎ চেয়েছিলেন (লজ্জার মুড়ো টিপিয়ে) সেই ভদ্র মহাশয়েরা আজ দেশের অর্থনীতির নিয়ামক হয়েছেন। অর্থাৎ যদি বা তাঁরা কেউ কেউ অর্থ লগ্নী করেও থাকেন তবে তা-ও ছিল ব্যবসায় লগ্নী। ক্ষমতা বিদেশী বণিকের হাত থেকে স্বদেশী বণিকের গদিতে আবর্তিত করার জন্য। সে উদ্দেশ্য সফল হলেও, তাঁদের আকাঙ্ক্ষার সমুদ্র যে সমগ্র ভারতভূমি গ্রাস করতে চলেছে, বিচক্ষণ মোরারজী সাহেবের নজরে এই বিষয়টি ধরা পড়লে দুর্গত পঞ্চাশ ভাগের বেদনামোচনে তিনি তাঁর অক্ষমতা অমন সদর্পে প্রকাশ করতেন না।

যদি বা এই অবাক-উক্তিটি তাঁর দ্বারা সম্ভব হল, তবে পঞ্চাশ ভাগের জন্য শ্রুতিকটু দবদটুকু অপ্রকাশিত থাকলেই বোধহয় ভালো ছিল। বুঝতাম, মোরারজী সমস্ত আর্জির ঊর্ধে বস্তুতই আত্মসম্মানী। তাঁকে নরম দেখে হতাশ হচ্ছি। না না, মোরারজী দেশাই 'একমেব-অদ্বিতীয়ম'-ই থাকুন। চাতবীর দ্বারা মহৎ কার্য সিদ্ধ হয় না, এই কথাটা তিনি যেমন বুঝে আসছিলেন, তেমনিই বুঝতে থাকুন। কাজ কি দুর্গত পঞ্চাশ ভাগের কথা পেড়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার যে বাকি পঞ্চাশ ভাগকে তাঁরই সরকার অবাধ শোষণের পরওয়ানা দিয়ে দিয়েছেন। এই অনর্জ-গোপন তথ্যটি (ওপেন সিক্রেট)

[illegible] তিন [illegible] পি পি আই নেতা শ্রীজ্ঞানেশ এবং শ্রী এস এন ব্যানার্জী বৃন্দ-তার বক্তব্যের কারাবরণে সাগ্রহে সাড়া দিয়ে বলেন, জেল দিন আমাদের যদি বিনিময়ে সমস্ত কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের ওপর থেকে শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করা সম্ভব হয় তার দ্বারা।

তখন একটা হাসির হুল্লোড় পড়ে যায় (সংবাদ)। কেন হাসি, কে কি ভেবে হাসলেন, তা অবশ্য বোধগম্য হল না। উপরোক্ত দুই নেতা কি কেবলমাত্র মজা-মস্করা করার জন্য কারাবরণে সম্মতি প্রকাশ করেছিলেন, তাই হাসি? সত্য বিচিত্র দেশ বটে।

বার হাজার কর্মচারীর যখন চাকরী গেছে [illegible] কেউ [illegible] সাস-

ইন্দিরা গান্ধী

পেনসনের সাসপেন্সে ভোগ করছেন, এবং বহু কর্মীর বিরুদ্ধে যখন আদালতে অভিযোগ ঝুলছে, তখন তাঁদের মুক্তির জন্য দুই নেতার জেলবরণের আগ্রহে হাস্যোদ্রেকের কোন্ কারণটা ঘটল? প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিরোধী নেতার বৈঠক কি মজলিশ নাকি?

তা সে যাই হোক, ঐ বৈঠকে শ্রীমতী গান্ধী স্রেফ জানিয়ে দিয়েছেন, সরকারী কর্মীদের অনুগত (লয়্যাল) থাকতে হবে এবং কোন রকম ক্ষমা প্রদর্শনে সরকার অক্ষম। প্রকাশ, শ্রীমতী গান্ধীকে এইভাবে আত্মসম্মান-প্রধানা করার জন্য নাকি তাঁর দুই আয়রনম্যান উপদেষ্টা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী চাপ সৃষ্টি করেছিলেন।

মিসেস গান্ধীর ওপর চাপ সৃষ্টির এহেন সংবাদটি কৌতূহলোদ্দীপক। প্রধানমন্ত্রী চাপের দ্বারা নুব্জা এই

আত্মসম্মানবোধকে কেবলমাত্র বিরুদ্ধ লোকদের প্রতিকূলে কাজে প্রয়োগ করা যায়। যার জেরটি বোঝা যাচ্ছে, ভারতের ক্যাবিনেট বর্তমানে জোহুকুমনিতে পরিণত হয়েছে এবং বিরোধী নেতাদের সম্পূর্ণ ব্যাপারটি এখন ঢোক গিলে হজম করতে হচ্ছে। এই পরিপাক ক্রিয়াটিকে মধুরসে মধুর করবার জন্য আবার কিছু হাস্যরসেরও আয়োজন চলেছে। অন্যদিকে একপাল সরকার কর্মচারী স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে অসহায়ভাবে হাপুস নয়নে শোক করছেন।

সমস্ত ব্যাপারটাই ভারতের কর্মচারী আন্দোলনের ইতিহাসে একটি চমকপ্রদ অধ্যায় হয়ে রইল।

বন্ধুর পন্থা : একক যাত্রী

কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী কেন্দ্রিক আলোচনায় আশ্চর্য এক বিদ্রোহীকণ্ঠ শোনা গেছল রাজ্যসভায় যখন কর্মী স্বার্থ-বিরোধী বক্তৃতায় মলিন কংগ্রেসী আসন থেকে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন আর এক কংগ্রেসী নেতা শ্রীঅর্জুন অরোরা। কংগ্রেসী আসন যখন সর্বপ্রকার ধর্মঘটের অধিকার নস্যাৎ করে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছে, তখন প্রকৃত কংগ্রেসী শ্রীঅরোরা ক্ষোভে রুদ্ধকণ্ঠে ধিক্কার জানিয়েছেন তথাকথিত গান্ধী-বাদীদের, যাঁরা কর্মচারীস্বার্থের বিরুদ্ধে বক্তব্য হাজির করছিলেন। তিনি চীৎকার করে কর্মচারীদের সমর্থন জানাতে দ্বিধা করেন নি। বন্ধুর অর্বাচীন কংগ্রেসীপথে অরোরা একক বীরের মতো কংগ্রেসের পূর্ব ঐতিহ্যে গরীয়ান হয়ে কর্মী-মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে এতটুকু স্বার্থটান অনুভব করেন নি। মনে হয়েছে এমন একজন কংগ্রেসীকেই অর্ধশতাব্দী আগে জনতার পুরোভাগে দেশবাসী হেঁটে যেতে দেখেছিল, যে স্মৃতি আজ ম্লান হয়ে আসছে। সেই পুরনো শ্রদ্ধা এবং বিস্ময় নিয়ে সেদিনও সমগ্র রাজ্যসভা এক অকৃত্রিম কংগ্রেসসেবীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

(২৩।১১।৬৮)

পশ্চিম পাকিস্তানের আরামবাগ মসজিদের ভেতরে ঢুকে পুলিশ ছাত্রদের লাঠিপেটা করে।

পাকিস্তান ঃ

আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে তার নেতৃত্ব দেবার জন্য এবার যিনি এগিয়ে এসেছেন তিনি হলেন এয়ার মার্শাল মহম্মদ আসগার খাঁ। কমাস আগে তিনি সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করেছেন।

১৮ই নভেম্বর তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে আসগার খাঁ অত্যন্ত কঠোর ভাষায় আয়ুব সরকারের সমালোচনা করেন। আয়ুবশাসনের বিরুদ্ধে তিনি দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও চরম স্বৈরাচার অভিযোগ আনেন। একনায়কতন্ত্রী শাসনের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে তিনি বলেন দেশে বন্দমাত্র মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নেই, এবং সংবাদপত্রেরও স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা নেই। তিনি ভুট্টো, ওয়ালি খাঁ ও অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তারের তীব্র সমালোচনা করেন। স্বৈরাচারী শাসনের অবসানের সংগ্রামে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হবার জন্য তিনি আহ্বান জানান। আসগার খাঁ তাঁর ভবিষ্যৎ রাজনীতি সম্পর্কে বলেন, এখনই তিনি কোন দলে যোগ দেবেন না তবে প্রয়োজন হলে ভবিষ্যতে যোগ দিতে পারেন। বর্তমানে তিনি বিরোধী দলগুলির সংগে মিলিতভাবে আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে চান।

পরের দিন, অর্থাৎ ১৯শে নভেম্বর, আসগার খাঁ লাহোর হাইকোর্ট ভবনে গিয়ে সেখানকার বার অ্যাসোসিয়েশনের চেম্বারে পাঁচ শ' আইনজীবীর এক সভায় ভাষণ দেন, এবং আইনজীবীদের হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি আয়ুবশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা ঘোষণা করেন। তখন সেখানে আসলার বার ... ইকবালের পুত্র জাবেদ ইকবাল। জাবেদ লাহোর বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি।

৪৭ বৎসর বয়স্ক আসগার খাঁ পাকিস্তানের সামরিক অফিসারদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। বিগত ভারত আক্রমণের সময় তাঁর বীরত্বের কাহিনী সকলের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। শোনা যায়, ১৯৫৮ সালে যখন আয়ুব খাঁ সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল করেন, তখন তাঁর ডান হাত ছিলেন এই আসগার খাঁ। এহেন ব্যক্তির আয়ুববিরোধী রাজনীতির নেতৃত্ব গ্রহণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেনাবাহিনীর অনেকেরই সমর্থন পাবেন আসগার খাঁ। তাছাড়া তিনি নিজে পাঞ্জাবী। পাঞ্জাবীদের আয়ুব সমর্থনেও তিনি ভাঙন ধরাতে পারবেন। পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলি ভুট্টো ও খান আবদুল ওয়ালি খান এবং পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবর রহমান এখন কারান্তরালে। তাই আয়ুববিরোধী রাজনীতির নেতৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই এখন আসগার খাঁর হাতে এসে পড়বে। অনেকের ধারণা, আয়ুব খাঁ আসগার খাঁকে মন্ত্রিসভায় যোগদানের আহ্বান জানিয়ে তাঁকে হাত করার চেষ্টা করবেন। তবে তিনি সফল হবেন না বলেই সকলের বিশ্বাস।

এদিকে নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার ও ছাত্রদের ওপর জুলুমের প্রতিবাদে পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বত্র ছাত্রবিক্ষোভ শুরু হয়েছে। পুলিশ এই বিক্ষোভ দমনের জন্য যত দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করছে, ছাত্রদের প্রতিরোধও তত বাড়ছে। নিহত ছাত্রদের স্মৃতিতে মসজিদে নমাজ পড়তে গিয়েও ছাত্ররা পুলিশের মারের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

পশ্চিম পাকিস্তানের আইনজীবীরাও আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমেছেন। লাহোর, পেশোয়ার, রাওয়ালপিণ্ডি প্রভৃতি প্রধান প্রধান শহরে আইনজীবীরা ১৪৪ ধারা ভংগ করে প্রতিবাদ মিছিল বের করেছেন। এতদিনে আইনজীবীরাও বুঝেছেন, নিয়মতান্ত্রিক পথে আয়ুবশাহী স্বৈরাচারের গতি রোধ করা যাবে না। ২১শে নভেম্বর রাওয়ালপিণ্ডিতে এক বিরাট মিছিল বের হয়; এক নিহত ছাত্রনেতার ৭০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধা মাতা এই বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্ব করেন। ২৫শে নভেম্বর সারা পশ্চিম পাকিস্তান জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালনের প্রস্তুতি চলছে।

পূর্ব পাকিস্তানও চুপ করে বসে নেই। ভুট্টোদের গ্রেপ্তার ও ছাত্র হত্যা জুলুমবাজির বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাবার জন্য ১৮ই নভেম্বর পূর্ববংগের সর্বত্র প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়।

এতদিন পূর্ববংগেই আত্মনিয়ন্ত্রণ ও গণতন্ত্রের দাবিতে শক্তিশালী আন্দোলন
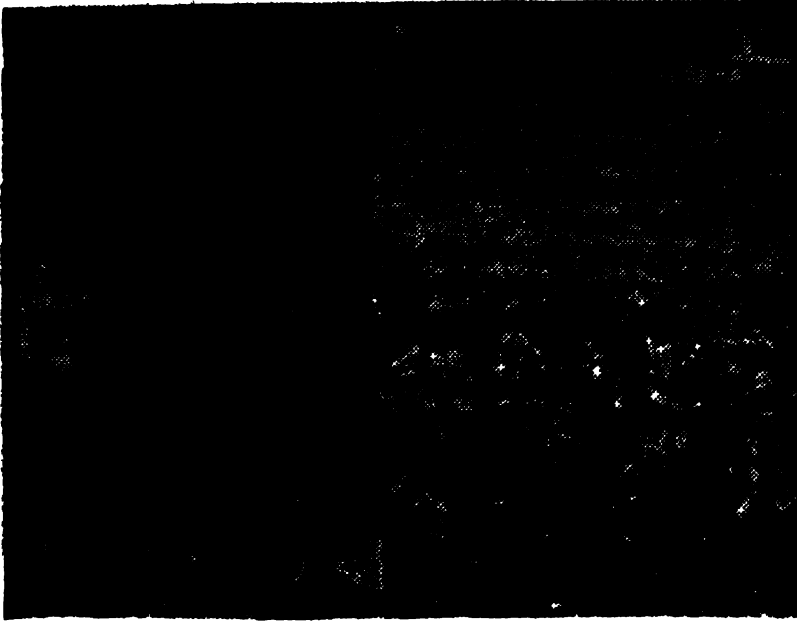
অতীত স্মৃতি

(১৯৬৪ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিকে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যোগদান করতে এলে আয়ুব খাঁ ও তাঁর সেদিনের পরম বিশ্বস্ত সহকর্মী ভুট্টো লণ্ডন বিমানবন্দরে কাশ্মীর-প্রশ্নে ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন।)

হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান মোটামুটি নিরাপদ ছিল। আজ সেখানেও আগুন জ্বলেছে। তাই পূর্ববঙ্গের গণতন্ত্রের সংগ্রামীরা উৎসাহিত বোধ করছে। তারা নতুন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। বিপ্লবী বাঙালীর পাশে একই রণাঙ্গনে এবার এসে দাঁড়িয়েছে ওয়ালি খাঁর নেতৃত্বে বীর পাঠান, ভুট্টোর নেতৃত্বে বিদ্রোহী সিন্ধী আর আসগার খাঁর নেতৃত্বে সাহসী পাঞ্জাবীর দল। ইতিপূর্বে কখনও পাকিস্তানে এরূপ সার্বিক সংগ্রামী ঐক্য দেখা যায় নি।

ব্রাসেলস :

'ন্যাটো' বা উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থা ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে স্বাভাবিক মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছিল। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নকে ধন্যবাদ, সে 'ন্যাটো'কে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছে এই সামরিক সংস্থার মধ্যে।

পাঁচ মাস আগে যখন আইসল্যাণ্ডে 'ন্যাটো'র মন্ত্রী-বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় তখন সবাই ধরে নিয়েছিলেন, এই প্রতিষ্ঠানের আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু গত সপ্তাহে ব্রাসেলসে যখন আবার 'ন্যাটো'র মন্ত্রী-বৈঠক বসল, তখন সবাই স্বীকার করলেন, এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন আছে, এবং একে আরও শক্তিশালী করতে হবে। এই কথা বলেছেন 'ন্যাটো'র সেক্রেটারী-জেনারেল মানলিও ব্রসিয়ো স্বয়ং।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সম্ভাব্য সোভিয়েট আক্রমণের হাত থেকে য়ুরোপের নিরাপত্তা রক্ষার অজুহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে জঙ্গী সামরিক সংস্থা 'ন্যাটো'র জন্ম হয়। কিন্তু ইদানীংকালে পশ্চিমীগোষ্ঠী এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও সোভিয়েট য়ুনিয়নের সম্পর্কের যথেষ্ট উন্নতি হওয়ায় অনেকে মনে করছিলেন, এবার 'ন্যাটো'কে তুলে দিলেই হয়। ফ্রান্স ইতিমধ্যেই 'ন্যাটো'র সৈন্যবাহিনী থেকে নিজের সৈন্য সরিয়ে নিয়েছে—'ন্যাটো'র সদর দপ্তরও প্যারিস থেকে সরানো হয়েছে। ক্যানাডা ও ডেনমার্কও ভাবছিল, 'ন্যাটো' থেকে তাদের কিছু সৈন্য তারা সরিয়ে আনবে।

কিন্তু সব গোলমাল করে দিল সোভিয়েট য়ুনিয়ন তথা ওয়ারশ চুক্তিগোষ্ঠী কর্তৃক চেকোস্লোভাকিয়ার সামরিক হস্তক্ষেপ। 'ন্যাটো' গোষ্ঠীর মতে, এই ঘটনার ফলে য়ুরোপের নিরাপত্তা নতুনভাবে বিপন্ন হয়েছে। সোভিয়েট আক্রমণের হাত থেকে য়ুরোপ রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব তাই 'ন্যাটো'কে পালন করতেই হবে!

'ন্যাটো' পক্ষে সাজো সাজো রবও পড়ে গেছে। গত সপ্তাহে ব্রাসেলস শহরের উপকণ্ঠে ইভেরেস্তে 'ন্যাটো' গোষ্ঠীর সদস্য-রাষ্ট্রগুলির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীদের বৈঠক বসেছিল। কথা ছিল, নভেম্বরের সময় এই বৈঠক হবে। কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়ার ঘটনার পর আর দেরি করা সঙ্গত মনে হয় নি, আগেই বৈঠক বসাতে হয়েছে। এর আগে হেগে য়ুরোপীয় পার্লামেণ্টারী কংগ্রেস ও ব্রাসেলসে ন্যাটো পার্লামেণ্টারী অ্যাসেম্বলীর বৈঠক বসেছিল।

ন্যাটো মন্ত্রী-বৈঠকে সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন, সোভিয়েট য়ুনিয়ন সম্পর্কে চিন্তিত হবার মত কারণ রয়েছে। সুতরাং, ন্যাটোকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডিন রাস্ক ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী ক্লার্ক ক্লিফোর্ড, ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইকেল স্টুয়ার্ট ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডেনিস হিলে প্রমুখ তো বটেই, এমন কি ফ্রান্সের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইকেল ডেবরে পর্যন্ত এই মতে সায় দিয়েছেন।

বৈঠক শেষে যে যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, য়ুরোপে নতুন কোন আক্রমণ হলে "বড় রকমের আন্তর্জাতিক সংকটের সৃষ্টি হবে এবং এর পরিণতি হবে গুরুতর।" কূটনৈতিক বিচারে সোভিয়েট য়ুনিয়নের উদ্দেশে এটা একটা কঠোর ধমক ছাড়া আর কিছু নয়।

ঘরোয়া আলোচনায় ডিন রাস্ক বলেছেন, কেবল 'ন্যাটো'র সদস্য-রাষ্ট্র নয়, যুগোস্লাভিয়া ও অস্ট্রিয়াকে রক্ষার দায়িত্বও 'ন্যাটো'কে নিতে হবে। কারও কারও মতে রুমানিয়া ও আলবানিয়াকেও সম্ভাব্য সোভিয়েট আক্রমণের হাত থেকে রক্ষার কথা 'ন্যাটো'কে ভাবতে হবে।

'ন্যাটো'র সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত এবং চেকোস্লোভাকিয়ার ঘটনাকে উপলক্ষ করে সোভিয়েটবিরোধী উগ্র মনোভাব গ্রহণের ফলে য়ুরোপে ঠাণ্ডা লড়াই আবার বৃদ্ধি পাবে।

সবচেয়ে খুশি 'ন্যাটো' সৈন্যবাহিনীর সুপ্রীম কম্যাণ্ডার জেনারেল লিম্যান লেমনিটজার। তিনি বরাবর শান্তি-প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে এসেছেন, এবং 'ন্যাটো'র সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছেন।

সৌদি আরব ঃ

ইরানের শাহ্‌ মহম্মদ রেজা শাহ্‌ পহলভী গত সপ্তাহে ৬ দিনের জন্য সরকারী শুভেচ্ছা সফরে সৌদি আরবে এসেছিলেন। সৌদি আরবের রাজা ফয়জাল তাঁকে যথোচিত সম্মানের সঙ্গে রাজকীয় সম্বর্ধনা জানিয়েছেন। শাহ্‌ একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরূপে মক্কা পরিদর্শনও করেছেন।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে কিন্তু ইরানের শাহ্‌ তাঁর সৌদি আরব সফর বাতিল করে দিয়েছিলেন। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক ভাল ছিল না। দুই দেশের মাঝখানে পারস্য উপসাগর। কিন্তু এই উপসাগরে দুই দেশের আঞ্চলিক দরিয়ার সীমানা কতটা, এই নিয়ে দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে। সাগরের উপকূলভাগে প্রচুর তৈলসম্পদের সম্ভাবনা রয়েছে বলে এই বিরোধ গুরুতর হয়েছে। দ্বিতীয়ত, ইজরায়েলের প্রতি ইরানের প্রচ্ছন্ন সমর্থনে অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের মত সৌদি আরবও ক্ষুব্ধ। ইরানের সঙ্গে ইজরায়েলের ভাল বাণিজ্য সম্পর্ক রয়েছে। তৃতীয়ত, বাহ্‌রিনের ওপর ইরানের দাবিতে সৌদি আরব রীতিমত ক্ষুব্ধ। বাহ্‌রিনের আরব শেখের প্রতি সৌদি আরবের সমর্থন রয়েছে।

ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে এই বিরোধে সবচেয়ে বেশি বিচলিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মধ্যপ্রাচ্যে নাসের ও সোভিয়েট য়ুনিয়নের প্রভাব হ্রাসের ব্যাপারে মার্কিন সরকারের ভরসা হল ইরান, সৌদি আরব আর জর্ডান। জর্ডানের রাজা হুসেন এখন নিজেই দেশে বড় রকমের বিদ্রোহের সম্মুখীন। জর্ডানের ভবিষ্যৎ রাজনীতি

মহম্মদ রেজা শাহ্‌ পহলভি

কোন পথে যাবে তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। এই অবস্থায় ইরান আর সৌদি আরবও যদি নিজেদের বিরোধ মিটিয়ে ঐক্যবদ্ধ না হয়, তা হলে মুশকিল। তারপর আবার ১৯৭০ সালে ব্রিটেন বাহ্‌রিন থেকে তার সামরিক ঘাঁটি সরিয়ে নেবে। তখন পারস্য উপসাগর এলাকায় কি হবে?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে শেষ পর্যন্ত দু'পক্ষ মীমাংসায় অগ্রসর হয়েছে। অবশ্য নিজেদের আগ্রহও ছিল। ইরানের শাহ্‌ ও সৌদি আরবের রাজা দু'জনেই মুসলিম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঐক্যের স্বপ্ন দেখেন। আরব জাতীয়তাবাদী ঐক্যের চেয়ে মুসলিম ধর্মীয় ঐক্যের ব্যাপারে সৌদি আরবের রাজা ফয়জালের আগ্রহ বেশি। দু'জনেই নাসেরের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষাকাতর, তাঁর প্রভাববৃদ্ধিতে বিচলিত।

শেষ পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে পারস্য উপসাগরের ব্যাপারে একটা মীমাংসা হয়েছে, উভয় দেশের মধ্যে পুরনো দাবি ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছে।

শাহের সফর শেষে দুই দেশের নৃপতির স্বাক্ষরিত যুক্ত ইস্তাহারে বলা হয়েছে, উভয় দেশের মধ্যে পুরোনো বিরোধসমূহের নিষ্পত্তি হয়েছে, উভয় দেশ পরস্পর সহযোগিতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হবে এবং পারস্য উপসাগর এলাকার স্থিতাবস্থা রক্ষার জন্য তারা একযোগে কাজ করবে।

সাপ্তাহিক বসুমতী

উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির তহবিলে দান

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

৫০১·০০ টাকা ঃ "কিশোরভারতী", বেহালা, কলিকাতা-৩৪। এঁরা ৮ গাঁটরি বস্ত্রও (পুরনো) দিয়েছেন।

১৩২·৯২ টাকা ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাপীঠ হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, বোরহাট, বর্ধমান। এঁরা কিছু বস্ত্রও (পুরনো) দিয়েছেন।

৭০·০০ টাকা ঃ "নেতাজী সংঘ", উত্তর গরিফা মালঞ্চ রোড, চব্বিশ পরগনা।

প্রত্যেকে ৫১·০০ টাকা ঃ "প্রতিরূপ", শ্রীপল্লী, পলতা, চব্বিশ পরগনা। এঁরা চাল, গম, আটা ও কিছু বস্ত্রও (পুরনো) দিয়েছেন। "সভ্যবৃন্দ", রহড়া (চব্বিশ পরগনা)।

৩২·২৫ টাকা ঃ "সংঘশ্রী" রহড়া (খড়দহ খালপার) চব্বিশ পরগনা।

৩১·০০ টাকা ঃ লালগোলা সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি লালগোলা (মুর্শিদাবাদ)।

১০·০০ টাকা ঃ অনঙ্গ চক্রবর্তী, অঞ্জনগড়, কলকাতা ৫৫।

প্রত্যেকে ৫·০০ টাকা ঃ মোহিনীমোহন সান্যাল, ২নং গভর্নমেণ্ট কলোনী মালদহ। এ কে পাত্র, পাণিক অফিসার ইনচার্জ স্টেট ভেটেনারী হসপিটাল কাকদ্বীপ (চব্বিশ পরগনা)। কার্তিকচরণ পাল, চুঁচুড়া (হুগলী)।

৩·১০ টাকা ঃ পরেশচন্দ্র বাগ।

৩·০০ টাকা ঃ কণিকা মুখার্জী C/o সার্জেণ্ট হীরালাল মুখার্জী, পলতা, পোঃ বেঙ্গল এনামেল (চব্বিশ পরগনা)।

প্রত্যেকে ২·০০ টাকা ঃ সত্যজিৎ গাঙ্গুলী 'রবিভরা', মালঞ্চ। এ কে চৌধুরী, দমদম, তারাপদ পাল, সোদপুর। বি চ্যাটার্জী উত্তরপাড়া। বি কেল শাভ এণ্ড সন্স, ব্যারাকপুর। অজিত চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা-১১। সুরমা দাশগুপ্তা নাকতলা। গীতা সেন, ইউনিক পার্ক, বেহালা। ইভা বিশ্বাস, কলকাতা ৩১। সুপ্রিয়া বসু কলকাতা-৭। পত্রালিকা দে, যাদবপুর। ইরা ব্যানার্জী, কলকাতা। গীতা সেন, কলকাতা-৩১। আরতি চৌধুরী, কলকাতা-৩১। সাগরিকা ঘোষ হিন্দুস্থান পার্ক, কলকাতা। শোভা ধর, যাদবপুর। প্রভাত দাস কলকাতা-১১। বামাগলতা সাহা, কলকাতা-৩১। নীরদকুমার দত্ত, কলকাতা-৩১, ক্ষীরোদবরণ গোস্বামী, সালকিয়া (হাওড়া)। গৌরচরণ চট্টোপাধ্যায়। কল্যাণকুমার ঘোষ, চন্দননগর। গোপালচন্দ্র সাউ বেলুড়। চিত্তরঞ্জন দত্ত, জিরাট।

[ক্রমশঃ]

মেঠো... পর ... ধরে ধানক্ষেত। উত্তরের অসমপ্রস্থ বুক ধরে কোন রকমে সাগরের কাছাকাছি আসতে পেরেছে মেকং নদী। তারপর আপন ভারে শতধা হয়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারধারে। পলিতে পলিতে ঢেকে দিয়েছে দেশের সে অংশটুকু। সোনালী ধানের শীষ দুলতে থাকে হাওয়ার বুকে ভর দিয়ে।

চারিদিকে ভরপুর শান্তি। দুপুরের কড়া রোদে সব কিছু আলস্যে মদির। আকাশ-বাতাস-নদীর জল; গ্রামগুলোর ওপরে কুণ্ডলী পাকান সামান্য ধোঁয়া।

দেশের ধানক্ষেতের সীমানা পার হবার আগেই নজরে আসে, দূরে উঁচুনিচু নীল রেখা। আরও এগিয়ে গেলে সে অসম রূপ পরিগ্রহ করে। সমতল মাথা নিচু করে বিদায় গ্রহণ করে পর্বতমালার কাছে। পাদদেশ, সমতল ও পর্বতের অবনিবনার সুযোগ নিয়েছে চূড়ান্তভাবে; ঘন জঙ্গলে সে অংশ ভরা। সারা দেশের ওপরে সুযোগ নিয়েছে অনেকেই, এখনও নিয়ে চলেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম চাঞ্চল্য থিতিয়ে এলো ইয়োরোপের বুকে। দ্রুতলয়ে অনেকক্ষণ বাজাবার পর জার্মানী তার আপন মর্জিতে বাদ্যযন্ত্রের তার বেঁধে নেবার জন্যে থেমেছে একটু। পূর্বপ্রান্তে তখন হঠাৎ উচ্চ-সুরে বাঁধা তবলা লহরা জেগে উঠলো। নানা ছন্দে, নানা সুরে, নানা গ্রামে বাজিয়ে সবাইকে চকিত-বিস্মিত করে দিল সে তবলা লহরার সৃষ্টিকারীরা। জাপানের উদীয়মান সূর্যের চিহ্নে ভরে গেল সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া।

অশান্ত হয়ে উঠলো মেকং-ডেলটার ঝিমিয়ে-পড়া শান্তি। নদীর স্রোত প্রখর হল, আকাশের গায়ে দেখা দিল ঘন কালো মেঘ। বাতাস বইতে শুরু করল এলোমেলো। মৌসুমী এসেছে। আবার ধান বোনা হবে, শীষ হাওয়ায় দুলবে, কিন্তু ততদিনে দেশের হবে ভাগ্য পরি-বর্তনের শুরু। এতদিনের প্রভু—ফরাসী শক্তির চিহ্নও দেখতে পাওয়া যাবে না খুঁজলে। তার জায়গায় এসেছে পীত জাতি। সংস্কৃতি, ধর্মে ও গাত্রবর্ণে ভিয়েতনামীজদের নিকট গোত্র।

মেকং নদীর জলের মতো তরল তখন বিশ্বের অবস্থা। স্রোতের মতো দ্রুত-গতিতে বদলে চলল পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিস্থিতি। সোভিয়েট রাশিয়ার নাৎসী জার্মানীর সঙ্গে বন্ধুত্ব টিকলো না। পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চলছিল, রাতারাতি সে যুদ্ধ হয়ে দাঁড়াল জনগণের লড়াই। দেশে দেশে সাম্যবাদীরা হয়ে উঠলো তৎপর। তৈরি হল গোপন বাহিনী। আশাভরে তারা চেয়ে রইল উদীয়মান সূর্যের অস্তের অপেক্ষায়।

কোন কিছুই চিরদিন টেকে না। পথে। বিজিত দেশগুলোতে রেখে গেল অজস্র অস্ত্রশস্ত্র ও স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষা। আর জানিয়ে গেল, অজেয় কেউ নয়—ফরাসীরা নয়—ইংরেজরা নয়—ওলন্দাজরা নয়, এমন কি উদীয়মান সূর্যের দেশও নয়।

মিত্রপক্ষের অগ্রগতির সাথে সাথে কালনেমির লঙ্কা ভাগ শুরু হয়ে গেল আবার। ফরাসীরা গুটি গুটি পায়ে এসে বসলো তাদের অধিকার কায়েম করতে। মেকং নদীর মিষ্টি জল—সুস্বাদু ধানের ভাত—শহরের সুন্দরীদের দেহসম্ভার।

কিন্তু অনেক কিছুরই অদলবদল হয়ে গিয়েছে গত কয়েক বছরে। ফরাসী ওয়াইন ও কালচারে এতদিনকার নিমজ্জিত জাতি মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইছে। দিকে দিকে শুরু করে দিয়েছে ধ্বংসাত্মক কাজ। এতদিনের প্রভুত্ব আর মানতে রাজী নয় তারা। নেপোলিয়ন ব্র্যান্ডির সঙ্গে জাহাজ ভর্তি হয়ে এলো ফ্রেঞ্চ লিজিয়ন, এলো কামান। বোমা বহন করে অবতরণ করল বিমানবহর। সমতলের প্রায় সবটুকু অধিকার করে নিয়ে এগুলো উত্তরের দিকে।

আকাশের নিচে উঁচুনিচু নীল রেখা। পর্বতশ্রেণীর আভাষ। পাদদেশে ঘন বনানী। ফরাসী বাহিনীর অগ্রগতিতে বাধা পড়ল সেখানে। লুকিয়ে লুকিয়ে যুদ্ধ করে বিপক্ষ দল। নিঃসাড়ে চলাফেরা করে। লড়াই ভালভাবে শুরু করার আগেই পালিয়ে যায় পর্বতমালায়। সুযোগ বুঝলেই আবার নেমে আসে বন্যার মতো। দয়া নেই, মায়া নেই, সম্মোহিতের মতো করে চলে শত্রুর বিনাশ। ফরাসী লিজিয়ন বিরক্ত হল; সত্যিকারের লড়াই-এর অভাবে হল তারা হতাশ। কামানগুলি প্রয়োজনেই আসছে না। বিমানবাহিনী লক্ষ্যবস্তুর অভাবে ফিরে যায় ব্যর্থ মনে।

লিজিয়নের অধিনায়ক ম্যাপ দেখলেন চিন্তিত মনে। আছে—উপায় আছে। উত্তরের পর্বতমালার মাঝে রয়েছে ফরাসী সৈন্যের বড় একটা ঘাঁটি। আর আছে সুরক্ষিত দুর্গ। পদাতিক বাহিনীর সাধ্য নেই সে দুর্গে ফাটল ধরাতে পারে। সারা ফরাসী ইন্দো-চায়নায় এমনটি আর নেই।

লিজিয়ন অধিনায়ক ম্যাপের একটি বিশেষ স্থানে তর্জনী রাখলেন। ডিয়েন বিয়েন ফু। বিমান আক্রমণ ছাড়া এ দুর্গ অজেয়। আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন অধিনায়ক, বিপক্ষ দলের বিমান নেই, আর দু-একটা থাকলেও শক্তিশালী ফরাসী বিমানবহরের হাতে ঘটবে তাদের অপমৃত্যু। নীলিমার দিকে চেয়ে থেকে হাসলেন তিনি।

বহু দূরে—অনেক দূরে, পর্বতমালার ঢেউ যেখানে উত্তাল হয়ে হারিয়ে গিয়েছে; একটি গুহায় বসে সেই একই আকাশের

[illegible] আঁকিয়ে রয়েছেন এক [illegible]। আকারে খর্ব, কৃশকায়, কপালে গভীর চিন্তার রেখা। চোখে শুধু জ্বলজ্বলে করছে ভবিষ্যতের আশা।

সামনের নড়বড়ে টেবিলের ওপরে রাখা ম্যাপের দিকে তাকালেন আবার। সব বাধা জয় করা যাবে, শুধু থাকবে একটি জায়গা—ডিয়েন বিয়েন ফু। অজেয় করে তৈরি করেছে ফরাসীরা, বসিয়েছে শক্তিশালী কামান। মেশিন-গানের ঘাঁটি পেতে ভরে দিয়েছে প্রতিটি গুহা ও কন্দর। তাঁর ছাত্র-কৃষক ও মজদুর সৈন্যের ওই শতাব্দীর স্থায়িত্বকে ধ্বংস করে ফেলার সাধ্য হবে কি?

চারিদিকে তাকালেন বৃদ্ধ। যত দূরে চোখ চলে, পর্বতশ্রেণী—আর তার মাঝে রয়েছে লক্ষ লক্ষ সাম্যবাদী সৈন্য। আর কোন সত্তা তাদের নেই, শুধু আছে তাদের দেশের পরিচয়। আর কোন লক্ষ্য তাদের নেই, শুধু রয়েছে অল্প একটু পাহাড়ঘেরা জায়গা—ডিয়েন বিয়েন ফু।

লক্ষ সৈন্যের প্রতিটি মুখের স্পষ্ট চোয়াল স্পষ্টতর হয়ে উঠলো। অসাধ্য সাধনের আশায় বুকের লহু হল দ্রুততর। চোখের তারা থেকে সব ছবি মুছে গিয়ে ভেসে উঠলো শুধু পাহাড়ঘেরা ছোট একটি জায়গা—ডিয়েন বিয়েন ফু।

অবরোধ শুরু হল ফরাসী শক্তির শেষ সম্বলটুকু ঘিরে। মুখোমুখি লড়াই যতখানি সম্ভব এড়িয়ে যেতে হবে, কিন্তু অবরোধের জাল ছড়িয়ে থাকবে যোজনের পর যোজন ধরে। গণসৈন্যকে হতে হবে নিশাচর প্রাণীর মতো। রাত্রির কালিমায় আত্মগোপন করে আঘাত হানবে তারা দুর্গের ভেতরে। বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষায় শত্রুপক্ষ যখন গুনবে প্রতিটি দণ্ড, সারাদিনের পর কামানের দেহ যখন হতে থাকবে শীতল, ফরাসী বিমানবহর আকাশ রক্ষা স্থগিত রেখে অবতরণ করবে আপন নিরাপত্তার আশ্রয়ে; পাহাড়ঘেরা ছোট একটি জায়গায় শুরু হবে তখন ধ্বংস-লীলা। বারুদের স্তূপে লাগান আগুনে ছাড়িয়ে পড়ে শেষ করে দেবে সব।

অস্ত্রশস্ত্রের লড়াই ছাড়াও স্নায়বিক দ্বন্দ্ব শুরু হল ক্রমশ। মাসের পর মাস ধরে সমানে অবরোধ চলতে থাকলো। প্রতি রাত্রির আক্রমণে দুর্গের পরিধি কমে এলো অনিবার্যভাবে। অবরোধ ভেদ করে, রাস্তা দিয়ে রসদ দূরে থাক, কীটপতঙ্গের প্রবেশও বন্ধ। দুর্গের ক্লান্ত সৈন্যদলের মনে ক্রমে চাপ বেঁধে উঠলো একঘেয়েমি, নিঃসঙ্গতা ও মরণভয়। ভোর হতেই ছুটে বেরিয়ে আসে তারা বাংকার থেকে, তাদের দৃষ্টি খোঁজে অসীমতার মাঝে—কয়েকটি [illegible] সন্ধানে। তাদের সে আশা দূর্গ[illegible] [illegible] আবার পাড়া ক্লাব, কাফে, রেস্তোরাঁ ও চিঠির খাম। [illegible] সামান্য, কিন্তু ওই বক্ষে মুহূর্তের জন্যেও অন্য কোনখানে রচিত হয় বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে।

বিমানের গুঞ্জনধ্বনি ক্ষীণতর হয়ে এসে মিলিয়ে যায়। দিনের উজ্জ্বলতায় মদিরতা কেটে গিয়ে ফরাসী সৈন্যের চোখে আবার স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে চারিদিকের পর্বতমালা। প্রতিটি বৃক্ষে, প্রতিটি গুহায়, প্রতিটি কন্দরে অপেক্ষা করছে তাদের জন্যে মৃত্যু। অতর্কিতে যে মৃত্যু তাদের মাঝে এসে পড়ে রাত্রির কালো চাদরে সর্বাঙ্গ মুড়ে। ভয়াবহ—ঠাণ্ডা—দয়ামায়াহীন।

দয়ামায়াহীন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন এলো। বৃদ্ধ-দার্শনিক-যোদ্ধা ফিরলেন উত্তরের দেশ থেকে। শীর্ষ সাম্যবাদীরা মিত্রপক্ষের কাছ থেকে যা পাওয়ার ছিল পেয়েছে এতদিন, কিন্তু এখন অন্য কথা। মন্ত্রের প্রচার আগে, তারপর বন্দুক। গণসৈন্যের কাছে এলো নতুন ধরণের অস্ত্রশস্ত্র, কামান ও অজস্র গোলা-বারুদ। শুরু হল দীর্ঘদিনের অপেক্ষার পর পরিসমাপ্তির যাত্রা। বৃদ্ধ ঝুঁকে পড়লেন যুদ্ধক্ষেত্রের ছকের ওপরে। সবাই তাকাল ফরাসীদের শেষ চিহ্নের দিকে। কামানের মুখ ঘুরলো। মেশিন-গানের নল এসে স্থির হল লক্ষ্যভেদের আকাঙ্ক্ষায়। গণসৈন্যের সম্মিলিত দৃষ্টি নিবদ্ধ হল দুর্গের শীর্ষের দিকে। পতাকা বদলের সময় এসে গিয়েছে।

তার মাত্র চারদিন বাদে, বৃদ্ধ তাঁর কৃশ দেহ নিয়ে আস্তে আস্তে উঠলেন ফরাসী লিজিয়নের কমাণ্ড গৃহের ছাদে। এত বড় জয়ের পরেও, মুখে তাঁর আনন্দ নেই। বেদনার চাপে দেহ যেন আরও খর্বকায় দেখাচ্ছে। চোখের তারা থেকে বিদায় নিয়েছে সৈনিকের কঠিনতা। দৃষ্টিতে দার্শনিকতা। ভয়ঙ্কর মৃত্যু দর্শন করেছেন গত কয়েকদিন ধরে। হাজার হাজার মৃতদেহ চারিদিকে। ফরাসী লিজিয়ন ও তাঁর আপন গণসৈন্যের অভূতপূর্ব মিলন। পাশাপাশি শুয়ে আছে তারা। বিজয়ী ও বিজিতের পার্থক্য ঘুচে গিয়েছে মৃত্যুর আননে।

সারা বিশ্ব অনিশ্বাসী দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল অনেক দূরের পাহাড়ে ঘেরা ছোট একটি জায়গার দিকে, যেখানে খর্বাকৃতি কৃশকায় একটি বৃদ্ধ পতাকা বদল করলেন দুর্গের শীর্ষদেশে; জন্ম দিলেন একটি রাষ্ট্রের, ভিত্তি স্থাপন করলেন ভবিষ্যতের—রক্ত ও প্রাণের [illegible] ও [illegible]।

দিন চলতে লাগলো। বৃদ্ধের নাম নতুন রাষ্ট্রের জনকের নাম।

মেকং নদী বয়ে চলেছে সাগরের দিকে। ধানের শীষ দুললো মৌসুমী হাওয়ার কোলে মাথা রেখে। আকাশে বাতাসে পর্বতমালায় একটি প্রতিধ্বনি ফিরলো, হো-চি-মিন্‌।

নতুন দেশে নতুন মন্ত্রে ভাঙা গড়া শুরু হল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাকাল নিজের মাটির দিকে। পাথুরে, উঁচু-নিচু; আবাদের পক্ষে অনুপযুক্ত। শস্য-শ্যামলা অংশগুলির বেশির ভাগই রয়েছে ওপাশে। একদা মাতৃভূমি হলেও এখন যে পররাজ্য। যেন পাঁচিল তুলে এক মায়ের দুই ছেলেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। একই মায়ের দুই ছেলে, কিন্তু স্বভাবে বিপরীত।

পাথুরে দেশের ছেলে তাকাল তার স্বল্পবিত্তের সন্ধানে। আহ্বান করল সংসারের সবাইকে। সঙ্কল্প নিল কঠিন কাজের দিনগুলির জন্যে। কঠিন মাটিতে আছড়ে পড়ল হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোদাল। আঘাত হানলো মাটির অন্তর্দেশে অগণিত গাঁইতি। পাথর সাজিয়ে বদলান হল নদীর জলধারার গতিপথ। রুক্ষ দিনে, পাথুরে জমি শীতল হল সে ছোঁয়ায়। অঙ্কুরিত হল শস্য। খনিজ সম্পদ আত্মপ্রকাশ করল বাইরের জগতে। জলধারার ধাক্কায় বিজলী তৈরির চাকা ঘুরতে লাগল মিনিটে হাজার পাক।

ধীরে ধীরে নগর শহরতলী বাড়তে লাগলো আয়তনে। উঁচুনিচু স্থির দিক-চক্রবালে জেগে উঠলো চিমনির কম্পিত ধোঁয়া। বন্দরে বন্দরে জাহাজ এলো সামগ্রী বয়ে, কিন্তু ফিরে গেল আরও বেশি নিয়ে। সমৃদ্ধির ছোঁয়া লাগলো সারা দেশে। সন্ধ্যায় কর্মক্লান্ত শরীরে আপন-জাত খাদ্য মুখে তুলতে গিয়ে অনেকে ভাবলো, এর প্রতিটি কণায় লেগে রয়েছে উৎসর্গের শোণিতাংশ—ডিয়েন বিয়েন ফু।

শস্যশ্যামল দেশের ছেলে তাকাল তার চারপাশে। মেকং নদীর অকৃপণ দান ঝলমল করছে। ভেলাটা ঢেকে রয়েছে শস্যসম্ভারে। খেয়ে ফেলে ছড়িয়েও দান করার মতো থাকবে অনেক। আর রয়েছে ভূগর্ভের প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে অগণিত সুরা। বন্দরে জাহাজের পর জাহাজ আসছে পশ্চিমী প্রলোভনের মূর্ত দূত হয়ে। ফরাসী গিয়ে এলো মার্কিন। এলো শতে শতে, সহস্রে সহস্রে। মুদ্রার আঘাতে অন্তর হল মূক কিন্তু হৃদয় হল মুখর।

পুরুষগণ !

মাত্র ৫টি পয়সা, আপনাদের পরিবার সীমিত রাখার ক্ষমতা এনে দেয়।

আগামী ২৮ বছরে ভারতের জনসংখ্যা [illegible] হয়ে যাবে; কিন্তু দেশের সম্পদ দ্বিগুণ [illegible]। তার অর্থ হল প্রত্যেককেই অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে হবে; অল্প শিক্ষা, অল্প খাদ্য, অল্প বস্ত্র।

এই ভয় দূর করা যায়। জন্ম যদি নিয়ন্ত্রিত করা যায়, যদি কয়েক বছরের ব্যবধানে পরিকল্পনা অনুযায়ী সন্তান জন্ম গ্রহণ করে তাহলে জনসংখ্যাও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আর এখানেই আপনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

এখনই ব্যবহার করতে সুরু করুন। পরিবার সীমিত রাখুন।

জন্ম প্রতিরোধ করার ক্ষমতা এবারে আপনাদের হাতে এসে গেছে।

পরিবার পরিকল্পনার জন্য

বর্তমানে মাত্র কয়েকটি জেলায় পাওয়া যায়।

পুরুষগণের পক্ষে ব্যবহারযোগ্য উন্নত ধরণের রবারের জন্ম নিরোধক

৩টির মূল্য ১৫ পয়সা

১টি ৫ পয়সা

(সরকারি সাহায্যে হ্রাসমূল্যে)

জীবন-যৌবন-ভোগ-উপভোগ। হৃদয়ের কামনা-বাসনা হাতছানি দিল সবাইকে। সুরার বুদ্বুদে শোণিত হল উত্তাল। বারবনিতার চোখের ঝিলিক হার মানাল বিজলীকে। ভোগের আহ্বান ছড়িয়ে পড়ল আকাশে-বাতাসে। নগরীর উচ্ছলতায় কাঁপতে থাকলো মেকং নদীর জল। নগরী-সবস্ব হয়ে সবাই ভুলে গেল দেশের বাকি অংশকে।

ওদিকে নগরীর বাইরে, গ্রামে গ্রামে দারিদ্র্য রোগ শোক চাপ বেঁধে বসে রইল ভবিষ্যতের অপেক্ষায়। কিন্তু ভোগে মত্ত নাগরিকদের দৃষ্টি হয়ে রইল আচ্ছন্ন। ক্রমে অন্তর্কলহে ও রাজনৈতিক চক্রান্তে ভারী হয়ে উঠলো দেশের আবহাওয়া। দিকে দিকে দেখা দিল অসন্তোষ, বিশৃঙ্খলা আর বেঁচে থাকার দাবিতে আর্ত চিৎকার।

সে ধ্বনি চাপা দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো কর্মকর্তারা। তাকাল সাগরপারের দেশের দিকে সাহায্যের আশায়। তৈরি হল ড্রাফট্ দূর দেশে। প্রকট হল মুদ্রার ঝন্‌ঝনানি। এলো আরও শ্বেতকায়ের দল। অভাগ্যদের উদ্ধারের ব্রত নিয়ে নামলো জাহাজ থেকে। তুলে ধরা অন্ন হাতে অর্থের থলি। কিন্তু বস্ত্রের আড়ালে রইল আগ্নেয়াস্ত্র।

পাথুরে দেশের জনক বেরোলেন নিজের দেশের বাইরে। পৃথিবীর সবাই তাঁকে দেখতে চায়। জানতে চায়, নতুন কিছু আছে কি তাঁর বলবার?

বৃদ্ধ মাথা নাড়েন। নতুন কি শোনাবেন তিনি? তাঁর কথা যে যুগ যুগ ধরে বলা হয়ে এসেছে। সবার মানুষের মতো বাঁচবার অধিকার—এইটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু, সেইটুকুই যে সবচেয়ে কঠিন। মানুষ তার আপন মর্জিতে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে চাইলে তো কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু ছোট দলকে যে সব সময়েই কোনো না কোনো বড় দলের আড়ালে থাকতে হবে। নইলে যে—। নইলে কি? নইলে, নীতিবাদ, অর্থনৈতিক আওতা আর মানুষের সবচেয়ে বড় জৈবিক বোধ যেটা, প্রভুত্বের প্রয়াস—ওগুলোর কি হবে?

বৃদ্ধ আবার মাথা নাড়েন। এবার মুখে সামান্য হাসি। তিনি জানেন, চারপাশের বন্ধু ও শত্রু, সবারই ঐ একই কামনা। না—তাঁর পাহাড়ভরা রাজ্য, যত ছোটই হোক না কেন, যত গরিবই হোক না কেন, যত নতুনই হোক না কেন; কারুর উপগ্রহ হয়ে থাকতে রাজী নয় সে। অনেক কষ্টে অর্জন করা আলাদা সত্তা, অনেক সন্তানের শোণিত দিয়ে কেনা সর্বস্বাধীনতা বাঁচিয়ে রাখবে তাঁর ছোট রাজ্য, আর কারুর মধ্যে নিজেকে বিসর্জন না দিয়ে।

সাগর সীমানা থেকে দশ হাজার ফিটের উচ্চতায়, মেকং নদীর ডেলটা পার হয়ে চললেন ডঃ হো চি মিন। ভারতের বিমানে বসে অভঙ্গুর কাচে ঢাকা ছোট গবাক্ষ দিয়ে চেয়ে রইলেন, আপন ভাইয়ের দেশের দিকে। মেকং তার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দিয়ে উপসাগরের দিকে চলেছে হাজার হাজার বর্গমাইল জুড়ে। মায়ের স্তনের মতো ভরা রয়েছে কত সম্ভাবনা ঐ দেশের মাটিতে। শস্যশ্যামলা প্রাচুর্যের দেশ। কিন্তু ঘটেছে বিপরীত। সব খবর পান তিনি। দারিদ্র্যের ভয়ংকর মুখ অনিবার্যভাবে গ্রাস করেছে এই দেশের প্রতিটি গ্রাম। নগরের নৈতিক মান ও ব্যভিচারিতার কাছে নরকও হার মেনেছে। ধীরে ধীরে অক্টোপাসের মতো লোভের বাহু বিস্তার করেছে অপর এক শ্বেতকায় জাতি।

ছোট বড় অতিকায়, নানা আকারের মেঘ এড়িয়ে বিমান উড়ে চলে পশ্চিম মুখে। বৃদ্ধ চেয়ে থাকেন তাঁর ভাইয়ের দেশের দিকে। কেন এমন হলো! এতটুকুও কি আত্মসম্মান জ্ঞান নেই এদের? এরা কি জানে না, যুদ্ধ জয় করে প্রভুত্বের দিন চলে গিয়েছে আজকাল, আর বদলে জেগে উঠেছে অর্থনৈতিক ও নীতিবাদের প্রভুত্ব। যুদ্ধে জয়ক্ষতি হয় সম্পদের কিন্তু এতে সর্বনাশ হয় নৈতিক ও মানসিকতার। তখন অনিবার্যভাবে হারিয়ে ফেলে জাতি তার আত্মবিশ্বাস। মেরুদণ্ড হয়ে যায় নরম। ক্রমশ হয়ে পড়ে তাঁবেদার জাতি।

ঘড়ির কাঁটার ঘূর্ণনের সঙ্গে বাকি অক্ষাংশের সংখ্যা কমতে থাকলো পশ্চিমের পথে। দূর থেকে দেখা গেল হিমালয়ের আভাষ, ঘন নীল রেখা। আরও দূরে আবছা চির তুষারের কিরীটমালা।

ভারতের রাজধানীর মাটিতে নামলেন নতুন রাষ্ট্রের জনক। পরনে হালকা হলদে রং-এর সুতি ড্রিলের পোশাক। ট্রাউজার ও বড় পকেটওয়ালা গলাবন্ধ কোট। পায়ে অত্যন্ত সাধারণ মূল্যের চপ্পলের মতো পাদুকা।

খর্বাকৃতি বৃদ্ধ, দীর্ঘকায় বাছা সৈন্য দিয়ে গড়া গার্ড অফ অনার পরিদর্শন করলেন। পরিচিত হলেন ভারতের হর্তাকর্তা বিধাতাদের সঙ্গে। দেখলেন যা দেখবার, শুনলেন যা শোনবার, করলেন যা করণীয়। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পশ্চিম থেকে পূর্ব; সারা দেশের বেশ খানিকটা পরিক্রমা করলেন সাত দিন ধরে। জায়গার বদল প্রতিদিন, বিভিন্ন প্রদেশ, বিভিন্ন কৃষ্টি, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন বর্ণ। প্রতিদিনের স্বাগতম নতুনভাবে, নতুন মানুষের মুখে। শুধু বদলাল না তাঁর পরিক্রমার বিমান ও বিমানের কর্মচারীরা। ছয়জন তারা। প্রতিদিনের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, শিষ্ট আপন-করা ব্যবহারে তাঁর হৃদয় জয় করল বিমানের অধ্যক্ষ ও তার পাঁচজন সহকারী, তার মধ্যে দুটি মেয়ে। অল্প বয়স সবার। সময় পেলেই তাঁর কাছে কেউ না কেউ এসে বসে। তাঁর পাহাড়-ভরা ছোট রাজ্য সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করে। আকাশপথ দিয়ে যাবার দীর্ঘ মুহূর্তগুলিকে করে আনে ছোট।

বৃদ্ধ ভালবেসে ফেললেন এদের। যখন যেখানে গেলেন সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ছয়জনকে। ভিড়ে কিছুক্ষণ না দেখতে পেলে জিজ্ঞাসা করেন, 'কোথায় ওরা—আমার সঙ্গীরা?'

দ্বিপ্রহরের সূর্য মাথার ওপরে রেখে বিমান আকাশপথে সাঁতরে চলেছে দক্ষিণ মালভূমির ওপর দিয়ে। আবহাওয়ার কম্পনে, দুলছে বিমানটি। অধ্যক্ষ ছুটে গেল বৃদ্ধের কাছে, হয়তো বা তিনি অসুস্থ বোধ করছেন এ দোলানিতে।

কাপড় ঘেরা, বিশেষভাবে গড়া কক্ষে শুয়ে আছেন রাষ্ট্রপতি। অধ্যক্ষ যেতেই, ইঙ্গিতে তাঁর কাছে বসতে বললেন। একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার, ঝড় আসছে?' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল অধ্যক্ষ। তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, 'বাবার চিঠি পেয়েছি। আপনাকে তিনি জানিয়েছেন তাঁর সশ্রদ্ধ প্রণাম, আর আপনার পরিবারবর্গের জন্যে জানিয়েছেন শুভেচ্ছা।'

বৃদ্ধ ক্ষণকাল থেমে থেকে হাসিমুখে বললেন, আমার পরিবারবর্গ, ভাই তারা যে অনেকে, লক্ষ লক্ষ জন যে। বেশ তোমাদের শুভেচ্ছা আমি তাদের দেব ফিরে গিয়ে।'

পূর্বমুখী হয়ে ভারত ভ্রমণ শেষ হতে চলল প্রতিটি ঘণ্টার সাথে। বাংলার মাটিতে এসে অবতরণ করল বিমান। নির্দিষ্ট জায়গায় এসে থামার পর প্রপেলারগুলি একের পর এক নিশ্চল হল। সূর্য ডুব দিয়েছে তার কিছুক্ষণ আগে।

ককপিটে প্রবীণ সহকারী চেক লিস্ট পড়ে চলেছে। শাট ডাউন চেক লিস্ট। যাত্রার পরিসমাপ্তির নির্দেশ। তাদের কাজ এখানেই শেষ। রাষ্ট্রপতিকে তাঁর আপন রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ভার অন্য দলের ওপরে। দীর্ঘ সাত দিনের প্রতিটি ঘণ্টা একযোগে ভিড় করে আসছে সবার মনে। বৃদ্ধ তাঁর স্নেহ দিয়ে জয় করেছেন প্রতিটি হৃদয়। হয়েছেন সবার পরমাত্মীয়। শেষের কয়দিন সবাই তাঁকে সম্বোধন করেছে দাদু বলে। প্রটোকল, পররাষ্ট্রীয় সম্ভ্রম দূরে সরে গিয়েছে আপনা থেকেই।

ককপিট ও কেবিন থেকে ছয়জন বেরিয়ে এসে দাঁড়াল টারম্যাকের ওপরে। প্রদেশের গণ্যমান্যরা রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত

জানাতে এসেছেন। ফুলের মালা তাঁদের হাতে হাতে। সম্ভাষণ মুখে মুখে। সে পালা সাঙ্গ হলে বুদ্ধ তাকালেন চারদিকে, খুঁজে পেলেন অধ্যক্ষ ও তার সংগীদের। কাছে ডেকে বললেন, আমি জানি তোমরা আমার সঙ্গে আমার দেশ পর্যন্ত আসছ না। কিন্তু এখানে বিদায় দিতে মন চাইছে না। রাজভবনে এসো সবাই, আরও দু-এক ঘণ্টা, যতটুকু সময় থাকা যায় তোমাদের সঙ্গে।

রাষ্ট্রচিহ্ন লাগানো গাড়িতে উঠে বসলেন রাষ্ট্রপতি। আবার চাইলেন অধ্যক্ষের দিকে। যেন বললেন, তাড়াতাড়ি চলে এসো, আর বেশিক্ষণ হাতে নেই। গাড়ি-গুলি একের পর এক এগিয়ে গেল শহরের পথে।

সময় বেশি নেই। অধ্যক্ষ পরামর্শ করল তার সহকারীদের সঙ্গে। বিমান-বন্দরেই তৈরি হয়ে নিল তারা। সবার যেমন ইউনিফর্ম তেমনই থাকলো। শুধু হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে নেওয়া। এয়ার হোস্টেস দুজন প্রসাধনের নতুন ছোঁয়ায় সজ্জিত করল নিজেদের। রওনা হল সবাই রাজভবনের উদ্দেশ্যে। শহরের মুখরতার মাঝে কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ থেমে এসেছে ততক্ষণে।

রাজভবনের মুখ্য প্রকোষ্ঠে সমবেত হয়েছেন বাংলার কর্মকর্তারা। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তাঁর আপন দেশ থেকে আসা সংগীদের সাথে আলাপে রত সবাই। প্রত্যেকের হাতে গ্লাস। কোনোটাতে হুইস্কি আবার কোনো গ্লাসে রক্তাভ টমাটোর রস।

কিছুক্ষণ পরে নৈশভোজনের ডাক এলো। এলো নানা ভোজ্যসামগ্রী। মাননীয় অতিথি আসন গ্রহণ করলেন।

আহার সমাপ্তে, ভিয়েতনামের মন্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন। রাষ্ট্রীয় কাগজ খুলে পড়লেন আপন দেশের ভাষায়। দোভাষী করে চলল ইংরেজীতে তর্জমা।

'রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুযায়ী, বিমানের অধ্যক্ষকে তার একনিষ্ঠতা ও কর্মক্ষমতার জন্যে এই পদক দেওয়া হল। রাষ্ট্রীয় খাতায় এর উল্লেখ থাকবে।'

অধ্যক্ষের ইউনিফর্মে বুদ্ধ যে পদক ঝুলিয়ে দেবার সময় মৃদু হেসে বললেন, আজ থেকে তোমাকে আমরা চিনবো শ্রমিক দলের দলপতি হিসাবে। (Hero of the Labour Group). টেবিলের ফুলদানী থেকে দুটি গোলাপ তুলে নিয়ে এয়ার হোস্টেস দুজনকে দিয়ে সবার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমাদের কর্মনিষ্ঠা ও সেবা আমি কখনই ভুলবো না। যদি কখনও সুযোগ ঘটে, আমাদের দেশে এসো তোমরা সবাই। আমার দেশবাসীর ও আমার নিমন্ত্রণ থাকলো চিরদিনের জন্যে।

বিদায়-ক্ষণ এসে গেল। বুদ্ধ আর সবাইকে ছেড়ে, বিমানের ছয়জনের সঙ্গে রইলেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। হলের সিঁড়ির কাছে এসে বিদায় জানালেন, মঙ্গল কামনা করলেন প্রাণ থেকে। দৃষ্টিপথ থেকে অদৃশ্য না হওয়া অব্দি চেয়ে রইলেন ওদের দিকে।

অধ্যক্ষ ও তার সহকারীরা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বার বার ফিরে চেয়ে দেখলো বুদ্ধকে। মনে হলো, যেন একান্ত আপনার জনকে ফেলে চলে যাচ্ছেন— অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে রেখে। আর কি কখনও দেখা হবে? বাঁক ঘোরার শেষ ধাপে পা দেবার আগে অধ্যক্ষ ফিরে তাকাল সিঁড়ির উচ্চ সোপানগুলির সীমান্তে— বুদ্ধ তখনও দাঁড়িয়ে আছেন। অতদূর থেকেও দেখা গেল তাঁর কোমল স্নেহভরা চোখের দৃষ্টি, আর ঈষৎ কাঁপতে থাকা দাড়ির শুভ্রতা।

জনক ভারতবাসীর কাছে বিদায় নিয়ে ফিরে চললেন আপন দেশে। ফিরে চললেন আবার মেকং ডেলটার ওপর দিয়ে। বিদেশী শ্বেতকায়ের প্রভুত্ব যেখানে ধীরে ধীরে কায়েমী হয়ে বসেছে অর্থনৈতিক শৃঙ্খলের বাঁধনে। দেশের প্রতিটি কথায় তাদের মতামত। রাষ্ট্রের শাসনে তাদের হাত। সর্বক্ষেত্রের নিয়োগ পন্থায় তাদের কারচুপি।

এত অপমানের মধ্যেও, মেকং তার বুকভরা সুধা দিয়ে পুষ্ট করছে দেশের মাটি। মাটি নিজেকে আবৃত করছে শস্যের আবরণে। বাতাস বইছে, ধানের শীষ দুলছে, মেকং নদীর রুপোলী ঢেউগুলি ছুটে চলছে উপসাগরের দিকে। এত থাকতেও এ দেশের মানুষ অসুখী। প্রভুত্ব-প্রয়াসী শ্বেতকায় চক্রান্তে জর্জরিত। বুদ্ধ চেয়ে রইলেন একদা মাতৃভূমির দিকে।

ধীরে ধীরে তাঁর ব্যথাভরা নিরাশ দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো' হয়তো উপায় আছে। বিদেশীদের চক্রান্তে দুই খণ্ড করা একই দেশ, একই জাতি, একই মনকে আবার এক করার পরিকল্পনা বুঝি মূর্ত হয়ে উঠলো বুদ্ধের অন্তরে দৃষ্টি-পথে। পাহাড় কেটে খনিজ, মেকং ডেলটার শস্য, দুই ভাই-এর সমবেত চেষ্টা। আবার সব ঝলমল করে উঠবে চারদিকে। বিদেশী প্রভুদের জাল সরিয়ে দিয়ে মুক্ত হবে দেশ, গাঢ় হবে আকাশের নীল।

বুদ্ধ চেয়ে রইলেন। তাঁর আশাভরা চোখে প্রতিফলিত হল মেকং ডেলটার ঘন চাপবাঁধা সবুজ।

ধীরে ধীরে শস্যশ্যামল দক্ষিণের দেশে জেগে উঠলো অসন্তোষের কালো ধোঁয়া। অনাচারের মধ্যে যে ভাঙনের বীজ সুপ্ত হয়ে ছিল এতকাল অঙ্কুরিত হল তা মারণমূর্তি পরিগ্রহ করে। উত্তরের দেশ থেকে প্রথমে মূক সম্মতি ও ক্রমে সাহায্য পেয়ে পরিপুষ্ট হল একটি আন্দোলন। সশস্ত্র বিপ্লব। কথা নয়— কাজ, অনাচার ও তাঁবেদারীর সমূলে বিনাশ।

স্পষ্ট কথা তাদের। বিদেশী প্রভুত্ব থাকবে না এ দেশের মাটিতে। আপন মত অনুযায়ী স্থির করবে দেশের নীতিবাদ, শাসনব্যবস্থা ও ভবিষ্যৎ পন্থা। বিদেশী মার্কিন—কে তোমরা? কি চাও? কেন এসেছ?

বিদেশী মার্কিন কিছু বলে না। কেন বলবে? এ দেশের কলকাঠির সব চাবি তাদের হাতে। তারাই [illegible] তাঁবেদার সরকার চীৎকার করে উঠলো আন্দোলনের বিরুদ্ধে। বললো, দেশের শত্রু তোমরা। উত্তরের প্ররোচনায় ভাল-মন্দের জ্ঞান হারিয়েছ। বিদেশী মার্কিন প্রভুত্বের জন্যে আসে নি, এসেছে সাহায্যের ডালি সাজিয়ে। লক্ষ লক্ষ ডলার বিলিয়ে দিচ্ছে, দিচ্ছে নানা সামগ্রী। বন্ধ করো এ আন্দোলন, নয়তো যে উপায়েই হোক না কেন বিনাশ করবো তোমাদের।

কালো ধোঁয়ার মাঝে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা দিল এবার। দক্ষিণী সৈন্য এগিয়ে গেল সে অগ্নিস্ফুলিংগ নেভাতে কিন্তু পারল না। মরণভয় ছড়িয়ে পড়ল তাদের মাঝে।

বিদেশী মার্কিন এবার নড়েচড়ে বসলো। তাদের এতদিনের পরিশ্রম বিফলে যেতে বসেছে। প্রভুত্বের নতুন জমি আজকাল বড়ই দুষ্প্রাপ্য।

কলকাঠির চাপে দক্ষিণী সরকার সাহায্যের প্রার্থনা জানালেন। এবার শুধু ডলার নয়, সৈন্য—যুদ্ধ-সরঞ্জাম—গোলা-বারুদ—বিমান। রাজ্যের অবস্থা টলমল। আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশে। রাজধানীর পথে পথে শোনা গেল মেশিন-গানের মৃত্যুসংগীত। বোমার আঘাতে ধ্বসে পড়ল তাঁবেদার সরকারের ভিত। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল রাজ্যের সর্বত্র।

জাহাজে জাহাজে উপসাগরের জল ভরে উঠলো। সাহায্য ও শান্তির জন্যে যারা এসেছিল, রাইফেল হাতে তুলে নিল তারা। জাহাজ থেকে সৈন্য নামলো হাজারে হাজারে। নামলো ট্যাঙ্ক, কামান ও অজস্র গোলা-বারুদ। বিমানবন্দরে আগমন হল স্কোয়াড্রনের পর স্কোয়াড্রন বিমানের।

[ক্রমশঃ]

৬· ১৯০০—৫০ঃ উপন্যাসের বয়ঃপ্রাপ্তি

মার্কিন উপন্যাসের এই শতাব্দীর ইতিহাসে প্রথম দিকে সমাজবাস্তবতার দৃষ্টি প্রখরতর হয়েছে, সমালোচকী মন আরো ক্ষমাহীন হয়ে শ্লেষব্যঙ্গ আশ্রয় করেছে। কিন্তু উপন্যাসের গঠনরীতি বা প্রকাশকৌশলের তেমন কোন রূপান্তর ঘটে নি। এই দিকে পরিবর্তন আসে প্রথম মহাযুদ্ধের পর। জন ডস প্যাসস (১৮৯৬—), উইলিয়ম ফকনর (১৮৯৭—১৯৬২), ও আর্নেস্ট হেমিংওয়ে (১৮৯৯—১৯৬১), তিনজনেই প্রথম মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, সৈনিকের ভূমিকায়। নির্মমতায় ও ব্যাপকতায় এই মহাযুদ্ধ তার আগের সব যুদ্ধকেই ছাপিয়ে গেছল (যেমন পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রথম মহাযুদ্ধকে)। মানবচরিত্রের এক ভয়ংকর রূপ, মানবনীতির চরম বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করে দেশে ফিরে, দেশের মানুষের আত্মতৃপ্ত উদাসীনতা ও স্বার্থসন্ধানী কর্মকাণ্ড দেখে তাঁরা স্বভাবতই বিচলিত হয়েছিলেন। তাঁরা যেমন এই জনমণ্ডলী থেকে তাঁদের দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতা উপলব্ধি করেছিলেন, তেমনিই আবার সাহিত্যের অভূতপূর্ব অভাবিত কোন রূপকৌশলের প্রয়োগে এই জনমণ্ডলীকে হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তোলার একটা তাগিদও বোধ করেছিলেন। যুদ্ধপ্রত্যাগত আরেকজন লেখক ই· ই· কামিংসের রচনা সমালোচনাকালে ১৯২২ সালে ডস প্যাসস লেখেনঃ "শেষ পর্যন্ত এতকাল পরে একটা বিশিষ্ট রূপরীতি, ব্যক্তিবিশেষের স্বকীয় দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ একটা অস্তিত্বের স্বাদ পাওয়া গেল......এই বইটির নিঃসংকোচ ও বেপরোয়া পরিকল্পনা খবরের কাগজে লেখক বা বইয়ের ব্যবসায়ী পাড়ার পরোয়া করে নি; উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ইতিহাস, ভ্রমণবৃত্তান্ত ইত্যাদি মার্কামারা খুপরিগুলির মধ্যে এঁটেসেঁটে ঢুকে যাবার চেষ্টা করে নি। এই রচনার অস্তিত্বের জন্যই ব্যাখ্যা পাওয়া যায়; লেখকের অস্তিত্বের কোন একটি খণ্ডমাত্র তাকে এমনই নাড়া দিয়েছিল, উত্তেজিত করে তুলেছিল, যাতে তিনি এমন মজা পেয়েছিলেন যে, কাগজের উপর ঘটনার প্রবাহ 'অবাধে দুর্বিনীত আবেগে বয়ে গেছে।... ছকে বাঁধা এই যুগে অধিকাংশ লেখকই যখন ব্যক্তিগত সুনাম বাঁচাতে সচেষ্ট.... তাঁদের চারপাশে ও তাঁদের নিজেদেরই মধ্যে যে জীবন, তাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে ভয় পান......তখন এই বইটিই বেপরোয়া প্রাণময়তার সেই চেতনায় পৌঁছেছে, যাতে মানুষ কল্পনায় সেই তীব্র আবেগ লাভ করে যার মধ্য দিয়েই আমাদের চতুষ্পার্শ্বের বন্দশাসিত জীবনের প্রাণহীন জটিলতাকে সৃষ্টির উচ্ছল ধারায় দ্রবীভূত করা যায়। আর সাবধানী

হেমিংওয়ে ·

হবার কোন মানে হয় না।" [দ্রঃ এডমণ্ড উইলসন সম্পাদিত 'দ শক্ অফ্ রেকগ্নিশন']

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই পর্বের সমগ্র অভিজ্ঞতাই এত জটিল, আর কোন একক তাৎপর্য আবিষ্কার করা এমনই অসম্ভব যে উপন্যাসের সাবেকি আখ্যানরীতি না ভেঙে যেন উপায় নেই, এই বোধেই ডস প্যাসস তাঁর 'ইউ· এস· এ' নামে পরিচিত উপন্যাসত্রয়ীতে ('দ ফর্টিসেকণ্ড প্যারালেল', 'নাইনটীন নাইনটীন' 'দ বিগ মানি') মহাযুদ্ধের আগের পর্ব থেকে শুরু করে যুদ্ধোত্তরকালের সামাজিক ইতিহাস রচনায় একাধিক আঙ্গিককৌশলের সাহায্য নিয়েছেন। সমাজের বিভিন্ন স্তর ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তিনি দশ-বারোটি নরনারীকে বেছে নিয়ে তাদের আশৈশব জীবনকাহিনী রচনা করেছেন, আলাদা আলাদাভাবেই তাদের কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে কখনও কখনও দেখা সাক্ষাৎ ঘটলেও তাদের জীবন সত্যিই কখনও মিশে জড়িয়ে যায় না, তারা আলাদাই থাকে। এদের জীবনপ্রবাহকে বার বার অতর্কিতে ভেঙে চলে আসে 'নিউজরীল' বা সংবাদপ্রবাহ—খবরের কাগজের হেডলাইন, খবরের টুকরো, সম্পাদকীয় প্রবন্ধের উদ্ধৃতি, প্রচলিত জনপ্রিয় গানের ছত্র, ইত্যাদিঃ সমকালীন জীবনের ঘটনাস্রোত যেন এই অংশগুলিতে ধরা পড়ে। নয়তো 'ক্যামেরা আই' বা ক্যামেরার চোখ কোন এক সংবেদনশীল কবির একান্ত ব্যক্তিক ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির তীব্র অন্তরঙ্গ প্রবাহ, শব্দ-গন্ধ-দৃশ্য-স্পর্শের চেতনা। এই 'ক্যামেরা আই' অংশে ভাষা ছেদহীন, যতিচিহ্নবিহীন, ব্যাকরণের নিয়মের পরোয়া করে না। এই অংশের ভাষার প্রয়োগে ডস প্যাসস অনুকরণ করেছেন আইরিশ কথাসাহিত্যিক জেমস্ জয়েসের 'চেতনাপ্রবাহের' রীতি। জয়েস্ও ভাষাকে অবাধ মুক্তি দিয়ে মানুষের মনের স্বচ্ছন্দ প্রবাহকে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। ডস প্যাসসেরও সেই লক্ষ্য। [জয়েসের রচনারীতিকে 'আন্তর্লীন স্বগতোক্তি' বলেও বর্ণনা করা হয়েছে ঃ এই রীতিতে কোন চরিত্র যেন যুক্তি বা বোধ্যতার কথা না ভেবেই তার গভীরতম সেই চিন্তা, যা সাধারণত অনুচ্চারিতই থেকে যায়, সেই চিন্তাকেই তার স্বাভাবিক গভীরতায় প্রকাশ করে। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, জয়েস বিষয়গত বাস্তবের জগৎকে অবহেলা করে ব্যক্তিবিশেষের মনের ঘটনাতেই আগ্রহী ছিলেন। তাঁর 'ইউলিসিস' উপন্যাসে ডাবলিন শহরের উপস্থিতি,

'তার ইতিহাস ও রাজনীতির চেতনা অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত।] ডস প্যাসস যে তৃতীয় আঙ্গিকপ্রকরণ ব্যবহার করেছেন, সেটি হল জীবনবৃত্তান্ত—সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে খ্যাতিমান কয়েকজন মার্কিন নাগরিকের জীবনী। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী জন রীড, রাষ্ট্রপতি থিওডোর রুজভেল্ট ও উড্রো উইলসন, শিল্পপতি কার্নেগি ও ফোর্ড, শ্রমিক নেতা জো হিল, নৃত্যশিল্পী ইজাডোরা ডানকান, চিত্রতারকা রুডল্ফ ভ্যালেন্টিনো, স্থপতি ফ্র্যাংক লয়েড রাইট ও বৈমানিক রাইট ভ্রাতৃদ্বয়। এই তিনটি আঙ্গিকপ্রকরণের মধ্যে নিউজরীল ও জীবনবৃত্তান্তে যেমন বৃহত্তর জীবনযাত্রার পটভূমি রচিত হয়, ক্যামেরা আই অংশগুলিতে তেমনই এক নিঃসঙ্গ নামহীন পর্যবেক্ষকের জীবনানুভূতি। এই দুই প্রান্তেই সীমায়িত ডস প্যাসসের চরিত্রগুলির জীবন। সেই জীবনযাত্রায় সাফল্যে পৌঁছবার প্রবল সাধ ছাড়া যেন আর কিছুই নেই—যেমন তেমন করে সাফল্যে পৌঁছতে হবেই। ডস প্যাসসের কল্পনায় ব্যবসায়িক ব্যবস্থা ও যন্ত্র এমনই সর্বশক্তিমান যে ব্যক্তির সাধ আকাঙ্ক্ষা নিতান্তই নিরর্থক ও তুচ্ছ মনে হতে বাধ্য।

ডস প্যাসসের পূর্ববর্তী সৃষ্টি 'ম্যানহ্যাটান ট্রান্সফার' সম্পর্কে ডি এচ লরেন্স তাঁর সমালোচনায় ('ক্যালেন্ডার অফ মডার্ন লেটার্স' পত্রিকায়, এপ্রিল ১৯২৭) যা লিখেছিলেন, তাঁর পরবর্তী রচনা সম্পর্কেও তা প্রযোজ্য : "মানুষ যারে যাবে, বারে বারে দেখা দেয়, এমন এক বিশৃঙ্খলায় যার মধ্যে কোন ছন্দ নেই, কিন্তু তারই মধ্যে আমরা শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করি সাফল্য অসাফল্যের নিরন্তর হৃৎস্পন্দন; যার পরিণতি অমোঘ ব্যর্থতায়, যদি জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়; এবং অতঃপর আরেক শূন্যতার দিকে মোহাচ্ছন্ন যাত্রা। সব ধ্বনি গ্রথিত করে রাখতে পারে এমন এক টেপরেকর্ডার যদি চালু করে রাখেন, একদল বিচ্ছিন্ন মানুষ অকস্মাৎ পরস্পরের কাছাকাছি এসে পড়ে পরস্পরকে স্পর্শ করে, তার আলোকচিত্র গ্রহণ করে রাখবার জন্য যদি এক চলচ্চিত্রের ক্যামেরা চালু করে রাখেন, তবেই মোটামুটি ডস প্যাসসের রচনারীতি পেয়ে যাবেন। . বহু কাহিনীর জটিলতায় জটিল এ যেন এক চলচ্চিত্র; এতে কোন ক্লোজ-আপ নেই, মধ্যে মধ্যে কোন লেখাও নেই। .বিভ্রান্ত হতে যদি আপনার অসম্মতি না থাকে, তবে ক্রমে উপলব্ধি করবেন যে এই বিভ্রান্তি যথার্থ, ভানমাত্র নয়। এটা জীবন, ভঙ্গি নয়। যষ্টি হয়ে ওঠে জীবনেরই প্রতিরূপ—চেতনায় ধাবিত অসংখ্য বস্তু ও অসংখ্য মানুষের অন্তহীন যাত্রা; কাহিনীর নির্দেশ ছাড়া, অতীত থেকে বর্তমান, যৌবন থেকে বার্ধক্য, জন্ম থেকে মৃত্যু, এ ছাড়া আর আর কোন পথ নেই, কোন স্পষ্ট লক্ষ্যই নেই। ক্রমে বোঝা যায়, এই প্রবাহের প্রচণ্ড গতির উৎসে সাফল্যের উদ্‌ভ্রান্ত অদ্ভুত কামনা—স্বার্থসর্বস্ব ব্যক্তিগত সাফল্যের।"

ডস প্যাসসের ঝোঁক ছিল এই বাস্তবকে তুলে ধরায়। তিনি তার কোন বিষয়গত বিশ্লেষ অথবা তার কোন তাৎপর্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেন নি। হেমিংওয়ে যুদ্ধ, ধ্বংস, হিংসা ও মৃত্যুকে তাঁর কালের চরিত্র বলে ধরেছিলেন। দুই মহাযুদ্ধ ও স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে স্পেনীয় প্রজাতন্ত্রের সপক্ষে লড়তে গিয়ে, এবং মৃগয়ায় তিনি বহুবার মৃত্যুর সান্নিধ্য উপলব্ধি করেছেন; দেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশে তিনি ন' বার গুলী খেয়েছেন, তার মধ্যে মাথায় দুবার, এবং অন্তত পাঁচবার গুরুতর দুর্ঘটনায় পড়েছেন। তিনি বলেছেন, তিনি "যুদ্ধকে যেমন ঘৃণা করেন, তেমনি ঘৃণা করেন সেই সব রাজনীতিবিদদের যাদের অকর্মণ্যতা, নির্বুদ্ধিতা, লোভ, স্বার্থপরতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা যুদ্ধ ডেকে আনে, যুদ্ধ অনিবার্য করে তোলে।" ১৯৩৯ সালে রুশ সমালোচক আইভান কাশকীনকে লেখা এক চিঠিতে তিনি লেখেন, "আমরা জানি যুদ্ধ খারাপ। তবুও কখনও কখনও যুদ্ধ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু তবুও যুদ্ধ খারাপই, যে লোক বলবে, তা নয়, সে মিথ্যাবাদী। কিন্তু যুদ্ধের কথা সততার সঙ্গে লেখা বড় জটিল, কঠিন। যুদ্ধ একবার বেধে গেলে, একটাই পথ থাকে—প্রাণপণে জিতবার চেষ্টা করে যেতে হয়। . যুদ্ধের গল্প লিখতে গিয়ে আমি তার সব দিক দেখাবার চেষ্টা করি, শান্তভাবে সততার সঙ্গে নানাভাবে আমি তাকে পরীক্ষা করে দেখি।" যুদ্ধের বর্ণনায় হেমিংওয়ের ভাষা এক মমত্বহীন নিষ্করুণ নির্লিপ্ততা লাভ করেছে—স্বল্পায়ত বাক্য, ছোট ছোট শব্দ, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ। হেমিংওয়ের প্রথম গল্পগ্রন্থ পড়ে ডি এচ লরেনস মন্তব্য করেছিলেন, "যেন একটা দেশলাইয়ের কাঠির অতর্কিতে জ্বলে ওঠা।" আবেগময়তা কখনও হেমিংওয়েকে আচ্ছন্ন করে না বৈনাশিক যুদ্ধের তীব্রতম অভিজ্ঞতার মুখোমুখিও। করবেই বা কেন ? "গৌরব, মর্যাদা, বীর্য—নির্বস্তুক কথাগুলো অশালীন শোনায়, তার চেয়ে ঢের দামী গ্রামগুলোর বাস্তব নাম, রেজিমেন্টের নাম, তারিখগুলো।" লরেন্সের 'লেডি চ্যাটার্লি'জ লাভার'-এও প্রায় একই সুর : "কনি-র মনে হয়, ঐ বড় বড় কথাগুলো তার যুগে সব বাতিল হয়ে গেছে : প্রেম, আনন্দ, সুখ, সংসার, মাতা, পিতা, স্বামী, ঐ সব জমকালো কথাগুলো একদিন জীবন্ত চেতনায় প্রাণপূর্ণ ছিল, আজ অবমৃত, দিনে দিনে নতুন করে মরছে। কিন্তু টাকা ? সে বেলায় ও কথা খাটবে না। টাকা সব সময়েই চাই। টাকা তোমাকে জমাতেই হবে। বাকি সবই, না হলেও চলবে। শুধু টাকা কয়, টাকা।" [প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আরেকজন মার্কিন লেখিকা আয়ন্‌রাঁড স্টাইন গভীর বিশ্বাসে বলেছিলেন, "পশুকুল থেকে মানুষের পার্থক্যের চিহ্ন হচ্ছে টাকা। টাকা একান্তভাবেই মানুষের সৃষ্টি এবং সেই কথাটা মনে রাখা বড় দরকার, বড় বেশি দরকার। কমিউনিস্টদের নিয়ে মুশকিলই হল, তারা টাকা বাদ দিয়ে বাঁচতে চায়। ফলে তারা পশুতে পরিণত হয়।" দ্রঃ 'এভরিবডিজ অটোবায়োগ্রাফি'।]

তবুও যুদ্ধের মধ্যেই মানবধর্মকে, প্রেমকে সংহতিচেতনাকে, বীর্যকে, বন্ধুত্বকে, ইন্দ্রিয়জ সংবেদনশীলতাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াসই জীবনকে একটা সদর্থক লক্ষ্য যোগাতে পারে। হেমিংওয়ের 'ফর হুম দ বেল টোলস' উপন্যাসেই তাঁর যুদ্ধদর্শনের পরিণততম রূপ। উপন্যাসের নামকরণ সপ্তদশ শতকের ইংরেজ কবি জন ডান-এর এক নীতিভাষণ থেকে : "কোন মানুষ দ্বীপ নয়, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নয়। প্রত্যেক মানুষ মহাদেশের অংশ, স্থলদেশের অঙ্গ। সমুদ্র যদি মাটির একটা খণ্ডও ভাসিয়ে নিয়ে যায়, য়োরোপই তার দেহের পরিসর হারায়। তোমার বন্ধুর জমি যাক তোমার নিজের জমি যাক অথবা একটা শৈলান্তরীপ যাক, ক্ষতি সমানই। যে কোন মানুষের মৃত্যু আমাকেই খর্ব করে—কেন না, আমি বিশাল মানবসমাজেরই একজন। কার মৃত্যুতে ঘণ্টা বাজছে, প্রশ্ন কর না : ও ঘণ্টা তোমারই মৃত্যুতে বাজছে।" এই চেতনা নিয়েই হেমিংওয়ের নায়ক রবার্ট জরডানের স্পেনীয় প্রজাতন্ত্রের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ। এই যুদ্ধের প্রয়োজন জরডান স্বীকার করে। তার স্পেনীয় সহকর্মী আনসেলমো মনে, "একটা মানুষ, যে আমাদেরই একজন, তাকে মারলে ভালো হয় না।" তবু আদর্শের জন্য যে যুদ্ধ, সে যুদ্ধে তার হাত কাঁপে না। সে বলে, "হ্যাঁ, আমি মানুষকে হত্যা করেছি বহুবার—আরো বহুবার করব কিন্তু আনন্দে নয় হত্যাকে পাপ বলে জেনেই।" রবার্ট জরডানের মৃত্যুতে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি নয়, উপন্যাসের শেষ ছত্রে "বনের পাইন কাঁটা-বিছানো মেঝেয় সে তার হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করছে।" জরডানের মৃত্যু অবধারিত, তবুও বিশেষ কারণেই হেমিংওয়ে তার জীবনান্ত দেখান না। জরডানের মৃত্যু ঘটলে যেন প্রমাণ হয়ে যেত যুদ্ধ কেবলই বৈনাশিক, নিষ্ঠুর, নঞর্থক।

অন্যদিকে জরডানের জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনার ইংগিত দিলে যুদ্ধের অনর্থক দিকই কেবল প্রকাশ পেত। হেমিংওয়ে উভয় সিদ্ধান্তই এড়িয়েছেন।

যুদ্ধান্তেও যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন হেমিংওয়ের নায়কদের ক্লিষ্ট করে। তিনি কি বলতে চান, এ যুগে আমরা কেউই যুদ্ধের ছোঁয়াচ থেকে পার পাই নি? 'ফিয়েস্টা' উপন্যাসের নায়ক জেক বার্নস যুদ্ধক্ষেত্রের আঘাতে তার পুরুষত্ব হারিয়েছে; ব্রেট-এর ভালোবাসা পেয়েও তার জীবনে প্রেম ব্যর্থ; ব্রেট-ও মদে চুর হয়ে রাতভর উচ্ছৃংখলতার পর জেক-এর কাছেই ফিরে আসে, বলে, "জেক, বল, আমরা দুজনে কী সুখের একটা জীবন কাটাতে পারতাম!" জেক বলে, 'হ্যাঁ, ভাবতেও কত ভালো লাগে, তাই না?' 'অ্যাক্রস দ রিভার অ্যান্ড ইনটু দ ট্রীজ' উপন্যাসের নায়ক কর্নেল কান্টওয়েল আয়নার দিকে তাকালেই যুদ্ধে বিকৃত নিজের মুখ দেখে আঁৎকে ওঠে; যুদ্ধে আঘাতে জর্জরিত তার বীভৎস হাতটা কী-এক দুর্জ্ঞেয় মায়ায় প্রেমিকা রেনাটাকে টানে। 'আফ্রিকার সবুজ পাহাড়ের' মৃগয়ায় কিংবা স্পেনের ষাঁড়ে-মানুষে লড়াই বুলফাইট-এ ঐ যুদ্ধেরই অন্য রূপ। 'ফিয়েস্টা' উপন্যাসে রোমেরো যখন তাকে কী নিষ্ঠুর-ভাবে হত্যা করে, কিন্তু তার পরেই মরা ষাঁড়ের কাটা কানটা ব্রেট-এর হাতে দিয়ে বলে: "দেখো, রক্ত লাগিয়ো না যেন।" অসম সাহসে এই অবাধ্য পশুকে দমন করতে গিয়ে সে যেন তার নিজের অন্তরের পশুপ্রবৃত্তিগুলিকেও দমন করেছে, সে যেন তার নিজের মনুষ্যত্বকে নতুন করে আবিষ্কার করেছে।

হেমিংওয়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস 'দি ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ সী' তাঁর আগের রচনাগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত, জীবনদৃষ্টির সাদৃশ্যে। কিন্তু এই প্রথম হেমিংওয়ে নারীপুরুষের সম্পর্ক, রাষ্ট্রনীতি, দৈনন্দিনের জীবন ইত্যাদি ছেড়ে বহুদূরে সরে গেছেন—একেবারে মাঝ সমুদ্রে। এই প্রথম তাঁর নায়ক একেবারে একা। সান্টিয়াগোও সেটা বোঝে। সে নিজেই পরে বলে: "বড় দূরে চলে গেছলাম"—"ছেলেটা যদি সঙ্গে থাকত!" বৃদ্ধ সান্টিয়াগো কি শেষ পর্যন্ত জয়ী হল? সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করে সে ছিনিয়ে এনেছে মার্লিন মাছের আঠারো ফিট কংকাল—এমন মাছ কখনও ধরা পড়ে নি।' কিন্তু মাছটা যদি অক্ষতদেহে আসত, বাজারে যেত, পাউন্ড প্রতি ত্রিশ সেন্ট দরে হাজার পাউন্ড বিক্রি হত? তার মাংস "বাজারে সবচেয়ে সেরা দামে বিকিয়ে যেত।" তবেই তার এই জয় তার জীবনের অংশ হয়ে উঠত, "ক্ষুধার শান্তি" থেকে মুক্তি, আসত। কিন্তু তা হল না। সান্টিয়াগোর জয় রয়ে গেল অপার্থিব, নির্বস্তুক এবং সেইহেতু অসম্পূর্ণ। ডাঙা থেকে বড় দূরে চলে গেছল, আর বালক সঙ্গী মনোলিসকে সঙ্গে নেয় নি বলেই সান্টিয়াগোর জয় তার জীবনে প্রবেশ করে নি। এই অভিজ্ঞতায় শিক্ষিত সান্টিয়াগো সংকল্প করে, সে আবার পাড়ি দেবে—নতুন পাড়িতে সঙ্গী থাকবে মনোলিস: "আবার আমরা একসঙ্গে মাছ ধরব।" সান্টিয়াগো সেই সংহতিচেতনায় ফিরে এসেই খবরের কাগজ দেখতে চায়। ক্ষুধা, বিরোধ, দ্বন্দ্বের পৃথিবীতে সে আবার ফিরে আসে।

হেমিংওয়ের তুলনায় উইলিয়ম ফকনরের (১৮৯৭—১৯৬২) জীবনপরিসর সীমিত। ফকনর তাঁর গল্প উপন্যাসে বেছে নিয়েছেন ইয়োকনাপাটোফা নামে একটি জেলা, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ দেশের অন্তর্গত। এই দক্ষিণ দেশই গৃহযুদ্ধে দাসত্বপ্রথা, বর্ণবিদ্বেষ ও তৎসান্নিহিত তাবৎ রক্ষণশীল ভাবধারার সপক্ষে অস্ত্রধারণ করেছিল। রাজনৈতিক বা সামরিক পরাভবে এই দক্ষিণ দেশ ক্ষুব্ধ হয়েছে, তারপর বহু বছর ধরে, বস্তুত এখনও, সেই ক্ষোভ লালন করে চলেছে। ফকনর এই দক্ষিণ দেশের অভিজাত পরিবারগুলিকে দেখেছেন বিকৃত মানসিকতার দাসরূপে। উপন্যাসের পর উপন্যাসে ইয়োকনাপাটোফা নামে সেই কাল্পনিক (আসলে নাকি মিসিসিপি রাজ্যের লাফায়েৎ কাউন্টি) জেলার সেই পুরনো পরিবারগুলিই ফিরে আসে—সার্টোরিস, কম্পসন, ম্যাক্যাসলিন, সাট্‌পেন, কোল্ডফীল্ড। অন্যদিকে ক্ষমতায় উঠে আসে স্নোপস পরিবার—কোন অভিজাত পরিচয়ই যাদের নেই, যারা অদ্ভুত নীতিহীনতায় টাকা জমায়, জমিয়ে টাকা দিয়ে ক্ষমতা কেনে। এদের আশে-পাশে যে সাধারণ পরিচয়হীন জনতা, তারাও এদের এই মানসিকতা থেকে মুক্ত নয়। তাই ফকনরের উপন্যাসে জনতা বারে বারে সন্দেহভাজন কোন অসহায়কে নির্মম পাশবিকতায় হত্যা করে। এর বাইরেও অবশ্য কিছু লোক আছে, নিতান্তই মুষ্টিমেয়, এদের মধ্যে যারা ভদ্রলোক, তারা অন্যায়কে অন্যায় বলে উপলব্ধি করে, তাকে প্রতিরোধ করতে ভয় পায়, ধার্মিকতার গ্লানিতে কষ্ট পায়; যেমন হরেস বেনবো ('স্যাংক্‌চুয়ারি') কিংবা গেল হাইটাওয়ার ('লাইট ইন অগাস্ট'); যারা আরো সাধারণ মানুষ, তারা মানবধর্মের শুদ্ধতম প্রবৃত্তিগুলিকে তুলে ধরে; যেমন ডিলসি ('দ সাউন্ড অ্যান্ড দ ফিউরি') বায়রন বাঞ্চ ('লাইট ইন অগাস্ট'), রুবি গুডউইন ('স্যাংক্‌চুয়ারি')। এই সব মিলিয়েই দক্ষিণ দেশ। উপন্যাসের কলা-পরিকল্পনায় ফকনর নিজেকে সর্বজ্ঞ লেখকের ভূমিকায় বসান না। বরং সংজ্ঞ আখ্যানধর্মের বদলে বহুস্তর দৃষ্টি বা একাধিক চরিত্রকে দিয়ে কাহিনী বলানোর আঙ্গিকই তিনি গ্রহণ করেছেন। এই আঙ্গিকের সহজতম রূপ 'অ্যাজ আই লে ডাইইং' উপন্যাসে, জটিলতর রূপ 'অ্যাবস্যালম অ্যাবস্যালম'-এ, জটিলতম রূপ 'দ সাউন্ড অ্যান্ড দ ফিউরি' উপন্যাসে। এর চারটি পর্ব চারজনের জবানীতে। প্রথম পর্বে কাহিনীকার বেনজি—তেত্রিশ বছরের এক হাবা। দ্বিতীয় পর্বে কোয়েনটিন—বেনজির ভাই। তৃতীয় পর্বে জেসন, তাদেরই আরেক ভাই। চতুর্থ পর্বে উপন্যাসকার নিজেই কাহিনীকার। চারটি দিনে চারটি চরিত্রের চৈতন্য প্রবাহের মধ্য দিয়েই উপন্যাসের কাহিনী গ্রথিত। প্রথম পর্বে অপরিণত অস্থির মস্তিষ্কের প্রলাপ-ভাষণে এক অবোধ্য পরিবেশের দুঃসহ ভারে পীড়িত বেনজির অন্তহীন জ্বালা যেমন আমাদের যন্ত্রণা দেয়, তেমনি অতীত-বর্তমানের ভেদহীন পারম্পর্যবিহীন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি যেন আরো তীব্র হয়ে ওঠে। বংশগৌরবের মিথ্যা দেমাক ও সংস্কারকে ভাঙতে গিয়ে এবাড়ির মেয়ে ক্যানডেস তলিয়ে যায়, আচার সংস্কারের সেই অমর্যাদায় বিচলিত কোয়েনটিন আত্মঘাতী হয়, জেসন তার মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে আরো নিকরুণ হয়। জেসনের মধ্যে পুরনো কুলগর্বের অহমিকা ও দক্ষিণী সংকীর্ণতার সঙ্গে মিশেছে নতুন ব্যবসায়ীর শঠ ক্রূরতা।

যে সমাজ অচল, দূষিত, তার প্রতি কোন মোহ আচ্ছন্ন না হয়েও ফকনর সেই সমাজের যথার্থ বিশ্লেষ রচনা করেছেন, বিষয়ীগত পক্ষপাত এড়ালেন বলে কলা-পরিকল্পনায় বহুমাত্রিকতা এনেছেন; তাঁর ভৌগোলিক ক্ষেত্র সীমিত হলেও ফকনর তার বিচারে বিস্তার এনেছেন, বিস্তারের চেয়েও যা বড়, গভীরতা এনেছেন।

হেমিংওয়ে ও ফকনরের মহীরুহস্বরূপ উপস্থিতির পাশে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক জন স্টাইনবেক (১৯০২—) ও টমাস উলফ (১৯০০—১৯৩৮)-কে তেমন মূল্য দেওয়া যায় না। প্রথম দিকের রচনায় প্রকৃতির জৈব শক্তির চেতনা বা পরে শহরের ভব-ঘুরেদের জীবনের আদিম আত্মীয়তা, কিংবা 'দ গ্রেপস অফ রথ'-এর সমাজ-বাস্তবতা ত্রিশের যুগে যতটা দামী লেগেছিল, আজ আর ততটা লাগে না। তবুও স্টাইনবেক আজও পড়া যায়, অন্তত সাবলীল বাস্তবতাগুণসমৃদ্ধ ভাষার কারণে। উলফ পড়তে কষ্ট হয়, ভাষার অহৈতুকী আড়ম্বরে—সে-আড়ম্বর তাঁর চিন্তার দীনতা ও যুক্তিহীন উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কোনটাই গোপন করতে পারে না।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

কোন্ সুভাষচন্দ্র বোলার নিকটে হাজির হয়েছিলেন, তার একটি চমৎকার চিত্র আমরা পেয়েছি সম্প্রতি প্রকাশিত জনৈক চেক মহিলার স্মৃতিকথা থেকে। মহিলার নাম কিটি কুর্তি গ্রন্থের নাম Subhas Chandra Bose As I Knew Him চেক ভদ্রমহিলা [illegible] এবং মিস্টিক প্রকৃতির। [illegible] তিনি [illegible] [illegible] এই সুভাষচন্দ্রের [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] এবং [illegible] [illegible] করেছেন। এ বিষয়ে [illegible] ও অনুশীলনের যথেষ্ট পরিচয় এই গ্রন্থে পাঠক পাবেন। এই পরম আধ্যাত্মিক মানুষটি কিন্তু বাইরের দুই হাতে রাজনীতিকে [illegible] ছিলেন সে বিষয়েও তাই অনেক কথা গ্রন্থটিতে আছে।

শ্রীমতী কুর্তির লেখা থেকে কিছু ছবি তুলে ধরা যাক।

১৯৩৩ এর বসন্তকালের বার্লিনে সুভাষচন্দ্রকে এই মহিলা প্রথম দেখেন। বার্লিনের বনে ও উপবনে তখন বসন্ত এসে গেছে, কিন্তু শ্রীমতী কুর্তির মন নয়, কারণ চেকোশ্লোভাকিয়ার সামনে খাড়া হয়ে উঠেছে অস্ট্রিয়া। অস্ট্রিয়া কি মোজার্টকে দেয় নি—তাঁর সঙ্গীতের অফুরন্ত আনন্দধারাকে? অস্ট্রিয়া কি হিটলারকে দেয় নি—যার দান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ!" মোজার্টের বুকের সামনে বেয়নেট তুলে উদ্যত হিটলার। সেই দিকে চোখ রেখে, বসন্তেও আতঙ্কিত নব-বিবাহিত মহিলাটি একদিন ঘরে ফিরছিলেন, এমন সময়ে

"হঠাৎ চমকে দেখি একটি বিস্ময়-কর মূর্তি ধীর পদক্ষেপে আমার দিকে আসছে। দীর্ঘ আকার, কৃশ-কায়, স্পষ্টই ভারতীয়। কালো রঙের স্যুট পরা প্রায় পাদদেশের [illegible]। মাথায় ক্রীম রঙের ছোট [illegible]। মুখ ঘন অলিভ [illegible] গোলপানা, শিশুর সরলতা [illegible] কিন্তু বিস্ময়করভাবে [illegible]।

[illegible] বুদ্ধিদীপ্তি মাত্র [illegible] নি, [illegible] তার সর্বব্যাপক দৃষ্টিও, [illegible] জিনিসের পরিমাপ [illegible] মধ্যে কেন্দ্রের মর্ম-[illegible] উপস্থিত [illegible] আর [illegible] চলার ভঙ্গি। মন্থর, ঋজু পদক্ষেপে অসামান্য মর্যাদা ও সংযমের দৃঢ়তা। [illegible] প্রথম দর্শন। কোনো [illegible] এক পুরুষের [illegible] মিস্টিক, আধ্যাত্মিক [illegible]। হায়, তরুণী নারী না হয়ে আমি কেন তরুণ যুবক হলাম না। সোজা তাঁর কাছে এগিয়ে গিয়ে আত্মপরিচয় দিয়ে খোলাখুলি কথা [illegible] পারতাম। কী দুঃখ-জনক এই আদবকায়দার দাসত্ব! কী দুঃখজনক—বার্লিনের মত [illegible] রাজ্যে এমন একটি মানুষের এক প্রাজ্ঞ হিন্দুর—সংস্পর্শের সুযোগ হারালাম। আধ্যাত্মিকতায় উদ্ভাসিত মানুষটি [illegible] চলে গেলেন, হায় সেই [illegible], যখন [illegible] শক্তির এত প্রয়োজন।"

পুরুষটি কিন্তু শ্রীমতী কুর্তির জীবনে সত্যই হারিয়ে যান নি। দ্বিতীয় দর্শন এক বিচিত্র পরিবেশে মিলল। আমেরিকান [illegible] ক্লাব থেকে রেভারেন্ড জনসন শ্রীমতী কুর্তিকে জানালেন, জনৈক সুভাষচন্দ্র বসু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বলবেন, এ বিষয়ে পূর্বাবধি আগ্রহী কুর্তি দম্পতি ইচ্ছা করলে আসতে পারেন। কুর্তি দম্পতি সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে সবিস্ময়ে দেখেন 'সেই স্পষ্টই আধ্যাত্মিক মানুষটি এই সন্ধ্যার বক্তা, এবং বক্তৃতার বিষয় আধ্যাত্মিক নয় রাজনৈতিক। কিছুটা হতাশ হয়েও শ্রীমতী কুর্তি ভাল করে মানুষটিকে [illegible] চাইলেন।—

আমি [illegible] কদাপি [illegible] ইনি সর্বো-পরি দার্শনিক। দেশের মুক্তির জন্য ইনি যদিও [illegible] সাহসে সংগ্রাম করছেন, [illegible] একই সঙ্গে, মানুষের, সমগ্র [illegible], ভাগ্য ও নিয়তির চিরন্তন চিন্তায় নিরত।'

বক্তৃতা হল। বক্তৃতান্তে ভিড়ের জন্য চেষ্টা করেও শ্রীমতী কুর্তি ঐ মানুষ-টির সঙ্গে আলাপ করতে সমর্থ হলেন না। যাই হোক তিনি রেভারেণ্ড জনসনকে ধন্যবাদ জানানো প্রয়োজন মনে করলেন—এমন একটি সন্ধ্যা, অমন একটি মানুষ ও তাঁর সুস্পষ্ট ভাষণে কোটি কোটি বন্দী মানুষের কণ্ঠস্বর—বক্তৃতার আয়োজনের জন্য রেভারেণ্ড জনসনকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানানো প্রয়োজন। তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে শ্রীমতী কুর্তি দেখলেন তাঁকে কয়েকজন ঘিরে আছে, উচ্চারণভঙ্গিতে বোঝা গেল তারা ইংরেজ। তাদের কথা শুনতে শুনতে রেভারেণ্ডের ললাটে ভ্রূকুটি, মুখ লাল—যেন রাগের জ্বালায় ছটফট করতে লাগলেন। শ্রীমতী কুর্তি অগ্রসর হয়ে তাঁকে বললেন—"মি জনসন,

অসাধারণ আজকের সন্ধ্যাটি। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। অতীব আকর্ষণীয় পুরুষ ঐ মিঃ বসু। আচ্ছা, উনি কে?"

শ্রীমতী কুর্তি রেভারেন্ডকে আগে কখনো রাগতে দেখেন নি; আমন্ত্রিত বক্তাদের বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করার মত অমার্জিত তিনি কদাপি নন। এখন কিন্তু রাগে গরগর করতে করতে বললেন—"জানলে কখনো লোকটিকে নিমন্ত্রণ করি—কক্ষণো না—কক্ষণো না—। লোকটা বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক। সম্ভবত ভারতের মঙ্গলের পক্ষেও বিশ্বাসঘাতক। আমার একদম ভাল লাগছে না। এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা আমার একেবারে উচিত হয় নি।"

শ্রীমতী কুর্তি শুনে স্তম্ভিত। কিন্তু—বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতক কি একই সঙ্গে ভারতের মঙ্গলের পক্ষেও বিশ্বাসঘাতক! মানুষটি সম্বন্ধে রেভারেন্ড অসন্তুষ্ট হলেন কেন—অসন্তুষ্ট হতে পারলেন কিভাবে—মানুষটি এতই আধ্যাত্মিক! রাজনৈতিক? —বাধ্য হয়ে তাই হতে হয়েছে, উপায় ছিল না বলে।

কুর্তি-দম্পতির সঙ্গে মানুষটির অর্থাৎ সুভাষচন্দ্রের পরিচয় সত্যই হয়েছিল। এঁদের আবাসে আমন্ত্রিত হয়ে সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিক ও দার্শনিক বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। বার্লিনের পরিবেশ তখন এই দম্পতির পক্ষে শ্বাসরোধী। আতঙ্কে কম্পমান নগরী। কারাগার, খুন, বিচারের প্রহসন। কনসেনট্রেসন ক্যাম্পের গোঙানি। চিন্তার, সাহিত্যের, সঙ্গীতের মৃত্যু। হিটলার। নির্বাসিত কুর্তি-দম্পতি তবু স্বপ্ন দেখতে চেয়েছেন। একদিকে বার্লিনের বাতাসে হিংসা, অন্যদিকে বসন্ত। পাখির গান ও বুটের শব্দ। প্রেমের হাসি ও ফাঁসির ছায়া, ফুলের গন্ধ আর রক্তের স্বাদ। কুর্তি-দম্পতি ব্যাকুল হয়ে ভাবতে চেয়েছেন হয়ত, হয়ত মানুষ ফিরে পাবে হারানো চৈতন্য; হয়ত বর্তমানের অশুভ সংকেত সত্ত্বেও ভবিষ্যতে বাজবে মঙ্গল-শঙ্খ।' সুভাষচন্দ্র নিমন্ত্রণরক্ষায় আসবেন, প্রতীক্ষায় ছিলেন তাঁরা। যথা সময়ে তিনি এসেছিলেন, দরজার ঘণ্টা বেজেছিল, তিনি ধীরে প্রবেশ করেছিলেন, ঋজু ভঙ্গিতে, অসামান্য মর্যাদার সঙ্গে। সকলে খাওয়ার টেবিলে বসেছিলেন, 'অবিলম্বে আবহাওয়া এক বিচিত্র প্রভাবে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, মনে হয়েছিল বার্লিনের পরিচিত দুঃসহ আলো যেন নির্মল উজ্জ্বল, পরম আকর্ষণীয়, বিচিত্র মানুষটিকে ঘিরে মিস্টিসিজমের দ্যুতি—।' আর মনে হয়েছিল, এই মানুষটির দৃষ্টি গভীরে প্রবেশ করে যায়, ইনি অপর মানুষের তুলনায় অনেক দ্রুত অনুভব করেন, এই রহস্যময় ভ্রাতাটির অসাধারণ ক্ষমতা আছে অন্যের বক্তব্য উপলব্ধি করার, আছে মধুর, মধুর হাসি, মুখে জেগেই আছে তা, অম্লান আলোকধারার মত ঝরে পড়ছে নিয়ত। শ্রীমতী কুর্তি ভোজনকালে জেনেছিলেন, উনি মাংস খান না তা নয়, তবে অল্প খান; যে-হাতে খাচ্ছেন, সুশ্রী তার গড়ন, সরু সংবেদনশীল আঙুল, দেখে বোঝা সম্ভব নয় শক্তি আসে কোথা থেকে—

'মিঃ বসু, বড় স্নিগ্ধ রোদের দিনটি আজ, এখন বেড়িয়ে ফিরছেন নাকি?'—শ্রীমতী কুর্তি প্রশ্ন করেছিলেন।

'না মিসেস কুর্তি, মিঃ গোয়েরিঙ-য়ের সঙ্গে একটা ইন্টারভিউ ছিল; সোজা তাঁর অফিস থেকেই আসছি।'

শুনে চমকে শিউরে উঠলেন তাঁরা। কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছিল তাঁদের। অসম্ভব—অবিশ্বাস্য—আধ্যাত্মিক মানুষটি বলছেন কি? সুভাষচন্দ্রের মত মানুষ অবশ্যই জানবেন নাজী জার্মানী কাদের প্রতিনিধি! সেখানে নৈতিকতার সম্পূর্ণ বিনাশ মানবমূল্যের চরম অস্বীকৃতি। কুর্তি-দম্পতি অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের যন্ত্রণায় কোনো ভঙ্গি ছিল না, অপরপক্ষে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি ভালবাসা ছিল। তাই তাঁদের পক্ষে সুভাষচন্দ্রের যন্ত্রণার আকৃতিকে একই সঙ্গে বোঝা সম্ভব হয়েছিল। শ্রীমতী কুর্তির মথিত গভীর বচনাংশ উদ্ধৃত করছি—

> গোয়েরিঙের সঙ্গে এমন মানুষের কী প্রয়োজন থাকতে পারে? কিভাবে ইনি লোকটার আকার, তার গন্ধ সহ্য করতে পারেন—সেই বৃহৎ পশু—নাজী জার্মানীর খ্যাপা ষাঁড়টিকে? যদি কখনো সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি মানুষ সম্ভবপর হয়, তাহলে গোয়েরিঙ ও বোস তাই।
>
> আমি অবশ্য বুঝেছিলাম, ইউরোপের, বিশেষত গ্রেট ব্রিটেনের সম্পূর্ণ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে ভারত হয়ত স্বাধীনতালাভে সমর্থ হবে। এবং তা ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী যুদ্ধের ফলেই হওয়া সম্ভব, যা ইউরোপকে সম্পূর্ণ দুর্বল করে দিয়ে ভারত ও অন্যান্য উপনিবেশের মুক্তি এনে দেবে।......
>
> হিটলার—গোয়েরিঙ—গোয়েবলস্—এই ত্রিমূর্তি ইউরোপের আবর্জনার প্রতিনিধি। আরও জানতাম যে, সর্বশ্রেণীর নির্বোধ জনতাকে উস্কানি দিতে রয়েছে মহা সুযোগসন্ধানীর দল—বৃহৎ ব্যাঙ্ক, অতিকায় শিল্প, প্রতিপত্তিশালী অভিজাত গোষ্ঠী, এবং নীতিহীন সংবাদপত্র—এরাই এখন বিজয়ী, পতনের যুগে এই হয়ে থাকে। জানতাম, এরা জোটবদ্ধ হয়ে আমাদের সকলকে শেষ করে দিতে পারে; শরীরে, মনে-প্রাণে, ভিতরে বাহিরে, সর্বাংশে ধ্বংস করে দেওয়া সম্ভবপর। মিঃ বসুও তা জানেন, স্পষ্টতঃই। এবং সেই মুহূর্তে আমি বুঝলাম, কেন তিনি বার্লিনে।
>
> এক মুহূর্তের জন্য আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালাম। পরস্পরকে বুঝলাম। আমি বিচলিত। তিনি কাঁধে একটু নাড়া দিলেন, যেন এই কথাটা বলতে:
>
> আর কী করবারই বা আছে? জঘন্য কাজ, কিন্তু করতেই হবে। কাউকে না কাউকে করতে হবে। একটিমাত্র সুযোগ এ-জীবনে পেয়েছি, তাকে ছেড়ে দিতে পারি না। ভারতের জনগণকে অনাহারে, উৎপীড়নে, শোষণে নরকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। চিরদিন এ-জিনিস চলতে দেওয়া যায় না। এ-কাজ করতে এসেছি বাধ্য না করে আমাদের উপায় নেই। পথ নেই—পথ নেই। বুঝতে পারছ না?
>
> এবার আমাকে ঈষৎ প্রতিবাদে কাঁধ নাড়াতেই হল। ইতস্ততঃ করে বললাম—'হাঁ, সে কথা ঠিক, তা বুঝি। আমিও আমার দেশকে মুক্ত করতে সব কিছু করতাম শুধু ঐ নাজীদের সঙ্গে সম্পর্ক করা ছাড়া। ও-জিনিস কদাপি করতে পারতাম না। তাদের সঙ্গে কোনো বোঝাপড়া করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। অসহ্য ওরা, ঘৃণ্য, ছুঁলে শিউরে উঠতে হয়, সংক্রামক রোগের মত। আপনি কি সত্যই নিজের পৃথিবী রক্ষার জন্য শয়তানের প্রতিনিধির সঙ্গে মিত্রতা করতে পারেন—বলুন?'
>
> 'ভয়ঙ্কর, সত্যই, কিন্তু উপায় নেই', তিনি বললেন, 'আমাদের কাছে একটি পথই খোলা আছে। ভারতকে তার স্বাধীনতা পেতে হবেই, যে কোনো মূল্যে। তার অর্থ হয়ত ইউরোপের ধ্বংস। কিন্তু ইউরোপ—এ ইউরোপ তো আবর্জনার স্তূপ! সুতরাং এর জন্য আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। নিশ্চয় চমৎকার কিছু মানুষ এখানে আছেন, ইংলন্ডেও, যাদের উদ্দেশে আমার অকপট প্রীতি শ্রদ্ধা রয়েছে। তাঁদের কেউ থাকবেন, কেউ যাবেন, তাঁদের হিসাবে আমি কেমন করে করব। অপরপক্ষে ভারতবর্ষে কিছু

লোক টিকে যাবে, যাদের বাঁচার অধিকার নেই। কিন্তু ভাবালু হয়ে লাভ নেই। আমাকে আমার নির্ধারিত কর্তব্যই করতে হচ্ছে। মিঃ কুর্তি, মিসেস কুর্তি! ভারতের নৈরাশ্য, দুঃখ, অপমানের চেহারা সম্বন্ধে আপনার কোনো ধারণা আছে? সে যে কী কষ্ট, কী লাঞ্ছনা—কল্পনা করতে পারেন? আপনাকে নিশ্চয় করে বলতে পারি, এখানে নাজী-তন্ত্র যেমন, ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তেমনই—একইরকম অসহনীয়। কিন্তু মনে হয়, এর সব কিছু আপনাদের পক্ষে সম্পূর্ণ বোঝা সম্ভব নয়।'

খানিক নীরবতা, ঘনীভূত গাম্ভীর্যের মুহূর্ত। সঠিক উত্তর আমরা খুঁজে পেলাম না, কারণ তিনি যেভাবে অনুভব করেছেন, সেভাবে অনুভব করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু মানুষটিকে আমরা যথার্থই বুঝেছি। মুজে তিনি আত্মিক পুরুষ, সুগভীর, যথার্থ তাঁর অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি, নিজের

আত্মাকে রুদ্ধ করে দিয়েছেন রাজনীতিকের ভূমিকা।"*

শ্রীমতী কুর্তি তাঁর সামগ্রিক অনুভূতিকে প্রকাশ করেছেন এই বলে—

> "আমার আত্মার গহন আলোড়িত হয়ে উঠল, আমি ও আমার স্বামী পরস্পরের দিকে দীর্ঘ সময় নীরবে তাকিয়ে রইলাম।...এই আশ্চর্য সন্ধ্যাটির কথা ভুলতে পারব না কখনো, এই আশ্চর্য মানুষটির কথা—তাঁর সহৃদয় অথচ সুকঠিন বুদ্ধি-দীপ্তির কথা।"

সুভাষচন্দ্রের আর একটি চিত্র শ্রীমতী কুর্তি দিয়েছেন। কয়েক বৎসর পরের ঘটনা। 'পায়ের তলায় পৃথিবী কাঁপছে; যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে জার্মানী।' ভয় করে সেই দিনগুলি। আতঙ্ক-নীল বিষাক্ত দিনগুলি ইউরোপের সভ্য মানুষের আনন্দ হরণ করে ডুবে যাচ্ছে অন্ধকারে,

---

* এখানে কৃতজ্ঞচিত্তে আমরা স্বীকার করব, কুর্তি-দম্পতি সুভাষচন্দ্রের অধ্যাত্ম-প্রকৃতিকে এবং তাঁর বিপ্লবী স্বভাবকে অনেকটা বুঝেছিলেন। তাঁরা সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবচেতনার মূলে উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে দেখেছেন, যখন আধ্যাত্মিক মানুষটি তাঁর গভীর প্রকৃতিকে যেন সংবৃত করে রেখেছেন। এইখানে আমাদের কিছু সংশোধন করতে হবে; সুভাষচন্দ্রের বিপ্লবস্পৃহাতেও তাঁর আধ্যাত্মিক প্রকৃতি সক্রিয় ছিল—তিনি নিজেকে নির্যতি-চালিত মনে করতেন, মনে করতেন যে কর্মেই তাঁর অধিকার। সুভাষচন্দ্র 'ভারতীয়' বিপ্লবী, কারণ তিনি শক্তিবাদী বৈদান্তিক বিবেকানন্দের অনুগামী। সৃষ্টি যখন আবর্জনাপুঞ্জ, তার অগ্নিসংকার করতে হয়, তথাকথিত ভালোর সঙ্গে মন্দও পোড়ে একই শয্যায়। শংকরকে দেখতে হয়—ভয়ঙ্করীকে দেখতে হয়—দুচোখ খুলে। তাই এঁরা গেয়ে ওঠেন—'কালী, তুই প্রলয়রূপিণী, আয় মাগো, আয় মোর পাশে।'

এখানে আরও মনে রাখতে হবে, সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি কদাপি নীতি-বাদী ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গি নয়। গান্ধীজীর মত ছেলেমানুষি ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেন না। বিহারের ভূমি-কম্পের পরে গান্ধীজী বলে-ছিলেন, অস্পৃশ্যতার পাপের ফলেই এই প্রাকৃতিক দুর্বিপাক। রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, এই পাপে পাপী নয় এমন লোকও তো মরেছে—তার ব্যাখ্যা কি? সুভাষচন্দ্রের কাছে, মন্দ যে করল, সেই কেবল মন্দ নয়, মন্দে যে বাধা দিল না, তেমন নিষ্ক্রিয় ভালোও মন্দেরই দলে পড়ে।

তেমনি একটি দিনে, সকালে, শ্রীমতী কুর্তি যখন একলা প্রাতরাশের টেবিলে, স্বামী বেরিয়ে গেছেন কাজে, বাইরে বেল বেজে-ছিল, শ্রীমতী কুর্তি দরজা খুলে বিস্ময়ে আনন্দে চমকে উঠলেন, দ্বারে আর কেউ নন, স্বয়ং সুভাষচন্দ্র বসু। কী করে সন্ধান পেলেন এই বাসার? শেষবার দেখা হওয়ার পরে তাঁরা দুবার যে বাসা বদলেছেন!

'ওঃ! মিঃ বসু! কী কাণ্ড, আপনি! কী অপূর্ব! আপনার দেখা পেলাম!'

সুভাষচন্দ্রকে তিনি ঘরে এনে বসালেন। আনন্দের সীমা নেই; প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যেতে লাগলেন।

'কতদিন যে আপনাকে দেখি নি! এক যুগ পরে দেখা। সোজা ভারতবর্ষ থেকে আসছেন না কি?'

'না, এখন সোজা আসছি ভিয়েনা থেকে। এখানে কাজে এসেছি, কয়েকদিন মাত্র থাকব।'

আরও কিছু সংলাপ। অতঃপর সুভাষচন্দ্রের গম্ভীর কণ্ঠঃ

'মিসেস কুর্তি, আপনার কাণ্ড দেখে আমি বিস্মিত। এখানে যুদ্ধের অবস্থা, বিকট মনোভাব, তবু আপনারা কি বলে এখানে আছেন? এদেশ আপনাদের ত্যাগ করা উচিত, যত শীঘ্র পারেন।'

মিসেস কুর্তি জানালেন, তাঁদেরও তাই ইচ্ছা। বিপদ সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন। শীঘ্রই তাঁরা চেকোস্লোভাকিয়ায় ফিরে যেতে চান।

'চেকোশ্লোভাকিয়া?'—সুভাষচন্দ্র প্রায় আঁৎকে ওঠেন—'না না, মিসেস কুর্তি, চেকোশ্লোভাকিয়া একেবারে বাঘের কাছে, আর সে নিতান্ত দুর্বল। ক্ষুধাতুর লোলুপ দেশের প্রতিবেশী। নিতান্ত সঙ্কটে সে রয়েছে। আচ্ছা, আপনি একবার আমে-রিকায় যাবার কথা বলেছিলেন না?'

বলেছিলেন, তা ঠিক, কিন্তু স্বদেশ, স্বজন, চাকরি-বাকরি ছেড়ে যাওয়া কি সহজ? তাছাড়া সে দেশে যাওয়ার ভিসা পেতে যথেষ্ট সময় লাগে। তবু চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা।

'হ্যাঁ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যান, কোনমতে ব্যাপারটা স্থগিত রাখবেন না। পরিস্থিতি শোচনীয়। পায়ের তলায় জমি নেই এখানে।'

সেকথা কি কুর্তিরা জানেন না। নিশ্চয় জানেন। তবু সুভাষচন্দ্র তাগিদ দেন—'মোটে দেরি করবেন না—একদম না—'

'ভাল, তাহলে আমরা শীঘ্রই যাব—'

'শীঘ্রই তো—'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

মিসেস কুর্তি অতঃপর লিখেছেন, "এ-সকল কথা অতীব সংযতভাবে তিনি বলেছিলেন, তাঁর সেই নিজস্ব অসাধারণ উপায়ে। কিন্তু তার ভিতর থেকেই তাঁর উৎকণ্ঠার আভাস দেখলাম, আমাদের জন্য উদ্বেগ বোধ করলাম সেজন্য। মানুষদের প্রতি তাঁর সুগভীর মমতাও দেখলাম, সে মনো-ভাবকে আমার কাছে গোপন করবার একটুও চেষ্টা করলেন না।"

এই মানুষই রোমা রোলাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে গিয়েছিলেন। সাক্ষাতের যে-বিবরণ তিনি লিখেছেন, তার গোটা রূপ আগেই দেখেছি। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য লেখাটি সুভাষচন্দ্র যখন পাঠিয়েছিলেন, তখন ভাবতে যা প্রকাশযোগ্য তাই পাঠিয়ে-ছিলেন। মডার্ন রিভিউয়ের সম্পাদক তারও উপরে কাঁচি চালিয়েছিলেন প্রেস অ্যাক্টের ফ্যাসাদ এড়াতে। আলোচনার যে বিবরণ রোলাঁর ডায়েরীতে আছে, তাতে সমগ্র আলোচনার একটা মোটামুটি পরিচয় পাই। আলোচনাকালে সুভাষচন্দ্র খোলা-খুলি জানিয়েছিলেন, গান্ধী-নেতৃত্ব এখন অচল অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, তা আর গতিশীল নয়, গতিশীল হওয়াও কঠিন, কারণ গান্ধীজীর কথায় ও কার্যকলাপের মধ্যে অসঙ্গতি প্রচুর। সুভাষচন্দ্র, বৈপ্লবিক প্রয়াসকে সমর্থন করে পরবর্তী পর্যায়ে সুসংগঠিত সশস্ত্র আন্দোলনের প্রয়ো-জনীয়তার কথাও জানান। আলোচনাকালে রোলাঁ বলেন, গান্ধীপন্থায় না চললে ভারতের আন্দোলন তাঁর সহানুভূতি হারাবে একথা ঠিক নয়; 'গান্ধীজীর মত-বাদের সঙ্গে আমার আর কোনো যোগা-যোগ নেই', তবে 'অহিংসাবাদীদের মধ্যে প্রচণ্ড বৈপ্লবিক শক্তি সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে' তাও তিনি মনে করেন। তাই বলে 'অহিংসা সকলপ্রকার সামাজিক কর্মের কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে না।' আসল কথা হল, "এই জরাজীর্ণ সমাজব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়া দরকার; না করলে এ সমাজ মানবসমাজকে ধ্বংস করে দেবে। সুতরাং তার বিরুদ্ধে হিংসা-অহিংসার সমস্ত প্রকার অস্ত্র নিয়ে সংগ্রামে নামতে হবে; যেসব অস্ত্রের দ্বারা সব থেকে সত্বর, সব থেকে নিশ্চিতভাবে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়, তখনি তা অবলম্বন করতে হবে।" সুভাষচন্দ্রকে রোলাঁ তাঁর শেষ কথা বলেছিলেন, "সুসংগঠিত অহিংসাবাদ ও সুশৃঙ্খল বিপ্লববাদ, উভয়কেই দুইটি সংযুক্ত বাহিনীতে পরিণত হতে হবে।"

রোলাঁর সঙ্গে আলোচনার যে-অংশটি সুভাষচন্দ্র তাঁর লেখায় প্রায় বাদ দিয়ে-ছিলেন, (বা সম্পাদক মহাশয় বাদ দিয়ে-ছিলেন), রোলাঁর ডায়েরীতে তা অনেকটা এইরকম—

> "তিনি (সুভাষচন্দ্র) আমাকে বোঝালেন, কিভাবে তাঁর মতে গান্ধীর নেতৃত্ব এমন একটা অচল অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে অগ্রসর হতে হলে গান্ধী-নেতৃত্ব থেকে তাকে পৃথক

হতে হবে। তাঁর মতে, ভারতের অসহযোগ আন্দোলনের কৌশল সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে; এই আন্দোলন বিদেশী বস্ত্র বয়কট করতে সমর্থ হয় নি। যে-আন্দোলন গান্ধী পরিচালনা করেন, তার শেষ ধাপ পর্যন্ত তিনি কখনই যেতে রাজি হন না। ...যেসব ভারতীয় বণিকেরা বিদেশী দ্রব্য বয়কট করতে অস্বীকার করেছিল, তাদের বাধ্য করাবার জন্য গান্ধী তাঁর সহযোগীদের অনুমতি দেন নি। এই আন্দোলনের সম্মুখীন হয়ে ইংরেজ শাসকেরা অনেক দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করে, ও অনেক ইতস্ততের পরে আন্দোলন দমন করার পথ খুঁজে পেয়েছে। আগে তারা যেমন হাজার হাজার লোককে জেলে পাঠিয়ে দিত (সব জেলগুলি ভর্তি হয়ে যেত), এখন আর তা করে না। এখন শুধু নেতাদেরই জেলে নিয়ে যায়—যাঁরা আন্দোলনের প্রাণ। কিন্তু অন্য সবরকম গণ-আন্দোলন নির্মমভাবে দমন করে। গান্ধীবাদের সত্যাগ্রহ তাদের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটায় না। তারা জানে, এইদিক থেকে তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই। ওয়েজউড বেন-এর মত বৃটিশ পার্লামেন্টের একজন (সমাজতন্ত্রী) নেতা—যিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সর্বদিক থেকে সহানুভূতিশীল—তিনি সম্প্রতি রাধাকৃষ্ণানকে বলেছেন: 'ভারতীয়রা নিজেরাই যখন আমাদের বিতাড়নে, আমরা তাহলে কেন ভারত ছেড়ে আসব?'

সুভাষচন্দ্র সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ সমর্থন করে বললেন, শুধু এইসব কাজগুলিই ভারতে ইংরেজদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলেছে। সন্ত্রাসবাদীরা যদিও সংখ্যায় খুব অল্প এবং প্রায় বাংলা দেশেই সীমাবদ্ধ, তাদের প্রভাব খুব গভীর। ইংরেজ কর্মচারীরাই একথা সুভাষচন্দ্রকে বলেছে। এবং এই পন্থা যদি ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তাহলে ইংরেজরা খুবই দমে যাবে। তবে তিনি পুনরায় বললেন, সন্ত্রাসবাদকে একটা প্রকৃষ্ট রাজনৈতিক উপায় বলে তিনি মনে করেন না; তিনি চান সুসংগঠিত সংগ্রাম, হিংসাকে বাদ দিয়ে নয়, বরং প্রয়োগ করে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, জনসাধারণকে সংগ্রামে আকৃষ্ট করা।

দেশের সকল পার্টি ও সকল শ্রেণীর মধ্যেই গান্ধীর প্রচণ্ড প্রভাব; কিন্তু তাকে তিনি কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য কাজে লাগান না। সন্দেহ নেই, গত ১৫ বছরের মধ্যে জাতীয় মনোভাব সৃষ্টির জন্য সকল শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য তিনি যথেষ্ট করেছেন। কিন্তু নিজ স্বভাবে তিনি মধ্যপন্থী,—চরম বৈপরীত্যের মধ্যে, বিভিন্ন শ্রেণী ও পার্টির মধ্যে আপোষ ঘটাতে চান। এইভাবেই তিনি সততার সঙ্গে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, কিন্তু আবার বর্ণভেদ প্রথাকেও সমর্থন করেন। শ্রমিকদের প্রতিও তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ আছে, কিন্তু মালিকদের বিরুদ্ধে তাদের সংগঠিত হতে বাধার সৃষ্টি করেন।* তিনি এখন আর যন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবে মুখর নন, বরং শুধু সমাজ সংস্কারের জন্য গ্রামাঞ্চলে গৃহশিল্পের (চরকা) উপরই জোর দেন মাত্র। কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা থেকে দেশ খুব সামান্যই উপকৃত হয়। পক্ষান্তরে, তাঁর এই কাজে প্রয়োজনীয় যৌথ [illegible] আন্দোলন থেকে দৃষ্টি [illegible] ঘুরিয়ে দেওয়ারই নামান্তর। [illegible] বিষয়েই তিনি আমাদের [illegible] রাশ টেনে ধরেছেন। [illegible] স্বাধীনতা সংগ্রামে [illegible] গুলিকে এড়িয়ে [illegible] সমস্যেই [illegible] সমাজতন্ত্রীরা সম্পূর্ণ [illegible] করতে চায় [illegible] এই [illegible] তাদের জোর দিতে হবে, [illegible] রণের মধ্যে কাজ করতে হবে তাদের দাবিগুলির সমর্থন করতে হবে, এবং কৃষকেরা যাতে জমি পায় তার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। সমাজতন্ত্রীদের গ্রামে গ্রামে প্রচার ও সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। এ কাজ আরও প্রয়োজন এইজন্য যে, গ্রামগুলিই একমাত্র স্থান যেখান থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে সহজে পৌঁছানো যায়, কারণ সেখান থেকেই সিপাহীদের জোগাড় করা হয়। সিপাহীদের মনোভাব পরিবর্তনের জন্য গ্রামে প্রভাব বিস্তারের বিশেষ প্রয়োজন। বোস ঢাকবার চেষ্টা করলেন না যে, বৃটিশদের বিরুদ্ধে একটা সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্ব প্রয়োজন এবং বৃটিশ অস্ত্রশস্ত্রের নিকট ভারতবর্ষ নিতান্তই দুর্বল। তিনি একথাও লুকোলেন না যে, শীঘ্রই ইউরোপে যুদ্ধ বাধবে ও ইংলণ্ড তাতে জড়িত হয়ে পড়বে, এবং তারই সুযোগে ভারত বিজয়ী হতে সমর্থ হবে।......

আমার মনে হয়, বোস কমিউনিজমের খুব কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন। কিন্তু সে-সম্বন্ধে এখনো কিছু পরিষ্কার বলতে চান না। সম্ভবতঃ তাঁর বিরাগের কারণ ব্যক্তিগত, ভারতের বর্তমান কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সম্বন্ধে তিনি বললেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়ত ভারতের মুক্তিসংগ্রামে সাহায্য করবে। তবে, অনুযোগের জবাবে বললেন, মনে হয়, সোভিয়েত কেন এখন বিশ্ব-বিপ্লবের প্রতি অনাসক্ত, তার জাতীয় সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত।"

[ক্রমশঃ]

---

* এই আলোচনার কিছুদিন পরেই, ১৯৩৬ সালের ১২ জানুয়ারীতে মাদলিন রোলাঁ জওহরলালকে একটি পত্র লেখেন, "পত্রগুচ্ছে" যা প্রকাশিত হয়েছে। পত্রটি রোলাঁর নয়, তাঁর ভগিনীর, কিন্তু সেই ভগিনী 'আমার তীর্থযাত্রা' গ্রন্থের রোলাঁর 'বিশ্বস্ত সঙ্গিনী'। রোলাঁর অননুমোদিত কিছু তিনি লিখবেন বলে মনে হয় না। মাদলিন রোলাঁ ঐ পত্রে জওহরলালকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি যেন গান্ধীজীর সম্পর্কে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গ্রন্থের প্রতিবাদ করেন। ঐ গ্রন্থ অবলম্বন করে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে ইউরোপের কোনো কোনো সমাজবাদী ও সাম্যবাদী মহলে শোচনীয় প্রচারকার্য চলছিল। ঐ পত্রে প্রকাশ, সৌমেন ঠাকুরের মতে 'গান্ধীজী পুঁজিবাদীদের কাছে আত্মবিক্রয় করেছেন, জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।' রোলাঁ-ভগিনী গান্ধী-সমালোচনার অধিকারকে স্বীকার করেছেন। গান্ধীজীর "মতবাদ যে পর্যন্ত নয়, অথবা সেগুলি বিপজ্জনক, এমন কথা ভেবে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার অধিকার আন্তরিকতাসম্পন্ন মানুষের আছে।" কিন্তু সৌমেন ঠাকুরের গ্রন্থে "ভুল তারিখ, বিকৃত উদ্ধৃতি, এবং অবাঞ্ছনীয় ও পক্ষপাতদুষ্ট উক্তির উপর নির্ভর করে এই যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে, সেগুলি ন্যক্কারজনক। জনৈক ভারতবাসী কর্তৃক আনীত এইসব অভিযোগে সমগ্র ভারতবর্ষই কালিমালিপ্ত হয়েছে।"

শ্রীযুক্ত ঠাকুরের গ্রন্থ আমি পড়ি নি, সে গ্রন্থ আমার আলোচনার বহির্ভূত। আমি শুধু বলতে চাই, রোলাঁ-পরিবার গান্ধীজীর যে-কোনো সমালোচনা সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। [illegible] প্রকাশকারীরাই সৌমেন্দ্রনাথের গ্রন্থের কঠোর নিন্দা করেছেন।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ সাতাশ ॥

জ্যোৎস্নার আলোয় একাকী পায়চারি করতে করতে বৃদ্ধ অধ্যাপকের মন উদ্বেল হয়ে উঠল। প্রত্যাশার অপমৃত্যু। কিশোরকাল থেকে উজ্জ্বল দিনের স্বপ্ন দেখে এসেছি, জীবনের শেষ অধ্যায়ে তার আজ এই পরিণতি। তা হোক, তা হোক—আশা ছেড়ো না। মৃত্যু সময়েও ভবিষ্যতে ভরসা রেখে চোখ বুজব। নইলে তো জীবনধারণের মানে থাকে না—এই মুহূর্তেই আত্মঘাতী হতে হয়। আমাদের জীবনকালে না-ই যদি পেলাম, উত্তরপুরুষ পাবে। পুরাণে জানি, তপঃসিদ্ধির ঠিক পূর্বক্ষণে কখনো ডাকিনী-যোগিনী কখনো বা উর্বশী-ডাকিনী-যোগিনী কখনো বা উর্বশী-কিন্নরী সামনে এসে নৃত্য জুড়ে দেয়। সেই কাণ্ডই তো চতুর্দিকে। মাথা ঠাণ্ডা রাখো তরুণ-তরুণীরা, রাত্রির শেষ প্রহরের ঘন তমিস্রা। সূর্য ওঠার বিলম্ব নেই বেশি।

কলমের এক খোঁচায় বানানো কৃত্রিম বর্ডারের উপর ঘুরতে ঘুরতে অনেকদিন পরে আজ বৃদ্ধের পুত্রশোক উথলে উঠল। ভয় পেয়ে ছেলে বাপের কাছে ছুটে আসছিল, বীরেশ্বরই ডেকেছিলেন। রাজনীতি করে না, কারো প্রতি কোন বিদ্বেষ নেই, সকলের মঙ্গল চায়, দেশ-বিদেশের কাব্য-সাহিত্য-শিল্প নিয়ে মাতোয়ারা নিরীহ শিক্ষক মাত্র। এই মানুষের শোচনীয় পরিণাম চোখে না দেখলেও শত শত জনের দেখেছি, শত শত কাহিনী শুনেছি, —ছবিটা অতএব ভেবে নিতে অসুবিধা হয় না। দরিদ্র নিরক্ষর নিষ্পাপ সরল-বিশ্বাসী কোটি কোটি মানুষ, গান্ধীজি, তোমাকেই তাদের একান্ত আপন বলে জানত। তোমার একটি কথায় উদ্বেল হত জনসমুদ্র, একটি কথায় আবার দীঘি-জলের মতন নিস্তরঙ্গ নিথর হয়ে পড়ত। তোমারও বড় গরব তাই নিয়ে—রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সে কংগ্রেসের একক প্রতিনিধি হয়ে বিলাতে গেলে। গর্জন তখনই উঠেছিল—জগতের সামনে মহাত্মাজি দেখাবেন, কোটি কোটি মূক জনসাধারণের মুখপাত্র আমি—আমিই একমাত্র। কিন্তু অর্ধনগ্ন ফকিরের কথা কেউ কানে নিল না, হতাশ হয়ে রিক্ত ঝুলি নিয়ে ফিরে এলে। এবং ভারতের উপর সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডনীতি দ্বিগুণ তেজে চলল। ভারতবর্ষের কঠিনতম সঙ্কটের কোন দুর্বলতায় পেয়ে বসল—ভ্রান্ত নেতৃত্ব স্বার্থান্ধ নেতৃত্ব ক্ষমতালোভীদের নেতৃত্বের কাছে মহাত্মাজি আত্মসমর্পণ করলেন। নেতা মশায়দের চিরকাল তড়পানি শুনে এসেছি—জিন্নাহ্‌র দ্বিজাতিতত্ত্ব মানি না আমরা। ওয়ার্কিং কমিটিতে নীতিগতভাবে বিভেদ প্রস্তাব পাশ করে নিলেন, তখনো ভদ্রলোকদের সেই এককথা—দ্বিজাতি মানিনে বটে, তথাপি হিন্দু-মুসলমানের নিরিখে আলবত দেশ দুইখণ্ড হবে। কোন্ তন্ত্রের নীতি জানি না বাবা—এক্কেও নীতির বলবেন তো দুর্নীতি কিসে ঘটে, নেতা মশায়দের কাছে কেউ জিজ্ঞাসা করে নি। ওয়ার্কিং কমিটির ঐ সর্বনেশে সিদ্ধান্তের সময় কোটি কোটি মানুষ যাঁকে সবচেয়ে বড় নির্ভর বলে জানে তিনি একটি বাক্যও উচ্চারণ না করে ধীরপায়ে ভাঙ্গি কলোনীতে ফিরে গেলেন। এত উপবাস কথায় কথায়—দেশখণ্ডনের প্রতিবাদে একটি বেলাও সেই অস্ত্র প্রয়োগ করলেন না মহাত্মাজি। বিষবৃক্ষে যেহেতু অমৃত ফলে না—দেশময় চেয়ে দেখুন ঘুস ভণ্ডামি বিশ্বাসহত্যা দেশদ্রোহিতা পারমিট-লাইসেন্স বানানোর ছলাকলা। বিপুল সমৃদ্ধি আর বিশাল ইজ্জৎ নিয়ে রাজত্বের শুরু, আঠারো বছর পরে আন্তর্জাতিক ভিক্ষুক আমরা। ভিক্ষা চেয়ে দোরে দোরে মাথা ঠুকছি, না পেলে রাগ-অভিমান-গালাগালি সে-ও তো রাস্তার ভিক্ষুকের মতোই।

হাত বুলিয়ে বৃদ্ধ অধ্যাপক অনুভব করলেন ভিজে-ভিজে চোখ। ছোরার ঘায়ে খণ্ড-বিখণ্ড তাঁর নকুলেশ্বরের দেহ—হাঁড়িকাঠে পাঁঠাবলির মতন দেশটাকে দুই খণ্ড করল—ছবিগুলো বড্ড মনে আসছে।

মহাত্মাজি নেকড়ের মুখে ছুঁড়ে দিয়েছ তুমি আমাদের—

সর্বত্যাগী সীমান্ত গান্ধী বলেছিলেন গান্ধীকে। আর পশ্চিমবঙ্গের সর্ব অঞ্চল থেকে সেই সঙ্গে ঠিক সেই সুরে যেন সহস্র সহস্র কণ্ঠের ধ্বনি:

মহাত্মাজি, নেকড়ের মুখে আমরাও। আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীরাও।

দিন যতই যাচ্ছে, অসহায় অবস্থা ততই স্পষ্ট হয়ে ফুটছে চোখের উপরে। 'বন্দেমাতরম্' গানে সুজলাং সুফলাং শস্যশ্যামলাং বলে দেশ বন্দনা। গান লিখছেন বঙ্কিমচন্দ্র, আর চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছেন তখন বঙ্গদেশের শ্যামল রূপমাধুরী। তৃপ্তিভরা মন ছাড়া কলমের মুখে এতদূর প্রসন্ন লেখা সম্ভবে না। সেই 'বন্দেমাতরম্' মুখে নিয়ে সোনার ছেলেরা দলে দলে ফাঁসি গিয়েছেন, গুলির মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, তাঁদেরও তখন বুকখানা জুড়ে রয়েছে—শ্যামশ্রী বঙ্গদেশের ছবি। সেই মহাবঙ্গের যে ভগ্নাংশটুকু পশ্চিমবঙ্গ নামে ভারতের এলাকায় থাকতে দিয়েছে, তার বাসিন্দাগুলোর দুর্ভোগের আজ অবধি নেই। সোনা-ফলানো ধানজমি—দেশের শস্যভাণ্ডার বলা হত যে অঞ্চলকে—কেটে চালান করে দিয়েছে পাকিস্তানের ভিতর। ছিটেফোঁটা যা এদিকে আছে, তারই একটা মোটা অংশে ধান বাতিল করে পাট আর্জানো হচ্ছে। পাট বিহনে জুটমিলের চিমনিগুলোর ধূম উদ্গিরণ বন্ধ হবে এবং সেই সঙ্গে ফরেন এক্সচেঞ্জের আমদানীও। দরিদ্র ভাবত দরিদ্রতর হবে এবং কথায় কথায় কর্তাদের এমন মজা করে ভুবন-পরিক্রমা চলবে না। কয়লার ব্যাপারেও তেমনি: পশ্চিমবঙ্গের অফুরন্ত কয়লা যেখানে গরজ নিয়ে যাচ্ছে—যাবেই তো নিয়ে, 'এক জাতি এক প্রাণ একতা'। কিন্তু ক্ষুধাতুর দৃষ্টি মেলে প্রতিবেশীর ফেলে-ছড়িয়ে খাওয়া দেখতে দেখতে

[illegible] অশান্ত হয়ে উঠল, তেমনি ক্ষেত্রে চালের সাহায্য না দিলেও বন্দুকধারী পুলিশের সাহায্য তো দিচ্ছে তারা। শান্ত করা নিয়ে কথা—ভাত দিয়ে ঠাণ্ডা করতে না পারলাম তো বুলেট খেয়ে ঠাণ্ডা হোক।

মহাত্মাজি, নেকড়ের মুখে আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসীরাও। সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির নুরুল ইসলাম ভাত চেয়ে গুলি খায়, বীরেন দে নিরপরাধ শিশু-সন্তানদের ভাত না দিতে পেয়ে বিষ খাওয়ায়। আর সেই যে শুনেছেন, খাওয়ার জন্যে ছেলে ঘ্যান-ঘ্যান করছিল বলে হতভাগ্য বাপ সামের উপর আছাড় মেরে মাথার ঘিলু বের করে দিয়েছিল। সুজলা সুফলা ভূমিতে পেটের অন্ন জোটাবার জন্য ধুন্ধুমার, তার উপর মুখের ভাষাটি অবধি বঞ্চনার পরিপাটি বন্দোবস্ত হচ্ছে।

মহাত্মা গান্ধীকি জয়! পণ্ডিতজি কি জয়! স্বাধীনতা ওঁরাই আনলেন। স্বাধীন সরকারও অকৃতজ্ঞ নয়। গান্ধী-জির চিতাভস্ম নিয়ে রাজকীয় সমারোহে রাজঘাট বানিয়েছি আমরা। এতাবৎ একান্ন লক্ষ টাকা খরচা করেছি, লাগবে আরো চল্লিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার। অর্ধনগ্ন ফকিরটি জীবিত থাকলে গরিব দেশের এত অর্থব্যয়ে কী জানি হয়তো বাধাই দিতেন। জীবনান্ত হয়ে গিয়ে আর কোন ঝামেলা নেই। ভুলি নি জওহরলালকেও। দেহের ছাই প্লেন চাপিয়ে সারা দেশের মাথায় মুখে ছড়িয়েছি আর বাকি দিয়ে বেদী বানিয়েছি শান্তিবনে। দশ লক্ষ [illegible] এখন অবধি গেছে। আরও প্রায় সাড়ে-গুণ লাগবে—চল্লিশ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার। তা হোক তা হোক, বৃহৎ [illegible] টাকার অংক দেখতে গেলে [illegible] বিদেশের তা বড় তা বড় মানুষ। এসে ফুল দিচ্ছেন নিত্যদিন, কত কত প্রশংসা করে বলছেন। রাশিয়ার দৃষ্টান্ত দেখুন। লেনিন সেই কবে দেহ রেখেছেন, দেহটি আজও পরম যত্নে রেড-স্কোয়ারের মুসোলিয়মে অম্লান রেখে দিয়েছে। শীত নেই বর্ষা নেই, নিত্য দিন লম্বা লাইন পড়ে দেহ দর্শন এবং শ্রদ্ধা ও ভালবাসার মাল্যদানের জন্য। স্ট্যালিনের দেহও ছিল লেনিনের ঠিক পাশটিতে। রাজনীতির পাশা কিঞ্চিৎ উলটে যাওয়ায় দেহটি সরিয়ে ফেলে কোথায় মাটি দিয়েছে, খোদায় মালুম। নেতাদের এই একটা বিপদ আছে—গণদেবতার কাছে আজকে যিনি নয়নের মণি, কাল হয়তো তিনি পদতলের ছুঁচো। সে যাক গে, আমাদের বানানো ঘাট বন আমরা চিরঞ্জীবী করে রাখব।

নাচনাচি করতে করতে এমনি সব তাবেদার ব্যাণ্ডপার্টি বাজছে [illegible]। অকালে খণ্ডচাঁদ, হিন্দুস্থানের পার থেকে ঝিরঝিরে বাতাস এসে গাছের শাখায় পাতায় মৃদু দোলা দিচ্ছে। সহসা যেন বহু কণ্ঠে কলরব করে উঠল: আমিও চাঁদা দিয়েছি রাজঘাটে শান্তিবনে, আমারও চাঁদা আছে; আমরা যারা ট্যাক্স দিই সকলের চাঁদা। কলরব বটে, কিন্তু নিঃশব্দ চতুর্দিক—কলরব বাইরে নয়, বুকের মধ্যে। চারদিকের সর্বপ্রান্তের মানুষ যেন একসঙ্গে হুড়ো-হুড়ি করে বলতে চায়। তার মধ্যে চেনাও যেন কতক কতকের সঙ্গে। এই একটু পুরানো খবরের-কাগজে যাদের কথা পড়ে এলেন—

যেন কবর থেকে তেপ্পান্ন ইসমুদের দুরেল ইসলামের চিৎকার আসছে : আমার আব্বাজানেরও একটা দুটো পয়সা কি নেই ঐ সব বড় বড় কীর্তি বানানোর কাজে? বাঁ'বন দে যিনি প্রাণের অধিক ছেলেমেয়ের মুখে ভাত দিতে না পেরে বিষ দিয়েছিলেন এবং স্বামী-স্ত্রী বিষ খেয়ে ব্যথার শান্তির করেছিলেন, তিনিও বুঝি চেঁচাচ্ছেন : চাঁদা আমারও আছে, সে কথা কক্ষণো ভুলো না—

ঘরের ভিতরে সেই সময়ে অমলেশ খবর পড়া ছেড়ে পূর্ব-বাংলার এক তরুণ কবির কয়েক ছত্র কবিতা সশব্দে পড়ে শোনাচ্ছে :

'হে অস্থির যুবকেরা শোন,
হতাশাই শেষ কথা নয়—
একমাত্র সত্য নয়—
যন্ত্রণার আর্তনাদ শেষ হয়ে যাবে;
তারপর জন্ম হোক
আশা আর আশ্বাসের
নতুন শিশুর ...”

আর ওঘরে ফুল্লরা ও তারাফুলি ইতিমধ্যে একেবারে অভিন্নহৃদয়। আজন্ম-পরিচিত দুই সখী যেন। মহাত্মা গান্ধী মস্ত বড় মানুষ, মানুষই বলবেন না ভক্তজনেরা—শাপভ্রষ্ট দেবতা। সীমান্ত-গান্ধী বাদশা খাঁকে তিনি বলেছিলেন, দেশবিভাগ আমি বিশ্বাস করি নে। সীমান্ত প্রদেশে যাবো, পাশপোর্ট নেবো না। তার জন্য কেউ যদি আমায় খুনও করে, সানন্দে আমি খুন হতে রাজী। চপল তরুণী তারাফুলি যা বলছে, তা-ও তো প্রায় এই জিনিস। বন্ধুরাকে জড়িয়ে ধরে বলল, বর্ডার আমি মানি নে। পাখিরা মানে? জন্তু-জানোয়ারে মানে? ইচ্ছে হলেই এপার-ওপার করি, আইন-টাইনের তোয়াক্কা রাখিনে। পাশপোর্ট রে ভিসা রে—অত সমস্ত পোষায় না ভাই আমার। মন কেমন করে উঠল, তক্ষুণি যদি ছুটে না গেলাম তেমন যাওয়ার সুখ কি? দিন ক্ষণ বার তিথি হিসাব করে পাল্কিগাড়ি চেপে লোকে তো বরের ঘরে ঘরকন্নায় যায়—

ফিকফিক করে হেসে ফুল্লরা বলল, এখন আর সেদিন নেই। এই ধরো আমিই তো যাচ্ছি—

বরের কাছে যাচ্ছ তুমি ভাই? বটে, বটে!

তারাফুলি কলরব করে উঠল : কিন্তু এটা কিরকম হল? আমাদের মুসলমান ঘরে কত মেয়ে আজকাল সিঁদুর-কুমকুম পরে। আর তোমার কপাল বিলকুল সাদা, অথচ বরের ঘর করতে যাচ্ছ নাকি তুমি—

ফুল্লরা হেসে বলে, ফ্যাসান বদলায়, ফ্যাসান চলাচল করে। এক দলে যা বাতিল করল, অন্য দলে তাই লুফে নিয়ে নিল, সে-ও কিছু নতুন কথা নয়। কিন্তু ভাই, আমার খানিকটা বাড়িয়ে বলা হয়ে গেছে। বর পাবার ভরসা পেয়েছি—সেই ভরসার পিছন ধরে ছুটেছি। পাকিস্তান-হিন্দুস্থান, বেলুচ ফৌজ, বর্ডার পুলিশের পরোয়া না করে ছুটেছি। ক্ষীরের বাটি মুখের কাছটিতে, ধরে নিয়েছি খেয়ে ফেলারই সামিল ওটা। কিন্তু হাত ফসকে পড়েও তো যেতে পারে। যারও তো কতজনার। বরের কাছে যাচ্ছি, কথাটা ঠিক নয়—বর ধরতে বেরিয়েছি নাতনি আর দাদুতে মিলে।

আরও বিশদ করে বলে, সেকালের কন্যা স্বয়ম্বরা হত। বেড়ে নিয়ম? বরেরা দেশদেশান্তর থেকে সভা করে বসেছে। মালা হাতে কন্যা বেরিয়ে এলো। গলা সব টান-টান করে আছে, বরমাল্য কোন গলাটার না-জানি এসে পড়ে। আর এখানে—বিশেষ করে আমার বেলা দেখ, বিলকুল উল্টো। নিজেকেই ফিরি করে বেড়াচ্ছি : আমায় কে নিবি লো চলে আয়। পাকিস্তান সারা করে এবারে হিন্দুস্থানে চলেছি। এত করে চেঁচাচ্ছি—তা ভাই কানা-খোঁড়া নুলো-বুড়ো আধখানা বরও গাঁথে না। হতকুচ্ছিত চেহারা দেখে দুড়দাড় করে পালায়।

হতকুচ্ছিত—তা বই কি!

তারাফুলি জড়িয়ে ধরে সশব্দে চুমা খেল ফুল্লরার দুই মুখে। বলে, আমি যদি পুরুষ হতাম, ঠিক বিয়ে করতাম তোমায়। বিয়ে করে আমার বাঁদি করে রাখতাম।

জিভ কেটে পরমুহূর্তে বলে, কী মুশকিল, কেমন করে হবে? মুসলমান যে আমি। আস্পর্ধার কথা কানে গেলে তোমার মা দাদু আর জ্ঞাতগোষ্ঠী মিলে তো পেটাতে লেগে যাবেন আমায়।

ফুল্লরা কিছু গম্ভীর হয়ে বলে, সত্যি সত্যি ছিল বটে ভাই। সেই ছুঁৎমার্গেরই সারা দেশ ভরে প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছি। আজকেও যে মুছে গেছে, তা বলিনে।

বাপ-মায়ের লাহোর থেকে পালানোর সেই কাহিনী বলল ফুল্লরা। অমলেশের অনেকের কাছে শুনেছে। মা ছাড়া সকলেরই তো শোনা বৃত্তান্ত, কিন্তু শত প্রশ্নেও মা ইদানীং জবাব দেয় না। শোনা তবু আটকায় না। যখন-তখন বাবার কথা ফুল্লরার মনে ওঠে। মন উদাস হয়ে যায়, দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

ঠাকুরমা কেমন যেন বাতিকগ্রস্ত সেই দুর্ঘটনা থেকে। মাথা খারাপই বলতে হবে। মুসলমান কথাটা কানে উঠলেই বিগড়ে যান, সব মুসলমানই যেন নকুলেশ্বরের হত্যার জন্য দায়ী। পাড়া-গেঁয়ে গৃহস্থবাড়ির গিন্নিবান্নি মানুষ, বয়সও কিছু বেড়েছে। শুচিবাই ভয়ংকর রকম বেড়েছে। বলবার কিছু নেই। ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে বাকি দিন ঘরেই থাকেন, তিলার্ধ বাড়ির বার হন না। আমাকে একলা ছাড়বে না বলে তো দাদুকে টেনে হিঁচড়ে তাই সঙ্গে নিয়ে চলেছি। হিন্দুস্থানে গিয়ে ছোট মামাকে দেখে আমার জন্য মা তো পাগল হয়ে আছে কিন্তু ঠাকুরমাকে ফেলে নড়বে কি করে? বলেও সেই কথা, যদ্দিন শাশুড়ি বেঁচে আছেন, এক পা কোথাও আমার নড়া হবে না। ও'র অবর্তমানে তখন ছোড়দার কাছে গিয়ে ভাইবোনে একসঙ্গে দিনকতক কাটিয়ে আসব।

ফুল্লরা ফিকফিক করে হাসতে লাগল। বলে, আমিও ছাড়ব কেন? বললাম, তখনো এক-পা নড়বে না তুমি। তোমার এই ছেলেপুলের দঙ্গল কার কাছে রেখে যাবে? ভার দিয়ে কাকেও তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না। পেটের মেয়ে আমি তো পর হয়ে গেছি তোমার মা। খাঁজা ভাই, হিংসে হয় তাদের উপর আদর-যত্ন দেখে।

(ক্রমশ)

মঙ্গল শঙ্খ

মৃগাঙ্কনাথ ঘোষ

শাঁখে ফুঁ দিয়ে শান্তি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। সন্ধ্যা গড়িয়ে গিয়ে রাতের আঁধার নেমে এল। তবুও ঠাকুরঘরের সামনে শান্তি ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। হাতে শুভ্র-ধবল মঙ্গল শঙ্খ। প্রতি সন্ধ্যায় এই শঙ্খে নৈষিক ফুৎকারে বার বার কম্বু-নিনাদ তুলেছে। আজ সহসা প্রশ্ন জাগল, এ বাড়ির মঙ্গলে তার কি আসে যায়?—আর কতক্ষণই বা এ বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক! বরং এ গৃহের যদি সমূহ অকল্যাণ হয় তাহলে সে বোধ হয় স্বস্তি পায়, এমন কি একটা হিংস্র আনন্দও অনুভব করে।

সেখানে দাঁড়িয়েই শান্তি মনে মনে চিঠিটার একটা মুসাবিদা করে ফেলল। আজ মাঝরাতে এ বাড়ি ছাড়বার সময় ঐ চিঠিটা সে তার বিছানার ওপর রেখে যাবে। রাত পোহালেই অলকেশের বৈঠকখানায় রেজিস্ট্রারের আফসের প্রাণনাথ আসবেন। সেখানে রেজিস্ট্রি মতে যথারীতি স্বাক্ষরিত হবে তাদের বিয়ে। অর্চিষ্মান সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা করে রেখেছে আর তাকে বার বার বারণ করে দিয়েছে কাউকে ঘুণাক্ষরেও কিছু না জানাতে। দেওয়ালের ত' কান আছেই, দরজার কীটপতঙ্গও বোধহয় দরজা দিয়ে মানুষের কথা চালাচালি করতে পারে? সভ্য সমাজে মনুষ্য দেহধারী কীটপতঙ্গের ত' অভাব নেই। শান্তি তার শ্বশুরের উদ্দেশে শব্দ শাণাতে লাগল—যে শব্দগুলো প্রয়োগ করে সে মৃণাল ডাক্তারকে তীব্র ইনজেকশনের সূঁচ ফোটানোর জ্বালা ধরিয়ে দেবে। তার শ্বশুরের পুরো নাম অরবিন্দমৃণাল দত্ত। সাধারণ লোক অবশ্য তাকে মৃণাল ডাক্তারই বলে। প্রথম জীবনে জলপাইগুড়িতে স্কুলের শিক্ষকতা না বলে সম্ভবত বোলচালের চেষ্টাকেও... বি-এসসি পাশ করবার পর সে আমলের ... ... এক দেশীয় রাজ্যে বিজ্ঞানের শিক্ষক হয়ে গিয়েছিলেন। সেই স্কুলের সেক্রেটারীও ছিলেন বাঙালী—জনৈক উকিল। কথাবার্তায় সেক্রেটারী ভদ্রলোক অরবিন্দমৃণালের ইংরেজীর ভুল ধরতেন, ব্যাকরণগত। সেক্রেটারীর কি দুর্মতি হল, অরবিন্দমৃণালকে পড়াতে দিলেন স্কুলের পুরস্কার-বিতরণী অনুষ্ঠানে পঠিতব্য তাঁর বার্ষিক-বিবরণী—ইংরেজীতে লেখা সেক্রেটারীর সে বিবরণীতে অরবিন্দমৃণাল কয়েকটি গর্হিত ভুল লাল কালি দিয়ে দাগিয়ে সেক্রেটারীকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন, আর সেই সঙ্গে পাঠালেন তাঁর নিজের পদত্যাগপত্র। সেখান থেকে অরবিন্দমৃণাল সোজা গিয়ে ভর্তি হলেন এক মেডিক্যাল কলেজে। ডাক্তারী পাশ করে অরবিন্দমৃণাল সরকারী চাকুরী পেলেন জেলের হাসপাতালে। সেখানে

এবং এ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনরূপে সরকারী হাসপাতালে অরবিন্দ ডাক্তার সারা জীবন মেনিনজাইটিসের কেসে দ্রুত নিরাময়ের জন্যে সতীর্থদের ছুরি চালিয়ে অনেক রোগীর পরকাল দ্রুততর করে দিয়েছিলেন। রোগী বা রোগিণী মারা গেলে সেদিন অরবিন্দ-মৃণাল উপবাসী থাকতেন। এ সমস্ত কথা শক্তি তার বড় জা নীরজার মারফৎ শাশুড়ির কাহিনীতে সবিস্তারে শুনেছে। বৃত্তি প্রকৃতির লোক এই মৃণাল ডাক্তার! শাশুড়ীঠাকরুণ নাকি বলতেন মঙ্গল ডাক্তার। শক্তির মতে, ওঁর নাম হওয়া উচিত ছিল অমঙ্গলের ডাক্তার। যার সম্পর্কে এসেছেন মৃণাল ডাক্তার তার জীবন কণ্টকিত করে দিয়েছেন, নানাভাবে বিপাকে ফেলেছেন। অথচ মুখে হাসিটি লেগেই আছে, অন্তরে এত বিষ সত্ত্বেও। যেন পদ্মের নিচে পাঁক।

ছেলেদের নামকরণে অরবিন্দবাবু নিজের প্রাধান্যই বজায় রেখেছেন—তাঁর সেই চিরাচরিত রীতি। বড় ছেলের নাম শ্বেতশতদল, তার পরেরটির অর্থাৎ শক্তির স্বামীর নাম নীলোৎপল। তাঁর সর্বকনিষ্ঠ অর্থাৎ বংশের পরপ্রজন্মের একমাত্র জীবিত ধারকের নাম বাতুলকমল। শক্তি তার ঠাকুরদাকে কি মনে করে, বোধহয় আদর করেই বকুলকমল বলে ডাকে। তার তিন ননদের নাম যথাক্রমে পংকজিনী, সরোজিনী ও নলিনী। পংকজিনী বালবিধবা, সরোজিনী বিয়ের কিছুদিন পরেই লোকান্তরিতা, নলিনী অবিবাহিতা এবং বিবাহের প্রতি তার অনীহা সুস্পষ্ট। নলিনীর ধারণা এ বাড়ির—এই সরসী লজের—বন্ধ্রে বন্ধ্রে অমঙ্গলের অধিষ্ঠান, কাজেই সে হোস্টেলে থেকে পড়ে আর রিটায়ার্ড অরবিন্দর পেনশনের টাকায় ভাগই ভাগ বসায়।

অরবিন্দমৃণালের ওপর শক্তির আক্রোশ আদৌ অকারণ নয়। তার প্রথম অভিযোগ, ডাক্তার হয়ে অরবিন্দ কি করে ছেলেদের বিয়ে দিতে পারলেন; বিশেষ করে বড় ছেলে শ্বেতশতদলের রোগ যখন গুরুতররূপে প্রকট হল। বিয়ের বছর না ঘুরতেই তাকে হাসপাতালে যেতে হল। সেখানে সেই দুরারোগ্য জন্মগত ব্যাধি ধরা পড়ল। এক্স-রে পরীক্ষায় দেখা গেল, মূত্রাশয়ের একটির সন্নিবেশ অস্বাভাবিক বক্রাকার। ইউরিনাল শ্বেতশতদলের শ্বেত-রক্তকণিকা দূষিত হল তার অকাল মৃত্যু ঘটল। বোধহয় শোক সামলাতে না পেরেই শাশুড়ীঠাকরুণ সরসী দেবী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। অরবিন্দর কাছে যে তিনি দিনদিনই অবহেলা পেয়েছেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। বড় জা নীরজা মন্তব্য করল—বাড়িতে শাঁখা-সিঁদুরের পাট একেবারেই চুকে গেল! কথাটা বোধহয় অরবিন্দমৃণালের কানে গিয়েছিল। বিন্ধ্যাচল একবার টলেছিল অগস্ত্যের যাত্রাপথ করে দিতে, অরবিন্দ-মৃণাল কিন্তু অটল। তাই তাঁর একান্ত তৎপরতায় মেজ ছেলে উদীয়মান বিজ্ঞানী নীলোৎপলের বিয়ে হয়ে গেল এই অঞ্চলের বালিকা বিদ্যালয়ের সেরা মেয়ে শক্তির সঙ্গে। এবারে ছ' মাসও পার হল না—সেই দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির প্রকোপ; এক্স-রে পরীক্ষায় ধরা পড়ল নীলোৎপলের মূত্রাশয়ের বিন্যাসের জন্মগত ত্রুটি—যাকে বলে অরগ্যানিক ডিফেক্ট। দেখতে দেখতে হাসপাতালে সুদর্শন নীলোৎপল যেন নীল হয়ে গেল। অবশেষে অবলীন হল নীলোৎপলের ইহলীলা নিতান্ত অকালে।

অরবিন্দমৃণাল পুত্রবধূকে পিতৃগৃহে যেতে দেবার পক্ষপাতী নন, অজুহাত, তাঁর দেখাশোনা করবে কে। সেই থেকে শক্তি একটানা লক্ষ্য করে এসেছে অরবিন্দ তাঁর নিজের সামান্য ত্রুটিও অতি প্রকট করতে বদ্ধপরিকর, শক্তি শ্বশুরমশায়কে সভয়ে একদিন বলেই ফেললো—"বাবা, নিরুদি তো সেলাই শিখছে, আমি ভাবছিলাম কি হাতে তো সময় আছে, বি-এ পরীক্ষাটা দিয়ে ফেলি।" অরবিন্দ রাজী হয়েছিলেন কিন্তু কি কুক্ষণেই শক্তি শ্বশুরমশাইয়ের কাছে নোটবই কিনে দেবার অনুরোধ জানিয়েছিল। অরবিন্দ ডাক্তার একবার বলেওছিলেন—"মেজ মা, নোটবইয়ের সাহায্য না নিয়ে নিজেই লিখতে শেখো।" তবুও শক্তি অনুরোধটার পুনরাবৃত্তি করল, আর যায় কোথায়! প্রতি সপ্তাহেই একখানি করে আগড়ম-বাগড়ম বই চাকর মুরলী শক্তিকে এনে দিতে লাগল। এইভাবে অরবিন্দের কৃপায় না আক্রোশে শক্তি বছরের শেষে এগার-খানা সহায়ক পুস্তিকা পেয়েছিল বি-এ ইংরেজীর। বোধহয় বাজারে এ বিষয়ে আর কোন সহায়ক পুস্তিকা ছিল না। শক্তি একদিন মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলেওছিল, "বাবা, অত নোটবই দিয়ে কি হবে?"

সঙ্গে উত্তর এল, "মুখস্থ করে যাও, ইংরেজীটা পোক্ত হবে।"

নীরজা একদিন বলেছিল যে, সিনেমা সে পছন্দ করে না, তবে ভক্তিমূলক বই দেখতে খুব ভালবাসে। বলা বাহুল্য সিনেমা অরবিন্দেরও নিতান্ত অপছন্দ। সেটা জেনেও যখন বউমা দেখতে চেয়েছে, তখন ব্যবস্থা করতে হয় বৈকি! চরম ব্যবস্থা হল। নীরজা ও শক্তি অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। কলকাতা শহরে যে পাড়ায় যত ভক্তিমূলক সিনেমা নাটক ও যাত্রা চলছিল তার সবগুলোই নীরজা ও শক্তির একাধিকবার দেখা হয়ে গেল। অবশেষে শরীর ভাল না বলে তারা রেহাই পেল। একদিন পরিচিত একটা সিনেমা হলে অরবিন্দর সঙ্গে যাওয়ার সময় শক্তি শুধু বলেছিল, "বাবা, ঐ গলিটা দিয়ে গেলে শর্টকাট হবে। অরবিন্দ তথাস্তু বলে সেই গলিতে ঢুকল। তারপর শক্তিদের সঙ্গে বেশ কিছুটা ব্যবধান রেখে এগলি-সেগলি করে যেন গোলক-ধাঁধায় ঘুরপাক খেতে লাগল। হয়রানির পর শক্তিরা যখন সিনেমাহলে ঢুকল, তখন 'শো' আরম্ভ হয়ে গিয়েছে প্রায় আধ ঘণ্টা আগে। শক্তি মর্মে মর্মে বুঝল, শর্টকাট করতে না চাইলে যথাসময়েই তারা সিনেমায় পৌঁছতে পারত।

অরবিন্দের একগুঁয়েমিপনার আরও অনেক স্মৃতি চলচ্চিত্রের মত শক্তি রোমন্থন করে চলল: "কার্তিক মাসে অরবিন্দের বাড়ির ছাদে আকাশপ্রদীপ দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। একদিন কারোর খেয়াল না থাকায় সে-বাতি জ্বলল না। তারপরে—কার্তিক মাসের তখনো আঠার দিন বাকী—প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সন্ধ্যার পর অরবিন্দ ছাদে গিয়ে ফুঁ দিয়ে আকাশপ্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে আসতেন। বোধহয়, শক্তিদের একদিনের ত্রুটিটা নির্মমভাবেই প্রতিদিন মনে করিয়ে দেবার জন্যই। রাত্রের রান্নাটা শক্তিই করত। শ্বশুরমশাই বললেন, "আমার রাত্রের দুধটা একটু ঘন করে দিও। বরাবরই পাতলা দুধে কেমন যেন গন্ধ লাগে।" প্রথম দিন শক্তির ভুল হয়ে গেল। আর সেই ভুলের মাশুল প্রতিদিনই তাকে গুণতে হল। কেন না, প্রতিদিনই অরবিন্দ প্রায় ক্ষীরের মত ঘন দুধে প্রায় আধ গ্লাস জল ঢেলে তরল করে নিয়ে খেতে লাগলেন। থাকতে না পেরে অবশেষে শক্তি একদিন বলেই ফেলল, "ও কি হচ্ছে বাবা?"

অরবিন্দের সেই নির্বিকার উত্তর "দুধ পাতলা খাওয়াই ভাল।"

"তাহলে কাল থেকে পাতলা করেই জ্বাল দেব?"

"যেমন রোজ দিচ্ছ সেরকম জ্বালই চালিয়ে যাও।"

কিছুটা নিরুত্তাপকণ্ঠে অরবিন্দর অমোঘ নির্দেশ শুনে শক্তি মনে মনে বলেছিল 'অদ্ভুত'। বাবলু নতুন চাকরী পেয়ে একটা রেডিও কেনার অনুমতি চাইল। অরবিন্দ সংক্ষেপে বলল, "বেশ তো।" রেডিও এল—অরবিন্দ নিজেই আনলেন কিন্তু তার কোন ভল্যুম কন্ট্রোল নেই, আর তার সুইচ অরবিন্দমৃণালের ঘরে। ফলে তারস্বরে বেতারের বাণী ও সঙ্গীতে অরবিন্দর গৃহ-প্রাঙ্গণ সকাল থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত মুখর। সুইচটা বন্ধ করে দিতে বৌমারা অনেক চেষ্টা করেছেন; কিন্তু রেডিও আসার পর থেকে অরবিন্দমৃণালের ঘর হয় ভেতর থেকে বন্ধ, নয়তো বাইরে থেকে তালা দেওয়া। শক্তিদের শোবার ঘরে সেই রেডিও কানে তালা ধরিয়ে দিল প্রায় ছ' মাস। অবশেষে বেতারযন্ত্রটা

আপনা থেকে বিকল হওয়ার স্বস্তি। একবার পুজোর সময় নীরজা ও শক্তি সিল্কের সাদা শাড়ি পরে বেরিয়েছিল। তারপর আজ অবধি অরবিন্দ তাঁর দুই বিধবা পুত্রবধূর জন্য সিল্ক ছাড়া 'আর কোন কাপড় কেনেন নি। দুজনকে বছরে প্রায় এক ডজন সিল্কের শাড়ি পেতে হয়েছে এবং আটপৌরে শাড়ির অভাবে সেই সিল্কের শাড়ি পরতেও হয়েছে ক্রমাগত। একবার পাড়ার ছেলেদের একটা প্রদর্শনী থেকে শক্তি একটা ছবি কিনেছিল। জানতে পেরে মিতব্যয়ী অরবিন্দ সে প্রদর্শনীর 'এক' থেকে 'পঞ্চাশ' সংখ্যক পর্যন্ত সবগুলো ছবিই শাশুড়িঠাকরুণের একটা গহনার বিনিময়ে কিনে এনেছিলেন এবং শক্তির ঘরে সেগুলো সার সার টাঙিয়ে দিয়েছিলেন। অরবিন্দের বিধান সত্যিই অতুলনীয়।

তাই শক্তি আজ মনে মনে স্বস্তির আনন্দ উপভোগ করতে লাগল। আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র; তারপর সে লোকটা তাকে এত উত্যক্ত করছে, তার হাত থেকে চিরদিনের রেহাই। এ বাড়ির প্রতি এবং শ্বশুর সম্পর্কিত অরবিন্দ নামক ঐ ব্যক্তির প্রতি তার মাত্র একটি কর্তব্য বাকী। অর্চিষ্মানের মা, বাবা কেউই বেঁচে নেই। সে ভদ্রলোকের চাকরী করে; সুঠামদেহী [illegible] তরুণ। [illegible]কে সম্মান দিতে [illegible]। [illegible] শক্তিদের বাড়ির পাশের ব্যায়ামাগার থেকে [illegible] বুঝে বিয়ের প্রস্তাব [illegible] সে শক্তির দ্বিধাহীন সম্মতি পেয়ে গেছে। সেই শুভদিন ও শুভলগ্ন [illegible] সমাগত। এবারে শেষ [illegible] হতে হয়ঃ অরবিন্দের নামে [illegible] চিঠি—যা [illegible] শেষভাগে থাকবে [illegible] কথাগুলো—'বস্তুকমলের [illegible] নিমন্ত্রণ না করলেও ও যখন ইউথেনিয়ায় [illegible] হয়ে হাসপাতালে যাবে তখন কিন্তু আমাকে জানাতে ভুলবেন না। বস্তুকরণে বস্তুকমলের [illegible] চোখ দুটো যখন বন্ধ হয়ে আসবে, যেমন কমলদলের জলবিন্দু ঝরে যায়, তখন তাকে শেষ দেখা দেখতে যাবার বড় ইচ্ছে রইল।"

চিঠি লেখার উদ্যোগ করতে শক্তি ঠাকুরঘরের দোর থেকে শোবার ঘরের দিকে পা বাড়াচ্ছিল; কিন্তু ও কিসের শব্দ! অর্চিষ্মানের তো এখনো আসবার সময় হয় নি। আর সে তো আসবে ঐ ব্যায়ামাগারের লাগোয়া দোর দিয়ে—সোজা বাথরুমে। কিন্তু না, শব্দটা সামনের রাস্তা দিয়ে আসছে। কান খাড়া করতেই শক্তি বুঝল, ব্যাণ্ডপার্টির বাজনা। পাড়ার ছেলেরা কি শীল্ড আনলো, নাকি কারো ঘরে বাড়িতে বউ আনছে? স্বভাবচপল শক্তি দোতলার বারান্দায় গিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়াল—হ্যাঁ, ব্যাণ্ডপার্টি। কিন্তু ও কি? তারা যে তাদের এ-বাড়ি—'সরসী ভবনের' সামনেই দাঁড়িয়ে পড়ল! সেই সঙ্গে গ্যাস লাইটের রোশনাই হাতে আরও কয়েকজন। একটা ফুলে ঘেরা ময়ূরপঙ্খী মোটরগাড়ি তাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আর একটা গাড়ি থেকে খানদানি শাল গায়ে জড়িয়ে হাতীর দাঁতে বাঁধানো শালকাঠের লাঠিটা হাতে নিয়ে অরবিন্দমুণাল নামলেন। তাঁর পিছনে কলকাতার একটা প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীর গাড়ি খাবারের প্যাকেট নিয়ে অরবিন্দর পিছনে পিছনে নিচের বৈঠকখানাতেই এসে ঢুকল। শক্তির বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই সে শুনতে পেল অসংখ্য শঙ্খের নিনাদ। নিচে তাকিয়ে দেখল—পাড়ার উঠতি বয়সী আট-দশটা মেয়ে বেলুনফুলো গালে ক্রমাগত শঙ্খে ফুঁ দিয়ে চলেছে। আশেপাশের দু'-একজন ভদ্রলোক এসে সমবেত হচ্ছেন। আর জানলাগুলোয় হয়ত একশো জোড়া কৌতূহলী নারীনয়ন। "শক্তি, শক্তি, কইলো—" ডাকতে ডাকতে অরবিন্দমুণাল সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসছেন। নাম ধরে তাকে শ্বশুরমশায় বোধহয় এই প্রথম ডাকলেন। হতচকিত শক্তি ঠাকুরঘরের দ্বারপ্রান্তে আবার ফিরে এলো, আর অরবিন্দর মুখোমুখি হতেই বজ্রচালিতের মত তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "ব্যাপার কি, বাবা?"

কালোযাতের গৎকারির মত প্রচণ্ড হাসি হেসে অরবিন্দ উত্তর করলেন, "আরে, ব্যাপার তো তোমারই। বাড়িতে এত বড় একটা শুভকর্ম হতে চলেছে, একটু আমোদ-আহ্লাদ করব না? পাড়ার পাঁচজনকে একটু মিষ্টিমুখ করাব না? ধুমধাম তো আর করছি না। অর্চিষ্মানকে আনতে গাড়ি রওনা হয়ে গেছে। তার বাড়ির চারদিকে আজ সকাল থেকেই কড়া পাহারা বসিয়ে রেখেছি, যাতে অন্য কোথাও সে না বেরুতে পারে। আমাদের কুলপুরোহিত কামাক্ষ্যাবাবুও এসে গিয়েছেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে আশেপাশের কোন ছাপাখানাই বিয়ের চিঠিটা ছাপাতে পারল না—সেই একটা আফশোস থেকে গেল। নাও, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও—গোধূলি লগ্ন বয়ে যাচ্ছে।"

একটা আর্তনাদ করে শক্তি ঠাকুরঘরের দুয়ার ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল। সেখান থেকে তীব্রতরকণ্ঠে সে সুস্পষ্ট ঘোষণা করল—"আপনি সমস্ত ভুল শুনেছেন বাবা, এ বিয়ে হবে না—হতে পারে না—কোনমতেই না। আর ঠাকুরঘরের দরজা কাল সকালের আগে খুলছি না।" বাইরে তখনও মেয়েরা একটা উলুধ্বনি ও শাঁখ বাজিয়ে চলেছে। শঙ্খধ্বনি না কশাঘাত! যেন অরবিন্দরই জয়ডঙ্কা বাজছে। শক্তি মনে মনে বলে উঠল—"উঃ, লোকটা আবার জিতে গেল—শেষ যুদ্ধের জয়। হে ঠাকুর এর হাত থেকে, এ বাড়ি থেকে কি আমার পরিত্রাণ নেই? একটা ব্যবস্থা কর। করুণ মিনতি করে করবিধৃত শঙ্খ ঠাকুরের উদ্দেশে ভক্তিভরে কপালে ঠেকিয়ে শক্তি তাতে ফুঁ দিল মংগল শঙ্খ [illegible] উঠল।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

কদাকারের জিনিসগুলির অবশ্যই একটা শাঁসাল দিক থাকে। আর সেই আবেগের উৎসটা যদি কোন কিছুকাল দমিয়ে রাখা হয় তাহলে সেটা যখন বেরুবার পথ খুঁজে পায় তখন তার চেহারাটা হয়—আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের সেই দৈত্যের মত। দেখলে ভয় লাগে। কিন্তু কি যাদু যে জানে দৈত্যটা—!

পূর্ব ইউরোপের ভেতরটা এমনি টগ্‌-বগ্‌ করত প্রথম কয়েকটা পাঁচসালা পরিকল্পনার যুগে। যা ছোঁয়া যাচ্ছে—তাতেই যেন একটা 'সোনা সোনা' ভাব। যা দেখে তা-ই যেন ওদের ভাল লাগে। যার সঙ্গে নতুন আলাপ হয়, তাকে বেশ একটু অকারণেই মনে জায়গা দিয়ে বসে।

ওদের কেন যে এই অবস্থা তা বোঝা যায় যুদ্ধের সময় ওদের গোটা দেশটার কী হয়েছিল দেখলে। প্রাগে এমন পরিবারের সংখ্যা কমই ছিল যারা জার্মান ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে, শান্তির জন্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে লড়ে নি। তাই যখন সোভিয়েতের লাল ফৌজ ওদের লড়াইয়ে চরম জয় এনে দিল—খাস জার্মানী পর্যন্ত উজিয়ে গিয়ে তখন চেকোশ্লোভাকিয়ার সমস্ত জনসাধারণ দু'-হাত বাড়িয়ে তাদের সমাদর জানিয়েছে। ফুচিকের শেষ লেখার প্রতি ছত্রে ছত্রে এই চরম দিনটির আশায় দিন গোণার কথা লেখা আছে।

মাজারিকের পর্ব এসেছিল এর অনেক পরে। ভেতরে ভেতরে প্রতিক্রিয়ার দোষ-গুণ বিচার না করেও এটুকু বলা যায় চেকোশ্লোভাকিয়ার সাধারণ মানুষ অকপটে নাৎসী-বিরোধী ছিল। সোভিয়েতের প্রতি মমত্ববোধেরও অভাব ছিল না। কিন্তু তাই বলে যে স্বাধীনতা এবং সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাদের নিজস্ব প্রশ্ন ছিল না তা-ও নয়। মাজারিকের পর্বে চেকোশ্লোভাকিয়াকে নিঃসন্দেহে সমাজতন্ত্রের আওতা থেকে বের করে নেবার চেষ্টা হয়েছিল। হবেই। ওরা বলে, 'আমাদের দেশ তো মাঝখানে—আমাদের দু'দিক থেকে টানার চেষ্টা হবে—তা কি আমরা বুঝি নি?' তাছাড়া শিল্পের দিক থেকেও চেকোশ্লোভাকিয়া পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশের চাইতে বেশ খানিকটা এগিয়ে ছিল।

বিশ বছর পরে চেকোশ্লোভাকিয়ায় আবার একটা ঝড় বয়ে গেল। এক চেক-বন্ধু বলেছিলেন—একটা দেশে যদি আদি অন্তকাল ধরে দেখো কোন আলোড়ন নেই, বুঝবে তার উন্নতি আটকে গেছে।"

আমি বলেছিলাম—যেমন সেকালের ভারতবর্ষ। অনড় অচল হয়ে কয়েক হাজার বছর কাটিয়ে এখন যেমন আমরা বেতাল ক্ষেপে উঠেছি। শুধু ক্ষেপলে যেমন পাগলাগারদ ছাড়া উপায় থাকে না—আমাদেরও হয়েছে অনেকটা তাই। বিশ বছর স্বাধীন হবার পরে।"

এক মস্ত আড্ডায় চায়ের কাপকে বঙ্গোপসাগর জ্ঞান করে তুমুল হল্লা হচ্ছিল। চেকোশ্লোভাকিয়া আর হাঙ্গেরী ছিল বিষয়বস্তু—। আড্ডায় এক হাঙ্গেরীয় বন্ধুও ছিলেন। তিনি বললেন, 'দেখো ভাই, পূর্ব ইউরোপে আমরা এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁচেছি, যখন জীবনে যেন আর পারস্পেকটিভ খুঁজে পাচ্ছি না। কোথায় যেন আটকে গেছি। ভারত-বর্ষে অত দারিদ্র্য দেখে ভীষণ মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তবু মনে হয়েছিল তোমরা একটা কিছুর আশায় লড়ছো—নেই নেই করে একটা বিশ্বাস আছে।' বলে খুব এক-চোট হাসতে লাগলেন। শেষে ব্যঙ্গ করে বললেন, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ফ্যামিলি প্ল্যানিং করি না। কেন জানো? আমার পার্সপেকটিভ হাঙ্গেরীর জনসংখ্যা বাড়ান। ছোট দেশ থাকলে তো কারুর না কারুর আওতায় থাকতেই হবে। বড় দেশ হলে তবেই অ্যাটম বোমা, রাজনৈতিক ক্ষমতা—চাঁদে যাবার ঔদ্ধত্য—অন্যদের স্বাধীন করার যৌক্তিক।"

প্রচুর পরিমাণে হুইস্কি খাওয়া এক দিলদরিয়া বন্ধু ফিক্‌-ফিক্‌ করে হেসে ফোড়ন কাটলেন—'ভাই রাগ কর না—তোমাদের হল বাপ-ছেলের ঝগড়া।' একান্নবর্তী পরিবার ছিল গত বিশ-বাইশ বছর। সমাজতন্ত্রের জয়েন্ট ফ্যামিলি। বাড়ন্ত ছেলে—ভাগ্‌ গিয়া ভাগ্‌ গিয়া ডাক তো তার হবেই।"

কিন্তু আমি যেবার প্রথম চেকোশ্লোভাকিয়া গেছি (ইউরোপ ও চীন থাকাকালে বহুবার গেছি এরপর) সেবার এসব কিছুই চোখে পড়ে নি। চোখে পড়ে নি কেন না সমস্যাগুলো ছিলই না। থাকলেও অনেক গভীরে ছিল—জন্মই হয় নি তাদের।

তাছাড়া আমি নিজেও গিয়েছিলাম একখানি উচ্ছ্বসিত তরুণ হৃদয় নিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়াকে জানতে। কূট রাজনীতি বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মূল্যবোধ নিয়ে মাথা ঘামানো আমার অভিপ্রায় ছিল না। বরং একটু এড়িয়ে চলার দিকেই আমার ঝোঁক ছিল বেশি। 'রাজনৈতিক' হবার মধ্যে একটা লুকোনো ফাঁকি আমায় ভয় ধরাত। 'রেজিমেনটেশান'-এ ছিল প্রচণ্ড ভয়। তাই নিজের অজান্তে আমি একটা বর্ম পড়ে ফেলেছিলাম।

চেকোশ্লোভাকিয়ার বুদ্ধিজীবীরা যদিও ঠিক আমাদের ধাঁচের নয়, অর্থাৎ যুদ্ধের নিদারুণ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আসায় ও'দের কাছে জীবনের দাগগুলো ছিল অনেক পরিষ্কার লাইনে টানা।

ফুচিক বলতেন—বেদনা হল জীবনের যমজ বোন। কথাটা প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে—যুদ্ধের চারটি বছর ও'রা টের পেয়েছেন। বিশ্বাস, আদর্শ আর হৃদয়াবেগের মিলন ঘটাতে পেরেছিলেন বলেই সেই সময় চেকোশ্লোভাকিয়ার মজুর চাষী মধ্যবিত্তের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বুদ্ধিজীবী ছিলেন—রাজনৈতিক। আর সেই জন্যেই মনে হয় আজও চেকোশ্লোভাকিয়া সমাজতান্ত্রিক থেকে গেছে। ভিতটা বেশ পাকা করেই গাঁথা হয়েছিল।

কিন্তু একটা জিনিস চোখে পড়ত। আইনের বেড়াজাল যত শক্ত হয়েছে, কমিউনিস্টদের মধ্যে একটা অংশ আদর্শবাদ, সুস্থিতিশীল সমাজ গড়ার প্রতিজ্ঞার সঙ্গে তাল রাখতে পারেন নি। 'ভয়' জিনিসটা সবচেয়েই বড় মর্মান্তিক। জনেই বলে, বিদেশেই বলে—এ

ভিয়েতনাম

রুণী অবী

মানুষের লড়াই থামে না। যদিও ভিয়েতনাম থেকে
শোনা যায় লক্ষ নরনারীদের অন্তিম নিশ্বাস,
অথবা পালায় ভীরু আততায়ী ভীরু কিরিচের
অব্যর্থ প্রহারে
দ্রুত আশাভঙ্গে, অস্তিত্বের বিপদ সংকেতে, অসহায়—

তবু শোনা যায়
ভিয়েতনামের যুদ্ধ থেমে গেলে
এখনো পৃথিবী জুড়ে পশুর গর্জন, আহত,
ভীরু
হিংস্র চায় প্রত্যহের নরমেধ, বীভৎস নরক,
ঘরে ঘরে কান্না—

মানুষের লড়াই থামে না। তাই আজকের
পৃথিবী
হাজার ভিয়েতনাম, বাঁচবার একটিই শপথে দীপ্ত,
খোঁজে পাহাড়ে জঙ্গলে কত খাদ?

চেহারা প্রায় এক। এইসব দিনগুলো নানাভাবে এখানে-সেখানে পলকের জন্যে চোখে চমকে যেত।

এসব যে ঠিক বুঝে বুঝতাম তা নয়। কোনো ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় আমি সাবধান হয়ে যেতাম। কেউ কেউ বলত—দেশের সব স্তরের মানুষ যখন জেগে ওঠে, ভারি একটা ভাই ভাই ভাবের জন্ম হয় তখনই মাত্র বুদ্ধিজীবীদের সরাসরি রাজনীতিতে নামা উচিত—নচেৎ নয়। বড় বেসামাল হয়ে যায় তাদের জীবনের চাওয়া-পাওয়া আর দেওয়ার পাল্লাগুলো।

প্রাগের রূপ দেখে তখন আমার বাঙালী চোখ একটু বোধ হয় ভেজা ভেজা হয়ে উঠেছিল। যা দেখছি—তা-ই ভাল লাগছে। সমস্ত কিছুতে যেন একটা গদগদ ভাব। এখন সেসব দিনের কথা ভাবলে মজা লাগে।

সত্যি বলতে কী যুব বা ছাত্র-বন্ধুদের কারুর নামধাম আমার মনে নেই। নেতাদের নাম কিছু মনে আছে। কিছু লেখক শিল্পীদের নাম জানি। আমার ডাইরী রাখার অনিয়মিত অভ্যাস ছিল। কিন্তু কাগজপত্র 'বাজেয়াপ্ত' হত ইউরোপের বিভিন্ন অংশে। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বিলিতি সায়েব থেকে বোম্বাইয়ের সান্টা-ক্রুজ বিমানবন্দরের দিশি 'অফিসিয়াল' পর্যন্ত আমার কাগজপত্র বড় বেশি ঘাঁটা-ঘাঁটি করেছেন। বহু ছবি এবং কাগজপত্র গেছে জার্মানীর মার্কিন জোন পার হবার সময়। আর যা গেছে—তা নিজের হারাবার অভ্যাসের দোষে।

তবু কয়েকটা নাম ভাসা ভাসা মনে পড়ে—লিদা, মারি, ইয়োসেফ, ইয়ান, ভ্যাদিমীর, মিলোশ—!

এরা কে যে কোন্ জন, হয়তো হজম করে বলতে পারব না। কিন্তু তাদের মুখ আর কথা আর কাজ আমার আজও পরিষ্কার মনে আছে। আর মনে আছে এদের প্রাণখোলা হাসি, শিশুর মত অবাক হবার ক্ষমতা আর দস্যুর মত খাটার স্পৃহা।

প্রাগের মাঝখানে বিরাট এক পার্কে গেলাম সেদিন দুপুরে। পার্কটা সত্যিই হাসছিল! ফুলে ফুলে একাকার। এপ্রিল মাস বলে কথা। ঐ মাসটার নাম করলেই ইউরোপীয়দের যেন নেশা ধরে যায়। কেন ধরে তা বেশ মালুম হচ্ছিল। দুপুরের রোদ বটে। কিন্তু যেন আদর করছে। রোদটার এমন এক রকমের আলো আর তাপ আছে, যেন তা হাতে ধরা দেবে বলে আশা হয়। পার্ক জুড়ে ফুটফুটে বাচ্চারা খেলা করছে। বোধ হয় রবিবার ছিল। কেন না, অনেককে হাত ধরাধরি করে ঘুরতে দেখছি। কারুরই কোনো অশান্তির ভাব চোখে পড়ছে না। ভাবছিলাম সত্যিই যদি দেশের লোক সোভিয়েত-বিরোধী হত তাহলে এমন নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে বেড়াতে পারত? কোথাও একটা দৃঢ় বিশ্বাস কি নেই?

না, এত ওপর ওপর দেখে কিছু বলা উচিত নয়। বলা যায়-ও না। দেখতে দেখতে চেনা আর চিনতে চিনতে জানার পদ্ধতিটা আমার ধাতে সইবে। মন উতলা করে লাভ নেই।

অথচ এপ্রিলের এমন এক লোভনীয় দুপুরে কেন যে ছাই দেশের জন্যে মন কেমন করে ওঠে কে জানে! পুরো অজানা, অচেনার রাজ্যে আজ এই প্রথম। ইংলণ্ডে পৌঁছে অবাক হই নি। সবই চেনা পিতৃপুরুষের বলে মনে হয়েছিল। তাছাড়া অলিতে-গলিতে ভারতীয়, চেনা-অচেনা অনেকই! পশ্চিম ইউরোপের অনেক জায়গায়ও তাই। কিন্তু এ যে একেবারেই কিছুই! নিজের বলার তো আমায় চেকোশ্লোভাকদের হাতে তুলে দিয়ে কোথায় চলে গেছে কে জানে! এক বর্ণ ভাষা জানি নে। দো-ভাষীর উচ্চারণ বুঝতে অসুবিধে হয়।

কিন্তু এসবের জন্যে ওদের ভালবাসা বুঝতে অসুবিধে হয় নি। প্রথম দিনের কথাই বলি। ভারি একটা মজার ব্যাপার হল। একটি তরুণ অনেকক্ষণ ধরে ঘুর-ঘুর করছিল। চোখে-মুখে চাপা উত্তেজনা লম্বা-চওড়া চোয়ালভারী শক্তিমান চেহারা। হঠাৎ দো-ভাষীকে টপকে এসে আমার গালটা আঙুল দিয়ে ঘসে নিজের আঙুলটা পরীক্ষা করে দেখল। ইংরিজিতে অবাক হয়ে বলে উঠল—'রিয়াল!' মানে 'আসলি রঙ!' দো-ভাষী খুব খানিকটা হাসল। কেন না ছেলেটির ইংরিজির জ্ঞান চার পাঁচটা কথায় নিঃশেষিত। যখন ওকে বলা হল আমার রঙ অত্যন্ত পাকা বাদামী, তখন তরুণটি ঠিক বাচ্চা ছেলের মত লাফাতে লাগল। চেক ভাষায় অনেক কিছু বলে গেল। সংক্ষেপে দো-ভাষী বলল, 'ও ভারতীয় মেয়ে বিয়ে করতে চাইছে।'

'ভাল তো! আমাদের দেশে প্রচুর মেয়ে আছে।'

দো-ভাষী হো-হো করে হাসতে লাগল। বলল—'ও বলছে তোমাকে হলেই চলবে।'

হাসাহাসির মধ্যে ছেলেটি আর একবার আমার গালের রঙ পরখ করে তারিফ করল। তারপর ওর যে বান্ধবীটির জন্যে ও অপেক্ষা করছিল, সে এসে পড়ায় তার সঙ্গে চলে গেল। যাবার সময় দুজনেই সমবেত উচ্ছ্বাসে আমার বাদামী রঙের তারিফে আমাকে প্রায় ভাসিয়ে দিয়ে গেল।

আর আমি কি আহাম্মক! এতদিন সাহেবদের দেশে থেকে কি না ভাবছিলাম আমি ফর্সা হয়ে গেছি। [ক্রমশঃ]

মস্কোয় বাংলা ভাষার চর্চা : গোপাল হালদারের বই প্রকাশ

মস্কোর প্রাচ্যবিদ্যা পরিষদ্‌ ১৯৫৯ সাল থেকে "এশিয়া ও আফ্রিকার ভাষাসমূহ" নামে একটি গ্রন্থমালা প্রকাশ করে চলেছেন। এই পর্যায়ে ইতিপূর্বে উর্দু, অসমীয়া, ওড়িয়া, দ্রাবিড়ী, বাংলা, সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে রুশ ভাষাতাত্ত্বিকদের লেখা বই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ভাষা সম্পর্কে ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত বইটি রচনা করেছিলেন যেভগেনিযা মিখাইলোনা বীকোভা। এই পর্যায়েই এবার প্রকাশিত হতে চলেছে শ্রীগোপাল হালদারের 'পূর্ব বাংলার উপভাষাসমূহের সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ'। ছাপার কাজ সবে শুরু হয়েছে। প্রকাশ হতে এখনও বছরখানেক লাগবে।

অন্তত বাংলাদেশে শ্রীগোপাল হালদার সেই মুষ্টিমেয়দের একজন যাঁরা রাজনীতি, সাহিত্য ও বিদ্যা, এই তিনেরই চর্চায় যুগপৎ নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন ও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। বস্তুত আমাদের বহুবার এমনই মনে হয়েছে যে বড় স্বচ্ছন্দে ও বড় সহজে মানুষের সঙ্গে মেশেন, মানুষের আবেদনে সাড়া দেন বলেই বোধহয় আমরা এই কাজের মানুষটিকে তাঁর যোগ্য সম্মান দিতে ভুলেছি। তা না হলে কেন এমন হবে? ১৯৩৫ সালে লেখা তাঁর বইয়ের এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হতে চলেছে এতদিন পরে, তাও সোভিয়েত ভারততাত্ত্বিকদের উৎসাহ ও উদ্যোগে। তাতে বাংলাদেশের কোন কৃতিত্ব নেই।

শ্রীহালদারের সঙ্গে বিক্রমপুর ও নোয়াখালির যোগ ঘনিষ্ঠ। তাঁর প্রথম জীবন কেটেছে ঐ দুই অঞ্চলেই। ওখানকার মুখের ভাষা তাঁর কানে লেগেছিল, তার নানা খুঁটিনাটি ভাষাতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যও। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ভাষাতত্ত্বের গবেষণায় উদ্যোগী হয়ে শ্রীহালদার পূর্ব বাংলার উপভাষা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন। তাঁর এই গবেষণায় শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনা ও সহায়তা আজও শ্রীহালদার গভীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করেন। ১৯৩০-৩২-এর মধ্যেই নোয়াখালির উপভাষার ধ্বনিতত্ত্ব ও ব্যাকরণ বিষয়ে তাঁর দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯৩২-এ রাজনৈতিক কারণে কারারুদ্ধ হয়ে কাজ চালাতে অসুবিধা হয়। কিন্তু ততদিনে তথ্যসংগ্রহের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ। তাছাড়া কারাগারেও পাওয়া গেল পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলার মানুষ: তাঁদের মুখের কথায় অনেক তথ্য যাচাই করে নেওয়া গেল। জেলের মধ্যে বসেই ১৯৩৩ সাল নাগাদ 'একদা' উপন্যাস সমাপ্ত করে তিনি পূর্ব বাংলার উপভাষা সম্পর্কে তাঁর গবেষণার ফল লিখতে শুরু করলেন। ১৯৩৫-এ লেখা শেষ হয়। অন্তত তিন কপি টাইপ করে না দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের থিসিস জমা দেওয়া যায় না, তখনকার সেই নিয়মরক্ষা করা সম্ভব ছিল না, কারারুদ্ধ গোপাল হালদারের পক্ষে। কারামুক্ত হবার পরেও উৎসাহী প্রকাশক পাওয়া যায় নি। বই বিক্রি হবে কি না, সে ভাবনা তো ছিলই। তাছাড়াও ছিল মুদ্রণের অসুবিধা: ইংরেজিতে লেখা বইয়ের মধ্যে প্রত্যেকটি শব্দের সঙ্গে ফোনেটিক (ধ্বনিনির্দেশের প্রতীক) হরফে, বাংলা হরফে, শুদ্ধ বাংলায়, রোমান হরফে উচ্চারণনির্দেশ সহ তার রূপও সন্নিবেশিত হয়েছিল। ফোনেটিক ও উচ্চারণনির্দেশ প্রতীক হরফগুলি বাংলা ছাপাখানায় পাওয়াই দুষ্কর খুব কম মুদ্রণালয়েই তা পাওয়া যায়; যেসব মুদ্রণালয়ে পাওয়া যায়, সেখানে ছাপার খরচও তেমনি ভারী। কোন ব্যবসায়িক
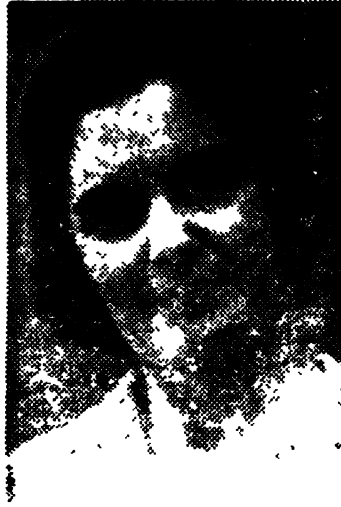
যেভগেনিয়া মিখাইলোনা বীকোভা

প্রকাশক স্বভাবতই এদিকে এগোবেন না। এগোতে পারেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ সে দায়িত্ববোধ তাঁদের নেই।

শ্রীহালদারের গবেষণাজাত মূল রচনার একটি দেড়শো-দুশো পৃষ্ঠা আয়তনের সংক্ষিপ্তসার মাত্র মস্কো থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। হরফের বৈচিত্র্যও অনেক সহজ করা হয়েছে। ফোনেটিক ও রুশ হরফেই মাত্র বাংলা শব্দগুলি দেওয়া হবে; কেবল কিছু বিশেষ স্থলে বাংলা হরফও থাকবে। কার্যত নতুন একটি বই-ই গোপালবাবু রচনা করেছেন। মস্কোয় পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দেবার পর শ্রীযুক্তা য়েভগেনিয়া বীকোভা সেটি আদ্যোপান্ত পাঠ করে সবিনয়ে কিছু সংযোজন, বিস্তৃততর ব্যাখ্যা ও পরিবর্তনের প্রস্তাব করেন। শ্রীহালদার বলেন, "শ্রীমতী বীকোভা যা করেছেন, তাকে এদেশে আমরা 'সম্পাদনা' বলতাম।" অথচ ওদেশের বিচারে তাকে সম্পাদনা বলা হয় না; তাই শ্রীমতী বীকোভা সেই কৃতিত্ব নেবেন না। অথচ যে প্রস্তাব তিনি করেছিলেন, তাতে ভাষাতত্ত্ব ও বিশেষত বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পেয়ে শ্রীহালদার মুগ্ধ।

শ্রীহালদার তাঁর গ্রন্থে চারটি প্রধান উপভাষা চিহ্নিত করেছেন: ১। খুলনা-যশোর; ২। মধ্য পূর্ব (ঢাকা, পশ্চিম শ্রীহট্ট ও টিপেরার অংশ); ৩। উত্তর পূর্ব শ্রীহট্ট ও টিপেরার অংশ); ৩। উত্তর-পূর্ব খালি)। এছাড়াও তিনি আরো তিনটি উপ-উপভাষা স্বীকার করেন: হাজং (গারো পাহাড়); বিষ্ণুপুরিয়া (যে বাঙালীরা মণিপুরীতে কথা বলেন); চাকমা (পার্বত্য চট্টগ্রাম)। শ্রীহালদার তাঁর গবেষণার পেছনে দুজন পূর্বসূরীর অবদানের কথা বারবার বলে থাকেন: একজন জর্জ গ্রীয়ারসন; অন্যজন সুনীতিকুমার। সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গ ও সমগ্র ভারতেই এ-ক্ষেত্রে এতই কম কাজ হচ্ছে যে শ্রীহালদার স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হন। তিনি দায়ী করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুৎসাহকে। একদা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে সুনীতিকুমারের বই ছাপার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণালয়ে নতুন ধরণের টাইপ নির্মাণ করাতেও পিছোন নি। অথচ আজ সেই উদ্যোগের কণামাত্রও নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগেও কোন উদ্যোগ নেই। ফলে দেখা যাচ্ছে, পূর্ব পাকিস্তানে উপভাষা নিয়ে মূল্যবান গবেষণা হচ্ছে (যেমন ঢাকাই উপভাষা বিষয়ে মুহম্মদ আবদুল হাই-এর কাজ)। অথচ পশ্চিমবঙ্গে মানভূমের উপভাষা বিষয়ে সুধীর করণের কাজ ছাড়া সাম্প্রতিককালে আর কোন উল্লেখযোগ্য কাজই হল না। আমাদের রাজ্য সরকারের এদিকে কোন দৃষ্টিই নেই।

শ্রীহালদার সুনীতিকুমারের একটি পুরনো উক্তি স্মরণ করে বলেন, "বাংলা উপভাষাগুলি না জানা গেলে বাংলা ভাষার কোন সমগ্র রূপই ধরা যায় না।" অথচ এই গুরুত্ব সম্পর্কে এখানকার উদাসীনতার পাশে রুশ ভাষাতাত্ত্বিকদের, বিশেষত শ্রীযুক্তা বীকোভার উৎসাহ আরো আশ্চর্য ও মূল্যবহ মনে হয়। ভারতচর্চায় রুশ ও বাঙালী মনীষার এই গভীর যোগাযোগ স্বভাবতই আমাদের উৎসাহিত করে। সেদিন শ্রীগোপাল হালদারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বিদ্যাচর্চার এই আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের বোধই উপলব্ধি করছিলাম।

—সৌম্য মিত্র

—"তুমি বড় হয়ে কি করবে?"

—"ধানী জমি করব, মোদের জমি নাই মোটে, অপরের মাঠে লাঙল দিতে হয়।"

—"তা তো বুঝলাম। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র, জমি কিনবে কি দিয়ে, কি করে?"

গোবিন্দচন্দ্র বেপরোয়া। চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে বলে,

—"কেন? বাপ মাঠে কাজ করে, আমিও কাজ করি এই দোকানে। পয়সা হবে, পয়সা জমলে, তাই দে জমি কিনব।"

—"শুধুই জমি কিনবে, আর কিছু নয়?"

—"আর আবার কি? বাপ বলেছে জমি হোলেই সব হোল। তখন আর অপরের রোজ খাটতি হবে না, নিজের মাঠ, নিজের ধান, সব কিছু নিজের। কম খাই বেশি খাই, নিজেরটাই খাব।"

সদরে এসেছি পড়তে—আমতা

আমতা সদর থেকে অনেক দূরে দারিট, ছোট্ট, সবুজ, মিষ্টি একটি গ্রাম। গোবিন্দচন্দ্রের "দেশ"। "দেশে" বাপ আছে, মা আছে, আছে পাঁচটি ভাই-বোন। অনেক দারিদ্র, অনেক কর্তব্য আর অনেক স্বপ্ন নিয়ে "বিদেশে" এসেছে গোবিন্দ, চাকরি নিয়েছে কমলবাবুর চায়ের দোকানে। বাপ তো অন্যের মাঠে মুনিষের কাজ ঠেলতে ঠেলতেই বুড়িয়ে গেল। রাতদিন কেবল আপশোষ করে "জমি" "জমি" করে বলে—"মরার আগে যদি একবারটিও নিজের মাঠে লাঙল দিতে পারতাম তো জন্ম সার্থক হোত।" মা-ও ভারী কষ্টে আছে। পাঁচটি অপোগণ্ডর পেটের এক কোণাও ভরে না বাপের রোজগারে। সে তাই গ্রামের বড়মানুষদের বাড়ি খেটে-পিটে কুড়িয়ে-কাচিয়ে আনে এটা-সেটা। জোড়াতালির ওপর জোড়াতালি। তবুও অভাবের ফুটো-গুলো মুখ বার করে থাকে! ষোল বছরের গোবিন্দচন্দ্র তাই জুনিয়র হাই স্কুল থেকে নিজেকে নির্বাসিত করেছে, চলে এসেছে সদরে। পয়সা জমাচ্ছে। মাসে একবার করে বাপ আসে ছেলের কাছে। মাইনের সবটা কিন্তু দেয় না গোবিন্দ। লুকিয়ে রাখে কিছু, বাপের জন্যই রাখে। বাপকে জমি কিনে দেবে। মরার আগে সনাতন জেনে যাবে, জমি হয়েছে তার, জমির মালিক হয়েছে সে, যত তুচ্ছ হোক না কেন সেই জমির আয়তন।

কিন্তু সনাতনের ছেলে গোবিন্দচন্দ্রের ভবিষ্যৎ কি? গোবিন্দ'র মত আরও অনেক চাষীঘরের ছেলে ঠিক একইভাবে জড়িয়ে গেছে সংসারের চাকায়। ওদের ভবিষ্যৎই বা কি? সরকার এ প্রশ্নের উত্তর দেবে না জানি। কারণ সে এখন সুতো-ছেঁড়া ঘুড়ি, সে উড়ছে নিজের খেয়াল-খুশিমত, পিছুটান তার নেই। প্রশ্নের উত্তর তাই আমাদেরই দিতে হবে। বিঘে দু'তিন জমি, ঘাটে গঞ্জে চায়ের দোকানে চাকরি বা সদরের ছোট কারখানার মেকানিক,—এর বেশি কেন ভাবতে পারছে না গ্রামবাংলার চাষীঘরের ছেলেরা? ঠিক এইটুকুই যদি ওদের প্রত্যাশা হয়, এইটুকুই যদি ওদের দাবি হয় তা হোলে ওরা দেবেই বা কতটুকু আর আমরাই বা কি পাব? আমরা যারা শহরে থাকি, শহরের পড়ুয়া ছেলেমেয়ে-দের আর তাদের স্কুল-কলেজগুলোকে দেখি আর ভাবি কমতা হোচ্ছে কোথায়? শহরের বাইরে পা দিলেই কিন্তু ধারণাটা ক্রমশ পাল্টে যাবে। দেখতে পাব, দেশের ছেলেমেয়েদের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ সৌভাগ্যের সোনার কাঠির ছোঁয়া পেয়েছে বাকীরা এখনও যে তিমিরে সেই তিমিরে। এই তিমিরেই ওদের জন্ম আর এই তিমিরেই হবে ওদের মৃত্যু!

গোবিন্দ'র কথা লিখতে বসে মনে পড়ে যাচ্ছে আরও দুটি কচিমুখ, প্রফুল্ল আর কুসুম। এই এবারের বন্যায় যখন আমতার মাঠে মাঠে চাষীদের সব স্বপ্ন, আশা-ভরসা ভেসে ধুয়ে সাফ হোয়ে গেল, প্রফুল্লর বাবাও চলে গেল সেই সঙ্গে। আপার প্রাইমারী ছেড়ে প্রফুল্ল আজ বাগনান স্টেশনের প্লাটফর্মে বুটপালিশের বাক্স নিয়ে ঘুরছে। অপটু হাতে কালি মাখায়, বুরুশ ঘষে, তবুও ওর ছোট্ট কপালে ঘামের বিন্দু ফুটে উঠে সাক্ষ্য দেয় ওর নিষ্ঠার, ওর সততার, বিধবা মা আর ভাই-বোনকে বাঁচিয়ে রাখার

অনেক আশার অপমৃত্যু ঘটেছে এইখানে—আমতা

ঐকান্তিক ইচ্ছা ও জেদে রুচি গলায় প্রফুল্ল ডাকে "বুটপালিশ," "বুটপালিশ"।

কুসুমও একদিন স্কুলে পড়ত। মামলাবাজ বাপ জমি-জমা সব খুইয়ে একদিন নিজেও খোয়া গেল। মা গেছে আরও আগে, সাতষট্টির খাদ্য সংকটের সময়। একলা কুসুম, একরত্তি মেয়ে, গ্রাম ছেড়ে চলে এসেছে সদরে। মেলাই-চন্ডীর চত্বরে বসে ওর কথা সব শুনলুম। দিয়ে এলুম জানাশোনা এক বাড়িতে। ফাইফরমাস খাটবে, আর দুবেলা খাবে। কিন্তু এটা যে আসল সমস্যার কোনও প্রকৃত সমাধান নয়। কুসুম বা ঠিক তার মত আরও যারা আছে তারা কি এভাবেই বেঁচে থাকবে, এভাবেই বেড়ে উঠবে অনাদর আর অবহেলার মধ্যে। চাষীর ঘরের ছেলেমেয়ে ওরা, মাটির সাথে ওদের নাড়ীর টান, ওরা মাটির বুকেই থাকুক, কিন্তু মাটির বুকে আলো এসে না পড়লে ওরা বাঁচবে কি করে, বড় হবে কি করে?

আমতার যে সব গ্রামে গিয়েছি, কোথাও শুনি নি যে ছেলেমেয়েরা তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবনাহীন, নিশ্চিন্ত। আলাপ করেছি অনেকের সাথে, দেখেছি পড়াশুনা নিয়ে ওদের আগ্রহ যতটা, আশা-আকাঙ্ক্ষা যতটা, ঔদাসীন্য এবং অনাদর তার চেয়ে কিছু কম নয়। অনেক বড় ইচ্ছে, অনেক বড় স্বপ্ন বুকে নিয়ে ওরা ছাত্রজীবন শুরু করে। কিন্তু এই ছাত্র-জীবন শেষ হোয়ে যায় খুবই তাড়াতাড়ি, যখন বন্যা আসে, খরা আসে আর দেনার দায়ে অসহায় বাপ-মা শেষ সম্বলের সাথে নিজেদেরও বিকিয়ে দিতে চায় মহাজনের

পাঠশালা —আমতা

কাছে। ওদের পড়ার পাট চুকে যায়। প্রাইমারী স্কুলকে "গুড বাই" করে আরও অনেক বড় এক স্কুলে ওরা ঢুকে পড়ে। এই স্কুলের নাম সংসার। ওরা হোতে চায় এক হয় আর এক। গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে এমনি করে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে কত স্বপ্ন, কত সদিচ্ছার অপমৃত্যু ঘটছে আমরা তার খোঁজ রাখি না।

আমতায় মহিলা সমাজশিক্ষা কেন্দ্র আছে আটটি। মহিলাদের অর্থাৎ চাষী পরিবারের মেয়েদের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার বিস্তৃতি সাধনের উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠান-গুলো কাজ করবে, এমনটি আশা করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ঘটছে বোধ হয় অন্যরকম। স্থানীয় অনেক লোকই অভিযোগ করেছেন যে গ্রামসেবিকারা একটু উন্নাসিক। গরীব চাষীর বাড়িতে গিয়ে তার বউ-মেয়েদের সাথে আলাপ পরিচয় করার মত মনোভাব তাদের নেই। অপেক্ষাকৃত উচ্চবিত্তদের সাথেই তাদের দহরম মহরম বেশি।

ছোট ছেলেমেয়েদের জীবনে মা'র ভূমিকা অনেক বড়, অনেক বেশি গুরুত্ব-পূর্ণ। মা'র কাছে সে যে পাঠ নেয়, যে আচার-আচরণ শেখে তাই তাকে পরে পথ দেখায়। কাজেই মা'র দায়িত্বও বেশি। গ্রামের মেয়েদের ক্ষেত্রে এ কথাটা খুবই সত্য। ছেলেমেয়েদের গড়াতে হোলে তাদেরও গড়ে ওঠা চাই দায়িত্বের উপযুক্ত হোয়ে। কিন্তু শ্যামপুরে, বাগনানে

আমতা, কোথাও দেখলুম না গ্রামের মেয়েদের অজ্ঞতা দূরে করার জন্য কোনও প্রকৃত চেষ্টা চলছে। সমাজশিক্ষা কেন্দ্রে সবই আছে, বই, তাঁত, বাণী, উপদেশ। কেবল নেই নিষ্ঠা। সেখানে যারা সমাজসেবী, তাদের কাছে সমাজ সেবার মানেই হোল চাকরি। চাকুরেদের মত তারা তাই মেপে মেপে দেয়। তাদেব সামনে রক্ত নেই, যা আছে তা স্বার্থ। ওদের কাছ থেকে গ্রামের মা-বোন শিখবে কতটুকু, জানবে কতটুকু?

দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাই কিন্তু এত সব গোলমাল পাকিযেছে আব এই গোলমালের সুযোগ নিয়েছেন নেতাবা। তাঁবা যেমন নাচান, তেমনি নাচে সবাই। শিক্ষা-ব্যবস্থা নিযে আলোচনা কবছি, এখানেও দেখছি পুতুলনাচ। শিক্ষক, সেও নাচছে, উঠছে, বসছে কর্তাদের মর্জিমাফিক! ভাবছি কতকগুলো কলেব মানুষ কি করে হাজার হাজাব ছেলেমেয়ের দায়িত্ব নিতে পারে বা পালন করতে পারে? নাইট স্কুল থেকে শুরু কবে হাই স্কুল পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে দলাদলি। বাজনৈতিক মতভেদ, ব্যক্তিগত মনোমালিন্য, সবকিছু একাকাব হোযে এমন একটা জটিল চেহাবা নিয়েছে যে কেউ বাইবে থেকে আসল চেহাবাটা কোনমতেই টেব পাবে না। ভেবেছিলাম অন্তত এই একটা জায়গায় আমরা পবিত্রতা বজায় বাখব, আদর্শচ্যুত হব না। কিন্তু আমবা তা পাবি নি। গ্রামবাংলাব শিক্ষা-ব্যবস্থা আজ এক অতি নোংবা বাজনৈতিক দলাদলিব বলি হোযেছে। এ বাজনীতিকে নোংরাই বলব আমি, কারণ নীতিগত বিবোধেব স্বচ্ছ আববণেব নিচে আত্মগোপন কবে থাকা ব্যক্তিগত স্বার্থ আব গামা দলাদলিব কুৎসিত দেহটাকে স্পষ্ট [illegible]

শিক্ষককে শিক্ষক [illegible] না স্কুল কর্তৃপক্ষ। [illegible] স্বার্থরক্ষায লোকটি তাদেব কতটা কাজে লাগাতে পাবে বা এ ধবণের কাজে তাকে আদৌ ব্যবহার করা যাবে কি না। শিক্ষকেব যোগ্যতাব বিচার তাব জ্ঞান দিযে হয না, হয় দলাদলিতে তাব অভিজ্ঞতা দিয়ে। আমতাবই এক আদর্শবাদী শিক্ষকেব কথা শুনেছি যাঁকে তাঁব নীতিব প্রতি, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা দেখাবাব জন্য শাস্তি পেতে হয়েছিল। তাঁব চাকরি চলে গিয়েছিল। বৃদ্ধ শিক্ষকটি আর কোথাও কোনও কাজ পান নি। অভাব আর অনটনের মধ্য দিয়ে তাঁকে তিলে তিলে মরতে হোয়েছিল! এই আমাদের দেশ, এই আমাদের দেশের মানুষ!

মার্টিনের খোকাগাড়ি চেপে কলকাতায় ফিরে চলেছি, গ্রামবাংলা ছেড়ে শহর বাংলায়। তবু মন পড়ে আছে পেছনে, বলছে—

বড় ভালবাসি এই সবুজ বাংলাকে,
সোনালী ধানের শীষে ভরা যার
ছড়ানো আঁচল-
মায়ের মুখের মত পৃথিবীতে কোন
মুখ নেই,
তবুও এই মা আমার দুঃখ নিয়ে বেঁচে
আছে আনন্দের মাঝে। *

* আলোকচিত্র : লেখক কর্তৃক গৃহীত

একটি গাছ একশ ফুল (শ্রাবণ, ১৩৭৫)—দুর্গাদাস সরকার। নবজাতক প্রকাশন। ৬, এ্যান্টনীবাগান লেন, কলকাতা-৯। দাম : তিন টাকা।

যুগ জীবন ও যৌবনের যন্ত্রণা-মথিত হৃদয় নিয়ে যে সব প্রগতিবাদী আধুনিক কবি তাঁদের চেতনার রঙে মানুষের মনকে বিস্ময়ে-আনন্দে-বেদনায় মূল থেকে নাড়া দিয়ে যান, দুর্গাদাস সরকার তাঁদের অন্যতম। জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে গ্রাম ও নগর-বাংলার প্রাত্যহিক পরিবেশের প্রতিটি খুঁটিনাটি তাঁর কবিতায় প্রতিবিম্বিত হয় বলেই তাঁকে অত্যন্ত কাছের, একান্ত আপনার বলে মনে হয়। সহানুভূতি শুধু নয় মানুষ ও মনুষ্যত্বের প্রতি কবির "অকৃত্রিম দরদ" অধুনা প্রকাশিত তাঁর "একটি গাছ একশ ফুল" কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুচ্ছকে অপরূপ ব্যঞ্জনা দিয়েছে।

'একদিকে মৃত্যু, আর অন্যদিকে তার/জীবনের বিচিত্র সম্ভার' ("সোনার বাংলা") নিয়ে গ্রাম বাংলার মমতাময় রূপ কবি তাঁর কাব্যে এঁকেছেন "সোনার বাংলা", 'পড়েছি অশোকলিপি' "কার শস্য তার নাভিমূলে" ইত্যাদি কবিতায়। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও শুনিয়েছেন 'নিভৃত নিশ্বাস আছে গ্রামের গভীর মর্মমূলে।' ("কার শস্য তার নাভিমূলে")। তাই 'দিগন্তে মাঠের দিকে ছুটে যাবে যে সব কৃষক—শান্তি ফসলের মুখে এনে দেবে নতুন শতক।" (ঐ)

কবি তাঁর গভীর বেদনার্ত অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে 'ব্লাইন্ড স্কুলের মাঠে' এ অন্ধ ছেলেদের ফুল ফোটানো, ফুল ফোটানো এ-অনন্দ ভীষণ গন্ধ' হতে দেখেছেন, ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব স্কুলের বাসের আরোহীদের "বুকের ভিতরে" মৃত ভাষার কলধ্বনি শুনেছেন। "সোনার বাংলা"র অন্নদা বাগচী "নেপথ্যের সংসার" কবিতায় যাত্রা দলের শাক্রশান অভাগী নবীন মাঝি "নেপথ্য থেকে" এবং "মাঠের পর" কবিতায় জাহাজের কয়লা ভাঙা নাবিক মত্ত ইব্রাহিম শেখ দেবের দুর্দশা দুর্ভাগ্য বেদনা বঞ্চনা নিয়ে অবিস্মরণীয় চরিত্র।

স্বচ্ছ উদার কবির দৃষ্টিভঙ্গী, বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কণ্ঠ তাঁর বজ্রদীপ্ত —'কখনো মানুষ নয় অবনত বর্ণের বিভেদে,/সেকথা থাকুক লেখা আদি থেকে শেষ পরিচ্ছেদে।' ("অটোয়ার গমক্ষেত থেকে") অথবা 'সঙীন বেঁধা বুকের রক্তে ডেকেছে আজ বান।/'খোকন তোকেও ডাক দিয়েছে আমার ভিয়েৎনাম"/..খোকা আমার নিজেই ভিয়েৎনাম।' ("ভিয়েৎনামের মা") দিনবদলের পালার ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ক্রান্তদর্শী কবি যেন মুক্তিমন্ত্রের উদ্গাতা—'জানি তা ঘোষণা করে বার্থ দিন বদলের পালা/হে আফ্রিকা সেই মন্ত্রে মানুষকে তুমি দীক্ষা দিলে। ("আফ্রিকা")।

গীতিধর্মী প্রেমের কবিতাগুলিতে আধুনিক জীবনের অপরূপ অপ্রিয় বেদনা উৎসারিত। এখানেও কবি স্নেহমুক্ত অথচ সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী। অপূর্ব আবেগে তিনি বলেন, "কোনও দেখা শেষ নয়। শেষ পাওয়া অপূর্ণই নয়।/বার বার হাতড়িয়ে খুঁজি শুধু হৃদয়ের সীমা।" ("পঞ্জরী-পরাগ")। সভ্যতার অস্থির অর্ন্তবন্দিতে কিম্বা অতি আধুনিকতায় যেখানে 'আধুনিক সার্জারীতে হৃদয় বদলাবে আধুনিকা' ("নতুন পৃথিবী") সেখানেও কবি "বোধায়ন" কবিতায় অলোকসামান্য প্রেমের প্রাণময় সংজ্ঞা দিয়েছেন, 'প্রেম থাকে গভীর গহ্বরে/মননের। প্রেম হয় মন্বন্তর সৃষ্টির সংস্কার।' প্রেমের এই "বোধায়ন" এক হিসাবে কাব্যগ্রন্থটির শ্রেষ্ঠ কবিতা। কবির অশ্রু এবং বিশ্বাস যে ভালবাসা "যে ফুল ফোটেনি", সে ফুল ফোটেনি কেউ না কেউ সে ফুল ফোটাবার ভার নেবে—'ক্ষতি না ফোটাও যদি সে ফুল ফোটানোর অনাড়ম্বর। ("ক্ষতি না ফোটাও যদি")।

লিরিকের স্বচ্ছন্দ গতি, গীত প্রবাহিত। সনেট নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, সফল হয়েছেন। কবির বিজ্ঞান-মানসের পরিচয় পাই "শিশুবধ যন্ত্রের অপেরা", "নতুন পৃথিবী" প্রভৃতি কবিতায়। কবিতাগুলির ছন্দ এবং গঠনপদ্ধতি সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন। কবি তাঁর কাব্যলক্ষ্মীকে স্বচ্ছন্দে নানা অলংকারে ভূষিত করেছেন। সাধারণের মধ্যে অসাধারণত্বের ব্যঞ্জনা দুর্গাদাসবাবুর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'একরাউবী বউ/এক ঝাঁক রোদ রঙীন বসনে' ("হেলিকপ্টার গর্জন") 'বেতো বাদুড়টা' ("ঘণ্টা") ইত্যাদি রূপকল্প অনন্যসাধারণ।

[illegible] মধুক্রেশ [illegible] সম্পাদক : কল্যাণ বসু। মধুক্রেশ সিণ্ডিকেট, ৬৪।১৩, বেলেঘাটিয়া রোড, কলকাতা-৩৭। দাম : তিন টাকা।

'মধুক্রেশ' মনোজ্ঞ একটি বার্ষিক সংকলন, আর দু'-দশটি এই ধরণের সংকলনের মধ্যে যার স্বাতন্ত্র্য সহজেই চোখে পড়ে। পূর্ববঙ্গের সাহিত্য সংকলনটির একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ চৌধুরী ও দেবীপদ ভট্টাচার্যের আলোচনাগুলি চিন্তা উদ্রেককারী। চেকোস্লোভাকিয়ার কবি আন্দ্রে প্রাভাকা, ফ্রান্টিসেক হালাস ও ইয়ান কোসত্রার তিনটি কবিতার অনুবাদ করেছেন। যথাক্রমে দক্ষিণারঞ্জন বসু, কৃষ্ণ ধর ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। লেখক গোষ্ঠীতে আছেন প্রলয় সেন, ভবানন্দ ভট্টাচার্য, প্রবোধকুমার সান্যাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখ। মনীশ ঘটক, দুর্গাদাস সরকার, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, মণীশংকর দাশগুপ্ত অমিয়কুমার হাটি, আব্দুস সাত্তার (পূর্ববঙ্গ) প্রমুখ কবির কবিতা উল্লেখযোগ্য। এমন একটি সংকলন প্রকাশে সম্পাদক যে শ্রম স্বীকার করেছেন, তা প্রশংসার্হ।

যাত্রী : সম্পাদনায়—দ্বিজেন্দ্র চক্রবর্তী ও লক্ষ্মীনারায়ণ সেন। ৫২, নবাসড়ক রোড, গোরাবাজার বহরমপুর। দাম : এক টাকা

'লিটল ম্যাগাজিন' পর্যায়ে একটি পত্রিকা। লেখকদের মধ্যে সবাই নতুন। তবে রচনাগুলির মধ্যে একটি সামগ্রিক সাহিত্য মানবতার প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

ভুবন : প্রধান সম্পাদক : নয়নকুমার রায়। ২নং গভঃ স্কীম, পোঃ চন্দননগর, জিঃ—হুগলী। দাম : এক টাকা।

এই সংখ্যায় রয়েছে, তিনটি বড় গল্প এবং কয়েকটি কবিতা। গল্প লিখেছেন নবকুমার রায়, শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ও মিতালী চক্রবর্তী। কবিতায় আছেন মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ঋষিকা রায়, সুভাষিতা পাল, প্রতাপচন্দ্র সরকার।

আজকাল—সম্পাদক : নিত্যগোপাল সামন্ত। বিষ্ণুপুর (২৪ পরগনা)। দাম : এক টাকা।

এই শারদীয় সংখ্যাটিতে গল্প লিখেছেন শংকর দাশগুপ্ত ও অমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। কবিতা লেখকদের মধ্যে আছেন : চন্দন সেন, গোপাল ভৌমিক, সুকুমার আয়েন, বাসুদেব দত্ত প্রমুখ। নলিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দাদাঠাকুর স্মৃতি' প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য হয়েছে।

এস এন রায় কমিটির রিপোর্ট প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক বসুমতীর নিয়মিত পাঠক হিসাবে এই পত্রিকার গত ১৪।১১।৬৮ তারিখে প্রকাশিত অধ্যাপক নির্মল বসুর "এস এন রায় কমিটির রিপোর্ট" সম্পর্কিত মন্তব্য পড়বার সৌভাগ্য হয়েছে।

আমরা উত্তরবঙ্গে থাকি না, তাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত সত্য ও অসত্য রিপোর্টের ওপর আমরা নির্ভরশীল। কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিবৃতিও আমাদের প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করতে সাহায্য করে। বিশেষ করে তাঁরা যদি আবার স্থানীয় লোক হন।

অধ্যাপক বসু অভিযোগ করেছেন যে, "শ্রীরায় কবে জলপাইগুড়ি গেলেন, কোথায় বসলেন, কি ভাবে তদন্ত করলেন, সাক্ষ্য নিলেন, অনেকেই তা জানতে পারেন নি। সবাই-এর সাক্ষ্য নিয়ে তদন্ত করাটা বোধ হয় সরকারেরও ইচ্ছা ছিল না।" তিনি আরো মন্তব্য করেছেন, "বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের প্রাক্তন বামপন্থী এম-এল-এ'দের ডাকা হয় নি (কংগ্রেসী এম এল-এ'র বাড়ি গিয়ে কিন্তু শ্রীরায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন)। এম এল এ-রা এখন নেই, কিন্তু এম এল সি-রা আছেন। শহরে দু'জন বামপন্থী এম এল সি, তারা বন্যার সময় ও তারপর ছিলেনও, তাঁদের কাউকে ডাকা হয় নি, অথচ কংগ্রেসী এম এল সি-র সঙ্গে দেখা করার জন্য শ্রীরায় নদী পার হয়েছেন। শহরের নির্বাচিত মিউনিসিপ্যাল কমিশনারদের (অন্ততপক্ষে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার) ডাকা হয় নি।" উপরোক্ত অভিযোগ যদি সত্য হয়, তবে বুঝতে হবে যে তদন্ত নিরপেক্ষ হয় নি এবং অনেক স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের ডাকা হয় নি এবং তাঁদের কোন অভিযোগের মূল্যও যাচাই করা হয় নি। তাই প্রসঙ্গক্রমে, একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে শুধু এইটুকু বলব যে, জনসাধারণের অর্থে এ-রকম একটা পক্ষপাতমূলক তদন্তের কি কোন প্রয়োজন ছিল? বিশেষ করে যখন প্রমাণিত দোষীদের বিরুদ্ধে কোন রকম শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। যাঁদের দোষের জন্য আজ লক্ষ লক্ষ মানুষ ছিন্নমূল, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট, হাজার হাজার লোকের মৃত্যু ঘটেছে, সেখানে কয়েকজন দোষী ব্যক্তির বদলীই কি একমাত্র চরম শাস্তি?

অধ্যাপক বসু গত ২১শে অক্টোবর '৬৮ ময়দানে নেতাজীর পাদদেশে উত্তরবঙ্গের বন্যাবিধ্বস্ত এলাকার করুণ অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে সামরিক বাহিনীর কার্যকলাপের যে অবহেলার নিদর্শন তুলে ধরেছিলেন, তা কোন একটি প্রভাবশালী

সংবাদপত্রে (বসুমতী নহে) সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে বিরূপ সমালোচনার ঝড় উঠেছিল এবং অধ্যাপক বসুকে "কাটা সৈনিক" আখ্যা দিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে নি, এবং সামরিক বাহিনীর কোন ত্রুটির কথা বলবার মত স্পর্ধা পর্যন্তও নাকি তাঁর (অধ্যাপক বসু) নেই। অথচ খুবই পরিতাপের বিষয় যে, সেদিন অধ্যাপক বসু যে কথা ময়দানে বলেছিলেন, আজ তারই প্রতিফলন এস এন রায়ের রিপোর্টে স্থান পেয়েছে।

("No notice of the Army yet on whom we were depending so much Pity indeed." পৃঃ ৩১)।

তাই আজ জনসাধারণের মনে যে সংশয় দানা বেঁধেছে তা নিরসনের জন্যেই উচিত একটা বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করা, যার ওপর মানুষ আস্থা রাখতে পারেন এবং এটা দেশের স্বার্থেই বিশেষ প্রয়োজন বলে মনে হয়।

—অমলেন্দু রায়চৌধুরী
কলকাতা-১৭

পুলিশ সম্পর্কে মন্তব্যের প্রতিবাদ

১৪ই নভেম্বরের সাপ্তাহিক বসুমতীর কৃত্তিবাস ওঝা লিখিত 'সপ্তাহের [illegible]' পড়িলাম। কোন বিষয়ে মন্তব্য করিবার পূর্বে প্রকৃত ঘটনা জানা প্রয়োজন। ১৩০১ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কলমে পুলিশ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা অসত্য ভাষণপুষ্ট বলিয়া আমি মনে করি।

জলপাইগুড়িতে প্রধানমন্ত্রী আসিবার দিন আমি কমিশনারের বাংলোর নিকটবর্তী পি ডব্লিউ ডি অফিসের দ্বিতলের বারান্দা হইতে ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। প্রধানমন্ত্রীর গাড়ি কমিশনারের বাংলোয় প্রবেশ করিলে স্থানীয় জনতার কতকাংশ রাস্তায় পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করিয়া বাংলোর গেটের দিকে যাইতে চেষ্টা করে। পুলিশ বাধা দেয়। এই সময় একজন বর্ষীয়সী মহিলা রাস্তায় পড়িয়া যান। কর্তব্যরত একজন পুলিশ কর্মচারী ভদ্রমহিলাকে উঠিতে সাহায্য করেন। তখন জনতার ভিতর হইতে কেহ কেহ বলিয়া ওঠেন যে, পুলিশ ভদ্রমহিলাকে আঘাত করিয়াছে। পুলিশ কর্মচারী তখন সত্য ঘটনা জানান এমন কি ভদ্রমহিলা নিজেও প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, পুলিশ তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও জনতার মধ্যে মিথ্যা অপপ্রচার হইতে থাকে এবং পুলিশবাহিনীকে লক্ষ্য করিয়া ইষ্টক বর্ষণ হইতে থাকে। তখন কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী জনতাকে লাঠি হাতে তাড়া করেন। কাহাকেও আঘাত করিতে দেখিতে পাই নাই। কারণ পুলিশকে লাঠি হাতে আসিতে দেখিয়া জনতা কিছুটা ছত্রভঙ্গ হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। ইহার অল্প পরেই কিছু ছেলে বাংলোর বেড়া ডিঙাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে। কয়েকজন ছেলে একজন লোককে আহত বলিয়া বর্ণনা করিয়া প্রধানমন্ত্রীর সম্মুখে লইয়া যান। কিন্তু তাহার গায়ে কোন আঘাতের চিহ্ন দেখা যায় নাই। অল্পক্ষণ পরে আহত বলিয়া বর্ণিত ব্যক্তি নিজেই ঐ স্থান পরিত্যাগ করেন। পুলিশের একজন কর্মচারীও [illegible] জখম হইয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ একজন পুলিশ কর্মচারীর একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পুলিশ কর্মচারী জখম হইবার পর আমি কয়েকজন কনস্টেবলকে লাঠি চালনা করিতে [illegible]। কিন্তু কোন [illegible] সংবাদ নহে [illegible] [illegible] এবং [illegible] হইয়াছে। [illegible] জলপাইগুড়ি [illegible] [illegible] [illegible] পশুর মৃতদেহ অপসারণ [illegible] ব্যাপৃত ছিলেন ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সৈন্যবাহিনী এই মৃতদেহ অপসারণ করিয়াছেন বলিয়া কোনও কোনও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু মনে হয় সেনাকার্যে নিযুক্ত পুলিশবাহিনীকে সৈন্যবাহিনী বলিয়া ভুল করা হইয়াছে কারণ সৈন্যবাহিনীর কর্মীরা পশুর মৃতদেহ অপসারণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। সৈন্যবাহিনী অবশ্য ট্রাক, নৌকা ইত্যাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু দুর্গন্ধময় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে পচা গলিত পশুদেহ পুলিশ কর্মচারী এবং তাঁহাদের সহকর্মী ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্সের কর্মীরাই অপসারণ করেন।

ডি আই জি শ্রীরণজিৎ গুপ্ত জলপাইগুড়িতে ত্রাণকার্যের সমন্বয়সাধনের জন্যই গিয়াছিলেন, আইন শৃঙ্খলা রক্ষার পুলিশ কার্যের তদারকের জন্য নহে। শ্রীরণজিৎ গুপ্ত জলপাইগুড়ি পৌঁছিবার ২।৩ দিন পূর্ব হইতেই পুলিশ এবং তাহাদেব সহযোগী বাহিনী ত্রাণকার্যে নিযোজিত ছিলেন। পুলিশবাহিনী আর একটি দুরূহ কাজ করিয়াছিলেন তাহা হইল পঙ্কোদ্ধার। শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের ভ্রমণসূচী সম্বন্ধে থানা কোন খবর দিতে পারিয়াছিলেন কিনা জানি না। কিন্তু ৮ই অক্টোবর হইতে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালী থানাই প্রথমের দিকে জনসেবামূলক এবং অন্যান্য প্রশাসন কার্যের একমাত্র কেন্দ্র ছিল।

পুলিশ অন্যায় কাজ করিলে নিশ্চয়ই তাহার বিরূপ সমালোচনা হওয়া উচিত, কিন্তু পুলিশ জনসেবামূলক কাজ করিলে প্রাপ্য প্রশংসা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা কি ন্যায়সংগত হইবে?

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
পোঃ ধূপগুড়ি (জলপাইগুড়ি)

*

ওয়ার্লড্ রেডিও লিস্নার্স ক্লাবের আবেদন

স্বাভাবিক কারণবশত মেঘদূত-এর 'আকাশবাণী-পরিক্রমা' আমরা সকলেই সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পড়ে থাকি এবং যথেষ্ট গঠনমূলক সমালোচনার জন্য মেঘদূতকে অভিনন্দন জানাই। যদিও আমাদের অভিনন্দন ছাড়াও তাঁর কাজ চলবে, তবু এ আমাদের স্বতোৎসারিত।

এখানে আমাদের পরিচয়টা দিলে হয়ত সুবিধা হবে। ভারতবাসীদের সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ রেডিওতে কি বলে ও ভারত-জার্মান মৈত্রী সম্পর্কে আরও বিশদ করে শোনার জন্য আমরা এখানে একটি আন্তর্জাতিক রেডিও শ্রোতা ক্লাব সংগঠন করেছি। পৃথিবীর প্রধান প্রধান প্রায় ৩০টি দেশের বেতার কেন্দ্র ও পশ্চিম জার্মানীর বেতার কেন্দ্র আমাদের এই সংগঠনকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আমাদের ক্লাব দুটো- একটির নাম World Radio Listener's Club ও অপরটি Deutsche Welle Listener's Club

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাধারণ লোকের কথা ও সেই দেশের সাংস্কৃতিক খবরাখবর জেনে নিজেদের খবর তাদের দিয়ে একটা লেখাপড়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্ব গড়ে তোলার কাজে আমরা হাত দিয়েছি ১৯৬৭ সাল থেকে এবং আজকে দক্ষিণ এশিয়ায় Radio Monitoring ও সাংস্কৃতিক ভাবধারার আদান-প্রদানের একটি প্রথম শ্রেণীর ক্লাব বলে পরিগণিত হয়েছে। এ ধরণের ক্লাব পৃথিবীর আরও বহু দেশে আছে। তাদের সাথে চিঠিপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা বিনিময় করে আমাদের গভীর যোগাযোগ আছে।

আমাদের এই ক্লাবের খবর (আমাদের দেশের পোড়া AIR ছাড়া) অনেক দেশের বেতার কেন্দ্র থেকে মাঝে মাঝেই প্রচারিত হয় যেমন—সুইডেন, পশ্চিম জার্মানী, পূর্ব জার্মানী, কায়রো, সিংহল, উত্তর ভিয়েতনাম, অস্ট্রেলিয়া ইত্যাদি।

বিদেশের অনেক বেতার শ্রোতা ক্লাবের মত আমরা এখানে আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে এক সর্বভারতীয় ও আন্তর্জাতিক বেতার শ্রোতা ক্লাব সম্মেলনের অনুষ্ঠান করছি।

এই সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শ্রোতা ক্লাবের কর্তৃপক্ষরা ও বিদেশের যেমন—কায়রো, পঃ জার্মানী ইত্যাদি দেশের বেতার কেন্দ্রের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন বলে জানিয়েছেন। ওপরে বর্ণিত সকল দেশের সরকারের তরফ থেকে আমাদের দেশে অবস্থিত মাননীয় রাষ্ট্রদূতেরা বা তাঁর কোন প্রতিনিধিও উপস্থিত থাকবেন বলে জানতে পেরেছি।

আমাদের ক্লাবের শৈশবকাল কাটে নি, তাই মেঘদূত-এর উপস্থিতি কি আমাদের কামনা করা ঠিক হবে। যদি মেঘদূত উপস্থিত থেকে প্রতিটি অনুষ্ঠান দেখেন তবে অত্যন্ত বাধিত থাকব। আমরা তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। যদি আসতে না পারেন, তবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এই ভাবের আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে যে সখ্যতা ও সৌহার্দ্য গঠনের কাজে আমরা ব্রতী রয়েছি তার জন্য পত্রের মাধ্যমে আমাদের উৎসাহিত করবেন যাতে করে আগামী দিনে আপনাদের শুভেচ্ছা ও পরিবহনে আমাদের প্রিয় ক্লাব আরও বলিষ্ঠ পদক্ষেপে সক্ষম হয়। এই ধরণের সম্মেলন ভারতে এই প্রথম। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের মাঝে জাতীয় ভাব গঠনে ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও শান্তি সংরক্ষণের কাজে আমরা চিরদিন নিয়োজিত থাকব—এই আমাদের আশা।

এই কাজে অন্যান্য দেশের মত আমরা আকাশবাণীকেও আমাদের মাঝে পেতে ইচ্ছা করেছিলাম। আকাশবাণীর কর্ণধার তাঁর এক চিঠির মাধ্যমে আমাদের খুব তারিফ করেছেন, যদিও সহযোগিতা করতেও নারাজ হয়েছেন। সহযোগিতা পাব না জানতাম, কারণ ওটা তাঁদের একচেটিয়া সম্পত্তি। সেজন্য আমরা দুঃখিত নই। পৃথিবীর অনেক দেশের রেডিও বুলেটিনে ও পত্রিকায় এই সঙ্গে প্রেরিত Annexure-এ জানা পেরেছে। নানা দেশ থেকে অভিনন্দন পেয়েছি ও পাচ্ছি। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকেও আমাদের নানাপ্রকার প্রতিযোগিতায় ভাই-বোনেরা অংশ গ্রহণ করছে—ভারতের বাইরেও। বাংলা দেশ থেকে আমরা কোন সাড়া পাই নি। অথচ বাংলা ভাষা প্রচার ও প্রসারের জন্য বিভিন্ন দেশে আমরা সংগঠিত ও সুসংবদ্ধভাবে চিঠিপত্র চালিয়ে যাচ্ছি ও ফলও ফলতে সুরু করেছে। তাই আমাদের প্রচেষ্টার কথা বাংলা দেশের জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে আপনি নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারেন। এই সঙ্গে প্রেরিত হোল সম্মেলন উপলক্ষে বিভিন্ন ক্লাব (আমাদের দেশের ও বিদেশের) পাঠান বুলেটিনের কয়েকটি, যাতে করে আপনি আরও ভাল বুঝতে পারেন।

বাংলা ভাষা প্রচারের ও প্রসারের জন্য এই ক্লাবের চেষ্টার কথা জানতে চাইলে আমরা পরবর্তী চিঠিতে আপনাকে নিশ্চয়ই জানাব।

শ্রীসুধাংশুকুমার ঘোষ
সভাপতি

*

সাপ্তাহিক বসুমতী প্রসঙ্গে

আমি গত চার বৎসর যাবৎ 'সাপ্তাহিক বসুমতীর' নিয়মিত পাঠক। বাজারে প্রকাশিত আরও ২-৪টি সাপ্তাহিক পত্রিকার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা সত্ত্বেও একথা জোর দিয়ে বলা চলে যে, বর্তমানে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির মধ্যে 'সাপ্তাহিক বসুমতী"ই প্রগতিশীল ও উন্নতমানের পত্রিকা।

যে সকল কবি, সাহিত্যিক প্রবন্ধকার, নিবন্ধকার, সমালোচক, বিজ্ঞানী ও বিপ্লবী তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে "সাপ্তাহিক বসুমতী"র পৃষ্ঠা উজ্জ্বল, কলেবর বৃদ্ধি ও শ্রীমণ্ডিত করেছেন, সত্যিই তাঁরা জাতির ধন্যবাদার্হ।

'সাপ্তাহিক বসুমতীর' ১৯শ সংখ্যার উত্তরবঙ্গের বন্যার যে সকল বাস্তব ছবি সত্যনিষ্ঠ, নীতিজ্ঞানসম্পন্ন ও আদর্শবাদী-সাংবাদিকগণ সারা দেশের সামনে তুলে ধরেছেন তা অদ্যাবধি অন্য কোন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় নি। উত্তরবঙ্গের বন্যার সামগ্রিক চিত্র একমাত্র "সাপ্তাহিক বসুমতী"র পৃষ্ঠাতেই প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র সরকার
আই, টি, আই
পোঃ দুর্গাপুর-১
(বর্ধমান)

মার্টিন এসলিন বলেছেন, ব্রেশট নিজেই স্বীকার করে গেছেন যে নাটক রচনায় এবং নাটকের প্রযোজনার ব্যাপারে তিনি পৃথিবীর নানা দেশের মঞ্চরীতি এবং নাট্যরচনা পদ্ধতি থেকে অনেক কিছু আহরণ করেছেন। এই জন্যই তাঁর থিয়েটারে এলিজাবিথান, চাইনিজ, জাপানিজ এবং ভারতীয় থিয়েটারের প্রভাব আছে। গ্রীক ট্র্যাজেডী থেকে "কোরাস" গ্রহণ করে বিশেষ বিশেষ নাটকে এই কোরাসের উপযোগিতা ব্রেশট দেখিয়েছেন। মিউজিক হাউসের ক্লাউনদের-রাও তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। অস্ট্রিয়ান এবং ব্যাভারিয়ান লোকনাট্যও এক এক সময়ে তাকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু কোন কিছুর দ্বারা প্রভাবিত হওয়া, আর তার অনুকরণ করা, এই দুইয়ের ভেতর অনেক প্রভেদ আছে। যা কিছু ব্রেশট ঋণ হিসাবে অন্য সূত্র থেকে গ্রহণ করেছেন, তাকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন নিজের রচনায়। উদাহরণ হিসাবে গর্কির 'মাদার' উপন্যাসের সংগে ব্রেশটকৃত নাট্যরূপায়ণ এবং শেক্সপীয়ার কোরিওলেনাসের সংগে ব্রেশটের কোরিওলানের তুলনা করলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট বোঝা যাবে।

ব্রেশটের ওপর ভারতীয় নাটকের প্রভাবের সুষ্ঠু উদাহরণ হিসাবে আমি 'দি গুড পার্সন অভ সেৎসুয়ান' এবং 'দি ককেশিয়ান চক সার্কল'—এই দুটি নাটকের নাম করবো। নাটকের পাত্রপাত্রী চাইনিজ হলেও রচনারীতি আমাদের সংস্কৃত নাটকের ধরণের।

ব্রেশটিয়ান থিয়েটারের থিওরি এবং প্র্যাকটিস সম্পর্কে আমি আগেও বহুবার সাপ্তাহিক বসুমতীতে লিখেছি—সুতরাং সে বিষয়ে এখানে আর পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন দেখি না। অভিনয়ে বিচ্ছিন্নবাদ বলতে তিনি ঠিক কি বুঝতেন এ বিষয়ে ব্রেশট একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন। ব্রেশট বলেছেন: যে-কোন বড় শহরের একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার কথা ধরা যাক—রাস্তায় একটি এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে এবং ঘটনাস্থলে প্রচুর লোক জড় হয়েছে। একজন প্রত্যক্ষদর্শী অন্যান্যদের কাছে ঘটনার বিবরণ দিচ্ছেন: তিনি বোঝাতে চাইছেন আহত বৃদ্ধ লোকটি ধীরে ধীরে হেঁটে আসছিলেন—বিবরণ দেবার সময় বক্তা বৃদ্ধের হাঁটবার ভঙ্গি নিজে হেঁটে দেখাবেন—অর্থাৎ এর দ্বারা তিনি শ্রোতাদের নিজের বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেবেন। এক্ষেত্রে বক্তা বৃদ্ধের হাঁটবার ভঙ্গিটা উদাহরণ হিসাবে দেখাচ্ছেন। এ উদ্দেশ্য বক্তার নেই যে ঐসব শ্রোতা এবং দর্শকেরা তাঁকেই ঐ আহত বৃদ্ধ বলে মনে করুক।

The eyewitness concerned is far from wanting to impersonate the victim: 'he never forgets, nor does he allow anyone to forget, that he is not the one whose action is being demonstrated, but the one who demonstrates it'—(Brecht—DIE STRASSENSZENE (1940), SCHRIFTEN ZUM THEATRE, p. 127). The character who is being shown and the actor who demonstrates him remain clearly differentiated. And the actor retains his freedom to comment on the actions of the person whose behaviour he is displaying.

পৃথিবীর সর্বত্রই আজ নাট্যানুরাগী এবং নাট্যরসিক দর্শকের দল ব্রেশটকে এ যুগের সব সেরা নাট্যকার হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। এর বিশেষ কারণও আছে: প্রথমত যে-কোন ব্রেশট-প্লে পড়ে বা দেখে আমরা সহজেই বুঝতে পারি গল্পচ্ছলে 'একটি মহৎ সত্যকে' বিশ্বাসযোগ্য করে চমৎকারভাবে নাট্যিক আকারে রূপায়িত করেছেন বেরটল্ট ব্রেশট।

তাছাড়া ব্রেশট-প্লেতে থাকে প্রচুর চিন্তার খোরাক। তাঁর নাটক পড়ে প্রত্যেক পাঠকের মনে জেগে ওঠে কর্তব্যবোধ, ন্যায়-অন্যায় বোধ এবং মানবিকতার গুণাগুণ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা।

ব্রেশটের পাশাপাশি রেখে যখন আমরা এ্যাবসার্ড নাটক পড়ি—যথা বেকেটের 'এণ্ড গেম', অথবা ইওনেস্কোর 'দি লেশন' বা 'দি চেয়ার্স'—মনে হয় যেন আমরা জিগ-স পাজলসের সম্মুখীন হয়েছি। আমাদের দেশে আজকাল একশ্রেণীর বুদ্ধিবিলাসী লোক এই এ্যাবসার্ড নাটক নিয়ে খুব মেতে উঠেছেন। তবে ইওরোপের বেসব জায়গায় এর জন্ম, ১৯৬২ সাল থেকে সেসব জায়গায় এ্যাবসার্ড আন্দোলনে ভাটার টান দেখা দিয়েছে।

এ্যাবসার্ড প্লে-রাইটসরা মনে করেন, জগতের ঘটনাবলীর মূলে কোন যুক্তিবাদ নেই। কিন্তু সাধারণ লোক জগৎকে ঠিক এর উল্টোভাবেই দেখে। যে-কোন এ্যাবসার্ড নাটকের মূল বক্তব্যের অনুধাবন করবার জন্য দু-তিন ঘণ্টা ধরে—অর্থাৎ যে-সময়টা এসব নাটক দেখতে বা পড়তে যায়—যে মানসিক অত্যাচার এবং পীড়ন আমাদের সহ্য করতে হয়, তারপর স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে—"এই মানসিক উৎপীড়ন সহ্য করবার কোন সত্যিকার আবশ্যকতা ছিল কি?"

তাছাড়া একথা বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে—এ্যাবসার্ড প্লে এমন একটা অস্বাস্থ্যকর এবং হতাশাপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি করে, যার ফলে পাঠক বা দর্শকের মনটা বিষাক্ত এবং ক্লেদাক্ত হয়ে ওঠে।

এ্যাবসার্ড নাটকের অন্তঃসার একবার জানতে পারলে আর দ্বিতীয় বার ঐ নাটক দেখবার বা পড়বার কোন সত্যিকার ইচ্ছা আপনার হবে না। ঐ নাটকের পাণ্ডুলিপি আপনার কাছে পাগলের প্রলাপ বলে মনে হবে। তার মঞ্চরূপায়ণ দেখতে গিয়ে 'দি লেশনের' ছাত্রীটির মতই দাঁত ব্যথার যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকবেন।

ব্রেশটের নাটকের বেলায় এর ঠিক উল্টো। তাঁর লেখা নাটক বার বার পড়তে ইচ্ছা হয় এবং যত বেশিবার পড়বেন, সমাজ ও রাষ্ট্রের সংগে প্রত্যেক নাগরিকের সম্পর্ক এবং নাগরিকদের প্রতি সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য বিষয়ে আপনার জ্ঞান ক্রমাগত বেড়ে যাবে।

এ কথা আমাদের অজানা নয় যে, ব্রেশটের নাট্যিক শক্তির উদ্বোধন, উদ্দীপন এবং পরিপুষ্টির মূলে ছিল দুটি বিশ্বমহাযুদ্ধের সর্বনাশকর বিষময় কীর্তিকলাপ এবং জনসাধারণের নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতি। এই দুটি যুদ্ধের ফলে সারা পৃথিবীতে যে ধ্বংস এবং নাশনের প্রলয়-তাণ্ডব চলেছিল, সাধারণ মানুষকে যেভাবে গরু-ভেড়াতে পরিণত করেছিল, তারই বিরুদ্ধে শক্ত হাতে লেখনী ধারণ করেছিলেন বেরটল্ট ব্রেশট। আর ব্রেশটের চিন্তার অনুধাবন করা ভারতীয়দের পক্ষেই তো সব থেকে সহজ। কারণ বৃটিশ শাসনের আমলে বিজেতা ইংরাজরা তো এদেশের লোকেদের গরু-ভেড়ার থেকে খুব বেশি উচ্চশ্রেণীর জীব বলে মনে করতো না এবং সেই মতই আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করতো। বিগত দুই বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এই ইংরাজ মহাপ্রভুদের তুষ্টিসাধনের জন্য আমাদের ক্রীতদাসদের মত সেবা করতে হয়েছে। আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] ছিল

'চক সার্কল'-এ হেলেনা ভাইগেল

বিচারে বন্ধ কারাগৃহে পশুর অধম জীবন-যাপনে বাধ্য হয়েছেন।

ব্রেশটের নাটকে ধনতান্ত্রিক সমাজের এবং রাষ্ট্রের কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত বিকৃত স্বরূপকে তুলে ধরা হয় বলেই, বঞ্চিত আপামর সাধারণ তাঁকে এ যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়ে থাকেন। কিন্তু শোষক শ্রেণীর লোকেরা ব্রেশটের নাটকের বিকৃত ভাষ্য করে জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে চায়—যাতে তারা ঐ বিকৃত ভাষ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিপথে পরিচালিত হয়ে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনে। ধনতান্ত্রিক দেশের সমালোচকেরা এমন কথাও প্রচার করবার চেষ্টা করেছেন যে, যেহেতু ব্রেশট কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন না, সুতরাং তিনি সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাস করতেন না। এ বিষয়ে কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলে তাঁকে আমি ব্রেশটের 'দি গুড পার্সন অভ সেজুয়ান' নাটকটি একটু যত্ন করে পড়তে বলব।

এ নাটকে ব্রেশট আগামী বিজ্ঞান-ভিত্তিক এবং সমাজতান্ত্রিক যুগে নাট্য-রচনারীতি এবং অভিনয়পদ্ধতি কোন পথ ধরে অগ্রসর হবে তার একটি চমৎকার উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। সেজুয়ানের মহৎ নারীতে তিনি যেন বর্তমান পৃথিবীর ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর সাধারণ দরিদ্র, শোষিত মানুষদের সম্বন্ধেই প্যারাবলের সাহায্যে একটি চমৎকার আলেখ্য দর্শকদের উপহার দিয়েছেন।

ব্রেশটের কাছে প্রগ্রেস শব্দের অর্থ ছিল—"ক্রমাগত এগিয়ে চলা"। রচনার ক্ষেত্রেও তিনি কখনই থেমে থাকেন নি। বিশেষ রচনাকেও একটা ফাইন্যাল ফর্ম দেওয়াতে তিনি বিশ্বাস করতেন না। এই জন্যই সব রচনাকেই তিনি ক্রমাগত সংশোধন করতেন, বদলাতেন।

এই প্রবন্ধ শেষ করার আগে শ্রীদুর্গাদাস সরকারকৃত ব্রেশটের দুটি কবিতা—(১) হাউ ডাজ ম্যান কিপ এলাইভ এবং (২) আই গ্রু আপ এ্যাজ সান অফ ওয়েল টু ডু পিপ্‌ল্‌—পাঠকপাঠিকাদের উপহার দিলাম—

(১)

হাউ ডাজ ম্যান কিপ এলাইভ

কিভাবে মানুষ বিলাস-ব্যসনে
বাঁচবার নেয় ঝুঁকি !
হয়তো সে ভাবে ধরা পড়বে না
তার কোনো বুজরুকি।
চারিধারে শুধু ক্ষুধিত মানুষ
মরিছে অত্যাচারে।
লুণ্ঠন করে গলা টিপে মারা
লোহের কারাগারে।
কোনোদিন সে কি হবে না ধরায়
সত্যের মুখোমুখি ?
বেঁচে থাকা মানে মনুষ্যত্ব বিসর্জন,
একদিন সে যে করবে নিজেকে সমর্পণ
তখনই বলবে : মানুষ সেই
বেঁচে থাকা লোক সুখী।

(২)

আই গ্রু আপ এ্যজ সান অভ ওয়েল টু ডু পিপল্‌

তোমরা জানো জন্ম আমার
বিরাট বড়লোকের ঘরে;
সেই কথাটি শুনে কাঁচ্ছা আমার
বিচার ওজন দরে?
মা ও বাবা স্নেহের সাথে
আমায় ঢেকে দিলেন সোনার পাতে;
হুকুম করে সেবা নেবার
মন্ত্র দিলেন সোহাগ ভরে।

বালক থেকে সাবালক হেই—
পাবি নি আর সেবা নিতে,
দেখতে পেলাম গরীবজনের
চালকে বাবা চাপা হাতে।
তারা আমার আপন শ্রেষ্ঠ শ্রেণী
দেয় না কারেও দু-এক পেনী;
অবশেষে তাদের ছেড়ে
এলাম তোমাদেরি দোরে।
অভাগাদের
পেলাম অভাগাদের

সমাপ্ত
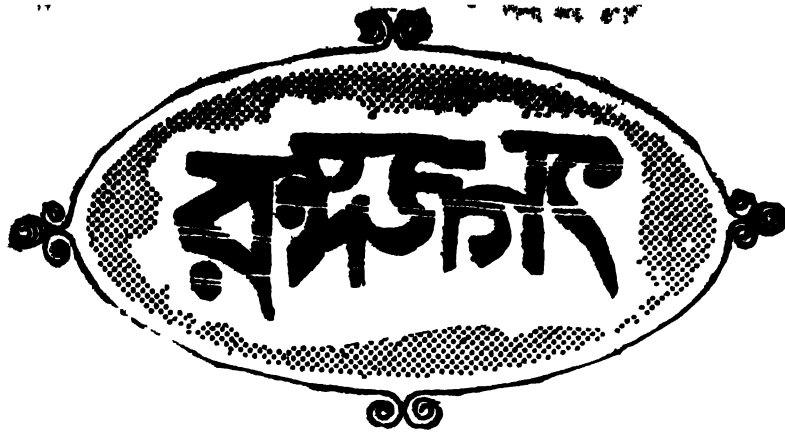
সেন্সর নিয়ে কথা

কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত ফিল্ম সেন্সর সম্পর্কিত তদন্ত কমিটিকে উপলক্ষ করে ফিল্ম সেন্সর ব্যবস্থার পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক কথা হচ্ছে। সেন্সরের পক্ষের লোকদের অপেক্ষা সেন্সর তুলে দেওয়ার লোকেদের গলার স্বর বেশি চড়া। শোনা যাচ্ছে বোম্বের চিত্র প্রযোজকরা সেন্সর তুলে দেওয়ার জন্য না কি উঠে-পড়ে লেগেছেন। সেন্সরের জন্য তাঁরা ছবিতে চুম্বনের দৃশ্য দিতে পারছেন না। ইউরোপের ছবিগুলিতে আজকাল যেভাবে বেড-রুমের দৃশ্য দেখান হচ্ছে, এমন কি যৌনমিলন মুহূর্ত পর্যন্ত বাদ যাচ্ছে না সে মজাটা ভারতীয় ছবিতে দিতে না পারায় ইংরেজীর সঙ্গে প্রতি-যোগিতায় পেরে ওঠা যাচ্ছে না। সে-রকম দৃশ্য দিতে পারলে মধ্য এশিয়ার এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে না কি ভারতীয় ছবির বাজার খুব গরম হয়ে উঠত। এই দুঃখেই ত' সেন্সর তুলে দেবার জন্য এত চাপ সৃষ্টি। প্রযোজকদের কেউ কেউ আবার এই সুযোগে দেশপ্রেমিক হয়ে গেছেন। বিদেশী ছবির আধিক্য কমিয়ে দেশের টাকা দেশে রাখার, এবং কিছু বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে দেশের উপকার করার বাসনাও তাঁদের মনে জেগেছে।

দেশের একদল শিক্ষিত মানুষও আছেন যাঁরা সেন্সর তুলে দেবার পক্ষে কলম ধরেছেন। দেশের জন্য অসি ধরতে না পারলেও মসি ধরার মুরোদ তাঁদের আছে। কয়েকদিন আগে স্বাধীন সাহিত্য সমাজের এক সম্পাদককে এক সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করলেন—দাদা, সেন্সর সম্পর্কে আপনার মত কি? সম্পাদক মহাশয় হেলান দেওয়া অবস্থার থেকে উচ্চৈঃস্বরে বললেন সেন্সর উঠে যাক। তিনি সাহিত্যে স্বাধীন যখন সেন্সারেও স্বাধীন হবেন, কিন্তু সাহিত্যের স্বাধীনতা ত' একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল, ফিল্মের স্বাধীনতার কথাটাও তেমনি কিছু হয় ত' হবে। কিন্তু এই স্বাধীনতার আর একটা দিকের দরজাও খুলে যায়, সেটা ভেবে দেখেছেন কি? সেন্সর কোড কেবল নৈতিক দিক আগলায় না; নিয়ম আছে শ্রেণী সংগ্রাম বা শ্রেণী বিদ্বেষের কথা উচ্চারণও করা যাবে না। এ-কারণে কোন ছবিতে লেনিন বা স্টালিনের ছবি থাকলে সেন্সর কর্তৃপক্ষ বাধা দেয়, শ্রেণী সংগ্রাম কথাটা উচ্চারণও করা চলে না। সেন্সর উঠে গেলে চুম্বনের স্বাধীনতার সঙ্গে কেউ যদি শ্রেণী সংগ্রামের স্বাধীনতা গ্রহণ করেন তখন স্বাধীন সাহিত্যের সম্পাদক মশায় কি বলবেন? স্বাধীনতা কি একপেশে অর্থ বহন করবে? তবে রক্ষা এখানে যে চলচ্চিত্রে চুম্বনের স্বাধীনতা [illegible] প্রযোজক যত আছে শ্রেণী সংগ্রামের [illegible] বলার প্রযোজক নেই বললেই চলে। কারণ ছবি তৈরি হয় ব্যবসার [illegible] রুচির জন্য নয়।

এঁরা বলছেন সেন্সর [illegible] দেখই না প্রযোজকদের এত অবিশ্বাস কেন? সত্যিই ত' এই সঙ্গে রেশন ব্যবস্থা তুলে দাও—ব্যবসায়ীদের অবিশ্বাস করো না পুলিশ তুলে দাও, বিচার তুলে দাও, মানুষ নিজের বিচার নিজে করবে ইত্যাদি কথাগুলি এলে কেমন হয়? অর্থাৎ ধরে নিতে হবে চিত্র প্রযোজকরা উচু জাতের শিল্পী? ওরা জাতীয় স্বার্থ জাতীয় ঐতিহ্য, নৈতিকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এবং প্রগতির রক্ষক হবেন। হিন্দী ছবিতে তার নমুনা দেখছি। ভুলে যেতে হবে যে প্রযোজকরা ব্যবসার জন্য এবং মুনাফার লোভেই ছবি করেন।

—সুজন

সোভিয়েত লোকনৃত্য দলের শিল্পী [illegible]

জর্জিয়ান লোকনৃত্যে জিত তাবাখমেলাশভিলি ও ইতেরি তাখনাসভিলি

সোভিয়েত লোকনৃত্য

এক উদ্দীপনাময় অনুষ্ঠান

গত পাঁচ বছরের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে যে সকল সাংস্কৃতিক দল ভারতে এসেছে—তার সঙ্গে তুলনায় 'পিপলস ডান্সেস অব ইউ এস এস আর' দলটির কিছুটা স্বাতন্ত্র্য আছে। এই দলের প্রায় সকল সদস্য বয়সে তরুণ এবং এঁরা পরিবেশন করেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন রিপাব্লিকের লোক-নৃত্য। শিল্পী হিসাবে এঁদের সকলে একেবারে প্রথম শ্রেণীর না হলেও শিল্পী-দের যৌবনোচ্ছ্বাস আর আনন্দময় নাচে লাস্যে ও ছন্দে দর্শকদের শুধু বিমোহিত করেন নি এমন এক আনন্দলোকে নিয়ে গেছলেন যে সেই মধুর মুহূর্ত তাঁরা অনেক দিন মনে রাখবেন।

৩০ জনের এই দলে ছিলেন আজার-বাইজান, লাটভিয়া, উক্রেইন, কাজাকাস্তান, উজবেকিস্তান, তাতারিয়া, তুর্কমেনিস্তান, মোলদাভিয়া এবং বাশিরার তরুণ নৃত্য-শিল্পীরা। এসব অনেক অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটার এই প্রথম সুযোগ হল।

গত ১৯শে ও ২০শে নভেম্বর নবনির্মিত সঙ্গীতকলা মন্দিরে (থিয়েটার রোড ও লোয়ার সার্কুলার রোডের সংযোগস্থলে) দুটি অনুষ্ঠান করেছেন। এই ত্রিশ শিল্পিদলের সকলেই নৃত্য-শিল্পী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি ছিল নাচে ভরা। শিল্পীদের মধ্যে ব্যালে নাচে এল মার্কোভিনা, উজবেক লোকনৃত্যে জি নুরিংডিনোভা, তুর্কমেনিয়ার বৈরাম দুরেভা, জর্জিয়ার তরুণী ইতেরি তাখনাসভিলি, আজারবাইজানের আমিনা দিলবাজী, মোলদাভিয়ান লোক-নৃত্যে এল আফানাসায়েভার নৃত্যে হাস্যময়তা, ছন্দ, নিপুণ অভিনয়, বিস্ময়-সুন্দর দেহ ও এক্রোবেটিস্ ক্ষমতা পরম উপভোগ্য। এই সঙ্গে পুরুষ শিল্পীদের মধ্যে আজারবাইজানের লোকনৃত্যে দাদা-সেভ ও জেইনানভের যৌবনোচ্ছ্বাস, অসাধারণ এক্রোবেটিস্ এবং পৌরুষে দর্শক মাত্রই উদ্দীপ্ত হয়েছেন, তাই এ দুজন শিল্পীকে দর্শকদের অবিরাম হাততালিতে বার বার মঞ্চে আসতে হয়েছে। অনুষ্ঠানসূচীতে লোকনৃত্যের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যালের অংশবিশেষও ছিল, আর ছিল কৌতুকনৃত্য। কৌতুক-নৃত্যের মধ্যে তাতার লোকনৃত্য 'বুড়ো ও তরুণী' দারুণ উপভোগ্য। নাচটির অবলম্বন একটি গল্প। যৌবনচঞ্চল

রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত 'হাটে বাজারে' ছবির একটি দৃশ্য

রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত ফিল্ম ডিভিশনের দলিল চিত্র 'সন্দেশ'-এর একটি দৃশ্য

সুযোগ পেত—তবে আরো আনন্দের হত। এ দায়িত্ব ভারত সরকারের ছিল।

নাট্যকের কথা

কালবৈশাখীর 'জীবন-যৌবন' ও 'মৃত্যুরা কাঁদে'

বন্যাদুর্গতদের সাহায্যের জন্য কাল-বৈশাখী নাট্যসংস্থা গত ১৭ই নভেম্বর টালিগঞ্জ বাঙ্গুর বহুমুখী বিদ্যালয় হলে অভিনয় করলো দু'টি নাটক 'জীবন-যৌবন' ও 'মৃত্যুরা কাঁদে'। অমর গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'জীবন-যৌবন' নাটকে আজকের সমাজজীবনের অনাচারকে দেখান হয়। বিভূতি বসু লিখিত 'মৃত্যুরা কাঁদে' নাটকের পটভূমি বাস্তবজীবনে

এক তরুণীর সঙ্গে পাল্লা দিতে যাচ্ছে এক বৃদ্ধ। প্রকৃতিকে অস্বীকার করে বুড়োর তরুণ সাজার বেদনা হাসির সঙ্গে ফুটে উঠেছে। এ দু'টি নাচে অংশ গ্রহণ করেছে খান্তিমিরোভা ও সাদিকভ। আর একটি উক্রেনিয়ার কৌতুক নাচ 'ভ্রাম্যমাণ দোকান'-এ গালিনা মোদজোলেভস্কায়া ও মোদজেলেভস্কি এক দোকানদার এক তরুণীর মন পাবার জন্য কিভাবে নিজের সব গুণগুলি একে একে জাহির করলো তারই উপভোগ্য নৃত্য। আজারবাইজানের 'বিয়ের নাচ' দুটিও চমৎকার। অঙ্গসজ্জা, বস্ত্র ও নৃত্যভঙ্গিতে তাঁরা ভারতের যে কত কাছের মানুষ এই নাচে সেকথাই বার বার মনে হয়েছে। ব্যালে অংশে মার্কোভিনা আর জিমিন নাচলেন গ্লিয়েরের 'রোমান্স' আর বিটোভেনের 'ওয়াল্টজ্'। অপূর্ব সাবলীলতা—পালকের মত সহজগতি দেহছন্দ—দেহবল্লরীর কমনীয়তা এবং প্রেমের আকুতি ও শৈশব অফুরন্ততার এ দু'টি নাচ রাশিয়ান ব্যালের বিশ্বখ্যাতির কথাই মনে করিয়ে দিয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের এই তরুণ লোকনৃত্য শিল্পিদল আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করেছে, পরম আনন্দ দান করেছে। জীবন যে কত আনন্দময়, জীবন কত সুন্দর ও পবিত্র এই নাচগুলি তারই সুর ও ছন্দোময় প্রকাশ। গভীর আশাবাদের সুরে এই নৃত্যগাথা রচিত। মানুষকে জীবনজয়ের জন্য উদ্দীপিত করে যে নৃত্য সেই শিল্পিদলকে আমরা অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই।

পরিশেষে শুধু একটিমাত্র বক্তব্য : এই নাচগুলি শহরের অভিজাত মহলের বাইরে যদি সাধারণ লোকেরা দেখবার
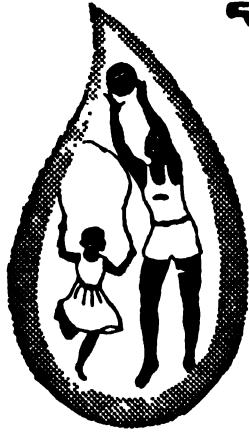
...ত্তানি, সংঘ-দুঃখ এবং আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। বিভিন্ন চরিত্রে সার্থক অভিনয় করেন বিপ্লব ভট্টাচার্য, প্রশান্ত চক্রবর্তী, ইন্দ্রজিৎ সরকার, চিত্ত ব্যানার্জী, নারায়ণ চক্রবর্তী, হরিশংকর দাস, মণ্টু বিশ্বাস, সুপান্থ ভট্টাচার্য, বিভূতি বসু, কৃষ্ণা গুহ, রঞ্জিত চক্রবর্তী, অঞ্জন ঘোষাল, অশোক গোস্বামী, অরুণ দাস।

আগামী জানুয়ারী মাস থেকে মঞ্চ অংগনে কালবৈশাখী নাট্যসংস্থা নিয়মিত নারায়ণ চক্রবর্তী রচিত 'পরিচয়' ও বিভূতি বসু লিখিত 'মক্কেরা কাঁদে' নাটক দুটির অভিনয় করবে।

ডন বহে ধীরে

ভারত সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির শিল্পী সদস্যবৃন্দ মিখাইল শলোকফের এণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন'-এর বঙ্গরূপ ডন বহে ধীরে মঞ্চস্থ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। প্রথম মহাযুদ্ধ ও রুশ বিপ্লবের পটভূমিকায় রচিত এই বিশাল উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন রমেন লাহিড়ী। নির্দেশনার দায়িত্বেও আছেন তিনি।

টেন কমাণ্ডমেন্টস' ছবিতে ইয়ুল ব্রাইনার।

দিলীপ বসু পরিচালিত 'বৌদি' ছবিতে কালী ব্যানার্জী ও অনুপকুমার

স্টুডিও খবর

নেভে নি যে দীপ

অজয় চক্রবর্তী অনেকদিন পরে একটি নতুন ছবির কাজে হাত লাগিয়েছেন। নতুন গঠিত গ্রেট ইস্টার্ন মুভিজের প্রযোজনায় একটি হিন্দী গল্প অবলম্বনে 'নেভে নি যে দীপ'-এর চিত্রনাট্য লিখিত হয়েছে। নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করবেন তনুজা।

শেষ থেকে শুরু

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক 'শেষ থেকে শুরু'-র চিত্ররূপের কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। চিত্রসাথী পরিচালিত এই ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন অখিল বাগচী ও নচিকেতা ঘোষ। নেপথ্য-শিল্পী রূপে অংশ গ্রহণ করেছেন প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোরকুমার, মান্না দে, সবিতাব্রত দত্ত। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন সবিতাব্রত দত্ত, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, সমরকুমার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, লতিকা দাশগুপ্ত, বিদ্যা রাও।

ভারতে ওবেরহাউজেন

পশ্চিম জার্মানীর ওবেরহাউসেন স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসবের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর মিঃ উইল ওয়েলিঙ কলকাতা এসেছিলেন। তিনি ম্যাক্সমুলার ভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, এবং সেই সাংবাদিক সম্মেলনে ওবের-আউসেন উৎসবের পুরস্কার প্রাপ্ত কয়েকটি ছবি দেখান হয়েছে।

ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটিজের উদ্যোগে এই ছবিগুলি গত ১৯শে ও ২০শে নভেম্বর ফাইন আর্টস একাডেমি হলে দেখান হয়েছে। পশ্চিম জার্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স, বৃটেন, জাপান, আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, নেদারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের ছবি দেখান হয়েছে।

অবরোধকেনা

হরবোলা অজয় গঙ্গোপাধ্যায়

তরুণ হরবোলা শ্রীঅজয় গঙ্গোপাধ্যায় সম্প্রতি নয়াদিল্লীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে কলকাতা প্রত্যাবর্তন করেছেন। তিনি সফদরজং, মিন্টো রোড, লাজপত নগর এবং দক্ষিণী ও বেঙ্গল ক্লাবের বিচিত্রানুষ্ঠানে হরবোলা শিল্পী হিসাবে অংশ গ্রহণ করে দিল্লীর জন-

তরুণ হরবোলা বেতার শিল্পী
অজয় গঙ্গোপাধ্যায়

সাধারণের নিকট জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। জগৎপুর নগরের অনুষ্ঠানে দর্শকদের অনুরোধে তাঁকে প্রায় ৪৫ মিনিট হরবোলার ডাক করতে হয়। তিনি সি এল টি-র কয়েকটি মুখোশ নাটকে নেপথ্য শিল্পী হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন।

জগৎপুর সম্মিলনীর অনুষ্ঠান

গত ১৭ই নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টার কলেজ স্কোয়ার 'স্টুডেন্টস্ হল'-এ বিজয়া উপলক্ষে জগৎপুর সম্মিলনীর এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে বৈষ্ণব কবি শ্রীবিষ্ণু-সরস্বতীর সভাপতিত্বে মহকুমার কৃতী লোকশিল্পী কবিয়াল শ্রীগুমানী দেওয়ানকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। প্রধান অতিথির অভিভাষণে কবি দুর্গাদাস সরকার বলেন যে, সম্মিলনীর মাধ্যমে শ্রীগুমানী দেওয়ানকে এই সম্বর্ধনা সারা বাংলা দেশ জানালো। অধুনা পণ্ডিচেরী নিবাসী বিপ্লবী নলিনীকান্ত সরকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটক থেকে আবৃত্তি করে শোনান। অমিয়কুমার ছটি কবিতা পাঠ করেন। রবীন্দ্রভারতীর রেজিস্ট্রার শ্রীভবরঞ্জন দে তাঁর ভাষণে এই প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেন। মধুসূদন চক্রবর্তীর পরিচালনায় বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশ নেন, অনুশ্রী ঘোষ, তমালী গাঙ্গুলী, চিত্ত বসুমল্লিক, বুদ্ধদেব গঙ্গোপাধ্যায় ও অহীন মজুমদার। সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিনায়ক রায় অভ্যাগত সকলকে ধন্যবাদ জানান।

মধ্য ইন্টালী সাংস্কৃতিক সম্মেলন

"মধ্য ইন্টালী সাংস্কৃতিক সম্মেলন" আগামী ৫ই ডিসেম্বর থেকে ছয়দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে স্থানীয় দেবনারায়ণ দেবের বাড়িতে। বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিনে থাকবে শ্রীকাশীনাথ, অমিতাভ মজুমদার, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ও হিরণ্ময়ের মূকাভিনয়। 'নটতীর্থম'-এর "আমি থামবো না" নাটক। চিন্তপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, ডাঃ শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাণী ঠাকুর, রজত ভট্টাচার্য, সৌরেন পাল, স্বপন রায় ও পূরবী ঘোষের রবীন্দ্র-সঙ্গীত ; এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে থাকবেন রামচন্দ্র পাল, এ কানন, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, মালবিকা কানন, মুনাব্বর আলি খান, গৌতম বাষ, অজয়া রায়-চৌধুরী, নীলিমা মজুমদার, বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত, জি এন গোস্বামী, কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়, দবীর খান, মেরী লু বেনেডিকট, বলাই দত্ত, অনিল ভট্টাচার্য, ভি বালসারা, সন্দীপ দেব, দ্বিজেন ঘোষ ও রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। কত্থক-নৃত্য পরিবেশন করবেন মায়া চট্টোপাধ্যায় ও বন্দনা সেন।

শোক-সংবাদ

সঙ্গীতজ্ঞ গঙ্গাপদ আচার্যের জীবনাবসান

গত ১৩ই নভেম্বর সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীগঙ্গাপদ আচার্যের ৭৪ বছর বয়সে তাঁর বাঁশদ্রোণীস্থ ভবনে জীবনাবসান হয়েছে। তিনি চট্টগ্রামের আর্যসঙ্গীত সমিতি, চট্টগ্রাম সঙ্গীত পরিষদ ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি সঙ্গীতগুরু গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন এবং সঙ্গীতাচার্য সুরেন্দ্রলাল দাসের সহযোগী ছিলেন। একসময় তিনি ঢাকা রেডিওর অর্কেস্ট্রার লীডার কম্পোজার ও প্রডিউসার ছিলেন। দেশভাগের কিছুকাল পরে তিনি কলকাতা চলে আসেন। তাঁর স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনী এবং বহু ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে।

'নাইট ইন লণ্ডন' হিন্দী ছবিতে বিশ্বজিৎ ও মালা সিনহা

দুধের স্বাদ ঘোলে

কলকাতার ফুটবলরসিকরা এবার বোধ হয় শেষ পর্যন্ত দুধের স্বাদ ঘোলেই মেটালেন। না মিটিয়ে আর উপায় বা কি? আমাদের মহামান্য ফুটবল কর্তৃপক্ষের কৃপায় কলকাতার ফুটবল মরশুমে শেষ হবার আগেই উঠেছিলো শিকেয়। কারণ আমাদের ফুটবল জগতের হর্তা-কর্তা বিধাতারা এতো বেশি তৎপর যে সব বিষয়েই তাঁরা পর পর দিচ্ছেন ব্যর্থতার পরিচয়! আর সেই ব্যর্থতার বোঝার ওপর দাঁড়িয়ে মুচকি হেসে কলকাতার ফুটবল শেষ পর্যন্ত গিয়ে আশ্রয় নিলো আইন-আদালতের আঙিনায়—হয়তো বা ফুটবলের বড়বাবুদের হাত থেকে অন্তত এ বছরটার জন্যে রেহাই পাবার জন্যে!

তাই এবার কলকাতার লীগ ফুটবলের আসর শেষ হতে হতেও হলো না; আর শীল্ডের খেলা শিকেয় উঠলো মাঝ পথেই। আমরা আগেই লিখেছি যে কলকাতার ফুটবলের বরাতে এবার বোধ হয় শনির দশা। অবশ্য কাদের কল্যাণে—সে কথা হয়তো বা না বলে দিলেও চলবে। তবু কলকাতার এই উত্তুরে হাওয়ার শীত-শীত-মধ্যাহ্নে ময়দানে ফুটবলের আসর আবার জাঁকিয়ে বসলো। তবে তার জন্যে আই এফ এ কর্তৃপক্ষের বিশেষ কোন কৃতিত্ব আছে বলে মনে হয় না। কৃতিত্ব সবটুকুই বোধ হয় দাবি করতে পারেন অমৃতবাজার পত্রিকার শতবার্ষিকী কমিটি। অসময়ে কলকাতায় এই জমাটি ফুটবলের জমজমে ভাব তাঁদের শতবার্ষিকী উৎসবেরই অংগ। আই এফ এ-র ওপর ছিলো শুধু মাত্র পরিচালন ভার। যাই হোক এবারকার এই অসমাপ্ত ফুটবল মরশুমে ঐ খেলার আসর কলকাতার ফুটবল পাগল দর্শকদের আবার নতুন করে ফুটবলানন্দে মাতিয়ে তুলেছিলো। আবার কলকাতা তথা সমস্ত বাংলা দেশে জেগেছিলো উন্মাদনা। আবার আনন্দ-হাসি-গানে মেতে উঠেছিলো কলকাতা ময়দান।

কিন্তু লীগ ফুটবলের যে উন্মাদনা, শীল্ড ফাইন্যালের যে উত্তেজনা—তা কি এবার আর ফিরে পাওয়া যাবে? যাবে না—যেতে পারে না। কলকাতায় যদি বিশ্বের সেরা দুটি ফুটবল দলও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়—তবু লীগ কিম্বা শীল্ডে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল আর মহামেডান স্পোর্টিং দলের খেলার মতো উদ্দাম উত্তেজনা কিছুতেই পাওয়া যাবে না। পাওয়া যাবে না উৎসব পরিবেশে জনতার আনন্দ! কিন্তু কেন? কেন আমরা এবার বঞ্চিত হলাম ক্রীড়াংগনের নির্মল আনন্দ থেকে। আই এফ এ কর্তৃপক্ষের কি কোন অধিকার ছিলো বাংলা দেশের হাজার হাজার ফুটবল উৎসাহীর এই আনন্দ কেড়ে নেবার? হ্যাঁ, তাঁরাই তো কেড়ে নিয়েছেন—তাঁরাই দায়ী এবারকার অসমাপ্ত ফুটবল মরশুমের জন্যে। কারণ তাঁদের অতি বেশি তৎপরতার জন্যেই এবারকার লীগ কিম্বা শীল্ডের খেলার ওপর বড় অপ্রত্যাশিতভাবে পড়েছে [illegible] দাঁড়ি। হায়! কলকাতার ফুটবলকে এঁরা নিয়ে [illegible] চলেছেন কোথায়...? [illegible]
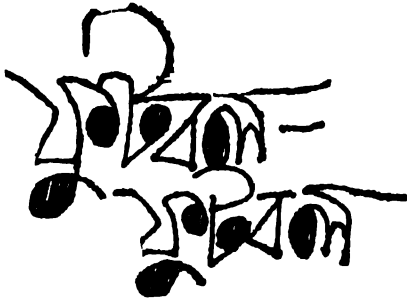
কলকাতার নামকরা ফুটবল খেলোয়াড়দের অনেকেরই বড় বেশি ঠাট। তাঁরা বেশ ভালোভাবেই জানেন যে তাঁদের ছাড়া কিম্বা তাঁদের বাদ দিয়ে বাংলা কিম্বা ভারতীয় দল গঠন করা যাবে না কোন মতেই।

তাই তাঁরা নিজেদের অন্য সকলের চেয়ে একটু আলাদাভাবে রাখতেই বড় বেশি ব্যস্ত। আর তাঁদের সেই ব্যস্ততার সর্বশেষ উদাহরণ হলো রাশিয়ান দলের বিরুদ্ধে খেলার জন্যে অনুষ্ঠিত আই এফ এ-র খেলোয়াড়দের শিক্ষা শিবিরে তাঁদের অনুপস্থিতি।

শক্তিশালী রাশিয়ান দলের বিরুদ্ধে খেলার জন্যে ঠিক হয়েছিল কলকাতার খেলোয়াড়দের গড়ে-পিটে তৈরি করে নেওয়া হবে। তাই রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে বসেছিলো অনুশীলনের আসর।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ আর পরিতাপের বিষয় হলো কলকাতার নামী আর তথাকথিত দামী খেলোয়াড়দের অনেকেই শিক্ষণ শিবিরে হাজির হলেন না।

নিজেদের ওঁরা বোধ হয় মস্ত বড় সব খেলোয়াড় ভাবেন। ওঁরা বোধ হয় মনে করেন যে ফুটবল খেলার সব কলাকৌশলই ওঁদের আয়ত্তে। নতুন করে কিছু জানার নতুন করে কিছু শেখার আর দরকার নেই। তাই বোধ হয় আর কোচিং-এ যাবার প্রয়োজন বোধ করেন নি তাঁরা।

কিম্বা হয়তো বা এই কথাই ভাবেন যে ওঁদের বাদ দিয়ে তো আর দল গঠন করা সম্ভব নয়—কোচিং ক্যাম্পে যান আর নাই যান দলে ওঁদের নিতেই হবে। তাই কি হবে আর মিছিমিছি এই শীতের সকালে রবীন্দ্র সরোবরে ছুটে। তার চেয়ে বরং লেপ কিম্বা কম্বলের তলায় আরাম করে শুয়ে থাকা যাক।

তাই রবীন্দ্র সরোবরে এবারের কোচিং ক্যাম্পকে কেন্দ্র করে হলো বেশ কিছু টাকার শ্রাদ্ধ। কিন্তু কাজের কাজ যে কতোটা হয়েছে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ

মিনস্ক দলের বিরুদ্ধে খেলার আই এফ এ-র অধিনায়ক চুনী গোস্বামী খেলার প্রথম দিকে সহ-খেলোয়াড়দের ভুল ধরায় মন দিয়ে নিজের গাম্ভীর্য বজায় রাখতে পারেন নি।

আছে। কারণ যাঁদের জন্যে হলো কোচিং ক্যাম্পের আয়োজন তাঁরা সেই প্রশিক্ষণের সময়টাই নিজেদের ঘরে কিম্বা পাড়ার রকে শুয়ে বসে কাটিয়ে দিলেন।

কিন্তু কেন এই উদাসীনতা। না উদাসীনতা নয়—এ হলো ঔদ্ধত্য। তাই

॥ আজ-কাল-পরশু ও সেদিন ॥

আজকের খবর, এম সি সি দলের ভারত ভ্রমণ বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের জন্যে বাতিল হয়ে গেছে। কালকের খবর, এই সফর সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী আবার দেখিয়েছেন আশার আলো। আর পরশুর খবরে জানা গেলো যে এম সি সি-র ভারত সফরের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেদিন—অর্থাৎ আজ থেকে বছর চারেক আগে এম সি সি দল কলকাতায় খেলে গেছে। ২১-১-৬৪ সালে তোলা এই ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে যে এম সি সি-র অধিনায়ক মাইক স্মিথ, তাঁর সহ-খেলোয়াড় কলিন কাউড্রে, পিটার পারফিট, ব্যারিংটন প্রভৃতিকে নিয়ে ফিল্ডিং করতে নামছেন ইডেন উদ্যানে।

॥ ঘরে বসে অলিম্পিক ॥
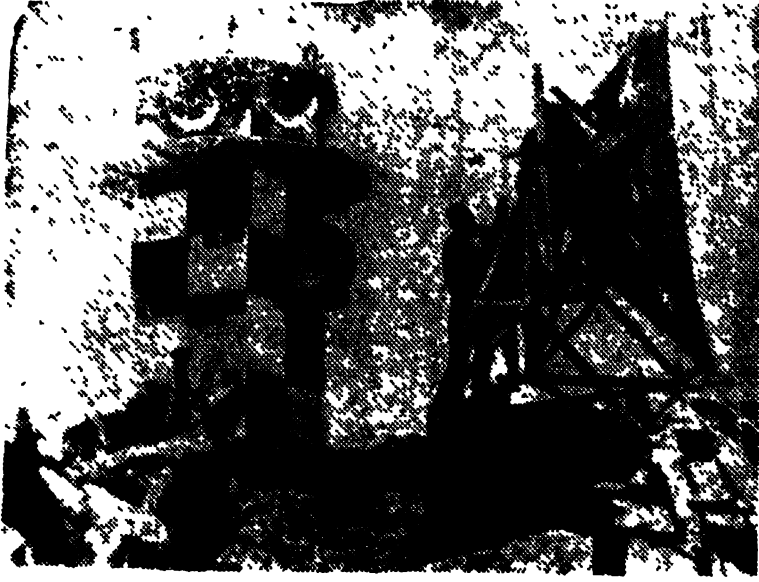
মেক্সিকোর অলিম্পিক প্রতিযোগিতার মনোরম দৃশ্যগুলো ওদেশের অনেকেই দেখার সুযোগ লাভ করেছেন নিজেদের ঘরে বসে। টেলিভিসনই করেছে এই অসাধ্যসাধন। টেলিভিসনে দেখাবার জন্যে প্রতিযোগিতার দৃশ্য কিভাবে ছবির মাধ্যমে তোলা আর পাঠানো হচ্ছিলো তারই ছবি দেখা যাচ্ছে এখানে।

আজ কি আমরা সবিনয়ে তাঁদের জিজ্ঞেস করতে পারি যে এতো বড় ঔদ্ধত্য দেখাবার অধিকার সত্যিই কি তাঁদের ছিল? তাঁর জন্যে জনসাধারণের অর্থের যে অপচয় হলো—তার জন্যে কি বক্তব্য তাঁরা রাখবেন?

জানি কিছু বলার মতো মুখ তাদের আর নেই। এ লেখা যখন আপনাদের হাতে পৌঁছুবে তখন কলকাতায় খেলার পাট চুকে গেছে। আর হয়তো খেলার ফলাফলই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে আমাদের খেলোয়াড়দের খেলার মান কতো নিচে।

তবু সেই খেলার মান একটু উন্নত করার জন্যে কোচিং ক্যাম্পে যেতে আমাদের নামী আর দামী খেলোয়াড়রা একেবারেই নারাজ।

কিন্তু এ-কথাটা তাঁরা যে বুঝেও বোঝেন না, তাঁদের এই ধরণের খামখেয়ালীপনার জন্যে দেশের মান সম্মান ধুলোয় লুটোচ্ছে। আমরা এ-কথা বলছি না যে কোচিং ক্যাম্পে গেলেই ভারতীয় খেলোয়াড়রা ভালো খেলতেন। কিম্বা হারিয়ে দিতেন রাশিয়ান দলকে। কিন্তু এ-কথা তো অস্বীকার করা যাবে না যে ঐ অনুশীলনের জন্যে ভারতীয় খেলোয়াড়রা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া আর দলগত সংহতির মাধ্যমে হয়তো বা গড়ে তুলতে পারতেন সংগ্রামী ক্রীড়াধারা।

কিন্তু আমাদের মাননীয় খেলোয়াড়রা সে গুড়ে দিয়েছেন বালি। এখন দু'গালে চুন-কালি না মাখলেই বাঁচি..! দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়......।

খেলার মতো খেলায় নয়, অতি সাধারণ ম্যাচে আই এফ এ দু' গোলে হেরে গেলো রাশিয়ার মিনস্ক ডায়নামো দলের কাছে। অথচ এই খেলায় খুব কম করে আই এফ এ'রও দুটো গোল করা উচিত ছিলো।
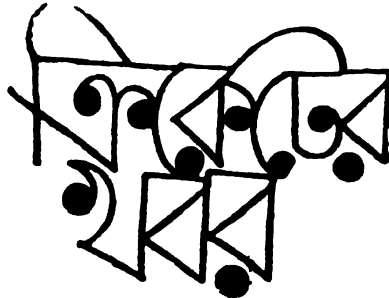
ক্রিকেট খেলার খবর বলতে গেলে এবারও আসবে শুধু মাত্র এম সি সি প্রসংগই। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক এম সি সি দলের ভারত সফরের জন্যে প্রয়োজনীয় ২০,০০০ (কুড়ি) হাজার পাউন্ডের বৈদেশিক মুদ্রা মঞ্জুর করেন নি। তাই বাতিল হয়ে গেছে এম সি সি দলের ভারত সফর।

এখন সেই বাতিল ভ্রমণের প্রসংগটি নিয়ে চলেছে তদবিরের পালা। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার সংকটের জন্যেই এম সি সি দলের ভারত ভ্রমণের প্রস্তাবটি বাতিল করে দিতে হয়েছে।

তবু এরপরেও চললো উপরোধ, অনুরোধ। শেষ পর্যন্ত যেন দায়ে পড়েই ইন্দিরাজী বললেন যে এই বিষয়টি নিয়ে তিনি অর্থমন্ত্রীর সংগে কথা বলবেন দু-একদিনের মধ্যে।

এ লেখা যখন আপনাদের হাতে পড়বে ততোদিনে হয়তো এম সি সি দলের ভারত ভ্রমণ প্রসংগটি সম্বন্ধে নেওয়া হয়ে যাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়। তবে এ-কথা ঠিক যে সফর হলে আমরা যতোটা আনন্দিত হবো—ততোটা খুশি আর কিছুতেই বোধ হয় হবো না।

গল্প হলেও সত্যি

ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং....

প্যাভেলিয়নের টেলিফোনটা বেজেই চলেছে। ধরবার কেউ নেই।

কারণ অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হয়ে এসেছে। শেষ ব্যাটসম্যান আয়রনমঙ্গার গিয়েছেন ব্যাটিং করতে। হয়তো বা এক্ষুণিই শেষ হয়ে যাবে অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস। সকলেই উদগ্রীব হয়ে আছেন। কারণ আয়রনমঙ্গার যে ব্যাট ধরতেই জানেন না। ব্যাটিং-এ একেবারেই অপটু তিনি।

প্যাভেলিয়নে টেলিফোনটা তখনো আর্তনাদ করে চলেছে।

হঠাৎ একজনের কানে গেলো টেলিফোনের শব্দ। ছুটে এসে তিনি রিসিভারটা তুলে নিলেন,

"হ্যালো. "

"আমি একটু আয়রনমঙ্গারের সংগে কথা বলতে চাই।" ও-প্রান্ত থেকে ভেসে এলো কণ্ঠস্বর।

'কি মুশকিল। উনি তো এক্ষুণি ব্যাটিং করতে গেলেন। আপনি বরং খানিক পরে আবার টেলিফোন করবেন।"

ও-প্রান্ত থেকে শোনা গেলো তখন হাসির শব্দ। হাসতে হাসতেই ভদ্রলোক বললেন,

"পরে আবার টেলিফোন করার কি দরকার? আমি না হয় একটু ধরেই থাকি...!'

গল্প কথা নয়। এ ঘটনা ঘটেছিল ১৯৩২ সালে ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ খেলার সময়।

আইন-কানুনের দুনিয়া বিভাগে আমরা এর আগেই ডাইরেক্ট ফ্রি কিক সম্বন্ধে আর ইন-ডাইরেক্ট ফ্রি কিক্ সম্বন্ধে আংশিকভাবে আলোচনা করেছি। আজকের এই লেখা ইন-ডাইরেক্ট ফ্রি কিকের বাকি অংশ নিয়ে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি যে ফুটবল খেলা নিয়ে এবারকার মতো এইটাই শেষ আলোচনা। আইন-কানুনের দুনিয়া বিভাগ এর পর আবার শুরু করবো ক্রিকেট খেলার আইন সংক্রান্ত বিষয়টি নিয়ে।

১ নং ছবিতে দেখা যাচ্ছে একজন খেলোয়াড় তাঁদের গোলের সামনে প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়টিকে অবৈধভাবে বাধা দিচ্ছেন। তিনি এমনভাবে বাধার সৃষ্টি করেছেন যাতে প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়টি এগিয়ে যেতে না পারেন আর তাঁর নিজের

ছবির পেছনের খেলোয়াড়টি ছুটে গিয়ে বলটা ধরতে চাইছেন। কিন্তু ছবির

বিষয়ে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে, বল পেছনে চলে গেছে, কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য নেই খেলোয়াড়টির। উল্টে তিনি ইচ্ছে করে বাধা দিচ্ছেন প্রতিপক্ষ দলের সেই খেলোয়াড়টিকে যিনি ছুটে যেতে চাই-ছিলেন বলের দিকে। এইভাবে বাধা সৃষ্টি করার জন্যে রেফারী ঐ খেলোয়াড়টির বিরুদ্ধে দেবেন ইন-ডাইরেক্ট ফ্রি কিকের নির্দেশ।

৪ নং ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে একজন খেলোয়াড় যখন হেড করতে যাচ্ছিলেন,

দলের গোলরক্ষক বিনা বাধায় বলটা বিপন্মুক্ত করতে পারেন। এইভাবে অবরোধ সৃষ্টি করার জন্যে রেফারী ঐ খেলোয়াড়টির বিরুদ্ধে শাস্তি হিসেবে

সামনের খেলোয়াড় তার দিকে পিঠ রেখে অর্থাৎ তাঁকে এমনভাবে গার্ড করে যাচ্ছেন যাতে খেলোয়াড়টি এগিয়ে যেতে না পারে। এইভাবে অবরোধ করার জন্যে

তখন প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়টি বিপজ্জনকভাবে পা তুলে সেই বলটি কিক করতে গেলেন। এটি সাংঘাতিক ধরনের খেলা। এর জন্যে রেফারী দেবেন ইন-ডাইরেক্ট ফ্রি কিকের নির্দেশ।

৫ নং ছবিটি থেকে দু'রকম ফ্রি কিকেরই প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রথমত বল যে খেলোয়াড়টির পায়ে আছে তিনি যদি পেছনে সরে এসে খেলোয়াড়টিকে ধাক্কা দেন তাহলে উঠবে ডাইরেক্ট ফ্রি কিকের প্রশ্ন। খেলার মাঠে প্রায়ই এই ধরনের অপরাধ করতে দেখা যায় খেলোয়াড়দের।

দেবেন ইন-ডাইরেক্ট ফ্রি কিকের নির্দেশ।

২ নং ছবিটিও ঠিক একই ব্যাপারের জন্যে। বল সামনের দিকে চলে গেছে।

শাস্তি হিসেবে ইন ডাইরেক্ট ফ্রি কিকের নির্দেশ দেবেন রেফারী।

৩ নং ছবিটিও অবরোধ সৃষ্টি করার

কিন্তু খেলোয়াড়টি যদি ধাক্কা না দিয়ে শুধুমাত্র প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন পেছনের খেলোয়াড়টিকে কিছুতেই এগিয়ে যেতে না দিয়ে তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে রেফারী দেবেন ইন-ডাইরেক্ট ফ্রি কিকের নির্দেশ।

[illegible] [illegible] (**[illegible] রোড, [illegible]পুর, মুর্শিদাবাদ**)

প্রশ্ন : মিলখা সিং কি টোকিও অলিম্পিকে গিয়েছিলেন? খেলাধুলো সম্বন্ধে লেখা পাঠাতে পারি কি?

উত্তর : হ্যাঁ। লেখা পাঠাতে পারেন।

নিমাইচন্দ্র প্রামাণিক (কাটোয়া, নিশানতলা, বর্ধমান)

প্রশ্ন : প্রথম থেকে এ পর্যন্ত অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় কতো পদক ছিলো আর কোন দেশের ভাগ্যে কতোগুলি এবং কোন কোন বিভাগে জুটেছিলো—তা যদি জানান খুব খুশি হবো।

উত্তর : আপনাকে খুশি করা তো সম্ভব হচ্ছে না। কারণ আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে সাপ্তাহিক বসুমতীর সবগুলো পাতা নিলেও দু-তিন সংখ্যাতেও শেষ হবে না সুতরাং বুঝতেই পারছেন।

অসিতকুমার চৌধুরী (থুবা, টাকী, ২৪ পরগনা)

উত্তর : আমি প্রায়ই টাকী যাই—আপনি সেখানে আমার সংগে যোগাযোগ করতে পারেন। চিঠির সংগে খাম, পোস্ট কার্ড কিম্বা স্ট্যাম্প থাকলে তবেই ব্যক্তিগতভাবে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়।

জীতেশরঞ্জন দত্ত (লংকা, নগাঁও, আসাম)

উত্তর : আপনার চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। ভুলক্রমে দক্ষিণ আফ্রিকার জায়গায় [illegible] ছাপা হয়েছিলো। ওটা [illegible] উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপ[illegible] আর কি।

[illegible]র নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট নয় [illegible] হল [illegible]। ওটা ছাপার ভুল। এই ত্রুটির জন্যে আমরা দুঃখিত।

বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দল হিসেবে আপনি মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের কথাই বলতে পারেন।

সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (হালিসহর, গোলাবাড়ি, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : টেস্ট খেলায় পর পর সেঞ্চুরী করার রেকর্ড কে করেছেন? কোন সালে এবং তিনি কোন দেশের খেলোয়াড়?

উত্তর : পর পর পাঁচটি টেস্ট সেঞ্চুরী করেছেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের উইকস। ১৯৫৫-৫৬ সালে।

স্বাস্থ্য গঠন সম্বন্ধে কিছু লেখার ইচ্ছে আছে ভবিষ্যতে। তবে এই বিষয়ে আপনি কলকাতার আখড়াগুলোর সংগে যোগাযোগ করতে পারেন।

দিলীপকুমার রক্ষিত (সিহিকা, বাঁকুড়া)

প্রশ্ন : ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের সাক্ষাৎকারে আজ পর্যন্ত কোন হ্যাটট্রিক হয়েছে কি?

উত্তর : না।

পরিতোষ নাগ (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : প্রথম শ্রেণীর খেলায় ও টেস্ট ম্যাচে ইংলণ্ডের কম্পটন আর হাটনের ব্যাটিং এ্যাভারেজ জানতে চাই। অস্ট্রেলিয়ার ট্রামবেল ও ইংলণ্ডের বোলিং এ্যাভারেজটাও জানাবেন।

[illegible] [illegible] [illegible] (**[illegible] রোড, কলকাতা—১১**)

প্রশ্ন : কলকাতার কোন দল সব চেয়ে বেশিবার রোভার্স বা ডুরাণ্ড কাপ পেয়েছে?

উত্তর : রোভার্স কাপ ইস্টবেঙ্গল (একবার যুগ্ম সহ) ও মহামেডান স্পোর্টিং তিনবার করে পেয়েছে।

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ডুরাণ্ড কাপ জিতেছে চারবার করে।

বিদ্যুৎ দত্ত (কলকাতা—১২)

প্রশ্ন : ভারতের মানকাদ, উমরিগড় ও পাতৌদির নবাব কি টেস্ট খেলায় ডাবল সেঞ্চুরী করেছেন? করে থাকলে কোন্ সালে, কোন্ দলের বিরুদ্ধে এবং কতো রান করেছেন তাঁরা?

উত্তর : মানকাদ নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৫৫-৫৬ সালে মাদ্রাজ টেস্টে ২৩১ রান ও বম্বে টেস্টে করেছিলেন ২২৩ রান।

উমরিগড় ঐ বছরই নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধেই হায়দ্রাবাদ টেস্টে করেছিলেন ২২৩ রান।

আর পাতৌদির নবাব ১৯৬৩-৬৪ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে দিল্লী টেস্টে অপরাজিত থেকে করেছিলেন ২০৩ রান।

ব্যাটিং : প্রথম শ্রেণীর খেলায়

	রাণ	ইনিংস	অঃ পঃ	সর্বোচ্চ	শতরান সংখ্যা	এ্যাভারেজ
কম্পটন	৩৮৯৪২	৮৪২	৮৯	৩০০	১২৩	৫১.৭১
হাটন	৪০১৪০	৮১৪	৯১	৩৬৪	১২৯	৫৫.৫১

টেস্ট ম্যাচে	টেস্ট	ইনিংস	অঃ পঃ	রান	সর্বোচ্চ	শতরান	গড়
কম্পটন	৭৮	১৩১	১৫	৫৮০৭	২৭৮	১৭	৫০.০৬
হাটন	৭৯	১৩৮	১৫	৬৯৭১	৩৬৪	১৯	৫৬.৬৭

বোলিং — টেস্ট ম্যাচে

	টেস্ট	রান	উইকেট	গড়
লারউড	২১	২২১৬	৭৮	২৮.৪১
ট্রাম্বল	৩২	৩০৭২	১৪১	২১.৭৮

অনুপ চক্রবর্তী (রেস্টক্যাম্প, পাণ্ডু, আসাম)

প্রশ্ন : ইংলণ্ডের অধিনায়ক কলিন কাউড্রের আগে সব থেকে বেশি টেস্ট খেলার রেকর্ড কার ছিলো এবং তিনি মোট কয়টি টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর : ইংলণ্ডের টি জি ইভান্সের। তিনি মোট ৯১টি টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

অশোককুমার মল্লিক (বেলদা, মেদিনীপুর)

প্রশ্ন : মোহনবাগান কতোবার আই· এফ· এ শীল্ড পেয়েছে?

উত্তর : আটবার।

স্বপনকুমার রায় (ঠিকানা নেই)

প্রশ্ন : জার্নাল সিং-এর বাড়ির ঠিকানাটা যদি জানান তাহলে খুব ভালো হয়।

উত্তর : Sj. Jarnail Singh,
P.O. & Vill.—Panam
(Via—Garh Shanker)
Dt.—Hoshiarpur,
Punjab

সম্পাদিকা—[illegible] সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার [illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

৭৩ বর্ষ : ২৪শ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা
বৃহস্পতিবার, ১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ
PRICE : 30 Paise
Thursday, 5th December, 1968

সরকারী আদর্শের লটারী

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের দেখাদেখি পশ্চিম[illegible] সরকার [illegible] এখন ল[illegible] নিয়োগ [illegible] হন। রাজ্য-পা[illegible] অনুযায়ি [illegible] প্রবর্তন করা হ[illegible] চারবার। প্রথম পু[illegible]। লটারী প্রবর্তন [illegible] সরকার আশা করছেন যে [illegible] সরকারী [illegible] পড়বে।

[illegible] এইভাবে অন্য কয়েকটি রাজ্যের মতো [illegible] সরকারও ধনাঢ্য হবেন!

কোনো ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের প্রতি ক্রেতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য লোভনীয় পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্য ও অর্থ বোঝা যায়। কিন্তু কোনো সরকার যদি অর্থ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নতুন করে লটারী প্রবর্তন করেন—তখন মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সেই সরকার বোধ হয় দেউলিয়া হবার পথ থেকে মুক্তির জন্যে ভিন্ন পন্থা গ্রহণ করেছেন। অথচ এমন কথা হামেশাই শোনা যায় যে, ইনকাম ট্যাক্স যথাযথভাবে আদায় করা সম্ভব হয় না এবং কালো টাকা লুকানো থাকলেও তার হদিস মেলে না। সরকারী কর্মকাণ্ডের এই ধরনের সমন্বয়ের পর সরকার কর্তৃক লটারীর প্রবর্তন বিশেষ রকম দক্ষতারই পরিচয় দেয় বৈকি!

অথচ ১৯৪৮ সাল বা ঐ রকম সময় থেকেই জনসাধারণ শুনে এসেছেন এদেশ থেকে ঘোড়দৌড় বিদায় দেওয়া হবে, ফাটকাবাজি জুয়াখেলা এদেশে চলবে না। কিন্তু সে সব বহাল তবিয়তে তো আছেই; উপরন্তু জুয়াখেলা, ফাটকাবাজির বাড়-বাড়ন্ত। বাজারদরের খবর যারা রাখেন ফাটকাবাজির ব্যাপার তাঁদের অজানা নয়। হয়তো এ সবের কিছু চলছে বেআইনী-ভাবে আর কিছু চলছে সরকারী বিধি-মতে। অবশ্য সরকার ট্যাক্স পেলে সব কিছুই আইনসম্মত হতেও বোধ হয় দ্বিধা নেই। কারণ সরকার নিজেও এখন ঐ দিকে পথ দেখাচ্ছেন। দরিদ্র জনসাধারণকে লক্ষ টাকার লোভ দেখিয়ে, ক্ষুধার অন্ন থেকে আংশিকভাবে বঞ্চিত করে তাঁদের কাছ থেকে পরোক্ষ কর আদায় গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষেই সম্ভব! আমরা এদেশে গণতন্ত্রের বড়াই করি। আমাদের নম্র গণতন্ত্রের আদর্শ বোধ হয় এই যে সর্ব সাধারণের যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য দেওয়া যখন অসম্ভব, তখন দু টাকার বিনিময়ে কোটি কোটি লোকের মধ্যে হঠাৎ দু একজনকে বড়লোক করে দেওয়া।

সরকারের আদর্শ ও উদ্দেশ্য যদি এই রকম হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ এটাই কল্পনা করে নেবেন যে, এ আমলে আর বোধ হয় তাঁদের অবস্থার কোনো রকম পরিবর্তন হবে না। কারণ সরকারের কাছে এ প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর যে, কে কি-ভাবে বড়লোক হচ্ছে। কোটিপতি অব্যাহত-ভাবে অর্বুদপতি হতে থাকবেন। এবং যে সরকার আ[illegible] সম্পূর্ণ [illegible] গ্রহণ [illegible] পা[illegible] আ[illegible] সম্পদ [illegible] এ রকম কথা [illegible]

কোনো এক[illegible] ঘট বা সত্তর লক্ষ টাকার [illegible] খুব একটা কঠিন ব্যাপার [illegible] যেখানে শোনা যায় [illegible] সরকার আদায় করতে অসমর্থ হন। [illegible] লটারীর মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ গণ[illegible] সমাজতন্ত্রে [illegible] সম্ভব [illegible] আমাদের কাছে দুর্বোধ্য। আশা [illegible] পর সমাজতন্ত্র শব্দটি আর উচ্চারিত হয় না। এখন শুধু গণতন্ত্রের জয়োল্লাস। সেই জয়োল্লাসে এক জন হবেন লক্ষপতি আর লক্ষ লক্ষ লোক পথের ভিখিরি।

লটারীর প্রবর্তনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কিছু বলা নিরর্থক। এই সরকার মহাজন পথই অনুসরণ করেছেন। আমরা ভেবে শুধু অবাক হই—এককেটি রাজ্যের অর্থ লোভের কারণে আজ রাষ্ট্রীয় আদর্শই যেন ধূলিসাৎ হতে বসেছে। ১৯৪৮-এর পর ১৯৬৮-তে দেশের কেন্দ্রীয় সরকার তথা রাজ্য সরকারগুলির এই পরিণতি অত্যন্ত দুঃখের।

সম্পাদকীয়

মানুষের কত বিচিত্র রকমের পেশা। কারো পেশা শিক্ষকতা কারো বা ছবি আঁকা। কারো লাঙল চষা কারো বা কলম পেষা। নতুন সৃষ্টি করে কেউ রুটি রোজগার করে, কারো দায়িত্ব অবিরাম কেবল ভেঙে যাওয়া। যদি বলি স্যর ডাডলে সেনানায়কের পেশা মন্ত্রিগিরি তাহলে কি আমরা অনৃতভাষণের দায়ে পড়বো? স্যর সেনানায়ক গত ২২ বছর ধরে প্রায় একটানা মন্ত্রিত্ব করছেন, এবং চার বার দেশের প্রধানমন্ত্রী হবার গৌরব অর্জন করেছেন।

ছোট্ট দেশ সিংহল। কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে তার গুরুত্ব অপরিসীম যার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন দীর্ঘকাল দ্বীপটিকে নিজের দখলে রেখেছিল। স্বাধীনতা আদায়ের জন্যে একদিন বাপ-বেটায় কাঁধে কাঁধ দিয়ে সিংহল জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে লড়েছিলেন। সেদিনকার ত্যাগের পুরস্কারও তাঁরা দুজনেই পেয়েছেন। পিতা ডি এস সেনানায়ক স্বাধীন সিংহলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হবার সম্মান লাভ করেছিলেন. দুর্ঘটনায় পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর পুত্রও যে উত্তরাধিকারসূত্রেই প্রধানমন্ত্রীর গদি পেয়েছিলেন।

অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে ডাডলে। দেশে শিক্ষা শেষ করার পর তিনি কেম্ব্রিজে যান। বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্র হিসেবে প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন অধ্যাপক এবং ছাত্রদের কাছ থেকে। অনেক শুভানুধ্যায়ী অধ্যাপকই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তিনি একজন নামজাদা রাজনীতিবিদ হবেন বলে। রাজনীতির আসরে তিনি ১৯৩৬ সালেই প্রথম নির্বাচনপ্রার্থী হন উচ্চতর পরিষদে এবং জয়লাভ করেন। সিংহলে সাধারণ নির্বাচনের সূচনা হয় '৪৭ সনে। বলাই বাহুল্য যে নির্বাচনে ডাডলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং জিতেও ছিলেন। ফলে কৃষি ও ভূমিদপ্তর নিয়ে প্রথম মন্ত্রী হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর গদিতে তখন তাঁরই বাবা ডি এস সেনানায়ক।

সিংহলের প্রধান রাজনৈতিক দল এখন সংযুক্ত জাতীয় দল (ইউ-এন-পি)। এ পার্টি গড়ে তোলার কৃতিত্ব ডাডলের বাবার পরে ডাডলে নিজেই দলপতি হন। অর্থাৎ ১৯৫২ সালে অশ্বারোহণ করতে গিয়ে যখন প্রধানমন্ত্রী পিতার মৃত্যু হয়। তখন ডাডলেকেই দলনেতার পদ নেবার জন্যে অনুরোধ জানানো হয়। ডাডলে সিংহলের প্রধানমন্ত্রী হলেন, বয়স তখন তাঁর মাত্র ৪১; সমগ্র কমনওয়েলথের সর্বকনিষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী।

কিন্তু "উত্তরাধিকারসূত্রে" প্রধানমন্ত্রিত্ব পেয়ে তাঁর মন হয়তো খুঁত খুঁত করছিলো, তিনি গণসমর্থন চান, তাঁর ক্ষমতা গ্রহণে তিনি দেশবাসীর অনুমোদন চান। সাধারণ নির্বাচন হলো, ডাডলের ইউ-এন-পি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলো। অর্থাৎ ডাডলে সেনা-

ডাডলে সেনানায়ক

নায়ক দ্বিতীয়বারের জন্যে সিংহলের প্রধানমন্ত্রী হলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, শরীর তাঁর ভেঙে গেলো অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে, বাধ্য হলেন তিনি কাঁধ থেকে দায়িত্বের বোঝা নামাতে। প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন, তিনি চার মাস বাদে। এমন কি ১৯৫৬ সালে অনুষ্ঠিত পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে ডাডলে নির্বাচনপ্রার্থীই হন নি।

শরীরকে বিশ্রাম দিলে কী হবে, মন তো বিশ্রাম নিতে রাজী নয়, সদাসর্বদা রাজনীতিই যাঁর মাথায় ঘুরছে তিনি রাজনৈতিক জীবন থেকে আত্মনির্বাসন মেনে নেবেন কেমন করে। রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে পুনরাবির্ভাব ঘটলো ডাডলের, এবং ১৯৬০ সনের নির্বাচনে আবার তাঁর দলকে জয়যুক্ত করালেন। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর গদি পেলেন তিনি তৃতীয়বারের মত।

কিন্তু এরপরেই যেন তাঁর দলে ভাটার টান ধরলো। এপ্রিল মাসে প্রতিনিধি সভার ভোটাভুটিতে ইউ-এন-পি'র পরাজয় ঘটলে ডাডলেকে গদিত্যাগ করতে হয়। পরের বছর অন্তবর্তীকালীন নির্বাচনে তাঁর দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ হলো, সিংহলের প্রধানমন্ত্রী হলেন শ্রীলঙ্কা ফ্রীডম পার্টি'র (এস-এল-এফ-পি) শ্রীবন্দরনায়ক। বন্দরনায়কের মৃত্যুর পর তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী সিরিমাভো পৃথিবীর প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হবার গৌরব লাভ করেন। কিন্তু ১৯৬৫ সালের নির্বাচনে আবার চাকা ঘুরে গেলো। এস-এল-এফ-পি নির্বাচনে সুবিধে করতে পারে নি, ফলে ইউ-এন-পি কোয়ালিশন সরকার গঠন করলেন ফেডারেল পার্টিকে নিয়ে। এবং ডাডলে সেনানায়কও চতুর্থবার সিংহলের প্রধানমন্ত্রী হবার দুর্লভ সুযোগ লাভ করলেন।

কিন্তু চারবার প্রধানমন্ত্রিত্ব করে ডাডলে দেশকে কিছু স্বর্গরাজ্য বানাতে পারেন নি। যদিও সিংহলের প্রভূত উন্নতিসাধন করেছেন তিনি। একদিন সিংহলকে তার প্রয়োজনীয় প্রায় সব কিছুরই জন্যে বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হতো, তার সম্পদের মধ্যে ছিলো কেবল চা আর রবার। কিন্তু ধীরে ধীরে এখানে শিল্পায়ন হচ্ছে, সিংহলের চেহারা দ্রুত পাল্টাচ্ছে। কিন্তু সমস্যাও থেকে যাচ্ছে, ডাডলের সামনে প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা হলো কোয়ালিশন সরকারের অন্তর্ভুক্ত ফেডারেল পার্টির মন্ত্রীরা গদি ত্যাগ করেছেন, এম-পি'রাও সরকার ত্যাগ করার ফলে ইউ-এন-পি'র শক্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। অবশ্য তামিল ভাষাভাষী ফেডারেল পার্টির সঙ্গে সিংহলী ভাষাভাষী ইউ-এন-পি'র গাঁটছড়াটা সুবিধাবাদী নীতিরই প্রতীক ছিলো। এখনকার শিল্পায়ন এখনো আশানুরূপ হয়ে উঠতে পারে নি এবং চা এবং রবার রপ্তানীর ক্ষেত্রেও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে সিংহলের বৈদেশিক মুদ্রার দারুণ সঙ্কট চলেছে। ভারতের লক্ষ লক্ষ রাষ্ট্রহীন মানুষদের নিয়েও ডাডলে বিব্রত। তার ওপর রয়েছে ভারতের সঙ্গে তার কচ্ছতিভু নিয়ে বিরোধ। ডাডলে সেনানায়ক বৌদ্ধ, কিন্তু তিনি রক্ষণশীল না হলে বোধ হয় সঙ্কট উতরানো তাঁর পক্ষে খুব কঠিন হতো না।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর

॥ বার ॥

১৯৫৪ সন। আমার গঠনমূলক কাজের ব্যস্ততা নাই। বাড়িতে প্রায় বেকার অবস্থায়ই আছি। প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনের কথাবার্তা চলিতেছে। পৃথক নির্বাচন, আমারও ইচ্ছা হইল নির্বাচনে দাঁড়াইব। আমার গঠনমূলক কাজ ব্যর্থ হইয়াছে, প্রাদেশিক আইনসভার সভ্য হইলে ক্ষমতা এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে, সেই সুযোগে জনগণের সেবা করার সুযোগ পাইব। ইলেকসন বড় লোকের কাজ, এখানে হাজার হাজার টাকা খরচ হয়। আমি বড়লোক নই, এখন ইলেকসনের খরচের টাকা আসিবে কোথা হইতে? আমি বন্ধু-বান্ধবদের সহিত পরামর্শ করিলাম, তাঁহাদের আশ্বাস পাইয়া মন স্থির করিলাম, নির্বাচনে দাঁড়াইব। নির্বাচন সংগ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতারা এক মত হইতে পারেন নাই তাই বিভিন্ন নামে বিভিন্ন দল নির্বাচন সংগ্রামে মাঠে অবতীর্ণ হইলেন। সংযুক্ত প্রগতিশীল দল (ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ পার্টি) পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, সিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশন হইতে এবং স্বতন্ত্রভাবে বহু লোক নির্বাচনে দাঁড়াইলেন। আমি সংযুক্ত প্রগতিশীল দল হইতে দাঁড়াইলাম। এই দলের নেতা ছিলেন শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। সভ্যদের মধ্যে ছিলেন, শ্রীকামিনীকুমার দত্ত (কুমিল্লা), ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (ময়মনসিংহ), প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী (রাজসাহী), সাগ্রাম মাঝি (রাজসাহী), ফণী মজুমদার (মাদারীপুর), রমেশ দত্ত (ভাণ্ডা), দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ (বরিশাল), হারানচন্দ্র ঘোষচৌধুরী (নোয়াখালি), প্রফেসর পুলিন দে (চট্টগ্রাম), ডাঃ শৈলেন সেন (ঢাকা), আশুতোষ সিংহ (কুমিল্লা) প্রমুখ। আমি পূর্ব ময়মনসিংহ হইতে দাঁড়াইয়াছি। আমার নির্বাচন এলাকা ছিল নেত্রকোণা মহকুমার ১২টি থানা এবং কিশোরগঞ্জ মহকুমার ৮টি থানা। এই এলাকা হইতে আমরা ৬ জন প্রার্থী ছিলাম।

আমি পদব্রজে ভোট ভিক্ষার জন্য রওয়ানা হইলাম এবং প্রায় দেড় মাসে নির্বাচন সফর শেষ করিলাম। প্রায় প্রত্যহ খাওয়ার প্রচুর ব্যবস্থা, মাঝে মাঝে অনুরোধে অতিরিক্ত ভোজনের জন্য পেটের অসুখও হইয়াছে। নির্বাচন উপলক্ষে গ্রামের সকল বাড়িতেই যাইতে হইয়াছে. যে যে বাড়িতে বসিয়াছি, পান, তামাক এবং চা লইয়া আসিয়াছে, আমি তামাক খাই না, এজন্য তামাক খাওয়া হইতে রক্ষা পাইলাম কিন্তু পান এবং চা খাইতে হইয়াছে। আমি প্রত্যহ ৪০।৪৫ কাপ চা এবং পান খাইয়াছি। আমার অবস্থা এরূপ হইয়াছে চায়ের কাপ দেখিলে বমির উদ্রেক হইত, পান খাইতে খাইতে জিহ্বার ছাল গিয়াছে, খাওয়ার কোন স্বাদ পাই না। গ্রামের লোক আগ্রহ করিয়া চা লইয়া আসিয়াছে, চা পান না করিলে মনে ব্যথা পাইবে এবং ইহাও ভাবিতে পারে, মহারাজের দেমাক হইয়াছে, আমি গরীব বলিয়া আমার বাড়িতে চা খাইল না। ইলেকসনে দাঁড়াইয়াছি, কাহাকেও অসন্তুষ্ট করিতে পারি না। আমি যখন বাবহাট্টা যাই, আমার কর্মীদের অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িলাম এবং লজ্জা বোধ করিতে লাগিলাম। আমার প্রতিনিধি ডাঃ সত্যরঞ্জন চক্রবর্তীর নিকট জানিতে পারিলাম, তিনি প্রচারের জন্য ৪ জন কর্মী নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহারা চোঙ্গা ফুঁকিয়া গ্রামে গ্রামে যাইয়া আমাকে ভোট দেওয়ার জন্য প্রচার করে. তাহারা নিজ নিজ বাড়িতেই খাওয়া-দাওয়া করে, তিনি শুধু তাহাদের চা খাওয়ার জন্য দৈনিক জনপ্রতি দুই আনা ধার্য করিয়াছেন। আমার কর্মীরা ইহাতেই সন্তুষ্ট। আমি যখন ভাটি অঞ্চলে গিয়াছি, তখন দেখিয়াছি, শ্রমশক্তির (Human labour) কিরূপ অপচয় হইতেছে। গ্রামের লোকের বর্ষায় ছয় মাস কোন কাজ থাকে না, তাহারা বেকার অবস্থায় কাটায়। এখন গ্রামে গ্রামে যদি কুটির-শিল্প প্রবর্তন করা হয়, তবে দেশেরও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, তাহাদেরও অর্থ লাভ হয়। আমি গ্রামবাসীদের সহিত কুটির-শিল্প প্রবর্তন সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা করিলাম, তাঁহারা খুব উৎসাহ দেখাইলেন। আমি নির্বাচন সফর শেষ করিয়া বাড়ি ফিরিলাম। আমার নির্বাচন কেন্দ্র ছিল ৬০টি। নির্বাচনের দিন ভোটারদের মিষ্টিমুখ করাইতে হয়, এজন্য প্রচুর কিছু অর্থ ব্যয় হয়। আমি স্থির করিলাম, আমার প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্য ঐ দিন ১০৲ টাকা করিয়া খরচ করিব, ইহাতে আমার ৬০০৲ টাকা খরচ হইবে। তখনই শেষ পর্যন্ত আমার সব কেন্দ্রে টাকা দিতে হয় নাই, কোন কোন কেন্দ্র হইতে আমাকে জানাইয়া দিয়াছে, তাহাদের টাকার প্রয়োজন হইবে না, পরে জানিতে পারিলাম, তাহারা নিজেরাই টাকা খরচ করিয়া ভোটারদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছেন। আবার দুই-এক জায়গায় এরূপও হইয়াছে, আমার কোন প্রতিনিধি ছিল না, ভোটারগণ ভোট দিতে আসিয়া আমার কোন প্রতিনিধি না দেখিয়া, নিজেরাই পরস্পরকে পান-বিড়ি খাওয়াইয়া আমাকে ভোট দিয়া গিয়াছেন।

নির্বাচনে আমার সর্ব মোট ২৮৯৲ টাকা খরচ হইয়াছে, আমি জয়ী হইয়াছি। আমি যুক্তফ্রন্টের যুগে সরকার পক্ষের এম পি এ ছিলাম কিন্তু নিজের অক্ষমতা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য আমার এলাকায় ২।১টা টিউবওয়েল বসান ছাড়া বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই। আমার ভোটার এবং কর্মিগণ আমার জন্য যথেষ্ট সহানুভূতি দেখাইয়াছেন, ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, প্রতিদানে আমি তাহাদের জন্য কিছুই করিতে পারি নাই। এজন্য আমি দুঃখিত। আজ আমি জীবনের সায়াহ্নে তাহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

॥ তের ॥

মিলিটারী শাসন শুরু হইয়াছে, ১৯৫৮সন। ২৭শে অক্টোবর, আমি তখন আমার নির্বাচনী এলাকায় ছিলাম। পরস্পর সংবাদ পাইলাম আমাদের এম পি এ চাকুরী নাই, আমরা বরখাস্ত হইয়াছি। আমি বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম এবং জানিতে পারিলাম, বাস্তবিকই আমরা বরখাস্ত হইয়াছি। আমরা যে কি অপরাধ করিয়াছি, কেন বরখাস্ত হইলাম কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অবশেষে একদিন নোটিশ পাইলাম, আমি এবডোতে (E.B.D.O.) পড়িয়াছি। আমার বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ আনা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, আমি যদি এরূপ প্রতিশ্রুতি দিই, আগামী ৬ বৎসরের মধ্যে কোন নির্বাচনে দাঁড়াইব না তবে আমার বিরুদ্ধে কিছু করা হইবে না, নতুবা আমাকে ট্রাইব্যুন্যালের সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে। আমি নির্বিবাদে এই হুকুম মানিয়া লইতে রাজী হইলাম না, ট্রাইব্যুন্যালের সম্মুখে দাঁড়াইতে প্রস্তুত হইলাম। আমি নির্দিষ্ট তারিখে ঢাকা গিয়া ট্রাইব্যুন্যালের (Tribunal) সম্মুখে হাজির হইলাম। ট্রাইব্যুন্যালের চেয়ারম্যান ছিলেন জাস্টিস আক্রাম। মামলা শুরু হইল। আমার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ ছিল, আমাকে পড়িয়া শোনান হইল। আমার উত্তর আমি পূর্বেই বাংলা ভাষায় লিখিয়া সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম, আমি একে একে প্রত্যেকটি অভিযোগের উত্তর পড়িয়া শুনাইলাম এবং জাস্টিস আক্রামের সহিত তর্ক করিতে লাগিলাম। আমি দাবি করিলাম, আমার বিরুদ্ধে যাহারা রিপোর্ট দিয়াছে, তাহাদিগকে কোর্টে হাজির করিতে হইবে, আমি তাহাদিগকে জেরা করিব। জাস্টিস আক্রাম বলিলেন, তাহাদিগকে কোর্টে হাজির করা হইবে না। আমি বলিলাম, তাহাদিগকে জেরা না করিলে আপনি কি করিয়া বুঝিবেন, তাহাদের রিপোর্ট সত্য না মিথ্যা? তিনি আমার প্রস্তাব বাতিল করিয়া দিলেন। আমার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ ছিল, আমি একটি সোস্যালিস্ট কনফারেন্স ডাকিয়াছিলাম, সেই কনফারেন্সে এরূপ কতকগুলি লোক ছিল, যাহারা পাকিস্তান-বিরোধী। আমি দাবি করিলাম, তাহাদের নাম কোর্টে প্রকাশ করা হউক। উত্তর,—তাহাদের নাম প্রকাশ করা হইবে না। আমার বরিশাল কনফারেন্সের সভাপতির ভাষণ-এর এক কপি ট্রাইব্যুন্যালের সম্মুখে দাখিল করিলাম। আমার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ ছিল, আমি কলকাতার আশে-পাশে এক সোস্যালিস্ট সভায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় বলিয়াছি, "কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ"। আমি প্রশ্ন করিলাম, সেই সভা কোন সনে এবং কোথায় হইয়াছিল? উত্তর—তাহা বলা হইবে না। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, আমি দুই বাংলা এক করার চেষ্টা করিয়াছি। আমি প্রশ্ন করিলাম, প্রমাণ কি? উত্তর—বলা হইবে না। আর একটি অভিযোগ ছিল গোপনে নাশকতামূলক (Subversive) কাজের চেষ্টা করিয়াছি। আমি উত্তরে বলিলাম, পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম আই জি পি জাকির হোসেন সাহেব, শামসুল দোহা সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া হাফিজুদ্দিন সাহেব পর্যন্ত সকল আই জি পি-র সহিত আমার পরিচয় আছে এবং মাঝে মাঝে দেখা হইয়াছে। আমার যদি সাবভারসিব একটিভিটি থাকিত, তবে তাঁহারা নিশ্চয়ই আমাকে সাবধান করতেন। এতকাল আমাকে গ্রেপ্তার করা হইল না কেন? তখন তৃতীয় বিচারক, বাড়ি সিলেট, বলিলেন, আপনি বৃদ্ধ, এজন্য আপনাকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। আমার বিরুদ্ধে সর্বশেষ অভিযোগ, আমি গভর্নমেণ্টকে ফাঁকি দিয়া বহু টাকা আত্মসাৎ করিয়াছি। আমি মাসিক বেতনের টাকা বেশি লইয়াছি, গাড়িতে নিম্নশ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়া উচ্চশ্রেণীর বিল করিয়া টাকা লইয়াছি। উত্তরে আমি বলিয়াছি, আমি প্রচলিত প্রথা অনুসারে বিল করিয়াছি। ইহার পর সরকার পক্ষের উকিল সওয়াল জবাব করেন। তাহার পর আমাকে উত্তর দিতে বলা হইল। আমি বলিলাম, বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা, পূর্বে দেশে যাঁহাদের সুনাম ছিল, অবস্থার পরিবর্তনে আজ সকলেই "এবডোতে" পড়িয়াছেন। পলিটিক্যাল লীডার্সদের পলিটিক্যাল ফিল্ড হইতে দূরে সরাইয়া রাখার ইহা একটি কৌশল কি না, আমি ট্রাইব্যুন্যালকে অনুরোধ জানাইতেছি, ইহারও অনুসন্ধান করা হউক। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগের লিখিত উত্তর আমি ট্রাইব্যুন্যালের সম্মুখে দাখিল করিলাম। ট্রাইব্যুন্যালের কাজ যখন শেষ হইল, তখন জাস্টিস আক্রাম হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন, আপনি ত' সোস্যালিস্ট? আমি, হাঁ। Then you are not un-social. আমি—Surely not. তখন দ্বিতীয় বিচারক, একজন পাঞ্জাবী মিলিটারীম্যান বলিলেন, You are a Socialist. আমি—Yes sir. হাসিমুখে সভা ভঙ্গ হইল। আমার বিবৃতির সারমর্ম স্টেটসম্যান কাগজে বাহির হইয়াছিল।

ট্রাইব্যুন্যালের বিচারের রায় আমার বাড়ির ঠিকানায় ডাকযোগে জানাইয়া দেওয়া হইল, আমি দোষী সাব্যস্ত হইয়াছি, আমার সাজা ১৯৬৬ সনের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। আমি কোন নির্বাচনে দাঁড়াইতে পারিব না। নির্বাচনে দাঁড়ানোর আমার আর কোন প্রয়োজনও নাই, বয়স ৭২ বৎসর পার হইয়াছে, এখন অবসর গ্রহণ করার সময়। মিলিটারী শাসন, বাড়িতেই আছি, একদিন সরকারী খামের চিঠি দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম, আবার কোন্ বিপদ ঘনাইয়া আসিল? তাড়াতাড়ি চিঠি খুলিয়া পড়িয়া দেখিলাম একটি বড় অঙ্ক, সরকারী হিসাবে যাহা আমি বেতন ও এলাউন্স বাবদ সরকারকে ফাঁকি দিয়া অতিরিক্ত গ্রহণ করিয়াছি, তাহা অবিলম্বে সরকারী ট্রেজারীতে জমা দেওয়ার নির্দেশ। এরূপ নোটিশ শুধু আমার একা নয়, অনেক এম পি এর উপরই জারি হইয়াছে। আমরা আমাদের বেতন ও এলাউন্সের টাকার বিল করিয়াছি, এ জি অফিস পরীক্ষা করিয়া তাহা মঞ্জুর করিয়াছে, এখন অনেকে কিভাবে যে গভর্নমেণ্টকে ফাঁকি দিয়া অতিরিক্ত টাকা লইয়াছি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক মিলিটারী শাসন, আমি হিন্দু, হুকুম পালন করিতেই হইবে, টাকা দিতে হইবে। আমার হাত শূন্য, টাকা কোথা হইতে দিব? আমি কখনও কল্পনা করি নাই, আমার এম পি এ গিরি চাকুরী চলিয়া যাইবে, আমি মাসিক ২০০ টাকা যাহা পাইতাম, সবই খরচ করিয়া ফেলিতাম, ভবিষ্যতের জন্য কিছু জমাই নাই। অবশেষে পৈত্রিক জমি বিক্রি করিয়া সরকারের দাবি পূরণ করিলাম,—এম পি এ হওয়ার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলাম।

॥ চোদ্দ ॥

পাক-ভারতের স্বাধীনতা যেমন হঠাৎ একদিন আসে নাই, তাহার পিছনে আছে অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী শত শত, সহস্র সহস্র দেশপ্রেমিকের সংগ্রাম,—আত্মবলিদান, নির্যাতনভোগ; সেই প্রকার জেলের বর্তমান অবস্থাও একদিনে আসে নাই, তাহারও পিছনে আছে সংগ্রাম,—শত শত দেশপ্রেমিকের নির্যাতনভোগ। আমি প্রথম জেলে আসিয়াছি ১৯০৮ সনে, আর এখন জেলে আছি ১৯৬৬ সন। ১৯০৮ সন ও ১৯৬৬ সনের জেলের মধ্যে পার্থক্য অনেক অধিক,—ইহাও ক্রমবিকাশের ফল। বর্তমান পৃথিবীও ক্রমবিকাশের ফল। পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা এবং চিন্তাধারাও হঠাৎ একদিনে এরূপ হয় নাই, ইহাও শত শত বৎসরের ক্রমবিকাশ ও অভিজ্ঞতার ফল। সমাজের আদিম অবস্থায় লোকের সংখ্যা ছিল কম, অভাবও ছিল না, অভাববোধও ছিল না। তাই লোকে অপরাধও করিত না। পরবর্তী যুগে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং

চিন্তাধারার পরিবর্তনের ফলে লোকের অভাবও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আবার কিছু লোকের মনে সমাজবিধি লঙ্ঘনেরও প্রবৃত্তি জাগিল। তখনও জেলের কল্পনা হয় নাই। তখন সমাজবিধি লঙ্ঘনকারীদের সৎ পথে আনার জন্য সাজার ব্যবস্থা ছিল, মৃদু ভর্ৎসনা, ধিক্কার। যখন দেখা গেল প্রকাশ্য তিরস্কার দ্বারা অপরাধীর মনের পরিবর্তন হইতেছে না, তখন ব্যবস্থা হইল শারীরিক শাস্তি, প্রহার। পরবর্তী যুগে যখন প্রমাণ হইল, ইহাও যথেষ্ট নহে, তখন সমাজবিধি লঙ্ঘনকারীদের মনে ত্রাস সঞ্চারের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা হইল অঙ্গচ্ছেদ, প্রস্তর নিক্ষেপ দ্বারা মৃত্যুদণ্ড। পরবর্তী যুগে, সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে জেলের কল্পনা হয়। তখন সমাজবিধি লঙ্ঘনকারীদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে ছিল। অপরে যাহাতে সংক্রামিত না হয়, এজন্য তাহাদিগকে পৃথক করিয়া রাখার ব্যবস্থা হইল,—ইহাই কারাগার বা জেল-খানা। জেলখানারও অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গেল, শুধু অপরাধীকে জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেই তাহার সংশোধন হয় না, তখন ব্যবস্থা হইল কড়া শাসন,—কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, কঠোর পরিশ্রমের কাজ এবং শারীরিক শাস্তি, যাহাতে অপরাধীর মনে ত্রাসের সঞ্চার হয় এবং অপরাধ করার প্রবৃত্তি না জাগে। এই কঠোর ব্যবস্থা শুধু ভারতবর্ষেই ছিল না, পৃথিবীর সকল দেশেই জেলের অবস্থা প্রায় এক-রূপেই ছিল। আমি যখন প্রথম ১৯০৮ সনে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে যাই তখন জেলের অবস্থা প্রায় ঐরূপই ছিল। খাবার ব্যবস্থা ছিল, মোটা চাউলের ভাত, এক ডাল বৃদ্ধ পুঁইডাটাসিদ্ধ তরকারী, মাংসের হাড় বলিয়া চিবান যাইতে পারে এবং খাট্টা বা তেঁতুল গোলা জল। মাছ বা মাংসের কোন ব্যবস্থা ছিল না। জোড়া জোড়া চলা, বে-ফাইলে চলিলে বা কাজ কম হইলে প্রহার। দুইটি কম্বল, শীত-কালে একটা কম্বল অতিরিক্ত পাওয়া যাইত প্রতি ছয় মাসে ২টি হাফ প্যান্ট, একটা হাতকাটা জামা এবং একটা গামছা পাওয়া যাইত। জেলের কয়েদীরা কোন অপরাধ করিলে প্রথমে মেট-পাহারারা ধোলাই (প্রহার) করিয়া হাজির করিবে, পরে অপরাধের গুরুত্ব বুঝিয়া হাতকড়ি, ডাণ্ডা বেড়ি বা বেত দেওয়া হইবে। প্রহার জেলারের হুকুমে হইত, দণ্ড সুপারিন্টে-ণ্ডেন্ট দিতেন। প্রহারের ফলে জেলে বহু লোকের মৃত্যু হইয়াছে, সরকারী রিপোর্ট—হাসপাতালে অসুখে মৃত্যু হইয়াছে। সেন্ট্রাল জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাধারণত শ্বেতাঙ্গ আই এম এস অফিসার হইতেন, জেলার হইতেন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট যখন জেলের ভিতর প্রবেশ করিতেন, তখন মস্তকের উপর প্রকাণ্ড রাজছত্র, সঙ্গে সঙ্গে ছোট একটি সিপাহী, মেট-পাহারার প্রসেশন, যেন কোন মহারাজ আসিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে সরকার-সেলাম-আজবর, ধ্বনি শোনা যাইতেছে। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আসার সময় সকলকে বসিয়া থাকিতে হইবে, সরকার বলিলে উঠিয়া দাঁড়াইবে, সেলাম বলিলে, সেলাম দিতে হইবে, আজবর (এজ ইউ উরেআর) বলিলে বসিতে হইবে। এই সরকার সেলাম জেলারও পান। পূর্বে প্রত্যেক কয়েদীর গলায় লোহার শলার হাঁসুলী থাকিত, তাহার মধ্যে একটি তিন কোণা কাঠ ঝুলিত, কাঠে কয়েদীর নম্বর, সাজার তারিখ এবং মুক্তির তারিখ (Dates of sentence, Date of Release) থাকিত। হাঁসুলী রিবেট করা থাকিত, খোলা যাইত না, মুক্তির পূর্বদিন কামারখানায় খুলিয়া দিত। তখন প্রত্যেক কয়েদীকে একটি লোহার থালা ও একটি লোহার বাটি দিত। থালা বাটি পরিষ্কার রাখিতে হইত। পূর্বে জেল জগৎ-এর খবর কেহ রাখিতেন না, জেলার বা যমরাজই ছিলেন জেল বা যমপুরীর সর্বময় কর্তা।

পরবর্তী যুগে পূর্ব ধারণা বাতিল হইয়াছে, অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে, অত্যাচার করিলে কয়েদীর মনের পরিবর্তন হয় না, কয়েদী তখন মরিয়া (Desparate) হইয়া উঠে। এজন্য পৃথিবীর সর্বত্র পূর্ব নীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে, প্রহার বন্ধ হইয়াছে। অবশ্যই বর্তমান যুগে বে-আইনী প্রহার সব জেলেই কিছু কিছু চলিতেছে। পূর্বে জেলে কোন শ্রেণীবিভাগ ছিল না, সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী। রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত হইয়া যাঁহারা জেলে যাইতেন, তাঁহারাও তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী বলিয়া গণ্য হইতেন। ১৯০৮ সনে শ্রীমহিম চন্দ্র নন্দী, মাটীরপাড়া হাই স্কুলের শিক্ষক, (নরসিংদী—ঢাকা) বিলাতী লবণ ফেলার মামলায় দণ্ডিত হইয়া ঢাকা জেলে ছিলেন। তিনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহাকেও ঘানিতে দেওয়া হইয়াছিল। আমরা সাধারণ কয়েদীর সহিত একত্র ঘানি ঘুরাইয়াছি, একত্রে বাস করিয়াছি, জোড়া জোড়া বসিয়াছি, সরকার সেলাম দিয়াছি, সাধারণ কয়েদীর সঙ্গে আমাদের কোন পার্থক্য ছিল না। তখন জেলে কোন সংবাদপত্র দেওয়া হইত না, বই পড়ারও কোন ব্যবস্থা ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে রাজনৈতিক কারণে শিক্ষিত যুবকের দল জেলে যাইতে আরম্ভ করিলেন, জেল হইতে বাহির হইয়া এই অজ্ঞাত জগতের সংবাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ফলে দেশবাসীর দৃষ্টি এদিকে পড়িল। রাজবন্দীরা জেলের খাদ্য, ব্যবহার এবং সরকার সেলামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু করিলেন। এই সংগ্রাম ১৯০৮।১২ সন হইতে আরম্ভ হয়। রাজবন্দীরা জেলের প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে যাইয়া জেল কর্তৃপক্ষের বহু অত্যাচার নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন, বুটের লাথি, প্রহার, হাতকড়ি, ডাণ্ডা বেড়ি, বেত প্রভৃতি দণ্ড ভোগ করিয়াছেন। সুদীর্ঘকাল নির্জন সেলে বাস করিয়াছেন, সুদীর্ঘদিন জেলে অনশন করিয়াছেন। একদিকে যেমন জেলের ভিতর সংগ্রাম চলিতেছিল, আবার জেলের বাহিরেও আন্দোলন চলিতেছিল। সভা-সমিতি করিয়া প্রতিবাদ জ্ঞাপন, কাউন্সিলে প্রশ্ন করা, সংবাদপত্রে জ্ঞাপন, কাউন্সিলে প্রশ্ন করা, সংবাদপত্রে লেখা, সরকারের সহিত আলাপ-আলোচনা প্রভৃতি নানাভাবে চেষ্টা চলিতেছিল। এই সংগ্রাম ও আন্দোলন ভারতের সর্বত্র চলিতেছিল। অবশেষে সম্ভবত ১৯২৯ সনে ১৩ই সেপ্টেম্বর লাহোর সেন্ট্রাল জেলে যতীন দাসের ৬৪ দিন অনশনের ফলে মৃত্যু হয়। যতীনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিরণ দাস, যতীনের শব পুষ্পশয্যায়, লাহোর হইতে ট্রেনে হাওড়া স্টেশনে লইয়া আসে। পূর্বেই সংবাদ ছিল, হাওড়া স্টেশন লোকে লোকারণ্য, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতাগণ স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে দুই লক্ষ লোকের শোভাযাত্রা হাওড়া স্টেশন হইতে যতীন দাসের শব লইয়া কেওড়াতলা শ্মশানে উপস্থিত হইল। সহস্র সহস্র লোকের অশ্রু বর্ষণের মধ্যে যতীনের শেষ কাজ সম্পন্ন হইল। ইহার পর সমগ্র ভারতে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। রাজবন্দীদের দাবি ছিল, সকলকে এক বিশেষ শ্রেণীভুক্ত করা কিন্তু গভর্নমেণ্ট তাহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন, যাহা আজ পর্যন্ত চলিতেছে।

বৃটিশ ভারতেই কারাসংস্কার শুরু হইয়াছে, পূর্ব ধারণার পরিবর্তন হইয়াছে, জেলের কঠোরতা কমিয়াছে, খাদ্যের উন্নতি হইয়াছে, মারপিট বন্ধ না হইলেও কমিয়াছে। জেলের ভিজিটার বোর্ড, মুক্তি-প্রাপ্ত কয়েদীদের তত্ত্বাবধানের জন্য বোর্ড গঠিত হইয়াছে। এখন যদি ১৯০৮ সনের ঢাকা জেলের জেলার লালগোবিন্দ চৌধুরী ও বড় জমাদার ভগলু সিং আসিয়া উপস্থিত হন, তবে অবাক হইয়া পড়িবেন। বৃটিশ ভারতে ইংরাজ জাতি ছিল বিদেশী, এই দেশের সহিত রক্তের কোন সম্বন্ধ ছিল না, তাঁহারা যাহা কিছু করিয়াছেন, মানবতার জন্য—কর্তব্যবোধে। স্বাধীনতা-লাভের পর অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে, যাহারা কারা প্রাচীরের অভ্যন্তরে বাস করে এবং যাহারা কারাপ্রাচীরের বাহিরে বাস

করে, সকলেই একই দেশের অধিবাসী, একই সমাজদেহের অঙ্গ। কোন্ দেশ কতটা উন্নত, তাহার মাপকাঠি জেলখানা। কয়েদীরা যে অপরাধ করে, সে জন্য দায়ী কে? সে জন্য শুধু তাহারা নিজেরাই দায়ী নয়, সেজন্য দায়ী তাহারা যে সমাজে বাস করে সেই সমাজ এবং সেই গভর্নমেণ্ট। লোকের অপরাধ করার প্রবৃত্তি জন্মে কেন? পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং সুশিক্ষার অভাব। আমার গ্রামে যদি কেহ অপরাধ করে বা কোন সমাজবিরোধী কাজ করে তবে সেজন্য আমিও দায়ী, কারণ আমার গ্রামের উপর আমার একটা সাধারণ কর্তব্য আছে, আমি সেই কর্তব্য পালন করি নাই। গভর্নমেণ্ট দায়ী, সে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি কি? বর্তমান শিক্ষায় মানুষের চরিত্র গঠন হয় কি? প্রাচীন ভারতের শিক্ষাকেন্দ্র ছিল মুনি-ঋষিদের তপোবন। এখানে বিদ্যাদান করা হইত, বিক্রি নহে। যাঁহারা শিক্ষা দিতেন, তাঁহারা ছিলেন মহাপণ্ডিত এবং ত্যাগী পুরুষ। ছাত্ররা ছিল আশ্রমবাসী। তাহারা যে আবহাওয়ায় বাস করিত এবং তাহাদের সম্মুখে যে আদর্শ ছিল, তাহাতে তাহাদের পদস্খলনের সম্ভাবনা ছিল না। আশ্রম-কর্তার আশ্রমের খরচ চালানোর দুশ্চিন্তা ছিল না, গভর্নমেণ্ট এবং জনসাধারণের দানেই আশ্রমের ব্যয় নির্বাহ হইত। আশ্রমবাসীদের অভাবও ছিল খুব কম। ব্রহ্মদেশের শিক্ষাপদ্ধতিও ভারতের অনুরূপেই ছিল। সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা ফুঙ্গি-চঙ্গ-এ হইত। (ফুঙ্গি—সন্ন্যাসী—চঙ্গ—আশ্রম) ব্রহ্মদেশের প্রায় গ্রামে গ্রামেই ফুঙ্গি-চঙ্গ আছে। বিদ্যার্থীরা মস্তক মুণ্ডন করিয়া, গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া ফুঙ্গি-চঙ্গে বাস করিবে, শিক্ষা সমাপন হইলে বাড়ি ফিরিয়া আসিবে। মাতা-পিতার সন্তানের লেখা-পড়ার জন্য কোন চিন্তা নাই, ইহা ধর্মীয় অঙ্গ। অবশ্যই বর্তমানে সকলেই স্কুল কলেজে পড়ে, অবসর মত, ছুটির সময় ৩ দিন, ৫ দিন বা ৭ দিন ব্রহ্মচারী বেশে ফুঙ্গি-চঙ্গে থাকিয়া নিয়ম রক্ষা করে। আশ্রমের সন্ন্যাসী (চঙ্গের ফুঙ্গি) ভোরে স্নান করিয়া বিদ্যার্থীদিগকে লইয়া ভিক্ষায় বাহির হইবেন। তাঁহারা ভিক্ষা চাহিবেন না, মৌনভাবে, সারিবদ্ধ হইয়া, ভিক্ষাপাত্র হাতে রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইবেন। এদিকে প্রত্যেক গৃহকর্ত্রী শেষ রাত্রে উঠিয়া স্নান করিয়া, রান্না করিয়া, খাদ্যদ্রব্য লইয়া রাস্তার পাশে বসিয়া ফুঙ্গি এবং ব্রহ্মচারী-বালকদের জন্য অপেক্ষা করিবেন। তাহারা চলিয়া যাওয়ার সময় গৃহকর্ত্রী প্রত্যেকের ভিক্ষাপাত্রে এক চামচ ভাত এবং একচামচ ডাল বা তরকারী দিবেন। নিজের পুত্র থাকিলেও বেশি দিতে পারিবেন না এবং তাঁহারাও এক চামচের বেশি গ্রহণ করিবেন না। ভিক্ষালব্ধ যাহা পাওয়া যাইবে, তাহাই সারাদিনের খোরাক।

১৯০০ সন, ১৯০১ সনে আমি মাল-দহ জেলার অন্তর্গত কানসাট গ্রামে ছিলাম, সেখানে মহারাজ সূর্যকান্তের একটি বড় কাছারী ছিল, ম্যানেজার ছিলেন জে, আর, হলো সাহেব, আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা কামিনী-মোহন চক্রবর্তী ছিলেন সেই কাছারীর কোষাধ্যক্ষ। আমার দাদা ভাল শিকারী ছিলেন, হলো সাহেব যখন শিকারে যাই-তেন, আমার দাদাকে সঙ্গে লইয়া যাই-তেন, এজন্য মাঝে মাঝে মাংস খাওয়ার সুযোগ ঘটিত। তখন চাউলের মণ ছিল দুই টাকা দই ছিল টাকায় ৩২ সের। আমি পুখুরিয়া মাইনর স্কুলে পড়িতাম, হেডমাস্টার ছিলেন কেফাতুল্লাহ মিঞা। আমরা একদল ছাত্র প্রায় ১০।১২ জন হইবে, প্রত্যহ প্রাতে হেডমাস্টার সাহেবের বাড়িতে যাইয়া পড়াশুনা করিতাম মাদুর বিছান থাকিত, হেডমাস্টার সাহেব মাঝে মাঝে সাংসারিক কাজে উঠিয়া যাইতেন, আবার আসিয়া মাদুরেই বসিতেন এবং আমাদের পড়াশুনার তত্ত্বাবধান করিতেন। এজন্য টাকা দিতে হইত না বা কোন জিনিস দিতে হইত না। ইহার পর আমি রায়পুরা (ঢাকা) হাই স্কুলে ভর্তি হই। রায়পুরার নিকট বড়চর গ্রামে আমাদের একটি কাছারী ছিল, আমার তৃতীয় ভ্রাতা চন্দ্রমোহন চক্রবর্তী সেখানে থাকিতেন, আমাদের আম-কাঁঠালের বাগান ছিল, আমি স্কুল-বোর্ডিং-এ থাকিতাম, বন্ধের সময় বড়চর থাকিতাম। এক বৎসর পর আমি ধলা (ময়মনসিং) হাই স্কুলে ভর্তি হই এবং স্কুল-বোর্ডিং-এ থাকিতাম, তখন

স্বদেশী আন্দোলন শুরু হইয়াছে। আমি ১৯০৬ সনে. সাটীরপাড়া (ঢাকা) হাই স্কুলে ভর্তি হই, স্বদেশী আন্দোলনের নেতা. জমিদার ও ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল ললিতমোহন রায়ের বাড়ি সাটীরপাড়া। তিনি স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন. আমি স্কুল-বোর্ডিং-এ থাকিতাম এবং ললিত-বাবুর প্রিয়পাত্র ছিলাম। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হইয়া ললিতবাবু এবং সাটীরপাড়া স্কুলের ছাত্র, আমার সহপাঠী এবং বন্ধু যদুনাথ দাস ও বিনোদ চক্রবর্তী প্রায় এক বৎসরের উপর ঢাকা জেল-হাজতে ছিলেন, আমি ছিলাম পলাতক আসামী। সেই যুগে আমরা যখন স্কুলে পড়িয়াছি, তখন নকল করিয়া পাশ করার কল্পনা কোন ছাত্রের ছিল না, তখন প্রাইভেট মাস্টার রাখার প্রথাও ছিল না। শিক্ষকগণই আমাদের পড়া বা অঙ্ক শিখাইয়া দিয়াছেন, এজন্য টাকা দিতে হয় নাই। আমরা শিক্ষকদের বেতের প্রহারও খাইয়াছি, প্রহারের মধ্যে স্নেহ-মিশ্রিত থাকিত, এজন্য কাহারও মনে কোন আক্রোশ থাকিত না। আমরা আমাদের শিক্ষকদিগকে কত ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়াছি তাঁহারা আমাদিগকে কত ভালবাসিয়াছেন, তাহাদের বাড়িতে গেলে কত আদর করিয়া চিড়া, মুড়ি, মোয়া খাওয়াইয়াছেন,—এখন সেইদিন কোথায় গেল? ১৯৫৬ সনে, আমি তখন এম, পি, এ, ময়মনসিংহ শহরে গিয়াছি, সিটি স্কুলের শিক্ষক সুকুমার [illegible] আছি, স্কুলের পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। একদিন প্রাতে ৫।৭টি ছাত্র আমার আসিয়াছে, সুকুমার ছিল না, আমি তাহাদিগকে ডাকিয়া ঘরে বসাইয়া তাহাদের সহিত গল্প করিতে লাগিলাম, গল্প বেশ জমিয়াছে। তাহারা সকলেই ফেল করিয়াছে, এখন মাস্টারকে ধরিয়া প্রমোশন চাই। আমি বলিলাম, তোমরা ফেল করিলে কেন? তোমরা নকল কর না? তাহারা বলিল, নকলের ত' রেওয়াজ হইয়া গিয়াছে, সকলেই নকল করে কিন্তু সারা বছর পড়াশুনা করি নাই, নকল করিব কি করিয়া, বই খুলিয়া বাহির করাও কঠিন। আমি বলিলাম, তোমরা প্রমোশনের চেষ্টা না করিয়া এক বছর এই ক্লাশেই থাকিয়া যাও। তাহারা বলিল, আপনি বলেন কি? বাড়িতে এখনও টের পায় নাই, ফেল করিয়াছি জানিতে পারিলে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিবে। আমি বলিলাম, দেশ স্বাধীন হইয়াছে, তোমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক, দেশের ভবিষ্যৎ আশা ভরসা তোমরা, এখন আমাদের প্রয়োজন বড় বড় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার, ডাক্তার, এখন নকল করিয়া পাশ করিয়া কি তোমরা বড় বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক হইতে পারিবে? ছাত্ররা নীরব। যখন শুনিল আমি এম, পি, এ, তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। আমি সুকুমারের ছাত্রদের পরীক্ষার খাতা দেখিয়াছি, হাতের লেখা কি বিশ্রী, বানান ভুলের অন্ত নাই। এইসব নকল করা ছাত্র যখন বি-এ পাশ করিয়া স্কুলের শিক্ষক হইবে, তখন ছাত্রদিগকে কি শিক্ষা দিবে?

১৯৫০ সনের দাঙ্গার পর আমি ঢাকা গিয়া মৌলানা আক্রম খাঁর সহিত দেখা করি। ১৯২১ সনে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে মৌলানা সাহেবের সহিত যে পরিচয় হইয়াছিল তাহার পর আর মৌলানা সাহেবের সহিত দেখা হয় নাই। তখন শহরের যা অবস্থা আমাকে রাস্তায় হত্যা করিয়া ফেলিয়া রাখিলে কিছুই হইত না। তখন আজাদ অফিস ও মৌলানা সাহেবের বাড়ি এতবড় ছিল না। মৌলানা সাহেব একতলা দালানে বাস করিতেন, গেটের দরজা খোলা ছিল. আমি কিছুক্ষণ মৌলানা সাহেবকে ডাকিয়া উত্তর না পাইয়া, ভিতরে প্রবেশ করিলাম। তখন বেলা প্রায় তিনটা। মৌলানা সাহেব বারান্দায় পায়চারি করিতেছিলেন। আমার পরনে ধুতি ছিল। একজন অপরিচিত হিন্দুকে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি রাগতভাবে বলিলেন, বাড়িতে মেয়েছেলে আছে, ভিতর ঢুকিয়াছেন? আমি বলিলাম, "আপনার বাড়ির মধ্যে আমি ঢুকিতে পারি।" বুদ্ধের রাগ অর্ধেক কমিয়া গেল। তিনি বলিলেন, পরিচয়? আমি আলিপুর জেলের পরিচয় দিলাম, তিনি আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং পাশে চেয়ারে বসাইলেন। আমি বলিলাম, মৌলানা সাহেব, দেশ স্বাধীন হইয়াছে। এখন জাতির মধ্যে যদি সাম্প্রদায়িকতা, দুর্নীতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা থাকে, তবে জাতির ভবিষ্যৎ কি? মৌলানা সাহেব বলিলেন, পূর্বে রাজা-বাদশারা ছিল চরিত্রহীন, স্বার্থপর, জাতকে গড়িয়া তুলিয়াছে, সাধু-সন্ন্যাসী ফকির। আমি সময় সময় ভাবি, সব ছাড়িয়া গাছতলায় বসি কিন্তু আমি ত' সব ছাড়িতে পারিতেছি না, এজন্য কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতেছি না। যাহা কিছু করার আপনারাই করিবেন। তিনি ইহাও বলিলেন, ইসলামিক রাষ্ট্রে হিন্দুরা বাস করিতে পারিল না, দুনিয়ার সম্মুখে ইসলামের এই কলঙ্ক হইতে দিব না। যখনই কোন গণ্ডগোলের আভাস পাইবেন, আমাকে সংবাদ দিবেন, আমি গণ্ডগোল বন্ধ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, প্রয়োজন হইলে আমি নিজে সেইখানে যাইব।

স্বাধীনতা লাভের পর জাতি গঠনের বা জাতীয় চরিত্র গঠনের কোন চেষ্টা হয় নাই। আমাদের ছেলেরা শৈশব হইতে দেখিতে পায়, দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ না করিতে পারিলে জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় না, ঘুষ না দিলে কোন কাজ হয় না, দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ না করিলে প্রচুর অর্থ উপার্জন হয় না, যাহার প্রচুর অর্থ আছে তিনিই বড়লোক, তিনিই দেশের মধ্যে গণ্যমান্য নেতা, তিনিই সুখী। যাহারা সৎলোক, সাধারণত তাহারা গরীব, কেহ তাহাদিগকে গ্রাহ্য করে না।

বর্তমানে প্রয়োজন সমাজ-সংস্কার। বর্তমান দূষিত আবহাওয়ার পরিবর্তন করিয়া নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করা। ইহার মূলে হইবে দেশপ্রেম। দেশপ্রেম থাকিলে প্রত্যেকেই মনে করিবে আমি জাতির সেবা করিতেছি, তখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্তব্য করিয়া যাইবে, তখন সরকারী কর্মচারীরা ঘুষ লইতে সাহসী হইবে না, লজ্জা বোধ করিবে। তখন ব্যবসায়ীরা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মিশিত করিবে না, মনে করিবে আমার জাতি দুর্বল হইয়া পড়িবে। যাঁহারা সমাজ সংস্কার করিবেন, ভবিষ্যৎ জাতি গড়িয়া তুলিবেন, তাঁহাদের প্রথমে আদর্শ স্থানীয় হইতে হইবে, নতুবা কেহ তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিবে না। অবশ্যই বর্তমান অবস্থার মধ্যেও কারা-সংস্কার চলিতে পারে এবং সংস্কারের প্রয়োজনও আছে, তবে জেলের কয়েদীদের চরিত্র সংশোধনের পূর্বে, জেল কর্মচারীদের এবং দেশের নেতাদের চরিত্র সংশোধন প্রয়োজন।

[ক্রমশঃ]

আমাদের বর্তমান প্রশাসনের সর্বস্তর যে কোন্ শোচনীয় অবস্থায় এসে পড়েছে এবং প্রশাসকদের হৃদয়হীনতা দেশবাসীকে আজ কোথায় নিয়ে গেছে তার একটি সামান্য উদাহরণ দিয়েই আমরা অন্তরের বঙ্গদর্শন শুরু করছি। উদাহরণটি ছোট, কলকাতার একটি বৃহৎ হাসপাতালের বহু ও বিচিত্র কর্মকাণ্ডের একটি ছোট নিদর্শন। কিন্তু হাঁড়ির একটি ভাত টিপলেই যেমন সমস্ত ভাত সেদ্ধ হয়েছে কি না বোঝা যায়, সেই রকম এই উদাহরণটিই প্রমাণ করবে আমাদের প্রশাসন-ব্যবস্থায় জনগণের আস্থা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, প্রমাণ করবে হৃদয়হীনতার সর্বনিম্ন ধাপে যে জাতির প্রশাসকবর্গ পৌঁছে গেছেন, সে জাতির কোন ভবিষ্যৎ থাকতে পারে না। নীলরতন সরকার হাসপাতালের যে ঘটনাটি এখানে বিবৃত করা হচ্ছে এটিকে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে গ্রহণ করলে চলবে না। পশ্চিমবঙ্গের সকল বিভাগেই এই একই অবস্থা।

এখানে আমরা একটি পত্রের ফটোস্টাট কপি প্রকাশ করছি। পত্রটি নীলরতন সরকার মেডিকাল কলেজ হাসপাতাল থেকে প্রেরিত, পিছনে হাসপাতালের স্ট্যাম্পের মধ্যে লেখা আছে বি পি চ্যাটার্জী, এম এস (ক্যাল) এফ আর সি এস (ইংল); প্রফেসর এণ্ড ডিরেক্টর, ডিপার্টমেন্ট অফ সার্জারি: এন আর এস মেডিকাল কলেজ হসপিটাল; ক্যালকাটা-১৪। অর্থাৎ বিভাগটি তাঁর। পত্রের আরও একটি সাব হেডিং আছে: ডিপার্টমেন্ট অফ থোরাসিস সার্জারি। ওপরে আছে মেমো নং টি এইচ এস, ৫২২০।৬৮ অফ ২১-১১-৬৮। নং এন এইচ।১৩২২৪, এইচ ২১-১১-৬৮।

পত্রটির প্রেরক ডাঃ মনোজ ভট্টাচার্য। পত্রটি লেখা হয়েছে চুঁচুড়া আখনবাজারের সুকুর আলি মণ্ডলকে। বিষয়বস্তু: আপনি গত ৩১-১০-৬১ তারিখে হাসপাতালে শরীর পরীক্ষা করিয়ে গিয়েছিলেন। আপনাকে আবার আসতে বলা হচ্ছে উচ্চতা ও ওজন পরীক্ষার জন্য। কিন্তু শ্রীসুকুর আলি মণ্ডল এই সহৃদয় আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেন নি। কেন না আজ থেকে তিন বছর আগে তাঁর এন্তেকাল হয়েছে এবং তাঁকে যদি আদৌ পরীক্ষা করতে হয় তা হলে ডাক্তার সাহেবকে আসতে হবে হুগলী স্টেশনের কাছে গ্র্যাণ্ডট্রাংক রোডের পাশের কবরখানা মাঠে, যেখানকার মাটির তলায় তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন।

চিঠিটা দেখে প্রথমে খুবই আনন্দ হল। সত্যিই আমাদের দেশ চিকিৎসার ব্যাপারে কতই না এগিয়ে গেছে। সাত বছর আগে যে রোগী হাসপাতালে নিজেকে দেখিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি হাসপাতালকে ভুললেও হাসপাতাল তাঁকে ভোলে নি। সাত বছর পরে তাঁকে দেখে চিঠি দিয়েছে। কিন্তু এ [illegible] মায়া বা মতিভ্রম নিশ্চয়ই বাস্তবভিত্তিক নয়, কেন না পশ্চিমবঙ্গে হাসপাতালগুলি আজও মৃত্যুর ফাঁদ বলেই পরিচিত।

বুঝতে অসুবিধা নেই এই চিঠিখানি দায়িত্বজ্ঞানহীনতার এক শোচনীয়তম নিদর্শন। ওই রোগী সংক্রান্ত যে সকল তথ্য আমরা পেয়েছি তাতে এটুকুই জানা গেছে যে আজ থেকে সাত বছর আগে ওই ভদ্রলোক চিকিৎসার জন্য নীলরতন সরকার হাসপাতালে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোন চিকিৎসাই পান নি। আজ থেকে বছর তিনেক আগে [illegible] যে ডাক্তারের দ্বারা [illegible] তিনিই এ খবর দিয়েছেন। সাত বছর পরে অকস্মাৎ তাঁকে এই চিঠি দেওয়া হয়েছে, তাঁর শরীর ওজন ও মাপ নেবার জন্য নিমন্ত্রণ পরিহাসই বটে।

কিন্তু ব্যাপারটা শুধু একটি বিশেষ হাসপাতালের একটি বিশেষ কেসের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। এই কেসটা ধরা পড়ে গেছে এই যা। চিকিৎসার নামে কি ধরণের যে প্রহসন এদেশে চলে তা ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন। দু একজন চিকিৎসকের কথা বাদ দিলেও সার্বিকভাবে চিকিৎসকদের জগৎ যে অধঃপতিত, কায়েমী স্বার্থের কবলিত, এ-কথাটা জোর করেই বলা যায়। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন তথ্য প্রতিবাদ করতে পারেন, কিন্তু মিথ্যাকে কখনো সত্য বলে

চালানো যায় না। হাসপাতাল এখানে রোগীর চিকিৎসার জন্য নয়, চিকিৎসার ক্ষমতাধারীদের একটা ভালো উপার্জনের ক্ষেত্র। হাসপাতালে ভর্তি হবার অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু সুযোগ অনেকেরই নেই, কেন না সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে প্রাইভেটলি মোটা টাকা দক্ষিণা দিয়ে না দেখালে ভর্তি হবার কোন উপায়ই নেই। কায়েমী স্বার্থের প্রহরীরা দরজায় পাহারা দিচ্ছে। তা ছাড়া আছে নার্সিং হোম, সেগুলিতে অ্যাটেন্ড করলে মোটা টাকা পাওয়া যায়। কাজেই হাসপাতাল রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্র নয়, চিকিৎসকদের উপার্জনের একটা বড় মাধ্যম। ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন চিকিৎসক হয়ত দায়িত্বশীল, তাঁদের সংখ্যা আঙুলে গোণা যায়।

মনে আছে যুক্তফ্রন্ট সরকার সরকারী হাসপাতালের ডাক্তারদের বাধ্যতামূলক আটঘণ্টা কাজ করার নোটিশ দিয়েছিলেন এবং তাতেই কায়েমী স্বার্থ ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আমরা সেই নীতি সমর্থন করেছিলাম বলে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে একটা প্রতিবাদপত্র এসেছিল, যা আমরা প্রকাশ করেছিলাম। তাতে বলা হয়েছিল যে, সরকারের এই আদেশটা হাস্যকর, কেন না ধরা যাক কোন ডাক্তার অপারেশনের ঘরে কাজ করছেন, সেই অবস্থায় তাঁর আটঘণ্টা কার্যকাল পূর্ণ হয়ে গেল, তখন যদি তিনি বেরিয়ে যান তা হলে কি তিনি বে-আইনী কর্ম করবেন? একজন দায়িত্বশীল পদস্থ ব্যক্তির এই চিঠি পড়ে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। কেন না আমরা যতদূর জানি, যে কোন সরকারী চাকুরেই তা ডাক্তারই হোন, পুলিশই হোন, বা অধ্যাপকই হোন বা চাপরাশিই হোন চব্বিশঘণ্টাই তাঁর কর্তব্যকাল। এমন কি যথাস্থানে অনুমতি না নিয়ে নিজের এলাকারও বাইরে যাওয়া যায় না। তবে সর্বদা এই নীতি প্রয়োগের প্রয়োজন থাকে না এইমাত্র।

শুধু তাই নয় চিকিৎসাজগতের এই কায়েমী স্বার্থ যে কত দূর শক্তিশালী তা দেখার জন্য বেশি দূর যেতে হবে না। কলকাতার বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কোন কোন চিকিৎসক যুগ যুগ ধরেই স্বস্থানে রয়ে গেছেন, তাঁদের বদলি হয় না, সরানো যায় না, কেন না তাঁরা নাকি অপরিহার্য, ইনডিসপেন্সিবল। এই কায়েমী স্বার্থের শোষণচক্র ক্ষেত্র-বিশেষে স্বজনকেও রেহাই দেয় না। এ কথা কে না জানেন চিকিৎসাশাস্ত্রের সর্বোচ্চ ডিগ্রী এম-ডি পাওয়াটা জনৈক ব্যক্তির মর্জির ওপর নির্ভরশীল, অধীত বিদ্যার ওপর নয়? এ কথা কে না জানেন ওই ব্যক্তিটির পুত্রের কোচিং ক্লাসে ভর্তি না হলে এম-ডি ডিগ্রি পাওয়া যায় না? এ কথা কে না জানেন সেই ব্যক্তিটি চিকিৎসা-শিক্ষাজগতের হর্তাকর্তাবিধাতা এবং পকেটের মোটা পয়সা খরচ করে তাঁকে খুশি না করতে পারলে স্বয়ং ধন্বন্তরিও পরীক্ষায় ফেল করবেন? কেন মেডিক্যাল কলেজ ছাড়া আর কোথাও এম-ডি পরীক্ষা হয় না? যদিও কলকাতায় আরও তিনটি কলেজে এম-ডি পরীক্ষা গ্রহণের সকল ইকুইপমেণ্টসই বর্তমান। সকল কথাই এখানে বলা সম্ভব নয়, বারান্তরে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করব।

POST CARD
To

উপরি-লিখিত পত্রখানির ফটোস্টাট কপি

অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে, চিকিৎসা বিভাগ ও স্বাস্থ্যদপ্তর সম্পর্কেই বঙ্গদর্শনে একটু বেশি আগ্রহ প্রদর্শন করা হয়। তার কারণ আর কিছুই নয়, এটি এমন একটি বিষয়, যার সঙ্গে বৃহত্তর জনজীবন প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। শুধু কলকাতা শহরেই নয়, পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই হাসপাতালগুলি কায়েমী স্বার্থের পীঠস্থান। আমরা সেখানকার অনাচার ও দুর্নীতির বহু উদাহরণ ইতিপূর্বে বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করেছি। প্রাক্তন স্বাস্থ্য-অধিকর্তার আমলে অবশ্য এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয় নি, তবে বর্তমান স্বাস্থ্য-অধিকর্তা, সীমিত ক্ষেত্রে হলেও, কোন কোন অন্যায়ের প্রতিকার করছেন, খোদ স্বাস্থ্যদপ্তরের মধ্যেই একটি ঘুঘুর বাসা রয়েছে যেটাকে ভেঙে দেওয়া এই মুহূর্তেই প্রয়োজন।

আমরা যে উদাহরণটি এখানে দিয়েছি তা চিকিৎসাজগৎ সম্পর্কিত, কিন্তু এই জগতের বাইরেও ঠিক একই অবস্থা বিরাজ করছে, এবং সর্বত্রই এই সুকুর আলিনা এইরকম অবস্থার মধ্য দিয়েই অবলুপ্ত হচ্ছে। নীলরতন সরকার হাসপাতালের প্রশাসনের সঙ্গে রাইটার্স বিল্ডিংসের প্রশাসন ব্যবস্থার বাহ্যিক কিছু কিছু পার্থক্য অবশ্য আছে, কিন্তু গুণগত কোন পার্থক্যই নেই। দেশের সমগ্র প্রশাসনই এই অপদার্থতার স্তরে নেমে গেছে, সকল মূল্যবোধ, মানবিকতা, হৃদয়, কর্তব্যনিষ্ঠা সমস্তই অন্তর্হিত হয়েছে।
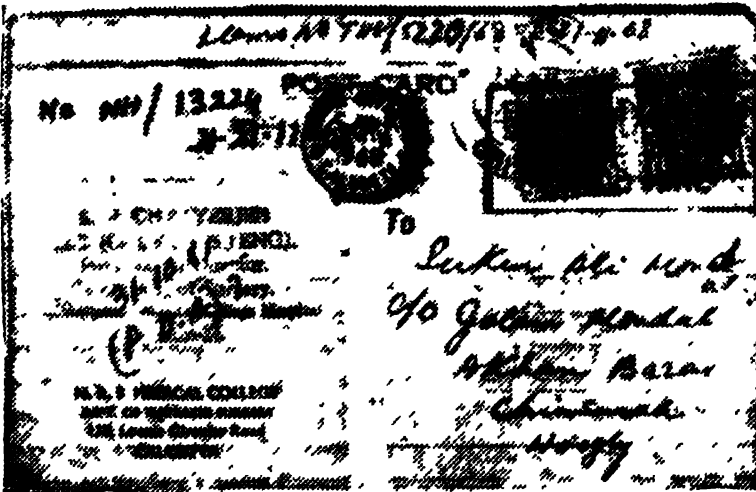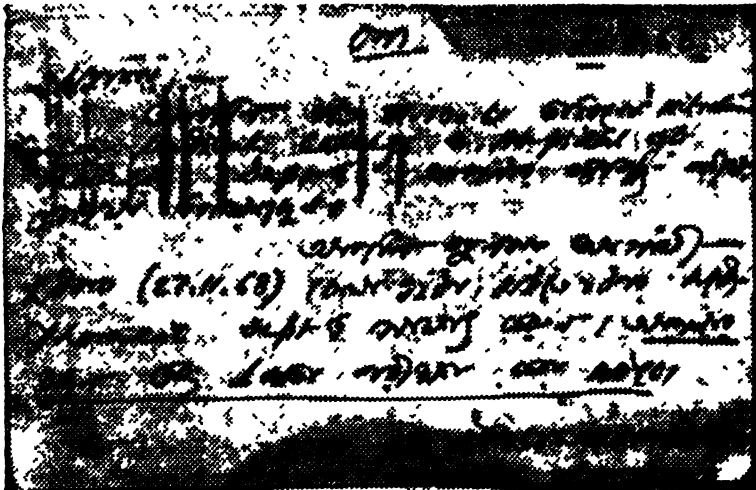
উত্তরবঙ্গ

উত্তরবঙ্গে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে টাকা বরাদ্দ করার প্রসঙ্গটি কি শেষ পর্যন্ত ধামাচাপা পড়বে? এই সন্দেহ অনেকের মনেই দেখা দিয়েছে, কেন না কেন্দ্র এই ব্যাপারটি নিয়ে অত্যন্ত গড়িমসি করছে। ত্রাণ-খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দ করার জন্য কেন্দ্রের স্টাডি টীম উত্তরবঙ্গে এলেন অস্বাভাবিক বিলম্ব করে। রিপোর্ট দিতেও অস্বাভাবিক বিলম্ব হল এবং উত্তরবঙ্গের জন্য এ পর্যন্ত কেন্দ্রের হাত দিয়ে একটি পয়সাও গলল না। অথচ উড়িষ্যায় বন্যা হয়েছে উত্তরবঙ্গের বন্যার পরে। সেখানে স্টাডি টীম দ্রুত এল, সাতদিনের মধ্যেই রিপোর্ট দেওয়া হল এবং উড়িষ্যা সরকার যে পরিমাণ অর্থ চেয়েছিলেন স্টাডি টীম তার চেয়েও দেড় কোটি টাকা বেশি দেবার সুপারিশ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে সবই কি ভিন্ন পথ?

গত ২৪শে নভেম্বর জলপাইগুড়িতে যুক্তফ্রন্টের উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে উত্তরবঙ্গের বন্যাত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যাপারে সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে এবং পুনর্বাসনের দাবিতে ধাপে ধাপে দীর্ঘ এবং সুষ্ঠু আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উত্তর বাংলার বন্যাবিধ্বস্ত পাঁচটি জেলার প্রায় আড়াই হাজার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে আগামী ২০শে ডিসেম্বর "সারা উত্তর বাংলা বন্ধের" প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে নানা টানা-পোড়েনের ফলে জলপাইগুড়ির ব্যবসায়ী-দের মধ্যে গভীর হতাশা দেখা দিয়েছে। এই অব্যবস্থার প্রতিবাদে জলপাইগুড়ির ব্যবসায়ীসমাজ গত ২৫শে নভেম্বর একদিনের জন্য প্রতীক ধর্মঘট পালন করেছেন। এখনো পর্যন্ত একজন ব্যবসায়ীও ঋণ পান নি। সব দেখে-শুনে মনে হয় জলপাইগুড়িকে সত্যই ধামাচাপা দেওয়া হল। প্রধানমন্ত্রী ও উপ-প্রধানমন্ত্রী জোর গলায় বলে গেছলেন বন্যার্তদের জন্য টাকার কোন অভাব হবে না। কিন্তু সেগুলি সস্তা বুলি মাত্র। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার কোন পক্ষই জলপাইগুড়ির ব্যাপারে আন্তরিক নন। এই কথাটার এত বেশি প্রমাণ পাওয়া গেছে যে তা আর বিশদ করে বলার প্রয়োজন নেই।

পুনরায় [illegible]

বোধ হয় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পশ্চিম-বঙ্গে বিদ্রোহ না করিয়ে কেন্দ্র ছাড়বেন না। কেন্দ্র এবং কেন্দ্রেরই দোসর পরি-কল্পনা কমিশন সাফ বলে দিয়েছেন যে, রাজ্যের চতুর্থ যোজনার জন্য তাঁরা দুশো কোটি থেকে আড়াইশো কোটি টাকার বেশি দিতে পারবেন না। এবং দৃশ্যতই এই টাকাটার পরিমাণ এত নগণ্য যে, এর দ্বারা কোন গঠনমূলক কাজে হাত দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ আরও পাঁচ বছর পশ্চিমবঙ্গকে ধাপে ধাপে অধিকতর অবনতির পথে নামিয়ে দেবার সিদ্ধান্তই করা হল শেষ পর্যন্ত।

কেন্দ্র যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে একেবারেই হাত গুটিয়ে নিতে চলেছেন তার পরিচয় গত এক বছরে পাওয়া গেছে। রাজ্য সরকার পূর্বে ৫৮৪ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। পাঠকদের হয়ত স্মরণ আছে যে, এই ৫৮৪ কোটি টাকার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল অনেক কাটছাঁটের পর, যদিও পশ্চিমবঙ্গ আশা করেছিল আরও কিছু পাওয়া যাবে। অন্য কোন কোন রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় দাক্ষিণ্যের বহর দেখে এই ধারণা অসংগত ছিল না। কিন্তু কেন্দ্র তখনই সাফ কথা বলে দিয়েছিলেন যে, বেশি টাকা দেওয়া হবে না। ফলে বিভিন্ন বিষয়ে কাটছাঁট করে ৫৮৪ কোটি টাকার পরিকল্পনা দাঁড় করানো হয়েছিল, কথা ছিল রাজ্য সরকার ৭৫ কোটি টাকা তুলবে, কেন না তার চেয়ে বেশি তোলা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অবস্থায় সম্ভব নয়।

কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতই সংবাদ এল যে ওই ৫৮৪ কোটি টাকার মায়া ত্যাগ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের উন্নতি নিয়ে কেন্দ্রের মাথাব্যথা নেই এবং কেন্দ্র দু'শো থেকে আড়াইশো কোটির বেশি দেবেন না। ফলে বাধ্য হয়ে রাজ্যের চতুর্থ খসড়া যোজনা অনেক ছেঁটেকেটে ৪২০ কোটি টাকায় দাঁড় করানো হল। বলা বাহুল্য এতে কোন কাজই হবে না, সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের ভরণপোষণের ব্যয় করতেই এই টাকাটা খরচ হয়ে যাবে। কোন নতুন উন্নয়ন পরিকল্পনায় হাত দেওয়া যাবে না, নতুন কর্মসংস্থানের কোন আশা নেই। তদুপরি কেন্দ্র দাবি করছে যে, ওই ৪২০ কোটি টাকার পরি-কল্পনার (ঈশ্বর জানেন শেষ পর্যন্ত তা কতোয় দাঁড়াবে) অন্তত একশো কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গকে নিজের চেষ্টায় কর বসিয়ে তুলতে হবে। তা যে অসম্ভব সে কথা রাজ্যপাল ধরমবীরও স্বীকার করেছেন।

রাইটার্স বিল্ডিংসের বর্তমান ভাগ্য বিধাতারা পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রের এই আচরণে ক্ষুব্ধ, বিস্মিত ও বেদনাহত হয়েছেন। কিন্তু তার চেয়ে বেশি কিছু করার ক্ষমতা তাঁদের নেই। দলীয় শাসন থাকলে হয়ত কিছুটা সোরগোল হত। কংগ্রেস শাসনে পর পর তিনটি পরি-কল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ প্রায় এইভাবেই বঞ্চিত হয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রের কাছে এই নিয়ে কোন জোরাল প্রতিবাদ করা হয় নি। সে সাহস পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস নেতাদের ছিল না। একমাত্র ডাঃ রায়ই ছিলেন কিছুটা ব্যতিক্রম, তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে মাঝে মাঝে কেন্দ্রকে নত হতে হয়েছে এইমাত্র। সীমিত আর্থিক অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের যেটুকু হয়েছে যেমন দুর্গা-পুর, সল্ট লেক, রাষ্ট্রীয় পরিবহন, কল্যাণী ইত্যাদি, তার জন্য একমাত্র কৃতিত্ব ডাঃ রায়েরই এবং তাঁর মৃত্যুর পর আর কিছু গড়া হয় নি, বরং গড়া জিনিস ভাঙা হয়েছে, যেমন রাষ্ট্রীয় পরিবহন। যুক্ত-ফ্রন্ট সরকার গদিতে থাকলে জোরালো প্রতিবাদ অবশ্যই হত, তাতে কিন্তু কেন্দ্রের বরফ গলত না। বরং সারা ভারতের বৃহৎ সংবাদপত্রগুলিতে সাড়ম্বরে প্রচার করা হত যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার কিছু করতে না পেরে কেন্দ্রকে দোষারোপ করছে। এখন যা করা হচ্ছে কেরলকে নিয়ে, কিন্তু নাম্বুদ্রিপাদ কেন যে প্রতিবাদ করছেন তা বুঝতে কোন

অসুবিধাই হবে না, যদি আমরা পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বঞ্চনার ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি খুলে দেখি।

হাওড়া গার্লস কলেজ

হাওড়া গার্লস কলেজে একটি নারকীয় কান্ডকারখানা বেশ কয়েক বছর ধরেই চলছিল, সম্প্রতি তার কোন কোন অংশ ফেটে বেরিয়ে গেছে। পরিণামে কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, ছাত্রীদের পড়াশোনা শিকেয় উঠেছে, এবং যেভাবে কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তাতে অনেকেরই মনে নানা প্রশ্ন জেগেছে। সমগ্র বিষয়টাই একটি জটিল রহস্যের আবরণে মুড়ে রাখা হয়েছে এবং সংবাদপত্রে পরস্পরবিরোধী সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। অধ্যক্ষ ও গভর্নিং বডির কোন কোন সদস্যের নামে রাজনীতির সংগে সংস্রব থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে, এবং এমনও কথা বলা হচ্ছে যে, নিছক রাজনৈতিক প্রয়োজনে নাকি কতিপয় ছাত্রীকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দিয়ে জোর করে কলেজ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। জনৈকা ছাত্রী শ্রীমতী তাপসী মৈত্র কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করেছিলেন। কাল বিচারপতি বি সি মিত্র ওই কলেজের অধ্যক্ষ ও গভর্নিং বডির বিরুদ্ধে রুল জারী করেছেন। এই রুলে বিচারপতি ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ ধারা অনুযায়ী শ্রীমতী মৈত্রের বিরুদ্ধে জারী ট্রান্সফার সার্টিফিকেট কেন বাতিল করা হবে না তার কারণ দর্শাতে নির্দেশ দিয়েছেন।
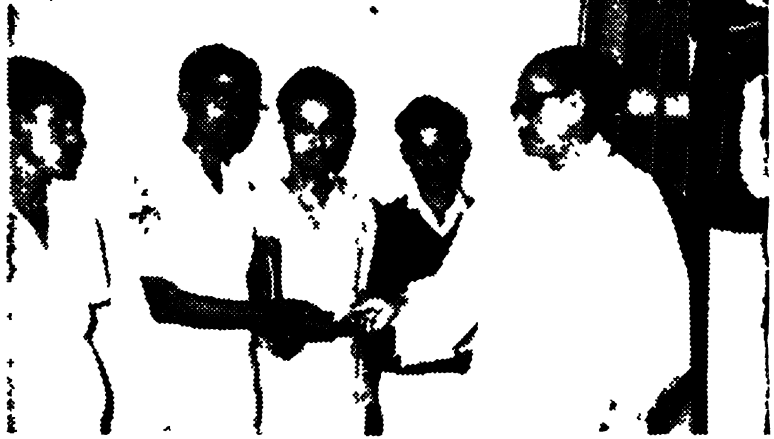
সাপ্তাহিক বসুমতী উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির তহবিলে সাহায্য দান করছেন : বাঁদিক থেকে (১) বেহালার কিশোর ভারতী-এর শ্রীসুভাষ সরকার ও শ্রীঅশোক ঘোষ (২) 'ডে স্টুডেন্টস হোম'-এর কর্মিগণ (৩) পলতা শ্রীপল্লীর 'প্রতিরূপ'-এর সভ্যবৃন্দ।

শিশু উৎসবে বালসেবিকা

পশ্চিমবঙ্গ শিশু কল্যাণ পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত শিশু উৎসবে এবার ৪২ জন বালসেবিকা অভিজ্ঞান পত্র গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি হয় নীলরতন সরকার হলে। অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ করেন শ্রীমতী রাধারাণী দেবী। এই বালসেবিকা শিক্ষণ প্রকল্প রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত। ১৯৬৩ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে মোট ২০২ জন প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছেন। দন্ডকারণ্য, নৈনীতাল বক্সদুয়ার ক্যাম্প ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এই সব শিক্ষিকারা প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশুসদন, শিশু কল্যাণ কেন্দ্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন।

(২৯।১১।৬৮)

অভিজ্ঞানপত্র সহ বালসেবিকারা

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

জেলখানায়, পুলিশফাঁড়ী ও গোয়েন্দা বাহিনীর উপর সাম্প্রতিক হামলার পর দার্জিলিং জেলায় এসে দুইজন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম অনেকগুলি প্রশ্ন নিয়ে। প্রথমজন হলেন জেলার জনৈক পদস্থ পুলিশ অফিসার, যিনি নকশালবাড়ী আন্দোলনের শুরু থেকে শ্রীকানু সান্যালের গ্রেপ্তার পর্যন্ত সর্বসময় পুলিশ-বাহিনীকে পরিচালনা করেছেন আর অপরজন হলেন নকশালবাড়ী আন্দোলনের তাত্ত্বিক নেতা শ্রীচারু মজুমদার। প্রথমজন বললেন—নকশালবাড়ীতে আর নকশালপন্থী নেই, তারা স্থান নিয়েছেন কলকাতার একটি থিয়েটার মঞ্চ নাটকের চরিত্রে আর দেওয়ালের কিছু পোস্টারে। অপরজন বললেন নকশালপন্থীরা আজ আর নকশালবাড়ীর ভৌগোলিক সীমার মধ্যে নেই, তাঁরা আজ ছড়িয়ে পড়েছেন বাংলা বিহার আসাম থেকে সুদূর কেরল, মহীশূরের গ্রাম পর্যন্ত। শ্রীচারু মজুমদার তাঁর নিজের বাড়িতে নিজের ঘরে ঠিক সেই স্থানে বসেছিলেন যেখানে কয়েক মাস আগেও তাঁকে একবার দেখে গিয়ে আলাপ করেছিলাম। শ্রীমজুমদার আমার একের পর এক প্রশ্নের জবাব দিলেন অতি সহজ ও সরলভাবে শুধু একটি প্রশ্নের জবাব দিতে একটু সময় নিয়েছিলেন। সেই প্রশ্নটা ছিল শ্রীকানু সান্যাল ধরা পড়ার আগে 'দেশব্রতী'তে ৭০ বড় একটা নিবন্ধ লিখলেন কেন? আর লিখলেনই যদি তবে সেই লেখায় বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী বললেন কেন আর শ্রীসান্যাল বললেনই যদি, আপনারা সেটা ছাপলেন কেন?

জবাবের সুরুতে বললেন—কানুর ও লেখাটা আমিই তো প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলাম। প্রশ্ন করলাম—তাহলে কি সংবাদপত্রে প্রচার করে, বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিপ্লব হবে, শত্রুকে বিপ্লবের সব কথা জানিয়ে বিপ্লব হবে? এইবার শ্রীমজুমদার একটু সময় নিয়ে চেয়ারম্যান মাও-এর একটি বক্তব্য উল্লেখ করে জবাব দিলেন যে, মাও মনে করতেন শত্রুরা যা জানুক না কেন, তাতে বিপ্লবের কিছু আসে যায় না।

কেরলের দুটি থানা আক্রমণের ঘটনা উল্লেখ করে একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমজুমদার বললেন—কেরলে যারা থানা আক্রমণ করেছে, তারা নকশালপন্থী কি না তাতে তাঁর সন্দেহ আছে। কারণ এইভাবে থানা আক্রমণ করা আমাদের লক্ষ্য বা পরিকল্পনা নয়—আমাদের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা হল কৃষি বিপ্লব। তিনি বললেন—এর পিছনে সম্ভবত একটা বিশেষ এজেন্সী আছে, এদের উদ্দেশ্য এমন হতে পারে যাতে কেন্দ্র থেকে কেরলের মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়, এর পিছনে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদও থাকতে পারে এবং তিনিও হয়তো শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের সঙ্গে আলোচনা করেই এটা করেছেন। শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ আজ এমন অবস্থায় এসেছেন যে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। আজ কেন্দ্র যদি কোনক্রমে কেরল মন্ত্রিসভা বাতিল করে তবে শ্রীনাম্বুদ্রিপাদের সম্মান কিছুটা রক্ষা পাবে।

তাঁর এই ধারণার ব্যাখ্যা করে বললেন যে, কয়েক শত লোক প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা করে পর পর দুটো থানা আক্রমণ করলো অথচ পুলিশ এই পরিকল্পনার কথা আগে জানতে পারলো না এটা কিভাবে সম্ভব? দু পাঁচজনের একটা কাজ হয় তবে সেটা হয়ত গোপন থাকতে পারে, কিন্তু যেখানে তিনশো লোক অংশ গ্রহণ করছে সেই পরিকল্পনা গোপনে হতে পারে না। আর থানা আক্রমণের পরেও কিন্তু ঠিকমত সবাই ধরা পড়লো না অথচ। শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ ঘটনার অনেক পরেও স্পষ্ট করে বলছেন না কারা এই কাজ করেছে কি উদ্দেশ্যে করেছে, বা কারা কারা এই কাজের নেপথ্যে আছে বা ইন্ধন জুগিয়েছে। আবার এমন হতে পারে যে, সমস্ত কাজটাই করেছে মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট সদস্যরা। তাদের দুটো উদ্দেশ্য হতে পারে—এক হল নিজেদের প্রমাণ করা যে, তারাও বিপ্লবী তারাও বিপ্লবী কাজ করছে, অপরটি হল এই জাতীয় কাজ করলে তাদের নেতা শ্রীনাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভা পরিচালনার দায় থেকে রেহাই পাবেন।

এবার প্রশ্ন করলাম—নকশালবাড়ী আন্দোলনের ব্যক্তিদের মামলা ডিফেন্ড করা হবে কি না। শ্রীমজুমদার তাঁর নিজের মামলার এক অতীত প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বক্তব্য শুরু করলেন। তিনি বললেন—তাঁকে যখন পুলিশ গ্রেপ্তার করে, তখন তিনি তার বিরুদ্ধের অভিযোগ শুনে পুলিশকে বলেছিলেন, আরো তিনটি অভিযোগ লিখে নিতে। সেটা হল—এক : চেয়ারম্যান মাও হলেন বিশ্বের সবচেয়ে বড় নেতা, দুই : চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব হল অক্টোবর বিপ্লবের চেয়ে বড় বিপ্লব, তিন : চীন ভারতকে আক্রমণ করে নি, ভারতই চীনকে আক্রমণ করেছিল। তার পর অত্যধিক দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন—কানুদের মামলায় কোন উকিল নিয়োগ করা হবে না, কোন আত্মপক্ষ সমর্থন করা হবে না, এমন কি কোন অভিযোগ অস্বীকারের চেষ্টাও হবে না। বরং বিপ্লবীরা যে কাজ করছে সেই কথা জোর গলায় স্বীকার করবে এবং বলবে। এইভাবে বিচারে যদি মৃত্যুদণ্ড হয়, তাতেও ক্ষতি নেই—কারণ মৃত্যু শেষ কথা নয়, মৃত্যুই বড় নয়—বড় হল আদর্শ। কথা শেষ করে একটু থেমে বললেন—তবে কি জানেন এমন দিন আসছে যে এদের বেশিদিন জেলে রাখা যাবে না, দিনের পরিবর্তনে এরা জেল থেকে বেরিয়ে আসবে।

কথা শেষ করলেন মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে। তিনি বললেন মার্কসবাদী কম্যুনিস্টরা চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েট আক্রমণ সমর্থন করেছে। চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েট আক্রমণ যদি সমর্থন করা হয়, তবে ভিয়েৎনামে মার্কিন আক্রমণ সমর্থন করা যেতে পারে। চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েট সৈন্যের প্রবেশাধিকার সমর্থন করলে ভিয়েৎনামে মার্কিন সৈন্যের অবস্থান অন্যায় হতে পারে না। ভিয়েৎনামে তো মার্কিন সৈন্য, যে কেউ হোক একজনের আমন্ত্রণে গেছে কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়ায় তো কেউ সোভিয়েটকে ডাকে নি, কেউ

তো স্বীকার করছেন না যে. আমি ডেকেছিলাম। অথচ মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি সেই সোভিয়েটকে সমর্থন করলেন।

এই সময় শহরের অন্যতম বড় ডাক্তার শ্রীমজুমদারকে দেখতে এলেন। ডাক্তারবাবু ঘরে ঢুকতেই আমরা বেরিয়ে এলাম, কারণ শ্রীমজুমদার অসুস্থ, বেশি কথা বলা মানা, ডাক্তারের নিষেধ।

কথা বলছিলাম দার্জিলিং জেলার সেই পদস্থ পুলিশ অফিসারের সঙ্গে, যিনি নকশালবাড়ীতে ১৯৬৭ সালের মার্চ মাস থেকে পুলিশের সব কাজের নেতৃত্ব করেছেন। সেই অফিসারের কাছে প্রশ্ন ছিল—শ্রীকানু সান্যাল এতদিন ধরা পড়েন নি কেন আর সম্প্রতি ধরা পড়লেন কিভাবে? প্রথমে পুলিশ অফিসার এক কথায় জবাব দিলেন যে. শ্রীকানু সান্যালের যে গুণই থাক না কেন, প্রধান দোষ হল সে গোঁয়ার। পরে ধীরে ধীরে তাঁর কাছ থেকে জানা গেল যে. কিভাবে শ্রীকানু সান্যাল ও অন্যান্যরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।

গত কয়েক মাস ধরে পুলিশ নিজের চেষ্টায় নকশালবাড়ী এলাকায় সাধারণ মানুষের মনে নাকি এমন একটা ধারণা জন্মাতে পেরেছিল যে, তাদের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক শুধু অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের নয়। শ্রীসান্যালের ধরা পড়ার দিন শিলিগুড়ির এস-ডি-পি-ওর কাছ থেকে খবর পেলেন যে. শ্রীসান্যালদের অবস্থানের একটি খবর আছে।

প্রশ্ন করলাম—এই খবরটা কি কোন একজন গাঁজা চোরাকারবারীর মাধ্যমে পুলিশ পেয়েছিল এবং সেই চোরাকারবারী খবরটা বহন করে এনেছিল ধরাপড়া ব্যক্তিদের কোন একজনের কাছ থেকে। অফিসার তার সংবাদের সূত্র প্রকাশ করলেন না বা আমার সংবাদটি সমর্থনও করলেন না। শিলিগুড়ি থানায় বসে সন্ধ্যাবেলা পলাতকদের অবস্থানের গ্রামটি সম্পর্কে যাবতীয় বক্তব্য শুনে গ্রামটি ঘেরাও করার পরিকল্পনা রচনা হল। অভিযান সুরু করা হল গভীর রাত্রে। ৬।৭টা ওঁরাওদের বস্তী নিয়ে গ্রাম, রিং-এর অবয়বে গ্রামটি অনেক দূর থেকে ঘিরে ক্রমে ক্রমে রিংটি সংকুচিত করা হল। প্রায় পাঁচটা নাগাদ প্রবেশ করা হল গ্রামে। নির্দিষ্ট বাড়িগুলিতে হানা দেওয়া সুরু হল।

প্রথমে একটি ঘরে যেতেই একজন বয়স্ক মহিলা বেরিয়ে এলেন। দ্বিতীয় ঘরে প্রবেশ করছি, এমন সময় শুনতে পেলাম একজন অফিসার বলছেন বড় সাহেবকে ডাকো। দ্রুত কাছে যেতেই দেখলাম. উক্ত অফিসার একজনকে ধরে আনছে. দুটো হাত ধরা. একটি হাতে একটা রিভলবার দেখা যাচ্ছে। দ্রুত সেই হাত থেকে রিভলবারটা নিয়ে অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলাম—কার রিভলবার। অফিসার জানালো সেটি তার. অর্থাৎ যাকে ধরেছে তার হাতে কিছু ছিল না। যাকে ধরে এনেছে. তাকে কানু সান্যাল বলে চিনতে পারলাম। প্রথমে দেখে হাত ধরা লোকটির মুখখানি ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল—হয়ত তার ধারণা ছিল অন্য রকম কিছু হবে; কিন্তু রিভলবারটা হাতে নিয়ে পকেটে রাখতেই ধৃত ব্যক্তি যেন বেশ কিছুটা আশ্বস্ত হল তখনই প্রশ্ন হল—স্যার আপনি নিজে এসেছেন। আমি সেই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলাম, অন্যরা সব কোথায়? ধৃত ব্যক্তি বললো—ঐ ঘরে কেশব আছে। কেশবের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলাম—আপনার নাম কি? উত্তর এল—কেশব সরকার। বললাম—কাপড় পরে নিন। দু-এক মিনিটের মধ্যে শ্রীকেশব সরকার কাপড় পরে নিলেন। সকলকে নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হল।

প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা বিপ্লবের জন্য নয়, আত্মরক্ষার জন্যও শ্রীকানু সান্যাল, শ্রীকেশব সরকার নিজেদের কাছে কোন অস্ত্র রাখে নি কেন. এমন নিরস্ত্র অবস্থায় ধরা পড়ার তাৎপর্য কি। অফিসার একটু ভেবে নিয়ে বললেন—সম্ভবত বাবুলালের মৃত্যু তাদের হাতে অস্ত্র রাখতে উৎসাহ দেয় নি। কারণ নিরস্ত্রভাবে থাকলে বাবুলালের মৃত্যু হত না। বাবুলালের মৃত্যু, সম্ভবত কানু সহ অন্যান্যকে অস্ত্র থেকে দূরে থাকবার উৎসাহ দিয়েছে।

তবে এই শেষ কথা নয়. কানু সান্যালের গ্রেপ্তার ও অন্য প্রশ্ন সম্পর্কে শেষ কথা বলার সময় এখনও আসে নি—কারণ. শ্রীসান্যাল বিচারাধীন বন্দী। শেষ কথা তখনই শোনা যাবে. যখন শ্রীসান্যাল নিজে বলবেন। সেই দিন জানা যাবে সব অকথিত কাহিনী. জানা যাবে প্রকৃত সত্য কি?

বিবর্তন —

সেদিন কথায় কথায় দিলীপ বলছিলো—
"আমি জেতাতে মার সেকি আনন্দ যদি দেখতেন!"
Cadbury's
Bournvita
the ideal food drink for strength and vigour
450g net

আমার সংগে আপনারা যাঁরা কলকাতার ট্রামের মাসিক টিকিট কিনে ঘোরাঘুরি করেন তাঁরা জানেন যে টার্মিনাস থেকে ট্রামে উঠলেও সব সময় বসবার জায়গা পাওয়া যায় না। বরানগর থেকে ট্রেনে আমি বালিগঞ্জ স্টেশনে যখন নামলাম তখন ঘড়িতে মাত্র সাড়ে ছটা। কিন্তু শীতকাল। তাই বেলার বালাই নেই। অকাশ অন্ধকার। শহরে বিজলি-বাতি অনেক জায়গায় জ্বলছে। কিন্তু যে-সব মোক্ষম জায়গায় বিজলি-বাতির দরকার ঠিক সেই-সেই জায়গাতেই বাল্ব চুরি হয়ে গেছে। কোথায় কলার খোসা, কোথায়—কর্পোরেশনকে রাস্তা চালু রাখার জন্যে আমরা যে ট্যাক্স দিই সেই রাস্তার খানা-খন্দ বুঝতে পারলাম না। প্রায় হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে ওভারব্রিজ পেরিয়ে রাস্তায় নেমে অত্যন্ত সন্তর্পণে, যেখান থেকে ট্রাম ছাড়ে সেখানে পৌঁছলাম। ভবানীপুরে যাবার একটা চব্বিশ নম্বর ট্রাম দাঁড়িয়ে-ছিলো। সেখানে সবাই ছিলো—ছিলো না শুধু ট্রামের ড্রাইভার আর কণ্ডাক্টর।

শুনলাম ভবানীপুরে যাবার আগের ট্রাম পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে ছেড়েছে। তারপর থেকে গাড়ি যে যাচ্ছে না তার নানা কারণের মধ্যে একটা কারণ এই হতে পারে যে মাঝপথে কোথাও কোনো গাড়ি ডি-রেলড হয়েছে।

ফার্স্ট ক্লাশে দারুণ ভিড়। তা সেদিকে পা না বাড়িয়ে সেকেণ্ড ক্লাশে উঠলাম। উঠে একেবারে পেছন দিকে গেলাম। সেখানে একটা বেঞ্চি খালি ছিলো। দুজনের মতো জায়গা। বসলাম। আর সংগে সংগে আর একজন যাত্রী আমার পাশে বসলো।

তার পা খালি। পরনে হাঁটু পর্যন্ত বড়ো ময়লা এক টুকরো থান ধুতি। গায়ে ততোধিক ময়লা এক টুকরো কাপড় কোনো রকমে চাদরের কাজ করছে। তার গালে একগাল কাঁচা-পাকা দাড়ি। তার মাথায় টাক পড়ে এসেছে। তার চোখ ভীতু-ভীতু। তার কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে গেছে। তার হাত দুটো শুকনো—শুকনো মরা-গাছের ডালের মতো। পাশে বসবার আগে আমাকে সে প্রশ্ন করলো, "স্যার—বসবো?" তখন দেখেছিলাম তার সামনের নিচের পাটিতে গোটা কয়েক দাঁত নেই।

বললাম, "বিলক্ষণ—বসুন।"

সে আমাকে ধন্যবাদ-টাদ জানালো না। ডান হাতে ধীরে ধীরে কর গুনতে লাগলো। তার ঠোঁট নড়তে লাগলো। কিন্তু কোনো শব্দ কানে এলো না। এ-রকম লোক হামেশাই চোখে পড়ে। জীবন যাদের ঠকিয়েছে, দেশ যাদের ঠকিয়েছে, পৃথিবী যাদের ঠকিয়েছে—তারা শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করতে পারে না যে, তাদের ভগবানও ঠকাচ্ছে। তাই সেই ভগবানকে তারা নিজেদের জীর্ণ আঙুলে ধরে শুকনো জিভে নাম আওড়ায়।

জানালার বাইরে তাকিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। ট্রামে-বাসে ধূমপান নিষিদ্ধ সত্ত্বেও, দেখলাম, আমার মতো অনেকেই বিড়ি-সিগারেট ধরিয়েছে। এমন কি এইমাত্র যে ট্রাম কণ্ডাক্টর ও ড্রাইভার এলো—তারাও। বুঝলাম, ট্রাম চালু হলেই আইন চালু। ট্রাম যতক্ষণ না নড়ে আইনও ততক্ষণ নড়ে না।

দেখতে দেখতে এই সেকেণ্ড ক্লাশ কামরাও মানুষে বোঝাই হয়ে গেলো। ভাগ্যবানেরা বসেছেন, কম ভাগ্যবানেরা হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে আর যাঁদের একে-বারেই দুর্ভাগ্য তাঁরা প্রাণ হাতে করে পাদানিতে প্রায় ঝুলছেন। কয়েকটি অল্প-বয়সী ছেলে, যাদের পরনে হাফ-প্যান্ট, গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি, পা খালি তারা ট্রামের পিছনে জানালার শিক ধরে এক আশ্চর্য কায়দায় দাঁড়িয়ে উঠলো।

কামরাটা গুরুগুর করে উঠলো। আলো জ্বললো। ঘণ্টা পড়লো। ট্রাম ছাড়লো।

তারপর হামেশা যা হয়ে থাকে তাই শুরু হয়ে গেলো—ছোটোখাটো ঝগড়া আর কথা কাটাকাটি। প্রবেশপথের কাছে যাঁরা দাঁড়িয়ে তাঁরা বলছেন—আপনারা ভেতর দিকে সরুন, ভেতরে তো অনেক জায়গা। ভেতরের লোকরা চেঁচাচ্ছেন—একটু চোখ মেলে দেখুন, তা হলেই দেখবেন পেছন দিকটা গড়ের মাঠের মতো ফাঁকা। এক ভদ্রলোকের হাতে চটের থলি। তিনি হেঁকে উঠলেন—একটু দেখে পা রাখুন মশাই: বুড়ো আঙুলটা থেঁৎলে গেলো। আর একজন টিপ্পনী কাটলেন—ভিড়ের মধ্যে ও-রকম একটু-আধটু হয়েই থাকে; অত খুঁতখুঁতে হলে ট্যাক্সি নিলেই পারেন। আমার মতো যাঁরা বাসে-ট্রামে ঘোরেন এ-রকম মন্তব্য তাঁরা দুবেলা শুনে থাকেন। অতএব ফর্দ বাড়িয়ে লাভ নেই।

আমি তাই সেদিকে কান না দিয়ে বাইরে তাকাবার চেষ্টা করলাম। ভিড়ের মধ্যে দিয়ে বাইরেটাও ভালো করে দেখা যায় না।

এমন সময় কণ্ডাক্টর ভিড় ঠেলতে-ঠেলতে আমার কাছে এসে টিকিট চাইলো। মাসিক টিকিট হাতেই ধরা ছিলো। দেখালাম। মাসিক টিকিটের এই একটা মস্ত সুবিধে। চেঞ্জ নিয়ে হাঙ্গামা এড়ানো যায়।

হাঙ্গামা বাধলো আমার পাশের সেই লোকটিকে নিয়ে—যার গালে একগাল

গভীর উপবাসে

অশোক ভট্টাচার্য

তবে কী বলতে হবে এসে গেছে মহামন্বন্তর ঃ
ভিক্ষার স্বভাব গেছে বহুকাল, আত্মা উপবাসে
থেকেছে অনেকদিন ; যে রকম সহিষ্ণু প্রবাসে
প্রোষিতভর্তৃকা জ্ঞানী, তারও চেয়ে বিদগ্ধ অন্তর।

এবং চিন্তার মতো মেঘ ঢাকা এসে পঙ্গপাল
রেখেছে মধুর দর, দেখা নেই যদিও সন্তের-
হয়তো ভাবেন তাঁরা ঃ এ রকম হয় ; অনন্তের
করুণাধারার জন্য বসে থাকে যা অনন্তকাল।

তপস্যার প্রেক্ষাপটে বহুদৃষ্ট কঙ্কালীতলার
স্থির অবস্থান নেই ; সর্বত্রই বজ্রপ্রস্তরিণী
মুদ্রায় কাঠিন্য দেন, অথচ যা রুগ্ন আর ঋণী
তাদের মানুষ ভেবে ভিক্ষাদাত্রী চৌর্ষট্টিকলার।

যে তৃষ্ণায় মাঠ ফাটে, কেটে মেঘ আকাশনীলিমা
তাকেই কী স্পষ্ট করে, বিকিরণ বঞ্চনার সীমা!

কাঁচা-পাকা দাড়ি। যার মাথায় টাক, যার চোখ দুটো ভীতু-ভীতু।

সে একটা পাঁচ পয়সা আর দুটি দু' পয়সা এগিয়ে দিলো।

বালিগঞ্জ থেকে সেকেণ্ড ক্লাশে কালিঘাটের ভাড়া আট পয়সা।

কণ্ডাক্টর হিন্দী-বাংলা মিশিয়ে জানালো একে আট পয়সা দিতে। তার কাছে চেঞ্জ নেই।

"আমি তো এক পয়সা দিতে পারছি না, কণ্ডাক্টর মশাই। ন' পয়সা নিয়েই আমাকে একখানা আট পয়সার টিকিট দিন।"

পাশেই বাজারের থলি হাতে হ্যাণ্ডেল ধরে যে প্রৌঢ় ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন তিনি চটে উঠলেন। "এক পয়সা বেশি ভাড়া কেন দেবেন? আজকালকার বাজারে একটা পয়সা সস্তা নাকি? সাত হাত মাটি খুঁড়লে একটা পয়সা পাবেন?"

তাঁর পাশের ভদ্রলোকও ঝাঁঝিয়ে উঠলেন। "ট্রাম কোম্পানীর যত বজ্জাতি। প্যাসেঞ্জারদের দাঁড়াবার জায়গাও দিতে পারবে না, তার ওপর চেঞ্জও দিতে পারবে না!"

অন্য পাশ থেকে আর এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "এটা সেফ জুলুমবাজি।"

কণ্ডাক্টর বললো, "জুলুম কি বাত নেই জি। পয়সা কা দর্শন নেই মিলতা।"

"দর্শন নেই মিলতা তো প্যাসেঞ্জার কোন করেগা?" তারপর সেই ভীতু-ভীতু লোকটির দিকে চেয়ে তিনি বললেন, 'খবরদার মশাই! কক্ষণো এক পয়সা বেশি ভাড়া দেবেন না। কোম্পানী চেঞ্জ দিতে না পারলে এক পয়সা কম ভাড়া নিক।"

"ঠিক বলেছেন মশাই। এটা কোম্পানীর ভাড়া বাড়াবার একটা ইনডিরেক্ট ট্যাকটিক্‌স।"

প্যাসেঞ্জারদের মারমুখী হয়ে উঠতে দেখলে কণ্ডাক্টরও প্রথমে গরম হয়ে ওঠার চেষ্টা করলো। তারপর কী ভেবে যেন মিইয়ে গেলো। বললো সাত পয়সাই দিতে। এক পয়সার লোকসানটা সে-ই সইবে।

অন্য এক যাত্রী নরম সুরে বললেন, "কোম্পানীকে তোমরা চাপ দিতে পারো না? পয়সা নিয়ে এ-রকম হাঙ্গামা তো রোজই হচ্ছে। পাঁচ-দশ টাকার নোটের ভাঙানি দিতে না পারলে কিছু বলছি না। সেটা বোঝা যায়। কিন্তু একটা পয়সা চেঞ্জ দিতে পারবে না—এ কেমন কথা?"

আর এক যাত্রী বললেন, "সরকারই যদি বাজারে পয়সা না ছাড়ে তা হলে এ বেচারারাই বা কী করবে?"

এক উগপন্থী যুবক উত্তেজিত হয়ে বললো, "তা হলে সরকারকেই চাপ দিতে হবে।"

"সরকারকে কী করে চাপ দেবেন শুনি?"

"কেন, ট্রামের ভাড়া না দিয়ে।"

এমন সময় ট্রাম এসে কালিঘাটের স্টপে দাঁড়ালো। নামবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো অনেকে। আমিও উঠে দাঁড়ালাম।

ন'টি পয়সা কণ্ডাক্টরের দিকে এগিয়ে সেই শুকনো চেহারার মানুষটিও উঠে দাঁড়ালো। তারপর ঘটে গেলো সেই অভাবনীয় কাণ্ড।

লোকটির টাঁক থেকে ঝন-ঝন করে পড়ে গেলো অনেকগুলো পয়সা। যাঁরা নামতে যাচ্ছিলেন থেমে গিয়ে অবাক হয়ে তাঁরা তাকালেন সেই ভীতু-ভীতু লোকটির দিকে। কণ্ডাক্টরের মুখে ফুটে উঠলো একটা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ মেশানো বিজয়ীর হাসি।

আর সেই শুকনো লোকটির ভীতু-ভীতু চোখ ভেঙে তার কাঁচা-পাকা দাড়ি বেয়ে ঝরঝর করে ঝরতে লাগলো জল।

সে বলে চললো, "আপনারা আমাকে মাপ করুন। আমার একটিমাত্র ছেলে। তার জ্বর কিছুতেই ছাড়ছে না। মা-কালী স্বপ্ন দিয়েছেন তিন দিন উপোস করে তাঁকে পঁচিশটা তামার পয়সা দিলে ছেলে সেরে উঠবে—"

তাকে পয়সাগুলো কুড়িয়ে দিতে অনেকেই এগিয়ে এলো। কিন্তু এ-ব্যাপারে সবচেয়ে উৎসাহ দেখলাম কণ্ডাক্টরের। ভিড় সরিয়ে উবু হয়ে বসে পয়সাগুলো সে কুড়িয়ে চললো। সেকেণ্ড ক্লাশ থেকে গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা না পেয়ে বিরক্ত হয়ে ফার্স্ট ক্লাশের কণ্ডাক্টর এলো ব্যাপারটা কী জানতে। পয়সা কুড়োতে-কুড়োতে আমাদের কামরার কণ্ডাক্টর গম্ভীর গলায় বললো, "টিকি খোল গিয়া।"

অবাক হয়ে দেখলাম বাস্তবিকই কোন্ ফাঁকে পিছনের দড়ি টেনে মাথার উপরকার তারের সংগে ট্রামের যোগাযোগ কে ছিন্ন করে দিয়েছে।

দেশলাই জ্বালিয়ে-জ্বালিয়ে কণ্ডাক্টর তন্ন তন্ন করে খুঁজলো। কিন্তু একুশটার বেশি পয়সা পাওয়া গেলো না। সে তখন নিজের ভিতরকার বুক-পকেট থেকে অতিশয় ক্ষুদ্র একটি ব্যাগ বার করে খুললো। ভিতরে শুধুই খুচরো পয়সা।

চারটি পয়সা সেই ভীতু-ভীতু লোকটির হাতে দিয়ে সে বললো, "যাইয়ে। কালী-মা আপকা লেড়কাকো আরাম কর দেংগে।"

মনে হোলো সেই লোকটিকে হয়তো জীবন ঠকাচ্ছে, দেশ ঠকাচ্ছে, নিয়তি ঠকাচ্ছে—কিন্ত মানুষ ঠকাচ্ছে না।

মৌমাছি এবং মোমাছি

কিছুকাল আগে সংবাদপত্রে পড়েছিলাম যে, ভারত সরকার এখন থেকে শিক্ষকদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ এবং ধর্মপ্রচার গর্হিত বলে গণ্য করবেন। ছাত্রাবস্থায় কেনা ভারতীয় সংবিধান হারিয়ে গেছে, নইলে এখনই 'কোটেশন্' তুলে দেখানো যেতো যে শিক্ষকদের সম্পর্কে এই আচরণবিধি মৌলিক অধিকারের বিরোধী কি না। কিন্তু সে তো অনেক ভেতরের ব্যাপার, মাথার জটিল কাজ। আমাদের এই সংবিধান, যা [illegible] আগে প্রসিদ্ধ হয়েছে, সেই সংবিধানকে ভুলে গিয়ে তাকানো যাক্ সরকারের নিষেধাজ্ঞার দিকে। আলোচনার সুবিধের জন্য আমি ধরে নিচ্ছি যে একজন বিদ্যালয়-শিক্ষক প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের আদর্শে বিশ্বাস করেন কিংবা তিনি ঐ দলের একজন সক্রিয় সদস্য। যেহেতু আমরা সবাই মনে করি যে তাঁর বিশ্বাসের স্বপক্ষটিই খাঁটি এবং তাঁর অপরপক্ষটি ভুল এবং বাসি সুতরাং সেই শিক্ষকও নিজের আদর্শকে প্রচার করে বেড়াবেন, এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু কাদের মধ্যে তিনি প্রচার করবেন? হাতের নাগালে ছাত্ররা আছে, তাদের মধ্যে নিশ্চয়ই। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে কি তিনি কোনো সাড়া পাবেন? যখন অধিকাংশ ছাত্র ণত্ব-ষত্ব বিধি বুঝতে বছর-বছর কাটিয়ে দেয়, এবং একটি বাক্য শুদ্ধ ইংরেজিতে লিখতে সারা বিদ্যালয়-জীবন কাটায়, তারা রাজনৈতিক মতবাদের কূটকচালি বুঝে তার দ্বারা দীক্ষিত হবে, এ বড়ো বেশি দাবি। আর ধর্মপ্রচার? অধিকাংশ ধর্মেই যে 'মাইক'-এর অনুমোদন নেই, নাচ-গানের ব্যবস্থা তেমন উদার নয় এবং জলসা নিষিদ্ধ—এই ব্যাপারটিই কি ধর্মদীক্ষার যথেষ্ট পরিপন্থী নয়?

শিক্ষার আদর্শ বা আদর্শ শিক্ষা কী তা নিয়ে আমাদের এখন আর মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথের বাংলায় তার প্রয়োজন ছিল, বিবেকানন্দের চিন্তায় তার মূল্য ছিল—এখন ও-প্রসঙ্গ ভুলে যাওয়াই শ্রেয়। বরঞ্চ, শিক্ষা থেকে যে শব্দ দুটি তৈরি হয়েছে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, সেই শব্দ দুটির প্রতিই আমাদের সমস্ত মনোযোগ এখন নিবদ্ধ। পাঠকদের অনুমতি নিয়ে আমি বলতে চাই যে, যদিও শিক্ষার লক্ষ কী আমি জানি না, কিন্তু শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর লক্ষ সম্পর্কে আমার স্পষ্ট ধারণা আছে; এবং সেই ধারণা অনুসারে শিক্ষকের লক্ষ টাকা রোজগার করা এবং শিক্ষার্থীর লক্ষ টাকা রোজগারের পথ খুঁজতে খুঁজতে সময় নষ্ট করা। ভাবছেন আদর্শচ্যুত, নাকি মতিভ্রান্ত 'সিনিক'? মনে রাখতে হবে যে, আমি সেই একজন শিক্ষক এবং একজন শিক্ষার্থীকে বাদ দিয়ে বলছি, যাদের কাছে শিক্ষাদান একটি ব্রত এবং শিক্ষালাভ একটি উদ্ভাসন, আমি বলছি অধিকাংশের কথা, এবং সেই অধিকাংশের কাছে রাজনীতি, ধর্ম ইত্যাদি নিতান্তই ঘোরাটে ব্যাপার, 'ইংলিশ কম্পোজিশন'-এর বাইরে, পরীক্ষার সম্ভাব্য প্রশ্নে ব্যতিরেকে, যাদের কোনো অস্তিত্ব নেই।

কলকাতা শহরে শিক্ষাদান ব্যবসা যে বেশ জমে উঠেছে তার প্রমাণ অলিতে-গলিতে রাস্তায় ছড়ানো টিউটোরিয়ালগুলি। হ্যান্ডবিল থেকে শুরু করে বড় রাস্তায় শূন্যে ঝোলানো বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে টিউটোরিয়ালের মহিমা প্রচারিত হচ্ছে—প্রত্যেক টিউটোরিয়ালেরই গর্বের বস্তু এক শতকরা ৯৬ বা ৯৯ পাশ করেছে তাদের কাছে পড়ে, এবং তাদের সাজেসশন অব্যর্থ, বস্তুতঃ এতোই সার্থক যে ঐগুলিকে যোগসাজস ভাবলেও ভুল হতে পারে। ফলতঃ ছাত্র এবং ছাত্রের অভিভাবক উভয়ের মনেই এ কথা গেঁথে গিয়েছে যে টিউটোরিয়াল [illegible] সাধাসাধনকারী, এখানে খরচ অল্প কিন্তু লাভ বেশি, জ্ঞানার্জন অসম্ভব বটে, কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সহজ। টিউটোরিয়ালগুলি যে ভালোই চলবে এতে আর আশ্চর্য কি? যদি ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়েরই স্বার্থ এতে রক্ষিত হয়, তাতে কারোর হিংসে করা উচিত নয়, এমন কি টিউটোরিয়ালের উপযোগিতাও তাতে কিছুটা প্রমাণিত হয়। কিন্তু যতক্ষণ এই তথাকথিত বিদ্যাভারতীগুলি উভয়পক্ষের অর্থাৎ ছাত্র-শিক্ষকের স্বার্থ রক্ষা করে চলে, ততক্ষণই এগুলি ভালো। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে, টিউটোরিয়াল অন্যদিক থেকে ক্ষতিকর এবং সেই ক্ষতির কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই আমাকে যে প্রশ্ন বিদ্ধ করে তা হচ্ছে এই যে, টিউটোরিয়াল চালায় কারা? শিক্ষকরা? আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শিক্ষক বলতে অবশ্য তাঁদেরই বোঝানো হচ্ছে যাঁরা বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু আমরা সবাই আজকাল জেনে গেছি যে, প্রত্যেকেই শিক্ষক হবার যোগ্য শুধু শিক্ষকেরই বিদ্যালয়ে পড়ানো ছাড়া অন্য কোনো যোগ্যতা নেই। এই কারণে যাঁরা মোটামুটি শিক্ষিত, অফিসে চাকরি করেন, তাঁরাও অবসর সময়ে টিউটোরিয়ালের ব্যবসা জমিয়েছেন এবং ভালোই চালাচ্ছেন। এর ফলে শিক্ষকদের 'প্রাইভেট ট্যুইশন'-এর ক্ষেত্র ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে, তাঁদের বাজারদরও কমছে, কিন্তু তাঁদের সম্বন্ধে যে অপবাদ স্থায়ী আছে, অর্থাৎ শিক্ষকরা ক্লাশে ঘুমোন আর জাগ্রত অবস্থায় বাড়ি বাড়ি ট্যুইশন করে বেড়ান, সেই অপবাদও যাচ্ছে না।

না, শিক্ষকদের অবস্থা যতোটা খারাপ ভাবছেন, ততোটা অবশ্য নয়। শিক্ষকদেরও টিউটোরিয়াল আছে, সেখানে না পড়লে ছাত্ররা ইস্কুলের পরীক্ষায় পাশ করতে পারে না। আমি একটি বিদ্যালয়ের কথা জানি যেখানে ইস্কুলের শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত টিউটোরিয়ালে ভর্তি হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল

মানুষের জন্য

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়

কিছু ভালোবাসা রাখো, কিছু ক্ষমা। দুই চোখে সামান্য মমতা
অন্তত জ্বালিয়ে রাখো—সেই মৃদু স্নেহরেখা দেখে
কেউ যেন সহজে বিশ্বাস করে [illegible] শেষ কথা নয়,
পৃথিবীতে মানুষের ভালোবাসা কিছু এখনো রয়েছে।

চারদিকে এত বেশি হতাশা, নিশ্বাস বড় অভিমানে
রুদ্ধ হয়ে আসে ঃ
এত ভিড় তবু সব বিচ্ছিন্ন একক, এই মানুষের বিচিত্র সমাজে
কোনো আত্মীয়তা নেই কোনো হৃদয়ের উন্মোচন নেই দেখে
প্রতিদিন যে মানুষ দুঃখিত হয়েছে—
শেষরাতে ট্রেনের চাকার নিচে আত্মহননের আগে—তাকে
সামান্য বাতাস দাও, বুকের যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে
সে যেন আবার স্থির জীবন-বিশ্বাসে আসে ফিরে!

কিছু স্বার্থ ত্যাগ করো, কিছু লোভ। মাঝে মাঝে অন্তত
নিজেদের
উদাসীন ছায়া দেখো চেতনার শান্ত নীল জলে!

এক সময়। দু-একটি মিশনারি স্কুলে এমন ব্যবস্থাই আছে যে, শিক্ষকরা বাড়িতে গিয়ে পড়াতে পারবেন না, ইস্কুলের ভিতরে কতিপয় ছাত্র নিয়ে তাঁরা পড়াবেন, কর্তৃপক্ষের সমর্থন থাকবে তাতে। এ ব্যবস্থা একদিক দিয়ে ভালো কারণ এতে লুকোচুরির কোনো ব্যাপার নেই, কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সজাগ, শিক্ষকরা দাসিয়ে সন্তুষ্ট এবং ছাত্রদেরও টিউটোরিয়ালে যাবার নাম করে সান্ধ্য-ভ্রমণের চওড়া রাস্তা বন্ধ।

একজন শিক্ষক যে ব্যবসায়ী নন, এই কথাটি [illegible] এসেছে। আর এই কথা মনে রাখেন, শিক্ষকের সম্পর্কে [illegible] তিনি [illegible] অনাদর, তিনিও [illegible] দিনে তাঁরও সাধ যায়—ধর্মতলার চৌরঙ্গীতে চলে যান, সখে চর্কির [illegible] যাওয়াতেই তাঁর আনন্দ। এই জন্য সবাই, যাঁদের কথা আমি এতক্ষণ উল্লেখ করলাম, তাঁদের মধ্যে ছাত্র এবং অভিভাবকরাও পড়েন আশাই—সুতরাং শিক্ষকরাই শুধু আদর্শের মই বেয়ে ক্রমশ ওপরে উঠবেন, ছাত্র-অভিভাবকরা থাকবেন সুখে, মাটি আঁকড়ে, এই বা কেমন কথা? এ যুগে

আমরা স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন দিয়েছি, এখন আর বলা যাবে না 'অমুক লোকটি একটু ভিন্ন ধরণের'। যদি কেউ ভিন্ন থাকেনও, তিনি বেশিদিন আর থাকতে পারবেন না—ভালো লোক হওয়া কঠিন নিশ্চয়ই, কিন্তু ভালো লোক হয়ে থাকা কঠিনতর। তাই এখন শিক্ষক অভিভাবক-ছাত্র অফিসকর্মী সবাই এক- একই লক্ষ্যের দিকে ধাবিত, একই স্বার্থে তাঁদের সুখ [illegible] একই কারণ [illegible] আন্দোলন, স্ট্রাইক, প্রতিবাদ তার অনশন। কার্ল মার্কসের সেই [illegible] উপমা মনে পড়ছে যেখানে তিনি বলেছিলেন যে, মৌমাছি যতই দক্ষ স্থপতি হোক না কেন, তার [illegible] মানুষের [illegible] চিন্তা-[illegible] উদ্ভাবনী শক্তি। [illegible] মৌমাছি [illegible] চিন্তাশক্তি নেই, [illegible] গড়া, তার সঙ্গে অন্য মৌমাছির কোনো প্রভেদ নেই। নিজেদের দেশের মানুষ সম্পর্কে কি কার্ল মার্কসের এই উক্তি আর প্রযোজ্য?

শিক্ষকদের লক্ষ্য যদি হয় টাকা রোজগার করা (স্কুল-কলেজ নির্বিশেষে অবশ্যই) এবং ছাত্রদের টাকা রোজগারের রাস্তা খুঁজে বার করা, তাহলে সেই লক্ষ্যের মধ্যে আমি কোনো খারাপ কিছু

দেখতে পাই না। ছাত্ররা পাশ না করলে চাকরি পাবে না এ যেমন সত্য, তেমনি সত্য এই যে, শিক্ষকরা চাকরি করছেন টাকা উপায় করবেন বলে। বিদ্যালয়ের বেতন স্বল্প, কিন্তু জীবনযাত্রার দাবি বৃহৎ—কাজে কাজেই তাঁদের ভিন্ন পথে অর্থ-অন্বেষণ করে বেড়াতে হয়, এ ব্যাপারের মধ্যে খারাপ কিছু দেখি না। যদি ছাত্র এবং অভিভাবকের স্বার্থ মেটে, তবে শিক্ষকের কোচিং ক্লাসের অবশ্যই উপযোগিতা আছে যদি প্রশ্নপত্র ছাত্রদের ভাষায় 'সেন্টপারসেন্ট কমন [illegible]', 'সাজেসশন' 'সারটেনটি'তে রূপান্তরিত হয় [illegible] আগামী পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভেসে [illegible] -তাই বা মন্দ কী? বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষা বুঝতেন না তাই লিখেছিলেন যে একজন অধম হলে অন্যজনের উত্তম হতে কোনো বাধা নেই। একজন অধম হলে [illegible] সবাই অধম হতে বাধা, 'মেটিস্টোফিলিস' যে আমাদের সবার মধ্যেই আছে। তাই কোচিং ক্লাস, টিউটোরিয়াল পুরোদমে চলুক, ছাত্ররা পাশ করুক বেকার হবার জন্য, কোয়েশ্চেন আউট হোক, মাইনে বাড়ানোর আন্দোলন চলুক, এতে আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। আমরা ঠিক রাস্তাতেই চলেছি—এ যুগে আমরা সবাই মৌমাছি।

দিল্লী পালাম বিমানবন্দরে ডাডলে সেনানায়ক

শিক্ষানিকেতন, ছাত্র ও পুলিশ

পঞ্জাব গুজরাট, দিল্লী উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিম বাঙলা উড়িষ্যা সর্বত্রই কোনো না কোনো কারণে ছাত্র বিক্ষোভ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। শিক্ষায়তন ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পুলিশ, [illegible] এবং কেন্দ্রীয় পুলিশের প্রবেশ, ছাত্রদের ওপর হামলা ও মারপিট, [illegible] প্রভৃতিসব [illegible] চমকপ্রদ সব ঘটনায় [illegible]। ইতি-[illegible] মর্যাদা [illegible] আওতার [illegible]। অথচ স্বাধীন দেশের পুলিশ [illegible] স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী। এবং পুলিশ এককর্তা যেদিন অলিখিত আইন ভঙ্গ করে বিদ্যালয় ভবন দূষিত করার হুকুম পেয়েছে, সেদিন থেকেই তার ক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশেরও অলিখিত বাধা অপসারিত হয়েছে। অপর দিকে তেমনিই সম্প্রতিককালে ছাত্ররাও বিদ্যাভবনকে লড়াইয়ের দুর্গে পরিণত করছেন। বিদ্যাভবনকে দুর্গে তৈরি করার এহেন কৌশল এবং কার্যকালে সঠিক বুদ্ধি প্রযোগে অপারগম সর্বাধ্যক্ষগণ পুলিশকে বিদ্যাভবন কলুষিত করবার ঢালাও সুযোগও করে দিচ্ছেন। কিছু ভোটে-তৈরি নেতাও ভাবতে শুরু করেছেন, বিদ্যাভবনকে বিশেষ মর্যাদাদানেরই বা অর্থ কি। বিদ্যাভবনের সঙ্গে ভূশণ্ডীর মাঠেরই বা পার্থক্য কোথায়। এহেন নেতাদের উক্তি এবং অক্ষম পরিচালনায়, বিদ্যাভবনের ইজ্জত গেছে, দেশে শিক্ষার ইজ্জত তথাপি বজায় থাকবে, এমন আশায় তাই ছাই পড়ছে। আর শিক্ষক সম্প্রদায়ও যে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে পুলিশী তাড়নায় প্রাণভয়ে বিদ্যাভবনে দৌড়ঝাঁপ করে বেড়াচ্ছেন এমন অবস্থাও দেশের সেই মহান পণ্ডিত নেতৃবর্গের করুণার অবদান। শিক্ষায়তনের সর্বাধ্যক্ষগণ তখন সরকারী আমলাদের অনুকরণে ছাত্রসমস্যা নিয়ে সরকারী কর্তাদের সঙ্গে কেবলমাত্র হট-লাইন ডিসকাশনে ব্যস্ত। সব মিলে ভারতবর্ষের শিক্ষার জগতে যে নৈরাজ্য চলেছে, তাতে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বিশেষ উদ্বিগ্নবোধ করার কারণ দেখা দিয়েছে।

সম্প্রতি ইউ জি সি বা য়ুনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশনের ৬৫-৬৬-৬৭ সনের প্রতিবেদনের ওপর বক্তৃতাকালে রাজ্যসভার বিভিন্ন রাজনীতিজ্ঞেরা ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষানীতির কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং এই বিতর্ককালে বস্তুত গভীর উদ্বেগও প্রকাশিত হয়েছে।

জনৈক কংগ্রেস সদস্য শ্রীপাতিল পুট্টাপ্পার মতো নেতারা বিদ্যালয়ের কোনো বিশিষ্ট মর্যাদায় বিশ্বাসী নন। এঁদের বক্তব্য ঃ বিশ্ববিদ্যালয় এমন কিছু 'সুপার স্টেট নয় যে পুলিশ ঢুকবে না।

যেহেতু এঁরা ভোটজেতা নেতা সুতরাং এঁরা যা কিছু বলেন ভেবেই বলেন ধরে নিতে হবে। কিন্তু গভীর দুর্ভাবনাই এই জাতীয় ভাবনার জন্মদান করে।

শিক্ষানিকেতন 'সুপার স্টেট' না হলেও, তা যে জাতি গঠনের মহান আলয় শ্রীযুত পুট্টাপ্পা যদি তা স্বীকার করেন, তবে তাঁকে বলতেই হবে যে জাতীয় জীবনে শিক্ষানিকেতনের বিশিষ্ট স্থান বরবাদ করা যায় না। এমন কি ভোটেজেতা নেতারাও তা পারেন না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ছোট করে দেখলে শিক্ষাব্যবস্থার মানও নিম্নগামী হবে। শিক্ষা ও শিক্ষক সম্বন্ধে শ্রদ্ধা হারিয়ে ভোটভ্রষ্ট জাতিতে যে কখনো উন্নতির আলো অন্ধচোখে সহ্য করতে পারবে না এ কথাটা ধৈর্যের সঙ্গে ভেবে দেখা দরকার। নেতা তো হলেই হল না, নেতা হতে হলে জাতি গঠনের কিছু কিছু দায় দায়িত্ব গ্রহণ করবার মতো ধৈর্যও ধারণ করতে হয়। বলা বাহুল্য ভোটে জেতা নেতাদের বড় একটা এমন দায়ের বালাই নেই। তাই ফস করে মুখের কথা খসাতেও দ্বিধার কারণ নেই। কিন্তু প্রকৃত নেতা শ্রীযুত পুট্টাপ্পার মতো শিক্ষানিকেতনের মর্যাদা কাড়বার আগে নিশ্চয় ভেবে দেখেন অন্যতর উপায়। সেই অন্যতর উপায় উদ্ভাবনের ক্ষমতা না থাকলে নেতৃত্বে বরং ইস্তফা দেওয়াই শ্রেয়।

যাই হোক, সমস্যাটা পুলিশ কেন শিক্ষানিকেতনে প্রবেশ করবে না, তা নয়, সমস্যা হল, শিক্ষানিকেতনকে কেমন করে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের দুর্গে পরিণত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা যায়। নেতারা এই কেমন করের উত্তর যদি অধীনের কাছে চান তো বলব, তবে নেতা না বনে নেতৃবাণীর উদ্ধারকের কাজ করছি কেন! নেতারা করবেন কি। অন্তত একটু চিন্তা করুন!

'ভারতদর্শনে'র পাতায় ছাত্রসমস্যা নিয়ে আলোচনা এই প্রথম নয়। ঢের বার ঢের সাজেশন এখানে মুদ্রিত করা হয়েছে কেবলমাত্র অরণ্যে রোদন করার জন্যই।

পাপড়ি পেলব তনু
বিউটি ক্রীম-এর
এইতো সবচেয়ে বড় অবদান
নিজেদের সৌন্দর্য্য সম্পর্কে
আধুনিকারা তাই
প্রশংসায় মুখর।
সাধনা
বিউটি
ক্রীম
অতি আধুনিক অবদান
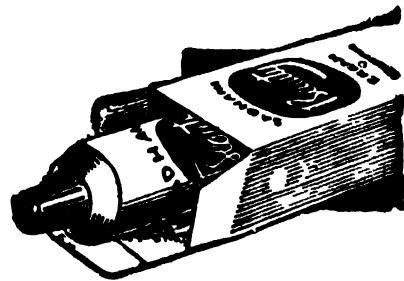
মনে হয়, ছাত্রদের অন্যান্য সমস্যার যথাযথ মোকাবিলা করা হলে শিক্ষালয়কে দুর্গে পরিণত করার আধুনিক রেওয়াজের হাত থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি। বিশেষ এ বিষয়ে ছাত্রদের মধ্যেই চেতনা সৃষ্টির জন্য সব কটি রাজনৈতিক দল ও ভোটে-জেতা নেতাদের সঙ্গে প্রকৃত নেতাদেরও এগিয়ে আসা দরকার। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই ছাত্র ক্ষেপিযে স্বদলের স্বার্থ-সাধন কবে যাচ্ছেন। এই সস্তা পথটি তাঁদেব অবিলম্বে ত্যাগ করতে হবে।

ছাত্র ক্যাপান কারা?

কিন্তু সুযোগসন্ধানী রাজনীতিওয়ালারা তো বটেই, এমন কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বাধ্যক্ষরাও ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং তাদের উদ্দাম চেতনায় নানা মতের কুটিল বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে সময় মত তাদেব হাতিয়ার করছেন, আবার সময় ফুরোলে. কার্যোদ্ধাব হলেই, যে যখন ক্ষমতায, মিলিটারী লেলিয়ে দিচ্ছেন।

এই রাজনীতির খেলা চলতে থাকলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও রাজনীতির দুর্গেই পরিণত হবে এবং কতিপয় ছাত্রের রাজনৈতিক কর্মের ফলভোগী হবেন তাবৎ ছাত্রসমাজ। দেশকে বাজনীতির ব্যবসাদাররা টেনে নিয়ে যাবেন অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে।

রাজ্যসভাব আলোচনাব এমন আশঙ্কাও অনেকেই অনেকভাবে প্রকাশ করেছেন। বেনাবস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বহু বিশিষ্ট নেতা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সাম্প্রদাযিক উস্কানীর অভিযোগ এনেছেন। পি এস পি'র শ্রীবাঁকাবিহাবী দাস বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালযে সরকারেব হস্তক্ষেপ অত্যন্ত বেশি হযে উঠছে। আর কংগ্রেসের শ্রীঅর্জুন অরোরা সভাগৃহকে সচকিত করে বলেছেন : ভারতেব বিশ্ববিদ্যালযগুলি বর্তমানে কুখ্যাত সি আই এ-র দখলে চলে যাচ্ছে। ১৯৬৭ সালে তার কিছু সংবাদও ফাঁস হযে গেছল। তিনি অভিযোগ করেন : দিল্লী বিশ্ববিদ্যালযে জনৈক আমেবিকান অধ্যাপক সোভিযেট ইতিহাসের পাঠ দান করেন। তিনি জানতে চান, ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের অর্থসাহায্যেব জন্য কি আমবা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে আমেবিকার হাতে অর্পণ করব।

স্বভাবতই এ-সমস্ত প্রশ্ন পড়ুয়া ছাত্রদের মধ্যেও অসন্তোষের সঞ্চার করতে পারে।

অসন্তোষের অন্যতম প্রধান কারণটি তুলে ধরেন সি পি এম নেতা শ্রীকেসভন ধাজাতা। তিনি বলেন, শিক্ষিত বেকারের হার কমাতে হলে সরকারকে বাৎসরিক স্নাতকের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

অবশ্যই তিনি বলতে চান, বিভিন্ন শিক্ষণীয় পাঠক্রমে ছাত্রদের ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে একই বিষয়ে যোগান না বাড়ে। বস্তুত, দেশে চালাও হারে স্নাতকের প্রয়োজন নেই। কিন্তু কারিগরি বিদ্যালয়ের অভাববশত সাধারণ স্কুল-কলেজে স্বাভাবিকভাবে চাপ বাড়ছে। ফলত ছাত্র-মহলে নিদারুণ হতাশার সঞ্চার হচ্ছে।

কারিগরি বিদ্যাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা দেওয়া এবং তার প্রতি আকৃষ্ট করার প্রয়োজন ছিল কুড়ি বছর আগেই। আমাদের একটি সঠিক শিক্ষানীতির অভাবে সেই অবশ্যকর্তব্য এখনও পালনীয় স্তরেই আবদ্ধ আছে। অথচ যোগান বাড়ায় ডিগ্রী কোর্সের ছাত্রদের বাজার মূল্য পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু দেশের চাহিদা অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থার সঠিক নিয়ন্ত্রণ থাকলে শিক্ষিত যুবকের বাজার এমন মন্দা হত না।

সম্প্রতি বিনোবা ভাবেজীও এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন : "আজকের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান গলদই হল এতে শিল্প-শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই, যার ফলে দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। শিক্ষা ও বেকারী সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকের শিক্ষিত যুবক এক বিহ্বল অবস্থায় পড়েছে : ."

আশাহীন অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে তাকিযে ছাত্রদেব মনে সব সময় যে অসন্তোষ এবং বিহ্বলতা বিরাজমান তাই যে কোন উপলক্ষে বিস্ফোরিত হচ্ছে। এ দোষ ছাত্রদেব না নেতাদেব এ কঠিন প্রশ্নটি বারম্বার উত্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও যাঁরা ব্যাপারটা কেবলমাত্র ল' এন্ড অর্ডারের সমস্যারূপেই গণ্য করছেন. তাঁরা লাঠি উঁচিযেই ঘুমিযে থাকুন। ওদিকে সর্বনাশ দ্বারদেশে করাঘাত শুরু করেছে।

আদর্শ চাই

ছাত্র অশান্তির যে কারণটি বার বার ভারতদর্শনের বক্তব্য হযেছে, প্রসঙ্গত সংক্ষেপে তারও পুনরুল্লেখ রাখি :

তরুণসমাজেব সামনে আজ এমন কোন আদর্শ নেতা নেই, যিনি তরুণ ভারতেব শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে তাদের প্রকৃত পথে চালনা করতে সক্ষম। নেতাকুল আজ স্বার্থে আকুল। গদির জন্য হেন কাজ নেই যা তাঁরা না পারেন। এই কেরিয়ারিস্ট নেতাদের আদর্শ সামনে থাকলে তরুণ ভারত যে সুস্থ সামাজিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবে, এমন আশা বাতুলতামাত্র। তাই তরুণরাও আজ শিখছে, দল বাঁধতে ঘোঁট পাকাতে ও সহজে কিস্তি মাৎ করতে। যস্মিন দেশে যদাচার। মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তারাও চলেছে রাজনীতি সম্বল করে কেরিয়ার তৈরি করতে। যারা খুঁটির জোরের স্বাদ পেয়েছে, তারা নেতাদের প্রতিষ্ঠিত পন্থায় ও আদর্শে মতো ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শিখছে। বাকি পনের আনা তিন পয়সাই কালক্রমে হয়ে ক্ষোভে দুঃখে উন্মত্ত হয়ে উঠছে। এদের পুলিশী লগুড়াঘাতে শায়েস্তা করার কথা চিন্তা না করে শায়েস্তা যাঁরা যদি নিজেদের আদর্শ পুরুষ করার দিকে নজর দেন, তবে ঢের কাজ হবে।

শিক্ষাখাতে টাকা চাই

ইউ জি সি প্রতিবেদনের ওপর আলোচনায় সদস্যরা বলেন, ইউ জি সি'র যতখানি ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার, তা তাঁরা করেন নি। যেন ইউ জি সি শুধুমাত্র অর্থ বিনিয়োগের যন্ত্র। অথচ কোন্ ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ করতে হবে এ বিষয়ে চিন্তা করা হলে মোটামুটি একটি শিক্ষানীতি তৈরির দিকে ইউ জি সি'ও নজর দিতে পারতেন।

প্রত্যেক সদস্যই একটি ঐক্যবদ্ধ শিক্ষানীতি দাবি করেন এবং শিক্ষাখাতে বরাদ্দ বাড়াবার পক্ষে সমস্বরে আওয়াজ তোলেন।

শিক্ষাজগতে পুলিশী ল' এন্ড অর্ডারের স্থান নেই। উপলব্ধি, সহানুভূতি এবং সদিচ্ছাই একমাত্র শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য দূরীকরণেব সহাযক হতে পারে।

ভারত-সিংহল শীর্ষ সম্মেলন

প্রধানমন্ত্রী শ্রীডাডলে সেনানাযক তাঁব দুদিনব্যাপী আলোচনা শেষ করলেন আশাব্যঞ্জক মন্তব্য প্রকাশ করে।

কচ্ছতিভু দ্বীপ সম্পর্কে তিনি বলেছেন ব্যাপারটা তিনি প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং তাঁব আশা, ভাবত-সিংহল এ ব্যাপারে একটি সন্তোষজনক চুক্তিতে উপনীত হতে পারবে।

যুক্ত বৈঠকে সিংহলস্থ ভাবতীয় বংশোদ্ভূতদের সমস্যাও আলোচিত হযেছিল। প্রধানমন্ত্রী সেনানাযক বলেন, সিংহলেব ভারতীয়দের সঞ্চিত অর্থের মধ্যে সর্বোচ্চ পঁচাত্তর হাজাব টাকা ভারতে নিয়ে আসতে দেওয়া হবে।

বর্তমান নিবন্ধের রচনাকাল পর্যন্ত উভয় প্রধানমন্ত্রীর যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয নি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সেনানাযকের সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত বিবৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে যুক্ত বিবৃতি উভয় দেশের সোহার্দ্য বৃদ্ধির পক্ষেই মন্তব্য রাখবে।

সিংহলের সঙ্গে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সমস্যা এবং কচ্ছতিভু সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে মাঝে যে মন কষাকষি দেখা দিয়েছিল, প্রধানমন্ত্রী সেনানায়কের ভারত সফর নিশ্চিতভাবে তারই অবসান ঘটাবে এবং দুই দেশের মৈত্রী ও অসহযোগিতা বর্ধনে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের পর কেরালা?

বিপ্লবী নকসালপন্থীরা (এঁরাও

কম্যুনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গের জ [illegible] [illegible] ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর কেরালায় নজর দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে যেমন ছিল, কেরালায়ও তেমনি, কম্যুনিস্ট, বিশেষ মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট প্রভাবিত যুক্তফ্রন্ট সরকার তাঁদের পছন্দসই হয় নি। না হওয়ারই কথা, মার্কসবাদী কম্যুনিস্টদের সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে মুখড়ে পড়তে দিতে তাঁরা গররাজী। গদি নিয়ে পড়ে থাকা নৈব নৈব চ, তাঁদের বক্তব্য। যদি প্রশ্ন হয়, ভারতে এতো এতো রাজ্য থাকতে নকসালপন্থীদের বিপ্লব অভিযান বেছে বেছে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালায়ই বা কেন? তাঁদের জবাব নিশ্চয় হবে সর্বাগ্রে প্রগতির আলোকে যাঁরা রঙিন করে দেখাচ্ছেন তাঁদের গদীর মোহ ভাঙো, পরে অন্ধকারের সঙ্গে লড়ো। অর্থাৎ পহেলা শত্রু নয়াসংশোধনবাদীরা।

কিন্তু নকসালপন্থীদের উত্তেজনার কারণটা কি তাহলে এই দাঁড়ায় না যে, তাঁদের তথাকথিত কৃষি বিপ্লবের বুলিটা আসলে একটা মুখোশ, যে মুখোশের আড়ালে আসল মুখটি কম্যুনিজম-বিমুখ? বিপ্লবই যদি উদ্দেশ্য তবে পোস্টার যুদ্ধ এবং অনশন বিক্ষোভ ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের বিক্ষোভ জ ঘোষের মন্ত্রিসভা গঠনের পরবর্তীকাল থেকেই মিইয়ে গেল কেন? কেনই বা বিপ্লবের রণদামামা এখন সুদূর কেরালায় শ্রুত হচ্ছে। বিপ্লবের ধোঁয়া শুধুই ধূম্রজাল মাত্র! কেন্দ্রীয় পুলিশের হাতে কেরালাকে সমর্পণ করাতেই এবং পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন বয়কটের মাধ্যমেই যদি তাঁদের ভারতব্যাপী নকসালবাড়ি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়, তবে এহেন সহজ পদ্ধতির বিপ্লব কতদূর বস্তুবাদী তাতে সন্দেহের অবকাশ অবশ্যই থেকে যাবে।

কেরালায় থানা আক্রমণের ছলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি যে সুপরিকল্পিত বিপ্লবীয়ানা নয়, সাধারণ বুদ্ধির মানুষও তা উপলব্ধি করবেন। শুধু নকসাল-পন্থীরা উত্তপ্ত চোরাবালির ওপর দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছেন না পায়ের তলায় মাটির চেতনা কেমনতর।

যে কৃষক ক্ষেতে ফসল বোনেন, তাঁকে এই কুটিল রাজনীতির খেলায় টেনে প্রথম প্রথম বিঘূর্ণিত মস্তিষ্কের অধিকারী করা সহজ। কিন্তু রাজনীতি-অনভিজ্ঞ কৃষককে রাজনীতির শিকারে পরিণত করার ফলশ্রুতি খুব সুখকর নয়। বিপ্লববাদের ফাঁকি ধরা পড়লে পাল্টা আঘাত চূড়ান্ত হয়েও দেখা দিতে পারে। ঠিক সেই রকমই অবস্থা কিশোরদের নিয়েও। তাঁরা অধুনাতন উত্তেজনার দ্বারা সর্বদাই প্রভাবিত। এঁদের সুকুমার মনে হঠাৎ প্রভাব বিস্তার করার মতো চমকপ্রদ বুলি বিপ্লব হতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বিপ্লব অর্থাৎ সত্যকার পরিবর্তনের বদলে পরি-বর্তমান চেহারাকে এদেরই দ্বারা ভেঙে-চুরে এদের ওপর গতায়ু বুদ্ধের খবর-দারি চাপিয়ে দেওয়ার খেলাটা পরিণামে রমণীয় হবে বলে ভরসা হয় না। যেদিন মুখ থেকে মুখোশ পড়বে খসে সেদিন এই উল্টো বিপ্লববাদের পরিণতিও হবে সাংঘাতিক।

উড়িষ্যায় বিশৃঙ্খলা

ভারতের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় বিদ্বেষ এ যাবৎ খুব তীব্র ছিল না। অন্তত গত দু-একদিনে কটকে যা ঘটে গেল তা বস্তুত অপ্রত্যাশিত। ঘটনার ক্রমাবনতি লক্ষ্য করে মনে হয়, কটকী উত্তেজনা ঠিক আকস্মিক নয়, যেন তা সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে ছিল। সাধারণ শান্তিপ্রিয় নাগরিকবৃন্দ কখনও কোন ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বিশৃঙ্খলা চান না। কটকবাসীরাও তা চান নি। কিন্তু তবু দোকান-বাজার পুড়েছে, ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে সাধারণের সম্পত্তির। তবে স্বস্তির কথা, প্রাণহানি এখনো আতঙ্ক সৃষ্টি করে নি। কিন্তু লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা একদল দুষ্কৃত-কারীর সম্ববন্ধ প্রচেষ্টার পরিচয় রেখে গেছে সেখানে।

সরকারী তরফে বলা হচ্ছে, অবস্থা প্রায় আয়ত্তাধীন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংবাদ ২৩শে নভেম্বর রাত্রিকাল পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

ছাত্রদল হাঙ্গামা নিবারণের জন্য যথেষ্ট প্রয়াস পাচ্ছেন, যেমন পুলিশ-বাহিনীও তৎপর। উড়িষ্যার প্রাক্তন দুই মুখ্যমন্ত্রী এবং শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব প্রমুখ নেতৃবৃন্দ জনগণকে শান্তি সংরক্ষণের জন্য সজাগ হওয়ার আহবান জানিয়েছেন। অর্থাৎ হাঙ্গামা দমনে সকলরকম সং-প্রচেষ্টাই চলছে। কিন্তু সে তো স্বাভাবিক।

যা কর্তব্য তা হল, এই হাঙ্গামার পেছনে যাদের উস্কানি কাজ করেছে অকপটে তারই অনুসন্ধান এবং কঠোর হাতে সেই সব ঘৃণ্য অন্তর্ঘাতকদের দমন করা।

গত ২৫শে তারিখে একটি 'বিজয়ী' (খেলাধুলা) ছাত্র শোভাযাত্রার ওপর অতর্কিত আক্রমণ থেকেই হাঙ্গামার সূত্রপাত। আক্রমণকারীরা দলবদ্ধভাবে প্রস্তুত ছিলেন এবং সুবিধা মত একটি উপাসনাস্থলের সামনে তাঁরা তাঁদের পরিকল্পনা কার্যকরী করেন। সঙ্গে সঙ্গে দুটি ব্যাঙ্ক ভবনে অগ্নিসংযোগও করা হয়। দোকান-বাজারে লুঠতরাজ চলে ত্বরিত তৎপরতায়।

ঘটনাবলী লক্ষ্য করে বোঝা যায়, এই হাঙ্গামার পিছনে যাঁরা সক্রিয় তাঁরা অত্যাচারী এবং লুঠেল, লুঠতরাজ তাঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য। সমাজবিরোধী লুঠেল সমাজ হাঙ্গামা সৃষ্টি করে অবাধে তাঁদের কাজ গুছিয়ে নিয়েছেন।

হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র নাগরিক-দের সাহায্যার্থে মুখ্যমন্ত্রীর তহবিল থেকে পনের হাজার টাকা মঞ্জুরের সিদ্ধান্ত অভিনন্দনযোগ্য। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী আর এন সিং দেও জানিয়েছেন, লুণ্ঠিত মাল পুনরুদ্ধারের জন্য স্পেশাল স্কোয়াড নিযুক্ত করা হচ্ছে এবং উপদ্রুত এলাকায় পিটুনি কর বসানোর সিদ্ধান্ত সঠিক। কিন্তু পিটুনি করটা যে নির্দোষ শান্তি-প্রিয় নাগরিকদেরই স্কন্ধে চাপবে। একে তো হাঙ্গামার দরুণ দারুণ দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন তাঁরা। তার ওপর আবার তাঁদের ঘাড়ে এই বোঝা কেন? দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব সরকারের। দীর্ঘকালের সরকারী অকৃত-কার্যতা আজ দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির দুঃসাহসের কারণ। এ জন্য নিরীহ নাগরিকদের ওপর করভার চাপানোর অর্থ সরকারী অপদার্থতা সাধারণের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিং দেও এই ব্যাপারটি পুনর্বিবেচনা করলে তাঁর সরকার আপন অক্ষমতা অপরের ঘাড়ে চাপানোর দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন।

শ্রী সিং দেও প্রসঙ্গত বলেছেন, শ্রীযুত বিজু পট্টনায়ক ছাত্র-সংযমের প্রশংসা করেছেন বটে, কিন্তু বিনানুমতিতে শোভাযাত্রা বার করার জন্য তাদের তিরস্কার করেন নি।

শ্রী সিং দেও-র বক্তব্যের নেপথ্যে আমাদের সেই চিরাচরিত দুর্বল রাজ-নীতির পরিচয়ই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না থাকলে অনেক ক্ষেত্রে যা তিরস্কারযোগ্য বলে মনে না হয়, সরকারে প্রতিষ্ঠিত থাকলে সেই অবস্থাতেই গুলী চালনার হুকুম দিয়ে থাকেন নেতারা। ক্ষমতার মোহ এইভাবে দেশকে ভ্রান্তপথে পরিচালনা করে হাঙ্গামা-হুজ্জোত এবং শৃঙ্খলাহীনতার প্রশ্রয় দিয়ে যায় বহু ক্ষেত্রে। দূষিত রাজনীতি থেকে এই মনোভাব পরিত্যক্ত না হলে সরকার যাঁর হাতেই থাক তিনিই বেসামাল বোধ করবেন। এবং মনে রাখতে হবে, গণতন্ত্রে সরকার কোনো না কোন সময় কারও না কারও হাতে আসবেই, যদি সুস্থ গণতন্ত্র টিকে থাকে এবং সরকার হারানোর ফলে হিংসা ও দ্বেষ যদি তীব্র না হয়।

(৩০-১১-৬৮)

আন্তর্জাতিক

...জাঞ্চন দিয়ে ফ্রাঁর মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে পারবেন কি দ্য গল?

ফ্রান্স।

...শুধু একজন। এবং তিনি ... যিনি আগেও বহু গুরুত্ব-... বন্ধুদের সঙ্গে এক মত হতে ... ফ্রান্সের সেই দ্য গল। প্রেসি-ডেন্ট চার্লস দ্য গল আর একবার প্রমাণ করেছেন যে, সাধারণ লোক যে পথে চলেন, তাঁর সে-পথ নয়। সকলেই যখন ধরে নিয়েছে যে, ফ্রাঁর অবমূল্যায়ন অবধারিত, তখন তিনি বজ্রমুষ্টি তুলে ঘোষণা করলেন যে, তাঁর মুদ্রামূল্যের হ্রাস করার বান্দা তিনি নন।

অক্টোবরের শেষভাগ থেকে সারা ইয়োরোপের মুদ্রার বাজারে যে সঙ্কট দেখা দেয় তা নভেম্বর মাসে চরমে ওঠে। পশ্চিম ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজধানীতে দেখা গেল ফাটকাবাজরা ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে লাইন দিয়ে ফরাসী মুদ্রা ফ্রাঁ ফেরৎ দিচ্ছেন সোনা অথবা পশ্চিম জার্মানীর মার্কের বদলে। দু সপ্তাহ মধ্যে যখন দেখা গেল যে, ৪০০ কোটি ফ্রাঁ ব্যাঙ্কে ফেরৎ এসেছে তখন সঙ্কটের গুরুত্ব সম্পর্কে কারো মনে কোন সন্দেহ রইলো না। ফাটকাবাজরা যখন ফ্রাঁর বদলে পাউন্ড বা ডলার নিতেও রাজী হলেন না তখন বোঝা গেলো যে, এ দুটো মুদ্রার স্থায়িত্ব সম্পর্কেও তাদের আস্থা নেই, তারা চায় প্রধানত পশ্চিম জার্মানীর মুদ্রা—ডয়েটস্ মার্ক।

এ ওলট-পালট হলো কেন? ফ্রাঁই বা কেন অপাংক্তেয় হলো আর মার্কই বা কুলীন হলো কী করে? জার্মান মুদ্রার এ উন্নতির পেছনে অবশ্যই আমেরিকা, বৃটেন এবং ফ্রান্সের পিঠ চাপড়ানি রয়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত পশ্চিম জার্মানীকে সোভিয়েট পুনর্গঠিত এবং আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনতে গিয়ে পশ্চিমী বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি তাকে অবাধ সুযোগ দিয়েছে। আমেরিকা, বৃটেন ইত্যাদি দেশ পশ্চিম জার্মানীর শিল্পায়নের জন্যে যেভাবে দু-হাতে টাকা ঢেলেছে তার কোনো সাম্প্রতিক তুলনা নেই। পশ্চিম জার্মানীর উৎপাদন এবং পুঁজি এবং মুনাফা হু হু করে বেড়ে যেতে লাগলো। কিন্তু অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের বিনিময়ে জার্মানদের বিদেশে কোনো অর্থলগ্নী করার দায়বন্ধন ছিল না। পশ্চিম জার্মানীর শিল্পদ্রব্যের রপ্তানী অবিশ্বাস্য হারে মানে শতকরা ৮০ ভাগ থেকে শতকরা ৯০ ভাগ হয়ে গেলো। রপ্তানী বাড়ানোর জন্যে সরকারী সুবিধাও দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে তার আমদানীর পরিমাণ ক্রমেই সঙ্কুচিত হতে থাকলো। ফলে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনের তুলনায় মার্কের সরকারী মূল্য অনেক কম হয়ে গেলো, এমন কি ডলার পাউন্ড এবং ফ্রাঁর তুলনায় জার্মান মার্ক সস্তা দেখা গেলো। এতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলো ফ্রাঁ, কিন্তু অন্যান্য দেশের মুদ্রাও সেহেতু ইজ্জৎ হারাতে লাগলো, তখন আমেরিকা, বৃটেন এবং ফ্রান্স দাবি জানালো জার্মান মার্কের পুনর্মূল্যায়ন হোক, অর্থাৎ তার সরকারী মূল্য বাড়িয়ে দেওয়া হোক রপ্তানী কমিয়ে আমদানী বাড়ানো হোক। কিন্তু যে পশ্চিম জার্মানী আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্সের স্নেহপুষ্ট হয়ে বেড়ে উঠেছে, সে জার্মানই তাদের মুখের ওপর জানিয়ে দিলো যে, মার্কের মূল্যবৃদ্ধি করতে সে রাজী নয়। আর্থিক সমৃদ্ধির দিক থেকে যে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে সে রাজনীতির ক্ষেত্রেও দুর্বল থাকতে চাইলো

না। ফ্রাঁর সঙ্কট উপস্থিত হলো সে জন্যেই।

প্রেসিডেন্ট দ্য গল অবশ্য বলেছেন যে, গত মে-জুন মাসে ছাত্রদের ক্রুদ্ধ বিপ্লবের ফলে দেশের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছে, মজুরীবৃদ্ধি তার প্রধান কারণ। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ব্যয়বৃদ্ধি ইত্যাদিও সরকারী স্বর্ণ তহবিলে টান ধরিয়েছে। বাস্তবিক আমেরিকা, বৃটেন, জাপান, পশ্চিম জার্মানী সহ প্রায় সব বন্ধুরাষ্ট্রেই ধরে নিয়েছিলো যে, ফ্রাঁর ডিভ্যালুয়েশন বা মূল্যহ্রাস ছাড়া দ্য গলের বাঁচার আর কোনো পথ নেই। আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, জাপান, ইতালি, কানাডা, বেলজিয়াম, সুইডেন, হল্যান্ড ইত্যাদি দেশকে নিয়ে যে ১০ রাষ্ট্রের সংস্থা (গ্রুপ অফ টেন) [illegible] হয়েছে সে সংস্থাই এক জরুরী [illegible] থেকে সুপারিশ করেছিলো যে, [illegible] মূল্য শতকরা ১০ ভাগ থেকে ১৪ [illegible] কমিয়ে দেওয়া হোক। [illegible] না দিলে ১০০ [illegible] [illegible] নাভিশ্বাস [illegible] ফ্রাংসের এ [illegible] অবশ্যই [illegible] এবং [illegible] প্রতিশ্রুতি [illegible]। দশটি রাষ্ট্রের সংস্থা [illegible] ২০০ [illegible] সাহায্য এবং [illegible] রপ্তানী [illegible] আশ্বাসও [illegible]। অর্থাৎ [illegible] তৈরি [illegible] ঘোষণা [illegible]নই দ্য গল তাঁর লুকোনো বোমাটি [illegible] পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন যে, ফ্রাঁর মূল্যহ্রাস করা হবে না। সকলেই এ ঘোষণায় হতবাক, কেউ তো তৈরি ছিলেন না একথা শোনার জন্যে, বরং দ্য গল নতজানু হয়ে বন্ধু-রাষ্ট্রগুলোর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবেন, এ দৃশ্যটি দেখার জন্যই তৈরি হয়ে ছিলেন তাঁরা।

দ্য গল বলেছেন যে, প্রতিরক্ষা, সরকারী প্রশাসন ইত্যাদিতে ব্যয়-সঙ্কোচ করে সঙ্কট কাটিয়ে ওঠা হবে, মজুরী হ্রাস করা হবে না। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-গুলিতেও অনুদান কমিয়ে দেওয়া হবে, বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ, বিদেশী ফরাসীদের ব্যয় সঙ্কোচ ইত্যাদি কার্যক্রমের কথাও বলা হয়েছে। যদিও দ্য গলের শক্তি সম্পর্কে কারো মনে কোনো সন্দেহ নেই, তবু অনেকেই মনে করেন যে, গোঁজামিল দিয়ে তিনি ফ্রাঁর মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!

পাকিস্তান :

ক্ষমতাগর্বী জঙ্গীশাসকের এবার

সাপ্তাহিক বসুমতী
উত্তরবঙ্গের বন্যাত্রাণ কমিটির তহবিলে দান
(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

১০৪·৯২ টাকা : ডে স্টুডেন্টস্ হোম, ১৭, শরৎ বসু লেন, কলকাতা-৫১।

৬১·০০ টাকা : মিনার্ভা ব্যায়াম সমিতি, নৈহাটি। এঁরা পুরনো কাপড়-চোপড়ও দিয়েছেন।

৪০·৬১ টাকা : শিবপুর কিশোর সংঘ। এঁরা কালীপুজোর খরচ কমিয়ে এই টাকাটা দিয়েছেন।

৩০·০০ টাকা : 'শিশু ভবন' এর (অনাথ-ভবন) ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ, ৩০, অশোক এভিনিউ, কলকাতা-৪০। এছাড়া এরা ১০ কে-জি চাল ও ২ কে-জি ডাল দিয়েছে।

১০·০০ টাকা : ১টি ব্রীজ প্রতি-যোগিতার উদ্বৃত্ত অর্থ এই দশ টাকা দাস-পাড়া, করিমগঞ্জ (আসাম) থেকে শ্রীহরি আনন্দ দাস পাঠিয়েছেন।

প্রত্যেকে ৫·০০ : শান্তিপ্রিয় বন্দ্যো-পাধ্যায়, টাকী (২৪ পরগনা)। জ্ঞান দত্ত, মানসবাগ, বেলঘরিয়া (২৪-পরগনা)। এ মিত্র, হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলকাতা।

প্রত্যেকে ২·০০ টাকা : জে এ পল, লিলুয়া। আনন্দ সেন, লিলুয়া। বগলাচরণ দে, লিলুয়া। সমীর-কুমার মিত্র, বেলুড়। রবীন্দ্রনাথ সেন লিলুয়া। সুবিমল মুখার্জী, লিলুয়া। অনিলকুমার মন্ডল, জোগ্রাম, বর্ধমান। ফণিভূষণ সেন, লিলুয়া। চিত্তরঞ্জন দাঁ, লিলুয়া। শ্রীচ্যাটার্জী ও শ্রীদে, লিলুয়া ওয়ার্কশপ। শ্রীআচার্য ও শ্রীব্যানার্জী, লিলুয়া ওয়ার্কশপ। প্রমোদ-রঞ্জন সরকার, বেলুড়। অপরেশ মিত্র, রাধানগর, বর্ধমান। এস সেনগুপ্ত, হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলকাতা। অনিল-কুমার সেন, হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কল-কাতা। নিরঞ্জন সাহা, কলকাতা-৫৫। কালিবিহারী বন্দোপাধ্যায়, কলকাতা-৬। বিভূতি ভট্টাচার্য, কলকাতা-৫৫।

অন্যান্য জিনিসপত্র :

বহুলা শশী স্মৃতি হাইস্কুলের (বর্ধমান জেলা) প্রধান শিক্ষক শ্রীগণেশচন্দ্র দত্ত তাঁর বিদ্যালয় থেকে সংগৃহীত কিছু পাঠ্যপুস্তক রেলওয়ে পার্শেলযোগে পাঠিয়েছেন।

ডিব্রুগড থেকে আসাম মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র শ্রীঅসীম-রঞ্জন দাস পুরনো বস্ত্রাদি পাঠিয়েছেন।

টিটাগড় বিবেকনগরের স্বামীজি বিদ্যামন্দিরের (প্রাথমিক বিদ্যালয়) ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ চার প্যাকেট খাতা দিয়েছে।

[ক্রমশঃ]

হৃৎকম্প সুরু হয়েছে। তাঁর মাস-পয়লা বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ ঘোষণা করেছেন যে, ছাত্রদের মূল দাবি মেনে নিতে তিনি রাজী আছেন। অর্থাৎ ছাত্ররা গত কয়েকদিন ধরে আন্দোলন করছিলেন যে, রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অপরাধে ছাত্রদের ডিগ্রি কেড়ে [illegible] যে আদেশ পাক সরকার দিয়েছিলেন তা প্রত্যাহার করা হোক তাঁর ছাত্র আন্দো-লনের বিস্ফোরণের মুখে আয়ুব খাঁ শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করেছেন, তিনি বলেছেন যে, সরকারী আদেশটি প্রত্যাহার করা যায় কি না তিনি বিবেচনা করে দেখবেন। তবে পরীক্ষার পাশের শতাংশ হার কমানোর দাবিটি তিনি গ্রাহ্য করেন নি।

আয়ুব খাঁ ভাঙবেন, তবু [illegible] না। ছাত্রদের দাবি মেনে নেবার [illegible] তিনি বলতে ছাড়েন নি যে, তাঁরা [illegible] চালিত হচ্ছেন, দেশে বৈপ্লবিক [illegible] বর্তন আনতে চাইছেন। এবং এ [illegible] তিনি রাজনৈতিক [illegible] উপদেশে [illegible] হাত দিতে চেষ্টা করছেন। [illegible] তিনি অভিযোগ করেছেন যে বাম[illegible] নেতারাই তরুণ ছাত্রদের মাথা খাচ্ছেন [illegible] হিংসাত্মক আন্দোলন উসকে [illegible] ইত্যাদি। প্রেসিডেন্ট আয়ুব [illegible] দিয়েছেন যে, কোনরকম অরাজকতা [illegible] সহিংস আন্দোলন [illegible] না। তাঁর মতে বামপন্থী নেতারা হিংসা ছাড়া দেশকে আর কিছুই দিতে পারেন না। তিনি মনে করেন, ১৯৫৮ সালে "বিপ্লবের" মধ্য দিয়ে যে সরকারের পত্তন তিনি করেছিলেন সে সরকারই দেশে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব এনেছেন দেশকে প্রগতির পথে এগিয়ে দিয়েছেন। বাম-পন্থীরা দেশকে অরাজকতার দিকে ঠেলে দিতে চাইছেন বলেই ভুট্টো, ওয়ালি খাঁ ইত্যাদি নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে তিনি সাফাই দিয়েছেন।

তবে ভুট্টো এবং অন্য বামপন্থী নেতা দের তিনি কতদিন বিনা বিচারে কারান্তরালে বন্দী রাখতে পারবেন, তা নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ পাকি-স্তানের দুটো অংশেই যে স্বতঃস্ফূর্ত গণ-আন্দোলনের জোয়ার এসেছে এমন দৃশ্য এখানে অভূতপূর্ব। এবারকার আন্দো-লনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সহজেই রাজ-নৈতিক নেতা এবং সাধারণ মানুষকে যুগপৎ আকর্ষণ করেছে। ধৃত বামপন্থী নেতাদের মুক্তির দাবিতে এবার কেবল ছাত্ররাই সোচ্চার নন, পাকিস্তানের আইন-জীবীরা পর্যন্ত মিছিল শোভাযাত্রা করে ছেন সরকারী নিপেষণের প্রতিবাদ জানিয়ে। আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো রাওয়ালপিণ্ডি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে

এই প্রথম ছাত্রীরা বিক্ষোভ-শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেছেন।

ছাত্র-আন্দোলন বিদ্যুৎগতিতে শহর থেকে শহরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। করাচী, রাওয়ালপিণ্ডি, পেশোয়ার, ঢাকা, চট্টগ্রাম—পাকিস্তানের দুটো অংশেই ছাত্র-বিক্ষোভ দিনকে দিন প্রবল হচ্ছে।

ছাত্ররা আয়ুবের স্বরূপ আগেই বুঝতে পেরেছিলেন, আয়ুবের বিরুদ্ধে আওয়াজও তাঁরাই আগে তুলেছিলেন। এবার কিন্তু তাঁরা একক শক্তিতে আয়ুবের সংগে পাঞ্জা কষতে অগ্রণী হন নি, তাঁদের পেছনে রয়েছেন প্রাক্তন এয়ার মার্শাল আসগর খাঁ। বস্তুত পাকিস্তানের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আসগর খাঁর আবির্ভাবের পর এখানকার বামপন্থী আন্দোলন একটা নতুন দিকে মোড় নিয়েছে, আন্দোলনও জোরদার হয়েছে। পাকিস্তান টাইমস-এর সম্পাদক সম্প্রতি এক স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পরিষ্কার লিখেছেন যে, রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আসগর খাঁর আত্মপ্রকাশের পর পাকিস্তানের একটা জরুরী প্রশ্নের—'আয়ুবের পর কে?' সমাধান হয়ে গিয়েছে। আসগর খাঁকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বলে মেনে নিতে কারোর আপত্তি হবে না। আসগর ছাড়া পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রাক্তন জজ মেহবুব মুরশেদও সম্প্রতি আয়ুব খাঁর স্বৈরাচারী শাসনের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ঘোষণা করেছেন যে, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে আনার জন্যে তিনি লড়াই করতেও পিছু-পা হবেন না। মুরশেদ একথাও বলেছেন যে, তিনি বামপন্থী আন্দোলনে যোগ দেবেন।

আসগর খাঁ এবং মেহবুব মুরশেদ কোন রাজনৈতিক দলের সংগে কখনো যুক্ত ছিলেন না। এখনো কোন দলে যোগদান করার কথা বলেন নি। তবে এ দুজন নেতাকে পেয়ে যদি আয়ুব-বিরোধীরা একজোট হতে পারেন, তবে আগামী বছরের নির্বাচনে আয়ুব খাঁর পক্ষে গদি বাঁচানো দুরূহ হবে।

ভিয়েৎনাম ঃ

কেবল প্রেসিডেন্ট আয়ুবই নন, রাজী প্রেসিডেন্ট থিউও। প্যারিসের সম্প্রসারিত শান্তি আলোচনায় সায়গন সরকারের প্রতিনিধি পাঠাতে শেষ পর্যন্ত সম্মত

প্রেসিডেন্ট থিউ

হয়েছেন থিউ। প্রেসিডেণ্ট জনসনের ৩১শে অক্টোবরের ঘোষণা অনুযায়ী চতুঃশক্তি সম্মেলনটি সুরু হবার কথা ছিল ৬ই নভেম্বর, কিন্তু প্রধানত জাতীয় মুক্তি-ফ্রন্ট প্রতিনিধিদের সংগে এক টেবিলে বসতে থিউ রাজী ছিলেন না বলেই এতদিন আলোচনা বসতে পারে নি, ২৭ দিন ধরে একটা অস্বস্তিকর অচলাবস্থা গিয়েছে। উত্তর ভিয়েৎনাম কিম্বা জাতীয় মুক্তি-ফ্রন্টের কাছ থেকে তো পরোক্ষভাবে, প্রত্যক্ষ চাপ এসেছিল খোদ মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের কাছ থেকে যে থিউ যেন শান্তি বৈঠকে প্রতিনিধি পাঠানোর বিষয়ে আর গড়িমসি না করেন।

প্রেসিডেন্ট থিউ আশা প্রকাশ করেছেন যে, ১০ দিনের মধ্যেই শান্তি আলোচনা সুরু হতে পারবে। তিনি এর জন্যে ভাইস প্রেসিডেন্ট কাও কাইকে প্রতিনিধি দলের নেতাও মনোনীত করেছেন। কিন্তু যেহেতু কাও কাইকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করেন না, সেহেতু তাঁকে আলোচনায় নেতৃত্ব করা বা অংশ গ্রহণ করার দায়িত্ব দেন নি, তিনি কেবল প্রতিনিধি দলকে পরামর্শ ও উপদেশ দেবেন।

কিন্তু মুখে ১০ দিনের মধ্যে আলোচনা সুরু করার আশা প্রকাশ করলেও বা প্রতিনিধি দল পাঠাতে সম্মতি জানালেও সে আলোচনা আদৌ থিউর শর্তানুযায়ী সুরু হবে কি না সে বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কারণ, প্রেসিডেন্ট থিউ এখনো তাঁর মূল যুক্তিতে অনড় রয়েছেন। অর্থাৎ তিনি বলেছেন যে, জাতীয় মুক্তি-ফ্রন্টের প্রতিনিধিরা হ্যানয় প্রতিনিধিদের সংগে আলোচনায় অংশ নিতে পারেন, তাঁদের আলাদা অস্তিত্ব তাঁর সরকার স্বীকার করবেন না, কিম্বা দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কোয়ালিশন সরকার গঠনের প্রস্তাবও তাঁর ওপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। প্রেসিডেন্ট থিউ একথাও বলেছেন যে, আলোচনায় তাঁর মিত্রপক্ষের হয়ে সায়গন সরকারই নেতৃত্ব করবেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়।

বিস্ময়ের বিষয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সায়গনের দাবি শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছে সে দাবি যতই অযৌক্তিক হোক না কেন। ওয়াশিংটন থেকে একথাও বলা হয়েছে যে, শান্তি আলোচনা প্রধানত দুপক্ষে হবে, এক পক্ষের নেতা সায়গন, অন্য পক্ষের নেতা হ্যানয়, এবং মুক্তি-ফ্রন্ট হ্যানয় প্রতিনিধি দলেরই একটা অংশ মাত্র। অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট জনসন তাঁর ৩১শে অক্টোবরের ঐতিহাসিক ভাষণে যে চতুঃশক্তি বৈঠকের কথা বলেছিলেন তাকে সুবিধেমতো ভুলে যাওয়া হয়েছে।

মুক্তি-ফৌজের নেতা মিসেস ডুয়েন থি বিন বলেছেন যে, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের এক-মাত্র প্রতিনিধি মুক্তি-ফৌজ, শান্তি আলো-চনায় অংশ গ্রহণ করার কোনো এক্তিয়ারই সায়গন সরকারের নেই, কারণ সে সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই হাতে-গড়া পুতুল সরকারমাত্র। এ বিবৃতির মধ্যেই মুক্তি-ফৌজের ক্রোধ প্রশমিত হয় নি। মুক্তি-ফৌজের সামরিক কর্তৃত্ব সায়গন সরকারকে চারদিক থেকে আক্রমণ হেনে ধ্বংস করে দেবার আদেশও দিয়েছেন। বাস্তবক্ষেত্রেও কাম্বোডিয়ার সীমানা বরাবর এবং দানাং, সায়গনে প্রচণ্ড লড়াই সুরু হয়ে গেছে।

হ্যানয় বেতারেও ঘোষণা করা হয়েছে যে, জাতীয় মুক্তি-ফৌজ দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ১৭টি প্রদেশ, ৫টি শহর, ৩২টি উপনগরী এবং ১৭০০ গ্রামে বিপ্লবী প্রশাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। দেশের দুই-তৃতীয়াংশই মুক্তি-ফৌজের দখলে চলে গিয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর মার্কিন সাহিত্য

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

৭। মার্কিন নাটক : ১৯০০—৫০

প্রথম মহাযুদ্ধের আগে থেকেই ইউজীন ও'নীল (১৮৮৮—১৯৫৩) লিখতে শুরু করেছিলেন। ফ্র্যাংক নরিস, থিওডোর ড্রাইজারের উপন্যাসে যে সমাজবাস্তবতা ও অর্থনীতিসচেতন জীবনদৃষ্টি ততদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, সেই ধারাই নাটকে এল। নিজেরই সমুদ্রজীবনের স্মৃতি থেকে রচিত প্রথম দিকের একাংক নাটক ও মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'এ লঙ ডেজ্ জার্নি ইনটু নাইট', মধ্যেকার দীর্ঘকাল ব্যবধান সত্ত্বেও এই দুই পর্বের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। কিছু মানুষ ও সমাজের কোন বিশেষিত পরিবেশে তাদের জীবনকে বিশ্লেষণ করে যাবার প্রয়াসই ও'নীলের নাট্যকর্মের মুখ্য প্রয়াস ছিল। ১৯১৬ সালে প্রভিন্সটাউন প্লেয়ার্স নামে এক নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁদের স্বল্পসংখ্যক দর্শকদের রুচি, ভালো লাগা না লাগা ও গ্রহণক্ষমতার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ও'নীল লাভ করেছিলেন। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী এই দর্শকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় ও'নীলের নাট্যকর্ম বিকাশলাভ করে। 'দি এমপারার জোনস্' নাটকেই ও'নীল প্রথম অন্য ধরণের নাটকীয়তার সন্ধানে সচেষ্ট হন। কোন বিশেষ সামাজিক পরিবেশে সীমিত বিশেষ কোন জীবন-ধারা তুলে ধরার চেষ্টা এখানে নেই। এক পলাতক নিগ্রো এক আফ্রিকান দ্বীপে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে স্বৈরাচারী শাসন চালিয়ে একদিন উপলব্ধি করে, দেশের মানুষ তার পাশ থেকে সরে গিয়ে তারই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। সে জঙ্গলের দিকে পালায়; কিন্তু জঙ্গলের মধ্যেই ঘুরতে ঘুরতে সে জঙ্গলের কিনারেই ফিরে আসে, যেখানে তার প্রতিপক্ষ অপেক্ষমাণ। এই নিশীথ অভিযানে তার সামনে এসে দাঁড়ায় সেই অতীত যে অতীত তাকে জন্ম এনে দিয়েছিল, আবার আজ অশান্ত করে দিল—"ছোট ছোট অগঠিত ভয়", তারই হাতে নিহত ব্যক্তি, ক্রীতদাস বেচা-কেনার হাটের স্মৃতি। পরের নাটক ধরে একটা প্রবল ত্রাস গড়ে ওঠে; দূর থেকে ক্রমাগত মাদলের আওয়াজ আসে। সেই মাদলের আওয়াজে দূর-নিকট ভেদ ধরা পড়ে, তাল বদলায়। মঞ্চে একটি-মাত্র মানুষ ও তার স্বগতভাষণ। এতদিন পর এই আত্মতৃপ্ত মানুষটি তার নিজের সত্য পরিচয় সন্ধানে আগ্রহী হয়েছে। কিন্তু এতদিনে বড় দেরি হয়ে গেছে। 'দ হেয়ারি এপ' নাটকেও প্রায় একই সংকট। সমুদ্রগামী জাহাজের 'স্টোকার' ইয়্যাংক স্মিথ এতদিন নিজের সামর্থ্য ও উপযোগের ভরসায় নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু মিলড্রেড ডগলাস নামে এক যাত্রিণী

ইউজীন ও'নীল

তাকে দেখে আঁৎকে ওঠে, "কদর্য পশু" বলে চিৎকার করে উঠে অজ্ঞান হয়ে যায়। ইয়্যাংকের আত্মবিলাস হঠাৎ ভেঙে পড়ে, সবকিছু যেন তার মুঠি থেকে খসে যায়। ক্রমে সবাই যেন তাকে "কদর্য পশু"-ই ভাবতে থাকে। শেষ দৃশ্যে চিড়িয়াখানায় এক গোরিলার খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে তাকেই সম্বোধন করে ইয়্যাংক বলে : "তুই তোর অতীতে, সবুজ বনে, জঙ্গলে স্বপ্নে মত্ত ফিরে যেতে পারিস। তুই তারই অংশ।... কিন্তু আমার তো অতীত নেই, যা আসবে তাও আমার নয়—আমি তো কিছুর মধ্যে নেই। একটা নতুন আত্মীয়তার লোভে ইয়্যাংক গোরিলাটার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, জন্তুটা হঠাৎ ক্ষেপে উঠে তাকে জাপটে ধরে তাকে গুঁড়িয়ে ফেলে। নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রিকায় ও'নীল (১৬ নভেম্বর, ১৯২৫) লেখেন : "এটা সেই পুরনো প্রতীক, যে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে তার আদি [illegible] যোগ হারিয়েছে, যে যোগ সে একদা লাভ করেছিল তার পশুসত্তায়, অথচ আজও পেল না তার গভীর মননে। অতীতের নাটকে লড়াইটা ছিল দেবতাদের সঙ্গে এখন তার নিজেরই সঙ্গে, তার নিজের অতীতের সঙ্গে তার 'আত্মীয়তায় অঙ্গীভূত হবার' চেষ্টার সঙ্গে।" ও'নীল নিজেই এই নাটকটিকে 'দি এমপারার জোনস্'-এর প্রত্যক্ষ উত্তরসূরি বলে বর্ণনা করেছেন।

১৯২৯ সালে জর্জ ন্যাথানকে লিখিত পত্রে ও'নীল লেখেন, তিনি চান, "বর্তমানকালের যে ব্যাধির অস্তিত্ব আমি অনুভব করি, তারই মূলে আমাকে পৌঁছুতে হবে—প্রাচীন ঈশ্বরের মৃত্যু ঘটেছে, অথচ যে আদিম ধর্মভাব এখনও রয়ে গেছে, বিজ্ঞান ও বস্তুবাদ তাকে কোন নতুন ঈশ্বরের মূর্তি যোগাতে পারে নি যাতে জীবনের একটা মানে খুঁজে পাওয়া যায়, মৃত্যুভয় থেকে সান্ত্বনা পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, আজকের দিনে যে মানুষই বড় কিছু করতে চায়, তাকে তার নাটকের যাবতীয় সূত্র বিষয়ের গভীরে এই বড় বিষয়টিকে স্থান দিতে হবে।" অর্থ-লোভ, ক্ষমতার লোভ একদিকে পুরনো নীতিবোধকে প্রচণ্ড আঘাত করেছে,

দ্বন্দ্ব পুরুষ-নারী সম্পর্কের সর্বোচ্চ সংস্কারগুলির অনড় শাসনে মানুষকে আজও কষ্ট পেতে হয়, এই অসহনীয় মিথ্যাচার, কিম্বা অর্থলোভের চাপে যাবতীয় মানবিক বোধের অবদমন, কিংবা চরিত্রের দ্বৈততাকে গোপন করতে গিয়ে আত্মবিলাস, এমনি নানা বিষয় ও'নীলের 'ডিজায়ার আনডার দি এল্‌ম্‌স্‌', 'ল্যাজারাস লাফ্‌ড', 'মারকো মিলিয়ন্‌স্‌', 'স্ট্রেন্‌জ্‌ ইন্টারলিউড', 'দ গ্রেট গড ব্রাউন' প্রভৃতি নাটকে মুখ্য হয়ে উঠেছে। "বর্তমানকালের ব্যাধির অন্যতম যে মানস-বিকৃতি বহু মানুষকেই প্রায় অপরিচিত করে তুলেছে, তার প্রচণ্ড ক্ষমতা দেখাতে গিয়ে 'দ গ্রেট গড ব্রাউন' ও 'ল্যাজারাস লাফ্‌ড' নাটকে তিনি মুখোস ব্যবহার করেছেন, নাটককে স্বাভাবিকবাদী আখ্যানধর্ম বা বিবরধর্মের স্তর থেকে 'কল্পনানির্ভর নাট্যকলা'র স্তরে উন্নীত করেছেন। চরিত্র-কল্পনায় ও পরিবেশ রচনায় এই দুই নাটকেই তিনি বাস্তবের গদ্যময়তা কাটিয়ে কাব্য-গুণের অর্থ-গভীরতা, ব্যঞ্জনা ও প্রগাঢ়তা লাভ করেছিলেন; নাটক তার সাধারণ জীবনদর্পণ থাকে নি, জীবনের উপকরণ নিয়ে ভাঙা-চোরা করেছে, গুরুত্ব অগুরুত্বের ভেদ নতুন তীব্রভাবে রচনা করেছে। পরে জীবনে 'দি আইসম্যান কামেথ'-এর মত নাটকে যখন তিনি জীবনসদৃশ বাস্তবতায় ফিরে এসেছেন, তখনও ঐ কাব্যগুণেই হিকি-র চরিত্রকে আমাদের আশপাশের চেনা মানুষদের স্তর থেকে অন্য স্তরে পৌঁছে দিয়েছে, অথচ তার সাধারণত্বকেও বিনষ্ট করে নি। মধ্য পর্বের জটিলতর নাট্যকৃতির শিক্ষা শেষ পর্যন্ত তার বাস্তববাদী নাট্যধর্মকেই সমৃদ্ধ করেছিল, আরো তাৎপর্যবহ করে তুলেছিল।

১৯৩৪ ও ১৯৪৬-এর মধ্যে ও'নীল কোন নাটক প্রকাশ করেন নি, তাঁর কোন নতুন নাটক মঞ্চস্থও হয় নি। এই সময়টা মার্কিন নাটকের ইতিহাসে একটা স্বতন্ত্র পর্ব, "ত্রিশের দশকের নাটকে"র অভিধায় চিহ্নিত। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ধাক্কায় বেকারি, দারিদ্র্য ও বিক্ষোভের এই যুগে নাটক স্বভাবতই তাৎক্ষণিকের দাবি মেটাতে সচেষ্ট হয়। জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক দায়িত্ববোধে অনুপ্রাণিত নাট্যচর্চার বিবরণ ততদিনে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে গেছে। 'অ্যাজিট-প্রপ থিয়েটার' অর্থাৎ অ্যাজিটেশন ও প্রপাগ্যান্ডা, বিক্ষোভ ও প্রচারের আদর্শ অনেককেই নাটকের লক্ষ্য বলে ধরেন। এই যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাট্যকার ক্লিফর্ড ওডেট্‌স (১৯০৬—১৯৬৩) পরে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন ও শ্রেণীসংঘাতকে নাটকের মুখ্য বিষয় স্থির করেছিলেন। ও'নীলের ক্ষেত্রে যেমন প্রভিন্‌স্‌টাউন প্লেয়ার্স, ওডেট্‌স্‌-এর ক্ষেত্রেও তেমনি গ্রুপ থিয়েটারের ভূমিকা। গ্রুপ থিয়েটার ছিল উদারমনা বামপন্থার ধারক। ওডেট্‌স্‌-ও সেই রাজনীতি গ্রহণ করেছিলেন। গ্রুপ থিয়েটারের

আর্থার মিলার

অন্যতম পরিচালক হ্যারলড ক্লারমান ওডেট্‌স্‌-এর প্রথম উল্লেখযোগ্য নাটক 'ওয়েটিং ফর লেফটি'-র প্রথম মঞ্চায়নের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন : "মঞ্চ থেকেই জঙ্গী প্রশ্ন শোনা গেল : 'বলুন, কী জবাব দেবেন আপনারা?' দর্শকমণ্ডলী যখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে গর্জন করে উঠলেন, 'ধর্মঘট! ধর্মঘট!' তাতে শুধু নাটকের ক্ষমতাই যে প্রকাশ পেল তা নয়, শুধু যে দর্শকসাধারণের সৃষ্টি-ধর্মী সামাজিক কর্মের আর্তিই প্রমাণ হল তা নয়। ত্রিশের যুগের জন্মের কান্না যেন শোনা গেল। আমাদের যুব-সমাজ যেন তার কণ্ঠস্বর খুঁজে পেল। তার মধ্যে শোনা গেল অর্থনৈতিক ভীতি, মিথ্যাচরণ, নির্বুদ্ধিতা ও লোভের পায়ে নতশির দাসত্ব থেকে মুক্ত পৃথিবীতে পূর্ণতর জীবনের জন্য লড়াইয়ের ডাক। শুধু কিছু বাড়তি বেতন কিংবা কাজের সময় হ্রাসের দাবিতে নয় অধিকতর মর্যাদার জন্য, আরো সাহসিক মানবতার জন্য, মানুষের পরিপূর্ণ সম্মানের জন্য ধর্মঘট—'ধর্মঘট' হল লেফ্‌টির বাণী।" ১৯৩৪-এর ফেবরুয়ারির ট্যাক্সি ধর্মঘটের ঘটনাকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেও একটা সামগ্রিক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ওডেট্‌স্‌ রচনা করতে পেরেছিলেন। 'অ্যাওয়েক অ্যান্ড সিং' ও 'গোলডেন বয়' নাটকে দারিদ্র্য, আশা, ব্যর্থতা, স্বপ্ন ইত্যাদির মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ জীবনবর্ণনাই মুখ্য হয়ে ওঠে; স্বপ্নসাধের কল্পনায় ওডেট্‌স্‌ তেমন মোহ রচনা করতে পারেন না। পরবর্তীকালে ওডেট্‌স্‌ কমিউনিস্ট পার্টি ত্যাগ করেছেন, সরকারের কাছে তাঁর এককালীন কমিউনিস্ট সহযোগীদের নাম জমা দিয়েছেন, নাটকেও হলিউডি জীবনের ছবি আঁকবার অসার্থক চেষ্টা করেছেন। ওডেট্‌স্‌-এর সমকালীনদের মধ্যে এলমার রাইস (১৮৯২—১৯৬৭) 'স্ট্রীট সীন' বা 'কাউনসেলর অ্যাট ল'-এর মত নাটকে শহরের নানা ধরণের মানুষের বৈশিষ্ট্যের নাটক রচনা করেছেন, ঘটনার দিকে যানই নি। ফলে 'স্ট্রীট সীন' তো প্রায় একেবারেই স্থিতীয়। জীবনে তেমন কোন ঘটনা ঘটেই না, এমনি একটা বোধও যেন রাইসের আছে। রাইস অবশ্য 'দি অ্যাডিং মেশিন'-এ প্রতীক-চরিত্র ও প্রতীকায়িত জীবনের মধ্য দিয়ে মানুষ ও যন্ত্র যান্ত্রিকতার সম্পর্ক বিশ্লেষ করেছেন—মিস্টার জিরো বা শ্রীযুক্ত শূন্যও অংক যোগ করবার এক যন্ত্রকে নিয়ে। এই নাটকটিকে প্রকাশবাদী নাট্যরীতির অন্তর্গত বিবেচনা করা হয়। এই নাটকের সঙ্গেই প্রকাশবাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাইস লেখেন, প্রকাশবাদের প্রয়াস নিছক অনুকৃতি পেরিয়ে বাস্তবকে ব্যাখ্যা করা। লেখক ঘটনার তথ্যনিষ্ঠ বিবৃতি না সাজিয়ে তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য দর্শকের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেন। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার তাগিদে নাট্যকার অনেক সময় বিষয়গত বাস্তবকে সম্পূর্ণ পরিহার করে প্রতীক, সংক্ষেপণ ও এমন নানা কৌশল ব্যবহার করেন যা রক্ষণশীলদের কাছে একেবারেই খাম-খেয়ালীপনা মনে হতে পারে।"

সমাজবাস্তবতার এই ধারার মধ্যেই রবার্ট শেরউড (১৮৯৬—১৯৫৫) ও উইলিয়ম সারোয়ানের (১৯০৮—) অবস্থান ওডেট্‌স্‌ ও রাইস থেকে কিছুটা দূরে। শেরউডের 'দ পেট্রিফায়েড ফরেস্ট' ও 'ইডিয়ট্‌স্‌ ডিলাইট'-এর ঘোর নৈরাশ্য বা সারোয়ানের 'মাই হার্ট্‌স ইন দ হাইল্যান্ডস', 'দ টাইম অফ ইয়োর লাইফ', 'দ বিউটিফুল পীপল' নাটকে অনাগরিক সারল্য ও প্রেমধর্মের আবেগবহুল জয়গান এই যুগের দর্শকে

[illegible] [illegible] বোধ হয়। [illegible] স্বকীয় বিচারেও তাঁরা কোন কারণেই গুরুত্ব দাবি করতে পারেন না। বরং সেদিক থেকে থর্নটন ওয়াইলডার (১৮৯৭—) কিছুটা পরীক্ষামূলক চেষ্টা করেছেন। 'আওয়ার টাউন'-এর মত নাটকে ওয়াইলডার স্থান-কালের সাজানো ব্যবস্থা ভেঙে, বিশেষিত মঞ্চপরিবেশ ভেঙে উড়িয়ে দিয়ে, কাহিনীর যান্ত্রিক ক্রমান্বয়তা পরিহার করে নাটকে যে মুক্তি এনেছিলেন, তা সেদিন চমকপ্রদ ঠেকেছিল, এতদিনে সেই স্থানকালের ভাঙচুর আধুনিক নাট্যকলার অংগ হয়ে গেছে। ওয়াইলডার সম্পর্কে হ্যারলড ক্লারম্যান অনুযোগ করেছিলেন, ওয়াইলডার ফুল সাজাতে পারেন ভালো, ফোটাতে পারেন না।

ত্রিশের যুগের নাট্যকার হলেও ম্যাকসওয়েল অ্যানডারসন (১৮৮৮—১৯৬৮) ও এস্‌· এন্‌· বেরমান (১৮৯৩—) একেবারেই অন্য ধরণের নাটক লিখেছেন। অ্যানডারসন কাব্য-নাটকের পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় নিতান্তই সাবেকি মনস্তাত্ত্বিক ধাঁচের কিছু ঐতিহাসিক নাটক লিখেছেন, নিউ ইয়র্কের বস্তিজীবনে প্রতিষ্ঠিত 'উইনটারসেট' নাটকেও বাস্তবচেতনা নিতান্তই শিথিল। তাঁর নাটক পড়ে মনে হয়, কোন মানুষ, কোন শক্তিই ন্যায়-পরায়ণ নয়; অথচ তা নিয়ে কিছু করবারও নেই : একটু সংশয়, একটু অসন্তোষ, একটু বেদনা, এই নিয়েই জীবন কাটিয়ে যেতে হবে! বেরমান হালকা চালে অবস্থাপন্ন উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনের ছোটখাটো রাগ-হিংসা-ভয় নিয়ে তাঁর নাটকে খেলা করেন। 'বায়োগ্রাফি', 'দ সেকন্‌ড ম্যান', 'নো টাইম ফর কমেডি' প্রভৃতি নাটকে তাঁর সংলাপের বুদ্ধিদীপ্ত চাতুরীই এখনও ভালো লাগে।

চল্লিশের দশকের শুরুর দিকেই আর্থার মিলার (১৯১৫—) ও টেনেসি উইলিয়ম্‌স্‌-এর (১৯১১—) জনপরিচিতির সূত্রপাত। দুজনেই এখনও নাটক লিখে চলেছেন, এবং নিঃসন্দেহেই এখনও মার্কিন সাহিত্যের সবচেয়ে সম্মানিত জীবিত নাট্যকার। মিলারের জীবন-দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, তিনি ব্যক্তিমানুষের সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ববোধকে তার পরিবার বা সংসারের মধ্যে তার যে ভূমিকা, তারই সংগে যুক্ত করে দেখেন। তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি নাটকেই তাঁর নায়ককে তিনি উপস্থিত করেন একটি পরিবারের সম্পর্কবন্ধনের মধ্যে। বাইরের সমাজে তার ভূমিকা ও পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কে তার ভূমিকা এক অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে গ্রথিত। 'এ ভিউ ফ্রম দ ব্রিজ' নাটকে এডি, 'অল মাই সান্‌স্‌' নাটকে জো কেলার, 'ডেথ অফ এ সেল্‌স্‌ম্যান' নাটকে উইলি লোম্যান, নিজেদের আত্মীয়-পরিবারের কাছে সত্যকে গোপন করে, ও সেই সত্য গোপনের দাম দিতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে প্রোক্‌টর 'ক্রুসিব্‌ল্‌' নাটকে তার পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালনের অটল সংকল্পে সত্যের দাম রাখে, নিজের প্রাণের বিনিময়েও। নিজের কাছে সৎ থাকার এই চেষ্টায় মানুষ যত বাধারই সম্মুখীন হয়, সেই সব বাধাই মিলারের প্রতিপক্ষ। মিলার তাদের বরাবর আঘাত করেন—কখনও ফ্যাসিবাদ, কখনও কমিউনিস্টনির্যাতন, কখনও জাতিবিদ্বেষ, কখনও হয়ত নিতান্তই বাস্তবপরাঙ্মুখতা। নায়কের মনের

টেনেসি উইলিয়ম্‌স্‌

স্বচ্ছন্দ সাবলীল স্থানকালবিহার দেখাতে গিয়ে 'আফটার দ ফল' নাটকে মিলার যেভাবে নাটকের চিরাচরিত রূপকে ভেঙে অবাধ প্রবাহ রচনা করেছেন, 'ডেথ অফ এ সেল্‌স্‌ম্যান' নাটকেই তার সম্ভাবনার প্রথম ইংগিত পাওয়া গেছল। এ বছরের 'দ প্রাইস' নাটকে মিলার প্রথাগত রূপের মধ্যেই তাঁর পরিবারভিত্তিক সমাজচিন্তার আরেকটি দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন। নাটকের রূপকল্পনায় ও গভীর চিন্তা-শীলতার কারণেই মিলারের গুরুত্ব এত বেশি।

সে-তুলনায় টেনেসি উইলিয়ম্‌স্‌ আবেগে বা উত্তেজনায় দর্শককে সহজেই আকৃষ্ট করার কৌশল জানলেও জীবন-দৃষ্টির অগভীরতায় এখনই ফুরিয়ে যেতে বসেছেন। আবেগের কাছে আত্মসমর্পণে আরো দ্বিধারহিত বলেই উইলিয়ম্‌স্‌-এর নাটকে নারীদের প্রাধান্য। 'দ গ্লাস মেন্যাজেরি' নাটকে লরা উইংসফিলডের একটি পা ঈষৎ পংগু। দৈহিক এই বিকলতা থেকে যে হীনমন্যতা (সিঁড়ির উপর পায়ের ব্রেস-এর আওয়াজটা তার নিজের কানেই মনে হত যেন "বজ্রের গর্জন"—এবং সেইহেতু লজ্জা), সেই হীনমন্যতা ও সংকোচবোধই লরাকে নৈঃসঙ্গে নির্বাসিত করেছে। জিম এসে সেই নৈঃসঙ্গ ভেঙে দেয়, কিন্তু নৈঃসঙ্গ থেকে সে-মুক্তি নিতান্তই সাময়িক; কারণ, জিম যাবার আগে বলে যায়, "আমি বেটির সংগে বেরোই"—জিম আর আসবে না। পংগু দেহ, ক্ষণভংগুর কাচের পুতুলের প্রতি আসক্তি, এক [illegible] গানের সুর, এবং শেষে [illegible] (তাও যেন প্রায় ভবিতব্য, কারণ জিম নির্দোষ)—সব মিলিয়ে এক [illegible] আবেগে লরা দর্শকজনের সহানুভূতি ধরে রাখে। এই সার্বিক [illegible] বজায় রেখেও তাকে ঈষৎ ভেঙে [illegible] জন্যই কিছুটা প্রয়োগকৌশলের [illegible] ব্যবহারের পরামর্শ আছে : পর্দায় [illegible] ম্যাজিক লণ্ঠনের স্লাইড [illegible] বিশেষের তাৎপর্যনির্দেশ, [illegible] নয়তো আঁকা ছবিতে। 'এ [illegible] নেম্‌ড্‌ ডিজায়ার' নাটকেও ব্লান্‌শ [illegible] জীবনব্যাপী ব্যর্থতা ও [illegible] সহানুভূতি বা করুণা আকর্ষণ [illegible]। সে যখন প্রথম তার বোন স্টেলার [illegible] আসে, অন্তঃসত্ত্বা স্টেলাকে দেখে [illegible], এ জীবনে তার বুঝি কিছু [illegible]। কিন্তু ব্লান্‌শ্‌ এসে তাকে নাড়া [illegible], স্টেলা-স্ট্যানলির সম্পর্কের আ[illegible] ব্যাপারটাকে ভেঙে দেয়। প্র[illegible] পড়ে আপাত আত্মতৃপ্ত সং[illegible] গোপন অতৃপ্তি। উইলিয়ম্‌স্‌-সৃষ্ট এই বিকারপীড়িতা নারীদের মধ্যে [illegible] ব্লান্‌শ্‌-ই অন্যদের জীবনযাত্রায় [illegible] বিস্তার করে: অন্যরা নিজেদের [illegible] করে প্রকাশ করেই শেষ [illegible]। উইলিয়ম্‌স্‌ তাঁর একটি নাটকের [illegible] লিখেছিলেন : "ক্রোধ নিশ্চয়ই [illegible], নিশ্চয়ই! কিন্তু ঘৃণা নৈব চ।" [illegible] তিনি ডাক্তারদের উদাহরণ দি[illegible]। ডাক্তারের অপার করুণাধর্ম [illegible] যতই শোভা পাক, সাহিত্যে তা [illegible] রই নামান্তর। সম্প্রতিকালের 'দ [illegible] অফ দি ইগুয়ানা' বা 'দ মিলক [illegible] ডাজ্‌নট্‌ স্টপ হিয়ার এনি [illegible] উইলিয়ম্‌স্‌ নাটকের স্থাপত্যে [illegible] হয়েই কথা ও মুহূর্তের তাৎক্ষণিক মজায় মজেছেন।

মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র—প্রথম খণ্ড : শিশির দাশ : প্রকাশক—গ্রন্থকার, ৩৫, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫। পরিবেশক—সুবোধচন্দ্র ঘোষ (গোবর্ধন প্রেস) ২০৯বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬। মূল্য : বার টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করেছে আজ থেকে একুশ বছর আগে। এর মধ্যে আমাদের জাতীয় সরকারের উদ্যোগে দেশের ইতিহাস, বিশেষ করে স্বাধীনতার জন্য আমাদের সংগ্রামের ইতিহাস লিপিবন্ধ করার আয়োজনও হয়েছে। খুবেই পরিতাপের কথা সরকারী ইতিহাসের ভাষাকার আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ইতিবৃত্ত রচনায় ঐতিহাসিক নিরপেক্ষতার স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেন নি। এই ইতিহাসের মাধ্যমে দেশবাসীকে জানানো হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা এসেছে কেবলমাত্র গান্ধীজীর পরিচালিত অহিংস সংগ্রামের মাধ্যমে। কিন্তু এ ইতিহাস সত্য নয়, সম্পূর্ণভাবে একদেশদর্শী। অবশ্য। শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাসবিহারী বসু, সূর্য সেন, ভগৎ সিং প্রমুখ বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের সংগ্রামের ইতিহাস সরকারী স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে না। একই কথা নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথাও উল্লেখযোগ্য। ইংরাজের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের ইতিহাসের চর্চা বিদেশেও কিছু কিছু হয়েছে এবং সেগুলির মধ্যে রাশিয়ায় প্রকাশিত আধুনিক ভারতের ইতিহাস এই একদেশদর্শিতা বর্জিত।

সুভাষচন্দ্রের জীবনী রচনায় লেখক আধুনিক ভারতের এই অবিস্মরণীয় মহানায়কের জীবনের নানা পর্যায়ের নানা অভিজ্ঞতা অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামে তাঁকে যাঁরা বাধা দিয়েছিলেন তার মধ্যে একদিকে ছিলেন কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী, অপরদিকে বামপন্থী সম্প্রদায়, বিশেষত সি পি আই দল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র সব বাধা অতিক্রম করে তাঁর সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসী গোষ্ঠীর মত প্রচ্ছন্ন ইংরাজপ্রীতি সুভাষচন্দ্রের কোনদিন ছিল না, তাই তাঁরা তাঁকে বরদাস্ত করতে পারেন নি। তৎকালীন সি পি আই নেতৃবৃন্দের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ইচ্ছা অথবা শক্তি ছিল না বলেই তাঁরাও সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা করেছেন।

এসব কারণেই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী করবার জন্য তিনি দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। জীবনের এই অধ্যায়ে তিনি নেতাজীরূপে পরিচিত। অস্থায়ী আজাদ হিন্দ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্রপতি রূপে সুভাষচন্দ্রের কর্মের মধ্যে দিয়ে যে ঐতিহাসিক পুরুষের পরিচয় আমরা পাই তার কোন তুলনা নেই।

সুভাষচন্দ্রের এই জীবনবৃত্তান্ত রচনা করে শিশিরবাবু সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য কাজ করেছেন। বার্লিন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে প্রদত্ত সুভাষচন্দ্রের যে সব বক্তৃতা এই গ্রন্থটিতে মুদ্রিত হয়েছে সেগুলি সামগ্রিকভাবে গ্রন্থটির মান অত্যন্ত বাড়িয়ে তুলেছে। আমরা আশা করি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটিও এমনই সুলিখিত হবে।

নাম তার রূপসী—শ্রীমন্ত। পরিবেশক বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড। ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য : ৩·৫০।

'নাম তার রূপসী' উপন্যাসটি একবার শুরু করলে শেষ না করে ছাড়া যায় না। এর একমাত্র কারণ লেখকের গল্প বলার ভঙ্গিটি মনোরম। এই উপন্যাসে সামাজিক অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতিবাদই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য। রূপো ও সুজয়ের প্রণয় চিত্রটি সমাজের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতাকে ফুটিয়ে তুলবার উদ্দেশ্যে অবতারণা করা হয়েছে। রূপো ও সুজয়ের মিলনের মধ্যে দুস্তর বাধা। তাই সুজয়ের মধ্যে আসে দৌর্বল্য কিন্তু রূপোর স্থির প্রতিজ্ঞা যে সে সুজয়কেই করবে জীবনের সাথী। সামাজিক অত্যাচার, পারিবারিক কলহ এমন কি সুজয়ের অবজ্ঞা কোনটাই তাকে বিচলিত করতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত বলাই ঠাকুরের সাহচর্যে রূপোর মনোবাঞ্ছা পূরণ হল। বলাই ঠাকুর একজন শিল্পী। সে রূপোকে দেখেছিল শিল্পীর চোখ দিয়ে এবং সেজন্যেই তার অন্তরের বেদনা অনুভব করেছিল। সুদাম এই উপন্যাসে একজন 'ভিলেন'। তার অপকীর্তির জন্যই রূপোর জীবনে এসেছে সমাজের চরমতম নির্যাতন। [illegible] নীচ স্বার্থপরতা, হেন কাপুরুষতা আমাদের সমর্থন লাভ করে, এটাই লেখক চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন।

লেখক কঠোর বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়েই এই বইয়ের চরিত্র ও ঘটনাকে রূপদান করেছেন। তাছাড়া রয়েছে লেখকের মানুষ চেনবার অসাধারণ ক্ষমতা। এই উপন্যাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, সামাজিক অত্যাচার-কাহিনী করুণ রসপ্রধান ও মর্মস্পর্শী হয়েছে। লেখকের বিশ্লেষণশক্তি যেমন তীক্ষ্ণ ও অভ্রান্ত লক্ষ্য, তাঁর করুণ রস-সঞ্চার করবার ক্ষমতাও সেই পরিমাণে অসাধারণ।

মর্মকথা : শ্রীকালীপদ মৈত্র : প্রকাশক—শ্রীশেখর মৈত্র, ৭৭, যতীন দাস রোড, কলকাতা—২৯। মূল্য : এক টাকা।

সাধু-মহাপুরুষগণের ও শাস্ত্রগ্রন্থের যে সমস্ত বাণী ও উপদেশ লেখকের অন্তরে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে তারই কিছু অংশ দুটি রচনার মাধ্যমে এই গ্রন্থটিতে প্রকাশিত হয়েছে। মর্মকথা একটি সার্থক রচনা। লেখকের অন্তরে নানা অবস্থায় ঈশ্বর এবং ঈশ্বরানুগ্রহ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জেগেছে এবং তিনি নিজের অন্তরের অন্তস্তলে ডুবেই তার উত্তর খুঁজেছেন। প্রজ্ঞা এবং ভক্তিকে সম্বল করে অগ্রসর হওয়ার ফলে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার মত উত্তর তিনি পেয়েছেন। লেখকের মূল বক্তব্য—'ভগবান সম্বন্ধে একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা না জন্মিলে এবং উহা একটি স্থায়ী ভূমিতে না আনিতে পারিলে পথহারা এবং দিশাহারা হইয়া পড়িতে হয়'—প্রণিধানযোগ্য। ভক্তমহলে গ্রন্থটি উপযুক্ত সমাদর লাভ করবে বলে আমরা মনে করি।

ক্রান্তি—সম্পাদক : বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। দাম : এক টাকা।

প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যাটি মোটামুটি কার্ল মার্ক্স সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। একমাত্র ত্রিদিব চৌধুরীর প্রবন্ধটি ব্যতিক্রম; কিন্তু ঐ লেখাটিও মার্ক্সবাদের একটি সাম্প্রতিক সংকট-চেকোশ্লোভাকিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। এই সংখ্যার মূল্যবান রচনা পল এ বারান এবং জ্যাক লিণ্ডসে-র দুটি প্রবন্ধের অনুবাদ এবং অরবিন্দ চক্রবর্তীর 'মার্ক্স থেকে মাও', দেবব্রত ঘোষ-এর 'মার্ক্সবাদ ও সাহিত্য-চিন্তা' এবং রবীন্দ্রনাথ বসুর 'মার্ক্সবাদ ও ভারতবর্ষ'। অশোক মিত্র-র 'কবিতা বাদ দিয়ে মার্ক্স' একটি ভঙ্গীসর্বস্ব হাল্কা রচনা। এই একটি রচনা ছাড়া পত্রিকার সর্বত্রই পরিশ্রম ও রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

মার্ক্স-কে নিবেদিত বিমলচন্দ্র ঘোষ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের পাঁচটি কবিতা এই সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

১৯৩৬ সালে কংগ্রেসের লখনৌ অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হন পণ্ডিত জহরলাল নেহরু। সুভাষচন্দ্র স্থির করলেন ঐ অধিবেশনে যোগ দিতে ভারতযাত্রা করবেন। সরকারের লিখিত সতর্কবাণী লঙ্ঘন করে, যে কোনো দুর্গতি বহন করবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে তখনো অসুস্থ সুভাষচন্দ্র ভারতযাত্রা করলেন, এবং ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে বোম্বাইয়ে পদার্পণ করা মাত্র তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল।

১৯৩৫-এর ৩রা এপ্রিল প্রথম সাক্ষাতের পরেও রোলাঁ ও সুভাষচন্দ্রের আরও একবার সাক্ষাৎ হয়েছে। রোলাঁ স্বভাবতই তাই সুভাষচন্দ্রের প্রতিজ্ঞা ও তার সম্ভাব্য পরিণতি সম্বন্ধে উদ্বেগ বোধ করেছিলেন। এই সময়কার রোলাঁ-সুভাষচন্দ্র পত্রালাপ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

রোলাঁর চিঠি—

ভিলনাভ, ভিলা ওলগা
২০ মার্চ, ১৯৩৬

প্রিয় সুভাষচন্দ্র বসু,

এইমাত্র আপনার চিঠি আমরা পেলাম। উত্তরও সঙ্গে সঙ্গে দিচ্ছি। আমাদের সহানুভূতি ও স্নেহ-প্রীতি না জানিয়ে আপনাকে বিদায় দিতে পারি না; আপনার সমস্ত বিপদ ও সংগ্রামের মধ্যে তা আপনাকে অনুসরণ করবে। আমাদের ইচ্ছা ও আশার রূপকে আপনি বিশেষভাবে জানেন। আমরা চাই আপনাদের মহান্ দেশ সম্পূর্ণ স্বাধীনতালাভ করুক, এবং সেখানে সামাজিক প্রগতি ঘটুক। এই দুই উদ্দেশ্যসাধনে নিযুক্ত শ্রেষ্ঠ সংগ্রামীদের সঙ্গে আমাদের চিন্তা ও কামনা জড়িত হয়ে রইল। আপনার ভিলনাভের বন্ধুরা পরম অনুরাগে আপনাকে মনে রাখবে, একথা বিশ্বাস করবেন।

আপনার প্রতি অনুরক্ত
রোমাঁ রোলাঁ

সুভাষচন্দ্রের উত্তর—

বাডগাস্টাইন,
মার্চ ২৫, ১৯৩৬

মান্যবরেষু,

২০শে মার্চের পত্রের জন্য আমার গভীর কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করবেন। ঐ পত্রে আমার জন্য বিশেষ বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবাবেগ প্রকাশিত হয়েছে। আমি যে ভিলন্যভে আপনার সঙ্গে দুবার সাক্ষাতের ও সাক্ষাৎকালে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ পেয়েছি, তার জন্য নিজেকে নিরতিশয় সৌভাগ্যবান মনে করি। আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে আপনার ভালো-কামনা যুক্ত রয়েছে, এই বোধ আমার কাছে এবং আমার দেশবাসীর কাছে শক্তি ও প্রেরণার উৎসস্বরূপ। ভারতের সুপ্রাচীন সংস্কৃতি সম্বন্ধে আপনার উপলব্ধি, এবং সমগ্র জগতে সেই সংস্কৃতির বিস্তারে আপনার প্রয়াসের মূল্য আমাদের কাছে অপরিসীম। কিন্তু তারও বেশি মূল্য দিই ভারতের স্বাধীনতার অধিকার সম্বন্ধে আপনার জোরালো প্রচারকে। ভিলন্যভে আনন্দপূর্ণ যে সময় কাটিয়েছিলাম, তার মধুরতম স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

বর্তমানে আমার ভারতযাত্রা স্থগিত রাখার যুক্তিযুক্ততা দেখিয়ে আপনার হয়ে মাদাম রোলাঁ আমাকে যে সব কথা জানিয়েছেন, সে সব কথা নিয়ে আমি গভীরভাবে ভেবেছি। এ ব্যাপারে আপনার ভাবানুভূতির প্রতি আমার পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা আছে; কিন্তু কতকগুলি কারণের জন্য (যেগুলি আমি ভারতীয় সংবাদপত্রের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বিবৃতিতে পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করেছি, যার কপি এই সঙ্গে আপনাকে পাঠাচ্ছি) অবিলম্বে ভারতে প্রত্যাবর্তনকে আমি কর্তব্য মনে করি, তাতে সরকারের ভ্রুকুটি যতই গভীর হোক। এ কথা সত্য, একজনের জীবনের শ্রেষ্ঠ ও সৃষ্টিমূলক সময়টা কারাগারের মধ্যে কাটানোর চেয়ে ট্রাজিক ব্যাপার আর কিছু হয় না, তবু সে মূল্য শৃংখলিত মানুষকে চিরদিন দিতে হয়েছে, ভবিষ্যতেও দিতে হবে।

আপনারা আমার প্রতি যে সহৃদয়তা দেখিয়েছেন, তার জন্য আপনাকে এবং মাদাম রোলাঁকে এই সঙ্গে আমার নিবিড়তম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বিনয়াবনত
সুভাষচন্দ্র বসু

ইউরোপের স্বাস্থ্যনিবাস ছেড়ে সুভাষচন্দ্র ভারতের কারাগারে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন স্বেচ্ছায়, নিজ দায়িত্বে। আমি যে একজন শৃংখলিত ভারতবাসী, তা পুনশ্চ প্রমাণ করবার জন্য। এইকালে রোমাঁ রোলাঁকে তিনি যথার্থই শ্রদ্ধা করতে পেরেছিলেন। কারণ অন্যান্য আদর্শবাদী চিন্তানায়কদের সঙ্গে এঁর তফাৎ দেখতে পেয়েছিলেন। চিন্তা-জগতের মানুষেরা সংগ্রামক্ষেত্র ত্যাগ করে শিল্পের সাহিত্যের বা মিস্টিসিজমের জগতে প্রস্থান করেন—রোলাঁর এই কথাগুলি শুনে সুভাষচন্দ্র নিশ্চয় সবিস্ময়ে ভেবেছিলেন, চিন্তানায়কদের সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত কথাগুলিকে এই মানুষটি এত অব্যর্থভাবে অনুভব করলেন কি করে? ধর্মের রাজ্যে প্রস্থান করেছিলেন অরবিন্দ, রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম মিশিয়ে

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে উগ্র মানসিক বক্রক্ততা বোধ করতে পারেন নি; তার কারণ শুধু এই নয় যে, রবীন্দ্রনাথ বৃহত্তর পৃথিবীতে ভারতবর্ষের মর্যাদাবৃদ্ধি করেছেন, অধিকন্তু তিনি জানতেন, রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে শেষ কথা বলা শক্ত. কবি যে কখন অগ্নিবাণী নিয়ে শান্তি-কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে আসবেন, তা কেউ বলতে পারবে না। তবু ঠিক বর্তমান ক্ষণে তাঁর মনে হয়েছিল, পরাধীন দেশে সাহিত্যিক বা চিন্তানায়কদের যে ভূমিকা হওয়া উচিত তারই সার্থক রূপ রোলাঁর মধ্যেই দেখছেন।

১৯৩৫-৩৬ সালে রোলাঁকে যে-রূপে সুভাষচন্দ্র দেখে এসেছেন, তাঁর সেই রূপ জীবনের শেষ পর্যন্ত (১৯৪৪, ৩০শে ডিসেম্বর) অব্যাহত ছিল বলে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত জানিয়েছেন। যদি তা সত্যই থাকে তাহলে বলতে হবে চির অশান্ত রোলাঁ একটি মতের মধ্যে শান্তি পেয়েছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ইউরোপের এবং রোলাঁর উপর দিয়ে মহাযুদ্ধ বয়ে গেছে। যে সোভিয়েত রাশিয়াকে রোলাঁ শ্রমিক-দুনিয়ার একমাত্র ভরসা মনে করেছিলেন, জার্মানীর আক্রমণে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়েছিল; প্রচণ্ড প্রাণশক্তিতে রাশিয়া সেই ধাক্কা সামলে উঠেছে, রোলাঁ তাও দেখেছেন। এই সমস্ত সমর্থটিতে রোলাঁ অকুণ্ঠে সোভিয়েত-সমর্থক, এ কথা তাঁর বাংলা জীবনীকার বলতে চান।

বিপ্লবোত্তরকালে সোভিয়েত রাশিয়ায় নির্যাতনের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হলে রোলাঁ পূর্ব থেকেই তার প্রতিবাদ করে আসছেন। যেমন ১৯২৭ সালে অ্যানার্কিস্ট-কমিউনিস্টদের মুখপত্র 'লিবা-ত্তে'ইর' পত্রিকা 'রাশিয়ার নির্যাতন' নামে কতকগুলি প্রবন্ধ ছেপেছিল। দেশত্যাগী বিখ্যাত দুই রুশ সাহিত্যিক ইভান বুনিন ও কনস্টানটিন বালমন্টও রাশিয়ার অত্যাচারের বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন রোলাঁকে উদ্দেশ্য করে। রোলাঁ এই-সকলের উপযুক্ত উত্তর দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রাশিয়ায় নির্যাতনের ব্যাপারটা সত্যই ঢেকে রাখা যাচ্ছিল না। জনৈক জার্মান লেখকের মতে, ১৯৩৬ সাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে সব মামলা হয়, তার পর থেকে রোলাঁ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কমিউনিজমের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। উক্ত লেখক জানিয়েছেন, স্টালিনের সন্ত্রাসবাদে রোলাঁ বিচলিত হয়েছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে স্টালিনের কাছে চিঠি লিখেও উত্তর পান নি। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত এই সব তথ্যের প্রতিবাদ করে বলতে চেয়েছেন, শেষ পর্যন্ত রোলাঁ স্বমতে বহাল ছিলেন। হয়ত ছিলেন।

জীবনের শেষ প্রান্তে পৌছে এই চিরযাত্রীও হয়ত মৃত্যুক্লান্তি অনুভব করেছিলেন, কিংবা বিপ্লবের অত্যাচার হয়ত তাঁর কাছে না-বিপ্লবের স্থায়ী শোষণের চেয়ে কম ভয়াবহ মনে হয়েছিল। স্টালিনের অত্যাচারের প্রচারিত বিবরণে তিনি আস্থা স্থাপনও করতে পারেন নি (ক্রুশ্চেভের উদ্‌ঘাটন ও রাশিয়ার স্টালিন-বিতাড়ন আরও বেশ কিছু বছর পরের ঘটনা)। রোলাঁর মনোভাব সম্বন্ধে সকল সংবাদ আমাদের হাতে নেই; তবু শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের গ্রন্থ থেকেও দেখতে পাই রাশিয়ার প্রতি রোলাঁর আশা ও বিশ্বাসকে কতখানি সহিষ্ণু হতে হয়েছিল। ফিনল্যাণ্ড রুশ বোমার আঘাতে চূর্ণ হয়ে গেলেও হয়ত রবীন্দ্রনাথের মত প্রকাশ্যে আর্তনাদ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি; নিজের অপ্রকাশ্য আর্তনাদেরও হয়ত কণ্ঠরোধ করে রেখেছিলেন; এবং তার আগে ১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্ট আত্মরক্ষার জন্য 'দানব' হিটলারের সঙ্গে 'মহামানব' স্টালিন যখন অনাক্রমণ চুক্তি করলেন, 'ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির কাছে যা বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত', তখন 'রোলাঁ চুপ করেই ছিলেন, সোভিয়েতকে নিন্দা করেন নি',—কিন্তু আমরা জানি, যদি কিছুটা রোলাঁকে জেনে থাকি, এত বড় নৈতিক সংকটের সম্মুখীন তিনি খুব কম ক্ষেত্রেই হয়েছেন। মুসোলিনির কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীকে রক্ষা করার ধর্মব্রত যিনি গ্রহণ করেছিলেন, তাঁকেই চুপ করে থাকতে হল এক্ষেত্রে—অবশ্যই এ-বস্তু রোলাঁর নৈতিক মহত্ত্বের উপর 'বজ্রাঘাত'। রোমা রোলাঁ সুভাষ-চন্দ্র নন; ভারতের স্বাধীনতার জন্য সুভাষচন্দ্র নরকে যেতেও প্রস্তুত। স্বাধীনতা-স্বার্থের জন্য হিটলার মুসো-লিনির সঙ্গে চুক্তিতে তাঁর লজ্জা নেই.—সত্যই লজ্জা থাকত, যদি তিনি সাম্রাজ্য-বাদী ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাম্য-বাদী রাশিয়ার সাহায্য পেয়েও জার্মানী ছুটতেন। রাশিয়ার কাছ থেকে সুভাষ-চন্দ্র প্রত্যাখ্যান ভিন্ন আর কিছু পান নি। সুভাষচন্দ্রের নৈতিক মহত্ত্ব এইখানে—সাম্রাজ্যবাদের হন্যে চোখ এড়িয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য পলাতক, সাহায্য ও আশ্রয়প্রার্থী তাঁকে যে-রাশিয়া আশ্বাস বা আশ্রয় দেয় নি, সেই রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধরত জার্মানী ও জাপানের সাহায্য-লাভ করার পরেও তাঁর অস্থায়ী জাতীয় সরকার রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নি।

[প্রথম খণ্ড সমাপ্ত]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

পেন্টাগন এতদিনের চেপে-ধরা নিশ্বাস ছাড়লে ফেলল সশব্দে, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি সৈন্যদলের কাছে মৃত্যুর সামিল। অস্ত্র ও মুদ্রাস্ফীত মর্চে ধরে যায় যে! এতদিন বাদে আবার এলো মহড়ার সুযোগ। কর্মব্যস্ততায় মুখরিত হয়ে উঠলো দূরের দেশ। 'অনগ্রসর জাতিদের রক্ষা করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।' পেন্টাগন কর্তাদের গোপন হাসির আড়ালে সে বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হল দিকে দিকে। বিশ্বের সবাই তাকাল আবার সেই একই কোণায়। যেখানে একদিন পেনস দিয়েছিল একটি নাম, ডিয়েন বিয়েন ফু।

দলবদ্ধ ও সুসংঘটিত বিদ্রোহ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়লো রাজ্যের সর্বত্র। শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে, পাহাড়ে জঙ্গলে, মাঠে ঘাটে সব জায়গায় পৌঁছে গেল নতুন স্বাধীনতার বাণী। বিদেশীদের বিরুদ্ধে সর্বরকমে শুরু হল সে লড়াই। বিদ্রোহী দলের অনুপ্রবেশ ঘটলো সরকারের দপ্তরে দপ্তরে। গুপ্তচর ও সংবাদ সংগ্রহকারীরা যোগাযোগ করল নানা স্তরের সঙ্গে। বিদেশীদের দেশীয় কর্মচারী, সমর বিভাগের অফিসার থেকে ভৃত্য এমন কি অনুবাদকদেরও অনেকে। টুকরো টুকরো বহু খবর যোগাড় করে আগে থেকে জানতে পারলো তারা বিদেশী সৈন্যদের সংখ্যা ও তাদের গতিবিধি।

ক্রমে ক্রমে বদলাতে লাগলো লড়াই-এর ধরণ-ধারণ। সম্মুখ যুদ্ধে বিদেশীদের সঙ্গে কখনই মোকাবিলা করা যাবে না। উন্নত ও আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত যে তারা। বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দুটি দেশের একটি হয়ে, নেমেছে অতি ছোট একটি শিশু রাষ্ট্রের আপন স্বত্ব নিশ্চিহ্ন করে দিতে।

বিদ্রোহী দল ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল মাঠে ঘাটে, পাহাড়ে জঙ্গলে ও বিশেষ করে মেকং নদীর হাজার হাজার বর্গমাইলের ডেল্টায়। দিনের বেলায় সব কিছু লুকোনো। সব কিছু শান্ত। নিরীহ জীবনযাত্রার নিষ্কলুষ প্রতিচ্ছবি। স্বল্প গতিতে চলা হেলিকপ্টারের চোখকে ফাঁকি দেওয়া মুশকিল। ঝাঁকে ঝাঁকে তারা বিচরণ করে আকাশের বুকে। শকুনির মতো করে চলে শত্রুর সন্ধান। মাটিতে কৃষক মাথা নিচু করে ক্ষেতের কাজ করে আর মনে ভাবে, ভরসা এখন উত্তরের দেশ। পাহাড় ও জঙ্গলে ভরা সে রাজ্য। তাদের আপন ভাই-এর দেশ। সাহায্য কি পাওয়া যাবে না?

সাহায্য এলো। প্রথমে আড়ালে, পরে প্রকাশ্যে। শুরুতে স্বল্প গতি পরে বন্যার স্রোতো। পায়ুরে দেশের রাষ্ট্রপতি কিবকে জানালেন তাঁর শর্ত। বিদেশী চলে যাক দক্ষিণের দেশ ছেড়ে। আমাদের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ আমরা নিজেরাই মেটাব। জনমতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা হবে নতুন সরকার। আমরা সবাই তখন মেনে নেব সে শাসনতন্ত্র।

পেন্টাগনের হাসি নিভে গিয়ে কপালে চিন্তারেখা দেখা দিল। সামান্য বিদ্রোহ দমন করতে এতদিন লাগবে কেন? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল শ্বেতকায় প্রভুরা। দক্ষিণ দেশের সরকার একেবারেই অকেজো। নিজেদের স্বার্থ নিয়েই মত্ত। যুদ্ধ সংক্রান্ত ভাবনা তাদের ভাববার সময় নেই। কলকাঠির চাপে, দক্ষিণী সরকারের পতন হল। সমর বিভাগ দেশের শাসনব্যবস্থা হাতে তুলে নিল মার্শাল কানুন জারী করে। উপসাগর বেয়ে আরও জাহাজ এসে পৌঁছলো। নামলো আরও অনেক সৈন্য, যুদ্ধসরঞ্জাম হাতে করে। বিদ্রোহ দমনের জন্যে বিদেশীদের শক্তিবৃদ্ধির প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়ে চলল। ক্ষতবিক্ষত হল দক্ষিণের দেশ। আর সবচেয়ে বড় কথা, অসহিষ্ণু হয়ে পড়ল শ্বেতকায়রা। ঘরে ও বাইরে একই সঙ্গে। সাগরপারের দেশে যুদ্ধ মতবাদ বিপরীত স্রোতে বইতে শুরু করল। হাজার হাজার মাইল দূরে, অপরিচিত ক্ষুদ্র এক দেশের মাটি কেন মার্কিনী যুবকদের রক্তে রঞ্জিত হবে বছরের পর বছর ধরে? কার স্বার্থে?

নিজের দেশের গুঞ্জন ক্রমশ কোলাহলে পরিণত হতে বিদেশীরা প্রমাদ গুনলো। তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলা উচিত ছিল বিদ্রোহীদের। কিন্তু মুশকিল তো সেখানেই। দিনের আলোয় দেখা যায় না ওদের। মাইলের পর মাইল জুড়ে ধানক্ষেত। শুধু হাওয়ায় দোলে। হেলিকপ্টার ঘুরে বেড়ায় মাথার ওপরে। খুঁজে খুঁজে দিশেহারা হয়। কোথাও নেই বিদ্রোহীদের অস্তিত্ব। নদীর বুকে দেখা যায় না বড় কোন নৌকা। আকাশ-বাতাস মাঠ-ঘাট সব নিস্তব্ধ। এমন কি পাখীরাও চুপ করে থাকে কিসের আতঙ্কে যেন।

ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসে মেকং ডেল্টার বুকে। ঝিঁঝিঁপোকা জেগে ওঠে দিবানিদ্রার অবসানে। নদীর জল ছলছলিয়ে ওঠে। ধান গাছের রাশি দুলতে থাকে। কিন্তু দুলতে থাকে এলোমেলো। বিদ্রোহীদের দল চলাফেরা করছে। নানা রকমের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে জড় হয় তারা। সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র। আসে গোলা আসে যুদ্ধ [illegible] আসে রসদ। কি এক দুর্বার [illegible] তাদের মন ভেসে যায়। কিন্তু লক্ষ্য থাকে স্থির, সংকল্প অটুট।

[illegible]র প্রাণীর মতো প্রকৃতির আচ্ছাদন [illegible] করে এগিয়ে যায় তারা, ক্রমে ধীরে ধীরে বিদেশীদের ঘাঁটি। দলপতিরা অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে। যামিনী এগিয়ে চলে পলের পর পল ধরে, আর এরা বসে থাকে চরম ক্ষণের প্রতীক্ষায়। শত্রুর অসতর্ক মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। মর্টার বসান হয়েছে পেরিমিটার ঘিরে। সেগুলির খোলা মুখ রক্তপানের আশায় অধীর। গ্রিনেড ধরা তালু ঘেমে ওঠে ধীরে ধীরে।

অদূরের বিমানক্ষেত্রে সারিবদ্ধ বিমান। হেলিপ্যাডে অতিকায় শকুনের মতো হেলিকপ্টারগুলি মাটিতে বসে আছে ঊষার প্রতীক্ষায়। প্রহরীর দল শেষ রাত্রির হাওয়ায় অসতর্ক। বিদ্রোহীর দল শয়ে শ[illegible] [illegible] ঘিরে ধরল পেরিমিটারের [illegible]। [illegible] সময় নেই। রাত্রি প্রায় শেষ। দলপতিদের মৃদু পরামর্শ, সতর্ক ইঙ্গিত। আকাশ বাতাসের নিস্তব্ধতা চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল সে মুহূর্তে। হাত [illegible] রাইফেল গর্জে উঠলো একসঙ্গে। হ্যান্ড গ্রিনেডের বিস্ফোরণে ওলটপালট হয়ে গেল আশেপাশের সব কিছু। মর্টারগুলি তাদের [illegible] জন্যে গোলা উদ্গার করে চলল একের পর এক। জি আই—ডেথ টু য়ু, চিৎকার জেগে উঠলো সহস্র কণ্ঠে।

পেরিমিটারের অধ্যক্ষ ছুটে বেরিয়ে এলো আপন বাসস্থান থেকে। চারিদিকে ধ্বংসলীলা। বিমান ও হেলিকপ্টারগুলি জ্বলছে দাউ দাউ করে, আর তার আগুনে দেখা যাচ্ছে সর্বদিকে যমদূতের ভয়াল নৃত্য। বিস্ফোরণের শব্দে ও মানুষের চিৎকারে সবাই ত্রস্ত ও সচকিত।

ক্ষণেকের জন্যে অধ্যক্ষর মনে পড়ল কোরিয়ার কথা। সে যুদ্ধে তবুও ছিল আক্রমণ ও প্রতিরোধের শৃঙ্খলা, কিন্তু এ যে অরাজকতা! কি করে এরা পেরিমিটারের মধ্যে ঢুকতে পারলো? কিন্তু কোনো চিন্তারও আর সময় নেই। তাড়াতাড়ি প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরি করতে হবে কামানক'টি ঘিরে। উপায় আছে বিদেশীদের, কিন্তু সে যে ভয়াবহ। গ্রেপ শট। কামানের গোলা অর্ধপথে ফেটে গিয়ে ছড়িয়ে দেবে হাজার হাজার গুলির ঝাঁক। তার আঘাতে আহত হবে বিদ্রোহীদের দলের পর দল।

অধ্যক্ষর আদেশে, কামানের মুখ হল নিচু। লক্ষ্য স্থির হলে, মাটি কাঁপিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল গোলার পর গোলা। বিস্ফোরকের চাপে অগ্নিবর্ণ অজস্র লৌহবিন্দু বিদ্ধ করল অগণিত দেহ। ফ্লেয়ারের আলোতে প্রকট হল চারপাশ। আরও গোলা, আরও গ্রেপ শট......ধান গাছের শীষ দুলে চলেছে এলোমেলো। বিদ্রোহী দল তাঁদের আহতদের কাঁধে করে চলে যাচ্ছে দূরে। ভারি মর্টারগুলি নিয়ে ছুটে চলেছে গোপন আস্তানায়। ঊষা আগতপ্রায়। দূরে—অনেক দূরে আবার আঘাত হানতে হবে রাত্রির গোপনতা সম্বল করে। আবার শত কণ্ঠে চিৎকার উঠবে, জি আই ডেথ টু য়ু।

পেন্টাগনের বর্তাদের কপালে ঘাম। আবা [illegible] মুখে বিদ্রূপের হাসি। আপন দেশে প্রতিবাদের ঝড়। উপায় কি নেই?

উপায় আছে। বুনো গাছের ডালপালা কেটে তার নাশ সম্ভব নয়। সমূলে বিনাশ করতে হলে গোড়ায় হাত দিতে হবে। আর সে গোড়া রয়েছে পড়ুরে দেশে।

সযত্নে তৈরি হল নতুন প্ল্যান। ছোট একটি রাজ্যের এতদিনের চেষ্টায় গড়ে-তোলা সম্পদ ধ্বংস করতে নিদ্রাহীন রাত্রি কাটালেন শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা। আদেশ পাঠান হল দিকে দিকে। নৌবহর এসে অবরোধ করল উত্তর দেশের সর্বক'টি বন্দর। আকাশের বুকে গর্জে ছুটে চলল বিমান বহর। ছুটে চলল নানা লক্ষ্যবস্তু নিশানা করে, পাহাড় ঘেরা ছোট একটি রাজ্যের দিকে; যেখানে অনেক দিন আগে শোনা গিয়েছিল একটি নাম—ডিয়েন বিয়েন ফু।

বন্দর হল ধ্বংস। শহর হল চুরমার। তিল তিল করে গড়ে তোলা রাষ্ট্রের সম্পদ ধুলোয় পরিণত হল বোমার আঘাতে। প্রতিদিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে চলল একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

জনক আরও বৃদ্ধ হয়েছেন। দেহ হয়েছে আরও কৃশ। গৃহপ্রাঙ্গণে শত্রু দিয়েছে হানা। লুঠপাট নয়, শুধু মৃত্যু। চারিদিকে ধ্বংসের বিভীষিকা। আপন সন্তানদের ডেকে চিৎকার করে বলে উঠলেন, আমরা রক্তবীজের দল। কখনই আমাদের বিনাশ নেই। শত্রুর প্রতিরোধ করে যাব শেষ দিন পর্যন্ত। তাই হবে আমাদের সংকল্প, তাই হবে আমাদের মন্ত্র।

পাহাড় ঘেরা রাজ্যে সবকিছু বদলে চলল দ্রুতগতিতে। [illegible] [illegible] যেমন [illegible] ইয়োছিল [illegible] শুরু। [illegible] বেলার মাটির ওপর সর্বক্ষ[illegible], রাজ্যের [illegible] হল রাতা[illegible]। পাহাড়ের প্রতিটি গহ্বর, [illegible] বসল যন্ত্রপাতি। [illegible] [illegible] লাগলো [illegible] [illegible] কালি[illegible] গোপন [illegible] আপেক্ষ[illegible]। [illegible] [illegible]

বহু [illegible] এলো [illegible] উত্তরের [illegible] [illegible] এতদিনের [illegible] গিয়ে [illegible] [illegible] এ বর্ষায়। শিশুর দল [illegible] আকাশের দিকে চেয়ে [illegible] আলোর চেহারা ভুলতে [illegible]। সাইরেনের গোঙানী মন [illegible] ফেলতে চেষ্টা করল সবাই।

মেঘের বাধায় বিরক্ত হল পেন্টাগন। বৈজ্ঞানিকদের তাড়া দেওয়া হল উন্নত ধরণের বেতার চাই যাতে টেলিভিশনের মতো সব কিছু দেখা যাবে মেঘের স্তর ভেদ করে। শত্রুকে সময় দেওয়া আপন আত্মহত্যার সামিল।

কেউই কিন্তু বসে রইলো না। পৃথিবীর সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলি থেকে এলো বিমান, অগণিত অস্ত্রশস্ত্র, গোলা বারুদ। পাহাড়ে পাহাড়ে গুহা-কন্দরে তৈরি হল বর্মার [illegible]ট। রাত্রি ও বর্ষার মেঘকে

আচ্ছাদন করে হওনা হল সে সরজার দক্ষিণ দিকে। প্রত্যাঘাত হানার সময় এসে গিয়েছে।

ধীরে ধীরে আয়োজন সম্পূর্ণ হল। এবারের লক্ষ্যস্থল রাজধানী ও বাকি নগরকেন্দ্র। ব্যবস্থা অনুযায়ী দক্ষিণে সারা রাজ্যে বিদ্রোহীতে ভরে গিয়েছে। অফিস-বাবুর ব্রীফকেসে টাইম-বোমা, বারবনিতার বিলাস-শয্যার নিচে হ্যান্ড-গ্রীনেড, ফিরিওয়ালার পণ্যের মধ্যে গোপনে রাখা ডিনামাইট স্টিক।

বর্ষার পর শরৎ। শরতের পর হেমন্ত। মেকং ডেলটায় শস্যসম্ভার যুদ্ধ-ক্ষত ঢাকবার চেষ্টা করল নিজেদের গা এলিয়ে দিয়ে। অন্যান্য বছরের মতো এবারও তারা হাওয়ায় ভর দিয়ে দুললো, কিন্তু কেমন যেন এলোমেলো। নদীর ঢেউ এবারও পাড়ে এসে ছলকাল, কিন্তু ভাষা তার অস্পষ্ট। বাতাস এবারও বইল, কিন্তু দিক তার ঠিক রইল না।

এমন সময় হঠাৎ এক রাত্রিতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজধানীগুলিতে একযোগে মারণযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। এবার আর সৈন্যদল হিসাবে নয়, রশি মেপে জায়গা হিসাবে নয়—সমগ্র দেশে অনল জ্বলে উঠলো। উত্তরের আপন ভাই-এর দেশ থেকে এসেছে অঢেল সাহায্য, এসেছে মন্ত্র—লক্ষ্য হয়েছে স্থির।

রাজধানীর রাজপথে এসে পড়ল বিদ্রোহীরা। মর্টারের গোলার আঘাতে চারিদিক হল আচ্ছন্ন। মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হল দুই পক্ষ। বিদেশীদের বাবুদের স্তূপ আগুনের ছোঁয়ায় ধ্বংস পেল একের-পর-এক। দাউ-দাউ করে জ্বলতে লাগল বিমানবাহিনীর স্কোয়াড্রনের পর স্কোয়াড্রন।

দুই দিকের হতাহতে ভরে উঠলো দেশের মাঠ-ঘাট ও রাস্তা। শোণিতের ধারা এসে মিশলো সুয়েল নদীর বুকে। জল হল রক্তবর্ণ। অলিন্দে অলিন্দে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নিশানা স্থির করল রাইফেল তুলে নিয়ে।

শ্বেতকায়দের ভিত নড়ে উঠলো এবার। চোখে নেমে এলো মরণভয়। হাবে-ভাবে দেখা দিল অনিশ্চয়তা। শতে শতে সহস্রে সহস্রে মৃত্যু ঘটছে তাদের। জাহাজ এসে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা হচ্ছে নবাগত প্লাটুন, কম্পানী, ব্যাটেলিয়ান। অল্পবয়স্ক যুবকের দল, দৃষ্টি তাদের আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে—জ্যাজ, পপ মিউজিক, গ্রন্থরাশি ও মেয়ে বন্ধুর টুইস্ট হিল্লোলে। ক'জন এদের থেকে ফিরে যেতে পারবে দেশে? একজনও কি নয়? এ নিরর্থক মারণযজ্ঞ থামাবার কি কোনো উপায়-ই নেই?

পৃথিবীর দেশ-বিদেশের কোনো কোনো প্রান্ত থেকে শোনা গেল অনুচ্চ কণ্ঠস্বর, উপায় আছে, একমাত্র উপায় শান্তির আহ্বান।

কিন্তু পেন্টাগন গর্জে উঠলো। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্র হয়ে, ক্ষুদ্র এক দেশের কাছে মাথা নুইয়ে পিছু হটতে হবে? কি দরকার আর বিশ্বের পরোয়া করে! কেউ দেখছে না, দেখবার প্রয়োজনও বোধ করছে না কি সর্বনাশা এই নতুন নীতিবাদের প্রকাশ। মানুষ দলবদ্ধ হবার সঙ্গে এই নীতিবাদের জন্ম হলেও, গত শত শত শতাব্দী ধরে যা ছিল সুপ্ত; বিংশ শতাব্দীর এক অশুভ কালে উত্তরে এক রাষ্ট্রে জাগরিত হল তা নানা উপচারের মধ্যে। অনেক চেষ্টা করেও আর তাকে দমন করা গেল না। ভাইরাস জীবাণুর মতো তার আপন পক্ষ কালে একের পর এক দেশ সংহার করে চলল। মহামারীর মতো ছড়িয়ে দিল অশান্তির আগুন। সমাজব্যবস্থা ওলট-পালট করে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলল। ঘোষণা করল, মৃত সব কিছুর মধ্যে থেকে জন্ম নেবে চির নতুন; এবং তারই জন্যে এই মারণযজ্ঞের আয়োজন।

পেন্টাগন মরিয়া হয়ে তাকাল তার গোপন ভাণ্ডারে। এমন কি আছে, যা দিয়ে শেষ করে দেওয়া যায় ঐ ছোট রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে? চোখে পড়ল অনেক কিছু, কিন্তু ব্যবহারের যোগ শুধু একটি। কিন্তু বিশ্বমত? প্রভুরা সেদিকে তাকাতে চাইলেন না। যখন সভ্যতার মুখোস খুলতেই হবে, ইতস্তত করে লাভ কি? রণাঙ্গনের দিকে দিকে নতুন হুকুম গোপন বার্তায় ছড়িয়ে গেল। শেষ করে দাও। আকাশ-বাতাস, শস্য-শ্যামল ক্ষেত কিছু বাকি রেখো না।

[illegible] হবার আগেই দিক দিক থেকে আকাশের বুকে হানা দিল বোমারুর দল। লক্ষ্যস্থল আর অনেক চারিদিকে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম। পাহাড়-কন্দর, শহর-গ্রাম, শস্য-শ্যামল ক্ষেত, নালা-নদী। বোমারুর দল বহন করে নিয়ে চলেছে ভয়াবহ নাপাম বোমা। তীব্র কেমিক্যাল আগুনে সব কিছু পুড়িয়ে ছাই করে দেবে তারা। আধুনিক দ্রাগনের অভিশপ্ত তপ্ত নিশ্বাস ছড়িয়ে পড়বে দিগ্-দিগন্তরে।

নাপামের আগুনে পুড়তে লাগলো শস্যক্ষেত্র, জ্বলতে লাগলো নদী-নালা-ডোবা, দাবানল ছড়িয়ে পড়ল জঙ্গলে জঙ্গলে। ছোট ছোট চিহ্নিত গ্রামগুলির অস্তিত্ব লোপ পেল মাটির বুক থেকে। শহরের প্রতিরোধ নাপামের নিদারুণ তাপে আত্মাহুতি দিয়ে ভস্মে পরিণত হল। সবাই ভীত মুখে তাকাল আকাশের দিকে। ঐ সুন্দর শীতল নীলিমার মাঝে কি করে লুকিয়ে থাকতে পারে অমন অভিশাপ? সবকিছুই যে জ্বলতে শুরু করেছে; সবকিছুই কি ছাই হয়ে যাবে?

জনকের চোখে জল। এ অশ্রু কষ্টের নয় এ অশ্রু শোকের নয়; এ অশ্রু বিশ্বের অবমাননার। মানবতার চরম অধঃপতন দর্শন করছেন আজ। আবছা দৃষ্টি তাঁর চলে গিয়েছে দূরে—বহুদূরে। আপন দেশের জ্বলন্ত উঁচু-নিচু ছাড়িয়ে, আপন ভাইয়ের ক্ষত-বিক্ষত ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে সে দৃষ্টি অসীমের মাঝে। যেখানে নেই দলগত স্বার্থ, নেই সমষ্টিগত প্রভুত্বের প্রয়াস, হয়তো আছে সেখানে বাঁচবার অধিকার, আছে সর্বস্বাধীনতা।

* * *

বিষুবরেখার আশ্রয় ছেড়ে উঠে এলো মৌসুমী তার সাথীদের নিয়ে। নীলিমার বুকে জেগে উঠলো কালো ঘন মেঘের দল। কিন্তু মাটির দিকে চেয়ে তারা চমকে উঠলো সবাই। একি—এ কোন্ দেশ?

মৌসুমীর দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে পড়ল আকাশে-বাতাসে। হাওয়া হল এলো-মেলো। অর্ধদগ্ধ ধানের শীষ দুলে চলল তাল হারিয়ে। মেকং সংগোপনে বয়ে চলল সাগরের দিকে, তার স্তনভরা সুধা বিদেশীর কৃপায় হয়েছে আজ বিষাক্ত। নদীতে জাগলো ঢেউ, কিন্তু তাতে কোনো ভাষা আর প্রকাশ পেল না। পোড়া-ধানের শীষ চারিদিকের হাহাকার সহ্য করতে না পেরে অবশেষে লুটিয়ে পড়ল উত্তপ্ত মাটির বুকে।

[illegible]

সুধাময়ের কণ্ঠস্বর এবার গম গম করে উঠলো ঘরের মধ্যে।

বিস্ময়ে রোমাঞ্চে সুধাময় টেপ-রেকর্ডারটার দিকে তাকিয়ে নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে থাকলো। যে কবিতাটা খানিক আগে আবৃত্তি করেছিল সুধাময়, সেই কবিতাটাই বেজে যাচ্ছে এখন। ঠিক যেমনিভাবে আবৃত্তি করেছিল, ঠিক তেমনিভাবেই বেজে যাচ্ছে তার কণ্ঠস্বর। এক মুহূর্তের জন্য কেবল নিখিলেশের দিকে তাকিয়ে দেখল, নিখিলেশ তার মুখের দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে আছে।

একবারই নয়, অনেকবারই সেই আবৃত্তি শুনলো সুধাময়। নিখিলেশ ফিরিয়ে ফিরিয়ে বাজালো টেপরেকর্ডটা।

এক সময় টেপরেকর্ডটা আলমারীতে তুলে রেখে নিখিলেশ বললো, 'তোমার কণ্ঠস্বর আমার কাছে রইলো কিন্তু।'

সুধাময় হেসে বললো, 'বন্দী করে রাখলে আর কি!'

নিখিলেশ বললো, 'কথাটা মিথ্যে নয়।'

সুধাময় ভালো আবৃত্তি করে। শুধু আপিসের অনুষ্ঠানেই নয় পাড়ার এবং বাইরে দু'একটা ফাংশানেও সুধাময়ের নেমন্তন্ন হয়ে থাকে। এ জন্যে কাজের মধ্যে সুধাময় একটা সুখ বুকের মধ্যে তুলে রাখে।

সুধাময় ভালো আবৃত্তি করে বলেই নিখিলেশ তাকে ধরে নিয়ে এসেছে। অনেকদিন থেকেই বলছিল। নতুন টেপ-রেকর্ডারটা কিনেছে নিখিলেশ। সুধাময়েরও অসম্ভব উৎসাহ এ ব্যাপারে। কিন্তু কিছুতেই সে সময় করে উঠতে পারছিল না।

আজকে রবিবার বলে বাড়ির কিছু কাজকে পরের জন্য তুলে রেখে চলে এসেছে সুধাময়।

নিখিলেশ কাছাকাছি এসে বসে বললো, 'আরেক কাপ চা খাবে নিশ্চয়ই।'

সুধাময় বললো, 'না।'

নিখিলেশ বললো 'নিশ্চয়ই খাবে।'

তারপর উঠে ভেতরে চলে গেলো।

সুধাময় টেবিলের ওপর রাখা নিখিলেশের সিগারেটের প্যাকেটটা নিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। কাঠিটা ডুবিয়ে দিলো এ্যাসট্রের মধ্যে। দেয়ালের দিকে চোখ ফেরালো। একটা সুন্দর ছবি দেয়ালে। ছবি সম্বন্ধে সুধাময়ের কোনো ধারণা নেই। তবু যেহেতু ছবিখানার মধ্যে সুন্দর মতো একটা ভালো লাগা অনুভব করলো, সেহেতু ছবিখানাকে তার মূল্যবান মনে হলো।

সেই ছবিখানা থেকে অনেকটা সময় পর তার চোখ ফিরে স্থির হলো আলমারীর মধ্যে।

টেপরেকর্ডারটার বাক্সটা চোখে পড়লো কাচের মধ্য দিয়ে। বাক্সটার দিকেই তাকিয়ে রইলো সুধাময়। খানিকটা ফিতের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে তার কণ্ঠস্বর। তার কণ্ঠস্বরকে বন্দী করে রেখেছে নিখিলেশ। রোমাঞ্চিত বিস্ময়ে সুধাময় স্থির হয়ে বসে রইলো। আঙুলে তার সিগারেট পুড়তে থাকলো আস্তে আস্তে।

নিখিলেশ এলো। বললো, 'চা আসছে।'

সুধাময় নিখিলেশের দিকে তাকালো। বললো, 'খুব দেরি হয়ে গেলো কিন্তু।'

'রবিবারের দুপুরটাকে সকালই বলা যায়।' হাসলো নিখিলেশ।

সুধাময় আগের মতোই ছবির দিক থেকে আলমারীর দিকে তাকালো। টেপ-রেকর্ডারের বাক্সটার দিকে। আগের মতোই তার মনে হলো, তার কণ্ঠস্বরকে বন্দী করে রেখেছে নিখিলেশ।

নিখিলেশ এবার টেবিলের ওপর

থেকে প্যাকেটটা তুলে নিয়ে বললো, 'তোমার [illegible] কিন্তু অসম্ভব ভালো হয়েছে।'

সুধাময় [illegible] নিজের কানে নিজের গমগমে [illegible]। রোমাঞ্চিত সুধাময় বললো, 'আমারও কিন্তু ভালো লেগেছে আজ নিজের আবৃত্তি।'

হাসলো নিখিলেশ। সিগারেট টানলো আস্তে আস্তে। তারপর সুধাময়ের দিকে ফিরে বললো, 'এরপরে আরো কয়েকটা আবৃত্তি রেকর্ড করে যাবে কিন্তু।'

সুধাময় বললো, 'আচ্ছা।'

চা এলো। নিয়ে এলো সীমা, নিখিলেশের স্ত্রী।

চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে সীমা বললো, 'আপনার আবৃত্তি রান্নাঘর থেকে শুনছিলাম। খুব ভালো লাগছিল। কাজটাজ সেরে একবার ভালো করে শুনতে হবে।'

সীমার কথায় খানিকটা লজ্জিত হলো সুধাময়। তারপর অদ্ভুত একটা অনুভূতিতে ভরে উঠলো। সীমা তার সময় মতো সুধাময়ের কণ্ঠস্বরকে বাজাবে। ভালো লাগাটুকু ভালো করে অনুভব করবে। সুধাময়ের সেই কণ্ঠস্বর সুধাময়ের শরীরের প্রয়োজন আর অনুভব করবে না।

অনুভূতিটুকুকে বুকের মধ্যে নিয়ে সুধাময় সীমার দিকে তাকালো। কথাটা বলবার পর সীমার চোখেমুখে যে আন্তরিকতা ফুটে উঠেছিলো, সে আন্তরিকতার চিহ্ন এখনও আছে। সেই আন্তরিকতার চিহ্নগুলি সীমাকে আরো কমনীয় এবং আরো সুন্দর করে তুলেছে।

নিখিলেশ বললো, 'বেশ কয়েকদিন চেষ্টা করে ওকে নিয়ে এসেছি। আসবার জন্যে সময়ই ছিল না যে।'

সুধাময় সীমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি যে কোনো কাজে ব্যস্ত থাকতে পারি নিখিলেশ তা বিশ্বাস করতে চায় না। সত্যি সত্যি কিন্তু ব্যস্ত ছিলাম আমি। না হলে নিজের কণ্ঠস্বর নিজে শোনবার একটা লোভও আমার মধ্যে আছে। আর সেই লোভটা নিশ্চয়ই ছোটো নয়।'

নিখিলেশ বললো, 'সীমা তোমাকে সমর্থন করবে জানি। এবার চায়ের কাপটা হাতে নাও তো। ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে চা।'

সুধাময় চায়ের কাপটা হাতে নিলো।

সীমার বোধ হয় কাজের তাড়া ছিলো। বসলো না। আরেকবার আবৃত্তির প্রশংসা করে চলে গেলো ভেতরে।

নিখিলেশ বাঁ হাতের আঙুলের ফাঁকে সিগারেটটা ধরে ডান হাতে চায়ের কাপটা মুখে তুলে একচুমুক চা খেলো, তারপর সিগারেটে দীর্ঘ একটা টান দিয়ে সুধাময়ের দিকে ফিরে বললো, 'সীমা তোমার ফ্যান হয়ে গেলো কিন্তু।'

সুধাময় বললো, 'তাই তো দেখছি।'

'স্পষ্টই বুঝতে পারছি, টেপটা চালিয়ে চালিয়ে সীমা আমার কান ঝালাপালা করে দেবে।' নিখিলেশ বললো।

হাসলো সুধাময়। বললো, 'তার মানে আমার কণ্ঠস্বর তোমার ঘরে-পাড়ায় আজ পরিপূর্ণ হয়ে থাকবে।'

নিখিলেশ বললো, 'তাই।'

চা শেষ হতেই সুধাময় উঠলো। বললো, 'এবার যাই।'

নিখিলেশ বললো, 'কিন্তু কথা থাকলো, তোমার নতুন আরো কয়েকটা আবৃত্তি আমি টেপে তুলে রাখবো।'

সুধাময় ঠিক আগের মতোই বললো, 'আচ্ছা।'

গলির মুখ পর্যন্ত এলো নিখিলেশ। সুধাময় নিখিলেশকে তার সঙ্গে বাসস্টপ পর্যন্ত আসতে না করলো বলে নিখিলেশ আর এগুলো না। অকারণে নিখিলেশের বাসস্টপ যাওয়াটা খারাপ লাগলো সুধাময়ের।

বাসস্টপে এসে রৌদ্র এড়াবার জন্য কাছের ছোটো গাছটার ছায়ায় দাঁড়ালো সুধাময়। ঘড়ি দেখলো একবার। সামান্য ঝুঁকে একবার দেখলো বাস আসছে কি না। তারপর পথের হৈ-চৈ ভিড় ইত্যাদিকে এড়িয়ে নিজের রোমাঞ্চিত কিছু ভাবনার মধ্যে প্রবেশ করলো।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে কিন্তু দেরি হয়ে গেলো সুধাময়ের। পাড়ার মোড়েই অশোকদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। ওরা সুধাময়কে প্রায় সাড়ে বারোটা পর্যন্ত আড্ডায় আটকে রেখেছিলো। বাড়ি ফিরে সুধাময় দেখলো, বাড়িতে সবাই তারই জন্যে অপেক্ষা করছে।

সুতরাং সুধাময় কোনো কথা না বলে খুব তাড়াতাড়ি মাথায় তেল লাগিয়ে বাথরুমে ঢুকলো। আলোটা জেলে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করলো।

সুধাময়ের অদ্ভুত লাগে দেখতে। এখন চৌবাচ্চার নিচে নেমেছে জল। সুধাময় চৌবাচ্চার মগ ডুবিয়ে গায়ে মাথায় ঢেলে সাবান ঘসতে থাকলো। অসম্ভব স্নিগ্ধ লাগছে এখন। সুধাময় চৌবাচ্চার জল শেষ করে স্নান করলো।

খাওয়াটা আরো তাড়াতাড়ি সেরে সুধাময় নিজের ঘরে এলো। সিগারেট ধরালো একটা। আজকের কাগজটা তার ছোটো টেবিলের ওপর গুছিয়ে রাখা। কাগজখানা কোলের ওপর নিয়ে বসলো সুধাময়। ভেবেছিলো পড়বে। কিন্তু পড়তে ইচ্ছে করলো না। চেয়ারে খানিকটা আরাম করে বসে আত্মমগ্নভাবে সুধাময় সিগারেটটাকে দু'-আঙুলের ফাঁকে পোড়াতে থাকলো।

চেয়ারে বেশিক্ষণ বসলো না সুধাময়। কয়েকবার হাই তুলে কাগজখানা টেবিলের ওপর রাখলো। তারপর বিছানায় ছাদমুখো হয়ে শুয়ে সিগারেট টানতে থাকলো।

অনেকটা সময় ধরে সিগারেট টেনে ফুরিয়ে যাওয়া সিগারেটটা বাইরে ছুঁড়ে ফেললো সুধাময়।

নিজের কণ্ঠস্বর ফের সুধাময়ের কানে বাজতে থাকলো। চোখ বুজলো সুধাময়। নিখিলেশ তার কণ্ঠস্বরের খানিকটা অংশ অধীন করে রেখেছে। সুধাময় নিখিলেশের বাড়িতে গেলে নিখিলেশই হয়তো সুধাময়কে তার কণ্ঠস্বর শুনিয়ে দেবে। টেপরেকর্ডারটা চলতে থাকবে আর এক সময় আবৃত্তি করা সেই কবিতাটা ঠিক তেমনি করে বেজে যাবে। ফের বিচিত্র একটা অনুভূতিতে সুধাময় ভরে গেলো।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলো সুধাময়। যখন ঘুম ভাঙলো তখন বিকেল।

উঠে বারান্দায় এসে যতটুকু রোদ এবং আকাশ দেখা যায় দেখলো সুধাময়। অনেকটা সময় ঘুমিয়েছে সে। ছোটো একটা হাই তুলে বাথরুমে এলো। আলো জ্বাললো। চৌবাচ্চাটা বিকেলে ধরা জলে টইটুম্বুর হয়ে আছে। সেই জলে আলো ডুবলো। একটু সময় দেখে চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে ঘুম ঘুম ভাবটা ফুরিয়ে ফেললো সুধাময়।

ঘরে এসে দেখলো চা তৈরি।

চা খেতে খেতে সুধাময় খানিকটা বেড়িয়ে আসবার কথা ভাবলো।

কোথায় বেরুনো যায় ভাবতে ভাবতে অদ্ভুত একটা ইচ্ছে খেলা করলো মনের মধ্যে। সুধাময় একটা সিগারেট ধরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে চোখ রাখলো। আরেকটু বিকেল হোক। বিকেল নয়, গোধূলি।

কোনো কাজ বিকেলের জন্য আছে কি না ভেবে দেখলো সুধাময়। না, নেই। মা'র জন্য একটা ওষুধ কেনা দরকার ছিলো। আগামীকাল অফিস থেকে ফেরবার সময় কিনবে। আজ হাতে টাকাও নেই।

এবার একটু সময় কাগজখানাকে চোখের সামনে ধরলো সুধাময়। দ্রুত বড় বড় অক্ষরগুলোর ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিলো। অবশ্য তেমন গভীরভাবে কাগজ পড়া সুধাময়ের অভ্যেস নয়। তবু কাগজখানা একবার দেখা চাই তার।

কাগজ দেখতে দেখতেই চা ফুরোলো। সিগারেটটায় কয়েকটা টান দিয়ে সুধাময় ছুঁড়ে ফেলে দিলো বাইরে।

ঘুমিয়ে, চা খেয়ে, কাগজে চোখ বুলিয়ে সুধাময় বেশ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছে। বিকেলটাকেও ভালো লাগছে তার।

আলো খুব তাড়াতাড়ি কমে যাচ্ছে।

সুধাময় সুটকেস থেকে ধুতি আর সার্ট বের করলো। আপিস করা জামা প্যান্ট পরতে এখন ভালো লাগবে না। কথাটা ভেবেই একবার আপিসে যাওয়া জামা প্যান্টগুলো দেখলো। বিকেলের জন্য ওরা ম্লান এবং নিরুত্তাপ।

ধুতি খুব একটা পরে না বলে পরতে সময় নিলো। আঁট-সাঁট করে পরলো ধুতিটা। সার্টটা গায়ে চাপিয়ে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো। নিজের মুখের দিকে তাকালো। সকালে বেরোবার সময় দাড়ি শেভ করেছিলো সুধাময়। গালে এখনও দাড়ির চিহ্ন নেই। কাল সকালেই খানিকটা সবুজ হয়ে উঠবে গাল।

দেরাজে চিরুনী। সেটা বের করে পরিপাটি করে মাথার চুল আঁচড়ালো সুধাময়।' চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতেই আলো জ্বালাতে হলো। মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো না। সামান্য অন্ধকার ছিলো ঘরের ভেতরে। জানালা দিয়ে অস্পষ্ট অন্ধকার ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়েছিলো।

আয়না থেকে সরে এসে দেশলাই আর সিগারেটের প্যাকেটটা পকেটে নিয়ে সুধাময় বেরিয়ে পড়লো।

হাঁটতে হাঁটতে সোজা বাসস্টপে এলো সুধাময়। প্রথমে যে বাসটা এলো তাতে বেশি ভিড় বলে উঠলো না সে। দ্বিতীয় বাসটাও একই কারণে ছেড়ে দিলো। প্রায় সংগে সংগে তৃতীয়টা এলো বলে ভিড় খুব কম। সুধাময় তৃতীয় বাসটাতেই চাপলো।

বাসের মধ্যে একটু যেনো অনামনস্ক রইলো সুধাময়।

যখন বাস থেকে নামলো, তখনও সেই অন্যমনস্কতাটুকু তাকে ঘিরে রইলো। খানিকটা হেঁটে নিখিলেশদের গলিতে প্রবেশ করলো সুধাময়।

আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে প্রশস্ত গলিপথ। সেই আলোয় নিজেকে কিছুটা আড়াল করতে চেষ্টা করলো সুধাময়। তারপর হাঁটতে থাকলো।

নিখিলেশের বাড়ির খানিকটা আগে থেকেই সুধাময় নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো। ঠিক এই-ই তো মনে মনে চাচ্ছিলো সুধাময়। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো সে। আরো এগিয়ে সুধাময়ের মনে হলো, তার স্পষ্ট এবং ভরাট কণ্ঠস্বরে গলিটা ভরে গেছে। খুব আস্তে আস্তে অপরিচিতের মতো হেঁটে নিখিলেশের বাড়ি অতিক্রম করলো সুধাময়।

না, সম্পূর্ণ রেকর্ডটা বাজলো না। হঠাৎ মাঝপথে বন্ধ হলো। দাঁড়ালো সুধাময়। একটু পরেই একটা গান শুরু হলো। দাঁড়িয়ে গানটা শুনতে থাকলো সুধাময়। গানটা থামতেই কি যেনো কথা এবং হাসি চলতে থাকলো। সেগুলোকেও রেকর্ড করেছে নিখিলেশ।

অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করলো সুধাময়। মনে হলো, একটা যন্ত্রণা তার মনের মধ্যে জন্মালো এইমাত্র। যন্ত্রণাটা স্পষ্ট হলো না।

শুধু দাঁড়িয়ে না থেকে হাঁটতে থাকলো সুধাময়। হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা এলো। এখন আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না এখান থেকে।

পথের পাশে পার্কের মতো একটা ছোট্ট ফাঁকা জায়গা। সুধাময় সেখানেই ঘাসের ওপর রুমাল পেতে বসলো। আরো অনেকেই এদিকে-ওদিকে বসে আছে। অস্পষ্ট কথা ভেসে বেড়াচ্ছে জায়গাটুকুতে।

নিখিলেশ তার খানিকটা কণ্ঠস্বরের মালিক। শুধু তার কণ্ঠস্বরেরই নয়, আরো অনেকের।

অস্বস্তিবোধটুকু ঘিরে ধরলো সুধাময়কে। সুধাময় উঠে পড়লো। রুমালটা ঝেড়ে পকেটে পুরে ফিরতে থাকলো গলি দিয়ে।

নিখিলেশ তার খানিকটা কণ্ঠস্বরের মালিক। কথাটা আবারও মনে হলো সুধাময়ের। নিখিলেশের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছে বাঁধা হয়ে আছে তার সেই কণ্ঠস্বরটুকু।

এবার যন্ত্রণাটা যেনো স্পষ্ট হলো সুধাময়ের কাছে।

অসহায় সুধাময় পায়ে পায়ে গলি দিয়ে ফিরতে থাকলো।

নিখিলেশের বাড়ির কাছাকাছি হবার অনেক আগেই আবার নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো সুধাময়। নিখিলেশের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় বাঁধা কণ্ঠস্বর।

সুধাময় হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো এক মুহূর্তের জন্য। মনের মধ্যে নিজেকে দৃঢ় এবং সংহত করলো। তারপর দ্রুত পায়ে এসে দাঁড়ালো নিখিলেশের ঘরের দরজার সামনে। কড়া নাড়লো তীব্রভাবে।

'কে?' ভেতর থেকে সীমার কণ্ঠস্বর এলো।

'আমি।'

সীমা বললো, 'দাঁড়ান, আসছি।'

দরজা খুললো সীমা। টেপ রেকর্ডটা চলছেই। সুধাময়ের কণ্ঠস্বর ঘর ছাপিয়ে গলিটাকে ভরে ফেলেছে।

সুধাময়কে দেখে অবাক হয়ে সীমা বললো, 'এ কী আপনি ভেতরে আসুন।'

সুধাময় বললো, 'নিখিলেশ কোথায়?'

'বেরিয়ে গেছে। আপনি ভেতরে আসুন না।'

অসহায় গলায় সুধাময় বললো, 'একটা কাজ করতে হবে, এখুনি।'

অসম্ভব অবাক হলো সীমা। বললো, 'কী কাজ?'

'টেপরেকর্ড থেকে আমার কণ্ঠস্বর মুছে দিতে হবে।' আরো অসহায় শোনালো সুধাময়ের কণ্ঠ।

'ওমা, সে কী! কিন্তু আমি তো মুছতে জানি না। সে কেবল নিখিলেশই জানে।'

'নিখিলেশ কখন ফিরবে?'

'আজ রবিবার তো? দেরি হবে।'

সুধাময় ভেতরে ভেতরে নিজেকে শক্ত করে ধরে বললো, 'তাহলে?'

সীমা অসম্ভব বিস্ময়ে কী যেনো ভাবলো। তারপর বললো, 'আপনি বসুন না এসে।'

এক মুহূর্তে দাঁড়ালো সুধাময়। সীমার দিকে একবার গম্ভীরভাবে তাকিয়ে অন্য এক ভাবনায় ফিরে হাঁটতে শুরু করলো। তার কণ্ঠস্বর সীমার ইচ্ছায় বেজেই যাচ্ছে।

সীমা বোধহয় চেঁচিয়ে বললো, 'ও কী, চলে যাচ্ছেন কেনো?'

ফিরে তাকালো না সুধাময়। হাঁটতেই থাকলো। মনে হচ্ছে নিখিলেশও ফিরে এসে বলবে, 'আমিও মুছতে জানি না।'

সুধাময় অনুভব করলো, নিখিলেশ মুছে ফেললেও সেই কণ্ঠস্বর মুছবে না। কারণ আমাদের মনের মধ্যেও এমন একটা টেপরেকর্ডার আছে। যা থেকে কোনো কথা কিছুতেই মুছে ফেলা যায় না। সেখানে আমরা সবাই সবার ইচ্ছা-অনিচ্ছার অধীন হয়ে আছি। সেই জন্যেই তো এখুনি সে সীমার এইমাত্র বলা কথাগুলো মনের মধ্যে একলক্ষবার বাজাতে পারে। কেউ সেই কথাকে নিশ্চিতভাবেই মুছে ফেলতে পারবে না।

হাঁটতে হাঁটতে কথাটা ভেবে একটা সিগারেট ধরালো। অনিবার্য এই বিষয়টা সুধাময়কে তার অস্বস্তিটুকুকে আশ্চর্যভাবে উত্তীর্ণ করে দিলো। বাসস্টপে এসে দাঁড়ালো না সুধাময়। হেঁটেই যাবে সে। হাঁটতে এখন তার ভারি ভালো লাগছে।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ফুচিক তাঁর জেলের ডাইরীর শেষ অংশে লিখেছেন—

বাস্তব জীবনে কোনো দর্শক নেই ঃ আমরা সবাই জীবনে অংশ নিই।

'এখন শেষ অঙ্কের পর্দা উঠছে।

'বন্ধু আমি তোমাদের সবাইকে ভালবেসেছিলাম। হুঁশিয়ার থেকো।'

ফুচিকের জীবনের শেষ অঙ্কে, তাঁর মৃত্যুর পর, জার্মান ফ্যাসিস্টদের পরাজয় হয়েছিল। তারপর আমরা যখন গেছি—তখন গড়ার পর্ব। কিন্তু 'হুঁশিয়ার থেকো' কথাটা ছিল সর্বকালের জন্যে হুঁশিয়ারী। তা গড়ার পর্বেই হোক, ভাঙার পর্বেই হোক।

সেই সময়ে পূর্ব ইউরোপে দর্শক হয়ে বসে থাকার মত লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। সবাই জীবনে রুদ্ধনিশ্বাসে অংশ নিচ্ছে—সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেন ওরা যুদ্ধে হারানো ক'টা বছর পুষিয়ে নিতে চায়।

দর্শকের মধ্যে ছিল আমাদের মত কিছু বাপে-খ্যাদানো-মায়ে-তাড়ানো ভবঘুরে। প্রধানত বিদেশী। কিন্তু অবস্থার এমনিই চাপ ছিল যে, শুধুই নেচেকুঁদে বেড়ানো তার উপায় ছিল না। আমাদেরও, এদের এই জীবন্ত নাটকে অংশ নিতে হত। কখনও করতে হত পর্দা টানার কাজ, কখনও বা প্রম্পট করার দায়িত্ব পড়ত ঘাড়ে।

অর্থাৎ যুব ব্রিগেডের সঙ্গে পাহাড়ী পথে রাস্তা বানাবার কাজে ভিড়ে যেতে হত। কিন্তু খোয়া, ইট—এসব বওয়া আর ফেলা, রাস্তায় দুরমুশ পেটানো,—সব কাজে বড়ই ঘায়েল হয়ে পড়তে হত। তার জন্যে লজ্জাও করত। আমাদের দেশে তো এরকম কাজের উদ্দীপনা দেখি নি। আমরা ভাবতাম বাঁধা আর চুল বাঁধার মধ্যে তো বরাবরই একটা আড়াআড়ি সম্পর্ক।

দুশান-এর সঙ্গে আলাপ হল প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায়। ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট ভাঙা ভাঙা আধো আধো বাংলা বলতেন। এদিককার লোকের মুখে ইংরিজি বা প্রাচ্যের কোনো ভাষা শুনতে ভারি মজা লাগে। মনে হয় বুঝি যাচ্চা কোনো কারুর কথা শুনছি।

প্রফেসর লেসনি ছিলেন বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্। উনি তখনও বেঁচে। সৌম্য সুন্দর মানুষ। রবীন্দ্রনাথ আর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ওঁর শুধু অগাধ ভালবাসাই যে ছিল তাই নয়, উনি সে বিষয়ে ছিলেন পণ্ডিত। প্রাগের ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার কাজে তাঁর চেষ্টার কথা অনেকের মুখে শুনেছিলাম।

দুশান জবাভিতেল-কে অনেক কাল পরে কলকাতায় দেখেছিলাম। বয়েস বেড়ে হয়েছেন ভারিক্কি। ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের এখন উনি একজন হোমরা-চোমরা হয়েছেন বলে শুনেছি। উচ্চারণে এখনও কিছুটা আধো ভাব থাকলেও তাতে আধোমী নেই।

দুশান জবাভিতেল-এর কাছ থেকে আমরা অনেক খবরাখবর পেতাম। তখন প্রাগে ছিল আমার এক ভাই—প্রদ্যোত মুখার্জী (স্লাভোনিক ভাষা শিখত—এখন অস্ট্রেলিয়ায় ইতিহাসে অধ্যাপনা করে) আর বন্ধু অজিত মিত্র (অশোক মিত্র মহাশয়ের ভাই—ওখানে পড়ত)। দুজনেই বয়েসে তরুণ আর ডানপিটেমীতে তত্তোধিক। দুশানের সঙ্গে ওরা বেশ জমিয়ে নিয়েছিল। প্রদ্যোতের ছিল নিয়মতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ। ফলে ওর বেশবাস থেকে খাওয়া শোয়াতে পর্যন্ত একটা বোহেমিয়ান ভাব ফুটে থাকত। অজিত ছিল অপেক্ষাকৃত শান্ত ধরণের। বয়েসেও ও আমাদের মধ্যে সব চাইতে ছোট ছিল। আমারই মত ওরা প্রায় খালি পকেটে নতুনের সন্ধানে এখানে চলে এসেছে। কিন্তু ওদের পক্ষে পূর্ব ইউরোপে থাকা আমার মত সহজ হয় নি। প্রধানত তার পেছনে ছিল প্রাগবাসী কিছু ভারতীয় কমিউনিস্টদের সংকীর্ণতা। ভারতবর্ষ এমনিতেই খুব গোঁড়া দেশ। সে দেশের লোকের বেশ কিছুটা অংশ যে গোঁড়ামীকে জীবনের সব স্তরে নিয়ে গিয়ে পৃথিবীর সব চাইতে প্রগতিশীল মতবাদকেও তারি বশে রেখেছে পারে, তা তখন বুঝতাম না। ভাবতাম এ কেন হবে—এ তো অন্যায়। গোঁড়ামীর কত যে বিচিত্র রূপ দেখেছি। বিশেষ করে আমাদের মত যারা খানিকটা বেপরোয়া, তাদের পিঠে সব দিককার লাঠি পড়েছে। এবং প্রাগে—প্রদ্যোত আর অজিতের একটু বেশি লক্ষ্মীছাড়া বলে নাম রটিয়ে দেওয়ার পর ওখানকার ভারতীয় কমিউনিস্টদের একটা অংশ ওদের "নিয়মে" আনার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। অথচ চেকোশ্লোভাক কমিউনিস্টরা কিন্তু মোটেই এসব 'ইনফেণ্টাইল' গোঁড়ামীতে ভুগতেন না। ওঁদের অনেকের মধ্যেও সংকীর্ণতা হয়তো ছিল কিন্তু আমাদের তা চোখে বেশি লাগত না। তাছাড়া একটা ভয়ানক বাড়-বাড়ন্ত দেশে সংকীর্ণতা জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই খুব বেশি পাত্তা পায় না।

ভাবতে অবাক লাগে—কতটুকুই বা দেশ চেকোশ্লোভাকিয়া। এমনিতে বড় যে কোনো দেশ ওদের গিলে খেয়ে নিত যদি না চেকোশ্লোভাক জাতটার বুনিয়াদ এত পাকা হত।

৪৯,৩৭২ বর্গমাইল জমির ওপর ১৪,২৭১,৫৪৭ লোকের বাস (লোকসংখ্যা আরও বেড়ে থাকবে)। চেকোশ্লোভাকিয়ার ৯৪ ভাগ লোক হল চেক এবং শ্লোভাক। বোহেমিয়া আর মোরাভিয়াতেই এদের তিন ভাগের দু' ভাগ থাকে। বাদবাকি থাকে শ্লোভাকিয়াতে। এ ছাড়া প্রবাসী হাঙ্গেরীয়ান, পোলিশ, ইউক্রেনিয়ান, জার্মান এবং রাশিয়ানের সংখ্যাও নেহাৎ মন্দ নয়।

চেকোশ্লোভাকিয়ার লোকের চেহারার কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়—ওরা যেন একটু বেশি ভারী। গায়ের রঙে একটা সতেজ সজীবতা আছে। আমাদের শীতকালীন আনাজের মত। গালের হাড় বেশ একটু উঁচু। ফলে মুখগুলো সচরাচর বড়সড় দেখায়। কিন্তু এরই মধ্যে রকমফের আছে। একদিকে যেমন প্রাগের পার্কে বসে খুব সুন্দরী নীলনয়নাকে উদাসভাবে প্রেমিকের জন্যে অপেক্ষা করতে দেখে প্রাণ জুড়োবে অন্যদিকে তেমনি

চা   বী চাষী মেয়েটকেও বোহেমি   গ্রামে খড় বইতে দেখে খুব ভা লাগবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়ার লোকেদের চেহারার মধ্যে যে আত্মীয়তা খুঁজে পাওয়া যায়—তাকে ইংরেজরা 'স্লাভোনিক' আখ্যা দিয়ে থাকেন।

চেকোশ্লোভাকিয়া যে নাৎসী জার্মানীর বশ্যতা স্বীকার করে নি সেটার ইতিহাস অনেক পুরনো। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়াতেই ওদের মধ্যে এই স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছিলেন ইয়ান হুস। তখনকার গোঁড়া অত্যাচারী রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর জেহাদ। ইয়ান হুস ছিলেন প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর। ১৪১৫ সালে এই নির্ভীক সমাজসংস্কারককে গোঁড়া ক্যাথলিকরা পুড়িয়ে মারে। আর তারই ফলে বোহেমিয়ার বুকে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে মধ্যযুগীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে এক অসামান্য বৈপ্লবিক আন্দোলন।

চেকোশ্লোভাকিয়াকে চিরটা কাল পরাধীনতার বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। তার সেই লড়াই চরম সীমায় পৌঁছেছিল গত মহাযুদ্ধে জুলিয়াস ফুচিকদের সময়ে। ওখানে সাধারণ যে কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বললে বোঝা যেত জার্মান নাজীবাদ কি মর্মান্তিক দাগ রেখে গেছে চেকোশ্লোভাকিয়ার বুকে। আর হয়তো এই নির্মম অত্যাচারের জন্যেই সব শ্রেণীর মানুষ গুপ্ত আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। বিশেষ করে কমিউনিস্ট আর ইহুদীদের বিরুদ্ধে নাজী-জার্মানদের বর্বরতার সীমা পরিসীমা ছিল না। অনেকের হাতে দেখতাম উল্কি-কাটা নম্বর। জিজ্ঞেস করে জানলাম—খোদ্টো বা কনসেন্ট্রেশান ক্যাম্পে থাকাকালে ওঁদের নাম ছিল না। গায়ে নম্বর দিয়ে, গরু ভেড়ার মত ওদের চিহ্নিত রাখত জার্মানরা। আঠার ঘণ্টা কুড়ি ঘণ্টা কাজের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখত। পেট থেকে কথা বের করে নেবার জন্যে। শেষে যখন মানুষগুলোর আর কিছু বাকি থাকত না, তখন তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হত গ্যাস চেম্বারে। অথবা ফাঁসে ঝুলিয়ে। যদি সন্দেহই হত কোনো পরিবারে কেউ কমিউনিস্ট আছে, তখনি শুধু সে পরিবারের আবালবৃদ্ধবনিতাকে নয়, আশপাশের বাড়ির লোকেদেরও ধরে নিয়ে যাওয়া হত। ছ' মাসের শিশুটিকে পর্যন্ত ন্যাড়া করিয়ে, উলঙ্গ অবস্থায় গ্যাস চেম্বারে ভরা হত।

একটি কনসেন্ট্রেশান ক্যাম্পে (এখন মিউজিয়াম) এমনি শিশুর পায়ের জুতো (বুটি) ছিল একঘর ভর্তি। দেখাবার জন্যে জার্মানরা কাঁচের ঘরে বাহার দিয়ে রাখত। অন্য একটা ঘর বোঝাই ছিল মানুষের—মাথা রঙ আর বয়সের চুলে। গ্যাস চেম্বারে পাঠানোর আগে সকলের মাথা মুড়িয়ে ফেলা হত। তারপর সারি সারি নগ্ন, অসহায়, মেয়ে, পুরুষ, শিশুকে চেম্বারে ভরে দেওয়া হত। ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ওপর দিক থেকে বিষাক্ত গ্যাস ছাড়ত এস এস আর গেস্টাপোর সৈন্যরা। চিৎকার করে ভেতরের মানুষগুলো কাঁদতো।

এমনি একটি কনসেন্ট্রেশান ক্যাম্প দেখে এসে আমর আর দ্বিতীয়বার ওমুখো হবার বাসনা জাগে নি। মানুষ যে মানুষের ওপর বিংশ শতাব্দীতে এ ধরনের অত্যাচার করতে পারে তা আগে বিশ্বাস হত না। বৃটিশ আমলে ভারতবর্ষে বহু অত্যাচারের গল্প শুনেছি। বিশেষ করে সন্ত্রাসবাদীদের ওপর। কিন্তু—জার্মান নাজীদের এই বীভৎস রসের উৎস কোথায়?

হয়তো জার্মানরা খুব বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল বলেই তাদের উৎখাত করতে সব দেশের লোক এগিয়ে এসেছিল। চেকোশ্লোভাকিয়ায় জনজাগরণের চেহারাটা ছিল এমনি আকর্ষণীয়। একটা চরম অত্যাচারীর বিরুদ্ধে একটা চরম বীরত্ব।

ইদানীংকালে কিছুটা বদলালেও, ভারতবর্ষ আগে ইউরোপীয়দের চোখে একটা টেরাডাক্টিল গোছের জীব ছিল। কিপলিং-এর জঙ্গলের মধ্যে বসে থাকা একটা সেকেলে প্রাগ্-ঐতিহাসিক জন্তু বিশেষ। জন্তু বলে কিন্তু খারাপ অর্থে নয়। খুব আকর্ষণীয়, সংস্কৃত জানা একটা ডাইনোসর। রোপাস্ত্রিকের কথাও অনেকে জিজ্ঞাসা করেছে। কিম্বা, 'তোমাদের দেশে সভ্যতা আছে?' প্রশ্ন করে দেখেছি সভ্যতা বলতে অনেকে রেডিও, ইলেকট্রিসিটি, ট্রেন ইত্যাদি আছে কিনা জানতে চেয়েছে। এমন কী কলকাতার পথে 'কোবরা'-র স্ট্যাটিসটিক জানতে ওদের অদম্য ইচ্ছা হত। আমরা এসব প্রশ্নে খুব মজা পেয়ে যা-তা উত্তর দিতাম। বলতাম—'না, সভ্যতা আমাদের সব ঘরে নেই—তবে কিছু কিছু ঘরে চেষ্টা হচ্ছে। আর গোখরো? সে তো হামেশাই বাসে, ট্রামে, গাড়িতে, ময়দানে ঘোরে। এখানে আসার আগেই একদিন ট্রামে বসে আছি, দেখি আমার সীটের তলায় এক জোড়া গোখরো সাপ খেলা করছে।' এক ফরাসী মহিলা, জ্ঞানী এবং গুণী। সব বিষয়ে তিনি ওপর-তলা থেকে কথা বলতেন। কমিউনিস্ট হওয়া সত্ত্বেও ফরাসী ভাষা সম্পর্কে তাঁর ছিল সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব। আফ্রিকার লোকেদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে তাঁর জবরদস্ত সমর্থন সময় সময় উপচে পড়ত। কিন্তু আফ্রিকানরা (ফরাসীদের আওতায় যারা ছিল) যেন ফরাসী ভাষাকে তাদের মাতৃভাষা করে তোলে এটাই ছিল তাঁর এবং আরও অনেক প্রগতিবাদীর মত। ওঁরা মনে করতেন, ঐ কালো দেশের লোকগুলোকে লিখিত ফরাসী ভাষার দাপটে এক পুরুষে সভ্য করে তোলা যাবে। কথা প্রসঙ্গে সেই ফরাসী মহিলা আমাকে এক সভায় জিজ্ঞেস করলেন—'বাঙলা ডায়লেক্ট কি—'

আমি অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরেছিলাম। এবার অধৈর্য হয়ে বাধা দিলাম—'বাঙলা ডায়লেক্ট মানে?'

'মানে বাঙলা কি লিখিত ভাষা না কি?'

আমার এতক্ষণে পুরোপুরি ধৈর্যভঙ্গ হয়েছে। চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তর দিলাম—

'আপনাদের প্রপিতামহরা যখন গাছে বাস করত বাঙলা তখন থেকেই লিখিত ভাষা।'

এসব আলোচনার মধ্যে একটু হুল ফোটাতে হলেও শেষ পর্যন্ত ফল ভাল হত। অবশ্য দেশে ফিরে এসে আমার এখন ভাবতে লজ্জা হয় যে, এ দেশেও, এমন কী প্রগতিবাদীর চূড়ান্তদের মধ্যেও ইংরিজিকে মাতৃভাষা করবার একটা নির্লজ্জ হুড়োহুড়ি পড়ে যাবার ফলে বাংলা সত্যিই 'ডায়লেক্টে' পরিণত হচ্ছে। অনেক বঙ্গসন্তান, এই কালো মাটিতে জন্মেও বাংলা লিখতে না পারার গর্বে আজ কি ভয়ানক গর্বিত!

প্রাগ্‌বাসী কিন্তু অন্য অনেক পূর্ব আর পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের চাইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জানত বেশি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ওদের বেশ একটা অংশ জানত। আসলে যুদ্ধের সময় জার্মানী যখন চেকোশ্লোভাকিয়ার অঙ্গচ্ছেদ করতে চেয়েছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ চেকোশ্লোভাকিয়ার পক্ষে খোলাখুলি সমর্থন আর দরদ দেখিয়ে এদের মনে একটা বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিলেন।

ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটে বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী বাঙলা শিখত। হান্নাকে মনে আছে। প্রাগে বাঙলা শিখে এসেছিল ভারতবর্ষে। এক সভায় ভাষণ দিল মেয়েটি। একটি ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করল না। আমরা যেহেতু ইংরিজি বর্জিত বাংলা বলতে অভ্যস্ত নই, আমরা ঠিক বাংলা বলি না। ওরা ভাষা শেখে দরদ দিয়ে। আর তা ছাড়া যেহেতু ওদের প্রাক্তন প্রভুর ভাষা নয়, ওরা ভালবেসে বাংলা বলতে গিয়ে ইংরিজির ভেজাল মেশাতে নারাজ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানা মস্ত

রবীন্দ্রনাথের লেখা ইনস্টিটিউট। অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে জানেন, রবীন্দ্রনাথের পরেই এরা সব চাইতে বেশি চেনে জহরলাল নেহরুকে (রাজকাপুরকে নয়)। গত মহাযুদ্ধের আগে হিট্‌লার জহরলাল নেহরুকে ন্যাশিস্ট জার্মানীতে আসবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। নেহরু সে ডাকে সাড়া তো দেনই নি, বরং তিনি চলে এসেছিলেন চেকোস্লোভাকিয়ায়। পূর্ব-পশ্চিমের মাঝখানে, মাথা উঁচু করে যে ছোট্ট দেশটি দাঁড়িয়ে আছে, তাকে সালাম জানাতে এশিয়ার সমস্ত সংগ্রামী দেশগুলোর আগ্রহের অন্ত ছিল না।

এখন অবশ্য সব দেশের অবস্থাই পাল্টে গেছে। ভারতবর্ষের রহস্যের বেড়া ভেঙে একটা বিকট দারিদ্র্যের ছবি ওরা দেখতে পেয়ে গেছে। এক হিপিরা ছাড়া, ভারতবর্ষের দারিদ্র্য নিয়ে আদিখ্যেতা করবার মত লোক বেশি নেই। আর পৃথিবী জুড়ে মূল্যবোধের একটা প্রশ্ন হাঁ করে মাথাচাড়া দিয়েছে। পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলো, সেই প্রশ্নগুলোকে মাঝে মাঝে বিশ্বদরবারে ছুড়ে ছুড়ে দিচ্ছে। ছোট দেশ হবার যেমন একটা বেদনা আছে, তেমনি তাদের এমন একটা সন্দর সরলতা থাকে যেটা বলিষ্ঠ যৌবনের সাক্ষ্য দেয়। বড় দেশগুলোর জটিলতা অনেক বেশি বলেই হয়তো তাদের চলা বলার মধ্যে সাবধানতার, কূট-রাজনৈতিক চালের ছাপ স্পষ্ট। তারা যে শুধু নিজেদের দেশকে চালিয়ে সন্তুষ্ট তাই নয়। তারা চায় বহু দেশের নেতা হতে, বিশ্বদরবারের কার্নিশ পেতে হলে কি আর সরল মাধুর্য নিয়ে বসে থাকা চলে?

প্রাগ পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর শহর। ১৯শ শতাব্দীতেই প্রাগের সৌন্দর্যের কথা পরিব্রাজকদের মুখে মুখে শোনা যেত। প্রায় এক হাজার বছরের পুরোনো এই শহরের রূপের তুলনা হয় না। ভাটাভা নদীর কূলে, ঠিক বোহেমিয়ার বুকের মাঝখানে প্রাগ স্পন্দিত হচ্ছে। শহরের লোকসংখ্যা এখন ১,০৩০,৩৩০-র মত। যুদ্ধের সময় প্রাগের জনসংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল।

প্রাগের দিকে কোনো বসন্তের দুপুরে তাকালেই মন ভরে যায়। শহরটা ভেঙ্গেলও নয় আবার সেকেলেও নয়। একদিকে এর অপূর্ব রাজপ্রাসাদ, গথিক সেন্ট ভাইটাস গির্জা, সেন্ট জর্জের রোমান গির্জা শহর আলো করে আছে। অন্য দিকে—যাকে মালা স্ত্রানা অর্থাৎ শহরের ছোট তরফ বলা হয় সে সব এলাকার গলি, পথ, রাস্তা—নদীর দিক দিয়ে গিয়ে চতুর্দশ শতাব্দীর চার্লস ব্রীজে মিশেছে।

শহরের এই ছোট তরফেই আগেকার কালের অনেক ধনীর স্বদেশী প্রাসাদে সরকারী অফিসগুলো আস্তানা গেড়েছে।

নদীর ওপারে হল স্তারে মেস্‌তো মানে পুরোনো তরফ। মধ্যযুগের চোখ জোড়ানো সেকেলে ঐতিহাসিক বাড়িঘর নিয়ে এই এলাকা। আর নোভো মেস্‌তো অর্থাৎ নতুন তরফে রয়েছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক আর ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলো। থিয়েটার, কনসার্ট হল, সিনেমা, ক্যাবারে, কফি-হাউস, নাইট ক্লাব, পার্ক বাগান, নদীতে বাইচ, দ্বীপে চড়ুইভাতি প্রাগের সর্বত্র। দূরে দূরে কারখানাগুলো ছড়ানো। চেটোল রাস্তার ওপর দিয়ে অবিরাম যানবাহন চলেছে তো চলেছেই।

একদিনে প্রাগ দেখা শেষ করা যায় না। চোখ বোলাতেও সময় লাগে। এর আর্ট গ্যালারীতে ঢুকলেই তো একটা দিন কেটে যাবে। মিউজিয়ামগুলো বাদ দিলে চলে না। তারপর ক্লান্ত হয়ে ওদের কোনো রেস্টুরেন্ট বা পাবে ঢুকলে তো সোনায় সোহাগা। ছবির মত দৃশ্যগুলো মনে পড়ে। চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ে কি যেন একটা অনুষ্ঠান ছিল। পাহাড়ী পথের মত ঘুরিয়ে ঘারিয়ে এখানে পৌঁছনোর রাস্তা। পাথরের চাঙড়া কেটে কেটে তৈরি এই বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু এর মধ্যে বসে কি ভয়নক সব আধুনিক কথাবার্তা চলেছে, শুনলে চমক লেগে যায়। [ক্রমশঃ]

পথ কে রুখবে?

মনোজ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর

॥ আগাশ ॥
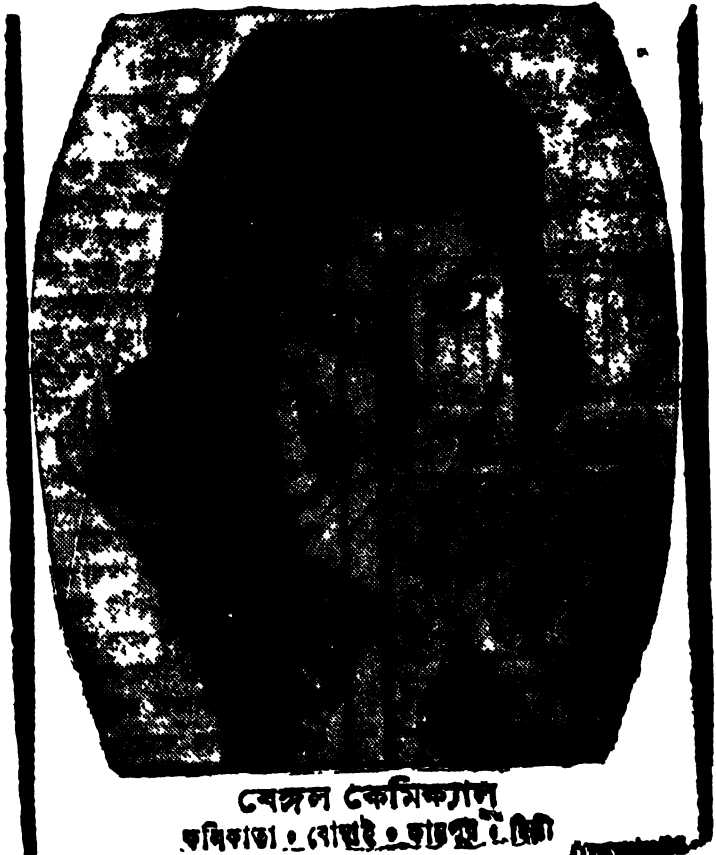
চার ছেলেমেয়ে বীরেশ্বরের, একটিও বেঁচে নেই। অসুখে ভুগে দুটি গেছে। শ্বশুরবাড়ি যাবার মুখে নৌকাডুবি হয়ে মেয়েটা গেল। শেষ সন্তান নকুলেশ্বর ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য সাম্প্রদায়িক বলি। বীরেশ্বরের শোক বোঝা যায় না। নিজের ও ছাত্রদের পড়াশুনো নিয়েই বরাবরই মেতে থাকতেন, তার কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। কিন্তু স্ত্রী কমলবাসিনীকে নিয়ে সমস্যা। শান্ত-স্বভাবের মানুষ তিনি, কিন্তু দাসী কুন্তী অর্ধমৃত অবস্থায় কোনক্রমে যশোরে ফিরল, তার কাছে পথের বৃত্তান্ত সবিশেষ শুনলেন। নকুলেশ্বর, লীলা এবং আরও হাজার হাজার মানুষের শোচনীয় পরিণাম। গলা টিপে লীলাকে মারতে গিয়েছিল এই কুন্তী, কিন্তু দুর্বল আঙুলের চাপে মারা পড়ল না। বেঁচে রয়েছে সে, কোন অজ্ঞাত জায়গায় তাকে নিয়ে পাচার করেছে, কিন্তু না বাঁচাই ছিল ভাল তরুণী বউটার পক্ষে। কুন্তী নিজের মৃত্যুরও বন্দোবস্ত করে রেখেছিল, কিন্তু সময়কালে ভেস্তে গেল। গলায় পা চাপিয়ে যে মেয়েলোকটার দাঁড়াবার কথা, ভয়ে সে পেরে উঠল না—থর থর করে কাঁপতে লাগল। অনেক ঘাটের জল খেয়ে কুন্তী শেষ পর্যন্ত কোনক্রমে দেশে-ঘরে ফিরল বয়স এবং চেহারা বিশেষ অনুকূল ছিল বলেই। দেখতে সে কুৎসিত এবং বয়সেও প্রৌঢ়ত্ব প্রায় পার হয়ে এসেছে।

এই সব বিবরণ শোনার পর চিরকেলে শান্ত মানুষ কমলবাসিনীর পাগলের অবস্থা। কখনো আকাশ ফাটিয়ে কাঁদেন, কখনো বা বিড় বিড় করে আপনমনে বকছেন। অথবা একেবারে চুপ। হঠাৎ একসময় বা অদৃশ্য কাদের উদ্দেশে গর্জে ওঠেন, গালিগালাজ করেন। স্বাধীনতার পর থেকে শহরে-গ্রামে এক অদ্ভুত কাণ্ড শুরু হয়ে গেল—যশোরে বীরেশ্বরদের অধ্যাপকপাড়াতেও বটে। হিন্দুস্থানে পালানোর কথা উঠলে পড়শিদের প্রতিজনেই মুখে মুখে বীরত্ব জাহির করেন: খেপেছেন? বস্তুভিটে ঘর-বাড়ি ছেড়ে-ছুড়ে কোন চুলোয় যেতে যাবো? এক পা নড়ছি নে, নিজেদের ঘর-বাড়িতে থেকে যা ঘটবার ঘটুক। সপরিবারে সেই মানুষেরই পাত্তা নেই, এক সকালবেলা উঠে দেখা গেল। সাধের বাস্তুভিটে ও ঘর-বাড়ি ছুঁচো-চামচিকের হেপাজতে সমর্পণ করে রাতারাতি ফৌত হয়েছেন। এবং কিছুকাল পরে উঠোনের জঙ্গল সাফ সাফাই করে ঘরের চামচিক-ছুঁচো তাড়িয়ে আর এক দল এসে আস্তানা গাড়ল সেখানে। একবর্ণ বাংলা বোঝে না তারা, পড়শিদের কথাবার্তা শুনে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। উদ্বাস্তু তারাও—পূর্ব-বাস্তুতে সর্বস্ব ফেলে ছড়িয়ে যৎসামান্য সঙ্গে আনতে পেরেছে। আর নিয়ে এসেছে প্রচণ্ড ক্রোধ। ক্রোধের পাত্র যারা, সে সব মানুষ নাগালের বাইরে। হিন্দু বলতে হাতের কাছে অসহায় যে ক'টি পড়ে রয়েছে, ঘৃণা-বিদ্বেষ তাদেরই উপর গিয়ে পড়ছে। যতটুকু পারে, এদেরই জব্দ করে প্রতিহিংসা নিতে চায়।

ছেলে-বউয়ের উপর অত্যাচারের জঘন্য খবর এসে পৌঁছল, কমলবাসিনীর মনের গতিকও তখন অবিকল এই রকম। পাশের বাড়ি নতুন পড়শি হয়ে এসেছেন তাঁরা মুসলমান—বিহারসরিফে ঘর-বাড়ি ছিল। সে বাড়ির কাউকে দেখলেই ধক করে কমলবাসিনীর দুচোখে আগুন জ্বলে ওঠে। পুত্রহন্তা তাঁরাই যেন। বর্ষীয়সী গিন্নীমানুষ—শোধ তুলবার কোন উপায় নেই, নিজেই অন্তরালে চলে যান—ঘরে ঢুকে দড়াম করে হুড়কো এঁটে দেন। শুচিবাই বিষম বেড়ে গেল—নিজের বাড়ির উঠোনে পা দিতেও গা ঘিনঘিন করে, সৃষ্টির অনাচার গায়ে লেগে গেল—বাতাসেও বুঝি অনাচার ভেসে বেড়াচ্ছে। বীরেশ্বর অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছেন: উত্তেজনার মুখে দাঙ্গা হয়ে গেছে—, তার জন্যে মুসলমান মাত্রেই কি দোষী? সৎ মুসলমান কতজনে প্রাণ অবধি দিয়েছেন দুর্গতকে বাঁচাবার জন্য। পাশের বাড়ি যাঁরা এসেছেন তাঁরাও দুর্ভাগা আমাদের মতন। দাঙ্গায় আত্মজনেরা প্রাণ দিয়েছে। লাহোরে মকুলদের উপর হামলা আর এঁদের বাড়ি হল বিহারে—লাহোর থেকে হাজার হাজার মাইল দূর।

কিছুতে কিছু নয়। শঙ্কা হল, শোক-তাপে কমলবাসিনী পুরোপুরি পাগল না হয়ে যান। সেই সময়টা মন দুলে উঠেছিল বীরেশ্বরের: দেশ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে যাই চলে। কোন একটা গাঁয়ে পোড়ো-জমির উপর খড়ের-চালা তুলে স্বাধীনতার সুখভোগ করিগে। কমলবাসিনী যেখানে একটু মানসিক

শান্তি পান, নরক হলেও সেইখানে আস্তানা নিতে হবে।

নরুল্লাহ্ ইদানীং পাড়ার মধ্যে প্রধান। এক সময়ে বীরেশ্বরের ছাত্র ছিল সে। মতিস্থির করতে না পেরে বীরেশ্বর তাকে খবর দিয়ে পাঠালেন : সমস্যায় পড়েছি নুরু। অন্যদের মতন পালাব না। যা-কিছু করব দিনমানে—দশের চোখের উপর দিয়ে। বিচারবুদ্ধি আমার লোপ পেয়ে যাবার গতিক। কী করা উচিত, তুমি বাবা ভেবেচিন্তে বাতলে দিয়ে যাও।

নুরু ব্যথাভরা দুই চোখে মুহূর্ত-কাল চেয়ে রইল অধ্যাপকের দিকে। বলল, আপনার মতন মানুষ যদি দেশ থেকে চলে যান, আত্মসম্মান বলে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না। নিজেদের জন্তু জানোয়ারের সামিল মনে হবে।

একটু থেমে আবার বলে, যা হয়ে গেছি জানোয়ার থেকে আলাদাও বড় বেশি নেই আর। তবে আপনার বাড়ির দিকে যদি কখনো হামলা আসে, হাজার মানুষ অন্তত ছুটে এসে পড়বে হাঙ্গাম-কারীদের মড়া না মাড়িয়ে কেউ এ বাড়ি ঢুকতে পারবে না। আপনার পা ছুঁয়ে বলছি মাস্টারমশায় এই কথাটা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করুন। গান্ধীজিও বলে-ছিলেন দেশ ভাগ সত্যি সত্যি যদি হয় তাঁর মৃতদেহের উপর দিয়ে তা ঘটবে। কিন্তু মহাত্মা মানুষের সঙ্গে সামান্য আমাদের তুলনা করতে যাবেন না। আমরা সত্যিই তাই করব।

অভিভূত কণ্ঠে বীরেশ্বর বললেন : হামলার ভয় করিনে আমি। যাদের বেঁচেবর্তে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবার কথা তারাই সব চলে গেল, বুড়োমানুষের প্রাণের কি দাম আছে? অশান্তি হয়েছে নকুলের মাকে নিয়ে। আপন হাতে চারিদিক তোমরাই সব—অথচ নাম শুনাতে পারব না তোমাদের। পা ফেলে তোমরা চলে গেলে সার্টিফিকেট গোবরজল ছেড়ে জায়গাটা শুদ্ধ করে নেয়। পাগলের বেহদ্দ—ভয় করছি, উদ্দণ্ড পাগল না হয়ে ওঠে। অসম্ভব নয়, বড্ড কঠিন ঘা খেয়েছে তারই প্রতি-ক্রিয়া। কঠিন সমস্যা হয়েছে এখন নকুলের মাকে নিয়ে। কী করব তোমার কাছে পরামর্শ চাচ্ছি।

নরুল্লাহ সমাধান দিতে পারে নি, খানিকটা হাহুতাশ করে চলে গেল। কিন্তু স্থানের বীরেশ্বরের বিশ্বের জন্য সেখানে সব কাজকর্ম নিয়ে আছে। শিকড় পড়লে সত্যিই যে পোড়ো-জমি খুঁজে নিয়ে চালাঘর তুলতে হবে, সে ব্যাপার নয়। কিন্তু পলায়ন জিনিসটাই আদর্শবিরুদ্ধ। গান্ধী-নেতৃত্বের দুর্বলতা নিয়ে লোকে আজ যতই বক্রোক্তি করুক, বীরেশ্বরের বিশ্বাস অবিচল। গান্ধীজির উক্তি মন্ত্রের মতন মনে মনে জপ করেন : দেশ-বিভাগ আমি বিশ্বাস করি নে। পাকিস্তানে যাবার সময় পাশপোর্ট করবেন না, বলেছিলেন গান্ধীজি। অতএব বিভেদটাই যখন অলীক, কেন তিনি নিজ অঞ্চলের ঘর-বসত তুলে দিতে যাবেন?

কর্তব্য ভেবে পাচ্ছেন না, এমনি সময়ে হেমকান্ত লীলা ও ফুল্লবালাকে বীরেশ্বরের যশোরের বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন। সেখানে কুন্তী। কুন্তীকে দেখে লীলা কী আকুল কান্না কাঁদল তাকে জড়িয়ে ধরে : প্রাণ ধরে আমায় মারতে পারলিনে কুন্তী, তবু কিন্তু বেঁচে নেই আমি। বাঁচবার জন্য কত হাতে-পায়ে ধরলাম, কিছুতে বাঁচতে দিল না। তোর হাতে প্রাণ গেলে কত শান্তি ছিল রে কুন্তী প্রাণ বজায় থেকে অহোরাত্রি জ্বলে-পুড়ে মরি, প্রাণ রাখতে একটুও আমার ইচ্ছে করে না।

সাত-সাগরের সমস্ত জল যেন লীলার চোখ দুটোয়। অনেক করে কুন্তী বোঝাচ্ছে : প্রাণ দিলেই তো হল না। বাচ্চার মুখে তাকাও বউদি। আহা, ঝিকমিকে সোনার পদ্ম। তুমি ভেঙে পড়লে বাচ্চার কি হবে?

লীলা বলল, প্রাণটা থাকতে দিয়েছি ফুল্লরার মুখ চেয়েই তো। শ্বশুর-শাশুড়ির আশ্রয়ে এনে ফেলেছিও সেই জন্য। বাচ্চার একটা হিল্লে হয়ে যাক তারপরে একটা দিনও আর প্রাণ রাখব না। প্রাণ নিয়ে আমার বড্ড ঘেন্না রে কুন্তী—

বলতে বলতে চাপা গলায় সহসা গর্জন করে উঠল : আমার বড় দা ফাঁসিতে গেছে, ছোড়দাও যাবার জন্য তৈরি। বিয়ে খাওয়া করে ছেলের বাপ হয়েও সে সংসারী হতে পারল না। মরণ আমরা একটুবিন্দু ডরাইনে। আমার অর্ধেক ফাঁসি দিয়েই তো দিয়েছিস তুই, গলার উপর ছাপ পড়ে আছে। ফুল্লরার একটু ব্যবস্থা হয়ে গেলে নাকিটুকু সারা করব। কিন্তু অমনি এমনি যাবো না আমি, প্রতিহিংসা নিয়ে যাবো। অত্যাচারী দুশমন দু দুটোকে ঘায়েল করে আমার বড়দা শিখিয়েছিলেন আমি নেবো অন্তত একটাকে দু গণ্ডা।

কুন্তীর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছিল। বয়স কাঁচা হলে কি হয়—বউটা একেবারে শিক্ষা বাঁচবে নাহারে। থাকতে কুন্তী পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। পাগল, পাগল—পাগলের জ্যেঠী ওরা। বাড়ি যে উন্মাদাশ্রম হয়ে ওঠবার গতিক। কথাবার্তার খানিক খানিক সে বীরেশ্বরকে বলল : দিদি-মা'কে নিয়ে উতলা হয়েছিলেন, আবার একটি এসে পড়ল। এটি তো সাংঘাতিক একেবারে।

একফোঁটা নাতনীকে কমলবাসিনী কোলে তুলে নিলেন, কোল থেকে বড় নামাতে চান না। ক'দিনের মধ্যে মেতে উঠলেন একেবারে। খাওয়াচ্ছেন বাচ্চাকে টিপ-কাজল-আলতা পরাচ্ছেন, নাচাচ্ছেন কোলে কাঁখে নিয়ে, মাথায় তুলছেন। ঐ অবস্থায় একদিন মাথা ভিজিয়ে দিল তো হেসেই কুটি-কুটি। নাতনী পেয়ে শোক অনেকখানি এবার সামলে নিয়েছেন। শুচিবাইয়ের উগ্রতাও নেই আর তেমন। ঘরের বারই হন না—অহরহ নাতনীর সঙ্গে মেতে আছেন, সময় কোথা অন্য ভাবনা-চিন্তার?

বীরেশ্বরের সোয়াস্তি। লীলার সম্বন্ধেও কুন্তী কত কি বলেছিল, কত রকম ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু বউয়ের কথাবার্তা চালচলনে কেউ বলতে পারবে না আর দশটা গৃহস্থবধূ থেকে সে আলাদা-কিছু। বিষাদের একটা করুণ ছায়া মুখের উপরে, হাসে না সে কখনো কিন্তু ভয়ের নয় সে জিনিস, বড় বেদনার।

ফুল্লরা সর্বক্ষণ কমলবাসিনীর কাছে সংসার নিয়েই আছে লীলা—মেয়ের শুধু রাত্রিবেলাটা মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক। সে সময়টুকুও কমলবাসিনী নাতনীকে ছাড়তে চান না। প্রকাণ্ড খাটের ব্যবস্থা হয়েছে—তার একদিকে কমলবাসিনী অন্য দিকে লীলা মাঝে ফুল্লরা। মেয়েকে দুজনে দু'দিকে ঘিরে নিয়ে ঘুমোন। এই কিছু-কাল বীরেশ্বরের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে ছিল। কলেজ-লাইব্রেরীতে ইতিমধ্যে বিস্তর নতুন নতুন বই এসেছে, তিনি শুধু চোখ তাকিয়ে দেখেন—উল্টে-পাল্টে চোখ বুলোবার মতোও মনের অবস্থা ছিল না। সম্প্রতি আবার রাশি রাশি বই বাড়ি আনতে লেগেছেন—গভীর রাত্রি অবধি বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকেন আগেকার দিনের মতো।

কুন্তী একদিন পড়ার ঘরে ঢুকে ভগ্নদূতের মতন হঠাৎ এক দুঃসংবাদ দিল : গতিক ভাল নয়।

এ কোন্ অরণ্যে আমি একা

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

তুমি ঐ বিজন পথ ছেড়ে দাও;
        সহজ দুঃখের মতো
নিতান্ত বন্ধুর বেশে এখানে দাঁড়িও না কিন্তু
        অন্ধকারে চিৎ হোলে
আশ্চর্য ভুবন আমরা হাতড়ে খুঁজে ফিরি।
কোলাহল থেমে গেলে
অনায়াসে ভুলতে চাই তৃতীয় বন্ধুর নাম।

নাম সে কি বিপর্যস্ত হাওয়ার শরীর?
নাকি এই স্বাস্থ্যকর পাহাড়টিলার মতো রমণীয় কিছু!
হত্যার প্রথম সর্ত তবে কী তোমাকে উন্মন করে দেওয়া?

কে তুমি বাজালে বীণা মুগ্ধ করতলে,
অকস্মাৎ কে তুমি নিভিয়ে দিলে বৈদ্যুতিক আলো এই রাতে!
হত্যাকারী কোথায় পালালে তুমি এই অন্ধকারে!
        এ কোন্ অরণ্যে আমি একা
        ফিরবো কী?
ফেরলে হয়ত তুমি বলবে নিঃসঙ্গ কেমন আছো স্মৃতি
        কী ভীষণ পুরাতন!
অথচ
পর্দা সরালে দেখবে বুকে গূঢ় নেশা নিয়ে
অর্থাৎ তোমার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে স্থির
        কোনো এক আদিম সাপুড়ে।

কি হল আবার?

এদিক-ওদিক চেয়ে নিয়ে ফিসফিসিয়ে কুন্তী বলল, রিভলবার এনেছে বউদি সঙ্গে করে। দিন-রাত তো কাছে কাছে রয়েছি, ঘুণাক্ষরে টের পাই নি। আজকেই প্রথম দেখতে পেয়েছি।

ঠিক দুপুরবেলা, বীরেশ্বর কলেজে। বাচ্চাকে নিয়ে কমলবাসিনী নিজের ঘরে ঘুমিয়ে গেছেন। রান্নাঘরে কুন্তী খেতে বসেছে খেয়েদেয়ে বাসন-কোসন ধুয়ে সে-ও ঘরে শুয়ে পড়বে। নিত্যিদিনের এই বিধি। লীলা এ সময়টা উপরের ঘরে থাকে—বই টই পড়ে, ঘুমোয় কোন কোন দিন। বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে, ছোট বাসাবাড়ি একেবারে নিশুতি। উনানে বেগুন পুড়িয়ে নিয়েছে কুন্তী, মাখাতে গিয়ে দেখে লঙ্কা নেই। ঘরে না থাকুক, তরকারি-ক্ষেতে আছে—তুলে আনলেই হল। পাঁচিলের বাইরে ক্ষেতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল আমবাগানের ভিতর মানুষ একটা। স্ত্রীলোক—বউদিদি বলে তো মনে হয়। হাঁ, লীলাই। এই ভর-দুপুরে উপর থেকে নেমে পা টিপে টিপে আমবাগানে যায় কেন যাচ্ছেন বউ কী কাজ তার এখন? আরও কিছু এগিয়ে কুন্তী অন্তরালে দাঁড়াল। রিভলবার তাক করছে বউদিদি আমের গুঁড়ির দিকে। নিরিবিলি টার্গেট প্র্যাকটিস হচ্ছে। লীলার কথাবার্তাগুলো ধক করে মনে পড়ে গেল কুন্তীর। প্রতিহিংসা মুখের কথাই নয় তবে। ভাই-বোন এদের আক্রোশ কথার তড়পানিতেই শেষ হয়ে যায় না—যা বলে কাজেও ঠিক ঠিক তাই। ভাইয়ের প্রতিহিংসা নেবার সংকল্প ফুটফুটে ঐ তেজী বউয়ের। কুন্তীর গা কাঁপে, তাড়াতাড়ি সে রান্নাঘরে পালিয়ে এলো।

বীরেশ্বর পরদিন লীলাকে নিরিবিলি ডেকে বললেন, ছেলেকে একটা জিনিষ দিতে হবে মা। না—বললে শুনব না।

প্রথমটা বুঝতে পারে নি। শুনে নিয়ে লীলা বেকবুল গেল না আজে-বাজে কৈফিয়ৎও দিল না। একটুখানি চুপ করে থেকে বলল, কেন বাবা?

আমার ভয় করে। মাস্টারমানুষ তো তায় বুড়ো হয়ে গেছি। ওসব জিনিষে বড্ড ভয় আমার।

কিন্তু এই যে সম্বল আমার বাবা। এই সম্বল হাতে পেয়েই তো বুকে জোর এলো আতঙ্ক দূর হয়ে গেল—আপনাদের মাতঙ্গী আপনাদের কাছে এনে পৌঁছানোর ভরসা পেলাম।

বলতে বলতে লীলার কণ্ঠে হাহাকার বেজে উঠল: সেদিন এমনি কিছু হাতের কাছে পেলে লাঞ্ছনা কিছুতেই ঘটত না। কুন্তীর হাতে মরতে গেলাম, ভয়ে সে নিজেই কেঁপে মরে। অস্ত্র থাকলে মরণ কেউ রুখতে পারত না আমার। দুটো-চারটে দুশমনকেও ঠিক শেষ করে যেতাম।

বীরেশ্বর ফোঁস করে একটা গভীর নিশ্বাস ফেললেন: এইটুকু বয়সে কত দুঃখ পেয়েছ মা। হাজারের মধ্যেও একটা এমন হয় না। ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়। বাগ পেয়ে হিংস্র জানোয়ার আক্রমণ করেছিল, সে আতঙ্ক চিরকাল মনে পুষে রাখতে যাবে কেন?

লীলা বলে, তর্ক করা অন্যায় হচ্ছে বাবা। কিন্তু জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে আগেকার মতন আবার নিঃসম্বল হয়ে থাকতে বলেন?

ভুল ভেবেছ মা। জন্তু জানোয়ার নয়, মানুষ। চারিদিকে কত সব ছাত্র আমার, তাদের একফোঁটা বয়স থেকে জানি। মানুষ বলেও সুখ হয় না। মুসলমান হলেও হিন্দুর দেবদেবীদের যেন তাদের মধ্যে দেখতে পাই।

লীলা বলে, লাহোরেও সবাই এমনি ভেবেছিল বাবা। কত অধ্যাপক-বন্ধু আপনার ছেলের-প্রাণের দোসর। ভক্তিমান ছাত্রেরা স্যারের নামে অজ্ঞান। দুটো-তিনটে দিনের ভিতর কী হয়ে গেল, পায়ের নিচে মাটি নেই।

বলতে বলতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠে সে কেঁদে পড়ল। বলে, কুপিয়ে কুপিয়ে মানুষ মেরে মরা-ইঁদুরের লেজ ধরে ছুঁড়ে দেবার মতন মড়া ফেলতে দেখেছি। নিজের এই চোখ দুটো দিয়ে দেখেছি বাবা, একটা দুটো নয়—গাদা গাদা। আর শুনতে পাই, বিনি-রক্তপাতে অহিংসার পথে না কি স্বাধীনতা এসেছে!

বীরেশ্বর চোখ নিচু করে ক্ষণকাল চুপ করে রইলেন। তারপর ধীরকণ্ঠে বললেন, তবু বলছি মা, বিশ্বাস করে আমার কাছে গচ্ছিত রাখ। খুব সাবধান করে রাখব। তোমার সঙ্গে নিয়ে-আসা জিনিষ কোন রকমে বেহাত হতে দেবো না। দরকারের মুহূর্তে পেয়ে যাবে। চাইতেও হবে না, আমিই তোমার হাতে গুঁজে দেবো।

[ক্রমশ]

লোকসঙ্গীতের একাল না আকাল?

মুরশিদ

মারিফতী গানে মুরীদ অর্থাৎ শিষ্য তার মুরশিদ অর্থাৎ গুরুকে জিজ্ঞাসা করছেন : "মুরশিদ কই আইলাম অ, নির্ণয় না পাই মুরশিদ কই আইলাম অ।" সে যুগে মুরশিদের কাছে প্রশ্ন ছিল একটাই। কিন্তু একালের মুরশিদের সামনে হাজার জনের হাজার রকমের প্রশ্ন —বলুন তো, লোকসংগীতের সংজ্ঞাটা কি? আকাশবাণী আগে ঘোষণা করত পল্লীগীতি এখন বলে লোকগীতি, এটা কি আকাশবাণীর কর্তাদের শুধু মর্জি, না এর মধ্যে কোনো তাৎপর্য আছে? প্রাচীন লোকগীতি ও আধুনিক লোকগীতির সীমান্তরেখাটা কোন্ তারিখ ও কোন্ সনের ওপর দিয়ে টানা হয়েছে। যদি টানা না হয়ে থাকে তবে এই সীমান্ত-বিরোধের মীমাংসা করছে কে? গ্রামোফোন কোম্পানী দমদম কারখানায় 'ফোক-সং' তৈরি করে স্টার লেবেলে বাজারে যা ছাড়ছেন, সেগুলি সত্যি 'সং' না 'সঙ'? অমুক বিশ্ববিখ্যাত পল্লীগীতি গাইয়ে কিংবা তমুক গোল্ডমেডালিস্ট বাউল ফাংশনে ফাংশনে যা পরিবেশন করে বেড়াচ্ছেন—এর নামাকরণ কি ফোক, না ফকো-মডার্ন? লোকসঙ্গীতে বাঙাল বা বাঙালদের উপভাষা পরিশোধিত করে নেয়া উচিত না অনুচিত? ইত্যাদি শত শত প্রশ্নে ক্ষতবিক্ষত মুরশিদ। শহরের সুরের সুরা আর তাসের তাড়িতে মাতালদের ভাটিখানায় গাঁয়ের জলভরা সুন্দরী কন্যাকে রোজ ধর্ষিতা হতে দেখছেন মুরশিদ অসহায়ের মত। 'দুঃখের কথা কার কাছে কই গিয়া?' এমন সময় সাপ্তাহিক বসুমতীর সম্পাদিকা তাঁর বহুল প্রচারিত পত্রিকার গণ্যমান্য বিদগ্ধদের সভায় মেহেরবাণী করে এই গ্রাম্য আউলিয়াকে দু'-কথা পেশ করার জন্য দাওয়াত দিলেন। কিন্তু মুরশিদ তো আলিম আদমী নয়। গবেষক পণ্ডিতদের ভাষায় সে তো কথা বলতে জানে না। মুরশিদ মরমীয়া। নিম্নস্তরের হালধরা ও 'হাইল ধরা' কড়াপড়া হাতের গ্রাম্য মানুষগুলির সুখে-দুঃখে ও শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মরম দিয়ে মিশলেই কেবল লোকগীতির সমজদার হওয়া যায় মুরশিদ এই কথা মনে করে। পণ্ডিতালীতে তা বোঝা যায় না। তাদের পক্ষ থেকেই সহজ ভাষায় মুরশিদ কিছু নিবেদন করতে চায়।

'এমন উল্টা দেশ বা গুরু'

গ্রাম্য পালাগানের প্রস্তাবনা গাইতে গিয়ে গ্রামের বয়াতী আরম্ভ করেন :

'পুবেতে বন্দনা করি পুবের ভানুশ্বর—
একদিকে উদয়রে ভানু চৌদিকে
পশর।'

কিন্তু মুরশিদ এই আলোচনার প্রস্তাবনায় কি গাইবে? 'চৌদিকে পশর' ত' সে দেখতে পাচ্ছে না। সে দেখছে চৌদিকে কুয়াশা। আর সেই কুয়াশার পশ্চাৎপটে চলছে এক উলটপুরাণ পালা। চারদিকে লোকসঙ্গীতের ছয়লাপ। আকাশবাণীতে সকাল আটটা থেকে রাত সাড়ে দশটা অবধি কত নতুন নতুন গলা। লোকসঙ্গীতে গবেষণা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট পেলেন কত সুধীব্যক্তি। সংগীত-নাটক একাডেমী কত বৃত্তির আয়োজন করেন প্রতি বৎসর। সরকারী সাহায্য পাওয়া কত সঙ্গীত গবেষণা কেন্দ্র। পাড়ার 'ফাংশন' নামীয় বিচিত্র বারোয়ারী ভোজে লোকসঙ্গীতের চাটনি না থাকলে ত' চলেই না। তাই বলছিলাম চারদিকে লোকগীতির ছয়লাপ। অথচ লোকগীতি কই? বানে ভেসে গেল দেশ—কিন্তু পিয়াসার পানি কই? তাই মুরশিদের গাইবার মন যায় দেহতত্ত্বের একটি গান "এমন উল্টা দেশ বা গুরু কোন জায়গায় আছে।"

এখানে কেউ আবার বলতে পারেন —কিন্তু এই 'উলটপুরাণ' কি কেবল লোকসঙ্গীতের বেলায়? দেশে বিদ্যালয়ের সংখ্যা এবং সে জন্য যত অর্থব্যয় বাড়ছে— শিক্ষিতের মান ও সংখ্যা তত যাচ্ছে কমে। দেশ উন্নয়নের জন্য যতই পরিকল্পনা হচ্ছে ততই বাড়ছে বেকারী, বিদেশ থেকে যতই খাদ্য আমদানী হচ্ছে ততই খাদ্যের অনটন ইত্যাদি। তার জবাবে মুরশিদ বলতে চান—সে জন্য আছে আন্দোলন, বিক্ষোভ মিছিল, ঘেরাও, ধর্মঘট ইত্যাদি। কিন্তু সংগীতের উলটপুরাণ পালার গায়ন ও বাদনদের ও তাদের প্রধান আখড়া আকাশবাণী কিংবা গ্রামোফোন কোম্পানীকে ঘেরাও করার কথা কি কেউ ভাবতেও পারেন? সংস্কৃতির বিকৃতির বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন তো দেখছি না, বরঞ্চ এই বিকৃতির উপাসনায় রত মুনাফার কাপালিকরা মঞ্চ দখল করে আছে সর্বত্র। সেখানে তার প্রথম বলি, বাপ-মা হারা এতিম লোকগীতি। রবীন্দ্রসঙ্গীত, রাগসঙ্গীতের পাহারাদার অনেক আছেন। বিকৃতির বিরুদ্ধে কাগজেপত্রে তাঁরা লেখালেখিও করেন। কিন্তু গেঁয়ো চাষার গানের বিকৃতির বিরুদ্ধে সওয়াল জবাব করার মতো কোন উকিল মোক্তার নেই। রবীন্দ্রসঙ্গীত, রাগসঙ্গীতের মুরুব্বীয়ানদের অনেককে দেখেছি লোকসংগীত সম্পর্কে একেবারে কিছুই জানেন না, এবং এই না জানার জন্য এঁরা লজ্জাবোধও করেন না। এঁদের এই অজ্ঞতাই সেই বিকৃতিকে সাহায্য করে চলেছে।

কে দায়ী?

লোকসংগীতের কথা উঠলেই লোকে কয়েকজন মুখ্য লোকসঙ্গীত গাইয়েকে নিয়ে আলোচনা করে। বাংলাদেশে দুজনের কথাই সবচেয়ে আলোচিত। একজন হলেন নির্মলেন্দু চৌধুরী, অন্যজন পূর্ণদাস। খ্যাতির কথা বলতে গেলে তাঁরা আব্বাসউদ্দীন ও শচীনদেব বর্মণকেও ছাড়িয়ে গেছেন। খ্যাতিলাভ করলেও অতীতে এদেশের লোকসংগীত গাইয়েরা ছিলেন আদার বেপারী জাহাজের খবর তাদের রাখতে হয় নি, কিন্তু নির্মলেন্দু চৌধুরী বা পূর্ণদাস জাহাজে কেন হাওয়াই জাহাজে দুনিয়ার ঘাটে বাংলার লোকসংগীতের গবগবী কাঁভারে এসেছেন। নির্মলেন্দু চৌধুরীই এ বিষয়ে অগ্রজ ও অগ্রণী। আব্বাস-শচীনের যুগ কেটে যাওয়ার অনেকদিন পর আধুনিক গানে ঝিমিয়ে-পড়া মাইক-মুখী অমায়িক গায়কদের আসরে বেমাইক মোটা জোরালো কণ্ঠে দরজা ভেঙে প্রবেশ করলেন নির্মলেন্দু চৌধুরী। পূর্ববঙ্গের

হাওর-বিলের হাওয়া কলকাতার 'বিদগ্ধ'-দের গা জুড়িয়ে দিল। কিছু-দিন পর পূর্ণদাসের আগমন। এ যুগের বাউলদের গাঁজা-খাওয়া হেঁড়ে গলা শুনে যাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন, রাঢ়ের শুকনো লালমাটির চিক্কণ শানানো গলায় পূর্ণ-দাস তাদের মন মাতিয়ে তুললেন। তাদের জনপ্রিয়তা ও আর্থিক সাফল্যই শেষে কাল হয়ে দেখা দিল। শহরের উন্নাসিক ভদ্দরলোকরা এঁদের "ড্রইংরুমে" তুলে নিলেন। তারপর নির্মল চৌধুরীর দোতারা হাত থেকে খসে গেল, পূর্ণ-দাসের আলখাল্লায় লাগলো সিল্কের জৌলুস। হলেন তিনি বাউল-সম্রাট। অর্থলোভী যশপ্রার্থী নবীন গায়করা এই দুই মহাজনের আখড়ায় ভর্তি হতে লাগলেন। কিন্তু মুরশিদ আজকের সওয়াল জবাবে এঁদের কাউকে আদালতে হাজির করতে চায় না। বরঞ্চ আজকের জনসাধারণের রুচি তৈরির একচেটিয়া কারখানা রেডিও বা গ্রামোফোন কোম্পানীকে কাঠগড়ায় প্রথম দাঁড় করাতে চায়। প্রথমেই ধরতে চাই আকাশবাণীকে।

আকাশবাণীর 'আরশীনগর'

আকাশবাণীই সবচেয়ে বেশি লোক-সঙ্গীতজ্ঞ উৎপাদন করছেন—প্রতিদিন ৩।৪ জন লোকগীতি গায়ককে আমাদের সামনে হাজির করে। কিন্তু যত বেশি উৎপাদন, তত বেশি গানের মান যাচ্ছে নেমে। কিন্তু আকাশবাণীর কর্তারা বোধ হয় হোমিওপ্যাথীর বিশ্বাসী, যত বেশি 'ডাইলুশন' তত বেশি শক্তিশালী।

আমি এ কথা বলছি না যে, রেডিওতে খাঁটি লোকসঙ্গীত একেবারেই শোনা যায় যায় না। পরিচিত পুরনো শিল্পী অমর পাল মণীন্দ্র দাস, শশাঙ্ক সিংহ, ধীরেন দাস, রাজেন্দ্রনারায়ণ বর্মণ কোন-রকমে ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছেন। সাধারণে অপরিচিত গ্রামশিল্পী দীনবন্ধু দাস, অনন্ত দাস, নারায়ণদাস বাউল, নিমাইচন্দ্র দাস, নিমাই রায়, মাখনলাল সরকার প্রভৃতির গলায় গ্রাম্য আমেজটি চমৎকার পাওয়া যায়। নতুন শিল্পীদের মধ্যে নিত্যপদ দাস নিঃসন্দেহে এক আবিষ্কার। তাঁর গলা শুনলে গ্রামের বালুচরের রূপালী দানাগুলি যেন কানে বাজে পড়ে। যদিও তাঁর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় মুরশিদ কিছুটা আতঙ্কিত। আজকের চাহিদার স্রোতকে সামলাতে গিয়ে গলায় জোর দিয়ে যেন চলতি চলনে না পড়ে গলার পালে হাওয়া লাগাতে চলে যান। নতুন গায়কদের মধ্যে দীনেশ চৌধুরী, রাণা চৌধুরী প্রমুখের কণ্ঠে পল্লীর সংকেত, আবেদনটি আছে। মেয়েদের মধ্যে কুন্তলা গোস্বামী, কল্যাণী বিশ্বাস, কৃষ্ণা সাহা, ললিতারাণী ধরচৌধুরী, সিন্ধুরাণী ধর, রমা সরকার, গীতা চৌধুরী, সবিতা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ গায়িকারা ধারা বজায় রেখে চলেছেন। যদিও এঁদের মধ্যে কেউ কেউ একদিন খাঁটি গান গাইছেন অন্যদিন আবার সেই পবিত্রতা রক্ষা করতে পারছেন না—অর্থাৎ লোকসঙ্গীত সম্বন্ধে এঁদের কারও কারও ধারণা খুব অস্পষ্ট। তা ছাড়া আছে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় এবং ক্যালকাটা ইউথ কয়ার, ন্যাশনাল ইউথ কয়ার প্রভৃতি। কিন্তু আজ এঁদের সম্বন্ধে আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয় আমার বক্তব্য রেডিওর কয়েকটি ধানের সঙ্গে এতো তুষ মিশে আছে যে, তা থেকে সাধারণ শ্রোতার পক্ষে ধান বেছে বার করা প্রায় অসম্ভব। রেডিও কর্তৃপক্ষ কি জেনেশুনে স্বজনতোষণের জন্য এই ভেজালের ব্যবসা করছেন না তাঁরাও ধান আর তুষের পার্থক্য জানেন না? দু-একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে। শ্রীসনৎ সিংহ কিম্বা সলিল মিত্রের মত আধুনিক গায়করা মাঝে মাঝে লোক-সঙ্গীতের প্রোগ্রাম করেন। তাঁদের প্রোগ্রামে তাঁরা যথেচ্ছভাবে লোকসঙ্গীতকে ধর্ষণ করে যান। তাঁরা আবার সকাল ও রাত্রে গান গাইবার বিশেষ সুবিধা ভোগ করেন। আকাশবাণীর বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে এমনভাবে পল্লী-গীতির উপর বলাৎকার করার দুঃসাহস তাঁরা পেতেন না। রেডিও কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞেস করতে চাই তাঁরা কি বাংলা-দেশের গ্রামে গেছেন কোনদিন? পাল্কী-চলা দেখেছেন? না কবি সত্যেন দত্তের রচনা সলিল চৌধুরীর সুরে শুনেই পাল্কীর গানের ধারণা করে নিয়েছেন। তাঁরা কি করে গত ২৬শে জুলাই মতিলাল দাস ও সম্প্রদায়কে সলিল চৌধুরীর সেই বিখ্যাত গানের বিকৃত অনুকরণে রচিত ও গীত তথাকথিত পাল্কীর গানকে পল্লীগীতি বলে চালিয়ে দিলেন। এদের লোকগীতি সম্বন্ধে কোন বিদ্যে থাকলে গত ২রা জানুয়ারী ভাটিয়ালীতে গাওয়া:—

পাহাড়ের গায় হেলান দিয়া বাঁস
        ওরে সাঁওতালীরা
মনের বনে তুমি বাজাও বাঁশী,
        পিয়ালপাতার বাঁশী ..

এই গানকে প্রাচীন রচনা বলে ঘোষণা করতেন না। যে কোন একজনকে দিয়ে গান লিখিয়ে ও সুর দিয়ে রেডিও-র ফাঁকের বাসায় কতো চতুর কোকিল যে নির্বিবাদে ডিম পেড়ে যাচ্ছে—ইয়ত্তা নেই।

কর্তৃপক্ষের অজস্র অনুযোগ নিয়েছেন অনেক ভাল গায়কও। পরোক্ষভাবে নাম জানে তাঁর গলায়ও জিনিস আছে। কিন্তু তিনিও গানের অভাবে (আজকাল কেউ আর সংগ্রহের চেষ্টা করতে চান না) কোন কোন সময় নিজেই তৈরি করছেন, নিজেই সুর লাগাচ্ছেন। কয়েকদিন আগে ভৈরবী-ঠুংরীর ধরণে "স্বরচিত মধুবনে মধু নাই —ভ্রমরা যাও রে।" কিংবা পূর্ববঙ্গের অতি পরিচিত একটি মরমী গীত "বিদায় দেও গো শচীরাণী সন্ন্যাসেতে যাই" গানটিতে নিজে সুরসংযোজন করে গান-টির মাধুর্য নষ্ট করেছেন। কিন্তু তিনি ভালই জানেন রেডিওতে তাঁকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কেউ নেই। মণীন্দ্র দাসের মত বিখ্যাত গাইয়ে গত ৩রা অক্টোবর ভাওয়াইয়া ঘোষণায় সোজা ভাটিয়ালীতে গেয়ে চলে এলেন। আজ আর দৃষ্টান্ত বাড়াতে চাই না। আজ শুধু রেডিও কর্তৃ-পক্ষের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন উপস্থিত করে দফাওয়ারী এই আলোচনা শেষ করব।

—আপনাদের লোকসঙ্গীতের অডি-শনের পরীক্ষক কে বা কারা? তাঁদের যোগ্যতা কি? বাংলাদেশের সব অঞ্চলের লোকসঙ্গীত বিচার করার মতো উপযুক্ত ব্যক্তি কে কে আছেন?

—আপনাদের উপদেষ্টা বোর্ড আছে কি? থাকলে তাঁদের নাম জানতে পারি কি?

—প্রোগ্রাম ঠিক করেন কে? কি রীতিতে এবং নীতিতে তিনি কাউকে সকালে ও রাত্রে আবার কাউকে বিকালে ও সন্ধ্যায় প্রোগ্রাম দেন?

—প্রাচীন লোকগীতি বলতে আপনারা কি বোঝেন? কোন্ তারিখ থেকে প্রাচীনের সংজ্ঞা নির্ধারিত হবে?

—আপনারা আঞ্চলিক নামে ঘোষণা করেন না কেন? ভুস., ভাদু., গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া, চটকা, ভাটিয়ালী কিংবা-- বাউল, (পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, মধ্যবঙ্গ) এইভাবে। তাহলে ফাঁকি দেবার পথ কি অনেকটা বন্ধ হবে না?

—বাংলাদেশে কি লোকসঙ্গীতের এমনি আকাল পড়েছে যে অজিত গুপ্ত, মিন্টু দাশগুপ্ত, সুধীর সরকার, প্রবীর মজুমদারদের মত রচয়িতাদের নিয়োগ করতে হয়? তাঁরা তো ঐতিহ্যবাহী লোকগীতিগুলিরই অঙ্গচ্ছেদ করে—কালা, কুঞ্জ, রাধা আর বাঁশীর যোগ-বিয়োগে গান তৈরি করেন।

—আরো প্রশ্ন আছে। কিন্তু এ কয়টির জবাব পেলেই অন্য প্রশ্ন করতে পারি। তাঁরা যদি উত্তর না-ও দেন মুরশিদ তাঁদের ছাড়বে না। বাংলাদেশের লোকগীতির অনুরাগীদের কাছেও এই প্রশ্ন রইলো।

ইংলিশ থিয়েটার ঃ

নর্মান মার্শাল—অভিনেতা এবং প্রডিউসার হিসেবে ইংলণ্ডে এঁর যথেষ্ট নাম আছে। বছর ১২।১৩ আগে একটি ছোট দল নিয়ে ইনি কলকাতায় এসেছিলেন। শেক্সপীয়রের নাটকের বাছাই করা দৃশ্য এই দলটি নিউ এম্পায়ার মঞ্চে অভিনয় করে দেখিয়েছিলেন। কলকাতায় যে সব বিলিতি দল অভিনয় দেখিয়ে গেছেন তার মধ্যে এই দলটিই বোধহয় ছিল সব দিক দিয়ে সেরা।

থিয়েটার সম্পর্কে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দিকগুলো নর্মান মার্শাল ১৯৪৭ সালে তাঁর বিখ্যাত বই 'দি আদার থিয়েটার' এ প্রকাশ করেন। এ বইটির কিছু কিছু অংশ অনুবাদ করে বসুমতী সাপ্তাহিকের পাঠক পাঠিকাদের উপহার দেব।

নর্মান মার্শাল লিখেছেন ঃ
প্রথম পরিচ্ছেদ—দি চৌরেস্টিজ

ভুলেই গেছিলাম ১৯২৫ ২৬-এর সিজনটা কি রকম উত্তেজনাপূর্ণ হয়েছিল। পুরনো প্রোগ্রাম এবং প্রেস কাটিংসে ঠাসা একটা কার্বোর্ড হাতড়াতে হাতড়াতে এক বাণ্ডিল কাগজ পেলাম। তার ওপর লেবেল মেরে লেখা আছে—"১৯২৫-এর ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৯২৬-এর ১লা জুন অবধি যে সব শো দেখেছি। ঐ বছরই আমি অক্সফোর্ড ছেড়ে আসি। লণ্ডনে থাকবার সুযোগ পেয়ে থিয়েটার দেখবার খুব সুবিধা হল।

আমার মত থিয়েটার অনুরাগী যুবকের দিক থেকে সত্যিই এই সিজনটা ছিল খুবই বিস্ময়কর। লণ্ডনে একসঙ্গে এতগুলো ক্ল্যাসিকস্ এক সিজনে আর কখনও হয়েছে কিনা সন্দেহ। প্রোগ্রামগুলো পরীক্ষা করে দেখলাম আমি শেক্সপীয়রের তেরটি নাটক, এলিজাবিথান এবং রেস্টোরেশন যুগের ছটি চেখভের পাঁচটি অর্থাৎ সব কটি পূর্ণাঙ্গ নাটক এবং একটি করে মলিয়ের, ইবসেন, গোগোল, কল্ডিরন, আন্দ্রেয়েভ, ডস্টয়েভস্কি, টুর্গেনেভ, হাউপ্টম্যান ও বেনাভান্টের প্লে ঐ সিজনে দেখেছি। এও নজরে এল যে তাৎকালীন কালের আধুনিক লেখকদের নাটকও অনেক দেখেছিলাম—এঁদের মধ্যে পিরানদেল্লো, ককতো, লেনোরমাণ্ড, ওনীল, গ্র্যানভিল বার্কার, ফ্লেকার, কাইজার, জেমস জয়েস, চাপেক, জাঁ জাক্‌স বার্নার, ও' কেসী, শ' প্রমুখের নাটকের প্রোগ্রাম উপরোক্ত বাণ্ডিলে ছিল। ঐ সিজনের শ'-এর "ম্যান এণ্ড সুপারম্যান" অকর্তিত অবস্থায় মঞ্চস্থ হয়েছিল।

আমার কথা শুনে পাঠক হয়তো ধারণা করে নেবেন যে এত ভাল ভাল নাট্যকারের সেরা সব নাটক যে সিজনে লণ্ডনে মঞ্চস্থ হয়েছে সেই সিজনটা নিশ্চয় থিয়েটারের জগতে একটা ইতিহাসের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু ঠিক তা নয়—লণ্ডনের থিয়েটারের তীর্থস্থল হচ্ছে ওয়েস্ট এণ্ড। আমার বর্ণিত নাটকগুলো ওয়েস্ট এণ্ডের কোন থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় নি। ঐ সব নাটক অভিনীত হচ্ছিল হ্যাম্পস্টেডের 'দি এভরিম্যান থিয়েটারে' (একটি ড্রিল হল থেকেই এই রঙ্গগৃহের জন্ম) হ্যামার স্মিথের একটি বিস্মৃত নাট্যগৃহে—এটিকে কিছুদিনের জন্য ফার্নিচার স্টোর হিসাবেও ব্যবহার করা হয়েছিল বার্নেস একটি ছোট সিনেমা হাউস—যেখানে একটি অতি ছোট মঞ্চে কমিসার্জেভস্কি তাঁর নানা প্রডাকসনে অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছিলেন এবং গেইট থিয়েটার—যেটি সেই সময় সদ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কাভেন্ট গার্ডেনের পেছন দিকের রাস্তায় একটি এ্যাটিকে। ওয়াটারলু রোডে ওল্ড ভিক এর ঐ সময় ছিল একটি অপেরা কোম্পানী এবং একটি শেক্সপীয়ার কোম্পানী—ঐ সিজনে তারা দশটি নাটক মঞ্চস্থ করতে পেরেছিল। এদিকে কিংস ক্রশে ইউস্টান প্যালেস অভ ভ্যারাইটিজের নতুন নামকরণ হল দি [illegible]। একমাত্র এখানে যে সব নাটক প্রবেশাধিকার পেতো না সেগুলোর আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়ালো এই নাট্যালয়টি। আর কিছু নাটক সাধারণ থিয়েটারগুলোতে রবিবারে এক রাত্রের জন্য অভিনীত হোত। সময় সময় কিছুকাল বাদে এই জাতীয় নাটককে সোমবার বিকেলে দ্বিতীয় অভিনয়ের অনুমতি দেওয়া হোত। এইসব প্লে কে আইনানুমোদিত করবার জন্য বারোটির কিছু বেশি প্রাইভেট সানডে প্লে-প্রডিউসিং সোসাইটিজ ছিল—এরা লর্ড চেম্বারলেন যেসব ইউরোপীয়ান এবং আমেরিকান নাটককে ইংলণ্ডে পাবলিক পারফরমেন্সের অনুপযুক্ত মনে করতেন, সেগুলোকে মঞ্চস্থ করতো। এরা প্লে-প্রডিউসিং প্রাইভেট সোসাইটি হওয়াতে এদের শোগুলোকে পাবলিক শো বলা চলতো না এবং সেইভাবেই এরা লর্ড চেম্বারলেনের নিষেধাজ্ঞার আওতার বাইরে পড়তো। এইসব সোসাইটি বা সমিতির ভেতর যেগুলো সবথেকে সক্রিয় ছিল তাদের নাম হচ্ছে—দি স্টেজ সোসাইটি দি থ্রি হাণ্ড্রেড ক্লাব, দি রেপারটরী প্লেয়ার্স দি ফিনিক্স দি প্লে এ্যাকটর্স দি রেনেসাঁ দি ফেলোশিপ অভ প্লেয়ার্স দি ভেনচারার্স দি প্লে মেইটস এবং দি পাইওনিয়ার প্লেয়ার্স।

এইসব অপাংক্তেয় দলগুলোর সঙ্গে তুলনা করবার মত কি কাজ ওয়েস্ট এণ্ড থিয়েটার এই সময় করছিল?

লুই ক্যাসন এম্পায়ারে তাঁর জাঁকজমকপূর্ণ হেনরী দি এইটথ-এর প্রডাকসন করেছিলেন—আর নিউ থিয়েটারে সম্পূর্ণ প্রাণহীন এবং সেকেলে ভঙ্গিতে মাচ এডোর অভিনয় হচ্ছিল। কিংস ওয়েতে মডার্ন ড্রেসে হ্যামলেট মঞ্চস্থ হয়েছিল—এই প্রডাকসনটিকে অবশ্য ওয়েস্ট এণ্ড প্রডাকসন বলা চলে না। কারণ ব্যারী জ্যাকসন তাঁর বার্মিংহাম রেপারটরীর দলটি নিয়েই আধুনিক পোশাকে হ্যামলেট অভিনয় করছিলেন। কন্টিনেন্টাল থিয়েটারের সিরিয়াস নাটকের একমাত্র প্রতিনিধিত্ব করছিল 'এ ডলস হাউস'—এটির অভিনয় চলছিল প্লে হাউস রঙ্গগৃহে। নতুন নামকরা নাটক বলতে ছিল আমেরিকা থেকে আমদানী করা 'দে নিউ হোয়াট দে ওয়াণ্টেড' এবং বেন লেভির 'দিস ওম্যান বিজিনেস'। শেষেরটি একটি সানডে নাইট সোসাইটির থেকে কিনে নেওয়া নাটক। ঠাট্টা তামাসা, বুদ্ধি এবং স্টাইলের দিক থেকে যে সামান্য অবদান ওয়েস্ট এণ্ড এই সময় করছিল তার উৎস ছিল ককরানের লণ্ডন প্যাভিলিয়নে অনুষ্ঠিত সাময়িক ঘটনা সম্বলিত একটি নাটক আর্চি দা বেগারের ভডভিলে মঞ্চস্থ 'আর এস ভি পি' এবং এম্ব্যাসাডর্সের প্যালেসে প্রদর্শিত 'লেডী বি গুড' নাটক।

দু'এক সময় কিছু ভাল নাটক কোন ছোট এবং নামডাকহীন থিয়েটারে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল—এইসব থিয়েটারকে বড় নাটকের কম্বাইনগুলো গ্রাস করে নেয় নি এই কারণে যে বসবার সিট কম থাকাতে এ জাতীয় থিয়েটারে বড় মুনাফা রোজগারের সম্ভাবনা ছিল না। জে. বি. ফাগান তাঁর আইরিশ প্লেয়ার্সদের দিয়ে ফরচুন রঙ্গগৃহে 'জুনো এবং পেকক' অভিনয় করালেন, আর রয়ালটিতে

করালেন 'দি প্লাউ এ্যান্ড দি স্টারস্'। এ্যান্ডমার হল এই বর্ষাটিতেই তাঁর 'এ মান্থ্ ইন্ দি কান্ট্রি' মঞ্চস্থ করিয়েছিলেন।

লিটল এ ফিলিপ বিজওয়ে চেখভের 'দি সি গাল' প্রডিয়ুস করছিলেন— বার্নস [illegible] খন্ড সিজনের দায়িত্বও নিয়েছিলেন [illegible] তিনিই। এ্যামব্যাসেডরস্-এ কয়েক মাসের জন্য গ্র্যানভিল বার্কারের 'দি ম্যাড্রাস হাউসের' রিভাইভ্যাল হল— এরপর ঐ থিয়েটারেই ও'নীলের বিখ্যাত নাটক 'দি এম্পারর জোনস' অভিনীত হল কয়েকমাস। ব্রুটাস জোনসের ভূমিকায় নামলেন পল রোবসন। [ও'নীলের এই নাটকের চিত্ররূপ এবং জোনসের ভূমিকায় রোবসনের অভিনয় দেখেছিলাম ১৯৩৪ সালে দিল্লীতে। বনের ভেতর এম্পারার জোনসের হারিয়ে যাওয়ার দৃশ্য এবং থেকে থেকে মাইন্ডসে অভ টম টম তাঁকে কিভাবে বিভ্রান্ত করে দিচ্ছিল—এসব একবার দেখলে আর কখনও মানসপট থেকে মুছে যেতে পারে না—লেখক।]

ওয়েস্ট এন্ডের সীমান্তের দুই-এক জায়গায় এই রকম থিয়েটার বিষয়ক হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখে লন্ডনের রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে আমি কিন্তু খুব আশাবাদী হয়ে উঠতে পারি নি। অক্সফোর্ড থেকে সদ্য প্রত্যাগত আমার মত একজন যুবকের মনের প্রতিক্রিয়া তখন হয়েছিল এই রকম— ওয়েস্ট এন্ডের থিয়েটারের ম্যানেজাররা অত্যন্ত [illegible] এবং প্রাণহীন হয়ে গেছেন —[illegible] বাণিজ্যিক স্বেচ্ছাচার চালিয়েছেন থিয়েটারের ব্যাপারে—এ সবের ফলে ইংলিশ থিয়েটারকে টেনে আনা হয়েছে অবনতির এ [illegible] চরম সীমায়। কিন্তু একমাত্র [illegible] আলো দেখতে পাচ্ছিলাম 'দি [illegible] থিয়েটারে'—[illegible] কথা [illegible]। এঁরাই তখন ইংলিশ থিয়েটারে [illegible] কি থেকে নতুন [illegible] সঞ্চার করবার চেষ্টা করছিলেন।

[illegible] সংগ্রাম এবং [illegible] এসেছেন [illegible]।

[illegible]—দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী [illegible] ধরে অবিরতভাবে এই সংগ্রাম চলছিল। এবং সংগ্রাম শীর্ষবিন্দুতে উঠেছিল ১৯২৫-২৬ এর থিয়েটার সিজনে। এই সংগ্রাম এবং বিদ্রোহের যাঁরা পান্ডা অর্থাৎ যাঁরা আপ্রাণ সাধনা করছিলেন মরণশীল ইংলিশ থিয়েটারকে বাঁচিয়ে তুলতে, তাঁরাও আর কয়েক বছর পরে ক্রমশ ক্লান্ত এবং নৈরাশ্যবাদী হয়ে

গেইট থিয়েটারে নর্মান মার্শালের স্টাইনবেকের অভ্ মাইস এন্ড মেন-এর প্রডাকসনে জন মিলস এবং নায়াল ম্যাকগিনিশ।

পড়ছিলেন। হ্যামারস্মিথের লিরিক থিয়েটার আবার হল পরিত্যক্ত, এভরিম্যান এবং কিংসেন্ট চলে গেল ফিল্মওয়ালাদের হাতে বার্নেসের ছোট্ট রঙ্গমঞ্চটিতে এত নানাবিধ অভাব এবং অসুবিধা দেখা দিতে লাগল যে কমিসার জেভস্কিকেও শেষ পর্যন্ত পরাজয় মেনে নিয়ে নিজের কাজ গুটিয়ে নিতে হোল ব্যারী জ্যাকসন তিক্ত এবং নৈরাশ্যপূর্ণ অন্তরে লন্ডন পরিত্যাগ করে গেলেন। সানডে সোসাইটি এগুলোর ভেতর সব থেকে বড় এবং পুরনো দি স্টেজ সোসাইটির সংগঠন ক্রমশ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লো—এর অন্য শাখা দি ফিনিক্স এবং আরও অনেকগুলো সানডে সোসাইটি একপর উঠে গেল। প্রতিক্রিয়ায় অত্যন্ত দুঃসাহসিক এবং প্রাণবন্ত দুটি থিয়েটার—লিডসের সিভিক প্লে-হাউস ও কেমব্রিজ ফেস্টিভ্যাল থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেল থার্টিজের প্রথমদিকে। ফাগান অক্সফোর্ডে নিজের থিয়েটার ছেড়ে চিরাচরিত অতি সাধারণ রেপারটরি নিয়ে কাজ চালাতে লাগলেন।

এর পরের যে কাহিনী আমি বলবো প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে সেটা হচ্ছে ইংলিশ থিয়েটারের নৈরাশ্যভরা ব্যর্থতা এবং অসাফল্যের ইতিহাস। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে আপাতদৃষ্টিতে যাকে ব্যর্থতা বলে মনে হচ্ছে তার মূলে রয়েছে প্রচন্ড সাফল্যের কাহিনী।

[ক্রমশঃ]

[illegible] আমাদের দেশের খবরে সাধারণ মানুষের রুচি নেই, যা তারা তা জানলে বা না জানলে কিছু এসে যায় না—সেই সব খবর পরিবেশনে আকাশবাণী কলকাতার জুড়ি নেই। অথচ আমাদের দেশে নিরক্ষরদের সংখ্যা এতো বেশি যে একথা সবাই কবুল করবেন—আকাশবাণী মারফৎ এমন সংবাদ পরিবেশিত হওয়া দরকার যা তাদের নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করবে, দেশ-বিদেশের খবরাখবর সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল করে রাখবে।

এদেশে নানা দল ও নানা মতের পত্র-পত্রিকা আছে। ঐ সব কাগজের সম্পাদকীয় বা বিশেষ কোনো মতামত সম্বন্ধে কোনো পাঠকের আপত্তি থাকলেও পরিবেশিত সংবাদগুলির বিচার যদি করা যায় তাহলে দেখা যাবে, সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে প্রায়ই তাঁরা নিরপেক্ষ। এমন হবার কারণ হয়তো এই—পত্রিকার পরিচালকগোষ্ঠী জানেন যে, সংবাদপত্র জগতে কোন গোষ্ঠী এককভাবে রাজত্ব করবেন না লেখাপড়া জানা একালের পাঠক পর পর দুটো দৈনিক সংবাদপত্র পড়লেই কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা তা' ধরে ফেলেন। এদেশের 'আকাশবাণী' 'একমেবাদ্বিতীয়ম' তাকে প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হতে হয় না। তাই লেখাপড়া জানা শ্রোতাদের কাছে [illegible] পড়লেও দেশের অশিক্ষিত নিরক্ষর জনতার শ্রোতারা আকাশবাণী পরিবেশিত সংবাদের ত্রুটি ধরতে পারেন না। ফলে এই গণতান্ত্রিক দেশে নিরক্ষরদের মধ্যে ভুল ধারণার সৃষ্টি করা হয়।

আমরা মনে করি, আকাশবাণী পরিবেশিত সংবাদ সম্বন্ধে সরকারী নীতির পরিবর্তন হওয়া দরকার। আকাশবাণীর মতো বৃহৎ প্রতিষ্ঠান কি কোনোদিন [illegible] কোনো বিবরণ সংগ্রহ করে তা প্রচার করতে পেরেছেন? অথবা সাধারণ শ্রোতারা কী রকম সংবাদের দ্বারা উপকৃত হতে পারেন—তার সমীক্ষা গ্রহণ করেছেন? ফলে, একই দিনের মধ্যে একাধিকবার একজাতীয় সংবাদ পরিবেশনের ফলে শুধু অর্থ নষ্ট হচ্ছে। আর এই অর্থ যাচ্ছে জনসাধারণেরই কায়ক্লেশে উপার্জিত অর্থ থেকে।

সংবাদ পরিবেশনের ব্যাপারে আমরা আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষকে কিছুটা উদার নীতি গ্রহণ করতে অনুরোধ করবো। আমাদের দেশের পটভূমিকায় আকাশবাণীর সঙ্গে বি. বি. সি-র তুলনা করা হয়তো কারো কারো কাছে অবাঞ্ছনীয় বলে মনে হতে পারে। তবে একথা ঠিক, সংবাদের নির্ভরযোগ্যতার মাপকাঠির

বিচার প্রসঙ্গে আকাশবাণীর সংবাদের ওপর শ্রোতাদের মনে আস্থা জন্মে না। অপরপক্ষে আমরা স্মরণ করতে পারি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধের সঠিক বিবরণ লাভের জন্য শত্রু-মিত্র উভয় পক্ষই বি বি সি-র ওপর নির্ভর করতে পারতো।

সংবাদ সমীক্ষা

কলকাতা কেন্দ্রের আকাশবাণী থেকে সংবাদ সমীক্ষাও কি শ্রোতাদের মনে কোনোরকম আগ্রহ সৃষ্টি করতে সমর্থ হচ্ছে। সংবাদ সমীক্ষার আসল উদ্দেশ্য কি—এ ব্যাপারে আজো শ্রোতাদের মনে ধাঁধার সৃষ্টি করে। কথায় বলে—'নেই কাজ ত' খই ভাজ'। আমরা অবশ্য আকাশবাণীর অমূল্য (যার মূল্য জনসাধারণই দেন) পাঁচ মিনিটকে খই ভাজার সময় নয় বলেই মনে করি। তবে সংবাদ সমীক্ষা যিনি পাঠ করেন—তিনি কি তাঁর মনের মতো কিছু বললেই কর্তব্যের সমাপ্তি? 'সংবাদ সমীক্ষা' লোকশিক্ষার বিভাগ না প্রচার বিভাগ এবং এর উদ্দেশ্য কি—আসলে সেটাই নির্ধারিত হওয়া উচিত। তবে 'সংবাদ সমীক্ষা' এই নামকরণের অভিধানগত অর্থ মনে করা যেতে পারে : সংবাদের 'পূর্বাপর বিবেচনা' 'অন্বেষণ' 'অবজারভেসন' বা 'যত্ন'। কিন্তু সংবাদ সমীক্ষা শুনে মনে হয় এতে না আছে 'পূর্বাপর বিবেচনা.' না আছে 'অন্বেষণ', 'অবজারভেসন' বা 'যত্ন' তো নেই-ই। কারণ সমীক্ষা যিনি দান করেন তিনি বলার ভঙ্গি ছাড়া যুক্তির দ্বারা শ্রোতার কাছে সংবাদ সমীক্ষাকে বিশ্বাসযহ করে তুলতে পারেন না। এই যদি হয় আমাদের দেশের শ্রোতাদের মনের প্রতিক্রিয়া—তাহলে না জানি অপর রাষ্ট্রের কোনো সংবাদের ওপর যখন 'সমীক্ষা' করা হয়—তখন সেই দেশের শ্রোতারা কি ভাবেন। সংবাদ সমীক্ষা 'প্রচার' হিসেবেও ব্যর্থ এবং দেশের সাধারণের মানুষের কাছে পাঁচ মিনিটের অপব্যয়।

সংবাদ বিচিত্রা

'সংবাদ বিচিত্রা'র মধ্যে কখনো সখনো দু-একটি ঘটনা চমক সৃষ্টি করে—কিন্তু সময় সময় যে বিচক্ষণতার অভাব দেখা যায়, তার প্রমাণ পাওয়া গেল গত ২৪শে নভেম্বর। পূর্ব বাংলার জনৈক প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাতের বিবরণ ছিল সেদিন। পূর্ববঙ্গে কবি নজরুলের সম্পর্কে আগ্রহ ও অনুশীলনের বিষয় ছিল সেদিন জিজ্ঞাস্য। উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিস্থানীয় বক্তা প্রশ্নোত্তরে বলেছিলেন যে, পূর্ব বাংলায় যথাযথ আন্তরিকতার সঙ্গে কবি নজরুলকে গ্রহণ করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ যে করেছেন—তা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু পাকিস্তান সরকার যে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে প্যান ইশলামিক কবি হিসেবে প্রচার করছে—তা কি কলকাতা কেন্দ্রের আকাশবাণীর প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞেস করেছিলেন? এই ধরণের প্রশ্নকর্তার সীমিত জ্ঞানের জন্য শ্রোতাদের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি করা হয়।

উত্তরবঙ্গের বন্যাক্রান্ত শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রতি জরুরী দায়িত্ব

উত্তরবঙ্গের বন্যার্ত সমস্ত মানুষের সঙ্গে আজ শিল্পী ও সাহিত্যিকরাও দুঃস্থ ও নিঃস্ব। আর্থিকভাবে তাঁদের অবস্থা নিদারুণ হয়ে উঠলেও শিল্পী ও সাহিত্যিকরা কখনো সৃষ্টির ক্ষেত্রে দুঃস্থ ও নিঃস্ব হতে পারেন না। আবার সহায়-সম্বলহীন হয়েও শিল্পী-সাহিত্যিকরা সাহায্য বা দান গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হন। অপর দশজনের থেকেও তাঁদের এই জাতীয় পার্থক্যটুকু স্বীকার না করে উপায়ও থাকে না। তাই সকলের কর্তব্য হচ্ছে, সৃষ্টির বিনিময়ে তাঁদের এই দুঃসময়ে আর্থিক মর্যাদা দান করা। এই ব্যাপারে আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ, উত্তরবঙ্গের বন্যার্ত শিল্পী ও সাহিত্যিকদের জন্য তাঁরা নিয়মিত প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের প্রতি আর্থিক আনুকূল্য দান করুন।

সঙ্গীত নাটক একা-ডেমির পুরস্কার

সঙ্গীত নাটক একাডেমি এবার তের-জনকে পুরস্কার দিয়েছেন। একজনকে ফেলো নির্বাচিত করেছেন, বারজনকে একাডেমি পুরস্কার দিয়েছেন। এই বার-জনের মধ্যে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের যাত্রা-জগতের বিখ্যাত নট ফণিভূষণ বিদ্যা-বিনোদ। ফণীবাবুকে একাডেমি পুরস্কার দেওয়ায় যাত্রাজগৎকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হল। গ্রাম বাংলার এই কৃষ্টি-সংস্কৃতি যথেষ্ট জনপ্রিয় হলেও উপেক্ষিত ছিল। তাই এই পুরস্কার পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে বাস্তবিকই গর্বের কথা। আমরা ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

নাট্যকারের পুরস্কারটি দেওয়া হয়েছে শ্রীবাদল সরকারকে। পশ্চিমবঙ্গ এই প্রথম নাট্যকারের পুরস্কার লাভ করল। সারা ভারতে নাটক রচনা ও মঞ্চ রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ অগ্রণী। এখানে নাটক নিয়ে যত পরীক্ষানিরীক্ষা হয় তেমন আর কোন রাজ্যে হয় না। বাস্তববাদী নাটক ও সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার নাটকেও এদেশ অগ্রণী। এই দেশে এখনো শ্রীমন্মথ রায়ের মত নাট্যকার রয়েছেন, বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখ নাট্যকাররা নাট্যমঞ্চে নবযুগ এনেছেন। কিন্তু সংগীত নাটক একাডেমি মন্মথ-বাবুকে নাট্যকারের স্বীকৃতি দিলেন না। বাস্তববাদী নাট্যকারদেরও স্বীকৃতি দিলেন না। তাঁরা স্বীকৃতি দিলেন এ্যাবসার্ড নাট্যকার শ্রীবাদল সরকারকে। এ্যাবসার্ড নাটক বাংলা দেশে সাম্প্রতিক সংযোজন। এই রীতির নাটককে এখনো দেশবাসী স্বীকৃতি দেয় নি। এখনো সীমাবদ্ধ দর্শকরা এ্যাবসার্ড নাটকের সমজদার। ক্ষয়িষ্ণু চিন্তাধারা ও রহস্যবাদের নাটক বলেই অনেকে এ্যাবসার্ড নাটককে মনে করেন। ইউরোপ আমেরিকায় যুদ্ধ-পরবর্তীকালে এই রীতির নাটক প্রচলিত হয়েছে। আঙ্গিক আবরণে এখানে বক্তব্য অস্পষ্ট। আমাদের দেশে যখন স্পষ্টভাবে বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ এখনো রয়েছে তখন রহস্যের জালে তাকে আবৃত করা কেন এই প্রশ্ন অনেকের মনে উঠেছে। কেনই বা কথার মায়াজালে মূল কথাকে এড়িয়ে যাওয়া। এদিক থেকে এ্যাবসার্ড নাট্যকারকে পুরস্কৃত করা বাংলা নাটকের বলিষ্ঠতার ঐতিহ্য-বিরোধী বলে অনেকে মনে করছেন। এতে বাংলা নাটকের ঐতিহ্যকেই স্বীকৃতি দেওয়া হল না। স্বভাবত এই কারণে একাডেমির এই পুরস্কার আমরা খুশি মনে গ্রহণ করতে পারলাম না। তবে কি সংগীত নাটক একাডেমি ভারতীয় নাট্যজগতে এ্যাবসার্ড নাটককেই উৎসাহ দিতে চান?

—সুজন

উত্তমকুমার
ভরত পুরস্কার পেয়েছেন।

নার্গিস
উর্বশী পুরস্কার পেয়েছেন।

বৌদি

(পরিচালনা : দিলীপ বসু)

এস বি ফিল্মসের বাঙালী জীবন-নির্ভর ছবি 'বৌদি'। ছবির প্রথমাংশ গ্রামের জীবনকে কেন্দ্র করে এক সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের পরিবেশ ফুটিয়ে তুলেছে। এই পরিবারের কর্তা অল্প শিক্ষিত, সৎ প্রকৃতির মানুষ। সৎভাবে জীবনযাপনের আদর্শে তার জীবন পরি-চালিত। গৃহকর্ত্রী মমতাময়ী এবং কর্তব্য-পরায়ণা। এই দুজনে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে ছোট ভাইকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার। সমস্ত পরিবারটা যেন স্নেহ-ভালবাসা ও কর্তব্যপরায়ণতার এক স্বর্গ। ভাইকে লেখাপড়া শেখাতে গিয়ে দাদা-বৌদি সর্বস্বান্ত, বৌদির গায়ের অলঙ্কার গিয়েছে, এখন ঋণের বোঝায় বাড়ি বন্ধক যাবার পথে। এমন সময় এম-এ পরীক্ষার ফী যোগাড় করতে ব্যর্থ হয়ে নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে দাদা মনিবের সিন্দুক থেকে টাকা চুরি করল। একদিন যে মনিবের স্বার্থের দিকে চেয়ে ঘুষের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে ; সেই আজ
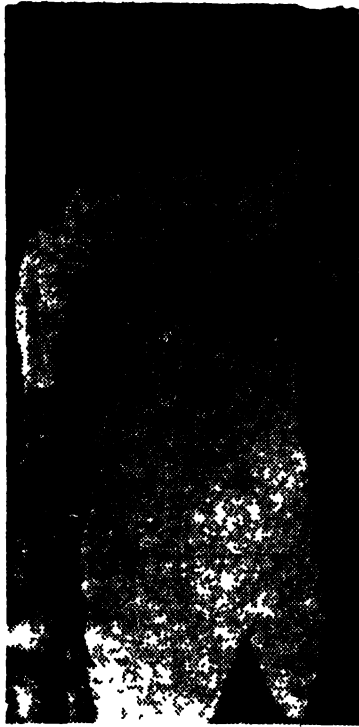
ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ
সংগীত নাটক একাডেমি পুরস্কার
পেয়েছেন।

টাকা চুরি করছে। চুরির দায়ে সে ধরা পড়ল এবং ন'মাস জেল হল।

এই ন'মাস তার জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়ে গেছে—গ্রামবাসীর কাছে এই সৎ মানুষটি চোর নামে পরিচিত হয়েছে। অপমানে দুঃখে সে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে এক বস্তীতে আশ্রয় নিল।

এদিকে ছোট ভাই এক কারখানার ছোট সাহেব হয়েছে ; দাদা হয়েছে সেই কারখানার মজুর। কিন্তু দুজনায় দেখা-সাক্ষাৎ নেই। দুর্ঘটনায় ভাইয়ের আহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুভাইয়ের পুনর্মিলন ঘটে। তাদের জীবন থেকে কালো মেঘ সরে যায়।

ছবিটির প্রথমাংশে—গ্রামের জীবনের ছবি থাকার জন্য দেখতে বেশ ভালই লাগে। শহরে জীবনের রূঢ়তায় এবং কৃত্রিম জীবনযাত্রার জন্যে কিছুটা যেন বিলিফ বোধ হয়। কিন্তু পরবর্তী অধ্যায়ে পরিচালক কাহিনীকে গতানুগতিক ঘটনা ও রীতিতে টেনে নিয়ে গেছেন—যেমন নির্বাক যুগ থেকে আরো অসংখ্য ছবি হয়েছে। একটি জায়গায় সামাজিক জীবনে চিন্তাধারার দুই বিপরীত ধারাকে দেখাবার সুযোগ পেয়েও পরিচালক তা গ্রহণ করেন নি। মালিকের স্বার্থের দিকে দেখে কর্মচারী হয়ে নিজ না, মালিক এই সততার পরিচয় পেয়েও তার বিপদে সাহায্য করল না। অথচ পরিচালকের দৃষ্টিতে এই কর্মচারী ও কারখানার মালিক অত্যন্ত সদাশয় মানুষ!

ছবির ফটোগ্রাফি ও সম্পাদনা পুরনো দিনের ছবির কথাই মনে করিয়ে দেয়। রবীন চ্যাটার্জী পরিচালিত সংগীতাংশ সংগীতসম্পন্ন।

অভিনয়ে কালী ব্যানার্জী ও সন্ধ্যা-রাণী যথার্থভাবে গ্রামের দুটি সরল ও স্নেহপরায়ণ মানুষের চরিত্র প্রকাশ করেছেন। এক গ্রাম্য মেয়ে হিসাবে লিলি চক্রবর্তীকেও ভাল লাগে। ছাত্র হিসাবে ঠিক না মানালেও ছোট ম্যানেজার হিসাবে অনিল চ্যাটার্জীকে মানিয়েছে। অনুপ-কুমার অভিনীত চরিত্রটিও দর্শকদের ভাল লাগবে। অন্যান্য চরিত্রে কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, পদ্মা দেবী, বিকাশ রায়, তরুণকুমার, মলিনা দেবী পদ্মা দেবী, বনানী চৌধুরী, জহর রায়, প্রসাদ মুখার্জী অভিনয় করেছেন।

'দি ব্যাটল অব আলজিয়ার্স'

(আলজেরিয়া-ইতালী যুক্ত প্রযাস)

ফিল্ম সোসাইটি ও ক্লাবগুলি একটি চমৎকার ছবি দেখাচ্ছে। এই ছবিটি চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী ছবি হিসাবে পরিচিত। ছবিটি নির্মিত হবার সঙ্গে সঙ্গে, ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে ভেনিস, এ্যাকা-পোলো, এডিনবরা, লন্ডন, নিউইয়র্ক ইত্যাদি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার লাভ করেছে। চাঞ্চল্যকর বিস্ফোরণ, বিস্ময়কর উত্তেজনা সৃষ্টি, অসাধারণ সম্পাদনা ও ... এবং বৈশিষ্টপূর্ণ সংগীত সৃষ্টি। এই ছবি একালের চলচ্চিত্র শিল্পের এক চমৎকার নিদর্শন। রুশ বিপ্লবের পর সেগেই আইজেনস্টাইন যে রীতি ও পদ্ধতিতে 'অক্টোবর' বিপ্লবের আন্দোলন-কারী দিনগুলিকে চিরন্তন চলচ্চিত্রে উপস্থিত করেছেন, সেই একই রীতি অনুসরণ করে আলজেরিয়ার বিপ্লবের দিন-গুলিকে চলচ্চিত্রায়িত করেছেন। আইজেন-স্টাইন যেমন এডওয়ার্ড টিসের মত ক্যামেরাম্যান এবং প্রকোফিয়েভের মত সংগীত পরিচালক পেয়েছিলেন "দি ব্যাটল অব আলজিয়ার্স"-এর পরিচালক জিলো পন্টেকোর্বো তেমনি পেয়েছেন ক্যামেরায় মার্চেলো গাত্তি ও সঙ্গীতে ইনিও মরিব-কোন, রিজোলি ও জি, পন্টেকার্বোর সহযোগিতা।

এই ছবি গতানুগতিক কাহিনীর ছাঁচে নয়; এখানে তথাকথিত নায়ক-নায়িকাও নেই। ভাঁড়ের বা দুষ্ট লোকের চরিত্রও নেই। অথচ এসবই আছে। কাহিনী আলজিয়ার্স বিপ্লব, নায়ক-নায়িকা বিপ্লবী জনসাধারণ দুষ্ট লোক ফরাসী সামরিক শাসকরা আর হাসির খোরাক জুগিয়েছে সময় সময় সামরিক অফিসার, সময় সময় বিপ্লবীদের নানা ঘটনা, সর্বশেষ বিশাল জনসমুদ্রের মাঝখানে

'বৌদি' ছবিতে কালীপদ চক্রবর্তী, মলিনা দেবী ও সন্ধ্যারাণী
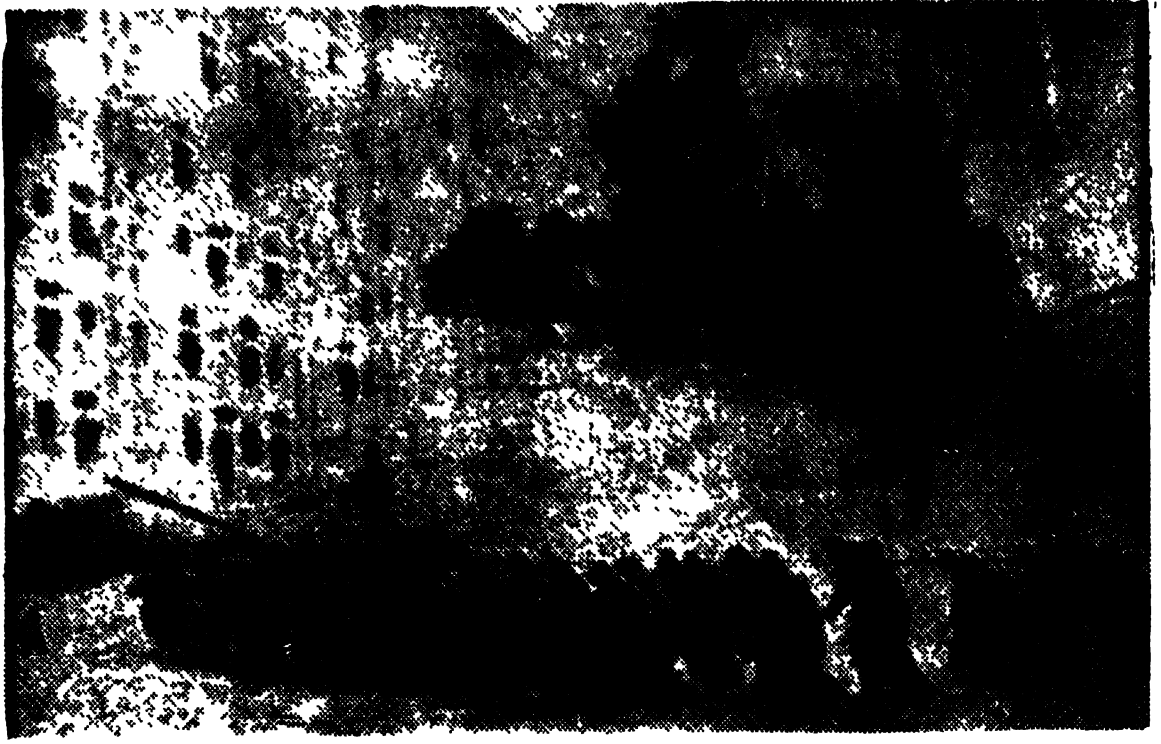
'দি ব্যাটল অব আলজিয়ার্স'-এর একটি দৃশ্য

একটি ট্যাঙ্কের অসহায় অবস্থা। করুণ-রসও আছে সর্বত্র, প্রেমরস নেই তাও বলা চলে না। বাস্তবিকপক্ষে সারা ছবিটাই যে প্রেমের রঙে রঙিন, তবে সে প্রেম যৌনতায় আবদ্ধ না থেকে দেশপ্রেমে মহত্তর হয়ে উঠেছে। একজোড়া তাজা তরুণ-তরুণীর বিবাহ উৎসবে সাক্ষী হলেন দর্শকরা, সবেমাত্র তারা তারুণ্যের সীমায় পৌঁচেছে; কিছুক্ষণ পরেই যখন দেখেন এ দু'জনার একজনকে ফরাসী মিলিটারীরা ডিনামাইটে উড়িয়ে দিয়েছে তখন সে করুণ মুহূর্ত কি দর্শক-হৃদয়কে মথিত না করে পারে?

ছবির ঘটনাকাল ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত প্রথম পর্ব। এ সময় ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট গঠিত হয়েছে আলজেরিয়ার ১৩২ বছরের বিদেশী শাসন অবসানের জন্য। গণ আন্দোলন অপেক্ষা বিদেশী শাসকগোষ্ঠীকে হত্যা ও সন্ত্রাস জাগাবার পথ তাঁরা গ্রহণ করেছেন। প্রত্যেক ঔপনিবেশিক দেশে প্রাথমিক পর্যায়ে যা হয়ে থাকে। এই পর্যায়কে সন্ত্রাসবাদের কাল বা বিপ্লবের সূচনাপর্ব যাই বলা হোক না কেন বিপ্লবীদের সাহসিকতা, ত্যাগ এবং নিষ্ঠা সমগ্র জাতিকে উদ্দীপিত করে তোলে। ফরাসী সামরিক শাসক এই প্রাথমিক পর্বকে ফ্যাসিস্ট পদ্ধতিতে নিপীড়নে শেষ করে দেয়। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা যখন বিপ্লবীদের শেষ করে দিয়েছে বলে দাবি করছে; মাত্র ২ বছর গোপন কাজের পর ১৯৬০ সালে স্ফুরণ ঘটল বিরাট গণ-আন্দোলনের। একদিকে শহরে গণ-বিক্ষোভ, ইটপাটকেল নিয়ে সশস্ত্র বাহিনীর সম্মুখীন হওয়া এবং লাগাতার ধর্মঘট চলেছে, তেমনি পাহাড়াঞ্চলে শুরু হয়েছে গেরিলাযুদ্ধ। গ্রাম ও শহরের, অর্থাৎ সশস্ত্র ও নিরস্ত্র জনতার সংগ্রাম মিলিত হয়ে এমন এক উত্তাল শক্তি জাগ্রত হল যে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা হটে আসতে বাধ্য হল—১৯৬২ সালের জুলাই মাসে আলজিয়ার্স হল স্বাধীন। পর্দায় দেখা গেল যে জনতা শুধু ইটপাটকেলের আঘাতে একটা ট্যাঙ্ককে প্রায় হাস্যকর করে তুলেছে। সেই জনতার উল্লাস পথে পথে, হাতে রুমাল নিয়ে মহিলাদের নৃত্যরতা ভঙ্গী—সারা জাতির আনন্দ ও নতুন জীবনের কথা ঘোষণা করছে।

ছবিতে সাম্প্রতিককালের রাজনৈতিক চিন্তার প্রকাশ অত্যন্ত স্পষ্ট। যে ফরাসী সামরিক অফিসার নিজের দেশে ফ্যাসিস্ট-দের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম করেছে, ইন্দো-চীনে গিয়ে সেই লড়েছে দেশ-প্রেমিকদের বিরুদ্ধে, আবার তাকেই পাঠান হয়েছে আলজিয়ার্স-এ। সে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী মনে করে নিজেকে, তাকে নাজি বলাকে গালাগাল দেওয়া মনে করে—কিন্তু জয় অথবা পরাজয় এই প্রশ্নে সে ফ্যাসিস্ট-দের পন্থাই গ্রহণ করেছে। বুর্জোয়া শাসনযন্ত্রের একটা যন্ত্র হিসাবে এই পরিণতিতেই পৌঁছবে। তার পাল্টা ফরাসী দেশেই রয়েছে সার্ত্রের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা—যাঁরা স্পষ্ট কণ্ঠে আলজিয়ার্সের স্বাধীনতা সমর্থন করে নিজ দেশের শাসকদের নিন্দা করেছেন। এরও ছবিতে উল্লেখ আছে।

ছবিতে গেরিলাযুদ্ধের উল্লেখ থাকলেও গ্রামাঞ্চলের এই লড়াইয়ের কিছুটা দেখান উচিত ছিল—তাতে দ্বিতীয় পর্যায়ের সংগ্রাম আরো স্পষ্ট হতে পারত।

ছবির পাঁচটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইয়াকেফ, সাদী, হাদাজ, ব্রাহিম এবং জীন মার্টিন। এঁদের অভিনয়-দক্ষতা এত সুন্দর যে মনে হয় যেন সুসম্পাদিত সংবাদচিত্র দেখছি। অথচ আগাগোড়া ছবিটি চিত্রনাট্য-সহায়তায় নির্মিত। সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য—মনে হয় যেন সমগ্র আলজিয়ার্সের মানুষ এই ছবিতে অংশ গ্রহণ করেছে।

দ্বিধা

(বিধায়ক ভট্টাচার্য)

হাওড়ার সালকিয়ায় শীশমহল নামে নতুন এক নাট্যশালা হয়েছে। সমস্তরকম

আধুনিক যন্ত্রপাতি সহ এমন সুসজ্জিত নাট্যালয় প্রতিষ্ঠা হাওড়ার সাংস্কৃতিক জীবনে বিশেষ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মঞ্চ প্রক্ষেপণ ও আলোকসম্পাতের সর্বাধুনিক ব্যবস্থা মঞ্চে রয়েছে—যার জন্য একেবারে পেছনের সারির দর্শকও এই মঞ্চে অভিনয় উপভোগ করতে পারেন।

এই শীশমহল মঞ্চে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'দ্বিধা' নাটক অভিনীত হচ্ছে। নাটকটি নাট্যকারের নামে যেমন, তেমনি বাংলার প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অংশ গ্রহণে আকর্ষণীয়। এই নাটকে অভিনয় করছেন তৃপ্তি মিত্রের মত প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী; অসিতবরণ, অসীমকুমার, তরুণকুমারের মত যশস্বী অভিনেতা। হাওড়ার সাংস্কৃতিক জীবনে এ কি কল্পনীয় ছিল? বাস্তবিকপক্ষে এই সুখ্যাত শিল্পী-সমাগমে বৃহত্তর কলকাতার প্রথম শ্রেণীর রঙ্গালয়ের ক্ষেত্রে শীশমহল আর একটি সংযোজন।

'দ্বিধা' নাটকে নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে দুই ভাগ্যহত জীবনকে কেন্দ্র করে। নায়ক সাগর অসীমকুমার থাকে উত্তর কলকাতা, নায়িকা রত্না (তৃপ্তি মিত্র) থাকে দক্ষিণ কলকাতা। টেলিফোনে ভুল নম্বর ডায়াল করায় তাদের পরিচয়। সেই পরিচয় এক সময় এমন অন্তরঙ্গতায় পৌঁছে গেল যখন তারা দু-জনেই জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছে; নতুন করে জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে।

হঠাৎ বজ্রাঘাতের মত তাদের এই স্বপ্নসাধ ভেঙে গেল। সাগরকে ভালবাসত যে গুজরাটি তরুণী (লতিকা দাশগুপ্ত) সে রত্নার কাছে এসে ভিক্ষা চাইল সাগরকে। চিরবঞ্চিতা রত্না সবেমাত্র জীবনে সূর্যোদয়ের আলো দেখলেও একটি কুমারী জীবনের রঙিন বাসনাকে সে উপেক্ষা করতে পারল না। রত্না সাগরের থেকে দূরে সরে গেল।
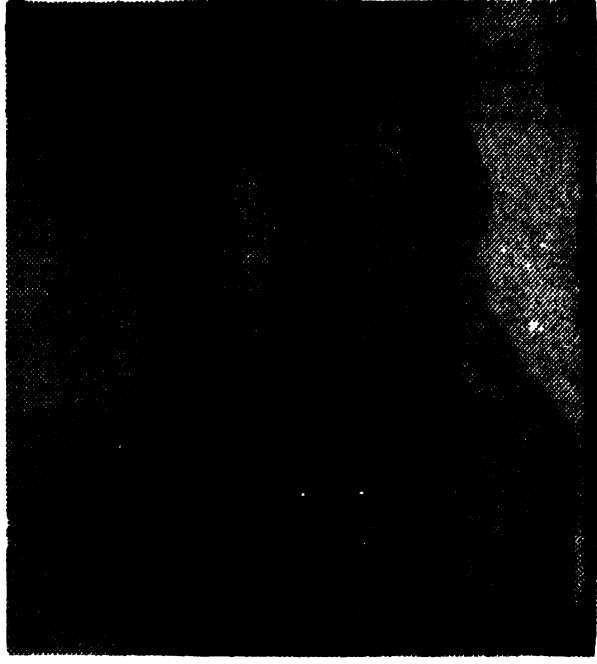
সাগর এবং রত্না দু-জনারই যেন অভিশপ্ত জীবন। সাগরকে উঠে আসতে হয়েছে বিয়ের আসর থেকে, তারপর থেকে তার জীবন যেন লক্ষ্যহারা। রত্নাকেও বিয়ে অসমাপ্ত রেখে উঠে আসতে হয়েছে। অথচ এক অপদার্থ লোক তার কাছে এসে স্বামী (অসিতবরণ) দাবিতে মাসে মাসে টাকা নিয়ে যায়। রত্না মেয়ে—এবং এ সমাজে মেয়েরা কেবল ভোগ ও সেবার পাত্রী মাত্র। তাই রত্নাকে একটা চাকুরী জোটাতে যে মূল্য দিতে হয়েছে, এবং বাইরে চাকচিক্য অথচ ভিতরে আত্মগ্লানির যে জীবন-যাপন, তা নারীত্বের পক্ষে অবমাননাকর হলেও মুমূর্ষু পরিবারের দিকে চেয়ে তাকে তাই মেনে নিতে হয়েছে। রত্নার দাদা যখন স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা থেকে পরিবারের দায়িত্ব এড়াতে পারছে, রত্না তখন পরিবারের দায়িত্ব মাথায় নিয়ে শত গ্লানির মধ্যেও সূর্যমুখী ফুটে রয়েছে। রত্না চরিত্রটি একালের চাকুরীজীবী মহিলাদের জীবনের ব্যথা ও গ্লানির কথা মনে করিয়ে দেয়। নারীরা সর্বক্ষেত্রে সমান হয়ে ওঠা সভ্যতার দাবি হলেও ধনতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থায় 'বস'রা নারী কর্মীদের কাছ থেকে কিভাবে সুযোগ গ্রহণ করতে চায় তারই এক মর্মান্তিক চিত্র রয়েছে এই নাটকে।

নাটকের অন্যতম আকর্ষণ বিধায়কবাবুর চমৎকার সংলাপ। চোখা চোখা কথাগুলি কানে লেগে থাকার মত। এক স্থানে ভগবানের বিচার ক্ষমতা দিন দিন হ্রাস পাওয়ার কথা তোলা হয়েছে—হাসির চমৎকার রেখায়। কিন্তু সাগর-রত্নার কাম্য মিলন না হওয়ায় দ্বিতীয় বিধাতাকেও কম নিষ্ঠুর মনে হয় না! নাটকে এক রাজনৈতিক কর্মীর (তরুণকুমার) চরিত্র রয়েছে, যে মানবিক ও উদার মানসিকতার প্রতীক। কিন্তু চরিত্রটি যদি আরো আশাবাদী ও পজিটিভ হত তবে বোধ হয় ভাল হত।

তপন সিংহের 'আপনজন' ছবিতে কিশোরী মৃত্যা রায়

মূকাভিনয়ে মহাদেবের রূপের একটি অভিব্যক্তি
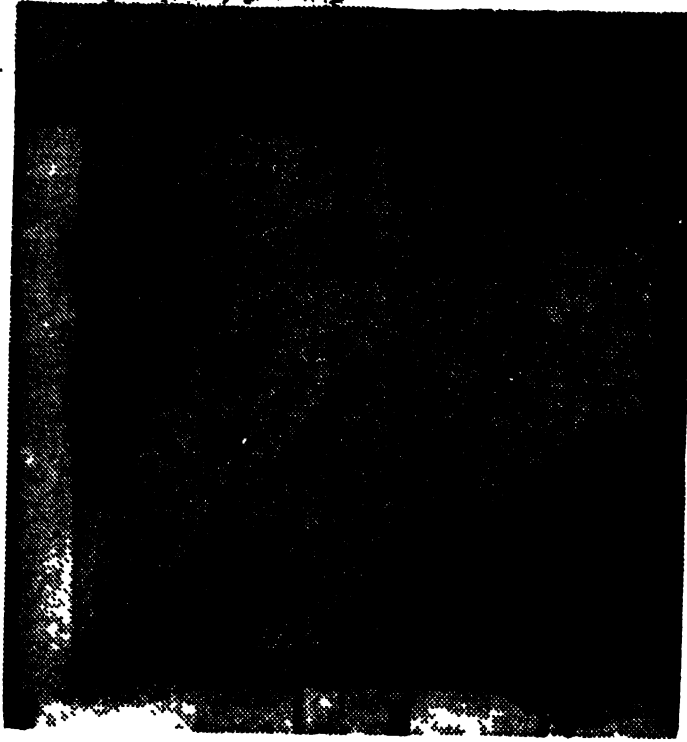
শীশমহলের 'শিখা' নাটকে তৃপ্তি মিত্র ও অরুণকুমার

এবারে অভিনয় প্রসঙ্গে আসা যাক। সুখ্যাত আর নবাগত শিল্পীদের সমন্বয়ে শিখার অভিনয় অনিন্দ্য সুন্দর। প্রত্যেক শিল্পী যেভাবে মনেপ্রাণে ছোট-বড় চরিত্রগুলিকে ফুটিয়ে তুলেছেন কোন পেশাদার মঞ্চে তার তুলনা হয় না। তৃপ্তি মিত্র থেকে বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় একই আন্তরিকতায় মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন। অসীমকুমার ও তৃপ্তি মিত্রকে একসঙ্গে অভিনয় করতে ইতিপূর্বেও দেখেছি,—কিন্তু এখানে তাঁদের যৌথ অভিনয় অনেক বেশি উন্নত, বিশেষ করে অসীমকুমার। তৃপ্তি মিত্র সম্পর্কে এককথায় বলা যায় রুগ্না চরিত্রে তিনি বিস্ময়কর অভিনয়-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নতুনদের মধ্যে মধ্যবিত্ত ঘরের এক সরল তরুণীর ভূমিকায় বনানী ভট্টাচার্য যেরূপ সহজ-স্বাভাবিক চরিত্র রূপ দিয়েছেন তাতে দর্শকমাত্রেই মুগ্ধ হবেন। অন্যান্য ভূমিকাগুলিতে যথাযথভাবে অভিনয় করেছেন অসিতবরণ, তরুণকুমার, লতিকা দাশগুপ্ত, ভানু চট্টোপাধ্যায়, রুদ্র সরকার, সীতেশ চক্রবর্তী, কালিদাস গাঙ্গুলী, সুবোধ মুখার্জী প্রমুখ।

পরিচালনায় বিধায়ক ভট্টাচার্যের শিল্পবোধের নিদর্শন রয়েছে। আলো ও মঞ্চসজ্জার কাজ সম্পাদন করেছেন আর দুই কৃতী শিল্পী তাপস সেন ও সুরেশ দত্ত।

চলাচলের নতুন নাটক

প্রখ্যাত নাট্যসংস্থা এবার তাঁদের নতুন নাটক উমানাথ ভট্টাচার্যের "ধনপতি গ্রেপ্তার" মঞ্চস্থ করছেন, রবীন্দ্র সদনে আগামী ১৪ই ডিসেম্বর '৬৮ শনিবার সন্ধ্যা সাতটায়।

প্রয়োগ পরিকল্পনায় আছেন—রবি ঘোষ।

সমাজ যাদের চোর বানিয়েছে আর সেই সমাজের যারা শিরোমণি যদি কোনদিন কখনো কোনখানে তারা মুখোমুখি দাঁড়ায়? এমন ঘটনা হয়তো ঘটে না, কিন্তু যদি ঘটে? নাটকের বিষয়বস্তু অবশ্যই মৌলিক।

এ নাটকে চলাচলের শিল্পীদের মধ্যে আছেন—রবি ঘোষ, ভোলা দত্ত, নিমাই ঘোষ, উমানাথ ভট্টাচার্য, প্রণব চক্রবর্তী, গোরা চট্টোপাধ্যায়, তপেন চট্টোপাধ্যায়, হৃষীকেশ চক্রবর্তী, রণজিৎ দেব, অহীন ভট্টাচার্য, স্বর্ণেন্দু রায়চৌধুরী, তপন দাশগুপ্ত ও অনীতা লাহিড়ী।

স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে

মাধবী মুখার্জী বিয়ের আগেই 'স্বর্ণশিখর প্রাঙ্গণে' ছবির কাজ শেষ করে ফেলতে চান। এ কারণে এই ছবির জন্য তিনি এখন একান্তভাবে কাজ করছেন। সারদা চিত্র মন্দিরের এই ছবির কাজ ৩০শে নভেম্বর শেষ হবে। ক্যালকাটা [illegible] এবং [illegible] স্টুডিওতে (২) এক সঙ্গে কাজ চলছে। মাধবী মুখার্জীর 'বিয়ের দিন স্থির' হয়েছে ৪ঠা ডিসেম্বর।

এই ছবিতে আরো যাঁরা অভিনয় করছেন তাঁদের মধ্যে আছেন দিলীপ রায়, স্বরূপ দত্ত, তরুণকুমার, সুব্রতা চ্যাটার্জী, বেবি রিস্তু, কৃষ্ণা প্রধান, অরুণ মুখার্জী, প্রশান্ত চ্যাটার্জী, শ্যামল ব্যানার্জী প্রমুখ।

সমরেশ বসু রচিত উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন পীযূষ বসু।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলা

নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে যে চলচ্চিত্র মেলা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সেই উপলক্ষে গত ২৩শে নভেম্বর মেট্রোপোল হোটেলে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাংবাদিকদের কাছে উদ্যোক্তাগণ এই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। ভারতে এই ধরণের চলচ্চিত্র মেলার আয়োজন এই প্রথম। প্রতি শোতে ৪ হাজার দর্শকের উপযোগী ছবি দেখার ব্যবস্থা এ যাবৎ হয় নি। আগামী ১৪ই থেকে ২৩শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বিকাল ৫টায় ও রাত ৮টায় দুটি করে শো হবে। এই মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন স্টল, রেস্টুরেন্ট, চিত্রপ্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রতিদিন শো আরম্ভ হবার আগে যে দেশের ছবি দেখান হবে সে দেশের প্রতিনিধির বক্তৃতার ব্যবস্থাও থাকবে।

মেলার দশদিনে নিম্নোক্ত পূর্ণাঙ্গ ছবিগুলি দেখান হবে : (১) সুবর্ণরেখা (বাংলা) (২) এ সাইড ট্রেক (বুলগারিয়া) (৩) বাইসিকেল থিফ (ইতালী) (৪) ইউকিওয়ারিসু (জাপান) (৫) অক্টোবর (সোভিয়েত) (৬) ইউ এন্ড ইয়োর পল (পূঃ জার্মানী) (৭) টু-হাফ টাইমস ইন হেল (হাঙ্গেরী) (৮) দি গ্রেট এ্যাডভেঞ্চার (সুইডেন) (৯) বার্থ সার্টিফিকেট (পোল্যান্ড) (১০) আওয়ারা (হিন্দী)। এই সঙ্গে বিভিন্ন দেশের ও ফিল্ম ডিভিশনের স্বল্পদীর্ঘ ছবি থাকবে।

চলচ্চিত্র মেলা উদ্বোধন করবেন বিখ্যাত পরিচালক শ্রীমধু বসু।

স্বাধীনতাযুদ্ধের অন্যায়কারীদের দাম্ভিক কার্যে আপনারা যেভাবে অগ্রণী হয়েছেন তা বহুদিন অন্যান্য পত্রিকার কাছে আদর্শ ও অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

এদিকে আর একটি বিপদ আমাদের দুয়ারে এসে হানা দিয়েছে। আমি বলছি বাংলা সাহিত্যে দুর্নীতির বন্যার কথা। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব কোনও নতুন ঘটনা নয়। কিন্তু সম্প্রতি বাঁধ কেটে দেওয়া হয়েছে—তার ফলে বাংলা সাহিত্যে যে দুর্নীতির বন্যা এসেছে তা তিস্তার ভয়ংকরী রূপকেও লজ্জা দেয়। বাঁধ কেটে দিয়েছেন বাংলা সাহিত্য ও কাব্যজগতের ২।১জন তথাকথিত হোমরাচোমরা। এঁদের পিছনে অনেকে আছেন এবং এঁদের দল হয়ত বাড়ছে। কিন্তু এঁরাই কি বাংলা সাহিত্যের প্রধান উদ্গাতা? কে বা কারা এঁদের প্রধান বলে নির্বাচন করল? আজ এদের জয়ধ্বনি শুনতে শুনতে লজ্জায় ... কাটা যায় তাঁদের এবার কলম ধ... অভিনন্দন জানাই। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ ... বিপুল বাংলা সাহিত্যিকের ... আমাদের শপথ ... যে এই দুর্নীতির বন্যা ... সাহিত্যকে রক্ষা করতে হবে।

... মধ্যে নেই— ... শরৎচন্দ্র অশ্লীল। ... আমাদের ... রেখে ... অমূল্য ... তাঁরা আমাদের ...

... অশ্লীলতা চালানো ... পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয় একথা ... বলবেন, ... তারা ... না যে কোনটা ... আর কোনটা তা নয়। পাক ... ঘাঁটতে পাকের গন্ধই এরা ... ফুলের গন্ধ কত সুন্দর হতে পারে তা এঁরা জানেন না জানতে চান না এবং জানাতে চান না বাংলা দেশের পাঠক-পাঠিকাদের।

বাংলা দেশে কি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাহিত্যিকের দুর্ভিক্ষ ঘটেছে? তাঁরা কেন সোচ্চারকণ্ঠে বলছেন না যে বাংলা দেশের বুকে দাঁড়িয়ে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে এই দুর্নীতির বিষপ্রয়োগ করা চলবে না? ইতস্তত অনেকে অনেক কথা বলেন কিন্তু আজ সেভাবে বলার দিন ফুরিয়েছে। শুধু মন্তব্য করেই চুপ করে গেলে চলবে না—ঐ দুর্যোধন দুঃশাসনদের বিরুদ্ধে বক্তব্য চাই। অসির চাইতে মসী শক্তিশালী এ কথায় আমরা বিশ্বাস করি। আজ সেই শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

দুর্ভাগ্য ও দুর্যোগ আজ বাংলাদেশকে ও বাঙালীকে বিপর্যস্ত করছে। কিন্তু বাংলাদেশের অন্তরাত্মা ত কাঁদতে জানে না

—সে ত চিরবিদ্রোহী। আমরা বিশ্বাস করি খণ্ডিত বাংলার বুকে এখনও যথেষ্ট সাহস আছে—তাদের বাহুতে এখনও শক্তি আছে—যার বলে মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে নিশ্চুপ করে দেওয়া যায়।

আপনাদের পত্রিকার একটা আদর্শ আছে, বিশ্বাস করি সে আদর্শ বাংলা সাহিত্যকে আরও প্রগতির পথে এগিয়ে দিতে চায়—তাই আপনাদের শরণাপন্ন হলাম। আপনারা একটা আন্দোলন গড়ে তুলুন সেই আন্দোলনের পুরোধা হোন বাংলাদেশের সেই সব সাহিত্যিকরা যাঁরা মাঝপথে থেমে যাবেন না—বাংলা সাহিত্যের মধ্য থেকে দুর্নীতির বীজকে সম্পূর্ণভাবে দূরীকৃত করবেন। আপনারা এই আন্দোলন গড়ে তুলবেন এই আশা নিয়ে এই চিঠি লিখলাম। বলা বাহুল্য, বাংলা সাহিত্যের পাঠকবৃন্দের অনেকেই আমার মত ভাবছেন।

বারীন ঘোষ
অযোধ্যাগঞ্জ বাজার পূর্ণিয়া।

* * *

২১শ সংখ্যার সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত কয়েকটি লেখার মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের দ্বারা বাংলা ভাষার উপর মর্মান্তিক অস্ত্রোপচারের নামে পঙ্গু করার ষড়যন্ত্রের কানাকানি সংবাদটির সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হলাম। এই প্রসঙ্গে আব্দুল হাশিম লিখিত "বাংলা সাহিত্য" প্রসঙ্গে আমার সামান্য কয়েকটি কথা আছে।

ভাষার সংস্কারের প্রয়োজন মূলত প্রচলিত অর্থে শিক্ষা ইত্যাদির সরলীকরণের প্রয়োজনে নয়—সাহিত্যের প্রয়োজনে। কারণ ভাষা ওতপ্রোতভাবে তার সাহিত্যের সাথে এবং মাধ্যম হিসাবে অন্যান্য শিল্প ও সংস্কৃতির রূপকার। সেখানে পরিবর্তন বা সংশোধনের দ্বারা সংস্কৃত করার দাবি প্রাথমিক এবং মূলগত-ভাবে সাহিত্যিকদের কাছ থেকেই আসা বাঞ্ছনীয়—বৈয়াকরণদের কাছ থেকে নয়।

যেমন আধুনিককালে বহু লেখক-কবি মনে করে থাকেন সাহিত্য, প্রগতিশীলতার ধারাকে বজায় রেখে সৃষ্টিশীল হতে গেলে অনেক নতুন নতুন শব্দ সৃষ্টি করার প্রয়োজন আছে। সেই কারণেই বর্ণমালার সমস্ত বর্ণ থেকেই যথাসম্ভব উপযোগিতা সৃষ্টির জন্য তাঁরা ব্যস্ত। রাজশেখর বসুকে লিখতে হয়েছিল "হয়, হ্যনাতি পার না", এখন আর ঽ ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না, সেই জায়গায় অ-এর নিচে একটা ফুটকি দিলেই যথেষ্ট হয়।

লেখক বলেছেন "ঙ, ণ, ঞ অক্ষরগুলি বর্জন করা চলে।" কিন্তু সাহিত্য যতই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নিতান্ত মুহূর্তেরও মতানুভব সঙ্গী হতে চাইছে ততই অনুভূতির সাথে যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠ বর্ণ (ধ্বনির রূপ) ব্যবহৃত হচ্ছে। সেখানে 'ঞ' বললে যে অনুভব ঘনিষ্ঠতার অভাব থাকে তা পূরণ করছে কি? ব্যবহারে। ঠিক এমনিভাবেই ধরা যায় ঌ বর্ণটিকে যার উচ্চারণ ধ্বনির মধ্যে রয়েছে সম্ভবত একটি ব্যঞ্জন ও একটি স্বর ধ্বনি। কেন জানি না ঌ তবু স্বরবর্ণ।

সে প্রশ্নে অপাতত না গিয়ে বলা যায় ঌ বর্ণটির মধ্যে যে একটি মিষ্টি ধ্বনি সম্ভবনা রয়ে গেছে তা লি দিতে পারে না। একটু সচেতনভাবে খেয়াল করলেই বোঝা যায় পদ্ধতিটা প্রকট না হলেও বেশ স্পষ্ট। যেমন ইংরাজী Lyric কথাটি বাংলায় লিরিক বানানে বহুল প্রচলিত। কিন্তু লিরিকের লি (Ly), ধ্বনির দিক থেকে ঌ এর অনেক ... ।

এ ক্ষেত্রে এই বর্ণগুলো তাড়াতাড়ি তুলে দিয়ে শিশুদের বর্ণপরিচয়ের পড়া সামান্য একটু হালকা করে তাদের সমূহ ক্ষতি ছাড়া কি কিছু করা হবে? আমরা এ বর্ণগুলির অক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ... অব্যাহত শক্তিকে ব্যবহার করার দায়িত্ব যে আমাদেরই তা ভুলতে শুরু করি নি। সুতরাং অতীতে যা ব্যবহৃত হয় নি তার ব্যবহার সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে এদের অপ্রয়োজনীয় ভেবে অপসারণের থেকে আগামী দিনের জন্যে অপেক্ষা করা কি উচিত নয়?

অনুপম মজুমদার
৫-ডি, কেদারনাথ দাস লেন,
কলকাতা ৩০

বড়বাবু

কলকাতা ময়দানে অনেক বড়বাবু আছেন। তাঁদের কেউ খেলেন, কেউ বা আবার খেলান। কিন্তু খেলা আর খেলানোর মধ্যের সম্পর্কটা যে বড় কাছাকাছির —এ-কথাটা অনেক সময় আমরা অনেকেই ভুলে যাই। কিন্তু বড়বাবুরা ভোলেন না। তাঁরা খেলার কিম্বা খেলানোর জন্যেই হয়তো ভাবেন যে তাঁদের সাতখুন মাপ। যা-খুশি তাই করতে পারেন। এক মাঠ দর্শকের সামনে সহ-খেলোয়াড়ের সামান্য ভুল কিম্বা ত্রুটির জন্যে হাত-পা নেড়ে বিশ্রী ভঙ্গিমায় খেঁকাতেও তাই তাঁদের এতটুকুও বাধে না। কিন্তু যাঁর বিরুদ্ধে অমন কাণ্ডটি করা হচ্ছে তিনিও কিছু আর ফ্যালনা নন। তাহ'লে আর যাই হোক' দলে অন্তত স্থানলাভ করতে পারতেন না। তবে এমনও হতে পারে যে, ঐ খেলোয়াড়ের সঙ্গে তাঁর এমন সম্পর্ক আছে যে, তিনি ঐ খেলোয়াড়টিকে বকতে পারেন কিম্বা উপদেশ দিতে পারেন। কিন্তু সে যাই হোক, মাঠের মধ্যে অঙ্গ-ভঙ্গী করে বকতে যাওয়া নিঃসন্দেহে বিসদৃশ। চুনী গোস্বামী বড় খেলোয়াড় ছিলেন, হয়তো বা এখনো আছেন। কিন্তু তাই বলে এক মাঠ দর্শকের সামনে তাঁর অমন অস্বাভাবিক আচরণ আমরা কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না। প্রতিবাদ না জানিয়ে তাই উপায়ও নেই।

ময়দানের অন্য বড়বাবুদের মেজাজ বোধ হয় আরো ভারী। হবে নাই বা কেন—তোয়াজ করার মতো লোকের তো আর অভাব নেই। এই বড়বাবুরা আবার স্থান-কাল-পাত্র দেখে ডাল ছেড়ে পাতায় পাতায় ঘুরতে শুরু করেন। তখন তাঁদের পাত্তা পাওয়াই ভার। অথচ পেছনে বসে কল-কাঠি তাঁরাই নেড়ে যান। যা খুশি তাই করেন। অনেক কাল থেকে এঁরা ময়দানের শাসন-ভার নিজেদের হাতে নিয়ে কলকাতা ময়দান তথা বাংলা দেশের ক্রীড়া জগৎকে অনেকটা দেউলিয়া করে তুলেছেন। অথচ সেই বড়বাবুদের বিরুদ্ধে কোন দিন কিছু করা যায় নি—কোনদিন যাবেও না। কারণ সবকিছুই যে এঁদের হাতের মুঠোর মধ্যে। ক্ষমতা এঁদের অসাধারণ আর প্রতাপ প্রচণ্ড। তাই মনে হয় এঁদের গায়ে সহজে হাত পড়বে না। কারণ বড়বাবুদের চার-দিকে আজো পাঁচিল দিয়েই ঘেরা। আর সে পাঁচিল ভেদ করে এগিয়ে যাওয়া বোধ হয় আমাদের মতো সাধারণ ক্রীড়া-রসিকদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু এ-কথা বোধ হয় আজ আর কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে, এই বড়বাবুদের হাত থেকে ময়দানী খেলাধূলার পরিচালনভার থেকে সরিয়ে নিতে না পারলে বাংলা দেশের খেলাধূলার হাল হয়তো বা শেষ পর্যন্ত এবারকার ফুটবল মরশুমের মতো অন্তিম দশায় পৌছুবে—.

—[illegible]

সম্প্রতি কলকাতায় বসেছিলো ফুটবলের আসর। সামনের সপ্তাহে আবার খেলতে আসবে রাশিয়ার মিনস্ক ডায়নামো দল। পত্রিকা শতবার্ষিকী উৎসবের দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান সূচীতে ছিল এই খেলাগুলো।

মিনস্ক ডায়নামো দল প্রথম খেলায় হারিয়ে দিলো আই এফ এ একাদশকে। আই এফ এ র পরাজয় অযৌক্তিক না হলেও খুব একটা স্বাভাবিক ছিল না।

কারণ যদি আই এফ এ র দল গঠন ঠিকভাবে হতো আর খেলার সময় খেলোয়াড়রা যদি আর একটু বেশি সক্রিয় হয়ে উঠতেন তাহলে আর যাই হোক আই এফ এ-কে এমনভাবে দু' গোলে হারতে হতো না।

॥ চুনী গোস্বামী ॥
কলকাতার ফুটবলে চুনী দিয়েছেন একটি আলাদা অধ্যায়!

কারণ মিনস্ক ডায়নামোর খেলা দেখে দলটিকে খুব একটা আহা মরি কিছু বলা যায় না। তবে এ কথা ঠিক যে, দলের খেলোয়াড়রা খুবই ক্লান্ত। গত ১৬ই নভেম্বর ওদেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল লীগের খেলা শেষ করেই ও'রা এসেছেন ভারত সফরে।

গল্প হলেও সত্যি

[illegible]—

অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক ডন ব্রাডম্যান একবার তিন ওভারে সেঞ্চুরী করেছিলেন। আট বলের তিন ওভার মানে হলো মাত্র ২৪টি বল। আর এই ২৪টি বলে ব্রাডম্যান আর ওয়েন্ডেল বিল একসঙ্গে করেছিলেন ১০২ রান। এর মধ্যে বিল করেছিলেন ২ রান আর ব্র্যাডম্যান ১০০। তৃতীয় ওভারের প্রথম আর পঞ্চম রানটি করেছিলেন বিল।

ভাবতেও অবাক লাগে। ঠিক যেন বিশ্বাসও হতে চায় না। কিন্তু ঘটনাটা নির্জলা সত্যি। আর ঘটেছিলো অস্ট্রেলিয়ার সাধারণ একটা খেলায়। নিউ সাউথ ওয়েলস-এর লিথগো ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলায় ব্রাডম্যান করেছিলেন এই অসাধ্য-সাধন।

ঐ তিনটে ওভারের ২৪টি বলে কিভাবে রান হয়েছিলো নিচে তার খতিয়ান দেওয়া হলো—

প্রথম ওভারে—
৬, ৬, ৪, ২, ৪, ৪, ৬, ১,=৩৩

দ্বিতীয় ওভারে—
৬, ৪, ৪, ৬, ৪, ৬, ৪, ৬,=৪০

তৃতীয় ওভারে—
১, ৬, ৬, ১ [illegible] ৬.=২৯

মোট ১০২ রান

ব্রাডম্যানের এই বিশ্ব রেকর্ড বোধ হয় কেউ কোনদিনও ভাঙতে পারবেন না।

এবার অবশ্য মিনস্ক ডায়নামো দল লীগ কমিটিতে খুব একটা সুবিধে করতে পারে নি। বরাবর তাদের লীগ তালিকার দ্বিতীয় তৃতীয় কিম্বা চতুর্থ স্থান থাকে। কিন্তু এবার তারা নেমে গেছে অনেকখানি। পেয়েছে ষষ্ঠ স্থান।

মিনস্ক ডায়নামো দলে আছেন জনা পাঁচেক এমন খেলোয়াড়—রাশিয়ায় যাঁদের নাম খুব। এদের অনেকের আন্তর্জাতিক ফুটবলের আসরে রাশিয়ান দলের পক্ষে খেলার অভিজ্ঞতাও আছে।
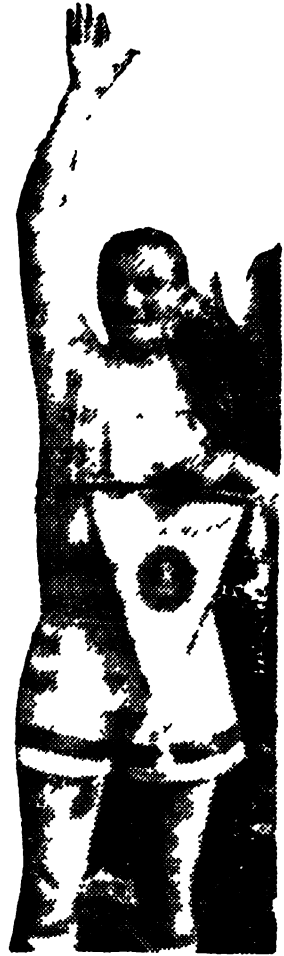
॥ সাভোস্টকভ ॥
ভারত সফররত মিনস্ক ডায়নামো দলের অধিনায়ক।

তা সে যাই হোক না কেন—মিনস্ক ডায়নামো দলের খেলা দেখে আমাদের মন ভরে নি। আমরা আরো অনেক উন্নত-ধরণের খেলা দেখার আশা নিয়ে মাঠে গিয়েছিলাম। কিন্তু ফিরতে হলো সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে।

সত্যি কথা বলতে কি এর আগে যে রাশিয়ান দলটি কলকাতায় খেলে গিয়েছিলো বছর কয়েক আগে তাদের খেলা ছিলো মিনস্ক দলের চেয়ে অনেক ভালো। তবে মিনস্ক দলের ভালো না খেলতে পারার কারণও দেখিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। প্রথম কারণ হলো, দলের খেলোয়াড়রা ভীষণ ক্লান্ত। দ্বিতীয়ত আবহাওয়ার তারতম্য। আরো নাকি অনেক কারণ আছে। থাকুক না—তাতে ক্ষতি কি!

কিন্তু ওদের খেলায় এমন কতকগুলো গুণ আছে—যা আমাদেরও শেখা উচিত। রাশিয়ান গোলরক্ষকদের রিসিভিং অর্থাৎ বল ধরার কায়দা এককথায় অনবদ্য।

ডিস্ট্রিবিউসান অর্থাৎ বল আদান-প্রদানের কায়দা গ্রাউন্ড পাসিং আর বল দিয়ে-নিয়ে আক্রমণ করা দৃশ্য দেখার আর শেখার মতো।

আই এফ এ-র খেলোয়াড়রা ও'দের সংগে চালিয়েছিলেন সমানে সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা। গোলে কিন্তু বলাই দে'কে দেখা গেলো গ্যালারী শো করতেই বড় বেশি সচেষ্ট। কিন্তু একটা কথা আমাদের মাথায় ঢুকলো না যে থঙ্গরাজকে কেন দলে স্থান দেওয়া হলো না। থঙ্গরাজ এখনো থঙ্গরাজই। আর অন্য কথা যদি ওঠে তাহলে বলতে বাধা নেই যে চুনী যদি খেলতে পারেন তাহলে কেন থঙ্গরাজ পারবেন না?

এ ছাড়া আরো অনেকগুলো বিষয় সকলের চোখে পড়েছে (খেলা আর খেলোয়াড়দের বিষয়ে) যা সত্যিই অস্বাভাবিক। কিন্তু সে বিষয় নিয়ে পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখালেখি হয়েছে—তাই আর পুরনো প্রসংগ টেনে না আনাই ভালো।

রাশিয়া আর ভারতের দ্বৈত জিমনাস্টিকের আসরে একটা কথাই বড় বেশি প্রকট হয়ে উঠেছিলো যে ওদের সংগে আমাদের কতো তফাং। খেলাধুলোর জগতে ওরা কোথায় আর আমরাই বা কোথায়?

দ্বৈত প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে ওদের সংগে আমরা কোন মতেই এঁটে উঠতে পারি নি। আমাদের প্রতিযোগীদের বড় বেশি অসহায় বলে মনে হচ্ছিলো।

প্রেস বক্সের ঠিক পেছনের দর্শক আসন থেকে একজনের একটি মন্তব্য কানে এসেছিল। ভারতীয় প্রতিযোগীদের মান দেখে ভদ্রলোক বড়ই নিরাশ হয়েছিলেন। তিনি বোধহয় তাঁর পাশের বন্ধুকে বলছিলেন, "বড্ড ভুল হয়ে গেছে বুঝলি। ফুটবল ক্রিকেট না খেলে যদি জিমনাস্টিকের আসরে আসতাম তাহলে হয়তো এতোদিনে গায় চড়াতে পারতাম ইণ্ডিয়ার ব্লেজার।."

সত্যিই তাই। ভারতের সেরা প্রতিনিধিদের খেলা দেখে আমাদের অনেকের ঠিক ঐ কথাটাই মনে হচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো, কতো সহজেই না এ'রা পেয়েছেন ইণ্ডিয়ার ব্লেজার। আর জিমনাস্টিকে ভারতের মান সত্যিই কতো নিচে।

আর ভাবতে আরো অবাক লাগে যে এতো নিম্নমান সত্ত্বেও ভারত কি করে অলিম্পিকে (মেক্সিকোতে নয়) যোগ দিয়েছিলো জিমনাস্টিক বিভাগে?

আরো একটা বিষয়ে আর একটা প্রশ্ন এই প্রসংগে মনে আসছে। জিমনাস্টিক বিভাগে উন্নতির জন্যে কি করা হচ্ছে? সত্যি কোন প্রচেষ্টা হচ্ছে বলে মনে হয় না। মনে হয় সব কিছু চলছে গতানুগতিকভাবে—যেমন চলছিলো সব ঠিক সেই রকম ভাবেই।

তবে এ কথা ঠিক ভারত-রাশিয়া দ্বৈত জিমনাস্টিক প্রতিযোগিতা দেখে এই কথা মনে হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার স[illegible] ভারতীয় প্রতিযোগিতা আজো অনে[illegible]।

আই এফ এ বনাম মিনস্ক ডায়নামো দলের খেলায় দুজন রাশিয়ান খেলোয়াড়ের মধ্যে দিয়ে লাফিয়ে উঠে অশোক চ্যাটার্জী চেষ্টা করেছিলেন গোল করতে। আই এফ এ কিন্তু একটাও গোল করতে পারে নি।

মেক্সিকো অলিম্পিকের বাজী আর পশ্চিম জার্মানীতে যন্ত্রের কারসাজি। অলিম্পিকে না গিয়েই ঘরে বসে সবাই দেখছে রঙীন টেলিভিশনে অ্যাথলেটদের সশরীরে আর শুনছে ধারাবিবরণী। শূন্যে স্থাপিত দুটি উপগ্রহ মারফত বেতার রশ্মি ছড়িয়ে পড়বে দিগ্‌বিদিকে। মেক্সিকো সিটির কাছেই তুলিকান পর্বতে বেতার রশ্মি স্তম্ভ বসানো হয়েছিল। ওখান থেকে একসংগে ১৬টি টেলিভিশন সূচী কিম্বা ২৮,০০০ খবর পাঠানো যেতো। 'এ টি এস ৩' নামে উপগ্রহ সরাসরি অলিম্পিকের ক্রীড়াঙ্গন থেকে টেলিভিশনের জন্যে রঙীন ছবি পাঠাতো। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, কানাডা ও পশ্চিম জার্মানীর গ্রাহকযন্ত্রের মারফৎ ইওরোপের টেলিভিশন সেটে সেই সব সংবাদ ও ছবি ধরা দেয়। এই সাফল্যের জন্যে সকলের ধন্যবাদ পাবেন পশ্চিম জার্মানীর স্ট্যাণ্ডার্ড ইলেকট্রিক লোরেঞ্জ এজি কোম্পানির কলাকুশলীরা।

টেস্ট ক্রিকেটে সব থেকে বেশি উইকেট দখলের রেকর্ড অর্জন করবার পর প্যাভেলিয়নে ফিরে আসছেন ফ্রেড ট্রুম্যান :
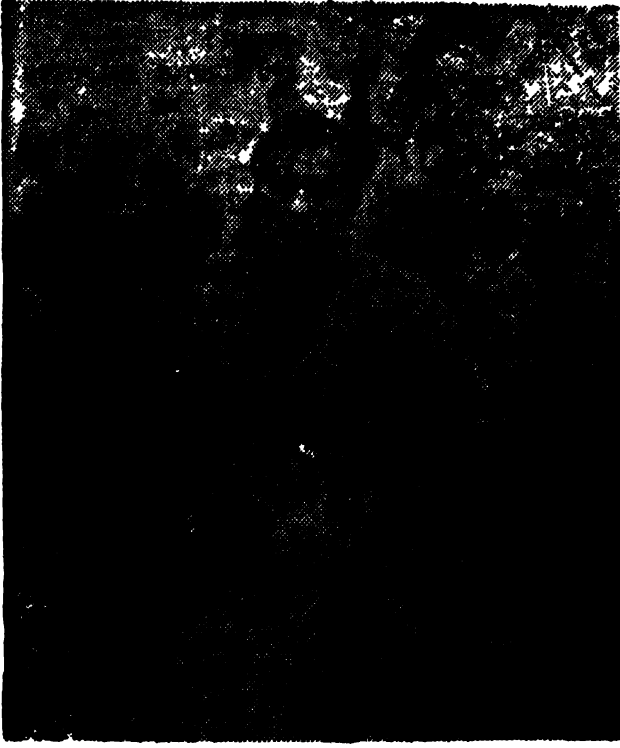
ভাবতেও অবাক লাগে যে ফ্রেড্ডী ট্রুম্যান আর খেলবেন না। খেলার মাঠের খুব বেশি কাছের মানুষ ফ্রেড্ডী এবার ছাড়লেন খেলার মাঠ।

না খেলার মাঠ ট্রুম্যান ছাড়ছেন না। ছাড়তে সে তিনি পারেন না। কারণ ট্রুম্যানের জীবনটাই খেলার মাঠ। খেলা ছেড়ে তিনি তাই করবেন খেলার সাংবাদিকতা। অর্থাৎ খেলার মাঠের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়তে ট্রুম্যান নারাজ।

ট্রুম্যান ছিলেন ইংলণ্ডের ক্রিকেট জগতের একটা আলাদা যুগ। সে যুগের নায়ক ট্রুম্যান ছিলেন ভীষণ,—ব্যাটসম্যানদের কাছে সাংঘাতিক এক বোলার। ট্রুম্যানের বিরুদ্ধে খেলতে গিয়ে বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানও হঠাৎ কেমন যেন 'মেকি' হয়ে পড়তেন, নিজেদের কেমন যেন দুর্বল আর অসহায় ভাবতেন। তারপর এক সময় ট্রুম্যানের বলে আউট হয়ে ফিরে যেতেন প্যাভেলিয়নে।

ট্রুম্যানকে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা রীতিমত ভয় পেতেন। অবশ্য ভয় করবেন নাই বা কেন। ট্রুম্যানের টেস্ট খেলোয়াড় জীবন শুরু হয়েছিলো ভারতের বিরুদ্ধেই।

আর সে খেলার কথা আজো ভারতীয়দের কাছে ভয়ের বস্তু। আজো সেই খেলার কথা, সেই দিনের কাহিনী ক্রিকেট উৎসাহীদের মুখে মুখে ঘোরে।

এ সেই ১৯৫২ সালের কথা। ট্রুম্যান সেবার ভারতের বিরুদ্ধেই পেলেন ইংলণ্ডের টেস্ট ক্যাপ। ম্যাঞ্চেস্টারের তৃতীয় টেস্টে তাঁর সেই ভয়াবহ রূপের কথা কল্পনাও করা যায় না। প্রথম ইনিংসেই ট্রুম্যান দখল করে বসলেন ৮টি উইকেট। মাত্র ৮·৪ ওভার বল করে—কেবল ৩১টি রান দিয়ে তিনি পেয়েছিলেন অতোগুলো উইকেট। আর ভারতের বিরুদ্ধে চারটি টেস্টে ট্রুম্যান সেবার পেয়েছিলেন মোট ২৯টি উইকেট গড়ে উইকেট প্রতি রানের হিসেব দাঁড়িয়েছিলো ১৩·৩১।

এ তো গেলো শুরুর কথা। কিন্তু তারপর ?

তারপর ট্রুম্যান যেন হঠাৎ তাঁর জীবনের কৈশোর থেকে যৌবনে এসে হাজির হলেন। ইংলণ্ডের বোলিং বিভাগে ট্রুম্যান হয়ে দাঁড়ালেন অসাধারণ এক পুরুষ।

তারপর এলো টেস্টের পর টেস্ট। আবার এক সময় শেষও হয়ে গেলো। কিন্তু ট্রুম্যানের সংহার মূর্তির সামনে তখন ব্যাটসম্যানদের অসহায় রূপ। তাঁরা আসেন, খেলেন—হয়তো সেঞ্চুরীও করেন। কিন্তু ট্রুম্যানকে সমীহ করে চলতেও ছাড়েন না। কারণ তাঁরা জানতেন, ট্রুম্যানের হাতে আছে মৃত্যুবাণ। একটু অসাবধান হলেই ব্যাস, আর দেখতে হবে না। মুহূর্তের মধ্যে হয় উইকেট ছিটকে যাবে কয়েক গজ দূরে না হয় তো ব্যাটের কোণে লেগে বল উঠে যাবে শূন্যে।

এমন সাংঘাতিক যে বোলার, যাঁকে সবাই ভয় করতেন, খেলতে নেমে রীতিমত সমীহ করে খেলতেন—সেই ট্রুম্যান কিন্তু নিজে খুব সহজ, সরল আর কৌতুকপ্রিয় লোক। খেলার মাঠে আর মাঠের বাইরে ট্রুম্যানকে নিয়ে চলতো হাসির ফোয়ারা। মাথার লম্বা লম্বা চুলে ঝাঁকানি দিয়ে এমন সব অদ্ভুত ভঙ্গি করতেন ট্রুম্যান যার জন্যে মাঠের আবহাওয়াই যেতো পাল্টে।

অথচ বল হাতে নিয়ে ট্রুম্যান যখন ছুটতেন তখন তাঁকে মনে হতো অন্য এক মানুষ। তখন ব্যাটসম্যান তাঁর কাছে সব থেকে বড় শত্রু। তাঁকে আউট করাই তখন ট্রুম্যানের একমাত্র লক্ষ্য। যে করেই হোক শত্রু নিধন করতে হবে। আর তার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করতে তাঁকে কখনো দেখা যায় নি।

ধরা যাক ১৯৬১ সালের লিডস মাঠে তৃতীয় টেস্ট খেলার কথা। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে খেলায় অস্ট্রেলিয়া সেবার দু' ইনিংসেই দিয়েছিলো চরম ব্যর্থতার পরিচয়। আর তার জন্যে ধরতে গেলে সব কৃতিত্বটুকুই দাবি করতে পারেন ট্রুম্যান। প্রথম ইনিংসে তিনি ৫৮ রানে ৫টি আর দ্বিতীয় ইনিংসে ৩০ রানে ৬টি উইকেট দখল করেছিলেন।

আরো অনেক আছে। ১৯৬৩ সালে এজবাস্টনের তৃতীয় টেস্টে ইংলণ্ড ২১৭ রানে হারিয়ে দিয়েছিলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে। কিন্তু ইংলণ্ডের সে জয়লাভের আসল নায়ক ছিলেন ট্রুম্যানই। ট্রুম্যান প্রথম ইনিংসে পেয়েছিলেন ৭৫ রানে ৫টি আর দ্বিতীয় ইনিংসে ৭টি উইকেট পেয়েছিলেন মাত্র ৪৪ রানের বিনিময়ে।

সুতরাং, এই ট্রুম্যানই যে টেস্ট খেলায় সব চেয়ে বেশি উইকেট পাবার রেকর্ড করবেন তাতে আর অবাক হবার কি আছে। ১৯৬৪ সালে ওভাল মাঠের দ্বিতীয় টেস্ট অস্ট্রেলিয়ার নীল হককে আউট করে অর্জন করেছিলেন ৩০০টি উইকেট দখলের কৃতিত্ব।

সেই ট্রুম্যান এবার বিদায় নিলেন খেলার জগৎ থেকে। কিন্তু ক্রীড়াঙ্গন ছাড়ছে না তাঁকে। তাই অবসর গ্রহণ করার পর ট্রুম্যান বেছে নিলেন সাংবাদিক জীবন।

এতোদিন ট্রুম্যানকে নিয়ে যাঁরা লিখেছেন পাতার পর পাতা এবার ট্রুম্যান তাঁদেরই পাশে বসে, তাঁদেরই একজন হয়ে লিখবেন খেলার খবর, ক্রিকেটের কাহিনী, আর খেলোয়াড়দের বিষয়।

আমরা আশা করি যে ট্রুম্যানের নতুন জীবন তাঁর খেলোয়াড়ী জীবনের মতোই ফলে-ফুলে ভরে উঠবে !

তন্ময়, মিতা, স্বাতী, কৃষ্ণ ও অপর্ণা (শুকনা, দার্জিলিং)।

প্রশ্ন: বিশ্ব অলিম্পিকে মহিলা হকি দল যোগ দেয় না কেন? আগামী বিশ্ব অলিম্পিক মিউনিকে কি কোন মহিলা হকি দল যোগদান করবে?

উত্তর: বিশ্বের সব জায়গায় মহিলাদের হকি খেলার খুব একটা বেশি চলন হয় নি কিম্বা মহিলাদের হকি খেলা এখনো খুব বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে নি বলেই বোধহয় অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় এই বিষয়টিকে স্থান দেওয়া হয় না।

মিউনিক অলিম্পিকে সম্ভবত মহিলাদের হকি খেলার বিষয়টি অবহেলিতই থাকবে।

মলয় দাশগুপ্ত (দত্তকুটীর বাইলেন), কৃষ্ণনগর, আগরতলা, ত্রিপুরা)

উত্তর: আপনার চিঠিতে অনেকগুলো প্রশ্ন আছে। সবগুলোর তো এক সঙ্গে উত্তর দেওয়া যাবে না। যাই হোক—গত বছর ভারত ডেভিস কাপে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছেই হেরেছিলো। অস্ট্রেলিয়ার কাছে নয়। গত সংখ্যাতেও এটি উল্লেখ করা হয়েছে। তা ছাড়া ঐ খেলার বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনাও করেছিলাম। তবু নামটি ভুল ছাপা হওয়ার জন্যে আমরা দুঃখিত।

মেক্সিকো অলিম্পিকের কুস্তি খেলার ফলাফল সম্ভব হলে সময় মতো ছাপাব চেষ্টা করা হবে।

হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র (সুভাষপল্লী), শিলিগুড়ি)।

প্রশ্ন: টেস্ট ক্রিকেট খেলায় কোন খেলোয়াড় কোন এক ওভারে একই বল পর পর দুবার মারেন, তবে কি তিনি আউট হবেন—না 'নট আউট' থাকবেন?

উত্তর: 'হিট দি বল টোয়াইস' নিয়ম অনুসারে ব্যাটসম্যান আউট হয়ে যাবেন।

ক্রিকেট খেলার আইন কানুনের একটি নিয়মটি এই বিষয়ে। নিয়মে বলা হয়েছে,

'ব্যাটসম্যান বলে দু'বার আঘাত করার জন্যে আউট হবে—যদি বলটা থেমে যাবার পর (যে কোনভাবেই হোক ব্যাটে লেগে কিম্বা ব্যাটসম্যানের শরীরে লেগে) ব্যাটসম্যান পুনরায় ইচ্ছে করে বলটি মারেন। কিন্তু

উইকেট বাঁচানোর জন্যে ব্যাটসম্যান ব্যাট দিয়ে কিম্বা দেহের যে কোন অংশ, শুধু হাত বাদ দিয়ে, বলটি মারতে বা থামাতে পারেন। এই রকম অবস্থায় অর্থাৎ ব্যাট দিয়ে বলটি দু'বার মারলে একমাত্র 'ওভার থ্রো' ছাড়া আর কোন রান হবে না।

শম্ভু রক্ষিত (গয়েরকাটা হাই স্কুল, জলপাইগুড়ি)।

উত্তর: এবার তো এম সি সি দলের ভারতে খেলতে আসার কথা ছিলো। কিন্তু ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার সংকটের জন্যে সে প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেছে। আপনি যে ঠিকানায় এই চিঠিটা লিখেছেন—সেই ঠিকানায় চিঠি দিলেই আমি পাবো।

প্রদীপ বিশ্বাস (গুলমা চা বাগান, গুলমা, দার্জিলিং)।

প্রশ্ন: বর্তমান ক্রিকেট জগতে সেরা বোলার কে?

উত্তর: কোন বিভাগের আর বিশ্বের মধ্যের কি? না ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে। পরিষ্কার করে জানাবেন।

শংকর গুহকর্মকার (তেজগঞ্জ, বর্ধ)

উত্তর: মাসিক বসুমতীর 'খেলাধুলো' বিভাগটা আপনার ভালো লাগে জেনে আমরা উৎসাহিত হয়েছি। আপনি অলিম্পিক হকি দল সম্বন্ধে যা জানতে চেয়েছেন তা পাবেন আমাদের অলিম্পিক সংখ্যায়। আশা করি আপনি দেখে নেবেন।

অনুপ চক্রবর্তী (রেস্টক্যাম্প, পাণ্ডু, আসাম)।

উত্তর: আপনার প্রশ্নের উত্তর তো গত সংখ্যাতেই দেওয়া হয়েছে।

মানিক পাল (ফকিরপাড়া রোড, বেহালা, কলকাতা-৩৪)।

প্রশ্ন: ভিনু মানকাদের ব্যাটিং ও বোলিং এ্যাভারেজ জানতে চাই।

উত্তর: ব্যাটিং—

মানকাদ:

টেস্ট	ইনিংস	নঃ আঃ	রান	সর্বোচ্চ	শতরান সংখ্যা	গড়
৪৪	৭২	৫	২১০৯	২৩১	৫	৩১·৪৭

বোলিং—

টেস্ট	রান	উইকেট	গড়
৪৪	৫২৩৫	১৬২	৩২·৩১

সুবিনয় রায় (কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা-৪)।

প্রশ্ন: কলকাতা ময়দানের অনেকগুলো ফুটবল খেলা এবার দেখেছি। রাশিয়ান দলের সঙ্গেও আই এফ এর খেলা দেখলাম। আপনিও বোধহয় অনেক খেলা দেখেছেন। কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারলাম না যে এবারের কলকাতা ময়দানের সব থেকে খারাপ খেলোয়াড় কে?

উত্তর: কি আশ্চর্য, এমন সহজ প্রশ্নও কেউ করে না কি? এই মরশুমে কলকাতা ময়দানের সব থেকে খারাপ খেলোয়াড় কে তা জানেন না? এ তো সবাই জানে। হয় আমি না হয় আপনিই ময়দানের সব চেয়ে খারাপ খেলোয়াড়!

সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (হালিসহর গোলাবাড়ী ২৪ পরগনা)।

প্রশ্ন: বর্তমানে আপনার মতে পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা ক্রিকেট দল কোনটি?

উত্তর: আমার মতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজই।

সন্তোষ মুখার্জী (বনগাঁ, ২৪ পরগনা)।

প্রশ্ন: ভারতীয় ক্রিকেট দলের ১৯৪৬ সালের ইংলণ্ড সফরে কে সবচেয়ে বেশি রান করেছিলেন? তাঁর গড় রান সংখ্যা জানতে চাই।

উত্তর: বিজয় মার্চেণ্টই সেবার সবচেয়ে বেশি রান করেছিলেন। তাঁর খেলার গড় নিচে দেওয়া হলো—

ইনিংস	অঃপঃ	মোট রান	সর্বোচ্চ	গড়
৪৫	১০	২,৬০০	২৪২	৭৫·১৪

সঞ্জয় মিত্র (উকিলপাড়া, কৃষ্ণনগর, নদীয়া)।

প্রশ্ন: পঙ্কজ রায় ও অম্বর রায়ের বাড়ির ঠিকানাটা জানাবেন কি?

উত্তর: ৮বি, অভয় মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৫—এই ঠিকানায় লিখতে পারেন।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২ বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

এ. সরকার এণ্ড সন্স

৭৩ বর্ষ ঃ ২৫শ সংখ্যা—মূল্য ঃ ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 12th December, 196

চরম দুরবস্থায় উত্তরবঙ্গ

উত্তরবঙ্গের ধ্বংসবিধ্বস্ত ও বন্যা বিপর্যস্ত অসহায় মানুষগুলি প্রলয় অবস্থার দু' মাস পরেও চরম দুরবস্থার মধ্যে রয়েছে। তাদের প্রতি এই রকম হৃদয়হীন উদাসীনতা বা নিষ্ঠুর আচরণের জন্য কে দায়ী? উত্তরবঙ্গের বন্যার জন্য কিছুটা দায়ী রাজনীতি, আর বিশেষভাবে দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার, যাঁরা বিগত বিশ বছর ধরে বন্যাকে কণ্ট্রোল করার কথা বলে আসছেন। পাহাড়ী অঞ্চলের নদীগুলির আকস্মিক বন্যা থেকে ধনপ্রাণ বাঁচাবার জন্য যে রকম প্রখর সতর্ক থাকা প্রয়োজন ছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়েও প্রায় কোনো কিছুই করেন নি। তবু আশা করা গেছিল, প্রধানমন্ত্রী এবং উপ-প্রধানমন্ত্রী দু'জনেই যখন উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের চরম দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করে সাহায্যদানের অভয়বাণী দান করে গেছেন, তখন দান-খয়রাত আশাতীত না হোক, প্রয়োজন মাফিক কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যাবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রয়োজন মাফিক সাহায্যের আশা এখনো পর্যন্ত সুদূরপরাহত। উত্তরবঙ্গের বন্যা ও পুনর্বাসনের বহর কি রকম—সম্প্রতি তার একটি খণ্ডচিত্রও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিবরণী থেকেই পাওয়া গেছে। এই ডিসেম্বরের দারুণ শীতে এখনো ৪৭০০ পরিবার তাঁবুর নিচে দিন কাটাচ্ছে। আর গৃহনির্মাণ মঞ্জুরী বাবদ যে ৭ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা খরচ করা হয়েছে (দেবার কথা মাত্র ১ কোটি ১৭ লক্ষ; পাওয়া গেছে বাকি ৪৭ লক্ষ ৫ হাজার টাকা—একেই বলে সমুদ্রে গোষ্পদ!)—তা জলপাইগুড়ি জেলার গৃহনির্মাণ মঞ্জুরী বাবদ ২৯০০ জনকে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ গড়ে প্রতিজন পেয়েছে প্রায় আড়াই শো টাকা করে—যা গৃহনির্মাণের পক্ষে একেবারেই নগণ্য ও গৌণ (সরকার নিজেরা কি ঐ টাকায় বাড়ি তৈরি করে দেবেন? এরা তাঁবুর নিচের পরি-বারের মধ্যে নিশ্চয়ই পড়ে না।

একটি প্রমাণ ঃ সরকার এখনো পর্যন্ত হদিস করতে পারেন নি উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের মধ্যে কতো লোক মারা গেছে বা নিখোঁজ হয়েছে। রিলিফ কমিশনারের ভাষ্যমতে ঃ ও কাজ তাঁদের নয়, ও কাজ জেলা অফিসারদের।

আসল লোকগুলোর সঠিক খবর যখন পাওয়া যাচ্ছে না, তখন সাহায্য কি রকম দেওয়া হচ্ছে, সে ব্যাপারেও সাধারণের মনে সন্দেহ ঘনীভূত হওয়া স্বাভাবিক বৈকি। বিশেষত বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ রাজ্যের দারুণ বিপদের মধ্যেও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সাহায্য সংগ্রহ করতে অসমর্থ হয়েছেন কেন—এ নিয়েও কারো কারো মনে প্রশ্নের উদ্রেক করে। বর্তমান সময়ে যিনি এ রাজ্যটি চালাচ্ছেন তিনি উত্তরবঙ্গের বন্যাকে তেমন গুরুত্ব দেন নি। উত্তরবঙ্গে যখন প্রলয়, তখন রাজ্য-পাল রাজভবনে নৈশভোজনে ব্যস্ত। এ সংবাদ কোনো উগ্র মতাবলম্বী খবরের কাগজের খবর নয়, বরং যে কাগজে সর-কারের প্রতি অহরহ সমর্থন জানানো হয় সেই কাগজেই এ খবর পরিবেশিত হয়েছে। এরপরও তিনি সাহায্য সংগ্রহের নামে বা হাজার রকম বড় ঠাটের প্রমোদানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন। আমরা প্রশ্ন করি ঃ উত্তরবঙ্গের অবস্থা সরেজমিনে তদন্ত বা প্রত্যক্ষ করার জন্য মোট ক'বার তিনি সেখানে গেছেন? তাঁর জন্যে তো আর বিমানের অভাব হয় না। যেখানে রাজ্য সরকারের সেক্রেটারীদের মধ্যে নিত্য অসহ-যোগিতার খবর বের হচ্ছে, সেখানে তাঁর কর্তব্য ছিল না—অভিভাবক হিসেবে সেখানে নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকা? আর কেন্দ্রীয় সরকার মুষ্টিভিক্ষা দেবার পর আগামী ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে (মনে হয়, অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পর হাওয়া বুঝে) স্টাডি টীম' পাঠালে পর তাঁরা যে সমীক্ষা চালাবেন—তারই উপর ভিত্তি করে, কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৬৯—৭০ সালের অর্থ-সাহায্য নির্ধারণ করবেন—এর বিরুদ্ধে

মহলের কাণ্ড-কারখানা দেখে নিঃশঙ্কভাবে দিন কাটাচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের আর একটি কৃতিত্ব এই দারুণ দুর্দিনেও ভোলবার নয়। পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ বড়লোক নয়—তবু অকাতরে তাঁরা তাঁদের সাহায্য নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু যেহেতু সেই সাহায্য খোদ সরকারী বা মনোমত ভাঁড়ারে পড়ছে না—কিংবা তা রীতি-মতো বে-সরকারী, তাই সেসব সংগৃহীত সাহায্য উত্তরবঙ্গে পাঠানোও এক দারুণ সমস্যা। রাজ্য সরকারের কৃপাধন্য না হলে কোনো সহায়তার আশাই নেই। অপরপক্ষে খোদ রাজ্যপালের তহবিল থেকে সংগৃহীত পাঁচ হাজার টাকা আর কিছু কম্বল পাঠাবার জন্য নাকি স্পেশাল চার্টার্ড প্লেনের ব্যবস্থা করতে সরকারের তৎপরতার অভাব হয় না! আসল উদ্দেশ্য, সাহায্য করা নয়, বিলাসীদের বিমানভ্রমণ। অর্থাৎ বহুর সর্বনাশে একের পৌষ মাস। এই না হলে গণতন্ত্র এবং রাষ্ট্রপতির শাসন

সম্প্রতি শীতে শীতাতপ বোটাণ্ড হলে একটি অভূতপূর্ব সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হোল। সেক্রেটারীদের উপস্থিতিতে তাঁদের কার্যক্রম ও সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেবার নমুনা যাঁরা সংবাদপত্রে পাঠ করেছেন, তাঁরা মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন যে, এই রাজ্যটি চলছে কেমন সুতরাং তাঁরাই বলবেন, উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের অদৃষ্টে এঁদের দৌলতে কিছু কি আর মিলতে পারে?

আমরা কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলবো, রাজ্য সরকারের অকর্মণ্যতার জন্য আপনারাও বৃথা অজুহাত প্রদর্শন করবেন না; সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কাছ থেকে যে টাকার বিরাট বোঝা কেন্দ্রীয় কোষাগারে সঞ্চিত হয়, তার বৃহৎ অংশই যায় উত্তরবঙ্গ থেকে। সেই উত্তরবঙ্গের মানুষও ভোট দেয়। তাদের আজকের দুর্দিন, চিরকালের দুর্দিন না হয়তো তাদের সুদিনে আপনারা তাদের ভালবাসা হারাবেন।

আজকের মানুষ

বাংলাদেশের গর্ব এবং গৌরববোধ করবার কারণ এখানে যে, শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে-দুজন দীর্ঘকাল ভারতবর্ষকে জগৎসভায় প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তাঁরা দুজনই বঙ্গ সন্তান—একজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্যজন উদয়শঙ্কর। রবীন্দ্রনাথ বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর কবিতার ছন্দ দিয়ে, উদয়শঙ্কর সেখানে ভারতের মর্মবাণী পৌঁছে দিয়েছেন তাঁর নৃত্যের ছন্দ দিয়ে। নোবেল পুরস্কার দিয়ে বিশ্বসভা রবীন্দ্রনাথকে সম্মানিত করেছে, উদয়শঙ্করের সে-ধরনের পুরস্কার পাবার সুযোগ নেই, কিন্তু যে সম্মান, শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা তিনি সমস্ত বিশ্ববাসীর কাছ থেকে লাভ করেছেন তার কাছে সমস্ত পার্থিব পুরস্কারই নিষ্প্রভ। সেই উদয়শঙ্কর আজ গুরুতর অসুস্থ, জন্মভূমিতে নয়, সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায়। স্বভাবতই এ-সংবাদে ভারতীয়মাত্রেই উদ্বিগ্ন।

ইংরেজরা বল নাচ জানে, রুম্বা বোঝে, কিন্তু কথক-কথাকলি, ভরতনাট্যম-মণিপুরী নাচ বলে কোনো বিশেষ নৃত্যভঙ্গী আবার আছে নাকি? আজ থেকে প্রায় ৪৬ বছর আগে লন্ডনের এক সৌখীন থিয়েটার হল-এ উদয়শঙ্কর প্রথম পরিবেশন করলেন ভারতীয় নৃত্য। দর্শকসাধারণ, স্বভাবতই বিদগ্ধজন বিস্ময়ে বিমুগ্ধ। সমালোচকেরা বিস্ফারিত। পরাধীন দেশের নেটিভের কাছে এত উচ্চমানের শিল্পকলা তাঁরা আশা করেন নি।

উদয়শঙ্কর অবশ্যই বিদেশীদের নাচ দেখাবার উদ্দেশে বিলেত যাত্রা করেন নি, তিনি গিয়েছিলেন রয়াল কলেজ অফ আর্টস-এ বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর রুদেনস্টাইনের কাছে চিত্রকলা শিখতে। কিন্তু সুধী দর্শকমণ্ডলীর সামনে তাঁর প্রথম আবির্ভাবে তিনি যে আশাতীত সাফল্য লাভ করলেন, যে-প্রশংসা অর্জন করলেন তাই তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছে নটরাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে। প্রেরণা পেয়েছিলেন তিনি বলশিল্পী রুশ ব্যালেরিনা প্যাভলোভার কাছ থেকেও। প্যাভলোভার সঙ্গে [illegible] নৃত্য পরিবেশন করে তিনি লন্ডনের অভিজাত [illegible]।

কিন্তু বিদেশী ঢং-এ নেচে যথেষ্ট হাততালি কুড়োলেও উদয়শঙ্করের মন ভরলো না যেন। তিনি ভারতীয়, ভারতের কথা ও কাহিনী বিদেশে প্রচার করাই তাঁর কর্তব্য। তাই ভারতের পুরাণ-গাথা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলাকে কেন্দ্র করে তিনি রয়াল অপেরা হাউসে নৃত্যানুষ্ঠান করলেন। রাধার ভূমিকায় প্যাভলোভা, কৃষ্ণ সাজলেন স্বয়ং। মন জয় করলেন তিনি ইংলন্ডবাসীর সহজেই। ইংলন্ড থেকে উদয়শঙ্কর আটলান্টিক পাড়ি দিলেন, পাশে প্যাভলোভা। আমেরিকানদের শহরে শহরে উদয়শঙ্কর নৃত্যনাট্য উপহার দিলেন, তাঁর অপরূপ ছন্দময় নৃত্য দেখে

উদয়শঙ্কর

সকলেই অবাক। উদয়শঙ্করের মধ্য দিয়ে আমেরিকা যেন ভারতকে নতুন করে আবিষ্কার করলো। যেখানে তিনি কাদামাটিও, তাকে জয় করতেও বেগ পেতে হয় নি।

এরপরে এই তরুণশিল্পী [illegible] যশের মাল্য পরালো। অত্যন্ত খুঁতখুঁতে ফরাসীরা, বিভিন্ন শিল্পকলার চূড়ান্ত পরিণতি এখানে [illegible] এদের গর্ব রয়েছে—তারা শিল্প-সংস্কৃতির [illegible]। কিন্তু সেই [illegible] [illegible] উদয়শঙ্কর [illegible]।

[illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] [illegible] লেখার এবং [illegible] থেকে [illegible] কিছু শেখার জন্য তিনি পেয়েছিলেন। আর লাভ হয়েছিলো তিনি বিখ্যাত ফরাসী নৃত্যপটীয়সী সিমকিকে তাঁর দলে পেয়েছিলেন।

এর পর থেকে উদয়শঙ্কর তাঁর দল নিয়ে প্রায়ই এদেশ-সেদেশ করেছেন, আবার দেশে ফিরেছেন সুধীজনের সামনে হাজির হয়েছেন। বস্তুত ইয়োরোপ-আমেরিকার ভারতীয় নৃত্যশিল্পী বলতে একজনকেই বুঝিয়েছে, তিনি হলেন উদয়শঙ্কর। অবশ্য উদয়শঙ্কর কেবল চিরাচরিত ভারতীয় নৃত্যপদ্ধতি নিয়ে পড়ে থাকেন নি, তিনি নিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন নতুন নতুন শিল্পে, নতুন নৃত্যরীতি প্রবর্তনে যার মূল রয়েছে অবশ্য ভারতেরই মাটিতে। রুশ প্যাভলোভাকে যেমন তিনি ভারতীয় নৃত্যকলার দীক্ষা দিয়েছিলেন, সিমকিকেও তাই। কলকাতাবাসী সেদিন এই চটুল, লাস্যময়ী ফরাসী তরুণীর ভারতীয় নৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

স্বদেশে-বিদেশে যথেষ্ট সম্মান-সমাদর পেলেও উদয়শঙ্করের আর্থিক অনটন কিন্তু ঘোচে নি, বিদেশে দল নিয়ে যাবার খরচ প্রচণ্ড। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা কেবল যাযাবরবৃত্তি করলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না। উদয়শঙ্করের স্বপ্ন একটা অভিনব নৃত্যকলা মন্দির প্রতিষ্ঠা করা। বহু অর্থ ব্যয়ে তিনি আলমোড়ায় একটা সংস্কৃতি কলাকেন্দ্র স্থাপন করেছেন। যদিও আর্থিক প্রতিকূলতার জন্যে কেন্দ্রটিকে তিনি যেভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন তা পারেন নি। উদয়শঙ্কর যে নতুন নৃত্যরীতি উপহার দিয়েছেন, তাতে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য বা নৃত্যকৌশলকে বর্জন করা হয় নি, তিনি চেয়েছেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে, প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয় সাধন করতে। তাঁর 'শ্রম ও যন্ত্র', জীবনের ছন্দ ইত্যাদিতে এই সমন্বয়েরই স্বাক্ষর রয়েছে। একই ভাবের প্রকাশ দেখা গিয়েছে তাঁর 'কল্পনা' নৃত্যচিত্রে।

উদয়পুর গ্রামের নামেই উদয়শঙ্কর নাম। তাঁর বাবা ঝালওয়ার মহারাজার প্রথমে শিক্ষা উপদেষ্টা এবং পরে মন্ত্রী ছিলেন। উদয়শঙ্করের এক ভাই বিখ্যাত সেতারবাজিয়ে রবিশঙ্কর। উদয়শঙ্কর দেশে বহু নৃত্যশিল্পী সৃষ্টি করেছেন, শান্তি বর্ধন, শচীনশঙ্কর, নরেন্দ্র শর্মা তাঁদের অন্যতম। সহধর্মিণী অমলাশঙ্করও প্রায় প্রথমে তাঁর কাছে নৃত্য শিক্ষার জন্যই এসেছিলেন। আজ এই [illegible]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ পনের ॥
পাকিস্তানের জেলে

৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সন, পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হইয়াছে, মাত্র ১৭ দিনের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ উপলক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেক জিলার সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী হিন্দুদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে আটক করা হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন, ভূতপূর্ব মন্ত্রী, এম-এল-এ, শহরের নাম-করা ডাক্তার, উকিল, মোক্তার, ব্যবসায়ী, জমিদার-তালুকদার, ইংরাজ আমলের রাজনৈতিক কর্মী। ন্যাশন্যাল আওয়ামী পার্টি এবং এন, ডি, এফ পার্টির মধ্য হইতে বাছাই করিয়া হিন্দুকর্মিদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাদের নেতা বা কোন মুসলমান কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবে, আমি এই রাষ্ট্রের নাগরিক, আমাকে কেন গ্রেপ্তার করিয়া জেলে আটক করা হইবে? যাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই জীবনে কখনও রাজনীতি করে নাই বা রাজনৈতিক দলকে কোন সাহায্য করে নাই। যাঁহারা শহরে ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কিছু লোক, যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর, মুসলমান বন্ধুদের সহিত প্রকাশ্য সভায় "ভারতীয় বর্বর আক্রমণের" তীব্র নিন্দা করিয়া বক্তৃতা দিয়াছেন, যুদ্ধ তহবিলে অর্থ দান করিয়াছেন, তাঁহারাও রেহাই পান নাই। একজন ধনী সাহা যুদ্ধ-তহবিলে দশ হাজার টাকা দান করার কয়েক দিনের মধ্যেই গ্রেপ্তার হন, তিনি যে কয়মাস জেলে ছিলেন, তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী হিসাবেই কাটাইয়াছেন।

আমার পরাধীন ভারতে বিনা বিচারে জেলে আটক থাকার অবস্থা জানা ছিল, পাকিস্তানের জেলের অবস্থা জানা ছিল না, গ্রেপ্তারের পর আমি ভাবিলাম, [illegible] [illegible] [illegible] ভাত [illegible] [illegible] যাওয়ার [illegible] জেলেই [illegible] [illegible] কাপড়-জামা-জুতা ইত্যাদির জন্য এক-কালীন ২৫০৲ টাকা পাইব। আমি শুধু একটা তোষক-বালিশ ও মশারি সঙ্গে লইলাম, নিজের কিছু সম্বল থাকা ভাল। টাকা-পয়সা সঙ্গে কিছু নিলাম না, কারণ হাতখরচ বাবদ প্রতি মাসে একটা এলাউন্স ত' পাইবই। বর্তমানে আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক, পরাধীন বৃটিশ-ভারতে, বিদেশী গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার পাইয়াছি, এখন নিশ্চয়ই তদপেক্ষা ভাল ব্যবহার পাইব। বিশেষত আমি এই দেশের স্বাধীনতার জন্য সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর জেলে কাটাইয়াছি, যাঁহাদের চেষ্টায় আসিয়াছে দেশের স্বাধীনতা, আমি তাঁহাদের অন্যতম। জেল-গেটে প্রবেশ করার সময় ভাবিলাম, রাত্র অধিক হইয়াছে, বিশেষ কিছু খাইব না, শুধু দুধ-রুটি খাইব। উল্টা বুঝিলি রাম? জেল-গেটের লেখা-পড়ার কাজ শেষ হওয়ার পর ডেপুটি জেলার সিপাহীকে নির্দেশ দিলেন, ১৪ নম্বর দোতলা। আমার সঙ্গে ছিল একটা স্যুটকেশ এবং একটা হোল্ড-অল। সিপাহী আমাকে নির্দেশ দিল স্যুটকেশ লইয়া তাহার সঙ্গে যাইতে। আমি বলিলাম, আমার হার্ট ট্রাবল, আমি ইহা বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিব না। তখন সিপাহী দয়া করিয়া আমার স্যুটকেশ সঙ্গে লইয়া চলিল। ১৪নং দোতলার মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে কুমুদবাবু, বিনোদবাবু, গৌরবাবু প্রমুখ অভ্যর্থনা করিয়া ভূমি-শয্যায় বসাইলেন। খাবার কি ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, কল্যের ঠাণ্ডা ভাত এবং ডাল আছে। খাওয়ার প্রবৃত্তি হইল না। শোয়ার ব্যবস্থা দেখিলাম, জেলের দুইটা কম্বল সম্বল করিয়া ভূমি-শয্যায় সকলে শয়ন করিয়া আছেন। মশারি দেওয়া হয় নাই, নিজের মশারিও ব্যবহার করিতে দেওয়া হইল না, কারণ হুকুম নাই। কি মশা? [illegible] দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাকা-চাকা ফুলিয়া উঠে এবং কি চুলকানি? উপায় নাই। সারা রাত্রি ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইতে হয়। আমি যখন ১৯০৮ সনে নারায়ণগঞ্জ জেলে বা ঢাকা জেলে ছিলাম, তখনও খুব মশা ছিল কিন্তু তখন মশার কামড়ে ঘুমের কোন ব্যাঘাত হইত না। মুক্তাগাছার বিখ্যাত জমিদার, এক সময় যাঁহার জমিদারীর আয় তিন লক্ষ টাকা ছিল, এম্‌-কম পাশ, বকুল আচার্য-চৌধুরী, ভূতপূর্ব মন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর, প্রসিদ্ধ ডাক্তার কে, পি. ঘোষ, প্রসিদ্ধ উকিল কুমুদ চক্রবর্তী, ভূতপূর্ব এম, পি, এ, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ), বিনোদ চক্রবর্তী, গৌরকিশোর দাস প্রমুখ সকলেরই এক অবস্থা, সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী। এই ব্যবস্থা শুধু ময়মনসিংহ জেলের বন্দীদের জন্য নয়, পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেক জিলার গণ্যমান্য হিন্দু বন্দীদের জন্য। ঢাকেশ্বরী মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টার, সুর্য বসুর পুত্র সুনীল বসু, ভবেশ নন্দী, দেবেন্দ্র ঘোষ, অবনী ঘোষ, ফণী মজুমদার, চিত্ত সুতার, পূর্ণেন্দুকিশোর সেনগুপ্ত—সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী। দুই মাস পর আমরা ডি, পি, আর, বন্দী হইলাম, প্রায় সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী, দৈনিক খোরাকী বাবদ ১৷৷৹ টাকা ভাতা। কেহ কেহ দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দী হইলেন। আমি তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীই ছিলাম। জেলখানায় দৈনিক ১৷৷৹ টাকায় খোরাকী চলে না, কারণ লাকড়ী, তৈল, চাউল, ডাইল, মাছ-তরকারি, চা-চিনি সবই এই দেড় টাকার মধ্যে। বিশেষত মাল সরবরাহ করিবে জেলের কনট্রাক্টার।

ময়মনসিংহ জেলের আটক বন্দীরা ভাতা বৃদ্ধির জন্য আবেদন-নিবেদন করিতে লাগিল কিন্তু ফল কিছুই হইল না। অবশেষে কর্তব্য নির্ধারণের জন্য সভা বসিল, আমি সভাপতি। সভায় আলাপ-আলোচনার পর স্থির হইল, এক দিনের জন্য টোকেন (Token) হাঙ্গার

স্ট্রাইক হইবে। গভর্নমেণ্টকে নোটিশ দিয়া একদিন হাঙ্গার স্ট্রাইক করা হইল।

জেলে যাওয়ার পর আমার নিকট বড় সমস্যা হইল খাওয়ার পর থালা-বাটি ধোয়া। আমার হার্ট ট্রাবলের জন্য শুইয়া বা বসিয়া কোন কাজ করিতে পারি না, পেটে চাপ পড়িলেই বুকে চাপ পড়ে, তখন হার্ট ট্রাবল সুরু হয়। এই বিপদ হইতে রক্ষা করিল তরুণের দল। তাহারা স্থির করিল খাওয়ার পর বৃদ্ধদের থালা বাসন তাহারা ধুইবে। খাওয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা থালা বাসন লইয়া যাইত। এই ভলাণ্টিয়ারদের মধ্যে ছিলেন জ্যোৎস্নাময় দত্ত—উকিল, ভাই সেন, সোমেশ আচার্য, আলোকময় নাহা—উকিল, রবি নিয়োগী, ডাঃ ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী, মিহির মজুমদার, মনোরঞ্জন সিংহ। থালা-বাটি ধোযার সমস্যা মিটিল এখন কাপড় ধুইয়া দেয় কে? আমি ছোটসময় হইতেই মিতব্যযী এবং স্বাবলম্বী। আমার কাপড-জামা সর্বদাই আমি নিজে ধুইয়াছি। হার্ট ট্রাবল হওয়ার পর হইতেই পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি, কোন পরিশ্রম করিতে পারি না, এমন কি গাযে সাবান মাখার যে পরিশ্রম তাহাও সহ্য হয় না, এজন্য আমি বৎসরে এক দিন কি দুই দিন গায়ে সাবান মাখি। আমাব কাপড়-জামা ময়লা হইবে, এজন্য আমি গাযে তেল মাখি না। জেলে আসার পর গায়ে সাবান লাগান এবং তেল মাখার সুযোগ পাইলাম। জেলে যাওযাব দুই মাস পর ব্যবস্থা হইল জেলের ধোপায় সপ্তাহে একবার কাপড় কাচিযা দিবে। এখন কাপড় মযলা হওযাব চিন্তা নাই। জেলের এক বৎসব প্রত্যহ গায়ে নিজে তেল মাখিয়াছি এবং মাঝে মাঝে সাবান লাগাইয়াছি, অবশ্যই মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে হইযাছে এবং প্রায় দুই ঘণ্টা সময় কাটিযাছে।

জেলখানায় কিছুদিনের মধ্যেই অনেকের স্বাস্থ্য ভাঙিতে লাগিল, ডাঃ কে পি, ঘোষ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, তাঁহাকে বাহিরের হাসপাতালে পাঠান হইল অবস্থা আশঙ্কাজনক বলিয়া মুক্তি দেওয়া হইল, মুক্তির কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল। আমিও ভগ্ন-স্বাস্থ্যের জন্য মুক্তি পাইলাম, স্বাস্থ্য আর ফিরিয়া পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক জেলখানায় আমাদের দিন-গুলি আনন্দেই কাটিয়াছে। রান্নার ব্যবস্থা আমাদের তত্ত্বাবধানেই হইত। একটি কবিতা হইতে আমাদের মনের অবস্থা জানা যাইবে।

রইল বাকী

হোটেল শ্রীগুরু নারাণ
চার দেয়ালের মাঝে স্থান,
রাজবন্দী ডিকেণ্ডারী
সেই কিচেনের ম্যানেজারী
পালাক্রমে পড়ল এসে
মোদের হাতে অবশেষে।

এক হপ্তা সবার ছিল
মোদের বেলায় দ্বিগুণ দিল
ভেবেছিলাম ভালই হলো
মোদের ভাগেই সিকা ছিঁড়ল
এর মধ্যেই রিলিজ হবে
ধন্য ধন্য করবে সবে।

উৎসাহে তাই চাঙ্গা হই
এই ক'টা দিন কাটাবই
নেই যখন আর অন্য গতি
হলেই বা ছাই ত্রুটি অতি
একস্পেরিমেণ্ট দু'-চারটা
চালিয়ে যাই দিবস ক'টা।

ফুড সেণ্টার বড়ই গরম
সুকুমারের 'কু'ই রকম
মাখনবাবুর এটা-ওটা
কুমুদ বকুল প্যাজে চটা
মন ওঠে না যোয়ান ভানুর
পেটের ব্যামো দাদা মানুর।

নানান জনের নানান ভোল
মেটে ফালতুর গণ্ডগোল
নুন থাকে তো চাল আসে না
ডাল আসে তো জল থাকে না
জিভের ধার ক্ষুরের মতই
সামলে চলি ভযে কতই।

কি করেছি ঠিক জানি না
মোদের সাধ্যে বাদ রাখি না
সবার জন্যই ঠিক ভেবেছি
তবু কি ছাই সব পেরেছি?
দোষ-ত্রুটি তাই অনেক হলো
ক্ষমা চাইবার মুখ কি রইল?

রবি নিয়োগী মূল হলেন
কুল সামলান ভাই সেন
গুরুপদ আছেন সদা
ভাণ্ডারী খোদ নারাণদা,
সময় তরুণ কাজের পাগল
আমি হলাম ফোপরদালাল।

মিত্র-বন্ধু পেলাম হরেক
সায় সাহায্য করল অনেক
মাথায় বুদ্ধি সোমেশবাবু
মহাদেব সে হাতে কাবু
গায়ে বুদ্ধি মিহির ভাই
আলোকের তো তুলনাই নাই।

নগরবাসী খাটিয় অতি
তর্ক করেন দুর্গাপতি
পর-পরামেশ অজয় রায়
জ্যোতিষ বোসের পেয়ে সায়
নানান রকম মনের মতো
চালিয়ে গেলাম প্ল্যানিং যতো।

খাদ্যসূচী করে লিস্টি
ভেবেছিলাম করব কিস্তি,
কিন্তু মোরা পাই না মিষ্টি
আ-মিঠা ভোজ অনাসৃষ্টি
বাতিল শেষে করতে হ'লো
দিনও মোদের ফুরিয়ে এলো।

আজকে মোদের শেষের দিন
খেয়ে যান পদ দু'-চার-তিন,
ভালোই বলেন বিনোদদা
প্রফুল্ল বীর জানিই তা
মহারাজের তো খেদ নাই
আর সকলেও বলেন তাই।

হয় নি যাদের মনের মত
পান নি যাঁরা আরাম তত
শ্রীগুরু নারাণ স্মরি
খান নি যাঁরা পেটটা ভরি
আমরা নত হারটি মেনে
করুন ক্ষমা আপন জেনে।

ঝালা-আঝালা গরম জল
সেদ্ধই খান যিনি কেবল,
টোপলার ভাত, নিরামিষ,
মাংস খান না কেবল ফিস্
করুন ক্ষমা সবাই মিলি
প্রাণের দুঃখ এবার বলি।

বড়ই নিরাশা করল মোদের
বাণী ফলে না বড় দাদাদের,
নগেনদা তো কেবল তাড়াল
রবীন্দ্র সেন শুধুই পেছাল,
অরুচি হায় অন্ন-ব্যঞ্জন
চুল কাটবেন মনোরঞ্জন।

মনটা তাই কাতর জানি
উৎকণ্ঠা যাচ্ছে হানি
একটি প্রশ্ন বারংবারে
আজও খবর এল না রে?
হায় কুহকী সবই ফাঁকি
রিলিজ হওয়াই রইল বাকী!

[illegible]
[illegible]

[illegible] জেলে যাঁহারা ছিলেন :—

সদর—

জ্যোৎস্নাময় দত্ত—উকিল, জলধর পাল—ব্যবসায়ী, সুখেন্দু সেনগুপ্ত ([illegible] সেন), কুমুদচন্দ্র চক্রবর্তী—উকিল, [illegible] লাল লাহিড়ী—উকিল, [illegible] আচার্য-চৌধুরী জমিদার—মুক্তাগাছা, [illegible] দাস—উকিল (Ex. M. P. A.) বিনোদ চক্রবর্তী (Ex. M. P. A.) [illegible] (ভানু), জ্ঞানেন্দ্র ভট্টাচার্য, গুরুপদ দেব—ব্যবসায়ী, সত্যনারায়ণ মিশ্র—ব্যবসায়ী, ডাঃ অবনী নন্দী, ডাঃ রবীন্দ্র সেনগুপ্ত, মোহিনীমোহন বসাক—ব্যবসায়ী, ডাঃ যতীন পাল, ডাঃ ক্ষিতীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সোমেশ আচার্য—কবিরাজ, মহাদেব সান্যাল, আলোকময় নাহা—উকিল, মদন পাল—ব্যবসায়ী, অজয় রায়, জ্যোতিষ বসু, মনোরঞ্জন ধর—উকিল (Ex. Minister)

নেত্রকোণা—

সুকুমার ভাওয়াল, দুর্গেশ পত্রনবিশ—উকিল, মিহির মজুমদার, মনোরঞ্জন সিংহ (নকুল), যতীন্দ্র সিংহ, রূপচন্দ্র সাহা—ব্যবসায়ী, কালিদাস সাহা—ব্যবসায়ী, রমেশ চক্রবর্তী, অশ্বিনী চক্রবর্তী, জগবন্ধু সাহা—অলংকার, যতীন্দ্র হাজং, নবকুমার চাতুগং, হরেন্দ্রচন্দ্র সাহা, অনিল গুপ্ত, রাখাল সাহা, [illegible] রায়, শীবেন লাহিড়ী নারায়ণ হাজং।

টাঙ্গাইল—

বীরেন্দ্র চৌধুরী—মোক্তার, নারায়ণ বিশ্বাস—উকিল, রাইচরণ রায়—[illegible] (Ex. M. P. A.) যোগেশচন্দ্র নিয়োগী, ডাঃ ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী।

জামালপুর—

রবি নিয়োগী, হেমন্ত ভট্টাচার্য, রাধামোহন বর্মণ।

কিশোরগঞ্জ

ইন্দুভূষণ চক্রবর্তী, গণেশ সরকার, ডাঃ উমেশ বিশ্বাস, নগরবাসী দেবনাথ, খগেন্দ্র অধিকারী, নগেন সরকার, ডাঃ প্রফুল্ল বীর, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী।

॥ জেলে ॥

সংখ্যালঘু [illegible], সাম্প্রদায়িক [illegible] ও সংখ্যালঘু [illegible]

প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতা আমার মধ্যে নাই, আমি সমাজতন্ত্রী। তবে কেন আমি সংখ্যালঘু কনফারেন্স ডাকিতে চাই। আমার রাজনৈতিক বন্ধুদের মধ্যেও অনেকে সংখ্যালঘু নামে কিছু করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন, কারণ সংখ্যালঘুর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা আছে। কেহ কেহ ইহাও বলিয়াছেন, আপনি ইহা অপেক্ষা কিছু [illegible] করেন। সংখ্যালঘুরা বা হিন্দুরা [illegible] [illegible] লোক। সমাজদেহের এক অংগ দুর্বল হইলে সম্পূর্ণ সমাজ দুর্বল হইয়া পড়িবে। [illegible] শাসনের পর সংখ্যালঘুরা কোন সভা ডাকেন নাই বা [illegible] নাই। আমি কনফারেন্স ডাকিব [illegible] অনেকেই ইতস্তত করিতেছিলেন, তাঁহাদের ধারণা, গভর্নমেন্ট সভা [illegible] দিবে এবং গ্রেপ্তার করিবে। আমি ১৯৬৩ সনে কনফারেন্স উপলক্ষে কুমিল্লা [illegible], ঘরোয়া বৈঠক হইল, ঘরভরা লোক, উকিল, ডাক্তার, ব্যবসায়ী ছিলেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আশু সিংহ প্রমুখও উপস্থিত ছিলেন। একই প্রশ্ন গভর্নমেন্ট সভা করিতে দিবে কি না? আমি বলিলাম, আমি গভর্নরের সহিত আলাপ করিয়া অনুমতি লইয়া আসিব। ইহাতে সকলেই আশ্বস্ত হইলেন। আমি যথ সময়ে গভর্নরের সহিত দেখা করিলাম, আমি বলিলাম, সংখ্যালঘুরা বর্তমানে যে অবস্থায় আছে, তাহা তাহাদের পক্ষেও কল্যাণকর নহে, রাষ্ট্রের পক্ষেও কল্যাণকর নহে। আমি একটা সংখ্যালঘু কনফারেন্স ডাকিব। সংখ্যালঘুদের রাষ্ট্রবিরোধী কোন কাজ করার ক্ষমতা নাই, তাহারা যাহা কিছু করিবে, আইনসংগতভাবেই করিবে। আমরা কনফারেন্সের পর আপনার নিকট ডেপুটেশন আনিব এবং একটি স্মারকলিপি দিয়া যাইব, আপনি সহানুভূতির সহিত তাহা বিবেচনা করিবেন। গভর্নরের সহিত আলাপের পর সকলকে জানাইয়া দিলাম কনফারেন্সে গভর্নরের মত আছে। ইহার পর প্রস্তুতির জন্য আমি বিভিন্ন শহরে যাইয়া ঘরোয়া বৈঠক করিতে লাগিলাম। আমি প্রথমে কুমিল্লায় ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের বাসায় গেলাম, সেখান হইতে রাজসাহী যাইব স্থির করিলাম। আশ্বিন মাস, কিছু ঝড়বৃষ্টি হইতেছে, ধীরেনবাবু, বিশেষত তাঁহার পুত্র সঞ্জীব নিষেধ করিতে লাগিল, আমি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া স্টেশনের দিকে চলিলাম, তখনও ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল, আমি ভাবিলাম গাড়ির দরজা বন্ধ থাকিবে, ঝড়বৃষ্টি আমি টেরও পাইব না। আমি তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট কাটিয়া রাজসাহী মেইলে উঠিলাম। গাড়িতে ভিড় যথেষ্ট ছিল, রাস্তায় বিশেষ কিছু টের পাই নাই, দরজা-জানালা বন্ধ ছিল। পরদিন প্রাতে গাড়ি জগন্নাথগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছিল। তখনও অল্প অল্প ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল। গাড়ি হইতে নামিয়া বুঝিতে পারিলাম, গত রাত্রিতে কি প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। সকলেই নদীর ঘাটে ফ্ল্যাটের দিকে চলিল, আমার হার্ট ট্রাবল, বিশেষ চলিতে পারি না, আস্তে আস্তে ভিজিতে-ভিজিতে নদীর ঘাটে ফ্ল্যাটের দিকে চলিলাম। সঙ্গে জিনিস বিশেষ কিছু ছিল না, একটা সতরঞ্চি, একখানা ধুতি ও গামছা। চা খাওয়ার ইচ্ছা হইল, কিন্তু কোথায় চায়ের দোকান? ফ্ল্যাটে উঠিয়া দেখি দাঁড়ানোর স্থান নাই। কোন প্রকারে দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিলাম। আর কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা যায়, বসার স্থান নাই। জানিতে পারিলাম, পূর্বদিন ফেরী স্টিমার আসে নাই। আজ আসিবে কিনা বলা যায় না। অবশেষে বৈকালে ৩টার সময় ফেরী স্টিমার আসিল। ফেরী স্টিমারে উঠিয়াই মিষ্টি এবং চা খাইলাম, বয়লারের একপাশে দাঁড়াইলাম, কাপড়-জামা শুকাইয়া গেল। যখন সিরাজগঞ্জ ঘাটে পৌঁছিলাম তখনও অল্প অল্প ঝড়-বৃষ্টি হইতেছিল। ভিজিতে-ভিজিতে গাড়িতে উঠিলাম, গাড়ির ছাদ দিয়া জল পড়ে, জানালা ভাঙা, ভিজিতে-ভিজিতেই ঈশ্বরদী স্টেশনে রাত্রি ৯টার সময় পৌঁছিলাম। স্টেশনের অবস্থা দেখিয়া চক্ষুস্থির! খোলা প্ল্যাটফর্ম, ঝড়ের ঝাপটায় বৃষ্টি আসিতেছে। আমার হার্ট ট্রাবল চলিতেছে। মনে হইল আজ রাত্রে মৃত্যু অবধারিত। মৃত্যুর জন্য কোন চিন্তা নাই, আমি গীতার ভাষ্যকার। তবে মনে হইতেছিল, কনফারেন্সের পর মৃত্যু হইলেই ভাল হইত। মরবার সময়ও বাঁচবার একটা স্বাভাবিক চেষ্টা আসে। আমি হোটেলের খোঁজ করিতেছি, আমার পরনে ধুতি-পাঞ্জাবী ছিল। স্টেশনের একজন চাপরাশী বলিল, ঐ দিকে একটা হিন্দু হোটেল আছে। আমি আশার আলো দেখিলাম। রাত্রি দশটা, বৃষ্টি পড়িতেছে। কিছু ঝড়ও আছে, হোটেলের দিকে যাইতেছি, বিশ্বাস ছিল আশ্রয় পাইব। রাস্তায় এত কাদা জুতা ডুবিয়া যায়, জুতা এবং পুটুলি হাতে করিয়া হোটেলে উঠিলাম, আমার হার্ট ট্রাবল চলিতেছে। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হোটেলওয়ালা খাওয়ার ডাক দিল, লোকজন বিশেষ কিছু নাই, না খাইলে থাকার দাবি হইবে না, খাইতে বসিলাম, মাছ-ডাইল লইলাম, খাইতে পারিলাম না, কোনমতে হাত-মুখ ধুইয়া বারান্দায় বসিলাম। হোটেলের মালিক চলিয়া যাইতে বলিল, থাকার নিয়ম নাই, আমি নিরুপায়, হোটেলের মালিককে অনেক তোয়াজ করিলাম, আমার পরিচয় দিলাম, অবশেষে তিনি দয়া করিয়া খোলা বারান্দায় চৌকির উপর থাকিতে অনুমতি দিলেন। চৌকির উপর একটা মাদুর বিছান ছিল, ঠাণ্ডা হাওয়া আসিতেছিল, অগত্যা চৌকির উপর আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, শেষ রাত্রে রাজসাহীর গাড়ি। শরীর ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, মনে হইল জ্বর হইবে। সময় সময় পালস্ দেখি। গায়ে [illegible] কিছু নাই, কাপড় জামা [illegible]। শেষ রাত্রে স্টেশনে চলিলাম। রাজসাহীর গাড়িতে উঠিলাম, বৃষ্টি

[illegible] অন্যায় স্বচ্ছ সমুখে
চিন্তাকে বোঝাই
জীবনের জিজ্ঞাসার অভিব্যক্তি সম্মুখ সকল
উত্তর দেবার স্পর্ধা
বার বার করেছে প্রখর।

সমুখের প্রশ্নের [illegible]
মনুষ্যের সুতীব্র পরিচিতি
পরিবর্তনীয় ঋতু স্পর্শ লীন প্রাকৃতিক রীতি
অথবা ইচ্ছার স্পষ্ট দীপ্ত মুখ
হৃদয়ের ঘরে
অনায়াসে ব্যক্ত করি উচ্চারিত অব্যর্থ কথায়।

অথচ বোঝে না কেউ; কৌতূহলী
উন্মুখ প্রহরে
জটিল বৈচিত্র্যে মূক কণ্ঠস্বর
অস্বচ্ছ জীবন।
প্রশ্নের সমাপ্তি নেই, উত্তরেও
নেই সমাধান।
তাইতো দোভাষী খুঁজি অর্থবহ
অবোধ্য সংলাপে!

থামিয়া গিয়াছে। বেলা দশটার সময় বীরেন সরকারের বাসায় পৌঁছিলাম, বীরেন তখনও কোর্টে যায় নাই, বীরেনকে প্রথমই বলিলাম, "এখন আমার বিশ্বাস হইয়াছে, এখনও আমার জীবনীশক্তি আছে, এক কাপ্ গরম চা খাওয়াও।" রাজসাহীর সকলের সহিত দেখা করার পর বীরেনের মোটরে একদিন আমার ১৯১২-১৩ সনের কর্মকেন্দ্র নাটোর গেলাম। সেইদিনই রাজসাহী ফিরিলাম। পরদিন রংপুর রওয়ানা হইলাম। বীরেন আমার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকেট কাটিয়াছিল, এজন্য তাহাকে মৃদু ভর্ৎসনা করিলাম, পরদিন শেষ রাত্রে রংপুরে পাখী মৈত্র উকিল-এর বাসায় পৌঁছিলাম। উত্তরখণ্ডের কাজ শেষ করিয়া, আমি ময়মনসিংহ হইয়া ঢাকা পৌঁছিলাম।

আমি স্থির করিলাম, সংখ্যালঘু সম্মেলন ঢাকা শহরে ডাকিব, অসুবিধা অনেক। অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হইল, চেয়ারম্যান ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, যুগ্ম-সম্পাদক সুধাংশু হালদার এডভোকেট, বসন্ত দাস। সভ্য—ডাঃ শৈলেন সেন, ভবেশ নন্দী, বীরেন্দ্র চৌধুরী এডভোকেট, সুরেশচন্দ্র বসু—এডভোকেট, হারাধন সরকার—এডভোকেট, ডাঃ কালিদাস বৈদ্য, ডাঃ যতীনন্দন গোস্বামী, বিভূতি দাশ (ডাঃ চাঁদসী) প্রমুখ। সভাপতি নির্বাচিত হইলেন, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। কনফারেন্সের প্রস্তুতি চলিতে লাগিল, নিমন্ত্রণপত্র ছাপান হইল, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ এবং মূল সভাপতির ভাষণ ছাপানোর জন্য প্রেসে দেওয়া হইল।

আমি ৫১ নং হেমেন্দ্র দাস রোড—স্বদেশ নাগের বাসায় আছি। পরাধীন [illegible] রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীগণ, যাঁহারা এখনও দেশত্যাগ করিয়া যান নাই, সময় সময় কার্যোপলক্ষে ঢাকা আসেন, তাঁহাদের অনেকেই দল-নির্বিশেষে, এই ৫১নং হেমেন্দ্র দাস রোড-এর স্বদেশ নাগের বাসায় আতিথ্য গ্রহণ করেন। ঢাকা শহরে অনেকেরই উঠার স্থান নাই, হোটেলে থাকার ব্যয় বহন করাও কঠিন। কিন্তু এখানে নিজ বাড়ির মতই থাকা যায়। স্বদেশ খুব অতিথিপরায়ণ, আদর-যত্নের কোন ত্রুটি নাই। আমার ত' কোন কথাই নাই, সময় সময় এক মাস, দেড় মাস থাকি, স্বদেশ আমার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছে এবং করিতেছে। এই কনফারেন্স উপলক্ষে স্বদেশ নাগের বাসাই বড় আড্ডা। ১১ই, ১২ই জানুয়ারী, ১৯৬৪ সন, সংখ্যালঘু সম্মিলনীর দিন ধার্য হইয়াছে। প্রত্যেক জিলায় নিমন্ত্রণপত্র পাঠান হইয়াছে। একদিন প্রাতে আমি ও স্বদেশ পায়ে হাঁটিয়া ওয়ারী হইতে হাটখোলার দিকে যাইতেছি, পরনে ধুতি-পাঞ্জাবী, একটি মুসলমান যুবক বলিল, ওদিকে যাবেন না, রেলওয়ে ক্রসিং-এর নিকট একটা খুন হইয়া গিয়াছে, আমরা সরোজ গাঙ্গুলীর বাসায় গিয়া ফোন করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ মিলের একটা গাড়ি আনাইয়া বাসায় ফিরিলাম। শহর গরম। ইতিমধ্যে ধীরেন দত্ত ঢাকা আসিয়া কনফারেন্স বন্ধ করিতে বলিলেন। আমি বিভিন্ন জিলায় প্রায় এক শত urgent টেলিগ্রাম করিয়া সকলকে জানাইয়া দিলাম, কনফারেন্স স্থগিত, কেহ যেন ঢাকা না আসে। ১০ই জানুয়ারী হইতে দাঙ্গা সুরু হইল। আমি ঐ সময় বিভিন্ন কাগজে সময়োপযোগী একটি বিবৃতি পাঠাইলাম, আমার বিবৃতি ১৩ই জানুয়ারী সকল কাগজে বাহির হয়। আমরা আজাদ শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। "শান্তিবাহিনী [illegible] ক্যাম্পে দশ দিন" আনন্দবাজার পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল।

বিভিন্ন অসুবিধার জন্য পুনরায় কনফারেন্স ডাকা সম্ভবপর হয় নাই। ইহার পর, মে মাসের শেষ ভাগে বিভিন্ন জিলার নেতৃস্থানীয় লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া ঢাকায় আনা হয়। ২রা জুন প্রাতে ৫১ নং, হেমেন্দ্র দাস রোড-এর বাড়িতে এক ঘরোয়া বৈঠক হয়। ঐদিন বৈকালে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে বিভিন্ন জিলার ২১ জন প্রতিনিধি গভর্নরের সহিত দেখা করিয়া এক স্মারকলিপি দিয়া আসেন। গভর্নরের সহিত প্রতিনিধিদলের দুই ঘণ্টা আলাপ-আলোচনা হয় এবং গভর্নর সকলকে মিষ্টি ও চা পান করাইয়া আপ্যায়িত করেন। প্রতিনিধিদলের মধ্যে ছিলেন:—১। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। ২। ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী। ৩। বীরেন্দ্রনাথ সরকার—এডভোকেট, রাজসাহী। ৪। দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ—বরিশাল। ৫। ভবেশচন্দ্র নন্দী—ঢাকা। ৬। আশুতোষ সিংহ—উকিল—কুমিল্লা। ৭। অতীন্দ্র ভদ্র—উকিল, কুমিল্লা। ৮। ফণী মজুমদার—মাদারীপুর। ৯। পুলিন দে—চট্টগ্রাম। ১০। বিনোদ চক্রবর্তী—ময়মনসিংহ। ১১। নিকুঞ্জ গোস্বামী—শ্রীহট্ট। ১২। পিটার পল গোমেজ—ঢাকা। ১৩। সুরেশচন্দ্র বসু—এডভোকেট—ঢাকা। ১৪। বীরেন্দ্র চৌধুরী—এডভোকেট, রাজসাহী। ১৫। সুধাংশু হালদার—এডভোকেট, খুলনা। ১৬। হারাধন সরকার—এডভোকেট, কুমিল্লা। ১৭। বসন্ত দাস—ঢাকা। ১৮। রবীন্দ্র নাগ—ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ১৯। [illegible] পঞ্চানন [illegible], খুলনা। ২০। [illegible]—এডভোকেট, রাজসাহী। ২১। [illegible] [illegible] দাস, ঢাকা।

[illegible] আর কোন দেশের যুবশক্তি ভারতবর্ষের যুবকদের মত এতটা বেদনা, হতাশা ও ব্যর্থতার জ্বালা নিয়ে বাস করে না। বেকারত্বের অভিশাপ এতটা শোচনীয় রূপে আর কোথাও দেখা দেয় নি। ভারতবর্ষের মধ্যে আবার পশ্চিমবঙ্গ এ-বিষয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে, ভারতবর্ষের আর কোন রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের মত বেকার সমস্যা এত তীব্র নয়। দেশ-বিভাগজনিত স্ফীত লোকসংখ্যার দায় তো আছেই, তদুপরি পশ্চিমবঙ্গে বাঙালী আজ কর্মত [illegible]দেশী। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক শক্তি অবাঙালীদের করায়ত্ত হওয়ায় এ দেশের সন্তানদের স্থান এখানে নেই। বেকারত্ব ভারতবর্ষের জাতীয় সমস্যা হলেও পশ্চিমবঙ্গে এ সমস্যার তীব্রতা ও ব্যাপকতার সঙ্গে আর কোন তুলনা নেই। ১৯৬১ সালের আদমসুমারির ফলাফল থেকে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গের কর্মক্ষম মানুষের শতকরা ৬৭ জন বেকার। এই হিসাবের মধ্যে গ্রামাঞ্চলের ভূমি-শ্রমিকদের ধরা হয় নি, যদিও তারা বছরে আট মাস বেকারই থাকে। কিছুদিন আগে এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে কুড়ি-পঁচিশজন কেরানীর জন্য পদপ্রার্থী হয়েছিলেন কুড়ি হাজারেরও বেশি মানুষ। এ থেকে পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যার ভয়াবহতার চরম নিদর্শন পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্প সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার মন্থর এবং এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিই দায়ী। ১৯৫৬ থেকে ৬০-এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে নতুন রেজিস্ট্রীকৃত কোম্পানীগুলির অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৮১ কোটি টাকা। কিন্তু মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে ওই সময় মূলধনের পরিমাণ ২৫২ কোটি টাকা। ১৯৫৬-৬০ [illegible] পশ্চিমবঙ্গের কারখানাসমূহে দৈনিক কর্মসংস্থানের গড় বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল পাঁচ শতাংশ, মহারাষ্ট্রে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ৪৫ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গকে অর্থ সাহায্য দেবার ব্যাপারে, বেসরকারী শিল্পকে ঋণ দেবার ক্ষেত্রে এবং দুষ্প্রাপ্য কাঁচামাল বণ্টনের নীতি গ্রহণে কেন্দ্রীয় সরকার অসম ভিত্তি নির্ধারণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে আয় কেন্দ্রীয় সরকার করছেন, পশ্চিমবঙ্গকে তার ন্যায্য অংশ কোনদিনই দেওয়া হয় নি, অথচ মহারাষ্ট্রের বেলায় তাঁরা মুক্তহস্ত। পশ্চিমবঙ্গকে আমদানী কোটা থেকে বঞ্চিত করে মহারাষ্ট্রকে উপহার দেওয়া হচ্ছে। ১৯৬৩-৬৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের তামার চাহিদার মাত্র শতকরা এগারো ভাগ, দস্তার মাত্র সাত ভাগ, টিনের মাত্র সতের ভাগ এবং সীসার মাত্র দুভাগ আমদানী করতে দেওয়া হয়েছিল। প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাবে পশ্চিমবঙ্গে শিল্প উৎপাদন কমেছে, অর্থনীতিতে মারাত্মক মন্দা দেখা গেছে, আর ওদিকে সমৃদ্ধ হয়েছে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, গুজরাট।

এদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগকে আরও সীমাবদ্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের চেষ্টার অন্ত নেই। রাজ্য সরকার চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রের কাছ থেকে ৫৮৪ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা চেয়েছিলেন, কলকাতা উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত ৮০ কোটি টাকার দাবিও তাঁদের ছিল। কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের জন্য আগামী পাঁচ বছরে মোট ৬৬৪ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা সরকারী উদ্যোগে ব্যয় করা স্থির হয়েছিল, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজে ৭৫ কোটি টাকা যোগাড় করবে ও বাকি ৫৮৯ কোটি টাকা [illegible] হবে। এখন কেন্দ্র জানিয়েছেন যে তাঁরা সবসুদ্ধ ২০০ থেকে ২২৫ কোটির মত দিতে পারবেন, অতএব পরিকল্পনা কাটছাঁট কর। তার নীট ফলটা কি দাঁড়াচ্ছে? পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৯০ জন বালক-বালিকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা শিকেয় উঠল এবং এই সঙ্গে কয়েক সহস্র মানুষের শিক্ষক হিসাবে কর্মসংস্থানের পথ বন্ধ হয়ে গেল। বিদ্যুৎ পর্ষৎ গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ১২০ কোটি টাকার যে পরিকল্পনা করেছিলেন তাও বরবাদ হয়ে গেল, এবং সেই সঙ্গে আরও কয়েক সহস্র মানুষের কর্মসংস্থানের পথও মাঠে মারা গেল। এ রাজ্যের মোট ৩৮,৫৫৪টি গ্রামের মধ্যে মাত্র ১,৯১২টি গ্রামে বিদ্যুৎ গেছে এবং এ পর্যন্ত মাত্র ১,১০৭টি বিদ্যুৎচালিত নলকূপ বসেছে। বিশ বছরের এই অ্যাচিভমেন্টের কথা ভাবতেও লজ্জা হয়।

একদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে অপর দিকে নতুন করে বেকার সৃষ্টি করা হচ্ছে। একমাত্র ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে ছাঁটাই হয়েছে এক লক্ষ বিশ হাজার মানুষ। চট শিল্পে আরও পঞ্চাশ হাজার মানুষের মাথায় ছাঁটাই-এর খড়্গ ঝুলছে। এদিকে অটোমেশন হাজার হাজার মানুষকে বেকার করতে উদ্যত। লক-আউট লে-অফের সংখ্যা গত এক বছরের মধ্যেই দ্বিগুণ হয়ে গেছে। গত দু'বছরে পশ্চিমবঙ্গে ছাঁটাই-এর সংখ্যা দু'লক্ষেরও বেশি। এদিকে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বরাদ্দের ব্যাপারে কেন্দ্র যেভাবে কাঁচি চালিয়েছেন, তাতে কলকাতা উন্নয়ন আকাশকুসুমই থাকবে, দ্বিতীয় হাওড়া ব্রীজ, চক্ররেল, হলদিয়া বন্দর ও [illegible] সমস্ত কিছুই চাপা পড়ে যাবে, উত্তরবঙ্গের তিস্তা, তোর্সা

মহাজনদের পরিকল্পনার নিদারুণ উদ্ভব আর সেই সঙ্গে নষ্ট হবে অজস্র কর্মসংস্থানের সুযোগ। ক্রমাগত করে হাঁকডাকই তো দুর্গাপুরে যন্ত্রপাতির পরিকল্পনা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ কাহিনী আমরা আগে বঙ্গদর্শনে লিখেছি নতুন করে তা বলা নিষ্প্রয়োজন। এটা বন্ধ করে সেটিক ফ্যাক্টরি অ্যাসেম্বল্ড করা হয়েছে, আর দশ হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ ব্যবসায় এই কেন্দ্রীয় বিরুদ্ধে দলমত আন্দোলনে নেমেছেন দেখে আমরা আনন্দিত। এ দেশে আন্দোলন ভিন্ন কোন কিছুই সিদ্ধ হয় না। এ তো পরীক্ষিত সত্য। লক্ষ লক্ষ প্রাণবন্ত তরুণ আজ অভিশপ্ত কর্মহীন জীবনের শিকার। কৃষি স্বাধীনতার মূল্য এদের কাছে অর্থহীন, কেন না বেঁচে থাকার অধিকার থেকে যাদের বঞ্চিত করা হয়েছে শুধু বুলিতে তাদের ভুলিয়ে রাখা যায় না।

উন্নয়ন নিয়ে উদ্বেগ

যে কলকাতায় ভারতের শতকরা ১৫ ভাগ শিল্প কেন্দ্রীভূত, ব্যাঙ্কের লেনদেনের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ যে শহরে হয়ে থাকে দেশের শতকরা ৪২ ভাগ রপ্তানী ও ২৫ ভাগ আমদানী যে কলকাতা বন্দরে হয়, সেই কলকাতার জন্য কেন্দ্র এ পর্যন্ত এক পয়সা খরচ করে নি, করবে বলেও মনে হয় না। বোধ হয় ম্যাকনামারার ভ্রমণ একটা আই-ওয়াশ। বিশ্বব্যাঙ্ক এই বিষয়ে কিছু সাহায্য করলেও সে সাহায্য কলকাতায় না এসে যদি দিল্লী বা বোম্বাই বা মাদ্রাজে যায় তাহলেও বিস্ময়ের কিছু নেই, কেন না টাকাটা দিচ্ছে বিশ্বব্যাঙ্ক, পাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ নয়, কেন্দ্রীয় সরকার। কলকাতার প্রতি যে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন রকম মায়ামমতা আছে তার নিদর্শন এ-পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। তার বিনিময়ে যে খবরটা পাওয়া গেছে সেটা আরও মারাত্মক।

কয়েকদিন আগে পর্যন্ত সরকারী মহল থেকে শোনা যাচ্ছিল যে বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়নের জন্য ৮০ কোটি টাকার মধ্যে অন্তত ৪০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে, কিন্তু জাতীয় উন্নয়ন সংস্থার বৈঠকের পর রাজ্যের ঊর্ধ্বতন সরকারী মহলে সে ধারণা একেবারে পাল্টে গেছে। কেন্দ্র নাকি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন কলকাতা উন্নয়নের জন্য এক কপর্দকও দেওয়া হবে না। পরিকল্পনা কমিশন সি এম পি ও'র ৮০ কোটি টাকার প্রকল্প ব্যাপক ছাঁটাই করে ওটা রাজ্যের চতুর্থ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করতে বলেছেন। আমরা আগেই দেখেছি যে কেন্দ্র চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য ২০০ থেকে ২২৫ কোটি টাকার মত পশ্চিমবঙ্গকে দিতে পারে, এখন আমার কাছে যে কলকাতার জন্য যে ৮০ কোটি টাকা আলাদা করে দেবার কথা হয়েছিল ওটা আর দেওয়া হবে না। যদি কলকাতা উন্নয়নের শখ তোমাদের মাথায় একান্তই চেপে থাকে তাহলে ওই যে আমরা ২০০ থেকে ২২৫ কোটি দিতে রাজী আছি তা থেকেই ব্যবস্থা করে নাও, আলাদা করে আমরা কানাকড়ি দেব না। সোজা কথা কলকাতা উন্নয়নের জন্য টাকা দেওয়া যাবে না। সি এম পি ও'র মাস্টার প্ল্যান, যাকে খোদ ম্যাকনামারা সাহেব সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন, সেটি আবর্জনার বাক্সে ফেলে দাও।

কথা ছিল গঙ্গার ওপর দ্বিতীয় হাওড়া সেতুর জন্য কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গকে কুড়ি কোটি টাকা দেবে এবং এর জন্য আর দর কষাকষি করতে হবে না। এখন দেখা যাচ্ছে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। দ্বিতীয় গঙ্গা সেতু প্রকল্পটিকেও চতুর্থ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করতে কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও টাকা দেওয়া হবে না। এর পরে হয়ত এটাও বলা হবে যে বন্যাক্লিষ্ট উত্তরবঙ্গের পুনর্বাসনের জন্যও কোন আলাদা টাকা দেওয়া হবে না, ওটাও চতুর্থ পরিকল্পনার অন্তর্গত কর। মনে রাখতে হবে উত্তরবঙ্গ বাবদ কেন্দ্র এখনো একটা আধলাও দেয় নি, যদিও প্রধানমন্ত্রী ও উপ-প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেবার বেলায় কোন কার্পণ্য করেন নি। বন্যার পর দু'মাস কেটে গেছে, কেন্দ্র শুধুমাত্র একটি সমীক্ষক দল পাঠিয়েছিলেন। এই দলটি তিন দিনে জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও বিহারের কিছু অংশ দেখেছেন, কিন্তু দার্জিলিং, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুরে কালিম্পং প্রভৃতি স্থানে যাবার সময় পান নি। সমীক্ষক দলের নেতা শ্রীভোরা কোন রিপোর্ট দিয়েছেন কি না জানা যায় নি এবং সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গকে এই বাবদে কত দেওয়া হবে তাও আমাদের অজ্ঞাত। পশ্চিমবঙ্গকে চিরকাল যারা অপক্ক কদলী দেখাতে অভ্যস্ত তাদের কাছে এই গড়িমসি নীতিটাই স্বাভাবিক। এবং আশঙ্কা করছি যে এক্ষেত্রেও চতুর্থ পরিকল্পনা দেখিয়ে দেওয়া হবে।

গত বিশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ একটানা শুধু কেন্দ্রের কাছে এক কাঁদুনিই গেয়েছে : টাকা নাই, কি খাই, হাঁড়ি কানাই। কেন্দ্রও চিরকাল একই উত্তর দিয়ে গেছে : টাকার সাধ, করো মাফ, ইতি বাপ। উভয় তরফের এই কথোপকথনে শুধু মার খেয়েছে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ। কথাটা কাজে করতে রোষ নেই, পশ্চিমবঙ্গের প্রতি এই অবিচারের হেতু [illegible] প্রাদেশিকতা। কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় স্বার্থ বাদ দিয়ে দল-গত প্রাদেশিক স্বার্থটাই বেশি বড় দেখেন এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় অবিচারের এটাই একটা বড় কারণ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ মনের দিক থেকে এখনো অতটা নিচে নামে নি, কেন না বাঙালীর সর্বভারতীয় দৃষ্টির সূত্রপাত উনিশ শতক থেকেই, ভারতের বহু অংশেই যখন মধ্যযুগ। বৃটিশ আমলে বাঙালী সারা ভারতেই আদর্শগত নেতৃত্ব দিয়েছিল, তারই প্রতিক্রিয়ায় একটা হীনমন্যতা ভারতের অপরাপর অংশে প্রচ্ছন্ন ছিল এবং আজকের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও আমলাতন্ত্রের অতি-প্রাদেশিক মনোভাব তারই পরিণতি। অপর দিকে দেশ বিভাগের ফলে বাঙালী দেউলিয়া হয়ে গেছে দেহে ও মনে। যার ফলে সর্বভারতীয় পরিবেশে পশ্চিমবঙ্গের স্থান হয়েছে নগণ্য। তদুপরি নেতৃত্বের ব্যর্থতাও পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ ডেকে এনেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অবিচারের দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে রাজনৈতিক। যে রাজ্য আমাকে দলীয় রাজনীতিতে মুনাফা দেবে, তার প্রতি আমি দরাজ হব না কেন? পশ্চিমবঙ্গে সে মুনাফা ওঠার সম্ভাবনা কম।

সঙ্গীত শিক্ষিকা-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়

আজ থেকে কয়েক বছর আগে কলকাতার কেয়াতলায় গভর্নমেণ্ট-স্পনসর্ড একটি সঙ্গীতের শিক্ষিকা-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে অনেকগুলি অভিযোগ বিভিন্ন মহল থেকে করা হয়েছে। এই অভিযোগগুলি যথার্থ কি না সে বিষয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করার জন্য আমরা রাজ্য সরকারের শিক্ষাসচিব তথা শিক্ষা-অধিকর্তাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

উপরি-উক্ত প্রতিষ্ঠানটির সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপক নিয়োগকালে যে-সময়ের জন্য যে বেতন তখন ধার্য হয়েছিল, দশ বছর পরেও, অধ্যাপনার সময় বৃদ্ধি পেলেও, তাঁদের বেতন বৃদ্ধি হয় নি আজও। অথচ যথাসময় বেতন বৃদ্ধির আশ্বাস তাঁদের দেওয়া হয়েছিল। একটি গভর্নমেণ্ট-স্পনসর্ড কলেজের সঙ্গে অপর একটি গভর্নমেণ্ট-স্পনসর্ড কলেজের বেতনক্রমের আকাশ-পাতাল পার্থক্য হবে, এর পিছনে কি যুক্তি আছে বোঝা গেল না। প্রত্যেকেই আজও তাঁদের প্রাপ্য [illegible] আছেন, এবং তা-ও নিয়মিত দেওয়া হয় না। অপর [illegible] কলেজের [illegible]

গ্র্যাচুইটি, ইনক্রিমেন্ট, দুর্মূল্যভাতা কিছুই নেই।

১৯৫৭-র ডিসেম্বর মাসে এই মহাবিদ্যালয়ে ক্লাস হত বেলা সাড়ে এগারোটা থেকে সাড়ে চারটে এবং অপরাহ্ণ পৌনে পাঁচটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত। হঠাৎ ১৮।৮।৬৭ থেকে দুপুরের ক্লাসগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়, শুধুমাত্র বিকেলের ক্লাসগুলি চালু রাখা হয়। অর্থাৎ এই কাজের দ্বারা ফুল-টাইমার অধ্যাপকদের রাতারাতি পার্ট-টাইমার করে দেওয়া হয়। অবশ্য পরে ১৮।৮।৬৭ তারিখের এই ব্যবস্থা বাতিল করে দিতে হয়।

আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ, একাধিক মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষতা করে থাকেন। ফলে অনেক সময় নাকি তাঁকে আলোচ্য সংস্থায় অনুপস্থিত থাকতে হয়। একটি গভর্নমেন্ট-স্পনসর্ড প্রতিষ্ঠানে কাজ ঠিকমত হচ্ছে কি না তা দেখার দায়িত্ব কি সরকারের নয়?

এই মহাবিদ্যালয়ের জন্য কলকাতার গোলপার্কের কাছে অনেকটা জমি কেনা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তৎকালীন শিক্ষা-মন্ত্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্তৃক স্থাপিত ভিত্তিপ্রস্তর সহ। সরকারী সাহায্যরূপে এই জমি ও গৃহনির্মাণের জন্য এককালীন প্রায় দুই লক্ষ টাকা ওই মহাবিদ্যালয় লাভ করে। আজও কোন গৃহ-নির্মাণ হয় নি এবং হবে কি না বলা যায় না। অথচ এগারোশো টাকা মাসিক ভাড়ায় নাকি মহাবিদ্যালয়ের কাজ নির্বাহ হচ্ছে এবং সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, ওই টাকাটা নাকি ব্যাঙ্কে পড়ে আছে কারেন্ট একাউন্টে, সুদবিহীন অবস্থায়।

শোনা যায়, উপযুক্ত ক্ষেত্রে ছাত্রীদের মাসিক পঞ্চাশ টাকা করে স্টাইপেন্ড দেবার একটি ব্যবস্থা ওখানে আছে। অনেক দুঃস্থা ছাত্রী এই স্টাইপেন্ডের আশায় ওখানে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। অথচ আজও পর্যন্ত কোন বিদ্যার্থী এই স্টাইপেন্ডের সুযোগ কেন পেলেন না সে-ও এক রহস্য।

'পরিবার পরিকল্পনা পক্ষ'

এবছর ২রা ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গে 'পরিবার পরি-কল্পনা পক্ষ' পালন করা হচ্ছে। গত ৩০শে নভেম্বর রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য-সচিব এই পরিকল্পনার অগ্রগতি প্রসঙ্গে আলোচনার জন্যে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। পশ্চিমবঙ্গে পরিবার পরিকল্পনার কাজে ১১১০০ কর্মী নিযুক্ত আছেন। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে [illegible] বর্তমান [illegible] শতকরা ৪০ থেকে ২৯-এ নামিয়ে আনতে চান সরকার। জানা গেল, লুপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যদিও তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যের মাত্র ১৫·৩%-এ উপনীত হয়েছেন, তাহলেও গত বছরের স্টেরিলিজেশন অপারেশনের ক্ষেত্রে শতকরা ১৩৫ ভাগ সফল হয়েছেন। এ বছরে স্টেরিলিজেশন অপারেশনের লক্ষ্য ২,৫৭,২৬০। এর মধ্যে অক্টোবর পর্যন্ত অপারেশন হয়েছে ১,১৩৩৩৭। গত সেপ্টেম্বরে এন্টালীতে ভিক্ষুকদের স্টেরিলিজেশন অস্ত্রোপচারের জন্য যে ক্যাম্প খোলা হয়, তাতে মোট ১৮৭টি অপারেশন হয়েছে তিন দিনে। কলকাতা, ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলীতে এখন ৪০০০ দোকানে "নিরোধ" পাওয়া যাচ্ছে। পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে মুসলমান সমাজে কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয় নি—তাঁদের মধ্যেও সমান সামাজিক চেতনাবোধ লক্ষ্য করা গেছে। পরিবার পরিকল্পনা পক্ষ উপলক্ষে "দম্পতি" নামে স্টেট ফ্যামিলি প্ল্যানিং ব্যুরোর মাসিক মুখপত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

পরিবার পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণ আমাদের কাম্য। কিন্তু এর মধ্যে যেসব গলদ আছে, যেসব ফাটকাবাজি চলছে, সেসব বন্ধ করতে হবে। যে কেউ অস্ত্রোপচারের জন্যে "কেস্" ধরে নিয়ে গেলেই পায় তিন টাকা। এদের বলা হয় প্রমোটর। যার ওপর অস্ত্রোপচার করা হয়, সে পায় ১৮ টাকা, ডাক্তার ৫ টাকা এবং ওষুধপত্রের জন্য ৪ টাকা। অতীতে সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়েছে যে, সামান্য টাকার লোভে বয়ঃপ্রাপ্ত নয়, এমন ছেলেকেও ভ্যাসেকটমী করা হয়েছে। দ্বিতীয় কথা, পরিসংখ্যান সঠিক কি না, সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে। বেসরকারী ৬৩টি প্রতিষ্ঠান প্রকারান্তরে অর্থ সাহায্য পাচ্ছে বলে সরকারী মুখপত্র জানিয়েছেন। এঁদের অর্থসাহায্যের ধরণটা কি? তাঁরা কি প্রমোটর-এর কাজ করে এই অর্থ সাহায্য পান? বস্তি অঞ্চলে এবং গ্রামাঞ্চলে এই আন্দোলন ব্যাপক করা হচ্ছে কি না? কর্মীর অপ্রতুলতা কিভাবে এঁরা দূর করবেন?

পঃ বঃ সরকার অত্যন্ত উচ্চাশা পোষণ করেন যে, এই পরিকল্পনায় শেষে তাঁরা নিজের লক্ষ্যে উপনীত হবেনই, এমন কি জন্মহার হাজারকরা ২৯-এর নিচেও চলে যেতে পারে। পরিকল্পনা সম্পর্কে এত উচ্চাশা পোষণ করার জন্যে যে প্রশাসনিক দক্ষতা, সততা এবং নিষ্ঠার প্রয়োজন, তা স্বাস্থ্যদপ্তরের পরিবার পরি-কল্পনা শাখার কর্তাব্যক্তিদের আছে তো?

হাসপাতাল না কসাইখানা?

চুঁচুড়ার জেলা হাসপাতালের দুর্নীতি সম্পর্কে 'চরাচর' পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা অত্যন্ত গুরুতর। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য অধিকর্তার জরুরী দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সংবাদটি নিম্নে প্রকাশ করা হলো :

'চুঁচুড়ার অবস্থিত জেলা হাস-পাতালটির বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ। আর এই দুর্নীতির নায়ক ডাক্তার থেকে সামান্যতম সুইপার পর্যন্ত। এককথায় লোকে বলেন এই হাসপাতালের প্রতিটি ইটও দুর্নীতির জালে আবদ্ধ।

সাধারণত দুশো শয্যার এই হাস-পাতালে যেখানে সর্বদাই চারশো রোগী চিকিৎসার জন্য মেঝের মাটিতে পড়ে পড়ে কাতরান, সেখানে সামান্য অবস্থাপন্ন ব্যক্তি এই হাসপাতালে ভর্তি হয়ে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে আসেন না নিশ্চয়ই। আসেন কারা? সাধারণ দরিদ্র মানুষ। যাঁদের ওষুধ কিনে খাবার সামান্য পয়সাও জোটে না, এমন কি অসুস্থ হলে পাঁচটা পয়সা নেই যে একখানা বিস্কুট কিনে খান।

সেই সব জরা-জীর্ণ দরিদ্র নিঃস্ব এমন কি সহায়-সম্বলহীন মানুষ ছোটেন এখানে রোগযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে, মৃত্যুর বিভীষিকাকে জয় করতে। কিন্তু অভিযোগে প্রকাশ কোনো রোগীকেই ভর্তি করা হয় না যদি ভর্তির জন্য আগে আট টাকা ফি দিয়ে কোনো স্পেশালিস্ট ডাক্তারকে না দেখান বা আউটডোরে কম্পাউন্ডারদের অথবা ওয়ার্ড মাস্টার অফিসার বাবুদের কাছে কিছু প্রণামী ধরিয়ে না দেন। এই দাবি এমনই চড়া দরের যে কখনও কখনও স্পেশালিস্ট [illegible] ফেরৎ ডাক্তারদের চেম্বার ফি'র চেয়েও অনেক বেশি। যথা দশ থেকে পনের টাকা পর্যন্ত। এই টাকা না দিলে মুমূর্ষু রোগীকেও ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। মেঝের একটা কোণও জোটে না। জনৈক গরীব রোগী বলছেন : বাবু, আমার কিছুই নেই, আমি খেতে পাই না। কোনো রকমে দিন চলে। আপনাদের টাকা দেবো কোত্থেকে। সঙ্গে সঙ্গে জনৈক কম্পাউন্ডার তাঁর ট্যাঁকে হাত দিয়ে কাপড়ের মধ্যে থেকে হাতড়ে বের করে ফেললেন আনা দশেক পয়সা—যা লোকটির ফেরার পথের পাথেয়। এই তো পয়সা রয়েছে, এদিকে গরীব সাজছেন। ডাক্তারবাবু ওটা বাড়ি ফেরার পাথেয়। এই কথা বলার বহু আগেই দশ আনা পয়সা আউটডোরের সেই কম্পাউন্ডারটি পকেটস্থ করে ফেলেছেন।

যাই হোক কোনও রকমে একটি স্লিপ হাতে করে লাইন দিলেন ওষুধ নিতে

[illegible]

...বাবু বলে দিলেন, ডাক্তারবাবু যে ওষুধ লিখছেন তা আমাদের স্টকে নেই। অবশেষে ভদ্রলোক দেখলেন তাঁর রোগের চিকিৎসা তো দূরের কথা, তিনি নিঃস্ব, বাড়ি ফেরার সেই খুচরো পয়সাকটিও নেই। হাইড্রোসিল ও হার্নিয়া যাদের অপারেশন হচ্ছে তাঁদের নিয়মিত ড্রেস করা হয় না। প্রতিবার ড্রেসের জন্য জেল নার্সদের এক টাকা করে দিতে হয়।

উঠতে পারেন না রোগী বিছানা থেকে। মলত্যাগের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন তোমাদের পায়ে পড়ি একবারটি বেডপ্যান দাও। বেডপ্যান নিয়ে এসে রোগীটির কাছ থেকে পয়সা চাওয়া হচ্ছে। এ-মর্মান্তিক দৃশ্য চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা অসম্ভব। তাই লোকে এই হাসপাতালকে হাসপাতাল না বলে বলেন কসাইখানা।

এই হাসপাতাল থেকে সামান্য দূরেই অবস্থিত হুগলী জেলা শাসকের খাস কামরা। তারই কিছু দূরে অবস্থিত বিভাগীয় কমিশনার অফিস। যাঁদের হাতে এই দুর্নীতি দমনের ব্যাপক ক্ষমতা।

ভুক্তভোগী রোগীরা বলেন: জেলা শাসক তথা দুর্নীতি-দমন বিভাগের এতো কাছেই এতো দুর্নীতি, যা তাঁদের চোখে পড়ে না, তাহলে এই জেলার বহু দূরে যে দুর্নীতি চলছে তা এঁদের নজরে পড়বে কি করে? মা আমাদেরই এই গরীব দেশের মোটা টাকা ব্যয় করে আমাদেরই ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে,—সরকার দুর্নীতি দমন করে থাকেন। জনৈক রোগী বলেন জেলাশাসক একদিন এক গরীব চাষী সেজে এই হাসপাতালে এসে ভর্তি হন। এই শীতের দিনে মেঝেয় এক সপ্তাহ পড়ে থাকুন। এতে কেবলমাত্র সরকারী শাসক হিসাবে নয় মানুষ হিসাবে মানুষকে জানার চেনার যে অভিজ্ঞতা হবে তা সারা

[illegible] অথবা আমরা সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্যপরায়ণতা।"

উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের জন্য সাপ্তাহিক বসুমতীর অর্থ দফায় সাহায্য

উত্তরবঙ্গ বন্যার করাল গ্রাসে সর্বস্ব হারিয়েছে। বাংলা দেশ যে-সংস্কৃতির জন্য আজো গর্বিত, উত্তরবঙ্গে তাও আজ নিদারুণ বিপন্ন। অথচ অগ্রগামী হয়ে সাহায্য গ্রহণ করতেও শিল্পী-সাহিত্যিক ও সাংবাদিকসমাজ কুণ্ঠিত। এ অবস্থায় জলপাইগুড়ি বন্যাক্রান্ত সঙ্গীত-শিল্পী সমিতির পক্ষ থেকে বিস্তারিত খবর জানিয়ে একটি চিঠি দেওয়া হয় শিল্পী শ্রীসবিতাব্রত দত্তকে। ঐ চিঠিতেই (চিঠিটি নিম্নে প্রকাশ করা হলো) উল্লেখ থাকে যে, অবিলম্বে কোন্ কোন্ প্রতিষ্ঠানের সাহায্য প্রয়োজন। চিঠিতে আরো উল্লিখিত হয়েছে যে, অন্য কোথাও সাহায্যের আবেদন জানিয়ে সাহায্য পাওয়া তো দূরের কথা, বিপন্ন শিল্পী ও সংস্কৃতির প্রতি সহানুভূতি জানিয়েও কেউ চিঠির উত্তর পর্যন্ত দেন নি। এই পরিস্থিতিতে সাপ্তাহিক বসুমতী উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির তহবিল থেকে পনের শ' এক টাকা কমিটির সহ-সভাপতি অধ্যাপক নির্মল বসুর মারফৎ পাঠানো হয়েছে।

ইতিপূর্বে সাপ্তাহিক বসুমতী উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটি উত্তরবঙ্গে বন্যার্তদের মধ্যে বিতরণের জন্য সপ্তম দফায় সাহায্য পাঠিয়েছেন। বর্তমানে প্রেরিত ১৫০১ টাকা অষ্টম দফার সাহায্য।

জলপাইগুড়ি বন্যাক্রান্ত সঙ্গীতশিল্পী সমিতির আবেদন

"আজ এইমাত্র আপনার চিঠি L.I.C.I Office মারফৎ আমার হাতে এলো। আপনি আমাদের সমিতির আবেদনকে শিল্পী সাহিত্যিকদের নজরে পৌঁছে দিয়ে যথার্থ শিল্পীর কাজ করেছেন—এর জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনার [illegible] বিভিন্ন ব্যক্তির আবেদন ফর্ম তৈরি করছি। যদিও কাজটি কঠিন, তবুও আমরা সাহায্য দানের ব্যাপারে যে norm ঠিক করছি সে অনুসারেই priority list তৈরি করছি। আমরা জানি না সাপ্তাহিক বসুমতী উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটি কি ভাবছেন। তবে এ [illegible]

[illegible]

[illegible] ... সংগীত শিক্ষক শিল্পী [illegible] জানিয়ে। বর্তমানে যদি আমরা [illegible] appeal পাঠিয়ে [illegible] fresh appeal বসুমতী ত্রাণভাণ্ডারের কাছে করতে যাই, তবে অন্য সকলের মনে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়—এমনিতেই শিল্পীকুল ভীষণ অনুভূতিপ্রবণ।

আমাদের কাছে যা আবেদন আছে যা আমরা নিজেরা যোগাযোগ করে যা বিবরণ সংগ্রহ করেছি তার একটা বিভাগ নিচে দিলাম:

(১) সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান-বিদ্যালয়—

(ক) সঙ্গীতালয়, (খ) মূর্ছনা, (গ) গীতছন্দা, (ঘ) গীতছন্দম, (ঙ) অগ্নি কোরাস, (চ) Melody, (ছ) নটরাজ নিকেতন যাত্রাদল।

(২) উপরোক্ত সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন শিক্ষকবৃন্দ, যাঁদের সঙ্গীত একমাত্র পেশা—এঁদের সংখ্যা আমাদের হিসাব অনুযায়ী ১২ জন কি ১৪ জন।

(৩) সঙ্গীত যাঁদের উপার্জনের একটা অন্যতম অঙ্গ (Part-time)—এঁদের সংখ্যা ১৫/২০ জন। এই হিসাবে [illegible] শিক্ষকগণও আছেন।

(৪) ব্যান্ডপার্টি, ঢোল-কাঁসি, বিবাহ, পালা-পার্বণ ও উৎসবে যাঁরা বাজিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন—এঁদের সংখ্যা কমবেশি ২০ জন।

(৫) এ্যামেচার শিল্পী দল—এঁরা হয় ছাত্র-ছাত্রী, না হয় চাকুরীজীবী, অতএব এঁদের কথা আমরা সব শেষেই ভাবছি।

আপনাকে এ দীর্ঘ পত্র লেখার উদ্দেশ্য আপনি আমাদের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হোন এবং আশা করি আপনার [illegible] norm [illegible]

[illegible] ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

(২) সংগীত শিক্ষকগণ যাঁরা সর্বসময়ের জন্য এর ওপর নির্ভরশীল।

(৩) যাঁরা সংগীত থেকে আয়ের একটি বিশেষ অংশ [illegible] করতেন, বন্যার বিশেষ রকমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত—অবস্থা বিবেচনা করে এঁদেরও সাহায্যের ব্যাপারে ২নং-এর সঙ্গে বিবেচনা করা হবে।

(৪) অন্যান্য professional অর্থাৎ ব্যাণ্ডপার্টি, ঢাকী ইত্যাদি—এঁদের কথাও অবস্থা অনুসারে বিবেচনা করা হবে।

(৫) সকল অবস্থা বিবেচনার পর অ্যামেচার শিল্পী—যাঁদের অবদান এ জেলায় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং তাদের আর্থিক সঙ্গতির কথা বিবেচনা করে সাহায্য দেওয়া সম্ভব হলে দেওয়া হবে।

ওপরের বিধি অনুসারে আমি সর্বপ্রথম সংগীত বিদ্যালয় ও যাত্রা প্রতিষ্ঠানের জন্য সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি।

একটা প্রতিষ্ঠানকে যা সাহায্য ত্রাণভাণ্ডার করবেন সেটাই তাদের কাজে লাগবে। ঠিক একই কথা খাটবে সংগীত শিক্ষকগণের বেলায়—তাঁরা সর্ব সময়েরও হতে পারেন আবার part-time-এর হতে পারেন।

আমরা নিজেরা চেষ্টা করছি হুগলী এলাকায়, যেখানে বন্যার জল ঢোকে নি, সেসব জায়গায় অনুষ্ঠান করে সাহায্য সংগ্রহ করতে। কলকাতার বহু প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিকে চিঠি দিয়েছি। এ পর্যন্ত [illegible] আপনি ছাড়া কারো কাছ থেকে উত্তর পর্যন্ত পাই নি। আমরা জানি আমাদের বিপন্ন সংস্কৃতিকে রক্ষা [illegible] করবো, অতএব এই সাময়িক [illegible] এবং প্রয়োজন [illegible] দিতে হয়েছে।

সাপ্তাহিক বসুমতী ত্রাণভাণ্ডার সরাসরি আমাদের কাছে টাকা পাঠিয়ে দিলে আমরা অন্যান্য যে সব প্রতিষ্ঠানের কাছে সাহায্য পাব আশা করছি বা নিজেরা যা collection করবো, সব এক করে মোটামুটি একটা সুষ্ঠু বণ্টননীতি আমাদের চিঠি অনুযায়ী করতে পারি। তবু আপনার কথামত এবং আমার ওপরে বর্ণিত প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকগণের আবেদন আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছি ২/১ দিনের মধ্যে। সাপ্তাহিক বসুমতী ত্রাণভাণ্ডারের পক্ষে এখানে শ্রীসত্যজ্যোতি সেন সাংবাদিক, আমার বিশেষ বন্ধু। আপনার চিঠির বক্তব্য মত আমাকে বলেছিলেন individual আবেদন করতে শিল্পীদের পক্ষ থেকে। আমি এই সব difficulty বলাতে আমার কথানুযায়ী সাপ্তাহিক বসুমতী ত্রাণভাণ্ডারকে আমাদের সমিতিতে সরাসরি সাধ্যমত সাহায্য করতে অনুরোধ জানাবে বলেছিল। পরিশেষে জানাই আমাদের সমিতি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক বা চিত্রশিল্পী—এঁদের সাহায্যদানের কোন পরিকল্পনা করে নি। বস্তুত professional সাহিত্যিক বা সাংবাদিক কেউ নেই, আর সংস্কৃতির general problem যাঁদের কেন্দ্র করে ভাবিয়ে তুলেছে বিশেষ করে তাঁদের জন্যই চেষ্টা করছি।"

প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়

এমন কোন কোন মানুষ আছেন যাঁদের মৃত্যুসংবাদ বড় হেডলাইন দিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না, বোধ হয় তাঁরা রাজনীতির মানুষ নন বলেই। লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে অনেকে নীরবে যে কাজ করে যান তাঁদেরও অবদান দেশ ও জাতির পক্ষে বড় কম নয়। প্রভাতকুমার চট্টোপাধ্যায়ও সেই বিরল ব্যক্তিদের একজন [illegible] আছে [illegible] সাতষট্টি বছর বয়সে [illegible] করোনারী থ্রম্বোসিস রোগে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে হুগলী চুঁচুড়া-চন্দননগরে বিরাট ছায়া নেমে এসেছে। তিনি শুধু হুগলী-চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও সমাজসেবীই ছিলেন না, এ যুগের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত হিসাবে তাঁর পরিচয় অধিক। এগারোটি ভাষায় তিনি অনর্গল কথা বলতে পারতেন, এছাড়া ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা সম্বন্ধেও তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তাঁর অনূদিত রচনাসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মূল ফরাসী থেকে আঁরি পারমেতিয়েরের ভারতীয় স্থাপত্যবিষয়ক একটি গ্রন্থ, জার্মান থেকে ভিলিবাল্ড কিরফেলের কসমোগ্রাফিয়ে ডের ইণ্ডের, এবং রাশিয়ান থেকে ভারততত্ত্বমূলক বহু প্রবন্ধ। তাঁর অপরাপর রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'মহাবিশ্বের রহস্য', জনৈক রুশ বিজ্ঞানী রচিত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। এছাড়া মূল উর্দু থেকে কিষেনচাঁদ কাপুরের অনেক গল্পের তিনি বঙ্গানুবাদ করেছেন যেগুলি ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। নিরভিমানী ও নিভৃত এই বাণীসাধকের আকস্মিক মহাপ্রয়াণে তাঁর শোকনিমগ্ন পরিজনদের উদ্দেশ্যে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। তাঁর আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক। (৬।১২।৬৮)

ব্রিটিশ শাসকদের হাত থেকে সামান্য পৌর-শাসনের অধিকারটুকু আদায়ের জন্য আমাদের জাতীয় নেতাদের একদা প্রচুর লড়াই লড়তে হয়েছিল। অনেক সংগ্রামের পর আমরা পৌর-শাসনের অধিকার পেয়েছিলাম। সেদিনের পরাধীন দেশে কলকাতা কর্পোরেশন ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনের পীঠস্থান। জে· এম· সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসুর মত জাতীয় নেতারা একদিন কলকাতার মেয়রের আসন অলংকৃত করেছিলেন।

কথাগুলি শুধুই সত্যি নয়—এই ছিল কলকাতা কর্পোরেশনের, এমন কি শহরতলী ও মফস্বলের পৌরসংস্থাগুলিরও ইতিহাস। আজকে সেই ইতিহাস সেই ঐতিহ্য, সেই সব জাতীয়তাবাদী পৌরপিতাদের কথা মনে পড়লে কষ্ট হয়। স্বনামধন্য সেই সব নেতৃবৃন্দের অনেকেই আজ মর্মর মূর্তি ও তৈলচিত্র হয়ে ময়দানে অথবা পৌর-ভবনের দেয়ালে বিরাজ করছেন। বছরে একবার হয়তো সেই মর্মরমূর্তি ও তৈলচিত্রদের গায়ের ধুলো ঝেড়ে, গলায় মালা পরান হয়। অনুষ্ঠানও হয়, বক্তৃতাও হয়। তার পর আবার সারা বছরের ধুলো জমতে শুরু করে তাঁদের সর্বাঙ্গে।

মৃত নেতৃবৃন্দের মর্মরমূর্তি অথবা তৈলচিত্রের জমাট ধুলো আমাকে তত বেশি উদ্বিগ্ন করে না, যত করে, জ্যান্ত নেতাদের বিবেকের মনুষ্যত্বের ওপর সঞ্চিত জমাট ধুলো আর ঝুলে। আমি আজকের পৌর-কর্তৃপক্ষের কথা বলছি, ভোট দিয়ে যাঁদের আমরা পৌরপিতৃত্বের আসনে বসিয়েছি, তাঁদের সকলের কথা বলছি।

* * *

কলকাতার [illegible] রোডের ওপর দিয়ে একদিন ধাপার ময়লাবাহী ট্রেন যেত। আমার মনে পড়ে সেই দুর্গন্ধ ময়লার গাড়ি রাজপথে ধোঁয়া উড়িয়ে যখন যেত, তখন নাকে কাপড় দিতে হত পথচারীদের। ধাপার সেই ময়লার গাড়ির ব্যবস্থা উঠে গেছে অনেকদিন; কিন্তু জমান ময়লার দুর্গন্ধ যায় নি। একদিন যে দুর্গন্ধ শুধু সার্কুলার রোডের অধিবাসীদের ভোগ করতে হত, আজ সারা কলকাতার নাগরিকদের তাই ভোগ করতে হচ্ছে। কলকাতার পাড়ায়, পাড়ায়, রাস্তার মোড়ে মোড়ে গড়ে উঠেছে এক-একটি দুর্গন্ধের নরককুণ্ড, নতুন নতুন ধাপা।

* * *

ছোটবেলায় দেখেছি সন্ধ্যের আগেই একটা লোক মই কাঁধে নিয়ে ছুটছে। পথের আলো সেদিন অপ্রচুর হলেও বাতিওয়ালা তার মই নিয়ে নিয়মিত রোজ সন্ধ্যায় আলো জেলে দিত। সেই পুরনো গ্যাসের আলোর যুগ চলে গেছে। কিন্তু আজ বিজলী আলোর কলকাতায়ও দেখা যাবে সব রাস্তায় আলো নেই। চৌরঙ্গী অথবা পার্ক স্ট্রীটের কথা বলছি না। রেড রোডেও প্রতিদিন নিয়মিত নীলাভ আলোর টিউবগুলি স্বপ্নালোক সৃষ্টি করে। কিন্তু পার্ক স্ট্রীট, চৌরঙ্গী আর রেড রোডের বাইরে যে বিশাল, বিরাট কলকাতা তার অনেক পথেই আজ নিয়মিত আলো জ্বলে না। আলো আছে, বাল্ব আছে—আছে সবই কিন্তু তথাপি দেখা যায় প্রতিদিনই প্রায় কলকাতার অনেক পথই নিষ্প্রদীপ। অথবা সেই সব পথ, সেই সব পাড়াই জনবহুল, যানবহুলও বটে।

* * *

ছোটবেলায় কলকাতায় দেখেছি চৈত্রের শুরুতেই পথের মোড়ে মোড়ে জলসত্র। পৌরপ্রতিষ্ঠানের নয়, ব্যক্তিগত উদ্যমে ও দানে গড়ে-ওঠা জলদান কেন্দ্র। ছোটবেলায় ইস্কুল থেকে ফেরার পথে অনেকদিন সেই জলসত্রে দাঁড়িয়ে ভিজে ছোলা, গুড় আর আঁজলাভরে জল খেয়েছি। পৌরপ্রতিষ্ঠান যেখানে অক্ষম সেইখানে এইভাবেই তার অক্ষমতাকে ব্যক্তিগত উদ্যমে দূর করতে এসে হাজির হয়েছে নাগরিক সাধারণেরা।

সুখের বিষয় সেদিন আর নেই। কলকাতা কর্পোরেশন সাবালক হয়েছে, তার বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটেছে। কলকাতার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত কলের জল সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু নাগরিক জীবন? নাগরিক জীবনের অবস্থা আজ আরও ভয়াবহ।

* * *

গত নভেম্বরের ১৭ তারিখ থেকে তিন দিন কলকাতা কর্পোরেশন নাগরিকদের যে জল সরবরাহ করেছে তা পরিশ্রুত জল নয়। নোংরা, বীজাণুবাহী, অপরিশ্রুত গঙ্গার জল। ক্লোরিন ও ফিটকিরির অভাবেই নাকি পৌর-কর্তৃপক্ষ পানীয় জল শোধন করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁরা কি নাগরিকদের সে কথা পূর্বাহ্নে জানিয়েছিলেন? জানান নি। অর্থাৎ এই বিবেকহীন নিষ্ঠুর ঘাতকেরা নিঃশব্দে সারা শহরের অধিবাসীকে নোংরা, অপরিশ্রুত জল সরবরাহ করে গেছেন তিন দিন ধরে। সেই জল পানের ফলেই নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলকাতার হাসপাতালগুলিতে জন্ডিস্ ও মারাত্মক উদরের ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগী ভর্তি হয়েছে অস্বাভাবিক সংখ্যায়। তিন দিন ধরে [illegible] [illegible] জল [illegible] প্রতিক্রিয়া

এখানেই শেষ হয়েছে বলে মনে করলে ভুল হবে। অদূর ভবিষ্যতে এর প্রতিক্রিয়া হয়তো মহামারীরূপেও দেখা দিতে পারে। কলকাতা কর্পোরেশনের চারটি পানীয়জল শোধন কেন্দ্র গত কয়েক মাস ধরে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। কবে, কোন্ ভবিষ্যতে তাদের কাজ চালু হবে—এই প্রশ্নে নির্বিকার পৌর-শাসকদের কোন জবাব নেই।

আমার সবচেয়ে অবাক লাগে এই ভেবে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও তাঁদের কর্মীদের এতবড় অমানুষিক এই অবহেলা, যা নাগরিকদের অনেকেরই জীবন সংশয় করে তুলেছে, সেইরকম একটা মারাত্মক অপরাধ অনুষ্ঠানের পরও পৌর কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের কাছে দোষ স্বীকারের, অথবা কোনরকম কৈফিয়ৎ দেওয়ার পর্যন্ত দরকার মনে করেন নি। পৌরসভা গৃহের মধ্যে সব কিছুর চুলচেরা বিচার নিয়ে অশোভন দক্ষযজ্ঞ করে চলেছেন কিন্তু নাগরিকদের কাছে কোন কৈফিয়ৎ দেবার প্রয়োজন মনে করছেন না।

পাড়ায় পাড়ায় এঁদেরই আবার দেখা যাবে কর্পোরেশনের নির্বাচনের আগে। দরদে তখন এঁদেরই গলা দিয়ে মধু ঝরবে। পাড়ায় পাড়ায় নাগরিকদের পিঠে হাত দিয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে এঁরাই আবার এসে বলবেন—আপনাদের সেবা করতে পেলে কৃতজ্ঞ হব। অযাচিত-ভাবেই হয়তো তখন এঁরা পাড়ার বস্তির মোড়ে টিউব ওয়েল বসিয়ে দেবেন রাতারাতি পাড়ার রাস্তার ল্যাম্পপোস্টে নতুন বালব লাগিয়ে দেবেন, পাড়ার জমান ময়লা সাফ করতে আনুষ্ঠানিকভাবে হয়তো নিজেরাই লেগে যাবেন। রাস্তা-গুলোও একটু-আধটু মেরামত হতে শুরু করবে। আর আমরা? আমরা নাগরিকেরা, যারা সারা জীবন বিবিধ-বিচিত্র সমস্যার ভার বহন করে চলেছি স্মৃতিতে, তাদের সেই ভারাক্রান্ত স্মৃতিতে এই সব ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবী পরা, আপাতদৃষ্টিতে জনদরদে বিগলিত, ভাল মানুষদের পিছনের চেহারাটা মনেও থাকবে না। আমরা বড় বেশি ক্ষমা করে ফেলেছি। আমাদের সেই বিস্মৃতি ও অহেতুক ক্ষমার ওপর ভর করেই বেঁচে রয়েছে অকর্মণ্য, অপদার্থ, অমানুষিক এই পৌর-শাসকেরা।

কবি জীবনানন্দ স্বপ্ন দেখেছিলেন "কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে।" সত্যিই জল চর্মরোগের গঙ্গা এই শহরে একদিন তিলোত্তমা হয়ে উঠতে পারে। কলকাতাকে সুন্দর করার জন্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয় না। আমার মনে হয় প্রতিদিন কোন এক প্রভাতে নাগরিকতার পরিচিতজনেরা এগিয়ে এসে ঝাঁটা হাতে পথে নামলে কলকাতার সব আবর্জনা, সমস্ত অভিশাপকে একদিনে ঝেঁটিয়ে দূর করা যায় এমন কি সুশান্ত ব্যানার্জি রোডের ঐ ভয়ানক লালবাড়ি-টাকেও। দরকার শুধু সামাজিক সচেতন রাখা, প্রতিদিন নিজের মনাকে পাঠ দেওয়া—ভুলি নাই ভুলব না। তার আগে আমাদের হৃদয়ের সেই অবারিত ক্ষমার সিংহদরজাটাকেও সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিতে পারলে বোধ হয় ভাল হয়।
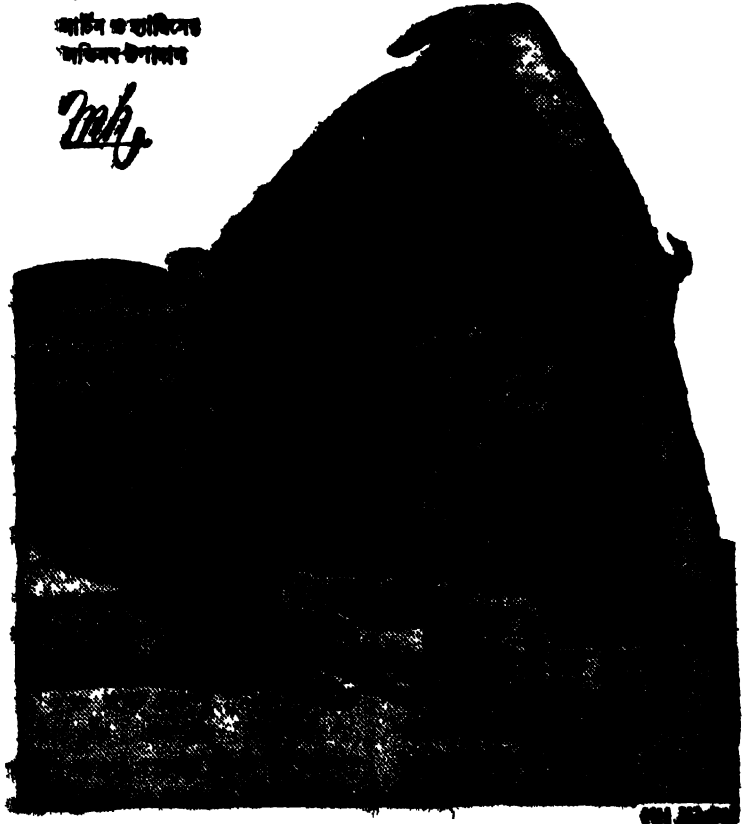
ধান ধরার পালা শুরু হল

আমলারা ঢাল-তরোয়াল নিয়ে মঞ্চে নেমেছেন; এখনও প্রধান হাতিয়ার পুলিশবাহিনী আসে নি, বোধ হয় তারা অস্ত্র শাণাচ্ছে। প্রথমটা যেমন হয়, বেশ জোর কদমেই ধান-চাল সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে; এরই মধ্যে ২০ হাজার টন উঠে গেছে। এই বিশ হাজার টনের পিছনে কোন অত্যাচার বা নির্যাতনের কাহিনী আছে কি না তা এখনও আমি জানতে পারি নি। তবে এর বেশির ভাগ চালই ও'রা খোলাবাজার বা হাট থেকে কিনেছেন আর ধানকলের উপর লেভী করেও কিছু আদায় হয়েছে। খোলাবাজারে বা হাটে যারা চাল বিক্রি করে তাদের বেশির ভাগই পাকা ব্যবসায়ী, সরকারের চাল সংগ্রহ করার আগেই এরা গাঁয়ে গাঁয়ে ফ'ড়ে পাঠিয়ে চাল সংগ্রহ করে, তারপর বাজারে এনে বেশি দামে সেই চাল জনসাধারণকে ও সরকারকে বিক্রি করে। সরকার খুশি, কারণ এক রকম সরকারের বেঁধে দেওয়া দরেই তাঁরা চাল কিনতে পারছেন আর টাকাও গৌরী সেনের; কিন্তু গ্রামের সাধারণ মানুষ অসন্তুষ্ট—কারণ অফুরন্ত ধান-চাল হওয়া সত্ত্বেও এই সময়ে হাট-বাজার থেকে দেড় টাকা করে চাল কিনতে হচ্ছে! সরকারের ভাণ্ডারে ধান-চাল জমা পড়ুক কেউ তাতে আপত্তি করবে না, কিন্তু আপত্তি গাঁয়ের জনসাধারণকে কেন এতো বেশি দামে এই সময়ে চাল কিনতে হবে? যদি বুঝতাম বেশি দামটা গরীব চাষীদের ঘরেই যাচ্ছে তাহলেও চুপ করে সয়ে যাওয়া যেতো। কিন্তু তা তো নয়। সেই মুনাফাখোরদেরই পকেট ভারী হচ্ছে। যেই তারা শুনলো সরকার আসছে হাট-বাজার থেকে চাল কিনতে, অমনি মুনাফাখোররা দর

তথাস্তু বলে সেই চাল বেশি দামে কিনে ঘরে ফিরলো। অথচ সরকারের আমলারা হাট-বাজার ছেড়ে যদি একটু গাঁয়ের ভেতরে পা বাড়াতেন তাহলে যে দামে তাঁরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাল কিনলেন তার চেয়ে কম দামেই পেতেন, তাহলে বাজারে এই চালের দরটা বাড়ার সুযোগ পেতো না।

যে কোন জেলার, যে কোন গাঁয়ে প্রধান রাস্তা বা জাতীয় সড়ক দিয়ে গেলেই সরকারের আমলারা এই সময় দেখতে পাবেন অবাঙালী ফ'ড়েরা গাছের তলায় থলে বিছিয়ে সেই ভোর অন্ধকার থেকে বসে আছে। তাদেরও উদ্দেশ্য চাল সংগ্রহ করা; গাঁয়ের মেয়ে-পুরুষ চাষীরা মাথায় করে বা গরুর গাড়ি বোঝাই করে যখন ধান-চাল হাটে বাজারে বিক্রির জন্যে নিয়ে যায়, তখন ফ'ড়েরা পথেই তাদের থামায় এবং সব মাল কিনে নেয়। এইভাবে এক-একজন ফ'ড়ে এই সময় দিনে ১০০ মণ পর্যন্ত ধান-চাল সংগ্রহ করে; আর আমাদের সরকারী আমলারা? কোট-প্যান্টালুন-নেকটাই পরে ভ্যান থেকে নেমে যখন বাজারে ঢুকবেন মনে হবে যেন কলকাতার নিউমার্কেটে বাজার করতে এসেছেন! নিউমার্কেটের বাজারীদের মতো আতিথেয়তা এখানেও তাঁরা পাচ্ছেন ও পাবেন। খাদ্য কর্পোরেশনের এই সব সাহেববাবুদের দেখতে পেলে বাজারীরা তখন আর গাঁয়ের মানুষকে পরোয়াই করে না। চাল সংগ্রহ অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে গাঁয়ের হাট-বাজারগুলিতে এই অবস্থা চলছে। সব জায়গায় এখনও এ'দের পদার্পণ হয় নি, কাজেই আসর তেমন জমে ওঠে নি।

বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়ার ধান মোটামুটি সবই প্রায় পেকে গিয়েছে, কাটার কাজ চলছে। বীরভূমে এবার

গিয়েছে ও কাটার কাজও শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু লেভী কার কত হল এখনও জানতেই পারা যাচ্ছে না। শুনেছি লেভী তালিকা না কি তৈরি হয়ে গেছে, এখনও ওপর মহল থেকে অর্ডার আসে নি তাই প্রকাশ করা হচ্ছে না। ঠিক যা নিয়ে প্রতিবারই সমস্যা হয়, যে জন্য নানা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে সরকার কিছুতেই সে সব সমস্যা আগে-ভাগে সমাধান করতে এগিয়ে আসবেন না। লেভী ধার্যের ব্যাপারে নানা ভুল-ত্রুটি থাকে, উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপে—যা নিয়ে মামলা-মকদ্দমা হামলা-হুজ্জত কিছুই বাদ যায় না। গত বছর এমন গাঁ বোধ হয় ছিল না যেখানে এ সব ঘটনা ঘটে নি। সরকার নিশ্চয়ই এ সব জানেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কি ব্যবস্থা করলেন? খামারে ধান উঠছে, বড় বড় জোতদাররা হয়তো এখনই বেশ কিছু ধান সরিয়ে ফেললেন, চোরাপথেও হয়তো কিছু গেল—সরকার সাবধান না হলে হয়তো আরও কিছু যাবে; শেষ পর্যন্ত মার খাবে নিম্নমধ্যবিত্ত জোতের মালিকরা। এক মাস হল সরকার নতুন খাদ্যনীতি ঘোষণা করেছেন; সেই নীতির কেন্দ্র থেকে অনুমোদন আনতেই যদি এক মাস কেটে যায়, সে নীতি কার্যকারী করতে ক'মাস সময় লাগবে ভগবানই জানেন! আর সেই এক মাস সময় বড় কম সময় নয়: এই সময়ের মধ্যে জমিজমার কত কারসাজি হচ্ছে হাত বদল হচ্ছে তার কোন হিসেব এখনও না পাওয়া গেলেও রেজিস্ট্রি অফিসগুলোতে ভিড় দেখে আশঙ্কা হয় বড় জোতের মালিকরা বোধ হয় চুপ করে বসে নেই। সেচ এলাকায় ৮ একর ও অসেচ এলাকায় ১০ একর জমির মালিকরা লেভীর হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন; কিন্তু বড় বড় জোতের মালিকরা এই সুযোগে তাদের জমি ছেলেমেয়ে, স্ত্রী, এমন কি নাতি-নাতনিদের মধ্যে ভাগ করে ঐ ৮ একর ও ১০ একরের ফাঁক দিয়ে যদি গলে যায় সরকার বাহাদুর তাদের ধরবেন কি করে? তর্কের খাতিরে ধরলাম সরকার নির্দেশ দিলেন যে ৩ মাস আগে যার নামে জমি ছিল তাকে নির্দিষ্ট হারে লেভী দিতে হবে। কিন্তু সেখানে উত্তর হচ্ছে ৩ মাস আগে যার জমি ছিল এখন আর তিনি মালিক নন, এখন বর্তমানে মালিক হচ্ছেন অমুক এবং তার জমির পরিমাণ ৮ একর। কোন আইনেই সরকার বর্তমানে মালিকের কাছ থেকে লেভী আদায় করতে পারবেন না, আগের মালিকও তো সরকারী আইনের
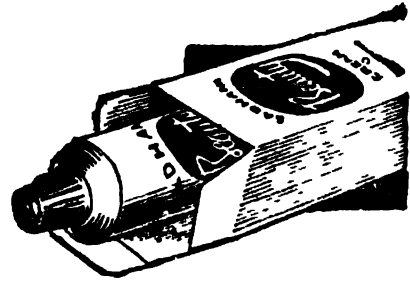
সেই রক্তারক্তি কাণ্ড আর আইন-আদালতে লক্ষ লক্ষ টাকাব শ্রাদ্ধ।

যদি সবকারী কর্তাদেব গাফিলতির জন্য কাজ আবম্ভ কবতে দেরি হয তাহলে অর্ডিনান্স জাবী কবে জমি হস্তান্তব বন্ধ কবা উচিত ছিল না কি? লেভীর নামেব তালিকাও যদি এতদিনে ঘোষণা কবা হত তার ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভুল সব কিছুই এতদিনে যথেষ্ট সংশোধনেব সুযোগ ছিল। আর এ সব তালিকা যত নির্ভুল হয সবকাবেব পক্ষে ততই মঙ্গল —কাবণ তাঁদেব পক্ষে লেভী আদায় সহজতব হবে।

কিন্তু প্রভুদেব বকম-সকম দেখে মনে হচ্ছে কোন কাজই তাঁবা শান্তিতে করতে চান না। শেষ মুহূর্তে লেভীব তালিকা ঘোষণা কবা হবে আব তাব ভুল-ত্রুটি নিযে সংগে সঙ্গে মামলা-মকদ্দমা শুরু হযে যাবে, ইঞ্জাংসন জাবী হবে, ক্ষেত-খামাবে গণ্ডগোল বাধবে, ধান-চাল পাচার হবে—লেভী শিকেয উঠবে। সবকাবের গাফিলতি আব অপদার্থতার দোষ নিরীহ জনগণেব উপর চাপিযে হিটলারী কায়দায় বিচাব হবে। গত দু'বছরের সদ্য অভিজ্ঞতা সাহেববা এত তাড়াতাড়ি কি করে ভুলে যেতে পারেন তা ভেবে আশ্চর্য হতে হয। আমলাদের বোঝা উচিত ছিল মাথার উপর নির্বাচন আসছে, এখন সাবধানে চলা উচিত। কি কংগ্রেস, কি ফ্রন্ট, কি অন্যান্য দল—সকলেই এখন কোমরে গামছা বেঁধে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরছে? কোথাও ভোটারের উপর এতটুকু নির্যাতন বা অত্যাচার হলে তাঁরা কেউই চুপ করে বসে থাকবেন না। গত দু'বছবে নির্বাচিত সবকারের একটিব পর একটি কাত হল; এর পিছনে রাজনৈতিক কারণ যাই থাক না কেন লেভীর অত্যাচাবও যে জনপ্রিয় সরকাবকে গদি থেকে টেনে নামানোর পিছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ কবেছিল এ বিষযে কোন সন্দেহই নেই। গাঁযের মানুষ সে সব ভয়ঙ্কর দিনগুলির কথা আজও ভুলতে পারে নি। তাই এই অগ্রাণ-পোষে যেখানে গাঁয়ের প্রায় প্রতিটি ঘবে বাঁচার নতুন আশা জাগে, উৎসাহের নতুন স্পন্দন অনুভূত হয়, পোষালী উৎসবে গাঁয়ের বাতাস পবিত্র হয়—সেই সময় লেভীর আতঙ্কে সকলেই যেন শিউরে রয়েছেন। লেভী যদি ঠিক ঠিক ধার্য হয় বেশির ভাগ মানুষেরই তা দিতে কোন আপত্তি নেই; কারণ নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে যে চাল তা তো বিক্রির জন্যেই; মহাজন বা জোতদারের পাল্লায় সেটা যেতো না হয সরকার কিনে নিচ্ছেন। আপত্তি এবং ঘোবতর আপত্তি ছিল গত বছর জোর-জুলুম করে আদায় করার বিরুদ্ধে আর মিথ্যে মাপ দেখিয়ে গোলা ভেঙে ধান নিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে। আমলাদেব তবু গাঁয়ের মানুষ বরদাস্ত করেছিল, কিন্তু বরদাস্ত করতে পারে নি অত্যাচারের প্রতীক সরকারের পুলিশ-বাহিনীকে। এবারে আমার বিশ্বাস লেভীর তালিকায যদি ভুল-ত্রুটি না থাকে আর সরকাবেব ঐ পুলিশ যদি গাঁয়ে না ঢোকে তাহলে আদায় সুষ্ঠুভাবেই চলবে —তা না হলে যে বিভ্রাট বাধার আশঙ্কা রয়েছে তা ঠেকাতে সরকারকে হিমসিম খেতে হবে। আগেই বলেছি, এখনও বলছি লেভী আদায করাব জন্য একদল আমলা কাজ কবে যান আব একদল গাঁযের ভেতরে ঢুকে ধান-চাল কিনতে থাকুন; হাট-বাজাবেব ব্যবসাযীদেব উপব নির্ভর করলে জুয়া খেলারই সামিল হবে।

চালকল মালিকদেব উপব শতকবা ৫০ ভাগ লেভী ধার্য কবা হাস্যকর হয়েছে, ওটা যদি ৯০ ভাগ কবা হতো তা হলেও বোধ হয় কোন আপত্তি উঠতো না, কেন না চালকলেব খাতাপত্রেব কাবচুপি এমনই তা ধরতে হলে আমলাদেব কয়েক যুগ সাধনা করতে হবে। পাইকারী ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা খাটে। তাই দেখা গেল নতুন খাদ্যনীতি ঘোষণার পর এরা কেউই বিচলিত হয নি।

এখন দেখা যাক সবকাবেব নতুন খাদ্যনীতির বাস্তব অবস্থায় পড়ে কি হাল হয়।

—সমর চট্টোপাধ্যায়

শিক্ষামন্ত্রীর সতর্কবাণী : শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি

আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে কার্যকরী কিছু করা না হলে ছাত্র-অশান্তি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে বলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন।

গত সংখ্যার 'ভারতদর্শনে' আমরা বলেছিলাম, 'পুলিশী ল' এণ্ড অর্ডার নয়, উপলব্ধি, সহানুভূতি এবং সদিচ্ছাই, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য দূরীকরণে একমাত্র সহায়ক উপায় (বিস্তৃত আলোচনার জন্য ৫ই ডিসেম্বর, ২৪শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং ছাত্র-অশান্তি মোকাবিলায় সার্থক খ্যাতির অধিকারী শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেনও ঠিক বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন : ছাত্র-অশান্তি ল' এণ্ড অর্ডারের সমস্যা নয়। তিনি বলেন, "তরুণদের আমরা বুঝতেও চাই না, ভালও বাসি না।" ছাত্র-অশান্তির এ-ও যেমন একটি কারণ, তেমনি তাঁর মতে, মুখ্য কারণ হল, শিক্ষার মানের অধোগতি, ছাত্রদের দারিদ্র্য এবং সুযোগের অভাব ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে ঐকান্তিক সম্পর্কের অভাব। ছাত্র-সমস্যার সঙ্গে বিজড়িত আছে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা। শিক্ষামন্ত্রী চান, শিক্ষাখাতে আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি, চতুর্থ যোজনাকালে অন্তত এক হাজার তিন শত কোটি টাকা। শুধু উচ্চ শিক্ষার জন্যই প্রয়োজন তিনশ' কোটি টাকা।

উপযুক্ত বরাদ্দ এবং দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষাব্যবস্থাই ছাত্র-অশান্তি নিবারণে সহায়ক হতে পারে। অন্যথা বিশাল ছাত্রশক্তি দেশের শান্তি ও সংহতি বিনষ্টির কারণ হতে পারে বলেও শিক্ষামন্ত্রী সতর্ক করেন।

দেশে আজ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বিশ লক্ষ, যা আগামী অর্ধ দশকে ত্রিশ লক্ষে পৌঁছবে। দেশের জনসংখ্যার তুলনায় এই সংখ্যা যতই নগণ্য হোক, অবহেলার বস্তু নয়। ছাত্ররাই জাতির ভবিষ্যৎ, সুতরাং অবহেলিত শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের বিশেষ নজর আশু প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে, যার সঙ্গে ছাত্রদেরই নিত্য-দিনের বিরোধ। ছাত্রভর্তিকাল থেকে চূড়ান্ত পরীক্ষাকাল পর্যন্ত ছাত্র ও তদীয় অভিভাবকদের দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষাযন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হতে হচ্ছে। ফলত ছাত্র ও অভিভাবক মহলে গভীর হতাশা ও তজ্জনিত বিক্ষোভ দানা বাঁধছে।

সম্প্রতি বিভিন্ন স্কুলে ভর্তির মরশুম চলছে। এখানে একটি উদাহরণ রাখলে ছাত্র ও অভিভাবকদের ব্যর্থতার একটি সাধারণ চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে।

কলকাতার একটি ক্লাশ-ওয়ান মিশনারী স্কুলে পয়লা ডিসেম্বর ছাত্রভর্তির পরীক্ষা-প্রহসনের অভিজ্ঞতা লাভ করে বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের সুযোগ ঘটেছিল। এই স্কুলের প্রকাণ্ড উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পয়লা ডিসেম্বর অভিভাবকবৃন্দের বিশাল সমাবেশ হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারত, সেদিন উক্ত স্কুলে বোধহয় প্রাক-বড়দিনের কোন উৎসব অনুষ্ঠান ছিল। শীতের নাতি-উষ্ণ বাতাস বালীগঞ্জ সার্কুলারের ও রীচি রোডের ধুলো কুড়িয়ে স্কুল প্রাঙ্গণে এসে পাক খাচ্ছিল। নয় ঘটিকায় দুধের শিশুদের পরীক্ষা নেবেন কর্তৃপক্ষ। পরীক্ষায় বসার অনুমতি পাওয়ার জন্য ইতিপূর্বে অভিভাবকদের দু' টাকা দর্শনী দিয়ে হলদে কার্ড সংগ্রহ করে স্কুল সর্বাধ্যক্ষের সঙ্গে তিন মিনিটের সাক্ষাৎকার রাখতে হয়েছে; পুনরায় দু' টাকা দিয়ে দুধের শিশু কচি ছেলেদের পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেন কর্তৃপক্ষ। ক্লাশ ওয়ানে ভর্তির জন্য এই চারটি টাকার লটারীর টিকিট কেটে অভিভাবকরা কম্পিতবক্ষে লাইনে এসে দাঁড়ান, শিশু পরীক্ষার্থীর প্রলম্বিত লাইন! শুধু ক্লাশ-ওয়ানের জন্যই শুনলাম, আট শত চল্লিশ জন শিশু পরীক্ষার্থীর কার্ড না কি ছাড়া হয়েছে। সীট খুব জোর বাট। কিন্তু প্রশ্ন তা-ও নয়, প্রশ্ন, এই শিশুদের পাক্কা দু' ঘণ্টা ধরে লিখিত পরীক্ষা করা হল। তাজ্জব ব্যাপার! অনেক পয়সা রোজগার হল স্কুল কর্তৃপক্ষের। শেষে বেলা এগারটায় অভিভাবক ও শিশু ছাত্রেরা ছাড়া পেলেন। ঐখানেই একটি ফীডার স্কুলের নাম বারম্বার উচ্চারিত হতে শুনলাম। অনেকেই বলাবলি করছিলেন, অমুক স্কুলের কে জি-তে পড়িয়ে নিলে তবেই নাকি এই মহান মিশনারী শিক্ষাতীর্থে প্রবেশের সৌভাগ্য হয়। এমন ফীডার স্কুল না কি আরও কয়েকটি নামজাদা স্কুলে এ্যাডমিশন প্রভাবিত করে। অবশ্য অনেকের অন্যান্য ধারণাও নিজের নিজের শিশুর 'চান্স' সম্পর্কে তাঁদের সন্দিহান করছিল। যা হোক, আশ্চর্যের বিষয় এই যে এতো ঘটা-পটা করে একবার সর্বাধ্যক্ষের কাছে মৌখিক পরীক্ষার (দু' টাকা দর্শনী সহ) দিয়ে এক রবিবার যে উত্তরপত্র পাঁচ-ছয় বছরের শিশুরা সেখানে রেখে এলো, তা পরীক্ষা করতে কর্তৃপক্ষের কতটুকু সময় প্রয়োজন ছিল জানি না, দ্বিপ্রহরে পরীক্ষা শেষ করে একই তারিখের ছাপ-সমেত আপনার শিশুটি অকৃতকার্য, এই ছাপানো কার্ড অভিভাবকের বাড়ি পৌঁছতে একটি দিনের বেশি সময় নেয় নি? কর্তৃপক্ষ অত শিশু পরীক্ষার্থীকে বস্তুত বাছাই করলেন কখন, এ-ও এক বিস্ময়। অর্থদণ্ড এবং পরীক্ষা-প্রহসনের এই বিচিত্র বিশাল আয়োজন বস্তুত বিস্ময়কর। পাঁচ-ছয় বছরের শিশুকে এভাবে বাছাই করা মোটেও সঙ্গত নয় নব্য শিক্ষাবিদরা নিশ্চয় সে কথাই বলবেন। কিন্তু শিক্ষার জগতে কার্ড বিক্রির এমন ঢালাও আয়োজনও দিব্যি চলছে, ঠিক পি এস সির চাকরীর জন্য লটারীর দরখাস্ত-পত্র খরিদ করার মতো এ-ও এক বিরাট প্রহসন।

যে দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি বারমাস প্রহসন ও ব্যবসায় চালিয়ে যাচ্ছেন, সে দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও স্বেচ্ছাচার তো আপনি অবাধ হবে। শিক্ষামন্ত্রকের এ বিষয়ে কি কিছুই করণীয় নেই? শিশু ভর্তির ক্ষেত্রে এ-জাতীয় প্রহসন ও পরীক্ষা কতদূর সঙ্গত শিক্ষাবিদরা কি সে বিষয়ে সুচিন্তিত মত রাখবেন না?

মধ্যশিক্ষা পর্ষৎও কি স্কুলান্তর ব্যাপারে স্কুলের তহবিল পূরণের এমত নীতি গর্হিত বলে বিবেচনা করবেন না? ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের এ বিষয়ে কোন বক্তব্য থাকবে না? যে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইচ্ছে করলেই কর ধার্য করে যাবেন?

ইতিপূর্বে পত্রপত্রিকার মাধ্যমে অভি-কেলে ভর্তির ব্যাপারে অর্থের খেলার সংবাদ বেরিয়েছে। অর্থ ছাড়াও প্রভাব বিস্তারের ব্যাপার তো হামেশার ব্যাপার। এখন হতাশ ছাত্র ও অভিভাবকদের মুখে শোনা যায়, উপযুক্ত বেতন দিয়ে পড়তে/পড়াতে চাই, কিন্তু সেখানেও জায়গা দখলের বিচিত্র রীতি সে সাধে বাদ সাধছে। শিক্ষাজগতের বিচিত্র রীতি-নীতি!

ছাত্র সমস্যার সংগে এসব সমস্যাও ওতপ্রোত জড়িত। ছাত্রসমাজ মুহুর্মুহু এই জাতীয় ঘাত-প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়ে সমগ্রভাবে সামাজিক অবস্থার ওপরই বিক্ষুব্ধ ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছে। দোষ তাদের নয়, সমাজকে দোষমুক্ত না করতে পারলে, শিক্ষামন্ত্রী যেমন বলেছেন, বিশাল বিক্ষুব্ধ তরুণসমাজ ভবিষ্যতে মহৎ বিনষ্টির কারণ হয়ে উঠবে, তখন শিক্ষা নিয়ে ব্যবসাদারির দেনা চুকিয়ে দেওয়ার সময় ও সুযোগ হয়ত আর মিলবেও না।

পথ-পরিবারের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা কে করবেন, কিভাবে করবেন?

যে বিষয়টির প্রতি 'ভারতদর্শনে' বারম্বার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস পেয়েছি, প্রধান-মন্ত্রীকে ধন্যবাদ, সম্প্রতি তিনি চণ্ডীগড়ে সেই বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, অনগ্রসর অঞ্চলে পরিবার পরিকল্পনার অভিযান সুরু করারই বর্তমানে সর্বাধিক প্রয়োজন। 'ভারত-দর্শনে'র সুরে তিনিও বলেন: এ পর্যন্ত পরিবার পরিকল্পনার কাজ হয়েছে কেবলমাত্র উচ্চ-মধ্যবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে। কিন্তু দেশের সংখ্যাগুরু গরীব সাধারণের মধ্যে পরিবার পরি-কল্পনার তাৎপর্য এখনও বোঝানো যায় নি।

দেশের সরকারী ও বেসরকারী বিশেষজ্ঞরা কতিপয় বিদেশী বিশেষজ্ঞের সংগে এক সপ্তাহব্যাপী সম্মেলনে পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচী আলো-চনায় বসছেন। সেই মঞ্চ নিখিল ভারত পরিবার পরিকল্পনা সম্মেলনে প্রধান-মন্ত্রীর এই উদ্বোধনী ভাষণকে বিশেষ গুরুত্ব দান করা উচিত বলে আমাদের বিশ্বাস।

ভারতদর্শনের পাতায় এই বিষয়টি একাধিকবার উত্থাপন করে আমরা বলতে চেয়েছি যে, পরিবার পরিকল্পনা কার্যসূচী রূপায়ণে সংশ্লিষ্ট আমলাবর্গ সহজ বাবুয়ানী পথটিই বেছে নিয়ে সাধারণের অর্থের অপচয় করে যাচ্ছেন। এতোদিনে প্রধানমন্ত্রীও অনুরূপ বিশ্বাস প্রকাশ করে বললেন: যাঁরা সহজে পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব উপলব্ধিতে অক্ষম, আমাদের প্রচেষ্টা তাঁদের মধ্যে চেতনাসঞ্চারে নিয়োজিত হোক।

পরিবার পরিকল্পনা অভিযান যদি শুধু সংবাদপত্রে, বেতারে ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমেই আবদ্ধ থাকে, তবে এ পথে অভিযানের আবশ্যকতা বর্তমানে কথঞ্চিৎ হ্রাস পেয়েছে বলতেই হবে। শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে এখন একটি লাগাতার পুনরাবৃত্তি প্রচার চালিয়ে যাওয়া ছাড়া অধিকতর কিছুর সম্ভবত প্রয়োজন নেই। শিক্ষিত সমাজে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত চেতনা যতদূর সম্ভব ইতিমধ্যেই সঞ্চারিত হয়েছে। 'অধিকতর'-র দোষ না থাকলেও তার বিশেষ প্রয়োজন আর নেই। শুধু এইবার লেগে-থাকা অভিযানই যথেষ্ট।

কিন্তু যে অশিক্ষিত ও অনগ্রসর সমাজে উপরোক্ত প্রচার মাধ্যমও পৌঁছয় না, সমস্যাটা তো বর্তমানে সেইখানেই।

আরও দৃষ্টি প্রসারিত করলে এই অভিযানের আওতায় তারাও এসে পড়ে সমাজে যারা নিতান্ত অবহেলিত এবং তালিকাবদ্ধ সামাজিক-রূপেও গণ্য নয়, যাদের বসবাস উন্মুক্ত আকাশের নিচে। রন্ধনশালা রাজপথ। স্নানাগার পাইপ-বাহী পবিত্র গঙ্গাবারি: আমি রাজপথে লক্ষ ভিক্ষুক শিশুর কথা বলছি। সমাজ সরকার কেউ এদের বাড়বৃদ্ধিতে যেন সচেতনই নন। ওরা বাড়ছে যেমন করে বাড়ে জৈবজীবন। এই বাড়ের প্রতি আমরা ভ্রূক্ষেপহীন, কারণ, সমাজে প্রতিটি মানুষের জন্য খাদ্য বাসস্থান শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের দায়িত্ব আমাদের দেশের সরকারের বহন না করলেও চলে। কিন্তু কোনও সরকারকে যদি ঠিকিয়ং দিতে হয় সমাজে রোজদিন অগণিত অবহেলিত মানবে সৃষ্টির জন্য, যদি এদের দায়িত্ব বহন করতে বাধ্য হতেন সরকার, তাহলে পরিবার পরিকল্পনার অভিযানটা বোধকরি শুরু হত এইখান থেকেই। মাভিভাবকহীন পথের জীবজন্তু সম্পর্কে যেমন কারও মাথা ব্যথা নেই, তাবলে দুঃখ হয়, এই অগণিত মনুষ্যো-চিত জীবনধারীর প্রতিও তেমনি আমাদের বিন্দুমাত্র সচেতনতা নেই। দুর্ভাবনা নেই যদি এরা কাতে-কাতে মরে; কেন না এদের কোনও উৎপাদন-

[illegible] করে না। এরা পথে জন্মায়, পথেই হারিয়ে যায়। আর কে জানে এই দুঃস্থ হারাচ্ছে শিশুদের জন্মই কত ক্ষত জাতির তেজ হারিয়ে গেছে ও যাচ্ছে।

পরিবার পরিকল্পনা এদের মধ্যেও প্রয়োজন। সমাজে ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়িয়ে জীবনযাপনের মানোন্নয়নের বড়াই করা চলে না। এদের পথ-পরিবারকে সমাজজীবনে সংস্থাপিত করার মানবিক দায়িত্ব আমাদেরই। চোখ বুজে থাকলে সে লজ্জাও আমাদের।

সমস্যাটা হ'ল, এদের মধ্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের অভিযান চালানো অবাস্তব কল্পনা ততক্ষণ যতক্ষণ এরা কেবলমাত্র পথ-পরিবার। কিন্তু এদের প্রকৃত সংস্থানের ব্যবস্থা হলে সে সমস্যা আর থাকে না। পরিসংখ্যানে এদের সংখ্যা যদিও বা এড়িয়ে যাওয়া যায়, দেশের খাদ্য-বস্ত্রের সমস্যাটা তাই দিয়ে কিন্তু মেটে না। আমাদের তথাকথিত কল্যাণ-ব্রতী সরকার এদের দিকে চোখ ফিরিয়ে রেখে যথেষ্ট অকল্যাণ করছেন। তথা-কথিত কল্যাণব্রতী সরকার কাউকে অনাহারে মরতে দিতে তো পারেন না, অথচ এদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থার দায়িত্বও বহনে অক্ষম। সমাজের সাধারণ মানুষই রোজদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই পথ-পরিবারের ভরণ-পোষণের ভার নিয়েছেন। সুতরাং এদের পেট গুণলেও কম বিভীষিকার ব্যাপার নয়। কিন্তু তাও যুগিয়ে যেতেই হবে। সুতরাং সমস্যাটা খাদ্যসমস্যাকেও বেশ জাপটে ধরেই আছে। সরকার অবহিত হোন।

তাছাড়া যে কোন উন্নয়নশীল দেশে প্রতিটি মানুষকে উৎপাদনক্ষম শ্রমে নিয়ো-জিত রাখা দরকার। ঐ অতগুলি মানুষ দুটি হাত দুটি পা ও সক্ষম শরীর সমাজের কোন কাজেই লাগাতে পারছে না, অথচ সমাজকে তার আমরণ ভাগ করে নিতে হচ্ছে এদের সংগে। অন্নসংস্থানের ব্যাপারে এদের মধ্যে চরম মানসিক দায়িত্বহীনতাই (যার জন্য এরা নিজেরা দায়ী তত নয়, যত দেশের পরিস্থিতি) এদের পরিবার-বর্গকে অনর্গল জ্যামিতিক হারে বাড়িয়ে যেতে সাহায্য করছে। পরিবার পরি-কল্পনার প্রচারসর্বস্ব কর্মসূচী এই সামাজিক বিভীষিকাকে কখনো গণনা করেছে বলে মনে হয় না, অথচ ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রধানমন্ত্রী পরিবার পরিকল্পনা কর্ম-সূচীকে [illegible] [illegible] উপদেশ দিয়েছেন। [illegible]

[illegible] সংখ্যায় [illegible] আমরা বলছি বার পুনরা-বৃত্তির প্রয়োজন দেখি না। বর্তমান অবস্থায় দেশে চিন্তাগর্ভ ও গুরুত্বপূর্ণ এক জাতীয় সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংশ্লিষ্ট মহলকে সচেতন করার প্রয়াস পেলাম ; এবং জানি, এর দ্বারা আমার সাপ্তাহিক কর্তব্য সমাধা হল বটে কিন্তু কোন কাজের সম্ভাবনার সূত্রপাত করতে পারলাম না। এদেশে কাগজ কালির লেখাও স্লেটের আখর, সময়ের জলে আপনি ধুয়ে যায়। আজকের আলোচনার ভবিষ্যৎও বিস্মৃতির অন্ধকারেই নিক্ষিপ্ত হবে।

কালা বিল

না, বলবন্ত রাও চ্যবন সাহেবের বিলটির নাম 'কালা বিল' নয়, বিলের চরিত্র বিশ্লেষণী এই বিশেষণটি বিরোধী-পক্ষের দ্বারা প্রদত্ত। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উত্থাপিত বিলটির নাম নির্দোষ, যেমন এই বিলকে বলা হয়েছে অত্যাবশ্যকীয় কর্ম (পরিচালনা সংক্রান্ত) বিল বা এসেনসিয়াল সার্ভিসেস (মেনটেন্যান্স) বিল। এ বিলের উদ্দেশ্য কেন্দ্রীয় কর্মচারী ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে যে অর্ডিন্যান্সটি বলবন্ত চ্যবন সাহেব দেশের স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়েছিলেন তাকেই আইনের মর্যাদা দান। এই বিলের আইনী মর্যাদার ফলে কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের ধর্ম-ঘটের অধিকার চিরতরে কেড়ে নেওয়া হবে। স্বাধীনতার একুশ বছর পর জাতীয় সর-কারকে এমন একটি ফ্যাসিস্ট হাতিয়ার সংগ্রহ করে দেশ শাসন করতে হবে কেউ ভাবেন নি। লোকে জানতেন স্বাধীনতার পর বিদেশী বণিকের কালাকানুনগুলি বাতিল করে জাতীয় সরকার দেশের লোককে স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করার সুযোগ দেবেন। কিন্তু গান্ধী-সরকার সেপাই-চ্যবনের শক্ত হাতে পেষণের যন্ত্র ধরিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং আর রক্ষা নেই, সোস্যাল কন্ট্রোল এবং এসেনসিয়াল সার্ভিসের চাপে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি একে একে অপহৃত হতে চলেছে। সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধি-কারে দলীয় দমননীতির কলুষিত হাত পড়েছে। বিরোধীরা বাধ্য হয়ে বলবন্ত চ্যবন সাহেবের বিলটিকে 'কালা বিল' বলে আখ্যায়িত করেছেন, এবং বলা বাহুল্য, [illegible] পার্টি [illegible] এই বিলকে [illegible] হাত তুলে স্বাগতম জানিয়েছে। কি [illegible] বিরোধীদের [illegible] কক্ষ প্রতি-[illegible] ত্যাগ করে না-এলেও এই বিলের [illegible] করেছেন। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। [illegible] নির্বাচনগুলোতেই [illegible], মানুষের প্রতিবাদে জানালার পর্দাগুলি বন্ধ হয়ে যায়; তাই তো তাঁদেরই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সমস্ত অন্যের বিনয় আবেদন, তর্ক ও উষ্মাকে সদর্পে প্রত্যাখ্যান করে, অত্যাবশ্যক সংস্থা চালু রাখার প্রস্তাবটি গৃহীত হয়ে যায় ৯৩—৩৬ ভোটের ব্যব-ধানে। তা এক রকম ভালই হল, বলবন্ত চ্যবন সাহেবের হাতে আরও আরও আরও দুষ্টদমন ক্ষমতা চাই। তবে শ্রীরামচন্দ্রেরও যেমন নিন্দুকের অভাব ছিল না, মোরারজী-চ্যবন-গান্ধী সরকারের বাম রাজত্বকে ঠেস দিয়ে কথা বলারও তেমনি কুচক্রীদের অভাব নেই।

তাঁরা বললেন, কংগ্রেসী কফিনে এই কালা বিল সর্বশেষ পেরেক পুঁতল। কেউ বললেন, সংবিধানে প্রদত্ত মৌলিক অধি-কারই এর দ্বারা অপহৃত হল। কেউ

চ্যবন

বললেন, অত্যাবশ্যক সংস্থা কোনগুলি তা বিশিষ্টভাবে উল্লেখিত হয় নি। ফলে সরকার সর্বত্রই এই ক্ষমতা অবাধে প্রয়োগ করে সাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করবেন। কেউ বা বললেন, একবার যা অর্ডিন্যান্স হয়, ভোটের জোরে তাকেই চিরকালের জন্য আইন করা হচ্ছে। এবং সবাই একবাক্যে ধিক্কার দিলেন, শেম, শেম!

অমন যে জনসঙ্ঘ, সে দলের অন্যতম নেতা শ্রী কে এল গুপ্তও ধৈর্য ধারণ করতে পারেন নি। যুক্তিপূর্ণ কঠোর সমালোচনার বিলটিকে 'কালা বিল' আখ্যা দিয়ে বললেন : শ্রমিক-কর্মীদের ধর্মঘটের মৌলিক অধিকার হরণকারী এই 'কালা বিল' [illegible]। [illegible] সরকারের [illegible] দাঁড়িয়ে [illegible] প্রশ্ন। কেন্দ্রীয় কর্মীরা [illegible] সাধারণ মানুষের মধ্যে যখন উত্তেজনা [illegible] আবেদনে সমবেতভাবে আত্মরক্ষা করার পরামর্শ দিচ্ছেন, ঠিক তখই সরকারী কর্মীদের অনুরূপ অধিকার কেড়ে নিলে, বিকল্প পথের অভাবে, শ্রমিক-কর্মীরা বেআইনী ও হিংসাত্মক কার্যকর্মে লিপ্ত হবেন। সরকার নিজেই তার প্ররোচনার যোগান দিচ্ছেন। এইভাবে দেশে আইন শৃঙ্খলা ও গণতন্ত্র রক্ষা করা যায় না। এর ফলে একনায়কতন্ত্রকেই প্রতিষ্ঠিত করা হবে।

এর পর চ্যবন সাহেবের সহাস্য উত্তর কল্পনা করতে পারি এইভাবে : গণতন্ত্র ঠিক আছে। ও, কে। ৯৩—৩৬ ভোটে প্রস্তাব পাশ হয়েছে। আর আইন শৃঙ্খলা, কেন কেন্দ্রীয় পুলিশ কি নিরস্ত্র নাগরিক দমনেও ব্যর্থ হয়েছে কোথাও কোন প্রমাণ পাওয়া গেছে?

কিন্তু সমস্যাটি বোধ হয় সত্যিই গুরুত্বর। এবং যতই বলা হোক, আসলে ব্যাপারটা আদৌ দুষ্টদমন নয়, বঞ্চিত শ্রেণীর ওপর ক্ষমতাবানের সদর্প হুমকি। প্রশ্নটির গুরুত্ব স্বয়ং স্পীকারকেও বিচলিত করেছিল এবং তিনি প্রশ্ন করতে বাধ্য হন। তাঁর বক্তব্য:

আমরা ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার জন্য একটি বিল এনেছি। কিন্তু বিকল্প কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা না রেখেই আপনারা কি আইন করে ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নিতে পারেন?

উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত ভাঙল

মুখ'বাচক সোস্যালিস্ট শব্দের শিখণ্ডী সামনে নিয়ে উত্তর প্রদেশের কিছু কংগ্রেস-কর্মী পাল্টা সোস্যালিস্ট কংগ্রেস গঠন করেছেন। বিক্ষুব্ধ পাল্টা কংগ্রেসের নেতা হলেন শ্রীশিবনলাল সাক্সেনা। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নির্বাচনী কমিটি আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে নবগঠিত পাল্টা কংগ্রেসীদের মনোনয়ন দিতে রাজী হন নি। বিক্ষুব্ধ নয়-প্রধান অতঃপর বিদ্রোহ করলেন পার্টি এবং একেবারে সোস্যালিস্ট (!) কংগ্রেস গঠন করে। এই বিক্ষুব্ধেরা মধ্যবর্তী নির্বাচনে গোরক্ষপুর, বস্তি, আজম-গড়, মীরজাপুর, দেওরিয়া ও কানপুর সিটিতে নিজস্ব প্রার্থী খাড়া করবেন। আরও উল্লেখ্য, উক্ত নয়-প্রধানই [illegible] বহু-উল্লিখিত গুপ্ত [illegible] নেতা শ্রীচন্দ্রভান গুপ্তের সমর্থক। এঁরা গত নির্বাচনেও কংগ্রেসের মনোনয়ন না পেয়ে কংগ্রেসের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে বিজয়ী

প্ররোচিলেন এবং সংযুক্ত বিধায়ক মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়ে পুনশ্চ সাদরে কংগ্রেসী ক্যাম্পে সমাদৃত হন। অথচ অত কাণ্ডের পরও কংগ্রেস এ'দের মনোনয়ন নিয়ে আবার গণ্ডগোল করল। সেই যে কথায় বলে, কাজের সময় কাজী, কাজ ফুরলে পাজী তেমনি আর কি। কিম্বা এ'দের কি আবার কোন সম্ভাব্য অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভা পতনে ব্যবহার করা হবে বলে একেবারেই 'সোস্যালিস্ট' ছাপ দিয়ে নির্বাচনী বাজারে ছেড়ে দেওয়া হল? মন্ত্রিসভা ভাঙা-গড়ার ব্যাপারে বিচিত্র কিছুই নেই। একমাত্র বিচিত্র হল এই দেশ ও দেশের কতিপয় ক্ষমতাশিকারী মানুষ।

প্রয়োজনভিত্তিক বেতনের প্রতিশ্রুতি

উত্তর প্রদেশের নবগঠিত সোস্যালিস্ট কংগ্রেস সর্বস্তরের কর্মীর জন্য প্রয়োজনভিত্তিক মজুরীর এক বৈপ্লবিক প্রতিশ্রুতি রেখেছেন, যদিও নির্বাচনের প্রাক্কালে চমকপ্রদ প্রতিশ্রুতি হামেশাই মেলে। তবু কংগ্রেসী কতিপয় সদস্য এরূপ এক প্রতিশ্রুতি কংগ্রেস ছাড়ামাত্র রাখলে, সংবাদ শোনামাত্র কান খাড়া হয় বৈকি!

এ'রা শুধু ভারতকে একটি গণতান্ত্রিক সোস্যালিস্ট রাষ্ট্রেই পরিণত করতে চান তাই নয়, পাক-ভারতের মধ্যে একটি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কনফেডারেশন গঠনের পরিকল্পনাও এ'দের ইস্তাহারে স্থান পেয়েছে। চীন-অধিকৃত ভারতীয় অঞ্চল আলোচনার মাধ্যমে পুনরধিকার করাও হবে সোস্যালিস্ট কংগ্রেসের লক্ষ্য। শিক্ষাকে অবৈতনিক করা এবং উত্তর প্রদেশ শিক্ষক সম্প্রদায়ের দাবিকে সমর্থন জানানও সোস্যালিস্ট কংগ্রেসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য। হিন্দীর বহুল প্রচারের জন্য এ'দের ভূমিকা হয়ত দর্শনীয় হয়ে উঠবে।

সোস্যালিস্ট কংগ্রেসের ইস্তাহার পড়ে খুশি হতে হয় এই ভেবে যে, নির্বাচনে মনোনয়ন পেয়ে গেলে এ'দের এইসব সাধু উদ্দেশ্য চাপাই পড়ে থাকত। সুতরাং কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটিকে ধন্যবাদ, তাঁরা মনোনয়ন না দিয়ে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসীদের দেশের সমস্যার প্রতি সচেতন হবারই সুযোগ দিয়েছেন।

শিক্ষকদের প্রতি উত্তর প্রদেশ সরকারের বাঁধ গরম

উত্তর প্রদেশে যখন সোস্যালিস্ট কংগ্রেস শিক্ষকদের দাবির যৌক্তিকতা উপলব্ধি করছেন, উত্তর প্রদেশ সরকার তখন সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে আগামী ১০ই জানুয়ারের মধ্যে কাজে যোগ না দিলে শিক্ষকদের [illegible] হতে হবে। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলির কার্যকরী পরিষদকেও নির্দেশ দিয়েছেন যে উপস্থিতির ব্যাপারে কড়াকড়ি করতে। এই নির্দেশ অমান্য করা হলে স্কুলগুলি প্রাপ্য সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবে।

উত্তর প্রদেশ সরকার ঠিক কেন্দ্রীয় সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাজ্যের শিক্ষক সম্প্রদায়কে দমন করতে অগ্রসর হয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় কর্মচারী আন্দোলন দমন করার জন্য অর্ডিন্যান্স জারি করেছিলেন যা এখন আইনে পরিণত হতে চলেছে। উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসী ও প্রাক্তন কংগ্রেসী চরণ সিংয়ের সরকারের সরকারী কর্মচারী দমনের যথেষ্ট শক্ত ইতিহাস আছে। বর্তমানে সেই শক্তহাতের আঘাত এসে পড়বে শিক্ষক সম্প্রদায়ের ওপর।

অথচ মজা এই যে, স্বয়ং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী লোকসভায় সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, তিনি উত্তর প্রদেশ সেকেণ্ডারী শিক্ষকদের দাবির সমর্থক। তিনি এতৎ বিষয়ে ইউ পি'র রাজ্যপালের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে সম্ভাব্য প্রতিকারের উপায় নির্ধারণেরও চেষ্টায় আছেন। তিনি বলেন, সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষকরা উত্তর প্রদেশ সরকারী স্কুলের বেতনহারের অনেক নিচে বেতন পেয়ে থাকেন। তাঁদের বেতনক্রম অন্যান্য রাজ্যের তুলনায়ও কম। তাছাড়া এ'দের এক-একজনের বকেয়া বেতনই বৎসরাধিককাল ধরে অপ্রদত্ত পড়ে থাকে। সরকারী স্কুলে প্রদত্ত মহার্ঘভাতার সমান মহার্ঘভাতার দাবিও শিক্ষামন্ত্রী ন্যায়সঙ্গত বলেই গণনা করেন।

কিন্তু এবম্বিধ ধারণা সত্ত্বেও শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, তবে শিক্ষকদের ধর্মঘট গর্হিত কাজ যা খুব খারাপ উদাহরণ সৃষ্টি করবে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, শিক্ষকদের দাবি যদি যথার্থই হয় এবং সরকার যদি তৎসত্ত্বেও এই দাবি পূরণের আশ্বাস দান দূরে থাক, শিক্ষকদের চাকরী খতম করার ও তাঁদের ওপর অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবার হুমকী দেন তখন সেই অবুঝ সরকারকে বুঝ মানানোর জন্য শিক্ষকদের আর কোন্ পথ খোলা থাকে।

শিক্ষামন্ত্রী বলছেন, চেষ্টা করছি। উত্তম কথা। কিন্তু একই সময় তাঁরই শিক্ষাদপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীভগবৎ ঝা আজাদ কেন্দ্রীয় সরকারের অক্ষমতা জ্ঞাপন করছেন সভাগৃহে। এমতাবস্থায় শিক্ষকরা কোন্ পথে যাবেন! কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কথায় পূর্ণ আস্থা স্থাপনেরই বা পথ কৈ?

[illegible]

সাপ্তাহিক বসুমতী
উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির তহবিলে দান

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

১০১·০০ টাকা : প্রণবকুমার ঘোষ, সহঃ সম্পাদক, টুর্নামেণ্ট কমিটি, সাঁকরাইল (হাওড়া)।

৫৪·০০ টাকা : বসুমতীর কর্মিবৃন্দ, কলকাতা-১২।

৫১·০০ টাকা : রিষড়া ইয়ংমেনস্ এ্যাসোসিয়েশন, ৪৫, রামকৃষ্ণ রোড, রিষড়া (হুগলী)।

৪৬·০০ টাকা : মৃত্যুঞ্জয় দত্ত, ওড়গ্রাম, বর্ধমান।

৪২·০০ টাকা : বৈঁচী কোনেটিক কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউশনের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। বৈঁচী, হুগলী।

৪১·০৫ টাকা : তেলিয়ামুরা হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল (ত্রিপুরা)।

২৪·০০ টাকা : হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার, রাজবলহাট, হুগলী।

১৫·০০ টাকা : দত্তবরটীয়া 'যুব সংঘ'-এর পক্ষে সম্পাদক শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পাল। দত্তবরটীয়া, ভায়া সালার (মুর্শিদাবাদ)।

প্রত্যেকে ১১·০০ টাকা : নকড়িচন্দ্র ঘোষ, গোয়ালপাড়া, বহরান (বর্ধমান)। ভানুবাবু, কলকাতা।

প্রত্যেকে ৫·০০ টাকা : প্রণবজ্যোতি মণি, গোপাড়া সাহাপুর, বীরভূম। মিসেস মীনা চৌধুরী, C/o. Supdt. of Central Jail, Buxar (Sahabad), Bihar। হারাধন সাপুই, চিঁচুড়ী, বর্ধমান। মাখনলাল বসু, কলকাতা-৫৬।

২·০১ টাকা : মধুতটী উচ্চ বিদ্যালয় (পুরুলিয়া)।

প্রত্যেকে ২·০০ টাকা : রামকৃষ্ণ রায়, কোতলপুর, বাঁকুড়া। প্রবোধকুমার ঘটক, কাকদ্বীপ ভেটেরেনারী হসপিটাল (২৪-পরগণা)। বিমলকুমার চ্যাটার্জী, কলকাতা-৫৬।

অন্যান্য জিনিসপত্র :

শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, (কলকাতা-১২) এক গাঁট পুরনো বস্ত্র ও কিছু পুরনো বইপত্র দিয়েছেন।

কাঁচরাপাড়া মণ্ডলবাজারের 'আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ'-এর ছেলেরা পুরনো (১০১ খানি) বস্ত্র দিয়েছেন। (ক্রমশঃ)

হোম অগানের দল 'পিপল্‌স প্রোগ্রেসিভ পার্টি' সম্পর্কে বার্নহামের নাটকীয় ঘোষণা অনেকের কাছেই কৌতুককর মনে হয়েছে

পাকিস্তান।

আয়ুব খাঁ ভেবেছেন, ছাত্রদের প্রধান দাবিগুলি যদি তিনি মেনে নেন, তাহলে হয়ত তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভের অবসান ঘটবে। তাই তিনি তাঁর মস-নদ ছাড়ার আগে দেশবাসীকে ছাত্রদের অনেক দাবিই মেনে নিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন : ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত থাকলে ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি কেড়ে নেবার যে আইন বর্তমানে রয়েছে তা বাতিল করা হবে, এবং প্রতি পরীক্ষার দ্বিতীয় ডিভিশনে পাশের নম্বর শতকরা ৫০ থেকে কমিয়ে ৪৫ করা হবে, এবং এইরকম আরও অনেক।

কিন্তু আয়ুব খাঁ হিসাবে ভুল করেছেন। স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ একবার সুরু হয়ে গেলে তা থামানো শক্ত। নিপীড়ন বা তোষামোদ কোনটাই কাজে লাগে না।

আয়ুব খাঁ পূর্ব পাকিস্তান সফরের জন্য ঢাকায় এসে পৌঁছলেই দেখা গেল, হাজার হাজার মানুষ বিমানবন্দরে উপ-স্থিত হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাবার জন্য। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে [illegible] [illegible] কড়া কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, পাকিস্তান এখন এক ভয়ংকর সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দেশের শত্রুরা বিদেশের সংগে যোগসাজসে পাকিস্তান ধ্বংস করার চক্রান্তে লিপ্ত। দেশের শত্রুদের তিনি কিছুতেই ক্ষমা করবেন না।

কেবল ঢাকায় নয়, পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র বিক্ষোভ সুরু হয়েছে। সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আবদুল মোনেম খাঁর শ্রীহট্ট সফরের সময় তাঁর বিরুদ্ধে বিরাট বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে।

ভুট্টো ও ওয়ালি খাঁর অনুপস্থিতিতে পশ্চিম পাকিস্তানে এখন আয়ুব-বিরোধী রাজনীতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন প্রাক্তন এয়ার-মার্শাল আসগর খাঁ। পূর্ব পাকিস্তানেও আর একজন সম্মানিত ব্যক্তি স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য এগিয়ে এসেছেন। তিনি হলেন পূর্ব পাকি-স্তানের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মহম্মদ মুরশেদ। মুরশেদ কোন দলের সঙ্গে যুক্ত নন; সেনাবাহিনীর সঙ্গেও তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। তিনি সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যবস্থার একজন বড় সমর্থক। এয়ার-মার্শাল আসগর খাঁ আবার সক্রিয়ভাবে পাকিস্তানের রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছেন। জেনা-রেল খাঁ পশ্চিম পাকিস্তানের লোক হলেও পূর্ব পাকিস্তানে তাঁর বিশেষ জনপ্রিয়তা আছে। এক সময়ে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন। ১৯৫৮ সালে আয়ুব খাঁ যখন পাকি-স্তানের শাসনক্ষমতা হস্তগত করে সামরিক আইন জারি করেন, তখন জেনারেল আজম খাঁ ছিলেন তাঁর প্রধান সহকর্মী। ১৯৬৫ সালে আয়ুব খাঁর বিরুদ্ধে মিস ফতেমা জিন্নাকে যখন পাকিস্তানের সব বিরোধী রাজনৈতিক দল প্রেসিডেন্ট পদের প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করিয়েছিল, তখন জেনারেল আজম খাঁ বিরোধী দলগুলির হয়ে নির্বাচনী অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

সত্তর সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আয়ুবের বিরুদ্ধে কে উপযুক্ত প্রার্থী হচ্ছেন : ভুট্টো না আসগর খাঁ না আজম খাঁ না মুরশেদ, এই নিয়ে ইতিমধ্যেই জল্পনা-কল্পনা সুরু হয়ে গেছে।

গায়না :

বার্নহামের, পিপল্‌স ন্যাশনাল কংগ্রেস ও ড. জাগানের প্রোগ্রেসিভ

ন্যাশনাল পার্টির কোয়ালিশন সরকার ভেঙে গেছে। বার্নহামের সরকার পদত্যাগ করেছেন, এবং এই মাসেই পার্লামেন্টের নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

প্রগতিশীল শক্তির নেতা ডঃ ছেদি জগান দীর্ঘদিন গায়নার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। প্রধানত তাঁর চেষ্টাতেই গায়না বৃটিশ শাসন থেকে মুক্তিলাভ করে। কিন্তু গত নির্বাচনে ইংরেজ ও মার্কিন ব্যবসায়ীদের সমর্থনপুষ্ট বার্নহাম জগানকে হারিয়ে প্রধানমন্ত্রী হন। এবারের নির্বাচনে বার্নহামকে জগানের কাছ থেকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হবে।

তাই আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে বার্নহামের একটি নাটকীয় ঘোষণা অনেকের কাছেই কৌতুককর মনে হয়েছে। জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত বেতার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী এল· এফ· এস· বার্নহাম বলেছেন, জগানের দল পিপলস্ প্রোগ্রেসিভ পার্টি গায়নায় কিউবার অনুকরণে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের চক্রান্তে লিপ্ত। পার্শ্ববর্তী ভেনিজুয়েলার গেরিলাদের সঙ্গে যোগসাজসে তাঁরা এই কাজ করছেন। ভেনিজুয়েলার গেরিলা লড়াই-এর নেতা পেদ্রো বেরিয়ার সঙ্গে এঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। বেরিয়াকে তাঁরা গায়নায় নিয়ে আসার চেষ্টাও করেছেন। এই অভিযোগ তুলে বার্নহাম ঘোষণা করেছেন, জগানের দলের কয়েকজনকে এই কারণে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। দরকার হলে আরও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ছেদি জগানের স্ত্রী দলের অন্যতমা প্রধান নেত্রী জ্যানেট জগান এই ঘোষণাকে সম্পূর্ণ হাস্যকর ও একটি আজগুবি মিথ্যা কাহিনী বলে অভিহিত করেছেন।

নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের জন্যই যে এই কাহিনী প্রচার করা হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভেনিজুয়েলার সঙ্গে গায়নার কিছু সীমান্ত-বিরোধও রয়েছে। সুতরাং কিছু গায়নাবাসী এর দ্বারা বিভ্রান্তও হবে।

মালি ঃ

পশ্চিম আফ্রিকার প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ মালিতে সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে। চোদ্দজন তরুণ সামরিক অফিসার 'জাতীয় মুক্তি কমিটি' এই অভ্যুত্থানের উদ্যোক্তা, এবং ৩২ বৎসর বয়স্ক লেফটেন্যান্ট মুসা ট্রাওর অভ্যুত্থানের প্রধান নায়ক। রাষ্ট্রপতি মোডিবো কিটা, সেনাবাহিনীর প্রধান কর্নেল সেকু ট্রাওর ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিদ্রোহীরা সারা দেশে তাঁদের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সফল হয়েছে। একরূপ রক্তপাত না ঘটিয়ে এই বিপ্লব ঘটেছে।

মহল ও আফ্রিকার বামপন্থী রাষ্ট্রনেতারা খুশি। কারণ, কিটা গত আট বছর ধরে মালিতে সমাজতন্ত্রের নীতি অনুসরণের চেষ্টা করছিলেন, এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলছিলেন। অভ্যুত্থানের নেতা মুসা ট্রাওর বলেছেন, সমাজতন্ত্র দেশকে গোল্লায় পথে নিয়ে যাচ্ছিল, তাই দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই তাঁরা কিটা ও দলবলকে সরিয়েছেন। ট্রাওর ইতিমধ্যেই দেশী ও বিদেশী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের আহবান জানিয়েছেন দেশের অর্থনীতিতে অংশ গ্রহণ করার জন্য।

এ কথা ঠিক, গত কয়েক বৎসর ধরে মালির অবস্থা ভাল যাচ্ছিল না। চরম অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে। জীবনযাত্রার মান খুব নেমে গেছে। কর্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি বন্ধ করা হয়েছে, এবং নতুন কর্মনিয়োগ একেবারেই হচ্ছে না। তবে কিটা সামলে ওঠার জন্য চেষ্টা করছিলেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়াও ফ্রান্সের সাহায্যের জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন।

আসল বিপদ এদিক থেকে আসে নি। এসেছে অন্য দিক থেকে। মোডিবো কিটা সমাজতন্ত্রী ঠিকই, কিন্তু তিনি মোটামুটি নরমপন্থী সমাজতন্ত্রী—একটু ধীরে চলার পক্ষপাতী। তাঁর দলের কট্টর বামপন্থীরা তা' মানতে চায় না। এদের মধ্যে চীনাপন্থীও অনেক আছে। এরা কিছুদিন ধরেই নানাভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। রেড গার্ডে এদের প্রভাব যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঠিক মোডিবো কিটার ভয়ে নয়, এই অতি-বামপন্থীদের ভয়েই সামরিক অফিসাররা নিজেদের হাতে ক্ষমতা নিয়ে নিল। দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, এমন কি বিদেশেরও হাত নিশ্চয়ই আছে এর পেছনে।

জাপান ঃ

প্রধানমন্ত্রী এসাকু সাতো ক্ষমতাসীন দল লিবারেল ডেমোক্রাটিক পার্টির সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। গত ২৭শে নভেম্বর এই নির্বাচন হয়েছে। এই নিয়ে তিনি পর পর তিনবার দলের সভাপতি হলেন। জাপানের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অনুযায়ী দলের যিনি সভাপতি হবেন, তিনিই দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন। সুতরাং এই দিক দিয়ে এঁকে আবার প্রধানমন্ত্রী পদেও পুনর্নির্বাচিত বলা যেতে পারে।

সাইও। দলের অভ্যন্তরে যাঁরা অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল ও বামপন্থী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী তাঁরা তাকেও মিকিকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা জয়লাভ করতে পারেন নি।

সাটোর এই জয় এই কথাই প্রমাণ করে যে দল তাঁর মার্কিন-ঘেঁষা নীতিও সমর্থন করে। কারণ, তাঁর বিরুদ্ধে দলের ভেতরে ও বাইরে বিরোধীদের এটাই প্রধান বক্তব্য যে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একান্ত বশংবদ। তাই নির্বাচনে জয়ের ফলে সাটো আরও দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর মার্কিন-ঘেঁষা নীতি অনুসরণ করবেন। সভাপতি নির্বাচনের পর সাটো যে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন তাতেও এই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিগত মন্ত্রিসভার একজন ছাড়া আর সবাইকে তিনি বাদ দিয়েছেন। নতুন যাঁদের নিয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই সাটোর গোঁড়া সমর্থক ও মার্কিন-ঘেঁষা। বিশেষ করে যিনি নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন, কিচি আইচি, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

১৯৭০ সালে বর্তমান জাপ-মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তির চুক্তিকাল শেষ হবে। নতুন করে এই চুক্তি না করার জন্য ছাত্র ও বামপন্থীরা দাবি জানিয়েছে, তারা এর জন্য আন্দোলনও করছে। সাটো এই ব্যাপারে কি করেন তাই লক্ষ্য করার বিষয়।

ভাবে আরব-ইজরায়েল যুদ্ধের অবসান ঘোষণা করা হলেও, এক দিনের জন্যও বোমাবর্ষণ বন্ধ হয় নি। ইজরায়েলী বিমান থেকে সীমান্তবর্তী জর্ডান এলাকায় নির্বিচারভাবে বোমাবর্ষণ চলছে।

ইজরায়েলের আক্রমণে এ পর্যন্ত বহু নিরপরাধ শিশু ও নারী মারা গেছে। গত ৩রা ডিসেম্বর বড় রকমের আক্রমণ হয় জর্ডানের গ্রাম কাফার আসাদে। ইজরায়েল থেকে ৩৬টি সামরিক বিমান বে-আইনীভাবে জর্ডান সীমান্ত অতিক্রম করে এসে এখানে বোমা ফেলে যায়।

ইজরায়েলের বক্তব্য : জর্ডান থেকে ইজরায়েলের অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ চালানো হচ্ছে। জর্ডানীরা গেরিলাদের সাহায্য করছে। জর্ডানের ভেতরে অবস্থিত গেরিলা ঘাঁটিগুলির বিলোপের জন্যই ইজরায়েলী বোমাবর্ষণ। ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও আরব-বিরোধী অভিযানের প্রধান নায়ক একচক্ষু মসে দায়ান তাঁর পার্লামেন্ট-বক্তৃতায় এমন অভিযোগও করেছেন যে, স্বয়ং রাজা হুসেন এই গেরিলা বাহিনীর কাজকে সমর্থন করছেন।

ইজরায়েল থেকে বিতাড়িত আরবরা ইজরায়েলে বিপ্লবী সংগ্রাম পরিচালনা করছে। এবং তার পেছনে সমগ্র আরব জগতের নৈতিক সমর্থন রয়েছে, এ কথা সত্য, কিন্তু এই অজুহাতে দিনের পর দিন জর্ডানের ওপর আক্রমণ চালিয়ে যাবার কোন যুক্তি নেই।

এবারের বোমাবর্ষণের পর সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও ইরাকে সামরিক তৎপরতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অনেকেরই ধারণা, ইজরায়েল বড় রকমের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসন আরও বেশি আরব-বিরোধী জঙ্গী মনোভাব গ্রহণের পক্ষপাতী। এই অবস্থায়, নিকসন রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণের পর নতুন ইজরায়েলী আক্রমণ সুরু হলে অনেকেই বলবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে বিশেষ করে নিকসনের উস্কানিতে আক্রমণ হয়েছে। সুতরাং নিকসনের আগেই আক্রমণ সুরু করতে হবে।

জর্ডান ও ইরাকের সৈন্যরা ইজরায়েলী বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে পালটা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে গুলী চালিয়েছে। ফলে সমগ্র পশ্চিম এশিয়ায় নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

এর মধ্যে একমাত্র ভাল খবর, ডঃ গানার জারিং পশ্চিম এশিয়ায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের শান্তিদূতরূপে কাজ চালিয়ে যেতে রাজী হয়েছেন। আরব-ইজরায়েল বিরোধ নিষ্পত্তি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে উভয় পক্ষের মধ্যে দূতিয়ালীর জন্য জারিং অনেক দিন ধরে এই অঞ্চলে রয়েছেন, নানাভাবে চেষ্টাও তিনি করেছেন। কিন্তু তিনি কিছুই করে উঠতে পারছেন না। তাই বিরক্ত হয়ে তিনি চলে যেতে চেয়েছিলেন। এখন উ থান্টের অনুরোধে তিনি থাকতে রাজী হয়েছেন।

(৭।১২।৬৮)
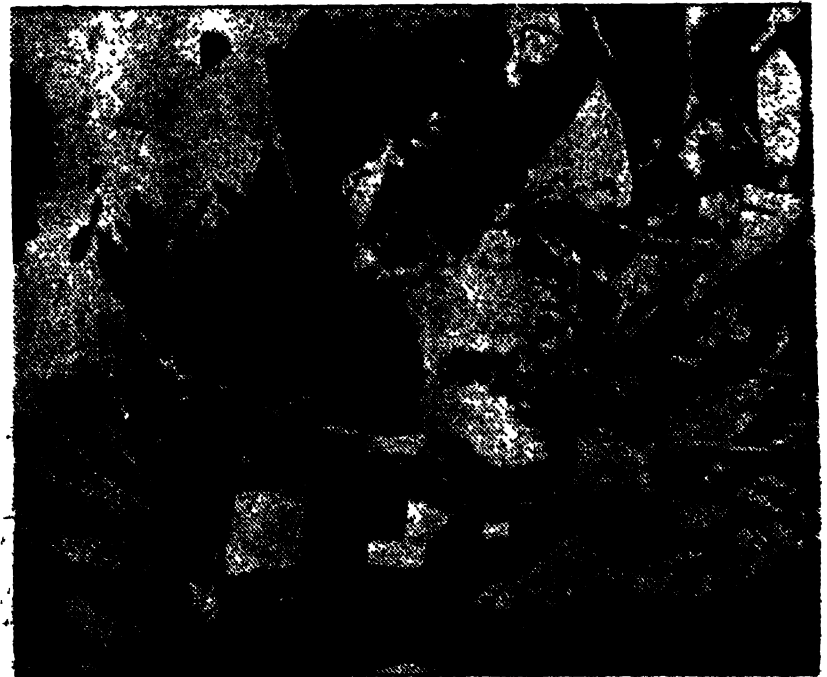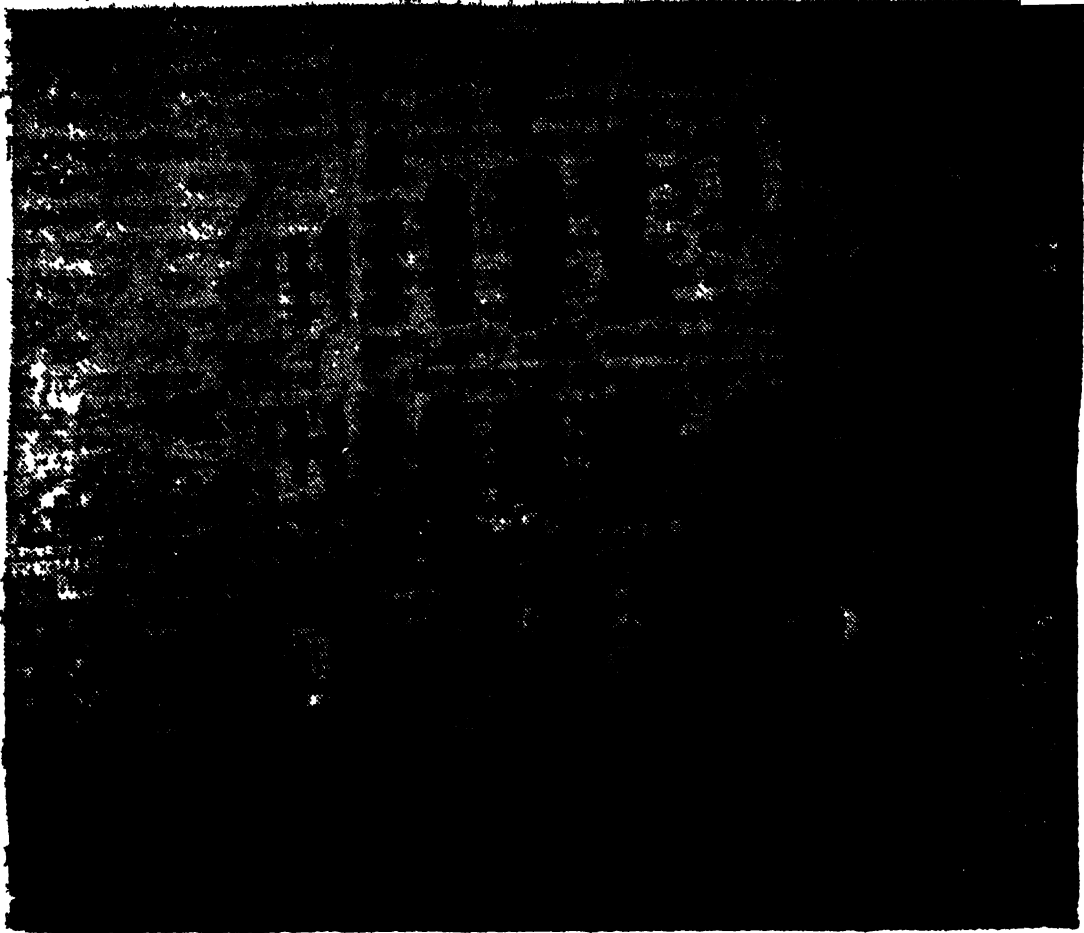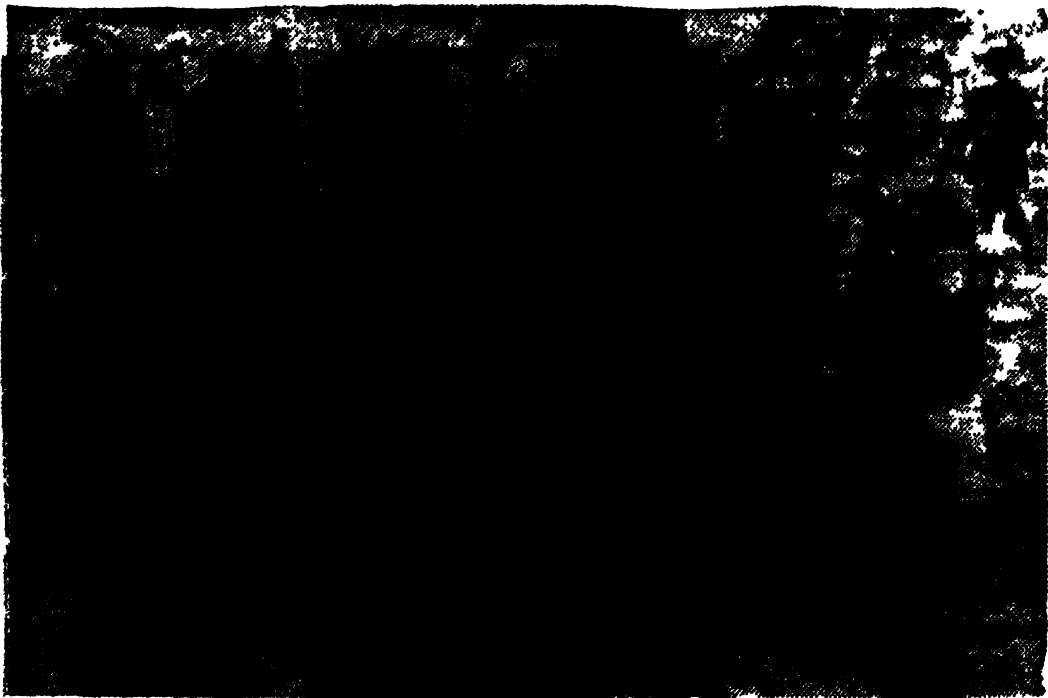
পশ্চিমবঙ্গের পি এস পি দলে এক গুরুতর সংকট দেখা দিয়েছে এবং গত কয়েকদিন এই সংকটের বিষয়ে সংবাদ-পত্রগুলিতে বেশ জমজমাট সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। এই সংবাদসমূহ প্রকাশিত হবার পর আজ প্রকৃতপক্ষে খেই হারিয়ে যাচ্ছে অনেকের কাছে—তাহলে ব্যাপারটা কি? একটা আসন নিয়ে এত গোলমাল কেন? পি এস পি দল ভেঙে যাবে? এমনি আরো অনেক কথা। এই সব কথার নেপথ্যে রয়েছে বহু কথা, যে কথাগুলি জানা দরকার। তবে 'সপ্তাহের বোঝা'র পাঠকরা সম্ভবত পি এস পি দলের এই বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বেশ কিছুটা ওয়াকিবহাল আছেন—কারণ রায়-গঞ্জে পি এস পি রাজ্য সম্মেলনের পর 'সপ্তাহের বোঝা'য় বেশ কয়েক সপ্তাহে পাঠকদের সম্ভবত আগাম জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, পি এস পি দলে আগামী দিনে এক সংকট চরম আকার ধারণ করবে।

পি এস পি দলের বর্তমান সংকটের কারণ কিন্তু বহুবিধ, বরং বলা যায় জগাখিচুড়ি। সিপাহী বিদ্রোহের কারণ যদি বলা যায় এনফিল্ড টোটা—সেও যেমন সত্যের অপলাপ, এক্ষেত্রেও যদি বলা যায় পি এস পি দলের সংকট মুগ-বেড়িয়া আসনকে কেন্দ্র করে, তাহলেও একই সত্যের অপলাপ হবে। এই ক্ষেত্রেও একটি কথা আগাম বলতে চাই যে, যে মুগবেড়িয়া নিয়ে এত হৈ-চৈ হচ্ছে সেটা যদি মিটেও যায়, তবু পি এস পি দলের সংকট মিটবে না—কারণ সংকটটি আসলে সৃষ্টি হয়ে রয়েছে রাজনৈতিক আদর্শে —সেই আদর্শের যতক্ষণ সমন্বয় বা আপোষ না হচ্ছে, ততক্ষণ সংকট মিটবে কি ভাবে? হার্ট অপারেশনের রোগীর অন্য হৃৎপিণ্ড বসিয়ে রোগীকে [illegible] বাঁচিয়ে রাখা যায়, কিন্তু সেই বেঁচে থাকা এখন পর্যন্ত চিরকালের বেঁচে থাকায় পরিণত হয় নি। এই ক্ষেত্রেও তাই। মুগবেড়িয়া সমস্যা হয়ত মিটবে, কিন্তু দলের মধ্যে আদর্শের লাঠিবাজি মিটবে না। তাই সর্বাগ্রে বোঝা দরকার আদর্শের সংঘাতটা কোথায়?

প্রথম সংঘাত সুরু হল রায়গঞ্জে পি এস পি'র যুক্তফ্রন্ট ত্যাগকে কেন্দ্র করে—একলা চলার নীতি গ্রহণ করার পর। কিন্তু এই নীতি দলের মধ্যে অনেকেই মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারলেন না। তাই এক পক্ষ চাইলো যুক্তফ্রন্টমুখী নীতিকে বাঁচিয়ে রাখতে—আর অপর একদল চাইলেন সেই নীতিকে সমূলে বিনাশ করতে। এই নীতিরই সংঘর্ষ ঘটলো মেদিনীপুরে। মেদিনীপুর জেলা পি এস পি যুক্তফ্রন্টের আসন বণ্টনের ফরমুলা মেনে নিয়ে চারটি আসন নিয়ে যুক্ত-ফ্রন্টের সঙ্গে একটা চুক্তি করল। এই চুক্তি হয়ে যাবার বহু পরে দেখা গেল রাজ্য পি এস পি অনেকগুলি কথা তুলে এই চুক্তিকে ভঙ্গ করতে তৎপর হলেন। এর পিছনে কিন্তু প্রধান কারণ হ'ল এই যে, এই এলাকায় পি এস পি দলের যিনি এম পি, তিনি মনে করেন তাঁর কেন্দ্রের আসনগুলিতে তাঁর প্রভাব বজায় রাখা দরকার, তার জন্য চাই অপর পক্ষের প্রভাব খর্ব করে নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠা। এই প্রভাব প্রতিষ্ঠার পরীক্ষাতেই বলা হল যে, জেলা পি এস পি যে চুক্তি করেছে, সে চুক্তি রাজ্য পার্টির অনুমোদনে বা জেলার সকল সদস্যের অনুমোদনে হয় নি, তাই মুগ-বেড়িয়া কেন্দ্রে প্রার্থী দেওয়া হবে। উক্ত এম পি'র এই ইচ্ছা পূরণের কিন্তু কারণও তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন এবং তাঁর মনে এমন ধারণাও জন্মেছিল যে, শ্রীসুধীর দাসকে বাদ দিয়ে তিনি কাঁথি মহকুমায় পি এস পি'কে চালিয়ে নিয়ে যাবেন। কারণ ভারতবর্ষে এমন কোন মহকুমা সম্ভবত নেই, যেখানে পর পর দুইবার বন্যার পর সরকারকে দিয়ে ১৮ কোটি টাকা খরচ করানো গেছে। কাজেই ১৮ কোটি টাকা খরচের এলাকায় তাঁর প্রভাব নিশ্চিতভাবে তাঁর স্বপক্ষে যাবে। কিন্তু লড়াইটা লেগে গেল কাঠে কাঠে। পি এস পি নেতা শ্রীসুধীর দাস, শ্রীবলাইদাস মহাপাত্র, শ্রীসুবোধ পুরোহিত ও শ্রীবিভূতি পাহাড়ী—এঁরা চারজনই একটু স্বতন্ত্র ধাতুতে গড়া। রাজ্য রাজনীতিতে এই চারজনকে কখনও কেউকেটা বলে মনে হয় নি সত্য, তবে বিধানসভায় তরোয়ালের মত চেহারা নিয়ে এই চার-জনের একজন—শ্রীবলাইদাস মহাপাত্র একাই গত বহু বৎসর মেদিনীপুরে কংগ্রেসের বড় বড় নেতাদের সঙ্গে মোকা-বিলা করেছেন। শ্রীবলাইদাস মহাপাত্র বিধানসভায় কথা বলতে দাঁড়ালেই সব সময় শ্রীমতী আভা মাইতি, শ্রী চারু মহান্তি প্রমুখের বুকে কাঁপুনি ধরতো। আর শ্রীসুধীর দাস—অতি সাধারণ চেহারার বারো মাস কালো একটি গ্রাম্য কোট পরা মানুষটিকে কখনও কারো পক্ষে পরাজিত করা সম্ভব হয় নি। ১৯৫০ সালে কাঁথি মহ-কুমায় বিপুলভাবে সেবা করে স্বর্গত শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভাব বৃদ্ধি করেছিলেন এবং ১৯৫২ সালের নির্বা-চনে জনসঙ্ঘের সবচেয়ে বেশি আসন পেয়েছিলেন মেদিনীপুর জেলায়, কিন্তু শ্রীসুধীর দাস তখনও সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন—কাঁথিতে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শত চেষ্টা করেও তাঁর প্রার্থী শ্রীতারাপদ মিশ্রের জামানত বাঁচাতে পারেন নি। তখন থেকে আজ পর্যন্ত শ্রীসুধীর দাস একভাবে দাঁড়িয়ে আসছেন। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর দলের

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সাপ্তাহিক বসুমতীর মাননীয়া সম্পাদিকা সমীপেষু,—

বর্তমান সংখ্যা (৫ ডিসেম্বর) সাপ্তাহিক বসুমতীতে আমার ধারাবাহিক রচনা "রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের" শেষ অংশের নিচের দিকে তাকিয়ে চমৎকৃত হয়েছি। বিস্ময়ে কয়েকবার চোখ রগড়াতে হয়েছে—এ কি স্বপ্ন, না মায়া, না আমার মতিভ্রম! 'প্রকাশিত হল' বলে আমার "রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র" গ্রন্থের দু' কলমজোড়া বিজ্ঞাপন বেরুল, অথচ গ্রন্থাকারে আমি বইটি ছাপতেই দিলাম না—এ কী করে সম্ভব! অথচ আমার ছাড়া বইটি কারো হতেও পারে না, কেন না আমার 'রবীন্দ্র-নাথ ও সুভাষচন্দ্র' লেখার তলায় 'রবীন্দ্র-নাথ ও সুভাষচন্দ্র' বইয়ের বিজ্ঞাপন, এবং বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকারের নাম নেই। এই অবস্থায় আমার মত খ্যাতিলুব্ধ ব্যক্তির প্রাণ-মন যে ও হেন মস্ত বিজ্ঞাপনটিকে 'এ তো আমারি' বলে আঁকড়ে ধরতে চাইবে, তাতে বিস্ময়ের কি আছে!

কিন্তু যেহেতু আমি সত্যই গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য পাণ্ডুলিপি এখনো কোনো প্রকাশককে দিই নি (অবশ্য বাক্-সাহিত্যকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি), তখন অবশিষ্ট বাস্তব বুদ্ধিযোগে আমাকে বুঝতে হল—"রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র" নামক সদ্য-প্রকাশিত, বিজ্ঞাপিত, লেখকের নামহীন গ্রন্থটির লেখক আমি নই। এই ব্যাপারটি আমার কাছে স্পষ্ট হবার পরে দ্বিতীয়বার চমকালুম। কী কাণ্ড! "রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র" নামে দীর্ঘদিন ধরে আমার রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে—সেই একই নামে আর একটি বই!! গত জানুয়ারী মাস থেকে [illegible] সাপ্তাহিক বসুমতীতে বেরুচ্ছে, [illegible] প্রথম কিস্তিতে জানানো হয়েছিল, [illegible] রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থ। আরও [illegible] জানুয়ারী মাসেই

"কয়েকটি পত্রের কাহিনী" নামে সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত রচনার সঙ্গেও একই বিজ্ঞপ্তি ছিল। তারও কয়েক বৎসর আগে "জয়শ্রী" পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার সঙ্গে অনুরূপ বিজ্ঞপ্তি। একথা আমি বুঝি যে, এতদিন ধরে কোনো গ্রন্থকে 'প্রকাশিতব্য' শব্দের শিকেয় ঝুলিয়ে রাখা অন্যায় হয়েছে এবং এমন একটি স্বাদু নাম ও উপাদেয় বিষয়কে ভালবেসে আপনার করে নেওয়ার বাসনা স্বাভাবিক। আমি আরও বুঝি, প্রকাশিতব্য গ্রন্থ-নামের কোনো কপিরাইট হয় না, যদি হ'ত তাহলে একই নামে আর একটি গ্রন্থ বেরুতে পারত না; যাঁরা বার করেছেন, তাঁরা আইন জানেন না, তাঁদের বুদ্ধিশক্তি সম্বন্ধে এমন সন্দেহ আমি কদাপি করি না। কেবল বিনীত জিজ্ঞাসা, আইনে যদি না-ও আটকায় রুচিতে ও নীতিতে কি আটকায় না? নিশ্চয় আটকায় না, যদি আটকাত, তাহলে রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষ-চন্দ্রের মত মহাজীবনের পর্যালোচনা যে গ্রন্থের উদ্দেশ্য, সে গ্রন্থের লেখক আমার তুল্য সামান্য লেখকের সামান্য রচনার নামটি আত্মবৎ করতেন না। আমার এখনো বিশ্বাস, বিজ্ঞাপিত গ্রন্থের লেখক বা প্রকাশক না জেনেই নামটি নিয়ে ফেলেছেন এবং সেইভাবে না জেনেই আমার লেখার তলায় বিজ্ঞাপন দিয়ে ফেলেছেন। আমার এহেন বিশ্বাসের কারণ—'বিশ্বাস হারানো পাপ।' বিশ্বাস বজায় রেখেই, সম্পাদিকা মহোদয়া, আপনার ধৈর্যের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করে, এই চিঠি শেষ করলাম।

—শঙ্করীপ্রসাদ বসু

দ্বিতীয় খণ্ড

'তোমাকে সংবর্ধনা করি'

[illegible] পার্কের বিশাল জনসভায় সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের অভি-নন্দন-বাণী পঠিত হল—

"সমস্ত দেশের সংগে কণ্ঠ মিলায়ে
আমি তোমাকে সংবর্ধনা করি।"

দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পরে সুভাষচন্দ্র মুক্ত। বাংলা এবং ভারতের অন্তরে অক্ষয় স্থান ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছেন এই দুঃসাহসী সন্তানটি। কিভাবে কারাবাস তাঁর শরীরকে জীর্ণ করে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল, বিদেশে নির্বাসনে কিভাবে তিনি স্বাস্থ্যোদ্ধারের চেষ্টা করেছেন, পিতার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বেও যথাসময়ে উপস্থিত হতে কিভাবে তাঁকে সাম্রাজ্যবাদী সরকার বাধা দিয়েছে—অবরুদ্ধ যন্ত্রণার সংগে সেই সব কিছুই দেশবাসী লক্ষ্য করে গেছে। ভারতে এসেই তাঁর স্বাস্থ্য আবার ভেঙেছে, প্রথমে কার্সিয়াঙে রাখা হয়েছে, সেখানেও স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে তিনি চিকিৎসিত হবেন, হয়তো সেরে উঠবেন, নয়তো—

নয়তো—! পাক-খাওয়া যন্ত্রণা ফেনিয়ে উঠেছে কণ্ঠে—

এমনি এক সময়ে, ১৯৩৭ সালের ১৮ই মার্চ, বৃহস্পতিবার, প্রভাতী সংবাদ-পত্র পাতা-জোড়া আনন্দ-সংবাদ বিস্ফারিত হয়ে উঠল:*

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর বিনাশর্তে মুক্তিলাভ

পুনরায় মুক্ত মানুষ

অসুস্থ মাতার শয্যাপার্শ্বে প্রত্যাবর্তন

শ্রীযুক্ত বসুর ভগ্ন শীর্ণ চেহারা

সন্ধ্যায় এখনো জ্বর, পেটে যন্ত্রণা

---

* অমৃতবাজার থেকে সংবাদগুলি এখানে পরিবেশন করছি, অনুবাদ করে। একই ধরণের সংবাদ অন্যান্য জাতীয়তা-বাদী সংবাদপত্রসমূহেও প্রকাশিত হয়ে-ছিল।

সংবাদে জানা গেল, তিন নম্বর রেগুলেশনের বন্দী সুভাষচন্দ্র বসু বুধবার সন্ধ্যায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে তাঁর ভাই ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসুর এলগিন রোডের বাড়িতে প্রহরাধীন অবস্থায় অসুস্থ মাকে দেখতে যান; সেই সময়ে সেখানে কলকাতা স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার মিঃ জনস্টন স্বয়ং হাজির হয়ে তাঁর হাতে সপারিষদ গভর্নর জেনারেল কর্তৃক পাঠানো মুক্তির আদেশনামা তুলে দেন। "মুক্তির আদেশ শ্রীযুক্ত বসুর আত্মীয় ও বন্ধুদের কাছে তো নিশ্চয়ই, স্বয়ং শ্রীযুক্ত বসুর কাছেও বিশেষ বিস্ময়ের কারণ হয়।" মুক্তিপ্রাপ্ত সুভাষচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত সাংবাদিকেরা দেখেন, তাঁর শরীর রক্তহীন, শীর্ণ, ক্ষয়িত; শোনেন, সন্ধ্যার দিকে এখনো ৯৯—১০০ জ্বর ওঠে, সব সময়ে পেটে এক ধরণের ঘিনঘিনে যন্ত্রণা; বর্তমান ওজন ১৪৬ পাউন্ড; স্যার নীলরতন সরকারের চিকিৎসাধীনে থাকবেন; রাজনৈতিক বিষয়ে কথা বলতে তিনি অনিচ্ছুক।

সুভাষচন্দ্রের মুক্তিতে সারা বাংলা ভাবাবেগে হয়ে উঠল। চতুর্দিকে শুভেচ্ছা, প্রার্থনা ও জয়ধ্বনি। বাংলা দেশ নেতৃহীন, নেতৃত্ব গ্রহণ করো তুমি—কণ্ঠে কণ্ঠে, পত্রে পত্রে আহ্বান। দেশবন্ধু নেই, দেশপ্রিয় নেই—সুভাষচন্দ্র ফিরেছেন—অনেকদিন পরে সহর্ষ উদ্দীপনা বোধ করে বাংলা দেশ।

সমগ্র ভারতবর্ষেও আনন্দ সঞ্চার হয়। জহরলালের সভাপতিত্বে অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি সুভাষচন্দ্রের কারামুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করে প্রস্তাব গ্রহণ করে। সারা ভারতবর্ষের বহু বিশিষ্ট নরনারীর শুভেচ্ছা প্রস্তাব ক্রমাগত আসতে থাকে। রোমা রোলাঁর শুভেচ্ছা জানিয়ে যান জিন হারবার্ট।

কারামুক্তির এক সপ্তাহ পরে ২৫শে মার্চ সংবাদপত্রে ঘোষিত হল—'সারা বাংলা সুভাষ দিবস' পালিত হবে আগামী ২৯শে মার্চ, শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। দেশবাসীর পক্ষ থেকে ঐ দিন তাঁকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হবে। সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যের কারণে ঐ তারিখ কিছুটা বদলে ৬ই এপ্রিল করা হল।

১৯৩৭ সালের ৬ই এপ্রিলের স্মরণীয় 'সুভাষ দিবসে' বাংলা দেশ হৃদয় উজাড় করে সুভাষচন্দ্রের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা জানাল। স্মরণীয়তম অনুষ্ঠান হল শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। সেই 'জাতীয় অনুষ্ঠানে' 'অতি প্রিয় নেতাকে' অর্ঘ্য দিয়েছিল তাঁর দেশবাসী। শহর এবং শহরের বাইরে থেকে অজস্র নদীধারার মত মানুষ এসে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে হাজির হয়েছিল। পার্ক ভর্তি হয়ে উপচে-ওঠা মানুষেরা ছড়িয়ে গিয়েছিল পার্শ্ববর্তী পথে বহু দূর পর্যন্ত। আশপাশের কোনো বারান্দা, ছাত, গৃহ খালি ছিল না। সুভাষচন্দ্র যখন উপস্থিত হলেন হাজার হাজার কণ্ঠে তাঁর জয়ধ্বনি, ন্যাশন্যাল ভলান্টিয়ারদের ব্যাণ্ডবাদন, পুষ্পবর্ষণ ও মাল্যদান, "দেখা গেল তিনি পুষ্পস্তবক ও মাল্যের বর্ষাধারায় ডুবে গেছেন।"

"জনগণের স্নেহ ও ভালবাসার সে এক সুমহান দৃশ্য! মাতৃভূমির জন্য সুদীর্ঘ ত্যাগ, তপস্যা ও যন্ত্রণাবহনের দ্বারা যিনি দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জয় করে নিয়েছেন, তাঁকে আবার নিজেদের মধ্যে ফিরে পেয়ে তারা আবেগে উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল; প্রিয় মানুষটির জন্য স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন, যিনি ফিরেছেন, ফিরেছেন কিন্তু ভগ্ন বিধ্বস্ত দেহে।"

অভিনন্দন সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। দেশবাসীর পক্ষ থেকে যে অভিনন্দনপত্র তিনি পাঠ করেন, তাতে সরল ভাষায় সুভাষচন্দ্রের দীর্ঘ সাধনা এবং আত্মত্যাগের কথা লিখিত ছিল, প্রার্থনা জানানো হয়েছিল ঈশ্বরের কাছে ভারতমাতার বীরপুত্রের নিরাময় ও দীর্ঘজীবনের জন্য। শ্রদ্ধেয় রামানন্দ তাঁর আবেগকম্পিত ভাষণে বলেছিলেন—শ্রীযুক্ত বসুকে দীর্ঘদিন পরে ফিরে পেয়ে আমাদের আনন্দের সীমা নেই—কিন্তু চলে গিয়েছিল কে, আর ফিরে পেলাম কাকে—এ কী চেহারা হয়েছে! বৃদ্ধ আমি, আমারই চোখ ফেটে জল আসছে। সুভাষচন্দ্রের বহু গুণের কথা বলার পরে রামানন্দ বলেছিলেন, সরকার এঁর মাথায় কাঁটার মুকুট পরিয়েছে, দেশবাসী পরাচ্ছে ফুলের মুকুট।

সহজেই বুঝতে পারি, এমন একটি সভায়, ভালবাসার জনগণের মধ্যে দাঁড়িয়ে অভিভূত কথা বলা কতখানি কঠিন ছিল সুভাষচন্দ্রের পক্ষে, হৃদয়ের অবতার দেশবন্ধু পর্যন্ত যাঁকে 'আমার কাঁদুনে সেনাপতি' বলে সস্নেহ কৌতুক করেছেন। সুভাষচন্দ্রের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছিল, ভেঙে গিয়েছিল বারবার, বিশেষত যখন তিনি অবরুদ্ধ রাজবন্দীদের কথা বলেছিলেন। তাঁর মথিত মনের রূপঃ

> "বন্ধুগণ! আপনাদের বিশ্বাস ও স্নেহের এই যে বিপুল প্রকাশ আমি দেখলাম, এতে আমি একেবারে অভিভূত। কিভাবে কৃতজ্ঞতা জানাব তা জানি না। যদি কথা থেমে যায়, সে দোষ সবটা আমার নয়। জনজীবনের ক্ষেত্রে আমার কষ্টস্বীকার ও কৃতিত্বের কথা আপনারা সহৃদয়তাবশে জানিয়েছেন। কিন্তু আমি একটুও অযথা বিনয় প্রকাশ করব না যদি খোলাখুলি বলি, সুদৃঢ় কাজের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত সামান্যই আমি করে উঠতে পেরেছি। আমি সৈনিক বই কিছু নই, সর্বদাই এগিয়ে চলেছি। আমাদের লক্ষ্যস্থল এখনো দূরে, এবং পথ কণ্টকাকীর্ণ, কুসুমাস্তীর্ণ নয়। আমাদের দীর্ঘ কঠিন যাত্রায় অবশ্যই আমি আমার প্রাপ্য যন্ত্রণা পেয়েছি, কিন্তু সে কষ্ট জাতীয় বাহিনীর কে পায় নি বলুন? দেশের জন্য যাঁরা সব কিছু দিয়েছেন, তাঁদের তুলনায় আমি এমন কী বেশী যন্ত্রণা সয়েছি?

'গত ১৭ই মার্চ যখন আমাকে সহসা মুক্তি দেওয়া হল, সেই মুহূর্তে আমার মনে পড়ল তাঁদের কথা বছরের পর বছর যাঁরা কারাগারের মধ্যে রয়েছেন রয়েছেন অন্তরীণে, দ্বীপান্তরে। তাঁদের সঙ্গে একই পাত্র থেকে দুঃখবারি আমি পান করেছি, তাঁদের স্বজন-বান্ধবদের চোখের জলের ধারা আমি দেখেছি। এরও কি বেশী কিছু দেখতে হবে, যা আমাকে যন্ত্রণায় অস্থির করে তুলবে? হাঁ, তাও মিলেছে। কলকাতা মেডিকেল কলেজে যখন আছি, আমার পাশের কেবিনে ছিলেন একজন রাজবন্দী, তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়বার সময়ে আমি উপস্থিত ছিলাম। আর সেখানে উপস্থিত ছিল পাহারা দিতে আমাদের উৎসাহী পুলিশের সদাসতর্ক দৃষ্টি; প্রাণহীন দেহকে শেষ পর্যন্ত, যতক্ষণ না দেহটি গঙ্গাতীরে ভস্মীভূত হয়েছে, সেই পর্যন্ত অনুসরণ করে গেছে পুলিশের জাগ্রত চক্ষু। সুতরাং আপনারা বুঝতে পারবেন, আমার বুকে কী পাষাণ চেপে বসে আছে।

"এই [illegible] [illegible] [illegible] শিকার যারা, অন্যের জন্য যাতে আপনাদের সহানুভূতি আরও সক্রিয়-ভাবে জেগে ওঠে, সর্বক্ষণ আমাকে সেই চেষ্টা করতেই হবে।"

এই সভায় সুভাষচন্দ্র লোকান্তরিত বিঠলভাই প্যাটেল, ডাঃ আনসারি, বীরেন্দ্র শাসমল প্রভৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল স্বর্গত দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের উদ্দেশ্যে তাঁর মুক্ত শ্রদ্ধানিবেদন। পূর্বতন সেন-গুপ্ত-সুভাষ বিরোধের পটভূমিকায় সুভাষ-চন্দ্রের উদার ভাষণটিকে স্মরণ করতে হবে। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, দেশপ্রিয়ের বিহনে দেশ মুকুটহীন; সর্বশক্তি সঞ্চয় করে তাঁর অভাব পূরণে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

এর পরে সুভাষচন্দ্র যেসব কথা বলে-ছিলেন, সেই কথাগুলি তাঁর চিন্তা ও কর্মপন্থার ক্ষেত্রে নতুন ইঙ্গিতে পূর্ণ। এইদিক থেকে বক্তৃতাটি বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ মনে করি। পরবর্তী অধ্যায়ে সুভাষচন্দ্রের এই নূতন বক্তব্যের আলো-চনা আমরা করব। তার আগে বর্তমান অধ্যায় শেষে রবীন্দ্র-সুভাষ সম্পর্কের দ্বিতীয় পর্ব সম্বন্ধে দু'-একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। ১৯৩৭ থেকেই উভয়ের সম্পর্কের দ্বিতীয় পর্বের আরম্ভ। এই পর্বের ব্যাপ্তিকাল বেশি নয়—চার বৎসরের মত, ১৯৪১ সালের জানুয়ারীতে সুভাষ-চন্দ্রের অন্তর্ধান পর্যন্ত। কবির শরীরও বেশিদিন থাকে নি। কিন্তু এই কয়েক বৎসরে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সুভাষ-চন্দ্র যা পেয়েছেন, তার সীমা নেই। মহা-কবি পাখা মেলে দেবার আগে ডানার একটি পালক তরুণ রাজকুমারের মুকুটে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। এবং সুভাষচন্দ্র, রোলাঁর মধ্যে শিল্পী-বিপ্লবীকে দেখে আরও দেখার যে আকাঙ্ক্ষা বোধ করে-ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের এই নূতন আকার তাঁর মনকে অনেকাংশে ভরিয়ে দিয়েছিল।

সুভাষচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ কাছে টেনে নিয়েছিলেন কেন—যখন বয়োধর্মে দূরে সরিয়ে দেওয়াই স্বাভাবিক ছিল? অশীতি-পর বৃদ্ধ কবি, সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্য দিয়ে নিশীথ-তারকার আহ্বান যখন তাঁর কাছে ছুটে আসছে, তখন কেন সন্ধ্যা-কল্পনা ত্যাগ করে পিছন ফিরে উগ্র উজ্জ্বল অগ্নিযজ্ঞের দিকে সুস্মিত দৃষ্টিপাত করলেন? কারণ, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে একটি বিস্ময়কর অথচ সর্বজ্ঞাত বার্তা হল—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নবীন হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ সত্যই বার্ধক্যে তাঁর যৌবনের দিনগুলিকে আহ্বান করে-ছিলেন। [illegible] [illegible] এই [illegible] রূপে কি [illegible], সুভাষ-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল, সে বিষয়ে আলোচনা আমরা যথাস্থানে করব। কিন্তু সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে যে তাঁর অনেক বৎসর পূর্বেকার শীতলতা দূর হয়ে অন্তরে উত্তাপের সঞ্চার হয়েছে, তা বোঝা যায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সুভাষ-চন্দ্রকে আশীর্বাদ সহ 'সঞ্চয়িতা' পাঠিয়ে দেওয়ায়। অনুমান করি, বে-ইন্ডিয়ান শৃঙ্খলের ভূমিকা লেখার ব্যাপারে বার্নার্ড শ' প্রমুখকে অনুরোধ করতে কবি কুণ্ঠিত ছিলেন, সেই গ্রন্থ যখন ভারত ও ভারতের বাইরে আলোড়ন সৃষ্টি করল, তখন কবি অবশ্যই কিছু উৎসুক ও সম্ভ্রম বোধ করেছিলেন। সরকার যখন গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করল তখন বার্নার্ড শ', এইচ জি ওয়েলস, আলডুস হাক্সলি, আর্ল রাসেল প্রমুখের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে উদ্যোগী হয়েছিলেন।*

সঞ্চয়িতা পেয়ে আনন্দিত সুভাষচন্দ্র কবিকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ৩০।১।৩৭ তারিখে লেখেন—

শ্রীচরণেষু,

আপনার প্রেরিত "সঞ্চয়িতা" পাইয়া বিশেষ অনুগৃহীত হইলাম। আপনি যে আমাকে স্মরণ করিয়াছেন ইহা আমার পক্ষে কম আনন্দের বিষয় নহে। তার উপর, আপনার স্বহস্ত-লিখিত আশীর্বাদ পাইয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছি।

আপনার স্বাস্থ্য সমাচারের জন্য আমরা সর্বদা চিন্তিত থাকি একথা আপনি নিশ্চয় জানেন। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন।

ইতি—
বিনীত
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

সঞ্চয়িতা পেয়ে সুভাষচন্দ্র মনে হয় তার পৃষ্ঠাগুলি উল্টে গিয়েছিলেন, যে-সব কবিতা তাঁর কৈশোরকে আকুল ও যৌবনকে আলোড়িত করেছিল মহাদানে, সেগুলির পুনরুচ্চারণ করেছিলেন, তাঁর সুগভীর মনের দার্শনিক পিপাসাকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ভেবেছিলেন, এই [illegible] ও [illegible] [illegible] হবে [illegible] নিজের জন্য একান্ত [illegible]।

সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে একটা ভাবনা কর্মযোগী সুভাষচন্দ্রের মনেও সর্বদা বর্তমান ছিল। তাঁর মত অন্তর্গহন-রাজ্যের অধিবাসী ব্যক্তিমনের সর্বোচ্চ দৃষ্টি সম্বন্ধে উদাসীন হতে পারেন না; তিনি নিশ্চয় [illegible], সেই সৃষ্টিলোকে সাধারণের প্রবেশাধিকার নেই। তবু কর্ম-জীবনে সমষ্টিকে নিয়ে তাঁর সাধনা; তাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও দর্শনের সিদ্ধান্তকে সমষ্টির সঙ্গে যুক্ত করেই অনুভব করতে চেয়েছেন। বেদান্তের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল সত্য কিন্তু সাধনায় তিনি তান্ত্রিক; 'রিয়ালিটি' সম্বন্ধে তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত, তা 'প্রেম', খাঁটি বৈষ্ণব মতে যদি নাও হয়, বিবেকানন্দ বেদান্তকে নব ব্যাখ্যার দ্বারা যেখানে আকর্ষণ করে এনেছিলেন, সেই ভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি সর্বব্যাপ্ত সৃষ্টিতে একমাত্র প্রেমকেই দর্শন করেছিলেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সার্বজনীন কল্যাণের প্রশ্নটিকে তিনি বিস্মৃত হতে পারেন নি। সাহিত্যবিষয়ে সুভাষচন্দ্রের ধারণার বেশি পরিচয় আমরা পাই না। দিলীপকুমার রায়কে ধন্যবাদ, তাঁর অনিবার্য আকর্ষণে সুভাষ-চন্দ্র সাহিত্যবিষয়ে মত প্রকাশ করে ২৮ বছর বয়সে মান্দালয় জেল থেকে একটি পত্র লিখেছিলেন, যার মধ্যে প্রকাশিত মত পরবর্তীকালে বজায় ছিল বলেই মনে হয়, এবং বর্তমান প্রসঙ্গের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথা হল, সেই চিঠি দিলীপ-কুমারের কল্যাণে রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন এবং খুশি হয়ে মন্তব্য করেছিলেন। দিলীপকুমারের 'অনামী' গ্রন্থ থেকে সুভাষচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের চিঠি দুটি প্রধানাংশে উদ্ধৃত করছি।

সুভাষচন্দ্র মান্দালয় জেল থেকে ৯।১০।২৫ তারিখে দিলীপকুমারকে লেখেন—

"একথা কিছুতেই মনে করো না যে, আমার দৃষ্টি নিতান্তই সঙ্কীর্ণ। "Greatest good of the greatest number"-এতে আমি যথার্থই বিশ্বাস করি, কিন্তু সে "good" আমার কাছে সম্পূর্ণ বস্তুগত নয়। অর্থনীতি বলে, মানুষের সকল কাজ হয় productive, নয় unproductive; তবে কোন্ কাজ যে productive তা নিয়ে অনেক [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

---

* "কাগজে বাহির হইয়াছে, বিলাতের বার্নার্ড শ', এইচ জি ওয়েলস, [illegible] হ্যাকসলি, এবং আর্ল রাসেল প্রমুখ লেখক-গণ এবং ভারতবর্ষের রবীন্দ্রনাথ সুভাষ-বাবুর বহির টাইপ-লিপি বাজেয়াপ্ত করার জোরালো প্রতিবাদ করিয়াছেন যা করি-[illegible]।"

প্রবাসী, মাঘ, ১০৪১

[illegible]

...দ্রি হয়, আর দার্শনিক চিন্তা বা [illegible]কে নিষ্ফল বা নিরর্থক বলে অবজ্ঞা করি নে। আমি নিজে একজন আর্টিস্ট না হতে পারি,— আর সত্যি বলতে কি আমি জানি যে তা নই, কিন্তু সেজন্য দোষী প্রকৃতি বা ভগবান যাই বল, আমি নই। অবশ্য যদি বল যে, আর-জন্মের কর্মফল এ-জন্মে ভোগ করছি, তাহলে আমি নাচার। সে যাই হোক, এ-জন্মে যে আর্টিস্ট হলুম না, তার কারণ হতে পারলুম না। আর আমার বিশ্বাস, 'শিল্পী জন্মায়, তৈরি করা যায় না', একথা অনেকটা সত্য। কিন্তু নিজে আর্টিস্ট না হলেই যে আর্ট উপভোগ করা যায় না, এমন কোনো কথা নেই; আর কোনো কলার সমঝদার হতে গেলে তাতে নিজের যেটুকু পরিমাণ দখল থাকা দরকার, আমার মনে হয় তা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেই সুলভ।

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে এ আক্ষেপ করো না যে, সঙ্গীত নিয়ে তুমি সময়টা হেলায় কাটিয়ে দিচ্ছ, যখন শেক্সপীয়রের কথায় বলতে গেলে 'the time is out of joint'. বন্ধু, সারা দেশকে সঙ্গীতের বন্যায় প্লাবিত করে দাও, আর যে-সহজ আনন্দ আমরা প্রায় হারিয়ে বসেছি, তা আবার জীবনে ফিরিয়ে আনো। যার হৃদয়ে আনন্দ নেই, সঙ্গীতে যার চিত্ত সাড়া দেয় না, তার পক্ষে জগতে বৃহৎ কি মহৎ কিছু সম্পাদন করা কি কখনো সম্ভব? কার্লাইল বলতেন, সঙ্গীত যার প্রাণে নেই, সে করতে পারে না হেন দুষ্কার্যই নেই। একথা সত্যি হোক বা না হোক, আমার মনে হয় যার প্রাণে সঙ্গীতের কোনো সাড়া নেই, সে চিন্তায় বা কার্যে কখনই মহৎ হতে পারে না। আমাদের প্রত্যেক রক্তকণিকায় আনন্দের অনুভূতি সঞ্চারিত হোক, এই আমরা চাই, কারণ আনন্দের পূর্ণতাতেই আমরা সৃষ্টি করতে পারি। আর সঙ্গীতের মত এমন আনন্দ আর কিসে দিতে পারে?

কিন্তু আর্ট ও তজ্জনিত আনন্দকে দরিদ্রতমের পক্ষেও সহজলভ্য করতে হবে। সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞতার চেষ্টা অবশ্য হোক [illegible] জন্যে, আর [illegible] সঙ্গীতকে সর্বসাধারণের উপযোগী করে তুলতে হবে। বিশিষ্ট সাধনার অভাবে আর্টের উচ্চ আদর্শ যেমন ক্ষুণ্ণ হয়, তেমনি জনসাধারণের কাছে সুগম না হলেও আর্ট এবং জীবনে বিচ্ছেদ ঘটে এবং তাতে আর্ট নির্জীব ও খর্বই হয়ে যায়। আমার মনে হয় লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের ভিতর দিয়েই আর্ট জীবনের সঙ্গে যোগ রাখে। ভারতবর্ষে জীবন ও আর্টের মধ্যে এই যোগটি পাশ্চাত্যসভ্যতা প্রায় ছিন্ন করে ফেলেছে, অথচ তার স্থানে নতুন কোনো যোগসূত্র যে আমরা পেয়েছি, তাও নয়। আমাদের যাত্রা, কথকতা, কীর্তন প্রভৃতি যেন কোন্ অতীত যুগের স্মৃতিচিহ্ন মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে: বস্তুত যদি আমাদের গুণী শিল্পীরা অচিরে আর্টকে পুনরায় জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না করতে পারেন, তাহলে আমাদের চিত্তের যে কী দৈন্যদশা ঘটবে, তা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। তোমার হয়ত মনে আছে, তোমাকে আমি একবার বলেছিলাম যে, মালদায় 'গম্ভীরা' গানের সৌন্দর্যে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাতে সঙ্গীত ও নৃত্য উভয়ই ছিল। বাংলার অন্যত্র ওরূপ জিনিস কোথাও আছে বলে তো আমি জানি নে। আর মালদাতেও ওর মৃত্যু শীঘ্রই অবশ্যম্ভাবী, যদি নতুন করে প্রাণশক্তি ওতে সঞ্চারিত করবার চেষ্টা না হয়, আর বাংলার অন্যান্য স্থানেও ওর প্রচলন না হয়। বাংলা দেশে লোক-সঙ্গীতের উন্নতিকল্পে মালদায় তোমার শীঘ্রই যাওয়া উচিত। গম্ভীরার মধ্যে জটিল বা বিশাল বা মহৎ কিছুই নেই,—তার গুণই এই যে, তা সহজ, সাদাসিধে। আমাদের নিজস্ব folk music ও folk-dancing একমাত্র মালদাতেই এখনও বেঁচে আছে, আর সেই হিসেবেই গম্ভীরার যা মূল্য। সুতরাং যাঁরা ও-প্রকার সঙ্গীত ও নৃত্য পুনর্জীবিত করতে চান, তাঁদের মালদা থেকে কাজ আরম্ভ করাই সুবিধা।

লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের দিক থেকে বর্মা এক আশ্চর্য দেশ। খাঁটি দিশী নাচ ও গান এখনো পূর্ণোদ্যমে এখানে চলেছে, আর সুদূর পল্লীতে পর্যন্ত লাখ লাখ লোককে আমোদ-আহ্লাদের খোরাক যোগাচ্ছে। ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি অনুশীলন করার পর, তুমি যদি ব্রহ্মদেশের সঙ্গীতের চর্চা কর তো মন্দ হয় না। সে সঙ্গীত হয়ত তত সূক্ষ্ম বা উন্নত নয়, কিন্তু দরিদ্র ও অশিক্ষিতকেও প্রচুর আনন্দদান করবার যে ক্ষমতা তার আছে, আপাততঃ আমি তাতেই আকৃষ্ট হয়েছি। শুনি নাকি এখানকার নাচও বড় সুন্দর। বর্মার জাতি-ভেদ না থাকাতে এখানকার শিল্প-কলার চর্চা কোনো শ্রেণীবিশেষের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। ফলে বর্মায় আর্ট চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। বোধহয় এই কারণে, আর লোকসঙ্গীত ও নৃত্যের প্রচলন থাকার দরুণ, ব্রহ্মদেশে ভারত-বর্ষের চেয়ে জনসাধারণের মধ্যে সৌন্দর্যজ্ঞান অনেক বেশী পরিণতি লাভ করেছে। দেখা হলে এ-বিষয়ে আরও কথা হবে।......

আমি একথা সম্পূর্ণ মানি যে, প্রত্যেকেরই নিজের ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ করবার চেষ্টা করতে হবে। নিজের মধ্যে যা সর্বোৎকৃষ্ট, তা দানই হচ্ছে প্রকৃত সেবা। আমাদের অন্তরপ্রকৃতি, আমাদের স্বধর্ম যখন সার্থকতা লাভ করে, তখনই আমরা যথার্থ সেবার অধিকারী হই। এমার্সনের কথায় বলতে গেলে, নিজের ভিতর থেকেই আমাদের গড়ে উঠতে হবে; তাতে আমরা সকলেই যে এক পথের পথিক হব, এমন কোনো কথা নেই, যদিও একই আদর্শ হয়ত আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। শিল্পীর সাধনা কর্মযোগীর সাধনা থেকে ভিন্ন; তত্ত্বজ্ঞানীর যে সাধনা বিদ্যার্থীর সে-সাধনা নয়;

"কিন্তু আমার মনে হয়, এ-সকলের আদর্শ প্রায় একই। গোলাকার ব্যক্তিকে চতুষ্কোণ গর্তের মধ্যে পুরতে আর যেই চাক না কেন, আমি কখনই চাইনে। নিজের প্রতি সত্য হলে বিশ্বমানবের প্রতি কেউ অসত্য হতে পারে না। তাই আত্মোন্নতি ও আত্মবিকাশের পথ নিজের প্রকৃতিই দেখিয়ে দেবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজের শক্তি ও প্রকৃতি অনুসারে নিজেকে সার্থক করে তুলতে পারে, তাহলে অচিরেই সমগ্র জাতির নবজীবন দেখা দেয়। সাধনার অবস্থায় হয়ত মানুষকে এমনভাবে জীবনযাপন করতে হয়, যাতে তাকে বাইরে থেকে স্বার্থপর বা আত্মসর্বস্ব মনে হতে পারে। কিন্তু সে অবস্থাতে মানুষ বিবেকবুদ্ধির দ্বারা চালিত হবে, বাইরের লোকের মতামতের দ্বারা নয়। সাধনার ফল যখন প্রকাশিত হবে, তখনই লোকে স্থায়ী বিচার করবে। সুতরাং আত্মবিকাশের সত্যপথ যদি অবলম্বন করা হয়ে থাকে, তাহলে লোকমত উপেক্ষা করা যেতে পারে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, তোমার সঙ্গে আমার মতের যে বিশেষ পার্থক্য আছে তা নয়।"

দিলীপকুমার-প্রেরিত সুভাষচন্দ্রের চিঠি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত খুশি হলেন। বাংলা দেশের তরুণ দেশব্রতীদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিটির যে সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা রয়েছে, এই ব্যাপারটি কবির কাছে খুবই তৃপ্তিদায়ক হয়েছিল; কবি [illegible] ভেবেছিলেন, রাজনীতিতে [illegible] নিমজ্জিত এই যুবকের মত স্বভাবতই সংকীর্ণ হবে। পরিবর্তে মানসিক উদারতা দেখলেন।* সুভাষচন্দ্রের পত্রের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ বিস্তারিতভাবে নিজের মত প্রকাশ করলেন—

> "সুভাষের চিঠি বড় সুন্দর—এই লেখার ভিতর দিয়ে তাঁর বুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে তৃপ্তিলাভ করেছি। সুভাষ আর্ট সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তার বিরুদ্ধে বলবার কিছুই নেই। যেখানে আর্টের উৎকর্ষ, সেখানে গুণী ও গুণজ্ঞদের ভাবের উচ্চশিখর। সেখানে সকলেই অনায়াসে পৌঁছবে, এমন আশা করা যায় না—সেইখানে নানা মতের রসের মেঘ জমে ওঠে—সেই দুর্গম উচ্চতায় মেঘ জমে বলেই তার বর্ষণের দ্বারা নিচের মাটি উর্বরা হয়ে ওঠে। অসাধারণের সঙ্গে সাধারণের যোগ এমনি করেই হয়, উপরকে নীচে বেঁধে রেখে দিলে হয় না। যারা রসের সৃষ্টিকর্তা, তাদের উপর যদি হাটের ফরমাস চালানো যায়, তাহলেই সর্বনাশ ঘটে। ফরমাস তাদের অন্তর্যামীর কাছ থেকে। সেই ফরমাস অনুসারে যদি তারা চিরকালের জিনিস তৈরী করতে পারে, তাহলেই আপনিই তার উপরে সর্বলোকের অধিকার হবে। কিন্তু সকলের অধিকার হলেই যে হাতে হাতে সকলে অধিকার লাভ করতে পারে—ভালো জিনিস এমন সস্তা নয়। বসন্তে যে ফুল ফোটে, সে ফুল তো সকলেরই জন্য। কিন্তু সকলেই তার মর্যাদা সমান বোঝে, একথা কেমন করে বলব? বসন্তে আমের মুকুলে অনেকেরই মন সায় দিলে না বলেই কি তাকে দোষ দেব? বলব, তুমি কুমড়ো হলে না কেন? বলব কি, গরীবের দেশে বকুল ফুল ফোটানো বিড়ম্বনা—সব ফুলেরই বেগুনের ক্ষেত হয়ে ওঠা নৈতিক কর্তব্য? বকুল ফুলের দিকে যে-অরসিক চেয়ে দেখে না, তার জন্য যুগযুগান্তর ধরেই বকুল ফুল যেন অপেক্ষা করে থাকে, মনের খেদে এবং লোকহিতৈষীদের তাড়নায় সে যেন কচুবন হয়ে উঠবার চেষ্টা না করে। গ্রীসে সর্বসাধারণের জন্যই সক্রেটিস [illegible] নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছিল, একদল বিশিষ্ট কতিপয়ের জন্যে নয়। সেখানকার সাধারণের ভাগ্য ভালো যে, তারা কোনো গ্রীসীয় দাশু রায়ের শরণাপন্ন হয় নি। সাধারণকে শ্রদ্ধাপূর্বক ভালো জিনিস দিতে থাকলে ক্রমশই তার মন ভালো জিনিস গ্রহণ করবার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। কবিকে আমরা যেন এই কথাই বলি—তোমার যা সর্বশ্রেষ্ঠ তাই যেন তুমি নির্বিচারে রচনা করতে পারো। কবি যদি সফল হয়, তবে সাধারণকে বলব—যে-জিনিস শ্রেষ্ঠ তুমি যেন সেটি গ্রহণ করতে পারো। যারা রূপকার, যারা রসস্রষ্টা, তারা আর্টের সৃষ্টি সম্বন্ধে সত্য ও অসত্য, ভালো ও মন্দ, এই দুটি মাত্র শ্রেণীভেদই জানে—বিশিষ্ট কতিপয়ের পথ্য ও ইতরসাধারণের পথ্য বলে কোনো ভেদ তাদের সামনে নেই। শেক্সপীয়ার সর্বসাধারণের কবি বলে একটা জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, হ্যামলেট কি সর্বসাধারণের নাটক? কালিদাস কোন্ শ্রেণীর কবি জানি নে, কিন্তু তাঁকে আপামরসাধারণ সকলেই কবি বলে প্রশংসা করে থাকে। জিজ্ঞাসা করি, যদি মেঘদূত গ্রামের দশজনকে ডেকে শোনানো যায়, তাহলে কি সেই অত্যাচার ফৌজদারী দণ্ডবিধির আমলে আসতে পারে না? সর্বসাধারণের মোক্তার যদি কালিদাসের আমলে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন বেদখল করে কালিদাসকে ফরমাসে বাধ্য করতেন, তাহলে মেঘদূতের জায়গায় যে-পদ্যপাঠ তৈরী হত, মহাকাল কি সেটা সহ্য করতেন? আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর এ সমস্যার মীমাংসা কী, আমি বলব, মেঘদূত গ্রামের দশজনের জন্যই, কিন্তু যাতে সেই দশজনে মেঘদূতে নিজ অধিকার উপলব্ধি করতে পারে, তারই দায়িত্ব [illegible]বর্গের লোকের। যে দশজন মেঘদূত বোঝে না, তাদের খাতিরে মেঘদূতের বদলে পদ্ম-ভ্রমরের পাঁচালিতে সস্তা অনুপ্রাসের চকমকি ঠোকা কবির দায়িত্ব নয়। কৃত্রিমতা সকল কবি, সকল আর্টিস্টের পক্ষেই দূষণীয়, কিন্তু যা সকলেই অনায়াসে বোঝে সেটাই অকৃত্রিম, আর যা বুঝতে চিত্তবৃত্তির উৎকর্ষসাধনের দরকার সেটাই কৃত্রিম, এ-রকমের কথা অশ্রদ্ধেয়। সর্বসাধারণকে আমরা [illegible] রসের [illegible] বাইরে

---

* এই উদারতা রবীন্দ্রনাথ তিলকের মধ্যেও দেখেছিলেন।

অন্ধকার ফেরি করতে

অমিয়কুমার হাটি

অন্ধকার ফেরি করতে বের হয়েছে মতলবীরা
সংগোপনে।

যেমন করে আফিং বেচে, কড়া কোকেন,
মারিহুয়ানা, এল-এস-ডি,
তেমনি করে বেচবে ওরা
আদিমরিপু, বাসনা যত,
টাকার লোভ, পাপের বোঝা,
সাদা-কালোর হিংসা-দ্বেষ।

মনুষ্যত্ব হত্যা করা এদের নেশা—
অন্ধকার ফেরি করলে
সহজ হবে মনুষ্যত্ব হত্যা করা।

আঙিনায় তাদের জন্য চিঁড়ে-দইয়ের ব্যবস্থা করি—সন্দেশগুলো বাঁচিয়ে রাখি যাদের বড় লোক বলি তাদের জন্যই। শিশুদের আমরা অশ্রদ্ধা করি বলেই শিশুসাহিত্যের রচনার ভার গোঁয়ার সাহিত্যিকদের ওপর। তারা ছেলেমানুষির ন্যাকামি করাকে ছেলেদের সাহিত্য বলে মনে করে। আমি ছেলেদের শ্রদ্ধা করি, এই জন্যে আমি আমার বিদ্যালয়ে যখন ছেলেদের পড়াই, তখন তাদের জন্য যথার্থ সাহিত্যেরই আয়োজন করি—এমন সাহিত্য যা আমাদের সকলেরই ভোগের জন্য। অবশ্য আমাকে চেষ্টা করতে হয় যাতে শিশুরা এই সাহিত্যের রস বুঝতে পারে। এ-চেষ্টা করে আমি বিফল হয়েছি, তা বলতে পারি নে।

এত কথা তোমাকে বলবার দরকার ছিল না,—বাচালতা ক্রমে বেশী করে অভ্যস্ত হয়ে আসছে বলে বন্ধুসমাজে কথার মাত্রা রাখতে পারি নে। যা হোক, সুভাষের চিঠিখানি পাঠিয়ে তুমি আমাকে বিশেষ আনন্দ দিয়েছ—সেই কৃতজ্ঞতাবশতই, আমার ডান হাতের তর্জনী এই খানিক আগে ছুরিতে বিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও এতখানি লিখে ফেললুম।"

সুভাষচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের পত্রের সূত্র ধরে সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্বন্ধে উভয়ের [illegible] বিস্তারিত আলোচনার এখানে [illegible] আমাদের নেই। সংক্ষেপে এইটুকু বলে নেওয়া যায়, উভয়ের দৃষ্টি-ভঙ্গিতে ঐক্য এবং পার্থক্য, দুই-ই ছিল। উভয়ে ব্যক্তির 'স্বধর্মে' বিশ্বাসী ছিলেন। নিজের সম্বন্ধে সত্য হয়ে উঠলে অপরের সম্বন্ধে সত্য হয়ে ওঠা যায়, এ বিষয়টি তাঁরা স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এটি সহজ সত্য, সুভাষচন্দ্রের কাছেও তার সত্যতা স্বীকৃত দেখে রবীন্দ্রনাথ সন্তোষবোধ করেছিলেন। মানব-জীবনে শিল্পের আনন্দের প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং তাকে অর্জন করতেই হবে সর্ব-সাধারণের জন্য, সুভাষচন্দ্রের এই মনোভাব কবির কাছে খুশির কারণ হয়েছিল। কিন্তু সমস্যা হল, শিল্পকে সর্বসাধারণের আস্বাদ্য কি করে করা যায়? এইখানেই কবি ও কর্মীর ধারণার ভেদ। সুভাষচন্দ্র বললেন, শিল্পকে দরিদ্রতমের পক্ষে সহজ-লভ্য করতে হবে। কিন্তু কিভাবে? তাকে তরল করে, তার সূক্ষ্মতা ও গভীরতা নষ্ট করে? শিল্পকে সর্বভোগ্য করার দাবি ছিলই এবং রাজনীতিকেরা কলাশিল্পের ক্ষেত্রেও বণ্টনসাম্য আনায় উৎসাহী ছিলেন। এইখানে রবীন্দ্রনাথ আতঙ্কিত না হয়ে পারেন নি। শিল্পের মান ক্ষুণ্ণ করার চিন্তা তাঁর পক্ষে অসহ্য। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতে চাইলেন, শ্রেষ্ঠ শিল্প সকলের সমান উপভোগ্য হওয়া সম্ভব নয়। শিল্পের মান না নামিয়ে সাধারণকে সেই শিল্পরস আস্বাদনের জন্য যোগ্য করাই উচিত কর্তব্য। বলা বাহুল্য সেটা আদর্শ ব্যাপার কিন্তু সেই দুরারোহ আদর্শে যতক্ষণ না উপনীত হওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণ কিভাবে জনসাধারণকে শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির স্পর্শ দেওয়া যাবে? সুভাষ-চন্দ্রের কাছে এইটেই সমস্যা। অবশ্যই এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ বস্তুর কিছু তরলীকরণ বা জনসংস্করণ প্রস্তুতের প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথ দাশু রায়ের নিন্দা করেছেন, আমরাও না হয় তাতে যোগ দিলাম, কিন্তু কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস সম্বন্ধে কী বলা যাবে? কিংবা তুলসীদাস? তাঁরা কি, মধুসূদন যেমন বলেছেন, জনজীবনের কাছে ভারতরসগঙ্গার ভগীরথ নন? সর্বসাধারণকে অবশ্যই শ্রদ্ধা করে শ্রেষ্ঠ বস্তু দেওয়া কর্তব্য, কিন্তু শ্রেষ্ঠ বস্তু দেখে যদি নমস্কার করে আসর থেকে তারা পলায়ন করে, তাহলে কার উপকার? জনকল্যাণের উৎকণ্ঠায় দেশব্রতীরা যখন সাহিত্যের উপর ভালবাসার উৎপীড়ন করেন, তখন একথা সত্য, সাহিত্য ত্রাহি ত্রাহি করে, তেমনি অপরপক্ষে এও বলা যায়, নিজের সৃষ্টির ধ্যানে মগ্ন আছি বলে সাহিত্যিকেরা যখন দু' চোখ বোজেন, তখন দেখা যায় বহুক্ষেত্রেই তাঁরা আত্ম-রতির কয়েরে নেশায় আচ্ছন্ন। আর্ট ও জীবনের বিচ্ছেদ যে, জাতীয় জীবনের পক্ষে মারাত্মক হয়েছে, সে কথা তো অগ্রাহ্য করা যায় না। এবং নিশ্চয় অস্বীকার করা যাবে না যৌথ মনের খামারে সৃষ্ট বস্তু মানেই সাহিত্য নয়। অর্থাৎ, এখানে এই কথাটাই আমরা স্বীকার করব, কবি ও কর্মী, উভয়েই সত্য বলেছিলেন, তবে আপেক্ষিক সত্য, এবং যেহেতু সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তব্য, সেহেতু কর্মীর অপেক্ষা কবির কথা অধিকতর সত্য।

[ক্রমশঃ]

পথ কে রুখবে?

মনোজ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ উনত্রিশ ॥

রিটায়ার করার সময় আসন্ন, কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাড়তে নারাজ। কমিটির মধ্যে প্রভাবশালী কয়েকজন বীরেশ্বরের ছাত্র। তাঁরা আড় হয়ে পড়লেন: কলেজে ইস্তফা দিয়ে আমাদের ছেড়ে পালাবেন, সে আশা ছেড়ে দিন মাস্টার-মশায়।

বীরেশ্বর বললেন, ডিপার্টমেন্টের আইন। টেনেটুনে একটা বছর আরও না হয় টিকে থাকতে পারি। তখন আইন ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়াবে, তার চেয়ে মানে মানে হাসিখুশির মধ্যে চলে যাওয়াই তো ভালো।

যার সঙ্গে কথা হচ্ছে, ছাত্রটি যশোরের পাবলিক প্রসিকিউটার। বলল, আইন থাকে, আবার আইনের ফাঁকও থাকে নানান রকম: আইনের ভাবনা আমায় ভাবতে দিন মাস্টারমশায়। আপনার রিজিগনেশনের দরখাস্ত কমিটি সর্বসম্মতভাবে নামঞ্জুর করবে, ভিতরে ভিতরে আমাদের কথা হয়ে আছে।

সকাতরে আবার সে বলে, কত কষ্ট করে কলেজ একটা দাঁড় করানো গেছে, গাঁ-অঞ্চলের গরিব ছেলেদের পড়াশুনো চলছে—আপনি চলে গেলে ইজ্জত-সম্ভ্রম ধসে যাবে একেবারে।

কিছু বিরক্ত হয়ে বীরেশ্বর বললেন, চিরকাল বুঝি তোমাদের ইজ্জত-সম্ভ্রম ঠেকনো দিয়ে রাখব? আমি মরব না?

না—

বলে বীরেশ্বরকে প্রণাম করে সে কথাবার্তার শেষ করে দিয়ে চলে গেল।

নিরুপায় বীরেশ্বর তখন বান্ধব খলিলুর রহমানকে ধরলেন। কলেজ কমিটিতে তিনিও আছেন।

ডাক্তার আপনি। আমার অন্দরের কোনো খবর আপনার অজানা নয়। শখ করে সরতে চাচ্ছি নে, বুঝিয়ে বলুন আপনি ওদের। একান্নবর্তী আধা-পাগলা [illegible] নিয়ে [illegible]

একজন—বউমা এসে পড়লেন তার উপরে। ইনি তো উন্মাদ একেবারে—কখন কি ঘটিয়ে বসেন, সর্বক্ষণ ভয়ে ভয়ে আছি।

বলেই সঙ্গে সঙ্গে আবার ডাক্তারকে সতর্ক করেন: কথাগুলো এমন স্পষ্টাস্পষ্টি বলতে যাবেন না কিন্তু ডাক্তার-সাহেব, আকারে-ইঙ্গিতে ঠারেঠোরে বলবেন। ছাত্র ওরা সব, পুত্রতুল্য—মনে কোন রকম ব্যথা পাবে, আমি তা চাই নে।

হাত ঘুরিয়ে অবহেলার সুরে ডাক্তার রহমান বললেন, ব্যথা কিসের? মুসলমানের উপর আক্রোশ, বাড়ির মেয়েরা মুসলমান-জাত ধরে বেধড়ক গালিগালাজ করেন—ডাক্তার হিসাবে আপনার অন্দরে ঢুকতে পাই বলে জানটা আমার প্রত্যক্ষ। যাঁদের কথা বলছেন তাঁরাও শিক্ষিত বুদ্ধিমান—তাঁদের কাছে এ জিনিষ একেবারে অজানা নয়।

একটু থেমে আবার বললেন, আমার অন্দরের খোঁজ পান না তো আপনি—হিন্দু-অঞ্চলের ঘরবসত ফেলে আসতে হয়েছে, আমাদের মেয়েরাও হিন্দুর উপরে খাপ্পা, অষ্টপ্রহর গালিগালাজ করেন। হতেই হবে—বিষবৃক্ষ পুঁতলে বিষফলই পাওয়া যাবে। কিন্তু রিটায়ার করে আপনি তো গাঁয়ের বাড়ি যাচ্ছেন। শহর ছেড়ে গাঁয়ে থাকবেন, সেখানে তো আরও অসুবিধে। জায়গাটাও পাকিস্তানের বাইরে নয়। ভেবেচিন্তে দেখুন, ফ্রাইং-প্যান থেকে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পড়া হবে না তো? রাগ মুসলমানদের উপরে—ডাইনে-বাঁয়ে আগে-পিছে তারাই তো জমিয়ে আছে সেখানে। [illegible] হিন্দু কিছু আছেন, তাঁরা তো সব শহরের উপর।

বীরেশ্বর সায় দিয়ে বললেন, ভারি ভারি [illegible] হিন্দু তাঁরা—উকিল, মাস্টার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার। ধনী-মানী [illegible] [illegible] [illegible]

স্বার্থের ঠোকাঠুকি শহরেই লেগে যায়। যত গণ্ডগোল, শহরে তাদের উদ্ভব। সর্বনাশের পাণ্ডা শহুরে ধনী-মানীরাই।

রহমান ডাক্তার ঘাড় নেড়ে প্রতিবাদ করেন: কী বলেন! গাঁয়ে গণ্ডগোল নেই বুঝি?

বৈষয়িক কি সামাজিক গণ্ডগোল। ছোটখাট ব্যাপার—হিন্দু-মুসলমান নেই তার মধ্যে। হালে কিছু কিছু শুনি বটে, যে জিনিষ শহরের মতলবী শিক্ষিতেরা শহর থেকে চালান করে দিচ্ছে। বিশেষ করে আমার গাঁয়ের কথাই বলছি—বাপ-পিতামহের গ্রাম, আমার চেয়ে ভাল কেউ জানে না। হিন্দু ছিল—বেশির ভাগই চাষাভুষো ক্ষেতমজুর, বড় জোর ছোটখাট জোতদার গাঁতিদার। ভয় ধরিয়ে দেওয়া হল তাদের, বাস তুলে সরে পড়েছে। নিতান্ত গরিব নিরুপায় দু-চার ঘর পড়ে আছে। গ্রামবাসী সবাই প্রায় মুসলমান, সে আমার জানা আছে। নিরানব্বই পার্সেন্টেরও বেশি।

গাঢ়স্বরে বীরেশ্বর বললেন, খোদার কাছে দোয়া করুন ডাক্তারসাহেব। বাইরে থেকে মাতব্বররা বিষ ঢোকাতে গিয়ে না পড়ে—রিটায়ার করে গাঁয়ের বাড়িতে শান্তিতেই থাকব আমরা।

দেড় বছর আগেকার কথা। [illegible] একফোঁটা তখন। বাচ্চা মেয়ে কাঁধে তুলে [illegible] পিছনে [illegible] গাঁয়ের উঠানে গরুর-গাড়ি থেকে নামল।

যাবার মুখে লীলা [illegible] কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল: [illegible] নিয়ে যাবেন কিন্তু বাবা। [illegible]

বীরেশ্বর অভয় দেন: নেবো বই কি। [illegible] দেখলে তোমার হাতে তুলে দেবো—[illegible] দিয়েছি। আমি কি [illegible] [illegible]?

[illegible]

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়ে [illegible]।

[illegible] লীলা বলে, কষ্ট আমায় একটুও করতে হয় নি বাবা। রওনা হচ্ছি, ছোড়দাই তখন হাতের মধ্যে গ‍ুঁজে কোন কায়দায় পাচার করতে হবে তালিম দিয়ে দিলেন। দুশমনের কাছে কান্নাকাটি আর অহিংসার বুলি কপচানোর গরজ না হয়, সেইজন্য। বলেছিলেন, অন্য বারা করে কর্‌কগে, আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়ের পক্ষে বেইজ্জতি। তা দুশমনই একটা তো পেলাম না এদ্দিনের মধ্যে। তা হলে চেয়েই নিতাম, দেবার জন্য তাগিদ দিতে হত না আপনাকে।

বীরেশ্বর নিরস্ত হলেন না : দুশমন এখন না থাক, কোন এক সময় মুখোমুখি পড়তেও তো পারে। ভয় পেয়ে একদিন তোমার কাছ থেকে জিনিষটা আমি চেয়ে নিয়েছিলাম, সে ভয় কেটে গেছে। বুড়ো-মানুষ কবে মরে যাই—এবারে নিজের কাছে রাখো মা, আমি আর সামাল-সামাল করে বেড়াতে পারিনে।

লীলা অবহেলাভরে বলে, ফেলে দিন তবে বাবা। গাঙের জলে ছুঁড়ে দিন। আমার কোন দরকার নেই। ভারি সাংঘাতিক জিনিষ—হাতে নিয়ে নেশায় পড়ে যাবো, টার্গেট-প্রাকটিশ করব হয়তো আবার। এক এক ফোঁটা চঞ্চল ছেলেপুলে নিয়ে সংসার, কোনটা কোন দিক দিয়ে এসে পড়ে কখন—সর্বনাশ হয়ে যাবে।

সত্যি, এই আঠারো বছরে লীলা মস্ত এক সংসার জমিয়ে নিয়েছে। ছেলে আর মেয়ে নিয়ে তিরিশের কাছাকাছি। সকলের সে মা-জননী। ফুলুরা অভিমান করে : পেটের মেয়ে আমি এক লহমা মা'কে কাছে পাই নে, শতদলেরা সর্বক্ষণ ঘিরে রয়েছে। মনে হয়, সৎমা তুমি আমার—ওরাই সব আসল।

লীলা স্নেহভরে ওদের একটি-দুটির দিকে চেয়ে জবাব দেয় : তোমার দাদা আছে, দিদা আছে—মা না হলেই বা কি? দুনিয়ার ভিতরে ওদের তো শুধুই আমি—একমাত্র মা-ই শুধু।

শিশুদের [illegible] প্রতিষ্ঠান—[illegible] [illegible]। শতদলের ব্যাপার নিয়েই [illegible] [illegible] কাছে ঠোঁট ফুলায়। প্রতিষ্ঠাতা বীরেশ্বর, এবং তাঁর যৌবন [illegible] উৎসাহী বন্ধু কয়েকটি।

ছোট এক ঘটনা। যশোরে থাকতে ভোরবেলা কয়েকজনে মিলে [illegible] [illegible] মাঠে বেড়াচ্ছিলেন, অদূরে ভুঁইচাঁপা-বনের ভিতর দেখলেন [illegible]। [illegible], [illegible] ঠাহর হল, কাপড়-চোপড়ে [illegible] [illegible] [illegible] শিশু একটি। [illegible] দিকে [illegible] দিয়েছে কেউ। বীরেশ্বর বসে পড়লেন সেই বাসনের মধ্যে, বাচ্চাকে তুলে ধরলেন। ভুঁইচাঁপার জঙ্গলের ভিতর থেকে শতদল-পদ্ম যেন ঝলমল করে উঠল—আহা, কত দুঃখে যে বিসর্জন দিয়ে গেছে মা-হতভাগী! দেহ তখনো উষ্ণ, বুকের নিচে ধুক ধুক করছে প্রাণটুকু। বীরেশ্বরের সংগী এক-জন ছুটে গিয়ে একটুকু দুধ জোগাড় করে আনলেন একবাড়ি থেকে। রুমাল ছিঁড়ে ইতিমধ্যে সলতে পাকানো হয়েছে। বীরে-শ্বর বাচ্চাকে কোলে তুলে নিয়ে দুধে ভিজিয়ে সলতে মুখে ধরছেন, চুক চুক করে কেমন খাচ্ছে স্তন্যপানের মতন।

এবারে কি হবে? কমলবাসিনী শুচিবেয়ে মানুষ, কুড়ানো বাচ্চা নিজের বাড়িতে নিয়ে তোলা অসম্ভব। বন্ধু-দেরও সেই অবস্থা—টাকাপয়সার সাহায্য করতে রাজী, কিন্তু দায়িত্ব কে নিতে যাবে? ভেবেচিন্তে বাচ্চাটাকে কোত-য়ালির থানায় নিয়ে জমা দিলেন। ও সি-র ছেলে কলেজে পড়ে, সেই সূত্রে বীরেশ্বরের কিছু জানাশোনা ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি বললেন, আপনি যত্ন করে নিয়ে এসেছেন, লোকত ধর্মত একটা কোন সুব্যবস্থা করে দিতে আমি বাধ্য। আইনতও বটে। কিন্তু উপায় ভাবতে গিয়ে থই পাচ্ছিনে। কলকাতায় নানা রকম সমিতি আছে, মফস্বল-শহরে কার মাথাব্যথা পড়েছে এসব নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করবে? অথচ হেলাফেলাও আর চলে না—আকচার এই জিনিষ। পথে-ঘাটে জলে-জঙ্গলে রাত্রিবেলা চুপিসারে খই-মুড়ির মতন ছড়িয়ে যাচ্ছে। তবে স্যার, সবই প্রায় মরা—জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নুন গালে পুরে মেরে রেখে যায়। আমাদেরও হাঙ্গামা কিছু নেই—খানিকটা হাই-হুই করে কচুরিপানার গাদে ঢুকিয়ে দিলেই হল। জ্যান্ত আছে বলেই এটিকে নিয়ে মুসকিল। সার্কেল-অফিসার আমাদের হামিদসাহেবের স্ত্রী বন্ধ্যা—শুনেছি তিনি একটা বাচ্চা মানুষ করতে চান। বলে-কয়ে তাঁর ঘাড়ে গছানো যায় কি না দেখি।

বীরেশ্বরকে পুনশ্চ অভয় দিলেন : নির্ভাবনায় চলে যান স্যার। আপনি হাতে করে দিলেন—ফেরত নিতে হবে না, ব্যবস্থা করবই—দু-এক দিনের মধ্যে হয়ে যাবে।

মিথ্যে স্তোক দেন নি ও. সি. সাহেব। ব্যবস্থা হয়েছিল, এবং দুদিনের [illegible]। বাচ্চাকে আর [illegible] আনতে [illegible] নি. দুদিন পরে খবর নিতে গিয়ে শুনলেন মরে গেছে। কিন্তু ব্যবস্থাটুকু শক্ত করে দিলেন—খোদা না মানুষ, জান-বার উপায় নেই। বাপ-মায়ের ভুল হয়ে গিয়েছিল—নুন খাইয়ে প্রাণটুকু শেষ করে দেবার কথা। সেই ভুল অন্য কেউ সংশোধন করে সর্বসমস্যার সমাধান করে দিল কি না, বীরেশ্বরের চিরকাল সন্দেহ রয়ে গেল।

বীরেশ্বর তারপর উঠে পড়ে লাগ-লেন। ভ্রূণহত্যা ও শিশুহত্যা অজস্র চারিদিকে—ডাক্তার-বন্ধুদের কাছে বিবরণ শুনে শিউরে উঠতে হয়। চোখ বুজে থাকলে হবে না। পাপ ও সামাজিক ক্ষতিরোধের চেষ্টা করতেই হবে।
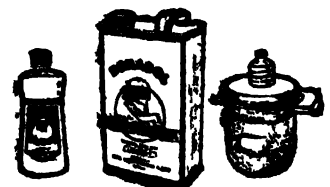
দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধ চলছে, প্রৌঢ় বয়সে তখনও বীরেশ্বরের উদ্যম ও কর্মশক্তি প্রচুর। ভূতপূর্ব ছাত্রদের অনেকেই নানান বৃত্তি নিয়ে জমিয়ে বসেছে। বন্ধুবান্ধবও অনেক। সকলের শ্রদ্ধা ভালোবাসা বীরেশ্বরের উপর। যশোরের মতন সামান্য শহরে তাঁরা এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন পিতৃপরিচয়হীন ছেলেমেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণ ও মানুষ করে তোলার জন্য। নাম দেওয়া হল: পঙ্কজ-বিহার। বিহারের যারা বাসিন্দা তারা সব পঙ্ক থেকে উঠে এসেছে, সেই বিচারে নামকরণ। বিহারের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হয়ে এলেন মৃণালিনী দেবী নামে এক বিধবা ভদ্রমহিলা। কাজটা তিনি ভালবেসে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করলেন। দেখতে দেখতে পঙ্কজ-বিহার জাঁকিয়ে উঠল, নাম ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। অনেক দূরের কলকাতা অঞ্চল থেকেও বাচ্চা বয়ে এনে বিহারে দিয়ে যায়।

তারপরে দুর্দিন এলো বিহারের। দেশ ভাগ হয়ে বিশৃঙ্খল অবস্থা। মানুষজনের ছুটোছুটি—কে কোন দিকে পালাবে দিশা করতে পারে না। অনেক শতাব্দী ধরে যেমন চলে আসছিল—পলকের মধ্যে সব উল্টোপাল্টা হয়ে গেল। পঙ্কজ-বিহারের কর্তাব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই হিন্দুস্থানে চলে গেলেন, কেউ কেউ মারাও গিয়েছেন ইতিমধ্যে। সকলের বড় সর্বনাশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মৃণালিনী দেবী মারা গেলেন বিহারকে যিনি প্রাণের অধিক ভালবাসতেন। পঙ্কজ-বিহার টিমটিম করছে। পঞ্চাশ-ষাটটি বাচ্চা ছিল, সেখানে পাঁচ-সাতটি এসে দাঁড়িয়েছে। সরকারি সাহায্য এখন কাগজে-কলমে হিসাবের মধ্যেই আছে, টাকা বড় একটা হাতে আসে না। মৃণালিনীর পর যিনি নতুন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হয়ে এলেন, তাঁর মাস-মাইনেটাও জোটানো সঙ্কট হয়ে উঠেছে ইদানীং। কমিটির সভাপতি বীরেশ্বর একা আর সামাল দিতে পারছেন না। তাঁরও মন ভাল নয়, ছেলে-বউয়ের খবর নেই। তারপর কুন্তী কোন রকমে এসে পৌঁছল, তার কাছে লাহোরের বৃত্তান্ত পাওয়া গেল। পুত্রশোকে কমলবাসিনী পাগলিনীপ্রায়। বিহারের দরজায় এর পরে পুরোপুরি তালা পড়ে গেল।

রিটায়ার করার পর গাঁয়ে চলে গিয়ে প্রচুর অবসর, কাজ-কর্মের মধ্যে না থাকলে মন হু-হু করে। তবু নাতনিটা আছে। ফুল্লরা কিছু বড় হয়েছে, তাকে নিয়ে বুড়ো-বুড়ি দুজনেরই দিব্যি কেটে যায়। বীরেশ্বর পড়ান ফুল্লরাকে, তার সঙ্গে গল্পগাছা বেড়ানো। গাঁয়ের উপর নতুন করে বিহার গড়ে তুলবেন, এই সময়টা মাথায় এলো। নাম পালটানো হল। পঙ্কজ-বিহার নয়—শতদল এবারের নাম। বাচ্চাদের কোথায় উদ্ভব সেটা তুলে ধরবার কি গরজ? খানিকটা যেন নৃশংসতার ছাপ ছিল পুরনো নামের মধ্যে। যা ভাবা হয়ে উঠবে সেই বস্তু ঝলমল করছে এবারের নতুন নাম 'শতদলে'। অথচ অর্থের দিক দিয়েও মিল রয়েছে। পাকিস্তান হবার পর স্থানীয় কর্তা যাঁরা হয়েছেন, অনেকেই তাঁরা বীরেশ্বরের ছাত্র। প্রতিষ্ঠান যশোর থেকে গাঁয়ে সরিয়ে সম্পূর্ণ নিজের এক্তিয়ারে নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা এ ব্যাপারে দরাজ হাতে সাহায্য দিচ্ছেন। আগের সুনাম আছে—বাচ্চাও দু-চারটি এসে গেল।

বাচ্চাদের দেখিয়ে বীরেশ্বর লীলাকে বললেন, মুখের পানে তাকিয়ে দেখ মা। বড় দুর্ভাগা—দুনিয়ার উপর কেউ নেই। বাপের সাকিন নেই—হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ-খৃস্টান কোন ধর্মেরই ছাপ পড়ে নি এদের গায়ে—

বীরেশ্বর একটু হাসলেন: তোমার বদলা নেবার প্রতিজ্ঞা—সে এলাকার বাইরে পড়ে গেল। জন্মা—মুসলমান কি হিন্দু কিম্বা অন্য-কিছু, ধরবার উপায় নেই। মাইনে নিয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেলা অঢেল মেলে, কিন্তু মা হয়ে বাঁচিয়ে তুলবেন, মৃণালিনী দেবীর পরে তেমনটি আর পেলাম না। মৃণালিনীরা গণ্ডায় গণ্ডায় আসেন না জানি। কিন্তু তেমনি একটি মেয়ের অভাবে যশোরের অমন বিহার ধ্বসে পড়ল। তোমায় ডাকছি মা আমার সঙ্গে। বাইরের যাবতীয় বন্দোবস্ত আমি দেখব, তুমি এদের মা-জননী হও।

আকুল প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলছেন, অস্বীকার করা কঠিন। তবু ইতস্তত করে লীলা বলল, কী অবস্থা আমার হয়েছিল সে কি ভুলে গেলেন বাবা? ডাক্তার রহমান বিস্তর কষ্টে ভাল করে তুলেছেন, কিন্তু মাথা আবার বিগড়াতে কতক্ষণ?

বাচ্চাদের কাজে যদি থাকো বিগড়াবার মতন সময়ই পাবে না তোমার মাথা। ঝামেলা কী রকম নিয়ে দেখ। পাকাপাকি ভার না নেবে তো নেহাৎ ছ মাস এক বছরের জন্য নাও।

অনিচ্ছুক লীলা নীরবে মেঝের উপর আঁচড় কাটে পায়ের নখে। তাকিয়ে দেখে বীরেশ্বর বললেন, এমন একটা মহৎ জিনিষ লোকের অভাবে ঠিকমত চালু হতে পারছে না। কাজ চালাতে থাকো তুমি, আমিও লোকের সন্ধানে রইলাম। আর লোক পাই ভাল না পাই ভাল, তোমার কাছে কথা দেওয়া রইল—অনিচ্ছা যে মুহূর্তে জানাবে, সঙ্গে সঙ্গে তোমার রেহাই দেবো। শতদলের স্বার্থ ভেবে আটকাতে যাবো না। আমার উপর বিশ্বাস রাখো, অস্থায়িভাবেই তুমি ভার নিয়ে দেখতে পারো।

এর পরে আর কিছু সে বলতে পারে নি। শতদলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লীলা। কাজটা অস্থায়িভাবে নিয়েছিল—দরকার হলেই ছেড়ে দিতে পারবে, এই চুক্তি। সেই থেকে চলেছে—দরকার আজও হয় নি, হবে কোনদিন মনে হয় না। এক-ফোঁটা সেই ফুল্লরা কত বড় হয়ে গেল, কমলবাসিনী তো তাগিদ দিয়ে দিয়ে বীরেশ্বরকে পাগল করে তুলেছেন: নাতনি সেয়ানা হল, তা যে মোটে নজরে পড়ে না! বিয়ে-থাওয়া দাও এইবারে, উঠে-পড়ে লাগো।

বীরেশ্বর খোঁজ-খবর নিচ্ছেন, একে তাকে বলছেন।

[ক্রমশঃ]

কলম ঝর ঝরে। হাতের লেখা মুক্তোর মত। মর্মার্থ যেন চাবুক। গল্প নয়, উপন্যাস নয়, সংবাদ বিচিত্রা বা সমীক্ষাও নয়। চিঠি। এটাও একটা পেশা।

রমানাথবাবুর বর্তমান পেশা। শিশু, পৈতে, শ্রাদ্ধ, স্বস্ত্যয়ন থেকে চার্জশীট, ছাঁটাই, লে-অফ, লক-আউট, ক্রোজার ইত্যাদি ইত্যাদি নানারকমের পত্র-বিনিময়ে রমাবাবুর মুক্তাক্ষর আজকাল হামেশাই নজরে পড়ে। বেলেঘাটা-মাণিকতলা অঞ্চলে যে-কোন কারখানার শ্রমিকেরা চার্জশীট বা লে-অফের নোটিশ দেখলেই বলে দেয় রমাবাবুর ড্রাফট।

আইনটা মন্দ নয়। দু'কলম লিখে দুটো পয়সা আয়ের ব্যবস্থা। এতে সরাসরি ক্ষতি করার ইচ্ছে রমাবাবুর নেই। কিন্তু ক্ষতি লোকের হয়। শ্রমিকদের চাকরি যায়, কারখানাও বন্ধ হয়। কিন্তু রমাবাবু আর করবেন কি? মালিকদের ইচ্ছে। তাঁর কলমের মারফতে জন্ম নেয়, তার বেশি কিছু নয়। রামরতিকলাল কারখানার মালিক বলে, রমাবাবু সোনার কলমে লেখে ....।

পাড়ার লোকেরা সময় সময় বলে এত কায়দার চিঠি না লিখে দিলে কি হয়। একটা লোকের চাকরি গেলে একটা নতুন চাকরি পাওয়া কি মুখের কথা......।

রমাবাবু হেসে বলেন—আরে ভাই আমার কি কারুর ভাত মারার ইচ্ছে। আমিও তো ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘর করি ..। তা তোমাদের ইউনিয়নের জোর থাকে তো লড়ে যাও না। আগুনও স্ট্রাইক......।

তোমরা আছ বলেই তো আমারও দু পয়সা আসে। আইন যেমন আছে তেমনি আমার চিঠিতে ফাঁকও আছে। ভাল করে পড়লেই জবাব খুঁজে পাবে।

শোনা যায় রমাবাবুও নাকি একজন ছাঁটাই কর্মচারী। কোন বিলাতী সওদাগরী অফিসে চাকরি করতেন। কোম্পানীটা হঠাৎ কয়েকটা ডিপার্টমেণ্ট গুটিয়ে দেবার জন্য, সিনিয়রিটির হিসাব করে কোম্পানী কিছু লোককে বলে—ছাঁটাই করার ইচ্ছে কোম্পানীর নেই, তবে স্বেচ্ছায় যদি অবসর গ্রহণ করে তাহলে বেশ মোটামুটি টাকা দিয়ে তোমাদের বিদায় দেবে।

এমনি করে রমাবাবুর ডিপার্টমেণ্টেও একদিন কর্তৃপক্ষের প্রস্তাব এল। রমাবাবু ব্যাপারটা নিয়ে ইউনিয়নের মিটিং-এ তুলে, খুব তোড়জোড় করে একটা আন্দোলন সংগঠিত করবার মুহূর্তেই কোম্পানীর এক বড় কণ্ট্রাক্টর রামরতিকলাল বললে—বাবু আন্দোলন করে আর না হয় বছর দুই চাকরিটি করবেন। কিন্তু আমরা তো বুঝি, এটা আর সেইরকম বিলাতী কোম্পানী নেই। এর অনেক হাত-পরাত হয়েছে। শেষে কারুরই চাকরি আর থাকবে না, আন্দোলনে জড়ালিয়ে নতুন বাধা এরা ভাঁজছে। তার চেয়ে আপনি এই ব্যবসাটা চালু করুন।

কি ব্যবসায়? রমানাথ ভেবেই খুন?

কেন ঐ আপনার হাতেই রয়েছে।

রমানাথবাবু তাও বোঝেন না, কি বলছে রামরতি? পুঁজি-পাটা নেই কিসের ব্যবসায়? আর কত টাকাই বা দেবে কোম্পানী তাঁকে? রমানাথ রীতিমত ঘেমে উঠেছিলেন।

রামরতি বললে—"আরে বাবু আপনি তো বিল ক্লার্ক। আপনার তাগাদার চিঠিগুলো পেলে রাত-দুপুরে হুণ্ডি কেটে টাকা তুলে কোম্পানীর পায় ঢালতে হয়। তাই বলছিলাম ঐ কলমটাকে একটু আমাদের দিকে ঘুরিয়ে ছ্যাচড়া পার্টিগুলোর কাছ থেকে টাকাগুলো একটু যদি আদায় করে দিতে পারেন তাহলে আপনার পয়সা খায় কে? আমি একা রামরতি নয়, আমার মত হাজার ক্লায়েণ্ট আপনাকে ধরিয়ে দেবো। রামরতিকের বুদ্ধির তারিফ করেন রমাবাবু।

কলম ভালই চলছে। সোনার কলম রমাবাবুর। মেয়ের বিয়ে দিলেন। খোকনকে হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করিয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি করে দিলেন। কলকাতায় ভাড়াটে বাড়ি ছেড়ে

ঝুলালেন। সঙ্গে ছোট একটা ফুলবাগান। একটা রিক্সা সাইকেলের গ্যারেজ, খান-তিনেক রিক্সা কিনে স্ত্রীর নামে সত্যি-কারের একটা ভাড়ার ব্যবসা খুললেন।

কিন্তু রমাবাবু দিশাহারা হয়ে পড়লেন ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট কায়েম হবার সঙ্গে সঙ্গে। ভীমরুলের চাকে কাঠির খোঁচা লাগলে যেমন অবস্থা হয়...। ঠিক সেই অবস্থা। ছুতোয়-নাতায় লাইন দিয়ে কারখানা বন্ধ। চারদিকে শুধু ছাটাই, ঘেরাও, লে-অফ, লক-আউট স্ট্রাইক।

সরাসরি যেন দুটো সীমান্ত...। কেউ কারুর কথা সহ্য করে না। হাজারে হাজারে বেকার মানুষের ভিড়। লিখতে লিখতে আঙুলগুলো ব্যথা হয়ে যায় রমাবাবুর। রাত্রে ঘুম হয় না..। খালি মনে হয় কেন এই ব্যবসায় হাত দিয়েছিলেন তিনি। নাঃ আর না...। এইবাবে শেষ। কিন্তু কে কাকে ছাড়ে। নোটিশ লিখলেই নগদ টাকা।

দেখতে দেখতে যুক্তফ্রন্টের গভর্ন-মেন্টের পতন হল, কিন্তু কারখানাগুলোর সমস্যা খুব মিটল বলে মনে হয় না। রামরীকের কারখানা খুলল বটে তাও পুলিশ দিয়ে ২০০ লোককে ছাটাই করে। প্রসিকশান হচ্ছে না। ইউনিয়নের সেক্রে-টারী বেচারাকে জেলে পাঠাল রামরীক। আরও কয়েকজনের নামে ওয়ারেন্ট। সব অভিযোগগুলোই রমাবাবুর হাতের লেখা। রামবীক আহ্লাদে আটখানা। সত্যি রমাবাবু আপনার হাতখানা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখতে ইচ্ছে করে। রমা-বাবু বলেন না রামরীকবাবু আমার হাতে বোধহয় পক্ষাঘাত হবে। কত মানুষকে পথে বসিয়ে দিলাম তোমার কথায়। আমাব হাত তো সোনা দিয়ে

ঐ লক্ষ্মীনারায়ণ আর গোকুল গড়াকেকে কি দেবে। হারামজাদারা যে তোমার কথায় ২০০ লোকের পেটে লাথি মেরে ছমাস পরে কাজে ঢুকল...।

রামরীক এবার হাসিতে ফেটে পড়ে। সেও আপনার হাতে রমাবাবু, ওদের ডবল প্রমোশন হবে......।

রামরীকের কারখানার ইউনিয়নটা ভেঙে তছনছ করে ঐ কারখানার দুই সহকারী সেক্রেটারিকে রামরীকের হাতে সঁপে দিয়ে রমাবাবু কলম আর হাতকে দিনকতক বিশ্রাম দেবার জন্য একবার ব্যারাকপুরে গিয়ে বসলেন। কলকাতার নাম আর মুখেও আনেন না। মালিকরা খবর দিলে, বলেন শরীর খারাপ।

রমাবাবুর স্ত্রীও যেন এতে খুশি। ঘর, বাড়ি, বাগান নিয়ে স্বামী-স্ত্রী ক'দিন মেতে আছেন। রমাবাবুর স্ত্রী বললেন ভাল করেছ কলকাতা ছেড়ে। যথেষ্ট হয়েছে আর কাজ নেই। ভাল ব্যবসা ধরেছ তুমি। এতে লোকের অভিশাপ কুড়নো ছাড়া আর কিছু নয়। এবার কারখানাওয়ালাবা হাজার ডাকলেও আর নয়। বিয়ে, পৈতে, এটা-সেটা শুভ-কাজের লেখা-লেখি কর.। আচ্ছা তুমি গল্প লিখতে পার না? চেষ্টা কর না একটা উপন্যাস লিখতে। রমাবাবু বাগানের সূর্যমুখী ফুলগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেন. ঐ ফুলগুলো সূর্যের দিকে মুখ করে রোজ অমন করে নিজেকে খুলে ধরে কেন জান?...রমা-বাবুর স্ত্রীর সারা মুখটা লাল হয়ে ওঠে স্বামীর পরিহাসে বুড়ো বয়সেও ঐ সব ছ্যাবলা কথা..জানি আমি ওরা কি চায়। ...পায় না ..পারে না...তাই বলবে

অন্যকে লোকে।"

আর যাই হোক রামরীকের কারখানায় আর যেও না। খোকন সেদিন খুব রাগারাগি করছিল। ওর এক বন্ধু ওর কারখানায় কাজ করতো। গত বছর নতুন বিয়ে করেছিল। রেডিও, ঘড়ি যা পেয়ে-ছিল সব খোকনকে বেচতে এসেছিল মাত্র পঞ্চাশ টাকায়...। ফিলিপস্ রেডিও...।

খোকন আমার কাছ থেকে একশ টাকা ধার করে ওকে দিয়েছে...আর কি সব যা-তা তোমায় বলছিল...। আমি খুব ধমক দিলাম...।

রমাবাবু বললেন—তোমায় কি উত্তর দিলে ও, বলে চোরের সাহায্য যে করে সেও...সমান পাপী।

সেদিন ভোরে উঠে গাছে জল দিতে দিতে হঠাৎ গাড়ির হর্নে চমকে ওঠেন রমাবাবু। প্রথমে ভেবেছিলেন যে জামাই বিজেশ। নাঃ রামরীকলাল। আবার রামরীকলাল। কি ব্যাপার। না ব্যাপার ভালই। এখন তো ভালই দেখছি। তা আপনি এই ভোরে...।

রামরীক যথা নির্ধমিত কায়দায় বললে —রমাবাবু আপনি এ লাইন ছেড়ে দিয়ে-ছেন আমি শুনেছি। কিন্তু আমি ত' আপনাকে জানিয়েছিলুম, তাই আপনার হাতে শেষ চিঠিটা লেখাতে চাইছি। তার মানে লছমীকে তাড়াতে হবে।

সে কি? লছমীকে আবার?

না শুধু তাড়ানো নয়, ওকে জেল খাটাতে হবে। ও ব্যাটা পাকা বেইমান। দশদিন না যেতেই আবার মাও পেশ করেছে। সেই বোনাস, ডবল ওভারটাইম, আগড়-বাগড়..। তাই আমি একটা বুদ্ধি এঁটেছি, ও-ব্যাটা আমার বাড়িতে যাতায়াত করে। আমার মেয়ে মঙ্গলা ওকে একটু সুনজরে দেখে। ওকে তাই ফাঁসিয়ে দেবো ঐ চার্জে। তাই লছমীকে পনের দিনের ছুটি দিয়ে, মঙ্গলাকে পাঠিয়েছি আগ্রায় ওর মামার বাড়ি। লছমীয়া গেছে ওর সঙ্গে ওকে পৌঁছে দিতে...ওখানে ক'দিন থাকবে ওরা একসঙ্গে...। এর পর যা করতে হয় বাকিটা আপনার কলমকে আদেশ করুন।

রাম রাম রামরীকলাল, আপনি অত নিচে নেমেছেন কেন আজ-কাল? নিজের মেয়েকে দিয়ে......

আরে থামুন মশাই, লছমীর কথা রাখে নি। অতগুলো টাকা ক্যাশ মেরে নিয়ে দশ দিন না যেতেই জরুরী পিটিশন দিয়েছে। হাইই প্রেসকেসেলোর অফিসার দাবি সমেত।

এখন কোথাকার জল কোথায় গড়াবে...। বলে লোক কমাবার কথা, দালালী করে কমিয়ে দিয়েছি, তাই বলে বোনাস ছাড়বো কি করে। এতদিন কারখানা বন্ধ ছিল...এত ধার-দেনা হয়ে গেছে মানুষের...।

তাই বলে রামরীকলাল এতবড় একটা নোংরা কেস......

আরে ছাড়ুন কর্তব্যের খাতিরে অনেক কাজ করতে হয়। আমি ত' দাতব্য করতে বসি নি, লাভ করতে চাই...।

রমাবাবু বললেন—মাপ করবেন, আমি এ কাজ ছেড়ে দিয়েছি, ভগবানের নামে শপথ করছি...।

রামরীকলাল এবার হিংস্র নেকড়ের মত দাঁত খিঁচিয়ে বলে—ভগবানের নামে এও শপথ করেছেন যে রামরীকলালের কয়েক হাজার টাকা মেরে নিয়ে বাড়ি বাগান হাঁকিয়ে নিয়ে...তার কারখানায়, ছেলেকে দিয়ে ইউনিয়ন করিয়ে আরও কিছু মোটা টাকা আদায় করতে হবে এই রামরীকলালের কাছে ওটা হবে না। আপনার ছেলে যত বড়ই ইঞ্জিনীয়ার হোক না কেন? কলেজের পড়া ছেড়ে আমার গেটে এসে এবার মিটিং করতে এলেই ওকে জেলে পাঠাব। পাঁচ বছরের মত তার মুখ দেখতে পাবেন না।

রমানাবুর হাত থেকে জলের পাত্রটা পড়ে যায়। মাথার ভেতর কি সব পোকা-মাকড় যেন একসংগে কামড়াতে থাকে। চোখে যেন সর্ষেফুল অদ্ভুত দেখছেন রমাবাবু। ... রংটা যেন কি রকম শাদা, ... আসছে। কে যেন ওর সমস্ত ... নিয়ে শাদা করে দিচ্ছে সে প্রতি মুহূর্তে।

"আমার খোকন তোমার কারখানায় গেটে মিটিং করছে। ওদের ভাঙা ইউনিয়ন আবার জোড়া দিয়ে দিয়েছে খোকন। লছমীকে দলে টেনে নিয়েছে ওরা আবার। দালাল বলে মারে নি? আবার স্ট্রাইকের জন্য তৈরি হচ্ছে......।

কিন্তু তুমি ওকে জেলে পাঠাবে কেন? রমাবাবুর স্ত্রী হঠাৎ ওদের কথার মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন, বললেন—ওঁর টাকা আছে। উনি ত' দাতব্য করতে বসেন নি, লাভ করতে চান তুমি তো জান...? এখন নতুন করে জিজ্ঞাসা করছ কেন? দাও ওঁকে একটা চিঠি লিখে! তোমার খোকনকে বাঁচাতে হবে ত'।"

রমাবাবু স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন তাঁর রামরীকের চেয়েও "আর একধাপ এগিয়ে যেতে চায়।"

বললাম কৈ দাও কাগজ-কলম।

আর একটু ... হয়ে উনি স্ত্রী রামরীকবাবুকে বললেন ... রামরতী আর ... [illegible]। ও চিঠিতে

আর কাজ হবে না। আপনি বরং খোকনকে জেলেই পাঠিয়ে দিন। তখন আবার ওঁর কলম চলবে তীরের মত...।

আর বাগানের পূব দিকের সূর্য-মুখী গাছগুলোর দিকে আঙুল তুলে বলেন, "ও গো দেখ, আজ চারটে সূর্য-মুখী ফুটেছে একসংগে। দুটো বড় দুটো ছোট। একসংগে চারটেই কেমন চেয়ে আছে সূর্যের দিকে। যেন আমি, তুমি, লছমী আর খোকন একই সংগে এক সূর্যকে দেখছি। অথচ কে কি চোখে দেখছি জানি না..। তখন একরাশ ধুলো উড়িয়ে রামরীকের গাড়িটা বহুদূর চলে গেছে। পকেটের রুমালটা বের করে কপালের ধুলো ঝাড়েন নীরবে রমানাথবাবু!

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

প্রাগে সেবার একটা খুব মজার ব্যাপার হল।

বিশ্ব ছাত্র সংস্থার (ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ স্টুডেন্টস) উৎসব হচ্ছে প্রাগে। পৃথিবীর বহু দেশ থেকে ছাত্র-ছাত্রী যুবক-যুবতীর দল এসেছে। ইতালীর ছাত্র সংস্থা পাঠিয়েছে বিরাট এক বাহিনী বিশেষ। ফ্রান্স থেকেও নেহাৎ কম আসে নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, বৃটেন, আমেরিকা—সকলেই তাদের মনোনীত এবং নির্বাচিত ছাত্র প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। আফ্রিকা থেকে নিগ্রো-অনিগ্রো ছেলেমেয়েরা এসেছে। পূর্ব ইউরোপের গণতন্ত্রগুলো থেকে বিরাট বিরাট প্রতিনিধিদল উপস্থিত হয়েছে। উত্তর কোরিয়ায় তখন মার্কিন বোমারুর উৎপাত। সেখান থেকেও বেশ কিছু ছেলেমেয়ে লম্বা রাস্তা পাড়ি দিয়ে চলে এসেছে।

ভারতবর্ষ থেকে সোজাসুজি কেউ আসতে পারে নি। তখন নানা রাষ্ট্রের মাধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষ বৈদেশিক সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করছিল। সোভিয়েত বা পূর্ব ইউরোপ সম্বন্ধে তখন এ দেশের ক্ষমতা-প্রাপ্তদের বেশ বিরোধ ভাব। বিরোধের চাইতে ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া ভাব বললে হয়তো আরও ঠিক বলা হয়। কমিউনিস্ট বা সমর্থকদের (তখন যেমনো [illegible] বলা হত) বিদেশ যেতে দেওয়ার ব্যাপারে প্রচণ্ড ওজর-আপত্তি উঠত। তারই মধ্যে দিয়ে অবশ্য আমরা কিছু ছেলেমেয়ে আঙুল গলিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম।

ভারতের প্রতিনিধিরা সবাই এসেছিল ইউরোপ থেকেই। ইংল্যাণ্ড থেকে মস্ত ভারতীয় ছাত্রের দল এল—'ফেডিশন'-এর পক্ষ থেকে। আমরা চারজন এলাম হাঙ্গেরী থেকে। মন্টু দিলীপ, উমা এবং আমি। চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে ছিল ভিমলা রেড্ডি, অজিত, প্রদ্যোত ইত্যাদি প্রায় আট-দশজন। এদের মধ্যে চারজন দক্ষিণ ভারতীয় ছিল। এদের আরও মনে আছে এই জন্যে যে, এরা নিরামিষ খেত। মদ বা বিয়ার ছুঁতো না। সিগারেটও বোধ হয় খেত না। চেকোশ্লোভাকিয়া বা অন্যান্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর [illegible] প্রাচুর্য আসে নি। ফলে মাংস না খাওয়ার এই দক্ষিণ ভারতীয় ছাত্ররা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ল। কিছুকাল পরে এদের টি-বি রোগে ধরেছিল।

এদেরই একজনের সঙ্গে হঠাৎ একদিন বার্লিনে এক রিসেপশনে দেখা। এমন কিছু আলাপও ছিল না। কিন্তু ছেলেটি হঠাৎ এই বিভূঁইয়ে একটি পরিচিত মুখ দেখে ঐ বিরাট লোক গমগমে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেলল। আমি তো অপ্রস্তুত। কিন্তু ছেলেটি চোখের জল মুছে একেবারে মুখর হয়ে উঠল। চেকোশ্লোভাকিয়ার নিরামিষ খেয়ে খেয়ে হয়েছিল যক্ষ্মা। জার্মানীতে এক স্যানাটোরিয়ামে পাঠিয়েছিল ওরা সারবার জন্যে। ভাষা না জানায় অনেকদিন কারুর সঙ্গে কথা বলতে পারে নি। তাই আমাকে দেখে হঠাৎ চোখে এই জলোচ্ছ্বাস।

অবশ্য প্রাগে ছাত্র-উৎসবের সময় এরা সকলেই শারীরিক ভালই ছিল। বেড্ডির পা দুখানা ওকে কষ্ট দিত। ছোটবেলায় হয়েছিল ইনফ্যান্টাইল প্যারালিসিস। আশা করে এসেছিল এদেশে। পা অবশ্য পুরো সারে নি। খানিকটা ভাল হয়েছিল 'পা'-গুলোয় ঘুরে চরে। কিন্তু তার চেয়ে অনেক দামী জিনিস ওদেশে নিয়ে গিয়েছিল—একটি সুন্দরী তরুণী চেক স্ত্রী।

এইসব কাঁড়ন-বাঁড়িয়ে আমাদের ভারতীয় প্রতিনিধিদলে নেই নেই করে কুড়ি-পঁচিশজন জুটে গেল। তরুণ বসু (এখন কলকাতা হাইকোর্টের জজ) ছিল তরুণ স্ফূর্তিবাজ। লণ্ডনে মজুর এলাকা সেন্হাতে থাকত। ছাত্র সংগঠনের পাণ্ডা-গোছের ছিল। দিলীপ বসুর সে সময়ে কেমিস্ট্রিতে খুব নাম। তার বরাবরই 'দাদা দাদা' ভাব। তরুণ বলত—'এক রকমের লোক আছে—জোয়ানীরা পেট থেকে পড়েই দাদা হয়ে যায়।'

ভারতীয় ডেলিগেশনের চেহারাটা মোটের ওপর সেই সুকুমার রায়ের [illegible] রামের ভাইদের মতই ছিল। কেউ পায়জামাতে, কেউ ধোঁয়ায়। কেউ বা কাঁদুনে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু [illegible] ভারতীয় ডেলিগেশনের [illegible] [illegible] [illegible] ছিল—কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কেবলই যাও এই বলে হেতু কি খাতির কি খাতির!

সেই গল্পই বলব। সব ডেলিগেশন তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক গ্রুপ এনেছে। বিরাট খোলা মুক্ত অঙ্গন তৈরি হয়েছে উৎসব-সন্ধ্যাগুলোকে সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় জাঁতিয়ে তোলার জন্যে। দিনের বেলায় হচ্ছে সিমপোজিয়াম সম্মেলন, আলোচনা বৈঠকগুলো। সন্ধ্যেবেলায় মুক্ত আকাশের নিচে উদাত্ত প্রাণখোলা গান, নাচ, বাজনা নাটক আবৃত্তি হচ্ছে। সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়া ভেঙে দর্শক আসত এইসব মনে রাখার মত সন্ধ্যেগুলোর অংশ নিতে।

কিন্তু আমাদের হল মহা মুস্কিল। পুরনো ঐতিহ্যের দেশ হলেও সাংস্কৃতিক দল আমাদের সঙ্গে ছিল না। তবে সবাই মোটামুটি সুরে বেসুরে জনগণমন গাইতে পারতাম। আর কারো কারোর হয়তো অভিনয় টভিনয়ের নেশা খানিকটা ছিল। কিন্তু তাই দিয়ে তো আর এক লক্ষ দর্শকের সামনে লোক হাসানো যায় না।

দিলীপের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সংগঠকরা বলেছে ভারতকে সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম দিতেই হবে। তখন খুঁজে-পেতে দিলীপ ওর লণ্ডন গ্রুপ থেকে যে 'কনিষ্ঠটি তবলা বাজায় যাত্রা দলে পাঁচ টাকা' পাবার মত গুণী, সেই প্রমোদ ব্যানার্জীকে দিল পরিচালনার ভার। নাটক হবে। স্বরচিত স্বদেশী নাটক।

প্রমোদের গানের গলা ভাল ছিল বলে যে সে কি করে পরিচালক হতে পারে আমরা বুঝতে পারলাম না। দিলীপ আমাদের কি সব হিন্দুশাস্ত্রের সংস্কৃত কথা তুলে বুঝিয়ে দিল যে বিভূঁইয়ে নিয়মো নাস্তি। ফলে একটি না-লেখা নাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রী হিসেবে আমাদের ওপর নিয়মিত মহড়ার হুকুম জারি করে দিলীপ রাজনৈতিক আলোচনা করতে চলে গেল।

এদিকে প্রমোদও সময় পায় না। ধরে কনফারেন্সে ছিল সম্ভবত। কেন না, রোজই মহড়ার সময় ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

বিদ্রোহ

সমসুল হক

কী জন্যে এই সোপান গড়া
রক্ত জমাট তৈরি ইটে,
মাথার ভেতর কে ফুলেরা
গল্প দিয়ে সাজায় ভিটে?

কী জন্যে এই বৃক্ষ রোপণ
শক্ত দাঁড়ির বেড়ায় ঘের
বুকের ভেতর বয় কি গোপন
বিদ্রোহী আজ সব ভৃত্যেরা?

বলে যেত—'ভাল করে রিহার্সাল দাও।' আমরা যে যার আড্ডা দিতে বসে যেতাম। খুব হাসাহাসি হত প্রমোদের দায়িত্বজ্ঞান এবং দিলীপের নেতা নির্বাচনের ক্ষমতা নিয়ে। কিন্তু তাতে খুব একটা লাভ হত না। দিন এগিয়ে আসছে। পোস্টার বেরিয়ে গেছে। অথচ আমরা যে তিমিরে সে তিমিরে। আমাদের দলে তখন অনেকেই ছিল যারা পরে সাংস্কৃতিক কর্মী হিসেবে নাম করেছে। শান্তি চৌধুরী (এখন চিত্র পরিচালক) তখন নেহাৎই ছাত্র। এরকম আরো অনেক ছিল যারা জানত, বুঝত—কিন্তু কি করা যায়। হাত পা বাঁধা।

শেষে দিন এসে গেল। ঠিক হল আমাদের নাটকটা হবে খানিকটা ট্যাবলো জাতীয়। একটা ছাত্র ছাত্রীদের মিছিল ঢুকবে মঞ্চে। পুলিশ সেজে থাকবে কেউ কেউ। ওরা গুলী করবে। ছাত্র ছাত্রীরা ছত্রভঙ্গ হবার সময় একজন নিহত হবে। তাকে তুলে নিয়ে আমরা চলে যাব। ব্যাস! যবনিকা তো নেই। তাই নিহত বন্ধুকে তুলে নিয়ে যাবার মধ্যে একটা ট্র্যাজিডি ফুটিয়ে তুলতে হবে।

মনে আছে শেষ দিনেও পরিচালকের আসতে একটু দেরি হয়েছিল। মঞ্চে ঢোকার আগে আমরা পৈ পৈ করে বলে দিলাম যেন মোটা ছেলেদের মধ্যে কেউ নিহত না হয়। কেন না, তাকে তুলতে এমন কষ্ট হবে যে নাটকের মাধুর্য থাকবে না। ঠিক হল পুলিশ গুলী করলেই মণ্টু মারা যাবে। হাল্কা মানুষ—আমরা তাকে অনায়াসে তুলে আনতে পারব।

আমরা 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ডাক ছেড়ে মঞ্চে ঢুকে পড়তেই কি হাততালি, কি হাততালি! হাততালি শুনে আমাদের মেজাজ খুলে গেল। মহা মজা করে মিছিল মঞ্চে একটা পাক দিয়ে আসতেই পুলিশদের ভূমিকায় যারা ছিল (মোটা ছেলেদের বুটিশ মনে হবে বলে নেওয়া হয়েছিল) তারা বন্দুক চালাল। মণ্টুর দিকে তাক করে দীপক সেন একবার আর আইজাক একবার গুলী করল। মণ্টু পরম উৎসাহে লম্ফ ঝম্ফ করতে লাগল। মরার নাম নেই। গায়ে এদের মধ্যে কিছু বেশি জোর। আমি সত্যিকারের পুলিশ ঠ্যাঙানোর মত করে আইজাককে বেশ পিটিয়ে দিলাম। আইজাক তো অবাক। বলে 'করছ কি গীতা, সত্যি মেরে ফেলবে না কি?' আমি বললাম—'সাট আপ।' বলে আরও দু' ঘা লাগিয়ে দিলাম। মঞ্চ তখন একটা বেশ 'ফ্রি ফর অল' মারপিট চলেছে। লক্ষখানেক দর্শক বিস্ময়ে স্তব্ধ।

দীপক বেচারী আবার বন্দুক ছুঁড়ল। মণ্টু আবার মরল না। তাই দেখে শান্তি চৌধুরী বেচারী স্রেফ বাস্তবতা বোধের তাড়নায়, পড়ে মরে গেল। শান্তি তখন শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে—বেশ মোটাসোটা। ওকে পৈ পৈ করে মরতে বারণ করা সত্ত্বেও ও-ই মরায় আমরা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। চারিদিক আরও নিস্তব্ধ। শান্তি মৃত অবস্থায় বলতে লাগল—'কি করব মণ্টু কিছুতেই মরছে না দেখে আমায় মরতে হল।'

ঠিক যখন আমরা শান্তির দিকে চেয়ে দাঁত কিড়মিড় করছি (দর্শকরা ভাবছে দুঃখে) তখন মণ্টুর হঠাৎ খেয়াল হল, ওর মরার কথা ছিল। দীপকের পায়ের কাছে ও ধপাস্ করে পড়ে গেল। শান্তিকে তুলতে তুলতে আবার হঠাৎ মণ্টুকে পড়তে দেখে আমাদের পিত্তি জ্বলে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে আমরা প্রস্থানের ব্যবস্থা করছি শুনলাম মণ্টু দীপকের পায়ের কাছে শুয়ে বলছে—'এই দীপক, আমায় তোল্ না।' দীপক বলল, 'হ্যাট্ হ্যাট্—ওদিকে শান্তি মরেছে ওকে কে তোলে তার নেই ঠিক! তুই আগে মরলে আর এমন হত না।'

কিন্তু কি বলব! আমাদের এই পাঁচ মিনিটের প্রচেষ্টা দশ মিনিটের হাততালি পেল। সমস্ত প্রাগের আকাশে যেন মেঘের গর্জন। শেষে আমাদের ভিমলা, তরুণী-দের হাতে ফুল দিল ইতালীর ছেলেরা (ওরা যে কোনো মওকায় ভাব করবে)! তাই নিয়ে আর চীন দেশীয় একটি মেয়ের হাত ধরে ওরা মঞ্চে উঠে জনতার উল্লাসকে অভিনন্দন জানিয়ে এল। ভারত-চীন তখন ভাই ভাই। আর ভারতবর্ষের সম্মান তখন দিকে দিকে।

এতক্ষণ পরিচালক প্রমোদ পৌঁছে গেছে। 'সব ঠিক নি ভাল হবে?' বলে খুব একটা কি জরুরী কাজের ভান করে ও আবার বেগতিক সরে গেল।

এখন এসব মনে পড়লে যা মজা লাগে। তখন কিন্তু খুব ধিক্কার জাগত। আমাদের দিয়ে কোনোদিনই কোনো জিনিসের মান উঁচু করা যাবে না? যা দেখো—নাটকের কথা ছেলের নাচ বলে আহ্লাদ করবে বলে—আমাদেরও তাই থেকে যেতে হবে।

সেই দিনটির কথা মনে পড়লে একজনের মুখ মনে পড়ে মনটা দারুণ খারাপ হয়ে যায়। মণ্টুর কথা মনে পড়ে। সেদিন মঞ্চে ও কিছুতেই মরতে চায় নি। সম্ভবত খুব কম বয়েসে ওকে জীবনের মঞ্চ থেকে ছুটি নিতে হবে বলে। মণ্টুর ভাল একটা নাম ছিল—দেবব্রত গুহঠাকুরতা। এমন আহ্লাদী ছিল ছেলেটা—ওকে কেউ ভাল নামে ডাকতই না। মণ্টু পরে হাঙ্গেরীয়ান মারিকে বিয়ে করেছিল। দুটি ছোট ছেলে আর মেয়ে রেখে ও হঠাৎ একদিন মারা গেল।

খবরটা কাগজে পড়ে আমার প্রাগের সেই অদ্ভুত সন্ধ্যেটার কথা বার বার মনে হয়েছিল।

সাঁকো থেকে দেখা (আষাঢ়, ১৩৭৫) ঃ হরপ্রসাদ মিত্র। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-১২। দাম ঃ তিন টাকা।

হরপ্রসাদ মিত্র শান্তচিত্ত নিসর্গপ্রিয় ধ্যানস্তিমিত অন্তরের কবি। তাঁর "সাঁকো থেকে দেখা' কাব্যগ্রন্থ আর এক নিসর্গ ধ্যানমগ্ন নির্লিপ্ত কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। 'ইহলোক পরলোক ভেদাভেদ অনুভবের/অনিশ্চিত সাঁকোর ওপর' (সাঁকো থেকে দেখা) থেকে বর্তমান কবি দেখছেন জগৎসংসারকে তার রূপরং প্রেমপরিণাম সমেত।

কবির প্রকৃতিপ্রেমের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রকৃতিতে তিনি নিজের মধ্যে অনুভব করেছেন। 'কারণ, সজনের ফুলেল বেড়া আমার নিজের মধ্যেও অনুভব করি' (ছাতা) অজস্র ফুল পাখি লতা গাছ-এর সমারোহ শোভাযাত্রা তাঁর কাব্যে। প্রশ্নচ্ছলে কবি স্পষ্ট বলেছেন, 'সাধ্য কি যে নিসর্গবেগ আমরা রুখি ?' (যাত্রা)। একটি অতি সুন্দর কবিতা "নিসর্গ"তে কবি একটি অনুপম অনুভূতি লাভ করেছেন 'প্রেম বা দুঃখের মতো পাওয়া ছাড়া হারাবার গতি' নেই প্রকৃতিতে।

আধুনিক যুগের সংশয়, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব কেমন তির্যকভাবে 'বোগেনভিলা', 'পিকনিক' 'দ্বন্দ্বময়', 'সন্তোষ' প্রভৃতি কবিতায় রূপ নিয়েছে। সভ্যতা ও ভব্যতার রীতি সম্বন্ধে কবি বলেছেন 'সবাই জানে চালাকিই সভ্যতার শেষ ফসল/ অনেক কিছু না দেখার নামই ভব্যতা।" (যাত্রা)। "সিঁড়ি' কবিতাটি আশ্চর্য ব্যঞ্জনাময়। 'ফাঁকা সিঁড়ি' কোথায় উঠিয়ে নিয়ে যাবে ? সিঁড়ির ধাঁধায় সবাই হাঁটছি যেন।' কিন্তু যেখানে পৌঁছতে চাই সে জায়গাই হারিয়ে গেছে, 'হারিয়ে গেছে আমাদের হৃদয়ের বাড়ি।'

"সাঁকো থেকে দেখা" কাব্যের কবি অহরহ "সময় নামক সাপ"-এর দংশন অনুভব করছেন। 'সময়ের রেজে শ্যামবাজার' (ট্রামে বিশ্চিত) যেতে যেতে শুনেছেন 'সময়ের নদীস্রোতে জীবনের গভীর গর্জন' (বোলাজে বেড়ানো)। যেতে চাইছেন 'অনন্য অন্য ভ্রমণে/সময়-ধারার (ইচ্ছে মতন দুর্গাপুরেই)। বলেছেন, 'সময় আমার ঘুমোতে চায় বৈকালী বোদ্দুরে।' (বৈকালী) কখনো বা তাঁর কাছে 'সময় সমুদ্র নয—মনে হচ্ছে 'ছায়ার শিবির।' (ইন্দ্রিয়ের বেড়া); 'সময় ঝিম্-ঝিম্ করে' (অদ্বৈত)। হারানোর, হারাবার বেদনা-যন্ত্রণা রয়েছে। তার থেকে মুক্তি পাবার জন্যে কবির অনন্য নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গি গড়ে উঠেছে। 'সময়ের জ্বালে সত্যকে ধরে/যেটুকু ধীবর মন/তাতেই আমার সাগর পাহাড় বনবনান্ত সব।' (ক্ষণবন্ধ) কবি তাই শুনিয়েছেন, 'শরীর তোমার নশ্বরতায় মেলে অনন্ত সংবাদ।' (শরীর)।

কি সুন্দর একটি উপমা—'আকাশ যেন ওল্টানো ডিশ' (সকালটা)। 'চাঁদের ফিনিকে' (অদ্বৈত), তারার চুমকি (শরীর) 'চোখের তারায় বুকের গুবুগুবু' (খুকু), 'সপ্তর্ষিলতিকা' (অ্যালবামে ভুবনেশ্বর) ইত্যাদি শব্দচয়নে, 'উপর্যবণময়' (মেঘে আকাশ ঢাকা) 'প্রাণনী' (পিকনিক), 'অপারবণমতি' (খুকু) ইত্যাদি নতুন অথবা প্রায় নতুন শব্দ প্রয়োগে 'মান্ধাতার স্মৃতির ময়দানে' (গুমোট) 'মনের অজন্তা গুহা, কবিতার শ্রবণলতারা' (বাগানে বেড়ানো), 'প্রেমের আঙুলে' (বোধ হয় নক্ষত্র দুলালো) ইত্যাদি রূপকল্পের ব্যবহারে কবি মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। অধিকাংশ কবিতায় ছন্দের দোলা পাঠকচিত্তে সাড়া জাগায়। 'সংবিৎ' শব্দটি একাধিকবার ব্যবহৃত।

বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যে কবি হরপ্রসাদ মিত্র'র "সাঁকো থেকে দেখা" গ্রন্থটি আধুনিক বাংলাকাব্যে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে মনে করি। প্রচ্ছদপট, ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ।

গীতাবিন্দু (নতুন সংস্করণ, ১৯৬৮) বিহারীলাল গোস্বামী। ইম্প্রেসিও। ৮, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬। দাম ঃ তিন টাকা।

বিহারীলাল (১৮৭১—১৯৩১) ছিলেন পূর্ববঙ্গের একটি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তৎকালীন বঙ্গভাষা, ভারতী, প্রদীপ, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তিনি কবিতা ও প্রবন্ধ লিখতেন। 'বঙ্গদর্শন'-এ সেকসপীয়র সম্পাদ- সময় সঙ্গীতের ভাবানুবাদ এবং মূলের অনুবাদ। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ হয় ১৯১৩। সমসাময়িক ভারতী, অমৃত বাজার পত্রিকা, গৃহস্থ, এডুকেশন গেজেট ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা গ্রন্থটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। এ-কালেও গ্রন্থখানি সমাদর লাভ করবে। "গীতাবিন্দু"র মুখবন্ধ লিখেছেন বিহারীলালের পুত্র শ্রীপরিমল গোস্বামী।

শ্যামল ও ধূমল—স্বামী প্রত্যাগাত্মানন্দ সরস্বতী ঃ প্রকাশক—কালীপদ মৈত্র, ৭৭, যতীন দাস রোড, কলকাতা—২৯। মূল্য ঃ এক টাকা।

শ্রীশ্রীধূমাবতী রহস্যটিকে ভাবনা এবং কল্পনার কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে এই কাব্য-গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। সন্ন্যাসী কবি তাঁর এই কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে বলেছেন যে, ক্ষুদ্র তৃণ হইতে ব্রহ্মা পর্যন্ত সবাই জরা-কবলিত হতে চাচ্ছে—কেন এই বিশ্বজরা ? যেটি ধ্রুবতম সেটিও ক্ষয়িষ্ণু—কেনই বা এই ধ্রুবের অপায় ? অনাদি ক্লেশসঙ্কুল জন্মমরণের পথে সংসার-বন্ধের চক্রনেমি কেবলি ঘুরছে, তাতে কি শৈথিল্যের লেশটুকুও লক্ষিত হবে না ? মিথ্যার অন্ধকার বেসাতির মাঝে যেটি সত্য, যেটি স্বরূপ তা কি সংগৃহীত হবে না ? মামুলী কাব্য-গ্রন্থ এটি নয়। অশেষের অনির্বচনীয় বীণাঝংকারে কবির অন্তর অনুরণিত। তাই অপূর্ব এক অনুভূতি ও প্রাণরসে এর প্রতিটি ছত্র সিঞ্চিত। স্বল্প-পরিসরে লেখা এই কাব্যের প্রসাদগুণ পাঠকের অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। চেতনার জগৎকে অতিক্রম করে অধিচেতন মনের যে গভীরতম চিন্তার জগতে কবি প্রবেশ করেছেন সেখানে তাঁর ভাষা ও ভাব শুধু দার্শনিক নয়, যুক্তিবাদী এক বিজ্ঞানী মনের সুস্পষ্ট পরিচয় তার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। চিন্তাশীল পাঠকেরা এই গ্রন্থটি পাঠ করে যথেষ্ট তৃপ্তি লাভ করবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

দি ন্যাশনাল এ্যওয়েকেনিং এ্যান্ড দি বঙ্গবাসী (The National Awakening And The Bangabasi) : শ্যামানন্দ ব্যানার্জী ঃ অভিজাত প্রকাশন পাবলিশার্স, ৪২।১এ, শরৎ বোস রোড, কলকাতা-২০। মূল্য ঃ ২৫ টাকা।

ঊনিশ শতকের শেষভাগে 'বঙ্গবাসী' বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। গ্রন্থটির ভূমিকা লিখতে গিয়ে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, "আমাদের দেশের এই পত্রিকাটি একটি [illegible] হয়ে উঠেছিল [illegible] 'লোকের বাংলা

[illegible]। অর্থাৎ [illegible] এই পত্রিকাটি লোক-প্রিয়তার [illegible] নিয়ে পৌঁছেছিল।"

'বঙ্গবাসী'র এই [illegible] কারণও ছিল। ১৮৮১ খৃস্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর আত্মপ্রকাশ করবার পর এই পত্রিকাটি বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার গুণে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে সেদিনও এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা বিদেশের সবকিছুই অন্ধভাবে অনুকরণ করতে চাইতেন না। 'বঙ্গবাসী' আমাদের দেশের যা কিছু মহৎ, যা কিছু আদর্শনীয় তা পাঠকদের কাছে তুলে ধরে এই শ্রেণীর মানুষকে চমৎকৃত করেছিল। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যময় অতীতের বর্ণনা ছাড়াও বঙ্গবাসী স্বাদেশিকতার আদর্শে এদেশের নরনারীকে দীক্ষিত করেছিল। বৃটিশ শাসনের দুর্নীতিমূলক ক্রিয়াকলাপের সবকিছু পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করে সেদিন তাদের মনে স্বাধীনতালাভের ইচ্ছা প্রবলভাবে জাগিয়ে তুলেছিল 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা। এদেশের ঐতিহ্যের প্রতি এই পত্রিকার শ্রদ্ধার ভাবটিকে তৎকালীন সাহেবীভাবাপন্ন বাঙালীরা ভাল চোখে দেখেন নি; আর বিদেশী সরকার ত' এদের উপর রীতিমত অপ্রসন্নই ছিলেন। তবু পত্রিকাটির গ্রাহকসংখ্যা ছিল তিরিশ হাজারের মত।

এই পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারী ছিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, কিন্তু এটির এই অসাধারণ সাফল্যের মূলে ছিলেন সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৯১ খৃস্টাব্দের কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত কিছু প্রবন্ধের জন্য 'বঙ্গবাসী'র স্বত্বাধিকারী, সম্পাদক, ম্যানেজার এবং মুদ্রককে ভারতীয় পিনাল কোডের দুটি ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

বৃটিশ শাসিত ভারতে এই শ্রেণীর মামলা এর আগে কোনদিন হয় নি। এর ফলে সারা ভারতবর্ষে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া দেখা দিল এবং জনসাধারণ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ব্যাপারে সরকারের মনোভাব সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারল। লেখক এই বিখ্যাত মামলার সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত কেমন করে সরকার তার এই অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিল তা সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

বিগত যুগের ইতিহাসের অনেক কিছুই পুরনো বইয়ের পাতার মত আমাদের জীবন থেকে ঝরে গেছে। এ একশতাব্দীর [illegible] [illegible]— [illegible] ইতিহাস সম্পর্কে উদাসীন ও [illegible] এমন অবস্থায় এই [illegible] পড়ে আমরা খুবই আনন্দলাভ করেছি।

শারদীয় গণবার্তা—সম্পাদক : সুখময় চক্রবর্তী। দাম : একটাকা পঞ্চাশ পয়সা।

রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি এবং আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি-কে সামনে রেখে কয়েকটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ এবং কার্ল মার্ক্স-কে নিবেদিত চোদ্দটি কবিতা নিয়ে শারদীয় গণবার্তা প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে তারাপদ লাহিড়ীর 'ভারতীয় সংবিধানের শ্রেণীরূপ', মাখন পাল-এর 'বিপ্লব পদ্ধতির বৈপ্লবিক রূপান্তর' এবং বানীন রায়-এর 'ছাত্র অসন্তোষ' স্মরণীয় রচনা। সম্পাদনায় অপরিসীম যত্ন ও পরিশ্রম চিহ্ন রেখেছে।

লা পয়েজি (২য় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৬৮)—সম্পাদক : বার্ণিক রায়। ৫, গগন সরকার রোড, কলকাতা-১০। দাম : ১ টাকা।

দ্বিভাষিক ত্রৈমাসিক হিসাবে "লা পয়েজি" অভিনবত্বের দাবি করতে পারে। বিদেশী কবিদের কবিতার বাংলা অনুবাদ ছাড়াও বাঙালী কবিদের কবিতার ইংরাজী অনুবাদ (রোমান হরফে বাংলা কবিতা সহ) পত্রিকাটিতে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। আলোচ্য সংখ্যার লেখকগোষ্ঠীতে আছেন মনীশ ঘটক, হরপ্রসাদ মিত্র, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অমিয়কুমার হাটি, ভবানীনাথ দত্ত, বার্ণিক রায়, অজিত দাশ, হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

কণ্ঠস্বর—(শারদীয়া সংকলন) সম্পাদনায় সত্যরঞ্জন বিশ্বাস। ৪৭।এল।৭ নারকেলডাঙ্গা নর্থ রোড। কলকাতা-১১। দাম : দুই টাকা।

'কণ্ঠস্বর' সাম্প্রতিক কবিতার যুগ-ধর্মী মুখপত্র। শারদীয়া সংকলন প্রকাশেও তার সেই বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। পত্রিকাখানির নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী'র 'পুরোনো বাংলা কাব্য প্রসঙ্গে', ডক্টর সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য-এর 'রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসে সবজে-পত্র-পর্ব যুগ' ও জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'বটতলার কবিতা' তথ্য ও তত্ত্বমূলক প্রবন্ধ। অমিতাভ চৌধুরীর 'উৎসর্গ পত্র' রচনাটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবিতার লেখকদের মধ্যে আছেন রমণীমোহন চক্রবর্তী, সত্যব্রত দে, মনুজেশ মিত্র, উত্তম বসু, সমীর ঘোষ, রজত চৌধুরী, বরুণ মজুমদার প্রমুখ। এ সংখ্যায় কয়েকটি ছোট গল্পও স্থান পেয়েছে। মোটের ওপর কবি কাব্য কবিতা [illegible] পত্রিকা হিসেবে সংকলনটি [illegible] ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে। সংখ্যাটি বিদগ্ধমহলে সমাদৃত হবে।

চিত্রাঙ্গদা (শারদীয়া)—সম্পাদক—অজিতমোহন মিত্র। ৭২।১ কলেজ স্ট্রীট। কলকাতা-১২। দাম : তিন টাকা।

'চিত্রাঙ্গদা' সিনেমা পত্রিকা নয়, সাহিত্য পত্রিকা। আলোচ্য শারদীয়া সংখ্যায় প্রবন্ধ, উপন্যাস, ভ্রমণ-কাহিনী, গল্প, কবিতা, রঙ্গালোক প্রভৃতি সমৃদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রবন্ধ লেখকদের মধ্যে আছেন প্রশান্ত সেন, মনোজিৎ বসু, পান্নালাল দাশগুপ্ত, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, বিনয় ঘোষ প্রমুখ। গল্প লিখেছেন—অমিতাভ বসু, সুমথনাথ ঘোষ, মানবেন্দ্র পাল প্রমুখ। কবিতা লেখকদের মধ্যে রয়েছেন পরমানন্দ সরস্বতী, জগদীশ ভট্টাচার্য, হেনা হালদার, শম্ভু চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। এ সংখ্যায় পরেশ ভট্টাচার্য ও সুনীলকুমার নাগ দুটি উপন্যাস লিখেছেন। প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটি সুন্দর।

উইকেট থেকে বাউণ্ডারী—দিলীপ দত্ত : বাক্ সাহিত্য, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা-৯। দাম : তিন টাকা।

টুকি-টাকি ঘটনা আর কিছু ছবি—মূলত এই নিয়েই দিলীপ দত্তর উইকেট থেকে বাউণ্ডারী বইটি। যাঁরা অনেক কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে বইটি পড়তে বসবেন, তাঁদের কিন্তু ঠকতে হবে। তবে জানতে পারবেন অজানা অনেক টুকরো টুকরো ঘটনার কথা।

তবে বইটির সব থেকে ভালো জিনিস হলো ডিসপ্লে। কিম্বা বলা যায় যে খুব ছোট হলেও বইটি চমৎকার ভাবে সাজানো।

লেখক হিসেবে দিলীপ দত্ত এই বইটিতে খুব একটা কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন—এমন কথা বলা যায় না। অবশ্য বইটিতে সে সুযোগও ছিলো না। কারণ বইটি ঘটনাবহুল। আর লেখক ঘটনা সংগ্রহেই দিয়েছেন যেমন সব থেকে বেশি জোর তেমনি তিনি ঐ জন্যে দাবি করতে পারেন যথেষ্ট কৃতিত্ব। সেই জন্যেই পাঠক-পাঠিকারা বইটি হাতে পেলে ছাড়তে চাইবেন না। আর সব থেকে বড় কথা হলো যে শুধুমাত্র ঘটনায় ভরা অর্থাৎ ঘটনাবহুল বই-এর একঘেয়েমি বইটিতে একদম নেই। আর সেইটিই লেখকের [illegible] স্বাক্ষর।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

৮. ১৯৫০—৬৮ : রাজনৈতিক-সামাজিক পটভূমি

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে খানিকটা জড়িয়ে পড়েছিল। যুদ্ধ শেষ হতে পৃথিবীর মানুষের মনে এই ভরসা এসেছিল, এবার বুঝি দুই বৃহৎ শক্তি জোটের কর্ণধার সোভিয়েত জাতিসংঘ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষ করে শান্তির দায় সম্পর্কে যথার্থই সচেতন হয়ে উঠেছেন, ভবিষ্যতে শান্তির স্বার্থে তাঁরা একত্রেই কাজ করবেন। ভরসা করবার আরেকটা কারণ ছিল বিশ্বব্যাপী শান্তি আন্দোলন। হিরোশিমা নাগাসাকির পারমাণবিক বিস্ফোরণের ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া তখনও এক বিভীষিকার মত মানুষের মনে লেগে ছিল। শান্তির সপক্ষে জনসাধারণের স্বরকে বাঙ্ময় করে তোলার চেষ্টা শুরু করেছিলেন বিজ্ঞানীরা। ১৯৪৬ সালের ২৩ জুন নিউ ইয়র্ক টাইমস্ ম্যাগাজিনে এক সাক্ষাৎকারে আলবার্ট আইনস্টাইন বলেন, "যুদ্ধের সময়ে অনেক মানুষই নিজেদের চিন্তার অভ্যাস বিস্মৃত হয়েছিলেন, কারণ অনেকেরই কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তাঁদের যা করবার নির্দেশ দেওয়া হয়, তা-ই পালন করে যাওয়া। অথচ আজ সাধারণ মানুষও এই বিপদ প্রতিরোধে যে ভূমিকা পালন করতে পারেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে আগ্রহের অভাবকেই 'গুরুতর ভ্রান্তি নির্দেশ করব।..... বিজ্ঞানীরাও পারমাণবিক শক্তি সম্পূর্ণ বোঝেন না, কারণ প্রত্যেক মানুষেরই জ্ঞান অসম্পূর্ণ। .....কিন্তু সব মানুষকে কয়েকটি তথ্য জানালেই তাঁরা বুঝবেন এই বোমা কী ভয়ঙ্কর বস্তু; তাঁরা বুঝবেন যুদ্ধ কঠোর বাস্তব, এবং তা এমন কিছু দূরবর্তীও নয়। সভ্য জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিই এই বিপদের প্রত্যক্ষ দায়ভাগী। আমরা এই প্রশ্নটির সমাধানের ভার সৈন্যাধ্যক্ষ, সেনেটর ও কূটনীতিকদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না...। হয়ত আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই অনেক দেশেই পারমাণবিক বোমা তৈরি হয়ে যাবে, তখন আর সর্বনাশ এড়াবার কোন পথই থাকবে না।..... নিউ ইয়র্কে, প্যারিতে কিংবা মস্কোয় যাঁরা আমাদের প্রতিনিধি, তাঁদেরও কিন্তু শেষ পর্যন্ত নির্ভর করতে হয় গ্রামের পাঁচমাথার মোড়ে মিলিত জনতা যে সিদ্ধান্ত নেয়, তারই উপর। সেই গ্রামের পাঁচমাথার মোড়েই আমাদের পৌঁছে দিতে হবে পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য। সেখান থেকেই উঠে আসবে আমেরিকার কণ্ঠস্বর।" একদিকে বিজ্ঞানীদের এই উদ্যোগ, সাধারণ মানুষের কাছে পারমাণবিক যুদ্ধের বিপদাশংকা পৌঁছে দেবার প্রয়াস, অন্যদিকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মিলিত আন্তর্জাতিক শান্তি আন্দোলন, এর কোনটাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে জড়াবার সাধ প্রশমিত করতে পারে নি। ট্রুম্যানের শাসনকালেই কোল্ড ওয়ার বা ঠাণ্ডা যুদ্ধের সূচনা—সন্দেহ, অবিশ্বাস ও যুদ্ধের হুমকি মার্কিন রাষ্ট্রনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। ঠাণ্ডা যুদ্ধ উত্তপ্ত যুদ্ধ হয়ে উঠতে খুব সময় লাগে না। ১৯৪৯ সালে ন্যাটো ও ১৯৫৪ সালে সিয়াটো চুক্তির মধ্যে যা প্রকাশ পেল, তাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের উপযোগ সম্পর্কেই অনাস্থা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। ১৯৪৬ সালের ৫ মার্চ মিসৌরির ওয়েস্টমিনস্টার কলেজে রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানেরই উপস্থিতে উইনস্টন চার্চিল বলেন, বৃহৎ শক্তিবর্গের সহযোগিতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রয়াসে শান্তি রক্ষিত হবে, এই ধারণাই অমূলক। তিনিই প্রস্তাব করেন ইঙ্গমার্কিন সামরিক জোট তৈরি করে সোভিয়েত জাতিসঙ্ঘকে ভয় দেখিয়ে ঠাণ্ডা রাখতে হবে। যে জর্জ কেনানের ১৯৪৭ সালের একটি প্রবন্ধ একদা সোভিয়েত বিরোধিতার নির্দেশক রূপে গৃহীত হয়েছিল, সেই জর্জ কেনানই আবার ১৯৬৫ সালে বলেছেন যে ন্যাটো চুক্তি রচিত হয়েছিল সামরিক প্রতিরক্ষার উপায় হিসেবে, "এমন এক আক্রমণের আশংকায় যা কেউ কোন দিন পরিকল্পনাই করে নি।" কেনান আরো বলেছেন, "স্তালিনচালিত রুশিয়া পশ্চিমী দুনিয়াকে আক্রমণ করতে উদ্যত এবং অত্যন্ত আগ্রহী, এবং কেবলমাত্র আমাদের পারমাণবিক অস্ত্রের ভয়েই সংযত, এই ধারণাটাই মুখ্যত পশ্চিমী জগতের কল্পনাপ্রসূত।" ১৯৬৬ সালে ইতিহাসবিৎ এ জে পি টেলর আরো স্পষ্টভাবেই অভিযোগ করেছেন, "বিস্তৃত নথিপত্র থেকে ..অতি স্পষ্টই প্রমাণ হয়ে যায় যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু করেছিলেন ট্রুম্যান ও তাঁর উপদেশকেরা, স্থিরমস্তিষ্কেই।" এই ঠাণ্ডা যুদ্ধের রাজনীতিই আজও পৃথিবীর জায়গায় জায়গায় উত্তেজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছে, প্রথমে কোরিয়ায় ও পরে ভিয়েতনামে স্থানীয় যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করেছে, মার্কিন অস্ত্রের ব্যবহারে এই যুদ্ধকে আরো প্রচণ্ড বৈনাশিক ও প্রাণঘাতী করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই যুদ্ধসাধের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় মার্কিন অর্থনীতিবিৎ পল এম্ সুইজির লেখায় : "সাম্রাজ্যবাদী ও যুদ্ধাত্মক প্রয়াসে বিপুল ব্যয়ের সুযোগ না পেলে মার্কিন পুঁজিবাদ অচিরেই দীর্ঘস্থায়ী মন্দা ও ব্যাপক বেকারির কবলে পড়বে।" সুইজির মত আরো অনেক অর্থনীতিবিদই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন যে, মার্কিন সমাজব্যবস্থা যুদ্ধ ছাড়া টিকতে পারে না। এই বোধ অস্পষ্ট আকারে হয়ত জনসাধারণের মনেও ছিল : বিশেষত যুদ্ধটা ঘটছে এত দূরে যে মার্কিন জনসাধারণ তাতে কোনভাবেই বিচলিত হন নি। কিছু মধ্যবয়সী বুদ্ধিজীবী, কিছু বিজ্ঞানী ও কিছু কমিউনিস্ট ছাড়া পঞ্চাশের পর্বে শান্তির দাবি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেউই তোলেন নি।

ফলে এই সময়ে অ্যান-আমেরিকান আন্তর্জাতিক কার্যকলাপ বা অমার্কিন কার্য-

কল্যাণ কমিটি বিশেষ সক্রিয় হয়ে ওঠে। এঁরা কমিউনিস্ট সন্দেহে বহু ব্যক্তিকে ধরে এনে জেরা করে দেশদ্রোহী বা বিদেশের গুপ্তচর বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে থাকেন। সন্দেহভাজনদের কাছে তাঁদের কমিউনিস্ট বন্ধুদের নাম দাবি করা হয়; এইভাবে অন্যদের ধরিয়ে দিতে অস্বীকার করলে কমিটির অসম্মান করেছেন এই অভিযোগে অনেকের নাগরিক অধিকার হরণ করা হয়। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা হারাবার ভয়ে ক্লিফর্ড ওডেট্স্-এর মত নাট্যকার কিংবা এলিয়া কাজানের মত নাট্যপরিচালক এই কমিটির চেয়ারম্যানের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁদের বহু বন্ধুরই নাম কমিউনিস্ট বলে কমিটির কাছে পেশ করেছেন। অন্যদিকে তখন মার্কিনপ্রবাসী জর্মন নাট্যকার বেরটোল্ট ব্রেক্ট্ ও আর্থার মিলার এই কমিটির সামনে উপস্থিত হয়ে যে অনমনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা ইতিহাসে রয়ে গেছে। এই সময়ে সারা দেশ জুড়ে যে ত্রাস ও আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়, নিজের অতীত ও নিজের বন্ধুদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবার জন্য চাপ দিয়ে মানবব্যক্তিত্বের যে ঘোর অমর্যাদা সাধিত হয়, মিলার তাকে মধ্যযুগের বর্বরতার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন 'দ ক্রুসিবল্' নাটকে। ১৯৫৪ সালে "জনসাধারণের মনোভাব প্রশমনের জন্য একটি সবিনয় প্রস্তাব" নামে এক ব্যঙ্গরচনায় মিলার প্রস্তাব করেন, আঠারো বছর বয়সে পড়লেই এবং তারপর দু'বছর অন্তর প্রত্যেক মার্কিনেরই কর্তব্য, নিজের দেশপ্রেম প্রমাণ করার জন্য স্বেচ্ছায় কারাবরণ। কারাগারে এঁদের দু' ভাগে ভাগ করা হবে, যাঁরা মানসিকতায় দেশদ্রোহী (যাঁরা এমন কথোপকথনে অংশ গ্রহণ করে থাকেন যা "শত্রুর বিরুদ্ধে কিংবা দেশের প্রতিরক্ষার প্রয়াসের সহায়ক নয়" বা এই ধরনের কথোপকথনের বিরুদ্ধে "দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর বিক্ষোভ প্রকাশে অপারগ হয়েছেন"), এবং যাঁরা সক্রিয় দেশদ্রোহী (যাঁরা অ্যাটর্নি জেনারেল কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত গোষ্ঠীর সভায় উপস্থিত থেকেছেন)। মিলার আরেকটি তৃতীয় শ্রেণীও নির্দেশ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে পড়বেন বিকৃতমস্তিষ্ক, অশক্ত স্থবির, সরকারী গোয়েন্দা, যাঁরা বই পড়েন না, এবং যাঁরা মানসিকতায় নিতান্তই শিশু। তীব্র ব্যঙ্গে মিলার লেখেন, "যদি বলা হয়, কমিউনিস্টরাও তো ঠিক এই-ই করে, তা মোটেই সত্য নয়। আমি জোর দিয়ে একথা বলতে পারি যে কমিউনিস্টরা শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত কোন রুশ নাগরিক কারাগারে যান না, এবং কেউই স্বেচ্ছায় কারাগারে যান না। রুশ নাগরিক [illegible] তাঁর স্বাধীনতা হারান। কিন্তু এই আইন গৃহীত হলে মার্কিন নাগরিক স্বেচ্ছায় কারাগারের কর্তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন...তিনি তাঁর মহামূল্য স্বাধীনতা বিসর্জন দেন না, কারণ তিনি কারাগারে ধরা দেন, হৃদয়ে প্রেম নিয়ে, অন্য নাগরিকদের কাছে নিজেকে মার্কিন বলে প্রমাণ করবার অদমনীয় আর্তি থেকে। তিনি চান, সকলেই তাঁর জীবনের প্রতিটি ঘটনা ও তার দেশাত্মক তাৎপর্য জানুক। একথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে কোন মার্কিন তরুণ যদি দেশের জন্য লড়াই করবার তাগিদ অনুভব করে, তবে সে নিশ্চয়ই তার দেশের মনের শান্তির জন্য কারাগারেও যেতে পারে"। কমিউনিস্ট-বিদ্বেষের এই বর্বরোচিত অগণতান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ড সেনেটর জোসেফ ম্যাকার্থির নামের সঙ্গে যুক্ত হলেও এবং ম্যাকার্থিবাদ নামে ইতিহাসে পরিচিত হলেও এর দায়িত্ব সমগ্র মার্কিন রাষ্ট্রযন্ত্রের; এবং কোন ব্যক্তিবিশেষকে যদি দায়ী করতেই হয়, তবে দায়ী হবেন রিচার্ড নিক্সন, যিনি ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করবার জন্য বিল এনেছিলেন। ১৯৫০-এর সেপ্টেম্বরে ম্যাককারান আইনের জোরেই কমিউনিস্ট কার্যকলাপের নামে যাবতীয় বিরোধী রাজনীতির উপর কঠোরতম অগণতান্ত্রিক বিধিনিষেধ আরোপিত হল। অথচ বিস্ময়ের কথা, গণতন্ত্রের প্রতি তেমন কোন আন্তরিক আসক্তির প্রমাণ মার্কিন জনসাধারণ দেন নি। এমন কি গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে যখন রোজেনবার্গ দম্পতির প্রাণদণ্ড হয়েছে (এঁদের বিচারের পদ্ধতিতে সারা পৃথিবীর বুদ্ধিজীবীসমাজ সন্দিহান হয়ে বিচলিত হয়ে সক্রিয় প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন), তখনও নয়।

মার্কিন জনসাধারণ তখন কেন এদিকে তেমন দৃষ্টি দেন নি, তার কারণ বোঝা শক্ত নয়। পঞ্চাশের দশকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সম্পদ, আয় ও ক্রয়ক্ষমতার অভাবনীয় বৃদ্ধি লক্ষিত হয়েছে। বছরে (কর বাদ দিয়ে) চার হাজার ডলারের (৩০,০০০ টাকা) বেশি উপার্জন করেন এমন পরিবারের সংখ্যা কেবল ১৯৫০ থেকে ১৯৫৬-র মধ্যে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান মার্কিন সমাজকে 'দি অ্যাফলুয়েন্ট সোসাইটি' বা প্রাচুর্যের সমাজ বলে বর্ণনা করে অর্থনীতিবিদ জে. কে. গলব্রেথ বলেন, "জাতিসমূহের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের অভিজ্ঞতা স্বল্প দিনের। ইতিহাসে প্রায় সব জাতিই দারিদ্র্যের জীবন যাপন করেছে। ব্যতিক্রম দেখা গেছে.....ইয়োরোপীয় অধিবাসীদের পৃথিবীর এক সংকীর্ণ কোণে সাম্প্রতিক কয়েক প্রজন্মের অভিজ্ঞতায়। পৃথিবীর এই ভাগ্যবান অংশের মানুষেরা যে সব ধারণা থেকে তাঁদের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করে থাকেন, বা যেসব ধারণার সাহায্যে তাঁদের আচরণ স্থির করেন, সেইসব ধারণা প্রাচুর্যের পরিবেশে রচিত হয় নি। এইসব ধারণার জন্ম হয়েছিল এমন এক পৃথিবীতে যেখানে দারিদ্র্যই ছিল মানুষের অদৃষ্ট, অন্য কোন জীবন কল্পনাতীত ছিল। ...কেউই বলবেন না, যে-ধারণার সাহায্যে অভাবের এই কালকে বোঝা সম্ভব ছিল, সেইসব ধারণাই সমকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কার্যকর হবে। সেই সময়ের মূল সমস্যাই ছিল দারিদ্র্য। সে-সমস্যা আজ আমাদের সমস্যা নয়।" প্রাচুর্যের এই অভিনব পরিবেশে মানসিকতায় যে পরিবর্তন ঘটেছে, অনভ্যস্ত সম্পদ নিয়ে দৈনন্দিন জীবনযাপনের যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তা নিয়ে সমাজতাত্ত্বিকেরা যথেষ্ট ভাবছেন। একদা হয়ত বাড়ি, গাড়ি, রেফ্রিজারেটর, কিংবা এমার কন্ডিশনেই বড়মানুষি প্রমাণ করা যেত। আজ আর তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না, কারণ ওসব আজ অনেকেরই আয়ত্তে এসে পড়েছে। ফলে বড়লোকি দেখাবার তাগিদে কেবল ১৯৫৭ সালেই ৫০,০০০ মার্কিন তাঁদের বাড়ির পেছনের মাঠে সাঁতারের পুল কাটিয়েছেন। সম্পদ যতই বাড়ুক, সম্পদ যতই আরো বেশি লোকের আয়ত্তে আসুক, নিজেকে সম্পন্ন প্রমাণ করে অন্যের ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিতে নিজেকে মহিমান্বিত ভাববার লোভ এখনও রয়ে গেছে। আয় ও সম্পদ অনুসারে বসতি, ক্লাব, স্কুল, গৃহসজ্জা, কঠোর শ্রেণীবিভাগে সামাজিক মর্যাদার বিভিন্ন ধাপের জন্য সংরক্ষিত। চাকরিতে উন্নতির সঙ্গে

সেজন্যেই বাড়ি বদলানো ও পাড়া বদলানো রেওয়াজ হয়ে উঠেছে। ১৯৫০ সালের পর থেকেই প্রতিদিন প্রায় ২৫,০০০ মার্কিন পরিবার নতুন পাড়ার নতুন বাড়িতে উঠে যায়। শতকরা ৮৭ জন মার্কিনই আজ কর্মচারী শ্রেণীর—মালিকানা শতকরা ১৩ জনের হাতে। কর্মক্ষেত্রে কর্মচারীদের বসবার ঘর সাজানো হয় সামাজিক বা পদমর্যাদা অনুসারে। যে যত উঁচুতে, তাঁর ঘর খোদ কর্তার ঘরের তত কাছাকাছি। টেবিলের কাঠেও শ্রেণীভেদ—সবচেয়ে ওপরের ধাপের জন্য মেহগেনি, তার নিচে আখরোট কাঠ তার নিচে ওক কাঠ। অফিসে ঢোকার দরজা বা হাজিরার সময় থেকেও কর্মচারীদের পদমর্যাদা অনুমান করা যায়। কে কোন দোকানে কেনাকাটা করবেন, তাও পদমর্যাদামত। ভুল দোকানে গিয়ে পড়লে অপমানিত হবার সম্ভাবনা। বন্ধুত্বের ক্ষেত্রেও নিজের শ্রেণীর মধ্যে থাকাটাই বিধি। অন্য শ্রেণীর লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলা হয়ত চলে, কিন্তু বাড়িতে যাওয়াদাওয়া চলে না। শহরে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য পৃথক ক্লাব। সামাজিক ধাপ ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি বদল, পাড়া বদল দোকান বদল, বন্ধু বদলের সঙ্গেই ক্লাব বদলও চলে। বড় দোকানের তরুণ কেরানী কোন এক শাখার ম্যানেজার হয়ে গেলে তার সেলস্‌গার্ল প্রেয়সীকেও ত্যাগ করতে হয়। এই উপেক্ষিতারা অনেকেই মদ বা ঘুমের পিলের নেশার শিকার হয়। মর্যাদার ধাপে অবনতিও ঘটে থাকে। ৯৫ জন প্রথম শ্রেণীর মুষ্টিযোদ্ধার যৌবনান্তে গৌরবহানির ফলে দেখা গেছে, এঁদের মধ্যে ১৮ জন অদক্ষ শ্রমিক হয়ে পড়েছেন, দু'জন কুস্তিগীর, ২৬ জন খাবারের দোকানের কর্মচারী, ৩ জন ট্যাক্সি ড্রাইভার ইত্যাদি। যারা ধাপে নেমে আসে, কিংবা ওঠবার চেষ্টায় ব্যর্থকাম হয়, তারা হয় মদের, নয়তো অন্য কোন নেশা ধরে। যারা ধাপের ওপরে ওঠে, তারাও সময়ে সময়ে নতুন পরিবেশ ও অন্যতর জীবনযাত্রায় খাপ খাইয়ে নেওয়ার টানা-পোড়েনে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়। নেশা ও মানসিক বিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রেণীমর্যাদা ও শ্রেণীবোধের এই অনুভূতি সর্ব বয়সের সর্ব শ্রেণীর মার্কিনকেই আচ্ছন্ন করেছে। এ দেশের জাতীয় স্কলারশিপপ্রাপ্ত ছাত্রদের পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এদেরও অধিকাংশই ভোগ্যসামগ্রীর জন্য যথেষ্ট ব্যয় করবার মত সামর্থ্য এবং শহরের উপান্তে সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনের আকাঙ্ক্ষী; কোন আদর্শের জন্য কাজ করা বা শিক্ষার্জনে জীবন ব্যয় করবার কথা মুষ্টিমেয়মাত্র বলে। কৃষ্টির নিদারুণ অধোগমন এই পরিবেশের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কোন এক প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের প্রধান সম্পাদক হ্যারল্ড স্টাউস 'স্যাটারডে রিভিউ' পত্রিকায় অভিযোগ করেন, "আমাদের লেখকদের সাহস নেই, শিক্ষা নেই, নিষ্ঠা নেই।" স্টাউসের ব্যাখ্যা, "চারিদিকে অর্থনৈতিক মর্যাদায় এগিয়ে যাবার প্রাণান্ত চেষ্টা দেখে লেখকও লোভ সামলাতে পারেন না। এই এক সর্বাত্মক প্রয়াসে জড়িয়ে পড়ে লেখক কার্যত সাহিত্যের প্রবাহ থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। ঐশ্বর্যের ভয়ংকর প্রভাব মার্কিন মানুষের নৈতিক দায়িত্ববোধকেই ক্ষয়িত করেছে। তার প্রভাব সমাজশরীরে বহুদূর প্রসারিত।

তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দারিদ্র্য নির্মূল হয়েছে। সরকারি সূত্রের হিসেবেই মার্কিন জনসমষ্টির শতকরা ১৫ ভাগ দরিদ্র, সংখ্যায় ২৯,৭০০,০০০। বেসরকারি সংগঠন 'দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে নাগরিক অভিযান' তাঁদের সমীক্ষায় আবিষ্কার করেন যে এক কোটি মার্কিন প্রায় জন্ম থেকেই পুষ্টিহীনতায় ভোগেন। এই দরিদ্রসমাজের এক-তৃতীয়াংশ নিগ্রো। নিগ্রোসমাজের বিপুল বৃহদংশই এই দরিদ্রসমাজের অন্তর্গত। ছ' কোটি গাড়ি, সাত কোটি টেলিভিশন সেটের (তার মধ্যে এক কোটি রঙিন টেলিভিশন) দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বস্তি আছে, অশিক্ষা আছে, বেকারি আছে। গত বছর 'লাইফ' পত্রিকায় এক [illegible] হ্যারিংটন [illegible] মন্তব্য করেছিলেন, "পৃথিবীর অন্য [illegible] দরিদ্র থাকার চেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দরিদ্র হওয়া আরো দুর্ভাগ্যজনক।...অন্যত্র দরিদ্র হয়ে জন্মগ্রহণের চেয়েও দুর্ভাগ্যজনক, কারণ ভাবতে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই দারিদ্র্যপীড়িত। ভাগ্যাহত সংখ্যালঘু সমাজের অংশ হয়ে দারিদ্র্য ভোগ করার চেয়ে মর্মান্তিক দারিদ্র্য আর কিছুই হতে পারে না, কারণ এই দারিদ্র্য কেবলমাত্র হিংসাত্মক প্রকাশেই মূর্ত হতে পারে।" অথচ এই দারিদ্র্য অপনোদনে সংখ্যাগরিষ্ঠের এতদিন কোন ভূমিকাই ছিল না।

অন্যদিকে উৎপাদন ক্রয়ক্ষমতাকে ছাপিয়ে গেছে। ব্যবসায়ীদের প্রাণান্ত চেষ্টা, জনসাধারণকে কীভাবে দুটো শাড়ি কেনানো যায় দুটো গাড়ি কেনানো যায়, দুটো রেফ্রিজারেটর কেনানো যায়; হয়তো নতুন ফ্যাশন চালু করে দিয়ে পুরনো মডেল খারিজ করিয়ে নতুন মডেল কেনানো যায়। এই চেষ্টায় স্বভাবতই ব্যবসায়ীদের মধ্যে সমানে বিজ্ঞাপন। বেতারে, টেলিভিশনে চলচ্চিত্র এবং নানা মাধ্যমের আশ্রয়ে এই বিজ্ঞাপনের প্রচার চলেছে। এই প্রচারপদ্ধতি এতই তীব্র হয়ে উঠছে প্রতিদিন যে সম্প্রতি মার্শাল ম্যাকলুহান ব্যঙ্গ করে বলেছেন যে, প্রচারের মাধ্যমগুলি "শরীরমর্দনের" নামান্তর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রচারের প্রবল ক্ষমতা মানুষের রুচি ও চিন্তাকে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করছে।

এই ধারা অবস্থাটা মার্কিন জনসাধারণ দীর্ঘকাল মেনে এসেছেন। হাওয়া বদলাতে শুরু করেছে ১৯৫৫ সাল থেকে—নিগ্রোসমাজের নাগরিক অধিকারের দাবিতে অ্যালাবামার মন্টগোমারিতে যে নতুন আন্দোলনের সূত্রপাত হয় সেই সময় থেকেই। একদিকে ভিয়েতনামে মার্কিন ভূমিকায় বিক্ষোভ এবং নিগ্রো বিপ্লব, অন্যদিকে পাচার্য কালচার হিপি-দের অসামাজিকতা এই সব মিলিয়ে ষাটের দশকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গতিবর্ত পেয়েছে। অনেক কিছু ভাঙছে বদলাচ্ছে। ছাত্রবিক্ষোভে আর কিছু এখনই দানা বেঁধে না উঠলেও একটা আন্তর্জাতিক চেতনা ও দায়িত্ববোধ লক্ষ করা যাচ্ছে। কেনেডি ভ্রাতার [illegible] হত্যাকাণ্ডের বেশ আগের আরো অনেকগুলি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের তাৎপর্য স্পষ্টতর হচ্ছে। ফলে যুবসমাজের মানসিকতায় সহিংসে চেতনার অভ্যাদয় ঘটাচ্ছে, গণতন্ত্রের ভণ্ড আচরণের অর্থহীনতার বোধ থেকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আত্মসন্তুষ্টতা কেটেছে, স্বার্থপরতা ধাক্কা খেয়েছে—এই দেখেই [illegible] আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। [illegible]

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে * শিল্পী এবং এদেশে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

দি আদার থিয়েটার—নর্মান মার্শাল: দুটি বিশ্বযুদ্ধের মাঝের সময়টায় ইংলণ্ডের থিয়েটারে উল্লেখযোগ্য যা কিছু ঘটেছে তার জন্য মূলত দায়ী অব্যবসায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন বিদ্রোহী সংগঠনগুলো। সত্যি কথা বলতে কি বৃটিশ স্টেজকে তখন ঘুণে ধরা থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল ছোট ছোট দলের প্রডিউসার, অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং এদের নাটকের দর্শক দল। কমার্শিয়াল থিয়েটারের ম্যানেজারের দল এবং সেনসর সে সময় যেভাবে বৃদ্ধিজীবীদের পরিস্ফুটনে বাধার সৃষ্টি করছিলেন তাতে ঐ থিয়েটারের সমূহ সর্বনাশ হতো, যদি না উপরি উক্ত বিদ্রোহীর দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো। এই জন্যই ওই সব পে-পডিউসিং সোসাইটিজগুলোর কাছে ইংরাজ-থিয়েটার অনুরাগীদের চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

মিউজিক্যালস ফার্সেস এবং থ্রিলারের কথা বাদ দিলে দেখা যায়, যে সব নাটক ওয়েস্ট এণ্ডে দীর্ঘদিন ধরে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে—সেগুলোও ওয়েস্ট এণ্ডের ম্যানেজাররা নিজের থেকে প্রথমে মঞ্চস্থ করেন নি। অভিনেতা এবং নাট্যকার হিসাবে নোয়েল কাওয়ার্ডের সত্যিকার প্রাথমিক সাফল্য হয় এভরিম্যান থিয়েটারে। এইখানেই 'দি ভরটেক্স' প্রথম মঞ্চস্থ হয় —এর আগে নাটকটিকে কোন ওয়েস্ট এণ্ড ম্যানেজার গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন নি। এমেলিন উইলিয়ামসের প্রথম লণ্ডন প্রডাকসন সম্ভব হয়েছিল একটি সানডে সোসাইটির কৃপায়। এই সঙ্ঘটিই বহু চেষ্টা করে এমেলিনের নাটক একটি ওয়েস্ট এণ্ড ম্যানেজমেন্টের দ্বারা প্রডিউস করান —নাটকটি দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল। আর্টস থিয়েটারে 'রিচার্ড অভ বোরডোয়ার' অভিনয় করা সম্ভব হয়েছিল একটি সানডে সোসাইটির সাহায্যে। এ নাটকের বিরাট সাফল্যের পর এটিকে ওয়েস্ট এণ্ডে স্থানান্তরিত করা হয়—নামভূমিকায় অপূর্ব অভিনয়-কৌশল প্রদর্শন করেছিলেন জন গিলগুড এবং শেষ পর্যন্ত নিজেকে ওয়েস্ট এণ্ড স্টার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। জার্নিজ এণ্ড নাটকটির ইতিহাস তো সবারই জানা। এই [illegible]

বড় থিয়েটারের মালিকেরা গ্রহণ করতে অসম্মতি জানান। শেষ পর্যন্ত এর প্রডাকসনের ভার নেন দি স্টেজ সোসাইটি। তাছাড়া একথা অনেকেই ভুলে গেছেন যে দি ব্যারেটস্ অভ্ উইমপোল স্ট্রীট, ইয়াং উডলে, আউটওয়ার্ড বাউণ্ড, দি ম্যন উইথ এ লোড অফ মিসচিফ, দি লেডি উইথ দি ল্যাম্প, স্ট্রেইঞ্জ অর্কেস্ট্রা, মিউজিক্যাল চেয়ার্স, জর্জ এণ্ড মার্গারেট, দি এ্যাপলকার্ট, লাভ অন দি ডোল, ভিক্টোরিয়া রেজিনা এবং জিনি প্রভৃতি নাটক—অর্থাৎ যে সব নাটক একনাগাড়ে বহুদিন অভিনীত হয়েছিল, সেগুলো সবই প্রথমে প্রদর্শিত হয়েছিল অব্যবসায়িক নাট্যসংঘের দ্বারা। কুড়ি বছরের ভেতর ওয়েস্ট এণ্ড মাত্র চারজন নাট্যকারকে নিজেরা আবিষ্কার করেছিল— এ এ মিলন্, ডডি স্মিথ, ক্লেমেন্স ডেন ও জে বি প্রিস্টলে। প্রিস্টলে অবশ্য নিজের নাটক মঞ্চস্থ করবার জন্য নিজেই যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।

ওয়েস্ট এণ্ড কিভাবে প্রাইভেট থিয়েটার

দি ফোর্চুন থিয়েটারে দি লেট রিভিউতে হারমিওন জিনগোল্ড

'দি গেইট থিয়েটার'—[illegible]

এবং সানডে সোসাইটিগুলোর ওপর নির্ভরশীল ছিল তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, যখন যুদ্ধি [illegible] এই সব থিয়েটারের কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। অসহায়ভাবে ওয়েস্ট এণ্ড একেবারে নির্ভর করতে থাকে পুরনো নাটকের পুনরভিনয় এবং আমেরিকা থেকে আমদানী করা নাটকের ওপর। যে অল্প সংখ্যক নতুন নাটক এই সময় মঞ্চস্থ হোত তার অধিকাংশই ছিল হাল্কা এবং বাজে ধরনের। পুনরভিনয়ের বেলায়ও থিয়েটারের মালিকেরা অভাবনীয় সংখ্যায় [illegible] অভিনীত নাটকগুলোরই পুনরাভিনয় করবার ব্যবস্থা করতেন—উদাহরণ হিসাবে ১৯৪৩ সালের দুটি বিরাট সাফল্যমণ্ডিত নাটকের পুনরভিনয়ের কথা বলা যায়—এ দুটি হচ্ছে, দ [illegible] দি [illegible]—

[illegible] হল দুবার এ নাটক প্রডিউস করেছিলেন এবং প্রভিন্সেসেও এ নাটক অভিনয়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন। [illegible] তিনবার প্রডিউসড হয়েছিল—দুবার সানডে সোসাইটির দ্বারা এবং একবার ওল্ড ভিক্-এ। [illegible] দুবার [illegible] মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং [illegible] দি [illegible] প্রডিউস করেছিলেন—[illegible] ভূমিকায় নামেন।

ওয়েস্ট এণ্ড থিয়েটারের উদ্যমের অভাব এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর নাটক প্রডাকসনের ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ অনেকেই করেছেন। কিন্তু কি কারণে বিদ্রোহী স্টেজ-প্রডিউসিং সোসাইটিগুলো একই সময়ে অজস্র প্রায়োগিকপূর্ণ এবং [illegible] নাটকাভিনয় করেছিলেন এবং পাশাপাশি কমার্শিয়াল থিয়েটার প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রাণহীন নাটক ছাড়া অন্য কিছু মঞ্চস্থ করতে পারছিলেন না, সে কথাও ভেবে দেখা দরকার। রঙ্গজগতে এ ধরণের অবস্থা তো অন্য কোন দেশে হয় নি। প্যারিস, প্রাক্-নাৎসী বর্লিন, নিউ ইয়র্ক, প্রহা বা ভিয়েনাতে, থিয়েটার ক্লাব বা স্টেজ প্রডিয়ুসিং সোসাইটির কোন অস্তিত্ব দেখা দেয় নি বা তার আবশ্যকতাও ছিল না। ওসব দেশে কমার্শিয়াল থিয়েটারই ছিল যথেষ্ট প্রগতিপন্থী এবং দুঃসাহসিক। দর্শকরাও ভাল নাটক গ্রহণ করবার মত মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল।

এখানে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার—আমাকেও ওয়েস্ট এণ্ডের ছোট-খাট ম্যানেজারের শ্রেণীতেই পর্যায়ভুক্ত করা চলে। সময় সময় আমিও স্যাকটসবারী এভিনিউ এবং ব্রডওয়েতে নাটক প্রডিউস করে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেছি। তবে আমি হচ্ছি প্রডিউসারদের ভেতর চুনো-পুঁটির দলে। থিয়েটারের ব্যবসায় যখন মন্দা আসে তখনই আমাদের মত লোকেদের সুযোগ দেওয়া হয় ওয়েস্ট এণ্ড কাজে নামবার। যেই আবার ব্যবসা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, আমাদের হটিয়ে দেওয়া হয় এবং আমাদের জায়গায় এসে হাজির হয় বড় বড় কম্বাইনগুলো। ছোট শ্রেণীর [illegible] ভেতর আমি আবার একটু [illegible]। এক সময় 'দি গেইট থিয়েটারের' মালিক হয়ে পড়েছিলাম—এখানকার চাঁদা-দেওয়া বিদগ্ধ দর্শক ছিল বহুসংখ্যক। এখানে আমি নিজের ইচ্ছামত এবং সেনসরের প্রভাবমুক্ত হয়ে ভাল ভাল নাটক মঞ্চস্থ করতে পেরেছি—কোন ভাল নাটকের দর্শক সংখ্যায় কম হলেও রোজী থিয়েটার মালিক এসে যে আমার নাটক বন্ধ করে দেবে এ বিপত্তির সামনে আমাকে পড়তে হয় নি।

১৯১৪-১৮ সালের আকস্মিক বাজার-গরমের ব্যাপারটাই প্রথম থিয়েটারের জমজমাট কম্বাইনের সৃষ্টি করলো। থিয়েটার-গুলোতে [illegible] হাত [illegible] বাজার চললো—যে বেশি টাকা চালাতে পারে সেই থিয়েটার কিনে নেয়—এই সব মালিকের নাটক এবং অভিনয় সম্পর্কে কোন জ্ঞান-[illegible]

যুদ্ধকালীন দর্শকেরা কোনরকম বিচার করবার মনোভাব নিয়ে থিয়েটার দেখতে আসতো না। সুতরাং একদল ব্যবসায়ী দেখলো থিয়েটার নিয়ে ব্যবসা করে খুব টাকা তোলা যায়—তারা টাকার জোরে দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত থিয়েটার মালিকদের অতি সহজেই হটিয়ে দিতে পারলো।

Control of the theatre passed from the hands of men of the theatre into the hands of men of money.

১৯১৪ সালের আগে দর্শকদের কাছে নাটক পরিবেশন করা হোত ম্যানেজারদের নিজস্ব রুচি এবং বিচক্ষণ প্রণালী অনুসারে। অনেক সময় এই সব ম্যানেজারেরা আবার অভিনেতা হিসাবেও যথেষ্ট যশ এবং খ্যাতির অধিকারী হওয়াতে নিজেরাই থিয়েটারের মালিক হয়ে নাটক প্রডিউস করতেন এবং প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। যুদ্ধের সময় অর্থাৎ ১৯১৪-১৮ সাল অবধি মুনাফাখোর ব্যবসায়ীরা থিয়েটারগুলোকে করায়ত্ত করতে শুরু করলেন ভাল অর্থ উপার্জনের উপায় হিসাবে। থিয়েটার সম্বন্ধে এঁদের কোন অন্তরের টান ছিল না—ফ্যাক্টরী, হোটেল, চেইন অফ সপস্ বা বাড়ির মালিকানা থেকে যেমন টাকার আমদানী হয়—রঙ্গমঞ্চ থেকেও এই সময় টাকা রোজগার হবে দেখেই এই সব ব্যবসায়ীর দল থিয়েটারের দিকে শ্যেন দৃষ্টি হানলেন। রুচিসম্পন্ন ম্যানেজাররা হটে যাওয়াতে এরপর ইংলিশ থিয়েটারে সর্বত্র একটা একঘেয়ে ভাব দেখা দিল। দর্শকরা যা চায় তাই তাদের দেওয়া হতে লাগল ব্যবসায়ী ম্যানেজারদের তরফ থেকে। অন্তত আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হচ্ছিল—কারণ প্রেক্ষাগৃহগুলো একেবারে লোকে ভর্তি হয়ে থাকতো। অন্য ধরণের ভাল নাটক দর্শকরা নিতে পারে কি না সে-জাতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষাও ব্যবসায়ীরা করতো না—কারণ তারা ভাবতো টাকা যখন আসছে তখন অন্যভাবে রিস্ক নিয়ে লাভ কি? এদের কাছে লোহার ব্যবসা, থিয়েটার আর ম্যাজিকের ভেতর তো কোন প্রভেদ ছিল না। আসল কথা মুনাফা অর্জন।

১৯২০ সালে ফেঁপে-ওঠা টাকার বাজার চুপসাতে শুরু করলো। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ী ম্যানেজারেরা অন্য দিকে চলে গেল। কিন্তু যে ক্ষতি তারা করে গেল তা কিন্তু থেকেই গেল। রঙ্গমঞ্চ হয়ে পড়লো পঙ্গু এবং অক্ষম—তার ঘাড়ে চাপল নানাধরণের বোঝা, যথা বিরাট অঙ্কের ভাড়া, প্রচুর আমোদকর এবং ট্যাক্স প্রভৃতি। একটা উদাহরণ দিচ্ছি, ১৯১৪ সালে ওয়েস্ট এণ্ডের একটি থিয়েটারের যে ভাড়া ছিল, থার্বটিজে তার তিনগুণ টাকা দিয়ে সেই থিয়েটারের ভাড়া নিয়েছিলাম আমি নিজে।

যুদ্ধোত্তর কালের থিয়েটার ব্যবসার অর্থনীতির ব্যাপারটা এমন জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, আগেকার দিনে স্বাধীনচিত্তের ম্যানেজারদের অর্থাৎ যাঁরা নিজেদের রুচি এবং বিচার-শক্তির ওপর নির্ভর করে নাট্য প্রযোজনা করতেন—রঙ্গজগতে তাঁদের প্রত্যাবর্তন আর সম্ভব ছিল না। থিয়েটার ম্যানেজমেন্টের খরচা এবং ঝক্কির দিকটা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, যথেষ্ট টাকার জোর না থাকলে কোন নতুন কর্তৃপক্ষ আর এ ব্যবসায় হাত দিতে সাহস পেতেন না। পুরনো দিনের সেই সব থিয়েটারের মালিক যাঁরা কোনরকমে টিকে গিয়েছিলেন তাঁরাও যুদ্ধপ্রসূত সমস্যাগুলোর সামনাসামনি এসে হতচকিত হয়ে পড়েছিলেন। যুদ্ধের সময় গজিয়ে-ওঠা থিয়েটারের মালিকদের ভেতর যাঁরা যুদ্ধোত্তর কালেও থিয়েটারে থাকলেন, তাঁরা লক্ষ্য করলেন যে, শান্তির সময়ের সাধারণ শ্রেণীর দর্শকের সঙ্গে যুদ্ধকালীন লণ্ডনে আগত অর্থবান আগন্তুক দর্শকদের প্রবৃত্তিগত এবং রুচিগত পার্থক্য যথেষ্ট। যুদ্ধের সময়ের দর্শকেরা ছিল বিত্তবান—বিশ্লেষণ করে নাটক দেখবার মত সময় বা মনোবৃত্তি তাদের ছিল না। সব উদ্যমহীন ম্যানেজমেন্টই এই সময় শুধুমাত্র নিরাপত্তার অনুসন্ধানে ব্যস্ত ছিল। তাই তারা চিরাচরিত এবং একঘেয়ে নাটকের বাইরে দৃষ্টিক্ষেপ করতে রাজী ছিল না। যে নাটকে মৌলিক বা নতুন ধরণের চিন্তার ছাপ থাকতো সে নাটকের কোন সমাদর ছিল না। এই অবস্থাতেই টোয়েন্টিজের প্রথম দিকে কমার্শিয়াল থিয়েটারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছিল।

[ক্রমশঃ]

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলা

চলচ্চিত্র উৎসব কথাটার সঙ্গে এখন সকলে পরিচিত। আমাদের দেশে কথাটা চালু হয়েছে ফিল্ম সোসাইটিগুলির কাছে। সরকারী চলচ্চিত্র উৎসব পর পর কয়েকটি হয়ে যাওয়ায় কথাটার গুরুত্ব আরো বেড়েছে। সাধারণত একটি দেশের কয়েকটি ছবি দেখানোকে উদ্যোক্তারা উৎসব নামে পরিচিত করেন। কিন্তু উৎসব কথাটার অর্থ বাংলা দেশে আরো একটু ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত।

আগামী ১৪ই ডিসেম্বর থেকে এক আন্তর্জাতিক মেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। প্রচলিত উৎসবগুলির সঙ্গে একটু ভিন্নতা দেখাবার জন্যই হয়ত মেলা কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে। অন্তত কিছুটা মেলার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন রকমের স্টল ইত্যাদির ব্যবস্থাও থাকবে। যাতে আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই আনন্দময় পরিবেশে প্রতিদিন ৮ হাজার লোক ছবি দেখবে। এক সঙ্গে বসে এত লোকের ছবি দেখা আমাদের দেশে ভাবা যায় না। যাত্রা দেখা যায়, গান শোনা যায়; কিন্তু ছবি দেখা ব্যাপারটা স্বতন্ত্র। সোভিয়েত রাশিয়া ও ইউরোপের আরো কয়েকটি দেশে বেশি লোকের ছবি দেখার ব্যবস্থা আছে. কিন্তু এদিক থেকে আমরা বেশ পেছনে। ফলে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবগুলিতে প্রবেশপত্রর জন্য লোকের দুর্গতির সীমা থাকে না। তিন-তিনটে আন্তর্জাতিক উৎসবের পরও সরকার তেমন কিছু ভাল ব্যবস্থা করতে পারলেন না। এরূপ ক্ষেত্রে সর্ব ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি যে সাহস করে এমন একটা উদ্যোগ গ্রহণ করলেন—তা প্রশংসার বিষয়।

এরূপ উদ্যোগ ভারতে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের অগ্রগতির একটি লক্ষণ। আমাদের দেশে জনসাধারণের বিশেষ করে ছাত্র ও যুবকদের ভাল ছবি দেখার প্রায় উপায় নেই। অথচ সেই হাউসগুলি ত' সস্তা পণ্যচিত্রে বোঝাই থাকে; আর ভাল ছবিগুলি দেখার সুযোগ পায় কেবলমাত্র ফিল্ম সোসাইটির লোকেরা। এরূপ পরিস্থিতিতে বাছা বাছা ভাল ছবিগুলিকে দেখাবার ব্যবস্থা করা ফিল্মের ভাল দর্শক তৈরি করতে সাহায্য করা। এবার বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবের সময় উদ্যোক্তারা শহরতলীতে [illegible] জন্য বাছাই করা ছবিগুলি শ্রমিকদের দেখাবার ব্যবস্থা করে-

[illegible] থাকলেন। [illegible] ব্যবসার দিক থেকে চিন্তা করেই এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশের ফিল্ম ব্যবসায়ীর সহযোগিতা দূরের কথা চিন্তা করা উচিত দরকার। এ ধরনের মেলা বা উৎসবের একমাত্র কথা হল—ভাল ছবির স্বাদ জাত এবং তার ফলে সিনেমার দর্শকবৃদ্ধি।

এরূপ উদ্যোগকে সকলেই সমর্থন করছে। কিন্তু জেনে আশ্চর্য হলাম যে সরকার এবং কলকাতা কর্পোরেশনের কাছ থেকে এই মেলা কোনরকম সহযোগিতা পায় নি। উপরন্তু নানাভাবে চাপ দেওয়া হয়েছে। চলচ্চিত্রের শিল্পের সামগ্রিক স্বার্থের দিক থেকে চিন্তা করলে ফিল্ম ব্যবসায়ী, সরকার ও ফিল্ম ডিভিশন ইত্যাদি এই মেলার সহযোগী হওয়া উচিত।

—সুজন

নন্দিনী মালিয়া
[illegible]

'দি গ্রেট রাশিয়ান সার্কাস'-এর একটি দৃশ্য

উড়াও কেতন

যাত্রা আঙ্গিকের নাটক

যাত্রাকে বলা হয় কৃষি-বাংলার লোক-সংস্কৃতি। এককালে যাত্রা কেবলমাত্র গ্রাম ও গঞ্জে সমাদৃত হত বেশি। শহরে যে হত না—এমন বলা চলে না। তবে যাত্রার মোটা দাগের অভিনয়রীতি ও সহজ পরি-বেশনা নিয়ে শহরে রসিকতা চলত। কিন্তু সহজভাবে বিনা আড়ম্বরে মানুষের কাছে বিষয়বস্তুকে পৌঁছবার যাত্রাপালার রীতি অনেকদিন আগে গণনাট্য সংঘ উপলব্ধি করেছিল। 'রাহুমুক্ত' যাত্রা আঙ্গিকের নাটক তার প্রমাণ। কিন্তু তারপরে গণনাট্য সংঘ এ ব্যাপারে আর মাথা ঘামায় নি। [illegible] যাত্রা—এ [illegible] নাটক করে গেছে। অনেকক্ষেত্রেই সে সব নাটক কলকাতায় নাট্য-জগতে বিশেষ রেখাপাত করতে পারে নি।

অথচ যাত্রাদলগুলির ওপর পড়েছে গণ-আন্দোলনের প্রভাব। একদিকে যেমন নাটকের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর ক্রমবর্ধমান পরিবর্তন, আর দর্শকদের মতিগতির দিকে চেয়ে যাত্রাওয়ালারা 'বাঁশের কেল্লা' থেকে 'একটি পয়সা', 'মাইকেল মধুসূদন' থেকে 'হিটলার' পালা তৈরি করেছে। যাত্রার জনপ্রিয়তা আগের থেকে অনেক বেড়ে গেছে। আজ ২৩টির বেশি যাত্রাদল অভিনয় করছে। ফিল্ম ও নাট্য জগতের অনেক শিল্পী যাত্রাদলে অভিনয় করে অভিনয়-রীতিরও পরিবর্তন আনয়ন করেছেন।

এই পরিস্থিতিতে—গণনাট্য আন্দোলনে বিশ্বাসী 'রূপান্তরী' নাট্যগোষ্ঠীর যাত্রা আঙ্গিকে নাটকাভিনয় অভিনন্দনযোগ্য ব্যাপার। 'রূপান্তরী' পরিচালক ইতিপূর্বে বলিষ্ঠ বক্তব্যের কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করে শহরে নাট্য-রসিকদের কাছে পরিচিত হয়েছেন। সুতরাং তাঁদের যাত্রা-আঙ্গিকের [illegible] দেওয়ার জন্য [illegible] অত্যাবশ্যক।

[illegible] নাটক 'উড়াও কেতন' কলকাতায় ইংরেজদের বণিক-রূপে আগমন, এবং তারপর থেকে ধীরে ধীরে "পোহালে শর্বরী—বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে"র সেই অতীত দিনের ঘটনাকে উপস্থিত করেছে ইতি-হাসের ফকির বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত করে। তাই এই নাটকের প্রধান চরিত্র মজনু ফকির। উত্তরপ্রদেশ থেকে বাংলা দেশ পর্যন্ত একদা যার দূরদৃষ্টিতে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরেছিল। যে বিদ্রোহের বাণী ইংরেজ ও সামন্ত শাসকদের অত্যাচারে কখনো পিছু হটেছে, কখনো কখনো এগিয়েছে। কিন্তু একেবারে শেষ হয় নি। ইতিহাসের পাতায় পাতায় নানা নামে গণ-বিদ্রোহের সে-কাহিনী নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। গণ-বিদ্রোহের সেই কথাকে এই নাটকে উপস্থিত করা হয়েছে বর্তমানকালের অভিজ্ঞতার আলোকে। আজো সেই সাম্রাজ্যবাদীরা কখনো রাত্রির অন্ধকারে, কখনো প্রলোভনে শোষণের চক্রান্ত জাল ছড়িয়ে যাচ্ছে। নিরপেক্ষতা ও বিশ্ব-শান্তির নামাবলী গায়ে 'এইডের' নামে অর্থ ছড়াচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। [illegible]দের সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন [illegible] [illegible]ষণের [illegible]জীবনকে দুর্বিষহ কর[illegible]।

অতীতের ইতিহাসকে আজ বিচার করার প্রয়োজন আছে এই আলোকে। সেদিন যে ম্যাকনামারা এসে প্রলোভনের জাল ছড়িয়ে গেল। অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই কুঠিয়াল বণিকদের এই কথা শুধু ঢংটা ভিন্ন। বিষয় বিচারে জোছনদার এই নাটক রচনা সময়োপযোগী। বিশেষ করে মজনু ফকিরের উপাখ্যানকে আজ স্মরণ করিয়ে দেবারও প্রয়োজন রয়েছে।

কিন্তু এই নাটকের প্রধান দুর্বলতা যাত্রাধর্মী হলেও সম্পূর্ণভাবে যাত্রাপালা হয়ে উঠতে পারে নি। যাত্রাপালায় যেমন ঘটনার সঙ্গে ঘটনার যোগ—অথচ প্রত্যেকটি দৃশ্যের স্বতন্ত্র পরিবেশ রচিত হয় এখানে সময় সময় রাজ দরবার ও অন্তঃপুর, এবং অন্তঃপুর ও বাহির মহল যেন একাকার হয়ে যায়। মজনু ফকির এখানে যাত্রা-পালার বিবেকের মত চরিত্র। এই চরিত্র-টিকে ঠিকভাবেই উপস্থিত করা হয়েছে। তবে বিবেকের আগমন হয় গানে গানে; কথার শেষে প্রত্যাগমনের পরে তার গান হয় না হলেও হয়ে আগমনের গানের পারিপার্শ্বিকতা বা তালই [illegible]। মজনু ফকির ছিল দার্শনিক ও তাত্ত্বিক। তিনি বিদ্রোহের বাণী ছড়িয়েছিলেন—[illegible] নিয়েছিলেন। তাই আসরে তাঁকে কোমরে

তাসখন্দ চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন দিনে সেনেগালের চলচ্চিত্র-অভিনেত্রীগণ ইসা নিয়াং, তেরেসে ডিওপ, সেইয়া কন দিয়াই।

তলোয়ার নিয়ে যত না মানায—তত মানায বিদ্রোহের প্রেরণাদাতা এবং অত্যাচারকে নিধন করার মন্ত্রগুরু হিসাবে। যদিও নাটকটিকে ইতিহাসের সঙ্গে সাল তারিখ ও ঘটনার সংগতি রেখে রচনা করা হয় নি, কিন্তু এটি ইতিহাস আশ্রিত নাটক।

নাটকের শুরুতে নেপথ্য ভাষ্যে বলা হয়েছে অতীতের ইতিহাসকে বর্তমানের আলোকে স্মরণ করে দেওয়া হচ্ছে। এদিক থেকে আমার মনে হয় সংলাপে আরো যত্ন নেবার দরকার আছে। কুঠিয়াল টমাসের কথাগুলি এমন হওয়া দরকার, যাতে একালের সাম্রাজ্যবাদীদের কথার সঙ্গে মিলে যায় আর রাজা গণপতি, কমলাপতি, মন্ত্রীর কথাতেও আমাদের দেশের সাম্রাজ্যবাদ সহযোগী, দালাল এবং বিভ্রান্তকারীদের কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। তাহলে দর্শকরা অতীত আর বর্তমানের যোগসূত্র সহজেই খুঁজে পাবেন। নাটকে লোকশিক্ষার ভূমিকা এখানেই হবে সার্থক।

যাত্রা রীতির অভিনয়ের দিক থেকেও দুর্বলতা রয়েছে। যাত্রার অভিনয় হওয়া দরকার মোটা দাগে। যাতে হাটেবাজারে দর্শকরা বুঝতে ও শুনতে পারে। এদিক থেকে কুঠিয়াল টমাস, লাঠি ও কাঠি এবং মজনু ফকির সর্বাধিক সার্থক। মন্ত্রী অম্বর, গণপতি ও রাণী লতা যথাযথ বলা চলে। জ্যোছনবাবুর সর্বাধিক বড় কৃতিত্ব মজনু ফকিরের ভূমিকায় শিল্পী নির্বাচন ও তাঁকে তৈরি করে নেওয়ায়। বর্তমান যাত্রা জগতের যাঁরা নামকরা বিবেক এই গায়ক অভিনেতা তাঁদের সমকক্ষ শুধু নয়, গানের দিক থেকে আরো উন্নত। এই ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রামকমল চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে আমরা সঙ্গীতশিল্পী হিসাবেই জানতাম : এই যাত্রা পালায় তিনি গায়ক-অভিনেতা হিসাবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

প্রসঙ্গত বলা দরকার প্রথম গানটি যেরূপ চমক সৃষ্টি করে, সুরের দিক থেকে শেষের দিকে তেমন করে না। লোকসঙ্গীতের মেজাজটাই অক্ষুণ্ন থাকা বোধ হয় ভাল।

নাটকের পোষাক-পরিচ্ছদ প্রশংসনীয়। জ্যোছন দস্তিদার ও চন্দ্রা দস্তিদার দু-জনই শিল্পী। তাঁদের শিল্পরুচির পরিচয় এই পোষাক-কল্পনায় পাওয়া যায়।

'উড়াও কেতন' যাত্রা আঙ্গিকের নাটকাভিনয়ের এই উদ্যোগের জন্য আবার আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

"হিটলার"

গত ২৪শে নভেম্বর মহাজাতি সদনে 'তরুণ অপেরা'র যাত্রা অনুষ্ঠান 'হিটলার' দর্শকমণ্ডলীর অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেছে। ভার্সাই সন্ধিপত্র অগ্রাহ্য ও ছিন্ন করে হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসী জার্মানীর অভ্যুদয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হোতা বিশ্বত্রাস হিটলারের বিশ্বগ্রাসী পরিকল্পনার ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার—রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানের সংকল্প,—লালফৌজের মুক্তিসংগ্রাম,—স্টালিনগ্রাদে শোচনীয় পরাজয়—তারপর মদোন্মত্ত হিটলারের পতন এবং প্রণয়িনী এফা (এভা) ব্রাউনের সঙ্গে সহমরণ,—১৯৪০ থেকে ১৯৪৯ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রোমহর্ষক কাহিনী দর্শকবৃন্দ বিস্ময়ে সংগোপাবি অভিনীত হতে দেখছেন শম্ভু বাগ রচিত এই নাটকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নায়কদের মধ্যে জনারেল গোয়েরিং প্রমুখকে এবং যুদ্ধবিরোধী পক্ষে স্তালিন, গুকভ প্রমুখকে দেখতে পাওয়া যায়। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ছোট-বড় উপকাহিনী—রাশিয়ার গুপ্তচর মেয়ে লুসির সঙ্গে এক রাশিয়ান সৈন্যাধ্যক্ষ সেরাভিচ-এর প্রণয়: এক জার্মান আর্মি অফিসার ব্রানস্টেইন ও জার্মান নারী বারবারার প্রণয়-ঘটিত কাহিনী। অবশ্য শেষ অঙ্কে সেরাভিচের বারবারার প্রতি অনাবিল আকর্ষণ উপস্থাপনা [illegible] দিক থেকে [illegible]

সংগত হয়েছে বলে মনে করি না। পোল্যান্ড ভাগ করে যুদ্ধ-বিরতিতে স্তালিনের সম্মতি—ইতিহাস বিকৃতির জঘন্য দৃষ্টান্ত। নাট্যকার সাম্রাজ্যবাদের এই অপপ্রচার নাটকে সংযোজিত করে অত্যন্ত অন্যায় করেছেন। এই অংশ বাদ দেওয়া কর্তব্য। এই ধরণের নাটক লিখতে যেরূপ বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও চেতনা দরকার, নাট্যকারের তা নাই বলেই এসব অসংগতি রয়েছে।

নামভূমিকায় শিল্পী শান্তিগোপাল পাল তাঁর অনবদ্য অভিনয়ে একাধারে হিটলার চরিত্রের উগ্র দেশপ্রেমের অন্ধতা, দাম্ভিকতা, ঔদ্ধত্য, সন্দেহপরায়ণতা, একাকীত্ব ও বেদনা পরিস্ফুট করে তুলেছেন। স্তালিন চরিত্রটিতে অমর ভট্টাচার্য যথাযথ গাম্ভীর্য আরোপ করেছেন। তুষার গোয়েরিং (প্রসেনজিৎ সরকার), অংকত (মান চ্যাটার্জী), জনৈক (নরেন দে), সেরাজিচ (সুদেশকুমার) কিছুটা আড়ষ্ট। অনুশীলনের মাধ্যমে আশা করা যায় এ আড়ষ্টতা কেটে যাবে। গোয়েন্সলাভস্কি (শিব ভট্টাচার্য) তাঁর জ্বলন্ত দেশপ্রেম নিয়ে একটি জীবন্ত চরিত্র। যাত্রার দলের বিবেকের মত নিকোলাই (সুদর্শন সেন)-এর কণ্ঠে "সৈনিক নির্ভয়" "জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ পৃথিবীর বুকে কীর্তি রেখেছে লাল-ফৌজ আর স্তালিনগ্রাদ" ইত্যাদি গানগুলি বেশ ভাল লেগেছে।

গুপ্তচর মেয়ে লুসির ভূমিকায় বর্ণালী ব্যানার্জীর অভিনয় অত্যন্ত প্রাণবন্ত। তাঁর জ্বলন্ত দেশপ্রেম, জীবনের হাহাকার এবং ট্রাজেডি দর্শকদের মনে দাগ কেটে দেয়। এফা ব্রাউন (জ্যোৎস্না ঘোষ) এবং বারবারা (আরতি দত্ত) সু-অভিনয় করেছেন। স্পানয়া ভূমিকায় সুপর্ণা মন্ডলের উচ্চারণভংগী আরও ভাল হলে এবং নাটকীয়তা কম হলে আরও জ্বলন্ত হয়ে উঠতে পারত।

রূপসজ্জা যথাযথ। পেশাদারী যাত্রাজগতে পরিবর্তনের হাওয়া কিভাবে জেগেছে 'হিটলার' তার একটি দৃষ্টান্ত। রাজা-রাজড়ার কাহিনী-নির্ভরতা থেকে যাত্রা ক্রমেই আধুনিক মানবের মূল্যে সংগতি রেখে চলতে চেষ্টা করছে। তাই যাত্রায় প্রায় যুগান্তকারী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

"তরুণ অপেরা"র এই প্রচেষ্টা অভিনন্দনীয়, তবে পালাটির আর একটু সম্পাদনা প্রয়োজন।

দুর্গেশনন্দিনী

অল ইন্ডিয়া উয়োমেন্স কনফারেন্স (দঃ কলিকাতা কালচারাল ক্লাব) গত ৯ই নভেম্বর রবীন্দ্র সদন মঞ্চে 'দুর্গেশনন্দিনী' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। সংখের অভিনয়ে মহিলারা এইরূপ একটি দীর্ঘ নাটক প্রযোজনায় যথেষ্ট সাহসের ও অভিনয়নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। পরিচালক শ্রীসুখেন্দু চট্টোপাধ্যায় সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনাই করেন নি, প্রেম দৃশ্যটির পরিকল্পনায় যথেষ্ট মনোযোগের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রাখেন।

অভিনয়ে উজমানের পরিচয় দেন শ্রীঐন্দ্রিলা চৌধুরী (ওসমান) ও শ্রীপ্রণতা ভট্টাচার্য (বিমলা)। শ্রীসুনীতি দাস ও শ্রীকনকমণি, দিগগজ ও রহিম শেখের ভূমিকায় দর্শকদের হাসির খোরাক যোগান। কতলু খাঁ ও বীরেন্দ্র সিংহের ভূমিকায় শ্রীমীনা সেনের ও মাধুরী সেনের অভিনয় চরিত্রানুগ। শ্রীইন্দুনিভা রায়চৌধুরীর জগৎ সিংহ বাচনিক দোষে দুষ্ট। শ্রীরমা গাঙ্গুলীর আয়েষা ও শ্রীকমলা ব্যানার্জীর তিলোত্তমা চরিত্রানুযায়ী অভিব্যক্ত।

শ্রীকণিষ্ক সেনের আলোকসম্পাত নিতান্তই সাধারণ স্তরের। শ্রীগোপালদেব ও তাঁহার সম্প্রদায়ের সঙ্গীতপরিচালনা চলনসই।

উত্তমপুরুষ

গত ১৬ই নভেম্বর শিবাজী সংঘের সদস্যরা সিকদারপাড়ায় দীপ্তিকুমার শীল
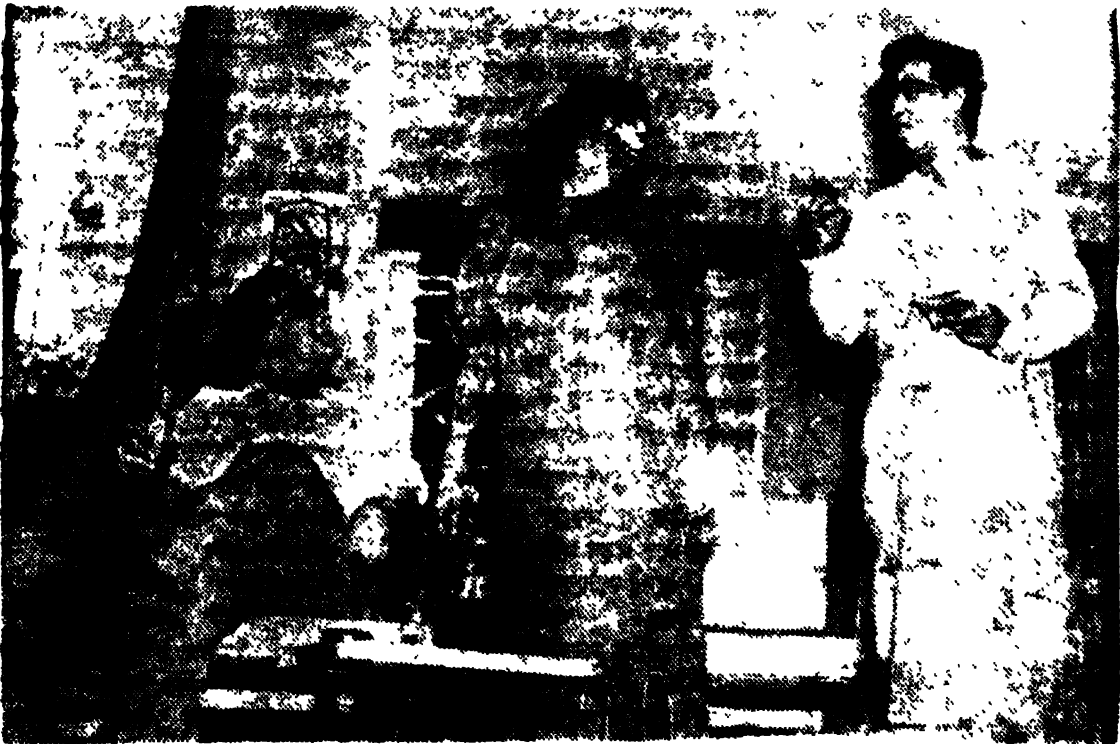
[illegible]

রচিত 'উত্তমপুরুষ' হাসির নাটকটি উপহার দিলেন। নাটকের কাহিনী দুই বন্ধু মৃণাল ও শৈলেনের মধ্যে জয়ন্তী নামে কোন এক মেয়েকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। নাট্যকার নাটকের পরিসমাপ্তি দেখিয়েছেন—'প্রেম ভোগে নয় ত্যাগে'। এই দুই বন্ধুর চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন যথাক্রমে—দীপ্তিকুমার শীল ও দিলীপ বসাক। জয়ন্তীর চরিত্রে রূপদান করেন গোপা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য চরিত্রে রূপদান করেছেন—ডাঃ বিমল চন্দ্র, প্রশান্ত মজুমদার, অশোক চন্দ্র, মিহির চন্দ্র, মদন মজুমদার, ব্যোমকেশ ঘোষ ও অসীম সরকার।

মাটির ঘর

গত ২৫শে নভেম্বর শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্যের নাটক 'মাটির ঘর' দক্ষিণ কলকাতার ভারত নাট্যসংস্থা কর্তৃক বেহালার অহীন্দ্র মঞ্চে মঞ্চস্থ করা হয়েছে।

নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন : সর্বশ্রী পা[illegible]গোপাল দাস, তপনকুমার হুই, অধে[illegible] মণ্ডল, নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখরকুমার, সুর্য রক্ষিত, প্রণব দাস, সুতপা চক্রবর্তী, ছবি পাল, কৃষ্ণা ভ[illegible] ও কবিতা চাটার্জী।

আগন্তুক

গত ৩রা ডিসেম্বর বিশ্বরূপা থিয়েটারে প্রেমেন্দ্র মিত্র ও ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'আগন্তুক'-এর মহরৎ অনুষ্ঠান হয়েছে। মহরতের পরে 'আগন্তুক' নাটকটি অভিনীত হব।

বার্তাজীবীসঙ্ঘের উদ্যোগ

ভারতীয় বার্তাজীবী সঙ্ঘ উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য আগামী ১৫ই ডিসেম্বর এক চ্যারিটি শো'র ব্যবস্থা করেছেন। সোসাইটি সিনেমায় ঐ দিন 'দি গ্রেট রাশিয়ান সার্কাস' ও 'বিদ্যাসাগর' ছবি দুটি দেখান হবে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ রিলিফের কাজে ব্যয়িত হবে।

দানীবাবুর জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব

দানীবাবুর জন্মশতবর্ষপূর্তি [illegible] আগামী [illegible]

ডিসেম্বর, ১৯৬৮। বাংলা দেশের রঙ্গমঞ্চ তথা রঙ্গালোক ভারতবর্ষের বিশেষ গৌরবস্থল। বহির্ভারতেও বাংলাদেশের থিয়েটার নিয়ে আমাদের গর্ব। এই থিয়েটারের উন্মেষ ও যৌবনকালে যাঁরা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন, অগৌরবের ক্ষেত্র থেকে তুলে এর ওপর দিগ্বিজয়ের কেতন উড়িয়েছেন, যে সব নট-নটী অতীতকালে বিস্ময়কর অভিনয় ক্ষমতায় রঙ্গজগৎ আলোড়িত করেছেন, মহাকবি গিরিশচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র দানীবাবু (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ) তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও অগ্রণীতম।

তাই দানীবাবুর জন্মশতবর্ষপূর্তিকে কেন্দ্র করে আগামী ১৪ই ডিসেম্বর '৬৮ শনিবার সকাল ৯টায় বাগবাজারস্থ "গিরিশ ভবনে" দানীবাবুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হবে। এই উপলক্ষে সকলকে গিরিশ ভবনে উপস্থিত হবার জন্য উৎসব সমিতির পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

১৫ই ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ৯টায় সদানন্দ রোডস্থ কালিকা হলে (হাজরা মোড়ের কাছে) এই সুমহান নটের জন্মশতবর্ষপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। রঙ্গজগতের নবীন এবং প্রবীণ সকল অভিনেতা-অভিনেত্রী রবিবার সকালে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করবেন।

রবীন্দ্র সদনে নাট্যোৎসব

রবীন্দ্র সদনের পরবর্তী প্রয়াস ২৪ দিনব্যাপী পূর্ণাঙ্গ নাট্যোৎসব। উৎসবের শুভ উদ্বোধন হবে জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে। বাংলা দেশের প্রখ্যাত বহু গোষ্ঠী অংশগ্রহণ করছেন এই উৎসবে। ইতোমধ্যেই সদনের আহ্বানে যে সমস্ত গোষ্ঠী সানন্দ সম্মতি জানিয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন—ক্যালকাটা থিয়েটার, চলাচল, মাস থিয়েটার্স, রঙ্গসভা, থিয়েটার ইউনিট, চতুরঙ্গ, ইঙ্গিত, থিয়েটার ওয়ার্কশপ, অভ্যুদয়, রূপান্তরী, দক্ষিণ পরিষদ, ক্রান্তি, আনন্দলোক, আই. টি. এ. গণনাট্য, পাভলভ ইনস্টিটিউট, দশরূপক, নক্ষত্র, জাজঘর ইত্যাদি নাট্যসংস্থা।

'শতরূপের' আসন্ন নাটক

নাট্যসংস্থা 'শতরূপ' শীঘ্রই থিয়েটার সেন্টার মঞ্চে নতুন নাটক নিয়ে অবতীর্ণ হচ্ছে। এদের নাট্যাবদান হচ্ছে স্মৃতিময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অষ্টোপাশ' ও অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নবদূর্বাদলশ্যাম'।

বিভিন্ন চরিত্রে থাকছেন : গোবিন্দ চক্রবর্তী, শচীন মুখার্জী, চন্দন সেন, প্রণব চক্রবর্তী, কমল হালদার, [illegible] রায়, শরদিন্দু ঘোষ, [illegible] দে, [illegible] [illegible], [illegible] দে, [illegible] রায় ও [illegible]

বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্দেশনার নাট্যকার নিজে।

ত্যাগরাজ হলে 'হিরোসিমা'

আগামী ১৭ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা [illegible] দক্ষিণ কলকাতার ত্যাগরাজ হলে [illegible] অপেরার নতুন যাত্রাপালা 'হিরোসিমা' অভিনীত হবে। দর্শনীবাবদ প্রাপ্ত [illegible] অর্থ কন্যাকুমারিকায় নির্মীয়মাণ বিবেকানন্দ শিলা স্মারক তহবিলে প্রদত্ত হবে।

কথক কর্তৃক উত্তমকুমার ও শ্রীতপন সিংহ সংবর্ধিত

গত ৩রা ডিসেম্বর টালিগঞ্জের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংস্থা কথক সংস্থার কার্যালয়ে এক অনাড়ম্বর পরিবেশে চিত্র পরিচালক শ্রীতপন সিংহ, অভিনেতা উত্তমকুমার এবং লোকগীতিশিল্পী শ্রীপ্রহ্লাদ ব্রহ্মচারীকে সংবর্ধনা জানান হয়। শ্রীসিংহ এবং উত্তমকুমারকে এ বছর রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্তি এবং শ্রীব্রহ্মচারীকে সম্প্রতি সোফিয়ায় বিশ্ব যুব উৎসবে শ্রেষ্ঠ গায়কের সম্মানলাভ উপলক্ষে এই সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী কানন দেবী।

অনুষ্ঠানে শ্রীতপন সিংহ বলেন, উত্তমকুমার সর্বপ্রথম 'ভরত' পুরস্কার লাভ করেছেন। তাঁর এই সম্মানে আমি গর্বিত। এই সম্মানলাভের পিছনে রয়েছে তাঁর অমানুষিক পরিশ্রম। উত্তমবাবু নিজেই একটি অভিনয় ইন্সটিটিউশন। আমরা আর দশ-পনের বছর বাদে এই কথার মর্ম বুঝতে পারবো।

উত্তমকুমার বলেন যে, ভালো অভিনয় করার জন্য ভালো পরিচালকের প্রয়োজন। বাংলাদেশে বর্তমানে সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ এবং তরুণ মজুমদার প্রমুখ ছাড়া ভালো পরিচালকের বড়োই অভাব। দর্শকরা আমার অভিনয় ভালোবাসেন—আমি তাঁদের এই ভালোবাসার মর্যাদা রক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকব।"

পূর্ণিমা সম্মেলন

সম্প্রতি বনগাঁ মহকুমা পূর্ণিমা সম্মেলনের ৫ম অধিবেশন পাঁচপোতাতে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বনগাঁ মহকুমার সাহিত্যসেবীরা [illegible] মিলিত হয়ে স্বরচিত লেখা পাঠ, আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্যাদিতে অংশ গ্রহণ করেন। পরিশেষে কবি নির্মল আচার্য রচিত "দগ্ধ সরোবর" নাটকটি "নীলাঞ্জিকা সাহিত্যগোষ্ঠী" সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন। বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নেন—সর্বশ্রী নির্মলকুমার বিশ্বাস, কান্তিময় আচার্য, উত্তম রায়, [illegible] রায়, অজিত আচার্য, [illegible], [illegible], [illegible] ও [illegible]

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত মন্তব্য প্রসঙ্গে

[গত সংখ্যায় সাপ্তাহিক বসুমতীতে 'বঙ্গদর্শন' শীর্ষক বিভাগে চিকিৎসা-জগতের কায়েমী স্বার্থ সম্পর্কে আলোচনাকালে এম-ডি ডিগ্রি প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করা হয়েছে, তা চিকিৎসক মহলে দারুণ চাঞ্চল্য ও আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। দলে দলে চিকিৎসকগণ (এঁদের অধিকাংশই সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত আছেন) সাপ্তাহিক বসুমতী কার্যালয়ে এসে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত মন্তব্যের সমর্থনে ও প্রতিবাদে তাঁদের অভিমত জানিয়ে যাচ্ছেন। এ সম্পর্কে এবার দুটো চিঠি প্রকাশিত হলো। আগামী সংখ্যায় 'বঙ্গদর্শন' লেখকের মন্তব্য সহ বাকি চিঠিগুলি প্রকাশ করা হবে।

—সম্পাদিকা]

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রাক্তন ও বর্তমান চিকিৎসা বিভাগের স্নাতকোত্তর ছাত্রবৃন্দ গত ১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭৫ বৃহস্পতিবারের প্রকাশিত সাপ্তাহিক বসুমতীর (৭৩ বর্ষ : ২৪শ সংখ্যা) ১৪৮৪ পৃষ্ঠায় 'বঙ্গদর্শন' এর অন্তর্ভুক্ত মন্তব্যগুলির প্রতিবাদ জানাইতেছি।

এখানে বলা হইয়াছে যে, "চিকিৎসা-শাস্ত্রের সর্বোচ্চ ডিগ্রি এম-ডি পাওয়াটা জনৈক ব্যক্তির মর্জির উপর নির্ভরশীল, অধীত বিদ্যার উপর নয়।" চিকিৎসা-শাস্ত্রের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি অধ্যাপকই জানেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সর্বোচ্চ ডিগ্রির পরীক্ষায় চারিজন পরীক্ষক নির্বাচিত হন এবং ইহাদের মধ্যে বহিরাগত বিশিষ্ট অধ্যাপকগণও থাকেন। ফলে কোন এক বিশেষজনের 'মর্জি'র উপর পরীক্ষার কৃতকার্যতা বিন্দুমাত্র নির্ভর করে না এবং ইহা জনৈক বা কতিপয় স্বার্থান্বেষী, পরশ্রীকাতর ব্যক্তির উদ্দেশ্য-প্রণোদিত অপপ্রচার।

চিকিৎসা বিভাগের সমালোচনাকারী সেই শিক্ষা সংস্কারক (?) আরও বলিয়াছেন, "এ কথা কে না জানেন ঐ ব্যক্তিটির পুত্রের কোচিং ক্লাশে ভর্তি না হইলে এম-ডি ডিগ্রি পাওয়া যায় না।" তিনি বোধ হয় জানেন না যে, "চিকিৎসা-শিক্ষা জগতের হর্তাকর্তাবিধাতার সেই পুত্র" বর্তমান চিকিৎসা বিভাগের কতিপয় স্নাতকোত্তর ছাত্রের এবং তাঁরই কলেজের কিছুসংখ্যক হাউস-সার্জেনদের বিশেষ অনুরোধে তাঁহার বহুমূল্য সময় নষ্ট করিয়া বিনা পারিশ্রমিকে নিঃস্বার্থভাবে সর্বশ্রেণীর ছাত্রদের জন্য একাকী দিনের পর দিন শিক্ষাদান করিয়া ছাত্রদের প্রভূত উপকার করেন। এই প্রসঙ্গে সেই অধ্যাপকের ধৈর্য, সহানুভূতি এবং আন্তরিকতার উচ্চপ্রশংসা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া মনে করি। পক্ষান্তরে তাঁহার ক্লাশের (তথাকথিত কোচিং) সাহায্য না লইয়াও পরীক্ষায় কৃতকার্যতার নজির প্রচুর আছে। বলা বাহুল্য অন্য কোনও শিক্ষাবিদ্ 'এম-ডি' ছাত্রদের এইরূপ সহানুভূতিসহকারে শিক্ষাদান করেন না।

পরিশেষে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, "পকেটের মোটা পয়সা খরচ করে তাকে খুশি করতে না পারলে স্বয়ং ধন্বন্তরিও পরীক্ষায় ফেল করবেন।" নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারী আমাদের মধ্যে অনেকেই এম-ডি পাশ করিয়াছেন, কেহ বা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইয়াছি, তবুও এই ধরণের অযৌক্তিক ধারণা আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর। বস্তুত এই কটাক্ষপাত খুব সহজভাবেই আমাদের শিক্ষা-বিভাগের একজন পিতৃস্থানীয় শিক্ষকের সম্মানহানি করিয়াছে।

আমরা সমবেতভাবে এই বিচিত্র সংবাদগুলির উৎস এবং প্রামাণিক সত্যতা জানিবার জন্য উন্মুখ। আশা করি আপনাদের আগামী সংখ্যা সাপ্তাহিক বসুমতীতে আমাদের এই আগ্রহের উপশম হইবে। ইতি—

ডাঃ মানসকুমার সেন, ডাঃ বিমল ভৌমিক, এম-ডি, ডাঃ বাবুরাম হাজরা, এম-বি বি-এস, ডাঃ রণজিৎ চক্রবর্তী, ডাঃ শ্যামসুন্দর সরকার, ডাঃ সুপ্রিয় পাল, ডাঃ সমরেন্দ্র রায়, ডাঃ শংকর পাল, ডাঃ সুধীরকুমার চক্রবর্তী, ডাঃ প্রশান্ত বক্সী, ডাঃ আদিনাথ নাগ, ডাঃ সুবোধকুমার বাজিয়াল, ডাঃ নন্দন মুখোপাধ্যায়, ডাঃ চিত্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-ডি (ক্যাল), ডাঃ মানবেন্দ্রলাল বসু, ডাঃ গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ স্বদেশ খাঁড়া, এম-ডি (ক্যাল), ডাঃ সত্যপ্রসাদ চক্রবর্তী।

*

আপনার ১৯শে অগ্রহায়ণ 'বঙ্গদর্শনে' কলকাতার এম-ডি ডিগ্রী লাভ করা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা ভিত্তিহীন। আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-ডি ডিগ্রী লাভ করেছি, তা ছাড়া এম-আর-সি-পি ডিগ্রীও আছে। আমার এম-ডি ডিগ্রী লাভের পূর্বে কখনও "জনৈক ব্যক্তি"র সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয় নি। আমি "জনৈক ব্যক্তি"র পুত্রের কোচিং ক্লাসেও কখন যাই নি। আমি কোন ব্যক্তির পকেটে মোটা পয়সা খরচ না করে এবং তাঁকে খুশি না করেই এম-ডি ডিগ্রী পেয়েছি।

আমি এম-আর-সি-পি এবং এম-ডি পরীক্ষা দিয়ে দেখেছি যে উভয়ক্ষেত্রেই সমপরিমাণ অধীত বিদ্যার প্রয়োজন আছে।

ডাঃ দ্বিজেন্দ্রকুমার রায়, এম-ডি, এম-আর-সি-পি। রেসিডেন্ট ফিজিসিয়ান, নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ

'গান্ধীবাদ কি সচল'? প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক বসুমতী-সম্পাদিকাকে ধন্যবাদ, কারণ তাঁর সহযোগিতায় ও প্রেরণায় বসুমতীর নবম সংখ্যায় (১৫।৮।৬৮) শ্রদ্ধেয় দিলীপ ঘোষ-রায়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, যা সাধারণ পাঠকের সামনে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সম্বন্ধে চিন্তা ও মতামত প্রকাশের প্রেরণা আনবে।

এই প্রসংগে আমার বক্তব্য, প্রবন্ধটি আরও প্রাঞ্জল হওয়া উচিত ছিল। যেমন শ্রীনির্মল বসুর 'মাই ডেজ উইথ গান্ধী' অথবা সেগলের 'ক্রাইসিস ইন ইণ্ডিয়া' পুস্তকে গান্ধীজীর জীবনের নোয়াখালীর ঘটনাসমূহ। কারণ কোন বিরাট ব্যক্তি যিনি একজন অবতাররূপে প্রচারিত তাঁর জীবনের সর্বদিক (বিশেষ করে মানুষ অথবা অবতার) বিশ্লেষিত না হলে তাঁর নামের সংগে জড়িত একটা 'ism' (বাদ) সার্বিক বিশ্লেষণ সম্ভব নয়; বিশেষভাবে যাঁর কথা "আমার জীবনই আমার বাণী।"

দেশ বলতে একটা দেবীমূর্তি বা খানিকটা মাটি নয়, এমন কি তার বিশেষ নামডাকওয়ালা নেতারাও নন। "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।" দেখা যাক গান্ধীজী বাস্তবসম্মত উপায়ে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্যে কতখানি প্রয়াসী হয়েছেন। সমাজ-নীতি, রাজনীতি, ধর্ম ইত্যাদি সব কিছুই অর্থনীতির সংগে একান্তভাবে জড়িত। অর্থনৈতিক মানোন্নয়নেই মানুষের শিক্ষা, দীক্ষা, চরিত্র ইত্যাদির উন্নয়ন সম্ভব। সেই অর্থনৈতিক বক্তব্যে গান্ধীজী বিরাট একটা গোঁজামিল করে গেছেন বিশেষ শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষার্থে, যার জঠরে মিশ্র অর্থনীতির, গণতান্ত্রিক সমাজবাদের (সোনার পাথরবাটি) তথা-বর্তমান ভারতের জন্ম।

গান্ধীজীর সততা সম্পর্কে তিলমাত্র সন্দেহ না করেও বলা যায় যে তিনি

[illegible] কোন "[illegible]" (বোধ)-এর [illegible] নয়। তার পূর্ববর্তী ভাববাদী বা আয়-বাদী দার্শনিকদের ও ধর্মগুরুদের উপদেশ ও কার্যাবলীর কিছু কিছু গ্রহণ বা বর্জন করে হয়ত মানুষের মঙ্গল চেয়েছেন তার পূর্বসূরীদের পরীক্ষিত অসাফল্যের পথে। কিন্তু মানুষের দুরবস্থার মূল কারণ কোন অর্থনৈতিক সামাজিক ব্যবস্থা সে সমস্ত অনুসন্ধান ও তৎ মূলে ছেদ করবার ব্যবস্থা না করে তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের পথেই রাজা, মহারাজা, জমিদার, শিল্পপতিদের মানুষের মংগলার্থে দান-ধ্যান করতে বলেন যে মানুষকে শোষণ করেই তাঁরা এই অংশকার অর্জন করেছেন (মূল প্রবন্ধের ১১ ও ১২ প্যারা দ্রষ্টব্য)। বহু গান্ধী জীবনীকার গান্ধীজীর [illegible] 'গীতা ভাষ্যের' উদাহরণ বহু দিয়েছেন কিন্তু গীতার রাজনীতির মূলকথা 'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ' বা 'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' ইত্যাদি শ্লোক শ্রেণিস্বার্থের খাতিরে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের মত একজন ধর্মীয় নেতার চোখে মানবসমাজের যে শ্রেণী-সংগ্রাম এড়ায় নি, সেখানে কোন শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার্থে গান্ধীজীর মতন একজন রাজনৈতিক নেতার শ্রেণী-সংগ্রামহীন শ্রেণী সহ-যোগিতার রাজনীতির উদ্ভব তা বুঝতে শ্রেণী-স্বার্থহীন রাজনীতিজ্ঞের পক্ষে অসম্ভব নয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, জনসাধারণ বার বার গান্ধীজীর ডাকে জমায়েৎ হত কেন? কারণ সাধারণভাবে রাজনৈতিক চেতনা-হীন জনসাধারণ কোন রক্তাক্ত সংগ্রামে যেতে চায় না; যদিও দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে রক্তাক্ত সংগ্রাম বহু-বার অসংগঠিত, অবৈজ্ঞানিক হঠকারিতার পথে এবং সেই কারণেই প্রচণ্ড আঘাত পাবার পর হতাশ জনসাধারণ, বিশেষত মধ্যবিত্ত চেতনা বারবার গান্ধীজীর পেছনে জমায়েৎ হয়েছে—যদি আবেদন-নিবেদনে, অহিংসা ও সততার প্রার্থিত বস্তু পাওয়া যায়—যায় [illegible] বর্তমান ভারত। জমায়েৎ এদেশে বিচার না হয়, বহু শিক্ষিত বিজ্ঞান পড়া ব্যক্তিও 'নেপালবাবা', 'নিথরী মা', 'সাপের কথা কওয়া' বিশ্বাস করে জমায়েৎ হয়। অর্থ রোজগারের কারণে বিজ্ঞান পড়া ও প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মনে অনেক তফাৎ। জমায়েৎ দেখে জনপ্রিয়তা নির্ধারণ করা ভুল।

উপসংহারে বলা যায়—যদিও গান্ধীজী বহু গণ-জমায়েৎ করেছেন, গণ-আন্দোলন সংগঠিত করেছেন কিন্তু (কেতকগুলি অবাস্তব পূর্বশর্ত আরোপ করে—যা তাঁর [illegible] শিষ্যদের পক্ষেও [illegible] হয় নি—যা এখন [illegible] বা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নয় এবং যা [illegible] [illegible] [illegible] (আবশ্যক) তার চরম মুহূর্তে তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার্থে। আগামী দিনের জন-সাধারণ তাঁর দেবত্বের মূল্যায়ন করবে (যা ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়েছে) বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে 'গান্ধীবাদ' সচল কি না।

—শ্রীঅসিতরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
শাসন, বারুইপুর
(২৪ পরগনা)

*

[illegible] পত্রিকা মারফত অধ্যাপক দিলীপ ঘোষ যে বক্তব্য উপস্থাপিত করে-ছেন তাতে একান্তই বিচারশীল বিশ্লেষণের অভাব বলে বক্তব্যটিকে কেন্দ্র করে কোন সার্থক আলোচনা গড়ে উঠতে পারে নি বলে মনে হয়। বক্তব্যটিতে বিচার না করেই কতকগুলি সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। বলা যেতে পারে গান্ধীকে বড় বেশি over simplify করা হয়েছে। গান্ধীবাদ অচল কি না—এ সম্পর্কে লেখক আমে-রিকান নিগ্রো আন্দোলন কিংবা রাশিয়ার বিরুদ্ধে চেকদের অস্ত্রহীন প্রতিরোধের কথার উল্লেখ করতে পারতেন—সেই সঙ্গে গান্ধীজীর ডাণ্ডি অভিযানের সঙ্গে মাও সে-তুং-এর গ্রামীণ আন্দোলনের কোন সম্পর্ক আছে কি না অথবা অত্যাধুনিক অটোনোমাস বিরোধী আন্দোলনের উপর গান্ধীজীর মত সম্পর্কে বক্তব্যের পরোক্ষ প্রভাব আছে কি না তা পরীক্ষা করলে পারতেন। গান্ধীজী কোন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন নি—গান্ধীবাদ বলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই, এই তথ্যটাও লেখক এড়িয়ে গেছেন। গান্ধীজীর জীবনটাই একটা মতবাদ বলা যেতে পারে। একজন একক মানুষ কোন সংগঠন, কোন জাগতিক শক্তির সাহায্য ছাড়া অন্যায় অবিচার ও অত্যা-চারের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ ঘোষণা করে অন্যায়ের প্রতিবিধানে অত্যাচারিত ও নিপীড়িত মানুষকে সচেতন করে তুলতে পেরেছেন এটাই গান্ধী মতবাদ। অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে কোন অস্ত্রবল, কোন অর্থবল, কোন সৈন্য বল প্রয়োজন নেই—নৈতিক বলই যথেষ্ট। জ্বলন্ত দেশ-প্রেমের অগ্নিশিখা বুকে নিয়ে যে সমস্ত বিপ্লবীরা সাহেব মারতে বেরিয়েছিলেন—তাঁরা নমস্য, কিন্তু একটি রিভলবার দিয়ে যেখানে একটা কিংবা দুটো সাহেব নিধন করা যায় সেখানে একদিনের হরতালে [illegible] হিমাচল কাঁপিয়ে দেওয়া যায়। গান্ধীজীর তিনটি দেশব্যাপী আন্দোলন ১৯২১—১৯৩১—১৯৪২ মনে মনে [illegible] [illegible] কাঁপিয়ে তুলেছিল। [illegible] [illegible] [illegible] ঐ তিনটি আন্দোলনই এবং শিক্ষার বস্তু। [illegible] [illegible] একজাতিকে তিনি মুক্তির নিশানা দেখিয়েছেন জীবন পণ। যদি গান্ধীবাদ বলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি, তবে ঐ জীবনই সত্যকারের গান্ধীবাদ।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু মহাশয় নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও রবীন্দ্র-নাথের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে যে বিপুল সময় গান্ধী-নিন্দায় ব্যয় করেছেন তা'ও পীড়াদায়ক। স্থানে স্থানে out of context উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি রোলাঁর দৃষ্টিতে গান্ধীকে হেয় করার চেষ্টা করেছেন। মনে হয়। কিন্তু রোলাঁ গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ এই তিন মানবতাবাদী কোন সময় নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্কে অশ্রদ্ধের হয়ে উঠেছিলেন এটা পাঠককে বিশ্বাস করানো কঠিন। বিশেষ কতক-গুলো প্রশ্ন যেমন চরকা কিংবা প্রাথমিক আন্দোলন এদের মতপার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার সংকটে রোলাঁ-টলস্টয় গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ-আইন-স্টাইন এই মানবতাবাদীগণ শোষিত অত্যাচারিত মানবসমাজের বিরাট ভরসা-স্থল। আর গান্ধীকে হেয় করে সুভাষ-চন্দ্রকে বড় করা যায় কি না এটাও বিতর্ক বিষয়। আমার যত দূর বিশ্বাস অধ্যাপক বসু মহাশয় একজন স্বামীজীর ভক্তজন। স্বামী বিবেকানন্দের বীর্যবত্তার দিকটা নিয়ে বীরভক্ত যদি নেতাজী হতে পারেন তবে তাঁরই দরিদ্রনারায়ণ ও অস্পৃশ্য জনগণের জন্য কটিমাত্র বস্ত্র পরার-আদর্শকে গ্রহণ করে গান্ধী মহাত্মা হয়ে-ছেন এটা বলা কি অন্যায় হবে? আমরা [illegible] হয়েও নিরাসক্তভাবে বিচার-শীল বা মননশীল হতে পারি না কি?

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল মহাশয় শঙ্কর বসু মহাশয়ের সংগে ব্যবহারে গান্ধী কতটা বিদ্বেষের পরিচয় দিয়েছেন তা তাঁর একটি ব্যক্তিগত ঘটনা থেকে বলতে চেয়েছেন। ব্যক্তিগত ঘটনার ঐতিহাসিক মূল্য খুব কম হলেও লেখকের যুক্তিতর্কের যে পরিচয় এতে মিলেছে তা খুব যুক্তিসঙ্গত নয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে শরৎবাবু মন্ত্রিত্ব নিতে গিয়েছিলেন কেন? [illegible] যেমন [illegible] সরকারের তিন রাষ্ট্রপতির বিচারের প্রাক্কালে বিরাট এক নেতাজী-পাগল জনতা উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, সেখানে ঐ উদ্বেলিত জনতার নেতৃত্ব না দিয়ে তিনি মন্ত্রিত্ব ও পদমর্যাদার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন কেন? তিনি যদি একাই সমস্ত [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible]

দুর্গত—আরাম-প্রিয় সরকারের বীর বীরাঙ্গনাদের কাহিনী যখন দেশের দিকে দিকে মুক্তির জন্য মানুষকে পাগল করে তুলেছে, যখন গান্ধীজীও কংগ্রেস নেতৃত্বের দেশ-বিভাগ নীতিতে ও ক্ষমতা হস্তান্তর নীতিতে বীতশ্রদ্ধ, তখন ঐ উদ্বেগাকুল ভারতীয় জনতার নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যোগ্য দেশনায়কের অভাবেই আজ স্বাধীনতা পেয়েও আমরা খণ্ডিত ভারতের নিরন্ন-রিক্ত-নিরীহ নাগরিক।

শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন মৈত্র মহাশয়ের ক্ষোভের কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। সারাজীবন যে দেশের মুক্তির জন্য কোন নির্যাতনই যখন নির্যাতন মনে হয় নি, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যদি সেই দেশের মাটিতে ঐ দেশপ্রেমিকদের স্থান না হয় তবে যে দুঃখের সীমা থাকে না। সেই দুঃখে ও ক্ষোভেই তিনি গান্ধীর উপর আছড়ে পড়েছেন বুঝতে পারি। তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে আমার বলার শুধু এইটুকু যে দেশ বিভাগের দায়িত্ব গান্ধীজীর উপর ন্যস্ত করা যায় না। ঐ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজীর অসহায়ক একটা বিরাট জীবনের হৈমালয়িক ব্যর্থতার করুণ কাহিনী গান্ধীজীর বক্তব্যের মধ্য দিয়েই তখন ফুটে উঠেছে। যেদিন মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা (৩রা জুন, ১৯৪৭) কংগ্রেস নেতাগণ গ্রহণ করবেন বলে ঠিক করেছেন সেদিন সকালের গান্ধীজীর মনোভাব ফুটে উঠেছে তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। সেদিন গান্ধীজী লিখছেন,

"Today I find myself all alone. Even the Sarder and Jawharlal think that my reading of the situation is wrong and peace is sure to return if partition is agreed upon. They did not like my telling the viceroy that even if there was to be partition, it should not be through British Intervention or under British rule. . . . I see clearly that we are setting about this business the wrong way. We may not feel the full effect immediately but I can see clearly that the future of Independence gained at this price is going to be dark. I pray that God may not keep me alive to witness it...but should that evil apprehended over take India and her Independence is imperilled let posterity know what agony this old soul went through thinking of it. Let it not be said that Gandhi was party to India's vivisection. But everybody is impatient for Independence. Therefore there is no help. (Pyarelal—Last phase vol. 3)—

এই কথাগুলির মধ্যেই গান্ধীজীর অসহায়ত্বের বেদনার করুণ কাহিনী ফুটে উঠেছে। সকলে স্বাধীনতার জন্য উন্মাদ। দেশ-বিভাগের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ নেই। এমন কি শরৎ বসু মহাশয় যে চেষ্টা করেছিলেন তাতেও তাঁকে কালো পতাকার সম্মুখীন হতে হয়েছিল—স্বর্গীয় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় দেশ-বিভাগের প্রধান প্রবক্তা—কমিউনিস্টরা তো আগেই পাকিস্তান স্বীকার করে নিয়েছে—সোস্যালিস্টরা নীরব দর্শক। বাংলা দেশের যে হিন্দু এম-এল-এদের ভোটে দেশ-বিভাগ পাশ হোল তাঁরা সকলে একবাক্যে দেশ বিভাগের পক্ষে ভোট দিলেন, একজনও প্রতিবাদ করলেন না। প্রধানমন্ত্রী নেহরু গান্ধী-হত্যার পরে স্বীকার করলেন বাপুজীর কথা না মেনে দেশ-বিভাগ করে ভুল করেছেন। কিন্তু তখন 'ফিরিবার পথ নাই'। আর শ্রীমৈত্র মহাশয় যে বলেছেন, কংগ্রেস মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করে নি তা ইতিহাসের দিক থেকে সমর্থনীয় নয়। কংগ্রেস ঐ পরিকল্পনা পুরোপুরি গ্রহণ করেছিল। মুসলিম লীগ দরকষাকষি করে কূটনৈতিক যুদ্ধের অবতারণা করেছিল এবং ঐ কূটনৈতিক যুদ্ধে পরাজিত হয়েই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে দেশ ভাগ স্বীকার করতে হোল। যদি গান্ধীজীর কথামতো ঐ পরিকল্পনা গ্রহণ না করা হোত, তবে ঐ কূটনৈতিক যুদ্ধের অবকাশ থাকতো না। ইংরেজকেও বিনা-সর্তে সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হোত। গান্ধীজী প্রথম থেকেই ওই কথাই বলছিলেন সর্তহীন স্বাধীনতা—তাঁর একমাত্র বক্তব্য ছিলো ইংরেজ যদি তার কথামতো স্বাধীনতা দিতে আন্তরিক হয় তবে তাকে ঐ ক্ষণে সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে—সর্তহীন স্বাধীনতা ঘোষণা করতে হবে—এমন কি তারা ইচ্ছে করলে কংগ্রেস-লীগ আপোষ না হলে মুসলিম লীগের হাতেই শাসনভার অর্পণ করে দিয়ে যেতে পারে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই ইংরেজের উপস্থিতিতে দেশ-ভাগ নয়। দেশ-ভাগ যদি একান্তই প্রয়োজন হয়, তবে তা স্থির করবে ইংরেজ চলে যাওয়ার পর স্বাধীন ভারতের জনগণ। কিন্তু গান্ধীজী তখন অনাবশ্যক ব্যাঘাত। তাঁর কথা শোনার লোক নেই।

"Everybody is eager to garland by photo and statue and not to follow me".

সেই অসহায় ধিকৃত জীবন থেকে মুক্তিলাভের জন্য গান্ধীজী ১২৫ বৎসর বাঁচার আশা ত্যাগ করলেন। স্বাধীনতার দিন ১৫ই আগস্ট উপবাস করলেন—স্বাধীনতার দিনে অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আকাশবাণী মারফৎ দেশবাসীকে বাণী দিতে অস্বীকার করলেন। এমন কি বি-বি-সি প্রতিনিধিকেও প্রত্যাখ্যান করলেন।

ভারতবর্ষের সেই নিদারুণ সঙ্কটের দিনে একজন মানুষও ভবিষ্যতের কথা ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। একদিকে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা অন্যদিকে নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্তির উল্লাস। ঐ উল্লাস ও উন্মত্ততার মধ্যে একজনের ক্ষীণকণ্ঠ কারও কর্ণগোচর হলো না। গান্ধীজীর ঐ সময়ের মনের অবস্থা বুঝবার চেষ্টা করলে—তাঁর প্রতি অনাবশ্যক অবিচার করতে হয়তো আরও একটু ইতস্তত করতাম। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক হীরেন মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে কথা বলেছেন, তা নানা কারণে প্রণিধানযোগ্য। কারণ তিনি কংগ্রেস দলের নন—তিনি কমিউনিস্ট ও একাধারে ঐতিহাসিক।

—সিতাংশুকুমার দত্ত
অধ্যাপক, নেতাজী মহাবিদ্যালয়
আরামবাগ।

'ভারতদর্শন'-এ নির্ভীক উক্তি

২১শ সংখ্যায় "ভারতদর্শন" পত্রে নির্ভীক উক্তির জন্য প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না। বাংলাকে নাম পালটে রাজস্থান বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না। রাজস্থানী মালিকানায় অনেকগুলো চা-বাগানেও বৈষম্যমূলক ব্যবহার চলেছে বাঙালী ও রাজস্থানী করণিকদের ক্ষেত্রে। এই এলাকাগুলোতে বাঙালী কম থাকায়, আয়ুব রাজত্বের 'মাইনরিটি' পর্যায়ভুক্ত। চা শিল্পক্ষেত্রেও উচ্চপদে নিয়োগ অবাঙালী বিশেষ করে রাজস্থানী ও পাঞ্জাবীতে সীমাবদ্ধ। সর্বোচ্চ পদে পাঞ্জাবী আসীন থাকলে সেই সম্প্রদায়ের লোকই সর্বতোভাবে বেশি সাহায্য ও সুযোগ পেয়ে থাকে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ২১ বৎসর ধরে রাজ্যের কর্ণধারগণ দিল্লীর প্রসাদ লাভের জন্য বাংলাকে বিশেষ করে রাজস্থানীদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছেন। আমরা এক বাঙালী অপর একজনকে প্রায়ই সহ্য করতে পারি না। অথচ অবাঙালীমাত্রেই বাঙলায়—অপর একজন নিজ সম্প্রদায়ের লোককে উন্নতি করতে সর্বতোভাবে সাহায্য করে থাকে। কিন্তু দেখেও আমাদের জ্ঞান হয় না।

—সুধীর মুখার্জী
হাতীপোতা
(জলপাইগুড়ি)

ছোটরাই বড়

বড়রা যা পারে নি, বড়রা যা পারছে না, এখন ছোটরাই করছে সেই কাজ। দেশের আর বিদেশের মাটিতে বড়রা যে সম্মান (দেশের আর দশের) ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে এসেছে এখন ছোটরাই নিয়েছে দায়িত্ব সেই হারানো সম্মান পুনরুদ্ধার করার। আর সব থেকে আনন্দের বিষয় হলো যে সেই দায়িত্ব পালনে ছোটরা যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন আর এখনো দিচ্ছেন—সত্যি কথা বলতে কি তার তুলনা মেলা ভার। অতুলনীয় কৃতিত্ব আর অভাবনীয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে খেলার মাঠকে আলো করে রেখেছেন আমাদের দেশের ছাত্র খেলোয়াড়রা। কি ফুটবল, কি ক্রিকেট—দু'টি বিষয়েই তাঁরা লাভ করেছেন অকল্পনীয় সাফল্য। শুধুমাত্র দেশের মাটিতেই নয়—বিদেশের ক্রীড়াঙ্গনেও ভারতের ছাত্র খেলোয়াড়রা দেশের সুনাম দিনের পর দিন বাড়িয়ে চলেছেন নিজেদের অতুলনীয় ক্রীড়া-নৈপুণ্যের মধ্যে দিয়ে। আজ তাই ছোটদের নিয়েই আমরা গর্ব করতে পারি। জানি ছোটরাই আজ আমাদের একমাত্র আশা, ভরসা, একমাত্র ছোটরাই আজকের এই অশান্ত ক্রীড়া-জগতে আমাদের দেখাতে পারে আশার আলো। আর সত্যিকথা বলতে কি সে আশার আলো আমরা ছোটদের কাছ থেকেই দেখতে পাচ্ছি।

তাই সকালের কাগজে আমরা যখন অস্ট্রেলিয়ার সফররত ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের জয়লাভের খবর দেখি তখন আনন্দে আমাদের মন নেচে ওঠে। বড়দের খেলায় অর্থাৎ টেস্ট লড়াই-এ ভারত অস্ট্রেলিয়ার কাছে গো-হারা হেরেছে। পরাজয়ের সে জ্বালা আমরা ভুলি নি। তাই আজ ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের সাফল্যে মন আমাদের নেচে উঠছে ময়ূরের মতো। ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রাজা মুখার্জী আর দীপঙ্কর সরকারকে তাই মনে হচ্ছে বড় বেশি আপনার! ......আর কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশনের কল্যাণ মুখার্জীও আজ আমাদের বড় প্রিয়। তারই দেওয়া একমাত্র গোল এনে দিয়েছে বাংলাকে বিজয়ীর সম্মান। কুমার আশুতোষের জয় তো বাংলারই জয়। কারণ তাদের দৌলতেই 'লিটল ডুরান্ড' আজ বাংলার ঘরে। কুমার আশুতোষ আজ তাই বাংলা দেশের স্কুলগুলোর হিরো। তাই আজ আর বলতে বাধা নেই যে ছোটরাই অর্থাৎ ছাত্র খেলোয়াড়রাই দেশের আর বিদেশের মাটিতে মান রাখতে এগিয়ে এসেছে। কথায় আছে—বড়দের দেখে ছোটরা শেখে। কিন্তু সব বিষয়েই আমাদের দেশের হাল-চাল উল্টো! তবে কি শেষ পর্যন্ত ছোটদের দেখেই বড়রা কিঞ্চিৎ শিক্ষা গ্রহণ করবেন......?

লিটল ডুরাণ্ড অর্থাৎ সুব্রত মুখার্জী কাপ এবার আবার এসেছে বাংলা দেশে। পাইকপাড়ার কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশন জিতে এনেছে সুব্রত মুখার্জী কাপ। এই প্রতিযোগিতার সেরা দল হিসেবেই তারা লাভ করেছে এ সম্মান।

আজ তাই সর্বভারতীয় স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতাতে আবার বাংলা দেশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো। নবছর আগে যখন এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিলো, তখন থেকেই বাংলার স্কুল দিয়ে আসছে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়।

তবে সুব্রত মুখার্জী কাপ অনেকবারই হাত ছাড়া হয়েছে আমাদের। গত বছর কাপ জিতেছিলো নাগাল্যাণ্ডের একটা স্কুল।

এবারও সুব্রত মুখার্জী কাপ লাভ করতে কুমার আশুতোষকে খেলতে হয়েছিলো নাগাল্যাণ্ডের একটি স্কুলের বিরুদ্ধে। আর তাদের হারাতে কুমার আশুতোষকে পোড়াতে হয়েছে অনেক কাঠ-খড়। খেলার নির্ধারিত সময়ে গোল করতে পারে নি কোন দল। কিন্তু কুমার আশুতোষ জিতে গেলো অতিরিক্ত সময়ের খেলায় তাদের অধিনায়ক কল্যাণ মুখার্জীর গোলে।

যাই হোক রাজধানী শহর দিল্লীতে কুমার আশুতোষ এবার দিয়ে এসেছে অভাবনীয় কৃতিত্বের পরিচয়। খেলার প্রথম থেকেই তারা উন্নত ধরণের ক্রীড়াচাতুর্যের পরিচয় দিয়ে এসেছে শেষ পর্যন্ত। তাই ফাইন্যাল খেলায় তারা যখন নাগাল্যাণ্ডের মোককচাং স্কুলকে এক গোলে হারিয়ে দিয়ে সুব্রত কাপ লাভ করলো তখন অবাক হন নি কেউই।

আর তাই দিল্লীর একটা কাগজ এতটুকুও ইতস্তত করে নি লিখতে যে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ২৬টি দলের মধ্যে কুমার আশুতোষ ছিলো সব দিক দিয়ে সেরা। আচার-ব্যবহার থেকে আরম্ভ করে পোষাক-আষাক আর মাঠের মধ্যের ও বাইরের আচরণে তারা ছিলো শ্রেষ্ঠ।

শুধু তাই নয়—কুমার আশুতোষ দলটি ছিলো সব দিক থেকে সুন্দর। খেলার ধারা থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই তাদের ছিলো উন্নত ধরণের। পত্রিকাটির মতে, কুমার আশুতোষ দলে দু'জন অভিজ্ঞ খেলোয়াড় থাকলেই স্কুলটি যে কোন নামী দলের বিরুদ্ধেও লড়তে পারবে সমান তালে দিয়ে।

যাই হোক ১৬ দিন ব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় বাংলা দেশের একটি স্কুল যে কাপ জিতে নিতে পেরেছে এইটাই আমাদের কাছে যথেষ্ট। লিটল ডুরাণ্ড অর্থাৎ সুব্রত মুখার্জী কাপ প্রতিযোগিতার ন'বছরের ইতিহাসে এই তৃতীয়বার বাংলা দেশের একটি স্কুল জিতে আনলো—বাংলারই বীর ছেলে যাঁর নামে এই প্রতিযোগিতা সেই সুব্রত মুখার্জী কাপ।

গল্প হলেও সত্যি

বছর কয়েক আগের ঘটনা।

ইংলণ্ডের ডেনিস কম্পটনের মতো ব্যাটসম্যান তখন পৃথিবীতে খুবই কম ছিলো। যেমন তার মারের কায়দা, তেমনি হাতের জোর। ডেনিস কম্পটনের খেলা দেখতে তাই মাঠে জোটেন হাজার হাজার দর্শক।

কম্পটন সেদিন ব্যাট করছিলেন সারের বিরুদ্ধে। কম্পটন খেলবে না হয়। মাঠে ভীষণ ভিড়। হাজার হাজার দর্শকের সমবেত উল্লাসে মাঠ গুলজার।

সারের উইকেট কীপার আর্থার ম্যাকেন্টায়ার তখন উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়ে সুযোগ খুঁজছিলেন কম্পটনকে আউট করার। ব্যাকওয়ার্ড শর্টে থেকে ফিল্ডিং করছিলেন এরিক বেডসার। একটা আকানো বল পেয়েই কম্পটন কবে হুক করলেন। চার রান অবধারিত। কিন্তু বলটা ব্যাকওয়ার্ড শর্ট লেগে এরিক বেডসারের পায়ের বুটে লেগে ছিটকে গিয়ে পড়লো উইকেটরক্ষক আর্থার ম্যাকেন্টায়ারের হাতের দস্তানার মধ্যে !

প্রথমটায় ঘাবড়িয়ে গেলেও আর্থার জোরগলায় হেঁকে চীৎকার করে উঠলেন—হাউজ দ্যাট !

আম্পায়ারের আঙুলও সংগে সংগে উঠলো মাথার ওপরে। কম্পটন আউট !

কট আউট !

লণ্ডন থেকে সিডনি

লণ্ডন থেকে সিডনি পর্যন্ত দশ

সম্প্রতি কলকাতায় শেষ হয়ে গেছে ন্যাশনাল অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় [illegible] চ্যাম্পিয়ান হয়ে [illegible]

দশ হাজার মাইলের ম্যারাথন মোটর রেসে ভারতের একমাত্র প্রতিযোগী ডাঃ ওয়াদিয়া তাঁর গাড়ি নিয়ে চলেছেন ইটালীর পথ দিয়ে। পেছনে তাঁর শুভ্র শিখর মাউন্ট ব্লান্স...। ডাঃ ওয়াদিয়া কিন্তু এই ম্যারাথন রেসের শেষ পর্যন্ত থাকতে পারলেন না। তাঁর গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিলো তেহেরানে। তাই ৪ঠা ডিসেম্বর সন্ধ্যের মধ্যে পৌঁছতে পারেন নি বোম্বাই-এ।

হাজার মাইলের এক মোটর দৌড় এখন প্রতিযোগিতার শেষ ধাপে এসে পৌঁচেছে। মোট ৯৮টি গাড়ি এই ম্যারাথন মোটর রেসে যোগ দিয়েছিলো। তার মধ্যে ৭২ খানা গাড়ি বোম্বাই বন্দর থেকে চুসান জাহাজে করে অস্ট্রেলিয়ার পথে রওনা হয়ে গেছে।

আগামী ১৩ই ডিসেম্বর অস্ট্রেলিয়ার ফ্রি ম্যানটেল বন্দরে পৌঁছুবে জাহাজ। আর পরের দিন অর্থাৎ ১৪ই ডিসেম্বর থেকে আবার শুরু হবে শেষ পর্যায়ের দৌড় প্রতিযোগিতা।

এই ম্যারাথন মোটর রেসে একজন মাত্র ভারতীয় প্রতিযোগী ছিলেন। কিন্তু তিনি শেষ পর্যায়ের রেসে অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ করা থেকে বঞ্চিত হলেন। অবশ্য বোম্বাই থেকে জাহাজ ছাড়ার আগে

ফলে শেষ পর্যন্ত ভারতের একমাত্র প্রতিযোগী ডাঃ বি ওয়াদিয়া বাদ পড়লেন অভিনব এই প্রতিযোগিতা থেকে। ডাঃ ওয়াদিয়ার গাড়িটা (ফোরড লোটাস কর-টিনা) তেহেরানে খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। গাড়ি সারিয়ে তিনি আবার যাত্রা করেছিলেন।

কিন্তু গত ৪ঠা ডিসেম্বর রাত সাড়ে আটটায় ৭২ খানা রেসের গাড়ি নিয়ে চুসান যখন যাত্রা শুরু করলো অস্ট্রেলিয়ার পথে তখনও বোম্বাই-এ পৌঁছয় নি ডাঃ ওয়াদিয়ার গাড়ি। অথচ ঐদিন দুপুর দুটোর সময় খবর পাওয়া গিয়েছিলো যে ডাঃ ওয়াদিয়ার গাড়ি বোম্বাই থেকে মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরে আছে। তাই ঠিক হয়েছিলো যে শেষ মুহূর্তে

॥ ব্যারিংটন ॥
আরো দু'বছর ক্রিকেট খেলার আশা রাখেন।

তাহলে তাঁকে জাহাজে তুলে নেওয়া হবে। কিন্তু ডাক্তার সাহেব শেষ পর্যন্ত আর আসতে পারেন নি।

লণ্ডন-সিডনি মোটর রেসের শেষ আর সব থেকে আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা শুরু হবে ১৪ই ডিসেম্বর ফ্রি ম্যানটেল বন্দর থেকে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কার ভাগ্যে চ্যাম্পিয়ানশীপের সম্মান জোটে ....."

সমাচারদর্পণ

অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট লড়াই শুরু হলো। এ লেখা যখন আপনাদের হাতে পৌঁছুবে তখন ব্রিসবেনের প্রথম টেস্ট ম্যাচও হয়ে আসবে শেষ। অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট লড়াই-এর ফলাফলের মূল্য এবার অপরিসীম। গত বছর ইংলণ্ড ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে রাবার। অস্ট্রেলিয়াও এবার চেষ্টা করবে জিততে। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারানো সহজ নয়। তাই মনে হয় যে অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট লড়াই এবার জমবে খুব।

* * *

ইংলণ্ডের নাম করা ব্যাটসম্যান কেন ব্যারিংটন কয়েক মাস আগে অস্ট্রেলিয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর হৃদযন্ত্রে দেখা দিয়েছিলো মৃদু গোলযোগ। এখন ব্যারিংটন ভালো আছেন। তাই ফিরে যাচ্ছেন দেশে। ইংলণ্ডের পথে যাত্রা করার আগে ব্যারিংটন সাংবাদিকদের কাছে বলেছেন যে তিনি আরো দু'বছর ক্রিকেট খেলতে পারবেন বলে আশা রাখেন। তবে ডাক্তাররা যদি তাঁকে খেলতে বারণ করেন তাহলে তিনি ইংলণ্ডের খেলোয়াড় নির্বাচকমণ্ডলীর সভ্য হবার জন্যে চেষ্টা করবেন। আর এও চেষ্টা করবেন যাতে তিনি সরকারী

রাশিয়ার লেভ ইয়াশিন—বিশ্ব-ফুটবলের এক অতুলনীয় নাম। ডুপেলে, পুশকাস, ম্যাথুজ, ইউসেবিওদের নাম সারা দুনিয়ার খেলা-পাগল মানুষের মুখে মুখে ঘোরে, ঠিক তেমনি লেভ ইয়াশিন হয়েছেন রূপকথার নায়ক। তাঁর আগে এত ভালো গোলরক্ষক আর আসেন নি বিশ্ব-ফুটবল-অঙ্গনে। তিনি স্বতন্ত্র, অনন্য।

ইয়াশিন এসেছেন ফুটবল-প্রগতির এক মাহেন্দ্রক্ষণে, যখন তিন ব্যাক প্রথা থেকে পৃথিবীর ফুটবল-ট্যাকটিক্স ঝুঁকেছে চার ব্যাক প্রথার দিকে। সে সময় রাশিয়ার গোল আগলে ধরলেন লেভ ইয়াশিন। তাঁর নয়নাভিরাম খেলা দেখে দর্শকরা পাগল, সমালোচকরা উচ্ছ্বসিত, বিপক্ষ ফরোয়ার্ডরা হতবাক! ছোট জায়গায় দাঁড়িয়ে ত্বরিৎগতিতে যে কোন অবস্থায় তীব্রগতির বিদ্যুৎ-শট আটকাতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার! আর, কি সুন্দর সে প্রাণ-মাতানো মন-ভোলানো মনোরম ক্রীড়াশৈলী। তাঁর অনন্য ক্রীড়াভঙ্গি বুঝি লজ্জা দিল পৃথিবীর খ্যাতিমান জিমন্যাস্টদের! বিখ্যাত ক্রীড়া-সমালোচক ফ্রান্সের জি পেটাকের বললেন, "ইয়াশিন সম্পূর্ণ নতুন স্টাইলের গোলরক্ষক। গোল লাইনের সংকীর্ণ বিধিনিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে তিনি এগিয়ে এলেন 'পেনাল্টি এরিয়া' পর্যন্ত। গোলরক্ষকদের বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিলেন, স্বাধীনতা দিলেন! বেশি জায়গা নিয়ে গোলরক্ষকদের খেলার পথ তিনিই দেখিয়েছেন।"

তাঁর স্বদেশীয় ফুটবল সমালোচক এ ভিওনতিয়েভ ইয়াশিনের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে অভিমত প্রকাশ করলেন, "ফুটবল দশজন খেলোয়াড় ও একজন গোলরক্ষকের খেলা—এই প্রবাদবাক্যের অসারত্ব প্রমাণ করলেন লেভ ইয়াশিন। তিনি শুধু রক্ষণভাগের শেষ খেলোয়াড় নন, আক্রমণভাগের তিনি প্রথম খেলোয়াড়। প্রকৃত অর্থেই তিনি একজন আক্রমণাত্মক খেলোয়াড়। মুহূর্তের মধ্যেই তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, ইতস্ততঃ ভাব তাঁর মধ্যে নেই।"

ইয়াশিনের জন্ম ১৯২৯ সালে। গত পনেরো বছর ধরে তিনি মস্কোর ডায়নামো, রাশিয়া, য়ুরোপ ও বিশ্ব-ফুটবল দলের গোলরক্ষক। আজ পর্যন্ত তিনি পাঁচশো'রও বেশি খেলায় অংশ নিয়েছেন। প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলেছেন ৩৭৪টি (১৯৬৮-র এপ্রিল পর্যন্ত), আর তাঁর বিরুদ্ধে গোল হয়েছে ২১৮টি। রাশিয়ার জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন ৭০ বার, ২৬১টি ম্যাচ খেলেছেন এই প্রতিযোগিতায়। এর মধ্যে তিনি ২১ বার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন আর রাশিয়ার জাতীয় দলের পক্ষে ৭৪ বার খেলেছেন। য়ুরোপের বাছাই একাদশে স্থান তাঁর হয়েছিল তিনবার এবং দু'বার তিনি বিশ্ব-একাদশে স্থান পেয়েছেন। ষষ্ঠদশ অলিম্পিকে তিনি সোনার পদক পেয়েছেন রাশিয়ার গোলরক্ষক হিসেবেই। তাঁর অনন্য-সাধারণ ক্রীড়াকীর্তির স্বীকৃতি স্বরূপ "ফ্রান্স ফুটবল" পত্রিকা তাঁকে ১৯৬৩ সালের শ্রেষ্ঠ য়ুরোপীয় ফুটবলারের স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি প্রথম গোলরক্ষক যিনি এই সম্মান পেয়েছেন।

॥ ইয়াশিন ॥
আজকের ইয়াশিনের সঙ্গে সেদিনের অর্থাৎ ছেলেবেলার ইয়াশিনের কতো তফাৎ।

ব্রাজিলের প্রথম বিশ্ব-কাপ জয়ের দশম-বার্ষিক স্মরণোৎসবে গত ১৫ই নভেম্বর বিশ্ব-একাদশ বনাম ব্রাজিল দলের খেলায় তিনি বিশ্ব-একাদশের গোলরক্ষক নির্বাচিত হয়েছিলেন। এখন তাঁর বয়স ৩৯, এ সময়েও তিনি পৃথিবীর পয়লা নম্বর গোলরক্ষকের স্বীকৃতি আদায় করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন।

ইয়াশিনের আবিষ্কর্তা কোচ ইয়াকুশিন লেভ ইয়াশিন সম্পর্কে বলেছেন, "লেভের মধ্যে দার্শনিক ও নিপুণ শিল্পীর দুর্লভ সমন্বয় সাধিত হয়েছে।"

ইয়াশিনের প্রতিভা সম্পর্কে এই হল প্রথম ও শেষ কথা।

ইয়াশিন শুধু মাত্র রাশিয়ারই নন—আজো তিনিই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক।

—অরুণ চট্টোপাধ্যায়

সমরকুমার রায় (শ্রীখণ্ড, বর্ধমান)

উত্তর : মোহনবাগান ১৯৫৯ ও ১৯৬০ (ইস্টবেঙ্গলের সংগে যুগ্ম), তারপর ১৯৬৩—১৯৬৫ পর্যন্ত ডুরান্ড কাপ জিতেছিলো। আর সর্ব প্রথম মোহনবাগান ডুরান্ড কাপ জিতেছিল ১৯৫৩ সালে।

আপনার চিঠির জন্যে ধন্যবাদ।

সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (হালিসহর গোলাবাড়ি, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : অস্ট্রেলিয়ার লিণ্ডসে হ্যাসেট ও ডন ব্রাডম্যানের টেস্ট ম্যাচের ব্যাটিং এ্যাভারেজ জানতে চাই।

উত্তর	টেস্ট	ইনিংস	নঃ আঃ	রান	সর্বোচ্চ	শতরান সংখ্যা	গড়
হ্যাসেট	৪৩	৬৯	৩	৩০৭৩	১৯৮*	১০	৪৬'৫৬
ব্রাডম্যান	৫২	৮০	১০	৬৯৯৬	৩৩৪	২৯	৯৯'৯৪

(* অপরাজিত)

কিন্তু [illegible] সময়টা হবে [illegible] সেকেণ্ড।"

[illegible]

উত্তর : [illegible] আবার বন্ধ করতে হবে। [illegible]

[illegible] ও [illegible] (উত্তর পাড়া.)

প্রশ্ন : গত সংখ্যায় ট্রুম্যানের পরিচিতি প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু তাতে ট্রুম্যানের ব্যক্তিগত রেকর্ডস নেই। আমরা সেই রেকর্ড জানতে চাই।

উত্তর :

এক নজরে ট্রুম্যানের টেস্ট জীবন

	টেস্ট	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট	গড়
অস্ট্রেলিয়ার	১১	৬৪৫·১	৮৩	১৯১৯	৭৯	২৫·০৫
দক্ষিণ আফ্রিকা	৬	২১৫·০	৩৫	৬২০	২৭	২২·৯৬
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১৮	৭৬৪	১৭৬	২০১৮	৮৬	২৩·৪৬
নিউজিল্যাণ্ড	১১	৩৬১·১	১১৩	৭৬২	৪০	১৯·০৫
ভারতবর্ষ	৯	২৯৭ ২	৭৮	৭৮৭	৫৩	১৩·৮৪
পাকিস্তান	৪	১৬৪·৫	৩৭	৪০৯	২২	১৯·৯৫
মোট	৬৭	২৪৪৮	৫২২	৬৬২৫	৩০৭	২১·৫৭

হীরেন্দ্রমোহন জয় (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

প্রশ্ন : ইংলণ্ডের ইভান্স ও জে হার্ডস্টাফ এবং অস্ট্রেলিয়ার কিথ মিলার ও আর্থার মোরিসের টেস্ট খেলার ব্যাটিং এ্যাভারেজ জানতে চাই।

উত্তর	টেস্ট	ইনিংস	নঃ আঃ	রান	সর্বোচ্চ	শতরান সংখ্যা	গড়
ইভান্স	৯১	১৩৩	১৪	২৪৩৯	১০৪	২	২০'৬৯
হার্ডস্টাফ	২৩	৩৮	৩	১৬৩৬	২০৫*	৪	৪৬'৭৪
মিলার	৫৫	৮৭	৭	২৯৫৮	১৪৭	৭	৩৬'৯৭
মোরিস	৪৬	৭৯	৩	৩৫৩৩	২০৬	১২	৪৬'৪৮

নিমাইচন্দ্র প্রামাণিক (কাটোয়া, নিশানতলা, বর্ধমান)

প্রশ্ন : আধুনিক অলিম্পিক প্রতিযোগিতা কবে, কোথায় হয়েছিলো, কতোগুলো দেশ অংশ গ্রহণ করেছিল এবং চ্যাম্পিয়ানশীপ কে লাভ করেছিলো?

উত্তর :

স্থান	সাল	প্রতিযোগী দেশ	চ্যাম্পিয়ানশীপ
এথেন্স (গ্রীস)	১৮৯৬	১৩	গ্রীস
প্যারিস (ফ্রান্স)	১৯০০	১৬	ফ্রান্স
সেণ্ট লুইস (ইউ এস এ)	১৯০৪	৭	ইউ এস এ
লণ্ডন (ইংলণ্ড)	১৯০৮	২২	ইংলণ্ড
স্টকহলম (সুইডেন)	১৯১২	২৭	সুইডেন
এণ্টোয়ার্প (ইউ এস এ)	১৯২০	২৬	ইউ এস এ
লণ্ডন (ইংলণ্ড)	১৯০৮	২২	ইংলণ্ড
প্যারিস (ফ্রান্স)	১৯২৪	৪৫	ইউ এস এ
আমস্টারডাম (নেদারল্যাণ্ড)	১৯২৮	৪৬	ইউ এস এ
লস এঞ্জেলস (ইউ এস এ)	১৯৩২	৩৯	ইউ এস এ
বার্লিন (জার্মানী)	১৯৩৬	৫১	জার্মানী
লণ্ডন (ইংলণ্ড)	১৯৪৮	৫৯	ইউ এস এ
হেলসিংকি (ফিনল্যাণ্ড)	১৯৫২	৬৯	ইউ এস এ
মেলবোর্ন (অস্ট্রেলিয়া)	১৯৫৬	৭৩	ইউ এস এ
রোম (ইটালী)	১৯৬০	৮৫	রাশিয়া
টোকিও (জাপান)	১৯৬৪	৯৪	রাশিয়া

অনুপ চক্রবর্তী ও স্বদেশ ঘোষাল (রেস্টক্যাম্প, পাণ্ডু, আসাম)

প্রশ্ন : ভারত কোন্ সাল থেকে অলিম্পিকের হকি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করছে? ঐ অলিম্পিকগুলি কোথায় কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিলো?

উত্তর : আপনারা যদি গত ১০ই অক্টোবরে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বসুমতীটি একবার দেখে নেন তাহলে অনেকটা জায়গা বেঁচে যায়। ঐ সংখ্যায় পাবেন আপনাদের প্রশ্নের উত্তর।

পরিতোষ নাগ (কোকোবা.

উত্তর : আপনার চিঠির কিছু অংশ তুলে দিলাম।

"গত .৯শ সংখ্যায় মহিলাদের ২০০ মিটার দৌড়ের বিশ্ব রেকর্ডের যে সময় দেওয়া হয়েছে সেটা ভুল। ছাপা হয়েছিলো ২২·৭ সেঃ বলে,

সম্পাদকা—[illegible] সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, বসুমতী প্রেস হইতে শ্রী[illegible] কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক বসুমতী

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

৭৩ বর্ষ : ২৬শ সংখ্যা মূল্য : ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা PRICE : 30 Paise

বৃহস্পতিবার, ৪ঠা পৌষ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ Thursday, 19th December, 1968

বিকৃত রুচির বিরুদ্ধে

আজকাল কথায় কথায় দেশের যুব-সমাজের প্রতি দোষারোপ করা হয় এবং তাদের অধঃপতনের কথা লিখতেও কেউ কেউ বিশেষ নৈপুণ্য দেখান। সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা, এই সব লেখাকে সাহিত্যের ট্রেড মার্ক দিয়ে বাজারে ছাড়া হয়। আর যাঁরা ঐ সব ছাড়েন, তাঁরা দেশ-প্রেমের আদর্শ সাহিত্যের তত্ত্ব নিয়ে বুলি কপচালেও আসলে তাঁদের উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জন। তাঁদের দেখাদেখি, দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ীরাও অগ্রসর হন। এই শহরের যে কোনো বুক স্টলে চোখ রাখলেই তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই যেখানে পরিস্থিতি, সেখানে যুবসমাজকে দোষ দেওয়া নিরর্থক। বরং বলা যায়, বিকৃত রুচির লেখার দ্বারা এক শ্রেণীর লেখক যুবসমাজকে আকৃষ্ট করতে চায়—যাতে ঐ সব যুবকেরা বিপ্লব-টিপ্লব না ঘটিয়ে বসে।

বিকৃত রুচির লেখকদের উদ্দেশ্য কী—এখন আর তা' কারো অজানা নয়। অন্তত সম্প্রতি তার প্রমাণও পাওয়া গেছে।

ইতিপূর্বে বিকৃত রুচির লেখার বিরুদ্ধে বহুবার আমরা বলেছি। বাংলা-ভাষাভাষী পাঠকরা আমাদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। আবার যে সমাজের লোকদের বিকৃত রুচির লেখকরা অধঃপতনে নিয়ে যাবার ষড়যন্ত্র করে—সেই সমাজেরই কিছু ব্যক্তি জনসমক্ষে মোকাবিলা করে দিয়েছেন যে, বাংলা দেশে এক শ্রেণীর নীচ প্রকৃতির লোক কী ধরনের হীন কাজে লিপ্ত রয়েছেন। বিশেষভাবে সেই লেখকের ব্যাপারে আজ সতর্ক হওয়া দরকার, একদা যিনি বিপ্লবের জয়ধ্বজা তুলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আসলে উনি জনশত্রু। তাঁর লেখাতেই তার প্রমাণ রয়েছে। বিকৃত রুচির বেআইনী পুস্তিকা-লেখকদের সঙ্গে ইনিও তুলনীয়। অবশ্য ব্যবসা যাঁরা করেন, তাঁদের কাছে তাঁর বাজারদর আরো চড়বে। এবং একবার আইনের কবলে পতিত হওয়ার পর বুদ্ধ দলপতি সহ তিনি অন্য পথে পরিক্রমা সুরু করবেন। কিন্তু বাংলা দেশের জাগ্রত পাঠকদের কর্তব্য এই ধরনের লেখা ও লেখকের প্রতি সর্বদা হুঁসিয়ার থাকা।

বিকৃত রুচির লেখার বিরুদ্ধে আমাদের ঘৃণা ও অভিযোগ জানানোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি আধো আলো-আঁধারী অলি-গলির প্রতি। কারণ একবার ভালোভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে কী ধরনের বিকৃত রুচির ছবি ও বই প্রকাশ্যেই দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখে বিক্রি করা হচ্ছে। অথচ এ সব ব্যাপার পুলিশের চোখে পড়ে না, দৃষ্টি আকর্ষণ করলে গোয়েন্দা বিভাগ প্রকাশক ও মুদ্রককে খুঁজে বের করতে পারে না।

ইংরেজি নববর্ষ আগত। এই বর্ষকে উপলক্ষ করে যে সব ক্যালেন্ডার প্রকাশিত হয়, তাদের একাংশ কী ধরনের ছবি ধারণ করে পার্কগুলির লোহার রেলিঙে শোভা পায়—এটাও কারো অজানা নয়। এই সব ছবি রাস্তার ধারেই শোভা পায় এবং কোনো ভদ্রব্যক্তি সপরিবারে যখন সেই রাস্তা পার হন—তখন তাঁর অবস্থা কী হয়, তাও বলার অপেক্ষা রাখে না। এই ধরনের ছবির দ্বারা দেশের সরল লোকগুলিকে প্রলোভিত করা হয়। আমরা সাধারণ শিক্ষা দিতে যখন অসমর্থ, তখন এই ধরনের বিকৃত রুচির সৃষ্টির দ্বারা সমাজের আর এক শ্রেণী যে লাভবান হয় তা বলাই বাহুল্য।

আরো বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করছে—এক ধরনের চলচ্চিত্র। সরকারের আইনে গঠিত সেন্সর বোর্ড কিভাবে যে বেআইনী চলচ্চিত্রগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শনের ছাড়পত্র দেন, তা' আমাদের কাছে দুর্বোধ্য। সাপ্তাহিক বসুমতীর চলচ্চিত্র বিভাগে এই সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা ও সমালোচনা হয়েছে, 'নাইট' নামধারী ছবিগুলি প্রদর্শন করার বিরুদ্ধে ক্ষোভ জানানো হয়েছে।

বস্তুত এই দেশের সর্বত্র বিকৃত রুচির প্রসার ঘটাবার জন্য এক শ্রেণীর লোক উঠে-পড়ে লেগেছেন। অথচ আমাদের সরকার আদর্শের বাঁধা বুলি বললেও এদের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেন নি। কেন্দ্রীয় সরকার তথা পশ্চিম-বঙ্গের শিক্ষাদপ্তর এ ব্যাপারে নিশ্চুপ! কেন্দ্রীয় সরকারের সমাজকল্যাণদপ্তর সমাজের কল্যাণের কথা বললেও আজ পর্যন্ত বিকৃত রুচির লেখা বা ঐ জাতীয় ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু করেন নি। যা হোক এখন আইন জনসাধারণের পক্ষে থাকায় আমরা মনে করি, বিকৃত রুচির লেখাগুলি জঞ্জালের মতো দূরে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। তার সঙ্গে এটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, সমাজের শত্রু কারা, আর মিত্রই বা কে।

সম্পাদকীয়

একটার পর একটা দুর্ভেদ্য দুর্গের যখন পতন ঘটে, তখন সেনাপতির মনের অবস্থা কী হয় ফিল্ডমার্শাল আয়ুব খাঁর তা বিলক্ষণ জানা আছে। কিন্তু একবার ভাঙন যখন সুরু হয় তাকে রোধ করা প্রায় দুঃসাধ্য, সে যেন নদীর মতো আপন ধর্মেই ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে চলে। সে-নদীতে প্লাবন এলে বা বান ডাকলে হাজার স্লুইস গেটের ক্ষমতা নেই তার জল বাঁধ দিয়ে ধরে রাখার। পাকিস্তানের রাজনীতিতে এখন সেই প্লাবন এসেছে, আয়ুব-বিরোধীরা বাঁধ-ভাঙা জলের মতো দিনকে-দিন স্ফীত হচ্ছে। বিরোধী শিবিরে জেনারেল আজম খাঁর যোগদানের পর মনে হচ্ছে প্রেসিডেন্ট আয়ুব বেগবতী বন্যার তোড়ের মুখে দাঁড়িয়েছেন। খোদায় জানে আয়ুব শেষরক্ষা করতে পারবেন কি-না।

অথচ আজম বলতে আয়ুব অজ্ঞান ছিলেন একদিন। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে আজম আছেন আয়ুবের পাশে। বস্তুত আয়ুব সেদিন আজমের কাঁধে পা রেখেই ক্ষমতার মগডালে চড়তে পেরেছিলেন। ইস্কান্দার মির্জাকে ক্ষমতার গদি থেকে অপসারণ করার চক্রান্তের তিনি ছিলেন অন্যতম নায়ক। এ-পরিকল্পনাকে রূপান্তরিত করতেও আয়ুবের একান্ত প্রয়োজন হয়েছিলো আজমের শক্ত হাতের। সেদিন পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন অফিসার যে আদেশপত্রবলে ইস্কান্দারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন, সে পত্রখানি বয়ে নিয়ে যেতে সাহসী হয়েছিলেন একমাত্র আজম খাঁ-ই।

বস্তুত আয়ুব খাঁ সেদিন আজম খাঁকে তাঁর অনুগত ভৃত্যের মতোই ব্যবহার করেছিলেন, আজমও প্রভুসেবা করে নিজেকে ধন্য মনে করতেন। সেদিন আজমের ওপর আয়ুবের অটুট আস্থাও ছিলো, তাই যে চালাকির কাজে নিজে হাত দিলে হাত এবং ক্যারিয়ার মলিন হবার আশংকা থাকতো, সে কাজ অম্লানবদনে আয়ুব আজমের ঘাড়েই চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতেন।

ডিক্টেটররা জানেন রাইফেলই তাঁর শক্তির উৎস। মূক জনতা যাতে কখনো মুখর না হয়ে উঠতে পারে তার জন্যে হাতের কাছে রাইফেলটি তৈরি রাখতে হবে আর রক্তচক্ষু দেখাতে হবে তাদের। তাঁরা আরো জানেন, গণসমর্থন তাঁরা কোনোদিনই পাবেন না, স্বয়ং ডিক্টেটর তো ননই, তাঁর পারিষদবর্গের কারো পক্ষেও তা সম্ভব নয়। আয়ুবশাহীর পেছনেও গণসমর্থন কিছু ছিলো না, যদিও গোষ্ঠীসমর্থনের দাবি তিনি অবশ্যই করতে পারেন, কিন্তু জনতার হাততালি? নৈব নৈব চ। বেনেভোলেন্ট ডেস্‌পটিজম-এর যুগ দুনিয়া কবে ফেলে এসেছে।

তাই সে-অঘটন যখন ঘটলো, তখন

আজম খাঁ

আয়ুব মুহূর্ত বিলম্ব করলেন না, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করে ফেললেন। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। অমূল্য সহযোগিতার পুরস্কার-স্বরূপ প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ দোসর আজম খাঁকে মন্ত্রিত্ব দিয়েছিলেন: উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দপ্তর। অনুন্নত দেশের ক্যাবিনেটে খাদ্যদপ্তরের মতো পুনর্বাসন দপ্তরের ভার নেবার অর্থ স্বেচ্ছায় মনসা-ঘট দিয়ে দুশ্চিন্তাকে আমন্ত্রণ জানানো। হাজার হাজার উদ্বাস্তুর দুঃখের সমস্যা [illegible] হাজারো [illegible]। এ [illegible]

[illegible] ছিলেন [illegible] তিনি [illegible]। কিন্তু [illegible] ঠিক তার [illegible]। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যাটি তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে সমাধানে সচেষ্ট হলেন, উদ্বাস্তুরা পুনর্বাসনমন্ত্রীর মধ্যে [illegible] হৃদয়ের স্পর্শ পেলো। কিন্তু এতটা 'বাড়াবাড়ি' আয়ুবের মনঃপূত ছিলো না। জনসাধারণ মন্ত্রীকে শ্রদ্ধা করুক, ঠিক আছে; কিন্তু মন্ত্রীর আবার উপরি-পাওনা হয় কী করে? জনপ্রিয়তা লাভ করেন তিনি কোন্ হিসেবে?

স্পষ্টতই আয়ুব চটলেন আজমের ওপর। কিন্তু চতুর ডিক্টেটর অধস্তন আজমকে তা জানতে দিলেন না, কেবল তাঁর কর্মক্ষেত্র দিলেন পাল্টে। আজম খাঁকে সুদূর পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর করে সরিয়ে দেওয়া হলো। [illegible] তাঁর ভক্তদের তিনি দেখালেন। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের আয়ুব ভালো করেই জানেন। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন এই পাঠান শাসকের প্রাণ পূর্ব বাঙলার তরুণ দেশপ্রেমিকরা দুদিনেই ওষ্ঠাগত করে ছাড়বে। কিন্তু এখানেও দেখা গেলো, আয়ুবের হিসেবে বিস্তর গোলযোগ। বাঙালীরা অবাক হলো, এ কেমন শাসক, রক্তচক্ষু নেই, উদ্যত তর্জনী নেই, বদলে আছে স্মিত হাসি, আন্তরিক আলিঙ্গন? সবার বন্যায় যখন গ্রামের পর গ্রাম ডুবলো, চারদিকে আর্ত চীৎকার উঠলো, তখন ত্রাণসামগ্রী বোঝাই করে নৌকো নিয়ে প্রদেশের এ জেলা থেকে সে জেলায় দিনের পর দিন ভেসে বেড়াতে দেখা গিয়েছিল গভর্নর আজম খাঁকে। জীবন ফিরে পেয়ে সেদিন কত মরণোন্মুখ মানুষ আজম খাঁকে প্রাণভরে অভিনন্দন জানিয়েছিলো তার বিশদ বিবরণ আয়ুবের দরবারেও গিয়ে পৌঁছেছিল।

পূর্ববঙ্গেও সেই একই জনপ্রিয়তার অপরাধে আজম খাঁকে শাস্তি পেতে হলো। বিনা আড়ম্বরে আজমকে বরখাস্ত করা হলো এবং আর সাহস করলেন না কোনো পদ দিয়ে নতুন বিপদ ডেকে আনতে, প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি করতে। আয়ুবের চক্ষুশূল হলেও আজম এতদিন সুযোগ পান নি প্রতিশোধ নেবার। যদিও তাঁর কোনো রাজনৈতিক আদর্শ নেই, এবং আয়ুবের বিরুদ্ধে নিজের সীমিত শক্তি সম্পর্কেও তিনি সচেতন। তাই তিনি [illegible] মার্শাল আসগর খাঁকে বিরোধী দলের প্রতি [illegible], অনিচ্ছার সাথে [illegible] [illegible]।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

গত ১৯৬৪ সনের জানুয়ারী মাসে এই কনফারেন্স ডাকা হইয়াছিল, সর্বত্র নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠান হইয়াছিল, প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থাই করা হইয়াছিল কিন্তু দাঙ্গার জন্য অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়। পরে বিভিন্ন জেলার কিছু প্রতিনিধিস্থানীয় লোক একত্র হইয়া, গভর্নরের নিকট ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা নিজদিগকে সংখ্যালঘু বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত নয়. কারণ পরাধীন পাক-ভারতে তাহারাই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে স্বাধীনতার জন্য যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিয়াছে, ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়াছে, কারাগারে-দ্বীপান্তরে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে, গুলীবিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে,—তাহাদের কল্পনায় সাম্প্রদায়িকতা-প্রাদেশিকতা ছিল না। তাহাদের কল্পনায় ছিল প্রাদেশিকতা-সাম্প্রদায়িকতা-অস্পৃশ্যতা বর্জিত স্বাধীন দেশ, যে-দেশে থাকিবে সকলের সমান অধিকার, সমান সুযোগ—সেখানে থাকিবে না দুর্নীতি, দুর্ভিক্ষ, শোষণ-নিষ্পেষণ। স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা এতকাল দেশ ও জাতি হিসাবে চিন্তা করিয়া আসিয়াছে, প্রাদেশিকতা-সাম্প্রদায়িকতার কল্পনা তাহারা কখনও করে নাই কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর গত ১৮ বৎসরের ইতিহাস, সংখ্যালঘুদের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস।

বন্ধুগণ, আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, সমবেতকণ্ঠে আমাদের পুঞ্জীভূত বেদনা প্রকাশ্যে প্রকাশ করার জন্য। আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, সমবেতকণ্ঠে ক্রন্দন করার জন্য। আমাদের এই ক্রন্দন অরণ্যে রোদনই হয়ত হইবে। বালক অসহায়, বালকের বল ক্রন্দন। পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরাও নিজদিগকে বালকের মত অসহায় বোধ করিতেছে, তাই তাহাদের সম্বল ক্রন্দন বা আবেদন-নিবেদন। আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি, সমবেতকণ্ঠে আবেদন-নিবেদন করার জন্য, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সহানুভূতি লাভের জন্য, গভর্নমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য।

পরাধীন পাক-ভারতে বৃটিশ আমাদের মস্তিষ্কে যে চিন্তাধারা প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে, স্বাধীন পাকিস্তানে আমরা তাহারই জের টানিতেছি। দুর্নীতি ও সাম্প্রদায়িকতা এদেশের জিনিস নয়—বৈদেশিক কূটনীতির সৃষ্টি। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের জন্য ভেদনীতি আমদানী করিয়া জাতীয় চরিত্র কলুষিত করিয়াছে, আমাদের জাতি হিসাবে চিন্তা করার শক্তি নাই। একটা জাতির মধ্যে যদি সাম্প্রদায়িকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও দুর্নীতি থাকে তবে সেই জাতির ভবিষ্যৎ কি?

পৃথিবীর কোন দেশই সম্প্রদায় হিসাবে পরিচিত নহে, জাতি হিসাবে পরিচিত। ভৌগোলিক সীমারেখাই দেশ। সেই সীমারেখার মধ্যে যাহারা বাস করে তাহারা সেই দেশের নামে, সেই জাতি হিসাবে গণ্য হয়। যেমন ইংলণ্ড, আমেরিকা, তুরস্ক, জাপান ইত্যাদি। ঐ সব দেশের অধিবাসীরা ধর্ম বা সম্প্রদায় হিসাবে পরিচিত নহে। এক দেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী থাকিতে পারে কিন্তু জাতি হিসাবে তাহারা এক। একটা জাতির মধ্যে যদি বিভেদ থাকে, সেই জাতি দুর্বল হইয়া পড়ে। জাতির যাহারা শত্রু তাহারাই জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাইয়া, জাতিকে দুর্বল করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দ্বারা এক সম্প্রদায়ের লোক যদি অপর সম্প্রদায়ের লোকের ধন অপহরণ করে, এক সম্প্রদায়ের লোক যদি অপর সম্প্রদায়ের লোকের সম্পত্তি নষ্ট করে, এক সম্প্রদায়ের লোক যদি অপর সম্প্রদায়ের লোককে হত্যা করে, তবে জাতি হিসাবে আমরা কতটুকু লাভবান হইলাম? দাঙ্গায় যে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয় তাহা কি আমার জাতীয় সম্পত্তি নয়? সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অর্থ সেই জাতির মধ্যে দেশপ্রেম নাই। দেশপ্রেম থাকিলে কেহ জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া জাতিকে দুর্বল করিবে না। দেশপ্রেম থাকিলে মনে করিবে এই দেশের প্রত্যেক নর-নারী আমার আপন জন। তখন কেহ কাহাকেও হত্যা করার চেষ্টা করিবে না, রক্ষা করার চেষ্টা করিবে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা জাতীয় কলঙ্ক বিশেষ, ইহা দ্বারা জাতির ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়ে। দাঙ্গা কাহারা কি উদ্দেশ্যে বাধায় গভর্নমেণ্টের তাহা জানা উচিত এবং দাঙ্গা বন্ধ করার ক্ষমতাও গভর্নমেণ্টের থাকা প্রয়োজন। পরাধীন পাক-ভারতে গভর্নমেণ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য দাঙ্গা বাধাইয়াছে, এখন স্বাধীন দেশে দাঙ্গা বন্ধ হইবে না কেন? স্বাধীনতার পর সকলের মনে এই আশা ছিল, দাঙ্গা আর হইবে না। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর বন্ধ হইল না। গত ১৮ বৎসরে কতবার দাঙ্গা হইয়াছে, কত হাজার লোক নিহত হইয়াছে, কত কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে, সে খবর গভর্নমেণ্টের নিশ্চয়ই জানা আছে, তবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ হয় না কেন? সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য কোন কার্যকারী পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে কি? সংখ্যালঘুরা আর কতকাল অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করিবে?

দেশ-বিভাগের পর সংখ্যালঘুদের হাত হইতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরী সংখ্যাগরিষ্ঠদের হাতে চলিয়া গিয়াছে ফলে এক শ্রেণীর লোকের হাতে টাকা হইয়াছে, তাহারা চায় জমি কিনিতে। জমি হিন্দুদের হাতে। যাহারা জমি কিনিতে চায়, তাহারা জানে হিন্দুরা চলিয়া না গেলে জমি-বাড়ি সস্তায় পাওয়া যাইবে না, সংখ্যালঘুরা জমি বিক্রি করিবে না, কারণ তাহাদের জীবিকা-নির্বাহের একমাত্র অবলম্বন জমি। তাই সংখ্যালঘুদের দেশত্যাগ করিতে বাধ্য করার জন্য নানাভাবে উৎপীড়ন চলিতে থাকে,—জমির ধান কাটিয়া লইয়া যাওয়া গরু দিয়া ক্ষেত খাওয়ান, মেয়ে চুরি, ভীতি প্রদর্শন ইত্যাদি। সময় সময় এরূপ মিথ্যা মামলা সৃষ্টি হয় আমি এই সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য এত টাকা বায়না দিয়াছি, এখন কবলা করিয়া দিতেছে না। এইসব মামলার সাক্ষীর অভাব হয় না।

দেশ-বিভাগের পর হইতে সংখ্যালঘুদের মনোবল সম্পূর্ণ ভাঙিয়া গিয়াছে, প্রতি-

রাষ করিতে বা থানায় এজাহার দেওয়ার সাহস নাই। থানার এজাহার দিলেও কোন লাভ হয় না। এখানে একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বেশি দিন নয় ১৯৬৪ সালের কথা, আমার গ্রামের ছয়জন হিন্দুর জমির ধান কাটিয়া লইয়া গেল, ভয়ে কেহ কোন প্রতিবাদ করিল না। ইহার পর এক রাত্রে আমার ক্ষেতের ধান কাটিয়া লইয়া গেল, আমি বাড়ি ছিলাম, থানায় লিখিত এজাহার দিলাম, থানার দারোগা সাহেবকে তাগিদ দিলাম, কোন ফল হইল না, কিছুদিন পর দারোগা সাহেব তারাইল থানায় বদলী হইয়া গেলেন। ইহার কয়েক মাস পর আমি ঢাকা যাই, ইদ্রিস সাহেব তখন I.G.P. ছিলেন, আমি ইদ্রিস সাহেবের সহিত দেখা করিয়া কুলিয়ারচর থানার ও-সি'র নিকট যে এজাহার দিয়াছিলাম, তাহার নকল I.G.P. সাহেবকে দিয়া বলিলাম, আমি এখন ও-সি সাহেবের বিচার চাই। ইদ্রিস সাহেব আমাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যত কিছুই হইল না। ইদ্রিস সাহেবের বিচার কে করিবে? ইহার পরও, ১৯৬৫ সনেও আমার ক্ষেতের ধান কাটিয়া লইয়া গিয়াছে, থানায় এজাহার দিয়াছি, এজাহারের নকল আমার নিকট আছে কিন্তু ফল কিছুই হইল না, পাকিস্তানের সর্বত্র এরূপ ঘটনা ঘটিতেছে।

যখনই একজনের সারা বৎসরের পরিশ্রমের ফল ক্ষেতের ফসল, কাটিয়া লইয়া যায়, তখনই তাহার মনে এই প্রশ্ন জাগে—থাব কি, তখনই এই কথা মনে আসে, এই দেশে আর থাকা যাইবে না, তখনই হিন্দুস্থানের দিকে নজর পড়ে। যখনই একজনের কন্যাকে লইয়া যায়, তখনই তাহার মনে এই ভাব আসে, এদেশে আর মান-সম্মান লইয়া থাকা যাইবে না, তখনই হিন্দুস্থানে চলিয়া যাওয়ার চেষ্টা করে। যখনই কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়, তখনই সকলের মনে এই বিশ্বাস জন্মে, এদেশে আর থাকা যাইবে না। যাঁহারা বলেন, সংখ্যালঘুরা হিন্দুস্থানের প্রলোভনে পড়িয়া দেশত্যাগ করিয়া যায়, তাঁহারা কাটা-ঘায়ে নুনের ছিটাই দেন, তাঁহারা জানেন না, রিফিউজিরা সেখানে কি অবস্থায় আছে।

পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র, এখানে অপর ধর্মাবলম্বীদের স্থান কোথায়? আমি ইসলাম ধর্মাবলম্বী নই, এখন আমি কি করিয়া এই রাষ্ট্রকে নিজ রাষ্ট্র বলিয়া মনে করিতে পারি? এখন আমার এই রাষ্ট্রে বাস করিতে হইলে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবেই বাস করিতে হইবে। এই দেশকে যদি আমি আমার নিজের দেশ বলিয়া মনে করিতে না পারি, তবে এই দেশের সহিত আমার সম্পর্ক কি? অবশ্যই আইনত সকলের সমান অধিকার আছে কিন্তু কার্যত আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা দেখিতে পাই, গত ১৮ বৎসরের মধ্যে কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক গভর্নর, চীফ সেক্রেটারী, আই জি পুলিশ, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয় নাই। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে কোন রাষ্ট্রদূত নেওয়া হয় নাই। সৈন্য বিভাগেও নেওয়া হয় না। আমি এই দেশের নাগরিক, দেশ রক্ষায় আমার অধিকার থাকিবে না কেন? চাকুরীক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় কেরানী বা কনস্টেবলের চাকুরী লইয়াই সংখ্যালঘুরা সন্তুষ্ট থাকিবে কেন? ব্যবসাক্ষেত্রে নানা অজুহাতে সংখ্যালঘুদের লাইসেন্স কাটিয়া দেওয়া হয়।

পাকিস্তানের সংবিধানে ১৩ ও ১৫ ধারায় যদিও সমান অধিকার এবং সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কার্যত আমরা কি দেখিতে পাই? আমরা দেখিতে পাই সংখ্যালঘুর জন্য এক আইন, সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য অপর আইন। সংখ্যালঘুরা জমি-বাড়ি-গাছ বিক্রয় করিতে পারিবে না। অবশ্যই জমি, বাড়ি, বৃক্ষ বিক্রয় বন্ধ নাই, দাম কমিয়া গিয়াছে মাত্র। সংখ্যালঘুরা তাহাদের নাগরিক অধিকার, পাসপোর্ট পাইবে না কেন? হিন্দুরা মুসলমানের সহিত এক বাড়িতে বাস করিতে অভ্যস্ত নয়, শহরে অবশ্যই চলিয়া গিয়াছে কিন্তু পল্লীগ্রামে তাহা অচল। রিফিউজী নাম দিয়া হিন্দু-বাড়িতে মুসলমান বসানর অর্থই সেই পরিবারকে দেশত্যাগ করিতে বাধ্য করা।

পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা চায় গণতন্ত্র। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হইলে, জনগণের হাতে ক্ষমতা না আসিলে, দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে না, দেশ শক্তিশালী হইতে পারে না। গণতন্ত্রের অভাবেই সংখ্যালঘুদের বর্তমান দুর্দশা। গণতন্ত্রের অভাবেই সংখ্যালঘুরা সকল রাজনৈতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত। গত দুই নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক যাইতে পারে নাই, প্রাদেশিক পরিষদের সংখ্যাও অতি নগণ্য। জাতীয় পরিষদে কোন সংখ্যালঘু মন্ত্রী নাই।

দেশে যুক্ত নির্বাচন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আমার ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইবে, আমি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হইতে পারিব না কেন? যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠরা শতকরা ৮০ জন, সেখানে রক্ষাকবচের প্রয়োজন হয় কেন? সেখানে কেন আইন করা হয়, শতকরা ২০ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হইতে পারিবে না? এত ভয় কিসের? সংখ্যালঘুদের দাবি, পাকিস্তান ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হইবে, যুক্ত নির্বাচন প্রথা বলবৎ থাকিবে, সংখ্যালঘুদের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হইতে কোন বাধা থাকিবে না। যদি তাহা না হয়, তবে সংখ্যালঘুদের দাবি "পৃথক নির্বাচন"। তাহাদের দাবি পাকিস্তানের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন। ইসলামিক রাষ্ট্রে যুক্ত নির্বাচন চলিতে পারে না, যুক্ত নির্বাচন অর্থই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।

এখন প্রশ্ন এই, এই দেশে আমি কেন থাকিব? এই দেশে আমার কি অধিকার আছে? আমি যখন দেখিতে পাই, এই দেশে আমার কোন অধিকার নাই, আমার সম্পত্তি আমি ইচ্ছামত দান-বিক্রয় করিতে পারি না, আমার সারা বৎসরের পরিশ্রমের ফল, খেতের ফসল, ঘরে আনতে পারি না, কোন্ সময় আমার বাড়িতে রিফিউজী ঢুকিবে, কোন্ সময় তহশিল কাছারীর নায়েব বলিবে, তোমার খাজনা নিব না, ইহা হিন্দুস্থানী সম্পত্তি। আমি ব্যবসায়ী, ব্যবসার সুযোগ পাইব না, আমি দোকানদার, আমার জিনিস বাকী দিতে হইবে, সেই টাকা আর ফেরৎ পাওয়া যাইবে না। আমি মৎস্যজীবী, আমার মাছ কাড়িয়া লইয়া যাইবে, আমার গাছের ফল, পুকুরের মাছ লইয়া যাইবে, আমি কিছু বলিতে পারিব না। আমার খেত গরু দিয়া খাওয়াইবে, কিছু বলিলে গ্রাম্য বিচারে আমার সাজা হইবে এই মিথ্যা অভিযোগে, "আমি রাখালকে গালি দিয়াছি, প্রহার করিয়াছি, জাতি তুলিয়া গালি দিয়াছি"। আমি চাকুরীর সুযোগ পাইব না, পাসপোর্ট পাইব না, বন্দুকের লাইসেন্স পাইব না, কোন সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিবে, আমার গৃহ লুণ্ঠিত-ভস্মীভূত হইবে, আমাকে হত্যা করিবে, আমি এই অনিশ্চয়তার মধ্যে কেন বাস করিব? কোন দেশে কি ঘটিবে, সে জন্য এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোক কেন গরম হইবে, আর আমাদিগকে কেন আতঙ্কের মধ্যে বিনিদ্ররজনী যাপন করিতে হইবে? অপর দেশে যদি কিছু ঘটে সেজন্য আমি কি দায়ী? আমি কি এ দেশের নাগরিক নই? সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকের দেশে বাস করা যদি সংখ্যালঘুদের অপরাধ হয়, তবে আমি বিনা অপরাধে কেন অপরাধীর মত এ দেশে বাস করিব? পাকিস্তান যদি ইসলামিক রাষ্ট্র হইয়া থাকে, ইসলামের যদি এরূপ বিধান থাকে, বিধর্মীকে হত্যা করিতে হইবে,—রক্ষা করিতে নয়, তবে অপর ধর্মাবলম্বীরা এরূপ ইসলামিক রাষ্ট্রে কেন বাস করিবে? এই দেশে আমার ভবিষ্যৎ কি? আমার যদি নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা না থাকে, থানায় এজাহার দিলে যদি কোন প্রতিকার না হয়, সকলেই যদি মনে করে আমি অবাঞ্ছিত, তবে আমি কি করিয়া এই দেশে বাস করিতে পারি? নারায়ণগঞ্জে নোভাক সাহেব নিহত হইলেন, হত্যাকারীদিগকে

[illegible] হইবে না, স্বার্থ [illegible] পরিষ্কার নেতা-অনুগ্রহ [illegible] । কিন্তু গত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বা তাহার পূর্বে, শত শত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক নিহত হইয়াছে, তাহাদের বাড়ি লুণ্ঠিত-ভস্মীভূত হইয়াছে, আশ্চর্যের বিষয় একটি অপরাধীকেও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সংখ্যালঘুরা কি এতই বেওয়ারিস মাল? সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় এবং গভর্নমেণ্ট যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকদিগকে না চায়, তবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দাবি লোক বিনিময়। ভারতের সংখ্যালঘুরাও সম্ভবত অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাইতেছে। Exchange of population হইলে উভয় দেশেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থাকিবে না, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও হইবে না, রিফিউজী সমস্যাও থাকিবে না। অবশ্যই Exchange of population সহজ নয় কিন্তু উপায় কি?

উপায় আছে। উপায় সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকের হাতে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি আন্তরিকতার সহিত চান সংখ্যালঘুরা এ দেশে থাকুক এবং সংখ্যালঘুরাও যদি অপর দেশের দিকে না তাকাইয়া সাহসের সহিত নিজের অধিকার বজায় রাখার জন্য দৃঢ়-সংকল্প হন, তবেই সমস্যার সমাধান হইবে। উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা যদি এই সমস্যার সমাধান করিতে চান, তাঁহারা যদি সঙ্ঘবদ্ধভাবে নতুন আবহাওয়া সৃষ্টি করেন, তবেই সমস্যার সমাধান হইবে।

সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধান দেশত্যাগ নয়, দেশত্যাগ করিয়া যাহারা গিয়াছে, তাহাদের শতকরা কতজন লোক সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? যাহারা দেশত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহাদের এক-চতুর্থাংশ লোক মৃত্যুবরণ করিয়াছে,—ছুরিকাঘাতে নয়—অনাহারে, অর্ধাহারে, অচিকিৎসায়, বিভিন্ন ব্যাধিতে। শিয়ালদহ স্টেশনে, ফুটপাথে বা রিফিউজী ক্যাম্পের জীবন পশু-জীবন অপেক্ষা নিকৃষ্ট;—সেখানে তাহারা সম্মানী অতিথি নয়—অবাঞ্ছিত অতিথি।

যাঁহারা ভারতের দিকে তাকাইয়া আছেন, তাঁহারা নিরাশ হইবেন। গত দাঙ্গার পর ঢাকা মাইগ্রেশন অফিসের দৃশ্য হৃদয়বিদারক ছিল না কি? যাহারা গত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সর্বস্বান্ত হইয়া—স্বামী-পুত্র হারাইয়া ভয়ভীত, শোকাকুল অবস্থায়, ভারতে আশ্রয় পাইবে আশায় ভারতীয় মাইগ্রেশন অফিসে [illegible] ভারতীয় কর্মচারীদের নিকট হইতে কোন সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার পায় নাই। ভারতীয় কর্মচারী, যাহাদের অনেকেই এক সময় পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক ছিল, কাপুরুষের [illegible] ভারতের সীমানা পার হইয়া, ভারতের নাগরিক হইয়াছে, [illegible] মাইগ্রেশন অফিসে চাকুরী পাইয়াছে, এখন বীর সাজিয়া মাইগ্রেশন প্রার্থীদের উপর বীরত্ব দেখাইয়াছে, এমন কি অসহায়া নারীরা পর্যন্ত স্ত্রীলোকদিগকে ধাক্কা মারিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়াছে। সেই সময় এক সেট মাইগ্রেশন ফর্ম ১০, ১৫, টাকায় বিক্রি হইয়াছে। আবার যে সব সৌভাগ্যবান পুরুষ মাইগ্রেশন পাইয়াছে, তাহাদের রাস্তায় কুলির দৌরাত্ম্য, বর্ডার কর্মচারীদের দৌরাত্ম্য ভোগ করিয়া নিঃস্ব অবস্থায় যখন হিন্দুস্থানের পথে পাড়ি দিল, তখন তাহাদের মোহনিদ্রা ভাঙিল, তখন তাহারা দেখিল, তাহারা অবাঞ্ছিত অতিথি। উপায় নাই! স্রোতের জলে গা ভাসাইয়া দিল, কোথায় দণ্ডকারণ্য, বিহার-উড়িষ্যা—নানা স্থানে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া প্রাণ হারাইতে লাগিল। তাহাদের মনে তখন এই প্রশ্নই জাগিয়াছিল, "আমি কি অপরাধ করিয়াছি?"

আজ ভাগ্যচক্রে আমি আমার দেশে সংখ্যালঘু। কিন্তু আমার সংখ্যা ত কম নয়? আমি সংখ্যালঘু হইলেও আমার সংখ্যা এক কোটি। এক কোটি সংখ্যা ত কম নয়? এক কোটি লোক সঙ্ঘবদ্ধ হইলে কি না করিতে পারে? এই দেশ, পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান, আমার দেশ, আমার পিতৃ-পিতামহের দেশ। এই দেশে আমার জন্মগত অধিকার। আমার মাতৃভূমি, আমার পিতৃ-পিতামহের স্মৃতি জড়িত সোনার বাংলা, কেন আমি ছাড়িয়া যাইব? আমি কি এতই ভীরু? আমি কেন নিজ দেশ ছাড়িয়া অপর দেশে যাইয়া, ভিক্ষাপাত্র লইয়া, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিব? আমার অধিকার আমায় রক্ষা করিতে হইবে। আমার অধিকার যদি আমি রক্ষা না করি, তবে সে দোষ আমার নিজের, অপরের নয়। পশুর মত বাঁচিয়া লাভ কি? ভীরুর কোন স্থান নাই। ভীরু পদদলিত হইবে, লাঞ্ছিত-অপমানিত হইবে ইহাই স্বাভাবিক। শক্তিমানকে সকলেই ভয় পায়। পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা নিজ দেশে অপরের অনুগ্রহের উপর থাকিবে না।—জিম্মি হিসাবে থাকিবে না, তাহারা থাকিবে তাহাদের প্রতিভার উপর, বাহুবলের উপর। সংখ্যালঘুদের বাঁচিতে হইলে মরিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে, নিজ অধিকার রক্ষা করিতে হইবে, আক্রমণকারীকে বাধা দিতে হইবে। তাহাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, আক্রমণকারীরা লুঠ করিতে আসে—মরিতে নয়, বাধা পাইলে পলাইয়া যায়।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য কনফারেন্স বন্ধ হইয়া যায়, পরে আর একটা কনফারেন্স ডাকার কথা ছিল কিন্তু তাহা সম্ভবপর [illegible] পরে [illegible] [illegible] জেলায় [illegible] এবং আমাদের আন্দোলনের পরে পার্লামেন্টের নিকট ডেপুটেশন [illegible] আমার জীবনস্মৃতি প্রতিনিধি সভায় পাঠ করা হয়।

আমি যে সব জেলখানায় ছিলাম ও দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে জেলে একত্র ছিলাম*

১৯০৮ সন, ঢাকা সেণ্ট্রাল জেল।

মহিমচন্দ্র নন্দী—শিক্ষক, সাটীরপাড়া হাই স্কুল।

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী—ছাত্র, সাটীরপাড়া হাই স্কুল।

বদ্রনাথ দাস—ছাত্র সাটীরপাড়া হাই স্কুল।

ত্রিলোক চক্রবর্তী—ছাত্র সাটীরপাড়া হাই স্কুল।

১৯১১ সন ঢাকা সেণ্ট্রাল জেল—খুনের মামলায় ধৃত, নির্জন সেল বাস।

১৯১৪—১৫ সন—বরিশাল জেল।

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী—বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা।

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী—বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা।

মদনমোহন ভৌমিক—বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা।

রমেশচন্দ্র চৌধুরী—বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা।

১৯১৬ সন—প্রেসিডেন্সী জেল—শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, মদন ভৌমিক, খগেন চৌধুরী।

১৯১৬—২০ সন—সেলুলার জেল—আন্দামান (কালাপানি)।

বিনায়েক দামোদর সাভারকার—বার-এট-ল—নাসিক ষড়যন্ত্র।

গণেশ দামোদর সাভারকার—নাসিক ষড়যন্ত্র।

নারায়ণ বলী—জ্যাকসন হত্যা মামলা।

প্রফেসার ভাই পরমানন্দ—লাহোর ষড়যন্ত্র।

বাবা জোয়ালা সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।

বাবা সোহন সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।

সর্দার শের সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।

সর্দার গুরুমুখ সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।

সর্দার পৃথ্বী সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।

সর্দার প্যারা সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।

সর্দার কেসর সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।

সর্দার ভান সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।

---

* [বহু লোকের নাম ভুলিয়া গিয়াছি, যাহাদের নাম স্মরণ আছে লিখিলাম।]

সর্দার বিশাখা সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।
সর্দার নন্দ সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।
সর্দার ইন্দ্র সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।
সর্দার শিব সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।
সর্দার মদন সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।
সর্দার বীর সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।
সর্দার হরনাম সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।
সর্দার নিধান সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।
সর্দার কৃপাল সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।
পণ্ডিত পরমানন্দ—লাহোর ষড়যন্ত্র।
পণ্ডিত রামসরণ দাস—লাহোর ষড়যন্ত্র।
পণ্ডিত হৃদয়রাম—লাহোর ষড়যন্ত্র।
সর্দার হর সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।
বাবা বুর সিং—লাহোর ষড়যন্ত্র।
পণ্ডিত জগৎরাম—লাহোর ষড়যন্ত্র।
সর্দার বুড্ডা সিং—বার্মা ষড়যন্ত্র।
সর্দার অমর সিং—বার্মা ষড়যন্ত্র।
সেখ আলি আহম্মদ—বার্মা ষড়যন্ত্র।
মোহম্মদ মোস্তাফা—বার্মা ষড়যন্ত্র।
পণ্ডিত রাম রক্ষা—বার্মা ষড়যন্ত্র।
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—আলিপুর বোমার মামলা।
হেমচন্দ্র কানুনগো—আলিপুর বোমার মামলা।
উপেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জি—আলিপুর বোমার মামলা।
পুলিনবিহারী দাস—ঢাকা ষড়যন্ত্র।
অমৃতলাল হাজরা—রাজাবাজার বোমার মামলা।
ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী—বরিশাল ষড়যন্ত্র।
মদনমোহন ভৌমিক—বরিশাল ষড়যন্ত্র।
খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী—বরিশাল ষড়যন্ত্র।
শচীন্দ্রনাথ সান্যাল—বেনারস ষড়যন্ত্র।
নিকুঞ্জ পাল—সিরাজগঞ্জ খণ্ডযুদ্ধ।
গোবিন্দ কর—সিরাজগঞ্জ খণ্ডযুদ্ধ।
আশুতোষ লাহিড়ী—প্রাগপুর ডাকাতি।
গোপেন্দ্রলাল রায় — প্রাগপুর ডাকাতি।
ক্ষিতীশচন্দ্র সান্যাল — প্রাগপুর ডাকাতি।
ফণিভূষণ রায়—প্রাগপুর ডাকাতি।
নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষচৌধুরী—শিবপুর ডাকাতি।
ভূপেন ঘোষ—শিবপুর ডাকাতি।
সত্যরঞ্জন বসু—শিবপুর ডাকাতি।
নিখিলচন্দ্র গুহরায়—শিবপুর ডাকাতি।
সানুকূল চ্যাটার্জী—শিবপুর ডাকাতি।
সুরেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস—শিবপুর ডাকাতি।
সতীন্দ্রচন্দ্র নন্দী—শিবপুর ডাকাতি।

মহেন্দ্রচন্দ্র দাস—মালদহ হেড মাস্টার খুন।
সুরেশচন্দ্র সেন—জয়দেবপুর ট্রেন ডাকাতি।
চৌধুরী বোগ্গা মল—পাঞ্জাব মার্শাল ল মামলা।
মহাশয় রতন চান্দ—পাঞ্জাব মার্শাল ল মামলা।

১৯২১—২৩ সন—আলিপুর সেন্ট্রাল জেল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ—বার-এট-ল, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত—বার-এট-ল, কিরণশঙ্কর রায়—বার-এট-ল, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল—বার-এট-ল, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জী, ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহরায়, প্রোফেসার জে. এল. ব্যানার্জী (জিতেন্দ্রলাল) প্রোফেসার অনিলবরণ রায়, প্রোফেসার নৃপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জী, সুভাষচন্দ্র বসু—আই, সি এস, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—উকিল, নগেন্দ্রচন্দ্র গুহরায়-মোক্তার শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী—এম, এ সম্পাদক সার্ভেন্ট, চিত্তরঞ্জন দাশ, হেমন্তকুমার সরকার, সুশীল ব্যানার্জী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা আক্রাম খাঁ, পীর বাদশা মিঞা (ফরিদপুর) হাজী আবদুর রসিদ খান (নোয়াখালী) চান্দ মিঞা সাহেব (জমিদার, কবটিয়া) কবি কাজী নজরুল ইসলাম পদ্মরাজ জৈন, বসন্তলাল মুরারকা, মুলচাঁদ আগরওয়ালা, (সম্পাদক—বিশ্বামিত্র) হীরালাল লোহিয়া, সতীন্দ্রনাথ সেন (বরিশাল) মহিমচন্দ্র দাস (চট্টগ্রাম) ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী (চট্টগ্রাম) বসন্তকুমার মজুমদার (কুমিল্লা) কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য (কালিগঞ্জ-সরাইল) পঞ্চানন চক্রবর্তী (দাদাবীপুর) বম ইয়ার্ড—অমৃতলাল (শশাঙ্ক) হাজরা, (রাজাবাজার বোমার মামলা) ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (বরিশাল ষড়যন্ত্র) মদনমোহন ভৌমিক (বরিশাল ষড়যন্ত্র), খগেন্দ্রনাথ চৌধুরী (বরিশাল ষড়যন্ত্র), নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (বেনারস ষড়যন্ত্র) নিকুঞ্জ পাল, (সিরাজগঞ্জ সুটিং) গোবিন্দ কর, (সিরাজগঞ্জ সুটিং), মহেন্দ্রচন্দ্র দাস (মালদহ হেড্ মাস্টার খুন) আশুতোষ লাহিড়ী (প্রাগপুর ডাকাতি) গোপেন্দ্রলাল রায় (প্রাগপুর ডাকাতি) ফণিভূষণ রায় (প্রাগপুর ডাকাতি) নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষচৌধুরী (শিবপুর ডাকাতি) ভূপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (শিবপুর ডাকাতি) সানুকূল চ্যাটার্জী (শিবপুর ডাকাতি), সত্যরঞ্জন বসু—(শিবপুর ডাকাতি), সতীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (শিবপুর ডাকাতি), সুরেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস (শিবপুর ডাকাতি), হরিকৃষ্ণ দে (রাজাবাজার সুটিং) মোহিনীমোহন দাস (ডাকাতি) অতুলচন্দ্র দত্ত (ডাকাতি) মথুরামোহন চক্রবর্তী (ডাকাতি), সুধীরচন্দ্র মজুমদার (ডাকাতি), প্রফুল্লচন্দ্র রায় (ডাকাতি)।

১৯২৪—ফেব্রুয়ারী, ময়মনসিংহ জেল।

মুক্তির জন্য প্রেরিত, কয়েকদিন একাকী অবস্থান।

১৯২৪ সন, নভেম্বর মাস, আলিপুর সেন্ট্রাল জেল। (বিনা বিচারে আটক)

নরেন্দ্রমোহন সেন, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী।

১৯২৪ সন—মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেল। (বিনা বিচারে আটক)

ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী ভূপতি মজুমদার হরি চক্রবর্তী, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী রবীন্দ্রমোহন সেন, মদনমোহন ভৌমিক, গিরীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনুকূল মুখার্জী, বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলী, সতীশচন্দ্র পাকড়াশী অমৃত সরকার।

১৯২৫—২৬ সন, মান্দালয় সেণ্ট্রাল জেল (ব্রহ্মদেশ) বিনা বিচারে আটক।

সুভাষচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, মদনমোহন ভৌমিক, বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, অমরকৃষ্ণ ঘোষ, জীবনলাল চ্যাটার্জী, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী।

১৯২৭ সন—মিয়ান জেল—ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী।

১৯২৭—২৮ সন, ইন্‌সিন্ সেন্ট্রাল জেল। (ব্রহ্মদেশ)

নরেন্দ্রমোহন সেন, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, ভূপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত।

১৯২৮ সন—হাতীয়া দ্বীপে অন্তরীণ ও মুক্তি।

১৯৩০ সন—রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেল (বিনা বিচারে আটক)

বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলী, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, বঙ্কিমচন্দ্র মুখার্জী, অমৃতলাল অধিকারী, জিতেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী।

[ক্রমশঃ]

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী অভিযান পুরোদমে শুরু হয়েছে

অবশেষে নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গের দুয়ারে সজোরে আঘাত করতে শুরু করেছে, তাকে দ্বার খুলে অভ্যর্থনার জন্যও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল রীতিমত প্রস্তুতি-পর্ব চালিয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেস এবং যুক্তফ্রণ্ট উভয় তরফেরই আশা যে তারাই এবার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে। পক্ষান্তরে সদ্যোনির্মিত কয়েকটি দল, যেমন আই-এন-ডি-এফ, লোকদল প্রভৃতি, আশা করেছে যে, এবারে কোন পক্ষই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে না; কাজেই তাদের দলীয় যে ক'জন সদস্য বিধানসভায় থাকবেন শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য তাঁদেরই দ্বারস্থ হতে হবে। কিন্তু কংগ্রেস বা যুক্তফ্রণ্ট কোন তরফই এই বক্তব্যের প্রতি কোন মূল্য আরোপ করছে না, উভয় তরফেরই বক্তব্য যে, তৃতীয় শক্তি বলে কোন কিছুরই অস্তিত্ব পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে নেই আগামী নির্বাচনই তা প্রমাণ করে দেবে।

কাজেই এবারকার আসল সংগ্রামটা দু তরফের মধ্যেই, এবং এ রকমটি ইতিপূর্বে কখনো ঘটে নি। কেন না বামপন্থী শক্তিগুলি এবারের মত ঐক্যবদ্ধ ইতিপূর্বে কখনো হয় নি। গতবারেও বামপন্থী শক্তি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে লড়েছিল এবং যার ফলে প্রায় পঞ্চাশটি আসন তাদের খোয়াতে হয়েছিল। এবারে অবশ্য এই সুবিধাটা যুক্তফ্রণ্ট পেয়েছে। তবে অসুবিধাও যুক্তফ্রণ্টের কিছু কিছু আছে। এইবারেই প্রথম তাদের বিগত শাসনকালের সমালোচনা শুনতে হচ্ছে।

কংগ্রেস দলের প্রচারে যুক্তফ্রণ্টের আমলের আইন ও শৃঙ্খলাহানি, ঘেরাও ও স্ট্রাইক, চালের মূল্যবৃদ্ধি, ইত্যাদি নানা বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্ছে। পক্ষান্তরে যুক্তফ্রণ্টও প্রচারের ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। তাদেরও বক্তব্য হচ্ছে—উপরি উক্ত সকল অবস্থা কংগ্রেসী আমলেও ছিল আর টানা বিশ বছর কুশাসন চালিয়ে নয় মাসের শাসনের ব্যর্থতার কথা বলার কোনো অধিকার কংগ্রেসের নেই, থাকতে পারে না। এছাড়া রাজ্যপালের আমলে অবস্থার যে আরও অবনতি ঘটেছে, বিশেষ করে আইন ও শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে, শিল্প ও শ্রমবিরোধের ক্ষেত্রে, তা যুক্তফ্রণ্টের প্রচারের পক্ষে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। যুক্তফ্রণ্টের বিরুদ্ধে কংগ্রেস অনৈক্যের অভিযোগ এনেছে, কিন্তু হরিয়ানার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী কংগ্রেসের ভিতরকার অবস্থাটা প্রকাশ করে দিয়েছে, যার ফলে যুক্তফ্রণ্টের পক্ষে প্রচারের একটা ভাল হাতিয়ার পাওয়া সম্ভবপর হয়েছে।

নির্বাচনী লড়াই কখনো কখনো গণতান্ত্রিক রীতিনীতির সীমা লঙ্ঘনও করে যাচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ যে, একটি নির্বাচনী সফরে লোকদলের নেতা শ্রীহুমায়ুন কবির কতিপয় ব্যক্তির দ্বারা আহত হয়েছেন। যারা এই দুষ্কার্য করেছে, তাদের সকলেই তীব্র ভাষায় নিন্দা করবে। যুক্তফ্রণ্টের তরফ থেকে শ্রীকবিরের ওপর এই হামলার নিন্দা করা হয়েছে। কিন্তু এটিকে একটি রাজনৈতিক ইস্যুতে দাঁড় করাবার যে প্রচেষ্টা কবির সাহেব করেছেন সেটা ঠিক নয়। কোন কোন লোক রাজনীতির ক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিক নীতি অবলম্বন করে, সেটা সর্বদাই নিন্দনীয় এবং যে-কোন দলেরই কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ তা সমর্থন করবেন না। কিন্তু কবির সাহেব এবং তাঁর দল যেভাবে যুক্তফ্রণ্টকে এজন্য দায়ী করছেন সেটা রাজনৈতিক শিষ্টাচার বিরোধী। যদি কোন লোকদলের কর্মী কোন যুক্তফ্রণ্টের কর্মীকে আহত করে (এরকম সম্ভাবনা যে একেবারেই থাকে না তা নয়) তাহলে যদি এরকম ঘোষণা করা হয় যে লোকদল হিংসা ও গুণ্ডামীর নীতিতেই বিশ্বাসী, তাহলে কি সিদ্ধান্তটা ন্যায়সংগত হবে?

একটি গুরুত্বপূর্ণ রায়

সম্প্রতি জনৈক প্রখ্যাত লেখক একটি অশ্লীল গ্রন্থ রচনা করার জন্য আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছেন। বিচারক এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, লেখক ইচ্ছাপূর্বক তাঁর এই রচনায় বিকৃত যৌনতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন এবং এই রচনা পাঠকদের মানসিক উৎকর্ষের পরিবর্তে বিপথগামী

হবারই সহায়তা করবে। এই রায়টি নিঃসন্দেহে গণ-তৎপর্ণে। মার্কিনী কায়দায় এদেশের তরুণ তরুণী ও কিশোর-কিশোরীদের রুচি ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করবার একটা অপচেষ্টা এদেশে দীর্ঘকাল ধরেই চলছে, সিনেমায় পোস্টারে পোষাকে-পরিচ্ছদে তার প্রভাব সুস্পষ্ট। সাহিত্যও এই অপচেষ্টার একটা হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং [illegible] লেখক ও কয়েকটি পত্রিকা এই অপচেষ্টায় শামিল হয়েছেন। এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে কাঁচা বয়স থেকে ছেলেমেয়েদের মাথায় যৌনতার ভূত ঢুকিয়ে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দাও, তাহলে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে কোনদিন তারা মুখর হয়ে উঠবে না। এই অপচেষ্টারই শরিক হবে কয়েকটি পত্র-পত্রিকাও আত্মপ্রকাশ করেছে, যৌনজগতের নাম করে যেগুলি বিকৃত রুচি ফিরি করে। বিচারপতির রায়ের পর অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে কি-না তা দেখার জন্য আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছি।

কল্যাণপুর

আবার পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে সবে-মাত্র কিছু কিছু ধান কাটা শুরু হয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন জেলা থেকে নানান ধরনের অভিযোগ আসছে, জোতদার শ্রেণী কৃষকের ধান জোর করে লুঠপাট করছে এবং বহু ক্ষেত্রেই পুলিশ সক্রিয়ভাবে এই জোতদার শ্রেণীকে সাহায্য করছে। কৃষক-দের বিরুদ্ধে ৩০৭ ধারা মামলা রুজু করে, জামিনবিহীন ধারায় গ্রেপ্তার করে শত শত কৃষককে আটক করা হয়েছে। মেমারী থানার অন্তর্গত কল্যাণপুর গ্রামে এই রকমই কিছু ঘটনা ঘটেছে। ধান কাটার ব্যাপারকে উপলক্ষ করে কল্যাণপুর গ্রামে পুলিশের গুলীতে একজন নিহত ও কয়েকজন গুরুতর আহত হয়েছে। তিন বিঘা বিলি করা খাস জমির ধান কাটাকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত। যাদের এই জমি চাষ করার জন্য বিলি করা হয়েছিল চাষের অন্তে ফসল তোলার অধিকার তাদের কাছ থেকে হরণ করার প্রচেষ্টা হয়েছিল। সংবাদে প্রকাশ, প্রাক্তন জমি-দারের বেনামদার লোকেরাই প্রথমে অন্যায়-ভাবে জোর করে ধান কাটতে যায় এবং যারা ওই জমি চাষ করেছিল, তারা বাধা দেয়। তারপর স্থানীয় এক নেতার মধ্য-স্থতায় ব্যাপারটা মিটে যায়, কিন্তু আকস্মিকভাবে পুলিশের উপস্থিতিতে ব্যাপারটি আবার অন্যদিকে মোড় নেয়। পুলিশ বিনা প্ররোচনায় কৃষকদের ওপর উল্ট হামলা চালায়। কল্যাণপুরের অনু-রূপ ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্রও ঘটেছে। [illegible] প্রতি বছরেই ফসল ওঠার সময় এই রকম [illegible] পশ্চিমবঙ্গের প্রায়

সকল গ্রামেই দেখা যায়। গতবারে ফসল সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসাকল্পে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্যাম্পকোর্ট বসিয়েছিলেন। এবারেও অনুরূপ কর্ম করা হয়েছে তবে এক্ষেত্রে বিরোধগুলিকে বৃহৎ চাষী, জোতদার এদেরই স্বপক্ষে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অবি-লম্বে ভূমিসংক্রান্ত একটি বাস্তবনীতি গৃহীত হওয়া উচিত। নতুবা একদল লোক প্রাণপাত করে চাষ করবে, আর আরেকদল লোক অপরের তা জোর করে কেটে নিয়ে যাবে, বাধা দিতে গেলে পুলিশ এসব অপহরণকারীরই পক্ষ নেবে; এইরকম হতে দেওয়া যায় না।

ডানকুনিতে ছাত্রীহত্যা

ডানকুনি শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশ্রমের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী রমা কর গত ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে বিদ্যালয় থেকে প্রত্যা-বর্তনকালে তার বাড়ির নিকট থেকেই এক-দল দুর্বৃত্ত কর্তৃক অপহৃতা হয়। দুর্বৃত্তেরা তাকে প্রথমে ধর্ষণ করে এবং তারপর তাকে হত্যা করে একটি পুষ্করিণীর জলে ফেলে দেয়। তার পরের দিন মেয়েটিকে লোনা-পুকুর নামক স্থানীয় একটি পুষ্করিণীর জলে মৃতাবস্থায় ভাসতে দেখা যায়। তৎক্ষণাৎ বিধানসভার প্রাক্তন সদস্য শ্রীমনো-রঞ্জন হাজরা চণ্ডীতলা থানার ও-সি'কে জানান, ও-সি তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে আসেন এবং মৃতদেহটিকে তোলার ব্যবস্থা করেন। এখন সমগ্র কেসটি পুলিশের হাতে। স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষ থেকে শ্রীমনো-রঞ্জন হাজরা ও-সি'কে জানান যে প্রকাশ্য দিবালোকে বাড়ির অত্যন্ত কাছাকাছি এই রকম একটি বর্বর পৈশাচিক ঘটনার অনু-ষ্ঠান প্রত্যেকটি লোককে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। এ অবস্থায় অপরাধীদের খুঁজে বার করতেই হবে।

ইতিমধ্যে একজন ধরা পড়েছে বলে শোনা গেছে। কিন্তু ঘটনাদৃষ্টে আমাদের মনে হয় যে, এই ব্যাপারে দুষ্কৃতকারী সংখ্যায় বেশ কয়েকজন। দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ ও পরে ধর্ষিতাকে হত্যা আজ পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে। আমাদের স্মরণে আছে আমাদেরই জনৈক সাংবাদিক বন্ধুর ভগ্নীর ঠিক একই অবস্থা হয়েছিল। সে-ক্ষেত্রে অবশ্য পুলিশ অতি দ্রুত অপরাধী-দের ধরতে সক্ষম হয়। চণ্ডীতলার ও-সি যতদূর আমরা জানি বা শুনেছি একজন তরুণ সুদক্ষ অফিসার। স্থানীয় ভীত-সন্ত্রস্ত অধিবাসীরা তাঁর ওপর আস্থাশীল বলেও আমরা শুনেছি। এই জঘন্য হত্যাপ-রাধীদের তিনি গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হবেন সে বিশ্বাস অনেকেরই আছে। আমরা এও আশা করি—যে-কোন চাপের নিকট তিনি নতিস্বীকার করবেন না। এ দেশে [illegible] অপরাধী [illegible]

পোষকতা করার মত ডি-আই-জি'রও অভাব নেই। ডানকুনির আবগারী বিভাগ থেকে জানা যায় যে সেখানে বিরাট চোলাই মদের ব্যবসায়ী দল আছে, ওয়াগন ভাঙা উঠতি মস্তানেরও দল আছে এবং প্রকাশ্য দিবালোকে তারা এইসব কাজ নির্বিঘ্নে চালিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় সেই দলের কাজই যে এটা নয় তা কে বলতে পারে?

এই জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে বন্ধ হয় তার জন্য সরকারেরও কিছু কর্তব্য আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এইসব অপ-রাধের ক্ষেত্রে যে শাস্তির ব্যবস্থা আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। আমেরিকার মত দেশেও ধর্ষণের জন্য প্রাণদণ্ডের বিধান আছে। এদেশে শাস্তির মাত্রা সর্বক্ষেত্রেই অল্প হওয়ায় জন্য অপরাধের সংঘটন অধিক হয়। তাছাড়া পুলিশবাহিনীকে অপরাধমূলক কার্যকলাপ দমনে উৎসাহিত করার পরিবর্তে নিষ্ক্রিয় করে তোলাই যেন সরকারের নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা পূর্বে বারবার লিখেছি পুলিশকে নিজ কর্মের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে এনে অন্যত্র নিযুক্ত করা শুধু অন্যায়ই নয়, নীতি-বিরুদ্ধও বটে। পুলিশকে অপরাধমূলক কাজ দমন করার পরিবর্তে রাজনৈতিক প্রয়োজনেই নিয়োগ করার ঐতিহ্য গত বিশ বছর গড়ে উঠছে। ধান চাল ধরতে পুলিশ, ছাত্র-বিক্ষোভ দমন করতে পুলিশ, জনতার ওপর লাঠিচার্জ গুলীবর্ষণ করতে পুলিশ, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের পিছনে লেগে থাকতে পুলিশ এত ধাক্কা সামলে অপরাধ ও অপরাধীর দিকে নজর দেবার সময় কোথায় পুলিশের। ফলে তার স্বাভাবিক কর্মের এলাকা থেকে পুলিশকে সরিয়ে আনার জন্য পুলিশের স্বক্ষেত্রে কর্মদক্ষতা হ্রাস পেয়েছে, যার পরিণামে অপরাধ ও সমাজবিরোধী কাজকর্ম দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে।

যাই হোক বর্তমান কেসটির অপরাধীরা যাতে ধরা পড়ে এবং চূড়ান্ত শাস্তি পায় সেই দাবিই আমরা পুলিশ ও কর্তৃপক্ষের নিকট করব। এই জাতীয় অপরাধের এমন শাস্তি হওয়া উচিত যা পুনরায় এই জাতীয় অপরাধের সংঘটন বহুলাংশে রোধ করতে সমর্থ হবে।

রাষ্ট্রীয় পরিবহণ

ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা, অযোগ্য পরি-চালন, দুর্নীতি, অপচয় ও স্বজনপোষণের জন্য রাষ্ট্রীয় পরিবহন শিল্প না হল স্বয়ং-সম্পূর্ণ না দেখল কোন লাভের মুখ। বর্তমানে এই শিল্প এক সঙ্কটজনক অব-স্থায় উপনীত হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্তৃপক্ষ লোকসানের দায়-দায়িত্ব শ্রমিক-কর্মচারীদের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করে-ছেন। যাত্রীদের সময় মত ভাড়া বাড়িয়ে

জনগণের পকেট কেটে লোকসান উশুল করা ভিন্ন রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্তৃপক্ষ আর কিছুই করতে পারেন নি। সম্প্রতি আর একদফা ভাড়া বাড়ানোর অপচেষ্টা চলছে, তবে এ পর্যন্ত এখনো তা হয় নি, যদিও সংবাদপত্রে ঘোষণার অভাব এ বিষয়ে নেই। পরিবহনের ক্ষেত্রে ভাড়া বাড়াবার যে ঘোষণাগুলি করা হয়েছে, আপাতত স্থগিত থাকলেও, তা বলবৎ একদিন-না-একদিন হবে, যখন কর্তাদের মাথায় এই ভূত একবার চেপেছে। ফলে ভাড়া বাড়বে স্টেট বাসের, ভাড়া বাড়বে ট্রামের এবং ভাড়া বাড়বে প্রাইভেট বাসের। কিন্তু সত্যাই কি এর কোন প্রয়োজনীয়তা আছে? রাজ্য সরকারের হিসাবমত রাষ্ট্রীয় পরিবহনের ঘাটতি পূরণ বাবদ বছরে এক কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ টাকা দিতে হয়। কিন্তু ভাড়া না বাড়িয়ে কি এই ঘাটতি পূরণ করা যায় না? রোড ট্যাক্স ও মোটর ভিহিকলসের বিভিন্ন ট্যাক্স যদি পুরোপুরি আদায় করা যায় তাহলে ভরতুকির টাকা যোগান দেওয়া যেতে পারে ভাড়া না বাড়িয়ে। এই বিভাগ থেকে যা আদায় হওয়া উচিত তার এক তৃতীয়াংশও আদায় হয় কি না সন্দেহ। রোড ট্যাক্স বর্ধিত করতেও কোন অসুবিধা নেই। সমীক্ষায় প্রকাশ যে পশ্চিমবঙ্গে এই ট্যাক্সের হার ভারতের অন্যান্য সকল রাজ্যের চেয়ে অনেক কম। গুডস্ ট্যাক্স তদন্ত কমিটির সামনে ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লরি মালিকেরা স্বেচ্ছায় শতকরা পাঁচ টাকা ট্যাক্স বৃদ্ধি মেনে নেওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত সেই বাড়তি ট্যাক্সের এক পয়সাও আদায় করা হয় নি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সত্যই যদি ভরতুকি দিয়েই রাষ্ট্রীয় পরিবহনকে টিকিয়ে রাখতে হয়, তাহলে ভাড়া বৃদ্ধি না করেই তা করা সম্ভব। এবং এরপর যে প্রশ্নটি অনিবার্যভাবেই আসছে তা হচ্ছে এই যে, ভরতুকি দেবার আদৌ কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি-না?

এম-ডি প্রসঙ্গ

গত সংখ্যার আগের সংখ্যার সাপ্তাহিক বসুমতীর এই বঙ্গদর্শন বিভাগে এম-ডি পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু মন্তব্য করা হয়েছিল। আমাদের সেই বক্তব্যের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক চিঠিপত্র আসছে এবং এই বিষয়টিকে উপলক্ষ করে চিকিৎসক মহলে অদ্ভুত আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। দলে দলে চিকিৎসক, এম-ডি পরীক্ষার্থী আমাদের এখানে আসছেন এবং নিজ নিজ বক্তব্য প্রকাশার্থে রেখে যাচ্ছেন। প্রত্যেকেরই ইচ্ছা এই চিঠিগুলি যাতে প্রকাশিত হয়। আমরা লিখেছিলাম যে, এই সংখ্যাতেই বঙ্গদর্শন লেখকের বক্তব্য প্রকাশ করব। কিন্তু পত্রগুলির প্রকাশ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা তো সম্ভব হতে পারে না, কাজেই সাবান্তরে এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য প্রকাশিত হবে।

প্রসঙ্গত একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করি। কোন কোন পত্রলেখক লিখেছেন যে, আমাদের বক্তব্য কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার। এটা ঠিক নয়, এখানে আমাদের কারোরই কোন স্বার্থ নেই। সাপ্তাহিক বসুমতীর পাঠকমাত্রই জানেন যে, সাপ্তাহিক বসুমতী তার নবপর্যায়ে জন্মলাভের পর থেকে চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানা সমস্যার ওপর চূড়ান্ত গুরুত্ব আরোপ করে এসেছে। কেন না এগুলি জনজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। ব্যক্তিবিশেষকে লোকচক্ষে হেয় করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কাজও নয়।

বন্যার্ত শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের সাহায্য দান

গত ১০ই ডিসেম্বর জলপাইগুড়িতে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক বসুমতী উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির পক্ষ থেকে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের সাহায্য বণ্টন করা হয়।

অপরাহ্নে স্থানীয় গোপালপুর হাউস হলে শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এক অনুষ্ঠানে এই সাহায্য বণ্টন করা হয়। বিশিষ্ট সমাজসেবী ও উত্তরবঙ্গের ত্রাণকার্য সংগঠনের অন্যতম প্রধান উদ্যোগী শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। জলপাইগুড়ি জেলা সাংবাদিক সমিতির সভাপতি এবং বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সমাজসেবী ও জননেতা ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল শিল্পী, সাহিত্যিক ও

ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যালের হাত থেকে জলপাইগুড়ির প্রবীণ সংগীতশিল্পী শ্রী...েন্দ্র বসু সাপ্তাহিক বসুমতী উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির সাহায্য গ্রহণ করছেন। পাশে বসে আছেন অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এবং মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন অধ্যাপক নির্মল বসু।

[illegible] উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির সাহায্য [illegible] করেন।

[illegible] অনুষ্ঠানে সাতটি সঙ্গীত ও [illegible] প্রতিষ্ঠান, সাতজন সঙ্গীতশিল্পী, দশজন সাংবাদিক ও তিনজন সাহিত্যিককে নগদ অর্থ দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সাপ্তাহিক বসুমতী উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির সহকারী সভাপতি অধ্যাপক নির্মল বসু বন্যার্তদের সেবায় ত্রাণ কমিটির উদ্যোগের বিবরণ দেন। কিভাবে বাংলার প্রবীণ ও নবীন বিশিষ্ট সাহিত্যিক, কবি, সাংবাদিক, শিল্পী, চিকিৎসক কলকাতার পথপরিক্রমা করে উত্তরবঙ্গের বন্যার্তদের জন্য অর্থ এবং অন্যান্য জিনিস সংগ্রহ করেন, সে সম্পর্কে তিনি বলেন। শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিকদের জন্য সাহায্য দেবার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে তিনি বলেন, এঁদের দিকে কারও নজর পড়ে নি বলেই প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য হলেও সাপ্তাহিক বসুমতীর ত্রাণ-কমিটি এঁদের প্রতীক-সাহায্যদানে সাহসী হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও বেশি ব্যক্তিকে সাহায্য দেবার জন্য চেষ্টা করা হবে বলে তিনি জানান। অধ্যাপক বসু বক্তৃতা প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সাপ্তাহিক বসুমতীর ত্রাণকার্যের বিস্তৃত বিবরণ দেন।

সভাপতির ভাষণে শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ সাপ্তাহিক বসুমতীর ত্রাণ-কমিটির উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, একটি অতি বড় প্রয়োজনের প্রতি তাঁরা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি জলপাইগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের জনসাধারণের পক্ষ থেকে এই ত্রাণ-কমিটির কর্তৃপক্ষ এবং উদ্যোগী শিল্পী, সাহিত্যিকদের ধন্যবাদ জানান।

ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল বলেন, আজকের অনুষ্ঠানে এসে ও এই ত্রাণকার্যের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করছেন। তিনি বলেন, যাঁরা মাথার কাজ করেন, যাঁরা মানুষের মনের খোরাক যোগান তাঁরা ভিড়ের আড়ালে থাকেন বলে সাধারণত কারও নজর তাঁদের দিকে পড়ে না। তাই দেখা যাচ্ছে, বিরাট ত্রাণযজ্ঞে অসহায় শিল্পী, সাহিত্যিকদের কোন স্থান নেই। সাপ্তাহিক বসুমতী উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ-কমিটি এঁদের সাহায্যে এগিয়ে এসে একটি মহৎ কাজ করলেন, একটি মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। সাহায্যের পরিমাণ যত কমই হোক এর সঙ্গে যে প্রীতির স্পর্শ আছে, যে দরদী মনের যোগ রয়েছে, তা সবাইকে অভিভূত করেছে।

যাঁরা সাহায্য পেয়েছেন তাঁদের পক্ষ

চিত্রে জলপাইগুড়িতে সাপ্তাহিক বসুমতীর আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের একাংশকে দেখা যাচ্ছে।

থেকে ধন্যবাদ দিতে উঠে সাহিত্যিক শ্রীনির্মলেন্দু গৌতম বলেন, যখন তিনি এই অনুষ্ঠানে যোগ দেবার ও সাহায্য গ্রহণের আহ্বান পেলেন, তখন তিনি একটু বিস্মিতই হয়েছিলেন। বন্যার সর্বস্বান্ত তাঁদের কথা সমাজ ভোলে নি, সাপ্তাহিক বসুমতীর ত্রাণ-কমিটির এই প্রচেষ্টা এই কথাই প্রমাণ করল। এর ফলে তাঁরা নতুন করে শক্তি ও উদ্দীপনা লাভ করবেন।

জলপাইগুড়ি জেলা বন্যাক্লিষ্ট শিল্পী সমিতির সভাপতি শ্রীগণেশ রায় (দৈলাবাবু) অসুস্থ শরীর নিয়েও এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। অসুস্থতার জন্য আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা না করলেও তিনিও তাঁর শুভেচ্ছা জানান।

অনুষ্ঠান শেষে সাপ্তাহিক বসুমতী উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ-কমিটির পক্ষে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রের [illegible] স্থানীয় উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী আশা গুহঠাকুরতা উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সাপ্তাহিক বসুমতী উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির উত্তরবঙ্গ সংগঠক শ্রীমুকুলেশ সান্যাল, জেলা বন্যাক্লিষ্ট শিল্পী সমিতির সম্পাদক শ্রীপ্রবীর রায় প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উত্তরবঙ্গে সাপ্তাহিক বসুমতীর ত্রাণকার্য

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সাপ্তাহিক বসুমতী উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ-কমিটির পক্ষ থেকে কয়েকটি ত্রাণকেন্দ্র খোলা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলি থেকে বিভিন্নভাবে বন্যার্তদের মধ্যে নগদ অর্থ, কম্বল, পুরনো জামা-কাপড়, বেবি ফুড, ওষুধ প্রভৃতি বণ্টন করা হয়েছে।

নিচে জেলাগতভাবে বিভিন্ন কেন্দ্র, এবং এই কেন্দ্রগুলির দায়িত্বে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের নাম দেওয়া হল :

জলপাইগুড়ি জেলা : (১) জলপাইগুড়ি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী আশা গুহঠাকুরতা। (২) ময়নাগুড়ি—ময়নাগুড়ি উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী ইরাণী মিত্র (৩) মাণিকগঞ্জ—মাণিকগঞ্জ জুনিয়র হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীসুধাংশু মজুমদার।

কোচবিহার জেলা : (১) হলদিবাড়ি—হলদিবাড়ি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীউপেন্দ্রমোহন [illegible]। (২) [illegible] — [illegible] অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রী[illegible] রায়।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা : (১) [illegible]—[illegible] উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী[illegible] (২) [illegible]—শ্রী[illegible] (৩) ইসলামপুর—ইসলামপুরের [illegible] শ্রী[illegible]।

খবরের কাগজের প্রথম পাতা

খবরের কাগজের প্রথম পাতা খুললেই দেখা যাবে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান শহরের অধিকাংশ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এখন বন্ধ, না ছুটি নয়, তারা এখন যুদ্ধকালীন শান্তি উপভোগ করছে। কিসের যুদ্ধ? শেষ পর্যন্ত ছাত্র-পুলিশ, কিন্তু তার আগে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এবং নিজেদের মধ্যে এই যে যুদ্ধ যা এখন প্রায় প্রাদেশিক জলবায়ুর সঙ্গে মিশে গেছে, তার কারণ বুঝে ওঠা ভার। ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক দলাদলি, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ, ছাত্র-ছাত্রীর বহিষ্কারে অসন্তোষ ইত্যাদি ঘটনা থেকেই শুরু হয় বিশৃঙ্খলা, তারপর সেই বিশৃঙ্খলা বাড়তে থাকে, বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থায় পৌঁছোয় যখন বিদ্যায়তনের দরজা বন্ধ করে না দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। এমনিতেই প্রচুর ছুটি উপভোগ করেন বলে শিক্ষককুল অপবাদে কলঙ্কিত, তারপরে যদি বছরের কর্মদিবস কমতে কমতে একটি লজ্জাকর অঙ্কে এসে ঠেকে, তখন আর কিছুতেই তাঁদের বাঁচানো যাবে না। মুস্কিল হচ্ছে এই যে, ছুটি-ছাটা যাই থাকুক না কেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের পাঠ্যবইগুলি শেষ করতে হয়—অন্তত, করার কথা। কিন্তু যদি খোঁজ-খবর নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে, কলেজের অনার্স ক্লাশে টেস্ট পরীক্ষা পর্যন্ত যা পড়ানো হয়, তার সঙ্গে সমগ্র পাঠ্যসূচীর ব্যবধান হতাশাব্যঞ্জক, কৃত-কর্মের সঙ্গে করণীয়ের ফারাক মনস্তাপের যোগ্য বিষয়। এর পরেও যদি কলেজের দরজা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়, তবে কী ঘটবে তা সহজেই অনুমেয়: ছাত্ররা উদ্যোগী হয়ে বাড়িতে নিজেদের পড়া তৈরি করে আসন্ন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হবে, এমন ভাবতে পারলে সুখী হতুম, কিন্তু তা নিশ্চয়ই হবে না, হবে একটি আন্দোলনের জন্ম এবং সেই আন্দোলনের স্নিগ্ধ শ্লোগান—'পরীক্ষা পিছিয়ে দিতে হবে।'

ছাত্র-উত্তেজনা ব্যাপারটি এখন দেশের সর্বত্র উত্তেজিত বিতর্ক সৃষ্টি করছে। অর্থনৈতিক চাপ, চাকুরি সম্পর্কে হতাশা, নানা রাজনৈতিক মতবাদের ঘূর্ণাবর্ত। সমাজজীবনের বহুবিধ টানা-পোড়েনে ছাত্রদের পক্ষে এখন আর অধ্যয়নকে তপস্যা মনে করা অসম্ভব (নাকি সেকেলে)—হয়তো এই সমস্ত কারণের যোগফলেই উদ্ভূত তাদের অসন্তোষ ও উত্তেজনা। এই [illegible] কেনোটিকেই যখন দূর [illegible] কোনো উপায় [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের বছরের অধিকাংশ সময় ছাত্র-অসন্তোষজনিত কারণে বন্ধ থাকবে, এ ঘটনা এখন স্বাভাবিক। এবং যে মুষ্টিমেয় দিন শিক্ষালয়ে পড়াশুনো হয়, তা ভারী পাঠ্যসূচীর তুলনায় নিতান্তই অল্প সময়। এইজন্যই পরীক্ষা পিছিয়ে দেবার শ্লোগান ওঠে, প্রশ্নপত্রকে অকারণে সিলেবাস-বহির্ভূত মনে হয়, অজানা প্রশ্নই শক্ত প্রশ্ন হয়ে ওঠে, 'গ্রেস' নম্বরের লজ্জা গায়ে উড়ে আসে।

যাকে বলে, সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, সেই সম্মান লাভ করার জন্য একজন ছাত্রকে একটি কাজই করতে হয় এবং সেই কাজটি পড়াশুনো। কিন্তু পড়াশুনো করবার জন্য সময় চাই, চাই মানসিক স্থিরতা, নিজেকে অকারণে ব্যস্ত না করা। এমন কিছু নতুন কথা বললুম না, সব সময় নতুন কথা বলবার দরকারও নেই, দরকার পুরোনো কথাই আবার শুনিয়ে দেওয়া। কিন্তু ছাত্ররা যদি সারা বছরই কোনো-না-কোনো কারণে আন্দোলিত হতে থাকেন, যদি ট্রাম-বাসের ভাড়া বৃদ্ধি থেকে শুরু করে প্রেসিডেন্ট জনসনের ভিয়েতনাম-নীতি পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ই তাঁদের মিছিলে হাঁটায়, প্রতিবাদে ডাক দেয়, তবে লেখাপড়া হবে কী করে? আবার দেখুন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বেশি সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ফেল করলেও বিপদ, তখন কর্তৃপক্ষ কী জবাবদিহি করবেন? তখন হয়তো এই অভিযোগ উঠবে যে কলেজে পড়াশুনো হয় না, পাঠ্যসূচী দীর্ঘ, নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি হয়েছে ইত্যাদি।

* * *

ঘটনাগতির এই পরিণাম দেখে দেখে এখন মনে হয় যে, পরীক্ষার সিলেবাস ও পরীক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্তনের সময় এসেছে কি না। কলেজে ঢোকার আগে ছাত্রদের যে দুটি পরীক্ষা দিতে হয়, স্কুল ফাইনাল ও হায়ার সেকেন্ডারি, তার জন্য পড়তে হয় যথাক্রমে দুই ও তিন বছর। হায়ার সেকেন্ডারিতে ইংরেজির দুশো নম্বর শুধু 'কম্পোজিশন'-এর ওপর ছিল, এই প্রথার সমাপ্তি ঘোষিত হলো এই বছর। পরের বছর থেকে যারা পরীক্ষা দেবে তাদের টেক্সট বই পড়তে হবে, সঙ্গে অন্যান্য বিষয়গুলিও থাকবে যাতে পরিক্ষার্থীদের রচনাশক্তি প্রমাণিত হয়। হঠাৎ আবার টেক্সট বই ঢুকিয়ে দেবার কী সদুদ্দেশ্য আমরা বুঝতে পারি না; যাঁরা টেক্সট বই বাদ দিয়েছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই কাণ্ডজ্ঞানহীন

ছিলেন না, ছাত্রদের হিতৈষীই ছিলেন। ভেবেচিন্তেই তো তাঁরা কাজটি করেছিলেন, সুতরাং এখন যখন আবার পাঠ্যসূচী পরিবর্তিত হলো, তখন কি আমরা ধরে নেবো যে, বর্তমান পাঠ্যসূচীই ঠিক, ছাত্রদের পক্ষে সহজ ও মঙ্গলজনক? এত ঘন ঘন যদি কর্তাব্যক্তিদের মতিগতি পাল্টায়, তবে এমন ধারণাই হয় যে, তাঁদের মধ্যে সংহতি নেই, কিসে ছাত্রদের ভালো হবে তা তাঁরাও জানেন না, ছাত্রদের পরীক্ষা নেওয়ার বদলে তাঁরা ছাত্রদের ওপরেই পরীক্ষা চালাচ্ছেন।

স্কুল ফাইনাল পাশ করে কলেজে ঢোকার পর ছাত্রদের প্রি-য়ুনিভার্সিটি পরীক্ষা দিতে হয়। আমি অনেকদিন এই নামটি নিয়ে ভেবেছি; পরীক্ষাটি যখন য়ুনিভার্সিটিই নেন, তখন তার আগে 'প্রি' কথাটি যোগ করার মানে কী? এই পরীক্ষাটি বি· এ· বা বি· এস্‌সি ক্লাশে প্রবেশের ছাড়পত্র; সুতরাং প্রি-য়ুনিভার্সিটি পরীক্ষা বলবো কেন, বড় জোর বলতে পারি প্রি-গ্র্যাজুয়েশন পরীক্ষা, প্রি-মেডিক্যাল বা প্রি-ইঞ্জিনীয়ারিং পরীক্ষার মতো। আর যদি নিতান্তই এই নামটি রাখতে হয়, তবে পরীক্ষাগ্রহণের দায়িত্ব নিন বোর্ড অব্‌ সেকেণ্ডারি এডুকেশন—তখন অন্তত হায়ার সেকেণ্ডারির সঙ্গে স্কুল ফাইনালের একটি সমতা খুঁজে পাওয়া যাবে, এবং হায়ার সেকেণ্ডারির সঙ্গেই প্রি-য়ুনিভার্সিটি পরীক্ষা নেওয়া যাবে। যেভাবেই হোক না কেন, বিদ্যালয়ে এগারো বছর ছাত্রদের তখন কাটাতে হবে, পড়াশুনোর মধ্যে একটি অনবচ্ছিন্নতা থাকবে। স্কুল ফাইনালের পর প্রচলিত প্রি য়ুনিভার্সিটি পরীক্ষাটি বেশ খাপছাড়া একথা মানতেই হবে,—পরিবেশ ভিন্ন পাঠ্যসূচী দীর্ঘ, ইতিমধ্যে ছাত্ররা যা শিখেছে তার সঙ্গে যা পড়তে হবে তার বিচ্ছিন্নতা স্পষ্ট। সমস্ত ব্যাপারটি যদি বিদ্যালয়ের পরিবেশেই নিষ্পন্ন হতো তাহলে স্কুল ফাইনালের দু' বছরে অর্জিত বিদ্যাকে ছাত্ররা তৃতীয় বছরের প্রি য়ুনিভার্সিটি পরীক্ষায় অসন্দিগ্ধভাবে কাজে লাগাতে পারতো, তৃতীয় বছরের 'কোর্স' টি অনেক হাল্কা হয়ে যেতো। কিন্তু এখন এই তথাকথিত প্রি-য়ুনিভার্সিটি একটি পুরোদস্তুর ভারী পরীক্ষার বিভীষিকা ধারণ করে আছে।

বলা বাহুল্য, যারা স্কুল ফাইনাল পাশ করছে, তারা প্রি-য়ুনিভার্সিটি (বা এস্‌· এফ্‌·২) পরীক্ষাটি তাদের নিজেদের স্কুল থেকে দিতে পারছে না। কারণ স্কুলটি হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুল নয়। সুতরাং হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলে তাদের ভর্তি হতে হবে, এইচ্‌· এস্‌· ছাত্রদের সঙ্গেই তাদের পরীক্ষায় বসতে হবে। যদিও ভিন্ন প্রশ্নপত্রে। এই পরিকল্পনার দু'টি উদ্দেশ্য—এক, ছাত্রদের ওপর থেকে পি· ইউ·-এর অকারণ বোঝা নামানো এবং দুই, আরো একটি বছর তাদের বিদ্যালয়ে আটকে রাখা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের পক্ষে এইটুকু বলতে পারি যে, কলেজজীবনের আয়ু এক বছর কমে গেলে (আমি আইনসিদ্ধ ন্যূনতম সময়টি ধরছি) ছাত্রদের ভালোই হবে কারণ আজকাল কলেজ-টলেজের যা আবহাওয়া তা তো খবরের কাগজের প্রথম পাতা খুললেই জানতে পারছেন, আমি আর কী বলবো?
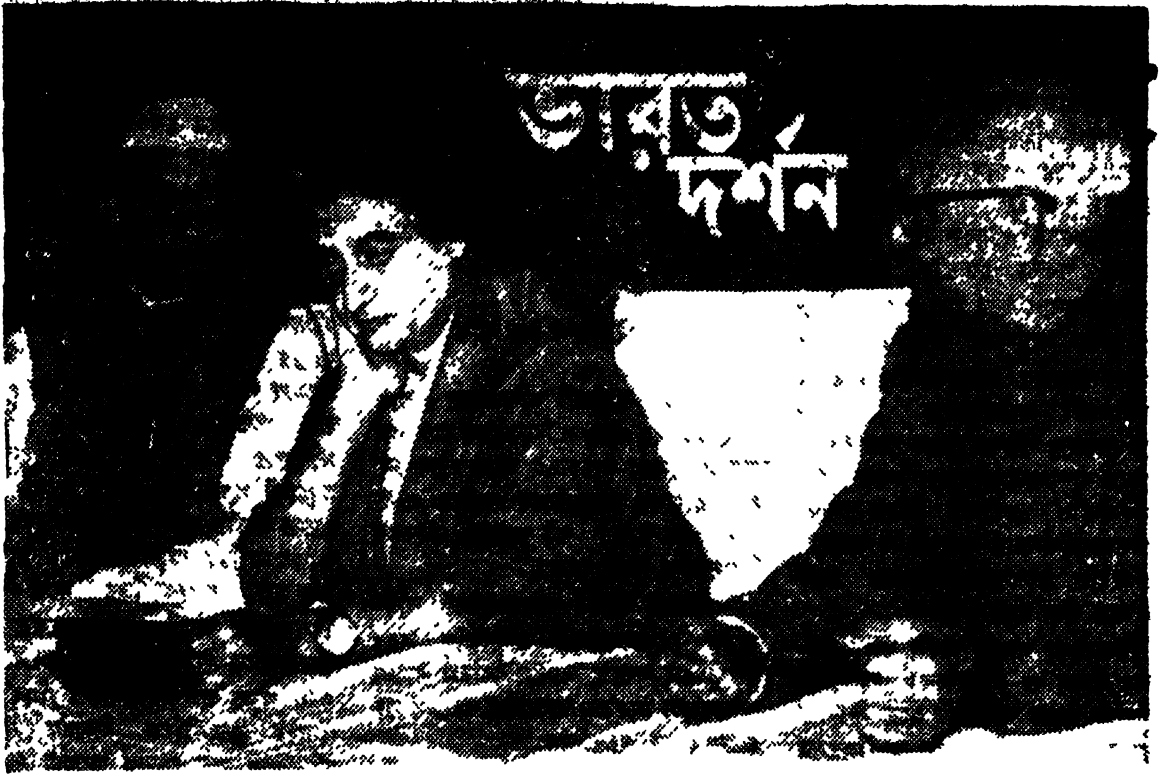
হরিয়ানার সঙ্কট সম্পর্কে আলোচনারত কংগ্রেসের তিন প্রধান—শ্রীমোরারজী দেশাই, শ্রীমতী গান্ধী ও নিজলিঙ্গাপ্পা

হরিয়ানার আলোকে রাজনীতি ফেরৎ মাঘের শীত

প্রবাদ বলে এক মাঘে শীত যায় না। কংগ্রেসের ভাগ্যে কথাটা বংশীলাল-সরকার এমনভাবেই প্রমাণ করে দেবেন এবং এত তাড়াতাড়ি, বস্তুত একে ললাট-লিখন ছাড়া আর কী-ই বা বলা যেতে পারে। হরিয়ানার বর্তমান সরকারের প্রতি সংখ্যাগুরু সদস্যের সমর্থন নেই। এই দাবির উপরে বিধানসভায় শক্তিপরীক্ষার নামতে যে কোন কারণেই হোক, শ্রীযুত বংশীলাল নারাজ হয়ে দিন কেবল পিছিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সৌভাগ্য, তিনি কংগ্রেস হাই কম্যান্ডের স্নেহধন্য এবং হরিয়ানা রাজ্যে ধর্মবীরের মতো জবরদস্ত রাজ্যপাল নেই, আছেন শ্রী বি এন চক্রবর্তী মহাশয়। সুতরাং সন্ধ্যেরাতে বংশীলালের সরকার কেড়ে নেওয়ার পশ্চিমবঙ্গীয় প্রথা সেখানে যথার্থ কারণেই গৃহীত হয় নি। বংশীলাল খোদ হাই কম্যান্ডের মনোনীত। রাজ্যপাল তাঁকে সময় না দিয়ে যাবেন কোথায়। সময় তাঁকে দিতে হয়েছে এবং রাজ্যপাল বলেছেন, আহা, বেকায়দা মুখ্যমন্ত্রীকে আর পীড়াপীড়ি করার দরকার নেই। রাজ্যপাল তাতে অসুবিধা বোধ করছেন। 'থাউক গা জাউক!' বংশীলালের ২৭শে জানুয়ারী তক সময়, দরকার হেতু এর মধ্যে দাবার ছক পুনরায় সামলে কিস্তির ধাক্কায় সামাল দিতে পারবেন তিনি), তা তাই দেওয়া যাক।

রাজ্যপালের এ হেন সহানুভূতি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে জোটে নি। অজয় মুখার্জি মন্ত্রিসভাকে রাতারাতি পেড়ে ফেলে ডঃ প্রফুল্ল ঘোষের শাসন চাপিয়ে দিয়ে গুরুতর সংসদীয় সঙ্কট সৃষ্টি করা হয়েছিল সেখানে। যার ফলে আদিল্লী টাল মাটাল হয়েছে। চ্যবন সাহেবের চিত্তচমৎকার ঘটেছে। শেষে স্পীকার সম্মেলন পর্যন্ত ডাকাডাকি করে বিজয় ব্যানার্জি মহোদয়ের ঐতিহাসিক রুলিংয়ের দাপট সামলাতে হয়েছিল। এত সব করা হয়েছিল, কারণ পশ্চিমবঙ্গে হাই কম্যান্ডের আশীর্বাদপুত মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় আসীন ছিলেন না। যেমন বলা যেতে পারে, দেশের কুত্রাপি ল' এ্যান্ড অর্ডারের পান থেকে চুন খসে নি ডাকাতি, রাহাজানি এবং সামালহীন বিক্ষোভাদির পরেও, কেবল যত গণ্ডগোল দেখা দিচ্ছে কেরালা রাজ্যে। এ-ও তেমনি নিজের বেলা আঁটি-সুটি ব্যবস্থা আর কি।

পশ্চিমবঙ্গ পরিস্থিতির পর যে স্পীকার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতেও বিধানসভার সদস্যগণই মন্ত্রিসভা ভাঙা-গড়ার মালিক বলে বিবেচিত হয়েছিলেন। বলা হয়েছিল, মন্ত্রিসভার ওপর আস্থা আছে কি নেই, এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসা শুদ্ধ বিধানসভার সদস্যরাই করতে পারেন। আর সেজন্যই সদস্যরা যদি এ ব্যাপারটার ফয়সালা করতে চান, তবে মুখ্যমন্ত্রীর কর্তব্য হবে সপ্তাহকালের মধ্যে বিধানসভার অধিবেশন আহ্বানের জন্য রাজ্যপালকে পরামর্শ দান করা।

লোকসভায় উত্তেজনা

লোকসভার সদস্যবর্গ এই কারণেই উত্তেজনায় বিস্ফোরিত হয়েছিলেন। উপাধ্যক্ষ যখন রুলিং দিলেন যে, হরিয়ানায় বিধানসভার অস্তিত্ব (বৈঠক নয়) থাকাকালীন লোকসভায় এতদ্বিষয়ে আলোচনা চলতে পারে না, তখন ক্ষুব্ধ সদস্যরা যথার্থই প্রশ্ন উত্থাপন করেন: সে কি, এমন নীতিধর্মের কথা তো পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে শোনা যায় নি। বংশীলাল-সরকারকে শক্তিপরীক্ষা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে বলে তাঁরা অভিযোগ করেন। অথচ স্পীকার নিজে মনে করেন হরিয়ানার বিধানসভা আহূত হওয়া উচিত ছিল। বিরোধীকণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে শ্রীপ্রকাশবীর শাস্ত্রী বলেছেন: কয়েকটি রাজ্যে আসন্ন অন্তর্বর্তী নির্বাচনের কথা মনে রেখে সমস্ত ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব কংগ্রেসী সরকার এড়িয়ে যেতে পারেন না। হরিয়ানা বিধানসভা আহূত না হলে লোকসভায় এ বিষয়ে আলোচনা চলতে

হওয়া উচিত বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

লোকসভায় হরিয়ানা নিয়ে সরকার-পক্ষের পাশ-কাটানো নীরবতায় স্বতন্ত্র ও জনসংঘের সদস্যরাও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন।

বস্তুতপক্ষে লোকসভার অধ্যক্ষের অভিমত পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের নীরবতায় নস্যাৎ হয়ে তো গেছেই, উপরন্তু চ্যবন সাহেবের প্রকাশিত উক্তিও নিন্দিত হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মন্তব্যঃ বংশীলালজী রাজ্যপালকে বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার পরামর্শ দিতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে রাজ্যপাল তা মেনে নিতে বাধ্য। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এবম্বিধ উক্তির দ্বারা বংশীলাল-মন্ত্রিসভায় আস্থাহীন দলছুট-দের ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্য প্রকট বলে মনে করা হচ্ছে।

বিধানসভা ভাঙার অর্থই হল রাজ্যপালের শাসন ও নির্বাচন। দলছুটরা স্বভাবতই তাতে শঙ্কিত হয়ে পুনশ্চ কংগ্রেসী বিবরে প্রবেশ করে বংশীলালের মন্ত্রিসভায় ঠেকনোর কাজ করতে বাধ্য হবেন, চ্যবন সাহেবের উক্তি সেই উদ্দেশ্যেই প্রচারিত এমন সন্দেহকে অবশ্যই অমূলক বলা যায় না।

হরিয়ানা কম্যুনিস্টদের প্রস্তাব

হরিয়ানার কম্যুনিস্ট পার্টি সমগ্র ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন তাতেও বলা হয়েছেঃ হরিয়ানা পরিস্থিতিতে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, কংগ্রেস রাজ্যে কোন স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠনে সক্ষম নন।

তাঁরা স্পষ্টতই অভিযোগ এনেছেন যে, হরিয়ানার রাজ্যপাল পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের সংগে নিজের নাম জড়িয়ে ফেলছেন। ভংগুর কংগ্রেস দল রাজ্যপালকে ক্ষমতার অপব্যবহার করতে আরও একবার প্রভাবিত করছেন। সুতরাং রাজ্য পরিষদ পুনশ্চ দাবি রাখছেন যে, রাজ্যপালের পদটি শাসনতন্ত্র সংশোধন করে খতম করে দেওয়া হোক।

রাজ্যপালের বক্তব্য

অন্যদিকে রাজ্যপাল শ্রী বি এন চক্রবর্তী গত পয়লাই ডিসেম্বর সাংবাদিক-দের বলেন, নিরস্কুশী জনের মধ্যে বিয়াল্লিশ জন সদস্যের সমর্থন এখনো বংশীলালের প্রতি আছে বলে মনে করা যেতে পারে। তিনি জানান, কংগ্রেস সভাপতির আহ্বানে সাড়া দিয়ে তিনজন পদত্যাগী সদস্য পুনরায় বংশীলাল-মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করবেন বলে রাজ্যপালকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন। তাছাড়া দুজন নির্দলীয় সদস্যের লিখিত সমর্থনও তাঁর হস্তগত হয়েছে। সুতরাং তাঁর হিসেবমত বংশীলাল এখনও বিয়াল্লিশ সদস্যের আস্থাভাজন। এই অবস্থায় তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে পীড়াপীড়ি করে বিধানসভা আহ্বানে ব্যস্ত করাতে চান না। তাঁর সে ক্ষমতাও নেই।

একই অংগে এত রূপ

কিন্তু কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার বেলায় রাজ্যপালদের এমন সুবিবেচকের মত কথা বলতে শুনলে স্বভাবতই অনেকে আশ্চর্য হয়ে ভাববেন, রাজ্যপালের শরীরে একই অংগে এত রূপ! কী আশ্চর্য, এইভাবে কি গণতন্ত্র টিকে থাকে?

গণতন্ত্র দলগত শক্তির খেলা, শক্তিধরের খেয়ালখুশির ক্রীড়াভূমি নয়। কিন্তু এই সত্যটা, সামনে বিভিন্ন রাজ্যে অন্তর্বর্তী নির্বাচন থাকলেও, কংগ্রেস তা মেনে নিতে গররাজি।

জবাব নেই

হরিয়ানায় ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য বংশীলাল-সরকার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চলেছেন এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে ধরনের হুঙ্কার দিচ্ছেন তাতে কংগ্রেসের সুনাম বাড়ছে না, বরং সাধারণ নাগরিক গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান ও নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছেন। বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত সরকারের চরিত্র অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রযত্ন এবং হুমকির তারতম্যে অধিকাংশই স্তম্ভিত। আইনের চোখ সর্বত্র সমান নয়। লিখিত আইনের অলিখিত অপপ্রয়োগে দেশবাসীর দর্শক হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই। কেন না জটিল রাজনীতির চুলচেরা হিসেবনিকেশ করে সরকার গঠনের মতো শিক্ষা নেই নাগরিক সাধারণের। আর তাই আমাদের দেশের গণতন্ত্রের ভালমন্দের কোন জবাবও নেই।

মন্ত্রিত্ব সঙ্কটের নেপথ্যে

বংশীলালের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল বর্তমান বছরের মে মাসে। তার আগে হরিয়ানার কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পতন ঘটে কংগ্রেসী সদস্যদের দলবদলের ফলে। তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ভগবৎদয়াল শর্মা। কয়েক মাসের জন্য মন্ত্রিত্ব করতে আসেন সংযুক্ত বিধায়ক দল। মুখ্যমন্ত্রী রাও বীরেন্দর সিং। কিন্তু তাঁর ভাগ্যেও মন্ত্রিত্বের মেয়াদ অধিককাল ছিল না। পেছনে লেগেছিলেন জনৈক দেবীলাল। বীরেন্দর সিং বুঝলেন, দেশসেবা আসলে [illegible] মন্ত্রিত্বের ভিতে পেতল মাঝেরের মত তোফা গুছিয়ে নেওয়ার চাকরি। দল আদর্শ সেবাব্রত নরাধমের গায়ে-জড়ানো নামাবলী মাত্র। সুতরাং তিনি অবশ্য রাজনীতিকের সন্ধানে ব্যাপৃত হলেন এবং রোজ গণ্ডা গণ্ডা লোক ভাঙিয়ে তাঁর মন্ত্রিসভার প্রতি আস্থা নির্ণয়কারী দাঁড়িপাল্লাটির ঝুঁকতি নিজের দিকে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন। এদেশে পয়সা দিয়ে যেমন ভোট কেনা যায়, তেমনি এম-এল-এ'র নাকেও মন্ত্রিত্বের বঁড়শি গাঁথা একটি সাধারণ আয়াসী মৃগয়ামাত্র। তিনি সদস্য-শিকারে রাজ্যে মন্ত্রীর হাট বসিয়ে দিলেন। তবু ভরিল না চিত্ত, ক্ষুধার্ত মানব। যত পাই তত চাই, হুড়োহুড়ির মধ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলার অবশেষে রাজ্যপালের শাসন (রাষ্ট্রপতির শীলমোহরে) নেমে এলো আর শুরু হল অন্তর্বর্তী নির্বাচনের সজ্জা। রাজনীতির বারোটা বাজল। হরিয়ানার মত অনেক রাজ্যেই পরাধীন ভারতের বুভুক্ষু রাজনীতিকরা সুযোগ বুঝে এম-এল-এ'র নিলাম ঘর তৈরি করে সারিবদ্ধভাবে ঘণ্টানিনাদ শুরু করে দিলেন। প্রায় সব দলেই ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি। দে মা আমায় মন্ত্রী করে, শ্লোগান।

কংগ্রেসে প্রকাণ্ড ভাঙন, অন্যদল থেকে টোপ গলাধঃকরণেচ্ছু এম-এল-এ-দের নিলাম ঘর থেকে তুলে আনার ব্যস্ততা কংগ্রেসের সুমহান ঐতিহ্যে চির-কালীন কলঙ্কের রেখা টেনে দিল। অন্তর্বর্তী নির্বাচনকালে তাই কংগ্রেস হরিয়ানায় দলত্যাগীদের বাদ দিয়েই মনোনয়ন দিলেন। এমন কি ভগবৎদয়াল শর্মাও পেলেন না বাঞ্ছিত মনোনয়ন। দেখা গেল তাতে ফল ভালই ফলেছে। কংগ্রেসের নীতিনিষ্ঠা দেখে জনগণ আবার কংগ্রেসকেই গদিনসীন করেছে। বেমক্কা [illegible] ভ্রান্তনীতি অবলম্বন করে মাঝের [illegible] বেদম বদনাম কিনে বসল শুধু শুধু।

কিন্তু দরিদ্র নিরক্ষর দেশে জনতার রায়ই শুধু স্থায়ী সরকার গঠন করতে পারে না। ভারতবর্ষ ইংলন্ড নয়। হরিয়ানায় স্থায়ী সরকার টিকিয়ে রাখাই সমস্যা হল। হরিয়ানা এম-এল-এ বাজারের অন্যতম বড় মহাজন শ্রীভগবৎদয়াল শর্মা। বংশীলাল তাঁরই সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রীর সিংহাসনে আরূঢ় হলেন। তাঁর পক্ষে শর্মার প্রতি রূঢ় হওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু ক্ষমতালাভের পর বংশীলালের ধারণা হল, আটঘাট বাঁধি তাঁর পাকাপাকি বাঁধা হয়ে গেছে। তিনি গোষ্ঠী-সমর্থন [illegible]

[illegible]তে নতুন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় থেকে মন্ত্রী বাছাই করে নিয়ে ভেবেছিলেন, এম-এল-এ নিলাম ঘরে স্থায়ী তালা ঝোলানোর চমৎকার ব্যবস্থা তিনি করে ফেলেছেন। সুতরাং ভি ডি শর্মাকে অতঃপর তিনি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনে আর ইতস্তত করলেন না।

মহাজনের চোখে তখন বিরাগবহ্নি পুনশ্চ প্রজ্বলিত হতে শুরু করল। আবার ফ্লোর-ক্রশিং-এর হাওয়া বইয়ে দেওয়ার খেলা শুরু হল হরিয়ানা বিধান-সভায়। শর্মা নিজে কংগ্রেস ছেড়েছেন। কংগ্রেস পরিষদীয় দল থেকে এম-এল-এ ভাঙানোর কাজটি তিনি পাকা হাতেই শুরু করলেন। ঘোষিত হল, ষোলজন কংগ্রেসের বিপরীতে আসন গ্রহণে প্রস্তুত। ওদিকে একচল্লিশ-সদস্যক হরিয়ানা বিধায়ক দলের চিঠি গেছে রাজ্যপালের কাছে, বংশীলালের আর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই, হুজুর যেন বিধানসভায় একটা বিচারের ব্যবস্থা করেন। হুজুর চুপচাপ।

কিন্তু এই নীরবতা দিয়ে মন্ত্রিত্ব শিকারের হুড়োহুড়ি বন্ধ করে রাখা যাবে না। ভগবৎদয়াল যে সে লোক নন। হরিয়ানা দলাদলি বিধ্বস্ত রাজ-নীতিতে তাঁর ভগ্নতরীর হাল এখনও পর্যাপ্ত পানি বঞ্চিত হয়ে পড়ে নি। কান্ডারী হাওয়ার গতি পুনরায় উল্টো খাতে বইয়ে নিয়ে যাবেন। বিরোধী-পক্ষের সমর্থনও রাও বীরেন্দর সিং-এর মাধ্যমে ইতিমধ্যেই ঘোষিত হয়েছে। বিধানসভা আহ্বানের দাবি যেভাবে উঠেছে তাতে রাজ্যপাল কতদিন আর শালগ্রাম-শিলাবৎ নীরবতা অবলম্বন করবেন। তাছাড়া স্পীকার মহোদয়ের বক্তব্যকে হুট বললেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে চ্যবন সাহেবের হাতে যে মোক্ষম মুগুরটি সর্ববিষয়ে ভীমবিক্রমে আন্দো-লিত হতে থাকে, এখন একমাত্র ভরসা সেইটিই। চ্যবন সাহেবের গদাই মন্ত্রিত্ব-লোভীদের চেতনায় ঝাঁকি দিতে একম্ এবং অদ্বিতীয় অস্ত্র।

গত ১২ই ডিসেম্বর যখন রাজ্যপাল সাড়ম্বরে বংশীলাল-মন্ত্রিসভার প্রতি ৪২ জনের সমর্থন ঘোষণা করেন, ঠিক সেইদিন রাত্রেই শ্রী ভি ডি শর্মা মুখ্য-মন্ত্রী বংশীলালকে এক পত্রে পদত্যাগের আহ্বান জানান।

রেওয়ারীতে একটি নির্বাচনী সভায় তিনি বলেছেনঃ মাত্র একটি ভোটে পরাজিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে হরিয়ানায় সুস্থ রাজনৈতিক এবং গণতান্ত্রিক আব-হাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন। আর সেই ভোটটিও তাঁর পক্ষে পড়ে নি শুধুমাত্র বংশীলালের অনুপস্থিতির দরুণ। বংশীলাল তখন চণ্ডীগড়েই উপস্থিত। অথচ বিধানসভায় অনুপস্থিত থেকে শর্মা-মন্ত্রিসভার পতনের কারণ হয়েছিলেন। আজ সেই বংশীলাল নিজে কি করছেন?

তিনশ' কংগ্রেসীর দলত্যাগ

হাওয়া মোটেই সুবিধের নয়। হিসার জেলার তিন শতাধিক কংগ্রেস সদস্য দল থেকে হান্সি মিউনিসিপ্যালিটির কমি-শনার শ্রীজনার্দন দাশগুপ্তের নেতৃত্বে পদ-ত্যাগ করেছেন বলে সংবাদ। তাঁদের অভিযোগ কংগ্রেস হাই কম্যান্ডের অ-গণতান্ত্রিক মনোভঙ্গির বিরুদ্ধে। শ্রীগুপ্ত বলেনঃ হাই কম্যান্ড একনায়কী ক্ষমতা প্রয়োগ করে হরিয়ানা কংগ্রেসের প্রতি বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করছেন।

তবে প্রত্যাবর্তনও শুরু হয়েছে। এক এক করে দলছুটরা দলে ভিড়ছেন। এ-ও কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হার্ড-লাইনের হ্যামারিং-এর ফল!

বিহারে সঙ্কট

হরিয়ানার পর বিহার। হাই কম্যান্ডের হাত সেখানে কিছুটা নীতিনিষ্ঠ হতে গিয়ে কতিপয় বিহার কংগ্রেসী নেতার সমূহ বেদনার কারণ ঘটিয়েছে। তাঁরা স্বভাবতই বলতে চাইছেনঃ এই কী পুরস্কার এতকাল কংগ্রেস সেবার!

নেতৃপঞ্চক হলেন, সর্বশ্রী কে বি সহায়, মহেশপ্রসাদ সিংহ, সত্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, রামলখন সিং যাদব এবং অম্বিকা-শরণ সিং। প্রত্যেকেই বিহার রাজ্য কংগ্রেসের ক্ষমতাশালী নেতা। কিন্তু এঁদের কেউই সম্ভবত মনোনয়ন চাইবেন না। কারণ কিছু দায়িত্বশীল ব্যক্তি প্রকাশ্যে পঞ্চপাণ্ডবের মনোনয়নের ব্যাপারে অসম্মানজনক উক্তি করেছেন। যাতে তাঁরা ব্যথা পেয়েছেন। কংগ্রেস সভাপতির বিরুদ্ধেও এঁরা অভিযোগ করেছেন।

বোঝা যাচ্ছে, এঁদের সরে দাঁড়ানোটা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়, সদুদ্দেশ্যেও নয়। নিতান্ত আত্মমর্যাদার আঘাতেই এঁদের নির্বাচনী মহোৎসবের প্যান্ডেল থেকে দূরে নিক্ষেপ করেছে। ব্যাপারটি সুতরাং গুরুতর। ক্ষুব্ধ কংগ্রেসী ভয়ানক কাণ্ডই করতে পারেন। একশ বছরের মিঠাই নোনতা হলে মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করা স্বভাবতই অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। আর কংগ্রেস হাই কমান্ড তা-ও জানেন। তবু এমনটাই ঘটল।

ওদিকে বিহারের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার ছ'জন প্রাক্তন মন্ত্রীকে নিয়েও কংগ্রেসী নির্বাচনী কমিটিতে বিতর্কের ও অসন্তোষের তুষে আগুন পাকছে। এই সমুদয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভি-যোগ থাকায় আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে এঁদের টিকিট দিতে পাতিল-নিজলিঙ্গাপ্পা প্রমুখ নেতারা গররাজি। কংগ্রেস সভা-পতি শ্রীযুক্ত নিজলিঙ্গাপ্পা একটি আবেদনে এঁদের স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়াবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু তাই কি হয়। মন্ত্রী হওয়ার জন্যই কী কাণ্ড, আর একবার মন্ত্রিত্বের স্বাদ পেয়ে সরে দাঁড়ানো, সে কি চাট্টিখানি কথা। সুতরাং ঐ ছ'জন ভীষণ বিক্ষুব্ধ প্রায় বিদ্রোহী হওয়ার উপক্রম।

কিন্তু কংগ্রেস সভাপতির সংগে এক-মত হয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং জগজীবন রাম, ডি পি মিশ্র এবং ফকরুদ্দীন আলি আমেদ প্রমুখ নেতারাও মনে করছেন যে, উক্ত ছ'জনকে মনোনয়ন দেওয়া হলে মধ্য-বর্তী নির্বাচনে কংগ্রেসের আর মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না। এমতা-বস্থায় এ পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে সি ই সি-র পক্ষে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নি।

শ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষ এবং শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের যুক্তি নেহাৎ ফেলে দেওয়ার মত নয়। তাঁরা বলেন, হতে পারে এঁদের মনোনয়নের ফলে কংগ্রেসের নির্বাচনী লড়াই কিছু কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, কিন্তু সেকথা আগেই ভাবা উচিত ছিল। প্রদেশ কংগ্রেসকে এঁদের নাম না পাঠাতে আগে থেকে নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু হাই কম্যান্ড থেকে তেমন নির্দেশ যায় নি। এখন এই এগার ঘটিকায় (শেষ মুহূর্তে) এঁদের বাদ দেওয়া অসমীচীন।

অন্যপক্ষের বক্তব্য দুর্নীতি ও স্বজন-পোষণ, গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষা ও দলাদলির অবসানের জন্যই আজ কংগ্রেস নির্বাচনী কমিটিকে শক্ত হতে হবে। সাধারণের সামনে তুলে ধরতে হবে একটি আদর্শ নীতি।

কিন্তু আদর্শ-ফাদর্শের কথা টেনে আজ আর বিশেষ লাভ আছে বলে মনে হয় না। জল নিচের দিকেই গড়ায়। কুড়ি বছর ধরে আপন-গুছানোর স্রোত নিম্নখাতে অবাধে বইয়ে দিয়ে আজ হঠাৎ কয়েকজন ইঞ্জিনীয়ারে মিলে স্রোতের মুখে বাঁধ বাঁধতে গেলে ফল কি খুব ভাল হবে। বিশেষ, শুধু কংগ্রেস কেন, সব দলেই যে-স্বার্থের দাপট বৃদ্ধি দুর্নীতিতে নতুন উত্তেজনার সঞ্চার করেছে তাকে ঠাণ্ডা করতে কেবলমাত্র বাইরের চাপ সৃষ্টি মোটেও কার্যকর নয়। কেন না কে সেই নিষ্কলুষ যিনি নির্মমন না হয়ে সদর্পে নীতিহীনতাকে নীতিহীনতা বলে ঘোষণা করবেন! যিনি রক্ষক, ভক্ষকে তাঁর ভূমিকাও যে এককথায় অস্বীকার্য নয়। তাই আদর্শ চিত্র তুলে ধরবেন এমন ভয়ঙ্কর পণ করে কেউই পার পাবেন না।

[১৪।১২।৬৮]

পূর্ব পাকিস্তানে আয়ুববিরোধী প্রচণ্ড গণ-বিক্ষোভ

ইতালী :

ইতালীর রাজনৈতিক সঙ্কটের এখনও কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় নি। গত জুন মাসে জলজো মোরোর সরকারের পদত্যাগের পর এখানে কোন স্থায়ী সরকারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নি। জিওভান্নি লিওনের সরকারও মাসখানেক হল পদত্যাগ করেছে। লিওন কোনরকমে তদারকি সরকারের কাজ চালাচ্ছেন। ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি, য়ুনাইটেড সোস্যালিস্ট পার্টি (সম্প্রতি সম্মেলনে এঁরা নামের গোড়া থেকে সংযুক্ত কথাটি বাদ দিয়েছেন) ও রিপাবলিকান পার্টির মধ্যে কোয়ালিশন সরকার গঠনের কথাবার্তা চলছে। তবে এখনও তাঁরা কোন ঐক্যমতে পৌঁছতে পারেন নি।

কিন্তু ইতিমধ্যে সারা ইতালী জুড়ে এক বিরাট ঝড় বয়ে গেল। ছাত্র, শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রচণ্ড আন্দোলনের ফলে ইতালী কেঁপে উঠেছে। সিসিলীর সায়রাকিউজ থেকে শুরু করে রোম, মিলান, ভেনিস, নেপেলিস, পিসা, জেনোয়া কোন শহর এই আন্দোলন থেকে বাদ যায় নি। এই আন্দোলনের ফলে সমগ্র ইতালী অচল হয়ে পড়েছিল।

কৃষি-শ্রমিকদের মজুরীবৃদ্ধির আন্দোলন থেকে এর সূত্রপাত। সিসিলীর কৃষি-শ্রমিক ও ভাগচাষীরা তাদের দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছে। তাদের দাবির প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তাঁরা লেনটিনি, রোসোলিনি ও আভোলা শহরের পথঘাট অবরোধ করে রাখে। পুলিশ এসে এই অবরোধ সরিয়ে দেবার চেষ্টা করলে সংঘর্ষ শুরু হয়। আভোলার কাছে পুলিশের গুলীতে ২ জন কৃষক নিহত হন এবং ৫২ জন আহত হন।

আভোলার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় দেশব্যাপী বিক্ষোভ। কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়ায় ছাত্র, শ্রমিক, শিক্ষক ও কর্মচারীর দল। দেশের ৩টি প্রধান কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন একযোগে ধর্মঘটের ডাক দেয়। কৃষকদের দাবি ও ধর্মঘটের সমর্থনে দেশের সর্বত্র বিরাট বিরাট মিছিল ও সমাবেশ হয়। রোমে ৩০ হাজার ছাত্র ও ২০ হাজার শ্রমিকের দুটি বিরাট সমাবেশ হয়। দেশব্যাপী এই বিক্ষোভের প্রত্যক্ষ কারণ আভোলার ঘটনা হলেও মূল কারণ আরও গভীরে। ইতালীর অর্থনৈতিক সঙ্কট ক্রমেই তীব্র হচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছাত্ররা দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষা সংস্কারের দাবি জানাচ্ছে। কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। তাই এতদিনের বিক্ষোভ হঠাৎ সুযোগ পেয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। যে-অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল, অনেকের মতে তা মে-জুনের ফ্রান্সের মত।

তবে অবস্থা দ্রুত স্বাভাবিক হয়েছে। সরকারও কিছু দাবি মেনে নিয়েছেন। কৃষকদের দাবি সরকার বিবেচনা করছেন। গুলীতে নিহত দু'জনের বিধবাকে আজীবন পেন্সন দানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে। সিসিলীর পুলিশ-প্রধানকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতি সারাগাত থেকে শুরু করে সরকারের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সবাই ঘটনার [illegible] নিয়ে বড় রকমের কোন আন্দোলন [illegible] পরে পড়েও যায় না। বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কটের পর্বে সংশোধন গ্রহণ করে তারা নির্বাচনী পন্থাতেই ক্ষমতা দখলের আশা পোষণ করে।

শুধু ইতালীর অবস্থা কিরূপ বিস্ফোরক, এই বিক্ষোভ তার প্রমাণ।

পাকিস্তান :

পূর্ব পাকিস্তানে আয়ুববিরোধী বিক্ষোভ ক্রমেই বেশি তীব্র হচ্ছে। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে এবং আয়ুবী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালন করা হয়েছে।

জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ দমনের জন্য সরকার সর্বপ্রকার দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছে। লাঠি, গুলী, টিয়ার-গ্যাস, কোন কিছুই বাকি নেই। ৭ই ডিসেম্বর ঢাকায় পুলিশের গুলীতে ২ জন নিহত হয়েছেন এবং ২০ জন আহত হয়েছেন। ১৩ই ডিসেম্বর চট্টগ্রামে পুলিশের গুলী চলেছে। হতাহতের পূর্ণ বিবরণ এখনও জানা যায় নি। তবে সব মিলিয়ে নিহতের সংখ্যা এ পর্যন্ত প্রায় ১০ বলে একটি সংবাদে প্রকাশ। গ্রেপ্তারের সংখ্যা হাজারের ওপর। কিন্তু পুলিশী সন্ত্রাস গণ-আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে পারে নি।

আয়ুবের বিরুদ্ধে যেন সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান ক্ষেপে উঠেছে। গত মাসে পশ্চিম পাকিস্তানে দমননীতির বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে খুব একটা বড় রকমের কোন প্রতিবাদ হয় নি দেখে যাঁরা ভাবছিলেন পূর্ব পাকিস্তান বুঝি ঝিমিয়ে পড়ল, তাঁদের ভুল ভেঙেছে। আরও ব্যাপকভাবে বিক্ষোভ জানাবার জন্য পূর্ব পাকিস্তান তৈরি হচ্ছিল। ৫ই ডিসেম্বর আয়ুব খাঁর ঢাকা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল প্রচণ্ড বিক্ষোভ। মুহূর্তের মধ্যে যেন সারা দেশে আগুন জ্বলে উঠল। কি নিদারুণ আয়ুববিদ্বেষ! রাস্তায় রাস্তায় পোস্টার : আয়ুব চোরের মত দেশ থেকে পালাচ্ছেন! আয়ুব আশ্রয়ের আশায় পাগলের মত গ্রেট বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের দিকে একের পর এক ছুটছেন।

ঢাকায় বিমান থেকে অবতরণের সময় যে সরকারী অনুষ্ঠান হবার কথা ছিল, তা বাতিল করতে হয়েছে। রমনার মাঠে যে শিক্ষা ও কৃষি সমাবেশ হয়েছে, সেখানে কড়া সৈন্য ও পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। [illegible] করতে আয়ুব খাঁ

ঢাকায় আয়ুববিরোধী বিক্ষোভ-মিছিল পরিচালনার সময় পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় আওয়ামী দলের ৮৬ বছরের বৃদ্ধ নেতা ভাসানীর গতিরোধ করছে পুলিশের দল।

এরূপ বিক্ষোভের সম্মুখীন হন নি, কখনও এ রকম অপমান সহ্য করেন নি। অনেক দুঃখে আয়ুবের মুখ থেকে বেরিয়েছে: সারা জীবনের জন্য তিনি রাষ্ট্রপতি থাকতে চান না!

পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে ভয় দেখাবার জন্য আয়ুব খাঁ ও তাঁর সুযোগ্য সহচর পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আবদুল মোনেম খাঁ পশ্চিম পাকিস্তানের দমন-নিপীড়নের কাহিনী খুব ফলাও করে প্রচার করছিলেন। মতলব ছিল, এইসব কাহিনী শুনে পূর্ববঙ্গবাসী ভয় পেয়ে যাবে এবং আর তারা বিক্ষোভ দেখাবে না। কিন্তু হিসাবে ভুল হয়েছে। বাঙালীরা ভয় তো পায়-ই নি, বরং তাদের প্রতিরোধের দৃঢ়তা আরও বেড়েছে।

বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টাও করেছে আয়ুব সরকার। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মধ্যে যে সংগ্রামী ঐক্য গড়ে উঠতে চলেছে, তাতে ফাটল ধরাবার জন্য আয়ুব ঢাকায় এমন ইঙ্গিত করেছেন যে, তাঁর সরকার পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বেশি অর্থব্যয় করছে বলেই পশ্চিম পাকিস্তানের লোক তাঁর ওপর চটেছে। এবারের পশ্চিম পাকিস্তানের বিক্ষোভের এই নাকি আসল কারণ। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ এই মিথ্যা-প্রচারের দ্বারা বিভ্রান্ত হয় নি।

চিরাচরিত কায়দায় হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টাও হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হিন্দুও আছেন। হিন্দুদের নাম ফলাও করে প্রচার করে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে যে, আয়ুববিরোধী বিক্ষোভের মূলে রয়েছে হিন্দুরা। কিন্তু এসব কৌশলে আর কাজ হচ্ছে না। ঢাকা ও অন্যান্য শহরে সাম্প্রদায়িক মৈত্রী বজায় রাখার জন্য পোস্টার পড়েছে। হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিতভাবে আজ আয়ুব-শাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে।

ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে পূর্ব পাকিস্তানের দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরাবার চেষ্টাও আয়ুব করেছেন। ফারাক্কা বাঁধের কথা তুলে তিনি পূর্ব পাকিস্তানে ভারতবিরোধী মনোভাব সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এতেও কাজ হয় নি। সাধারণ মানুষের আজ প্রথম দাবি: গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চাই, স্বৈরাচারের অবসান চাই।

এবারের আন্দোলনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য সকল শ্রেণীর মানুষের ঐক্য। বিপ্লবী ছাত্রদের পাশে আইনব্যবসায়ী উকিলেরাও এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রগতিশীলদের সঙ্গে উদারনৈতিকেরা এসে মিশে ছেন। হিন্দু মুসলমান মিলেছে। শ্রমিক ও কৃষক এক হয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান আজ এক লড়াই-এর ময়দানে। এমন কি মৌলানা ভাসানী সম্পর্কে কারও কারও মনে সন্দেহ ছিল যে তিনি হয়তো শেষ পর্যন্ত আয়ুব খাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামবেন না, সেই ভাসানী পর্যন্ত এই বৃদ্ধ বয়সে আয়ুববিরোধী মিছিলের নেতৃত্ব করছেন, ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন।

আসগর খাঁ-ও ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আসগর খাঁ থামেন নি। তিনি সর্বত্র আয়ুব শাসনের তন্ত্রের সমালোচনা করে বক্তৃতা করছেন।

ভেনিজুয়েলা :

আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে রাফেল ক্যালডেরা ভেনিজুয়েলার নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। গত সপ্তাহে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ভোট-গণনায় কিছু গোলমালের জন্য ফল প্রকাশে বিলম্ব হল।

রাফেল ক্যালডেরা সোস্যাল ক্রিশ্চিয়ান পার্টির প্রার্থী। তিনি তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাসীন দল ডেমোক্রাটিক অ্যাকশন পার্টির প্রার্থী বিদায়ী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোনজালো ব্যারিয়সকে প্রায় ত্রিশ হাজার ভোটে পরাভূত করে নির্বাচিত হয়েছেন। ব্যারিয়সের পরাজয় রীতিমত বিস্ময়কর। তিনি ভেনিজুয়েলার শক্ত মানুষ এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরূপে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। ক্যালডেরা এর আগেও তিনবার রাষ্ট্রপতি পদের জন্য দাঁড়িয়ে হেরেছেন। এবারও তিনি হারবেন প্রায় সবাই তাই ধরে নিয়েছিলেন। তবু তিনি জিতলেন।

ব্যারিয়সের পরাজয়ের ফলে ভেনিজুয়েলার ডেমোক্রাটিক অ্যাকশন পার্টির দশ বছরের একটানা শাসনের অবসান ঘটল। ১৯৫৮ সালে ক্ষমতায় এসে পেরেজ জিমেনেজ-এর একনায়কতন্ত্রী শাসনের অবসান ঘটিয়ে ডেমোক্রাটিক অ্যাকশন পার্টি ভেনিজুয়েলায় গণতান্ত্রিক শাসনের পত্তন করে। ভেনিজুয়েলায় বিপুল তৈল-সম্পদ থেকে প্রাপ্ত অর্থ জিমেনেজ রাজধানী কারাকাসের শোভাবর্ধনের জন্য ব্যয় করছিলেন। ডেমোক্রাটিক পার্টি ক্ষমতায় এসে এই তেলের টাকা স্কুল-কলেজ, রাস্তা ঘাট এবং স্বাস্থ্য ও গ্রামোন্নয়নের জন্য ব্যয় করে। ফলে সাধারণ মানুষের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। এই নির্বাচনেও দলের ধ্বনি ছিল: 'এই নীতি অব্যাহত থাক'—'কনটিনুউজমো'।

ব্যারিয়স নির্বাচনে নেমেছিলেন 'পরিবর্তনের' ধ্বনি নিয়ে। দশ বছর এক শাসন চলেছে, এবার পরিবর্তন চাই। এই পরিবর্তনের আহ্বানে অনেকে সাড়া দিয়েছে।

ব্যারিয়সের জয়লাভের পেছনে দুটি প্রধান কারণ রয়েছে। প্রথম তিনি প্রাক্তন ডিক্টেটর জিমেনেজের দলবলের সমর্থন পেয়েছেন। আর, দ্বিতীয়, ডেমোক্রাটিক অ্যাকশন পার্টির ভাঙন। দলের সভাপতি লুই বেলট্রান পিয়েটো পৃথকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। তিনি যে ছ' লক্ষ ভোট পেয়েছেন, তার অধিকাংশই ব্যারিয়সের ভোট।

এবারের নির্বাচনে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা জিমেনেজের ভেনিজুয়েলার রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন। সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগে তিনি ছ' বছর জেল খাটার পর অল্প কিছুদিন আগে মুক্তি পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি মাদ্রিদে। সেখান থেকে তিনি ভেনিজুয়েলার সেনেটে নির্বাচনপ্রার্থী হয়েছেন এবং জয়লাভও করেছেন। তাঁর দল 'ন্যাশনাল সিভিক ক্রুসেডের' ১১ জন প্রার্থীও নিম্নকক্ষে নির্বাচিত হয়েছেন। আইন অনুসারে এবার তিনি দেশে ফিরবেন এবং রাজনীতিতে অংশ নেবেন। হয়তো আগামীবার রাষ্ট্রপতি পদের জন্যও তিনি দাঁড়াবেন।

লাতিন আমেরিকার অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ ভেনিজুয়েলা। সামরিক অভ্যুত্থান ও একনায়কত্বের মহাদেশের এই দেশটিতে কিছুটা স্থায়ী গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ডেমোক্রাটিক পার্টির সরকার প্রগতিশীল না হলেও মোটামুটি গণতান্ত্রিক ছিল। কিন্তু এবারের নির্বাচনে দক্ষিণপন্থীরা প্রাধান্য লাভ করল। কেবল ভেনিজুয়েলা নয়, সমগ্র লাতিন আমেরিকার রাজনীতিতে এর প্রভাব পড়বে।

(১৫-১২-৬৮)

সাপ্তাহিক বসুমতী

উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটির তহবিলে দান

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

১৭১·০০ টাকা : ডকমাস্টার মেরিন স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব, খিদিরপুর, কলকাতা—২৩।

১১৭·০০ টাকা : 'ড্রেজার সুবর্ণরেখা'-এর কর্মিবৃন্দ। ১৫, স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলকাতা—১।

১০১·০০ টাকা : মধ্য কলকাতা সার্বজনীন শ্যামাপূজা কমিটি, ফরডাইস লেন, কলকাতা—১৪।

৮৩·০১ টাকা : রামনগর কর্মী সংঘ, দক্ষিণ বারাসত (২৪-পরগনা)।

৫১·০০ টাকা : এরুয়ার উদয়াচল ক্লাব, এরুয়ার (বর্ধমান)।

৪৩·০০ টাকা : টি· এস· সনাতন হারার সেকেণ্ডারী স্কুলের ছাত্রবৃন্দ, সররেড়িয়া, (২৪-পরগনা)।

প্রত্যেকে ১০·০০ টাকা : বিশ্বেশ্বর চ্যাটার্জী, দক্ষিণ বারাসত (২৪-পরগনা), ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, কলকাতা—৫০।

প্রত্যেকে ৫·০০ টাকা : ডাঃ মিহির-কুমার মুখার্জী, খড়দহ, (২৪-পরগনা), ডাঃ প্রবীরকুমার মুখার্জী, টিটাগড়, (২৪-পরগনা), রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, রঞ্জি স্টেডিয়াম, কলি—১১। অধ্যাপক জগদিন্দু ভট্টাচার্য, জয়পুরিয়া কলেজ, কলকাতা।

প্রত্যেকে ১·০০ টাকা : প্রফুল্লকুমার জ্যোতি, রঞ্জি স্টেডিয়াম, কলকাতা—২১। ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য, কলকাতা—১২। অবনীভূষণ চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জি স্টেডিয়াম, কলি—২১। বিভূতিভূষণ ঘোষাল, রঞ্জি স্টেডিয়াম, কলি—২১। সুশীলকুমার বিশ্বাস, রঞ্জি স্টেডিয়াম, কলি—২১। গৌতম সাধুখাঁ, ব্যারাকপুর। জীবন সরকার, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি। সীতানাথ ধর, কলকাতা—৫। সুচরিতা চক্রবর্তী, কলকাতা—৩১। মনীষা ঘোষাল, ৩/১, মহারাজা টেগোর রোড, কলকাতা। হিন্দুস্থান বিল্ডিংস-এর -বাসুদেব মুখার্জী, পি· কে· ধর, বিশ্বনাথ মুখার্জী, মিহির ঘোষ, জে· কে· মজুমদার, এস· এস· ব্যানার্জী, বি· কে· বিশ্বাস, জহর চ্যাটার্জী, অনিল সেনগুপ্ত, ডি· ব্যানার্জী, চিত্ত চন্দ, এইচ· মুখার্জী, এস· এন· চ্যাটার্জী, এন· জি· দত্ত, জিতেন ভট্টাচার্য, ডি· দাস, এস· গাঙ্গুলী, এন· সেনগুপ্ত, বিমল রায়, রীতা মুন্সী, এস· এম· নাগ, এইচ· চৌধুরী। সমীর সরকার, কলকাতা—৩৬। এস· ডি· ব্যানার্জী, কলকাতা—৫০। [ক্রমশ]

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কাঠকো নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্রচুলিক, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ষটচক্র, ভৃগু, শিক্ষা, ব্রহ্মবিদ, নারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গল, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, পাশুপত-ব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন, গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তর-তাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগ্নিরুদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপাল-পূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয় কৌষীতকী, অমৃতবিন্দু, কালিকা সর্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : প্রতি খণ্ড—৪·০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

বাংলা বলতে এমন কিছু অবশিষ্ট নেই, যা বড়ো একটি বাঙালী জাতের দরবারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে তথা পরাধীন ভারতে পশ্চিম বাংলা সর্ববিষয়েই অগ্রণী ছিল। তাই "What Bengal thinks today, India thinks to-morrow"—এত বড় সম্মানজনক জয়টীকা বাংলা দেশের ললাটে জুটেছিল। এমন কি সেইদিন পর্যন্ত শিক্ষিতের হারে, শিক্ষার প্রসারে, অগ্রগতিতে বাংলা দেশের স্থান সর্বোচ্চ ছিল। আজ শিক্ষার ক্ষেত্র বাংলা দেশের স্থান গ্রহণ করেছে কেরল-মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্য। তবে শনিবার প্রভাতী সংবাদপত্রে একটি সংবাদ পড়ে বোঝা গেল, পশ্চিম বাংলা আজও কোন কোন ক্ষেত্রে অন্য রাজ্যকে পিছনে ফেলে শীর্ষস্থান অধিকার করে তাক লাগিয়ে দিতে পারে। শনিবারের কাগজটি পড়ে দেখা গেল একটি ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে কেরল, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজের কোন নাম নেই আর অন্য যাদের নাম আছে তারা কেউ বাংলা দেশের গোড়ালি, হাঁটু খুব বেশি হলে কোমর পর্যন্ত উঠে, মাথার কাছে পৌঁছবার যোগ্যতা কেউ অর্জন করে নি। আমি গত এক বৎসরে পশ্চিম বাংলায় গুলীবর্ষণ ও নিহতের যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে সেই তালিকার কথা বলছি। ১৯৬৮ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত পশ্চিম বাংলায় ৩১৫ বার গুলীবর্ষণ ও ১১৫ জন নিহত হয়েছে। বিহারে ৫৪ বার গুলীবর্ষণ, ৭১ জন নিহত, উত্তর প্রদেশে ৫২ বার গুলীবর্ষণ, ৪৭ জন নিহত, পাঞ্জাবে ৮ বার গুলীবর্ষণ, ১২ জন নিহত হয়েছে। দেখুন, এই তালিকায় কেরল, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যের নামোল্লেখের যোগ্যতা অর্জিত নি। শিক্ষার অগ্রগতিতে কেরল, মহারাষ্ট্র মাদ্রাজ আমাদের হারিয়ে দিয়েছে বটে—কিন্তু গুলী আর খুনের সংখ্যায় কেরল, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ আমাদের কাছে আসতে পারে নি।

পশ্চিম বাংলায় এবং অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে যখন কংগ্রেস-বিরোধী সরকার গঠিত হয়, সেই সকল সরকার বহুক্ষেত্রেই একদলীয় ছিল না, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু দলের নেতৃত্বে গঠিত সরকার ছিল। এই সরকারগুলি গঠিত হলে সারা ভারতবর্ষে বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় একটা ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছিল। "সত্য নাশ হো গিয়া"—আর এই সত্যের পূজারীরা অনেক কসরৎ করে অনেকগুলি সরকারের পতন ঘটিয়েছে এবং সেইসব রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন তথা রাজ্যপালের শাসন কায়েম হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে গুলীবর্ষণের শীর্ষে যে রাজ্যগুলির নাম রয়েছে সেগুলি হল পশ্চিমবঙ্গ, বিহার উত্তর প্রদেশ। এই তিনটি রাজ্যই রাষ্ট্রপতির শাসনের অধীন। রাষ্ট্রপতির শাসন ছেড়ে এইরকম দশা—যেমন মহারাষ্ট্র, মহীশূর কংগ্রেসের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গঠিত সরকারের দ্বারা পরিচালিত। উড়িষ্যা যেখানে স্বতন্ত্র পার্টি ও জনতা পার্টির আধিপত্যের সরকার—মাদ্রাজ, যেখানে ডি, এম, কে দলের নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার চলছে কেরল, যেখানে কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) প্রভাবের সরকার, আর মধ্যপ্রদেশ, যেখানে কংগ্রেস ছাড়া অন্য দলের এক জগাখিচুড়ি ও হযবরল সরকার চলছে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কংগ্রেস পরিচালিত মহারাষ্ট্র আর মহীশূর কেন, স্বতন্ত্র পার্টি পরিচালিত উড়িষ্যাই হোক, কিংবা মধ্যপ্রদেশের ক্ষণভঙ্গুর হযবরল সরকারই হোক, কোন রাজ্যই কিন্তু এই গুলীচালনা আর মানুষ খুনের তালিকায় স্থান লাভ করতে পারে নি। অন্য রাজ্যের কথা থাক—পশ্চিম বাংলার কথাই যদি শুধু ধরা যায় তবে একদা কবি ঈশ্বর গুপ্ত কলকাতা বাসের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেছিলেন, "রাতে মশা দিনে মাছি/এই নিয়ে কলকাতায় আছি।" আর এযুগে যদি কোন নতুন ঈশ্বর গুপ্ত সত্য কথা বলা অথবা লেখার স্পর্ধা রাখেন তবে তিনি বলবেন, "খুন-ডাকাতি অরাজকতা/এই তিন নিয়ে কলকাতা।" তবে আজকে সবচেয়ে মজার কথা হল কোন সত্যকথা বলবার উপায় নেই—বললে শত্রু বাড়বে এবং সেই শত্রু ছলে-বলে-কৌশলে আপনার ঘাড় মটকাবে। কলেজ অধ্যাপক অথবা শিক্ষক সত্য কথা বলতে পারবেন না—সাংবাদিক যে সত্য দেখবেন, সে সত্য লিখতে বা প্রকাশ করতে পারবেন না। রাজনৈতিক নেতারা যে সত্য বুঝবেন, সেই সত্য বলবেন না। এর কোনটার যে কোন নির্দিষ্ট বাধা আছে অথবা কারো নির্দেশে অথবা নিষেধে এই সত্যের গতিপথ রুদ্ধ হচ্ছে তা নয়। সর্বক্ষেত্রেই একটি প্রশ্ন—এই সত্য প্রকাশ করলে আমার নিরাপত্তা থাকবে না। এই নিরাপত্তা চাকরীর ক্ষেত্রেও হতে পারে, জীবনের ক্ষেত্রেও হতে পারে। তাই সকলেই যে যার জীবন জীবিকার নিরাপত্তার কথা ভেবে অতি সুনিপুণভাবে সত্য প্রকাশে বিরত থেকে যাচ্ছেন।

সম্প্রতি মেদিনীপুরের একটি ছোট্ট সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে অধ্যাপক হুমায়ুন কবির আহত হলেন। অধ্যাপক কবিরকে পি জি. হাসপাতালে আনা হল, দৈনিক কাগজগুলোতে বড় সংবাদ ছবি ছাপা হল। কেউ বলছেন এই কাজ করেছে কম্যুনিস্টপন্থী ছাত্ররা, আর 'গণশক্তি' পত্রিকা বলছে পটকা ছোঁড়ার অভিযোগে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তারা ছাত্র-পরিষদের কর্মী। অধ্যাপক কবির নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের একজন সুমহান সন্তান। বাংলা দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি গৌরবের পাত্র। কিন্তু পটকা অধ্যাপক কবিরের গায়ে লাগায়েই হৈ-চৈ হবে আর নিত্যদিন পটকা ছোঁড়া অথবা গুলীচালনায় নিহত হলে তার কোন গুরুত্ব দেওয়া হবে না এই তত্ত্ব মেনে নেওয়া হলে ঠিকই ভুল হবে। অর্থাৎ মূল সমস্যা যেটা সেই সমস্যাকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধু ব্যক্তিকে নিয়ে হৈ-চৈ করে সমস্যার সমাধান হবে না। বেলেঘাটার বিশ্বনাথ চৌধুরী, বাগনানের অমর মান্না, অথবা বরাহনগরের সুশীল পাল, বিরাটির শ্রীদত্ত এমনি আরো অনেকেই আততায়ীর হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। দৈনিক সংবাদপত্রে এমন একটি দিন নেই যেদিন দেখা যাবে না, পশ্চিম বাংলার কোথাও একটি খুন, একটি ডাকাতি, একটি রাহাজানি, একটি পটকা নিক্ষেপ বা ছুরিচালনার ঘটনা না ঘটছে। সমস্যা হল সেইখানে আর এই সমস্যাকে দিনে দিনে পাশে রেখে আজ পশ্চিম বাংলা গুলীচালনার খুনের খতিয়ানে শীর্ষস্থানে চলে এসেছে। এই সমগ্র ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং তাঁদের অনুগামীদের ভূমিকা মোটেই ছোট করে দেখবার নয়। বরঞ্চ দেখা যাচ্ছে—বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কিছু না কিছু রাজনীতির গন্ধ রক্তঝরার ঘটনায় সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে আজ মেতেদের ভূত মেতেদের বাইরে চলে

এসেছে। কোন একটি দল বা কোন একজন পদস্থ অফিসারের শত চেষ্টাতেও এই ভূতকে আর বোতলে পোরা যাবে না। তার জন্য প্রয়োজন দেশের কথা যাঁরা ভাবেন অর্থাৎ দেশের মানুষকে নিয়ে যাঁরা রাজনীতি করেন, তাঁদের সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা। বিশ্বনাথ চৌধুরীর হত্যা যদি কোন দলের কাছে নিন্দার ঘটনা হয়, তবে সুশীল পালের হত্যাও নিন্দার ঘটনা হিসাবে গ্রহণ করতে হবে এবং অধ্যাপক কবিরের উদ্দেশ্যে পটকা নিক্ষেপও একই প্রকার নিন্দার কাজ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। নইলে জামাতার মৃত্যুতে যদি ভাবা যায় "মড়ক অপরের ওপর দিয়ে গেল"—তবে এক্ষেত্রেও সেই একই বোকামী হবে। গুণ্ডার কোন জাত নেই—গুণ্ডামীর পেছনে কোনও রাজনীতি বা কোন নীতিই থাকতে পারে না। যারা পরম বিপ্লবী অথবা নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদী—সকলের কাছেই এটা সত্য হওয়া উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের হলেও সত্য—এর ব্যতিক্রম হচ্ছে। যে দলের কর্মী যখন আহত-নিহত হচ্ছে, তখন সেই দল অথবা তার পরিমণ্ডলের সাথীরা বুক চাপড়াচ্ছে। কিন্তু এই পথে সম্ভবত সমস্যার কোনদিন সমাধান হবে না। বিশেষ করে পশ্চিম বাংলায় যখন পরম উত্তেজনাকর অন্তর্বর্তী নির্বাচন শিয়রে উপস্থিত। শ্রীসেনবর্মা কেন্দ্র থেকে পুলিশ আনলে সব ভাল ছেলে হয়ে যাবে এ যুক্তি বিশ্বাসের কোন কারণ নেই। গুণ্ডাদের অথবা ব্যক্তিগত বিদ্বেষীদের যদি কোণঠাসা করতে হয় অথবা একঘরে করতে হয়, তবে অধ্যাপক কবিরের মত "আমি আগেই বলেছিলাম অজয় মুখুজ্যে-জ্যোতি বোসকে জেলে পোরা হোক"—এই কথা বললে যেমন সমস্যার সমাধান হবে না, তেমনি এই ঘটনার প্রতি কোন গুরুত্ব না দিয়ে মুখ ফিরিয়ে থাকাও সঙ্গত নয়। শুধু অজয় মুখুজ্যে আর জ্যোতি বোস জেলে থাকলে যদি রাজ্যের শান্তি ফিরে আসে, তা হলে সম্ভবত শ্রীবসু ও শ্রীমুখোপাধ্যায় স্বেচ্ছায় জেলে গিয়ে বসে থাকতেও অরাজী হবেন না। কিন্তু সমাধান সম্ভবত দুজন লোককে জেলে পোরাতেও নয়—তেমনি কোন সভায় ও নেতার উদ্দেশ্যে পটকা ছোড়াতেও নয়। সব দল যখন চান শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন পরিচালিত হোক এবং কোন দলই যখন এই নির্বাচনে বোমা-পিস্তল-পটকার আধিপত্য চান না, তখন সব দলনেতারা একটা বৈঠকে মিলিত হোন না কেন! সেই বৈঠকে রচনা করা হোক একটা আচরণবিধি—যে আচরণবিধি সব দল মেনে চলবেন ও তাঁদের কর্মী ও অনুগামীদের মেনে চলতে বাধ্য করবেন। রাজ্যের রাজনৈতিক দলের কর্মী, সদস্য, অনুগামীর সংখ্যা যে পরিমাণ, গুণ্ডা অথবা চপলমতি পটকাবাজের সংখ্যা কোনক্রমেই তার চেয়ে বেশি নয়। ভাবের ঘরে চুরি না করে আন্তরিকভাবে সেই আচরণবিধি সব দল যদি মেনে চলেন, তবে পশ্চিম বাংলায় অশান্তি সৃষ্টি ও নির্বাচনে বিঘ্ন সৃষ্টির অশুভশক্তি কোনক্রমেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না। এই কাজের জন্য কোন দলেরই কোন খরচ নেই, কোন আদর্শ ত্যাগেরও প্রশ্ন নেই। শুধুমাত্র নিজেদের উদ্যোগে তাঁরা একটি বৈঠকে মিলিত হবেন—ছোট-বড় দল সে যে আদর্শেই হোক না কেন, নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করছে—তাদের ডাকা হবে এবং একমত হয়ে মেনে নেওয়া হবে নির্বাচনের আচরণবিধি। নির্বাচন কমিশনার অথবা রাজ্যপাল ডেকে যদি এই জাতীয় চেষ্টা করেন তবে তার মধ্যে নানাপ্রকার ফর্মালিটির প্রশ্ন উঠবে। আর দেশটা যখন তাঁদের—নির্বাচনে জয়যুক্ত হয়ে দেশ শাসন যখন তাঁরা করতে চান তখন অপরের ডিক্টেশনে যাবার প্রয়োজন কী? এখনও সময় আছে, এখন যদি সাধু সাবধান না হন, তবে শয়তানের হাত থেকে কেউই রক্ষা পাবেন না। আর এই শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাবার পথ বোমার জবাবে পিস্তলের গুলীতেও নয়—দুজন নেতাকে জেলে পুরেও নয়। ভদ্র, সহনশীল, অনাক্রমণ এক আচরণবিধি মেনে নেওয়াই একমাত্র পথ। সে আচরণবিধি মনেপ্রাণে নিজেদের মানতে হবে—দলের সর্বস্তরের কর্মী, অনুগামী ও সমর্থকদের মানাতে হবে। তবেই হবে সমস্যার সমাধান। এর ব্যতিক্রম যদি করা হয়, তবে গত দশমাসে গুলীচালনায় এবং হত্যায় যে শীর্ষস্থান পশ্চিম বাংলা দখল করেছে, সারা ভারতের রেকর্ড ভেঙেছে—আগামীদিনে তা বিশ্ব রেকর্ড ভাঙলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না।

(১৪।১২।৬৮)

ভারসাম্য—
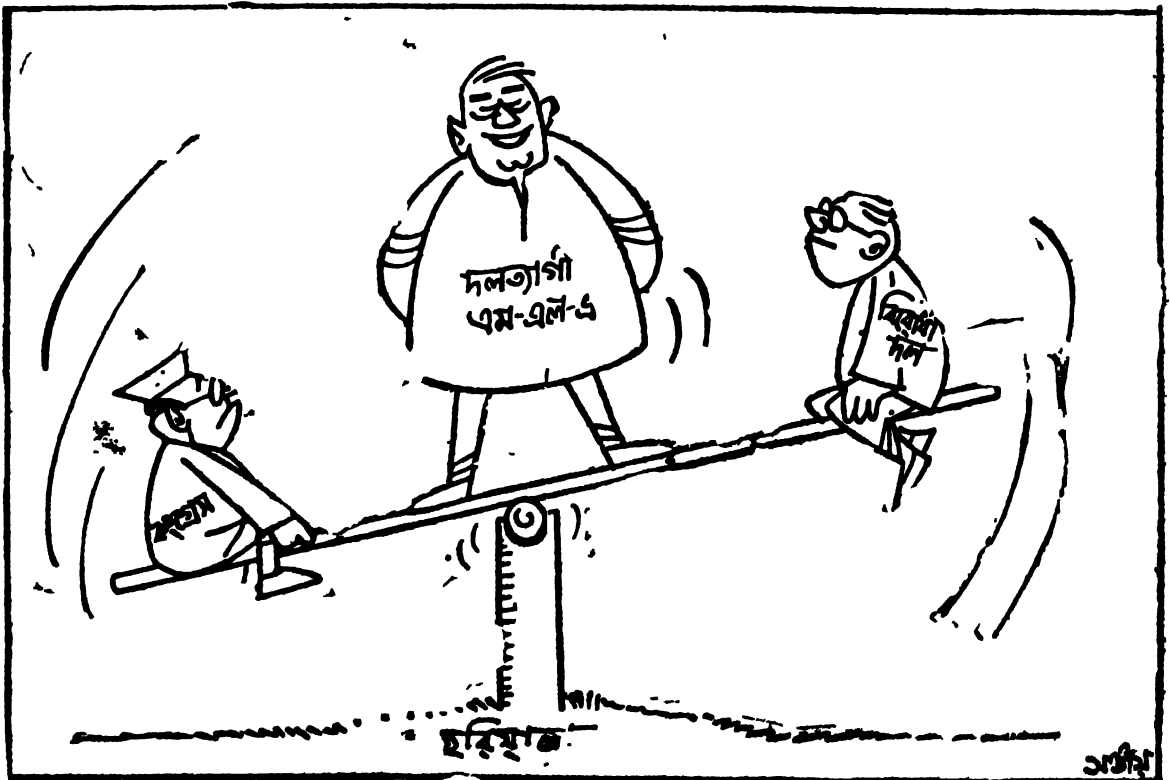
সাগর-সমীক্ষা (২)

অবাক শুনছি। শোনাচ্ছে কারিগরি বিজ্ঞান। এ বিজ্ঞান জলে যেমন, ডাঙায়ও তেমনি নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। বলছে, সাগরে আছে বিপুল খাদ্যসম্ভার; আছে এত প্রচুর উদ্ভিদ ও জীবজন্তু, যাদের কাজে লাগালে অচিরেই আমাদের খাদ্যসমস্যার সমাধান হতে পারে।

এ ছাড়া খাদ্য সম্পর্কে আরও অনেক নতুন কথা শোনাচ্ছে বিজ্ঞান। জানিয়ে দিচ্ছে যে সাগর থেকে পাওয়া আহার্য স্থলের তুলনায় অনেক বেশি খাদ্যগুণ-সম্পন্ন; আর এই গুণসম্পন্ন খাদ্যের বিশিষ্ট উদাহরণ হল সাগরে জাত নানা ধরণের লতাপাতা। ওই সব লতাপাতায় প্রোটিন থাকে শতকরা ৫০ ভাগ। কিন্তু স্থলে জাত লতাপাতায় সাধারণত শতকরা ২০ ভাগের বেশি প্রোটিন থাকে বলে আমাদের জানা নেই।

আর শুধু প্রোটিনই বা কেন, চর্বি! সমুদ্রজ আহার্য-সম্পদের কথা। এদের তুলনায় সমুদ্রের অনাহার্য বা অখাদ্য-সম্পদও বড় কম নয়। আজকের বিজ্ঞানী-দের ধারণা, সমুদ্রে আছে লক্ষ লক্ষ টন রূপো লক্ষ কোটি টন সোনা, আর হীরের অদ্ভুত ও বিচিত্র সব উপত্যকা। এছাড়া সমুদ্রগর্ভে বিপুল পরিমাণ ইউরেনিয়াম, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি মূল্যবান পদার্থ বিপুল পরিমাণে মজুত আছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধারণাটা অযৌক্তিক কিছু নয়; কেন না, সমুদ্রে সত্যি আছে এরা এবং এরা ছাড়া সমুদ্রে আছে আরও অনেক রহস্য। এই সব রহস্যের অন্যতম হল জোয়ার-ভাটা। বিজ্ঞানীরা বলছেন, জোয়ার-ভাটা থেকে সমুদ্রে প্রতিদিন ৮০,০০০,০০০ কিলো-ওয়াট শক্তি উৎপন্ন হয় এবং এই শক্তি হল পৃথিবীর সবগুলো জলবিদ্যুৎ-প্রকল্পের শক্তি-উৎপাদন-ক্ষমতার ১০০ গুণ। এদিকে হিসেব করে দেখা গেছে যে, সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত ১০ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তি-বিশিষ্ট একটি বহুমুখী 'নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর' থেকে প্রতিদিন ৪০ লক্ষ টন মিঠে জল পাওয়া যেতে পারে এবং এই জল দিয়ে কেবল যা কলকাতার মতো বিরাট শহরের সব রকম জলের চাহিদা মেটানো [illegible]। [illegible] শুধু [illegible] চাহিদার কথাই বা বলি কেন! এই ধরণের একটি প্রকল্পে কাজ শুরু হলে এ থেকে জল ছাড়াও প্রতিদিন পাওয়া যাবে ১০০,০০০ টন লবণ, ৩,৫০০ টন পটা-সিয়াম, ৫,০০০ টন ম্যাগনেসিয়াম, ৩,০০০ ব্রোমিন এবং ১০,০০০ টনের চেয়েও বেশি সালফিউরিক এ্যাসিড।

ভেবে দেখুন একবার, একটিমাত্র 'নিউ-ক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর' কাজে লাগালে প্রতিদিন পাওয়া যাবে এই বিপুল পরিমাণ সম্পদ; এবং যাবে বলেই পৃথিবীর উন্নত দেশ-গুলো আজ সমুদ্র সম্পর্কে হঠাৎ খুব বেশি রকম কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

এই কৌতূহল রাষ্ট্রসংঘের সভ্যদের ভাবিয়ে তুলেছিল। রাষ্ট্রসংঘ চেয়েছিল, সমুদ্রের ওপর গার্জেনীর দায়িত্বটা নিজের হাতে তুলে নিতে। কিছুদিন আগে এ নিয়ে এমন কি প্রস্তাবও উঠেছিল সঙ্ঘে। কিন্তু এ প্রস্তাবে পৃথিবীর ধনী ও উন্নত দেশগুলো সায় দেয় নি। ওরা নিজ নিজ তত্ত্বাবধানে সমুদ্রকে কাজে লাগাতে চেয়েছে বরং। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত বছরের বাজেটে সমুদ্র-সম্পর্কিত গবেষণা এবং উন্নয়ন-খাতে মোট ৩৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল, আর সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাদ্দ করেছিল ২২০ কোটি টাকা। তবে ছোটখাটো দেশগুলোও সমুদ্র-সম্পর্কিত গবেষণায় খুব একটা পিছিয়ে নেই আজ। দেশের আর্থিক উন্নয়নের খাতিরে ওরাও আজ সমুদ্রকে কাজে লাগাতে চাইছে। মালয়েশিয়া, থাই-ল্যান্ড ও ইন্দোনেশিয়া চাইছে সমুদ্র থেকে টিন আহরণ করতে।

সুখের কথা, আহরণের কাজ শুরু হয়েছে এরই মধ্যে। ওই সব দেশের সমুদ্রোপকূলে টিন-অন্বেষণ এখন পুরো-দমেই চলছে। ওদিকে জাপান মেতেছে লোহা-অন্বেষণে। সমুদ্রতীর থেকে ৩০ মিটার অবধি গভীর অঞ্চলে এমন সব পদার্থ সংগ্রহ করছে ওরা, যাদের থেকে হাজার হাজার টন লোহা পাওয়া যেতে পারে।

এছাড়া কোনো কোনো দেশের দৃষ্টি আবার সমুদ্রের মৎস্য-সম্পদের ওপর নিবদ্ধ। উদাহরণ হিসেবে পেরুর কথা বলা যায়। আজ থেকে দশ বছর আগেও ওদেশে মৎস্যশিল্প বলে কিছু ছিল না। কিন্তু আজ মৎস্যশিল্পে পেরু অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছে।

এইখানে প্রশ্ন উঠছে, মৎস্যশিল্প এবং বিশেষ করে সমুদ্র-সম্পদকে ব্যবহার করার কাজে ভারতের ভূমিকা কি? ভারতবর্ষ কি সমুদ্র থেকে রত্ন-আহরণে তৎপর হয়েছে? না কি সে এখনও বসে আছে মান্ধাতার আমলের জাল হাতে নিয়ে? বসে বসে চরম অসহায়ের মতো বিরাট ও মহান রত্ন-গর্ভার দিকে তাকাচ্ছে?

এই সব প্রশ্নের জবাব দিতে হলে ভারতবর্ষের সঙ্গে সমুদ্রের সম্পর্কটা খোলসা করে বলতে হয়। বলতে হয় যে, এদেশের সমুদ্রোপকূল আছে প্রায় ৫,৬০০ কিলোমিটার; কিন্তু সমুদ্র থেকে বছরে মাত্র ২৫ লক্ষ টন মাছ ধরা হয় এখানে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, নতুন যুগের বিজ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগালে এই মাছ ধরার পরিমাণকে ১০ গুণ বাড়ানো যেত; এবং এছাড়া বাড়ানো যেত অন্য কয়েকটি সম্পদকে। এই শ্রেণীর সম্পদের বিশিষ্ট উদাহরণ হল তেল, গ্যাস এবং সার হিসেবে ব্যবহৃত ফসফরাস। সম্প্রতি বিভিন্ন দেশের সমবায়ে গঠিত 'আন্তর্জাতিক ভারত-মহাসাগর অভিযান' থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের সমুদ্রে আছে প্রচুর তেল এবং ফসফরাস জাতীয় সম্পদ। এছাড়া আরব সাগরের জায়গায় জায়গায় মৎস্য-সম্পদের পরিমাণও নগণ্য নয়। এখন ভারতবর্ষ যদি প্রতিবেশী দেশ-গুলোর সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে এই নতুন আবিষ্কৃত মৎস্য-সম্পদকে কাজে লাগাবার জন্যে উদ্যোগী হয় তো একদিকে যেমন এদেশের মাছখেকো মানুষগুলো উপকৃত হবে, অপরদিকে তেমনি দেশের সম্পদেরও হবে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।

কিছুদিন হল, এই অগ্রগতির ছোট-খাটো একটি চিত্র তুলে ধরেছেন ভারত-বর্ষের কোনো কোনো সাগর-সমীক্ষক। ওঁরা বলেছেন, সাগর থেকে পাওয়া বাগদা চিংড়ির সংরক্ষণ ও রপ্তানীতে এরই মধ্যে কৃতিত্ব দেখিয়েছে ভারতবর্ষ। ভারত থেকে রপ্তানী করা বাগদা এখন পৃথিবীর ৩৫টি দেশে সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হচ্ছে।

কিন্তু প্রশ্ন, এই সমাদর কি এমন কিছু যা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক জীবনে ছাপ ফেলছে? যার দিকে তাকিয়ে আমরা বলতে পারি, মান্ধাতার আমলের জালটা আমাদের হাতে এখন নেই আর?

আন্তর্জাতিক সাগর-সমীক্ষকরা বল-ছেন, না; এত বড় কথা বলার দিন ভারত-বর্ষের এখনও আসে নি। কারণ, মান্ধাতার আমলের জালটা এখনও পুরোপুরি খসে পড়ে নি তার হাত থেকে। তবে জালটাকে খসাবার যা ছুটি দেবার সময় যে হয়েছে, সে সম্পর্কে আজ সে মোটামুটি ওয়াকি-বহাল। আজ সে বুঝতে পেরেছে যে, সমুদ্রকে ঘিরে বিরাট কোনো পরিকল্পনা রচনা করা হয়তো তার পক্ষে সম্ভব হবে

না; কিন্তু প্রতিরক্ষা ও বাণিজ্যের খাতিরে তাকে আজ যেমন করেই হোক সমুদ্র সম্পর্কে আগের তুলনায় আরও বেশি সচেতন হতে হবে। তাকে খবর নিতে হবে সমুদ্র-স্রোতের, জোয়ার-ভাটার এবং সাইক্লোনের। এছাড়া জলবায়ু ও সমুদ্রবায়ু সম্পর্কেও [illegible]ক সব নতুন তথ্য-সংগ্রহের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে আজ। কিন্তু প্রশ্ন, এত কিছু প্রয়োজনের দাবিকে মেটাতে গিয়ে আজ অবধি কী করেছে ভারতবর্ষ? সাগর সমীক্ষায় কতটুকু কৃতিত্ব সে দেখিয়েছে?

এইসব প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বলছেন, কৃতিত্ব সে পায় কিছুই দেখায় নি। কারণ, ৫২ কোটিরও বেশি লোক অধ্যুষিত এই বিশাল ভারতবর্ষে 'ওসানোগ্রাফার' বা সাগর-সমীক্ষক আছেন মাত্র ১০০ জন এবং সাগর-সমীক্ষার জন্যে বা সাগর সম্পর্কে গবেষণা করবার জন্যে এদেশে বছরে এমন কি ১০ লক্ষ টাকাও বরাদ্দ করা হয় না।

ইয়োরোপা / হিরন্ময় ভট্টাচার্য

—কে? মিঃ সিং? আচ্ছা পাঠিয়ে দাও।

—গুড মর্নিং। বসুন।

—আপনার নাম মিঃ জগন-স্ল সিং। মাপ করবেন। আপনার নামটা বোধহয় ঠিক উচ্চারণ করতে পারলাম না। থাকেন ২ নম্বর...

—এক মুহূর্তের জন্যে ক্ষমা করবেন। আপনার ফাইলটা বের করি।

—কতদিন আছেন এদেশে?

—কটা ছেলেমেয়ে?

—চার-চারটে।

—কি করা হয়?

—তার মানে, বেকার।

—কত দিন চাকরী নেই?

—ন্যাশনাল অ্যাসিসটেন্স কত দেওয়া হয়।

—বড ছেলে চাকরী করে, তার সাহায্যে চলে যায়। কোন সাহায্য দেওয়া হয় না।

—সাবধান করে দেওয়া ভালো, ভুল তথ্য আইন অমান্যের দায়ে পড়বে।... বেকারী ভাতা তো পান।

—দেশে কে আছে?

—দেশে কত টাকা নিয়মিত পাঠান হয়?

—বলছেন, বেকার। কি করে পাঠাবেন। কিন্তু রিপোর্টে লেখা আছে প্রতি মাসে টাকা পাঠানর কথা। মা না অন্যায় নয়। বুড়ো মা—নিশ্চয় টাকা পাঠাবেন। সে তো আপনার কর্তব্য। দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ভালো। দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে দেখছি। তিন বছর আগে ভারতে গিয়েছিলেন। তা ভালো।

—এ দেশে কোন ক্লাবের সভ্য। নাচে-টাচে অংশ গ্রহণ করেন?

—চার্চে যান?

—তা তো বটে আপনি খৃস্চান নন, শিখ।

—পেরেন্টস কমিটি, স্কাউটস কমিটি কিম্বা ধরুন কোন বিংগ ক্লাবের সভ্য? আমার ফর্মের সমস্ত কলম ভরতে হবে। তাহলে লিখি Integration—Nil.

মিঃ সিং এটা মিনিস্ট্রি অফ রিপ্যাট্রিয়েশন বিভাগ। এদেশে কমনওয়েলথ থেকে অনেক লোক এসেছে। ভেবেছে দেশটা সোনায় ভরা। আমাদের দায়িত্ব সে ভুল ভেঙে দেওয়া। এদেশে কত অসুবিধে। গরমকালেও পচা বৃষ্টি। শীতকালে স্মোক। ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়, কুয়াশায় পথ দেখা যায় না। কখন বা বরফ পড়ে। ঠান্ডায় জল বরফ হয়ে যায়। ভারতবর্ষে কেমন সূর্যের আলো।

আরও আছে, ধরুন আপনি গ্র্যাজুয়েট। দেশে ভালো চাকরী করতেন। এদেশ আপনার শিক্ষার মর্যাদা দেয় নি। আপনাকে ফ্যাকট্রিতে চাকরী করতে হয়েছে। ভাবলে আমারই লজ্জা হয়। অন্ধ সংস্কার। আমার তো মনে হয়, ভারতে ফিরে যাওয়াই আপনার পক্ষে সব দিক দিয়ে মঙ্গল।

—কি বলছেন মিঃ ব্রাউন। এ তো লেবার সরকার। আমরা লেবার পার্টিকে ভোট দিয়েছি। তারা তো উদার, সমাজতান্ত্রিক। টোরি পার্টি যখন ইমিগ্রেশন বিল পাশ করে লেবার পার্টির নেতা মিঃ গেটস্কেল বলেছিলেন, লেবার পার্টি গদি পেলে ইমিগ্রেশন বিল নাকচ করে দেবেন। ১৯৬৪ সালে যেবার লেবার পার্টি টোরি পার্টিকে হারিয়ে দিয়ে গদি দখল করে। সে সময় আমি দোরে দোরে গিয়ে লেবার পার্টিকে ভোট দেবার জন্যে অনুরোধ করেছি। মনে আছে সে সময় লেবার পার্টির নেতা মিঃ হ্যারল্ড উইলসন এক উদ্ধত বৃদ্ধকে ধমক দিয়েছিলেন, কমনওয়েলথ থেকে ডাক্তাররা না এলে উপস্থিত লোকের অনেকে হয়ত চিকিৎসার অভাবে মারা যেত।

আরও মনে আছে, কন্সারভেটিভ পার্টির পিটার গ্রিফিথস বর্ণবৈষম্যের ভিত্তিতে লেবার পার্টির নামকরা নেতা মিঃ গর্ডন ওয়াকারকে হারিয়ে দেন। মিঃ উইলসন তাঁকে পার্লামেন্টের কুষ্ঠ রোগী বলে সম্বর্ধনা জানান।

—মিঃ সিং আপনি শিক্ষিত লোক। আপনার কথা সব ঠিক। তবে সে সব হল ১৯৬০ সালের কথা। পৃথিবী ডাইনামিক—প্রচন্ড গতিবেগে এগোচ্ছে। ১৯৭০ সালের পর থেকে আদর্শের রদ-বদল হয়েছে। আর আমাদের সঙ্গে কোন পার্টির দহরম মহরম নেই। আমরা সিভিল সার্ভেন্ট। রাণীর আনন্দে আমাদের চাকরি। পার্লামেন্ট যা আইন করে তা পালনের দায়িত্ব আমাদের।

আমাদের সরকার আপনাদের জন্যে দরাজ হস্তে খরচ করছেন। দরকার হলে ফিরে যাবার জন্যে টাকা সাহায্য করতে পারে। এই খাতে বরাদ্দ আছে বছরে ৫০ মিলিয়ন পাউন্ড। টাকার হিসেব করুন। প্রায় একশ কোটি টাকা।

পথ কে রুখবে?

মনোজ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ ত্রিশ ॥

পাত্র কোথা পাকিস্তানে? ভাল পাত্র যা ছিল, সবই তো বর্ডার-পারে চলে গেছে। দুটো-চারটে রদ্দি মাল পড়ে আছে, ফুল্লরার যোগ্য তারা নয়।

কমলবাসিনী বলেন, বর্ডার পার হয়েই তবে খোঁজ-খবর করো। ন-মাস ছ মাসের পথ নয়। লোকে তো পট পট করে পার হয়ে যাচ্ছে।

নিজের বিয়ের ব্যাপার হলেও ফুল্লরা ঠাকুরমার কাছে গিয়ে ফোড়ন কাটে: অত হাঙ্গামা দাদু পেরে উঠবেন না।

না পারলে কে আর পারবে? যার করবার কথা সে যে ফাঁকি দিয়ে পালাল।

চোখ ছলছলিয়ে ওঠে কমলবাসিনীর। ধাবাপত্তন শুরু হয়ে যায় আর কি। ফুল্লরার কৌশল আছে। তাড়াতাড়ি কলহ জুড়ে দেয়: বুঝি গো বুঝি দিদা, আমায় তাড়ানোর ফিকির। কতগুলো করে খাই তোমাদের? না হয় এক বেলা করে খাবো এখন থেকে।

কথার মোড় ঘুরল। হাসি চিকচিক করে ওঠে কমলবাসিনীর মুখে নাতনির থুতনি ধরে নাড়া দিয়ে বললেন, তাড়ানোর ফিকির—তাই বটে! নিজের যেন ইচ্ছে হয় না। তোর বয়সীরা দুটো-তিনটের মা হয়ে ছেলে-মেয়ে কোলে-কাঁখে নিয়ে দিব্যি সুখে ঘরসংসার করছে।

শিউরে উঠে ফুল্লরা বলে, রক্ষে করো দিদা। ছেলে-মেয়ে কোলে-কাঁখে নেবার শখ নেই আমার অত।

নাছোড়বান্দা ঠাকুরমা বলেন, দরকারও নেই—কোলে-কাঁখে আমরাই করব। ছুঁতেও দেবো না তোকে। শখ তোর না থাকুক আমাদের আছে—ঘরবাড়ি আলো-করা নাদুস-নুদুস একটা নাতজামাই আসবে। কোমর বেঁধে লেগে গেছেন তোর দাদু। চিঠিপত্তোর লিখছেন, যার সঙ্গে দেখা হয় তাকেই বলছেন। জুটে যাবে শিগগির, দেরি হবে না।

ফুল্লরা বলে, নাতনি তোমাদের অনেক তো আছে। আমায় রেহাই দাও, তাদের নিয়ে পড়ো গে।

বুঝতে না পেরে কমলবাসিনী সপ্রশ্ন চোখে তাকালেন।

শতদলের নাতনিরা। এখন তো দশটি তারা। ছোটদের বাদ দিলাম, তোমাদের হিসাব মতো দুটি-তিনটি তো দস্তুরমতো অরক্ষণীয়া। বিয়ে-থাওয়া দাও একটার। ঘরজামাই এনে চব্বিশ ঘণ্টা চোখের উপরে রেখে মনের শখ মেটাও।

ঘেন্না! ঢিল-পাটকেলের মতন রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা—তারা নাকি নাতনি আমাদের!

মুখ বাঁকিয়ে কমলবাসিনী সরে গেলেন।

কমলবাসিনীর কথা মিথ্যা নয়। বীরেশ্বর পাত্রের সন্ধানে উঠেপড়ে লেগেছেন। ফুল্লরা তাঁর উপরে ঝঙ্কার দিয়ে পড়ল: তোমার নাতনির কত কুড়ি বয়স হয়েছে দাদু, যে বিয়ে না দিলে ঘর ভেঙে পালাব? আট বছরে গৌরীদান হত, দিদার কাছে গল্প শুনে থাকি। কিন্তু সে কাল পার হয়ে অনেক তো এগিয়ে এসেছি। বিয়ে ধরো মোটে না-ই হল আমার।

বীরেশ্বর বললেন, তোর ঠাকুরমা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাকে নিয়ে বড্ড ভয়। সাংঘাতিক অবস্থা হয়ে উঠেছিল, তুই তখন একফোঁটা শিশু। তোকে পেয়েই ঠান্ডা হয়ে গেল। তোর সুখের সংসার হবে, এবারে তার সেই ঝোঁক। না হলে হয়তো ক্ষেপে যাবে আবার।

ঘোর বেগে খোঁজাখুঁজি চলল। সত্যি, কঠিন হয়েছে উপযুক্ত পাত্র জোটানো। এক একটা খবর আসে, বীরেশ্বর পুত্রবধূর সঙ্গে পরামর্শ করতে বসেন। আদ্যোপান্ত বিবরণ দিয়ে প্রশ্ন করেন: বলো দিকি মা, সোনার পদ্ম মেয়ে এমন ছেলের হাতে কেমন করে দিই?

হনুমান-মেয়ে—

জানলার ওধারে ফুল্লরা পড়াশুনোয় আছে—উঁচু গলায় মেয়ের কানে পৌঁছনোর মতো করে লীলা বলল।

বীরেশ্বর চটে গেলেন: কোন চোখ দিয়ে দেখে তুমি হনুমান বলো?

ফনফন করে গাছ বেয়ে উঠে যায়, এ গাছ থেকে ও-গাছে লাফ দিয়ে পড়ে—হনুমান ছাড়া আর কি। হুপ হুপ করে আওয়াজটাই কেবল করে না।

হেসে পড়ল লীলা। হাসতে হাসতে বলে, মিছে চেষ্টা বাবা। কার্তিক কি কন্দর্প যে পাত্রই আসুক, পছন্দ হবে না। নাতনি চলে যাবে ভাবতেই আপনার মন বিগড়ে যাচ্ছে।

ভুল ধারণা তোমার। পছন্দ হয় কি না দেখবে। ভাল পাত্র পাকিস্তানে নেই, পার হয়ে সমস্ত চলে গেছে। ও-পারের খোঁজ নিতে হবে। নিচ্ছিও।

লীলা বলে, পাকিস্তানেও ভাল বিয়ে-থাওয়া অঢেল হচ্ছে বাবা। পাত্র-পাত্রী পাকিস্তানেরই।

হচ্ছে বই কি! হবার যাদের, হচ্ছে—

ঢোক গিলে বীরেশ্বর আবার বললেন, পাত্র-পাত্রী কেন ভাল হবে না! সোনার টুকরো ছেলেমেয়ে, আমারই ছাত্র কতজনা।

হিন্দু মুসলমান আমার কাছে বাছবিচার নেই। ধর্ম জীবনের কোন সমস্যাই নয় আজকের দিনে। অনেকটা খৃস্ট ভজে না কৃষ্ণ ভজে, বুদ্ধ ভজে, না আল্লাহ্ ভজে, কারও কোন মাথাব্যথা নেই ও নিয়ে। ভুল বললাম, আছে সামান্য কিছু লোকের —কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখবে, কারণটা নিছক ঐহিক স্বার্থ। এদেরও দিন ফুরিয়েছে, দ্রুত লয় পেয়ে যাচ্ছে ধর্মধ্বজীরা।

একটু থেমে আবার বললেন, কিন্তু তোমার শাশুড়ি বেঁচে রয়েছে। তার চোখের উপরে হতে পারবে না। ধর্মের চেয়েও বড় বাধা বুকের ক্ষত। সে কালের সেই ক্ষত আজও শুকোয় নি, জীবন থাকতে শুকোবে না। উপরে একটা পর্দা পড়ে আছে, সামান্য নাড়াচাড়া খেলেই ঘা দগদগে হয়ে উঠবে। মুখ দিয়ে তোমরা কেউ এ ধরনের কথা উচ্চারণও করবে না।

মা হনুমান বলেছে, কায়দা পেয়ে এই-বারে ফুল্লরা শোধ নিয়ে নেয়। দাদুর কাছে নালিশ করে: আমার নাম মা জোহরা দিয়ে রেখেছে। ডাকে—ফুল্লরা নয়, জোহরা।

নাতনির নালিশ বীরেশ্বর উড়িয়ে দেন: নামে কি আসে যায়? তুই দিদি আমাদের যে গোলাপ, সেই গোলাপই— যে নামে খুশি ডাকুকগে।

এবারে লীলারই প্রতিবাদ: না বাবা, নামের অনেক দাম। ফুল্লরাকে জোহরা নামে ডাকি, ধর্মে সে মুসলমান হবে কিম্বা মুসলমান পাত্র বিয়ে করবে সে সব কিছুই নয়। মেয়ে বড় হয়ে পরিপুষ্ট জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে পছন্দমতো বিয়ে করবে, আমি অন্তত তাতে বাধা দিতে যাবো না। বিয়ে নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই, আমি ভাবি অন্য জিনিষ।

এই পূর্ব-পাকিস্তানে অহরহ মুসলমানের সঙ্গে মেলামেশা—হিন্দুর সঙ্গে ভিতরের ফারাক দেখিনে তো ওঁদের। দেশ হতে যাবে—বাঙালি উভয়েই, এক জাত একই রক্তের চাঞ্চল্য। [illegible] খুঁজে খুঁজে মাথা গলাতে চায় তবু। তার মধ্যে একটা হল নাম। সর্বাংশে এক হলেও নামের মধ্য দিয়ে সন্দেহ আসে, বুঝি-বা পৃথক আমরা।

একটু থেকে আবার বলল, হরেন মুখুজ্জে ধর্মে খৃস্টান, কিন্তু নামের সঙ্গে মাইকেল এডোয়ার্ড স্টিফেন কোন-কিছুই জোড়া ছিল না। গেঞ্জি গায়ে থেলোহুঁকোর তামাক-খাওয়া দানবীর পবিত্র মানুষটি দশজনের থেকে কোন দিক দিয়ে আলাদা-কিছু, ভুলেও কেউ ভাবতে পারত না। কোন ধর্মেই বিধান নেই অমুকে অমুক নামকরণ করতে হবে। বাংলার জন্য মুসলমান কিশোররা সকলের আগে প্রাণ দিয়েছেন, নামে কেন তাঁরা বাংলা নিচ্ছেন না বুঝতে পারি নে।

ফুল্লরা বলে ওঠে, ঘরক্যাডারি প্রায়ই তো বাংলা নাম। মীরা ছন্দা সন্ধ্যা— আমারই বন্ধু তারা। এমন কি লক্ষ্মী নামেরও একটি। লক্ষ্মীর মা বলেন, এ হল আমার মেয়ে লক্ষ্মী। ঐ নামের এক হিন্দু দেবী আছেন বলে এমন মিষ্টি নামটা বাতিল করে দিতে পারি নে।

লীলা বলে, পোশাকি নামেই বা বাধা কিসের?

বীরেশ্বর ঘাড় নেড়ে বললেন, কিছু না, কিছু না। ইসলাম ঝড়ের বেগে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, আরবি নামেরও তার সঙ্গে আমদানি। চীনারা কিন্তু এ ব্যাপারে গোঁড়া —চীনা মানুষ ইসলাম গ্রহণের পরেও চীনা নাম আঁকড়ে ধরে রইলেন। সোভিয়েতের মুসলমানেরা আরবি নামের পিছনে রুশ-প্রত্যয় জুড়ে মিশাল করে নিয়েছেন। বাংলা দেশে বাংলা-নাম ইতিমধ্যেই ঘরের ভিতরে ঢুকে গেছে, বাইরে বেরুতেও আর বেশি দেরি হবে না।

লীলা বলে, কত দিনে বেরুবে— আমরাই বা চুপচাপ থাকি কেন? ফুল্লরার আর এক নাম জোহরা। ওঁরা বাংলার দিকে এগোচ্ছেন, আমরাও না-হয় আরবি-ফারসির দিকে খানিকটা এগিয়ে গেলাম। শত্রু তো হতো খুঁজে খুঁজে বেড়ায়, এমনটি হলে অমুক হিন্দু তমুক হারুন, কেউ ঠাহর করতে পারবে না। কত বাঙালি মেয়ের নাম মেরি ডলি কুইনি, তা হলে লায়লা জোহরা নাজমা মিষ্টি মিষ্টি নামগুলোই বা কী দোষ করেছে? নামে নামে মিশামিশে একাকার—কে হিন্দু কে মুসলমান নামের ভিতর দিয়ে আর উঁচিয়ে না থাকে।

ফুল্লরা দাদুর দিকে একনজর চেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল।

মেয়ের হাসির মর্ম লীলা বোঝে, এ প্রসঙ্গ আগেও হয়েছে। তবু না বোঝার ভান করে বলে, হাসি কিসের এত?

হিন্দুস্থান থেকে জেঠামশায়ের সঙ্গে পাকিস্তানে এসে পড়লে—তখন মা তুমি মানুষ নও, দুর্গা—একখানা আগুনের চাবুক। এসেছিলে কোলের মেয়েটা দাদু-দিদার হেপাজতে রেখে দিয়ে কান্না নিয়ে কাঁদিয়ে পাড়বে। রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে—রিভলভার-কার্তুজ নিয়ে তৈরি হয়ে এসেছিলে।

অনেকবারই এসব কথা হয়েছে, তবু লীলা লজ্জা পেয়ে যায়। বলে, হ্যাঁ, কোলের মধ্যে থেকে আগুনের আঁচ পেয়েছিলি বুঝি তুই—সর্বাঙ্গ ঝলসে গিয়েছিল? রিভলভার-কার্তুজ সব পুটপুট করে দেখেছিলি একবছুরে মেয়ে?

আমি আর দেখব কি করে, দাদুর কাছে গল্প শুনে থাকি। দাদু কেন বানিয়ে বলতে যাবেন? যা তোমার মতলব ছিল মা, অর্ধেকখানি দিব্যি হাসিল করেছ: মেয়েকে দিদা-দাদুর হেপাজতে দিয়ে ভরমন্ত হয়েছ। মুখের একটা 'মা' ডাক ডাকব, তারও একটু ফুরসত খুঁজে পাই নে। তোমার নতুন ছেলেমেয়েরা ঘিরে থেকে দিনরাত 'মা' 'মা' করছে, তার মধ্যে আমার একলা গলার ডাক কান অবধি পৌঁছবে কেমন করে?

লীলা মেয়েকে কোলের কাছে টেনে নিল। সামনে উচ্ছৃঙ্খল চুল ক'টি ঠিক করে দিয়ে মৃদু হেসে বলল, তাই যদি বলিস, মতলবের বাকি অর্ধেকও হাসিল করে ফেলেছি। সেটা দেখতে পাস নে কেন জানি নে।

ফুল্লরা সবিস্ময়ে বলে, বদলা নেওয়া শত্রুর উপরে?

তাই, ঠিক তাই—

সগর্বে লীলা বলে ওঠে: শত্রু একেবারে নির্মূল হয়ে গেছে। রিভলভার চালাতে হয় নি, রিভলভারে এমন নির্মূল হয় না। এক শত্রু মেরে ফেললাম, তার জায়গায় দশ শত্রু নতুন করে জন্মায়। রিভলভার কোথায় জং ধরে পড়ে আছে, খবরও রাখি নে। অথচ একটা শত্রু নেই দেখ কোনদিকে—সবাই আপন, সবাই আত্মীয়। এর চেয়ে জোরের বদলা কে কবে নিয়েছে। অমুক অমুক জাতে হিন্দু, অতএব অমুক অমুক জাতে মুসলমান— এমনি করে ভাববার ক'টা মানুষ আছে, বের কর দিকি এত বড় দেশের মধ্যে।

ফুল্লরা ফস করে বলল, খুঁজতে হবে না, বলেই তো একটি। আমার দিদা।

কথাই বলেন না একরত্তি, আকবরি আমলের গলা থাকে। সময় মেলে না। তখনকার হিন্দু বৌ—[illegible] বাংলাময় যাচ্ছেন না মুসলমানেরা। যে

কটা দিন জীবন আছে, শান্তিতে থাকুন নিজেদের সংস্কার-বিশ্বাস নিয়ে। কিন্তু এই বস্তু ও'দের কাছ থেকে নিয়ে নেবার মানুষ জন্মাচ্ছে না—ও'রা যেদিন চলে যাবেন, সংস্কার-বিশ্বাসও সঙ্গে সঙ্গে ও'দের চিতায় উঠে যাবে।

যশোর শহরে, জানাশোনার মধ্যে, ভাল এক ঘটক আছেন। ঘটকালি করে বিস্তর বিয়েথাওয়া দিয়েছেন তিনি। ফুল্লরার বাপ-মায়ের বিয়েও তার যোজনা। ঘটকমশায় এখন বুড়ো হয়ে পড়েছেন, ঘটকালি কাজটাও তেমন আর চলন্ নেই। সে কাজ অনেকক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী নিজেরাই স্কন্ধে নিয়ে নেয়। তা সত্ত্বেও ঘটকমশায়ের খুব একটা অসুবিধা হয় না। ছেলে-মেয়ে যাদের বিয়ের একদা যোজনা করে দিয়েছিলেন, তারাই এখন প্রবীণ। অভাবে পড়লে ঘটকমশায় তাদের বাড়ি চলে যান। একটা বেলার পরিপাটি ভোজন-ক্রিয়া এবং একটা-দুটো টাকা দক্ষিণা মিলে যায়। পাকিস্তান হবার পর পালানোর হিড়িক পড়ে গেল, ঘটকমশায় নড়লেন না : নতুন জায়গায় কে চেনে আমায়? পেটের ভাত জোটাতে পারব না, অনাহারে মরতে হবে এই অন্তিম বয়সে।

থেকে গেলেন তিনি। বুদ্ধির কাজ করেছিলেন। মুসলমান ঘরেও ছেলেমেয়ে-দের বিয়েয় ঘটকের প্রয়োজন পড়ে। কিছু মক্কেল সেখানেও জুটেছে। কেটে যাচ্ছে কোনরকমে। হিন্দুস্থানে গিয়েও বা কী লাটসাহেব হতেন।

কলকাতাবাসিনী ঘটকমশায়কে নিজের হাতে চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন : নাতনি অরক্ষণীয়া হয়ে উঠেছে। ওর বাপ-মায়ের বেলা আপনারই ঘটকালি; মেয়েটাকেও এবার পাত্রস্থ করে দিন। পাকিস্তানে সুপাত্র দুর্লভ বটে, কিন্তু আপনার উপর আমাদের অশেষ আস্থা। এপার-ওপার খুঁজে পেতে আপনিই উপযুক্ত পাত্র এনে দেবেন। আপনার পাওনাগণ্ডার কৃপণতা হবে না, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

ঘটক বুড়ো হয়েছেন, তবু উঠেপড়ে লাগলেন তিনি। এবং অচিরেই ভাল একটি সম্বন্ধ জুটিয়ে ফেললেন। পাত্র চাটার্ড একাউন্ট্যান্ট, কলকাতায় থাকে, নতুন পাশ করে অন্যের অফিসে বসছে। আদিবাস যশোর শহরেরই কাছাকাছি এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে। ডাকসাইটে বনেদি পরিবার। পাকিস্তান হবার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার পাট তুলে বাড়ি সুদ্ধ কলকাতায় গিয়ে উঠেছে। বিষয় সম্পত্তি ও ঘরবাড়ির বন্দোবস্ত সারা হয় নি এখনো, ধীরেসুস্থে হচ্ছে। পাত্রের পিসেমশায় যশোরের পসারওয়ালা উকিল, ওকালতি ছেড়ে তিনি যেতে পারেন নি। তিনিই তাড়াহুড়ো করতে দেন নি, ধীরে-সুস্থে হলে মনের মতন দর আদায় করে দিতে পারবেন। পাত্রের বাপের সেই সূত্রে যশোরে আসা যাওয়া আছে। ঘটক-মশায় তক্কেতক্কে ছিলেন, ধরে ফেললেন সেই সময়। পাত্রের বাপ পিসে এবং জনা-দুই ভদ্রলোক কনে দেখতে বীরেশ্বরের গ্রামের বাড়িতে উপস্থিত হলেন।

ফুল্লরাকে দেখে গেলেন তাঁরা। দেখতে সুশ্রী, পালটি ঘর, বীরেশ্বর হাতে ধরে নাতনিকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন—অপছন্দের কোন হেতু নেই। তাহলেও আর একটু আছে—আরও একবার কষ্ট করতে হবে মা-জননীকে। আজকালকার ছেলেপুলে—আমাদের সেকেলে পছন্দে ওদের মন ভরে না। বন্ধুবান্ধব নিয়ে পাত্র নিজেও একদিন আসবে। ছেলের মায়েরও সেই রকম ইচ্ছা, কথার ভলে আমরা থাকতে চাইনে। পাশপোর্ট-ভিসা করে এখানেই আসবে তারা, আপনাদের কষ্ট করে ওপার অবধি যেতে বলছিনে।

বেশ তো, বেশ তো—

তটস্থ হয়ে বীরেশ্বর সায় দিলেন। মুরুব্বিদের সঙ্গে সঙ্গে বাস-রাস্তা অবধি গিয়ে বাসে তুলে আপ্যায়িত করে এলেন।

বাড়ি ফিরলে নাতনি ঝঙ্কার দিয়ে পড়ে : কেন তুমি রাজি হয়ে গেলে দাদু? মানা করে চিঠি দাও, আসতে হবে না। আমি যেন জেলের ডালায় মাছ—কেনবার আগে খদ্দেরে কানকো তুলে পরখ করবে। একবার একদলের পরীক্ষায় হবে না—দলের পর দল আসবে।

বীরেশ্বর বোঝাচ্ছেন : কথা দিয়ে ফেলেছি, এসে যাক তারা। এই শেষ আর নয়। তাতে বিয়ে হোক আর না-ই হোক। সত্যি সত্যি ভাল সম্বন্ধ। পাকিস্তানে পাত্র জোটানো বড় মুশকিল। মনের মতন একটি পাওয়া গেছে কপালক্রমে—

লীলাও দেখি শ্বশুরের সঙ্গে একমত। মেয়েকে বলে, মন্দটা কিসে হল? তোকেই তো শুধু দেখবে না, তুইও তাকে দেখে নিবি। তার মতন তোরও পছন্দ অপছন্দ আছে—মস্ত বড় সুযোগ পেলি। বরই ইন্টারভিউ দিতে আসছে, সেইরকমটা ধরে নে। ফাঁকতালে আমাদেরও দেখা হয়ে যাবে। শতেক হাঙ্গামা করে বাড়ির উপর আসছে, এতে কেন বাগড়া দিবি তুই?

[ক্রমশঃ]

অশ্লীলতার বিরুদ্ধে

সমীর মুখোপাধ্যায়

আমরা বেশ ভালো আছি। বেশ একা আছি। ঘোরতর নির্জনে আছি। আমরা আছি হে আছি। কিন্তু কেউ কাউকে চিনি না। কারুর ভাষা কেউ জানি না। এক অনিঃশেষ রাত্রির ভেতরে আছি। বুকের ভেতরে আছে এক অমর ঘুণপোকা। সে আমাদের কুড়মুড় কুড়মুড় করে কী চমৎকার কুরে কুরে খাচ্ছে। তাকে আমাদের এতদিনের অর্জিত পুণ্যফল, বিশ্বাস, ভালোবাসা, স্নেহ-প্রীতি, শ্রদ্ধা, বিশ্বস্ত বন্ধুর মত, সে খাবে বলে, টেবিলে সাজিয়ে রেখেছি। কতো ভালোভাবে, দ্যাখোরে দ্যাখো, নিবাসক্ত আর নির্বিকার হয়ে যেতে পেরেছি কাফ্‌কা আর কামুর মত, সার্ত্রের মতন না, কেন না উনি আবার মাঝে মাঝে যোগোড়বাই কবেন, দুম কবে বলে বসেন,

'Against a crying child 'La Nausia' is insignificant',

নির্বিকাব আর নিবাসক্ত হয়ে যেতে পেরেছি সমাজ ও রাষ্ট্রের ব্যাপারে। কেন না সজীব, প্রাণশক্তিসম্পন্ন সৃষ্টিশীল সাহিত্য এবকমই দাবি আজকাল করছে আমাদেব কাছে, কিন্তু নারীব বেলায়? আমবা আব নির্বিকার, নিরাসক্ত থাকছি না। কেন না বেঁচে থাকাব, বাঁচবার কী আর অবলম্বন আছে ও ছাড়া! সৃষ্টিশীল সাহিত্যের কাঁচা-মাল ত' আর নীতিশিক্ষার কোল্ড স্টোরেজে থাকবন্দী করে রাখা যায় না, এবং এ কাবণেই এসে যাচ্ছে এমন সব নায়ক—রক্ষণশীল সমালোচক আপনি যাকে অপনায়ক বলেন। যাদের অনুক্ষুধা মোটেই নেই, যারা যে-কোন নিষেধ-কেই মনে করে পরাধীনতা (?)। সেই পরাধীনতার শেকল ছিন্ন করবার স্থান বেছে নেয় নিয়ন-কলঙ্কিত কলকাতা। যেন কলকাতা মানেই বাংলা দেশ। কলকাতার অলিতে-গলিতে বার, ক্যাবারে পেয়ে যায়। কথায় কথায় ফ্লাশ, জুয়ো, মদ—অনর্গল সেই ঝরণাধারা, যত্রতত্র পেয়ে যায় শরীর। আর এর সংগে এসেই পড়ে স্বাধীনতার সেই বিরাট (?) আকাঙ্ক্ষাটি, যার একমাত্র সমাধান ক্রাইমে, সামান্য প্ররোচনায় অথবা বিনা প্ররোচনাতেই প্রায়। খুব শান্ত মাথায় কখনো নিজের প্রেমিকাকে খুন, কখনো সন্তান হয়ে নিজের মাকে খুন, কখন নিজেরই খুন হয়ে যাওয়া, মোটমাট একটা জোরালো খুনোখুনি না হলে কি নাটক জমে! তার সংগে একটু দিশী রাজনীতির ককটেল, ব্যাপারটা বুঝলেন!

নায়কেরা প্রশ্ন তোলেন, কেন কেন আমাদের অপরিমিত অর্থ থাকবে না হৈ হৈ করে উড়িয়ে দেবার? কেন, কেন আমাদের অপরিমিত নারী থাকবে না আমাদের বন্ধ্যা দার্শনিক চিন্তাকে উত্তপ্ত করার? আমরা যা খুশি তাই করবো, মুখ ভেঙ্‌চাবো, ঘাড় মট্‌কাবো, শিস দোব, কোমর দুলিয়ে নাচবো, তাতে কার কী! এমনি করে জীবনের মধ্যে যে আরো এক জীবন আছে তাকে জেনে যাচ্ছি আমরা ক্রমশ। আমরা স্পষ্টই বুঝে ফেলেছি এ জীবনে আমাদের শত্রু কে। কে আমাদের বাড়া ভাতে ছাই দিচ্ছে। আগেকার লেখকেরা বড্ড ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলতো। নিজেরা যা বলছে হলফ করে বলতে পারি নিজেরাই বুঝতো না, তা অমারা কি করে বুঝবো। এ-কালের সাহিত্যিকরা বেশ চাঁছাছোলা। সব স্পষ্টাস্পষ্টি, আমরাও, ওদের হাতে তৈরি একালের নায়কেরাও তাই যা করছি, যা করছি সব সোজাসুজি। বেশ আছি আমরা। এতদিন পর যা হোক একটু চুটিয়ে বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পাচ্ছি।

যতদিন এসব আমাদের দেওয়া না হবে ততোদিন, দেখবেন, আমরা ট্রাম পোড়াবো, বাস জ্বালাবো, মিছিলে ঢুকে পড়ে পুলিশের মাথায় ডাণ্ডা হাঁকড়াবো। এল এস ডি খাবো, রক্তের রণক্ষেত্র করে তুলবো। আমরা দেখিয়ে দোব, দেখিয়ে দোব, দেখিয়ে দোব। এই নায়কেরা গলার শির ফুলিয়ে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করছেন, আমরা আজ শেয়ানা হয়েছি শেয়ানা চিনেই, আমরা আমাদের বাবা, মা, বোন সকলের 'ফেরেব্বাজী' ধরে ফেলেছি, হুঃ হুঃ বাব্বা, ঝোপেঝাড়ে সব লুকিয়ে থাকে। আমরা সব ধরে ফেলেছি। ধরে ফেলে আমরা তৈরি হয়ে গেছি সম্পূর্ণ 'ফেরেব্বাজ'। শুধু মদ আর তার অনুষঙ্গ আমাদের পৌঁছে দিতে পারে যাকে আমরা দার্শনিক ভাষায় বলি 'স্বাধীনতা' তার কৈলাসে। অবশ্য এর জন্যে খুনটুন, তা আমাদের প্রেমিকাকেই হোক বা মাকেই হোক যাকে পারি তাকে, যখন যেমন মন থাকে, এ একেবারে অপরিহার্য। পুলিশ, পিনালকোড ইত্যাদি দুর্গন্ধযুক্ত নর্দমা-গুলো অবশ্য আছেই। ওদেরই যা একটু ভয়, কিন্তু এদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিমানও খুব, কেন এরা বুঝতে চাইছে না। ড্রাই ডে মুখে সবাই জানলেও, হুঃ হুঃ বাব্বা, কার মুখই বা ড্রাই থাকে। এই হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের হাই-এক্সপ্লোসিভ বইগুলির ভেতরের কথা।

এর সংগে পুরোদস্তুর সহযোগিতা করছেন, আমাদের লজ্জা, অধিকাংশ সাহিত্য-পত্রিকা। কোন একটি পত্রিকার কাছ থেকে নবীন লেখক-লেখিকাদের কাছে 'একটি আদিরসাত্মক গল্প পাঠান' এরকম অনুরোধ আসছে পত্রযোগে।

যাঁরা জ্যেষ্ঠ লেখক, একদা প্রচুর ভালো লিখেছেন, আজ স্বাভাবিক যৌবন হারিয়ে কিছুতেই অবস্থাটাকে মেনে নিতে পারছেন না। বিকৃত ক্ষুধার তেজস্কর টনিক খুঁজছেন। তাঁদের রচনার প্রতি ঔৎসুক্য সামান্য কিন্তু তবু তাঁদের কথা কিছু বলতে হচ্ছে এ কারণেই যে তাঁরা নিজেরা যে গাড্ডায় পড়েছেন, অনেক সম্ভাবনাপূর্ণ তরুণ লেখক-লেখিকাদেরও সেই একই সর্বনাশ, বন্ধ্যা ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।

একদিকে সম্পাদক চাইছেন আদি-রসাত্মক লেখা। সে লেখা কেমন করে লিখলে ওৎরাবে তাব লাইন ঠিক করে দিচ্ছেন জ্যেষ্ঠরা নিজে লিখে। শূন্যতা-বোধ, জীবনের উদ্দেশ্যহীনতা ইত্যাদি জুড়ে দিয়ে লাইনটিকে একটা শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন। কামু, কাফ্‌কা যেন এইটুকুই আমাদের শিখিয়েছেন। জীবনের কোন সংকেত নেই, কোন কবিতা নেই। 'শরীর, শরীর, তোমার মন নেই কুসুম'—যেন এ প্রশ্ন অবান্তর, প্রেম ঠাট্টা-তামাসা জড়ানো কিম্ভূত বস্তু!

কামু, কাফ্‌কার এরকম বিকৃত ব্যাখ্যার রীতিমত লজ্জাজনক জোয়ারে বাহাত্তুরে থেকে সদ্য কফি-হাউসে গজানো, চিকণ যুবক লেখক পর্যন্ত নেমে পড়েছেন।

এ এক অদ্ভুত, উন্মাদ ব্যাপার! সাহিত্যের অলিতে-গলিতে কিলবিল করছে হাজার হাজার কাফ্‌কা, হাজার হাজার কামু। এরা সবাই 'ভীষণ' একা, 'ভীষণ' ক্লান্ত, সামাজিক রীতিনীতির ওপর 'ভীষণ' বিরক্ত।

বাংলাসাহিত্যের উৎকৃষ্ট লেখকদের চর্চায় বাংলা গদ্য একটা স্ট্যাণ্ডার্ডে দাঁড়িয়ে গেছে। একটু চেষ্টা করলে, একটু মনো-যোগ দিলে যে-কেউ মোটামুটি চলনসই গদ্য লিখতে পারেন আর এর সংগে যদি

[illegible] উচ্চাশা [illegible], আত্মমর্যাদা বোধটা নিজস্বতই যদি অর্জিতা করে নেওয়া সম্ভব হয়, আমার ধারণা তাহলেই আজকাল বাংলাদেশের একজন লেখক হওয়া যায়।

কামু ও কাফ্‌কা, আমরা এ'দের যতোটা চিনি, তাতে মনে হয় এ'রা সহৃদয় পাঠককে যে মৌন শূন্যতা, শস্যহীন মরুভূমি, সুস্থির অন্ধকারে পৌঁছে দেন, শ্বাসরোধকারী অপ্রতিরোধ্য সেই অতলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমাদের ঘাটা-পড়া উদাসীন মনের কুম্ভকর্ণ-ঘুম ভাঙান। আমরা ভয়ংকর সর্বনাশ জেনে নিয়ে পরস্পরকে আরো ভালোভাবে জানবার জন্যে আরো আপন আরো অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করি। স্বদেশে আমরা যতোই পরবাসী হই তবু এক অদ্ভুত টান-ভালোবাসা অনুভব করি সকলের প্রতি। গোপনে অত্যন্ত গোপনে এক বিচিত্র বিশ্বাস এ'দের বই পড়ে আমাদের হয় যে হয়তো ভালো-বাসার চাষবাস ঠিকমত শিখলে ও পোড়া-জমি আর অতো পোড়া পোড়া লাগবে না। কিন্তু কামু, কাফ্‌কা, প্রুস্ত ইত্যাদির নাম নিয়ে আমাদের দেশে যেটা হচ্ছে সাহিত্যের নামে সেটাকে কি বলবো? স্পষ্টই দেখছি আলু-অলা, পটল-অলার মত এক ধরণের সাহিত্য-অলায় দেশ ছেয়ে গেছে।

'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে শ্রদ্ধেয় কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাঠকদের প্রতি অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে অনুযোগ করেছিলেন। শ্রদ্ধেয় কবির অনুযোগের প্রতি মনোযোগ রেখেও আমরা বলতে বাধ্য সকলমতি পাঠকদের তরলমতি করবার দায়িত্ব লেখকেরা কি অস্বীকার করতে পারেন?

পাঠকেরা অজীর্ণে ভোগেন না, তাঁরা ক্ষুধা পেলে 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র তিনকড়ির মত সোজাসুজি বলেন, 'খিদে পেয়েছে মশাই'। এই অকপট খিদের মুখে যা তাদের পাতে দেওয়া হয় তাই তাঁরা গোগ্রাসে গেলেন। মুখরোচক খাদ্য তালিকার ভেতর কোনটা বিশুদ্ধ প্রোটিন তা ও'রা জানবেন কি করে? এর জন্যেও তো শিক্ষার দরকার। 'ঠিক এ কারণেই বিখ্যাত রুশ লেখক এরেনবুর্গ এদেশে এসে বলেছিলেন, 'এতোদিন আমরা জয়াল তৈরি করেছি, এইবার ছবি টাঙাবো।'

আজকের পাঠকরা যে অর্ধ-শিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি [illegible], এর জন্যে তো ও'রা দায়ী হতে পারেন না। ও'দের অর্ধশিক্ষার এই সুযোগ নিয়ে মধ্যে [illegible] লেখকেরাই কি ব্যবসা [illegible] করে যাচ্ছেন না?

[illegible] মার্কসবাদী লেখকেরা লড়াই করতেন সাহিত্যে। সে-লড়াই ছিল বাইরের লড়াই'। 'সেখানে বাইরের লড়াই' চালাতে চালাতে যদি কেউ নিজস্ব কোন দুঃখের কথা বলতো, অমনি নিষেধাজ্ঞার লাল আলো জ্বলে উঠতো। গল্পের গ্রন্থিতে সূক্ষ্ম কারিগরি নিন্দিত হোত বুর্জোয়াবিলাস বলে। অপার জ্যোৎস্নার মত যদি কোন গভীর কথা মগ্ন হতে চাইতো তবে তা হত প্রতিক্রিয়ার হাতিয়ার।

অবিকল এরই বিপরীত ক্রিয়া দেখছি, যাঁরা ভেতরের লড়াই করছেন তাঁদের ভেতরে। মার্কসবাদী লেখকদের সে সব রচনা সংগত কারণেই সেদিন স্থূল প্রচার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এখানে-সেখানে দু'চারটি রুবতপদ্ম যে কলমের মুখে সেদিন রচিত হয় নি তা নয়। কিন্তু দলবদ্ধভাবে একই ছকে একই নীতি আঁকড়ে সেদিনের প্রায় অধিকাংশ রচিত লেখাই সত্যি ডাস্টবিনে স্থান পাবার যোগ্য। তরুণ যুবক হয়তো সেই সব

যার ব্যাখ্যা লেখা পড়ে, তাঁর উত্তেজনায় ক্ষেপে গিয়ে পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙেছে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলবো লেখাগুলো কিন্তু লেখা হয় নি।

তেমনি আজ অন্য ধারায়, হাঁ মার্কস-বাদী লেখকদের মত দলবদ্ধভাবে, একই প্যাটার্নে আজ যে-সব লেখা ফলে উঠছে সেগুলোও একটি বন্ধ্যা দর্শনের স্থূল প্রচার ছাড়া আর কী ?

শুধু 'ভেতর' নিয়েই জীবন সম্পূর্ণ নয়। যেমন শুধু 'বাহির' নিয়েই সেদিন জীবন সম্পূর্ণ ছিলো না। 'গোটা মানুষকে খুঁজতে গেলে এই 'ভেতর' ও 'বাহির'—এই দুটিকেই একসূত্রে বাঁধতে হবে।

এই 'ভেতর'-সর্বস্ব লেখকেরা সাহিত্যের আবহাওয়াকে আরও বিষাক্ত করছেন অশ্লীলতাকে কামধেনু করে। মার্কসবাদী লেখকেরা সেদিন সাহিত্য রচনা করতে পারেন নি বটে, কিন্তু সাহিত্যের স্বাস্থ্যে তাঁরা লাবণ্য না এনে দিন, দৃঢ়তা, পৌরুষ এনে দিয়েছিলেন। আর এঁরা, এঁরা কি করছেন ?

এঁদের অশ্লীলতা অসহ্য হোত না, দু' পাশ মাড়িয়ে যাওয়া যেত অনায়াসে। এঁদের গ্রাহ্যই আমরা আনতাম না, নির্মম উপেক্ষা দিয়ে মনে মনে হেসে নিতাম। কিন্তু এঁদের অশ্লীলতা আজ একা নয়। অস্ত্রহীন নয়। এর হাতে আছে নানাবিধ আয়ুধ। উর্বর মস্তিষ্ক এই অশ্লীলতার সমর্থনে দর্শনকে সহযোদ্ধা বানিয়েছে। এ কারণে একে উপেক্ষা করা যাচ্ছে না। উপেক্ষা করা অবশ্য সংগতও নয়। এর সংগে লড়ে একে হারাতে হবে। স্পষ্টতই এ অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কেন না সকলেই জানেন এই অশ্লীলতা একাধিক গোপন কেন্দ্র থেকে অনবরত উৎসাহ উত্তেজনা পাচ্ছে। আমরা সব জেনেও সেই ভীমরুলের চাকটি ভাঙতে পারছি না। ঐ চাকটি ভাঙলেই এঁদেরও যে জারিজুরি সব শেষ তা জানেন ঐ প্রতিভাবান অশ্লীল বিক্রেতারা।

দুর্ভাগ্য দু'-একটি পত্র-পত্রিকা বাদে সাহিত্য-পত্রিকাগুলির অধিকাংশই ভরে উঠছে এক ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন বে-সবুর স্মার্ট অক্ষরে। দুর্ভাগ্য, বাংলা-দেশে আজ গানের বেলা ফুরিয়ে এলো। দুর্ভাগ্য আজ আর বাংলাদেশে প্রেমের গল্প তেমন গড়ে ওঠে না। দুর্ভাগ্যের কি শেষ আছে? জ্যেষ্ঠ, প্রবীণ লেখকরা, যাঁরা এই গড্ডলে গা ভাসান নি তাঁরাও কেমন ম্লান বিবর্ণ যেন ভয় পান। কোথাও যেন আটকে যাচ্ছে, গলা ছেড়ে স্পষ্টকণ্ঠে বলতে পারছেন না: এসব কিছু হচ্ছে না, কামু, কাফকা, জয়েস, প্রুস্ত অমন গণ্ডায় গণ্ডায় জন্মায় না। যে কেউ ইচ্ছে করলেই একাকী বিজ্ঞ মগ্ন হয়ে যেতে পারে না, শ্রেষ্ঠ আর্টের চোখ রূপে কখনো ক্লান্ত হয় না, সে বারেবারে আবিষ্কার করে নবীনকে। সৃষ্টি-উৎসের গভীরে যে আনন্দ আছে, আধুনিকের ছিন্নতার ফাঁকে ফাঁকে চির-কালের সাহিত্যিক তাকেই অনির্বচনীয় করে তোলে। প্রচ্ছন্নতাই আর্টের লক্ষ্য, ব্যক্ত করা নয়, আর জীবনও অসমাপ্ত যদি না তাতে থাকে কবিতা, এসব জেনে, বুঝেও এঁরা এখন একটু পাতার আড়াল খুঁজছেন।

নইলে এখনো ত' শুদ্ধতার, শুভ্রতার প্রতীক অন্নদাশংকর আছেন। সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে যিনি এক্কেশ্বর সেই বনফুল, তিনি আছেন। আছেন তারাশংকর, গ্রামবাংলাকে যিনি প্রতি ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে চেনেন। শহরের মধ্যবিত্ত আর নিম্ন-মধ্যবিত্তদের জীবন সম্বন্ধে জানতে উৎসুক এমন কোন বিদেশীকে স্বচ্ছন্দে, একবাক্যে যাঁর সম্বন্ধে বলে দিই, 'ওঁর বইগুলি পড়ুন তাহলেই সব জানতে পারবেন, অনর্থক লাইব্রেরী ঘাটাঘাটি আর গাইড নিয়ে হন্যে হয়ে ঘুরবেন কেন?' সেই কুশলী নরেন্দ্র মিত্র আছেন। সাম্প্রতের তরংগে তরংগে বারংবার আন্দোলিত হতে যাঁর কোন ক্লান্তি নেই অথচ যিনি চিরন্তনের রশ্মিদূত সেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আছেন, বন্ধ হয়ে ত' যান নি।

কিন্তু ওঁরা কিছু বোধ হয় বলবেন না। এ সময়ের এই মূঢ়তা দেখে প্রচ্ছন্ন কৌতুক বোধ করবেন। এই অন্ধকারেও একদিন আলো জ্বলে উঠবে, এই গভীর বিশ্বাস, এই গাঢ় প্রত্যয়ই ওঁদের স্থির রেখেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম প্রেমেন্দ্র মিত্র।

সংকেত, নিঃশব্দতা অস্পষ্ট গন্ধের এই অনুপম লেখকই যখনি সুযোগ পেয়েছেন তখনি অশ্লীলতার এই মুখরতাকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছেন। জনপ্রিয়তা হারা-নোর ভয়কে পৌরুষের সংগে অস্বীকার করে তিনি সত্যকথনের নির্ভীক দায় বারংবার নিজের কাঁধ তুলে নিয়েছেন। বাংলাসাহিত্যের পংকিল জলে আজো যিনি তরুণ রৌদ্রের মত ঝলোমলো, আশ্চর্য এই বয়সেও যিনি অনবদ্য প্রেমের গল্প লিখতে পারেন, নানা কারণেই যিনি বহু লেখক শ্রেষ্ঠের সংগে তুলনীয়, আমাদের অশেষ সৌভাগ্য তাঁর তূণীরের বাণ আজো নিঃশেষ হয় নি:

আমরা জানি এ দেশ যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপ নয়। এ দেশ ও জাতি অগ্নি-পরীক্ষার ভেতর দিয়ে কখনো যায় নি। প্রায় বিনামূল্যে স্বাধীনতা পেয়েছি। রক্তমূল্য দিই নি। ঋণ পরিশোধ করি নি। তাই যেমন এদেশের মানুষ তেমনি এদেশের সাহিত্যিক। এমন গণ্ডায় গণ্ডায় আত্মবিক্রিত, আত্মধিকৃত, কেঁচোর মতন মাটির ভেতরে ভয়ে ভয়ে আত্ম-গোপনকারী লেখকের দল বোধ করি পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই। বোধ করি এদেশের লেখকদের পক্ষেই সম্ভব দু'-চারদিনের জন্যে অপরের টাকায় বিদেশে গিয়ে তাদের আপ্যায়িত করবার জন্যে সেই দেশ ও জাতির কাছা-খোলা প্রশংসা করে ফেলা। এও ত' অশ্লীলতা!

সুতরাং এই সর্বব্যাপী, বিপুল অন্ধকারের সংগে মরণপণ লড়াই চালাবার জন্যে যেমন চিরকাল সব দেশে হয়েছে, সংকটে পড়লেই তাঁরা ক্লাসিকের আশ্রয় নিয়েছেন, তেমনি আমরা 'দূরে আত্মজনের অনাত্মীয় নক্ষত্র' বলে অধুনা-পরিত্যক্ত রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়চ্ছায়ায় ফিরে আসবো 'রক্ষণশীল' এই অপবাদ মাথায় নিয়েও।

আসক্তি দিয়ে যিনি প্রেমকে আবিল করে তোলেন নি, যিনি স্তব্ধ, নিঃশব্দ ও সুদূর। সকল সুন্দরের মধ্যে যাঁর আসন, যাঁর সৃষ্টির অনেক বাতিল হয়ে যাবে নিশ্চিত কিন্তু তবু যা' থাকবে, ক্ষণকালের আত্মবিস্মৃতির যবনিকা উঠে গেলে দেখা যাবে, তা' সকরুণ, শান্ত ও সুগম্ভীর। তাঁর বইগুলি বারংবার পড়তে হবে, তাঁর মহান নায়ক যেমন নিজের দেশকে আবিষ্কার করতে গিয়ে একদিন দেশ ও তিনি এক হয়ে গিয়েছিলেন, বলেছিলেন মেঘমন্দ্রধ্বনিতে, 'আমিই ভারতবর্ষ'—তেমনি করে আমাদেরও দেশকে চিনতে হবে, জানতে হবে। তাঁর কবিতাগুলি, মুক্তোর মত নিটোল ছোটো গল্পগুলি আরো একবার পড়তে হবে। কেন না অসহ্য পেষণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনিই ত' বলেছেন, 'আমি জীর্ণজগতে জন্মগ্রহণ করি নি। আমি চোখ মেলে যা' দেখলুম তাতে চোখ আমার কিছুতেই ক্লান্ত হোল না' তিনিই ত' আমাদের নারীর মধ্যে যে অসীম রহস্য রয়েছে তা' জানিয়েছেন, বলেছেন, 'তুমি যে তুমিই ওগো সেই তব ঋণ, আমি শুধু প্রেম দিয়ে শুধি চিরদিন'। অতএব বন্ধু, সংবদ্ধ প্রতিরোধ অশ্লীলতার বিরুদ্ধে। অতএব আমাদের ঘোষণা, আমরা কেউ অশ্লীল লেখা লিখবো না। সম্পাদক আদিরসাত্মক গল্প চাইলে একযোগে অস্বীকার করবো। কবি আমাদের যা' হাতে ধরে শিখিয়েছেন, সংকেত, ব্যঞ্জনা, রহস্য তারই ধ্যানে মগ্ন হয়ে, মানুষের মধ্যে যে সেই অপরাজিত মানুষ আছে তাকে আবিষ্কার করবো।

ওঁদের আছে অশ্লীলতা। আমাদের আছে রবীন্দ্রনাথ। দেখা যাক।

অশ্লীলতার বিরুদ্ধে এই অভিযান দীর্ঘজীবী হোক।

গাঁয়ে গাঁয়ে আবার অশান্তি

আঃ, গাঁয়ে দেখছি শান্তিতে আর থাকা যাবে না। পাড়াগাঁয়ের উন্নতির জন্যে সকলেই এমন উঠে-পড়ে লেগেছেন, শেষ পর্যন্ত ভিটে-মাটি ছেড়ে হয়তো গ্রামবাসীদের পালাতে হবে। গাঁয়ের উন্নতি আর গ্রামবাসীদের কল্যাণের ঠেলায় এবার সত্যি ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে।

বৎসরান্তে অঘ্রাণ-পৌষ—এই দুটি মাস শত দুঃখকষ্ট, দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার মধ্যেও গ্রামবাসীদের শরীরে ও মনে আনন্দের জোয়ার জাগায়; সংসারে ঘরের লক্ষ্মী বিরাজ করে—ভাঙা-চোরা ঘর-দোর মেরামত করার সুযোগ আসে, মনের সাধ-আহ্লাদ মেটাবার উপযোগী একটা পরিবেশ ও আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ বছরটা কেন জানি না গোড়া থেকেই বড় অসোয়াস্তিতে কাটছে। বোশেখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে এমন খরা গেল যে চাষবাস তো পরের কথা সামান্য পানীয় জলটুকু জোটানও যেন দায় হয়ে দাঁড়ালো। তারপর ধরতে গেলে আষাঢ় মাস থেকেই শুরু হল অকাল বন্যা, সেই বন্যার ঢেউ পুরো চার মাস গাঁয়ের মানুষকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে। খরা ও বানে কত প্রাণ গেল, কত ঘরবাড়ি নষ্ট হল, কত জমি-জমার ফসল ডুবলো তার ঠিক হিসেব কোনদিনই হয়তো পাওয়া যাবে না। এ সবই যাঁরা আমাদের কল্যাণের জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছেন তাঁদেরই অবদান! তা সত্ত্বেও গাঁয়ের মানুষ এখনও মরিয়া হয়ে বেঁচে আছে এবং সমানে ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে।

সব সময় তো হেয় করার চেষ্টা করা হয় আমাদের গাঁয়ের মানুষকে অন্য দেশের গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে তুলনা করে। কিন্তু পর পর এত বিপর্যয়ের পর, সর্বস্বান্ত ও রিক্ত হয়ে পৃথিবীর কোন্ দেশের গাঁয়ের মানুষ নিজের চেষ্টায় সেই ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে এতো সোনার ফসল ফলাতে পারে তা আমার জানা নেই; কিন্তু নিঃসন্দেহে এবং গর্বের সঙ্গে বলতে পেরেছে আমাদের এই বাংলা দেশের গাঁয়ের চাষীভাইয়েরা।

গাঁয়ের দিকে যদি আপনাদের বেড়াতে আসার সখ হয় দেখবেন আজও হাজার হাজার পরিবার ঘরবাড়ি খুইয়ে রাস্তায় তাঁবু খাটিয়ে বাস করছে; কিন্তু সেই পরিবারের একজনও জোয়ান বসে নেই। জল সরতে না সরতেই ছুটে গেছে ক্ষেতের পানে—কোন রকমে চাষটা সারা চাই-ই। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগনা ও বর্ধমানের বানে ভেসে-যাওয়া অনেক জমিতে হয়তো এ বছর ফসলই ফলতো না—যদি না চাষীরা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে সেখানে ছুটে যেতো। উত্তরবঙ্গের দিকে তাকিয়ে দেখুন এত বড় দুর্যোগের পরও চাষীরা সরকারী সাহায্য ছাড়াই লাঙল নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে। হয়তো ভগবানের আশীর্বাদে তাদেরও পরিশ্রম সার্থক হবে—আর যদি বিপত্তি না হয় সেখানেও সোনার ফসল ফলবে।

কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এত ভাগ্য-বিপর্যয়ের পর হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে চাষীরা যে ফসল ফলিয়েছে তা ঘরে তোলা নিয়ে ক্ষেতে ক্ষেতে যে অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে ওরা পরিত্রাণ পাবে কি করে? জমির মালিকানা নিয়ে শুরু হয়েছে গোলমাল—এ বলে আমার ফসল, ও বলে আমার ফসল। ফসল কাটা নিয়ে গোলমাল তো আছেই। লেভি-ফাঁকি দেওয়ার জন্যেই হোক বা অন্য যে-কোন কারণেই হোক কেউ কেউ আগে-ভাগে ফসল কাটিয়ে অপরের পাকা ধানের ক্ষেত মাড়িয়ে গরুর গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে—ফলে মারামারি, কাটাকাটি, রক্তারক্তি।

মেমারীর কল্যাণপুরে জোর করে ধান কাটা নিয়ে দু' দলে ঝগড়াঝাটি হতে হতে ব্যাপারটা এমন হয়ে দাঁড়ালো যে পুলিশকে শেষ পর্যন্ত গুলী চালাতে হল। সিঙ্গুরের পাথরাওড়া গ্রামে জমি দখল ও ধান তোলা

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

কারামুক্ত সুভাষচন্দ্রের সংবর্ধনা উৎসবে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ-বাণী বর্তমান পরিচ্ছেদের শিরোনামা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আর একটি সংবর্ধনা উৎসবের কথা পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সেদিন উৎসব হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে, আর শ্রদ্ধাবাণী নিবেদন করেছিলেন সুভাষচন্দ্র।

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী উৎসব বাংলাদেশের ইতিহাসে ব্যক্তিকেন্দ্রিক উৎসবের মধ্যে অতি স্মরণীয় এক ঘটনা। সেই উৎসবে যে-সংখ্যায় শ্রেষ্ঠ বাঙালী ও ভারতীয় সম্মিলিত হয়েছিলেন, সে রকম অন্য কোনো সময়ে দেখা গিয়েছে কি না সন্দেহ। অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীঅমল হোম তাঁর 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে তার চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন। সমসাময়িক সংবাদপত্রে বিস্তারিত বিবরণও আমরা দেখেছি। মূল উৎসব হয় ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে। উৎসবের উদ্যোগ আয়োজনের জন্য একটি বৃহৎ উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৬ মে তারিখে, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে। ঐ সভার আমন্ত্রণকর্তাদের অন্যতম ছিলেন সুভাষচন্দ্র।*

১৬ই মের সেই উদ্বোধন সভায় যে জয়ন্তী-উৎসব-পরিষৎ গঠিত হয়েছিল, তার অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। অন্যান্য সহকারী সভাপতিরা হলেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল, কামিনী রায়, ডবলিউ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, এস আর্কুহার্ট, আবুলকালাম আজাদ, চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমণ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নীলরতন সরকার, ঘনশ্যামদাস বিড়লা, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বিধানচন্দ্র রায়। সভাপতি হন আচার্য জগদীশচন্দ্র এবং কোষাধ্যক্ষ—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

সেই স্মরণীয় সভা সম্বন্ধে সংবাদপত্রে লেখা হয়েছিল—

"Never was a gathering more distinguished or more representative in recent times than that at the Calcutta University Institute Hall on Saturday (May 16) when a large number of ladies and gentlemen, young, old and grey,—the learned and the learner, the scientist and the philosopher, the literature and the aspirant, the artist and the politician, the educationist and the student—assembled and offered their respectful greetings and warm felicitations to poet Rabindranath Tagore on his completing seventieth year of his life and formed a distinguished committee with Sir Jagadish Chandra Bose as president to celebrate the seventieth birthday of the great poet in a fitting

* অমল হোম মহাশয় তাঁর গ্রন্থে আমন্ত্রণপত্রের একটি প্রতিলিপি মুদ্রিত করেছেন। স্বাক্ষরকারীদের নাম—জগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকামিনী রায়, শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বাসন্তী দেবী, শ্রীঅবলা বসু, শ্রীসরলা রায়, শ্রীনীলরতন সরকার, শ্রীমন্মথনাথ রায়চৌধুরী, আবুলকালাম আজাদ, ঘনশ্যামদাস বিড়লা, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল, শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সি ভি রমণ, এইচ এস সারাওয়ার্দি (ভাইস চ্যান্সেলার), শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিধানচন্দ্র রায়, শ্রীহৃষীকেশ লাহা, মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, ফস ক্যালকটা (মেট্রোপলিটান), শ্রীদেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী, ডবলিউ এস আর্কুহার্ট, জে আর ব্যানার্জি, শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়, এ কে ফজলুল হক, এইচ এ গিডনে, শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীজলধর সেন, মুজীবর রহমান, শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, আনন্দজী হরিদাস, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, আর্থার মুর, ই সি বেনথল, শ্রীমতী সরোজিনী দেবী, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল, শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সরকার, শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র, এস খুদাবক্স, হরিরাম গোয়েঙ্কা, শ্রীঅর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, পদ্মরাজ জৈন, জাহাঙ্গীর কয়াজী, শিবানন্দ (অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন)।

manner in the city at a convinient time.

Men like Sir C. V. Raman, Sj. Bipin Chandra Pal, Sir Devaprasad Sarbadhikari, Sir J. C. Coyajee, and Mr. Arthur Moor sqatted on the dais without chairs like humble students learning at the feet of and paying homage to a great Master and of thought in the one they had assembled to honour."

(অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৭ মে, ১৯৩১)*

সভায় প্রভূত বক্তৃতাদি হয়। বিখ্যাত ব্যক্তিগণ অকুণ্ঠে তাঁদের শ্রদ্ধানিবেদন করেন। রবীন্দ্রনাথের মতই বঙ্কিমচন্দ্রের আশীর্বাদ নিয়ে যিনি বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বয়োজ্যেষ্ঠ সেই সর্বজনশ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সভাপতিত্ব করেন। তিনি ইংরেজী ভাষায় ভাষণ দেন, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ যেহেতু 'ওয়ার্ল্ড পোয়েট', তাঁর সংবর্ধনা-ভাষণ 'ওয়ার্ল্ড-ল্যাংগুয়েজে'ই হওয়া উচিত। ভারতবর্ষ পূর্বে কিভাবে যোগ্য উপায়ে কবিদের সংবর্ধিত করত তার নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে একালের শ্রেষ্ঠ কবি সম্বন্ধে ভারতবাসীদের দায়িত্বের কথা শাস্ত্রী মহাশয় স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর বক্তৃতায় এই আন্তর্জাতিক কবি ও বিশিষ্ট শান্তিবাদীর রচনার মধ্যে বৈষ্ণব প্রভাবের কথা বিশেষভাবে বলেন। কামিনী রায় বলেন, রবীন্দ্রনাথ কেবল বিরাট কবি নন, সেই সঙ্গে বিরাট জাতীয় কর্মী, তরুণদের কাছে আদর্শ নেতা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঐক্যের প্রতীক। শরৎচন্দ্র বিশ্বভারতীর জন্য অর্থদান করতে বিশেষভাবে আবেদন করেন: "আমাদের দেশের অনেকেই বিশ্বভারতীকে তাঁর একটা খেয়াল বলে মনে করেন। আমি বলি, হলই বা খেয়াল, কিন্তু কার খেয়াল ও কত বড় সে খেয়াল, তা তো আমাদের ভুললে চলবে না।" বৈজ্ঞানিক সি ভি রমণ এক তীক্ষ্ণ ভাষণে বলেন—এ যুগ বিজ্ঞানের; কবিরা এখন বিরল; খাঁটি ও বিরাট কবি আরও অল্প। সেজন্য নোবেল পুরস্কারে কবিদের ভূষণের [illegible] সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার ৫, ১০ বা ২০ বছরের ব্যবধানে দেওয়া উচিত, প্রতি কাব্যে নয়, কারণ মহৎ কাব্য বহু বছরের ব্যবধানে আসে। এই অবস্থাতেও, আমার মতে, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তিই পুরস্কার পেয়েছেন।"

এই উদ্যোগ সভার পরে মূল উৎসব হয়েছিল বিরাট আকারে ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে। সপ্তাহব্যাপী এই আয়োজনে সমৃদ্ধ সেই উৎসবে কৃতজ্ঞ দেশবাসী শ্রেষ্ঠ কবির প্রতি শ্রেষ্ঠ সম্মান জানিয়েছিল। এই সময়ের মূল অনুষ্ঠানে কবির উদ্দেশ্যে জাতির অভিনন্দনপত্রে শরৎচন্দ্র-রচিত অবিস্মরণীয় পংক্তিটি উচ্চারিত হয়েছিল: "কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।" এবং স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন চমৎকার ভাষায় বলেছিলেন—

"..He (Rabindranath) has added considerably to the sweetness of civilization..Rabindranath in his works emphasises the necessity for this inward life and meditation. Much of modern literature is lacking in feeling and intensity. Bernard Shaw and H. G. Wells are intellectual, entertaining, instructive and interesting but they do not stir the depths in us. Robert Bridges treatment of Beauty is a classical exposition of philosophical thesis in language but does not touch the soul. Unless we speak from depth we cannot engage depths in us. Tagore belongs to the great tradition of pure artists who speak from the profundity of their experience. His works have that magnetic touch of the Eternal and the magnificience of mind which goes beyond the surface and looks into deeper reality. Not only does he insist on inward life but is conscious that the life of the world is also informed by spirit [illegible] a man of great sensitivity he is up against all social wrongs which are perpetuated in the name of social code. Life is higher than law even as beauty is greater than harmony, and truth greater than consistency. A soul which stands on the basis of spirit cannot help loving the whole of the humanity. ..Tagore in all his works stands up for these three principles—inwardness of spiritual life, futility of mere renunciation and positive development of love and sympathy. His ideal is one of the wholeness where life and mind are not sacrificed but are subdued in the purpose of the higher."

জয়ন্তী অনুষ্ঠানের অন্যতম আহ্বায়ক ও অনুষ্ঠান সমিতির অন্যতম সহকারী সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু কিন্তু মে মাসের উদ্যোগ-সভা কিংবা ডিসেম্বর মাসের মূল সভা—কোনো সময়েই উপস্থিত থাকতে পারেন নি। ১৭ মে তারিখের সংবাদপত্রে উদ্যোগ-সভার বিবরণ বেরিয়েছিল, সেই-দিনেরই সংবাদ—"Sj. Subhas Bose : Busy programme at Noakhali." নোয়াখালিতে জেলা যুব সম্মেলনে প্রদত্ত সুভাষচন্দ্রের ভাষণের মধ্যে ছিল—

"বাংলাদেশের যুবসমাজের ভিতর থেকে সহস্র সহস্র যতীন দাস আমরা চাই, যারা তাঁর আত্মোৎসর্গের ভাবকে রূপায়িত করবে। তাঁর জাতীয় চেতনাসম্পন্ন নতুন একদল যুবক আমাদের অবশ্যই চাই কারণ তারাই ভাবী ভারতবর্ষকে নির্মাণ করবে, যে-ভারতবর্ষে কৃষক, শ্রমিক নির্বিশেষে সকল নরনারী স্বাধীনতার আশীর্বাদ উপভোগ করবে। আপনাদের আমি আহ্বান করছি, অদূর ভবিষ্যতে কি গৌরবময় ভূমিকা আপনাদের গ্রহণ করতে হবে তা অনুভব করুন, তারপর আপনারা অগ্রসর হয়ে চলুন একটিমাত্র ভাবনা নিয়ে—মাতৃভূমির মুক্তিব্রতই আমার একমাত্র কর্তব্য।"

সেদিন সংবাদপত্রে এই ভাষণ [illegible]

* শ্রীযুক্ত অমল হোমের বইয়ে এই তারিখের অমৃতবাজার থেকে যে উদ্ধৃতি দেওয়া আছে, তার থেকে আমাদের উদ্ধৃতির কিছু পার্থক্য আছে। আমরা অমৃতবাজারের শহর সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত করেছি।

সদ্য বিকশিত গোলাপের মত সুন্দর আনন ও

কুসুম কোমল

পাপড়ি পেলব তনু
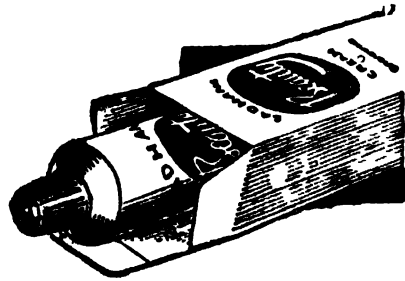
[illegible] বিপরীত [illegible] ছিল—

"Echoes of the voice of Will Durant, who wrote to Rabindranath—'you are the reason why India should be free"—seemed to reverberate through the hall *when Alderman Subhas Chandra Bose's message of regret for his inability to attend the meetting was read by Mr. Amal Home* before the representative assembly of Indians and Europeans—Hindus and Mahomedans, Sikhs, Parsis, Jews and Christians."*

নোয়াখালির যুবসম্মেলনে সুভাষচন্দ্র যুবকদের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন—স্বাধীনতা অর্জনের ব্রতে তাঁরা যেন একাগ্রমন হন, কোনো কিছুই যেন তাঁদের [illegible] না পারে। অনুষ্ঠানের [illegible] জন্য কিছু যে [illegible] করতে পারে নি, তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে প্রেরিত তাঁর [illegible]বাণী, যার মধ্যে তিনি বিশ্বপ্রেমিক কবিকে জাতীয়তার এক অভিশ্রেষ্ঠ আচার্যরূপে বন্দনা করেছেন। সুভাষচন্দ্রের রচনাটুকু আমরা শ্রীযুক্ত অমল হোমের গ্রন্থের কল্যাণে পেয়েছি :

"I am very sorry that my absence from Calcutta does not permit me to take part in the meeting convened to organise the celebrations in observance of Rabindranath's seventieth birth-anniversary. I would have really felt honoured to do so.

I take this opportunity of wishing all success to the movement to celebrate an occasion which has more than a special significance for our national life, and I shall certainly do whatever I can for its promotion and success.

Before. I conclude. I would like to say just one word. Will Durant, in presenting his well-known book—*The Case for India*—to Rabindranath Tagore, wrote : 'You are the reason why India should be free.' Mine has always been exactly the same feeling. A country which can give birth to a Rabindranath Tagore cannot but be free, and to the freedom Movement in India Tagore has contributed his unrivalled poetry and lofty patriotism. He has indeed been one of the greatest Prophets of Indian Nationalism in its best and noblest manifestation ; he serves as the becon light in our struggle for freedom. May [illegible] the dream realised—India enthroned once more in the pedestal of Her God-given destiny—the Teacher of all Nations."

ডিসেম্বর মাসের বৃহত্তর অনুষ্ঠানেও সুভাষচন্দ্রের পক্ষে উপস্থিত থাকা সম্ভব হয় নি। তখন তিনি পশ্চিম ভারত সফর করছিলেন, ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে রবীন্দ্রনাথ নামক কারণকে যাদের কাছে যথেষ্ট মনে হয় নি, সেই শাসকদের জ্বালানো-দয়ের চেষ্টায়। পুনার মহারাষ্ট্র যুব সম্মেলনে সভাপতিরূপে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত গ্যাডগিলের উক্তিকে সবিনয়ে সহাস্যে প্রত্যাখ্যানের চেষ্টায় বললেন, "না, না, আমি মোটেই ভারতের সর্বাধিক অশান্তিকর ব্যক্তি নই, যেমন সরকারী কর্মচারীরা মনে করে থাকেন। আমি খুবই শান্তিপ্রিয়।" * সরকারী কর্মচারীরা অবশ্য সুভাষচন্দ্রকে ঐ মুহূর্তে পরম সত্যবাদী মহাপুরুষ বলে গ্রহণ করে নি। সুতরাং কলকাতা শহরের জ্ঞানী-গুণী ও সাধারণ মানুষেরা যখন ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে রবীন্দ্রনাথ নামক পরম কারণকে বাক্যে অর্চনা করছে, প্রায় ঠিক তখনই ঐ স্বাধীনতাকে যিনি জীবনে অর্চনা করেছিলেন তাঁকে কারান্তরালে পাঠিয়ে দিল শাসক সম্প্রদায়। ১৯৩২, জানুয়ারীর প্রথম দিকে সুভাষচন্দ্র গ্রেপ্তার হলেন—পাঁচ বছর পরে কলকাতার ঐ ভগ্ন-স্বাস্থ্য মানুষটি মুক্ত হয়ে উপস্থিত হবেন—এবার তাঁকেই দেশবাসী অভিনন্দন জানাবে এবং কবিগুরু বার্তা পাঠিয়ে বলবেন—'তোমাকে সংবর্ধনা করি।'

[ক্রমশঃ]

---

* ১৭ মে তারিখের শহর সংস্করণ অমৃতবাজারে কিন্তু এই বিবরণটি খুঁজে পাই নি। আমি শ্রীযুক্ত হোমের গ্রন্থের উপরে নির্ভর করেই অংশটি উদ্ধৃত করলাম।

* "NOT THE MOST TURBULENT MAN"
Sj. Subhas Bose
Presides Over Maharastra
Youth Conference

Mr. Subhas Chandra Bose referring to Mr. Gadgil's remarks about him humorously prefaced his address by saying that he was a peace-loving man though he was described by some, including the official, as the most turbulent man of the land. (Amrita Bazar Patrika, Dec. 24, 1931).

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

৯· ১৯৫০-৬৮ : উপন্যাসে ব্যক্তির প্রশ্ন

মার্কিন উপন্যাসের যে ধারাটি অধিকতর পরিচিত, তার ভিত্তি সমাজ-বাস্তবতা, অর্থাৎ একটি বিশেষ সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশের বিশ্লেষণ। এই বিশ্লেষণের মধ্যে সময়ে সময়ে ব্যক্তির চেহারা যেন তলিয়ে গেছে, ব্যক্তি যেন দানাই বেঁধে উঠতে পারে নি। জন ডস প্যাসস তো যেন ইচ্ছা করেই ঘটনাস্রোতকে অবাধে বইবার সুযোগ করে দিয়ে তাঁর সৃষ্ট বিচ্ছিন্ন মানুষগুলিকে সেই স্রোতে খড়কুটোর মত ভাসিয়ে দিয়েছেন, তারা কখনও কখনও হয়ত পরস্পরে ধাক্কা খেয়েছে খানিকক্ষণের জন্য মুখোমুখি হয়েছে, কিন্তু তাদের ভেসে চলাটাই যেন জীবন। এই মূল ধারার বাইরে হেনরি জেমস অবশ্য একেবারেই বিপরীত কোটিতে চলে গেছেন—'অনেকই আব-হাওয়া"র মধ্যে। অথচ পঞ্চাশের দশকে পৌঁছে যেন মনে হল, ঐ দুই ধারার কোনটাতেই লাভ নেই। প্রাচুর্যের মধ্যে বসে আত্মসন্তুষ্ট মানুষ অভাব-দারিদ্র্যের কথা শুনতে চায় না, সে মনেরই হোক, আর দেহেরই হোক, ঐহিক হোক, পারত্রিকই হোক। এই পর্বের সমাজোত্ত-রণেও স্বার্থপরতাই যেন ধর্ম। দুর্নীতি-নির্ভর ও প্রযুক্তিনির্ভর কারুকৌশলের বিপুল বিস্তারে, চোখ ধাঁধানো চলমান ও স্থির ছবির ব্যাপক আয়োজনে ভাববার মনটাও খানিকটা থমকে দাঁড়িয়েছিল। এই পর্বের ঔপন্যাসিকদের স্বভাবতই নিজে-দের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে সংযোগহীনতার এই জটিল পরিস্থিতিকে বুঝতে হয়েছিল। সল বেলো-রই একটি উপন্যাসে "ম্যাস ম্যান" বা পিণ্ডমানুষের কথাটির সংজ্ঞা আছে —"ভিড়ের মানুষ। ভিড়ের আত্মা। প্রত্যেককে ছিঁড়ে কেটে নিজের মাপে এনে দাঁড় করায়।" এই পিণ্ডমানুষকে জাগিয়ে তোলার দায়ই ঔপন্যাসিকদের গ্রহণ করতে হয়েছিল। [illegible] উনিশশতকের [illegible] রেখে, সমাজ রেখেই ব্যক্তির সংকট ও দায়িত্বকে বড় করে তোলার যে চেষ্টা, সেই চেষ্টার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিকেরা কেন পিণ্ডমানুষকে আবার সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষে রূপান্তরিত করার সাধনা শুরু করেছিলেন। ব্যক্তি যদি ভিড় থেকে পৃথক করে নিজেকে দেখতে পারে, চিনতে পারে, তবেই সে সমাজে নিজের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারে। এই তাগিদ মাথায় ছিল বলেই এই পর্বের ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের চরিত্র-গুলিকে কখনই সমাজমুক্ত হতে দেন নি,

সল বেলো

পলাতক হতে দেন নি। অথচ তাঁদের নিঃসঙ্গ স্বাতন্ত্র্যেই জোর দিয়েছেন।

সল বেলো-র (১৯১৫—) একটি প্রবন্ধে এই বোধের আভাস আছে : লেখকের "হয়তো কখনও রাস্তায় চলতে চলতে মনে হতে পারে যে জনমণ্ডলীর মধ্যে শক্তি সামূহিক কর্মকাণ্ড, শিল্পোৎ-পাদন ও ঐশ্বর্যবৃদ্ধিতেই নিয়োজিত।... কখনও কখনও সন্দেহ হয়, হয়ত [illegible] হয়ত বা রাজনীতিকরাই [illegible] [illegible] [illegible] অধিকার করেছে। 'মানবজাতির ব্যক্তিগত, শিল্পবোধগত, জাতিক প্রতিভা কি শেষ পর্যন্ত অবজ্ঞিত? সে-পরিণতি অসম্ভব। এই তো সবে বিমান প্রয়োগ-বিদেরা দেখিয়ে দিলেন, একনাগাড়ে পঁয়তাল্লিশ ঘণ্টা বিমান চালিয়ে সারা পৃথিবীটা একবার চক্কর দিয়ে আসা যায়। একেই তো বলে প্রতিভা—মানুষকে আর ধাতুকে মাটি থেকে তুলে তাদের পৃথিবীর মুখের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনা।... মানুষের মধ্যে সংযোগের অভাব নিতান্তই সাময়িক। টাইপরাইটারে আঁটা এক-টুকরো কাগজে যখন এমন একটা সংলাপ বর্ণিত হয় যা কখনও আসলে শোনা যায় নি, তখন সেই রচনা দেবতাদের কাছে নিবেদিত অর্ঘ্য—সেই দেবতাদের কাছে যাঁরা আজ আমাদের সম্মুখে নেই। কিন্তু তাঁরা নিশ্চিত ফিরে আসবেন, কারণ কালে প্রত্যেকেই তাঁদের অভাব অনুভব করবেন।.. লেখক নিজেকে বলতে পারেন, 'তোমার আশপাশের মানুষের সঙ্গে তোমার সংযোগ অনেক ঘনিষ্ঠ। কারণ আসলে পরস্পরের সঙ্গে ওদের সংযোগ আর কতটুকু? ওরা আসলে আলগো করে জোড় লাগানো জড়পিণ্ড। কারখানার অ্যাসেম্বলি লাইনের [illegible], কিংবা খেলার জায়গার, কিংবা ক্লাব, কিংবা [illegible], কিংবা দোকানের [illegible] যে কখনই প্রগাঢ় নয়।...মনে রেখো, তোমার আনুগত্য মানবাত্মার প্রতি। তুমি লেখক নও, তুমি নিতান্তই জেলে কিংবা চাষী, এমনি কোন কিছু হলে তুমি জনতার লোক হতে যাবে কেন? কেবলমাত্র তবেই তুমি [illegible] অস্বীকার করতে পারবে —অন্য মানুষ থেকে পার্থক্য তোমাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে, সেই ভয়ে; বন্ধুত্ব জান্তব শক্তির ভয়ে।" এই প্রবন্ধেই (দ্র 'ডিস্‌ট্র্যাকশন্‌স্‌ অফ এ ফিক্‌শন রাইটার') বেলো বলেন: "আমাদের বিজ্ঞান, আমাদের আহার পান ও উড়ন-চণ্ডী [illegible] আমরা আমাদের সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য লড়াই করে

চলেছি, কারণ রিপুকে প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদন ও বিক্রয়ের জোরেই এই সভ্যতার অস্তিত্ব। লেখক ভাবতেই পারেন না, এই ধরনের দায়িত্বপালন আমাদের আত্মাকেই বিনাশ করবে।"

বেলো জাতে ইহুদি, পেশায় দীর্ঘকাল সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন। হয়ত তারই প্রভাবে চল্লিশের দশকে লেখা তাঁর প্রথম দুটি উপন্যাস 'ড্যাংলিঙ ম্যান' ও 'দ ভিকটিম' একটু বেশি সাহিত্যগন্ধী ও ধরনধারণে য়োরোপিয়। প্রথম উপন্যাসে পদবিহীন জনৈক জোসেফ চাকুরি ছেড়ে অতীতের কোন এক বিশেষ পর্বের চরিত্র অনুধাবনের পাণ্ডিত্য প্রয়াসে স্বাধীনতা খোঁজে: প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়। তার সমস্ত মানবিক সম্পর্ক বিষিয়ে ওঠে। নির্বস্তুক স্বাধীনতাকে আঁকড়ে থাকতে গিয়ে সে সব কিছুকেই ঘৃণা করতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত হাঁপিয়ে উঠে সে সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়: "আমাকে আর আমার নিজের ভাবনা ভাবতে হবে না। আমি তাই কৃতজ্ঞ। আমি এবার অন্যদের হাতে, অন্যেরাই আমাকে চালাবে। আমার স্বাধীনতা বাতিল। ছকে বাঁধা সময়ের জয় হোক। আমার উপর খবরদারির জয় হোক। দাসত্ব দীর্ঘজীবী হোক।" 'ড্যাংলিঙ ম্যান'-এর সর্বত্রই যেমন মহাযুদ্ধের প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি, 'দ ভিকটিম'-এ তেমনি ইহুদিবিদ্বেষ। অলবী নামে এক ইহুদিবিদ্বেষী ইহুদি লেভেনথালের কাছে এসে অভিযোগ জানায়, লেভেনথালেরই নালিশে অলবীর একদা চাকুরি গেছল; তার পরবর্তী জীবনের যাবতীয় ব্যর্থতাই তারই উত্তরফল: অর্থাৎ লেভেনথালই তার জীবনকে নষ্ট করেছে। লেভেনথাল প্রথমে মানে না সে কথা। কিন্তু তারা এক সঙ্গে থাকতে শুরু করে। বিদ্বেষ, ঘৃণা, ভয়, সংকোচ, অবিশ্বাস সব নিয়েই কিন্তু তারা ক্রমে ক্রমে জড়িয়ে পড়তে থাকে, একটা অদ্ভুত [illegible]তায়। অলবীর [illegible] নিজের দায়িত্ব মেনে নিয়েই লেভেনথাল শেষ পর্যন্ত অলবীর সঙ্গ থেকে মুক্তি পায়, নিজের স্বাভাবিক পরিবারজীবনে ফিরে আসতে পারে, আরো স্বচ্ছন্দ দৃষ্টি নিয়ে।

পঞ্চাশের দশকে 'দি অ্যাডভেঞ্চার্স অফ অগি মার্চ' ও 'হেনডারসন দ রেন কিং' উপন্যাসে বেলো তাঁর রচনার জাত বদলে দিয়েছেন—তিনি আর আগের মত অতটা বিষয়ীগত নন। শিকাগোর জীবন, শঠ, প্রবঞ্চক ও চোরদের গোপনলোক, নয়তো আফ্রিকার এক কাল্পনিক রাজ্যের পরিবেশ রচনায় বেলো-র সযত্ন নিষ্ঠার মধ্যেও গুরুত্ব পেয়েছে অভিজ্ঞতার মূল্য। অগি মার্চ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্পদের প্রলোভনের পরোয়া না করে বাউণ্ডুলে জীবন কাটিয়ে দেয়, অর্থের নিশ্চিত আশ্রয়ে শান্তি পাবার সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দেয়। উনিশ শতকে মার্ক টোয়েনের সৃষ্টি হাকলবেরি ফিন-এর যোগ্য উত্তরাধিকারী অগি মার্চ। এমনি যারা বাউণ্ডুলে তারাই পারে বেপরোয়া হয়ে অর্থলোভী স্থিতিবিলাসী স্বার্থপর সমাজকে বুড়োআঙুল দেখাতে। হেনডারসন তার সঞ্চিত সম্পদ ও প্রিয়তমা স্ত্রীকে ফেলে আফ্রিকার গভীর অরণ্যে পাড়ি দেয়, আদিম উপজাতিকে জীবনের প্রাণময়তায় ও আচাররক্ষায় মানিয়ে নেবার চেষ্টায় হেনডারসন নিজেকে পরীক্ষা করে নেবার সুযোগ পায়। অগি মার্চের মধ্যে যেমন মার্ক টোয়েনের হাকলবেরি ফিনের ছায়া, তেমনি হেনডারসনের মধ্যে মার্ক টোয়েনেরই কানেকটিকাট ইয়াংকির ছায়া। দুই সভ্যতার মধ্যে সরাসরি সংঘাতে বিপর্যস্ত হেনডারসনকে শেষ পর্যন্ত পালিয়ে আসতে হয়—কিন্তু সে সঙ্গে নিয়ে আসে এক অনাথ সিংহশাবক —"আমার সঙ্গে আর কোন মালপত্র নেই, ঐ সিংহশাবক ছাড়া।" বেলোর এই সদর্থক দৃষ্টি তাঁর ১৯৬৪ সালের 'হেরজগ' উপন্যাসে অবশ্য কিছুটা ছায়াচ্ছন্ন হয়েছে। সাহিত্যের অধ্যাপক মোজেস হেরজগ তার জীবনের দ্বিতীয় বিবাহ-বিচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে অতীত রোমন্থন ও পত্ররচনায় তার জীবনকে ভরিয়ে তোলে। নানা পরিচিত ও অপরিচিত-জনকে লেখা নানা বিষয়ে চিঠি, যার কোনটাই কোনদিন পাঠানো হবে না, কেবল আত্মপ্রকাশেই তাদের সার্থকতা—সাহিত্য, রাজনীতি থেকে শুরু করে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'র ইন্দির ঠাকরুণ ও দুর্গার মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়, কিন্তু প্রত্যেকটি বিষয়েই তার একান্তই ব্যক্তিক স্মৃতি ও অনুভূতির রেশ লেগে থাকে। বিনোবা ভাবেকে 'পথের [illegible] ভাবে: "[illegible] ইয়র্কেও বৃষ্টি পড়ছে। [illegible] হয়ে ওঠে। আরও যে [illegible], আর [illegible] দিচ্ছে গরীবের ঘরের মেয়ে। সেও শুয়েছে চটের থলি পেতে।" কিন্তু এই নিরন্তর আত্মপ্রকাশে ও নানাজনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের প্রাণান্ত চেষ্টায় হেরজগ শেষ পর্যন্ত যেন নিঃশেষিত হয়ে যায়: "তার আর কাউকে কিছু বলার নেই। কিচ্ছু নেই। একটা কথাও নেই।"

প্রায় সমবয়সী বার্নাড মালামুড-ও (১৯১৪) জাতে ইহুদি, পেশায় শিক্ষক। 'দি অ্যাসিসটান্ট' উপন্যাসে নিউ ইয়র্কের গরীব ইহুদি পাড়ায় বৃদ্ধ ইহুদি দোকানদার মরিস একদিন দুই দুর্বৃত্তের অতর্কিত আক্রমণে আহত হয়। অভিসন্ধি ছিল ডাকাতির। আহত মরিসকে দোকানের কাজে সাহায্য করতে আসে একটি ইতালীয় ছেলে, নাম ফ্র্যাংক অ্যালপাইন। কী এক জটপাকানো অপরাধ-বোধে সেদিনকার ডাকাতির অন্যতম নায়ক ফ্র্যাংক অ্যাসিসটান্টের কাজ নিয়ে বসে। মরিসের মেয়ে হেলেনের প্রতি সে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহুদিয়ানির দেমাকে হেলেন তাকে প্রশ্রয় দেয় না। এতদিনের ইহুদিবিদ্বেষী ফ্র্যাংক এদের সবাইকেই বুঝবার চেষ্টা করে। মরিসের মৃত্যুর পর দোকান চালাবার দায়, মরিসের স্ত্রী-কন্যার সংসারে খরচ যোগাবার দায় এসে পড়ে ফ্র্যাংকের উপর। নীরবে ফ্র্যাংক সেই দায় পালন করে। হেলেনও যেন তাকে বুঝতে শুরু করে। দুজনে বেশ কাছাকাছি আসে, কিন্তু আবার একটা ভুল বোঝাবুঝি ওদের পরস্পরকে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। সংসার আর দোকান, এই উভয়কেই চালাবার কাজে ওদের একত্রেই থাকতে হয়। জীবনের দিনানুদৈনিক টানাপোড়েনেই ওদের একসঙ্গে কাজ করতে হয়। ওরা পরস্পরকে বোঝে, তবু কোথায় যেন একটা বাধার প্রাচীর আছে। ফ্র্যাংক একদিন ইহুদিধর্মের আচারে ইহুদিধর্মে দীক্ষিত হয়ে আসে। ফ্র্যাংকের জীবনটাই বদলে যায়। এইখানেই উপন্যাসের শেষ। ফ্র্যাংক জীবনে হেলেনকে পাবে কি না, সে প্রশ্ন অবান্তর। ফ্র্যাংক আরেকটা জীবনকে চিনেছে, আরেকজনকে চিনেছে। ইহুদিদের [illegible] ভাষার ভাবান্তরিত রূপে আস্থা ও ভরসায় যে শান্ত মূর্তি ধরা পড়ে, প্রতিদিনকার জীবনের বিবর্ণ ক্লান্তিকরতার মধ্যে তা যেন আলো নিয়ে আসে। [illegible] কোন [illegible] নিয়েও তার প্রয়োগেই মালামুড এই ধরনের [illegible] রচনা করতে পারেন।

ভ্রম সংশোধন

গত ৫ই ডিসেম্বর সাপ্তাহিক বসুমতী সংখ্যাটিতে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র' গ্রন্থটির বিজ্ঞাপনটিতে ভুলবশতঃ লেখকের নাম ছাপা হয় নাই। গ্রন্থটির লেখক:—নেপাল মজুমদার। প্রকাশক: "সারস্বত লাইব্রেরী"।

২০৬, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

এই মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত।

ম্যানেজার:
(বিজ্ঞাপন বিভাগ)

মা বলছিলেন,
আমায় নাকি
দিন-দিনই
কচি দেখাচ্ছে ...
মা তো ছেলের দিক
টেনে কথা কইবেনই!
আসলে কিন্তু নির্মল
আর আমার তারিফ করা
উচিত। তিনি তো জানেন না
ওঁর আদরের ছেলেটিকে
আমিই নির্মল বার সাবানে
কাচা ধবধবে পোশাক
পরিয়ে অমন খোকাটি
করে রেখেছি।
নির্মল
Nirmal
BAR
SOAP
পূর্ব ভারতে বার সাবান
হিসেবে কাটতিতে
সবার উপরে
—সবার সেরা
বলেই।
কুসুম
প্রোডাক্টস লিমিটেড,
কলিকাতা-১
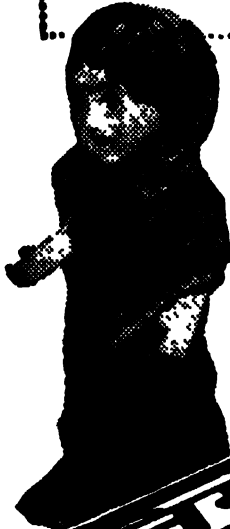
[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

প্রাণ যে বোহেমিয়ার লোকের মেলে সেটা বেশ বোঝা যায় বিশেষ করে ওখানকার উৎসবগুলো দেখলে। ওরা মজা করতে জানে। সারারাত ধরে নাচগানের উৎসবগুলোর শেষ হয় ভোরের আলো ফোটার পর। ড্যানিউব নদীর ধারে হলে ওরা বলবে—'দেখো দেখো—ড্যানিউব ভোরের আকাশের নিচে সত্যিই নীল—নীল ড্যানিউব।'

'তাই বুঝি ভোর পর্যন্ত নেচেকুঁদে অস্থির হও!'

'নিশ্চয়ই। আর একটা কারণেও ভোর পর্যন্ত জাগি। দেখো, দেখো আমার বান্ধবীর চোখ কত গাঢ় নীল দেখাচ্ছে।'

সত্যিই তাই। বান্ধবীর সোনালী চুলে ঢাকা মর্মর পাথরের মত সাদা মুখের মধ্যে নীল চোখ জোড়ায় ড্যানিউব নদীর ছায়া। নীলার মত নীল দেখাচ্ছে।

গ্রামাঞ্চল আরও সুন্দর। বিশেষ করে আমাদের মত বিদেশীর চোখে। এপ্রিল মাসে পাগল করা চেরীগাছের ফুল—ইংরিজিতে যাকে বলে ব্লসম! কোথাও ন্যাসপাতি গাছে বোল ধরেছে। কোথাও আপেল ফলতে শুরু হয়েছে। পাহাড়ী অঞ্চলগুলোর রূপ যেন দু' চোখে ধরে না! উঁচু নিচু, উঁচু নিচু। হাঁটছি, পাহাড় চড়ছি,—আবার নামছি। মানব কোথা কত স্মৃতি জাগাতে থাকে। মনে পড়ে যায় ছোটবেলার ছবি। মালয় দেশে থাকতে যখন কুয়ালালামপুরে ছিলাম তখন এমনি পাহাড়ী পথ ধরে স্কুলে যেতাম। অনেক উঁচুতে মস্ত বড় স্কুল। সেখান থেকে সারা কুয়ালালামপুর দেখা যেত।

কিন্তু বনের চেহারা কি ভয়ানক আলাদা। এশিয়া আফ্রিকার বন বা পাহাড়ী অঞ্চল কত অন্য রকমের। এমন কী গরু, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়ার চেহারাও সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। এখানকার গৃহপালিত পশুরা এখানকার লোকের মতই স্বাস্থ্যবান। পাহাড়ী গরুগুলোর গায়ের লোম ইঞ্চি খানেক লম্বা।

তখন বরফ গলে গিয়ে বসন্ত এসেছে। তাই সমস্তক্ষণ একটা চাঞ্চল্য! লোকের মধ্যে, গাছপালার মধ্যে, জীবজন্তুর মধ্যে। আর একটা চাঞ্চল্য এদেশে সব সময় অনুভব করেছি—নতুন জীবন গড়ার চাঞ্চল্য। কেবলি গড়ে চলেছে—অক্লান্ত শ্রমিক পিঁপড়ের মত।

লিদিচে গ্রাম দেখতে গিয়েছিলাম। যুদ্ধের শত ঘটনার কথা মনে আছে, অনেকে লিদিচের নাম শুনেছে নিশ্চয়ই। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত হিটলারের সাম্রাজ্য গড়ার বীভৎস দুঃস্বপ্ন ভাঙতে হাজার হাজার চেকোস্লোভাক মানুষ প্রাণ দিতে কুণ্ঠা করে নি। সেই সব সাধারণ মানুষের অসাধারণ কীর্তির কথা ফুচিক তাঁর ডাইরীতে লিখে গেছেন:

'পানক্রাৎস জেলের এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে এই কিংবদন্তী যেমনভাবে লিখতে চাই তা লিখতে পারছি না। আমাকে আরও সংক্ষেপ করতে হবে। সে সময়ের ঐতিহাসিক তাৎপর্যের চাইতে মানুষগুলোর ওপর নজর বেশি করে দিতে হবে। তারা সবচাইতে জরুরী।

'আমি জেলিনেক দম্পতির কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। সরল সাধারণ মানুষ। স্বাভাবিক অবস্থায় এদের মধ্যে বীর খুঁজে পাওয়া যায় না: আমরা গ্রেপ্তার হবার সময় তারা দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল। হাত ছিল মাথার ওপর তোলা। স্বামী বয়সে, স্ত্রীর মুখের কাঁটাটির বন্ধুর মেয়ের আদরে আজ। গেস্টাপোর লোকেরা যখন তাকে আদর্শ ফ্ল্যাটখানা পাঁচ মিনিটে তছনছ করে ফেলল তখন স্ত্রীর চোখে বিস্ময়ের ঘন ছায়া দিয়েছিল। তারপর সে মাথাটা আস্তে আস্তে স্বামীর দিকে ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল—

"এখন কী হবে, জুলা?"

স্বামী কখনই খুব বেশি কিছু বলতে পারত না। তাকে কথা খুঁজতে হত। কথা বলতে গেলে সে উত্তেজিত হয়ে পড়ত। এখন সে শান্তস্বরে উত্তর দিল। কোনোরকম প্রচেষ্টা বা কষ্ট এলো না: "আমরা মরতে চলে যাব, মারি।"

স্ত্রী চিৎকার করল না। কিম্বা কাঁদলও না। শুধু সাবলীল ভঙ্গিতে নিজের ডান হাতখানা নামিয়ে এনে স্বামীর হাত ধরল। একেবারে পিস্তলের মুখের সামনে। এইটুকুর জন্যে তাদের প্রথম পাওনা হল ঘুষি। স্ত্রী নিজের গাল মুছে, আক্রমণকারীদের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে প্রায় হাস্যকৌতুকের ঢঙে বলল:

"এমন সুন্দর দেখতে ছেলেগুলো", বলে সে গলার স্বর উঁচিয়ে দিল—"সুন্দর দেখতে, কিন্তু কি বর্বর।"

সে তাদের ধরেছিল ঠিকই। কয়েক ঘন্টা পরে ওরা যখন তাকে "পরীক্ষক কমিশনার"-এর আপিস ঘর থেকে মেরে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় তুলে নিয়ে গেল তখন তারা পিটিয়ে তার কাছ থেকে কিছু বার করতে পারে নি। তখন কিম্বা পরে—কখনই তারা তার কাছ থেকে কিছু জানতে পারে নি।'

ফুচিকের শেষ ডাইরীতে জেলিনেক দম্পতির মত আরও অনেক অসামান্য সাধারণ মানুষের বীরত্বের কথা লেখা আছে। এইসব মানুষ নিয়েই চেকোস্লোভাকিয়ার নয়া গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন।

১৯৪২ সালের জুন মাসে সারা দুনিয়া নাজী বর্বরতার প্রমাণ পেয়েছিল লিদিচেতে। এ গাঁয়ের সমস্ত পুরুষদের গুলী করে মেরে ফেলা হয়েছিল। নারী আর শিশুদের পাঠানো হয়েছিল কনসেণ্ট্রেশন ক্যাম্পে। গোটা গ্রামটি ধ্বংস করা হয়েছিল।

সারা পৃথিবীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে ভারতবর্ষেও আমরা মিছিল করেছিলাম। আমাদের বড় বড় শহরে "লিদিচে বেঁচে থাকবে" আওয়াজ তুলে দেশবাসীকে যুদ্ধ আর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জাগাবার চেষ্টা হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে "ইউনাইটেড নেশনস ডে" উপলক্ষে এদেশে চাঁদা তোলা হয়েছিল লিদিচের জন্যে একটি জমি কিনে দেবার জন্যে। ১৯৪৫ সালে যে বিজয়োৎসব হয়েছিল তাতে সারা চেকোস্লোভাকিয়া [illegible]

উঠেছিল। যুদ্ধ শেষ হয়েছিল প্রাগে। সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী শেষ পর্যায়ে জার্মান নাজীবাদকে একেবারে পিষে ফেলেছিল।

১৯৪৫ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ায় নয়া গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন হল। বড় বড় কল-কারখানা, জীবনবীমা, ব্যাঙ্ক, খনিজ সম্পদ, আর বৈদেশিক বাণিজ্য জাতীয়করণ করা হল এই গণতন্ত্রের প্রথম কাজ। বেগ পেতে হয়েছিল প্রচুর। কিন্তু অভিজ্ঞতার ঝাপটে মানুষ বুঝেছিল লাগাম আল্গা রাখলে চলবে না। যে সব বড় বড় ভূস্বামী আর যারা নাজীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল তাদের জমিজমা বাজেয়াপ্ত করে গরীব চাষীদের হাতে তা বিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ কাজে ছিল প্রচুর ঝামেলা। ধাপে ধাপে এগোতে হয়েছিল। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ধনতন্ত্রের পুনরুত্থানের অপচেষ্টা ব্যর্থ করতে চেকোশ্লোভাকিয়ার জনসাধারণকে মুঠো শক্ত করতে হয়েছিল।

চেকোশ্লোভাকিয়ার ওপর নজর রাখতে সোভিয়েত সৈন্যদের এদেশে থাকাটা অনেকে প্রয়োজনীয় মনে করতো। লোকে তাদের সম্মান করত, ভালবাসত। কিন্তু তবু কোনো বিদেশী সৈন্যের বছরের পর বছর এমনি অতিথি হয়ে থাকাটা বাঞ্ছনীয় মনে হত না। বিশেষ করে তাদের, যারা যুদ্ধোত্তর চেকোশ্লোভাকিয়ায় বড় হয়ে উঠল। ছোট দেশ। এমনিতেই সব সময়ে খবরদারীর মধ্যে থাকতে হয়। অথচ খোল নলচে বদলে ফেলতে চাইলেও আগের উপসর্গ কিছুটা থেকেই যায়। মাপকাঠি নিয়ে বসা বড় কঠিন।

মনে আছে লিদিচের কথা। ধ্বংসপ্রাপ্ত গাঁ-টাকে গড়তে গিয়েছিল যুব ব্রিগেড। দেখতে দেখতে সে গাঁয়ের চেহারা বদলে গেল। হাসি-কান্নায় যেন কানায় কানায় ভর্তি!

এদের কাণ্ডকারখানা দেখে নিজেকে বেজায় কুঁড়ে মনে হত। আদরে অপ্যায়নে —একেবারে ল্যাজে গোবরে হয়ে আছি। কাজ করব বলে জনাতে ওরা বলল—'বেশ তো, একটু গতরে খাটতে চাও? —যাও পাহাড় ভাঙো।'

শুনে তো আমি আহ্লাদে গদগদ। কিন্তু ঈশ্বর! এ কি! হাতে যে ফোস্কা পড়েছে! প্রথম পাঁচ মিনিটেই আমার দম নিকলে গেল।

লেনা বলে একটা মেয়েই সেদিন হেসে অস্থির হয়ে এমন অক্লেশে আমার ভাগের কাজ করে দিতে লাগল যে আমি একেবারে বেকুব। কিন্তু পরে জেদের বশে কিছুটা পারতাম।

ভেবেছিলাম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে দেশে ফিরে নিজেদেরকে [illegible] কলকাতাকে ঢেলে সাজাব। অভিজ্ঞতা হল বটে। কিন্তু দেশের মাটিতে পা দেওয়া মাত্র বিমানবন্দরেই যে আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা দেখলাম, তাতে চোখে সরষে ফুল ফুটতে লাগল। আমার কাগজপত্র, পাসপোর্ট, ছবি, নোটখাতা ইত্যাদি যাবতীয় "উৎসাহজনক" জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হল। কেন তা বলা হল না। ওসব কথা না কি বলতে নেই।

তারপর যা হবার হল। সাধের কলকাতা শুধু মিছিল দেখল। কিন্তু হাতে ফোস্কা পড়িয়ে একে গড়ে তোলার কোনো নিশানা খুঁজে পেলাম না। শুনেছিলাম এখানে আসল সমাজতন্ত্র হয়েছে। অনেকটা সেই কারণেই আমাদের বিদেশে অভিজ্ঞতা কুড়িয়ে আনতে যাওয়া। কিন্তু এ যে দেখি নামাবলী গায়ে মন্ত্র পড়ে চলেছে তো চলেছেই। হাতে আছে একটি জপের মালা। তাই আঙুলেই কেবল কড়া পড়ে যাচ্ছে আর কলকাতার রাস্তাগুলো গর্তে গর্তে ক্ষতবিক্ষত।

[ক্রমশঃ]

তখন শেষ চৈত্রের তেতে-ওঠা রোদ্দুরে পুকুরের জলটা চিকচিক করে কেঁপে কেঁপে উঠছে। লাইনবন্দী কয়েকটা নারকেল গাছের সরু লম্বা ছায়ার মধ্যে ছোট্ট দুটো ছায়া নিজেদের ধরাতে পারছে না। তাদের কিছু কিছু অংশ সামনে পেছনে বিচিত্র ধরণের ছায়ার ছবি এঁকে পড়ে রয়েছে।

গন্ধটা অনেকক্ষণই ছড়াচ্ছিল বাতাসে। এখন দুপুরের বাতাসে সেই কটু গন্ধটা নাকের ভেতর একটা অস্বস্তিকর সুড়-সুড়ি দিতে লাগল। ওরা, ওই ছায়া দুটো যাদের, তারা জানে, গন্ধটা কিসের। আরও জানে গন্ধ আজ থামবে না, কালও না, পরশুও নয়।

ওদেরই ঠিক পেছনে, হাত পঁচিশের মধ্যে কয়েক হাজার কাঁচা ইঁট পুড়ছে। আর হাজার রন্ধ্রের মধ্য দিয়ে ধোঁয়ার হাজার ফণা কুণ্ডলী পাকাচ্ছে। আর বাতাস সেই ধোঁয়ার গন্ধ গায়ে মেখে ছড়িয়ে পড়ছে চারধারে। কাঁচা ইঁট পুড়ছে। পুড়বে অনেকক্ষণ ধরে। পুড়ে পুড়ে লাল হবে। শক্ত হবে।

শক্রা ছোট্ট রুমালটা অনাবশ্যভাবে নাকের ওপর বুলিয়ে নিয়ে বলল, না, তোমার আর বাহাদুরী দেখাতে হবে না। তুমি বুঝি ভেবেছ, এই আধপোড়া ইঁট দিয়ে অবনীর মাথা ফাটাতে পারলে খুব একটা বাহাদুর গোছের কাজ করা হবে।

এতে তুমি বাহাদুরী দেখলে কোথায়? সুনীল শক্রার চোখের দিকে তাকাল।

তুমি নিজেও বেশ জানো, এটা বাহাদুরী দেখানোরই সামিল।

তোমাকে বোঝাতে পারব না শক্রা, এটা বাহাদুরী নয়।

শক্র মাটির গায়ে লেপটে-থাকা খানিকটা তাজা খানিকটা শুকিয়ে যাওয়া ঘাস ছিঁড়ল। তারপর সেই নেতিয়ে পড়া দুমড়ে থাকা সরু সরু ঘাসগুলোকে হাতের চেটোয় রেখে সোজা করবার চেষ্টা করতে লাগল।

সুনীল অনেক মুহূর্ত পুকুরের জলের দিকে চেয়ে কী যেন ভাবতে চেষ্টা করল। শেষে এপাশে নতুন কাটা বড় পুকুরটার বিশাল গহবরের দিকে চেয়ে বলল, তুমি কী বলবে শক্রা এই যে ছোট পুকুরটা কেটে বড় পুকুর করা হল, এটা কি কোনো বাহাদুরী নেবার জন্য?

ওটা প্রয়োজনের। তৃষ্ণার জল আর মারামারি এক নয়।

পৃথক মনে করলে পৃথক। কিন্তু ধরো যে লোক পুকুরটাকে বড় করেছে তার মনে তাতে তৃপ্তি; তেমনি মারামারি করেও অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে পারলে তৃপ্তি। তখন আর পৃথক থাকে না।

তোমার কথাগুলো ঠিক বি· কে· জি'র মতো। শক্রা হাসল। দাঁতগুলো ঈষৎ ফাঁক হল। আর সেই সময়েই শক্রার দিকে তাকিয়েছিল সুনীল। তার মুখখানাও হাসিহাসি খুশিতে ভরে উঠল। ঈষৎ নয়, মুখগহবরের ফাঁক দিয়ে আত্মপ্রকাশ করল অনেকগুলো দাঁত।

এখন কার প্রাণ।

টি. পি. এস-এর। যাবে না?

মনো।

ওরা কিন্তু খুঁজবে?

খুঁজুক গে।

চারদিকে দুপুরবেলার স্তব্ধতা। সম্মুখের ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে আসছে বাতাস। কেবল তারই একটা সন্-সন্ আওয়াজ। একটানা ছেদচিহ্নহীন। এমন সময় বাতাসে ঢেউ তুলল কয়েকটি ঘণ্টার ধ্বনি। শুক্লা একটু নড়ে সুনীলের মুখের দিকে চোখ তুলে বললে, উঠবে না?

বললাম তো উঠব না।

তরুণবাবু কিন্তু ঠিক খুঁজবেন আমাদের?

কেমন করে জানলে?

পোড়া ইঁটের পাঁজা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। তারই পেছনে একটা ছোট ধানক্ষেত পেরিয়ে কলেজের কম্পাউণ্ড। সেখান থেকে যখন সকলের অলক্ষ্যে ধোঁয়ার অফুরন্ত কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে ওরা এখানে আসছিল, সে সময় প্রফেসরস্‌রুমের জানলায় তরুণবাবুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল শুক্লা।

শুক্লা বললে, তরুণবাবুর চোখ! তুমি জান না?

কিরকম! হৃদয়ভেদী কটাক্ষের মতন কি?

তুমি ঠাট্টা করছ!

ঠাট্টা নয়। তুমি এই মেলামেশাকে অপরাধ বলে ভাবছ কেন?

অপরাধ বলে ভাবব কেন? জানছিলাম, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ভাল লাগে না।

প্রফেসরও তোমায় ঠাট্টা করে না কি?

ইয়ার্কি নয় সুনীল। তোমার কি? কেউ কিছু বললে, হয় দাঁত বার করে হাসবে, নয়তো এমন একটা ভাব দেখাবে যেন কত বাহাদুরী।

তোমায় আজ বাহাদুরীতে পেয়েছে। তোমার সঙ্গে বসে গল্প করছি, তাতেও বাহাদুরী।

লজ্জার আভাস মুহূর্তে ছড়িয়ে গেল শুক্লার সমস্ত মুখে। কপালের ওপর ইংরেজি কমা চিহ্নের মতন অসংখ্য ছোট ছোট চুল বাতাসে নড়ে-চড়ে খুলে পড়বার বিফল চেষ্টা করছে। ছোট্ট কপালের নিচে কাজলমাখা চোখে স্বপ্নের মত আবেশঘন রোমাঞ্চ। সুনীল চেয়ে চেয়ে দেখল। খুশি হল। আর তখন, ঠিক তখনই সম্মুখের পুকুরের ওপারের বন বাঁশঝাড় কি আম-কাঁঠালের বন থেকে ভেসে এল কুহু-কুহু কুহু-কু।

অন্য জগৎ থেকে চমকানিতে উঠল। সুনীল বলল, উঁ-হু-হু, উঁ-হুহু

তোমার ভাবে যে বাহাদুরী আছে তা সরবে ঘোষণা না করলেই কি নয়?

ঠিক তোমার মত। উচ্ছ্বসিত হল শুক্লা। কোথায় কবে কখন কিভাবে মারামারি করে কার মাথা ফাটিয়েছে—কাকে নাক খৎ দেওয়াতে বাধ্য করিয়েছে—তাই উচ্চকণ্ঠে ফেনিয়ে ফেনিয়ে বলা।

একটুও ফেনানো নয়। জিজ্ঞেস করো রমেনকে। হঠাৎ উত্তেজিত হল সুনীল। কেন, তোমার তরুণবাবুকে জিজ্ঞেস করো না, তিনিও তো ওই বাসেই যাচ্ছিলেন।

আঁচলটার কোণ ধরে সেটা আঙুলে জড়াবার চেষ্টা করল শুক্লা। ঠোঁটের কোণে একটা মিচকে হাসি। বললে, তরুণবাবু বুঝি তোমার পক্ষের উকিল।

রাখো। ওসব বাজে কথা। শোনো, স্পষ্ট কথাই বলি, অন্যায় হতে দেখলে আমি মেজাজ ঠিক রাখতে পারি নে। তখন আমার হাত চলে আগে।

সেটাই ভীষণরকম অন্যায়। এক অন্যায়কে রুখতে গিয়ে আর এক অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া।

অন্যায়ের দমন শক্ত হাতেই করতে হয়। তোমাদের মতন নরম হাতে হয় না।

আমাদের হাত নরম জানলে কেমন করে?

অ্যাঁ—থমকে পড়ল সুনীল অস্ফুটকণ্ঠে বললে, জানতে হয় না, জানতে পারা যায়।

তেমন করেই কি জানতে পারো না যে আমি ওই মারামারি পছন্দ করি না।

তুমি কি আমাকে একজন গুণ্ডা বলে মনে কর?

তোমার আজ হল কি? আমার মন এত নিচু, তুমি ভাবতে পারলে?

না হলে, তোমার কথাবার্তায় আমার কেবলই মনে হয় তুমি আমাকে মারামারি করে বাহাদুরী নিতে ছাড়া অন্য কোনো ভাবে ভাবো না।

দুজনেই চুপ করল। বাতাসে কটু গন্ধটা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। পোড়া মাটির গন্ধ। কাঁচা ইঁট পুড়ে পাকা হচ্ছে। লাল হবে। শক্ত হবে। সুনীল-শুক্লা মনে মনে নানা আঁকিবুঁকি কাটল কিছুক্ষণ। শুক্লার কপালটা তেলতেলে। নাসারন্ধ্র স্ফীত হচ্ছে, ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক। দুটো হাঁটু জড়ো করে দুহাত দিয়ে পা দুটোকে জড়িয়ে চিবুকটাকে সে আলতোভাবে ছুঁইয়ে রেখেছে যুগল হাঁটুর ওপর।

সুনীল একটা সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া ছাড়ল কয়েকবার। তারপর বললে, বিশ্বাস করো শুক্লা, কোনো প্রকার বাহাদুরী নেবার জন্য আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করি নে—সহ্য করতে পারি নে বলেই করি।

কিন্তু সেটা যখন কলেজে ফলাও করে বলো? তখন? তখন সেটা বাহাদুরী নেবার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।

তোমার তাই মনে হয়?

কার হয় না। সবাই হাসাহাসি করে। বিশেষ করে মেয়েরা।

মেয়েরা হাসে! কে হাসে? অনীতা হাসে কি?

হঠাৎ অনীতার কথা জিজ্ঞেস করছো?

হাসে কি না বলো?

বরং জিজ্ঞেস করতে পারো হাসে না এমন একজনও কেউ আছে কি না?

হুঁ। ওই অনীতার সম্মান রাখতে গিয়ে গত বছর কে মারামারি করেছিল, জিজ্ঞেস করো তো?

জিজ্ঞেস করবার কি আছে? আজ বাসে অনর্থক ঝগড়া করলে কেন?

করব না? যখন খুশি বাস থামাবে,

শ্রীমান

শ্রীমান সমরেন
মানুষ চিনেছেন:
দেশ বাঁচাতে, দেশের টাকায়
উকীল কিনেছেন।

হিজ্ হাইনেস্

হিজ্ হাইনেস্ বন্ধুর
একটিমাত্র কসুর;
তাঁর শ্বশুরের জামাতাটি
'সেন্ট্ পার্সেন্ট' অসুর।

হিজ্ মাস্টারস্

হিজ্ মাস্টারস্ মন্ত্রী
চান না কোনো বক্‌শিস;
তিনি শুধুই সাক্ষীগোপাল
সময়ে দেন 'প্রস্রী'।

প্যাসেঞ্জার নামবার আগেই ঘণ্টা বাজাবে এটা কি মগের মুল্লুক—

প্রতিবাদের একটা ধারা আছে তো? তোমার প্রতিবাদ সব সময়ই মারমুখী।

চুপ করল সুনীল। মনে মনে ভাবল, আশ্চর্য মেয়েরা। এতো বোঝে, এই সামান্য কথাটা কেন বোঝে না। না, বুঝতে চায় না। তাও তো নয়। আসলে পছন্দ করে না। আমি যা পছন্দ করি, ওর তাতে অপছন্দ। হ্যাঁ, এটাই আসল কথা।

রোদ সরে সরে যাচ্ছে। লাইনবন্দী নারকেল গাছের ছায়াও। ওদের গায়ে রোদ এসে পড়ে ওদের উত্তপ্ত করছিল। তখন বুঝতে পারল দুজনে। হাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওরাও নড়ন-চ..া।

তখন চোখে পড়ল। দূরে, ধান-ক্ষেতের আল ধরে দ..ি মূর্তি ক্রমশ দূরে আরও দূরে মি.. যাচ্ছে। শুক্লা বলল, অনীতা আর ..তা।

তুমি চিনতে পারছ।

হুঁ। হাসল শুক্লা। তুমি পারছ না।

পাগল। এতো দূর থেকে কখনও চেনা যায়। তুমি মেয়েমানুষ, তাই চিনতে পেরেছ?

তার মানে?

মানে জলবৎ তরলম্। চিনেছ স্রেফ শাড়ির রঙ-এর জন্য। এ কলেজের কোন্ মেয়ে কবে কোন নতুন শাড়ি কিনেছে—তা তোমাদের নখদর্পণে।

তুমি তো খুব মেয়েদের মনের খবর রাখো দেখি—কিন্তু মশাই, এ মন্তব্য সঠিক নয়।

তুমি কি বলতে চাও, শাড়ির রঙ্ দেখে তুমি ওদের চিনতে পারো নি?

অস্বীকার করব না। কিন্তু সব মেয়ের শাড়ির ইতিহাস আমি রাখি না, অনেকেই রাখে না। যাক্ গে। ওরা বাড়ি ফিরছে: তার মানে টি. পি. এস-এর ক্লাস শেষ। ঘণ্টা বাজা শুনেছ তো?

শুনব কেমন করে! সারাটা দুপুর ধরে কেবল তো ঝগড়াই করছ। আমাকে বলছ আমি মারামারি করে বাহাদুরী দেখাই—তুমি বোধহয় তেমনি ঝগড়া করেই বাহাদুরী দেখাও।

আমি মোটেই ঝগড়া করি নে। এখানে আসবার আগে ইঁটগুলোকে পুড়তে দেখে তুমি কেন বললে, এই ইঁট দিয়ে তুমি অবনীর মাথা ছাতু করবে!

কেন করব না। জানো ও আমাদের নামে কি সব বানিয়ে বানিয়ে বলেছে।

সেজন্য ওর মাথা ফাটাবে?

ফাটাব। হাজার বার ফাটাব। ইডিয়টটা বলে কি না—আমাদের জড়াজড়ি অবস্থায় চুমু খেতে দেখেছে সে।

বলেই হঠাৎ চুপ করল সুনীল। চোখের দৃষ্টি পুকুরের চিক্‌চিকে জলের ওপর ফেলে রাখল অনেকক্ষণ। শুক্লাও নীরব। দু' হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে ডান হাতে ঘাস ছিঁড়ছে।

সুনীলই নীরবতা ভাঙল। বলল, শুক্লা তুমি জানো বাজে কথায় অন্যায় আচরণে আমি সহসা উত্তেজিত হয়ে উঠি। তুমি বলো.—তোমার হাত পর্যন্ত কোনোদিন ছুঁই নি—অথচ এমন অপবাদ মুখ বুজে সহ্য করব।—ছটফট করে উঠল সুনীল।

শুক্লা দেখল সুনীলের চোখের তারায় সেই বুনো জন্তুটা জেগে উঠেছে। হাতের শিরাগুলো ভেসে উঠেছে। এমন অবস্থা মারামারির পূর্ব মুহূর্তে।

সুনীল। আস্তে করে ডাকল শুক্লা। আলতো করে ছুঁল সুনীলের হাতটা। বললে, অবনীর মাথা ফাটালেই এ অপবাদ থামবে তা ভেবো না।

সূর্য সরে গেল চোখের সামনে থেকে গাছপালার অন্তরালে। পুকুরের জলটা আর চিক্‌চিক্ করছে না। [illegible]

সরু-মোটা রেখাগুলো এঁকে-বেঁকে মিলিয়ে যাচ্ছে বাতাসে। শুক্লা ফিরে বসল। তাকাল সুনীলের দিকে। বললে, আজকেই একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। শয়তানের হাত তো বাড়তে পারে যত খুশি, সুতরাং তার আগেই ভাবা দরকার নিজেদের। না হলে—

নাহলে কি শুক্লা। বলো, থামলে কেন?

আজ এখানে বসে পর্যন্ত তো বলছি। তুমি এক এক দিন এক-একটা কাণ্ড বাধাও, আর আমি মনে মনে পুড়ে মরি। ভাবি, কেন তুমি এমন করো?

আমিও কি জানি না শুক্লা, এই মারামারির ইতিবৃত্তগুলো তোমার পছন্দ নয়। তুমি চাও শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন, নির্ঝঞ্ঝাট প্রহরভরা দিন। স্বার্থে ঘা না লাগলে আর পাঁচজন মানুষের মতন সব কিছুকে পাশ কাটিয়ে যাবার মতন মানসিকতা। শুক্লা, আমিও ভাবি, মনের মধ্যে ঝড় ওঠে। দেখা দেয় দ্বন্দ্ব। সারারাত সারাদিন ভাবি আর ভাবি। অন্তর্দ্বন্দ্বে জ্বলি আর জ্বলি। তবু কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি নে।

শক্ত করে সুনীলের হাতটা ধরল শুক্লা। বলল, কেন পারো না?

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সুনীল। তারপর ধীরে ধীরে শুক্লার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, যাতে পারি তার চেষ্টাই আমি দিনরাত করি শুক্লা। তবু পারি নে। তবু কথা দিচ্ছি তোমায়—আমি সেই চেষ্টাই করব। যদি পারি তবেই আবার কোনোদিন এমন নিবিড়-ভাবে বসব দুজনে না হলে—

উঠে দাঁড়াল সুনীল। পেছন পেছন শুক্লা। পোড়া ইঁটের স্তূপের কাছে এসে দুজনে দুদিক দিয়ে এগিয়ে চলল।

সেই লাল ত্রিকোণটি!

[illegible] রায়

আমাদের বাড়ির পাশেই এক হাতুড়ে ডাক্তার ছিল। সে কানে কম শুনতো, চোখে কম দেখতো, একটা পাও ছিল তার খোঁড়া। কিন্তু সেই বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তিটি পশার জমিয়েছিল কম নয়। তার চিকিৎসার পদ্ধতি, সে ছিল এক দেখার মত জিনিষ। পায়ের গোড়ালীতে ফোড়া হলে অবলীলাক্রমে সে গিয়ে দাঁত তুলে দিয়ে আসত।

—"ব্যাপারটা কেমন হোল ?"—জিজ্ঞেস করলে সে যুক্তি দিত—"কেন, খারাপ জিনিষ পেটে গিয়েছে বলেই না ফোড়া হয়েছে। দাঁত তুলে আমি সেই ফাঁড়াটা কাটিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি!"

তার জবর যুক্তি শুনে সবাই ধন্য ধন্য করতো। ওতে রোগ না সেরে, রোগী মরলেও তার পশার জমত খুবই!

আমাদের দেশের রাজনীতিতে এমন ধরনের হাতুড়ে অথচ পশার জম-জমাট কর্তাব্যক্তির অভাব নেই মোটেই। এঁরা, সকল অর্থনৈতিক উপসর্গের প্রতিকারকল্পে দাঁতওবাই আউড়ে এক চক্রেই আসর জমিয়ে ফেলেন।

এই ফ্যামিলি প্ল্যানিং আর তার উদ্ভাবকদের কথাই ধরুন না।—এঁদের মূল জিগিরটাই হচ্ছে দেশের দারিদ্র্য ঘোচাতে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ করতে হবে; অর্থাৎ জন্মের হার কমাতে হবে। কেন না, দেশে আবাদযোগ্য জমির একটা সীমা আছে। চাকুরীতে নিয়োগের সীমাও ক্রমশ সংকুচিত। অতএব জনসংখ্যার বাড়তি হার কমিয়ে ফেল। হাতুড়ে পাজিটি শিবানন্দের এ সব যুক্তি অবশ্যই মুখরোচক।

"খাদ্য নেই অতএব জনসংখ্যা কমাও।"—এ কথা যাঁরা বলেন, তাঁরা দেশে অনাবাদী জমি কতটা যে পড়ে আছে সে হিসেব চেপে যান। সমুদ্রে যে অফুরন্ত খাদ্যভাণ্ডার রয়েছে সেটাও বলেন না। মাটির তলায় গভীরে যে তৈল সম্পদ রয়েছে, তা থেকে কোটি কোটি মানুষের খাদ্যের উপযোগী প্রোটিন যে উৎপাদন করা যায় সেটাও গোপন করেন।

সে যাক, জন্ম-নিয়ন্ত্রণের [illegible] লেগেছে, আর [illegible]-এর [illegible] চলছে, [illegible] আজ সরকারী খাতে যে টাকাটা খরচ হচ্ছে, তার [illegible] [illegible] করলে লাখ দশেক শিশুর [illegible] দুধের ব্যবস্থা করা যেত। পঁচিশ হাজার একর অনাবাদী জমি [illegible] চাষযোগ্য হয়ে উঠত।

[illegible] [illegible] [illegible]

খাতে যে টাকা জলের মত নর্দমায় ঢালা হচ্ছে তার একাংশ ব্যয় করলে—দেশে গোটা দশেক চিনির কল চালু করা যেত বা নিদেনপক্ষে বেশ কয়েকটা হাসপাতাল বা মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হতে পারত।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ধোঁকা যাঁরা দিচ্ছেন, তাঁরা (আমাদের সেই হাতুড়ে ডাক্তারের মত) অর্থনৈতিক সমস্যার বায়োলজিক্যাল সমাধান দিয়েই যে ক্ষান্ত থাকছেন, তা নয়,—আগামী যুগের ভারতবর্ষের গোটা মানুষ সমাজটাকেই পঙ্গু করে দেবার এক মস্ত চক্রান্তের জাল ফেলেছেন।

অবশ্য, এ ষড়যন্ত্রে, কতখানি যে বিদেশী সাহেবদের অবদান, আর এ দেশী মোসাহেবদের অবদান রয়েছে—তা সঠিকভাবে বলা শক্ত। অবশ্য এ বিষয়ে এ-দেশ, ও-দেশের মধ্যে প্রকাশ্য ও গোপন সলা-পরামর্শের কিছু কিছু তথ্য ফাঁস হয়ে গেলেও, সম্পূর্ণ নথিপত্র জনসাধারণের হস্তগত হতে হয়ত কিছু দেরীই হবে।

* * *

পরিবার পরিকল্পনা, বা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ,—এই জাতীয় জিগিরগুলোর আড়ালে, নিছক লালসা-ভিত্তিক দুর্নীতি-বাদের অস্তিত্বটাই যে আছে তাই নয়, ব্যাপারটা আরও গভীর,—ব্যাপকভাবে ভবিষ্যৎ-হত্যার ষড়যন্ত্রটাই এতে প্রধানভাবে কার্যকরী! আগেই বলেছি,—এই শতকের উত্তর-তিরিশে, হিটলার, Genocide বা জাতিধ্বংসের পরিকল্পনা শুরু করেছিল। অবশ্য তার প্রধান লক্ষ্যটা ছিল য়িহুদী সম্প্রদায়! বর্তমান দশকে নাই-জেরিয়ায় বায়াফ্রানদের প্রত্যক্ষভাবে ঝাড়ে-বংশে ধ্বংস করবার মতলব ফেঁদেছে ফেডারেল সরকার আর ইংলণ্ডের উইলসন সাহেবরা। বোমা ফেলে, রাসায়নিক আর জীবাণু যুদ্ধ চালিয়ে ভিয়েৎনামের মানুষকে নির্মূল করবার দুরভিসন্ধি পোষণ করছে মার্কিন শাসকগোষ্ঠী। এগুলো সংঘাতিক হলেও,—এ সবের বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত লড়াই করছে ও করবে! কিন্তু ভারতবর্ষে, দারিদ্র্য-মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়ে, [illegible] সহজ দুর্নীতির [illegible] খাইয়ে, কণ্ঠরোধ করে, যেভাবে অনি-[illegible] পরিকল্পনা শুরু করা হয়েছে—তার [illegible] আর তুলনা নেই।

সরকারী প্রচারসূচীটিকে এমন সুকৌশলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সাধারণ লোক [illegible]—[illegible] জন্ম-নিয়ন্ত্রণ [illegible] [illegible]

দারিদ্র্য ঘুচে যাবে,—দেশে দুধ আর মধুর বন্যা বইবে!—যেন শোষণটা কিছু নয়। লোভ আর মুনাফাবাজীর কুটিল পথে, ফাটকাবাজদের আনাগোনাটা কিছু নয়!! যেন ধনতন্ত্রের পেষাই কলটাও কিছু নয়!!! সব মায়া!!

যারা চালে কাঁকর, খাদ্যে-পানীয়ে বিষ, আর ওষুধে ভেজাল চালিয়ে বর্তমানটাকে হত্যা করছে, তাদেরই সরকারী দোসররা বলছে,—"ভবিষ্যতের অনাগত শিশুগুলোর গলা টিপে ধরো! নইলে, সুখ যাকে বল, তা মিলবে না!"

এই সুখ বা আরাম লাভের ফাঁদে আর কেউ না হোক, কিছুসংখ্যক মধ্য-বিত্ত নিশ্চয়ই ধরা পড়েছে।

জ্ঞাতসারে হোক, বা অজ্ঞাতসারে হোক,—এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা অংশই জন্ম-নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে উচ্চকিত প্রবক্তা হয়ে উঠেছে। কারণ এদেশে অবক্ষয়ের অভিশাপ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেই প্রত্যক্ষভাবে ঘা দিয়েছে।

* * *

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে পশ্চিমী দুনিয়ার ছলা-কলার জবাব একবার দিয়ে ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এ-বিষয়ে কবির কথাতেই তাঁর বক্তব্য তুলে ধরি:—

"যেটা বাহুল্য, তাতে ছোট বড় কোন মানুষের কোন অধিকার নেই। ...মানুষের আসল প্রয়োজনের ভার খুব বেশি নয়।

"অনতিপ্রয়োজনীয়কে প্রয়োজনীয় করে তোলা যখন দেশশুদ্ধ সকল লোকেরই নিত্য সাধনা হয়, তখন বিশ্ব-ব্যাপী দস্যুবৃত্তি অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

"লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা নিয়ে পাশ্চাত্যেরা অনেকে উদ্বেগ প্রকাশ করে থাকেন। সমস্যাটি প্রধান হবার কারণ হচ্ছে সর্বসাধারণেরই ভোগ বাহুল্যের প্রতি দাবি। এত বড় ব্যাপক দাবি মেটাতে গেলে,—ধর্মরক্ষা করা চলে না মানুষকে মানুষপীড়ক হতেই হয়। সেই পীড়ন কার্যে ভাগ করে হাত পাকান হয় দুরস্থ অনাত্মীয় জাতির উপর দিয়ে।"

ইংরেজ অধিকারে এই "দূরস্থ অনাত্মীয়" জাতি ছিলাম আমরা—ভারতীয়েরা। আর আজ শাসক-সম্প্রদায়ের কাছে সেই দূরস্থ অনাত্মীয় জাতি হচ্ছে, শোষিত মানুষ, যারা অর্থনৈতিক মৌখের সমাজের নিম্নস্তরের অধিবাসী।

[illegible] [illegible] রবীন্দ্রনাথের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উচ্চারিত হয়েছে:—

শক্তিব্রত ঘোষ

ভরা দুপুরের ভরা কলকাতা
কুকুরের মত চিৎকার করে ;
চিৎকার করে, কেন না উঠোনে
ব্যস্ত শোকের আততায়ীদল বাড়িয়েছে পা,
ছোট্ট বুকের ভিতে সিঁদ কেটে ঢোকার আগেই
ভক্ত কুকুর চিৎকার করে
ধর্মতলায় টেরিটিবাজারে ;
গির্জের ঘড়ি পদতলনত, ডুবে যায় তার
ঘরফঘণ্টা সুখী দরোয়ান।
সূর্য কখন জমাট-আঁধার ধনী কামনায় সমর্পিত
নির্জনতায় মৃত্যু কখন দুপুরের দিনে
বাদুড়ের ঘুম, কখন দালাল ঘরে ফিরে গেছে
ফুলা বারোটার মধ্যরাতে।

কবিতার চেয়ে ঢের বিশ্বাসী কুকুর আমার
উঠোন কাঁপায়, ধর্মতলা, টেরিটিবাজার,
সমতলবাহী গৃহজনবধূ অনিদ্রিত।

"এর বিপদ এই যে, জীবনের ক্ষেত্রে, যে কিনারাতেই ধর্মবুদ্ধিতে আগুন লাগান হোক না,—সে অগুন, সেইখানেই থেমে থাকে না। ভোগী স্বভাবতই যে নিষ্ঠুরতার সাধনা করে—তার সীমা নেই। কারণ আত্মম্ভরিতা কোথাও এসে বলতে জানে না—"এইবার বাস্ হয়েছে।"

"বস্তুগত আয়োজনের অসংগত বাহুল্যকেই, যে সভ্যতার প্রধান লক্ষণ বলে মানা হয়—সে সভ্যতা অগত্যাই নরভুক!! নরবন্ত শোষণের বিশ্বব্যাপী চর্চা একদিন আত্মহত্যায় এসে ঠেকবেই! —এতে আর সন্দেহ নেই!"

বহুতর পরিকল্পনার অপমৃত্যু ঘটানোর তালে তালে—জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রচারে সেই আত্মহত্যারই পদচারণা শুরু হয়েছে।

* * *

এ কথা আজ কে না জানে, সব যুগের সভ্যতাই দাঁড়িয়ে আছে, যুগে যুগে ব্যয়িত মানুষেরই উদ্বৃত্ত শ্রমের ওপরে!! অর্থাৎ একজন মানুষ সারা জীবন ধরে যা উৎপন্ন করে, তার একটা ক্ষুদ্র অংশ সে নিজে ভোগ করে। বাকিটা সে রেখে যায় অন্যের জন্যে। ভবিষ্যতের জন্যে!

ঐশ্বর্য, একদিকে যেমন তাই মানুষেরাই সৃষ্টি, অপরদিকে, শ্রমরত-মানুষই সভ্যতার সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য।

মানুষের সংখ্যা কমানোর অভিসন্ধি যাঁরা আঁটেন, তাঁরা আসলে মানুষের সভ্যতা আর ঐশ্বর্যের মূলেই কুঠারাঘাত করতে চান। এদিক থেকে তাঁরা মূলত অপরাধী।

অন্য দিক থেকে দেখলেও এই অবক্ষীয়দের জীবন-বিমুখী পথের রেখাটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সম্প্রসারিত হওয়া, জীবনের একটা মূল সর্ত। কেবল মেটাবলিজমে নয়—মাইটোসিস-এও সে অবলুপ্তিকে পরাস্ত করে। কেবল নিজে বর্ধিত হওয়া নয়—সংখ্যার বৃদ্ধিও অনিবার্য।

নিয়ন্ত্রণের নামে যারা মানুষের সংখ্যা কমিয়ে আনতে চায় তারা জীবনের পরিপন্থী বলে কেবল দুর্নীতিগ্রস্তই নয়—মৃত্যুর অগ্রদূত বলে যমরাজের চেলাও।

এই চেলাদের কার্যকলাপের অন্য সামান্য কটি বিবরণ দিয়েই—লাল ত্রিকোণের পালাটি শেষ করব।

স্বাস্থ্যদপ্তর থেকে হাসপাতাল-গুলোর পাঠানো প্রায় চল্লিশ বছরের পুরোনো এক গোপন বৃটিশ সার্কুলার সম্প্রতি সকলের গোচরে এসেছে। তার মোদ্দা কথাটা ছিল এই, "পঞ্চাশ-ষাট বছরের রোগীগুলোকে, বিনা চিকিৎসাতেই মরতে দাও!" খোদ বৃটেনেই যদি এমন-তর গোপন নির্দেশ জারী হয়ে থাকে তো, তার অধীনস্থ উপনিবেশে কি ধরনের সার্কুলার নরভুক আমলাদের হাত ঘুরিয়ে যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছাতো তা সহজেই অনুমেয়।

১৯৪৭-এর পর ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য-কেন্দ্রগুলিতে ও অন্যত্র কি ধরনের সার্কুলার কার্যকরী হচ্ছে তা, কয়েকটি ঘটনা পর পর সাজিয়ে রাখলেই প্রকট হয়ে ওঠে।

নবজাত শিশু হাসপাতাল থেকে উধাও হয়ে যাওয়া এখনকার নৈমিত্তিক ঘটনা। প্রসূতি ধনুষ্টংকার রোগে মারা যাচ্ছে, আকস্মিকভাবে নয়—সরকারী ব্যবস্থাপনার গুণে, গাদায় গাদায়, প্রায় পরিকল্পিতভাবেই। রোগী ভর্তি হল, মেডিক্যাল কলেজে, পরদিন তাকে রাস্তায় মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেল।... প্রায় একদিন আগে জানা গেল, ষাট ফুট উঁচু হয়ে তিস্তার জল আসছে। অথচ সে কথা চেপে যাওয়া হল, জানানো হল না তাদের যাদের গায়ে প্রলয়ের ধাক্কা এসে লাগতে পারে। ..কুড়ি হাজার লোক ডুবে মারা গেল! এমন কি সাহায্য দেবার নাম করে এমনভাবে অনির্ধারিত স্থানে বস্তা ফেলা হোল যেখানে কিছুসংখ্যক শিশু পিষ্ট হয়ে সংগে সংগে মারা গেল। কাণ্ডি-কাচেরেলার সেই বিবেকবর্জিত গ্রামে কৃষ্ণমাদের বাচ্চা ছেলেটিকে পুড়িয়ে মারা, বা গান্ধী জন্মদিনে হরিজন শ্রমিককে কুপিয়ে হত্যা করা ; সুখাদিয়ার রাজস্থানে ১২ বছরের ছেলেকে বলি দিয়ে সরকারী বাঁধের নির্মাণ উদ্বোধন ; আন্দামানে হামফ্রেগঞ্জে তৃষ্ণার্ত মানুষকে জলের বদলে বুকের ছাতিতে লাথি মেরে নিহত করা ; ইন্দ্রপ্রস্থ ভবনের ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে নিম্নপদের সরকারী কর্মচারীকে থেঁৎলে মারা—এর প্রত্যেকটির সঙ্গে বর্তমানের পরিকল্পনাবাজ সরকারের প্রত্যক্ষ না হয় পরোক্ষ যোগ রয়েছে।

এসব নিশ্চয়ই সেই নরভুক পরিকল্পনার অন্তর্গত। কিন্তু প্রশ্ন এই, এমন আর চলবে কত দিন??

[প‍ূর্ব-প্রকাশিতের পর]

জে, বি কাগান ও অক্সফোর্ড প্লে হাউস : আমাকে যদি কখনও আত্মজীবনী লিখতে হয়—বলেছেন নর্মান মার্শাল—তাহলে আমার প্রথম জীবনের রঙ্গমঞ্চের অভিজ্ঞতার পরিচ্ছেদটি পড়তে পাঠকের অত্যন্ত একঘেয়ে লাগবে। অন্যান্য লোকের লেখা বইতে দেখতে পাই তাদের বালক বয়সের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত হয়ে রয়েছে আনন্দ রঙের দিনগুলি—পড়ে আমার হিংসাই হয়। কারণ আমার প্রথম জীবনে কোন উল্লেখযোগ্য ভাল থিয়েটার দেখবার সুযোগ হয় নি। আরভিং-এর শাইলক দেখি নি, ফর্বস রবার্টসন শহরে সফরে এলে এক সপ্তাহ ধরে লাঞ্চের টাকা বাঁচিয়ে তাঁর থিয়েটারের সিট রিজার্ভ করি নি, ডুজের স্বল্প সময়ের ম্যাটিনি দেখবার জন্য স্কুল পালাই নি, জুলিয়াস সিজারে অজমাণ্ড লিয়ার্লের এ্যান্টনীরূপী ফ্রেন্ডস, রোমান্স, ... বক্তৃতা শুনি নি, বারে নিদ্রিত অবস্থায় ট্রির সেঙ্গালীর চেহারা স্বপ্নে দেখে আঁতকে উঠি নি। এলেন টেরীর পেশা পাড় গিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহের হাতখরচার টাকা বাঁচিয়ে তাঁকে ফুলের তোড়া উপহার দেবার ব্যবস্থা করি নি। সারা বার্নার্ডকেও আমার দেখবার সৌভাগ্য হয় নি।

আমার থিয়েটার দেখার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই রকম—এডিনবরার লাইসিয়াম থিয়েটারের ড্রেস সার্কেলের প্রথম সারিতে গিয়ে বসেছি মায়ের সঙ্গে—পরণে প্রথম দিকে থাকতো ইটন স্যুট, পরের দিকে ডিনার-জ্যাকেট। যে সব দল মিউজিক্যাল কমেডী নিয়ে সফরে আসতো তাদের শো দেখতে যেতেম। এই সব কিছু কিছু শোর—যা দেখেছিলাম—নাম হচ্ছে : দি পার্ল গার্ল, টিনা, দি ডান্সিং মিস্ট্রেস, দি ম্যারেজ মার্কেট। জিপসী লভ, দি সানসাইন গার্ল, দি গার্ল ফ্রম উটা বেট্টি, ব্লুই জিন্স, টু লাইটস দি নাইট, দি মেইড অব মাউন্টেন্স, থিয়োডোর এ্যান্ড কম্পানী—আরও অনেক নাম মনে নেই। যে সব ... আমি দেখেছিলাম, তাদের ... তাদের ছিল সে সময়ের ট্যুরিং ... দ্বারা অভিনীত সকল কতকগুলো নাটক—যেমন ধরুন : হোয়েন নাইটস ওয়্যার বোল্ড, আর ইউ এ মেসন ? দি প্রাইভেট সেক্রেটারী, চার্লিজ আণ্ট, ব্রুস্টার্স মিলিয়নস। অবশ্য ডর্বাল কার্ট দেখেছিলাম, টেরিজদের দেখেছি দি স্কারলেট পিম্পারনেল-এ ও সুইট নেল অভ ওল্ড ড্রুরী-তে এবং মার্টিন হার্ভেকে দেখেছি, দি ওনলি ওয়েতে, দি সিগারেট মেকার্স রোমান্সে এবং দি ব্রেড অভ স্ট্রেসহ্যামসে। ফ্লাইং ডাচম্যান সম্পর্কীয় একটি নাটকে ম্যাথিসন ল্যাংকে এবং গার্লস স্কুল বিষয়ক একটি প্লেতে আওয়েন নেয়ার্সের অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এ ছাড়া নামকরা শিল্পীর ভেতর এক সিসিল কোর্টনিজের মিউজিক্যাল কমেডীতে অভিনয় দেখেছি—এঁর বাবা যখন দল নিয়ে সফরে আসতেন তখন মিস কোর্টনিজ তাতে অংশগ্রহণ করতেন।

আজকের দিনের কথা আলাদা। কোন বালক বড় প্রভিন্সিয়াল সিটিতে মানুষ হলেও ভাল ভাল লণ্ডন প্রোডাকসন দেখবার আজ কোনই অসুবিধা হয় না। ঐ সব দল মূল কাস্ট সহ অভিনয় দেখাতে আসেন লণ্ডন থেকে। আর স্থানীয় রেপারটরী থিয়েটার তাকে সুযোগ দেয় অন্যান্য নাটক এবং তৎকালীন সফল নাটকগুলোর মঞ্চাভিনয় দেখবার। এই সব রেপারটরীতে ক্ল্যাসিকসও প্রডিউস করা হয়। আমার বয়স যখন টিনসের গণ্ডীতে অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং তার পরবর্তী সময়ে, প্রভিন্সিয়াল থিয়েটার তখন খুব খারাপ অবস্থার ভেতর দিয়ে চলছিল। থিয়েটার দেখতে ভালই লাগতো—কিন্তু ঐ সময় এমন কোন ভাল নাটক দেখি নি বলেই বুঝতে পারি নি যে বই পড়ে যে চিন্তার খোরাক এবং উত্তেজনা পাওয়া যায় তা থিয়েটার থেকেও আহরণ করা সম্ভব। আমাদের সময়ে ছাপা নাটক হাতে পাওয়াও সহজ ছিল না। আজকাল প্রতি স্কুলে ডিবেটিং সোসাইটি এবং লিটারেরি

জন গিলগুড

সুন্দরী প্রতিযোগিতা—ফ্যাসন প্যারেড

সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার নামে একটা তামাসা শুরু হয়েছে দেখা যাচ্ছে। এতকাল সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা গ্র্যান্ড, গ্রেট ইস্টার্নের মত হোটেলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমে দেখা যাচ্ছে পরগাছাদের স্বপ্নরাজ্য থেকে মাটির জগতে নেমে আসছে। কথাটায় শ্রেণী গণ্ডী লোপ পাচ্ছে মনে করে খুশি হবার কিছু নেই, বরঞ্চ ভাবনার আছে।

দেশে নাটকের অভিনয় বাড়ছে, চলচ্চিত্র-চিন্তা বাড়ছে, সঙ্গীত ও নাচের চর্চাও বেশ বেড়েছে। শিল্প-চিন্তা ও চর্চা বাড়া আনন্দের কথা। শিল্পের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মনের বিকাশ ও প্রসার ঘটে। সুন্দরকে ভালবাসতে শেখে। কিন্তু সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা, ফ্যাসন প্যারেড এসব কোন ধরণের শিল্পের মধ্যে পড়ে কি না জানি না। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে শিল্পচর্চার সঙ্গে সঙ্গে এদিকেও একদল লোক উদ্যোগী হয়েছেন।

ভারতের মেয়েরা সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে বিশ্ব-সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করছে। এ পর্যন্ত কয়েকজন বিদেশে গিয়ে বেশ আসর জমিয়েছেন। যাঁরা সুন্দরী প্রতিযোগিতা থেকে ফিরে এসেছেন—লক্ষ্য করার ব্যাপার তাঁরা আর এসব ব্যাপারে কোন উৎসাহ দেখান না। রীতা ফারিয়ার সম্পর্কে অবশ্য খবর মাঝে মাঝে কাগজে প্রকাশিত হয়। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার ব্যাপার নিয়ে কয়েকটি ফিল্ম হয়েছে। ফিল্মগুলিও সত্যকে গোপন করতে পারে নি। দেখা গেছে এসব প্রতিযোগিতার পেছনে প্রধান পাণ্ডা একদল ব্যবসায়ী। টয়লেট কোম্পানী, ফিল্মের শিল্পী অলংকারী থেকে বিভিন্ন রকমের ব্যবসায়ীরা এর মধ্যে থাকেন। প্রতিযোগিতা শেষে নজরুলের সুন্দরীরা কেউ গৃহবধূ, কেউ এয়ারহোস্টেস, কেউ রিসেপশনিস্ট, কেউ বা মডেল হিসাবে কাজ পান। কিন্তু সবাই কি পান!

আজকাল সুন্দরী প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা কেবল ব্যবসায়ীদের ব্যাপারও আর নয়। এর মধ্যে রাজনীতিও রয়েছে। কথাটা বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সাম্রাজ্যবাদীদেশগুলি নানাভাবে প্রাচ্যের এবং ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকার মানুষকে নেশাগ্রস্ত করছে। দেখা যায় প্রাচ্যের ও পিছিয়ে পড়া দেশগুলি থেকেই বিশ্বসুন্দরী নির্বাচিত হচ্ছে। এই প্রাচ্য ও লাতিন আমেরিকা প্রীতির পেছনে নাকি সি. আই. ই নামক মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার উৎসাহ রয়েছে। কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে বেরিয়েছে ম্যানিলায় এশীয় সুন্দরী প্রতিযোগিতার ছবি।

পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি এক সুন্দরী প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। এবার প্রতিযোগিতা যেভাবে হয়েছে তাতে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা যোগ দিতে পেরেছে। এই প্রতিযোগিতাকে সাধারণের মধ্যে যাঁরা নিয়ে এসেছেন তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত ব্যায়ামবিদ্ বিষ্ণু ঘোষ অন্যতম। এতদিন ইনি দেহ-চর্চার সাধনা করেছেন, জীবনসায়াহ্নে সুন্দরী প্রতিযোগিতায় আগ্রহী হয়েছেন। সকলকে টেক্কা দিয়েছে অর্ডন্যান্স ক্লাব। ওদের কাজটা নীরস হলে কি হবে, রস সিঞ্চন করেছে ফ্যাসন প্যারেড করে। প্রায়

দি লাইভ ব্রেক' ছবির নায়িকা মেভেনা মেকেমেনেজ

সন্ধ্যা নীড় সংস্থার 'বনলতা মিটার' নাটকের একটি দৃশ্য

৫৮ জন বঙ্গললনা নাকি যোগ দিয়েছিল। কেউ কেউ মিনিস্কার্ট পরে, কেউ সাঁতারের পোষাকে। একটানা সাড়ে ছয় ঘণ্টা এই সুন্দরীরা নাচ গানও করেছে। অবশ্য খানা এবং পিনা যে বাদ গেছে সে কথা নয়। সি, আই, ই-র অনুপ্রেরণায় কত-রকমের শিল্পের সঙ্গে আমরা পরিচিত হচ্ছি।

সুন্দরের সাধনা চিরন্তন। মানুষ সুন্দর হতে চায়। কিন্তু জীবনের নিম্নতম চাহিদা মেটাবার ব্যবস্থা সকলের জন্য না থাকলে সুন্দরের নামে ঘটে বিকৃতি। আজ যা ঘটছে তা সুন্দরের বিকৃতি। দেশের বিরাট অংশে যখন বন্যার্ত নারীরা নিরাশ্রয় ও নিরন্ন, যখন কলকাতার রাজপথে শত শত নারী ফুটপাতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে, যখন দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে কত মেয়েদের সৌন্দর্য ফুটে উঠতে পারছে না, তখন দেশ ও মানুষ সম্পর্কে বোধহীন মেয়েরা সেজেগুজে মাথায় মুকুট পরে সৌন্দর্যের রাণী সাজছে, সাঁতারের পোষাক পরে ফ্যাসন প্যারেডের নামে নিজেদের সম্মান বিসর্জন দিচ্ছে। ব্যাপার দেখে 'নীরোর বাঁশী' বাজাবার কথা মনে পড়ছে।

সায়গন, ফরমোজা, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশে এবং সম্প্রতি ভারতে সুন্দরী প্রতি-যোগিতা ও ফ্যাসন প্যারেডের বাড়াবাড়ির সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতির কোন সম্পর্ক আছে কি?

—[illegible]

নাটকের কথা

সন্ধ্যানীড়ের অনুষ্ঠান

গত ৭ই ডিসেম্বর শ্রীশিক্ষায়তন মঞ্চ-গৃহে শ্রীঅশোক সেন (পিলালি)-এর পরি-চালনায় "সন্ধ্যানীড়" পরিবেশন করেন ব্রেশট্-এর কতকগুলি অমর গান এবং ফরাসী নাট্যকার হেনরী ফ্রান্সোইস বেক-এর La Parisienne-এর ভাবালম্বনে একটি দুঃসাহসিক নাটিকা "বনলতা মিটার"।

ব্রেশটের মোট পাঁচটি অনুদিত গান ও দুটি কবিতার আবৃত্তি নিয়ে অশোক সেন-এর মনোজ্ঞ আলোচনা সহ ব্রেশট-এর গানের এই অনুষ্ঠান বাংলাদেশে অভিনব এবং অভিনন্দনযোগ্য। গানগুলি অনুবাদ করেছেন কবি দুর্গাদাস সরকার। সাপ্তাহিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় কবিতার আকারে এগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। গানগুলিতে সুর দিয়েছেন প্রভাতভূষণ। গেয়েছেন নয়নিকা দাসগুপ্ত ও প্রভাতভূষণ। আবৃত্তিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন দীপ্তি চক্রবর্তী। পরিচ্ছন্ন প্রাণময় দীপ্ত এই অনুষ্ঠানটি অনেকদিন মনে থাকবে। অনুদিত গানের প্রতিটি শব্দ সুপ্রযুক্ত। সহজ স্পষ্ট ভাষায় ব্রেশট-এর দরদ, মানবিকতা ও বঞ্চিত সর্বহারাদের কর্তব্য এখানকার দিনে অত্যন্ত যুগোপ-যোগী করে পরিবেশিত হয়েছে। সুরারোপে প্রভাতভূষণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। দু-একটি গান কোরাস-এ গাওয়া হলে হয়ত ভাল হত। গানগুলির ছন্দে আরও বৈচিত্র্য আসার অবকাশ ছিল। একখানি সুপ্রযুক্ত রবীন্দ্রসঙ্গীতের পর এই অনুষ্ঠানটি শেষ হল। এক হিসাবে এটি তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ দুই দেশের দুই মহান মনীষীর অন্তরের সাযুজ্য অনুভব করা যায়।

ব্রেশট-এর গানের অনুষ্ঠানের পর আরম্ভ হল "বনলতা মিটার" নাট্যাভিনয়।

সন্ধ্যানীড় সংস্থার 'বনলতা মিটার' নাটকের একটি দৃশ্য   ছবি : [illegible]

'সাবরমতী' ছবিতে সুপ্রিয়া দেবী ও মাঃ অরিন্দম

হয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন সুব্রত সেন। এক সন্তানহারা মায়ের কাহিনী ছবিটির বিষয়বস্তু।

তিন ভুবনের পারে

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'তিন ভুবনের পারে' ছবির চিত্র গ্রহণ করা

হচ্ছে নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে। সমরেশ বসুর কাহিনী অবলম্বনে এই ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক। ছবির চিত্রশিল্পী রামানন্দ সেনগুপ্ত। প্রধান ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করছেন তনুজা ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন সুমিতা সান্যাল, তরুণকুমার, সুব্রতা চ্যাটার্জী, সুলতা চৌধুরী, রবি ঘোষ ও অরুণ বসু।

শিশুদের

আগামী ২২শে ডিসেম্বর, রবিবার সকাল ন'টায় মহাজাতি সদনে "বাবলু" ছায়াছবি প্রদর্শিত হবে।

সংবাদকণা

॥ দ ॥

ক্যান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুনায় ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের তোলা

তপন সিংহের 'আপনজন' ছবিতে স্বরূপ দত্ত ও [illegible]

"বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত মন্তব্য প্রসঙ্গে

এম-ডি পরীক্ষার ব্যাপারে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত মন্তব্য প্রসঙ্গে আপনার পত্রিকার গত দুটি সংখ্যায় যে সংবাদ এবং প্রতিবাদপত্রগুলি ছাপা হয়েছে, তা আমার মত হতভাগ্য এম ডিতে অকৃতকার্য এক ছাত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আপনারা মৌচাকে ঢিল দিয়েছেন। বলতে পারি সাপের গর্তে হাত ঢুকিয়েছেন। জানি না, শেষ পর্যন্ত সাপটিকে টেনে আনতে পারবেন কি না। কারণ তার আগেই তার ছোবলে আপনাদের অক্কা প্রাপ্তি ঘটতে পারে। দীর্ঘ এই দুর্ভেদ্য চক্রকে কেউ ভাঙতে পারে নি।

আমি কয়েকটা প্রশ্ন আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাই—নিজের কেরিয়ার এর জন্যে নিশ্চিতভাবে বিপন্ন হবে জেনেও। আমি জানি, আমার নাম যদি কোনোক্রমে প্রকাশ পায়, তাহলে এম ডি পাশ করতে পারব না এবং চাকরীজীবনে প্রমোশনও পাব না। কারণ ভজনা না করতে পারলে এ বৈতরণী পার হওয়া কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়।

যাহোক, আমার প্রশ্নগুলির জবাব আপনার বঙ্গদর্শনের লেখক বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দয়া করে জানাবেন কি?—

(১) অনেক মেধাবী ছাত্রও এম ডি-তে ফেল করেন কেন? এরকম প্রমাণ আছে, এম আর সি পি পাশ করা ব্রিলিয়ান্ট রেকর্ডের ছেলেও ফেল করছেন। তুলনায় দেখা যায় যাঁরা এম বি বি এস-এ ভাল ফল করেন নি, তাঁরাও পাশ করেছেন এক চান্সে।

(২) এ কথা কি ঠিক যে, যাঁরা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন, তাঁরা 'কর্তা'কে বেশি 'কস' দেন বলে তুলনায় বেশি পাশ করেন?

(৩) এ কথা কি ঠিক যে, কর্তার মতানুযায়ী না চলায় কয়েকজন প্রখ্যাত চিকিৎসকের ছেলেকে বারবার ফেল করতে হয়েছে বা এখনো ফেল করছে?

(৪) এ কথা কি ঠিক যে ট্রপিক্যাল স্কুলের কোনো এক ডাক্তার ভাল পোস্টিং-এর লোভে অর্গানাইজ করে আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের প্রতিবাদ করতে দলে দলে ডাক্তারদের পাঠাচ্ছেন?

(৫) এ কথা কি ঠিক যে যাঁরা প্রতিবাদ [illegible], তাঁরা অনেকে কর্তার চাপে পাড়ে [illegible] ঐ প্রতিবাদ জানাতে? চৌদ্দ-[illegible] করে যা লোক [illegible] তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে দলে দলে আপনার অফিসে যাবার জন্যে?

(৬) এ কথা কি ঠিক যে, একাডেমিক কাউন্সিলের প্রমোশনের লোভ দেখিয়ে অনেককে প্রতিবাদ জানাবার জন্যে পাঠানো হচ্ছে?

(৭) এ কথা কি ঠিক যে, কর্তাব্যক্তিটি সমস্ত একাডেমিক কাউন্সিল বা সমস্ত কলেজের সমস্ত কমিটিতে আছেন এবং কোনো মিটিং-এ গরহাজির থাকতে চান না?

(৮) এ কথা কি ঠিক যে, যাঁদের প্রতিবাদপত্র ছেপেছেন, তাঁদের অধিকাংশ-এর নামেই একটি ডাক্তারী বই-এর লেখক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন?

(৯) এ কথা কি ঠিক যে, একদল ছাত্র পরীক্ষার প্রাক্কালে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পান? অনেকে কেস দেখেন আগে থেকেই—যে কেস আসে পরীক্ষায়? আর একদল হতভাগ্য ছাত্র এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন?

(১০) আর একটি প্রশ্ন, 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' এই মতবাদের উপরেই কি এম ডি পরীক্ষার অন্য পরীক্ষকগণ নির্ভর হন না?

(১১) এরকম মজাকথা শোনা গেছে, আর নাকি কেউ পড়ান না। ভবিষ্যতে একজন নাকি পড়াবেন না এবং তাঁদের বক্তব্য—এই একজনই কেন এম ডি পড়াবার উপযুক্ত, আর কেউ নন। একথা কি সত্যি যে, কোনো প্রখ্যাত প্রবীণ চিকিৎসকের ক্লাসে অধিকাংশ ছাত্র যান না,—ভিড় করেন একজনেরই দরবারে? অন্য সকল বিশেষজ্ঞ-দের কি এর দ্বারা অপমানিত করা হচ্ছে না?

(১২) এটা কি এথিকস্ যে, যিনি এম ডি পরীক্ষার কর্তা তাঁর ছেলে পরীক্ষা দেয়? এটা কি বাঞ্ছনীয়?

(১৩) এম ডি পরীক্ষার এ জাতীয় গলদ সম্পর্কে ১৯৬২ সালে 'যুগান্তর' ও 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় চাঞ্চল্যকর পত্র বের হয়েছিল। তার প্রতিকার কি হয়েছে?

(১৪) আবহমান কাল থেকে একই কলেজে পরীক্ষা হয় কেন?

পরিশেষে বক্তব্য, আপনারা সত্য প্রকাশের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। আমার মনে হয়, আপনাদের কপালেই দুঃখ আছে। দুষ্ট স্বার্থচক্রকে ভাঙা কি আপনাদের ক্ষমতায় কুলোবে? যদি তা সম্ভব হয়, তাহলে তখন কতকগুলি মেরুদণ্ডহীন পদালোভীর কি অবস্থা দাঁড়াবে? সবচেয়ে অবাক লাগছে দেখে সরকারী ডাক্তাররা সরাসরি কিভাবে আপনার কাছে প্রকাশের জন্য পত্র পাঠালেন আর আপনিই বা কি করে ছাপলেন। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য-দপ্তর কি 'থ্রু প্রোপার চ্যানেল' ছাড়া সরকারী ডাক্তারদের প্রতিবাদপত্র ছাপাবার আদেশ দিয়েছেন বর্তমান ক্ষেত্রে? তবে এ কথাও ঠিক, কিছু পেটোয়া ডাক্তার চাকরি রক্ষার খাতিরে 'কর্তা'ব্যক্তিকে সায় দিলেও এমন কিছু নিরুপায় সৎ ডাক্তার আছেন, যাঁরা নিরপেক্ষ তদন্ত হলে গোপন সাক্ষ্যর দ্বারা সাপটিকে গর্ত থেকে টেনে বের করে দিতে পারেন। সেই তদন্তের ভার হাই-কোর্টের কোনো বিচারপতির উপর দিতে হবে। বিচার বিভাগীয় তদন্ত না হলে 'কর্তা ব্যক্তি'টি অতি ক্ষমতার বলে হয় দংশন করবেন না হয় সব চাপা দেওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলবেন।

—জনৈক অকৃতকার্য এম-ডি পরীক্ষার্থী

*

গত ৫ই ডিসেম্বর আপনার পত্রিকায় "বঙ্গদর্শন" অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি মন্তব্যের প্রতিবাদ না করলে অন্যায় হবে বলে আমি মনে করি। আমার মনে হয় যে, কোন উচ্চতর পরীক্ষায় সাফল্য প্রধানত ২টি জিনিসের উপর নির্ভরশীল। প্রথমটি অধীত বিদ্যার উপর দখল। আর দ্বিতীয়টি "লাক"। দুর্ভাগ্যবশত কারো কারো ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় কারণটি পুনঃ পুনঃ অসাফল্যের প্রধান কারণ হলেও এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না যে এম ডি ডিগ্রী পাওয়াটা [illegible] ব্যক্তির মর্জির উপর নির্ভরশীল। এম ডি পাশ করতে হলে কোন [illegible] কোচিং ক্লাসে [illegible] ভর্তি হতে হবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ধার্য্য করতে হবে—এ ধরনের মন্তব্য আমাকে আশ্চর্যান্বিত করেছে।

—ডাঃ কে পি সাহা
নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ
কলকাতা

*

আপনাদের ৭৩ বর্ষ, ২৪শ সংখ্যা, ১৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৭৫ সংখ্যায় "বঙ্গদর্শনে" চিকিৎসা জগতের কায়েমী স্বার্থ সম্পর্কে আলোচনায় লেখক এম ডি ডিগ্রী প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন, তার বিরুদ্ধে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী চিকিৎসা জগতের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

'বঙ্গদর্শনে' এম ডি ডিগ্রী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, চিকিৎসাশাস্ত্রের সর্বোচ্চ ডিগ্রী এম ডি পাওয়াটা জনৈক ব্যক্তির মর্জির উপর নির্ভরশীল, অধীত বিদ্যার উপর নয়। চিকিৎসা জগতের প্রতিটি অধ্যাপক তো বটেই, স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাও জানেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই এম ডি ডিগ্রী পরীক্ষায় চারজন পরীক্ষক নির্বাচিত হন। ফলে, এই পরীক্ষার কোন এক ব্যক্তিবিশেষের মর্জির উপর নির্ভর করে না। আরো বলতে চাই যে, উক্ত বিশেষ ব্যক্তির 'পুত্রের' কোচিং ক্লাস প্রসঙ্গে যে দুর্নীতির কথা বলা হয়েছে, তাও মিথ্যা এবং অপপ্রচার মাত্র। ছাত্র-ছাত্রীদের অনুরোধেই উক্ত বিশেষ ব্যক্তির 'আলোচ্য পুত্র' স্বীয় পসার ক্ষুণ্ন করে, এম ডি ছাত্রদের সহানুভূতির সঙ্গে শিক্ষাদান করেন। বিনা পারিশ্রমিকে নিঃস্বার্থভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সমাজের সুপ্রতিষ্ঠিত একজন কৃতী চিকিৎসক তাঁর যে বহুমূল্য সময় অপব্যয় করেন, তার জন্য চিকিৎসা জগতের অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী চিরকৃতজ্ঞ।

ইতি—ডাঃ চিত্ত ব্যানার্জী, এম-ডি, ডাঃ বন্দিতা বসু, ডাঃ প্রণবকুমার দাস, ডাঃ দুজয়া চক্রবর্তী, ডাঃ অরবিন্দ মল্লিক, ডাঃ রাজশ্রী সিনহা প্রভৃতি।

গত ৫ই ডিসেম্বর তারিখের বঙ্গদর্শনে আপনি চিকিৎসা জগতের কায়েমী স্বার্থ সম্পর্কে আলোচনায় এম-ডি পরীক্ষা সম্পর্কে যে অভিযোগ করেছেন তার জন্য আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব তা ভেবে পাচ্ছি না। চিকিৎসা জগতে যে কথাটি ছিল ওপেন সিক্রেট অথচ ভয়ে যে বিষয়ে কেউ কোনদিন মুখ খুলতে সাহস করেন নি, এখনো মুখ খুলতে নারাজ, আপনারা তা বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ করেছেন দেখে আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না।

যাঁদের বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগ, তাঁদেরই কিছু ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি গত সংখ্যায় সাপ্তাহিক বসুমতীর পাঠকমনে একটি প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছেন। তাঁরা লিখেছেন, "চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি অধ্যাপকই জানেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সর্বোচ্চ ডিগ্রীর পরীক্ষায় চারজন পরীক্ষক নির্বাচিত হন এবং ইঁহাদের মধ্যে বহিরাগত বিশিষ্ট অধ্যাপকগণও থাকেন। ফলে কোন এক বিশেষজনের মর্জির উপর পরীক্ষার কৃতকার্যতা বিন্দুমাত্র নির্ভর করে না।" আক্ষরিক অর্থে কথাগুলি অসত্য নয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আপনারা বঙ্গদর্শনে যে মৌলিক প্রশ্নটি তুলেছিলেন, পত্রলেখকগণ তা সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন। সেই প্রশ্নটির পরিপ্রেক্ষিতেই উপরি-উক্ত বক্তব্যটিকে বিচার করতে হবে। আপনারা যে মৌলিক প্রশ্নটি তুলেছিলেন তা হচ্ছে এই যে, একমাত্র মেডিক্যাল কলেজেই কেন এম-ডি পরীক্ষার কেন্দ্র হবে? এই পরীক্ষা গ্রহণের উপযোগী মোট চারটি প্রতিষ্ঠান যখন কলকাতায় রয়েছে, তখন একটি বিশেষ কলেজকেই কেন এই উদ্দেশ্যে বেছে নেওয়া হবে? দু' বছর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রসঙ্গটি অবলম্বন করে তীব্র বাক্-বিতণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় পূর্বতন ব্যবস্থাই বজায় রেখেছিলেন। একথা কি উক্ত পত্রলেখকদের নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে? সম্প্রতি যতজন এম ডি পাশ করেছেন, তার মধ্যে বেশির ভাগই যে মেডিক্যাল কলেজের এই স্থূল বিষয়টিকে কি অগ্রাহ্য করা যায়? উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে এবারে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। কণ্ডাক্টিং ডাক্তারদের সাহায্যটা কি পরীক্ষাকালে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররাই সর্বাংশে লাভ করেন না? এইবার পত্রলেখকদের মূল কথায় আসি। তাঁরা যে চারজন পরীক্ষকের কথা তুলেছেন, এবারে তাঁদের মধ্যে তিনজনই কি মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন? অর্থাৎ চারজন নির্বাচিত পরীক্ষকের তিনজনেই সচরাচর মেডিক্যাল কলেজেরই হয়ে থাকেন। এরপর বাইরের পরীক্ষকের কথা। গত কয়েক বছরের ইতিহাসের খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে দক্ষিণ ভারতের দু'জন মাত্র ব্যক্তিই পালাক্রমে এক্সটারনাল একজামিনার হয়েই আসছেন, এক্ষেত্রেও কুমীরের সাতটা ছানা হিসাবে একটাকেই সাতবার দেখানোর উপমাটা মনে পড়ছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা বিশেষ একজন ব্যক্তির মর্জির উপরেই চলে যাচ্ছে, এবং এই কথাটিই বঙ্গদর্শনে খোলাখুলি বলা হয়েছে। কোচিং প্রসঙ্গে উক্ত পত্রলেখকেরা জানিয়েছেন যে, এর পিছনে কোন অর্থনৈতিক ব্যাপার নেই, বিষয়টি আগাগোড়াই ফিলানথ্রফিক। তাঁদের এই বক্তব্যে আমার কোন ভিন্নমত নেই। নন-প্র্যাকটিসিং ফিজিসিয়ান যখন বাইরের রোগী দেখেন, সেটাও নিশ্চয়ই ফিলানথ্রফি এবং এতগুলি যে কোচিং ক্লাস ও টিউটোরিয়াল হোম পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে চলছে, সেগুলিও নিশ্চয়ই ফিলানথ্রফিরই নিদর্শন। বঙ্গদর্শনে উল্লিখিত বিষয়টি অবলম্বনেই যখন একটি প্রখ্যাত ইংরাজী দৈনিকে একটি দীর্ঘ পত্র প্রকাশিত হয়েছিল, তখন এই পত্রলেখকগণ কোথায় ছিলেন? যাঁদের বিরুদ্ধে বঙ্গদর্শনে অভিযোগ আনা হয়েছে পত্রলেখকেরা তাঁদেরই যে ঘরের লোক এটা কি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে? বঙ্গদর্শনে আলোচ্য ব্যক্তিদের একজনের রচিত একটি গ্রন্থের ভূমিকা থেকেই বোঝা যায় তাঁদের সঙ্গে এই পত্রলেখকদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক কি প্রকারের।

কিন্তু ব্যাপারটি তো নিছক গুরু-ভক্তির নয়, আমরা দেখেছি ভাগ্যবানরা কিভাবে ঝটপট এম-ডি হয়ে যান, এবং বাকিরা "অধীত বিদ্যা" সত্ত্বেও বছরের পর বছর ফেল হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সমতুল্য ডিগ্রী যিনি অর্জন করেছেন, কয়েকবার পরীক্ষা দিয়েও তিনি এম-ডি হতে পারলেন না। বোধ হয় তাঁর অধীত বিদ্যা নেই। অপর একজন যিনি কলকাতার একটি প্রখ্যাত হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগে আছেন, বার বার এম-ডি'তে ব্যর্থ হয়ে, দুত্তোর বলে বিলাতে গিয়ে এক-চান্সেই এম আর-সি-পি পাশ করেন। অপর একজন পত্রলেখক দ্বিজেনবাবুর ভাষায় "উভয় ক্ষেত্রেই সমপরিমাণ অধীত বিদ্যার প্রয়োজন আছে।" কিন্তু উক্ত কার্ডিওলজিস্টের ক্ষেত্রে দেখা গেল, যে অধীত বিদ্যা তাঁকে বিদেশে এম-আর-সি-পি দিয়েছে, স্বদেশে সেই অধীত বিদ্যা তাঁকে আটবারেও কৃপা করে নি। খবর নিলে অনুরূপ একটি ঘটনার বিবরণ ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে পাওয়া যাবে। এ রকম আরও বহু নিদর্শনই দেওয়া যায়, বাহুল্য বোধে তার প্রয়োজন আপাতত বোধ করছি না, নিজের ঘরেও তো এই একই চিত্র দেখতে পাচ্ছি।

দুর্গিরা চক্রবর্তী
কলকাতা—৬

"লোকসঙ্গীতের একাল না আকাল" প্রসঙ্গে

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আধুনিক লোকসঙ্গীতের বহুল প্রচলনের সুযোগ গ্রহণ করে নতুন ও পুরনো লোকসঙ্গীত-শিল্পীরা লোকগীতির মাধ্যমে বৃহত্তর জনতার সামনে দাঁড়াবার এবং উন্নততর জীবিকার সুযোগ লাভ করেছেন। তাই আপনার সাপ্তাহিক [illegible] মুর্শিদের "লোকসঙ্গীতের একাল না আকাল" সমালোচনাটি বিভিন্নমুখী ও সময়োপযোগী হয়েছে।

সমালোচনায় তথাকথিত খ্যাতিমান লোকসঙ্গীতশিল্পীদের অনুশীলন এবং তাঁদের "ফকো-মডার্ন" গান সম্বন্ধে তিনি যা লিখেছেন সে কথা আমাদের মত সাধারণ লোকসঙ্গীতানুরাগী শ্রোতারই মনের কথা। অবশ্য শিল্পীদের নামের তালিকায় কয়েকজন অতিপরিচিত গুণী শিল্পীর নামের উল্লেখ না থাকার কোন কারণ জানি না। এঁদের মধ্যে আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ সন্তোষকুমার ঘোষের ভাওয়াইয়া, চটকা দেহতত্ত্ব, ভাটিয়ালী প্রভৃতি বিশুদ্ধ লোকগীতি শুনে আসছি। বহু শ্রোতা ও সঙ্গীতজ্ঞের কাছে এঁর দরদীকণ্ঠের ভূয়সী প্রশংসাও শুনেছি। এছাড়া প্রদ্যোৎনারায়ণ, নিখিল চক্রবর্তী, গৌর বসাক, সুবোধ রায়, রাধারাণী, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, লাবণ্যলেখা পাকেল (ঢাকার পুরানা শিল্পী) প্রভৃতি শিল্পীরা প্রাচীন ধারায় লোকসঙ্গীতে শ্রোতাদের মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছেন এবং পল্লীসঙ্গীতের গ্রাম্যভাব ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলেছেন। মুর্শিদ তাঁর সমালোচনায় এঁদের নামের উল্লেখ না করায় বিস্ময়বোধ করছি।

আর একটি বিষয় মুর্শিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি সেটা হচ্ছে—লোকসঙ্গীতের শিল্পীরা বর্তমানে সাংস্কৃতিক দূত হিসাবে বিদেশ সফরের সুযোগ লাভ করছেন। যোগ্য ব্যক্তিই যাতে নির্বাচিত হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান এবং এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে শিল্পী নির্বাচন যাতে দুর্নীতিমুক্ত হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে মুর্শিদকে অনুরোধ করি।

লোকসঙ্গীতের অনুরাগী শ্রোতা হিসাবে আমি মুর্শিদকে (আমাদের [illegible] তাঁর উপর এই ভরসা রেখেই [illegible] যেন তাঁর নির্ভীক [illegible] কলকাতা আকাশবাণী, গ্রামোফোন কোম্পানী, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থা ও শিল্পিসমাজের চেতনা উদ্বুদ্ধ করে পল্লীর স্বভাবকবির রচনা ও সুরকে অবলুপ্তির অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করার মহান ব্রত গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে তাঁকে (মুর্শিদকে) কিঞ্চিন্মাত্র সহায়তা করতে পারলেও নিজেকে ধন্য মনে করব।

[illegible] মজুমদার
[illegible]

■

"গান্ধীবাদ কি অচল?" প্রসঙ্গে

"গান্ধীবাদ কি অচল" প্রবন্ধটি খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়েছিলাম, দেখেছিলাম বাংলাদেশের যা ফ্যাসন, এতে তার বেশি কিছু নেই। ফ্যাসনে গা ঢেলে দিলে, তার সমর্থনে যত কিছু প্রমাণ যোগাড় করে প্রবন্ধ লিখলে সস্তায় প্রতিষ্ঠাও হয়, বহুক্ষেত্রে অর্থও আসে এ কে না জানে, কে না বোঝে। আমার অনুমান যে একেবারে মিথ্যা নয়, এই প্রবন্ধের সমর্থনে যে সব চিঠি ছাপা হয়েছে, তা থেকেই বোঝা যায়।

গান্ধীবাদ কি তা লেখক পরিষ্কার করে বলেন নি, যেটুকু বলেছেন তাঁর নিজের অনুমান না অন্য কিছু তা বোঝা যায় না। বস্তুত কুহেলিকার সৃষ্টি হয়েছে। যদি তিনি সে বিষয়ে প্রামাণ্য আলোচনা স্পষ্টভাবে করতেন, তা হলে একটা সত্যকার কাজ করতেন। প্রত্যেক বিরাট নেতার বা মানুষের চরিত্রে বহু বৈষম্য দেখা যায়, যদি বিচ্ছিন্নভাবে বৈষম্যগুলোই আলোচনা করা যায়, কিছু থাকে না, মুক্তিও থাকে না, [illegible] কথা দূরে থাক।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে "Give the devil his due", গান্ধীকে যদি devil-ও বলা যায়, তা হলেও লেখককে সে মূল্য দিতেও দেখা গেল না।

গান্ধীকে বিরাট শক্তির সাথে অতি প্রতিকূল অবস্থায় প্রতিযোগিতা করতে হয়েছে, স্বাধীনতার পথে তিনি [illegible] [illegible] যখন সম্ভব হয় নি, তাঁর আদর্শ নিয়েই আলোচনা করলে আজকের দুঃস্থিত জাতীয় জীবনে শান্তির বারি সেচিত হত।

বাংলাদেশে যদি এইরূপ চলতে থাকে অপরাপর [illegible] তরুণ প্রতিভা [illegible]। স্বাধীনতালাভের প্রসঙ্গ সম্বন্ধে বহু হিন্দি পুস্তিকা পেয়েছি, তাতে বিপ্লবী বা নেতাজী সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই। বস্তুত কোন মানুষের নীতি গ্রহণ না করা চলে কিন্তু তাঁর প্রাপ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা না দিলে জাতির ক্ষতি, কিশোর-যুবক বিভ্রান্ত হয়, তারাই তো জাতির ভবিষ্যৎ।

কোন নীতি, মত বা পথ নিয়ে একই-ভাবে ভাবতে ভাবতে, সেই পথে কাজ করতে করতে মানুষ বেশ বিভ্রান্ত হয়, পক্ষপাতদুষ্টও হয়ে পড়ে, সে তিনি ধর্মীয় নেতাই হোন বা জাতীয় নেতাই হোন একথা প্রত্যেক লোকের পক্ষে সত্য, নেতাদের তো কথাই নেই। গান্ধী তার ব্যতিক্রম নন। লেখক পুরাতন কাগজ খুঁজলে দেখতে পাবেন, তিনি হিটলারকে পরাজিত করবার উপায় হিসেবে চার্চিলকে আত্মসমর্পণের উপদেশ দিয়েছিলেন। আবার তিনিই গুজরাটে যন্ত্রণাকাতর দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত গরুকে গুলী করে মেরেছিলেন এবং তাতে দেশে প্রবল আলোড়ন হয়েছিল।

গান্ধী সন্ত্রাসবাদের বিরোধী ছিলেন কিনা বিচার করা অসম্ভব, তবে সেইটাই যে একমাত্র পথ তা মনে করতেন না, এটা সত্য। তিনি বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ছিলেন সেটা বলাও ভুল। তাঁর মুখে সে যুগের এ [illegible] রাখতে [illegible] এটাও ঠিক না হলে তিনিই আন্দামানে নির্বাসিত তিন হাজার (বাঙালী বোধ হয় প্রায় সকলে) রাজবন্দীর মুক্তি আনতে পারতেন না; [illegible]।

তিনি যে মূলতঃ সন্ত্রাস-বিরোধী ছিলেন একথাও ঠিক নয়, কারণ তিনিই [illegible]

বিষয় হয় নি, হয়েছে রাজনীতিতে, বাহিরে তার জঞ্জাল নিয়ে আলোচনা চলেছে। দুঃখের বিষয় যাঁরাই এ নিয়ে আলোচনা করেছেন, ত্রিপুরীর সভাপতি সুভাষবাবুর নির্বাচন পূর্ব বিবৃতি উদ্ধৃত করা পরিহার করেছেন বা এ আই সি সি'র কলকাতা অধিবেশনে সর্তহীন-ভাবেও ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে অস্বীকারের কথা উল্লেখ করেন নি। এটা বললে সুভাষ-ব্যক্তিত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হতো না, বরং দেশ কতটা সংগ্রামে প্রস্তুত ছিল বোঝা যেতো।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষ তিন দশকে ভারতের রাজনৈতিক গগনে দু'টি বিরাট নেতৃত্ব গড়ে উঠেছিল তা হ'ল গান্ধী ও নেতাজী। বিরাট ব্যক্তিত্ব, লক্ষ্য নির্দিষ্ট, ভারতের স্বাধীনতা, উভয়ে নিষ্কলুষ স্বাভাবিকভাবে, আবার উভয়ে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, একজন অভিজ্ঞতায় পরিপক্ক আর একজন যৌবনে উদ্বেলিত। নেতাজী যে গান্ধীশ্রদ্ধ কম ছিলেন না তা অপর প্রবন্ধে শঙ্করীবাবুর উদ্ধৃতি এবং নেতাজীর সাইগন-ভাষণ (শঙ্করীবাবু অবশ্য নেতাজীর "মহানুভবতা" বলে বর্ণনা করে নেতাজীকে ছোটই করেছেন) থেকে প্রমাণিত। লক্ষ্য এক থাকলেও তা সিদ্ধির পথ নিয়ে সংঘর্ষ সর্বত্রই সর্বযুগে হয়েছে, হয়; ভারতেও হয়েছে, কিন্তু তার ফলে কোন পক্ষ যদি বিদ্রূপের পাত্র হন, তা হলে যাঁরা নেতা তাঁদের অপমান হয় না. যিনি তা করেন তিনিই নীচমন্য প্রমাণিত হন।

। ৫৫০ পৃষ্ঠার ১ম কলমে লেখক বালকসুলভ যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তিলক, দেশবন্ধু, সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিন পাল প্রমুখের তৈরি বুনিয়াদ না পেলে গান্ধীর এতটুকু অবদানও সম্ভব হতো না"। কথাটা সত্য। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ বিরাট সাহিত্যরথীদের আবির্ভাব না হলে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পেতাম কি? বিপ্লবীদের অক্লান্ত সাত যুগব্যাপী আত্মত্যাগ, সর্বোপরি রাসবিহারী বসুর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি এবং সংগঠন ক্ষমতা না থাকলে আমরা সুভাষবাবুকে নেতাজীরূপে কি পেতাম?

৫৫৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের শেষাংশে এবং তৃতীয় কলমের প্রথমাংশে লেখক স্বাধীনতা প্রাপ্তির কারণগুলো বলেছেন এবং তাঁর বক্তব্য "অস্বীকার" শব্দ দিয়ে ঢাকতে চেয়েছেন অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহ থেকে আরম্ভ করে ৯০ই বছর যে সকল আন্দোলন বিভিন্ন ফ্রন্টে চলেছে তা অস্বীকার করেছেন, তা বাতুলেরাই করতে পারে।

লেখকের মূল বক্তব্য বোধ হয় একমাত্র সহিংস বিপ্লব ছাড়া কিছুই হতে পারে না, যদি তাই হয় তা তো সকলে করতে পারবে না, কোন দিন পারে নি। তিনি বা তাঁর অনুগামীরা তা পারবেন কি না জানি না, কাজেই সে বিষয়ে আমার বক্তব্য কিছু নেই। তবে আছে একটা জিজ্ঞাসা, তিনি কি বলেন, বিপ্লবীদের দিকে তাকিয়ে সমস্ত লোক বসে থাকবে? তাঁদের কি আর কিছু করণীয় নেই? যদি না থাকে বিপ্লব কি সম্ভব হবে? আর যদি তাও সম্ভব হয়, সে বিপ্লব কি সার্থক হবে? আর তাদের সত্যিই করার যদি কিছু থাকে কি তা? তিনি যেন মনে রাখেন বহু বিপ্লবী আন্দামান থেকে ফিরে এসে ভিক্ষুকের মত সাহায্য চাইতে বাধ্য হয়েছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহায্য পাওয়ার পর তাদের যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে পরবর্তী কার্যক্রম কি, তাঁরা বুকে হাত দিয়ে বাজিয়ে দেখিয়েছেন এবং সে বুক ধাতব-পাতের মত বেজেছে।

গান্ধী রাজনীতিতে ধর্ম টেনে এনেছেন, এ কথাও ঠিক নয়, এরূপ কোথায়ও পাওয়া যায় না। তিনি "সত্য" ও "নীতি"তে বিশ্বাস করতেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত, এতে বলবার কি আছে, অনেক কম্যুনিস্ট ত ধর্মের অনুশাসন, আচার বা ভগবানকে মানেন তা তো আলোচ্য বিষয় হয় না।

লেখক বহু উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতিতে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর ঐতিহাসিক তো ইতিহাসের ব্যাখ্যা দেবেন। তাঁর জীবিতকালের ঘটনার ব্যাখ্যা সে হবে তৎকালের আগুনে কতটা তিনি পুড়েছেন, তার বিবৃতি। পরবর্তী যুগের ঐতিহাসিক তার আবার ব্যাখ্যা করবেন। এইটেই তো স্বাভাবিক।

গান্ধী-অনুগামীদের কার্য দিয়ে গান্ধীর বিচার লেখক করেছেন, বুদ্ধের অনুগামীদের দিয়ে বুদ্ধের, খৃস্টের অনুগামীদের দিয়ে খৃস্টের বিচার হয় কি? বিবেকানন্দের অনুগামীরা তাঁরই গড়া প্রতিষ্ঠানে তাঁরই মানস-কন্যা ভগিনী নিবেদিতাকে স্থান দিয়েছিলেন কি?

লেখক ৫৫৫ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে দেশবন্ধুর ভাষণ বলে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাতে বক্তব্য সংগ্রামে স্নায়ু সবল শেষ পর্যন্ত গান্ধী রাখতে পারতেন না। এটা ব্যর্থতার, সাময়িক দুঃখের একটা অভিব্যক্তি ভিন্ন কিছু নয় এবং তা স্বাভাবিক, কিন্তু তাতে তাঁর বক্তব্য প্রমাণিত হয় না। দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণের সময় দেশবন্ধু রচিত ভ্রমণসূচীতে গান্ধী বাংলাদেশের জেলায় জেলায় ভ্রমণ করছিলেন এবং তাঁর তিরোভাবের কথা বরিশালে পান।

১৯৩৭ সালে নির্বাচনের পরে কংগ্রেস ততদিন সরকার গড়ে নি, যতদিন না বৃটিশ সরকার গভর্নরের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ হবে না এ আশ্বাস দেয় নি, কাজেই লেখকের বক্তব্য প্রলাপ ভিন্ন কিছুই নয়।

বহু ভুল তথ্য বা ব্যাখ্যা এই লেখায় রয়েছে তা আলোচনা করে কি হবে, দৃষ্টি ও লক্ষ্য যেখানে ন্যাবাগ্রস্ত সেখানে সবই হলদে দেখাবে। বিরাট ব্যক্তিত্বে পরস্পর শ্রদ্ধাশীল, বহু মতান্তর মধ্যেও, দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর মধ্যে। চরকাকে কুটিরশিল্প ও আত্মনির্ভরতার প্রতীক হিসাবে কাজ করেছি এবং জেনেছি। যে সায়েন্স কলেজে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র চরকাকে বিদ্রূপ করতেন, তাঁর শেষ জীবন যখন সেই সায়েন্স কলেজে থেকেই চরকা প্রচারে কাটালেন, কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলেছিলেন, "He convinced me, I could not convince him", এই হলো বিরাট ব্যক্তিত্ব।

দেশ বিভাগের জন্য মূলত দায়ী সেই বৃটিশ শক্তি যারা ১৯০৫ সালে একবার দেশ বিভাগ করেছিল তারাই। মুসলিম লীগের স্বাধীনতালাভ প্রতিরোধ ভিন্ন কোন সংগ্রামনীতি ছিল না, যেমন আজ ভারত-বিদ্বেষ ভিন্ন পাকিস্তানের কোন নীতি নেই। দৃষ্টি একটু পরিষ্কার করলে লেখক বুঝতে পারবেন। গান্ধী যথাসাধ্য দেশ বিভাগ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন। মুসলিম লীগের সংগ্রামী নীতি ছিল এক দাঙ্গা বাধানো তাতে শেষে যখন হিন্দুরাও দেশ বিভাগের জন্য জীবনমরণ পণ করলো, তখন হল দেশ বিভাগ। এই বিভাগকে গ্রহণ করা ভিন্ন গান্ধীর কোন উপায় ছিল না, অশীতিপর বৃদ্ধ আর কি করতে পারতেন, লেখক অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন
কলকাতা ৫

বাড়াবাড়ি

ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে—'টু মাচ অফ এনাথিং ইজ ব্যাড।' কথাটা যে কতোবড় সত্য তার জলজ্যান্ত প্রমাণ ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দল। অস্ট্রেলিয়ায় সফররত ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলকে নিয়ে আলোচনায় ভারত আর অস্ট্রেলিয়া বড় বেশি সরগরম হয়ে উঠেছিলো। সে আলোচনা ছিলো প্রশংসার আর বিষয়টি ছিলো ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের উন্নত ধরণের ক্রীড়ানৈপুণ্যের আর ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাতুর্যের। তাই সকলেই খুশিমনে ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের প্রশংসায় হয়ে উঠেছিলেন পঞ্চমুখ। আর শেষ পর্যন্ত সে প্রশংসালোচনা গিয়ে পৌঁছুলো টু মাচের পর্যায়ে। কিন্তু তারপরই ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়রা দিলেন ব্যর্থতার পরিচয়। হয়তো এ ব্যর্থতা অস্বাভাবিক নয়। পর পর সব খেলাতেই ভালো খেলতে হবে এমন কোন কথা নেই। আর তা সম্ভবও নয়। খেলায় জয়-পরাজয় আছেই। তাই ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের পরাজয় কিছু একটা অস্বাভাবিক নয়। ঐ পরাজয় হযতো সকলে স্বাভাবিকভাবেই নিতেন। কিন্তু ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলকে মাথায় তুলে বড় বেশি নাচা হয়েছে আর বোধ হয় সেই জন্যেই ভারতীয় স্কুল ক্রিকেট দলের পরাজয়কে আজ কেউ আর স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছেন না। তাই আজ আর বলতে বাধা নেই যে অতি প্রশংসা মোটেই ভালো নয়!

গত সংখ্যায় আমরা খেলাধুলোর বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছিলাম যে বর্তমানে ভারতীয় ও বাংলা দেশের খেলধুলোর জগতে ছোটরাই বড়। আর আমাদের সে উক্তি যে কত্তো বড় সত্য তার প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গেছে জুনিয়র বাংলা দলের চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করে বিধান রায় ট্রফি লাভ করায়। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, খেলাধুলোর সব বিভাগে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আসরে ভারতীয় দল দিনের পর দিন পিছিয়ে পড়ছে। ফুটবলে বাংলাই ছিলো ভারতের পথিকৃৎ। কিন্তু সেই বাংলা দলই জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় গত ক'বছর মোটে সুবিধেই করতে পারে নি। কিন্তু ফুটবলে এবার বাংলা দেশের ছোটরাই দিয়ে এলো অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয়। সর্বভারতীয় স্কুল ফুটবলে কলকাতার কুমার আশুতোষ বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে জিতে এনেছে সুব্রত মুখার্জী কাপ। আর জুনিয়র ফুটবলেও এবার চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে বাংলা দলই। তাই আজ আর এ-কথা বলতে বাধা নেই যে ভারতীয় খেলাধুলোর ক্ষেত্রে ছোটরাই আগুয়ান। আর এখন যদি এই ছোটদেরই গড়ে-পিঠে তৈরি করে নেওয়া যায় তাহলে মনে হয় অবস্থা অতটা খারাপ হবে না। কিন্তু তৈরি করবেন কে? সে দায়িত্ব নেবেন যাঁরা তারা যে আজো ঘুমিয়ে। এ ঘুম কি তাঁদের কোনদিনও ভাঙবে না...?

লণ্ডন-সিডনি ম্যারাথন [illegible] ভারতের একমাত্র প্রতিযোগী [illegible]
[illegible]
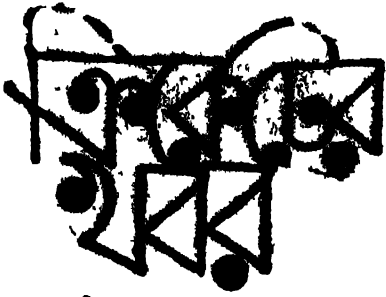
ক্রিকেট জগতের দৃষ্টি এখন অস্ট্রেলিয়ায়। সেখানে চলেছে এখন অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট লড়াই। ব্রিসবেনের প্রথম টেস্ট ম্যাচও শেষ হয়ে গেছে। অস্ট্রেলিয়াকে ১২৫ রানে হারিয়ে দিয়েছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। যখন অস্ট্রেলিয়ার শেষ ব্যাটসম্যান আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে এলেন তখনো খেলা শেষ হতে বাকি ছিলো এক দিনের কিছু বেশি সময়।

প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এই মরশুমের লড়াই-এ এগিয়ে গেলো ১-০ খেলায়। বাকি

॥ লরি ॥

শতরান করা সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়াকে পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন নি।

চারটে টেস্টের ওপর নির্ভর করছে স্থাবারের ভাগ্য।

অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট লড়াই-এ যে দল বেশি ম্যাচ জিতবে সেই দলই লাভ করবে ওরেল ট্রফি।

যাই হোক প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার পরাজয় খুব একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার না হলেও প্রত্যাশিত ছিলো না। সকলেই আশা করেছিলেন যে খেলাটা শেষ পর্যন্ত জমবে খুব আর হয়তো শেষ দিনে সাম্প্রতিক একটা বিরল খেলা হবে।

কিন্তু লড়াই শেষ দিন পর্যন্ত গড়ালোই না। তার আগেই ব্রিসবেনের প্রথম টেস্টের ওপর পড়লো ইতির দাঁড়ি। তাই বাকি চারটে টেস্টের ওপর এখন নির্ভর করছে ওরেল ট্রফির ভাগ্য। তবে এ-কথা ঠিক যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল এবার আবার লাভ করে ওরেল ট্রফি জেতার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

তাই মনে হয় যে বাকি চারটে টেস্টে লড়াই এবার জমবে খুব। তবে এ-কথা ঠিক যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলই এবার মনে হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া-মাঠের ফেবারিট। অন্তত প্রথম টেস্টের ফলাফল দেখে তাই তো মনে হয়।

প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয়লাভের পেছনে ছিলো লয়েড, কানহাই আর কেরুর ব্যাটিং এবং সোবার্স ও গিবসের অসাধারণ বোলিং। প্রথমে ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসে করেছিলো ২৯৬ রান। এর মধ্যে ছিলো কানহাই-এর ৯৪ আর কেরুর ৮৩ রান। কনোলী পেয়েছিলেন ৬০ রানের বিনিময়ে ৪টি উইকেট।

অস্ট্রেলিয়ার চ্যাপেল ১১৭ আর লরি ১০৫ রান করা সত্ত্বেও প্রথম ইনিংসে তারা ২৮৪ রানের বেশি করতে পারলো না। অবশ্য তার জন্যে দায়ী গিবসের মারাত্মক বোলিং। গিবস ৫টি উইকেট পেয়েছিলেন মাত্র ৮৮ রানের বিনিময়ে।

॥ সোবার্স ॥

শুধু অধিনায়ক হিসেবেই নয়, খেলোয়াড় হিসেবেও সোবার্স প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে হারানোর নেতৃত্ব করেছেন।

গল্প হলেও সত্যি

ক্রিকেট খেলায় সবাই ওভার বাউণ্ডারী অনেকেই মেরে থাকেন। কিন্তু ওয়ারউইকশায়ারের রেভারেণ্ড জে এইচ পারসনের মতো আর কেউ মারতে পারেন নি। ওভার বাউণ্ডারী মেরে পারসন যে অভাবনীয় নজীর সৃষ্টি করেছিলেন তার তুলনা মেলা ভার। সত্যি কথা বলতে কি—অমন ঘটনা আর একটাও ঘটে নি।

ঘটনাটা অবশ্য অনেক পুরনো। এ সেই ১৯২৮ সালের কথা। সেবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজ গিয়েছিলো ইংলণ্ড সফরে। সেই সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে খেলার সময় পারসন করেছিলেন সেই অসাধ্য সাধন।

একটা ওভারে পর পর ওভার বাউণ্ডারী মারতে আরম্ভ করলেন পারসন। পর পর চারটে ওভার বাউণ্ডারী মেরে পারসন তো কুড়োলেন অনেক প্রশংসা, অনেক হাততালি। কিন্তু পারসন সাহেবের মারা ওভার বাউণ্ডারী নেপথ্যে যে কি কাণ্ড করে বসেছে সেই মুহূর্তে বিশেষ কেউ আর তা জানতে পারলেন না।

পারসনের মারা বলটা শূন্যে ভেসে বাউণ্ডারীর ওপর দিয়ে সোজা চলে গিয়েছিলো প্যাভেলিয়ানের মধ্যে খাবার ঘরে। খাবার ঘরে তখন এক ভদ্রমহিলা বসে বসে চা খাচ্ছিলেন।

চায়ে চুমুক দেবার জন্যে তিনি যখন কাপটা তুলেছেন ঠিক তখনই বলটা এসে সজোরে লাগলো কাপে। ফলে বলের সংগে কাপটাও গেলো ছিটকে। ভদ্রমহিলার হাতে শুধু থাকলো কাপের ডাঁটিটা।

চা খাওয়া মাথায়। ভদ্রমহিলার চক্ষু তখন চড়কগাছ......!

লয়েড ১২৯ আর কেরু ৭১ রান করায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলো ৩৫৩ রানে। বোলিং-এ অস্ট্রেলিয়ার গ্লীসন ১২২ রানের বিনিময়ে পেয়েছিলেন ৫টি উইকেট।

দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া মোটে সুবিধেই করতে পারলো না। সোবার্স

আর গিবসের মারাত্মক বোলিং-এর জন্যে মাত্র ২৪০ রানে শেষ হয়ে গেলো অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস। সোবার্স ৭৩ রানে ৬টি ও গিবস ৮২ রানে ৩টি উইকেট পেয়েছিলেন। ব্যাটিং-এ একমাত্র ম্যাপেলের ৫০ রানই উল্লেখযোগ্য।

ফলে প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ১২৫ রানে পরাজিত করলো অস্ট্রেলিয়াকে।

এক নজরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-অস্ট্রেলিয়ার খেলার ফলাফল

সাল	সফঃ অধিনায়ক	অস্ট্রেঃ জয়	ওঃ ইঃ জয়	ড্র	টাই	মোট
১৯৩০-৩১	জি সি গ্রান্ট (ওঃ ইঃ) —	৪	১	০	০	৫
১৯৫১-৫২	জে ডি গডার্ড (ওঃ ইঃ) —	৪	১	০	০	৫
১৯৫৪-৫৫	আই জনসন (অস্ট্রেঃ) —	৩	০	২	০	৫
১৯৬০-৬১	এফ ওরেল (ওঃ ইঃ) —	২	১	১	১	৫

জাতীয় জুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলা দল এবার লাভ করেছে চ্যাম্পিয়নশীপ। বাংলা দেশের ফুটবল উৎসাহীদের কাছে এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয়।
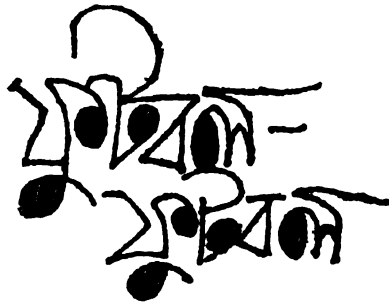
তাই সেদিন যখন বাংলা দলের খেলোয়াড়রা জব্বলপুর থেকে কলকাতায় ফিরে এলেন তখন হাওড়া স্টেশনে বসে গিয়েছিলো আনন্দের হাট। বাংলা দলের অধিনায়ক এস সেনগুপ্তকে কাঁধে নিয়ে ক্রীড়ামোদীরা আনন্দে হাসি গানে মাৎ করে তুলেছিলেন হাওড়া স্টেশন।

বাংলার খেলোয়াড়দের স্বাগত জানাবার জন্যে সেদিন হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন আই· এফ· এ'র সভাপতি শ্রীঅজয়কুমার বসু, যুগ্ম সম্পাদকদ্বয় এবং আরো অনেকে। শ্রীবসু বাংলার খেলোয়াড়দের গলায় মালা পরিয়ে তাদের জানিয়েছিলেন আন্তরিক অভিনন্দন।

বাংলা দলের ম্যানেজার বলেছেন যে প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হলেও বাংলা দলের খেলোয়াড়রা প্রত্যেকটি খেলায় জয়লাভের অদম্য বাসনা আর আন্তরিকতার সংগে খেলায় তাদের কাছে জয়লাভ অনেকটা সহজ হয়ে যায়। তাঁর মতে বাংলা দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ই জয়লাভের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে খেলেছেন। তাই বাংলার
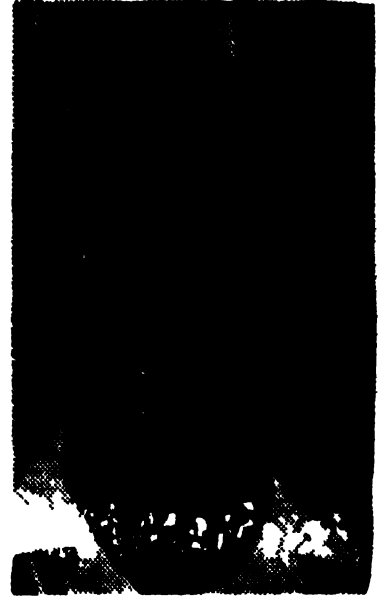
. কানহাই ।
প্রথম ইনিংসে মাত্র ৬ রানে জন্যে পারেন নি শত রান করতে।

ব্রিসবেনে অনুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম টেস্ট খেলায় গিবসের বলে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক [illegible]
[illegible]

প্রশ্নকান্তি দে (মোলবাড়ি কলোনী গৌহাটি, আসাম)

প্রশ্ন : "পরে আবার টেলিফোন করার কি দরকার। আমি না হয় একটু ধরেই থাকি ..।" উক্ত কথার বক্তাকে কতোক্ষণ টেলিফোন ধরে থাকতে হয়েছিলো?

আয়রনমঙ্গারের সামান্য পরিচয় দিলে খুব খুশি হবো।

উত্তর : তা তো জানি না। তবে বেশিক্ষণ যে নয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এইচ আয়রনমঙ্গারের জন্ম ১৮৮৩ সালের ৭ই এপ্রিল। তিনি ছিলেন কুইন্সল্যান্ড ও ভিক্টোরিয়া দলের খেলোয়াড়। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে খেলেছিলেন মোট ১৪টি টেস্ট ম্যাচ। ইংলন্ডেব বিরুদ্ধে ১৯২৮ সালে দুটো ও ১৯৩২ সালে ৪টি আর সাউথ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ...১৯৩১ সালে ৪টি এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১৯৩০ সালে ৪টি টেস্ট খেলেছিলেন আয়রনমঙ্গার।

বিপুল সরকার (রায়গঞ্জ বি· এন)

উত্তর : ভারতীয় ক্রিকেট এবং হকিতে ক'জন বাঙালী খেলেছেন এ প্রশ্নের উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে। একই প্রশ্নের উত্তর কি বারবার দেওয়া উচিত .. আপনি পুরনো সংখ্যাগুলো একটু দেখে নেবেন।

গোবিন্দ, বাবুয়া ও কমল (হিলা চা-বাগান, নাগরকাটা)

উত্তর : পি দে'কে হাবিবের জায়গায় কেন নেওয়া হয় নি—তা তো জানি না।

পঙ্কজ গুপ্ত তো কোনদিন টেস্ট ক্রিকেট খেলায় অংশ গ্রহণ করেন নি! তবে তিনি ভারতীয় ক্রিকেট দলের ম্যানেজাব হয়েছেন অনেকবার।

সেন্টু, কুন্টু, অর্চনা ও চন্দনা চক্রবর্তী (কালীবাড়ি রোড, লামডিং আসাম)

প্রশ্ন : অলিম্পিক সংখ্যা পড়ে খুব ভালো লেগেছে। অলিম্পিক সংখ্যার মতো যদি একটা ক্রিকেট সংখ্যা করেন তাহলে খুব ভালো হয়।

উত্তর : ধন্যবাদ! চেষ্টা করা হবে।

প্রদীপ বিশ্বাস (গুলেমা চা-বাগান, শুকনা, দার্জিলিং)

প্রশ্ন : বর্তমান ক্রিকেট জগতে বিশ্বের মধ্যে সেরা স্পিন বোলার কে?

উত্তর : গিবসই বোধহয়।
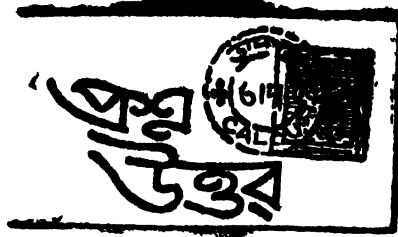
পরিতোষ নাগ (প্রসন্ননগর, বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

উত্তর : বিমন দু'ফুটের কাছাকাছি বেশি লাফিয়েছেন লং জাম্পে। যাই হোক বিমনের পরিচিতি তো সাপ্তাহিক বসুমতীতে পড়েছেন। আশা করি এখন আর কোন গোলমাল নেই। আপনার রিপ্লাই কার্ডের চিঠি পেয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে উত্তর ক'দিনের মধ্যেই পাবেন।

> **সবিনয় নিবেদন**
>
> পাঠক-পাঠিকাদের অনুরোধ জানাই যে তাঁরা যেন একসংগে বেশি প্রশ্ন না করেন। আর প্রশ্নগুলো খেলাধুলোর ওপর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রতিদিন অনেক চিঠি আসে, তাই প্রশ্নের উত্তর পেতে মাঝে মাঝে একটু-আধটু দেরি হয়ে যায়। আশা করি আমাদের অসুবিধাটুকু আপনারা বুঝবেন।

পৃথিবীতে একটাই টেস্ট টাই হয়েছে। টেস্ট ম্যাচটা ছিলো অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের। সেবার অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ছিলেন বেনো আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওরেল।

দিলীপকুমার রক্ষিত (সিমিকা, বাঁকুড়া)

প্রশ্ন : আমি জানতে চাই যে পতৌদি টেস্ট ম্যাচে আজ পর্যন্ত কতবার শূন্য রান করেছেন—কোন্ কোন্ দেশের বিরুদ্ধে?

উত্তর : আমিও জানি না। কেউ জানালে জানিয়ে দেবো।

হীরেন্দ্রমোহন জয় (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

প্রশ্ন : টেস্ট ক্রিকেট খেলায় বিশ্বের কোন্ দেশের খেলোয়াড় সবচেয়ে বেশি সময় ধর ব্যাট করেছেন? তিনি কতো সময় ধরে খেলে কতো রান করেছিলেন?

উত্তর : পাকিস্তানের হানিফ মহম্মদ ১৬ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট ধরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে বার্বাডোজের টেস্টে (১৯৫৭-৫৮ সালে) করেছিলেন ৩৩৭ রান।

তন্দ্রা, মিতা, স্বাতী, কৃষ্ণ, স্বপ্না ও প্রমুখ (গুলেমা টি এস্টেট, দার্জিলিং)

প্রশ্ন : ভারতীয় মহিলারা তো সব কিছু খেলা খেলে থাকেন, কিন্তু ক্রিকেটটা খেলেন না কেন?

উত্তর : যতোদূর জানি দিল্লীর কয়েকজন মেয়ে ভি জি-কে একবার ধরেছিলেন মেয়েদের ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য। ভি জি-ও তাঁদের কথা দিয়েছিলেন চেষ্টা করবেন বলে। কিন্তু হঠাৎ মারা যাওয়ায় ভি জি আর কিছু করে যেতে পারেন নি।

যাই হোক আপনারা তো বাড়িতে ক্রিকেট খেলতে পারেন। আমরা কিন্তু বাড়িতে সবাই মিলে খুব ক্রিকেট খেলতাম...!

রবীন্দ্রনাথ হালদার ও মনোরঞ্জন দাস (হিংগলগঞ্জ, ২৪ পরগনা)

উত্তর : খেলাধুলার বিভাগের জন্যে এর চেয়ে বেশি জায়গা পাওয়া বোধহয় সম্ভব নয়। মা খেলা চলার সময় কোন খেলোয়াড় ধূমপান করতে পারেন না।

অসিতকুমার চৌধুরী (টাকী, ২৪ পরগনা)

উত্তর : আপনার রিপ্লাই কার্ড পেয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে উত্তর পাবেন, কয়েক দিনের মধ্যে।

অরুণকুমার গুহকর্মকার (তেজগঞ্জ, বর্ধমান)।

প্রশ্ন : বর্তমানে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে কাকে একমাত্র নির্ভরযোগ্য অথচ নিপুণ বলা যায়?

উত্তর : আমার মতে অজিত ওয়াদেকার।

দুর্গাশংকর সুর (বারাসত, দশভুজাতলা, চন্দননগর)।

উত্তর : এবারের ক্রিকেট মরশুম শুরু হয়ে গেছে। তাই এ বছর তো কিছু করা সম্ভব নয়। তবে আপনি শ্রীকার্তিক বসু, C/o. সি, এ, বি, ইডেন গার্ডেনস, কলকাতা—এই ঠিকানায় চিঠি লিখে কিম্বা অন্য কোনভাবে যোগাযোগ করে দেখতে পারেন।'

হ্যাঁ চুনী গোস্বামী তো এ বছরও ক্রিকেট খেলছেন।

সম্পাদিকা—অরুন্ধতী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

৭৩ বর্ষ ঃ ২৭শ সংখ্যা মূল্য ঃ ৩০ পয়সা বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা PRICE : 30 Paise

বৃহস্পতিবার, ১১ই পৌষ, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ Thursday, 26th December, 1968

ভেজালের বিরুদ্ধে চাই কঠোর ব্যবস্থা

জনসাধারণকে অতি সাধারণ অধিকারগুলি থেকে বঞ্চিত করার জন্য সরকারের পক্ষে নিত্য-নতুন আইন প্রণয়ন করতে কুণ্ঠিত দেখা যায় না। কিন্তু যে সব স্থলে অধিকার কিছুটা সীমিত হলে জনসাধারণের প্রাণ রক্ষা পায় সে সব জায়গায় কঠোর আইন প্রণয়নের কথা সরকার কল্পনাও করতে পারেন না। বিগত একুশ বছরের—এই হচ্ছে আমাদের দেশের এক মর্মান্তিক ইতিহাস।

সেই কঠোর আইন প্রণয়নের প্রয়োজন কাদের বিরুদ্ধে—তা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবু পুনরুক্তি করতে বাধা নেই যে, আমাদের কল্যাণকামী সরকার জাল, ভেজাল, দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন করতে অসমর্থ হয়েছেন। অথচ দেশ যখন স্বাধীনতা লাভ করে নি, তখন এ দেশের জনদরদী নেতৃবৃন্দ হামেশাই চোরাবাজারী আর ভেজালদারদের প্রকাশ্য ল্যাম্পপোস্টে কিংবা ফাঁসি-কাঠে ঝোলাবার বাসনা ঘোষণা করতেন। তারপর সত্যি সত্যি দেশ যখন স্বাধীন হোল এবং সেই স্বাধীনতার আস্বাদ জন-সাধারণ অপেক্ষা এক শ্রেণীর সমাজ-বিরোধী ব্যবসায়ী বেশি ভোগ করার সুযোগ নিল, তখন নেতৃবৃন্দের সেই পুরাতন ঘোষণা কেবলমাত্র উদ্ধৃতি হিসেবেই ব্যবহৃত হতে লাগলো, প্রচুর ক্ষমতা তাঁদের হাতে থাকলেও সমাজ-বিরোধীদের শায়েস্তা করার মতো উপযুক্ত ব্যবস্থা তাঁরা গ্রহণ করতে পারলেন না। ফলে, ভেজাল ও নানারকম দুর্নীতি ক্রমশ আরো বিস্তার লাভ করলো। এবং ভেজালদার ও দুর্নীতি পরায়ণদের মধ্যে যেটুকু ভয় ছিল, জামাতাসুলভ আদর-যত্নলাভে সে-ভয়ের অস্তিত্ব পর্যন্ত তাদের থাকলো না। তা ছাড়া ভেজালনিরোধে, দুর্নীতি দূরীকরণে যে সব প্রতিষ্ঠান নিযুক্ত, তারাও ধীরে ধীরে ঐ সব কাজে নিরুৎসাহ বোধ করলো, কেউ কেউ বা দুর্নীতি দূরীকরণে থেকে অসৎভাবে অর্থ উপার্জনের পথ খুঁজে পেল। উপরি উক্ত বক্তব্য কারো অজ্ঞাত নয় এবং আমরা নতুন করেও বলছি না! মাসাধিক কাল আগে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমরা দেশময় দুর্নীতির রাজত্ব কেন—তা আলোচনা করেছি। বলা বাহুল্য, আমরা আশা করেছিলাম, কেন্দ্রীয় সরকার জাল, ভেজাল বা দুর্নীতির ব্যাপারে জন-সাধারণকে বড় বড় কথা না শুনিয়ে এমন একটি আইন রচনা করে দেবেন—যার সাহায্যে দুর্নীতিগ্রস্তরা শুধু প্রকাশ্যে কানমলাতেই রেহাই পাবে না, উপরন্তু নরহত্যার দায়ে তাদের অভিযুক্ত করে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হবে।

দুর্ভাগ্যের ব্যাপার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি সেদিকে নেই এবং কোনো কোনো রাজ্যও এখন মন্ত্রিত্বের উত্থানে, পতনে কিংবা সাময়িক অবসানে পঙ্গু অথবা দৃষ্টিশক্তিহীন।

আমাদের ধারণা, পশ্চিমবঙ্গের জন-সাধারণের এখন অত্যন্ত দুর্ভাগ্য। সম্প্রতি সরিষার তেলে ভেজালের ব্যাপারে যেটুকু খবর প্রকাশ পেয়েছে—তাতে সরিষার তেল ব্যবহারকারীরা আতঙ্কিত এবং ইতিমধ্যে অনেকেই রোগগ্রস্ত।

সরিষার তেলে শেয়ালকাঁটা ভেজাল দেওয়া এবং তা খাওয়ার জন্য রোগীদের মধ্যে চক্ষুরোগ, বেরিবেরি, সংক্রামক শোথ, হৃদ্‌রোগ প্রভৃতি আরো অন্যান্য মারাত্মক ব্যাধির লক্ষণ দেখে স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন থেকে রাজ্য সর-কারকে জানালেও সরকার এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন নি। পরে বঙ্গীয় চক্ষু চিকিৎসক সমিতির সভাপতি ডাঃ মুরলীধর সেনগুপ্ত পৌরসভা ও রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙিয়ে দিতে সমর্থ হলে স্বাস্থ্যবিভাগ এমন হৈ-চৈ সুরু করে ভেজাল তেল আতঙ্কের ফতোয়া জারী করে যে, বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীরা রাতারাতি সুযোগ পেয়ে সমস্ত সরিষার তেল সরিয়ে ফেলে। এ ছাড়া পৌরসভার যে বিভাগের উপর ভেজাল প্রমাণ করার দায়িত্ব রয়েছে তারা যে নিতান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছে তার প্রমাণ মেলে একটি ঘটনায় ঃ তারা এতোদিন কোনো কিছুই করে নি। কেন করে নি—তার জবাবদিহি, আশা করা যায়, পৌরসভা অবশ্যই গ্রহণ করবেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা দরকার যে, পৌর লেবোরেটারীর সংখ্যা যতই কম হোক না কেন—ব্যবসায়ীদের মিলে বা দোকানে আকস্মিক উপস্থিত হয়ে সেই তেল পরীক্ষা করতে বাধা ছিল কোন্ আইনে? এবং কেনই বা তা করা হয় নি? সম্ভবত সেখানেও দুর্নীতির সন্ধান মিলবে।

যারা সরিষার তেলের ডীলার, তারা কেউই সরকারের অপরিচিত নয় এবং কিছুমাত্র আন্তরিকতা থাকলে ভেজাল তেল কোথা থেকে এবং কিভাবে আসছে, তা খুঁজে বার করা সরকারের পুলিশ বিভাগের পক্ষে মোটেও কঠিন কাজ হবে না আমরা চাই—রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পুলিশ দপ্তর অবিলম্বে যুক্তভাবে ও কঠোরতার সঙ্গে ভেজাল-বিরোধী অভিযান সুরু করুন। আগে থেকে তৎপর হলে অপরাধী ডীলারদের আড়তে হানা দিয়ে অনেক কাজ হত, কিন্তু এখন আড়তগুলি সাবধান হয়ে গেছে। তবে পি. ডি. এ্যাক্টের নির্মম প্রয়োগে অনেকটা কাজ এখনো হতে পারে।

রাজ্য সরকার কতদূর কি করছেন আমরা তা সাগ্রহে লক্ষ্য রাখছি।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

কোনো কোনো শিল্পব্যবসার ক্ষেত্রের মতো তেমনি জাতির জনক গান্ধীজীর ওপরেও কি বিড়লারা একচেটিয়া কর্তৃত্ব স্থাপন করেছেন? নয়াদিল্লীর ছাত্ররা এই প্রশ্নই তুলেছেন। শুধু ছাত্রদের নয়, শশিভূষণ সমগ্র জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন একটি মূল জিজ্ঞাসা নিয়ে: যেখানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে গান্ধীজী জায়গাটি পবিত্র করে গিয়েছেন, তাকে জাতীয় সম্পদে, জাতীয় স্মৃতিমন্দিরে পরিণত করা হবে না কেন. তাকে ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশি মাফিক ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে কেন? নয়াদিল্লীর যে বিড়লাভবনে ১৯৪৮ সনের ৩০শে জানুয়ারী আততায়ীর গুলীতে বিদ্ধ হয়ে মহাত্মা গান্ধী মহাপ্রয়াণে গিয়েছিলেন তাকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার দাবি নিয়ে লোকসভার সদস্য শ্রীশশিভূষণ অনশন শুরু করেছিলেন।

অথচ শশিভূষণ বিরোধী কোন দলভুক্ত সদস্য নন কিম্বা নামজাদা নেতাইও তিনি নন, কংগ্রেসীদের তিনি স্বগোত্র, কংগ্রেসের টিকিটেই তিনি মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরস্থ পশ্চিম নিমার কেন্দ্র থেকে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। হবে তো. শশিভূষণকে কংগ্রেস থেকে বার করে দেওয়ার কথাও [illegible] তুলেছেন।

কিন্তু বিড়লাভবনকে জাতীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করার দাবিকে শশিভূষণ কংগ্রেসের বিরোধিতার সমান্তরাল বলে মনে করতে পারেন নি, বরং তিনি তাঁর ব্যক্তিগত দাবিকে জাতীয় দাবিতে উত্তরণ করাতে চেয়েছেন। তাই তিনি কংগ্রেসী হয়েও জাতির এ-জরুরী প্রয়োজন নিয়ে মাথা ঘামাতে দ্বিধা করেন নি।

শশিভূষণের চরিত্রের এ-বিশিষ্টতা কিন্তু এই প্রথম প্রকাশ পেলো না, বরং বলা যেতে পারে ওই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই শশিভূষণ বালক বয়সে কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। দেশীয় রাজ্য গোয়ালিয়রে চল্লিশ বছর আগে শশিভূষণের জন্ম। স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার অপরাধে শশিভূষণকেও বিস্তর হুজ্জত পোহাতে হয়েছিলো. হলেনই না তিনি কিশোরমাত্র। এই কিশোরকে সেদিন যাঁরা কাসুর সাব জেলে দেখেছিলেন রাজবন্দী হিসেবে, সেদিন বিস্ময়ে সকলে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, বৃটিশরাজ এই বালককেও ভয় করেন। রাজবন্দীদের মধ্যে শশিভূষণই ছিলেন সেদিন

শ্রীশশিভূষণ

কনিষ্ঠতম। কিন্তু দেশবাসীর বিস্ময় প্রকাশে বৃটিশ শাসকের রক্তচক্ষু শান্ত হয় নি, শশিভূষণের কারাবাস পাকা করার জন্য তাঁকে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হলো।

মুক্তি পাবার পর তরুণ শশিভূষণ দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সীমান্তগান্ধী আবদুল গফুর খানের সংস্পর্শে এসে শশিভূষণের বুকের ভেতরে যে-আগুন ছিল তার দাহিকাশক্তি আরো বেড়ে গেলো। তাঁর [illegible] দীক্ষা ও শিক্ষা যেমন শক্ত ভিত খুঁজে পেলো, তেমনি তাঁর মধ্যে সীমান্তগান্ধী সযত্নে পুঁতে দিলেন অন্যায়ের সঙ্গে আপোষহীনতার বীজ।

তাই শশিভূষণ কংগ্রেসের কেবল হাত-তোলা সমর্থকমাত্র হয়ে থাকতে পারেন নি. পার্লামেন্টে নীরব শ্রোতার ভূমিকা তাঁর জন্যে নয়, যে-কোনো জাতীয় প্রশ্নে উচ্চগ্রামের কণ্ঠ শুনলে মাননীয় সদস্যরা বুঝতে পারেন সোচ্চার হয়ে উঠেছেন কে। অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ তিনি করতে পারেন না, তাই তাঁকে নিজের বিবেকের তাড়নায় কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের সুস্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধে বিতর্কে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। তখন তিনি নবীন তুর্কী।

অর্থাৎ সাধারণের চোখে দলের অমর্যাদা ঘটে, শশিভূষণের তা কখনই অভিপ্রেত নয়। তিনি চান প্রতিক্রিয়াশীলতা, সঙ্কীর্ণতা এবং অন্তকলহের পাপপঙ্ক থেকে গান্ধীজীর কংগ্রেসকে উদ্ধার করতে, পৃথিবীর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের নবীন যাত্রার সহায়ক হতে। দলের মধ্যে প্রগতিশীলতার প্রতিষ্ঠা দিয়ে তিনি কংগ্রেসকেই পুনরুজ্জীবিত করতে চান। তাই তাঁকে দেখা যায় রাজন্যবর্গের ভাতা দানের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষণ দিতে, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সপক্ষে অকাট্য যুক্তিজাল বিস্তার করতে, একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে! স্বভাবতই কংগ্রেসের প্রাচীনপন্থী 'ওল্ডগার্ড'রা তাঁর ওপর চটেছেন। কিন্তু তিনি নাচার, দল তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় ঠিকই, কিন্তু জাতি দলের চেয়েও বড়ো।

শশিভূষণকে নিয়ে কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের দুশ্চিন্তার সীমা নেই। তিনিই একমাত্র কংগ্রেস এম-পি যিনি লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হবার দু' বছরের মধ্যে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। অবশ্য সেই একই সাধারণ মানুষের মৌলিক দাবির প্রশ্নে। গত বছর উত্তরপ্রদেশের বিলাসপুরের হরিজনরা যখন [illegible] তকাভি ঋণ আদায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামেন, [illegible] নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

বয়সে যেমন শশিভূষণ এখনো তরুণ, তারুণ্যের দীপ্তি তাঁর মুখে-চোখেও। তাঁর কাজকর্মের মধ্যেও তেমনি যুবোচিত ছাপ। বিশ্ব যুব ফেডারেশনে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ভিয়েনা গিয়েছিলেন, এবার তাঁকে যেতে হয়েছিলো সোফিয়া।

কিন্তু বিড়লাভবনকে গান্ধী শতবার্ষিকীর বছরে জাতীয় সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করার দাবি কেবল যুবকদেরই নয়, তবে যুবকদের তিনি কর্মচঞ্চল করে তুলেছেন। তাঁর দাবির সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোক, গঠিত হয়েছে সর্বদলীয় কমিটি. কংগ্রেসের নামজাদা নেতারাও যার মর্যাদা রক্ষা করেছেন। এই কমিটির অনুরোধ এবং সর্বসম্মত প্রস্তাবেই শশিভূষণ শেষ পর্যন্ত অনশন ভঙ্গ করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছে, একটা জরুরী প্রশ্নে তিনি জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন. জাতি আজ প্রয়োজনের ব্যাপারে উত্থিত ও জাগ্রত, সজাগ ও সতর্ক।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

(আইন অমান্য আন্দোলনে)

রমেশচন্দ্র বাগচী—উকিল (চাঁপাই নওয়াবগঞ্জ), রজনীকান্ত সান্যাল (নওগাঁ), সুধাংশু (চেবু) চৌধুরী, গোরা মৈত্র, সুরেন্দ্রচন্দ্র দাস, বীরেশ্বর চক্রবর্তী, সুশান্তচন্দ্র ধাড়া (মেদিনীপুর), ঝাড়েশ্বর মাঝি (মেদিনীপুর), সতীশচন্দ্র সামন্ত (মেদিনীপুর)।

১৯৩০ সন—বহরমপুর জেল। (বিনা বিচারে আটক)।

প্রতুলচন্দ্র গাংগুলী, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, কেদারেশ্বর সেন।

১৯৩০—৩১ সন—বক্সা ক্যাম্প জেল। (বিনা বিচারে আটক)।

প্রফেসার জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, প্রতুলচন্দ্র গাংগুলী, রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, রমেশচন্দ্র আচার্য, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, আনন্দচন্দ্র মজুমদার, পূর্ণচন্দ্র দাস, পঞ্চানন চক্রবর্তী, অমলেন্দু দাশগুপ্ত, ফণিভূষণ মজুমদার, বিপিনচন্দ্র গাংগুলী, ভূপতি মজুমদার, হেমচন্দ্র ঘোষ, অনিলচন্দ্র রায়, ভূপেন রক্ষিত, সত্যরঞ্জন বক্সী, সত্য গুপ্ত, জ্যোতিষচন্দ্র জোয়ারদার, মদনমোহন ভৌমিক, তরণীভূষণ সোম, চিরঞ্জীব মিশ্র, স্বদেশরঞ্জন নাগ, চারু রায়, রবি বসু, দুর্গেশ ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন গুপ্ত, ভূপেন দত্ত, অরুণচন্দ্র গুহ, প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্তী, নরেশচন্দ্র সোম, অমূল্যচন্দ্র অধিকারী, রাখালচন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার, শ্যামানন্দ সেন, ক্ষিতীশচন্দ্র বসু, পৃথ্বীশচন্দ্র বসু, প্রতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য, ক্ষিতীশচন্দ্র ব্যানার্জী, বঙ্কিমচন্দ্র মুখার্জী, কালী সেন, আব্দুর রেজ্জাক, আস্রাব উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, নিতাই কুণ্ডু, সুকুমার ভৌমিক (আগরতলা), প্রতাপচন্দ্র রক্ষিত (চট্টগ্রাম) শ্যামাচরণ বিশ্বাস (চট্টগ্রাম), যশোদারঞ্জন চক্রবর্তী (চট্টগ্রাম), কবিরাজ যতীন রক্ষিত (চট্টগ্রাম) অতীন্দ্রমোহন রায় (কুমিল্লা), অমূল্য মুখার্জী (কুমিল্লা), মণীন্দ্র চক্রবর্তী (কুমিল্লা), ব্রজেন্দ্র চক্রবর্তী (কুমিল্লা), রবি ভট্টাচার্য (কুমিল্লা), মাখনচন্দ্র পাল (নোয়াখালী), প্রতুলচন্দ্র চৌধুরী (নোয়াখালী), শান্তিময় দত্ত (নোয়াখালী), শুভময় শূর (নোয়াখালী), সুখময় চক্রবর্তী (নোয়াখালী), সন্তোষ চক্রবর্তী (নোয়াখালী), রসময় শূর (নোয়াখালী) দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ (বরিশাল), দেবকুমার (মনা) ঘোষ (বরিশাল), যতীন (ফেগু) রায় (বরিশাল), নরেন দাস (বরিশাল), রঞ্জিৎ সরকার (বরিশাল), নলিনীকান্ত দাশগুপ্ত (বরিশাল), ধূর্জটি নাগ (বরিশাল), অমর বসু (কলিকাতা) ধীরেন মুখার্জি (কলিকাতা), হরিকুমার চক্রবর্তী (কলিকাতা), গোবিন্দ ব্যানার্জি (খুলনা), নারায়ণ চ্যাটার্জি (খুলনা), কিরণচন্দ্র মুখার্জি (খুলনা), ইন্দ্রচন্দ্র নারাং (লাহোর), নিরঞ্জন সেন (বরিশাল), অবলা কর (বরিশাল), প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী (রাজসাহী), সুধাংশু (চেবু) চৌধুরী (রাজসাহী), প্রভাতকুসুম ভাদুড়ী (রাজসাহী), নলিনী বাগচী (জলপাইগুড়ি), প্রফুল্লচন্দ্র ত্রিপাঠী (জলপাইগুড়ি), প্রতাপচন্দ্র মজুমদার (হিলী, বগুড়া), কেদারেশ্বর সেন (ফরিদপুর), সরল সেন (ফরিদপুর), সন্তোষ দত্ত (ফরিদপুর), সতীশচন্দ্র পাকড়াশী (ঢাকা), মাখন দত্ত (ঢাকা), ডাঃ গুরুগোবিন্দ রায় (ঢাকা), পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত (ঢাকা), সুরপতি চক্রবর্তী (ঢাকা), অমর ব্যানার্জি (ঢাকা), জীবনলাল চ্যাটার্জি (ঢাকা), বীরেন্দ্রচন্দ্র গাংগুলী (ঢাকা), গোপাল গুপ্ত (ঢাকা), সতীন্দ্র রায় (ঢাকা), সুশীল সরকার (ঢাকা), ভবেশচন্দ্র নন্দী (ঢাকা), কিরণ নন্দী (ঢাকা), অমল নন্দী (ঢাকা), সুধীর নন্দী (ঢাকা), মণীন্দ্র রায় (ঢাকা), উমাপদ চক্রবর্তী (ঢাকা), তারাপদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণপদ চক্রবর্তী (ঢাকা), জগদীশ চক্রবর্তী (ঢাকা), পরিমল ভট্টাচার্য (ঢাকা), সুধীর কুশারী (ঢাকা), সুখময় চাকলাদার (ঢাকা), সুশীলচন্দ্র দেব (রংপুর), ক্ষিতীশচন্দ্র দেব (রংপুর), পরেশচন্দ্র গুহ (রংপুর) অমর চক্রবর্তী (চট্টগ্রাম), যামিনী পাল (কুমিল্লা), জগদীশ চ্যাটার্জি (বরিশাল), ত্রিদিব চৌধুরী (ঢাকা) (বহরমপুর), মিহির মুখার্জি, ননী ভট্টাচার্য (বহরমপুর), অমিয় সান্যাল (ময়মনসিংহ), জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী (ময়মনসিংহ), ফণী আচার্য (ময়মনসিংহ), সৌরভ ঘোষ, ব্রজেন্দ্রব্রহ্ম, রেবতী বর্মণ (ময়মনসিংহ), দেবব্রত (দেবু) রায় (ময়মনসিংহ), অমূল্য লাহিড়ী (লাহিড়ী মোহনপুর পাবনা), জলদেশ লাহিড়ী (লাহিড়ী মোহনপুর পাবনা), সুরেন রায় (নওগাঁ রাজসাহী), রণেন গোস্বামী (নওগাঁ, রাজসাহী)।

১৯৩১—৩২ সন, কেনানুর জেল—মদ্র প্রদেশ। (রাজবন্দী)।

প্রতুলচন্দ্র গাংগুলী, রবীন্দ্রমোহন সেন, রমেশচন্দ্র আচার্য, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী।

আইন অমান্য বন্দী—(কংগ্রেস)

কে পি কৃষ্ণন মেনন, (কংগ্রেস মন্ত্রী হইয়া ভেল্লোর জেলে আমাদের সহিত দেখা করিয়াছিলেন) কর্ণাটক সদাশিব রাও, গোবিন্দ মেনন, শঙ্কর নাম্বুদ্রিপাদ (বর্তমান কম্যুনিস্ট নেতা), এ কে গোপালন (বর্তমান কম্যুনিস্ট

নেতা), কৃষ্ণ পিলে, দামোদর মেনন, মাধব মেনন ইত্যাদি।

১৯৩২ সন ত্রিচিনপল্লী জেল।

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, রবীন্দ্রমোহন সেন, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী।

১৯৩৩—৩৫ সন ভেলোর জেল। (রাজবন্দী)।

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, রবীন্দ্রমোহন সেন, রমেশচন্দ্র আচার্য।

আইন অমান্য কংগ্রেস বন্দী

প্রোফেসার এন জি রঙ্গ, লিঙ্গ রাজু (অন্ধ্র), নারায়ণ মেনন (মালাবার মোপলা বিদ্রোহ নেতা, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড), কমলনাথ তেওয়ারী (কাঁকড়ী ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড)।

১৯৩৫—৩৭ সন হিজলী জেল। (বিনা বিচারে আটক)।

প্রোঃ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ (হুগলী), ভূপতি মজুমদার (হুগলী), ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (ময়মনসিংহ), সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (ময়মনসিংহ), প্রতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য (ময়মনসিংহ), পূর্ণচন্দ্র দাস (ফরিদপুর), প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী (ঢাকা), রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (ঢাকা), ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত (ঢাকা), সত্যরঞ্জন গুপ্ত (ঢাকা), জীবনলাল চ্যাটার্জি (ঢাকা), রমেশচন্দ্র আচার্য—(ঢাকা), রসিকলাল দাস (খুলনা), অরুণচন্দ্র গুহ (বরিশাল), মনোরঞ্জন গুপ্ত (বরিশাল), ভূপেন দত্ত (যশোহর)।

১৯৩৯ সন—চট্টগ্রাম জেল—(এক বৎসর দণ্ডিত)।

আস্রাফ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী (কুমিল্লা), ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (ময়মনসিংহ)।

১৯৩৯ সন—ঢাকা সেণ্ট্রাল জেল—

আস্রাফ উদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী।

১৯৪০ সন—মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেল—(দণ্ডিত)।

ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, নিকুঞ্জ মাইতি, কমলকৃষ্ণ রায়, মিহিরলাল চ্যাটার্জি, কুমারচন্দ্র জানা, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী।

১৯৪২ সন—ঢাকা সেণ্ট্রাল জেল—বিনা বিচারে আটক।

(এই সময় ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে গুণ্ডা সিকিউরিটিদের উপর গুলী চালান হয় এবং ফজলুল হক সাহেব জেলে অনুসন্ধান করিতে যান এবং বিনা বিচারে আটক রাজবন্দীদের সহিত দেখা করেন।)

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, রবীন্দ্রমোহন সেন, রমেশচন্দ্র আচার্য, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্যামানন্দ সেন, পূর্ণচন্দ্র দাস, প্রফুল্ল চ্যাটার্জি, ভবেশচন্দ্র নন্দী, রবি বসু, চিরঞ্জীব মিশ্র, স্বদেশরঞ্জন নাগ, দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ, দেবকুমার ঘোষ (মনা ঘোষ), অমূল্য মুখার্জি, মণীন্দ্র চক্রবর্তী, নিরুপম কুশারী, উমাপদ চক্রবর্তী, তারাপদ চক্রবর্তী, রাখাল ঘোষ, মাখন দত্ত, সত্য গুপ্ত, রমেশচন্দ্র ঘোষ।

১৯৪৪—৪৬ সন—দমদম জেল—(বিনা বিচারে আটক)।

প্রোফেসার জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, রবীন্দ্রমোহন সেন, রমেশচন্দ্র আচার্য, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, ভূপতি মজুমদার, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্যামানন্দ সেন, পূর্ণচন্দ্র দাস, ভবেশচন্দ্র নন্দী, পঞ্চানন চক্রবর্তী, মিহির মুখার্জি, ত্রিদিব (ঢাকু) চৌধুরী, অমূল্যচন্দ্র অধিকারী, নরেশচন্দ্র সোম, ধনঞ্জয় কর, রাম মজুমদার, হরেন্দ্র রায় (দক্ষিণ চাতরা), অতীন্দ্রমোহন রায়, অমূল্য মুখার্জি, মণীন্দ্র চক্রবর্তী, শান্তিময় দত্ত, মাখন পাল, কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত, বিনয়জীবন ঘোষ (মেদিনীপুর), ধীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি, হরিকুমার চক্রবর্তী। •

মহাত্মা গান্ধী হিজলী ও প্রেসিডেন্সী জেলে যাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন

(১) প্রোঃ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ (হুগলী) (২) ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী (ময়মনসিংহ) (৩) প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী (ঢাকা) (৪) রমেশচন্দ্র আচার্য (ঢাকা) (৫) রবীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (ঢাকা) (৬) সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (ময়মনসিংহ) (৭) পূর্ণচন্দ্র দাস (মাদারীপুর) (৮) ভূপতি মজুমদার (হুগলী) (৯) সত্যরঞ্জন গুপ্ত (ঢাকা) (১০) মনোরঞ্জন গুপ্ত (বরিশাল) (১১) জীবনলাল চ্যাটার্জী (ঢাকা) (১২) ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত (ঢাকা) (১৩) প্রতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য (ময়মনসিংহ) (১৪) রসিকলাল দাস (খুলনা) (১৫) ভূপেন দত্ত (যশোহর) (১৬) অরুণ গুহ (বরিশাল)।

ভারতবর্ষের সর্বত্র বিপ্লব দলের ধ্বংসাত্মক কাজ চলিতেছিল, জাতীয় কংগ্রেস আন্দোলনও জোরে চলিতেছিল, তখন ভারত গভর্নমেণ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, মহাত্মা গান্ধীর মাধ্যমে বিপ্লবীদের মনের পরিবর্তন করিতে। ১৯৩৫ সন বাংলার বিপ্লবী নেতাদিগকে ভারতের বিভিন্ন জেল হইতে মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত হিজলী জেলে একত্র করা হয়। মহাত্মা গান্ধীর আগমন সংবাদ আমরা পূর্বেই পাইয়াছিলাম। মহাত্মা গান্ধীকে সাদরে অভ্যর্থনা করার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম। তাঁহার বসার স্থান ফুল দিয়া সাজান হইল, ফুলের তোড়া তৈয়ার করা হইল। তিনি নির্দিষ্ট সময়ে হিজলী জেলে উপস্থিত হইলেন, আমরা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলাম। তিন ঘণ্টা আলাপ-আলোচনা হইল, সেখানে জেলের কোন কর্মচারী উপস্থিত ছিল না। মহাত্মা গান্ধী চাহিয়াছিলেন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আমাদের মতের পরিবর্তন করা। তিনি চাহিয়াছিলেন, আমরা যেন হিংসানীতি পরিত্যাগ করিয়া মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী হইয়া দেশের স্বাধীনতার কাজে অগ্রসর হই। বিপ্লবীরা যদিও মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না, তবুও তাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সংগ্রামে যোগদান করিয়াছেন, খাঁটি সত্যাগ্রহীর ন্যায় পুলিশের লাঠিচার্জের সম্মুখীন হইয়াছেন, কোনপ্রকার দুর্বলতা দেখান নাই বা হিংসা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন মহাত্মার অহিংস আন্দোলন দেশকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিবে। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছিলেন, আমরা যদি এই প্রতিশ্রুতি দেই (মৌখিক) হিংসায় আমাদের বিশ্বাস নাই, আমরা অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী, তবে মহাত্মা গান্ধী আমাদের মুক্তির জন্য গভর্নমেণ্টকে সুপারিশ করিবেন এবং আশা করা যায়, গভর্নমেণ্ট সকল রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিবেন। বিপ্লবীরা অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী নন। তাঁহারা মনে করেন স-শস্ত্র বিপ্লব দ্বারাই ভারতের স্বাধীনতা আসিবে। বিপ্লবী নেতারা মহাত্মা গান্ধীর সহিত এক মত হইতে পারিলেন না। মহাত্মা গান্ধী আমাদের নিকট হইতে বিদায় লওয়ার সময় বলিলেন, "ইহার পর আমি আবার তোমাদের এখানে আসিয়া তিন দিন তোমাদের সহিত একত্র থাকিব এবং তোমাদিগকে আমার মতে আনিব।" মহাত্মা গান্ধীর সহিত সকলেই খুব সম্মানের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়াছেন। ইহার কয়েক মাস পর আমরা সংবাদ পাইলাম, মহাত্মা গান্ধী আমাদের সহিত দেখা করিবেন। এবার তিনি হিজলী আসিতে পারিবেন না, তিনি অসুস্থ, প্রেসিডেন্সী জেলে দেখা করিবেন। আমাদিগকে প্রেসিডেন্সী জেলে (কলিকাতা) স্থানান্তরিত করা হইল।

গ্রেপ্তারের পূর্বে তাঁহার সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর সহিত আমাদের আবার দেখা হইল, আলাপ-আলোচনা সুরু হইল। আলাপ-আলোচনায় কেহ কাহাকেও স্ব-মতে আনিতে পারিলেন না, প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতে অটল রহিলেন। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দুই ঘণ্টা আলাপ হইয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী হাসিমুখেই বিদায় লইলেন।

কারা সংস্কার

আমি জেলখানায় জেল রিফর্ম সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম। আমি আন্দামান, ব্রহ্মদেশ ও ভারতের বিভিন্ন জেলে ছিলাম। আমি তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে সাধারণ কয়েদীর সঙ্গে বহু বৎসর কাটাইয়াছি, আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দী ছিলাম, আমি সিকিউরিটী বন্দী ছিলাম, আমি স্টেট প্রিজনার ছিলাম*। জেল কোডে যে সব দণ্ডের কথা লিখিত ও অলিখিত আছে আমি বেত্রদণ্ড ব্যতীত সকল দণ্ডই ভোগ করিয়াছি। আমি ক্রস্-বার ফেটার্স (লোহার ডাণ্ডাবেড়ি পরিবর্তে দেওয়া হয়) বারফেটার (লোহার বেড়ি) সিকলি (... খাড়া হাতকড়ি, পেছনে হাতকড়ি, আর ভাত নিজনসেল প্রভৃতি সকল দণ্ডই ভোগ করিয়াছি, আমার জেলের সব রকম অভিজ্ঞতাই আছে। আমার লেখা "কারা সংস্কার" প্রকাশিত করার জন্য শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট দিয়াছিলাম তিনি ছাপাইতে রাজী হইয়াছিলেন, খাতা তাঁহার নিকটই ছিল, ইহার পর ১৯৪০ সনে আমি ধৃত হই, খাতার কোন খোঁজ করিতে পারি নাই, তাহার পর রামানন্দবাবুরও মৃত্যু হয়, আমার খাতাখানারও পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হয়।

আমি এক সময় পূর্ববঙ্গে কালীচরণ মাঝি নামে পরিচিত ছিলাম। (জিতেশচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত "নমামী" দ্রষ্টব্য) বিপ্লব যুগে বিপ্লবীরা অর্থ সমস্যা সমাধানের জন্য ডাকাতি করিত, ইহার দ্বারা সামরিক শিক্ষাও হইত। বিপ্লবীরা ডাকাতি করার সময় চোরের মত গৃহে প্রবেশ করিত না তাহারা বিগল বাজাইয়া, বন্দুকের আওয়াজ করিয়া, গ্রামবাসীকে জাগাইয়া, গৃহের দরজা ভাঙিয়া লুণ্ঠন করিত। ঢাকা জিলার অন্তর্গত বাহা ডাকাতিই প্রমাণ। (জেলে ত্রিশ বছর ও ভারতের বিপ্লব সংগ্রাম দ্রষ্টব্য) জলপথে ডাকাতির জন্য বিপ্লব দলের বড় ঘাসি নৌকা থাকিত, বিপ্লবীরাই নৌকা

* অন্তরীণে আবদ্ধ ছিলাম।

চালাইত। ১৯১০।১২ সনে, আমার পলাতক অবস্থায়, আমি বিভিন্ন মামলার পলাতক আসামী ছিলাম, আমার নামে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা ছিল, আমি তখন ঘাসি নৌকার মাঝি। আমার সঙ্গে দলের অপর তিনজন মাঝি হিসাবে থাকিত, তাহাদের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (ফতেজংপুর—ফরিদপুর) সতীশ দাশগুপ্ত (কুমরপুর—ফরিদপুর, বর্তমান স্বামী সত্যানন্দ)* থাকতেন। পূর্ববঙ্গের যতগুলি বড় বড় নদী আছে, আমি সব নদীতেই নৌকা চালাইয়াছি, আমি ঢাকা হইতে বরিশাল গিয়াছি, নোয়াখালী গিয়াছি, বর্ষাকালে ঝড়-বৃষ্টির দিনে পদ্মানদী পাড়ি দিয়াছি। আবার সময় সময় নৌকা নিরাপদ স্থানে ডুবাইয়া রাখিয়া ভদ্রলোক সাজিয়াছি। আমি ঐ সময় পলাতক অবস্থায়, মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত গড়পাড়া মাইনর স্কুলে হরেন্দ্র চক্রবর্তী নামে কিছুদিন হেডমাস্টারী করিয়াছি, গড়পাড়ার জমিদারপুত্র অশ্বিনী ঘোষ আমাদের দলের সভ্য ছিল। (জেলে ত্রিশ বছর ও ভারতের বিপ্লব সংগ্রাম দ্রষ্টব্য)

গীতা ভাষ্য

আমি ১৯৩১ সনে বাক্‌সা ক্যাম্প জেলে গীতা ভাষ্য লিখি। ১৯৩৮ সনে ঢাকার রাজনৈতিক কর্মী শ্রীতরণী সোম আমার গীতা ভাষ্য "গীতায় স্বরাজ" নামে চারি অধ্যায়ে প্রথম খণ্ড প্রকাশ করে। ১৯৪০ সনে ধৃত হওয়ার পর বিভিন্ন জেলে গীতার বাকী অধ্যায়গুলির ব্যাখ্যা করি। আমি জেলে বহু লোকের গীতা ভাষ্য পড়িয়াছি, সকলেই নিজ নিজ মত গীতা ভাষ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন, আমিও আমার মত গীতা ভাষ্যে প্রকাশ করিলাম। আমি গীতার রাজনৈতিক ব্যাখ্যা করিলাম। গীতার উৎপত্তি কোন্ সময়? যুদ্ধক্ষেত্রে উভয়পক্ষের সৈন্য সমাবেশ হইয়াছে, যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আর বেশি বাকী নাই, তখন অর্জুনের মনে এই প্রশ্ন জাগিল, এই যুদ্ধে বহু লোকক্ষয় হইবে, ভারত বীরশূন্য হইবে, এখন এই যুদ্ধ করা উচিত কি অন্যায়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে নিযুক্ত করার জন্যই গীতার উপদেশ দিলেন। গীতায় ভক্তিতত্ত্ব আছে, জ্ঞানতত্ত্ব আছে, কর্ম-সন্ন্যাস আছে, উপনিষদ-সাংখ্য সব কিছুই আছে; সর্বত্র ব্রহ্মানুভূতি আছে কিন্তু গীতার ভগবান এই কথা ভুলেন নাই যে স্ব-রাজ্যভ্রষ্ট পার্থের পিতৃরাজ্য উদ্ধারের চাইতে প্রথম ও প্রধান বড় আর কোন কাজই নাই; জ্ঞানের কথা আছে, যোগ ভক্তির কথা আছে; বিশ্বাত্মিক যে ভগবান তাঁহার কথা আছে কিন্তু অর্জুনের কাছে—"অতএব যুদ্ধ কর" ইহাই প্রধান কথা। জ্ঞান ভক্তির ভাণ্ডার উজাড় করিয়া যোগ-মার্গ বিশ্লেষণ করিয়া ভূমার সন্ধান দিলেন; কিন্তু ভুল হইল না; না বক্তার, না শ্রোতার—না গুরুর, না শিষ্যের, কাহারও এই ভুল হইল না, যে অর্জুন স্ব-রাজভ্রষ্ট; সুতরাং অর্জুনের পক্ষে সর্বাগ্রে স্ব-প্রতিষ্ঠ হওয়াই শ্রেষ্ঠ ধর্ম—একমাত্র ধর্ম। কারণ এই হাজার উপদেশের পর অর্জুন যে কার্যটি করিলেন তাহা যুদ্ধ—পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধ এবং স্বয়ং ভগবান এত উপদেশের পর কার্যত যাহা করিলেন তাহা ঐ যুদ্ধেরই নেতৃত্ব। অর্জুন গীতার উপদেশ শ্রবণ করিয়া যোগমার্গ অবলম্বন করত ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া থাকেন নাই, বা ভক্তিমার্গ অবলম্বনপূর্বক প্রেম বিতরণ করেন নাই। তিনি মোহ নষ্ট হইয়াছে বলিয়া পৈতৃক রাজ্যের পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করিলেন এবং যুদ্ধে জয়ী হইলেন। আমার গীতা ভাষ্য, অষ্টাদশ অধ্যায়, গীতায় স্বরাজ নামে, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ১৯৫২ সনে প্রকাশ করেন। ১৯৬১ সনে আমার অনুরোধে শ্রীঅশোককুমার সরকার অবশিষ্ট গীতায় স্বরাজ—প্রায় পাঁচ শ' কপি "অনুশীলন ভবনকে" দান করেন। অনুশীলন ভবন—৩২।৪, চণ্ডী ঘোষ রোড—কলিকাতা ৪০।

সমাপ্ত

উত্তরবঙ্গের বন্যাত্রাণের জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্যের অভাব হবে না একথা গোড়া থেকেই শোনা গিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী, অর্থ-মন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রত্যেকেই এক-একবার হাওয়াই জাহাজ চেপে জলপাইগুড়ি বেড়িয়ে গেছেন এবং আশার বাণী শোনাতে কার্পণ্য করেন নি। কিন্তু নিছক বাণী ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নি। ভি, আই, পি-দের আনাগোনার বিরাম ছিল না, সরকারী খরচায় ইনটা-রেস্টিং ভ্রমণকার্য অনেকেই সম্পন্ন করে-ছেন, কিন্তু বন্যাক্রিষ্ট উত্তরবঙ্গের অধি-বাসীদের ভাগ্য যেখানে ছিল সেখানেই আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও কেন্দ্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিয়েই খালাস, নিজেরা কার্যকর যেটুকু করতে পারতেন তাও করেন নি। একেবারে যে কিছু করা যেত না তা নয়; মনে আছে গত বছরে ত্রাণখাতে যুক্তফ্রণ্ট সরকার তের কোটি টাকা বরাদ্দ করতে পেরেছিলেন। রাজ্যপালের সরকার কুড়ি কোটি টাকার একটা পরিকল্পনা জানিয়েছেন, কিন্তু টাকাটা আর পাওয়া যাচ্ছে না। কেন্দ্র এখনো উপুড়-হস্ত করে নি। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে একটি সমীক্ষক দল এসেছিল। আমরা আগে লিখেছিলাম যে উড়িষ্যায় এই দলটি সমীক্ষা চালিয়ে ওখানকার সরকার যা চেয়েছিলেন তার চেয়ে বেশি দিতে কুণ্ঠিত হন নি এবং সেটাও ঘটে গেছল সাত দিনের মধ্যে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এসে তাঁরা তুষ্ণীম্ভাব গ্রহণ করেছেন, তাঁরা সত্যই কি রিপোর্ট দিয়েছেন আপাতত ভগবান জানেন, কিন্তু লোকপরম্পরায় শোনা যাচ্ছে যে তারা নাকি সাড়ে বারো কোটি টাকা মঞ্জুর করার চিন্তা করছেন। এই টাকাটা উড়িষ্যায় প্রদত্ত টাকার চেয়ে অনেক কম, যদিও উড়িষ্যার বন্যার তুলনায় উত্তরবঙ্গের বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতি শতগুণে বেশি। সমীক্ষক দলের সুপারিশ অনুযায়ী যদি সাড়ে বারো কোটি টাকাও পাওয়া যায় তা দিয়ে কিছুই করা যাবে না কেন না পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিষয়ে যে পরি-কল্পনা নিয়েছেন তার জন্য প্রয়োজন কুড়ি কোটি টাকার। কেন্দ্রীয় সরকার যে এই বিষয়ে কার্যত কিছু করতে অনিচ্ছুক তার প্রমাণ খয়রাতি সাহায্যের ক্ষেত্রে ব্যয় কর্তন। তাঁরা এই খাতে মাত্র এক কোটি টাকা মঞ্জুর করেছেন। যাঁরা সবকিছু হারিয়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের পুনরায় নিজেদের ওপর নির্ভর করে রুজি-রোজগার করে খেতে অনেক সময় লাগবে এবং খয়রাতি সাহায্য না দিলে তাঁদের অনাহারেই মৃত্যু হবে। অথচ এই সামান্য বরাদ্দ থেকে এটাই অনুমান করা যায় যে, বন্যাক্রিষ্ট মানুষগুলির প্রতি কোন মনুষ্যত্ববোধের পরিচয় দিতেই কেন্দ্র নারাজ। উত্তরবঙ্গের ত্রাণকার্য বাস্তবিকই একটা ছেলেখেলা পর্যায়ে এখনো পড়ে আছে। গৃহনির্মাণের জন্য দুশো-আড়াইশো করে টাকা দেওয়া হচ্ছে। ব্যাপারটা একান্তই হাস্যকর, শুধু হাস্যকরই নয় এই দেওয়া-টার মধ্য দিয়ে সরকারের যে মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে সেটা নিশ্চয়ই কল্যাণ-রাষ্ট্রের পক্ষে অনুকূল নয়। গজিকা-প্রসাদাৎ-ও বোধ হয় কেউ আড়াইশো টাকায় গৃহনির্মাণের কথা ভাবতে পারে না. অথচ সরকার সেইরকম-ই ভেবেছেন। উত্তর-বঙ্গের তীব্র শীতে কোন শীতবস্ত্রের যোগান নেই, দেড় মিটার মাপের যে তুলোর কম্বল দেওয়া হয়েছে তা দিয়ে এক-একটি পরিবারের কিভাবে শীতনির্বাহ হবে তা ভাবতেই গায়ে কাঁটা দেয়। মাঠের পর মাঠ জমিতে পলি পড়ে সেগুলি চাষের অযোগ্য হয়ে আছে, একটি সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা এরই বুকে সোনা ফলাতে পারে, কিন্তু কোন কিছু কাজই হয় নি। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের জন্য ঋণ মঞ্জুরের ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু তা এত সর্ত-কণ্ট-কিত যে সে ঋণ গ্রহণ করতে কেউই উৎসাহ পাচ্ছে না। বাস্তবিকই হৃদয়হীনতা ও অমানবিকতা উচ্চমহলে পরিব্যাপ্ত হয়েছে উত্তরবঙ্গের বন্যাত্রাণের ব্যাপারটি তারই জ্বলন্ত নিদর্শন।

গুলী ও হত্যা

রাজ্যপালের প্রশাসন পশ্চিমবঙ্গে গুলী-বর্ষণ ও হত্যার রেকর্ড স্থাপন করেছে। এটা আমাদের কথা নয়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বক্তব্য। ১৯৬৮ সালের পয়লা জানুয়ারী থেকে একত্রিশে অক্টোবর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ৩১৫টি গুলীবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে এবং এর ফলে নিহত হয়েছে ১১৫ জন। অন্যান্য রাজ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, বিহারে ৫৪টি গুলীবর্ষণের ঘটনায় ৪১ জন নিহত হয়েছে, উত্তর প্রদেশে ৫২টি গুলীবর্ষণের ঘটনায় ৪৭ জন এবং পাঞ্জাবে ৮টি গুলীবর্ষণের ঘটনায় ১২ জন নিহত হয়েছে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ

এ বিষয়ে রেকর্ড স্থাপন করেছে। অর্থাৎ এই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপাল প্রশাসনের আসল চিত্র। অথচ এই শাসনের গুণগানের কোন কমতি নেই। বরং এই কথা বলে বাজার তাতানো হয়েছে যে, যুক্তফ্রন্টের আমলে দেশ গোল্লায় যাচ্ছিল এবং রাজ্যপাল দেবদূতের মতই পশ্চিমবঙ্গকে উদ্ধার করতে আবির্ভূত হয়েছেন। অথচ এই হিসাব থেকেই দেখা যায় মানুষ খুন করার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতে গত দশ মাসে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এ ছাড়া গত এক বছরে কলকাতায় খুন হয়েছে মোট ৬০ জন এবং সারা পশ্চিমবঙ্গে ৫২৯ জন। বস্তুত গত এক বছরে আইন ও শৃঙ্খলার ক্রমাবনতি ছাড়া আর কিছু দৃষ্ট হয় নি। গত একুশ বছরের প্রশাসন জনগণের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ককে অহি-নকুল সম্পর্কে পরিণত করেছে। সরকারের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্কটা শাসক ও শাসিতের সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। নামে গণতান্ত্রিক দেশ হলেও গত একুশ বছরে শাসকবর্গ দেশের মধ্যে কোন গণতান্ত্রিক জীবনাদর্শের সৃষ্টি করতে পারেন নি, কল্যাণ রাষ্ট্রের খোলের আড়ালে কার্যত পুলিশী রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। গণতান্ত্রিক জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য কোন বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা নেই, কিন্তু আইন ও শৃঙ্খলার নামে পুলিশকে লেলিয়ে নরঘাতনের প্ররোচনা দেবার ব্যবস্থা পাকা আছে। এবং যে সমস্যাগুলিকে আইন ও শৃঙ্খলার সমস্যা বলে চালানো হয়, প্রকৃত সর্বক্ষেত্রে সেগুলি আইন শৃঙ্খলার সমস্যা নয়। শ্রমিক-মালিকের ক্ষেত্রে যদি পুলিশ মালিকপক্ষের হয়ে ধর্মঘটী শ্রমিকদের ওপর লাঠি ও গুলী চালায়, যে দৃশ্য গত একুশ বছর ধরে দেখতে অভ্যস্ত, তাহলে এটা কি আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপার বলে গণ্য হবে? পৃথিবীর সর্বত্রই শিল্পোন্নত দেশে শ্রম-বিরোধ আছে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই ভারতের মত পুলিশ তথা সরকার একটি পক্ষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় না। যখন এই যে ফসল কাটার প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র স্থানেই পুলিশ জোতদারদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছে, নিশ্চয়ই এই একাত্মতা আইন ও শৃঙ্খলার স্বার্থে নয়, অথচ এক্ষেত্রেও রক্তপাতের ব্যাপার ঘটবে। রাজ্যপালের প্রশাসন যে নজির দেখিয়েছেন তা অভূতপূর্ব, আইন-শৃঙ্খলার এমন অবনতি বোধ হয় ইতিপূর্বে পশ্চিমবঙ্গে আর কখনো হয় নি। অন্তত হত্যা ও গুলীর ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ যে রাজ্যপালের আমলে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে, সে তথ্যকে তো আর বামপন্থী অপপ্রচার বলে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না।

সরষের তেল

যারা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল মেশায় তারা এদেশে দণ্ড তো পায়-ই না, উল্টে টাকার জোরে সমাজে কৌলীন্যের অধিকারী হয়। ভেজাল খাদ্য, ভেজাল ঔষধে হাজার হাজার মানুষকে রোগগ্রস্ত করে মেরে ফেলার অপরাধে যারা অপরাধী আইন তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে না, একান্ত বেকায়দায় পড়ে যদি কেউ ধরাও পড়ে যায় —দু'-চারশো টাকা জরিমানা দিয়ে তারা স্বচ্ছন্দেই বেরিয়ে আসতে পারে। এবং তাতেও মূল গায়েনরা ধরা পড়ে না। আমাদের পরিচিত একজন মহাপুরুষ আছেন, যিনি হাসপাতালে দুধের যোগান দিয়ে বাড়ি-গাড়ি করেছেন। দুধে ভেজালের জন্য ধরাও পড়েছিলেন, কিন্তু দণ্ডটা গেল যে লোকটি দুধ বয়ে নিয়ে যেত তার ওপর দিয়ে, আর এক মাস জেল খেটে এসে সে বলল যে, এই রকম মাঝে মাঝে তাকে যেতেই হয়, আর তার এই জেলখাটার সময়ের মাইনেটা তার বাবু ডবল করে দেন। অনেকেরই নিশ্চয়ই পাশুপত রাম নির্বাচিত গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়ার কাহিনী মনে আছে, ভেজাল দিয়ে কাসেম আলি গণ্ডেরিরামকে তা চোখেও দেখেন না, খালি মুনাফার টাকা গোণেন। আগে, অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হবার আগে কংগ্রেসী নেতারাই বলতেন স্বাধীনতার পর ভেজাল বন্ধ করে দেওয়া হবে এবং যারা খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেয় তাদের কঠোর সাজা দেওয়া হবে, কিন্তু অন্যান্য বহু ঘোষণার মত এইগুলিও ক্লীবের বাগাড়ম্বরে পরিণত হয়েছে। এবারে আসল কথায় আসা যাক। পশ্চিমবঙ্গ অন্ধত্ব নিবারণী সমিতির সভাপতি এবং বিশিষ্ট চক্ষু চিকিৎসক ডঃ মুরলী সেনগুপ্ত সাংবাদিকদের নিকট এই তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, শিয়ালকাঁটা মিশ্রিত ভেজাল সরষের তেল পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকভাবে চালু হওয়ায় সরষের তেলভোজীদের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে এপিডেমিক-ড্রপসি বা বেরিবেরি এবং মারাত্মক গ্লুকোমা চক্ষুরোগ দেখা দিয়েছে। ডঃ সেনগুপ্ত আরও জানিয়েছেন যে, "এক বিশেষ সম্প্রদায়ের" মিল মালিকরা এই ভেজাল তেলের যথাও কারবার চালাচ্ছেন। সরষের তেলের ব্যবহারটা বাঙালীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হওয়ায়, এই মারাত্মক রোগে বাঙালীরাই বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন। লক্ষণীয় যে সরষের তেলের আমদানীটা এ রাজ্যে ভিন্ন রাজ্য থেকেই বেশি হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিত এইদিকে বিশেষ নজর দেওয়া এবং এখানকার তেলকলগুলির ক্রিয়াকলাপের ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া। আমাদের স্মরণে আছে, কয়েক বছর পূর্বে কিভাবে সরষের তেলের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী কোটি কোটি টাকা অতিমুনাফা অর্জন করেছিল। ভেজালের কথাতেই আবার ফিরে আসা যাক। এ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বাস্থ্যদপ্তর বা কলকাতা কর্পোরেশন এ বিষয়ে কোন বাস্তব ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নি, দশ দিনের জন্য সরষের তেল বর্জন করার পরামর্শ দেওয়া ছাড়া। যথচ আরও করণীয় ছিল। যারা সরষের তেলের ডীলার, তারা কেউই সরকারের অপরিচিত নয় এবং এদের বেশির ভাগ আবার কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলে। সব ক'টাকে ধরে ঠাণ্ডাঘরে এনে পেশ করার দরকার আগে ছিল এবং এই পার্টি আড়তের তেল বাজেয়াপ্ত ও পরীক্ষা করতে সরকার অক্ষম পারতেন। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত তেলের যোগানদার তো এরাই এবং ভেজাল তেল নিশ্চয়ই এদের আড়ত থেকে এসেছে আকাশ থেকে ঝরে পড়ে নি। কাজেই ভেজাল তেল বিক্রির অপরাধে তাদের কোর্টে তোলা চলত অনায়াসেই। এবং এই ভেজালের উৎস কি তা জানতে পুলিশেরও বিশেষ বেগ পাবার কথা নয়। চাপ দিয়ে ভিতরে নাড়ীর ভিতর থেকে খবর বার করে আনতে হয় সে ট্রেনিং তো ব্যারাকপুর থেকে পুলিশের নেওয়াই আছে। কাজেই সরকারের কিছু করণীয় নিশ্চয়ই এই প্রসঙ্গে ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে গত একুশ বছর ধরে সরকার কন্ট্রোল ইত্যাদির মারফৎ নিজ পোষ্যদের কিছু পাইয়ে দেবার চেষ্টাতেই ব্যস্ত ছিলেন এবং এখনো আছেন, এসব বিষয়ে মাথা ঘামানোর অবকাশ কোথায়? কর্পোরেশনের কথাই বা কি বলব ওই প্রতিষ্ঠানটি এখন রাজনীতিমার্গের শিক্ষনবীশদের রিহার্সাল কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন সভ্য সরকার বা বিন্দুমাত্র সহ্য কোথাও করে না, ভারতবর্ষেই তা চলে, সত্যই বিচিত্র এ দেশ!

> ### রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে
> **(বিলম্বে প্রাপ্ত)**
>
> **রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গুরুতর অনিয়মের কয়েকটি বিবরণ নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। বঙ্গদর্শনের লেখা আগেই প্রেসে চলে যাওয়ায়, বিবরণসমূহ চাঞ্চল্যকর হওয়া সত্ত্বেও এ সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হলো না। আগামী সংখ্যায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।**

কলকাতা উন্নয়নের নেপথ্যে

পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে কিছু-কাল আগে কলকাতার কয়েকজন শিল্পপতি সভা করে ঘোষণা করেছিলেন যে, অতঃপর কলকাতা শহরের উন্নতির জন্য তাঁরা উঠে-পড়ে লাগবেন। কিন্তু এই ঘোষণায় আমাদের মনে কিছুটা সন্দেহ ও আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছিল। শত বছরের ইতিহাসে তাঁরা যা করেন নি, কিসের অনুপ্রেরণায় হঠাৎ তাঁরা দাতাকর্ণ হতে চলেছেন? তাঁরা নাফা ভিন্ন কলকাতার অন্য তাৎপর্য আছে তা কখনোই বোঝেন নি। আজ হঠাৎ তাঁরা এতদিনের ঐতিহ্য ভুলে কলকাতাপ্রেমে হঠাৎ গদগদ হয়ে উঠলেন কেন? এই কারণেই আমরা এই প্রসঙ্গে কিছু লিখি নি, কেন না যাদের মূলধনের মূল উৎসই হচ্ছে ভেজাল দিয়ে মানুষ মারা, তাদের এই আকস্মিক মতিভ্রম দেখে আমরা কোথা-কার জল কোথায় দাঁড়ায় তা দেখবার প্রতীক্ষায় ছিলাম। আমাদের অপেক্ষা করাটা ব্যর্থ হয় নি। ঝুলির ভিতর থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে।

গত ১১ই ডিসেম্বর রাজ্যপাল কলকাতায় ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের এক সভায় এবং ১২ই ডিসেম্বর রাইটার্স বিল্ডিংসে বৃহত্তর কলকাতা উন্নয়নের এক পরি-কল্পনা পেশ করেছেন। এই পরিকল্পনা এবং পূর্ব প্যারায় বর্ণিত শিল্পপতিদের আগ্রহ কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। এগারোই ডিসেম্বর ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ ভবনে ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্সের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শিল্পপতিদের এক সভায় রাজ্যপাল ধরম-বীর একটি নগর-উন্নয়ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ঘোষণা করেছেন এবং সেই প্রস্তাব অবাঙালী শিল্পপতিরা লুফে নিয়েছেন। রাজ্যপালের প্রস্তাবের সারমর্ম হল এই যে, ব্যাঙ্কটি শুরু হবে কুড়ি কোটি টাকার মূলধন নিয়ে এবং শিল্পপতিরা এতে কম করে আরও ষাট কোটি টাকা লগ্নী করবেন। কলকাতা উন্নয়নের ব্যাপারে শিল্পপতিদের আগ্রহের কারণ এতক্ষণে বোঝা গেল, কিন্তু এটি উপলক্ষ করে তাঁদের মহলে যে উল্লাসের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়েছে তার তাৎপর্য বুঝতে আরও একটু সময় লাগবে। এই ব্যাঙ্কের মারফৎই কেন্দ্রের কাছ থেকে এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক ও ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের মত প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে টাকা সংগ্রহ করা হবে। ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের প্রতিনিধি ওই সভায় উপস্থিত থেকে রাজ্যপাল প্রস্তাবিত কলকাতা উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ও তার কার্যাবলীর প্রতি পূর্ণ সহযোগিতা দানের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছেন। কলকাতায় ম্যাকনামারার আগমনের তাৎপর্য উপলব্ধি করবার কোন অসুবিধা বোধ হয় আর রইল না। এবং এও বোঝা গেল যে ম্যাকনামারা কেন শিল্পপতিদের সঙ্গে তিরস্কার করেছিলেন। ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্সের সভাপতি শ্রীভকৎ রাজ্যপালের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন যে কলকাতার উন্নয়নের ভার নেবার জন্য ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি-দের নিয়ে একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করা হচ্ছে এবং ওই সমিতিই কলকাতা উন্নয়ন ব্যাঙ্কের ভার নেবে।

কিন্তু পরিকল্পনাটা কি? সেইটাই আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়। এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হল বাংলা দেশ থেকে বৃহত্তর কলকাতাকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া। এই বিচ্ছিন্নকরণের ব্যাপারটি ঘটবে কলকাতার চারদিকের সমস্ত জমিতে অবাঙালী কলোনী গড়ে তুলে। ব্যাপারটাকে আরও একটু খুলে বলা যাক। পরিকল্পনা হচ্ছে এই যে কলকাতার দক্ষিণে কালিয়াদহ, রাজেরহাট, বৈষ্ণবঘাটা, বজবজ ও জোকা অঞ্চল নিয়ে একটি, এবং হাওড়ায় কোনা ও দাশনগর নিয়ে আরও একটি উপনগরী স্থাপন করা হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী এই উদ্দেশ্যে জমি সংগ্রহ ও ভরাট করার জন্য খরচ পড়বে মোট সাড়ে বত্রিশ কোটি টাকা এবং উপনগরী দুটির মোট আয়তন হবে চার হাজার সাতশো ছাব্বিশ একর।

কিন্তু আমরা আগেই বলেছি যে এই উপনগরী দুটিতে অবাঙালীর কলোনী হবে এবং তার ফলে বৃহত্তর কলকাতার ওপর অবাঙালীর অধিকার আরও পোক্ত হয়ে বসবে এবং তা ঘটলে কলকাতাকে পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের প্রশাসনের বাইরে নিয়ে যেতে ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলে পরিণত করতে কোন বাধা থাকবে না। এখন অনেকেই এ প্রশ্ন তুলবেন, উক্ত উপনগরী দুটি অবাঙালী কলোনীতে পরিণত হবে এই কথাটা বলার হেতু কি। কারণটা খুবই সহজ। জমি কিনতে হলে তা কিনতে হবে ওই কলকাতা উন্নয়ন ব্যাঙ্ক মারফৎ এবং কলকাতার যেখানে সকল শিল্পপতিই প্রায় অবাঙালী, তাঁদের ব্যাঙ্কের মারফৎ জমি পাওয়ার আশা বাঙালীকে ত্যাগ করতেই হবে। ১২ই ডিসেম্বর রাইটার্স বিল্ডিংসের সভায় এই প্রসঙ্গ আলোচনার কালে প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার শ্রীরঘু ব্যানার্জী এবং রাজস্ব বোর্ডের সদস্য শ্রীকরুণাকেতন সেন এই পরি-কল্পনায় তীব্র বিরোধিতা করে বলেছেন যে, এই পরিকল্পনার আসল উদ্দেশ্য হল কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে বাঙালীকে উচ্ছেদ করে সেখানে অবাঙালীর কলোনী নির্মাণ। কিন্তু এই আপত্তি সভায় গ্রাহ্য হয় নি, রাজ্যপাল এই পরিকল্পনা কার্যকর করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলন এখনি শুরু হওয়া উচিত, এ বিষয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিরও আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

(২১।১২।৬৮)

শিল্প-বাণিজ্য-অর্থনীতি

সাপ্তাহিক বসুমতীর নূতন ফিচার

১৯৬৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ভারতে অনাদায়ী আয়করের পরিমাণ ছিল ৩২৫ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। ১৯৬৫-৬৬ সালে ভারতের জাতীয় আয়ের মোট ৪·৭ শতাংশ সরকারী কর্মচারীদের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল। ১৯৬৬-৬৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত শিল্পে লগ্নী ছিল ২০৫৬·৯ কোটি টাকা। আর মুনাফা এসেছিল মাত্র ৫৭·৭ কোটি টাকা। তার আগের বছর একই ক্ষেত্রে ১৬১৩·৫ কোটি টাকা লগ্নীর উপর মুনাফা এসে-ছিল ৫৫·৯ কোটি টাকা। ভারতের জাতীয় আয় ১৯৬৬-৬৭ সালে ছিল মোট ১৫,২৭২ কোটি টাকা। ১৯৬৭-৬৮ সালে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৬,৬৬৫ কোটি টাকা। তার মধ্যে কৃষি ক্ষেত্রে আয় বেড়েছে সবচেয়ে বেশী (২০·৩ শতাংশ)। ৬,১৭৩ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৭,৩৮১ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।—আমরা বাঙালী ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক দুনিয়ার এই সমস্ত সংবাদ সম্পর্কে অনেকটা নিরাসক্ত। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্য আমাদের ধাতস্থ নয়। কিন্তু দেশের সামাজিক জীবনে শিল্প বাণিজ্যের প্রভাব যে রকম ক্রমবর্ধমান, তাতে সে সম্পর্কে বাঙালী বেশীদিন উদাসীন থাকলে তাকে সবার পেছনে পড়তে হবে। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার দেশের বণিক সম্প্রদায়ই রাষ্ট্রীয় কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করেন। আমরা যখন সমাজতন্ত্রের পথে বিশেষ অগ্রসর হতে পারি নি, তখন এই বাস্তব সত্য সম্পর্কেও আমাদের সচেতন থাকা উচিত। তাই পাঠকের মনে ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থনীতির চিন্তা আদান-প্রদানের জন্য আমরা সাপ্তাহিক বসুমতীতে একটা নতুন বিভাগ খুলছি ২রা জানুয়ারী, ১৯৬৮ তারিখ থেকে। এই প্রস্তাব সম্পর্কে পাঠকের মতামত পেলে খুশি হব।

পৃথিবীর সব দেশের অধ্যাপকেরা কি একই রকম হয় ? কলকাতায় উক্রাইনের পণ্ডিত অধ্যাপক মার্তিনোভস্কির প্রেস কনফারেন্সে বসে সেদিন বার বার আমার এই প্রশ্নটা মনে জাগছিল।

উক্রাইন সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যতম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। উক্রাইনের প্রযুক্তিবিদ ডক্টর মার্তিনোভস্কি এবং ইংরাজি ভাষার শিক্ষিকা লিলিয়া ভোলস্যুক কলকাতায় এসেছিলেন মৈত্রী সফরে। ভারতের এই যুগলবন্ধুর সংগে একাধিকবার আমার দেখা হয়েছে কখনও প্রেস কনফারেন্সে, কখনও সভায়, কখনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে।

মার্তিনোভস্কিকে প্রথম দর্শনেই মনে হয় পৃথিবীর যে-কোন দেশের, যে-কোন শহরের যে-কোন পথেই যেন এই বৃদ্ধ অধ্যাপককে মানিয়ে যায়। বয়স কত আন্দাজ করা কঠিন। ষাটের ঊর্ধ্বে অবশ্যই, তবে সত্তরও হতে পারে আশীও হতে পারে। দীর্ঘ ওকগাছের মত অকপট দেহ কাঁধের কাছে সবে একটু নুয়ে পড়তে শুরু করেছে কিন্তু কথা বলতে বলতে আচমকা হঠাৎ হঠাৎ কাঁধ টান করার অভ্যাস দেখে মনে হয় অধ্যাপক মার্তিনোভস্কি যেন সেই নুব্জতাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছেন। পুরু কাচের ভারী চশমাটা প্রায়ই ঢিলে হয়ে নাকের প্রান্তে এসে পড়ে। চশমার কাচের ভিতর দিয়ে দুটি চোখ মনে হয় অনেক দূরের দুটি আলো। প্রাচীন ঠোঁট দুটির কোণে মাঝে মাঝেই যে হাসির রেখা ফুটে ওঠে সে হাসি নবজাতকের ঠোঁটেই মানায়। গলার স্বর গম গম করছে। সেই স্বরে মাঝে মাঝে আনুনাসিক সুর কানে লাগে এবং তখনই নজর পড়ে অধ্যাপকের দীর্ঘ নাকের দিকে। এই নাক ভারতীয়ের হোতে পারত, খাঁটি ইংরেজ কিংবা আইরিশেরও হতে পারত। কণ্ঠস্বরে ইউরোপীয় টান কিন্তু মার্তিনোভস্কির স্বদেশ সোভিয়েত উক্রাইন।

উক্রাইন আমদের পরিচিত নাম। গত মহাযুদ্ধের সময় জয়-পরাজয়ের মরণপণ যুদ্ধের ইতিহাসে প্রতিদিন উক্রাইনের নাম আমরা শুনেছি। উক্রাইনের গমে ভারতের তন্দুরিতে অনেক রুটি তৈরি হয়েছে। উক্রাইন আমাদের অপরিচিত নয়।

অধ্যাপক মার্তিনোভস্কির পাশে দাঁড়িয়ে ওঁর দীর্ঘ দেহের দিকে তাকালে মনে হয় দেওদার গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছি। পাশে দাঁড়ালেই কাঁধে হাত রেখে কথা বলতে শুরু করেন। "তুমি দেখছি ক্রমাগত সিগারেট খেয়ে যাচ্ছ, অত খেও না" এক সাংবাদিক বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে মার্তিনোভস্কি বলেছিলেন। একটু থতমত খেয়েই বন্ধুটি এবার হাতের সিগারেটটি লুকোতে চেষ্টা করলেন। নিজের পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরিয়ে এরপর অধ্যাপক বললেন—"সিগারেট খাও ভাল, কিন্তু কক্ষণো ঘন ঘন ব্র্যাণ্ড বদল কোরো না। প্রেমের বেলায় যেমন, ধূমপানের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি, একনিষ্ঠতাই হোল সবচেয়ে বড় কথা।" হাসতে হাসতে বৃদ্ধ অধ্যাপক একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন।

তবু ধূমপান নয়, অধ্যাপক মার্তিনোভস্কির একনিষ্ঠ ধ্যানের বিষয় হল থার্মোডায়নামিক্স। ওডেসার প্রযুক্তিবিদ্যা ইনস্টিটিউটের রেক্টর অধ্যাপক মার্তিনোভস্কি এ পর্যন্ত তাঁর নিজস্ব বিশেষ বিষয়ের উপর একশোটিরও বেশি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন। ডিজাইন ও গবেষণার জন্য একাধিক পুরস্কার পেয়েছেন। ফলিত বিজ্ঞানের ডাইরেক্টররূপে বহুদিন তিনি উনেস্কোয় কাজ করেছেন।

তবু আমার চোখে অধ্যাপক মার্তিনোভস্কির আকর্ষণের কারণ ভিন্ন। ভারতের প্রতি গভীর, নিখাদ ভালবাসা এবং তাঁর ভারতচর্চা—এ দুটো আমাকে মার্তিনোভস্কির প্রতি সবচেয়ে বেশি করে আকর্ষণ করেছে। ওডেসায় অধ্যাপক মার্তিনোভস্কির হাতে তৈরি হয়ে উঠছে অসংখ্য ভারতীয় বিজ্ঞানী। ভারতের অন্যতম এক বিজ্ঞানী সম্প্রতি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিজ্ঞানের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী নিয়ে স্বদেশে ফিরেছেন। তিনি মার্তিনোভস্কির ছাত্র।

"কোন্ কোন্ ভারতীয় কবির কবিতা আপনাদের ভাষায় অনূদিত হয়েছে?" এক সাংবাদিক এই প্রশ্ন করেছিলেন মার্তিনোভস্কিকে। লম্বা, লম্বা আঙুল দিয়ে শূন্যে আঁচড়াতে আঁচড়াতে অধ্যাপক জবাব দিয়েছিলেন—"আমি যতদূর জানি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বই অনূদিত হয়েছে এবং একালের বাংলার কবিদেরও কিছু কিছু
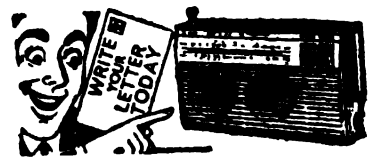
কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে তবে তার হুবহু সংখ্যা ও নাম আমি বলতে পারব না। তবে বিজ্ঞানের কথা যদি বল তাহলে বলতে পারি" . এ পর্যন্ত বলেই বৃদ্ধ বিজ্ঞানী একলাফে কবিতা থেকে চলে এলেন বিজ্ঞানে, যেখানে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ।

আবেগরুদ্ধকণ্ঠে মার্তিনোভস্কি শোনালেন বাংলা দেশের বিজ্ঞানী জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু, বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ও অধ্যাপক রমণ—এই নামগুলো তাঁদের কাছে শুধু নামের তালিকা নয়, এঁদের থিওরী এবং এঁদের রচনা উক্রাইনের বিজ্ঞানের ছাত্রদের অবশ্য পাঠ্য। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এইসব ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবদানের কথা বলতে গিয়ে বৃদ্ধ এই অধ্যাপকের চোখের কোণে আলো চিকচিক করছিল।

"আশ্চর্য উজ্জ্বল প্রতিভা দেখেছি আমার ভারতীয় ছাত্রদের। কিন্তু তাদের সবচেয়ে যে বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়—সেটা হচ্ছে ব্যবহারিক শিক্ষার আয়োজনের অপ্রতুলতা। ভারতের কয়েকটি বিজ্ঞান-সংস্থার মান সন্তোষজনক নয় বটে তবে উচ্চমানের সংস্থাও ভারতে আছে"—অধ্যাপক মার্তিনোভস্কির কাছে শোনা এই উক্তি।

ভারতের প্রযুক্তি বিদ্যায়তন সম্পর্কে মার্তিনোভস্কির অভিজ্ঞতা পুঁথিগত নয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে তিনি উনেস্কো মিশনের প্রধানরূপে এসেছিলেন খড়্গপুর আই, আই, টি-তে। ১৯৬৮ সালে তিনি বোম্বাইতে বিশেষজ্ঞ শিক্ষণ কেন্দ্র আই, আই, টি-তে প্রধানের কর্মভার নিয়ে আসেন।

কিন্তু এবার মার্তিনোভস্কি এসেছিলেন মৈত্রী সফরে, উক্রাইন ও বাংলা দেশের মধ্যে একটি অদৃশ্য সেতুবন্ধনের কাজে। এবার মার্তিনোভস্কি ঘুরেছেন শান্তিনিকেতন, দেখেছেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি আর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। স্বদেশ যাত্রার প্রাক্কালে সদ্য শান্তিনিকেতন প্রত্যাগত মার্তিনোভস্কি বললেন: "বাংলা দেশের সঙ্গে আমার দেশ উক্রাইনের আর একটা সুন্দর মিল খুঁজে পেলাম। আমার দেশের সেরা গান হল উক্রাইনের গান, আর এদিকে বাংলা গান হল ভারতের শ্রেষ্ঠ গান।"

কলকাতার উক্রাইনের লোকশিল্পীর কণ্ঠে আমি একবার উক্রাইনের গান শুনেছিলাম। চোখ বুজে সে গান শুনলে মনে হয় রৌদ্রকরোজ্জ্বল ফসলের ক্ষেতের পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছি। অধ্যাপক মার্তিনোভস্কি হয়তো শান্তিনিকেতনের পথে দূর থেকে ভেসে-আসা কোন বাউলের গান শুনে এসেছেন।

জোয়ারের জল চলে গেলে উপকূলে পড়ে থাকে ভাঙা ঝিনুক। অধ্যাপক মার্তিনোভস্কি তাঁর সংক্ষিপ্ত সফর শেষ করে স্বদেশের দিকে রওনা হয়ে গেছেন। এ ক'দিনে এই মাঝে মাঝে দেখার শেষে আমি এখন আমারও মনের মধ্যে বিচিত্র সব ভাবনার ভাঙা ঝিনুক কুড়িয়ে চলেছি।

আমি খুব কম বিদেশী দেখেছি যাঁদের সামনে দাঁড়ালে নিজের দেশ সম্পর্কে একটা গভীর শ্রদ্ধা নতুন করে মনের মধ্যে জেগে ওঠে। স্বদেশ সম্পর্কে একটা হীনমন্যতার ভাব যেন আজকাল আমাদের অনেকের মনেই বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশের দারিদ্র্য, দেশের ব্যর্থতা এসব কিছু নিয়ে আজকাল শুধু বিদ্রূপ আর বিক্ষোভই যেন শুনতে পাই পথে-ঘাটে, দেশে ও বিদেশে। ভুলেই গিয়েছিলাম এতসব ব্যর্থতা ও অকর্মণ্যতার আড়ালেও আমার দেশ নিয়ে গর্ব করার, নতুন করে আবার আশায় বুক বাঁধার কিছু বিত্তও আছে। অধ্যাপক মার্তিনোভস্কি দু' দিনের জন্য এসে আমায় সেই কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেলেন। উপকূলে ভাঙা ঝিনুকের টুকরো রেখে জোয়ার যেমন চলে যায়।

লেভির নোটিশ ঝুলছে

এতদিনে লেভির নোটিশ লটকানো হয়েছে। বি-ডি-ও'র অফিস, অঞ্চল পঞ্চায়েত ও গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিস, থানা ও ফাঁড়িতে নামের তালিকা ও কাকে কত দিতে হবে সে সব নোটিশ টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে। নোটিশের তারিখের ১৫ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাতে হবে; তারপর সেই আপত্তির ভিত্তিতে শুনানীর দিন ধার্য হবে, শুনানীর পরই সংশোধিত যদি কিছু হয় সেই তালিকা বা নোটিশ হাতে হাতেই দিয়ে দেওয়া হবে। যারা এই সংশোধিত আদেশেও সন্তুষ্ট হবেন না, তাঁদের এস-ডি-ও'র কাছে দরখাস্ত করতে হবে; অবশ্য সংশোধিত আদেশে যতটা লেভি ধার্য করা আছে তার শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ লেভি আগে আদায় দিয়ে তার রসিদ সমেত এস-ডি-ও'র সমীপে যেতে হবে। তারপর এস-ডি-ও'র রায়েও যদি কেউ সন্তুষ্ট না হন তার জন্যে হাইকোর্টের দরজা তো খোলাই আছে।

এ সব পরের [illegible]। এখন নোটিশে কার ভাগে কি পড়লো তাই নিয়েই গাঁয়ে গাঁয়ে আলোচনা চলছে, বাদানুবাদ হচ্ছে, উকিল মোক্তারের দরজায় দরজায় ভিড় জমছে। ছুটির দিনে উকিল-মোক্তাররা নাওয়া-খাওয়ার সময় পাচ্ছেন না, [illegible] টাইয়ে বসার সকলকে জায়গা দিতে পারছেন না। আপত্তির আর্জির মুসাবিদা হচ্ছে ২ টাকা, ৪ টাকা ৬ টাকা যে যেমন পাচ্ছেন আর্জি লেখার জন্যে নিয়ে নিচ্ছেন; সময় অল্প, অথচ একে একে সকলকেই লিখে দিতে হবে। বড় বড় জোতদাররাও আসছেন, তাঁরা তো প্রতিবারই আসেন, পয়সা আছে, কাজেই মামলা-মকদ্দমা লড়ার তাঁদের ক্ষমতা আছে। কাগজে-কলমে যতই জোতদারদের শ্রাদ্ধ করা হোক না কেন, এখনও কিন্তু গাঁয়ে এঁদের বেশ খ্যাতি ও সম্ভ্রম রয়েছে। দূর থেকে উকিলের নাম ধরে ডাকতেই আর পাঁচজন গাঁয়ের মানুষ যাঁরা উকিলবাড়ির চত্বরে আর্জি লেখানোর জন্যে সাতসকালে এসে বসে আছেন তাঁরাও সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ান, অনেকে নতজানু হয়ে জোতদারমশাইকে প্রণাম জানান। উকিলবাবু গায়ের চাদর গুছোতে গুছোতে আসন ছেড়ে জোতদার-মশাইকে সম্বর্ধনা দিতে এগিয়ে আসেন; তারপর আড়ালে দু'চারটি কথা বলে হাসতে হাসতে ফিরে আসেন: বোধ হয় আর্জি লেখার জন্য মোটা টাকার ব্যবস্থা হয়।

নিম্নমধ্যবিত্ত যাঁরা তাঁরা এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন। ৮ একর/১০ একরের মধ্যে থেকে তাঁরা অনেকটা নিশ্চিন্তই আছেন; তবু আমলাদের কর্ম-দক্ষতায় তাঁদের এতটুকু আস্থা নেই বলে লেভির তালিকায় একবার চোখ বুলোতে দ্বিধা করছেন না। তার ওপর শত্রুপক্ষ তো আছেই; দু' দশ টাকা ঘুষ দিয়ে তালিকায় নামটা তুলে দিয়ে তাঁরা মজা দেখেন; অযথা হয়রানি তাঁরা উপভোগ করেন। এরকম কারুর নাম তালিকায় উঠেছে কি না এখনও জানা যায় নি; হয়তো আসছে সপ্তাহেই জানতে পারবো। দু' সপ্তাহ আগে আমি লিখে-ছিলাম—সরকারের লেভির নীতি ঘোষণার পরই অনেকে জমি ছোট করে নিচ্ছেন, ছেলেমেয়ে,নাতিনাতনী সকলের নামে এমনভাবে দলিল হচ্ছে যাতে লেভি না দিতে হয়। এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যেও আমি অনুরোধ করে-ছিলাম। এখন দেখছি আমার সে অনুরোধ বৃথা যায় নি। দেরি হয়ে গিয়েছে, তাই জমি হস্তান্তর আর বন্ধ করা যাবে না বলে সরকার নির্দেশ দিয়েছেন যে, ৮ একর বা ১০ একরের নিচে জমি দেখালেই চলবে না, তাকে সংসারে হাঁড়ি আলাদা, সংসার আলাদা সেটাও দেখাতে হবে। সরকারের লোকজন নিজেরাই গিয়ে খোঁজ-খবর করবেন, এমন কি আশপাশের বাসিন্দারাও যদি সাক্ষী দেন যে, ওঁদের একান্নবর্তী সংসার তাহলে সেই সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেও লেভি ধার্য করা হবে। উত্তম ব্যবস্থা: আর এ ছাড়া উপায়ই বা কি আছে! [illegible] ত্রুটি দিয়ে যাঁরা গলে গিয়েছেন তাঁদের ধরার আমার এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি? কিন্তু এতে বিপদ আছে অনেক। এই সুযোগে গ্রাম্য শত্রুতা ও দলাদলি মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে: ফলে স্থানে স্থানে অশান্তি ঘটাও বিচিত্র নয়।

কিন্তু ব্যবস্থায় যেখানে আসল ত্রুটি তা দূর করার কোন চেষ্টাই হল না: ফলে সরকারের লক্ষ্য পূর্ণ হবে কি না সন্দেহ। গত বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি বেশির ভাগই বড় বড় জোতের মালিক লেভির পরিমাণ নির্ধারণে সরকারী সিদ্ধান্তে কোনদিনই সন্তুষ্ট হন না। ঘুষঘাষ দিয়ে একদফা চেষ্টা চলে পরিমাণ কমাবার; তারপর আপত্তি। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে এস-ডি-ও'র কাছে দরবার—তার-পর হাইকোর্ট। কাজেই লেভির পরিমাণ নির্ধারিত হতেই বছরের পর বছর ঘুরে যায়, তারপর প্রশ্ন আসবে লেভি আদায়ের।

তারা লেভির [illegible] পরমানন্দে দিন কাটাচ্ছেন। তার-পর হাইকোর্ট থেকে যখন লেভির পরিমাণ নির্ধারণে চূড়ান্ত রায় বেরুবে তখন তো সব ফর্সা। হাই-কোর্টের রায় নিশ্চয় কেউ অবজ্ঞা করবেন না; কিন্তু গোলায় যদি তখন একদানাও আর ধান না থাকে অনুকূলে ডিগ্রী পেয়েও সরকার কিছু করতে পারবেন না। কাজেই আটঘাট এমনভাবে বেঁধে সরকারের চলা উচিত ছিল যাতে কেউ লেভি কোন অবস্থাতেই ফাঁকি দিতে না পারে।

* * *

অসেচ এলাকায় ৮ একর ও সেচ এলাকায় ১০ একর পর্যন্ত জোতের মালিক-দের লেভি থেকে রেহাই দিয়ে সরকার ভাল কাজ করেছেন। তার ফলে হাটে-বাজারে চাল এখন অঢেল; দামও পড়তির দিকে। নিম্নমধ্যবিত্তরা তাদের বারো মাসের খাবার ধান রেখে বাকী ধান [illegible] বেচে দিচ্ছে বলেই দাম নেমে এসেছে এবং সকলেই বলাবলি করছে গোলমাল যদি কোথাও না হয় তা হলে চালের দর এক টাকায় নেমে যাওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু গ্রামবাসীরা সে ভাগ্য করেছে বলে তো মনে হচ্ছে না। ধান কাটা নিয়ে হাঙ্গামাটা এ বছর বড় বেড়েছে। ছুতোনাতা করে গোলমাল বাঁধানো হচ্ছে, জোর করে ধান কেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, বংশপরম্পরায় যাদের জমিতে চাষ করতে দেখছি, যারা জমির মালিক বলেই জানি—তাদের সে জমির ফসল থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা চলছে। ক্ষেতখামারে রাজনৈতিক দলের ছেলেরাও অজবের বড় আনাগোনা করছে, ভোটবাবুরাও আ[illegible]ছেন—কি যে তাঁরা ছাই-ভস্ম এদের বুঝাচ্ছেন জানি না: দেখছি শুধু বিরোধ বেড়েই চলেছে। মারামারি কাটাকাটি লেগেই আছে। ২৪ পরগনা, বর্ধমান ও হুগলীর নানা স্থানে এ সব ঘটনা ঘটছে; ফলে পুলিশ গাঁয়ের মধ্যে আবার ঢুকছে। আগে পুলিশ দেখলে লোকে ভয় পেতো, ঘরে গিয়ে লুকোতো—কিন্তু এখন পুলিশ দেখলে কেন জানি না ছেলেবুড়ো সকলেরই দেখি লোম খাড়া হয়ে ওঠে। গত বছর পুলিশ গাঁয়ে গাঁয়ে যে অত্যাচার চালিয়ে গেছে মনে হয় কাবুর গা থেকেই সে দাগ এখনও মোছে নি; তাই পুলিশ দেখলে ঘৃণা ও রাগে তাদের শরীর যেন ফুলেফেঁপে ওঠে। তবু সত্যি কথা বলতে কি পুলিশের সে উগ্রমূর্তি এখনও দেখছি না—গত বছরের চেয়ে এবারে কিছুটা ভদ্র ও সংযত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

অবশ্য এখনও [illegible] ধুম সুরু হয় নি। প্রকৃতপক্ষে জানুয়ারীতে

জয়ন্তা সেন

এ বাসনা [illegible] [illegible], লক্ষ্য থেকে দূরে
[illegible]
[illegible] আগুনের ধারে জড়োসড়ো
বুড়োটা [illegible] সুরে [illegible]
একই প্রশ্ন করে।
উপোসের [illegible] ছাপ ক্লান্ত মুখে, শরীরের খাঁজে
এবং ক্ষুধার্ত মনে,
যার কান্না [illegible] ভয়াবহ।
সকলে [illegible] মুখে চেয়ে থাকে,
নীরবতা [illegible]মূলক,
কেন না উত্তর কারো জানা নেই। শুধু মাত্র
ক্ষুধার শরিক,
বঞ্চনার সম্ভোগী, পথভ্রষ্ট যন্ত্রণার সাথী
[illegible] একত্রিত
একদল উপোসী মানুষ
প্রশ্নের আবর্তে ঘুরে খাবি খায়
স্রোতে ভাসা কুটো।

[illegible]টার স্থির হাতে আগুনের তাপ
শুষে নিতে
করুণ প্রচেষ্টা আছে, হিমবাহ
সময় এখানে
অজস্র তুষারপাত করে চলে
ঋতু [illegible]কারে।
কে দেবে উত্তাপ বল—কার বুকে
নিশ্চিত আশ্রয়
হারানো লক্ষ্যের দিশা, চির উষ্ণ
ঘুমের পৃথিবী!
আগুনের লাল আভা
ছায়া আরোপিত
নিরুপায় কপালের প্রতি ভাঁজে
স্থির ওষ্ঠাধরে
দিনের তৃষিত কান্না, সেও স্তব্ধ
রাত্রি গাঢ় হলে।

সুরু হবে তখন হয়তো দেখতে পাবো পুলিশের আসল চেহারা।

নির্বাচনটা যদি মাথার ওপর না থাকতো তাহলে বোধহয় ক্ষেতখামারে যে গণ্ডগোলটা প্রায়শই হচ্ছে তা হতো না। কারণ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি একদল রাজনৈতিক কর্মী [illegible] রয়েছেন কখন হামলা বাধবে; যে পক্ষ অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হবে অমনি তাদের সপক্ষে এঁরা এসে দাঁড়াবেন, অন্যায়ের প্রতিকার চাইবেন। প্রতিকার কিছু হোক আর না হোক ভোটের ব্যবস্থাটা [illegible] হবে। সেই-জন্যেই বড় আশঙ্কা হয় [illegible] যে বেটে বাড়ছে, ভোট আরও কাছে এগিয়ে এলে আরও না বাড়ে।

তারপর লেভি আদায়ের দিনক্ষণ এমনভাবে করা হয়েছে ঠিক ঐ ভোটের সময়ে গিয়েই পৌঁছবে। একদিকে লেভি আর একদিকে ক্ষেতের ফসলের মালিকানা নিয়ে বিরোধ এমন অবস্থায় এসে পৌঁছচ্ছে সামনের দুটি মাস ভগবানের কৃপায় ভালয় ভালয় কাটলে হয়। অথচ এ বছরই আমাদের সবচেয়ে আশা ও আনন্দের দিন। কারণ ভয়াবহ দুর্যোগ কাটিয়ে এবার আমাদের ক্ষেতখামার সোনা ফসলে ছেয়ে গিয়েছে। সরকারী কর্তারাও হিসেব করেছেন এত রেকর্ড ফলন আর কখনও হয়নি। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের এত ফসল পেয়েও আমরা সর্বহারা—সে ফসল যে শান্তিতে ভোগ করবো, ধ্বসে-পড়া বাড়িঘরগুলি নতুন করে যে [illegible] মাটি দিয়ে যে গোলা সাজাবো, আগামী বছরের জন্য দুটো ভাল বলদ কিনবো, গৃহ-লক্ষ্মীকে বৎসরান্তে একখানা ভাল শাড়ি দেবো, ছেলেমেয়েগুলো জাড়ে কষ্ট পাচ্ছে গরম দুটো জামা-কাপড় দেবো তারও দেখছি উপায় নেই। একটা না একটা উৎপাত লেগেই আছে। আমরা মুখ্যসুখ্যু মানুষ—অতশত বুঝি না। আমাদের বিশ্বাস লেভি আদায়ে জোর-জুলুম না করে সরকার গাঁ থেকে চাল কেনার দিকে আর একটু যদি জোর দেন তাহলে কয়েক লক্ষ টন চাল সংগ্রহ হয়ে যাবে। ফড়েরা কিনছে চোখের সামনে দেখছি; সরকারের লোকজনও যদি এইভাবে চাল সংগ্রহ করেন এবং এক একটি এলাকা থেকে দিনে ১০০ কুইন্টল চাল কিনতে থাকেন (যা পাওয়া এখন মোটেই দুষ্কর নয়) তাহলে সারা পশ্চিমবঙ্গে কয়েক লক্ষ কুইন্টল ধান সংগৃহীত হবে এক মাসের মধ্যেই—যা সংগ্রহ করছে ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীরা যা পারে সরকার তা পারবেন না কেন বুঝি না। অথচ এতে হাঙ্গামা-হুজ্জতেরও ভয় নেই। ৮ একর ও ১০ একরের মধ্যে যাঁরা পড়েছেন তাঁরা [illegible] নিজের প্রয়োজন-টুকু রেখে বাকীটা এখনই বেচে দিচ্ছেন। সরকারের উচিত যেখানে যা পাওয়া যায় তাই সংগ্রহ করে নেওয়া এবং দর যেখানে ১ টাকার কাছাকাছি রয়েছে সেখানে সুযোগ হাতছাড়া করা কখনই উচিত নয়। অবশ্য ফুড কর্পোরেশনের বাবুদের দিয়ে এ সব কাজ হবে না। গাঁয়ে ঢুকতে গেলে, গাঁয়ের রাস্তা চিনতে গেলে, গাঁয়ের মানুষের হাঁড়ির খবর পেতে হলে গাঁয়ের মানুষকে ফুড কর্পোরেশনে চাকরি দিতে হবে এবং তাদের দিয়ে এ কাজ করাতে হবে। মাপ করবেন, অপরাধ নেবেন না সরকার এমন সব ডি পি এজেন্ট নিয়োগ করেছেন যাঁদের লোকজনের অনেকে ধান-চালের হিসেবের 'হ'ও বোঝেন না, লাভ-লোকসানের খতিয়ানও ঘাটতে জানেন না। তবুও এঁরা যদি গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে ব্যবহারটাও ভাল করেন তাহলে অশান্তিটা অন্তত হয় না।

আমি সরকারের বড়কর্তাদের কর-জোড়ে অনুরোধ করবো এবার সরকারের যে সব লোকজন গাঁয়ে ধানচাল সংগ্রহের জন্যে আসবেন বা এসেছেন এবং লেভিও যাঁরা আদায় করবেন বা লেভির পরিমাণ সম্পর্কে আপত্তির যাঁরা বিচার করবেন তাঁরা যেন গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে একটু ভদ্র ও নম্র ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। ওরা অনেক জিনিষ বোঝে না; বুঝতে চাইলে তাদের ওপর খড়্গহস্ত হওয়া বা দেখা না করার চেষ্টা যদি এবারেও করা হয় তার ফল যে মোটেই ভাল হয় না গতবারে আমরা তা দেখেছি। যাঁরা বিচার করবেন দয়া করে তাঁরা যদি একটু সহানু-ভূতিশীল হন তাহলে লেভি নিয়ে আইন-আদালতের ঝামেলায় অনেকেই যেতে চাইবেন না। এতে সরকারের উদ্দেশ্যও সফল হবে। উদ্দেশ্য যখন ধান-চাল সংগ্রহ করা তখন সেইটেকেই বড় করে দেখা উচিত; এর ব্যতিক্রম হলে সরকারের একূলও যাবে, ওকূলও যাবে।

—অমর চট্টোপাধ্যায়

গান্ধীজী : বিড়লাপরিবার এবং বিড়লাভবন

গান্ধীজীর নামের সঙ্গে বিড়লাজীর নাম জাতীয় আন্দোলনের কাল থেকেই বিজড়িত আছে, যে কারণ বংশ পরম্পরায় বিড়লাপরিবার ব্যাপারটাকে শ্লাঘার বিষয় বলে ভাবতে পারেন। কৌপীন-ধারী মহাত্মা গান্ধী অন্নহীন, বস্ত্রহীন [illegible] তাঁর পবিত্র উপদেশাদি প্রাসাদোপম বিড়লাভবন থেকেই বহুবার প্রদান করে আসায় বিড়লাভবন প্রায় [illegible] পরিণত হয়েছিল। [illegible] সেই [illegible] প্রধান [illegible] জাতির [illegible] হয়নি।

কংগ্রেস এম পি শ্রীশশিভূষণ হঠাৎ [illegible] অনশনের হাট বসিয়ে [illegible] অধিকারের আন্দোলন সুরু করেছেন। এ বিষয়ে 'ভারত দর্শন' কার সদিচ্ছা বলতে বাধা [illegible] ব্যাপারটি সর্বাংশে শোভন হচ্ছে না।

দিনন্দিন জীবনে আমরা দেখে থাকি, পিতামাতার স্নেহভাজন পুত্র বা কন্যা একটি [illegible] হয়ে থাকেন। শিশুকাল থেকে পরিবারের মধ্যে তাঁদের বিশেষ প্রতিষ্ঠা জীবন সম্বন্ধে তাঁদের এক বিশেষ দর্শনের হদিস দিয়ে থাকে। তাঁরা [illegible] পরিবারকে তাঁদের [illegible] দেয় নেই পরিবারবর্গের সঙ্গে তাঁদের কেবলই প্রাপ্তির সম্পর্ক। এজন্য বয়সকালে তাঁদের সমাজজীবনে কিছু বিসদৃশ দেখালেও মনে রাখতে হবে এই মানসিকতার জন্য যদি কারও বস্তুত দায়িত্ব থেকে থাকে তবে সে দায়িত্ব সেই [illegible] স্থানীয় অভিভাবকবর্গেরই। অত্যধিক প্রশ্রয় এঁদের মধ্যে আত্ম-কেন্দ্রিক ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করে এসেছে। পরবর্তী জীবনে এঁদের ওপর দোষারোপ তাই বাস্তবের যথার্থ ব্যাখ্যা নয়।

গান্ধীজী জাতির পিতা। বিড়লা-পরিবার তাঁর স্নেহভাজন অতঃপর স্বাধীন ভারতে বিড়লাপরিবারের জাতির কাছ থেকে যত প্রাপ্তি আছে, তদনুরূপ দেয়ও থাকছে এমন তর্ক পৌরাণিক উদাহরণকে বানচাল করে দেয়। অতঃপর সেই যুক্তিতেই বিড়লাভবনের টাকা প্রাপ্তি যদি আজ গান্ধী স্মৃতির উদ্দেশে প্রদত্ত হয় [illegible] যদি গান্ধীজীর স্নেহভাজন পরিবার মনে করেন যে তাঁরা পিতার যথার্থ ঋণ শোধ করেছেন [illegible] জন্য [illegible] লাভ কি।

ব্যাপারটা [illegible] গান্ধীজীর [illegible] গান্ধী স্মৃতির উদ্দেশ্য [illegible] হবে কি না [illegible] বিড়লা [illegible]। কারণ গান্ধীজীর কাছে বিড়লাপরিবার যা পেয়েছেন তার [illegible] দেয় [illegible]। সমগ্র ব্যাপারটিকে তাই অতীতের মত ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখতে হবে।

আর জাতীয় স্মৃতিমন্দির সে কি দাবি করে আদায় করার বস্তু? সেই যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন (পরম [illegible] যাঁদের আমরা আজ প্রায় ভুলতেই বসেছি) তিনি তাঁর বসতবাটি দান করে গেছেন। দেশবন্ধু ভবনও তাঁর স্মৃতির প্রতীক। কিন্তু বিড়লাভবনকেও গান্ধীজীর স্মৃতি সমভাবে বহন করাতে হবে এ দাবির মধ্যে যথার্থ [illegible] তাৎপর্য নেই।

দেশবন্ধু ছিলেন দাতা। তিনি সর্বস্ব দিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু বিড়লাজীকে সেই সব আদর্শের সম্মুখীন করে বাপুজী স্মৃতির জন্য ঘর বাড়ি দিয়ে দেওয়ার দাবি তুলে ব্যস্ত করা কি দাবিদারের পক্ষেই যুক্তিযুক্ত ব্যাপার হচ্ছে।

আগা খাঁ তাঁর প্রাসাদের সেই অংশ দান করেছেন বৃটিশ যে অংশে গান্ধীজীকে প্রাসাদবন্দী করে রেখে-ছিলেন। কিন্তু এই নিদর্শন তুলেও বিড়লাজীকে বলা যায় না তিনিও দান করুন তাঁর প্রাসাদ যেখানে গান্ধীজী শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

অথচ সদম্ভবলে বিড়লাজীকে বিড়ম্বনায় ফেলা হয়েছে। কয়েকজন কিছু কিছু কড়া কথাও বলেছেন। যেমন জন-সংঘ নেতা স্বামী ব্রহ্মানন্দজী প্রকাশ্যে বলেছেন : বড়ই আশ্চর্যের কথা, যে বিড়লাপরিবার গান্ধীজীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগে প্রভূত অর্থো-পার্জনের পথ করে নিয়েছেন তাঁরা বিড়লা-ভবনটি জাতির নিকট দান করার মতো ছোট্ট সামান্য কাজ করতে পারছেন না।

অন্যদিকে কংগ্রেসী সংসদ সদস্য শ্রীঅনন্ত মাহাতো আবার এক [illegible] সুরে বললেন : যে সরকার (তাঁর দলেরই সরকার) কিষাণ ও কুটীর-বাসীদের অতি সামান্য সম্পত্তি এতো-টুকু কালহরণ না করেই দখল করে নিতে পারেন পরিতাপের বিষয় তাঁরাই বিড়লাভবনের ক্ষেত্রে [illegible] ব্যবস্থা অবলম্বনে এতো ধীরগামী।

গান্ধীজীর জন্য কম্যুনিস্ট সদস্য শ্রী এম ফারুকীকেও খুব চিন্তিত দেখা গেল।

বিষয়টি তাই জরুরী চিন্তার বিষয় সন্দেহ নেই। কারণ বিড়লাভবনকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ও বিভিন্ন মতাদর্শ একই সুরে এসে উপনীত হয়েছেন।

বিড়লাজী অন্তত এইটুকু বুঝুন, জাতির পিতার জন্য মতধর্মাদর্শ নির্বি-শেষে সন্তানগণ জাতীয় দাবি উত্থাপিত করেছেন। একই সঙ্গে শ্রীচন্দ্রশেখর অবশ্য আশ্বস্ত করে বলেছেন : গান্ধীজী যেখানেই গেছেন ও থেকেছেন সমবেত-ভাবে সেগুলির উপর কোনও দাবি রাখা হচ্ছে না। শুধু গান্ধীজী যেখানে শহীদ হয়েছিলেন সেই ভবনটিই দাবি করা হচ্ছে।

এখন বিড়লাজী তথা ভারত সরকার যদি বিষয়টিকে কেবলমাত্র হ্যাভ-নটস-দের চ্যালেঞ্জ বলে গ্রহণ করেন, তবে এই দাবি মেনে নেওয়া শক্ত হবে। নচেৎ একটি সাধু উদ্দেশ্যে বিড়লাভবন ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করতে পারে, যদি এক্ষেত্রে কোন চ্যালেঞ্জের প্রশ্ন না গণনা করা হয়। যতদূর দেখা যাচ্ছে, কংগ্রেস ও জনসংঘ যেখানে আন্দোলনের বড় সারিক, সেখানে ব্যাপারটিকে কেবলমাত্র চ্যালেঞ্জ বলে গ্রহণ না করাই বিধেয় এবং সে-কারণে বিড়লাজী অবশ্যই ফিরে ভাবতে পারেন। হাজার হোক, গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কটা খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। এবং বিড়লাজীর পক্ষে গোটা-কয়েক প্রাসাদ দান, লাভ ও তৈরি করা বাস্তবিক কোন সমস্যাই নয়।

কর্মী-অধিকার-হরণ অনুমোদিত

যেমন সচরাচর হয়ে থাকে, বলবন্ত রাও চ্যবন সাহেবের কেন্দ্রীয়-কর্মী-অধিকার-হরণ বাঞ্ছা ভোটের বলে পাশ হয়ে গেল লোকসভায়। বিরোধী সদস্যরা অবশ্য সেই "কালা কানুন" পাশের অংশীদার হতে অস্বীকৃত হয়ে সভাগৃহ ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃত বিরোধী আর ক'জন। দেশের সংখ্যাগুরু লোক ভোট দিয়ে যে সমুদয় আইন চাপিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, তাই চেপেছে। বলবার কিছু নেই। বিরোধীরা তাকে কালা কানুনই বলুন, আর যা ইচ্ছে তাই বলুন, আইন যাঁদের ওপর চাপছে তাঁদেরও মধ্যে ঢের লোক আছেন, যাঁরা ফের সেই আইনপ্রণয়নকারীদেরই দোসর সমজাতীয় আইন রচনা করতে বিধানসভা ও লোকসভায় প্রেরণ করবেন। সুতরাং দেশের মানুষ যা চান, তাই হয়েছে। বেশ হয়েছে।

বিরোধীপক্ষ অবশ্য মুষ্টিমেয় ভোটের জোর নিয়ে যথাসম্ভব লড়েছেন। বলেছেন : ও বিল আসলে শ্রমিকসমাজের অধিকার হরণে ব্যগ্র। আজ যা কেন্দ্রীয় কর্মীদের কণ্ঠরোধ ও সর্বস্ব করার অধিকার হরণে ব্যগ্র কাল তাই শ্রমিক ভারতের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করবে। তা করবে বৈকি, দেশের নির্বাচক-মণ্ডলী যতদিন চাইবেন, ততদিন এমন সব বিল হামেশা পাশ হয়ে যাবে।

বিরোধীরা নিয়মমাফিক হট্টগোল ছাড়াও সংসদীয় পন্থায় বিলটির বিরোধিতা করেন। যেমন বৈধতার প্রশ্ন, ডিভিসন এবং শেষ পর্যন্ত (সভা) গৃহ ত্যাগ। ফলে বিলটির স্বরূপ কিছু কিছু ব্যক্ত করায় তাঁদের ভূমিকা কিছু কাজেও এসেছিল। বিরোধী চাপ সৃষ্টির ফলে সরকারপক্ষ বিলের মেয়াদ পাঁচ থেকে তিন বছরে স্থির করতে বাধ্য হন। অর্থাৎ সাধারণ নির্বাচনের মুখোমুখি এই বিলের মেয়াদও শেষ হবে। অর্থাৎ বিলের মেয়াদ অতঃপর বাড়াতে হলে নির্বাচনের মুখে এই অপ্রিয় কাজটি করতে হবে। নির্বাচকমণ্ডলীর সামনে শ্রমিক-বিরোধী বিল পুনরনুমোদনে তোলা তখন একটু কষ্টকর হতে পারে। অবশ্য ভারতের নির্বাচকমণ্ডলী অতশত ভেবে সরকার গঠন করেন না। তাই নির্বাচনের টিকিট নিয়ে কোন সরকার কী করলেন না করলেন সংখ্যাগুরু নির্বাচকের তাতে থোড়াই কিছু এসে যায়। তাঁরা পঞ্চবার্ষিক ভোটটি স্রেফ খেলাচ্ছলেই বাক্সে ভরে দিয়ে যাবেন। অন্ততঃ গত একুশ বছরের অভিজ্ঞতা তাই-ই। তবু কেন বিরোধীরা চেঁচিয়ে মরেন? না, তাঁরা নির্বাচকমণ্ডলীকে জাগ্রত করতে চান। জানাতে চান ঐ 'কালা কানুনের' পেছনে পরোক্ষে নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থনই রয়ে গেল।

যাই হোক, ভাবনা ছিল সরকার খুশিমত এই আইনবলে যে কোন কাজকেই অত্যাবশ্যক শ্রেণীভুক্ত করে কর্মীকণ্ঠ দাবিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধক এই রাখা হয়েছে যে, কোন কাজ অত্যাবশ্যক ঘোষণার আগে ঘোষণার সরকারী বিজ্ঞপ্তি সংসদে উত্থাপন করা হবে। উত্থাপন মানেই আলোড়ন। সরকারী ইচ্ছা কার্যে অবশ্যই পরিণত হবে, তবে তার আগে পুনশ্চ আলোড়নের সুযোগ মিলবে। সম্ভবতঃ এদেশে তথাকথিত জনমত সৃষ্টিতে সাহায্য হবে।

প্রস্তাবাকারে অনুমোদিত আইনটি নাকি সরকার কেবলমাত্র প্রয়োজনেই বাস্তবে করবেন। এবং এই আইনও অত্যাবশ্যক না হলে সম্ভব হবে না। সরকার আরও প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, শীঘ্রই আর একটি বিল আনা হবে যার বলে কেন্দ্রীয় কর্মীদের অভাব অভিযোগ সালিশীতে পাঠানো হবে। কিন্তু এমনতর বদান্য ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বিরোধীরা অসন্তুষ্ট। তাঁরা মনে করেন, যে ব্যবস্থা কর্মীদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণে অনিচ্ছুক সেই ব্যবস্থার আওতায় কোনো সাজানো সালিশীই যথেষ্ট নয়। ধর্মঘটের অধিকার বাতিলের কর্মী ও শ্রমিক স্বার্থ পর্যুদস্ত হবেই। বস্তুত কার্যকরী সালিশীর সফল গ্রহণের ইচ্ছা থাকলে মাত্র এক দিনের প্রতীক ধর্মঘটের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় কর্মীসমাজে বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করাতেন না। একদিনের ধর্মঘটকে সরকার যেমন কড়াহাতের সঙ্গে দমন করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্ডিন্যান্স ও আইন প্রভৃতি দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিরোধীদের মুখে 'সালাজার সরকার নিপাত যাক' ধ্বনির যোগান দিলেন, আর মালিকশ্রেণীর সামনে তুলে ধরলেন শ্রমিক-দমনকারী এক শাসনের প্রকাশ্য রূপ, যার দ্বারা মালিকশ্রেণী অতঃপর শ্রমিক শোষণে আরও অকুতোভয় হওয়ার প্রেরণা লাভ করলেন।

অথচ আমাদের জাতীয় সরকারের মুখে অধরোষ্ঠের সুখবর্ধক একটি আওয়াজ হাটে-ঘাটে-মাঠে চালু আছে। তা' হল গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রের আশ্বাস। কিন্তু সরকার নিজেই যে আদর্শ-নিয়োগকর্তার 'স্পেসিমেন' প্রদর্শন করলেন, তার দ্বারা ঐ গালভরা 'সমাজতন্ত্রে'র বুলিটিকে কি একেবারেই কবরখানায় চালান করা হলো না?

শ্রমিকদরদী না হয়ে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার শ্রমিক নিপীড়কের ভূমিকা গ্রহণে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠছেন। এর ফলে শিল্পোদ্যোগে ও শিল্পে শান্তি ব্যাহত হবে এবং তার দায়িত্ব সরকারেরই অদূরদর্শিতারূপে কীর্তিত হতে থাকবে, এই পরিণতির কথাও গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা করবার প্রয়োজন।

হরিয়ানা-পশ্চিমবঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ প্রসঙ্গে

হরিয়ানা ও পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপালদ্বয় বৈষম্যমূলক আচরণ করেছেন, সদস্যবর্গের এই অভিযোগের উত্তরে চ্যবন সাহেব বলেন, দুই রাজ্যের পরিস্থিতি মোটেও এক রকম ছিল না। হরিয়ানায় রাজ্যপালের বিশ্বাস ছিল, বংশীলালই সংখ্যাগুরুর সমর্থনভাজন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপাল বুঝেছিলেন, যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা সংখ্যাগুরুর সমর্থন বঞ্চিত।

যেহেতু রাজ্যপালদ্বয়ের উপরোক্তরূপ উপলব্ধির ওপর নথিপত্র-বিবাদ উপস্থিত করা সম্ভব নয়, সে কারণ সদস্যবর্গ সমস্যার মূল প্রশ্নে বিতর্ককে টেনে নিয়ে গিয়ে বলেন, হরিয়ানার ক্ষেত্রে রাজ্যপালের ক্ষমতার প্রয়োগ স্পীকার সম্মেলনের সুপারিশের পর সীমিত হয়ে গেছল। স্পীকার সম্মেলনে বিধানসভাকেই উচ্চতম ক্ষমতা দান করার প্রস্তাব ছিল। মন্ত্রিসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে বিবাদ নিষ্পত্তির স্থান হিসাবে স্পীকার সম্মেলন বিধানসভাকেই নির্দেশিত করেন।

সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে বিবাদ উপস্থিত হওয়ার এক সপ্তাহকালের

মধ্যেই, স্পীকার সম্মেলনের সুপারিশ, মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা আহবান করা উচিত। এই সাদা কথাটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুঝতে চাইছেন না বলে সদস্যগণ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু চ্যবন সাহেবও স্পষ্টাস্পষ্টি জানিয়ে দিয়েছেন যে, স্পীকার সম্মেলনের সুপারিশ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় গৃহীত না-হওয়া পর্যন্ত ঐ সুপারিশ কার্যকরী করার অধিকার তাঁর নেই।

সুতরাং যেমন চলছিল, রাজ্যপালই এ বিষয়ে চূড়ান্ত বিচারক রয়ে গেলেন। রইল না শুধু স্পীকার সম্মেলনের সুপারিশের মর্যাদা, অন্তত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা যদি ঐ সুপারিশ গ্রহণ না করেন, তাহলে গত সাধারণ নির্বাচনের পর দেশব্যাপী পটপরিবর্তন এবং পরীক্ষামূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রয়োজন অনুসারে সাজিয়ে তোলার যে চেষ্টা শুরু হয়েছিল তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং বলেছেন, "কোন রাজ্যে রাজ্যপাল বিশেষ অবস্থায় কি করবেন তা কেন্দ্রেরও বিচার্য নয়।"

এ বক্তব্যের তাৎপর্য তো এই দাঁড়ায় যে রাজ্যে নির্বাচিত সরকার নিয়ে যখন বিবাদের সূত্রপাত হবে তখন সে বিবাদের

আমলাদের ওপর, কোন নির্বাচিত প্রতিনিধি বা প্রতিনিধিমণ্ডলীর ওপর নয়।

ভারত পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম গণতন্ত্র; শাসনতন্ত্র প্রণেতাগণ বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার সুযোগ পান নি। তাঁরা প্রাথমিক অনুশাসন লিপিবদ্ধ করে গেছেন, বাস্তব অবস্থার সঙ্গে যার ব্যাখ্যা ও সংশোধনাদি অবশ্যই প্রয়োজন হবে বলে নিশ্চয় তাঁদেরও ধারণা ছিল। বস্তুত প্রকৃত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই তো কোন কিছুর পরীক্ষা সম্ভব। হরদম দল বদলের ঘটনা মাত্র রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসী সরকার পতনের পরই সুরু হয়েছে। এই নতুন অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে সেইমত গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা তাই নতুন করে প্রণয়নের অবশ্যই প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। স্পীকার সম্মেলন সেই উদ্দেশ্যেই একটি গণতান্ত্রিক উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন, সর্বাধিক বুদ্ধিমত্তাও যা বিনা বাক্যে গ্রহণযোগ্য।

অথচ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এই সুপারিশ গ্রহণে কালহরণ করছেন তা দুর্ভাগ্য না হলেও বিস্ময়কর। যদি গণতন্ত্রে আস্থা রাখতে হয় তবে মনোনীত রাজ্যপালের হাতে নির্বাচিত সরকারের ভাগ্য নির্ধারণের ক্ষমতা নিরংকুশভাবে দেওয়া কতদূর উচিত কি। আজ কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় কংগ্রেস। কিন্তু গণতন্ত্রে বহু দলের সুস্থ গণতান্ত্রিক পটপরিবর্তনের ফলে যে কোন দলের মন্ত্রিসভার পতন হতে পারে। সেটাই স্বাভাবিক। সুতরাং দূরদর্শী ভাবেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত রাজ্যপালের ওপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার্পণ এবং প্রেসিডেন্ট-প্রধান গণতন্ত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশেষ নেই। ভারত কি শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট-প্রধান গণতন্ত্রের দিকেই পা বাড়াবে?

কংগ্রেস সংসদীয় কমিটিতে ছাত্র অশান্তির প্রশ্ন

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন গত বুধবার সংসদীয় কংগ্রেস সংসদীয় কমিটির কার্যনির্বাহক সভার বৈঠকে বলেন কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্ববিদ্যালয় আইনের যে খসড়া তৈরি করেছেন, রাজ্য সরকারগুলি সেই খসড়া আইনের মত ভিত্তি অনুসারে রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধনে নারাজ। এই খসড়া আইনের মূলনীতি গ্রাহ্য হলে উপাচার্য নিয়োগে রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতা খর্বিত হবে, তাঁদের আপত্তি সেকারণেই দেখা দিয়েছে।

ছাত্র অশান্তি সম্পর্কে শিক্ষামন্ত্রী তাঁর পূর্বপ্রদত্ত অভিমতের পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন, শিক্ষার অর্থকরী মূল্যের অভাব কারণ।

কেন্দ্রীয় খসড়া আইনের মূলনীতি কেবলমাত্র রাজ্য সরকারের ক্ষমতার ভিত্তিতেই রচিত হবে, রাজ্য সরকারগুলির এহেন দাবি শিক্ষাজগতে উদ্ভূত রাজনৈতিক অবস্থার আবহাওয়া তৈরি করবে। সুতরাং ছাত্র অশান্তি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছাত্রপ্রিয় শিক্ষামন্ত্রী যে গভীর ক্ষোভ ও চিন্তার সঙ্গে রাজ্য সরকারগুলির আচরণ লক্ষ্য করেছেন তা বলাই বাহুল্য। ক্ষমতার জাল বিস্তার করে রাজত্ব চালানোই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে কল্যাণব্রতী সরকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও কোনোদিন প্রভাতের পবিত্র বাতাসের স্পর্শে সফল হবে না। কিন্তু বস্তুত কল্যাণব্রতী সরকার প্রতিষ্ঠার দিকে নজর আমরা কেবলই সরিয়ে এনে সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গিকে ক্ষমতা ও স্বার্থের গণ্ডীতে সীমিত করে তুলছি। ফলত ভারতবর্ষ দিন দিন সমস্যাসংকুল একটি ভৌগোলিক অস্তিত্বে পরিণত হচ্ছে। এখানে কোন বিশেষ মন্ত্রীর ও সদস্যের শুভ ইচ্ছা কার্যকরী করার উপায় নেই। সমস্যারও তাই সমাধান নেই।

শিক্ষামন্ত্রী ছাত্র অশান্তির কারণকে সর্বদাই মনস্তাত্ত্বিক কারণ বলে ব্যাখ্যা করে আসছেন। যেক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রমুখের নজরে এ সমস্ত শুধুই ল' এণ্ড অর্ডারের প্রশ্ন। বলা বাহুল্য, ছাত্রসমাজের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর যেমন প্রত্যক্ষ সহানুভূতির সম্পর্ক ছিল, অন্যান্যদের ক্ষেত্রে তার সুযোগ ঘটে নি। তাঁরা যৌবনের আশা কল্পনা ও আকাঙ্ক্ষার কথা বার্ধক্যে বিস্মৃত হয়েছেন। গণ্ডগোলও সেইখানেই।

শিক্ষামন্ত্রী মনে করেন, উপাচার্য, বিভাগীয় প্রধান ও শিক্ষকদের ছাত্রদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হওয়া উচিত। শিক্ষামন্ত্রীর এমত প্রস্তাব কতদূর গ্রহণযোগ্য হবে জানি না, তবে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষামন্ত্রীর প্রস্তাব তাৎক্ষণিকভাবে গৃহীত হওয়াই উচিত।

শিক্ষার জগতে যেভাবে আমলাতন্ত্রের প্রবেশ শুরু হয়েছে তাতে অবশ্য সে আশায় প্রথম থেকেই ইস্তফা দিয়ে রাখতে হয়। ঐ তো রাজ্য সরকারগুলি উপাচার্য নিয়োগের ক্ষমতা প্রয়োগে কিছু অসুবিধা দেখে বিগড়ে গেছেন। অর্থাৎ উপাচার্যকেও আমলার পর্যায়ভুক্ত করার প্রবল ইচ্ছা অন্তর্নিহিত। অন্যদিকে শিক্ষাপর্ষদগুলিও আমলাচক্রের আওতাভুক্ত। স্কুল-কলেজের কমিটিগুলিকে বিশেষ দল সংগঠন ও সমিতির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে স্পেশ্যাল কনস্টিটিউশনের (Special Constitution) মারফৎ প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থাদির, সদস্যগণ প্রায় অভিজ্ঞতাহীন পরিচালনার ব্যাপারে, ছাত্রদের গণনাই করা হয় না। এইমত শিক্ষাব্যবস্থায় সুস্থ আবহাওয়া গড়ে তোলা দেবতারও অসাধ্য।

এরই মধ্যে শিক্ষামন্ত্রীর প্রস্তাব, অর্থাৎ বিভাগীয় কর্তাদের সঙ্গে ছাত্রদের যোগাযোগ মরুভূমিকে বারি সিঞ্চনের কাজ করতে পারে। কিন্তু সে আশাও যে ফলবতী হবে এমন দুরাশা রাখা যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপর্ষদগুলির এক একটি জনসংযোগ বিভাগ অবশ্যই থাকা উচিত, যেখানে অভাব-অভিযোগগুলির দ্রুত মীমাংসা সম্ভব হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচালনাগত ত্রুটি সম্পর্কে অভিযোগের মীমাংসা শুধু কয়েকটি আমলার ওপর ন্যস্ত থাকলে সেখানে লাল ফিতে ও অন্যান্য ভয়াবহ প্রতিবন্ধক যেমন চলে আসছে তেমনিই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে। ছাত্র এবং অভিভাবকদের সামনে বস্তুত কোন "ফোরাম" বা প্লাটফর্ম নেই যেখানে অভাব অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি হতে পারে। কেবলমাত্র অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনার জন্য একটি করে সর্বজনসংযোগ বিভাগ থাকলে অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়গুলির দ্রুত মীমাংসা ঘটতে সমর্থ হতে পারে। এই বিভাগের সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রকের সরাসরি যোগাযোগ এবং এই বিভাগের পরোক্ষে একটি নির্বাচিত সভাও থাকা বাঞ্ছনীয়। আশাকরি সে সভা সরকারী মনোভাবাপন্ন সদস্যদের দ্বারা ভারাক্রান্ত হবে না, কোন সুফলই দেখা দেবে না।

বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপর্ষদ পর্যায়ে যেমন বিভিন্ন বিষয়ক কমিটি আছে এই বিভাগও তদনুরূপ একটি কমিটিকে শীর্ষে নিয়ে দ্রুত সর্ব পরিচালনা করতে পারেন। তবে কমিটির গঠন অবশ্যই নিরপেক্ষ হওয়া আবশ্যক। এই কমিটির সদস্যবর্গ ছাত্র ও অভিভাবক শ্রেণীর ভোটেই নির্বাচিত হলে এবং সেখানে আমলাপ্রভাব না থাকলেই একমাত্র অভিযোগগুলির গণতান্ত্রিক মীমাংসা সম্ভব। আশা করি এ জাতীয় প্রস্তাব কতদূর বাস্তবায়িত করা সম্ভব সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষিত হবে এবং তিনি এ বিষয়টি ভেবে দেখবেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে যতদিন না সাধারণের পরিচালনাধীনে আনা যাচ্ছে ততদিন সমস্যার প্রকৃত উপলব্ধি ও তদনুযায়ী শিক্ষাসংস্কারেরও কোন উপায় হবে না, এমন কথা নতুন শোনালেও গভীরতর চিন্তার এর যাথার্থ্য উপলব্ধ হবে বলেই বিশ্বাস।

(২১।১২।৬৮)

[illegible] মণ্ডলীর সদস্যগণ

আমেরিকার মধ্যে সব চেয়ে বড় ও জনবহুল ব্রেজিলে অনেক দিনই গণতন্ত্রের কোন চিহ্ন নেই। চার বৎসর আগে জোয়াও গুলার্তের অপশাসনের হাত থেকে দেশকে উদ্ধারের জন্য সৈন্যবাহিনীর ক্ষমতা দখলের পর থেকে এখানে যা চলছে তা সামরিক অফিসারদের জঙ্গী শাসন। তবু তার মধ্যেও আইনসভা, রাজনৈতিক দল, সংবাদপত্র, এ সব চলছিল। গত সপ্তাহ থেকে সে সবেরও ইতি হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি আর্থার দা কস্তা অ' সিলভা 'ইনস্টিটিউশনাল অ্যাক্ট' স্বাক্ষর করে রাষ্ট্র-শাসনের সকল ক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ করেছেন। এই নিয়ে গত চার বৎসরে পাঁচ বার এই আইনের প্রয়োগ করতে হল।

রাষ্ট্রপতির ঘোষণা অনুসারে ব্রেজিলের সংবিধান বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, আইনসভা কংগ্রেস ভেঙে দেওয়া হয়েছে, এবং রাষ্ট্রপতিকে যে কোন নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়া, যে-কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা, হেবিয়াস কর্পাসের অধিকার বাতিল করা যে কোন সরকারী কর্মচারীকে কর্মচ্যুত করা, যে কোন সম্পত্তি দখল করা এবং সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

সামরিক অফিসারদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জনাই ব্রেজিলে আজ এই চরম একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হল। গত সেপ্টেম্বর মাসে ব্রাসিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশী অনুপ্রবেশের ঘটনা থেকে এর সূত্রপাত। ছাত্র আন্দোলন দমনের নাম করে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে ছাত্র ও অধ্যাপকদের ওপর নির্মম-ভাবে অত্যাচার চালায়। দেশের সামরিক কর্তারা পুলিশকে পূর্ণ সমর্থন জানান। এই ঘটনার নিন্দা করে আইনসভার নিম্ন-কক্ষ চেম্বার অব ডেপুটিজ এ মার্সিও মরেরা আলভেজ এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন।

বিরোধী দলের ৩২ বৎসর বয়স্ক তরুণ সদস্য আলভেজ সামরিক শাসনের একজন কঠোর সমালোচক। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশী অনুপ্রবেশের জন্য সামরিক কর্তাদের দায়ী করে এদের 'অত্যাচারীর গোষ্ঠী' বলে অভিহিত করেন। এই ঘটনার প্রতিবাদে তিনি দেশবাসীর কাছে স্বাধীনতা দিবসের সামরিক কুচকাওয়াজ বর্জনের জন্য আহ্বান জানান। যুবতী মেয়েদের প্রতি আলভেজের অনুরোধ: কোন সামরিক অফিসারের প্রেমে পড়বেন না! এদের বয়কট করুন!

সামরিক কর্তাদের পক্ষে আলভেজের স্পর্ধা সহ্য করা অবশ্যই সম্ভব নয়। তাঁরা চাপ দিলেন রাষ্ট্রপতির ওপর এখনই আলভেজকে গ্রেপ্তার করুন। দেশব্যাপী সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে, আলভেজ তার প্রতীক। সুতরাং, আলভেজকে গ্রেপ্তার করলে বিক্ষোভও থামবে। অন্তত সামরিক অফি-সারদের তাই ধারণা।

কিন্তু আইনসভার সদস্যরূপে আল-ভেজের কিছু বিশেষাধিকার আছে। তাঁকে গ্রেপ্তার করা যায় না। চেম্বারে কস্তা অ' সিলভার দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। তাই রাষ্ট্রপতি চেষ্টা করলেন, আলভেজের বিশেষ অধিকার কেড়ে নেবার জন্য চেম্বারকে দিয়ে প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেবার জন্য। সব ঠিকও ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ভোটের ফলাফলে দেখা গেল কস্তা অ' সিলভার দলের অন্তত ১০০ জন সদস্য এ ব্যাপারে বিরোধীপক্ষের সঙ্গে ভোট দিয়েছেন। তাঁরা 'নেকড়ের মুখে' তাঁদের সহকর্মী আলভেজকে ছেড়ে দিতে রাজী হন নি। ১৪১—২১৬ ভোটে আলভেজের বিশেষাধিকার কেড়ে নেবার সরকারী প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল। ভোটের ফলাফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দর্শক গ্যালারী থেকে দর্শকেরা আনন্দে নৃত্য শুরু করে এবং জাতীয় সংগীত গাইতে থাকে। চেম্বারের সদস্যরাও তাদের সঙ্গে সমবেত সংগীতে যোগ দেন।

আইনসভার সদস্যরা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হলেন বটে। কিন্তু সামরিক নেতাদের নিরস্ত করতে পারলেন না। জেনারেল সিসারো সার মেনতোর নেতৃত্বে সামরিক অফিসাররা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে গোপন আলোচনায় বসলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল [illegible] দা আলবুকার্ক লিমা এঁদের সঙ্গে ছিলেন। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। সংবিধান, আইনসভা, সব কিছু বাতিল। সব ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে।

আইনসভার ভোটের ফলাফল প্রকাশ করা বন্ধ করে দেওয়া হল। রেডিও টেলি-ভিশন এমন কি সংবাদপত্রের ওপর কঠোর নির্দেশ গেল। কয়েকটি সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হল। পরদিন মধ্যরাত্রে রেডিও টেলিভিশন [illegible] আনতোনিও দা গামা অ' সিলভা ঘোষণা করলেন, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সকল ক্ষমতা গ্রহণের কথা। রাষ্ট্রপতির নামে আসলে সব ক্ষমতা এল সামরিক বাহিনীর হাতে। এতদিনও তাই ছিল। তবে এখন আর কোন লুকোচুরি রইল না।

ব্যাপক গ্রেপ্তার শুরু হয়েছে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, জনপ্রিয় নেতা ও আগামী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রার্থী জুসেলিনো কুবিৎশেক [illegible] সিকা [illegible] দা [illegible] প্রভৃতি। [illegible] আলভেজের [illegible] যায় নি। [illegible] আছেন।

দেশের সকল শ্রেণীর জনসাধারণ, বিশেষ করে প্রভাবশালী ক্যাথলিক ধর্ম-যাজক গোষ্ঠী ছাত্র শ্রমিক এমন কি ব্যব-সায়ীরাও [illegible] সামরিক শাসনে ক্ষুব্ধ। [illegible] একনায়কতন্ত্রী শাসন কি [illegible] দা [illegible] অ এসতাদো দা সাও পাওলো [illegible] সিলভার উদ্দেশে [illegible] করেছে: আট কোটি [illegible] [illegible] না।

ইতালী:

শেষ পর্যন্ত [illegible] সংকটের অবসান হল। [illegible] মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেছেন।

আলদো মোরোর মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর দেশে একটানা রাজনৈতিক সংকট চলছিল। আইনসভায় আস্থাভাজন কোন মন্ত্রিসভা গঠন সম্ভব হচ্ছিল না। এই [illegible] মধ্যে আবার শুরু হয়েছিল ব্যাপক শ্রমিক ও ছাত্র বিক্ষোভ। শেষ পর্যন্ত দেশের প্রধান তিনটি দল খ্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি, সোস্যালিস্ট পার্টি ও রিপাবলিকান পার্টি একযোগে রাষ্ট্রপতি

করতে রাজী হয়েছেন।

নতুন মন্ত্রিসভা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইতালীর ২৯তম মন্ত্রিসভা। এটি বৃহত্তম মন্ত্রিসভাও বটে, এর মোট সদস্য হলেন ২৭ জন। আইনসভা সদস্যদের ব্যাপক অংশের সমর্থন লাভের জন্য মন্ত্রি-সংখ্যা বাড়াতে হয়েছে। এই মন্ত্রিসভায় ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টির ১৭, সোস্যালিস্ট পার্টির ৯ ও রিপাবলিকান পার্টির ১ জন সদস্য আছেন।

৭২ বৎসর বয়স্ক প্রবীণ সোস্যালিস্ট নেতা পিয়েত্রো নেন্নি নতুন মন্ত্রিসভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন। আর নেন্নির সহ-কর্মী ফ্রান্সেসকো দ্য মার্তিনো হয়েছেন সহকারী প্রধানমন্ত্রী।

রুমর মন্ত্রিসভা চেম্বার অব ডেপুটিজ-এর ৬৩০ জন সদস্যের মধ্যে ৩৬০ জনের

কথা হচ্ছে। রুমর প্র[illegible]। [illegible] প্রতি দিয়েছেন, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের কাজে তিনি হাত দেবেন এবং ছাত্রদের শিক্ষা সংস্কারের দাবিও বিবেচনা করবেন।

কিন্তু ইতালীর অর্থনৈতিক সংকট যেরূপ তীব্র আকার ধারণ করেছে, বর্ণ-বৈষম্য যেমন প্রকট হয়ে উঠেছে, এবং আমলাতন্ত্রের অপদার্থতার বিরুদ্ধে দেশ-বাসীর মনে যে ঘৃণা দেখা দিয়েছে, তাতে রুমর সরকারও কার্যকরী কিছু করে উঠতে পারবেন কি না, তাতে সন্দেহ রয়েছে। এই গুরুতর সংকটের মোকাবিলা করার জন্য যে কর্মপন্থা প্রয়োজন, সোস্যা-লিস্ট পার্টির সদস্যরা তা চাইলেও রক্ষণ-শীল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটদের অধিকাংশই তা সমর্থন করবেন না। এ অবস্থায় কিছু করা মুশকিল, আর করতে গেলে সরকারের পতন।

তাই ইতালীর কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক লুইজি লোঙ্গো বলেছেন, এই

[illegible] রুমর

মন্ত্রিসভার গঠনই এমন যে এর পক্ষে মৌলিক কিছু করা সম্ভব হবে না। এও সেই নতুন বোতলে পুরনো মদ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:

নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসন ২০শে জানুয়ারী দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর মন্ত্রিসভার ১২ জন সদস্যের নাম ঘোষণা করেছেন। আসলে মার্কিন শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীদের কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই। এখানে রাষ্ট্র-পতিই সর্বেসর্বা। তবু মন্ত্রীদের একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। পরামর্শদাতারূপে তাঁরা রাষ্ট্রপতির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন।

মন্ত্রীদের বিশেষ কোন ক্ষমতা নেই, এ কথা নিকসন জানেন বলেই বোধ হয় একটা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে টেলিভিশন

[illegible]

ইতিহাসে এই জাতীয় অনুষ্ঠান এই প্রথম। কেবল মন্ত্রীরা নন, মন্ত্রীদের স্ত্রীদেরও তিনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। মন্ত্রী-পত্নীদের জন্য বিশেষ রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধার কথাও নিকসন ঘোষণা করেছেন।

নিকসন মন্ত্রিসভার সকলেই রিপাবলি-কান দলভুক্ত, সকলেই শ্বেতাঙ্গ, সকলেই পুরুষ। সর্বশ্রেণীর প্রতিনিধি নিয়ে নিকসন একটি ব্যাপক মন্ত্রিসভা গঠন করবেন বলে যে কথা শোনা গিয়েছিল, তা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

পররাষ্ট্র সচিব (রাষ্ট্রপতির পরেই যাঁর স্থান এবং যিনি 'কিপার অব দি গ্রেট সীল অব দি যুনাইটেড স্টেটস') পদে নিযুক্ত হয়েছেন উইলিয়াম রজার্স। রজার্স নিকসনের দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ১৯৫২ সালে যখন নিকসন উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, তখন তহবিল সংগ্রহ নিয়ে যে কেলেঙ্কারী হয় তা থেকে নিকসনকে উদ্ধার করেন রজার্স। তখন থেকে প্রতি সমস্যায় নিকসনের প্রধান পরামর্শদাতা এই রজার্স। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদে আসছেন মেলভিন লেয়ার্ড। লেয়ার্ড রিপাবলিকান পার্টির অন্যতম প্রধান নেতা ও নিকসনের অনুগামী।

এই দুই প্রধান পদে যাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে, তাঁদের কারও সংশ্লিষ্ট কাজের ব্যাপারে কোন অভিজ্ঞতা নেই। দুজনেই আনকোরা নতুন। এই নিয়ে রীতিমত বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। আবার এর জন্য অনেকে নিকসনের প্রশংসাও করেছেন। এঁরা খোলা মন নিয়ে কাজ করতে পারবেন। আগের থেকে এঁদের মন আচ্ছন্ন হয়ে নেই। এ কথাও অবশ্য কেউ কেউ বলছেন যে, নিকসন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ দুজনকে এই দুই প্রধান গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেছেন, কারণ, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষার ব্যাপার আসলে তিনি নিজে চালাবেন।

নিকসন মন্ত্রিসভার সদস্যদের অধি-কাংশই মার্কিন রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ পরিচিত নন। এঁদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, এঁরা খুব বিরাট নন, নতুন নতুন চিন্তার উদ্ভাবকও নন। এঁরা হলেন দক্ষ ও পারদর্শী কারিগরের মত। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এমন লোকেরই দরকার। জনসন শাসনে যে বিশৃঙ্খলা হয়েছে, তা সামলাবার জন্য দক্ষ প্রশাসকের প্রয়োজন, চিন্তাবিদের দরকার নেই।

মন্ত্রিসভার মধ্যে রজার্স ছাড়া আরও দুজন রয়েছেন নিকসনের একান্ত ঘনিষ্ঠ। এঁরা হলেন অ্যাটর্নী জেনারেল জন মিচেল, এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জনকল্যাণ সচিব রবার্ট ফিনশ। এই তিনজনকে নিয়েই হবে মূল মন্ত্রিসভা।

২১-১২-৬৮

শ্যামেন্দু মৎসুন্দি

প্রিয়তমাসু,

তোমরা সব কেমন আছো, সুসান ?

আমরা তিনজন তো বেশ দিব্যি ফুর্তিতে ছিলাম। সকালের জলখাবারও মহানন্দে খেলাম। কিন্তু তারপর থেকেই কেমন যেন গা-বমি করছে। অ্যান্ডার্সেরও নাকি তাই। তা তুমি যেন বেশি ভেবো না আমার জন্যে। টুকটাক ওষুধ তো আমাদের সঙ্গেই রয়েছে। আবার ঠিক হয়ে যাবো'খন। যে-কাজে আমরা নেমেছি, আমাদের ওপর যে-বিশ্বাস দেশবাসী স্থাপন করেছে, কাজ সমাধা করে তার মর্যাদা রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করবো। তুমি তো আমায় জানো, সুসি, কেমন একরোখা আমি। আমার একগুঁয়েমি দেখে তুমিও তো মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়েছ।

কাজটা যে মোটেই সহজসাধ্য নয়, সে কে না জানে। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব কম করে ২ লাখ ২০ হাজার মাইল। এতটা পথ পাড়ি দেওয়া কি চাট্টিখানি কথা নাকি? কবিরা কল্পনার ডানায় ভর দিয়ে অবশ্য এবেলা ওবেলা পারাপার করেছেন, রূপকথার নায়কেরা পক্ষীরাজের পিঠে চেপে চাঁদের দেশে গিয়েছে, চাঁদ বুড়ির সঙ্গে আলাপ করেছে। কিন্তু কোন রক্তমাংসের মানুষ সত্যি সত্যি কতটা এগোতে পেরেছে? চাঁদ মানুষকে বার বার হাতছানি দিয়ে ডেকেছে ঠিকই কিন্তু সে ডাক শুনেই মানুষ এক গ্লাস জল খেয়ে নিয়ে ... তার কাছে যেতে পেরেছে কি?

এ তো তেপান্তর সাগর পাড়ি দেওয়া নয় সুসান কিম্বা এভারেস্ট শৃঙ্গে ওঠাও নয় যে ... হচ্ছে সেই বোঁচকা বুঁচকিতে খাবার দাবার নিয়ে হুট করে যাত্রা শুরু করব। তাই আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি মহাকাশযাত্রাতেও আমাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হলো সোভিয়েট রাশিয়া। এতদিন মানুষের ধারণা ছিলো আমেরিকা হেরে যাবে সোভিয়েট রাশিয়াই চাঁদে মানুষ পাঠানোর ব্যাপারে এগিয়ে আছে। কিন্তু এবার তুমি তোমার বন্ধু বান্ধবীদের নিশ্চিন্তে বলতে পারো আমেরিকা ওদের দেশকে ছাড়িয়ে অনেক এগিয়ে গিয়েছে।

ওঃ সেদিন তো তুমি এলে না, সুসান। আমরা যেখান থেকে শূন্যে যাত্রা করলাম সেই কেপ কেনেডিতে সেদিন লোকে লোকারণ্য। ফ্রেমের (বোরম্যানের) বৌ মেরিলীনও এসেছিলো। আমার এত খারাপ লাগছিলো তোমার জন্যে, কী বলবো। যাক গে তার জন্যে মন খারাপ করো না তুমি, তোমার অসুবিধে আমি বুঝি, সুসি। যাই হোক, কর্মসূচী মতো ভারতীয় সময় ঠিক ছ'টা একশে আমরা মহাশূন্যে যাত্রা করলাম। সেদিন ফ্রেডারিক আর এড্‌উইনকে যখন আমাদের প্রোগ্রাম বোঝাচ্ছিলাম, তুমিও তো সেখানে ছিলে। বলছিলাম না কী বিরাট দৈত্য বানানো হয়েছে স্যাটার্ন-৫ রকেটটিকে আমাদের অ্যাপোলো ৮ মহাকাশযানটিকে যে ঠেলে ওপরে নিয়ে এসেছে। কত উঁচু জানো রকেটটা? একটা মোটামুটি আকাশ ছোঁয়া ৩৬ তলা বাড়ির সমান। এর শরীরের ওজন হলো তিন হাজার টনেরও বেশি। আর এক একটা ধাক্কা যখন সে দেয় তখন তার শক্তি দাঁড়ায় ৭৫ হাজার পাউন্ডের সমান।

সুসান, মনে আছে নিশ্চয়ই তোমার, সেদিন বলছিলাম আমাদের এ যাত্রাকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম স্তরে স্যাটার্নের প্রচণ্ড ধাক্কায় আমাদের বাহন অ্যাপোলো ৮ এক লাফে ৩৮ মাইল উঁচুতে উঠে গেলো। দুর বোকা মেয়ে, ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে যাবো কেন আমরা টেরই পাই নি কিছু, শুধু মনে হলো খুট করে একটা আলতো অনুভূতি। ঘণ্টায় সেদিন ৬' হাজার মাইল বেগে ছুটে এসেছিলাম। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়। মানে আর একটি ধাক্কা, ব্যস আরো ৮০ মাইল। মানে তোমার কাছ থেকে আমি তখন ১১৮ মাইল দূরে। তারপর তৃতীয় পর্যায়ে শুরু করলাম আমরা চংক্রমণ। ঘুরছি তো কেবল ঘুরছিই। না গো, কেবল আমেরিকার চার পাশেই চক্কর দিচ্ছিলাম না, গোটা পৃথিবীর চারদিকে আমরা ঘণ্টায় ১৭ হাজার ৪ শ' মাইল জোরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আমরা তখন তোমাদের পৃথিবীর কক্ষপথে। বার দুয়েক পাক দিলাম। দেখে নিচ্ছিলাম পরবর্তী পদক্ষেপ নেবার আগে বাহন অ্যাপোলো-৮-এর যন্ত্রপাতি সব ঠিক আছে কি না, পরে আবার তারা বিশ্বাস-ঘাতকতা না করে। নিচের মহাকাশ স্টেশনের ডাইরেক্টর বোজারের (ক্রিস ক্র্যাফট) সঙ্গে হরদম কথা বলছিলাম। বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল ওর কথা, টেলিফোনে তোমার গলাটা যেমন পেতাম। তখনই আমি ওপরের সব অবস্থা বোজারকে জানিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ চাইলাম। এসে গেলো নির্দেশঃ এগিয়ে চলো, সোজা চাঁদে পাড়ি জমাও।

গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। একবার কল্পনা করো সুসান। মনে আছে, আমাদের বাগানে একদিন আমরা চারজনে গল্প করছিলাম। এড্‌উইন তখনো বাচ্চা। আমি ওকে ওপরে ছুঁড়ে দিতে তুমি ভয়ে আঁ আঁ করে উঠেছিলে। আমার ওপর কী রাগই না হচ্ছিলো তোমার সেদিন। কিন্তু আমি অনায়াসে ওপর থেকে লোফা আবার

(বাম থেকে দক্ষিণে) নেতা বোরম্যান, অ্যান্ডার্স ও লোভেল
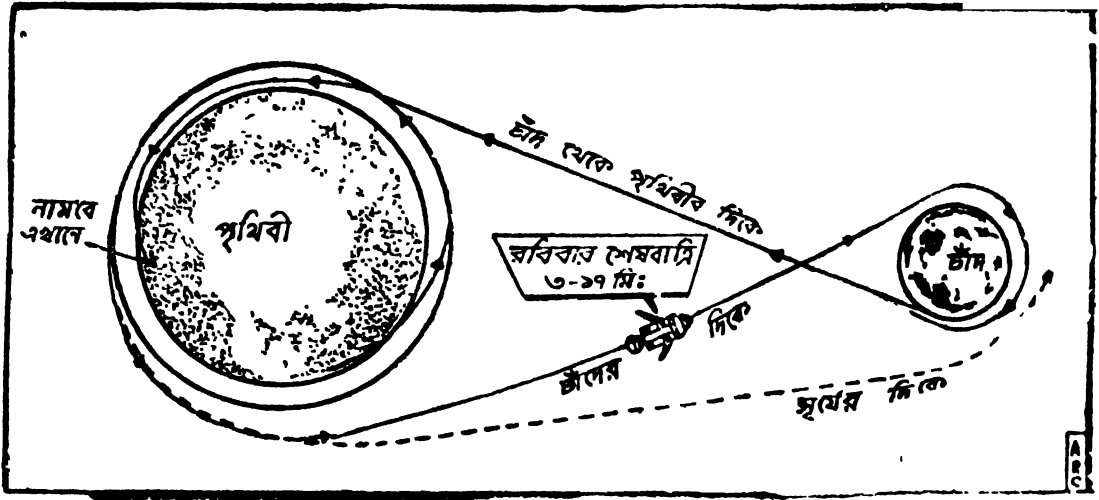
আমার কোলেই নেমে আসবে। জানতে তুমিও। পৃথিবীর তাই নিয়মঃ মাধ্যাকর্ষণ বা অভিকর্ষ। কিন্তু তা জেনেও তোমার আতঙ্কের সীমা ছিলো না, এই বুঝি তোমার ছেলে গেলো শূন্যে উড়ে, থাকবে সেখানে ঝুলে অনন্তকাল ধরে। কিন্তু সুসান, আমরা এখন সেই শূন্যতার মধ্যিখানে ভেসে বেড়াচ্ছি, চাঁদের কক্ষপথে। তোমার প্রতি আমার প্রাণের টান থাকলে কী হবে, সুসি, তোমার এমন কি তোমার পৃথিবীর কোনো টানই আর আমাদের ওপর রইলো না, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ডিঙিয়ে আমরা এখন চাঁদের মায়াজালে পড়ে গিয়েছি। এখন আমরা পৃথিবী থেকে এক লক্ষাধিক মাইল দূরে উঠে গিয়েছি। অবশ্যি ঠ্যালাটা বেশ জোরেই পেতে হয়েছে। ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল বেগে ছুটে তবে এখানে পৌঁছুতে পেরেছি। এ প্রচণ্ড বেগ না দিলে পৃথিবীর চুম্বকশক্তির হাত থেকে যে আমরা রেহাই পেতাম না। এখন টানছে চাঁদ, তারও তো মোহিনীশক্তি, মাধ্যাকর্ষণ রয়েছে। কেন ওর কাছে যাবো না, বলো। এ কথা আমি তোমার মুখে বলি বটে তোমার মুখটা চাঁদপানা, কিন্তু সে তো কেবল সোহাগ করে। আসলে তুমি তুমিই, মানে সুসান বোরম্যান, (আমার এক বাঙালী বন্ধু অবশ্য আমাকে ডাকে 'বর্মণ' বলে, ওদের নাকি এই পদবীর লোক আছে প্রচুর, মায় একজন নামডাকঅলা সুরশিল্পী পর্যন্ত!) আর ও হলো কিনা স্বয়ং চন্দ্রমা। কিসে আর কিসে! ওকি, অভিমানে ঠোঁট ওল্টালে নাকি সুসান। আরে নারে, পাগলী, চাঁদের দেশে নামার কোন প্রোগ্রামই নেই আমাদের। বলেছিলাম না, ভুলে গেলে কী করে তুমি এরই মধ্যে? আমাদের অ্যাপোলোর সংগে সে বিশেষ যন্ত্র 'ল্যুনার মড্যুল' দেওয়াই হয় নি তো নাবো কী করে। হ্যাঁ, আমরা কেবল বার দশেক চাঁদকে ঘিরে নাচবো। ভারতের পৌরাণিক কাহিনীতে নাকি আছে মুনি-ঋষিদের ধ্যান ভাঙার জন্যে রূপসী অপ্সরা-কিন্নরীরা থেই থেই করে নাচতো। আমাদের ঠিক উল্টো। চাঁদ-সুন্দরীর মন পাবার জন্যে আমাদের তিন সোমত্ত মরদকেই নাচতে-কুঁদতে হবে। কী জ্বালা বলো দিকি! আমরা যখন এভাবে চক্কর দেবো তখন সে আমাদের মাত্র ৭৫ মাইল দূরে—তাকে 'ছুঁই ছুঁই' করেও ছুঁতে পারবো না, অথচ সে যে বলবে 'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না বঁধু, ওইখানে থাকো', এমনও নয়, কেবল ওই 'ল্যুনার মড্যুল'র অভাবেই আমাদের মনের ইচ্ছে মনে পুষে বাড়ি ফিরতে হবে। মড্যুলা নিয়ে যাবে অ্যাপোলো-১১, তার আগে আরো দুটো অভিযানের কথা আছে। তোমরা যখন বড়দিনের কেকে কামড় দিচ্ছো, ছেলেরা যখন খৃস্টমাস ট্রি সাজাচ্ছে, সান্টা ক্লজ শানাচ্ছে, তখন আমরা অবিরাম ঘুরছি তো ঘুরছি, না তোমাদের চারপাশে নয়, সম্পূর্ণ অন্য জগতে, চন্দ্রলোকে।

ঝুঁকি, বিপদ? তা তো রয়েছেই, ব্রিটেনের বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার বার্নার্ড লোভেলই বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তো তুমি-আমি কোন ছার, সুসান। তবে পৃথিবীর চারপাশে চক্কর দিতে দিতে আমরা যদি দেখতে পেতাম কোন যন্ত্র বিগড়েছে তখন আমরা সংগে সংগে ফিরে যেতে পারতাম। সে ব্যবস্থা ছিলো। কিন্তু এখন আর সে রাস্তা নেই, সুসান। এখন যখন চাঁদের চারদিকে ঘুরছি, এখন কোন এদিক-ওদিক হলে বাস, আর রক্ষে নেই। না, পপাত ধরণীতলে হবারও কোনো আশা নেই। ঘুরতে ঘুরতে যেদিন অক্সিজেন ফুরিয়ে যাবে, সেদিন দম বন্ধ হয়ে ওই অ্যাপোলো—(আহা, তবু সান্ত্বনা থাকবে এমন একটা মধুর নামের মহাকাশযানের কোলে মাথা রেখে মরবো!) মহাকাশযানেই টুপ্ করে শেষনিশ্বাসটি যাবে। ওকি, তোমার চোখ ছলছল করছে কেন? আরে সত্যি আমরা মরছি নাকি? ইস, মরাটা যেন অতই সস্তা!

আরে বাপু, তুমি এটা কেন বুঝতে পারছো না, সরকার এই অ্যাপোলোর পেছনে ২৩২ কোটি ৫০ লাখ টাকা খরচা করছেন এবং স্যাটার্ন-৫ রকেটের বাবদ সাড়ে ১৮ কোটি ডলার, সে কি অত সহজে নষ্ট হতে দেবেন? টাকা কি খোলামকুচি নাকি? সাধারণ লোক তোমার-আমার টাকা না সেটা?

উঁহু, চোখ মুছে ফেলো, সুসি আমার, কেঁদো না। আমি আবার ফিরে আসছি, আমরা তিনজনেই। তাছাড়া ফেরাটাই তো বড় কথা নয়, আমরা যে অপূর্ব সম্পদ মানুষের দোরে এনে দিলাম তার দাম কে দেবে? অ্যান্ডার্স ইতিমধ্যে যে অজস্র ফটো পাঠিয়েছে, তার ওপর নির্ভর করেই তো ভবিষ্যতে অ্যাপোলো-৯, ১০, ১১কে যেতে হবে। লাভ হবে প্রতিদ্বন্দ্বী সোভিয়েট রাশিয়ারও। কী ভাবছো আবার? এত কৃতিত্ব অর্জন করেও আমাদের মাইনে এক পয়সাও বাড়বে না এই কথা? আমরা কি মাইনে বাড়ানোর জন্যে এ ঝুঁকি নিয়েছিলাম বলে মনে করো নাকি তুমি? আশ্চর্য!

যাক, আগে তো ফিরি। ফিরে কত গল্প বলবো তোমাদের। ওখান থেকে আমাদের পৃথিবী দেখতে কেমন, চাঁদের দেশই বা কেমনতরো। তুমি ভেবো না, সুসান, ২৭-২৮ তারিখে প্রশান্ত মহাসাগরে হাওয়াই দ্বীপের কাছে নামবো আমরা, সেদিন থাকবে তুমি সেখানে? থেকো, কেমন?

ফ্রেডারিক আর এড্রুইনকে আমার স্নেহচুমো দিয়ো। অনেক আদর তোমার জন্যে।

—তোমার আদরের ফ্রাঙ্ক

সীমান্তগান্ধীর স্বপ্ন ও বিষাদ

বীরেন্দ্র মিত্র
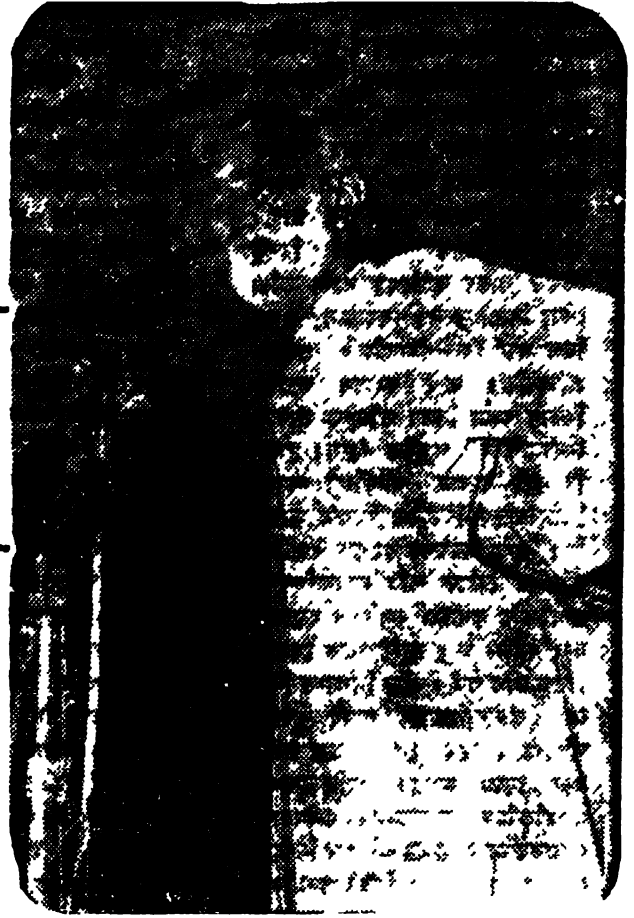
প্রবঞ্চিত সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফফর খান কি আজও স্বপ্ন দেখেন ভারতের অধুনাতন নেতারা তাঁর কাছে প্রদত্ত গান্ধীজীর প্রতিশ্রুতি পালন করবেন আর 'নেকড়ের মুখ থেকে" মুক্ত করবেন তাঁর স্বদেশবাসী পাখতুন ভায়েদের? বছরের পর বছর পাক জেলে কয়েদ থেকেও তাঁর সে স্বপ্ন বোধহয় ভঙ্গ হয় নি। আশ্চর্য, অমন জেদী পুরুষের মধ্যে এমন সরলতা প্রায় অবিশ্বাস্য, তবু সেটাই বাস্তব। সীমান্ত গান্ধী ভারতবাসীকে কাছে পেলে দু'হাতে ধরে যখন শিশুর মতো চোখের জল ফেলেন তখনও সেই অবুঝ সরল শিশুটির ছবিই আমাদের সামনে ফুটে ওঠে যিনি পাক ভারতের স্বাধীনতা উত্তরকালীন নেতৃবৃন্দের দিকে আজও আশা ও ভরসার দৃষ্টি তুলে ধরে কেবলমাত্র প্রবঞ্চিত হতেই ভালোবাসেন। বুঝতে পারেন না, স্বাধীনতাপূর্ব এবং স্বাধীনতা উত্তর ভারতবাসীর অধুনা (দ্বিখণ্ডিত) মন মেজাজে কেমন পরিবর্তন এসেছে। "কোন এক গান্ধীজীর প্রতিশ্রুতি নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় সুযোগ কারও নেই। সংসদের সামনে এখন কেবল গান্ধীর প্রতিকৃতি। গান্ধীজীর যদি কোনও প্রতিকৃতি আজও কারো কারো ড্রইং রুমের শোভা বর্ধন করে তবে সে প্রতিকৃতির আর সেই অমোঘ প্রভাব নেই। তবু সীমান্ত গান্ধী আজও আশা ও আশঙ্কায় দুরু দুরু বক্ষে কোন এক অনাগত শুভদিনের প্রতীক্ষা নিশ্চয় করেন, যেদিন ইচ্ছের বিরুদ্ধে ঠেলে-দেওয়া পাখতুনরা পুনরায় পাকিস্তানের থাবা থেকে মুক্ত হয়ে ভারতের উদার আবহাওয়ায় এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার সুযোগ পাবে। এই বিশ্বাসই সীমান্ত গান্ধীকে দীর্ঘকাল পাক-প্রভুদের কাছে অনমনীয় এবং বিদ্রোহী মনোভাব প্রদর্শন করে যেতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু সে আশা শুধু ছলনা, ভারত তার মর্যাদা রাখে নি। অথচ গান্ধীজী বলেছিলেন যদি লড়াই করেও পাখতুনদের স্বস্থানে প্রতিষ্ঠা দিতে হয় ভারতের তাতে কার্পণ্য করা উচিত নয়। কিন্তু পাখতুনিস্তানের স্বপ্ন সীমান্ত গান্ধীর চোখে ঝাপসা হয়ে আসছে। তথাপি গান্ধীজীর ওপর আস্থা তিনি অটুটই রেখেছেন। ভারতের প্রতি ভালোবাসায় একতোটুকু টাল খায় নি।

গান্ধী শতবার্ষিকী উপলক্ষে কাবুলে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতায় সীমান্ত গান্ধী সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়েছেন গান্ধীজীর নেতৃত্বের প্রতি। অবরুদ্ধকণ্ঠে ক্ষোভ ও অভিমান অবশ্যই ঝরে পড়েছে, কিন্তু পাখতুন নেতার এবং পাখতুনদের ক্ষতির তুলনায় সে আর কতটুকু।

১৯৪৭-এর ভারত বিভাগের সেই বিভীষিকাময়ী দিনগুলি আজও মনে পড়ে প্রায়-নির্বাসিত ভারতবন্ধু সীমান্ত গান্ধীর। তাঁর ভাষায় সেই নিষ্ঠুর ইতিহাস এইভাবে ধরা পড়েছে:

> **১৯৪৭-এ ভারতবর্ষ দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল। আমাদের অঞ্চলে রেফারেন্ডাম গ্রহণ করা হয়েছিল, যদিও ভারত-বিভাগের এক বছর আগে সীমান্ত প্রদেশে সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেছে। আর আমরা মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়লাভও করেছিলাম। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতেই এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ভারতের নেতৃবর্গ পাঞ্জাব এবং বাংলা দেশকে ভাগ করে দিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে রাজ্যের জনগণকে আমলই দেওয়া হল না, রাজ্য এ্যাসেম্বলীর পরামর্শেই ভাগ হল। কেন এমনটা হল? কেন পাঞ্জাব ও বাংলার জনগণকে তাদের মাতৃভূমি ভাগ-বাঁটোয়ারার ব্যাপারে নিজস্ব বক্তব্য রাখতে দেওয়া হল না? আর আমাদের রাজ্য এ্যাসেম্বলীকেই বা অন্যত্র রাজ্য এ্যাসেম্বলীর মতো পছন্দ করার অধিকার দেওয়া হল না কেন? তার কারণ এ্যাসেম্বলীতে আমাদের সংখ্যাধিক্য ছিল, কিন্তু বৃটিশ প্রভু ছিলেন পাখতুনদের প্রতি বিরূপ। আর ভারতের দশ কোটি মুসলমান যখন বৃটিশ প্রভুর সঙ্গে কদম কদম ফেলে চলছিল, আমরাই তখন বৃটিশ-বিরোধী।**
>
> **তথাপি বৃটিশের বিরুদ্ধে আমাদের**

> কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ আমাদের দেশী নেতাদের বিরুদ্ধেই। কেন না তাঁদের সঙ্গে আমরা জেলে গেছি, ঢের অসুবিধা ভোগ করেছি এবং স্বাধীনতার জন্য সমানে লড়াই চালিয়েছি। হলে হবে কি, তাঁরাই আমাদের ত্যাগ করলেন। কিন্তু কেন? কারণ বৃটিশের বক্তব্য তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন। কংগ্রেসের ওপর ছিল লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের প্রভাব-প্রতিপত্তি। তাই কংগ্রেস ভারত-বিভাগ মেনে নিল। সীমান্ত প্রদেশে রেফারেন্ডাম গৃহীত হল। যার বিরোধী ছিলেন গান্ধীজী স্বয়ং। তিনি ভারত-বিভাগও সমর্থন করেন নি। কিন্তু সর্বশেষ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে তাঁর সহযোগিবৃন্দ গান্ধীজীর কথায়ও কর্ণপাত করলেন না। বৃটিশ তার কূটনৈতিক খেলায় জিতে গেল তাই। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, ভারত-বিভাগ হবেই আর সীমান্ত প্রদেশে রেফারেন্ডাম গ্রহণ করা যেতে পারে। আমি তখন গান্ধীজীকে বলেছিলাম, কংগ্রেস দলগতভাবে আমাদের কতিপয় নিষ্ঠুর লোকের হাতে তুলে দিল। গান্ধীজী দুঃখ পেয়েছিলেন এবং আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তিনি ব্যাপারটি বিচার করে দেখবেন।

হায়, সেই বিচারের আর রায় বের হল না। পখতুন পাঞ্জাবী আর বাঙালী চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে বাধ্য হল। একদল নিষ্ঠুর লোকের হাতে নির্যাতন ভোগ করার জন্যই কি তারা স্বাধীনতা-সংগ্রামে সর্বস্ব পণ করেছিল? আজও সীমান্ত গান্ধীর মনে এইসব প্রশ্ন উথাল-পাথাল হচ্ছে। যেমন বিচ্ছিন্ন পাঞ্জাবী ও পূর্ববঙ্গবাসীরা নিঃশব্দে গণতন্ত্রগ্রাসী আয়ুবশাহীর দাপটে দুবেলা শুধু অদৃষ্টে করাঘাত করেন। দেশ বিভাগের পর দীর্ঘ নরক-যাতনার বিভীষিকাময়ী দিনগুলির স্মৃতি-চারণ করতে বসে অসহায়ের মতো কেবল-মাত্র অশ্রুবিসর্জন করেন তাঁরা। আর কী ই বা করণীয় আছে। দেশ ভাগ করে মুষ্টি-মেয় বড়কর্তারা মসনদ পেলেন। আর এঁরা পেলেন স্বপ্নভঙ্গজনিত বেদনার হিমশীতল স্পর্শ। এঁদের স্বাধীনতার স্বপ্ন এইভাবে ধূলি-লুণ্ঠিত হল কিন্তু ভারতের নেতারা তৎপর হয়ে উঠলেন অর্থ ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি হাতানোর অন্ধ প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। জনগণকে এমন কি সীমান্ত গান্ধীকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিও তাঁরা বেমালুম ভুলে বসলেন। সীমান্ত গান্ধী সেই ঐতিহাসিক বিস্মরণের ছবি এঁকেছেন এইভাবে:

> এইভাবেই সৃষ্টি হল পাকিস্তানের। আমার ছেলে গনী এই সময় গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমার বিপন্ন অবস্থা তাঁকে জানিয়েছিল। বলেছিল, পাক সরকার কি-ভাবে আমার প্রতি অবিচার করে চলেছে। শুনে গান্ধীজী বলেছিলেন, যদি বিবৃত ঘটনাবলী সত্য হয় তাহলে তাঁর সরকার সমুচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াইও করবেন (and would fight against Pakistan). তখন আমার ছেলে একটু সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, কেন না সে-ও তো ছিল অহিংসার উপাসক। কিন্তু গান্ধীজী বলেছিলেন, যদিও কংগ্রেস অহিংসায় বিশ্বাসী, সরকার তা নয়, এবং প্রয়োজন হলে সরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়বে বৈকি '(whereas the Congress believed in non-violence, the Government did not, and if necessary, would even fight Pakistan). কংগ্রেসের জন্যই পাকিস্তানে আমাদের যতেক যন্ত্রণা সইতে হচ্ছিল। কংগ্রেসের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার কারণে আজও আমাদের 'হিন্দু' বলে অভি-হিত করা হয় সেখানে। আজ ভারত সরকার বলছেন, তাঁদের হাতে এমন কোনো নথিপত্র নেই যার বলে তাঁরা আমাদের সাহায্যদান করতে পারেন। কিন্তু কোন নৈতিক কর্তব্যও কি নেই যার বলে আমরা সাহায্য পেতে পারি? ভারতের স্বাধীনতার জন্য আমরা কি আত্মত্যাগ করি নি? আমরা ভারত ছাড়ি নি, ভারতই আমাদের ত্যাগ করেছিল।

বৃদ্ধ নীতিনিষ্ঠ নেতার কণ্ঠে এই একই আর্তি বারম্বার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, আমরা বধির, সেই বেদনার্ত আবেদন আমাদের স্পর্শমাত্র করে না। নথি-পত্রের দোহাই যে যুক্তির ধোপে শেষ পর্যন্ত টেঁকে না সীমান্ত গান্ধী সে বিষয়েও যুক্তির অবতারণা করে বলেছেন:

> কোরিয়ার একাংশকে চীন সাহায্য প্রদান করেছিল সেই অংশ আমেরিকা ও অন্যান্য শক্তির বিরোধী। আর আমি? আমিও ভারতকে একাধিক-বার এই দৃষ্টান্ত অনুসরণের আবেদন জানিয়েছিলাম, বলেছিলাম, পাকিস্তানীরা আজও আমাদের ভারতের নামের সঙ্গেই জড়িয়ে রেখেছে।

বস্তুত সীমান্ত গান্ধী এবং তাঁর ভক্তবৃন্দের ভারতবাসী ও কংগ্রেসের প্রতি অটুট স্নেহ এবং বিশ্বাস পাকিস্তানের মনে একাধারে ঈর্ষা ও বিদ্বেষের জন্মদান করেছে। হরেক প্রলোভন এবং সুবিধা সুযোগের টোপ ফেলেও পাখতুনদের তাঁরা ভারত-বিদ্বেষের মন্ত্রে দীক্ষিত করতে সমর্থ হন নি। এবং যতদিন ভারতবর্ষে সীমান্ত গান্ধীর নীতিনিষ্ঠ পবিত্র অস্তিত্ব বর্তমান, ততদিন কোন নির্যাতনই তাঁদের যে নমনীয় করতে পারবে না, তাও প্রায় সুনিশ্চিত। কিন্তু এই মহান ভারতপ্রেমের পুরস্কার শুধুই হতাশা আর বেদনার মধ্যে পরিশোধিত হচ্ছে।

বৃটিশ তার রক্তচক্ষু প্রদর্শন করেও সীমান্ত গান্ধীকে প্রভুভক্ত প্রজায় পরিণত করতে ব্যর্থ হয়ে তাঁর ওপর নির্যাতনের ধারাবাহিক চাপ সৃষ্টি করেছিল। সেদিনও সীমান্ত গান্ধীর একমাত্র অপরাধ ছিল গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের প্রতি অনুরক্তি। পাক-প্রভুরাও সেই গভীর অনুরাগে কোন-মতেই ফাটল সৃষ্টি করতে না পেরে খান আবদুল গফ্ফর খানকে বছরের পর বছর অন্ধকার কারাগারে আবদ্ধ করে রেখে-ছিলেন আর মধ্যে মধ্যে তাঁর মন পরীক্ষা করার জন্য বিচিত্র টোপ ফেলে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

মাত্র গত বছরের কথা। আফগানি-স্তানে তখন পাকিস্তানের কূটনৈতিক প্রতিনিধি জেনারেল ইউসুফ। প্রজাতন্ত্র দিবসে তাঁরই পাশে উপস্থিত ছিলেন সীমান্ত গান্ধী। ইউসুফ সাহেব তখনও শেষ চেষ্টা করেছেন সীমান্ত গান্ধীর আনুগত্য লাভের জন্য। পাকিস্তানে ভ্রাতৃত্ব, মিত্রতা এবং ঐক্য গড়ে তোলায় শরিক হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে-ছিলেন তিনি বৃদ্ধ নেতাকে। উত্তরে সেই দুর্দমনীয় নীতিনিষ্ঠ নেতা বলেছিলেন, পাকিস্তান সর্বদাই মুসলিম ভ্রাতৃত্বের কথা বলে। তারা পাখতুনদের প্রতি ভ্রাতৃত্বের বাহু প্রসারিত করে ধরে না কেন? তাহলে তো আফগানিস্থানের ভ্রাতৃত্বও তারা লাভ করতে পারে। পাকিস্তান নিজেকে মুসলিম রাজ্য বলে অভিহিত করে। আফগান এবং পাখতুনরাও মুসলমান। পাখতুনদের ভ্রাতৃ-ভাবে গণনা করলে, আফগানরাও পাকি-স্তানের সঙ্গে ভ্রাতৃভাব বজায় রাখবে।

পাক প্রেসিডেন্ট গত ১০ই অক্টোবর মর্দানে বক্তৃতাকালে ভ্রাতৃত্বের বাণী উচ্চারণ করেছিলেন কিন্তু একই সময় পাখতুনদের প্রতি দোষারোপ করতেও ভুল করেন নি। সীমান্ত গান্ধীর প্রেসিডেন্ট আয়ুব সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য তাঁর ভাষাতেই উদ্ধার করি:

> তাঁর প্রতি আমার ব্যক্তিগত বিরাগ নেই। তিনি এক সময় আমাকে 'চাচা' বলে সম্বোধন করতেন। একদিন আমাকে বলেছিলেন, কেন্দ্রে সেনা-

বাহিনীর সাহায্যে তিনি একটি শক্ত সরকার গঠন করতে চান। কিন্তু আমি বলেছিলাম, সেনাবাহিনীর দ্বারা সমর্থ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় না, জনগণের সহযোগিতাই সমর্থ সরকার গঠনের একমাত্র সহায়ক।

সুতরাং একনায়কী শাসক আয়ুব খাঁকে উত্তেজিত করার পক্ষে ঐটুকুই যথেষ্ট ছিল। তাঁর 'চাচা'র প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি তারপরেই কর্পূরের মতো উবে গেছে। প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ এরপর পাখতুনদের সম্পর্কে মর্দানে বলেছেন, পাখতুনরা পাকিস্তানের ধ্বংস কামনা করে। আয়ুবের অভিধানে পাখতুনদের নাম হল 'black sheep', কালো ভেড়ার দল।

পাখতুনদের সত্তার প্রতি পাক-রোষ আজকের বলে নয়, আজন্ম কালের। কেন না খোদ মুসলিম লীগ সম্পর্কেই সীমান্ত গান্ধীর ধারণা ছিল বিরূপ। মুসলিম লীগকে তিনি কোনোদিন স্বাধীনতার শরিক বলে গণ্য করতেন না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, মুসলিম লীগ ছিল বৃটিশ প্রভুর পদলেহী একদল জাতীয় আন্দোলন বিরোধী সুযোগসন্ধানীর সংগঠন। সীমান্ত গান্ধী আজও সেকথা সোচ্চারে উচ্চারণ করতে দ্বিধা করেন না। বলেন :

> লীগ আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল না। কেনই বা করবে, তারা ছিল বৃটিশ প্রভুর মিত্রবাহিনী। বৃটিশের ঘাঁটাই লীগের সৃষ্টি। বৃটিশ সরকার জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যই লীগের জন্ম দেন। তাই আমরা যারা বৃটিশ-বিরোধী, লীগ তাদের সাহায্য করবে কি করে?

বস্তুত 'খুদাই খিদমদগারে'র আন্দোলনে (বৃটিশ যখন আফগানিস্থানকে পদানত করার আয়োজন করেছিল, পাখতুনরা তখন বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার জন্য যে সংগঠন গড়েন, ইতিহাসে তারই অমর নাম 'খুদাই খিদমদগার।') মুসলিম লীগ নেতাদের সাহায্য এগিয়ে আসে নি। সাহায্য করতে এগিয়ে গেছলেন গান্ধীজী ও কংগ্রেস। সেই স্মৃতি-বহুল দিনগুলির স্মরণে আজও সীমান্ত গান্ধীর হৃদয় ভারতবর্ষ এবং কংগ্রেসের জন্য আন্দোলিত হয়, কিন্তু বৃথাই। গান্ধীজীর প্রতিশ্রুতি ভারত পালন করে নি। সীমান্ত গান্ধীর সকৃতজ্ঞ ভালবাসার মূল্য দিতে পারে নি আজকের আত্মতৃপ্ত নেতৃত্ব।

প্রকৃত দেশপ্রেমিক সীমান্ত গান্ধী আজও তাই মুক্তকণ্ঠে বলেন :

> **ভারতীয় মুসলিমগণ (প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের), আমরা জানি, এমনই এক বক্তব্যের প্রচারক যার সম্পর্কে তাঁদের নিজেদেরই কোন ধারণা নেই।** শুধু অন্ধ উন্মাদনার বশেই তাঁরা প্রচারে নেমেছিলেন। বৃটিশ তাঁদের সর্বক্ষণ বুঝিয়েছে, যদি কংগ্রেস ও স্বাধীনতা যোদ্ধাদের হাতে ক্ষমতা চলে যায় তবে কি মুসলিম লীগ কি বৃটিশ কারও নিরাপত্তাই বজায় থাকবে না। তাই মুসলিম লীগের উচিত একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি তোলা। সেক্ষেত্রে সে রাষ্ট্র উভয়ের পক্ষেই সুবিধাপ্রদ হবে। এই বৃটিশ মানসকন্যা পাকিস্তানকে আমরা মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারি নি। কারণ আমরা ছিলাম বৃটিশ-বিরোধী। . তাই যখন পাকিস্তান সৃষ্টি হল, আমরা বলেছিলাম, এ রাষ্ট্র ভারতীয় মুসলমানদের জন্য নয়, বৃটিশ এবং তার ক্রীতদাসদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে (it was created by the British for themselves and their slaves).

খান আবদুল গফ্‌ফর খান সাহেব কালাপাহাড় নন। তিনিও মুসলিম। তাঁর অপরাধ তাঁর প্রগাঢ় নীতিনিষ্ঠা এবং ঐকান্তিক দেশপ্রেম। কোন ভৌগোলিক সীমায় চিহ্নিত ভারতের জন্য তাঁর চোখে কোনো মোহাঞ্জন নেই, সীমান্ত গান্ধীর সমস্ত দুঃখ আপত্তি এবং বিদ্রোহ বিশ্বাস-হননকারী নেতৃত্বের প্রতি, যে নেতৃত্ব মানুষের সংস্কারকে ক্যাপিটাল করে ভারতবর্ষকে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়েছিল শুধু ক্ষমতালোভী শকুন মনোবৃত্তির জন্য। তারাই সীমান্ত গান্ধীর বক্তব্যের বদর্থ করেছেন। পাখতুনদের সত্তার প্রতি সাধারণের চোখ ফিরিয়ে ধরার জন্য পাখতুনদের গায়ে কুচক্রীরা 'হিন্দু' নাম লিখে দিয়েছে। যেমনভাবে ফ্যাসিস্টরা দিত ইহুদের গায়ে পোড়া মাংসের ছাপ এঁকে। কিন্তু গফ্‌ফর খানের বক্তৃতাবলী আজও পাক পার্লামেণ্টের বিবরণী ঘাঁটলে উদ্ধার করা যাবে যে পার্লামেণ্টে দাঁড়িয়ে পাখতুন নেতা একদা বলেছিলেন :

> পাকিস্তান আমাদের দেশ। আমরা এদেশের উন্নতির জন্য সর্বদাই সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। আমাদের বিন্দু বিন্দু রক্তের মূল্যে পাকিস্তানের স্বপ্ন সম্ভব হয়েছে। সেই পাকিস্তানকে নষ্ট করার কল্পনা কেমন করে আমরা করতে পারি?

বস্তুত কোন ভৌগোলিক সীমানাই সীমান্ত গান্ধীর কামনার ধন নয়। **আজকের গুছিয়ে-নেওয়ার যুগে এই বৃদ্ধ নেতা শুধু এক টুকরো শোষণমুক্ত ভূমি চান যেখানে সত্যকার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের স্বাদ পাওয়া যায়।** পাকিস্তান সেই সাধ পূরণে অক্ষম। তাছাড়া পাক-নেতাদের ক্ষমতালোভী চরিত্রে স্খলিত-বিশ্বাস সীমান্ত গান্ধীর তীব্র ভর্ৎসনা এবং সমালোচনা তাঁদের রুষ্ট করে তুলেছে। পাক প্রচারে সীমান্ত গান্ধী তাই হিন্দু কাফের ছাড়া অন্য কিছু নন। এই বুজরুকী এবং অবিচারের নাগপাশ থেকে সীমান্ত গান্ধী মুক্তি চেয়েছিলেন। সাহায্যের জন্য ভারতের দিকে সকাতরে বহুবার আবেদন-নিবেদন রেখেছেন। স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন গান্ধীজী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি। কিন্তু তাঁর জীবন-সায়াহ্নেও সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের কোন লক্ষণই ভারত দেখাতে পারে নি। তবুও বৃদ্ধ নেতার আশা মরীচিকার মতো তাঁকে কোন এক শুভলগ্নের অপেক্ষায় উজ্জীবিত করে রেখেছে, এ বড় বিচিত্র বিস্ময়।

যে ভারতবর্ষ ভারতের জমি জায়গাই পাক আবদারে পাকিস্তানের কাছে গচ্ছিত করে দিতেই উৎসুক, সীমান্ত গান্ধী সেই ভারতীয় নেতৃত্বেরই ডাকার শোনার জন্য আজও উৎকর্ণ। এই প্রগাঢ় বিশ্বাসমূলক প্রতীক্ষার বস্তুত কোনো ব্যাখ্যা নেই।

পাঞ্জাব ও বাংলার লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল অসহায় মানুষের জন্য যে ভারতবর্ষ সামান্য জমি আদায় করতেও অক্ষম, বরং পাক হুমকীতে প্রভূত অন্যায় দাবি মেনে নিয়ে আপোষে টিকে থাকাই যাঁদের লক্ষ্য, সীমান্ত গান্ধী আজও তাঁদের মুখে কোন সান্ত্বনার বাণী শুনতে চান, বুদ্ধিতে বস্তুতই তার ব্যাখ্যা হয় না।

সীমান্ত গান্ধীর বেদনাকে আমরা বুঝি। বাংলা দেশের মানুষ, স্বাধীনতার শিকার। কিন্তু আর কে তাঁর অন্তরের নিদারুণ ব্যথাকে উপলব্ধি করবেন।

নির্বাচনী কমিশনার শ্রীসেনবর্মা গত সপ্তাহে কলকাতায় এসে রাইটার্স বিল্ডিং-সের রোটান্ডা হলে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে রাজ্যের নির্বাচনীপর্ব শান্তিপূর্ণ-ভাবে অনুষ্ঠানের জন্য সব দলনেতাদের সংগে একমত হয়ে একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করে গেছেন এবং সকল দলই ভাল ছেলের মত সেই আচরণবিধি মেনে চলবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সপ্তাহকাল পূর্বে 'সপ্তাহের বোঝা'তে এই রকমই একটি আচরণবিধির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনী কমিশনারের বাতলানো দাওয়াই রাজ্যের নির্বাচনীপর্ব শান্তিপূর্ণভাবে সমাধার সত্যকারের সহায়ক হবে কি না এ প্রশ্ন তোলার প্রয়োজন নেই। আমি যে কথাটা বলতে চাই, সেটা হল শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচনে অংশগ্রহণ-কারী দলনেতাদের গ্রহণ করতে হবে। শুধুমাত্র মুখের কথা অথবা কাগজ-কলমে এই শান্তিচুক্তি রচনা করলে চলবে না। শান্তিচুক্তির ভিত্তিটা হবে পরস্পরের প্রতি সহনশীলতার ভিত্তিতে—যেখানে একের প্রচারে অন্যে হস্তক্ষেপ করবেন না। একের প্রতি অন্যে দোষারোপ করে সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করবেন না। অর্থাৎ সকলেই একটি সর্ত মেনে নেবেন যে—আমরা কোনপ্রকার শান্তি বিঘ্নিত হতে দেব না। শান্তি বিঘ্নিত হয় এমন কোন কাজের প্রশ্রয় দেব না। এই কাজ করানো শ্রীসেনবর্মার পক্ষে সম্ভব নয়। এই কাজ করতে পারেন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলি নিজেদের মধ্যে উদ্যোগ নিয়ে। আমি সেই উদ্যোগের ওপরেই গুরুত্ব দিতে চাই। ওপর থেকে চাপানো সিদ্ধান্ত রাজ্যের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে কতটা শান্তিবারি সিঞ্চিত করতে পারবে অথবা সেই শান্তবারিতে কতটা উত্তেজনার আগুন নির্বাপিত হবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। শ্রীসেনবর্মার সামনে পাঠ-শালার পড়ুয়ার মত দলনেতারা বসলেন আর সমবেতভাবে প্রার্থনা সংগীতের ঢঙে অথবা নামতাপড়ার মত পড়লেন—তার পর কতটা কাজ হবে বলা শক্ত। 'প্রভাতে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি/সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি।'—গুরুমহা-শয়ের সামনে এই আপ্তবাক্য উচ্চারণ এক কথা আর ইস্কুলের সীমানার বাইরে এসেই অপরের বাগানের পেয়ারা চুরি অথবা ডাংগুলির ডাণ্ডা দিয়ে বন্ধুর মাথা ফাটানো অন্য কথা।

মূল কথা হল পরিবেশ সৃষ্টি। আর এই পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন দল-নেতারা, সরকারী আমলারা নয়। আজ যদি কোন একটি সভায় শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতি বসু প্রমুখ নেতারা মুখোমুখি বসে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতেন যে, আমরা নির্বাচনী প্রচারে কর্মীদের সর্বপ্রকার হিংসাত্মক পথ অবলম্বন প্রতিরোধ করব, কোনপ্রকার উত্তেজনা সৃষ্টির পথ পরিত্যাগ করব, ধর্ম-জাতি-প্রাদেশিকতা প্রভৃতি বিষয়গুলিকে কোনক্রমেই নির্বাচনী প্রচারের চৌহদ্দির মধ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না, ভোটারদের টাকা দিয়ে বা ভীতিপ্রদর্শন করে দলে টানার চেষ্টা পরম গর্হিত কাজ বলে গণ্য করা হবে, সভার নীতির সমালোচনা ছাড়া কোন-প্রকার ব্যক্তিগত আক্রমণ ও কুৎসা প্রচারের চেষ্টা করা হবে না, কোন দল কোনক্রমেই অন্য দলের সভা ভাঙবার বা প্রচারকার্যে বাধা দেবার চেষ্টা করবে না, কোন পক্ষেই একের প্রচারকে অন্যের প্রচারের দ্বারা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে না—তবে তার দ্বারা যে কাজ হত সেই কাজ কখনই শ্রীসেনবর্মার দাওয়াইয়ে হতে পারে না। আজ যদি সর্বস্তরের কর্মী ও সমর্থকরা বুঝতো যে, তার দলের নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীঅজয় মুখার্জী, শ্রীজ্যোতি বসু যে প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেছেন, সেই প্রতিজ্ঞাপত্রের মর্যাদা রক্ষা করা কর্মীর একান্ত কর্তব্য এবং কর্মীদের আচরণেই নেতৃবৃন্দের মর্যাদা রক্ষা হবে, তবে পরিবেশের পরিবর্তন হত। রাজ্যে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সম্পর্ক দীর্ঘ-

এসে পৌঁছেছে—যেখানে পাঠশালার পড়ুয়ার মত শান্তিবাণী উচ্চারণে শান্তি স্থাপিত হবে না। আজ এই যে বিরোধ, এ শুধু আদর্শের নয়। আদর্শের বিরোধ যদি বলা যায়, তবে কম্যুনিস্টদের সংগে কংগ্রেসের যে বিরোধ, কম্যুনিস্টদের সংগে বাংলা কংগ্রেসের একই বিরোধ। আর তাছাড়া এমন বহু দল রয়েছে যাদের বিরোধ সাদা চোখে ধরা একান্তই অসম্ভব। যেমন লোকদল, জাতীয়দল, আই এন ডি এফ, বাংলা কংগ্রেস, ক্রান্তি-দল, পশ্চিমবঙ্গ কৃষক সমাজ, রিপাবলিকান পার্টি—এই দলগুলির পরস্পরের আদর্শের ফারাক বিচার করে বের করা প্রায় অসাধ্য। একইভাবে এস এস পি, পি এস পি দলের আদর্শের ফারাক খুঁজে বের করা দেবতারও অসাধ্য। ফরওয়ার্ড ব্লক ও বলশেভিক পার্টির মধ্যে আদর্শের ফারাক কোথায় এবং কতটুকু সেটা খুঁজে বের করা রীতিমত গবেষণার বস্তু। সর্বো-পরি দুই কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে অথবা আর এস পি, এস ইউ সি, আর সি পি আই, ওয়ার্কার্স পার্টির মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শের ফারাক এই দলনেতারা হয়তো খুবই বোঝেন অথবা অন্যকেও বোঝাতে পারেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের বোঝা নিতান্তই দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই সাধারণ মানুষকে যখন একদল আর একদলের মধ্যে যুক্তির দ্বারা নিজের দলের উচ্চ আদর্শের কথা বোঝাতে ব্যর্থ হন, তখন শুরু হয় গায়ের জোরে বোঝাবার চেষ্টা। এই গায়ের জোরে বোঝাবার চেষ্টাই নানা দলে সংঘর্ষের রূপ নেয়। রোগ নিবারণ করতে হলে রোগ ও রোগীর সব কথা জানা চাই। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক যুদ্ধে শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রেও এই এক কথাই প্রযোজ্য। এই সমস্যার মোকাবিলার জন্যই প্রয়োজন দলনেতাদের উদ্যোগ এবং সেই উদ্যোগ আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্য সেই আন্তরিক-তার বড় অভাব সর্বক্ষেত্রে। যেমন কল-কাতার কোন একটি দেওয়াল জুড়ে বড় বড় করে একজন প্রার্থীর স্বপক্ষে লেখা হয়েছে, কিন্তু রাতারাতি অপর এক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রায় ঐ দেওয়াল-লিপি লেখার সমান পরিশ্রম করে উক্ত প্রার্থীর নামের আগে একটি কুৎসামূলক বিশেষণ জুড়ে দিয়েছেন। প্রার্থী যেমন লিখছেন—"ডাঃ গণিকে ভোট দিন" আর প্রতিদ্বন্দ্বী সেই লেখার আগে লিখে দিয়েছেন—"দালাল ডাঃ গণিকে ভোট দিন", কোথাও আরো অন্য বিশেষণ আছে। প্রশ্ন হল ডাঃ গণির প্রতিদ্বন্দ্বী যখন দেওয়াল জুড়ে কালি ও পয়সা খরচ করে লিখলেন, তো নিজের নামই লিখতে পারতেন, কিন্তু সেই কষ্ট

না করে তিনি তাঁর সব পরিশ্রম ব্যয় করলেন অন্য প্রার্থীর নামের আগে বিশেষণ লিখতে। এই যে মনোভাব, এই যে জঘন্য বা, এর মূলে উৎপাটন দরকার। অনুরূপ আর একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। রাজ্যের ছোট দলগুলি এবার প্রতীক নির্বাচন নিয়ে খুবই বিপাকে পড়েছেন। ছোট দলগুলিকে নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক ঘোষিত ফ্রি সিম্বলগুলি ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু সেই ক্ষেত্রে এই প্রতীক ও দলের সংখ্যা প্রায় সমান, কাজেই দুই দল একটি প্রতীক চাইলে বিপদ। এই বিপদের কথা ভেবে লোকদলের পক্ষ থেকে একটি সভা আহ্বান করা হল ছোট দলগুলি যাতে নিজেরা বসে প্রতীক সম্পর্কে মীমাংসা করে নিতে পারেন। কিন্তু সভার দিন দেখা গেল যে দুই দল সাইকেলকে নিজেদের নির্বাচনী প্রতীক হিসাবে চেয়েছেন, আর একটি দলই সভায় আসেন নি। ফলে প্রতীকের বিরোধ, যেটা নিজেদের মধ্যে মীমাংসার চেষ্টা হয়েছিল সেটা বন্ধ হয়ে গেল।

রাজ্যের রাজনৈতিক শত্রুতার অন্যতম মূল কারণ হল ভ্রাতৃবৈরিতা। অর্থাৎ একদল ভেঙে যাঁরা দুই দল হয়েছেন, বিরোধ তাঁদের মধ্যেই বেশি। যেমন কংগ্রেসের সঙ্গে বিরোধ বেশি বাংলা কংগ্রেসের—মার্ক্সবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির প্রধান শত্রু নকশালপন্থীরা—বাংলা কংগ্রেসের প্রধান শত্রু লোকদল ও জাতীয় দল—লোকদলের প্রধান শত্রু আই এন ডি এফ। এই সব বড় দল বাদ দিলে অন্য আরো অনেকে আছে যারা নিজেদের মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধি করে রাজ্য রাজনীতিতে কর্দম সৃষ্টি করছে। পশ্চিম বাংলায় একটা মুসলিম লীগ সৃষ্টি হয়েছে—যদিও নামের আগে একটা প্রগতিশীল কথা আছে কিন্তু সেই দলও এর মধ্যে ভেঙে দু টুকরো হয়েছে। এক দল পাকিস্তানের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন পতাকা গ্রামে গ্রামে উড়িয়ে মুসলিম স্বার্থের কথা বলছেন, আর দল-ভাঙা আর এক দল তাঁদের ওপর দিয়ে আর এক কাঠি প্রচার চালাচ্ছেন। পশ্চিম বাংলায়—'জাগো বাঙালী' নামে বাঙালীর স্বার্থ রক্ষার জাগ্রত প্রহরী বলে পরিচয় দিয়ে একটি দল বহুদিন থেকে দেওয়াল নষ্ট করে আসছেন। এই জাগো বাঙালী সংসদ সম্প্রতি বাঙালী দল বলে একটা দল গঠন করেছেন কিন্তু এই দল গঠনের সঙ্গে এই দল ভেঙে আরো তিনটি দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। বাঙালী দলের লক্ষ্য হল, পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তন করে রাজ্যের নাম "বাংলা" করা কিন্তু অপর দল যারা উঠেছেন—তাঁদের লক্ষ্য হল "বাংলাস্থান" গঠন করা। এই দল আমরা বাঙালী সংগঠনের নামে ইতিমধ্যে অনেকগুলি কেন্দ্রে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এই দলটি আবার শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, সদ্যগঠিত সারা ভারতের একটি সংগঠনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছে—দলের নেতা হলেন সদ্য কংগ্রেসত্যাগী জনৈক এম পি। কথায় বলে এক রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব সহায়। পশ্চিমবঙ্গে একে রাজনৈতিক দলের সীমা নেই, তার মধ্যে আবার মাথাচাড়া দিচ্ছে এই সব দল—যাদের পিছনে প্রাদেশিক ধর্মীয় ও নানা সংকীর্ণ স্বার্থের টান রয়েছে। বড় দলগুলি যদি নির্বাচনে শান্তি রক্ষা করার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হন তবে এই মাথাচাড়া দেওয়া শক্তিগুলি রাজ্যকে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। এই বিপদের দিকটা রাজনৈতিক দলগুলি যদি নিজেদের উদ্যোগে লক্ষ্য না করেন, তবে হয়তো দেখা যাবে উচ্চ লক্ষ্য ও আদর্শের নির্বাচনী যুদ্ধ বিপথগামী হয়ে তাদের অনেকের ঘাড় মটকাবে ও রক্ত খাবে।

(২১-১২-৬৮)
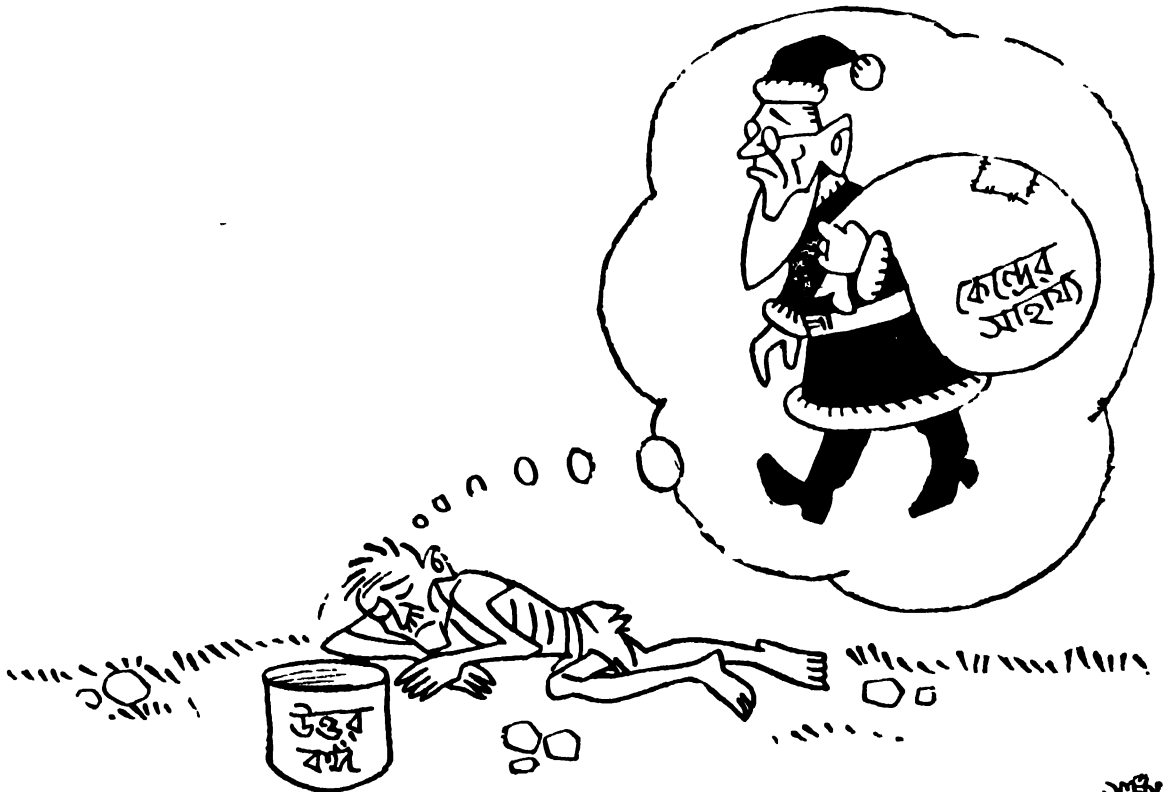
ডাঃ প্রবীর সেন অনেককালের ডাক্তার। মাঝামাঝি ধরণের তাঁর প্র্যাকটিস। তাঁর বাঁধা কয়েকটি পুরনো পরিবারের অসুখে-বিসুখে প্রথমে তাঁরই ডাক পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর ওষুধেই জ্বর-জ্বালা সেরে যায়। যখন সারে না, রোগ যখন ঘোরালো হয়ে ওঠে তখন তিনিই রোগীর আত্মীয়-স্বজনকে পরামর্শ দেন বত্রিশ বা চৌষট্টি টাকা ফি-ওলা স্পেশ্যালিস্টকে ডাকতে। কিন্তু সেরকম ঘটনা সচরাচর ঘটে না। তাঁর ওষুধেই কাজ হয়।

কলকাতায় ডিসেম্বরের রাত তখন প্রায় ৯টা। বেশ জমিয়ে ঠান্ডা পড়েছে। তার সঙ্গে হালকা কুয়াশা। খুব বেশি দূর নজর চলে না। পথের আলোর বাল্‌ব্‌ ঘিরে গোল-গোল চাকা—দেব-দেবীর ছবিতে তাঁদের মাথার চারপাশে গোলাকার জ্যোতি যেরকম আঁকা হয়ে থাকে অনেকটা সেরকম দেখাচ্ছে। পথে লোকজন বিশেষ নেই। গাড়ি-ঘোড়াও খুব কম।

ডাঃ প্রবীর সেন সেকেলে মানুষ। সুট পরেন না। পায়ে গরম মোজার ওপর ফিতে বাঁধা জুতো। পরণে ধুতি। গায়ে গরম পাঞ্জাবীর ওপর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা গলাবন্ধ কালো গরম কোট। কাঁধে গরম চাদর। মাথা ও থুতনি ঘিরে রয়েছে গরম একটা কমফর্টার। হাতে কালো ব্যাগ।

ঠান্ডাকে চিরকালই তাঁর ভয়।

এই বেশভূষায় লোকের চোখে তাঁকে কী রকম যে দেখায় সেটা নিয়ে কখনো তিনি মাথা ঘামান না। শীতের মধ্যে শরীরটা আরামে আর গরমে থাকলেই তিনি খুশি। তাঁর বেশভূষা দেখে লোকে মনে-মনে যদি হাসে তো হাসুক গে—তাঁর বয়ে গেছে।

ল্যান্সডাউন রোডে বহুকালকার পরিচিত এক বাড়িতে তিনি রোগী দেখতে এসেছিলেন রাত ৮টায়। উঠেছেন ৯টায়। এ বাড়িতে প্রথম কবে এসেছিলেন মনে-মনে হিসেব করতে তিনি চেষ্টা করলেন। ত্রিশ বছর আগে? তা হবে। তখন তিনি ভিজিট পেতেন দু' টাকা—এখন তাঁরা নিজে থেকেই বাড়িয়ে আট টাকা করেছেন। তিনি কিছু বলেন নি।

ল্যান্সডাউন রোডে অন্ধকার সরু গলিটা যেখানে পড়েছে সেখানে একটা ল্যাম্পপোস্ট। সেটার গায়ে আঁটা চৌকো বাস স্টপের প্লেট। সেই বাস স্টপের কাছে এসে তিনি দাঁড়ালেন। বাস পেলে হাজরায় নেমে তেত্রিশ নম্বর ধরে তিনি ট্রাম রাস্তায় পৌঁছবেন। তারপর ট্রামে গিয়ে টালিগঞ্জে নিজের বাড়িতে পৌঁছনো সহজেই যাবে। ট্রামের মাসিক টিকিট তার পকেটে। মিনিট দশেকের মধ্যে বাস পেলে একটা রিক্সা ধরে এলগিন রোড দিয়ে তিনি ট্রাম রাস্তায় পড়বেন। তারপর ট্রামে টালিগঞ্জ। আসল কথা ট্রাম রাস্তায় কোনোরকমে পৌঁছনো। বাসে গেলে দু'-চার আনার সাশ্রয় হয়। অনর্থক বেশি ওষুধ দেবার তিনি যেমন পক্ষপাতী নন অনর্থক বেশি পয়সা খরচ করতেও তেমনি তাঁর মন সায় দেয় না।

অনর্থক বেশি ওষুধ দেবার কথাটা ভেবে এইমাত্র ল্যান্সডাউন রোডের গাঙ্গুলীমশাইয়ের যে-বাড়ি থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন সেখানকার কথা তাঁর মনে হলো। মনে হতেই তাঁর ঠোঁটে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো। কিন্তু গরম কমফর্টারের প্যাঁচ ভেদ করে বাইরে সেই হাসি প্রকাশ পেলো না।

বরাবর যেমন হয় আজ সন্ধ্যেতেও গাঙ্গুলীমশাইদের বাড়িতে তাই হয়েছে। তাঁদের নাতির জ্বর। অবশ্য জ্বরটা একটু বেশিই। বুকে-পিঠেও সামান্য সর্দি বসেছে। ছেলেটার জন্মাবধি শীতকালে এই সর্দি-জ্বরের ধাতের কথা তিনি ভালো করেই জানেন। আরো জানেন নাতির অসুখ করলে গাঙ্গুলী-মশাই, গাঙ্গুলীগিন্নী থেকে বাড়ির সবাই কী রকম ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

রোগীর বিছানার পাশে চেয়ারে বসতেই বাড়ির সবাই ভিড় করে এলো। গাঙ্গুলীগিন্নী নাতির শিয়রে বসে তার মাথায় ওডিকোলন-মেশানো জলপটি লাগিয়ে তালপাখা দিয়ে বাতাস করছিলেন। শুকনো মুখে তিনি বলছিলেন, "ডাক্তারবাবু, জ্বর তো কমলো না।"

গাঙ্গুলীমশাই-এর ছেলে বলেছিলো, "পেনিসিলিন কি টেরামাইসিন ইনজেকশান দিলে হয় না?"

ডাঃ প্রবীর সেন কোনো উত্তর দেন নি। মাথা ও থুতনিতে জড়ানো কমফর্টার খুলে পকেট থেকে গোল ঘড়িটা বার করে রোগীর নাড়ী ভালো করে দেখেছিলেন, থার্মোমিটার লাগিয়ে জ্বর দেখেছিলেন, স্টেথিস্কোপ দিয়ে ভালো করে বুক-পিঠ পরীক্ষা করেছিলেন। তারপর মন্তব্য করেছিলেন, "হুঁ! জ্বরটা একটু বেশিই। বুকে-পিঠেও কিছুটা সর্দি বসেছে। আপনাদের নাতির এই জ্বর-সর্দি তো ঘরের লোক। পেনিসিলিন-টেরামাইসিনের দরকার নেই। তিন ঘন্টা ছাড়া-ছাড়া মিক্সচারটা যে-রকম চলছে সে-রকমই চলুক। তবে বুকে-পিঠে এ্যান্টিফ্লজেস্টিন আজ রাতে লাগিয়ে দিন।—ভাবনার কিছু নেই। কাল-পরশুর মধ্যে জ্বর ছেড়ে যাবে।"

তারপর গাঙ্গুলীমশাই-এর পুত্রবধূ যে চা তৈরি করে এনেছিলো সেই চা পান করেছিলেন, গাঙ্গুলীগিন্নীর ডিবে থেকে গোটাচারেক পান মুখে ভরেছিলেন, গাঙ্গুলীমশাই-এর সঙ্গে হিন্দুমহাসভা, কংগ্রেস, কর্পোরেশন

ইলেকশান ইত্যাদি রাজনীতির নানা সমস্যার কথা আলোচনা করেছিলেন। তারপর সেখানে ঘণ্টাখানেক কাটিয়ে, গাঙ্গুলীমশাই-এর নাতির পিঠে আস্তে কয়েকটা চাপড় দিয়ে, গাঙ্গুলীমশাইকে অভয় দিয়ে, মাথায় ও থুতনিতে সেই গরম কম্ফর্টারটা জড়িয়ে কালো ডাক্তারি ব্যাগটা নিয়ে ধীরে-সুস্থে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ল্যান্সডাউন রোডের সেই অন্ধকার গলির সামনেকার ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে আটকানো বাস স্টপের প্লেটের নিচে। তাড়াহুড়ো করা একেবারেই তিনি পছন্দ করেন না।

সেই গোল ঘড়িটা পকেট থেকে বার করে ডাঃ প্রবীর সেন দেখলেন প্রায় আট মিনিট ধরে তিনি অপেক্ষা করছেন। কিন্তু বাসের কোনো আভাস নেই। আর দু' মিনিট অপেক্ষা করে একটা রিক্সা নেবেন বলে মনে-মনে যখন তিনি স্থির করেছেন এমন সময় একটা দারুণ কাণ্ড ঘটে গেলো।

সেই অন্ধকার গলিটা থেকে আচমকা ঝড়ের মতন দৌড়ে এক ছোকরা বেরিয়ে এলো। পরণে চোঙা প্যান্ট। এই শীতেও তার গায়ে শুধু একটা টেরিলিনের নীল শার্ট। গলোর একটা রেজা। চুল উস্কোখুস্কো গলার স্বর খসখসে, চাপা, উত্তেজিত।

ডাঃ প্রবীর সেনের সামনে যাতায়াত করতে করতে হাঁফাতে হাঁফাতে সে বলে চললো, "উঃ, কী পালানই পালিয়েছি. ...কিন্তু মালতীদির কী হবে ? তাকে খুন করে ফেলবে ? লোপাট করে দেবে ? . সিনেমার ডিরেক্টর না ছাই!...পাকা একটা রাস্কেল! যত মাতালের আড্ডা!.. দুশ টাকা দেবে বলেছিলো। ..টাকা চাইতেই কী একখানা থাপ্পড়...

...আজ পাঁচ পয়সা

উঁর বাসরে......মালতীদিকে চলে আসতে বললে......উঃ কী মার, কী মার... ..এই দেখুন স্যার, জামা ছিঁড়ে গেছে. .. .এই দেখুন স্যার, কপাল থেঁতলে গেছে..... এই দেখুন স্যার, রক্ত পড়ছে . .উঃ, কী টবচারটাই না করছে .শালাদের জ্যান্ত পোড়াবো......রিফিউজি বলে কী অমানুষ নই ? .... ভদ্দরলোকদের মেয়েছেলে নিয়ে এই ব্যবসা জন্মের মতো ঘোচাবো . এক্ষুণি লালবাজার থেকে পুলিশ আনছি . কিন্তু তার আগেই না সটকায় .. "

তারপর ডাঃ প্রবীর সেনের সামনে হঠাৎ থেমে গিয়ে আরো হাঁফাতে-হাঁফাতে বললো, পাঁচটা টাকা দিন স্যর ... সময় নেই. ... আমার কাছে টাকাও নেই.. ...এক্ষুণি ট্যাক্সি করে লালবাজারে ছুটতে হবে . কুত্তার দল এসে পড়লো বলে. ... পাঁচটা টাকা. . লাইফ এ্যান্ড ডেথ নির্ভর করছে.. . '

ডাঃ প্রবীর সেন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। তিনি নির্বিরোধী মানুষ। তাড়াহুড়ো তিনি যেমন পছন্দ করেন না, দাঙ্গা-হাঙ্গামাকেও সে-রকমই ভয় পান। হ্যাঁ. তিনি একটু ভীতু গোছেরই মানুষ। ছোকরাকে দেখতে-দেখতে, তার কথা শুনতে-শুনতে তাঁর বুক দুরদুর করে উঠলো। মুখ শুকিয়ে গেলো। গাঙ্গুলীমশাই-এর বাড়িতে যে আট টাকা ভিজিট পেয়েছিলেন সেটা তাঁর পকেটে ছিলো। সেটা বার করে পাঁচ টাকার নোটটা ছোকরাকে দিলেন।

"বাঁচালেন ...থ্যাঙ্কস্' বলতে বলতে ঊর্দ্ধশ্বাসে সে এলগিন রোডের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে ছুটলো। আর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় খালি সাতচল্লিশ নম্বর একটা বাস এসে স্টপে দাঁড়ালো। কোনো দিকে না চেয়ে তিনি উঠে পড়লেন।

কলকাতায় শীতটা যাই-যাই করেও যাচ্ছে না। বাতাস বন্ধ। ধোঁয়া আর কুয়াশা শহরের ওপর যেন চাপ হয়ে বসেছে। চোখ জ্বালা করে। বালিগঞ্জ প্লেসের মিত্তিরবাড়ি ও ডাঃ প্রবীর সেনের পুরনো ঘর। মিত্তিরমশাই-এর বয়েস হচ্ছে। হাঁফানীতে প্রায়ই ভোগেন. প্রেসারও মাঝে মাঝে গোলমাল পাকায়।

মিত্তিরমশাইকে দেখে, হাঁফানী, প্রেসার ও ঘুমের বড়ির প্রেসক্রিপশান করে তাঁর মেয়ের তৈরি চা ও মিত্তিরগিন্নীর ডিবে থেকে পান নিয়ে চিবোতে-চিবোতে মাথায় কমফর্টার ও হাতে কালো ব্যাগ নিয়ে তিনি যখন জনবিরল রাস্তায় নামলেন তখন রাত পৌনে দশটা। মিনিট সাতেক হাঁটলে তবেই রুড স্ট্রীটের তেত্রিশ নম্বর বাস স্টপ। সেখান থেকে হাজরা মোড়। তারপর টালিগঞ্জের ট্রাম।

ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে ডাঃ প্রবীর সেনের মনে হোলো আরো মিনিট পনের
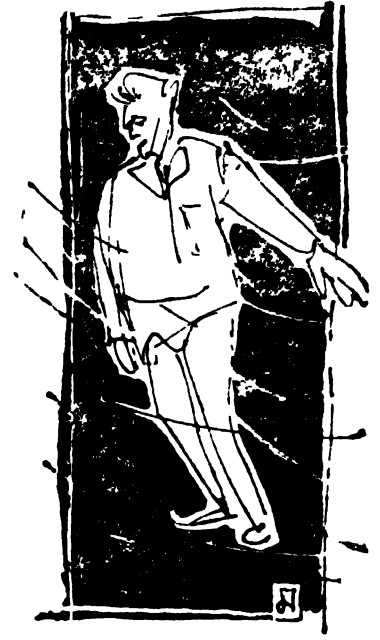
...আচমকা ঝড়ের মতন দৌড়ে এক ছোকরা.

আগে উঠলেই ভালো হতো। বাস আসতে দেরি হলে ট্যাক্সি নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। অনাবশ্যক তাড়াহুড়ো, অনাবশ্যক ওষুধ, অনাবশ্যক খরচ—এর কোনোটাই তিনি পছন্দ করেন না।

এমন সময় পাশের অন্ধকার গলিটা থেকে আচমকা ঝড়ের মতো চোঙা প্যান্ট পরা এক ছোকরা বেরিয়ে এলো হাঁফাতে-হাঁফাতে তাঁর কাছে এসে বললো, উঃ কী পালানই পালিয়েছি . . কিন্তু মালতীদিকে যে খুন করে ফেললো . ডিরেক্টর না ছাই .... সেন্ট পার্সেন্ট রাস্কেল মাতালের আড্ডা... এ্যাডভান্স দেবে বলে নিয়ে এসে ......উঃ কী টবচার . এই দেখুন স্যার, কপাল থেঁতলে গেছে এই দেখুন স্যার, রক্ত পড়ছে রিফিউজি বলে কি অমানুষ নই লাইফ এ্যান্ড ডেথ প্রশ্ন স্যার .. এক্ষুণি ফাঁড়ি থেকে পুলিশ নিয়ে আসবো . . ট্যাক্সি ভাড়া নেই গোটা পাঁচেক টাকা "

আজ আর ডাঃ প্রবীর সেনের বুক দুরদুর করলো না, মুখ শুকিয়ে গেলো না। কিন্তু তিনি নির্বিরোধী মানুষ। ঝামেলা পছন্দ করেন না। একটা ল্যাম্পপোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে তিনি পকেটে হাত ভরলেন। ছোকরা তার ডান হাত বাড়ালো।

একমুঠো খুচরো বার করে তার থেকে পাঁচ পয়সা বেছে ছোকরার উদ্যত হাতে ফেলে তিনি বললেন, ' আজ পাঁচ পয়সা ! '

ছোকরা হকচকিয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালো। তারপর ঝড়ের মতো এমনভাবে পাশের গলিটার মধ্যে উধাও হয়ে গেলো যেন ভূত দেখেছে।

'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত মন্তব্য প্রসঙ্গে—

১৯শে ডিসেম্বর সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত 'এম. ডি' ডিগ্রি প্রসঙ্গে আপনার ৫ই ডিসেম্বর "বঙ্গদর্শনের" মন্তব্যগুলিকে সমর্থন করে লেখা দু'টি দীর্ঘ পত্র পড়লাম।

আপনার এ সপ্তাহে 'বঙ্গদর্শনে' "বারান্তরে এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য প্রকাশিত হবে"—এই মন্তব্যটির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আশা করছি যে, আগামী সপ্তাহে এ বিষয়ে আপনার নিজস্ব মতামত আমরা জানতে পারব। এ প্রসঙ্গে আমাদের একান্ত অনুরোধ আপনি এ বিষয়ে বিশদ তদন্ত করে তবেই আপনার বক্তব্য প্রকাশ করবেন। আপনারা যদি বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ব্যানার্জী, ডাঃ নলিনীরঞ্জন কোনার, ডাঃ শিশিরকুমার মুখার্জী, ডাঃ অরুণকুমার নন্দী, ডাঃ ভুবনচন্দ্র সিংহ প্রমুখ 'এম. ডি' পরীক্ষার পরীক্ষকদের সহিত সাক্ষাৎকার আপনাদের তদন্তের অন্তর্ভুক্ত করেন, তাহলে মনে হয় প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটিত হবে। যা হোক, আমরা আপনার নিকট নিরপেক্ষ অভিমতই আশা করি।

আমাদের পূর্বের একটি পত্রে এরূপ লেখা হয়েছিল যে, "এই সব কতিপয় স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার"। এই কথাটিতে আপনাকে আক্রমণ করার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। যারা ঐ সংবাদ আপনার কাছে পরিবেশন করেছিলেন, তাঁদের সম্বন্ধেই ঐ মন্তব্য। আশা করি আপনারা ইহার অন্য অর্থ করবেন না।

শ্রীসুধীরকুমার চক্রবর্তী, শ্রীআদিনাথ নান, শ্রীসুধীরকুমার পাল ও শ্রীপ্রশান্ত বক্সী।

*

আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শনে'র লেখককে ধন্যবাদ। তিনি এমন একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, যা আজ পর্যন্ত কেউ বলতে সাহস পান নি—সুতরাং চাঞ্চল্য ও আলোড়নের সৃষ্টি হবে তাতে সন্দেহ কি? এ বিষয়ে 'পাঠকমনে' লেখকের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে প্রকাশিত চিঠিগুলোও আমি খুব আগ্রহের সাথেই পড়লাম। 'অপ্রিয়সত্য' কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় আলোচ্য বিখ্যাত ব্যক্তির "জো হুজুর" গোষ্ঠীর মহলে বোধ হয় এখন সামাল সামাল রব উঠেছে। নিজেদের 'আখের' গোছাবার জন্যে যাঁরা ব্যস্ত, তাঁরা হয়ত ভাবছেন দলে দলে প্রতিবাদ না করলে হয়তো "বিশিষ্ট ক্ষমতাবান" ব্যক্তি রুষ্ট হবেন। সুতরাং প্রতিবাদপত্রের মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফলাফলের কথা চিন্তা করে মাথা ঘামিয়েছেন। কিন্তু শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় কি?

আলোচ্য ক্ষমতাবান ব্যক্তির পত্রে কিছুদিন আগে একটা বই প্রকাশ করেছেন। সেই বইয়ের ভূমিকায় তিনি যাঁদের কাছে চির কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, তাঁদের প্রায় অধিকাংশই ২৫শে সংখ্যার পাঠকমনে প্রকাশিত প্রতিবাদপত্রের দলবদ্ধ লেখক—যদি আপনার সন্দেহ থাকে তাহলে মিলিয়ে নিতে পারেন। বইটির preface দেখলে সব বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, এতজন ডাক্তার নিজেদের সময় ও পরিশ্রম দিয়ে "কোন স্বার্থ (?) ছাড়াই পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে কেন সাহায্য করেছেন বলতে পারেন? কারণ অনেকেই জানেন, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ বলতে নারাজ। ভগবানের কাছে পৌঁছুতে গেলেও পুরুতের দরকার হয়—আলোচ্য ক্ষমতাবান ব্যক্তিটি যে চিকিৎসাবিদ্যা জগতের তথাকথিত ভগবান—যাঁর অঙ্গুলি হেলনে এবং ইচ্ছায় অসম্ভবও বোধ হয় সম্ভব হয়। তাই ভগবানের কাছে পৌঁছুতে গেলে সরাসরি আর সবাই কি করে যায়? পুত্র খুশি থাকলেই পিতা খুশি। 'খোঁজ লোক যে জানে সন্ধান'। প্রাইভেট কেস দিয়ে দিয়ে তেলের বন্যায় ভাসিয়ে দিলে কে জানে শিকে ছিঁড়তে কতক্ষণ। নেকনজর বলে কথা। এ কি আর যে-সে ডিগ্রী—এম. ডি।

পত্রলেখকদের অত চটবার কি আছে বুঝি না। বিশ্ববিদ্যালয়েও দুষ্ট লোকেরা বলে সব চেয়ে বড় পেপার হচ্ছে 9th Paper, ডাক্তারীতেও যে 9th Paper থাকবে না, তা হয় নাকি? আর ফেবারটিজম বলুন, নেপাটিজম বলুন—সে কোথায় নেই? বার বার কেস দিয়ে কোন ক্ষমতাবান ডাক্তারের পরিচিত হওয়াটা কি এমন অগৌরবের, বুঝি না। কেস দেওয়া সেই চেনামুখটা যখন পরীক্ষার্থী হয়ে এসে দাঁড়ায়, তখন জানবেন পরীক্ষক কোর্টের বিচারক নন—আইনের নিক্তি নিয়ে তো বসে নেই—তাই "চেনামুখ"কে খাতির না করতে চাইলেও খাতির এসে যায়। নম্বর দিতে গিয়ে ফেলের নম্বর যদি কলমের মুখ থেকে না বেরোয়—তাহলে মানুষ হিসেবে তিনি বোধহয় ক্ষমার্হ। এমন তো কেউ বলে দেয় নি পরীক্ষকরা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করবেন না—তাঁরা সবাই নন প্র্যাকটিশিং হবেন। এই সহজ কথাটা কেন যে প্রতিবাদকারী পত্রলেখকরা বুঝছেন না বুঝি না। সারা জগৎ জুড়েই তো আজকাল গায়ের জোর, মেধার জোর থেকেও মামার জোর বেশি। এখন মেধাটেধার কথা ভুলে যান—"তদ্বিরের নাও শুকনো ডাঙায় চলে"—"সুপারিশের গরু গাছে ওঠে।"

সুতরাং বিশিষ্ট কোন লোকের ক্লাশে যোগ দিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যেন-তেন-প্রকারেণ তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করাটা মানে ভালো একটা "সুপারিশ যোগাড়" করা। মনের আর্তি ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া। তিনি যদি ভাল নাও পড়ান, তবুও ক্লাশে ভিড় হবে—নিশ্চয়ই ভিড় হবে, মোসাহেবরা মাছি হয়ে ভনভনিয়ে আশেপাশে উড়বেন—এ কিন্তু খুবই স্বাভাবিক। যাঁরা তাঁর ক্লাশে যাবেন, বুক ফুলিয়েই যাবেন—তথাকথিত তদ্বির-দুনিয়ার নিয়মেই যাবেন, ঘাবড়াবার কী আছে? যাঁরা ঠিক জায়গায় কেস দেন তাঁরা কেসের সংখ্যা তিন ডবল, চার ডবল করে দিন—কেউ বলবে না আপনি বোকা। বলবে আপনি ট্যাক্টফুল—আপনি চালাক। যা বলবেন সোজাসুজি বলবেন—খোশামুদি ভাষায় "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" গোছের বক্তব্য পেশ করবেন না—তাতে হাসি পায়।

আলোচ্য ব্যক্তিটির পত্র যখন ভাল ক্লাশ নেন—তখন তিনি নিশ্চয়ই নেবেন। তাঁর কাছ থেকে সবাই যখন উপকৃত তখন তিনি কেন কোন এক বিশেষ কলেজে ক্লাশ নেন? কেন বাইরে "টিউটোরিয়াল হোম গোছের" কিছু একটা খুলছেন না। তিনি পয়সা নেন না, কিন্তু এমন তো ছাত্র থাকতে পারে যাঁরা "বিনা-পয়সার" ক্লাশে গিয়ে অবলিগেশনের মধ্যে যেতে চান না। তাঁর পড়াবার ক্ষমতার গুণে বাধ্য হয়েই যদি স্নাতকোত্তর ছাত্রদের ক্লাশ করতে হয় তবে যে-সব ডাক্তাররা অন্য কলেজের প্রাক্তন ছাত্র—তাঁরা "গুরুদক্ষিণা" বলে কিছু একটা যদি দিতে চান কীভাবে দেবেন? না বললেও বলা চলে 'কেসের মাধ্যমে ফীসের মাধ্যমে'—তাই নয় কি? তাই আমার মনে হয় কোন এক বিশেষ কলেজে ক্লাশ না নিয়ে তাঁর বাইরে ক্লাশ নেওয়া উচিত এবং সম্মানজনক দক্ষিণাও নেওয়া উচিত। এতে তাঁর সম্মানই বাড়বে—নইলে এ যুগে নিঃস্বার্থ লোকদের নিয়েই যত গণ্ডগোল—রটনা কখনও থেমে থাকে না।

আরেকটা কথা, একটা বিশেষ সেন্টারেই বছরের পর বছর এম. ডি পরীক্ষা হবে কেন? তবে কি অন্য কোন কলেজ হাসপাতালের এম. ডি পরীক্ষা

[illegible] দেওয়া নেই? এ বিষয়ে বঙ্গদর্শনের লেখকের বক্তব্যকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। একই কলেজে বার বার পরীক্ষা নেবার ব্যাপারে বিশেষ কোন ব্যক্তির হাত আছে কি না কে জানে? তবে ব্যাপার-স্যাপার কেমন সন্দেহের। পরীক্ষার সময় নিজের কলেজের পরীক্ষার্থীরা সুবিধা পাবেন—এ কথা চিকিৎসা-বিদ্যার সংশ্লিষ্ট লোকমাত্রই জানেন। কাজেই এ নিয়ে নানা কথা উঠবে তাতে আশ্চর্য কী? কথা ওঠার আগেই তো এক-একবার এক এক কলেজে পরীক্ষা হওয়া উচিত। ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষক হওয়া দরকার। "কন্ডাক্টার" নতুন নতুন হওয়াই বিধেয়। তাহলে দেখবেন ফলাফল হয়তো বদলে গেছে—পরিবর্তন হয়েছে College-সাম্প্রদায়িকতার।

বঙ্গদর্শনের লেখক এ বিষয়ে বেশি কিছু লিখে কী কোন পরিবর্তন আনতে পারবেন? মনে হয় না। তবে তিনি যে আমাদের সচেতন করে তুলতে চাইছেন তার জন্যে ধন্যবাদ।

—ডাঃ এস. সেন

কলকাতা—২৮।

*

গত ৪ঠা পৌষ আপনার সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'পাঠকমন' বিভাগে প্রকাশিত দুটি পত্রের আমরা নিম্নলিখিত স্বাক্ষরকারীরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

১। মেডিকেল পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য সাধারণ জ্ঞান ও প্রবল নিষ্ঠার দরকার। এখানে ব্রিলিয়ান্সীর বিশেষ স্থান নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামজাদা ছাত্রের এখানে এম-বি, বি-এস পরীক্ষায় বার বার অকৃতকার্য হওয়ার অনেক নজির আছে—এম-ডি তো দূরের কথা।

২। পরিসংখ্যান থেকে এই তথ্যই স্বীকৃতি পাবে যে, গত দশ বছরে শতকরা আশিজন এম-ডিই সবকারী নন-প্রাকটিসিং ডাক্তার।

৩। পিতা প্রখ্যাত চিকিৎসক হলেই তাঁর পুত্র এম-ডি'র যোগ্য হবেন, এমন কোন কথা নেই। তাহলে "গাছের তলায় আগাছা" এই কথার উৎপত্তি হোত না।

৪। উল্লিখিত ট্রপিক্যালের ডাক্তারের কথা আমাদের জানা নেই। পত্রলেখকের নিজের নাম প্রকাশের সৎসাহস না থাকতে পারে, [illegible] যাঁকে অভিযুক্ত করছেন তাঁর নাম প্রকাশের জন্য যেটুকু সততা থাকা দরকার, আমরা সেটুকু আশা করতে পারি কি?

৫। যাঁরা প্রতিবাদ জানাতে যাচ্ছেন, তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই যাচ্ছেন। দলে দলে প্রতিবাদ জানানো ব্যক্তিবিশেষের জনপ্রিয়তারই নিদর্শন।

৬। একাডেমিক কাউন্সিলের সাথে এম-ডি পরীক্ষার্থীদের কি সম্পর্ক থাকতে পারে তা আমাদের জানা নেই। আমরা জানি না পত্রলেখক এম-ডি পরীক্ষায় পাশ না করেও কি করে একাডেমিক কাউন্সিলের আওতায় আসেন।

৭। উল্লিখিত ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিটি উচ্চপদস্থ সম্মানিত ব্যক্তিদের দ্বারাই নির্বাচিত। পত্রলেখকের মন্তব্যে মনে হয়, যেন মিটিং-এ গরহাজির থাকাটা দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের পক্ষে বিশেষ গুণ।

৮। যে জন্তাবী বই-তে লেখক কয়েকজনকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন, তাঁরা লেখকের বহুদিনের ছাত্র অথবা তাঁর হাউস-ফিজিসিয়ান—তাঁরা সবাই এম-ডি পরীক্ষার্থী নন। কৃতজ্ঞতা স্বীকার মনুষ্যত্বেরই লক্ষণ।

৯। কেস দেখার সুযোগ সকল পরীক্ষার্থীদের জন্য সারা বছর ধরে উন্মুক্ত। পত্রলেখকের (এম-ডি পরীক্ষার্থী?) জানা উচিত ছিল যে পরীক্ষার অন্তত পনের দিন আগে থেকেই পরীক্ষার্থীদের হাসপাতালে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

১০। এম-ডি'র পরীক্ষক নিযুক্ত হন সিন্ডিকেটের মত অনুযায়ী। সিন্ডিকেটের মাননীয় সদস্যগণ নিশ্চয়ই 'মেরুদণ্ডহীন' নন যে, তাঁরা ব্যক্তিবিশেষের মর্জিকে মেনে নেবেন।

১১। 'মড়াকান্না'-ই তো করবেন—কারণ উল্লিখিত ব্যক্তি একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় শিক্ষক। তিনি না পড়ালে ছাত্রদের সমূহ ক্ষতি। যে প্রবীণ শিক্ষকের কথা বলা হয়েছে তার উত্তরে এইটুকু বলা যায় যে, বার্ধক্যই যোগ্য গুণ। ছাত্ররা যদি এই কারণে কোন বিশেষ শিক্ষকের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়, তাহলে অপর কোন 'বিশেষজ্ঞের' অপমানিত বোধ করা উচিত নয়।

১২। লেখক দয়া করে জানাবেন কি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন্ আইনে লেখা আছে এম-ডি পরীক্ষকের পুত্র ছাত্র পড়াতে পারবেন না।

১৩। "১৯৬২ সালের চাঞ্চল্যকর খবরের" প্রতিকারের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের—এম-ডি পরীক্ষার্থীদের নয়।

১৪। মেডিকেল কলেজ এখনও এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেডিকেল কলেজ। সুতরাং এম-ডি পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে নিশ্চয়ই যোগ্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এম-ডি পরীক্ষা শুধু মেডিকেল কলেজেই নয়, আর জি কর ও স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনেও অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর আগে এম-ডি পরীক্ষা শুধু আর জি করেই অন্তত দশবার হয়েছে।

এই সংখ্যায় আর একটি পত্রের লেখিকা "সুপ্রিয়া চক্রবর্তী"।

তাঁর অভিযোগ, পরীক্ষা পরিচালনায় বিশেষ [illegible] বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। তাই যদি হবে, অন্য কলেজের ছেলেরা পাশ করেন কি করে? সুপ্রিয়া দেবী কি প্রকারান্তরে অধীত বিদ্যার কৃতিত্ব স্বীকার করে নিচ্ছেন না?

আর একটি অভিযোগ এম-ডি'র তিনজন পরীক্ষকই মেডিকেল কলেজে যুক্ত থাকেন। কিন্তু লেখিকা জানেন না বোধ হয় সাধারণত বিখ্যাত চিকিৎসকরা মেডিকেল কলেজে যুক্ত থাকেন। অন্য কলেজের বিখ্যাত চিকিৎসকদেরও পরীক্ষক হওয়ার অনেক নজির আছে (ডাঃ এ কে নন্দী, ডাঃ সি সি সাহা, ডাঃ আর এন চৌধুরী, ডাঃ বিধু ভট্টাচার্য ও আরও অনেকে)।

সুপ্রিয়া দেবীর হিসাব অনুযায়ী মেডিকেল কলেজের ছাত্ররাই বেশি সংখ্যায় সফল হন। কিন্তু আমরা জানি বিগত পরীক্ষায় ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা বেশি সংখ্যায় পাশ করেছেন।

শিক্ষকতাকে টিউটোরিয়াল হোমের কোচিং-এর সাথে তুলনা করা লেখিকার বিকৃত রুচির পরিচয় মাত্র।

লেখিকা এম-আর-সি-পি এবং এম-ডি পরীক্ষার্থীর যে নজির দিয়েছেন এবং কোন বিশেষ ডাক্তারের এম-ডি পরীক্ষায় বারংবার অসাফল্যের কথা লিখেছেন তার উত্তরে এইটুকু বলা যায়—তিনি বোধহয় জানেন না ঐ ডাক্তারবাবুটি এম আর-সি-পি পরীক্ষায় বারকয়েক ঘায়েল হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এম-ডি ও এম-আর-সি-পি পরীক্ষার পার্থক্য সম্বন্ধে লেখিকা নিশ্চয়ই অবহিত নন। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রী অপরটি বিদেশী এক প্রতিষ্ঠানের ডিপ্লোমা মাত্র।

প্রথম পত্রের লেখক নিজেকে নিরপেক্ষ, সৎ, মেধাবী এবং সাহসী বলে জাহির করেছেন। কিন্তু তাঁর নিজের নাম প্রকাশের সৎসাহস নেই। আশা করি নীতির লড়াই-এর মোকাবিলা করার জন্য নিজে তাঁর 'গর্ত' থেকে প্রকাশ্য দিবালোকে আসবেন এবং যিনি কুলবধূর আঁচলের অন্তরালে ফিসফিস করছেন তিনিও আমাদের সামনে নিজেকে মেলে ধরবেন—আমরা তাঁদের অভিনন্দন জানাবো। ইতি—

অনিলকুমার [illegible], বিমলকান্তি ভৌমিক, দীনেশচন্দ্র দাস, সুনীতকুমার মুখার্জী, সনৎকুমার ঘোষ, বিকাশরঞ্জন মান্না, [illegible] মণ্ডল, [illegible] বাজিয়াল, দিলীপকুমার মজুমদার, বিশ্বনাথ জানা, [illegible] চক্রবর্তী, [illegible] হাজরা, রবীন্দ্র মিত্র, [illegible] ইতি ও আরো অনেকে।

*

আপনার পত্রিকায় এম-ডি পাশ হওয়ার বিষয়ে যে লেখা স্থান পাইয়াছে, তাহা পড়িয়া বিস্মিত হইলাম। এখন নাকি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ব্যক্তি আছেন, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই এবং তাঁহার পুত্রের

নিকট "কোচিং" করাইলেই নাকি এম-ডি পাশ করা নিশ্চিত।

আমি সর্বভারতের যে সংবাদ পাই তাহাতে দেখিতেছি যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যতজন এম-ডি পাশ হইতেছে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, পাটনা বা বিশাখাপত্তনম হইতে তদপেক্ষা অনেক বেশি এম-ডি পাশ হইতেছে। এখানে এত সহজ উপায় থাকিতে পাশ হইতে পারে না ইহা সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি আছেন বলিয়া যে অভিযোগ করিয়াছেন, লেখক কি মনে করেন যে এম-ডি পরীক্ষার অন্যান্য পরীক্ষকরা পরীক্ষার্থীদের যোগ্যতা বিচার না করিয়া কেবল ইহার কথাতেই তাহাদের পাশ করাইতে রাজী হইবেন? আরও জানিলাম এই ব্যক্তির পুত্র "কোচ" করিয়া অর্থগ্রহণ করেন না।

যাঁহারা কলিকাতা হইতে এম-ডি পাশ করিয়া ভারতের সর্বত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-ডি'র মানবর্ধন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের অপেক্ষা বর্তমানের এম-ডি'রা কোন অংশে ন্যূন নহেন ইহা আমি বলিতে পারি।

শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত

*

আপনার ৪ঠা পৌষ ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের (২৬শ সংখ্যা) সাপ্তাহিক বসুমতী পত্রিকায় 'পাঠকমনে' জনৈক অকৃতকার্য এম ডি পরীক্ষার্থীর মন্তব্যের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করিতেছি।

১। স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফলের কথা কেহই নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারেন না, ইহা স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রী মাত্রই ভাল করিয়াই জানেন। কোন মেধাবী ছাত্র বার বার স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় ফেল করেন এমন কোন নজীর নাই। চেষ্টা ও শ্রম থাকিলে মেধাবী ছাত্রের স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় অন্তত দুই-তিনবারেও পাশ করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে বা থাকে। যাঁহারা এম· বি· বিএস পরীক্ষায় ভাল ফল করিতে পারেন না অধ্যবসায়ের ফলে তাঁহারাও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় একবারেই পাশ করিতে পারেন। যাঁহারা এম· ডি-তে পাশ না করিয়া এম· আর· সি· পি পরীক্ষায় পাশ করেন এমন ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রের নজীর খুবই কম। এইসব ছাত্ররা এম· ডি পরীক্ষার জন্য ভালভাবে চেষ্টা করেন নাই। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন যাঁহারা এম· আর· সি· পি পাশ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার এম· ডি পাশ করিয়াছেন।

২। প্রাইভেট কেস্ দিয়া এম· ডি পাশ করা যায় না। লেখক নিজেই পরীক্ষার আগে কথিত 'কর্তা-ব্যক্তি'কে কেস্ দিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি পরীক্ষার্থীর কেস্ জানিয়া ঐ রোগীর কাছ হইতে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই।

৩। এম· ডি পরীক্ষায় পাশ বা ফেল কোন একজন 'কর্তাব্যক্তি'র উপর, নির্ভর করে না।

৪। একথা আপনার জানা দরকার যে ঐ চিঠির প্রতিবাদ করা এবং চাকুরিতে ভাল পোস্টিং পাওয়া—এ দুইয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই।

৫। স্বাধীন ভারতে ডেমোক্রেটিক কনস্টিটিউশনে কারও টেলিফোনে নির্দেশ পাওয়া মাত্র দলে দলে পত্রিকা অফিসে ছুটিয়া যাওয়া দুঃসাধ্য।

৬। একাডেমিক কাউন্সিলের ১২ জন ব্যক্তি আছেন। কাহারও একজনের কথায় বা মর্জির উপর প্রমোশন হয় না।

৭। তথাকথিত কর্তাব্যক্তি কোন মিটিং-য়েই থাকিতে চাহেন না। তাঁহাকে জোর করিয়াই আনা হয়।

৮। তথাকথিত ডাক্তারী বইয়ের লেখক এ পর্যন্ত কাহারও নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন নাই। ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ।

৯। একথা ভুল যে কোন ছাত্র স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় তাঁহাদের কেস্ জানিতে পারেন।

১০। ডেমোক্রেটিক কনস্টিটিউশনে একজন কর্তাব্যক্তির ইচ্ছায় পরীক্ষক নিযুক্ত হন না।

১১। এম· ডি পরীক্ষার্থীরা যাঁহাদের কাছে শিখিবার সুযোগ পান তাঁহাদের সকলের কাছেই ছুটিয়া যান।

১২। এম· ডি পরীক্ষার 'কর্তা'র পুত্র শুধুমাত্র এম· ডি পরীক্ষার্থীদের জন্যই ক্লাস নেন না। তিনি স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সমস্ত ছাত্রদের বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষা দান করেন।

১৩। ১৯৬২ সালে যুগান্তর ও অমৃতবাজার পত্রিকায় যে চাঞ্চল্যকর পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা মিথ্যা।

১৪। আর· জি· কর মেডিক্যাল কলেজে এম· ডি পরীক্ষা পূর্বে অনেকবার হইয়াছে। ট্রপিক্যাল স্কুলেও এম· ডি পরীক্ষা হইত। মেডিক্যাল কলেজ শহরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া আপাতত এইখানেই এখন এম· ডি পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

—জনৈক এম· ডি পরীক্ষার কৃতকার্য ছাত্র এবং কলিকাতার কোন বিশিষ্ট হাসপাতালের ভিজিটিং ফিজিসিয়ান।

*

"এম· ডি পরীক্ষা" প্রসঙ্গে আপনাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যেসব মন্তব্য ও পত্র প্রকাশিত হয়েছে, তা আমাদের সমাজজীবনের এক অপরিহার্য চিত্র। একজন পত্রলেখক বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করেছেন, আমি এ দাবিকে ন্যায়সঙ্গত ও যথার্থ বলে মনে করি।

গত সংখ্যায় যাঁরা বিপক্ষে চিঠি দিয়েছেন, মনে হয়, তাঁরা প্রায় সবাই এম-ডি পরীক্ষার্থী। চিকিৎসক মহলে অনেকেরই ধারণা, এঁদের অধিকাংশই আগামীবার এম-ডি'তে পাশ করবেন। এম-ডি পাশ করার এ এক সুবর্ণ সুযোগ।

আমি একজন প্র্যাকটিশিং ডাক্তার। এম-ডি'র দুষ্ট স্বার্থচক্রের অনেক কথাই আমি জানি। প্রয়োজনে সেসব তথ্য প্রকাশ করে দেব। কই, এম-ও এবং এম-এস (যা এম-ডি'র সমতুল্য) পরীক্ষা নিয়ে তো এসব স্ক্যান্ডাল হয় নি।

একথা কি সম্পাদিকা মহোদয়া জানেন যে, অনেক বড় বড় ডাক্তারকেও শাসানো হচ্ছে—যাতে করে তাঁরা প্রতিবাদ জানিয়ে আসেন—অনেকেই ভয়ে ভয়ে প্রতিবাদ জানাতে যাচ্ছেন।

এক পত্রদাতা পরীক্ষা পাশের ক্ষেত্রে 'লাক'-এর কথা বলেছেন। এই লাক-কি কেভাবে কবে এমন কারো পুত্রের কোচিং ক্লাশে গেলে বা কারো পিতার প্রসন্নদৃষ্টি লাভ করলে? পিতার প্রসন্নদৃষ্টি-ই তো 'লাক' এখানে! এবং এই লাক-ই প্রধান সহায় এম-ডি পাশের।

যাঁরা বিপক্ষে প্রতিবাদপত্র পাঠাচ্ছেন, তাঁদের সকলের ভাষাই এক—সেই জন্যেই কি প্রমাণিত হয় না যে, ওঁদের দলবদ্ধভাবে প্রম্পট করে পাঠানো হচ্ছে—একই কথার পুনরাবৃত্তি ঘটছে তাই!

কোচিং ক্লাশ—বেতন নিয়েই হোক বা অবৈতনিক হোক, অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। বিশেষত পিতা যেখানে এম-ডি'র পরীক্ষক। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না—ঢাক পিটিয়ে যতই প্রচার করা হোক না কেন সময় অপব্যয়ের কথা, নিঃস্বার্থ সহানুভূতির কথা, পশার ক্ষুণ্ণ করার কথা। একবার পিতা যদি এম-ডি'র পরীক্ষক না হন, তাহলে তাঁর কোচিং ক্লাশে ক'জন ছাত্র যাবেন ভেবে দেখতে ইচ্ছা হয়। ভবিষ্যতে তেমন দিনেই তাঁর জনপ্রিয়তার এবং পরার্থপরতার পরিচয় পাওয়া যাবে, তার আগে নয়। তার আগে পুত্রের স্বার্থ ও পিতার স্বার্থ অভিন্ন বলেই আমরা ভাববো।

ডাঃ এ, কে, দাশ কলকাতা—১৬

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মুক্তি দাও ! মুক্তি চাই !

সংবর্ধনা সভায়, অনেক ফুলের মালা ও তার সুবাসে আচ্ছন্ন সুভাষচন্দ্রের পক্ষে ফুলের কাঁটার কথা ভোলা সম্ভব হয় নি। আমার গলায় মালা, কিন্তু, সুভাষচন্দ্র ভেবেছিলেন, আমারি মত দেশকে ভালবাসার অপরাধে অপরাধী অনেক মানুষের গলায় রজ্জু এবং পায়ে শিকল। বড় তীব্র, তিক্ত যন্ত্রণার সঙ্গে এইসব কথা তাঁর মনে পড়েছিল। তখনো তাঁর সম্পূর্ণ নিরাময় ঘটে নি, কাজে নামবার মত শরীরের অবস্থা নয়, ডালহৌসিতে গিয়েছেন হৃত স্বাস্থ্য সন্ধানে, এবং অসহ্য মানসিক কষ্টে আছেন দেশের, বিশেষত বাংলা দেশের রাজনৈতিক অবস্থার কথা চিন্তা করে ডালহৌসি থেকে এই সময়ে লেখা একটি চিঠিতে তাঁর মনের অবস্থার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়—

"একথা বলতেই হচ্ছে, বাংলা থেকে যেসব খবর পাচ্ছি, তা আমাকে মোটেই সুখী করছে না। একদিকে, বন্দীমুক্তির ব্যাপারে সবচেয়ে কম প্রত্যাশাও পূরণ হয়নি; অন্যদিকে, বাংলায় কংগ্রেসের কাজেও কোনো উন্নতি দেখা যায়নি। ফলে, কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেরী হচ্ছে বলে আমি অস্থির হয়ে পড়ছি; কিন্তু উপায়ও নেই। আবার যখন স্বাভাবিক কাজের জীবনে ফিরে যাব, তখন অনুমান করতে পারছি, কী কঠোর কার্যভার আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে, আমি যদি শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ না হই, তাহলে সে কাজ সামলে উঠতে পারব না। আমার যুক্তি বা বুদ্ধি বলছে, আমার ধৈর্য ধরা উচিত। তবুও, সবসময়ে নিজের ভাবানুভূতিকে তো দমন করা সম্ভব হয় না! আর একটি নিরন্তর উৎকণ্ঠার মূলে আছে মুক্তিপ্রাপ্ত ডেটিনিউদের চিন্তা, সেই সঙ্গে যারা মুক্তি পায়নি তাদের পারিবারিক চিন্তাও। তাদের কাছ থেকে যেসব চিঠি পাচ্ছি, বড় যন্ত্রণাদায়ক সেগুলি।"*

সুভাষচন্দ্রের বিশেষ যন্ত্রণার কারণ বুঝতে হলে তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার কথা স্মরণ করতে হবে। ১৯৩৫ অ্যাক্ট অনুযায়ী তথাকথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা ভারতবর্ষে প্রবর্তিত হয়েছে এই ১৯৩৭ সালেই। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে কংগ্রেস অধিকাংশ প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে এবং বহু টালবাহানা করে মন্ত্রিত্ব গ্রহণে স্বীকৃত হয়েছে। বাংলা কংগ্রেস কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় নি; অধিকন্তু, কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের দক্ষিণমার্গী মনোভাবের জন্য বাংলা দেশে কংগ্রেস-লীগ কোয়ালিশনের প্রস্তাব বানচাল হয়ে গিয়েছে। কংগ্রেস-কর্তারা কদাপি নীতিগত দৃঢ়তার জন্য বিখ্যাত নন, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ব্যাপারে তাঁদের বিচিত্র না-গ্রহণ না-বর্জন নীতি রাজনৈতিক মেরুদণ্ডহীনতার চরম প্রমাণ, তা হলেও কখনো কখনো তাঁরা আশ্চর্য বীর্য প্রকাশ করেন, এবং দেখা যায়, তাঁদের বীরত্বের ফলভোগ করে বাংলা দেশ। বাংলা দেশের সম্বন্ধে কোনো নিরাগবশে তাঁরা বাংলার প্রতি ক্ষতিকর সিদ্ধান্তগুলি নিয়মিত করেছেন, তা যদি সত্য নাও হয়, একথা স্বচ্ছন্দে বলা যায়, তাঁদের সিদ্ধান্তের দ্বারা বাংলা দেশ নিয়মিত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফজলুল হকের কোয়ালিশন প্রস্তাবে গররাজি হয়ে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ পরবর্তী দেশ বিভাগের পথে সগৌরবে আর একটি দৃঢ় পদক্ষেপ করেছিলেন। আশাহত ফজলুল হকের লীগ মন্ত্রিসভা অতি প্রতিক্রিয়াশীল আচরণের দ্বারা বাংলা দেশের জীবন দুর্বহ করে তুলেছিল অতঃপর। এবং বাংলা দেশের জীবনের সেই অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে উঠেছিল অন্যতর কংগ্রেস-প্রদেশসমূহের আলোকোৎসবের পাশে। অধিকাংশ প্রদেশে জনপ্রিয় কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি যখন বন্দীমুক্তি দান, এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজে ব্রতী হল, তখন বাংলা দেশের চারদিকে অবরুদ্ধ দেশপ্রেমিকদের যন্ত্রণা ও পীড়নের হাহা স্বর, বাংলা দেশেই দীর্ঘদিন সে যন্ত্রণা সর্বাধিক, কারণ সে দেশ সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ত্যাগী বেপরোয়া দেশপ্রেমিক দান করেছে স্বাধীনতা সংগ্রামে! স্বাধীনতার 'মধ্যাহ্নে অন্ধকার' দেখবার জন্য এই প্রদেশকে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় নি, ১৯৩৭ সালের আগস্ট মাসেই সে গ্রহণের পুণ্যস্নান করেছিল।

সুভাষচন্দ্র মনে মনে কতখানি অস্থির হয়েছিলেন বোঝা যায় পূর্বোক্ত পত্রের কয়েক দিন পরে, ২৪ জুলাই তারিখে প্রকাশিত তাঁর বিবৃতি পড়লে। বঙ্গীয় কংগ্রেসের সভাপতিরূপে বন্দীমুক্তির ব্যাপারে এই জোরালো বিবৃতিটি তিনি দেন। সূচনায় বলেন, গত এপ্রিল মাসে বাংলা ছাড়ার সময়ে তিনি স্থির করেছিলেন রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তনের আগে কোনো বিবৃতি দেবেন না; কিন্তু সেখানে রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমাগত মন্দের দিকে চলেছে, তাই বিবৃতিযোগে তাঁর বক্তব্যকে সর্বসাধারণের গোচর করতে হচ্ছে, যেহেতু এখনি তাঁর পক্ষে ফিরে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তারপরে সুভাষচন্দ্র

---

* ২০ জুলাই, ১৯৩৭, অমৃতবাজার পত্রিকা থেকে অনূদিত।

হক-মন্ত্রিসভার প্রতিক্রিয়াশীল চেহারার বর্ণনা করেছেন—

"চার মাসের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, বাংলা দেশ সারা ভারতের সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রিসভার দ্বারা শাসিত। খাজা-হক মন্ত্রিসভার কাছ থেকে যদিও কেউই বড় কিছু আশা করেনি, কিন্তু যে গভীর-ব্যাপক নৈরাশ্য এই প্রদেশকে আচ্ছন্ন করেছে—আমার নিশ্চিত ধারণা, তাও কেউ কল্পনায় আনতে পারেনি।...

"সারা পৃথিবীতে দেখা যায়, উদারতর শাসন প্রবর্তনের সূচনা হিসেবে রাজনৈতিক বন্দীদের দণ্ড মকুব করা হয়। সুতরাং বাংলা দেশে, যেখানে দু' হাজারের উপর ডেটিনিউ বিনা বিচারে আটক রয়েছে, যেখানে বহু সংখ্যক রাজনৈতিক বন্দী বিচারের পর দণ্ডভোগ করছে, যাদের অনেকেই আন্দামানে দ্বীপান্তরবাসী, যেখানে পীড়নের সকল ব্যবস্থাই পূর্ণভাবে বলবৎ, সেখানে একথা বিশ্বাস করা কদাপি সম্ভব নয় যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন-জাতীয় কিছু প্রবর্তিত হয়েছে।

"বিনা বিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি না হওয়াই অবশ্য সবচেয়ে নৈরাশ্যের জিনিস। গভর্নর, আমলাতন্ত্র বা সি আই ডি বিভাগের মনোভাব এক্ষেত্রে বোধগম্য, কিন্তু যিনি একদা জনদরদীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর এখনকার মনোভাব আমাদের বোধগম্য নয়—তিনি এখন বিনা বিচারে আটক রাখা সমর্থন করার চেষ্টা করছেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের রাজনীতি পরিত্যাগ করার সদুপদেশ দিচ্ছেন! মিঃ ফজলুল হক যথার্থই নিষ্ঠুরতার নিষ্ঠুরতম ঐতিহাসিক চরিত্রকেও অতিক্রম করেছেন।

অবস্থা যেখানে এই রকম, সেখানে প্রচণ্ড আন্দোলন সৃষ্টি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই—সুভাষচন্দ্র জানালেন। "এমন আন্দোলন করতে হবে যাতে মন্ত্রিসভা ভেঙে পড়ে।" সেই সঙ্গে 'বন্দী-দিবস' পালনের কথাও বললেন। তার পরে তিনি গভর্নর স্যার জন অ্যান্ডারসনের শুভবুদ্ধির প্রভাত এবং বিবেকের কাছে আবেদন করলেন—

"বক্তব্য শেষ করার আগে মাননীয় গভর্নর স্যার জন অ্যান্ডারসনের কাছে, এবং স্থায়ী আমলাদের কাছে (যাঁরা কার্যতঃ বাংলা দেশ শাসন করছেন) কিছু নিবেদন করতে চাই। স্যার জন সাম্প্রতিক এক বক্তৃতায় তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, আইন ও শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে, মন্ত্রিসভার সঙ্গে তার কিছু মতভেদ ঘটেছে। এবং আমাদের কাছে এটা বিস্ময়ের বিষয় মনে হয়নি যে, বর্তমান মন্ত্রিসভা গত সাত বছর ধরে বাংলা দেশে যে-নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা চলেছে, তার ধারাই গ্রহণ করেছে।

"আয়ারল্যান্ডের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে যে ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তার বিষয়েও মাননীয় গভর্নর মহোদয় উল্লেখ করেছেন, সেই সঙ্গে সখেদে জানিয়েছেন, বাংলার পরিস্থিতি আয়ারল্যান্ড থেকে ভিন্ন। কিন্তু একথা কি সত্য নয় যে, আয়ারল্যান্ডে মুক্ত বিদ্রোহ হয়েছিল ও তাতে সহস্র সহস্র ইংরেজ নিহত হয়েছিল, অপরপক্ষে বাংলা দেশে বড় জোর একটা গুপ্ত বৈপ্লবিক আন্দোলন ছিল, যার ফলে সর্বোচ্চ কয়েক ডজনের বেশী প্রাণহানি হয়নি?

"স্যার জন জানেন, সেই সঙ্গে তাঁর স্থায়ী আমলারাও জানেন যে, বৈপ্লবিক আন্দোলন এখন অতীতের ব্যাপার। ব্যক্তিগতভাবে আমি যে সংবাদ পেয়েছি, তা ছাড়াও বন্দিত্ব-কালে একাধিক দায়িত্বশীল পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে শুনেছি, বাংলা দেশের তরুণেরা—তাদের মধ্যে দণ্ডিত বা বিনা বিচারে আটক বন্দীরাও আছেন—আর গুপ্ত বৈপ্লবিক আন্দোলনের কথা ভাবছেন না; পরিবর্তে তাঁরা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ও গণ-আন্দোলনের পরিকল্পনাই করছেন।

"সরকারী মতে বৈপ্লবিক আন্দোলনের সংযোগের জন্য যাদের অবরুদ্ধ করা হয়েছে, এক্ষেত্রে তাদের এখনো আটক রাখার কী যৌক্তিকতা থাকতে পারে? পাঁচ বছর আগে, যখনো স্যার জন ইংলণ্ড ছেড়ে আসেননি, আয়ারল্যান্ডে 'ব্ল্যাক অ্যান্ড ট্যান' শাসনে তাঁর ভূমিকার জন্য সমালোচিত হয়েছিলেন; তিনি চোখা উত্তর দিয়ে বলেছিলেন, একই সঙ্গে তিনি আইরিশ জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারেও অংশ নিয়েছিলেন।

"মহামান্য গভর্নর মহোদয় শীঘ্রই শাসনভার ত্যাগ করবেন। তার আগে এখানেও কি তিনি আয়ারল্যান্ডে যা করেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করবেন? অর্থাৎ, সকল রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেবেন এবং ভারতভূমি ত্যাগ করে যাবার আগে যথার্থ জনপ্রতিনিধিদের হাতে শাসনভার তুলে দিয়ে যাবেন?

"কংগ্রেসসেবীদের এবং বাংলার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে আমি বলতে পারি, বিলম্বে হলেও সরকার যদি এক্ষেত্রে ন্যায়বিচার করেন, তাহলে আমরা জনগণের মধ্যে অহিংসার ভাবপ্রসারে আমাদের প্রয়াস দ্বিগুণ বাড়িয়ে অবশ্যই সাড়া দেব। বাংলার নিজের স্বার্থে, বৃহত্তর ভারতের স্বার্থেও বটে, বাংলাকে জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ, নীতি ও পদ্ধতিকে বরণ করতেই হবে।"

সুভাষচন্দ্রের এই বিবৃতি প্রকাশিত হবার কয়েকদিনের মধ্যে রাজনৈতিক ঘটনাগতি অকস্মাৎ তীব্রবেগ ধারণ করল। ৩১শে জুলাইয়ের সংবাদপত্রের বিরাট সংবাদ, আন্দামানে বন্দীদের অনশন শুরু হয়ে গেছে ন্যায়ব্যবহারের ও মুক্তির দাবিতে। আন্দামান-বন্দীদের কোন্ নিষ্ঠুর অত্যাচারের মধ্যে দিনযাপন করতে হত, রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিরা তার কিছুটা জানেন। অত্যাচারিত কিছু কিছু মানুষ এখনো বেঁচে আছেন সেখানকার কল্পনাতীত পীড়নের সাক্ষ্য দিতে। বেশি সন্ধানের প্রয়োজন নেই, পাঠকরা যদি গত ৭ নভেম্বর, ১৯৬৮, তারিখে সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত শ্রদ্ধেয় ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর 'জীবনস্মৃতি'র অংশটুকু পড়েন, তাহলে অবস্থার কিছুটা আভাস পাবেন।

২৪শে জুলাই থেকে বন্দীরা অনশন শুরু করেছিলেন। সেখানকার ২৮৩ জন বন্দীর অধিকাংশই বাঙালী; অনশন করেছিলেন যে ১৮৭ জন বন্দী, তাঁদেরও প্রায় সকলেই বাঙালী। অনশনের সংবাদ অবিলম্বে জানানো হয় নি। ২৪শে জুলাইয়ের অনশনের সংবাদ কলকাতার সংবাদপত্রে প্রথম বেরিয়েছিল ৩১শে জুলাই।*

দেশপ্রেমিকদের মরণপণ অনশনের সংবাদে এবং শাসকচক্রের নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যের চেহারা দেখে বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষ রোষে-ক্ষোভে ফেটে পড়ল। প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হয়ে গেল সর্বত্র,

---

* বিস্ময়ের কথা, ২৪ জুলাই, যেদিন অনশন শুরু হয়, সেইদিনের সংবাদপত্রেই ডালহৌসি পাহাড় থেকে সুভাষচন্দ্রের পাঠানো বন্দীমুক্তি বিষয়ক বিবৃতিটি বেরিয়েছিল। এটা কি কাকতালীয় ব্যাপার।
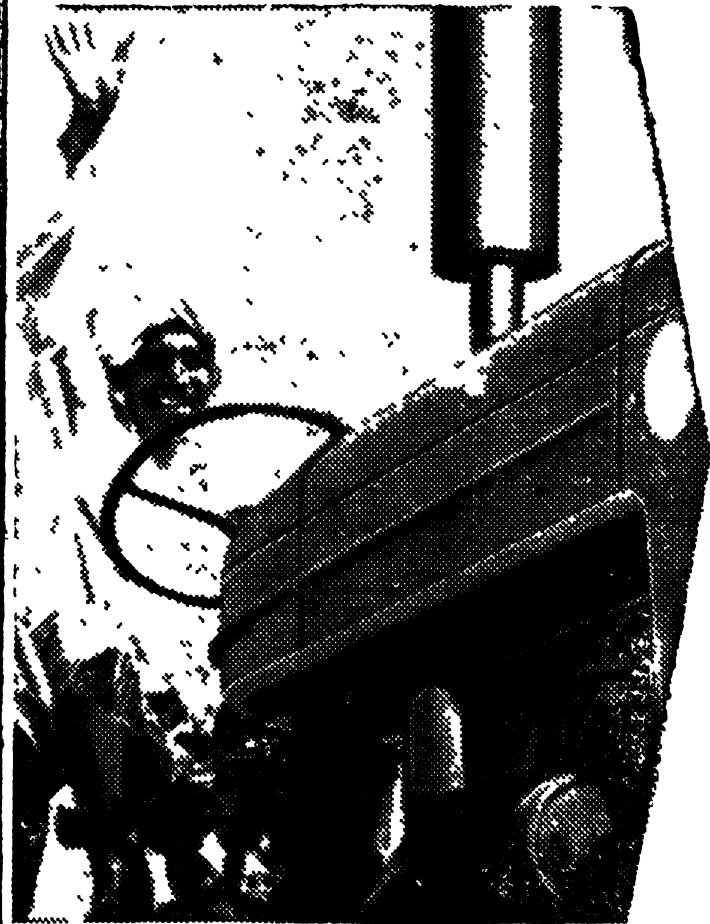
বিশেষত বাংলায়। সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে শরৎচন্দ্র বসু আন্দোলনে নেতৃত্ব নিলেন। "আন্দামান দিবস" ঘোষিত হল। সেদিন এবং প্রতিদিন শোভাযাত্রা, সভা, বিক্ষোভ—প্রতিবাদ ও ধিক্কার। সহানুভূতিতে অনশন হল নানা স্থানে, বিশেষত বন্দীনিবাসগুলিতে। এই সব বিক্ষোভ কিন্তু নিরুপদ্রবে হতে পারে নি—কলকাতায় শোভাযাত্রার উপরে লাঠি-সুদ্ধ পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল নিষ্ঠুরভাবে, মহিলা শোভাযাত্রী সমেত আহত হলেন বহুজন।

এই সমস্ত আন্দোলন যখন চলেছে, আশঙ্কায় ও শাসকদের প্রতি ঘৃণায় যখন দেশবাসীর মনপ্রাণ শিহরিত এবং দূরে দ্বীপের ক্ষীণবৃন্ত প্রাণশিখাগুলির প্রতি শ্রদ্ধায় ও মমতায় ভাবাতুর, তখনো কিন্তু বাংলা সরকারের আত্মতুষ্টির সীমা নেই। ইতিমধ্যে ভারত সরকার বন্দীদের ব্যাপারে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছে, দায় চাপিয়ে দিয়েছে বাংলা সরকারের ঘাড়ে, কিন্তু এখানকার শাসনতান্ত্রিক অহমিকা অনশনের চাপের কাছে হার মানতে একেবারেই নারাজ। এদিকে উদ্বেগের মাত্রা প্রতিদিন বেড়েছে—চরমে পৌঁছেছে অনশনের ৩৪-তম দিনে—যেদিন মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়ল এবং বাংলার আইনসভা থেকে কংগ্রেসী সদস্যরা বেরিয়ে এলেন। রুদ্ধ যাতনার উপর দিয়ে আরও কয়েকদিন কাটল, অবশেষে ৩১ আগস্টের সংবাদপত্রে পরম স্বস্তিকর সংবাদটি বেরুল—তৃতীয় দুর্দৈব শেষ পর্যন্ত ঘটে নি—বন্দীরা অনশন ত্যাগ করেছেন।

ডালহৌসিতে স্বাস্থ্যোদ্ধারে ব্রতী সুভাষচন্দ্রই বোধ হয় এই সময়ে সর্বাধিক কষ্টে ছিলেন, কারণ স্বাস্থ্যসঞ্চয় করা ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না অথচ করবার ছিল কত কিছু! মাত্র বিবৃতিদানে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল তাঁকে। ডালহৌসি থেকে ৬ই আগস্ট তারিখে প্রচারিত বিবৃতিতে তিনি বাংলার তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব খাজা নাজিমুদ্দিনের হৃদয়হীনতা ও কপটতাকে কঠোরভাবে আঘাত করলেন।

"বাংলা মন্ত্রিসভার কিছু কিছু সদস্যের কথাবার্তা শুনে বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা দমন করা সত্যই শক্ত"—সুভাষচন্দ্র লিখলেন—"বর্তমান শাসন সংস্কারের পূর্ববর্তী কোনো কঠিন চোয়াল আমলাও এঁদের থেকে অধিক দায়িত্বহীনতার খেলা দেখাতে পারতেন না। স্বরাষ্ট্রসচিব স্যার নাজিমুদ্দিন সেদিন বলেছেন, আন্দামান বন্দীরা বেয়নেটের মুখে তাঁদের দাবিকে এগিয়ে দিয়েছেন। আমরা একথা কদাপি জানতে পারিনি, সেই 'নরক দ্বীপের' বন্দীদের ইতিমধ্যে বেয়নেট সরবরাহ করা হয়েছে! অনশন ধর্মঘট সম্বন্ধে যদি স্যার নাজিমুদ্দিনের আপত্তি থাকে, তাহলে যে-চার মাস ধরে তিনি পদে অধিষ্ঠিত আছেন, তার মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি কেন?" সুভাষচন্দ্র আরও বললেন—"স্যার নাজিমুদ্দিনের বোধোদয়ের জন্য জানাতে পারি, শাসন সংস্কারের পূর্ববর্তী আমলাতান্ত্রিক সরকারের আমলে অনশন ধর্মঘটীদের দাবির কাছে অজস্রবার সরকার নতি-স্বীকার করেছে; আমার ক্ষেত্রেই তা ঘটেছে, যখন আমি ব্রহ্মদেশে ১৯২৬ সালে রাজবন্দী ছিলাম। ভারতের বাইরে, তাঁর সরকারের চেয়েও অনেক শক্তিশালী সরকার অনশন ধর্মঘটের নৈতিক চাপের কাছে নত হয়েছে। আমাদের ইদানীন্তন কালের এইসব পূর্ণ-প্রস্ফুটিত আমলা মহোদয়দের বোধ হয় ১৯৩২ সালে মহাত্মা গান্ধীর সুবিখ্যাত অনশনের কথা স্মরণ করাতে হবে না, যা মহামান্য বৃটিশ সরকারকে পর্যন্ত বিবেচনাসম্পন্ন করে তুলেছিল।"

সুভাষচন্দ্রের কঠোর বিদ্রূপের পিছনে ছিল আতঙ্ক ও অন্তর্যাতনা। ১৯৩৩ সালের আন্দামান অনশনে তিনজনের প্রাণহানি হয়েছিল। আন্দামান থেকে সদ্যপ্রত্যাগত বন্দীর কাছে তিনি শুনেছেন, বন্দীদের শারীরিক অবস্থা অতি শোচনীয়। না জানি অনশন চলতে দিলে এবার আরও কত বেশি প্রাণহানি ঘটবে। তবু বন্দীরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সুতরাং, বাংলা কংগ্রেসের সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্র ঐ বিবৃতিতে আহ্বান করলেন—অবিরাম আন্দোলন চলুক—সপ্তাহমধ্যে আন্দমান দিবস ঘোষিত হোক।*

অনশনের চতুর্দশ দিবসে সুভাষচন্দ্রের বিবৃতি প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বিবৃতি পাই অনশনের এক মাস পরে। এবার তাঁর লক্ষ্য ভাইসরয়, কারণ তিনি জানতেন, কোন্ হাতে কান ধরা আছে। ২৪ অগস্ট তারিখে প্রকাশিত এই বিবৃতিতে তিনি বহু সরকারি কুযুক্তি তীক্ষ্ণভাবে খণ্ডন করেছেন। ভারত সরকার অহিংস ও সহিংস—রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যেও এই দুই শ্রেণী ভাগ করেছেন। বলাবাহুল্য অহিংস রাজবন্দীরা সরকারের পক্ষে নিরাপদ শব্দ। সুভাষচন্দ্র লিখলেন—"শুধু ভারতবর্ষেই রাজবন্দীদের মধ্যে শ্রেণীভাগ করার ব্যাপারে অহিংস এবং না-অহিংস শ্রেণীভাগ করা হয়; অপরপক্ষে অন্যান্য দেশে রাজবন্দী হিসাবে তাঁদেরই গণ্য করা হয়, যাঁরা দারুণতম অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত, তাঁদের গুণের মধ্যে থাকে, অপরাধের পিছনে উদ্দেশ্য ছিল দেশপ্রেমমূলক।...জার্মানী, রাশিয়া, ইটালী, স্পেন, আইরিশ; ফ্রি স্টেট এবং আরও কয়েকটি দেশের রাষ্ট্র-প্রধানরা আন্দামান বন্দীদের অধিকাংশ যেসব অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত, তার থেকে বহুগুণ বেশী দোষে কারাবুদ্ধ হয়েছিলেন।" মুক্তির ব্যাপারে আবেদন-নিবেদনের পন্থা কেন নিয়েছেন সে বিষয়ে সুভাষচন্দ্র বললেন—"কারণ এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয়েছে, নচেৎ আমি ধরেই নিতাম, সরকার মন্দতম ব্যবহারই করে যাবে।" আমলাতন্ত্রের যুক্তি ও উক্তির নিষ্ঠুরতায় সুভাষচন্দ্র বেদনাবোধ করেছিলেন। সরকারের প্রধান বলেছিলেন, অপর বন্দীদের তুলনায় আন্দামান বন্দীদের মৃত্যুহার কম। মর্মবিদ্ধকণ্ঠে সুভাষচন্দ্র বললেন—তাজা সব তরুণদের ধরে নিয়ে আন্দামানে রেখে দেওয়া হয়েছে, সুগঠিত তাদের স্বাস্থ্য ছিল; তাই তারা মার খেয়েও টিকে আছে; আর অন্যত্র বন্দীরা বয়স্ক, অধিকাংশই জঘন্য অপরাধী, কোকেনখোর, মদ্যপ, অসুস্থ। সরকার বলেছিল আন্দামানে বন্দীদের জন্য খেলাধুলোর পরিপাটি ব্যবস্থা হয়েছে। সুভাষচন্দ্র বললেন, বটেই তো! অবশ্যই সেখানে একটি ফুটবল মাঠ আছে, টেনিস কোর্টের আকারে; এবং সরকারের নিনাদিত প্রচারযন্ত্রের কল্যাণে সারা পৃথিবী জেনেছে, চমৎকার সুইমিং পুলে বন্দীরা সন্তরণাদি করে; সেটা আর কিছু নয়, জেলগুলিতে যে জলাধার থাকে, তারই কিছু বর্ধিত সংস্করণ।

সুভাষচন্দ্র আরও বহু যুক্তিতে সরকারপক্ষের অসার কথাগুলিকে খণ্ড খণ্ড করলেন। সব শেষে অতি ব্যাকুলতার সঙ্গে বললেন—"এই চরম সংকটের কালে প্রতি ঘণ্টা, না, প্রতিটি মিনিট পর্যন্ত বিপজ্জনক—অবিলম্বে সরকার সক্রিয় হোন।"

[ক্রমশঃ]

* অমৃতবাজার পত্রিকা, ৭ আগস্ট, ১৯৩৭।

চাঁদ সদাগর

অনিল কুমার দলুই

টিফিনের ঘণ্টা শেষ হলো। ছেলেরা যে যার ক্লাশে ফিরে গেছে। একটু আগে তাদের প্রচণ্ড কলরব সারা বাড়িতে প্রতিধ্বনি তুলে ফিরছিল। এখনো তার রেশ একেবারে মিলিয়ে যায় নি। চাপা গুঞ্জন এখনো চলেছে ঘরে ঘরে—যেন লক্ষ লক্ষ মৌমাছি তাদের চাকে ফিরে এসেছে দিনান্তে।

টিচার্স রুমে চলেছে রাজনীতির তুমুল তর্ক। টিফিনের সময় সকলে একসংগে মেলবার সুযোগ পায়। মোহিতবাবু কংগ্রেসের গোঁড়া সমর্থক এবং বারীনবাবু কম্যুনিস্ট পার্টির। এই দুজন এক সংগে মিললে উচ্চগ্রামে তর্কের জোয়ার বয়ে চলে। অন্যান্য টিচাররাও দু'দলে বিভক্ত হয়ে গিয়ে দুজনকে সমর্থন জানায়। মাঝে মাঝে তর্ক এতো জোরালো হয়ে পড়ে, ছেলেদের মিলিতকণ্ঠের চিৎকারও তার তলায় চাপা পড়ে যায়। ঘরের উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা ও বাইরের ছেলেদের অবাধ কণ্ঠের চিৎকারকে আমলে না এনে আধ ঘণ্টার দিবানিদ্রাটুকু উপভোগ করেন হেড পণ্ডিত রামকমলবাবু। তাঁর স্থির দেহ ও মুদ্রিত নেত্র দেখে মনে হয় তিনি বাস্তব জগতের অনেক ঊর্ধ্বে বাস করেন—যেখানে সমস্ত কোলাহল শান্ততার মাঝে বিশ্রাম লাভ করছে। কিন্তু ঐ আধ ঘণ্টা। টিফিনের শেষ ঘণ্টা পড়ার সংগে সংগে তাঁর শরীরে চঞ্চলতা জাগে। পকেট থেকে নস্যির কৌটো বার করে এক টিপ নস্যি নেন। তারপর ভারী গলায় একবার বলে ওঠেন : মাধব, পার করো। তবে এই পর ... আকুল আর্তি অন্যান্য ...দের সব আলোচনাকে স্তব্ধ করে দে[য়]।

কিন্তু আজকের আলোচনা থামে না। বারীনবাবু ও তাঁর সমর্থকরা ... আইনের অসারতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন। রামকমলবাবু ... ঘণ্টা পড়ে গেছে, এখুনি ... এসে পড়বে।

মুহূর্তে সকলে চুপ করে যায়। ঘরটাকে অত্যন্ত নিশ্চুপ মনে হয়। সকলে ক্লাশে যাবার জন্যে তৈরি হয়। ঠিক এই সময় হেডমাস্টার ধূর্জটিবাবু ঘরে ঢোকেন। বলেন : ছেলেরা ক্লাশে চলে গেছে, আর আপনারা এখনো বসে আছেন?

কারো মুখে কোনো কথা নেই। সকলে একে একে ধূর্জটিবাবুকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। দোতলার সিঁড়িতে উঠতে উঠতে কমলবাবু পার্শ্ববর্তী নবেন্দুবাবুকে বলেন : না, যুধিষ্ঠিরের জন্যে আর পারা যায় না।

ধূর্জটিবাবুকে আড়ালে আবডালে অন্যান্য টিচাররা যুধিষ্ঠির বলে থাকেন। ধূর্জটিবাবু ইস্কুলে আসার পর সকলের মনে মনে একটা চাপা অসন্তোষ আছে। কারণ তাঁর সততা, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি অনেকের পছন্দ নয়। এ যুগে এমন একটা লোক থাকতে পারে, অনেকের ধারণার অতীত। অনেক ব্যাপারে অনেকের আর্থিক ক্ষতি পর্যন্ত হয়ে গেছে। দুর্ভাগ্যবশত এই রকম একটা কড়া

গ্রামের লোক মাথার ওপর থাকার জন্যে অনেকে সবাই তাঁর ওপর হাড়ে-হাড়ে চটা। তাদের মনের চাপা ক্রোধ প্রকাশ পেতো তাঁর মাধ্যমে।

রামকমলবাবুর ছাত্র ছিলেন ধূর্জটি-বাবু। তিনি রামকমলবাবুকে শ্রদ্ধা করেন। তারই সুযোগ নিয়ে তিনি একবার ধূর্জটিবাবুকে বলেছিলেন : শ্যামলকে তুমি সায়েন্স দিয়ে দাও।

: কোন্ শ্যামল—আপনার নাতি?

: হ্যাঁ।

: কিন্তু ও তো অঙ্কে ফেল করেছে।

: ওকে একটা চান্স দাও।

ধূর্জটিবাবু ক্ষণকাল চুপ করে-ছিলেন। হাতের পেন্সিলটা ধীরে ধীরে টেবিলের ওপর ঠুকতে ঠুকতে বলে-ছিলেন : পণ্ডিতমশাই আপনি প্রবীণ লোক। তা ছাড়া আপনার কাছে যে আদর্শ একদিন পেয়েছি তা আজ লঙ্ঘন করি কি করে? শ্যামলকে দিতে হলে আরো অনেককে দিতে হয়।

: আজকাল তো অনেকে..

তাঁকে শেষ না করতে দিয়েই ধূর্জটিবাবু বলেছিলেন : ও কথা আমাকে বলবেন না। ওরকম কোন অন্যায় কাজ আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়।

একথা শিক্ষকমহলে ডালপালা মেলে ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয় নি। সকলেই এক-বাক্যে রামকমলবাবুর পক্ষ নিয়েছিলেন এবং একথা সকলে স্বীকার করেছিলেন, রাম-কমলবাবুর নাতিকে সায়েন্স গ্রুপে নেওয়া উচিত ছিলো ধূর্জটিবাবুর। তাদের মধ্যে যতই বিরূপতা থাকুক না কেন, তা মুখে প্রকাশ করবার শক্তি কারো নেই। তারা নিরুপায়, তাই তারা সকলেই বিষের জ্বালায় ছটফট করে।

সন্ধ্যের সময় ধূর্জটি বাড়ি ফেরেন। সারা রাস্তা তিনি চিন্তা করতে করতে আসেন—স্বাধীনতা পাবার পর সত্যি কি দেশটা বদলে গেছে? দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এসেছে দুর্নীতি। কিন্তু কেন এ অবস্থা হলো? কোথা এর উৎস?

তাঁর মনে পড়ে, একদিন দেশের সেবার জন্যে সব কিছুকে পরিত্যাগ করেছেন। সেদিনের একমাত্র সোনার স্বপ্ন ছিল দেশের স্বাধীনতা। স্বাধীন দেশের কথা বইয়ে পড়তেন আর ভাবতেন, ভারত একদিন স্বাধীন হবে। দেশের লোক সুসমৃদ্ধ হবে, স্বাধীন দেশের আকাশের নিচে লোক মাথা উঁচু করে চলবে। প্রতি মুহূর্তে পরাধীনতার গ্লানি তাদের পীড়া দেবে না। অহরহ পায়ে বাজবে না পরাধীনতার লৌহ-শৃঙ্খল।

সরকারী চাকরি উপেক্ষা করে শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজের অফিসে সুখে কলম পেশা অপেক্ষা গরীব শিক্ষক হওয়া শ্রেয়। এখানে প্রতি পদে পদে দাসত্বের লাঞ্ছনা নেই, নেই গোলামীর কলঙ্কময় জীবনের গ্লানি; এখানে আছে মানুষ গড়ার পবিত্র কর্তব্য, দেশসেবার মহান আদর্শ।

বাপ-মায়ের স্নেহ হারিয়েছেন। রিটায়ার্ড সরকারী অফিসরের ছেলে শিক্ষকতা করবে, এ তাঁরা স্বপ্নে কল্পনা করতে পারেন নি। তাঁদের অনেক আশাকে সেদিন ধূর্জটি ব্যর্থ করে দিয়ে-ছেন। একমাত্র ছেলে ধূর্জটি; তাঁর এই পরিণামে তাঁরা ভেঙে পড়েছিলেন ব্যর্থ-তার বেদনায়, হতাশার হতাশ্বাসে।

কিন্তু সেদিন একজন তাঁকে, তাঁর আদর্শকে অভিনন্দন জানিয়েছেন—তিনি কল্যাণী। না, তখনো তাঁর স্ত্রী হন নি। তখনকার দিনের কলেজে-পড়া মেয়ে। রীতিমত প্রগতিশীল। ধূর্জটি যেদিন তাঁর দাবি নিয়ে হাজির হয়েছেন কল্যাণীর কাছে, তাঁকে শূন্য হাতে ফিরে আসতে হয় নি। সমাজসংস্কার সব কিছুকে পেছনে ফেলে রেখে কল্যাণী এসে দাঁড়িয়েছেন ধূর্জটির পাশে। সেদিন একটি কোমল হাতের স্পর্শ তাঁর মনে সঞ্চারিত করত অসীম শক্তি, অমেয় প্রেরণা।

কারাগারের অন্ধ কক্ষে বসে মাঝে মাঝে একটি মুখের ছবি তাঁর চোখের সামনে প্রতিভাত হত। সে দুটি চোখে ছিল অগ্নির প্রতিভাস। যৌবনের বিরহ বেদনা তাঁকে স্পর্শ করত না। একটা অসীম তৃপ্তি ছিল মনে, প্রাণে ছিল অদম্য উৎসাহের অফুরান জোয়ারের কলতান।

তারপর একদিন এলো পরম ঈপ্সিত লগ্ন। দেশ স্বাধীন হলো। দেশের চেহারা পরিবর্তন হলো। কিন্তু সে রূপান্তর দেখে চমকে উঠলেন ধূর্জটি। এ কি দেখছেন তিনি? এ তো তিনি চান নি। সুস্থ ভারত কোথা? চারিদিকে নীতিহীনতা। যে সমস্ত সহকর্মী একদিন কঠিন সংকল্প নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা রাতারাতি রূপ বদলে ফেললেন। বঙ্কিমের সন্তানদের অকাল-মৃত্যু দেখে নিদারুণ ব্যথিত হলেন তিনি। সারা ভারতবর্ষ ঘোর অন্ধকারে ঢাকা পড়ল। সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মাঝে শ্মশান শিবাদের অবিরাম চিৎকারে কম্পিত হলো চারিদিক। ধূর্জটির একটি দৃশ্য মনে পড়ল : একদিন তিনি গো-ভাগাড়ের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন, একটা মরা গোরুর ওপর অসংখ্য শকুনি বসেছে : লাল চোখে তাদের মাংসের মাদকতা; তীক্ষ্ণ ঠোঁটে জিঘাংসার বিভীষিকা; গোরুটার পচা মাংস খুবলে খুবলে খায় তারা; দারুণ ক্রোধে পাখসাট মারে অপরকে।

কল্যাণীর মনের দিক পরিবর্তন হয়েছে। যৌবনের কঠিন শপথ শিথিল হয়ে গেছে দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর পেষণে। সংসারের বিরাট চাহিদা মেটে না ধূর্জটির উপার্জনে। প্রতি পদক্ষেপে অনুভব করেন দারিদ্র্যের জ্বালা; প্রতি মুহূর্তে ত্রুটি চোখে পড়ে ধূর্জটির আদর্শবাদের। এবং মাঝে মাঝে—হ্যাঁ, ধূর্জটির বাস্তব-বোধের ঔদাসীন্যে—কল্যাণীর মনে হয়, যৌবনের নীল স্বপ্নের মাঝে ধূর্জটিকে চিনতে তাঁর ভুল হয়েছিল। সেদিন ধারণা হয়েছিল, ধূর্জটি বিরাট, অপার তাঁর শক্তি, অসীম তাঁর জীবনবোধ। কিন্তু আজ? নিজের প্রশ্নের সামনে নিজে থমকে থামেন কল্যাণী। ধূর্জটি আজ তাঁর কাছে একটা শূন্যগর্ভ নিঃশেষিত হাউই। ঊর্ধ্ব-মুখে অগ্নি বিকিরিত হাউইকে তাঁর মনে হয়েছিল, অনন্ত দীপ্তিসম্পন্ন জ্যোতিষ্ক।

কল্যাণী মাঝে মাঝে ধূর্জটির কাছে দরবার করেছেন : তোমার বন্ধুবান্ধবরা অনেকে বড় বড় কাজ বাগিয়ে নিচ্ছে আর তুমি চুপ করে বসে আছ?

নিস্পৃহ কণ্ঠের পাল্টা প্রশ্ন এসেছে ধূর্জটির কাছ থেকে : কি করব?

মাস্টারী করে ক' পয়সা ঘরে আনছ? ছেলেমেয়েদের ভালো খেতে দিতে পারি না, ভালো পরতে দিতে পারি না—এ কি দু'চোখে দেখতে পাও না?

: সব পাই কিন্তু কি করব? তুমি জান, আমি গরীব।

: এ গরীবানা তোমার বিলাস!

: না কল্যাণী এ আমার আদর্শ।

জ্বলে উঠেছেন কল্যাণী : কিসের তোমার আদর্শ? ছেলেমেয়েদের যদি প্রতিপালন না করতে পারো তবে বিয়ে করেছিলে কেন?

: কল্যাণী, এ রকম প্রশ্ন তোমার কাছ থেকে আশা করি নি। সে দিনের কথা এর মধ্যে ভুলে গেলে? যেদিন আমার হাত ধরে সংসারে তুমি পা দিয়েছিলে। বিলাস-বিভব তো তুমি চাও নি।

: সেদিন আজ আর নেই, দিন পাল্টে গেছে।

ধূর্জটি থেমে পড়েন, কল্যাণীর কথাটা তাঁর মনে পড়ে—সত্যি কি দিন পাল্টে গেছে? ভাবতের রূপান্তর ঘটেছে? বিশ্বাস করতে মন চায় না। এতদিনের বিশ্বাসের সৌধ কি এবার ধ্বসে পড়বে? এ তিনি ভাবতে পারেন না।

রাস্তায় চলমান মানুষের স্রোত, ঘরে ঘরে আলোর শয্যা; ক্ষণে ক্ষণে উচ্চ হাসির উচ্ছল রব; সংগীতের সুরেলা রেশ; দূরে আকাশে নিওনের হাতছানি।

এতো আলো, এতো হাসি এতো গান—
সবই বাহানা?

ভাবেন ধূর্জটি। ভাবেন আর পথ চলেন। সকলেই লক্ষ্যের কেন্দ্রে ছুটে চলেছে—তিনি শুধু কক্ষচ্যুত তারার মত শূন্যমার্গে ভেসে চলেছেন।

বিশ্বাস করতে তাঁর মন চায় না।

এই ঘর। চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ ধূর্জটি। ঘরে আলো জ্বালা নেই। অন্ধকার ঘরের মধ্যেই তিনি বসে থাকেন। বাড়ির চারদিকে আলোর রোশনাই। শুধু তাঁর ঘরে অগাধ অন্ধকারের বিস্তার। অথচ এ রকম হওয়া উচিত ছিল না। হিসেব অনুযায়ী অন্য রকম হওয়া উচিত ছিল। সব ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। হিসেবের বাঁধা পথটা হঠাৎ বেঁকে গেছে। কেন এমন হলো, তিনি ভেবে পান না।

সকলের গলার স্বর তিনি শুনতে পান। কিন্তু কথার উচ্চারণগুলোকে ঠিক ধরতে পারেন না। সব যেন কেমন অস্পষ্ট। মাঝে মাঝে ওঠে কলরোল ... মিশ্রিত ... পড়ে। ওরা, ওই ইন্দ্রাণী, অলোকেশ, বিদিশা, কমলেশ, তাঁর আত্মজ। অথচ ওরা কতো দূরে। ওদের কথা শোনা যায়, ওদের চোখে দেখা যায় কিন্তু ওদের স্পর্শ করা যায় না। একটা দুরতিক্রমণীয় বাধা এসে সামনে দাঁড়ায়। তিনি ভাবেন, নিঃসীম ... আকাশের মধ্যে তিনি যেন এলোক-... । ... তাঁর কক্ষপথ ছুটে চলেছেন।

... আলো জ্বলে ওঠে। ... দেখে ইন্দ্রাণী বিস্মিত হয়। বলে : বাবা, কখন তুমি এসেছ?

ধূর্জটি বলেন : এই কিছুক্ষণ আগে।

: ডাকো নি কেন?

: এমনি।

: তোমার শরীর ভালো আছে?

: হ্যাঁ।

: চা দোব?

: দে।

ইন্দ্রাণী চলে যায়। বড়ো মেয়ে। ভালো! মেধাবী। এবারে বি. এ. দেবে। ঐ তার একটু তদ্বির-তদারক করে। বড়ো ছেলে অলোকেশ: বিলিতি ফার্মে কাজ করে, ভালো মাইনে। সে ধূর্জটিকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। আজকাল আর বাবা বলে না, বলে 'ওল্ড ফসিল'।

বিদিশা আর কমলেশ তাঁর ধারে কাছে আসে না।

ইন্দ্রাণী চা নিয়ে আসে। বলে : বাবা, তোমার শরীরটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

ধূর্জটি মেয়ের মুখের দিকে তাকান। তাঁর মনে, অভিমান হঠাৎ প্রবল হয়ে ওঠে। কেউ যে তাঁর শরীরের খবর নিতে পারে, এ তাঁর ধারণার বাইরে। সত্যি, এ সংসারে তিনি 'ওল্ড ফসিল'। অনেকদিন আগে তিনি বেঁচে ছিলেন, আজ কোথাও তাঁর অস্তিত্ব নেই। তিনি মৃতের সামিল।

ইন্দ্রাণী মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর আর একজনের কথা মনে পড়ে। এক বিস্মৃত কালে, আরো একটি মেয়ে এমনি করে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াত। উচ্চ গ্রীবায় থাকত কঠিন শপথের ইস্পাত
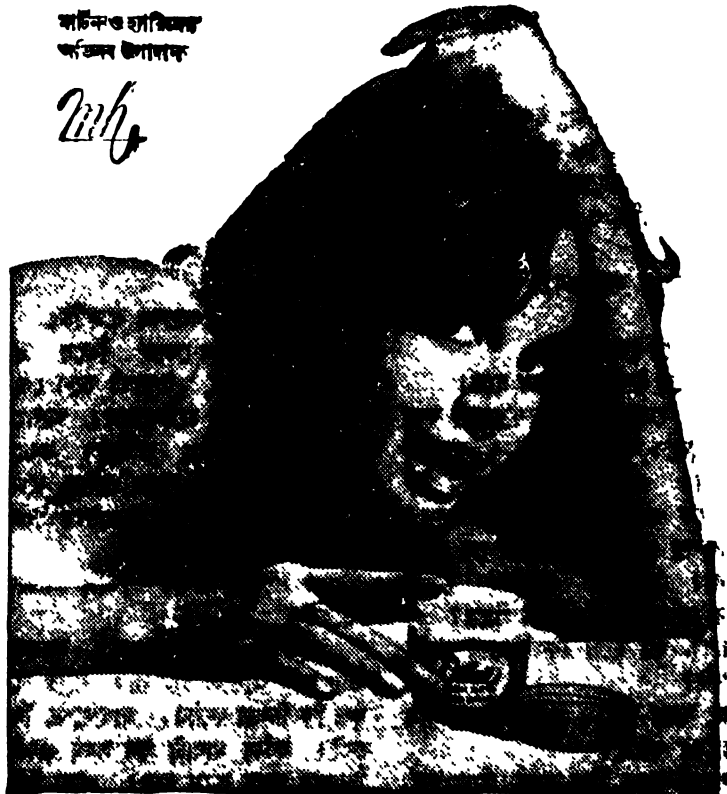
চেতনা। চোখে থাকত দুবার যৌবনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। বুকে ছিল অসীম প্রেমের অফুরান স্রোতোধারা।
: বাবা, তোমার চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।
ধূর্জটি চায়ে চুমুক দেন। ইন্দ্রাণীকে বলেন : তোর পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?
: ভালো।
: ইংরিজি কেমন হলো?
: ইয়ারো কবিতা দুটো বুঝিয়ে দেবে?
: দোব। হ্যাঁরে, কমল পড়াশোনা করে? ওকে তো ইস্কুলে দেখতে পাই না। ও কি রোজ ইস্কুলে যায় না?

ইন্দ্রাণী একটু চুপ করে থাকে। কমলেশের কথা বাবাকে বলতে তার কষ্ট হয়। কমলেশ মা-র প্রশ্রয় পেয়ে ইস্কুল তো ছেড়েই দিয়েছে, উপরন্তু সে দিনরাত হৈ হৈ করে ঘুরে বেড়ায়। কারো কথা শোনে না। এমন কি প্রকাশ্য রাস্তায় তাকে সিগারেট খেতে দেখেছে ইন্দ্রাণী। এ সব কথা বাবাকে বললে, তিনি ভীষণ আঘাত পাবেন, সে জানে। এ বাড়িতে বাবা কারো প্রিয় নয়, ইন্দ্রাণীর অজানা নয়। তাই সে চুপ করে থাকে। ইন্দ্রাণীর নীরবতার অর্থ ধূর্জটির বুঝতে দেরি হয় না। কমলেশের সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা তাঁর কানেও এসেছে। পরীক্ষার হলে কমলেশ অসৎ আচরণ করে। এমন কি তার নকল করার কথাও শিক্ষকমহলে সুবিদিত। কিন্তু কোনদিন সে হাতে-নাতে ধরা পড়ে না।

কল্যাণীকে তিনি দু-একবার কমলেশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। কল্যাণী বলেছেন : কোন প্রমাণ পেয়েছ?
: না।
: তবে?
: ও পড়াশোনা করে না, ইস্কুলে যায় না, ক্লাশ প্রমোশন পায় কি করে?
: সে কথা তুমি ভালো জান।
: তাই তো বলছি, ও বোধহয় টোকাটুকি করে।
: এটা তোমার অনুমান?
: হ্যাঁ।
: ধরা পড়েছে কোনদিন?
: ধরা পড়লে ইস্কুল ছাড়তে হবে।
: দ্যাখো, তোমার আদর্শবাদের কথা শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেল। তোমার আদর্শবাদের কি মূল্য? কে এর কানাকড়ি দাম দেয়? তুমি একবার চোখ খুলে দ্যাখ কে চুরি করছে না। সত্যমেব জয়তের দেশে মিথ্যাচার না করে কে বাঁচতে পারে?
: কল্যাণী, তা হলে কি সত্যের কোন মূল্য নেই?
: আছে, যারা ফুলস প্যারাডাইসে বাস করে তাদের কাছে।

কল্যাণী হয়ত ঠিক কথা বলেছেন, তিনি নির্বোধের স্বর্গে বাস করেন। তাঁর শিক্ষা ব্যর্থ, ব্যর্থ তাঁর নীতি। এ যুগে কেউ সৎ থাকতে পারে না। চারিদিকে মিথ্যাচার, প্রলোভনের দীর্ঘ প্রসারিত হাত। কালো হাতের ক্লেদাক্ত স্পর্শ থেকে কারো নিস্তার নেই।

একদিনের কথা তাঁর মনে পড়ে। সকালবেলা একটা লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। পরিচয় দিলেন শিক্ষক বলে।

ধূর্জটি বলেন : কি করতে পারি আপনার জন্যে?
: আমার একটা ইংরিজি গ্রামার আপনার ইস্কুলে ধরাতে হবে।
: বেশ, স্পেশিমেন কপি পাঠিয়ে দেবেন।
: এই নিন।

বইটা এগিয়ে দেন ভদ্রলোক। ধূর্জটি বইয়ের পাতা উল্টে যান। পাঁচটি দশ টাকার নোট মেঝেতে পড়ে যায়। ধূর্জটি নোট কটি কুড়িয়ে নিয়ে বলেন : এরকম অসাবধান করে টাকা রাখেন কেন?

ভদ্রলোক একটু হেসে বলেন : ও টাকা আপনার।

বিস্মিত ধূর্জটি বলেন : আমার কি রকম?
: আপনার প্রাপ্য।

ধূর্জটি ইঙ্গিত বুঝতে পেরে রুষ্ট হয়ে ওঠেন। জলদগম্ভীর স্বরে বলেন : ঘুষ দিতে এসেছেন। বেরিয়ে যান বলছি।

ভদ্রলোক হতভম্ব। কি বলবার চেষ্টা করেন কিন্তু ধূর্জটি গর্জন করে ওঠেন : কোন কথা নয়, আগে বেরিয়ে যান।

ভদ্রলোক চলে যান। কল্যাণী আসেন। প্রশ্ন করেন : কি হলো?

ধূর্জটি আনুপূর্বিক ঘটনা বলেন। কল্যাণী সব শুনে বলেন : এতে ক্ষতি কি হচ্ছিল?
: তুমি বলতে চাও, আমি ঘুষ নোব?
: মাসের শেষে পঞ্চাশ টাকার মূল্য কিন্তু কম নয়। যারা সংসার করে তাদের কাছে টাকার দাম আছে।
: অঃ।

চুপ মেরে গেছলেন ধূর্জটি।

চিন্তার জগৎ থেকে ফিরে এসে ধূর্জটি দেখেন, ইন্দ্রাণী চলে গেছে। কাপের চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আজকের পৃথিবীর রূপান্তর ঘটেছে। কল্যাণী হয়তো ঠিক কথা বলেছিলেন, ধূর্জটি নির্বোধের স্বর্গে বাস করছেন। কিন্তু সত্যি কি তাই?

এ প্রশ্নের জবাব তিনি কোথায় পাবেন?

ধূর্জটি শুয়ে পড়েন। আজকাল তাঁর ঘুম আসতে চায় না। শুয়ে শুয়ে কত কি চিন্তা করেন। মাথামুণ্ডু কিছু নেই। ফাঁকা মাথাটা সব সময় একটানা চিন্তার জাল বুনে যায়। শুধু চিন্তা, কেবল চিন্তা। চিন্তার একটানা মিছিল।

কল্যাণী ঘরে আসেন। মশারির মধ্যে এসে বসেন। বলেন : আজ তুমি ইস্কুল থেকে ফিরে অন্ধকার ঘরে বসেছিলে কেন?

ধূর্জটি কল্যাণীর প্রৌঢ় মুখের দিকে চেয়ে কি যেন খুঁজে ফেরেন। অনেকদিন পরে এমন শান্ত সহজ সুরে কল্যাণী কথা কইছেন। এমন ঘনিষ্ঠ নৈকট্য ইদানীং কালে মনে পড়ে না।

বলেন : এমনি।

কল্যাণী ধূর্জটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন : তোমার শরীরটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে একবার চেঞ্জে যাও না।
: চেঞ্জে যাবার মত অবস্থা আমার নয়। যা মাইনে পাই সব তোমার হাতে তুলে দিই, তাতে তোমার সংসার চলে না, চেঞ্জে যাব কি করে?
: তা বলে শরীর খারাপ হলে মানুষ চেঞ্জে যাবে না? না তোমার কোন কথা শুনেছি না, এ্যানুয়াল পরীক্ষার পর একবার ঘুরে এসো।

এ কি অনুরোধ, মিনতি না আদেশ? এই রাত গভীরে, নিদালী নিশীথে, স্তব্ধ ঘরে ধূর্জটির কেমন যেন অবাক লাগে। কালের চাকা কি উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করেছে? না কি পুরনো একটা রাত অতীতের যবনিকা সরিয়ে, অঙ্গে অঙ্গে স্বপ্নের রেণু মেখে বেরিয়ে এসেছে?
: কি চুপ করে আছ যে?
: ভাবছি।
: কি এতো ভাবো?
: কল্যাণী, ভাবনার কি শেষ আছে? যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ চিন্তা করতেই হবে।
: ছেলে বড়ো হয়েছে, উপায় করছে, এবার তুমি ছুটি নাও।
: বলছ যখন তাই হবে।

কল্যাণী চুপ করে যান। তাঁর কথার পরিধির শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছেন তিনি। এবার নীরবতা। কল্যাণীর ডান হাত ধূর্জটির বুকের ওপর চলাফেরা করে। ধূর্জটি মশারির বাইরে তাকিয়ে থাকেন। দেয়ালের গায়ে একটা টিকটিকি চুপ করে বসে থাকে। চোখে তার আলো পড়ে চক চক করে। বাতাস আসে মশারি কাঁপিয়ে।

একটু পরে কল্যাণী বলেন : সুকোমল মিত্র নামে তোমার কোন ছাত্র ছিল?

ধূর্জটি একটু চিন্তা করেন। কতো নাম, কতো মুখের মিছিল চোখের সামনে দিয়ে পার হয়ে যায়। সব নাম মনে থাকে না, সব মুখ চেনা যায় না। বলেন : হতে পারে। তাকে কিসের দরকার?
: ঐ সুকোমল এখন সিমেন্টের ইন্সপেক্টর হয়েছে।

: হতে পারে।

: ওকে ধরে একটা সিমেণ্টের পারমিট বার করে দিতে পার?

: কার পারমিট?

: অমলের অফিসের বড়বাবুর।

: তিনি নিজেই তো করতে পারেন।

: করতে পারলে তোমাকে বলবো কেন? একে ঘুষ দিতে হবে, তার ওপর ধরা-করা ঘোরাঘুরি করতে হবে।

: কল্যাণী এ অন্যায় কাজ আমার দ্বারা হবে না।

: ছেলেটার কাজে উন্নতি হয়, এ তুমি চাও না?

: চাই। সব বাপ-মা-ই চায় ছেলের উন্নতি হোক কিন্তু তা ফেয়ার মিনসের দ্বারা। ঘুষ দিয়ে উন্নতি হোক, এ আমি চাই না।

সহসা কল্যাণীর মুখের পেশীগুলো কঠিন হয়ে ওঠে। চোখে জ্বালা ধরে ক্রোধে। বলেন : কবে তোমার জ্ঞান হবে? সে পাজোর যে মনতোর।

: কেউ কেউ অজ্ঞান থেকে যায় সারা জীবন, আমি তাদের একজন। তোমাদের পুজোর মন্ত্র আমার আর এ জন্মে শেখা হোল না।

: এই করে নিজের সারা জীবন বরবাদ করলে, জানো না?

: জীবন বরবাদ হয়েছে কি না জানি না, তবে এটুকু জানি, কোন অন্যায় কাজ কোনদিন করি নি। সারা জীবন সৎ থাকবার চেষ্টা করেছি। প্রলোভনের কাছে মাথা নোয়াই নি। মাথা উঁচু করে এতকাল চলেছি, বাকি জীবনটাও চলব।

: চুপ করো। তোমার গসপেল তুলে রাখ তোমার ছাত্রদের জন্যে।

কল্যাণী পাশ ফিরে শুয়ে পড়েন। আর ধূর্জটি শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। ঘরের আলো জ্বলে। বাইরে মশার অবিরাম গুঞ্জন। কল্যাণীর দ্রুত নিশ্বাস শুনতে পান। মৃত আগ্নেয়গিরির মধ্যে হঠাৎ প্রাণ সঞ্চার হয়েছে। এবার বিস্ফোরণের পালা।

ধূর্জটি আলোটা নিভিয়ে দেন। জানালার ধারে এসে দাঁড়ান। আকাশে তারার দীপান্বিতা, সারা শহর অন্ধকারে ঢাকা। কোথাও কোন আলোর নিশানা নেই। আকাশের আলো পৃথিবীর বুকে এসে পৌঁছয় না।

টিচার্স রুমে আনন্দের জোয়ার। সকলের মনের আশা এতদিন পরে পূর্ণ হতে চলেছে। ধূর্জটির ছেলে কমলেশ এবার টেস্টে ধরা পড়েছে নকলসমেত। ছেলেটা বেশ চালিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু শেষ দিন ব্রজকমলবাবুর শ্যেন দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে নি। সেদিন তিনি যে আনন্দ পেয়েছিলেন তা জীবনে কোনদিন পান নি।

সব টিচারদের একটা-না-একটা ব্যথার স্থান আছে। ধূর্জটির আদর্শবাদ সকলেরই ছোবল মেরেছে। এতোদিন পরে সেই ছোবল তাঁর দিকে ফিরে দাঁড়িয়েছে।

[illegible] এদের জিঘাংসা আজ নগ্ন হয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

ব্রজকমল বলেন : এবার দেখা যাবে।

বারীন বলে : ভগবানের আর দুনিয়ার নয়। ওদিকে খবর এসেছে, গুরুদ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে। দেখা যাক, কি হয়।

মোহিত বলে : মা কালী, জোড়া পাঁঠা দোব, মুখ রেখো।

ওদিকে নিজের ঘরে বসে ধূর্জটি চিন্তা করেন। বাইরে ছেলের গোলমাল শোনা যায়। রেজাল্ট বার করতে হবে। এ কটা দিন তাঁর ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। কল্যাণী তাঁকে শাসিয়েছেন, আত্মঘাতী হবেন বলে।

কল্যাণীর যুক্তি : কে না চুরি করে?

এ কথা ধূর্জটি মানতে পারেন না। চুরি না করলে এ দুনিয়ায় বাঁচা যায় না, এ কথা বিশ্বাস করতে তাঁর মন চায় না। তাঁর বিশ্বাসের ভিত্তিমূল ধীরে ধীরে আলগা হয়ে আসছে। সংসারে যাঁর হাত ধরে সব বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করে এসেছেন, সেই কল্যাণী তাঁর পরম বৈরী। হ্যাঁ, এ কথা স্বীকার করতে তাঁর দ্বিধা নেই। তাঁর ভালবাসার ওপর কল্যাণী অনেক অত্যাচার করেছেন এবং ধূর্জটি তা সব সহ্য করেছেন দিনের পর দিন। আর নয়। কল্যাণী যদি আত্মহত্যা করতে চান, করতে পারেন।

ধূর্জটি কলিং বেল টেপেন। বেয়ারা বামকিশান ঘরে ঢোকে। ধূর্জটি বলেন : শ্যামবাবু

ক্লার্ক শ্যামবাবু আসেন। ধূর্জটি বলেন : রেজাল্ট তৈরি হয়ে গেছে?

: হ্যাঁ। কিন্তু কমলেশ

: ও' সেন্ট আপ হবে না।

রেজাল্ট টাঙানো হয়। টিচার্স রুমে শোকের ছায়া নামে। কারো মুখে কোন কথা নেই। এবারেও ধূর্জটি জিতে গেলেন। এ তাঁদের কল্পনাতীত। এ পরাজয় তাঁদের সকলের। মোহিত বলে : না ঠাকুর-দেবতাদের ওপর আর নির্ভর করা যায় না।

ধূর্জটির মনে গভীর প্রশান্তি—নিষ্ঠার কর্তব্য সমাধা করতে পেরেছেন। এ ক'দিন তাঁর জীবনের অগ্নিপরীক্ষা গেছে। ইন্দ্রাণী ছাড়া সকলে তাঁর প্রতি বিমুখ। কল্যাণী কথা বন্ধ করেছেন। অমলেশ তাঁর ছায়া মাড়ানোকে পাপ মনে করে। বিদিশা ঘৃণায় নাক কুঁচকিয়েছে। আর কমলেশ নাকি তাঁকে [illegible] করবার পরিকল্পনা করেছে।

অনেকদিন পরে গঙ্গার তীরে এসে বসেন। ছোটবেলা থেকে এ জায়গাটা তাঁর ভালো লাগে। বেশ নিরিবিলি। শহরের কোলাহল এখানে এসে পৌঁছয় না। সামনে গৈরিক চলমান জলধারা।

সন্ধ্যে হয়ে আসে। জেলেডিঙিতে আলো জ্বলে। এক [illegible] আলো পড়ে [illegible]। শীতের বাতাস শরীরে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। ধূর্জটি উঠে পড়েন।

বাড়িতে ঢোকার মুখে ছোট একটা জনতা। ধূর্জটি চঞ্চল হয়ে পড়েন। ব্যাপার কি কেউ খুলে বলেন না। বাড়িতে ঢুকে দেখেন ডাক্তার এসেছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন : ব্যাপার কি ডাক্তার?

: কল্যাণী দেবী আফিং খেয়েছেন। এ কেস অব সুইসাইড।

চমকে ওঠেন ধূর্জটি—সত্যি কল্যাণী আত্মহত্যা করতে চায়? দ্রুত কল্যাণীর ঘরে ঢুকতে চান। অমলেশ বাধা দেয় : আপনি খুনী। বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে।

ধূর্জটি তার কথা বুঝতে পারেন না। বলেন : কি বলছ অমল?

গর্জে ওঠে অমলেশ : হ্যাঁ, য়্যু আর দ্য মার্ডারার. আপনি মাকে খুন করেছেন।

ইন্দ্রাণী এগিয়ে আসে। বলে : কি বলছ, দাদা?

: তুই চুপ কর।

: বাবা তুমি এসো ..

ইন্দ্রাণী হাত ধরে ধূর্জটিকে কল্যাণীর বিছানার কাছে নিয়ে যায়। ধূর্জটি পাথরের মত নিশ্চল হয়ে বসে পড়েন। কল্যাণীর মুখের দিকে তাকান। নিমেষের ছায়া কল্যাণীর গোটা মুখে।

চোখ বোজা। ঠোঁট শুকনো। বিস্রস্ত চুলের রাশ।

ধূর্জটি ডাকেন : কল্যাণী।

চোখ খোলেন কল্যাণী।

: এ তুমি কি করলে?

কল্যাণী ধূর্জটির একটি হাত তুলে নেন নিজের হাতে। বলেন : তুমি সুখে বাঁচো। ধূর্জটি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন কল্যাণীর পাংশু মুখের দিকে। গভীর বেদনায় তাঁর মন ভরে যায় কানায় কানায়। দুই শিথিল বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরতে চান কল্যাণীকে। তাঁর একান্ত আপনজন—তাঁর জীবনের দীপশিখা।

একটি স্বর ডাকে : বামকিশান!

বামকিশান বেরিয়ে আসে। চোখে তার বিস্ময় : আপনি?

: হ্যাঁ, অফিস ঘরটা খুলে দাও।

বোর্ডে একটা নাম ওঠে—কমলেশ চট্টোপাধ্যায় সেন্ট আপ।

একটা ছায়া বেরিয়ে আসে। বাইরে আঁধারের বন্যা। চলার পথের সব দীপ নিভে গেছে। কানের পাশ দিয়ে বাতাস বয়ে যায় জোরে। বিদ্রূপের অট্টহাসি ছড়িয়ে পড়ে নিঃসীম আকাশের নীরব আঙিনায়। দ্রুত পা চালায় ছায়া। আর এ আলোর রাজ্যে নয়, এবারে লুকিয়ে পড়তে হবে আঁধারে—কোন অন্ধ-বিবরে।

কিউবার আশেপাশে

সুরেশচন্দ্র সাহা

[illegible] ডঃ গাঙ্গুলীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ডঃ রমা গাঙ্গুলী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা ছাত্রী, মাইক্রোবাইওলজির প্রচণ্ড পি এইচ-ডি। বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার কর্মী হিসেবে আমেরিকায় এসে তিনি তখন ইউনিভার্সিটি টেকসাস মেডিকেল ব্র্যাঞ্চের গ্যালভেস্টনে গবেষণা করছিলেন।

গ্যালভেস্টনের অদূরে নাসার বৈজ্ঞানিক কারখানায় তৈরি মহাকাশযান কেপ কেনেডি থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে হিউস্টন থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। কিন্তু হিউস্টনের গর্ব তার এ্যাস্ট্রোডোম—বিশ্বের প্রথম শীতাতপনিয়ন্ত্রিত স্টেডিয়াম। পৃথিবীর অষ্টমাশ্চর্যও বটে। ত্রিশ মাইলের হিউস্টন অথবা একশ মাইলের নাসার বিস্ময় ডঃ গাঙ্গুলীর মনোযোগ যত আকৃষ্ট করেছে সাতশ মাইল দূর ক্যারিবিয়ানের রাজনীতি তার চেয়ে কম নয়। সত্যি আজ ক্যারিবিয়ান সাগর রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ [illegible] সব মতই রোমাঞ্চকর। আমার [illegible] ক্যারিবিয়ান যাবার আগে ওঁর সঙ্গে সেই আলোচনাই হচ্ছিল।

গ্যালভেস্টন থেকে এগিয়ে চলেছিলাম জাহাজে। সামনে দেখা হল একটি যাত্রীবাহী জাহাজের সঙ্গে। নাম তার ক্যাবো ইজাবা। ক্যারিবিয়ান থেকে আমেরিকার এই দিকটাতে ক্যাবো ইজাবা ঘন ঘন পাড়ি জমায়। দেশীয় রীতিতে ইজাবা আমাদের অভিবাদন জানাল লম্বা মাত্রার ভোঁ ভোঁ করা বাঁশি তিনবার বাজিয়ে। তারপর মাস্তুলে উড়িয়ে দিল তিন অক্ষরজ্ঞাপক তিনটি নিশান WAY, যার অর্থ—তোমাদের যাত্রা শুভ হোক। ক্যারিবিয়ান দ্বীপগুলির বেশির ভাগ আবিষ্কার করেছিলেন ক্রিস্টোফার কলম্বাস। সেই দ্বীপাবলীমেখলা সাগরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ক্যাবো ইজাবার অর্থবহ অভিবাদন আমাদের ভাল লাগল, কিন্তু কোথায় আজ কলম্বাস, কোথায় দিগ্বিজয়ের দ্বীপে দ্বীপে তাঁর পদচিহ্নের ছাপ। আজ ক্যাস্ট্রো মার্কা লাল জুজু ক্যারিবিয়ানের কূলে কূলে নীল জলের ধারে ধারে মাথা তুলে প্রতি মুহূর্তে বলছে—এই যে আমি এসেছি।

আর তখন আমেরিকার ওয়াশিংটনে ভূমিকম্পন ঘটে যাচ্ছে।

গ্যালভেস্টনের বাইরে এসে পাইলট যেখানে আমাদের ছেড়ে দিয়ে গেলেন সেইখান থেকে দেখছিলাম বিলীয়মান কূলের কলঙ্করেখা। নীলে সবুজে জলরাশি রূপালী আভায় দীপ্ত হয়ে কানায় কানায় ভরে আছে। এইখান থেকে মিসিসিপির মোহনা ২৮০ মাইল দূরে। সেই মিসিসিপি উজিয়ে দুশ' মাইল গিয়ে একদিন যা খুঁজে বেড়িয়েছিলাম, আজ তারই যেন আভাস ছিল টেকসাসের দিগন্তরেখায়—নদী কিনারে পিয়া পুকারের মত একটি ব্যথার সুর।

বিয়াল্লিশ ঘণ্টার পর মেক্সিকো উপসাগরের শেষে ক্যারিবিয়ানের ছাই ছাই রঙের জল কম্পিত মেঘের ছায়া দেখে মনটা মোচড় দিয়ে উঠল। তবে যে শুনেছিলাম ক্যারিবিয়ানের জল নীল। এইখানে ডানদিকটাতে মেক্সিকোর ইউকাতান অন্তরীপটি এগিয়ে এসে স্তব্ধ হয়ে থেমে গেছে। কিউবার একটি ক্রমশ সরু অগ্রভাগ বাঁদিকে ক্রমে এগিয়ে আসছিল ইউকাতান তাকে এক ধমকে থামিয়ে দিয়েছে। এটি ক্যারিবিয়ান সাগরের পশ্চিমপ্রান্ত। হন্ডুরাস ও গুয়াতেমালার উপকূল পশ্চিম ক্যারিবিয়ানকে কিছুটা ঘিরে রেখেছে। ক্যারিবিয়ানের উত্তরে কিউবা হাইতি, ডোমিনিকান রিপাবলিক পোর্টোরিকো দ্বীপ। পূর্বে আটলান্টিকের সঙ্গে এর বিভেদ ঘটিয়ে ছড়িয়ে আছে ভার্জিন আইল্যান্ডস গুয়াডেলুপ, ডোমিনিকা, মার্তিনিক সেন্ট লুসিয়া, গ্রেনেডিনস ইত্যাদি দ্বীপগুলি। জ্যামিতিক রেখা টেনে সব কটিকে যোগ করলে মনে হয় যেন অল্প গুণ টানা একটি ধনুক। ক্যারিবিয়ানের দক্ষিণে দক্ষিণ আমেরিকার ভেনিজুয়েলা, কলাম্বিয়া এবং মধ্য আমেরিকার পানামা, কস্টারিকা, নিকারাগুয়ার সাগরসীমা। সুতরাং সব মিলিয়ে ক্যারিবিয়ানকে বলা হয় ল্যান্ড-লকড সি। আমাদের ছোটবেলাকার ভূগোলের ভাষায় হ্রদ অবশ্য আকারে আরও অনেক ছোট।

বিশ্ব রাজনীতিতে লালিমরেখা

আর যেন বিশেষ দুটি খাতে বয়ে চলেছে—ভিয়েৎনামের জঙ্গলে তার [illegible] ক্যারিবিয়ানের কূলে কূলে কিউবার বক্ষের দিকে লক্ষ্য রেখে। আমেরিকার রাজনীতিরও আজ তাই বিশেষ দুটি দিক—দূরের ভিয়েৎনাম কাছের ক্যারিবিয়ান। ক্যারিবিয়ানের দ্বীপে দ্বীপে একটি করে আস্ত ফিদেল ক্যাস্ট্রো কিভাবে রাতারাতি খাড়া হয়ে না বসে সেজন্য আমেরিকার ঘুম নেই। চিন্তা ও ভাবনার অন্ত নেই। চক্ষু[illegible] বালাই নেই। ভিয়েৎনাম যুদ্ধ যতই দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে ওয়াশিংটনের কর্তারা ততই ক্ষ্যাপা ক্ষ্যাপা হয়ে উঠছেন [illegible] হটা [illegible] আরও [illegible] এবং অন্য সব অর্থাই [illegible] দাক্ষিণ্য ছড়িয়ে দেওয়া উচিত কি না তাই নিয়ে গবেষণা করছে। যুক্তরাষ্ট্রের অনেকেই কিন্তু প্রেসিডেন্ট জনসনের সঙ্গে তখন একমত হতে পারছিলেন না—কম্যুনিস্টদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একদিন না একদিন আমাদের লড়তে হবেই। সেটি কেন এখনই নয়, কেন নয় ভিয়েৎনামে? যাঁরা আরও একটু ভাবিক লোক, এবং যাঁরা চিন্তাশীল তারা কিন্তু বরাবর বলে এসেছেন—ভিয়েৎনামের শেষ নেই, শেষ নেই তার পরিণামের।

আমেরিকার কবি ও সাহিত্যিক নরম্যান মেইলার লাল রাজনীতিওয়ালা নন বুর্জোয়াও নন—একেবারে নির্ভেজাল বাস্তববাদী মানুষ। একের পর একজন মেয়েকে ভালবেসে তিনি বিয়ে করেছেন, তারপর ডাইভোর্স করেছেন। চতুর্থ পত্নীর সঙ্গে যখন মনান্তর হল, সাহিত্যিকপ্রবর প্রিয়তমার বুকে তখন দিব্যি ছুরি চালিয়ে দিলেন। এই সময় ভদ্রলোক ছিলেন আমেরিকার [illegible] এবং নিউইয়র্কের মেয়রের পদপ্রার্থী। এই নরম্যান মেইলার সাহেব একদিন প্রেসিডেন্ট জনসনের সমালোচনায় বলছিলেন—আমেরিকার চতুরতম প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত অচতুর আচরণ করেছেন ভিয়েৎনামে। প্রেসিডেন্ট কেনেডি হলে অমন করে জড়িয়ে পড়তেন না—

কম্যুনিস্টরা যে ঘোর ক্যানিব্যালিস্ট তা তিনি জানতেন। নরম্যান মেইলার অন্য অনেক প্রজ্ঞাশীল আমেরিকানের মতই এই কথা বিশ্বাস করেন, আর বলেন—লড়ুক না ওরা নিজেরা, একদিন একে অপরকে সাবাড় করে ফেলবেই।

কিউবার শূকরোপসাগরের শোকাবহ নাটক আমেরিকাবাসীরা ভোলেন নি, এখনও ভোলেন নি লিণ্ডন জনসন, যে নাটকের অপটু (?) পরিচালনার জন্য জন এফ কেনেডিকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। টেকসাসবাসীরা আজও কিন্তু টগবগিয়ে উঠে বলেন—কেনেডির ভুলের জন্য আমরা কিউবাকে হারিয়েছি। সুতরাং আর নয়—দ্বিতীয় কিউবার পুনরভিনয় কোথাও আমরা কিছুতেই ঘটতে দেব না। আমেরিকার কূল থেকে ক্যারিবিয়ানের নীল জলে আজ শুধু এই কথাই প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে—ভিয়েতনামে, ক্যারিবিয়ানে, ওয়াশিংটনে চিরজীবী হয়ে বেঁচে থাক আমেরিকা; আর সব যাক রসাতলে।

কিউবার শতখানেক মাইল দূরে জ্যামাইকা। এখানে ক্যারিবিয়ানকে দেখে আনন্দের সীমা রইল না। কি 'সোহাগী নীল জল' জ্যামাইকার তীরে প্রহত হয়ে ঢেউগুলি ফিরে আসছে। কদলী লবঙ্গ কিংবা দারুচিনিবনের একটি গাছও বিশিষ্ট হয়ে চোখে পড়ল না। নীল আকাশের নিচে নীল সাগরের তীরে [illegible] জ্যামাইকা নীলকান্ত মণিটির মত উদ্ভাসিত হয়ে আছে। দিগ্বিজয়ী কলম্বাস এইখানে এক বছর বাস করেছিলেন। মনে হয় নাবিক কলম্বাস হয়ত ছিলেন নিসর্গ কবি।

আমাদের অনেকেরই পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে রূপ-বিস্তর পরিচয় আছে। সে পরিচয় বেশির ভাগই [illegible] মাঠে ও পর্দে, ক্রীড়াজগতের মধ্য দিয়ে। ভারতীয়—এই কথাটি পশ্চিমের এই গোলার্ধে একটি বহুব্যবহৃত শব্দ। কলম্বাস সমুদ্রের পথে বের হয়েছিলেন ভারত আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে। আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে এসেই ভেবেছিলেন সত্যিকারের ভারতবর্ষে তিনি পৌঁছে গেছেন। নতুন দেশের অধিবাসীদের অভিহিত করেছিলেন ইণ্ডিয়ান বলে। আজও বজায় আছে সেই নাম। আমেরিকার অনেককেই জিজ্ঞেস করেছিলাম—আপনার পূর্বপুরুষ কোন্ দেশের লোক ছিলেন? শতকরা তিনজনের কাছে জবাব এসেছে—আমরা ইণ্ডিয়ান। হিউস্টনবাসী একজন মেক্সিকান ভদ্রলোক বলেছিলেন—আমরা খাঁটি ইণ্ডিয়ান, সনস অব দি সয়েল। ভেনিজুয়েলা গয়াতেমালা কিংবা ব্রাজিলের লোকেরাও বলে—আমরা ইণ্ডিয়ান। স্থানীয় অধিবাসী বাদে ইউরোপীয় লোকেরা এইসব দেশে আসলে বহিরাগত—গায়ের জোরে জমিয়ে বসা বেদখলদার মানুষ।

কলম্বাসের আবিষ্কৃত ক্যারিবিয়ান দ্বীপগুলিতে আধিপত্যে স্পেন, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, পর্তুগাল, ডেনমার্ক ইত্যাদি দেশের লোকের মধ্যে অনেকদিন আধিপত্যের লড়াই চলেছিল। ১৬৫০ সালে সামান্য স্থিতাবস্থা এলো, কলোনী স্থাপনের কাজ একটু একটু করে এগিয়ে চলল। তারপর পরবর্তী দু'শ বছর কেটে গেল গোলমাল দখল বেদখল জবরদখলের মধ্য দিয়ে। শেষ পর্যন্ত অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে এলো সম্রাট নেপোলিয়নের পতনের পর।

কলম্বাসের আগমনের আগে দক্ষিণ আমেরিকার ভেনিজুয়েলা থেকে কিছু ইণ্ডিয়ান এসে হাজির হয়েছিল ডোমিনিকা দ্বীপে—অবশ্য বর্তমান ডোমিনিকান রিপাবলিক নয়, ভিন্ন একটি দ্বীপ। তখন ডোমিনিকার ইণ্ডিয়ানদের শৌর্য-বীর্যের খ্যাতি ছিল। ভেনিজুয়েলার ইণ্ডিয়ানরা এসেই স্থানীয় পুরুষগুলিকে খেয়ে ফেলল, আর মেয়েগুলিকে বিবি বানিয়ে ধরে তুলল। মাংসের ভক্ষণ আর রক্তের মিশ্রণের মধ্য দিয়ে ডোমিনিকান শৌর্য-বীর্যের উত্তরাধিকারী হবার পক্ষে এই নাকি ছিল তাদের সহজ পথ।

[illegible] অভিযানের সময় ১৫০২ সালে কলম্বাস যখন তিন [illegible] মার্টিনিক দ্বীপ আবিষ্কার করেছিলেন। তখন [illegible] যুগের সূচনা হতে চলেছে। দিল্লীর সিংহাসনে বাবর তখনও এসে বসেন নি। পানিপথের ধূলিও ইব্রাহিম লোদীর রক্তে রাঙা হয়ে ওঠে নি। ক্রমে আরও দেড় শতাধিক বছর চলে গেল, পলাশীর পথ বেয়ে ভারতে এলো ইংরেজ—আটলান্টিক, উত্তমাশা অন্তরীপ এবং ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে। কলম্বাস থেকে ক্লাইভ, কিংবা আকবর থেকে মাউন্টব্যাটেন যুগ পর্যন্ত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের কেউ কখনও অ্যাটলান্টিক, ক্যারিবিয়ান, প্রশান্ত মহাসাগরে বের হল না। ভাবপ্রবণ বাঙালী খেলো কল্পনার মাদকের তাল ঠুকে বঙ্গীয় নৌকীর্তির জয়গান করবার জন্য কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গদগদস্বরে গেয়ে উঠল—আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিল জয় ইত্যাদি। কিন্তু সে ত' প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে লঙ্কা জয় করবার ইতিকথা। অবশ্য ১৯৪৮ সালের এক সুপ্রভাতে [illegible] আমরা বঙ্গোপসাগরে বের হয়েছিলাম, গভীর জলে মৎস্য শিকার করতে। তার ইতিহাস খুব সুখপাঠ্য নয়। ক্যারিবিয়ানে কেবলই মনে হচ্ছিল, চারশ' বছর আগে যদি আড়াই হাজার বছরের পুরনো মডেলে জাহাজ তৈরি করে বঙ্গসন্তানরা একবার এই দিকটাতে পাড়ি জমাতেন, তাহলে কিউবা-জ্যামাইকা কিংবা বাহামাস বার্বাডোসের একটি দ্বীপও কি আমরা আজ আমাদের বলে দাবি করতে পারতাম না!

কিউবা, জ্যামাইকা, হাইতির পর এগিয়ে এলাম ডোমিনিকান রিপাবলিকের কাছে। ডোমিনিকান রিপাবলিকের বর্তমান রাজধানী স্যান্টো ডোমিংগো ফ্লোরিডার মায়ামী থেকে আটশ' মাইল দূরে। ১৫০৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর ক্রিস্টোফার কলম্বাস বর্তমান হাইতি (প্রশান্ত মহাসাগরের তাইহিতি নয়) এবং ডোমিনিকার মিলিত দেশটি দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন—লা আইলা এসপ্যানোলা (LA ISLA ESPANOLA) তাই দ্বীপটির নামকরণ হয়েছিল হিসপ্যানিওলা। টাসমেনিয়ার জল-বায়ু, বন-প্রকৃতি, তার পাহাড়ের পাথরে পাথরে বরফের স্তর দেখে বৃটেনের কাপ্টেনরাও একদিন বলে উঠেছিল—এ দেখি নিউ ইংলণ্ড। [illegible] হিসপ্যানিওলার [illegible] আগের [illegible] হিসপ্যানিওলা [illegible] কিন্তু [illegible] হিসপ্যানিওলার [illegible] আর হয়ত [illegible] বসে বসে তাই ভাবি।

১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে ডোমিনিকান রিপাবলিকে একটি গণ-অভ্যুত্থানের সূচনা হয়, ১৯৬৩ সালের গদিচ্যুত প্রেসিডেন্ট জুয়ান বশের সমর্থকরা বিপ্লবের ঘূর্ণিঝড় ডেকে আনে। তাই-না দেখে সিঁদুরে মেঘ ভীত ওয়াশিংটন প্রায় ল্যাজে-গোবরে এক-রকম বা দ্বিতীয় কিউবায় পরিণত হয়ে গেল ডোমিনিকান রিপাবলিক। কিউবার পর এমন সাংঘাতিক ঘটনা কি আর মনের শান্তি বিঘ্নিত না করে পারে? এমন কি ওয়াশিংটনের সে অশান্তি আরও বেড়ে গেল ফিডেল ক্যাস্ট্রোর এককালের অনুচর ও সহকর্মী, লালচীন-পরিব্রাজক গয়েভারার সুদীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের সূত্রে। শেষ পর্যন্ত গয়েভারা বলিভিয়াতে মৃত্যু বরণ করে প্রমাণ করলেন, তিনি আর বেঁচে নেই। কিন্তু ওয়াশিংটনে কত

[illegible] আছে।

ডোমিনিকান রিপাবলিকে গণ-বিপ্লবের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসন হিমসিম খেয়ে ভাবছিলেন, ওখানে আমেরিকার নাক গলানো উচিত হবে কি না। তাঁর আদেশে ডাক পড়ল সামরিক কর্তাদের, সি-আই-এ শিরোমণিদের, আইন-রাষ্ট্রবিজ্ঞান-ইতিহাস-বিশেষজ্ঞদের। ডাক পড়ল ম্যাক জর্জ বাণ্ডির। এই ভদ্রলোক আদিতে ছিলেন হারবার্ডের অধ্যাপক। আপৎকালে তাঁর সৎপরামর্শের মূল্য আছে মনে করে প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি তীক্ষ্ণধী বাণ্ডিকে ওয়াশিংটনে ডেকে এনেছিলেন। ড্যালাসের পর লিণ্ডন জনসনও তাঁকে ওয়াশিংটনে থেকে যেতে অনুরোধ জানালেন। ডোমিনিকান রিপাবলিকের পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট জনসন বাণ্ডিকে জিজ্ঞেস করলেন—ওখানে আমাদের হস্তক্ষেপ করা কি উচিত? অশান্ত দ্বীপটিতে আমেরিকার জান, মাল মর্যাদার বিচার বিশ্লেষণ করে ম্যাক জর্জ বাণ্ডি জবাব দিলেন—নিশ্চয় উচিত। মার্কিন প্রেসিডেন্টের আদেশে [illegible] সক্রিয় হল [illegible] মার্কিন [illegible] ডোমিনিকান রিপাবলিকে। আর [illegible] রাশিয়া লালচীনে [illegible]। প্রেসিডেন্ট বশকে [illegible] ব্রিগেডিয়ার জেনারেল [illegible] আমেরিকার [illegible] ডলার পেয়ে [illegible] রিপাবলিকের মাটিতে [illegible] দেখালেন।

[illegible] বিপর্যয় [illegible] পোর্টোরিকো। [illegible] থেকে [illegible] মাইল দূরে। প্রতি [illegible] পোর্টোরিকান মানুষ [illegible] আসছে [illegible]—অথচ দোরোপ-[illegible] এবং [illegible]। আমেরিকার [illegible] 'না' নেই। হাওয়াই আর আলাস্কা [illegible] যুক্ত হওয়ার পর [illegible] শোনা যাচ্ছে, পোর্টোরিকো হবে [illegible] রাষ্ট্র—এমন কি মেক্সিকোর আমেরিকাভুক্তি সম্বন্ধেও কিছুর গুজব [illegible] আমেরিকার অনেক জনপদে। এ বিষয়ে একজন মেক্সিকান ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি কিন্তু বলেছিলেন দায় পড়েছে!

পোর্টোরিকোর উপর আমেরিকার ভরসা অনেক। এইখানে বসে ক্যারিবিয়ান শাসনের সুবিধা হবে, হয়ত কিউবার লোকসানও পুষিয়ে নেওয়া যাবে. যদিও মর্যাদা নয়। তবে ঢাকার প্রান্ত হবে আমেরিকার। সি'দুরে মেঘের বর্ণ ক্যারিবিয়ানের নীল জলে কিছুতেই মিশতে দেওয়া হবে না। ঠিক এমন অবস্থায় বসে আজ কিন্তু কোন কোন পণ্ডিত মনে করছেন, যে সব দেশ লালে লাল হবে যেতে চায় তাদের পথে বাধা সৃষ্টি না করাই উত্তম উপায়। বছর দশেক পর সবারই একদিন স্বপ্নভঙ্গ হবে, ঘরে ফিরে সবাই তখন বলবে—দূর ছাই, আগেই ত' ছিলাম ভাল!

কিন্তু সর্বসাধারণ আমেরিকাবাসীর মনের কথা তা' নয়। শুধু ভিয়েতনাম, ক্যারিবিয়ানেই তাঁরা লাল-দুঃস্বপ্নকে বিদায় করে দিতে তৎপর নন—সম্ভব হলে সমস্ত দুনিয়া থেকে তার অবলুপ্তি স্বপ্নে জাগরণে তাঁরা কামনা করেন। তাই উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে আগেই তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন একটি আত্মরক্ষামূলক সংস্থা—ও-এ-এস (অর্গানিজেশন অব আমেরিকান স্টেটস) [illegible] সিন্নাতোর মত। তবু কিন্তু শান্তি নেই—আজ গুয়াতেমালা, কাল বলিভিয়া, পরশু হয়ত ব্রাজিলে কম্যুনিস্ট উৎক্ষেপ প্রকট হবে উঠছে, আর আমেরিকানরা তা দমন করবার জন্য বেমালুম টাকা ঢেলেই চলেছেন। মনে হয় শেষ ডলারটি খরচ করাতেও যেন তাঁরা দ্বিধা করবেন না। কোথাও ত' আর দ্বিতীয় কিউবা ঘটতে দেওয়া যায় না।

১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের কালে সাম্যবাদের ঋষি নিকোলাই লেনিন যে কথাটি বলেছিলেন, হয়ত তাই আজ নতুন করে কারও আবার মনে পড়তে পারে। তিনি বলেছিলেন—জার্মানী সমরসজ্জার মধ্য দিয়ে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হবে, ইংলণ্ড বিলুপ্ত হবে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের মাত্রাধিক তাড়নায়—আর আমেরিকা নিঃশেষ হবে আর্থিক অপচয়ের গুরুভারে!

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আমাদের যেমন যুবশক্তি বলতে কিছু নেই অর্থাৎ যুবশক্তি শুনলে যেমন আমাদের কিছু বেকার, কিছু ছাত্র ছাড়া কিছু মনে আসে না, ইউরোপে কিন্তু ঠিক তার উল্টো। বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপে। আমাদের অবশ্য ছাত্রশক্তি বলে একটা প্রচণ্ড শক্তি আছে। কিন্তু ছাত্রজীবন পেরোলেই আমরা [illegible] চলে যাই। শুধু ধাঁধায় ঘোরা বা বেকার বসে থাকা ছাড়া কোন পথ থাকে না। আর আমাদের মেয়েদের কথা বাদই দিচ্ছি। এ দেশে এখনও মেয়েদের দুটো বয়স—বিয়ের আগের আর বিয়ের পরের।

চেকোশ্লোভাকিয়ার যুবশক্তি যেমন প্রাণচঞ্চল, তেমনি শক্তিমান। অবশ্য দুর্বলতা ছিল না তা নয়। প্রচুর ছিল। এবং স্বাভাবিকভাবেই ছিল। ওদের কাগজ ছিল—ম্লাদা ফ্রন্টা। তার আপিসে গেলে তাক লেগে যেত—বিরাট সংগঠন। গিজ গিজ করছে ছেলেমেয়ে। ভয়ানক গম্ভীর মুখে কেউ কাজ করছে। কোথাও বা টেবিল থাবড়ে তর্ক। আমরা ভারতীয়রা গেলে ওরা বেশ একটু চমকিত হত। অনেকরকম লোকের আনাগোনার মধ্যে আমাদের একটু আলাদা করে বসিয়ে গল্প করত কেউ কেউ। খাওয়াত। কফি বা চা খাওয়া ওসব দেশে প্রচণ্ড বিলাসিতা। ভারতীয়দের চায়ের কথা ভেবে ওরা যখন চা খাওয়াবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ত আমাদের একটু হাসি পেয়ে যেত। সে যে কী বিশ্রী চা! প্যাকেটগুলোয় চায়ের খড়কুটো। ছোট্ট এক চামচের মত চা থাকত প্যাকেটে। তাই কাপে গুলে দুধ ছাড়া খাওয়া। না আছে স্বাদ, না গন্ধ। ওরা তো তাই খেয়েই উচ্ছ্বসিত। ভারতবর্ষ থেকে নাকি এ চা এসেছে। ভীষণ চড়া দামে কেনা জিনিস। দেখেশুনে এ দেশের ব্যবসায়ীদের জন্যে একটু লজ্জা হত।

লুডমিলা আর ডাসা নামে দুটি মেয়ে ছিল। লুডমিলা ইংরিজি ভাষা শিখে দো-ভাষীর কাজ করত। আর ডাসা ছিল কোনো একটা কারখানার শ্রমিক। কি কারখানা মনে নেই। তবে যুব-সংগঠনের আপিসে মেয়েটির খাতির দেখে বোঝা যেত সে তার কর্মক্ষেত্রে সম্রাজ্ঞী। জাহাবাজ মেয়ে কারখানার একটা ডিপার্টমেন্ট ছিল তার অধীনে। ট্রেড ইউনিয়নের কর্মী হিসেবে তার কাজ ছিল একদিকে শ্রমিকদের ভালমন্দ দেখা আর অন্যদিকে উৎপাদন বাড়ানো। উৎপাদন বাড়ানোর ব্যাপারটা পূর্ব ইউরোপে তখন মূলমন্ত্র। আর সেই কাজে সব চাইতে আগে দৌড়েছিল—এদের যুবশক্তি।

লুডমিলা শান্ত প্রকৃতির। সবকিছু বুঝিয়ে দেওয়া ছিল তার কাজ। এ ব্যাপারে ওর কোনো ক্লান্তিও ছিল না। আমাদের প্রয়োজনমত ও এখানে-ওখানে যেত, চেকোশ্লোভাকিয়াকে চেনাত। যুদ্ধের সময় ও ছিল ছোট। বাবা, মা, এক ভাই—সব ফ্যাসিস্টদের অত্যাচারে প্রাণ দিয়েছিলেন। একটি ভাই হারিয়ে গিয়েছিল কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে। এখন ও একা।

ওদেরই সঙ্গে গিয়েছিলাম চার্লস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক উৎসবে। চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের মত আশ্চর্য সুন্দর কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আগে কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না (খানিকটা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আদল আসে)। পাহাড়ী পথ বেয়ে পৌঁছতে হয়। ওঠা-নামার মধ্যেই এর অবস্থান। গোটা জিনিসটাই এত ঐতিহাসিক, এখনকার আধুনিক পরিবেশে একে খানিকটা স্বপ্নাবিষ্ট লাগে।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার শুরু যাঁরা করেছিলেন তাঁর মধ্যে চেক দার্শনিক ইয়ান আমোস কোমেনিয়াস অন্যতম। তাঁরই আদর্শে প্রাগ চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ে (তিনশ' বছর আগে) আধুনিক শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য চতুর্থ চার্লস প্রাগে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৩৪৮ সালে।

এখানে আগে ধনী বংশের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো করত। এখন দ্বার অবারিত। আমাদের দো ভাষী ছেলেটি সব ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখাচ্ছিল। বক্তৃতাগুলো শোনার তেমন উৎসাহ ছিল না। কেন না সব দেশে বক্তৃতা প্রায় একই রকমের হয়। অনেকেই শুনছিল না। আমি গোড়ায় বোকার মত সব বক্তৃতা শুনতাম। শব্দগুলো মুখস্থ হয়ে যেতে লাগল। একজন আমার এই অভ্যাসের কথা শুনে একেবারে অবাক। বলে—'পাগল নাকি? বক্তৃতা তো আহাম্মকরা শোনে। ওসব কাল সকালে কাগজে পড়ে নিও।'

একটা জিনিস বড় চোখে পড়ত। এদের নেতা-প্রীতি। সব দেশের মত এরাও রাজনৈতিক নেতাদের দেবতার আসন দিত। তারপর সেই নেতাদের কেউ কেউ যখন দানার দানে খেলার বার হয়ে যেতেন—কেমন যেন একটা ভাব দেখতাম। টিটোর ব্যাপারটা মনে আছে। তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে টিটোর মনোমালিন্য চলেছে। আগে পূর্ব ইউরোপে তিনটি নেতার নাম ধরে ওরা আওয়াজ দিত। অর্থাৎ স্তালিন-টিটো থাকতেন-ই। আর তৃতীয় নামটা হত জাতীয় নেতার। এই

শুধু নাম ধরে ওরা 'জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ' করত। ছবি টাঙানোর ব্যাপারেও তাই। সব সংগঠনে, প্রতিষ্ঠানে, কারখানায়, স্কুল-কলেজে—ঐ তিন নেতার অবস্থিতি। সুন্দর ফ্রেমে বাঁধানো সব ছবি। একদিন দেখলাম রাতারাতি টিটোর ছবি উধাও। আমতা আমতা করে এক যুবনেতা বললেন,—'বুঝলে না,—উনি রেনিগেড হয়ে গেছেন।' পরে অবশ্য স্তালিনের ছবিও উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল শুনেছি। আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম—'আর আমরা যে এত হাত লাল করে জিন্দাবাদ করেছি—সে পরিশ্রমের হিসাবত কে দেবে?' ছেলেটি হেসে উত্তর দিয়েছিল—'ওটাই তো এখানকার একমাত্র দান নয়? তোমাদের দেশে এসব হয় না?'

কথাটা ঠিক। আমাদেরও তো রাজনীতিতে এই আছি এই নেই! সব দেশেই তাই। রাজনীতি আর সিনেমা থিয়েটারের যেন একই অবস্থা। দৃশ্য বদল, চরিত্র বদল!

কিন্তু এরা কয়েক বছরের মধ্যে দেশটাকে যা তুলে ধরেছিল, মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। সমাজতন্ত্রের আওতায় সাধারণ মানুষ যে কত [illegible] হয়ে ওঠে তা এসব দেশে না গেলে বোঝা যায় না। বাইরে কত রকমের অপপ্রচারের ঘটা। ভেতরেও সে [illegible] তা নয়। কিন্তু টানাপোড়েনে এই সাধারণ মানুষের জয় হচ্ছে চারিদিকে। ভুলত্রুটি যা হচ্ছে না হচ্ছে, তার মধ্যে কিন্তু একটা স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের দোষ-ত্রুটির সন্ধান মেলে।

একদিন গেলাম অল্পবয়সী মায়েদের বাচ্চা রাখার আয়োজন দেখতে। শিল্প বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মজুরের চাহিদা বেড়েছে। স্কুল কলেজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিকা-শিক্ষকের দরকার হয়েছে। সব দিকেই একটা সাজসাজ রব হলে যা হয়। ফলে মেয়েরা আগের চাইতে অনেক বেশি করে উৎপাদনে অংশ নিচ্ছেন। শুধু শিক্ষার ব্যাপারে একটা হিসেব দিলে (সরকারী) খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যাবে।

বছর	বিশ্ববিদ্যালয় আর কলেজের সংখ্যা	উচ্চশিক্ষার ফেকাল্টি	মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা	ছাত্রী সংখ্যা
১৯৩৬/৩৭	১৩	৫২	২৪,৪৩৫	৪,০৬৩
১৯৬৬/৬৭	৭১	১০৫	৯৩,০০০	৩৭,০০০

বোঝা-ই যায় কর্মী মেয়ের সংখ্যা কি আন্দাজ বাড়ছে। ফলে তাদের শিশুদের রাখার ব্যবস্থা সরকারই করেছেন। কারখানাগুলোর তরফ নিজস্ব ক্রেশে শ্রমিকদের ব্যবস্থা করে নিয়েছে। অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠানও তাই করেছে।

যে নার্সারীটি দেখতে গিয়েছিলাম, তার বাচ্চাদের বয়েস—তিন মাস থেকে তিন বছর পর্যন্ত। নার্সারী বলতে আমরা এখানে যা বুঝি তা ঠিক নয়। ভেতরে ঢুকে একটা করে 'ওভারঅল' পরিয়ে দেওয়া হল। ছোট ছোট বাচ্চাদের যাতে কোনোরকম ছোঁয়াচ না লাগে। একেবারে খুদেগুলো শুয়ে আছে উঁচু ঘেরা খাটে। কাঁচের জানলা খোলা। রোদ এসে পড়েছে বাচ্চাদের গায়ে। এমন সুন্দর গাবদা-গোবদা সব ছেলে-মেয়ে। চোখ ফেরে না। মা'রা সারাদিনের জন্যে রেখে গেছে। বিকেলে বা সন্ধ্যেবেলা কাজ শেষ হলে এদের নিয়ে বাড়ি ফিরবে। যারা একটু বড় বাচ্চা তারা শিক্ষামূলক খেলা খেলছে। পুতুলগুলো সাজানো দেখে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম 'এরা ভাঙে না?' ভারপ্রাপ্তা মহিলা উত্তর দিলেন—ভাঙে। তবে আমরা ওদের পুতুল দিয়ে সমাজশিক্ষা দিই। পুতুলের যত্নের ভেতর দিয়ে একটা দায়িত্ব-বোধ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়।

বাচ্চাগুলো যেন মোমের পুতুল। আমাকে দেখে একটু অবাক হয়েছিল গোড়ায়। একজন সপ্রতিভভাবে জিজ্ঞেস করল, 'এ এরকম কেন?' 'কি রকম?' 'অন্য রকম।' দো-ভাষী বুঝিয়ে দিল। আমি বললাম—'আমি যে অন্য দেশের লোক।' 'কোন দেশ?' 'ভারতবর্ষ।' 'সে কোথায়?' 'অনেক দূরে।' 'কত দূরে?'

সব দেশের বাচ্চাই সমান। প্রশ্নে প্রশ্নে অস্থির করে তোলে। যাঁদের ওপর এদের শিক্ষার ভার, তাঁরা সকলেই অভিজ্ঞ এবং শিশু-বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত। এমন অনায়াসে এই এককাঁড়ি বাচ্চা নিয়ে সারাটা দিন থাকেন, অবাক না হয়ে পারা যায় না।

এখান থেকে গেলাম নার্সারী স্কুলে। সেখানকার বাচ্চাদের বয়েস তিন থেকে ছ' বছর। এদের একটা পদ্ধতির অনুসরণ করে শিক্ষা দেওয়া হয়। একটা সিলেবাস থাকে। খেলা আর ঘুরে বেড়ানোর জন্যে অনেকটা সময় থাকে। ওরা নিজেরা নিজেদের খাবার টেবিল গোছাতে শেখে, গাছে জল দিয়ে ফুলের বাগান করে, পুতুল সাজায়। ব্যস্! সামাজিক জীব হতে শেখাতে পারলেই এ পর্যায়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ হল বলে ধরে নেওয়া হয়। তারপর ছ' থেকে পনের বছর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থায় ওদের লেখাপড়া শুরু হয়।

শুনে অবাক হয়েছিলাম যে যাদের আয় কম সেসব মা-বাবাদের এই নার্সারীতে বা নার্সারী স্কুলে ছেলেমেয়ে রাখার জন্যে কোনো খরচই দিতে হয় না। যাঁদের মাইনে বেশি তাঁরা সামান্য একটা অঙ্ক দেন এদের খাওয়া-দাওয়া বাবদ।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় এখন এইরকম নার্সারীর শিশু সংখ্যা ৬৫,০০০ আর নার্সারী স্কুলে আছে ৩৪৫,০০০ ছেলে-মেয়ে। প্রত্যেক বছরে সরকার মাথাপিছু প্রতি শিশুর খাতে ১,৭০০ ক্রাউন খরচ করে থাকেন।

তুলনা করলে মন খারাপ লাগে। তবু মনে হয়—এদেশে কিছু কি করা যেত না? যা সামান্য আছে তা তো সমুদ্রে একফোঁটা জলের মত। আর পাড়ায় পাড়ায় যেসব নার্সারী স্কুলের ভড়ং, তা এখন ব্যবসায়িক লাভের অঙ্ক কষে বাচ্চা নেয়। গরীব কেন, সাধারণ মধ্যবিত্তেরাও নার্সারীতে ছেলে-পুলে রাখতে পারে না। আসলে যেসব কর্মী মায়েরা নতুন মা হন, তাঁদের অনেকেই সচরাচর নিম্নবিত্তের। ফলে তাঁদের পক্ষে বাচ্চাকে নার্সারী স্কুলে দেওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া সারাদিন রাখার মত ক্রেশ কোথায় এদেশে?

অথচ চেকোশ্লোভাকিয়া আর আমরা প্রায় একই সংগে স্বাধীন হয়েছিলাম।

[ক্রমশঃ]

ধবানাথ ভট্টাচার্য স্মরণে

সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

Let action be man's God,
O'er whom even Fate
Can rule not, nor his puissance
abrogate.
—Aurobindo

কর্ম হোক মানুষের আবাধ্য দেবতা
ভাগ্য যেথায়,
শাসনে অক্ষম কিংবা তার যত পরাক্রম
বিলুপ্ত সকলি।

এমনই একটি কর্মযোগীর আবির্ভাব হয়েছিল খুলনা জেলার বাগেরহাট সাবডিভিশনের ধলনগর গ্রামে, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮২ খৃস্টাব্দে—পিতা উমাচরণ ভট্টাচার্যের ঔরসে আর মাতা বিন্দুবাসিনীর গর্ভে শিশু ধবানাথের। কিন্তু নাম তো মানুষকে পরিচিতি দেয় না পরিচয় তার কর্মের মাধ্যমে। তাই ধবানাথকে তাঁর আসল নামের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি একদিন বলেছিলেন—আমার নাম তো ছিল অনেক কোন্‌টা বলবো বল। আমার দুটি নাম শেষ পর্যন্ত যা চালু হয়েছিল তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে ধূর্জটিনাথ ভট্টাচার্য আর পরে চলেছিল ধবানাথ বলে। তবে তিনি যে সত্যই ধবানাথ হয়েছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর ৮৬-বছরের কর্মময় জীবন।

ধবানাথের পিতামহ ছিলেন রামসুন্দর বিদ্যালঙ্কার বাচস্পতি আর তাঁর প্রপিতামহ ছিলেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। স্বাভাবিকভাবেই পণ্ডিত বংশের পৈতৃক পেশা

ধবানাথ ভট্টাচার্য

ছিল যাজন যজন [illegible] পরিবারের অন্তর্গত শিশু [illegible] ছিল ইংরাজী শিক্ষার পথে [illegible]। ধবানাথও তাই ৮।৯ বছর বয়সে মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিলেও ইংরাজী শিক্ষার দিকে তিনি আর এগুতে পারেন নি। বরিশালের কুমার জগদীশ মুখোপাধ্যায়রা ছিলেন উক্ত পণ্ডিত পরিবারের শিষ্য। বালক ধবানাথ ঐভাবে ইংরাজী পড়ায় বাধা পেয়ে কুমার জগদীশের সঙ্গে বরিশালে চলে যান এবং সেখানে গিয়ে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের সান্নিধ্য লাভ হয় ধবানাথের সর্বপ্রথম। এইভাবে বালকমনে বৈপ্লবিক বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল তাঁর বরিশাল জেলায় এসে। তারপরে তিনি ১৯০০ ১৯০১ সালের কোন সময় পিতার সঙ্গে কলকাতায় এসে হাজির হন। ধবানাথের বয়স তখন ১৫-১৬ বছরে পৌঁছেছে। ঐ সময় কলকাতায় থাকাকালে ধবানাথ তাঁর পিতার সঙ্গে কালীঘাটে যাবার উদ্দেশ্যে একদিন ধর্মতলা ও চৌরঙ্গীর সংযোগস্থলে দাঁড়িয়েছিলেন। আলোচ্য সময় ফিরিঙ্গী আর গোরা সৈন্যের অত্যাচারে কলকাতার বাঙালী-জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ ঐ ফিরিঙ্গীদলেরই কেউ এসে তাদের আচরিত প্রথায় উমাচরণকে গালিগালাজ ইত্যাদি করে অপমানিত করে। বালক ধবানাথের মন সেই পিতৃ অপমান স্বচক্ষে দেখে চাপা ক্রোধে ফেটে পড়ে। [illegible] বা নিকটে, কোন কিছু না পাওয়ায় তিনি সেদিন তাঁর পিতৃ-অপমানের প্রত্যুত্তর দিতে অক্ষম হন বটে কিন্তু অন্তরিক সংকল্প নেন এই বলে যে —এর পর থেকে হাতে এক টুকরো লাঠি, কিংবা দু-একটি ইঁটের টুকরা নিয়ে, সুযোগ পেলেই ঐ অঞ্চলে ঘুরে বেড়াবেন এবং ফিরিঙ্গী জাতীয় কোন জীবকে দেখলেই তিনি তাঁর পিতৃ অপমানের প্রতি-[illegible]। [illegible] একদিন দু তিনটি ফিরিঙ্গীর সঙ্গে তাঁর তাণ্ডব বেধে গেছে এমন সময় দেখেন তাঁরই সমবয়সী [illegible] একটি [illegible] বালক ছুটে এসেছেন তাঁর সাহায্যার্থে। এইভাবে ঐ দুটি [illegible] বাঙালী [illegible] হাতে [illegible] দিন ফিরিঙ্গীরা [illegible] প্রহারে [illegible] দিকে [illegible] সঙ্গে [illegible] সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর জীবনের [illegible] পরিণত [illegible] হয়েছিল। উক্ত বালকটি ছিলেন পরবর্তী কালের বিপ্লবী নেতা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী তিনি আজও বাংলা সমাজে বিপিনদা বলেই অধিক পরিচিত। ফিরিঙ্গী ঠেঙানোর কাজ সেদিনকার মত শেষ করে বিপিনদা তৎক্ষণাৎ ধবানাথকে [illegible] কলকাতার [illegible]।

[illegible] ১৯০৪ সালে [illegible] পর্যন্ত ধবানাথের [illegible] জীবনের [illegible] সমিতির মাধ্যমে। এই সময় তিনি [illegible] ও বিপিনচন্দ্র [illegible] আন্দোলনে যোগদান [illegible] জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়, উক্ত সময় আত্মোন্নতি সমিতির বিশিষ্ট সভ্যদের মুরারিপুকুরের বাগানের সঙ্গেও যথেষ্ট যোগ-সাজস ছিল। আর তা না হলে ঐ সমিতির প্রথমকালীন একজন বিশিষ্ট সভ্য শ্রীইন্দ্রনাথ নন্দী ঐ মামলায় জড়িত

হয়ে গ্রেপ্তার হবেন কেমন করে। তবে বোমার মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে ধরপাকড় শুরু হলে আত্মোন্নতি সমিতির বিশিষ্ট সভ্যদের অনেকেই আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়। ধরানাথও সেই উদ্দেশ্যে একটি রিভলভার সঙ্গে নিয়ে পদব্রজে পাড়ি দিয়েছিলেন বর্মা অভিমুখে। সঙ্গে ছিলেন ক্ষিতীশ গাঙ্গুলী আর গিরীন রায়চৌধুরী। এই সকল তথ্য জানা গিয়েছিল ধরানাথের কাছে ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাসে। ১৯১০ সালের শেষের দিকে আবার তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং ১৯১৩ সালের বর্ধমান বন্যার সময় সেখানে গিয়ে আর্তত্রাণে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯১৪ সালের শেষে অমর চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ বিপ্লবীরা যখন নানা বেশে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েন আত্মগোপনের উদ্দেশে গ্রেপ্তার এড়ানর জন্যে, ধরানাথও সেই সময় নানা নামে নানা স্থানে ঘুরে গ্রেপ্তার এড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই ধরানাথকে একদিন তাঁর জীবনকাহিনী জানাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করায় তিনি বলেছিলেন -১৯০১ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত দেশের মুক্তিকল্পে কোন কাজই আমাদের কাছে অসম্ভব বোধ হয় নি। তবে সহজে ধরা দেওয়া বা কোন-প্রকারে আত্মপ্রচার করা ছিল আমাদের আদর্শ-বিরোধী। গ্রেপ্তার হয়ে পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন—

১৯০৬ সালে খুলনা জেলায় তিনি একবার গ্রেপ্তার হয়ে বেশ কিছুদিন জেলে কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৯১৪ সালে—সন্দেহে গ্রেপ্তার হয়ে কিছুকাল হাজতবাস করতে বাধ্য হন।

তারপরে ১৯২১ সালে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের ব্যাপারে মূল উদ্যোক্তা হতে হয়েছিল ধরানাথকে।

শেষে বলেছিলেন ১৯২৬ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত সময় জেলের বাইরে বেশি সময় তাঁকে থাকতে হয় নি। তাই বোধ হয় দেওঘর ষড়যন্ত্র মামলায় ২১ জন অভিযুক্তের মধ্যে ধরানাথের নামটিও দেখতে পাওয়া যায়।

ধরানাথের জীবনের আর একটি উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা, বিশেষ করে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে—দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা। এই সম্বন্ধে তিনি একদিন বলেছিলেন, তাঁর জীবনে কমপক্ষে ২০টি স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছিল। আর শেষ চেষ্টা চলছিল হরিপাল কলেজ প্রতিষ্ঠার। এই চেষ্টা প্রায় পূর্ণতায় পৌঁছে দিয়েই ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৬৮ সালের প্রভাতে স্নানাদি নিত্যকর্ম শেষ করে গীতাপাঠ করতে করতে তিনি সেদিন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে গেছেন। এ যেন স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রের ভাষায়—

ফোটে ফুল সৌরভ হৃদয়ে ধরি
সৌরভ বিতরি
আপনি শুকায়ে যায়
মৃত্যুভয় আছে কি কুসুমে?

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ একত্রিশ ॥

চারজন এসেছে। ফুল্লরা এসে দাঁড়াল। নমস্কার করে সকলের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল একবার। যে চেয়ারটা খালি ছিল, তার উপরে বসে পড়ল।

পাত্র এবং বন্ধুরা হকচকিয়ে গেছে। গাঁয়ের মেয়ের এতখানি সপ্রতিভতা ভাবতে পারে নি।

মিনিটখানেক স্তব্ধ হয়ে বসে রইল ফুল্লরা। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলে, কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না?

চারের মধ্যে এক ছোকরার ছাঁটাই-করা মনোরম গোঁফ ও দাড়ি, গায়ে ছাপা-সিল্কের বুশসার্ট। কথাবার্তা যত-কিছু সে-ই বলছে। তাকে লক্ষ্য করে ফুল্লরা বলল, কিছু প্রশ্ন থাকে তো বলুন।

ছোকরা বলল, শিক্ষা-দীক্ষার ভার যিনি নিয়েছিলেন তাঁর খ্যাতি দেশ-জোড়া। আমিও কিছুদিন ছাত্র ছিলাম তাঁর। বিস্তর গাধাকে তিনি ঘোড়া বানিয়ে দিয়েছেন।

মুখ টিপে হেসে ফুল্লরা বক্তাকে তাকিয়ে দেখল। ছোকরা থতমত খেয়ে যায়। গাধাকে ঘোড়া বানানোর কথা বলল —তার চেহারার ভিতর পূর্বেকার গাধাকে খুঁজে নাকি মেয়েটা?

কথা শেষ করে দিল ছোকরা: প্রশ্ন আবার কি থাকবে?

বোবা কিনা, অন্তত সেই পরীক্ষার জন্যেও দুটো জিজ্ঞাসাবাদ করতে হয়।

ছোকরা হেসে বলে, কথা বলে আপনি নিজে থেকেই তো সন্দেহ ভঞ্জন করে দিয়েছেন। ইচ্ছে করলে আপনি চলে যেতে পারেন।

ফুল্লরা উঠে দাঁড়াল। মুহূর্তকাল ইতস্তত করে বলে, সুব্রতবাবুটি কে আপনাদের মধ্যে?

পাত্রের নাম ধরে পাত্রী জিজ্ঞাসা করে —হতভম্ব হয়ে গেছে সকলে। ছাঁটা-গোঁফ-দাড়ি সেই ছোকরাই আবার বলে ওঠে, উঠে দাঁড়া সুব্রত। তোকে দেখতে চাইছেন!

ফুল্লরা সহজভাবে বলল, কৌতূহল এসে কিনা বলুন। দয়া করে এত দূরে যখন পদধূলি দিয়েছেন, সন্দেহ কেন রাখব। চারজনের মধ্যে তিনি কে, জিজ্ঞাসা করে নিলাম। দোষের হল নাকি?

না, দোষের কী আর। বেশ হল, উভয়পক্ষেরই চাক্ষুষ দেখা হয়ে গেল।

ফুল্লরা চলে যাচ্ছে, মুখফোঁড় ছোকরা আবার বলে, পছন্দ হল কিনা সুব্রতকে, বলে যান।

ঘাড় ফিরিয়ে ফুল্লরা বলে, বলি তাই, আর বেহায়া বলে নিন্দে রটে যাক। তা ছাড়া ব্যাপারটা নির্ভর করছে সম্পূর্ণ আপনাদের রায়ের উপরেই। আপনাদের পক্ষই সর্বেসর্বা। প্রশ্নটা আমাদেরই বরঞ্চ আপনাদের কাছে করার কথা।

ছোকরা বলে, আমাদের রায় দিতে এক মুহূর্তও সময় লাগবে না। সুব্রতর পছন্দ—ঘোরতর পছন্দ। পরমানন্দে সে স্বীকৃতি দিচ্ছে। আমাদের সর্ববাদী-সম্মত অভিমত এই। এইবারে শুনব আপনার নিজের কথা।

জবাব না দিয়ে ফুল্লরা যুক্তকরে নমস্কার করল। হাসিমুখে বলে, আমি যাই। আমি গেলে দাদু এসে বসবেন। দাদুকে আমি মানা করেছিলাম: তুমি থাকলে ও'দের অসুবিধা হবে, মন খুলে জেরা করতে পারবেন না। তা জেরা তো একেবারেই করলেন না। দাদু ঐ উঠানে পায়চারি করছেন। নাতনি বেচারি না-জানি কত নাকানি-চোবানি খাচ্ছে—এই সমস্ত ভাবছেন আর কি!

প্রসন্ন ভঙ্গিতে ফুল্লরা চলে গেল। যেতেই উচ্ছ্বসিত কলরব উঠল: এমনই তো চাই। জবড়জং শাড়ি-গয়নার এক-একটা পুঁটলি নিয়ে ঘর করা যায় আজকের দিনে?

পাত্র সুব্রত মুখ টিপে হেসে বলল, পুঁটলির একটা সুবিধা যেখানে যেমন নিয়ে রাখো, চুপচাপ তেমনিভাবে থেকে যাবে। তর্কাতর্কি করবে না, বিদ্রোহ করবে না। মতামতের বালাই নেই। পাকা উকিল-ব্যারিস্টারের মতন এ মেয়ে আমাদের পেটের ভিতরের সবগুলো কথা শুনে নিয়ে চলে গেল, নিজের মতামত কিন্তু একবর্ণ বলল না।

আর বলবে কেমন করে? হাত ধরে টেনে বলবে নাকি, চলো এক্ষুণি ছাতনা-তলায় গিয়ে বসিগে?

উভয়পক্ষেরই পছন্দ, মোটামুটি বুঝতে পারা গেল। এবং গয়না [illegible] ও পণের টানাটানি দরকষাকষি [illegible] বড় হয় না। তবে [illegible] কিছু নিষ্পত্তি [illegible] করে ফেলা যাক। দুহাত এক [illegible] পারলেই নিশ্চিন্ত। শুভকর্ম [illegible] সমাধা হওয়ার দরকার সেকেলে গিন্নি-মানুষ কমলবাসিনী মেয়ে সেয়ানা হলে বলে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছেন।

শুভকর্ম কোনখানে সম্পন্ন হবে বরের বাবা প্রশ্ন তুললেন। নিরর্থক প্রশ্ন—পুরুষ-পুরুষান্তর ক্রমে যেমনধারা বিধি। সারা জন্মের ব্যাপার—লক্ষণ-অলক্ষণ, এমন কি বাড়ির মানসম্ভ্রমের কথাও আছে। পুরানো পদ্ধতির এক চুল এদিক ওদিক হবে না—হতে দেবেন না কমলবাসিনী যতদিন বর্তমান আছেন।

বীরেশ্বর বললেন, আমার বাড়িতে পদধূলি পড়বে আপনাদের সকলের। বাজি-বাজনা করে ষোল বেহারার পালকি হুমদাম আওয়াজ তুলে বর নিয়ে আসবে। শহুরে এক রাত্রির বিয়ে নয়—টিমটিমে আলোয় দশ-পনেরোটা মন্তোর পড়ে পুরুত বলে দিলেন হয়ে গেল বিয়ে, রাত পোহাতে না পোহাতে শোনা গেল বিদেয় হয়ে গেছে বরকনে, বউভাতের আগেই কনে ভাঁড়ারের চাবি আঁচলে বেঁধে সংসারধর্মে লেগে যায়। আমাদের গাঁ-গ্রামের বিয়ের এলাহি ব্যাপার। সাঁজো-বিয়ে হয়ে গেল রাত্রিবেলা, পরের দুপুরে বাসি-বিয়ে। দাঁরিতাম ভুজ্যতাম—এসো-জন বসো-জন থাকে বিয়েবাড়িতে মাস-খানেক ধরে। নিমন্ত্রিত-অভ্যাগতজনের

শোবার জন্য অস্থায়ী চালাই বা তোলা হয়েছে কত! গ্রামের কোন বাড়ি উনুনে হাঁড়ি চাপছে না বিয়ের আগে-পিছে হপ্তাখানেক ধরে—

বর্ণনার মাঝখানে সুব্রতর বাপ বলে উঠলেন, এই নিত্যি-আকালের দিনে শুনতে খাসা লাগছে। ছিল বটে এমনি দিনকাল।

বীরেশ্বর বলেন, একমাত্র নাতনি এই আমার। বাপ নেই। সবখানি না পেরে উঠি—ওর ঠাকুরমার বড় ইচ্ছে, খানিকটা অন্তত করতেই হবে আমায়।

বরের বাপ বললেন, আমার তরফেও ঠিক সেই সমস্যা। ছেলের বিয়ে প্রথম এই আমার। পাঁচ মেয়ের পর ছেলে—আত্মীয়জনেরা মুখিয়ে আছে। কিন্তু বাদসাদ দিয়েও তো বরযাত্রী শ'য়ের নিচে নামানো যাবে না।

বীরেশ্বর দরাজভাবে বললেন, বাদ দিতে কেন যাবেন? কুটুম্ব আত্মীয় যিনি আসতে চান সবাইকে আনবেন। একশ' দেড়শ' কেন, তিনশ' হলেও অসুবিধে নেই। লোক বেশি তো চাই-ই, লোক জমজমাট না হলে আবার বিয়ে কিসের? ভাববেন না আপনি। বরযাত্রী যেমন ইচ্ছা আনবেন—সংখ্যাটা মোটামুটি আগে একটু জানিয়ে দেবেন, আপনার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে পাতে পাতে চাট্টি ডাল-ভাত দেওয়া কঠিন হবে না।

বরের বাপ বললেন, ডাল-ভাত নয় পোলাও-কালিয়া, সেটা বিলক্ষণ জানি। কিন্তু মুখের কথা বলে দিলেন, তাতেই তো লোক এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বে না। যে রকম অবস্থা তাতে একলা বর এনে হাজির করতেই আমার নাভিশ্বাস উঠে যাবে। হাজারো হয়রানি ভিসা-পাশপোর্ট পেতে—বিশগণ্ডা হাত মুঠো মেলে রয়েছে, ঘুষ দিয়ে মুঠোগুলো এঁটে দিন। না মশায়, বাড়ির মধ্যে বড়ছেলে—একলা বর এসে বিয়ে করে চুপিসারে চলে যাবে, সে জিনিস হতে পারবে না।

বীরেশ্বর জোর দিয়ে বললেন, আমাদের তরফেও তো ঠিক এই কথা। আগেই বলে দিয়েছি। কী হতে পারে, ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করুন এবারে।

বিবেচনার কি আছে? দিন স্থির করে আপনারা কলকাতায় চলে আসুন।

বীরেশ্বর বললেন, সে-ও তো একরকম লুকো [illegible] নিয়ে হাজির করা। বিয়ের আগে পাত্রপক্ষের জায়গায় মেয়ে নিয়ে তোলা—'তোলা-বিয়ে' তাকে বলে। খুবই অপমানের ব্যাপার। তেমন ক্ষেত্রে আমার আত্মীয়স্বজনরাও তো [illegible] যোগ দিতে পারবেন না।

কেন, পার হয়ে এতই তো চলে গেছেন। বেশি তো তাঁরাই। হিন্দুস্থানে আত্মীয়ের অভাব হবে কিসে?

ঘাড় নেড়ে দৃঢ়কণ্ঠে বীরেশ্বর বললেন, অনেক তবু রয়ে গেছেন এপারে। দুঃখকষ্ট উপেক্ষা করে পিতৃপুরুষের ভিটার উপর আছেন। পাকিস্তানে রয়ে গেছেন বলে সমাজ-সামাজিকতার ব্যাপারে তাঁরা বাদ পড়বেন, এ জিনিস হতে দিতে পারিনে। একত্রে আমরা অহরহ হাজার রকম দুশ্চিন্তা বয়ে বেড়াই, আমোদ-উৎসবের বেলা সেই মানুষগুলোকে ছেড়ে টুক করে ওপারে চলে যাবো, সে জিনিস কেমন করে হয়?

পাত্রের বাপ বললেন, সমস্যা শুনে গেলাম—বাড়ি গিয়ে সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখিগে। এখন অকাল চলছে—শুভকর্ম ফাল্গুনে কি বৈশাখের আগে হচ্ছে না। দেখা যাক ভেবেচিন্তে।

পছন্দের মেয়ে। নাতনিকে দেওয়া-থোওয়ার ব্যাপারে বীরেশ্বর কৃপণতা করবেন না, সে-ও জানা। ইত্যাদি বিবেচনা করে বরের বাপ সম্বন্ধ সঙ্গে সঙ্গে কেটে দিতে পারলেন না। লম্বা সময় হাতে নিয়ে তিনি বাড়ি ফেরত চললেন।

ফুল্লরা বীরেশ্বরকে বলল, বেশ শুনিয়ে দিয়েছ। দাদু তুমি এমন খাসা!

বীরেশ্বর বলেন, কী জানি, আমি আরও কত কি ভাবছিলাম। চটেমটে তুই কথাই বলবিনে আমার সঙ্গে। বর পছন্দ হয়ে গেছে, বকমারি ফ্যাকড়া তুলে মিলনের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি আমি—

ফুল্লরা অবহেলা ভরে বলে পছন্দর জন্যে কি? কানা-খোঁড়া গলা-কাটা না হলেই হল। বলে দিচ্ছি দাদু, পুরোপুরির—আস্ত যে-কোন পাত্র হাজির করো—সঙ্গে সঙ্গে পছন্দ করে ফেলব। আমার অত বায়নাক্কা নেই। তা-ই বা কেন—তুমি একলাই পছন্দ কোরো, তোমার পছন্দে আমার পছন্দ। তুমি হুকুম করবে, মাথায় ঘোমটা তুলে সুড়সুড় করে অমনি ছাতনা-তলায় গিয়ে বসব। ভালমন্দ একটি কথাও বলতে যাব না। পাত্রপক্ষের কোট ষোল-আনা বজায় থাকবে, মেয়ের পক্ষ বলে আমাদের কথার দাম হবে না—এ [illegible] কক্ষণো হবে না। ঠিক করেছ তুমি দাদু, বড্ড বাঁচান বাঁচিয়ে দিয়েছ। নইলে তুমি হয়তো ঠিকঠাক করে ফেলেছ, [illegible] মুখে [illegible] বসল। [illegible] মনে মেয়ে ঘাড় নিয়ে হাজির [illegible], তাতে আমার অপমান।

ঠাকুরদা-নাতনিতে চুপিসারে কথাবার্তা। কমলবাসিনী ইতিমধ্যে ঘটক-মশায়ের কাছে সবিস্তারে শুনলেন। শুনে তো মারমূর্তি বীরেশ্বরের উপর: নিজেদের উদ্যোগে কিছু তো হয় না—এত চেষ্টায় ঘটকমশায়কে দিয়ে একটা ভাল সম্বন্ধ জোটানো গেল—দিলে সেটা ভেস্তে। ধুবড়ো মেয়ের বিয়ে দিতে পারলেই লোকে বর্তে যায়, ঘটা হতে পারবে না বলে উনি এখন মোচড় দিতে গেলেন।

বুঝিয়ে-সুজিয়ে ঠাণ্ডা করেন বীরেশ্বর: ভেস্তে গেল কিসে? বাড়িতে শলাপরামর্শ না করে উনি জবাব দিতে পারলেন না। গিয়েই চিঠি দেবেন। তার পরে আমরাও লিখতে পারব আবার। কথাবার্তার সবে তো শুরু—লাখ কথা ছাড়া বিয়ে হয় না। ডাকে ছেড়েছেন চিঠি এদ্দিনে, দু-পাঁচ দিনের মধ্যে এসে যাবে। পাকিস্তানের চিঠি পৌঁছানো চাট্টিখানি কথা নয়।

এক মাস যায় দু-মাস যায় এল না কোন চিঠি সুব্রতর বাপের কাছ থেকে। কমলবাসিনী অধীর হয়ে উঠেছেন: চিঠি লিখতে বয়ে গেছে ভদ্রলোকের। ওসব ছেলে পড়তে পায় না। এত ফৈজত করে বাড়ি অবধি এসে উঠল, সে মাণিক হেলায় হারালে। ওসব জানি নে এ বছরের মধ্যে নাতনিকে সাতপাক আমি ঘোরাবই এ ছেলে না হয়, অন্য ছেলে।

তারই পরে লড়াই বাধল পাকিস্তানে আর হিন্দুস্থানে। হায়রে হায়, এক দেশ কেটে দু-খানা করে সুখ নেই, খবরের-কাগজ ও রেডিও'র বেধড়ক গালিগালাজেও যথেষ্ট হল না—রণমত্ত দুই শত্রুদেশ। এই না হলে এত চক্রান্তের ভাগাভাগির ফল? [illegible] একই রকমের মানুষজন

হুইস্কেত সাজসোনাক কথাবার্তা—কোনদিন হয়তো শোনা যাবে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হুট করে ওরা এক হয়ে গেছে। হয়ে আসছেও তাই ঘোর বেগে। অতএব দেবি নয় আব—ডাঙায় ছুটাও চ্যাঙ্ক, আকাশে বম্বার। মানুষ যত ঘায়েল হল আর না হল—মিলমিশের যে বেয়াড়া কথাবার্তা উঠেছিল, গুলিগোলা ছিন্নভিন্ন করে দিল সেগুলো।

তবু জুত হল না তেমন—লড়াই বাইশ দিনের বেশি জিইয়ে রাখা গেল না। এবং দুই বাংলার মধ্যে তো একেবারে কিছুই নয়। তবে অজুহাত পাওয়া গেল বটে।

দাও উভয় বাংলার মধ্যে। মুখ বন্ধ হলে প্রাণের টান কমে আসবে।

হরি—হরি! কলসির মুখে জল আটকে দেবে না—কিন্তু এ যে সেই পৌরাণিক ছিদ্রকুম্ভ। ছিদ্রপথে শতেক ধারে জল পড়ছে। আগেও ছিল না যে তা নয়—পাশপোর্ট করে যারা যেত হিসাবের মধ্যে পাওয়া যেত তাদের। তার বাইরেও যেত বিস্তর মানুষ—কিন্তু এবারের এই কাণ্ড ভাবতে পারা যায় না। আইনের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে আবালবৃদ্ধ ব্ল্যাকের পথে দেখতে দেখতে পুরোদস্তুর ওস্তাদ হয়ে গেল—ব্ল্যাকে চলাচল, ব্ল্যাকে ব্যাপার বাণিজ্য। এর পরে দয়াজ হাতে পাশপোর্ট ছাড়লেও লোকে কি আর তেমনিধারা লাইন দিতে যাবে? ব্ল্যাকে বিস্তর সুবিধা—ইচ্ছে হলেই বেরিয়ে পড়লাম। ছ' মাস আগে থেকে এ-বাবুকে খোশামুদি ও-সাহেবের কাছে ধন্না দেওয়া ইত্যাদি তম্বির করে বেড়াতে হবে না। খরচা উভয়ত্র। কিন্তু ব্ল্যাকে দরদাম চলে, ঘাটোয়ালরা বিবেচনাশীল সহৃদয় মানুষ—লোকের অবস্থা বিশেষ অবস্থা। ঝামেলা বিন্দুমাত্র নেই—কি কি মাল পাচার করছেন কি-ই বা সঙ্গে নিয়ে এলেন, এপারে-ওপারের কোন ব্যক্তি চোখ তুলে দেখতে যাবে না।

কমলবাসিনী দিনকে-দিন ক্ষেপে যাচ্ছেন। নাতনির ছেলেপুলে দিয়ে বংশের ধারাটা বজায় থাকবে সে যেন আর হবার নয়। ফুলবরা অটেনড়ো থেকে যাবে এমনি যেন সন্দেহ আসে। বীরেশ্বরই এর মূলে। স্বাধীনতার পর থেকে সর্বনাশ চতুর্দিকে, এরই মধ্যে উনি আগের মতন পাকিজমকের কারবারে জুটলেন। এত কষ্ট এবং এমন পণ্ডিত মানুষ হয়েও বুঝলেন না যে সে-জিনিস আর হবার নয়। পাত্র বাড়ির ওপারে এসেছিল—কমলমাণিক হাতের মুঠোয় পেয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

ঘটকমশায়কে কাকুতিমিনতি করে কমলবাসিনী পুনশ্চ চিঠি দিয়েছিলেন। জবাব এলো না। লোক পাঠালেন যশোরে, ফিরে এসে সে-লোক খবর দিল ঘটকমশায়ও হিন্দুস্থানে সরেছেন। স্বাধীনতার গোড়াতেই দুই ছেলে ওপারে গিয়ে উঠেছিল লড়াই অন্তে এবারে বাপকেও জোরজার করে নিজেদের কাছে নিয়ে তুলেছে। দাস, হয়ে গেল। ছটোছুটি সার এবং চিঠিপত্র লিখে সম্বন্ধ নতুন করে জুড়ে-গেঁথে দেবার মানুষ কেউ রইল না।

মত বাগ এখন বীরেশ্বরের উপর। সময় সময় ক্ষেপে ওঠেন কমলবাসিনী চোখ-মুখের ভঙ্গি দেখে বীরেশ্বর শঙ্কিত হয়ে পড়েন—আবার সেইরকম মাথা খারাপ না হয়, লাহাদের সর্বনাশের পর যেমন-ধারা হয়েছিল।

প্রেমের ব্যবসা রঘুদাস তাঁর মোক্তারী করেন শহরে থেকে মোক্তারী করেন। রঘু দাস মোক্তারির বাইরেও নানান ফিকিরে রোজগার। ভাইয়ের ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে রঘু দাস বাড়ি এলেন কয়েকদিনের জন্য। বীরেশ্বর তাঁর কাছে চলে গেলেন। কমলবাসিনীর কথা সব বললেন। বললেন, নাতনির বর না জোটালে আর উপায় নেই মোক্তারমশায়। ঘটকমশায় ওপারে, তাঁকে আর পাচ্ছি নে। ওপারেও অনেক ছাত্র আমার বিস্তর বন্ধুবান্ধব। গিয়ে পড়লে খোঁজাখুঁজি করে সম্বন্ধ একটা ঠিক করা যাবে না, এমন মনে করি নে। তা ছাড়া নিজেও ওসব দিকে কতদিন যাই নি—একই দেশে ছিলাম আমরা—বন্ড মন কেমন করে সময় সময়।

মোক্তার এক কথায় বলে দিলেন, সেই ভাল। চলে যান নাতনিকে নিয়ে।

কিন্তু যাই কি করে? লড়াই থেকে পাশপোর্ট বন্ধ, যাতায়াতের কড়াকড়ি।

রঘু দাস মোক্তার ভ্রূভঙ্গি করে বললেন, ঘোড়ার ডিম! গরজ বড় বালাই। লাইন কেটে মাটি ভাগ করলেই সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অমনি ভাগ হয়ে যায় না। বর্ডার সিল করে দেবার পর যাতায়াত চার-পাঁচ গুণ বেড়ে গেছে। হরবখত দেখতে পাচ্ছি।

বীরেশ্বর বললেন গিয়ে একবার উঠতে পারলে তারপরে আর কোনো অসুবিধা নেই। ফুলবরের ছোটমামা হিন্দুস্থানে। সেখানে রেখে যত খুশি মেয়ে দেখানো যাবে। ভাল সম্বন্ধ একটা না একটা যাবেই গেঁথে।

মোক্তার জোর দিয়ে বললেন, রওনা হয়ে পড়ুন দু' পাঁচ দিনের ভিতর। মানুষ পটাপট চলে যাচ্ছে আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন তা জানিনে।

বীরেশ্বর ইতস্তত করে বললেন ব্ল্যাকে যাওয়া কিনা। চিরকাল মাস্টার মানুষ—বাঁকা পথে চলি নি কখনো। তায় বুড়ো হয়ে পড়েছি, সঙ্গে সোমত্ত মেয়ে—

রঘু দাস মোক্তার দরাজভাবে বললেন, নির্ভাবনায় চলে যান। পাশপোর্ট-ভিসা করে বেনাপোলে পেট্রাপোলে দাগি আসামীর মতো দু-দুবার খানাতল্লাশি আর হয়রানি—তার চেয়ে অনেক ভাল যেতে পারবেন।

মল্লিকঘাটের কথা তাঁর মুখে শুনলেন তখন। পথ কিছু ঘুর হলেও ঐ ঘাটে পার হওয়া ভাল। ভারি চমৎকার ব্যবস্থা, এপারে ওপারে ঘাটোয়াল দুটিও ভাল। এপারের ঘাটোয়াল আনোয়ার। কাজি-বাড়ির ছেলে, বনেদি বংশ—আমার সঙ্গেও কাজকর্ম আছে। যাবার মুখে আমার বাসা হয়ে যাবেন, চিঠি দিয়ে দেবো আনোয়ারের নামে।

[ক্রমশঃ]

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

জে. বি. ফাগান ও অক্সফোর্ড প্লে হাউস : ফাগানের দলটিতে বহু প্রতিভাবান তরুণ-তরুণী এসে যোগ দিয়েছিল। এর ভেতর ছিল টাইরন গাথরি, এলান নেপিযার, জেমস হোয়েল, পিটার ক্রেসওয়েল ও রিচার্ড গর্ডন। নায়িকার ভূমিকায় নামতেন ফাগানের স্ত্রী ম্যাবী গ্রে। রয়েল অ্যাকাডেমী অভ্ ড্রামাটিক আর্ট থেকে বেরিয়ে কয়েকদিন বাদেই জন গিলগুড এখানে এসে যোগ দিলেন। অন্যান্য আরও যাঁরা এলেন তার ভেতর ছিলেন ফ্লোরা রোবসন, রমাণ্ড মেসী, ফ্রেড ও'ডেনোভান, ভেরনিকা টার্নলে, গ্লেন বায়াম শ, [illegible] নোর্মান্ড ডেনহাম— [illegible] সকলেই প্রতিষ্ঠাবান হয়েছিলেন। [illegible] ও'ডোনোভ্যান ছাড়া [illegible] নতুন এবং [illegible] অদ্ভুত [illegible] অভিনয় [illegible] [illegible]। [illegible] হল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] হ্যাঙ্কিনের 'দি রিটার্ন অফ দি প্রডিগ্যাল', 'দি মাস্টার বিল্ডার', [illegible] নো ট্রাইফলিং উইথ লাভ' ও [illegible]'।

আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট দর্শকদের পক্ষে এটি ছিল একটি আকর্ষণীয় নাট্যশালা। এ জাতীয় দর্শকদের খুশি করা খুব সহজ ব্যাপার নয়। আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট দর্শকদের মনটা সব সময়েই একটা অস্বাভাবিক সেমি সফিস্টিকেটেড অবস্থায় থাকে। এর ফলে তার মনঃশক্তি অত্যন্ত আত্মসচেতন হয়ে থাকে। থিয়েটার ইমোশানের প্রভাবমুক্ত হয়ে থাকতে হবে এই চিন্তা মাথায় নিয়েই সে অভিনয় দেখতে আসে। তার সব সময় ভয় পাছে কেউ তাকে সেণ্টিমেণ্টাল ভাবে—এর ফলে ভাবাবেগের সংগে ভাবাহত হওয়াকে প্রায়ই গুলিয়ে ফেলে। অন্যান্য অনেক পরিণত শ্রেণীর প্যাশন সম্বন্ধেও তার অভিজ্ঞতা না থাকাতে সে-সব জিনিস তার কাছে একটু হাস্যকরই মনে হয়। যেহেতু নিজের মনের দৃঢ়তা নেই, সেজন্য সব সময়েই ভয় পায় সে ভাবাপ্লুত হয়ে পড়বে এবং আত্মরক্ষার জন্য বিদ্রূপ এবং উপহাসকে বর্মস্বরূপ অবলম্বন করে। অথচ সে স্টাইল, কাব্যসৌন্দর্য, উইট সব কিছুই ঠিকমত ধরতে পারে এবং আলোচনায় মেতে উঠে আনন্দ পায়।

His reactions to every-

১৯২৯ সালে "সেইণ্ট জোন্" নাটকে সিবিল থর্নডাইক।

thing that he enjoys are quick, lively and generous.

যে সব নাটক ফাগান তাঁর প্রথম প্রোগ্রামের জন্য ঠিক করেছিলেন, তার সাতটির মধ্যে ছটিই ছিল সর্বজনস্বীকৃত মাস্টারপিসেস। আর এক 'দি মাস্টার বিল্ডার' নাটকটি ছাড়া অন্য সব প্লেগুলো ভাবাবেগের ওপর নির্ভরশীল ছিল না মোটেই—এদের উপজীব্য ছিল সরস উক্তি, বাচনভঙ্গী, উল্লাসের দিক এবং যুক্তি-তর্কের অবতারণার ওপর। 'মাস্টার বিল্ডার' নাটকটিকেও আণ্ডারগ্র্যাজুয়েট দর্শকেরা অন্তর থেকেই গ্রহণ করেছিল—কারণ এর জটিল সাংকেতিকতার ব্যাপারটা নিয়েই তারা মাথা ঘামাচ্ছিল—নাটকের ভাবাবেগের দিকগুলো তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি।

এই সিজনে সাইন্ট জন হ্যাঙ্কিনের 'দি রিটার্ন অব দি প্রডিগ্যাল' নাটকটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা এবং সাফল্য অর্জন করেছিল। অথচ পরে এ নাটকের নামও লোকে ভুলে গেছে।

এই সময়কার থিয়েটার দেখে আমি কিন্তু অনেক বিষয়ে ওয়াকিবহাল হতে পেরেছিলাম। এখানকার নাটক এবং অভিনয় আমাকে বিস্মিত এবং উত্তেজিত করে তুলেছিল। ফাগানের দলটি 'দি অক্সফোর্ড প্লেয়ার্স' নামেই পরিচিত ছিল। অভিনেতারা বেশির ভাগই ছিল অল্প-বয়সী এবং অনভিজ্ঞ—তাদের অভিনয়ে পরিণত প্রতিভার ছাপ ছিল না বটে, কিন্তু ছিল যথেষ্ট প্রাণবন্ত এবং সতেজ ভাব, ছিল কল্পনার বিস্তার এবং উৎসুক আগ্রহের ভঙ্গী। এই গুণগুলো আগে মঞ্চাভিনয়ে দেখবার সুযোগ আমার হয় নি। আমি যে ধরণের অভিনয় দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম তা হচ্ছে, লণ্ডনের কোন নাটকের মূল অভিনেতাদের অভিনয়ের অনুকরণ, অথবা লণ্ডনের রেপারটরীর অভিনীত নাটকের বড় বড় ভূমিকাভিনেতাদের সফর করবার সময় নিজ নিজ রোলের একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি অথবা ওয়েস্ট এণ্ড এ্যাক্টরের নিজের পুরনো ভূমিকার একঘেয়ে ধরণের অভিনয়। দীর্ঘদিন লণ্ডনে ঐ সব নাটকের একটানা অভিনয় হওয়াতে নটনটীরা আগে থেকেই সফরে অসবার সময় নিজেদের ভূমিকা বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ হয়ে থাকতো এবং সেই ভাবেই প্রভাবিত হয়ে সফরের সময় অভিনয় করতো। অক্সফোর্ড প্লে হাউসেই আমি প্রথম নতুনভাবে সব নাটকের প্রোডাকসন দেখি—এসব নাটকে হয়তো দোষত্রুটি থাকতো—কিন্তু এগুলো যে সম্পূর্ণ সজীব এবং তাতে ছিল একথা জোর গলায় বলা যায়। [illegible] সফরবত [illegible] কসুমিক থিয়েটারের প্রয়াসের থেকে ফাগানের প্রোডাকসন আমাদের কাছে অনেক বেশি মর্মস্পর্শী মনে হত।

একটা কথা মনে রাখা দরকার—অক্সফোর্ডের প্লেয়াররা ঠিক সাধারণ রেপারটরী দলের মত ছিলেন না। এঁদের যে সব গুণাগুণ ছিল রেপারটরীর দলে তা পাওয়া যায় না। রেপারটরীতে সাধারণত কি হয়? বছরের প্রতি সপ্তাহে তারা একটি করে নাটক অভিনয় করে। কোন বড় অভিনেতা অমুক নাটকের অমুক রোল কিভাবে অভিনয় করেছিল দেখে, রেপারটরীর সেই রোলের অভিনেতা সেই বড় অভিনেতার অভিনয়ভংগী অনুকরণ করেই চরিত্রটি দাঁড় করাতে চেষ্টা করে—অভিনয়ের দুর্বলতাকে ঢাকতে চায় চাকচিক্যপূর্ণ ভাসা ভাসা তথাকথিত টেকনিকের দ্বারা। কতকগুলো চিরাচরিত

একঘেয়ে 'কায়দা-কানুন' এবং 'খেলা' দেখিয়ে আসর মাতিয়ে রাখবার চেষ্টা করে—কিন্তু এসব নাটকের প্রদর্শনীতে সত্যিকার শিল্পসৃষ্টির প্রয়াসেরই অভাবটা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। অক্সফোর্ড প্লে' হাউসে বছরে সর্বসমেত একুশটি প্রডাকসন হোত। সিজন ছিল তিনটি। এক সিজনে সাত সপ্তাহ। এর ফলে রেপারটরী দলগুলোর তুলনায় প্লে' হাউসের অভিনেতারা অনেক বেশি সময় নিয়ে ভালভাবে রিহার্স করতে পারতো। সাধারণ রেপারটরীর অভিনেতাকে কর্মশক্তি অক্ষুণ্ন রাখতে হয়—এজন্য যতটা সম্ভব কম রিহার্সাল দেওয়া হয়, যাতে সে যথেষ্ট অবসর এবং বিশ্রাম লাভ করতে পারে। এ ব্যবস্থা না করলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস তাকে দিয়ে অভিনয় করানো সম্ভবপর হয় না। কিন্তু সাত সপ্তাহের সিজনে অভিনেতা প্রাণপণ করে পরিশ্রম করতে পারে—সে জানে সাত সপ্তাহ কেটে গেলে সে বিশ্রামের জন্য অবসর পাবে—তার ফলে তার সমস্ত শারীরিক গ্লানি এবং ক্লান্তির অপনোদন হবে। প্লে' হাউসে কিছু খারাপ প্রদর্শনীও আমি দেখেছি। কিন্তু এমন কোন প্রডাকসন দেখি নি যাকে অসাড়, একঘেয়ে বা নির্জীব আখ্যা দেওয়া চলে।

এরপর নর্মান মার্শাল লিখেছেন : প্লে' হাউসের উন্নতমানের অভিনয় যে শুধুমাত্র সংক্ষিপ্ত সিজনের জন্যই সম্ভব হয়েছিল একথা বলা ঠিক হবে না। এ দলটিতে যারা ছিল তাদের ভেতর প্রায় সবারই ছিল অসামান্য প্রতিভা। এদের অনেকেই পরে রঙ্গজগতে বিরাট নাম-যশ এবং খ্যাতির অধিকারী হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। কিন্তু ১৯২৩ সালে এরা সবাই ছিল প্রায় প্রাথমিক শিক্ষার্থী নটনটীর মত।

যে সব গুণ পরবর্তী জীবনে অভিজ্ঞতা এবং অধ্যবসায়ের ফলে এই সব অভিনেতা-অভিনেত্রী অর্জন করেছিল, শুরুতে সে সব গুণ না থাকলেও তার অভাব পূরণ করতো অন্য ধরণের কয়েকটি বিশেষত্ব। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা, টেকনিক এবং ম্যাচিওরিটি লাভের পর ঐ সব বিশেষত্বকেও আপনা থেকেই তাদের বাদ দিতে হয়েছিল। কারণ এই দুটো দিক ছিল পরস্পরবিরোধী।

১৯৪০ সালে হে-মার্কেটে 'লাভ ফর লাভ-এ' জন গিলগুডের ভ্যালেনটিন দেখতে দেখতে বারবার আমার বিশ বছর আগে অক্সফোর্ড প্লে' হাউসে তাঁর ঐ পার্টের আদি অভিনয়ের কথা স্মরণ হচ্ছিল। মনে মনে এই দুই অভিনয়ের তুলনাও করছিলাম। এ কথা বলছি না যে, অতদিন আগেকার প্রদর্শনীর সব কিছু আমার স্মরণে ছিল, অবশ্য তার জন্য ক্ষতিও বিশেষ হয় নি। একথা ঠিকই যে, যে সুন্দর সংলাপটি ভ্যালেনটিন এঞ্জেলিকাকে সম্বোধন করে বলছিলেন, "ইউ আর এ ওম্যান...ইত্যাদি" দিয়ে শুরু করে, হে-মার্কেট থিয়েটারে গিলগুড যে চমৎকারিত্বের সঙ্গে আবৃত্তি করেছিলেন, বিশ বছর আগে প্লে' হাউসে তাঁর পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। হে-মার্কেটে যে অভিনয় গিলগুড করেছিলেন, তার পেছনে ছিল তাঁর বহুদিনের অভিজ্ঞতা এবং অভিনয় সম্পর্কীয় কারিগরীবিদ্যা—আর তার সঙ্গে যুক্ত ছিল তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতির ক্ষমতা এবং কল্পনাশক্তি। বিশ বছর আগেকার গিলগুডের টাইমিং জ্ঞানও এত সঠিক ছিল না, পংক্তিবাদনও এত সুন্দরভাবে সমতা মেনে চলতো না, কার্যকরী অভিনয়ের

'হার্টব্রেক হাউস' নাটকে রবার্ট ডোনাট ক্যাপটেন শটওভার এবং ডেবোরা কার এলি ডানের ভূমিকায়।

দিকগুলোও এত স্পষ্ট হোত না এবং কোথায় কিভাবে সংলাপবাদনে বিরতি দিতে হবে তাও এত নিখুঁত হোত না। কিন্তু বিশ বছরের আগেকার প্রদর্শনীতে এমন অনেক গুণাগুণ ছিল যার স্পষ্ট অভাব দেখতে পেয়েছি হে-মার্কেটের প্রডাকসনে—

Gaiety and impudence and high spirits, fresh, ringing tones, a youthful, self-confident dash and swagger.

দুটি প্রদর্শনীতে বৈষম্য ছিল অনেক দিক থেকে—ঐক্যের দিক ছিল কল্পনাশক্তির মিশ্রণে, উপলব্ধি এবং অনুভূতির সূক্ষ্মতা এবং গভীরতায়। সংলাপের ভাষার মর্মস্পর্শী কথনে। কিন্তু এ বিষয়ে আমার আসল বক্তব্য হোল—দুটি প্রদর্শনীই হয়েছিল মনোমুগ্ধকর। অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন যুবক গিলগুড পরিণত অভিজ্ঞতা এবং টেকনিকের অভাবকে প্রথম প্রদর্শনীতে ঢেকে দিয়েছিলেন যৌবনের নানাবিধ গুণাবলীর সাহায্যে।

টোয়েন্টিজের পর থেকে থিয়েটারগুলোতে এক অদ্ভুত ঝোঁক দেখা দিয়েছে। সেটা হচ্ছে অভিজ্ঞতা এবং টেকনিকের ওপর অতিমাত্রায় প্রাধান্য দেওয়া। এর ফলে টাটকা, সতেজ, প্রাণবন্ত যৌবনশক্তির বিকাশের সুযোগ হচ্ছে না রঙ্গমঞ্চের ওপর। খুবই দুঃখের কথা ওল্ড ভিক—যাঁরা এক সময় নিজেদের যুবক অভিনেতাদের স্টার তৈরি করতেন—পরে তাঁরা তাঁদের প্রচলিত ধারা বিসর্জন দিয়ে বয়স্ক, প্রতিষ্ঠিত, নামডাকওলা স্টার-অভিনেতা নিয়েই থিয়েটার চালাচ্ছেন। অক্সফোর্ড প্লে হাউসের মূল দলটি, টোয়েন্টিজের ওল্ড ভিক এবং সমসাময়িক বার্মিংহাম রেপারটরী কোম্পানীর মঞ্চই প্রমাণ করে দিয়ে গেছে যে সঠিকভাবে বাছাই করে নিতে পারলে এবং দক্ষতার সঙ্গে প্রডাকসন করলে তরুণ অভিনেতা-অভিনেত্রী দিয়েও আলোড়ন সৃষ্টিকারী অভিনয় করানো যেতে পারে।

[প্রত্যেক দেশেই রঙ্গালয়গুলো হচ্ছে অভিনয় শিক্ষার আদর্শ পীঠস্থান। আমাদের দেশেও গিরিশচন্দ্র, অর্ধেন্দুশেখরের কাছে কত যুবক-যুবতী মঞ্চাভিনয়ের মাধ্যমে অভিনয় শিক্ষা করে ভবিষ্যতে নিজেদের স্টার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। শিশিরকুমার তো সারাজীবন ধরেই অভিনেতা-অভিনেত্রী তৈরি করে গেছেন। কিন্তু শিশিরোত্তর যুগের কথা একবার ভেবে দেখুন! আজকের দিনের মঞ্চের ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের আখড়ায় কোন নটনটী তৈরি হতে দেখেছেন? অথচ এই প্রত্যেক দলই দেখবেন দিল্লীর নাটক কলা আকাদেমী থেকে প্রতি বছর নাট্যশিক্ষার বিদ্যালয় চালাচ্ছেন দেখিয়ে বিরাট অঙ্কের টাকা আদায় করছেন। কিন্তু ঐ সব টাকা কোথায় কিভাবে মিলিয়ে যাচ্ছে, আমাদের সরকার সে বিষয়ে কোন নজর দিচ্ছেন কি? গিরিশ-অর্ধেন্দুর যুগে মঞ্চ অর্থসাহায্য পায় নি, শিশির যুগেও নয়—অথচ এদেশে সত্যিকার মঞ্চাভিনয়, নাট্য রচনা প্রভৃতি ঐ সব যুগেই হয়েছে। সুতরাং এই অর্থসংকটের দিনে এভাবে নাট্যোন্নয়নের নামে অর্থের অপচয় না ঘটিয়ে টাকাগুলো অন্যান্য ব্যাপারে, যেমন কৃষি উন্নয়ন খরচ করাটাই বিধেয় নয় কি?—লেখক]

[ক্রমশঃ]

'মাল্যদান' ছবির নায়িকা নন্দিনী মালিয়া
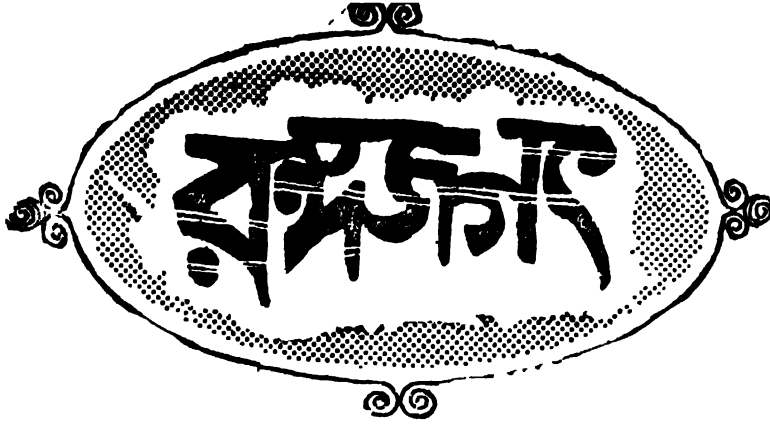
অসামান্য ক্ষতি

যাত্রাজগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের জীবনাবসানে আমরা শোকস্তব্ধ। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে সঙ্গীত নাটক একাডেমি যাঁকে সম্মান জানিয়েছে; যাঁর সম্মানে যাত্রাজগৎ সারা ভারতের স্বীকৃতি লাভ করেছে; যে স্বীকৃতির জন্য পশ্চিমবঙ্গের যাত্রামোদীরা গর্বিত হয়েছে, সেই মহৎ শিল্পী আজ জীবিত নেই। সেদিনও যাঁর অভিনয় দেখার জন্য অসংখ্য মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে ভিড় করতেন আজ আর তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যাবে না; সেই অঙ্গুলী সঞ্চালন আর চোখের তীক্ষ্ণ চাহনী দেখা যাবে না। যাত্রাজগতের মধ্যমণি, যাঁকে কেন্দ্র করে যাত্রার দলগুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তিনি তাঁর জীবন-অভিনয় শেষ করেছেন। যাত্রার এই নিষ্ঠাবান শিল্পী অভিনয়ের আসর থেকেই বিদায় নিয়ে গেছেন। জীবনের রঙ্গমঞ্চে সকলেই অভিনেতা; ফণিভূষণ ছিলেন বৃহত্তর রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা। কৈশোরে যিনি রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই ভূমিকাকে তিনি যথার্থভাবে সম্পাদিত করেছেন। ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষালাভের পর চাকুরি জীবন তাঁকে ততটা আকৃষ্ট করতে পারে নি যতটা আকর্ষণ করেছিল যাত্রাজগৎ। একাধারে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অভিনেতা, যাত্রাপালা রচনাকার এবং উপদেষ্টা, শিল্পীজীবনের কোন কোন সময়ে তিনি চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন; হয়ত মঞ্চনাট্য জগতেও তাঁর সার্থকতার পথে বাধা ছিল না। কিন্তু যাত্রাকেই তিনি ভালবেসেছিলেন। যাত্রা যে পল্লীবাংলার লোকসংস্কৃতি এই চেতনাই তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি বুঝেছিলেন যাত্রার মাধ্যমে পল্লীবাংলার অবহেলিত মানুষকে যে আনন্দ দেওয়া যায় আর কোন শিল্পমাধ্যম তখন এত শক্তিশালী ছিল না। যাত্রার উৎপত্তি যেখান থেকেই হোক, তিনি বুঝেছিলেন যাত্রা বাংলার নিজস্ব লোকসংস্কৃতির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে। যে সময় ফণিভূষণ যাত্রাকে জীবন বিকাশের ক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন তখন যাত্রা আজকের মত এতো বেশি মর্যাদা লাভ করে নি। বর্তমান যাত্রার জনপ্রিয়তা ও মর্যাদায় ফণিভূষণের দান অনেক। সেই শিল্পনিষ্ঠা ও সাধনার কথা স্মরণ করে আমরা যাত্রাগুরু ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

এরই সময়ে আমরা হারিয়েছি আর একজন লোকশিল্পীকে। এই লোকশিল্পী বিখ্যাত তর্জা গায়ক গুরুদাস পাল। ময়দানের জমায়েতে, বড় বড় সভায় গুরুদাস পালের গান যাঁরা শুনেছেন তাঁরা জানেন কত নির্ভীক, কত ক্ষমতাশালী ছিলেন এই শিল্পী। লোকশিল্পের এই অবজ্ঞাত সংগীতধারাকে তিনি মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সমসাময়িক চিন্তাধারা ও গণ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে। খেউড়-খিস্তি ও [illegible] থেকে তর্জাকে তিনি টেনে তুলেছিলেন এমন এক স্তরে যা শোনবার জন্য গ্রামের অশিক্ষিত মানুষের সঙ্গে শহরের শিক্ষিতরা একই আসরে জমায়েত হতেন। শহরের ও গ্রামের মানুষ একইভাবে এই সংগীতরস উপভোগ করতে পারতেন। এই সংগীতরীতির মাধ্যমে গুরুদাস পাল দেশী-বিদেশী শোষকদের চরিত্র উদ্‌ঘাটন করে—জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য প্রেরণা দিতেন। তাঁর বাক্য প্রয়োগ কারো কাছে কড়া চাবুকের মত মনে হলেও—জনগণের মনের কথাই তিনি ব্যক্ত করতেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষাত্মক কথায় শ্রোতারা হাসিতে ফেটে পড়ত। জমায়েতের মঞ্চে দাঁড়িয়ে কোমর নেড়ে গুরুদাসের সেই কশাঘাত ও শ্লেষপূর্ণ সংগীত আর শোনা যাবে না। তাঁর মৃত্যু লোকশিল্পজগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি।

সারাটা জীবন তিনি অশেষ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন। চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি যেমন এই লোকশিল্পকে ত্যাগ করেন নি, তেমনি অর্থের জন্য তাঁর সংগীতকে অবনমিত করেন নি। এই সংগ্রামী লোকশিল্পী গুরুদাস পালকে দেশবাসী ভুলবে না। আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর কথা স্মরণ করছি। —সুজন।

কথনো মেঘ

(অগ্রদূত)

বাংলা চলচ্চিত্র জগতে অগ্রদূত পরিচালক গোষ্ঠীর একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। তাঁদের প্রায় প্রত্যেক ছবি জনপ্রিয় হয়েছে। এবার তাঁদের নির্মিত 'কথনো মেঘ' একটি অপরাধধর্মী ছবি। ছবির কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার প্রশান্ত দেব। তবে এতে বিদেশী গল্পের ছায়া রয়েছে। তা হলেও, ঘটনার পর ঘটনার উন্মোচন এবং শেষ সময় আসল অপরাধীকে আবিষ্কারে দর্শকরা সন্তুষ্ট হন।

অপরাধ কাহিনীর সাধারণ যা ধরণ, যাকে অপরাধী বলে সামনে দেখছি তার চেয়েও ভয়ঙ্কর অপরাধী রয়েছে অন্তরালে। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বজায় রেখে তাকে খুঁজে বার করার মধ্যেই কাহিনীর সার্থকতা। এই ছবিতেও আসল অপরাধী বলে যাদের দেখা গেছে, তাদের সবার ওপরে টেক্কা দিয়ে রয়েছে এক ভয়ঙ্কর লোক। সে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই যেন অপরাধীদের খুঁজে বার করার মহৎ কাজের ভার নিয়েছে। এদের সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে কাজ করতে হয়েছে পুলিশকে। তাদেরও একজন ছদ্মবেশে এতদূর অগ্রসর হয়েছে যে—যাকে কেন্দ্র করে এত ঘটনা সেই শিক্ষয়িত্রী সীমার

সংগে তার প্রেমই হয়ে গেল। জানি না সার্ভিস কোডে এটা আপত্তিকব কি না। তদন্তে গিযে পুলিশরা যদি ক্ষেত্র বিশেষে প্রেম কবে বসে তবে ত' পুলিশেব কাজটা বড় মজাব!

কাহিনী গড়ে উঠেছে একদল দুর্বৃত্তেব মধ্যে হীবা চুবিব জন্য প্রতিযোগিতা নিযে। পবস্পবকে ঠকাতে গিযে হত্যা থেকে কিছুই বাদ যায নি। স্কুলেব শিক্ষযিত্রী সীমা এতে জড়িযে পড়ে নিজেব অজান্তে। তাব ওপব যেমন পুলিশেব নজব, তেমন দুর্বৃত্তদেব নজব। সকলেব ধাবণা ওরই কাছে চোবাই হীরেটা লুকোনো বযেছে। কারণ সে দুর্বৃত্তদলের সুবেশেব ভাইঝি। একদিন দেখা গেল সত্যিই হীবেটা তাবই বাড়িতে বযেছে। পেযেই সে ছুটল পুলিশেব বাড়িতে। সেখানে গিযে তাব যখন জীবন বিপন্ন—ঠিক সে সময আশ্চর্যভাবে তার জীবন রক্ষা পেল।

সীমাব চবিত্রে অভিনয় করেছেন অঞ্জনা ভৌমিক নাবাযণ চৌধুবী বা মিঃ মুখার্জী হচ্ছেন উত্তমকুমাব। কালী ব্যানার্জী এখানে এক শঠ চবিত্রে অভিনয কবেছেন। সুব্রতা চ্যাটার্জী, শোভা সেন, জহব বায, নীলিমা দাস প্রমুখ বিভিন্ন চবিত্রে অভিনয় কবেছেন। দুর্বৃত্তদলে বঙ্কিম ঘোষ তরুণ মিত্র, কানু মুখার্জী অভিনয কবেছেন।

ছবির টেকনিক্যাল দিক ও সঙ্গীত প্রশংসা পাবাব মত এমন কিছু নয।

'রাজা আউর রংক' ছবিতে কমল কাপুর ও মহেশকুমার

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলা এক অভিনব প্রচেষ্টা

গত ১৪ই ডিসেম্বব রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোযাবে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলার উদ্বোধন হযেছে। পার্কের অর্ধাংশব্যাপী নির্মিত বিবাট প্যাণ্ডেল, চাবিদিকে আলোকসজ্জা সুসজ্জিত দুটি তোরণ, নানা রকম খাবার ও পানীয়ের তিনটি স্টল, এম্বুলেন্স কোরের সদস্যদের ও ফায়ার ব্রিগেডের এবং পুলিশের উপস্থিতি ইত্যাদিতে পার্কটি এক নতুন রূপ গ্রহণ কবেছে। প্যাণ্ডেলেব মধ্যে সাড়ে তিন হাজাব লোকের বসাব ব্যবস্থা হয়েছে—চেযার ও গ্যালাবী মিলে। দুটি করে শো'তে ছবি দেখছেন প্রতিদিন সাত হাজাব কবে লোক। মেলা উপলক্ষে ফিল্ম সোসাইটি অস্থাযী সদস্য গ্রহণ করে বহু লোককে ছবি দেখাব সুযোগ দিযেছেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলা উদ্বোধন কবেন বিখ্যাত চলচ্চিত্রস্রষ্টা শ্রীমধু বসু। উদ্বোধনকালে তিনি এরূপ মেলার আযোজনকে অভিনব প্রচেষ্টা বলে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, এরূপ প্রচেষ্টায যেমন ফিল্ম সোসাইটি মুভমেণ্টের ভাল হবে, তেমনি ভাল দর্শক তৈবিব সহাযতা হবে এবং সামগ্রিকভাবে দেশীয চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতিব সুযোগ কবে দেবে। জার্মান ডেমোক্রেটিক বিপাবলিকেব মিঃ এ বেডাব আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলার উদ্দেশ্যকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ভাল ছবি দেখান—ভাল সমাজ গঠনেব সহাযক।

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলা কমিটির সম্পাদক শ্রীকল্পতরু সেনগুপ্ত বলেন, ফিল্ম সোসাইটি মুভমেণ্টে এই মেলা এক নতুন পদক্ষেপ। এরূপ উদ্যোগেব ফলে ফিল্ম সোসাইটিগুলি মানুষের কাছাকাছি যাবার সুযোগ পাবে, সোসাইটিগুলিতে উন্নাসিকদের প্রাধান্য থাকবে না। নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটিব পক্ষে শ্রীসুশীল কবণ সমাগত ব্যক্তিদেব এবং এই মেলা সংগঠনে যাঁবা সহাযতা কবেছেন তাঁদের অভিনন্দন জানিযে বলেন, এরূপ আযোজন ভাবতে এই প্রথম, সুতরাং অভিজ্ঞতাও প্রথম।

মেলাব প্রথম দিন প্রদর্শিত হয ঋত্বিক ঘটকের 'সুবর্ণরেখা'। ছবিটি দেখাব জন্য প্রচুব দর্শক সমাগম হয়েছিল। বিরাট জনতাব মধ্যে দেখে ছবিটিকে যেন নতুনভাবে উপলব্ধি কবা গেল। ছবিটির প্রযোজক শ্রীবাধেশ্যাম ঝুনঝুনওযালা বাব বাব বলছিলেন, বিশ্বব নানা স্থানে দেখিযে তিনি এত আনন্দ পান নি এত বিবাট সংখ্যক দর্শকেব আগ্রহ ও অভিনন্দনে আজ তিনি যে আনন্দ পেলেন। আমাদেব দেশেব চিত্র সমালোচনাব মান যে কত নিম্নস্তবেব আজকের দর্শকদের উচ্ছ্বাস তাব প্রমাণ।

১৫ই তাবিখ প্রদর্শিত হযেছে বুলগেরিযাব 'দি সাইড ট্রেক'। মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত এই ছবিটিতে বর্তমানেব পবিণত বুদ্ধিতে দুজন নবনাবীব ।তাকে বিচাব কবা হয়েছে। এতে গভীর মানবিক দৃষ্টিতে এসেছে বুলগেরিযাব কমিউনিস্ট বিপ্লব ও মানসিক উন্নয়ন। প্রেম ও জীবনের সম্পর্ক এবং দাযিত্ব। বুদ্ধিব দীপ্তিতে প্রেমের প্রশ্ন আলোচিত, যা ধনতান্ত্রিক দেশের ছবিতে পাওযা যায় না। অথচ কোন উগ্র আধুনিকতা বা প্রকৃতিবাদেব প্রশ্রয় নেই।

১৬ই তারিখে দেখান হয়েছে ইতালীর বিখ্যাত ছবি 'খাইসাইকেল

'মেরে হুজুর' ছবিতে রাজকুমার ও [illegible]

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলার উদ্বোধন করছেন শ্রীমধু বসু। পাশে বসেছেন জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের মিঃ এ, রেডার।

থীফ"। যে ছবিতে ভিত্তোরিও দে সিকা খ্যাতির উচ্চাসন পেয়েছেন। যুদ্ধোত্তর-কালে ইতালীর শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থায় এক বেকারের চাকুরী লাভ, তার ভাড়া করা সাইকেল চুরি যাওয়া এবং সাইকেলটি উদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে নিজে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ার ঘটনার মধ্যে একটা সমাজব্যবস্থা ও সময় প্রকাশ পেয়েছে।

১৭ই দেখান হয়েছে জাপানের 'ইউকিওয়ারসু'। এই ছবিতেও এক জাপানী দম্পতি ও একটি শিশুকে নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে যুদ্ধোত্তর জাপানকে দেখান হয়েছে। ছবিটি প্রধানত মনস্তাত্ত্বিক হলেও এতে সর্বকালীন আবেদন রয়েছে।

১৮ই প্রদর্শিত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের 'অক্টোবর'। সের্গেই আইজেনস্টাইন যে ছবি করে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেছিলেন—'অক্টোবর' তার অন্যতম। এই ছবিতে রাশিয়ার ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের পরে কেরেনেস্কির অস্থায়ী সরকার গঠন, জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও বলশেভিকদের ক্ষমতা দখলের ইতিহাস দেখান হয়েছে। ছবিটিতে আইজেনস্টাইনের ব্যঙ্গ ক্ষমতার যেমন চমৎকার নিদর্শন রয়েছে, তেমনি সংবাদচিত্রের মত করে ঘটনা সাজানোর চমৎকারিত্ব রয়েছে। সর্বাধিক আকর্ষণীয় লেনিনের বক্তৃতা।

মেলায় সর্বাধিক লোক সমাগম হয়েছিল বাইসাইকেল থীফ, ইউকিওয়ারসু ও অক্টোবর দেখার জন্য।

১৯ তারিখে দেখান হয়েছে জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের "ইউ এণ্ড ইয়োর প্যাল"। থর্নডাইক দম্পতি নির্মিত

মূকাভিনেতা অরূপ নাগ সাংবাদিক সমর চ্যাটার্জীর লেখা 'উত্তরবঙ্গের কালরাত্রি' অভিনয় করছেন।

এই ছবি বিশ্ব ইতিহাসের এক মূল্যবান দলিল। এতে দেখান হয়েছে ধনতান্ত্রিক সংকট থেকে কিভাবে ফ্যাসিজম জন্ম লাভ করেছে। ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রামের চিত্রও দেখান হয়েছে—তবে এই সংগ্রামে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সেই স্তালিনকে দেখান হয় নি।

২০শে দেখান হয়েছে হাঙ্গেরীর 'টু হাফ টাইমস ইন হেল'। এই ছবিতে জার্মান অধিকৃত হাঙ্গেরীতে এক বন্দী-শিবিরের বন্দীদের দিয়ে নাজীদের ফুটবল খেলার ঘটনা এবং তা থেকে ফ্যাসিস্টবিরোধিতার চমৎকার পরিণতি দেখান হয়েছে। খেলার অংশ বিস্ময় ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে।

২৩শে ডিসেম্বর পর্যন্ত আরো তিনটি ছবি—দি গ্রেট এ্যাডভেঞ্চার (সুইডেন), বার্থ সার্টিফিকেট (পোলাণ্ড) এবং হিন্দী ছবি মেহবুবের আওরৎ দেখান হবে।

ইতালী, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দূতাবাসের প্রতিনিধিগণ মেলায় বিভিন্ন দিনে উপস্থিত ছিলেন।

পুরনো দিনের জার্মান ছবি

দিনে ক্লাব অব ক্যালকাটা চারটি

আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মেলা উপলক্ষে চলচ্চিত্র ইতিহাসের চিত্র ও লেখার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। প্রদর্শনী স্টলে উদ্যোক্তাদের কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে।

পুরনো দিনের জার্মান ছবি দেখাবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। গত ১৭ই ও ১৮ই ডিসেম্বর সরলা রায় মেমোরিয়াল হলে স্টুডেন্টস অব প্রাগ (১৯১৩), দি জয়লেস স্ট্রীট (১৯২৫), দি গোলেম (১৯২০) এবং রয়্যাল স্ক্যান্ডাল (১৯২৭) দেখান হয়েছে।

দাসজীবী

বেলুড় 'কৃষ্টিলোক'-এর বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ই আর ইনস্টিটিউট, হাওড়া মঞ্চে শ্রীভানু চট্টোপাধ্যায় রচিত 'দাসজীবী' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়ে দর্শক-মণ্ডলীর সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়।

বিভিন্ন চরিত্র-অভিনয়ে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ হাজরা, নিমাই চট্টোপাধ্যায়, নীরেন সেন, শংকর রায়, শক্তিকিঙ্কর গাঙ্গুলী, সন্তোষ গাঙ্গুলী, দুলাল পাত্র, দুলাল ঘোষ, দিলীপ মজুমদার, গোপাল সরকার, মন্টু ভট্টাচার্য, অরুণ ভট্টাচার্য, অমিতাভ ভট্টাচার্য, স্বপ্না মিত্র, সেবা দাস, বন্দনা মুখার্জী। নাটকটির পরিচালনায় ছিলেন সুখ্যাত নাট্য-পরিচালক শ্রীবিজলীমোহন মুখোপাধ্যায়। আবহ সংগীতে শ্রীবিশ্বনাথ সুর ও শ্রীঅলোক পণ্ডিত। মঞ্চ-পরিচালনায় শ্রীসীতাংশু মুখোপাধ্যায়।

জে কে নগরে বিচিত্রানুষ্ঠান

গত ২৩শে নভেম্বর জে কে নগর অফিসার্স ক্লাব রঙ্গমঞ্চে অ্যালুকয়েন ক্লাবের উদ্যোগে এক বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে কুলটির জনপ্রিয় শিল্পসংস্থা "উদয় চক্র" শ্রীসমীপেন্দু লাহিড়ীর পরিচালনায় মূকাভিনয় ও সংগীতানুষ্ঠান পরিবেশন করে প্রশংসা অর্জন করেন। অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে অরুণ গুপ্ত, সুশান্ত ঘোষ, বাদল দাস, অশোক ঘোষ, তপেশ রায় ও সমীপেন্দু লাহিড়ীর নাম উল্লেখযোগ্য।

'অগ্নিযুগের কাহিনী' ছবিতে সীমন্তিনী রায়

ত্রিসপ্তক

গত ১৪ই ডিসেম্বর ঝামাপুকুর রাজবাড়ি মঞ্চে নবগঠিত ত্রিসপ্তক সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শীতকালীন সংগীত অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল সুনির্বাচিত রবীন্দ্রসংগীত সহযোগে 'বিরহ মিলন' নৃত্যনাট্যটি। মাত্র ছ' মাস পূর্বে প্রতিষ্ঠিত সংস্থার কাছ থেকে এরূপ মিশ্ররসের নৃত্যনাট্য অভিনন্দনীয়।

নৃত্য পরিচালনা করেন সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেপথ্য কণ্ঠসংগীতে বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন বন্দনা সিংহ, শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়ব্রত মৈত্র ও তৎসহ ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ। নৃত্যে সূক্ষ্মরসের পরিচয় দান করেন ভদ্রা মিত্র। গ্রন্থনায় ছিলেন অশীষ মজুমদার ও বিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষা শ্রীমতি মিত্র। বিদ্যুৎ বসুর পরিচালনায় ছাত্রছাত্রীদের সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সন্ধ্যার অন্যান্য আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে একক রবীন্দ্রসংগীতে ছিলেন বিদ্যালয়ের সংগীত উপদেষ্টা অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন গুপ্ত ও প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ঋষিণ মিত্র। বেহালায় রবীন্দ্রসংগীতের সুর বাজিয়ে শোনান সত্য মজুমদার।

মেমসাহেব

'চৌরঙ্গী'র প্রযোজিকা নিমাই ভট্টাচার্য রচিত 'মেমসাহেব'কে চিত্ররূপ দিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে জানা গেল। ছবিটি পরিচালনা করবেন পিনাকী মুখার্জী।

সূর্য পরশ

একটি অপরাধমূলক কাহিনীচিত্রের নাম 'সূর্য পরশ'। আন্তর্জাতিক অপরাধের পটভূমিতে চিত্রনাট্য লেখা। ছবিটির সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সলিল চৌধুরী। নেপথ্য সংগীতে অংশ গ্রহণ করছেন মান্না দে, আশা ভোঁশলে, সবিতা চৌধুরী। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন অনিল চ্যাটার্জী, মাধবী মুখার্জী, বিকাশ রায়, দীপ্তি রায়, সুখেন দাস, জহর রায়, দিলীপ রায়, মধুমতী, উদয়কুমার, নীলম চৌধুরী প্রমুখ।

সাগিনা মাহাতো

তপন সিংহ তাঁর নতুন ছবি সাগিনা মাহাতোর কাজ নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে আরম্ভ করেছেন। রূপশ্রী ইন্টারন্যাশনালের এই ছবিতে অভিনয় করবেন হিন্দী চিত্রজগতের দিলীপকুমার ও সায়রাবানু। বাঙালী শিল্পীদের মধ্যে থাকবেন অনিল চ্যাটার্জী, সুমিতা সান্যাল, চিন্ময় রায়, স্বরূপ দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। চিত্রনাট্য রচিত হয়েছে একই নামের উপন্যাস অবলম্বনে।

"তাসের রাজা যাদুকর হাউয়ার্ড থার্স্টনের স্মৃতি উৎসব"

যাদুকর প্রফেসার হাউয়ার্ড থার্স্টনের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৫ই ডিসেম্বর (২২৬এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড) শ্যামবাজারে এক ম্যাজিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যাদুকর জি. সি ভট্টাচার্য সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। মহীশূর, বম্বে, মাদ্রাজ সমগ্র ভারতবর্ষের বহু যাদুকরই বিভিন্ন খেলা দেখিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেন। এই সভায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন সংগীতাচার্য জয়কৃষ্ণ সান্যাল। উদ্বোধন করেন শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু। প্রারম্ভে মাঙ্গলিকী উচ্চারণ করেন শ্রীবনমালী ভট্টাচার্য।

শর্মিলা-পতৌদির বিয়ে

শর্মিলা ঠাকুরের সঙ্গে পতৌদির নবাবের বিয়ে হচ্ছে ২৭শে ডিসেম্বর। বিয়ে কলকাতাতে সামরিক এলাকাতে হবে। এক খবরে প্রকাশ শর্মিলা ঠাকুর বিয়ের পর চলচ্চিত্র অভিনয় করা ছেড়ে দেবেন।

রবীন্দ্রসরোবর হলে ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে সুতপা দাশগুপ্তা সেনগুপ্ত ও অনুপশঙ্কর।

স্বজনপোষণ

আমাদের দেশে এই সময়টাকে যদি স্বজনপোষণের যুগ বলা যায় তাহলে মনে হয় যে কেউই আপত্তি করবেন না। কারণ পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, অফিসে-আদালতে যেখানেই যাওয়া যাক না কেন—দেখা যাবে স্বজনপোষণের অভিনব প্রচেষ্টার আধুনিক কায়দা। তা সে রাজনীতিই বলুন কিম্বা দুর্নীতিই বলুন—জীবনের সর্বক্ষেত্রে আজ চলেছে স্বজনপোষণ। সুতরাং ক্রীড়াজগৎই বা কেন আর এমন একটি কায়দা থেকে, এমন একটা সুবিধাজনক ব্যাপার থেকে পিছিয়ে থাকবে? আর এ বিষয়ে আমাদের খেলাধুলার জগৎও যে পিছিয়ে নেই সে আমরা সকলেই হলপ করে বলতে পারি। উদাহরণ চাই? তাহলে দিতে হবে একটার পর একটা অতি মনোরম কাহিনীর পরিচয়। অবশ্য তার যে খুব একটা বেশি প্রয়োজন আছে তা মনে হয় না। কারণ পাঠক-পাঠিকারা নিজেরাই জানেন একাধিক ঘটনার কথা। সে সব ঘটনার মধ্যে আছেন ভারতীয় ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ড, সি. এ. বি, তাই [illegible] এ. বি এবং এ সবাই। কেউ বাদ নেই। [illegible] না কি করে! যুগের হাওয়া [illegible] সবাই যে দুলছেন। কেউ কেউ আবার ঝুলছেনও। সত্যি কথা বলতে আজ বোধহয় কেউই বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন না যে তিনি ধোয়া তুলসীপাতা। তবে একথাও সত্য যে এ যুগে কেউই বোধহয় আর ধোয়া তুলসী পাতাটির মতো পবিত্র হতে চান না বা পারবেন না।

তবে বর্তমানে যে সব ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের স্বজনপোষণ নীতি স্বেচ্ছাচারিতার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁচেছে তার মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পোর্টস বোর্ড অগ্রণী। কথাটা শুনতে অবশ্য বড়ই পুরনো লাগতে পারে। আর সেইটাই স্বাভাবিক। কারণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের খেলোয়াড় নির্বাচনের কীর্তিকাহিনীর কথা কেই বা আর না জানেন। প্রতি বছরই তাঁরা নিজেদের পছন্দমত খেলোয়াড় খেলিয়ে বহুকাল আগে থেকেই সৃষ্টি করে বসে আছেন একটা উল্লেখযোগ্য নজীর। সম্প্রতি আমাদের দপ্তরে একটি কলেজের জনৈক অধ্যাপকের চিঠি এসেছে। চিঠিটির প্রতিটি ছত্রেই পাওয়া যায় তাঁর বিক্ষুব্ধ মনের পরিচয়। আর তাঁর মনের পুঞ্জীভূত ঐ ক্ষোভ বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ডের বিরুদ্ধেই। তিনি ভুক্তভোগী—তাই তাঁর জ্বালা একটু বেশি। চিঠিটির এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "...এবারে কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের (আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় হকি প্রতিযোগিতার) ট্রায়ালগুলো প্রহসনে রূপান্তরিত হয়েছে। ২১।১১ ও ২২।১১ তারিখে ট্রায়াল ছিল। ট্রায়ালে কোন একজন খেলোয়াড় আসে নি। কিন্তু তাকে কোচের দ্বারা ফোন করিয়ে মাঠে এনে পরে দলে চান্স পাইয়ে দেওয়া হলো। অথচ সে ছিলো আহত ও সম্পূর্ণ আনফিট। কিন্তু আর একজন খেলোয়াড় যে কলকাতার একটি নামকরা কলেজের হকি অধিনায়ক ও প্রথম বিভাগের খেলোয়াড়—সে রোজ ট্রায়ালে আসা সত্ত্বেও চান্স পেল না। অথচ অনেকেই জানতেন যে, এবার তারই বিশ্ববিদ্যালয় দলের অধিনায়ক হবার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো যে, যে দলে আসে নি তার নাম আছে অতিরিক্ত খেলোয়াড় তালিকায়!....." জানি সে বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ড এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেবেন কি না। —শান্তিপ্রিয়।
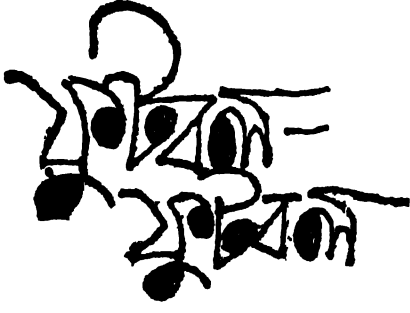
সুব্রত মুখার্জী কাপ আগেই এসেছে, এসেছে জুনিয়ার জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ানশীপের ট্রফি, আর এবার বাংলা দেশে এলো রোভার্স কাপ। মোহনবাগান ক্লাব এ বছর লাভ করেছে রোভার্স কাপ বিজয়ীর সম্মান।

এ বছরের রোভার্স কাপ ফাইন্যাল

অশোক চ্যাটার্জী
রোভার্স কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলার শেষ দিনে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন।

খেলাটা ছিলো মর্যাদার লড়াই। কলকাতা তথা বাংলা দেশের প্রেসটিজ জড়িয়েছিলো খেলাটির ফলাফলের ওপর। কারণ অনেক আগেই হেরেছিল ইস্টবেঙ্গল, তারপর পরাজিত হলো মহামেডান স্পোর্টিং অর্থাৎ একমাত্র মোহনবাগান ছাড়া একে একে হেরে গিয়েছিলো কলকাতার দলগুলো। তার ওপর ইস্টবেঙ্গল আর মহামেডান স্পোর্টিং পরাজিত হয়েছিলো ঐ লীডার্স ক্লাবের কাছেই।

তাই ফাইন্যাল খেলার ফলাফলের সঙ্গে জড়িয়েছিলো কলকাতার মর্যাদার প্রশ্ন। কারণ অন্যদিকে ফাইন্যালে উঠেছিলো জলন্ধরের লীডার্স ক্লাবই। এইবার সর্বপ্রথম ওরা উঠেছে ফাইন্যালে।

গত বছর ডুরান্ড কাপের খেলাতেও মুখোমুখি সমরে অবতীর্ণ হয়েছিলো এই দুটি দল অর্থাৎ কলকাতার মোহনবাগান আর জলন্ধরের লীডার্স ক্লাব। লীডার্স সে খেলায় হারিয়ে দিয়েছিলো মোহনবাগানকে।

তাই এ বছরের রোভার্স কাপ ফাইন্যালের গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম। বাংলা দেশের সমর্থকদের মনে ছিলো আশা-নিরাশার দোলা। সংশয়ে ভরা ছিলো সকলের মন। সকলেরই মনে ছিলো চিন্তা—পারবে কি মোহনবাগান লীডার্স ক্লাবকে হারাতে? পারবে কি মোহনবাগান পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে . ?

কিন্তু প্রথম দিনের খেলা শেষ হলো অমীমাংসিতভাবে। কোন দলই পারে নি একটাও গোল করতে। অথচ গোল করবার জন্যে প্রাণপণ সংগ্রাম চালিয়েছিলো দুটি দলই। উন্নত ধরণের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শনের বদলে উভয় দলের খেলোয়াড় দৈহিক শক্তি প্রকাশের দিকেই দিয়েছিলেন বেশি জোর।

মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়দের মাথা গরম হয়েছিলো খেলার প্রথম দিকে অশোক চ্যাটার্জী বিশ্রীভাবে আহত হবার পর। শেষ পর... [illegible] দিন-
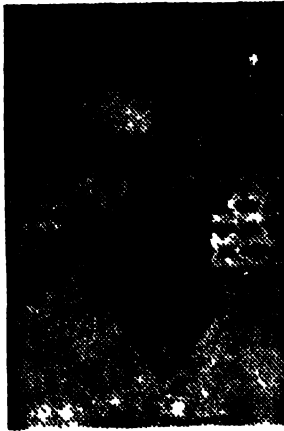
[illegible]
একাই দুটো গোল দিয়েছিলেন এবারের রোভার্স কাপ ফাইন্যাল খেলায়।

পাটকেল থেকে আরম্ভ করে আগুনও জ্বলেছিলো। আর তার মধ্যে শেষ হয়ে গেলো খেলা অমীমাংসিতভাবে।

পরের দিন খেলার আগেই মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা মাথা ঠাণ্ডা করে খেলবেন ঠিক করেই মাঠে নেমেছিলেন।

গল্প হলেও সত্যি

ক্রিকেট মাঠে আর মাঠের বাইরে আমরা হামেশাই ক্রিকেট ব্যাট দেখি। ছোট-বড় নানা মাপের ব্যাট। তবে ক্রিকেট ব্যাট এখন আর চওড়ায় সওয়া চার ইঞ্চি আর লম্বায় আটত্রিশ ইঞ্চির বেশি হতে পারে না। কিন্তু এই নির্দিষ্ট মাপ একদিনে হয় নি। এর পেছনে আছে একটি মজার ঘটনা। আর সেই ঘটনার নায়ক চারটেসী দলের খেলোয়াড় হোয়াইট সাহেবের নাম ক্রিকেট ব্যাটের সংগে চিরদিন জড়িয়ে থাকবে।

১৯৭১ সালে বিলেতের হ্যাম্বলডন ক্লাব আর চারটেসী দলের মধ্যে ক্রিকেট ম্যাচ খেলা হচ্ছে। চারটেসী দলের ব্যাটিং। হোয়াইটের পালা এলে সে দরজার মত চওড়া একখানা ব্যাট নিয়ে এসে দাঁড়ালো। চওড়া ব্যাটের আড়ালে উইকেট ঢাকা পড়ে গেছে। বোলাররা সারাদিন আপ্রাণ চেষ্টা করেও হোয়াইটকে আউট করতে পারলো না। পারবেই বা কি করে? হোয়াইটের ব্যাট যে দরজার মত চওড়া। আর সে ব্যাট মোটে তোলেই না!

আজকালকার এম· সি সির মতো হ্যাম্বলডন ক্লাব ছিলো সেকালের ক্রিকেট খেলার হর্তা-কর্তা-বিধাতা। তাঁরা দেখলেন, এ বড় ভাবনার ব্যাপার। এর বিহিত না করলে কেউ হয়তো কোনদিন একটা আস্ত দরজা ভেঙে নিয়ে ব্যাট করতে আসবে। তাই এর একটা কিছু ব্যবস্থা করার জন্য তাঁরা উঠে পড়ে লেগে গেলেন। ঠিক হলো যে ক্রিকেট খেলার ব্যাট কোন মতেই সওয়া চার ইঞ্চির বেশি চওড়া করা চলবে না। তাঁরা একটা ঐ মাপের ফ্রেম বানালেন। আর ঐ ফ্রেমে মাপা না হলে সে ব্যাটে খেলতে দেওয়া হবে না বলে ঠিক হলো।

ম্বুর তাই লীডার্স দলের আক্রমণ আর রক্ষণভাগকে ভেঙে তছনছ করে দিয়ে মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা দিলেন পর পর তিনটে গোল।

রেফারীর সমস্ত সিদ্ধান্ত ঠাণ্ডা মাথায় মেনে নিয়ে খেলেছিলেন মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা। অথচ রেফারীর অনেক নির্দেশই ছিলো নাকি অহেতুক, অবাঞ্ছনীয় এবং অযৌক্তিক।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত নঈমের দেওয়া দু'টি ও কাননের একটি গোলে লীডার্স ক্লাবকে হারিয়ে দিয়ে মোহনবাগান লাভ করলো বিজয়ীর সম্মান।

কানন

মোহনবাগানের রোভার্স কাপ লাভের পেছনে ছিলো কাননের একটা গোল।

অনেকটা সেই অশ্বমেধের ঘোড়ার মতো শেষ পর্যন্ত লণ্ডন থেকে ১০,৬০০ মাইল পাড়ি দিয়ে সিডনিতে গিয়ে হাজির হয়েছে ম্যাবাথন মোটর রেসের গাড়িগুলো।

হিলম্যান হান্টার গাড়ি নিয়ে স্কটল্যাণ্ডের অ্যাণ্ড্রু কাওয়ান সবার আগে গিয়ে পৌঁচেছেন নির্দিষ্ট সীমানায়। জয়ী বিজয়ীর সম্মান হিসেবে তিনি লাভ করলেন দশ হাজার স্টার্লিং। এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন আয়ারল্যাণ্ডের প্যাডী হপকার আর তৃতীয় স্থান পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার আয়ান ভাগ্গন।

গত ২৪শে নভেম্বর লণ্ডন থেকে আরম্ভ হয় এই অভিনব মোটর রেস। দশ হাজার ছ'শ' মাইলের এই মোটর দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন ৯৮ জন প্রতিযোগী।

গাড়িগুলো প্যারিস, তুরিন, বেলগ্রেড, ইস্তামবুল, তেহেরান, কাবুল, খাইবার পাশ, সাবোবিনি হয়ে দিল্লী থেকে বোম্বাই-এ আসে। বোম্বাই থেকে ৭২টি

শান্তি দত্ত

সম্প্রতি ভারতীয় বডিবিল্ডিং ফেডারেশন পরিচালিত 'ভারতশ্রী' শ্রেষ্ঠদেহী প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান অর্জন করেছেন।

রোভার্স কাপ বিজয়ী মোহনবাগান ক্লাবের খেলোয়াড়রা শনিবার কলকাতা পৌঁছলে অসংখ্য ক্রীড়ামোদী ও সমর্থকগণ তাঁদের বিপুলভাবে সম্বর্ধনা করে। ছবি দিয়ে মোহনবাগান সমর্থকদের আনন্দ প্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছে।

[illegible] বন্দরের পথে। তারপর পার্থ থেকে সিডনি পর্যন্ত ৩,৫০০ মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল গাড়িগুলোকে বিপদ-সংকুল পথের ওপর দিয়ে। এই পথে ৩১টি গাড়ি প্রতিযোগিতা থেকে সরে আসে।

সিডনি থেকে মাত্র একশ' মাইল দূরে একটা বিশ্রী রকমের দুর্ঘটনা ঘটে। বেলজিয়ামের লুসিয়েন বিয়ানচি চলেছিলেন সকলের আগে। তিনি যে প্রথম স্থান লাভ করবেন সে বিষয়ে ছিল না কারো এতোটুকুও সন্দেহ। কিন্তু শেষ সীমানা থেকে মাত্র একশ' মাইল দূরে একটা দুর্ঘটনার কবলে পড়ে গুরুতর আহত হন বিয়ানচি। তাঁর গাড়ি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। আর তিনি আঘাত পান মাথায়।

যাই হোক এই অভিনব প্রতিযোগিতার কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছেন যে প্রতি অলিম্পিক বছরে অনুষ্ঠিত হবে দূরপাল্লার এই মোটর দৌড়ের ম্যারাথন রেস।

থাইল্যান্ড অলিম্পিক কমিটির একজন মুখপাত্র বলেছেন যে থাইল্যান্ডেই বসবে ষষ্ঠ এশিয়ান গেমস ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসর। তবে এই প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানসূচীতে যেমন কাট-ছাঁট করা হবে তেমনি কমানো হবে খরচের অংকও। খরচের হিসেবে ধরা হয়েছে সাড়ে সাতষট্টি লক্ষ টাকা। আর অনুষ্ঠানসূচী থাকবে — এ্যাথলেটিকস, বাসকেটবল, [illegible], ভলিবল, টেবল টেনিস, ফুটবল, মুষ্টিযুদ্ধ, ভারোত্তোলন, সাইকেলচালনা আর শুটিং কিম্বা মল্লযুদ্ধ।

* * *

নিউ সাউথ ওয়েলসের উইকেটরক্ষক ব্রায়ান ট্যাবার দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার ১২ জন খেলোয়াড়কে ক্যাচ ধরে আউট করে বিশ্ব রেকর্ডের সমান কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। আজ থেকে ঠিক একশ' বছর আগে ১৮৬৮ সালে সারে কাউন্টি দলের উইকেটরক্ষক ই. এইচ. পুলে এসেক্সের বিরুদ্ধে আর ১৯৩৮-৩৯ সালে কুইন্সল্যান্ডের ডন ট্যালন নিউ সাউথ ওয়েলসের বিরুদ্ধে উইকেট কিপিং-এ বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন।

ফুটবলের মান কোন পথে?

• নীলিমেশ রায়চৌধুরী •
(সংকলক)

[ফুটবল খেলার মান এখন নাকি নিম্নমুখী, খেলার সৌন্দর্যের বিষয়টিও এর সংগে জড়িত। সমস্ত ফুটবল-বিশ্ব আজ তাই এই চিন্তায় মগ্ন। পৃথিবীর দিকপাল কোচ, ম্যানেজার ও খেলোয়াড়রাও এই বিষয়ে তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছেন। আমরাও তাঁদের সেই মন্তব্যগুলো পাঠক-পাঠিকাদের জানার জন্যে আলোচ্য লেখাটির মাধ্যমে ছাপার ব্যবস্থা করেছি। —ক্রীড়া সম্পাদক]

বিশ্ব ফুটবলের মান ও সৌন্দর্য নিম্নমুখী কেন? —আজ এই প্রশ্নই গোটা বিশ্বের ফুটবল-উৎসাহীদের মুখে মুখে ফিরছে। গত বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার পর থেকে সবাই এই প্রশ্নেই সোচ্চার। বিভিন্ন দেশের নামী-দামী প্রশিক্ষকেরা বিভিন্ন অভিমতও ব্যক্ত করেছেন এই বিষয়টি নিয়ে। আসলে গত বিশ্বকাপে খেলার মান দেখে সবাই বেশ কিছুটা মর্মাহত। সেই সংগে ভয়ও পাচ্ছেন ফুটবলের ভবিষ্যৎ ভেবে। সময় থাকতে কাজে হাত না দিলে ভবিষ্যৎ শুভ নয়—এটা জেনেই সবাই উঠে পড়ে লেগেছেন কারণ অনুসন্ধানে। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মত—প্রত্যেকেই স্বপক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি রাখতে কসুর করেন নি—আমাদের এই আলোচনায় বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়, প্রশিক্ষক ও ম্যানেজারের মতামতকে তুলে ধরা হচ্ছে পাঠক-পাঠিকাদের সামনে।

হেলমাট স্কুন (জাতীয় প্রশিক্ষক—জার্মান ফেডারেল রিপাবলিক)

ওঁর মতে "ফুটবল খেলা 'আইস্ হকি' নয়"। ফুটবলের বর্তমান দশায় ওঁর বক্তব্য হল—"বিভিন্ন দেশে আজকাল ফুটবল খেলা হয় কতকটা রক্ষণাত্মক ঢঙে। কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে যে আক্রমণ ও রক্ষণভাগের সমান দায়িত্ব রয়েছে। এর জ্বলজ্বলে দৃষ্টান্ত এবারের বিশ্বকাপে রেখেছে—ইংল্যান্ড, পর্তুগাল, হাঙ্গেরী এবং আমাদের দেশ।

আন্তর্জাতিক ফুটবল আইনের কোন রদবদলের আমি তীব্র বিরোধী। এখনকার আইন নিয়ে কোচেরা ততটা চিন্তিত নন যার ফলে আইন বদলের প্রয়োজন আছে। অনেকেই ফুটবলের অন্ধকার ভবিষ্যৎ-এর কথা উল্লেখ করেছিলেন আইনের জন্মলগ্নে অর্থাৎ ১৯২৬ সালে। অথচ সে ফুটবল সগৌরবে গড়িয়ে চলেছে। খেলার মাঝে খেলোয়াড় বদলে খেলার মাঝে ছন্দঃপতন ঘটায়—এ জিনিস 'আইস হকিতেই চলে। ফুটবল আইস হকি নয়।"

গ্যাভরিল কাচালিন্ (সোভিয়েট অলিম্পিক দলের প্রশিক্ষক)

ওঁর সোজা কথা—"সবাইকে দায়িত্ব নিতে হবে"! আরও সহজ করে উনি যে কথা বলতে চেয়েছেন তাহলে—"গত বিশ্বকাপের আসরে ফুটবল রক্ষণাত্মক পদ্ধতিতেই বেশি খেলা হয়েছে—তবে এটা সুনিশ্চিত এ জিনিস বেশিদিন টিকবে না। এখন থেকেই প্রশিক্ষকদের উচিত কার্যকরী আক্রমণপদ্ধতি বার করা। আজ একথা সবার কাছেই পরিষ্কার হয়েছে যে ফুটবলের সব গুরুত্বই গোলে রক্ষণাত্মক ঢঙে খেলাতে নয়। আইন নিয়ে মাতামাতি না করে আমার মতে কোচ আর ম্যানেজারদের 'সাইকোলজির' পরিবর্তন দরকার। পরাজয়ের ভয়ে তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেন রক্ষণভাগ সামাল দিতে—এতে আক্রমণভাগ দুর্বল হয়ে পড়ে। আমার কথা—ঝুঁকি নিতে হবে। আজকাল তেমন দক্ষ ফরোয়ার্ড আমার চোখে পড়ে না—বিশ্ব সেরা দলেও না। সেক্ষেত্রে বরং রক্ষণভাগের দু'-একজনকে আক্রমণভাগে নিয়ে গেলে ভাল ফল মিলবে বলেই আমার বিশ্বাস।"

[চলবে।

(উপনিবেশ কলোনী, পাণ্ডু, আসাম)

উত্তর : হাঁ।

"রেন পাল (বংশীহারী, পশ্চিম দিনাজপুর)

উত্তর : শারদীয়া সংখ্যায় 'মাই ডিয়ার গোপাল' আর অন্য সংখ্যাগুলোতে খেলাধুলা বিভাগটা আপনার ভালো লাগে জেনে আমরা উৎসাহিত হয়েছি। এর আগে কিন্তু আপনার কোন চিঠি পাই নি আমরা।

যাই হোক আপনার প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে শর্মিলা-পতৌদির বিয়ে আগামী ২৭শে ডিসেম্বর।, সুতরাং অন্য কারো সংগে শর্মিলার বিয়ের প্রশ্নই ওঠে না।

গোপাল পালচৌধুরী (কালীচরণ ব্যানার্জী লেন, হাওড়া)

প্রশ্ন : গত বছর কলকাতার আই· এফ· এ শীল্ড ও এ বছরের লীগ ও শীল্ড খেলা হবে কি?

উত্তর : গত বছরের আই· এফ· এ শীল্ড খেলা পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ বছরের খেলাগুলো এখন ঝুলছে আইন আদালতের আঙিনায়.....!

অশোক অরোরা (নর্দান বেনজী লীগ, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলকাতা—৭)

প্রশ্ন : এমন কি কোন রেকর্ড আছে যে একজন গোলরক্ষক এক সিজনে কোন গোল খান নি?

উত্তর : মনে হয় নেই!

হরেন্দ্র তিওয়ারী (কলকাতা—৭)

প্রশ্ন : বোলার বল করলো। বল ব্যাটে না লেগে ব্যাটসম্যান যখন ক্রীজের মধ্যে তখন প্রথমে উরুতে লাগার পর প্যাডের মধ্যে পড়ে পায়ে লাগলো। এল· বি· ডব্লিউ হবে কি?

উত্তর : যদি আম্পায়ার মনে করেন যে ব্যাটসম্যানের পা উইকেট আড়াল করে ছিলো অর্থাৎ পায়ে না লাগলে বলটা নির্ঘাৎ উইকেট ভেঙে দিত আর বলটা লেগস্টাম্পের বাইরে পড়ে নি তাহলে ব্যাটসম্যানকে এল· বি· ডব্লিউ-এর নির্দেশ দেবেন আম্পায়ার।

প্রভাত ভট্টাচার্য (নর্দান বেনজী লীগ, কলকাতা—৭)

প্রশ্ন : ব্যাটসম্যান একটা বল ঠুকে রান নেবার চেষ্টা করলো। একজন ফিল্ডসম্যান বলটা তুলে নিতে এসে দুজনের মধ্যে সংঘর্ষ হলো (ক্রীজের
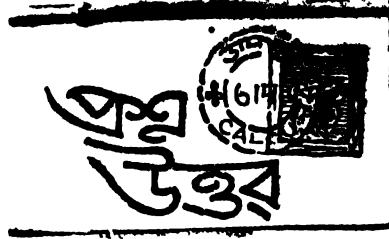
বাইরে)—ফলে দুজনেই মাটিতে পড়ে গেলো। অন্য একজন ফিল্ডার ছুটে এসে বল ছুঁড়ে উইকেট ভাঙলো। আউট হবে কি ব্যাটসম্যান?

উত্তর : নিশ্চয়ই হবে।

অমিত বসু (কলকাতা—৭)

প্রশ্ন : লন টেনিস খেলা পুরোদমে চলার সময় একজন খেলোয়াড় হাত দিয়ে বল ধরে ব্যাট বদল করার আবেদন জানালো। এ ক্ষেত্রে পয়েন্ট যাবে না কি?

উত্তর : পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে সব কিছু।

সুব্রত মিত্র (লোয়ার চিৎপুর রোড, কলকাতা—৭)

প্রশ্ন : গোল হলো। বল জালে ঢুকলো। গোলরক্ষক এসে দেখালো যে বলটা পাংচার হয়ে গেছে। গোল নাকচ হবে কি না?

উত্তর : রেফারীর ওপর নির্ভর করবে। কারণ গোল হবার সময় রেফারী গোলের কাছাকাছি ছিলেন। তিনিই ব্যাপারটা ভালো বুঝবেন ও যা করণীয় তাই করবেন।

ঈপ্সিতা মণ্ডল (নর্দান বেনজী লীগ, কলকাতা—৭)

প্রশ্ন : বাম্প ক্যাচ ও ক্যাচে সন্দেহ থাকলে কি করা হয়?

উত্তর : ব্যাটসম্যান আউট দেবার আগে কোনরকম সন্দেহ জাগলে আম্পায়ারের রায় সাধারণত ব্যাটসম্যানের অনুকূলেই যায়। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও তাই হবে।

হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

উত্তর : আপনার চিঠিটি হুবহু তুলে দিলাম, "গত ২৫শ সংখ্যায় সুজন মুখার্জী ও টাইগারের প্রশ্নের উত্তর (ট্রুম্যানের রেকর্ড) প্রকাশিত হয়েছে। তাতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ট্রুম্যান যত রান দিয়েছেন তার হিসেব দেওয়া হয়েছে ১৯১৯ রান। কিন্তু এটা ভুল। আসলে হবে ১৯১১ রান...!"

(বৌবাজার স্ট্রীট, রোড, কলকাতা—২)

প্রশ্ন : "মজফরে বোলিং ডলিভিয়ের বিষয়ে যে প্রশ্ন করেছিলুম তা উত্তর না পাওয়ায় আমরা বড়ই ক্ষুব্ধ আপনি যখন প্রশ্ন-উত্তর বিভাগ খুলেছেন তখন যদি প্রশ্নের উত্তর নাই দিতে পারেন তবে সেটা লজ্জার বিষয়। বলেই দিতে পারতেন উত্তর দিতে পারবো না তাহলে এইবার থেকে জানা রইল যে আপনাকে বাচ্চা ছেলেদের মত প্রশ্ন করতে হবে। মনে হয় একমাত্র তারই উত্তর দিতে পারবেন। যদি বলে দিতেন তাহলে ... থেকে জানার চেষ্টা ... যা হোক এবার যা প্রশ্ন করছি তার যথাযথ উত্তর পেলে বুঝবে 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগ সার্থক।"

উত্তর : বাবা : এর পরেও কি আর আপনাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পারা যায়!

তবে কিনা ডলিভিয়েবার জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল "আজকের মানুষ" বিভাগে। তাই উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি।

যাই হোক ১৯৩০ সালে উরুগুয়েই প্রথম বিশ্ব কাপ পেয়েছিল।

নরেন রায় (শিবপুর, হাওড়া)

প্রশ্ন : বড় ফুটবল খেলোয়াড় হতে হলে কি করতে হবে?

উত্তর : এ প্রশ্নটি আর একজন করেছিলেন। আমরা বলেছিলাম :

প্রথমে কোচের পায়ে আর পরে নিজের পায়ে তেল মালিশ......!

সম্পাদিকা—প্রণতী সেন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-১২

বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।